ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষ

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড—আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ]

১৩২১

বিষয়নির্ব্বিশেষে বর্ণানুক্রমিক

প্রবন্ধমালা

শিল্প—কৃষি—বিজ্ঞান—বাণিজ্য

অর্থনীতি

ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন

ইতিহাস – প্রত্নতত্ত্ব

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—দেশের বিবরণ

জীবনী

বিবিধ

গল্প-স্বল্প

উপন্যাস—ধারাবাহিক

ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ

ব্যঙ্গকবিতা

কবিতা—গাথা

সঙ্গীত

স্বরলিপি

পুস্তক-পরিচয়

ভারতবর্ষ—সূচি

দ্বিতীয় বর্ষ

[প্রথম খণ্ড—আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ

১৩২১

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক নামানুসারে

প্রবন্ধমালা

চিত্রাবলী

মনস্বীবর্গের প্রতিকৃতি

(পত্রাঙ্কানুক্রমিক)

স্থানীয় দৃশ্যাবলী

(পত্রাঙ্কানুক্রমিক)

পৃষ্ঠাব্যাপী

বহুবর্ণ-চিত্র

আষাঢ়

[১—১৬৮ পৃষ্ঠা]

শ্রাবণ

[১৬৯—৩৬৮ পৃষ্ঠা]

ভাদ্র

[৩৬৯—৫৬৬ পৃষ্ঠা]

আশ্বিন

[৫৬৯—৭৬০ পৃষ্ঠা]

কার্ত্তিক

[৭৬১—৯৬০ পৃষ্ঠা]

অগ্রহায়ণ

[৯৬১—১১৩৬ পৃষ্ঠা]

"ভারতবর্ষের" গতবর্ষ

"ভারতবর্ষ" এই গরিমময় নাম লইয়া আমরা গত বৎসর এই এমনই দিনে—প্রাবৃটের এই এমনই প্রথম ধারার মত, মা বঙ্গবাণীর অমৃতধারা বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, বিশেষ সঙ্কোচের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কতটা সে কার্য্য করিতে পারিয়াছি, তাহা 'ফলেন পরিচীয়তে',—ভারতবর্ষের নিয়মিত পাঠকবর্গকে তাহার আর পরিচয় দিতে হইবে না। মাসের পর মাস বঙ্গবাণীর যে নির্ম্মাল্য-নৈবেদ্যে অর্ঘ্যপাত্র সাজাইয়া আমরা তাঁহাদের দ্বারে প্রতিমাসের শুভ প্রথম দিনে উপস্থিত হইয়াছি ;—হয় ত অকিঞ্চন-অভাজনের পূজাসম্ভারে পলাশ, ঘেঁটুর ন্যায় নির্গন্ধ বা দুর্গন্ধ ফুলের আধিক্য, মৃগচন্দনাদির অভাব, পূত গঙ্গাসলিলবিন্দুর পরিবর্ত্তে—পঙ্কিল কূপোদক, আর দিব্য সুগন্ধ শালিধান্যের অক্ষত-নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে নীবারকণার বা শ্যামাবীজের নৈবেদ্য দিয়া সারিতে হইয়াছে,—অবশ্য সেগুলি মা ভাষাজননীর নির্ম্মাল্যবোধে সকলের নিকটে উপেক্ষিত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু প্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য তেমন আশানুরূপ আগ্রহও ত দেখা যায় নাই! তাই, কবিকঙ্কণের ন্যায় বর্ষশেষে "নৈবেদ্য শালুক-পোড়া" বলিয়া আজ আমাদের কাঁদিতে হইতেছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই?—যাঁহার কৃপায়—'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্,'—আমরা যে তাঁহারই নাম লইয়া নামিয়াছিলাম—তাঁহার নামে কি কলঙ্ক হইবে? আমরা ভাগ্যদোষে নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিতে না পারি, কিন্তু যাঁহার নামে কার্য্যারম্ভ করিয়াছি, তাঁহার নামেই বা কলঙ্ক হইবে কেন? আর তাঁহার নামে যে কার্য্যের সূচনা হইয়াছে, তাহাই বা নিষ্ফল হইবে কেন? দুর্গানামে যাত্রা করিলে, নামের গুণেই যাত্রায় কোন বিপদ্ ঘটে না; ঘটিলেও সে বিপদ্ কাটিয়া যায়—এই বিশ্বাসেই লহনা-খুল্লনা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক শ্রীমন্তকে পিতৃ-অন্বেষণে অজ্ঞাত দেশ দক্ষিণ পাটনে পাঠাইতে পারিয়াছিল; আর শ্রীমন্ত মহাবিপদে,—যে মহামায়ার নামে বিপদুদ্ধার হইবে, সেই মহামায়ারই মায়াচক্রে পড়িয়া,—তাহা হইতে উদ্ধার হইয়াছিল।

আমরা কর্ত্তা, এই মনে করিয়া আমাদের আরব্ধ কার্য্যে—আমাদের অদৃষ্ট মিশাইয়া—তাহার সফলতা—নিষ্ফলতার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া—তৃপ্ত হইতে চাই; কিন্তু যদি মনে করি,—যাহার প্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কর্ত্তা তিনি,—তখন আমরা যন্ত্রমাত্র; তখন কর্ম্মে আমাদের দায়িত্ব কাটিয়া যায়,—যিনি কর্ত্তা—কর্ম্মও তাঁহার—এই হইয়া পড়ে। গীতার কর্ম্মযোগে ভগবান্ এই মূল সূত্রটুকুই বুঝাইয়াছেন। তবে একটা ভাবিবার আছে,—যন্ত্রে দোষ থাকিলে, কার্য্যে দোষ ঘটিবে,—ইহা অনিবার্য্য; কাজেই যন্ত্র আমরা—ক্ষুদ্র আমরা—আমাদের কর্ম্মে দোষ ঘটিবে বৈ কি!

তবে, আর কিছু করিতে পারি আর না পারি, কি করিয়াছি,—প্রাপ্তভার কার্য্যের কতটা কি করিতে পারিয়াছি, তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাঙ্গালার যাঁহারা সাহিত্যের ধুরন্ধর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনা-সম্ভারে "ভারতবর্ষ" এই একবৎসর কাল অলঙ্কৃত হইয়াছে। একই বৃক্ষে যখন অপুষ্ট সুপুষ্ট ফল একই সময়ে ধরিতে দেখা যায়, তখন ঐ সকল মনীষি-লেখকের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত রচনাগুলি পাঠক ও সমালোচকবর্গের যদি পূর্ণতৃপ্তি দিতে না পারিয়া থাকে, তজ্জন্য উদ্যানরচকের অপরাধ কিছু আছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন নবীন-লেখকের রচনারাশিও "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়া তাহাকে যে কেবলই নিন্দিত করিয়াছে, এমন কথা আমাদের কোন সমালোচকও বলেন না। এই সকল লেখকের রচনা ব্যতীত ভারতবর্ষে অনেক নূতন বিষয় নূতন প্রণালীতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"ভারতবর্ষ" যখন আসরে নামিল, তখন একটা কথা উঠিয়াছিল, এই শ্রেণীর মাসিক পত্রের কি অভাব আছে? ঠিক এই প্রশ্নের আবৃত্তি প্রতি নূতন মাসিক পত্রের আবির্ভাব কালেই হয়। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মাসিক "বঙ্গদর্শনে"র পরে যখন "আর্য্য-দর্শন" প্রকাশিত হয়, তখনও এ কথাটা উঠিয়াছিল; আবার "বঙ্গদর্শন"—নবপর্য্যায় যখন বাহির হয়, তখন কথাটা উঠিয়াছিল,—আর ইহার প্রয়োজন কি? পরে, ক্রমে যখন অপরাপর মাসিক জন্মিল, তখনও ঐ প্রশ্ন উঠে। কিন্তু অপরিণামদর্শী আমরা—কার্য্য-কারণের-ভবিষ্যৎ-দর্শনে

অন্ধ আমরা—আমাদের এ প্রশ্ন করাই যে ভুল হয়। সে ভুল [illegible] ঐ সকল সুপরিচালিত মাসিকপত্রের স্থায়িত্ব দেখিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। গত কএক বৎসরের মধ্যে অনেক মাসিক পত্রিকা জন্মিয়াছিল; তাহার কতক বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। যাহারা স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল না, একথা বলা ধৃষ্টতামাত্র; যাহারা নূতন প্রণালীতে মাসিকপত্র পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন,—তাঁহাদের একটু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখা উচিত। সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সমাজ তাহার উপায় আপনিই করিয়া লয়, আর তাহা স্থায়ী হইয়া যায়, অন্যথা কোন বিষয়ের চেষ্টা করিলে তাহা অসাময়িক বা প্রয়োজনের বহু অগ্রবর্ত্তী বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এখন এমন হইয়াছে,—সমস্ত প্রধান মাসিকপত্রেই উপযুক্ত, সুন্দর, শিল্পকৌশল-সম্পন্ন বহুচিত্রের সমাবেশ হইতেছে। ‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’র চেষ্টায় তাহাতে এবং তদনুসরণে অন্যান্য পত্রিকায় শিলালেখ, তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’র পত্রিকার ন্যায় সুন্দর হইয়া ছাপা হইতেছে।—এখন ছবি মাসিকপত্র-প্রকাশের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

মাসিকপত্রের অবস্থা এখন যাহা দাড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সকলেই পাচফুলে সাজি সাজাইয়া পাঠক-দেবতার সেবায় লাগাইতেছেন, আর যাহার সাজিতে সুদৃশ্য ও সুগন্ধ ফুলের যত ঘন সন্নিবেশ হইতেছে, তাহার ততই কৃতিত্ব জাহির হইতেছে। একটা ধুয়া উঠিয়াছে, লোকে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে, তাই গভীর বিষয়ের আলোচনা পড়িতে চায় না—মাসিকপত্রের পরিচালক আমরা—আমরা কিন্তু সে কথা মানি না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেবল গল্পময়ী পত্রিকা প্রাচীন “উপন্যাস-রত্নাবলী”, “উপন্যাস-মঞ্জরী”, “আদরিণী” এবং সেদিনের “নন্দন-কানন”, “দারোগার দপ্তর”, প্রভৃতি উঠিয়া যাইত না; কেবল কবিতাময়ী পত্রিকা “বীণা”, “লহরী” প্রভৃতি লোপ পাইত না। সত্য বটে, এখনকার কালেও গল্প-কবিতা-উপন্যাস দিলে “হাটে নাহি বাট মিলে”—কিন্তু হাটে বল করিয়া দাঁড়াইতে হইলে, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমালোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়ই ত বাদ দিতে পারা যায় না; কেহ কেহ গল্প ও [illegible] বাদ দিয়া [illegible] রাখিয়াছেন;—কৈ, তাঁহাদের যে বিশেষ কিছু সম্ভ্রম বাড়িয়াছে, তাহা ত অনুভূত হইতেছে না। কেহ কেহ নাটক দিয়া আসর জমকাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৈ তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ সফলতা কিছু হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ‘ভারতবর্ষে’র পূর্ব্বেও মাসিকপত্রিকার হাটের যে অবস্থা ছিল, যেমন কেনা-বেচা হইত, যে শ্রেণীর খরিদ্দার যাতায়াত করিত, গতবর্ষেও ঠিক সেই অবস্থা গিয়াছে। কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তবে কএকবর্ষ হইতে শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের মত শিশু-পাঠ্য মাসিকপত্রের কিছু প্রাবল্য হইয়াছে,—এই ত গেল মাসিকপত্রের হাটের অবস্থা, কাজেই ‘ভারতবর্ষের’ ‘গতবর্ষ’ গতানুগতিক ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। ‘ভারতবর্ষ’ নূতন জন্মিলেও হাটের বেসাতির অবস্থা ও খরিদ্দারের রুচি বুঝিয়া বিশেষ কিছু নূতন পসরা লইয়া নূতন জিনিসের বেসাত করিতে অবসরও পায় নাই।—এই বয়ে কি করিবে, তাহার আশ্বাস এখন কিসের উপর নির্ভর করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা নির্ণয় করিবারও বিশেষ কোন হিসাব পাওয়া যাইতেছে না! অভাবের হিসাব দিয়াছি,—অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে,—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। তারপর—ভগবানের ইচ্ছা।

আমাদের বর্ষ সমালোচনার উপসংহার এইখানেই হউক—এ দুনিয়ায় আত্মপ্রশংসাই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট লাগে,—সেই মিষ্ট-সংবাদ আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে আরও অধিক মিষ্ট লাগিতেছে,—কেন জানেন? —এ প্রশংসা ঠিক আত্মপ্রশংসা নহে,—ইহা আমাদের গ্রাহক-পাঠকের গুণগ্রাহিতার পরিচয়, আমাদের সহস্র ত্রুটী বিচ্যুতিসত্ত্বেও তাঁহাদের ক্ষমার পরিচয়, তাঁহাদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়!—আমাদের দেশবাসীর এই সকল গুণের পরিচয় দিতেই আমাদের এত আনন্দ!—নতুবা আত্মশ্লাঘা—তাও আবার আত্মমুখে করিয়া—গর্ব্ব করা মূর্খেও সমীচীন মনে করে না।

অতঃপর ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া, অনুগ্রাহক, গ্রাহক ও পাঠকবর্গের জয়গান করিয়া, সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া আর এক বৎসরের জন্য সাহিত্যসেবা-ব্রতের সংকল্প লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছি।

পুরাতন প্রসঙ্গ

(নবপর্য্যায়)

১

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি যে, আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত গাড়ি লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের গৃহে পৌঁছিয়া প্রথমেই তাঁহার পিতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চরণবন্দনা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

করিলাম। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ; শ্রবণেন্দ্রিয়ও পূর্ব্বের মত সবল নহে; দেহ কৃশ, কিন্তু সতেজ।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমি বলিলাম—"আপনার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি আমি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছি; শিক্ষিত-সমাজে তাহা অনাদৃত হয় নাই; কিন্তু আপনি যে সকল কথা বলিতে পারেন, তাহা আর কেহ পারিবেন না!" ক্ষণেক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—"আমার পূর্ব্বস্মৃতি শুনিতে চাও? বহু পুরাতন কথা আমার বেশ মনে আছে বটে, একটিও বিস্মৃত হই নাই। তবে শোন।

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমি জন্মগ্রহণ করি; ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। তিনি কলিকাতায় চাকরি করিতেন; পীড়িত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিলেন,—মরিবার জন্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একবার আমাকে বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন; সেই নিবিড় আলিঙ্গনের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সাথী হইয়া আছে। এত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে আমার জীবন আবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অতি শৈশবের এই স্মৃতিটুকু মুছিয়া যায় নাই।

"কৃষ্ণনগর একটা নগর নহে; অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি। গোবিন্দ সড়ক, বৈকুণ্ঠ সড়ক, নতুন সড়ক, চাঁদসড়ক, হট্টনগর, আমিন বাজার, গোয়াড়ি, সোন্দা, ঘুর্ণী, মালোপাড়া, পান্নালা, নেদেরপাড়া, বেলডাঙ্গা, রুইপুকুর, বাঘাডাঙ্গা প্রভৃতি ৩০।৪০টি স্বতন্ত্র স্বাধীন গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল—শিবনিবাস; সেখান হইতে আসিয়া তিনি এই সমস্ত গ্রাম একত্র করিয়া একটি বড় নগর স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম হইল কৃষ্ণনগর। আমাদের এই পাড়ার নাম নেদেরপাড়া কেন হ'ল জান? হট্টনগরের দত্তরা মহারাজের কর্ম্মচারী ছিলেন; সমাজে তাঁহারা "হটু দত্ত" বলিয়া পরিচিত; মহারাজের নিকট হইতে তাঁহারা এই গ্রামটি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন; অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়া এখানে একটি ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপিত করিলেন; রাজকোষে কিন্তু একটি পয়সাও দিতেন

না ; ক্রমে ইহার "না দেয়ার পাড়া" নাম জাহির হইল ; অল্প রূপান্তরিত হইয়া উহা 'নেদের পাড়ায়' দাড়াইল। ক্রমে হটু দত্তদিগের বংশলোপের উপক্রম হইল ; নিকটস্থ পান্নালা গ্রামের গুপ্ত-বংশ হইতে একটি ছেলেকে আনিয়া পোষ্যপুত্রগ্রহণের আয়োজন করা হইল ; কিন্তু adoption-এর অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটির স্বীবিয়োগ হয় ; সুতরাং ছেলেটি পোষ্যপুত্র হইল না বটে, কিন্তু হটুদত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইল। তদবধি সে "দত্ত" উপাধি গ্রহণ করিল। ইনিই আমার পূর্ব্বপুরুষ। এই জন্যই আমরা "দত্ত' বলিয়া পরিচিত ; বস্তুতঃ আমরা পান্নালার গুপ্ত।

"পিতার মৃত্যুর পর জ্যাঠামহাশয় চার পাচ বৎসর আমাদিগকে ভরণপোষণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন ; পরে মোক্তারি করিতেন। বাল্যকালেই আমার struggle আরম্ভ হইল।

'পাচ বৎসর বয়সে পুরোহিত ঠাকুর আমার হাতে খড়ি দিলেন। মেজদাদা আমাকে পাঠশালায় লইয়া গেলেন ; বলিয়া দিলেন যে, আট বার দাগা বুলাইতে হইবে, নহিলে বাড়ি আসা হইবে না। দুর্গানন্দ রায়ের বাটীতে পাঠশালা ছিল ; চার পাচ বছর পড়িতে হইত। প্রথম বৎসর, খড়িতে লেখা ; দ্বিতীয় বৎসর, তালপাত ; তৃতীয় বৎসর, কলাপাত ; চতুর্থ বৎসর, কাগজে লেখা। তখন আমি পাঠশালার "সদ্দার পোড়ো", নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইতাম। গুরুমহাশয়ের নাম রঘুনাথ রায় ; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আমাদের কুটীরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অনেকদূর পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যাইত ; গুরুমহাশয় আমাকে কাঁধে করিয়া পাঠশালায় লইয়া যাইতেন, ও অপরাহ্নে পাঠশালা হইতে গৃহে লইয়া আসিতেন। দরিদ্র বিধবার এই পঞ্চমবর্ষীয় শিশুপুত্রটি পাঠশালায় উপস্থিত না থাকিলে, গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনায় মন লাগিত না। তাঁহার বংশে এখন কেহই জীবিত নাই। তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহের কথা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। গুরুমহাশয়কে সচ্ছল গৃহস্থের ছেলেরা পূজা-পার্ব্বণে কাপড় চোপড় দিত ; কিন্তু সাধারণতঃ বেতন-স্বরূপ এক আনা, দুই আনা, চার আনা পর্য্যন্ত দিতে হইত।

"পাঠশালায় প্রথম দুই তিন বৎসর কেবল লেখ মুদ্রিত পুস্তকের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না বলি চলে ; "আমড়াতলার ছাপা" বলিয়া পরিচিত দাতা প্রহ্লাদচরিত্র, চাণক্যের শ্লোক, গুরুমহাশয় মুখে

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আবৃত্তি করিয়া বলিতেন ; আমরা শুনিয়া মুখস্থ করিতাম হয় ত দুই চারি জন ছাত্র বইগুলি ক্রয় করিত। থা পত্র লেখা ; জরিপ চিঠে ; জমাখরচ ; জমাওয়াশি বাকি ; এই সমস্ত আমরা শিখিতাম। কাহাকে কি "পা লিখিতে হইবে, তাহা আমাদের মুখস্থ ছিল। এক আধটু এখনও স্মরণ আছে।

গাঁয়ের জমিদার যদি হয় মুসলমান,
বন্দের সেলাম বলে' লিখিবে তখন।

"সমস্ত "পাঠ" শ্লোকের মধ্যে গ্রথিত ছিল। লিখিবা জন্য কলাপাত চাই ; কাহারও বাগানে প্রবেশ করি কলাপাত কাটিয়া আনা হইত ; এ সম্বন্ধে কাহারও কোন নিষেধ ছিল না ; ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। এক রক পাটী (মাদুর) তৈয়ারী হইত, তাহার নাম "পড়ো পাটী

গার পড়ুয়ারা এই সব ছোট ছোট মাদুরে বসিত); সমস্ত গ্রামেই খুব বেশী বিক্রয় হইত; গত পঞ্চাশ বৎসরে বোধ হয় এ ব্যবসাটি লুপ্ত হইয়াছে। শরের বা কঞ্চির বা কলমির (শাক নহে) কলম ব্যবহৃত হইত। লেখাপড়ার খরচ কত কম ছিল, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ; অথচ ইহাই যথার্থ Mass Education ছিল।

"মুখে মুখে নামতা পড়ান হইত; অঙ্কের বই ছিল না; tables গুলা, কাঠাকালি, কুড়োকালি মুখে মুখে হইত। তখনকার লেখাপড়ার ব্যবস্থা এই রকম ছিল। বৈদ্য-সন্তান হাতের লেখা পুঁথি পাঠ করিয়া কবিরাজি শিক্ষা করিতেন; সকলেই হাতের লেখা ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেন। একখানি বই সাধারণতঃ গৃহস্থের কুটীরে প্রবেশলাভ করিত,—সেটি পঞ্জিকা। পাজি দেখিয়া সব কাজ করা হইত; এমন কি ঘর ছাইবার জন্য ঘরামি লাগাইতে কবে হইবে, তাহাও পাজি দেখিয়া স্থির করা হইত। দোকানদারের ছেলে,—মালীর, তেলীর, কামারের, ছুতারের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল; অল্প লেখা পড়া শিখিয়াই তাহারা পাঠশালা পরিত্যাগ করিত; বড় বড় রাজমিস্ত্রীরা লিখিতে পারিত না, হিসাব করিতে পারিত না, পাঠশালায় আসিয়া এক বৎসর অধ্যয়ন করিত।

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিশনরি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। বিদ্যালয়টি ঐ বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনরিরা গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলি দেখিয়া বেড়াইত। এ পরিদর্শন অবশ্যই গভর্মেণ্টের অনুমোদিত ছিল না। কলিকাতার 'মিশনরি সোসাইটি' হইতে তাঁহাদের উপর এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন দেশীয় পাঠশালাগুলির শিক্ষাপ্রণালী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। পাদরী সাহেবেরা দরিদ্র গুরুমহাশয়দিগকে কিছু অর্থদানে আপ্যায়িত করিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। দশ বৎসর পরে একটি মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; মিশনরিরা চিন্তামণি সরকার নামক একটি ছাত্রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। সেই স্কুলের শিক্ষক ব্রজবাবু * তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিলেন। কালীচরণবাবু ও আমি তাঁহার সহিত যোগ দিয়া একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত করিলাম। এই জন্য ইহাকে সাধারণতঃ ব্রজবাবুর স্কুল বলে। আজ প্রায় ৬৫ বৎসর ধরিয়া সেই A. V. School বেশ চলিয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, আমি দশম বর্ষে সেই পাদরীদের স্কুলে প্রবেশ করিলাম। অধ্যক্ষ C. H. Blumhardt 'ট' বলিতে পারিতেন না, 'ত' বলিতেন। ডিয়ার সাহেব আমাদের সেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিতেন। পাদরী সাহেবের একখানা বই পাঠশালায় পড়া হইত; বইখানি একটি অভিধান-বিশেষ। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছেলেরা উহা মুখস্থ করিত; আমি তখন খড়ি লিখি, বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র; তাঁহাদের আবৃত্তি শুনিয়া আমারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমিও আবৃত্তি করিতাম—

অংশ = ভাগ
অঙ্ক = চিহ্ন
অন্য = পর

"ডিয়ার সাহেব পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিলে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ঐ বই হইতে প্রশ্ন করিলেন; তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না। আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবকে বলিলাম, "আমি বলিতে পারি"; সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া আমাকে একটি পয়সা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

"মিশনরি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল হইত না; ইংরাজি First Reader পুস্তকখানি পড়িলাম; বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে ৺রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর পঞ্চম পুত্র শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী তাঁহাদের বাড়ীর দালানে আমাদিগকে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর ছয় ছেলে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ—কেশব, দ্বিতীয় পুত্রের নাম—তারাবিলাস, তৃতীয় পুত্রের নাম রামতনু। শ্রীপ্রসাদ কালেক্টরের মুহুরী ছিলেন, Hobhouse সাহেবের কাছে যাইতেন; তিনি আমাকে যেটুকু ইংরাজি শিখাইয়াছিলেন, তাহা আমার বড় কাজে লাগিল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

"লাহিড়ী মহাশয়েরা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ কুলীন; ছ'ঘরের মধ্যে বংশমর্যাদায় উচ্চতম। কলিকাতার হিন্দুকলেজে যখন De Rozio শিক্ষকতা করিতেন, তখন রামতনু

* এই ব্রজবাবু (৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইনিই 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী'র স্বত্বাধিকারী।

লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায়

রামতনু লাহিড়ী

পটলডাঙ্গায় শ্যামাচরণ সরকার ও রামতনু বাবু একটি ছোট বাসায় মেস করিয়া থাকিতেন। বহুদিন পরে শ্যামাচরণ সরকারের একটি ছোটখাটো জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন যে, শ্যামাচরণ এক সময়ে সামান্য পাচক '(cook) ছিলেন। রামতনুবাবু ইহা contradict করিয়া বলেন—'আমরা কলেজে পড়িবার সময়ে বাসায় থাকিতাম। মাঝে মাঝে যখন পাচক থাকিত না, আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাঁধিতাম; বোধ হয় সেই জন্যই লেখক স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্যামাচরণ cook ছিলেন।' রামতনুবাবু রসিককৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; রসিককৃষ্ণের নাম করিবার সময় তাঁহার চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন—'রসিকের মত thoughtful মানুষ আমি দেখি নাই; রসিক dared to think for himself।' রামগোপাল ঘোষকেও তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, রামগোপালের চরিত্র-দৌর্ব্বল্য ছিল; তথাপি রামগোপাল তাঁহার শ্র[illegible] ছিল। শেষ পর্য্যন্ত রামতনুবাবুর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁ

রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষক ডি, রোজিও তাঁহার নৈতিক চরিত্র গঠিত কা দিয়াছিলেন। সাহেব নিজে Free-thinker ছিলে ছাত্রগুলিও সেই রকম দাড়াইল। ঐ একম

রামগোপাল ঘোষ

মাসাট চাকরি গেল। কালক্রমে রামতনু বাবু ব্রাহ্ম- সমাজে প্রবেশ করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা রামমোহন রায় যখন খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন; তর্ক করিয়া Dr. Adamsকে পরাজিত করিলেন; তখন রামতনুবাবু তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, বাপের শ্রাদ্ধ করেন নাই।

ডি. বোথড

"আমার এক আত্মীয় রেজেষ্টরি আপিসের মুন্সী ছিলেন; আমি তাঁহার নিকটে নকল-নবিসি কাজ করিতে লাগিলাম; কৃষ্ণনগরের ডাক্তার সাহেব (Civil Surgeon) ডাক্তার ফুলার তখন রেজিষ্ট্রার। ১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি ডাক্তার সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। তদবধি ঐ ডিপার্টমেন্টটা আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে আসিল। তখন চার্ল্‌স্ প্যারি হব্‌হাউস্ (Charles Parry Hobhouse) জেলার অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, লর্ড ব্রাউটন (Lord Broughton) পরে President of the Board of Control হন। চার্ল্‌স্ পরে—স্যর চার্ল্‌স্ হব্‌হাউস্ হইয়াছিলেন; আমাদের Court Fees Actএর ইনি জনক। এই সাহেবই আমার ভাগ্যবিধাতা হইলেন। আমার সহিত একটি আধটি কথা কহিতেন; আমি শ্রীপ্রসাদ বাবুর আশীর্বাদে যে টুকু ইংরাজি আয়ত্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতাম। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার সেই আত্মীয় মুন্সী মহাশয়কে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা এ ছেলেটি পড়া শুনা করে।" তখন সবে মাত্র কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহার ইচ্ছা আমি সেই কলেজে ভর্ত্তি হই। আমি কলেজে অধ্যয়নের ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থ শুনিয়া তিনি নিজে টাকা দিয়া আমাকে কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি আমি কলেজে ভর্ত্তি হই।

"এখন যে স্থানটি "পুরাণো কলেজের হাতা" নামে পরিচিত উহার একটু ইতিহাস আছে। ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বে বড় ডাকাতি হইত; পুলিস কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, তাঁহার নাম এলিয়ট্। তিনি ভবানীপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় একজন ধনাঢ্য ভদ্রলোককে বলিলেন, 'তুমি যদি ঐ খানে একখানি বাড়ি করিয়া দিতে পার, উহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসগৃহ হইবে; একদিনও খালি থাকিবে না; তুমি উপযুক্ত ভাড়া পাইবে। ভদ্রলোক বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির সম্মুখেই বড় রাস্তা; রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশের থানা বসিল। অল্পদিনের মধ্যেই ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল। তখন গোয়াড়ি অঞ্চলে লোকে বাস করিতে আরম্ভ করিল; নূতন নূতন বসতবাটি নির্ম্মিত হইল। কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগরে কলেজস্থাপনার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতার সমস্ত সাহেব মত প্রকাশ করিলেন। একা বীডন সাহেব (মিঃ সেসিল বীডন) প্রস্তাবের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কলেজ স্থাপন করা যখন স্থির হইল, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেভর (Trevor) কলেজের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ বাড়িটি ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইল।

"কলেজ চালাইবার জন্য একটি স্থানীয় কাউন্সিল গঠিত হইল; তাহার সদস্য হইলেন—কৃষ্ণনগরের মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব। যে নূতন সিভিল সার্জ্জন আসিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার চার্ল্‌স্ আর্চার (Dr.

(Charles Archer); তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন; পরে ইনি 'Opthalmic Surgery'র অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে যখন হাওড়ায় ও অন্যত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া কেবলই সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতি-কল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দশ বারটি ছেলের মাসিক বেতন তিনি নিজের পকেট হইতে দিতেন; সন্ধ্যার পর 'Natural Philosophy'র উপর বক্তৃতা দিতেন; আমরা সেই বক্তৃতা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন; আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন, আমার সতীর্থ বন্ধু অম্বিকাচরণ ঘোষ; আমি দ্বিতীয় স্থান পাইলাম। উভয়েই তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাইলাম। অম্বিকা Whewell's History of the Physical Sciences পাইলেন; আমি পাইলাম Arnold's History of Rome। ম্যাজিষ্ট্রেট E. T. Trevor অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; আমাদের অঙ্কের পরীক্ষা লইতেন; আমাকে তিনি একখানি প্লেফেয়ারের 'ইউক্লিড' কিনিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি তাঁহার বাড়িতে যাইতাম, তিনি আমাকে ইউক্লিড্ পড়াইতেন; তিনি আমার জ্যামিতির সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক; ১৮৪৮ সালে আমাকে তিনি Mitford's History of Greece প্রাইজ্ দেন। তাঁহার বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; সেই লাইব্রেরী ঘরে সকাল বেলায় আমি ইউক্লিড পড়িতাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস বিনি ট্রেভর (Charles Binny Trevor) বারাসতে জজ ছিলেন; রোজ সকালে পকেটে টাকা লইয়া বাহির হইতেন; যত ছেলে দেখিতে পাইতেন, তাহাদিগকে খাবার কিনিয়া দিতেন।

"কৃষ্ণনগরে ট্রেভর সাহেব যে বাংলায় বাস করিতেন, তাহার এক অংশে হব্‌হাউস্ থাকিতেন। তিনি প্রাতঃকালে একাগ্রচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহাদের একটি Book Club ছিল; নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাঁহারা কিনিয়া আনিতেন। হব্‌হাউস আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন। কাপ্তেন প্যারীর (Captain Parry) কথা শুনিয়াছ কি? লেখাপড়া খুব জানিত; সাগরবক্ষে দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। Prescott তাঁহার Essay on Lockhart's Life of S[illegible] একস্থলে কাপ্তেন প্যারীকে Literary Sindbad [illegible] প্রদান করিয়াছেন। সেই কাপ্তেন প্যারী আমা[illegible] অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হব্‌হাউসের পিসেমহাশয় ছিলে[ন।] হব্‌হাউসের নামকরণের সময় তিনি baptismal font [এ] Sponsor হইয়াছিলেন; তাই উঁহার নাম হইল পা[রী] হব্‌হাউস্ (Parry Hobhouse)।

"আমি ত একেবারে কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। লর্ড মেকলের মন্তব্যানুস[ারে] কার্য্যারম্ভের পর School Book Society স্থাপি[ত] হইয়াছিল। তাহারা অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক ধারাবাহি[ক]ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল; সেই গুলিই সকল পাঠ্য হইত। আমরা কি কি বই পড়িতাম শুনিবে?

১। Fifth Number Reader—(School Boo[k] Society's Publication)।

২। Second Number Reader—(ইহার মধ্যে Miss. Edgeworth এর একটি গল্প ছিল)।

৩। Stewart's Geography

৪। Chamier's Arithmetic.

৫। Gay's Fables.

৬। Goldsmith's History of Rome.

৭। Third Number Prose Reader—(ইহাতে Æsop's Fables ছিল)।

৮। জ্ঞানার্ণব—ইয়েটস্ সাহেব (Rev: W. Yate[s] D. D.) কর্ত্তৃক বিরচিত।

৯। সারসংগ্রহ— ঐ (বিলাতী রীতিনীতি সম্বন্ধে পাঠ সন্নিবেশিত ছিল)

প্রথমে আমরা পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন করি; পরে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আমাদের বাঙ্গালার অধ্যাপক হইলেন। খড়িয়ার ওপারে বিশ্বগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন; পরে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তিনি আমাদিগকে কোন্ পুস্তক পড়াইয়াছিলেন, ঠিক তাহা আমার স্মরণ নাই। গল্প করিতে তিনি খু[ব] ভালবাসিতেন। মুখে মুখে আমাদিগকে বাঙ্গালা ব্যাকর[ণ]

শিখাইতেন; বড় কড়া লোক ছিলেন; ছেলেদের পলায়ন-নিবারণ করিবার জন্য তিনি নিজের একটি স্বতন্ত্র রেজিষ্টর খাতা করিয়াছিলেন। পরে যখন বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হইল, তিনি ঐ পুস্তক খানি আমাদিগকে পড়াইতেন।

"মদনমোহন খুব তেজস্বী ছিলেন। একদিন একজন ... সাহেব কর্ম্মচারী পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আহ্বান করিয়াছিল; পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'খবরদার, ভদ্রলোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিবেন।' সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

"তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, একবার ...ট্স সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বচসা হইয়াছিল। সাহেব একটু উত্তেজিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় বাঙ্গালা শিখেছেন?' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিলাতে'। তর্কালঙ্কারের বিদ্রূপে তর্ক ... হইয়া গেল।

"...টেভর ও হব্‌হাউস সাহেব অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন।

"আমাদের প্রথম জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (First ...nior Scholarship Examination) বাঙ্গালায় আমাদের পরীক্ষক ছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Major G. T. Marshall। জুনিয়র পরীক্ষা ... দিন ধরিয়া হইত। ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষা হইত ... ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ইংরাজি—বাঙ্গালা বাদ, এই পাঁচ দফা পরীক্ষা হইত। বিলাতের হেলিবেরি ...ত যত সিভিলিয়ন এখানে আসিতেন, সকলকেই দু' তিন ...র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়িতে হইত।

"কলেজের উন্নতির জন্য সাহেবদের একাগ্র চেষ্টা ত ছিলই; মহারাজা শ্রীশচন্দ্রও যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মত তিনিও আমাদের পরীক্ষক ছিলেন।

"তখন সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল,—হুগলি, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও কলিকাতার হিন্দু কলেজ। প্রশ্ন-পত্রিকা কলিকাতা হইতে সর্ব্বত্র স্থানীয় কমিটির নিকট প্রেরিত হইত। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট, স্যামুয়েল সাহেব 'Friend of Education' খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার ছোট আদালতের জজ কল্‌কুহন্ গিডিয়ন স্কন্স্ (Colquhon Gideon Sconce)—Crimean War-এর সময়ে তিনি জজ ছিলেন—ও চট্টগ্রামের কমিশনর আর্চিবল্ড্ স্কন্স্ (Archibald Sconce)—পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচারে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। সর্ব্বত্রই স্থানীয় কমিটির যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে গভর্মেণ্টের খুব নজর ছিল। রামতনুবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে উত্তরপাড়া ও হাবড়ার Salt চৌকির কমিশনর কোবার্ণ্ (Cockburn) সাহেব স্কুল কমিটির দুইটা মিটিং-এ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লর্ড ডালহৌসি স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন তুমি উপস্থিত হইতে পার নাই?' Cockburn সাহেব উত্তর করিলেন যে, তাঁহার ডিপার্ট্‌মেণ্টের কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই স্কুল কমিটির মিটিং এ আসা ঘটে নাই। লাট সাহেব বলিলেন, 'স্কুল কমিটির মিটিং-এ তুমি যে অজুহতে দুইবার উপস্থিত হইতে পার নাই, সেই Substantive post এর পদ তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।'

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

হারাণ ধন

(১)

"মা !—বড় খিদে পেয়েছে !"

অতি ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে রুগ্ন বালক, এই কয়টি কথা মাত্র বলিয়া নীরব হইল ! সে কথাকয়টি তীব্র বিষাক্ত শেলবৎ পার্শ্বোপবিষ্টা মাতার অন্তরতম প্রদেশে বিদ্ধ হইল !

দামোদর-তীরে একটি অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ-পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ পর্ণকুটীর !—কুটীরাভ্যন্তরে কএকটি মৃন্ময়পাত্র ও দুই একখানি শতধা ছিন্ন বস্ত্র ব্যতীত অপর তৈজস মাত্র নাই। একাধারে সহস্রগ্রন্থিযুক্ত একখানি অপরিচ্ছন্ন কন্থোপরি সপ্তমবর্ষদেশীয় জীর্ণশীর্ণ—কঙ্কাল মাত্র সার একটি বালক শায়িত—শয্যাপার্শ্বে বিশীর্ণকলেবরা বিষাদক্লিষ্টা অভাববেদনাপ্রপীড়িতা জনৈক রমণী উপবিষ্টা !—রমণীর পরিধানে অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট—লজ্জামাত্র নিবারণ-ক্ষম—একখানি মলিন শাটী; প্রকোষ্ঠে আয়তিচিহ্ন-স্বরূপ একগাছি 'লৌহ' ও শঙ্খ, শিরে রুক্ষ কেশভার মধ্যে সিঁথিতে সিন্দুর-রেখা।

বালক পুনরায় বিজড়িতস্বরে বলিল, "মাগো আর যে পারি না !—বড় খিদে মা !"—পরক্ষণেই অতিকষ্টে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া যেন নির্জীব হইয়া পড়িল ! মাতার পাংশুমুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার সর্ব্বশরীর উদ্বেলিত করিয়া পঞ্জরাস্থি স্পন্দিত করিয়া, অন্তর্জ্জালার ভীষণোষ্ণতাপ একটা আকুল দীর্ঘনিঃশ্বাস রূপে নাসারন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া—পূর্ণ দারিদ্র্যের প্রকট চিত্র সেই ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীরমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল !—আকুল হৃদয়ে জননী পীড়িত—বুভুক্ষু অচৈতন্য সন্তানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল !—তাহার বাহ্যসংজ্ঞা যেন লুপ্ত-প্রায় ! দেহ—নিস্পন্দ—স্থাণুবৎ !

(২)

সে আজ ছয়মাসের পূর্ব্বের কথা—একদিন নিশা-শেষে মাধব জেলে স্বজাতীয়গণ সহ—প্রত্যহ যেমন যায়, তেমনই—ক্ষুদ্র ডিঙ্গী ও জাল লইয়া, মৎস্য ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করে। বেলা প্রায় নয়টার সময় হইতেই ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল; সারাদিন সমভাবেই চলিল; সন্ধ্যার প্রাক্কা[ল] হইতেই তুফানের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল;—একখানি জেলেডিঙ্গি ফিরিল না ! ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, রাত্রি আসিল !—কৈবর্ত্তপল্লী একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবী বিপৎপাতের মৌন আশঙ্কায় এতক্ষণ আকুল হইয়াছিল;—নিশাগমে চারিদিক্ উৎকণ্ঠার অস্ফুট আর্ত্তরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ হুতাশে দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র পল্লীবাসিগণ প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া মশালালোক জ্বালিয়া—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নদীতীরেই নিশাযাপন করিল ! বৃদ্ধেরা বসিয়া জাল বুনিতে লাগিল,—রমণীমণ্ডলী জটলা পাকাইতে লাগিল,—বালক-বালিকা বালুকাশয্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিল,—রমণীগণ কেহ মাকালঠাকুরের—কেহ বা কালীর—পূজা, কেহবা হরিরলুট মানিতেছে। ক্রমে যখন দুর্ভাবনাসঙ্কুল দীর্ঘরজনী অবসান হইল, তখন দুর্যোগ কাটিয়া গিয়াছে।

তীরস্থিত সকলেই ভ্রূপরি হস্তসংস্থাপন করিয়া সংযত দৃষ্টিতে—আশাতীরোজ্জ্বল নয়নে—আকুল উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রশস্ত—প্রশান্ত দামোদর-বক্ষে নৌযাত্রীদের প্রত্যাগমনের পথপানে চাহিয়া আছে। সহসা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বলয়ে কএকটা অতিক্ষুদ্র কৃষ্ণবিন্দু দেখা গেল—তীরবর্ত্তী প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ জনসঙ্ঘের মধ্যে একটা মৃদুগুঞ্জন উত্থিত হইল ! ক্রমে সে বিন্দুগুলি বৃহত্তর—অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া, অচিরে অগ্রবর্ত্তীগুলি স্পষ্ট নৌমূর্ত্তি ধারণ করিল, পশ্চাদ্বর্ত্তীগুলি তখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ শুশুকের মত প্রতীয়মান হইতেছিল ! তখন কূলে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে একটা হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। এইবার দুইয়ে একে নৌকাগুলি তটে পৌঁছিল—আরোহিগণ অবরোহণ করিল ! তখন সেই উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এতক্ষণ যাহারা সমবেদনায় একীভূত হইয়াছিল, এই মিলনের সমীপবর্ত্তীকালে তাহাদের মধ্যে কেমন একটা দ্বন্দ্বভাবের আভাস লক্ষিত হইল ! অবশেষে, সেই চিরবিচ্ছেদ ভীতির অবসানে পুনর্ম্মিলনের তীব্র হর্ষে—বিয়োগাশঙ্কাপগতে পুনঃ-প্রাপ্তির আনন্দে দামোদরতটে ক্ষণতরে একটা মধুর সুখক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইল !—সরল

সংসারী প্রিয়পরিজনের অকপট আনন্দ-কল্লোলে তদঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল!

একে একে সকলেই ফিরিল—সমবেতায় ধীবর-পরিবার হর্ষোৎফুল্ল হইল; অবশেষে দেখা গেল, ফিরে নাই শুধু মাধব! ক্রমে সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনন্দভোজের আয়োজনে বিব্রত হইয়াছে।—সেই জনবিরল নদীকূলে একমাত্র পুত্রক্রোড়ে করিয়া বিরস বদনে—মর্ম্মাহত নিরানন্দ-প্রতিমার মত—চক্রবাল-সংবদ্ধদৃষ্টিতে—স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে কেবল মাধবের পত্নী!—বালক মেঘনা বালসুলভ অস্থিরতায় এক একবার ইতস্ততঃ দৌড়িয়া দৌড়িয়া খেলিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই সেই স্থানের স্থির—নিষ্পন্দ—নিশ্চল মূর্ত্তির নিকট ফিরিয়া, তাহার সেই বিষাদগম্ভীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, বিষণ্ণভাবে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে।—মাঝে কএকবার সে মাতার চিবুক ধরিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা!—বাবা কোথায়?"—"বাবা এল না?"—মাতা উত্তর দেয় নাই—কি যে উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পায় নাই!—অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে—শূন্যদৃষ্টিতে ব্যাকুলহৃদয়ভাব কষ্টে নিবারণ পূর্ব্বক বারেক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, আনমনে আবার সেই সুবিশাল জলরাশিপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াই আছে। ক্রমে যখন বেলা বৃদ্ধি পাইয়া—ক্রমে আবার কমিবার মুখ হইল,—সূর্য্যতেজ প্রখর হইল, তখন মেঘনা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিল—আবদারমিশ্র ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল—"বড় খিদে পেয়েছে মা!" একথা শুনিয়া জননী-হৃদয় আর উদাসীন থাকিতে পারিল না—দাম্পত্য প্রেমকে পরাস্ত করিয়া তখন বাৎসল্য-প্রীতি বিশালতর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। শশব্যস্তে উঠিয়া মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের উদ্দেশে চলিল।—এ পর্য্যন্ত সে মাধবের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই—জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই—লোকের মুখে তাহার সম্বন্ধে একটা অশুভবার্ত্তা উচ্চারিত হওয়াও অকল্যাণকর বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল।—অবস্থা-

প্রতীক্ষার পথে

গতিকে যাহা বুঝা যাইতেছিল, সে কথাটা স্পষ্ট—প্রকৃত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে, তাহার আদৌ মন সরিতেছিল না। তাই সে তাহার মনোগত ধারণা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে—আর অন্যের মতাপেক্ষী হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। মাধব সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে যখন প্রত্যাগত হয় নাই, তখন অবশ্যই তাহার কোন একটা বিপদ্ ঘটিয়াছে;—সাধ্যপক্ষে সে তাহাকে—তাহাদের প্রিয়দর্শন মেঘনাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না! কিন্তু সে বিপদে যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, একথা তাহার হৃদয়ে কিছুতেই স্থান পাইতেছে না!—কেহ যদি আসিয়া বলিত যে, সে স্বচক্ষে তাহার মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াছে,—তাহা হইলেও সে কথা বিশ্বাস করিত না। সে নিশ্চয়ই মরে নাই—মরিতে পারে না; তাহাদের এমন নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া মরা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশবাসী দেবতা তাহাকে যেন আশ্বাস দিতেছে—

হারাণ ধন

(১)

"মা !—বড় খিদে পেয়েছে !"

অতি ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে রুগ্ন বালক, এই কয়টি কথা মাত্র বলিয়া নীরব হইল ! সে কথাকয়টি তীব্র বিষাক্ত শেলবৎ পার্শ্বোপবিষ্টা মাতার অন্তরতম প্রদেশে বিদ্ধ হইল !

দামোদর-তীরে একটি অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ-পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ পর্ণকুটীর !—কুটীরাভ্যন্তরে কএকটি মৃন্ময়পাত্র ও দুই একখানি শতধা ছিন্ন বস্ত্র ব্যতীত অপর তৈজস মাত্র নাই। একাধারে সহস্রগ্রন্থিযুক্ত একখানি অপরিচ্ছন্ন কন্থোপরি সপ্তমবর্ষদেশীয় জীর্ণশীর্ণ—কঙ্কাল মাত্র সার একটি বালক শায়িত—শয্যাপার্শ্বে বিশীর্ণকলেবরা বিষাদক্লিষ্টা অভাবদৈন্যপ্রপীড়িতা জনৈক রমণী উপবিষ্টা !—রমণীর পরিধানে অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট—লজ্জামাত্র নিবারণ-ক্ষম—একখানি মলিন শাটী; প্রকোষ্ঠে আয়তিচিহ্ন-স্বরূপ একগাছি 'লৌহ' ও শঙ্খ, শিরে রুক্ষ কেশভার মধ্যে সিঁথিতে সিন্দূর-রেখা।

বালক পুনরায় বিজড়িতস্বরে বলিল, "মাগো আর যে পারি না !—বড় খিদে মা !"—পরক্ষণেই অতিকষ্টে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া যেন নির্জীব হইয়া পড়িল ! মাতার পাংশুমুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার সর্ব্বশরীর উদ্বেলিত করিয়া পঞ্জরাস্থি স্পন্দিত করিয়া, অন্তর্জ্বালার ভীষণোষ্ণতাপ একটা আকুল দীর্ঘনিঃশ্বাস রূপে নাসারন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া—পূর্ণ দারিদ্র্যের প্রকট চিত্র সেই ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীরমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল !—আকুল হৃদয়ে জননী পীড়িত—বুভুক্ষু অচৈতন্য সন্তানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল !—তাহার বাহ্যসংজ্ঞা যেন লুপ্ত-প্রায় ! দেহ—নিস্পন্দ—স্থাণুবৎ !

(২)

সে আজ ছয়মাসের পূর্ব্বের কথা—একদিন নিশা-শেষে মাধব জেলে স্বজাতীয়গণ সহ—প্রত্যহ যেমন যায়, তেমনই—ক্ষুদ্র ডিঙ্গী ও জাল লইয়া, মৎস্য ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করে। বেলা প্রায় নয়টার সময় হইতেই ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল ; সারাদিন সমভাবেই চলিল ; সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই তুফানের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ;—একখানি জেলেডিঙ্গি ফিরিল না ! ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, রাত্রি আসিল !—কৈবর্ত্ত-পল্লী একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবী বিপৎপাতে মৌন আশঙ্কায় এতক্ষণ আকুল হইয়াছিল ;—নিশাগমে চারিদিক্ উৎকণ্ঠার অস্ফুট আর্ত্তরবে মুখরিত হইয়া উঠিল রুদ্ধ হুতাশে দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র পল্লীবাসিগণ প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া মশালালোক জ্বালিয়া—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নদীতীরেই নিশাযাপন করিল ! বৃদ্ধেরা বসিয়া জাল বুনিতে লাগিল,—রমণীগুলা জটলা পাকাইতে লাগিল,—বালক-বালিকা বালুকা শয্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিল,—রমণীগণ কেহ মাকালঠাকুরের—কেহ মা কালীর—পূজা, কেহবা হরিরলুট মানিতেছে। ক্রমে যখন দুর্ভাবনাসম্ভব দীর্ঘরজনী অবসান হইল, তখন দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে।

তারস্থিত সকলেই ভ্রূ'পরি হস্তসংস্থাপন করিয়া সংযত দৃষ্টিতে—আশাতীব্রোজ্জ্বল নয়নে—আকুল উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রশস্ত—প্রশান্ত দামোদর-বক্ষে নৌযাত্রীদের প্রত্যাগমনের পথপানে চাহিয়া আছে। সহসা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বলয়ে কএকটা অতিক্ষুদ্র কৃষ্ণবিন্দু দেখা গেল—তীরবর্ত্তী প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ জনসঙ্ঘের মধ্যে একটা মৃদুগুঞ্জন উত্থিত হইল ! ক্রমে সে বিন্দুগুলি বৃহত্তর—অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া, অচিরে অগ্রবর্ত্তীগুলি স্পষ্ট নৌমূর্ত্তি ধারণ করিল, পশ্চাদ্বর্ত্তীগুলি তখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ শুশুকের মত প্রতীয়মান হইতেছিল ! তখন কূলে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে একটা হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। এইবার দুইয়ে একে নৌকাগুলি তটে পৌছিল—আরোহিগণ অবরোহণ করিল ! তখন সেই উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এতক্ষণ যাহারা সমবেদনায় একীভূত হইয়াছিল, এই মিলনের সমীপবর্ত্তীকালে তাহাদের মধ্যে কেমন একটা দ্বন্দ্বভাবের আভাষ লক্ষিত হইল ! অবশেষে, সেই চিরবিচ্ছেদ ভীতির অবসানে পুনর্ম্মেলনের তীব্র হর্ষে—বিয়োগাশঙ্কাপগতে পুনঃ-প্রাপ্তির আনন্দে দামোদরতটে ক্ষণতরে একটা মধুর সুখক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইল !—সরল

সংসারী প্রিয়পরিজনের অকপট আনন্দ-কল্লোলে তদঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল!

একে একে সকলেই ফিরিল—যাবতীয় ধীবর-পরিবার হর্ষোৎফুল্ল হইল; অবশেষে দেখা গেল, ফিরে নাই শুধু মাধব! ক্রমে সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনন্দভোজের আয়োজনে বিব্রত হইয়াছে।—সেই জনবিরল নদীকূলে একমাত্র পুত্রক্রোড়ে করিয়া বিরস বদনে—মূর্ত্তিমতী নিরানন্দ-প্রতিমার মত—চক্রবাল-সংবদ্ধদৃষ্টিতে—স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে কেবল মাধবের পত্নী! বালক মেঘনা বালসুলভ অস্থিরতায় এক একবার ইতস্ততঃ দৌড়িয়া দৌড়িয়া যাইতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই সেই স্থাণুবৎ স্থির—নিষ্কম্প—নিশ্চল মূর্ত্তির নিকট ফিরিয়া, তাহার সেই বিষাদগম্ভীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, বিষণ্ণভাবে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে।—মাঝে কতএকবার সে মাতার চিবুক ধরিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা!—বাবা কোথায়?"—"বাবা এল না?"—মাতা উত্তর দেয় নাই—কি যে উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পায় নাই!—অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে—শূন্যদৃষ্টিতে ব্যাকুলহৃদয়ভাব কষ্টে নিবারণ পূর্ব্বক বারেক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, আনমনে আবার সেই সুবিশাল জলরাশিপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াই আছে। ক্রমে যখন বেলা বৃদ্ধি পাইয়া—ক্রমে আবার কমিবার মুখ হইল,—সূর্য্যতেজ প্রখর হইল, তখন মেঘনা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিল—আবদারমিশ্র ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল—"বড় খিদে পেয়েছে মা!" একথা শুনিয়া জননী-হৃদয় আর উদাসীন থাকিতে পারিল না—দাম্পত্য প্রেমকে পরাস্ত করিয়া তখন বাৎসল্য-প্রীতি বিশালতর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। শশব্যস্তে উঠিয়া মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের উদ্দেশে চলিল।—এ পর্য্যন্ত সে মাধবের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই—জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই—লোকের মুখে তাহার সম্বন্ধে একটা অশুভবার্ত্তা উচ্চারিত হওয়াও অকল্যাণকর বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল।—অবস্থা-

প্রতীক্ষার পথে

গতিকে যাহা বুঝা যাইতেছিল, সে কথাটা স্পষ্ট—প্রকৃত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে, তাহার আদৌ মন সরিতেছিল না। তাই সে তাহার মনোগত ধারণা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে—আর অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। মাধব সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে যখন প্রত্যাগত হয় নাই, তখন অবশ্যই তাহার কোন একটা বিপদ্ ঘটিয়াছে;—সাধ্যপক্ষে সে তাহাকে—তাহাদের প্রিয়দর্শন মেঘনাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না! কিন্তু সে বিপদে যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, একথা তাহার হৃদয়ে কিছুতেই স্থান পাইতেছে না!—কেহ যদি আসিয়া বলিত যে, সে স্বচক্ষে তাহার মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াছে,—তাহা হইলেও সে কথা বিশ্বাস করিত না। সে নিশ্চয়ই মরে নাই—মরিতে পারে না; তাহাদের এমন নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া মরা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশবাসী দেবতা তাহাকে যেন [illegible]

ছেন—'মাধব মরে নাই!—তবে বিপন্ন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' অভাগিনী সেই আশায় বুক বাঁধিয়াছে—তবে মাধবের অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় তাহার হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে!

নদীকূলে বসিয়া এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই সে মাধবের বিষয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই—জিজ্ঞাসা করা আবশ্যকও মনে করে নাই। সকল দেশের মন্দপ্রকৃতি প্রতিবেশীরা ভাল করিতে তেমন উৎসুক নহে—কিন্তু মন্দ করিতে বিশেষ তৎপর।—শুভ ঘটনায় তেমন আন্তরিক অভিনন্দন জানায় না—কিন্তু বিপৎপাতে মৌখিক সমবেদনা জানাইতে নিতান্ত ব্যস্ত হয়। মাধব বনিতা যখন পুত্রক্রোড়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সেই সময় পথে মাধবের কএকজন সহচর এক বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া তামাকু-সেবন করিতে করিতে কেহ বা জাল বয়ন করিতেছিল, কেহ বা সন্থোগত বিপদের সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়াই একজন বলিয়া উঠিল—"দ্যাখ! সেই ভারী তুফানটার পরে, মাধবদার ডিঙ্গীটাকে আর দেখিতে পাই নাই!"

আর একজন বলিয়া উঠিল—"হুঃ! তখন সবাই 'চাচা আপন বাঁচা'! যে যার আপন পরাণটার লয়ে ভোর—তখন কে কার খোঁজ লয়?"

তৃতীয় একব্যক্তি বলিল—"আহা—মোরা এত জনা ছিলাম, কিন্তু একা মাধব বেচারাই বেঘোরে প্রাণটা খোয়ালে!"

মাধব-বনিতা সকলই শুনিল—কিন্তু কোনও কথা কহিল না, বা কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আদৌ কৌতূহলী হইল না। আপন মনে গৃহে চলিয়া গেল!—মূল কথাটাই যখন তাহার প্রত্যয় হয় নাই, তখন সে আনুষঙ্গিক কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে কেন?—সে ভাবিতেছিল, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন অবিচার ঘটিবে কেন?—তাঁহার রাজ্যে এমন অঘটন ঘটিলে যে, তাঁহার নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে! মাধব আসিবে—আবার তাহাকে সোহাগ করিবে,—মেঘনাকে আদর করিবে। সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে—এই আশায় বুক বাঁধিয়া—এই বিশ্বাসে দৃঢ় নির্ভর করিয়া তাহার আসার আশায় পথ চাহিয়া রহিল—তবে আশঙ্কা উদ্বেগ ঘুচিল না! গৃহে আসিয়া সে অনন্যমনে পুত্রের আহার্য্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল! লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য-জ্ঞান করিতে লাগিল, পড়শীরা অলক্ষ্যে কাণাঘুষা করিতে লাগিল—"তবে কি রমণী নষ্ট-চরিত্রা? না বিকৃত-মস্তিষ্কা?"

দামোদরের নাতিদূরে কৈবর্ত্তপল্লী। তাহারই পুরোভাগে—নদীর দিকে—অপর কুটীর-শ্রেণী হইতে পৃথগ্‌ভাবে—একান্তে একটি সুবৃহৎ আম্রবৃক্ষ-পার্শ্বে অবস্থিত যে নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন কুটীর খানি, সেই খানিই মাধবের।

এক, দুই, করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল; তথাপি মাধব ফিরিল না। ধীবরপল্লীর সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, মাধব নিশ্চই সে রাত্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। অথচ মাধব-পত্নী স্বীয় আয়তি-চিহ্ন অব্যাহত রাখিল!—কেহ কদাচ তাহার প্রতিকূলে কোন কথা কহিলে, সে বিরক্ত হয়—কাতরও হয়—সশঙ্ক ভাবে অধীর হইয়া বলে—"অমন অলক্ষণের কথা আমার কাছে বলিও না। তোমরা কি তার শত্রু যে তাহার অমঙ্গল কামনা কর? সে ত কখনও মনে জ্ঞানে তোমাদের কোন মন্দ করে নাই!" প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলে সে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়—"সে আসিবে বৈ কি। আমাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার উদ্দেশেই সে যাত্রা করিয়াছে; আমাদের যথাসম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের আয়োজন করিতেই সে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া সে এক দিন গ্রামে ফিরিবে। তখন দেশের লোকে দেখিবে—বুঝিবে, আমার দেবতা কত জাগ্রৎ—আমার ধারণা কত সত্য!" এই বিশ্বাস হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া—প্রাণপণে সেই আশাতরুস্কন্দ জড়াইয়া ধরিয়া ধীবরবালা প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া—অনির্দ্দিষ্ট দিন গণিতে লাগিল!

মাধব নিরুদ্দিষ্ট হইবার কিছুদিন পরে একদা দামোদরের ধস্ ভাঙ্গিতে লাগিল,—যেখানটায় সেই ধীবরপল্লী স্থাপিত, সেই ধারটাতেই এবার ভাঙ্গনের বিশেষ টান্ ধরিয়াছে! বেগতিক দেখিয়া ধীবরকুল স্ব-স্ব আবাস উঠাইয়া, খুব খানিকটা দূরে একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া নিজ নিজ পর্ণ-কুটীর স্থানান্তরিত করিল—নূতন পল্লী রচনা করিয়া আবার সকলে নূতন সংসার পাতাইয়া বসিল।

পরিত্যক্ত পল্লীতে, পুরাতন ভিটা ও অতীত স্মৃতি লইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে সেই বিজন পর্ণকুটীর ও বিচিত্র বিশ্বাস

লইয়া রহিল একমাত্র মাধব-বনিতা!—সে বর্ত্তমান কুটীর ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে নূতন কুটীর প্রতিষ্ঠার উপযোগী "ড্রপ্—বুক"—উদ্যম অভিলাষ—অর্থ সামর্থ্য—কিছুই যে তাহার নাই! তাই, সে আসন্ন বিপদ্ উপেক্ষা করিয়া—সকল ভার সেই সর্ব্বশক্তিমানের উপর সমর্পণ করিয়া—তাঁহার মঙ্গলবিধানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া—একমাত্র পুত্রকে লইয়া মাধবের প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া, সেই ভাঙ্গনের মুখে ভাঙ্গাঘর আশ্রয় করিয়া, বাস করিতে লাগিল!

মাধব জাতিতে ধীবর ছিল বটে, কিন্তু অনেক উচ্চ-জাতীয়ের অপেক্ষা সামর্থ্য-গর্ব্বিত, স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিল। এই দুই কুড়ি বৎসর বয়সে, সে আজ পর্য্যন্তও কখনও কাহারও সাহায্যপ্রার্থী—কৃপাভিখারী হয় নাই। বিহিত সম্মান প্রদর্শনে সে অনেকের নিকটেই মস্তকাবনত করিয়াছে, কিন্তু অভাবপীড়নে—আনুকূল্য প্রত্যাশায় সে এতাবৎ কখন কাহারও নিকট হেঁটমুণ্ড করে নাই। অভাব আবেদন লইয়া সে এপর্য্যন্ত কখনও কাহারও দ্বারস্থ হয় নাই! তাহার গৃহস্থিত পুরোবর্ত্তী আম্রবৃক্ষতলে সময়ে অসময়ে পাড়ার সকলে আসিয়া সমবেত হইত—গল্পগুজব করিত—মাধবের 'সলা পরামর্শ' লইত—জাল বুনিত—গান গাহিত—তামাকু সেবন করিত; মাধব কিন্তু আহূত না হইলে কদাচ কাহারও দ্বারে পদার্পণও করিত না!—তবে কাহারও কোনও বিপদ্ আপদ্ পড়িলে, সে বিপন্নের বাটী ছাড়িত না! এই সকল কারণে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—সকলেই প্রকাশ্যে যেমন তাহাকে ভয় করিত, আন্তরিক তেমনই তাহার প্রতি বিরক্ত ছিল! (মানুষের স্বভাবই এই যে, যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে, ভীতিপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত অথবা সমাজ-বিধান পরবশে, মুখে যতই কেন সমবেদনা—সমোল্লাস অভিনন্দন ব্যক্ত করুক না, আন্তরিক সে লোককে দুঃখ—বিপন্ন—অভাবপীড়িত আর্ত্ত—অবমানিত দেখিতে ভালবাসে! মানবপ্রকৃতি স্বতঃই প্রভুত্ব-প্রয়াসী;—সাধ্য হইলে, স্বেচ্ছায় বা অনুরোধবশে, কাহারও কোনও সাহায্য করিব না, তথাপি লোকে আমার নিকট প্রার্থীরূপে উপস্থিত হউক—এই মনোভাবটাই সাধারণতঃ মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক থাকে! সেই জন্যই স্বাধীনপ্রকৃতির লোকের পক্ষে সমাজে প্রতিপত্তিলাভ দুর্ঘট হয়—আর যদিই বা কচিৎ তেমন একটা অসম্ভব,—সম্ভবপর হয়; তাহা হইলেও সামাজিকেরা মুখে যাহাই বলুন, অন্তরে কিন্তু সকলেই অসন্তুষ্ট ভাব পোষণ করেন। সুতরাং, স্বাধীন-প্রকৃতি মাধবের নিজস্ব প্রতিপত্তিটুকু, মাধবের অনুপস্থিতি সহকারে বিলুপ্ত হইয়াছিল।) তবে, মাধবের ঐ গুণটি সঙ্গগুণে তাহার সহধর্ম্মিণীতেও সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তিয়াছিল। স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ধর্ম্মপত্নী, স্বামীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে একেবারেই অস্বীকৃতা ছিল; সুতরাং সে উপস্থিত বিপাকে পড়িয়াও যাচ্ঞা করিতে—পরের দ্বারস্থ হইতে, স্বার্থমাত্র প্রলোভনে অপরের সাহায্য-প্রার্থী হইতে—সে নিতান্তই নারাজ! তবে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ভাগ্যের ফেরে—বিপন্ন হইয়া মানুষ, মানুষের নিকট—সামাজিক, সমাজের নিকট—যতটুকু সাহায্যলাভের অধিকারী, যতটুকু স্বত্ব দাবি করিতে স্বত্ববান্—সে সেইটুকু লইয়াই পরম সন্তুষ্ট—একান্ত কৃতার্থজ্ঞান করিত!

মাধব নিরুদ্দিষ্ট হওয়া অবধি, মাধব-পত্নী দিনের বেলায় অপরাপর ধীবরবনিতাদিগের নিকট হইতে মৎস্য লইয়া গ্রামে গৃহস্থবাটীতে গিয়া বিক্রয় করে; তাহাতেই যৎসামান্য যাহা লাভ পায়, তদ্দ্বারাই কায়ক্লেশে কোনরূপে নিজের ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে!

যাহা কিছু সামান্য গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া—প্রতি অপরাহ্ণে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, সে দামোদর-তীরে গিয়া বসিত এবং একে একে তীরোদ্দেশে সমাগত তরণীগুলি সোৎকণ্ঠায় নিরীক্ষণ করিত। এই যে নিত্যনিয়ত দিবা-বসানে নদীতীরে কঙ্করাসনে বসিয়া তাহার ঐকান্তিক—আকুল—পূজাপ্রার্থনা, বুঝি লোকে সুসজ্জিত মন্দিরাভ্যন্তরে সুখাশনে প্রতিমা-সমক্ষে উপবিষ্ট হইয়া, শতোপচারে—বিচিত্র অনুষ্ঠানে, এমন অর্চ্চনা—আরাধনা করিয়া উঠিতে পারে না!

'ঐ—ঐখানি ঠিক্ যেন কর্ত্তার নৌকা!—যদি বাস্তবিকই ঐ খানিই হয়!—উহাতেই যদি খোকার বাপ্ থাকে!—আসিলে সে প্রথমটায় কি করিবে—কিরূপে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে? প্রথম ত গলবস্ত্র হইয়া একটা প্রণাম করিবে,—অঞ্চলে পা মুছাইয়া নিজের ও খোকার মাথায় দিবে!—আর খোকা?—সে ত তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে চীৎকার করিয়া, হাসিয়া ছুটিয়া তাঁহার কোলে গিয়া উঠিবে!—আর তিনি?—তিনি কি করিবেন?—খোকাকে কোলে লইয়া, শতচুম্বনে তাহার বদন-মণ্ডল

আচ্ছন্ন করিবেন। তাহার পর তাহাকে কি বলিবেন?—সে কথা ভাবিতেও তাহার ধারণা অধীর হইয়া পড়িল!—তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত—সে চারিদিক্ কুয়াসাচ্ছন্ন দেখিত!—ক্রমশঃই কত বিচিত্র ঘটনা কল্পনা-তুলিকায় আঁকিয়া সে উৎফুল্ল হইত!—এমন প্রতি সন্ধ্যায়—নিতি নিতি—কতদিন!—দয়াময়ের দয়ার প্রতি অগাধ অটল বিশ্বাসে - এক অনির্দ্দিষ্ট, সুদূর ভবিষ্যুগর্ভে লীন—আশার প্রকট-মূর্ত্তি কল্পনায়, শিশুপুত্রের মুখ চাহিয়া, বালককে উল্লসিত করণোদ্দেশে—স্বয়ং আশ্বস্ত হইবার চেষ্টায় এরূপ শুভ—আশ্বাসবাণীর সাফল্য কামনায়—সে প্রতি সন্ধ্যা যাপন করিত! কিন্তু হায়! তাহার হারাণ ধন—তাহার বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশিত ফিরিল কৈ? তাহার কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইল কৈ?—হইবে কি না, কে জানে?

রোগ-শয্যায় পুত্র

(৪)

"অনন্তর একদিন—কিসে কি ঘটিল কে জানে?—বোধ হয়, নিয়ত সান্ধ্যসলিলশীকরসিক্ত বায়ুসেবনে—নৈশ শিশিরের শৈত্য-প্রভাবে—বালক মেঘনাদর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল!—সন্ধ্যাকালে সহসা ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিল, আকস্মিক এই বিপৎপাতে অভাগিনীর শিরে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন যাহার মুখ চাহিয়া—যে উড়ুপ আশ্রয় করিয়া দুস্তর নৈরাশ্য-সমুদ্রে ভাসমানা হইয়াও সে কূল পাইবার আশা করিতেছিল—যাহাকে বুকে লইয়া সে দারিদ্র্যের শত অভাব, দুশ্চিন্তার মর্ম্মন্তুদ যাতনা হেলায় সহ্য করিতেছিল, আজি তাহারই অশুভ সংঘটনার দারুণ আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! সহসা সেই শিবরাত্রির সলিতাটিকে নিষ্প্রভ হইতে দেখিয়া, সে ভীষণ ভীতা—আশঙ্কায় আতঙ্কিতা হইয়া উঠিল! তাহার সেই ভগ্ন-হৃদয়ের ক্ষীণ অবলম্বন, যেন সবেগে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল!—সে সংসারের অপর সকল কার্য্য হারাইল;—তাহার বুক-জুড়ান ধনকে বুকে করিয়া সে তদবধি রাত্রিদিন কাটাইতে লাগিল।

এইরূপে, অভাগী তাহার বত্রিশ-নাড়ী ছেঁড়া ধনকে বুকে করিয়া, আজ মাসাবধি কাটাইয়াছে। এই একমাস কাল, তাহার হাটে বাজারে যাওয়া বন্ধ;—যৎকিঞ্চিৎ খুদি গুঁড়ি যাহা সঞ্চিত ছিল, এই অসময়ে—পুত্রের চিকিৎসা-পথ্যে—সে সকল ত নিঃশেষিত হইয়াছেই;—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও অর্থসামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ সাধ্যমত গ্রাম্য চিকিৎসকদ্বারা বালকের চিকিৎসাদি করাইয়াছে! অঙ্গের আয়তিচিহ্ন শাঁখা লোহা ব্যতীত যাহাকিছু যৎসামান্য অলঙ্কারপত্র—গৃহের যাহাকিছু ধাতব তৈজসপত্র একে একে সবই নাম মাত্র মূল্যে মহাজন পসারীকে ধরিয়া দিয়াছে! অবশেষে, আজ দুইদিন হইতে, সে একেবারে কপর্দ্দকমাত্র-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে!—প্রবাদীভূত 'কড়িকড়া' পর্য্যন্ত আজ তাহার কুটীরে নাই! একে ত রোগ-দুঃখের দিন বিপর্য্যয় দীর্ঘ হয়, তাহার উপর যদি দারুণ অভাব-অনটন আসিয়া

যোগ দেয়, তাহা হইলে বুঝি সেদিন আর কাটে না।—দয়াময়ের রাজ্যে এমন অনর্থপাতও ঘটে!

এতদিন নিজের একবেলা—আধপেটা—যাহাকিছু জুটিতেছিল, আজ দুইদিন তাহাও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে!—সে কথা কিন্তু সে একবারও ভাবে নাই—সে জন্য সে অণুমাত্র কাতরাও নহে! সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই।—সে ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর কোথায়?—সে বাঁচিয়া থাকিতে যে একমাত্র রুগ্ন পুত্রের সামান্য পথ্য পর্য্যন্ত জুটাইতে পারিতেছে না,—সেই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে দারুণ শেলসম বাজিতেছে!—সে অহর্নিশি সেই চিন্তাতেই অস্থির!—এ দুঃখ রাখিবার তাহার স্থান নাই—এখনই মরিলেও ত এ দুঃখ ঘুচিবে না!

পুত্রকে রোগশয্যায় একাকী ফেলিয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই—সে যাইতে চাহেও না—পারেও না! রাত্রে অন্ধকারে থাকিতে রোগী ভয় পায়;—ঘরে এমন তৈল-বিন্দুও নাই, যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখে! তাই, কএকদিন হইতে, দিবাভাগে—পুত্র ঘুমাইলে—সে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী গাছের শুষ্ক পাতা—লতাগুল্ম—কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিত; রাত্রে সেই সব দিয়া আগুন করিত—তাহাতে শৈত্যও ঘুচিত, কুটীরও প্রদীপ্ত থাকিত! আজ ভোর হইতে বৃষ্টি নামায়, কাঠকুটাও কুড়ান হয় নাই; যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাও নিঃশেষিত; অথচ অগ্নিও নির্ব্বাণপ্রায়।

এদিকে রোগক্লিষ্ট পুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে পথ্য যাচ্ঞা করিতেছে,—কিন্তু হায়! গৃহে যে এমন কিছুই এক রতি নাই, যদ্দ্বারা জননী রোগার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণ করে!—এ অবস্থায় যে ভীষণ অন্তর্দাহে—যে হৃদয়বিদারী সন্তাপে—যে অব্যক্ত ব্যাকুলতায়—মাতৃহৃদয় এক্ষণে কাতর, তাহা ঐ অনলবিস্ফারী দীর্ঘনিঃশ্বাসেই পরিব্যক্ত!

রোগকাতর বালক ক্ষীণকণ্ঠে—রুদ্ধপ্রায় স্বরে—দুএক বার 'মা! বড় খিদে লেগেছে!' বলিয়াই ক্ষুধার দৌর্ব্বল্যে সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল! জননী নির্ব্বাক্—নিথর—নিস্পন্দ! শোণিতলেশপরিশূন্য বিবর্ণ কপোল করতলে বিন্যস্ত করিয়া সঙ্কীর্ণ শয্যাতলে শায়িত রুগ্নপুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশপাতাল স্বর্গনরক—পাপপুণ্য—জন্মমৃত্যু—স্বামীপুত্র—এবংবিধ কত বিচিত্র বিষয়ের গভীর দার্শনিক তত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন! বাহ্যসংজ্ঞা-বিরহিতা বালার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণ তখন কোন্ কাল্পনিকরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল—কে বলিবে? সর্ব্বসন্তাপহারিণী আরামদায়িনী নিদ্রাদেবী সেই উদ্বেগকাতরা বিপন্না বিষাদিনীর নয়নে কত দিন যাবৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই কে জানে?

হঠাৎ বায়ুবেগ বর্দ্ধিত হইল—দামোদরের গর্জ্জন গভীর-তর—ভীষণতর বিক্রমে ধ্বনিত হইতে লাগিল—বাহিরে প্রকৃতি যেন ভীমা উন্মাদিনীবেশে তাণ্ডবনৃত্যপরায়ণা! কর্ণ-বধিরকর কুলিশনিনাদে দিগন্ত প্রকম্পিত—প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইতেছে! হতভাগিনীর মাথা রাখিবার স্থান—সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরও—বুঝি আর থাকে না! দুঃখিনীর অন্তরাত্মার অবস্থাও প্রকৃতির প্রচণ্ডমূর্ত্তির প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ক্রমে যেন ভৈরবীভাব ধারণ করিল!

এমন সময়ে ওকি!—এই প্রলয়োপম প্রকৃতিবিপর্য্যয় মধ্যে, কোন্ অনিবার্য্য কার্য্যব্যপদেশে, এই করালমূর্ত্তি নদীবক্ষে কোন্ অসমসাহসী তরণী ভাসাইয়াছিল?—ঐ সেই হতভাগ্য বিপন্নদিগের হৃদয়বিদারী আকুল আর্ত্তনাদ—বিকটকাতর চীৎকারধ্বনি—মুহূর্ত্তেকের জন্য দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া দিগন্তে বিলীন হইল!—রমণী উৎকর্ণে সে কাতরধ্বনি শ্রবণ করিল! আহা! কোন্ অকুতো-ভয় দুঃসাহসী নৌকারোহীদের জীবনবুদ্‌বুদ আজ ভীষণ বেগোচ্ছ্বসিত দামোদরগর্ভে মিশাইয়া গেল!—আহা!—এমন দুর্দ্দিনে—এমন দুর্যোগ মাথায় করিয়াও লোকে কোন্ অনতিক্রমণীয় প্রেরণায় মূর্ত্তিমান্ কালসদৃশ এই নদীবক্ষে নৌকাযানে বহির্গত হইতে সাহসী হইয়াছিল?—ক্ষণতরে জননীর শোকসন্তপ্ত—স্বতঃস্নেহপ্রবণ প্রাণ—বিচলিত হইয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল!—সহসা অদূরে বজ্রনির্ঘোষে তটভূমির কতকটা জলসাৎ হইল!

পরক্ষণেই অভাগীর বদনমণ্ডলে একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল!—তাহার বিষাদমলিন, বেদনাসিক্ত, আনন হইতে যাবতীয় করুণ-কোমল ভাব তিরোহিত হইল! ক্ষণপূর্ব্বে দৈন্য-চিন্তা-বিষাদ-অবসাদ-পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি মনোভাব যে মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছিল, সহসা সে সকল পুণ্য-আভাষ অন্তর্হিত হইয়া, সেখানে কঠিন কঠোর

অথচ পৈশাচিক সপ্রফুল্ল একটা ভাবলহরী ফুটিয়া উঠিল! সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হায়! হায়! হতবিধি!—একি করিলে! মুমূর্ষু সন্তানের শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা শোকতাপ-জর্জ্জরিতা ধীবর-বালার দৈন্য-বিরহ-সন্তাপবেগ কি অবশেষে উন্মাদনাবারিতে প্রশমিত করিলে!

উন্মাদিনী সেই জলে ঝড়ে—সেই প্রলয়ঙ্করী দুর্য্যোগে—রুগ্নপুত্রশায়িত জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে সবেগে নিষ্ক্রান্তা হইল। মেঘমন্দ্রস্তনিত বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত সেই ঘনান্ধকার নিশীথে ঝঞ্চানিল ও অবিরল বর্ষাধারা হেলায় উপেক্ষা করিয়া কঙ্করবিদ্ধ-কণ্টকীলতাগুল্মাহত-ক্ষিপ্রচরণে স্রস্তবাসকুন্তলা হইয়া উন্মাদিনী, যেদিক্ হইতে সেই মর্ম্মস্পর্শী কাতরধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, ইতস্ততঃ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল!—কণ্টকী তরুশাখায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই!

কিয়দ্দূর এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল, প্রমত্ত-দামোদরের উত্তালতরঙ্গবাহিত হইয়া কি একটা শ্বেত পদার্থ-পিণ্ড তটদেশে নীত হইল! রমণী পিশাচিনীর ন্যায় সোৎসাহিতবেগে—চঞ্চলচরণে সেই পদার্থউদ্দেশে প্রধাবিতা হইল!—নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, সেটা একটা মানবমূর্ত্তি!—বুঝিল কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে বিপন্ন নৌকারোহীদের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়াছিল—সেই জলনিমগ্ন হতভাগাদিগেরই অন্যতম কাহারও এই শবদেহ! পৈশাচিক আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে উন্মাদিনী ধীবররমণী ঝটিতি সেই মৃতদেহ-সন্নিহিত হইয়া, দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার প্রকোষ্ঠধারণ করিয়া, কর্কশভাবে তাহাকে জলরেখা সন্নিধান হইতে দূরবর্ত্তী তটাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আনিল! পরে, ক্ষিপ্রহস্তে তাহার গাত্রবস্ত্র—অঙ্গরেখার জেব প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল!—অভাবের চরমপ্রান্তে উপনীত হইয়া, হতভাগী আজ মৃতস্বাপহরণ করিবার কল্পনায় এই দুর্য্যোগে বহির্গতা হইয়াছে!—দেবী বুঝি এইরূপেই দানবী হয়!—পুণ্যচরিত্রা এইরূপেই পিশাচী হয়!—**এখানে ক্রম-অভিব্যক্তিবাদের স্থান নাই!—দর্শন-মনস্তত্ব এখানে মূক!**

গাত্রবাসে যখন কোথাও কিছু মিলিল না, তখন অগত্যা রমণী কটিবস্ত্র পরীক্ষায় প্রবৃত্তা হইল। কটিতটে হস্তক্ষেপ করিতেই একটা কি কঠিন গ্রন্থিবদ্ধ পদার্থ তাহার হ[স্ত] স্পর্শ করিল! দ্রব্যটি যেন অতি সযত্ন-রক্ষিত—সঙ্গোপ[নে] বিশেষ সতর্কতার সহিত লুক্কায়িত!—রমণী সবলে যে[ম]ন সেটি বাহির করিতে যাইবে, অমনই সেই মৃতকল্প ব্যক্তি কণ্ঠনালি হইতে অতি ক্ষীণ—অতিকাতর—অস্পষ্টধ্ব[নি] নিঃসৃত হইল! সে স্বরে রমণীর হৃদয়ে তাহার আস[ন্ন]মৃত্যু পুত্রের পথ্যাভাবজনিত আর্ত্তরব প্রতিধ্বনিত হইল!

ক্ষণতরে অভাগিনী বিচলিতা হইল! কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাহার মনে ভয় হইল—এমন দারুণ অভাবকালে, হস্তগত প্রায় অর্থমুষ্টি পাছে করলচ্যুত হয়! অভাবের তাড়নায়—তীব্র মনঃকষ্টের প্রভাবে পৈশাচিক প্রকৃতি-প্রাপ্তা উন্মাদিনী তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা—দিগ্বিদিক্ বোধ বিরহিতা—হইয়া মুমূর্ষু জলনিমগ্নের জীবন-বিনিময়ে স্বীয় অপত্যের জীবন-সংরক্ষণ-কল্পে পার্শ্বস্থিত সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া হতভাগ্যের জীবনলীলাভিনয় অবসানে উদ্যতা হইল! এমন সময়ে বিদ্যুচ্ছলে ছিন্নমস্তারূপিণী প্রকৃতিদেবীর অট্টহাস্য বিকশিত হইল—সেই হাস্যালোকে মৃতকল্প হতভাগ্যের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল! রমণীর উদ্যত হস্তের মাংসপেশী শিরাবন্ধনী সেই মুহূর্ত্তে শিথিল হইয়া গেল—প্রস্তরখণ্ড সশব্দে পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইল, হতভাগিনী বিকট চীৎকার রবে সেই বিজন বেলাভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া, প্রকৃতির উদ্দাম বিশৃঙ্খলতা ক্ষণতরে প্রশমিত করিয়া,—সেই মৃতপ্রায় জলসমাধি-প্রক্ষিপ্তের হৃদয়োপরি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! সে যে তাহারই 'আয়তি'-নিদর্শন—আশার সাফল্য-অভিব্যক্তি—এতকালের প্রত্যাশিত **হারাণ ধন**!

সেই ছয়মাস পূর্ব্বে আসন্ন অপমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া—নিঃসহায় অবস্থায়—মাধব এক অজানাদেশে উপনীত হয়; কিন্তু তাহার স্মৃতি-শক্তি তখন বিলুপ্ত! পরে, এক পরদুঃখকাতর মহানুভবের আশ্রয় পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করে এবং অর্থার্জ্জনে নিয়োজিত হয়; কিন্তু গতজীবনের কথা কিছুতেই মনে আনিতে পারে না! অবশেষে, সেদিন সহসা একজনের মুখে "মেঘনা" শব্দটা শুনিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠে—ক্রমে তাহার লুপ্তস্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে!—লুপ্তস্মৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যাকুল হইয়া দেশে ফিরিতেছিল!—শেষে এই বিপৎপাত!

শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

সতীন ও সৎমা

প্রথম প্রবন্ধ

১। বহুবিবাহ।

"ময়না ময়না ময়না। সতীন যেন হয় না॥
হাতা হাতা হাতা। খাই সতীনের মাথা॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি। সতীন মাগী চেড়ী॥
পাখী পাখী পাখী। সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে,
ছাদে উঠে দেখি॥
খুংকুড়ি খুংকুড়ি খুংকুড়ি। সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি॥
বটি বটি বটি। সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি॥
উদ্‌বিড়ালী খুদ খায়। স্বামী রেখে সতীন খায়॥
কুলগাছ কুলগাছ ঝেঁকুড়ি।
সতীন আবাগী মেকুড়ি॥
সাত সতীনের সাতটা কৌটো।
আমার আছে নবীন কৌটো॥
নবীন কৌটো নড়ে চড়ে। সাত সতীন পুড়ে' মরে॥
ঢেঁকিশালে শুলো। আর ঠুস্ করে ম'লো॥
অশথ কেটে বসত করি। সতীন কেটে আলতা পরি॥"

"সাঁজ পূজনী" বা "সেঁজুতি" ব্রতে বাঙ্গালীর মেয়ে এই সব কামনা করেন। ইহাই হইল মেয়েলিতন্ত্রের মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণ মন্ত্র। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, নারী-জাতির সপত্নীশঙ্কা কত প্রবল এবং সপত্নীবিদ্বেষ কত তীব্র!

'ব্রতকথা'র একখানি ছাপান পুস্তকে দেখিলাম গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, কুলীনদের ঘরে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে কুলীনকন্যাদিগের সপত্নী-সম্ভাবনা-নিবারণের কামনায় এই ব্রতের উৎপত্তি। কিন্তু কেবল কুলীনদের ঘরে সপত্নী-সম্ভাবনা থাকিলে, এ ব্রতটি দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে কেন? আবার শুধু তাহা নহে, আর সকল ব্রতের আগে এই ব্রত করিবার নিয়ম আছে—যেমন আর সকল পূজার আগে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজার বিধি। মূল কথা, শুধু কুলীনদের ঘরে কেন,—সেকালে সকল ঘরেই বহুবিবাহের সম্ভাবনা ছিল, তবে অবশ্য এক্ষেত্রে কুলীনদের খুব 'সুবর্ণ-সুযোগ' ছিল। পত্নী-বিয়োগে, তাঁহার গণ্ডজ সন্তান বর্ত্তমান থাকিলেও, গৃহধর্ম্ম-পালনের জন্য পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে শাস্ত্রের অনুমতি আছে। শাস্ত্র না মানিলেও, গৃহশূন্য হইলে অনেকে 'ঘর চলে না' বলিয়া, শিশুগুলির লালন-পালনের জন্য, আবার বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন ও আজকালও হয়েন। আসল কথা, ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্যই অধিকাংশস্থলে বিপত্নীকগণের দ্বিতীয়-সংসার করা। আবার শুধু পত্নী-বিয়োগে কেন, পত্নীর জীবদ্দশায়ও, পত্নী বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, বা কেবল-কন্যা-প্রসবিনী হইলে পত্ন্যন্তর-গ্রহণে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা আছে, কেন না—

"পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্।"

আবার পত্নী চির-রুগ্ণা বা দুঃশীলা হইলেও পুনর্দ্দার-গ্রহণের বিধি আছে। আবার শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া, অনেকে অন্য কারণেও, প্রথমা পত্নী বিদ্যমানে দ্বিতীয় পক্ষ করিতেন। অনেক সময় গুণধর পুরুষ, পত্নীর প্রতি কোন কারণে অপ্রীত হইয়া,—মনের মিল হইল না—এই ছুতা ধরিয়া, অবলীলাক্রমে আবার বিবাহ করিতেন। প্রয়োজন হইলে 'সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী' এই শ্লোকাংশ উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতেও পারিতেন। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ও মুসলমান নবাব-বাদশাহ্‌দিগের দেখা দেখি, একাধিক পত্নী সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরকে বিলাস-ভবনে পরিণত করিতেন। অতএব, কেবল যে কুলীনগণই উক্ত দোষে দোষী ছিলেন, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

আর কুলীনগণও অনেক সময় মেলবন্ধনের আঁটা-আঁটিতে, পালটিঘরের 'চিঁড়ের বাইশ ফেরে' পড়িয়া, কুল-রক্ষার জন্য বহুকন্যা একপাত্রস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। কায়স্থের "আন্থিরস"ও এইরূপ কুলপ্রথার প্রভাবে ঘটিত। তবে অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, দেবীবরের প্রবর্ত্তিত প্রথার ফলে বহুবিবাহ, অর্থলোভী কুলীনের জীবিকার্জ্জনের উপায়-

স্বরূপ একটা ব্যবসায় হইয়া দাড়াইয়াছিল। তাঁহারা পত্নীদিগের ভরণপোষণের ভার লইতেন না এবং পতির কোন কর্ত্তব্যই পালন করিতেন না। ইহার নানারূপ কুফলও ফলিত। যাহা হউক, বহুবিবাহের বহুদোষ-কীর্ত্তন বর্ত্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নহে। আর সেরূপ করিতে গেলে, লেখককে প্রকারান্তরে নিজের কুলীন পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা—গুরুনিন্দা—করিতে হইবে। বৈদিক ব্রাহ্মণ 'নাটুকে নারাণ' (৺রামনারায়ণ তর্করত্ন) 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় কুলীনসন্তানগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান চূড়ান্ত রকমেই করিয়াছেন, আর পিষ্টপেষণে প্রয়োজন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন ; * আইন করিয়া এই প্রথার উচ্ছেদ করিবার জন্য আবেদন পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বিংশশতাব্দীতে, ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে ও ইংরাজ-সমাজের একপত্নীবাদের দৃষ্টান্তে, এই প্রথা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজ হইতে এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই হয়। তবে শুনিয়াছি, ইহা পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও কোথাও এখনও কুলীন-সমাজে প্রচলিত আছে। আশা করা যায়, আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবে।

যাঁহারা আমাদের দেশে ইংরাজের আমলে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ একাধিক পত্নী বিবাহ করিয়াছিলেন। তবে তাহা অবশ্য মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল, স্বেচ্ছাকৃত নহে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, হালেও দক্ষিণ-বঙ্গের দুই একজন উচ্চউপাধিধারী ও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীকে এক স্ত্রী বিদ্যমানে, অপর পত্নী গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি ;—অবশ্য তাহা কৌলীন্যের প্রকোপে নহে, শুধু খেয়ালের বশে! আজকাল শাস্ত্রে তত বিশ্বাস না থাকিলেও, কেহ কেহ মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, প্রথমা পত্নীর বন্ধ্যাত্ববশতঃ বংশরক্ষার জন্য, পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন—এরূপ সুপুত্রও দেখা যায়। পণের টাকা, তত্ত্বের পরিমাণ প্রভৃতি লইয়া বধূর মা-বাপের সঙ্গে অম্বরস হইলে, কখন কখন বরের মাতা, জিদ করিয়া, পুত্রের আর একটি বিবাহ দিয়া বসেন ; এরূপ ঘটনাও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। বধূর সঙ্গে বনিবনাও না হইলে, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া, জননী পুত্রের আবার বিবাহ দিয়াছেন ; এরূপ ঘটনাও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। কোন কোন স্থলে বধূ, মাতাপিতার প্ররোচনায় অথবা নিজের স্বভাবদোষে, কিছুতেই স্বামীর ঘর করিতে সম্মত হয় না ; সেক্ষেত্রে উপায়ান্তর না দেখিয়া, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, স্বামী, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বা মাবাপের চেষ্টায়, সরাসরি ভাবে আবার বিবাহ করিয়াছেন ; এরূপও ঘটে। যাহা হউক, শেষোক্ত কএক প্রকার ঘটনা এত বিরল যে, সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

বহুবিবাহের কথাটা যখন তুলিয়াছি, তখন ইহার আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। এই প্রথা যে কেবল বাঙ্গালী-সমাজের নিজস্ব ছিল, তাহা নহে। সকল সমাজেরই শৈশবে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নানাবিধ অপ্রতিবিধেয় কারণও ছিল. ইন্দ্রিয়-লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য, বা অর্থলাভের লোভে, সকল ক্ষেত্রে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় রাজগণ, বা মোগল বাদশাহগণ, রাজনীতিক কারণে অনেক সময়ে বহুপত্নী গ্রহণ করিতে এক প্রকার বাধ্য হইতেন। অনেক সময়ে উহা আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। আরও প্রাচীন কালে, দেশজয়ের পর অনেক সময়ে স্ত্রী-হত্যা বা দাসত্ব-প্রথা অপেক্ষা সমাজ-রক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠকল্প বিবেচনায় বহুবিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। এ ভাবে দেখিলে উল্লিখিত প্রাচীন প্রথাটি 'অতি জঘন্য, অতি নৃশংস, অশেষ দোষাস্পদ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতে পারে না। বরং, তখনকার হিসাবে উহা করুণা-প্রসূত (humane) বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে, এখন অবশ্য এই প্রথার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার বাহিরে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, রাজারাজড়ার ঘরে আজও এ প্রথার আদর আছে। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ইহা এখনও বিদ্যমান আছে, একথা বলাই বাহুল্য।

প্রাচীন য়িহুদি সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, বাইবেলের পাঠকগণ অবশ্যই এ সংবাদ অবগত আছেন। এব্রাহাম্, আইজ্যাক্ প্রভৃতি patriarchগণের একাধিক

* পরপ্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পত্নী ছিল। জেকব্ কি প্রকারে মাতুলের দুইটি কন্যা-রত্নকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন,তাহা বাইবেলে, কাব্যের মত হৃদয়গ্রাহিভাবে, বর্ণিত আছে। ডেভিড্, সলোমন্ প্রভৃতি রাজাদিগের বেলায় ত খুবই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সভ্যতাস্পর্দ্ধী প্রাচীন গ্রীস-রোমে এক সময়ে বহুবিবাহ ছিল। প্রাচীন জার্ম্মান-জাতিতে সাধারণের এ অধিকার না থাকিলেও প্রধানবর্গ একসঙ্গে একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। অতএব ইহা প্রাচ্যদেশসুলভ কুপ্রথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। মুসলমানধর্ম্মেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, তবে যথেচ্ছ বিবাহে বাধা আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, হিন্দুশাস্ত্রেও বৈধ কারণ ব্যতীত বহু-বিবাহের বারণ আছে। শৈববিবাহ, তান্ত্রিক-আচার-পালন-জন্য বিবাহ, প্রভৃতি প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। পুরুষ ও নারীর বিবাহ-বিষয়ে সমান অধিকার সকল সমাজের শাস্ত্রবিধিতে ও রাজবিধিতে স্বীকৃত নহে।

খ্রীষ্টীয় সমাজে বহুবিবাহ এক্ষণে ধর্ম্মবিধি এবং রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রথম আমলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিল না, কাহারও কাহারও মতে বাইবেলে ইহার কোন স্পষ্ট নিষেধও নাই। মাঝে মাঝে আদালতের ব্যাপার হইতে জানা যায় যে, একাধিক বিবাহ করার প্রথা এখনও খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয় নাই। তবে এরূপ অপকার্য্য অবশ্য গোপনে সম্পন্ন হয় এবং সাধারণতঃ জুয়াচোর-জাতীয় লোকদ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। যাহাহউক, খ্রীষ্টীয় সমাজে একপত্নীবাদ (monogamy) এক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। সঙ্গত কারণে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ (divorce) করিয়া পুরুষের (ও নারীর) আবার বিবাহ করায় অবশ্য বাধা নাই। এস্থলে একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আধুনিককালেও খ্রীষ্টীয় সমাজে কোন কোন চিন্তাশীল লেখক বিবেচনা করেন যে, অবস্থা-বিশেষে একাধিক পত্নীগ্রহণ ধর্ম্মতঃ ও আইন-অনুসারে সিদ্ধ হওয়া উচিত। কবি কুপরের বন্ধু মার্টিন ম্যাডান (Martin Madan) Thelyphthora ইতি বিকটনাম্নী পুস্তিকায় এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মযাজক ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সুরুচির খাতিরে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

মার্কিন-মুল্লুকের 'মরমন' (Mormon) দিগের কীর্ত্তি-কলাপও বোধ হয় পাঠকসমাজের অগোচর নাই। শুনা যায় ইহাদিগের দলের একজন 'কর্ত্তা', মিঃ ইয়ং (বোধ হয় স্থিরযৌবন-বিধায় এরূপ নামকরণ!) মোটে ষাটটি বিবাহ করিয়াছিল! ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যদেশের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যখন এই হাল, তখন আর কুলীনসন্তান একাই কলঙ্কী কেন?

২। সপত্নী-বিরোধ।

যা'ক,—বহুবিবাহের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা আসিয়া পড়িয়াছে। সপত্নীগণের পরস্পরের প্রতি ও পরস্পরের সন্তানের প্রতি আচরণই আমার বর্ণনায় বিষয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত মেয়েলিব্রতের ছড়া, সতীনবাদ, সতীনকাঁটা, সতীনঝালা সতাসতীনের ঘর, সৎসম্পর্ক (!) প্রভৃতি শব্দ এবং দু'একটি প্রবাদবাক্য-প্রবচন হইতে বেশ বুঝা যায়, সপত্নীবিদ্বেষ কি ভীষণ বস্তু! ব্রতকথা ও রূপকথায়ও সপত্নীর ও বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকষষ্ঠীর কথায় দেখা যায় যে, অশোকা রাজরাণী হইয়া ছয় সতীনের হাতে অনেক লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভজ সন্তানদিগের পর্য্যন্ত নির্য্যাতন হইয়াছিল। অনেক রূপকথার আখ্যানবস্তু—দুয়ারাণীর, বা, তাঁহার গর্ভজ সন্তানের, উপর সুয়ারাণীর অমানুষিক অত্যাচার। বেশী কথায় কায কি, এমন যে স্নেহসম্পর্ক মায়ের পেটের বোন তাহাও সপত্নী-সম্পর্ক হইলে বিষম বিষময় হয়। পুরাণে চন্দ্রের পত্নীগণের বেলায় ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েলি ছড়ায় আছে—

> "নিম তিত নিসিন্দে তিত তিত মাকাল ফল।
> তাহার অধিক তিত বোন সতীনের ঘর॥"

সপত্নী-বিরোধের নিদান নির্ণয় করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পতিপ্রেম লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রেই দ্বেষ হিংসা কলহবিবাদ প্রভৃতি অনর্থের উৎপত্তি হয়। অবৈধ প্রণয়-স্থলেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে; কিন্তু সে তত্ত্ব এক্ষণে আমার প্রতিপাদ্য নহে। পতিহৃদয়ে একেশ্বরী হইয়া বিরাজ করিতে না পারিলে সধবাগণ নারী-জন্ম বৃথা বলিয়া বিবেচনা করেন ও নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন

বলিয়া অসহ্য হৃদয়-বেদনা পান। সুতরাং ইহার জন্য স্ত্রীলোক না করিতে পারে এমন অপকর্ম্ম নাই। মরণ-কালেও অনেকের নিকট এই যন্ত্রণাই মর্ম্মান্তিক হয় যে, ইহার পর আর একজন আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিবে,—যে নিতান্তই আমার, সে আমাকে ভুলিয়া আর একজনকে আপনার করিবে! * অবশ্য সতীসাধ্বীরা পরম নিশ্চিন্ত মনে পতিপদে মাথা রাখিয়া নয়ন নিমীলিত করেন, এমন কি পতিকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া যান। তবে এরূপ মনের জোর, এরূপ নিঃস্বার্থভাব অল্পস্থলেই দেখা যায়। কথায় বলে, "যমকে দেওয়া যায়, তবু সতীনকে দেওয়া যায় না।"

পতিপ্রেম লইয়া আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি ছাড়া, আর একটি কারণে সপত্নীগণের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ ঘটে ;—নিজ নিজ গর্ভজ সন্তানের স্বার্থ লইয়া সপত্নীগণ পরস্পরের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। রামায়ণে কৈকেয়ীর কীর্ত্তি, ও পুরাণে সুরুচির কাণ্ড, সর্ব্বজনবিদিত। সপত্নী পাছে পুত্রবতী হইলেই স্বামীর পরম প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়ে, পুত্রের দাবিতে পতিহৃদয় ষোল আনা দখল করিয়া ফেলে, অথবা দাবাখেলার ভাষায় বলিতে গেলে 'দু'জোর' হইয়া বসে, এই ভয়ে বন্ধ্যার হৃদয়ে দারুণ অশান্তি উপস্থিত হয়। বধূদিগের মধ্যে যিনি পুত্রবতী বা সন্তান-সম্ভাবিতা হয়েন, তিনি শ্বশুরশাশুড়ীরও স্নেহলাভ করেন। অনেকস্থলে নারীগণ, যতদিন নিজের সন্তান না হয় ততদিন, সপত্নীর সন্তানকে স্নেহমমতা করেন ; কিন্তু নিজের সন্তান হইলে তখন সপত্নীর সন্তানকে বিষনয়নে দেখেন। ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা ; ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অবশ্য বন্ধ্যা নারীর বেলায় এই শেষোক্ত কারণ বলবৎ নহে ; তজ্জন্যই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বন্ধ্যা নারী সপত্নী-পুত্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছেন। শুধু তাহা কেন ;—বন্ধ্যা নারী নিজে উদ্যোগ করিয়া, স্বামীর বংশরক্ষার্থ ও নিজের জলপিণ্ডলাভের * আশায়, স্বামীর আবার বিবাহ দিতেছেন ; বালিকা নববধূকে স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় 'যত্নআত্তি' করিতেছেন এবং এত সাধের 'কনে বউ'এর সন্তান হইলে তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতেছেন, এরূপ ঘটনাও নিতান্ত আষাঢ়ে গল্প নহে। ইহা একদিকে গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের ফল, অন্যদিকে প্রকৃত পতিভক্তির নিদর্শন, এবং অপরদিকে গূঢ় মাতৃভাবের বিকাশ। পক্ষান্তরে, পুরুষ বংশরক্ষার জন্য প্রথমা পত্নীর অনুকূলতায়—অথবা মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, প্রথমা পত্নীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতেছেন এবং পরে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে (এবং তাঁহারও 'যোগসাজোগে') প্রথমা পত্নীর দারুণ দুর্গতি হইতেছে, সপত্নীবিদ্বেষের এরূপ হৃদয়বিদারক পরিণামও সমাজে বিরল নহে। ধনার পত্নী নিজে নিঃসন্তানা হইলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া সপত্নীপুত্রের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণা হয়েন, ইহাও প্রত্যক্ষ ঘটনা। সপত্নী জীবিতা না থাকিলেও এই সূত্রে বিদ্বেষের মাত্রার হ্রাস হয় না। কুলীনের বহুবিবাহ নিন্দিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কুলীন-দের ঘরে সপত্নীবিদ্বেষ তত প্রকট হইতে পারিত না। কেননা সপত্নীগণের একত্র স্বামিগৃহে বাস প্রায় ঘটিত না। প্রায় সকল পত্নীই 'আইবড়' নাম ঘুচাইয়া পিত্রালয়ে বা মাতামহালয়ে পড়িয়া থাকিতেন। দু'একজনকে লইয়া কুলীনস্বামী ঘর করিতেন, কখন কখন তাঁহাদিগকে পালা করিয়া আনিতেন।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, সপত্নীগণের পরস্পরের প্রতি ও সপত্নীসন্তানদিগের প্রতি বিদ্বেষ, এই উভয় প্রকার বিদ্বেষই সাধারণতঃ নারীচরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই স্বাভাবিক, এবং ইহাই সাধারণ নিয়ম। ক্বচিৎ কুত্রচিৎ বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সদ্ভাব-সম্প্রীতি দেখা যায়। মোট কথা, ইহা মর্ম্মান্তিক বিরোধের সম্পর্ক। শাশুড়ী-বধূতে, যা'এ যা'এ, ননদ-ভাজে, সদ্ভাবের তেমন প্রবল বাধা নাই, কিন্তু সতীনে সতীনে শাশ্বতিক বিরোধ, অহি নকুল-

* এসকল ব্যাপারের উদাহরণ বাস্তব-জীবন হইতে দেওয়া সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও সুরুচিসম্মত নহে। অতএব পাঠকবর্গকে ভদ্রভাবে মিল্‌টনের ঈভের কথা স্মরণ করাইয়া দিই।

> Then I shall be no more ;
> And Adam, wedded to another Eve,
> Shall live with her enjoying, I extinct !
> A death to think !—*Paradise Lost* Bk. IX.

প্রভাত বাবুর 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে ইহার হাস্যরসাত্মক দিক্‌টা (comic side) মুন্সীয়ানার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

* সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥

সম্পর্ক! * বিমাতা ও সপত্নীপুত্রেও এইরূপ বিরোধের সম্পর্ক। এই দুইটি সম্পর্কের ভিতর মাধুর্য্যসঞ্চার সমাজ ও সাহিত্য—উভয়ত্রই সুদুর্লভ।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যে সপত্নী ও বিমাতা।

সাহিত্য, সমাজের দর্পণ। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির ছায়া সাহিত্যমুকুরে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সমাজে বহুবিবাহ সপত্নীবিরোধ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে সাহিত্যে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের—সংস্কৃত, এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের—ভিতর অনুসন্ধান করিতে গেলে এই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ হয়। বাস্তবিক, আমাদের সাহিত্যে অন্য চিত্র থাকুক না-থাকুক, এই শ্রেণীর চিত্রের খুবই ভরাভর। শুধু নরলোকে কেন,—দেবলোকেও বহুবিবাহ ও তৎসহচর সপত্নীবিরোধ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মানুষ নিজের ছাঁচে দেবতা গড়ে—'Man makes God after his own image'; (দার্শনিকগণ উক্ত তত্ত্বকে anthropomorphism বা দুরুচ্চার্য্য নামে অভিহিত করেন)। সুতরাং ইহা যে মর্ত্ত্যধাম হইতে স্বর্গে উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্বর্গলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, বাস্তবিকই বিচিত্র ব্যাপার চোখে পড়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিব, এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে দেখা যায়, শিবের যুগলপত্নী (ইঁহারা বোন-সতীন) গৌরী ও গঙ্গা, বিষ্ণুর যুগলপত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদের ফল আজও ফলিতেছে এবং আমাদের মত ব্রাহ্মণসন্তান তাহার ভোগ ভুগিতেছে—

নাথে কৃতপদঘাত শ্চুলুকিততাতঃ সপত্নীকাসেবী।
ইতি দোষমিব রোষাদ্ মাধববোষা দ্বিজং ত্যজতি॥"

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে'র রিপোর্টার মহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত বলিতেন যে, ব্রহ্মা,—শিব ও বিষ্ণুর দশা দেখিয়া শিখিয়াছিলেন, তাই ও বালাই যোটান নাই; মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়া পিণ্ডের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবলোকে আরও দেখা যায়,—কশ্যপের আট পত্নী—তন্মধ্যে এক যোড়া দিতি ও অদিতি। উভয়ের গর্ভজ সন্তানদিগের মধ্যে বিরোধ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। এত বিবাদ সাধিয়াও কশ্যপ নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার আর এক যোড়া পত্নী বিনতা ও কদ্রু—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলে তাঁহাদিগের গর্ভজ গরুড় ও নাগগণের বিষম বিরোধ ও চিরন্তন শত্রুতা ঘটিয়াছিল, পুরাণজ্ঞগণ অবগত আছেন। ইহার পরের পুরুষে সূর্য্যের দুই পত্নী—সংজ্ঞা ও ছায়া। তবে এক্ষেত্রে এই সপত্নীসৃষ্টি সংজ্ঞারই কায,—সূর্য্যের কোন দোষ ছিল না। চন্দ্র সাতাইশ তারার পতি। জানি না সেকালের কুলীনরা 'চন্দ্রাহত' হইয়া বহু বিবাহ করিতেন কি না! রোহিণীর প্রতি পক্ষপাতপ্রদর্শনে তাঁহার ভগিনী-সপত্নীগণ কিরূপ কুপিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে চন্দ্রের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পুরাণজ্ঞগণের অবিদিত নাই। দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্রে অন্য কলঙ্ক যাহাই থাকুক, গ্রীক্‌পুরাণোক্ত জিউসের (Zeus) মত, তাঁহার অজস্র দার-গ্রহণ দোষ ছিল না; কিন্তু তাঁহার প্রাসহা নামে বাবাতা পত্নী ছিলেন, বেদজ্ঞ ত্রিবেদী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। * শ্রীমদ্‌ভাগবতে নররূপী নারায়ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী প্রভৃতি বহু পত্নীর উল্লেখ আছে। শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী কুব্জা প্রভৃতির কথা অবশ্য এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিলে দেখা যায়, ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও প্রাচীনকালে বহুবিবাহ ছিল। 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে, তস্মাদেকো বহ্বীর্বিন্দতে, তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিবচন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় অনেকেই জানেন। সপত্নীদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পতি যাহাতে একজনকেই হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উৎসর্গ করেন, তাহার জন্য মন্ত্রৌষধের নির্দ্দেশ বহু বেদমন্ত্রে আছে। † ইহা ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। অন্যে পরে কা কথা, ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যের যুগলপত্নী—গার্গী ও মৈত্রেয়ী। কক্ষীবান্ ‡ নামক দ্বিজকে এক রাজা এককালে দশ কন্যা সম্প্রদান করেন, পরে তাঁহার

* সংস্কৃতভাষায় 'সপত্ন' অর্থে 'শত্রু'। বৈয়াকরণ ইহার অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি দেন; কিন্তু আমার মনে হয়, 'সপত্ন'—সপত্নীর পুংলিঙ্গ!

* ত্রিবেদী মহাশয় বলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' ইন্দ্রের বাবাতা পত্নী প্রাসহা। পূর্ব্বে আর এক পত্নী থাকিলেই বাবাতা পত্নী হইতে পারিত, নতুবা হইতে পারিত না। অতএব ইন্দ্রের অন্ততঃ দুই পত্নী ছিল।

† বিশ্বকোষ। ‡ বিশ্বকোষ।

বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রও তাঁহার আর একটি পত্নী ঘটাইয়া দেন।—ইত্যাদি বৃত্তান্ত বেদে আছে। সৌভরি মুনি রাজা মান্ধাতার বহুকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়। এ সব অবশ্য বল্লালী বা দেবীবরী কুল-মেলাদির ফল নহে। মহাভারতোক্ত অনন্তব্রতের কথায় দেখা যায় যে, সপত্নীযুগল পরস্পরকে পতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, সেই পাপে তাহারা পরজন্মে পুষ্করিণী হইয়াছিল এবং সেই পুষ্করিণীদ্বয়ের জল কেহ পান করিত না। মাতৃহীনা সপত্নীকন্যা শীলার, বিমাতা কর্কশার হস্তে লাঞ্ছনার প্রসঙ্গও উক্ত কথায় আছে।

পুরাণ ইতিহাসে ক্ষত্রিয় রাজগণের বহুকলত্রতার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেক রাজা বহুকাল অপুত্রক থাকিতেন, ইহা অবিদিত নহে। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে পুত্রলাভের জন্য নৃপতিগণ বহুবিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন কি 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা' এই নীতির অনুসরণ করিতেন তাহা অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা যায় না। যাহা হউক, মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করি।

উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, কিন্তু সুরুচির, সপত্নীপুত্র ধ্রুবের প্রতি দ্বেষ ও দুর্ব্ব্যবহার সুবিদিত। শুনিয়াছি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দানবীর হরিশ্চন্দ্রের শত জায়ার উল্লেখ আছে। ভাগবতে বসুদেবের—দেবকী রোহিণী প্রভৃতি বহুপত্নীর উল্লেখ আছে। বীরশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বহু পত্নীর কথা রামায়ণে আছে। শ্রীবৎস রাজা শনির দশার শেষে আদর্শসতী চিন্তার সপত্নী যোটাইতে কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তবে, তখন তিনি চিন্তার সঙ্গে পুনর্ম্মেলনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, পুণ্যশ্লোক নল রাজার বহু-দারগ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায় না। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরবর্ণনে ইন্দুমতীর করপ্রার্থী কোন কোন রাজার বহুপত্নীর কথা সুনন্দার প্রদত্ত পরিচয়ে জানা যায়। *

সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা বংশ-প্রবর্ত্তয়িতা সূর্য্য ও চন্দ্রের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। সগর রাজার মাতা যখন সসত্ত্বা ছিলেন, তখন তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে গরল পান করিতে দেন (সপত্নী-বিদ্বেষের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!) সেই জন্য পুত্রের নাম স-গর। সগরেরও দুই পত্নী ছিল। ভগীরথের দুই মাতা—উভয়েই নিঃসন্তানা ছিলেন, সুতরাং দায়ে পড়িয়া সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। (ইহা কি কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি?) রঘুবংশের প্রথম সর্গে 'অবরোধে মহত্যপি' এই চরণ হইতে দিলীপের পরিগ্রহবহুত্ব জানা যায়। দশরথের ৩৫০টি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এই তিনজন প্রধান। কৈকেয়ীর সপত্নীবিদ্বেষ ও তাহার বিষম পরিণাম ভুলিবার নহে। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' রামায়ণের এই শ্লোকার্দ্ধ জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত। তবে মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ীর কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা করিয়া ঋষিকবি বিমাতার দোষ কতকটা ক্ষালন করিয়াছেন। * রঘুবংশ-প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্রের একপত্নীকত্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই বিধি পালন করিবার প্রয়োজনেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করাইয়া শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নেরও একাধিক বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, পিতৃকীর্ত্তি দেখিয়া ইঁহাদিগের সকলেরই বহুকলত্রে অরুচি ধরিয়াছিল।

যেমন সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের পত্নীভাগ্য সুপ্রসন্ন, তেমনই সূর্য্যবংশীয় নৃপগণ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয় নৃপগণের পত্নীভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। সুতরাং রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে বহুবিবাহের বাহুল্য—এত বাহুল্য যে পুরুষের বহুপত্নী ত আছেই, নারীরও বহুপতি ঘটিয়াছে! যযাতির—দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা—দুই পত্নীর বিরোধ ও তাহার ফলে শুক্রাচার্য্যের শাপ বিশদরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। মহাভারতের শকুন্তলা দুষ্যন্তকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভজ সন্তানই রাজ্য পাইবে—ইহা হইতে দুষ্যন্তের 'পরিগ্রহবহুত্ব' অনুমেয়। কালি

* রাবণের সহস্রাধিক নারী—সবই কি অধিকাংশই 'রাক্ষস বিবাহে'র ব্যাপার? বালী ও সুগ্রীবের কীর্ত্তি 'বাঁদুরে কাণ্ড' বলিয়াই ধর্ত্তব্য।

* রঘুবংশে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সম্প্রীতিবশতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুমিত্রাকে চরুর ভাগ দিয়াছিলেন, ইহা রামায়ণ-বিরোধী। মল্লিনাথ বলেন, ইহা 'নারসিংহপুরাণ' হইতে গৃহীত। রামায়ণে রাজা তিন জনকেই নিজে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

াসের নাটকে ইহা দুষ্যন্তকর্তৃক স্পষ্টতঃ স্বীকৃত। শান্তনু ত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে দাসরাজ ধরিয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠাধিকার উচ্ছেদ করিয়া রাজা তাবতীর গর্ভজ সন্তানকে রাজ্য দিবেন। ভীষ্মের ানুভবতায় এক্ষেত্রে সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার বিদ্বেষ-ি জ্বলিয়া উঠিতে পারে নাই;—আরম্ভেই নির্ব্বাপিত ইয়াছিল। ইহার পর পুরুষে, ভীষ্মের উদ্যোগে, বিচিত্র-র্য্যের দুই পত্নীলাভ হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী পুরুষে, জ্যেষ্ঠ তরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াও পতিব্রতা গান্ধারীর সতীনকাঁটা াটাইতে ক্রটি করেন নাই, যুযুৎসুর বৈশ্যা মাতা তাহার াক্ষী। কনিষ্ঠ পাণ্ডুর যুগলপত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী। মাদ্রীর াবদ্দশায় তাঁহার সহিত কুন্তীর কোন অসদ্ভাব ছিল না, বং মাদ্রীর সহমরণের পর কুন্তী নকুল-সহদেবের সহিত জ সন্তানদিগের কোন প্রভেদ করেন নাই। বাস্তবিকই হাভারত পবিত্র নৈতিক আদর্শের অক্ষয় ভাণ্ডার—হিন্দুর ঞ্চম বেদ। পতিব্রতা দ্রৌপদীর সপত্নীর অভাব ছিল না বং তাঁহাকে সুভদ্রাদি সপত্নীর সহিত একত্র এক ংসারে বাসও করিতে হইয়াছিল। সে প্রসঙ্গে কোন সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্রৌপদী-সত্যভামা-বাদে (বনপর্ব্ব ২৩২ অধ্যায়) দ্রৌপদী বলিতেছেন:—ামি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।' হা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, তিনি সপত্নীদ্বেষিণী লেন না। তবে এ টুকু ভুলিলে চলিবে না যে, অশ্বত্থামা র্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিনষ্ট হওয়াতে, পুত্রের উত্তরা কার লইয়া দ্রৌপদী-সুভদ্রায় যে মনোমালিন্যের আশঙ্কা ল, তাহা তিরোহিত হইয়াছিল। যাহা হউক, দ্রৌপদী সর্বপ্রকারেই 'শ্বাশুড়ীর যোগ্য বধূ' ছিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়িয়া কাব্যনাটক ধরিলে দেখা য় যে, অনেকগুলি নাটকে—যথা শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, ত্নাবলি, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রিয়দর্শিকা, মৃচ্ছকটিক, স্বপ্ন-াসবদত্তম্—এক বা একাধিক পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও ায়ক নূতন প্রণয়িনীর পাণিগ্রহণে সমুৎসুক। এই নূতন পুরাতনের সঙ্ঘর্ষই বহু নাটকের প্রাণ, তাঁহাদিগের েষারেষি লইয়াই আখ্যানবস্তু জটিল হইয়াছে। কএকখানি পরিণীতা পত্নী নব-প্রণয়িনীর সহিত মিলনে যথাসাধ্য বাধা দিতেছেন, তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতেছেন, কিন্তু নাটকের শেষ-অঙ্কে নববধূকে বহুমান করিতেছেন, এমন কি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া নিজেই উদ্যোগ করিয়া রাজার সহিত বিবাহ দিতেছেন। মৃচ্ছকটিকে অসদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাসকবির নবাবিষ্কৃত স্বপ্ন-বাসবদত্তের যতটুকু পরিচয় জানিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, সপত্নী-দর্শনে বা সপত্নীর প্রতি পতির প্রীতি দর্শনে সপত্নীর মনে বিষাদের উদয় হইতেছে, কিন্তু বিদ্বেষের উদয় হইতেছে না। তবে এ সকল নাটকের সম্মেলনেই পরি-সমাপ্তি, ভবিষ্যতে একত্র ঘরসংসার করিতে করিতে অশান্তি ঘটিয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, এক মৃচ্ছকটিক বাদে অন্যগুলিতে রাজার ঘরের কথা—সে বিরাট্ রাজভবনে প্রত্যেক রাণীর আলাদা আলাদা মহল নির্দ্দিষ্ট থাকাতে অনেক অনর্থ নিবারিত হইত। সাধারণ গৃহস্থঘরের সপত্নীবিরোধ সমস্যা এগুলি দ্বারা মীমাংসিত হয় না।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া বৈশ্যের বহুপত্নীর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ধনমিত্র বণিকের বহুকলত্রের উল্লেখ আছে। ইহার ঢেউ বাঙ্গালা-সাহিত্যে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ধনপতি সদাগরের গায়ে লাগিয়াছে। উভয়ের নাম-সাদৃশ্যও অনুধাবনীয়।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, মহাভারতে বর্ণিত আদর্শ-নারী কুন্তী ও দ্রৌপদীর বেলায় ছাড়া আর কোন স্থলে সপত্নী ও বিমাতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ 'কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে' অতি অল্প স্থলেই প্রতিপালিত হইয়াছিল।

৪। সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে সতীন ও সৎমা।

সংস্কৃত সাহিত্যে, সপত্নীগণের দৈনন্দিন জীবনের বড় একটা সংবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু এবিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচুর আলোক পাওয়া যায়। সেকালের বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এবিষয়ে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেন এবং বর্ণনাটাও বহুস্থলে খুব ফলাও করিয়া করিতে ভালবাসিতেন। (They simply revelled in these descriptions)—'সতিনী বাঘিনী'র প্রসঙ্গ পাইলে,

তাঁহারা যেন পাকাকলা পাইতেন। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই। ভারতচন্দ্র চোখের উপরেই স্বীয় প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষদ্বয়াশ্রয় ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে উহা কুলীনসমাজে প্রচলিত থাকাতে কবির যথেষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান ছিল। সুতরাং রায়গুণাকরের তূলিকায় অঙ্কিত চিত্র সুপরিস্ফুট ও সংখ্যায়ও বহু। যাহা হউক, সম্পন্নঘরের সন্তান ভারতচন্দ্র বিলাসবহুল রাজসভায় বসিয়া এরূপ রং ফলাইয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কিন্তু দামুন্যার দরিদ্রকবি মুকুন্দরাম দুঃখদারিদ্র্যময় পল্লীক্রোড়ে পালিত হইয়াও যে তৎপ্রণীত 'চণ্ডী'কাব্যে এই শ্রেণীর একাধিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। কবিকঙ্কণের কোন কোন বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তখনকার কালে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এই প্রথা অজ্ঞাত ছিল না। কেননা তিনি দেখাইয়াছেন যে, কালকেতু ব্যাধের ন্যায় নিতান্ত দুঃখী দরিদ্রের ঘরেও সপত্নীসম্ভাবনা একেবারে অসম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে, রাজদরবারের রাজকবির লেখনীর মুখ হইতে সাধারণ গৃহস্থসংসারের বার্ত্তা বড় পাওয়া যায় না, তিনি ধনীর গৃহের, রাজভবনের, অন্দরের খবর লইয়াই ব্যস্ত। বড় লজ্জার কথা যে, উভয় কবির সপত্নীবিরোধ-বর্ণনায় কোন কোন স্থলে পবিত্র-প্রণয়ের পরিবর্ত্তে উদ্দাম ইন্দ্রিয়লালসা নগ্নভাবে দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, আগে ভাগে টিপ্পনী না কাটিয়া, উভয় কবির চিত্রগুলির সঙ্গে পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়া দিই

উভয় কবিই বুঝাইয়াছেন যে, সপত্নী বিরোধ বিশ্বব্যাপী ব্যাপার—স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সর্ব্বত্র 'এই রঙ্গ'। উভয়েই গৌরী ও গঙ্গার বিরোধ বর্ণনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ কালকেতুর গুজরাটনগর-পত্তনকালে 'দোঁহার কোন্দল' বে একচোট গায়িয়া লইয়াছেন। বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে,—

'গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥'

কলেরই সুপরিজ্ঞাত। তবে দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দার ন্যায় খানেও ভারতচন্দ্র 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতি' করিয়া হিন্দুয়ানি বজায় খিয়াছেন! মুকুন্দরাম এ কৌশলটুকু আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। হরগৌরী একতনু হওয়ার পরেও দেবীর সপত্নীশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। সুরুচির খাতিরে সে শঙ্কার কথা তুলিব না। চণ্ডীতে লীলাবতী ব্রাহ্মণী স্বামি-বশীকরণের ঔষধের প্রশংসা-প্রসঙ্গে লহনাকে বলিতেছেন:—

"পঞ্চপতি একনারী দ্রুপদনন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥
বসুদেব-সুতা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদীর হইল যবে প্রবল সতিনী॥
ইহা ধরি দৌপদী বশ কৈল নাথ।
পতি ছাড়ি গেল ভদ্রা যথা জগন্নাথ॥" *

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সাবী দাসীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, দেবলোকেও সপত্নী বিরোধ ও রূপবতীর প্রতি পতির পক্ষপাত আছে:—

"রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥"

উভয় কবিই রামায়ণে কেকয়ীর কীর্ত্তি ও মন্থরার মন্ত্রণার কথা তুলিতে ছাড়েন নাই। অন্নদামঙ্গলে সাবী মাধীকে বলিতেছে,—

"কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুজী॥"

দাসুবাসুর রামায়ণ-গানে আছে

'কেকয়ী হইল বাম, বনবাসে গেল রাম।'

চণ্ডীতে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"কৌশল্যা রামের মাতা কেকয়ী তাহার সতা
দুহার কন্দলে সর্ব্বনাশ।
* * * *
সতিনী কন্দল যথা অবশ্য বিঘন তথা
রামায়ণে শুন ইতিহাস।"

(৵০) কবিকঙ্কণের কাব্য।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' সপত্নী 'সর্ব্বত্র গীয়তে'। কালকেতু ব্যাধকে যখন ভগবতী ছলিতে আসিলেন তখন সপত্নীর কথা আছে, তাহার পরে লহনা-খুল্লনার

* ইহা মহাভারতোক্ত 'দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে'র বিরোধী। এই বিকৃত বিবরণের জন্য কে দায়ী—মুকুন্দরাম, না লীলাবতী ব্রাহ্মণী?

কাণ্ড আছে, লীলাবতী ব্রাহ্মণীরা সাত সতান সে প্রসঙ্গ আছে, আবার শেষে কবি শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত সদাগরের দুই পত্নী ঘটাইয়া তাহাকে 'বাপ্‌কা বেটা' সাজাইয়াছেন। তার মধ্যে লহনা-খুল্লনার ব্যাপারই ফলাও করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(১) কালকেতু সামান্য ব্যাধ, পরে চণ্ডীর কৃপায় রাজাপদ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু কবি তাহার দরিদ্র অবস্থার বর্ণনায়ও ফুল্লরার সপত্নী-সম্ভাবনার কথা তুলিয়াছেন। তাতে বুঝা যাইতেছে যে, দিন আনে দিন খায়, এমন ঘরেও সতীন যুটিবার কোন আটক ছিল না। কালকেতু ফুল্লরাকে বলিতেছেন——

"শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করা্যা চক্ষু কৈলি রাতা॥"

দেবী যখন ফুল্লরাকে ছলিতেছেন, তখন দুঃখ করিতেছেন—

"একে সতীনের জ্বালা, কত সহে অবলা,
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে।"

ইহা শুনিয়া ফুল্লরা তাঁহাকে মন্ত্রণা দিতেছেন—

"যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি
কোপে করি বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতীনের কিবা হবে হানি।"

ইহা হইতে মনে হয়, সতীন তখনকার দিনে এত সাধারণ ছিল যে, ফুল্লরার মত ব্যাধরমণীও ইহার 'হদিস' জানিত। সে সপত্নীশঙ্কা করিয়াই এত কথা বলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

(২) লহনার সখী লীলাবতী ব্রাহ্মণী, কুলীনকন্যা ও সপত্নী। তাঁহার ছয় সতীন। তিনি বলিতেছেন :—

"ফুলিয়া নগর, মোর বাপঘর, বাপেরা কুলে মুখটি।
নারায়ণ-সুত, ভুবনে বিদিত, মহাকুল বন্দ্যঘটি॥
প্রীতি করি দয়া, বাপে দিল বিয়া, দারুণ ছয় সতানে।
* * * *
অল্প বয়েস, আমার প্রবেশ, ছয় সতীনের ঘরে।"

তার পর তিনি ঔষধ করিয়া * স্বামী ও শাশুড়ীননদী বশ করিয়া সুখে ঘরকরনা করিতেছেন :—

"এ ছয় সতিনী, মনে নাহি গণি, সাবাসি মোর পরাণি।"

এই চিত্রে বল্লালী, তথা দেবীবরী, কৌলীন্যপ্রথার উপর কটাক্ষ রহিয়াছে।

(৩) ধনপতি সদাগর, ভারত-বর্ণিত ভবানন্দ হরিহোড় প্রভৃতির ন্যায়, ধনী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ নহেন; কিন্তু শকুন্তলায় উল্লিখিত ধনমিত্রের ন্যায় ধনী বণিক্। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লহনাকে কখন কখন টিট্‌কারী দিয়া 'বাঁঝা' বা 'বাঁঝী' বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি ধর্ম্মার্থে, বংশরক্ষার্থে, আর একটি বিবাহে উদ্যোগী হইলেন, তাহা নহে। পায়রা উড়াইতে গিয়া সৌখীন সদাগর 'রূপবতীং দ্বাদশবার্ষিকীং' খুল্লনাকে দেখিয়া, ও তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মোহিত হইয়া, জনাই ওঝাকে ঘটক লাগাইলেন। খুল্লনার মাতা রম্ভাবতী সম্বন্ধের কথা শুনিয়া বোন-সতীনের ঘরে মেয়ে দিবেন না কোট ধরিলেন—

'নাহি দিব দারুণ সতীনে';
'তোমাকে বুঝাব কি, লহনা ভাইয়ের ঝী,
যদি তুমি তারে দিবে সতা।'

কিন্তু

'গণক কহিল মোরে দিবে দোজবেরে বরে—
বিচারিয়া বিধবা লক্ষণ।'

এই বলিয়া লক্ষপতি রম্ভাবতীকে রাজী করিলেন। স্নেহময়ী মাতা নারীসুলভ সংস্কারবশে কন্যার জন্য স্বামিবশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

এদিকে লহনা 'প্রভু দিবে নিদারুণ সতা' 'খুড়া হয়ে দেই সতা' এই দুঃসংবাদ পাইয়া, 'একলা ঘরেশ্ব দারা, আছিলাম স্বতন্তরা, নিতে দিতে আপনি গৃহিণী' এখন সে সুখের বাসা ভাঙ্গিল, এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। তাহার পর সদাগর ঘরে আসিলেন ও লহনাকে 'কপট প্রবন্ধে' বুঝাইলেন। বাঙ্গালী বর যেমন বিবাহযাত্রাকালে মাকে বলে 'মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি,' দোজবেরে হইবার সময় তেমনই সদাগর প্রথমা পত্নীকে বলিলেন, 'রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী।' 'রূপনাশ কৈলে প্রিয়া রন্ধনের

* এই ঔষধ করা খুব প্রাচীন প্রথা। মহাভারতে দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদে এবং বেদমন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতচন্দ্রও সাধীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

'মাধী পাছে পড়ি দেয় পাণ পানি গো।

শালে।' অবশ্য এই 'কপট আশ্বাসে'ই লহনার মান ভাঙ্গিল না, ভাঙ্গা মনও যুড়িল না। সদাগর তখন যথারীতি মান-ভঞ্জনের পালা শেষ করিয়া লহনাকে অর্থ দিয়া বশ করিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মে অধিবেদনের অনুমতি পাইলেন।+

"পরিতোষে লহনাকে দিল পাটশাড়ী
পাচ পল দিল সোণা গড়িবারে চূড়ী॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
আছিলা যেমত পূর্ব্বে বিবাহের দিনে॥
রত্ন পায়্যা যত্নে নৈল লহনা যুবতি।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥"

বিবাহের পরে সদাগর রাজাদেশে গৌড়রাজ্যে যাইবার কালে লহনার হাতে খুল্লনাকে সঁপিয়া দিলেন। বোন-সতীনের ঘরে প্রথম প্রথম খুল্লনার সুখেই কাটিল। লহনা তাহাকে নিজে হাতে নাওয়ায় খাওয়ায়, কাপড় পরায়, চুল বাঁধিয়া দেয়, পাণ সাজিয়া দেয়, পাখার বাতাস করে। 'লহনার খুল্লনা-পরাণ'; 'দু'সতীনে প্রেমবন্ধ' অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা নিদারুণ বজ্রপতনের পূর্ব্বে ক্ষণিক চপলাচমক।—'কৃস্বালোকং তরল-তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি।' সুন্দরীরা বলিবেন—'নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি। পুরোণো হ'লে বাতায় গুঁজি।'

'দু'সতীনে প্রেমবন্ধ' দেখিয়া দুর্ব্বলা দাসীর হৃদয়ে কাল-কূট জ্বালা হইল। সে বুঝিল—

"যেই ঘরে দু'সতীনে না হয় কন্দলী
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলী॥"

তখন সে লহনার কাণে মন্ত্র দিল। সে বুঝাইল—

"সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোরে বধিবে পরাণে॥"

খুল্লনা যৌবনস্থা হইলে, বিগত-যৌবনা লহনা পতিপ্রেম হারাইবে ইহাও বুঝাইল। তখন লহনার দিব্যজ্ঞান হইল। সে দুর্ব্বলাকে লইয়া সখী লীলাবতী ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে স্বামিবশীকরণের ঔষধ আনিতে গেল, যাহাতে—'সাধু হ'বে কিঙ্কর খুল্লনা হ'বে চেড়ী।' লীলাবতী নিজ তুক্‌তাকের খুব বড়াই করিল, কিন্তু লহনার তখন

'ঔষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে।'

দুই সখীতে যুক্তি করিয়া সদাগরের জাল চিঠি খাড়া করিয়া, খুল্লনাকে খুঞা বস্ত্র পরাইয়া ছেলি (ছাগল) চরাইতে পাঠাইল এবং শয়ন আহার প্রভৃতি বিষয়ে তাহাকে নাজেহাল করিল। এই ব্যাপারে দু'সতীনে খুব একটা কোন্দলও লাগিল। মুখোমুখি হ'তে হ'তে হাতা-হাতিও হইল। মৃদুস্বভাবা হইলেও খুল্লনা 'চটচট চাপড়' 'কীল লাথি' গুলি নীরবে হজম করে নাই, সেও দুই এক ঘা দিল। তবে প্রবলা লহনারই জয় হইল। এই নিতান্ত গ্রাম্য কলহের বর্ণনাটা খুবই জাঁকাল, কিন্তু এখনকার দিনে তাহা বোধ হয় পাঠকের রুচিকর হইবে না। সম্ভবতঃ কবি এরূপ কলহ চোখে দেখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, খুল্লনার কষ্টের জীবন কবি অমর অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহার পর, সদাগরের দেশে ফিরিবার পূর্ব্বাহ্নে চণ্ডীর কৃপায় লহনার সুমতি হইল। সে খুল্লনার গৃহাগমনের বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল—

"খুল্লনার উদ্দেশে লহনা যায় বন।
মাঝ পথে দু'সতীনে হৈল দরশন।"

তাহাকে পাইয়া লহনা কত কাঁদিলেন, কত আদর করিলেন, কত বার ক্ষমা চাহিলেন। এই সপত্নীমিলন-দৃশ্য ও সপত্নী-সোহাগ অতি মধুর; কিন্তু ইহাও ক্ষণিক। স্বামীর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া লহনার আবার সপত্নী-দ্বেষ তীব্র হইয়া উঠিল। সে আবার দুর্ব্বলার সঙ্গে মিলিয়া লীলাবতী সখীর নিকট ঔষধসংগ্রহে ব্যস্ত হইল। দুর্ব্বলা দুই সতীনকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, দু'জনের সঙ্গেই আত্মীয়তা দেখাইল। তাহার পর দু'সতীনের পতি-সম্ভাষণের আর বিশদ বর্ণনা করিব না। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের রুচির নিন্দা করেন, তাঁহারা একবার অনুগ্রহ করিয়া মুকুন্দরামের বর্ণনাটা পাঠ করিবেন।

কবি বলিয়াছেন—

"একজনে সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥"

কিন্তু এই অভিসার-ব্যাপারেই কন্দল শেষ হইল না। যথাসময়ে খুল্লনা লহনার সতীনবাদের কথা স্বামিসকাশে বলিয়া দিল। লহনা নিজের সাধু উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া

+ 'একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢামপরাং বহেৎ॥'

সাফাই গাহিল। সদাগর লহনাকে ভৎর্সনা করিলেন। লহনাও ছাড়িবার পাত্র নহে। সে খুল্লনার চণ্ডীপূজা লইয়া 'চুকুলি কাটিল'। খুল্লনার গর্ভসঞ্চার হইলে লহনা তাহাকে বড় আদর করিয়াছিল; কিন্তু আবার সুযোগ পাইলেই সতীনবাদও সাধিত। শ্রীমন্তকে খুঁজিতে খুল্লনা 'বৎসহারা গাভীর মত' বাহির হইলে, তাহা লইয়া লহনা বেহায়ামির জন্য সতীনের অনেক নিন্দা করিল; বাহুল্য-ভয়ে আর উদাহরণ দিলাম না।

(৪) কিন্তু কবি ইহাতেও নিরস্ত হ'ন নাই। তিনি আবার ধনপতির পুত্র শ্রীপতি বা শ্রীমন্তকেও দ্বিপত্নীক করিয়াছেন; বণিকপুত্র দুই বিবাহেই রাজ-জামাতা হইলেন। এক পত্নী সিংহলরাজের কন্যা—সুশীলা, অপর পত্নী গৌড়রাজের কন্যা—জয়াবতী। নববধূ ঘরে আসিলে সুশীলা খুবই অভিমান করিলেন ও স্বামীকে 'আর কর সাত বিয়া' এই অভিমান-বাক্য বলিয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। সদাগরের-পো অভিমানিনী রাজ-কন্যাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন যে তাহার কি দোষ?

"রাজা করে কন্যাদান, আমি কি বলিব আন
সত্য নহে জয়া তোর দাসী।"+

তখনকার মত বিবাদ মিটিল। একত্র ঘর করিতে দু'-সতীনে সম্প্রীতি হইয়াছিল, কি শাশুড়ীদের ধারা পাইয়াছিল, কবি সে প্রসঙ্গ তোলেন নাই।

[৵০] ভারতচন্দ্রের কাব্য।

(১) রায়গুণাকর প্রথমেই কৃষ্ণচন্দ্র 'ধরণী-ঈশ্বরে'র সভা-বর্ণন উপলক্ষে খুব জমাইয়া লইয়াছেন:—

"দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥"

এটা কিন্তু মনিবের মনরাখা কথা; কেন না কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের বৃত্তান্ত-বর্ণনে ঐ কবিই স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই জ্যোৎস্নার আড়ালে অভিমান-মেঘ, দ্বেষ-দামিনী-চমক ও প্রণয়-কোপজনিত বাগ্‌বজ্র-পতনের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সপত্নীবিদ্বেষ-হলাহলে কৃষ্ণচন্দ্রও যে জর্জ্জর না হইয়া কালীয়-দমনে সমর্থ হইতেন, আমাদের এমন ত মনে লয় না। যাহা হউক, কৃষ্ণ-নগরাধিপের ব্যক্তিগত কথা লইয়া বাদানুবাদ করিব না।

(২) অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দেখা যায়, শাপ-ভ্রষ্ট বসুন্ধর কায়স্থকুলে হরিহোড় হইয়া জন্মিয়া দেবীর কৃপায় প্রভূত বিত্তশালী হইলেন এবং যথাকালে হরিহোড

"ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥"

তাহার পর কবি পূর্ব্বজন্মের পত্নী বসুন্ধরার মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে যার।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥"

যাহা হউক, এতদিন 'তিনে গণ্ডগোল' চলিতেছিল, এবার 'চারে হাট' বসিল। গণ্ডা পূরাইবার জন্য 'বৃদ্ধকালে হরিহোড়' পাড়া-কুঁদুলী সোহাগীকে বিবাহ করিলেন।

"শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
কলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া॥"

এ ঠিক রামায়ণের 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী'র কলির সংস্করণ! শেষে 'চারি সতিনীর সদা লাগে কন্দল'—'যেখানে কন্দল, দেবী না রন সেখানে'—অগত্যা অন্নপূর্ণা সে গৃহ ছাড়িলেন। সপত্নীকলহের চূড়ান্ত ফল-শ্রুতি!

(৩) তাহার পর, কুবের-সুত নলকূবর ও তাঁহার দুই পত্নী চন্দ্রিণী পদ্মিনী শাপভ্রষ্ট হইয়া ভবানন্দ মজুমদার ও তাঁহার যুগল জায়া—চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী—রূপে ধরাধামে শরীর পরিগ্রহ করিলেন। স্বর্গে হয় ত পতির অপক্ষপাত ছিল, কিন্তু মর্ত্তে আসিয়া পতি 'সুয়াভাবে' পদ্মমুখীতে 'অনুগত' হইলেন। ইহার পরিণাম, 'মানসিংহ' কাব্যে মজুমদারের দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পর পুরীপ্রবেশকালে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা-পূজার সময় চন্দ্রমুখীকে এয়োজাতের ভার ও পদ্মমুখীকে রন্ধনের ভার * দিয়া বেশ কর্ম্মবিভাগ

+ এই শ্লোকবাক্যটি শ্রীমন্তের পৈতৃক।

* কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও 'সুয়া' খুল্লনাকে রন্ধনের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

(division of labour) হইল বটে; কিন্তু প্রবাস হইতে প্রত্যাগত মজুমদার নারী-সম্ভাষণকালে মহাফাঁফরে পড়িয়াছিলেন। প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য ভারতচন্দ্র—

'—করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দু'জনার ঘরে॥'
'সমান রাখিলে মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার',
'দু'সতিনে কন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই, কে কেমন কহে'॥
'দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর'

ইত্যাদি-অনেক রংদার বোলচাল দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ভিতরও বিদ্রূপের চাপা স্বর কাণে বাজে। আবার তিনি 'দু'সতিনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর কন্দলে বাড়াবাড়ি', 'পতি লয়ে দু'সতিনে হানাহানি', ইত্যাদি অপ্রিয় সত্য বলিতেও কসুর করেন নাই। তিনি দাসী-দিগের মুখ দিয়া—

'সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার।'
'শ্বশুর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা'
'একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা'

ইত্যাদি যুক্তিতে পুত্রবতীর স্বামীর উপর মৌরুসী-স্বত্ব জন্মে এবং পক্ষান্তরে রূপবতীই রূপ-যৌবনের জোরে সুয়া হইয়া বসে,—দাম্পত্য-প্রণয়ের দুই দিকই বলাইয়াছেন। যাহা হউক,—

'কার ঘরে আগে যাবো ভাবিতে লাগিলা'
'দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥'

ইহাই আসল সমস্যা।

প্রসঙ্গক্রমে কবি 'দু'সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর,' 'দু'জনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে,' এই তত্ত্বটুকুও বুঝাইতে ভুলেন নাই এবং 'রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী' এই নজিরও খাড়া করিতে ছাড়েন নাই। পাখোয়াজ কাটিয়া বাঁয়া-তবলা গড়ার মত ভারতচন্দ্র পূর্ব্ব কবির ভুবনাকে কাটিয়া সাধী মাধী গড়িয়াছেন। শেষ রক্ষার বেলায় মজুমদার কিরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা সুরুচির খাতিরে খোলাসা করিয়া বিবৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গ ভারতচন্দ্রের রচিত মধুচক্র হইতে যথেচ্ছ মধুপান করিতে পারেন।

(৪) দেবলীলা-বর্ণনা কালে ভারতচন্দ্র বাক্‌ছলে কুলীনের ঘরের খবর দিয়াছেন। বুড়া বরে গৌরীর বিবাহে কুলীনকন্যার বিবাহের প্রতি কটাক্ষ আছে। দেবী আত্ম-পরিচয়ে শ্লেষালঙ্কারের আশ্রয় লইয়া বলিতেছেন—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥"

আবার ঈশ্বরী পাটনী দেবীর সপত্নীপ্রসঙ্গে বলিতেছে,"যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।" যাহা হউক,ভারতচন্দ্র বোধ হয়, বহুকুলীনের আশ্রয়, শ্রোত্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খাতিরে, কবিকঙ্কণের ন্যায়, কুলীনদের লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই।†

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, লহনা-খুল্লনার ক্ষণিক সদ্ভাবের চিত্র ভিন্ন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথাও সপত্নীগণের স্থায়ী সদ্ভাবের বিবরণ পাওয়া যায় না। কুন্তী-দ্রৌপদীর পৌরাণিক আদর্শ, সমাজ ও সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ইহাও বেশ বুঝা গেল যে, উভয় কবিই বহুবিবাহের কুফল—সপত্নীবিরোধ অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল; অথচ উহা যে তখনও সমাজে নিন্দিত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

† বিদ্যাসুন্দরে নারীগণের পতিনিন্দায় কুলীনপত্নীর সপত্নী-জ্বালার কথা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'কুলীনদের বহুবিবাহসত্ত্বেও তাহাদের ঘরে সতীনদের একত্রবাস বড় ঘটিত না।'

ভারতীয় অর্থোৎপাদন সম্বন্ধে কএকটি বক্তব্য।

১। ভারতবর্ষে কৃষির আবশ্যকতা—

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জন কৃষি ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; অবশিষ্ট ২০ জনও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অল্পাধিক পরিমাণে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট। শিল্পোন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না বলিয়া আমরা অনেকেই চীৎকার করি; কিন্তু কৃষির উন্নতির কথা চিন্তা করি না। অথচ কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পের উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না। কাপাসের উন্নতি, ও অধিকতর চাস, না হইলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং, বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে কৃষির উন্নতি অত্যাবশ্যক। ভিন্ন আরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আবার দেখা যাইতেছে যে, কৃষির উন্নতি করিয়া বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি করিলেও, কৃষকদেরই উপর সেই বস্ত্র ক্রয়ের লাভালাভ নির্ভর করিতেছে। কারণ, শতকরা ৮০জন লোক কৃষিজীবী; তাহারাই ত বস্ত্র ক্রয় করিবে। যদি তাহাদের পেটের সংস্থান না হয়, তবে তাহারা কি প্রকারে বস্ত্র খরিদ করিবে? সুতরাং, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কৃষির উন্নতিই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত সরকারী তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, শতকরা প্রায় ৬০জন লোক—কৃষির' অন্যতম অঙ্গ পশুচারণ—কার্য্য বাদে, মাত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ১৮৯১ সনে ২৮৭,০০০,০০০ সংখ্যক লোকের মধ্যে ১৭৫,০০০,০০০ও ১৯০১ সনে ২৯৪,০০০,০০০ লোকের মধ্যে ১৯৬,০০০,০০০ ব্যক্তি কৃষি ও পশুচারণে ব্যাপৃত ছিল। ১৯১০ সনে যে আদমসুমারি হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদমসুমারিতে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, সেবারেও তাহা অপ্রতিহতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নিম্নের তালিকা দৃষ্টে ব্যক্ত বিষয় আরও পরিষ্কৃত হইবে;—

		বিটিশ ভারত	করদ ও মিত্ররাজ্য	একুন
জমিদার ও প্রজা	...	১২২৭২৭৯৭২	২৯৯৫৬২৭৬	১৫২৬৮৪২৪৮
কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মজুর	...	৩০৩১০০৬৪	৫০৯৮৭৭৪	৩৫৪০৮৮৩৮
পরিদর্শন প্রভৃতিতে নিযুক্ত	...	৮৫৬২৬৯	১১৩৭৫৬	৯৭০০২৫
অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য্যে নিযুক্ত		১৭৮৩৬৬০	৮৪৪৯৬০	২৬২৮৬২০
একুন	...	১৫৫৬৭৭৯৬৫	৩৬০১৩৭৬৬	১৯১৬৯১৭৩১
পশুচারণে নিযুক্ত	...	২৮২৫৪৪	১১৭৪০৮৭	৩৯৭৬৬৩১
		১৫৮৪৮০৫০৯	৩৭২৮৭৮৫৩	১৯৫৬৬৮৩৬২

দেশে শিল্পোন্নতির প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। শিল্পোন্নতি ই অত্যাবশ্যক। আমরা সেই জন্য যাহাতে শিল্পের—সঙ্গে সঙ্গে কৃষির—আরও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কোন দেশেই কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পের উন্নতি হয় নাই। আজ ইংলণ্ড শিল্পোন্নতির চরমসীমায় অবস্থিতা। ইংলণ্ডের ইতিহাস

আলোচনা করুন; দেখিবেন যে, এই সার্ব্বজনীন শিল্পোন্নতির পূর্ব্বে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।* প্রায় সকল দেশেই এই প্রকার হইয়াছে। ভারতবর্ষেও তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। অর্থের উপাদান—ভূমি, পরিশ্রম, মূলধন।

অর্থোৎপাদনে সাধারণতঃ তিনটি উপাদান আবশ্যক হয়—ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। ভারতবর্ষের অর্থোৎপাদনের এই তিনটি উপাদান আমরা আলোচনা করিব। প্রথমে ভূমির বিষয় আলোচনা করি।

৩। ভূমি

ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি আছে এবং ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরতা চিরপ্রসিদ্ধ। "ক্রমিক হ্রাসের" নিয়মানুসারে দিন দিন অনুর্ব্বরা বা অল্প-উর্ব্বরা ভূমিরও চাষ হইতেছে। তবুও এখনও যথেষ্ট জমি পতিত রহিয়াছে এবং এই জমি খুব অল্পায়াসে কর্ষিত হইতে পারে। স্যর জন্ ষ্ট্রাচী হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ৮০,০০০,০০০ † একর ভূমি পতিত রহিয়াছে। অনেকে হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড একত্র করিলেও এত ভূমি পাওয়া যাইবে না। করদ ও মিত্ররাজ্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভূমি কোথায় কতখানি করিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে কর্ষিত হইতেছিল, তাহার একটি তালিকা দিতেছি; তালিকাটি বর্গ মাইল হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

	১	২	৩	৪	৫		
প্রদেশ	মোট পরিমাণ	কর্ষিত ভূমি	বনভূমি	চাষের অযোগ্য	পতিত	২, ৩, ৫ এর মোট	পতিত ব্যতীত চাষের যোগ্য
মান্দ্রাজ	১৩১১০৯	৪২১৪৭	১৯৭৬৬	২০৭৭২	৯৫৫৬	৫১৭০১	৮৮৬৮
বোম্বাই	১১৫১৮৭	৪২৬৬১	১৮৭১৩	৩০৬৬৯	১৭৫৪৫	৬০২০৬	১২৪৮৫
বঙ্গ	১৫২৪৫৩	৭৬৪৫৪	৮২১০	৩৭৭৪৬	১০৫৭৩	৮৭০২৭	১৯৪৭০
যুক্ত প্রদেশ	১০৩৯৭১	৫৫৭৯৯	১৪৪৮২	১৩৫৫৬	৬২০৬	৫৯০০৫	১৬৯২৮
পাঞ্জাব	৮৯২৭০	৩৮৯২৪	৫৪১২	১২৯৯৯	৩৮০৫	৪২৭২৯	২৮১৬০
বর্ম্মা	১৬২৫১০	১৯৬৭৯	১৮৬২৫	৮২৮০৮	৪৯৬৪	২৪৬১৬	৩৬৪৮৪
মধ্য প্রদেশ	৯৬৭১০	৩৮৬১১	২০৯৬৫	৮২৫৬	৫১৬১	৪৬৭৪২	১৩৭৪৭
আসাম	৪৮৮৯৪	৭৭৬০	৬৭৭৮	৩১৪৮	১৯৮০	৯৭১০	১২২৫৮
সীমান্ত প্রদেশ	১৩২৮০	৩৬৩৮	৫২৭	৫৫৩২	৬০২	৮২৪০	২৯৮১
মোট	৮৬৩৬০০	৩৫২৬৪৩	১০৪০৮৬	২১৫৮১৬	৫৭৩৩২	৩৮২৯৭৫	১৬১৩৫১

উপরে দশ বৎসরের পূর্ব্বের তালিকা দিয়াছি। নিম্নে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের আর একটি তালিকা দিতেছি। তদ্দৃষ্টে কোন্ ফসল কতখানি ভূমিতে রোপিত হয়, তাহার হিসাব পাওয়া যাইবে। বিহার, বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, বিহারের স্বতন্ত্র সঠিক তালিকা এখনও পাওয়া যাইতেছে না। কোটী একর হিসাবে এই তালিকা প্রদত্ত হইল।

---

* অন্যত্র আমি বলিয়াছি যে, "It is said that History repeats itself. In England, the era of Arkwright, Crompton, Hargreaves was preceeded by the era of Agriculture. And, therefore, if the real regeneration of India must come, history should repeat itself here also and the great industrial activity which is being marked throughout the country must be preceded by agricultural activity" অর্থাৎ ইংলণ্ডে আকরিট্, ক্রমটন্ ও হবগ্রিভ্সের শিল্পোন্নতির যুগের প্রারম্ভে তথায় কৃষির উন্নতি হইয়াছিল। এখানেও তাহাই হওয়া অত্যাবশ্যক।

* মৎপ্রণীত "অর্থনীতি" ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† স্যর জন্ ষ্ট্রাচী লিখিত "ইণ্ডিয়া।"

প্রদেশ	চাউল	গম	বজরা	রবিশস্য	পাট বা কার্পাস	মোট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ
বঙ্গদেশ ও বিহার	৩৯	১'৪৯	১'১	৩'৫	পাট ২.৬	৬৩
উত্তর পশ্চিম	৬'১	৬'৫	৫'৪	১	কার্পাস ১.২	৪৪
মাদ্রাজ	১০'৩	—	১১'৩	২'৫	২	৩৬'৩
পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ	'৮৩	৯.৭	৪'৪	১'৬	১.৩	৩২'৪
বোম্বাই	৩	১.৮	১৪'১	১'৭	৪	৩০'৩
মধ্যপ্রদেশ	৪ ৮	৩	৫	২'৪	১.৪	২৬'৪
বর্ম্মা	১০	—	—	১'২	—	১৪ ২
আসাম	৪'৪	—	—	'৩৩	-	৬
একুন	৭৮'৭	২২'৭	৪২'৬	১৪'৬	১৩'১	২৫৪

উপর্যুক্ত দুইটি তালিকাদৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, এখনও অনেক জমি অকর্ষিত রহিয়াছে; এবং ঐ সকল ভূমি যাহাতে কর্ষিত হইতে পারে, সর্ব্বপ্রকারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে, অনেকগুলি কারণে ভূমিকর্ষণের ব্যাঘাত ঘটে। এইসকল কারণের মধ্যে গুরুতর একটি স্বাভাবিক কারণ রহিয়াছে;—সেটি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি। কোন কোন প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ভালরূপে চাষ-আবাদ করা দুরূহ। পক্ষান্তরে, কোন প্রদেশে বৃষ্টির অভাবে সময়মত বীজ রোপণ করা যায় না, ও তজ্জন্য ফসলও সুন্দর হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাট, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ও দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টি-পতনের কিছুই নিশ্চয়তা নাই; এইসকল প্রদেশেই, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়, দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অধিক। বর্ম্মায় ও বঙ্গদেশে বৃষ্টি-পতনের অনেক পরিমাণে নিশ্চয়তা আছে; তাই, এই দুইপ্রদেশে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্য কম।

দক্ষিণ-বর্ম্মায়, কনকানে, মালাবারের দক্ষিণে, বঙ্গদেশের দক্ষিণে, পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে বৃষ্টিপতন অত্যধিক—১২৩ হইতে ১০০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অন্যত্র, ছোট-নাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ, ও বিহার অঞ্চলে ৫৯ হইতে ৫০ ইঞ্চি; উত্তর বর্ম্মা, যুক্তপ্রদেশ, বেরার, গুজরাট, মহীশূরপ্রভৃতি প্রদেশে ৪১ হইতে ৩৬ ইঞ্চি এবং মাদ্রাজের কতকাংশে, রাজপুতনার পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্জাবে, ও সিন্ধুতে ২৪ হইতে ৬ ইঞ্চি।

এই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক নিবারণের জন্য দেশে যাহাতে অধিক পরিমাণে পয়ঃপ্রণালী খনিত হয়, তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে জল সেচনের অসুবিধায় এক সময়ে ভারতবর্ষের অনেকস্থানে শস্যোৎপাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছিল। তাই, ১৮৫০ সনে গভর্ণমেণ্ট্ সর্ব্বপ্রথমে খাল-খনন করিতে আরম্ভ করেন, এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন সহকারে ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া খাল খনন করিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট্ ব্যয়ে খনিত সিরহিন্দ খালের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট্ কর্তৃক খনিত এই খাল ৫৪০ মাইল দীর্ঘ; এবং ইহা হইতে ১,২০০,০০০ একর ভূমিতে জল সরবরাহ করা হয়। এই প্রকার খালে প্রজার অনেকটা সুবিধা হইতেছে, এবং গভর্ণমেণ্টের ও প্রজার উভয়েরই লাভ হইতেছে. তদ্ব্যতীত যে টাকা ইহাতে প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহারও মুনাফা বড় কম হইতেছে না। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

প্রদেশ	মূলধন	কোটি একর হিসাবে যে পরিমাণ ভূমিতে জল সরবরাহ হইতেছে	মূলধনের উপরে লভ্য
পঞ্জাব	১১	৬	৯.৪৫
উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা	৭.৬	২.২৭	৫.৮৭
মাদ্রাজ	৭.১৭	৩.৭৮	৭.৫
বঙ্গ ও বিহার	৫.৮	.৮৯৮	১.১
বোম্বাই ও সিন্ধু	৪.৭	২.২	৫.১৫

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ব্যতীত আরও একটি কারণে আমাদের দেশে ভূমি-কর্ষণের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। আবহমান কাল হইতে আমাদের দেশে যে প্রথা প্রচলিত, তাহাতে কর্ষণের উন্নতি সুদূর-পরাহত। দেশের ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দে বিভক্ত। প্রত্যেক ক্ষুদ্র এক একটি বন্দের মালিক পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি এবং তজ্জন্য প্রায় প্রতি ক্ষেত্রের মালিকই দরিদ্র। ক্ষেত্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না হইয়া যদি বৃহদাকারের হইত, তবে খুব সম্ভব এ দারিদ্র্য থাকিত না ; অধিকন্তু, বৃহদাকারের ক্ষেত্র হইলে সমুন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে, ইঞ্জিন প্রভৃতি দ্বারা, ভূমি চাষ করাইয়া উহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যাইত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর নহে।

তারপর,—কৃষকদের মূলধন নাই। মূলধন-সংগ্রহ করিতে হইলে সুদ দিতে হয় ; সুদের হার এখানে বড় বেশী ; এ সকল কথা অন্যত্র বলিয়াছি। তাই আর পুনরুক্তি করিব না।

৪। পরিশ্রম।

কএক বৎসর পূর্ব্বে, ডাক্তার ভোয়েল্‌কার নামক একজন কৃষিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, ভারতীয় কৃষকগণের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট্-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'ন। ডাক্তার ভোয়েল্‌কার বলিয়াছেন যে, অনেক বিষয়েই ভারতীয় কৃষক বিলাতের কৃষকের সমকক্ষ এবং বিশেষ কথা এই যে—ভারতীয় কৃষক যেরূপ অক্লান্ত ও ধীরভাবে কার্য্য করিতে পারে অন্য কোন দেশের কৃষক সেরূপ পারে না।

ডাক্তার ভোয়েল্‌কার কৃষকদের সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, ভারতীয় সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেই সেই কথা বলা যাইতে পারে। অথচ, কএকটি কারণে ভারতীয় শ্রামিককে অর্থোৎপাদনে প্রয়োগ করিলে, সম্পূর্ণ-রূপে লাভবান্ হওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ দুইটি (১)—ভারতীয় কৃষকের অজ্ঞতা ; (২) ভারতীয় কৃষকের উদ্যমের অভাব। তদ্ভিন্ন আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—ভারতীয় শ্রামিক-গণ একস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চায় না। হয়ত যে জিলায় তাহাদের বাস, সে জিলায় কাজকর্ম্ম জুটিতেছে না, কাজকর্ম্ম জুটিলেও মজুরি অতি অল্প ; অথচ ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী জিলাতে হয়ত আবার যথেষ্ট কাজকর্ম্ম পাওয়া যায় এবং মজুরির হারও বেশী। ভারতীয় শ্রামিকগণ কিন্তু দেশ ত্যাগ করিয়া কিছুতেই যাইবে না। দেশে তথাকথিত বাস্তভিটা "কামড়াইয়া" অদ্ধাশনে থাকিবে, তবুও অন্যত্র গিয়া অবস্থার উন্নতি করিবে না। ইহাতে শুধুই যে তাহাদের ক্ষতি হয়, তাহা নহে—কর্ম্মাধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ যাহারা শ্রামিক নিযুক্ত করেন, তাঁহাদেরও ক্ষতি। কি প্রকারে ক্ষতি হয় তাহা দেখাইতেছি।—

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পারিশ্রমিকের হারে যথেষ্ট তারতম্য আছে। বঙ্গদেশে সাধারণ শ্রামিকের বেতনের হার মাস প্রতি ছয় টাকা ; আসামে আট টাকা, আগ্রাঅঞ্চলে তিনটাকা, অযোধ্যায় মাত্র দুই টাকা, পঞ্জাবে সাতটাকা, মাদ্রাজে চারি টাকা, বোম্বাই প্রদেশে সাতটাকা ; মধ্যপ্রদেশে চারি টাকা এবং বর্ম্মায় পনর টাকা ; ইহা হইল সাধারণ-শ্রেণী মজুরদের মাহিনার হার। "মেট্", বা ভাল শ্রেণীর মজুরদের বেতনের হার কোন প্রদেশে ছয়টাকা আবার কোন প্রদেশে বত্রিশ টাকা। বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর মজুর-দের বেতন এগার টাকা। বঙ্গদেশের কোন কোন জিলায় কুড়ি বাইশ টাকাও আছে।

আগ্রায় ৮৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা; মাদ্রাজে ১৩৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা; বোম্বাইয়ে ১৭৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা; মধ্য প্রদেশে ১২৲ হইতে ১৩৲ এবং বম্মায় ২৭৲ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা।

বিভিন্ন প্রদেশে বেতনের এতাদৃশ তারতম্য থাকিলেও বঙ্গদেশীয় মজুর বম্মায় যাইবে না। যুক্তপ্রদেশে মজুরের অভাব নাই; বঙ্গদেশে বেশ অভাব আছে। যাহাতে যুক্ত-প্রদেশের মজুরগণ বঙ্গদেশে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে যুক্তপ্রদেশের মজুরগণের কষ্ট অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। তাহাদের অবস্থাও উন্নত হয় এবং বঙ্গদেশের কর্ম্মাধ্যক্ষগণও অপেক্ষাকৃত কম বেতনে মজুর পাইতে পারেন। অবশ্য আজকাল রেলগাড়ীর প্রভাবে কিছু কিছু মজুর একপ্রদেশ হইতে অন্যপ্রদেশে যাইতেছে বটে, কিন্তু আরও অধিক সংখ্যকের আবশ্যক। তৎপরে, আমাদের দেশের জলবায়ুর গুণেও মজুরগণকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহাকে স্বাভাবিক অসুবিধা বলিতে পারা যায়। কোন কোন কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করা উচিত, জলবায়ুর গুণে তাহা তাহারা করিয়া উঠিতে পারে না। মিল্ অর্থাৎ কলের কার্য্যে যেরূপ অতিরিক্ত অথচ নিয়মিত পরিশ্রম আবশ্যক, ভারতবর্ষের কেবল কএকটি জাতি সেরূপ কার্য্যকরণে সমর্থ হয়। আবার মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশের জলবায়ুতে মজুরগণ শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইজন্যই বঙ্গদেশের বস্ত্রবয়নের কলগুলির মজুর পাওয়া যায় না; কলগুলিও ভালরূপে চলে না। আবার আমাদের চা-করগণকে বহুব্যয় করিয়া কুলিসংগ্রহ করিতে হয়। আমাদের শ্রমিকগণ অজ্ঞ বলিয়া আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধায় পড়িতে হয়। যাহাতে তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক; নিম্ন-শিক্ষার বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাতে নিম্ন শিক্ষার বেশী বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য অধুনা আমাদের গভর্ণমেণ্ট্ প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন, ইহা একটি শুভ-লক্ষণ।

৫। মূলধন

আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অভাব হইতেছে মূলধনের। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, সহজলব্ধ মূলধন চাই। সহজলব্ধ মূলধন না হইলে, কৃষি ও শিল্পের কোনই উন্নতি হইবে না; এবং অর্থোৎপাদনের পথও সুগম হইবে না। এই সম্বন্ধে একজন সাহেব একটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষকদের অভাবের কথা তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর; একই উত্তর পাইবে—মূলধনের অভাব। কাহারও হাতে চাষের উপযোগী বলদ নাই;—অর্থ চাই। কেহ তাহার উৎপাদিত ফসল যাহাতে মহাজন আটক না করে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেছে; অর্থ চাই। কেহ পাটের পরিবর্ত্তে ধান বুনিবে;—অর্থ চাই। কেহ পাটের চাষের জন্য ভূমি "পাট" করিবে;—মজুরের পয়সা চাই। সেই একই কথা—এক মূলধনের অভাব। কৃষকের যেরূপ মূলধনের অভাব, অন্যান্য অনেকেরই সেইরূপ মূলধনের অভাব।" 'যৌথ মহাজনী-সমিতি' (CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY) বিষয়ক আইন পাশ হইয়া এ বিষয়ে কিছু কিছু সুবিধা হইতেছে বটে; কিন্তু এরূপ সমিতি আরও বেশী চাই।—গ্রামে গ্রামে চাই। যাহাতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এইরূপ সমিতি স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট্ এই বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন—যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতেছেন; কিন্তু এক গভর্ণমেণ্টের ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর চেষ্টায় হইবে না। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক; নতুবা কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে কি মূলধনের অভাব আছে?—না। একবার একজন হিসাব করিয়াছিলেন, ৮২৫ কোটি টাকা এদেশে নিশ্চলাবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার কতকাংশ রাজামহারাজাদের ঘরে মণি-মুক্তায় আটকাইয়া রহিয়াছে। গতবার বাঁকিপুরে যে প্রাদেশিক সমিতি হয়, তাহাতে একজন মণিকার একখানি তরবারী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য ৩৫,০০০৲ টাকা। * এরূপ কত তরবারী, ইহাপেক্ষা অধিক মূল্যের কত জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে! তাহাতে দেশের কি কাজ হইতেছে?—কিছুই না! এই ৩৫,০০০৲ টাকার অনেকগুলি যৌথ

* ১৯১১ সালে মাদ্রাজ-পর্য্যটনকালে আমরা তথাকার প্রসিদ্ধ মণিকার টি, আর, টকর (ঠাকুর) মহোদয়ের অতিথি হইয়াছিলাম! তিনি একদিন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কতকগুলি পণ্য জহরাৎ আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন; সেই কএকটিরই মূল্য অনূন দশ কোটী টাকা!—[illegible]

মহাজনী সমিতি স্থাপন করা যায়। দেশের দশের অনেক উপকার হয়! বোম্বাই দেশের অধিবাসিবৃন্দ এ বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে আমাদের সকলের চক্ষু উন্মীলিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধনে আমাদের প্রভূত উপকার হইতেছে; কিন্তু সে বিষয় বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে, একবার নিম্নের তালিকা তিনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রথমটিতে কেবল য়ুরোপীয়গণ প্রদত্ত মূলধনের হিসাব; দ্বিতীয়টিতে অধিকাংশ মূলধন য়ুরোপীয়গণ দিয়াছেন; তৃতীয়টিতে অধিকাংশ ভারতীয়গণ দিয়াছেন।

ক—কেবল য়ুরোপীয়ানদের অধীন

শিল্প প্রভৃতি	মূলধন	মজুর প্রভৃতির সংখ্যা	বাৎসরিক হিসাব
রেলওয়ে	৪৩০ কোটী	৫,১৫ লক্ষ	৩১,৫০০ মাইল রেলওয়ে
ট্রাম ও ছোট রেলওয়ে	৩½ „	— —	— —
পাটের কল	১৫ „	১.৯২ লক্ষ	— —
সুবর্ণের খনি	৪.৮৮ „	— —	
পশমের কল	৪৪½ লক্ষ	৩৫১১	২.১৭ কোটী পাউণ্ড
কাগজের কল	৫৩৮ „	৪৯৫৯	৪৪ লক্ষ
ভাটিখানা	২৫ „	১৬৫৮	৭৫ লক্ষ টাকা

খ—বেশীর ভাগ য়ুরোপীয়ানদের অধীন

শিল্প প্রভৃতি	মূলধন	মজুরাদির সংখ্যা	বাৎসরিক উৎপাদন
কয়লার খনি	প্রায় ৭ কোটী	১'২৯ লক্ষ	৫ কোটী টাকা
পেট্রোলিয়ম্	— —	৬৬৬১	১ কোটী
চা-বাগান	২৪ কোটী	৫ লক্ষের উর্দ্ধ	২৪৭½ কোটী পর্য্যন্ত
ব্যাঙ্ক	৪৮ ৪ কোটী	— —	— —
চাউলের কল	১৯'৪ কোটী	২১,৪০০	— —
কাষ্ঠ চেরাইয়ের কল	৮২ লক্ষ	৮,৮০০	— —
ময়দার কল	৫৮ "	২৮২১	— —
চিনির কল	১'২৫ কোটী	৫৮৬৫	— —
লৌহের কারখানা	— —	২৬,০০০	— —
নীলের কারখানা	— —	৪২,১২৪	— —

গ

শিল্প প্রভৃতি	মূলধন	মজুরের সংখ্যা	বাৎসরিক উৎপাদন
কার্পাসের কল	২০½ কোটী টাকা	২৩৬,০০০	— —
বরফের কল	১৬ লক্ষ	— —	— —
বস্ত্রশিল্প-সংক্রান্ত	— —	৮২,০০০	— —
পাটের কল	— —	২৭,০০০	— —
ছাপাখানা	— —	১৬,৫০০	— —

পুনার ফার্গুসন্ কলেজের অধ্যাপক মাননীয় গোখলে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যবসায়ের কথা ধরুন। যে সকল ভূমিতে চা'র আবাদ হইতেছে সেরূপ ভূমির পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে! বৎসরে প্রায় ৩০০ কোটী টাকা

মূল্য পর্য্যন্ত চা তৈয়ারী হইতেছে। পাঁচলক্ষের অধিক মজুর এই ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং এই সকল কোম্পানীর মূলধন কিঞ্চিদধিক পঁচিশ কোটী। অথচ এই পঁচিশ কোটীর শতকরা ৮৫ ভাগ বৈদেশিক মূলধন, মাত্র ১৫ ভাগ ভারতীয় মূলধন!"

শুধু চা কেন, পাটের কথা ধরুন। ভারতবর্ষে প্রায় ৫০টি খুব বড় বড় পাটের কল আছে। এই সকল কলে প্রায় দুইলক্ষ লোক কাজ করে। ইহাদের মূলধন প্রায় চৌদ্দ কোটী; অথচ ইহার অধিকভাগ মূলধন সাহেবদের। এই প্রসঙ্গে বরদার গাইকোয়াড় একটা বড় নির্ম্মম সত্য বলিয়াছেন—"আমরা খাই—পরি—আমোদপ্রমোদ করি—সবই বৈদেশিক মূলধনের জোরে!" ফলে, একথা একেবারেই অস্বীকার করিবার যো নাই যে, বৈদেশিক মূলধনে আমাদের দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি বৈদেশিক মূলধনেই হইয়াছে। যদি বৈদেশিকগণ আমাদের দেশে তাঁহাদের বিদ্যা ও মূলধন না প্রয়োগ করিতেন, তবে অনেক শিল্পের নামপর্য্যন্তও আমরা জানিতে পারিতাম না। বৈদেশিক মূলধনের বলেই দেশে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অর্থোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক মূলধনের জন্যই তিনকোটী মজুর তাহাদের নিজেদের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন ও তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে। রেল্‌ওয়ে, পাটের কল, পশমের কল, কাগজের কল—সবই চলিতেছে—বৈদেশিকের কৃপায়, বৈদেশিকের মূলধনের জোরে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ এবংবিধ অনুষ্ঠান সকলের জন্য তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থপ্রয়োগ না করিবেন, ততদিন এই ভাবেই চলিতে হইবে। অন্য উপায় নাই, সম্ভবপরও নহে!

৬। উপসংহার

ভারতীয় অর্থোৎপাদন-সম্বন্ধীয় স্থূল বিষয়গুলি আমরা স্থূলতঃ সংক্ষেপে উপরে আলোচনা করিয়াছি।

আলোচনাকালে আমরা সাধারণতঃ উপাদানগুলির বর্ত্তমান অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎসম্বন্ধীয় ত্রুটীগুলির পর্য্যালোচনা প্রয়াস পাইয়াছি। নিম্নশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'যৌথ মংাজনী সমিতি'র প্রতিষ্ঠা প্রচারের আধিক্য হইলে, মূলধনের অভাব দূরীভূত হইলে এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিলে অনেকগুলি অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে এবং হইবেও। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই কার্য্য করিতে হইবে;—পশ্চাতের দিকে চাহিলে চলিবে না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন;—

"Admitting, for the sake of argument, that everything said by Messrs. W. Digby & R. C. Dutt about the strangling of Indian Industries by England in the 18th century, the needless wars of E. I. Co., at the cost of India, and the accumulation of unproductive debt on Railways is true—it all amounts to the condemnation of a certain past;—it sketches before us no programme for the future, it offers us no plan of work."—কথাগুলি কঠোর সত্য!

তর্কের খাতিরে ডিগ্‌বি ও রমেশচন্দ্রের মতে মত দিয়া অতীতের কার্য্যাবলীর সমালোচনায় কোনও ফল ফলিবে না। ভবিষ্যতে কিরূপ কার্য্য করিলে সাধনা সিদ্ধি হইবে তাহাই দেখিতে হইবে—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

"কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

নিঃসহায়, তাহারা বলবান্ ও শক্তিশালী লোকের কবল হইতে, এবং যাহারা রুগ্‌ণ, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও পাপী, তাহারা নিজেদের কবল হইতে, রক্ষিত হয়।—তখন দয়া ধর্ম্ম এত দূর প্রসৃত হয়—যেমন ভারতবর্ষে হইয়াছিল—যে মনুষ্যের কবল হইতে পশুদেরও রক্ষা করা হয়, এবং সমাজের কতকগুলি বৃহৎশাখা আমিষভোজন বর্জ্জন করে। কলাশিল্পের ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনেও ঐ নিয়ম-বিরোধ দেখা যায়, তবে তাহার মাত্রা কিছু কম হইতে পারে। কোনও কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তির—তাঁহার কার্য্যের পার্থিব লাভালাভের প্রতি যতটুক দৃষ্টি থাকে, কোনও একজন প্রত্যাদিষ্ট শিল্পীর বা কোনও তদ্‌গতচিত্তদার্শনিকের—নিজের নিজের কলাভবনে বা পাঠাগারে থাকিয়া যে কার্য্যে তন্ময় হ'ন, সেই কার্য্যের লাভালাভের প্রতি তাঁহাদেরও—ততটুকুই দৃষ্টি থাকে। মানুষ উন্নতির অন্বেষণ করে, এবং—সে উন্নতি মানসিক, নৈতিক বা আত্মিক হউক,—তাহার মন্দিরে পার্থিব লাভকে এবং অনেক সময়ে দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতাকেও উৎসর্গ করে। ঐরূপ উন্নতি জড়জীবনের সংগ্রামে—তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক—অনেক সময় উহার বিঘ্ন সম্পাদন করে, কখনও কখনও বা তাহাকে উহার অযোগ্য করিয়া ফেলে। আদিম প্রস্তর-যুগের মনুষ্যও অবসরকালে নিজের নিবাস-গৃহকে সজ্জিত করিত, এবং মৃগয়াহত পশুগণের শৃঙ্গ, দন্ত, এবং অস্থি লইয়া সেই গুলিকে খোদিত করিত। যদিও ঐ সকল কার্য্যদ্বারা জীবন-সংগ্রামে তাহার কিছুই সাহায্য হইত না, তথাপি উহাতে তাহার এত প্রযত্ন ছিল যে, তাহার কতকগুলি চিত্র ও খোদিত শিল্প—যথা পেরিগার্ড ও পীরনীসের গুহায় প্রাপ্ত ম্যামথের চিত্র, রেন্‌ডিয়ার ও বাইসনের প্রতিমূর্ত্তি—বর্ত্তমানকালের শিল্পীদিগের পশুচিত্রের সহিত উপমিত হইতে পারে। নব-প্রস্তর-যুগের মনুষ্য তাহার পাত্রাদি ও যন্ত্রসমূহের হাতলে চিত্র আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-পিপাসা চরিতার্থ করিত। প্রটো-আরিয়ানগণ মস্তকের উপর বিস্তৃত নীল আকাশের ধ্যানে মগ্ন হইয়া—এবং সম্ভবতঃ দ্যৌঃ-পিতার চরণে আন্তরিক প্রার্থনা ঢালিয়া—এমন এক আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল, যাহা আর্য্য-সভ্যতার কোনও এক পরবর্ত্তী স্তরে বিপুল উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল।

সকল প্রাচীন সভ্যতারই প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মই উন্নতির প্রধান উত্তেজকশক্তি ছিল। শিল্পকলার প্রতিভা মুখ্যতঃ সমাধি-ভবন ও মন্দির নির্ম্মাণে, এবং দেবদেবীর ভজন-সঙ্গীত-রচনায় অভিব্যক্ত হইত। ধর্ম্মের জন্যই জ্যোতিষ ও জ্যামিতি প্রভৃতি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা হইত। পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানের অনুশীলন হইত বিশুদ্ধ জ্ঞানানুরাগে নয়, পার্থিবেতর কোনও উদ্দেশ্যে; যথা—বাহ্য ও অন্তর্জগতে নিয়মের রাজ্য বিস্তৃত করিবার জন্য, সত্যনিরূপণের জন্য অথবা মুক্তি অন্বেষণের জন্য। প্লেটোকে প্রাচীন দার্শনিক-গণের মুখপাত্র স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। তিনি, ও তাঁহার পরে আরিষ্টট্‌ল্, বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ কল্পনানিরত বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনাই জীবন-যাপনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোত্তম উপায়।* কথিত আছে যে, কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রনিচয় উদ্ভাবন করিবার জন্য, তিনি তাঁহার বন্ধু আরকাইটাসকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। হিন্দু-দিগের মধ্যে উচ্চতমবর্ণ ব্রাহ্মণগণ অর্থকর ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে নিষিদ্ধ হইতেন। তাঁহাদের প্রতি এই অনুশাসন ছিল যে, তাঁহারা কেবল মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবেন। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও, যে ব্রাহ্মণ কোনও কার্য্য করিয়া তাহার বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হইত। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্রাহ্মণ অর্থের জন্য দাসত্ব করে ও কুসীদজীবী হয়, তাহাকে নিকৃষ্টতম বর্ণ—শূদ্রের মত দেখিবে।†

* এইচ্ সিজউইক—"নীতির ইতিহাস"—৫৩ পৃঃ।

† মিঃ বসুর উক্তি অতিবাদ বলিয়া মনে হয়। মনু বলিয়াছেন।—

"যাত্রামাত্র প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্॥"

অনন্তর তিনি বৃত্তিনিচয় নির্দ্ধারিত করিয়া বলিয়াছেন যে, বহু পরিবারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অন্যান্য জীবিকোপায়ের সঙ্গে কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদগ্রহণ করিতে পারেন।—৪র্থ অধ্যায় ৯।—গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিপালন অত্যাবশ্যক, ইহা মনু বলিয়াছেন; এবং আরও বলিয়াছেন যে গৃহস্থের পক্ষে পরিবার-প্রতিপালন সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য।—১১ অধ্যায় ৯—১০।—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য, বিশেষতঃ তখনকার পঞ্চযজ্ঞ-সমন্বিত গার্হস্থ্য প্রতিপালনের জন্য, অর্থ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে তিনি দাসত্বের ও অপ্রয়োজনে কুসীদ-গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। মনু ও অন্যান্য স্মৃতিতে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটা প্রকরণ আছে, তাহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।—ইতি অনুবাদক।

এমন সিদ্ধান্ত করিবার কতকগুলি হেতু আছে যে, সভ্যতার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর্য্য, সিমীয় ও মঙ্গোলীয়গণ সম্ভবতঃ যখন মধ্য-এসিয়ায় বা অপর কোনও স্থানে পরস্পরের অনতিদূরে বাস করিত, তখন তাহারা যে উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা প্রায় একই প্রকারের ছিল। কালডীয় ও চৈনিক সভ্যতার প্রথম অবস্থায় উভয়ের মধ্যে অনেক ঐক্য দেখা যায়। ইতিহাসের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, চীন ও কালডীয়ার জ্যোতিষিক জ্ঞান সমতুল্য। এই সাদৃশ্য উভয় দেশেই কোণ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায়—অর্থাৎ দিক্-চতুষ্টয়কে পশ্চিমাভিমুখ করায়—প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যগণ, চীনগণ, কালডীয়গণ—সকলেই রাশিচক্রের বিষয় জানিতেন।

সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের যেমন মিল ছিল, তেমনই ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানেরও মিল ছিল। ভারতবর্ষের আর্য্যগণ দ্যৌঃপিতাকে (আকাশ-পিতাকে) প্রধান দেবতা বলিয়া উপাসনা করিতেন। মীসরবাসী ও ব্যাবীলোনীয়াবাসীদের মধ্যে 'নূ' বা নভোমণ্ডল সমস্ত দেবতার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, এবং মীসর-ভাষার দেবতাবাচক 'নুটু' শব্দ আকাশবোধক 'নুটু'শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চীনের ধর্ম্মশাস্ত্রে আকাশ প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যাবীলোনীয় ও মীসরীয়, চীন ও ভারতবর্ষীয় আর্য্য ইহাদের জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উক্ত ও অন্যান্য বিষয়ে ঐক্য দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানাবিধ মত স্থাপন করিয়াছেন। বায়ট্ এবং লাসেন্ মনে করেন যে, হিন্দু-দিগের নক্ষত্র-সংস্থান চীনদিগের 'সিউ' হইতে গৃহীত। বেবর এই মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে হিন্দুদিগের নাক্ষত্রিক-জ্ঞান ব্যাবীলোনীয়া হইতে গৃহীত। হুইটনি এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু মোক্ষমূলর দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। এসীরিয়ার বিশেষজ্ঞ প্রসিদ্ধ হোম্মেল, বেবারের উপর এই মত স্থাপন করিয়াছেন যে, মীসরীয় সভ্যতা ক্যালডীয় সভ্যতার কাছে ঋণী। কিন্তু হীরেণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, মীসর—ভারতবর্ষ হইতেই তাহার সভ্যতা পাইয়াছিল।

আমাদের মনে হয় যে, দুইটি সভ্যতার মধ্যে পরস্পরের সহিত কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, যে একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর দুইটি জীবদেহে কতকগুলি বিষয়ে সাম্য আছে বলিয়া একটি অপরটির সহিত জন্মগত সম্পর্কযুক্ত, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে। উহারা সকলেই একটি সাধারণ-আদর্শ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, একথা বলিলে ঐ সাদৃশ্যের অন্ততঃ আংশিক সুমীমাংসা করা হয়। আমরা বিবেচনা করি যে, সম্ভবতঃ যেসকল জাতি প্রাচীন-সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারা যখন মিলিতাবস্থায় ছিল, তখনই কিয়ৎপরিমাণে সভ্যতার পুষ্টি করিয়াছিল, এবং পরে যখন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের মধ্যে জাতিগতপার্থক্য সূচিত হয়, তখন সেই অসম্পূর্ণ-সভ্যতাই ভবিষ্যৎ-উন্নতির বীজ স্বরূপ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঐ ভবিষ্যৎ-উন্নতির প্রকার ও পরিমাণের বহুবিধ তারতম্য ঘটিয়াছিল। মেসোপোটেমিয়া ও মীসরের সিমীয় জাতি, কলা-শিল্পের কোনও কোনও শাখার বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু মানসিক- বা নৈতিক- উন্নতি সম্বন্ধে বেশী অগ্রসর হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা শেষোক্ত বিষয়েই সমধিক উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন, এবং বাস্তবাভিজ্ঞ চীনেরা, কোনও বিষয়েই অধিক অগ্রসর না হইয়া, মাঝামাঝি থাকিয়া গিয়াছিল।

কেন যে জগতের কতিপয় জাতিমাত্র,—সকল জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত,—উন্নতিপ্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছিল, এবং সেই উন্নতির গুণ ও মাত্রাই বা কেন এত বিভিন্ন প্রকার হইয়াছিল, এ প্রশ্ন উঠিলে এখন,—সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইলেও—মনুষ্যের অসম্পূর্ণতার কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শারীরিক ও অশারীরিক—বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক—ঘটনাবলীর সংস্থান, এ বিষয়ের অনেক কথার মীমাংসা করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহা আশানুরূপ নহে। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায়, জ্ঞানোন্নতির নিয়মাবলী পার্থিব উন্নতির নিয়মাবলীর সহিত মিলে না, বরং ইহাদের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়। ওয়ালেস্ ও হক্স্লি এই বিরোধ স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যে নিয়মে নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনরূপ জড়নিয়ম হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার

জন্য, হক্‌স্‌লি উহাকে নৈতিক-নিয়ম বলিয়াছেন। * প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-তত্ত্বের আবিষ্কারে ডারউইনের গৌরবাংশ-ভাগী ওয়ালেস্‌ বলিয়াছেন—"ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ তথ্য যে মানুষে এমন এক বস্তু আছে, যাহা সে তাহার পশু-পূর্ব্বপুরুষগণের কাছে পায় নাই; সে বস্তুকে আমরা আধ্যাত্মিক সত্তা, বা প্রকৃতি, বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ঐ সত্তা অনুকূল-অবস্থায় পড়িলে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে পারে। মানুষের পাশব-প্রকৃতির উপর এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আরোপ করিলে তবে আমরা মনুষ্য সম্বন্ধে অনেক রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য কথা—বিশেষতঃ তাহার জীবন ও কার্য্যের উপরে ভাবের, নীতির ও বিশ্বাসের যে অনন্ত প্রভাব, তাহা—বুঝিতে পারি। এই উপায়েই আমরা ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারীর একনিষ্ঠা, পরোপকারীর স্বার্থহীনতা, স্বদেশ-প্রেমিকের ভক্তি, শিল্পীর উৎসাহ, এবং প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিকের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা বুঝিতে পারি। ইহারই সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের হৃদয়ের সত্যানুরাগ, সৌন্দর্য্যে আনন্দ, ন্যায়ের জন্য প্রবল-আকাঙ্ক্ষা, এবং নিঃশঙ্ক আত্মত্যাগের কথা শুনিলে উল্লাসের স্পন্দন, আমরা এমন এক উচ্চতর প্রকৃতি হইতে পাইয়াছি, যাহা জড়জীবনের সংগ্রাম হইতে উৎপন্ন হয় নাই।"

যাঁহারা উন্নতি-সাধনে ব্রতী হ'ন তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, সেই উন্নতির দ্বারা সমগ্রজাতির কত উপকার হইবে; বিশেষতঃ তাঁহাদের সমাজ ত তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারে না। যখন গৌতমবুদ্ধ তাঁহার মহোচ্চ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার মৃত্যুর কতশত বৎসর পরে ঐ ধর্ম্ম মানবজাতির উপর এত প্রভাব বিস্তার করিবে। তাঁহার জীবদ্দশায় ও তাঁহার মৃত্যুর পর, বহুদিন যাবৎ, ভারতবর্ষেই ইহার প্রচার সামান্যই হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের মঙ্গলের জন্য—অর্থের, শিল্পের, দুর্গ-নির্ম্মাণের ও যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন লোকে সহজেই বুঝিতে পারে; কিন্তু তৎপক্ষে দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার সার্থকতা কেহ সহজে বুঝেনা।

মানব যেমন কৃত্রিম-নির্ব্বাচনের সাহায্যে উদ্ভিজ্জ ও তির্য্যগ্‌জগতের উন্নতিবিধান করে,—মানব-সভ্যতার উন্নতিও অনেকটা সেইভাবেই হয়;—কেবল এক্ষেত্রে মানবের কর্তৃত্বের পরিবর্ত্তে এমন এক দৈবশক্তির কর্তৃত্ব আরোপ করিতে হইবে, যে শক্তি মানবোন্নতির ক্রম-বিকাশকে কোনও এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতেছে,—যাহার তাৎপর্য্য এখন অতিশয় অস্পষ্ট।

ওয়ালেসের মতে—'মানবের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি যে এখন চরমে উপনীত হইয়াছে, তাহা এক দৈব নির্ব্বাচনের ফল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে জাগতিক পুষ্টির ক্রম, গঠন-প্রণালী, মূলতঃ কোষাশ্রিত গঠন প্রণালী, (cell structures) এবং জীবনাধান, এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে প্রকাশিত এক সৃষ্টিকারিণী ও পরিচালিকা চিচ্ছক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই বিশ্বে শক্তির, জ্ঞানের ও বিজ্ঞতার, এবং নিম্নতর জীবের উপর শ্রেষ্ঠতর জীবের প্রভাবের, অনন্ত-পর্য্যায় রহিয়াছে; এবং এই বিরাট্‌ ও বিস্ময়জনক বিশ্বে,—আদিত্যসকল ও গ্রহাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জজীবন, তির্য্যগ্‌জীবন, ও জীবিত-মানবাত্মা পর্য্যন্ত—এত অনন্ত প্রকার মূর্ত্তি, গতি ও একঅংশের উপর অপরঅংশের ঘাতপ্রতিঘাত আছে যে, ইহার পরিচালনের জন্য চিরকাল ঐরূপ অসংখ্য চিচ্ছক্তির প্রয়োজন হইয়াছে ও হইবে।' *

সভ্যতার বাহ্য উপাদান

সভ্যতার মধ্য উত্তেজনা হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে—অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক, এই দ্বিবিধ অভাবের অতিরিক্ত বস্তুর জন্য কামনা হইতে—উদ্ভূত হয়। কিন্তু বাহ্য-

* হক্‌স্‌লি বলিয়াছেন:—"সামাজিক উন্নতি প্রতিপদে প্রাকৃতিক নিয়মের গতিকে অবরোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অপর এক নিয়ম—যাহাকে নৈতিক-নিয়ম বলা যাইতে পারে—স্থাপন করিয়া যায়। ঐ নৈতিক-নিয়মের ফলে, যাহারা বর্ত্তমান-অবস্থা-সমষ্টিসম্বন্ধে যোগ্যতম, তাহাদের উদ্বর্ত্তন ঘটে না; যাহারা নীতিসম্বন্ধে যোগ্যতম, তাহাদেরই উদ্বর্ত্তন ঘটে।" —রোমানিস্‌ লেক্‌চার, ১৮৯৩।

* জীবের জগৎ (THE WORLD OF LIFE. London, 1911) ৩৯৯-৪০০ পৃঃ।—ইনি আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্যগণের অন্যতম; এই মহাত্মার শেষের কথাগুলির সহিত হিন্দু ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের শিক্ষার বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। ওয়ালেসের শ্রেষ্ঠ চিচ্ছক্তিগুলি হিন্দুদের দেবতাগণের সহিত মিলিয়াছে।—অনুবাদক।

ও জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারাও উহা বিলক্ষণ অনুপ্রাণিত হয়। সভ্যতার প্রথম অবস্থায়, উহার উপর জড়-প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক সংস্থানের প্রভুত্ব অধিক। প্রকৃতির উপর মনুষ্যের অধিকার যত বাড়িতে থাকে, ততই উহার প্রভাবও কমিয়া আসে। নাতি-শীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অপেক্ষা, শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যের পরিচ্ছদ-বাহুল্যের ও অধিক পরিমাণে বলকর খাদ্যের আবশ্যক হয়; এই জন্য ঐ প্রকার দেশে তাহার জীবন-সংগ্রাম দুরূহতর হয়। জীবনের শারীরিক অভাব পূরণ করিতেই তাহার উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া যায়। এই জন্য উন্নতির প্রথমপর্য্যায়ে সভ্যতার পোষক স্বরূপ যে পার্থিব মানসিক ও নৈতিক প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর স্পৃহা, তাহার জন্য অল্পই উৎসাহ পরিশিষ্ট থাকে। কাজেই নাতি-শীতোষ্ণ অথবা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই—বিশেষতঃ ঐরূপ দেশের যে অংশে নীল, টাইগ্রীস, যূফ্রেটিস ও গঙ্গা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদীর গর্ভজাত বিস্তৃত উর্ব্বর ক্ষেত্রে অনায়াসে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, সেই সকল স্থলেই—সভ্যতার প্রথম ও প্রবল উন্নতি হইয়াছিল।

উত্তরের শীতপ্রধান দেশসমূহের অধিবাসীরা যে দুরূহ জীবন যাপন করিত, তাহার চিহ্ন উহাদের জাতীয় চরিত্রে মুদিত রহিয়া গিয়াছে;—তাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ফলে দৌর্ব্বল্যকর জলবায়ুযুক্ত দক্ষিণদেশবাসিগণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দ্বন্দ্বপ্রিয়তা, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা পাইয়াছে। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই দেখা যায় যে, দক্ষিণদেশের লোক অপেক্ষা উত্তরদেশের লোকের যুদ্ধের ও লুণ্ঠনের স্পৃহা অধিক; পররাজ্যের প্রতি অভিযানের তরঙ্গ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে, দক্ষিণ হইতে কদাচিৎ উত্তরে গিয়াছে। চীন, ভারতবর্ষ, ব্যাবীলোনীয়া ও মীসরের সভ্যজাতিরা বারংবার উত্তরদিকের অসভ্য-জাতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে; এবং প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসে উত্তরদিক্ হইতে আগত —অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কিন্তু সতেজ—জাতিকর্ত্তৃক এক সভ্য জাতির অভিভব; এবং যখন ঐ অনুন্নত জাতি—বিজিত জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়া—সেই দেশভুক্ত হইয়াছে, তখন আবার অপর এক অসভ্য জাতিকর্ত্তৃক উহার পরাজয়,—ভূরিভূরি এইরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও দেশের ভৌগোলিক ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সংস্থান তাহার সভ্যতার সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকর হয়। যেমন ফিনিসিয়া পর্ব্বত-বেষ্টিত হওয়ায়, স্থলভাগে ইহার তত বিস্তৃতি ঘটে নাই; কিন্তু ইহার অধিকারে বিস্তৃত বন্দরোপ-যোগী বেলাভূমি থাকায় এতদ্দেশবাসীরা নৌ-বল ও বাণিজ্যের জন্য প্রখ্যাত হইয়াছিল। ইহারা য়ুরোপ ও এসিয়ার মধ্যে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় করিত। ইহারা য়ুরোপের পশ্চিমভাগের সমুদ্রতটের সন্নিকটে পোত-চালনা করিত এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাবলীতেও উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা প্রাচীনকালের প্রধান খনিব্যবসায়ী ও শিল্পোৎপাদক প্রাচীনজাতিদিগের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিল। ফিনিসিয়ার মত, গ্রীসের অবস্থানও নৌ-বাহ বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক; পর্ত্তুগাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অধিকারভুক্ত বেলাভূমি স্পেনের সমান; এইজন্য গ্রীকগণ সমুদ্রগামী বলিয়া বিখ্যাত। ফিনিসিয়ার পদানুসরণে তাহারাও প্রাচীনজগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এবং প্রতীচী-উদীচ্যের মধ্যে সভ্যতার ও পণ্যের বিনিময় করিয়াছিল।

জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সকল উপকরণ সভ্যতার উপর প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান—মানুষ নিজে। যখন অনধিকারী বিদেশীরা চীনে, ভারতবর্ষে, ব্যাবী-লোনীয়ায়, মীসরে ও গ্রীসে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা দেখিল যে, ঐ সকল দেশ পূর্ব্বাবধি মনুষ্যাধিকৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ সিন্ধুনদের তীর হইতে পূর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন তাহাদের সহিত আদিমনিবাসীদের সংঘর্ষ হইল; উহারা তাহাদের গতিপথে বাধা দিতে লাগিল; যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিল এবং অশেষ প্রকারে দুঃখ দিতে লাগিল। আর্য্যদের কাছে নিশ্চয়ই ঐরূপ ব্যবহার নিতান্ত অভদ্র বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই তাঁহারা ঐ শত্রুদিগকে 'দস্যু' বা 'রাক্ষস' বলিয়াছেন। * চীনে যখন

* দস্যু বা রাক্ষস বলিলেই যে, আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যদিগকে জয় করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণ হয়, তাহা নহে। আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ এখন যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সে অর্থে হইত না। কেহ গর্হিত কার্য্য করিলে, সে যদি নিজ সমাজভুক্ত হয় তথাপি, আমরা তাহাকে 'দস্যু,তস্কর, রাক্ষস' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করি না কি?

—অনুবাদক

আক্রমণকারী বিদেশীরা 'সাস্‌সে' অরণ্য হইতে অগ্রসর হইল, তখন সমস্ত দেশটাকেই মানবাধিকৃত দেখিল, এবং ঐ সকল লোকগুলাকে "অগ্নিরূপী কুক্কুর সমূহ", "অদম্য কীট" এই সকল বিশেষণে ভূষিত করিল। ব্যাবীলোনীয়াতে সামারিয়গণ সিমীয়গণের হস্তে পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই কতক সভ্য হইয়াছিল। বিদেশিগণ কোন্ পথে মীসরে প্রবেশ করে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু তাহারা যে ঐ দেশকে মনুষ্যাধিকৃত দেখিয়াছিল, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। গ্রীসে হেলেনীয়গণের পূর্ব্বে পেলাস্‌গীয়গণ, এবং রোমে ল্যাটিন্ ও স্যাবাইন্‌গণের পূর্ব্বে ইট্রস্কান্‌গণ বাস করিত।

এই সকল দেশের সভ্যতায় বিজয়ী বিদেশিগণের প্রভাব মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে সত্য; কিন্তু বিজয়ী জাতির সভ্যতাও যে আদিমনিবাসিগণের সংস্রবের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তবে, বিজেতৃগণ বিজিত-জাতিকে কি দিয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট হইতেইবা কি পাইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। এখনকার বিজয়ী শ্বেতজাতিগণের এবং—আফ্রিকা, আমেরিকা, ও অষ্ট্রেলিয়ার—বিজিত কৃষ্ণ ও পীত জাতিগণের মধ্যে সভ্যতার যে প্রভেদ, তখনকার বিজেতা ও বিজিতের সভ্যতার সে প্রভেদ ছিল না।—তাহা ছিল না বলিয়াই আদিমনিবাসিগণ একেবারে উচ্ছিন্ন না হইয়া সংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অপেক্ষাকৃত বলশালী নবাগত বিদেশিগণের সমাজে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছিল। সিমীয় জাতিকর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বেই সামারিয়গণ সভ্যতার কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিল; এই জন্য সিমীয়গণ তাহাদের সভ্যতা ও লিখন-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল, এবং উহাদের ভাষাকে পবিত্র মনে করিত। এক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, বোধ হয় রোমকগণ কর্ত্তৃক ইট্রস্কান্‌গণের জয়েও অনেকটা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। যে সকল আদিমনিবাসী জাতি অভিযাত্রিগণের গতিরোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে চীনের লেখাবলীতে "মাহস্বাস" ও "অশ্বারোহী বীর" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে দেখা যায় যে, বিজয়ী আর্য্যগণ কতকগুলি কৃষ্ণকায় জাতির দুর্গ ও নগর থাকার কথা বলিয়াছেন। মীসরে পীরামিড্ নির্ম্মাণের সময়েই নিউবিয়া-নিবাসী নিগ্রোগণকে বেতন-ভোগী সেনা নিযুক্ত করা হইত। মীসরের প্রান্তদেশে লিবীয়ান প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতি ছিল।

এই সকল দেশের সভ্যতাগঠনে আদিমনিবাসিগণের কতটুকু হাত ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে আমাদের জানিবার উপায় নাই; কিন্তু ঐরূপ যে ঘটিয়াছিল, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এদেশে আর্য্য, দ্রাবিড় ও অন্যান্য আদিমনিবাসিগণের সংমিশ্রণে একটি মিশ্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তিগণই যে সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আজকাল যথার্থ আর্য্যবংশধর বলিয়া দাবী করিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা—বিমিশ্র ও নিঃসংশয়ে অনার্য্যগণের অপেক্ষা—অনেক কম। তবে ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় যে আর্য্য জাতির প্রতিপত্তিই প্রবল ছিল, তাহা ভারতীয় আর্য্যদিগের ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষা, ঐ সভ্যতার বাহন হওয়ায় এবং মিশ্রজাতিদিগের কথিত ভাষায় সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, কিংবা সংস্কৃত ভাষার, বহুল প্রবেশ হইতে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসভ্যতার ক্রমবিকাশবিষয়ে এই মিশ্রজাতির অন্য অংশের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্যে আদিম-নিবাসিজাতিগণের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের একটি অনার্য্য, অথবা শঙ্কর, রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করে। গ্রীক ইতিহাসের স্যাণ্ড্রা কোটাস্ (চন্দ্রগুপ্ত) এবং সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক এই বংশান্তর্গত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম যে দ্রাবিড়-সংস্রবে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্‌বেদের সময়কার ভারতীয় আর্য্যদিগের সরলতর ও অপৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে বহুদেববাদ-সমন্বিত বিস্তৃত হিন্দু-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।*

যাহা ভারতবর্ষে হইয়াছিল, কতকটা সেইরূপই বোধ হয় চীনে ও মীসরেও হইয়াছিল; তবে ঐ সকল দেশে এতৎ-বিষয়ক প্রমাণ তত স্পষ্ট নহে। যেমন জাতি ও ভাষায়, তেমনি ধর্ম্মেও।—মীসরে নিগ্রিটীয় ও সিমীয় জাতির সংমিশ্রণের

---

* ভারতের মূর্ত্তিপূজা যে দ্রাবিড়সংস্রবে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এ তথ্য আজকালের মনগড়া তথ্যের মধ্যে একটি বই আর কিছুই নয়। আর্য্য এবং অনার্য্যও মনগড়া হাল-আমদানি। এই ক্রমবিকাশের অন্তকারণ আছে।—অনুবাদক।

চিহ্ন দেখা যায়। দেবতাগণকে পশুর আকার দেওয়া; যথা —'রি অসিরিস'কে বৃষের আকার, 'ইয়া'কে মেষের আকার, 'আইসিস্'কে গাভীর আকার ইত্যাদি, এবং বিড়াল, মকর, ও সর্পপ্রভৃতি সরীসৃপ পশুগণকে অপরূপ সম্মান-প্রদর্শন, সম্ভবতঃ নিগ্রিটীয় প্রভাবের ফল। মীসরের অনেকগুলি গ্রাম্যদেবতা আফ্রিকা হইতে গৃহীত;—একথা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞরা বলিয়া থাকেন।

কোনও সমাজ অবিকৃত থাকা, না-থাকা অনেকটা তাহার ভৌগোলিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে; বিচ্ছিন্নতা এতৎপক্ষে অনুকূল। অসভ্যজাতিরা বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক অতিসামান্যই রাখে ও গিরিদুর্গ বা দ্বীপে অবস্থান করে। এই জন্য তাহারা যে সভ্যতা প্রথমে পায়, তাহা বহুযুগ ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিয়া যায়; ইহার উদাহরণ সিংহলের ভেদ্দাগণ, ভারতের কএকটা অসভ্যজাতি, আণ্ডামানী, টাস্মানীয় প্রভৃতি। শতবৎসর পূর্ব্বে তাহাদের মানসিক ও সামাজিক উন্নতি যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা প্রস্তরযুগের মনুষ্যের উন্নতির বিশেষ প্রভেদ ছিল না। কিন্তু সভ্যজাতিগণ এতদূর বিচ্ছিন্নতা রাখিতে পারে না। সভ্য-সমাজ নিজ সমাজ-বহির্ভূত সকল জাতিকেই—'অসভ্য' কল্পনারূপ—কৃত্রিম উপায়ে নিজের বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। প্রাচীনজাতিদের ভিতর চীন, বোধ হয়, ঐ প্রকার আত্ম-তৃপ্তির চূড়ান্ত করিয়াছিল। সামান্যদিন পূর্ব্বেও তাহারা বিদেশী বস্তুমাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীপর্য্যন্ত মীসরবাসীরাও এইরূপ বহিষ্করণের পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু এমন রক্ষণশীলতা, বাণিজ্যপ্রমুখ নানা কারণে শিথিল হইয়া যায়। পণ্যদ্রব্যের সহিত ভাবেরও বিনিময় ঘটে। বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটক ও শিক্ষাপ্রয়াসীর সমাগম হয়। ইহাদের বিদেশভ্রমণ—আমোদের জন্যই হৌক, অথবা জ্ঞানান্বেষণেই হউক,—ঐ ভ্রমণদ্বারা তাহাদের মতের প্রশস্ততা সাধিত হয়, এবং তাহারা এমন সকল ভাব স্বদেশে বহন করিয়া আনে, যাহা—অনুকূলক্ষেত্রে রোপিত হইলে,—সুসম্পন্ন ও ফলশালী হয়। খ্রীঃ পূঃ ৬৭০ অব্দে মীসরের বন্দরসমূহ উন্মুক্ত হওয়ায়, গ্রীসে যুক্তিমূলক চিন্তাপদ্ধতির প্রসার বৃদ্ধি হয়। গ্রীকগণ, মীসরে যাহা কিছু দেখিয়াছিল, তাহাদ্বারা বিশেষ অভিভূত হয়, এবং ঐ ঘটনায় উহাদের সভ্যতাও সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া ছিল। গ্রীকদর্শনের প্রবর্ত্তক থেলিস্ মীসরভ্রমণে গিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বিশিষ্ট দার্শনিক মতগুলি সেই দেশ হইতে প্রাপ্ত। পাইথাগোরাস্ ও আনাক্সাগোরাস্ অনেকদিন মীসরে ছিলেন, এবং তাঁহাদের দার্শনিক মতও মীসরের প্রভাববিশিষ্ট।

প্রাচীন সভ্যজগতে মেসোপোটেমিয়া, এসিয়া মাইনর, গ্রীস্ ও মীসর বাণিজ্যসূত্রে পরস্পরের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তেমন ভাবে ইহারা পূর্ব্ব-এসিয়ার দেশগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। এই কারণে পশ্চিম-এসিয়ার ভূমধ্যসাগর-সংলগ্ন দেশগুলির সভ্যতায়, কতকগুলি এমন সাধারণ গুণ ছিল, যাহার দ্বারা পূর্ব্ব-এসিয়ার ও ইহাদের সভ্যতার পার্থক্য নির্দ্দেশিত হয়। এসারিয়ার শিল্পিগণ কাল্‌ডীয়ার শিল্পিগণের অনুকরণ করিত। গ্রীক্‌গণ এসীরিয়ার অনুচ্চ উৎকীর্ণ (Bas relief) মূর্ত্তি সমূহের অনুকরণ করিত, এবং বহুলপরিমাণে মীসরের সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মেসোপোটেমিয়া, এসিয়া মাইনর, মীসর ও গ্রীস্—এইসকল দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্যাবীলোনীয় দেবতা মেরোডাকের পত্নী ইস্তার, গ্রীসে অ্যাফ্রোডাইট এবং ফিনিসিয়ায় আসটোরেট্ হইয়াছেন। নিমরড মহাকাব্যে গেশড়বারের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে; ইনি গৃহপ্রত্যাগমনের পর ব্যাবীলোনীয় শূর-লোকে (Valhalla) স্থান পাইয়াছিলেন; ঐ কাহিনীই গ্রীক্ পুরাণের হীরাক্লিস্, মেলিকর্টিস্ (ফিনিসিয়ার 'মেল্‌কার্ট') এবং প্রকসের গল্পের মূল। যে প্রবাদের উপর এই কাহিনীগুলি প্রতিষ্ঠিত, ফিনিসিয়া, বোধ হয়, তাহা বাণিজ্য-সূত্রে ব্যাবীলন হইতে গ্রীসে আনিয়াছিল। এই বাণিজ্যের নিকট য়ুরোপ তাহার বর্ণমালার জন্য ঋণী। গ্রীস, হোমরের পূর্ব্বেকার অনেক পুরাকাহিনী, মীসরের নিকট হইতে পাইয়াছিল।

পশ্চিম-এসিয়ায় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে যেমন মীসরের, তেমনি পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের, প্রভাব প্রবল ছিল। সম্রাট্ অশোকের সময় হইতে চীন ও জাপানের শিল্পকলা ভারতীয় আদর্শে বিলক্ষণ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ভারতের সহিত সুদূর পূর্ব্ব-দেশগুলির (Far East) বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং সেই ঘনিষ্ঠতা জল ও স্থল—উভয়পথেই রক্ষিত হইত। প্রচারক ও পর্য্যটকগণ

এই উভয় পথেই গতায়াত করিতেন। এক সময় চীনের গিয়ং নামক স্থানে তিনসহস্র ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী ও দশ সহস্র ভারতবর্ষীয় পরিবার বাস করিত। তাহারা যে কি পরিমাণে চীনের লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তাহারাই প্রথমে চীনদিগের চিত্রলিপিতে শাব্দিক অর্থযোজনা করে; এবং এই সূত্রেই অষ্টমশতাব্দীতে বর্ত্তমান জাপানী বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।* সুবিখ্যাত ইলোরাগুহার খোদিত শিল্প হইতে চীনে টাং শিল্পের উদ্ভব। ফাহিয়ান্, ইৎসিং এবং হিউন্‌থ্‌সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণ শিক্ষার জন্য বহুবৎসর ভারত-ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ভারতের শিক্ষাভবনে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

যেমন ভারতবর্ষ—চীন ও জাপানের সভ্যতাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তেমনি আবার চীন ও জাপান—মেক্‌সিকো ও পেরুর সভ্যতার উপর প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল; তবে সে প্রভাব ততটা প্রবল হয় নাই। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিবার বহুপূর্ব্বেই, চীন ও জাপানীরা ঐ দেশের সহিত বাণিজ্য করিত এবং সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল।† মেক্‌সিকোর ও মঙ্গোলীয়ার পঞ্জিকার সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। মেক্‌সিকো-নিবাসিগণের—চারিযুগের সম্বন্ধে এবং স্বর্গ ও নরকের পরস্তর সম্বন্ধে—ধারণা অনেকটা বৌদ্ধদিগের মত। টল্‌টেক্ উপকথার রহস্যময় সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু, লম্বিত পরিচ্ছদধারী ঋষিকল্প অধিপতি কোয়েট্‌জাল্ কোয়াট্‌ল্ (Quetzal Coatl) সম্ভবতঃ কোনও বৌদ্ধপ্রচারক হইবেন। কথিত আছে যে, তিনি মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের মধ্যে—অন্যতম টল্‌টেক্‌গণের মধ্যে—বিংশতি বৎসর বাস করিয়া, তাহাদিগকে নিজের মত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে, সকল প্রকার উগ্রতা ও বিরোধ ঘৃণা করিতে, এবং দেবমন্দিরে—মনুষ্য ও অন্যান্য পশুবলি দিবার পরিবর্ত্তে—পিষ্টকাদি নিরীহ নৈবেদ্য এবং পুষ্প ও গন্ধ উৎসর্গ করিতে, শিখাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের আদ্য শতাব্দীতেগুলিতে এইরূপ প্রশান্ত মত—পূর্ব্ব-এসিয়া ভিন্ন অন্য কোনও স্থল হইতে—আসা সম্ভবপর ছিল না। টল্‌টেক্‌গণের উপকথায় কথিত আছে যে, এই রহস্যাবৃত অতিথি তাহাদিগকে চিত্রলিপি, পঞ্জিকাতত্ত্ব, এবং রৌপ্যশিল্প—যাহার জন্য চলুনা বহুদিবসযাবৎ বিখ্যাত ছিল—শিখাইয়াছিলেন।*

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম-এসিয়ার ও মীসরের যে অল্পবিস্তর বাণিজ্যগত সম্পর্ক ছিল, সে বিষয় সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু আলেক্‌জান্দারের ভারত-আক্রমণের দ্বারা ভারতের সহিত প্রতীচ্যদেশসমূহের সংস্পর্শ ঘনীভূত হয়। সেই ঘটনার পর হইতে ভারতবর্ষ ঐ দেশসমূহের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং নিজেও উহাদের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। মেগাস্থেনিস একাদিক্রমে বহুদিন সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলিউকাসের দূতস্বরূপ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী বিন্দুসার, আণ্টায়োকাসের সহিত পত্র-বিনিময় করিতেন। টলেমি ফিলাডেলফস্ ভারত-রাজদরবারে ডাইওনিসিয়স্‌কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট্ অশোক পশ্চিম-এসিয়া, আফ্রিকা, ও য়ুরোপের গ্রীকরাজ্যসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ভারতীয় যবনরাজগণ প্রায় তিনশতাব্দী ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং ঐ শতাব্দীত্রয়ের অধিকাংশ সময়ই পঞ্জাব গ্রীকদিগের অধীনে ছিল।

এইরূপে ভারতবর্ষ প্রতীচ্য প্রদেশের সংস্রবে আসিয়াছিল, এবং উভয়ে পরস্পরের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তবে এই প্রভাবের কতটুকু বিস্তার হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বেবর ও বিন্টিশ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সংস্কৃত-নাটক গ্রীক-নাটক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু সিল্‌ভেঁ লেভি প্রভৃতি অন্যান্য সুধীগণ ইঁহাদের মত গ্রাহ্য করেন না। ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীকপ্রভাবসম্বন্ধে মতভেদ বড় অধিক নহে। প্রথম কয়েক খ্রীষ্টাব্দে গান্ধারে এবং তৎসন্নিকৃষ্ট স্থানসমূহে

* এ. ওকাকুরা—'পূর্ব্বের আদর্শ' (IDEALS OF THE EAST)—পাদটীকা।

† আ দ্য কোয়াত্রেফাগ—'মনুষ্যজাতি' (HUMAN SPECIES)—২০২-২০৬ পৃঃ।

* ENCYCLOPÆDIA BRITTANICA, 9th Edition—Mexico.

এবং THE STORY OF THE NATIONS Mexico.—pp. 29-30.

একটি ভারতীয় যাবনিক শিল্পী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতে মুদ্রাগঠন-শিল্প, গ্রীকগণ কর্ত্তৃক আনীত হয়; এবং মোক্ষমূলরের মতে—মন্দির, মঠ, বা স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত করিবার কল্পনা গ্রীস হইতে ভারতবর্ষে আইসে এবং কতকগুলি ভারতীয় স্থাপত্য—প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও—ঐ গুলিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্থাপত্যের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। *

ভারতবর্ষ আবার প্রতীচ্যদেশসমূহের চিন্তাপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীসের অত্যল্পবাদী নাস্তিকসম্প্রদায়ের মতগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবপ্রসূত। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন,—মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর-মালায়, মেনাণ্ডুস্ নামক গ্রীক রাজার সহিত একজন বৌদ্ধ দার্শনিকের দর্শন ও ধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি উচ্চতম সমস্যার আলোচনার একটা সুবিশ্বাস্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নিও-প্লেটনিক মতের স্থাপনকর্ত্তা রহস্যবাদী প্লটিনস্—তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে, সম্রাট্ গর্ডিয়ানের বিজয়াভিযানের সহচর হইয়া—পারস্যে ও ভারতে আসিয়াছিলেন; ইঁহার দার্শনিক মত, বেদান্তকর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। ড্রেপর্ বলেন যে, তাঁহার মতসমষ্টি ও অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল।।

গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যদ্বয়ের ধ্বংসের পর, আরবগণ প্রতীচ্যের ও ভারতের সম্বন্ধে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিয়াছিল; পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর হিন্দুদিগের প্রভাব বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন; অনেকে এমনও বলেন যে, হিপক্রেটিস্ হিন্দুদিগের কাছে ঋণী। সিরাপিয়ন্ নামক একজন প্রাচীনতম আরব-চিকিৎসক, আভিসেনা এবং হার্জিস্, চরকের উল্লেখ করিয়াছেন। চরক প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকর্ত্তা; ইঁহার গ্রন্থাবলী আমাদের সময়েও প্রচলিত রহিয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ, আরব্য ও পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়; এবং মানেথ্ ও সালেহ্ নামক দুইজন হিন্দুচিকিৎসক হারুণ-আল্-রসিদের শরীর-চিকিৎসকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বিষ-বিষয়ক একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতগ্রন্থের পারস্যভাষায় অনুবাদ করেন। সারাসেনগণ ভারতবর্ষের পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিল।

আমরা এতক্ষণ সভ্যতার এক কিংবা বিভিন্ন শাখার সম্বন্ধে—একসমাজ অন্যসমাজের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে,—তাহাই আলোচনা করিতে ছিলাম। এতদ্ভিন্ন একই সমাজের অন্তর্গত সঙ্ঘ (guild) রাজব্যবস্থিত সমিতি, পুরোহিতপ্রধানতন্ত্র, শাসনতন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আদর্শ, পরম্পরাগত বিশ্বাস, ও বিধিব্যবস্থাদি, সভ্যতার বিস্তারপক্ষে কার্য্যকর হয়। ঐ উপকরণগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সহানুভূতিসম্পন্ন, বিশিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্ব্বাচিত শাসনতন্ত্র সভ্যতার উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। আধুনিক কালে জাপান ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে একটি অপকৃষ্ট, কুচালিত এবং কুনির্ব্বাচিত শাসনতন্ত্র,—এবং যে শাসনতন্ত্র সর্ব্বদা আপন অধিকারবহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে,—সভ্যতার বিস্তারের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রভাব—ভালর দিকেই যাউক, বা মন্দের দিকেই যাউক, উহা—পার্থিব জড়োন্নতির উপরে উঠিতে পারে না।* সমীচীন ব্যবস্থা প্রণয়ন, শান্তিরক্ষা

---

* Six Systems of Indian Philosophy. p. 80.—এই মতটা কি সমীচীন? যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভার বর্ণনায় স্ফটিক-নির্ম্মিত প্রাসাদের বর্ণনা আছে; তাহা কি গ্রীকদিগের পূর্ব্বে নয়?—অনুবাদক।

† Intellectual Development of Europe,—ch. vii, P. 211

* সভ্যতার উপর শাসনতন্ত্রের প্রভাব কতদূর যাইতে পারে, সে বিষয়ে 'বকল' যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চরমেরই দিকে গিয়াছে;—"যে পরিমাণে শাসকসম্প্রদায় সভ্যতার বিস্তারবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং ঐরূপ হস্তক্ষেপদ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে,—তাহা এত বেশী যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিস্মিত হয়েন যে সব সব এত বাধা সত্ত্বেও কিরূপে সভ্যতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। য়ুরোপের কতকগুলি দেশে ঐ প্রকার বিঘ্ন এত দুর্লঙ্ঘ্য হইয়াছিল যে, তাহাদের জাতীয়উন্নতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল স্থলে শাসনতন্ত্রের প্রভাব অবশ্যই বিষময় হইয়াছিল। ভালর দিকেই হউক, বা মন্দের দিকেই হউক, শাসনতন্ত্রের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। যদি খতাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মন্দের ভাগটাই বেশী; কারণ বকল ঠিকই বলিয়াছেন যে, ক্ষমতা-পরিচালনস্পৃহা এত বিশ্বব্যাপী যে, যাহারাই ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহারাই উহার অসদ্ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।—'বকল্'-প্রণীত 'ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস'—নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ও সাধারণের উপকারী পূর্ত্তাদি কার্য্যদ্বারা ঐ তন্ত্র সভ্যতার পরিপুষ্টিসাধন করিতে পারে, উহাই আবার,—অসঙ্গত-ব্যবস্থা-প্রণয়ন এবং অনর্থক অনধিকারচর্চ্চাদ্বারা,—উন্নতিকে পিছাইয়া দিতেও পারে। ইতিহাস-পাঠকগণ উহাতে এই দ্বিবিধ প্রভাবেরই উদাহরণ পাইবেন, সন্দেহ নাই। ৮৭৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মীসর-রাজ (ফেরোয়া) মেঙ্গ (কিংবা মেনস) যে বিরাট্ পূর্ত্তকার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নালনদ একটি উর্ব্বরতা-বিধায়ক নদে পরিণত হইয়া মীসরের পার্থিব উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। অপরদিকে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল রাজব্যবস্থা, উহার পার্থিব উন্নতিকে বহুদিনযাবৎ পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছিল। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির উৎকর্ষ সাধনকার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসনতন্ত্রের শক্তি অতি অল্প।* বিশেষতঃ যে সকল শাসনতন্ত্রে নিম্নস্তরের প্রভাব প্রবল, তাহাদের সম্বন্ধে ঐ কথা অধিক সত্য। ঐ প্রকার তন্ত্রে প্রায়ই নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর অযথা-উত্থিত করা হয়। জনসাধারণকে উপরে উঠাইবারকালে, উহাদের মধ্যে যাহারা গুণবান্ তাহাদের নীচে নামাইয়া আনা হয়। সকল সমাজেই কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তির শিক্ষাই নিম্নস্তরের লোকদিগকে উন্নত করে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের প্রভাবের আধিক্যের উপর,—অর্থাৎ অধঃক্ষেপক-প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎক্ষেপক-প্রবৃত্তির প্রাবল্যের উপর—সমাজের সভ্যতার প্রসার নির্ভর করে। সাধারণ তন্ত্রের প্রভাব অধিক হইলে, এই উৎক্ষেপক-প্রবৃত্তির অত্যন্ত হ্রাস হয়। নীতি, সাহিত্য, শিল্প—সর্ব্বত্রই এই নিম্নগতি পরিস্ফুট হয়। উক্ত শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে বিজ্ঞ ও ধর্ম্মভীরু মনুষ্যেরা ঐ তন্ত্রে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ, ঐ শাসনতন্ত্রে কোনও পদ পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্য যে সকল নীচ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ইহারা করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু এমন সকল লোকের বর্জ্জনে সুফল ফলে না। এমন অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু ইহার গভীরতা কমিয়া যায়। লেখকগণকে ন্যূনাধিক অজ্ঞতা-সমাচ্ছন্ন জনসাধারণের নৈতিক ও মানসিক শক্তির অধিগম্য সাহিত্য রচনা করিতে হয়; তাই প্রচুর পরিমাণে চিন্তাহীন (Light) সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, এবং জ্ঞানের উৎকর্ষ ও চরিত্রের উন্নতি সাধিতে পারে, এমন সাহিত্য অতিশয় বিরল হইয়া পড়ে।

রাজনীতিসম্বন্ধে সক্রেটিসের এই মত ছিল যে,—উহার চক্রে পড়িলে তিনি নিরাপদ হইবেন না, কারণ তিনি নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি; এই মত সকল শাসনতন্ত্রের সম্বন্ধেই খাটে,—বিশেষতঃ যে শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের প্রভাব বেশী, তাহার পক্ষে। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, এইরূপ ঘটনায় গ্রীকদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে কতটা বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। পাইথাগোরাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া আরিষ্টট্‌ল্ পর্য্যন্ত, গ্রীসের প্রায় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই, বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন;—কেহ কেহ নির্ব্বাসিত, কেহ কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সভ্যতার প্রতিকূল অত্যাচার যত প্রকারের হইতে পারে, অজ্ঞ প্রজাতন্ত্রের অত্যাচার তৎসর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।*

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু। শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

---

* ফ্রিডর্স পেনি কহিয়াছেন—'শাসনতন্ত্রের ব্যস্ততা অতিরিক্ত; কিন্তু তাহা অনেকটা নিরর্থক। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্র—ইহাদের যে স্থায়ীমূল্য, তাহার পার্শ্বে শাসনতন্ত্রের ইতিহাস যেন নিষ্ফল কল্পনামাত্র। মানুষ কি করে, কেমন করিয়া তাহার শক্তির বিকাশ হয়, এবং সে ভবিষ্যবংশাবলীর জন্য কি রাখিয়া যায়,—এই সকলই সভ্যতার প্রধান উপদান।'—তৎপ্রণীত "সভ্যতার বিপ্লব"—১২৩ পৃঃ।

* আধুনিককালে যেসকলদেশে প্রজাশাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহ (UNITED STATES) সর্ব্বপ্রধান—কিন্তু উহাই আবার সর্ব্বাপেক্ষা কলুষিত এবং উন্নতি-বিরোধী। অক্‌স্‌ফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের সহকারী-অধ্যক্ষ এবং হিবার্টজর্ণালের সম্পাদক, ডাক্তার এল্. পি. যাক্‌স সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন:—

"আমেরিকার রাজনীতি-ব্যবসায় অতি মাত্রায় কলুষিত ও নীচ হইয়া পড়িয়াছে; ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমেরিকা এখন নামে মাত্র প্রজাশাসনতন্ত্রীদেশে পরিণত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক যন্ত্র বিদ্যমান, তাহাই এখন যথার্থ ক্ষমতাশালী এবং ঐ যন্ত্র পরিচালন করিতেছে কতকগুলি অর্থশালী লোক,—এবং উহা একটি বিরাট্-অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশেষ সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যে এই যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং ইহার তুলনা একমাত্র এডিসনের আবিষ্কারসমূহ। ইহার উদ্দেশ্য—স্বাধীনব্যক্তিগণকে স্বাধীন মত (Vote) দিতে না দেওয়া। আমি সর্ব্বত্রই ইহার অত্যাচার-কাতর লোকের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

ছিন্নহস্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি: ব্যাঙ্কার মঃ ডরজবেস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য, মালিকম্ দ্বারপাল, ডেন্‌লেভ্যান্ট্ শাস্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ। তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, সেটা ম্যাক্সিম্ নিজের কাছে রাখিলেন।

রবার্ট, এলিসের পাণিপ্রার্থী; এলিসও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক: তাই তিনি রবার্ট্‌কে মিশরস্থ স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ তাহাতে অসম্মত সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই —কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে দেখা গেল ৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেসলেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন; সে রমণী—কাউণ্টেস ইয়াল্‌টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেসলেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথাবার্ত্তায় বেশী রাত্র হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন। পথে গুণ্ডা পাছে লাগিয়াছিল।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরিসম্পর্কে সকলেই রবার্ট্‌কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা—সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্‌কে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্‌কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, গোপনে তাঁহাকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন; তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস,—রবার্টের নিয়োজিত কোন রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্‌কেও সেইরূপ বলিলেন; এবং জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর বিবাহ ঘটিবে; আর চুরীর গুপ্তকথা ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। তথায় এক রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেসলেট্‌টির পূর্ব্বাধিকারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট!—ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির। কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল; দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেসলেটের কথা উঠিতে ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেসলেট্ ও ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল;—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন!

একমাস গত:—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী; জর্জ্জেট্ সেদিন প্রাচীর হইতে পড়িয়া—তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াল্টা অসুস্থ ছিলেন,—আজ একটু ভাল আছেন, ম্যাক্সিম্ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। তিনি বলিলেন, ভিগ্‌নরীর সহিতই এলিসের বিবাহ হওয়া বিধেয়; আর জর্জ্জেটের নিকট হইতে রবার্টের যথাসম্ভব সংবাদ-আহরণ করা কর্ত্তব্য। অচিরে ব্যাঙ্কারের বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—এই আশ্বাস দিয়া ইয়াল্টা ম্যাক্সিম্‌কে বিদায় দিলেন।

কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার অনুরোধমত ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ পিরিয়াকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া জর্জ্জেট্‌কে সঙ্গে লইয়া পথিভ্রমণে নির্গত হইলেন। আশা,—পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখিলে, জর্জ্জেটের লুপ্তস্মৃতি যদি পুনরাবির্ভূত হয়। কার্য্যতঃ কতকটা সফলকামও হইলেন,—জর্জ্জেটের পূর্ব্বস্মৃতি কতক কতক পুনঃপ্রদীপ্ত হওয়ায়, সে প্রসঙ্গতঃ রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক আভাষ জ্ঞাপন করিল; যে বাটীতে রবার্ট্‌কে বন্দীভাবে থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহাও নির্দ্দেশ করিল; পরে সেই প্রাচীরের

উপর হইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সে হতচেতন হয়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ পাইল। ঠিক্ সেই সময়ে তাঁহার প্যারীর আবাস-বাটীর কক্ষে বসিয়া, পরদিন রবার্ট্‌কে দেশান্তরিত করিবার বিষয় নিজ প্রধান পরিচারকের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন—সহসা ম্যাক্সিম্ গিয়া উপস্থিত। প্রসঙ্গতঃ ম্যাক্সিম্ বলিলেন যে, তিনি জানিয়াছেন "এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট্‌কে ধরিয়া এবাটীতে আনা হইয়াছিল। এখনও কি সে এখানেই আছে,—না, স্থানান্তরিত হইয়াছে ?" ইহাতে বোরিসফ্ ক্রোধের ভাণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সে পুলিশের সাহায্য লইবে, জানাইয়া গেল। শুধু কর্ণেল্ সেই রাত্রেই রবার্ট্‌কে স্থানান্তরিত করিবে স্থির করিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন;—সকল কথা প্রকাশ করিবার জন্য, ভয়মৈত্রী দেখাইয়া, পীড়াপীড়ি করিলেন;—সে কিন্তু অটল! অগত্যা তাঁহার মনে হইল,—"তবে কি ভুল করিয়াছি ?"]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন কর্ণেল বোরিসফের সহিত ম্যাক্সিমের সাক্ষাৎ হইয়া ছিল, সেই দিন প্রভাতে এক তরুণী, শঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল চরণে এভিনিউম-দে-ফ্রায়াদলাণ্ড দিয়া গমন করিতেছিলেন। তরুণী সুন্দরী এবং অবগুণ্ঠনবতী, হর্ম্ম্যরাজির ছায়া-রেখা ধরিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতে ছিলেন। দেখিয়া বোধ হইতে ছিল, লোকের কৌতূহলদৃষ্টি অতিক্রম করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যেন তিনি কাহারও অনুসরণ-ভয়ে ভীতা। পথে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ পাইয়া সুন্দরী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাউন্টেস্ ইয়ান্টার বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন ?"

"কাউন্টেস ইয়ান্টা! এই যে তাঁহার বাড়ী, এই তাঁহার বাগানের পাঁচিল, ঐ ছোট ফটক দিয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। আপনার যদি তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকে, রুবিউজোঁর উপরে ডান হাতে ঐ সদর ফটকে যান।"

অতি মৃদুকণ্ঠে কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ করিয়া সুন্দরী চলিয়া গেলেন। তিনি হোটেল ইয়ান্টার বৃহৎ ও বিচিত্র তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে, দ্বিধা ও সন্দেহে তাঁহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। তিনি ধীরে পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। দ্বারে একজন ভীমকায় প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীর বুঝি ভয় করিতে ছিল। কেননা তরুণী যতই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তাঁহার পদক্ষেপ ততই মৃদু হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যুবতী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্বারস্থ ঘণ্টার আংটা ধরিয়া টানিলেন। প্রহরী অগ্রসর হইয়া বিনীত ভাবে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কম্পিত কণ্ঠে সুন্দরী বলিলেন,—"কাউন্টেস্ ইয়ান্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

দ্বারবান্ বলিল, "কাউন্টেস্ আজ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতেছেন না, তা আপনি যদি আপনার নাম, আর কি জন্য এসেছেন—"

সুন্দরী চমকিয়া মস্তক নত করিলেন, তাহার পর আত্ম-সংবরণ করিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,"কুমারী ডরজরেস্ দেখা করিতে আসিয়াছে বলিলে, তিনি হয়ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।"

নাম শুনিয়াই দ্বারবানের ভাবান্তর ঘটিল। কাউন্টেস্ যে পূর্ব্বদিন মসিয়ে ডরজরেসের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহা সে জানিত। সে সম্ভ্রমে বলিল, "আমায় ক্ষমা করিবেন; আপনি যদি বৈঠকখানায় গিয়া একটু অপেক্ষা করেন, আমি কাউন্টেস্‌কে খবর দিই। তিনি এখনও রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহার নিকট কাহাকেও লইয়া যাইবার হুকুম নাই।"

দ্বারবানের কথা শেষ না হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন আরদালি আসিয়া কুমারী এলিস্‌কে একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। এই প্রকোষ্ঠে ডাক্তার ভিলাগোস্ ইতঃপূর্ব্বে ম্যাক্সিম্‌কে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অবিলম্বে কাউন্টেসের সেই সঙ্গিনী আসিয়া কুমারীকে কাউন্টেসের শয়নমন্দিরে লইয়া গেল।

এখনও কাউন্টেসের শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি ছিল না। এলিস্ দেখিলেন, তিনি একখানি বৃহৎ পর্য্যঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া অর্দ্ধশয়ান রহিয়াছেন। পর্য্যঙ্কের চারিদিক্ বিচিত্র শিল্প-সুষমা-ভূষিত যবনিকা-জালে শোভিত। কক্ষ অতি মৃদু আলোকে আলোকিত। বাতায়নশ্রেণী নানা বর্ণবাসে রঞ্জিত,—কাচ ফলকে সজ্জিত। এলিসের বড় লজ্জা করিতে লাগিল; লজ্জায় সে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। সে কি বলিবে? কেমন করিয়া এই রোগশীর্ণা পাণ্ডুর-মুখী সুন্দরীর সহিত কথা কহিবে? যদি ম্যাক্সিম্ কথাটা অতি

রঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকে! যদি কাউন্টেস্ কেবল রবার্ট্ কার্ণোয়েলের প্রতি শুধু মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন! কিন্তু শীঘ্রই এলিসের সংশয় দূর হইল। অতি কোমল, অতি মধুর—ত্রিদিব-সঙ্গীত-তুল্য—রজত-নিক্কণ-নিন্দী কণ্ঠে কাউন্টেস্ বলিলেন—

"আপনি আসিবেন, তাহা আমি জানিতাম। তাঁর সম্বন্ধে কএকটি কথা যে আপনাকে বলিব, তাহা আপনি অনুমান করিয়াছিলেন।"

এলিসের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে কাউন্টেসের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। কাউন্টেস্ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আপনি না আসিলে, কবে আপনার সহিত দেখা হইত কে জানে? ডাক্তার আমাকে কথা কহিতে ও চলাফেরা করিতে বারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিলাম না। কাল ভাবিয়াছিলাম, আমি সুস্থ হইয়াছি; কিন্তু আপনাদিগের বাটী হইতে আসিয়া আবার রোগে ভুগিতেছি, সারিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিকট বসিয়া কথা কহুন।"

এলিস্ শয্যাপার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি যে এ অবস্থায় আমার সঙ্গে দেখা করিলেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কাছে কোন কথা লুকাইব না। পিতার অনুমতি না লইয়াই আমি আসিয়াছি!"

"তা'তে আমি বিস্মিত হইনি। কাল যখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন আপনার পিতা যে আপনার সঙ্গে আমার আলাপে অসম্মত, তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আপনি সব বিষয় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, আমি বড় সুখী হইলাম।"

"ম্যাক্সিমের মুখে শুনিলাম, আপনি মসিয়ে কার্ণোয়েলের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

কাউন্টেস্ বলিলেন,—"আপনি তাঁকে ভালবাসেন;—না?"

এলিস অতি কষ্টে বলিল,—"ভালবাসিতাম।"

"তবু আরএকজনের সঙ্গে আপনার বিবাহের কথা হইয়াছে।"

"আমাকে সকলে বুঝাইয়াছিল, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ অপকর্ম্ম করিয়াছে। তার উপর, বাবা আমাকে বিবাহ করিবার জন্য বড় অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁর কথা ঠেলিতে পারি নাই। লোকের চোখে আমি অন্যের বাগ্‌দত্তা পত্নী, কিন্তু হৃদয় ত আমারই।"

"তারা প্রমাণ ক'রেছিল, তিনি চুরি ক'রেছেন;—না? কথাটা মুখে আনিতে দোষ কি? এটা ত মিথ্যা কলঙ্ক বৈ আর কিছু নয়; কিন্তু অন্য কথা কহিবার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—কে আপনাকে এসব কথা বলেছিল? আপনি কি শুনিয়াছিলেন?"

এলিস্ সে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন।

কাউন্টেস্ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করিলেন, মসিয়ে রবার্ট চোর! একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, কতকগুলা দলিল-সমেত একটা বাক্স চুরি করিয়া তাঁহার কি লাভ? একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না, সিন্ধুক মোহর ও নোটে পরিপূর্ণ থাকিলেও চোর সে সব স্পর্শ করিল না কেন?"

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কুমারী বলিল, "সিন্দুক থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক্ চুরি গিয়াছে।"

"মিথ্যা কথা!"

"সত্যই টাকা চুরি গিয়াছে। আমার পিতা ও সেই কৃশ্ ভদ্রলোকের সম্মুখে, খাজাঞ্চি, টাকা ও নোট গণিয়া দেখিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা দেখেন, একতাড়া নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

কাউন্টেস্ বলিলেন, "অসম্ভব! কিন্তু পূর্ব্বে যে একবার চুরির চেষ্টা হইয়াছিল, এ কথা আপনার পিতা আপনাকে বলিয়াছিলেন?"

"না;—যদি পূর্ব্বে সিন্ধুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত, সে কথা আমি শুনিতে পাইতাম। মসিয়ে ভিগনরীই কথাটা আমাকে বলিতেন।"

"তা'হলে জর্জ্জেটের দেখিতেছি ভুল হইয়াছে; তার মুখেই আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম।"

"কাল সে ম্যাক্সিমের সঙ্গে আমাদের আপিসে গিয়াছিল।"

"ছেলেটি কেমন আছে বলিতে পারেন?"

"আরোগ্য হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল ; কিন্তু তার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নি।"

"আপনার পিতৃব্যপত্র তা হলে তার কাছে কোন সংবাদ পান নি ?"

"ম্যাক্সিম্ বলিলেন, জর্জ্জেট্ মসিয়ে ভিগনরার সমক্ষে চুরিসম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে ; সে আর একটু ভাল হইলেই প্রকৃত চোরের নাম প্রকাশ করিবে।"

"সম্ভব। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইতোমধ্যে জর্জ্জেট্ আপনার পিতৃব্যপুত্রকে মসিয়ে কার্ণোয়েলসম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবে।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল্ প্যারিসে আছেন, ইহাই আপনার ধারণা ?"

"উহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; যেদিন তাঁহার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, সেই দিনই তিনি কোন প্রবল শত্রুর হাতে পড়িয়াছেন।"

"তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল, তাহাও আপনি জানেন ?

"আমি সব জানি, মসিয়ে ম্যাক্সিমের মুখে সকল কথাই শুনিয়াছি। আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম বলিয়া কিছু করিতে পারি নাই। এখন সময় হইয়াছে। মসিয়ে কার্ণোয়েল্কে খুঁজিয়ে বাহির করিবই ; তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে, আমি নিজে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার পিতার কাছে যাইব, এবং তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহার প্রমাণ সকলকে দেখাইব।"

"ম্যাক্সিম্ বলিয়াছেন, জর্জ্জেট্ চুরি করিয়াছে।"

"আমি আপনাকে সে কথা বলি নাই ; কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েল্ যে নির্দ্দোষ, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।"

কাউণ্টেসের কথায় এলিসের সকল সন্দেহ দূর হইল। সে বুঝিল, কাউণ্টেস্ প্রকৃত অপরাধীকে জানেন ; নিরপরাধের কলঙ্কভঞ্জনের জন্য তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবেন। এলিস্ মনে মনে ইহাঁর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা একটা সন্দেহ তাহার মনে আঘাত করিল,—কাউণ্টেস্ কি কেবল নিরপরাধের কলঙ্ক-মোচন করিবার জন্য এত করিতেছেন —না ইহার ভিতর আরও কিছু আছে ? কাউণ্টেস্ রবার্টকে ভালবাসেন না ত ?

এলিস্কে ম্লানমুখী দেখিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "এখানে আসিয়াছেন বলিয়া, বোধ করি, দুঃখিত হন নাই ! মসিয়ে কার্ণোয়েল্কে বাঁচাইবার জন্য আমরা দুই জনে বোধ করি পরামর্শ করিতে পারিব ?"

এলিস লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ ?"

"আমি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না ; তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত !"

এলিসের মুখ হর্ষদীপ্ত হইল। সে কাউণ্টেস্কে আপনার প্রেমের কথা- রবার্টের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা—বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মসিয়ে ম্যাক্সিম্ এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন।"

"তাঁহাকে লইয়া আইস।"

ম্যাক্সিমের আগমন সংবাদ শুনিয়া এলিস্ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই ; কিন্তু দাসী চলিয়া যাইবামাত্র সে কাউণ্টেস্কে কহিল, "এখানে ম্যাক্সিমের সঙ্গে যেন আমার দেখা না হয় ;—আমায় আর লজ্জা দিবেন না।"

"তাহাকে আপনার আগমনের কথা বলিব না ? "

"দোহাই আপনার ;—ম্যাক্সিমকে কিছু বলিবেন না।"

"আপনাদের সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার উপায় কি ? আপনি ঐ ঘরটার ভিতর যাইবেন ?"

এই বলিয়া কাউণ্টেস্ তাঁহার পালঙ্কের শিরোদেশের সন্নিহিত একটি দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

এলিস্ তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহটি কাউণ্টেসের প্রসাধন কক্ষ। বৃহৎ দর্পণ, বিচিত্র শিল্প-সম্ভার, এবং কারুকার্য্যখচিত আসনসমূহে কক্ষটি পরিপূর্ণ। ম্যাক্সিম্ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আপনার এত অসুখ, আর আপনি কাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন ?"

"হাঁ, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। এখন সে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। তা' হউক, আপনি জর্জ্জেটের কথা বলুন।"

"অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় কথাটি আগে বলিতে চাহি।"

"জর্জ্জেট্ কেমন আছে? তাহার স্মরণশক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে ত?"

"আমার ত সেই বিশ্বাস; মাঝে মাঝে তা'র স্মরণশক্তি বেশ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সে এখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সে আজ গোটা কএক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, অন্যসময় হইলে সেকথা জর্জ্জেট্ কখনই বলিত না!

"কি বলিয়াছে?"

ম্যাক্সিম্ ডরজরেসের আপিসের ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন "আমার দৃঢ়বিশ্বাস জর্জ্জেট্ চোরের সহায়তাকারী!"

কাউণ্টেস্ ঔদাস্যভরে বলিলেন, "খুব সম্ভব।"

"একথা শুনিয়া আপনার মনে কষ্ট হইতেছে না?"

"এটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার বৈ ত নয়।"

"রাজনৈতিক ব্যাপার?—বলেন কি!"

তখন দুইজনে অনেক কথা হইল। ম্যাক্সিম্, স্কেটিং-ক্ষেত্রের সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর কথা, রুদে জুফ্রেতে সেই জনহীন গৃহের কথা, সেই বাড়ীর বিদেশী প্রহরীর কথা, আর সেই ব্যক্তিই যে সিন্দুক হইতে বাক্সটি চুরি করিয়াছে, তিনি যে জর্জ্জেটের মুখে তাহার নাম শুনিয়াছেন —এই সমস্ত কথা একে একে কাউণ্টেসের নিকট বর্ণন করিলেন। তাহার পর তিনি কি উপায়ে জর্জ্জেটের নিকট হইতে রবার্ট্ কার্ণোয়েলের সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাও বিস্তৃতভাবে বলিলেন। কথা শেষ হইলে ম্যাক্সিম্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মসিয়ে কার্ণোয়েল্ এখন যেবাড়ীতে আছেন, আপনি তাহার বর্ত্তমান অধিকারীর নাম শুনিলেই খুব বিস্মিত হইবেন। জ্যেঠার সিন্দুক হইতে যে রুশীয়ানটার বাক্স চুরি গিয়াছে, সেই লোকটাই ঐ বাড়ীর মালিক!"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "বোরিসফ? নহিলে এমন মহা পাপিষ্ঠ আর কে? সেই কার্ণোয়েল্কে ফাঁদে ফেলিয়া বন্দী করিয়াছে। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। দুরাত্মা যদি এখনও তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে সেটা সৌভাগ্য মানিতে হইবে!"

"সে কি! সে লোকটা মানুষ খুন করিতে পারে?"

"বোরিসফ্ রুশিয়া পুলিশের গোয়েন্দা; যে প্রকারেই হউক সে চোরাই বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। মসিয়ে কার্ণোয়েলের মাথায় এই কলঙ্কের ডালি চাপান হইয়াছে বলিয়াই, সে তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে। সাধ্য থাকিলে, তাঁহার প্রাণরক্ষায় আর এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা উচিত নহে। আমাভিন্ন একাজ হইবে না; আমার অনুরোধে আপনি আর একাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

"করিব না কি?—আমি যে ইহার মধ্যে কাজে হাত দিয়া বসিয়াছি!"

"কি করিয়াছেন?"

ম্যাক্সিম্ বোরিসফের সহিত সাক্ষাৎকারসংক্রান্ত সকল কথা অকপটে বলিলেন; সমস্ত শুনিয়া কাউণ্টেস্ ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সব মাটী করিয়াছেন দেখ্‌ছি।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কিসে?"

"আপনি কি মনে করেন বোরিসফ্ ঐ কথা শুনিয়াই মসিয়ে কার্ণোয়েল্কে ছাড়িয়া দিবে?"

ম্যাক্সিম্ অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, "আমি অকূলদিক্ বিবেচনা না করিয়া, ঝোঁকের মাথায়, কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!"

কাউণ্টেস্ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আপনার নিন্দা করিতেছি না। আপনি ভাল ভাবিয়াই ঐরূপ কাজ করিয়াছেন। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের হাঙ্গাম করিয়া কাজ নাই; বোরিসফের নিকট লোক পাঠাইলেও বিশেষ কোন ফল হইবে না। দলিলের বাক্সটি চুরি যাওয়াতে, সে চোরদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এই রুশীয়ানটা ভয়ানক লোক; যাহারা দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছে, তাহাদিগকে হাতে পাইলে, তাহাদিগের প্রাণ-বধেও সে কুণ্ঠিত হইবে না। আপনি সাবধানে থাকিবেন।"

"এটি দেখিতেছি, রাজনৈতিক চুরি বলিয়াই আপনার ধারণা।—এ চুরি কে করিল!"

"সম্ভবতঃ দেশান্তরিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এ কাজ হইয়াছে। য়ুরোপ এখন নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়।

ইহারা রুশিয়ার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল; এখন প্রবাসে থাকিয়া সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি রুশিয়ার প্রজা নহি, তাই বোরিসফের ন্যায় লোকের সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষ গ্রহণ করাই আমার স্বভাব; গোয়েন্দারা যাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করে, আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল্ এই দলিলের বাক্স অপহরণে সহায়তা করিয়াছেন; তাই আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

"তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তিনি আপনারই ন্যায় নিরপরাধ। কে দলিল চুরি করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। জর্জ্জেট্ তাঁহার ঠাকুরমার কথায় হয়ত এই ব্যাপারের ভিতর ছিল; কিন্তু সে সারিয়া না উঠিলে তাহার পিতামহীকে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।" এখন বোরিসফের সহিত এ বিষয়ে বুঝাপাড়া করিতে হইবে। মসিয়ে কার্ণোয়েলের কলঙ্কভঞ্জন করিতেই হইবে।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিন্তু এই কার্য্যে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।"

"কিন্তু তৎপূর্ব্বে সমস্ত ঘটনার কথা আপনাকে খুলিয়া বলিব! দুইবার যে জ্যেঠার সিন্ধুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বোধ করি আপনি জানেন না।" এই বলিয়া ম্যাক্সিম্ একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন। সিন্ধুকের কলে যে রমণীর করপদ্ম পাওয়া গিয়াছিল তাহাও বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "সাধারণ চোরে এই কাজ করিয়াছে বলিয়াই আপনার ধারণা?"

"কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই চুরি হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ও ভিগ্নরী প্রথম বারের ঘটনা গোপন করিয়াছিলাম।"

"আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ সম্পূর্ণ নিরপরাধ; তিনি প্রথমঘটনার সময়ে মসিয়ে ডার্-জারসের বৈঠকখানার মজলিসে ছিলেন। আর তিনি যদি চোরদিগের সহায়তা করিতেন,—তাহাদিগকে সিন্দুকের চোরধরা কলের খবর দিতেন,—তাহা হইলে সেই অভাগিনীর হাত ছিন্ন হইত না।"

"ঠিক কথা!"

"কিন্তু এই চুরির পর আপনারা এমন অন্ধ হইয়াছিলেন দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইতেছি। একজন সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়াই কি—পাপের বোঝা তাঁহার মাথায় চাপাইতে হয়?"

এই বলিয়া কাউণ্টেস্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিয়া বলিলেন,—"মসিয়ে ডার্জারেস্ কুসংস্কারে অন্ধ হইবেন, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া এই ছল অবলম্বন করিবেন, ইহাতে আমি একটু বিস্মিত হই নাই। তিনি সাধুপ্রকৃতির লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষের মনের সকল ভাব বুঝিবার শক্তি তাঁহার নাই। আর এই গুপ্তচরটা, প্রকৃত দোষীকে ধরিতে না পারিয়া, যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে, তাহাকেই অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে মসিয়ে ভিগ্নরীর ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য।"

"ভিগ্নরীর ব্যবহার অনিন্দনীয়; যখন জ্যেঠা মসিয়ে কার্ণোয়েল্কে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় ভিগ্নরী প্রাণপণে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিল।"

"আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?"

"না। আমি ভিগ্নরীর মুখেই এ কথা শুনিয়াছি; তিনি মিথ্যা বলিবার লোক নহেন,—কার্ণোয়েল তাঁহার পরম বন্ধু।"

"শুধু বন্ধু নহেন, প্রেমে প্রতিযোগীও বটেন।"

"ভিগ্নরী এলিস্কে প্রাণের সহিত ভালবাসে; কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার দুরাশাকে কখনও মনে স্থান দেন নাই,—রবার্ট্ ও এলিসের প্রেমকাহিনী তিনি জানিতেন। ভিগ্নরী অতি সজ্জন। কার্ণোয়েল্কে বাঁচাইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।"

"ভিগ্নরী দেখিতেছি মোটেই চতুর নয়! লোকটা বড় নির্ব্বোধ;—না?"

"নির্ব্বোধ কেন?"

"পরম বন্ধুর চোর অপবাদ ঘটিল; ইহা তিনি দাঁড়াইয়া দেখিলেন। কিন্তু যে কথাটা বলিলে তখনই অন্য দুইজনের মনের ধোঁকা কাটিয়া যায়, সে কথাটা বলিলেন না!"

কাউন্টেসের বক্তব্য কি, কতকটা বুঝিতে পারিয়া ম্যাক্সিম্ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"মসিয়ে ভিগ্নরী ভোরে আসিয়া দেখিলেন, সিন্দুক খোলা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মসিয়ে ডরজরেস্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তিনি আসিয়া বলিলেন—'এ মসিয়ে কার্ণোয়েলের কর্ম্ম!'" "কিন্তু ভিগ্নরীর মুখে কথা নাই। তিনি একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেন না, 'একাজ কার্ণোয়েল্ করেন নাই। আর একবার চুরির চেষ্টা হইয়াছিল, সিন্দুকের কলে স্ত্রীলোকের একটি ছিন্নহস্ত পাওয়া গিয়াছিল, সেদিন তখন কার্ণোয়েল্ আপনার বৈঠকখানায় ছিলেন। সে চুরির চেষ্টার সহিত যখন তাঁহার সংস্রব ছিলনা, তখন দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গেও তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।' একথা শুনিলে আপনার জ্যেঠা কখনই কার্ণোয়েল্কে 'চোর' বলিতে পারিতেন না।"

"আমার জ্যেঠা একবার যে মত ধরেন, সহজে তাহার খণ্ডন হয় না। তবে, ভিগ্নরী কথাটা খুলিয়া বলিলে ভাল করিতেন; কিন্তু বোধ করি, সেসময় তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

"কখনই নহে! তিরস্কারের ভয়ে, নিজের উপর দোষ পড়িবার ভয়ে, সে কিছুই বলে নাই।"

"ভিগ্নরীর কাজের জন্য আমিই দায়ী—আমিই তাহাকে কথাটা গোপন করিতে বলিয়াছিলাম।"

"এক্ষেত্রে আপনি কার্ণোয়েলের বন্ধুর কাজ করেন নাই। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটিবে,—তাহাও আপনি জানিতেন না। তবে ভিগ্নরী একবার কথাটা বলিলে, ব্যাপারটি ভিন্ন রকম দাঁড়াইত;—অকারণে তাহার বন্ধুর উপর দোষ পড়িত না। সে দুষ্টবুদ্ধিতেই চুপ করিয়াছিল; ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, কার্ণোয়েলের অনিষ্টকামনায়, এই কুকাজ করিয়াছে!"

"একথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখনও যদি আমি তাহাকে জ্যেঠার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলি, তাহাতে সে অসম্মত হইবে না।"

"সাবধান! অমন কাজও করিবেন না। এতদিন পরে ওসব কথা বলিলে মঃ কার্ণোয়েলের কোন উপকার হইবে না। ভিগ্নরী যেন আমার উদ্দেশ্য জানিতে না পারে। অঙ্গীকার করুন, তাহাকে কোন কথা বলিবেন না।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভিগ্নরী কোন কথায় থাকিতে চাহে না; সে বিবাহের ভাবনাতেই ব্যস্ত।"

"রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ যে বোরিসফের গৃহে বন্দী, একথা কি ভিগ্নরী শুনিয়াছে?"

"আপিস হইতে ফিরিবার সময় আমি বোরিসফের গৃহে গিয়াছিলাম। আপিসে কার্ণোয়েলের কথা লইয়া ভিগ্নরীর সহিত আমার একটু রাগারাগি হইয়া গিয়াছে।"

"যাউক, আপনি আর রুষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; আপনি যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, ওবিষয়ে আপনার যেন আর কোন মনই নাই, ইহাই বোরিসফ্কে বুঝাইতে হইবে। আমি আপনাকে না বলিলে, আপনি একাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। পৃথিবীতে আমিই কেবল কার্ণোয়েল্কে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ।"

"এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি এই কাজ করিবেন?"

"অন্যে আমার আদেশমত কাজ করিবে। বোধ করি, কর্ণেল্ বোরিসফ্ এতক্ষণে রবার্ট্ কার্ণোয়েল্কে সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর এবিষয়ে একমুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি তিনদিন পরে এবিষয়ে সংবাদ লইবেন।"

"আমি কিরূপে জানিব?"

"আমাকে দেখিতে আসিলেই হইবে। চাকরেরা যদি বলে আমি অসুস্থ, আপনি আমার পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। আর যদি ডাক্তার ভিলাগোস্ আপনাকে বাধা দেন,—সেই অঙ্গুরীটি আপনার কাছে আছে ত?—ডাক্তারকে সেই অঙ্গুরী দেখাইবেন। পরিচারিকাকে ডাকুন, সে আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইবে। প্রতিমুহূর্ত্তেই ডাক্তার ভিলাগোসের এখানে আসিবার সম্ভাবনা। এখানে আপনার সহিত তাঁহার দেখা হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

ম্যাক্সিম্, কাউন্টেসের শয্যাপার্শ্বে বিলম্বিত রেশম রজ্জু ধরিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে যাইতে ছিলেন; সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষমধ্যে রমণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর উঠিল। কাউন্টেস্ চমকিয়া শয্যায় সোজা হইয়া বসিলেন; বলিলেন, "পরিচারিকাকে ডাকিতে হইবে না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "বামাকণ্ঠ শুনিলাম না?"

"ঐ ঘরে একটি সুন্দরী আছেন বটে ; কিন্তু তিনি চীৎকার করিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কে যেন ভয়ে—বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; যদি তিনি সত্যই ভয় পাইয়া থাকেন, তবে আবার চীৎকার করিবেন।"

"তাঁহার বাহিরে আসিতে কোন বাধা নাই, দরজা খোলাই রহিয়াছে।"

"তবে আমি এখন বিদায় হই।"

কাউণ্টেস যবনিকার অন্তরালস্থিত প্রসাধন কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, এভাবে আপনি যাইতে পাইবেন না। আপনার সহিত দেখা হইবার ভয়ে একজন ঐ ঘরে লুকাইয়া আছেন। যান, আপনি গিয়া তাঁহাকে এঘরে আনুন। আমি তাঁহার ছেলেমানুষী শুনিতে পারিলাম না, আশা করি, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাক্সিম্ নীরবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে বেপমানা, ভীতি-পাণ্ডুরমুখী এলিস্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। আজ এই ভাবে এইখানে এলিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই! এলিস কি উদ্দেশ্যে কাউণ্টেসের গৃহে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাউণ্টেস্ তোমার চীৎকার শুনিয়া ভয় পাইয়াছেন, তাই তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। চেঁচাইয়া উঠিলে কেন? কি হইয়াছে?"

কম্পিত কোমলকণ্ঠে কিশোরী কহিলেন, "কিছুই হয় নাই। হঠাৎ কেমন ভয় হইল; আমি আর এঘরে থাকিব না, বাহিরে চল।"

ম্যাক্সিম্ এলিস্কে কাউণ্টেসের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন। কাউণ্টেস্ স্থিরদৃষ্টিতে এলিসের মুখপানে চাহিয়া গম্ভীর ও ঈষচ্চঞ্চল কণ্ঠে বলিলেন,—"আমাদিগের সাক্ষাৎ-কারের কথা গোপন থাকাই আবশ্যক। হয়ত আমাদিগের আর দেখা হইবে না। কিন্তু মসিয়ে ম্যাক্সিম্ সমস্তই জানেন, তিনি আপনাকে প্রয়োজন হইলেই পরামর্শ দিবেন। মসিয়ে কার্ণোয়েল্ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিয়া নিজ কলঙ্ক ভঞ্জন করিবেন। বিদায়ের পূর্ব্বে আপনার কাছে এক ভিক্ষা আছে। আজ আপনি এখানে যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, কোন কারণে কখনই কাহারও নিকট তাহার উল্লেখ করিবেন না।"

মৃদুকণ্ঠে এলিস্ বলিল, "আমি স্বীকার করিলাম।"

ম্যাক্সিম্ ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাদিগকে বাহিরে লইয়া গেল। গমনকালে কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিম্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মনে রাখিবেন, আমাকে না জানাইয়া একটি কথাও প্রকাশ করিবেন না, কিছুই করিবেন না ; আমি একাকিনী সব করিব, আমার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

ম্যাক্সিম্ ও এলিস্ রাজপথে বাহির হইয়া একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলেন। পথের প্রান্তে আসিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমাকে তোমার বিশ্বাস হইল না কেন? তুমি কাউণ্টেসের কাছে আসিবে,—একথা যদি আমাকে বলিতে, তোমাকে একাকিনী ভয়ে ভয়ে আসিতে হইত না।"

"কাল রাত্রে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিবার সংকল্প করি। শীঘ্র দেখা করিতে হইবে বলিয়া, কোন কথা বলিবার সময় পাই নাই। তোমার মুখে সকল কথা শুনিয়া কাউণ্টেসের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছিল।"

"রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ কোথায় আছেন, তিনি জানেন কি?"

"আমি, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, সেকথা তাঁহাকে বলিয়াছি।"

"কোথায় তিনি?"

"আজ সকালে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিতাম; কিন্তু রবার্টের মঙ্গলের জন্য কথাটা এখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আসিবার সময় কাউণ্টেস্ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বোধ করি, তুমি শুনিয়াছ!"

"তিনি আমাকেও সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

"কিসের কথা?"

"কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, বাড়ীটি বড়ই রহস্যপূর্ণ।"

"তোমার ধারণা সত্য, আমরা এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। তোমার পিতা ও ভগিনরী এ

বিষয়ে কিছুই জানেন না। তোমার পিতা ধ্রুব-বিশ্বাস, রবার্টের আর কোন খোঁজ পাওয়া যাইবে না। ভিগ্‌নরীও নিশ্চিন্তমনে আনন্দসাগরে ভাসিতেছে; তুমি যে তাহার বন্ধুকে ভালবাসিতে এ কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে কোন কথা কহিবে না? তাঁহারা যেমন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, তেমনই দেখিতে থাকিবেন?"

"না,—আজ আমি বাবাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব। আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

"তোমার পিতা হয়ত একথা শুনিয়া বলিবেন, কি ভিগ্‌নরী, কি কার্ণোয়েল্—কাহাকেও তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না।"

"আমি কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহি না।"

"এলিস্,—স্নেহের এলিস্! তুমি আপনার মন না বুঝিয়াই কথা কহিতেছ। কিন্তু একথা লইয়া এখন আলোচনা করিবার সময় নাই। আপাততঃ দিনকএক তোমার পিতার নিকট কোন কথা তুলিও না। বরং বলিও, তোমার শরীর অসুস্থ, কয়েক দিন বিশ্রাম আবশ্যক। এইভাবে এক সপ্তাহ কাটাইতে পারিবে। তাহার পর রবার্টের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিও।"

আবেগভরে এলিস্ বলিল, "তুমিও তার সপক্ষে হইয়াছ।"

"তাঁহার মিথ্যা অপবাদ রটিয়াছে; এ ঘৃণিত কলঙ্ক কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া এখন বিস্মিত হইতেছি। কাউন্টেস্ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভিগ্‌নরীর উপর আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা নাই।"

এলিস্ বলিয়া উঠিল—"এখন আমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি; আমি ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মাদিনী হইয়া ভিগ্‌নরীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু মরিব, তাহাও স্বীকার, তথাপি তাঁহাকে বিবাহ করিব না। তাঁহার যদি প্রাণ থাকিত, তিনি কখনই ধনের লোভে চিরজীবন আমার অনাদর সহিতে সম্মত হইতেন না।"

"যাক্ ও কথা। আমি এখন চলিলাম। কাউন্টেসের অনুমতি পাইলেই, তোমাকে সমস্ত সংবাদ জানাইব।"

"আজ কাউন্টেসের বাটীতে যাহা দেখিয়াছি, আমিও বোধ করি তোমাকে বলিব।"

(ক্রমশঃ)

স্বর্গ ও নরক

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক?—কে বলে তা' বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক,—মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়!
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য-বাঁধনে মিলি যবে পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে!

শেখ্ ফজলল্ করিম্

দিল্লী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বর্ত্তমান দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে কএকটির পরিচয় প্রদান করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কএকটির কথা বলিব। দিল্লী এখন সমগ্র ভারতের রাজধানী; সুতরাং দিল্লীর বিবরণ সকলেরই অল্পবিস্তর জানিয়া রাখা ভাল।

সালিম গড়। ইহা শাহ্‌জাহান কৃত দিল্লীদুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। নির্ম্মাণের পর ইহা কারাগার রূপেই ব্যবহৃত হইত। ইহা যমুনার পশ্চিমের তীরের সন্নিকটে একখণ্ড দ্বীপের উপর নির্ম্মিত; যমুনার পরপার হইতে দেখিতে বড় সুন্দর। সেরসার পুত্র সলিম সাহ কর্ত্তৃক, হুমায়ুনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয়। ইহা একসময়ে ১৮টী বুরুজ দ্বারা রক্ষিত হইত—এবং ৪ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ৫ বৎসরে নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার ১৩টী মাত্র বুরুজ অবশিষ্ট আছে এবং উত্তরে একটি বৃহৎ প্রবেশ দ্বারের উপর শ্বেত প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে যে, ১৮৫২ খৃঃ অব্দে দিল্লীর শেষ বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গেই হতভাগ্য সাহ আলাম ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় রক্ষিত হন। এই সালিম গড়ের উপর দিয়াই ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লাইন গিয়াছে। ইহার সন্নিকটস্থ সালিম গড় ষ্টেশনেই ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে পদার্পণ করেন।

সোনেহারি মস্‌জিদ্

মতি মস্‌জিদ্

নিগম বোধ ঘাট। এই স্থান হইতে নিগম বোধ ঘাট দেখিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহা যুধিষ্ঠিরের সময় হইতেই এই নামে অভিহিত এবং এক্ষণে ইহাই হিন্দুদিগের স্নানের ঘাট। প্রবাদ আছে, এই স্থানেই যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হয়।

নীল ছত্রি। সালিম গড়ের উত্তরে এই মন্দিরটী অবস্থিত। এই স্থানে পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মিত মন্দির ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কানিংহাম সাহেবের মতে আধুনিক মন্দিরটী মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সাধারণের বিশ্বাস, ইহা হুমায়ুন বাদশাহ্‌-নির্ম্মিত—এবং তখন আনন্দ-আগার স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

লোদিয়ান্ রোড দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে অবস্থিত **টেলিগ্রাফ মেমোরিয়াল** দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহী-

বিদ্রোহের সময় যেসমস্ত কর্ম্মচারী নিহত হন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ইহা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সার রবার্ট মঙ্গমারি বলিয়াছেন যে, এই সকল আত্মত্যাগী বীর-পুরুষের সাহায্যেই ভারতবর্ষ বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

হ্যামিল্টন্ রোড পার হইয়া গবর্ণমেণ্ট কলেজ এবং সাধারণ পাঠাগার। ইহার সন্নিকটে সেণ্ট জেমসের চার্চ্চ, স্কিনার হাউস, এবং ফাখরুল মসজিদ্। এই স্থান হইতে কাশ্মীর দ্বারে যাইতে হয়।

কাশ্মীর দ্বার হইতে আলিপুর রোড ধরিয়া গেলে বাম দিকে জেনারল নিকলসনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরই মহম্মদশাহ্-পত্নী কাদসিয়া বেগমের উদ্যান। উদ্যানের আর পূর্ব্ব-শোভাসৌন্দর্য্য নাই; তবে যাহা আছে, তাহা দেখিবার মত বটে। ইহার একটু দূরেই ইংরাজদিগের নূতন সমাধিস্থান। কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দক্ষিণে "মেডেন হোটেল"। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে দক্ষিণে জলের কল ও ইহারই পার্শ্বে মেটকাফ্ হাউস্। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাতে বিদ্রোহিগণ অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মসাৎ করে। সেই বিস্তীর্ণ সুন্দর প্রাসাদের কএকটি কক্ষমাত্র, অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়া, পুরাতন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় মেটকাফ্ সাহেব দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কোন দিন বন্দুক ধরিতে শিখেন নাই, কোন যুদ্ধেও যোগদান করেন নাই; কিন্তু এই বিপদের সময়ে তিনি সৈন্যপরিচালনার ভার লইয়া, অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া এবং বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া, দিল্লী প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দিল্লীর অনুচ্চ শৈলমালা —"রিজ"। ইহার উত্তর পশ্চিমেই ইংরাজসেনানিবাস— এই স্থানেই ১৮৭৭, ১৯০৩ ও ১৯১১ অব্দের দিল্লীর দরবার হয়।
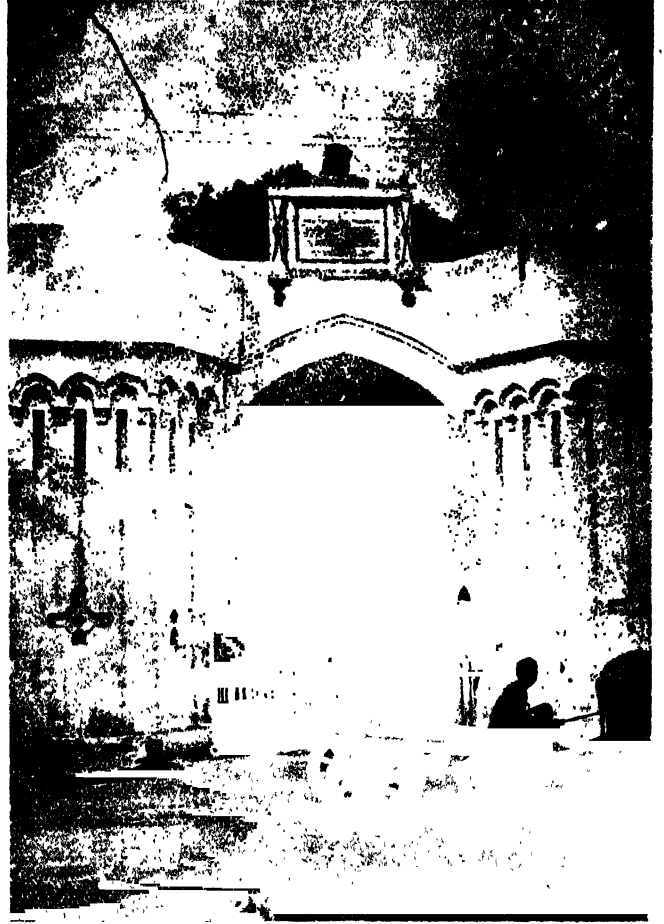
পুরাতন অস্ত্রাগারের দ্বার

এইস্থান হইতে বামদিক দিয়া রিজ রোড ধরিয়া অগ্রসর হইলে, কিছু দূরেই, দক্ষিণ দিকে "ফ্লাগ ষ্টাফ্" বুরুজ। ফ্লাগ্ ষ্টাফ্ বুরুজ, রিজ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র বুরুজ। এইস্থানে বহুইংরাজ-নরনারী সিপাহীবিদ্রোহের সময় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন। এই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলে, বামদিকে **"চার বুরুজি"** বা ফিরোজ সাহের সময়ে নির্ম্মিত—সমাধি-মন্দির। এইখানে রোসানারা, রাজপুর ও চন্দ্রাউল পথ মিলিত হইয়াছে।

রোসানারা রোড দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইলে, বামে **"পির গায়েব"**। ইহা বাদশাহ ফিরোজ শা'র সময়ে নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে 'ট্রিগোমেট্রিকেল্ সার্ভে আফিস্' এই-খানে অবস্থিত। পূর্ব্বে ফিরোজ সার সময়ে ইহা "খুস কি-শিকার", বা শিকারের স্থানের অংশবিশেষ ছিল বলিয়া

বোধ হয়; কিন্তু কি কারণে এই প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী "বাউলী", বা ধাপবিশিষ্ট কূপ, দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর বামদিকে অশোকের স্তম্ভ। এই স্তম্ভটী ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক মিরাট হইতে আনীত হইয়া খুস্কি শিকারের মধ্যে রক্ষিত হয়। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এখানকার বারুদের গৃহে অগ্নিসংলগ্ন হওয়ায় যে ভূকম্পন হয়, তাহাতে এই স্তম্ভটি ভূপতিত হইয়া পাঁচখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৪ হাত। উপরের কিয়দংশ নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ইহা জোড়াতাড়া দিয়া পুনরায় বসাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারই পর **'মিউটিনী মেমোরিয়াল,'** বা "সিপাহী বিদ্রোহের" স্মৃতিস্তম্ভ। ইহা ১১০ ফুট উচ্চ। যে সমস্ত বীর সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ইহার উপর উঠিলে, সমস্ত দিল্লীর দৃশ্য নয়ন গোচর হয়।

মোরিরোডের নিকট, 'রিজ' পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলে, 'সবজি মণ্ডির' ভিতর দিয়া **'রোসেনারা বাগ'** দেখিতে যাইতে হয়। শাহ্‌জাহানের কন্যা রোসেনারা বেগমের সমাধি এই বাগানে অবস্থিত এবং তিনিই ১৬৫০ সালে এই বাগান নির্ম্মাণ করান। আওরাংজীবের ভগিনী রোসেনারা বেগমের বড়ই প্রতাপ ছিল। পরে আওরাংজীবের পীড়ার সময় ষড়্‌যন্ত্র করিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টার অপরাধে বিষপ্রয়োগে তাঁহার জীবন লীলা শেষ করা হয়। সমাধিটী অনতিবৃহৎ হইলেও সুন্দর।

কাশ্মীর দ্বার

এই রত্ন-পেটিকাকৃতি সমাধির উপরিভাগ তৃণাচ্ছাদিত। —ইহার উপরিভাগে একটী মর্ম্মর প্রদীপাধার আছে। ইহাই রোসেনারা বেগমের অন্তিম শয্যা! এই স্থানেই সেই অতুলনীয়া সুন্দরীর কমনীয়দেহ মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে; সুধু এই সমাধি-মন্দির বেগমের স্মৃতি জাগ্রৎ রাখিয়াছে।

এইবার সার্কুলার রোডের কথা বলিব। এই পথে এত অধিক দ্রষ্টব্যস্থান আছে, যে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই যাত্রা করা উচিত; সঙ্গে আহার্য্য লইয়া যাওয়াই উচিত, কিংবা প্রাতে আহার করিয়া বাহির হইতে হয়।

চার বুরুজি

বামে "সাহজীর তালাও" বা পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীর তটে প্রতি-বৎসর রামলীলার মেলা হইয়া থাকে।

বামদিকেই "তুর্কী দ্বার" রক্ষিত বুরুজ। সাহ তুর্কমান, ওরফে সাম-সুল-আরাফিনের নাম হইতেই এই দ্বারের নামকরণ হইয়াছে। ইঁহার সমাধি-স্থান এই দ্বারেরই নিকটে।
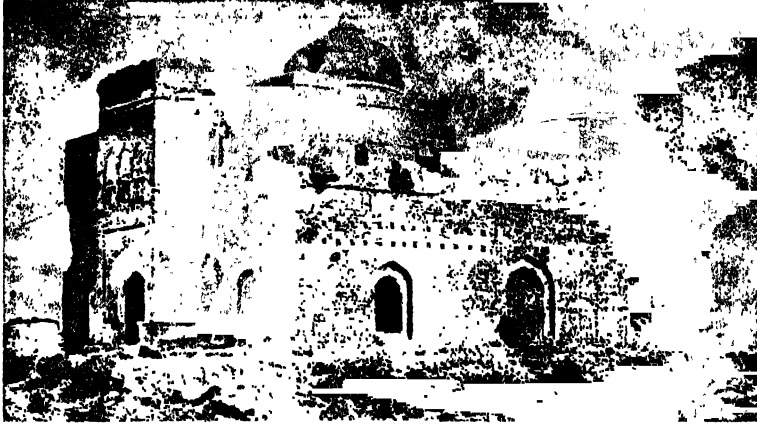
সার্কুলার রোড ধরিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলে, প্রথমেই ইদ্‌গা-কি-সরাই দ্রষ্টব্য। মুসলমানগণ রমজান পরবের পর, ইডল-ফিতরের সময়, এই ইদ্‌গাতে সমবেত হইয়া নমাজ করেন। এই পথে অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণে 'কুতবের' পথে না গিয়া বামদিকের পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই পথে যাইতে ফরাস-খানা, আজমীর-দ্বারের কবাট্ ও ঘাজিউদ্দিন খাঁর মসজিদ, বিদ্যালয় ও কবর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘাজিউদ্দিন খাঁর পিতা নিজাম-উল-মুল্‌ক, দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত করেন। ইনিই হায়দারাবাদের নিজাম বংশের আদিপুরুষ। উপরি উক্ত বিদ্যালয়ের চারিদিকে অট্টালিকাবেষ্টিত চত্বরের পূর্ব্বদিকে প্রবেশ পথ। এই দ্বারে এক সময় সুন্দর কারুকার্য্যময়—বৃক্ষ-লতাদি অঙ্কিত ছিল; এখন তাহার অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বিদ্যালয়টী সিপাহীবিদ্রোহের পর কোতোয়ালী-রূপে কিছুদিন ব্যবহৃত হয়। ১৮৯২ সালে এখানে একটী ইংরাজী-আরবী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। মসজিদটী পশ্চিম দিকে। মসজিদের সম্মুখের পুষ্করিণীটী বৃহৎ হইলেও এখন অনেক সময়ই ইহাতে জল থাকে না। মস্‌জিদের দক্ষিণদিক্ মর্ম্মরাচ্ছাদিত ও মর্ম্মরের জাফরিবেষ্টিত তিনটি কবর আছে। মধ্যস্থানের কবরটিতেই ঘাজিউদ্দিন খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। মস্‌জিদের পশ্চিমে একটি ষট্‌কোণ, কোনস্থানে দুইটি, বিচিত্র কারুকার্য্যময় সমাধিস্তম্ভ আছে।

সার্কুলার রোড ধরিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, এখান হইতে অল্পদূরে **কালান মস্‌জিদ** বা প্রধান মস্‌জিদ। কালান মস্‌জিদ, পাঠানদিগের সময় নির্ম্মিত বলিয়া, ইহাতে কোন প্রকার কারুকার্য্য নাই। মস্‌জিদের উপরে ১৫টি গম্বুজ। মধ্যস্থলের গম্বুজটি অপরগুলি অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। মস্‌জিদটি সাধারণ 'বেলে'পাথরে নির্ম্মিত। মোগলবাদসাহগণের সময়ের হর্ম্ম্যাদির গঠনের সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য নাই। মস্‌জিদের ভিতর ও বাহিরে এক সময় 'পঙ্কের' কাজ করা ছিল। প্রবেশদ্বারের স্থানে স্থানে দেখিলে বোধ হয়, এক সময় বাহির দিক্ নীলবর্ণের ছিল। মসজিদের প্রবেশপথে যাইতে ৩০টি ধাপ অতিক্রম করিতে হয়। প্রবেশপথের থামগুলি পালিশ করা নহে। ঝরোখা গুলি রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত। প্রধান প্রবেশপথে শ্বেত প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে যে, ইহা "অবুল মুজফ্‌র ফিরোজ সাহ সুলতানের রাজত্বকালে খাঁ জাহান কর্ত্তৃক ১০ই জমাদ-উল-আখির ৭৮৯ সালে নির্ম্মিত হয়"। এই মস্‌জিদটি ৫০০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন।

কালান মস্‌জিদের অনতিদূরেই সুলতানা **রিজিয়া বেগমের সমাধি।**

এই সুলতানা রিজিয়া ব্যতীত আর কোন মহিলা কখনও দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করেন নাই। ইতিহাসপাঠকগণ সুলতানার ইতিহাস, তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনী এবং তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ অবগত আছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা বাইরাম খাঁ কর্ত্তৃক এই সমাধি ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রায় ২৪ হাত প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধিটি

অবস্থিত। ইহার পশ্চিমেই একটি মস্‌জিদ আছে। একটি রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত "চবুতরা"র উপর এই সমাধিটি নির্ম্মিত। এই স্থানে দুইটি সমাধিমন্দির আছে; তাহার মধ্যে যে সমাধিটির উপরিভাগে একটি প্রদীপাধার নির্ম্মিত আছে, সেইটিই রিজিয়ার কবর বলিয়া বিখ্যাত। অপরটি তাঁহার ভগিনী সাজিয়ার।

এখান হইতে সার্কুলার রোড দিয়া অগ্রসর হইয়া দিল্লী-মথুরা পথে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এই পথের দক্ষিণপার্শ্বে একটি হিন্দু দেবালয় আছে। এখান হইতে বামের পথে অগ্রসর হইয়া, ফিরোজাবাদ বা ফিরোজ সাহ টোগলক-নির্ম্মিত নগরে যাইতে হয়। ফিরোজাবাদের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য জুমা মস্‌জিদ ও অশোকের স্তম্ভ। এই স্তম্ভের নিম্নের গৃহে ফিরোজ সাহ'র স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান আছে।

ফিরোজাবাদ ফিরোজসাহ টোগলক কর্ত্তৃক ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। যমুনার তটে, দক্ষিণে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে পূর্ব্বকথিত "পির গায়েবের" কিছু উত্তর পর্য্যন্ত, এই সহর সে সময়ে বিস্তৃত ছিল। ইহার অনেকাংশ দিল্লী সের সাহী ও সাজাহাঁবাদের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সহর এক সময়ে ৮টি মস্‌জিদ, ৩টি প্রাসাদ, সখের শিকারের স্থান, ও বহুহর্ম্ম্যাদি পরিশোভিত ছিল। এখন তাহার শেষনিদর্শন ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপ সকল হাহাকার করিতেছে! এই স্থানে অশোকের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এই বহুপুরাতন বৌদ্ধ-স্তম্ভ, দেখিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়। এই স্তম্ভটি, দিল্লী হইতে ৬০ ক্রোশ দূরে, খিজারাবাদের সন্নিকটস্থ নাহীরা হইতে বহুআয়াসে ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা অশোকের ৬টি মাত্র স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে এই স্তম্ভটি ফিকে গোলাপী বর্ণের ছিট ছিটে বালি-পাথরের নির্ম্মিত, উচ্চে ৪৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চি; ইহার ৪ ফিট্ ১ ইঞ্চি ভূমিতলে প্রোথিত আছে; উপরিভাগ হইতে ৩৫ ফিট্ অত্যন্ত মসৃণ পালিশ করা। নিম্নের পরিধি ৩৮·৪ ইঞ্চি এবং উপরের ২৫·৩ ইঞ্চি। এই স্তম্ভের
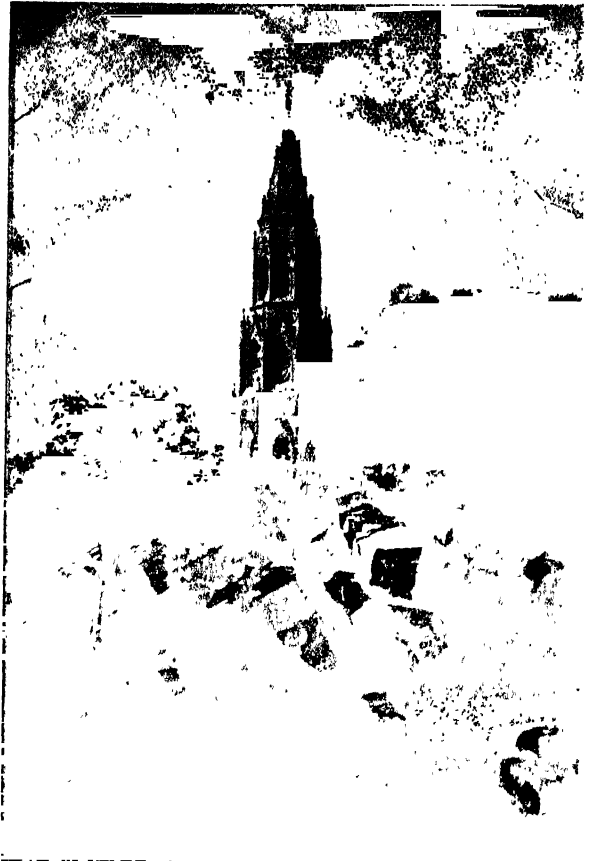
মিউটিনি মেমোরিয়াল

চতুর্দ্দিকে খোদিতলিপির মধ্যে অশোকের রাজ-আজ্ঞা (খ্রীঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচারিত) পালিভাষায় লিখিত। ১১৬৪ সালে লিখিত লিপিটি সংস্কৃত ভাষায়, চৌহান-রাজ বিশাল দেব শাকম্ভরীর বিজয়-কাহিনী জ্ঞাপক। প্রবাদ, যে রায় পৃথ্বীরাজের অনুমতিক্রমে ইহা খোদিত হয়।

সমসি সিরাজ বলেন যে, এই স্তম্ভটি আনীত হইবার পর, চূড়ার উপরিভাগ একটি স্বুবর্ণরঞ্জিত কলসদ্বারা শোভিত করা হয়। সম্ভবতঃ বজ্রাঘাতে, বা কামানের গোলায়, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না। ফিরোজাবাদের জুম্মা মস্‌জিদ, ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রধান প্রবেশ-দ্বার উত্তর দিকে। মস্‌জিদের নিম্নে বাসোপযোগী গৃহ বা তহখানা, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বরাবর দুইটি সুড়ঙ্গ পথ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাঙ্গণস্থিত কূপটির

ধ্বংসাবশেষ এক সময়ে "তহখানার" সংশ্লিষ্ট "বাউলী" ছিল বলিয়া অনুমান হয়। প্রবাদ আছে যে, এই কূপটীর উপরিভাগে একটী অষ্টকোণ গম্বুজ ছিল এবং তাহার গাত্রে শ্বেত প্রস্তরের উপর সেরশাহের বীরত্ব গাথা খোদিত ছিল। মস্‌জিদটির গঠন এক সময় অতি সুন্দর ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই; কারণ প্রবাদ আছে যে তৈমুরলঙ্গ তাঁহার রাজধানীতে ইহার অনুরূপ একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য একটী প্রতিকৃতি লইয়া যান। এই মস্‌জিদের পূর্ব্বোত্তর গৃহে, বাদসাহ দ্বিতীয় আলমগীরকে তাঁহার শত্রুগণ ছলে ভুলাইয়া আনিয়া ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে বধ করে এবং তাঁহার স্কন্ধহীন দেহটী যমুনার তীরে ফেলিয়া দেয়।
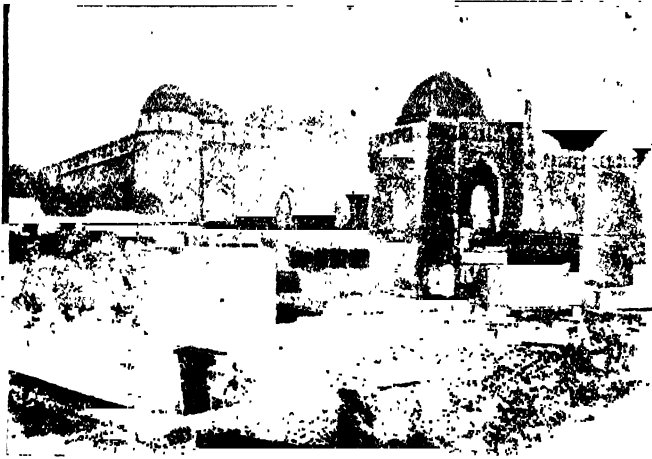
কালান মসজিদ

বড় রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রসর হইলে, বামে দিল্লী সেরসাহীর উত্তর দ্বার **'লাল দরওয়াজা'** দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথের দক্ষিণে ডিষ্ট্রীক্ট জেল ও পাগলা-গারদ। একটি পুরাতন সরাইকে এক্ষণে জেল রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। পথের উভয়পার্শ্বের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে দেখিতে আরও অগ্রসর হইলে, বামদিকে "কিলাকোনা মসজিদ" দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর পথপার্শ্বে কিছুদূর বিস্তৃত কেবল ধ্বংশাবশেষের দৃশ্য। আরও কিছুদূর গেলে, দক্ষিণে "দ্বিতীয় লাল দরওয়াজা" দেখা যায়।

লাল দরওয়াজার একটু দক্ষিণে, পশ্চিমদিকে, 'খয়ের-উল-মঞ্জিল', ও আকবর বাদসাহের বিমাতা-প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার ও মস্‌জিদ।

এখান হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে অগ্রসর হইতে হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ "পুরানা কিল্লা", "দিন্‌পানাহ", 'সেরগড়' ও 'সাহগড়' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানের দ্রষ্টব্য সেরসাহের জুম্মা মস্‌জিদ্ (কিলাকোনা মস্‌জিদ), সেরসার প্রাসাদ, ও কেল্লা।

১৫৪০ খৃঃ অব্দে সেরসাহী-দিল্লীর প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, এবং সেরসাহের পুত্র সেলিম সাহ সুরের সময় ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সহর নির্ম্মাণ শেষ হয়। **'কিলাকোনা মস্‌জিদ'** সেরসাহ কর্ত্তৃক ১৫৪১ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়। এই রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদটী দৈর্ঘ্যে ১১২ হাত প্রস্থে ৩০ হাত; ভিত্তি হইতে সর্ব্বোচ্চ গোলকের শিখরদেশ ৪০ হাত। এক সময়ে ইহা তিনটী গোলক-পরিশোভিত ছিল। এক্ষণে তাহার একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই মস্‌জিদটী দেখিলে পাঠান-শিল্পাদর্শের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মস্‌জিদটীর সম্মুখে পাঁচটী খিলান করা প্রবেশ-পথ কৃষ্ণ, শ্বেত ও অন্যান্য বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য-পরিশোভিত। ভিতরের মিনার কাজের এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। সম্মুখের খিলানের উপরে ও উপাসনা-স্থানের উপরে কোরাণের শ্লোক খোদিত আছে। সম্মুখের ষোড়শকোণ-বিশিষ্ট জলাধারটীর মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা ছিল—এখন জলাধারটী শুষ্ক, সুতরাং ফোয়ারাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেরসাহ-নির্ম্মিত দুর্গ ও প্রাসাদ—সের-মণ্ডলের ধ্বংশাবশেষ এই স্থানে রহিয়াছে। বুরুজটী অষ্টকোণ, রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত, এবং দ্বিতল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি দুইটী এখনও বর্ত্তমান আছে। বেলে-প্রস্তর নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ ধাপগুলি অতি মসৃণ; পা পিছলাইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। উপর হইতে হুমায়ুন বাদসাহের সমাধি ও কুতুবমিনার দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী পুনঃ অধিকারের পর হুমায়ুন এই সেরমণ্ডলে পাঠাগার স্থাপন করেন।

এই সিঁড়ির উপর হইতে যষ্টি-স্খলন হওয়ায় হুমায়ুন পড়িয়া যান, এবং অবশেষে সেই আঘাতফলে কালগ্রাসে পতিত হন।

পুরাণ কেল্লা।

হুমায়ুন বাদশাহ্, সিংহাসনারোহণের তিন বৎসর পরে, ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংশাবশেষের সংস্কার করিয়া একটি দুর্গনির্ম্মাণ করেন ; তাহারই নাম পুরাতন কেল্লা ; মুসলমান ঐতিহাসিক খোন্দ আমির বলেন যে, ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংশাবশেষের উপর হুমায়ুন বাদসাহ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের বাসের জন্য 'দিন্‌পানাহ' নামে এক নগরী আরম্ভ করেন। 'পুরাণ কেল্লা'র অপর নাম দীন্‌পানাহ্।

ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়া, মথুরার রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলে, এই পথের দক্ষিণপার্শে 'লাল বাংলা' নামক সমাধিদ্বয় দেখা যায়। এই পথের উভয় পার্শ্বে ক্রমে অসংখ্য সমাধির ধ্বংশাবশেষ দেখিতে দেখিতে, নিজামুদ্দিনের সমাধির পথ অতিক্রম করিয়া, আসিলে বামদিকের পথে 'আরব সরাই' ও ইসাখাঁর সমাধি পাওয়া যায়।

লাল বাংলা।—ইহা ওয়াক্‌ফী খালের পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত। হুমায়ুন বাদশাহ্‌র সময়—এই কবরদ্বয় নির্ম্মিত হয়। উত্তর ধারেরটি হুমায়ুনের গণিকা—সাহ আলমের গর্ভধারিণী—লাল কুমারীর কবর ; দক্ষিণেরটি—সাহ আলমের কন্যা—বেগম জানের সমাধি। ইহার সন্নিকটে—দ্বিতীয় আকবরের পরিবারস্থ তিনটি ব্যক্তির কবর আছে। ঐ কবরের সম্মুখে,খালের অপর পাড়ে,সইয়দ আবিদের সমাধি।

আরব সরাই।—আকবরের গর্ভধারিণী হাজি বেগম, মক্কাতীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, তিনশত আরব দেশীয়কে সঙ্গে লইয়া আসিয়া এই স্থানে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। গ্রামটীর চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া এবং তাহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। উত্তরদিকের দ্বার হুমায়ুনের কবরের অতি সন্নিকটে। এই সুবৃহৎ তোরণ দ্বিতল—দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ হাত, প্রস্থে ১৪ হাত ও উচ্চে ২৭ হাত ; দ্বারটী সুন্দর কারুকার্য্যময়। এখন ইহার অনেক স্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারটীও উল্লেখযোগ্য। এইটীতে যথেষ্ট মিনার কাজ আছে। ইহার উপর লেখা আছে যে, ইহা জাহাঙ্গীর বাদশাহর রাজত্বকালে মেহেরবান্ আগা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

ইসাখাঁর সমাধি

ইসাখাঁ—সের শাহশূরের দরবারের জনৈক অমাত্য। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে, তাঁহার পুত্র সলিমশাহর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। সলিম শাহ্‌র রাজত্ব সময়ে এই সমাধি ও মস্‌জিদ তিনি নির্ম্মাণ করান। এই সমাধির উপরিস্থিত ৮টী গম্বুজে নীলবর্ণের মিনার কাজ করা।

পুরাণ কেল্লা

সমাধি মন্দিরের মধ্যের কক্ষে, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত কৃষ্ণ প্রস্তর আচ্ছাদিত, দুইটী বৃহৎ কবর ও ইষ্টকনির্ম্মিত চারিটী কবর আছে। সমাধির একটি দ্বারের উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে ;—

"স্বর্গাপেক্ষা রমণীয় এই সমাধি, সের শাহর পুত্র, সম্রাট্ সেলিম শাহর সময় নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্য অক্ষয় করুন। সইয়দ ইসাখাঁ, বরার অগওয়া হাজিখাঁর পুত্র, ৯৫৪ হিজরি।"

ইহার সন্নিকটে, পশ্চিমে, ইসাখাঁ-নির্ম্মিত মস্‌জিদ। মস্‌জিদটী বেলেপাথরের। ইহার উপরিভাগ নানাবর্ণের টালিতে আবৃত ছিল। এখন তাহার অধিকাংশ খসিয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের তিনটি প্রবেশ দ্বারের খিলানগুলি কয়েকটি পাথরের থামের উপর অবস্থিত।

আরব সরাইয়ের দ্বারের সম্মুখদিয়াই হুমায়ুন বাদশাহর সমাধির পথ। হুমায়ুন বাদশাহর সমাধি, মোগলরাজত্ব কালীন সর্ব্বপুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন।
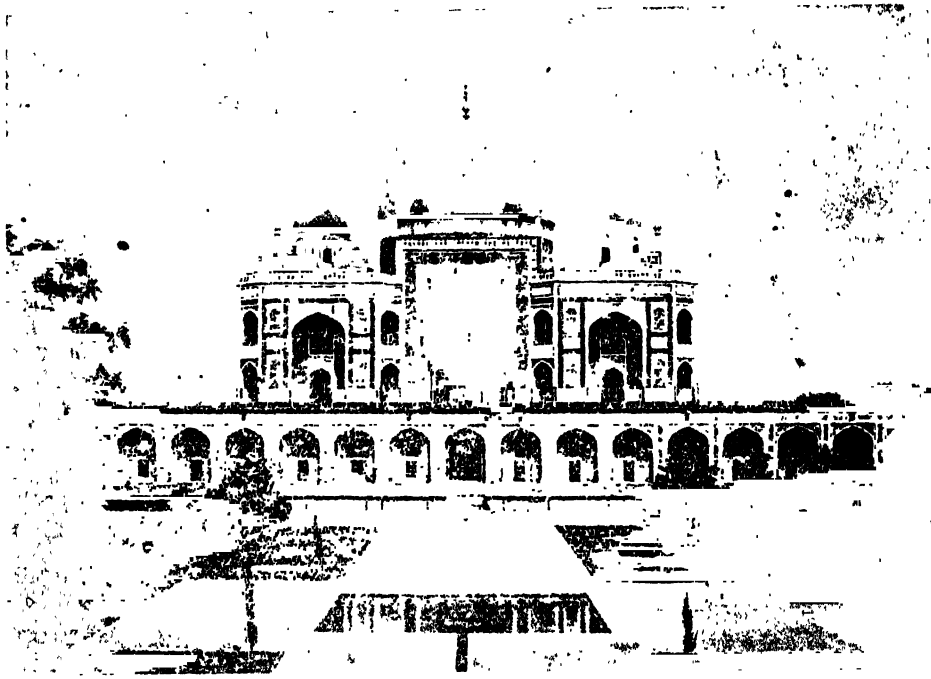
হুমায়ুনের সমাধি

হুমায়ুনের সমাধি

আকবরের মাতা হামিদা বানুবেগম, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এই কবর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করান। ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। প্রবাদ, ২০০ মিস্ত্রি ১৬ বৎসর প্রত্যহ কার্য্য করিয়া ইহা সমাধা করে। এই সমাধি নির্ম্মিত হইলে বেগম সাহেবা মক্কাতীর্থ যাত্রা করেন এবং সেই অবধি তিনি 'হাজিবেগম' নামেই পরিচিত। হাজিবেগমের আগরায় মৃত্যু হইলে, আকবর ও ওমরাহগণ তাঁহার মৃতদেহ কিছুদূর নিজস্কন্ধে বহন করিয়া আনেন ও অবশেষে এই-খানে, তাঁহার স্বামীর পার্শ্বে, তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। এই সমাধিটী প্রাচীরবেষ্টিত একটী চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমদিকের তোরণ, দুর্গ-তোরণের আকারে নির্ম্মিত। দক্ষিণদিকে এইরূপ আর একটী তোরণ আছে। পশ্চিমের তোরণটীই প্রধান প্রবেশ-পথরূপে ব্যবহৃত হয়। তোরণটী ধূসর-প্রস্তর-নির্ম্মিত—মধ্যে মধ্যে শ্বেত ও রক্ত প্রস্তর পরিশোভিত। পূর্ব্বপ্রাচীরের দক্ষিণদিকে "নীল বুরুজ" এবং তাহারই মধ্যস্থলে গ্রীষ্মাবাস। কাহারও মতে এই নীল বুরুজটী হুমায়ুনের নাপিতের কবর। কেহ বলেন ইহা মিয়া ফহিমের কবর। উত্তরদিকের প্রাচীরের পূর্ব্বপ্রান্তে নীজামুদ্দিন আউলীয়ার বাসগৃহের কিয়দংশ বিদ্যমান। হুমায়ুনের সমাধির মূল-মন্দিরটী রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত; তিন হাত উচ্চ ও দুইশত হাত চতুষ্কের উপর অবস্থিত। তদুপরি চার হাত উচ্চ ভিত্তির উপর ৮৫ হস্ত পরিমিত ১৪ হাত উচ্চ বুনিয়াদ। ইহার চারিপার্শ্বে লাল পাথরের রেলিংবেষ্টিত চত্বর। এই চত্বরের উপর দক্ষিণ-দিকে পাঁচটি সমাধি ও পূর্ব্বদিকে একটি স্ত্রীলোকের সমাধি অবস্থিত। ইহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি আছে। মধ্যস্থ কক্ষে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত হুমায়ুনের সমাধি। ইহার ঠিক নিম্নে—নিম্নতলে, ইষ্টকনির্ম্মিত আসল সমাধি। এই কক্ষের উপর শ্বেতপ্রস্তরের গম্বুজ, তাহার উপর গিল্টি করা কলস। এই কক্ষের দেওয়ালের গাত্র, চারি হাত উচ্চ পর্য্যন্ত, শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। তাহার মাঝে মাঝে রক্তপ্রস্তরের সুন্দর জাফরি। ইহার প্রধান চারিটি খিলানে শ্বেতপ্রস্তরের জাফরি আছে। গুম্বুজের ভিতরে পূর্ব্বে সোণালী ও মিনার কাজ করা ছিল। মধ্যস্থলের

সুবর্ণ-আচ্ছাদন জাঠগণকর্তৃক অপহৃত হয়। এই সমাধির গুপ্তপ্রকোষ্ঠে দিল্লীর শেষবাদসাহ মহম্মদ শাহ্, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও পৌত্র সহ সিপাহীবিদ্রোহের পর পলাইয়া লুকাইয়া থাকেন।

উত্তরপূর্ব্ব কোণের কক্ষে দুইটী স্ত্রীলোকের সমাধি অবস্থিত;—বড়টি হাজিবেগমের এবং ছোটটি তাঁহার কন্যার।

উত্তর-পশ্চিমকোণের কক্ষে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী সমাধি আছে। ইহার একটী অওরঙ্গজেবের পৌত্র সম্রাট্ জাহান্দর শাহ্‌র সমাধি। আর একটী, জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ ফরোখশাহের সমাধি। তৃতীয়টী, জাহান্দরের পুত্র, সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগী[illegible]

দক্ষিণপশ্চিমের [illegible] [illegible]াধি আছে। ছোটটি, অওরঙ্গজেবে[illegible] [illegible], [illegible]জীমের ও বড়টি আজীমের স্ত্রীর।

দক্ষিণপূর্ব্বের কক্ষের সমাধিগুলি জাহান্দর ও ফিরোজ প্রভৃতির স্ত্রীর সমাধি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

নিম্নের চত্বরে আরও অনেকগুলি সমাধি আছে। পূর্ব্ব ধারের রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত সমাধির উপর, দ্বিতীয় আলম গীরের কন্যা, সঙ্গী বেগমের নাম লিখিত আছে। এই চত্বরের পশ্চিমভাগে দ্বাদশটী সমাধি আছে। এগুলি কাহার, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সিঁড়ির নিকটে সুন্দর কারুকার্য্যময় সমাধিটী, অওরঙ্গজেবের হতভাগ্য ভ্রাতা দারা শেকোর সমাধি বলিয়া পরিচিত।

এই সমাধির উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্বকোণের সমাধিটীতে একটি স্ত্রীলোকের ও একটি পুরুষের কবর আছে। ইহা রক্ত ও ধূসর প্রস্তরনির্ম্মিত। এই দুইটি কাহাদের সমাধি, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

আষাঢ়

আজি পুনঃ আষাঢ়ের প্রথম-দিবস
আসিয়াছে বুলাইয়া সজল পরশ
পিপাসিতা ধরণীর তপ্তহিয়া মাঝে ;
নিখিল বিরহী চিত্তে গুরু গুরু বাজে
প্রণয়ের প্রথম মল্লার ; কুঞ্জবন ভরি'
কেতকী কদম্ব-শাখা উঠেছে মুঞ্জরি'।
হে কবি ! নবীন মেঘ দূর নীলিমায়
তোমার পরাণ কোন্ স্বপ্ন-অলকায়
রেখেছিল ভুলাইয়া ! কি বেদনারাশি
আষাঢ়ের নীলাকাশে উঠেছিল ভাসি' !
তোমার যে মর্ম্মব্যথা ফুটেছিল মেঘে,
আজো এই বরিষায় চিত্ত ভরি' জাগে !
আজিও বিরহী বিশ্ব তারি সুরে সুরে
পাঠায় বারতা মেঘে কোন্ যক্ষপুরে !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বৈষ্ণব পদাবলী

ভক্তির ভাণ্ডারে ওগো তোমরা সুন্দর,
অক্ষয়—উজ্জ্বল মণি, অমূল্য—অতুল,
প্রেমের নন্দনবনে আছ নিরন্তর
চিরস্ফুট মধুময় পারিজাত ফুল !
প্রীতির পীযূষ-সরে তোমরা নির্ম্মল
চিরনব-সুরভিত নীল-ইন্দীবর
হরি-পাদপদ্মমাঝে চির-অচঞ্চল
তোমরা সুতৃপ্ত—মুগ্ধ—প্রমত্ত ভ্রমর !
রাধার চরণস্পর্শে উঠেছ কি ফুটি'
ভক্তি-বৃন্দাবনে শত অশোক-মঞ্জরী ?
কিংবা মুকুতার-মালা—অভিমানে টুটি'
ছড়ানো কবিতা-কুঞ্জে—ব্রজের-সুন্দরী ?
না-গো—না—বৈষ্ণব ভক্ত রেখে গেছে হেতা—
ছোঁয়ায়ে হরির পদে—তুলসীর পাতা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সমুদ্র-যাত্রা

ব্রাহ্মণ-সভায় সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা করেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে চলিতে পারেন না। আমি যতদূর জানি, ইহাতে হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। অনেক লোক আমাকে বলিয়াছেন যে, এসব সিদ্ধান্ত তাচ্ছিল্য-ভাবে উপেক্ষা করা উচিত। মৈমনসিংহের তিনজন জমীদার, অন্য একজন প্রবলতর জমীদারকে জব্দ করিবার উদ্দেশে এই সব করিতেছেন—এই কথা অনেক লোকেই বলিতেছেন। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ-সমাজের এতগুলি 'পণ্ডিত' আপনাদিগকে উপ-হাসাস্পদ করিতেছেন,—ইহা হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিরই সন্তোষের কারণ হইতে পারে না। ইংরাজি কাগজওয়ালারা ব্রাহ্মণদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত খুসী। তাহারা স্পষ্টই বলিতেছে যে, এইবার ব্রাহ্মণদের অধঃপতন হইবে। একথাও প্রচার যে, ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ দিয়াছেন এই যে,—যদি ধনীলোকেরা সর্ব্বদাই বিলাত গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-দিগকে আর কিছু দিবেন না ;—এমতে তাঁহাদের জীবনোপায় বন্ধ হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মণদের মুখে এমন সকল কথা শুনিলে, প্রত্যেক হিন্দুই মর্ম্মাহত হয়েন।

আরও একটি আশ্চর্য্য কথা এই সভা হইতে প্রচার হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের ১ম অঃ শ্লোকবিশেষের ব্যাখ্যায় রঘু-নন্দন, "ব্যবহার্য্য" শব্দের স্থানে "অব্যবহার্য্য" পাঠ ধরিয়া, এই প্রকার দোষে দোষী ব্যক্তিরা যে সমাজে অচল—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এযাবৎ আমরা পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, রঘুনন্দন যে 'অব্যবহার্য্য' বলিয়াছেন তাহার অর্থ—'সমাজে অচল।' রঘুনন্দন-লিখিত 'অব্যবহার্য্য' শব্দের যে অন্য কি অর্থ হইতে পারে, তাহা সামান্যবুদ্ধির অগোচর। এখন ব্রাহ্মণ-সভা বলিতেছেন যে, 'ব্যবহার্য্য' শব্দের অর্থ—যাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহার করা যায়। ম্লেচ্ছাদির সহিত যে ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, ইহা ত কখনও লোকে শ্রুত হয় নাই। তাঁহাদের অর্থ ঠিক হইলে, রঘুনন্দনের মতানুসারে, উপপাতকী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপবিনষ্ট হইলেও, তিনি ব্যবহার্য্য হন না, অর্থাৎ তাঁহার সহিত ক্রয়বিক্রয়াদি বাণিজ্য ব্যাপারও নিষিদ্ধ। যে পণ্ডিতেরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, বা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি অন্যলোকের সম্মানবুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এপ্রকার সিদ্ধান্তের কারণ শুনিলাম এই যে, এস্থলে মিতাক্ষরামতে 'অব্যবহার্য্য' পাঠ না হইয়া 'ব্যবহার্য্য' পাঠ হইবে। বস্তুতঃ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন যে, মিতাক্ষরাধৃত পাঠভিন্ন অন্যপাঠ হওয়া সম্ভব নহে। বঙ্গদেশীয় রঘুনন্দনাদি পণ্ডিত ব্যতীত,—বিজ্ঞানেশ্বর, মাধব ও অপরার্ক প্রভৃতি সকল টীকাকার কর্ত্তৃক এই পাঠ গৃহীত। বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্কের মতের বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকের অন্য পাঠ স্থির করা, অসমসাহসিকতার কার্য্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং কালীঘাটের পণ্ডিতগণকে 'ব্যবহার্য্য' শব্দের উপরিকথিত আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। কিন্তু, শুনিলাম শেষদিনে, বোধ হয় তাঁহাদের এই প্রকার অর্থ সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে না, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা 'ব্যবহার্য্য' পাঠ ভুল ও 'অব্যবহার্য্য' পাঠই ঠিক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অথচ, সে পাঠও সম্ভব নহে।

আমাদের, পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষায় এদেশের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্গণের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত, মাত্র যে দুইজন ভারতে —পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমাচল এবং দক্ষিণে সমুদ্র,—এই সীমানিবদ্ধ, বিরাট্ সম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহাদের নামও আমাদের পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন না। ইতিহাসের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা, আমাদের দেশের দুরবস্থার অন্যতম কারণ। বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা, এবং নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ—এই স্বপ্নের প্রতি আস্থায়, ভারতবাসী সর্ব্ববাহ্যবস্তু, মনুষ্যত্ব এবং সত্যধর্ম্মও হারাইয়া ফেলিয়া, স্বপ্ন-গৌরবে স্ফীত-বক্ষ হইয়া, ধ্বংসের পথে সগর্ব্বপাদবিক্ষেপে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইঁহাদের এখন—জগৎশেঠের পুত্র

বধূ- ও রাণী-ভবানীর কন্যা-লোভী—সিরাজদ্দৌলাকে ধার্ম্মিক সপ্রমাণ করা, এবং কতকগুলি সত্য বা কৃত্রিম শিলালিপি-লিখিত পাঠ-উদ্ভাবন, এবং সামান্য রাজা, জমিদার, বা ডাকাইতের-কীর্ত্তিবর্ণন, ও মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান ইত্যাদির আলোচনাই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চার আদর্শ! কেহই ভারতবর্ষের, ও এই প্রিয় বঙ্গভূমির, প্রকৃত-গৌরবের বিষয় যে কি, তাহা একবারও চিন্তা করেন না; এবং সাহিত্যসেবিগণও সেই গৌরবের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন না। কারণ, তাহাতে অনেক পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক, এবং শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া ইত্যাদি কষ্টস্বীকার করিতে হয়! আমরা, সহজে যাহা হয় তাহা করিয়া, সহরে সহরে সভা করিয়া, নিজেদের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াই সুখী! কিন্তু বস্তুতঃই কি এই সাহিত্যসেবিগণ যাহা বলেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না? ইতিহাসে প্রকাশ যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইতিহাসে ইহাও প্রকাশ যে, বাঙ্গালী বীরগণ সমুদ্রপথে গিয়া 'সিংহল' অধিকার করিয়াছিলেন; বাঙ্গালিগণ ব্রহ্মদেশে 'আভা' ও 'অমরাপুরী' নগর স্থাপন করিয়াছিলেন; উত্তর-ভারতের আর্য্যবীরগণ, তাম্রলিপ্ত হইয়া, সমুদ্রপথে অভিযান করিয়া, বঙ্গদেশের ন্যায় শ্যামল দেশ দেখিয়া তাহার "শ্যাম" নামকরণ করেন এবং সেই দেশে বাস করিয়া তাহার রাজধানীকে স্নেহে 'অযোধ্যা' নামে অভিহিত করেন। সেই অযোধ্যা রঘুপতির অযোধ্যার ন্যায় গৌরবাস্পদ ছিল। আর্য্যবীর লক্ষ্মণ, দাসজাতির রাজধানী 'মধুরাপুরী' বা 'মথুরা' জয় করেন; পরে তাহা যাদবগণের রাজধানী হয়। সেই যাদবগণ দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া, পুরাতন রাজধানীর নামে, 'মধুরা' বা 'মাদুরা' নগর স্থাপন করেন। আবার দক্ষিণ-ভারতবর্ষের মধুরাবাসিগণ 'যবদ্বীপ' জয় করিয়া সেখানে 'মধুরাপুরী' স্থাপন করিয়া রামলক্ষ্মণ ও যদুপতিগণের স্মৃতি জাগরূক রাখেন। যদুপতিগণের সহিত মহাভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; যদি মহাভারতের প্রাচীনতম সংস্করণ পাইবার কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে যবদ্বীপে যাইয়া সেখান হইতে 'ভারতকাব্য' আনিতে হইবে। 'গান্ধারের' নিকটস্থ, প্রাচীন আর্য্যগণ-বিজিত, 'কাম্বোজে'র নাম লোপ পাইয়াছে; কিন্তু সমুদ্রগামী ভারতবাসিগণ-বিজিত 'কাম্বোজ' প্রদেশ এখনও সেই প্রাচীন সমুদ্র-অভিযানের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। 'সিঙ্গাপুরে'র প্রকৃত নাম 'সিংহপুর'। বস্তুতঃ, সেসময়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া যেসকল বীর 'সিঙ্গাপুর' প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বিক্রমকে সিংহবিক্রমের সহিত তুলনা করিবার অধিকারী ছিলেন, এবং সিংহপুর নামকরণও সার্থক হইয়াছে।

ভারতবাসি-বিজিত, পুণ্যস্মৃতি লক্ষ্মণমাতা 'সুমিত্রা'দেবীর নামে অভিহিত,বৃহৎ 'সুমাত্রা' দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম 'ইন্দ্রপুর'। 'যব'দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম 'সুমেরু'। যবদ্বীপের একটি প্রাচীন নগরের নাম 'আর্য্য-কীর্ত্তি'। 'যব' এবং 'বলি' দ্বীপে ভারতবাসী-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন দেব-মন্দিরসকলের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া জগৎ এখনও বিস্মিত হইতেছে—ভারতবর্ষেও সেরূপ মহান্ দেবমন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায় না! ভারতীয় আর্য্যজাতির এই গরিষ্ঠ-করুণ ইতিহাসের স্মৃতিপর্য্যন্ত লোপ করিবার জন্য—সেই সুপবিত্র তীর্থোপম কীর্ত্তিকলাপচিহ্ন দর্শনের উপায় অবধি—এবং যে পথে ভারতবাসী সেই গৌরবময় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, অনৃত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সে পথপর্য্যন্ত—রোধকরিতে, কতকগুলি—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর—লোক যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন এবং ভারতবাসী তাহা সস্মিত-আননে দেখিতেছে—শুনিতেছে!—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্;—আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সমুদ্রাভিযান ছিল। তাম্রলিপ্তি হইতে নিয়মিতরূপে সমুদ্রগামী জাহাজ লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজ, সুমিত্রা, যবদ্বীপ, বালি ও চীন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। এই জাহাজে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হুয়েন্‌সায়াঙ্গ চীনে গমন করিয়াছিলেন; এবং পথে সমুদ্রবাতাভীত হইয়া, ভারতদেব অবলোকিতেশ্বরের স্তব বন্দনা করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, তৎকর্ত্তৃক আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষিত হইয়াছিলেন—একথা তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—সেও বেশীদিনের কথা নয়; খ্রীষ্টাব্দ নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীন-পণ্ডিতগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হিন্দু-গণের এই প্রকার নিয়মিত সমুদ্র-অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আর, আমাদের সাহিত্যসেবিগণ কি চাঁদসওদাগরের সিংহল-যাত্রা ও বাঙ্গাল-মাঝিদিগের ভাষা ভুলিয়া গেলেন? —সেও ত বেশীদিনের কথা নয়। বস্তুতঃ বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের এবং পশ্চিম-ভারতের 'সৌরাষ্ট্র' ও 'গুর্জ্জর'

দেশের সমুদ্রকূলবর্ত্তী নগরসকল হইতে হিন্দুগণের নিয়মিত-রূপে সমুদ্র-অভিযান মুসলমানগণের আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মুসলমান-রাজত্বের সময়, সমুদ্রযাত্রী নাবিক ও বণিক্‌গণ অধিকাংশ মুসলমান হওয়াতে, তাহাদের সঙ্গে একত্র জাহাজে যাওয়া হিন্দুগণের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। 'দীর্ঘ-কাষ্ঠে সংস্পর্শ-দোষ হয় না' ইত্যাদি বচন এই সময়ে প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও সদাচারী হিন্দুগণের সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিল এবং কালে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই যে ব্যক্তি মুসলমানগণের সহিত জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিত, দেশে ফিরিয়া আসিলে সে সমাজচ্যুত হইত। ইহার আর একটী বিষময় ফল হইল। হিন্দুগণ ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপ, সুমিত্রা ইত্যাদি দ্বীপ সকলে না যাওয়ায়, এবং তাহাদের স্থলে ভারতবর্ষীয় মুসল-মানগণ মাতৃভূমি হইতে তথায় যাইয়া, ঐ সকল দ্বীপের ঔপনিবেশিক হিন্দুগণের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করায়, ঐ সকল হিন্দুগণের ভারতবাসী মুসলমানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতর সহানুভূতি জন্মিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ ঐ সকল দ্বীপের হিন্দু-অধিবাসিগণ কালে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বঙ্গ-ভূমিতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া, তাহা এখন 'দার-উল্ ইস্‌লাম্', অর্থাৎ মুসলমান-ভূমিতে পরিণত প্রায়; কিন্তু তথাপি সেখানে এত হিন্দু আছে যে, তাহারা 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতে 'ম্লেচ্ছাদিদৈত্যঘাতিনী দুর্গা'র সহিত বঙ্গমাতার তুলনা করিয়া, 'বঙ্গ' যে হিন্দুভূমি ইহাই উচ্চৈঃস্বরে এখনও প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছে—এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতেছে, যে তাহারা এখনও দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের সহিত ঔপনিবেশিক হিন্দুদিগের সম্বন্ধ লোপ পাওয়ায়, তাহারা হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিও হারাইয়া ফেলিল, এবং সকলেই মুসলমান হইয়া গেল। হিন্দুগণের আহার ও স্পর্শ সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়মই এই বিনাশসঙ্কুল বিষম ফলের একটী প্রধান কারণ। ভারত-বর্ষের দুই সর্ব্বপ্রধান প্রদেশ, বঙ্গ এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীর—প্রাচীন পঞ্চনদ, ও মনুকথিত স্বরস্বতী-দৃষদ্বতী দেবনদী-দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তও মুসলমানপ্রধান—দার-উল্ ইস্‌লাম্—হইয়া গিয়াছে।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, প্রাচীন বৈদিকসময়ে গোমাংস ইত্যাদি অভক্ষ্য ভক্ষণও হিন্দু ঋষিদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথমে গোবধ নিবারণ করেন। হিন্দুগণ তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন না; কিন্তু দশাবতার-স্তোত্রের বুদ্ধ-স্তোত্রে—"সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং ইত্যাদি" পদে তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবের পর যে নূতন হিন্দু-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিল তাহাতে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, জাতি-বিচার, অন্ত্যজ-সংস্পর্শে জাতিভ্রষ্টতা, ও আহারাদিতে এক জাতির অন্যজাতির সহিত সম্পর্কত্যাগ ইত্যাদি নিয়ম দৃঢ়তর হইয়া, হিন্দুজাতির অধঃপতনের বীজ-বপন করিল। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, মুসলমান-সময়ে জাতিভেদ ও খাদ্যাখাদ্য বিচারের দৃঢ়তা থাকাতেই ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-প্রভাবের জন্যই সমগ্র হিন্দুস্থান দার-উল্ ইস্‌লাম্ হইয়া যায় নাই। তবে, আবার একথাও বলিতে হইবে যে, আর তিনশত বৎসর মুসলমানরাজত্ব অব্যাহত থাকিলে, বঙ্গ ও পঞ্জাব—এবং বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষ—মুসলমান হইয়া যাইত। ভারতে ইংরাজাধিকার, মুসলমান-প্রভাব খর্ব্ব করায়, হিন্দুজাতির জীবনে নূতন আশা সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু যে সকল অস্বাভাবিক কঠিন নিয়ম পূর্ব্বে হিন্দুগণ পালন করিতেন, পাশ্চাত্যসভ্যতার নূতন-আলোকে সে সকল নিয়ম রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্রাহ্মণকন্যার,—অর্থাৎকুলীন-কন্যার *—সহিত বিবাহ দিয়া জাতীয় শুদ্ধিতা রক্ষা করি-তেন। কিন্তু তাঁহাদের অপরাপর পুত্রেরা দেশস্থ অন্য হীন-জাতির কন্যা-গমনের অপ্রতিহত অধিকার প্রাপ্ত হইত। সেরূপ অধিকার এ সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাহ্মণগণের নিয়মে শূদ্রাধিকার 'স্মৃতি' দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।—হিন্দুধর্ম্ম অর্থে স্মার্ত্ত-নিয়মবদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অন্য অর্থ করেন, তাঁহারা স্মৃতি, এবং পুরাণ ও নিবন্ধে 'ধর্ম্ম' শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে,

* কুলীন অর্থাৎ 'কুলজাত'। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ এই প্রকার জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত ঔপনিবেশিক কায়স্থ, অর্থাৎ কুলীন বা কুলজাত কায়স্থের—কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া জাতিরক্ষা করিতেন।

তাহা জানেন না—কিংবা তাহা উপেক্ষা করেন,—কিংবা জানিয়া শুনিয়াও ইংরাজিনবিশ্‌গণকে প্রতারিত করেন। শূদ্রের পাতক নাই, শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার নাই, শূদ্রের পক্ষে কোন ধর্ম্মের প্রতিষেধও নাই; মনুর নিয়মসকল কেবল ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ দ্বিজাতির প্রতিই প্রযুজ্য। শূদ্র, সমান গোত্রপ্রবর বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রেরা দাসবৃত্ত, পরপিণ্ডোপজীবী, পরায়ত্ত-শরীর, তাহাদের বৈধপুত্রের সম্ভাবনা নাই। শূদ্রেরা সকলেই নিসর্গজ দাস; ব্রাহ্মণগণের অধিকার আছে যে, তাহাদের দ্বারা বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। আজ কাল বি.এ., এম. এ., ডি. এল. পাশ করিয়াও অনেক শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতীয় শিক্ষিতলোকগণ—দেশাচারের ও চিরন্তন-দাসত্বের এমনি মোহিনী-ক্ষমতা—এখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যাকুল! তাঁহারা অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীতার বর্ণসকলের স্ববর্ণোচিত কার্য্যই যে ধর্ম্ম, এবং সেই ধর্ম্মস্থাপনের জন্যই যে ভগবানের 'অবতার'-রূপগ্রহণ, এই সকল শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন।—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

যখন আর্য্যজাতি প্রথমে এদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প ছিলেন। পারসীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ একসময়ে একজাতি ছিলেন। অনেক সমাজ-সংস্কারক পণ্ডিত বলেন যে, বেদের সময় জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু পণ্ডিতগণ, এই সকল সমাজ-সংস্কারকগণকৃত—স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে তদনুমত—বেদাদির অদ্ভুত অর্থে উপহাস করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ অথবা অথর্ব্বাণি, ক্ষত্র এবং বিশ্—এই তিনজাতি পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষীয় ও পারসীক আর্য্যগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথর্ব্বাণিগণ দেবপূজা ও অভিচার মন্ত্রাধিকারী পুরোহিত ছিলেন; তাঁহাদের মন্ত্রে যুদ্ধজয় ও রোগ উপশম হইত। ক্ষত্রগণ যুদ্ধব্যবসায়ী। বিশ্ বা বৈশ্যগণ ক্ষেত্রকর্ষণ, পশুপালন ইত্যাদি কার্য্যে লিপ্ত ছিল। এই তিন জাতি পারস্যে ছিল, এবং এই তিন জাতীয়ই ভারতবর্ষে অভিযান করে। তাহারা এখানে আসিয়া ত্রিবর্ণ 'দ্বিজ' হয়। তাহাদের বর্ণ, শ্বেতবর্ণ ছিল। ইহাই বর্ণের অর্থ। কৃষ্ণবর্ণ জাতি,—যাহাদের দুরবস্থার কথা কবিবর হেমচন্দ্র জলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন,—ভারতের আদিমবাসিগণ। তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে এখন অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য কায়স্থ ইত্যাদি জাতীয় লোককে কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্যের উত্তাপের প্রভাবে বর্ণের কিছু তারতম্য হয় বটে, কিন্তু ভারতবাসী পারসীকগণ এবং বিষুবরেখার নিকট-বর্ত্তী দেশ-অধিবাসী য়ুরোপীয়গণ সহস্রবৎসরেও কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই। সুতরাং "কালো-ব্রাহ্মণ ও কটা-শূদ্র" অনেকটা যে মিশ্রণের ফল, তাহাতে সন্দেহের কারণ ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হউক, ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি তাহাদের শ্বেতবর্ণ ও আর্য্যজাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য—যেমন এখন দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী য়ুরোপীয়গণ চেষ্টা করিতেছেন—যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার সহায়ক অনু-শাসন-ব্যবস্থাই মনুর স্মৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, —এই চেষ্টার নামই জাতিভেদ-তত্ত্ব! ইহাই শূদ্রের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কারণ; কিন্তু বিধাতার নিয়ম অপরিলঙ্ঘনীয়। ভারতীয় আর্য্যজাতি সংখ্যায় অল্প থাকায়, এবং শাস্ত্র ও ইতিহাস অনুসারে সতত-সংগ্রাম-শীল ক্ষত্রিয়বংশ ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, শক-পারদাদি জাতির আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। শূদ্রগণ কখনও আর্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অথচ, শক-পারদাদি ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়া অনেক বিখ্যাত রাজপুতজাতির মধ্যে মিশ্রিত হইয়াগেল। পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইবার পর, বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, শূদ্র রাজচক্রবর্ত্তী মহানন্দকর্ত্তৃক আরএকবার ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। এই সকল কারণেই বোধ হয় রঘুনন্দন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য দ্বিজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন যে কৃষ্ণবর্ণ কেন? —এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে রঘুনন্দন যে কি বলিতেন, তাহা চিন্তনীয় বটে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির সংখ্যার অল্পতা-নিবন্ধন এইদেশ বারম্বার অপরজাতিদ্বারা পদদলিত হইয়াছে। আর্য্যজাতি কোনস্থানে কখনও পরাধীনজাতি হয় নাই। ভারতবর্ষকে এখন 'আর্য্যদেশ' বলা যাইতে পারে না। মুসলমান ও আর্য্যেতর জাতি এখানে শতকরা ৮০ জনের অধিক; এখানে পুরাতন আর্য্যজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মনু-প্রণীত নিয়ম সকল, এবং শূদ্রদের প্রতি অবিচার ও ঘৃণামূলক নিয়ম, প্রচলিত করা উপহাসের বিষয়। যাঁহারা একটা ভারতবর্ষীয় জাতীয়তা সৃজন করিতে

চাহেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয় ভাবিতে হইবে। তাঁহাদের জানা উচিত ভারতবাসী—শূদ্রজাতি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলবান্ করিলে, শূদ্রজাতি তাহা কালে মানিবে না। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-অধিকারসকল—অর্থাৎ সকল জাতির প্রণাম-গ্রহণ, দেবপূজায়, এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে পৌরোহিত্য, দানগ্রহণ, ও ভোজনের অধিকার, ও শূদ্রের প্রতি অন্য যে সকল অত্যাচার করিবার অধিকার ছিল, তাহা—পরিত্যাগ করিতে সহজে স্বীকার হইতে পারেন না। কিন্তু উপায় নাই!—সময় ও বিদ্যাপ্রচারের প্রভাবে, তাঁহাদের এই সকল অন্যায্য অধিকার নিশ্চয়ই লোপ হইবে। আমি ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতীয় লোকগণের চিরন্তন আত্মরক্ষার চেষ্টায় দোষ দেখিনা।—তবে, বস্তুতঃ এখন সেই পুরাতন চেষ্টা একটি শোকাবহ দৃশ্য! লক্ষ্ণৌ ও মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব-বংশীয়গণের পক্ষে নবাবী-আচারসমস্ত অনুষ্ঠান করার চেষ্টা অন্যলোকের নিকট যেমন একটী করুণরসাত্মক ব্যাপার মাত্র; তেমনই ভারতজয়ী আর্য্যজাতির বংশধরগণের পূর্ব্ব-মহিমা বাহ্য আড়ম্বরদ্বারা: রক্ষাকরিতে চেষ্টা করাও করুণদৃশ্য বটে! ভারতবাসী আর্য্যজাতির বিশুদ্ধতা অনেক দিন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও—সহস্র বৎসর সমস্ত ভারতবাসী বৌদ্ধ থাকার পর, ও সহস্র বৎসর মসলমান ও ইংরাজ অধিকারের পর—তাহা অক্ষুন্ন আছে মনে করা, আত্ম-প্রতারণা করা মাত্র! ভারতবর্ষে পুনরায় আর্য্য-অধিকার ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বপ্নেরও অতীত। ভারতবর্ষে কালক্রমে, এক ভারতবাসী-জাতি হইলেও হইতে পারে; তাহারা কিন্তু আর্য্যজাতি হইতে পারে না। যাঁহারা ভারতবর্ষে একজাতীয়তা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর্য্যজাতি, পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেছে এবং করিবে। ভবিষ্যতে, নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ পুনরায় শ্বেতবর্ণ আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থান হইবে। ইংরাজ, জর্ম্মাণ্ ও রুশিয়ান্ যে শ্বেতবর্ণ বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি, সেবিষয় পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং আর্য্য-জাতির প্রভাব চিরদিন এই পৃথিবীতে অপ্রতিহত থাকিবে। বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—যাঁহারা ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহারা ইহাতে দুঃখিত হইবেন না। তবে মূল-আর্য্যজাতি 'অগ্নি, মিত্রাবরুণ, দ্যোঃপিতা' ইত্যাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগকরিয়া, শ্রাদ্ধাদি আচার, অগ্নি-রক্ষা, সংসৃষ্ট-পরিবার ও সহমরণাদি আর্য্যজাতির সাধারণপ্রথাসকল পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মালম্বী হইয়াছেন এবং নূতন আচারসকল গ্রহণ করিয়াছেন;—ফলে, আর্য্যগণের প্রাচীন-দেবতাগণের পূজা এখন ভারতবর্ষেও হয় না। নূতন দেবতা সকল, প্রাচীন দেবতাগণকে তাঁহাদের যজ্ঞাধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন! তবে প্রাচীন সামাজিক নিয়মসকলের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও সংস্কার বিধিসকল এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এই মাত্র! সুতরাং ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের বিশেষ ক্ষোভেরও কারণ নাই। সময়ের প্রভাব, কে প্রতিরোধ করিতে পারে? ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের আচারগ্রহণ করিলে, বিশেষ অন্যায় হইবে না। কিন্তু ভারতবাসী আর্য্যজাতি নহে। ভারতবাসী-জাতিকে কি প্রকারে আর্য্যজাতির অত্যাচারে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, ইহাই চিরন্তন-সমস্যা। এখন প্রাচীন আদিম-শূদ্র—কৃষ্ণবর্ণজাতির আর্য্য-সংমিশ্রণে শক্তি-সঞ্চার হইয়াছে। য়ুরোপের আর্য্যজাতিরও ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এই জাতিসংঘর্ষে, ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণবর্ণজাতি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না,—ইহাই সমস্যা! জনকয়েক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের—প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া—'অন্য সকলকে সমাজ-বহির্ভূত করিলাম', ইত্যাদি উক্তি, উপহাসের বিষয় মাত্র! তাঁহারা যখন স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্রযাত্রা-নিষেধাদি নিয়মসকল শূদ্রের প্রতি প্রয়োজ্য নহে, তখন তাঁহারা ভারতবাসী-হিন্দুসমাজকে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিতে হইবে! তাঁহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন! কিন্তু নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-সমাজ, এই মুষ্টিমেয় লোকের অশাস্ত্রীয় ও যুক্তিহীন কথায় প্রতারিত হইয়া, আত্মঘাত করিবেন না।

এত কথা যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে—ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহাতে আমি যে কত দুঃখিত তাহা বাক্যে বর্ণনা করা অসম্ভব। কি প্রকারে, ভারতবর্ষের জনসাগরের মধ্যে, এই মুষ্টিমেয় জাতি নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া থাকিবে, একথা —যে ব্যক্তি সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া গৌরব করে, সে—সর্ব্বদাই ভাবিয়া আকুল। কিন্তু সময়ের ও উন্নতির স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, ইহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না।—ব্রাহ্মণ-সমাজের ইহা স্মরণ রাখা

উচিত। তারপর, সমুদ্রযাত্রা কোন্ সময়ে ও কি কারণে নিষিদ্ধ হয়,তাহাও দেখা উচিত। আমরা 'আদিত্য পুরাণ', বা 'আদিপুরাণে',র ও 'বৃহন্নারদীয় পুরাণে'র কয়েকটী শ্লোকে প্রথম ইহা নিষিদ্ধ দেখিতে পাই। এই শ্লোকসকল হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্য প্রথমে ধৃত করেন। সেই শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। * ইহাতে প্রকাশ যে, বহুতর প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রথা—সময়ের প্রভাবে, অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হওয়ায়—সুধীগণ তাহা নিষেধ করিয়াছেন; যথা—অসবর্ণ বিবাহ, অক্ষতাযোনি বিধবাবিবাহ, গোবধ, বাণপ্রস্থ, নরমেধ, অশ্বমেধ, দেবর-কর্তৃক সুতোৎপত্তি, মদ্যপান। এই নিষিদ্ধ ক্রিয়াবলীর মধ্যে সমুদ্র-যাত্রাও আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্রীয় প্রাচীন প্রথা;—কলিযুগে মনীষিগণ ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যে সকল পণ্ডিতগণ বলেন যে, তাঁহারা শাস্ত্র বুকে করিয়া আছেন,—সুতরাং তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা অনুমোদন করিতে পারেন না,—তাঁহারা বোধ হয় এই সকল বচনের প্রতি প্রণিধান করেন নাই। তাঁহারা ইহা অবগত আছেন কিনা জানি না, যে নিবন্ধকারগণ ঐ বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—যদিও এই প্রথা সকল শাস্ত্রীয়, কিন্তু লোকগর্হিত বলিয়া—নিষিদ্ধ। "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু"—এই যাজ্ঞবল্ক্যবচন তাহার প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিয়া, ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে—লোক-বিদ্বেষই এই প্রকার নিষেধের একমাত্র কারণ,—অন্যকোন শাস্ত্রীয় কারণ নাই! বর্ত্তমান কালে, যখন সমুদ্রযাত্রা লোকবিদ্বিষ্ট নহে, তখন উহা নিষিদ্ধ হইতে পারেনা। যে মনীষিগণ পূর্ব্বে ইহা লোকবিদ্বিষ্ট বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই ক্ষমতা আছে যে পুনরায় সেই নিষেধ অপহার করেন। সুতরাং, পণ্ডিতগণের মুখে এই বিষয়ে শাস্ত্রের দোহাই শোভা পায়না; এখন—যখন সমুদ্রযাত্রা লোক-বিদ্বিষ্ট নহে তখন,—ইহা পূর্ব্বে যেরূপ শাস্ত্রসম্মত ছিল,এখনও সেই প্রকারই আছে ও থাকিবে, বলিতে হইবে।

সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, মানবজাতির উন্নতির পথ-অবরোধ-চেষ্টাকারী,অসমসাহসিক ব্রাহ্মণ-সভাকে হরজটাবরোহিণী জাহ্নবী-স্রোত অবরোধ-চেষ্টাকারী ঐরাবতের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়;—ইহা যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন।

* "ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহো জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥
বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্॥
বালিকাক্ষতযোন্যোশ্চ বরেণ্যান্যেন সংস্কৃতিঃ।
* * * *
"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলাবাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥"
—আদিত্যপুরাণ বচনানি

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বাণপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়া পুনর্দানং পায়স্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।"
—বৃহন্নারদীয় পুরাণম্—২৩অ।৩-১৬।

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রোদাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥"
—মনু ৮অ ৪১৩,৪১৪।

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্।"
—মনু ১০অ ১২৬।

"বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্মকীর্ত্ত্যতে!
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥"
—মনু ১০অ ১২৩।

"শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যোধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥"
—মনু ১০অ ১২৯।

"ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্ব্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ॥"
—মনু ৯অ ২৪৮।

"শূদ্রাণাং দাসবৃত্তীনাং পরপিণ্ডোপজীবিনাম্।
পরায়ত্তশরীরাণাং কচিন্ন পুত্র ইত্যপি॥"
—রত্নাকরধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচনম্।

শিল্প বিজ্ঞান-সভার কার্য্য তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত হইতে পারে—কিন্তু যে ৩০০ শত উচ্চবংশীয় বাঙ্গালী যুবক বিদেশযাত্রা করিয়াছেন,তাঁহাদিগকে,—তাঁহাদের পরিবার, কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গকে—সমাজ-বাহ্য করা উচিত কিনা, এবং তাঁহাদের এক্ষমতা আছে কিনা, তাহাও যেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন। শিল্প-বিজ্ঞা -সমিতি তাঁহাদের আন্দোলনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নহে তবে এক চিন্তার বিষয় এই যে—হিন্দুসমাজকে কি প্রকারে তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মণ-সভার যে প্রকার প্রয়াস, তাহা সফল হইলে ত হিন্দুসমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে! কিন্তু কি উপায়ে হিন্দুসমাজ হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু-জাতি রক্ষা হয়? একদিকে—ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার, অন্যদিকে—একেবারে ম্লেচ্ছভাব-প্রণোদিত মুসলমানৈক্য-প্রয়াসী স্বদেশহিতৈষী; আবার অপরদিকে—একেবারে বিদেশী আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী প্রবল সমাজসংকল!—ভারত-বাসী আর্য্যজাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা-দেবতাব্যতীত এক্ষণে আর ইহাকে রক্ষা করিতে পারে কে?—

শূন্য প্রতিধ্বনি বলিতেছে—'কে'!

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

পরিণতি

তরু তার নোঙাইয়া শাখা
উর্দ্ধদল তৃণ দলে করে আলিঙ্গন,
সমীরণ সঞ্চালিয়া পাখা
আলোক-সখারে করে বক্ষে নিপীড়ন,
অনুরাগী প্রভাত তপন
বাড়ায় সহস্র বাহু কমলের পানে,
ধরা দেয় অনন্ত গগন
ঊষার অস্ফুটালোকে বিহগের গানে,
বিকসিত কুসুমের 'পরে
ঢালে জ্যোতিঃ দেববালা কৌমুদীবরণ,
বারিধির নীলকলেবরে
হৈমবত নির্ঝরের পঙ্কিল পতন,
অণু চাহে মহতের পূর্ণ পরিশ্লেষ,
অনন্ত না গণে সান্ত মিলনের ক্লেশ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগরণ

হরণ কর দুঃখ-পর, বরষ প্রেমধারা,
স্মরণ করি চরণ ধরি' জরা মরণ-হারা!
সরল কর জীবনপথ হরণ কর শোকে,
মরণ হতে জনম দেহ অভয় তব লোকে!
তার হে তার, তারণ-দীন, সাগর-মহা পারে,
ফিরায়ে মোরে দিয়ো না ওগো, ফিরেছি বারে বারে!
করম মম সরম-দায়ী, ধরম মম নাহি,
বরণ ক'রে এনেছি কারে? তোমারে নাহি চাহি'!
শয়ান আছি সুপ্তিমাঝে, ধেয়ান গেছি ভুলি'
মণিকা ফেলি ক্ষণিকা মাঝে ধূলি-কণিকা তুলি!
স্মরণ করি অভয় পদ যাচি ও সুখ-ধাম,
হারায়ে ফেলে যখন ঘুরি, অভয় তব নাম!
তার হে তার, তারণ-দীন, হীন এ মনপ্রাণে,
জাগায়ে তোলো পুণ্যপথে অভয় তব নামে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে—নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি মৃগাঙ্ক ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিমাত্র পাইবেন।—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না!

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল।—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

ওদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়; ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তর হয়! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন; তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল। মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল এবং অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল।

পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল। বিবাহের পররাত্রি—কালরাত্রি—কাটিয়া গেলে, পরে ফুলশয্যাও চুকিয়া গেল। পরদিন শাশুড়ী কৃষ্ণপ্রিয়াকে কাঁদাইয়া, শ্বশুরকে উন্মনা, বাণীকে উদাসী করিয়া অম্বরনাথ আসাম যাত্রা করিলেন।

বাণীর বিবাহের দুচারিদিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অজ্ঞার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল;—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবন-গতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল।]

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ

শকটের মধ্যে একজন মাত্র আরোহী! কোচবাক্সে সরকার মহাশয়, নিজের মাথায় নিজেই ছত্রধারী হইয়া, বসিয়া আছেন। সে জানালার গরাদের উপর ললাট চাপিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু শকটারোহীর মুখখানা দূরত্বপ্রযুক্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য হইল না। সে, সেখান হইতে অপসৃত না হইয়া, তদবস্থই রহিল। গাড়িখানা এদিকে দেখিতে দেখিতে ফটক পার হইয়া, রাস্তায় বাহির হইয়া, অদৃশ্য হইয়াগেল এবং শকটচক্র-ঘর্ঘররবও ক্রমে অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর—শেষকালে একেবারেই অশ্রুত হইয়া পড়িল। তারপর, বাণী যখন ফিরিয়া গৃহমধ্যস্থ আসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন, তাহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল স্থিরনেত্রে একটু বিষাদের মালিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল! বিবাহব্যাপারটা চুকিলেই সে বর্ত্তাইবে স্থির করিয়া মনে মনে যেসময়ের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই ঈপ্সিতকাল অতীত হইয়া গেল; কিন্তু একি আশ্চর্য্য! মনঃতো তাহার কল্পনানুরূপ আনন্দে অধীর হইল না! যে মুখখানা শেষদর্শনের বিফলপ্রয়াসে তাহার শুভ্রললাটপটে লৌহ-দণ্ডের রাঙ্গাছাপ ফুটিয়া রহিয়াছিল, কল্পনানেত্রে সেই মুখ-খানাই যে তাহার অতিনিকটে অঙ্কিত দেখিতে লাগিল! এমনও মনে হইল যে, ছুটিয়া গিয়া মাকে বলে "মা! ওকে ফিরাও।" এই অতর্কিত ইচ্ছার প্রবল-আকর্ষণ হইতে নিজেকে জোর করিয়া ফিরাইবার জন্য, সে আসনে চাপিয়া বসিয়া পড়িল।—'ফিরাইবে?—কেন?—কেন ফিরাইবে? সে দূরে গেলেই তাহার পক্ষে ভাল নয় কি!'

'হাঁ, ভাল বই কি! সে তো তাহাকে স্বামীর অধিকার দিতে পারিবেনা, রমাবল্লভের মেয়ে তাঁহারই পূজারীর স্ত্রী! অতি লজ্জার বিষয়! এ গ্লানি যতটা চাপা পড়ে,

সে জানালার গরাদের উপর ললাট চাপিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল

ততই মঙ্গল। বিশেষ, সে যে প্রাণমন তাহার গোপিবল্লভকে দান করিয়াছে,—সে জিনিষ অন্যকে দিতে তাহার অধিকারই বা কি! গিয়াছে—বেশ হইয়াছে। একটা নগণ্য পুরোহিতের জন্য বাণীর মনে একবিন্দু অভাববোধ হওয়াও লজ্জার কথা!—তাহা সে হইতে দিবে না; নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মগরিমায় আপনার বিচলিত হৃদয়কে বাঁধিয়া সে আসনত্যাগ করিল। কয়দিন তেমন করিয়া দেখাশুনার সুযোগ ছিলনা। আজরাত্রে ভালকরিয়া দেবতার আরতি করাইতে হইবে। বৈরাগীদের ডাকিয়া কীর্ত্তন যাহাতে ভালরূপ জমে, তাহারও ব্যবস্থা করা চাই। দাদাবাবু! বড় ফন্দি করিয়া তুমি তোমার রাধারাণীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিলে! এইবার—কে জিতিল? হিন্দুর সব ভাল, কেবল এইটি মন্দ।—বিয়ে করিতেই হইবে! কেন,—এমন কঠোর নিয়ম কেন? মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া! আমি জমিদার হরিবল্লভের পৌত্রী, আমাকেও একটা যাহার-তাহার হুকুমবরদার্ হইতে হইবে? যিনি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেন, তিনিই হইবেন আমার প্রভু!—কিন্তু, তাই কি! কে আমার অন্নে প্রতিপালিত! সে? না—বাবা বলিলেন, সে আমাদের একটি কপর্দ্দকও লইতে সম্মত নয়! অনেক অনুরোধে পথখরচ ভিন্ন একটি পয়সাও সে লয় নাই। আশ্চর্য্য! গরীবের এত মর্য্যাদাজ্ঞান! আমি তো আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়াছি!'

সে আবার বসিল। 'এমন আমি স্বপ্নেও আশা করি নাই! যেমন সবাই হয়,—আমি তাকে তারচেয়েও কম মনে করিতাম; কিন্তু, বোধ হয়, সে তা নয়। বোধ হয়, অনেকের চেয়ে সে ঢের বড়! অত যে নিরীহ ভাব, সেটা বোধ হয় ওর ভিতরের প্রচণ্ড-তেজের আবরণ মাত্র! আর, তা' যদি না হয়, তা হ'লে সে নিতান্তই বোকা, অবুঝ,—না না মোটে তা-নয়;—একটুও না। কি রকম সতর্কভাবে এতবড় কাণ্ডটা শেষ করিয়া চলিয়া গেল! কাহাকেও জানিতেও দিল না যে, আমার সঙ্গে ওর এই চিরবিচ্ছেদের সর্ত্ত হইয়াই বিবাহ।—চিরবিচ্ছেদ!—হাঁ,—তা বই আর কি! জন্মের মত সকল সম্বন্ধ ফুরাল!' বাণীর অজ্ঞাতে তাহার কণ্ঠমধ্যে একটা মৃদুশ্বাস জমিয়া উঠিয়া বুকখানা একটু ভারি করিয়া তুলিল! সে, ধীরে ধীরে তাহা বাহিরের বাতাসে মিশাইয়া দিয়া, আবার ভাবিতে লাগিল, "না—নির্ব্বোধ নয়। সে বেশ বুঝিয়াছিল, আমি তাহার প্রতি কত অসন্তুষ্ট। আর প্রতিজ্ঞারক্ষা?—দেখিয়াছি বিয়ের মন্ত্র বলার সময়, যখন যখন আমার হাত ধরিতে কিংবা আমায় স্পর্শ করিতে হইয়াছে, কত সাবধানে সে স্পর্শ করিয়াছে। কাছেকাছে থাকিয়াও, আচম্কা একবারের জন্যও, তার

কাপড়টুকু পর্য্যন্ত আমার কাপড়ে ঠেকে নাই। আচ্ছা, তবে কেন সে আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইল? এই খানে বাণীর, দ্রুততরবেগে প্রবাহিত একটান', চিন্তা-স্রোতে অকস্মাৎ বাধা পড়িল;—এ যেন এক হেঁয়ালি! ভাবিয়া কিছু কূলকিনারা সে পায় না! সে অর্থপ্রয়াসী নহে—পাইবে না জানে, এবং তাহার দিকে নিজেকে এমন পূর্ণ-সংযতই রাখিল যে, পাইবার স্পৃহা কিছুমাত্র দেখাগেলনা। তবে কিসের জন্য সে এই বিবাহদ্বারা নিজেকে চিরদিনের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সম্মত হইল?—বাণী তাহার সহিত কখনও সদ্ব্যবহার করে নাই যে, সেই কৃতজ্ঞতার মূল্য সে দিয়া গেল! বরং কত লাঞ্ছিত-অপদস্থই তো করিয়াছে!—তবে?'

এ সমস্যা পূরণ কে করিবে? একটা জটিল জালের মত এই অমীমাংসিত প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যটায় জড়াইয়া সেই পাকগুলা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। 'কেন? কিসের আশায় সে তাহার এই অস্বাভাবিক পণরক্ষা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল!—দয়া?' মুহূর্ত্তের জন্য বাণীর মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। 'দয়া!—কিন্তু হয়ত তাই। রাগ করিলে কি হইবে? তখন তাহারা সবাই মিলিয়া দয়াপ্রার্থীইতো হইয়াছিল। হয়ত দয়ালু সে; তাহাদের দয়ার্হই দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদের উপকার করিয়াছে!' সে গভীর নিশ্বাস ফেলিল। 'দয়াতো মহতেই করিয়া থাকে। দয়ার্হ, দয়ালুর তুলনায়, অনেক ছোট। সেতো তবে তাহার নিকট দয়ার মূল্যে বিকাইয়া গিয়াছে? আজ সে রাজনগরের জমিদার বংশের উত্তরাধিকারিণী সত্য, কিন্তু সে অধিকার এখন আর জন্ম-সূত্রে পাওয়া নয়—তাহার দয়ার মূল্যে সে এই আবাল্য-প্রীতির আবাসে আজ স্থান লাভ করিয়াছে!' বাণী সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকাদিল। 'এসব তবে তাহার স্বামীর দান! সেই আজ তাহার ভরণভার-গৃহীতা ভর্ত্তা! গোপিবল্লভ! একি অবস্থা ঘটাইলে? সেই মূর্খ পুরোহিত—পূজাবিধিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আত্মপক্ষ-সমর্থনে একান্ত অপটু,—সেই আজ তাহার রক্ষাকর্ত্তা, তাহার অন্নদাতা, তাহার স্বামী! আর আজ সে তাহারই সচেষ্ট ব্যবস্থায়—তাহারই আদেশে—জন্মের মত তাহার নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে; এজীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না!'

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

দিন, পক্ষ, মাস, অতীত হইয়া গেল। গোপিবল্লভের মন্দিরে পুরোহিত আত্মনাথ, ঘণ্টা বাজাইয়া পঞ্চ-প্রদীপ নাড়িয়া, আরতি করে; বাণী নীরবে চাহিয়া দেখে। কিন্তু আত্মনাথ বেশ করিয়া লক্ষ্য করে যে, বাণীর মন পূর্ব্বের মত ঠিক মন্দিরের মধ্যস্থলটিতেই নিবদ্ধ নাই! সে দৃষ্টি ভাবহীন, পুতুলের চোখের দৃষ্টির মত।—লোকে তাহা দেখে, কিন্তু নিজে সে কিছু দেখিতে পায় না।

আজকাল মন্দিরের মধ্যে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে—ত্রুটিসহ্যকরণে একান্ত অসহিষ্ণু—পুরোহিতকে বিস্ময়পূর্ণ ক্রোধে অভিভূত করিয়াও তুর্ণতে ছাড়েনা। প্রায়ই দূর্ব্বাদলে ত্রিপত্রের স্থানে পঞ্চপত্র থাকিয়া যায়, ক্বচিৎ ফুলের মালার মুখে গ্রন্থি দেওয়া থাকে না! আবার এমন অঘটনও কখনও কখনও ঘটিতে দেখাযায় যে, আরতি-পূজাকালে বাণীর শিথিলহস্ত হইতে সশব্দে ব্যজনী খসিয়া পড়িয়া, পূজারত পুরোহিতকে চমকিত করিয়া, বিঘ্নোৎপাদন করে! আত্মনাথ দেখিয়া দেখিয়া ভাবে, 'এসব কি? কিসের এ সকল দুর্লক্ষণ?' বাণী পূজার অর্ঘ্যসাজাইয়া দেয়, পূজা দেখে, পূজা করে; কিন্তু এসকল নিত্যক্রিয়ার মধ্যে আর যেন তেমন করিয়া সে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে না। পূজার মন্ত্রে যখন মন্দিরাকাশ পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সকল শব্দ-লহরীর মধ্যদিয়াও নিবিষ্টচিত্ত সাধক যেমন অনাদি প্রণবের অফুরন্ত অবিচ্ছিন্নধ্বনি তাঁহার চিদাকাশে চির-ধ্বনিত শুনিতে পান, সেও তেমনি ইহার চিরপরিচিত শব্দের মধ্যে সেই একদিনের শোনা সুগম্ভীর বেদমন্ত্র স্পষ্ট শুনিতে পায়। সকল সুর সকল শব্দ ঢাকিয়া, কেবল উভয় কর্ণে বাজিতে থাকে, "মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্ত মনুচিত্তন্তে হস্ত।" তাহার শিথিলঅঙ্গুলী হইতে চামর খসিয়া পড়ে, চন্দনপাত্র কম্পিত-করস্পর্শে উলটিয়া স্থানচ্যুত হয়। সে লজ্জায় মরিয়া যায়; অপরাধের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠে। একি বশীকরণের যাদুবিদ্যা,—না মায়াবীর মায়া? মন্ত্রে এত শক্তি! সেই যে হোমানলপার্শ্বে যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন গৃহাকাশতলে এই মন্ত্রোচ্চারণশ্রুতিঘটিয়াছে, সেই দণ্ড হইতে পলেপলে দিনেদিনে একি অচ্ছেদ্য মহাশক্তির প্রভাব সে তাহার সর্ব্বশরীরমনে তীব্রভাবে অনুভব

করিতেছে! এ যেন পর্ব্বত-বক্ষতলবিদারী প্রচণ্ড-বেগবতী নর্ম্মদার জলপ্রবাহ—রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই—অযুতবাধা কাটাইয়া সে গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলে।

বাণী ভাবে, 'সেই দৃঢ় আদেশ সে কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিবে? সেই যে এক-চিত্ত, একহৃদয়, হইবার জন্য অলঙ্ঘ্য অনুজ্ঞা,—তাহার সকল গর্ব্ব,সমস্ত অহঙ্কারকে জাগাইয়া তুলিয়াও—বুঝি সে অনুশাসনের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। বেদমন্ত্রের এত বড় প্রভাব?' এই কথাই সে দিনে রাত্রে অবাক হইয়া ভাবিতে থাকে।

এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়াও জামাতার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। 'বিবাহ করিয়াই বাছা সেই যে দেশত্যাগী হইয়া গেল, তাহার পর বৎসর ঘুরিয়া গেল তবু সে—ফিরিল না; ইহার অর্থ কি?' ব্যগ্র হইয়া তিনি স্বামীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁগা! অম্বর আমার কবে আসিবে? তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছ না কেন?" রমাবল্লভবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দেন, "সে এখন আসিবে কি? সেখানে তিনটি চতুষ্পাঠী খুলিয়াছে। তার কত কাজ।" "একলা সে তিনটে টোলে পড়ায়? বল কি তুমি? এত খাটিলে তার শরীরে কি থাকিবে? ওগো! তুমি বাছাকে আমার ফিরাইয়া আনিয়া দাও।"

অনেক কষ্টে কর্ত্তা বুঝান যে, সে নিজে সকলকেই পড়ায় না; অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত জমা করিয়াছে। তাঁহারাই পড়ান। আর সে চতুষ্পাঠী সব একস্থানেও নয়, বিভিন্ন গ্রামে; সে তত্ত্বাবধান করে মাত্র।

কৃষ্ণপ্রিয়ার কিন্তু এ সংবাদে মনের অতৃপ্তি দূর হয় না। 'গরীব নয় যে খাটিতে গিয়াছে—নহিলে স্ত্রী-পরিবার খাইবে কি! তাহার কিসের দুঃখ? কি অভাবে সে এমন করিয়া নির্ব্বাসিত হইয়া রহিল?' মনে একটা বিষম সন্দেহ জাগে, একদিন, থকিতে না পারিয়া তাহার আভাষ দিয়া ফেলিলেন। কন্যাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন "অম্বরের চিঠি এলোরে রাধু?" মেয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেই সগর্ব্বে উত্তর দেন, 'আমি কি জানি!' সে দিনও যখন বাঁধানিয়মে প্রশ্নোত্তর সমাধা হইয়া গেল, তখন আচম্‌কা কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই বুঝি তাকে চিঠি লিখতে, বা আস্‌তে, মানা করেছিস্?"

"তুই বুঝি তাকে চিঠি লিখ্‌তে, বা আস্‌তে মানা করেছিস্?"

অকস্মাৎ মায়ের মুখে, এই হৃদয়বাণীরই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠাতে, ঈষৎ চমকিয়া বাণী থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি!" তারপর, আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, সে বিরক্তিপূর্ণ হাস্য করিয়া কহিল, "আমাকে কে চিঠি লিখিল না-লিখিল, সেই ভাবনায় তো ঘুম হইতেছে না!

তোমার যে কি হয়েছে, দিনরাত কেবল ঐ কথা! আমি এখন যেন তোমার আপদ-বালাই হয়েছি। কেবল ঐ একজনের দিকেই সকল টান!—বেশ বাপু, বেশ।—তার চেয়ে তুমি সেইখানেই কেন যাও না; আমায় তো আর ভালবাস না।”

মা, তাহার অভিমানস্ফুরিতাধর মুখের দিকে চাহিয়া, সস্নেহে কহিলেন, “তা বল্‌বি বই কি! মা কি আর সন্তানকে ভালবাস্‌তে জানে?”

আরও পাঁচ ছয়মাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রভাতে ডাকের চিঠি ও কাগজপত্র আসিয়া পৌঁছিলে, রমাবল্লভ কিছুক্ষণপরে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওগো! দেখ্‌চ, তোমার অম্বরের কত নাম হ’য়ে গেল।” একখানা সংবাদ-পত্রে এইরূপ সংবাদ ছিল,-“রাজনগরের বিখ্যাত ভক্ত-জমিদার হরিবল্লভ রায়ের পুত্র, রমাবল্লভ রায়ের জামাতা, ও তাঁহার বিপুল বৈভবের অধিকারী, অম্বরনাথ আসাম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন চারিটি গ্রামে সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে এক উচ্চ-আদর্শ স্থাপিত করিতেছেন। এদেশে এখন মম্মরমূর্ত্তি, বা টাউন-ক্লব, স্থাপনে যেটুকু উদ্যম দেখা যায়, সেইটুকুও সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি দেখা যায় না। তাই এই দেবভাষার প্রতি একান্ত অবজ্ঞার দিনে, ধনীগৃহ হইতে এই নিষ্ঠাপূর্ণ পূজার আয়োজনে, যথার্থ আনন্দে ও আশায় চিত্ত পূর্ণকরিয়া তোলে। অম্বরনাথ—ন্যায়, সাঙ্খ্য, যোগ ও বেদান্ত—চারি বিষয়ে চারিটি চতুষ্পাঠীকেই পরস্পরের তুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। নিজেও তিনি পরমপণ্ডিত; কিন্তু যথার্থ জ্ঞানীর প্রধান-চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সে পাণ্ডিত্য শান্তসলিলা জাহ্নবীর ন্যায়ই স্থির ধীর প্রশান্ত;—তাহাতে বাহ্য বীচি-বিক্ষেপের পঙ্কিল আবিলতা নাই। সুন্দর উন্নত-মূর্ত্তিতে, নিরহঙ্কার মধুরালাপে, তিনি সকলের হৃদয়স্পর্শ করিয়া থাকেন। বিশেষ তাঁহার দরিদ্র-প্রীতির যেন সীমা নাই। অথচ অনাথ আর্ত্তের পিতৃস্থানীয় অম্বর নিজে—সম্পদস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও—দরিদ্র-জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতেই তাঁহার সুখ।”

কৃষ্ণপ্রিয়া উলটিয়া পালটিয়া—একটা কথা পাঁচবার করিয়া—এই সংবাদটুকু আধঘণ্টা ধরিয়া পড়িলেন। পাঠ-কালে সগর্ব্ব আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিতে লাগিল। ‘তবে নাকি সে কিছু জানে না! বড় মূর্খ! বড় বোকা! পূজা করিতে কি সবাই শেখে—বিদ্যায়, আর বিদ্যাপ্রকাশে ঢের তফাৎ।’ মেয়ের কাছে গিয়া পুলকিতস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “পড়িয়া দেখ, রাধারাণি! লোকে তাকে কত ভাল বলিতেছে। তুই-ই শুধু তারে ভালচোখে দেখিলি না—আমার এই বড় দুঃখ রহিয়া গেল।”

বাণী সকৌতূহলে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া, নেত্রপাত করিতেই অম্বরের নাম দেখিয়া, তাহা অগ্রাহ্যভাবে ভূমে নিক্ষেপ করিল। “তুমি থামো মা; ওসব মোসাহেবের দল থেকে বিজ্ঞাপন বের করা। পণ্ডিত! ওঃ! বড়তো পণ্ডিত; তাই একটা উপাধিও দেয়নি।” কৃষ্ণপ্রিয়া এ উত্তরে বড় চটিয়া গেলেন; কিন্তু ক্রোধের মুখে কথা কহা তাঁহার নিয়ম নহে, তাই চুপ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে,বাণী কাগজখানা উঠাইয়া,ভাঁজ করিয়া,কাপড়ের মধ্যে লুকায়িত করিল, এবং একটা রুদ্ধদ্বার নির্জ্জনগৃহের মধ্যে বসিয়া, সংবাদটা বারকয়েক পাঠ করিয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল।—‘ “দরিদ্র-জীবন যাপন করেন!” কেন? কি জন্য? কি প্রয়োজনে? কে করিতে বলিয়াছে? এত তেজ! এত অহঙ্কার! শ্বশুর কি এতই পর? আমার বাপ, কি তাহার কেহই নহেন? গরীব ব্রাহ্মণ তো চিরকাল পরের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্য! উঃ সে যে বড় কষ্ট! খড়ের ঘর বোধ হয়? বৃষ্টির সময় ভিতরে হয় ত জল পড়ে। মোটা চালের ভাত, কলায়ের দাল ভিন্ন দরিদ্রের আর কিইবা দুবেলা জুটে? তাই বা কে রাঁধিয়া দেয়? এখানে সাতটা রাঁধুনিতে রাঁধিতেছে, আর সে নিজে রাঁধিয়া খায়; হয় ত গরম ফেন পড়িয়া হাতে ফোস্কা উঠে! সেই হীরকাঙ্গুরীশোভিত অনতিস্থূল চম্পকঅঙ্গুলী মনে পড়িতেই, সে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই হাতে এখন আর সে অঙ্গুরী নাই, থাকা সম্ভবই নয়; সেই বিদায় দিনের সূক্ষ্ম শান্তিপুরে ধুতিই কি আছে? গুণচটের মত মোটা ময়লা কাপড় সে অঙ্গে একটুও মানায় না।—তাহাতেই বা কি? কে দেখিতেছে? বারণ করিবেই বা কে? অসুখ করিলে মুখে জল দিবারও বোধ হয় কেহ নাই!’ বাণীর বুকখানা একটা বিষম চাপে ভার হইয়া উঠিতে লাগিল। ‘প্রশান্তসুন্দর মূর্ত্তি! তা সত্য! সুন্দর! খুব সুন্দর! এত সুন্দর যে পুরুষমানুষ হয় এ

ধারণা আমার ছিল না। পরম পণ্ডিত! আচ্ছা, এইটে তো ঠিক বলা হইল না! যদি তাই, তবে সেই বৈষ্ণব-নিষিদ্ধ ফুলে বৈষ্ণব-বিগ্রহের পূজা করিল কেন? মিথ্যা কথা —সব মিথ্যা—কিছু পণ্ডিত নয়। কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলি? সেও আমি এখন বুঝিয়াছি! ভাগবতে পড়িয়াছি, দেবতায় ভেদ নাই। শ্যাম ও শ্যামা এক; ইহা প্রতিপন্ন করিতেই তিনি রাধাকুঞ্জে শ্যামারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আমি মূর্খ, আমি অজ্ঞ, অহঙ্কারে জ্ঞানহীনা আমি, তাই সেদিন তাহাকে না বুঝিয়া অপমান করিয়াছিলাম। গোপিবল্লভ! বুঝিয়াছি সেই পাপেই আমার এই দণ্ড করিয়াছ! এমনই করিয়া তুমি দ্রৌপদীরও দর্পচূর্ণ করিয়াছিলে! দেখি আর কি লিখিয়াছে;—"জাহ্নবীর ন্যায় প্রশান্ত স্থির ধীর—" এ'একটু বাড়াইয়া লিখিয়াছে;—আচ্ছা তাই বা কেন? 'প্রশান্ত' বইকি! আর 'স্থির ধীর'—তাই বা নয় কেন? সে যে এতটা বিদ্বান্ কে ইহা মনে করিতে পারিত? আমি কি জানিতাম সে এত ভাল, এত বড়!' উথলিত বেদনায় উদ্বেলচিত্ত লইয়া বহুক্ষণ বাণী সেই শয্যাতলে লুটাইয়া রহিল। মন্ত্রবীর্য্য-বশীভূত সর্পের ন্যায় তাহার অবস্থা ঘটিয়াছিল; একদিকে অদম্য আভিজাত্যাভিমান, অপর পক্ষে বেদমন্ত্রের মহাশক্তি—এই দুই প্রবল শক্তিতে আজ দেড়বৎসর ধরিয়া ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছে;—কেহ কাহারও কাছে পরাভূত হইতে চাহে না। কাজেই দীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরে হৃদয়-প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল। অহর্নিশ বিবেকে অহঙ্কারে মহাদ্বন্দ্ব চলিতেছে;—বিবেক বলে, কেন এমন করিলি? নিজেও মরিলি আমারও কুযশ রহিল।—অহঙ্কার, সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া, উত্তর দেয়, "রহিল তো রহিল; তা বলিয়া জমিদারের মেয়ে কি পুরোহিতের দাসী হইব নাকি?"—বিবেক যদি বলে, "তা দাসীই বা কেন; স্ত্রী কি দাসী? সেবায় তো নিজের সুখ! তা যদি সুখ না পাও—নাই করিতে, তা কি শুদ্ধ বিসর্জ্জন টা—"

'অহঙ্কার বুক ফুলাইয়া উঠে, "বেশ করিয়াছি! আমি ঠাকুরকে দেহমন দিয়াছি, মানুষ ইহা স্পর্শ করিবে! তাহাতে আবার সেই ভাতরাঁধা বামুন—না হয় পুজারি বামুনই হইল, কত আর তফাৎ?"' এই একটি সাফাইএর জোরে সে নিজের কাছে একটুখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু সহসা একদিন এ অহঙ্কারেরও পরাজয় ঘটিল; কথকতার কালে অকস্মাৎ আগুনাথের মুখ দিয়া বাহির হইল, "দেব প্রতিমায় প্রতিষ্ঠামন্ত্রে আমি আবির্ভূত হই; কিন্তু হে নারদ! মানবদেহ-প্রতিমায় আমি অনুক্ষণ বিরাজিত। অতএব নরদেবতায় আমার রূপ কল্পনাপূর্ব্বক আমার পূজা করিলেই আমাকেই পাইবে। পিতৃরূপে-মাতৃরূপে-স্বামী-মূর্ত্তিতে মানবগণ চৈতন্যরূপী আমাকেই অনুক্ষণ পূজা করিতেছে; তাঁহাদের স্থূলরূপের পূজা করে না।"—অন্ধকারে পথভ্রষ্ট পথিক অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণে চমকিয়া যেমন মুহূর্ত্তে পথরেখা স্থির করে, বাণীর পূর্ণসংশয়স্থলেই এই উত্তর যেন দেবতার প্রেরণারূপে আলো জ্বালাইয়া দিল। 'যিনি মন্দিরে দেবপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই তো এই মানবশরীরেও বিদ্যমান! তবে দেবতার পূজাদ্বারাই শুধু তো তাঁহার প্রসন্নতা লাভ সম্ভবেনা; মানবের অপমানে তো তাঁহারই অপমান ঘটিয়া থাকে! জনকজননী, আর স্বামীরূপে তিনি পূজা গ্রহণ করেন? সে যে তাঁহারই এক মূর্ত্তিকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে ভগবদ্রূপকল্পনায় তো কই পূজা করা হয় নাই! হায়! দ্বারের দেবতাকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে আর কাহাকে পাইতে চাহে?'

সে দিনকার কথার আর একবর্ণও তাহার কাণে ঢুকিল না। সে মন্ত্রজপের মতই বারম্বার এই শব্দ কয়টি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল। 'যদি প্রতিমায় তাঁর পূজা করি, তবে মানুষের মধ্যেই বা না করি কেন? সকল কর্ম্মের মাঝখানে সেই একই তান সেদিন তার প্রাণের তারে বাজিতে লাগিল। যদি মৃৎশিলায় বেদমন্ত্র দেবত্ব আনয়ন করিতে সক্ষম হয়, তবে সেই মন্ত্র মানবের মধ্যেও সেই শক্তির বিকাশ করিয়া তুলিতে কেন না পারিবে? পারে;—সে প্রত্যক্ষদর্শী; মন্ত্রের যে কি প্রভাব, সে তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। সে মন্ত্র মাটি-কাঠ-খড়-রাংতাকে একমুহূর্ত্তে বিশ্ববরেণ্য বিধাতায় পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম! ইহার বলে, সকল দ্বেষ-ঘৃণা-অবহেলা;—মৈত্রী-প্রীতি-সম্ভ্রমে কত অল্পকালের মধ্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা শুধু ভুক্তভোগিগণই অনুভব করিতে পারে;—আর কে বুঝিবে? আবাহন-মন্ত্রে শিব-লিঙ্গে এ যেন রজতগিরিসন্নিভ বিশ্বনাথের আবির্ভাব! বাণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হিন্দুর মেয়ে যে স্বামীর সহিত হাসিমুখে কেমন করিয়া জ্বলন্তচিতায় পুড়িয়া বিচ্ছেদের শাস্তি করিত, আজ তাহা বুঝিলাম। এ যে কি

অচ্ছেদ্য বন্ধন; ইহার কঠিন পাশে বাঁধা পড়িলে আর দেহমন কিছুই নিজের বলিয়া জ্ঞান থাকে না। সেই যে কালমন্ত্র—"মমব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু"—সেই অনুজ্ঞার সম্মোহনবিদ্যা-প্রভাবে লুপ্তচৈতন্যবৎ হইয়া পত্নী সেইদিনেই পতির হৃদয়ে হৃদয়, চিন্তায় বাক্যে চিন্তাবাক্য সমস্তই সঁপিয়া দেয়; তাহার আর স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না। তবে সে কেন এই শরীরযন্ত্রণা টুকু সহিতে পারিবে না; শরীর যে মনেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী ক্রীতদাস মাত্র!'

রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়া দেখিলেন, বাণী ঠাকুরমন্দির হইতে আসে নাই! খবর লইয়া জানিতে পারিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, সংকীর্ত্তনও শেষ হইয়াছে। তবে একা সেখানে সে কেন রহিল? জননী উদ্বিগ্নচিত্তে স্বয়ং কন্যার উদ্দেশে গিয়া মন্দিরের রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া খুলিতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, শ্বেতমর্ম্মর তলে লুটাইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! কৃষ্ণপ্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মাথার কাছে বসিলেন, একি! তাহার সোনার কমল ধূলিলুণ্ঠিত কেন? মার প্রা। কি একটা অজানা বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল। মুখনত করিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে গভীর স্নেহ-পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। মুদিত নেত্রপল্লব অশ্রুজড়িত, চোখের নিচে অশ্রুবিন্দুটি তখনও স্থূল মুক্তাটির ন্যায় টল টল করিতেছে। কৃষ্ণপ্রিয়ার চোখও এই দৃশ্যে ছল ছল করিয়া আসিল!—কেন এ অশ্রুজল! এদুটি পদ্মপলাশ অনেক শিশিরবর্ষণে অভ্যস্ত, তা তাঁহার অজ্ঞাত নয়; কিন্তু সে গাছের শিশির তো পৃথিবীর বুকেই নিত্য ঝরিয়া পড়ে!—আজ মায়ের বক্ষ ছাড়িয়া তাহা নীরবে পাষাণশয্যা ধৌত করিতেছে কেন? এতো অভিমানাশ্রু নহে—এ অশ্রু যে বেদনার! মাথাটা কোলে তুলিয়া ডাকিলেন, 'রাধারাণি!'—'মা'! বলিয়া বাণী চোখচাহিয়া উঠিয়া বসিল। "এখানে পড়ে কেন মা? মনে কি কষ্ট হয়েছে?" বাণী তখন সামলাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া হাসিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি আমায় খুঁজ্‌তে এসেছ? দেখ্‌ছিলাম, কি কর!"

কৃষ্ণপ্রিয়া বেশ বুঝিলেন, মেয়ে তাঁহার কাছে আত্ম-গোপন করিতেছে! ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজেই জামাইকে পত্র লিখিলেন, "তুমি কবে আসিবে? তোমায় দেখিবার জন্য আমরা সকলেই বিশেষ উৎসুক। শীঘ্র আসিও।" কয়েকদিন পরেই উত্তর আসিল, "আপনার আদেশপালনে বিলম্ব হইবে। মা! এখন বড় কাজের ঝঞ্ঝাট। যাওয়া সম্ভব নয়,—সন্তান বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন।" কৃষ্ণপ্রিয়া মনে মনে বলিলেন, "লক্ষণ শুভ নয়। ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। কর্ত্তাও সেটা যেন জানেন, নহিলে এমন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। জানিনা মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘট্‌বে!"

দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষণক্লান্ত আকাশে শরতের চাঁদ পূর্ণশোভায় দেখাদিয়া, শারদোৎসব সমাগত-প্রায়—এই সমাচার বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এমন সময় একদিন রাজনগরের জমিদার-গৃহে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল। আকস্মিক ভীষণ রোগে কৃষ্ণপ্রিয়া সোনারসংসার শ্মশান করিয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। স্বামী, সম্পদ, সন্তান পরিবৃত হইয়া—রোগভোগহীন এ মরণ রমণীমাত্রেরই ঈপ্সিত—সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুর এই অতর্কিত আগমন আত্মীয়স্বজন-গণের পক্ষে মর্ম্মান্তিক বেদনা ও পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। ভাল করিয়া সেবাযত্ন, খেদ মিটাইয়া চিকিৎসা; কিছুই হইল না! অকস্মাৎ ঝড়উঠিয়া যেন ভরাপালের বোঝাই নৌকাখানাকে উল্‌টিয়া দিয়া চলিয়া গেল;—সতর্কতার সময় বা উপায় কিছুই হইল না!

মরণনিশ্চিত হইয়াগেলে, পূর্ণসংজ্ঞা কৃষ্ণপ্রিয়া সকলকে ক্ষণেকের মত বিদায় দিয়া, কন্যাকে একবারের জন্য একা কাছে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা তখনি পূর্ণ করা হইল। বাণী ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সবাই চলিয়া যাইতেই সে মায়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, "কত কষ্ট দিয়েছি মা! সেসব কথা মনে করে আমি কেমন করে প্রাণধর্‌বো!" বলিয়া দুইহাতে মায়ের গলাটা জড়াইয়া তাঁহার ললাটে গাঢ় চুম্বন করিলেন! কৃষ্ণপ্রিয়া অজস্র অশ্রুধারে অভিষিক্ত মুখখানা, তাঁহার শীতলবক্ষের উপর শিথিলহস্তে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া, তাহার উপরে, দুইজ্যোতিহীন নেত্রতারকার মধ্য হইতে, সু-গভীর স্নেহদৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া, তেমনি স্নেহ-সান্ত্বনায় কহিলেন,—"কোন কষ্ট দাওনি মা; তোমায় পেয়ে কি নিধি পেয়েছি-লাম, তা কেবল সেই তিনিই জানেন—যিনি আমার শূন্য বুকে তোমায় পাঠিয়ে দিয়াছিলেন। তোমাদের রেখে যেতে

রাধারাণী দুইহাতে মায়ের গলাটা জড়াইয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার ললাটে গাঢ় চুম্বন করিলেন

পড়িলেই যেতে হবে। কেন সে আস্‌বে না? —আমায় বল্‌ বাণি! সেতো তেমন নয়। তুই কি আস্‌তে মানা করেছিস্?" তখন আপনার শোকাহত হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদযন্ত্রণা রোধ করিয়া সে মুখ তুলিল, "আজ আর, কি লুকাব মা! বারণ কেন?—প্রতিজ্ঞা করাইয়াছি, জীবনে কখনও আর আমার সঙ্গে দেখা হইবে না!"

"ভাল কর নাই, রাধারাণি!—বড় অন্যায় করিয়াছ। তা হোক্; ছেলেমানুষ, না বুঝিয়া যা করিয়াছ, তার আর চারা নাই! আমায় সব বলিলে, কোন্‌দিন মিটিয়া যাইত! আমার শেষকালের আশীর্ব্বাদ রহিল—সে তোমায় ক্ষমা করিবে; তুমি তাকে ডাকিয়া ক্ষমা চাহিও।" বাণী এতক্ষণ কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল, আর পারিলনা; —দুইহাতে মুখঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "সে হবে না মা! আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, যে এজন্মে কেউ কারু সঙ্গে সম্পর্ক রাখিব না!" "স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের প্রতিজ্ঞা, আবার প্রতিজ্ঞা কি! মহাপাতক হইয়াছে! তার সেবা করিয়া,—আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া, এপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিও। সে বড় ভাল; একদিন বুঝিবি, সে কত ভাল। তখন মনে

পার্‌ব, এর বাড়া আমার আর সুখ কি! আজ আমায় শেষচিন্তা থেকে শুধু মুক্ত করে দে—আমায় বল্‌, বাণি, অম্বর কি আর আস্‌বে না?"

মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় বাণীর সারাপ্রাণ তখন ফাটিয়া যাইতেছিল। মা, আজ জন্মের মতন, তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন; আর কিছুক্ষণ পরেই তাহার এই সর্ব্বদোষক্ষম, সর্ব্বংসহা, সর্ব্বানন্দময়ী জননী এপৃথিবীতে থাকিবেন না! একি মনে করিতে পারা যায়? সে দুইহাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাষাণবিদারী স্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"না মা, সে আসিবে না। তুমিও চলিলে?—মা তুমি যেওনা—যেওনা।"

"ছিঃ রাধারাণি!—এসময় কি মায়ায় ফেলিবার চেষ্টা করে? থাকা-যাওয়া তো কারু হাতধরা নয়;—ডাক

করিস্, মা ঠিকই বলিয়াছিল।—কেঁদো না মা; ইঁহাকে একবার ডাকিয়া আনো! আমি গেলে বড়ই কাতর হইবেন! তুমি আছ—সর্ব্বদা দেখিবে, জানি; তবু, সেই দশবৎসর বয়স হইতে আজ ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর, একদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয় নাই; বিদায়ের দিনে মনটা শূন্য বোধ হইতেছে! এসেছ? মাথায় পায়ের ধুলা দাও—আবার যেন তোমায় পাই! বড় সুখী হয়েছিলাম। তোমায় পাইলে, আবার পরলোকেও তেমনি সুখীই হইব। বাণীকে দেখো; অম্বরকে ফিরাইয়া এনো।—জেনো স্বামীভিন্ন মেয়েমানুষের অন্য কোন কিছুই বড় নয়—অন্যসুখ, অন্যকামনা, এমনকি অন্যদেবতাও তার থাকিতে নাই;—এই শিক্ষাই ওকে দিও। এখন একটু হরিনাম শোনাও। রাধারাণি!

একটু গঙ্গাজল মুখে দে। তুই আমার শুধুমেয়ে নোস, আমার ছেলেও ;—তুই শেষ কাজ কর।"

ভোরের আলো না ফুটিতে, সদাহাস্য-ধ্বনিমুখরিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ গভীরশোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া, বুকফাটা ক্রন্দন উঠিল। সে হাহাকারের একমাত্র স্ফুটধ্বনি—"মা! মা!! মা!!!"

ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদ

প্রসন্নময়ী রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া, একটু চলা-ফেরা আরম্ভ করিতেই, অজ্জা তাহার নিজ পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল। প্রসন্নময়ী ভাঁড়ারের দ্বারে বসিয়া উপদেশ দেন, সে ভিতরে বসিয়া তরকারি বানায়। রন্ধনশালার দ্বারে প্রসন্নময়ী পিঁড়ি পাড়িয়া, দেওয়ালে শরীররক্ষা করিয়া বসিয়া, লুচির লেচি কাটিয়া দেন,—সে আপনি বেলিয়া লইয়া ভাজিয়া তোলে। মৃগাঙ্ক বড় বিপদেই পড়িল। অজ্জার সহিত সহজে সাক্ষাৎ হয় না; হইলেও, সে যেন পাশ-কাটাইতে পারিলেই বাঁচে; কথাবার্ত্তার সুযোগ দিতেই চাহেনা!

দিদি, খোরা-পাথরে গরম দুধ ঢালিয়া, পাথার হাওয়ায় জুড়াইতে ছিলেন

একদিন আহারে বসিয়া মৃগাঙ্ক বলিল, "দিদি! এই কাহিল শরীরে তুমি ঠাণ্ডালাগাচ্ছ,—একি ভাল হচ্চে? আবার পাল্টে পড়্‌লেই মুস্কিল্।"

দিদি, খোরা-পাথরে গরম দুধ ঢালিয়া, পাথার হাওয়ায় জুড়াইতে ছিলেন—বলিলেন "রোগকে ভয়করিনে ভাই; ভয় তোদের ডাক্তার বদ্দিকে। রোগ হলে যে তোদের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মরিব, তাহারতো যো' নাই। রাজ্যের বড়িপাচন খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তুলিবি; তাই বড় ভয় হয়। নহিলে হিন্দুর ঘরের বিধবার আবার রোগ-মরণের ভয় কি!"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, যখন মরিতেই পাইবেনা, তখন মিছা কেন রোগে পড়্‌বে? কেন,—চিরকালই কি তোমায় খাট্‌তে হইবে? আর কেহ কিছুই কি পারে না?"

প্রসন্নময়ী এখনও সে প্রাণান্তসেবা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেকি কথা! আমি আর কি করি? সে-ই তো এখন সংসার মাথায় করে রেখেছে। আমি, এই যা তোর খাবার কাছেই একটু এসে বসি; বলি,—একলাটি খাবি! কি চাই—না-চাই একটু দেখ্‌তে হবে তো?"

"না, না—সে সব ঠিক হইয়া যাইবে; সে জন্য তুমি কেন ব্যস্ত হও? কাল হ'তে রাত্রে তুমি নীচে নেমো না।" "পাগল হইয়াছিস্! যতক্ষণ আছি, তোর এতটুকু অসুবিধা সহিবে না। এমন ঠুঁটা-বাঁদর হইয়া, বাঁচার চাইতে মরা ভাল।" মৃগাঙ্ক ক্ষুণ্ণচিত্তে আহার সমাধা করিয়া উঠিল; মনে মনে বলিল, "দিদিরা একটু কম ভালবাসিলে,

এক এক সময় মন্দ হয় না।” কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “বাইরের ঘর বড় ঠাণ্ডা ; নূতন হিমের সময়, সর্দ্দিতে মাথা বড় ভার হয়। ডাক্তার ঘোষ বলেগেলেন, একটা গরম ঘরে শুইতে। তাই মনে করিতেছি, নবীনদের বাড়ী আজ শুতে যাইব। ওদের ওখানে অনেকগুলি ঘর খালি পড়ে আছে।”

ভাই রাত্রে বাড়ীর বাহির হয় না, এ সংবাদ প্রসন্নময়ীর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কয়দিন ধরিয়াই ভাবিতেছিলেন, ‘বউএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানর ব্যবস্থা করিয়া দিই।’ আবার ভয় হইতেছিল যে, ‘যদি এই প্রস্তাব আবার তাহার মনে বাহিরের স্মৃতি টানিয়া আনে। না—কাজ নাই ; যেমন দিন যাইতেছে তাহাই যাক্। হয় ত অল্পে অল্পে আপনিই সব হইবে।’ ভাইএর এখনকার প্রস্তাবে, তাঁহার সদা-শঙ্কিত-চিত্ত ছাঁৎ করিয়া উঠিল ; ‘এ বুঝি আবার একটা নূতন ফন্দি!’ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “ঘরের অভাব কি? বউ যেঘরে শোয়, সেটা তো খুব ভাল ঘর। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্চি, দাঁড়া। বৌ,—ওবৌ, শুনে যা—”

মৃগাঙ্কের বড় লজ্জা করিতে লাগিল ; সে কিছুই না বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া, কিছুপরে চোরের মত পা টিপিয়া, সেই প্রস্তাবিত কক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে প্রদীপে তেলের আলো জ্বলিতেছে, খাটে মশারি ফেলা। আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে গৃহে প্রবেশ করিল। দিদির পায়ে একটা প্রণাম করিয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল। ব্যাপারটা যে এমন সহজ হইবে, এ আশা তাহার হয় নাই। কিন্তু বড় লজ্জা করিবে, সে কি বলিবে না জানি! সহসা খাটের মধ্যে নজর পড়িল,—একজনের বালিস দেওয়া আছে। বিরক্ত হইয়া ফিরিতেই, দেখিল সম্মুখে অজ্ঞা ; তাহার হস্তে একটা জলপূর্ণ গ্লাস্ ; সে বোধ হয় এই ঘরেই সেটা রাখিতে আসিতেছিল। এই অতর্কিত সাক্ষাতে, বোধ হয় দুজনের বক্ষেই শোণিতস্রোত বেগে বহিয়া গেল। অজ্ঞা গ্লাস্‌টা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ ফিরিতেছিল ; দাঁতে দাঁতে চাপিয়া, তীক্ষ্ণস্বরে মৃগাঙ্ক ডাকিল, “শুনে যাও।”—তারপর ক্রোধ দমন করিয়া, সহাস্য মুখে কাছে আসিল ; “কি! ভূত দেখেছ নাকি? পালাও কেন? এসো না ;—একটু গল্প করা যাক্।”

অজ্ঞা নতমুখ উত্তোলন করিয়া, তাহার মুখে দিকে চাহিতে গেল ; কিন্তু সে সাগ্রহদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া, তাহার দৃষ্টি আপনিই নামিয়া আসিল। চঞ্চল ও গোপন ভাবে মৃদুহাসিয়া সে কহিল, “আমার এখন মরিবার সময় নাই, তা গল্প করিব কি! অনেক কাজ বাকি আছে ;—যাই।” “ভারি তো কাজ ;—ছাই কাজ। সে হ’বে না ; বড় পালিয়ে বেড়াও যে? আমি ওসব চালাকি বুঝি। তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?”—“না”, বলিয়া অজ্ঞা যেমন ফিরিতে গেল, অমনি তাহার স্বামী অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল। “বুঝিয়াও কি তুমি বুঝিবে না? অজ্ঞা!—” অজ্ঞা হাত ছাড়াইয়া লইল, “এ আবার কি! আমি এ সব ভালবাসি না—।” মৃগাঙ্কমোহনের মুখ মুহুর্মুহু আরক্ত হইয়া ম্লান হইতে ছিল ; সে কাতরভাবে আর একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, “আমি তোমার কাছে মহাঅপরাধী, সত্য। তা বলে কি আর, ক্ষমা করা যায় না? দেখ, তোমার জন্যই, আবার মানুষ হব মনে করেছি।” অজ্ঞার শান্ত নেত্রে গভীর আনন্দ ব্যক্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে—স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—“এত ভাগ্য কি আমার হইবে?”—‘কিন্তু না, ব্যস্ত হইলে চলিবে না। বাঘ বশকরিতে, ফাঁদও বেশ দৃঢ় হওয়া চাই। যদি যথার্থই তাঁহার সেই ভাব মনে জাগিয়া থাকে, তবে একদিন দুদিন বিলম্বে চলিয়া যাইবে না।—আর, তা যদি না হয়, তবে সে ক্ষণেকের নেশা যাওয়াই ভাল। এ অবস্থা একরকম সহিয়া গিয়াছে ; একদিনের রাজভোগ সুখের পর, চিরদারিদ্র্য অসহ্য হইবে ;—না?’

দৃঢ়স্বরে সে কহিল, “আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ; সেতো তুমি জানই! আমার বাবার তুমি খুব উপকার করেছ ; আমাকেও খাইতে পরিতে দিতেছ। আমার মনে তোমার উপর একটুও রাগ নাই। বন্ধুত্ব চাহনা বল্‌তেছিলে, তাই দেখাশোনা করি না। চাহ যদি, তা হ’লে—”

রাগে জ্বলিয়া মৃগাঙ্ক কহিল, “না—আমি তোমার বন্ধুত্ব চাইনে! তোমার খুসী হয় রাগ করিও। আমি তোমায় কৃতজ্ঞ হতে কখনও বলেছি? ইচ্ছা নাহয়, দেখাশোনা করিও না ; আমার তাহাতেও দিন কাটিবে। যাও তুমি—যাও।”

অজ্ঞা নিঃশব্দে চলিয়া গেলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিয়া, ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, “শোন—

এসো—যেও না”। কিন্তু অন্ধকার বারান্দার কোনদিকে সে মিশিয়া গেল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

অজ্ঞার সেদিনের ব্যবহারে, মৃগাঙ্কের মনে মনে ভারি রাগ হইল।—‘হইলই বা সে দোষী? তাই বলিয়াই, অজ্ঞার বারে বারে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় না!’ কয় দিন, মনের মধ্যের একটা অভিমানে, সেও তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিল না। একবার মনে করিল, ‘দূর হোক; ইহার প্রতিশোধ তো হাতেই রহিয়াছে। জোহরার কি মিষ্ট গলা!’ কিন্তু বন্ধুর দল আবার যখন, তাহাদের সমুদয় সম্মোহনশক্তি বিস্তার করিয়া, প্রবলভাবে প্রলোভিত করিতে আসিল—তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে, সেই স্বেদসিক্ত কুঞ্চিতালক-তলে সুদীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্মে অৰ্দ্ধাবরিত, সরল দুটি নেত্র মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া—নিজেকে জয়ী করিয়া তুলিল। জোহরার হীরার দুল-দোলান ঝাপ্‌টাপরা মুখ, তার কাছে বড় ম্লান প্রতিভাত হইতেছিল।

কিন্তু সময় আর কাটে না! প্রমোদ-যামিনী নিঃসাড়ে কাটিয়া যায়; মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন একান্ত আনন্দহীন—অলস! পুরাতন খাতা খুলিয়া, একদিন সে ‘অতীত জীবন’ নাম দিয়া, একটা কবিতা লিখিল। তারপর “পল্লীযুবক” নামে যে প্রবন্ধটা লিখিয়া সে একটা মাসিক-পত্রে পাঠাইয়া ছিল, অনেকগুলা কাগজ সেটার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়া—তাহাকে এক দিনেই সাধারণের পরিচিত ও যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এছটাই তাহার নিজের পূর্ণ-অভিজ্ঞতার ফল। প্রতি সংবাদপত্র-সম্পাদক, তাঁহাকে নিজের “নিজস্ব লেখক”করিয়া তুলিবার জন্য, বিশেষ যত্ন দেখাইয়া পত্র লিখিলেন। একখানা সুপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিকের সহকারীর কার্য্য-ভার লইবার জন্য বিনীত নিবেদনও আসিল। কিন্তু এ সব কিছুই ভাল লাগেনা! ‘যাহার জন্য এ পূজা-আয়োজন, সে যদি ইহা না গ্রহণ করিল তবে নামই বা কি, আর যশই বা কি? আগে তাহাকে চাই; তারপর আর যা হয়, সে উপরি পাওনা।’

জগতে একশ্রেণীর লোক আছে,—তাহাদের পতনশক্তি যেমন প্রবল, উত্থানশক্তিও তেমনই সতেজ। যখন যেদিকে তাহারা ঝোঁক দেয়, সেইদিকেই তাহারা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ছাড়ে! মৃগাঙ্কও সেই দলের লোক। সে যতখানি নামিয়া গিয়াছিল, উঠিতে আরম্ভ করিতেই, ঠিক ততখানি বেগের সহিত উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ভিতর

সেটা খুলিয়া ফেলিতেই গৃহমধ্যস্থ আলোকে সেই বাক্সমধ্যে একটা বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত কণ্ঠাভরণ ঝকমক্ করিয়া উঠিল

হইতে বাহির অবধি, সমস্তই আজ নূতন করিয়া গড়িবে,—এই ইচ্ছা। তাই, পূর্ব্বচিহ্নের কিছু বাকি রাখিবে না, এই সঙ্কল্প করিয়া, চারিদিক দিয়াই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়া-দিল। বৈঠকখানার নারীচিত্রগুলা, একদিন ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিল। আল্‌মারি খুলিয়া অনেক-

গুলা কাঁচের বাসন টানিয়া ফেলিয়া দিল। খানসামাটাকে বক্‌শিস্ সহ মাহিনা চুকাইয়া বিদায় দিল। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, বহুদিনের অসংস্কৃত অন্দরমহলে রাজ-মিস্ত্রিরা ভারা বাঁধিতেছে!—অবশ্য ইহার ফলে, তাহাকে কিছু পাপানুষ্ঠানও করিতে হইল; কারণ, অনেকগুলো বাদুড়-চামচিকা ও শালিক-চড়াই এতদুপলক্ষে গৃহহীন হইয়াছিল। শয়নগৃহ, সে ইচ্ছা করিয়াই অজ্ঞাকে ফিরাইয়া দেয় নাই। একদিন কি দরকারে, তাহার অবর্ত্তমানে, অজ্ঞা সেই প্রবেশ করিয়া, অবাক হইয়া গেল!—ঘরের দেওয়ালের জলতায় গোলাপী ফুল ধরিয়াছে। বার্ণিস্ করা খাটে, র দেওয়া মশারির মধ্যে, পুরু গদির উপর নূতন ও ধব্‌ধবে বিছানাপাতা। একধারে শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর সুতার কাজ দেওয়া শুভ্র আস্তরণ, তদুপরি একটা খেলেনার বাক্স, কতকগুলা এসেন্সের শিশি; খান-কয়েক কেদারা সেটাকে ঘেরিয়া আছে। আরও, গৃহশয্যার টুকিটাকি, কত কি যে এখানে সেখানে সাজানগুছান, সে সব ভালকরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। হয় ত কোন্ মুহূর্ত্তে মৃগাঙ্ক আসিয়া পড়িয়া, মনে মনে হাসিয়া, ভাবিবে—'গরীবের মেয়ে; কখনও তো কিছু দেখে নাই, তাই, এসব দেখিয়া, তাহার তাক্ লাগিয়াছে!' সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ, বালিসের তলায় অর্দ্ধ আবরিত একটা কি জিনিস দেখিয়া, কৌতূহল জন্মিল। 'কি এখানে?' বলিয়া সে ছোট একটা রঙ্গিন বাক্স টানিয়া বাহির করিল। তাহাতে একটি হুক্ লাগান; সেটা খুলিয়া ফেলিতেই, গৃহমধ্যস্থ আলোকে সেই বাক্সমধ্যে একটা বহুমূল্য প্রস্তরখচিত কণ্ঠাভরণ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল! সেটার নীচে সোনালি-অক্ষরে লেখা—"শ্রীমতী অজ্ঞা দেবী!" চোর, চুরি করিতে গিয়া, হঠাৎ বিবেকের তাড়নায় যেমন জড়সড় হয়, সেও তেমনি করিয়া তৎক্ষণাৎ বাক্সটা বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তারপর, জিনিষটা যথাস্থানে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আশায়, আনন্দে, লজ্জায় তাহার বুক গুরুগুরু কাঁপিতেছিল। গহনাটার দিকে চোখতুলিয়া চাহিয়াও দেখে নাই; কিন্তু ওইযে সোনার জলের ছাপা কয়টি অক্ষর,—উহার মূল্য যেন তাহার নিকট সাত-রাজার ধনের ন্যায় অমূল্য! সে কয়টি, যেন ছাপার কলের চাপে, তাহার বুকের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সে সজলনেত্র উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া, যেন সেই অজ্ঞাত-সুখদাতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাধারা ঢালিয়া দিয়া, কহিল, "জন্মদুঃখী অজ্ঞার অদৃষ্টে কি এত সুখ লিখেছ ঠাকুর? আমার যে এ বিশ্বাস হচ্চে না—যে এসব আমারই জন্য!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আদর্শ-বিদ্যালয়।

অনেক দেখে—অনেক ভেবে—
ঠিক করেছি মহাশয়,
'গ্রীণ্-উইচে' খুল্‌বো আমি
আদর্শ এক বিদ্যালয়।
গ্রীক্ কি ল্যাটিন্-সংস্কৃত
আরেবিক্ কি ইংরাজী,
হিন্দি-ফ্রেঞ্চ্-জার্ম্মান্-হিব্রু
শিখাইতে গররাজি।

একটা কোন বিশেষ ভাষায়
কর্‌তে গেলে শিক্ষাদান,
বেজায় তাতে থাক্‌বে যে গো
সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান!
এস্‌পার্ণাটো,—বায়োস্কোপে,—
শিক্ষা দেওয়া শক্ত নয়;
নূতনতর মৌলিকতা
নাইক তাতে, এই যা ভয়।

'ট্যাবলো'তে ভাবশিক্ষা দিবে
কোবিদ্ মানসরঞ্জনী ;
স্তব্ধ হবে আমেরিকা—
ফরাসী ও জার্ম্মানি।
সে আশ্রমে পড়্তে পাবে
হটেন্‌টট্-মুর-কাফ্রী-গ্রীক্,
হিন্দুরও নাই নিষেধ সেথা—
না হয় যদি পৌত্তলিক।
হবে সেথায় সকল শ্রেণীর
শিক্ষকের এক সমন্বয়,
পড়াইবে পাদ্রী 'গীতা',
'বাইবেল' পণ্ডিতমহাশয়।
ছাত্রগণের যজ্ঞসূত্র
দিবেন স্বয়ং মৌলভি,
উঠ্‌বে একটা নূতন ধরণ
সমন্বয়ের সৌরভই।
সঙ্গীত-চর্চ্চা যাচ্ছে উঠে—
হয়েছে তাই মস্ত ভয়,
* 'হরিপদ'র ধ্রুপদ-শিক্ষক
বুঝি সেথায় কর্‌তে হয়।
সেথায় ছাত্র 'ব্রহ্মচারী'—
পর্‌বে কৌপীন-কন্থা-ডোর,
পলাশদণ্ড হস্তে লয়ে
ঘুরাইবে দিন্‌টী ভোর।
ছাত্রদিগের বিশেষকিছু
সঙ্গে আনার হুকুম নাই—
কেবল দুখান 'এরোপ্লেন্', আর
'মোটর্ কার্'টা সঙ্গে চাই।
শিখ্‌তে সংযম-কর্‌বে ভিক্ষা
জীবিকা তার অর্জ্জনে,
মত্ত থাক্‌বে 'সেন্ সেন্' † এবং
হরিতকী চর্ব্বণে।
পাউরুটী আর 'মুক্ষির পিটা' ‡
মোচারঘণ্ট শুক্তুনী,
সাথে কিছু কোর্ম্মা-কাবাব
হবে নিত্য বণ্টনই।
বিশুদ্ধ সব আহার পাবে,
কিন্তু হবে নির্ব্বিকার,—
আপত্তিহীন সকল খাদ্যে—
যেটা আদত্ মত গীতার।
'শর্ম্মা' লিখ্‌বে সকল ছাত্র
হক্ না আরব্ কি জার্ম্মান,
সবাই পর্‌বে গলায় পৈতে
তবেই কর্‌বো শিক্ষাদান।
মসজিদ্-গির্জ্জা টেবর-নেকল্
মন্দিরাদি এককরে,
রচ্‌বো একটা ভজনালয়
একেবারে ঝর্‌ঝরে।
সেথা কেবল রবিবারেই,
'অজু'করে পঞ্চবার,
চক্ষুমুদে কুশাসনে
হরির ধ্যানটী কর্‌বে সার।
স্পিরিট্-ঘৃত-দর্ভ লয়ে
কর্ত্তে হবে 'হোম'টা রোজ,
নিষেধ নাইক খায় যদি কেউ—
গঙ্গাজল্‌টা দুএকডোজ্।
কর্‌বে দিব্য সকল ছাত্র
নিরাকারের সম্মুখে,
বিবাহ কেউ কর্‌বে না ক—
বিধবা বই অন্যকে।
শাস্ত্রের 'দোহাই' দেশের প্রথা—
বামুনগুলার বুজ্‌রুকি,
মাতাপিতার আদেশবাণী—
'ব্রহ্মচারী' শুন্‌বে কি ?
'দেশ ও সমাজ' 'জাত ও ধর্ম্মে'
থাক্‌বে না আর বিসম্বাদ,
সহায় হউন বিদগ্ধজন—
লউন প্রণাম—আশীর্ব্বাদ !

—কপিঞ্জল।

* D. L. Royর 'হরিপদ'র ধ্রুপদ' পড়ুন।
‡ PIGEON PIE † SEN SEN

বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানশিক্ষা ৮

বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নাই, এইরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। অবশ্য, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার তুলনায়, বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হইবারই কথা: তবে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি যে একেবারে নাই, একথা বলা চলিবে না। বাঙ্গালায় আজ পর্য্যন্ত কতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রন্থগুলি কোন্ কোন্ বিজ্ঞানভুক্ত—এ সংবাদ লেখকের মত, অনেকেই জানিতে চাহেন। আমি কয়েকখানি পুস্তকের তালিকা সম্মুখে রাখিয়া, নিম্নলিখিত তালিকাখানি প্রস্তত করিয়াছি। অনেক পুস্তক বোধ হয় বাদ পড়িয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক সন্ধান রাখেন, তাঁহারা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংবাদ দিলে বাধিত হইব।

(১) এলোপ্যাথি ও সাধারণ চিকিৎসা।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ বা প্রদাহ—	রামনারায়ণ দাস
ইরিটেশন্ বা উত্তেজন—	রামনারায়ণ দাস
উপদংশ ও প্রমেহ চিকিৎসা—	চণ্ডীচরণ পাল
ওলাউঠা (এলোপ্যাথি)—	সুরেশচন্দ্র সরকার
কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা—	শশিভূষণ দে
কুইনাইন্—	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
ক্রোমোপ্যাথি বা বর্ণ-চিকিৎসা—	জ্বালাপ্রসাদ ঝা
খাদ্য—	চুণীলাল বসু
খোকার মা—	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গুর্ব্বিণী-বান্ধব—	হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিকিৎসা বা প্রেস্কৃপসন্-বুক—	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
চিকিৎসক-রত্নাবলী—	রাধাবিনোদ হালদার
চিকিৎসা-তত্ত্ব ১ ভাগ—	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান ১ ভাগ—	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
চিকিৎসা-রত্ন—	দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন
চিকিৎসা সার-সংগ্রহ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ শিশুচিকিৎসা—	মহেশচন্দ্র ঘোষ
৪র্থ ভাগ মেলেরিয়া—	মহেশচন্দ্র ঘোষ
জগবন্ধুর প্রেসক্রৃপসন-সংগ্রহ—	বিনোদবিহারী দাস
জীবন-রক্ষা ১ম ভাগ—	সর্ব্বানন্দ মিত্র
জ্বর চিকিৎসা—	গদাধর সরকার
ডাক্তারি-শিক্ষা—	নগেন্দ্রনাথ সেন
ধাত্রীবিদ্যা—	রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
ধাত্রীশিক্ষা ও প্রসূতি-শিক্ষা—	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
ধাত্রীসহচর—	সুরথচন্দ্র বসু
পারিবারিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ—	নন্দলাল মুখোপাধ্যায়
পারিবারিক সুস্থতা—	অন্নদাচরণ কাস্তগিরি
পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান বা ড্রগিষ্টস্ হ্যাণ্ডবুক্—	রামচন্দ্র মল্লিক
প্রসব-বেদনা চিকিৎসা—	বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্লেগ—	রাধাগোবিন্দ কর
ভিষগ্বন্ধু—	রাধাগোবিন্দ কর
ভিষক-সুহৃৎ—	রাধাগোবিন্দ কর
ভৈষজ্য-রত্নাবলী—	দুর্গাদাস কর
ভৈষজ্যবোধ—	সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ
মাতার প্রতি উপদেশ—	কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যালেরিয়া—	সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত
ম্যালেরিয়া জ্বর-চিকিৎসা—	অম্বিকাচরণ রক্ষিত
যকৃত, প্লীহা, মূত্র, পিত্তাদি যন্ত্রসকলের পীড়া—	ফজলর রহমান
প্রসূতি-শিক্ষা নাটক—	প্রমথনাথ দাস
যকৃতের পীড়া—	দ্বারকানাথ গুপ্ত
যুবকযুবতী—	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
যুবতী-জীবন—	ঐ
রসায়ন-চিকিৎসা—	ভুবনচন্দ্র বসাক
রোগনির্ণয়-তত্ত্ব—	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
রোগ-পরীক্ষা—	সুরথচন্দ্র বসু
রোগী-পরিচর্য্যা	রাধাগোবিন্দ কর

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
বঙ্গে ম্যালেরিয়া—	রাজকৃষ্ণ মণ্ডল
বসন্ত-তত্ত্ব—	চারুচন্দ্র বসু
বসন্তরোগ—	চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বসন্তরোগ চিকিৎসা—	রাজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
বালক্ষেত্র ভৈষজ্য—	ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত
বিশ্ববিষ-চিকিৎসা—	হরিমোহন সেন গুপ্ত
বিসূচিকা চিকিৎসাতত্ত্ব—	কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
বেরিবেরি—	চারুচন্দ্র ঘোষ
শরীর-তত্ত্ব-সার—	রাধানাথ বসাক
শরীর-ব্যবচ্ছেদ ও শরীর-তত্ত্বসার—	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শারীর-স্বাস্থ্যবিধান—	চুণিলাল বসু
শিশু-চিকিৎসা—	বিপিনবিহারী মিত্র
শিশু-পালন—	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শিশুপালন সম্বন্ধে পিতামাতার প্রতি উপদেশ—	হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুশ্রূষা—	শ্যামাচরণ দে
সমন্বয় (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)—	সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
সরল গৃহ-চিকিৎসা—	যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সরল ধাত্রী-চিকিৎসা	সুন্দরীমোহন দাস
সরল ভৈষজ্য-তত্ত্ব—	সত্যকৃষ্ণ রায়
সর্পদংশন-চিকিৎসা—	রাজেন্দ্রলাল রায়
সর্পাঘাতের চিকিৎসা—	কেশবলাল রায়
সংক্ষিপ্ত শারীর-তত্ত্ব—	রাধাগোবিন্দ কর
স্তন্যপায়ী—	মথুরানাথ বর্ম্মণ
স্ত্রীচিকিৎসা—	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র
স্ত্রীচিকিৎসা ও শিশু-চিকিৎসা—	প্রসাদদাস গোস্বামী
স্ত্রীরোগচিকিৎসা —	কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য
স্বাস্থ্য ও পীড়ার কারণতত্ত্ব—	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র
স্বাস্থ্য-রক্ষা—	দেবেন্দ্রনাথ রায়
"	ভরতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
"	রাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি—	রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধান—	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—	অপ্রকাশিত
সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ (Unipathy)—	বিপিনকৃষ্ণ বটব্যাল

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
(২) হোমিওপ্যাথি	
অস্ত্র-চিকিৎসা (হোমিওপ্যাথি)—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
অক্ষি-চিকিৎসা—	কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য
(ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথিক্ ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাতত্ত্ব—	হরিপ্রসাদ মজুমদার)
ওলাউঠা, আমরক্ত ও উদরাময় চিকিৎসা—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
ওলাউঠা-চিকিৎসা—	অঃ সারদারঞ্জন রায়
ঐ	ডাঃ রামচন্দ্র ঘোষ
ওলাউঠা-চিকিৎসা—	অতুলকৃষ্ণ দত্ত
ওলাউঠা-চিকিৎসা —	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
ওলাউঠা—	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ঔষধগুণ-সংগ্রহ—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
কলেরা-শিক্ষা—	সুরথচন্দ্র মিত্র
গৃহ-চিকিৎসা—	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী
চিকিৎসা-তত্ত্ব—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
চিকিৎসা-বিধান— ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ, ৫ম ভাগ	চন্দ্রশেখর কালী
চিকিৎসা-তত্ত্ব—	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী
চিকিৎসা-প্রকরণ—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
চিকিৎসা-সোপান—	রাধাকান্ত ঘোষ
জ্বর-চিকিৎসা—	অতুলকৃষ্ণ দত্ত
টাইফয়েড্ জ্বর-চিকিৎসা—	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
নিউমোনিয়া চিকিৎসা—	ঐ
ধাতুদৌর্ব্বল্য—	ক্ষেত্রনাথ ঘোষ
পারিবারিক-চিকিৎসা—	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
বাইও-কেমিক্ চিকিৎসা—	ইউ. এন্. সামন্ত
বাইও-কেমিক্ মেটিরিয়া-মেডিকা —	ঐ
বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা—	চন্দ্রশেখর কালী
বৃহৎ গৃহ-চিকিৎসা—	ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বেলের ডাইরিয়া (বঙ্গানুবাদ)—	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র
ব্যবস্থা-সোপান—	বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা—	শশিভূষণ রায়চৌধুরী
ভেষজ-বিধান—	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ ১ম ও ২য় ভাগ—	ঐ ঐ
ভৈষজ্য-তত্ত্ব (সরল)—	রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মেটেরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স্—	অতুলকৃষ্ণ দত্ত
শিশু-চিকিৎসা—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
শিরঃপীড়া-চিকিৎসা—	রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সরল চিকিৎসা-প্রণালী—	শশিভূষণ রায়চৌধুরী
সংক্ষিপ্ত হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞান—	বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়
সদৃশ-বিধান-চিকিৎসা—	রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—	চন্দ্রশেখর কালী
সৌদামিনীর ধাত্রীশিক্ষা এবং গর্ভিণী ও প্রসূতি-চিকিৎসা—	মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
সৌদামিনীর শিশু বালক ও বালিকা চিকিৎসা—	ঐ ঐ
স্ত্রী-চিকিৎসা—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
স্ত্রী-চিকিৎসা—	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সোপান—	অম্বিকাচরণ রক্ষিত
হোমিওপ্যাথিক প্রথম গৃহ-চিকিৎসা—	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
ঐ	—এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং
ঐ	—লাহিড়ী এণ্ড কোং প্রভৃতি
হোমিওপ্যাথিচিকিৎসা-দর্পণ—	বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোং

(৩) আয়ুর্ব্বেদ।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা (অনুবাদ) ১ম ও ২য় ভাগ—	বিনোদলাল সেন
আয়ুচর্চ্চা—	নগেন্দ্রনাথ সেন
আয়ুর্বর্দ্ধন ১ম ও ২য় ভাগ—	আনন্দ চরণ কান্তগিরি
আয়ুর্বিজ্ঞান—	গুরু গোবিন্দ সেন
আয়ুর্ব্বেদ-চন্দ্রিমা—	হরলাল গুপ্ত
আয়ুর্ব্বেদ-প্রদীপ—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন
আয়ুর্ব্বেদ-প্রবেশ—	রামচন্দ্র ঘোষ
আয়ুর্ব্বেদ-ভাষাভিধান—	হরলাল গুপ্ত
আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ—	ভুবনচন্দ্র বসাক
আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন
আয়ুর্ব্বেদ-সোপান—	রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
আয়ুস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান—	বিনোদলাল সেন
আর্য্যগৃহ-চিকিৎসা—	বিনোদলাল সেন
কবিরাজ-ডাক্তার সংবাদ—	জগবন্ধু মোদক
কবিরাজি-শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ –	নগেন্দ্রনাথ সেন
গুরুশিষ্য-সংবাদ—	শীতলচন্দ্র সেন চক্রবর্ত্তী
চরক-সংহিতা (অনুবাদ)—	বঙ্গবাসী প্রেস
ঐ	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন, প্রভৃতি।
চিকিৎসা-দর্শন—	হারাধন শর্ম্মা
চক্রদত্ত সংগ্রহ (অনুবাদ)—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি
দ্রব্যগুণ—	বিবিধ
নিদান—	উদয়চাঁদ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক,
ঐ	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন
নিদানম্—	রামব্রহ্ম সেন
নিদান তত্ত্ব—	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
পরিভাষা-প্রদীপ—	হরলাল গুপ্ত
পরিভাষা-প্রদীপ—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন
পাচন-সংগ্রহ—	বসন্তকুমার রায়, হরলাল গুপ্ত,
ঐ	নগেন্দ্রনাথ সেন
ঐ	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি।
পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ—	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রয়োগ-চিন্তামণি—	কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
ভৈষজ্যরত্নাবলী, (গোবিন্দ দাস)—	হরলাল গুপ্ত, প্রভৃতি
ভৈষজ্যরত্ন—	কালীমোহন সেনগুপ্ত
মুষ্টিযোগ-সংগ্রহ—	গণনাথ সেন প্রভৃতি
রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি
রসেন্দ্র-চিন্তামণি—	উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
রোগিচর্য্যা—	নগেন্দ্রনাথ সেন
বনৌষধি দর্পণ— ১ম ভাগ, ২য় ভাগ—	বিরজাচরণ সেনগুপ্ত

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ভাব-প্রকাশ (অনুবাদ)—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন
সিদ্ধ-মুষ্টিযোগ—	হরলাল গুপ্ত
সুশ্রুত-সংহিতা (অনুবাদ)—	নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত,
ঐ	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন,
ঐ	অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
সুশ্রুত ও হ্যানিমান্—	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শার্ঙ্গধর (অনুবাদ)—	দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি

(৪) রসায়ন (CHEMISTRY)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
জল—	চুণিলাল বসু
নব্যরসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—	প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
রত্নপরীক্ষা—	যোগেশচন্দ্র রায়
রসায়ন—	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রসায়ন—	যাদবচন্দ্র বসু
রসায়ন-পরিচয়—	নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
রসায়ন-বিজ্ঞান—	কানাইলাল দে
রসায়ন-বিজ্ঞান—	রামচন্দ্র দত্ত
রসায়ন শিক্ষা—	রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
রসায়ন-সারসংগ্রহ—	প্রিয়নাথ সেন
রসায়ন-সূত্র—	চুণিলাল বসু
বায়ু—	চুণিলাল বসু

(৫) পদার্থবিদ্যা (PHYSICS) ও সাধারণ বিজ্ঞান।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার—	জগদানন্দ রায়
দর্শন ও বিজ্ঞান—	মহেশচন্দ্র মজুমদার
পদার্থ-দর্শন—	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
পদার্থ-বিজ্ঞান—	কানাইলাল দে
পদার্থ-বিদ্যা—	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
পদার্থ-বিদ্যা—	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রকৃতি—	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রকৃতি-পরিচয়—	জগদানন্দ রায়
বৈজ্ঞানিকী—	জগদানন্দ রায়
মায়াপুরী—	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
বস্তুবিচার—	রামগতি ন্যায়রত্ন
বিজ্ঞান-কুসুম—	জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
বিজ্ঞান-কুসুম—	সূর্য্যকুমার অধিকারী
বিজ্ঞান-রহস্য—	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৬) শিল্প (TECHNOLOGY)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা—	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
আলুর চুড়ি—	সতীশচন্দ্র সরকার
এতদ্দেশে লাভকর নূতন কল-কৌশলের কথা—	সতীশচন্দ্র মিত্র
কারিকর-দর্পণ—	বিহারীলাল ঘোষ
কার্য্যকরী-শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী—	সতীশচন্দ্র রায়
ঘড়ী-মেরামতী-শিক্ষা—	হীরালাল ঘোষ
চিত্র-বিদ্যা—	আদীশ্বর ঘটক
চিত্র-বিজ্ঞান—	গিরীন্দ্রকুমার দত্ত
ছায়াবিজ্ঞান—	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
ট্রেড্‌সিক্রেট্ বা বিদেশী-বাণিজ্য রহস্য—	ভৈরবদাস পাটাওরী
তাঁত—	কেদারনাথ দাস গুপ্ত
ধনবান হইবার সহজ উপায়—	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রিণ্টার্স-গাইড—	বিহারীলাল ঘোষ
ফটোগ্রাফি-শিক্ষা—	আদীশ্বর ঘটক
মৎস্যের চাস—	নিধিরাম মুখোপাধ্যায়
মৎস্যের চাস—	সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী
মহাজনসখা বা ব্যবসা-শিক্ষা—	সন্তোষনাথ শেঠ
মহাজনী-গাইড্—	দুর্গাচরণ শর্ম্মা
ফনোগ্রাফী —	দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
ফনোগ্রাফী অর্থপুস্তক—	ঐ ঐ
বস্ত্রবয়ন-শিক্ষা —	রামাচরণ বসু
ব্যবসা-শিক্ষা—	শশিভূষণ দে
শিল্পশিক্ষা—	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
শিল্পশিক্ষা-প্রণালী—	অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শিল্প-বিজ্ঞান—	সুধাকৃষ্ণ বাগচি
সূচি-শিল্প—	মিসেস এ, সি, মুরাট
স্বাধীন জীবিকা বা শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতি—	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
হাজার জিনিস—	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৭) কৃষি (AGRICULTURE)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
আদর্শ কৃষি —	শশিভূষণ গুহ
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	প্রবোধচন্দ্র দে
উদ্ভিজ্জীবন—	প্রবোধচন্দ্র দে
কলম-প্রণালী—	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
কার্পাস-কথা	প্রবোধচন্দ্র দে
কার্পাস-চাস—	নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
কীট-কৌতুক (রেশম ও তসর কীট)—	মহেশচন্দ্র তর্কবাগীশ
কৃষিক্ষেত্র ১ম ও ২য় ভাগ—	প্রবোধচন্দ্র দে
কৃষিতত্ত্ব—	নীলকমল শর্ম্মালাহিড়ী
কৃষিতত্ত্ব ১ম ভাগ—	হারাধন মুখোপাধ্যায়
২য় ভাগ—	ঐ
৩য় ভাগ—	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
৪র্থ ভাগ—	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৫ম ভাগ—	ঐ
৬ষ্ঠ ভাগ—	ঐ
কৃষিদর্পণ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ —	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
কৃষিদর্শন—	গিরিশচন্দ্র বসু
কৃষিপদ্ধতি—	উমেশচন্দ্র গুপ্ত
কৃষিপাঠ—	প্যারীচাঁদ মিত্র
কৃষিপ্রবেশ—	কালীময় ঘটক
কৃষিবন্ধু —	হরিচরণ দাস
কৃষিবিজ্ঞান—	প্রসন্নকুমার পণ্ডিত
কৃষিশিক্ষা—	কালীময় ঘটক
কৃষি-সোপান—	গিরিশচন্দ্র বসু
গোলাপ-বাড়ী—	প্রবোধচন্দ্র দে
তূলার চাস—	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দেশী সব্জী-চাস—	উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
পশুখাদ্য—	প্রবোধচন্দ্র দে
পাট বা নালিতা—	দ্বিজদাস দত্ত
ফলকর—	প্রবোধচন্দ্র দে
ফুলওয়ারি বা মালঞ্চ—	ঐ
ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য কি ?—	ঐ
মৃত্তিকা-তত্ত্ব—	ঐ
রেশম-তত্ত্ব—	শশিশেখর রায়
রেশম-বিজ্ঞান—	নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
বিলাতী সবজী চাষ—	মন্মথনাথ মিত্র
ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ—	হেমচন্দ্র দেব
শর্করা-বিজ্ঞান—	নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
সরল কৃষিবিজ্ঞান—	নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
সব্জী-চাস- ··	কাশীপুর প্রাকৃটিকাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্
সব্জী-বাগ—	প্রবোধচন্দ্র দে
সব্জী-বাগান—	কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়
সব্জী-শিক্ষা—	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
সখের বাগান—	হরলাল শেঠ

(৮) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (BOTANY)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
উদ্ভিদ-বিচার—	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
উদ্ভিদ-ব্যবচ্ছেদ-দর্শন—	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
উদ্ভিদ-শাস্ত্রের উপক্রমণিকা—	ব্রজেন্দ্রনাথ দে

(৯) প্রাণিবিদ্যা (ZOOLOGY)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
গো-চিকিৎসা—	সচ্চিদানন্দ গীতারত্ন
গোজাতির উন্নতি—	অতুলকৃষ্ণ রায়
গোজীবন ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ —	প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণিরাজ্য	
সরল প্রাণিবিজ্ঞান—	প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১০) পূর্ত্ত-বিজ্ঞান (ENGINEERING)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ইলেক্‌ট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং—	নীরদচরণ মিত্র
জল সরবরাহের কারখানা (water-works) ১ম ও ২য় ভাগ—	হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
পরিমাপ-পদ্ধতি—	শশিভূষণ বিশ্বাস
সরল পূর্ত্তশিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ —	কুঞ্জবিহারী চৌধুরী

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
সরল বিজ্ঞান-সোপান—	কুঞ্জবিহারী চৌধুরী
সার্ভে-সেটেল্‌মেণ্ট দর্পণ—	শশিভূষণ বিশ্বাস
স্থপতি-বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ —	দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
ক্ষেত্রমিতি ও সমতলমিতি—	কুঞ্জবিহারী চৌধুরী

(১১) ভূগোল (GEOGRAPHY)

আদর্শ ভূগোল—	কেদারনাথ মজুমদার
খগোল বিবরণ—	নবীনচন্দ্র দত্ত
প্রাকৃতিক ভূগোল—	রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ভূগোল-বিজ্ঞান—	কেদারনাথ মজুমদার
ভূগোল পরিচয়—	শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

(১২) জ্যামিতি (GEOMETRY)

ইউক্লিডের জ্যামিতি—	ব্রহ্মমোহন মল্লিক
জ্যামিতি—	হল্ এণ্ড্ ষ্টিভেন্স্ প্রভৃতি

(১৩) পাটিগণিত (ARITHMETIC)

পাটিগণিত—	কালীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী
„ —	সারদাপ্রসাদ সরকার
„ —	রাধারমণ শেঠ
„ —	গৌরীশঙ্কর দে
„ —	বি. ভি. গুপ্ত প্রভৃতি

(১৪) বীজগণিত (ALGEBRA)

বীজগণিত—	পি. ঘোষ
„ —	প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি

(১৫) ত্রিকোণমিতি (TRIGNOMETRY)

ত্রিকোণমিতি—	পি. ঘোষ প্রভৃতি

(১৬) মানবতত্ত্ব (ANTHROPOLOGY)

কন্যা ও পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা—	রমানাথ মিত্র
মানব-প্রকৃতি ১ম ও ২য় ভাগ—	ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী

(১৭) জ্যোতিষ

(ASTRONOMY ও ASTROLOGY)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
আদর্শ কোষ্ঠী—	প্রাণানন্দ সিদ্ধান্তরত্ন
আকাশ-কাহিনী—	কৃষ্ণলাল সাধু
আকাশের গল্প—	যতীন্দ্রনাথ দত্ত
আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ—	যোগেশচন্দ্র রায়
কোষ্ঠিফল—	পরেশচন্দ্র মহলানবিশ
কেরল, সামুদ্রিক, স্বর জ্যোতিষশাস্ত্র সংগ্রহ—	কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য
চরিত্রানুমান বিদ্যা—	কালীবর বেদান্তবাগীশ
জাতক-চন্দ্রিকা—	প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
জাতক-বিজ্ঞান—	প্রসন্নচন্দ্র সিংহ
জ্যোতির্ব্বিবরণ—	গোপীমোহন ঘোষ
জ্যোতিষ-কল্পলতিকা—	কুসুমেষুকুমার মিত্র
জ্যোতিষ-দর্পণ—	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
জ্যোতিষ-প্রভাকর—	কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
জ্যোতিষ-সার—	ব্রজলাল অধিকারী
জ্যোতিষ-রত্নাকর ১ম ভাগ—	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
২য় ভাগ—	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কল্পলতিকা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ—	যোগেন্দ্রনাথ রায়
জ্যোতিষাকর—	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী
জ্যোতিষ-কল্পবৃক্ষ—	নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ
জ্যোতিষ-সারসংগ্রহ—	প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
বরাহ-মিহির—	কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বরাহ-মিহির ও খনা—	বসুমতী
মৃন্ময়ী—	গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ
সামুদ্রিক রেখা-বিজ্ঞান—	রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সামুদ্রিক-বিজ্ঞান—	ঐ
সামুদ্রিক-শিক্ষা—	ঐ

সামুদ্রিকবিদ্যা—নিউ কলিকাতাপ্রেস ডিপজিটারী ও অন্যান্য।

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্বতই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালায় অল্পবিস্তর পুস্তক আছে। পুনশ্চ,এই তালিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে—

(১) এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ—এই ত্রিবিধ চিকিৎসাপ্রণালীসম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ দুইটি বলিয়া মনে হয়। প্রথম,—প্রত্যেক গৃহস্থই চিকিৎসাবিষয়ে অল্পবিস্তর
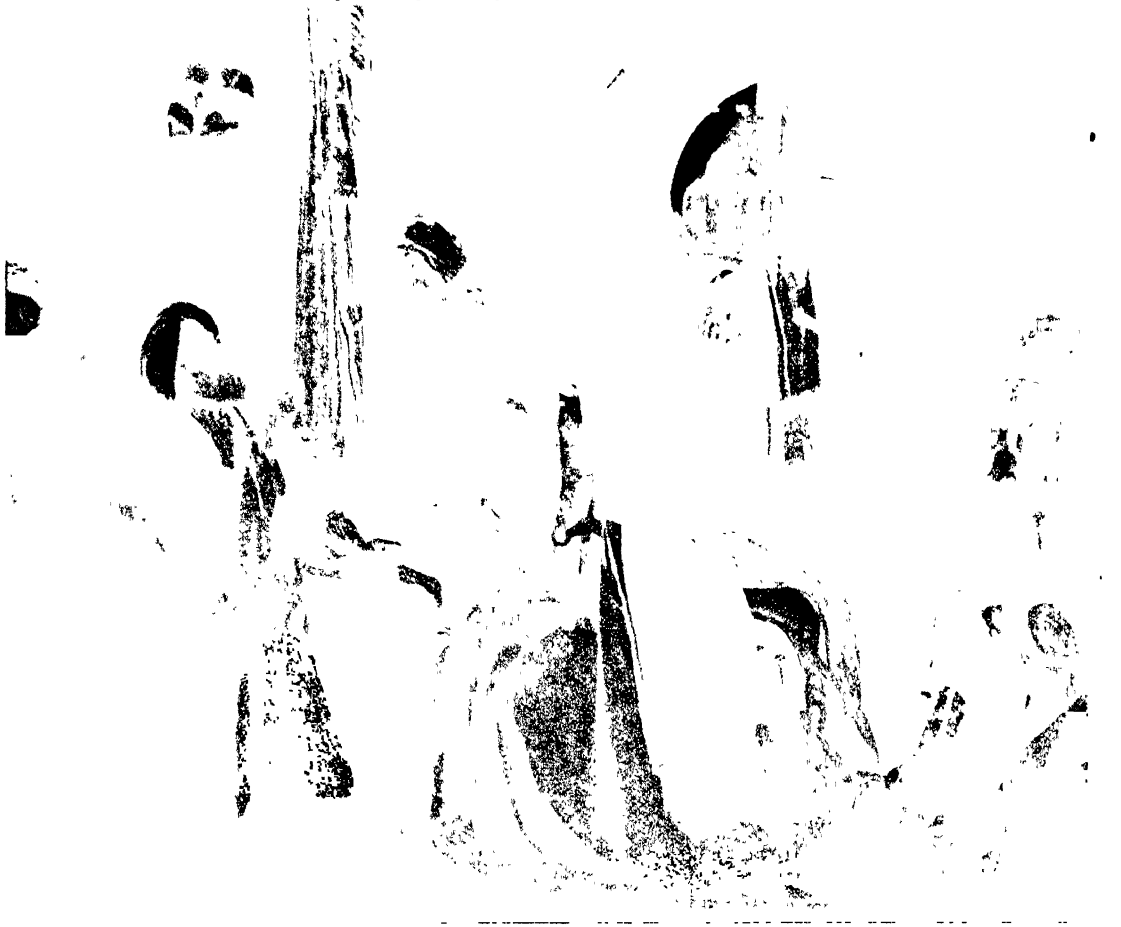
"মেকি নাকি ?"

চিত্র-শিল্পী—জে, এফ্, লুইস্, আর-এ,]

বাটীতে বসিয়াই জানিতে ইচ্ছা করেন; বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথির বাক্স আজকাল ঘরে ঘরে বিদ্যমান, এবং হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজ পল্লীগ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পূর্ব্বে ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলে এবং এক্ষণে কএকটি হোমিওপ্যাথি স্কুলে ও কবিরাজবাড়ীতে বাঙ্গালায় অধ্যাপনা হয়। এই সকল পুস্তকের কয়েকখানি আমি দেখিয়াছি; অনেকগুলি খুব বৃহদায়তন,—পাঁচ শত, হাজার, এমন কি দুই হাজার পৃষ্ঠা পূর্ণ। এনাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা, ফিজিওলজি, অস্ত্রচিকিৎসা, স্ত্রীচিকিৎসা, হাইজিন প্রভৃতি নানাবিষয়ক এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইয়াছে। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর "চিকিৎসা-বিধান" (পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ) একখানি বিরাট্ গ্রন্থ। মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং'র প্রকাশিত হোমিওপ্যাথি "ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে, দুই হাজারের উপর পৃষ্ঠা আছে। ডাক্তার আর-জি. করের "সংক্ষিপ্ত শারীর-তত্ত্ব", ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের "শরীর-ব্যবচ্ছেদ ও শরীরতত্ত্ব-সার" এনাটমিসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাভিন্ন সুখের বিষয়, আজকাল অধিকাংশ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ যথা,—চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, চক্রদত্ত, নিদান, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর, বিবিধ রসগ্রন্থ, বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

(২) কৃষি (AGRICULTURE) ও শিল্প (TECHNOLOGY) সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু কৃষিবিদ্যা ও শিল্পসাহিত্য এত বিস্তৃত, যে তাহার তুলনায় এই কয়খানি পুস্তক অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। ইংরাজিতে এক 'সাল্‌ফিউরিক্ এসিডে'র প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র ভিন্ন, যদি অন্যকোন বিজ্ঞানবিভাগে বাঙ্গালাপুস্তক থাকা প্রয়োজন থাকে, তবে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে; কারণ আমাদের দেশে কৃষিজীবী ও শিল্পজীবী অধিকাংশ লোকই ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞ। দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, পাশ্চাত্যদেশের উন্নত কৃষি ও শিল্প বিষয়ক জ্ঞান মাতৃভাষায় দেশের কৃষক ও শিল্পীর দ্বারে পঁহুছিয়া দিয়া আসিতে হইবে।

(৩) অঙ্কশাস্ত্রের (MATHEMATICS) পুস্তকতালিকা হইতে অবগত হই যে, স্কুলপাঠ্য অঙ্কশাস্ত্র,—যথা পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি সম্বন্ধে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে; কিন্তু ষ্ট্যাটিক্‌স্ (STATICS), ডিনামিক্‌স্ (DYNAMICS), হাইড্রোষ্টাটিক্‌স্ (HYDROSTATICS), ক্যাল্‌কুলাস্ (CALCULUS) প্রভৃতি উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রসম্বন্ধে কোনও পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নাই। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; কারণ, সকল শাস্ত্র কলেজেই পঠিত হয় এবং কলেজে পঠনপাঠন ইংরাজীতেই হইয়া থাকে। যতদিন কলেজশিক্ষার ভাষা ইংরাজী থাকিবে, ততদিন বঙ্গভাষায় উচ্চ-অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখিত হইবে না। পুস্তক পড়িবার লোক না থাকিলে, পুস্তক লিখিয়া কি হইবে?

(৪) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফলিত-জ্যোতিষ (ASTROLOGY) সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় থাকিলেও প্রাকৃতিক-জ্যোতিষ (ASTRONOMY) সম্বন্ধে গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় দুই একখানি মাত্র আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষের তথ্যগুলি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণের ভ্রমণ ও স্থিতির বিবরণ নাটক নভেলের চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক—অথচ সে সম্বন্ধে বহু পুস্তক আজ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় রচিত হইতেছে না কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল সাধু, এম. এ. মহাশয়ের "আকাশ-কাহিনী", শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "জ্যোতিষ-দর্পণ" ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের "আকাশের গল্প" শীর্ষক তিনখানি, নূতন পাশ্চাত্য-জ্যোতিষসম্বন্ধে, গ্রন্থ উপাদেয় হইয়াছে।

(৫) রসায়ন (CHEMISTRY) শাস্ত্রের অনেকগুলি ছোট ছোট পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইয়াছে। ডাক্তার চুণিলাল বসুর "রসায়ন-সূত্র" ও ডাক্তার কানাইলাল দের "রসায়ন-বিজ্ঞান" দেখিয়াছি। পুস্তকগুলি মেডিক্যাল্ স্কুলের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের রসায়নসম্বন্ধে পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নাই—না থাকিবারই কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি পাঠক মিলে, তবে রস্‌কো ও সর্ল্লামারের মত সুবৃহৎ রসায়নপুস্তক লিখিতে কয়দিন লাগে?

(৬) পূর্ব্বে স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা ও অল্পস্বল্প বিজ্ঞানের পাঠ প্রচলিত ছিল; সেই জন্য কএকখানি স্কুলপাঠ্য পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞানপাঠ বাঙ্গালা

ভাষায় বিদ্যমান আছে। এখন স্কুলে এক অঙ্কশাস্ত্র ও ভূগোল ছাড়া বিজ্ঞানের পাঠ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। (কেহ কেহ মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার জন্য "মেকানিক্স্" পড়ে)। সেই জন্য এই সকল "বিজ্ঞানপাঠ" "পদার্থবিদ্যার" চলনও লোপ পাইতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের "ডাক্তার জগদীশ বসুর আবিষ্কারকাহিনী" ছাড়া উচ্চ পদার্থবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় বিরল।

(৭) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও মানবতত্ত্ব বিষয়ক কএকখানি ছোট ছোট পুস্তক আছে কিন্তু ভূবিদ্যা (GEOLOGY) বিষয়ে কোনও পুস্তক নাই, বলিয়াই বোধ হয়।* যদি না থাকে বড়ই আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

(৮) বাঙ্গালাভাষায় পূর্ত্তবিজ্ঞান (ENGINEERING) সম্বন্ধে কোনও পুস্তক আছে, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে জানিতাম না। + পূর্ত্তবিজ্ঞানের পুস্তকের তালিকায় কয়েকখানি বৃহৎ পুস্তকের নাম পাইতেছি। ইহার মধ্যে, "জল সরবরাহের কারখানা" (২য় ভাগ) নামক পুস্তকখানি উপহার পাওয়াতে, উহাতে দেখিলাম গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুচিত্র-সংযোগে জলের কলের (WATER-WORKS) নির্ম্মাণ-কৌশল বিবৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক থাকা বিশেষ গৌরবের কথা।

বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষা

পূর্ব্বোক্ত তালিকা-সঙ্কলনের আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা যায় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা। পুস্তক না থাকিলে, শিক্ষা দিবেন কি করিয়া? এস্থলে গত সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রস্তাবটি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উত্থাপিত করেন, এবং সমর্থনের ভার আমার উপর ছিল। প্রস্তাবটি স্থূলতঃ এই :—

(ক) বাঙ্গালাভাষায় উচ্চশিক্ষা (COLLEGIATE EDUCATION) প্রদান করিবার জন্য ন্যাশনাল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশন্ (NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION)কে অনুরোধ করা হউক।

(খ) বাঙ্গালাভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় স্কুলের পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হউক।

(গ) বাঙ্গালাভাষায় আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য কবিরাজমহাশয়গণকে অনুরোধ করা হউক।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শিক্ষা

(খ) ও (গ) প্রস্তাবসম্বন্ধে উপরোক্ত পুস্তক-তালিকাতে দেখিতে পাইবেন যে, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি শাস্ত্রে বাঙ্গালাভাষায় এত পুস্তক আছে যে, মেডিক্যাল্ কলেজে না হউক, অন্ততঃ মেডিক্যাল্ স্কুলসমূহে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়সমূহে অনায়াসে অধ্যাপনা চলিতে পারে। আর, যেসকল বিভাগে পুস্তক নাই, বাঙ্গালা-ভাষায় শিক্ষা প্রচলিত হইলে, সেই সকল বিভাগের পুস্তক অচিরে প্রকাশিত হইবে। পুনশ্চ—যখন ইন্‌জিনিয়ারিং, এনাটমি, ফিজিওলজি, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইতঃ-পূর্ব্বেই অনেক পুস্তক বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে, তখন পরিভাষার জন্য যে পুস্তক-প্রণয়ন আট্‌কাইয়া থাকে, একথা আর স্বীকার করা চলিবে না। হোমিওপ্যাথি-স্কুলসমূহে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহারা অধিকাংশই ম্যাট্রি-কুলেশন্ পাশ বা ফেল ছাত্র; সুতরাং বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাদিলে, তাহাদের শিক্ষা সরল ও সুবোধ্য হইবে—সন্দেহ নাই; সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ লিখিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার ব্যাপার আরও গুরুতর। সংস্কৃত না জানিলে, আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা এখনও প্রায় অসম্ভব। একেত আয়ুর্ব্বেদশিক্ষাদিবার রীতিমত স্কুলকলেজ, বা হাঁসপাতাল নাই; তার উপর আবার, ছাত্রগণকে সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ প্রাচীনভাষা শিক্ষা করিতে হয়। বিংশশতাব্দীতে সংস্কৃতে

---

* শ্রদ্ধেয় ৺ব্রজমোহন মল্লিকের "ভূ-বিদ্যা" ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের "ভূ-তত্ত্ব" নামক ভূবিদ্যা-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ আছে।—ভাঃ সঃ।

+ ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ত্ত-বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক কয়খানি বহুকাল হইতেই প্রচারিত আছে।—ভাঃ সঃ।

আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা, আর মধ্যযুগে ল্যাটিন্ ভাষায় য়ুরোপে চিকিৎসাশিক্ষা, একই রকমের ব্যবস্থা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,ভারতের মধ্যযুগ কি কখনও যাইবে না?—মনে করুন, যদি আজ ল্যাটিন্‌ভাষায় পাশ্চাত্য-চিকিৎসা শিক্ষা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-চিকিৎসা কি আজ এত উন্নত ও প্রচলিত হইতে পারিত? শিখিব তো চিকিৎসা! ভাষাতো শিখিব না? তবে কঠিন সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া, জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট করিয়া, উত্তর-কালে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাকরিতে বাধ্য হই কেন? সুখের বিষয়—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় তাবৎ গ্রন্থ, যথা—চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, নিদান, চক্রদত্ত, ভাব-প্রকাশ, শার্ঙ্গধর বিবিধ-রসগ্রন্থ প্রভৃতি বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত হইয়াছে; যেগুলি হয় নাই, সেগুলিও আবশ্যক হইলেই হইবে। একজন কবিরাজ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে সেদিবস আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনার প্রস্তাব সাধু হইতে পারে; বস্তুতঃ শতকরা নব্বই জন আধুনিক কবিরাজ, সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় কবিরাজি-শিক্ষা আরম্ভ হইলে, সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে।"—এরূপ ধারণা যে থাকিতে পারে, আমি জানিতাম না। কবিরাজমহাশয়েরা সংস্কৃতের চর্চ্চা না করিলে, দেশ হইতে সংস্কৃতচর্চ্চা উঠিয়া,বা দেশে সংস্কৃতচর্চ্চা কমিয়া যাইবে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। য়ুরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষায় অধীত হইতেছে বলিয়া,গ্রীক্ বা ল্যাটিন্ ভাষা কি য়ুরোপ হইতে উঠিয়া গিয়াছে? যে ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি রচিত হইয়াছে,—যে ভাষায় কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,—যে ভাষা জগতের অন্যতম আদিভাষা,—সে ভাষার আলোচনা জগতের শেষদিন পর্য্যন্ত থাকিবে।

আবার বলি—চিকিৎসাই শিখিব; ভাষা তো শিখিব না! তবে, মাতৃভাষায় আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রচলিত হইবে না কেন? এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় যতগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা সমগ্রঅধ্যয়ন করিলে, আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ বিষয়ই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।—বাকিগুলি অনুবাদ করিতে কয় দিন লাগিবে?—এমন ব্যবস্থা করুন যে. আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন ইতিহাস-জিজ্ঞাসুভিন্ন, অন্যকোন আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীর সংস্কৃতজ্ঞান কিছু মাত্র প্রয়োজন না ঘটে। কথাটায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী; অন্ততঃ, আমার ধারণা যে হিন্দুমাত্রেরই সংস্কৃতশিক্ষা করা উচিত। তবে,আমার বক্তব্য এই যে,সংস্কৃত-অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিরল; মাতৃভাষায় চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, আয়ুর্ব্বেদ সকলের বোধগম্য হইবে এবং আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী সংস্কৃতশিক্ষার জন্য অনর্থক সময়ের অপব্যবহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যে সময়টা কঠিন সংস্কৃত-ভাষা আয়ত্ত করিতে লাগিত, সেই সময়টা পাশ্চাত্য উন্নত অস্ত্রবিদ্যা ও চিকিৎসা অধ্যয়নে ব্যয় করিলে, আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীর চিকিৎসাজ্ঞান বহুউন্নত হইবে। আশা করি, প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী নিজেই বলিবেন—চিকিৎসাই, শিখিব, ভাষা তো শিখিব না!

উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা

তার পর (ক) সংখ্যক প্রস্তাব—অর্থাৎ কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা অসম্ভব। ন্যাশনাল্ কাউন্সিল্ অব্ এড়ুকেশন্ দেশের দশজন-কর্ত্তৃক পরিচালিত। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া দেখাইতে পারেন যে, কলেজে বঙ্গভাষার সাহায্যে অধ্যাপনা চলিতে পারে, তাহা হইলে দেশের একটি সুমহান্ উপকার করা হইবে। * আর্টস্ কোর্সের (ARTS COURSE) বিষয়গুলি, যথা—ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, অর্থবিজ্ঞান, বাঙ্গালাভাষায় কেন পঠিত হইবে না, তাহার কারণ দেখা যায় না। মনে করুন—ইতিহাস; ইতিহাস কি সমস্তই বাঙ্গালায় পড়ান যায় না? অবশ্য পুস্তকের অভাব; কিন্তু পুস্তক লিখিতে কয় দিন যায়? বাঙ্গালায় লিখিত "তর্কবিজ্ঞান" (LOGIC) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আশা করি, ইতিহাস প্রভৃতি "আর্টস্ কোর্সের" অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি—ন্যাশন্যাল্ কাউন্সিলে কেন?—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মাতৃভাষায় অধীত হইবে এবং

* আমি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, ন্যাশনাল্ কাউন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্যম সফল হইবে।

পরীক্ষার্থিগণ, ইচ্ছা করিলে, মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে উত্তর লিখিতে পারিবেন।*

যত গোল—অঙ্কশাস্ত্র ও উচ্চবিজ্ঞানের বেলায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চ অঙ্কশাস্ত্র—উচ্চবিজ্ঞানের একখানি পুস্তক'ও বাঙ্গালাভাষায় এখনও পর্য্যন্ত নাই।—একে তো পুস্তক নাই, তার উপর আবার কটমটে পরিভাষা লইয়া গোল! কিন্তু তাই বলিয়া নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় গত সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, পরিভাষাগুলি ইংরাজিতে রাখিয়া, আধা-বাঙ্গালায় আধা-ইংরাজিতে তিনি ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন—তাহাতে ছাত্রদের বুঝিবার বেশ সুবিধা হয়। এ বিষয়ে আমিও ত্রিবেদী মহাশয়ের উক্তির সমর্থ করিতে পারি। ইন্‌টারমিডিয়েট্ ও বি. এস্-সিক্লাশে আংশিক ভাবে, এইরূপ "খিচড়ি"-ভাষায়, রসায়নশাস্ত্রে বক্তৃতা দিয়া দেখিতে পাই যে, ছাত্রেরা বেশ আনন্দ অনুভব করে এবং বিষয়গুলি তাহাদের সহজে বোধগম্য হইয়াথাকে। ফল কথা, বাঙ্গালাভাষায় উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষাদিবার সমবেত চেষ্টা আমাদের দেশে এপর্য্যন্ত হয় নাই—তাই আমরা বিজ্ঞানের নামেই বেশী ভয় পাইয়া থাকি। ন্যাশনাল্ কাউন্সিল্ যদি আমাদের এই ভয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা একটা বড় কাজ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে প্রথমেই,—উপযুক্ত লোকের দ্বারা উচ্চবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালায় পুস্তক লেখাইয়া প্রকাশ করাইতে হইবে। এইকার্য্যে, পরিভাষা সরল হইয়া আসিবে, ও সেই সঙ্গে, বিজ্ঞানের নামে যে একটা অহেতুকী ভয় আছে তাহা, ভাঙ্গিয়া যাইবে। আশা করি, ন্যাশনাল্ কাউন্সিল্ ও দেশের বৈজ্ঞানিকগণ উচ্চবিজ্ঞানসম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় পুস্তকলিখিয়া ভাষার দৈন্য দূর করিবেন এবং দেশে মাতৃভাষায় উচ্চবিজ্ঞানচর্চ্চার প্রবর্ত্তনকল্পে সহায়তা করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

* মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা, ইচ্ছা করিলে, ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গালাভাষায় লিখিতে পারে। আমার বক্তব্য, উচ্চ-পরীক্ষাগুলিতেও এই নিয়মটি "আর্ট্‌স্ কোর্সে'র" তাবৎ বিষয়ে প্রচলিত হউক।

† বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, ছাত্রেরা বিশেষ খুসি হইবে, কারণ তাহারা ইংরাজিভাষায় তেমন পারদর্শী নহে। রসায়নশাস্ত্র-পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিতে করিতে যে কত অদ্ভুত ইংরাজির পরিচয় পাইয়া থাকি, তাহার দুইএকটির নমুনা দিবার লোভসংবরণ করিতে পারিলাম না; যথা,—"the *within water* of the test-tube (অর্থ, "ভিতরকার জল"); the test-tube is *dived* into water (অর্থ, "ডুবান"); ইত্যাদি।

ফটো

(১)

তখন আমার বয়স সতের-আঠার। আমাদের পুরাতন বাড়ী মেরামত হইতেছিল। আমরা তাহার নিকটেই দুইটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলাম। আমাদের পরিবার-সংখ্যা যদিও বেশী ছিল না, কিন্তু অনেক লোক আমাদের বাড়ীতে খাইত—থাকিত; দাদামহাশয় সকলকেই তাঁহার পরিবারভুক্ত মনে করিতেন।

নীচের একটা ঘরে, আমি ও আমার সমবয়স্ক এক মাতুল পড়িতাম। পণ্ডিতমহাশয় সকালবেলা বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত পড়াইতেন, রাত্রিতে মাষ্টারমহাশয়ের নিকট ইংরাজী পড়িতে হইত।

দাদামহাশয় আমাদিগকে স্কুলে যাইতে দিতেন না। আমরা স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাহিলে, তিনি নিষেধ করিতেন। বোধ হয়, স্কুলের শিক্ষার উপর তাঁহার বড় আস্থা ছিল না। তখন তো আর শিক্ষা-কমিশন বসে নাই; ইউনিভার্সিটির শিক্ষার দোষত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কেহ কোন মন্তব্যও তখন প্রকাশ করেন নাই; তবুও তিনি কেন যে আমাদিগকে স্কুলে যাইতে দিতেন না, তাহার কারণ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। সেদিন মা'র কাছে শুনিলাম, আমাদের স্কুলে যাওয়ার কথা হইলেই দাদামহাশয় বলিতেন—"ওদের ত আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না। যা'তে ওরা সুশিক্ষিত হয়, সুপণ্ডিত হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।" হায়! বৃদ্ধের সেই আন্তরিক শুভকামনার অন্তরালে আমাদের ক্রূর ভবিতব্য যে বিদ্রূপের হাসি হাসিত, তাহা যদি তিনি দেখিতে পাইতেন!—যাক্, সে কথায় কাজ নাই।

একদিন সকালবেলা—তখন বেলা দশটা হইবে—পণ্ডিতমহাশয় পড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন; আমি ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি; দেখিলাম, মোড়ের মাথায়, কালীবাবুর বাড়ীর সম্মুখে, বেথুন্-কলেজের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে, কালীবাবুর মেয়েকে তুলিয়া লইয়া, গাড়ীখানা আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন আবার গিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইলাম; বেথুনের গাড়ীখানা, পূর্ব্ববৎ, আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কালীবাবুর মেয়েকে গাড়ীতে দেখিলাম না।

তখন হইতে প্রত্যহ ফটকের সম্মুখে দাঁড়ান, আমার একটা নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিল। কি দেখিতে যাইতাম, বুঝিতাম না; অথচ না যাইয়াও পারিতাম না! দশটা না বাজিতে-বাজিতেই আমার মাথায় 'টনক্' নড়িত; কে যেন আমার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া ফটকের নিকট লইয়া যাইত। সেই চিরপরিচিত রাস্তার জনপ্রবাহ, বা শকট-শব্দের, মধ্যে কোন অভিনবত্ব ছিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু একটী বিষয় আমার কাছে বড়ই বিস্ময়কর বোধ হইত!

সেই বেথুন্-কলেজের গাড়ীর মধ্যে একটী কালো মেয়ে—দিব্য ঢলঢলে মুখ, তার উপর বেশ বড় বড় দুইটী ভাসা-ভাসা চোখ্—ঠিক প্রবেশপথের সম্মুখেই, একখানা বেঞ্চের উপর—রাস্তার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া যাইত। অন্যান্য মেয়েরা কেহ, আজ-এখানে, কাল-ওখানে, বসিত; কিন্তু সেই কালো মেয়েটীকে একদিনের জন্যও স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে দেখিতাম না।

সে দিন রবিবার।—শরীরটা তত ভাল ছিল না। দুপুর বেলা একাকী শুইয়া শুইয়া আমি 'সার্লট্ ব্রণ্টির' 'জেন্ আয়ার' খানা পড়িতেছিলাম; এমন সময় বন্ধুবর শরৎবাবু আসিয়া উপস্থিত।

শরৎকে দেখিয়া, বই বন্ধ করিয়া, আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"ও-খানা কি বই পড়িতেছিলে?" আমি বলিলাম—"জেন্ আয়ার্।"

বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওঃ—সেই রংময়লা নায়িকার 'রোমান্স' বুঝি! ইংরেজী উপন্যাসে—ইংরেজী উপন্যাস কেন, প্রায় সব উপন্যাসেই—নায়িকা অসামান্যা সুন্দরী হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। 'আয়ারে' তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।—বই খানা বেশ।—কতটা পড়েছ?"

"একবার অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। আবার পড়্ছি।"

"তা বেশ ; কিন্তু দেখো 'জেন্ আয়ার্' যেন তোমাকে 'কন্ভার্ট' করে না-ফেলে ; ধর্ম্মে নয়—মতে। আগে তো তুমি ময়লা রঙে'র নাম শুন্‌লে চট্‌তে !"

"কেন ? কালো হ'লেই যে কুৎসিত হবে, এমন কথা বলেছি বলেত' আমার মনে হয় না ! সৌন্দর্য্যের কোন একটা absolute standard আছে বলেও আমার ধারণা নাই !"

"ধারণা বিলক্ষণই ছিল। হয়ত, 'জেন্ আয়ারে'র প্রভাবে তা দূর হয়ে থাক্‌বে।"

আমি, আর কিছু না বলিয়া, অন্য কথা পাড়িলাম। একথা-সেকথা—পাঁচকথার পর, শরৎ বলিল—"তুমি বলেছিলে, 'দর্শনমাত্র শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের প্রণয়ানুরাগ খুব অস্বাভাবিক ! যাহা অস্বাভাবিক, তাহা কখনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিষয় হইতে পারে না !' কিন্তু রস্কিন্ বলেন—"

আমি শরতের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"সেদিন আমি ঠাট্টা করিয়া ওকথা বলিয়াছিলাম ;—দেখি তুমি কি প্রতিবাদ কর।"

বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে শরৎ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে হয়ত মনে করিতেছিল—"তর্কে যাহাকে আঁটিয়া উঠা ভার, আজ সে এত সহজে পরাভব স্বীকার করিল কেন ?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া, শরৎ চলিয়া গেল।

শরৎ আসিলে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ লইয়া এইরূপ প্রায়ই তর্ক হইত।

(২)

সমস্ত সপ্তাহ বেশ থাকি, রবিবার আসিলেই শরীর অসুস্থ হয় !—এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। একদিন শুনিলাম, দাদামহাশয় শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবেন।

স্বাস্থ্যনিবাসে শুধু তিনি একাকী যাইতেন না ; আমাদিগকেও সঙ্গে যাইতে হইত। প্রতিবৎসর, পাঁচ-ছয়মাস, আমরা সেখানে থাকিতাম। অন্যান্যবার, সেখানে যাইবার নাম শুনিয়াই, আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই শস্যশষ্পশ্যামলা নগনির্ঝরমেখলা উন্মুক্তা প্রকৃতির অনুপমশ্রী দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত। সেই উপলবন্ধুর অসমতল পার্ব্বত্যপথ, দূর পর্ব্বতগাত্রে শেফালিবৃক্ষের সেই মনোরম মণ্ডলাকার বেষ্টন, নিশীথে শেফালিবাস-বাসিত স্নিগ্ধ সমীরণ !—মনে হইলে, কত আনন্দ হইত। সেবার কিন্তু সেখানে যাইতে কিছুতেই আমার ইচ্ছা হইতেছিল না।

ইচ্ছা না থাকিলেও গত্যন্তর ছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, দাদামহাশয় স্বাস্থ্য-নিবাসে যাত্রা করিলেন।—এবার কলিকাতার সহিত বিচ্ছেদ প্রাণে বড় বাজিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেখানে সেবার আমাদিগকে বেশী-দিন থাকিতে হইল না। কোন বৈষয়িক কার্য্যবশতঃ, দাদামহাশয়কে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল ; আমরাও সেই সঙ্গে আসিলাম।

রাত্রিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল, প্রাতঃকালে আবার সেই সময় গিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, কালীবাবুর বাড়ীর সম্মুখে, পূর্ব্ববৎ বেথুনের গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া আছে। কালীবাবুর মেয়েকে তুলিয়া লইয়া, গাড়ীখানা চলিয়া গেল ; কিন্তু সেদিন সেই কালো মেয়েটীকে দেখিতে পাইলাম না !

পরদিন, আবার গিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইলাম ; বেথুনের গাড়ী চলিয়া যাইতে দেখিলাম। সে দিনও সেই কালো মেয়েটীকে দেখিতে পাইলাম না !

এমনই করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। প্রত্যহ ফটকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম ; কিন্তু সেই কালো মেয়েটীকে আর একটী দিনও দেখিতে পাইলাম না !

প্রায় একবৎসর পরে—আমি বন্ধু সতীশচন্দ্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছি ; সেখানে দেখি, অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে সেই কালো মেয়েটী ! বন্ধুকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, সে তিনকড়ি বাবুর কন্যা—সুশীলা।

তিনকড়ি বাবুর সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল ; তিনি মধ্যে মধ্যে দাদামহাশয়ের নিকট আসিতেন।

(৩)

পূর্ব্বে বিবাহ করিতে চাহিতাম না ;—বিবাহে কেমন একটা আমার বিরাগ ছিল।

দাদামহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল,—তিনি আমাকে বিবাহিত দেখিয়া যান। বৃদ্ধের সে ইচ্ছা আমি পূর্ণ হইতে দিই নাই।

মা বিবাহের জন্য কতবার বলিয়াছেন; মা'র সে আদেশ আমি পালন করি নাই। বিবাহ লইয়া শরতের সহিত কতদিন কত তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও আমি রক্ষা করি নাই।

দাদামহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মা আছেন, শরৎ আছে; কিন্তু তাঁহারা আর কখনও আমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই;—করিলেও তাঁহাদের সে চেষ্টা নিষ্ফল হইত; বিবাহে তখনও আমার ইচ্ছা ছিল না, এখনও নাই।

কিন্তু এজীবনে এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন আপনা হইতেই আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। জীবনে একটী সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করিয়াছিলাম;—তখন মনে হইত, সেই কালো মেয়েটীকে পাইলে বিবাহ করি।

সে মনের বাসনা, মনেই চাপা রহিল। মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলি নাই—বলিতে ইচ্ছাও ছিল না।

ইহার কিছুদিন পরে, একদিন সতীশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে সেই কালো মেয়েটীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে বলিল, "আজ একমাস হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে তাহার স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।"

সুশীলার বিবাহ-সংবাদে আমি যে দুঃখিত হইয়াছিলাম, তা নয়; কিন্তু তাহাকে একবার দেখিবার জন্য বুকটার মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল।

* * * * * * *

তারপর, অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে।—অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তনের একটা প্রবল প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কত অঙ্কুরিত আশা, কত পল্লবিত বাসনা, কত কুসুমিত কল্পনা, মাটিতে লুটিয়া পড়িয়াছে!—অতীত এখন, যেন কোন্ জ্যোৎস্নাবিহ্বলা নিশীথে, ব্যথিতকণ্ঠ-নিঃসৃত অস্পষ্ট সংগীতাংশের মত, সময়ে সময়ে আসিয়া মর্ম্মের তারে আঘাত করে। কৈশোর, এখন যেন মাধবী-যামিনীর একটা সুখস্বপ্নের মত মনে হয়!—সব গিয়াছে, স্মৃতি ত যায় নাই! হৃদয়ের অর্গলিত কক্ষ, এখনও একএকবার, বেথুনের গাড়ীর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে!—কিন্তু এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে কানপাতিয়া সে প্রতিধ্বনি শুনিবার আমার অবকাশ কোথায়?

(৪)

দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে শরীর মন ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সেবার ওয়াল্‌টেয়ারে গেলাম।—পূজার ছুটী পাইয়া আমার আরও অনেক বন্ধু গেলেন।

ওয়াল্‌টেয়ারে গিয়া—কয়েকদিনেই—শরীর ও মনের অবসাদ কতকটা দূর হইল; এই নিদ্রাবিরল চোখেও নিদ্রা আসিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রিতে যখন শুইতাম, সমুদ্রশীকর শীতল-বায়ু—যেন জননীর স্নেহ-স্পর্শের মত—শরীরের সমস্ত অবসাদ মুছিয়া লইত।

একদিন বৈকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; অন্যান্য বন্ধুরা সমুদ্রতীরে গেলেন,—আমি একাকী সহরের দিকে গেলাম। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিতেছি, দেখি দিব্য একখানি ফটোগ্রাফের দোকান!—মান্দ্রাজী ফটোগ্রাফ্ দেখিতে বড় কৌতূহল হইল।—দোকানে প্রবেশ করিলাম।

দোকানদারটী খুব ভদ্র। বেশ ইংরেজীতে কথা বলে; আমাকে খুব খাতির করিয়া, একখানা চেয়ার আনিয়া বসিতে দিল,—কত রকমের 'ফটো' আনিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা, একখানা 'ফটো' দেখিয়া, আমার সমগ্র শরীরের মধ্যে যেন একটা প্রবল তাড়িত-তরঙ্গ বহিয়া গেল,—হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী যেন কি-একটা গুপ্ত-আঘাতে বাজিয়া উঠিল।

'ফটো' খানি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলাম; মনে হইল যেন আলেখ্যাধিষ্ঠাত্রীকে আমি চিনি! যেন কোথায় কবে তাহাকে দেখিয়াছি;—যেন সেই মুখখানিতে আমার পরিচিত একখানি মুখের ছাপ লাগিয়া আছে!—অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে দেখিতে, শেষে সেই কালো মেয়েটীর কথা মনে পড়িল!—

তেমনই মুখ—তেমনই চোখ!—ঋতুরাণী শরতের মত প্রশান্ত, স্থির, গম্ভীর!

ইচ্ছা হইতেছিল, দোকানদারকে কিছু জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

দোকানদার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল; বুঝি, সে আমার মুখেচোখে একটা অধীর আবেগ-চাঞ্চল্য দেখিতে পাইতেছিল।

অবশেষে, আত্মসংযম অসম্ভব হইয়া উঠিল ;—সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ 'ফটো' কার? আপনি ইহাকে চেনেন কি ?"

দোকানদার বলিল—"হঁ্যা চিনি।—ইঁহার স্বামী দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, এখানে খুব বড় চাকুরী করেন।"

দেবেন্দ্রবাবুর নাম শুনিয়া, আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না ; দেবেন্দ্রবাবুর সহিত যে সুশীলার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত ছিলাম।

কিন্তু প্রাণের মধ্যে একটা ধিক্কার আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাকে আমি নিত্য দেখিতাম—যাহাকে দেখিবার জন্য—থাক্ সে কথা—,তাহাকে চিনিতে আমার এত বিলম্ব হইল!—কৈশোর ও যৌবনের মধ্যে কি এতটা ব্যবধান!

আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য প্রাণের মধ্যে একটা রুদ্ধ-বেদনা-প্লুত হাহাকার অনুভব করিতাম, আজ প্রবাসবাসে তাহার সহিত এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব সাক্ষাতের সম্ভাবনা একান্ত দেবানুগ্রহের মত বোধ হইতে লাগিল।

আবেগকম্পিতকণ্ঠে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইঁহারা কোথায় থাকেন? অনুগ্রহ করিয়া ইঁহাদের ঠিকানা বলিয়া দিলে, বড় বাধিত হইব। ইঁহারা আমার পরিচিত।"

বক্তব্য শেষ করিয়া আমি ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

দোকানদার বলিল—"দেবেন্দ্রবাবু এখানে নাই! কাল্ তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

আমার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল ;—চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত আলোক নিবিয়া গেল ;—আমি পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় রাস্তা দিয়া একটা মাতাল সাহেব গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে—"In Heaven—in Heaven must we meet"—শুনিয়া দোকানদার হাসিতে লাগিল!

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

য়ুরোপে তিনমাস

আহারের পর 'চক্রবর্ত্তী'র সহিত গল্প করিতেছি, এমন সময় তাঁহার পুত্র সংবাদ আনিল যে, সেকেণ্ড ক্লাসে একজন যাত্রী মারা গিয়াছে; এখন তাহার সমুদ্র-সমাধি (Sea-burial) হইবে। শুনিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। কে বা সে আমার,—তথাপি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিতের সমুদ্র-বক্ষে জলপোতের উপর আকস্মিক মৃত্যুতে নানা তরঙ্গ মনে উদিত হইল। মন নারায়ণ!—কাল্ এডেনে দেখিয়াছিলাম যে, থলিয়ার মত একটা আবরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া, একজন নাবিক জলের গভীরতা মাপিতেছিল। Monte Cristo নবন্যাসের নায়ক, জীবন্ত-সমাধিতুল্য সমুদ্রগর্ভস্থ কারাগার

জাহাজের বহির্দৃশ্য

হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায়, সমুদ্র-সমাধির জন্য প্রস্তুত মৃতসহ বন্দীর স্থান সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। বাল্যজীবনে 'ডুমা'র সেই অমর পুস্তক পাঠকালে যেসকল যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ তরঙ্গে হৃদয় আন্দোলিত হইত, সমুদ্র-তরঙ্গের উপরও আজ সেই লীলালহরী খেলিয়া গেল। কালো থলিয়ার মাঝে মানুষ দেখিয়া অকারণে সমুদ্র-সমাধির কথা মনে হইয়াছিল;—হঠাৎ মনে হইয়াছিল, এই যাত্রায়, নিজের কিংবা সহযাত্রীদিগের কাহারও না কাহারও, সমুদ্র-সমাধি অবশ্য-ম্ভাবী। এ কথার আভাস কাল চক্রবর্ত্তীকে দিয়াছিলাম। এত অমঙ্গল-আশঙ্কা কদাচিৎ বৃথা হয়। কিন্তু একথা মনে হইবার পর, এত শীঘ্র যে Sea-Burial দেখিতে হইবে,—তাহা ভাবি নাই। নিজের ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের বাহুল্য-পরিচয় জন্য এত কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থা হিসাবে ভবিষ্যতের ছায়া যে মানুষের মনে পড়ে, তাহা মনে না হইবার কারণ নাই। তাই বুঝি বলে, "মন নারায়ণ!" চক্রবর্ত্তী ছয়বার বিলাত যাতায়াত করিয়াছেন, কখনও Sea Burial দেখেন নাই। কিন্তু দুইবার জাহাজ হইতে পড়িয়া দুইজন আত্মহত্যা করিয়াছে, দেখিয়াছেন। তখনই জাহাজ থামাইয়া, ছোট নৌকার সাহায্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও, সেই হতভাগ্যদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের সময়ের প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন খ্যাতনামা এবং ছাত্রপ্রিয় গণিত-অধ্যাপক এইরূপে বাস্তবিকই "দেহ-বিসর্জ্জন" দিয়াছিলেন! —এই সকল কথার কা'ল আলোচনা হইয়াছিল। আর আজই এই সাক্ষাৎ Sea-Burial। অনুসন্ধানে শুনিলাম যে, P.&O. Companyর China Serviceএর একজন Steward, পীড়িত হইয়া দেশে যাইতেছিল, সেই হতভাগ্যেরই আজ মৃত্যু হইয়াছে। পাছে অন্য যাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ আতঙ্ক হয়, এই জন্য তাহার মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে প্রচার পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু এখন সমাধির সময় উভয়শ্রেণীর প্রায় সমস্ত যাত্রী ও নাবিকগণ তাহাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সমবেত হইল। একটী ক্যাম্বিসের থলিয়াতে মৃতদেহ সেলাই করিয়া, বিশ্ববিজয়ী বৃটীশ্ বৈজয়ন্তীর আবরণে তাহার শেষকৃত্য সম্পাদিত হইল। দেহ পাছে ভাসিয়া উঠে, তাই গুরুভার প্রস্তরাদি বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পুরোহিত, নিয়মিত পদ্ধতিমত, অন্ত্যেষ্টিকালীন পাঠ ও প্রার্থনা করিলেন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দেহটী জলে নিক্ষিপ্ত হইল! ক্ষণকালের জন্য জাহাজের সমস্ত কার্য্য, জীবনসাগরের পরপারযাত্রী পথিকের সম্মানার্থ,

বন্ধ রাখা হইল। নিশিদিন গতিশীল অর্ণবযানের অখণ্ডগতিও নিমেষের জন্য স্থগিত রহিল। সে রাজার ভাব লইয়া, রাজার নিশান উড়াইয়া, যাইতেছে; সহজে এ জাহাজের গতি বন্ধ হয় না। রাজার রাজার আহ্বানে মহাপ্রস্থানসময়ে সে গতি লহমার জন্য বন্ধ রাখিয়াও, মহাপথের যাত্রীর প্রতি সম্মান যত দূর দেখান হউক আর না হউক, মানুষ নিজের নিজত্ব স্মরণ—অনুধাবন করিবার অবকাশ মুহূর্ত্তের জন্যও পাইল। সেই অপরিচিত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অশ্রুতনামা হীনাবস্থ সহযাত্রীর জন্য গভীর দীর্ঘশ্বাস, বিরাট্ অর্ণবপোতের সকল অংশ হইতেই, সমান আন্তরিক-তার সহিত পড়িল বলিয়াই মনে হইল! মানুষের ঐ ভাবের ইহা পরিচায়ক মাত্র।—এইরূপে সমাধি-কার্য্য সম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে দেহখানি অতলজলে ডুবিয়া গেল। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইল!

অদ্যকার এই ঘটনায়, অনেকের মনে একটু নিরানন্দ ভাব দেখা গেল। কিন্তু এক দল লোক আছে, তাহাদের যেন কিছুতেই উত্তম নষ্ট হয় না;—অল্পক্ষণ পরেই, তাস-পাশা-গল্প সকলই সমানভাবে চলিতে লাগিল।

পত্নীপুত্র সান্নিধ্যে যে হতভাগ্য শান্তি পাইবে বলিয়া রুগ্নদেহে দেশে ফিরিতেছিল, তাহার নশ্বরদেহ মকর-কুম্ভীরের আহার যোগাইতেছে—আর সেই দৃশ্য পাঁচ মিনিট অন্তর্হিত হইতে না হইতেই যে-সেই—সেই নাচগান, ধূমধাম! বাস্তবিকই—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং? ডেকের এই সকল ব্যাপার ভাল না লাগাতে, ক্যাবিনে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

UNIVERSITY CONGRESS এ বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহার আয়োজন কিছুই হয় নাই। মনে করিলাম, চিত্ত স্থির করিবার উপায়স্বরূপ সেই সাজটাই লইয়া থাকি!—কাগজ-পত্র গুছাইতে গিয়া দেখিলাম, ছেলেবাবাজীরা কাগজপত্র সমস্ত সঙ্গের ব্যাগে দেয় নাই।—প্রয়োজনীয় উপাদান না পাইয়া সে কাজে ক্ষান্ত হইতে হইল। কোন্ বাক্সে কি আছে, লণ্ডনে না যাইয়া তাহা স্থির হইবে না;—কাজেই কংগ্রেসের কাজ যখন শেষ হইবে, বক্তৃতাচিন্তা প্রায় তখন আরম্ভ হইবে। সেখানে নূতন-জগতের মধ্যে পড়িয়া লেখাপড়ার কাজ করিবার সময়, সুবিধা ও ইচ্ছা, কতদূর ঘটিবে জানি না। সেইজন্য যতদূর হয়, এই সময় শেষ করিয়া রাখিব ভাবিয়া-

ফার্ষ্ট্ক্লাসের তামাক খাইবার বা আড্ডাঘর
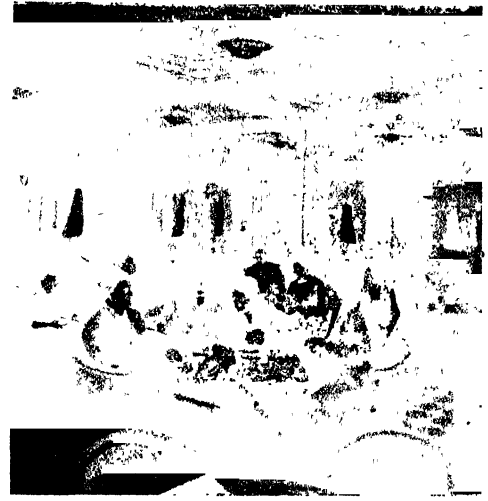
ছিলাম;—সুযোগ কিন্তু ঘটিল না! কাজেই, 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' মনে করিয়া, অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করিতে হইল।

দেশের অনেকগুলি যুবক সেকেণ্ডক্লাসে যাইতেছে; মাঝে মাঝে তাহাদের সংবাদ লইতে যাই;—কারণ, তাহাদের ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে আগমন নিষেধ।—কেবল মধ্যাহ্নে, একবার লাইব্রেরী হইতে চাঁদা দিয়া, বই লইতে আসিবার অধিকার আছে। আজও দেশের লোকের সঙ্গে দেশের দুটি কথা কহিয়া চিন্তাপাঘবের চেষ্টার প্রয়োজন হইল। স্যর্ জর্জ্জ সাদার্লণ্ড, স্যর্ গায়্ উইল্‌সন্ প্রভৃতির সহিতও নানাবিষয়ের কথা হইল। অনেক সাহেবই আমাদের নিজের বিষয়—আমাদের অপেক্ষা—অনেক বেশী জানে, এই ধারণাতেই ইহারা গর্ব্বের সহিত কাজ চালাইতেছে। কিন্তু যখন নিবিষ্টচিত্তে যে বিষয়ের আলোচনা হয়, তখনই ইহাদের ভ্রম বুঝিতে পারা যায়। তবে, ভ্রমস্বীকার অনেকেই করে না; অপরের কাছে, তাহা সারিয়া লইয়া, বাহাদুরী দেখায়।—বাস্তবিকই ইহা বাহাদুরী! কিন্তু ভাল লোকে ভ্রমস্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতাও দেখায়। উচ্চ-শ্রেণীর লোক এরূপ ভ্রমস্বীকারে পরাঙ্মুখ নয়। স্যর্ গায়্ উইল্‌সন্ সেই শ্রেণীর লোক।

শনিবার—২৫এ মে—১৯১২। কা'ল সূর্য্যোদয় দেখিয়া আজও দেখিবার লোভ হইল,—কারণ সে চিত্র ভুলিবার

নয়, পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও আশা মিটে না।—তাই, আবার দেখিতে গেলাম। পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিতেই ডেকে আসিলাম। আট্‌টা পর্য্যন্ত শয্যাশ্রয় অভ্যাসটা, জাহাজে চাপার মত "অহিন্দু" কার্য্যের উপলক্ষে যদি লোপ হয়, তবে মন্দ হইবে না। কিন্তু কলিকাতার জলহাওয়ার—গুণে (দোষে?) এ অভ্যাস যে থাকে, সেপক্ষে বিশেষ সন্দেহ।—আর একটা কারণও আছে।—এখন পরিশ্রম নাই বলিলেই হয়। কার্য্যাভাবে শীঘ্র শয়ন হইতেছে; অতএব অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কতকটা স্বাভাবিক।

সেকেণ্ড্ ক্লাসের বৈঠকখানা

কলিকাতায় উভয়ই অসম্ভব। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী, "দ্রুত গতিশীল", কর্ম্মজীবনে আমাদের অভ্যাস-প্রকৃতি সব ওলট্‌পালট্ হইয়া যাইতেছে! যেন বাতীর—দুমুখ কেন, বোধহয়—চার মুখই পোড়ান হইতেছে! কাজেই কলিকাতার জীবনে যত কদর্য্য-অভ্যাস প্রভুত্ব-স্থাপন ও বিস্তার করিতে সুবিধা পায়! কাল সূর্য্যোদয়ের ঘটা যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ যেন তাহার অপেক্ষা কম বোধ হইল।—"বর্ণরূপং" দর্শন বড় সুবিধার হইল না।

অল্প অল্প করিয়া ঠাণ্ডা পড়িতেছে। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ প্রদেশে যত ওঠা হইতেছে, ঠাণ্ডাও তত বাড়িতেছে; কিন্তু প্রত্যহ সমুদ্র-স্নানের লোভ সম্বরণ হইল না। নিত্যস্নানও বহুকাল উঠিয়া গিয়াছিল; সমুদ্রজলের লোভে অভ্যাসটী ফিরিয়া আসিতেছে,—সহজে ছাড়িয়া দিই কেন! অতি প্রভাতে ক্ষৌরকার-উপাসনা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা-ও ঔষধ-প্রার্থীর মত, পরের পর 'তীর্থের কাক' হইয়া সমান স্তব্ধ-গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকা, ক্রমশঃ অসম্ভব হইতেছে। বিলাতে গিয়াও নরসুন্দরের মন্দিরে গিয়া তাহার এই উপাসনা করিতে হইবে! অতএব হয় শ্মশ্রুগুম্ফ রক্ষা করিতে হইবে, না হয় অকুলীনোচিত ক্ষৌর-কার্য্যে মুখ্যকুলীন তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কোন্‌টা যে করিব, উপস্থিত তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না! যতই নিজ দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, সহযাত্রী সাহেবদের নেটিভাতঙ্ক ততই যেন কমিতেছে;—আপনারা দয়া করিয়া একে একে আলাপ করিতেছেন। আজ একজন Sappers and Miners দলের Engineer ও একজন General এর সহিত বিশেষ আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইল। সকলেরই কিন্তু এক ভাব। আমাদের দেশের—আমরা কিছু বুঝি না, জানি না; আর আমাদের সবই মন্দ!—এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছে, এইরূপ শুনিয়াই দেশে ফিরিয়া যায় ও দেশবাসীকে বুঝায়। খোসামুদে ভারতবাসীরাই বোধ হয় এইরূপ ধারণা করাইয়া দেয়। কিন্তু স্থিরভাবে কোন কথা বুঝাইয়া দিলেই—ভদ্রতা ও বুদ্ধির সহিত যাহাদের চিরবিরহ ঘটে নাই—তাহারা বেশ সরলভাবেই বুঝে; এবং সেই কথা লইয়া পরকে পরে বুঝায়। একজন বা দশজন ইংরাজের এই গুণই বল, দোষই বল,—সমস্ত জাতিটাকে সম্মানভাজন করিয়া রাখিয়াছে।

আহারের পর সেকেণ্ড্ ক্লাসে বেড়াইতে গেলাম; পরিচিত-অপরিচিত কয়েকজন ভারতবাসীর সহিত আলাপে আপ্যায়িত হইলাম। ফার্ষ্ট ক্লাস হইতে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী তাহাদের সর্ব্বদা তত্ত্ব সংবাদ লইতেছে, ইহাতে তাহারাও সন্তুষ্ট; কারণ, যাহারা ফার্ষ্টক্লাসে গমন-গরিমায় গৌরবান্বিত, তাহারা এ হীনতা স্বীকার প্রায় করে না।

সেকেণ্ড্ ক্লাসের যেরূপ ভীড়, ময়লা ও বেবন্দোবস্ত এবং পুরাদস্তর সাহেব "ছোটলোকের" ঠেলাঠেলি, তাহাতে আমার মত অকর্ম্মণ্য প্রাচীন-স্থবিরের, পয়সা বাঁচাইতে গিয়া, তাহাতে যাওয়া অসম্ভব হইত। ফার্ষ্ট ক্লাসের ইংরাজেরা গ্রাহ্যই করে না; তাহাদিগকেও গ্রাহ্য না করিলেই চলিয়া যায়। কিন্তু সেকেণ্ড্ ক্লাসের ইংরাজেরা বাঙ্গালীকে অনেক সময় অপমান করে; কারণ,

তাহারা প্রায়ই সমাজের অতি-নিম্নস্তরের লোক। ইংরাজী নবন্যাস সাহিত্যে সুপরিচিত STRANGE PASSENGERদের কথা সেকেণ্ড্ক্লাসে মনে পড়ে। P. & O. ছাড়া অন্য লাইনে নাকি এরূপ নয়।

সেকেণ্ড্ক্লাসে বেড়াইতেছি, এমন সময় "আগুন আগুন" রব ও একটা মহাকোলাহল উঠিল! খালাসী, নাবিক, কর্ম্মচারী, সকলেই—উর্দ্ধশ্বাসে উপরে নীচে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল; দমকলের নলে হু হু করিয়া জল দিতে লাগিল! লোকরক্ষার চেষ্টার জন্য, মাঝি মাল্লারা Life boats জলে ভাসাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল! মহা হুলস্থূল ব্যাপার! বিপদে সাহায্য-প্রার্থনাসূচক কামানধ্বনি হইতে লাগিল। চারিদিকে মহাকোলাহল।—নিত্যই একটা না একটা কাণ্ড দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজিকার এ ব্যাপার কিছু গুরুতর বোধ হইল। তবে যত গুরুতর প্রথমে মনে হইয়া ভয় হইয়াছিল, তাহার কিছুই নয়। জাহাজে আগুন লাগিলে, জাহাজরক্ষার বন্দোবস্ত কিরূপে করিতে হয়, লোকরক্ষার যে সব বন্দোবস্ত আছে, তাহার সুব্যবহার কিরূপে করিতে হয়, তাহারই অভিনয় হইয়া গেল! নাবিক-খালাসী-কর্ম্মচারী-যাত্রী—সকলকেই যথাযথ স্থানে কিরূপে থাকিতে হয়, কাজ করিতে হয়, আদেশপালন করিতে হয়, তাহার ছাপান নিয়ম জাহাজের স্থানে স্থানে টাঙ্গান আছে, সকলকে তাহা জানিয়া রাখিতে হয়। অভ্যাস রাখিবার জন্য এইরূপ অভিনয় মাঝে মাঝে করিতে হয়। 'টাইট্যানিক্' জাহাজ নিমজ্জনের কারণ অনুসন্ধানকালে, একথা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ (fire drill) 'অগ্নি-অভিনয়' হইবার যে নিয়ম ছিল, তাহা সে জাহাজে না হওয়াতেই, সে জাহাজের নাবিকেরা এ বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল। এখন তাই, সকল জাহাজেই এইরূপ অভিনয় সর্ব্বদা হয়। যাহা হউক, নূতন ব্যাপার দেখিলাম। বিপদে স্থিরবুদ্ধি কিরূপে হইতে হয়, তাহার অভ্যাস সর্ব্বদাই ভাল।—সংযমের অধিক বল নাই।

'টাইট্যানিক্' জাহাজ মারা যাওয়া সম্বন্ধে এক আজগুবি গল্প সম্প্রতি জাহির হইয়াছে। বৃটিশ্ মিউজিয়মে নাকি এক দুর্দ্দান্ত 'ইজিপ্সিয়ান্ মমি' ছিল। বহুসহস্রবর্ষ পূর্ব্বের কোন দুর্দ্দান্ত নরপতি কিংবা লোকনায়কের সমাধি-ভঙ্গ করিয়া, তাহাকে বিদেশে লইয়া যাওয়াতে 'মমি' নাকি 'মমি'-অবস্থায় বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং মিউজিয়মের রক্ষীদিগকে নানারূপে এত দূর ত্রস্ত-ব্যস্ত-বিপন্ন করিয়া ফেলে যে, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অধ্যক্ষগণের নিকট কর্ম্মত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কাজেই অধ্যক্ষেরা বাধ্য হইয়া জাল 'মমি' যথাস্থানে রাখিয়া, দুর্দ্দান্ত 'মমি'কে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া কোন নিভৃত স্থানে রক্ষা করেন। আমেরিকার কোন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেই জাল ধরিয়া, মিউজিয়াম্ অধ্যক্ষগণকে অপ্রস্তুত করিয়া, "উচিত মূল্যে" আসল 'মমি'টি আমেরিকার জন্য খরিদ করেন এবং অতি সন্তর্পণে 'টাইট্যানিক্' জাহাজে, তাহাকে "মাল" সাজাইয়া, লইয়া যাইতেছিলেন। ফলে, প্রত্নতত্ত্ববিৎসহ 'টাইট্যানিকে'র বিনাশ।
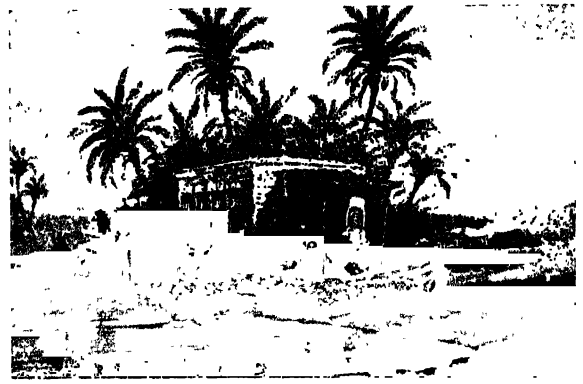
সুয়েজ-সমীপবর্ত্তী মুসা-নির্ঝর

প্রত্নতত্ত্ববিৎ-প্রবরের প্রতি 'মমি'র যত আক্রোশের কারণ থাকুক, এত সহস্র নিরপরাধ নরনারীকে 'ইজিপ্সিয়ান্' বীরে কেন বিপন্ন করিলেন, আমাদের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন দেশেও তাহা সহজে বোঝা যায় না। অথচ এ গল্পটির বিলাতে ক্রমশঃ বেশ কাট্তী হইতেছে।

আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় মোটামুটি ৩৬৫ মাইল বই আসি নাই! ইহার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টায় ৩৯৯ মাইল আসিয়াছিলাম। গতি কিছু কম হইতেছে—তাহার কারণ, ইটালী-তুরস্কী যুদ্ধের জন্য সমস্ত Light House এ আলো দেওয়া হয় না। তাই, রাত্রে জাহাজ খুব সাবধানে চালাইতে
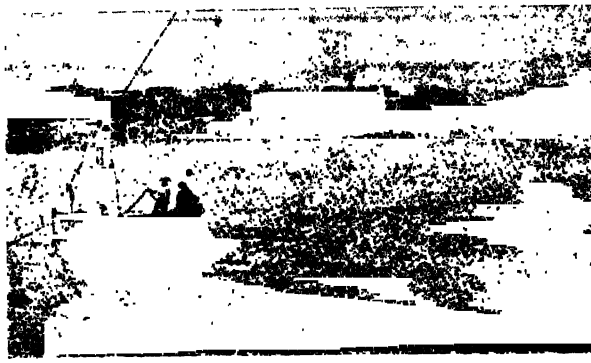
সুয়েজ প্রবেশ দ্বার

হয়; কাজেই জাহাজ ধীরে চলে। দুই প্রহরের পূর্ব্বে, একদিকে আফ্রিকার উপকূলে 'সুয়াকিন্', অপরদিকে আরব-উপকূলে 'মক্কা' যাইবার বন্দর 'জিদ্দা' বন্দরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া আসিয়াছি। মহম্মদের জন্মস্থান পুণ্যভূমি মক্কা একদিকে—আর মহম্মদীয় ধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া 'ইংরাজ-ইজিপ্সিয়ান্'কে ত্রস্তবস্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে—"মাধী" তাহার কীর্ত্তিভূমি 'সুদান' অপর দিকে।

'মাধী'-বিজেতা লর্ড কিচেনার্ এখন ইংরাজপক্ষে ইজিপ্টের কর্ত্তা। অদূরে "আল্লাহো আকবর" শব্দে মুখরিত 'খার্টুম্',—যেখানে কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী 'গর্ডন' অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—এখন সেস্থান ইংরেজী কলেজ-স্কুলে পরিপূর্ণ। আমরা এখন কলিকাতার Latitudeএর সমান Latitudeএ উঠিয়াছি। কিন্তু ঠাণ্ডা, কলিকাতার অপেক্ষা অনেক বেশী। এসিয়ার রাজ্য পার হইয়া যাইবার সময় আসিতেছে। Palestine—Jerusalem—যীশু খ্রীষ্টের জন্মভূমি—দক্ষিণে রাখিয়া য়ুরোপের অভিমুখীন হইবার প্রাক্কালে, য়ুরোপীয় শিক্ষার ভাবে বিভোর ভারত-বাসীর কত কথাই না মনে হয়।

যে মহাত্মা হাবড়াতে বাঙ্গালীর নাম ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে দেখিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, অন্য গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, স্যর্ উইলিয়ম্ ড্রিং আজ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। এই মহাত্মা মান্দ্রাজ ধন্য করেন নাই; ইনি কলিকাতার সওদাগর। ইঁহার পিতা কিরূপে Law Lord হইয়াছিলেন, সেই সূত্রে তিনি চিরস্থায়ী "অনারেবল্" উপাধিতে আখ্যাত। বোধ হয়, আমায় হাবড়া ষ্টেশনের পরিত্যক্ত সেই ধুতিপরিহিত বাঙ্গালী বাবু বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। আত্মীয়তা প্রদর্শন চেষ্টা অনেক করিলেন। আমার কিন্তু ভদ্রতার বিনিময়ে যতটুকু ভদ্রতা করিতে হয়, তাঁহার সহিত, তাহার অধিক আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার পুণ্য নামটি আর ভ্রমণকথার ভিতর উল্লেখ করিব না। বৈকালে, চা খাইতে যাইবার সময়, সিঁড়ির উপর একটি প্রবীণ সাহেব স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া বিস্তর আলাপ করিলেন। কয়েকদিনই তিনি সাধারণ ভদ্রতায় আমায় আপ্যায়িত করিতেছেন। নাপিত-বাড়ীতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ। কথায় কথায় শুনিলাম বিখ্যাত ঔষধওয়ালা Burgoyne Burgoiseএর তিনি এজেণ্ট। পিতৃদেবকে তিনি জানিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অনেক কথা—পুরাতন অনেক ঘটনা—তিনি গল্প করিলেন। আমাদের শৈশব অবস্থারও অনেক কথা তাঁহার জানা আছে, দেখিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে, যখন ১৮৭৮ সালে আমরা Presidency Collegeএর First Yearএ পড়ি, জ্যাঠামহাশয় তখন ইতিহাসের অধ্যাপক। একদিন আন্দুলে নৌকা করিয়া রোগী দেখিতে যাইয়া, বাবার নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়; তিন দিন তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই,—বহু কষ্ট সহ্য করিয়া পিতৃদেব তিন দিন পরে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারেন। বৃদ্ধ হোয়াইট্ সাহেব সে সময় কলিকাতায় উপস্থিত; তিনি সে সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। সেকথা আমার, সেদিনের কথার মত মনে আছে। দারুণ উৎকণ্ঠা ও দুঃখের কথা কি কখন ভোলা যায়! কি করিয়া যে সে কয়দিন কাটিয়াছিল, তাহা এখনও বেশ মনে আছে। আজ বিদেশে—অকূল সমুদ্রের মাঝে—পিতৃপরিচিত অপরিচিতের মুখে পিতৃকথা শুনিয়া, মনে নানা তরঙ্গের উদয় হইল। তাঁহাদের পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদে সব দুঃখ-বিপদ্ দূর হইবে, এ ভরসা মনে উদিত হইল। University Congressএ পেশ্ করিবার জন্য যাহা লিখিতে হইবে, তাহার কতকটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু অপরের সাহায্যে ২৫ বৎসর কাজ করিয়া, অভ্যাসের এমনই শৈথিল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবলমাত্র লেখা ছাড়া—কাগজ পত্র গুছাইয়া—কোন কাজ করিতে হইলেই যেন চক্ষে

অন্ধকার দেখি। যাহা হউক, কিছু কাজ হইল।—বেশ বাতাস বহিতেছে।—জাহাজ দুলিতেছেও ভাল।—গা কেমন-কেমন করিবার উপক্রম হইল—ইচ্ছাশক্তির বলে সেটা পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সাহেবেরা আমায় "good sailor", ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—শেষ রক্ষা না হইলে বিশ্বাস নাই!

কাশীর বিখ্যাত পাদরী "INDIAN CASTES AND TRIBES" ও "HISTORY OF PROTESTANT MISSION"এর লেখক Sherring সাহেবের পুত্র বদোনের কমিশনার সাহেবের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। লোকটি সাহেবদের সঙ্গে বড় মেশে না। নিজের স্ত্রীপুত্রের সহিত খেলাধূলা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যানেডাতে নিজকর্ম্মচারী ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন না—এই কথার উত্তরে বলিলেন যে,"তোমরা এসকল বিভিন্ন শাসন-প্রণালীকে এক গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়া রাগ করিতে পার; কিন্তু বাস্তবিক স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের মতে ইহাদের সকলকে এক গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। ভিতরের কথা এই যে, বরং ফরাসী, কিংবা জার্ম্মানী গবর্ণমেণ্ট কিংবা তাহাদের কর্ম্মচারী, ভারতীয় প্রজার উপরে অত্যাচার করিলে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইতে পারেন; কিন্তু ক্যানেডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ঘাঁটাইতে চাহেন না।—এ কথার প্রচার হইলেও বিপদের কথা।

রবিবার ২৬এ মে, ১৯১২। রজনীর অন্ধকারে এসিয়া ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছি। সুয়েজ খালে বেলা ২ টার সময় পৌছিব। এখন আমরা সুয়েজের সমুদ্রের ভিতর দিয়া যাইতেছি। আফ্রিকার উপকূল উভয় দিকেই দেখা যাইতেছে। নগ্নপ্রায় পাহাড়গুলি সূর্য্যালোকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। নিকটেই মরুভূমি আছে; কিন্তু আমরা বহুদূর উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, আদৌ গরম নাই। যে 'সিনাই' পর্ব্বতের অগ্নিধূমরাশির মধ্যে প্রাচীন য়িহুদীয় তপস্বী 'মোজেস্' ভগবৎ-সাক্ষাৎকার,

নীলনদ বন্যায় পিরামিড্-দৃশ্য

ও লোক-হিতার্থে ভগবৎ-আদেশ, পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং ইহুদিদিগের ধর্ম্ম-নিয়মের আদি সূত্র পাইয়া পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন; মিল্টনের অমর কবিতায়, ও অন্যান্য সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত, রত্নমালার ন্যায় গ্রথিত হইয়া যে কাহিনী অমর হইয়া আছে, সেই সিনাই পর্ব্বতচূড়া অদূরে। দক্ষিণে সকল ধর্ম্মের স্থায়ী স্তম্ভ।—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান্, ইহুদী, খ্রীষ্টান্ সকল ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা নেতা ও প্রধান পুরুষেরা—এই এসিয়া খণ্ডেই জন্মগ্রহণ ও কর্ম্মসূত্রের প্রাধান্য স্বীকার ও প্রচার করিয়া ধন্য ও জগৎ পবিত্র ও আধুনিক আলোক-মণ্ডিত পাশ্চাত্য জগতের ভাবী উপকার, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য জগতের উন্নতি ও রক্ষার স্থায়ী উপায়, করিয়া গিয়াছেন। এই মহাতীর্থরাজির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ও এসিয়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া ও মূর্ত্তিমান কাম্যকার্য্য ও ভোগের লীলাস্থল য়ুরোপে পৌছিবার পূর্ব্বে—আর একবার সব কথা মনে পড়িল। য়ুরোপ এসিয়ার নিকট কিরূপে আবদ্ধ, ভক্তিসহকারে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের মূল সূত্র যিনি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন,তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই 'দাদন' না দিলে, য়ুরোপের দশা কি হইত, আর অখ্রীষ্টীয়ান্ বলদৃপ্ত-য়ুরোপের সহিত এসিয়া-আফ্রিকার কি দশা হইত, ভাবিতে গেলে দেহে প্রাণ থাকে না। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। পাখা বন্ধ ত বহুকাল করিতেই হইয়াছে। 'পোর্টহোলে' বাতাস আসিবার জন্য, 'উইণ্ডসেল্' নামক যে ডানার মত চক্র জাহাজ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়, তাহাও খুলিয়া লইতে হইয়াছে।
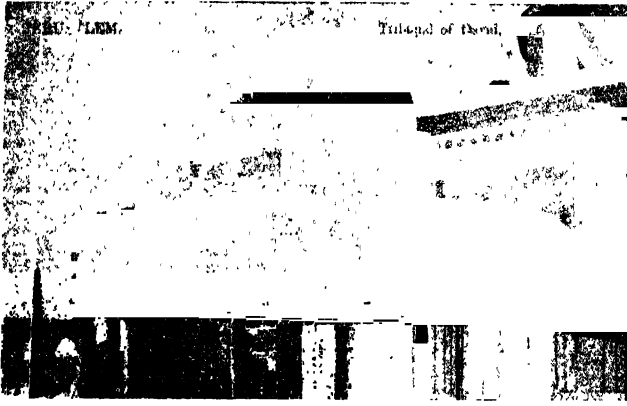
জেরুসালেম্—ডেভিডের বিচারাসন

উপাসনার জন্য দেখি যে মন্দির দ্বার এখনও খোলে নাই। নরসুন্দরের প্রাতরনুগ্রহ পাইবার জন্য যত ব্যস্ত হইতে হয়—সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্যও বুঝি বা তত ব্যস্ত না হইলেও চলে। ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু আছি মন্দ নয়। 'বাত' ত চাপা পড়িবার মত হইয়াছে। বোধ হয় সমুদ্র-স্নানে এতটা উপকার হইয়াছে!

পত্রাদি সুয়েজে ডাকে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। সেই জন্য বৈঠকখানার দরজায় নোটীশ্ দিয়াছে যে, আজ বেলা একটার মধ্যে পত্রাদি ডাকে দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা পরে পোর্ট সায়েদেও পত্র দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঠিক পরের জাহাজ তথায় ধরিতে না-পারারও সম্ভাবনা। সেইজন্য পত্রাদি লিখিতে সকলেই ব্যস্ত। আর যাহারা কাল 'পোর্ট সায়েদে' নামিবে, তাহারাও উদ্যোগ করিতেছে। পোর্ট সায়েদে ১২জন লোক নামিয়া 'বৃণ্ডিসী'র পথে যাইবে। আবার Cairo হইতেও অনেক নূতন লোক জাহাজে উঠিবে। ঘরকন্না এক রকম পাতা হইয়াছে; নৌ-সংসার একরকম কাটিয়া যাইতেছে; আবার কে কোথা হইতে আসিবে, ভাবিয়া একটু চিন্তা হইতেছে। মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই, যে-পরকে যেমন-করিয়া-হউক দুদিন আপনার করিয়াছি, তাহার উপর মন বসে; অপর কে আসিয়া কি করিবে—ভাবনা হয়। আবার, বিছানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছি, তাহা গুটাইয়া নিজাবাসে যাইবার সময়ও যেন একটু অনিচ্ছা-অনিচ্ছার মত উঁকি ঝুঁকি মারে।

বৃণ্ডিসীর পথে গেলে, দুই দিন পূর্ব্বে পৌছান যায়। যে জাহাজ পোর্ট সায়েদ হইতে বৃণ্ডিসী যায়, তাহা নিতান্ত ছোট এবং সমুদ্রতরঙ্গবক্ষে নৃত্য কিছু অধিক ভালবাসে। আড়াই দিন এইভাবে কাটাইয়া, তাড়াতাড়ি ইটালীর প্রধান সহরগুলিতে নামিয়া ভাল করিয়া না দেখিয়া রোম্, ভিনিস, মিলান্, টুরিণ্, ফ্লোরেন্স্, নেপল্‌সের মাঝখান দিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া কোন ফল নাই। তাই আমি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া, মার্সেলস্ হইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। মার্সেলসে একদিন, প্যারিসে সুবিধা মত দুইতিন দিন থাকিয়া, ক্যালে ও ডোবার পথে যাওয়া স্থির করিয়াছি। অনেকে মার্সেলস্, জিব্রাল্টার, বিস্কে ঘুরিয়া সমস্ত রাস্তা সমুদ্রপথে Plymouth অথবা London যাইবে। সময় থাকিলে, এবং বিস্কের ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয় না পাইলে, সে পথ মন্দ নয়। ফিরিবার সময় ইটালীর পথে আসিব, ইচ্ছা আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এখন কহিবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতের ভার তাঁহার উপর দিয়া, বর্ত্তমানে নিজের কর্ত্তব্য নিজে যতদূর সাধ্য করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কাল কি হইবে, আজ কেহ জানে না। বৈকালে কি হইবে, সকালে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মানবের জীবন ত এই! তার আর ভবিষ্যতের বন্দোবস্তের কথা আলোচনার প্রয়োজন কি?

আজ স্নানের পর IMITATIONS OF CHRIST পাঠ করিবার সময় যে অধ্যায়টি খুলিয়া গেল, তাহাতে একথা সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনিই ধন্য—তিনিই ভরসা—তিনিই কর্ত্তা। তিনিই কর্ম্ম; আমি আমার আমার করিয়া আপনার বন্দোবস্ত—আপনার প্রাধান্য—লইয়া এত ব্যস্ত কেন!

ঠাণ্ডা পড়ায় ও মাথায় একটা ফোড়া বাহির হওয়ায়, স্নান করিব না মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমুদ্র-স্নানের লোভসংবরণ করিতে পারা যায় না। কাল একাদশী। বহুদিন একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমায় স্নান করি নাই। কিন্তু জাহাজে যে কয়দিন সমুদ্রজলের সুবিধা পাওয়া যাইবে, সে কয়দিন স্নান না করিয়া যে থাকিতে পারিব, তাহাত বোধ হয় না।

কাল মহাত্রিবেণীতে একাদশীর উপবাস হইবে দেখিতেছি। যীশু, মহাম্মদ, মোজেস্ পবিত্রীকৃত এসিয়া এবং আফ্রিকা ও য়ুরোপের সঙ্গম-স্থান যে মহা-ত্রিবেণী ও মহাতীর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতীর্থ যেরূপ মহা-পাপেরও স্থান, পোর্ট সায়েদ্‌ও তাই। এখানে পৃথিবীর যেন বাছাই করা বদমায়েস্-গুণ্ডার মেলা!

একটি আরব-সহর

(শ্রীযুক্ত এস্. পি. সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

আটদশজন একত্র হইয়া দল বাঁধিয়া সহরের গলি ঘুঁজিতে না গেলে বিপদ হয়। সমস্ত দিন সেখানে জাহাজ থাকিবে। নামিয়া সহর দেখিবার কল্পনা করিতেছিলাম। নানা কথা শুনিয়া, আমার নামিবার ও বহুদূরে যাইবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। দূর হইতে নমস্কারই ভাল!

বাইশজন যাত্রী কাল পোর্ট সায়েদে নামিয়া ডাকের ছোট জাহাজে ব্রিণ্ডিসী যাইবে, আর কতজন উঠিবে, ঠিক নাই। কর্ম্মচারীরা সকল যাত্রীকে ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে যে, সকলের ঘরেই কাল ভিড় হইবে। চারিদিকে এখন এই বই আর কথা নাই।

আজ রবিবার। জাহাজে, প্রয়োজনীয় ব্যতীত, অপর সমস্ত কাজকর্ম্মই আজ বন্ধ। (Hold) খোল হইতে জিনিষ-পত্র আজ পাওয়া যাইবে না। অথচ গরম কাপড়ের কিছু প্রয়োজন হইতেছে।

রবিবার মধ্যাহ্নে সাহেবদের গির্জ্জার সরঞ্জাম, খাইবার ঘরেই হয়। জাহাজের অধিকাংশ সাহেবমেম তাহাতে যোগ দেয় না, কেহ বা কোন ধর্ম্ম কিছু গ্রাহ্য করে না, কেহ বা রোমান্ কাথলিক্ কিংবা অন্য শাখাধর্ম্মাবলম্বী, সেই জন্য সকলে গির্জ্জায় যায় না। কিন্তু ভগবানের নাম যে উপায়ে—যেখানেই হয়—তাহাতে দূর হইতেও অন্ততঃ যোগ দেওয়া উচিত। গত রবিবারেও এইরূপ ছাড়াছাড়ি দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম।

সুয়েজ-সমুদ্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ফারো'র সৈন্যদল হইতে পরিত্রাণপ্রার্থী য়িহুদী পলাতকগণ যে তখন-কার এই সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়। এখানে সমুদ্রের পরিসর খুব অল্প। প্রায় একটা বড় নদীর মতই বোধ হয়।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

অক্ষয় তৃতীয়ায় আতিথ্য

প্রতিবৎসর বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে, নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে, 'কাঙ্গাল' হরিনাথের পরলোক-গমনোপলক্ষে একটি স্মৃতি-মহোৎসবের আয়োজন হয়। অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ কাঙ্গাল হরিনাথ জীবনের মহৎব্রত সুসম্পন্ন করিয়া এই তিথিতে জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন;—সেই সময় হইতেই প্রতিবৎসর অক্ষয় তৃতীয়ায় তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়া ভগবানের নামগান ও তাঁহার গুণানু-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কাঙ্গাল হরিনাথের কএকজন ভক্তশিষ্য এই উৎসবের আয়োজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত জলধর সেন, কাঙ্গালের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার; এবং কাঙ্গালের ভ্রাতৃস্থানীয় ও তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; কুমারখালীর অনেকগুলি উৎসাহশীল সাধুহৃদয় যুবকও ইহাদের পশ্চাতে থাকিয়া এই উৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এবং কাঙ্গালের ভক্তশিষ্য রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাভাজন উকীল ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও এই বার্ষিক উৎসবে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন; তবে নানাকারণে তিনি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র রাজসাহী হইতে প্রায় কোনও বৎসরেই উৎসবের সময় কুমারখালীতে আসিতে পারেন না।—উৎসবের আয়োজনকারিগণকে এজন্য অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

গতবৎসর হইতে এই উৎসবে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে;—গতবৎসর কলিকাতা হইতে কএকজন প্রতিষ্ঠা-ভাজন সাহিত্যসেবক উৎসবের দিন কাঙ্গালের সাধনকুটীরে সমবেত হইয়াছিলেন; বহুদূরবর্ত্তী এক অখ্যাত পল্লীর প্রান্তদেশ হইতে কাঙ্গালের এই দীন ভক্তও তাঁহাদের দলে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সেই উৎসবের বিবৃত বিবরণ গতবৎসর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। গতবৎসরেই শ্রদ্ধেয় জলধরবাবু আশা দিয়াছিলেন, বর্ত্তমানবর্ষে উৎসবের আয়োজন একটু বিশেষভাবে করা হইবে, এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সাহিত্যিক বন্ধুগণ যাহাতে এই উৎসবে যোগদান করেন, তাহার চেষ্টা হইবে। হয়ত সে চেষ্টা হইত—কিন্তু গত চৈত্র মাসে কুমারখালীর উজ্জলরত্ন সাধক-শ্রেষ্ঠ বাগ্মীবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় অকালে পরলোক গমন করায় হরিনাথের ভক্তমণ্ডলী স্থির করেন,—এই শোকাবহ ঘটনার অব্যবহিত পরেই, এবার আর উৎসবের আয়োজন করা সঙ্গত হইবে না; কোনও প্রকারে নিয়ম রক্ষা করিয়াই তাঁহারা এবারের মত ক্ষান্ত হইবেন। আমিও এই সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আমার গৃহকোণে বসিয়াছিলাম।—তখন কে জানিত, ভগবানের ইচ্ছা অন্যপ্রকার!

অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য 'ভক্তমণ্ডলীর' নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম; তাহার পর আর দুই দিনে, দুইখানি পত্রও হস্তগত হইল। এক পত্রে রক্ষা নাই, পর পর তিন পত্র! কাঙ্গালের পুত্র অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, স্মৃতি-সভায় পাঠের জন্য আমি যেন কিছু লিখিয়া লইয়া যাই; জলধরবাবু অনুরোধ করিলেন, 'বঙ্গ সাহিত্যে হরিনাথের স্থান' সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমাকে বলিতেই হইবে। এই বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি জলধরবাবু স্বয়ং; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়দ্বয়ও এ সম্বন্ধে অনেক নূতন ও সারবান্ কথা শুনাইতে পারিতেন, কিন্তু—

"হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে
আশা বলবতী রাজন্ শল্য জেষ্যতি পাণ্ডবান্!"

অক্ষয়বাবু রাজসাহিতে ওকালতী করিবেন, চন্দ্রশেখর বাবু কৃষ্ণনগরের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের মধুর অবসর উপভোগ করিবেন, জলধরবাবু তোয়ালে কাঁধে লইয়া ও নবজলধরকান্তি বর্ত্তুলউদর পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া অতিথিসৎকারের জন্য আটত্রিশ সের ওজনের 'চাঁই' মাছের সদ্গতির ব্যবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর আমি বাতবেদনাক্লিষ্ট পাদযুগলে ভর দিয়া স্মৃতি-সভায় অনধিকার চর্চ্চা করিব! জলধরবাবুর এ বিধান —কেবল এ অধমের পক্ষে নহে, শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষেও—যে

কিরূপ বিড়ম্বনাজনক, তাহা ভুক্তভোগিগণের অজ্ঞাত নহে।

যাহা হউক—'সমন' অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ যখন কোনও বন্ধুর পত্রে জানিতে পারিলাম, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সুগায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রিয় মিত্র এবং সুধী অধ্যাপক ও কৃতি সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত সহ সভা আলো করিতে আসিতেছেন; দীনবন্ধু দেবীপ্রসন্নবাবু ভাবমন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় সভাসদ্‌বর্গকে অভিষিক্ত করিতে আসিতেছেন, 'সমাজপতি' প্রিয় সুহৃদ সুরেশবাবু ভ্রাতৃসহ কুমারখালীর তীর্থে শুভাগমন করিতেছেন, এবং সর্ব্বোপরি 'ভারতবর্ষে'র কর্ণধার প্রিয়দর্শন হরিদাসবাবু জননী বীণাপাণির কুঞ্জকুটীর হইতে বাহির হইয়া, এই বিদ্বজ্জনসমাগমে যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন —বিশেষতঃ শ্রদ্ধাভাজন চন্দ্রশেখরবাবু একপত্রে আমাকে আশা দিয়াছিলেন,—কাঙ্গালের উৎসবে এবার কুমারখালীতে তাঁহার দর্শনলাভের সম্ভাবনা আঠারো আনা,—তখন আমি আমার এই নির্জ্জন কুটীরে আর কি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি? বাতের বেদনা ভুলিয়া—পাদগ্রন্থির উৎকট ক্ষতযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া—কুমারখালীযাত্রার আয়োজন করিলাম।—সেদিন ১৩ই বৈশাখ রবিবার—শুক্লপ্রতিপদ্‌।

মেহেরপুর হইতে প্রতিদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় চুয়াডাঙ্গার 'ডাক গাড়ী' ছাড়ে; আজকাল অনেকেই বাঙ্গালা কথা বুঝিতে হইলে, তাহার ইংরাজী অনুবাদ না করিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা যদি 'ডাকগাড়ীর' অনুবাদে Mail Train বুঝেন,—তাহা হইলে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন; মল্লিনাথের অভাবে—এ স্থলে আমাকেই টীকা করিতে হইতেছে। ডাকগাড়ীর অর্থ 'Mail Cart'—তবে 'গরুর গাড়ী নহে; ঘোড়ার গাড়ী এখান হইতে ডাক লইয়া চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে মেলট্রেণে পঁহুছাইয়া দিয়া আসে। গাড়ীর ছাদে ডাকের ব্যাগ্‌ লইয়া কোচম্যান্‌ কোচবাক্সে বসিয়া থাকে; কোনযাত্রী সস্তায় এই নয় ক্রোশ পথ 'পাড়ি' দিবার জন্য তাহার পার্শ্বে বসিয়া যায়। আর ভিতরে চারিজন আরোহীর স্থান,—যথারীতি টিকিট কিনিয়া এই স্থান অধিকার করিতে হয়; কিন্তু কোনও আরোহীর সঙ্গে দশসেরের অধিক ওজনের জিনিস থাকিলেই বিপদ! ডাক গাড়ীর টিকিটে লেখা আছে—'কেহ দশসেরের অধিক জিনিস সঙ্গে লইতে পারিবেন না।'—আমি একবস্ত্রে কাঙ্গালের ভক্তগণের অতিথি হইতে যাইতেছি, সুতরাং আমার সে চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম—একথাও বলিতে পারি না, কারণ ডাকগাড়ীর টিকিট কিনিবার সময় শুনিলাম—সেই দিন ডাকগাড়ীতে যাইবার জন্য দুইজন কাবুলী টিকিট কিনিয়াছে। তাহা শুনিয়া এক রসিক বন্ধু বলিলেন, "একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর! কাব্‌লে দু' বেটার বোট্‌কা গন্ধেই মারা যাবে।" বস্তুতঃ কোনও প্রকারেই কাবুলী সাহচর্য্য বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, কয়েকজন পল্লীবাসী মুসলমান 'ব্যাপারী' যশোহরঅঞ্চলে গরু কিনিতে যাইতেছিল; তন্মধ্যে যে লোকটার কাছে গরু কিনিবার টাকা ছিল—সে যূথভ্রষ্ট হইয়া হঠাৎ এক কাবুলীপূর্ণ রেলের কামরায় উঠিয়া পড়ে; ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে, সেই কামরায় কয়েক জন কাবুলী-আরোহী—গরুর পরিবর্ত্তে—সেই গরুর ব্যাপারীটিকে 'কোর্‌বাণী' করিয়া, তাহার টাকার তোড়া দখল করে, এবং ব্যাপারীটিকে একটা বস্তায় পুরিয়া রাখিয়া, কোন্‌ ষ্টেসনে নামিয়া চম্পট্‌ দান করে!—এ অধিক দিনের কথা নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে নগদ দেড় শতাধিক টাকা আমাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল, কেহ কেহ আমাকে সেদিন যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু,তখন টিকিট ক্রয় করা হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, একজন শুভার্থী বলিলেন, "পাঁজি দেখিয়া শুভক্ষণে পা বাড়াও, আতঙ্ক দূর হইবে।"

আজকাল পঞ্জিকাকারগণ প্রত্যেক তারিখের নীচে শুভযোগের একটা নির্ঘণ্ট প্রকাশ করিয়া অনেক আনাড়ীর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলাম—সন্ধ্যার পর ৭—৩১ মিনিটে 'মাহেন্দ্রযোগ' আরম্ভ; জ্ঞানবৃদ্ধ, স্বল্পভাষী, শ্রদ্ধাভাজন পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের নিকট শুনিলাম—রবিবারে ইন্‌শিওর্‌, মণিঅর্ডার্‌ ও পার্শেল্‌ প্রভৃতির হাঙ্গামা নাই, সুতরাং ডাক একটু সকালে, 'অর্থাৎ সাতটার অব্যবহিত পরেই, ছাড়িবে।—অন্যদিন ডাক ছাড়িতে আট্‌টা বাজিয়া যায়।—শুনিয়া কিছু চিন্তিত হইলাম, ৭—৩১ মিনিটের পূর্ব্বে যদি ডাকের গাড়ী চলিয়া যায়—তবে ত 'যোগে'র সুযোগ লাভ করিতে

পারিব না।—'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' ভাবিয়া সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া, আমার বৈঠকখানায়, ঘড়ির দিকে চাহিয়া, বসিয়া রহিলাম। ঠং করিয়া সাড়ে সাতটার ঘণ্টা বাজিবার মিনিট খানেক পরে, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাকঘরের অভিমুখে কএক শত গজ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সারথী 'বিগল্' বাজাইয়া, ও জীর্ণরথের চক্রশব্দে রাজপথ মুখরিত করিয়া,আমার বাড়ীর অভিমুখেই আসিতেছে; আমি গাড়ী থামাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কাবুলীদ্বয় একদিকে বসিয়াছিল, অন্যদিকে আমারই একটি ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয় যুবক, শ্রীমান্ অহিভূষণ, খুলনায়—তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাইতেছেন। ভায়াকে দেখিয়া মনে কিঞ্চিৎ সাহসের সঞ্চার হইল। মনে হইল, ইহা বোধ হয় মাহেন্দ্রযোগেরই ফল।

খাঁ সাহেবদ্বয় কলিকাতায় যাইতেছে; একটি কাবুলীর পকেটে পানের ডিবার মত একটি ঘড়ি, সে আধঘণ্টা অন্তর ঘড়ি খুলিয়া, আমরা কয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম তাহার সন্ধান লইতে লাগিল; সারাপথ সে তাহার সঙ্গীর সহিত গল্প করিতে করিতে চলিল। আমরাও দুই বাঙ্গালী, নানা সুখদুঃখের কথার আলোচনায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। কাবুলীদের গায়ের দুর্গন্ধ ভিন্ন, চুয়াডাঙ্গার পথে আমাদের অন্য কোনও অসুবিধা হয় নাই। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ডাকগাড়ী চুয়াডাঙ্গায় চূর্ণীতটে উপস্থিত হইলে, আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া খেয়া নৌকায় উঠিলাম। কোচম্যান্ ডাকের ব্যাগ্‌গুলি নৌকায় তুলিল; নৌকা ছাড়িবে, এমন সময়, প্রায় দশ ঝোড়া মাছ লইয়া, একদল জেলে নদীতীরে উপস্থিত; তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া, নৌকা ছাড়িতে কিছু বিলম্ব হইল। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে, এক পয়সা হিসাবে পার-পণ্য দিলাম; কিন্তু কাবুলীদের আধ্ পয়সার মা-বাপ, পয়সা-উপার্জ্জনের জন্য তাহারা সুদূর পেশোয়ার হইতে এতদূরে আসিয়াছে,—তাহারা এক একটি আধ্‌লা বাহির করিয়া পারানী দিতে গেল; নৌকার মাঝি আধ্‌লা দেখিয়া চটিয়াই লাল!—নৌকা হইতে হাঁকিল, "ইজারদার মশাই, এ কাবুলে বেটারা আধ-পয়সার বেশী পারানী দিচ্ছে না!" খর্ব্বদেহ, স্থূলোদার, মসীকৃষ্ণ, ইজারদার,তাহার কুটীর হইতে বাহির হইয়া, ধীরমন্থর গতিতে নৌকার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাঁ সায়েব, আধপয়সা পারানী দিচ্ছ কেন? পারানী এক পয়সা হিসাবে দিতে হয়; তা জান না?" কাবুলী বলিল, "আধ্‌লাই ত দস্তুর।" বস্তুতঃ বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যসকল সময়ে এসকল ঘাটের পারানী আধ্‌পয়সা; কিন্তু ইজারদার গায়ের জোরে এক পয়সা আদায় করে!—এমন কি, গরুর গাড়ীর পারানী ও যাতায়াত নয়পয়সার স্থানে তিনআনা আদায় করে, সামান্য দুই এক পয়সার জন্য কেহ নালিশ ফরিয়াদ করে না; নির্দ্দিষ্ট-মাশুলের অতিরিক্ত পয়সা আদায় করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে,—"বেজায় চড়া ডাকে ঘাট লইয়াছি।"—চড়াডাকে ঘাট লইয়া, অবৈধরূপে পয়সা আদায়ের তাহার অধিকার কি?—বুঝিতে পারা গেল না। এ বিষয়ে নদীয়া জেলা বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

যাহা হউক, কাবুলীদের কাছে এক পয়সা হিসাবে পারানী আদায় করিয়া মাঝি নৌকা ছাড়িল। নদীর অপর পারে, আর একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডাক লইবার জন্য প্রস্তুত ছিল; আমরা তাহাতে উঠিলে, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কএক মিনিটের মধ্যেই আমরা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক এগারটা। সঙ্গে সঙ্গে হুস্ হুস্ শব্দে 'মিক্সড্ ট্রেণ' প্লাট্‌ফর্ম্মে প্রবেশ করিল। আমাদের, 'ডাক গাড়ী'তে আসিয়া, গোয়ালন্দের দিকে যাইতে হইলে, এই ট্রেণখানি প্রায়ই পাওয়া যায় না;—রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত মেল ট্রেণের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হয়! আজ রবিবার, এজন্য একটু সকালে ডাক-গাড়ী ছাড়িয়াছিল বলিয়াই 'মিক্সড্ ট্রেণের সাক্ষাৎ মিলিল; মনে হইল, ইহাও সেই মাহেন্দ্রযোগের ফল! কিন্তু হরিষে বিষাদ,—Booking Officeএ প্রবেশ করিয়া দেখি Booking Clerk, অর্থাৎ 'টিকিট বাবু', সে ঘরে নাই! একজন জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, তিনি 'ব্রেক্‌ভ্যানে' গিয়াছেন। অগত্যা বায়ুবেগে সেই দিকে ছুটিলাম; কিন্তু সেখানে তাঁহার দেখা পাইলাম না;—হায়, হায়, মাহেন্দ্রযোগ বুঝি নিষ্ফল হয়!—গার্ডকে বলিলাম, "কুমারখালী যাইব; কিন্তু টিকিট লইতে পারি নাই, বিনা টিকিটে উঠিব কি?" সাহেব বলিল, "There is ample time Baboo. You better buy your ticket."—কি করি?—আবার টিকিটঘরে আসিলাম; কিন্তু শূন্যগৃহ!—কি করি ভাবিতেছি, এমন সময় বুকিং ক্লার্ক নামক নবাবটিকে

দ্বারপ্রান্তে সমাগত দেখিলাম;—তাঁহার নিকট টিকিট চাহিবা মাত্র তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কি নাকে সর্ষের তেল দিয়া ঘুমাইতে ছিলেন? ট্রেণ এখনি ছাড়িবে, এখন টিকিট দিব না। পরের ট্রেণে যাইবেন।"—আমি বলিলাম, "আমি এইমাত্র আসিতেছি; দয়া করিয়া যদি একখানি টিকিট দেন, ত রাত্রে অনেকটা কষ্টের লাঘব হয়।"—বুকিংক্লার্ক বলিলেন, "না, ভদ্রলোকের আর কোন উপকার করিব না। সেদিন, টিকিট পাইতে বিলম্ব হওয়ায়, একজন ভদ্রলোক আমার নামে 'রিপোর্ট' করিয়াছিল।—ভদ্রলোকের উপকাব করিতে নাই।"—আমি বলিলাম, "আমি ত আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করি নাই; একের অপরাধে অন্যের উপর জুলুম করিবেন কেন? আমি ভদ্রলোক নই, এই মনে করিয়াই না-হয় একখান টিকিট দেন।"—কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, নবাব মহাশয়ের মনে বোধ হয় কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইল; তিনি তাঁহার আলমারি খুলিয়া একখানি টিকিট দিলেন, এবং দয়া করিয়া বলিলেন, "ঐ ট্রেণ ছাড়িল, আপনি উঠিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ!"—সঙ্গে সঙ্গে বংশীধ্বনি হইল। আমি দ্রুতবেগে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া, সম্মুখে যে কামরা দেখিলাম তাহাতেই, উঠিয়া বসিলাম। ট্রেণ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেখানি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা; সে কামরায় একজন মাত্র আরোহী সুপ্তিমগ্ন ছিলেন; আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া, তিনি তাঁহার নয়ন-বাতায়ন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া নিদ্রাবিজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কোন্ ষ্টেসন?"—আমি বলিলাম 'চুয়াডাঙ্গা,'—পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, "রাত্রি কত?" আমি বলিলাম "এগারটা।"—তিনি আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইলেন; আমিও, আর কোনও কথা না বলিয়া বাতায়ন-প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম, এবং মুখ বাহির করিয়া নৈশ-প্রকৃতির গম্ভীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মধ্যশ্রেণীর টিকিট লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে হইল বলিয়া, কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম।

পোড়াদহ ষ্টেসনে বিপুল জনতা; উত্তরের আরোহীরা বুঁচকি-বোঁচকা, ব্যাগবিছানা, এবং পশ্চাতে অবগুণ্ঠনবতী সজীব 'লগেজ' লইয়া, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দণ্ডায়মান; তাহাদের পশ্চাতেই ন্যাকড়া জড়ানো কাস্তে ও বাঁশের চটা নির্ম্মিত 'মাথাল', অর্থাৎ 'হ্যাট্'-ধারী মজুরের দল; পূর্ব্বে টাকায় জোড়া 'মুনিষ' শুনিয়া তাহারা অর্থোপার্জ্জনের আশায়—তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব—লোটা-কাস্তে-মাথাল—লইয়া বিদেশে যাত্রা করিয়াছে। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, তাহারা কোন্‌দিকে উঠিবে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিল; ইতোমধ্যে, সেই গাড়ীর এক প্রান্তস্থিত একটি দরজা খুলিয়া, একজন আরোহী নামিবামাত্র, একটি চালাক লোক সেইদিকে সরিয়া গিয়া 'উঁকি' দিয়া একবার গাড়ীর ভিতর চাহিল, এবং দক্ষিণ হস্ত সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিল, "আরে ও মামু, হ্যাদ্দে এদ্দিকে আস্তো। তামান্ গাড়ীখেন খালি!"—গড্ডালিকাস্রোত সেইদিকে প্রবাহিত হইল।—আমি পূর্ব্বেই ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলাম, একখানি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; একজন কুলি জানালার ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, মুটে লাগ্‌বি?"

প্রায় মিনিট পনের পরে, বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল; ক্রমে জগতি ও কুষ্টিয়া অতিক্রম করিয়া যখন কুমারখালী ষ্টেসনে উপস্থিত হওয়া গেল, তখন রাত্রি দেড়টা।—গাড়ীর দরজা খুলিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখি—প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে কলিকাতাগামী মেল্-ট্রেণ শত উজ্জ্বল দীপ বক্ষে ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অগত্যা আমাদের ট্রেণখানি উপেক্ষিত ভাবে 'সাইডিং'এ পড়িয়া রহিল। আমরা সমস্যায় পড়িলাম; নামি, কি না!—অধিককাল সেই নিশ্চল ট্রেণে বসিয়া থাকিতে সাহস হইল না; দেখিলাম, যাত্রিগণের কেহ কেহ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অন্যপাশে, রেলের লাইনের উপর, নামিতেছে; আমিও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলাম।—কথা ছিল, প্রিয়বর বিনোদবাবু লণ্ঠনসমেত ভৃত্য পাঠাইবেন; কিন্তু আমার আসিবার কথা দেড়ঘণ্টা পরে, মেল-ট্রেণে,—সুতরাং মেদিনীপুরবাসী নিদ্রাতুর ভৃত্য 'গজানন' নিশ্চয়ই ষ্টেসনে আসে নাই—সিদ্ধান্ত করিয়া দ্রুতগতি ষ্টেসনের সীমা অতিক্রম করিলাম এবং অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ইষ্টকপঞ্জর-কণ্টকিত রাজপথ দিয়া গৌরী নদীর চর-সন্নিহিত পল্লীপ্রান্তস্থিত আত্মীয়বরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। অদূরস্থ বাগান হইতে চাঁপা ফুলের সুতীব্র সৌরভ—বেড়ার ধারে অযত্ন-রোপিত হাস্-না-হানার মধুর সৌরভের সহিত মিশিয়া লতাবিতান-মধ্যবর্ত্তী সেই বিস্তৃত বাসভবন খানিতে 'গন্ধে ভরা অন্ধকার'

ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছিল।—অদূরে গৌরী নদীর সুবিস্তীর্ণ 'চর'—কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জন্য এই রাত্রিশেষে নদীবক্ষপ্রবাহিত বায়ু-তরঙ্গ অত্যন্ত শীতল; সেই সুশীতল সমীরণ-প্রবাহে মুক্তপ্রান্তরস্থিত পাট ও ধানের চারাগুলি হিল্লোলিত হইয়া সন্ সন্ শব্দ করিতেছিল। আমার মনে হইল, এই অন্ধকার নিশীথে স্বপ্নঘোরে, আমি যেন কোন্ অকূলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছি!

এক ঘুমে রাত্রি কাটিল। সোমবার প্রভাতে, শ্রান্ত দেহকে কিঞ্চিৎ 'চাঙ্গা' করিবার জন্য, এক পেয়ালা চায়ের সদ্ব্যবহার করা গেল; তাহার পর বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় জলধরবাবুর স্থূলোদর, তাঁহার ছত্রের অন্তরাল হইতে, নয়নপথে নিপতিত হইল।—তিনি আসিয়াই তাঁহার চিরপ্রিয় দা'কাটা থর্সানেরএকটা চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া সাময়িক আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন;—সুতরাং চুরুটের আগুন মাঠে মারা গেল!—ঘণ্টাখানেক শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর, উভয়ে বাহির হইয়া পড়িলাম; বিভিন্ন আত্মীয়ের গৃহে ঘুরিতে সেদিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর—কাঙ্গালের উৎসবে জলধরবাবুর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ—শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের বৈঠকখানার দ্বিতলস্থ বারান্দায় বসিয়া উৎসবের 'প্রোগ্রাম' স্থির করা হইল। জলধরবাবুর যেরূপ আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম কুমারখালীতে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণের প্রধানলক্ষ্য আহার, কাঙ্গালের উৎসব উপলক্ষ্য মাত্র। বুঝিলাম, কাঙ্গালের উৎসবে তিনি তাঁহার প্রিয় অতিথিগণের জন্য রাজভোগের আয়োজনে ব্যস্ত! কিন্তু এখানে তাহার পরিচয় দিয়া, বুভুক্ষু পাঠকবৃন্দের রসনায় রসসঞ্চার করা, নিতান্ত হৃদয়হীনের কার্য্য হইবে বলিয়া, সে চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া, স্থবির দেহ লইয়াও, বন্ধুবরের কি উৎসাহ!—সোমবার রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্নবাবুর আসিবার সম্ভাবনা ছিল; তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য জলধরবাবু ষ্টেসনে লোক পাঠাইয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না; ঘাড়ে একখানি তোয়ালে ও হাতে একটি হরিকেন্ লণ্ঠন লইয়া, স্বয়ং বাহির হইয়া পড়িলেন; তখন রাত্রি ১১টা। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি কয়েকটি বালকসহ ফিরিলেন; দেবীবাবু আসেন নাই,—এজন্য তাঁহাকে বড় ক্ষুণ্ণ দেখিলাম। উৎসবে যোগদানের জন্য, তাঁহার কয়েকটি আত্মীয় বালক কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রকাশ করিল—অনেকেই আসিতে পারিবেন না, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে 'গৌড়ীয় সম্মিলনে' যোগদান করিতে হইবে, কাঙ্গালের উৎসবে তাঁহার যোগদানের ফুরসৎ নাই; অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথের বাসায় বিভ্রাট্; অধ্যাপক বিপিনবাবু হুগলী না কোথায় গিয়াছেন; সরস্বতীর পাদপীঠ পরিত্যাগ করিয়া দিনেকের জন্যও কুমারখালী আসিবার অবসর হরিদাস বাবুর নাই; সমাজপতিদ্বয় আসিতে পারেন, না-আসিলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন আর সকলেই আসিবেন; বিশেষতঃ 'সাহিত্য পরিষদের জে. ঘোষাল' (তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা শান্তি লাভ করুক) ব্যোমকেশবাবু এবং সর্ব্বঘটে বিদ্যমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—নিশ্চয়ই আসিবেন; আর আসিবেন—'মানসী'র পরিচালকমণ্ডলী, অবশ্য মহারাজ-সম্পাদক বাদ। বুঝিলাম —এবার স্মৃতিসভা জাঁকিবে। জলধরবাবু যদি কোনও দিন কাঙ্গালের উৎসবে 'মানসী'র 'মহারাজা' ও 'ভারতবর্ষের' 'মহারাজাধিরাজ'কে তাহার কুঞ্জ-ঘেরা 'পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা' পর্ণকুটীরে আনিতে পারেন,—তবে তাহা কাঙ্গালেরই মহিমার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিব!—ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে—নারায়ণও একদিন বিদুরের 'ক্ষুদে' পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন; কাঙ্গালের উৎসবে আসিয়া কেহ অতৃপ্ত হইয়া ফিরিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

উৎসবের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে এবাড়ী-ওবাড়ী কোন বাড়ীরই বধূগণের নিদ্রা ছিল না, পল্লীবধূগণেরই বা কি উৎসাহ! তরকারী কুটিতে, পান সাজিতে, রন্ধনের আয়োজন করিতে সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল! রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল, তখনও জলধরবাবু নিদ্রালস-নেত্রে আমার পাশে এক খানি ডেক্-চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছেন—আর উৎসবের দিন কিরূপে সকলকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, তাহারই আলোচনা করিতেছেন। বৈঠকখানার প্রান্তস্থিত পুষ্করিণী হইতে মশকদল উঠিয়া আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল; অথচ খোলা বারান্দায় অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহে হিল্লোলিত কুরচি ফুলের মৃদু সৌরভও বেশ উপভোগ্য বোধ হইতেছিল। আমি বলিলাম, "আর কেন? শুইতে যান্।"—তিনি বলিলেন, "উঁহুঁ, আজ রাত্রে আর নিদ্রা নাই; বাড়ীর ঝি-বৌরা খাটিতেছেন, সমস্তরাত্রি খাটিবেন; আমি

কোন্ লজ্জায় মশারির আশ্রয় লইব ?—আপনি শয়ন করুন ; আমি ঊষা-কীর্ত্তনের আয়োজন করিগে।"—শেষে আরও দুই একজন বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, প্রত্যূষে কীর্ত্তন বাহির না করিয়া, একটু বেলা হইলে কীর্ত্তনের দল নগর-প্রদক্ষিণ করিয়া, কলিকাতাস্থ বন্ধুগণের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনের অদূরে অপেক্ষা করিবেন। ১নং আপ্ ট্রেণ্ বেলা সাড়েনয়টায় সময় কুমারখালী আসিবে ; সাহিত্যিক বন্ধুগণের সেই ট্রেণে আসিবার কথা।

শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের পাঠাগারের প্রান্তস্থিত কক্ষে রাত্রিযাপন করিলাম।—একটু বেলা হইলে, আমি স্নানাদির জন্য ভিন্ন পাড়ায় চলিলাম ;—স্থির হইল, ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বেই, আমি ষ্টেশনে গিয়া বন্ধুগণের সহিত যোগদান করিব।

স্নান শেষ করিতে আমার কিছু বিলম্ব হইল ; তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি—ট্রেণ্ ধূম-উদ্গীরণ করিতে করিতে অতিবেগে ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছে ! জলধরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এ আপনার সাহেবীয়ানা ; আর দুই মিনিট বিলম্ব হইলেই too late হইতেন।"—আমি বলিলাম, "আধঘণ্টা আগে আসিয়া অনর্থক রৌদ্রভোগ করিয়া কি লাভ ?"

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিল ; প্রিয়-দর্শন বন্ধুগণ কেহ একটি বালিশ, কেহ একটি গ্ল্যাড্ষ্টোন ব্যাগ, কেহ একখানি পাখা, হাতে লইয়া নামিয়া পড়িলেন, তাঁহাদের আনন্দধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রথমেই সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফার্ 'হরপসিং কোম্পানী'র পার্টনার সদাশয় সুবোধবাবু, তাঁহার বিরাট্ গোঁফের ধ্বজা উড়াইয়া, বালিশহস্তে হাস্যমুখে দর্শন দিলেন ; তাঁহার পশ্চাতেই বাগচি কবি ; তৎপশ্চাতে পাগড়ীধারী বহুমাদুলীবেষ্টিতকণ্ঠ শুভ্রগুম্ফ ব্যোমকেশবাবুর তাল-পত্রের সিপাহীবৎ শীর্ণদেহ ; অনন্তর ফকিরবাবু ; তৎ-পশ্চাৎ সুকণ্ঠ জ্ঞানপ্রিয়বাবু ও সুগায়ক বন্ধুবর যতীন্দ্রনাথ বসু, আরও দুই চারিজন সাহিত্য-সুহৃদের সারি ; সর্ব্ব পশ্চাৎ পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন। শালপ্রাংশু সমাজপতি মহাশয়কে সেই যাত্রিদলে না দেখিয়া, আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম ; গতবৎসর তিনি আসিয়াছিলেন—তাহাতে উৎসবে যেন নবজীবনের হিল্লোল বহিয়াছিল ; এবার তিনি কেন আসিলেন না—কে জানে ! জলধরবাবুও কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কেহ আসিলেন না ?" বাগচী কবি বলিলেন, "আর কে আসিবে দাদা ?—কাঙ্গালের উৎসবে কাঙ্গালেই আসে !"—

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া বন্ধুগণ মহাউৎসাহে লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিলেন ; কেহ কেহ কীর্ত্তনের এক লাইন্ ধরিতেই, বহুকণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ হইল। হঠাৎ সেই মধুর সঙ্গীত ডুবাইয়া সুবোধবাবু হুঙ্কার দিলেন, "যতীন বাগচীর কবিতা অতি মনোরম !"—সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেই সুরে সুর মিশাইলেন ; যতীনবাবু অত্যন্ত অপ্রতিভ ও বিরত হইয়া বলিলেন, "আঃ ! সব যায়গাতেই কি তোমরা বাদ্‌রামী করবে ? রাস্তার লোকগুলা কি ভাব্‌বে বল দেখি !"—ইহার উত্তরে আবার ভৈরব হুঙ্কার উঠিল, "যতীন বাগচীর কবিতা অতি মনোরম।"—পথের দুইধারে বাজার ; দোকানীরা বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে আগন্তুকগণের স্ফূর্ত্তি দেখিতে লাগিল ; আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম—হঠাৎ কাণে গেল, একজন দোকানদার আর একজনকে বলিতেছে, "বাবুদের এখনও নেশা ছোটেনি !"—বাস্তবিকই আমরা এতই অকালবৃদ্ধ ও বিকটগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছি যে, যাহাদের গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে—তাহাদিগকে খোলাপ্রাণে একটু আমোদ করিতে দেখিলেও—সামাজিক শিষ্টাচারের বাঁধাপথ হইতে এক পা এদিক্-ওদিক্ হইতে দেখিলেই—মনে করি 'ইহারা কি অসভ্য !'—নেশা ভিন্ন যে এমন স্ফূর্ত্তি জমিতে পারে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না ! বস্তুতঃ রাজবাড়ীর বাঁধা 'ওয়েলার্', দৈবাৎ বন্ধন-ছিন্ন করিয়া, যদি একবার রাজধানীর বাহিরে—খোলামাঠের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী এই পল্লীগ্রামে আসিয়া আগন্তুক বন্ধুগণের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল।

বাজারের মধ্যে, তে-মাথা রাস্তায়, একটি অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায়, সংকীর্ত্তনের দল অপেক্ষা করিতেছিল ; আমরা সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র 'বুজ্‌তা বুজাং'শব্দে খোল বাজিয়া উঠিল। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় 'সর্ব্বমঙ্গলা সাধন সমিতি'র উদ্যোগে একটি 'কীর্ত্তন' রচিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনটি যেমন সুন্দর, সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী—এটি কাঙ্গালের অভিনন্দন-গীতি ; তাহাতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও ধর্ম্মপ্রাণতার সুন্দর পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।

নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে সম্মুখে দেখিয়া গায়কগণ, উচ্চকণ্ঠে গায়িতে লাগিলেন,—

"আজ,এলে কি অক্ষয়তৃতীয়ায় কাঙ্গাল তোমার ভবনে?"

বন্ধুগণ সেইখানেই বসিয়াপড়িয়া, গায়কগণের সুরে সুর মিলাইয়া, মধুরস্বরে সমগ্রগানটি গায়িলেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা ও উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; রাত্রিজাগরণ ও পথশ্রম যেন কোন্ ইন্দ্রজালে বিলুপ্ত হইল! দলে দলে লোক আসিয়া সেই সঙ্গীতে যোগদান করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেইস্থানে গানটি গীত হইল, তাহার পর সকলে উঠিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কাঙ্গালের ভবনাভিমুখে চলিলেন; কিন্তু বেলা তখন প্রায় এগারটা। বিশ্রামের পর কাঙ্গালের সাধনকুটীরে সমবেত হওয়া সকলেই সঙ্গত মনে করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনদলকে বিদায় দিয়া আমরা শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম।—অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল। অতুলকৃষ্ণেরা চারিভ্রাতা, যেন মূর্ত্তিমান্ বিনয়; তাঁহারা অতিথিসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। আগন্তুক বন্ধুগণ খোলস্‌ছাড়িয়া,—কেহ প্রশস্ত ফরাসে,—কেহ বারান্দার উপর চেয়ারে, ক্লান্তদেহ প্রসারিত করিলেন। দক্ষিণদিক্ হইতে ঝির ঝির করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছিল, বন্ধুবর যতীনবাবু তাঁহার ব্যায়ামপুষ্ট গৌরতনু সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া, বায়ুসেবন করিতে করিতে বলিলেন, "কি চমৎকার যায়গা! কি মধুর হাওয়া!—এ বাতাসে একদিনেই দশবৎসর পরমায়ু বাড়ে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই চা, বিস্কুট, রাশিরাশি পান ও সিগারেট্ আসিল। শুনিলাম, বন্ধুগণ প্রভাতে পোড়াদহ ষ্টেশনে সাড়ে তিনটাকার চা-মাখন-পাঁউরুটি ধ্বংস করিয়া আসিয়াছেন! সুতরাং কেহ কেহ চা খাইলেন, অনেকে খাইলেন না। ফকিরবাবুকে চা-পানে অনিচ্ছুক দেখিয়া, কেহ কেহ তাঁহার মাথা ও মুখ ধরিয়া, মুখবিবরে চা ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে, প্রাথমিক চা-যোগ শেষ করিয়া, সকলে পুষ্করিণীতে স্নানকরিতে চলিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়সুহৃদ্ বাগচী কবি, একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দরজা বন্ধ করিলেন। শুনিলাম, স্মৃতিসভায় পাঠের জন্য তিনি গাড়ীতে একটি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ না করিয়া মাথায় জল দিবেন না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন! কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত মনে কবিতাটি শেষ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে ধরিয়া রীতিমত 'টগ্ অব্ ওয়ার' আরম্ভ হইল।—মুখর যতীনবসু বলিলেন, "তুমি যে কবিতা লেখ—তাহা অপাঠ্য, 'ওয়ার্থলেস্ ট্র্যাশ্', তোমার তাহা লিখিতে লজ্জা হয় না, কিন্তু আমাদের পড়িতে লজ্জা হয়! সেজন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই!"—কিন্তু কবিবরের কি অসীম ধৈর্য্য! নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও তিনি কাগজ-কলম ছাড়িলেন না, অগত্যা তাঁহাকে ফেলিয়াই সকলে স্নানে চলিলেন। তাঁহারা, অবগাহন ও সন্তরণে গ্রাম্যপুষ্করিণীটিকে পঙ্কিল করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন; বাগচীর সুদীর্ঘ কবিতা তখন শেষ হইয়াছিল।

বেলা বারটা বাজিয়া গেল, এইবার জলযোগের পালা। আমরা সকলে জলধরবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া, জলযোগের যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতেই চক্ষুস্থির!—আহারের পূর্ব্বেই ক্ষুধা ভয়ে পলায়ন করিল! ভারতবর্ষে যতপ্রকার ফল পাওয়া যায়—কান্দাহারের মেওয়া হইতে কুমারখালীর তরমুজ পর্য্যন্ত—কিছুই বাদ যায় নাই; তাহার উপর নানাপ্রকার গৃহজাত মিষ্টান্ন! চম্‌চম্ ও রসকদম্বের একটির অধিক দুইটি উদরগহ্বরে নিক্ষেপ করে, কাহার সাধ্য? কিন্তু ফকিরবাবু প্রভৃতি কয়েকজন, গতবারের মত এবারও, তাহা দুই এক গণ্ডা পার করিলেন! সুরসিক ব্যোমকেশবাবু বলিলেন, "বাঙ্গালদেশের আদরঅভ্যর্থনাই স্বতন্ত্র; কলিকাতার সামাজিক-শিষ্টাচারের নমুনা রসমুণ্ডিতেই সুপ্রকাশিত, দশগণ্ডা ভিন্ন এক সের পূর্ণ হয় না; কিন্তু এই পূর্ব্বাঞ্চলে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য রসকদম্ব উপস্থিত, এক একটির আকার যেন এক নম্বরের ফুটবল!—আবার যদি আরও 'পূবে' যাই, তবে সেখানে 'রসভাব' দিয়া আমাদের অভ্যর্থনা হইতেছে—দেখিব!" এই রসিকতায় ভোক্তাগণের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটিল, কাছা-কোঁচা সাম্‌লান কঠিন হইয়া উঠিল!

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের উদরটি স্থিতিস্থাপক, সুতরাং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলযোগ করিয়া আমরা কাঙ্গালের সাধন-কুটীরে চলিলাম। কাঙ্গাল যেখানে বসিয়া সাধনা করিতেন,—সেখানে আর কুটীর নাই,একটি ইষ্টকময় কুঠুরী নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহারই আঙ্গিনায় আমাদের বসিবার

স্থান হইয়াছিল।—উপরে চন্দ্রাতপ, চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎ-কুটীর—সে যেন সেকালের মুনিঋষির তপোবন। অট্টালিকার বারান্দার কিয়দংশ 'চিক্'দ্বারা আবৃত—পল্লী-রমণীগণ উৎসব দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছেন। বিভিন্ন সংকীর্ত্তনের দল, গান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া, অনেকক্ষণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়া অন্যপথ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল;—আবার নূতন দল শূন্য-আসন পূর্ণ করিল। তাহাদের কি উদ্যম, কি উৎসাহ, কি আন্তরিকতা! গগনে-পবনে সুমধুর হরিনামের স্রোত চলিতে লাগিল; সংসারের চিন্তা, বিষয়বাসনা, কিছুকালের জন্য সকলেরই অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। হরিনাথের জীবনব্যাপী সাধনা, যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, তাঁহার সাধনক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল! কলিকাতার বন্ধুগণ ভাবে ও সঙ্গীতে এমন তন্ময় হইয়া উঠিলেন যে, অনেকেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; সকলেই মনে করিলেন, তাঁহাদের জীবনের একটি দিন সার্থক হইল।

অবশেষে, কাঙ্গালের নিজের দল সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ দীনবেশে, ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঙ্গালের রচিত পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে, উদ্বেলিত হৃদয়ে নাচিতে লাগিলেন!—সে গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন; গান শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এসকল সঙ্গীত কাঙ্গালেরই রচনা। প্রকৃত সাধনা ভিন্ন এরূপ ভাবময়, প্রাণস্পর্শী,—এরূপ আন্তরিকতা-পূর্ণ, এমন হৃদয়োন্মাদক, সঙ্গীত লেখনীমুখে প্রকাশিত হয় না। অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হইবার পর, স্থানীয় ভদ্র-লোকেরা সুকণ্ঠ যতীনবাবু ও জ্ঞানপ্রিয়বাবুকে কিছু গায়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যতীনবাবুর কোমল হৃদয় একেবারে গলিয়া গিয়াছিল; তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে ছলছল নেত্রে করজোড়ে বলিলেন—"এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহা অপূর্ব্ব! আমার ভাষা এখানে মূক; এমন কি গান জানি, যাহা এই পুণ্যক্ষেত্রে গায়িতে পারি? যাহা শুনিলাম, তাহার উপর আর কোনও গান নাই; এখানে অন্য কোনও গান করিলে, সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অসম্মান করা হইবে।" অবশেষে, সকলের পীড়াপীড়িতে যতীন বাবু কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সেই পরম সুন্দর গানটি গায়িলেন,—

"আমার মাথা নত করে দেও হে তোমার চরণতলের ধূলিতে।"

আর একটি কীর্ত্তনও গায়িলেন। সুকণ্ঠ যতীনবাবুর গান দুইটি সকলের হৃদয়স্পর্শ করিল; সেগুলি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। যতীনবাবুর গান শেষ হইলে, জ্ঞানপ্রিয়বাবু, তাঁহার সুধাকণ্ঠের সুস্বরে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া, স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই সুন্দর গানটি গায়িলেন,—

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!"

এই সঙ্গীতে বিষয়বাসনা-ক্লিষ্ট অবসন্ন হৃদয়ের জীবন-ব্যাপী হাহাকার, যেন তাঁহার স্বরতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সকলেরই মনে হইল—কি মধুর, কি সুন্দর!

বেলা দুইটার সময়ে আমাদের বিশ্রামাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথে আসিয়া শুনিলাম, কোথা হইতে এক বিশাল-কায় চাঁই মাছের আবির্ভাব হইয়াছে,—মাছটি ওজনে প্রায় এক মণ! জলধরবাবু কুড়িটাকা মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া, অতিথি-সৎকারের আয়োজন করিতেছেন! বুঝিলাম, কাঙ্গালের এই ভক্ত সেবকটি আজ, অতিথি-সৎকারের জন্য, ফকির হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন! তাঁহার এই অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা হইলে, তিনি অতি দীনভাবে বলিলেন,—"ভাই, তোমাদের পাদস্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে! তোমাদের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করি, এমন কি আছে? আজ আমার বড় আনন্দের দিন; সেই আনন্দপ্রকাশের জন্য যতটুকু আমার সাধ্য, করিতেছি।" তাঁহার আতিথেয়তায় আমরা বিব্রত হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইয়া, অধিকক্ষণ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারিলাম না। বেলা তিনটার কিছু পূর্ব্বে গৈরিকপরিচ্ছদধারী নগ্নপদ মন্মথবাবু আসিয়া বলিলেন, "কুষ্টিয়া হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক উৎসব দেখিতে আসিয়াছেন; সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে, আপনারা আর একবার কাঙ্গালের সাধন-কুটীরে চলুন।" কি করি?—মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে, একটি বনচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়া, আবার সেখানে উপস্থিত হইলাম। সবেগে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। অবশেষে চারিটার সময় জলধরবাবু সংবাদ দিলেন, "আহার প্রস্তুত!" কিন্তু গুরুতর জলযোগের

শূন্য-শৃঙ্খল !

চিত্র-শিল্পী--শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল] [স্বত্বাধিকারী শ্রীমন্মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমত্যানুসারে

পর প্রায় কাহারও ক্ষুধা ছিল না; তথাপি আমাদের সকলকে একে একে উঠিতে হইল।

মধ্যাহ্ন-ভোজন, অথবা সান্ধ্য-ভোজনের যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে 'ভারতবর্ষে' স্থান সঙ্কুলান হইবে না। শাক-শুক্তুনি হইতে আরম্ভ করিয়া তরকারী আর ফুরায় না! তাহার পর, নানারকম মৎস্যের নানাপ্রকার ঝোল; দধিপর্য্যন্ত ভোজনের পর, পায়সে আর কাহারও প্রবৃত্তি রহিল না। বাগচী ও ফকিরবাবু-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ একঘরে বসিয়াছিলেন; তাঁহারা খাইলেন আমাদের চতুর্গুণ, অথচ আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক খাইতেছি এই মিথ্যা-অভিযোগে ঠাট্টা করিলেন দশ গুণ! প্রায় পাঁচটার সময় আহার শেষ করিয়া অতি কষ্টে আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। সুরসিক সুবোধবাবু কোথা হইতে একখানি তক্তা সংগ্রহ করিয়া উঠানে ফেলিলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, বাগচী কবিকে 'বক্ষে' তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া হইবে।—আমি বলিলাম, "দোহাই মশায়, আমি পায়ের দিকে ধরিতে পারিব না।"—হাসির চোটে ভোক্তাগণের অর্দ্ধেক ভুক্তদ্রব্য হজম হইয়া গেল। কবিবর লাঠিতে ভরদিয়া, অতিকষ্টে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসে দেহ-প্রসারিত করিলেন। নলিনীপণ্ডিত ললাটের উভয়প্রান্তে চুণ লেপিয়া জঙ্গমবৎ পড়িয়া রহিলেন; ফকিরবাবুর অবস্থাও তদ্বৎ শোচনীয়; কিন্তু যতীনবাবু ও জ্ঞানপ্রিয়বাবু স্থলপথে যেন দীনবন্ধুর 'নিমেদত্ত,'—আকণ্ঠপূর্ণকরিয়াও টলিবার পাত্র নহেন!

ঠাকুর-ষ্টেটের কুমারখালীস্থ কাছারীর ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত হীরালালবাবু সমাজপতিমহাশয়ের ন্যায় বিরাট্ জোয়ান্; কিন্তু তিনি বোধহয়, তাঁহার সাহিত্যগুরু কবিবর রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, অল্পাহারী। আমাদের ভোজনক্রিয়া যখন সবেগে ও অতিমাত্র উৎসাহের সহিত চলিতেছিল, সেই সময় তিনি আমাদের এই দেহ-নদীতে 'শিকস্তি' ও 'পয়ওয়স্তি' (কারণ, আমরা আহারে বসিয়া যেরূপ খাইতেছিলাম, তাহার চতুর্গুণ ঘামিতেছিলাম) পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমাদের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার কবিহৃদয় করুণার্দ্র হইয়াছিল। তিনি জনান্তিকে জলধরবাবুকে বলিলেন, "এইসকল ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া, এভাবে বধ করিবার কি আবশ্যক ছিল?" —কিন্তু জলধরবাবু অনেক অনাবশ্যক কথার ন্যায়—সেকথা কানে তুলিলেন না।

আহার শেষ করিতেই ত পাঁচটা বাজিল! জলধরবাবু আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ না করিয়া ছাড়িবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তিনি আমাদিগকে পাঁচমিনিটও বিশ্রামের অবসর না দিয়া বলিলেন, "স্মৃতি-সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছে; সভার সময় উত্তীর্ণ হয়, আর বিলম্ব করা হইবে না, শীঘ্র সভায় চলুন।" কলিকাতার বন্ধুগণ এ প্রস্তাবে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন;—অনেকেই বলিলেন, "আমরা ঘণ্টাখানেক না গড়াইয়া সভায় যাইতেছিনা; এতে সভা থাকুক, আর ভাঙ্গুক্।"—কিন্তু জলধরবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অগ্রপশ্চাৎ সকলকেই যাইতে হইল। তিনি সকলেরই বয়োজ্যেষ্ঠ, "সরকারী দাদা",—তাঁহার উৎকট্ জুলুমও, এই গুরুভোজনের পর, পরিপাক করিতে হইল।

সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় আর তিলধারণেরও স্থান নাই! যাঁহারা কুষ্টিয়া হইতে সভাদেখিতে ও বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন—সাড়েপাঁচটার পর—রাত্রি এগরাটার পূর্ব্বে—আর ট্রেণ নাই বলিয়া, তাঁহারা নিরাশহৃদয়ে পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছেন।

যাহাহউক, অবিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।—এসভার সভাপতি নাই,—সভারম্ভে জলধরবাবু টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাঙ্গালের প্রিয়শিষ্য ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের একখানি সংক্ষিপ্তপত্র পাঠ করিলেন;—অক্ষয়বাবু কেন যে কাঙ্গালের উৎসবে কুমারখালী আসিতে পারেন নাই,—পত্রে তাহারই কৈফিয়ৎ ছিল। একে উকীল, তাহার উপর সাহিত্যিক,—সুতরাং তাঁহার কৈফিয়ৎ যে সন্তোষজনক হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। কৈফিয়ৎপাঠ শেষ হইলে, জলধরবাবু এই নগণ্য লেখকের লিখিত 'বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথ'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া ভোজনের পর, দশপনের মিনিটও বিশ্রামের অবসর না পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগিগণের অজ্ঞাত নহে। অতি কষ্টে প্রবন্ধপাঠ শেষ করিলাম; এক এক সময় মনে হইতে লাগিল, আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে! জানিনা, পাঠের এই ত্রুটী সকলে ক্ষমা করিয়াছিলেন কিনা।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, তাঁহার রচিত কবিতাটি ধীরগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করিলেন; ভাব-ভাষা ও শব্দের ঝঙ্কারে কবিতাটি কিরূপ সুন্দর হইয়াছিল, শ্রোতৃবর্গের সঘন করতালিধ্বনিতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। এত তাড়াতাড়ি এমন মনোহর কবিতা-রচনা, অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে; কবিতাপাঠের পর কলিকাতা হইতে আগন্তুক বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ নিম্নস্বরে বলিলেন, "যতীন বাগচীর কবিতা অতি মনোরম"— চারিদিকে হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল!

হাসির গোল না থামিতেই শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলেন। নায়াগ্রা-প্রপাতের ন্যায় এই বক্তৃতা-স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিত, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশ যেরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নলিনীবাবু উপবেশন করিলে, রাধারমণবাবুর পুত্র, তাঁহার পিতার লিখিত, একটি প্রবন্ধপাঠ করিয়া লইলেন।—হরিনাথ যে কিরূপ সুদক্ষ সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছিল।—

মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া সাহিত্য-পরিষদের ব্যোমকেশবাবু অতঃপর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইতেছিল; তিনি অনেক নূতন কথা বেশ গুছাইয়া বলিবেন, ইহারও আভাস পাওয়াগেল। কিন্তু হঠাৎ প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় মধ্যপথেই তাঁহাকে উপসংহার করিতে হইল। *

সভাভঙ্গ করিয়া, আবার বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলাম। অল্পক্ষণপরে বৃষ্টি ধরিলে বহু কীর্ত্তনের দল নগর-প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল, মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে সমগ্রপল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল; অচল-দেহ লইয়া, আমরা আর সে সকলদলে যোগদান করিতে পারিলাম না। শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণের বৈঠকখানায় খোস্‌গল্প, গান, যাত্রা, কথকতা প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। যতীনবাবু (বসু) চমৎকার হরবোলা; তাঁহার সুচিক্কন রসিকতায়,হাসির রোলে বৈঠকখানার ছাদ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যতীনবাবু ও জ্ঞানপ্রিয়বাবুর গানগল্প সমান ভাবে চলিল।—তাহার পরই বিদায়ের পালা।

আমাদের কাহাকেও কোন কথা না জানাইয়া, শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ অতিথিগণের নৈশ-ভোজনের জন্য পোলাও কালিয়ার আয়োজন করিতেছিলেন;—শুনিয়া আমরা ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম! অগত্যা সকলেই রণেভঙ্গ দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন; কিন্তু অতুলকৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র নহেন।—তিনি পোলাও ত্যাগ করিয়া লুচি কালিয়া ও গৃহজাত সন্দেশমিষ্টান্নদ্বারা অতিথিসৎকারের লোভসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অগত্যা দশটারপর একবার সারি বাঁধিয়া আসনের উপর বসিতে হইল। ভাবিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরু-ভোজনের পর, কেহ বুঝি লুচি-কালিয়া-ছক্কাপঞ্জা স্পর্শ করিতেও পারিবেন না; কিন্তু গব্যঘৃতে টাট্‌কা-ভাজা ফুল্‌কো লুচি, 'বোঝার উপর শাকের আটির' মত, বিনাপ্রতিবাদে যথাস্থানে দাখিল হইল! উৎকৃষ্ট 'সুখোদই' ও সুপেয় তরমুজের সরবৎ সকলে পুনঃপুনঃ চাহিয়া লইতে লাগিলেন। আমি যতীনবাবুকে বলিলাম, "মিঃ বোস, আশঙ্কার কারণ নাই; ভগবান্ উদর জিনিস্‌টাকে দস্তুরমত স্থিতিস্থাপক করিয়াছেন; পূর্ণমাত্রায় 'কার্গো' বোঝাই করুন, ফাটিবেনা।" —মিঃ বোস্ বলিলেন, "হাঁ, পেট ফাটে না বটে, কিন্তু ছাড়ে!" —আবার হাসির গর্‌রা উঠিল; কিন্তু অধিককাল স্ফূর্ত্তি করিবার অবসর হইল না,—ট্রেণের সময় হইয়াছে বুঝিয়া সকলে তাড়াতাড়ি মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক, তাম্বুলচর্ব্বণ করিতে করিতে, লট্‌বহরসহ ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।—কার্য্যোপলক্ষে আমি আট্‌কাইয়া রহিলাম।—কিন্তু পর দিন আমার প্রবলজ্বর দেখাদিল,—সেই জ্বরে সাতদিন আমাকে কুমারখালী পড়িয়া থাকিতে হইল; মাহেন্দ্রযোগের যাত্রা ত নিষ্ফল হইবার নহে। জলধরবাবুও ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন—ভবিষ্যতে যদি এইভাবে অক্ষয় তৃতীয়ায় বন্ধুসমাগম হয়, তাহা হইলে, মধ্যাহ্নে তিনি আর ভোজের আয়োজন করিবেন না; উৎসব শেষ হইলে রাত্রে, বিদায়ের পূর্ব্বে, আহারের আয়োজন হইবে। জলধরবাবু 'পণ্ডিত লোক', 'অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলে' তাঁহার 'দেউলিয়া' হইবার আশঙ্কারও কতকটা নিবৃত্তি হইবে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

* ঠিক এই সময়ে কলিকাতার লোকে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল!—ভাঃ সঃ।

"সাহিত্য-সম্মেলনে"

ক্রটী স্বীকার

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের "সাহিত্য-সম্মেলনে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘ হওয়ায় তাহার কএকটি স্থান পরিবর্জ্জন করা প্রয়োজন হয়। আমরা এই পরিবর্জ্জনের ভার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর উপর সমর্পণ করি। আমাদের বন্ধুটি প্রবন্ধের কএকটি স্থান পরিবর্জ্জন করেন, কএকটি স্থানে দুই চারিটি নূতন কথা সংযোজন করেন, এবং কএক স্থানের ভাষা পরিবর্ত্তন উপলক্ষে অনুচিত স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা; সম্পাদকগণ কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষ পরিবর্জ্জন করিতে পারেন, ভাষা সংস্কৃত—মার্জ্জিত করিতে পারেন, কিন্তু অযথা পরিবর্ত্তন বা নূতন বিরুদ্ধ কথা সংযোজন করিতে পারেন না। এ জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি এবং শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ক্রটী স্বীকার করিতেছি। যে সকল স্থানে পরিবর্ত্তন ও নূতন কথা সংযোজন করা হইয়াছে; ন্যায়ানুরোধে তাহার প্রধান কএকটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে এক-স্থানে শ্রীযুক্ত রসিক বাবু লিখিয়াছিলেন—"নাগপাশ-বদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র তখন গরুড়কে স্মরণ করিয়াছিলেন, গরুড় তাঁহাকে ধনুর্ব্বাণত্যাগ করিয়া বংশীধারী নটবরবেশ ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ভক্তির এমনই প্রভাব বটে! আমরা গত বৎসর পালি 'জাতক' বাঙ্গালায় অনুবাদের প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয়কে কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন 'বাঙ্গালা! বাঙ্গালা কি আবার কেউ পড়ে নাকি?' এবার বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ্য হইবার পর বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 'বাল্মিকীর জয়'-গ্রন্থ-রচয়িতার অভিভাষণে আমরা মুগ্ধ হইলেও শ্রোতৃ-মণ্ডলী মোহিত হইতে পারিলেন না।" আমাদের বন্ধু এই অংশটি সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে লিখিয়া দিয়াছেন "অনুমানে ও ভবিষ্যৎবাণী করিতে গেলে সেকালের ত্রিকালদর্শী শাণ্ডিল্যের বংশধরকে এইরূপ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। মনে রাখা উচিত ছিল, এবং শশধর বাবুও আমাদের একথার সমর্থন করিবেন যে, শাণ্ডিল্য যখন চতুষ্কালদর্শী ছিলেন না, তখন heridity'র অভাবে শাস্ত্রী মহাশয় কলিযুগে ভবিষ্যৎদর্শন শক্তি পাইতে পারেন না।" জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের শিবস্তোত্র উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রসিকবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার শেষভাগে এই কয়টি কথা নূতন সংযোজিত হইয়াছে, যথা—"এরূপ সভায় শিবস্তোত্র পাঠে চতুর্দ্দিকে যে অশিবনিনাদ উঠিয়াছিল, প্রবীণ জজ মিত্রজা যদি তাহা বুঝিয়া না-থাকেন, তবে তাঁহার বিচারক পদ হইতে অবসর লইবার সময় হইয়াছে,—ইহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।"

আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রসিক বাবু লিখিয়াছিলেন,—"কেহ কেহ সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের অনুমান করিলেন! 'মহতী মণ্ডলীর' ধ্বনি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদের আশা ফলবতী হইবার সূচনা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। জনৈক বন্ধু মন্তব্য করিলেন, প্রতিভার অবতার বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ magnetic power ছিল; যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তাহাকেই তিনি অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন। অক্ষয়বাবুও তাঁহার সেই চুম্বকশক্তিবলে শক্তিশালী লেখক হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের তিরোধানের পর শ্রীকৃষ্ণের অভাবে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ন্যায় অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-কার্ম্মুক আর উঠিতেছে না!" আমাদের বন্ধু উপরিউক্ত কথাগুলি একেবারে তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে লিখিয়াছেন "অদম্য উৎসাহে, অশ্রাব্যস্বরে, উচ্ছ্বাসে চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া, সারদাবাবুর ইঙ্গিত-অনুরোধ না মানিয়া, অক্ষয়বাবু ম্যালেরিয়া-মহিমা গায়িয়া যাইতে লাগিলেন!" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়সম্বন্ধে একস্থানে শ্রীযুক্ত রসিক বাবু লিখিয়াছিলেন—"সভাপতিমহাশয় পাঠে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন" এই কথার পরিবর্ত্তে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে—"রাজপুরুষগণের পরিচিত—Political পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত—এস্থলেও তাঁহার সেদিনকার politeness বাদ্ গেল না—তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজসাহীর কমিসনারি সাহেবকে দেখিয়া পাঠে ভঙ্গ দিয়া চট্ করিয়া একটা সেলাম করিয়া লইলেন।" এতদ্ব্যতীত দুই এক স্থলে দুই একটি শব্দের বা সামান্য কথার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এই সকল ক্রটীর জন্য আমরা উপরিউক্ত মহোদয়গণের নিকট এবং স্বয়ং রসিকবাবুর নিকট ক্রটি স্বীকার করিতে যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত,—একথা আমরা রসিকবাবুকে জানাইয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও গিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি এজন্য এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমাদের ক্রটী-স্বীকার করার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই, সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন; আমরাও আমাদের এই ক্রটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তদ্ভিন্ন, যে মহাত্মগণের সম্বন্ধে রসিক বাবু যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা, এবং 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত মন্তব্য পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া উক্ত মহাত্মগণের নিকট আমাদের পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের নিকট এতৎপ্রসঙ্গে কিছু করা প্রয়োজন কি না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

নোবেল্ পুরস্কার

নোবেল্

পাশ্চাত্যপ্রদেশে, বাগ্দেবীর ভক্তদিগকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশে, ফ্রেঞ্চ একাডেমির সাহিত্যের প্রধান পুরস্কার, অকস্ফোর্ডের নিউডগেট্ পুরস্কার, বাউমগার্টানের পুরস্কার, লাকাস্ পুরস্কার, লাইবনিজ্ পুরস্কার, স্মিথ্ পুরস্কার, নোবেল্ পুরস্কার প্রভৃতি ৫৭টি বড় বড় পুরস্কার আছে। এই সমস্ত পুরস্কারের মধ্যে নোবেল্ পুরস্কারই সকলের শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত।

ইহা প্রতিবৎসর ৫টি স্বতন্ত্র বিভাগে প্রদত্ত হয়। প্রত্যেকটি ৮ হাজার পৌণ্ড। প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ সম্বন্ধের দরখাস্ত 'নোবেল্ প্রাইজ কমিটি'র হস্তগত হওয়া চাই। পরবর্ত্তী ১০ই ডিসেম্বর ফলাফল জানা যায়। "Nobel stiftelsen, Stockholm—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে, এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানা যায়।

নোবেল্ পুরস্কার সম্বন্ধে সাময়িকপত্রাদিতে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরাও এ বিষয় লইয়া অনেকানেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কর্ম্মের এক বিরাট্ তরঙ্গ ছুটিয়াছে। পাশ্চাত্য-মনীষিগণ, নানাদিকে নানাভাবে, জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য, জীবন-ব্যাপী সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব অধ্যবসায়-প্রভাবে, জগদ্বাসী ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্মকথা বা কীর্ত্তিকাহিনী, এতদিন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও, আমরা তেমন ভাবে সজাগ হইয়া উঠিতে পারি নাই। আজ বিজ্ঞান-লক্ষ্মী, তাঁহার জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া, আমাদের দ্বারে উপস্থিত।—বিজ্ঞানালোচনার নবসূচনা, আমাদের দেশের চারিদিকে, ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্পন্দনের দিনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ ও পৃথিবীর মঙ্গলেচ্ছুগণ সম্বন্ধে একটুআধটু বিবরণ দিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

আমরা যেসকল মনীষিগণের বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রতিভাবলে নোবেল্-পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা, বিজ্ঞানের ও পৃথিবীর মঙ্গলকামনায়, জীবনব্যাপী সাধনার পর, যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় জগতে অশেষ কল্যাণ-বিধান করিবে। তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে সমগ্র-পৃথিবীর স্পন্দনকাহিনী পাওয়া যায়।

এই সকল মনীষিগণের বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, আমরা নিম্নে অদ্যাবধি কোন্ দেশে কয়জন নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম।

য়ুরোপ

ইংলণ্ড—৬	জন	স্পেন—২	জন
জর্ম্মাণী—১	"	বেলজীয়ম—২	"
ফ্রান্স—১৪	"	অষ্ট্রীয়া—২	"
ইতালি—৪	"	রুষিয়া—৩	"
হলাণ্ড—৫	"	সুইজায়ল্যাণ্ড—৪	"
সুইডেন—৫	"	নরওয়ে—১	"

ডেনমার্ক—২ জন

আমেরিকা

যুক্তরাজ্য—৪ জন

এসিয়া

ভারতবর্ষ—১ জন জাপান—১ জন

অষ্ট্রেলেসিয়া

নিউজিলণ্ড—১ জন

সভাসমিতি—২

INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW এবং BERNE INTERNATIONAL PEACE BUREAU.

১৯০১—পদার্থ-বিদ্যায়—ডব্লিউ. সি. রণ্ট্‌জেন্

১৯০১

পদার্থ-বিদ্যায়—ডব্লিউ. সি. রণ্টজেন্

নোবেল্ পুরস্কারের প্রথম বৎসরে (১৯০১ খ্রীঃ) পদার্থবিজ্ঞানের পুরস্কার জার্ম্মান পদার্থতত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম্ কন্‌রাড্ রণ্ট্‌জেনকে প্রদানকরা হয়। ইনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ্চ তারিখে প্রুশিয়ার অন্তর্গত লেনেপ্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত 'যুরিক্' সহরে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়; তাহার পর, জার্ম্মানির বিভিন্ন সহরে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উর্জবার্গ সহরে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কাচের নল প্রস্তুত করিতে ও আলোকচিত্র তুলিতে উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং এই দুইটি বিষয় লইয়াই সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। যখন বিজ্ঞানবিদ্ হার্ট্‌জ ও লেনার্ড পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, একটি বায়ুশূন্য (Vacuum) কাচের নলের মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ উৎপাদন করিলে, একটি দৃশ্যমান আলোক-রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন রণ্ট্‌জেন্ এই নবাবিষ্কৃত রশ্মিতত্ত্ব হইতে নূতন কিছু তথ্য উদ্ভাবনার আশায় নানাপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একদা তিনি একটি বায়ুশূন্য কাচের নল প্রস্তুত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগ দুইটি "S" এর আকারে গঠিত করেন; পরে, নিজের পরীক্ষাগারে সেই কাচের নলটির মধ্যদিয়া তাড়িত-আলোক উৎপাদন করিতেছিলেন—ঘরের একধারে কয়েকখানি পুস্তক রক্ষিত ছিল; তন্মধ্যে একখানি পুস্তকের নীচে আলোক-চিত্রের একখানি প্লেট্ এবং পুস্তকের মধ্যে একটি চাবি ছিল;—ক্ষণপরে সেই প্লেটের সাহায্যে আলোক-চিত্র তুলিতে গিয়া দেখেন যে, প্লেটের উপর সেই চাবিটীর রেখা স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া আছে। এরূপ হইবার কারণ স্থির না করিতে পারিয়া, তিনি পুনরায় সেইভাবে পরীক্ষা করিয়া একইরূপ ফললাভ করিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, একটি অলক্ষ্য আলোক-রশ্মি (Invisible light) সেই উত্তপ্ত নলহইতে প্রকাশিত হইয়া, অস্বচ্ছ কাগজের পাতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, চাবিটির চিত্র প্লেটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে; রশ্মিরেখাগুলি যে শুধু অস্বচ্ছ পদার্থের অস্বচ্ছতা-ভেদ করিতে সমর্থ—তাহাই নহে, তাহা আবার সূর্য্য রশ্মির ন্যায় রাসায়নিক গুণসম্পন্ন। এই অলক্ষ্য

১৯০১—রসায়নে—অধ্যাপক জে. এচ. ভাণ্ট-হফ্

আলোকের গতিবিধি-প্রকৃতি নিরাকরণের যাবতীয় আন্ত-প্রয়াস ব্যর্থ হয়। পরে, ইহার স্বরূপ ঠিক করিবার জন্য, একটী

১৯০১—ভেষজে—অধ্যাপক ই. ভন্ বেহারিং

কাল পর্দ্দার একদিকে Barium Platino-cynide নামক (Florescent) পদার্থের দানা রাখিয়া দিলেন; অপরদিকে তিনি সেই বায়ুহীন কাচের নলের মধ্যে তাড়িতালোক প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। তাড়িত প্রবাহিত হইবামাত্র অদৃশ্য-রশ্মিরেখাগুলি, নলহইতে বাহির হইয়া, অপরপার্শ্বস্থ দানাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। ইহা হইতে তিনি সেই অদৃশ্য-রশ্মির প্রবাহের স্বরূপ স্থির করিতে পারিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, তিনি তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারটী উর্জবার্গ Physico-Medical Society নামক বিজ্ঞান-সভার গোচর করিলেন।—এই অদৃশ্য-রশ্মির প্রকৃতি যথাযথ অবগত হওয়ায়, তিনি ইহার নাম দিলেন 'X'-Ray; কারণ 'X' বর্ণটি ইংরেজীতে অজ্ঞাত-বিষয়ের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহাই রণ্ট্জেন্-রশ্মি অথবা 'X'-Ray; ইহাদ্বারা চিকিৎসা-বিদ্যার অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। কোন বস্তুর অস্বচ্ছ আবরণভেদ করিয়া আলোকচিত্র তুলিবার গুণ আছে বলিয়া, 'রণ্ট্জেন্-রশ্মি' ভাঙ্গাহাড়, শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 'গুলি,' দেহমধ্যস্থিত স্ফোটক প্রভৃতির আলোকচিত্র তুলিয়া, অস্ত্র-বিদ্যার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। রণ্ট্জেন্-রশ্মি শরীরের উপর অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে শরীরের তৎস্থানে ক্ষত উৎপাদিত করে; এই ক্ষতউৎপাদিকা-শক্তির সাহায্যে, কতকগুলি বিশেষ রোগ আরাম করিবার চেষ্টাহইতেছে।* রণ্ট্জেন্ এক্ষণে ম্যুনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেছেন।

রসায়নে—অধ্যাপক জে. এচ্. ভ্যাণ্ট্-হফ্

এই বৎসর রসায়ন-শাস্ত্রের পুরস্কার বিখ্যাত জার্ম্মান্ অধ্যাপক ভ্যাণ্ট্-হফ্কে প্রদান করা হয়। ভ্যাণ্ট্ হফ্ ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ৩০এ আগষ্ট হলণ্ডপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন; জার্ম্মানীর অন্তর্গত 'বন' সহরে ও ফ্রান্সের প্যারী সহরে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে, ছাত্রাবস্থায় তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া, তাঁহার ভাবী উজ্জ্বল জীবনের আভাস প্রদান করেন। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জৈব-পদার্থ (Living bodies) হইতে এমন কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহাদের পরমাণুর সংখ্যা এবং গুণ এক হইলেও রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অর্থাৎ, জাত-পদার্থচয়ের কতকগুলি ফুটিবার সময় এবং গলিবার সময় যে তাপ হয়, তাহা—অপরগুলির স্ফুটন-তাপ ও গলন-তাপ, এবং দানার আকৃতি (Crystaline shape) হইতে

১৯০১—সাহিত্যে—এস্. প্রুধোম্

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহার সঙ্গত কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ভ্যাণ্ট্-হফ্ তাঁহার অপূর্ব্ব মেধাবলে

* Quain's Medical Dictionary—P. 1438 দ্রষ্টব্য।

দেখাইলেন যে, এতাবৎকাল এই সকল দ্রব্যের পরমাণুগুলির গঠন-প্রণালী সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

১৯০১—শান্তিতে (১) জান্-হেনরী ডুনাণ্ট্

তিনি, অঙ্গারের যৌগিক মিলনে প্রাপ্ত, বহুপদার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন দুইটি পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু—সংখ্যায় এক হইলেও, পরস্পরের গঠন-প্রণালীতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন (arrangement in space was different)। এই গঠনপ্রণালীর জন্য বস্তুগুলির রাসায়নিক গুণেরও পার্থক্য দেখা যায়। গঠন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি যে নূতন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম 'STEREO CHEMISTRY'.

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভ্যাণ্ট্-হফ্ আম্ষ্টার্ডম্ সহরের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৮৮৫ সালে, নানাপ্রকার দ্রব্য (Solution) লইয়া পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তিনি LAW OF OSMOTIC PRESSURE আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ সালে প্রসিয়ার বিজ্ঞান-সভা (ACADEMY OF SCIENCE) তাঁহাকে প্রভূত বেতনে বার্লিনের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে একটি সুন্দর রাসায়নিক পরীক্ষাগারের (Laboratory) ভার দেওয়া হয়। এই স্থানে, সমুদ্রে প্রাপ্ত দ্রব্য সকলের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া, তিনি পরীক্ষা-মূলক ভূতত্ত্ববিদ্যার (EXPERIMENTAL GEOLOGY) ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসায়নিক গতিশীলতা (LAW OF MASS ACTION —CHEMICAL DYNAMICS) এবং রাসায়নিক সাম্যের (CHEMICAL EQUILIBRIUM) এর স্থির ভিত্তি-স্থাপন করিয়া যশস্বী হয়েন। ১৯১১ সালে এই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

ভেষজ-বিদ্যায়—অধ্যাপক ই. ভন্-বেহরিঙ্গ্

এই বৎসর ভেষজ-বিদ্যার পুরস্কার বিখ্যাত জার্ম্মান্ কীটানুতত্ত্ববিদ্ বেহরিঙ্গ্‌কে দেওয়া হয়। বেহরিঙ্গ্ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ জার্ম্মানীর অন্তর্গত 'হান্‌স্‌ডর্ফ' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পাস্তুর, কক্, ইয়ারলিক্ প্রভৃতি কীটানু-তত্ত্ববিদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ইনি নানাপ্রকার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইনি বিখ্যাত জাপানী কীটানুতত্ত্ববিদ্ কিটাসাটোর সাহচর্য্যে ডিপ্‌থিরিয়া-বিষঘ্ন (ANTITOXIN) আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। এই বিষঘ্ন-আবিষ্কারের পূর্ব্বে ডিপ্‌থিরিয়া রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইত; কিন্তু এক্ষণে রোগ সূচিত হইবামাত্র, এই বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, শতকরা ৯৫ জন লোক আরোগ্যলাভ করে। ১৯১২ খৃঃ অব্দে বেহরিঙ্গ্ উইস্‌বেডেন্ সহরে, চিকিৎসা-সম্মিলনীর সমক্ষে, আর একটি নূতন আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে প্রতিষেধক টিকা (VACCINE) আবিষ্কারে

১৯০১—শান্তিতে (২)—এফ্ প্যাসি

তিনি সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই টিকা জেনারের আবিষ্কৃত বসন্ত-রোগের টিকা হইতে অধিকতর ফলপ্রদ।

সাহিত্যে—এস্. প্রধোম্ম

এই বৎসর সাহিত্যিক নোবেল্ পুরস্কার ফরাসীকবি সুস্কি প্রধোম্ম প্রাপ্ত হন। *
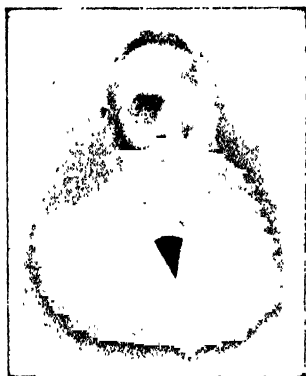
১৯০২—পদার্থ বিদ্যায় (১)—অধ্যাপক এচ্. এ. লরেঞ্জ্

এই বৎসর "শান্তি-পুরস্কার" সুইজারল্যাণ্ডবাসী ডুনাণ্ট্ ও ফরাসী-রাজনীতিক প্যাসিকে প্রদান করা হয়।

শান্তি-পুরস্কার (১)—জীন্-হেনরী ডুনাণ্ট্

সুলেখক জীন-হেনরী ডুনাণ্ট্ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'Un Souvenier de Solferino' নামক পুস্তকরচনা করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই পুস্তকে 'Solferino' যুদ্ধের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষণ বর্ণনা প্রদান করিয়া, তিনি যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের সেবা-ব্যপদেশে 'শুশ্রূষা-সমিতি'-গঠনের প্রার্থনা করেন। এই পুস্তক সমগ্র য়ুরোপে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে, তাহার ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা-সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে, যুদ্ধে—বিপক্ষদল হাঁসপাতালস্থ রোগীদিগকে এবং শুশ্রূষাকারীদিগকে আক্রমণ কিংবা বন্দী করিতে পারিবে না। তিনি জেনিভাকে কেন্দ্র করিয়া জগৎময় একটি বিশ্ববিশ্রুত 'শুশ্রূষা-সমিতি' গঠন করেন। একটি 'লাল ক্রুশ' এই সমিতির চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হয় বলিয়া, এই সমিতি 'RED CROSS SOCIETY' নামে পরিচিত। ডুনাণ্ট্ ১৯১০ খৃঃ ৩০এ অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শান্তি-পুরস্কার (২)—এফ্. প্যাসী

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও শান্তি-নায়ক ফ্রেডারিক্ প্যাসি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি, ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের অর্থসচিব হিপোলেট্ প্যাসির ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতৃব্যের নিকট তিনি ধনবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে ধনবিজ্ঞান অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন; তিনি প্রজাতন্ত্র ও (Free Trade) অবাধ-বাণিজ্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত অবাধবাণিজ্য-নায়ক কব্‌ডেনের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্য ছিল। ইনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Ligwe Internationale de La Paix নামক শান্তি-সভার প্রতিষ্ঠা করেন; পরে বিখ্যাত ইংরাজ শান্তি-নায়ক ক্রমারের উৎসাহানুকুল্যে Societe Pour La Aleitrange entre Nations নামধেয় আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

১৯০২

পদার্থ-বিদ্যায় (১)—অধ্যাপক এচ্. এ. লরেঞ্জ্

১৯০২ খৃঃ অব্দে পদার্থবিদ্যার পুরস্কার বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক লরেঞ্জ্, এবং পী. জীম্যান্‌কে প্রদান করা হয়। লরেঞ্জ্ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০২—পদার্থ-বিদ্যায় (২)—ডাক্তার পি. জীম্যান্

* সাহিত্যে নোবেল্ পুরস্কারের পরিচয় ১৩২০ সালের পৌষ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" প্রদত্ত হইয়াছে। সেইস্থানে উহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইনি লাইডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। লরেঞ্জ আলোকপাতের উপর চুম্বকশক্তি সম্বন্ধে কএকটি অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষা সাধারণের নিকট প্রদর্শন করেন।
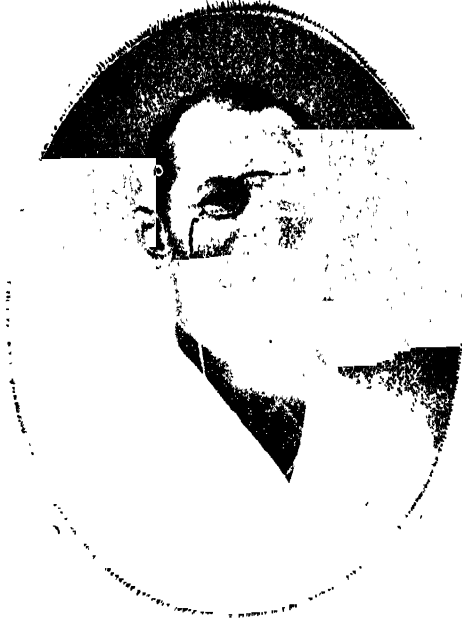
১৯০২—রসায়নে—ই. ফিশর্

পদার্থ-বিদ্যায় (২)—ডাঃ পী. জীম্যান্

পিটার্ জীম্যান্ ১৮৬৫ খৃঃ ২৫এ মে হলণ্ডের অন্তঃপাতী জন্‌মেয়রে সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও লরেঞ্জের ন্যায় একটি বর্ণরেখাকে (Spectrum) চুম্বকশক্তি-প্রয়োগে দ্বিধা ও বহুধা বিভক্ত করিয়া, আলোকের তাড়িত-চুম্বকবাদ মতের (Electro-Magnetic Theory of Light) পোষকতা করিয়া, বৈজ্ঞানিক সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি আম্‌স্‌টারডাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। তাহার পূর্ব্বে ইনি লাইডেন্ ইন্‌ষ্টিটিউটে গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন।

রসায়নে—ই. ফিশার্

এই বৎসর রসায়নশাস্ত্রের পুরস্কার এমিল্ ফিশার্‌কে প্রদান করা হয়। প্রসিয়ার অন্তর্গত ইউস্‌কারসেন্ নগরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ফিশার্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বন' ও ষ্ট্রাল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ম্যুনিক্ সহরে, বিখ্যাত রাসায়নিক বাচারের নিকট, শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গমন করেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি Hydrogen ও Nitrogen নামক গ্যাসের যৌগিক-মিলনে Hyroxine নামক একটি নূতন পদার্থ উদ্ভাবনা করেন। পরে, পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত পদার্থটির, এবং পার্কিন্-কর্ত্তৃক আল্‌কাতরা হইতে আবিষ্কৃত মেজেণ্টা রংএর, মূল (base) এক। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে নানা-প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানদ্বারা জৈবিক-পদার্থের (Organic) সহিত ভৌতিক-পদার্থের (Inorgainc) সম্বন্ধ-আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি অবগত হইলেন যে, যে পদার্থের জন্য চা, কফি, কোকো—উত্তেজক গুণ প্রাপ্তহইয়াছে (Caffine, Theo-bromine, &c.), তাহা এবং মূত্রেস্থিত ইউরিয়া (Urea)র রাসায়নিক গঠন একই। তৎপরে মূত্র হইতে চা, কোকো, কফি প্রভৃতির উত্তেজক পদার্থ, অর্থাৎ, Caffine, Theobromine, etc. প্রস্তুত করিলেন। ঐ বৎসরেই রাসায়নিক পরীক্ষাগারে তিনি কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করেন। রাসায়নিক হফ্‌মানের মৃত্যুর পর, তিনি বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। এইস্থানে এখনও ইনি জীবশরীরস্থ Albumin ও Protien নামক পদার্থগুলি লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। ফিশার্ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Albuminকে রাসায়নিক

১৯০২—ভেষজে—আর রস্

প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করিয়া Ammonia ও Amino-acidএ পরিণত করেন। জীবদেহপোষণে Protien অতি

প্রয়োজনীয় পদার্থ; তজ্জন্য আমাদের আহার্যদ্রব্যে, বহুল পরিমাণে Protienএর আবশ্যক হয়। লোকে জানিত

১৯০২—সাহিত্যে টি মমসেন্

জৈবিক-পদার্থ ভিন্ন Protien জন্মে না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফিশার্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় Protien প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মান সম্রাট্‌কে উপহার দেন। মানবদেহের পুষ্টিসাধনের জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া, ফিশার্ মানবের অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। চামড়া-সংস্কার প্রক্রিয়ায় Tanin নামক পদার্থের বহুল আবশ্যকতা আছে। কৃত্রিম উপায়ে Tanin প্রস্তুত, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কীর্ত্তি। ফিশারের কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত Taninএর মূল্য, গাছগাছড়া হইতে প্রাপ্ত Tanin অপেক্ষা অনেক সুলভ। মানবদেহে যে রাসায়নিক দ্রব্য বর্ত্তমান থাকায়, মানবের পাচনী-শক্তি (Eurynie) আছে, তাহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার জন্য ফিশার্ সচেষ্ট আছেন।

ভেষজ-বিদ্যায়—আর. রস্

এই বৎসর চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে পুরস্কার স্যর্ রোনাল্ড্ রস্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রস ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং লণ্ডনস্থ সেণ্ট বার্থলমো হাঁসপাতালে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় চিকিৎসা-বিভাগে প্রবেশলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কেবলমাত্র কবিতা ও উপন্যাস লিখিয়া, অবসর সময় ক্ষেপণ করিতেন। ম্যালেরিয়া-রোগে ভারতবাসীদিগের দৈহিক ও মানসিক অবনতি দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, গ্রীস ও রোমের অধঃপতন বুঝি এই কারণেই হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই ম্যালেরিয়া-ব্যাধি-প্রতিষেধক আবিষ্কার-কল্পে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া, এই রোগতথ্য আবিষ্কারের জন্য জীবাণুতত্ত্ব (Bactriology) অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ল্যাভারণ্ আফ্রিকার অন্তর্গত আল্‌জিরিয়া প্রদেশে—"মশক হইতে জীবদেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়", এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন। Ross এই তথ্যটি অবগত ছিলেন না; কিন্তু স্যর্ প্যাট্রিক্ ম্যান্‌সনের নিকট ল্যাভারণের আবিষ্কারের কথা অবগত হইয়া, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ইহার সত্যতা-নির্দ্ধারণের জন্য, মশক লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ম্যালেরিয়া-রোগে আক্রান্ত একটি রোগীর রক্ত, দুই জাতীয় মশককে পান করাইয়া, মশকদেহে রোগজীবাণু প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু এই মশকগুলিদ্বারা নরদেহ আক্রান্ত করাইয়া 'রস' পরীক্ষা করিয়া অবগত হন যে, সেই নরদেহে ম্যালেরিয়া-বিষ সংক্রামিত হয় নাই। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে,

১৯০২—শান্তি-পুরস্কার (২)—ই. ডুকোমুন্

সকল প্রকার মশকের ম্যালেরিয়া-বিষ সংক্রামিত করিবার শক্তি নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীতে

অ্যানোফিলি (Anophile) নামক ম্যালেরিয়া-সংক্রামক এক শ্রেণীর মশক আবিষ্কার করেন।

১৯০২—শান্তি পুরস্কার (২)—চাল স্ এলবার্ট গোবাট্

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লিভারপুলে 'গ্রীষ্মপ্রধানদেশের ভেষজানুসন্ধান বিদ্যালয়ে' (School of Tropical Medicine)র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া, মশক-নিবারণকল্পে নানাউপায় উদ্ভাবনা করেন।

রস্ (Ross) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে 'সুয়েজ কেন্যাল্ কাম্পানী' কর্ত্তৃক সুয়েজের ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে নিযুক্ত হয়েন। চারিজন অভিজ্ঞ সহচরের সাহায্যে, একবৎসরের মধ্যে, মশক-বংশ ধ্বংস করিয়া, সেই স্থানটির ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করেন। উক্ত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভেষজ-বিদ্যাবিষয়ক নোবেল্ পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

সাহিত্যে—টি. মম্‌সেন্

এই বৎসরের সাহিত্যের পুরস্কার জার্ম্মান্ ঐতিহাসিক থিওডোর মম্‌সেন্‌কে প্রদান করা হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০এ নভেম্বর ইঁহার জন্ম হয়, মৃত্যু—১৯০৩ সালের ১লা নভেম্বর। প্রত্নতত্ব, ব্যবহার-শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

শান্তি-পুরস্কার (১)—ই. ডুকোমুন্

সুইজার্‌ল্যাণ্ড-নিবাসী ডুকোমুন্ এবং সি. এ. গোবাট্‌কে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের 'শান্তি-পুরস্কার' প্রদত্ত হয়। এলী ডুকোমুন্ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ইনি জার্ম্মান্‌ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করেন। ডুকোমুন্ সাধারণ-শিক্ষা বিভাগে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। 'Revue de Genive' নামক পত্রিকায় ইঁহার সাহিত্যিক পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে ডুকোমুন্ "শান্তি-সংস্থাপন" ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে 'Ligue Internationale de la Paix et de la Liberate' নামক সমিতি স্থাপিত হয়, একমাত্র ইঁহারই চেষ্টায় তাহা পরিপুষ্টি লাভ করে। ইনি ১৮৮৯ সাল হইতে বার্ষিক 'শান্তি সম্মেলনে'র (Congress) প্রধান প্রধান কার্য্য, দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার বাগ্মিতাও যথেষ্ট।

শান্তি পুরস্কার (২)—সি. এ. গোবাট্

ডাক্তার চার্লস্ এলবার্ট গোবাট্ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শান্তি-সংরক্ষণ ব্যাপারে আপনার জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্যাণ্টনের 'সাধারণ শিক্ষা-বিভাগে'র পরিচালক (Director) ছিলেন। এই বৎসর তিনি ক্যান্টন্ গভর্ণমেণ্টের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 'সীইন্' ব্যাপারে ইনি সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ হইতে

১৯০৩—পদার্থ-বিদ্যায় (১)—এ. এচ. বেকারেল্

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি 'Conseil des Plat's' সমিতির বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক

পার্লামেণ্ট সভায় সাধারণে ইঁহাকে সভাপতিপদে বৃত করেন।

১৯০৩—পদার্থ বিদ্যায় (২)—এম্. এস্. কুরি

১৯০৩ পদার্থ-বিদ্যা (১)—এ. এচ্. বেকারেল্

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানের পুরস্কার ফরাশী পণ্ডিত আণ্টয়ন্ হেনুরি বেকারেল্, পিরি কুরি, ও পোল-রমণী মারি স্কলডোভ্স্কা কুরিকে প্রদান করা হইয়াছিল।

আণ্টয়েন্ হেনুরি বেকারেল্ ফ্রান্সের অন্তর্গত প্যারী নগরে ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ও পিতামহ বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। বেকারেল্ পলিটেক্‌নিক্-স্কুলে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ১৮৭৭ সালে ইঞ্জিনিয়ার্ হন। ১৮৮৫ সালে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম শ্রেণীর পদে নিযুক্ত হ'ন। তিনি ১৮৮৮খৃঃ অব্দে 'ডাক্তার অব্ সায়েন্স্' উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং ১৮৯২খৃঃ অব্দে Natural History Meuseum এ তাঁহার পিতার স্থলে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ইউরেনিয়ম্ নামক ধাতু আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হ'ন। ইহা বিনা-উত্তাপ প্রয়োগেও সাধারণতঃ রশ্মিবিকীরণ করে। পরে কতকগুলি দানাদার পদার্থের (crystals) আলোক-শোষণ করিবার শক্তির পরিমাণ নিদ্ধারণ করিয়া ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

পদার্থ-বিদ্যায় (২)—এম্.-এস্. কুরী

মারিকুরি পোলাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ার শ সহরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার পিতা বিখ্যাত পোল-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্ক্লোডোভস্কির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগারে তাঁহার বিদ্যা-চর্চ্চা সূচিত হয়। ইনি অতি অল্প বয়সে, অনুসন্ধানাগারের শিশিগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে, প্রায় সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম শিখিয়া ফেলেন।

ওয়ার শ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্যারী নগরে আগমন করিয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিপ্‌ম্যানের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তথায় তাঁহার ভাবীস্বামী পিরি কুরির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হইলে, উভয়ে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। ইতোমধ্যে তাড়িত-বিজ্ঞানে নানা প্রকার আবিষ্কার করিয়া পিরি যশস্বী হ'ন।

পদার্থ-বিদ্যায় (৩)—পি. কুরী

পিরি ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মে মাসে প্যারীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেকারেল্-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ইউরেনিয়ম্-রশ্মি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, শ্রীমতী কুরি কতকগুলি নূতন তথ্য তাঁহার স্বামীর গোচর করেন। তখন উভয়ে একসঙ্গে উক্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক পদার্থ

১৯০৩—পদার্থ-বিদ্যায় (৩)—পি. কুরি

হইতেই সর্ব্বপ্রথমে ইউরেনিয়ম্ ধাতু পাওয়া যায়। সেই পিচ্‌ব্লেণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে, তাঁহারা রেডিয়ম্ নামক অত্যাশ্চর্য্য অভিনব ধাতু আবিষ্কার করেন।

ইঁহারা ২৭ মন পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে মোটে এক গ্রেণ রেডিয়াম্ বাহির করিতে সমর্থ হ'ন; এবং এইকার্য্যে তাঁহাদের

১৯০৩—রসায়নে—এ আরহিনাস্

২০০০০ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হয়। একদা 'পিরি'র অসাবধানতা বশতঃ রেডিয়ামের শিশিটি হস্তচ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বহুমূল্য ও বহু আয়াসলব্ধ রেডিয়াম্‌টুকু ঘরের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে হারাইয়া যায়! পরে বহুকষ্টে তাঁহারা তাহার উদ্ধার সাধন করেন। উজ্জ্বল দিবালোকে রেডিয়াম্ ধাতু দেখিতে সাধারণ লবণের ন্যায়; কিন্তু অন্ধকারে উহা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে। উহার ক্ষয় নাই; উহা হইতে সমধিক পরিমাণে ও অবিরতভাবে রশ্মি বিনির্গত হইলেও উহা অক্ষুন্ন থাকে। ফটোগ্রাফীর প্লেটের উপর সূর্য্য-রশ্মি যে ক্রিয়া প্রকটিত করে, রেডিয়াম্-রশ্মি ঠিক তাহারই অনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। রেডিয়াম্-রশ্মিপ্রভাবে গাত্রচর্ম্মে ক্ষত উৎপাদিত হয়। পিরি কুরি লণ্ডনের রয়াল্ ইনিষ্টিটুটে রেডিয়াম্‌সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া, ফিরিবার সময়ে ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে রেডিয়ামের পাত্রটি রাখিয়া দেন। প্যারীতে ফিরিয়া দেখিলেন, পকেটের নিচে গাত্রচর্ম্মে একটি দাগ পড়িয়াছে। সেই দাগ ক্রমে ভীষণ ক্ষতে পরিণত হইল।

রেডিয়াম্ হইতে তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার রশ্মি ক্ষত-উৎপাদন করে, এবং অন্য এক প্রকার রশ্মির ক্ষত-আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। ফ্রান্সের পাস্তর ইন্‌স্টিটুট্ এই শক্তিকে দুরারোগ্য ক্যান্সার্ রোগচিকিৎসার্থে প্রয়োগ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন।* বৈজ্ঞানিক রুডারফোর্ড ও র‍্যাম্‌সে,—রেডিয়াম্ সাহায্যে নানা অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাহার সবিশেষ পরিচয় পরে প্রদত্ত হইল।

১৯০৬ সালে পিরি কুরি, ময়লার গাড়ী চাপা পড়িয়া, ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীমতী কুরি তাঁহার স্থলে সার্ব্বোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। এইস্থানে শ্রীমতী কুরি রেডিয়াম্ হইতে পলোনিয়ম্ নামক সূক্ষ্মতম পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পলোনিয়ম্, রেডিয়াম্-অপেক্ষা দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য। ইহারা পরস্পরের সহিত সহজেই মিশিয়া যায় বলিয়া, কুরি ইহাকে পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ করিয়া ইহার গুণগুলি স্থির করিতে ব্যাপৃত আছেন।

রসায়নে—এ. আর্‌হিনাস্

এই বৎসরের রসায়ন-শাস্ত্রের পুরস্কার স্বান্তে আর্‌হিনাস্‌কে দেওয়া হইয়াছিল। স্বান্তে আর্‌হিনাস্ ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ১৯ এ ফেব্রুয়ারি সুইডেনের অন্তর্গত আপ্‌শালা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আপ্‌শালা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত

১৯০৩—ভেষজে—এন্. আর্. ফিন্‌সেন্

করিয়া, ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি পি. এইচ. ডি

* *Vide*—Treatment by Radium by O. Lassar, & Bacterial Action of Radium-Rays by E. Froidberger.

(PH. D) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঐ স্থানের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৫

১৯০৩ - সাহিত্যে—বি. বোর্ণসন্

খৃঃ অব্দে তিনি ষ্টকহলমস্থ নোবেল্-ইনিষ্টিটুটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। ইনি ধাতবপদার্থের তাড়িত-বিশ্লেষণের (Electrolytic dissociation of metals) ব্যাখ্যা করিয়া অমর হইয়াছেন। এই বিষয়ে ইঁহার প্রামক-তত্ত্ব (Ionic theory) নামক সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃত হইয়াছে। তাড়িত-বিশ্লেষণে পরীক্ষাদ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, এই মতবাদদ্বারা সেই সমস্ত ঘটনার কারণ, সহজে বোধগম্য এবং ব্যাখ্যাত হয়; সেই জন্য এই মতবাদটি সুধী-সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে।

অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হাইডেল্‌বার্গ, লিপ্‌জিক্ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডনস্থ কেমিক্যাল্ সোসাইটি, রয়েল্ সোসাইটি প্রভৃতি বিজ্ঞান-সভা আর্‌হিনাস্‌কে বহুসম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত ইলেক্ট্রোকেমিষ্ট্রি, ওয়ার্লর্ড ইন্ দি মেকিং,লাইফ্ অব্ ইউনিভার্স প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে।

ভেষজ-বিদ্যায়—এন্. আর. ফিন্‌সেন্

এই বৎসরকার চিকিৎসাবিদ্যার পুরস্কার ডিনেমার ডাক্তার নিলস্ রাইবার্গ ফিন্‌সেন্‌কে দেওয়া হয়।

১৮৬১ খৃঃ অঃ ফ্যারোদ্বীপে ফিন্‌সেন্ জন্মগ্রহণ করেন; এবং কোপেন্‌হাগেন্-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ-প্রশংসার সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (Anatomy) শরীর-সংস্থান-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি মানব-শরীরের উপর সূর্য্যরশ্মির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। সূর্য্যরশ্মির সাধারণতঃ যে তিনটি প্রধান রশ্মি—রক্ত, পীত ও ধূম্র (Violet and Ultraviolet), তন্মধ্যে বেগুনী-রশ্মির মানবদেহের উপর যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আছে, তাহা তিনি পরীক্ষাদ্বারা অবগত হ'ন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সূর্য্যরশ্মির বেগুনী আলোকগুলি বসন্তরোগীর পক্ষে হানিকর। একালে চীন, রুমেনিয়া প্রভৃতি কতিপয় দেশে, এবং মধ্যযুগে য়ুরোপে, রক্তবস্ত্রাবৃত কক্ষে বসন্তরোগীদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা আছে ও ছিল। এতাবৎ সভ্যজগৎ এই প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ফিন্‌সেন্, কোপেন্‌হাগেন্-হাসপাতালে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে, এতদ্দ্বারা গুটীগুলি কমিয়া যায়। সূর্য্যরশ্মিস্থ বেগুনী রংগুলি বসন্ত-রোগীর পক্ষে হানিকর; এই রশ্মিগুলি লাল রং ভেদ করিতে সমর্থ নহে; তজ্জন্য, রক্তবর্ণাবৃত কক্ষে বেগুনী-রশ্মি প্রবেশ করিতে না পারাতে, রোগীর রোগবৃদ্ধি হয় না।

ফিন্‌সেনের আবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালী—বসন্তরোগের প্রতিষেধক না হইলেও—জ্বর, ক্ষত প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উপদ্রবগুলি নিবারণ করিয়া রোগযন্ত্রনার উপশম করে।

১৯০৩—শান্তি-পুরস্কার—ডব্লিউ. আর. ক্রেমার্

বেগুনী-রশ্মি লইয়া পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, ফিন্‌সেন্ অবগত হইলেন যে, এই রশ্মির স্নায়ুমণ্ডলীকে

উত্তেজিত করিবার শক্তি আছে; ফিন্‌সেন্ এই রশ্মি-প্রবাহ মানব-শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেহের পুষ্টিসাধনের

১৯০১—পদার্থবিদ্যায়—লর্ড র‍্যালে

ব্যবস্থা করিয়াছেন। লুপাস্ ভল্‌গেরিস (Lupus vulgaris) নামক ক্ষয়রোগের বীজাণু এই রশ্মিদ্বারা বিনাশ করিয়া, এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ধ্রুব মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া, মানবের অশেষ-হিতসাধন করেন। ফিন্‌সেনই সর্ব্বপ্রথমে আলোক-রশ্মি ব্যবহার করিয়া (Photo-therapy) আলোক-চিকিৎসা-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে, রঞ্জেন্-রশ্মি ও রেডিয়াম্-রশ্মিকেও চিকিৎসাবিষয়ে ব্যবহার করা হইয়াছে। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ফিন্‌সেনের মৃত্যু হয়।

সাহিত্যে—বি. বোর্ণসন্

এই বৎসর সাহিত্যের পুরস্কার নরওয়ের নাট্যকার ও কবি বোর্ণসন্ প্রাপ্ত হন।

শান্তি-পুরস্কার—ডব্লিউ. আর. ক্রেমার্

এই বৎসরের শান্তি-পুরস্কার বিখ্যাত ইংরাজ শান্তিনায়ক উইলিয়াম্ র‍্যাণ্ডাল্ ক্রেমার্ প্রাপ্ত হয়।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ফেয়ারহ্যাম্ সহরে ক্রেমারের জন্ম হয়। গৃহে জননীর নিকট যৎসামান্য শিক্ষা-লাভ করিয়া, তিনি ছুতার-মিস্ত্রীর কার্য্য আরম্ভ করেন। ৩ বৎসর বয়সে লণ্ডনে আসিয়া 'কার্পেণ্টারস্ ট্রেড্‌ইউনিয়ন্' নামক সূত্রধর-সভায় যোগদান করেন, এবং কিছুদিন পরে 'অ্যামাল্‌গেমেটেড্ কারপেণ্টারস্ এণ্ড জয়নারস্ ইউনিয়ন্' নামক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের স্বত্ব-সংরক্ষণী আন্দোলনের (Trade Union Agitation) একজন নায়ক হইয়া উঠিলেন। ইনিই সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদীদিগের অন্তর্জাতিক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শৈশবাস্থায় "জগতে শান্তি-স্থাপন" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা শুনিয়া, যুদ্ধবিগ্রহ-নিবারণ করিবার চেষ্টাতে, নিজের সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিতে ইনি কৃতসংকল্প হন। ১৮৭০ খৃঃঅব্দে, ফরাসী প্রুসীয় সমরের সময়, শ্রমজীবীদিগের শান্তি-সভার (Workingmen's Peace Association) প্রতিষ্ঠা করেন; এই সভাই কালে (International Arbitration League) অন্তর্জাতিক সালিসী সভায় পরিণত হইয়াছে। এই সভাই ইংলণ্ডকে ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় সমরে ও রুশ তুর্ক সমরে যোগদান করিতে বিরত করেন। ক্রেমার, ফরাসী শান্তি-নায়ক প্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া, 'ইণ্টর পার্লামেণ্টারি ইউনিয়ন্ অব্-ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল্ আর্বিট্রেশন' নামক সভা স্থাপন করিয়া উভয় জাতির মধ্যে শান্তি-স্থাপনের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নোবেল পুরস্কার পাইয়া, তাহার অধিকাংশই

১৯০৪—রসায়নে—স্যর্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌সে

(একলক্ষ পাঁচ হাজার টাকা) তিনি এই অন্তর্জাতিক সালিসী সভার সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন।

* *Vide*—British Medical Journal, April 23rd, 1914; দ্রষ্টব্য।

পদার্থ-বিদ্যা—লর্ড র‍্যালে

১৯০৪ খৃঃ অব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানের পুরস্কার, প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে (Rayliegh)কে প্রদান
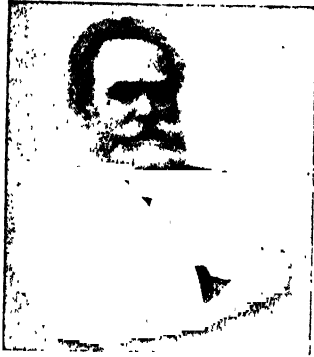
১৯০৪—ভেষজে—আই. পি. পাওলো

করা হয়। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে, ১২ই নভেম্বর, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এসেক্স প্রদেশে র‍্যালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬১ খৃঃ অব্দে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া, তথা হইতে অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ সম্মান—সিনিয়র্ রেঙ্গলার ও স্মিথ্ প্রাইজ্—লাভ করেন। অঙ্কশাস্ত্র চর্চ্চাকালে তিনি (Optics) অক্ষিবিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়, আকাশ কেন নীল দেখায়—তাহার কারণ আবিষ্কার করিয়া তিনি যশস্বী হয়েন। শ্রুতি-বিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া, পদার্থবিদ্যার এই বিশেষ বিভাগটির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে, ইনি সমর্থ হইয়াছেন। লেন্সে,—রুদ্ধকারক মুখ (Shutter) ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়া, ইনি আলোক-চিত্রণবিদ্যার যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বাতাস ও অ্যানোলিয়া হইতে প্রাপ্ত যবক্ষার-জানের (Nitrogen) গুরুত্বের পার্থক্য জানিতে পারিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। পরে বিখ্যাত ইংরাজ রসায়ণবিৎ র‍্যাম্‌সের সাহচর্য্যে বাতাস হইতে প্রাপ্ত যবক্ষারজান হইতে আরগণ (Argon) নামক এক নূতন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করেন। ইনি কয়েক বৎসর রয়েল্ সোসাইটির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার্।

রসায়নে—স্যর্ উ. র‍্যাম্‌সে

এই বৎসরের রসায়ন-শাস্ত্রের পুরস্কার র‍্যালের সহযোগী বিখ্যাত রসায়নবিৎ র‍্যাম্‌সেকে দেওয়া হয়।

স্যর্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌সে স্কটলণ্ডের অন্তর্গত গ্লাস্‌গো সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, বিখ্যাত ইংরাজ পদার্থবিদ্ লর্ড কেলভিনের নিকট কিছুকাল কার্য্য করিয়া, জার্ম্মানীর অন্তর্গত টুবিঞ্জেন্ সহরে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে গমন করেন। তিনি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ব্রিষ্টলের ইউনিভার্সিটি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন এবং অল্পদিনেই অধ্যাপনাগুণে তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লর্ড র‍্যালের সাহচর্য্যে আর্গণ্ গ্যাস আবিষ্কার করিয়া, ইনি সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তৎপরে একাকী, বাতাস লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে করিতে নিয়ন্ (Neon), জিনন্ (Xenon), ক্রিপ্টন্ (Krypton), ও হিলিয়ম্ (Helium) নামক গ্যাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

রেডিয়াম্ আবিষ্কারের অনতিবিলম্বে কানাডা উপনিবেশের অন্তর্গত মণ্ট্রিল্ সহরে, রুদারফোর্ড ও সডি নামক দুইজন নবীন বৈজ্ঞানিক, উক্ত পদার্থ লইয়া গবেষণা করিতে করিতে বুঝিতে পারেন যে, রেডিয়াম্ নামক পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া হিলিয়ম্ নামক মূল-পদার্থে পরিণত হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া র‍্যাম্‌সে, সডিকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া উভয়ে উহার সত্যতা নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। এতাবৎকাল বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস ছিল

১৯০৪—সাহিত্যে (১)—এফ্. মিস্ত্রাল্

যে, মূলপদার্থগুলির পরিবর্ত্তন হয় না; উহাদের পরমাণুগুলি অপরিবর্ত্তনীয়। এই পরমাণুবাদের ভিত্তি ভঙ্গ

করিয়া র‍্যাম্‌সে স্পষ্ট দেখাইলেন যে, মূলপদার্থকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, অন্যমূলে পরিবর্ত্তিত করা যায়। তবে যৌগিক

১৯০৪ - সাহিত্যে (২)—ডি. জে. একেগারে

পদার্থকে পরিবর্ত্তন করা যত সহজসাধ্য, মূলকে পরিবর্ত্তন করা তত সহজসাধ্য নহে; এবং মূল-পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অধিক শক্তি-প্রয়োগ করিতে হয়। র‍্যাম্‌সে, রেডিয়াম্ হইতে হিলিয়ম্ ও নিয়ন্, তাম্র হইতে লিথিয়ম্, সিলিকন্ ও থোরিয়ম্ হইতে অঙ্গার (Carbon) প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইজন্য র‍্যাম্‌সে বিশ্বাস করেন যে, অচিরে তিনি অন্য ধাতুকেও স্বর্ণে পরিণত করিতে পারিবেন। ইহার বিজ্ঞান আলোচনার ফলে, রসায়নশাস্ত্রের নূতন-ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; সেই জন্য জগতের ৫০টি বিজ্ঞান-সভা ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের রয়াল্ সোসাইটি ও ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ একাডেমির বিশিষ্ট সভ্য।

ভেষজ-বিদ্যায় —আই. পি. পাওলো

এই বৎসর চিকিৎসা-বিদ্যার পুরস্কার রুশ চিকিৎসক পাওলোকে প্রদান করা হয়। ইনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন।

ইনি রুষিয়ার অন্তর্গত সেণ্টপিটার্সবর্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-তত্ত্বের অধ্যাপক। তথাকার অনুসন্ধানাগারের অধ্যক্ষ।

সাহিত্যে (১)—এফ্ মিস্ত্রাল্

সাহিত্যে (২) —ডি. জে. একেগারে

এ বৎসর সাহিত্যের পুরস্কার ফরাসী-কবি মিস্ত্রাল্ ও স্পেনীয় নাট্যকার একেগারে প্রাপ্ত হন। মিস্ত্রাল্ বিগত মার্চ্চমাসে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এবৎসরের শান্তি-পুরস্কার দি ইনিষ্টিটুট্ অব্ ইন্টার-নেশান্যাল্‌স্ ল নামক সভাকে প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

অপেক্ষায়

রেখেছি দুয়ার মুক্ত করিয়া
হে প্রিয়! তোমারি তরে,
রেখেছি অর্ঘ্য পত্র পুষ্পে,
এস এ দীনের ঘরে!
পিপাসার জ্বালা এস মিটাইতে
পূর্ণ করিতে প্রাণ,
সুশীতল মধু প্রণয়ের ধারা
এস করাইতে পান।
বাসনা পুরাতে, এস বাঞ্ছিত!
মুছে দিতে আঁখি ধার,
আরাধ্য এস, সফল করিতে
জীবনের অভিসার!

শ্রীমতী বিজনবালা দাসী

নিবেদিতা

(১)

আমার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন ছয়মাসের একটি স্তন্যপায়িনী বালিকার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। পিতামহীর মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম। এবং আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে ভাবীশ্বশুরের গৃহ হইতে একটা বড় গোছের 'তত্ত্ব' আসাতে, সেই বয়সে বিবাহসম্বন্ধে যতটা বুঝিবার তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলাম। 'তত্ত্বে'র মিষ্টান্নাদি উদরস্থ করিবার সময়ে, মিষ্টান্নের মধুরতার মধ্যদিয়া, আমার 'কনে'র অস্তিত্ব-মাধুর্য্যও যেন কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার মনে আছে, একখানা চন্দ্রপুলি মুখে পুরিয়াই আমি পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ঠাকুরমা! কবে আমার কনের সঙ্গে বিয়ে হবে?" তখন চন্দ্রপুলিটার অধিকাংশ আমার মুখের ভিতরে ছিল! প্রশ্ন করিতে গিয়া আমি এমন বিষম খাইয়াছিলাম যে, আমাকে সুস্থ করিতে পিতামহীর অনেকগুলা মৃদু চপেটাঘাত ও তীব্র ফুৎকার আমার মাথার উপরে পড়িয়াছিল। এই বিষম খাওয়ার রহস্যও আমি পিতামহীর নিকটে বিদিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুই যেমন কনেকে স্মরণ করিতেছিস্, কনেও তেমনি তোকে স্মরণ করিতেছে।"

পিতামহীর সমবয়সী এক প্রতিবেশিনী ঠানদিদিও সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় যে সমস্ত মিষ্ট রহস্যে আমাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, একালে তাহা আর আপনাদের শুনাইবার উপায় নাই।

এইমাত্র বলিয়া রাখি, 'সম্বন্ধে'র বিষয় এই আমি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছি। তিন বৎসর বয়সে কি হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র আমার স্মরণে ছিল না অথচ শুনিয়াছি, এই 'সম্বন্ধ' ব্যাপার অনেকটা সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল।

অষ্টমবর্ষ বয়সে আমার উপনয়ন হইল। নবম বৎসরে আমার বিবাহের আয়োজন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, এমন সময় সহসা হৃদ্‌রোগে আমার পিতামহের মৃত্যু হইল; এতই আকস্মিক যে, তিনি মৃত্যুকালে কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ পান নাই। পিতাও সে সময় গৃহে ছিলেন না। বি. এ. পাসের পর একটা মাষ্টারি চাকুরী লইয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পিতা অবর্ত্তমানে পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাকেই করিতে হইয়াছিল।

শ্মশানে আমাদের প্রতিবেশী-আত্মীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমি কেবল এক কমনীয়-কান্তি অপরিচিত ব্রাহ্মণের মধুর আপ্যায়নে ও আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আত্মীয়গণও পিতামহের মৃত্যুতে যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও কথা সেই ব্রাহ্মণের কথার মত মিষ্টি লাগে নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছিল, আমার পিতামহের মৃত্যুতে আমাদের অপেক্ষাও বুঝি তাঁহার শোক অধিক হইয়াছে।

(২)

কলিকাতার চৌদ্দ-পনেরো ক্রোশ দক্ষিণে, একটি মাঝারী গোছের গণ্ডগ্রাম—আমার জন্মভূমি। আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা যাতায়াত এখন যতটা সুগম হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সোণারপুর পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিকেই জলাভূমি, মাঠের মধ্যে কোথাও সরু সরু খাল। এই সকলের মধ্য দিয়া, 'শাল্‌তি'র সাহায্যে, আমরা তখন সোণারপুরে গিয়া রেল ধরিতাম। কলিকাতা পৌঁছিতে, প্রায় পুরা একদিন লাগিত।

পিতাকে সংবাদ দিতে, এবং সংবাদ পাইয়া, তাঁহার বাটীতে আসিতে, সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছিল। যাই হ'ক, অবস্থাযোগ্য সমারোহের সহিত তিনি পিতামহের শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল হইতে বহুলোক নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু সেই লোক-সমাগমমধ্যে আমি যাঁহাকে দেখিবার প্রত্যাশা

রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর, সি. আই. ই. বাহাদুর,

মহারাজাধিরাজ কুমার শ্রীযুক্ত উদয় চন্দ্ মহ্তাব্

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর্ শ্রীযুক্ত বিজয়্ চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই ; কে, সি. আই. ই ; আই, ও. এম

"আষাঢ় প্রথম দিনে, সম্মুখে চাহিয়া শৈলভূমি,
ক্রীড়ামত্ত গজপ্রায়, মেঘ ভার, নিরখে সে কামী।"
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্র-শিল্পী - শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ]

করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণকেই কেবল দেখিতে পাই নাই।

সমারোহের উল্লাসে দিনান্তে তাঁহার কথা ভুলিয়া গেলাম।—কতক উল্লাসের নেশায়, কতকটা পিতামহের অদর্শনে, অন্তরে অন্তরে অনুভূত অপরিস্ফুট বেদনায় বিবাহের কথাও বিস্মৃত হইলাম। পিতামহের আকস্মিক-মৃত্যুতে পিতামহী এতই শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের অনাগমন লক্ষ্য করেন নাই; যখন তাঁহার কথা পিতামহীর মনে উদয় হইল, তখন পিতা আবার কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সেইদিনে, তাঁহারই মুখে, ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইলাম। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আবার আমার মনে কনে দেখিবার সাধ জাগিল।

কিন্তু সাধ মিটিবার আর অবসর হইল না। পিতামহের আকস্মিক মৃত্যু ও সেই সঙ্গে পিতার আকস্মিক ডেপুটীগিরি পদপ্রাপ্তি—এই দুয়ে মিলিয়া আমার ও আমার ভাবীবধূর মিলনপথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

পিতার কলিকাতা যাইবার তিনদিন পরে প্রাতঃকালে, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আমি বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে বসিয়া স্কুলের পড়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় পড়ান বন্ধ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"শীঘ্র বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা আসন লইয়া আইস। এবং তোমার ঠাকুরমাকে গিয়া বল যে 'সার্ব্বভৌম' মহাশয় আসিয়াছেন।"

আমি তাঁহাকে দেখিয়া, কি জানি কেন, যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। পণ্ডিতমহাশয়ের কথা আমার কানে প্রবেশ করিয়াও করিল না!

আমি উঠিলাম না দেখিয়া, পণ্ডিতমহাশয় কিঞ্চিৎ কঠোরতার সহিত আমাকে বলিলেন, "আমার কথা কি শুনিতে পাইলে না? শীঘ্র তোমার পিতামহীকে সংবাদ দাও, আর একখানা আসন লইয়া আইস।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "থাক্; আর বালককে উৎপীড়িত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বসিব না। একস্থানে আমাকে যাইতে হইবে। যাইবার পথ বলিয়া, আমি একবার বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

পণ্ডিতমহাশয় উত্তর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণের আগমন, বোধ হয় তিনি দূর হইতে অগ্রেই দেখিতে পাইয়াছিলেন; কেননা, বাক্যের সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়াই একখানি আসন পাতিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে তদুপরি বসিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ, পিতামহীর অনুরোধ সত্ত্বেও, আসনে বসিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন—"সেকি মা! তোমার দত্ত আসনে আমি বসিব!"

পিতামহী বলিলেন—"সেকি! আপনি সর্ব্বপূজ্য। আমার বংশের ভাগ্য, আপনার কন্যা আমার গৃহে আসিবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে উপবেশন করুন।"

তথাপি ব্রাহ্মণ সে আসনে বসিলেন না। তখন সেই আসন, পূর্ব্বরক্ষিত স্থান হইতে উঠাইয়া, অন্যত্র রাখিবার জন্য পিতামহী কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইলাম।

এইবারে আমি উঠিলাম এবং পিতামহীর ইচ্ছামত আসন স্থানান্তরিত করিলাম। ব্রাহ্মণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইলে, পিতামহী আমাকে—"হরিহর! তোমার শ্বশুরমহাশয়কে তুমি প্রণাম করিয়াছ ত?"

আমি আসনই ত্যাগ করি নাই, তা প্রণাম করিব! সুতরাং পিতামহীর প্রশ্নে আমি আর উত্তর দিলাম না।

পিতামহী আমার অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; এবং তন্মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইতে আমাকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"থাক্, বালক—প্রণাম না করিল, তাহাতে দোষ কি?"

পিতামহী বলিলেন—"সেকি ঠাকুর, এই বয়স হইতে যদি সদাচরণ না শিখে, ত আর কবে শিখ্‌বে! যদি গুরুজনের মর্য্যাদা রাখিতে না শিখিল, ত ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়া লাভ কি হইল!"

পিতামহী, আমাকে প্রণাম করাইয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন—"বৈকুণ্ঠ! বালক না হয় ভুল করিয়াছে। তুমি বুড়ো মিন্‌সে, ছেলেকে পড়াইতেছ, তুমি কি বালককে এটা বলিয়া দিতে পার নাই?"

পিতা, পিতামহ উভয়েই বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না

বলিয়া, পিতামহ বাড়ীতে আমার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়ী আমাদেরই গ্রামে —আমাদেরই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যে স্কুলে আমি পড়ি, তিনি সেই স্কুলেই শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন।

একে গ্রামে বাড়ী, তাহার উপর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী —সবার উপর সে সময়ে গ্রামে স্কুলের পড়া পড়াইবার যোগ্য লোক ছিল না বলিয়া, পিতামহ বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকেই আমার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের অসংখ্য বালক তাঁহার কাছে পড়িয়াছিল। পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পণ্ডিতমহাশয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার খ্যাতিটাই দেশমধ্যে প্রচার করিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রার্থনা' নামক কবিতার প্রারম্ভেই লেখা আছে ;—"না মাগি সুন্দরকায়, অর্থে মন নাহি ধায় ভোগসুখে চিত রত নহে।" কোনও সময়ে পণ্ডিতমহাশয় নাকি কবিতার অর্থ করিয়াছিলেন—"মাগি সুন্দর কায় নয়।" এইজন্য, সময়ে সময়ে, বালকেরা তাঁহাকে 'নামাগি' পণ্ডিত বলিত। অবশ্য, পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্র পৃষ্ঠদেশে পতিত হইবার ভয়ে, কেহ তাঁহার সম্মুখে একথা বলিতে সাহস করিত না। বালকদের মধ্যে যা-কিছু বলা-কওয়া তা তাঁহার অন্তরালেই হইত। পণ্ডিতমহাশয় কিন্তু নিজের এ সুখ্যাতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারই মুখে আমরা শুনিতাম, 'তদানীন্তন বাংলা ভাষায় রুচিবিরুদ্ধ যতপ্রকার বাক্য আছে তাহাদের মধ্যে, তাঁর উপাধিব্যঞ্জক কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

পিতামহীর প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"বলি নাই? বার বার বলিয়াছি! তোমার নাতী আমার কথায় কান দিল না—যতই উঠিতে আদেশ করি, ততই বালক, যেন দমভারী হইয়া, আরও জোর করিয়া বসিয়া থাকে?"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—"কই বৈকুণ্ঠ! তোমার মুখে ত একটিবারও সে কথা শুনি নাই! আমি এইজন্য তোমার উপর বিরক্ত হইতেছিলাম। তোমরা বালককে গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা শিখাও নাই।—বালকের অপরাধ কি?"

পণ্ডিতমহাশয় তথাপি বলিলেন—"আমি বলিয়াছি, আপনি শুনিতে পান নাই।"

ব্রাহ্মণ একথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। একবার পণ্ডিতমহাশয়ের মুখের পানে চাহিলেন—এই মাত্র। কিন্তু সেই দৃষ্টিই তাঁহার পক্ষে উত্তরের অপেক্ষা অধিক হইল। পিতামহী যে সময় ব্রাহ্মণের গৃহের কুশলাদির পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় তিনি, আমাকে পড়িতে আদেশ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সামান্য ত্রুটীস্বীকারে যাহার মীমাংসা হইত, এমন কার্য্যেও সত্য বলিতে যাহার সাহস নাই,—এমন লোকের কাছে বালক কি শিক্ষা করিবে?"

পিতামহী বলিলেন—"কি করি!—গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ স্কুলের পড়া তইরি করিবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন। অঘোরনাথ ত বাড়ীতে থাকিতে পারে না।"

তখন পণ্ডিতসম্বন্ধে কথা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ আমার পিতৃসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পিতামহীর মুখে যখন তিনি শুনিলেন—শ্রাদ্ধান্তে পিতা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি পিতামহীকে নমস্কার এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন—"অঘোরনাথ যখন ঘরে নাই, তখন আমার আগমনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না।"

পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহসম্বন্ধে কি জানিবার কিছু ইচ্ছা ছিল?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তাই। বিবাহের দিন স্থির করিবার একান্ত প্রয়োজন। শিরোমণি মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। বুঝিতেই ত পারিতেছ; যজমানের গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহাতেই যোগেযাগে আমাকে কন্যাটী পাত্রস্থ করিতে হইবে। দিনটা স্থির হইয়া গেলে, আমি আগে হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহ করিতে পারি।"

পিতামহী বলিলেন—"আমারও ইচ্ছা তাই। এ শুভকার্য্য যত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়, ততই উভয়পক্ষের মঙ্গল। নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

এই বলিয়াই তিনি পিতামহের উল্লেখ করিয়া একবার চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বলিলেন—"তাঁহার একান্ত ইচ্ছা

ছিল, পৌত্র বধূর মুখদর্শন করেন। তাঁহার ভাগ্যে এ আনন্দ ভোগ হইল না বলিয়া, আমার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। এখন আমি যাহাতে হরিহরের বউকে দুই চারিদিন নিজ হাতে খাওয়াইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। কেন না আমার মনে হয়, আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আর বাঁচিতেও আমার সাধ নাই। অঘোর-হরিহরকে রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই আমার মঙ্গল।"

"বিবাহ দিতে পারিলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণীরও একান্ত ইচ্ছা,—কন্যাকে যত শীঘ্র পারেন, গোত্রান্তারতা করেন।"

"তা হইলে অঘোর আসুক। আসিলেই আপনাকে সংবাদ দিব। আপনারা উভয়ে মিলিয়া একটা দিন স্থির করিবেন। কিন্তু কালাশৌচের ভিতর কি বিবাহ হইতে পারে?"

"হইতেই হইবে। অঘোরনাথের কালাশৌচ; তাতে হরিহরের কি?"

"বাধা না থাকিলেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি জানিনা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিজ্ঞ পণ্ডিত —আপনি যখন 'হইবে' বলিতেছেন, তখন না হইবে কেন? তাহ'লে আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন, আমি পাজি লইয়া আসিতেছি। আপনি—এমাসে আর হইবে না —আগামী মাসে একটা দিন স্থির করুন। অঘোর আসিলেই তাহাকে বলিব এবং আপনাকে সংবাদ পাঠাইব।"

পিতামহী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম। বিবাহের কথা শুনিয়া নবমবর্ষীয় বালক হৃদয়ে সে সময় কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই বৃদ্ধের পক্ষে অনুমানে আনা একেবারেই অসম্ভব। তবে আনন্দের যে অবধি ছিল না, এটা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কেন না, পাঁজি আনিবার কথা শুনিয়াই, আমি বলিয়া উঠিলাম—"আমি ছুটিয়া পাঁজি লইয়া আসিতেছি।"

আমার কথা শুনিয়া পিতামহী হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণেরও গম্ভীর মুখে হাসি আসিল।

পিতামহী বলিলেন—"দেখিতেছেন, আপনার জামাতারই আর বধূর অদর্শন সহ্য হইতেছে না!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বিবাহ যে বস্তু, তাহা ত বালকের বোধ নাই!—কাজেই উহার লজ্জা-সঙ্কোচও কিছু নাই।"

পড়া ছাড়িয়া উঠিলে মায়ের কাছে তিরস্কৃত হইব, এই ভয় দেখাইয়া পিতামহী পাঁজি আনিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। মায়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে, আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি তাড়াতাড়ি মাদুরে বসিয়া, আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পড়?"

আমি তখন মধ্য-ইংরাজী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি। কি কি পুস্তক পাঠ করি, তাঁহাকে বলিলাম। পাঠ্যপুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, স্কুলের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ একেবারে গণ্ডমূর্খ।

ব্রাহ্মণ ও আমার মধ্যে যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যতগুলা আমার স্মরণ আছে, আমি বলিতেছি।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইংরাজী পুস্তকখানার নাম কি?"

প্যারীচরণ সরকারের সেকেণ্ড বুক্ শেষ করিয়া ডগ্‌লাস্ রীডার তৃতীয় ভাগ তখন সবেমাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি পুস্তকের নাম বলিলাম।

"নামের মানে কি?"

"নামের আবার মানে কি?"

"সেকি? পুস্তকের নাম থাকিলে, সে নামের একটা অর্থ থাকিবে না?"

স্কুলে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভাবীশ্বশুরের কাছে পরাভবটা আমার তেমন মনোমত হইল না। আমি কথার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; বলিলাম—"'ডগ্' মানে কুকুর, আর 'লাস্' মানে বালিকা, 'রীডার্' মানে পাঠক।" "একসঙ্গে মানে হইল কি?"

"কুকুর-বালিকা-পাঠক—নম্বর তিন।"

'আমার মানে করা শুনিয়াই শ্বশুরঠাকুরের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তারপর, একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হুঁ! পুস্তকের ভিতর আছে কি?"

"ঈগল পক্ষীর গল্প আছে।"

"ঈগল পক্ষী!—সে আবার কি রকম?"

"সে এক প্রকাণ্ড পক্ষী—পণ্ডিতমহাশয় বলেন, সে ছাগল-ভেড়া ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া যায়।"

এই বলিয়াই, আমি বই খুলিয়া ঈগল পক্ষীর ছবি ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলাম। একটা ঈগল পক্ষী মেষশিশু নখে বিঁধিয়া আকাশে উড়িতেছে; পুস্তকে তাহারই চিত্র অঙ্কিত ছিল।

ব্রাহ্মণ ছবিটীকে দেখিলেন—বেশ করিয়া দেখিলেন। একটী শ্যামল তৃণক্ষেত্র—তৃণক্ষেত্রের একস্থানে দলবদ্ধ মেষ ও মেষশিশু; পার্শ্বে যষ্টিহস্তে, উর্দ্ধমুখে, ঈগলের প্রতি চাহিয়া, বিলাতী এক মেষপালক। দূরে নীলবর্ণ পাহাড়; সেই পাহাড়ের শৃঙ্গে ঈগলের বাসা। ঈগল, মেষশিশু পায়ে ধরিয়া, বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া, সেই পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে।

ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে সেই ছবি দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—"এ পক্ষী কোন্ দেশে থাকে?"

"এ বিলাতী পক্ষী। এদেশে কখন আসে নাই।"

"ছবিতে আসিয়াছে; আসে নাই কি হরিহর? জীবন্ত পক্ষী সেদেশে কেবল ছাগল-ভেড়া ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়; এই ছবির পক্ষী দুগ্ধপোষ্য বালকগুলির মাথায় ছোঁ মারিতে এইদেশে আসিয়াছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুস্তকখানা মুড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি?"

"আমরা মানুষ। আমাদের দুই হাত, দুই পা। আমরা বানরের মত চতুর্হস্ত নই; অথবা পশুর মত চতুষ্পদ নই; কিংবা বাদুড়ের মত কর-পক্ষ নই। আমাদের মাথা আছে, সে মাথায় বুদ্ধি আছে। পণ্ডিতমহাশয় বলেন—'মানুষ আর কিছু নহে,—এক বাক্পটু জন্তু।'"

"তা নয়—কি জাতি?"

"আমরা ককেসিয়ান্।"*

ঠিক এই সময়ে পিতামহী পাঁজি লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁজি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে দিতে বলিলেন—"আগামী বৈশাখে যে কয়টা ভাল দিন আছে, আপনি দেখিয়া রাখুন। অঘোর আসিলে, তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, যে দিন সুবিধা বোধ করিব, সেই দিনেই বিবাহ দিব।"

ব্রাহ্মণ পাঁজি হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পাঁজী ত লইয়া আসিলে, অঘোরের মা; কিন্তু কাহাকে কন্যা দিব?"

পিতামহী এই কথায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এ কথা বলিলেন কেন?"

"তোমার পৌত্রকে কি জাতি জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল—'আমরা ককেসিয়ান্।' এতকাল পূজা-আহ্নিক যোগযাগ করিয়া, শেষকালে মেয়েটাকে একটা ককেসিয়ানের হাতে দিব?"

পিতামহী তখন আমার পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সেকি রে! কি জাত বলিয়াছিস্?"

"কেন মাষ্টারমশায় বলিয়াছেন, আমরা ককেসিয়ান্।"

"আরে ছিঃ!—ওকথা বলিতে নাই।"

"না, বলিতে নাই! না বলিলে যে, মাষ্টারমশায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবেন!'

ব্রাহ্মণ, পিতামহীকে বলিলেন—"শিরোমণি কি বালককে এসব শিখান্ নাই?"

"শিখাইয়াছিলেন বই কি! আমি নিজেও শিখাইয়াছি।"

এই বলিয়াই পিতামহী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ কতকাল?" এই কথা শুনিবামাত্র, পিতামহী আমাকে, শৈশবে গল্প শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে, যে শ্লোক শিখাইতেন, সেই শ্লোক আমার মনে পড়িল যেমন পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ কতকাল?" অমনি আমি অভ্যাসবশে বলিয়া উঠিলাম—"চন্দর সুয্যি যতকাল। চন্দর-সুয্যি গগনে, আমি জান্‌ব কেমনে? যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবাঃ, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবৎ বিপ্রকুলে বয়ং।" উভয়েই আমার উত্তর শুনিয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পিতামহী বলিলেন—"সেকি! নিজেই বালককে এ সমস্ত শিখাইয়াছি, সে ককেসিয়ান্ বলিবে কি!—আর ওকথা বলিয়োনা, ভাই।"

"না বলিলে, মাষ্টারমশায় যখন বেত মারিবে? তখন তুমি কি আমার হইয়া মার খাইবে?"

"তাহ'ক; স্কুলে তুমি যা ইচ্ছা বলিয়ো। বাড়ীতে কখনও অমন কথা মুখে আনিয়ো না। যখনি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তুমি কি?' তুমি অমনি জোরের

---

* আমাদের সময়ে তাই জানিতাম। এখন শুনি, আমরা তাও নয়। আমরা দ্রাভিডো-মঙ্গোলিয়ান্। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, ডোম—ইহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত। সাহেবে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তাহাকে বেদের সূক্ত করিয়া লইয়াছেন। 'না' বলিবার উপায় নাই

সহিত বলিবে, 'আমি ব্রাহ্মণ'। ও নাস্তিকগুলার কথা শুনিয়ো না।"

স্কুলে আমার বুদ্ধির একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের যিনি ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহার উপাধি ছিল 'বিশ্বাস।' তবে তিনি জাতিতে কি ছিলেন, তাহা আমি বলিব না। তিনিই আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন—'আমরা—অর্থাৎ, তিনি, বালকবৃন্দ—সকলে ককেসিয়ান্ জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান্ শাখা।' যদিও 'জাতি' শব্দটা বর্ণের একটা নামান্তর নহে, তথাপি আমরা জাতি বলিতে তখন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কিম্বা শূদ্র—এইমাত্র বুঝিতাম। মাষ্টারমহাশয় আমাদের সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার সেই ভ্রমে পড়িতে হইবে? 'ব্রাহ্মণ' বলিলে মাষ্টারের কাছে মার খাইতে হইবে; 'ককেসিয়ান্' বলিলে বিয়ে হইবে না!—কি করি? অনেক ভাবিয়া পিতামহীকে বলিলাম—"আমি স্কুলে ককেসিয়ান্, আর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ।"

উত্তর শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"শিরোমণির পৌত্র বটে! বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সাহেব-পড়ান পণ্ডিতের-নাতী—মা! কথায় তুমি তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।"

পিতামহী এই মন্তব্যে উৎসাহিত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি ব্রাহ্মণ।"

"কুলীন ব্রাহ্মণ।"

"কুলের লক্ষণ কি?"

"স্কুলের 'কুল' হইলে, কুল দুই প্রকার—দেশী কুল, আর নারকুলে কুল। প্রথমের লক্ষণ গোল, দ্বিতীয়ের লম্বা; প্রথম টক্, দ্বিতীয় মিষ্ট, তবে দুয়েই শাঁস আছে ইত্যাদি। আর ঘরের 'কুল' হইলে—

'আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং॥"

এই তিন প্রকার কুলের লক্ষণ শুনিয়া, ব্রাহ্মণ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আমার মস্তক-আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন। তখনও স্নেহপ্রদর্শনে মস্তক-আঘ্রাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে, লোকের অজ্ঞাতসারে, সে প্রথার এখন বিলোপ হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমার বংশের মধ্যে এই প্রকারের স্নেহাভিব্যক্তি আমিই শেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণের স্নেহাভিনয় পিতামহী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বলিলেন—"কি দেখিতেছ অঘোরের মা?—কাল বড় বিষম আসিতেছে!—বুঝিতে পারিতেছ না; এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্ সন্তান ইহার পরে ব্রাহ্মণ্য প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না!"

স্কুলে যাইবার সময় হইতেছে বুঝিয়া, পিতামহী আমাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, পাঁজি লইয়া, বিবাহের দিন দেখিতে বসিলেন—আমিও স্লেট্-বই বগলে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণের কথায় তিনি যে কি উত্তর দিলেন, তাহা আর আমি জানিতে পারিলাম না।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ডাক্তারের আত্ম-কাহিনী

(রোজ্-নাম্চা হইতে সংকলিত)

কলেজে—পঠদ্দশায়

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন সকলের কাছে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।—থাকিবার একটু কারণও ছিল। মেডিক্যাল্ কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে কলেজময় একেবারে "ঢি ঢি" পড়িয়া গেল। আমার পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-ডিগ্রি ধারী অনেকে ডাক্তার হইয়াছেন; কিন্তু আমার পূর্ব্বে মাত্র দুইজন আমার ন্যায় উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্র মেডিক্যাল্-কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমার ডিগ্রি দেখিয়া, সকলে মনে করিতেন যে, আমি একজন "মস্ত ইংরেজী-নবিশ"। আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, যেব্যক্তি ভাল ইংরেজী জানে—অন্যদিকে সে যাহাই হউক না কেন,—সে অতি যোগ্য লোক;—আবার একজন বাস্তবিক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যদি ইংরেজীতে তত পটু না হন, তবে তাঁহার উপর লোকের যেন ততটা ভক্তি হয়না। আমার ইংরেজীর জ্ঞান যাহাই থাকুক না কেন, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের "তক্মা"ই আমার উক্ত ভাষায় পারদর্শিতার নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইত। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের নিকটত খাতির পাইতামই; উপরন্তু যে (ফিরিঙ্গী) মিলিটারী ছাত্রেরা কাহাকেও দৃক্পাত করিত না, তাহারাও আমাকে যথেষ্ট খাতির করিত। সাহেব-ডাক্তারদিগের সহকারী যে সকল বাঙ্গালী ডাক্তার (House Surgeons) ছাত্র-দিগের উপরওয়ালা ছিলেন, তাঁহারাও অত্যন্ত খাতির—এমন কি একটু একটু ভয়ও—করিতেন। শুদ্ধ এক "তক্মা"র প্রভাবে এত প্রতিপত্তি! তাহার উপর আবার সকলে মনে করিত যে, শরীরতত্ত্ব (Anatomy) ভৈষজ্য বিদ্যা (Materia Medica), এবং দৈহিক ক্রিয়াতত্ত্ব (Physiology),—এই তিনটি প্রধান পাঠ্যবিষয়ে আমি সুপণ্ডিত! এখনও মেডিক্যাল্ কলেজে শিক্ষাবস্থার প্রথম তিন বৎসর অতীত হয় নাই;—কিন্তু মনের অগোচর পাপ নাই—লোকের চক্ষে আমার মূল্য যাহাই হউক না কেন, আমার নিজের নিকট ঐ মূল্য বড় কম ছিল; আমার কোন বিষয়ের জ্ঞান নিখুঁত হইত না। পড়িতে পড়িতে যে অংশ কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য মনে হইত, অথবা যেটা আমার ভাল না লাগিত, সেটা ছাড়িয়া যাইতাম। সকল পাঠ্যবিষয়েই এইরূপে "ছাঁটছুট্" অনেক যাইত। এরহস্যটা কিন্তু কেবল আমিই জানিতাম; সুতরাং যখন সহপাঠীরা, এবং অন্যান্য অনেকে, বলিতেন যে পরীক্ষায় আমিই সর্ব্বোচ্চস্থান পাইব, তখন মনে মনে যেন মরিয়া যাইতাম। অবশেষে যখন প্রমাণ-প্রয়োগের দিন আসিল, তখন দেখা গেল—মেডিক্যাল্ কলেজের প্রথম এম্. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই!

এইখানে একটা হাসির কথা বলি।—একজন সহপাঠীর নামের সহিত আমার নামের ঐক্য ছিল; কিন্তু পদবীর প্রভেদ ছিল। কলিকাতা গেজেটে উত্তীর্ণ-ছাত্রদিগের নামের তালিকায় নিজের নাম দেখিয়া উক্ত ছাত্রটির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে উহা আমারই নাম—কেবল পদবী ছাপিতে ভুল হইয়াছে! উপর্য্যুপরি তিন বার তালিকা ছাপা হইবার পর, তবে তাহার সংশয় ঘুচিয়া যায়।

যদিও পরীক্ষার ফল মন্দ হইল, তথাপি কিন্তু আমার প্রতিপত্তির বিশেষ হানি হইল না! মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা অনেক সময়েই বিসদৃশ কঠোর হয়;—ইহা সকলেই জানিত। বিশেষতঃ সেবৎসর শেষ এম. বি. পরীক্ষায় একজন খুব ভাল ছাত্র অকৃতকার্য্য হওয়ায়, আমাকেও সকলে তাঁহারই দলে ঠেলিয়া দিল। আমিও, মান বজায় রহিল দেখিয়া, হাঁপছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পরবৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উচ্চশ্রেণীর ছাত্র হইলাম; প্রতিপত্তিও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাক্লাউড্ সাহেব আমার নাম রাখিলেন Anatomist (শরীরতত্ত্বজ্ঞ); পুলিস্সার্জ্জন্

মেকেঞ্জি সাহেব নামের পরিবর্ত্তে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিটা ধরিয়াই ডাকিতেন; নিদানতত্ত্বের (Pathology) শিক্ষক ডাক্তার গিবন্‌স্‌ সাহেব "দার্শনিক" বলিয়া ডাকিতেন; আর ডাক্তার আর. সি. চন্দ্র কোন নাম রাখেন নাই বটে; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁহার যে অতি উচ্চধারণা ছিল, তাহা তিনি আমার ও অপরাপর ব্যক্তির সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। ডাক্তারি শেষপরীক্ষা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সহপাঠী ও ডাক্তারবন্ধুরা ততই আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার হইলে কলিকাতায় আমার প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর ও বিস্তৃত হইবে, আমার টাকা রাখিবার স্থানে কুলাইবে না, ইত্যাদি। স্বনামখ্যাত ডাক্তার ৺ভগবানচন্দ্র রুদ্রের নাম অনেকেরই মনে আছে। তাঁহার কোন সহপাঠী ডাক্তার তাঁহার আর এক ডাক্তার সতীর্থের নিকট আমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'অমুক ডাক্তার হইলে অচিরেই ভগবানকে ছাড়াইয়া উঠিবে।' যে বন্ধুটির কাছে এই মতপ্রকাশ করা হইয়াছিল, তাঁহাকে একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছাইতে গিয়া দেখি যে, ডাক্তার রুদ্র ট্রেণে বসিয়া আছেন। শুনিলাম কোন একটি রোগী-দেখিতে তিনি রংপুর চলিয়াছেন। শুনিলাম, দশনী—দিন আড়াই শত টাকা ধার্য্য হইয়াছে। শুনিয়া, আমার ডাক্তার বন্ধুটি আমায় সস্নেহে বলিলেন—"ভায়া! কিছুদিন পরে তোমারও এইরকম হবে"। চারিদিক্ হইতে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হওয়ায়, আমি যেন ফুলিতে থাকিতাম। তখন মনে পড়িত (পাঠকমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া হাসিবেন না; যদি একান্তই হাসি চাপিতে না পারেন, তবে আমি যেন কিছু শুনিতে না পাই!) আমার জন্মকোষ্ঠীতে লেখা আছে, "গজবাজীধনৈর্যুক্তো পুজিতো রাজমণ্ডলে"। কিন্তু আমি একজন নব্যতন্ত্রের উচ্চশিক্ষিত যুবক; ও সকল গাঁজা-খুরীতে বিশ্বাস করিনা; কিন্তু এমন সরস—মধুর গাঁজা-খুরীতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না কি? তাই, মাঝে মাঝে মনে হইত যে—হবেও বা; সত্যই হয়ত আমি গুণে ধনে ও যশে শুধু দশজনের একজন নয়, "শতের একজন" হইব। কিন্তু এতকাল পরে—এখন, এই বাস্তব-সংঘাত-পিষ্ট হইয়া লজ্জা ও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, 'শতের দশের' ত বহুদূরের কথা, এত বৎসরেও দশটার একের বিশাংশও হইতে পারি নাই!

একব্যক্তি অতি সামান্য রকম ইংরাজী জানিত; কিন্তু তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী বুঝিত না। সুতরাং তাহারা বন্ধুবরকে মস্ত ইংরাজীবাজ বলিয়া মনে করিত। একদিন বন্ধুগণের পীড়াপীড়িতে এক সাহেবের অফিসে ঐ ব্যক্তি কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া যায়। তাহার জনৈক বন্ধু তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। সাহেবের সঙ্গে বন্ধু কেমন ইংরাজী বলে, এবং তাহার ইংরাজীতে মুগ্ধ হইয়া সাহেব তখনি তাহাকে একটা বড় চাকুরীতে বসায় কিনা,—তা দেখিবার জন্যই উক্ত বন্ধুটি সঙ্গে গিয়াছিল। সাহেবটি বিশেষ উগ্রপ্রকৃতির;—তাহার উপর, কোন কারণে সে সময়ে মেজাজটা অত্যন্ত বিগ্‌ড়াইয়াছিল। চাপরাশী সাহেব ঘটনা-ক্রমে সে সময় দ্বারদেশে অনুপস্থিত থাকায়, ইংরেজী আদব-কায়দাদোরস্ত, বাবুটি দরজা খোলা পাইয়া, একেবারেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সাহেব "গায়ের ঝাল ঝাড়িবার" লোকা-ভাবে এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; বাবুকে দেখিয়া সলম্ফে চেয়ার ছাড়িয়া "Who the d—l are you?" বলিয়াই সজোরে টেবিলে এক ঘুষি! ভীষণ "মুষ্টিযোগে" টেবিল সশব্দে নড়িয়া উঠিল, ঝন্ ঝন শব্দে একগ্লাস জল উল্টাইয়া পড়িল, সঙ্গী লোকটি সবেমাত্র ঘরের ভিতর এক পা বাড়াইয়া ছিলেন, তিনিও অমনি "বাপ্" বলিয়া পশ্চাদ্দিকে এক বৃহৎ লম্ফ! যেমন লম্ফ দেওয়া, অমনি চাপরাশীর ঘাড়ে পড়া এবং তাহাকে লইয়া ধরাশায়ী হওয়া! এদিকে অসুরতুল্য প্রকাণ্ডদেহ সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ের বিঘূর্ণন, মুখভঙ্গিমা ও সদ্যজ্বরোৎপাদক অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া, ঘরের ভিতরের বাবুটির নিম্নপরিধেয় বস্ত্র কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে হঠাৎ ভিজিয়া গেল, এবং তিনিও "Beg your pardon" বলিতে গিয়া, আর্ত্তনাদে "Hold your tongue" বলিয়া ফেলিলেন! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল! "D—n your impudence" বলিয়া সাহেব ঘুষি তুলিয়া বেগে তাড়া করিল। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত বাবুটি ততোধিক বেগে "I ত flying, Why again coming to beat?" বলিয়াই চম্পট্। সঙ্গীটি ইতঃপূর্ব্বেই তীরবেগে রাস্তায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িতেছিলেন; এক্ষণে বন্ধুকে দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া প্রাণপণে ছুট্। অনেক দূর গিয়া উভয়ে দাঁড়াইলেন; পরে ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্গীটি বলিল, "বলি ভায়া, ব্যাপারটা কি বল দেখি"? "ব্যাপারটা আর কি, হাতীঘোড়া! ব্যাটার

ইতুরোমি দেখে আমি এক ধমক দিলাম। দেখিলে না ব্যাটা একটা মূর্খ সেলর, কপালজোরে দুপয়সা রোজগার কচ্ছে। তার উপর মদ খেয়ে এখন বেজায় নেশা হয়েছে! ওব্যাটা আমার ইংরেজীর কি বুঝ্‌বে? আসবার সময় বলে এলুম—'তোর মত ছোটলোকের কাছে, আসাই আমার ভুল হয়েছে'।" "হাঁ হাঁ; আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে শুন্‌লাম বটে, তুমি চেঁচিয়ে ইংরেজীতে কি বল্‌ছিলে। যাহোক্ মাতাল ব্যাটার সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে ঝগ্‌ড়া কর নি—সেই ভাগ্‌গি!"—"একি! তোমার কাপড় ভিজ্‌ল কিসে?" "দেখিলে না?—ব্যাটা মাতাল—খামখা একগ্লাস জল গায়ে ঢেলে দিলে!"

বলা বাহুল্য, ভক্ত বন্ধুটির মুখে এই সংবাদ অল্পকালমধ্যেই সাঙ্গোপাঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং ইংরাজীওয়ালা বাবুর মানও অক্ষুণ্ণরূপে বজায় রহিল! পাঠক মহাশয়, আর বিদ্যাবুদ্ধির সার্টিফিকেট্‌গুলি সমস্তই আপনাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছি। ইহার পরেও যদি জিজ্ঞাসা করেন—আমার কিছু হইল না কেন? তাহা হইলে ঐ গল্পের বাবুটির মত আমাকেও বলিতে হইবে, 'সংসারে যত মূর্খ লোক বৈত নয়! আমার কদর ইহারা কি বুঝিবে'?' যাহা হউক, অবশেষে কোন গতিকে ডাক্তার হইলাম।

শ্রীসুরথচন্দ্র বসু।

পুস্তক পরিচয়

একতারা

(মূল্য ৷৷০ আট আনা)

এখানি সুকবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ. প্রণীত। একখানি কাব্য। ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন,—"একতারার কতকগুলি কবিতা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সামান্য গ্রাম্য ঘটনা,—বিষয়গুলি ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্র একতারাতে বড় সুর বাজিবেনা, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।" কবি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র একতারাতে বড়সুর বাজাইবার তাঁহার সামর্থ্যও নাই,—কথাটা তাঁহার কবিজনোচিত বিনয়ের পরিচায়ক বটে; কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, কথাটা সম্পূর্ণ অলীক—তাঁহার বড় সুর বাজাইবার সামর্থ্য আছে—তিনি ক্ষুদ্র নন।—তাঁহার "উজানি" কাব্য পাঠে বুঝিয়াছিলাম যে, কবি সরলপ্রাণে আন্তরিকতার সহিত পল্লীর সুখদুঃখ-কাহিনীর অনবদ্য মধুর-চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁহার 'বন তুলসী, তাঁহার হৃদয়ের প্রেম-চন্দন-চর্চ্চিত নির্ম্মাল্য। তাঁহার চির-সৌরভময় 'শতদল' ভাবুকের প্রাণে চিরকাল ভাব-কমল প্রস্ফুটিত করিবে।

গ্রাম্য-বিষয়গুলিকে কেহ কেহ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতে পারেন—কিন্তু পল্লীর সুখ-দুঃখের স্মৃতির সহিত কত না পুরাণ-কাহিনী জড়িত রহিয়াছে; ভবিষ্যতের জন্য চরিত্রগঠন করিতে হইলে, অতীতের দিকে চাহিতেই হইবে। অবশ্য, অতীত-প্রীতিতে বিভোর হইয়া সেই সকল পুরাতন কীর্ত্তি-গাথা গাহিলে চলিবে না—কার্য্য করিতে হইবে। আর দেখিতে হইবে, বাঙ্গালার সহরগুলি কয়দিনের—তাহাদের গৌরবময় অতীত আছে কি? জনসংখ্যায়ও সহরগুলি কয়জন বাঙ্গালীকে ধারণ করিয়া আছে? পল্লীর পনেরো আনা বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিয়া, সভা-সমিতি করিলে—কাব্য-গাথা গাহিলে—সহুরে লোকের অভাব-অভিযোগ মোচন করিলে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে না—বাঙ্গালা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। আর আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পল্লীগুলিই আমাদের সভ্যতার আদি-জননী। বাঙ্গালার ইতিহাসের ধারা একবার পর্য্যালোচনা করুন, তাহা হইলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝিবেন। কাব্যে ও সাহিত্যে—দর্শনে ও সমাজতন্ত্রে—শিল্পে ও বাণিজ্যে বাঙ্গালার আদর্শ কে? পল্লী না সহর? কোথা হইতে সভ্যতা প্রথম-প্রচারিত হইয়াছে? সেই সভ্যতা-ধারার উৎপত্তিস্থল শুষ্ক হইয়া গেলে আমাদের সমূহ-বিপদ্! তাই বলিতেছিলাম, আমাদের উন্নতি পল্লীর উন্নতি-সাপেক্ষ। আর যে কবি, তাঁহার অমর-লেখনীগুণে, সেই গ্রামগুলির সুখ-দুঃখের কাহিনী আমাদের নিকট বিবৃত করেন, তিনি আমাদেরই মহোপকারী বন্ধু।

কুমুদবাবু 'একতারা'য় যে করুণ হৃদয়দ্রবকর সুর বাহির করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। আমাদের বিশ্বাস, এসুর যাঁহারই কর্ণে পৌছিবে, তিনিই বুঝিবেন কবির হৃদয় কত উদার—সর্ব্বজীবে তাঁহার কত দয়া! কবিতাগুলি সহানুভূতির স্নিগ্ধ অমিয়ধারায় সিক্ত। তাহার দুএকটা নিদর্শন দেখুন:—'পাখিমারা'কে তিনি বলিতেছেন,—

"তোমারও ত ভাই আছে পরিবার,
পুত্র, কন্যা, প্রিয়া;
কতই শান্তি, কত দয়া, মায়া,
লভ তুমি সেথা গিয়া।

ভাব, সেই স্নেহ দুর্গের দ্বারে
যদি হে তোমারে প্রাণে কেহ মারে,

কি দারুণ ব্যথা পাবে প্রিয়জন
ভাব আপনারে দিয়া,
তোমারও ত ভাই আছে পরিবার
পুত্র, কন্যা, প্রিয়া।"

তাই তিনি "শরাহত কপোতের" গায়ে হাত দিবামাত্র

"—বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি"
পিয়ে মরণের কূট-হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি,—
"তার সে চাহনী যে কথাটী হায় কয়েগেল মোর প্রাণে
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়ে বিশ্বের অভিধানে।"

'বিশ্বের অভিধানে' ইহার অর্থ না মিলিতে পারে, কবি কিন্তু অন্যত্র ইহার অর্থ বলিয়া দিয়াছেন। 'গফুর' গাথায় কবি দেখাইয়াছেন—পথের মাঝে গিদ্ধশ্যেন-শাবক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার তৃষ্ণাতুর চক্ষুদুটীর দিকে পথের লোক কেহই ফিরিয়াও চাহিতেছে না। দীন কৃষক গফুর সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই—

"গামছাখানি আর্দ্র করি সলিল ভরি আনিয়া
শ্যেনশাবক চঞ্চুপুটে ঢালিয়া দিল ছানিয়া।
সলিল পিয়ে চাহিয়া পাখী মুদিল দুটী আঁখিরে
নীরব শত আশীষধারা ঢালিয়া গেল গফুরে।"

সে চাহনির অর্থ আশীষধারা-বর্ষণ! পাখী নীরবে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছে, আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার আশীষধারা কবির মস্তকে বর্ষিত হয়—তিনি যেন তাঁহারই কৃপায় এইরূপ সদ্ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

আবার কবি, ছাগলছানাটী শৃগালকর্ত্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া, 'পুত্রহারা' কবিতায় কি মর্ম্মভেদী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন দেখুন :—

"হৃদয়ভেদী কি কাতর ডাক, কি দারুণ সে চঞ্চলতা;
হতাশ-আকুল চাহনীতে ব্যক্ত—শত মর্ম্মব্যথা।
ছুটে বেড়ায় উঠানেতে, ছুটে যায় সে গোয়াল মাঝে;
হায় গভীর কি ভীষণ ব্যথা আজকে তাহার বক্ষে বাজে!!

এ চিত্র হেরিয়া অশ্রুসংবরণ করা কঠিন। আবার "প্রজাপতির মৃত্যু" নামক ক্ষুদ্র কবিতায় তাঁহার তুলিকার উজ্জ্বল মধুর অপূর্ব্ব বর্ণ সম্পাতে সে করুণ দৃশ্য অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে;—

"প্রজাপতি এক মধু-বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটী করবী পাতে
মণি সন্নিভ দুইটী ডিম্ব রাখি,
বারেক ফিরাল মৃত্যু-আঁধার-আঁখি!
শেষ-বিদায়ের করুণ চাহনী মরি!
শুভ-মঙ্গল-কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত শুভনিধি
নিঃশেষ করি ঢালিদিল যেন হৃদি।
সমীর আসিল, কাঁপিল করবী-শাখা,
মৃত-প্রজাপতি,—টলিয়া পড়িল পাখা।"

শুভমঙ্গল-কামনায় আত্মদান, যাঁহারা অপুত্রক—তাঁহারা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু অপরে ইহার যাথার্থ্য বেশ উপলব্ধি করিবেন। 'স্নেহের জয়' কবিতায় কবি গাহিয়াছেন,—

স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায়রে কখন?
ওযে ভরতপুরের চেয়ে দুর্জ্জয়
জননীর স্নেহ-ক্রোড়।"

"অরুন্তুদ" কবিতায় কবি প্রাণের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির উপর অত্যাচার করিলে তাহার প্রাণে ব্যথা লাগে সত্য, কিন্তু আর্ত্তের আঁখিজল দেখিলে তাহার ততোধিক ব্যথা বাজে:—

"কাঁদায় মোরে প্রাতে শীতের মলিন শতদল,
কাঁদায় মোরে বৃন্তভাঙ্গা কোরক সুকোমল,
কাঁদায় মোরে সাঁজের রবি নয়ন ছল ছল—
সবার চেয়ে কাঁদায় মোরে বুড়ার আঁখিজল।"

আবার দেখুন আঁধার নিশায় অন্নদাতারে চিনিতে না পারিয়া কুকুর চীৎকার করিয়াছিল, কিন্তু যখন,—

"বিদ্যুৎ আলোকে কথায় সাড়ায় চিনিতে পারিয়া তাঁরে,
অবোধ কুকুর জানায় মিনতি চরণে লুটায়ে পড়ে।

এই দৃশ্য দেখিয়া কবি গর্ব্বিত নরনারীকে শিক্ষাদিবার জন্য বলিতেছেন,—

"পশু কুকুর তাহারো হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা,
গর্ব্বিত নর, লজ্জিত হও স্মরি নিজ নিজ কথা।"

ইহাতেও কি আমাদের চক্ষু খুলিবে না—আমরা কৃতজ্ঞ হইয়া মানুষ হইব না?

আলোচ্য কাব্যে ৪৭টী কবিতা আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী। এক কথায় বলিতে গেলে, কাব্যখানি করুণরসের উৎস!

আরম্ভে যাহা বলিয়াছি, শেষেও তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আবার বলি, আলোচ্য কাব্যের বিষয়ও ক্ষুদ্রনয়—কবিও ক্ষুদ্রনয়—'একতারা'তে যে সুর বাজিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস তাহা বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকাল করুণ ঝঙ্কার তুলিবে।

গুচ্ছ

(মূল্য দেড় টাকা মাত্র।)

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর অনেক ছোট গল্প আমরা বাঙ্গালা মাসিকপত্রাদিতে পড়িয়াছি। এই প্রকার কএকটি গল্প-সংগ্রহ করিয়া এই 'গুচ্ছ' প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পগুলি যখন বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন অনেকেই অনেক গল্পের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা সকল গল্পগুলিই

পুনরায় পড়িয়া দেখিলাম। লেখার একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে বর্ণনার আতিশয্য নাই, অকারণ শব্দবিন্যাসের ঘোরঘটা নাই, ভাষার সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য একটা গলদ্-ঘর্ম্ম চেষ্টা নাই, অতি সহজ ও সরলভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই তাহা মনোরম হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে বলিতে পারি যে, লেখিকামহোদয়া অপরের আখ্যানভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক মৌলিক ও সম্পূর্ণ-নিজস্ব বলিয়া চালান্ নাই; তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের। গল্পগুলির আখ্যানভাগ সুন্দর, বর্ণনা-কৌশল সুন্দর, ছাপা কাগজ সবই সুন্দর, এবং বর্ত্তমান রেওয়াজ অনুসারে কএকখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ছোটগল্পের পাঠকপাঠিকাগণ যাহা যাহা চান, তাহার সকল উপকরণই 'গুচ্ছে' সংগৃহীত হইয়াছে।

কমলাকান্ত

(মূল্য এক টাকা।)

ইতিহাসমূলক নাটক। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বিরচিত। প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক কমলাকান্তের নাম বাঙ্গালাদেশে বিশেষভাবে পরিচিত; এমন একদিন ছিল, যখন সাধক কমলাকান্তের মধুর ও পবিত্র গীতাবলি সর্ব্বত্র গীত হইত; এখনও সেকেলে লোকের মুখে "কে বিহরে রণরঙ্গিণী শঙ্কর উরে" প্রভৃতি দুএকটি গান শুনিতে পাওয়া যায়, সে গান যেমন সাধন তত্ত্বের ভাবপূর্ণ তেমনই শ্রুতিমধুর! কমলাকান্ত বর্দ্ধমানের রাজ বাড়ীতে অবস্থান করিয়া অনেক দিন সাধন-ভজন করিয়াছিলেন বর্দ্ধমান রাজসংসারের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধন ছিল। তাই বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই ক্ষুদ্র নাটকখানিতে অতি অল্পকথায় সাধক কমলাকান্ত, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর ও মহারাজাধিরাজ কুমার প্রতাপচন্দের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অনেক উচ্চ সাধন-তত্ত্বের আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলিয়াছেন "যে মহাযোগী তিতিক্ষার জ্বলন্ত অবতাররূপে বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে তেজশ্চন্দ্র নরপতি নামে বিরাজমান থাকিয়া পুনঃ আফতাপচন্দ্ররূপে বিদ্যুৎ মেখলার ন্যায় নানা-কৌতুককলা দেখাইয়া নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সুমহৎ স্মৃতি-সাধনার্থেই আমার কমলাকান্ত।" মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যে কথা বলিবার জন্য 'কমলাকান্ত' লিখিয়াছেন তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র, অথচ সুন্দর, নাটকখানি পাঠ করিলে অনেকেই বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। ছাপা, কাগজ, ছবি, বাঁধাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বাঙ্গালা ছাপাখানা হইতে এমন সুন্দর বই দুই চারিখানির অধিক প্রকাশিত হয় নাই।

একখানি পুস্তক

"প্রাচীন ভারত"

দশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্য যখন "বৈশালী," "বৌদ্ধবারাণসী" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতাম, তখন বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করিবার সময়ে বীল্ (Beal), ওয়াটার্স (Watters), টাকাকুসু (Takakusu), ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল (Mc Crindle) প্রভৃতি অনুবাদকগণের নাম দিতে হইত। তখন মনে বড়ই কষ্টবোধ করিতাম; মনে হইত যে, যদি একজন বিদেশীয় পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তের বাঙ্গালা অনুবাদও থাকিত, তাহা হইলেও মাতৃভাষার সম্মানরক্ষা হইত। তখনও বাঙ্গালাদেশে ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ আদর ছিলনা। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বানুশীলন করিতেন, তাঁহারা ইংরাজী, বা অন্যান্য ভাষায় লিখিত, গ্রন্থাদির সাহায্যে ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা করিতেন। রাজসাহীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র" শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সে সময়ে, যদি কেহ বলিত যে, বিদেশীয় পর্য্যাটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহ একত্র গ্রন্থাবলীর আকারে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, তাহা হইলে তখন হয়ত তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতাম।

দুইবৎসর পূর্ব্বে একদিন একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সত্যসত্যই এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা তখনও

বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সমাদ্দারমহাশয় অদ্ভুত-কর্ম্মা, তিনি অনেক দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার যশঃ আছে, কিন্তু তিনি বিদেশীয় পর্য্যাটক-গণকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিশালস্তূপ যে কোনকালে অনুবাদ করিয়া শেষ করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু সমাদ্দার মহাশয়ের হস্তে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, ইতোমধ্যে "প্রাচীন ভারতের" তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে যদি তিনখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা হইলে ভরসা করা যাইতে পারে যে, অবশিষ্ট দ্বাবিংশখণ্ড আটদশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। শুনিতেছি চতুর্থ-খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণও শেষ হইয়া গিয়াছে।

"ভারতবর্ষের" অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই খণ্ডে গ্রীক্ ও প্রাচীন প্রতীচ্যের পর্য্যাটক-গণের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুবাদিত হইয়াছে;—হেরোডটস্, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখকগণ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইলেও ইলিয়ান, বার্দেসানেস্ প্রভৃতি লেখকগণের বৃত্তান্ত এখনও বহু ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই খণ্ডে সাঁইত্রিশ জন প্রাচীন ও প্রতীচ্য লেখকের গ্রন্থের বা গ্রন্থাংশের অনুবাদ আছে; তন্মধ্যে হেরোডটস, ষ্ট্রাবো, প্লিনি, কসমস্ ইণ্ডিকোমিউসটিস্, দায়দরস্ সিকুলস্, প্লুটার্ক, ডায়ন্ কাসিয়স্, হোরেস্ এবং ভার্জ্জিল্ ব্যতীত অবশিষ্ট লেখকগণের নাম বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত। "প্রাচীন ভারত" অনুবাদ-গ্রন্থ হইলেও ইহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব এবং ইহার পূর্ব্বে এই জাতীয় কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যবনরাজদূত মেগা-স্থিনিসের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন-প্রণালীর কথা ইতিহাসে পরিণত করিয়াছেন, 'প্রাচীন-ভারতে'র দ্বিতীয় খণ্ডে সেই মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ অনুবাদিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে আরিয়ান-লিখিত বিশ্ববিজয়ী যবনবীর আলেকজাণ্ডার বা সিকন্দরের ভারতবিজয় কাহিনী অনু-বাদিত হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাস"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। শুনিতেছি, চতুর্থ খণ্ডের মুদ্রাঙ্কনও শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাতে চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ থাকিবে।

"প্রাচীন ভারত" বিদেশীয় পর্য্যাটকগণের মূল-গ্রন্থের অনুবাদ নহে,—অনুবাদের অনুবাদ; সুতরাং, ইহার স্থানে স্থানে যে ভ্রম বা অসামঞ্জস্য থাকিবে, তাহা আদৌ বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহাতেই বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে, কারণ তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটি বহুকালের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মূলের যথাযথ অনুবাদ বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ইচ্ছা থাকিলেও ইহা অসম্ভব, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিদেশীয় পর্য্যাটকগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত মূল হইতে অনুবাদ করা একের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুবাদের অনুবাদই বহুমূল্য। ভরসা করি, অচিরে "প্রাচীন ভারতের" অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কি কি উপাদানে মনুষ্যদেহ গঠিত ?—

ছবিতে ঐ যে চামচখানি দেখিতেছেন—ঐ চামচের এক চামচ চিনি এবং এক টিন লবণ দেহের একটি উপাদান। ঐ যে ডিম্বগুলি সাজানো, উহার সংখ্যার দশগুণ অর্থাৎ ১০০টি ডিমের "অ্যাল্‌বুমেন্" দেহে আছে।

দেহে এরূপ পরিমাণ "চূণ" আছে, যাহাতে একটী রীতিমত "রন্ধনগৃহ" চূণকাম করা যাইতে পারে। যতটুকু ম্যাগ্‌নেশিয়ম্" দেহে আছে, তাহাতে একটী সুন্দর "চুল্লী-গৃহ" তৈয়ারী হইতে পারে।

যে "ফস্‌ফরাস্" দেহে পাওয়া যায়, তাহাতে ২২০০টী দিয়াশলাই কাটীর মুখের বারুদ (জ্বালিবার মসলা) প্রস্তুত হয়।

দেহের "চর্ব্বি"র দাম ৭৸৵০ (সাত টাকা তেরো আনা)। মনুষ্যদেহের ঈশ্বরদত্ত "খড় ও মাটীর" এইত পরিমাণ এবং মূল্য!—ইহা ছাড়া যে জিনিষটি দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এই "কাদার পুতুলটী" "ফিনিস্" করিয়া পৃথিবীতে "চরিতে" পাঠাইয়াছেন—প্রবীণ চিকিৎসক কেবল তাহারই পরিমাণ ও মূল্য ঠিক করিতে পারেন নাই।—সেইটাই বড় বিষম শক্ত সমস্যা!

একজন জার্ম্মান চিকিৎসক বলেন—পূরো পৌনে দু'মণ ওজনের একটী মনুষ্য দেহের মূল্য তেইশ টাকা সাত আনা। অর্থাৎ, যে সমস্ত উপাদানে একটী জোয়ান মানবদেহ গঠিত, সেই সকল উপাদান পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষিত করিয়া এবং প্রত্যেকটির মূল্য হিসাব করিয়া তিনি দেখিয়াছেন—যে এই মনুষ্যদেহ-গঠনে মোট ১ পাউণ্ড ১১ শিলিং ৩ পেন্স অর্থাৎ ২৩৷৵০ খরচ পড়িয়াছে!—ঈশ্বরের কি মহিমা! আর, এ নশ্বর দেহটাই বা কি অসার! যে ননীর দেহ রক্ষা করিবার জন্য লোকের এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম; যাহার জন্য শাস্ত্রের বিধান—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি", তার দাম কি না পূরা ২৫৲ টাকাও নয়! এই ২৩৷৵০ দামের জিনিষটী রক্ষা করিবার জন্য এত কাটাকাটি, হানাহানি, মারামারি, লোকঠকানো, পরকে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি মহাপাপের অনুষ্ঠান!

অজীর্ণ রোগের মহৌষধ—"হামাগুড়ি"।

প্যারিসের একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন—আহারের পর কচি খোকার মতন কিছুক্ষণ হামাগুড়ি টানিয়া

বেড়াইলে গুরু-আহার পরিপাক সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্যবস্থা শুনিবামাত্র "দর্জ্জীরা" "হামাগুড়ি"র জন্য একটী স্বতন্ত্র পোষাকের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। "খোকাদের" কথা কিছু বলেন নাই। ঐ দেখুন "খুকী"কেমন "মৃদুমধুর হাস্যাধরে" "হামাগুড়ি" টানিয়া বেড়াইতেছেন।
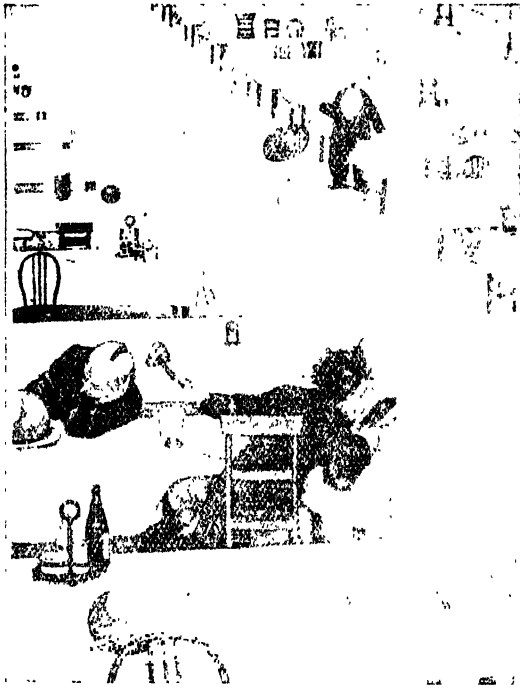
খানা বিভ্রাট।

ছবিটী দেখিয়া কিছু বুঝিলেন কি? দুটী ভদ্রলোক হোটেলে খাইতে বসিয়াছেন। একজন অন্যমনস্ক হইয়া খবরের কাগজ পড়িতে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন,—মাঝে মাঝে আহার-কার্য্যটাও চলিতেছে। সম্মুখস্থ "টেকো" ভদ্রলোকটী টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রামগ্ন। পাঠে তন্ময় ভদ্রলোক "পনির"-পাত্র হইতে "গোলাকার পনির হইতে" "পনির"—কাটিয়া দেখিবার মানসে ছুরী চালাইয়া নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির "পনিরস্থিত টেকো মস্তকটী" হইতে আহারোপযোগী খানিকটা কাটিয়া তুলিয়া লইয়া আহারের উদ্যাগ করিতেছেন। ভুল বটে!

স্মৃতিশক্তির উন্নতি-সাধন

স্যার W. H. Bailey স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি এক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম ;—

তিনি বলেন যে, লোকে স্মৃতিশক্তি নাই বলিয়া যে ক্ষোভ প্রকাশ করে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! তাঁহার কথানুসারে, অপরাপর শারীরিক শক্তির ন্যায় স্মৃতিশক্তিরও বিশেষ উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারা যায়। কারণ স্মৃতিশক্তিও শারীরিক শক্তিমাত্র। শরীরের মাংসপেশীর বলবর্দ্ধন-জনিত আকৃতি-পবিবর্ত্তনের ন্যায়, মস্তিষ্কেরও আকৃতি-পরিবর্ত্তন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব। স্মৃতিশক্তি অনেকটা আমাদের পুরুষানুক্রমিক হইলেও, কঠোর অধ্যবসায়দ্বারা ইহা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। শৈশব হইতে যাঁহারা এই শক্তির রীতিমত অনুশীলন না করেন, প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহা-দের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়ে।

স্নায়ুসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে,—স্মৃতি-শক্তির যথাযথ চালনা না করিলে, মস্তিষ্কের এক অংশ অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতি আরম্ভ হয়। ক্রমে দুর্ব্বল স্নায়ুসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং মস্তিষ্কের অপর অংশসকলকেও সংস্পর্শে দূষিত ও রোগাক্রান্ত করিয়া দেয়। তাহার পরই আমাদের জরার সূচনা হয়। সবল শরীর ও সুস্থ মন ভোগ করিতে হইলে, যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে যথারীতি পরিচালিত করিতে হয়। স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ-সাধন না করিলে, সংশিক্ষার ফল বহু-পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

বেলীসাহেব অবশেষে, মানসিক দৌর্ব্বল্য ও নিস্তেজতা দূর করিবার জন্য একটি প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—মনে করুন, চার লাইন পদ্য মুখস্থ করিতে হইবে।—যতক্ষণ না তাহা ভাল করিয়া মুখস্থ হয়, ততক্ষণ উহা অনবরত আবৃত্তি করিতে হইবে। যখন কোন জানা জিনিষের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হইবে, তখন উহা স্মৃতিপথে আনিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নিয়ম,—আবার একটা নূতন কিছু মুখস্থ করা।—এইপ্রকারে স্মৃতিশক্তি উদ্দীপিত হইলে, পূর্ব্বাবৃত্তিকৃত কথাগুলি মনে পড়িবে। এইরূপে স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করিতে হয়। যেমন বাজি রাখিয়া দৌড়ে জয়লাভ করিবার পূর্ব্বে একটু একটু করিয়া দৌড়ান অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ-সাধন করিতে

হইলে, একটু একটু করিয়া ঐ শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। মানসিকবৃত্তির যথারীতি চালনাদ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষা করা, অতীব প্রীতিকর কার্য্য বলিয়া মনে হইবে। অনেকে এই উপদেশকে অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এই টুকুর মধ্যে স্মৃতিবিজ্ঞানের সমস্ত সত্যই যে নিহিত আছে, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্মৃতি-প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন্ টেরী বলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ মুখস্থ করা সহজসাধ্য; সুতরাং স্মৃতিবর্দ্ধন কালীন সেইরূপ পদাবলী আবৃত্তি করাই শ্রেয়ঃ। অধ্যাপক লইসেট্ বলেন, সমভাবোদ্দীপক শব্দপুঞ্জ-সমবায়ে স্মৃতিশক্তি সহজে বর্দ্ধিত হয়।

অদ্ভুত শিল্পী।

স্পেনের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বার্শিলোনা সহরের অন্তর্গত গ্রেসিয়া নামক স্থানে এক অদ্ভুত শিল্পী বাস করেন; পূর্ব্বে তিনি ভাস্কর ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া একটি পান্থনিবাস বা হোটেল স্থাপন করিয়াছেন; হোটেলের তিনিই একমাত্র সত্ত্বাধিকারী। হোটেলের কার্য্যসমূহ তত্ত্বাবধান করিয়াও তিনি যথেষ্ট অবসর পান এবং সেই সময়ের অধিকাংশভাগই ফল ফুল ও নানা প্রকার শাক-সবজী দ্বারা আশ্চর্য্যজনক হাস্যোদ্দীপক বা নয়নরঞ্জক শিল্পজাত নানা দ্রব্য ও মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। এই প্রকার প্রতিমূর্ত্তিগঠনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এবিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ উদ্ভাবনীশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে। তিনি লোকের নিকট যশের প্রার্থী নহেন। এই আমোদজনক কৌতুকে তিনি স্বতঃই অনুরক্ত; আপনার মনে কার্য্য করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট; অথচ তাঁহার গঠিত শিল্পকার্য্যসমূহ লোকের নিকট তাঁহাকে পরিচিত ও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

তাঁহার শিল্পকার্য্য ও গঠিত প্রতিমূর্ত্তিসংখ্যা বিস্তর; তন্মধ্যে গুটিকতক মাত্র আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। অন্য কোন উপযুক্ত উপাধি খুঁজিয়া না পাওয়ায় আমরা তাঁহাকে "অদ্ভুত শিল্পী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই সকল দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে, ফলফুল, শাকসবজী, তরি-তরকারী ব্যতীত মাথার পিন্, দেয়াশলায়ের কাঠি, বোতাম, কর্ক প্রভৃতি অনেক দ্রব্য, প্রায়ই অধিকপরিমাণে, আবশ্যক হয়।

যেমন মৃত্তিকার সাহায্যে প্রতিমাগঠন করিতে হইলে প্রথমে খড় ও তৃণ দিয়া তাহার আভ্যন্তরিক আকৃতি প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ তিনি প্রথমে কাষ্ঠ ও লোহার তারের দ্বারা প্রতিমূর্ত্তির আকৃতি নির্ম্মাণ করেন; কিংবা প্রয়োজন বোধ করিলে, একেবারেই ফলমূল হইতে প্রতিমার আকৃতি গঠন করিয়া লন। ক্ষিপ্রহস্তচালনে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। তীক্ষ্ণ-ছুরিকার সাহায্যে, হাস্যোদ্দীপক হইতে আরম্ভ করিয়া, ভক্তিরসার্দ্র আকৃতিসমূহ গঠন করিয়া থাকেন। সেগুলি দেখিলেই তাঁহার নিপুণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১নং ছবি

১ নং ছবির বিচিত্র ফল-ফুলের সাজিটি একটি সাধারণ কুমড়া হইতে গঠিত। এই শিল্পকার্য্য যে যথার্থই প্রশংসাযোগ্য, সে বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনি ব্যঙ্গমূর্ত্তিগঠনেও সিদ্ধহস্ত। ২ নং চিত্র স্পেনদেশ-বাসী একজন ভিক্ষুকের হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি। ভিক্ষুকটি খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মস্তক গাজর হইতে এবং সমস্ত দেহ আলুর দ্বারা গঠিত হইলেও তাহার কৃষ্ণবর্ণ আলপিন-নির্ম্মিত চক্ষুদ্বয় হইতে বুদ্ধির রশ্মি নির্গত হইতেছে। পাদদ্বয় শালগমে প্রস্তুত জুতার মধ্যে স্থাপিত।

২নং ছবি

৩ নং ছবিটি ফলফুলে নির্ম্মিত একজন কৃষ্ণকায় কাফ্রি (Moor)। তাহার মস্তকে লাল লঙ্কার আবরণ। ইহার বড় বড় চক্ষু ও শ্বেতদশনপংক্তি বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তোলিত হস্ত দেখিলে মনে হয় যেন, সেনাপতি তাহার ভীত ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে

৩নং ছবি

—কিংবা কোন তামাসা-প্রদর্শক তাহার প্রদর্শনীগৃহের জিনিষপত্র দেখিবার জন্য যাত্রিগণকে গৃহে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিতেছে।

এই সকল জিনিষে একটা বেশ স্বাভাবিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গঠিত দ্রব্যজাত—সামান্যই হউক আর বিশেষ-ভাব-প্রকাশকই হউক—সেগুলির হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ও সাজগোজ দেখিলেই প্রাণ ভরিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে এবং মনে মনে গঠনকর্ত্তার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

নানাবিষয় হইতে তিনি গঠনোপযোগী মূর্ত্তির আদর্শ ঠিক করিয়া লন। ৪ নং ছবিতে একটি

৪নং ছবি

Bull-ring: প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে জাতীয় আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত সময়ে সময়ে রাজনৈতিক সভাসমিতিরও অধিবেশন হইয়া থাকে। এখন সভা বসিয়াছে। এটির গঠনে, কর্ক, খড়কে, ওলণ্ডা কলাই, ওকবৃক্ষের ফল, কার্ডবোর্ড প্রভৃতি নানারকম উপকরণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

৫ নং ছবিতে একখানি টেবিলে পাতিবার তোয়ালেকে নানাপ্রকারে ভাঁজ করা হইয়াছে। এইগুলি দেখিলে অনেকে অনুকরণ করিতে বা নূতন রকম কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন। ইহা অনেকেই প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু লাউকুমড়া হইতে ফুলের সাজি প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমাদের শিল্পী এই সুগঠিত কার্য্যে বিলক্ষণ
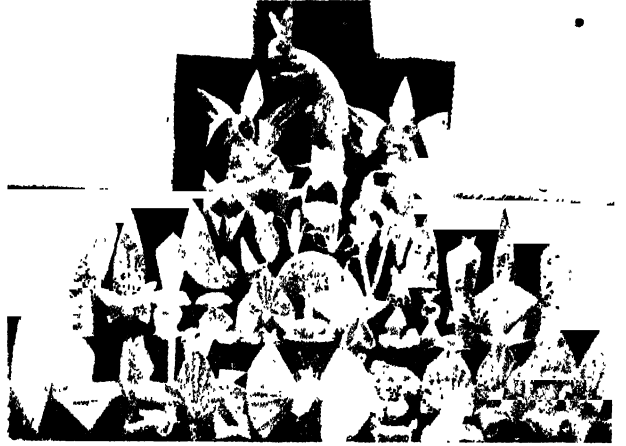
৫নং ছবি

কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং ১ নং ছবির কৃত্রিম ফুলের সাজির সহিত এই সাজির পার্থক্য এই যে ইহা স্বাভাবিক বর্ণশূন্য।

মারী করেলী। (Mari Corelli)

বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা শক্তিশালিনী লেখিকা মারী করেলীর নাম বিশেষ পরিচিত। তাঁহার রচিত দু'একখানি উপন্যাস অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশেও তাঁহার ভক্ত পাঠকবৃন্দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অনেকে তাঁহার রচনাকে কেবলমাত্র উত্তেজনাকারী (sensational) বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় তাঁহার উপন্যাসের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। নানাদোষ সত্ত্বেও উপন্যাসগুলি

যে সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে Romance of The Two Worlds, Vendetta, Thelma, Sorrows of Satan, The Life Evrelasting এই কয়খানি উপন্যাস বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শেষোক্ত দুই-খানি পুস্তক, আমাদের পাঠকসমাজেও আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার উপন্যাসে অনেক নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হইয়াছে, অনেক জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধান আছে। ইহাতে মানবাত্মা, পূর্ব্বজন্ম, পরলোক, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ের আলোচনা আছে। মানবাত্মার অমরত্ব, মানবজীবনের যে ধ্বংস নাই, মৃত্যু যে জীবনের রূপান্তর মাত্র, মৃত্যুর পরপারের কথা, সকল বস্তুরই মূলে যে বৈদ্যু-তিক শক্তি বিদ্যমান আছে, বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রভৃতি নানা জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। এক কথায় তাঁহার রচনায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সমাজে প্রভূত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাঁহার কতকগুলি বিশেষ উক্তি অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আমরা নিজেদের অনিষ্ট নিজেরাই করিয়া থাকি; ভগবান্ আমাদের কোন একটা ক্ষতি করেন না

* * * * *

আমরা নিজেদের দুঃখ নিজেরাই ডাকিয়া আনি। ভগবান্ সেগুলিকে প্রেরণ করেন না।

* * * *

ভগবান্ মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। তাঁহার অপার প্রেম কাহাকেও কোনও কার্য্য করিতে বাধ্য বা জোর-জবরদস্তি করে না।

* * * *

মানুষ যে সব কষ্ট, শোক-তাপ ভোগ করে, তাহা সবই তাহার স্বকৃত কার্য্যের ফল।

* * * *

হিতাহিতজ্ঞান আমাদের নিজেদের হওয়া উচিত। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহা আমরা নিজেরাই বিচার করিয়া, সংসারে পথ বাছিয়া লইব।

* * * *

নরনারীর ইচ্ছা জাহাজের "কম্পাস্" বা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র-স্বরূপ। যেদিকে যন্ত্র চালাইবে, জাহাজও সেইদিকে যাইবে। যন্ত্র পাহাড়ের দিকে নির্দ্দেশ করিলে, জাহাজডুবি ও অসংখ্য বিপদের সূচনা হয়। পক্ষান্তরে জাহাজকে বিস্তৃত সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিলে, বেশ শুভযাত্রা হয়,—আর কোন ভয় থাকে না। মানুষের ইচ্ছাও ঠিক সেইরূপ। যেদিকে মানুষকে চালায়, মানুষ সেইদিকেই ধাবিত হয়। কুপথে চালাইলে তাহার সর্ব্বনাশ, সুপথে চালাইলে তাহার সুখের সীমা থাকে না।

* * * *

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার এক পত্রে বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রতি আমার খুব সহানুভূতি আছে। আমি প্রাচ্য-ধর্ম্মপুস্তকাবলীর যথেষ্ট আদর করি এবং প্রায়ই সে গুলি পড়িয়া থাকি!" নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

জীবজন্তুদের মধ্যে ভালবাসা ও বিবাহপ্রথা

পশুদের প্রাণেও যে মানুষের ন্যায় ভালবাসা আছে, তাহারাও যে মানুষের ন্যায় বিবাহ করে ও আবার স্ত্রীকে ত্যাগ করে,—ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা সত্য কথা। আমাদের মধ্যেও যত প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যেও প্রায় সেই সকল রকমই বর্ত্তমান। অনেক অবিবাহিত পুরুষ-জাতীয় জন্তুদের এক একটি দল আছে। ইংরাজীতে ইহাকে "BACHELOR CLUB" বলে। তাহারা তিন চার জন একত্র হইয়া মনের আনন্দে আহারের অন্বেষণ করে ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের চালচলন দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা খুব সুখী। এবং যতক্ষণ না স্বশ্রেণীর কোন স্ত্রীজাতীয় জন্তু তাহাদের সম্মুখীন হয়, ততক্ষণ তাহারা আদৌ কলহ করে না, বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু একবার কোন স্ত্রীজন্তু তাহাদের দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহাদের শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। স্ত্রীজীব পরম কৌতূহলের সহিত তাহাদের এই সংগ্রাম দর্শন করে। পরে একজন দলের অপর সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্ত্রীটিকে লইয়া চলিয়া যায়। বাঁদর, হনুমান, হরিণ প্রভৃতিদের মধ্যে এরূপ অনেক দল আছে। ইহাদিগকে সন্ন্যাসীর দল বলে।

অধিকাংশ জন্তুরই এক বিবাহ। তাহাদের মধ্যে

সাধারণতঃ চারিপ্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথম প্রকার বিবাহে—পুরুষ একজন স্ত্রী-নির্ব্বাচন করিয়া লয় এবং যত দিন তাহার ভাল লাগে তাহার প্রতি আসক্ত থাকে ; মোহ কাটিয়া গেলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রীর অন্বেষণ করে। ইহাকে আমরা ইংরাজীতে "Trial Marriage" বলিতে পারি। এই প্রকার বিবাহ আমেরিকার বড় হরিণজাতীয় জন্তুদের মধ্যে দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় প্রকার বিবাহে—যতদিন ছেলেপিলে না হয়, ততদিন তাহারা স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকে। ছেলেপিলে হইলেই তাহারা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া নূতন স্ত্রীর অন্বেষণে বাহির হয়। ইন্দুর, খরগোস্, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি স্ত্রীকে একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। খেঁক্‌শিয়ালীর সন্তান বড় হইলে, আবার পূর্ব্ব স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বাস করে।

তৃতীয় প্রকার বিবাহ—বন্য হংস, ঘুঘু এবং সম্ভবতঃ পেচকদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে। তাহাদের মিলন যাবজ্জীবন স্থায়ী হয় এবং একজন মরিলে, অপরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না ; কিন্তু মৃতস্বামী বা স্ত্রীর জন্য শোক করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চতুর্থ প্রকার বিবাহ—মানুষের মধ্যে ইহাই বেশী প্রচলিত এবং অনেকে ইহাকেই আদর্শ দাম্পত্যজীবন বলিয়া মনে করেন। নেকড়ে বাঘদের মধ্যেই এই প্রকার বিবাহ বিশেষ প্রচলিত। তাহাদের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হয়, কিন্তু একজন মারা গেলে অপরে পুনর্ব্বার বিবাহ করে। পুনশ্চ তাহাদের মধ্যে আমরা প্রকৃত ভালবাসা ও স্নেহের আদানপ্রদান লক্ষ্য করিয়া থাকি। লণ্ডনের পশুশালায় একবার এক জোড়া নেকড়ে পরস্পর বড়ই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। তাহারা প্রায়ই কলহ করিত। একদিন তুমুল কলহের পর, পুরুষ নেকড়েটি স্ত্রীকে যেন কামড়াইবার জন্য তাহার দিকে রাগান্বিতভাবে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার নিকট যাইবামাত্র, সে যেন মনের মধ্যে কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। স্ত্রীও তখন ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া, তাহার মুখ ধীরে ধীরে জিব দিয়া চাটিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি-স্থাপিত হইল।

পশুদের মধ্যে সকলেই প্রায় বিবাহ করিয়া থাকে। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মারা গেলে, অপরকে পুনর্ব্বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে কষ্ট পাইতে হয় না। এক স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ না করাই যে আদর্শ দাম্পত্যজীবনের উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের ন্যায় ইহারাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছে ; এবং আমাদের অনেক পূর্ব্বেই যে ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! *

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সমাধিস্থান

নিম্নে বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টির সমাধিস্থানের একখানি ফটোচিত্র দেওয়া হইল। এইখানে সেই কর্ম্মবীরের ভস্মসমূহ চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে। কবরটি স্বর্ণমণ্ডিত ও খুব আড়ম্বরযুক্ত, মৃত দেবদেবীর সমাধির উপযুক্ত। তাঁহার সেই কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন ফরাসী সাহিত্যিক বলিয়াছেন—"আজ এই মহা-

পুরুষের জীবনী স্পষ্টভাবে উদিত হইতেছে। আমি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি, যেন তিনি সীন নদীর উপকূলে আত্মহত্যার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পাদচারণা করিতেছেন, তুলনের রাজপথে বিদ্রোহীদিগকে দমন
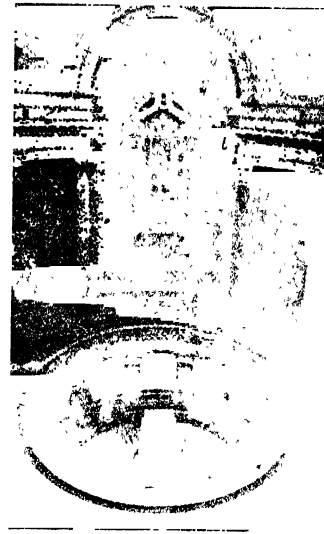
* সেই জন্যই কবি গাহিয়াছেন—

"Friendship take need ; if woman interfere,
Be sure, the hour of thy destruction's near.'

—ভাঃ সঃ।

করিতেছেন, সৈন্যদলের নেতা হইয়া ইটালীতে অগ্রসর হইতেছেন, মিসরদেশে পিরামিড্-সমূহের শীতল ছায়াযুক্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিতেছেন, কিংবা আল্পস পর্ব্বতের পার্শ্ব-বর্ত্তী দেশসমূহ জয় করিতেছেন। আমি তাঁহাকে আল্পস্ ও অষ্টার্লিজ্ প্রদেশে দেখিতে পাইতেছি, রুশিয়াতে তাঁহার বিপুল সৈন্য শীতকালের শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় বরফে ও প্রবল ঝটিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি। তিনি লিপ্জিকে পরাজিত ও বিপন্ন হইয়া প্যারিসে পলায়ন করিতেছেন, বন্যজন্তুর ন্যায় অবরুদ্ধ ও এল্বায় নির্ব্বাসিত হইতেছেন, পরে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া নিজের প্রতিভাবলে পুনর্ব্বার সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছেন, এসব ঘটনা আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ওয়াটালু'র ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ তাঁহাকে পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখিতেছি. সেণ্টহেলেনা দ্বীপপুঞ্জে বন্দী হইয়া, হস্তদ্বয় পশ্চাতে তির্য্যকভাবে রাখিয়া, বিষণ্ণভাবে গম্ভীর সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিতেছি। তিনি কত সন্তানকে পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় করিয়াছেন, কত রমণীকে বিধবা করিয়াছেন,—তাঁহার জয়োল্লাসের মধ্যে কতজন অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমি আজ বেশ ভাবিতে পারিতেছি। যে একজন রমণী তাঁহাকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিত, উচ্চাভি-লাষের শীতল হস্তে তাঁহার হৃদয় হইতে তিনি তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন। এই সব ভাবিয়া মনে হয় যে, এক জন ফরাসী কৃষক হইতে পারিলেও সুখী হইতাম। পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়া, দ্রাক্ষালতাবেষ্টিত দ্বারদেশে শরতের রবিকরের প্রেমচুম্বন-পরশে লম্বমান লাল টুক্টুকে দ্রাক্ষা-ফল দেখিয়া, জীবনের গণা দিনগুলি মহানন্দে কাটাইয়া দিতাম। পতিপ্রাণা সাধ্বী পার্শ্বে বসিয়া সেলাই করিবে, সন্তানগণ আমার হাঁটুর উপর বসিয়া গলা জড়াইয়া আধ আধ স্বরে কথা কহিবে,—এই সুখের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলশিখরদেশে অবরোহণ করিবেন। অসীম ক্ষমতাশালী রক্তপিপাসু সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ হওয়া অপেক্ষা এই দরিদ্র কৃষকের জীবনও সমধিক সুখময় ও লোভনীয়। মৃত্যুর পর ধূলার শরীর নীরব ধূলিরাশির সহিত মিশাইয়া যাইবে, কেহই একবারও আমার কথা মুখে আনিবেও না, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই।"

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শত্রু পা'ক ইহলোক—পরলোক, বন্ধু,
আমারে চরণে রাখ, ওহে কৃপাসিন্ধু।
ইহলোক-পরলোক কিবা প্রয়োজন,
বারেক পাই গো যদি তব দরশন ?

স্বর্গ-দ্বার

"মুক্তকর মোর তরে তব গৃহদ্বার"
কাতরে প্রার্থনা করে সাধু বার বার।
ঈশ্বর-প্রেমিক এক আছিল তথায়
সাধুর প্রার্থনা শুনি কহিল তাহায়—
"চির মুক্ত তাঁর দ্বার সবাকার তরে,
অগ্রসর হও, সাধু, সোজা পথ ধ'রে।
জটিল কুপথে যদি করহ গমন,
পথ-পার্শ্বে প'ড়ে রবে স্খলিত-চরণ।"

শ্রীহীরালাল সেন গুপ্ত।

ভারতবর্ষ

ভারতবাসী জনসাধারণের আয় ও দেয় রাজস্ব

ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব মহাশয়ের মতে প্রত্যেক সাধারণ ভারতবাসীর গড়ে বার্ষিক আয় ২৭৲ এবং মিঃ নৌরোজীর মতে ২০৲ টাকা। তন্মধ্য হইতে প্রত্যেকের দেয় রাজস্বের পরিমাণ গড় ৪৲ টাকা।

কৃষকের আয়

মিঃ ডিগ্‌বীর মতে প্রত্যেক ভারতীয় কৃষকের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ১৯৷৹ টাকা।

অর্থশালী ভারতবাসীর সংখ্যা

আয়কর বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, প্রতি সাতশত ভারতবাসীর মধ্যে এক জনের বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকা। ইংলণ্ডে শতকরা পাঁচজন অধিবাসীর বার্ষিক আয় অন্যূন ১৫০০৲ টাকা।

বিভিন্নদেশবাসীর তুলনায় প্রত্যেকের বার্ষিক গড় আয় ও দেয় কর

দেশ	বার্ষিক আয়	দেয় কর
ইংলণ্ড	৩৪০৲	৩০৲
ফ্রান্স	২৯০৲	৩৪৲
রুষিয়া	৫৪৲	১৪৲
তুরস্ক	৪০৲	৫৲
জাপান	৬২৲	৪৲
ভারতবর্ষ	২০৲	৪৲

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

ইংলণ্ডে তিন ক্রোর আটলক্ষ অধিবাসীর নিকট হইতে বার্ষিক দুই ক্রোর টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতবর্ষের বাইশ ক্রোর অধিবাসীর নিকট হইতে বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতের বাণিজ্যে লাভ-লোকসান

ভারতবর্ষে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ যতটা অধিক তাহা এবং তাহার উপর লাভটা গড়ে শতকরা ৭½ হারে খতাইয়া মিঃ নৌরজী দেখাইয়াছেন যে, বহুকাল যাবৎ ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষ বার্ষিক অন্যূন ৩০ ক্রোর টাকা বাণিজ্যে ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিতেছে। শ্রদ্ধেয় ৺ভূদেব-বাবু হিসাব করিয়াছিলেন—বার্ষিক প্রায় ৩২ কোটি টাকা।

অন্যান্য দেশের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বৃদ্ধির হার গড়ে

ইংলণ্ডে শতকরা ৩২ ; নরওয়েতে ৪২ ; ডেন্‌মার্কে ৪০ ; সুইডেনে ২৪ ; ফ্রান্সে ২০ ; স্পেনে ৯ ; তুরস্কে ২৪।

ভারতের লোক-সংখ্যা—প্রতি বর্গমাইলে

ইংরাজ-অধিকারে—২১১ ; দেশীয় রাজ্যে ৮৯ ; বেহারে ৪৬৫ ; বঙ্গে ৪৩৮ ; পাটনায় ৭৪২ ; সারণে ৭৭৮ ; চব্বিশ পরগণায় ৭৯৩ ; হুগলী জেলায় ১০৪৫ (ইংলণ্ডে ২৬০ ; জার্ম্মণীতে ১৮৯ ; ফ্রান্সে ১৮০)। দুর্ভিক্ষ-কমিশনের বিবরণী-পাঠে জানা যায় বাঙ্গালার প্রত্যেক লোক গড়ে দেড় কাঠা জমির উৎপন্ন ফসলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

প্রাচীন ভারতের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও পারিশ্রমিকের হার

আকবর শাহের আমলে—

রাজ—৵৫ রোজ	গম— ।৴০ মণ	ময়দা—॥৴০ মণ
মজুর—/১৫ „	যব—৶১০ „	ঘৃত—২॥৵ „
ঘরামি—/৫ „	চাউল—৶১০ „	দধি—।৶১০ „
ছুতোর—/১৬ „	দাল—।৶১০ „	দুগ্ধ—॥৵০ „
পদাতি—৵০ „	ছোলা—৵১০ „	লবণ—।৵১৫ „

ভারতের অরণ্যানী

এককালে সমগ্র ভারতের এক চতুর্থাংশ অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন ছিল। ইংরেজ আগমনের পরবর্ত্তীকালে অনেক বন নির্ম্মূল হইয়াছে। সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রফল ১৭ লক্ষ বর্গমাইল; ইংরাজাধিকৃত ভারতের ক্ষেত্রফল ১০ লক্ষ বর্গমাইল; তন্মধ্যে প্রতি একশত মাইলে মাত্র, তিন পোয়া হইতে ১·৮ বর্গমাইল অরণ্য।

রুষরাজ্যের শতকরা ৪২½; সুইডেনের ৪১; অষ্ট্রীয়ার ৩১⅞; প্রুশিয়ার ২৩½; নরওয়ের ২২৬; সুইজরল্যাণ্ডের ১৯½; ফ্রান্সের ১৬; বেলজিয়মের ১৫; ইতালীর ১২ মাইল অরণ্যাবৃত। প্রাচীন বঙ্গে প্রায় দশ সহস্র বর্গমাইল বনভূমি ছিল—এক সুন্দরবনই ছিল ৩৪ হাজার বর্গমাইল; এখন তাহা ন্যূনাধিক দেড় সহস্র মাত্র বর্গমাইল দাঁড়াইয়াছে!

ভারতে রেলওয়ে সূচনা—সর্ব্বপ্রথম হাওড়া এবং বোম্বাইয়ে রেলওয়ে স্থাপনা সূচিত হয়; ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে।

ভারতে সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ—স্থাপনা করেন ডাঃ ওয়াসানি—১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে।

হিন্দুকলেজ—ডেভিড্ হেয়ার কর্ত্তৃক ২০এ জানুয়ারী ১৮১৭ স্থাপিত হয়।

স্কুল-বুক্-সোসাইটি—১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়।

এগ্রি-হর্টি-কল্‌চর্যাল্ য়্যাসোসিএসনের—কৃষিবিভাগ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গাল-গল্প

প্রদীপ ও তারকা

সমুদ্রের উপকূলে মৎস্যজীবীর ক্ষুদ্র কুটীরের জলাশয়ে একটী প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। সে রাত্রিতে ভয়ানক দুর্য্যোগ; ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে প্রকৃতি যেন প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি কুটীরের ভিতর এবং জানালার মধ্য দিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রতরঙ্গের উপর আলোক বিতরণ করিতেছিল।

আকাশে একটী উজ্জ্বল তারকা মেঘের ভিতর দিয়া প্রদীপকে দেখিয়া বলিল—"কি তুচ্ছ—হীন ক্ষুদ্র জিনিস তুমি! মাত্র কয় ঘণ্টা আলো দিয়া জন্মের মতন তুমি লোপ পাইবে। তোমার আলোক রশ্মির এক মাইলও চলিবার শক্তি নাই; এবং বাতাসের একটী মাত্র ফুৎকারে তুমি নির্ব্বাপিত হইবে। আর আমি! আমি অনন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকিব। কাহারও সাধ্য নাই আমার আলোক নিভাইয়া দেয়; সমস্ত পৃথিবী আমাকে দেখিতে পাইতেছে। আমি জানিতে চাহি—তুমি—তুমি কাহার কি উপকার করিতে পার!'

তারকা যখন এইরূপ দম্ভ করিতেছে—সেই সময় অকস্মাৎ পবন ঘোরঘনঘটায় সমগ্র আকাশমণ্ডল আবৃত করিল, দেখিতে দেখিতে তারকা কোথায় লুক্কায়িত হইল, আর কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

ভীষণ তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্রবক্ষে বিপন্ন মৎস্যজীবী ক্ষুদ্র ডিঙ্গি লইয়া নিজ কুটীরের শেষ ক্ষীণ প্রদীপের আলোক-রশ্মির সাহায্যে নিরাপদে কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

যখন মৎস্যজীবী মহানন্দে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে কুটীরে বসিল—তখন দুর্য্যোগ থামিয়াছে; আকাশে আর মেঘের চিহ্ন নাই। আবার নির্ম্মল আকাশে সেই উজ্জ্বল তারকা—সেইরূপ বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ক্ষুদ্র প্রদীপের প্রতি ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—অবজ্ঞার হাসি হসিতে লাগিল।

মৎস্যজীবী-পত্নী যখন মহাযত্নপূর্ব্বক প্রদীপটীকে জানালা হইতে তুলিয়া আদরে সস্থানে রাখিতে গেল,—প্রদীপ বিনয়পূর্ব্বক তারকাকে বলিল—"ভাই! বড় লোক তুমি; কেবল ক্ষীণশক্তি দরিদ্রকে দেখিয়া হাসিতেই জান। আমি যত ছোট হই না কেন,—আমি ক্ষুদ্রজীবনে কর্ত্তব্য-পালন করিতে আসিয়াছি—কর্ত্তব্যপালন করিয়াই জীবন শেষ করিব। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে এবং তোমার মহাশক্তিতে মনুষ্যের কি সাহায্য এবং সুখ লাভ হইল—তুমি আজিকার ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ। অতএব আর বৃথা গর্ব্বের কি প্রয়োজন?"

"ঘনশ্যাম।"

কীর্ত্তন—একতালা
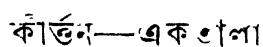
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিজাইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর-সার।
ধরম-করম, সরম-ভরম,
কিবা জাতি-কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

—চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি

২´ ৩ ০ ১
I সা গা রা | গা গা গা | গা পা পা | মা গা মগা I
পি রী তি ব লি য়া এ তি ন আ খ র৹
বি ধি এ ক চি তে ভা বি তে ভা বি তে৹
পু নঃ যে ম থি য়া অ মি য়া হ ই ল৹
যা হা র ম র মে প শি ল য ত নে৹
এ হে ন পি রী তি না জা নি কি রী তি৹

২´ ৩ ০ ১
I রা গা গা | রা সা সা | রা -া রা | -া -া -া I
এ তি ন ভু ব ন সা ০ র্ ০ ০ ০
নি র মা ণ কৈ ল পি ০ ০ ০ ০ ০
তা হে ভি জা ই ল তি ০ ০ ০ ০ ০
এ তি ন আ খ র সা ০ র্ ০ ০ ০
প রি ণা মে কি বা হ ০ য় ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা | মা গা গমা | রা পা পা | মা গা গা I
পি রী তি ব লি য়া৹ এ তি ন আ খ র
বি ধি এ ক চি তে৹ ভা বি তে ভা বি তে
পু নঃ যে ম থি য়া৹ অ মি য়া হ ই ল
যা হা র ম র মে৹ প শি ল য ত নে
এ হে ন পি রী তি৹ না জা নি কি রী তি

২´ ৩ ০ ১
I রা রগা গরা | সা সা সা | রা -া রা | -া -া -া I
এ তি৹ ন৹ ভু ব ন সা ০ র ০ ০ ০
নি র৹ মা৹ ণ কৈ ল পি ০ ০ ০ ০ ০
তা হে৹ ভি৹ জা ই ল তি ০ ০ ০ ০ ০
এ তি৹ ন৹ আ খ র সা ০ - র্ ০ ০ ০
প রি৹ ণা৹ মে কি বা হ ০ য় ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা ধনা | ধনর্সা না ধা | পা র্সা না | ধা ধা ধনর্সনধপা I
এ ই মো৹ র৹৹ ম নে হ য় রা তি দি নে৹৹৹৹৹
র সে র৹ সা৹৹ গ র ম ন্থ ন ক রি তে৹৹৹৹৹
স ক ল৹ সু৹৹ খে র এ তি ন আ খ র৹৹৹৹৹
ধ র ম৹ ক৹৹ র ম স র ম ভ র ম৹৹৹৹৹
পি রী তি৹ ব৹ ন্ ধ ন ব ড় ই বি ষ ম৹৹৹৹৹

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা | মা গা মগা | রা -া -া | -া -া রা II
ই হা ব ই না হি৹ আ ০ ০ ০ ০ র্
তা হে উ প জি ল৹ রী ০ ০ ০ ০ ০
তু ল না দি ব যে৹ কি ০ ০ ০ ০ ০
কি বা জা তি কু ল৹ তা ০ ০ ০ ০ র্
দ্বি জ চ ণ্ডী দা সে৹ ক ০ ০ ০ ০ য়

শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার

পণ্য-তত্ত্ব

কর্পূর—সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবৎসর ১ কোটী ৪ লক্ষ পৌণ্ড ওজনের কর্পূর প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে ফর্ম্মোসা হইতে ৫২ লক্ষ পৌণ্ড রপ্তানী হয়; জাপান হইতে ৩৩ লক্ষ পৌণ্ড বিদেশে প্রেরিত হয়। অবশিষ্টটা অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হয়। জর্ম্মাণীর জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, "সিংহলে ও ভারতে কর্পূরের আবাদ বেশ চলিতে পারে।" কিন্তু করে কে?—

চন্দন।—ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে, সমুদ্রনিকটবর্ত্তী মহীশূর রাজ্যে, প্রচুর পরিমাণে চন্দনবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক কালে ভক্তপ্রবর হনুমান সম্ভবতঃ মহীশূরের চন্দন-বন হইতেই চন্দনের শাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিগত ১৩০৮ সাল হইতে বিক্রয়ের জন্য এই চন্দনের উপর কর ধার্য্য হইয়াছে।

চা।—কেবল মাত্র লণ্ডনে প্রতিদিন ৯০ হাজার পৌণ্ড চা খরচ হয় এবং সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপে প্রত্যহ পাঁচ লক্ষ পৌণ্ড চা ব্যবহৃত হয়। ইদানীং ভারতবর্ষই পৃথিবীর নানা স্থানে চা সরবরাহ করিতেছে; কিন্তু এদেশের অধিকাংশ চা-বাগিচাই য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত—এদেশের জমিতে, ভারতবাসীর পরিশ্রমে বিদেশী মূলধনেই ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ চা উৎপাদিত হয়। সুতরাং লভ্যাংশ এ দেশের লোকের ভাগ্যে পড়ে না।

মধু।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সর্ব্বদেশ অপেক্ষা অধিক মধু উৎপন্ন হয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় প্রতিবৎসর ১ কোটী ৫০ লক্ষ পৌণ্ড মধু উৎপন্ন হইত; ২০ বৎসর পূর্ব্বে হইত ৬ কোটী ৫০ লক্ষ পৌণ্ড; ১০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৬ কোটী ৫০ লক্ষ পৌণ্ড। এক্ষণে কেবল হাওয়াইতেই বৎসরে ৯০ লক্ষ পৌণ্ড এবং কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি কয়েক স্থানে ৪০।৫০ লক্ষ পৌণ্ড মধু উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে মার্কিন, বিলাত প্রভৃতি স্থানের ন্যায় মধুমক্ষিকা পালনপূর্ব্বক রীতিমত মধুর ব্যবসা এতাবৎ প্রচলিত হয় নাই! কিন্তু সহজে, সুলভে সুন্দরবন, আসাম, দার্জ্জিলিঙ্গ, সিমলা প্রভৃতি শত শত স্থানে যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধু পাওয়া যায়, সে সকল আহরণ করিয়া নিয়মিত ব্যবসায় করিতে ব্যবসায়বিৎ শিক্ষিতসম্প্রদায় প্রবৃত্ত হয়েন না কেন? যতদিন কোন ইংরেজ বণিক্ ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিবেন, ততদিন কি এ সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন থাকিবেন? এক্ষণে বুনো, পাহাড়ী, মঘুকী প্রভৃতি ইতরজাতিরা প্রকৃতির অনন্তভাণ্ডার হইতে এই সকল মধু আহরণ করিয়া অতি হীনভাবে এই ব্যবসা চালাইয়া থাকে। শিক্ষিত লোকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারে।

নারিকেলের মাখন।—ভারতের নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া জনৈক পাশ্চাত্য পর্য্যটক বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর প্রতি ভগবান্ এতই সদয় যে, তাহাদিগের জন্য বৃক্ষশিরে আহার্য্য ও পেয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ নারিকেল বৃক্ষের পত্র, ফলের জল, শস্য, খোল ও খোসা—সকলই বিশেষ কার্য্য ও ব্যবহারোপযোগী। নারিকেলের আভ্যন্তরীণ শস্য অবস্থাভেদেই নানাগুণবিশিষ্ট; চিনি প্রভৃতি সংযোগে পাক হইয়া বঙ্গরমণীর হস্তসংস্পর্শে ইহা কতবিধ বিচিত্র রসনা-তৃপ্তিকর মিষ্টান্নে পরিণত হয়, তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। নারিকেলের গুড় অম্লরোগনাশক। মাদ্রাজ ও করমণ্ডল উপকূল প্রভৃতি সমুদ্রতটবর্ত্তী স্থানে নারিকেলের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হয়। আমরা এতদঞ্চলে যেমন প্রায়পচা নারিকেলের শস্য হইতেই নারিকেল তৈল প্রস্তুত করি; মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে তাহা করে না। উহারা কাঁচা নারিকেল হইতে যে তৈল প্রস্তুত করে, তাহাই এদেশের ঘৃতের ন্যায় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতার্থ ব্যবহার করে। এখানেও আমরা দেখিয়াছি যে, সদ্যপ্রস্তুত নারিকেল দুগ্ধ হইতে তৈল করিয়া তাহাতে লুচি প্রভৃতি ভাজিলে অতি সুখাদ্য হয়। জর্ম্মান দেশে হ্যান্‌হাম্ নগরে একটি কারখানায় প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুতের চেষ্টা ও তজ্জন্য নানা পরীক্ষা হইতেছিল। অবশেষে কার্য্যকারকেরা চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছেন। "কোকোটীনা" প্রভৃতিই সেই পরীক্ষার ফল। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, নারিকেলের মাখনে ৯৯ ভাগ স্নেহ-পদার্থ এবং দুগ্ধের মাখনে ৮৫ ভাগ স্নেহ-পদার্থ ও অবশিষ্ট জল বর্ত্তমান থাকে। এদেশের "কেমিক্যাল ওয়ার্কসের" অধ্যক্ষগণ এ বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পারেন না? বিজ্ঞানবিদ্‌গণ—B. Sc., D. Sc. গণও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন!

প্রতিধ্বনি

বাঙ্গালা মাসিক পত্র

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ।—বিবিধ প্রসঙ্গ, জীবনরস, জব্বলপুর ও গড়ামণ্ডলা, অরণ্যবাস, প্রতিফল, ধর্ম্মপাল, নিশীথে, লোক-শিক্ষক বা জননায়ক, নাটেশ্বর শিব, পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্রোহ, পঞ্চশস্য, সনাতন জৈনগ্রন্থমালা, কর্ম্মকথা, ওরাওঁ যুবকদের জীবন যাত্রা, অবিরামক, পুস্তক পরিচয়, আলোচনা, দেশের কথা ও কষ্টিপাথর প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং প্রদক্ষিণ, তিরোধান, ভিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আছে।

বিবিধ প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনে বিষয় বিভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ ও সরকারী সাহায্য, সাহিত্য সম্মিলনে মুসলমান, গোয়ালপাড়ায় আসামীয়া ও বাঙ্গালা, বঙ্গের প্রাদেশিক-সমিতি সমূহ, বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা, ধর্ম্ম ও জাতি অনুসারে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা, অল্পশিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, নন্দলাল বসুর অভিনন্দন, জাপানী ও স্বদেশী, জাভার চিনি ও গুড়, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস, এই চারিভাগ হইয়াছিল। বঙ্গদেশে শিক্ষার ও দেশীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ বিভাগ উচিত ও উপযুক্ত হয় নাই, সাহিত্য সম্মিলন বিষয়-বিভাগ-প্রসঙ্গে ইহাই বলা হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ও সরকারী সাহায্য প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে বার্ষিক সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহার ফলাফল চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যিনি গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইবেন, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, গবর্ণমেন্টের নিয়মের অধীনে আসিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু আমরা সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য পথ হইতে মনে মনে রেখা মাত্র বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা রাখিতে চাই না।" গোয়ালপাড়ায় আসামীয়া ও বাঙ্গালা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, গোয়াল-পাড়া জেলায় বাঙ্গালীরা ঔপনিবেশিক নয়, তাহারা তথায় পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা আসামীর সংখ্যার ৪গুণ। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদিগকে মাতৃ-ভাসা ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কখনই ন্যায়-সঙ্গত নহে। যাঁহাদের মাতৃভাষা আসামীয়া তাঁহাদেরও কোন অসুবিধা জন্মান উচিত নয়। সাহিত্য-সম্মিলনে মুসলমান প্রসঙ্গের মর্ম্ম এই, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২,৩৭,২২৮। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী না হইলেও অধিকাংশই বাঙ্গালী। সুতরাং বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক মুসলমান। আড়াই কোটি লোক তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে তাহাদেরও মঙ্গল নাই, এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যেরও যতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা হইবে না। বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি-সমূহ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, আমা-দের সমুদায় রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভি-যোগ, দাবী দাওয়ায় প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বাঙ্গলা ভাষার আছে। সভাপতির অভিভাষণ হইতে চাওয়া পাওয়ার সকল কথাই বাঙ্গলায় বলা সুবিধা ও সঙ্গত। আবশ্যক স্থলে সভাপতির অভিভাষণ ও প্রস্তাবগুলির ইংরেজী অনুবাদ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইতে পারে। তবে জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস, সমগ্র ভারতের জাতীয়-সংস্কার সমিতি প্রভৃতি সমগ্র ভারতের সমিতিগুলির ভাষা আপাততঃ ইংরেজীই থাকিবে। কখনও কোন দেশভাষা যদি ভারতব্যাপী হয়, তখন পরিবর্ত্তন সহজেই করা যাইতে পারে। বঙ্গের শিক্ষিতের সংখ্যায় বঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্ত্রী পুরুষের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা আছে। ধর্ম্ম ও জাতি অনুসারে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যার প্রসঙ্গে দেখা যায়, য়ুরোপীয়দিগকে বাদ দিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অল্পশিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রসঙ্গে নানা স্থানে এই চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। জাপানী ও স্বদেশী প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অনেকে স্বদেশী জিনিষ না পাইয়া জাপানী জিনিষ কিনিতেন, এবং এখনও কিনেন। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। শিল্প বাণিজ্যে জাপান মোটেই আমাদের বন্ধু নহে,—প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ জাপান, যত সস্তায় তাহার শিল্পজাত দ্রব্য দিতেছে,

য়ুরোপের কোন জাতি তাহা দিতে পারে না। জাপানীরা জাহাজ ভাড়া দিয়া এদেশ হইতে তুলা লইয়া যায়। তাহাতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়া ভারতে প্রস্তুত সূতি জিনিষের অপেক্ষা সস্তা দরে নিজেদের জিনিষ বিক্রয় করে। জাপান কিরূপে আমাদিগকে এই রূপ পরাস্ত করিতেছে, পর্য্যবেক্ষণদক্ষ কয়েকজন ভারতবাসী এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও অনুসন্ধান-ফল প্রচারিত করা উচিত। জাভার চিনি ও গুড় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতে গুড়চিনির আকর হইলেও জাভায় গুড় চিনি হু হু করিয়া আমদানী হইতেছে। এদেশে কএকটি চিনির কল কারখানা হইল বটে, কিন্তু কেহই বোধ হয় জাভায় গিয়া দেখিয়া আসেন নাই, কি কি কারণে সেখানে এত সস্তায় এত বেশী পরিমাণে গুড় চিনি উৎপন্ন হয়। অল্‌ষ্টারের আইনসঙ্গত আন্দোলনে অল্‌ষ্টার-পক্ষীয়গণ কিরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে কিরূপ রাষ্ট্রনীতি-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, আলোচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এংগ্লো ইণ্ডিয়ান্‌দিগের এদেশীয়দিগের প্রতি মনোভাবের ঈষৎ ইঙ্গিত আছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তি প্রসঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। জীবনরস প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রথমেই একটি ঋষি বাক্য ও তৎপরে কবি সতীশচন্দ্রের নিম্নলিখিত দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই,
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

ফলতঃ, এই প্রবন্ধে লেখক প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ঈশ্বরকে যখন আমরা সত্য বলি, তখন তাঁহার পূজা হয় না ; যখন রস বলি, আনন্দ বলি, তখনই পূজা হয়। সত্য বলিলে একটা 'আছে'—মাত্রকে স্বীকার করা হয়। হাঁ আছেন—এক আছেন। কিন্তু জীবনে বেদনার মুহূর্ত্তে,সমস্যার অন্ধকারের মধ্যে, হাতড়াইয়া বেড়াইবার সময় এ সকল কথা অন্ধকার রাত্রে সমুদ্র ফেনার মত জ্বলিয়া উঠে ও নিভিয়া যায় কেন ? তাহার কারণ এ যে তত্ত্ব, এ তো রস নয়।" জব্বলপুর ও গড়ামণ্ডলায় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে অনেক ঐতিহাসিক ও বিবিধ তত্ত্ব পাওয়া যায়। 'অরণ্যবাস'—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস লিখিত ধারাবাহিক উপন্যাস। 'প্রতিফল, শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা লিখিত ঐতিহাসিক গল্প। 'ধর্ম্মপাল'—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। 'নিশীথে' গল্প, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত। 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, "লোক শিক্ষক কেবল যে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত থাকিবেন, তাহা নহে। পাশ্চাত্য জগতের উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম প্রণালীর বিচিত্র খবর পল্লীসমাজে প্রচার করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। গ্রাম্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি তিনি হাতে কলমে কাজ করিয়া পল্লীসমাজে প্রচার করিবেন। কেবল যে তিনি কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রচারক হইবেন, তাহাও নহে। আমাদের প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন করিয়া এবং নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি পল্লীসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ধীর ও বিপুল আয়োজন করিবেন। পল্লীসমাজ তাঁহার নিঃস্বার্থ জীবন হইতে প্রাণ পাইবে, তাঁহার প্রাণ পল্লীসমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া প্রসার লাভ করিবে।" 'নাটেশ্বর শিব'—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ বলিয়াছেন যে, নৃত্যাবস্থায় মহাদেবের নানাপ্রকার মূর্ত্তি থাকিলেও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-লিখিত লঙ্কায় নটরাজ শিব মূর্ত্তি এদেশে দুর্লভ। আউটসাহী গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত, বি,এ,মহাশয়ের বাটীর বাঁধা ঘাটের উপর স্তম্ভগাত্রে সংলগ্ন এক নাটেশ্বর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিতে মহাদেব নৃত্যাবস্থায় কুঞ্চিতপদে দণ্ডায়মান—ইনি দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট। "পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ" শ্রীরাধারমণ সাহা লিখিত। তিনি বলিয়াছেন, পাবনা জেলার রায়তগণ স্বভাবতঃ নিরীহ হইলেও ১২৭৯।৮০ সালে প্রজায় জমিদারে হাঙ্গামা বাধিয়া তথায় বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। 'অবিমারক' মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক, শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ভারতী জ্যৈষ্ঠ।—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা, স্রোতের ফুল, আমার বোম্বাই প্রবাস, জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্য, সুদূর, শান্তিবাদীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার, লাইকা, মেজর থুরির নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান, মোগল আমলের বিদ্বজ্জন ও কবিবৃন্দ, নবাব, চিত্রে ছন্দ ও রস, অরণ্য-ষষ্ঠী,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, বেদে উষা, ক্যামেরার দ্বারা বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ, সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গ, সমালোচনা এবং বোম্বে হইতে আগত বনফুলের প্রতি, ভাল তোমা বাসি যখন বলি, ভিটের মাটী ও সবুজ পরী প্রভৃতি কবিতা আছে।

মৃচ্ছকটিকা, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের সময় নিরূপণ,ভারতীয় নাট্যকলার রীতি,নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিকাশ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। স্রোতের ফুল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস, শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। "আমার বোম্বাই প্রবাস" শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। তিনি এইবার বোম্বাই প্রবাসের উপসংহার করিয়াছেন। জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্য—শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত। ইহাতে জাপানের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। সুদূর, গল্প। "শান্তিবাদীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার," শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ফরাসী হইতে অনুবাদিত। লাইকা, শ্রীহেমনলিনী দেবী লিখিত কাহিনী। মেজর থুরির নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান—শ্রীদীনবন্ধু সেন লিখিত। মনুষ্য দেহের গঠন ভেদে মেজর থুরি মানুষকে মূলতঃ চারি প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ শ্বাস-ক্রিয়া-প্রধান, কেহ খাদ্যপাকক্রিয়া-প্রধান, কেহ বা মাংসপেশী-প্রধান, আবার কেহ বা মস্তিষ্ক-প্রধান। আবার দেখা যায় জীবনধারণের জন্য মনুষ্যের চারিটী প্রধান উপাদান আবশ্যক ; বায়ু, খাদ্য, গতি ও ভাব। কোন্ শ্রেণীর মনুষ্য কিরূপ পরিবেষ্টনে বাস করিবে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "মোগল আমলের বিদ্বজ্জন ও কবিবৃন্দ ; শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। মোগল আমলে কিরূপ বিদ্বজ্জন ছিল, শিল্পী ছিল, কবি ছিল প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ তথ্য ইহাতে আছে। নবাব, ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত। চিত্রে ছন্দ ও রস, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। এই প্রবন্ধে চিত্র কি, ছন্দ কি, রস কি, চিত্রে ছন্দ রস কিরূপ ইত্যাদি বিচিত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। অরণ্যষষ্ঠী, শ্রীনিরুপমা দেবী। ইহাতে ষষ্ঠীর কথা আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত। বেদে উষা, ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের অন্যতম প্রমাণ ও বৈদিক আলোচনা শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।

গৃহস্থ, জ্যৈষ্ঠ।—আলোচনা, সভাপতির অভিভাষণ, বিলাতযাত্রা, নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর, মহাকবি ভাস বিরচিত অবিমারক নাট্য, ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্য-প্রচার, হস্তীর জীবনযাত্রা, বৈদিক সাহিত্য, পদার্থের চেতনাচেতন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত, ময়নামতীর পুঁথি ও বঙ্গ সাহিত্যের অভাব অভিযোগ। এতদ্ব্যতীত মফঃস্বলের বাণীর মধ্যে নিরামিষ আহারের উপকারিতা, ভাবিবার কথা, উদ্বোধন ও স্বদেশীয় আবশ্যকতা আছে। পরিশিষ্টে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ আছে। আলোচনায় সতরটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আছে। ১। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন। সাহিত্য সম্মিলন এবার যেরূপ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, আমরা এই পৃথকীকরণের পক্ষপাতী নহি। ২। সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব। —সাহিত্য সম্মিলন যে সকল সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন, তন্মধ্যে—যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য যাহাতে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব এবং বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার প্রস্তাবের বিশেষ সমর্থন। ৩।—বেহারে শিক্ষা সমস্যার প্রসঙ্গে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হয় বলিয়া এবং ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চাহেন না বলিয়া বেহারের অনেক জেলা স্কুল হইতে বহু ছাত্র প্রবেশাধিকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত অচির-সম্ভাব্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা আছে। ৪। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। ইহাতে বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের উদ্ধার করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। ৫। হিন্দু মুসলমান সমিতি। বিদ্বেষ বাধা বিদূরিত করিয়া মিলন সহকারিতার প্রয়াস। ৬। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের স্মৃতিস্তম্ভ,—রিয়াজউস্ সালাতিন্ গ্রন্থের নাম ঐতিহাসিকগণের নিকট পরিচিত। এই গ্রন্থের রচয়িতা মালদহের লোক ছিলেন। মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এই পরলোকগত রিয়াজ-ওস্ রচয়িতার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐতিহাসিকের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭। সামাজিক সর-
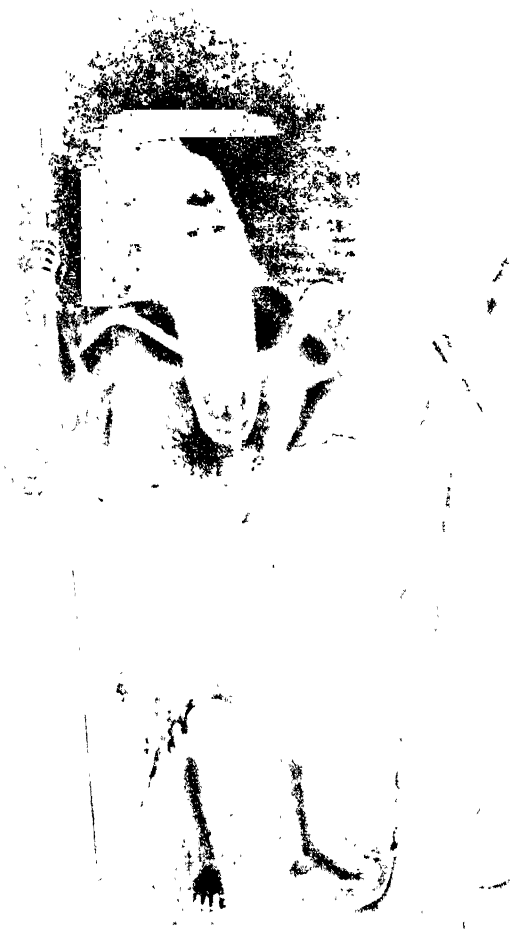
"বিরূপাক্ষ! দেহ রণ, বিলম্ব না সহে
ধর্ম্মসাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।"

—মেঘনাদবধ—পঞ্চমসর্গ।

চিত্রশিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বাগচী]

শ্রাবণ, ১৩২১

প্রথম খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈষ্ণব

[লেখক—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

(১)

ওহে আমার নীরদবরণ, ওহে আমার শ্যাম,
তুমি যদি হওহে নিরাকার,
এমন করে' পারব না ত ডাকতে তোমার নাম,
উদ্ধার হওয়া হবেই আমার ভার !
না পাই যদি তোমার দরশ,
না পাই তোমার সরস পরশ,
না পাই তোমার অভয় চরণ—
কিসের ধারি ধার !
হওনা নিরাকার !

(২)

ওগো আমার অন্তিম ধন, ওগো আমার প্রাণ,
ওগো আমার সাধন-ভজন-সার,
ছেড়ে অমন শিখিপাখা, অমন আঁখির টান,
হবে যেন নীরূপ-নিরাকার ?
রাধাকুমুদ পরাগমাথা
ওরূপ কিসে পড়বে ঢাকা ?
লুকাইবে কেমন করে'
গুঞ্জমালা হার ?—
হওনা নিরাকার !

(৩)

ছাড়লে তুমি ওরূপ বঁধু, ফুল হারাবে মধু,
অর্থশূন্য শব্দ হবে—গীতি,
পুঁথি হবে শাস্ত্রগুলা, মন্ত্র কথা শুধু,
নর গড়িবে ঈশ্বরেরে নিতি।
তীর্থ অপার শান্তি-আগার
হারাইবে সব শোভা তার,
হৃদয় হবে শূন্য দেউল
যাবে ভক্তি-প্রীতি—
ভেবেই লাগে ভীতি !

(৪)

ওহে আমার বেদন-বঁধু, ওহে নয়নতারা !
ভাবতে সে দিন শিউরে উঠে প্রাণ,—
থামবে যে দিন ধরার বুকে শ্যামের রূপের ধারা,—
হবে সকল সুখের অবসান।
বুকের সাথী জপের মালা
'শিকা'য় কি মোর থাকবে তোলা ?
ভুলতে হবে তোমার ধ্যান
থাকতে দেহে প্রাণ ?—
রক্ষ ভগবান্।

সাহিত্যের অর্থ

ও

বঙ্গীয় সাহিত্য-সভার কর্ত্তব্য *

[লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, M.A., B.L., M.P.C.S.,—J.B.,]

'সাহিত্য' কাহাকে বলে? কোন শব্দের মূল অর্থ বুঝিতে হইলে, তাহার ধাতুগত অর্থ প্রথমে বুঝিতে হয়। সহিতের ভাবকে 'সাহিত্য' বলে। যাহারা পরস্পর সাপেক্ষ—তুল্যরূপ, তাহারা পরস্পর এক ক্রিয়ার দ্বারা অন্বয়িত হইলে—তাহাকে 'সাহিত্য' বলে। যাহা সমভিব্যাহৃত—সংযুক্ত—সংহত, যাহা পরস্পর আপেক্ষিক অনেকের "সহ" বা একত্রভাবে "ইত" বা গমন করে, সেই সাহিত্যের ভাব যাহাতে আছে, তাহা 'সাহিত্য'। এই ধাতুগত অর্থ অতি ব্যাপক। এই অর্থে যাহারাই সম্মিলিত হয়, Organised হয়, তাহাদেরই সেই সম্মিলনের ভাবকে 'সাহিত্য' বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যের ধাতুগত অর্থ এইরূপ ব্যাপক এবং স্থলবিশেষে সাহিত্য এই ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার রূঢ়ি অর্থ আছে। আমরা সাধারণতঃ সেই অর্থেই সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। সাহিত্যের সেই সাধারণ অর্থ—পদ্য ও গদ্য কাব্য। "সাহিত্য দর্পণে" কাব্যকেই সাহিত্য বলা হইয়াছে। কাব্যের অর্থ রসাত্মক বাক্য—বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, লক্ষণা ব্যঞ্জনা, প্রভৃতি বিবিধ অর্থবোধক রসাত্মক বাক্য। ইংরাজিতে যাহাকে 'Literature' বলে, আমরা সাধারণতঃ তাহাকে সাহিত্য বলিয়া বুঝি। "সাহিত্যিক" শব্দ দ্বারা আমরা 'Man of letters' বা 'Litterateur' অনুবাদ করিয়া লইয়াছি।

সাহিত্যের ধাতুগত আর এক অর্থ আছে; তাহা হইতে এই অর্থের আভাস পাওয়া যায়। যে সহিতের ভাবকে সাহিত্য বলে, সেই সহিত শব্দের দুইরূপ অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ—সহ+ইত, বা সহগমন; আর এক অর্থ—স+হিত, বা যাহা হিতসহ বর্ত্তমান। যাহা আমাদের হিতকর বা কল্যাণকর, যাহা আমাদের কল্যাণের জন্য, হিতের জন্য—আমাদের সহগমন করে, তাহা আমাদের সাহিত্য। এই জন্য আমাদের কাব্যে, ইতিহাসে, পুরাণে, দর্শনে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ অর্থ সাহিত্য শব্দের সম্পূর্ণ অর্থপরিচায়ক নহে। আমরা সে অর্থ নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে, আমরা সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিব।

আমরা আমাদের এই স্থূল শরীরটা দেখিতেছি। এইটিই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। এই স্থূলশরীরের ধারণ, রক্ষণ, ও পোষণ আমাদের পরমপুরুষার্থ নহে। অবশ্য এই স্থূলশরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে "শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনং"। কিন্তু তাই বলিয়া এই শরীর-রক্ষণ-পোষণই আমাদের পরমপুরুষার্থ নহে। আমাদের যেমন স্থূলশরীর আছে, সেইরূপ আমাদের একটা সূক্ষ্মশরীরও আছে। বেদান্তভাষায় মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ, আনন্দময়কোষকে আমাদের সূক্ষ্মশরীর বলিতে পারি। আমাদের পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধন যেমন স্থূলশরীররক্ষা ও পুষ্টির প্রয়োজন এবং সেই জন্য যেমন অন্নবস্ত্রগৃহাদির প্রয়োজন, সেইরূপ সূক্ষ্মশরীর রক্ষণ, পোষণ ও পরিপুষ্টির প্রয়োজন ও সূক্ষ্মশরীর রক্ষার জন্য আমাদের সূক্ষ্ম আহার আবশ্যক এবং সে আহার এক অর্থে আমাদের সাহিত্য, উপযুক্ত জ্ঞেয় ও ভোগ্য বিষয়।

এই জ্ঞেয় ও ভোগ্য বিষয় যথোচিত কর্ম্মদ্বারা সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের সূক্ষ্মশরীরের বিকাশ ও পুষ্টি হইবে। এই খাদ্যসংগ্রহদ্বারা আমাদের জ্ঞানরাজ্যের ও ভোগরাজ্যের সম্প্রসারণ আমাদের প্রধান পুরুষার্থ। আমরা স্বরূপতঃ আত্মা। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাহা দেহসংযোগে দেহী হয়—দেহরূপ উপাধিতে বদ্ধ হয়। আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই সূক্ষ্মশরীরে জীব-ভাব হয়—

* বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখাসভার প্রথমবার্ষিক অধিবেশনে পূর্ব্ববৎসরের সভাপতিরূপে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়। ইহার অভ্যর্থনামূলক ভূমিকা অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব হয়। আত্মার চিৎ স্বরূপ বা সম্বিৎশক্তি হইতে অন্তঃকরণে জ্ঞাতাভাব, আত্মার সৎ স্বরূপ বা সন্ধিনীশক্তি হইতে কর্ত্তাভাব ও আত্মার আনন্দ-স্বরূপ বা হ্লাদিনীশক্তি হইতে ভোক্তাভাবের বিকাশ হয়। এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবের পূর্ণবিকাশে আমাদের পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। জ্ঞাতাভাবের পূর্ণ বিকাশজন্য জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, কর্ত্তাভাবের পূর্ণবিকাশ জন্য নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আর ভোক্তাভাবের পূর্ণবিকাশের জন্য ভোগবৃত্তির বা শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবের অনুশীলন করিতে হয়। যে ভোগ শুদ্ধ-সাত্ত্বিক নহে, যাহা কাম-মানসপ্রসূত—যাহা মনোময় কোষের অন্তর্ভূত—তাহা ত্যাগ করিয়া, যে ভোগ আনন্দময় কোষের পরিপুষ্টি হইতে অভিব্যক্ত, তাহার বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি করণীয়।

আমাদের চিত্তে বা সূক্ষ্মশরীরে এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবের বিকাশ হয় বটে; কিন্তু অন্তঃকরণ প্রকৃতিজ বলিয়া প্রকৃতির ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—দ্বারা ইহা রঞ্জিত হয়। ইহাদের মধ্যে যে গুণ প্রবল হয়,—তদনুসারে এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব নিয়মিত হয়। চিত্ত নির্ম্মল—শুদ্ধসাত্ত্বিক হইলে, তবে এই জ্ঞাতাপ্রভৃতি ভাবের উপযুক্ত বিকাশ হয়। অতএব চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া—শুদ্ধসাত্ত্বিক করিয়া—এই ত্রিবিধ ভাবের উপযুক্ত বিকাশ ও পরিণতি করাই আমাদের পরমপুরুষার্থ, অথবা সেই পুরুষার্থলাভের প্রধান সহায়। যাহা হউক, এ দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে জ্ঞানার্জ্জন ও ভোগ্যবিষয় অর্জ্জন করিয়া, আমরা ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকি। এই জ্ঞেয় ও ভোগ্য বিষয়ই বিষয়ী-আত্মার প্রধান আহার। তাহাই আহরণ করিয়া আমাদের সূক্ষ্মদেহের বৃদ্ধি ও পরিণতি করিতে হয়। অতএব, আমরা বলিতে পারি যে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের আহার এই দুইরূপ—জ্ঞান ও ভোগ। কর্ত্তাভাবে আত্মা এই আহারসংগ্রহ করে। চিত্ত শুদ্ধসাত্ত্বিক হইলে এই আহার যেরূপ গৃহীত হয়, সেই আহারই বিশেষ পুষ্টিকর হয়। আবিল, রাজস, তামস চিত্তজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত বা মোহযুক্ত হয়। সে অজ্ঞান ও মোহ জড়িত জ্ঞান—স্বাস্থ্যকর নহে। সেইরূপ রাজস ও তামস চিত্তের ভোগ অল্প সুখদুঃখদ্বন্দ্বজড়িত, কামনা ও প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-জনিত—তাহা আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য নহে। সাত্ত্বিক চিত্তের যাহা ভোগ, তাহা ভাবময়—আনন্দময়। জ্ঞান, বিজ্ঞানে পরিণত হইলে, তাহাও আনন্দময়—ভাবময় হয়। এইজন্য এক অর্থে, আমরা এই ভাবকেই প্রধানতঃ আমাদের সূক্ষ্মশরীরের আহার বলিতে পারি। চিত্ত যেরূপ ভাবময় হয়,—চিত্ত যেভাবে আকারিত হয়—আমরাও সেইভাবে ভাবিত হই। তাহাই আমাদের ভোগ্য হয়।

এই ভাবের সাত্ত্বিক অবস্থা—প্রীতি, স্নেহ, দয়া, ভক্তি প্রভৃতিরূপে বিকাশিত হয়। ইহার রাজসিক অবস্থা—অপ্রীতি, দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি রূপে অভিব্যক্ত হয়। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতির সহিত সমাজের সম্বন্ধ হইতে আমাদের ঐ সকল ভাবের বিকাশ হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই তবে স্নেহ, প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি ভাবের বিকাশ ও তাহার ক্রমপরিপুষ্টি হয়। যখন ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় ও সেইরূপ কোন সম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত স্থাপিত হয়—তখন এই ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাবের পূর্ণঅভিব্যক্তি হয়। ভগবান পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ,—রস-স্বরূপ, মধুস্বরূপ, অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস। 'রসঃ বৈ সঃ' তাঁহার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে উক্তরূপ ভাবে চিত্ত সিক্ত হয়—পরম আনন্দ, সর্ব্বত্র পূর্ণরস উপভোগ হয়; তাহাতেই আমাদের ভোক্তাভাবের সার্থকতা, তাহার পূর্ণচরিতার্থতা হয়।

প্রকৃত কাব্য আমাদের এই ভাববিকাশের সহায়। কাব্য হইতেই আমরা এই ভাব, এই রস সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার সাধনা করিতে পারি। তাহা হইতেই আমরা সূক্ষ্মশরীরের যাহা পুষ্টিকর খাদ্য—ভাব, তাহা সঞ্চয় করিতে পারি। শ্রেষ্ঠকাব্য আমাদের চিত্তের এই সাত্ত্বিক ভাবরাজ্যবিস্তারের প্রধান সহায়। কাব্য আমাদের সেই আনন্দময়ের আনন্দরাজ্যে, ভোগের রাজ্যে, সৌন্দর্য্যের রাজ্যে, প্রবেশের সহায়—আমাদের সহগামী। এইজন্য কাব্যকেই প্রধানতঃ সাহিত্য বলে। দর্শন, বিজ্ঞান (Science) প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি,—তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পথ পাই বটে; কিন্তু সেই আনন্দময়ের সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। ভাবের

ধ্য দিয়াই আমরা ভগবানের সাক্ষাৎ-অনুভূতি পাই। প্রতীচ্য দার্শনিক যাহা বলিয়াছেন, প্রকৃতই তাহা সত্য। তিনি বলিয়াছেন—

"The mind does not attain or realize the Absolute, either as Intelligence or Action, but as the Feeling of the Beautiful in Nature and in Art. Art, Religion, and Revelation are one and the same thing, superior even to Philosophy. Philosophy conceives God ; Art is God. Knowledge is the Ideal Presence, Art the Real Presence of the Deity."

দর্শন ও বিজ্ঞান আমাদের সাহিত্য হইলেও, মূলতঃ এই অর্থে তাহা প্রকৃত সাহিত্য নহে। বিজ্ঞানময় কোষের ভিতরে আনন্দময় কোষ। জ্ঞান অপেক্ষা আনন্দ বড়; জ্ঞান অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বেশী। সত্য ভাবরূপে অন্তরে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়। ভাবে বিভোর হইয়া মানুষ যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর, তাহা হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করে। জ্ঞান যাহা কেবল লাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ভাবের মধ্য দিয়াই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এককথায়, ভাব আমাদিগকে ভিতর থেকে ফুটিয়ে তুলে—জ্ঞান তাহা পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দই বিজ্ঞানের সার। অতএব আমাদের সাহিত্যের মধ্যে কাব্যের স্থান—প্রথম ও প্রধান। আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, (Science) ও ইতিহাসের স্থান তাহার পরে। তাই শ্রেষ্ঠভাব উপভোগই আমাদের সূক্ষ্মশরীরের প্রধান আহার, এবং জ্ঞান, ভাবেরই ভূমিতে স্থাপিত। জ্ঞান, ভাবদ্বারাই বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহাতেই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানদ্বারা যাহা জানা যায়, সাধনাদ্বারা সেভাব লাভ করিতে হয়। কোন ভাব লাভ করিতে হইলে, তাহার ভাবনা করিতে হয়। যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানানুসারে ব্রহ্মভাবনা করিলে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরভাব লাভেরও এই পন্থা আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আজীবন সতত নিত্য নিত্য যে ভাব সাধনা করা যায়, সেই ভাবে ভাবিত হইলে, তবে সেই ভাব লাভ হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—'Thought is Being'; কোন বিশেষ ভাব চিন্তা করিতে করিতে আপনাকে সেই ভাবময় করা যায়। 'ভূ' ধাতু হইতে ভাব। ভাব অর্থে হওয়া;—যাহা ভাবা যায়, তাহা হওয়া। আমি ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ-হেয়-শক্তিহীন মানুষ—যদি সতত নিত্য নিত্য ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়া তাঁহার কোন ভাব ভাবনা করিতে পারি, তবে আমিও সেই ভাব লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

সুতরাং, এই সকল শ্রেষ্ঠভাব আমাদের প্রধান আধ্যাত্মিক খাদ্য। সেই ভাব যদি আমাদের সহগমন করে—নিত্য নিত্য সতত আমাদের সঙ্গী হয়—তবে আমরা সেই ভাব প্রাপ্ত হই। সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভাবরত্নরাজি যাহাতে সংগৃহীত থাকে, তাহা কাব্য,—তাহাই প্রধানতঃ আমাদের সাহিত্য; তাহাই শুধু আমাদের সহগমন করে। ভাব আবার নানারূপ। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ভাব বহুপ্রকার হয়। সকল ভাবই আমাদের উন্নতির পথে সহায় নহে। যাহা প্রকৃত সহায়—যাহা প্রকৃত হিতকর—তাহাই প্রধান সাহিত্য। যে সকল ভাব এরূপ হিতকর, এরূপ উন্নতিকর, ও পরমপুরুষার্থ লাভের সহায়, নহে—তাহা নিম্নশ্রেণী হেয়সাহিত্য হইতে পারে; কিন্তু আমরা তাহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্য মধ্যে গণ্য করিতে পারি না।

অতএব যে গ্রন্থে এই সকল শ্রেষ্ঠভাবরাজি সংগৃহীত থাকে, যাহা হইতে আমরা আমাদের উপাদেয় ভাবসকল সংগ্রহ করিয়া—আমাদের আধ্যাত্মিক আহার গ্রহণ করিয়া—আমাদের সূক্ষ্মশরীর পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য।

এইরূপে আমরা সাধারণভাবে সাহিত্যের অর্থ বুঝিতে পারি। যে যে জ্ঞান ও ভাব—বিশেষতঃ যে ভাব—সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের সূক্ষ্মশরীরের উপযুক্ত পুষ্টি করিতে পারি, যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষ তাহার পরম-পুরুষার্থ লাভের জন্য গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারে, যে জ্ঞান ও ভাব বিকাশের উপর তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশ নির্ভর করে, সেইগুলি যে ভাণ্ডারে রক্ষিত থাকে—যাহা হইতে তাহা আমাদিগকে আহরণ করিতে হয়—তাহাই আমাদের সাহিত্য। যে সকল ভাব আহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিলে—যাহার ফলে সূক্ষ্মশরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও

করিয়া, তাহাদের নিয়মিত করিয়া, যাহাতে ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির প্রসার হয়, তাহার জন্ম ব্যস্ত। য়ুরোপীয় ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি লইয়াই বিব্রত; তাই য়ুরোপীয় কাব্য, প্রধানতঃ মানব চরিত্রে প্রবৃত্তির ও বিশেষ বিশেষ বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত দেখাইয়া দিয়া, নটের ন্যায় মানবের চিত্ত-রঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত। যাহা হউক, পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে উচ্চতর ভাবের বিকাশ ও অভিব্যক্তি একেবারেই নাই, তাহা নহে।

সমষ্টিভাবে মানবসমাজ, ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানব, যেসকল ভাব লইয়া অগ্রসর হইয়া ইহকালে সুখসম্পদ লাভ করিতে পারে, তাহারই প্রভাব বিশেষ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যসমাজ প্রধানতঃ রাজসিক। রজঃপ্রধান জাতির বা ব্যক্তির যেসকল ভাব প্রধানতঃ পরিস্ফুট, যেভাব লইয়া তাহারা অগ্রসর হইতে পারে, যে ভাবের সহায়ে তাহাদের জাতীয়জীবন ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে পারে, সেভাবসমূহ পাশ্চাত্য সাহিত্যে লক্ষিত হয়। এই জন্ম আমাদের কাব্যে ও য়ুরোপীয় কাব্যে বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমাদের কাব্যের মূল ধর্ম্ম, উচ্চতর রস ও ভাবাস্বাদন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, আদর্শ চরিত্র, স্নেহদয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের পরিস্ফুটন। আমাদের মহাকাব্য আছে, কিন্তু আমাদের বিয়োগান্ত নাটক নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে,মানবসমাজ-উপযোগী জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিয়া ব্যক্তি আপনাকে পরিপুষ্ট করে ও তাহার সহায়ে উন্নতির পথে আপন লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইহাদের মধ্যে 'জ্ঞান' এক অর্থে মানবসাধারণের সম্পত্তি। জ্ঞান বা বিদ্যা, পরা ও অপরাভেদে, দ্বিবিধ। আমরা প্রথমে পরাবিদ্যার কথা বলিব। পরাবিদ্যা যে দেশে যে মানুষ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করুক ও মানবের সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ করুক, তাহা সকল মানবের, সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি করিয়া লইলে বিশেষ লাভ আছে। ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। তবে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা অধিকারী ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভাব সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের সমাজ যে ভাবে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য সমাজ সে ভাবে অনুপ্রাণিত নহে; তাই তাহাদের সমাজের যে ভাব তাহাদের সাহিত্যে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের কাব্যে যে ভাব প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে, যে অভাব-অশান্তি, বেদনা, অসহিষ্ণুতা, উৎকট অস্থিরতা—যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জ্বালা, যন্ত্রণা ইহকালের অশান্তির পরিচয় আছে, আমাদের সাহিত্যে সে ভাব পাওয়া যাইবে না। আবার আমাদের সাহিত্যে যে মূল ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না।

আমাদের এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকে এ বিষয় আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বথা আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহারা, পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের তথ্যসকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই। কিন্তু, যাঁহারা পাশ্চাত্য-সাহিত্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া কাব্য প্রভৃতি দ্বারা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই উভয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য, গতি, প্রকৃতি ও প্রভেদ লক্ষ্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। ভাবের আদান-প্রদানে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয় সত্য; কিন্তু উচ্চ ভাবের সহিত নিম্ন-ভাবের আদান-প্রদানে, উচ্চ ভাবের ক্ষতি হয়। পাশ্চাত্য-ভাব আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিলে আমরা হয়ত ক্রমে মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যাইব। যেমন সৌরজগতে সূর্য্যের আকর্ষণে কেন্দ্রবদ্ধ হইয়া এই উপগ্রহগণ ঘুরিয়া বেড়ায়, কেন্দ্রাতিগ-শক্তির বলে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যায় না, সেইরূপ আমাদের সমাজ পূর্ব্বোক্ত ভাব-কেন্দ্রের আকর্ষণে সুসম্বদ্ধ হইয়া নিজ গন্তব্যপথে নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার কেন্দ্রচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন যদি অন্যরূপ ভাবের আকর্ষণে আমাদের সমাজ আকৃষ্ট হয়, তবে তাহার কেন্দ্রচ্যুত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; তাহার আকর্ষণে আমাদের সমাজ হয়ত,ধূমকেতুর মত,বিপথে চালিত হইতে পারে। যদি আমাদের জাতীয় লক্ষ্য স্থির রাখিতে হয়, যদি তাহার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্যও স্থির রাখিতে হইবে। অতএব পাশ্চাত্য-সাহিত্যে যে ভাব আমাদের জাতীয় সাহিত্যের মূলভাব

বা মূললক্ষ্যের প্রতিকূল নহে, বরং সে ভাব-বিকাশের অনুকূল হইতে পারে, আমাদের সাহিত্যে তাহা সঞ্চয় করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই বরং লাভই আছে। কিন্তু ইহার প্রতিকূল ভাব আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিলে, তাহাতে সমূহ ক্ষতি হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জাতীয়-জীবনের গঠনের পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের শক্তি অসাধারণ। প্রতিকূল সাহিত্য, আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইলে, তাহার ভাবী ফল ভয়াবহ।

তবে এ সম্বন্ধে কথা আছে। যাহা প্রকৃত জাতীয়-সাহিত্য—তাহাতে জাতীয় ভাবেরই অভিব্যক্তি হয়। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, প্রতিকূল ভাবকে তাহার অন্তর্ভূত হইতে দেয় না, অন্তর্ভূত হইলেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যাহা জাতীয় সাহিত্য, তাহার প্রভাব সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। সে সাহিত্য দ্বারা সমগ্র সমাজ পরিচালিত হয়। আর যাহা জাতীয় সাহিত্য নয়—তাহা সমাজের কোন বিশেষস্তর অতিক্রম করিয়া অন্যস্তরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহা নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

আজকাল পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অনুকরণে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের দেশে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে, কতিপয় ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই তাহার আদর, তাহার প্রভাব দেখা যায়; যাহাদের লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত, তাহাদের মধ্যে তাহার প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। মেঘনাদবধের ন্যায় কাব্য কয়েকজন ইংরাজিশিক্ষিত পাঠক ব্যতীত আর কেহ পাঠ করেন না। কিন্তু আমাদের যাহা জাতীয় সাহিত্য—কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডী, বিদ্যাপতিচণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী প্রভৃতি—তাহা উচ্চ হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তাহা কথকতা, যাত্রা, পাঁচালীতে যাহারা নিরক্ষর তাহাদের নিকট প্রচারিত হইতেছে। যাহারাই সামান্য লেখাপড়া জানে, তাহারা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করে। এইরূপে যাহা আমাদের জাতীয় সাহিত্য, তাহা আমাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতেছে। আমরা সে সাহিত্য হইতে আমাদের গন্তব্যপথ—আমাদের পরম লক্ষ্য জানিতে পারি। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতির আদর্শ স্বামীভক্তি, রামের ন্যায় আদর্শ রাজা, লক্ষ্মণের ন্যায় আদশ ভ্রাতা, ভীমার্জ্জুনের আদর্শ চরিত্র জানিয়া, তাহাদের ভাবে ভাবিত হইয়া, আমরা আমাদের চরিত্রগঠন করিবার অবসর পাই। আমাদের সাহিত্য হইতেই আমরা আপামর সকলেই ঈশ্বরতত্ত্ব, ভগবানে ভক্তি ও আদর্শ ভক্তের চরিত্র জানিয়া সাধনার পথে প্রবেশের সুবিধা পাই। আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে ভগবানকে আরাধনা করিবার তত্ত্ব জানিতে পারি। এই-রূপে যাহা আমাদের জাতীয় সাহিত্য, তাহার প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সাহিত্য আমাদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনগঠনের প্রধান উপকরণ হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অনুগ্রহে আমাদের আধ্যাত্মিক আহারের কখনও অভাব হয় না, আমাদের সূক্ষ্মশরীরের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত খাদ্যের কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না।

এই জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা আরও দুই একটি কথা বলিব। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আজিও উপযুক্তরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাঙ্গালা বড় প্রাচীন দেশ। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার শিল্প প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও আদৃত হইত। বাঙ্গালার জাহাজ তখন সুমাত্রা, যাভা, কেল্‌ডিয়া প্রভৃতি স্থানে দেশীয় পণ্য লইয়া গতিবিধি করিত। আমাদের দেশ হইতে তখন সুদূর যাভা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, আমাদের দেশের লোক লঙ্কা জয় করিয়া সেখানে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল, আমাদের দেশেরই পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন, আমাদের দেশের তন্ত্র-শাস্ত্র তাঁহারা কাশ্মীর, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেকালের সাহিত্য লুপ্ত হইয়াছে। তাহার কখন কিছু উদ্ধার হইবে কি না জানি না। সেকালের যাহা আছে, তাহা তন্ত্র গ্রন্থ। বাঙ্গালা দেশই পূর্ব্বে দেবীপূজার আদিস্থান ছিল, আজ পর্য্যন্ত যত তন্ত্র-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর। বাঙ্গালী প্রথম মা মা বলিয়া পরম ব্রহ্মশক্তি পূজা করিতে শিখিয়াছিলেন। মাতৃভাবে ভগবানের উপাসনা আর কোথায়ও হয় নাই।

মা-ভক্ত বাঙ্গালী মা মা বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে শিখিয়াছিল। সেদিনও বাঙ্গালীর কৃতী-সন্তান স্বদেশকে "বন্দেমাতরং" বলিয়া পূজা করিতে শিখাইয়াছে। যাহা হউক, সেই সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্য এখন লোপ পাইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য পাঁচ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সহিত আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন সমাজে যখন যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন তাহা সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন সমাজের কৃতী-সন্তানগণ—মহাপুরুষগণ সেই ভাবকে সাহিত্যে রক্ষিত করেন, সাহিত্যের দ্বারা তাহা প্রচার করেন। পাশ্চাত্য দেশে ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। ভল্‌টেয়ার ও রুসো যে সাহিত্য প্রচার করেন, তাহাতে তখন যে ভাব দ্বারা সমগ্র ফরাসী সমাজ আলোড়িত হইতেছিল, তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সেই সাহিত্যের প্রচারে যে দারুণ ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাই ইতিহাসপাঠাভিজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন। সেইরূপ আমাদের সমাজে যখন শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই ধর্ম্মভাবে যখন সমগ্র সমাজ আলোড়িত হয়, তখন সাহিত্যে সেই ভাবের অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব পদাবলী, মহাজনগণের কাব্য বা বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস প্রভৃতির শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্য প্রভৃতি কত কাব্যগ্রন্থ যে সেই সময় প্রচারিত হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের সমাজে এই যে ধর্ম্মভাবের উপর আমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় আর্য্যজাতির মজ্জাগত ধর্ম্মভাব আমাদের সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর বড় গৌরবের বিষয় যে, আমাদের বাঙ্গালা দেশেই নানা অনুকূল কারণে এই জাতীয় সাহিত্যের যেরূপ পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, এমন আর কোন স্থানে হয় নাই। পাশ্চাত্যসাহিত্য-প্রণোদিত আমাদের নবীন সাহিত্যে সে ভাবের বড় অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। সে সাহিত্য আমাদের জাতীয় সাহিত্য নহে, তাহা আমাদের জাতীয় ভাবের বিরোধী বলিয়া, কখন তাহা আমাদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইবে না, তাহার প্রচার আপামর সাধারণে কখন লক্ষিত হইবে না।

আমরা আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। এই সাহিত্য-প্রচারে এই বর্দ্ধমান জেলা যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, বঙ্গদেশের অন্য বিভাগের সহিত তুলনায় তাহা অসাধারণ। আমাদের কবিগণের মধ্যে অধিকাংশই বর্দ্ধমানবাসী। তাঁহাদের যে তালিকা বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালার লেখক ও বাঙ্গালীর গান" হইতে, আমাদের সহকারি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রধান কবি ও সাহিত্যিকগণের নাম উল্লিখিত হইল।—

পদকর্ত্তাগণ

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ, গোবিন্দ কর্ম্মকার, রায়শেখর, পরমানন্দ বা কবি কর্ণপূর, নরহরিদাস, উদ্ধবদাস, রামানন্দ বসু, আত্মারাম দাস, বৈষ্ণবদাস, জয়ানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও চৈতন্যলীলা-কাব্যরচয়িতা।

লোচনদাস—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীচৈতন্যচরিত-রচয়িতা।

প্রাচীন কবি

কবিকঙ্কণচণ্ডী-রচয়িতা—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। বাঙ্গালা মহাভারত রচয়িতা—কাশীরাম দাস। জগৎমঙ্গল রচয়িতা—গদাধর দাস। মনসার ভাসান-রচয়িতা—ক্ষেমানন্দ দাস। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচয়িতা—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পুঁথি-প্রণেতা—রূপরাম। প্রসিদ্ধ সংগীত রচয়িতা—সাধক কমলাকান্ত। বৃহৎ ভাগবতামৃতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদক—রায় গোবিন্দদাস। রামরসায়ন-প্রণেতা—রঘুনন্দন গোস্বামী। ইত্যাদি।

আধুনিক কবি ও লেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ—

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (দেওয়ান মহাশয়)—প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা। দাশরথি রায়—পাঁচালীর প্রবর্ত্তক। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী প্রভৃতির কবি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজকৃষ্ণ রায়। চিরঞ্জীব শর্ম্মা। যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়। প্যারিমোহন কবিরত্ন। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গবাসীর প্রবর্ত্তক ও সুলেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ইত্যাদি—

এখনও বৰ্দ্ধমানে সাহিত্যচর্চ্চার অভাব নাই। স্বয়ং মহারাজাধিরাজ গীতিকা, নাটিকা, কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। রায় ললিত-মোহন সিংহ অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রভৃতি লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে পুষ্ট করিতেছেন। হরিদাস পালিত মহাশয় 'গম্ভীরা' লিখিয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার করিতে-ছেন। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালার ইতিহাস" সংগ্রহ করিতেছেন। আর কত নাম করিব।—

অতএব যে বৰ্দ্ধমান হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ প্রচার হইয়াছে, সেখানে সেই সাহিত্যের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা উপযুক্ত হইয়াছে। এবং আগামীবর্ষের সাহিত্য-সম্মিলনীর এখানে অধিবেশন জন্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যে বৰ্দ্ধমানের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইয়াছে। আশা করি, সেই অধিবেশন যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, আপনাদের পক্ষে কোন ত্রুটী না হয়, তাহার জন্য এই পরিষদের যথোপ-যুক্ত চেষ্টা হইবে।

এই অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই শাখাসাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথামাত্র বলিয়া এক্ষণে শেষ করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের সাহিত্যের রক্ষা, উন্নতি ও প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যে কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংরক্ষিত আছে, যাহা দ্বারা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সংগঠিত হইয়াছে, তাহার আবিষ্কার ও প্রচার আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। যে জাতীয় ভাব আমাদের সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব ও মূল লক্ষ্য অনুসরণে অনুকূল, আমাদের প্রত্যেকে সেই ভাব গ্রহণ করিয়া, যাহাতে সে প্রকৃতরস আস্বাদন করিতে পারে ও আপনাকে সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময় আনন্দময়ের অভিমুখে লইয়া যাইতে পারে, সেই সাহিত্যের মূলভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, বিজাতীয় ভাবের দ্বারা তাহা রঞ্জিত হইয়া যাহাতে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। যাহাতে সেই জাতীয় সাহিত্য আমাদের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পায়, যাহাতে ইতর, ভদ্র, নীচ, উচ্চ সকলেই সে সাহিত্য উপভোগ দ্বারা পুষ্ট হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের আর এক উদ্দেশ্য। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহার উন্নতির জন্য আমাদের জাতীয় ভাবের অনুকূল যে সকল ভাবের অভিব্যক্তিও সাহিত্যে সংরক্ষণের প্রয়োজন, সে ভাব সাহিত্য মধ্যে যাহাতে সন্নিবিষ্ট হয়, ও সে ভাবের যাহাতে সমাজে সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তাহার জন্য চেষ্টা আমাদের আর এক কর্ত্তব্য। ভাব কার্য্যের জনক; কার্য্যের প্রবর্ত্তক। আমাদের সমাজের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া অবস্থা অনুসারে সমাজের উন্নতিকর ভাব যাহাতে সমাজে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, সমাজকে সেই পথে উন্নীত করিবার জন্য আমাদের যাহাতে প্রবর্দ্ধিত করে, সমগ্র সমাজকে যাহাতে সেই উদ্দেশ্যে, কল্পপথে লইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

এই সকল উদ্দেশ্যসাধন জন্য আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, কদাহার দ্বারা যেমন স্থূল শরীর রুগ্ন হয়, সেইরূপ সাহিত্যের কুভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের সূক্ষ্ম-শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে। আর যে গ্রন্থ দ্বারা সাহিত্য পুষ্ট হয়, তাহার রক্ষা ও প্রচার করিতে হইবে। রস্কিন বলিয়াছেন, সাহিত্য গ্রন্থ দুইরূপ—Books for all times, আর Books for the hour; যাহা Books for all times যাহাকে Classic বলে, তাহা দ্বারাই প্রকৃত সাহিত্য সংগঠিত ও পুষ্ট হয়।

আমাদের জানা উচিত যে, ভাষা ভাবের অনুবর্ত্তী। ভাষা ব্যতীত ভাবের অভিব্যক্তি হয় না—পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও জ্ঞানের আদান প্রদান হয় না। ভাষা ব্যতীত কোনরূপ চিন্তাও করা যায় না। যেমন ভাব দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হই, আমাদের ভাষাও সেইরূপ উপযোগী হয়। ভাষা ভাবের অনুগামী। জাতীয় সাহিত্যের ভাষা সরল, সতেজ, প্রাঞ্জল, সকলের সহজবোধ্য এবং গ্রাম্য বা প্রাদেশিক অপভাষা-দোষ ও ব্যাকরণ-দোষ-বিহীন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যের ভাষা যাহাতে এরূপ কোন দোষ-দুষ্ট না হয়, তাহার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আজকাল বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয় ভাষার রীতি ও শক্তি প্রভৃতি আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া, যাহাতে আমাদের ভাষা অপভাষায় পরিণত না করে, সাধারণের

দুর্ব্বোধ্য না করে, ইহার বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশীয় সাহিত্যের ভাষা সাধারণের বোধগম্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় কঠিন গ্রন্থেও দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার তত্ত্ব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

আমাদের সাহিত্যের উন্নতি, আমাদের ভাষার উন্নতির উপর নির্ভর করে। ভাষার সে উন্নতির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অথচ যাহাতে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছা-চারিতা, এবং ভাষার ও ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ না করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এই সভার ইহা প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত ইহার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। জাতীয় উন্নতি, জাতীয় ইতি-হাসের সহিত জড়িত। অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিত্যসম্বদ্ধ। আমাদের অতীতের ইতিহাস জানিতে পারিলে আমাদের জাতির বিশেষত্ব, তাহার গতি, তাহার উন্নতি, কোন্ পথে কি ভাবে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিব। এজন্য আমাদের দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান প্রচার হয়, যাহাতে জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার রক্ষিত হয়, তাহাও আমরা সাহিত্যের অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছি। অতএব এই জ্ঞান প্রচার করা, তাহাকে সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া সাহিত্যের পুষ্টি করা, আমাদের আর এক কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এই কর্ত্তব্য-তালিকা আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, আমাদের কর্ত্তব্য অনেক। নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্যপালন, কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। লোক-সংগ্রহ জন্য, সমাজ-রক্ষার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন। তাঁহারই পথ অনু-সারে আমাদের নিষ্কাম ভাবে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই শাখা-সাহিত্য পরিষদের কর্ম্ম তাহার অন্তর্ভূত। আশা করি, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—আমরা যেন সমবেত হইয়া সেই কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হই।

নাই

[কবিবর শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী-রচিত]

নীরদের ছায়াখানি গিয়াছে সরিয়া,
গিয়াছে মুরলীতান, পবনে মিশিয়া ;
সে স্বপন নাহি আর, নাহি ফুলবাস,
নাহি সে কুসুমদলে, অস্ফুট বিকাশ,
নাহি সেই অভিসার বাদল নিশায়,
তমাল, তাপনী, নীপ, নাহি এ ধরায়।
বদনেতে লোধ্ররেণু কুরুবক গলে,
মৃণাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া রাজহংস দলে,
বকুলের মালা গাথা চুপি-চুপি কথা,
উতলা হৃদয় মাঝে তীব্র ব্যাকুলতা.
নিশি জেগে আর নাহি প্রহর গণনা
নাহি সেই ইন্দ্রজাল আগ্রহে রচনা,
স্থবিরা, কাতরা, ক্ষীণা, কৃশাঙ্গী কল্পনা
মৃত্যুপানে চেয়ে চেয়ে স্বপনে মগনা।

পুরাতন প্রসঙ্গ

[শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত M.A.]

(নবপর্য্যায়)

২

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যখন কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে ছিলেন?" উমেশ বাবু বলিলেন—"কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন্। আর হেড মাষ্টার ছিলেন—এফ্. ডবল্ ইউ. ব্র্যাড্‌বেরি (F. W. Bradbury)। কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন্ কলিকাতার হিন্দু কলেজে দশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন।

লর্ড্ মেকলে

"লর্ড মেকলের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যের পর যখন ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করাই সাব্যস্ত হইল, তখন কলিকাতায় একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করা হইল; সভাপতি হইলেন স্বয়ং মেকলে—President of the General Commitee of Public Instruction. লর্ড হার্ডিঙ্গ্ (Lord Hardinge) ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্ব্বে স্যর জন্. মূওরের (Sir John Moore) সহচর (Hide de camp) ছিলেন; কিন্তু এদেশে তিনি ইংরাজি শিক্ষা-প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কমিটিতে ছিলেন—রামকমল সেন, রসময় দত্ত, কাপ্তেন রিচার্ডসন্, কাপ্তেন হেস্ (Captain Hayes), ডাক্তার

লর্ড হার্ডিঙ্গ্

মৌয়াট্ (Doctor Mouat)। কাপ্তেন হেস্, মিলিটরি ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতে হইয়াছিল। বীটন্ (Bethune), বীডন্ (Beadon), হ্যালিডে (Halliday), ও রামগোপাল ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমতঃ যে চারিটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলি দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর ও ঢাকা কলেজের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নের ব্যবস্থা ছিল; হুগলি ও হিন্দু কলেজের জন্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন করা হইত। ইহাদিগকে এক সূত্রে গ্রথিত করার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই ছিলেন; একা বীডন্ সাহেব জোর করিয়া উহা সম্পাদিত করিয়াছিলেন; তখন তিনি গভর্মেণ্টের সেক্রেটরি; তিনি বলিলেন, মফঃস্বলের কলেজে ভাল ছেলে আছে, হিন্দু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে তাহারা

পাল্লা দিতে পারিবে। তাঁহার জিদ্ বজায় রহিল। ১৮৪৮ সালে একই প্রশ্নপত্র হইতে সমস্ত কলেজগুলির
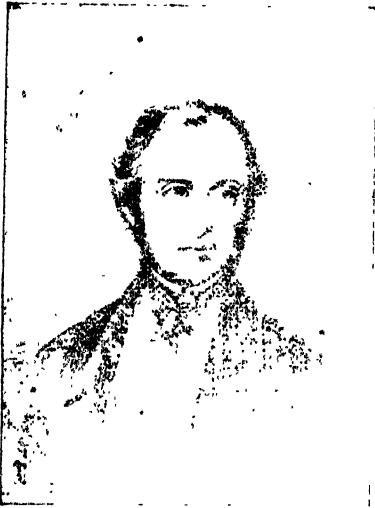
ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটর্ বীটন্

পরীক্ষা করা হইল। আমি General listএ পঞ্চম স্থান অধিকার করিলাম; একটি পদক (Rochfort Medal) পাইলাম। বীটন্ সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি, বীডন্ ও মৌয়াট্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিতে আসিলেন; বক্তৃতায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন—("Though fifth in order, the number of marks gained by him is within 22 of the highest number of marks gained by the first scholar of the Hindu College"); আমি যেন কলেজকে গৌরবান্বিত করিয়াছি, ইহাই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন ("Not only on the individual honour he had achieved for himself, but also on the honour he had reflected on his college.")। কলিকাতা হইতে কিন্তু তখনও প্রাইজগুলি আসিয়া পৌছায় নাই। স্থানীয় কলেজ কমিটির সদস্য মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়াছিলেন; সেই শালখানি তিনি আমাকে পুরস্কার দিলেন। বীটন্ সাহেব বেশ

স্যর্ সেসিল্ বিডন্ কে. সি. এস. আই.

স্যর্ ফ্রেডারিক্ জেম্‌স্ হ্যালিডে, কে. সি. বি.

বক্তৃতা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গলা শুকাইয়া আসিত; তিনি দুই তিন বার জল পান করিতেন।

"পরবৎসর আমি সীনিয়র্ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (Senior Scholarship Examination) General listএ প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। এবারও বীডন্ ও মৌয়াট্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া বীটন্ সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিতে আসিলেন। বক্তৃতার রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"A year has elapsed since I last visited this college. I told you then that I had just

come from warning the students of the Metropolitan college that they must expect soon to find formidable rivals in the mofussil institutions and must exert themselves to the utmost, if they wished to keep their old pre-eminence. I congratulate this college of Krishnagar on its having so speedily verified my prediction. Last year the foremost man among you occupied the fifth place in the comparative list....... this year your leader is at the head of all the colleges."

"বীডন সাহেব আরও অনেক কথা বলিলেন। প্রাইজ দেওয়া হইয়া গেলে পর আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন; সস্নেহে তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'যখনই তুমি কলিকাতায় যাইবে, আমার সহিত দেখা করিও।' পরে যখন তিনি বঙ্গের ছোট লাট হইলেন, তখন স্যর সেসিল্ বীডন্ কৃষ্ণনগরে আসিয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন; যতক্ষণ ছিলেন, আমার সহিতই আলাপ করিলেন; তজ্জন্য প্রিন্সিপ্যালের একটু ঈর্ষা হইয়াছিল। স্যর সেসিল্ আমাকে বলিলেন—"Do you know what is the first question I put to the gentlemen here?" আমি বলিলাম—"How should I know?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"I asked about you; they gave you a very high character." স্যর সেসিল্ বরাবরই আমাকে স্নেহ করিতেন। ঢাকা হইতে আসিয়া একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে, কি চাই বল।" আমি বলিলাম,—"তাহা বলিবার নয়।" প্রশ্ন হইল—"কেন?" উত্তর—"মা অগঙ্গার দেশে যাইবেন না।" তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—"আচ্ছা, এই মাত্র!" কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি যে ডাইরেক্টর আ্যাট্কিন্সন্ (Atkinson) সাহেব আমাকে ঢাকা হইতে বদলি করিয়া দিয়াছেন।

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কাপ্তেন রিচার্ডসন্ আমার মুখে সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়া আমাকে পঞ্চাশের মধ্যে (!) ষাট নম্বর দিলেন। 'মার্চ্যাণ্ট্ অভ্ ভেনিস্' আবৃত্তি করিতে দিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, আমি 'In sooth' কথাটার অর্থ করিতে পারি নাই; আমার সতীর্থ রামচরণ বলিতে পারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রিন্সিপাল কলেজের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া সেক্ষপীয়র পড়িতেন; রুস্কিনের বক্তৃতা পাঠ করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।"

উমেশ বাবু একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাঁহার চরিত্র কেমন ছিল?" দত্ত মহাশয় বলিলেন—"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চরিত্রদোষ ছিল; তাঁহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে ছিল; এ ব্যাপার চাপা রহিল না; বীডন্ সাহেব স্পষ্টই তাঁহাকে 'hoary-headed libertine' আখ্যা প্রদান করিলেন।—

"কলেজে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে দিন কতক 'Paradise Lost' পড়িয়াছিলাম। তাঁহার পড়াইবার ধরণ ছিল এক রকমের। কেতাবের ভাষা ব্যাখ্যা করার দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। কোনও একটা text অবলম্বন করিয়া তিনি বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। যাহাতে ছেলেরা সুচরিত্র হইয়া উঠে, সেইরূপ উপদেশ তিনি দিতেন। তাঁহারা অধ্যাপনায় তখন free-thinking এর ভাব খুব প্রকাশ পাইত। তাঁহার কথায়

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

একজন বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বহুদিন পরে নগেন বাবু একজন ব্রাহ্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। রামতনু বাবুর ভাই শ্রীপ্রসাদবাবু

ইংরাজি reading পড়িতেন খুব ভাল; তিনি কলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের আবৃত্তি শুনিতে যাইতেন। রামতনু বাবু যখন আমাদের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, তখন প্রিন্সিপ্যাল্ ছিলেন—রচ্‌ফোর্ট্ (Rochfort); হেড্ মাষ্টার ছিলেন—হ্যারিসন্ (Harrison); গণিতের অধ্যাপক ছিলেন—ব্রাড্‌বেরি (Bradbury); সেক্ষপীয়র পড়াইতেন—বীন্‌ল্যাণ্ড সাহেব। একটি শ্লোকে ছেলেরা অধিকাংশ শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—

সেক্ষপীয়র পড়াতে বীন্‌ল্যাণ্ড।
বীট্‌সনের নাই জ্ঞানকাণ্ড॥
বীন্‌ল্যাণ্ডের লম্বা দাড়ি।
তা'র নীচে রামতনু লাহিড়ী॥
রামতনু লাহিড়ী সদাশয়।
তা'র নীচে দয়াল রায়॥
দয়াল রায়ের নাড়ী পট্‌কা।
তা'র নীচে গুরো হট্‌কা॥
গুরো হট্‌কার সদাই রোষ।
তা'র নীচে বেণী বোস॥
বেণী বোসের সদাচার।
তা'র নীচে গোবিন্দ কোঙার॥
গোবিন্দ কোঙারের মোটা বুদ্ধি।
তা'র নীচে গদাই চক্রবর্ত্তী॥
গদাই চক্রবর্ত্তীর পেটটা মোটা।
তা'র নীচে হরনাথ জ্যাঠা॥

"বীন্‌ল্যাণ্ড সাহেব দিব্য কলম কাটিতে পারিতেন। দয়াল রায় খুব মদ খাইতেন; গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় বেজায় লম্বা (হট্‌কা) ছিলেন। শ্লোকের শেষোক্ত শিক্ষকটির পূরা নাম ছিল হরনাথ মিত্র।

"কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন্ ইংরাজি কাব্য খুব ভাল পড়াইতেন; Bacon's Essaysএর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। Kerr সাহেব বেকনের Novum Organum অনুবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ডফ্ কলেজের একজন অধ্যাপকও Bacon's Novum Organum অনুবাদ করিয়াছিলেন; কার্ সাহেবের চেয়ে তাঁহার অনুবাদ ভাল হইয়াছিল।

"গ্রীষ্মকালে আমাদের কলেজ বন্ধ হইত না; প্রাতে স্কুল বসিত। পূজার সময় ছুটি হইত; ছুটির পূর্ব্বেই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছেলেরা কলেজ পরিত্যাগের পরেও ৩।৪ বৎসর সিনিয়র্ বৃত্তি ভোগ করিত। হুগলি কলেজের একটি ছেলে একাদিক্রমে ছয় বৎসর উক্ত বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব বলিলেন,—এভাবে বৃত্তি দেওয়া অনুচিত।

সীনিয়র্ পরীক্ষার জন্য আমরা পড়িতাম—

Mill's Logic.
Adam Smith's Theory of Moral Sentiments.
Reid's Inquiry.
Arnold's History of Rome.
Elphinstone's History of India.
History of England. (কোনও পুস্তকের নাম করা ছিল না; কোনও একটা period নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত।)
Mathematics—Arithmetic হইতে Integral calculas পর্য্যন্ত (Pure and Mixed).
Richardson's Selections.—ড্রাইডেন্, পোপ প্রভৃতি কবির অধিকাংশ রচনাই পড়িতে হইত।

সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা অবশ্যপঠিতব্য নহে,—optional। গণিতশাস্ত্রে আমার সতীর্থ অম্বিকাচরণ ঘোষ সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন; আমাদের গণিতের অধ্যাপক হ্যারিসন্ সাহেব খুব পাকা লোক ছিলেন। সীনিয়র্ পরীক্ষায় মৌলিক ইংরাজি রচনায় আমি ৫০এর মধ্যে ৪৭ পাইয়াছিলাম। আমার প্রশ্নোত্তরগুলি শিক্ষাসমিতির বাৎসরিক রিপোর্টেও (Principal Kerr's Reports of Public Instruction in Bengal 1831-1850) কিছু কিছু আছে।

"সে সময়ে আর একটা পরীক্ষা ছিল, তাহার নাম লাইব্রেরী-পরীক্ষা। সীনিয়র্ পরীক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত, তদতিরিক্ত বহু গ্রন্থ লাইব্রেরী হইতে বাছাই করিয়া লইয়া আয়ত্ত করিতে হইত। ১৮৫০ সালে আমি দর্শন শাস্ত্রে লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিলাম; শতকরা এক শত নম্বর আদায় করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলাম; স্বর্ণপদকও পাইলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—

অম্বিকাচরণ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন; তাঁহার মত নির্ভীক ডেপুটি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন তিনি কটকে ছিলেন, তত্রত্য কলেক্টর মেট্‌কাফ্ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়; কলেক্টর সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন; রাসবিহারীর কৈফিয়ৎ তলব করা হয়; তাঁহার বক্তব্য পাঠ করিয়া বোর্ড স্বীকার করিল যে, কলেক্টরই অন্যায় করিয়াছেন। রাসবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্র রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু স্বনামধন্য হইয়াছেন।

"আর অম্বিকাচরণ? লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি যে আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর তোমায় কি বলিব! আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে বসন্ত-রোগে তিনি শয্যাগত হইলেন। এখানে তাঁহার আত্মীয় পরিজন ছিল বটে, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ অনেক নিষেধ করিতেন; আমি তাহাতে কর্ণপাত করিতাম না। শেষে তাঁহারা আমাকে আমাদের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি উন্মত্তের মত সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটা জীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অম্বিকার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অম্বিকা-চরণকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না। প্রাণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল। আমার খুব জ্বর হইল। লোকে ভাবিল আমারও বসন্ত হইল। আমি কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

"১৮৫৬ সালে মহারাজের দত্ত ভূমির উপরে কলেজের নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইবার কালে আমরা অম্বিকাচরণের স্মৃতিরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম। তাঁহার সতীর্থ ছাত্রেরা চাঁদা তুলিল। একটি tabletএ কত খরচ হইবে, তাহা আমরা জানিতাম না। শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন্ (Bethune) সাহেবকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন 'তোমরা যে টাকা তুলিয়াছ, তাহা আমাকে পাঠাইয়া দাও; অকুলান হইলে আমি বুঝিব (I will see; send what you have raised.) বাহিরের লোকেও চাঁদা দিয়াছিল। আমার মনে আছে ডাক্তার আচার দশ টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার এবং বীটন্ সাহেবের ইচ্ছা ছিল, ভাষাটা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া fellow students of the Krishnagar Collegeএর পরে 'and admirers' এই দুটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহাতে খরচ আরো বেশী হইবার ভয়ে আমরা রাজী হইলাম না। সকলের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই tabletটি প্রাচীরগাত্রে বসান হইল।

"This tablet is erected to the memory of Ombica Charan Ghose by his fellow students of the Krishnagar College as mark of their respect for his character and regret for his untimely death.

Died 26th March 1850, aged 20 years."

অম্বিকাচরণের সহিত আমার নিবিড় সখ্যভাবের কথা পূর্ব্বেই বীটন্ সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের রিপোর্টে দেখিতে পাইবে, তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিলেন—'And you, Omesh Chunder Dutt, whom I have so often had occasion to mark out for praise, be assured of this, that not even in that moment, which you probably thought the proudest in your life, when from this place I hailed you as the first scholar of your year throughout Bengal, not even then did I look on you with so kindly a feeling or so hearty a desire to serve you, as when I heard of your affectionate kindness to your dying friend and competitor; when I learned how carefully you had tended him in his malignant disorder, undeterred by the terror of contagion, which is so often powerful enough to break through stronger natural ties than those which bound you to your departed friend. I doubt not that your own approving conscience has already amply rewarded you;

for it is in the plan of the Allwise contriver of the world that every sincere act of kindness to a fellow-creature carries with it its own peculiar inimitable joy; but it is also my pleasing right to tell you that your behaviour in this matter has not been unobserved, and that by it you have raised yourself higher in the good opinion of those whose good opinion I believe you are desirous of deserving. May such examples multiply among us! May we have such students as Ombica Charan Ghose! May your conduct, one towards another, be so marked with brotherly love that it shall cease to call for particular notice or special commendation. Let these be the fruits of knowledge, and who shall then venture to say that a blessing is not upon the tree." *

"অম্বিকার ও আমার নাম আমাদের এ অঞ্চলের অনেক কবিতায় গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' নামক কবিতাপুস্তকের একটা লাইনে অম্বিকা উমেশ নাম দুটি পাশাপাশি বসান ছিল।

"যশোহর জেলার চৌগাছায় অম্বিকার বাড়ী ছিল। চৌগাছার ঘোষেদের অনেকেই তখন এখানে থাকিতেন। অম্বিকা ঈশ্বর ঘোষের বাড়ীতে থাকিতেন। ঈশ্বর ঘোষ গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন বাবুর কৃষ্ণনগরের মোক্তার ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে ২৪।২৫ জন লোক দুই বেলা আহার করিত। গোবরডাঙ্গার বাবুদের দেওয়ান ছিলেন—রাধাকৃষ্ণ ঘোষ। কৃষ্ণনগরের সরকারি উকিল ছিলেন—তারিণীপ্রসাদ ঘোষ। তারিণীপ্রসাদ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন; বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন; মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমি আদালতে যাইতাম। তাঁহার পুত্র গিরীন্দ্রপ্রসাদ দুটি শিশু সন্তান রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। সেই দুটি ছেলে, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ, কলিকাতাতে থাকে। অম্বিকার দুইটি সহোদর ও একটি বৈমাত্রেয় ভাই ছিল,—উমাচরণ, কালীচরণ, শ্যামাচরণ।

৺কালীচরণ ঘোষ

উমাচরণ জমিদারি বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন; কালীচরণ প্রথমে ওকালতি করিয়া পরে অনেকদিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন।

"অম্বিকার মৃত্যুর পর তাঁহার দিদি আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন 'অম্বিকা নাই; তুমি এস; তোমাকে দেখিলেই আমি ভাইয়ের শোক ভুলিতে পারিব।' চৌগাছায় গিয়া আমি দিন কতক কাটাইলাম। আর একবার চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেখানে গিয়াছিলাম। কপোতাক্ষীর জল কত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল তাহা তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না। একদিন এপার ওপার সাঁতার দিতেছিলাম; আমার পায়ে শৈবালদাম এমনভাবে জড়াইয়া গেল যে আমার ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা হইল; কালীচরণ একখানা নৌকা আনিয়া আমাকে উঠাইয়া লইলেন। এখন আর সে চৌগাছা নাই। চৌগাছার কথা ভাবিলে একটা বৈষ্ণব গান আমার মনে আসে—

আমি দেখে এলাম শ্যাম,
তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নামটি আছে।

"আমার জীবনের এই সমস্ত পুরাতন কাহিনী দেশের

* মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু তাঁহার কবিতাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধে এই আদর্শ বন্ধুত্বের কথা আলোচনা করিয়া এডুকেশন রিপোর্টের এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

লোককে শুনাইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা হয় না। আমার সমবয়স্ক কেহ বোধ হয় এখন আর জীবিত নাই। আমার মনে হয়, আমি একটা মস্ত anachronism। যে কয়টা দিন বাঁচি, the world forgetting and by the world forgot হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়।

*　　*　　*

"আমার পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, চুণীলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত (বরোদার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের পিতা) ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮৪৮) সীনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। আমার পরবৎসর, ১৮৫০ সালে শ্রীনাথ দাস প্রথম স্থান অধিকার করেন। আমার দু তিন বৎসর পরে দ্বারকানাথ মিত্র ও

৺দ্বারকানাথ মিত্র

পূর্ণচন্দ্র সোম (হুগলি কলেজে ইঁহারা সতীর্থ ছিলেন) উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

"এতদিন জুনিয়র ও সীনিয়র বৃত্তির টাকায় সংসার চালাইতে হইতেছিল; এখন চাকরির অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখনকার Council of Educationএর সেক্রেটরি কাপ্তেন হেস্ (Captain Haes) ১৮৫১ সালে চট্টগ্রামের স্কুলে একশত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষাবিভাগে মদ্যপান অতীব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। চট্টগ্রাম স্কুলের শিক্ষক M'C Carthy সাহেব মদ খাইয়া স্কুলে আসিতেন; বিভাগীয় কমিশনর Sconce সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; M'C Carthy পদচ্যুত হইলেন; আমি তাঁহার পদ অধিকার করিয়া বসিলাম।

"ইংরাজ অধ্যাপকদিগের নৈতিক দৌর্ব্বল্যের একটু কারণ ছিল; তাঁহারা প্রায় সকলেই অবিবাহিত ছিলেন, Nesifield সাহেব বিবাহ করেন—অনেক দিন পরে।

"স্কুল গুলির উপর গভর্মেণ্টের খুব দৃষ্টি ছিল, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সরকারি স্কুলে খুব ধুমধামের সহিত সরস্বতী পূজা হইত; গভর্মেণ্টের কোনও আপত্তি ছিল না। কৃষ্ণনগর কলেজে হইত না বটে, কিন্তু দুর্গাদাস চৌধুরীর মুখে শুনিয়াছি যে, রামপুর বোয়ালিয়ার হেড্ মাষ্টার সারদাচরণ মিত্র, স্কুলের মধ্যেই খুব জাঁকজমক করিয়া সরস্বতী পূজা করিতেন; শেষাশেষি স্থানান্তরে পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"চট্টগ্রামে কয়েক মাস কাজ করিয়া আমি এখানে বদলি হইয়া আসি। কিছু দিন পরে আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। একদিন আমার উপর আদেশ হইল যে, হুগলিতে ভূদেব বাবুর নর্ম্ম্যাল স্কুল পরীক্ষা করিতে হইবে। ভূদেব-

৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাবু ইন্‌স্পেক্টর লজ্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমার স্কুল পরীক্ষা করিবেন?' লজ্ সাহেব বলিলেন 'না; আমি উমেশচন্দ্র দত্তকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ

করিব।' আমি যথারীতি পরীক্ষাব্যাপার সম্পাদিত করিলাম। শুনিলাম যে সেই সময়ে সেখানে Teachership পরীক্ষা হইবে। একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, Sutcliffe সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট্; ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Lodge ও Thwayte সাহেব পরীক্ষক। আমি ভাবিলাম, মন্দ কি? পরীক্ষাটা দেওয়া যাউক। আরও ৫০।৬০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। কাগজে-কলমে ও মৌখিক পরীক্ষার পর আমাকে একটা ক্লাস পড়াইতে দেওয়া হইল। কুড়ি একুশ বছর বয়সের কতকগুলা দুষ্ট ছেলেকে একত্র করিয়া একটা ক্লাস গঠিত করা হইল। ঘরে প্রবেশ করিবার পর তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল; সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিলেন। আমি সাহেবকে বলিলাম—'আপনি কথা কহিলেন কেন? আমাকে নিযুক্ত করিবার সময় গবর্মেণ্ট ত একজন পুলিস সার্জেণ্ট আমাকে দেন নাই; গোলমাল আমাকেই থামাইতে হইবে।' কিছুক্ষণ পরে ক্লাসটা নিস্তব্ধ হইল; আমার অধ্যাপনায় সটক্লিফ-প্রমুখ পরীক্ষকমণ্ডলী খুসী হইলেন।

"হুগলি হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় গিয়া তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন—"তোমার পরীক্ষার ফল কি?" আমি উত্তর করিলাম—"জানি না; তবে, বোধ হইল পরীক্ষকগণ খুসী হইয়াছেন।" তিনি বলিলেন—"তুমি হুগলিতে ফিরিয়া যাও; তোমার পরীক্ষার ফল আমাকে শীঘ্র অবগত করাইবে।" হুগলিতে ইন্‌স্পেক্টর লজ্‌কে সকল কথা বলিয়া আমি দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

"সেই সময়ে ক্লার্মণ্ট্ (Clermont) নামক একজন ইংরাজ শিক্ষক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন; তাঁহার একটু পানদোষ ছিল; প্রায়ই সোমবার দিন যথাসময়ে তাঁহার স্কুলে আসা ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট হইল। তিনি বলিলেন যে, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলে আসিতে পারেন নাই। ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে আদেশ হইল। তাঁহার স্ত্রী ডাক্তার সাহেবকে (Dr. Palmer) সার্টিফিকেটের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। ডাক্তার মিথ্যা সার্টিফিকেট দিতে রাজি হইলেন না। ক্লার্মণ্টের পদাবনতি ঘটিল। ফলে বীটসন্ সাহেব ২০০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকায় উন্নীত হইলেন; আমি বীটসন্ সাহেবের পদে উন্নীত হইলাম।

সমুদ্র দর্শনে

[লেখক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, M.A.]

উত্তাল তরঙ্গ তুলি, মহারোলে অবিরল,
হে জলধি সুবিশাল কেন কর টলমল?
একি গো উন্মাদ নৃত্য, কেন এত আত্মহারা,
ছুটিতেছ মহাবেগে আছাড়ি' হতেছ সারা?
কা'র পদ প্রান্তে আসি, লুটায়ে দিতেছ প্রাণ,
কাহার চরণ চুমি' উল্লাসে তুলিছ তান?
কি উচ্ছ্বাস, কি সাধনা, একাগ্রতা কি যে ঘোর
শতাংশের এক অংশ থাকে যদি তায় মোর,
তা' হলে বিভোর হয়ে, অনন্তের অন্বেষণে
ছুটিতাম অবিরাম, কি উল্লাসে মত্ত মনে।

নয়নের তপ্তবারি সিঞ্চিতাম অবিরাম
আছাড়ি লুটায়ে পড়ি ডাকিতাম প্রাণারাম।
সেই ডাকে, সে ক্রন্দনে, জগৎ গলিয়া যেত,
বিষয় বাসনা ভুলি' অমৃতের স্বাদ পেত।
তখন সকল নর সমস্বরে তুলি তান,
ডুবায়ে সাগর-ধ্বনি গাহিত যে মহাগান,
সে গানে জগৎ-পিতা না পারি থাকিতে স্থির,
নিশ্চয় দিতেন দেখা উজলি হৃদি-মন্দির।
তাই সাধি হে বারিধি, বারেক শিখাও মোরে—
একাগ্র সাধনা তব পাইবারে মন চোরে।

সাহিত্যে জনসাধারণ

[লেখক—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, M. A.]

(বর্ত্তমান রুশ ও বাঙ্গালা সাহিত্য)

রুশ ও জার্ম্মান সাহিত্য

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সাহিত্যজগতে যে যুগান্তর,—যে বাস্তবজীবনে অপ্রীতি, নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা, অতীন্দ্রিয়ের প্রতি ভক্তি আনিয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সমাজকে একই ভাবে আন্দোলিত করে নাই। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই একটা নূতন প্রকার ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে Byron, Shelley প্রভৃতি একটা নূতন জগৎ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার সহিত বাস্তবজীবনের কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। ইংরাজ কবিগণ আপনাদের কল্পনার সংসারে, দৈনন্দিন জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া থাকিলেন; নিজের মনগড়া জগৎ—একটা Utopia—সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। জার্ম্মান সাহিত্যে Romanticismএর সহিত বাস্তবজীবনের একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। Goethe ও Schiller শেষবয়সে যে Classicismএর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তাহার প্রতিরোধ হইল। জার্ম্মানীতে Weimarism সমগ্র সাহিত্যকে গ্রাস করিতে পারে নাই; বরং বিপরীত দিকেই স্রোত ফিরিল। এক্ষণে জার্ম্মান সাহিত্যে ভাবুকতার চরম আছে; কিন্তু সে ভাবুকতা সমাজ-বিমুখ নহে,—জাতির দৈনন্দিন অভাবনিচয়, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, সে ভাবুকতা যথোচিত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। এ কারণে জার্ম্মান-সাহিত্য জাতীয়-জীবনকে এমন সুন্দরভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইংরাজী সাহিত্য তাহা করিতে পারে নাই।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সাহিত্যে যে ভাবুকতা আনিয়াছিল, তাহা বাস্তবজীবনের কাজে অতি সুন্দরভাবে লাগিয়াছে; তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, আধুনিক রুশ-সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হইতে পাওয়া যায়। জার্ম্মান সাহিত্য ৪০ বৎসর মধ্যে হঠাৎ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথমে -অশান্তি ও বিপ্লববাদ,—বর্ত্তমানের সমস্ত অসম্পূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়তঃ—আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ, আত্মকেন্দ্রতা, এবং অবশেষে আত্মসর্ব্বস্বতা, আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যমিথ্যা, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য, ভালমন্দ বিচার করা—বর্ত্তমান সমাজের সমস্ত মাপকাটি পরিত্যাগ করিয়া একটা Utopia সৃষ্টি করা। তৃতীয়তঃ—একটা অলীক ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ভাব-জগতের সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা, ভাবুকতাকে বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ফরাসী-বিপ্লবের পর ইউরোপ প্রত্যেক দেশেরই সাহিত্যে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। জার্ম্মান-সাহিত্যে এই উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে লক্ষিত হয়। Herder ও Burger এর সাহিত্যে, Goethe র Werther ও Schiller র Robbersএ, Sturm und drung এর সাহিত্যে, আমরা অশান্তি ও বিপ্লববাদ, আত্মচিন্তা ও আত্মকেন্দ্রতার পরিচয় পাই; শেষে Goethe ও Schiller এর শেষবয়সের কাব্যনাট্যে Novalis ও Eichen-droff, Richter ও Heineএর সাহিত্যে আমরা ভাবুকতার চরম দেখিতে পাই; অথচ সেই ভাবুকতা সমাজ-বিমুখ নহে, বরং বর্ত্তমান বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের দৈন্য-নিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। কিন্তু এই উন্নতির সময় লাগিয়াছিল—মাত্র চল্লিশ বৎসর।

আমরা রুশ-সাহিত্যকে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে দেখিব,—ঐ তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে দেখিব; কিন্তু জার্ম্মান-সাহিত্যকে এক পুরুষেই যেমন উচ্চতম সোপান অতিক্রম করিতেছে দেখিতে পাই, রুশ-সাহিত্যকে তাহা দেখি না। রুশ-সাহিত্য ধীরপাদক্ষেপে উন্নতিলাভ

করিয়াছে,—প্রায় ৭৫ বৎসর ব্যাপিয়া এই ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং উন্নতির স্তরগুলি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যের প্রথম যুগ— অশান্তি ও বিপ্লববাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশিয়ায় Catherineএর Courtierগণের মধ্যে সাহিত্যালোচনা আবদ্ধ ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের আদর্শই রুশ-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। Voltaire তখন সাহিত্য-জগতে একচ্ছত্র নরপতি; সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া তাঁহার রাজত্ব ছিল। রুশ-সাহিত্যও Voltaireকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর যখন Alexander I সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন রুশিয়ায় নবজীবনের সূচনা হইল। ঐতিহাসিক Karamsin এক বিপুল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়া Alexander Iকে উপহার দিলেন। রুশিয়ায় জাতীয়তার সেই সূত্রপাত হইল। Karamsin রুশিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া রুশ-সমাজে জাতীয়তার স্রোত প্রবাহিত করিলেন। সেই স্রোতই শেষে Muscovite, Panslavistগণ দ্রুতগতিতে সমগ্র রুশ-সমাজে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। আর এক দিক হইতে ফরাসী-আদর্শের গৌরব ক্ষীণ হইতে লাগিল। Jonkovsky রুশ সাহিত্যে Goethe ও Schiller এর আদর্শ আনিলেন। Pushkin ও Lermentoff, Byron-এর আদর্শ সাহিত্যে প্রচার করিলেন।

Voltaireএর সাহিত্যের—ফরাসী সাহিত্যের Classicismএর—অনুকরণের স্রোত হইতে ইঁহারা রুশ-সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। বিশেষতঃ Pushkin রুশ লিখিত-ভাষাকে মার্জ্জিত করিলেন, একটা নূতন রচনা-প্রণালীর সৃষ্টি করিলেন; তবুও তাঁহার সাহিত্য বিদেশী ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিল। Pushkinএর মত, Lementoffও Childe Haroldএর আদর্শে তাঁহার কবিতা ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। Byronএর বিপ্লববাদ, অশান্তি, বর্ত্তমানের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার আকাঙ্ক্ষা, একটা অসহ্য যন্ত্রণাবেদনার অনুভূতি Pushkin অপেক্ষা Lementoffএ অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। Lementoffএর A hero of our time উপন্যাসে আমরা Byron এর আবেগ, জ্বালা, ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, প্রণয়ের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা পাই, সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাই, প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ সুন্দর ভাবে পাই।

Pushkin ও Lementoff সাহিত্যে যে স্রোত আনিয়াছিলেন, রুশিয়ার অনেক সাহিত্যিকই সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। আমরা রুশ সাহিত্যে Romanticismএর প্রথম সোপান দেখিলাম। অশান্তি, ব্যাকুলতা, সমাজের বন্ধন ছিঁড়িবার আকাঙ্ক্ষা,—বিপ্লববাদের চরম পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সোপানের আত্মকেন্দ্রতা, আত্মসর্ব্বস্বতাও পাইলাম। সাহিত্য—সমাজের দোষগুলি প্রকাশ করিয়া—একটা গভীর নিরাশা, একটা তীব্র যাতনা আনিয়াছিল; নবজীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক সমাজ যে বেদনা ও অশান্তি, যে Sturm und drung অনুভব করে, তাহা রুশিয়ার সমাজ অনুভব করিল।

ব্লায়েনস্কি-প্রবর্ত্তিত নব্যসাহিত্য

তাহার পর সাহিত্যকেন্দ্রের একজন নবীন ও জ্ঞানী সমালোচক আবির্ভূত হইলেন। তিনিই রুশ-সাহিত্যের ভবিষ্যগতি নির্ণয় করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, উদ্দাম ভাবুকতা, চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতার আর প্রয়োজন নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন সমাজের উন্নতির অন্তরায় হইতেছে। এখন সমাজ, সাহিত্যের নিকট আরও বেশী কিছু দাবী করিতেছে। লোকে এখন কাব্য বুঝিতেছে না, অথবা কাব্য চাহিতেছে না। এখন নূতন প্রকার কিছু চাই; ভাবজগতের সৌন্দর্য্য, সমাজের পিপাসা মিটাইতে পারিতেছে না। তিনি প্রচার করিলেন, এখন সাহিত্যে আর "কাব্যির" আবশ্যক নাই। এখন চাই, সাহিত্য শুধু মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ অভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করুক; যে সব মানুষ এ জগতের বাহিরে, তাহাদের ভাব ও চিন্তা লইয়া একটা অলীক জগৎ সৃষ্টিকরার প্রয়োজন নাই। বাস্তবজীবনে মনুষ্যের বৃত্তি ও অভাবনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সাহিত্যে যে একটা মিথ্যা ও অলীক ভাবুকতা প্রশ্রয় পাইতেছিল, তাহা দূর হইবে; সাহিত্য তখন সবল, সতেজ হইবে,—

সাহিত্যের স্নায়ুদুর্ব্বলতা দূর হইবে। সাহিত্য তখন সমাজ হইতে জীবনীশক্তি লাভ করিবে, সমাজকেও নূতন জীবন দান করিতে পারিবে।

সমালোচক Blienski একটা নূতন প্রকার সাহিত্য চাহিয়াছিলেন। সাহিত্যে তিনি এক নূতন সুরের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণকে তিনি এক নূতন কর্ত্তব্যের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

তাঁহার আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। Lementoff যখন তাঁহার শেষকবিতাগুলি প্রকাশিত করিলেন, Gogol তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। সমালোচক Blienskiর তীক্ষ্ণদৃষ্টি Gogolএর প্রতিভা বুঝিতে পারিয়াছিল। Blienski কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া Gogol দৈনন্দিন জীবন —বিশেষতঃ দরিদ্রজীবন—সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন; সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। Blienskiর আশা পূর্ণ হইল। Blienski তখনকার রুশ-সাহিত্যের কি প্রয়োজন, তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি সমালোচক ছিলেন মাত্র, কবি বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না; কিন্তু তিনি রুশ-সাহিত্য-জগতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে রুশ-সাহিত্য নবজীবন লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান রুশসাহিত্যে দ্বিতীয় যুগ

Romanticismএর ফলে যে ভাবুকতা সাহিত্যকে মহুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা এতকাল পরে বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাস্তব ও অতীন্দ্রিয়,—Realism ও Romanceএর সমন্বয় সাধিত হইল। Romanticism সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের যাহাকে তৃতীয় স্তর বলিয়াছিলাম, রুশ-সাহিত্য Gogolএর উপন্যাস প্রকাশের সহিত সেই স্তরে উপস্থিত হইল; সাহিত্যের ভাবুকতা সমাজের প্রাণসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল।

Gogolএর উপন্যাস সমূহে, The Mantle, Dead Souls প্রভৃতিতে এবং তাঁহার প্রহসন The Inspectorএ রুশিয়াবাসী তাহার নিজের চিত্র দেখিতে পাইল,—সে দেখিল, শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার ও নির্যাতন, তাহাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা, কেরাণী-চাকুরেদিগের অজ্ঞতা ও ঘুস লইবার প্রবৃত্তি; আর দেখিল, অসংখ্য Serfদিগের অসহায় নিরুপায় অবস্থা,—তাহাদের দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা ও ক্লেশ। রুশ-সমাজ Gogolএর সাহিত্যে নিজের চিত্র স্পষ্ট ভাবে দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল,—"My countrymen looked at my play in terror." Gogolএর কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল; মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদিগের তিনি অসংখ্য চিত্র আঁকিয়া-ছিলেন, এবং সব চিত্রে তিনি একটা জীবনী-শক্তি দান করিতে পারিয়াছিলেন। দীনদরিদ্র নির্যাতিতদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতি বিশেষ লক্ষিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "The national characteristic of the Russian is his pity for the fallen." তাঁহার উপন্যাসেও তাঁহার ঐ গুণই বিশেষ প্রকাশিত হয়, এবং এই গুণের দ্বারাই তিনি যাহারা সমাজে নগণ্য, সমাজে যাহাদের কোন স্থান বা অধিকার নাই, তাহাদিগকে অত্যুজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; দারিদ্র্যের মধ্যে চারিত্র্য-মাহাত্ম্য, অপমান-লাঞ্ছনার মধ্যে সম্মানার্হ গুণসমূহের বিকাশ—দেখাইয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It is my peculiar power to display the triviality of life, to share all the dullness of the mediocre type of man, to make perceptible the infinitely unimportant class of persons who could otherwise not be seen at all. That is my special gift". এই সব গুণ তাঁহার ছিল বলিয়া রুশিয়ায় তাঁহার এরূপ প্রভাব। একজন অনুবর্ত্তী ঔপন্যাসিক লিখিয়াছিলেন, "We have all come forth from the mantle of Gogol." বাস্তবিক Gogolএর অঙ্কিত চরিত্রগুলি সাহিত্যজগতে কেন—সমগ্রসমাজেই চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। Gogolএর Ichitchkoff মৃত Serfগণকে ক্রয় করিয়া registerএ তাহাদের নাম লিখিয়া তাহাদের স্বত্বে যে টাকা ধার করিতেছে,—সে কথা রুশ এখনও ভুলিতে পারে নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সমালোচক Blienski প্রচার করিয়া ছিলেন, রুশ-সাহিত্যে Romanticismএর দিন গিয়াছে; এখন সাহিত্যে অলীক ভাবুকতার প্রয়োজন নাই,—বাস্তব-জীবনের ভিত্তির উপর সাহিত্যের গোড়াপত্তন করিতে হইবে; এবং তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, রুশিয়ায় যে নূতন সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, তাহা জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ, সুখদুঃখ,

তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ হইতেই জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিবে—"The elements of a new art shall be found in the life of the masses." তাহাই হইলে। Blienski পথপ্রদর্শক; Gogol ঐ নূতন পথের প্রথম পথিক। রুশ-সাহিত্য ঐ পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পথের ধারে পতিত পদদলিত নির্যাতিত দীনদরিদ্রকে সাহিত্য আপনার কোমল ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় বিপ্লবপন্থী ও সমাজ-তন্ত্রবাদীদের আন্দোলন সম্রাট্ Nicholasএর কঠোর শাসনে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক আলোচনা-দর্শন বা সংবাদপত্রে প্রকাশ সবই অসম্ভব হইল। তখন হইতে রুশ-সাহিত্যের সমস্ত শক্তি উপন্যাসেই প্রয়োজিত হইতে লাগিল। উপন্যাস একই সঙ্গে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার কাজ করিতে লাগিল, রুশিয়ার সমগ্র জাতীয় শক্তি ও সাধনা উপন্যাসের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাহিত্যের অন্য অঙ্গগুলি রাষ্ট্রের শাসনে অবশ হইয়া পড়িল। সমস্তশক্তি এক সঙ্গেই পুঞ্জীভূত হইল, তাই তাহা অত সতেজ, সবল হইল। শিক্ষিত রুশের সমস্ত প্রতিভা আসিয়া রুশ-উপন্যাসকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিল।

এ কথা ভুলিয়া যাইলে, আমরা রুশ-জাতীয়-জীবনের উপর রুশ-উপন্যাসের প্রভাবের কারণ কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। এ কথা না জানিলে, রুশ-উপন্যাসের সমাজ-গঠন শক্তি আমরা কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিব না।

যাহা হউক Blienski যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, Gogol যে পথে চলিয়াছিলেন,—পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণ সেই পথই অনুসরণ করিলেন।

আমরা এইবার ইঁহাদিগের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

Gogolএর অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, Turgenieff. তাঁহার প্রথম পুস্তক, "Sportsman's Sketches" ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের পরই প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে রুশিয়ার প্রধান সমস্যা Serfদিগকে স্বাধীনতা-দান। Turgenieff তাঁহার ছোট ছোট কৃষকজীবনের চিত্র আঁকিয়া রুশ কৃষকের অবস্থা দেখাইলেন;—Serfগণের দারিদ্র্য, তাহাদের অসহায় অবস্থা, তাহাদের হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার সমাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। Serfগণের নিরাশা, তাহাদের অন্তঃকরণের হীনতা ও পশুভাবের কারণও, তিনি ইঙ্গিত করিলেন। সমগ্র রুশিয়া Turgenieffএর চিত্রে তাহার দাসত্ব ও দাসসুলভ দুর্ব্বলতা দেখিয়া ভয় পাইল; ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল;—Turgenieff এক মুহূর্ত্তেই প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপন্যাস লেখা সার্থক হইল। রুশ-সমাজ দাসগণকে স্বাধীনতা-দান করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। Turgenieffএর পূর্ব্বে সমালোচক Blienski এবং Griboedoff ও Grigovovich প্রভৃতি লেখক দাসদিগকে স্বাধীনতাদানের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু Turgenieffএর লেখনীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে সমাজের কর্ত্তব্যনির্ণয় করিয়া দিয়াছিল।

ইউরোপে তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলি খুব বিখ্যাত হইয়াছিল। M. Taine তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'No one, since the Greeks, had cut a literary cameo in such bold relief, and in such rigourous perfection of form'. তাঁহার মৃত্যুর পর, ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Atheneum পত্রে তাঁহার পুস্তকগুলি সমালোচনার সময়ে লিখিত হইয়াছিল, "Europe has been unanimous in according to Turgenieff, the first rank in contemporary literature."

কিন্তু নিজের দেশে শেষবয়সে Turgenieff সম্মান হারাইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া, দেশের লোককে অগ্রাহ্য করিলেন, রুশ তাহা ভাবিল। তিনি ফরাসী রচনা প্রণালীর আদর্শ সাহিত্যে অনুকরণ করিলেন, ফ্রান্সে বহুকাল বাস করিলেন, স্বদেশকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন,—রুশ ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার উপন্যাসে রুশ-স্বদেশ-প্রীতিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, রুশ তাহা ভুলে নাই। Turgenieff যে নিজে একজন স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু তিনি যখন স্বদেশভক্তের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন,—স্বদেশভক্ত বিপদে পড়িলে একবারে ভীরু হইয়া দাঁড়ায়, অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অলস হইয়া পড়ে,—যখন তিনি দেখাইলেন, স্বদেশভক্তের বিষয়বুদ্ধির

অত্যন্ত অভাব,—তখন রুশজাতি, Turgenieff যে তাঁহার দোষ-সংশোধন করিতে চাহিতেছেন, তাহা না বুঝিয়া, তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী ভাবিল। রুশের পক্ষে Turgenieffএর একটী দোষ ছিল, যাহা একবারেই অমার্জ্জনীয়।

স্লাভোফাইলগণের আন্দোলন

রুশে তখন একদল সাহিত্যিক জাতীয়তার পুষ্টি-সাধন করিতেছিলেন। তাঁহাদের দলের নাম, Slavophiles. Turgenieff সে দলভুক্ত ছিলেন না বরং ঐ দলকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। তিনি ঐ সাহিত্যিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "the Russia-leather school of literature."—তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতিকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—"In Russia two and two make four, and make four with greater boldness than elsewhere."—এ অপমান রুশগণ সহ্য করিতে পারে নাই; তাই তিনি যখন মাঝে মাঝে St. Petersburg অথবা Moscow যাইতেন, তখন সেখানকার যুবকসম্প্রদায় তাঁহাকে পূর্ব্বের মত অভ্যর্থনা করিত না। ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যৌবনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইত; বৃদ্ধবয়সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিকগণ Tolstoi ও Dostoievsky একচেটিয়া সম্মান লাভ করিতেছেন;—ইহা সহিতে না পারিয়া, তিনি শেষজীবন Parisএ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অদৃষ্টক্রমে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি Despair নামে একখানি পুস্তক রচনা করিতেছিলেন;—তাহাতেই তাঁহার রুশ-চরিত্র সম্বন্ধে শেষকথা লিখিত হইল।

রুশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, জাতীয়তার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিলেন না বলিয়া, রুশজাতি তাঁহাকে শেষবয়সে সম্মান করিল না।

স্লাভোফাইলগণের জাতীয় সাহিত্য

আমরা রুশিয়ার এই নবজাগ্রত জাতীয়সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যখন নেপোলিয়ানের সমগ্র ইউরোপব্যাপী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইল, তখনই ইউরোপে জাতীয়তার অভ্যুত্থান। প্রত্যেক দেশই তখন তাহার নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিল,—তাহার অতীত ইতিহাসকে বিভিন্ন চক্ষে অত্যুজ্জ্বল রঙ্গীণ করিয়া দেখিতে লাগিল,—তাহার রীতিনীতি আচারব্যবহার পূজা করিতে লাগিল। লোকসাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতির সঙ্কলন আরম্ভ হইল। সমাজের সমস্ত অঙ্গের ভিতরই জাতীয়তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় শিল্পব্যবসায়, জাতীয় আচারপদ্ধতি তখন হইতে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। স্বদেশপ্রেমে প্রত্যেক সমাজ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

ইউরোপে যে জাতীয়তার স্রোত বহিতেছিল, তাহা Slavophileগণ রুশসমাজে আনয়ন করিলেন। Slavophileগণের মধ্যে সকলেই জার্ম্মানীর জাতীয়তার আন্দোলন-প্রসূত Hegelএর বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাস দর্শন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। Hegel বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রত্যেক জাতি এক এক যুগে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপেই বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানব ভগবানের বিভিন্নরূপ উপলব্ধি করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে। এক যুগে যখন কোন জাতি Weltgeistকে আপনার বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তখন বিশ্বজগতে সেইই ত ভাগ্যবান, তখন জগতের সেই যুগে অন্য সমস্ত জাতির পক্ষে তাহাকে অনুকরণ করা ভিন্ন অপর কোন কর্ত্তব্য নাই। জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া Hegel তাঁহার এই তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচ্যজগতে Babylonia, Persia প্রভৃতি সাম্রাজ্য সর্ব্বপ্রথম Weltgeist উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর Greece; তাহার পর Rome; সব শেষ টিউটন্—জার্ম্মান জাতি। Hegel ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন নাই;—Weltgeistএর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্ব্বশেষ অভিব্যক্তি হইয়াছে, টিউটন্ জার্ম্মান জাতির সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে। রুশিয়ার Slavophileগণ Hegel-এর সমস্তই গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহারা এক বিষয়ে Hegelকে অত্যন্ত অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেন। Hegel-এর ইতিহাস-বিজ্ঞানে Slavজাতির নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই। Slavজাতির কি পৃথিবীকে কিছু দিবার নাই? Slavজাতি কি বিশ্বমানবের নিকট চিরকালই ঋণী হইয়া থাকিবে? বিশ্বমানবের জন্য Slavজাতি কখনো কি কোন মহা সত্য আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে পারিবে না?—এই সকল প্রশ্ন তাহাদের মনে স্বতঃই উপস্থিত হইল। উত্তরও সঙ্গে

সঙ্গে হইল,—কি, যে Slavজাতি তুরস্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছে এবং Byzantine সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছে, তাহার জীবন কি বৃথায় যাইবে? যে Slavজাতি নেপোলিয়নের পদদলিত ইউরোপকে স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিয়াছে,—এক সময়ে সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে,—তাহার জন্ম কথনও ব্যর্থ হইবে না। Karamsin ত ঠিকই বলিয়াছিলেন, "Henceforth Clio must be silent, or accord to Russia a prominent place in the history of nations."—ভবিষ্যতে রুশিয়াই ইতিহাস গঠন করিবে;—সে কিনা টিউটন্-জার্ম্মান জাতিকে অনুকরণ করিয়া, আপনার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিবে? Slavophileগণ বলিল,—তাহা নহে,—সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহারা গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, তাহা নহে,—অমনি রুশ-সমাজের অন্তঃস্থল হইতে প্রতিধ্বনি শুনা গেল, তাহা নহে। Slavophileগণ সমাজকে আশার কথা শুনাইল, বিশ্ব-জগতে আশার বাণী প্রচার করিল। রুশিয়া বিশ্বজগতে একটি শ্রেষ্ঠদান উপহার দিবে।

Slavophileগণ বলিল—ইউরোপীয় সমাজ, ব্যক্তির প্রভাবকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছে, ব্যক্তির বিচারকে অত্যধিক সম্মান করিয়াছে। তাহার ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের গোড়াপত্তন পর্য্যন্ত ব্যক্তির তাড়নায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ইউরোপ ও প্রতীচ্য ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু প্রতীচ্য ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত সাধনা, চার্চ্চের বিধি-বিধান অপেক্ষা উচ্চ অধিকার পাইয়াছে। তাহার ফলে Roman Catholicism, ও Protestantism; এবং the protest of Protestantism and the dessent of Dissent. কূট বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরের ফলে পাশ্চাত্য ইউরোপে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক বিবাদ-আন্দোলন, ধর্ম্মে অনাস্থা ও ভগবানে অবিশ্বাস। প্রতীচ্য ইউরোপ—Romeএর নিকট হইতে নহে—Byzantium হইতে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল; তাই সে খৃষ্টধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তাহার ধর্ম্মজীবনে, একদিকে পোপের অত্যাচার ও অপর দিকে Protestantদিগের চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতার দোষ প্রবেশ করে নাই। প্রাচ্য ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম যে ভাবে পালন করিতে পারিয়াছে, প্রতীচ্য ইউরোপ তাহা করিতে পারে নাই। প্রতীচ্য ইউরোপ সুখসম্পদকেই তাহার ঈশ্বররূপে বরণ করিয়াছে; ভোগলালসা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়াছে, সমাজের দীনদরিদ্রদুঃখীকে নির্য্যাতিত করিয়াছে,—প্রাচ্য ইউরোপ তাহা করে নাই। প্রাচ্য ইউরোপ যিশুখৃষ্টের সেবাব্রতের মহিমা এখনও ভুলে নাই, প্রেম মৈত্রী ও করুণা, ভগবানে অটল বিশ্বাস, ভগবানের উপর অটল নির্ভরতা, আত্মসংযম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা—এই সকল শ্রেষ্ঠগুণ প্রাচ্য ইউরোপেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। খৃষ্ট যাহা বলিয়াছিলেন,—যাহা তাঁহার জীবনে দেখাইয়াছিলেন,—তাহা প্রাচ্য ইউরোপ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে।

Dostoievsky প্রচার করিয়াছেন, রুশিয়ার খৃষ্ট ধর্ম্ম আসল Byzantineএ প্রচারিত খৃষ্ট ধর্ম্ম, তাই তাহা এত বিশুদ্ধ। Moscowর St. Basil গির্জ্জা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। Napoleon ঐ গির্জ্জাকে মুসলমানের মসজিদ বলিয়াছেন; তাহা নহে, এ গির্জ্জা ইউরোপের গির্জ্জার মতন না হইলেও, এই গির্জ্জাতেই খৃষ্টের অধিষ্ঠান, দীনহীনের খৃষ্ট, পাপীতাপীর খৃষ্ট, পতিতপাবন খৃষ্টের সেই খানেই অধিষ্ঠান।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া রুশ এখন আপনাকে হীন নগণ্য মনে করিতেছে। তাই ধনিগণ—শিক্ষিতগণ বিদেশকে অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, তাই তাঁহারা স্বদেশী ভাষা ত্যাগ করিয়া ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। তাই Pushkin নির্লজ্জভাবে বলিয়াছেন, আমার মাতৃভাষা অপেক্ষা আমি ইউরোপের ভাষা, ফরাসী ভাল, শিখিয়াছি। তাই বিদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহারে, শিক্ষিত রুশিয়ার এত আদর। Slavophileগণ পরানুবাদ ও পরানুকরণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। পরানুকরণকে তাহারা "Monkeyism," "Parrotism" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা বিদেশী শিক্ষা পাইয়া দেশের সভ্যতাকে আদর করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে "Clever apes who feed on foreign intelligence." "Sauntered Europe round, and gathered every vice in every ground" বলিয়া তিরস্কার করিলেন।

Slavophileগণ রুশের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইলেন। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশের দর্শনবিজ্ঞান পাঠ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশকে অন্ধ ও মূঢ় ভাবে অনুকরণ করিবার জন্য তাহারা পাগল হইয়াছে; তাহারা তোতাপাখীর মত বিদেশের বুলি আওড়াইতেছে, বাঁদরের মত পরের পোষাকপরিচ্ছদে আমোদ বোধ করিতেছে; ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে; কিন্তু এখনও জনসাধারণ—রুশিয়ার কৃষকগণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাওয়া যাইবে।

অসংখ্য রুশ-কৃষক—বহুশতাব্দী ধরিয়া আত্ম-অবমান সহ্য করিয়াছে, দাসত্ব-শৃঙ্খলের গুরুভারে তাহাদের আত্মা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তবুত তাহাদেরই মধ্যে প্রকৃত রুশ মনুষ্যত্ব এখনও জাগ্রত রহিয়াছে, ধনিগণের প্রাসাদে বিলাসমণ্ডপে নহে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের পাঠাগার আলোচনার বৈঠকে নহে, কৃষকের জীর্ণ কুটিরেই রুশ-মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে,—"the living legacy of antiquity"র কৃষকই উত্তরাধিকারী—Slavophile-গণ এই কথা প্রচার করিলেন। Slavophile কবি ও দার্শনিক Khomiakof একটা সুন্দর তুলনা দিয়াছেন। বহুশতাব্দী ধরিয়া রুশ-সমাজের অন্তরস্থলের ভিতর দিয়া ফল্গুনদীর মত একটা সাধনার ধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা এখনও সতেজ সজীব রহিয়াছে, নানা দিক হইতে এখন যে পঙ্কিল স্রোত সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাই-তেছে, তাহা কখনই সেই জাতীয় সাধনার ধারার স্বচ্ছতা নষ্ট করিতে পারিবে না। কৃষক-জীবনের ভিতর দিয়া সেই "clear spring welling up living waters hidden and unknown but powerful" স্রোতোধারা অবশেষে বিদেশী-সভ্যতার পঙ্কিল স্রোত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, এবং আপনার স্বচ্ছ শীতল ধারায় সমগ্র সমাজকে প্লাবিত করিয়া দিবে।

রুশিয়ার কৃষক-সমাজ এখনও পরানুবাদ—পরানুকরণ শেখে নাই; রুশ কৃষক-সমাজে এখনও মনুষ্যত্ব জাগ্রত রহিয়াছে। শিক্ষিতসম্প্রদায় যে বিদেশী সভ্যতার মোহে পড়িয়া আপনার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। শিক্ষিতসম্প্রদায় ও কৃষক-সমাজের মধ্যে এক্ষণে একটা খুব বেশী ব্যবধান দেখা গিয়াছে, সে ব্যবধান দূর করিতে হইবে।

Slavophileগণ কৃষক-সমাজের চরিত্র, তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতির, প্রতি সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কৃষকগণের প্রকৃত মহত্বের প্রতি সমগ্র সমাজের শ্রদ্ধা জাগাইতে লাগিলেন; শিক্ষিত বংশের নিকট জাতীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার মোহ হইতে উহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; শিক্ষিত-রুশ অশিক্ষিত-রুশের নিকট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিয়া এক জাতীয় শক্তি, জাতীয় চরিত্র ও মনুষ্যত্বের পুষ্টি সাধন করিবে, ইহাই Slavophileগণের আশা।

আর এই আশা পূর্ণ না হইলে, বিশ্বসংসারে রুশের জাতীয় জীবন ব্যর্থ হইবে। Hegel যে বলিয়াছেন জগতে টিউটন্-জার্ম্মান জাতির জীবনে Weltgeistএর পূর্ণ-অভিব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য ইউরোপে এক্ষণে ব্যক্তির প্রভাবের কুফলে সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব আসিয়াছে; পাশ্চাত্য-সমাজ এখন ধ্বংসোন্মুখ। "Western Europe is on the high road to ruin"—তাই রুশ জাতি এখন একটা মহৎ কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য ব্রতী হউক,—"We have a great mission to fulfil." একজন Slavophile রুশকে এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য এইরূপে আশার বাণী প্রচার করিলেন—"Our name is already inserted on the tablets of victory, and now we have to inscribe our spirit in the history of the human mind. A higher kind of victory—the victory of Science, Art, and Faith—awaits us on the ruins of tottering Europe."

'আমরা জয়ী হইবই হইব; বিশ্বমানবের ইতিহাসে আমাদের এই জয়ের বিধান পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; ইউরোপ ধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু রুশিয়ায় নবজীবনের সূচনা হইয়াছে। Slav জাতি বিশ্বমানবকে নূতন বিজ্ঞান, নূতন বিশ্বাসের কথা শুনাইবে।'

আমার একটু বিস্তৃত ভাবে Slavophileগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কারণ এই যে—

আমাদের দেশেও এক্ষণে একদল ভাবুক ও লেখক, ঠিক Slavophileগণেরই আদর্শ লইয়া, সমাজকে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিতেছেন। বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দুসমাজ একটা নূতন আদর্শ দান করিবে এবং যতদিন সেই দান সে না দিতে পারে, তত দিনই হিন্দুজীবন যে ব্যর্থ যাইবে, এ কথা অনেকে প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বমানবকে একটা মহাপ্রাণ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া আপনার জাতীয় জীবন সার্থক করিবে,—ইহা হিন্দুর আশা বা আকাঙ্ক্ষামাত্র নহে, ইহা তাহার একটা বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে। সে ধারণা হইতে তাহাকে কেহই টলাইতে পারিবে না,—সে ধারণা যাইলে সে মনে করে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য জগতে ধনী ও অসংখ্য শ্রমজীবীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের ফলে সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব দেখা গিয়াছে,—পাশ্চাত্যজগতে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে,ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনৈক্য এবং অনৈক্যের নির্য্যাতনে সমাজ বিধ্বস্ত হইতেছে, ব্যক্তিপূজার পরিণাম,—সমাজদ্রোহিতা—সূচিত হইয়াছে।—শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে, পাশ্চাত্য জগতে জাতিতে জাতিতে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ চলিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা -সকলেই যেন একটা অনন্ত বেদনা ও মহাপ্রলয়ে সমাপ্ত হইতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা,এই অশান্তি এই সংঘর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ—পাশ্চাত্য সমাজে একটা নূতন বাণী প্রচার করিবে, ইহাই ত বর্ত্তমান ভারতের ধারণা। ভারতবর্ষ—পাশ্চাত্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিবে,—অহিংসা-মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধিয়া দিবে। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য-সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনী নির্ধন, বেকার শ্রমজীবী—সকল ব্যক্তিকেই প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষান্ত করিবে; প্রত্যেকে আপনার Rights—সমাজের নিকট হইতে আপনার দাবী—পূরামাত্রায় আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, যাহাতে সমাজের নিকট আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহার জন্য একটা নূতন কর্ত্তব্য-বোধ জাগাইয়া দিবে। হিন্দু-সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ ছিল, তাহাই পাশ্চাত্য-সমাজের অশান্তি দূর করিবে; আধুনিক Socialism তাহা কখনই করিতে পারিবে না।

বিশ্বজগৎকে শান্তিদান বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া, বর্ত্তমান-ভারত পাশ্চাত্য-সমাজের ভোগ-প্রসূত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম প্রসূত অকল্যাণ দূর করিবে।

এই সমস্ত ধারণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কতিপয় ভাবুক, হিন্দুসমাজকে বিশ্বমানবের নিকট আপনার মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। Slavophileগণের সংখ্যা যেমন খুব কম ছিল, ইঁহাদিগের সংখ্যাও তেমনই খুব কম; কিন্তু তাহা হইলেও, ইঁহারা সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সমগ্র সমাজ ইঁহাদিগের চিন্তার ও চরিত্রের প্রভাবে বিশ্বসভ্যতায় আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দুর প্রকৃত মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইতেছে; এবং জনসাধারণ কৃষক-সমাজের মধ্যেই হিন্দুর মহাপ্রাণ সুপ্ত রহিয়াছে;—এবং উহাকে জাগ্রত করিতে হইবে, ইহাও তাঁহারা বলিতেছেন। তাহার ফলে, আধুনিক ভারতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, পল্লীসেবা, পল্লীসংস্কার, বন্যা-দুর্ভিক্ষসময়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল উদ্যোগ, ও পরিশ্রম।

কিন্তু সাহিত্য-জগতে Slavophileগণ যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ কিছুই এ দেশের ভাবুকগণ করিতে পারেন নাই। আমাদের ভাবুকগণের চিন্তা ও কর্ম্ম জনসমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমরা পূর্ব্বেই রুশিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক Blienskiর মতামত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছি। রুশিয়ায় Byron, Goethe ও Schillerএর প্রভাবে তখন যে সাহিত্যে একটা কৃত্রিম ভাবরাজ্যের পুষ্টি-সাধন হইতেছিল, সমাজের দৈনন্দিন সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগ হইতে দূরে সরিয়া সাহিত্য আপনার সৃষ্ট কৃত্রিমতায় আপনিই পঙ্গু হইতেছিল, তাহা হইতে Blienski সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Blienskiর প্রভাবে রুশ-সাহিত্য কৃষক-সমাজের সুখদুঃখের কাহিনীতে নূতন প্রাণ পাইল। Blienskiর সমালোচনার ফলে, Gogol-Turgenieffএর সাহিত্য,—রুশ-সমাজের সাহিত্য,—রুশ সাহিত্যের বিয়োগ-নিবারণ,—সমাজ ও সাহিত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ-স্থাপন।

Slavophileগণের পক্ষে Blienskiর সমালোচনা অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। Blienski প্রচার করিতেছিলেন, সাহিত্য চন্দ্রকিরণ, পরীর রাজ্য, স্বর্গের পারিজাত, নন্দনকানন ছাড়িয়া এখন বাস্তবতায় নামিয়া আসুক, কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনীতে সাহিত্য নবজীবন লাভ করিবে। Slavophileগণ প্রচার করিতেছিলেন, কৃষকের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাওয়া যাইবে; ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে। Slavophileগণ সমাজে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহার সহায় হউক—জনসমাজকে সাহিত্যের কেন্দ্র করিবার Blienskiর আশা,এবং Gogol ও Turgenieffএর আয়োজন। ফলে Slavophileগণের—Blienskiর উপদেশ সার্থক হইল। মহনীয় ভাবগুলি সাহিত্যের ভিতর দিয়া অচিরেই প্রচারিত হইয়া সমাজে যুগান্তর আনিল,—সাহিত্যও তখন নূতন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গয়া

[সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত]

পুরাণে—ভারতে—শতেক গ্রন্থে—শতেক ছন্দে পূজিত নিত্য,
শৈল-সরণি হিঙ্গীরে বাঁধা পিতৃলোকের তৃপ্তি তীর্থ,
বিষ্ণুচরণ কিণ-গরিষ্ঠ ঋষ্টিনাশন যাহার দর্প,
প্রতি রেণু যার পুণ্যপৃক্ত স্বস্তিকসম পূতস্পর্শ,
এই সেই গয়া, যথা নারায়ণ-চরণ-কাঙালী অসুর ভক্তে—
দিয়া অমূল্য পদ-উপায়ন এ মহাতীর্থ রচিলা মর্ত্তে!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও গো হর্ষে,
চিরজাগ্রত যথা নারায়ণ সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

২

ধূ ধূ বালুতট—শুভ্রাংশুক-গুণ্ঠিত—মুখে নাহিক শব্দ—
অন্তঃসলিলা বহিছে ফল্গু—শঙ্কা-সরম-জড়িত স্তব্ধ!
কখন্ বাজিবে বাঁশিটি হাতের তাই চেয়ে চেয়ে এ উৎকর্ণ—
ভুলেছে ফল্গু—এ নহে সে কানু, আজো দেখে তাই প্রেমের স্বপ্ন!
এযে গয়া, ওগো যেথা হয় শুধু মৃতের কারণে অমৃত ভিক্ষা—
হেথা নারায়ণ দৈত্যের চির-বন্দী করিতে সত্য রক্ষা!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর ইত্যাদি—

৩

বালির পিণ্ডে তর্পি পিতায় নিজে নারায়ণ শ্রীরাম চন্দ্র
বাড়াইলা যার স্তবগৌরব, মানবের সেত' পরম বন্দ্য!
যথা বোধিতলে শাক্যসিংহরূপী নারায়ণ বুদ্ধ সিদ্ধ—
যার মন্ত্রে ঋতম্ভরায় করিলা বিশ্বে অশেষ ঋদ্ধ!
এই সেই গয়া—মুক্তির ভূমি, মোক্ষের মাটি, যুগ্যুগান্ত—
এ মহাতীর্থ মরণ-অহত মানববর্গে করিতে শান্ত!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর ইত্যাদি—

৪

প্রেম-অবতার নিমাই যেথায় হোমী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে,
পিণ্ড দিলেন পূর্ব্ব পুরুষে বসিয়া যাহার ধূলার অঙ্গে,
রূপ সনাতন আদি সাধুগুণ রেখে গেছে যথা চরণ অঙ্ক,
নরনারায়ণে মিলি যার ধূলি করিলা পুণ্য নিষ্কলঙ্ক;
এই সেই গয়া—প্রেমদাতারা যুগে যুগে সেবি করেছে উচ্চ
ধন্য তাহার ঘাট বাট মাঠ তরুলতা ধূলা—নহেত' তুচ্ছ!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর ইত্যাদি—

৫

"জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর" যাহার আকাশ স্তনিত নিত্য—
ভক্তি নিষ্ঠা গন্ধিত বায়ু, তোত্র বিভূতি পুণ্য দীপ্ত!
পূর্ব্বপুরুষ মুক্তি প্রার্থী কোটিনরনারী ব্যাকুলচিত্ত,
যার পথে পথে ফিরে সারাদিন—সে যে ধরণীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ!
এই সেই গয়া—এস নর নারী, হও ধূলিলীন আনত-মস্ত,
দৈত্য-দাতার হরিপদ-দান যত পার লও ভরিয়া হস্ত।
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও গো হর্ষে
চিরজাগ্রত যেথা নারায়ণ, সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবোত্তর, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবোত্তর ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে—নচেৎ; দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি মৃগাঙ্ক ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিমাত্র পাইবেন।—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না!

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না! স্নানযাত্রার 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল।—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়; ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তর হয়! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন; তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল। মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল এবং অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল।

পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল। বিবাহের পররাত্রি—কালরাত্রি—কাটিয়া গেলে, পরে ফুলশয্যাও চুকিয়া গেল। পরদিন শাশুড়ী কৃষ্ণপ্রিয়াকে কাঁদাইয়া, শ্বশুরকে উন্মনা, বাণীকে উদাসী করিয়া অম্বরনাথ আসাম যাত্রা করিলেন।

বাণীর বিবাহের দুচারিদিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অম্ভার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল;—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবন-গতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল। গৃহাদি সংস্কার করিল—পূর্ব্ব-চরিত্র পরিবর্ত্তন প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের গৃহসজ্জাদিও দূর করিয়া দিল। অম্ভা একদিন সহসা শশাঙ্কের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাতলে তাহারই নামাঙ্কিত একটি বাক্সমধ্যে এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া হার দেখিতে পাইল। পরক্ষণেই হর্ষে আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া সেই গৃহ হইতে সরিয়া গেল।

এদিকে অম্বর চলিয়া গেলে বাণীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বিবাহ মন্ত্রের শক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন তাহার মাতার মৃত্যু ঘটিল।]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রমাবল্লভ একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছেন; কৈশোর জীবনে তাঁহার জীবন-নির্ঝর যে প্রীতিমন্দাকিনীর শীতল ধারায় মিলিত হইয়া একসঙ্গে আজ এতখানি পথ অতি-বাহিত করিয়া আসিল, সেধারা অকস্মাৎ মরুভূমির বালুকা-রাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও শুষ্ক করিয়া দিয়া গেল। রমাবল্লভ শূন্যে চাহিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন; কত পূর্ব্ব-স্মৃতির উদয়ে চোখে জল আসে, আবার কত স্মরণীয় আনন্দের দিন মনে পড়িয়া চিন্তাকাতর বক্ষতলে সুখের স্মৃতি বহিয়া যায়।

তা রমাবল্লভের তো অনেকগুলা দিন কাটিয়া গিয়াছে! কাল চুলের মধ্যে মধ্যে রৌপ্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়া, স্থির ললাটপটে শেষদিনের সম্বলমাত্র ত্রিপুণ্ড্রলেখা লিখিয়া দিয়া, কালের ইঙ্গিত আপনাকে শতপথে ব্যক্ত করিতেছিল। কিন্তু এই যে কচিমেয়ে বাণী, ইহার দিন কাটে কি করিয়া? অসন্তুষ্টা আত্মীয়াগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য পূজাকাল খর্ব্ব করিতে হয়; পিতৃসেবা সে না করিলে পিতাকে কে দেখিবে? কিন্তু হায়, সে তো কাহারও জন্য কখনও কিছু করে নাই! লোকে তাহার দুঃখে বড় দুঃখিত। তাহারা

আড়ালে কাণাঘুষা করে। কেহ কেহ বরদাস্ত করিতে না পারিয়া সাম্‌নাসাম্‌নিই দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন, "আহা এমন সোনার পদ্ম কিনা একটা চামারের হাতে পড়িল! চোখ চাহিয়া সে একদিন দেখিলও না গা? এই 'আগুনের খাপ্‌রা' মেয়ে, মা নাই, কে দেখে?" অপমানে অভিমানে বাণীর চিত্ত বদ্ধপাত্রে ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ আক্ষোভে ফুলিয়া উঠিতে থাকে কিন্তু উথলাইতে পারে না। সে যে স্বেচ্ছায় নিজের মুখে নিজে বিষপাত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, এখন তাহাকেই এই তীব্র বিষ আকণ্ঠ পান করিতেই হইবে,— উপায় নাই।

কৃষ্ণপ্রিয়ার অন্তিম অনুরোধ রমাবল্লভকেও অত্যন্ত বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি নিজেই কি ইহা এখন বুঝিতে ছিলেন না? কিন্তু সেই যে আসন্ন বিপদের মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞানহীন হইয়া আত্মাভিমানের বশে ও কন্যাস্নেহে বিচারশক্তি হারাইয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, যতই অন্যায় হোক, তাহা সংশোধন করিবার সৎসাহস মনের মধ্যে জাগে কই? লজ্জার মাথা খাইয়া কোন্ মুখে আবার বলিবেন "অম্বর, তোমায় যে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া যাও; দয়া করিয়া আমার মেয়েকে গ্রহণ করো।" একথা বলা উচিত হইতে পারে কিন্তু বলা বড় কঠিন। তথাপি সাধ্বী স্ত্রীর শেষ অনুরোধ একেবারে কাটান যায় না। অনেক গড়িয়া ভাঙ্গিয়া অম্বরকে একখানা পত্র তিনি স্বহস্তে লিখিলেন, "এই সময় আমরা তোমাকে পাইলে বোধ হয় অনেকটা শান্তি পাই। তোমার ৺শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, তুমি ফিরিয়া আইস।" কয়েকদিন পরে উত্তর আসিল, "মাতৃস্নেহ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই; তাই মা পাইয়া এতদিন পরে সে দুঃখ আমার ঘুচিয়াছিল। তাঁহার অভাব যে কি, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। সোনাপুর চতুঃস্পাঠীতে শীঘ্রই আত্মপরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এখন যাইতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। পরম পিতা আপনাদের মনে শান্তিদান করুন। শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

পত্রখানা পিতার টেবিলের উপর দেখিয়া সুযোগমত বাণী চুরি করিয়া আনিয়া পড়িল। মায়ের অন্তিম আদেশ তাহার মনে অগ্নিতপ্ত শলাকা বিদ্ধ করিতেছিল। সন্তান হইয়া মার জন্য সে করে কি করিয়াছে? এই যে মৃত্যুশয্যায় আদেশটা দিয়া গেলেন, এটাও কি সে রাখিতে পারিবে না? কিন্তু মন এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। দেবতার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেদান কেমন করিয়া সে ফিরাইবে? তাহার পর, যে শপথ সে তাহাকে করাইয়াছে, সে শপথ ভঙ্গ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা অম্বরের পক্ষে সম্ভব কি? করিলেও সে নিজে কি তাহার এই এত বড় অপরাধটাকে ক্ষমা করিতে পারিবে? না; তাহার এতটুকু হীনতাও আজ বাণীর সহ্য হইবে না। সে যে অম্বরের সেই তুষারশুভ্র পবিত্রতা ও অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যে আজ আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে কেমন করিয়া ভক্তি করিবে?

পত্রখানা পাঠান্তে একদিকে একটা গভীর সুখে এবং অপরপক্ষে সুগভীর হতাশায় একসঙ্গে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আসিবে না। নিজের প্রতিজ্ঞা সে রাখিবে।

বাণীর মুখের সে সগর্ব্ব হাসির রেখা মিলাইয়া গিয়া একটা সকরুণ বিষণ্ণতা ফুটিয়া তাহাকে যেন আর একজন মানুষের মত দেখাইতেছিল। রমাবল্লভ এ মুখ দেখিয়া তৃপ্তি পান না, তাঁহার চোখে কেবলি জল আসে। পাছে সে তাঁহার কান্না দেখিয়া কাঁদে, তাই কোনমতে চাপাচুপি দিয়া পড়িয়া থাকেন। মনে মনে ডাকিয়া বলেন "তুমিতো চলিয়া গেলে কৃষ্ণা—আমি এমেয়ের মুখের দিকে কেমন করিয়া চাহিয়া দেখি? যে পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তুমি নাই—কে আমার সাহায্য করিবে বলিয়া দাও!"

অম্বরের পত্রখানি বাণী নিজের কাছেই রাখিয়া দিল। সেপত্রের প্রতি-অক্ষরটি সে যেন তুলি ধরিয়া নিজের মনের ভিতরে লিখিয়া লইয়াছিল। সুযোগ পাইলেই সে চুপিচুপি পত্রখানা বাহির করিয়া একবার করিয়া পড়িতে বসিত। কি সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তা-পংক্তি সাজান! যুক্তাক্ষর-গুলি যেন এক একখানি ছবির মত সুন্দর! সে নির্নিমেষে চিঠিখানার দিকে চাহিয়া থাকে; দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া দুই চোখে জল আসিয়া পড়ে। মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে অভিমান ভিন্ন অন্য কোন কারণে তাহার চোখে বড় একটা জল পড়িত না। আজকাল বড় সহজেই তাহার কান্না পায়। মনভাঙ্গা হইয়া গেলে বড় অল্পেই আঘাত লাগিয়া থাকে।

সহসা একদিন ম্লানমুখে বাণী তাহার পিতাকে বলিল "বাবা চল, আমরা কোথাও যাই।" তাহার এই নিরাশা-কাতর চিত্তের আকস্মিক অভিব্যক্তি পিতাকে যেন দণ্ডাঘাত করিল। মন যখন বড় অস্থির হইয়া পড়ে, চিরপরিচিত সমস্তই যখন এককালে বিষতিক্ত হইয়া উঠে, তখনই মানুষের মনে এই রকম একটা অস্থিরতা জাগিতে থাকে, যাইবার প্রয়োজন বা স্থানের ঠিকানা না থাকিলেও মনে হয়—কোথাও যাই! দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পিতা কহিলেন "কোথা যাব বল্‌মা!" "কোথা? কি জানি বাবা কোথা! চল, যেখানে হোক যাই।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "চন্দ্রনাথে যাবে বাবা, মা গিয়াছিলেন আমার যাওয়া হয় নাই।" "চট্টগ্রাম? যাবি, আচ্ছা সেই ভাল।"

রমাবল্লভ মনে মনে বলিলেন, তোমার ইচ্ছায় অত বড় কাজটাতেই যখন বাধা দিই নাই, এ সামান্য সাধে বাধা দিব? তুমি সুখে থাকিলেই আমার সুখ,—আমার আর এ পৃথিবীতে কে আছে?

যাত্রার পূর্ব্বে বাণী আশুনাথকে ডাকাইয়া পূজা-অর্চ্চনার পূর্ণভার তাহার উপর প্রদান করিলে, আশুনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মন্দির ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন?" সে বিষণ্ণ হাসি হাসিল, "তিনি যদি রাখেন তো পারিব না কেন?" পুরোহিত মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, 'মায়াকাটান নাকি!' শ্বশুরঘর করিতে যাইবার পূর্ব্বাভাষ?—

যাত্রাকালে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া উঠিতেই বাণীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। "কখনও তোমার কাছ ছাড়া হইনি, জ্বালায় বাহির হইতেছি। প্রাণে যেন শান্তি পাই ঠাকুর! যেন নির্ম্মল অন্তঃকরণ লইয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসি।" কিছুক্ষণ গলদশ্রুর মধ্যে সেই চিরসুন্দরের পানে চাহিয়া থাকিল। "শুধু বলে দাও—আমার এ চিন্তায় পাপ আছে কি না, আমি তাকে আমার স্বামী বলে ধ্যান করতে অধিকারী কি না। আরও বলে দাও—হে জগৎস্বামি! তোমায় পেয়েও আজ মানব-স্বামীর জন্য এ ব্যাকুলতা আমার মনে কেন জাগল? আমায় তাই বলে দাও—ওগো এই কথা আমায় বলে দাও—কি পাপে আমার এদশা ঘটালে?"

আবার ভূমিতলে লুটাইয়া পুনঃ প্রণামান্তে সে অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;—তাহার কাণের কাছে সেই মুহূর্ত্তে যেন বাজিয়া উঠিল "স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য সুখ নাই, অন্য কামনা নাই, এমন কি অন্য দেবতাও নাই।" সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। "একি মার কথা—না দেবতার আদেশ! মা—মা আমার আজ দেবতার রাজ্যেই গিয়াছেন। যদি মার কথাই হয়, তবু সে দেবাদেশ।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের পথে বাহির হইয়াই বাণীর মত ফিরিয়া গেল। সে বলিল "সম্মুখে মহাষ্টমী, কালীঘাটে মা কালী দর্শন করিয়া আসি, চন্দ্রনাথ এখন থাক্।" রমাবল্লভ অতিমাত্র বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না;—কিন্তু মনে হইল একি পরিবর্ত্তন! মা কালীর প্রতি এ শ্রদ্ধা কোথা হইতে আসিল?

সুদূর পথের সহস্র বাধা অপসারিত করিয়া যে অফুরন্ত হৃদয়ধারা হৃদয়েশ্বরের চরণে চিরপ্রধাবিত, সেই পবিত্র জাহ্নবী সলিলে স্নান করিতে বাণীর বুকের ভার যেন অনেকখানি লাঘব হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, কলুষনাশিনী মা! এ পাপিষ্ঠার মনের কলুষ আজ যেন একেবারে ধুইয়া যায়—দেখো।

বিশ্বনাথ বিশ্ব জুড়িয়া আছেন, ক্ষুদ্র মানবজীবনে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পিতায়—মাতায়—স্বামী—সখায় শতভাবে প্রকটিত! একজন সাধু রমাবল্লভের সহিত বিবিধ শাস্ত্রালোচনার মধ্যে এই কথাটি বলিবামাত্র বাণীর ক্ষুধিত চিত্ত ইহা একেবারে গ্রাস করিয়া লইল। সাধু বলিলেন, "জগতে এই সম্বন্ধ যত বিস্তৃত করা যায়, মনের ততই প্রসার হয়। ক্ষুদ্র 'স্ব'কে বৃহৎ করিতে পারিলেই যথার্থ অহংএর ধ্বংস ঘটে। ঘরের দ্বার আঁটিয়া শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা ভাল অথবা সন্ধিদ্বারা শত্রুহীন হওয়া শ্রেয়ঃ? লোকের বিশ্বাস আসক্তিহীন হইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায়, কথা ঠিকই; কিন্তু সে আসক্তিহীন হওয়ার উপায় প্রেমহীনতা নয়। প্রণয়ের অতি-প্রসার।"

কোনমতে পিতার অজ্ঞাতে বাণী নকুলেশ্বর মন্দিরের পাশে বটতলার সেই যতিটিকে জিজ্ঞাসা করিল "দেবতাকে যদি কোন দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া থাকি, সে বস্তু কি আবার মানুষকে দেওয়া যায়?" উত্তর পাইল, দেবতার প্রসাদ

মানবের সমধিক প্রিয় হইয়া থাকে। জীবদেহেই দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন, স্বমুখে তো গ্রহণ করেন না। মানবের মধ্যস্থ প্রত্যগাত্মারূপী ভগবানকে অর্পণ করিলাম, এ ভাবেও উৎসর্গ-বস্তু অর্পিত হইতে পারে।" বাণী নির্ম্মললঘুচিত্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া আসিল। বাহিরে নাই হোক, অন্তরে সে তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ধ্যান করিতে পাইবে, সেই ঢের। মহাষ্টমীর দিনে কালীমন্দিরে ভিড়ের সীমা ছিল না। কিন্তু যত ভিড়ই থাক, অর্থবল যাহার আছে, তাহার নিকট এক ভিন্ন সকল দ্বারই মুক্ত। সে প্রাণ ভরিয়া মায়ের পায়ে রক্ত-জবার অঞ্জলি ঢালিয়া দিল,—প্রত্যাবর্ত্তন-পথে রমাবল্লভ কহিলেন, যখন বাহির হওয়া গিয়াছে তখন আরও একটু বেড়ান যাক, ঘরের বাহিরে ভিতরের চেয়ে শান্তি আছে। বাণীরও সেই কথা মনে হইতেছিল, সে দুইধারের সৌধমালা পরি-বেষ্টিত ও জনারণ্যময় দৃশ্যের উপর নেত্র স্থির করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে বাবা?" "পশ্চিম—"বলিয়া রমাবল্লভ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত্তে বাণীর সকল উৎসাহ নিবিয়া গেল। অসংখ্য যানবাহনারূঢ় নরনারীগণের পানে ভাবশূন্য প্রাণে চাহিয়া চাহিয়া সে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল—"পশ্চিম!"

"জীবদেহেই দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন, স্বমুখে তো গ্রহণ করেন না।"

সংশয়পূর্ণচিত্তে রমাবল্লভ চাহিয়া দেখিলেন।—"থাক্‌গে—পশ্চিমে এখন অত্যন্ত শীত পড়িতেছে; কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল, ক্রমেই শীত বাড়িবে। জগন্নাথ, না হয় কামাখ্যায় যাওয়া মত হয় তো—" বাণী চমকিয়া উঠিল, "জগন্নাথ! তাই না হয় চলো"। "আমি বলি কামাখ্যা হইয়া তার পর ফিরিয়া জগন্নাথ যাওয়া হইবে—কি বলিস্?" "কামাখ্যা—না, সে বড় বিশ্রী রাস্তা—ভারি খারাপ দেশ;—থাক্‌গে।" বাণীর বুকের মধ্যে ধড় ফড় করিতেছিল।

"খারাপ,—হাঁ তা বটে"।—অসহায় ক্রোধে বাণীর সর্ব্ব-শরীর তাতিয়া উঠিল। নিজের প্রতিও রাগ হইল, পিতার প্রতিও রাগ হইল একটুখানি কি ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য এক সময়ে রমাবল্লভ সহসা কহিয়া উঠিলেন "কামাখ্যাটা একবার দেখা উচিত, অতবড় পীঠ—বড় জাগ্রত-স্থান—এসো, যাওয়া যাক্।" নিজের উপর ভরসা করিয়া বাণী আর উত্তর দিবারও চেষ্টা করিল না।

ধুবড়ি হইতে ষ্টীমারে উঠা হইল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা হইয়াছিল। রমাবল্লভ ডেকের উপরে গিয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন, বাণী নিজের কামরার ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে গবাক্ষ খুলিয়া চাহিয়া রহিল।

কাল অপরাহ্ণ; মহানদ ব্রহ্মপুত্র প্রশান্ত আকাশের স্থির নীলিমা বক্ষে ধরিয়া নীলাম্বু-নীল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। দুই পার্শ্বে উন্নত নীল পর্ব্বতমালা—পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্রবৃহৎ বৃক্ষলতাগুল্মাদি সব যেন চিত্র করা, সে সমস্তও দূরত্বপ্রযুক্ত পর্ব্বতগাত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া নীল দেখাইতে-ছিল। জলে, স্থলে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে সর্ব্বত্রই আজ

যেন নীলিমায় ভরিয়া গিয়াছে। বাণী মুগ্ধনেত্রে ইন্দীবর-শ্যাম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কামরূপে কামাখ্যাদেবী দর্শন হইলে রমাবল্লভ সহসা প্রস্তাব করিলেন, একবার শিলংটা দেখে যাওয়া যাক্ না। বাণী দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হাঁ-না কিছুই বলিল না। কেহ কোন কথা প্রকাশ করিল না বটে কিন্তু দুজনের মনেই যে এক ভাবেরই তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা দুজনেরই অজ্ঞাত রহিল না।

প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত-সজ্জিত রম্যকানন,পর্ব্বত, গিরিনদী-পরিবৃত, পথদৃশ্য বাণীর উদ্বেগশঙ্কিত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি-সুখ দিতে পারিল না। বৈচিত্র্যের সীমা ছিল না। দূরপথ, —কোথাও হরিৎ ক্ষেত্র শস্যসম্ভারে অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে, কোথাও গগনস্পর্শী ধূসর পর্ব্বতমালা! সুবিস্তৃত জলায় থাকিয়া থাকিয়া আলেয়ার অগ্নিক্রীড়া অনভিজ্ঞ দর্শককে বিস্ময়াতঙ্কে সহজেই অভিভূত করিয়া তুলে।

তাঁহারা শিলংএ একদিনমাত্র বাস করিয়াই আবার তল্পি বাঁধিয়া মেল ট্রেণ ধরিতে বাহির হইলেন। কোথা যাওয়া হইতেছে, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নোত্তর হইল না। গাড়ী ক্রমে সুরমা উপত্যকায় পৌছিল। গাড়ীর কামরায়, কাষ্ঠের পর্দ্দায় চামড়া আঁটা গদির উপর পিঠ রাখিয়া, উদাসনেত্রে বাণী বাহিরে চাহিয়া ভাবে, সে যেন কোথায় কোন্ অজানা-পথে যাত্রা করিয়াছে, এ পথের সীমা নাই—সীমার আবশ্যকও নাই।

এক দিন অতি প্রত্যূষে কলের গাড়ী থামিতেই মুদিত-নেত্রে থাকিয়া বাণীর কর্ণে—'গরম-চা পান চুরোট' ইত্যাদির মাঝখান হইতে হঠাৎ তাহার পিতার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল "এই যে তুমি এসেছ! এসো এসো, ভাল আছ তো?" "আজ্ঞা হাঁ, ভালই আছি।" "না না, বড় রোগা দেখিতেছি যে!—চেহারা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। কুলি! কুলি! এই রামসিং, বিন্দে, তেওয়ারি, মোট সব নামা, এখানে নামিতে হইবে।" বাণীর বক্ষশোণিতে ঢেউ উঠিতে লাগিল, সে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল, ভয় হইতেছিল—যদি চোখ চাহিলে চোখের জল রোধ করিতে না পারে! সহসা সে শুনিল এখানে নামিবেন? অতি বিশ্রী জায়গা এটা, কিছুই পাওয়া যায় না, তাভিন্ন আজ কাল এখানটায় ভয়ানক কালাজ্বর হইতেছে, লোক সব পলাইতেছে, নামিয়া কাজ নাই।" "অাঁ, তবে তুমি এখানে কেন রহিয়াছ! এসো এসো—অম্বর শীঘ্র উঠিয়া পড়ো। রামসিং—রামসিং, জামাই বাবুর জন্য শীঘ্র একখানা টিকিট কিনিয়া আন।—" "কোথাকার?" তা এখন ঠিক করি নাই। তোর যেখানের খুসী লইয়া আয়—রিজার্ভ গাড়ী! তা সত্য—তবে থাক—চলিয়া যাইবে। দাঁড়াইয়া কেন? অম্বর, অম্বর, উঠিয়া পড়, এখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিবে যে।"

রমাবল্লভ ভিতর হইতে হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিয়া ঝুঁকিয়া তাহার হাতটা ধরিলেন, "এসো—নহিলে আমাদের নামিতে হয়।"

হতবুদ্ধিপ্রায় অম্বর ভাল করিয়া সমস্তটা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই শ্বশুরের হস্তাকর্ষণে নিজেরও অজ্ঞাতে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজাইয়া সদর্পগতিতে ট্রেণও বিশ্রামস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

বাণী এপর্য্যন্ত চোখ চাহিয়া জাগ্রত-চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। অম্বর কক্ষে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তে একটা তাড়িত-বেগ আসিয়া তাহার সমস্ত শরীর যেন মুহূর্ত্তে নিস্পন্দ করিয়া দিয়াছিল। সুখ, কি দুঃখ, লজ্জা কি অভিমান, অথবা সমুদয় মানসিক বৃত্তির একত্র মিশ্রণের প্রবলতর অভিঘাত এমন করিল, তাহারও অনুভূতি যেন তাহার ছিল না। কেবলমাত্র অন্তর্চৈতন্যবিশিষ্ট জড়বৎ সে যথাস্থানেই পড়িয়া রহিল—অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত নাড়িবার শক্তি তাহার ছিল না।

গাড়ী ছুটিয়া চলিতেছে। পিতার সাগ্রহকণ্ঠ তাহার দুর্ব্বোধ্য শব্দজাল ভেদ করিয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু সে শব্দ শুনিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রবণাশ্রয়ী হইয়া আছে, কত সংক্ষেপ ও কদাচিৎ সে সুর! রমাবল্লভ কালাজ্বরের ভাবনায় শীঘ্র শীঘ্র এই ভয়াবহ স্থান ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অম্বরকেও এখানে রাখিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তাহাকে তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে-ছিলেন। শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিয়া বাণী উত্তর শুনিল—"এখন যাওয়া অসম্ভব। আগামী সোমবার গুরুগাঁও চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠার দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। আমার অনুপস্থিতিতে

ক্ষতি হইবে। আমি এখন ওদিকে তো ফিরিব না—সম্প্রতি এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে নাবিব।”—“না না সে কি হয়! চট্টগ্রামে আমাদের সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ দেখাইয়া আনিতে হইবে যে! সোমবার না হয় নাই হইল! দিন দশ পনের লাগিবে বৈত নয়।” উত্তর হইল “অনেক পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে, এখন কি দিন বদলান যাইতে পারে।” রমাবল্লভ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—‘তবে আর কি বলিব? আজই—এখনই—তোমায় সেখানে যাইতে হইবে?” “আজ্ঞা হাঁ, সেখান হইতে গরুর গাড়ীর পথে একদিন লাগিবে কি না, দেরি করিলে সময়ে পৌছিতে পারিব না। যাইতেই হইবে।”

পরষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই রমাবল্লভ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নামিয়া পড়িলেন। “আমায় একটু হাত মুখ ধুইতে হইবে—ওগাড়ীটায় যাইতেছি, অন্য ষ্টেশনে উঠিব। ওরে বিন্দা, আমার ব্যাগটা লইয়া চল্।”

অম্বর সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল। বাণী ইচ্ছা করিয়াই খবির শব্দ করিয়া স্খলিতাঞ্চল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল; কিন্তু অম্বর অত্যন্ত অন্যমনস্ক, ইহাতেও সে চাহিয়া দেখিল না, সে তখন গবাক্ষ-পথে মুখ বাহির করিয়া শৈলমালার বিচিত্র মায়ারূপ পর্য্যবেক্ষণে তন্ময়। বাণীর হৃদয়ে অভিমান, বেদনা ও হতাশা—তীব্র যন্ত্রণানল জ্বালাইয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবজাত বিজাতীয় ক্রোধও সুষুপ্তিভঙ্গ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু হায়, কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে! এযে তাহার স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরা! সম্মুখে শীতলজল—এখনই তাহার সমুদয় কণ্ঠশোষ সেই জলধারে নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! ওই মৃগতৃষ্ণিকার পানে চাহিয়া এই তপ্ত মরুপ্রান্তরে বসিয়া তাহাকে আজীবন কাঁদিতেই হইবে। সেযে স্বেচ্ছায় এই মরুভূমে আসন পাতিয়াছে!

আর একটা ষ্টেশন আসিয়া চলিয়া গেল, রমাবল্লভ দেখা দিলেন না, আরও একটা সুযোগ অতীত হইয়া গেল। বাণীর বুকের মধ্যে দুপদুপ্ করিয়া যেন ধুনারীর যন্ত্র চলিতেছিল! পিতার এ ইঙ্গিত, সে স্পষ্ট বুঝিতেছিল। নিজে অপরদের গাড়ীতে থাকিয়া এই যে সুযোগ তিনি কন্যাকে দিয়া দিয়াছেন, এ সুযোগ যদি সে হারায়, তবে হয় ত জীবনে দ্বিতীয়বার এ দিনের সাক্ষাৎ সে আর পাইবে না। মাবাপ সন্তানের জন্য কত সহিতে প্রস্তুত ইহা মনে করিতেই মার কথা স্মরণ করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। আজ মা যদি সঙ্গে থাকিতেন! একি! সে এ, কি ভাবিতেছে! সেই শপথের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে না কি? তাহাদের মাঝখানে যে বিশাল হিমাদ্রি দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইয়া আছে, মরণ ভিন্ন ইহা কে অতিক্রম করিবে? অম্বর তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে কেন? আর যদিই করে, তাহাতেও কি সে সুখী হইতে পারে? তথাপি যতই সময় যাইতেছিল, তাহার মনের মধ্যে ততই আনচান করিয়া উঠিতেছিল, কোন্ সময় চলন্ত গাড়ীখানা থামিয়া পড়িবে—আর সকল আশা জন্মের মত ফুরাইয়া যাইবে!

বন্ধুর গিরিপথে সাবধানে গাড়ী চলিল, বেগ মন্দ হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ অম্বর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া কামরার ভিতরে চাহিল। তাহার মনে হইল, কে যেন একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিয়া উঠিয়াছিল। সত্যইতো—বাণীর চোখে বুঝি কয়লার গুঁড়া পড়িয়াছে! সে একটু খানি স্থির হইয়া থাকিয়া উঠিয়া তাহার নিকটস্থ হইল, “চোখে কয়লা পড়িয়াছে? জল নাই? এই যে, দাঁড়াও আমি বাহির করিয়া দিতেছি।” অম্বর কুঁজা হইতে জল লইয়া সন্তর্পণে চোখে ঝাপটা দিয়া দিল। বাণীর দুই নেত্র হইতে দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল, বাহিরের জলের সাহায্যে সেই বেগ-বর্দ্ধিত অভ্যন্তরাশ্রু বাধাহীনভাবে তাহার সহিত মিশিয়া ঝরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অম্বর জিজ্ঞাসা করিল “কয়লাটা কি এখনও চোখে আছে!”

বাণী নীরবে ঘাড় নাড়িল। থাকিলে হয়ত ভালই হইত কিন্তু তাহা ছিল না, কোন্ সময় অশ্রুজলে ভাসিয়া গিয়াছে। সে চোখ মুছিল।

অম্বর আর কোন কথা কহিল না—অদূরে দ্বিতীয় আসন খানায় বসিয়া আবার বাহিরের দিকে চাহিল, তাহার মনের মধ্যে তখন যে কি হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব?

এবারে যেখানে গাড়ী থামিল, সেইটাই অম্বরের গন্তব্য স্থান। অম্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই প্রথম বার বাণীর দিকে এক নিমেষের জন্য চাহিয়া দেখিল, ‘সরিয়া বসো—আবার চোখে কয়লা পড়িতে পারে!’—এই কথা বলিয়া দ্বার খুলিয়া সে নামিয়া গেল, একটা বিদায়-সম্ভাষণও করিয়া

অম্বর কুঁজা হইতে জল লইয়া সন্তর্পণে চোখে ঝাপটা দিয়া দিল।

জানাইল "না"! রমাবল্লভ বালিস টানিয়া অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িলেন, সে বসিয়া রহিল। একটি কথা—তাহার শেষকণ্ঠ স্বর,—সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু বক্ষে লইয়া সে উদ্‌ভ্রান্তের মত হইয়া রহিল। গাড়ী হইতে নামিতেই—কে বোধহয় অম্বরের কোন পরিচিত—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "অম্বর যে! এখানে কোথায়? গাড়ীতে কাহারা রহিয়াছেন? স্ত্রীলোক দেখি না?" সে উত্তর দিয়াছিল—"হাঁ, আমার স্ত্রী!"

এই কথাটিই বাণীকে আত্মহারা করিয়াছিল। 'আমার স্ত্রী'। এইধ্বনি ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার কাণে বাজিতেছিল। 'আমার স্ত্রী'—সে স্বীকার করিয়াছে সে তাহার স্ত্রী! কত মিষ্ট এই কথাটুকু! নিকট হইতেও নিকটতম আত্মীয়তার এই স্বীকারোক্তি এ যেন তাহার মনকে আর একটা মন্ত্রমোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। 'আমার স্ত্রী!'—একটু দূর-আত্মীয়তাও সে নিকটে বসিয়া অঙ্গীকার করে নাই—বিদায়মুহূর্ত্তে এতবড় অধিকার সে গেল না, অথচ সে ভালই জানে যে, এই দেখাই শেষ দেখা। গাড়ীর কঠিন বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া তাহার একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল; কিন্তু সে কাঁদিল না। ইচ্ছা হইতেছিল—একবার মানঅভিমান লজ্জার তাড়না সবভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলে—"এই শেষ দেখা—একটু দাঁড়াইয়া চলিয়া যাও—আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ! একবার জন্মের শোধ 'বাণী' বলিয়া ডাকিয়া যাও।" কিন্তু কিছুই সে করিল না।

কখন ট্রেণ ছাড়িয়াছে, পিতা আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। পিতার কণ্ঠস্বরে সচেতন হইয়া সে মুখ ফিরাইতেই তাঁহার ব্যগ্র দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিল। পিতা বলিলেন "অম্বর চলিয়া গেল, কবে দেশে ফিরিবে, কিছু বলিল কি?" বাণী ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে দিয়া গেল! ভাগ্যে সে তখন এই নির্জ্জন কক্ষে তাহার সহিত একা ছিল না! তা থাকিলে আজ কি হইত কে জানে! এই নির্ম্মল সূর্য্যকিরণোদ্‌ভাসিত শান্ত প্রভাতে তাহার মুখের দিকে এই তাপহীন সূর্য্যালোকের মতই প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে আবার সেই স্বরে একবার উচ্চারণ করিত 'আমার স্ত্রী!' তাহা হইলে বোধ হয়, বাণীর মন হইতে সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গিয়া, সে আপনা ভুলিয়া, সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া তাহার পা চাপিয়া ধরিত, দীর্ঘসঞ্চিত অশ্রুজলে সেই চরণ ভাসাইয়া বোধ হয় বলিতেও তাহার বাধিত না—"আমার পাপ-প্রতিজ্ঞার সহিত সকল ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—আমি তোমার স্ত্রী, আমায় গ্রহণ কর।"

ছায়াছবির মত চারিদিকের দৃশ্য মিলাইয়া যাইতেছিল।

রমাবল্লভ বিষাদ-চিন্তামগ্ন, বাণী সুখ-রোমাঞ্চিত শরীরে স্মৃতি-সুখে বিভোর। সে ভাবিতেছিল—আচ্ছা সে স্বর এমন কাঁপিতেছিল কেন? কি যেন একটা ভাব তাহাতে ছিল, অত মিষ্ট তো কারও, কখনও, কোনও কথা মনে হয় নাই? সত্যই কি গলা কাঁপিয়াছিল? না আমার মনে ঐরূপ হইতেছে? কি সুমিষ্টই লাগিয়াছিল—আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্য কোথাও আর যাওয়া হইল না। এই শেষ আশাটুকু ভঙ্গে রমাবল্লভের শরীর অসুস্থ বোধ হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে কালাজ্বরের আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া খানিকটা কুইনাইন নিজে ও খানিকটা কন্যাকে খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। বাণী কহিল "চল ফিরিয়া যাই।" ঠাকুর দেখিবার মত ভাল মন তাহার ছিল না। বড় অস্থির, বড় হতাশ!

মেঘনার দূরবিস্তৃত বক্ষে অর্ণবতরণী তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। আবার গবাক্ষপথে বাণী একা। একা, কিন্তু গভীর যন্ত্রণাপূর্ণ চিন্তাসাগরে ভাসমান। সে যথার্থ কোন আশা বক্ষে লইয়া সেখানে যায় নাই। পিতার সাহায্যে তাঁহার গোপন চেষ্টায় যেটুকু স লাভ করিয়াছিল, তাহারও আশা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না। তথাপি আজ ফিরিবার সময় সর্ব্বক্ষণই মনে হইতেছিল, সে একা ফিরিয়া চলিল! যে একা আপনাকে লইয়া জীবন শান্তিসুখে নিজের অধিকারে কাটাইবার জন্য এতটুকু বেলা হইতে ব্যাকুল, সেই আজ গৃহাভিমুখী হইয়াই ভাবিল, সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া চলিয়াছে।

না—বুঝি ঠিক তেমন নয়। যে অঙ্কুর সেই বেদমন্ত্র রোপণ করিয়াছিল, দিনে দিনে বহুশাখ মহাবৃক্ষরূপে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এবার সেই যে নূতন মন্ত্র সে শুনিয়া আসিয়াছে, ইহার প্রভাবে সেই নবোদ্গত পত্ররাশিশোভিত শাখাগুলি ফলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নারীহৃদয় ইতঃপূর্ব্বে মন্ত্রশক্তির বলে অথবা রমণীহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতিপ্রবণতার ফলে, তাহার বাহু অহঙ্কার, ধন ও ধর্ম্মের গর্ব্ব, ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। সংসার-অনভিজ্ঞ বালিকার আত্মহৃদয়রহস্য সে প্লাবনে গোপনতার অতল অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, আজ আবার এক বন্যার উচ্ছ্বাসে তাহা তরঙ্গশিরে নাচিয়া উঠিয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসে।—হিন্দুগৃহের সতী নারীর মতই প্রাণঢালা প্রীতিভক্তি-প্রেমে তাহার এই ক্ষুদ্র হৃদয়নদী এই স্ফীতবক্ষ মেঘনার মতই ফুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। এই আকস্মিক বর্ষাস্রোতের উদ্দাম পরিপ্লাবনের পরিচয়ে সে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এত ভালবাসা লইয়া সে কি করিবে? আকাশে নক্ষত্র উঠিতেছিল, আশে পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ ভাসিতেছে, দিনের আলো নদীতীরে বিদায় লইয়া তাহার অস্পষ্ট অন্ধকার বনান্তরালে মিলাইয়া যাইতেছিল, বাণী জানালার কবাটে মাথা রাখিয়া চোখ মুদিল। আমার এই অসীম ভালবাসাও তাকে আমার কাছে আনিয়া দিতে পারিবে না? গোপীবল্লভ! প্রভু! পিতা! এমন কুমতি আমায় তুমি কেন দিয়াছিলে? আমি না হয় গর্ব্বে অন্ধ ছিলাম, তুমি তো সবই জানিতে। তবে আমার এ কি করিলে?

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঠের উপর মাথা রাখিল। আর যেন আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না! এই যে জন্মের শোধ দেখা হইল, একটি কথা কহিলেন না! পরও তো পরকে দেখা হইলে একবার জিজ্ঞাসা করে "কেমন আছ?" আমি কি তার চেয়েও পর? হাঁ, তা এক রকম নয় তো কি? "কেহ কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না" মন্দিরের শপথ! ভগবান্! কেন সে মুহূর্ত্তে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিলে না? সে যন্ত্রণায় দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিল। ষ্টীমারের চাকার আলোড়নে যেমন করিয়া জলরাশি আলোড়িত হইতেছিল, সেখানেও তাহার অনুকরণ চলিতেছে। মেয়েমানুষে এত বড় নির্ল্লজ্জ কেহ দেখিয়াছে! সে যখন আমায় দেখিয়া প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, আমি মরিবার জন্য কেন তাহাকে ডাকিলাম—কথাগুলা বলিতে একটু লজ্জাও তো হইল না?

এই নবোদ্ভূত ভালবাসায় সে সেই পূর্ব্বের প্রেমহীন দিবসের সগর্ব্ব নির্ল্লজ্জ ভাবসকল স্মরণে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। অম্বর তাহাকে এই নূতন সর্ত্তে বিবাহ

করিতে কেন যে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, সে রহস্যও আজ তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। বিবাহকে সে ছেলে-খেলার চোখে দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে কি গভীর ভাব ও মহাশক্তি নিহিত সে তো তাহা জানিত, কেমন করিয়া তাহাতে সে সম্মত হইবে? তবে, যদি ইহা বুঝিয়াই ছিল, তবে আবার কেমন করিয়া একাজ করিল? কেন করিল? না করিলে সে তাহাব সর্ব্বস্ব-হারা হইত! হইত—হইত, এর চেয়ে সে বোধ হয় ভাল হইত।

নিঃশব্দে তাহার গণ্ড বহিয়া প্রভাতপদ্মে অজস্র শিশির ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঠিয়া সে একবার ক্ষুদ্র কামরাটার চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। একস্থানে স্থির হইয়া থাকাও যেন আর সহজ হইতেছিল না। মনে মনে আবার বলিল "না ভালবাসিয়া কাজ নাই। ভালবাস নাই, ভাল করিয়াছ! বাসিলেতো আমারই মত দুঃখ সহিতে হইত।" বিষাদপূর্ণ ম্লানহাসি হাসিয়া সে নিজেই অশ্রু মুছিল। কে আর স্নেহকোমলস্পর্শে সে দুঃখাশ্রু মুছাইয়া দিবে? মুছিতে গিয়া মনে পড়িল, প্রাতে ট্রেণের কামরায় তাহার চোখে কয়লা পড়ার সময় অম্বর তাহার চোখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার সেই দারুণ যন্ত্রণার শান্তি করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, সে সময় তাহার যন্ত্রণা ও বেদনাশ্রুসিক্ত গণ্ডে তাহার করাঙ্গুলির ক্ষণস্থায়ী মৃদু স্পর্শও সে অনুভব করিয়াছিল। মুছিবে কি,—সে অশ্রুবেগ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই নিমেষের স্পর্শসুখ স্মরণ করিয়া সে অধীর আবেগে কাঁদিতে লাগিল, "ফিরে এসো, ফিরে এসো, একটা সান্ত্বনার কথা বলিয়া যাও। মাতৃহীনা আমি, তুমি আমার দিকে চাহিবে না তবে আমার গতি কি হইবে? ওগো এসো—এসো একবার এসো—"

সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ কবিয়া তীরতরুদলশিরে চাঁদ উঠিলেন, সেই বড় নক্ষত্রটা ঝিকি ঝিকি জ্বলিতে জ্বলিতে হাসিতে লাগিল। মেঘনাবক্ষে সহস্র সহস্র নক্ষত্রছায়া সোনার গুঁড়া ছড়াইয়া জল স্বর্ণবর্ণ করিয়া দিল। এঞ্জিনের ঘরে অগ্নিগর্ভ বিরাট এঞ্জিন ফুঁদিতেছিল। খালাসীরা ডেকের উপর ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিয়া ফিরিতেছিল। যাত্রিগণ স্থানেস্থানে দলবদ্ধ হইয়া নৈশ ভোজনের ও শয়নের বন্দোবস্তে মন দিয়াছে। কেহ তামাক খাইতেছে। কোন নিশ্চিন্তচিত্ত মানব রেলিং ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নারাত্রের নদীর শোভা দর্শন করিতেছে, একটি বৃদ্ধ গান ধরিয়াছেন—

"কারও দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

বাণী নিরুদ্ধ শ্বাসে শুনিল! তাহার অশ্রুবেগ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কার দোষ! হায় কার দোষ! সত্য—স্বখাদ-সলিলেই সে ডুবিতেছে। দোষ কাহারও নয়, শুধু একমাত্র তাহার—এদশার জন্য সে নিজেই দায়ী! স্বামিপ্রেম অনেকের ভাগ্যে থাকে না, তার তো ভাগ্যদোষও নহে, কেবলমাত্র নিজের দোষ! অশ্রুকাতর বিবশ হৃদয়ে সে অম্বরের মুখখানা ধ্যান করিতে লাগিল। কি সৌম্য! কি কোমল! আবার মনে পড়িল, 'আমার স্ত্রী!' সে বলিয়াছে সে 'তাহার স্ত্রী!'—এজন্মের মত এই শেষ, এই সম্বল! আর কিছু না, আর কিছুই পাইবে না, পাইবার আশা নাই—পাওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু লইয়াই তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। হা মৃত্যু! মৃত্যু ভিন্ন আর কে তাহাদের মধ্যের এই অচ্ছেদ্য পাশ মোচন করিতে সক্ষম! কে? কেহ নয়; শুধু মৃত্যু!

ক্লান্ত শ্রান্ত বাণী অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে আজ আবার এই নদীবক্ষে সেই দীপ্ত হোম-শিখা পার্শ্বে যজ্ঞপরায়ণ অম্বরকে তাহার সম্মুখে দেখিল, আর সেই গম্ভীর বেদমন্ত্রে তাহার কর্ণ ভরিয়া গেল—"ওঁ মমব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু"।

(ক্রমশঃ)

প্রবন্ধ-চিন্তামণি *

(কুমারপাল)

[লেখক—শ্রীপূরণ চাঁদ সামসুখা]

যখ্যাত গুর্জ্জরাধিপতি ভীমরাজের "চউলা" দেবী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে হরিপাল দেব জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিভুবন পাল হার পুত্র এবং এই ত্রিভুবন পালের পুত্র প্রথিতযশা মারপাল। ভীমরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষীর ভজাত পুত্র কর্ণদেব রাজত্ব প্রাপ্ত হন ও তৎপরে তৎপুত্র বিখ্যাত জয়সিংহ দেব সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

জয়সিংহদেব কুমারপালের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, মন কি তাঁহার প্রাণবধ করিতে কৃতসংকল্প হইলে, কুমার-ল ভয়ে সন্ন্যাসী-বেশে পলায়ন করেন। কয়েক বৎসর না দেশে পরিভ্রমণ করিয়া একদা গুপ্তভাবে পুনরায় জরাটে প্রত্যাগত হন।

এই সময়ে সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব পিতা কর্ণদেবের দ্ধোপলক্ষে সাধুসন্ন্যাসিগণকে নিমন্ত্রণ করিলে কুমারপালও হাদের সহিত গমন করেন। ভূপতি স্বহস্তে সন্ন্যাসিগণের প্রক্ষালন করিতে করিতে, কুমারপালের পদে ঊর্দ্ধরেখাদি জাচিত চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, সন্দেহক্রমে পুনঃপুনঃ হার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; কুমারপালও হার ভাবগতি বুঝিতে পারিয়া, কোনরূপে গোপনে পলা-পূর্ব্বক, আলিঙ্গ নামক জনৈক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় ণ করেন। কুমারপাল পলায়ন করিলে, রাজা তাঁহার সন্ধানের জন্য অবিলম্বে কয়েকজন অশ্বারোহীকে তাঁহার াৎ প্রেরণ করেন। কুমারপাল এই সংবাদ অবগত া, কুম্ভকার গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক ক্ষেত্রস্বামীর ট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সেই ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে কপরিপূর্ণ কাষ্ঠরাশির মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। রোহিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে, তথায় মন করিয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, কুমারপাল কণ্টকরাশির মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বেশ-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করেন।

এই সময়ে কুমারপাল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।—কখনও অন্নাভাবে দুইতিন দিবস উপবাস করিয়া থাকিতে হইত, কখনও বা ভিক্ষা করিতে গিয়া কত দুষ্টলোকের নির্যাতন সহ্য করিতে হইত, আবার কখনও বা ধৃত হইবার আশঙ্কায় নানাপ্রকার ছদ্মবেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে হইত। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্তম্ভতীর্থে (খম্বাত, বা Cambay) গমন করেন। তথায় উদয়ন মন্ত্রী অবস্থান করিতেছেন জানিয়া, পাথেয় ভিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। সে সময়ে সুবিখ্যাত জৈনসাধু শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য্যও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি ইঁহার শরীরে বহু সুলক্ষণ দেখিয়া, বলিয়াছিলেন,—যে 'কালে এই ব্যক্তি পরাক্রান্ত নরপতি হইবেন।' উদয়ন মন্ত্রী সৎকার করিয়া উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিলে, কুমারপাল মালবাভিমুখে প্রস্থান করেন।

মালবে অবস্থানকালে কুমারপাল সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি কপর্দ্দকশূন্য হস্তে তৎক্ষণাৎ গুর্জ্জরপ্রদেশের রাজধানী অনহিল্লপুর-পট্টনাভিমুখে যাত্রা করেন ও পথের মধ্যে বহুকষ্ট সহ্য করিয়া কএকদিবসের পর ক্ষুৎপিপাসা শ্রমপীড়িত দেহ লইয়া পট্টনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ভগিনীপতি "কাহ্নড়দেব" নামক জনৈক পরাক্রান্ত সামন্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে, জয়সিংহদেবের পুত্র না থাকায়, সিংহাসন লইয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজবংশীয় দুইজন কুমারকে যথাক্রমে সিংহাসনপ্রদান, ও ক্রমে অযোগ্যবিবেচনায় উভয়কেই অবসৃত করা হয়। ইত্যবসরে কাহ্নড়দেব কুমারপালকে লইয়া সসৈন্যে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে

---

* খৃষ্টোত্তর ১৩০৪ অব্দে শ্রীমেরুতুঙ্গাচার্য্য নামক জৈন-আচার্য্য "প্রবন্ধ-চিন্তামণিঃ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

প্রণত হন। অনন্তর, কুমারপাল গুর্জ্জরাধীশ বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবৎ ১১৯৯ (১১৪৩ খৃঃ অব্দে), প্রায় পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সে কুমারপাল রাজত্ব প্রাপ্ত হন।

কুমারপাল কঠোর শাসনে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন বলিয়া, শত্রুমিত্র সকলেই সশঙ্ক হইয়া উঠিল। ইনি স্বয়ং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, ও বহুদেশভ্রমণ করায়, এবং জীবনে নানাকষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদর্শী হইয়াছিলেন; সুতরাং, মন্ত্রিগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না। কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ইঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, ইঁহাকে বিনাশ করিতে ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু তাহা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হয়।

কাহ্নড়দেবের সাহায্যে কুমারপাল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, সভাস্থলেও রাজার অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কুমারপাল কয়েকবার নিভৃতে ইঁহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহাতেও ইনি নিবৃত্ত না হওয়ায়, ইঁহার উভয় চক্ষু উৎপাটিত করা হইয়াছিল।

যে কুম্ভকার ও ক্ষেত্রপতি বিপদের সময় কুমারপালকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজ্যপ্রাপ্তির পর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

কুমারপাল উদয়ন মন্ত্রীর পুত্র "বাগ্‌ভট্ট"কে মহামাত্যপদ প্রদান করেন।

উদয়ন মন্ত্রীর অপর পুত্র "বাহড়" সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন; এমন কি, সিদ্ধরাজ তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। কুমারপাল সিংহাসনারোহণ করিলে, ইনি সপাদলক্ষীর (আজমীর) চাহমানবংশীয় "আনাক" নামক ভূপতির শরণাপন্ন হন, ও তাঁহাকে গুজরাট আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করায়, চাহমান ভূপতি স্বয়ং সসৈন্যে গুজরাটের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কুমারপালও নিজ সামন্তগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন; কিন্তু "বাহড়ের" প্রদত্ত উৎকোচদ্বারা বশীভূত হইয়া, সামন্তগণ যুদ্ধের সময় অগ্রসর হইলেন না। কুমারপাল মহাবিপদাশঙ্কা করিয়াও, সাহসবলে মাত্র শরীররক্ষক সৈন্য সমভিব্যাহারে, "আনাক" ভূপতির দিকে তীব্রবেগে হস্তী চালিত করিলেন। "বাহড়" পথমধ্যে কুমারপালের হস্তীর উপর সশস্ত্র পতিত হইবার ইচ্ছা করিয়া, স্ব-হস্তী হইতে লম্ফ প্রদান করিলে,—গুর্জ্জরাধীশের হস্তিচালকের কৌশলে ভূপতিত হইয়া তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। ইত্যবসরে কুমারপাল চাহমান ভূপতির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। 'আনাক' ভূপতি ও 'বাহড়' উভয়ের পরাভবে সপাদলক্ষীর সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। বিজয়শ্রী কুমারপালের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

একদা গুর্জ্জরাধিপতি স্বীয় "আম্বড়" নামক মন্ত্রীকে সসৈন্য কঙ্কণদেশ-নাথ মল্লিকার্জ্জুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। "আম্বড়" কঙ্কণদেশে উপস্থিত হইয়া, উভয়কূলপূর্ণা 'কলবিনী' নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, মল্লিকার্জ্জুনকে আক্রমণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে কঙ্কণপতিকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া, অতি কষ্টে অবশিষ্ট অল্পমাত্র সৈন্যের সহিত পট্টনে প্রত্যাগমন করেন। কুমারপাল পুনরায়, বহু সৈন্য ও বিপুল যুদ্ধসম্ভার প্রদান করিয়া, মল্লিকার্জ্জুনকে জয় করিবার জন্য আম্বড়কে প্রেরণ করিলেন। এবার আম্বড়, কলবিনী নদীতে সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ সুরক্ষিত করিয়া, মল্লিকার্জ্জুনকে আক্রমণ করেন। ভীষণ সংগ্রামের পর 'আম্বড়', স্বহস্তে কঙ্কণাধীশকে নিহত করিয়া, তদ্দেশে গুজরাটের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। কঙ্কণ হইতে আনীত দ্রব-সম্ভারের মধ্যে কয়েকটীর নাম আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হইল :—

'পাপক্ষয়' নামক মুক্তাহার
'সংযোগসিদ্ধি' সিপ্রা
'শৃঙ্গার কোটী' সাড়ী
বত্রিশটি স্বর্ণকুম্ভ
সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ কোটি মুদ্রা
চতুর্দ্দন্ত হস্তী। ইত্যাদি

এই সময়ে শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য্য কুমারপালের নিকট আগমন করেন। নৃপতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তির সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ও তাঁহাকে পট্টনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। আচার্য্যের সদুপদেশে কুমারপাল জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, মদ্য ও মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন; স্বরাজ্যে চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত জীবহিংসা নিবারণ ও ১৪৪০টি

সুশোভন জিনমন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কুমারপাল জৈন সুশ্রাবকের পালনীয় দ্বাদশব্রত * অঙ্গীকার এবং রাজকোষে অপুত্রকের ধনগ্রহণ-প্রথা স্থগিত করিয়াছিলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় "সুংবর" নামক জনৈক রাজবিরোধীকে দমন করিবার জন্য উদয়ন মন্ত্রী সসৈন্যে প্রেরিত হন। পথে শত্রুঞ্জয় (২) তীর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় মন্ত্রী তত্রত্য মন্দির প্রস্তুত না হইবে, সেপর্য্যন্ত দিবসে মাত্র একবার আহার করিবেন। তৎপরে, তথা হইতে অগ্রসর হইয়া সুংবরকে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মন্ত্রীর সৈন্যগণ পরাজিত হয় এবং মন্ত্রী স্বয়ং গুরুতররূপে আহত হইয়া শিবিরে আনীত হন। বাগ্‌ভট্ট ও আম্রভট্ট নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়কে শত্রুঞ্জয় ও ভৃগুকচ্ছপুরস্থিত "শকুনিকা বিহার" নামক জিনমন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞার কথা
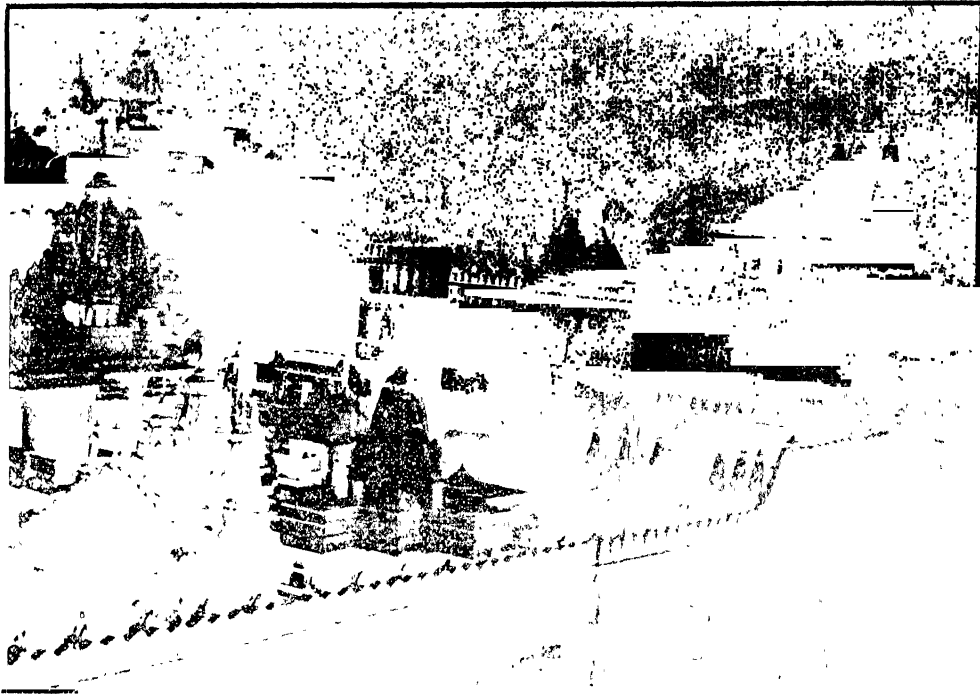
সিদ্ধাচল

ষ্ঠময় মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করাইয়া, পাষাণ-মন্দির প্রস্তুত রাইবার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেপর্য্যন্ত পাষাণ- বলিতে কয়েকজন আত্মীয়কে অনুরোধ করিয়া, উদয়ন মন্ত্রী দেহত্যাগ করেন।

বাগ্‌ভট্ট ও আম্রভট্ট, পিতার আদেশানুসারে দুই-বৎসরের মধ্যে শত্রুঞ্জয়-গিরিতে পাষাণ-মন্দির নির্ম্মাণ হইল; কিন্তু হঠাৎ একদিবস তাহা ভূমিসাৎ হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া বাগ্‌ভট্ট "কপর্দ্দী" নামক মন্ত্রীকে কার্য্যভার প্রদানপূর্ব্বক চারি সহস্র অশ্বারোহীর সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন, ও গিরিসান্নিধ্যে বাগ্‌ভট্টপুর নামক নগর স্থাপন করিয়া, পুনরায় মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনবৎসরে মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য সমাহিত

* জৈন শ্রাবককে (গৃহস্থকে)—এই দ্বাদশব্রত অঙ্গীকার হতে হয়; যথা;—(১) স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণ ব্রত, (২) স্থূল বাদ বিরমণ ব্রত, (৩) স্থূল অদত্তাদান বিরমণ ব্রত, (৪) স্থূল ব্রহ্মচর্য্য , (৫) স্থূল পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত, (৬) দিক্ পরিমাণ ব্রত, (৭) গোপভোগ পরিমাণ ব্রত, (৮) অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত, (৯) সাময়িক , (১০) দেশাবকাশিক ব্রত, (১১) পৌষোপবাস ব্রত, (১২) অতিথি বিভাগ ব্রত।

(২) "শত্রুঞ্জয় গিরি" বা "সিদ্ধাচল" কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত। জৈনগণের প্রধান তীর্থরূপে পূজিত।

হইলে, বাগ্‌ভট্ট মহোৎসবসহকারে, সংবৎ ১২১১ অব্দে, মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারপালও বাগ্‌ভট্টপুরে, পিতা ত্রিভুবনপালের নামে ত্রিভুবন-পাল-বিহার নামক জৈন ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শত্রুঞ্জয়গিরির মন্দির নির্ম্মাণ করিতে এক কোটি ষষ্টিলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

এদিকে আম্রভট্ট ভৃগুকচ্ছপুরস্থিত শকুনিকা বিহারের জীর্ণোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে, ধ্বজা-রোপণ উৎসব উপলক্ষে, শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য্য ও কুমারপাল নৃপতিকে আমন্ত্রণ করেন এবং বিপুল আড়ম্বরে উক্ত উৎসব সমাধা করেন।

একদা বাগ্‌ভটের অনুজ "বাহড়" মন্ত্রীকে (বোধ হয়, বাহড় পরে কুমারপালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, মন্ত্রিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন) সসৈন্যে সপাদ-লক্ষার ভূপতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে, বাহড় "বংবেরা" নামক স্থানের দুর্গ জয় করিয়া, সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা ও একাদশ সহস্র তুরঙ্গ লুণ্ঠন পূর্ব্বক, প্রত্যাগমন করেন।

সংবৎ ১২২৯ (১১৭৩ খৃঃ) অব্দে সুবিখ্যাত মনীষী শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য্য, চতুরশীতি বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাজ কুমারপাল অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ইনি সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন এবং জৈনশাস্ত্রের সম্যক্‌বেত্তা ছিলেন। ইনি সটীক যোগশাস্ত্র, সটীক দেশীয় নামমালা, বিভ্রমসূত্র, অর্হন্নীতি, পরিশিষ্ট পর্ব্ব, ত্রিষষ্টিশলাকা, পুরুষচরিত্র প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থ এখনও ইঁহার নাম জৈন-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কথিত আছে যে, ইনি সার্দ্ধত্রিকোটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের মৃত্যুর প্রায় ছয়মাসকাল পরে, মহারাজ কুমারপাল সংবৎ ১২৩০ অব্দে, ৩১ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া, দেহত্যাগ করেন। কুমারপাল গুণজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সঙ্গীতাদি দ্বারা মোহিত করিয়া, অনেকে ইঁহার নিকট হইতে প্রভূত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। জৈনধর্ম্ম অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বে, ইনি সোমনাথের কাষ্ঠময় মন্দিরের সংস্কার করাইয়া পাষাণময় সুদৃশ্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

কুমারপালের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র অজয়দেব সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি রাজ্যপ্রাপ্তিমাত্র, পিতৃকৃত সুন্দর জিনমন্দির সমূহ বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পরে, "সীল" নামক জনৈক ব্যক্তির বিদ্রূপবাক্যে লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া, এই কুকর্ম্ম হইতে বিরত হন।

কুমারপালের সম্মানিত, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান "কপর্দ্দী" মন্ত্রীকে ইনি প্রথমতঃ প্রধান-অমাত্যের পদ প্রদান করিবার ইচ্ছায় আহ্বান করেন; কিন্তু পরে দুষ্ট লোকের পরামর্শে হঠাৎ মন্ত্রীকে বন্দী করাইয়া নিহত করেন।

সুকবি রামচন্দ্রও এই রাজা কর্ত্তৃক হত হন।

বিখ্যাত আম্রভট্ট মন্ত্রী, অজয়দেবের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইতে অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সশস্ত্র বহুলোককে নিহত করিয়া, স্বয়ং হত হন।

এবংবিধ বহু অত্যাচারে জনসাধারণকে প্রপীড়িত করিয়া, অজয়দেব স্বকৃত উৎকট পাপের প্রতিফল স্বরূপ, "বয়জনদেব" নামক জনৈক দ্বারপাল-কর্ত্তৃক ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংবৎ ১২৩০ হইতে ১২৩৩ পর্য্যন্ত, মাত্র তিন বৎসর ইনি রাজ্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে, দ্বিতীয় মূলরাজ দ্বিবর্ষকাল রাজ্যপালন করিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার মাতা "নাইকীদেবী," দ্বিতীয় ভীমদেবকে দত্তকগ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে-লাগিলেন। এই বীর্য্যবতী মহিলা "গাডয়ার ঘাট" নামক স্থানের যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজকে (সাহাবুদ্দিন মহম্মদঘোরী) সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া, বিতাড়িত করেন।

দ্বিতীয় ভীমদেব সংবৎ ১২৩৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৩ বৎসর রাজ্য করেন। ইঁহার সময়ে মালবরাজ "সোহড়" নামক ভূপতি গুজরাট আক্রমণ করিতে আগমন করেন; কিন্তু ইঁহার মন্ত্রীর কৌশলে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে সোহড় ভূপতির পুত্র অর্জ্জুনদেব গুজরাট আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

ভীমরাজের পর ব্যাঘ্রপল্লী নামক স্থানের সামন্তরাজ "লবণ প্রসাদ" রাজ্যগ্রহণপূর্ব্বক বহুকাল রাজত্ব করেন। ইঁহার অপর পুত্র বীরধবল, পিতৃদত্ত ও স্ববলার্জ্জিত রাজ্য লইয়া, স্বতন্ত্র রাজ্য করিতে লাগিলেন।

বীরধবল, তেজপাল নামক জনৈক জৈন বণিক্‌কে প্রধান-অমাত্যপদ প্রদান করেন। তেজপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা

, সার্দ্ধ পঞ্চসহস্র বাহনসংযুক্ত একবিংশতি শত জৈন তীর্থযাত্রা করেন। ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এক অশ্বারোহী ও সপ্তশত উষ্ট্রারোহী সৈন্যের সহিত, চারি পরাক্রান্ত সামন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা যে যে তীর্থস্থলে ন করিয়াছিলেন, সেই সেইস্থলে নূতন জিনমন্দির নির্ম্মাণ, পুরাতন মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার, প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। এখনও বস্তুপাল ও তেজপালের নাম জৈন-সম্প্রদায়ে অমর হইয়া আছে।

বস্তুপালের সহিত খম্বাত (Cambay) নগরে সৈয়দ নামক নৌবিত্তকের (সমুদ্র-বণিক) সংগ্রাম হয়। সৈয়দ, ভৃগুকচ্ছপ্রবাসী 'শঙ্খ' নামক মহাপরাক্রমশালী পুরুষের সাহায্য লইয়া, বস্তুপালকে আক্রমণ করে। বস্তুপালও, গুড়জাতীয় (নীচজাতি বিশেষ) লুণপালের সহায়তা অবলম্বন করেন। যুদ্ধে শঙ্খহস্তে লুণপাল হত হয়; কিন্তু বস্তুপাল, অমিততেজে শঙ্খের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও সৈয়দকে সংহার করেন।

দিল্লীর সুলতানের সম্মানিত আলম খাঁ নামক ফকির, গুজরাটের মধ্য দিয়া মক্কা যাইতেছেন জানিয়া, লবণপ্রসাদ ও বীরধবল তাঁহাকে ধৃত করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু বস্তুপালের পরামর্শে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। ফকিরের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া, সুলতান বস্তুপালের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চগ্রামের অধিকারিত্ব লইয়া, বীরধবলের সহিত তাঁহার শ্বশুর-পক্ষীয় আত্মীয়গণের সংগ্রাম হয়; তাহাতে বীরধবল নিহত হন; কিন্তু লবণপ্রসাদ শত্রুগণকে সমূলে ধ্বংস করেন। বীরধবলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিশলদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

সিন্ধুর বিরহ

[শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন লিখিত]

কারে হারায়েছ সিন্ধু! কোন্ শিশু কালে!
যার তরে হাহাকারে উঠ কূলে কূলে!
আছাড়ি আছাড়ি পড়ি ধরণীর পায়,
বুক-ফাটা গানে বল 'হায় সে কোথায়!'
তোমার বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট শুক্ল কেশরাশি,
অনন্ত অপার হতে ভেসে ভেসে আসি,
কাতরে লুটায়ে পড়ে নির্ম্মম পাষাণে,
পাষাণও ফাটিয়া যায় সে করুণ গানে।
এত শোক বক্ষে ধর হে সিন্ধু কোমল!
যাহার কঠিন ভারে হয়েছ পাগল।
দিন নাই—রাত নাই—একই সুর গান,
সেই ক্ষুব্ধ হাহাকারে মর্ম্মভেদী তান!
তোমার বিষাদ-মাখা মলয় পবন,
থেকে থেকে তুলিতেছে আকুল ক্রন্দন।
তোমার বিষাদ-ছায়া অনিলে অম্বরে
রজনীর গণ্ড বাহি অশ্রুজল ঝরে।
ম্লান সূর্য্য, ম্লান চন্দ্র, পাখীর গলায়,
করুণ সঙ্গীত ধ্বনি করে হায় হায়!
তোমার শোকের ভারে নীরব ধরণী
আকাশে বাতাসে তোলে করুণ রাগিণী,
প্রতি তরঙ্গের শত উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
বহিয়া আনিছে তপ্ত দুঃখের নিঃশ্বাস,
তার সনে জগতের যত অশ্রুজল,
আমার হৃদয় আজি করিছে চঞ্চল।
ইচ্ছা হয় তব কণ্ঠে বাহুর বেষ্টনে,
বাঁধি তোমা বেদনার তীব্র আলিঙ্গনে,
একই সুরে গাই গান—একই তান ধরি,
কাঁপিবে বিশ্বের প্রাণ বিরহে তোমারি।

মেঘবিদ্যা

[লেখক—শ্রীআদীশ্বর ঘটক।]

বায়ু-সমুদ্র।—আর্য্য-ঋষিদিগের মেঘ-শাস্ত্র কিছু আছে কি না, আমি তাহা অনুসন্ধান করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য তাহা লিখিতে বসিয়াছি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান কালে বায়ুমান (Barometer), তাপমান (Thermometer), আর্দ্রমান যন্ত্র (Hygrometer) এবং বৈদ্যুতিক-বার্ত্তাবহ দ্বারা ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাড়িতবার্ত্তা দ্বারা ঝড়বৃষ্টিনির্ণয় করাকে আমরা মেঘশাস্ত্র বলিতে চাহিনা; কোথায় ঝড় হইতেছে এবং সেই ঝড় প্রতিদিন কত মাইল কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহা টেলিগ্রাফ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, এবং সেই ঝঞ্ঝাবর্ত্তের দৈনিক গতি স্থির করিয়া, পৃথিবীর কোন্ স্থান দিয়া কোন্ দিন তাহা যাইবে, ইহা নির্ণয় করিয়া একটা ভবিষ্যৎ-ঋতুর খণ্ডা প্রস্তত করাই আজকাল বৈজ্ঞানিক মেঘবিদ্যা * নামে অভিহিত হইতেছে।

আর্য্যঋষিদিগের মেঘবিদ্যা সেরূপ নহে। আর্য্যঋষিগণের বায়ুমান, তাপমান প্রভৃতি যন্ত্র ছিল না; প্রাকৃত পদার্থের দ্বারাই তাঁহারা প্রাকৃত তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের যন্ত্রাদির নমুনা এইস্থানে একটু দিলে ক্ষতি নাই, এই জন্য একটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

> "বিরসমুদকং গোনেত্রাভং
> বিয়দ্বিমলা দিশো লবণবিকৃতিঃ
> কাকাণ্ডাভং যদাচ ভবেন্নভঃ
> রসনমনসকৃন্মণ্ডূকানাং জলাগমহেতবম্॥"

গ্রীষ্মকালে কোন্ দিন বৃষ্টি হইবে, নির্ণয় করিবার জন্য ঋষিগণ জলের পরীক্ষা করিতেন। বৃষ্টির দিন কি হইবে? "বিরসমুদকম্ গোনেত্রাভং"—অর্থাৎ জল বিরস এবং গো-নেত্রের ন্যায় পরিষ্কার। কিন্তু যাহা সর্ব্বরসের অথবা স্নেহের আধার, তাহার রসহীনতা কি প্রকার, তাহা বুঝিতে আমার একটু সময় লাগিয়াছিল। 'শুষ্কজল' পদার্থটি কি প্রকার, তাহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক। পরে তাহা বক্তব্য। 'গো-নেত্রাভং' গোনেত্রের ন্যায় আভা কি প্রকার? ইহাও বুঝিতে একটু সময়ের আবশ্যক। "বিয়দ্বিমলাদিশো"—দিক্‌সকল বিমল—একথাও সহজে বুঝা যায় না। "লবণ-বিকৃতিঃ"—লবণের বিকার। "কাকাণ্ডাভং ভবেন্নভঃ"—আকাশ কাকের অণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত। রসনমনস-কৃন্মণ্ডূকানাং"—ভেক সকল বারবার গর্জ্জন করিতে থাকে। ছয়টি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ ভেকের গর্জ্জন।

ঋষিগণ ইতর জীবজন্তুদের সহিত প্রেম-ব্যবহারে তাহাদের চরিত্র সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা ভেকের গর্জ্জনকে ভবিষ্যৎবর্ষার একটা অমোঘ লক্ষণ বিবেচনা করিতেন।

জলের বিরসতা।—চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসে কোনও কোনও দিন এ প্রকার দেখা যায় যে, বারবার পিপাসা হইতেছে, বারবার জল খাইয়া পিপাসা মিটিতেছে না;—বরফ, বায়ুমিশ্রিত (Aerated) জল, সুরা ইত্যাদি খাইয়া যাঁহারা পিপাসা নিবৃত্তি করেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; যাঁহারা নদী, কূপ, অথবা পুষ্করিণীর জলে পিপাসা নিবৃত্তি করেন, তাঁহারা সকলেই কোনও না কোনও দিন এমন পিপাসা বোধ করিয়াছেন যে, জলপান করিয়া উদর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না। ইহাকেই ঋষিগণ "বিরসমুদকং" বলিয়াছেন।

এই প্রকার দারুণ পিপাসা আমাদের কখন হয়? বৃষ্টি-বর্ষা বুঝিবার জন্য ঋষিগণ আমাদের দেহকেই একটা যন্ত্র ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্যদেহের মত সুচারু যন্ত্র পৃথিবীতে বোধ হয় আর নাই। বর্ষার প্রারম্ভে, অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টিবর্ষা বুঝিবার পক্ষে আমাদের এই মনুষ্যদেহ অতি সুন্দর যন্ত্র। আধুনিক বর্ষাবিজ্ঞানে হাইগ্রোমিটার্

* Meteorology

(Wet and Dry Bulb, Thermometer) দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ করা হয়। একটি কাষ্ঠফলকের উপর এক জোড়া তাপমান যন্ত্র আবদ্ধ করিয়া একটি তাপমানের পারদ-ভাণ্ডারের (bulb) উপর একখানি আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড রাখিবামাত্র শুষ্ক অপেক্ষা আদ্র তাপমানের উত্তাপ কম হইয়া থাকে। চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসে উভয় তাপমানের প্রভেদ প্রায় ২০ ডিগ্রী হইতে আমরা দেখিয়াছি।

যে দিন আমাদের কলিকাতার সন্নিকটে প্রথম বৃষ্টি হইবে, সেই দিন বায়ুতে জলীয় বাষ্প অতি অল্প মাত্রই থাকে। প্রবহমাণ এক ঘনফুট্ বায়ুতে ৭ হইতে ৮ গ্রেণ মাত্র জলের ভাগ থাকে। বায়ু প্রাতঃকাল হইতেই জলশোষণ করিতে থাকে। আর্দ্রবস্ত্র সকল অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। সূর্য্যের উত্তাপও এমন প্রখর হয় যে, বেলা ৩টার সময় বায়ুর উত্তাপ প্রায় ১০৯ ডিগ্রী F. হইতে দেখা যায়। এ প্রকার হইলে, আমাদের দেহের কি অবস্থা হইবে? আমাদের দেহমধ্যস্থ শোণিতের উত্তাপ প্রায় ১০০ ডিগ্রী F. সুতরাং প্রবহমাণ উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু আমাদের দেহ হইতে ক্রমাগত রসশোষণ করিতে থাকে। দেহের চর্ম্ম শুকাইয়া যায়, এবং একটা জ্বালা বোধ হইতে থাকে। দারুণ পিপাসা বোধ, এবং জলপানেও তাহার নিবৃত্তি হয় না।—আমরা উপরে যে লক্ষণটি লিখিলাম, এইরূপ কষ্ট গ্রীষ্মকালে আমাদের প্রায়ই হইয়া থাকে। আমরা উহার কারণানুসন্ধান করিনা; ক্রমাগত জলপান করিয়া, অথবা বরফ ইত্যাদি শৈত্য সেবন দ্বারা সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জ্বর ইত্যাদির সূত্রপাত করি। কিন্তু ঐ প্রকার শুষ্ক বায়ু হইলে, গৃহের বায়ুর পথ অথবা দ্বার-জানালার উপর খস্‌খসের পর্দ্দা করিয়া তাহা জলসিক্ত রাখা, অথবা তদভাবে প্রবহমাণ বায়ুর পথে কয়েকখানা আর্দ্র বস্ত্র লম্বিত করিয়া দিলে, ক্ষণ মাত্রেই ঐ পিপাসা এবং গাত্রদাহের নিবৃত্তি হইতে পারে।

জলে গোনেত্রের আভা।—গাভী যখন চাহিয়া দেখে, তখন তাহার চক্ষু পলকহীন হয়। জলের উপরিভাগে গোনেত্রের আভা কি প্রকার? জল স্থির, তরঙ্গহীন, বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব জলের উপরিভাগে দর্পণের মত পরিষ্কার হয়। ইহা প্রবহমাণ বায়ুর অভাবের লক্ষণ। জলের উপর তরঙ্গের অভাব হইলে, বুঝিতে হইবে যে, বায়ু প্রায় স্থির রহিয়াছে। এই অবস্থা বুঝিবার জন্য জলের উপরিভাগকেই ঋষিগণ যন্ত্র করিয়াছেন।

দিক্ সকল পরিষ্কার।—দিক্ সকল বলিতে আকাশের নিম্নভাগ বুঝায়। আকাশের বর্ণ নিম্নভাগ পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ নীল। নীল বর্ণের সহিত শ্বেতবর্ণের কিছু মাত্রও মিশ্রণ নাই, একেবারে বিশুদ্ধ নীল (spectrum blue) আকাশ আমাদের বঙ্গদেশে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, এবং আশ্বিন মাসেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ প্রকার নীল বর্ণও আকাশের প্রকৃত বর্ণ নহে। অমাবস্যা অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রবিহীন নিশাকালে যখন আকাশ মেঘশূন্য হয়, সেই সময়ে আকাশের প্রকৃতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা কৃষ্ণ বর্ণ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই জন্য আকাশের কৃষ্ণবর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে নীলবর্ণের আকাশের কথা বলিয়াছি, ঐ প্রকার নীলবর্ণ তবে কিসের?

পৃথিবীর চারিদিকেই বায়ুসমুদ্রের আবরণ রহিয়াছে। মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বায়ুর নানা প্রকার স্তর রহিয়াছে। যতই উপরে যাও, ক্রমাগতই শৈত্যানুভব হইতে থাকে, এবং বায়ুর চাপও ক্রমশঃ কম হইয়া যায়। স্যর্ জেমস্ গ্ল্যাসিয়ার্ এবং কক্স নামে দুই জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ব্যোমযান সাহায্যে একবার প্রায় এক ক্রোশ উপরে উঠিয়াছিলেন; তাঁহারা মুক্তাসন্নিভ পর্ব্বতাকার 'Comulus' জাতীয় মেঘেরও উপরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। সেই স্থানে তাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের নিদারুণ ক্লেশ হইয়াছিল। তথায় একটি পারাবতকে বেলুন হইতে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দেওয়ায় সেই পারাবত সেই পাতলা বায়ুর উপরিভাগে উড়িতে পারে নাই; প্রস্তর-খণ্ডবৎ বহুদূর পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। গ্ল্যাসিয়ার্ অজ্ঞান হইয়াছিলেন; শীতে তাঁহার হস্ত পদাদি অবশ হইয়া গিয়াছিল। ঐ প্রকার উপরে উঠিয়াও তাঁহারা আরও বহু উপরে অশ্বপুচ্ছবৎ সূত্রাকার শ্বেত বর্ণের 'Cirii' মেঘ সকল দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল মেঘ পৃথিবী হইতে ১০ ক্রোশ উপরে দেখা যায়। বোধ হয়, আর কেহই ঐ প্রকার উপরে উঠিতে পারেন নাই। আজকাল যে সকল "এয়ারোপ্লেন্" অর্থাৎ উড়িবার কল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দ্বারা সেইরূপ উচ্চে উঠা যায় না।

ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নিম্নস্তরের বায়ুতে

ভার বেশী, উপরের বায়ু উত্তরোত্তর লঘু ও তরল। অতএব, আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, মৎস্যাদি জলচর জীব সকল যে ভাবে জলমধ্যে থাকিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতেছে, আমরা মনুষ্য, আমরা জলের উপরে থাকিয়াও বায়ু-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছি; বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ, আমরা বায়ু দ্বারা শ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিয়া, এই বায়ুসমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে পড়িয়া আছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা বায়ুসমুদ্রের গভীরতা ২৫ ক্রোশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, দশ ক্রোশ উপর পর্য্যন্ত মেঘাদির চিহ্ন পাওয়া যায়, এ জন্য ইহাও নিশ্চয় হইয়াছে, ঐ দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বায়ু-সমুদ্রের সহিত জলীয় বাষ্প মিশিয়া রহিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা একটি প্রশ্ন করিয়া রাখিয়াছি যে, আকাশের যে বিশুদ্ধ নীল বর্ণ বর্ষাকালে দেখা যায়, তাহা কিসের?—এক্ষণে উহা বলিবার সুবিধা। ঐ নীলবর্ণ জলীয় বাষ্পের। আকাশে যে পরিমাণ জল অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় একটা মহাসমুদ্র পূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের চক্ষুদ্বারা জলীয় বাষ্পের ঐ অদৃশ্যরূপ দেখিবার যো নাই, কিন্তু স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্ (Spectroscope) যন্ত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, জলীয় বাষ্প দ্বারা নীলবর্ণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে (Monsoon) বঙ্গদেশে প্রায়ই দক্ষিণা বায়ু অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং কদাচিৎ দক্ষিণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মানচিত্র দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল বায়ু সমুদ্রের জল বহন করিয়া উত্তর দিকে বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে প্রায়ই বৃষ্টিবর্ষা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার আদ্র বায়ু প্রবাহিত হইলে, বায়ু-সমুদ্রে জলাধিক্য, এবং আকাশের বিশুদ্ধ নীলবর্ণের চমৎকার শোভা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার নীলবর্ণের আকাশকেই "বিয়দ্বিমলাদিশো" বলা হইয়াছে।

লবণ-বিক্রুতি।—লবণের বিকার কি? —লবণ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিয়া ভিজিয়া গিয়া জলবৎ তরলাকার হয়। আমরা একখণ্ড বিট্‌লবণ একখানি ডিসে করিয়া রাখিয়া নিত্য উহার অবস্থা দেখিতাম। বৃষ্টি-বর্ষার দিন উহার উপরিভাগে শত শত সূক্ষ্ম জলের ধারা বহিত, এবং যেদিন বৃষ্টি না হয়, সেই দিবস লবণের উপরিভাগ বেশ শুষ্ক থাকিত। লবণ যে দিন বায়ুতে গলিয়া যায়, সেদিন প্রবল বর্ষা নিশ্চয় হইয়া থাকে।

কাকাণ্ডের ন্যায় আকাশ।—কাকাণ্ড কি প্রকার? তাহার উপরিভাগে নীল, শ্বেত, এবং ধূম্রবর্ণের চিহ্ন থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে আকাশে ঠিক ঐ প্রকার ত্রিবর্ণের বিকাশ হয়। বিশুদ্ধ নীলাকাশে ঐ প্রকার শ্বেত ও ধূম্রবর্ণের খণ্ড মেঘ, অনেকবার আমরা দেখিয়াছি। শ্বেত বর্ণের মেঘ সকল প্রায় উপর-আকাশস্থ 'কোদালে' (Cirro-Comulus) জাতীয়, এবং ধূম্রবর্ণের মেঘ সকল সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের (Stratus)। এই দুই জাতীয় মেঘ, এবং আকাশের নীলবর্ণ মিলিয়া কাকাণ্ডের ভাব কল্পনা হইয়াছে। ঐ প্রকার আকাশ হইলে, অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভেকের গর্জ্জন।—ইহাকে ইংরাজীতে 'ফ্রগ্-কন্‌সার্ট'(Frog Concert) ভেকের ঐক্যতান বলে। অনেক গুলি ভেক একত্র হইয়া মধ্যে মধ্যে রব করিতে থাকে। ভেক সকল বৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ প্রকার রব কিজন্য করে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত আমরা পৃথিবীর উত্তাপ পরীক্ষা করিতাম। দেখিয়াছি, মৃত্তিকার উত্তাপ বৃদ্ধি হইলেই ভেক সকল গর্ত্তের বাহির হইয়া কোনও জলাশয়ের জল সমীপে বসিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইহা জলের অভাবজনিত কাতরোক্তি, বা ডারউইনের মতে ভার্য্যা-লাভের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত, অথবা উক্ত উভয় ভাবের কোনও একটার সংমিশ্রণ হইতে পারে। বৃষ্টি হইলে ঐ প্রকার চীৎকারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বর্ষাঋতু জানিবার জন্য ঋষিগণ কি প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য আমরা একটি শ্লোক বিশদ করিয়া বুঝাইলাম, কিন্তু উহা বৃষ্টিলক্ষণ হইলেও উহাকে মেঘবিদ্যা বলা যায় না। ঋষিদিগের মেঘবিদ্যা জ্যোতিষমূলক। গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ বৃষ্টিবর্ষার এক অপরূপ শাস্ত্র লিখিয়াছেন। এস্থলে ঐ শাস্ত্রের এক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ করিব না। সেই মেঘবিদ্যার মূল কথা বুঝাইতে পারিলেই, আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এ জন্য স্থূল কথা সকল লিখিলাম।

কোনও ঋষি বলেন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লাতিথি সমাপ্ত হইলে মেঘ সকল 'গর্ভধারণ' করে। এবং একশত পঞ্চনবতি দিন পরে সেই মেঘ প্রসব করে, অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই মত সকলঋষির নহে। অধিকাংশ ঋষিই বলেন যে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের অবসান হইলে চন্দ্র যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপনীত হন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মেঘ সকল গর্ভ ধারণ করে ; বর্ষার বীজ রক্ষিত হয়।

এই গর্ভ কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় ?— অগ্রহায়ণ এবং পৌষমাসে সূর্য্যের উদয়াস্তকালে আকাশে মেঘ সকল সঞ্চারিত, এবং রক্ত, পীত, প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণে ঐ সকল মেঘের অতি অপরূপ শোভা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত শীতও মেঘের গর্ভ-লক্ষণের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। পৌষমাসে অত্যন্ত হিমপাত, মাঘ মাসের প্রবল বায়ু, কুয়াসায় চন্দ্রসূর্য্য আচ্ছন্ন, অত্যন্তশীত, এবং অস্তোদয়-কালে সূর্য্য প্রভৃতি মেঘাচ্ছন্ন এই গর্ভলক্ষণ। ফাল্গুনমাসে রুক্ষ, প্রচণ্ড পবন, আকাশে মেঘ সঞ্চার, এবং পরিবেশ অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল, প্রভৃতি এবং সূর্য্যের তাম্রবর্ণ মেঘের গর্ভের পরিচায়ক। চৈত্রমাসে মেঘ, পবন, এবং বৃষ্টিযুক্ত পরিবেশ, গর্ভলক্ষণ মধ্যে গণ্য হয়। বৈশাখ মাসে মেঘ, পবন, জল, বিদ্যুৎ, এবং মেঘগর্জ্জন এই পঞ্চ লক্ষণ একত্র হইলে গর্ভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। *

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত দিবারাত্র আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং গর্ভলক্ষণ দেখিতে পাইলেই তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়।

"যো দৈববিদ্বিহিতচিত্তোদ্যুনিশং গর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্য মুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যাম্বুনির্দ্দেশে॥"

যে দৈবজ্ঞ বিহিতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি মেঘের গর্ভলক্ষণ দেখিবেন, তাঁহার বাক্য বর্ষাবিষয়ে মুনিবাক্যের ন্যায় হয়, অর্থাৎ মিথ্যা হয় না।

এখন দেখা যাউক, একশত পঞ্চনবতি দিন পরে যে বর্ষা, তাহা জানিবার উপায় কি। এই স্থলে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।—

"যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ
স চন্দ্রবশাৎপঞ্চনবতে দিন গতে
তত্রৈব প্রসবমায়াতি।"

চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকিলে মেঘের গর্ভ হয়, একশত পঞ্চনবতি দিন পরে অর্থাৎ ৬ মাস ১৫ দিন পরে চন্দ্র যখন আবার সেই নক্ষত্রে অবস্থিত হইবেন, তখন বৃষ্টি হইবে।

"শীত পক্ষোদ্ভবাঃ কৃষ্ণে, কৃষ্ণা শুক্লে, দ্যুসম্ভবারাত্রৌ,
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি, সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্॥"

মেঘের গর্ভ যদি শুক্লপক্ষে হয়, কৃষ্ণপক্ষে তাহা প্রসব করিবে। সেই প্রকার কৃষ্ণপক্ষীয় গর্ভ শুক্লপক্ষে প্রসব করিয়া থাকে। দিনে মেঘের গর্ভ হইলে রাত্রিকালে তাহা প্রসব করে, এবং রাত্রিতে মেঘের গর্ভ হইলে দিনের বেলা তাহার বৃষ্টি হইয়া থাকে। আরও প্রাতঃকালে মেঘের গর্ভ হইলে সায়ংকালে তাহার বৃষ্টি এবং সায়ংকালে গর্ভ হইলে, সেই গর্ভজনিত বৃষ্টি প্রাতে হইয়া থাকে।

মেঘের গর্ভলক্ষণ সকল লিখিয়া রাখিতে হয়। যেদিন অথবা যে রাত্রিকালে মেঘের গর্ভলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।—উদাহরণ—

১৩২০ সাল, ৩০এ চৈত্র, সোমবার।—প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘ পরিমাণ ১০। মেঘের গতি S. S. W.—N. N. E ; বিশাখা নক্ষত্র—প্রাতে বেলা ৮।১ মিঃ পর্য্যন্ত, পরে অনুরাধা নক্ষত্র। বায়ু S. W., বেশপ্রবল ভাবে বহিয়াছে। সমস্ত দিবা সূর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ইহা মেঘের গর্ভ। "পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে স্বভাঃ সপরিবেশাঃ।" এই মেঘের প্রসব কাল।—১৩২১ সাল ৩০এ আশ্বিন গত হইবার পরে চন্দ্র যখন বিশাখা নক্ষত্রে আসিবেন। অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস শুক্ল পক্ষ, বিশাখা নক্ষত্র (১৩২১ সাল, ৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার প্রাতঃকালেই এই মেঘ প্রসব করিবে।) গর্ভকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বায়ু

* পৌষে চ মার্গশীর্ষে সন্ধ্যায়াঃ রাগাম্বুদাসপরিবেশাঃ।
অত্যর্থং মৃগশীর্ষে শীতং পৌষেঽতি হিমপাতঃ॥
মাঘে প্রবলবায়োস্তুষারকলুষিতদ্যুতিং রবিশশাঙ্কৌ।
অতি শীতং সঘনশ্চ ভানোরস্তুদয়ৌ ধন্যৌ॥
ফাল্গুন মাসে রুক্ষশ্চণ্ডঃ পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃ।
পরিবেশাশ্চা সকলাঃ তাম্রেরবিশ্চ শুভঃ॥
ঘন-পবন-বৃষ্টিযুক্তা শ্চৈত্রে স্বভাঃ সপরিবেশাঃ।
ঘন-পবন-সলিল-বিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥"

বহিয়াছে, প্রসব কালে উত্তর-পূর্ব্ব দিকের মেঘ এবং বায়ু বহিবে।

আমরা ৩০এ চৈত্র তারিখের মেঘের গর্ভ এবং তাহার প্রসবকাল নির্দ্দেশ করিলাম। যাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞান দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রকার ছয়মাস পূর্ব্বে বলিতে পারেন কি, ব্যারোমিটার্, হাইগ্রোমিটার, ইত্যাদি মতে কোন্ দিন ঝড়বৃষ্টি হইবে ?

আর্য্যঋষিগণ যে ভাবে ঝড়বৃষ্টি এবং বর্ষার গণনা করিতেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে দেখাইলাম। আমরা কয়েকবৎসর মেঘের গর্ভলক্ষণ, এবং তাহার বৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, উহা শতকরা প্রায় ৭০।৭৫ ভাগ ঠিক মিলে। কোনও অজ্ঞাত কারণে শতকরা ২৫ টা মিলে না। সেও বোধ হয়, গর্ভলক্ষণ বুঝিবার অথবা লিখিবার ভুলেই হইয়া থাকে। ফলতঃ এই বিষয়টি ভালকরিয়া দেখিবার উপযুক্ত।

সপ্তনাড়ী চক্র

মেঘের গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বর্ষা-নির্ণয় করা অবশ্য কষ্টকর ব্যাপার। কারণ, ছয়মাস কাল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আধুনিক যে মেঘবিজ্ঞান পণ্ডিত-সমাজে আলোচিত হইতেছে, তাহাও কি আরও কষ্টসাধ্য নহে ? প্রতি ঘণ্টায় ব্যারোমিটার্, হাইগ্রো-মিটার, থারমমিটার্, র‍্যাডিওগ্রাফ্, স্পেক্‌ট্রোস্‌কোপ্, ইত্যাদি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি দেখিয়া লেখা, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আকাশ দেখা, ইহাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যিনি এই প্রকার যন্ত্রাদির রেজিষ্ট্রার্ হইবেন, তাঁহার শিক্ষাও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যাহার তাহার দ্বারা একার্য্য সম্ভব নহে। বিজ্ঞানসম্মত মেঘবিদ্যা বড়ই জটিল এবং দুরূহ।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় একটি বড় রহস্যজনক ব্যাপার হইয়াছিল। আলিপুর মেট্রোলজিক্যাল্ অফিসে বঙ্গোপসাগর হইতে একটা ঝড়ের টেলিগ্রাম্ আসে। সেই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণাকাশে একটা মেঘও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এজন্য কলিকাতার বন্দরে মহাঝড়ের সংকেতসূচক চিহ্ন (Storm signal) প্রদর্শিত হয়। মুহূর্ত্ত মাত্রেই সকল জাহাজের পাল গুটাইবার জন্য নাবিকবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত হয়।

কলিকাতার বড়বাজারে সেই সময় বৃষ্টিবর্ষার একটা বাজীখেলা চলিত। যাহার মেঘবিদ্যা যে প্রকার, সে বাজারে তাহার তদনুরূপ লাভালাভ ছিল। এই বাজারে 'ভিখা' নামে একজন মেঘবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।* পোর্টকমিসনর মহোদয়দিগের Storm signal উত্থিত হইবা মাত্র সেই বাজারের দর নামিয়া "বরাবর্" (par) হইয়াছিল। বৃষ্টি হইবে, এই জন্য নানা জাতীয় লোকে আসিয়া টাকা "লাগাইবার" জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল 'ভিখা'—ছাতের উপর উঠিয়া সেই দক্ষিণ দিকস্থ মেঘের প্রতি তীব্র-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিছু কাল এই ভাবে দেখিতে দেখিতে, সেই মেঘে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। 'ভিখা' সেই বিদ্যুৎ দেখিবামাত্র হাসিয়া বলিলেন, "দশ রোজ্ শুখ্‌খা"—ইহার অর্থ এই যে, যদিও পোর্ট কমিসনারদিগের ঝঞ্ঝাবাতের নিশান উঠিয়াছে, এবং জাহাজ সকলের পাল বাঁধা হইতেছে, কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে দশ দিবস বৃষ্টিবর্ষা হইবে না। এই বলিয়া ভিখা সেই সময়ের অধিকাংশ টাকা নিজে লইয়াছিলেন। আমরা এই ব্যাপারে কৌতূহলী দর্শক ছিলাম। সেই দিন অবধি দশ দিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় বৃষ্টি হয় নাই। ভিখা-নামক ব্রাহ্মণ রংরাজ ঐ দশদিনে লক্ষাধিক টাকা লাভ করিয়াছিলেন। †

যন্ত্রাদি সাহায্যে বর্ত্তমানকালের যে মেঘবিদ্যা, তদপেক্ষা ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে মেঘবর্ষার জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ, আমরা তাহাতে সন্দেহের কারণাভাব মনে করি। কিন্তু ঋষি-প্রণীত পথে মেঘবিদ্যার অনুশীলন করিতেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আমাদের অনেক উপকারে আসিবে, এ কথাও আমরা বলিতে বাধ্য।

ভগবান্ মহাদেবও মেঘবিদ্যা বলিয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

* ইনি এখনও জীবিত আছেন।

† আমরা জানি, হাবড়ার সুপ্রসিদ্ধ ধনী, একাধিক ইংরাজ বাণিজ্যালয়ের মুৎসুদ্দি শ্রীযুত হরদৎরায় চামারিয়া একজন বিখ্যাত মেঘবিদ্যা-বিশারদ। এই বিদ্যাই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল। প্রথম জীবনে শীতকালের রাত্রিতে কম্বলমুড়ি দিয়া ছাদের উপরি বসিয়া, আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত রাত্রি তিনি মেঘের জন্ম নিরীক্ষণ করিতেন। বৃষ্টিপাত বিষয়ে তাঁহার গণনা প্রায়ই অব্যর্থ হইত।—ভাঃ সং।

নরওয়ে ভ্রমণ

[শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা—লিখিত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের ভাসমান গৃহে ফিরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখি—আজ সরিৎপতির মেজাজ তত সরিফ্‌ নয়, বড় যেন উগ্রভাব। এতদিন ইঁহার সহিত বাস করিয়া এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, এঁর স্বভাবটা একটু খাম্‌খেয়ালি গোছের। কিসে হাসেন, কিসে কাঁদেন,—কেন নাচেন, কেন গান,—কখন ঘুমান, কখন যে জাগেন—কিছুরই ঠিক নাই। হাঁ, মহানুভব মাত্রেরই, কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকেই। আমরা অল্পমতি, সে সমুদায়ের বিচার না করিলেই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের চোখেও যদি ঐ সব মহাজনের দুই একটা দোষ ত্রুটী পড়ে, তা কি বলিতে নাই? আমরা যখন দেখি যে, তিনি রত্নাকর হইয়াও, অতিথি-সৎকার জানেন না, তখন একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। এই যে এত লোক তাঁর সীমানা দিয়া দিনরাত আনাগোনা করিতেছে, কৈ কাকেও ত এক কণা দানা দেওয়া দূরে থাক্‌, এক ছিটা নুন দিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না! বরং উল্টাই করেন, যাত্রীরা যা কিছু সঙ্গে আনে, মাঝে মাঝে তৎসমুদয় লুটপাট করিয়া আত্মসাৎ করিবারই চেষ্টা বেশী। মণিমুক্তায় যাঁর ভাণ্ডার বোঝাই, তাঁর এই পরস্ব-হরণের প্রবৃত্তিকে, আমাদের দেশের স্থায়শাস্ত্র সায় দিতে পারে কি? এমন কি সামান্য আহার্য্য-সামগ্রী পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি। এই এক দোষে এঁকে অনেকেরই চোখে এমন বিষ করিয়া রাখিয়াছে, যে পারতপক্ষে আর তারা এঁর মুখদর্শন করিতে চায় না। সেই যে কথায় বলে "হাতে মারেন না ত, ভাতে মারেন" সেই দশা। আজন্মকাল ধরিয়া তাঁর এই নিষ্ঠুর লীলা চলিতেছে, আজ অবধি ইহার প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। আশ্চর্য্য! সমস্ত রাতই তাঁর ডাক হাক্‌ চলিল। প্রভাতে আচম্বিতে প্রিয়বয়স্য ফিয়র্ডের সাক্ষাৎ পাইয়া যেন সাপের মাথায় ধূলি পড়িল। জলযানের আরোহীদিগের অধিকাংশেরই ক্লিষ্ট মুখের কাতরভাব দেখিয়া, তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা,
(তুমি যখন) মারিলে মারিতে পার
তখন রাখিতে কে করে মানা।"

আর মুখে কথাটি নাই। রাজোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন

দুই—স্ক্রু যুক্ত "ন্যাণ্ট্যা" জাহাজ
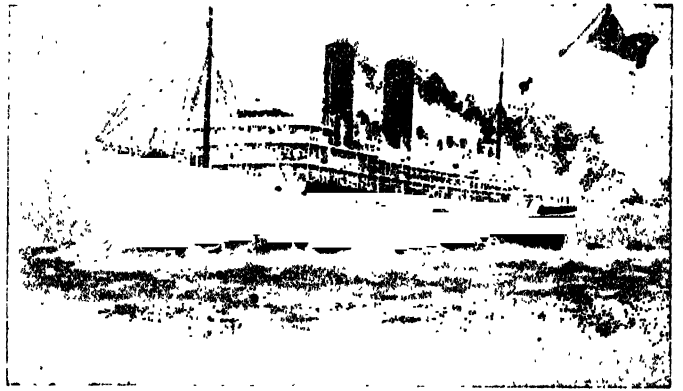
করেন নাই বলিয়া সিন্ধুরাজ বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। সকল দম্ভ দূরে গেল, মাটীর মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু প্রিয় বয়স্যের তবু মন উঠিল না। তিনি সেদিনকার মত বন্ধুর সহবাসে বীতস্পৃহা দেখাইয়া আনমনে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে ফিরিয়া চলিলেন। আমরা তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না। ইঙ্গিতে আমাদের তরী ঘুরিয়া চলিল। তখন বিজ্ঞাপনের আশ্রয় লইলাম। তাতে জানিলাম যে, এই ফিয়র্ড্‌ আমাদিগকে "Gudvangen" নামক স্থানের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। তারপর সেখান হইতে অশ্বযানে অৰ্দ্ধ-পথ চলা। যে ইচ্ছা করিবে,

সেই অন্ধ-পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাহাজে জলপথে সে স্থানের শেষ সীমায় পৌছিতে পারিবে। যার ইচ্ছা সেখান হইতে রেল গাড়ীতে গিয়া, তার পরদিন আসিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইবে। এস্থলে যে অনেকেই রেল-পথে যাওয়া স্থির করিলেন, সেটা দেশ দেখিবার উৎসাহে যত না হউক, জলনিধির গত রাত্রের গরম মেজাজের জন্যই বেশী।

ফিয়ডের দৃশ্য

ফিয়ডের এলাকা শেষ হইতে না হইতেই, কুক কোম্পানীর ভেরীর ভাঙ্গা-গলার বিকট আওয়াজ কাণে গেল। আজ বহুদূরের পথ যাইতে হইবে বলিয়া ভাল ভাল ঘোড়ার গাড়ী হাজির রহিয়াছে দেখিলাম। অশ্বগণ তেজ সংবরণ করিতে না পারিয়া ক্রমাগত নাচিতেছে, দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। জল ছাড়িয়া মাটীতে পা দিতেই, বন্ধুভাবে কে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তখন ভাবিলাম, কি কুক্ষণেই বিধি আমাদের গায়ে কাল রঙ্ মাখাইয়াছিলেন! তার আকর্ষণেই না এ সকল স্থানের পথ-প্রদর্শকগণ হাস্যবদনে আমাদের সন্নিধানেই আসিতে ব্যস্ত। তা, যারা স্থানের ইতিহাস বলিয়া দেয়, চিত্র-পরিচয় করায়, তারা কিছু মন্দ লোক নয়। বরং সহ-যাত্রীদের অনেকেরই আমাদের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ যে, আমরা গাইড্ ভায়াদের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছি।

আজ যে উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতেছি, তার দুই দিকেই দুইটি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত। মনে হইল এই যে, চতুর্দ্দিকে ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ, যুগ যুগান্তর হইতে সমাধিস্থ হইয়া আপনাদের পবিত্র দেহকে পাষাণব করিয়া রাখিয়াছেন, বুঝিবা তাঁহাদেরই সুকৃতির ফলে এ স্থান দিয়া নিরন্তর এই পুণ্যপ্রবাহ বহিয়া থাকে। কা অনন্ত, আর সৃষ্টিলীলাও অপরিমিত, তাই এই ক্ষুদ্র প্রা এই স্থানের কিছুরই সন্ধান পাইতেছে না, অভূতপূর্ব্ব রহস্যে পড়িয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়া আছে।

এমন জায়গায়, গাইড মহাশয়ের বেশী পাণ্ডিত্য দেখাইবার উপায় নাই। কেন না প্রকৃতি দেবীর, এত সব কারিগরির, সন তারিখ তাঁর বড় জানা নাই। সুতরাং দৃশ্য বস্তুর বিষয়ে নূতন কিই বা বলিবেন। তিনিও দুই চোখে যা দেখিতেছেন, আমাদেরও তেমনি দুইটী চক্ষু আছে। আজ বেচারা যেন একটু কাবু হইয়া, কেবল ভাবিতেছে যে, কখন বা এই অকৃত্রিমের মধ্যে কিছু কৃত্রিমের দেখা পাইবে, তখন তার কণ্ঠস্থ ঐতিহাসিক বিদ্যাটা একবার আমাদের কর্ণগোচর করাইয়া, প্রকৃতি দেবীর নিকট, বাধ্য হইয়া এই বেকুবী স্বীকারের প্রতিশোধ লইবে। এমন সময় বিঘ্নবিনাশন বিধি তার প্রতিবিধান করিলেন, দূর হইতে এক অট্টালিকার কিয়দংশ দেখা গেল; অমনই সেই বাগ্মীর বশীকৃত রসনা, এত ক্ষণের পুঞ্জীকৃত বাণী যেন একবারে উদ্গীরণ করিবার উপক্রম করিল। প্রথমে আমরা এই বাক্যস্রোতের উদ্ভব নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই নাই। কারণ বক্র পথের অদ্রিরাজি মুহূর্ত্তের জন্য সে অট্টালিকা অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা ভাবিলাম 'লোকটা বকে কি?' খানিক পরে চাহিয়া দেখি যে, সে বাতুল নয়, সম্মুখে বাড়ীই বটে। দেখিতে দেখিতে সে হর্ম্ম্য-সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম। আগেই বলিয়াছি যে, ইংরাজ জাতির, পরিপাটীরূপে আহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার স্থানের অসদ্ভাব কোথাও হইতে পারে না। ইহা ভোজনপ্রিয়তার পরিচায়ক, কি কার্য্যকুশলতার নিদর্শক? তা যে যাই মনে করুক, পর্য্যাটকের পক্ষে এ অবস্থা যে সুবিধাজনক, সে তো স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের গন্তব্য স্থানের এইটীই বিশ্রাম স্থল। এখান হইতে কেহ কেহ অগ্রসর হইবার পক্ষে, কেহ বা পুনরায় অর্ণবপোতে

প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছু হইলেন। আমরা প্রথম দলে রহিলাম। এখানকার আহারবিধি যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, ইহা বলা বাহুল্য। বাহিরে আসিয়া দেখি, নানাবিধ নৃত্যগীত-বাদ্যের চর্চ্চা চলিতেছে। ভ্রমণ-কারীদের চিত্তবিনোদনার্থ আসেপাশের গরীবদুঃখীরা মিলিয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। মেণ্ডেনীন নামক বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে গান বড় মিষ্ট শুনাইতে-ছিল। সামান্য সাজগোজ্ করা, কৃষক-দুহিতারা, যে তালে তালে তাহাদের কঠোর পদ-বিন্যাস করিতেছিল, তা'ও মন্দ লাগে নাই। বেহালা, ফ্লুট, ক্লেরিওনেট্ ইত্যাদি হরেক রকমের যন্ত্র হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া কেমন একটা হটুগোল বাধিয়া গিয়াছিল। কোন্‌টা যে শুনিব, ভাবিয়া পাই না; অবশেষে যার যার পথে যাইবার সময় সমাগত হওয়ায়, এ আমোদ বন্ধ করিতে হইল। যার যাতে মনস্তুষ্টি হইয়াছিল সেই অনুসারে দক্ষিণা দিয়া, এই দীনদুঃখীদিগকে বিদায় করিল।

গড্ডাঞ্জেন্—প্রথম দৃশ্য

এবারে আরও ৬ ঘণ্টার পথ ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট হোটেলে রাত্রিবাস। পর দিন রেলগাড়ীতে অবশিষ্ট রাস্তা শেষ করিয়া জাহাজ-ধরা। এই গিরিসঙ্কুল পথের দুই ধারে কৃষকদিগের শস্যক্ষেত্র সকল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। মাঝে মাঝে এই শ্যামল সুন্দর শোভা দেখিয়া, ভ্রম হইতেছিল, বুঝি বা আপনার দেশেই ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। কেননা সেই ভুবন-মনোমোহিনীর ত দেশ বুঝিয়া বেশবিন্যাসের পার্থক্য নাই। এখানেও তাঁর—

> "নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণতল,
> অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল"।'

তিনি এখানে ও "পুণ্য শুভ্র তুষারকিরীটিনী" কিন্তু যখন তাঁর কৃষকদের নগ্ন পদে, পাদুকা সংযোগ ; তাদের অনাবৃত অঙ্গে সভ্যতাসূচক সার্ট সংলগ্ন, যদিও তা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ শীর্ণ; পরণের শাদা ধুতির জায়গায় পায়জামা সন্নিবেশিত, আর খোলা মাথা, সোলার হেটে আবৃত; এবং তৎসঙ্গ কৃষকজায়ার অঞ্চলোচিত অঙ্গে জামা আঁটা, রুক্ষ কেশে বেণী বাঁধা, তার আজানুলম্বিত অনতিদীর্ঘ মোটা বুনট্ শাটীর বদলে কৃষিকার্য্যনিবন্ধন বির্মলিন ঘেরোয়া ঘাগ্‌রা দেখা যায়, তখন কি আর দেশ কি বিদেশ, এই ভুল ভাঙ্গিতে দেরী লাগে? তারপর বাড়ীঘর গাইবাছুরের ত কথাই নাই। সে খড়ের ঘরের কাঁচা মেজে, লেপা পোছায় সদাই ভিজে, এককোণেতে গোলাঘর, তাতে বোঝাই করা ধান জড়, ঢেঁকিতে সে ধান ভানা, তারই খুদ-কড়া দিয়া প্রস্তুত গাই-বলদের জাব্‌না—কিছুই এখানে দেখিলাম না। এদের আছে পাকা ইঁটের পাকা দালান, আঙ্গিনাতে ফুলের বাগান, কলেতে চাসবাস করা, ক্ষেতের চারিধারে আঙ্গুরের বেড়া, রাস্তাঘাট সব দুরস্ত, গাই-বাছুর সব মস্ত মস্ত। এই সব দেখিতে দেখিতে ছয়টা ঘণ্টা বেশ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সেই নির্দ্ধারিত হোটেলে আসা গেল। আমাদের যাওয়ার পরেই, সেই পান্থশালার তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং আমাদিগের তত্ত্ব লইতে আসিলেন। আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমাদিগের নিজ নিজ কামরার নম্বর জানিবার জন্য একটা বোর্ডের সাম্‌নে লইয়া গেলেন। পূর্ব্বেই তারযোগে আমাদিগের নামের তালিকা কুক্ কোম্পানী ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তখন নম্বর জানিয়া, বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় সে ঘরের পরিচারিকাকে ডাকা হইলেই, এক প্রবীণা অঙ্গনা আসিয়া আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সেই ভাষাবিভ্রাট্! সে বেচারা হাতমুখের চালনায় যতটুকু পারা যায়, বুঝাইয়া

"ষ্ট্যাল্‌হাম্‌ হোটেল্‌"—পন্ট্রাঙ্গেন্‌

বার অনেক আগেই আমরা প্রস্তু হইয়া বসিয়া ছিলাম। শীতের দেশে সুখের শয্যা ছাড়িয়া, সকাল সক উঠা ত সোজা কথা নয়? তা মনের জোর চাই। তারপর, ভে বলিতে, এদেশে সেই স্নিগ্ধ মনোহ ঊষার আলো নাই, যে দেখিয়া অসম ঘুমভাঙ্গার সকল কষ্ট দূর হইবে তা যাক্‌, দেশ দেখিতে আসিয়া কেবল নিছক্‌ সুখই পাব, এমন কি কথা—আর তা হবার যো নাই!—দুঃ যে সুখের নিত্য ভাণ্ডারী! এই বলিয়া মনটাকে প্রবো দিয়া, যথাশক্তি অন্তরে বল-সঞ্চয় করিয়া গাড়ীতে গিয় উঠিলাম। এ হোটেলের গায়েই রেল যাতায়ত করে, এই সুবিধার জন্যই এর এত খাতির।

আজ ট্রেণ বেশী বেগে চলিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, (Tunnel) রাস্তা দুর্গম। ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকার, যেন এক বৈদ্যুতিক খেলা চলিয়াছে। গাড়ীর ভিতরে মহা হাসির ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে, আচম্বিতে একেবারে দেহের বিলোপ। যেন কোন ফোন্‌ (Phone) সহযোগে কলে কথা চলিতেছে। সতত পরোপকারী গাইড্‌ বেচারী অন্য গাড়ীতে ছিল, আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসার জন্য, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে আমাদের ইচ্ছামত আরাম উপভোগের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও, ভদ্রতার খাতিরে হাসি-মুখে তাকে বসিতে বলিতে হইল। জানি, যে আজ তার বক্তৃতা বহুক্ষণ চলিবে। কেন না কত নদী, কত হ্রদ, কত পাহাড়, কত পর্ব্বত, কত পল্লী, কত জনপদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে হোটেলের রক্ষিত মানচিত্রে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ সকলের নাম, ছাই মনেও থাকেনা—উচ্চারণ ত ঠিক হয়ই না, শুধুই শোনা, তাও আবার সকল সময় হইয়া উঠে না—এই বড় আপ্‌সোস্‌। কথায় কথায় সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের দেশটা দেখিতে কেমন? এতই কি সুন্দর?" হা কপাল! দেশের কিই বা দেখিয়াছি যে, মুখ ভরিয়া তার বর্ণনা করিব। সেই আমাদের "সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী"ই না

আমাদিগকে ঘরে লইয়া চলিল। পথমধ্যে আমাদিগের জাতি-কুলশীল জানিবার একটা উগ্র বাসনা, যেন তার কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টিতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, বামে দক্ষিণে ঘুরিয়া ফিরিয়া, তবে ঘর পাওয়া যায়। বিখ্যাত হোটেল হইলেই তার কামরার সংখ্যাও বহু হইয়া থাকে।

আমরা জাতে বাঙ্গালী, তাতে স্ত্রীলোক, বে টাইম্‌ খাওয়া শোয়াই আমাদের অভ্যাস; এসব বিষয়ে কড়াকড়ি বিধি-ব্যবস্থা সব সময় আমাদের ভাল লাগেনা, পোষায়ও না। অথচ এদের কাছে নিজেদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে, কেমন আত্মগৌরবে আঘাত পড়িল, তাই বিশ্রামসুখে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, আহ্বানমত সকলের সঙ্গে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। এ হোটেলে প্রতিদিন অনেক বাহিরের লোক এসময় আহার করিতে আসে। এত অজানা মুখ দেখিয়া কেমন একটা অশোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। নরওইজীনদের কাছে যেন আমরা বিধাতার এক নূতন সৃষ্ট বস্তু হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারা আমাদের যত দেখে, আঁখির পিপাসা যেন আর মিটেনা। এত নজর দিলে কি আর প্রাণ বাঁচে? কাজেই অশোয়াস্তি। আহার শেষ হইতে না হইতেই চট্‌পট্‌ উঠিয়া ঘরে চলিয়া আসিলাম। বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম, শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু নোটিসে যে লেখা ছিল, ৫টা ভোরে রেল ছাড়িবে, সেই তাড়ায় ভাল ঘুম হইতে দিল না। বালিশের নীচের ঘড়ী তোলা, দেখা এবং পুনঃ যথাস্থানে রাখা, এই কর্ম্মেতেই ঘুমের দফা রফা! পরিচারিকা আসিয়া জাগাই-

"ভুবন মনোমোহিনী"। তার তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের কাছে দাঁড়াইতে পারে, এমন কোন্ শিখর জগতে আছে? তার শুভ্র তুষার-কিরীটের তুলনায় আর সব লাগে কোথায়? শুধু শোভায় কেন? "প্রথম প্রচারিত যার বন-ভবনে, পুণ্য ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী" আজও তাকে দেখিতে দূর—দূর দেশান্তর হইতে দলে দলে কত কত লোক আসিতেছে! আর আমরা অমন আপনার দেশ অবহেলা করিয়া পরের দেশে ছুটিয়া আসিয়াছি! ছি! লজ্জার কথা! তবে ঐ যা বলেছি, কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজের দেশ দেখা, কলিকালের আমাদের সভ্য-সমাজের সুখী প্রাণে হয় না। তীর্থদর্শনের পুণ্যফলে তাদের তেমন আস্থা নাই বলিয়া, পথঘাটের সাবেকী ধরণের ব্যবস্থা তাদের মাপিকসই নয়। তাতে, দীনদুঃখীরও প্রাণের যে ভক্তিবল, পথের আসল সম্বল, তাও তাদের নাই। এমন অবস্থায় যদি P. & O. আর কুক কোম্পানাকে পয়সা দিলেই তারা সুখসুবিধায় এ সকল রাজ্য দেখায়, তবে পথকষ্ট-অসহিষ্ণু, সৌখীনপ্রাণ প্রলুব্ধ না হবে কেন? অতএব আপনা হইতেই যে নিজ দোষদুর্ব্বলতা মাথা পাতিয়া মানিয়া লয়, তাকে আর পরিহাস বাক্যে মর্ম্মাহত করা সজ্জনোচিত হয় কি? যাক্, নির্ব্বাক্ দেখিয়া সে বাক্যবাগীশ একটু ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করিল যে, "সে যে শুনিয়াছে, আমাদের দেশটা একটা বাঘভাল্লুকের মুল্লুক, তাই কি?" আর সহ্য হইল না—অমনই গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলাম—

"হাঁ, আমাদের দেশে বাঘ ভাল্লুক বাস করে বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাদেরই মুল্লুক একথা মানিতে পারি না। কি জান! দেশটা বহু বিস্তৃত হইলেই, তার ঝোপ জঙ্গল থাকবেই; তাতে গ্রীষ্ম প্রধানদেশ! যদি জিজ্ঞাসা কর, ইণ্ডিয়াটা কতবড়? তবে এক কথায় এই বলিতে পারি যে, তোমাদের মত কত নরওয়ে, তার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখিতে পার, কেহ টেরও পাবে না। এত যে তোমরা পাহাড়ের বড়াই কর? তোমাদের পাহাড়ের উচ্চতা দেখিলে আমাদের হাসি পায়। তবে দুই চার হাজার ফিট্ উচ্চতেই বরফ জমে বলিয়া তার একটা বিশেষ বাহার আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি ইত্যাদির বিপুলতা ও উচ্চতা তোমরা ধারণাই করিতে পারনা।"

সেও ছাড়িবার পাত্র নয়। একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "Lakes Madam, Lakes"। উত্তর করিলাম "তা তোমাদের মত মাঠে ঘাটে আমাদের Lakes নাই বটে, দু চার টা যা আছে তা তোমাদের নামজাদা হ্রদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। যা বল্‌ব! তোমাদের এই ফিয়র্ড্ বাস্তবিক এক অভিনব নৈসর্গিক দৃশ্য! ইহা আমাদের দেশে কেন, জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া জানিনা। এর কথা শুনেই আমরা এত দূরে দেখ্‌তে এসেছি এবং দেখে খুবই খুসীও হয়েছি"।

কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলাম, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ছিল না। এখন চাহিয়া দেখি, প্রশস্ত পাইন ফরেষ্টের (Pine Forest) মধ্য দিয়া যাইতেছি। মহীধরগণের পাষাণের কঠোরতার মধ্যে সহসা মহীরুহদিগের শাখা-পত্রের স্নিগ্ধ কোমল ছবি দেখিয়া ভাবিলাম, তাই ত!
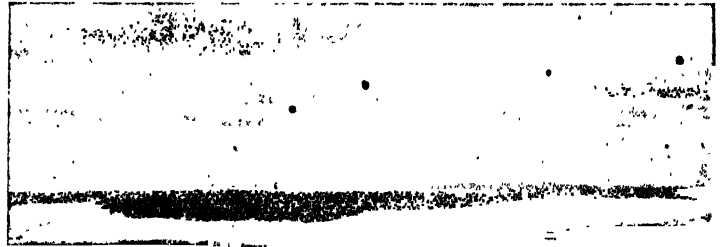
ফিয়র্ডের আর একটি দৃশ্য

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহিবিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

ফলতঃ সেই পরম পুরুষের এই লীলাবিগ্রহ কে বুঝিবে? মাঝে মাঝে আবার বৃহৎ হ্রদের জলস্রোত যেন তাঁহারই "বিগলিত করুণা" বহিয়া চলিয়াছে! শুষ্ক অচল এই জল না যোগাইলে, কে এখানে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? এখান হইতে আমাদিগের দোদুল্যমান প্রবাসগৃহ দেখা যাইতেছিল। অনেক আগেই সে আসিয়া আমাদের

প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। ট্রেণের দম্‌কল বন্ধ হইলেই, সে আপ্‌নার কলে দম্ দিবে। অনেকদিন পরে আপনার বাড়ী ঘর, আত্মীয়স্বজন দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, আজ যেন অন্তরমধ্যে সেই স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম। আজ আর দেশ বিদেশের পার্থক্য মনে নাই, গায়ের কাল রঙের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তারাও হাসে, আমরাও হাসি। তাদেরও একটা ভাবনা গেল, আমাদেরও তাই হইল। Tender হইতে জাহাজে উঠিতেই কাপ্তেন সাহেব হাত বাড়াইয়া দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন, পরে আমাদের পর্য্যটনের শুভাশুভ প্রশ্ন করিলেন। আমরাও যথারীতি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আমাদের ভ্রমণ ব্যাপার যে সর্ব্বথা আনন্দদায়ক হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলাম। তখন আরও অনেকে আসিয়া, ক্রমাগত আমাদিগকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সভ্য দেশ, কি রীতির দাস! পাখীর মত পড়া-কথা বলা ও শোনাই তাদের অভ্যাস। আমাদের কেমন বার বার একই উত্তর দিতে দিতে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তখন হুকুমের হাসিও হয়রান হইয়া পড়িল, আর তাহা দ্বারা কাজ হাসিল হয় না। সুতরাং কেবিনের আশ্রয় লওয়া গেল। আজ London হইতে ডাকের চিঠিপত্র পাইবার দিন। এই কার্য্যের বিলিব্যবস্থাপকের নিকট গিয়া আপন আপন চিঠিপত্র চাহিয়া আনিবার জন্য কেবিনের গায়ে বিজ্ঞাপন রাখা হইয়াছে। তাহাতে চোখ পড়িবামাত্র ছুটিতে হইল! কতদিন পরে দেশের খবর পাইব। সব মঙ্গল সংবাদ কি না, সঙ্গে সঙ্গে সে আশঙ্কা থাকাতে, প্রাণটা ছুটিলেও পাটা পিছে পড়িয়া থাকিতে চাহিল।

ইকেস্‌ডালেন্

জাহাজের 'মেইল ডে' এক মস্ত মহোৎসবের ব্যাপার। মা আছেন—সন্তানের সংবাদের আশায় উৎগ্রীব হইয়া, স্ত্রী থাকেন—স্বামীর খবরের অপেক্ষায় মুখ বাড়াইয়া, আর তরুণ প্রেমাসক্ত পাগলেরা আসে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড শূন্যভাবে দৌড়িয়া ;—দূরে দাঁড়াইয়া এসব ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে, কি যে আমোদ লাগে বলা যায় না। যার যার পদবীর প্রথম অক্ষরের পর্য্যায়ক্রমে চিঠি বাছিয়া রাখিবার নিয়ম। সভ্য দেশের সব বিষয়েই আবার পুরুষের আগে স্ত্রীলোকের পালা। সুতরাং পরবর্ত্তী জনদিগের এস্থলে উতলা হইয়া কোন লাভ নাই জানিয়া আশৈশব পুরুষজাতি এই সংযম শিক্ষা করে। আজও ইহারা, প্রাণের ভিতরে যাই করুক, মুখটী বুজিয়া, হাসিটী চাপিয়া নিজ নিজ অবসর অপেক্ষা করিতেছে। ইহা প্রশংসনীয় বলিতেই হইবে। সে কর্ম্মচারীর ঘরটী যে দূরে ছিল তা নয়, কিন্তু আজকার দিনে সেখানে পৌছান এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। একে লোকে লোকারণ্য, তাতে দাঁড়াইবার জায়গাটী অতি সঙ্কীর্ণ, বিধিকৃত আমাদের গায়ের রঙ্‌টী আবার কৃষ্ণবর্ণ,—কি জানি আমাদের সংস্পর্শে পাছে শ্বেতাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া যায়, সেই ভয়ে বলপূর্ব্বক অগ্রসর হওয়ার পক্ষে আমাদের মহা অন্তরায় ছিল। যদি বা দেহের দৈর্ঘ্য তেমন থাকিত, তবুও দূর হইতে, সে লিপিদান-কর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু বিধাতা পুরুষ তাতেও যে চির-বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এদেশের এত সব দীর্ঘাকার শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে দাঁড়াইলে খর্ব্বকায় আমরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ি যে! যাহা হউক, কোন প্রকারে পত্রাদি হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলাম এবং তাহা পাঠ করিয়া সকলের মঙ্গল সংবাদ জানিয়া উৎকণ্ঠার উপশম করিলাম।

হঠাৎ কেমন চটাচট্ কতকগুলা পায়ের শব্দ কাণে গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের খালাসী সব ছুটাছুটি করিতেছে, আর "আগুন" "আগুন" কি বলিতেছে। প্রথমে মনে আতঙ্ক হইল, বুঝিবা জাহাজে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত। কিন্তু ডেকে আসিতেই দূরবীক্ষণের ধূম দেখিয়া সে ভয় দূর হইল, বুঝিলাম পারে কোথাও কাপ্তানের হুকুম পাইবা মাত্র তারা জলীবোট বোঝাই হইয়া, সঙ্গে সব আস্‌বাব্ লইয়া, ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলিয়া নিমেষে গিয়া পারে পৌঁছিল। এবং তৎক্ষণাৎ কলে জল সেচিয়া দালানের ছাদে উঠিয়া নানাবিধ উপায়ে সেই দুর্দ্দমনীয় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানে সেদিন জর্ম্মানীর সম্রাট্ তাঁহার দলবল সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি প্রতিবৎসরই এই বিশেষ ফিয়ডে একবার করিয়া আসেন। এ স্থানটা তাঁর এতই পছন্দসই। তিনি তাঁহার শ্বেতাঙ্গ লোক লস্করকে, এই অগ্নিনির্ব্বাণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা তেমন পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক মনে না করাতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই পশ্চাৎপদ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রায় এক প্রহর সংগ্রামের পর যখন আমাদের লোকেরা কৃতকার্য্য হইয়া, ক্লান্ত দেহে ও প্রসন্নমুখে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শিক্ষিত সভ্য মণ্ডলীর, করতালির চোটে জাহাজ যেন ফাটিতে লাগিল। এতদিন যে কালো কালো কমিল্লাজিলার খালাসী গুলোর দিকে তাকাইবারও কারো প্রবৃত্তি হয় নাই, আজ তাহাদের সৎসাহস ও কার্য্য-কারিতা অজানিত দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম! বস্তুতঃ আজ ইহারা না থাকিলে, হুতাশন যে আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিত, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী বলিয়া, এই গরীবদুঃখীদের গৌরবে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিলাম। আজ ইহাদের সঙ্গে একীভূত ভাবে "ইণ্ডিয়ান্" বলিতে স্পর্দ্ধা অনুভব করিলাম। বিদেশে আসিলে, দেশের যে কোন লোকের প্রতি যে আপনার ভাব হয়, দেশে থাকিলে তেমনটী হয় না, আজ তাহা বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার ভ্রাতা ইহাদিগের এই অসম্ভব পরিশ্রমের কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছুক হইয়া চাঁদা-সংগ্রহের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। এবং চাঁদার বইএ, সই করিয়া বা কাহাকেও কিছু নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পাশ্চাত্য জাতি মাত্রেই, যে, সে দান কার্য্য বাস্তবে পরিণত করিতে, প্রায় কখনও কাল বিলম্ব করে না, বা তাহা কেবল মুখের কথায়, কি পুস্তকের পাতায়ই পর্য্যবসিত হয় না, ইহা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইল। বিন্দুর সমষ্টিতেই মহাসিন্ধুর উৎপত্তি, এস্থলেও তাহাই ঘটিল। দীনদুঃখিজন তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের এরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইল।

গদ্ভাঙ্গেন্—অপর একটি দৃশ্য

ক্রমশঃ

——

পণ্ডিত মশাই

[লেখক—শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৫)

কাল একটি দিনের মেলা-মেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে, ঠিক তেম্‌নি তাহাকে চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশ মাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের অগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাধিয়া ফেলিয়াছিল।

সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালা জোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিবে, এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ী ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুসি, আলো জ্বালিস্‌নি রে?" কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই দিই দাদা। কখন্ এলে?"

"এই ত আস্‌চি" বলিয়া কুঞ্জ অন্ধকারে সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনও প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেই সব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে-লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এত বড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, তাহা কি, এবং কতদূরে গিয়াছে, ইহাই জানিবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না, এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতে যাইতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা'হলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?" কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মা'র হাতে দিয়ে এলুম।"

"কি বল্‌লেন তিনি?"

"কিচ্ছুনা" বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, "তোর শাশুড়ী ঠাকরুণ কি একরকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা' একটি কথা বল্‌লে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বল্‌তে হয়, সে খুসী হয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, সাধ্য কি মা, যে-সে-লোক তোমার হাতের বালা হাতে রাখ্‌তে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ওকি রে?" কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু না। এ কথা তিনি বল্‌লেন?"

"হাঁ, সেই বল্‌লে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা'ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন,

তখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন, যে কি দিলুম, কি বল্লুম, তা' যেন বুঝতেই পারলেন না।" বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন চারি দিন গত হইয়াছে। রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এই মাত্র ভাই-বোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল। কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?" কুসুও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল - "আমি কারো কেনা দাসী নই—পারবনা রাঁধ্‌তে—যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনোগে।"

কুঞ্জর পেট জলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল— দুই আগে দূর হ', তখন আমি কিনা দেখিস।" বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেই দিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ত্যাগ করিলনা। দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্না-ঘরের চৌকাটে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না সুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধকরি তখন দশটা, ঘন্টা খানেক কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্র-পথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারি স্বামীর সন্তান তাহা সে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনিয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। তথাপি সে সাড়াদিতে, পা' বাড়াইতে পারিলনা, পাথরের মূর্ত্তির মত একভাবে পলকবিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাযে সে এই দিকে আসিয়াছিল, এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গো-যান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র 'চরণ' পূর্ব্বাহ্নেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সেও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল—"কেউ বাড়ী নেই নাকি?" তথাপি সাড়া নাই। চরণ কহিল—"জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।" বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক্ দিল—"না, পাবেনি। যাবার সময় নদীতে খাস।" সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু, আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোন মতেই সুমুখে আসিতে পারিতনা। সে একবার এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিল, তার পর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু, চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলনা। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়াই জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একেত, এই মাত্র সে ধমক্ খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে কে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোন দিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই। কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, জল দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবল বেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত

করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, 'ছি, বাবা, আমি যে মা হই।'

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোন মতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিতনা, কিন্তু, আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কথনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িতে পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইলনা? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এতবড় অনধিকার সংসারে কা'র আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল, ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিলনা। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু, চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধকরি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল—"ছেড়ে দাও।" কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, "মা বল, তা'হলে ছেড়ে দেব।" চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

"তা'হলে ছেড়ে দেবনা" বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, "মা না বল্‌লে কিছুতেই ছেড়ে দেবনা।"

চরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'মা।' ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হ'লরে চরণ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল, 'ছেড়ে দেয় না যে।'

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় কহিল, 'আজ চরণ আমার কাছে থাক।' বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, "ও থাকৃতে পারবে কেন? তা' ছাড়া এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।" কুসুম তেম্‌নি ভাবে জবাব দিল—"না, ও থাকৃবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।"

"মন খারাপ কেন?" কুসুম সে কথার উত্তর দিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "গাড়ী ফিরিয়ে দাও। বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি।" বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল। বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুসী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাকে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটু জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতা-মাতি করিয়া স্নান সারিয়া, কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতা-পুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে। ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু, দুঃখকষ্টের আভাস-মাত্রও বৃন্দাবন সে মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্যবিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপা-হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে ছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই, সহজভাবে কহিল, "এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।"

"তার পরে?"

"খাবে।"

"তার পরে?"

"খেয়ে একটু ঘুমোবে।"

"তার পরে?"

"যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরী ক'র না" বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বৃন্দাবন, গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং, তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা'হোক্ দুটো খাইয়ে দাও—আমাকে বাড়ী যেতেই হবে।

"যেতেই হবে কেন? গাড়ী ফিরে গেলেই মা বুঝ্তে পারবেন।"

"ঠিক সেই জন্যেই গাড়ী ফিরে যায়নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।" সম্বাদ শুনিয়া কুসুমের হাসি-মুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, মুখ তুলিয়া বলিল, "তা'হলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।" তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু, সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজ ভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েছি, কুসুম, যে মায়ের অমতে এ বাড়ীতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক্, সে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও, আর দেরী কোরো না, ওকে খাইয়ে দাওগে।" বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল। কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে পিতা-পুত্রে গাড়ী চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন, পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?" বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তোর মা হয় কে বলে দিলেরে?" চরণ জোর দিয়া কহিল, "হাঁ, আমার মা-ই'ত হয়—হয় না?" বৃন্দাবন এ কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকৃতে পারিস তোর মার কাছে?" চরণ খুসি হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "পারি বাবা।"

"আচ্ছা" বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ীর একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ণ বেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার তের বছরের বালক এদিকে ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার?"

"পারি, তুমি কোথা থেকে আস্চ?"

"বাড়ল থেকে। পণ্ডিত মশাই চিঠি দিয়েছেন" বলিয়া সে মলিন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা—বৃন্দাবনের স্বাক্ষর। কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্মত্ত আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি পণ্ডিত মশাই কাকে বল্‌ছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?" ছেলেটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পণ্ডিত মশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেনো?

"চিনি,—তিনিই'ত পণ্ডিত মশাই।"

"তাঁর কাছে তুমি পড়?"

"আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।"

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সমস্ত সম্বাদ জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতেই প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিত মশাই নিজেই বই, শ্লেট, পেন্‌সিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলা অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে, এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুই জন বয়স্ক ছাত্র, পাঠশালে ইংরাজি পড়ে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত নাই। অথচ, এই তাহার প্রথম পত্র। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু, সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেরই চিঠিপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ! আগাগোড়া কাযের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এই কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেন না, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, এবার সমস্ত অক্ষরগুলা তাহার চোখের সুমুখে

নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোন মতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

(৬)

মাসখানেক হইল কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ, গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার যো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ ছয় দিন ছিল। মনের মত নূতন মা পাইয়াই হৌক, বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হৌক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে, তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল! এই বিবাহ না হইতেই সে যে সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতে ছিল। দাদাকে সে ভাল মতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল দাদা শাশুড়ীর পরামর্শে এই দুঃখকষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘর-জামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া, বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনোহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রী হইল না। অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন চারিবার শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করিল। পূর্ব্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয়, কোথায় সরিয়া যায়—সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুর-বাড়ীর গল্প, এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ারী করে।

সে দিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্ণিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চক্‌চকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, "আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?" কুঞ্জ, হু বলিয়া নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল। খানিক পরে কুসুম মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেক দিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।"

কুঞ্জ উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, "তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।"

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সম্বরণ করিয়া বলিল, "ভালই থাক্। তবু একবার দেখে এসোগে, শ্বশুরবাড়ী কাল যেয়ো।" কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল, "কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটা পুরুষ মানুষ পর্য্যন্ত নেই। ঘরবাড়ী বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কত দিক সাম্‌লাই বল্‌ত?"

দাদার কথার ভঙ্গিতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "পার্‌বে সাম্‌লাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি, কেন, সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্চে।"

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া অতি রুক্ষ স্বরে কহিল,—"আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি, কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড় লোক যে একবার আস্‌তে পারলে না শুনি?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্ত ভাবে বলিল, তাঁর জ্বর হয়েছিল।

"হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বল্লেন, মিছে কথা। চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাষ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর বলে দিতে পারেন, তা' জানিস? নেমকহারাম আর কা'কে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখ্‌তেও চাইনে।" বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীর ভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল। কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল —নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেই দিন বেশী করে

পূজার্থিনী

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ লাহা]

খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে, ভয়ে, পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার এ বোধ করি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।" কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই, সে যেন শুনিতেই পাইল না এই রকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুসুম পুনরপি কহিল, "যা' তুমি তোমার বিয়ে আশয় বল্‌চ, সে কা'র হতে? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?"

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল—"কে কার বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বল্‌লেন, ফুল ফুটলে কেউ আট্‌কাতে পারে না! বিয়ে আপনি হয়!"

"আপনি হয়?"

"হয়ই ত।"

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এসব কথা যদি তাঁরা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে এই দুটি ভাই-বোন্ এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট কুড়ি পরে নূতন জুতার মচ্ মচ্ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ফির্‌বে?"

"কাল সকালে।"

"আমাকে বাড়ীতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না, লজ্জা হয় না?"

"কেন, এখানে কি বাঘ ভালুক আছে তোকে খেয়ে ফেল্‌বে? আমি সকালেইত ফিরে আস্‌ব" বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

(৭)

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেম্‌নি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও, আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।"

মা ঠাকুর ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি কর্‌বি?

"তোমার দাসী আন্‌ব। যে, চরণকে দেখ্‌বে, তোমার সেবা কর্‌বে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর ঘরের কাজ কর্‌তেও পারবে—হুকুম দেবেত মা?" প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একি তুই সত্যি বল্‌চিস বৃন্দাবন?

"সত্যি বই কি মা। ছেলে বেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান, কিন্তু, বড় হয়ে তোমার সাম্‌নে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা।

"আচ্ছা, ভেবে দেখি" বলিয়া মা একটু হাসিয়া কাজে মন দিলেন। বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বসিল। কহিল, "সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাব্‌তে সময় দেব না। যাহোক্ একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।"

"কেন ভাব্‌তে সময় দিবিনে?"

"তার কারণ আছে মা। তুমি ভেবে চিন্তে যা' বলবে সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভাল-মন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।"

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু, একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধা-সাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস্‌নি বৃন্দাবন?"

"তা' জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেচে" বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং, ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মা'র চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে ব'ল্‌ব।" বৃন্দাবন জিদ্ করিয়া কহিল, "যে কারণে ইতস্ততঃ কর্‌চ মা, তা' দুদিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয় তাকে তুমি ক্ষমা কোরো, কিন্তু, আমি কোরবোনা। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।"

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।"

এ নিঃশ্বাসের মর্ম্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু, সেও আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

"পণ্ডিত মশাই, আপনার চিঠি" বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানি পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র চিঠি বৃন্দাবন?"

"জানিনে মা, দেখি" বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই, বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে 'শ্রীচরণ কমলেষু" পাঠ লেখা আছে কিন্তু নীচে দস্তখত্ নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্ব্বে না দেখিলেও, তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র। সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবেনা। কেন, তাহা, অপরকে কিছুতেই বলা যায়না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ী গেলেন। হয়ত, কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ, বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ ভালুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।"

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বালে নাই! সারা দিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্র বার ঘর বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিলনা এবং এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারম্বার তাহার গায়ে কাঁটাদিতে লাগিল, এম্নি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জল-মগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা'দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্চেন?"

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।" কুসুম হাতে লইয়াই বুঝিল তাহাতে টাকা আছে। চরণ কহিল, "দিয়েই বাবা চলে গেলেন।" কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাথেকে চলে গেলেন রে?" চরণ হাত তুলিয়া বলিল, "ঐ যে তোথা থেকে।"

"এ পারে এসেছিলেন তিনি?" চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ এসেছিলেন ত'।" কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্য্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সেও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিলনা, বরং, শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন, সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে! তাঁর মিটিতে পারে, কিন্তু, অন্তর্যামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কি ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে, এবং, কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সে দিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যে দিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, "ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।"

অবশেষে, সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত বাকী রাখে নাই। বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই! ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া

পাইলনা, সেদিন এতবড় দুর্ম্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধ সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহমন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল, "কেন, একি আমার নিজের হাতে গড়া সম্বন্ধ, যে আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী ন'ন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু, একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্ত্তায়, একটি বেলার অতিক্ষুদ্র একটু খানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারেনা, এ আমি যে-কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, "মা মরিয়াছেন, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু, আমি যাই বলিনা কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্ম্মপত্নী তবে, কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্দ্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পাদিয়া ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু, তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই!" হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—"কি মা?" কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া, চুপি চুপি বলিল,—"কা'কে বেশী ভাল বাসিস্ বল্‌ত চরণ? তোর বাবাকে, না, আমাকে?" চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

"বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?"

"হাঁ' দেব।"

"তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি'ত?"

"হাঁ দেব।" কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল—"ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই!"

পরদিন সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল একটি প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শ্বাশুড়ী। শুধু, কৌতূহলবশে জামাতার কুটীর খানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কিনা!

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবনশ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিলনা। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, আর্দ্র এলো চুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বাম কক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘট। সংসারে এমন মাতৃমূর্ত্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শ্বাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, "এই কুসুম বুঝি?" কুঞ্জ খুসী হইয়া কহিল "হাঁ মা, আমার বোন্।" সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তা'ই কুসুম সেই খানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন, "এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।" ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, "আমি চরণ। ঠাকুমার সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে মামা বাবুর মেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।" কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"ছি, বাবা বল্‌তে নেই। মামীমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম বল্‌তে হয়।" কুঞ্জর শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? এক ফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!"

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসি-মুখ এক মুহূর্ত্তে কালী

হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পরে, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুঞ্জ নির্ব্বোধ হইলেও শাশুড়ীর এতবড় রূঢ় কথাটা তাহার কাণে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল, কুসুম ইঁহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স, চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরণে থান কাপড়, কিন্তু, গলায় সোণার হার, কাণে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু—নিজের শাশুড়ীর সহিত তুলনা করিয়া ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

দাদার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশী খান। সকাল হইতে সুরু করিয়া সারাদিনই সেটা ঘন ঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলক-সেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আর্শিটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই। কুসুম নিত্যপূজা সারিয়া, রাঁধিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কই গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলক-সেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?" কুসুম সংক্ষেপে কহিল, "আমি ওসব করিনে।"

"করিনে বল্লে চল্বে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্য্যন্ত খাবে না যে!"

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার তা'হলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?"

"আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত!" কুসুম জবাব দিল না। কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চরণ কখন্ এলো কুসুম?"

"কাল, সন্ধ্যার সময়।"

কুঞ্জর শাশুড়ী কহিলেন, "এই শুনি, বিনোদ বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু, ছেলে চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!" কুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কোথায় শুন্‌লে মা?" মা গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "আমার আরও চারটে চোক কাণ আছে। তা' সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজী হ'ল না। লোকে নানা কথা বল্‌বেই ত। পাড়ায় পাঁচ জন ছেলে ছোক্‌রা আছে, তোমার বোনের এই সোমও বয়স, এমন কাঁচা সোণার রং—লোকে কথায় বলে মন না মতি, পা ফস্‌কাতে, মন টল্‌তে, মানুষের কতক্ষণ বাছা?" কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা মা।" কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা! উঠে যাও।"

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "দাদাকে ঢাক্‌লেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়্‌বে না বাছা? এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখ্‌লে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?"

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।"

তাহার চীৎকার ও চোখ-মুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম্ করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালী করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে এমন হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

(৮)

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ী যে বিবাদ-সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা'ছাড়া তাঁহার বলার মর্ম্মটা

ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন এক সময়ে গ্রহণেচ্ছু থাকা সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহারত অগোচর নাই ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি, অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কায হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ী সে দিন সারাদিন আহার করে নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাটমানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মানরক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্ত দিন ভগিনীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ী কথা-কহেন নাই। বরং, জামাইকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "কুঞ্জনাথকে ঘরবাড়ী বিষয়সম্পত্তি দেখ্‌তে হবে, এখানে বোন্ আগ্‌লে বসে থাক্‌লেইত' তার চল্‌বে না!"

কুসুমের দিক হইতে একথার জবাব ছিল না। তাই, সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়াছিল। সত্যইত! দাদা এদিক-ওদিক দুদিক সাম্‌লাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন, প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু, যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্ত্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন, কলহও হয় না। কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তিও হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন, এক রাত্রি বাড়ীতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য, দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙিয়াছে।

তথাপি, এসব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু, সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না,—এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে, দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু, সেই 'মা, মা', করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং, কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে সে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ, যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা'ত আসিলই না, দুছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু, আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে, কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদু কণ্ঠে বলিয়া বসিল, "এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরী হবে না, দুটো খেয়ে যাও না।"

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "যা' ভেবেচি তাই। অম্‌নি পিছু ডেকে বস্‌লি?"

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু, এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পাল্টা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু, অতি কঠোর স্বরে বলিল, "তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মর্‌বে না। না'হলে আজ পর্য্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।"

"আমি মানুষ নই?"

"না। কুকুর-বেরালও নও—তারা তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেমকহারাম নয়" বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাহিরের দরজা তেম্‌নি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘণ্টা খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কুঞ্জর ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ,—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া 'কেঁউ' করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকি আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ী ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শ্রান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল, জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল। হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া, একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "মা কাঁদ্‌চে বাবা।"

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?" কুসুম তখনও নিজেকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই, জবাব দিতে পারিল না। বৃন্দাবন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?" কুসুম রুদ্ধ স্বরে কহিল, "মরে গেছে।"

"আহা, মরে গেল? কি হয়েছিল?" তাহার গম্ভীর স্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ, তামাসা কোরোনা। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, এখন ও-সব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কি এম্‌নি করে তার শোধ দিতে এলে?" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু, ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "ডেকে পাঠিয়েচ কেন?"

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, "না এলে আমি বলি কা'কে? আগে বরং নিজের কাযেও এদিকে আস্‌তে যেতে, এখন ভুলেও আর এ পথ মাড়াও না।"

বৃন্দাবন কহিল, ভুল্‌তে পারিনি বলেই মাড়াইনে, পারলে হয়ত মাড়াতুম। যাক্, কি কথা?

"এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?"

বৃন্দাবন হাসিল। তারপরে শান্তকণ্ঠে কহিল, "তাড়া দিইনি, ভাল ভাবেই জান্‌তে চাচ্চি। যেমন করে বল্‌লে সুবিধে হয়, বেশত, তুমি তেম্‌নি করেই বলনা।"

কুসুম কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞেসা করব বলে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি,—আমি চুল এলো করে পথে ঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই একথা কে রটিয়েছিল?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, "আমি। তার পরে?"

"তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—" কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু, সেদিন বলেও ছিলে, ভেবেও ছিলে। আমি বড়লোক হয়ে, শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাই-দের নিয়ে থেতে এসেছিলুম—সেদিন পেরেছি আর আজ পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি।"

"এখন পেরেচ?"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়িকুড়ি রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল!"

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, "যাক্‌গে। আমি ত খাবোনা,—আগে জান্‌লে রাঁধতেই যেতুম না।"

"আজ একাদশী বুঝি?"

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ও সব আমি করিনে।

"কর না?" কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া

রহিল। বৃন্দাবন সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?"

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, "করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্ব্বনাশ করতে চায়না সেই জন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু, সত্যি বল্‌চি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।"

বৃন্দাবন কহিল, "সেটা কোরোনা। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু, দাদার ব্যবহার অসহ্য হ'ল কেন?"

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "সে আর এক মহাভারত—তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবেন না—তাঁর শাশুড়ীর হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হোতো। এখন আমি—" সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি, না, তার পরে বলিল, "এখন আমি তাঁদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই এক দিন, এক দণ্ডও এখানে আর থাকতে চাইনে।"

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, "তাই থাক্‌তে ইচ্ছে নেই?"

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নীচু করিল। এই সহজ, সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল। বৃন্দাবন বলিল, "চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু, কোথায় থাকতে চাও তুমি?"

কুসুম তেম্‌নি নতমুখেই বলিল, "কি করে জান্‌ব? তাঁরাই জানেন।"

"তাঁরা কে?—আমি?"

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল। বৃন্দাবন কহিল, "সে হয়না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে, যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?"

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, "বলেছি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু, কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?"

বৃন্দাবন বলিল, তা' জানিনে, কিন্তু, পারলে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখ্‌তে পাইনে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "আমি যাবনা।" 'খুসী তোমার।' সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু, এখানেও আমার যে, আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা, নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু, তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?"

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেলা হ'ল। চরণ তুই থাক্‌বি, না, যাবি রে? থাক্‌বি? আচ্ছা, থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে দিয়ো। আমার বিশ্বাস, ওবাড়ীতে ওর হাত ধরে মায়ের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হোতো না। যাক্, চল্লুম—" বলিয়া পা বাড়াইতেই কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ সমস্ত বুঝ্‌লুম। আমার এতবড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে 'বেলা হ'ল চল্লুম' আমি কত নিরাশ্রয় তা' স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন, তোমাকে বল্‌বার, বা, আশা করবার আমার আর কিছু নেই। তবু, আরও একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?"

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং, তুমিই নিতে বারম্বার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্ম্মতি হয়েছিল, যার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে ফেলেচি, অন্তর্যামী জানেন, সে দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না—তাই, আমার মা, স্বামি-

পুত্র, ঘরবাড়ী সব থাকৃতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ীর মুখ দেখ্‌তে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক্‌, তবুত আমি সে বাড়ীর বৌ। কি ক'রে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোনো সোজা পথ দেখ্‌তে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছ-বৃত্তি ক'রে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প! আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু, তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মাল-মশলা যুগিয়ে দেবনা!

বৃন্দাবন অবাক্ হইয়া দাড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—"চল্লুম। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।"

কুসুম তেম্‌নি ভাবে জবাব দিল—"যাও। দাড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বোলো না—জিজ্ঞেসা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোনো সন্দেহ হয়েচে! যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সাম্‌নে দাড়িয়ে শপথ কচ্চি—"

বৃন্দাবন দুই এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "ওকি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি।" তাহার অর্দ্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় ভাবে কহিল, "তা ছাড়া, পরের চলা-ফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও আমি চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে" বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। চরণ কহিল, মা নদীতে নাইতে যাবে না? কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া একপা একপা করিয়া ঘরে আসিয়া, শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(৯)

অনেক দিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সম্বাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দাদার সেই একই ভাব,—সর্ব্ব রকমে প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া, কিংবা পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাটবাজার করিয়া দেয়, এম্‌নি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কায করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎগুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সেই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্ণ বেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে, সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল। যে দিন তাঁহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামিসম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কায ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানা ভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটি-মাত্র চিন্তাকেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ,

অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তারপরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামি-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্যে সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল "যাহোক কিছু।"

তাহার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নারী-দেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কাজ নিত্য করিতে পায়, এসংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষ দিনের কথা। যে দিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সে দিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু, তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন, যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে, চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যই যদি সে না আসে, তবে, একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে-সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বে ছিল, যাহা, এ দুর্দ্দিনে হয়ত, তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কাণে কাণে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলে-বেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে হিঁদুর মেয়ে, অতএব, যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোন মতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক্, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালবাসিতে পারে না। তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাযে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহ মন এমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে, ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এই জন্য সদর দরজা খোলাছিল, হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জ নাথ বাবু চাকর সঙ্গে করিয়া, বিলাতি জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রু-কলুষিত রাঙা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না। কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সুমুখে আসিয়া কহিল, "তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!" কুসুমের বক্ষ-স্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ, গলা চড়াইয়া কহিল, "কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি কোরে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখ্‌তে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কতবড় বোষ্টমের ব্যাটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমীদারীতে বাস কোরে আমারই অপমান!" কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ বোষ্টম কে?"

"কে? আমার প্রজা। আমার পুকুর-পাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাগুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাজ্।"

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, "ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?" ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "বেশ।" কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, "বেশ? কখ্‌খন না। আমার বোনের মত দেখ্‌তে? হুঃ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেছিস্?" ভূতো জবাব দিবার পূর্ব্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সুমুখে আসিয়া বলিল, "কিরে কুসী, বলেছিলুম না! বেন্দা বৈরিগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন, ফল্‌ল কি না? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না?" ঘরের ভিতর হইতে কোনো জবাব আসিল না, কিন্তু, কি এক রকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল। কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটো জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা

হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তুই কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখ্‌তে পাবি, তোর দাদা যা'বলে তাই করে কি না! কিন্তু, তুইওত শ্বশুরঘর করতে চাইলিনি বোন,—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারু কাণে তুল্‌লিনে।" কুঞ্জর শেষ কথাগুলা অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেক দিন ছাড়িয়াছিল। কুঞ্জর চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হোস্‌নে বোন্, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোন মতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।" কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "হাত দেব না? আমার চোখের সাম্‌নে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? তুই বল্‌চিস্ কি কুসুম?"

"না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।"

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু, আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা—তুই বলিস্ কিরে! লোকে শুন্‌লে আমাকে ছি ছি করবে না?"

কুসুম বালিশে মুখ লুকাইয়া বারম্বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিয়ো না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই,—আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়োনা—বিয়ে হচ্চে হোক্।"

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—না।

"না, কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করে ছিলেন, না হয়, আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুইই সমান। তোমার পায়ে ধর্‌চি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে, হাঙ্গামা কোরে, আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।"

কুঞ্জ, হুঁ বলিয়া খানিক ক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, "জানিত, তোকে চিরকাল। একবার 'না' বল্‌লে কার বাপের সাধ্যি হাঁ বলায়। তুই কারো কথা শুন্‌বিনে, কিন্তু, তোর কথা সবাইকে শুন্‌তে হবে।" কুসুম চুপকরিয়া রহিল, কুঞ্জ বলিতে লাগিল, "আর, ধর্‌লে কথাটা মিথ্যেও নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর কর্‌বিনে, তখন, তাদের সংসারই বা চলে কি কোরে? এখন, না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনিত চিরকাল বেঁচে থাক্‌বেন না।" কুসুম কথা কহিল না। কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, কুসুম, সে বিয়ে করুক, না করুক, তুই তবে এত কাঁদ্‌চিস্ কেন?" ইহার আর জবাব কি? অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না, কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবল বেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছিছি, মরিলেওত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। এই জন্যই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ, সে কতই না সাধিয়া ছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ীর বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু-পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্ব্বত-প্রমাণ অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্ম্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—উঃ, এই জন্যই আমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম!

(১০)

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথাগরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সাম্‌লাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি, হাঁকাহাঁকি বা উচ্চতর্কে যোগ দিয়া লোকজড় করিতে চাহেনা। তথাপি, সেদিন কুসুমের

বারম্বার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিলনা। তাই, পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, এবং, হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্য্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসঙ্কটই হৌক, কোন-না-কোনো উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়া ছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে। দুপুর বেলা গাড়ী একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ছিলনা। পণ্ডিত মশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে সুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল, শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধ করি অকৃত্রিম ভক্তি বশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্য্যাদা করিতে পছন্দ করিত না। এমনি সময়ে অকস্মাৎ এক দিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয়ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনর মিনিট করিল, এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে, সে দিকেও খর দৃষ্টি রাখিল।

দিনদশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারিদিয়া দাঁড়াইয়া, তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না। আগন্তুক তাহারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া, চিন্‌তে পারলেনা?" বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, "কৈ না।"

তিনি বলিলেন, "আমার কায আছে তা' পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখ্‌তে এলাম—আমি কেশব।" বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্য-সুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব্ব ইংরাজিশিক্ষক দুর্গাদাস বাবুর ভাগিনেয় ইনি। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন, সেই সময়ে উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্য-বন্ধুটির সম্বাদ পাইতেছিল।

কেশব ৫।৬ বৎসর হইল, এম. এ. পাশ করিয়া কলেজে শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে। কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, "আমার মামা মিথ্যেকথা ত' দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন, কিন্তু, তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কিনা, তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখ্‌তে এসেচি।"

কথাগুলা বন্ধুর মুখদিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ, এই স্তুতি, তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখদিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সম্বাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেশব বুঝিয়া বলিল, "যাক্, যাতে লজ্জাপাও, আর তা, বল্‌বনা, শুধু মামার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাযের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাওনা, পোড়োদের বইটই কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে

আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু, ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি,এত গুলি ছেলে জোগাড় করলে কি করে বলত ভায়া?"

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিলনা, বিস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল। কেশব হাসিয়া বলিল, "খুলে বল্‌চি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি যদি দেশের কোনো কায থাকেত ইতরসাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করিনা কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ, আমার ত এই মত যে, লেখা-পড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাব্‌না তারা আপনি ভাব্‌বে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হলে তবে যদি গাড়ী চলে, নইলে, এতবড় জড় পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি কোরে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক্‌, তুমি এ সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুল্‌তেনা। আমি এই জন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই, তাই, প্রথমে একটা পাঠ-শালা খুলে—শেষে একটাই স্কুলে দাঁড়করাব মনে ক'রে—তা' আমার পাঠশালাই চল্‌লনা—ছেলে জুট্‌লনা। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এম্‌নি সয়তান যে, কোনো মতেই ছেলেদের পড়্‌তে দিতে চায়না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট কোরে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত ঘুরে ছিলাম,—না, তবুও না।"

বৃন্দাবনের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, "ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু, তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।" তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—"না হে, না,—তোমাকে—তোমাদের—সে কি কথা! ছি ছি! তা' আমি বলিনি সে কথা নয়—কি জানো—" বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাযেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাযেও আমাদের বাড়ীতে ঢুক্‌লে তোমার মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।"

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বৃন্দাবন, সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভুষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেচি। যদি জান্‌তাম, তুমি নিজেই নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কক্ষণ এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।" বৃন্দাবন কহিল, "তাও জানি। কিন্তু, তুমি আলাদা করে দিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে রয়েচে! আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এই জন্যেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু, আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না,—তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান্‌না।" কেশব, লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনত মুখে শুনিতে লাগিল, বৃন্দাবন, কহিল, "জানি এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখ্‌তে পাওনা ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে,—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় বড় ডাক্তার-প্রফেসারও আমল পায়না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান্‌।"

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ-ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল-কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভালো হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশীবুঝি, তোমরাও চোখে দেখ্‌তে পাচ্চ আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল—"দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা' দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু, তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা করনা, মনিবের মত কর। তাই, আমাদের পোনর আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংশ্রবে লেখাপড়া শিখ্‌লে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন, অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানেনা, শ্রদ্ধা করেনা, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ, দেশের এই ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা কোরো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখা-পড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখা-পড়া-শেখা-ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই, শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্‌বে, যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা কর্‌বেনা এবং দলছেড়ে, সমাজছেড়ে, জাতিগত ব্যবসাবাণিজ্য কাযকর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, পৃথক্ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌বেনা। এ যতক্ষণ না কর্‌চ, ভাই, ততক্ষণ, জন্মজন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার কেন জীবনের ব্রত করনা কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবেনা। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুন্‌বেনা। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচ্‌বেনা যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।"

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "বৃন্দাবন, বোধ-করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা'হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত' কাযে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?" বৃন্দাবন কহিল, "ঐ যে বল্লুম আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোলো আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জ্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা'হলে কোন দিনই আমরা বুঝ্‌তে পারব না, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা, কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা আহ্নিক কর?"

"না।"

"জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?"

"খাই।"

"মুসলমানের হাতের রান্না?"

"প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।"

"তা' হলে আমিও বল্‌তে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা,—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বল্‌লে তুমি রাগ করবে।"

"ধৃষ্টতা?"

"ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাক্‌লেই পরের ভালো এবং দেশের কায করা যায় না। যাদের ভালো করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধিবিবেচনায় ধর্ম্মে কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু, আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কায করি।"

"কর, কাল সকালেই আবার আসব" বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হইলেও কেশব সহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই, পোড়োর দল মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, "তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি, বুঝ্‌লে ত?" কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, "বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থ ই একটা মানুষ, তা'তে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "আমারও নেই। তার পরে?"

কেশব কহিল, "তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেসা কচ্চি,—এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু, আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে, যেখানে 'ক' 'খ' শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কায কি গভর্‌মেণ্টের করা উচিত নয়?"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বল্‌বে—পণ্ডিত মশাই মাধুও করেচে। অর্থাৎ, মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্‌মেণ্ট তাঁর কর্ত্তব্য করেন কি না। নিজের কর্ত্তব্য করার আগে, পরের কর্ত্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।"

"কিন্তু, তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

বৃন্দাবন বিস্মিত ভাবে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কথাটা ঠিক হোল না ভাই। আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয় ত' এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব; বরং আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই অতি ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্ব্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালার একটি সর্ত্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাক্‌তে ত দেখ্‌তে পেতে, প্রত্যহ বাড়ী যাবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। আমার প্রতি-পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলে-বেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙলা দেশে একটি লোকও মূর্খ থাক্‌বে না।"

কেশব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উঃ কি ভয়ানক আশা!"

বৃন্দাবন বলিল, "সে বল্‌তে পার বটে। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু, সবল মুহূর্ত্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!"

কেশব কহিল, "বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখ্‌লে জবাব দেবে বল?"

"এ আর বেশী কথা কি কেশব?"

"বেশী কথাও আছে, বল্‌চি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?"

"তাও কোরব" বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

(১১)

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা।"

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদ্‌চে—তার বাপ নাকি ভেদ-বমি হয়ে আর উঠতে পার্‌চেনা।" বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল—"পণ্ডিত মশাই, বাবা আর চেয়েও দেখ্‌চেনা, কথাও বল্‌চেনা।" বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবুর তখন শেষ সময়। প্রতিবৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টা খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল। বাঙলা দেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক আধ জন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু'টাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার

করিলে এসব রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোক-গুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকেনা। শিবুর স্ত্রীও অতরাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া 'নুন-জল' খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারা রাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকাল বেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর 'গতি' করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল, তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক 'গতি' করিয়াছে, শিবুরও 'গতি' করিয়া অপরাহ্ণ বেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'আয় বোস্ ষষ্ঠিচরণ' বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল। ছেলেটি বার দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পণ্ডিত মশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সদ্য পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কেষ্টাও বমি কচ্চে।"

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সাহত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজরাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু, অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুক-ফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্য্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হইতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাত-যশ খারাপ করিয়া দিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল। মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্যবিধবা জননীর মর্ম্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, "মানুষের দোষের শাস্তি আর যা' ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়োনা"—জানিনা, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কি না, কিন্তু, নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক্ তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই নির্ব্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবস শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মর মর হইয়াছে। মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা খানেক পরে আর্ত্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারি সুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল, অধিকাংশেরই ছিলনা, তাহারা ভীত শুষ্ক মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, 'অন্ন জল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?' বৃন্দাবনের বাড়ীর সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায়, যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্ন-জল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশ-পাশের গ্রামেও দুই একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু, বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না। নদী নাই, যে দুই চারিটা পুষ্করিণী পূর্ব্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অথচ, কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিলনা। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত তাহার ভাল-মন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে, গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পাননা, অথচ, মারি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল

যে, ঔষধপথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহ সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনদের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচসাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়া ছিল। কিন্তু, বৃন্দাবন প্রতিদিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্য অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকিয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু, তাহার প্রতিপদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন্ সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে, তাহাকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছু দিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এবিষয়ে মাকেও যেন সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।—এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সম্বাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর না বাবা। এইবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।" বৃন্দাবন ছল ছল চক্ষে বলিল, "মা! তুমিও চল।" মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!"

"পুরুত ঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।" মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার ঠাকুরের ভার অপরে বইবে, আর, আমি পালিয়ে যাব?"

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা' নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো—"

মা দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা' হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ এভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি তবেই দেব, না হলে, আমারই মাথায় থাক্। কিন্তু, তোরা যা'।"

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "এই সময়ে কি করে তোমাকে একা ফেলে রেখে যাব, মা? ধর যদি—"

মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, "সে ত সুসময় বাবা। তখন জান্‌ব আমার কায শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই হোক্ বৃন্দাবন, আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা', আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারব।"

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, "তা' হলে আমারও যাওয়া হবেনা। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি, মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাক্‌তে পারিনে। কিন্তু, যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে স'পে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুক্‌নো মুখ দেখ্‌তে পাবে না, মা।"

তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকাল বেলা বৃন্দাবন কি কাযে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরে ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকি আছে। বস্ত্র-খণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "মড়ার কাপড়-চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন?" স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল তাহা বোঝা

গেলনা। বৃন্দাবন বলিল, "যতটা অন্যায় করেচেন, তারত উপায় নেই, কিন্তু, আর ধোবেন্ না—উঠে যান্।" সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখ-মুখ করিয়া বলিল, "তুমি নাকি আমার বাড়ীর লোককে পুকুরে নাব্‌তে দাওনি?" বৃন্দাবন কহিল, "তা' নয়, আমি ময়লা কাপড় চোপড় ধুতে মানা করেচি"। তারিণী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "কোথায় ধোবে? থাক্‌ব বাড়লে, ধুতে যাব বদ্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন, উচ্ছন্ন যাবি। ছোট লোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নিবংশ হ'বি।" বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু, চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসম্বরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, "আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু, আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাক্‌তে দেবেন না?"

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, "চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচেনা ত, কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?" বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, "এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ীর কোন লোককে আমি পুকুরে নাব্‌তে দেব না।" "নাব্‌তে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?" বৃন্দাবন কহিল, "এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পাবেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।"

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ছোটলোক হয়ে তোর এত বড় মুখ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়ীতেই বিপদ ঢোকেনি, রে, তোর বাড়ীতেও ঢুক্‌বে।"

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—"আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসীচাকর নেই, তখন, মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু, হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না।" বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ঘোষাল মশায় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, "হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ, পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ না কি?"

বৃন্দাবন কহিল, "ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জলতোলা বন্ধ করিনি।"

"ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্চি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।"

বৃন্দাবন জবাব দিল, "না। এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।"

কিন্তু ঘোষাল মশায় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় জিদ্ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র-বিশ্বাস না করলে চল্‌বে কেন বাপু?"

বৃন্দাবন এক কথা একশ বার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল—"শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু, আপনাদের মন-গড়াশাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ হলে ওসব কাপড় চোপড় পুড়িয়ে ফেল্‌ত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করিতে পারবেন না, তখন, মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ওসব চল্‌বে না" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মশায় বৃন্দাবনের সর্ব্বনাশ-কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু, বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানেই ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল প্রহরা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্ত দিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সম্বাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে, এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন

না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোটবড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

(১২)

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দ্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "তোর মায়ের কাছে যাবিরে চরণ?" চরণ নাচিয়া উঠিল—"যাব বাবা।" বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, "কিন্তু, সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাক্‌তে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাক্‌তে?"

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল—"পারব্।" বস্তুতঃ, এদিকের সূক্ষ্ম বাঁধা ধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায়না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্য্যন্ত পায়না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কি রকম একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ও দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা,—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখের সস্নেহ অনুযোগ ভিন্ন, কাহারো ভ্রুকুটি সহিতে হয়না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

'তবে যা।' বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, এবং, সজল চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারম্বার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ নাগেক্, একদিন অন্তরেও সম্বাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখিতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু, এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারিনা।

গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ, সে-দিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে, কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হ'লনা। অতবড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে, হয়ত, উল্টো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠ্‌বে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন,—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। চরণ পূর্ব্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামেঁচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "কুঞ্জ দা' কৈ?"

"কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।"

বৃন্দাবন কহিল, "দেখে মনে হয়, এযেন পোড়ো বাড়ী। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?"

"না।"

"কোথায় ছিলে?"

মাস খানেক পূর্ব্বে কুসুম দাদার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে। সে কথা না বলিয়া তাচ্ছল্য ভাবে জবাব দিল, "এখানে সেখানে নানা যায়গায় ছিলুম।"

অন্যবারে কুসুম সর্ব্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিলনা দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, "দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বস্‌বার যায়গা দাও।" কুসুম তেম্‌নি অবজ্ঞাভরে বলিল, "কি জানি, কোথায় আসন টাসন আছে" বলিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, একপা নড়িলনা। বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও, এত বড় অবহেলা তাহাকে

সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনা-বশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নম্র স্বরে বলিল, "আমি বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত কোরবনা। যে জন্যে এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্চে, তাই, চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।"

কুসুম এতদিন এখানে ছিলনা বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিলনা, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, "ওঃ তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু, অসুখ বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে কোর্‌ব কি সাহসে?" বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, "আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি ও সবচেয়ে ভাল বাসে।"

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ, হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, "মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব—নাইতে যাবেনা, মা?" কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, "আমার কাছে তোমার থেকে কায নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।"

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটু খানি হাসিয়া কহিল, "তা'ও শুনেচ। আচ্ছা, বল্‌চি তা'হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু, তখনি থেমে গেছে।"

"থাম্‌ল কেন?"

"তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু, সে কথায় আর কায নেই। চরণ, আয়রে, আমরা যাই—বেলা বাড়্‌চে।"

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, "বাবা, কাল যাব।"

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীর-স্বরে ডাক দিয়া বলিল, "আর দেরি করিস্‌নে রে, আয়" বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি, সে, মায়ের মুখের দিকে তৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধ মুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাঁড়োয়ান গরু দুটোকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক-দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, "একবার শোনো।"

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, "কি"?

"তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?"

"না।"

"তবে, এমন রোগা দেখাচ্চে কেন?

"তাত' বল্‌তে পারিনে। বোধকরি ভাবনায় চিন্তায় শুক্‌নো দেখাচ্চে।"

ভাবনা চিন্তা! স্বামীর শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, "তোমার'ত ষোলো আনাই সুখের সময়! ভাব্‌না চিন্তা কি শুনি?"

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিলনা। গাড়ী প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, "তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?" সে নামিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্র ভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এটা সে বুঝিয়াছিল, মা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, "কে জানে, যদি আর কখন না বল্‌তেই পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই। আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলেনা, কিন্তু, আমার অবর্ত্তমানে দিয়ো।" কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—"ও সব আমি শুন্‌তে চাইনে।"

"তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসে ছিলুম।"

"আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?" বৃন্দাবনের চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল, বলিল, "তবু সেই রাগের কথা। কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু, মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন

শেখোনি? কিন্তু, তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে, কার হাতে হয় বল?"

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটো বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, "বাবা, এসোনা?" কুসুম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি, সত্যই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কা'র ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামি-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সে কথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন? আজ, তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত? কিংবা, সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?' একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "ভগবান, আমার যা' হোক্ একটা উপায় করে দাও। হয়, মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয়, ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।"

(১৩)

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সম্বাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এম্নি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনা বাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু, এ সব ছোটখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, তাই, নলডাঙ্গায় ফিরিয়া, যখন সে বাড়ী আসিতে চাহিল, এবং তিনি সাপের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "খ্যাপার মত কথা বোলো না বাছা। আমাদের বড় লোকদের শত্তুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে সেখানে একলা পড়ে থাক্লে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পার্ব না।" তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই। তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, "ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘর দোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না তা' বলে দিচ্ছি।" কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ, চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারী চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোন্‌কে লইয়া শ্বশুরবাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরেদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই, সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পোনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু, তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার-মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত। এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে, কি জানি কেন, চোখের দেখা মাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুসি হ'ন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন। বাড়ীর সম্মুখেই পুষ্করিণী, দিন তিন চার পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলা বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "হাঁ, ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?" মা, অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কায করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?" মেয়ে উত্তর দিল, "আপনার জন আমার, তোমার

কে, যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসী-বৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?"

প্রত্যুত্তরে, মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলা একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন। কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া, "তা' থাক্!" বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল। ইহার পর দুই তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগঝাল করিলেন, কিন্তু, অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইল। কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী, স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "মা ভোল ফেরালেন কেন তাই ভাব্‌চি ঠাকুরঝি।" কুসুম চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু, মেয়ে মাকে বেশ চিনিত তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোন্-পো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা, এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁইত্রিশ কি পঁইষট্টি তাহা ধরিবার যো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ী ও পাড়ায়। পূর্ব্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু, সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসীমাতার প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বাড়িয়া উঠিল, যে, প্রত্যহ, যখন তখন 'মাসী মা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা' ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। তখন আর কিছু না বলিয়া, কোন মতে কায সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম, আকণ্ঠ ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেল, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, গোবর্দ্ধন দাদা আগে কোন কালে তোমাকেত দেখ্‌তে পেতুম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বলত? বাড়ীর ভেতর আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।"

গোবর্দ্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু, এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু, মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চোখ রাঙা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আস্‌চে। তোর কি?"

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যেও তত বলিনে, মা, কিন্তু, আমার নোনদ রয়েচে, সে পরের মেয়ে, তা'ত মনে রাখ্‌তে হবে।" মা, সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, "পরের মেয়ের জন্যে কি আমার আপনার বোন্‌পো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না, বাড়ী ঢুক্‌বে না? তা'ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পরদার বিবি, না, কারু সাম্‌নে বার হ'ন না? ওলো, ও যেমন ক'রে বার হতে জানে, তা দেখ্‌লে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্য্যন্ত লজ্জা হয়।"

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই, সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কতভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু, তখন আলাদা কথা ছিল, এখন, সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন, কুসুমকে সে ভালবাসে নাই, এখন বাসিয়াছে। এবং এ ধরণের ভালবাসা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্দ্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "গোবর্দ্ধন দাদা, ভারী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বল্‌তে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আস্‌তে পার, ত' এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা' বলে দিচ্ছি।" বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, "কি হয়েচে রে গোবর্দ্ধন?" গোবর্দ্ধন মুখ রাঙা করিয়া বলিল—"তোমার দিব্বি মাসী, আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভেতরে—ম্যাইরি বল্‌চি—একটা দাঁতন ভাঙ্‌তে—জিজ্ঞেস্ কর্‌বে চল ময়রাদের

দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ওপাড়ায় ভজিয়ে দিচ্চি—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়াই রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিক্‌তে দেবে না?"

"আগে কাপড় ছাড়, তারপরে বল্‌চি" বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়া কহিল, "অন্যায় আমি কোন মতেই সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা' তোমার জন্যেই হোক্, আর আমার জন্যেই হোক্। ও হতভাগাকে আমি বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না—ওর মৎলব আমি টের পেয়েচি।" জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না। কুসুম কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "মৎলব যার যাই থাক্, বৌদি' তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা নিয়ে কথা ক'য়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।"

"কিন্তু, আমি বেঁচে থাক্‌তে বিপদ্ হবে কেন?" কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "হবেই। চোখে দেখ্‌চি হবে" কপালে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল, "এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ্ সঙ্গে যাবে। বোধ করি স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ কোরোনা ভাই, কিন্তু, শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজের দোষও কম নয় ঠাকুরঝি!" কুসুম, তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলার ঘটনা সব শুনেচ ত?"

"শুনেচি। কিন্তু, সে ত আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এ'স্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদূর পরনা, নোয়া হাতে রাখনা, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ, না, তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন, না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে ত? তুমিই বল, কোন্ সধবা কবে, রাগ করে বিধবার বেশে থাকে?"

"সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু, আমি সিঁদূর নোয়া পরে থাক্‌লেই ত লোকে শুন্‌বে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?"

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশী প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে! তুমি কি কিছুই শোন নি, ঐ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দ জ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়ীতেই হয়ে গেল!" একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, "কেন, তোমার দাদা ত সমস্তই জানেন, তিনি বলেননি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনে শুনেই এখানে এসেচ, তাই, পাছে, রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেই জন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং, তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার ওপর আমার রাগ পর্য্যন্ত হয়েছিল।" কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কিচ্ছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।"

ব্রজেশ্বরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন্। ঠাকুরজামায়ের সঙ্গে নন্দ জ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন, তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সেই চুপ করে আছে! আমার শাশুড়ীর কথা, তোমার কথা, ওদের কথা, সমস্তই ওঠে,—তখন নন্দ জ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তা'র মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। তার পরে ঠাকুরবাড়ীর বড় বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনিই মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একেত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ সকল কায হতেই পারে না, তা' ছাড়া, তিনি নন্দ জ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে, একায করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে! তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয়, কণ্ঠিবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু, হয়নি।"

কুসুম আশঙ্কায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু, আমার কথাই বা এত উঠ্‌ল কেন?"

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল—"তোমার দাদার একটুখানি

বাইয়ের ছিট আছে কি না, ভাই। অপর কেউ হয়ত, চক্ষু লজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু, ওঁর ত', সে জ্বালাই নেই, তাই, চতুর্দ্দিক তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা, যখন সত্যিই তার কণ্ঠিবদল দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দ জ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!"

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল,—"ছি ছি, তার পরে?"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "তার পরে আর বেশী কিছু নেই। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আর নন্দ জ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে তোমাকে নিয়ে এই খানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু, হতে পায়নি। আচ্ছা, ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি তোমাকে কোন ছলে জানাননি? আগে শুনেছিলুম তোমার জন্যে তিনি নাকি—"

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বল্‌তেই এসেছিলেন।"

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?"

"হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি, সেই দিন সকালে।"

"তার পরে?"

"আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।"

ব্রজেশ্বরী মুখটিপিয়া হাসিয়া কহিল, "কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুক্‌তে দাওনি, না, কথা কওনি?" কুসুম জবাব দিলনা। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারি দিকের শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি একটু বোসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা প্রদীপ জেলে আনি" বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল, এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"সত্যিই কাযটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য, কি করেছিলে, তা, আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন, তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়াই উচিত হয়নি।"

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরী কহিল, "তোমাদের কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হ'লে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন সারা পথ নাকখত্ দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম।"

কুসুম পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, "বৌ মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাযে করা শক্ত।" "কিচ্ছু না। গেলে, স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়ে মানুষের আবার শক্ত কাজ কি দিদি? তা'ও যদি না পাই, তবু ফিরে আস্‌তুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড় জোর বল্‌তেন, 'তুমি যাও, আমিও বল্‌তুম 'তুমি যাও'—জোর করে থাক্‌লে কি করতেন তিনি?" তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল। ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যি বল্‌চি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনোনা —যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামি-পুত্রকে একা ফেলে রেখোনা।"

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বিপদের দিন কেন?"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "বিপদের দিন বই কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু, বাড়লে সেই যে ওলাউঠা সুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বল্‌লেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে —প্রত্যহ দশ জন বার জন করে মারা পড়চে—ছি ছি ওকি কর—পায়ে হাত দিয়োনা ঠাকুরঝি।"

কুসুম তাহার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল— "বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিই নি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি—"

ব্রজেশ্বরী বাধাদিয়া বলিল, "বেশ, এখন শুন্‌লে ত! এখন গিয়ে তাকে নাওগে।"

"কি করে যাবো ?" ব্রজেশ্বরী, কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাটের ওদিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, "ঠাকুরঝি ঠাকরুণকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি ?" ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "বেশত' মা, ভেতরে এসো বল্‌চি। তোমার কিন্তু, ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মৎলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।"

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তার মানে আমি লোকজনকে কু-মৎলব দিয়ে থাকি, না ? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়ীও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারেনা, এই স্বভাব রীতের গুণে !"

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিম্‌টি খাইয়া থামিয়া গিয়া বলিল, "সেই জন্যেই কালামুখীকে বল্‌ছিলুম, যা শ্বশুরঘর করগে যা, থাকিস্‌নে এখানে।"

শ্বশুরবাড়ীর নামে মা, তাম্বূলরঞ্জিত অধর প্রসারিত, ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বলি, কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস্ লো ? নন্দ বোষ্ট—"

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক্ দিয়া উঠিল—"সমস্ত জেনে শুনে, ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান কোরো না। শ্বশুরঘর মেয়ে মানুষের দশ বিশটা থাকেনা, যে আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্দ্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুন্‌তে হবে।" মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মার নামে এত বড় অপবাদ দিস্ !"

মেয়ে বলিল, "অপবাদ হলেও বাঁচ্‌তুম, মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি, বল্‌ছি, মা, তোমাদের মত দুই একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়িমুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু, বোষ্টম বল্‌তে মাথা কাটা যায়। থাক্, চেঁচামেচি কোরোনা, যদি, অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, দাও ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা' মুখে আসে তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো, তোমার দিব্যি করে বল্‌চি, মা, কথাটি ক'বনা।"

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে, মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এ ভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন "সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা, তারা ঘরে নেবে কেন ? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি, ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই।—মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াসনে" বলিয়া, তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা বোন্, মিথ্যে কথা। মা জেনে শুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আস্‌চি আমি—" বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে, বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্ত্তব্যে বিচলিত করিলনা। সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে হতে পারে না। মা না বল্‌লে আমি চরণকে এখানে আন্‌তে পারিনে।"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো তারা কেমন আছে।"

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্‌রে ! দশ-বিশটা রোজ মর্‌চে সেখানে।"

"তবে, কোন লোক পাঠিয়ে দাও খবর আনুক।"

"তা' হতে পারে বটে।" বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, "মা বারণ করলেন দিদিঠাকরুণ, আজ আর রান্না ঘরে ঢুকোনা।" কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, "কেন ?"

"সে ত জানিনে দিদি" বলিয়া সে নিজের কাযে মন দিল। ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে

বসিয়া রহিল। অন্য দিন এই সময় টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ, এ ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা, সুমুখে আসিয়া বলিলেন "আর দেরী করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এসে এ বেলার মত যা' হোক দুটো মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুর বাড়ীতে মত জানতে গেছে।"

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন, মা নিজেই একটু করুণ স্বরে বলিলেন, "ব্যাটার বউ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক্ মাগী দোষে গুণে ভাল মানুষই ছিল। সে দিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা। আজ ছ' দিন হয়ে গেল বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা' সে যা' হবার হয়েচে, এখন, মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন্! কি নাম বাছা তার ? চরণ না ? আহা ! রাজপুত্তুর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদ-বমি হয়েচে।"

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেচিস্ রে ?

"না দিদি, সেই যে সকালে দেখেছিলুম।" পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সে কি কথা ! কোথায় গেল তবে সে ?"

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"জানিনে ; আমি ঘর দোর পুকুর বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।" চোখের জল এবং পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—"তবে সে আর নেই। মা'র গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে" বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "শোনো অমন করে যেয়োনা"—"আমি কিছু শুনতে চাইনে" বলিয়া একটান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট দশেক পরে মেয়ে মানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"মা আমার বোন্‌কে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাক্‌বনা, আর এ বাড়ী ঢুক্‌বনা—ওরে কুসুম রে—" তাহার শাশুড়ী কিছুই জানিত না, চীৎকার শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—"ওই রাক্ষসীই আমার ছোট বোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হ'লরে !" ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—"দূরহ দূরহ ! ছুঁস্‌নি আমাকে।" ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোন্‌কে ফিরে পাবে ? আমি বলচি, সে কক্ষণ ডুবে মরেনি।" কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, এক ভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই বোন্‌টিকে সে অনেক দুঃখে কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্ব্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন, তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল, এবং তাহার অভিমানিনী ছোট বোন্‌টির মৃত দেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয় বল্‌চি সে মরেনি।" কুঞ্জ সজল চক্ষে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, "আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।" কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "নানা সেখানে সে যাবেনা। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখ্‌তে পারতনা।" ব্রজেশ্বরী কহিল, "এটা তোমাদের পাহাড়-পর্ব্বত ভুল। আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাইহোক্, চরণের জন্যেও ত সে যেতে পারে !"

"কিন্তু, সেত বাড়লের পথ চেনেনা ?"

"সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল করে পৌঁছুতে দেরী হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে। নইলে, বাড়ল সাত সমুদ্র তের নদী পারে হলেও সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।"

'চল্লুম' বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্‌চকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল্ শ্বশুরবাড়ীতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথ বাবু, ফেরীওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া গেল।

(১৪)

ছয় দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর, কেহ কোন দিন এ অধিকার সুকৃতি-বলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সে দিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল-মশায়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরণের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না, এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মারিভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে; এম্নি একটা বড় রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হৌক, নির্ম্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফার্মে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানি লোক পাঠাইয়া ছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথা-বার্ত্তা ও চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুল্‌চেন না?" বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা, কি এখনো শুয়ে আছেন?"

"হাঁ, দাদা, দোর ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্ছিনে।" বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, "ওমা মাগো!" কেহ সাড়া দিল না। বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দ মাত্র আসিল না। তখন, লোহার সাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলা মাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যেন, মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্ত্তের মধ্যে সাম্‌লাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল। শয্যা শূন্য। মা, মাটীতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্ন-প্রায়। ঘরময়, বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই, মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারা-রাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার, এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি, নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ বলে চৌকাট চাপিয়া ধরিল, কিন্তু, পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং, ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া বলিল, "তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।" মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু, জ্ঞান ছিল পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া, তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারম্বার কাঁপাইয়া দাস-দাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা কাহারো কাণে গেল না বটে, কিন্তু, সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসী-মঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর মলিন শ্রান্ত চক্ষুদুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কি করিয়া কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। শুধু, এই মাত্র বলা যায়, দিন-কাটার ভার ভগবানের হাতে, তাই কাটিয়াছে, তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু, চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেল্‌না কিনিয়া দিয়াছিল,—নানাবিধ কলের গাড়ী, জাহাজ, ছবি দেওয়া পশুপক্ষী—যে সমস্ত লইয়া ইতিপূর্ব্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন, চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ীর বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িশুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, কোন দিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্ব্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না। এ কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাস বাবু আসিয়া বসিতেন, কত রকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু, অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়িরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, অকস্মাৎ, অকুল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌছিবেনা। শেষ-পরিণতি যাহার সমুদ্র গর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্য্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইতনা, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিতনা। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন,—যাবার সময় কথাটি পর্য্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন, বাড়ীর পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, "দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকোনা, আদর করনা, চেয়ে দেখ দেখি, কি রকম হয়ে গেছে!" তাহার কথাগুলা লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি হয়েচে চরণের?" দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বালাই, ষাট্! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাক্‌চেন।" অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীর পদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—"চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!"

দাসী ধমক্ দিয়া উঠিল—"ছিঃ ওকি কথা দাদা?" বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেক দিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল। দাসী নিজের কাযে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, "মার কাছে যাব বাবা।"

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, "তোর মাত সে-বাড়ীতে সেই চরণ।"

"কখন্ আস্‌বে তিনি?"

"সেত' জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।"

চরণ খুসি হইল। সেই দিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকী আছে, সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাযে ব্যস্তছিল, খবর পাইল, ভিতরে

চরণের ভেদ-বমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জ্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদ-বমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িল, "একবার কেশবকে খবর দাও" বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা খানেক পরে গোপাল-ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা দুটো আকুল ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দয়া করুন ডাক্তার বাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক্, কিন্তু, সে নির্দ্দোষ। অতি শিশু ডাক্তার বাবু—একবার পায়ের ধূলো দিন্, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখ্‌লে আপনারও মায়া হবে।"

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, "তখন মনে ছিল না, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তার বাবুরই মামা? ছোট লোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা দুটোই মাথায় ধরতে হবে!"

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌চি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা' তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত' জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়।"

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, "অন্যায় বই কি! মামা ভারী অন্যায় করেচে! আমি ডাক্তার, আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু'ছত্তর ইংরিজী পড়ে, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ! অতবড় পুকুরে দু'খানা কাপড় কাচ্‌লে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা' হয় তাই। নইলে, বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ কর্‌তে চাও? এত দর্প, এত অহঙ্কার! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ী মাড়াবনা।"

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—"ঘাট মান্‌চি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তার বাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। একশ টাকা দেব—দু'শ টাকা, পাঁচশ' টাকা—যা' চান্ দেব ডাক্তার বাবু, চলুন, —ওযুধ দিন।"

পাঁচশ টাকা! গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, "কি জান বাপু, তাহ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হ'তে হবে। এই মাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণী মামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহারব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে, আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওযুধ দেব। কিন্তু, সেত হবার যো নেই। তোমার ওপর দয়া করতে গিয়া ছেলে-মেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়েত আমার কায চল্‌বে না। বরং, এক কায কর, ঘোষাল মশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধরগে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বল্‌লেই আমি—আজকাল টাট্‌কা ভাল ভাল ওযুধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।"

বৃন্দাবন বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরপি কহিলেন, ভয় নেই ছোক্‌রা, যাও দেরি কোরো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কায নেই—যাও ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল। তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফল্‌ল কি না! নির্বংশ হলি কি না!" বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, "ছি ছি, এমন অধর্ম্মের কায কোরোনা। যা' হবার হয়েচে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে ওযুধ দিক্।" তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—"তুই থাম্ মাগী! পুরুষ মানুষের কথায় কথা কোস্‌নে।" তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে" বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না, তবু না। এই সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল মশায় পাশের বাড়ী হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্ট চিত্তে বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে, কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করিলে সমাজ

উচ্ছন্ন যায়। এম্‌নি করেই কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে, তারিণী, সে দিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে। যখন, ও আমার কথা মান্‌লে না, তখনি জানি ওর ওপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে-হাতে ফল দেখ্‌লে তারিণী ?" তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, "আর আমি! সে দিন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্ব্বংশ হ'। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌চে, এখনও জোয়ারভাঁটা খেল্‌চে!" বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া, নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া, তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সগর্ব্বে উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতণ্ডার শেষ মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরু তৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়ুনি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, "কোল্‌কাতায় চল্লুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফির্‌ব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্ব্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে, বৃন্দাবন! চল্লুম, পারত, ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখো ভাই।" বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, চরণ পিতাকে কাছে পাইয়া, 'মার কাছে যাব' বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোন দিনই জিদ্‌ করিতে জানিত না, কিন্তু, আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কায হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ, বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্ণে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ী ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু; ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব, সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, "হাঁ, আমিই বাপ বটে, কিন্তু, কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টা কাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাক্‌তে পারে, তা'র সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তার বাবু।"

পিতার এত বড় ধৈর্য্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি, ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল। বৃন্দাবন, বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চল্লুম। পাশেই ঠাকুর ঘর, আবশ্যক হ'লে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হ'বার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখ্‌তে পাই" বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ, সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়াছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপিচুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে

ঢুকিয়াছে ? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে। ভগবান, আমি সে নালিস জানাতে আসিনি, কিন্তু, পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে, বাপের চোখের উপর, বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন ? সে পিতৃ-হৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কি জন্য ? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবারকথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু, আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত, গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটীতে পড়ে না; তাই, আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ ? আমার এই, অতি ক্ষুদ্র, এক ফোঁটা চরণের মৃত্যুতে, এ সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে ? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল, এবং কেনই তাহাকে একটি কায করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল !

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু, মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের তলে, ভবিষ্যৎ. জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে, দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে-আড়ালে বসিয়া আছে ! বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল "কুসুম, আমার ষোল আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি ?" কিন্তু বলিল না। এই মাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মানঅভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যু শয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না। বরং, করুণ কণ্ঠে বলিল, "আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্ত দিন, যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসে ছিল ! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই —এসো আমার সঙ্গে।"

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল।—দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা।" বলিয়া ধীরেধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ওকথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্য্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, "ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে আর লাভ কি, ছেড়ে দাও ওরা নিয়ে যাক্।"

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, "ওঁদের আস্‌তে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।" তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

(১৫)

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"সমস্ত মিছে কথা। যা'রা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর !" বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব। প্রত্যুত্তরে কেশব উঃ—বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগ্দীদের দুই তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেশব, কালথেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি তার জবাব পেলাম—সংসারে একছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।"

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। বৃন্দাবন কহিল, "তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝ্‌বেনা—বোঝা অসম্ভব। এ, এমন জ্বালা যে, মহাশত্রুর জন্যও কেহ কামনা করেনা। কিন্তু, এরও দাম আছে, কেশব, এখন যেন টের পাচ্ছি, খুব বড় রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয় ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।"

কেশব তেমনি নিরুত্তর মুখে চাহিয়া রহিল, বৃন্দাবন বলিতে লাগিল—"এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখ্‌চি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্চে—চরণ বেঁচে থাক্‌তে'ত একটা দিনও এমন হয়নি!"

কেশব অবনত মুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোট ভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, "বনমালী, কোথায় যাচ্চিস্‌রে"?

"বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্চি পণ্ডিত মশাই।"

"আমার কাছে একবার আয় তোরা" বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গিয়া উভয়কেই এক সঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল "আঃ—বুক জুড়িয়ে গেলরে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল, ভাই, চরণকে বুঝি সত্যিই হারালাম। নাঃ, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবেনা,—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভিতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।" কেশব সভয়ে এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও হে, বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখ্‌তে পেলে ভারী রাগ করবে।"

"ওঃ তা' বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আস্‌চি যে!" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বনমালী, পণ্ডিত মশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল। পণ্ডিত মশাই সেই খানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, "জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েচ, কিন্তু, আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়োনা। আজ যেমন দেখ্‌তে দিলে, এম্‌নি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমরা চরণের মুখ দেখ্‌তে পাই! এম্‌নি বুকে নেবার জন্যে যেন, চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর ন'ন।"

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ী চল।

'চল' বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ আমার বাচালতা মাপ কোরো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ, এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—" কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল,—জিজ্ঞেসা করগে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে,—সে বল্‌বে তার জপতপের তেজে জিজ্ঞেসা করগে আর এক জোচ্চোরকে, সে বল্‌বে পূ[র্ব] জন্মের পাপে—উঃ—*এই দেশের ব্রাহ্মণ!*

বৃন্দাবন ধীর ভাবে বলিল, "কেশব, গোখ্‌রো সাপের খোলোষকেও লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান, ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।" কেশব সেই সব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, "তবে, এত বড় দণ্ড কেন?"

বৃন্দাবন কহিল, "দণ্ড'ত' নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়েনা, তখন, এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখ্‌তে আমি চাইনে। এ জীবনের স্মরণ হয়না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরু-গৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলেনা, কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলেনা। বুকচিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ, পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের যায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে।

তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ যা' পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।" বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখো-মুখি দাঁড়াইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটি মাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্ব্ব দিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস, এ পাড়ায় আর একটা বড় রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবেনা। তাই, কেশব, ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্বাদ লইয়া আসিল, যে, যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে এমন কূপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু, অসময়ে, যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে। বৃন্দাবন খুসী হইয়া সম্মত হইল, এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেব-সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "কেশব, এইটি কোরো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন, আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখ্‌তে পাই আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেই দিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুল্‌ব।"

দুর্গাদাস বাবু এ কয়দিন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন, নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে, বাবা, কিন্তু, দুঃখ যত বড়ই হোক্, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম, অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।"

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্পইত আমার নেই, মাষ্টার মশাই! বরং, সেত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখ্‌তে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচবনা। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিত মশাই বলে সকলের কাছে পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করবনা। আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন, "কিন্তু তোমার সর্ব্বস্বত' জল-কষ্টমোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে?"

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, "বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টি ভিক্ষার অভাব হবেনা মাষ্টার মশাই, এইতেই আমার বাকি দিন গুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা'ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি, তারই সঙ্গীসাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।"

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাই, তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, "সেটা ভাল হবেনা বাবা। তোমার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু, বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারেনা বৃন্দাবন!"

বৃন্দাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, "তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।"

দুর্গাদাস, বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্ব্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্ব্বের মত সমস্ত হতে পারে।"

বৃন্দাবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল, "ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু, সে আমি এখানে পারবনা। তা' ছাড়া এ বাড়ীতে যে দিকেই চোক পড়্‌চে সেই দিকেই তার ছোট হাত দুখানির চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চি। আমাকে ক্ষমা করুন, মাষ্টার মশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়া হয়ে যাবে।" দুর্গাদাস বিমর্ষ মুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সে দিনের মর্ম্মান্তিক ঘটনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেই দিন সকালে বিনা আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব, কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার

ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাঠশালা নিয়ে সারা জীবন থাক্‌বে ?"

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াইত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা' জানি, কিন্তু, কলেজের প্রফেসরি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক ? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি ?" কেশব সহজ ভাবে বলিল, "সমস্তই। টাকা-রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।"

"নয় মানি। কিন্তু, এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়—উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে হে।"

বৃন্দাবন হাসিল। এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্ব্বেই কহিল, "সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তার বাবু, আপনাদের নয় ? আজ আমার দুর্দ্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, কিন্তু, এম্‌নি দুর্দ্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী হত্যা হয়, সে কি কারো কোন দিন চোখে পড়ে ? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরিনা! রাগ করবেন না ডাক্তার বাবু, কিন্তু, যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরণের বসন যোগায়, সেই হতভাগা দরিদ্রের এই সব গ্রামেই বাস। তা' দিগকেই দুপায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরে দাঁড়িয়েচে।"

কেশব, আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো, তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি, না!"

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুটি বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে। এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে কোন স্থানে নিজের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু, বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখদুঃখ, সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া, দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহা-দিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু, কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যে দিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেই দিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জন্মিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাই, কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই। এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও, কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েক বার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু মুখের পানে তাহার সে দিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ওদিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই। এমনি করিয়া ঐ কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু, আর ত সময় নাই ; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না। বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আরত থাক্‌বার যো নেই, সে কথা বলে দিলেনা কেন ? দাসী কহিল, বউমা নিজেই সমস্ত জানেন।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাক্‌বে ?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট, ক্ষিপ্ত

চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক, কতশীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল। অসাবধানে কপাটের কড়া নড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল, এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো। বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত, সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্তনারী কি কাণ্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু, কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিলনা, গলায় আঁচল দিয়া, উপুড় হইয়া পড়িয়া, স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। বৃন্দাবন, ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ কণ্ঠে বলিল, "সবাই বলে তুমি সইতে পেরেচ, কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?"

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষবহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।" কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাস্‌তে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকৃচি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখ্‌তে শিখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।"

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।" বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, "আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।" "খুব সম্ভব। আমি যাবই।"

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু, তোমার জন্যেত পারিনে! তা'ছাড়া তুমি হাঁট্‌বে কি করে?

কুসুম অবিচলিত স্বরে কহিল, "আমিও খুব হাঁট্‌তে পারি—হেঁটেই এসেচি। তা'ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কায করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি, দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।"

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল, কুসুম বলিল, "ভাব্‌না মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।" বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, "চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?" কুসুম শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—পারব।

"তবে চল" বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।*

---

* এই গল্পের পূর্ব্বাংশ বৈশাখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলোকের প্রকৃতি

[লেখক—শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A.]

আলোক বিষয়টি মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) আলোকের যথার্থ প্রকৃতি কি ? অর্থাৎ ইহা কি ?—কোন বস্তু—না শক্তি বিশেষ ? আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব কোথায় এবং জড়-জগতে ইহার প্রকৃত কারণ কি ? আলোক সম্বন্ধে নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী—যাহা আমরা বাহ্যজগতে দেখিতে পাই, তাহা—কি কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। (২) কি ভাবে বাহিরের আলোক আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে পতিত হইয়া দৃষ্টি উৎপাদন করে, সে বিষয়ের আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। চক্ষু, বাহ্যবস্তুর আলোক-প্রতিরূপ গঠন করিবার একটী যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষু-কোটরস্থ রেটিনা 'Retina' নামক স্থানে বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপ গঠিত হয় এবং তাহা হইতেই আমাদের ঐ বস্তুর দর্শনানুভূতি হয়।

প্রথমে বিষয়টির ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া কি ভাবে আলোকের আধুনিক সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞান-জগতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। এইরূপ আলোচনার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে ; ইহাতে বিষয়টা কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণকে কি কি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহা দৃষ্টিপথে আনয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণা-কারীর পথ সুগম করিয়া তুলে এবং তাঁহার বিচারশক্তিরও সাহায্য করে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব আলোক সম্বন্ধে নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী দেখিয়া আসিতেছে। দর্পণের আবিষ্কারের পূর্ব্বে অবীচি-বিক্ষুব্ধ সলিলে পৃথিবীর আদিম নিবাসী আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে নির্ব্বাক্ হইয়াছে, মরুভূমির পথিক জলভ্রমে মরীচিকায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, ইন্দ্রধনু ও আকাশের বিবিধ লোহিত-পীতাদিবর্ণ দর্শনে লোক পুলকিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ঘটনা যে, কোন্ নিয়মানুসারে ঘটে এবং সে নিয়মগুলিই বা কি, তাহা অতি অল্পকাল মাত্র মানব অবগত হইয়াছে।

প্রাচীন কালের লোকেরা আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন এরূপ বোধ হয়না ; আলোক-সম্বন্ধে যন্ত্রাদিও যে, সে সময়ে বেশী কিছু নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহা হইলেও আলোকের সাধারণ ঘটনাগুলি যে, তাঁহারা একেবারে লক্ষ্য করেন নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু নির্ণয় করিতে না পারিলেও যে নিয়মে আলোক পরাবর্ত্তিত (Reflected) হয় এবং যে নিয়মে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু ধারণা ছিল এবং ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেও যে, দর্পণ কাচ প্রভৃতির নির্ম্মাণ হইয়াছিল এবং কাচ-নির্ম্মাণের অল্পকাল পরেই যে দহন-ক্ষম কাচেরও (Burning glass) আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীকগণ গণিত, দর্শন, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের প্রভূত উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু পদার্থ-বিদ্যা-ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিভার ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে তাঁহারা যে অক্ষম ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু পদার্থ-বিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি যে যান্ত্রিক পরীক্ষাসাপেক্ষ হইতে পারে, এরূপ ধারণাই তাঁহাদের ছিলনা।

পদার্থ-বিদ্যার আলোচনা কেবল মনোরাজ্যের বিষয় নহে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে বাহ্য-জগতের ঘটনাবলী বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক এবং বিবিধ যন্ত্রাদির দ্বারা এবং সময়ে যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়াও পরীক্ষার আবশ্যক। প্রাচীন গ্রীকগণ পদার্থ-বিদ্যাকেও কেবল মনোরাজ্যের বিষয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষার সহিত

মিলিল কি না, তাঁহারা তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। গ্রীকগণের পদার্থ-বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিতে না পারিবার মুখ্যকারণ—পরীক্ষা করিয়া দেখার অভ্যাসের অভাব, প্রতিভা কিংবা উদ্যমের অভাব নহে।

গ্রীকগণ যদিও পদার্থ-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা সে বিষয়ে নিজেদের মতগুলি প্রচার করিতে ক্ষান্ত হন নাই। আলোক সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারও কাহারও মত অতি অদ্ভুত রকমের। এম্পিডক্লিস্ (Empedocles) এবং প্লেটো-সম্প্রদায়ের (Platonists) মতে চক্ষু হইতে নির্গত কোন পদার্থ বিশেষের সহিত বাহ্যবস্তু হইতে নির্গত অন্য কোন পদার্থ-বিশেষ মিলিত হইয়া দৃষ্টির উৎপাদন করে এবং এইরূপে বাহ্যবস্তু আমাদের নয়ন-গোচর হয়। পিথাগোরাস্ (Pythagorus) এবং তাহার শিষ্যগণের মত এইরূপ যে, প্রকাশমান বাহ্যবস্তু হইতে কোন এক প্রকার সূক্ষ্মকণা নিরন্তর চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যখন ঐ কণা সকলের কিয়দংশ চক্ষুতে পতিত হয়, তখন আমরা ঐ বস্তু দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের আধুনিক ছাত্রগণ হয়ত প্রথম মতটীকে উপহাসযোগ্য মনে করিবেন কিন্তু সে সময়ে এই মতটিই অনেকের নিকট যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। নিউটনের (Newton) নিঃস্রবণ-বাদের (Emission-theory) সহিত দ্বিতীয় মতটীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আরিষ্টটল (Aristotle) এই দুইটী মতেরই প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে আলোক পেলিউসিড (Pellucid) নামক নিখিল বিশ্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর গুণ অথবা কার্য্য মাত্র। আরিষ্টটলের এই মতের ভিতর আলোকের আধুনিক আন্দোলন-বাদের (Undulatory theory) কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

প্লেটো-সম্প্রদায় দৃষ্টি সম্বন্ধে অসম্ভব মত প্রচার করিলেও ইহা তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে যে, তাঁহারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আলোকের সরল-রেখায় গতি এবং আলোক যখন কোন তলে (Surface) পতিত হইয়া, পরাবর্ত্তিত (Reflected) হয়, তখন আপতিত (Incident) আলোক-রেখা তলের লম্বের (Normal to the surface) সহিত যে কোণ করে, পরাবর্ত্তিত আলোক-রেখাও সেই কোণ করিয়া থাকে, এই দুইটী সত্য প্রচার করেন।

প্রাচীন লেখকদের মধ্যে মিশরদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমির (Ptolemy) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দিঙ্মণ্ডলের নিম্নে থাকিতেই যে দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেখানে অবস্থিতি-কালে তুঙ্গ স্থানে অবস্থিতির সময় হইতে বৃহদায়তন দেখায়, ইহা তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। আলোক এক ক্রিয়াধার (Medium) হইতে অন্য ক্রিয়াধারে লম্বমান ভাব ব্যতিরেকে প্রবেশকালে প্রবেশের পূর্ব্বে যে সরল রেখায় গমন করিতেছিল, তাহা হইতে পৃথক্ এক সরল-রেখা অবলম্বন করে। এই ঘটনার নাম বর্ত্তন (Refraction)। টলেমি আপতিত (Incident) আলোক-রেখা দুই ক্রিয়াধারের (Medium)—যেমন বায়ু ও জল—তল-সীমার (Surface of Separation) লম্বের সহিত যে কোণ করে এবং বর্ত্তিত (Refracted) আলোক-রেখাও ঐ লম্বের সহিত যে কোণ করে, তাহার সারণী (Tables) রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই দুইটী কোণের পরস্পরের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি ব্যতীতও ইন্দ্রধনু, মরীচিকা, প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনদিগের কিছু ধারণা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনন্তর বহুকাল নিশ্চেষ্টতার পর খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আরব দেশীয়েরা অধ্যবসায়ের সহিত আলোক-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হ'ন। আরব-দেশবাসী আল্‌হাজান (Alhazen) জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গণিত ভিত্তিতে আলোকের বিভিন্ন তত্ত্ব নির্ণয়ে অগ্রসর হন। চক্ষু-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কি কি ব্যবহার, তাহা দেখাইয়া দেন এবং দুই চক্ষু দ্বারা আমরা একটী বস্তুর দুইটী প্রতিরূপ না দেখিয়া কেন একটিই দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন এবং বাহ্যবস্তু হইতে একটিমাত্র আলোকরশ্মি আমাদের চক্ষুতে পতিত হইয়াই যে, বস্তুটিকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করায় না, পক্ষান্তরে বস্তুর প্রত্যেক বিন্দু হইতে কতকগুলি করিয়া রশ্মি চক্ষুতে পতিত হইয়াই বস্তুটিকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে, তাহা বুঝাইয়া দেন।

আল্‌হাজান আলোকের নানাপ্রকার ধাঁধার বিষয়েও

কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। উদয়াস্তের সময় চন্দ্রসূর্য্য বৃহদায়তন দেখায় কেন, তাহার কারণ তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করেন। —দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুইটী বস্তুর উচ্চতা যদি সমান বলিয়া বোধ হয়, তবে যে বস্তুটি বেশী দূরে, সেইটিই যে বড় ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। যদিও সূর্য্য-চন্দ্রের দৃষ্টি-গ্রাহ্য ব্যাস, উদয়কালে এবং তুঙ্গে কার্য্যতঃ এক সমানই থাকে, কেন না চন্দ্রসূর্য্যের পৃথিবী হইতে দূরত্ব এক সমানই রহিয়া যায়, তথাপি উদয়-কালে পার্থিব গৃহবৃক্ষাদির সহিত এক রেখায় দেখা যায় বলিয়া, সূর্য্যচন্দ্রের দূরত্ব তুঙ্গে অবস্থিতির সময় হইতে অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বৃহদায়তন বলিয়া মনে হয়।

আলোক বিষয়ে আল্‌হাজান, টলেমির পথানুসরণ করিলেও নিজে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় হইতে প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত তাঁহারই মত আলোক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মত বলিয়া ইয়ুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী সময়ের এই পাঁচশত বৎসর কাল আলোক-বিজ্ঞানের আর বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড (Poland) নিবাসী ভিটেলিয়ো (Vitellio) নামক এক ব্যক্তি আলোক বিষয়ে একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। আকাশে তারকার প্রতিমুহূর্ত্তে উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে তিনি অনুমান করেন যে, যে বায়ুর মধ্য দিয়া আমরা নক্ষত্রটিকে দেখিতে পাই, সেই বায়ুর গতিই ইহার কারণ। গতিশীল জলের মধ্য দিয়া নক্ষত্রটীকে দেখিলে উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। তিনিও টলেমির মত আলোক যখন এক ক্রিয়াধার হইতে অন্য ক্রিয়াধারে গমন করে, তখন আপতিত আলোক-রেখা ও বর্ত্তিত-আলোকরেখা, দুই ক্রিয়াধারের তল-সীমার (Surface of Separation) লম্বের সহিত যে ভিন্ন ভিন্ন কোণ করে, তাহার সারণী (Tables) রাখিয়া যান, কিন্তু তিনিও টলেমির মত এই দুই কোণের পরস্পর কি সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই; তবে প্রভেদ এই যে, ভিটেলিয়ো এই কোণগুলির অনেকটা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পর ইংলণ্ডের রোজার বেকনের (Roger Bacon) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি একজন অতি প্রতিভাশালী লোক ছিলেন এবং বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই অল্পাধিক লিখিয়া গিয়াছেন। আলোক বিষয়ে তিনি আল্‌হাজানের উপর নূতন কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই; পরন্তু প্রাচীনদিগের কতকগুলি অসম্ভব ও অভিনব মত তাঁহার নামের সমর্থন পাইয়া বহুকাল মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

বেকন, ম্যাজিক-লণ্ঠন আবিষ্কার করেন, জনশ্রুতি এইরূপ। কিন্তু তিনি দূরবীক্ষণের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ও চশ্‌মার আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি এরূপ ভাষায় তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা ভবিষ্যদ্‌-বাণীরূপে গৃহীত হইতে পারে। বেকন এবং ঐ সময়ের আরও কোন কোন লোকের লেখা হইতে এরূপ মনে হয় যে, কোন এক প্রকার দূরবীক্ষণের গুণ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন, অন্ততঃ কি কি গুণ থাকিতে পারে, তাহার অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দূরবীক্ষণের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে কিছু প্রচার হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না।

অন্য অন্য অনেক আবিষ্ক্রিয়ার মত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণের ধারণাও হয়ত যুগপৎ অনেকের মনে উদয় হইয়া থাকিবে এবং মোটামুটি ধরণের দূরবীক্ষণ হয়ত কেহ কেহ নিজের কৌতূহল-তৃপ্তির জন্য নিম্মাণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ সকল বিবরণ কেহ প্রকাশ করিয়া যান নাই। এই জন্যই দূরবীক্ষণের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার বাদ-প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়। ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা আপনাপন দেশের এক কিংবা অধিক ব্যক্তির উপর দূরবীক্ষণের প্রথম নিম্মাণ আরোপ করিয়া থাকেন। তবে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, লিপার্সী (Hans Lippershey) নামক কোন ওলন্দাজ চশ্‌মা নির্ম্মাতা, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম জগতে প্রকাশ করেন। দূরবীক্ষণের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্যালেলিও সামান্য প্রশংসা-ভাজন নহেন। লিপার্সীর আবিষ্কারের কেবলমাত্র সংবাদ পাইয়াই তিনি দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে কৃতকার্য্যও হন। তিনি এরূপ দক্ষতা ও একনিষ্ঠার সহিত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে অতি উন্নত

প্রণালীর একটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়া, ঐ যন্ত্রটীর সাহায্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করিলেন।

ইঁহার পরে কেপলার (Kepler) (১৫৭১-১৬৩০) সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণের সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ করেন এবং সাধারণ কিরণসম্পাত (Lens) ও কিরণ-কেন্দ্রান্তর-নির্দ্ধারণ (focal length) করিবার নিয়মগুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

তাহার পর নেপ্‌ল্‌স্ বাসী ব্যাপ্টিষ্টা পোর্টা (Baptista Porta) ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা (Camera Obscura) আবিষ্কার করেন। ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা বিষয়টী এই :— অন্ধকার কুঠরীতে ছিদ্রপথে বাহিরের কোনবস্তু হইতে আলোক প্রবেশ করিলে ঐ বস্তুটীর একটী বিপরীত প্রতিরূপ ঐ কুঠরীর দেওয়ালে গঠিত হয় ; অর্থাৎ বস্তুটীর উদ্ধভাগের প্রতিরূপ নিম্নে এবং নিম্নভাগের প্রতিরূপ উদ্ধে গঠিত হয়। এই ঘটনাটী আলোকের সরল-রেখায় গতিরই ফল। ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা আধুনিক ছায়া চিত্রের পথ-প্রদর্শক।

১৬১১ খৃষ্টাব্দের স্পেলাটোর (Spalator) প্রধান পাদ্রী এ. ডি. ডমেনিস্ (A. de. Dominis) ইন্দ্রধনুর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কোন কিরণাবলীর মেঘবারিবিন্দুতে একবার বর্ত্তন (Refraction) ও দুইবার আভ্যন্তরিক পরাবর্ত্তন (Reflection) হইতে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি। একটী কাচ-গোলক জলপূর্ণ করিয়া সূর্য্যালোক পাতিত করিলে, ইন্দ্রধনুর বর্ণ কয়টী পাওয়া যায়। ইহার পর ১৬২১ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে লিডেনের গণিতাধ্যাপক স্মেল (Smell) আলোক যখন এক ক্রিয়াধার হইতে অন্য ক্রিয়াধারে গমন করে, তখন আলোক-রেখার আপতন-কোণের 'জ্যা'র (Sine) সহিত বর্ত্তন-কোণের (Angle of refraction) 'জ্যা'র অনুপাত (Ratio) সর্ব্বদাই সমান (Constant), এই সত্যটী আবিষ্কার করেন। আলোক-বিজ্ঞানের ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। বর্ত্তন-ব্যাপারের গণিত ভিত্তিতে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই সত্যটী তাহার মূলে। ইতঃপূর্ব্বে টলেমি ও ভিটেলিয়ো আলোক-রেখার আপতন-কোণ ও বর্ত্তন-কোণের সারণী রাখিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্মেলের পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই দুই কোণের একটির পরিবর্ত্তনের সহিত অপরটির কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে স্মেল এই সত্য জগতে প্রকাশ না করিয়াই পরলোক গমন করেন। দেকার্ত্তে (Descartes) এই তথ্যটি প্রথম প্রকাশ করেন, এই জন্য তাঁহাকে ইহার প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরিষ্টটল ও দেকার্ত্তের মতের পরস্পর সাদৃশ্য আছে। দেকার্ত্তের মতে আলোক সর্ব্বস্থানব্যাপী, স্থিতিস্থাপক, কোন ক্রিয়াধারে অসীম বেগ-শালী চাপবিশেষ। আরিষ্টটল হইতে দেকার্ত্তের সময় পর্য্যন্ত আলোকের প্রকৃতি নির্ণয় সম্বন্ধে কোন উন্নতি হয় নাই।

ইহার পরে আসিলেন নিউটন্ (Newton) এবং গ্রীমল্ডা (Grimaldi)। গণিত বিজ্ঞান জগতে নিউটনের স্থান অদ্বিতীয় ; যতকাল পৃথিবীতে গণিত-বিজ্ঞানের চর্চ্চা থাকিবে, ততকাল নিউটনের নাম লোপ পাইবার নহে। তিনি গণিত-বিজ্ঞানের যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক গণিত-বিজ্ঞান তাহারই উপর উন্নত মস্তক লইয়া দণ্ডায়মান। আলোক-বিজ্ঞানের তিনি প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। যদিও আন্দোলন-বাদ (Undulating theory) তাঁহার নিস্রবণ-বাদের (Emission theory) স্থান অধিকার করিয়াছে তথাপি আলোক বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষাগুলির মূল্য চিরকাল অব্যাহত থাকিবে।

গ্রীমল্ড সর্ব্বপ্রথম আলোকের বিকৃতি (Deffraction) লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ আলোক-রশ্মি কোন ছিদ্র-পথে প্রবেশ কালে সকল দিকেই কিছু কিছু ছড়াইয়া পড়ে, ইহা প্রথম লক্ষ্য করেন। এই পরীক্ষা হইতে দেখা যায়, শব্দ যেমন কোন বস্তুর কিনারা ঘেঁসিয়া যাইবার সময় ঐ বস্তুর অপর পার্শ্বেও কিছুদূর ছড়াইয়া পড়ে, আলোকও সেইরূপই ছড়াইয়া পড়ে। তবে প্রভেদ এই যে, শব্দ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃহৎ বাধার অপর পার্শ্বে বহু দূর ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু আলোক এত অল্প ছড়াইয়া পড়ে যে, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন। অতএব দেখা যাইতেছে

যে, আলোক কেবল সরল-রেখার অবলম্বনে গমন করে না। আলোকের এই বক্রগতি দর্শনে অনুসন্ধিৎসুর মনে স্বতঃই একটি অনুমান আসিতে পারে—শব্দ যেমন বায়ুতে তরঙ্গরূপে গমন করে, আলোকও হয়ত সেইরূপ কোন বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াধারে তরঙ্গরূপে গমন করিয়া এবং আলোকের তরঙ্গগুলি হয়ত শব্দ তরঙ্গের অতীব ক্ষুদ্র।

বৈষ্ণব-কবি

[লেখক—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।]

অবগাহি' অলকার নব গঙ্গাজলে,
কল্পরতি-পরসাদে রস-তরুতলে
ধ্যানের আসনে বসি' সুধা-নিমন্ত্রণে,
প্রেমের পরম তীর্থে অরবিন্দ-বনে,
তোমরা হয়েছ ধন্য অমৃত-বিলাসে—
ভাসায়ে দিয়েছ দেশ রসের উচ্ছ্বাসে।
তোমরা গেয়েছ গুণী বাণী উপবনে
চিরবসন্তের শ্রীতে মুরলী-নিস্বনে—
"না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"
রাধা হ'য়ে বিরহের শাওন রজনী
জাগিয়াছ একাকিনী পল গণি' গণি';
ফিরিয়াছ কেঁদে কেঁদে যমুনার কূলে
না হেরি' তমাল-নীলে তমালেরি মূলে।
কোথা সে বাসক-সজ্জা! মালতী-মল্লিকা
ফুলের বালিস রচি' নবীনা বালিকা,
"ফুলের আচিরে আর ফুলের প্রাচীরে,"
ফুলশরে মূরছিতা নাথের মন্দিরে!
দোদুল ফুলের হার ভুজঙ্গের প্রায়
নিশি শেষ—ওই বুঝি বাঁশী শোনা যায়!
প্রেম-পাগলিনী হ'য়ে নীল নীপবনে
নাথের রাতুল পদে বসি' আন্‌মনে
ভাবিয়াছ—কোথা প্রিয়, কই সে আমার—
দু'নয়নে দর দর ঝরেছে আসার;
কৌতুকে হাসিয়া হরি সোহাগের ভরে
মুছায়ে দেছেন আঁখি আপনার করে।
রাখালের বেশে রাই, গোঠে গেল কবে,
কবরীতে চূড়া বেঁধে' দিল সখী সবে,
কটিতটে দিল ধটি; রতন-নূপুর
চরণেতে রুণু রুণু বাজিল মধুর!
কবে সেই মান-ভঙ্গ! শ্যাম-অনাদরে
ধীরে ধীরে বিরহিণী মরিবার তরে
ভাসাল যমুনা-জলে সোণার বিজুলি—
নেচে ওঠে তালে তালে কালো ঢেউগুলি
চন্দ্রাবলী-কুঞ্জ ছাড়ি' হেন কালে হরি
কহিলেন সেথা আসি' বিপ্রবেশ ধরি'—
"হে কিশোরি, মরণ সে শ্যামেরি সমান
নিকরুণ তব প্রতি—ছাড় অভিমান।
হে তরুণি, মরণের আছে কত দেরি
বলে' দিতে পারি যদি করকোষ্ঠী হেরি।"
মানময়ী বাড়াইয়া দিল হাতখানি,
পরিচিত-পরশনে শিহরিল পাণি।
একদিন বৃন্দাবন অন্ধকার করি'
দ্বারকার সিন্ধুকূলে চলে' গেল হরি—
তন্দ্রাঘোরে হেরে সেথা রাধিকারমণ
অশ্রুধারে ধৌত কার আঁখির অঞ্জন।—
তনুমন ঢালি দিয়ে রুক্মিণী-সুন্দরী
পারে নি বাঁধিতে তাঁরে পাদপদ্ম ধরি'।
চমকিয়া ওঠে রাই চন্দন-পরশে,
গুঞ্জরে না অলি আর কমল-সরসে,
মালঞ্চে গাহে না পাখী, ফোটে নাকো কলি
মাধবের অদর্শনে বিরস সকলি।
কতদিনে প্রাণবন্ধু পরবাস থেকে
ফিরে এল—আচম্বিতে ওঠে সারী ডেকে,
ফোটে ফুল,—ভুজে ভুজে আকুল বন্ধন—
চিরন্তন রস-রঙ্গ অনন্ত যৌবন।
রাসেশ্বরী-সৌন্দর্য্যের গৌরব-বিহারে
বাঁধিল সে রসরাজে বরণের হারে।
কোথা মধু-অনুরাগ, অমৃত-পুলিন?
মণির মৃণাল-বৃন্তে ফুটেছে নলিন—
কোন্ অরুণের রাগে পাব প্রাণনাথে?
কোন্ মন্ত্রে, কোন তন্ত্রে প্রেম-অশ্রু-পাতে
কোন্ কুঞ্জে দেখা দিবে মদন-মোহন?—
অন্তরে পাইব ফিরে অন্তরের ধন।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

অষ্টম অধ্যায়

[লেখক — মাননীয় বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ K.C.I.E., K.C.S.I., I.O.M.]

লুজার্ণ

২০এ মে প্রাতঃকালে মিলান ত্যাগ করিয়া আমরা লুজার্ণ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। একটা পাহাড়ে ধস্ নামিয়া রেলের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য মিলান হইতে আমাদিগকে একটু ঘোরা-পথে যাইতে হইয়াছিল; সুতরাং আমাদের যে সময়ে লুজার্ণে পৌছিবার কথা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দিন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এ দিনের দৃশ্য অতি সুন্দর, পরম রমণীয়—কারণ আজ আমরা আল্প্‌স্ পর্ব্বতের শোভা এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলাম। চিয়াসোতে আমরা সীমান্ত পার হইলাম; সুতরাং সেখানে আর একবার শুল্ক-বিভাগের পরীক্ষা-বিভ্রাটে পড়িতে হইল। একটু অগ্রসর হইয়াই আমরা কোমোহ্রদ দেখিলাম;—তাহার পরেই লুগেনে হ্রদ। একটু একটু করিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল, আকাশও নির্ম্মল হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেণ্ট গোমার্ড সুরঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। এ স্থানের দৃশ্য অতীব চমৎকার।

সিম্পল সুরঙ্গ (Simple Tunnel) প্রস্তুত শেষ হইবার পূর্ব্বে উপরিউক্ত সুরঙ্গটীই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুরঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইত। এই সুরঙ্গটি সাড়ে সাত মাইল লম্বা; যে সকল গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল হিসাবে যায়, সে সকল গাড়ীরও এই সুরঙ্গ পার হইতে পনর মিনিটের অধিক সময় লাগে। আমাদের গাড়ী যখন সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন আমরা দেখিলাম, চারিদিক তুষারাচ্ছন্ন, তখনও তুষারপাত হইতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত তুষার পড়িতেছে। আমার নিকট সে এক অভিনব দৃশ্য! আমরা যখন সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন বেশ শীত শীত বোধ হইতেছিল, তবুও সুরঙ্গের মধ্যে আমাদের গাড়ীর ইঞ্জিনের ধূমের জ্বালা আমরা গাড়ীর সমস্ত সার্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। সুরঙ্গ প্রবেশ করিবার একটু পূর্ব্বেই বাদলার জন্য আমরা অভিযোগ করিতেছিলাম, কারণ আকাশ মেঘে ঢাকিয়া থাকায় আমরা এমন সুন্দর দৃশ্য সকল উপভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এখন আমরা সে সকল কথাই ভুলিয়া গেলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও তুষারপাত দেখি নাই, সুতরাং এ দৃশ্য যে আমাদের নিকট কেমন মনোমোহন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার নহে। সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়াই গাড়ীখানি অল্পক্ষণের জন্য থামিয়াছিল। তখন আমরা এই তুষারপাত আরও ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম।

আমাদের গাড়ী গোসেনেন ছাড়িয়া আমষ্টেগ্ অভিমুখে ছুটিল; তখনও তুষারপাত হইতেছে। আমষ্টেগে পৌছিয়া দেখিলাম, তুষারপাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চারিদিক্ শুভ্রবর্ণ তুষারে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর আমরা আর্থগোল্ড ষ্টেশনে পৌছিয়া শুনিলাম যে, আমাদের যে পথে যাইবার কথা, সে পথে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে; পথের মধ্যে একটা পাহাড়ের ধস্ নামিয়া রেল-লাইন অগম্য হইয়াছে। ভাল কথা! তখন শুনিলাম, আমাদিগকে অবশ্য এই ষ্টেশনেই বসিয়া থাকিতে হইবে না, আমাদের গাড়ী ঘোরা-পথে জুগ হইয়া লুজার্ণে পৌছিবে। এখানকার আবহাওয়ার গতি দেখিয়া আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, লুজার্ণে যে কয়দিন থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার একদিন কমাইয়া ফেলিব। যাহাই হউক, যখন আমরা লুজার্ণের ন্যাসনাল হোটেলে পৌছিলাম, তখন চারিদিকে যে সুন্দর দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা পরম সুন্দর। হোটেলের সম্মুখেই হ্রদের মহান্ দৃশ্য, এই হ্রদের তীরেই সহর, সহরের পশ্চাতে অপর পার্শ্বেই

তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তখন আমরা পূর্ব্বের সঙ্ক ত্যাগ করিলাম। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক, আর রৌদ্রই উঠুক, আমরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে এ সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছি না। য়ুরোপ অঞ্চলে আমরা যে কয়টী অতি উৎকৃষ্ট হোটেলে বাস করিয়াছি তন্মধ্যে এই ন্যাসনাল হোটেল একটী; এখানে আহারাদির সুন্দর ব্যবস্থা এবং হোটেলে বর্ত্তমানকালের সভ্যতা ও বিলাসিতার সমস্ত উপকরণই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার জন্য এই হোটেলের যে কক্ষটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সম্মুখেই হ্রদ। আমি যে কয়দিন এই হোটেলে ছিলাম, তাহার মধ্যে যখন তখনই আমার কক্ষের বাতায়নে বসিয়া এই হ্রদের শোভা, সহরের দৃশ্য, আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের মহান্‌ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতাম এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বসিয়া থাকিতাম।

মিলান হইতে লুজার্ণে আসিতে হইলে যে রেলপথে আসিতে হয়, তাহা যে শুধু সেণ্ট গোথার্ড সুরঙ্গের জন্যই সুন্দর তাহা নহে, ইহা রেল-স্থাপত্য-বিদ্যার এক মহান্‌ কীর্ত্তি। এই পথে আসিতে যে কত সুরঙ্গ, কত বৃত্তাকার পথ (Loop)—কত চড়াই উৎরাই পার হইতে হয়, তাহা বলিতে পারি না।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তখনই টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া ত আর ঘরে বসিয়া থাকা যায় না। ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি, জলবৃষ্টির ভয় করিলে কি চলে? আমরা প্রাতঃকালেই কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি খরিদ করিবার জন্য বাহির হইলাম। এখানকার কাষ্ঠের কাজ অতি সুন্দর; এ সহরও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যের কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সহরটী কিন্তু খুব ছোট। আমরা কিছু জিনিসপত্র কিনিয়াই সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। এখানে অনেকগুলি হোটেল ও কএকটি সুন্দর উদ্যান-বাটিকা দেখিলাম; তাহাই এ সহরের যাহা কিছু। যেখানে নদীটা হ্রদে পড়িয়াছে, সেই স্থানে একটা সেতু আছে; আমরা সেই সেতু পার হইয়া গেলাম। এই স্থানে একটা কারখানা দেখিলাম; এই কারখানার সংলগ্নে একটা মিউজিয়ম বা যাদুঘর আছে। এখানে সুইজরল্যাণ্ডের সকল রকম পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট পতঙ্গ প্রভৃতির মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব স[illegible] এই যাদুঘরের একটা বিভাগ আছে; তাহাতে নানা[illegible]মের প্রস্তরাদি সজ্জিত আছে। যে বাগানের মধ্যে যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত, সেই বাগানের প্রবেশ-দ্বারের একটী মনুমেণ্ট আছে; তাহাতে মুমূর্ষু সিংহের (Dying Lion) যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহা অতি সুন্দর। একটি ইতিহাস আছে। ফরাসী-বিপ্লবের সময় সুইস্‌ রক্ষীরা টুইলারিসে ষোড়শ লুইকে রক্ষা করিবার জ[illegible] ভাবে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই স্মরণীয় ক[illegible] জন্য এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই উ[illegible] নিকটেই আর একটা যাদুঘর আছে; তাহার নাম Museum of Peace and War 'যুদ্ধ ও সন্ধিবি[illegible] কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের [illegible] যুদ্ধের দৃশ্য প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে; যুদ্ধের ভীষণতা সাধারণকে দেখাইবার জন্যই এ সকল প্রদর্শিত হইয়া থ[illegible] যুদ্ধের ভীষণতা ও নৃশংসতা দর্শনে শান্তিপ্রিয়, সরল, প[illegible] সুইজারল্যাণ্ডবাসী কৃষকগণ সুশিক্ষা লাভ করিতে [illegible] কিন্তু য়ুরোপের যে সমস্ত জাতি সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য [illegible] মারি কাটাকাটি করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহারা [illegible] দর্শন করিয়া কোন শিক্ষাই লাভ করিবে না।

এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই আমরা হোটেলে [illegible] আসিলাম। অপরাহ্নকালে আকাশ একটু পরিষ্কার [illegible] আমরা মোটর লঞ্চে চড়িয়া, হ্রদের মধ্যে ভ্রমণ ক[illegible] গেলাম। আমাদের হোটেলের সম্মুখ হইতেই [illegible] নৌকায় চড়িয়াছিলাম,—তাহার পর হ্রদের পার্শ্ব[illegible] যাইতে যাইতে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান দর্শন ক[illegible]ছিলাম। একটা স্থানে দেখি, হ্রদের তীরেই একটা [illegible] রেল লাইন পাতা রহিয়াছে। আমরা সেখানে [illegible] হইতে নামিলাম, এবং তীরে উঠিয়াই দেখিলাম, [illegible] প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া [illegible] চড়াই উঠিয়া বারজেনষ্টকে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে হ্রদের শোভা দর্শন করিয়া আমরা পুন[illegible] হইলাম। কিছুক্ষণ পরে রেলে চড়িয়া নামিয়া আসি[illegible] এবং আমাদের নৌকায় উঠিয়া ওয়েগিজ, ভিজনো, বে[illegible]রেড প্রভৃতি কএকটী স্থান দেখিয়া ব্রুনেনে উপ[illegible] হইলাম। এই ছোট সহরটী দেখিতে অতি মনোরম।

মাইটেন্‌ষ্টিন

সহরের নিকট একটা বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। প্রস্তরখণ্ড হ্রদের জলের মধ্য হইতে উঠিয়াছে এবং উচ্চতাব বোধ হয় একশত ফিট হইবে। এই প্রস্তর গাত্রে খোদিত লিপি আছে। তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই প্রস্তরখণ্ড জার্ম্মান কবি সিলারের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এই কবিবরই উইলিয়ম টেলের কাহিনী কবিতায় চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তরখণ্ডের নাম মাইটেন্‌ষ্টিন (Mytenstin)। ইহারই নিকটে টেল্‌স্‌ প্লেট (Tell's Platte) নামে একটী স্থান দেখিলাম। শুনিলাম যে, টেলকে যখন নৌকায় করিয়া কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন এই স্থানে তিনি নৌকা হইতে নামিয়া পলায়ন করেন; তাই এই স্থানে এই উপাসনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এ দেশের পল্লীবাসীরা দলে দলে এই স্থানে সমবেত হয় এবং তাহাদের এই জাতীয় বীরবরের স্মৃতির পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, উইলিয়ম টেলের গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যা; ও নামের কেহই ছিল না। এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা ফ্লুয়েলেন হইয়া লুজার্ণে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা চারি ঘণ্টার মধ্যে এ বেলার ভ্রমণ শেষ করিয়া দিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিয়াছিলাম।

আমরা যখন হ্রদে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন একটা বড় আমোদজনক ঘটনা হইয়াছিল; সে কথাটা এখানে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমরা যখন বোটে চড়িতে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে একটী সাত আট বৎসর বয়সের বালক আমাদের নিকটে আসিয়াছিল এবং এমন ভাবে আমাদের দি চাহিতেছিল যে, আমার মনে হইল সে হ আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে চা আমি তাহাকে ডাকিয়া আমাদের সা হ্রদে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলা বালকটী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। এ ছেলে কোন ছোটলোকের ছেলে নহে; এ লুজার্ণে আমেরিকান্‌ কন্‌সলের পুত্র। ছেলেটীর ন হ্যারি মরগান। সে বেশ চালাক-চতুর,—আ এমন শিষ্ট শান্ত অথচ বুদ্ধিমান বালক অতি কমই দেখিয়াছি সে আমাকে এমন সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে আমি অবাক্‌ হইয়া গেলাম; তাহার এত বাক্যবাগীশত বিরক্ত না হইয়া আমি বিশেষ আনন্দই অনুভব করিয় ছিলাম; বাস্তবিকই এতটুকু একটু ছেলের এমন বু ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ বো করিয়াছিলাম। বালকটী যে ভাবে তাহার স্বদে আমেরিকার প্রতি তাহার প্রাণের টান প্রকাশ করিল, তাহ সত্য সত্যই অতি সুন্দর!—তাহা হইতেই বুঝা যায়, প্রদেশের বালকেরা অল্প বয়স হইতেই কেমন স্বদেশপরায় হইয়া থাকে। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্বে আমি নৌকা কর্ণধারকে বলিয়াছিলাম যে, সে যেন নৌকার উপর হইতে আমেরিকান্‌ নিশান নামাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের নিশান তুলিয়া দেয়। সে সময় অনেক আমেরিকার ভদ্রলোক সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন; বোধ হয় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নৌকার কর্ণধার তাহার নৌকায়—তারা ও ছককাটা আমেরিকান্‌ নিশান তুলিয়া দিয়াছিল। কর্ণধার আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল, সে বৃটীশ পতাকাই তাহার নৌকায় উড়াইয়া দিয়াছিল। এই পতাকাটীর ব্যাপার আমার বালক সঙ্গীটির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা যখন নৌকায় উঠিয়া বসিলাম এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন বালকটী তাহার অনুনাসিক স্বরে আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিল। সে বলিল "আপনি আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকার) জাতীয় পতাকা নামাইতে আদেশ দিলেন কেন?" আমি প্রথমে তাহাকে আমেরিকা সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে ভুলিবার ছেলে নহে। অবশেষে আমি বলিলাম

যে, আমি আমেরিকাকে অশ্রদ্ধা করি না, এবং সেজন্যও আমেরিকার নিশান নামাইয়া ফেলিতে বলি নাই; তবে কথা এই যে, আমি বৃটীশ রাজার প্রজা; আমার পক্ষে বৃটীশ পতাকাকেই প্রাধান্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাই আমি বৃটীশ পতাকা উড়াইতে আদেশ করিয়াছি। আমার এই কৈফিয়তে বালক সন্তুষ্ট হইল। এই বালকটীর কথা আমার অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। বারুজেনষ্টকে পৌছিয়া আমার সহযাত্রী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় বালকটীকে এত অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়াছিলেন যে, আমাদের প্রত্যাগমনের সময় বালকটী বড়ই অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি, আমার সহযাত্রী আর একজনও অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। আমি বালকটীকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম এবং সহযাত্রী অসুস্থ বন্ধুটীকে সাহস দিতে লাগিলাম যে, এই এখনই নৌকা তীরে লাগিবে। অবিলম্বেই নৌকা তীর-সংলগ্ন হইল; বালকটী তাহার আবাসে চলিয়া গেল; আমরাও হোটেলে উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় দেখি, সেই বালকটী তাহার নিজের পক্ষ হইতে তথা তাহার মাতার পক্ষ হইতে আমাকে ধন্যবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়াছে। এই বালকটীর কথা আমার কএকদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই মনে পড়িত।

পর দিন প্রাতঃকালে আমরা তারের রেলে চড়িয়া গুস্ পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোরম। অপরাহ্ণকালে আমরা পুনরায় হ্রদের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বদিন যে মাঝীর নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, এ দিনেও সেই নৌকাই পাইয়াছিলাম। আমরা প্রথমে আল্‌প্ন্যাকে গিয়াছিলাম; তাহার পর পুনরায় ভিজনো দেখিতে গিয়াছিলাম।—এই স্থান হইতে রিজি পর্য্যন্ত রেল চলিয়া থাকে; কিন্তু আমরা এই স্থানে পৌছিয়া শুনিলাম যে, পাহাড়ে এত অধিক তুষারপাত হইয়াছে যে, গাড়ী অর্দ্ধেক রাস্তার বেশী যাইতে পারিতেছে না। এই কথা শুনিয়া আমরা সে দিকে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। তাহার পর আমরা কুস্‌নটে গেলাম। সেই স্থান হইতে আমরা আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের ফিন্‌স্টেরার হরণ্ শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। এইটী সুইজর্‌লণ্ডের পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানীয়। অতি সুন্দর। এ দৃশ্য কিছুতেই ভুলিবার নহে। সং প্রাক্কালে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ তুষার পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হইয়া যে শোভা বিস্তার করিয়া তাহা বর্ণনাতীত।

এখানকার গ্লেসিয়ার বাগান আর একটি বি দ্রষ্টব্য। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গ্লেসিয়ার গাত্রে যুগান্তের কতই চিহ্ন প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে।

গ্লেসিয়ার বাগান

সুইজর্‌লণ্ডে অতি অল্প সময়ই আমরা অবস্থি করিয়াছিলাম; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি য দেখিয়াছিলাম,—তাহাতে এদেশ সম্বন্ধে আমার মনে এব ভাল ভাবেরই সঞ্চার হইয়াছিল। এখানকার লোকগু বেশ সরল ও পরিশ্রমী;—তাহারা ইটালীর লোকদিে মত অনুসন্ধিৎসু নহে। এখানে একটী জিনিস আমি প্রথম দেখিলাম; লুজার্ণো রাস্তার ধারে স্থানে স্থা অকেজো কাগজ রাখিয়া দিবার স্থান আছে, অবশ্য প য়ুরোপের অন্যান্য সহরেও এ ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম।

লুজার্ণের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা মোটে ত্রিশ হাজা মাত্র; কিন্তু অনেক সময়েই আর ত্রিশ হাজার লোক অন্য নানা দেশ হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকে।

নিবেদিতা

[লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M.A.]

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৩)

আমার এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া এখন অনেকেরই মুখে হাসি আসিবে। কিন্তু কুল-প্রথানুযায়ী আমাদের সমাজে কুলীনদিগের মধ্যে আগে প্রায় ওইরূপ বয়সেই বর-কন্যার মধ্যে 'সম্বন্ধ' স্থাপিত হইত। অবশ্য বিবাহ যে তখন হইত না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবাহ হইতে চারি পাঁচ বৎসরের অধিক বিলম্ব হইত না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ—উভয়েই কেবল বালকের উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা করিত।

আমরা দাক্ষিণাত্য শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ—কুলীন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আমাদের সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন। আমার পিতামহ এরূপ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন গৌরবের বিষয় মনে করিয়াই আগ্রহের সহিত ওরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। আমার ভাবী শ্বশুরও অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। যাজন-ক্রিয়ায় যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কোন রকমে তাঁহার দিনপাত হইত।

দরিদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের প্রদেশে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহ ছিল না। শুনিয়াছি, ষড় দর্শনেই তিনি সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, সকলেই তাঁহাকে একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমীদারই কায়স্থ। তাঁহারা সে সময়ে তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতকলেজে চাকরী লইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি অনুরোধ রাখেন নাই—ম্লেচ্ছের চাকরী স্বীকার করেন নাই।

তাঁহার নাম ছিল শিবরাম সার্ব্বভৌম। কিন্তু 'সাভ্যোম' ম'শায় বলিয়া দেশের মধ্যে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিচয়ের জন্য তাঁহার নামের আর বড় একটা প্রয়োজন হইত না।

আমার পিতামহ রাম সেবক শিরোমণিও একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যে তিনি 'সাভ্যোম' ম'শায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। তবে 'সাভ্যোম' অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি বেশী ছিল। দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা তিনি পূর্ব্বে হইতেই বুঝিয়া সাহেবের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন অনেক সিবিলিয়ানকে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছিল ও ইংরাজ-মহলে প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটিয়াছিল। দেশে বাগান-বাগিচা, দুই দশ বিঘা জমি প্রভৃতি সম্পত্তি করিয়া তিনি পরিবারবর্গকে অন্নচিন্তা হইতে নিস্কৃতি দিয়াছিলেন। পিতারও ভবিষ্যৎ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় রাখিয়া তিনি পিতাকে সংস্কৃতকলেজে পড়াইতেন। এবং যে বৎসর পিতা বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসরেই তাঁহার এক ছাত্র উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীকে ধরিয়া পিতার ডেপুটিগিরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তবে ভাগ্যবশে পিতার হাকিমী দেখা পিতামহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিয়োগ-পত্র আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিল।

এরূপ তেজস্বী সার্ব্বভৌম সাহেবের চাকরী স্বীকার-কারী ব্রাহ্মণের পৌত্রকে কেমন করিয়া কন্যাদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেইটাই কেবল আমি বুঝিতে পারি নাই—আজি পর্য্যন্তও পারি নাই।

পিতার হাকিমী-প্রাপ্তির চেষ্টা পিতামহ এতই গোপনে করিয়াছিলেন, এবং পিতাকেও একথা এমন গোপনে রাখিতে বলিয়াছিলেন যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও জানা দূরে থাক্, বাড়ীর কেহও তাহা জানিতে পারেন নাই। পিতা-মহী পর্য্যন্ত একথার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। ম

বোধ হয় পিতার কাছে কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর পিতার চাকরী হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মায়ের কথাবার্ত্তায় ও আচরণে কতকটা অনুমান করিতে পারি; কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখি, মা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অন্য অন্য দিন যখন পড়া শেষ করিয়া ভিতরে আসি, তখন মায়ের রান্না একরূপ শেষ হইয়া যায়। আজ আর পড়া হয় নাই, সেই জন্য সকাল সকাল উঠিয়াছি।

যেখানে ইস্কুল, সে স্থান আমাদের গ্রাম হইতে পাকা এক ক্রোশ দূরে। আমাদের গ্রাম হইতে আরও পাঁচ ছয়জন বালক সেই ইস্কুলে পড়িতে যাইত। আমরা এই কয়জন প্রায়ই প্রত্যহ ইস্কুল বসিবার এক ঘণ্টা আগে গ্রাম হইতে যাত্রা করিতাম। যাইবার সময় দলবদ্ধ হইয়া চলিতাম। ইহাদের মধ্যে একটী প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক, আমাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যাইত। আমি কোনও দিন তাহার আগে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। সে দিন মনে করিলাম, আমি আগে প্রস্তুত হইয়া আমার সহচরকে ডাকিতে যাইব।

এই মনে করিয়া আমি রন্ধনশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। এবং মাকে বলিলাম—"মা! আমাকে ভাত দে। আমি আজ রামপদকে ডাকিয়া যাইব।"

মা উনুন হইতে হাঁড়ি নামাইতেছিলেন। তিনি আমার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আমি আবার বলিলাম "আমার কথা শুনিতে পেলিনি?" মা এবারও কোন উত্তর দিলেন না। আপনার মনে কি বলিতে বলিতে হাঁড়ির ভিতর কাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন।

দুইবার উত্তর না পাইয়া আমার রাগ হইল। আমি রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটু জোর করিয়া বলিলাম—"ভাত দিবিত দে। নইলে আমি না খেয়ে ইস্কুলে চলিয়া যাইব।"

এইবারে মা উত্তর করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়াছেন। কেবল ক্রোধের বশে আমার কথার উত্তর করেন নাই। মা বলিলেন— "ইস্কুলে যাইয়া কি করিবি? পড়াশুনাত কিছু হইল না।"

এইরূপে কথা আরম্ভ করিয়া মা ব্রাহ্মণ ও পিতামহীর ব্যবহারের উপর অনেক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলে[ন]। আমাকেও তিরস্কার করিলেন এবং পিতার সঙ্গে আমা[কে] কলিকাতায় পাঠাইবার ভয় দেখাইলেন, এবং বলিলে[ন] একবার সেখানে পাঠাইলে আর দশবছরের মত এমু[খো] হইতে দিব না।

আমি শৈশব হইতে পিতামহীর আশ্রয়েই পালিত[।] আমার শাসনে মায়ের কোনও অধিকার ছিল না। সুতর[াং] মায়ের এই সকল কথা শুনিয়াও আমাতে বিন্দুমাত্র ভয়ে[র] সঞ্চার হইল না। আমি অন্নের জন্য বারংবার মাকে পীড়[া] করিতে লাগিলাম। ইস্কুলে যাইবার সময় একান্ত উপস্থি[ত] হইল দেখিয়া অগত্যা তিনি আমাকে ভাত বাড়িয়া দিলেন[।]

সবে মাত্র একটী গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়াছি, এমন সম[য়] পিতামহী রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া মাকে ডাকিলেন- "বৌমা!"

আমার বেলায় যেমন মা প্রথমে কোনও উত্তর দে[ন] নাই, এবারেও তিনি তাই করিলেন। পিতামহীর ডা[কে] উত্তর দিলেন না।

পিতামহী আবার বলিলেন—"বৌমা!"

মা এবারে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। মু[খ] না ফিরাইয়াই কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন:- "কেন?"

"মুখ তুলিতেছ না কেন?"

"কি বলিবে বল না।"

"তুমি হাঁড়ীর দিকে মুখ করিয়া থাকিলে কি বলিব।"

"হাঁড়ীমুখটা কিসে দেখিলে?" এই বলিয়া মাতা মু[খ] ফিরাইলেন।

"হাঁড়ীমুখ ত বলি নাই মা, হাঁড়ীর দিকে মুখ বলিয়[া] ছিলাম। তবে এখন দেখিতেছি তাই, মুখ হাঁড়ীর মত হইয়াছে। কেন মা, এরূপ হইবার কারণ? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে।"

"কার কি করিয়াছি, তা বলিবে?"

"তবে মুখ গম্ভীর হইল কেন?"

"তুমি নিজেই যখন নাতীর পরকাল নষ্ট করিতে কোম[র] বাঁধিয়াছ, তখন মুখে হাসি আনি কেমন করিয়া?"

"আমি পরকাল নষ্ট করিলাম!"

"তা নয় ত কি? ও বামুন সকালবেলায় কি করিতে[...]

আসিয়াছিল ? ছেলের পড়া হইল না।" বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত বাড়ী যাবার সময়ে বলিয়া গেল।—"সার্ভৌম আসিয়া হরিহরের পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইল। আমি আর তার কথা-শেষের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না—ঘরে চলিলাম। আজ যদি হরিহর ইস্কুলে পড়া বলিতে না পারে, তার জন্য আমাকে যেন দায়ী করিবেন না।"

"কই, একথা সে আমাদের বলিল না কেন ? আমরা জানি, সে পড়ানো শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর আমাদের কথায় তাহার পড়ানো বন্ধ করিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না।"

"তোমাদের মতন তোমরা বুঝিলে, সে তাহার মতন বুঝিয়াছে। এই কচিবালকের কাছে বিবাহের কথা লইয়া তোমরা কিচকিচি করিবে, বালকের কি তাতে মনঃস্থির থাকিতে পারে, না পণ্ডিতই মনোযোগ দিয়া পড়াইতে পারে ?"

"না মা, আসল কথা তা নয়।"

এই বলিয়া পিতামহী ঘটনাটা বিশদরূপে মায়ের কাছে বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন—"সে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীর কাছে কচিছেলেকে পড়াইতে দিলে তাহার শিক্ষার কিছুই ফল হইবে না।"

"তা কচিছেলেকে যার তার কাছে মাথা নোয়াইলেই বা ছেলের কি শিক্ষা হইবে ? পণ্ডিতকে বামুন যা ইচ্ছে তাই বলিয়াছে। সে কেমন করিয়া সেখানে থাকিবে ! তাহাকে নমস্কার করে নাই, তাহাতেই একেবারে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে !"

মা এই সকল কথা বলিতেছেন, পিতামহী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, আর আমি একডেলা ভাত হাতে করিয়া তাঁহাদের উভয়েরই পানে চাহিয়া আছি। তাঁহাদের এ বাদানুবাদ আমার কেমন ভাল লাগিতেছে না।

পিতামহের জীবদ্দশায় ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের এরূপ কথাবার্ত্তা কখন শুনিনাই। তখন কার্য্যের দোষ উপলক্ষ্য করিয়া পিতামহীই মাঝে মাঝে মাকে মৃদু তিরস্কার করিতেন। আজ প্রথম আমি পিতামহীকে মায়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে দেখিলাম। মায়ের এভাব দেখা আমার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এভাব আমার ভাল লাগিলনা। পিতামহীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, অন্তর হইতে যেন বিষাদ সবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে। পিতামহী প্রাণপণ চেষ্টায় ভাব-সম্বরণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বহুচেষ্টাতেও ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না।

মা পিতামহীর মুখের ভাব দেখিয়া, মাথা অবনত করিলেন। চোখের পানে চাহিয়া কথা কহিতে আর বোধ হয়, তাঁহার সাহস হইল না।

তখন আমার দিকে চাহিয়া, আমাকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বলি, পড়ার দফাতো রফা হইয়াছে। ইস্কুলেও কি আজ যাইতে হইবে না। বাবু আসিলে তাঁর সঙ্গে তোকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব। এখানে পাঁচ জনের দৌরাত্ম্যে তোর পরকাল ঝরঝরে হইয়া যাইবে।"

পিতাকে বাবু নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া পিতামহী বলিলেন—"বাবু কে গো ?"

মা এ কথার আর কোনও উত্তর দিলেন না। পিতামহী বলিতে লাগিলেন—"কাল পর্য্যন্ত কর্ত্তা ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি না মরিতে মরিতেই তাঁর ছেলে বাবু হইয়াগেল ! এখনও যে ঘরে চালের খড় ঘুচে নাই। গরীব বামুনের ছেলেকে বাবু বলিতে শুনিলে, পাড়ার লোকে যে গায়ে ধূলা দিবে !"

মা তথাপি নিরুত্তর। আমিও নিঃশব্দে আহারে নিযুক্ত। আহার প্রায়-শেষ হইয়াছে, এমন সময় রামপদ আসিয়া আমাকে ডাকিল—"হরিহর !"

মা ও পিতামহীর বৃথা বাদানুবাদে সেদিন আমার আর আসল কথা শুনা হইল না।

(৪)

সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতামহী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বেলা অপরাহ্ণ। মা ঘরদোর ঝাঁটদিয়া কাপড় কাচিয়া, ঘরের দাওয়ায় চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। প্রতিবাসিনী সেই পূর্ব্বোক্ত ঠানদিদি, মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছেন। আমি ইস্কুল হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া 'জল-খাবার' খাইতে বসিয়াছি। উপনয়ন হইবার আগে আমি বিকালে দুধ-মাখা ভাত খাইতাম। এখন এক সূর্য্যিতে দুইবার অন্নাহার নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ উপনয়নের পর এখনও এক

বৎসর অতীত হয় নাই। সুতরাং আচমনীয় কোনও বস্তু অর্থাৎ মুড়ি অথবা অপর কোনও ভাজা-জিনিষও বিকালে খাইতে আমার অধিকার ছিল না। পিতামহী সেই জন্য ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি অনাচমনীয় মিষ্টান্ন আমার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।

আমি তাই খাইতেছি, আর চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা ও ঠাঁনদিদিতে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহাই শুনিতেছি।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন—"হাঁ বৌমা, হরিহরের বিবাহের কি হইল?"

মা বলিলেন—"চুলো জানে। ও সব কথা গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়ো। আমি বাড়ীর ঝি বইত নয়!"

ঠানদিদি। সেকি মা,—তুমি ঘরণী গৃহিণী—বউ, তুমি ঝি হইতে যাবে কেন?"

মা। সে তোমরা দূর থেকে দেখছ। ভিতরের মর্ম্ম্ত জান না?

ঠানদিদি। কেন, দিদি কি তোমাকে কিছু বলিয়াছেন নাকি?

মা। বলবে আবার কি? বলবার আমি কার ধার ধারি।

ঠানদিদি। কেন দিদি ত সে রকম লোক নয়!

মা। এই যে বললুম, বাইরে থেকেই ওই রকম দেখতে। ঘর-জ্বালানি পাড়া-ভোলানি। মুখের বচন ত শোননি খুড়ীমা! তবু যদি আমার গতর না থাক্‌তো। সারাদিন মুখে রক্ত-ওঠা খাটুনি। কোথায় দু'টো মিষ্টি কথা শুনবো, তাও আমার বরাতে নেই। একটা ঝি নেই, চাকর নেই—উনিও ঠাকুর মরবার পর থেকে একেবারে হাত পা এলিয়ে দিয়েছেন। কেবল বাকিটা বেড়েছে।

ঠানদিদি। তা হ'লে ত দিদির বড় অন্যায়। তবুতো তোমাদের বাসন মাজবার, গরুর সেবা করবার, লোক আছে। আমার আবার তাও নেই। ঘরঝাঁট দেওয়া থেকে ঠাকুর-পূজো পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে হাতে করতে হয়। বউটা একটা কুটো পর্য্যন্ত নাড়্‌বে না। তবু আমি তাকে কিছু বলিনা।

মা। তোমার মতন শাশুড়ী ক'জনের হয়! আমার বাবা আমার পিছনে তিনটা ঝি রাখিয়াছিলেন। বাড়ীর একটীও কাজ তিনি আমাকে করিতে দিতেন না। পেয়াদারা ছেলেবেলায় মাটীতে আমাকে পা দিতে দিতনা।

ঠানদিদি। তাকি আর বুঝিনা মা! হাকিমের পেশকারী—সে কত বড় চাকরী। আমার বাপের বাড়ীর দেশের নবীন চৌধুরী পেশকারী করে জমীদারী করে গেছে।

মা। খেটে খেটে গতর চূর্ণ করছি, তাতেও দুঃখ নেই—যদি মুখের একটুও মিষ্টতা পেতুম।

ঠানদিদি। পরের মেয়ে। তাকে নিয়ে ঘর করতে হবে। খিটখিটে হ'লে চলবে কেন?

মা। এই যে বললুম খুড়ীমা, অনেক তপস্যা করলে, তবে তোমার মতন শাশুড়ী পাওয়া যায়। সেদিন সকাল বেলায়—পণ্ডিত ছেলেটাকে পড়াচ্ছে, এমন সময় সেই বামুনটো—

ঠানদিদি। কোন বামুন?

মা। ওই যেগো—শ্বশুর যার মেয়ের সঙ্গে নাতীর সম্বন্ধ করেছেন।

ঠানদিদি। কে—সাভ্যোম ম'শায়?

মা। হাঁ—ওই তোমাদের সাভ্যোম। মিন্‌সের একটু আক্কেল নেই গা! কচিছেলে পড়ছে, তার কাছে ব'সে বিয়ের কথা পেড়ে বসল! শাশুড়ীও তেমনি—এক পাঁজী নিয়ে নাতীর সামনে দিন দেখাতে বসে গেল। ছেলেটার পড়া হ'ল না। এই কথা বলেছি ব'লে শাশুড়ী তিন দিন আমার সঙ্গে কথা কয় নি।

ঠানদিদি। না, এ ভাল কথা নয়। নাতীর বিয়ের দিন দেখতে হয়, অন্য সময় দেখ। ছেলের পড়াবন্ধ হবে, একি কথা! তাই কি বিয়ের কথা তোলবার এই সময় পড়ল! কাল অমন সোয়ামী গেল, আমরা হ'লেত একবছর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতুম। তা বিয়ের কি ঠিক হল?

মা। কে জানে! আমি আর কথা কইনি। যার ছেলে সে আসুক—সে বুঝবে।

এবারেও আসল কথা আমার শোনা হইল না। কেবল বসিয়া বসিয়া মায়ের কতকগুলা মিথ্যা উক্তি শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে পিতা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে ডাকিলেন—"হরিহর!" মাতা ঠাকুরাণী অমনি অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিলেন।

ঠানদিদি বলিলেন—"তুমি অনেক কাল বাঁচিবে অঘোর

নাথ! আমরা সবে মাত্র তোমার নাম করিয়াছি, আর অমনি তুমি উপস্থিত হইয়াছ।"

আমি তাড়াতাড়ি ভোজন সাঙ্গ করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

সেদিন পিতার বাড়ী আসিবার দিন নয়। মা সেইজন্য তাঁহার অত শীঘ্র আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন—"তুমি আগে কেশ-বিন্যাস সারিয়া লও, আমি পরে বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার হাত হইতে ব্যাগ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ব্যাগ যথাস্থানে রক্ষা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন —"তোমার ঠাকুর-মা কোথায়?"

আমিও ইস্কুল হইতে আসিয়া ঠাকুরমাকে দেখি নাই। কিন্তু বৈকালে প্রায়ই প্রত্যহ তিনি প্রতিবেশী গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠ শুনিতে যাইতেন। সেই খানেই তাঁর থাকা বিশেষ সম্ভব মনে করিয়া আমি পিতাকে বলিলাম—"ঠাকুরমাকে ডাকিয়া আনিব?" পিতা বলিলেন—"আন।"

আমি পিতামহীকে ডাকিতে গোবিন্দ ঠাকুরদার গৃহাভিমুখে চলিলাম।

(৫)

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, গোবিন্দ ঠাকুরদা' একখানা ছোট চৌকীতে পাতা আসনের উপর একখানা বটতলার রামায়ণ রাখিয়া, চোখে চারিদিকে সূতা-বাঁধা এক চসমা লাগাইয়া সুরের সহিত পাঠ করিতেছেন।

যেখানে বসিয়া তিনি পড়িতেছিলেন, সেটা তাঁহাদের সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপ। তাঁহারা জ্ঞাতিতে অনেক ঘর। সাধারণের পূজাদি কার্য্য উক্ত চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহারাই সে সময়ে শ্রীমান্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জ্ঞাতিরই জমীজমা ও নগদ সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া দেবকার্য্যের জন্য সাধারণের একটা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। তাহারই আয় হইতে দুর্গাপূজাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা শাক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবসম্মত দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের যদিও তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু দুর্গাপূজা ও কালী পূজাতেই ঘটাটা বিশেষ রকমেই হইত। দুর্গোৎসবে নবমী পূজার দিনে এবং কালীপূজার রাত্রিতে দশ বারোটা মহিষ ও শতাধিক ছাগ বলি হইত। এ কয়দিন গ্রামের ব্রাহ্মণ-শূদ্র কাহাকেও ঘরে হাঁড়ি চড়াইতে হইত না। দেশের অনেক ধনী কায়স্থ জমীদার তাঁহাদের শিষ্য ছিল। এই কারণেই তাঁহারা উক্তরূপ ধনী ছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ ঠাকুরদা' আবার ধনে মানে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ অভাব এবং কার্পণ্যের কিঞ্চিৎ দুর্নাম ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দোষের কথা আমরা শুনি নাই। বরং অতি সজ্জন বলিয়াই গ্রাম মধ্যে তাঁহার অতি খ্যাতি ছিল।

তিনি বেশ লোক ভাল ছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সকলেই যে ভাল ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। বসিয়া বসিয়া আহার পাইলে অলসপ্রকৃতিক লোক-দিগের যে সকল চরিত্রগত দোষ ঘটিয়া থাকে, অনেকের মধ্যে সে দোষ ছিল। তবে কাহারও দোষের ভাগ বেশী ছিল, কাহারও ছিল কম।

গোবিন্দ ঠাকুরদা', আমার পিতামহের সমবয়স্ক ছিলেন। দুইজনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বাল্যাবস্থায় পিতামহ দরিদ্র ছিলেন। শুদ্ধ মাত্র পুরুষকারে তিনি অবস্থার উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। উপার্জ্জনের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এই জন্য সম্পত্তি ক্রয় করিতে তিনি উপার্জ্জনের টাকা গোবিন্দ ঠাকুরদা'র কাছে পাঠাইতেন। সেই টাকা হইতে তিনি পিতামহের নামে লাভবান সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিতেন। এবং পিতামহের অনুপস্থিতিতে আমাদের গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেন।

পরবর্ত্তী কালে গ্রামবাসীদের ভিতরে যেমন ঈর্ষাদ্বেষের প্রাবল্য হইয়াছিল—গ্রামের মধ্যে কেহ কাহারও উন্নতি দেখিতে পারিত না, তখন ততটা হয় নাই—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে এ ভাবটা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ—তখনও জানিত না যে, তাহাকে চাকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে। অর্থ না থাকিলেও যজমান ও বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ-জমীদারদিগের কল্যাণে কাহারও বড় একটা অন্নাভাব ঘটিত না। অনেকেরই পিতৃ-পিতামহের প্রাপ্ত ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল। ব্রাহ্মণের চাকরী-স্বীকার তখন একটা বড় লজ্জার কথাই ছিল। চাকরী করিবে কায়স্থ। ব্রাহ্মণ

চিত্রশিল্পী—লর্ড লেটন্, P. R. A.]

তাহাকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পেট পূরাইবে। আর অবকাশে যথাশক্তি শাস্ত্রচর্চ্চা করিবে। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই বিধিই প্রচলিত ছিল। কাজেই চাকরী-স্বীকারকারী পিতামহের অর্থোপার্জ্জনে কাহারও তখন কুটিল দৃষ্টি পড়ে নাই। পিতামহও এদিকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া গ্রামবাসিগণের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। লোকের মনে বিন্দুমাত্রও ঈর্ষা জন্মিবার তিনি অবকাশ দিতেন না। এই জন্য, সামর্থ্য সত্বেও তিনি কোঠা-বাড়ী প্রস্তুত করান নাই। খোড়ো-ঘরগুলির একটু শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন—এই মাত্র।

আখ্যায়িকার সঙ্গে এই সকল কথার সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এখন অবান্তর হইলেও কথাপ্রসঙ্গে এই সকল কথা বলিয়া রাখিলাম।

চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া দেখি, গোবিন্দ ঠাকুরদা' পূর্ব্বোক্ত-ভাবে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন, আর পাড়ার অনেকগুলি বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহাকে ঘেরিয়া তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শুনিতেছেন।

যেখানে হনুমানের অশোকবনস্থা সীতার অন্বেষণের কথা আছে, ঠাকুরদা' সেইখানটা পড়িতেছিলেন। আর স্ত্রীলোকেরা পাছে বুঝিতে না পারে, এই জন্য স্থানে স্থানে দুই একটা দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।

হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াও সীতার সন্ধান পাইতে-ছেন না। অগত্যা তাঁহার অবস্থিতিস্থান নির্ণয়ের জন্য তিনি যে কোন উচ্চবৃক্ষের অন্বেষণ করিতেছিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন, একটা শিমূলগাছ শূন্যে সবার উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখি উচ্চতর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥

এই দুইটী কবিতার চরণ তিনি পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"মহাবীর শংসপার গাছে উঠলেন মেনে।"

শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে জনৈক মহিলা প্রশ্ন করিলেন—"শংসপার গাছটা কি?" অপর এক মহিলা ঠাকুরদা'র হইয়া উত্তর করিলেন—"এ আর বুঝতে পার্‌লিনি। যে গাছে খুব শাঁস আছে—মানে কি না খুব শাঁসালো গাছ।"

ঠাকুরদা' চসমাখানা চোক হইতে খুলিয়া বইএর উপর রাখিলেন। তারপর প্রশ্নকারিণী মহিলার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"হাঁ শাঁসালো গাছ বটে। তবে শাঁসটা মাথার দিকে নয়, পায়ের দিকে। মানে কিনা গোড়ার দিকে—কেননা কথাটা হচ্ছে শংস—পা অর্থাৎ শাঁকালু।"

অপর এক মহিলা বলিয়া উঠিলেন—"সেকি ঠাকুরপো! শাঁকালু গাছে চড়বে কি! শাঁকালু ত লতানে গাছ।"

ঠাকুরদা বলিলেন—"আগে কি লতানে ছিল। তখন এই গুঁড়ি—এই ডাল। মহাবীর স্বয়ং চেপে ঝাঁকারি দিয়ে-ছেন, সাধ্য কি তার খাড়া থাকে। সেই অবধি মাথা নুইয়ে বাছাধন মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ছেন। ফল তার আজও প্রাণভয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে আছে।

আমি তখন চণ্ডীমণ্ডপের সমস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র রোয়াকের উপর পা দিয়াছি। তখনও পর্য্যন্ত আমি কাহারও লক্ষ্য হই নাই। ঠাকুরদাদার মানে করা শুনিয়া আমি আর হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম—"ও কি বলিতেছ ঠাকুরদা"! শিংশপা মানে যে শিমূল গাছ।" অমনি সকলে আমার পানে চাহিল।

ঠাকুরদা' চসমাখানি আবার চোখে তুলিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তাহা আর তাঁর করা হইল না। "মুখ্‌খু পণ্ডিতগুলো বলিয়াছে বুঝি? আরে শালা, সে সময় কি শিমুল গাছ লঙ্কায় ছিল? রাবণ রাজা কুস্তি করে' শিমুল গাছে পিঠ ঘস্‌ত, তাইতেই শিমূলগাছ একেবারে তেল।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিলেন।

ঠাকুর মা চণ্ডীমণ্ডপের একটি কোণে বসিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে তিরস্কারছলে কহিলেন—"হাঁরে গাধা, ইস্কুলে পড়িয়া তোমার এই বিদ্যা হইতেছে। গুরুজনের কথার উপর কথা কওয়া! নাও, কাণ মলিয়া ঠাকুরদাদার পদধূলি গ্রহণ কর।"

ঠাকুরমার আদেশটা আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার উপরে কি এক রকম শক্তি প্রকাশ করিত, আমি তাহা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদা'কে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাতদিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন "বালকের কথা – শুনিতেই মিষ্টি।"

তখন আমার কথা লইয়া, বুদ্ধি লইয়া, লক্ষণ লইয়া মহিলামণ্ডলীর ভিতরে অনেক কথা হইয়া গেল।

সকলে নীরব হইলে ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমনসময়ে আমি পিতামহীকে পিতার আগমন বার্ত্তা শুনাইয়াদিলাম। এবং তাঁহাকে গৃহে আসিতে কহিলাম।

এই কথায় আবার পাঠ বন্ধ হইল। ঠাকুরদা' এবারে বই মুড়িয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সপ্তাহ যাইল না, এরই মধ্যে যে অঘোরনাথ ফিরিয়া আসিল?"

ইহার পূর্ব্বে পিতা প্রায় মাসান্তে একবার করিয়া বাড়ী আসিতেন। সুতরাং সপ্তাহমধ্যে তাঁহার আসা সকলেরই বিস্ময়ের বিষয় হইল।

পিতামহী বলিলেন—"কেন আসিয়াছে, তাহাতো বলিতে পারিনা।"

তখন কেহ বলিলেন—"মনটা ভাল নয়, তাই কলিকাতায়, থাকিতে পারে নাই।"

কেহ বলিলেন—"মন খারাপ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অমন বাপ গেল, তা তাকে দেখিতে পাইল না।"

তৃতীয়া বলিলেন—"আর তার বিদেশে থাকিবার দরকার কি। বৃদ্ধ মাও কোন্ দিন হঠাৎ ঘরে মরিয়া থাকিবে।"

ঠাকুর দা' বলিলেন—"বল কি গো! চার চারটে পাশ করিয়া ছোকরা ঘরে বসিয়া থাকিবে!"

তৃতীয়া উত্তর করিলেন—"বাপত আজন্ম বিদেশে কাটাইয়া কিছু রাখিয়া গিয়াছে। তাই বাড়ীতে বসিয়া দেখিলে যে যথেষ্ট হয়।"

ঠাকুর দা। কি এমন রাখিয়া গিয়াছে! তার যা কিছু করা সে সমস্ত আমারই হাত দিয়ে ত! একটা বই ছেলে নেই, তাই রক্ষা। ওর ওপর আর একটী দুটী হ'লে হাতে মাখিতে কুলাইবে না।

তৃতীয়। বেশ ত, দেশের ইস্কুলে মাষ্টারী ত করিতে পারে। বামুনের ছেলে চাকরী বৃত্তি ধরিলে, তার তেজ নষ্ট হইয়া যায়।

ঠাকুর মা এতক্ষণ এই সকল মতামত নীরবে শুনিতে ছিলেন। এইবারে কথা কহিলেন। তৃতীয়া মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলিয়াছ ঠাকুর ঝি! তবে আমার স্বামীর সংসার-নির্ব্বাহের অন্য উপায় ছিল না বলিয়া তিনি চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঠাকুর দা। চাকরীই বা তাকে কেমন করিয়া বলিব! সাহেবদের পড়াইত এইমাত্র।

ঠাকুর মা। সে যাই করুন, তবু তাকে চাকরীই বলিতে হইবে। আর সেই জন্যই তিনি একটী বিশেষ দুর্ব্বলতার কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর দা। কি কাজ! কই আমি ত কিছু জানি না!

ঠাকুর মা। তুমিও জান বইকি ঠাকুর পো, তবে তোমার মনে নাই।

ঠাকুর দা। কি বল দেখি।

ঠাকুর মা। সময়ান্তরে বলিব। আর বলিতেই বা হইবে কেন, এর পরে আপনিই বুঝিতে পারিবে।

এ হেঁয়ালীর মত কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। সুতরাং শুনিয়াও তুষ্ট হইল না।

তৃতীয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলিতে কি আপত্তি আছে?"

ঠাকুর মা। না থাকিলে ত বলিতাম। তবে তোমাদের কারও তা অবিদিত থাকিবে না। একথার পর আর কেহ সে কথা জানিতে জেদ করিল না। সুতরাং হিঁয়ালি—হিঁয়ালিই রহিয়া গেল। আমি পিতামহীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

(৬)

হিঁয়ালি বুঝিতে পারি আর নাই পারি, পিতামহীর কথার ভাবে আমি তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি। সেদিন প্রাতঃকালে মা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়াছি। এইমাত্র, পিতার আসিবার পূর্ব্বক্ষণে, মা ও ঠানদিদির কথোপকথনও শুনিলাম। আমি ইহাতেই বুঝিলাম, মা আমার অনুপস্থিত সময়ে নিশ্চয়ই পিতামহীর অমর্য্যাদা করিয়াছে।

পথে চলিতে চলিতে আমি পিতামহীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ ঠাকুরমা, মাকি তোমাকে কটু কথা কহিয়াছে?"

পিতামহীও বিস্মিত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলি বল্ দেখি?"

"তোমার কথার ভাবে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

পিতামহী হস্ত দ্বারা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। এবং বলিলেন—"যদিই করে, তা হ'লে তুই কি করিবি?"

তাই ত! আমি তা হ'লে কি করিব? আমি কিই বা করিতে পারি? আমি পিতামহীর এ প্রশ্নে উত্তর দিতে অসমর্থ হইলাম। পিতামহী আমার মুখ দেখিয়া কি বুঝিলেন। বলিলেন—"না ভাই, অমর্য্যাদা করিবে কেন? অমর্য্যাদা করিতে তাহার ক্ষমতা কি?"

"তবে চণ্ডীমণ্ডপে ওকথা বলিলে কেন?"

"সে ত তোমার পিতামহ সম্বন্ধে কথা। সে নিগূঢ় কথা তোমাকে শুনিতে নাই।"

"তবে শুনিব না।"

"আর দেখ, তুমি সন্তান। ব্রাহ্মণ-সন্তান—লেখাপড়া শিখিতেছ। এর পরে তুমিও তোমার বাপের মতন চার পাচটা পাশ করিবে। তুমি মাকে যেন কোনও কটু কথা কহিয়ো না।"

"আমি কি কটু কথা কহিয়াছি?"

"তুমি মাকে 'তুই' বলিয়ো না। গর্ভধারিণী সকলের চেয়ে গুরু—তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইতে হয়। তুমি তাহা কর না বলিয়া তোমার মা আমার কাছে অনুযোগ করে।"

"তা আমায় বলে না কেন?"

"সেইটীইত তার দোষ। যাহাকে যা বলিবার, তাহা তার সুমুখে বলিলেই হয়। তুমি ছেলে, তোমাকে বলিবে, এ সাহসও তার নাই। দুর্ব্বল-ঘরের মেয়ে—নিজে কল্পনায় ভিতরে দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে। সে মনে করে, আমি তোমাকে অমর্য্যাদা দেখাইতে শিখাইয়া দিই।"

"তবে কি এবার থেকে তাকে 'আপনি' বলিব ঠাকুর মা?"

"না ভাই, অত করিতে হইবে না। সেটা বাড়াবাড়ি হইবে। আমাদের নিধি তুমি। তুমি 'তুমি' বলিলেই যথেষ্ট হইবে।"

আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করিলাম, মাকে এবার হইতে আপনি বলিয়া ডাকিব।

বাড়ীর দ্বার সমীপে আসিয়া, পিতামহী পাদ-প্রক্ষালনের জন্য পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। আমাকে বলিয়া গেলেন —"তুমি আগে যাও। গিয়া তোমার বাপকে বল আমি আসিতেছি।"

আমি একাই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলাম। উঠানে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে ঠানদিদিকে দেখিলাম। তিনি মায়ের চুল-বাঁধা কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁর হাতে একটী ছোট রেকাবিতে কতকগুলি মিষ্টান্ন। বুঝিলাম, পিতা ব্যাগের ভিতরে পূরিয়া কলিকাতা হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী আমাদের জন্য আনিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ ঠানদিদির প্রাপ্য হইয়াছে। সেরূপ মিষ্টান্ন আমাদের দেশে পাওয়া যাইত না। পিতামহ যখনই কলি-কাতা হইতে বাড়ী আসিতেন, তখনই বড়বাজার হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাবার আমার জন্য লইয়া আসিতেন। রাতাবী সন্দেশ, গুঁজিয়া, বরফী, পেঁড়া, ক্ষীরের গোলাপ-জাম, যাহা আমাদের দেশের লোক চোখে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না, পিতামহের মমতায় তাহা আমি কতবার উদর পূরিয়া আহার করিয়াছি। পিতামহের জীবদ্দশায় পিতা এ সকল সামগ্রী আনেন নাই। আনিবার আর লোক নাই বলিয়া পিতা আজ পিতামহের মমতার অনুসরণ করিয়াছেন।

আমি মিষ্টান্ন-পাত্রের দিকে চাহিয়াছি দেখিয়া ঠানদিদি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—"আর দেখিতেছ কি ভাই, তোমার সমস্ত খাবার তোমার বাপ আজ আমাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।"

"তা আর দিতে হয় না।"

"আর দিতে হয় না। তুমি যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর।"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে না দিতে পিতা আমাকে ডাকিলেন।—"হরিহর।" ঠানদিদি তখন প্রস্থান মুখে আমাকে বলিলেন—"নাহে ভাই, ভয় নেই। তোমার মা তোমার জন্য আগে তুলে রেখে, তবে তোমার কাকাকে এই খাবার দিয়েছেন।" এই বলিয়াই ঠানদিদি চলিয়া গেলেন। আমি পিতার কাছে চলিলাম। তিনি হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় একটা চৌকীর উপর বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন! আর বৃদ্ধ চাকর সদানন্দ চৌকীর পাশে বসিয়া একটা কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতেছিল। ফুঁ শেষ করিয়া হুঁকাটীর উপর কল্‌কেটী বসাইয়া সবে মাত্র সে পিতার হাতে দিয়াছে, এমন সময়ে আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

মা অন্যদিকে মুখ করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কি কাজ করিতেছিলেন। তিনি আমার উপস্থিত দেখিতে পান নাই। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই পিতাকে কি বলিতেছিলেন।

আমি সে কথার কিয়দংশ শুনিতে পাইলাম। মা বলিতে ছিলেন—"খুড়ী মা আমার সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে।".

পিতা আমাকে দেখিয়াই হউক, অথবা অপর কোন কারণেই হউক, মায়ের কথার অন্য কোন উত্তর দিলেন না। বলিলেন—"আচ্ছা সে সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন যা করিতেছ, কর।" এই বলিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মার দেখা পাইলি ?"

"ঠাকুর মা ঘাটে গিয়াছে। এখনি আসিবে।"

"হাঁরে গাধা, তুমি দিন দিন অসভ্য হইতেছ ? তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে রূঢ় কথা বল ?"

এইবারে মা কথা বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আমি পিতার প্রশ্নে কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া গেলাম। রূঢ়বাক্য বস্তুটা কি, এবং তাহা মায়ের প্রতি কোন্ সময়ে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা, কখন আপনাকে রূঢ়-বাক্য বলিয়াছি ?"

পিতা মায়ের মুখপানে চাহিলেন। মাও পিতার মুখ-পানে চাহিলেন, এবং ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন—"আমার মুখপানে চাহিতেছ কি! ও শয়তান, ওর ভাব বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নয়।"

পিতা তখন আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"হাঁরে গাধা! তা হ'লে তুমি সমস্তই জান। গুরুজনের সঙ্গে কিরূপ কথা কহিতে হয় জানিয়াও তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে 'তুই' বলিয়াছ।"

আমি নিরুত্তর। সত্যইত মাকে 'তুই' বলিয়াছি। পিতা শাসন-স্বরূপ আমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন। বলিলেন—"এখানে থাকিলে তুমি অসৎ শিক্ষায় ও অসৎ সঙ্গে অসভ্য হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে আর এখানে রাখিব না।"

প্রথম প্রথম পিতামহের মুখে কলিকাতার কথা শুনিয়া, কলিকাতা দেখিতে অথবা তথায় বাস করিতে আমার আগ্রহ হইত। এ আগ্রহ শৈশবে কতবার পিতামহের কাছে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু আজ শাসনের সঙ্গে পিতার মুখে কলিকাতার নাম শুনিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

শৈশবের কল্পনায় যতটুকু শক্তি, সেই শক্তিতে কলি-কাতার এক বিভীষিকাময় ছবি আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। মুহূর্ত্তের ভিতরে আমি তন্ময় হইয়া গেলাম।

সদানন্দ এই সময়ে পিতার সঙ্গে কি কথা কহিল। আমার বোধ হইল, তাহাও কলিকাতার কথা। সদানন্দকে বোধ হয়, পিতার সঙ্গে যাইতে হইবে। সদানন্দ কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। পিতার কাছে এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সে তিনদিনের অবসর প্রাপ্ত হইল। সদানন্দ চিন্তা-ভারাক্রান্তের মত যেন টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল। আমি দ্বিগুণ ভীত হইলাম। পিতাকে কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ইত্যবসরে পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

পিতামহীকে দেখিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী আসিয়াছে।

তাপস নিজামউদ্দীন আউলিয়া

[লেখক—মোজাম্মেল হক্]

মুসলমান তপস্বীদিগের মধ্যে নিজামউদ্দীন আউলিয়া একজন পরম তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণ ও সাধুতা প্রভাবে একদা দিল্লী ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ জনপদসমূহ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহু-দিন হইল, সেই তাপস-প্রবর ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহিমাময় নাম শ্রবণে লোকে এখনও অবনত মস্তকে তৎপ্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পবিত্র সমাধি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

তাপস নিজামউদ্দীন এতদ্দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদি অধিবাস-ভূমি এদেশ নহে। তাঁহার পূজনীয় পিতামহ খাজে আলি বোথারী অর্থাৎ বোথারার অধিবাসী ছিলেন। বোথারা স্বাধীন তাতার বা তুর্কিস্থানের অন্তর্গত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। খাজে আলি এই সুসভ্য জনপদের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি হীন ছিল। তিনি অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অবস্থার উন্নতিবিধান মানসে তিনি সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ধনধান্যের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন।

খাজে আলি, স্ত্রী ও একটী তরুণবয়স্ক পুত্রের সহিত প্রথমে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু তথায় অভীষ্ট-সিদ্ধির কোনও সুবিধা না দেখিয়া, তিনি সপরিবারে বদাউনে আগমন করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তথায় একটী কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

খাজে আলি বোথারীর সংসারের অবলম্বন একমাত্র পুত্র খাজে আহম্মদ দানিয়েল। দানিয়েল শিষ্ট, শান্ত এবং পিতৃ-অনুগত বালক। কিন্তু বৃদ্ধ খাজে আলি দারিদ্র্য বশতঃ পুত্রের শিক্ষার দিকে ইচ্ছানুরূপ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। দানিয়েল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তিনি কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী সুশীলা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। এই দম্পতিই আমাদের আলোচ্য তাপস-প্রবরের জনকজননী। খাজে আলি পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিবার কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন।

অনন্তর যথাকালে ৬৩৪ হিজরী সালে দানিয়েলের গৃহ আলোকিত করিয়া এক পরম সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। সকলেই আনন্দিত হইলেন। এই শিশুই পরিণামে হজরত খাজে নিজামউদ্দীন আউলিয়া জরিজার বখ্‌শ নামে অভিহিত হইয়া অলৌকিক সাধুতা ও গুণ-গ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

জননীর যত্নে এবং পিতামহীর স্নেহে নিজামউদ্দীন সুচারুরূপেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ স্নেহ—এ যত্ন তাঁহার অধিক দিন ভোগ করা ঘটিল না। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতা আহম্মদ দানিয়েল এবং স্নেহময়ী পিতামহী পরলোক যাত্রা করিলেন।

তখন সংসারে নিজামের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে একমাত্র মাতা রহিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী সুশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি দুঃখের অবস্থাতেও প্রাণাধিক পুত্রকে যত্নে প্রতিপালন এবং শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিজামউদ্দীন অতি বুদ্ধিমান বালক ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সকলের নিকট সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মভাবও অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ বলিয়া ধনীর প্রাসাদ ও দীনের কুটীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর কাজীর পদ শূন্য হয়। দিল্লীর বাদশাহ জনৈক চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি নিজামউদ্দীনের উপর পতিত হয়। নিজাম দরবারে আনীত হইলেন। বাদশাহ তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা ও বিদ্যা-

বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকেই কাজীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

দিল্লীর কাজীর পদ-প্রাপ্তি—বিচার-বিভাগের উচ্চাসনে উপবেশন, বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। দরিদ্র নিজাম সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই শুভ সংবাদ জননীর কর্ণগোচর করিলেন। পুত্রের সম্মান ও কুশল সংবাদ শ্রবণে কোন্ জননীর অন্তর না আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে? দুঃখিনী নিজাম-জননী পুত্রের কাজীর পদ লাভের কথা শুনিয়া—করুণাময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু এদিকে বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ, তাই সহসা নিজামের ভাগ্যফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নিজাম যে দিন কাজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিনই কার্য্যানুরোধে সাধুশ্রেষ্ঠ খাজা কোতবদ্দীনের সমাধির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা জনৈক জ্যোতির্ম্ময় দরবেশ আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"হা নিজাম! তুমি নগণ্য কাজীর পদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছ! ছি ছি তোমার কি ভ্রম! আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি ধর্ম্মজগতের অধিপতি হইয়া তত্ত্বোপদেশ প্রদানে কুক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করিবে, ধর্ম্মের নামে গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু হায় তোমার কি নীচ অভিরুচি!"

নিজামের কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি দরবেশের দিকে নেত্রপাত করিলেন। কিন্তু দরবেশ অদৃশ্য! নিজামের দর্শন-লোলুপ চক্ষু সহস্র চেষ্টাতেও আর দরবেশকে দেখিতে পাইল না। তখন তিনি চিন্তিত হইলেন। অন্তরে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, "কাজীর পদ শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত পদ বটে, কিন্তু এ পদে উপবেশন না করিতেই দৈব-প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। অগত্যা এ পদ আর কোন ক্রমেই গ্রহণীয় নহে।" এই স্থির করিয়া তিনি গৃহে আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। সেই সরলা মহিলা তাহা শুনিয়াই মুগ্ধ হইলেন, নৈরাশ্যে তাঁহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আত্মীয় বন্ধুগণ নিজামকে কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় আর কর্ণপাত করিলেন না, অযাচিতরূপে প্রাপ্ত স্পৃহণীয় কাজীর পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বদাউনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার জননী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

মাতৃবিয়োগে নিজামউদ্দীনের অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিল। তাঁহার সুখশান্তি তিরোহিত হইল, তিনি ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা শক্করগঞ্জের সাধক-প্রবর খাজা ফরিদ উদ্দীন মস্‌য়ুদের তপোমহিমা ও অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। এই তপোধন তৎকালে ভারতে মুসলমান তপস্বীদিগের মধ্যে তেজস্বী সূর্য্য-স্বরূপ ছিলেন। নিজাম প্রেম-ভক্তির আকর্ষণে পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভার্থ অযোধ্যায় তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। এবং সেই মহর্ষির চরণ চুম্বন করিয়া, আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে, তিনি সহাস্যে নিজামের হস্ত ধারণ করিয়া আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে নিজামউদ্দীনের বয়স বিংশ বর্ষের কিছু অধিক হইবে।

নিজাম গুরুগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একেই তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহার সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অধিকতর উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিল—তাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞান-রশ্মি-সম্পাতে আলোকিত ও মাধুর্য্যপূর্ণ হইল। কিয়দ্দিবস পরে তিনি গুরুর অনুমতিক্রমে দিল্লীর অদূরে গয়াসপুরে গমন করিলেন এবং সেই স্থলেই আপনার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

নিজামউদ্দীন গয়াসপুরের সাধনকুটীরে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুতা ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, বহু লোক তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে চরিতার্থ হইবার অভিলাষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সাধক-প্রবর এই সময়ে সশিষ্য বারমাস উপবাস-ব্রত (রোজা) পালন করিতেন। অতঃপর ক্রমেই নিজামউদ্দীনের সাধুতার উজ্জ্বল আলোক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—তাঁহার ভক্তি ও সম্মানের সীমা রহিল না। প্রতি দিন শত সহস্র লোক উপাদেয় সামগ্রী-সম্ভার উপহার লইয়া তাঁহার দর্শনার্থ আসিতে লাগিল। নিয়ত লোক সমাগমে শীঘ্রই গয়াসপুর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই আকস্মিক উন্নতি দর্শনে তাৎকালিক দিল্লীর সম্রাট্ মাজদ্দীন কায়কোবাদ শাহ তথায় একটী অভিনব নগর স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফলতঃ স্বয়ং বাদশাহ এবং আমির ওমরাহগণ সর্ব্বদা গতিবিধি করায় সেই নিস্তব্ধ পুরী শীঘ্রই কোলাহলপূর্ণ হইল।

তাপস-প্রবরের সাধন-কুটীরে বহুশিষ্য নিয়ত অবস্থিতি করিতেন। তদ্ভিন্ন অনেক অক্ষম ও দরিদ্র লোক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল লোকের আহারাদির জন্য তিনি নিত্য যে সমস্ত উপঢৌকন পাইতেন, তদ্ব্যতীত প্রতিদিন তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। কথিত আছে, প্রত্যহ দশটী উষ্ট্র-বোঝাই খাদ্য সামগ্রী তাঁহাকে আনিতে হইত। ফকির নিজামউদ্দীন প্রতিদিন এত অর্থ কোথায় পান? দিল্লীর বাদশা মবারক খিলজীর একদা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। মবারক নিষ্ঠুর ও নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি স্বীয় রাজত্ব নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সহোদর খিজির খাঁন ও সাদীক খাঁনকে নিহত করিয়াছিলেন। এই নিহত ভ্রাতৃদ্বয় মহর্ষির শিষ্য ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের গুরুর প্রতিও তাঁহার কোপের সঞ্চার হইয়াছিল। মবারক শেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈন্য ও সভাসদ্‌বর্গই ফকিরের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, অতঃপর আর কেহই নিজামউদ্দীনের নিকট যাইতে বা উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সকলে এ আদেশ শুনিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুর্ম্মতি মবারকের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মূর্খ মবারক ভাবিয়াছিলেন, অতঃপর তাপসকে বহু কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা বিধাতার প্রিয়পাত্র, নিয়ত তপশ্চরণে নিরত, সেই সৎকর্ম্মশীল সাধুদের কি কোন মানুষে কষ্টে পাতিত করিতে পারে? মবারকের ধৃষ্টতার সংবাদ যথাকালে মহর্ষির কর্ণগোচর হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন, "আজ হইতে দৈনিক ব্যয়ের অর্থ এই মৃৎভাণ্ড হইতে গ্রহণ করিও।" তপস্বীর তপোমাহাত্ম্যে দৈবের অনুগ্রহে সেই ক্ষুদ্র ভাণ্ড হইতে দৈনন্দিন ব্যয়ের অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। মূর্খ মবারক তৎশ্রবণে মৌন ও বিষণ্ণ হইলেন।

একদা সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী তাপসকে আপনার প্রাসাদে আনয়ন করিবার জন্য জনৈক সভাসদকে প্রেরণ করেন। সভাসদ সুলতানের শিক্ষানুসারে সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "সুলতানের জনৈক সেনাপতি বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের ভাল মন্দ কোনও সংবাদ না পাওয়ায় সুলতান অতীব ব্যাকুল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আপনি দয়া করিয়া একবার বাদশাহের ভবনে পদার্পণ করেন, তবে তাঁহার চিত্তের শান্তি ও সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সাধিত হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া ফকির নিজামউদ্দীন কহিলেন, "বাদশাহের দরবারে আমার যাইবার আবশ্যক নাই। তিনি কল্যই যুদ্ধের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবেন।" অতঃপর আলাউদ্দীন সভাসদমুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনস্থ করিলেন যে, যুদ্ধের সুসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আমি ভক্তিভাজন তপস্বীকে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন প্রেরণ করিব। ফলতঃ সাধুদের বাক্য বিফল হইবার নহে, পরদিবস প্রকৃতই বাদশাহ কুশল সমাচার প্রাপ্ত হইলেন এবং তদ্দণ্ডে নিজামউদ্দীনের সাধুতার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। গয়াসপুরে তপস্বীর নিকটে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা প্রেরিত হইল। মুদ্রা মহর্ষির সম্মুখে প্রদান করিবামাত্র একজন ফকির হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাহার অর্দ্ধেক আপনার দিকে টানিয়া লইয়া নিজামউদ্দীনকে কহিলেন "ইহা আমাকে দান করুন।" তৎশ্রবণে সেই বিষয়বাসনা-নির্লিপ্ত -পুরুষ কহিলেন, "অর্দ্ধেক কেন? তুমি সমস্তই গ্রহণ কর।" এই ঘটনা হইতে তাপস নিজামউদ্দীন "জরিজার বখ্‌শ্" নামে অভিহিত হইলেন।

একদা কোনও জায়গীরদারের গৃহ অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়া যায়। তৎসঙ্গে তাঁহার জায়গীরের "ফরমান"ও নষ্ট হয়। তিনি দিল্লীতে আসিয়া বাদশাহ দরবার হইতে "ফরমান" পুনর্ব্বার হস্তগত করেন কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথে হারাইয়া ফেলেন। ফরমান হারাইয়া তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাহা না পাইয়া অবশেষে হতাশহৃদয়ে নিজামউদ্দীনের নিকটে যাইয়া নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন। সাধুবর তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "যদি তুমি ফরমান পাও, তবে তোমাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে কিছু খয়রাত করিতে হইবে।" জায়গীরদার কহিলেন, "যদি সে সৌভাগ্য হয়, তবে আপনার আজ্ঞা পালিতে কি ক্ষণবিলম্ব হইবে?" তখন সুধীবর কহিলেন, "যাও এক্ষণে কিছু হালুয়া কিনিয়া আন।" তিনি আজ্ঞামাত্র বাহিরে

যাইয়া নিকটস্থ একটী দোকানে হালুয়া ক্রয় করিলেন। বিক্রেতা হালুয়া ওজন করিয়া পার্শ্ব হইতে একখণ্ড কাগজ টানিয়া লইয়া তাহা বাঁধিতে লাগিল। জায়গীরদারের দৃষ্টি সেই কাগজের উপর পড়িতেই বুঝিলেন যে, ইহা তাঁহারই ফরমান! তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং ইহা যে ধর্ম্মাত্মা নিজামউদ্দীনের মাহাত্ম্যের পরিচায়ক, তাহা অনুভব করিয়া ফরমান ও হালুয়া সাধুবরের পদপ্রান্তে অর্পণ করিলেন এবং আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ভক্তির সহিত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন।

তাপস নিজামউদ্দীনের মাহাত্ম্যপ্রকাশক বহু ঘটনা আছে। ফলতঃ তিনি যে একজন অদ্বিতীয় সাধুপুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত্র ছিলেন, এবং দার-পরিগ্রহ করেন নাই। ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭২৫ হিজরী, রবিয়ল আওল মাস। এই দীর্ঘকাল তিনি আধ্যাত্মিক ধ্যানে ও বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান-সাধনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের দিন তিনি আপনার ভাণ্ডারস্থ খাদ্যসম্ভার ও টাকাকড়ি সমস্তই দীন-দুঃখীদিগকে বিতরণ ও শিষ্যদিগকে "খের্কা খেলাফত" ও উপদেশ দান করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। গয়াসপুরে আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি-সৌধ বিদ্যমান থাকিয়া ভারতে মুসলমানদিগের এক তীর্থভূমিরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সমাধি-প্রাচীরে একটী কবিতায় তাঁহার স্বর্গারোহণের তারিখ ও অপর বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে।

বর্ষা-রাণী

[লেখক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে]

সবুজ-শষ্প আসনখানি
কে তুমি কনক আঙুলে টানি'
দিতেছ নিখিলে বিছায়ে?
কবরী আবরী' কবরী কুসুমে
ঝুম্‌কো দোলায়ে কুন্দ- প্রসূনে
কে তুমি রূপসী দাঁড়ায়ে?
লজ্জা-চকিত আননখানি,
তুমি কি আমার বর্ষা-রাণী।—
বঙ্গ-কৃষক-কর্ণে কি তুমি
ভরসা-দায়িনী মধুর বাণী?
(তব) কণ্ঠে দুলিছে চম্পক মালা,
হস্তে শোভিছে বকুলের বালা
কটিতে বেলার কোমর-পাটা;
তুমি কি আমার বর্ষা-রাণী?—
নিটোল সুগোল বাঁধন-আঁটা।
অন্ধ প্রেমিক গন্ধরাজ
লুটিছে তোমার চরণে।
চামেলী, টগোর, যূথিকা বিভোর
হাসিছে তোমার শিথানে।
জলদ-বসনে ঘোমটা টানিয়া
চপলা-চমকে ক্ষণিক হাসিয়া
দাঁড়ায়ে আমার বর্ষা-রাণী;
তপ্ত ধরণী সিক্ত করিতে
এসেছ সঘন শ্রাবণ প্রভাতে
তুমি লো শস্য শ্যাম বরণি।

য়ুরোপে তিনমাস

[লেখক—মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M.A., D.L., C.I.E.]

২৫এ মে—আজ উত্তর বাতাসের প্রবলতা যেন কিছু বেশী। ডেকে বসিবার বা বেড়াইবার সম্ভাবনা নাই। বাতাস এত বেশী কিন্তু সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, তাই রক্ষা। সকল সময়েই যে, এই আরেবিয়া-জাহাজখানি শান্তভাবে চলে, তাহা নহে। প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া কেমন নির্ভয়ে চলে, নাপিতের দোকানে তাহার এক ছবি আছে। ঝড়ের সময় ক্যামেরা লইয়া যে ফটো তুলিয়াছিল, বোধ হয় তাহা নহে। তবে কল্পনার সাহায্যে ছবির সৃষ্টি হইয়া যাত্রীর মনে অভয় উৎপাদনের সাহায্য করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে এখনও আমরা দুর্গম পথে ঝড়ের মুখে পড়ি নাই। বরাবর বেশ নিরাপদেই আসিয়াছি। ইহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।

প্রবল বাতাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৈঠকখানা ঘরে আশ্রয় লইলাম।

অভ্যাসবশে মনে নানা কথার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশ ও ক্রমশঃ স্বপ্নাবেশও হইল। স্নেহময় পুত্রকন্যা ও আত্মীয় বন্ধুগণ সব যেন চকিতের ন্যায় মানস-পট উজলিয়া, আবার যে আঁধার সেই আঁধারে আমাকে রাখিয়া গেল।

আজ নয় দিন অগাধ বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে আলোকের ছড়াছড়ি। কিন্তু হৃদয়ের আঁধার ত কিছুতেই ঘোচে না। জানিনা এত আঁধার কিসের! অজানা অচেনা নূতন যায়গায় যাইতেছি বলিয়াই কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না। ভগবৎ নাম মধুর গম্ভীর স্বরে নীচে গীর্জ্জা-সভায় গীত হইতেছে—ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নিজেকে সেই সঙ্গীত-সাগরে ভাসাইয়া দিলাম। প্রাণে যেন কিছু শান্তি আসিল। আঁধার হৃদয়ের সব আঁধার—সব ভার তাঁর পাদপদ্মে দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিছু কায না থাকায় ভ্রমণ কথা লিখিতে বসিলাম। যা মনে আসে, তাই লিখিতেছি। কেন যে লিখিতেছি, কার যে পড়িবার জন্য মাথাব্যথা করিবে, কে যে কষ্ট করিয়া, এই দেবাক্ষর পড়িবে জানি না। যদি লেখায় লেখনীর তেজ, ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণশক্তি, ভাবপ্রকাশশক্তি, পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান কিছু থাকিত, "ইউরোপে তিনবৎসরে" বর্ণিত বিষয়ের মত বহুবৎসর পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয়ের কিছু নূতনত্ব থাকিত কিংবা নূতন ভাবে দেখাইবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে P. & O. Companyর এত কাগজ কলম এবং আমার নিজের সময় ও ছেলেদের প্রতি ডাকে বড় বড় কাগজের তাড়া পাঠাইবার—ষ্টাম্প খরচ করিবার কোনও তাৎপর্য্য থাকিত। যাহাদের জন্য গমনশীল রেলে জাহাজে ইহা লিখিতেছি, তাহাদের এই বর্ণবাহ ভেদ করিয়া অর্থসংগ্রহই বিশেষ ধৈর্য্যের পরিচায়ক হইবে। যাহা হউক, মনের কথা মনে সব সময় না রাখিয়া কাগজে কতক স্থান পাইতেছে। ইহাতে মনের ভার কিছু লাঘব হইতেছে। এইটুকুই সান্ত্বনা।

Dutton সাহেব আমায় কাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি Diary লিখি কি না। আমি বলিয়াছিলাম যে Diary লেখার অভ্যাস আমার নাই—আর পাঠক-মনোহর Diary লিখিবার ক্ষমতাও আমার নাই। তবে প্রিয়জন—যাহাদের গ্রন্থ-পাঠে পথের কথা, ভ্রমণের কথা, ভ্রমণ-পথের সমাজ-কথা প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে জানিবার সম্ভাবনা বা সুবিধা নাই, আমার হস্তাক্ষরে যাহাদের তুষ্টি, তাহাদের জন্য সময়ে সময়ে মনে যাহা উদয় হয়, তাহা লিখি। আমার প্রবাস উপলক্ষে তাহাদের কোন কোন কথা জ্ঞানগোচর হইলে, তাহারা প্রবাসকাল ধৈর্য্য-সহকারে কাটাইতে পারে। প্রচলিত সামান্য Guide Bookএ পর্য্যন্ত আমার লিখিত বিষয় অপেক্ষা শতগুণে প্রয়োজনীয় ও শ্রুতিমধুর কথা-সম্বলিত বর্ণনা সামান্য ব্যয়ে পাওয়া যায়। অতএব সাহিত্য-সৃষ্টির উচ্চাশায় এ উদ্যমের অবতারণা নয়। তবে হয়ত এ লেখা

পড়িয়া তাঁহাদের ভাল লাগিবে, এই মনে করিয়াই লিখি।

এডেন হইতে গুরুদাস বাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে, ডাকে দেওয়া হয় নাই। আজ তাহা খুঁজিয়া পাইলাম। অন্য চিঠির সহিত আজ তাহা ডাকে দিলাম। ডাক-মাসুলের জরিমানা তাঁহাকে বোধ হয়, কিছু দিতে হইবে। কারণ, এডেন পর্য্যন্ত দুই পয়সায় চলে—তার পর চার পয়সা মাসুল।
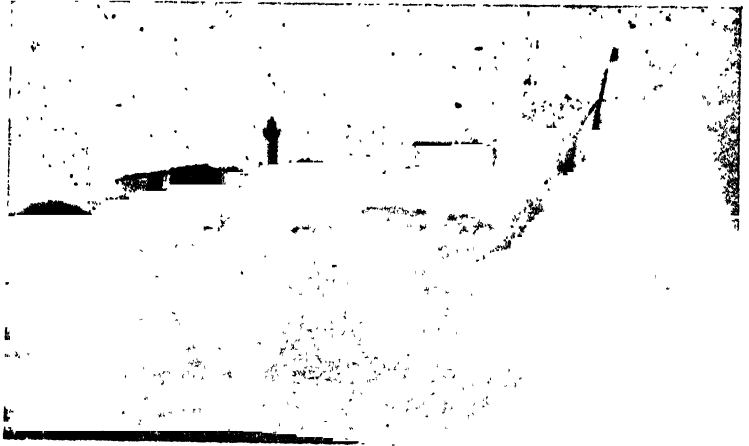
পোর্ট্ সৈয়দ্—সাধারণ উদ্যান

ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্রের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া ভয় হইল। ছেলে বাবাজীরা যাহা কিছু পারিয়াছে চাপাইয়াছে কিন্তু যেখানকার জিনিস সেইখানেই রহিয়া গেল। বাবুগিরি অভ্যাসটা আমার কিছুতেই রপ্ত হইতেছে না। গৃহস্থ-মানুষ বাবুগিরি করেই বা কি করিয়া! জাহাজের খরচপত্র যা দেখিতেছি, তাহাত সাধারণ লোকের পক্ষে ভয়ানক ব্যাপার। ভাড়া যা লাগে, তাহাইত যথেষ্ট। তাহার উপর অতিরিক্ত যাহা চাও, তাহা চতুর্গুণ দুর্ম্মূল্য। এক গ্লাস নেবুর সরবতের দাম ৪ পেনি অর্থাৎ চার আনা। একটা কামিজ কাচাইবার খরচ ৬ পেনি অর্থাৎ ছয় আনার বেশী। এই দামে প্রত্যহ কামিজ কাচাইলে আমি যে দামের কামিজ পরি, কাচাইবার দামেই তাহার গোটা কয়েক খরিদ হইয়া যায়। এর উপর মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি যাহাদের অভ্যাস আছে, কিংবা ফ্যাসানের দাসত্ববশে যাহারা তাহা করিতে বাধ্য, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ! এই সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে অল্পবয়স্ক স্বদেশবাসিগণকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই বারবার একথার অবতারণা।

নাপিত মহাশয় প্রত্যহ ছয় আনা লইতেছেন। "কি করিতে পারি" বলিয়া এটা-ওটা বাজে জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা ত নিত্যই করিতেছেন। আর "কিছু করিতে পারার" অনুমতি না পাইয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ন। Steward মহাশয় প্রাচীন অথর্ব্ব ও জরদ্গবসদৃশ প্রাজ্ঞ। প্রায়ই শুনাইয়া রাখিতেছেন যে, তাঁহার রোজগার এবার কিছুই হইল না। বোধ হয়, এক গিনির কম তাঁহার মন উঠিবে না। এ সকল এক রকম বাঁধা দরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে এবং অপরিহার্য্য। অতএব পরিহার্য্য খরচ-পত্র সম্বন্ধেই গৃহস্থশ্রেণীর যাত্রীর প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা হিসাব কোথায় মিটিবে, বলা যায় না। স্থানীয় ডাকের নিয়ম শুনিলাম অদ্ভুত। সুয়েজে জাহাজ হইতে বাক্সসমেত চিঠি লইয়া গিয়া দিয়া আসিবে, তাহাতে চার পয়সায় ইংলণ্ড ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র যাইবে। কিন্তু খালের মধ্যে গিয়া কিংবা Port Said এ পত্র দিলেই Egyptian Government অধিক Stamp লইবে অথচ এক জাহাজেই সব চিঠি যাইবে। ডাক সুয়েজ হইতে রেলে পোর্ট সেড যাইবে। সেখান হইতে জাহাজে Brindisi। Foreign Governmentদিগের এই সব নির্ব্বোধ ব্যবহারই তাহাদের স্থায়ী উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ। আর এই সব বিষয়ে এত সূক্ষ্ম দূরদর্শী অথচ মোটের উপর অধিক লাভজনক ব্যবস্থার জন্য ইংরাজের এত উন্নতি। International Penny Postageএর এখনও অনেক বিলম্ব।

মাথায় একটা ছোট ফোঁড়ার মত হইয়াছে। Steward মহোদয়ের বহু বিস্ফোটক-শোভিত মস্তক দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, ক্রমাগত Oatmeal Porridge ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে। আমিও ত প্রত্যহ Oatmeal Porridge যথেষ্ট খাইতেছি; তাই বা বিস্ফোটক-বিকাশ

হইল। Oatmealএ বলাধান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে একটু "বাড়ীতে" "মাথার দিব্য" দিয়া দুগ্ধেরও কথা যে বলা আছে, তাহাও বেনামীতে কতক পেটে যায়,তাই খাই। দুধ, মাখম, ফল, মাংস, মৎস্য সবরকমই ঠাণ্ডা-ঘরে থাকে। জনশ্রুতি-মতে তাহা খারাপ হয় না। মুখে খাইতে খারাপ না লাগিতে পারে, কিন্তু জিনিষটা যে, সত্যসত্যই অবিকৃত আছে—একথা বলা চলেনা।

Oatmeal Porridgeএর পরিবর্ত্তে বীচ-প্রাচুর্য্যে Slevar সাহেবের রুচি বাড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমার আহারের রুচি ও ক্ষুধা আর পূর্ব্বের মত নাই। আহার কমাইয়া দিয়াছি। আহার-বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু নিত্য এসব ভাল লাগেনা। আপেল, আনারস, আম, আঙ্গুর, আপ্রিকট, ওয়ালনট, বাদাম, নজিন, প্রুণ, ফিগ, বাতাবীলেবু, কমলালেবু, জাভালেবু, Marmalade, Jena, Anohona, আদার আচার, অন্য বহুতর আচার, মাখম, Cheese, রুটি, কেক, স্কন্স, পুডিং, আইস ক্রীমের ছড়াছড়ি। আহার্য্যের এই অরণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া লওয়া আমার মত অল্পাহারীর পক্ষে প্রত্যহ অধিক কষ্টকর হইতেছে। মটন, মুর্গী, মাছ, গেমবার্ডও প্রচুর। অন্য মাংস আমাদের ইচ্ছাক্রমে আমাদের নিকটে আনেনা। মাছও এত রকম যে, নাম মনে করিয়া রাখা কঠিন। Place, Tarbot, Sole, Halibut, Herring, Sardeni, Solmon এই কয়টা মনে পড়িতেছে। সবই সমুদ্র-মৎস্য। এত রকমের এত জিনিষ প্রত্যহ খাওয়া অসম্ভব। ফল মূল আর সাকসব্জী-সিদ্ধর উপর ক্রমশঃ নির্ভর করিতে হইতেছে। রান্না-ঘরের উপর দিয়া নাপিতের ঘরে যাইতে হয়। সে সময়ত আমার প্রায় বমনোদ্রেক হয়। সাদাটুপি ও পোষাকপরা রসুয়ে 'ঠাকুর'দের গাত্রে সৌগন্ধও কিছু কম নয়। ফলমূলের যোগান যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। Port Saidএ নূতন যদি কিছু লয়, তবেই রক্ষা।

বায়ুর প্রতিকূল বলিয়া আমাদের গতি কিছু কম। সমুদ্র-খাড়ির দুই দিকে তৃণগুল্মশূন্য নগ্ন পাহাড় অনেক দূর বিস্তৃত। তাহার কোলেই কোথাও মরুভূমি কোথাও কৃষিক্ষেত্র। এই পাহাড়ের গণ্ডীর বহু পশ্চিমে নীল নদ। "যমুনা লহরী" বহুদিন সুকবির দ্বারা রচনা হইয়াছে। আজ সমুদ্র-বক্ষে মনে মনে "নীল" লহরী রচিত হইল। কিন্তু "সমালোচকের" ভয়ে প্রকাশিত হইল না। Pharoaদিগের কীর্ত্তিকথা মনে পড়িল। কত যুগের সে কথা। যেন মানসচক্ষে দেখিলাম।

আমার এত লেখার ঘটা দেখিয়া Sir William Dring জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এত লিখিতেছ কি? বিলাতের জন্য বক্তৃতা লিখিতেছ নাকি? তাহা হইলে ত কাজ হইত। সে দিকে মন আদৌ যাইতেছে না। বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম, দেশ ছাড়িয়া আসিলাম, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিলাম। এসিয়া ছাড়িবার সময় সেই সব যন্ত্রণা যেন নূতন করিয়া সহ্য করিতে হইল।

জাহাজের ঘণ্টায় একটা বাজিল। কিন্তু ওটা "একটা" নয়—Youngএর মত এমন বলিতে পারিলাম না—

"The clock strikes one.
We take no note of him but by its loss."

জাহাজে ঘণ্টা বাজে নূতন রকমে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্থানবিশেষের Latitude Longitude হিসাবে প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটা ১০।২০।৩০।৪০ মিনিট পিছাইয়া দিলে তবে সেই জায়গায় ঠিক সময় জাহাজের "পরিদৃশ্যমান" ঘড়িতে পাওয়া যায়। তারপর দিনরাত্র ছয় প্রহরে ভাগ করা হয়। আমাদের মত আটপ্রহর নহে। Eight Bells জাহাজের সর্ব্বোচ্চ ঘণ্টাবাজা। প্রতি ঘণ্টার সঙ্কেত তাড়াতাড়ি দুইটা ঘণ্টার আওয়াজ দেওয়া হয়, আর আধ ঘণ্টার সঙ্কেত একটা আওয়াজ। বেলা আটটার সময় ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পড়িবে। সাড়ে আটটার সময় ১ঘা পড়িবে। ৯টার সময় ১টা ডবল ঘণ্টা পড়িবে। এইরূপে ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়িলে ঘড়ির ১২টা বাজিল। আবার ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টার সাহায্যে পরিচয় হইবে। ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা এবং ৮টা হইতে ১২, ১২টা হইতে ৪টায় পুনরায় ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা বাজিবে। ঘণ্টার পরিচয় বুঝিতে পূর্ব্বজ্ঞান সত্বেও আমার ২দিন লাগিয়াছিল। আমার ২৫ বৎসরের সাথী ঘড়ি-মহাশয় এইরূপ অকারণ অতিরিক্ত পরিশ্রমে অস্বীকৃত। তাই তাঁহাকে পুরাবেতনে ছুটী দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। Louis Stevenson এর "Essays on Travel" নামক

সুন্দর গ্রন্থে সে দিন পড়িতেছিলাম যে, এইরূপ স্থানবিশেষে সময় ভিন্ন হয়। এক বৃদ্ধা যাত্রী সে কথা আদৌ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ঘড়িটিতে নিজের গ্রামের সময় বরাবর ঠিক রাখিয়া যাইতেছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, সে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকার ঘড়ি তদারক করিয়া নাবিকদিগকে জব্দ করিয়া তাহাদিগের ভুল দেখাইয়া দিবে। কিন্তু আকস্মিক সমুদ্রপীড়ায় বেচারা দুই তিন দিন ঘড়িতে দম দিতে না পারায় অনাহারে ঘড়িটি কর্ম্মে ইস্তফা দিল। কাজেই প্রাচীনার মনোজ্ঞ পরীক্ষার শেষ পর্য্যন্ত ফলাফল তদারক হইতে পারিল না। একথা Stevensonএর পুস্তক পড়িবার পূর্ব্বে বম্বেতে আমারও মনে হইয়াছিল যে, গোপনে আমিও এইরূপ একটা পরীক্ষা আমার পুরাতন বিশ্বাসী ও চিরপরিচিত পানের ডিপানুকারী ঘড়িটি দ্বারা করিব। কিন্তু সমুদ্র-পীড়া না হউক, আলস্যবশতঃ আমার ঘড়িরও আহার বন্ধ হইয়া পরীক্ষা বন্ধ হইল। পূর্ব্ব-কথিতা প্রাচীনা আমারই মত কীর্ত্তি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পড়িয়া হাসিলাম। দেখিতেছি, বিজ্ঞান-জগতেও নূতন কিছু নাই। আমি এতবড় একটা কাণ্ড করিয়া গোপনে একটা বহুমূল্য তথ্যসংগ্রহের চেষ্টায় ছিলাম, আর প্রাচীনা আমার বহু পূর্ব্বে তাহার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাই বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল।
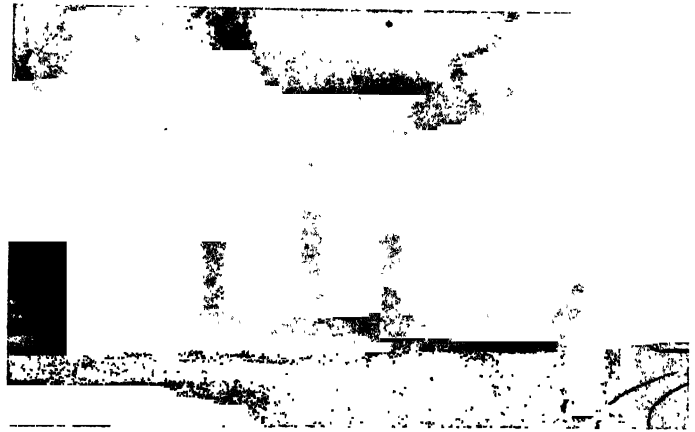
আহাম্মুখীতে মানুষের "পার্ব্বত্য-প্রাচীনতা" আছে দেখিতেছি। বৈঠকখানার জানালা দিয়া জলযোগ আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। বিশেষ প্রয়োজনাভাবেও আহার-টেবিলে পাঁচটিবার যাওয়া চাই। অতএব আপাততঃ এইখানেই লেখনীর বিশ্রাম হউক।

সোমবার ২৭শে মে।—ক্রমশঃ বাড়ী, ঘর, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি দেখা দিতে লাগিল। আমেরিকা-আবিষ্কারের প্রাক্কালে কলম্বসের ভাবের মত মনের ভাব হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তীরে অগ্রসর হওয়ার জন্য জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদিগের জল মাপা ও

পোর্ট্ সৈয়দ্—বাজার

সাবধানে অগ্রসর হইবার কাজও তত বাড়িতে লাগিল; Deep Six, A half and Six, A quarter less Seven, Deep Seven এই সব অদ্ভুত শব্দ শুনিতে লাগিলাম! ঠিক যেন আমাদের দেশের খালাসীদের 'পাঁচ বাম মিলেনা'র মত সুর করিয়া করিয়া গান। কাপ্তেন, কর্ম্মচারী সকলেই সতর্ক হইয়া কাজ করিতে লাগিল। জাহাজের সম্মুখে সব পাল নামাইয়া ফেলিয়া মাল লইবার জন্য স্থান পরিষ্কার ইত্যাদি উদ্যোগ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খালে প্রবেশ করা যাইবে ও ও নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইবে, মনে করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ঘটল না। জাহাজ নোঙ্গর ফেলিল। ভারতবর্ষের ডাক, জাহাজ হইতে নাবিয়া গেল। ৩৫০ বস্তা হস্তি-দন্ত জাহাজে বোঝাই লওয়া হইল। ক্রমশঃ নূতন যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিল। তীরে যাইবার জন্য ছোট নৌকা ধীরে ধীরে নামান হইল। কিন্তু হঠাৎ বিপদের সময় এত বিলম্বে ও ধীরে ধীরে বোট নামাইলে যে বিশেষ কায হয়, তাহা সন্দেহের স্থল। সে সময় নিশ্চয়ই ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কার্য্য সাধিত হয়। নানা রকমের বোট আসিতেছে যাইতেছে।

এখানেও আবার প্লেগের পরীক্ষা। বম্বেতে একবার এই অভিনয় হইয়াছে। এখানে পুনরভিনয়। ৯ দিন সমুদ্রবাসের পরেও আবার পরীক্ষা! সভ্য ইউরোপের প্লেগ-আতঙ্ক দেখি কিছুতেই যায় না। Veince Convention এর নিয়ম অনুসারে ১৪ দিন সমুদ্র বাস না হইলে প্রতি বন্দরে ডাক্তার পরীক্ষা করিবে। কিন্তু

সে পরীক্ষা নাম মাত্রের অপেক্ষাও হাস্যাস্পদ। ডাক্তার-দের চাকরী বজায় রাখা চাই, তাই স্থানে স্থানে এই পরীক্ষা-পীড়ন। প্লেগের কোন সন্দেহ থাকিলে Moses' Well নামক নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রীদের নামাইয়া Quarantineএ রাখা হইত, এখন সে সব গোল নাই। এই Moses' Well সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী শুনিলাম। Moses'এর আততায়ী Pharaohর সৈন্য হস্তে পরিত্রাণ পাইয়া দৈবানুকুল্যে লোহিত সমুদ্র পার হইয়া এই স্থানের কূপে নাকি জলপান করিয়া-ছিলেন। এখানে লোহিত সমুদ্র এত সঙ্কীর্ণ যে, সেকালে হাঁটিয়া পার হওয়ার অজানিত অথবা কেবল মোজেসের জানিত পথ থাকা, আর তারপর হঠাৎ বান আসিয়া Pharaohর সৈন্য ধ্বংস হওয়া, বড় বিচিত্র ঘটনা বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। আমাদের ভাগ্যে পরীক্ষার জন্য এক মহিলা-ডাক্তার জুটিয়া গেল। পুরুষ-ডাক্তার সাহেব মাঝিমাল্লা ও সেকেণ্ড ক্লাস তদারকে ছিলেন। মহিলা-ডাক্তার আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন। খাবার ঘরে সকলে সমবেত হইলে জাহাজেরই একজন কর্ম্মচারী আদালতের পেয়াদার মত সুন্দর উচ্চারণ করিয়া নামধারীর পর্য্যন্ত অবোধ্য ভাবে সকলের নাম ডাকিতে লাগিল। বিশেষ এসিয়াটিকদিগের নাম উচ্চারণে তাহার বেজায় কারদানী। বহুকাল লেভীতে যাওয়া হয় নাই; আজ ডাক্তার-মেমের নিকট ছোটখাট লেভী হইয়া গেল। সিঁড়ির কাছে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর নাম-ডাকার ক্রম অনুসারে এক এক যাত্রী তাঁহার সম্মুখ দিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেমেয়েদের নাড়ী দেখা হইল, কাহাকে কাহাকেও বা কঠোর, কঠোরতর পরীক্ষার জন্য বসাইয়া রাখা হইল। কিন্তু জঘন্য পুরুষদিগকে তিনি স্পর্শও করিলেন না। একবার চাহিয়াই পরীক্ষা কার্য্য শেষ হইল—আমরাও বাঁচিলাম।

তাঁহার সার্টিফিকেট পাইতে ও মনশুদ্ধি করিয়া তুলিতে সান্ধ্য-আহারের সময় উপস্থিত হইল। তখন ঠাণ্ডা বেশ পড়িয়াছে। ডেকের উপর হাওয়া বেশ জোরে বহিতেছে। Temperature ৮১। বৈকালে সুয়েজের কাছাকাছি হইয়া জাহাজ যখন দাঁড়াইয়া ছিল, তখন বেশ গরম পড়িয়াছিল। বোধ হয়, জাহাজে উঠিয়া অবধি এত গরম হয় নাই। তাই গরম কাপড় না পরিয়াই ডেকে আসিয়া-ছিলাম। ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পাইতে হইল। ৯টার সময়ই নামিয়া শুইতে গেলাম। Port hole বন্ধ করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইতে হইল। সকালে সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কত গল্পকথা শুনিলাম। খালের পথেও কত সুদৃশ্য দেখিলাম, তাহা সব লিখিতে গেলে একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ডাকও ধরা যায় না।

Baron Lesseps নামে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই খাল কাটেন। পূর্ব্বে Pharaohদের আমলে এই খাল Mediterranean হইতে Red Sea পর্য্যন্ত এক ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। এ কথার প্রমাণ ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার পাইয়া-ছিলেন বলিয়া প্রকাশ এবং সহস্র বাধা, বিপত্তি, ভ্রূকুটি, এমন কি অত্যাচার সহ্য করিয়াও তিনি এই খাল কাটিতে কৃত-সঙ্কল্প হন এবং সংকল্প ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিলেন। আমেরিকার Panama Canalএরও মতলব ও নক্সা এই মহা কর্ম্মবীর করিয়া যান। কিন্তু শেষ জীবনে অন্যান্য কর্ম্মবীরগণের ন্যায় তিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এখন হইয়াছে। সুয়েজ খালের সফলতার সম্ভাবনা ধনকুবের জগতে নিতান্ত বিদ্রূপের কথার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর শেয়ার কেহ কিনিতে চাহে নাই।

Baron Lessepsএর নিজ দেশবাসী ফরাসীরাও বিশেষ বিদ্রূপ করিত। গাঁয়ের ফকির অতি অল্প স্থানেই "ভিক্" পায়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী দুরদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিজ্‌রেলী খালের ভবিষ্যৎ উপকারিতা ভারত-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে ধ্রুব, একথা নিশ্চয় বুঝিয়া সামান্য মূল্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফে যতদূর পারিলেন, গোপনে শেয়ার কিনিয়া ফেলিলেন। দেখাদেখি Egyptএর খেদিভও কিনিলেন এবং ফরাসীরাও কিনিলেন। এখন ইংরাজের অংশই প্রধান; এবং সেই সূত্রে খাল সম্বন্ধে ও Egypt শাসন-সম্বন্ধেও ইংরাজের প্রাধান্য হইয়া গিয়াছে। Egypt ইংরাজের অধিকৃত ও শাসিত দেশ না হইলেও ইংরাজ এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। ৯৯ বৎসর খাজনা করিয়া কোম্পানী খাল কাটেন। আর ৪০ বৎসর পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ইংরাজের প্রাধান্য তখন আরও বাড়িবে মনে হয়।

প্রথমে খাল অতি সঙ্কীর্ণ ছিল এখন খুব বিস্তৃত করিয়া

মার্সেল্—Phare de la Desirade

করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীন কীর্ত্তি আধুনিক সভ্যতার মাঝে ছায়ার ন্যায় জাগিতেছে। নূতনের মধ্যেও পুরাতন মাথা জাগাইয়া রহিয়াছে। তাহাকে তাচ্ছিল্য বা ত্যাগ করিবার উপায় নাই। রাত্রে সুয়েজ খালের আলো, ভিন্ন ভিন্ন আপিসের, দূরবর্ত্তী সহর ও ডকের আলো বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। দিনেও ঝাউগাছের সার, রেল রাস্তা, রেল লাইন বড় মনোরম দৃশ্য।

দুই দিকে পাথর বাঁধা হইয়াছে। তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে নয়ন-রঞ্জন মনোরম সবুজ ঝাউ গাছের শ্রেণী,—খালের তীর দিয়া রেলও গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রাচীন স্বাভাবিক লবণ হ্রদ আছে। খালের মুখে ডক আছে। স্থানে স্থানে দুই খানা জাহাজ পাশাপাশি হইয়া এক সময়ে বাহির হইয়া যাইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত আছে। যেখানে তাহার সম্ভাবনা নাই, সেখানে খালে একখানা জাহাজ অপেক্ষা করিবার বন্দোবস্তও আছে। Signal দ্বারা সব কাজ হইতেছে। যে জাহাজ যে ভাবে যাইবে, তীর হইতে তার দিয়া তাহার হুকুম দেওয়া হয়, এবং সমস্ত খালের রাস্তায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে একজন পাইলট যায়। জাহাজ খুব ধীরে চালাইতে হয়। Electric Search-light সাহায্যে রাত্রে যাইবার কোন বাধা বা অসুবিধা নাই। খালের দুই ধারে লাল, নীল, আলো দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করা আছে। মাঝে মাঝে রেলের লাইনের উপর পাথরের বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। খালের বালি কাটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য কয়েকখান জাহাজ সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। সেই বালি-মাটীতে অনেক গ্রামের নীচু জায়গা ভরাট হইতেছে। উটের দ্বারা বালি বহান হইতেছে। দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা ইজিপ্ত ও আরবীয় নাবিকগণ ধীর গম্ভীর ভাবে নিজ কাজ করিতেছে। সেইরূপ বেশ-পরিহিত নাগরিকগণ খালের ধারের রাস্তা দিয়া যাইতেছে; মাট বহিতেছে। সর্ব্বত্রই একটা গম্ভীর ভাব। রাজসই ভাব, আমীরি চাল, যেন এই মাত্র Cleopatraর সেবা

খালের ধার দিয়া পূর্ব্বে স্থলপথে ডাক যাইত। Port Said হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত স্থলপথ দিয়া পুনরায় জাহাজে যাইতে হইত। Lieutenant Waghorn নামে একজন নৌসেনা কর্ম্মচারী, ১৮৪০ সালে এই পথ আবিষ্কার করেন। গল্প আছে যে, বর্ত্তমান Finlay Muir Companyর পূর্ব্ববর্ত্তী James Finlay Companyর একবার হঠাৎ অনেক তুলা খরিদের প্রয়োজন হয়। তখন Cape of Good Hope পথে ছয় মাসে জাহাজ যাইত। টেলিগ্রাম ছিল না। অথচ সত্বর তুলা খরিদ করা প্রয়োজন। James Finlay কোম্পানি যথেষ্ট টাকা দিয়া Waghornকে যেমন করিয়া হউক, শীঘ্র ভারতে পৌছিবার ভার দেন। তিনি এই পথ আবিষ্কার করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করেন। গল্পটা বড় প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ সেই সময়ে East India Companyর বাণিজ্যের একচেটিয়া ছিল। বে-সরকারী কোম্পানী যে এত বড় রকমের একটা কাজ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প ছিল। Interloper বড় জোর লুকাইয়া চুরাইয়া কিছু কাজ করিত। Waghorn এ অবস্থার অনেক পরে এই পথ আবিষ্কার করিলেন বলিয়া প্রবাদ। যে উপলক্ষেই হউক, Waghorn যে এই পথ আবিষ্কার করেন, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কেনালের প্রবেশ-দ্বারে তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। অপর দ্বারে Baron Lessepsএর মূর্ত্তি আছে। অঙ্গুলিনির্দ্দেশে যেন খালের রাস্তা দেখাইয়া দিতেছেন। Pharaohদিগের পূর্ব্বে প্রদর্শিত

পথে এই অদ্ভুতকর্ম্মা ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাহায্যে এখন ইউরোপ-এসিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা ক্ষণজন্মা কর্ম্মবীরের নিকট জগতের ঋণ অপরিশোধনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কাল বড় ঠাণ্ডা গিয়াছে। সকালে তাই পুরাতন বড়কোট ও হাত-বাঁধা পাগড়ী বাহির করিয়া সাহেব-মেমকে চমকিত করিয়া দিলাম।

আজ একাদশী। স্নান নিষেধ। আর খালের জঘন্য জলে স্নান করিতে প্রবৃত্তিও হইল না। আজ যেন রামরাবণে উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র স্নান বন্ধ করিলেন। আহার সম্বন্ধেও তাই। একাদশীর দিন পাঁজি না দেখিলেও শরীরের জড়তায় তিথি-মাহাত্ম্য বুঝা যায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া গরম গেঞ্জি ও ফ্লানেল বেনিয়ান পরিয়া ডেকে আসিলাম। যাহারা Port Saidএ নামিয়া যাইবে, তাহাদের উদ্যোগ চলিতেছে।

খোসামোদ করিয়া ঘরে যাহাতে ভিড় না হয় তাহার তদ্বির প্রয়োজন হইল। আজ কেরানী (Purser) মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া লাটসাহেবের দর্শন পাওয়া অপেক্ষাও ভার। কয় দিনে তাঁহাকে দেখিতেই পাইলাম না। অতএব তাঁহাকে তুষ্ট করার চেষ্টা না করিয়া অবশ্যম্ভাবীর বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। তবে কালা মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেব দল কেবিন হইতে পলায়ন করিলেও মঙ্গল।

একখানি রেলওয়ে ট্রেণ ঝাউগাছের ভিতর দিয়া খালের তীর কাঁপাইয়া চলিয়া গেল। জলপথে জাহাজ চলিতেছে। আর তাহার পাশেই স্থলপথে রেল গাড়ী চলিতেছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য! মরুভূমিতে যেখানে তৃণপল্লবও টিকিতে পারে না, সেখানেও ঝাউবনের প্রাদুর্ভাব! বাগান, বাড়ী সমস্তই পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত। রেলওয়ে, পথে, ষ্টেসনে French নাম লেখা। এই সব দেখিতে দেখিতে মৃদুমন্দ গমনে চলিতেছি। খালের তীরভূমি পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই অতি ধীরে যাইতে হয়। কিন্তু আমাদের ডাক-জাহাজ বলিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত যাইতেছি, ৯টার মধ্যে Port Said পৌঁছিবার সম্ভাবনা। সম্মুখে অন্য জাহাজ থাকিলে আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া পাশের খালে অপেক্ষা করিতে বাধ্য। অন্য জাতির ডাক-জাহাজকেও ইংরাজের ডাক-জাহাজকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ধন্য ইংরাজ, ভারতবর্ষে নিজ অধিকারে এই আধিপত্য, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরের দেশেও এইরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ভয়ে তীরে যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ মাত্রা নামিবার পূর্ব্বেই পাওয়া গেল। সিঁড়ি ফেলিতে, তদ্বির করিতে করিতে অনেক সময় গেল। ততক্ষণ কাল ধূলার পূর্ণভোগ।

ইতোমধ্যে অসুরের মত দীর্ঘাকৃতি অসভ্যদশন ভীষণদন্ত তাম্রবর্ণ একজন ইজিপ্সিয়ান নানা ভাবের সাঁতার দেখাইয়া বাহাদুরী ও পয়সা উপায় করিতে লাগিল। জলের মধ্যে পয়সা ফেলিয়া দিলে মাছের মত ডুবিয়া গিয়া তুলিয়া মুখের মধ্যে রাখিতে লাগিল। কেহ পয়সার বদলে ঢিল ছুঁড়িলে নিজের নিজের ভাষায় গালি দিতে ও মুখ-বিকৃতি করিতে লাগিল। তাহতে তাহার বড় অপরাধ ধরা যায় না। প্রায় একঘণ্টা সে এইরূপ অবলীলাক্রমে জলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। পরে যখন আমরা নগরভ্রমণে যাইলাম, তখন দেখি, সে দীর্ঘবপু উভচর টুপী পরিয়া ভদ্রলোক হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার অসুর মূর্ত্তি লুকাইবে কিরূপে। তখন বোধ হয় সহরের অলিগলিতে অন্যরূপ শিকারে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টায় ছিল।

তীরে যাতায়াতের জন্য অনেক ছোট জাহাজ ছিল। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে Sir William Dring প্রভৃতি যাহারা Brindisi পথে যাইবেন, তাঁহাদের জন্য Osiris নামক জাহাজও নিকটে বাঁধা ছিল। করমর্দ্দন, বিদায়গ্রহণ, কার্ড ও ঠিকানা আদান-প্রদানের দস্তুরমত ধূম পড়িয়া গেল। কয়দিন সব একত্র থাকা হইয়াছিল, কাজেই এই সকল আত্মীয়তার প্রাবল্য। বিশেষ.Sir William Dring এবং General Maclyn ও সেই ফরাসী সাহেবটি বড়ই আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদায় দান-গ্রহণে উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কষ্টবোধ হইল। বিলাতে ড্রিং সাহেবের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দেখা হইলে সাধারণ হিতকর কার্য্য—রেলওয়ে স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইবে কথা ছিল। কে জানিত, দারুণ কাল ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে এই মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের নিজের রেলওয়ের উপর নিজের

সেলুন গাড়ী হইতে চোরের ন্যায় অসম্ভাবিত লোকবুদ্ধির অতীত ভাবে অপহরণ করিবে। ড্রিং সাহেবের ন্যায় সদাশয় নিত্যপ্রফুল্ল ভারতহিতৈষী ইংরাজ আমি অল্পই দেখিয়াছি।

জাহাজ হইতে দেখিতে সহরটি সুন্দর। সুন্দর সুন্দর বাড়ী অনেক। হোটেল দোকান আপিসই অধিক। অধিবাসী সংখ্যা কম। বড় বড় বিজ্ঞাপন চারিদিকে আঁটা রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যে, সহরের নাম বুঝি, Pears Soap, না হয় Dawson's Whisky, না হয় Coleman's Mustard.
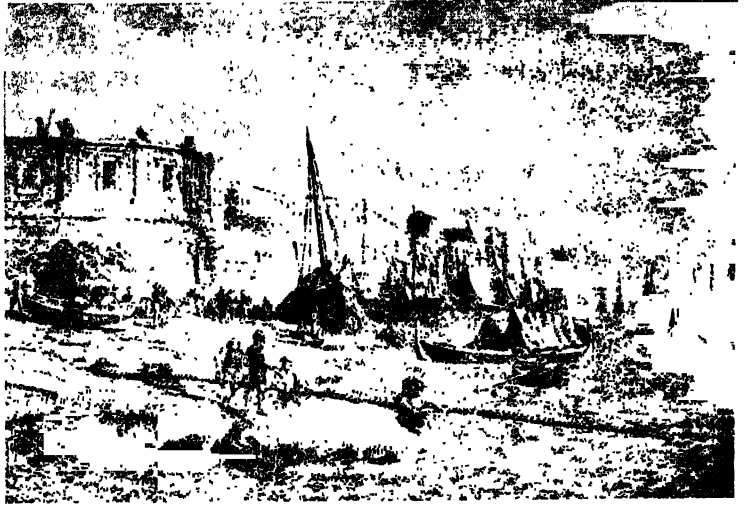
মার্সেল্—Le Chatean d'If

ইউরোপের নগরমাত্রেই এই বিপদ্। সহরের ষ্টেশনের সেই ষ্টেশনের রাস্তায় সেই বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্যে নবাগতের পক্ষে সহরের নাম স্থির করা দুষ্কর।

এখানে প্রধান বাড়ী ক্যানাল কোম্পানির আপিস। খাল দিয়া যাইবার জাহাজের মাশুল এইখানে আদায় হয়। আমাদের জাহাজকে প্রায় দুই হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকা মাশুল দিতে হইয়াছে। যাত্রীপেছু পাঁচ শিলিং মাশুল লাগে। সমুদ্রের ধারে পাকা Quay, পাকা রাস্তা রেলিং দিয়া ঘেরা। গাড়ী-ঘোড়া বিস্তর। দুই শিলিং দিলে প্রকাণ্ড জুড়ী ও গাড়ী সহর ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনে। অশ্বতরে ট্রাম টানিতেছে, অশ্বতরে মোট বহিতেছে। আগে এই অশ্বতরই যাত্রীদের প্রধান সহায় ছিল। এখন গাড়ীঘোড়া হইয়া সুবিধা হইয়াছে।

সিঁড়ির সুবিধা হইবামাত্র আমরা (অর্থাৎ আমি, চক্রবর্ত্তী-পরিবার, আর তাঁহাদের সহযাত্রী শিশুতুল্য সরল ও উৎসাহী প্রাচীন থিওজফিষ্ট কিটনী সাহেব) দল বাঁধিয়া নৌকা করিয়া সহর দেখিতে গেলাম। অত্যাচার-নিবারণের জন্য পুলিস নৌকার ভাড়ার হার ঠিক করিয়া দিয়াছে। সেই হারেই তিন পেনি করিয়া প্রতিজনে দিতে হয়। কোন গোলমাল নাই। বাহান্নখানা নৌকা আসিয়া টানাটনি করিবার হুকুম নাই। পুলিস যে নৌকাকে যে যাত্রীর জিম্মা করিয়া দিতেছে, সেই সে যাত্রী পাইতেছে। আসিবার সময়ও তাই। জাহাজ পাঁচটার সময় ছাড়িবে, নোটিস দিয়াছে। আমরা ১০টার সময় নৌকা লইলাম। কিন্তু গরমে অধিকক্ষণ বেড়াইতে পারা গেল না। ১১॥ টার মধ্যেই জাহাজে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল।

মেয়ে ছেলে সব সঙ্গে ছিল বলিয়া বেশী দূর যাওয়া হইল না এবং দিশী সহর-অংশটা আসলেই দেখা হইল না। সেখানে পৃথিবীর বিখ্যাত বদমায়েসদের আড্ডা। চুরি ডাকাতী নরহত্যা প্রায়ই হয়। তবু কিন্তু পুলিসেরও প্রতাপ অল্প নহে। তাহাতেই এমন অত্যাচার-হাঙ্গাম কম। সঙ্গীন লইয়া পুলিশ নানাস্থানে পাহারা দিতেছে। দিশী লোকদের এক কথায় বর্ণনা করিতে হইলে truculence to the weak ও servility to the strong personified বলিতে হয়। ইউরোপীয় দেখিলে কোমর-হাঁটু বাঁকাইয়া সেলাম করে, আর অপরের প্রতি কঠোর খরদৃষ্টি—ভারতের চিত্রের পুনরভিনয় এখনও দেখিতেছি। ফুটপাথ, বাড়ী, দোকান বিস্তর আছে। অনেক সওদাগর ও অন্যান্য কোম্পানির প্রতিনিধিগণ এখানে আছে; কারণ কায়রো যাইবার ইহাই পথ এবং এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় যাইবার রাস্তার চৌমাথা বলিলেই হয়! খুচরা ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তর হয় দেখিলাম। সব রকমের দোকান আছে। মোটামুটি বড় দরের বাণিজ্যের চিহ্ন বিশেষ দেখিতে পাইলাম না।

পাথর সিমেণ্ট দিয়া ফুটপাথ সব বাঁধান। স্থানে স্থানে চৌড়া ফুটপাথের উপর চৌড়া বারান্দা দোকান হোটেলের সাম্‌নে ছায়া করিয়া আছে। সেই ফুটপাথের বারান্দার নীচে টেবিল চেয়ার সাজাইয়া চা, সরবৎ, কফি এবং গুরুতর শ্রেণীর পানীয় বিক্রয় চলিতেছে; গল্পগুজব এবং নাচগান-বাজনাও চলিতেছে। মারামারি গালাগালিরও অভাব নাই। রাস্তার উপর দুই পার্শ্বে এই রকম দোকান হোটেল সাজাইয়া প্রকাশ্য বৈঠকখানা ভাবে ব্যবহার প্যারিস-প্রমুখ ইউরোপের অনেক সহরে আছে। এইখানে তাহার আরম্ভ। ডাকঘরটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা জায়গা। কিটনি সাহেবের ও মিসেস রাওয়ের—বাজার করার চেষ্টা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নগরভ্রমণ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে হইল। যেখানে ভাল টুপী, জুতা, কি অন্য জিনিস দেখেন সেইখানেই মিসেস রাও দৌড়িয়া যান, দর করেন, অথচ খরিদ কিছুই হয় না। এই "প্রাচীনা বালিকার" সহিত অধিকক্ষণ নগর-ভ্রমণে বড় সুবিধা বোধ হইল না। আবার সকলকে ফেলিয়া একলা গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানটাও ভাল দেখায় না। কাজেই পরিশ্রান্ত হইয়া সকাল সকাল ফিরিতে হইল। গণক, জুয়াচোর, নানাশ্রেণীর দালাল ও ফিরিওয়ালায় রাস্তা পরিপূর্ণ। ঠকাইবার চেষ্টা চতুর্দ্দিকে যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। রৌদ্রও অধিক হইয়া পড়িতেছিল; সকাল সকালই জাহাজে ফেরা গেল।

কয়লা তোলার কাণ্ড তখনও শেষ হয় নাই। কাজেই ক্যাবিনের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে কয়লা তোলা পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ক্ষিপ্রকর্ম্মা নাবিকগণ সব ধুইয়া পুঁছিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল।

অনেক নূতন মুখ দেখা গেল। পুরাতন মুখ কতক দেখিতে পাইলাম না। সব যাত্রী এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। বেলা ৪ টার কায়রোর ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে জাহাজ পাঁচটায় ছাড়িবে। সুয়েজে পাঁচ ঘণ্টা সময় গিয়াছে।

পোর্ট সায়েদে প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। জাহাজ ছাড়িয়া ডাক গিয়াছে, ব্রিণ্ডিসী পথে। কাজেই জাহাজ আর এখন "ডাকের জাহাজ" নয়, জরিমানার ভয় নাই। গয়ংগচ্ছ, একটু বাড়িয়াছে।

Sir Gay Wilson আজ কিছু ভাল আছেন, দেখা হইল। জ্বর অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল সেই জন্য বড় দুর্ব্বল। বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা এত যত্ন করিতেছি বলিয়া ধন্যবাদ দিতেও ছাড়িলেন না।

পোর্ট সায়েদ বন্দর বহুদূর বিস্তৃত। দীর্ঘবাহু ছড়াইয়া কয়েকটা Sea Wall দিয়া বন্দর তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। জাহাজ নৌকায় বন্দর প্রায় পরিপূর্ণ থাকে। Mediterranean Sea উপরে ও বন্দরের কোলে সুয়েজ ক্যানালের ইঞ্জিনিয়ার ব্যারণ লেসেপ্সের প্রস্তরময় বৃহৎ মূর্ত্তি রহিয়াছে। যত্নের সহিত খালের মুখের পথ বাহু বিস্তার করিয়া দেখাইয়া দিতেছে—"Behold my Work." এসিয়ার সীমা এইবার নিতান্ত ছাড়াইলাম। ইউরোপ এখন সম্মুখে। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মনে কত তরঙ্গের উদয় হইতেছে। কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধের স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছি। মহম্মদ, মোজেস্, ফেরোর স্থানও ছাড়িয়া আসিলাম। অদূরে যিশু খ্রীষ্টের স্থান। এই ত্রিসঙ্গম স্থানে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকার মিলনপ্রয়াগে মহাত্রিবেণীতে ভাবতরঙ্গের আন্দোলন স্বাভাবিক। ভারত-বিদায় দশ দিন হইয়াছে। আজ এসিয়ার বিদায়!

চারিটার পর কায়রোর ট্রেণ আসিল। ইতিহাস-ধন্য এবং বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে নগণ্য হইয়াও অবস্থা-বৈচিত্র্যে সর্ব্বমান্য কায়রো সহর পোর্ট সায়েদ হইতে রেলপথে ৬ ঘণ্টার রাস্তা। অনেকটা রেলরাস্তা খালের ধারে ধারে গিয়াছে। তাহার অনতিদূরে জগদ্বিখ্যাত পিরামিড স্ফিংকস্ প্রভৃতি প্রাচীন ইজিপ্ত কীর্ত্তি—যাহার সহিত প্রাচীন ভারত-কীর্ত্তিও অতি ঘন সম্বন্ধে আবদ্ধ। সে সম্বন্ধ কত নিকট তাহা এত দিন জানা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি জর্ম্মান পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের নৈকট্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। মিশর দেশের সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, রাবণের লঙ্কা বর্ত্তমান সিংহলে নয়, প্রাচীন মিশরে ছিল। কাহারও মতে তাহা সিঙ্গাপুরের দিকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণার বৈচিত্র্যের অবধি নাই। যাহা হউক, এ যাত্রায় ইজিপ্ত দেখা হইল না। ভবিষ্যতে হইবে কি না ভবিষ্যতই জানে।

সকলেরই লক্ষ্য নিজের নিজের স্থান ঠিক করিয়া লইতে

—আর আমার লক্ষ্য নিজের স্থান রক্ষা করিতে! কয়দিন একলা নির্ব্বিরোধে ঘরকন্না করিয়া আসিয়া কেমন বিলাতী ধরণের "হিংসুটে" ভাব ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। তিন জনের ঘর রিজার্ভ না করিয়াও একলা দখল অভ্যাস হইয়া যাওয়াতে তাহা সেইরূপ চিরদিন দখলের ইচ্ছাটা এবং সে ইচ্ছা সফল না হইলে, তাহা অন্যায় বলিয়া ধারণাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অন্য ঘর খালি আছে, কিন্তু Purser বাবাজী Maltaতে নূতন যাত্রী উঠিবার আশায় বিস্তৃত কিম্ভূতকিমাকার "Kim" মহাত্মাকে তাঁহার "স্বকীয়" বিপরীত দরখাস্ত এবং আমার পক্ষে তদ্বিরকার আমার Stewardএর বিস্তর মৃদু চেষ্টা সত্ত্বেও আমারই স্কন্ধে চাপাইলেন। লোকটা দেখিলাম Egyptian। এক বর্ণ ইংরাজী জানে না। ভাঙ্গা French জানে। আমার Frenchএর জ্ঞান অতি সামান্য।

অতএব কথাবার্ত্তা কতকটা ইশারা ইঙ্গিতে হওয়া ছাড়া উপায় নাই। Stewardএর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সে অন্য ঘরে শুইবে ও আমায় যত কম পারে বিরক্ত করিবে, এইরূপ ভদ্রতার কথাও প্রকাশ করিল। আমিও ধন্যবাদের সহিত আপ্যায়িত করিলাম। পাঁচটার সময় নঙ্গর তুলিয়া মাপিতে মাপিতে পোর্ট সায়েদ পশ্চাৎ রাখিয়া ধীরে ধীরে "ভূমধ্যসাগরে"—প্রবেশ করিলাম। এইবার প্রকৃতই এসিয়া ত্যাগ করিয়া ইউরোপে পদার্পণই বল—আর জাহাজার্পণই বল হইল। লিসেপ্সের প্রতিমূর্ত্তি Sea Wall এর প্রায় মধ্যস্থানে। এখানে জল কম বলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত এই সমুদ্র-প্রাচীর গাঁথিয়া বন্দর প্রস্তুত হইয়াছে। "বয়া" লাইট হাউস প্রভৃতিরও প্রচুর বন্দোবস্ত। সমুদ্রে অল্পদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যও Pilot এর সাহায্য লইতে হয়। বম্বে, এডেন ও সুয়েজে পাইলট যেমন সহজে নামিয়া যাইতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা হইল না। পবনদেব Mediterranean Seaকে রীতিমত নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন। সেই জন্য Pilot সাহেবকে সেই নৃত্যশীল তরঙ্গের উপর নৃত্যশীল নৌকার কাছি ধরিয়া নামিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। যাহা হউক, পাইলট নামিয়া গেল। আমরাও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার আঁধার অল্পে অল্পে এসিয়া-আফ্রিকার সঙ্গম-স্থল ছাইয়া ফেলিল, আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ হাসিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া "ভূমধ্য" দর্পণে স্থির-মুকুর তুলনা অসম্ভব। স্থির ভাবে প্রতিফলিত হইতে না পারিয়া, চন্দ্রমা আত্মীয়তা-রাশি বর্ষণ করিয়া সঙ্কেতে যেন জানাইলেন যে, ধীরসমীর সরসীতে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। প্রখর চাঞ্চল্য উপভোগ করিতে হইলে, শশধরের "কুমুদিনী কান্ত" হওয়া সাজিত না। চাঁদ সেই সেই বটে কিন্তু দেশের চাঁদের মত, চিরপ্রিয় মধুপুরের চাঁদের মত "চন্দ্রিকা-ধৌত হর্ম্ম্য" কারিকর চাঁদের মতন ত দেখাইতে ছিল না। যেন কিছু কান্তিহীন—যেন কিছু ম্লান। কিংবা আমার হৃদয়ের ছায়াই চন্দ্রমাকেও কি স্পর্শ করিয়াছিল। কারণ ভূমধ্য-সাগর তীরেই গ্রীক,

মার্সেল্—Vieux-বন্দরের সাধারণদৃশ্য

ইটালিয়ান, য়িহুদীয় ও ইজিপ্সীয়ন কবিগণকে চন্দ্রদেব "চন্দ্রিমা গ্রস্ত" করিতেন।

ডেকে বড় ঠাণ্ডা বলিয়া অগত্যা "তামাক খাইবার" ঘরে যাইয়া বসিতে হইল। পরিচিত সাহেবেরা "সুধা" ও "তাসে" যোগ দিবার জন্য কায়দা-দস্তুর মত অনুরোধ করিলেন। অধীন উভয়েই বঞ্চিত। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা-বাহুল্যে অকারণ পরস্পরকে বিব্রত না করিয়া পলায়ন-পন্থাই প্রকৃষ্ট বোধ হইল। অবশেষে নিজের ক্যাবিনে আসিয়া সকাল সকাল পদ্মনাভ স্মরণের উদ্যোগ করিতে হইল।

আজ Northern Armyর একজন Staff Officerএর সঙ্গে অনেক কথা হইল। পোর্ট সায়েদে বহু অপরিচিতের সমাগম হওয়াতে পূর্ব্বপরিচিত সহযাত্রীরা যেন অধিকতর রূপে আপনার হইতেছে ও আত্মীয়তা করিতেছে। এই Officerটী ভারতের বহু স্থানে ঘুরিয়াছে এবং ভারত সৈনিকের প্রতি প্রসন্ন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় সৈন্যের সংগ্রাম-কৌশলের হ্রাস হইতেছে দেখিয়া সে দুঃখিত ও চিন্তিত।

শূরবীরেরাও আর যুদ্ধের নাম করে না। শিখও এখন যুদ্ধের বাজনায় নাচিয়া উঠে না। দিনে দিনে তাহারা অর্থান্বেষণে ভারতসীমার বাহিরে বিদেশে যাইতেছে। ক্যানাডা,ভ্যাঙ্কুভার প্রভৃতি স্থানে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাহাদের এই অর্থলালসা কমিতেছে না। স্থানে স্থানে কুলী হইয়া প্রত্যহ ছয় শিলিং পর্য্যন্ত যদি ইহারা উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে মাসে ১০।১২ টাকার জন্য সিপাহী হইতে যাইবে কেন? আমরা Port Said হইতে বাহির হইবার সময় দেখি যে; অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া Steerage Passengerরূপে প্রায় ২০০ শিখ Sicily ও Rubotino নামক জাহাজে কোথায় যাইতেছে। বোধ হয়, South America, Canada, কি এমনি কোন জায়গায় যাইবার জন্য Genoaতে গিয়া জাহাজ বদলী করিবে।

Colonel Palmer নামে একজন অতিবৃদ্ধ সৈনিকের সহিত আলাপ হইল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর চাকরী লইয়া তিনি ভারতে আসেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়কুটুম্বদিগের নিকট বিলাতে গিয়া কিছু দিন থাকেন। নিজের ঘরবাড়ী কিছুই নাই। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ বা দুঃখিত ভাব কিছু প্রকাশ করেন না।

১৮৫৯ সালে Mutinyর পর যখন কোম্পানির রাজ্য গিয়া মহারাণীর রাজ্য হয়, তখন কলিকাতায় লাট সাহেবের বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া যে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র (Proclamation) পাঠ হয়—সে সময় এ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। Sir Hugh Rose, Collin Campbell প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে কর্ম্ম করিয়া Lord Robertsএর আমল পর্য্যন্ত চাকরী করে। ইহার সহিত কথাবার্ত্তায় পুরাতন ইতিহাস পাঠের কাজ হইল। পিতাঠাকুরের পুরাতন বন্ধু মিউটিনির ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার পামারের সহিত ইহার বেশ পরিচয় ছিল। পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া পুরাতন কথা অনেক হইল।

বুধবার ২৯এ মে।—নিত্যভ্রমণকথা লিপিবদ্ধ করিবার বিষয় ক্রমশঃ খুবই কমিয়া আসিতেছে। ৫টার কিছু পরেই সূর্য্যোদয় হইল। ৬টার পর আমার ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দেওয়া হইল। নবসুন্দর উপাসনা এবং বহুজন-উপাসিত দেবোচিত ঔদ্ধত্য-দশন ইহাত নিত্যকর্ম্ম। স্নানআহার শয়ন, নিদ্রা—সব নিয়ম ও কায়দামাফিক চলিতেছে। কিন্তু পরিমাণ ও সংখ্যায় অধিক। কারণ পোর্ট সায়েদে লোকসমাগম অধিক হইয়াছে। কাল ভোজনালয়ে অধিক টেবিল সাজাইতে হইয়াছিল। স্নানাগারের ক্রম-প্রতীক্ষায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। নিরিবিলি ডেকে বসিয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, ছেলেমেয়ের দৌরাত্ম্যে এবং ফরাসী ভাষার প্রাচুর্য্যে ডেক মুখরিত। যে যার চেয়ারে বসিতেছে, যে যার চেয়ার পাইতেছে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে। বসিবার বেড়াইবার গল্প করিবার জায়গা নাই। ওদিকে তামাক খাইবার ঘরে যাইলেই মদ, তামাক, তাসের ভিড়ে তিষ্ঠান দায়। পরিচিতেরা আতিথ্য-গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করে। বারংবার নানা কথায় কথা-কাটাকাটি করিয়া সযত্ন-অর্পিত আতিথ্য-প্রত্যাখ্যানেও ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়। অতএব সে দিকেও ঘেঁসিবার যো নাই। শুনিতেছি, মাল্টাতে Sir John Hamilton, Commander of the Mediterranean Fleet ও অন্যান্য প্রায় নব্বই জন যাত্রীকে লইবার জন্য আমাদের জাহাজকে যাইতে হইবে। কাপ্তেন সাহেব সোজা রাস্তা ছাড়িয়া যাইতে বড় রাজী নয়। কিন্তু হুকুম আসিয়াছে, যাইতেই হইবে। তাহা হইলেই অসুবিধা ও গোলমালের চূড়ান্ত হইবে। এতদিন এসিয়া রাজ্যে যে নির্ব্বিঘ্নে আনন্দে আসা গিয়াছে, তাহাত আর থাকে না দেখিতেছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর কনকনে করিয়া দিতেছে। জাহাজের পৃষ্ঠদিকেত যাইবার যো নাই। পশ্চিমদিগের মাঝখানে আমার চেয়ার পাতিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানেও বেদখল। অতএব সমস্ত দিনই ভূমধ্যসাগরে পড়িয়া অবধি একটা কেমন আবহাওয়ার বদল ভাব বোধ হইতেছে।

ভূমধ্যসাগর কখন স্থির, কখন অস্থির। মধ্যে মধ্যে

তরঙ্গভঙ্গও বেশ হইয়া জাহাজকে রীতিমত দোলাইয়া দেয়। তাহার জন্য বহুবার সমুদ্রগামী যাত্রীকেও ভূমধ্যসাগরে কষ্ট পাইতে হয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার এখনও পর্য্যন্ত কোন কষ্ট হয় নাই। তাহার জন্য আমার পূর্ব্বউপার্জ্জিত 'Good sailor' পদবীটি এক প্রকার কায়েমী হইয়া গেল।

আজ সকালে হাওয়া ও শীত একটু কমিয়া গিয়াছে। আকাশ-সমুদ্র প্রশান্ত, স্থির ও প্রসন্ন। সমুদ্রের এ নিত্য নূতন—এমন কি পলে পলে নূতন লীলা দেখিয়াই—সময়টী একপ্রকার কাটিয়া যাইতে পারে। আজ কয়েকটী পাখী কোথা হইতে আসিয়া মাস্তুলের উপর বসিল। বসিতেছে—আবার উড়িয়া যাইতেছে। নিকটে কোন দ্বীপ আছে,
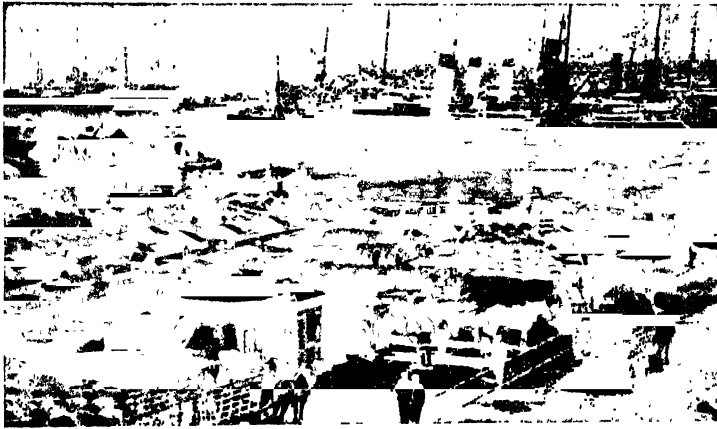
মার্সেল্—Joliette বন্দর

বোধ হয়। স্থলভ্রমে পরিশ্রান্ত পক্ষিগণ যখন সমুদ্রের শ্বেত ফেণরাশির উপর বসিতে যায়—তখন অপূর্ব্ব ভ্রান্তি-বিলাসের অভিনয় হয়। জাহাজে আশ্রয় পাইয়া শ্রান্তি দূর করিয়া লয়। আসন্ন-বিপদ ভাবিয়া লোকজনের কোলাহলেও তাহারা ভয় করে না। কারণ এ অবস্থায় নৃশংসের ব্যবহার অমানুষিক, এ বিশ্বাস বোধ হয়—তির্য্যক্‌জাতির আছে। আর যখন এ আশ্রয় না পাইয়া সুদূর-সমুদ্রে—শ্রান্তপক্ষে স্থলোন্মুখী পক্ষী ক্রমে ক্রমে হতবল হইয়া জলমগ্ন হয়—তখনকার অভিনয় বিশেষ শোকাবহ। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট মানব যখন অগাধে এইরূপে মিশাইয়া যায়, তখনকার অভিনয়ও এইরূপ শোকাবহ। লক্ষ্যভ্রষ্ট কত জীবনের এই দারুণ অবস্থা দেখিয়া সময়ে সময়ে দারুণতর ব্যথা পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবলও পাইয়াছি। লক্ষ্যস্থির করিয়া করযোড়ে সকাতরে বলিয়াছি, ভগবান সহায় হও। যে সকল গ্লানি, তাপ, এ অভিনয় স্মরণে দেহমন দগ্ধ করে—অসীম অনন্তের শোভা, সৌন্দর্য্য দেখিয়া—তাহা কতক ভুলিয়াছি। কিন্তু সময়ে সময়ে বৃশ্চিক-দংশনের মত সে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জাগিয়া উঠে। ভগবান্ সকলকে সুমতি দিন—সকলের মঙ্গল করুন। কাহারও অহিত কামনা স্বপ্নেও যেন কেহ না করি।

আজ সকলকে গরম কাপড় বাহির করিতে হইয়াছে। জাহাজের কর্ম্মচারিগণ, নাবিক ও ভৃত্যগণও কাল পোষাকে বাহির হইয়াছে। মিসেস্ রাও চক্রবর্ত্তী কন্যাকে মেম্ সাজাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহার সুবুদ্ধি দৃঢ়চিত্ত পিতা তাহাতে সম্মত নহেন। মেয়েটিও বড় বুদ্ধিমতী ও স্থির। আমাদের মেয়েদের, আমাদের পোষাকে যেমন দেখায়, আমাদের পোষাকে তেমন দেখায় না, ইহা তাঁহার ধারণা। আর আমাদেরও ছেঁড়া চোগাচাপকান কাল মূর্ত্তিতে কতকটা যেমন মানায়, ধার করা পোষাকে আদৌ মানায় না। আমি গরমের কদিন পাগ্‌ড়ী বাহির করি নাই; এখন ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে পাগ্‌ড়ী বাহির করিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অধিক পরিমাণে রক্ষার আয়োজন করিতেছি। সাহেব, মেম—যাহার যাহার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিল, "তুমি নিজের পোষাক বজায় রাখিতে স্থির করিয়া ভাল করিয়াছ। তাহাতে অধিক স্নেহ ও সম্মান পাইবে।" এই কথা যদি তাহাদের যথার্থ মনের কথা হয়, তাহা হইলে বুঝিনা যে, আমাদের দেশের লোক অকারণ ব্যয়কষ্ট, লাঞ্ছনা পাইয়াও পদে পদে ভ্রান্তিবিলাস অভিনয় করিয়া—সাহেব সাজার যন্ত্রণা কেন সহ্য করেন। সাহেব বলিয়া সহজে ভুল করিবে, এ সম্ভাবনা কম। তবে সাহেব মেমদের সহিত মিশিতে হইলে ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে ধুতি কিংবা প্রকাণ্ড আলখাল্লা দোলাইয়া বেড়াইলে চলিবে না। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থা ও কর্ম্মভেদে আমাদের নিজের মধ্যেই পোষাক পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ যাহা হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে জাতীয়তা রক্ষার কোন

বাধাকষ্ট নাই। হ্যাট্‌কোট, মদ, অস্পৃশ্য মাংস, তামাক চুরুট না হইলে বিলাত যাওয়া যায় না—আর বিলাত গেলেই নৈতিক ধ্বংস হইতেই হইবে, এ ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হওয়াও আবশ্যক। শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য আমাদের দেশের প্রধান এবং প্রবীণ লোকের বিলাত আসার এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বাধা তাহাদের পক্ষে থাকা উচিত নয়। ভারতের অন্যান্য জাতিও অধিকাংশ স্থলে এ বাধা থাকিতে দেয় না। বাঙ্গালীই বা পশ্চাৎপদ হইয়া পরানুকারী থাকিবে কেন?

জাহাজে যাহারা তাস খেলিয়া সময় কাটাইতেছে তাহাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়াছে। কারণ তাস, চুরুট, তামাক, সিগারেট, সব মাল্‌টা পৌঁছিবার পূর্ব্বে Purser-এর জিম্মা করিয়া দিতে হইবে। Customs Officialরা খানাতল্লাসী করিয়া গেলে তবে সেই সব মহারত্ন পুনরর্পিত হইবে, ইহাই নিয়ম। মাল্‌টা হইতে ডাকে চিঠি দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহে পত্রলেখার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সকালেই Malta পৌঁছান যাইবে। পূর্ব্বে Maltaর পথে জাহাজ যাইত না। কিন্তু এখন Maltaয় কি একটা কাণ্ড চলিতেছে। Egypt হইতে Lord Kitchener, Mediterranean Seaর Commander-in-Chief Sir John Hamilton, Asquith, Winston Churchill প্রভৃতি সব মহারথী নাকি সেখানে সমবেত হইয়া ইংরাজের ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য-রক্ষার কি সব উপায় উদ্ভাবন হইতেছে। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও সহযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে। প্রায় ১০০ জন লোককে লইয়া যাইতে হইবে, তাই জাহাজ এই পথে চলিয়াছে। অতি অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াইবে। আমাদের নামিয়া দেখিবার সময় হইবে না। Knights Templarsদের আমল হইতে Malta ইতিহাসে বিখ্যাত। কয়েকজন Monk নাকি অমানুষিক অত্যাচার সহিয়া মরিয়াছিলেন। ভূমধ্যস্থ গহ্বরে যে ভাবে দাঁড়াইয়া মরিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবেই নাকি আছেন। Knights Templarsদের কীর্ত্তি আধুনিক কেল্লা, সহর, বন্দর ইত্যাদি দেখিবার অনেক জিনিস আছে। তবে দেখিবার সময় না হয় উপায় নাই। স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্তের "Three Years in Europe" যখন রচিত হয়, তখন ডাক-জাহাজ Colombo হইয়া Malta পথেই যাইত। তখন বম্বের পথ প্রচলিত হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার পুস্তক পাঠে বিলাত-যাত্রার সহিত Malta নামটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

লণ্ডনের কুলী-গাড়য়ানের ধর্ম্মঘটে জাহাজ-চলার কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা Marseillesএ পৌঁছিলে বুঝা যাইবে। কেহ কেহ বলিতেছে যে, এ জাহাজ আপাততঃ Marseillesএই অপেক্ষা করিবে। ধর্ম্মঘট না মিলিলে লণ্ডনে যাইবে না। যাহা হউক, এক মণ মালের ভাড়া এক পাউণ্ড দিয়া, আড়াই মণ মাল লইয়া রেলে যাওয়া সুবিধাজনক না হইলেও তাহা করিতে হইবে। নতুবা লণ্ডনে পৌঁছিয়া জিনিষপত্রের জন্য হা-প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কষ্ট-অসুবিধার ত কথাই নাই, কাজেরও ক্ষতি হইবে।

গোয়ালিয়ার দরবারের ল-মেম্বর সুলতান আহমেদের সহিত আলাপ হইল। ইনি Paris হইয়া Londonএ যাইবেন। লোকটী বেশ সদালাপী। গোয়ালিয়রের Private Secretary Colonel Haksarও সঙ্গে আছেন। তিনি সমুদ্রপথেই যাইবেন। দুই জনেই আমাদের আহারের টেবিলে বসেন। তাঁহাদের সহিত গোয়ালিয়ার সংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তায় অনেক নূতন সংবাদ পাইলাম। শুনিলাম, মহারাজ মাত্র শিকার ও ঘোড়াচড়া লইয়া থাকেন না। সব রাজকার্য্য নিজে সমস্তই স্বহস্তে করেন।

বৃহস্পতিবার, ৩০এ মে।—উত্তর ল্যাটিচিউডে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেবের আপিসের তাড়াটা যেন বেশী। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়। ৫।০ টায় উদয়—৭টার পর অস্ত। প্রায় ১৪ ঘণ্টা দিনের আলোক পাওয়া যায়। অথচ তাহার সদ্ব্যবহার বড় কম। বিশেষ চেষ্টা না করিলে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়-দর্শন সুলভ নয়।

মাল্‌টা দর্শন-চেষ্টায় ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিল। আজ পূর্ণিমা বলিয়া স্নান বন্ধ দিলাম। কাজেই সকাল সকাল "সুপরিহিত" হওয়া সম্ভব হইল। পোর্ট সায়েদের পর স্নানাগারের ভিড় বাড়িয়াছে। দেখি, মাল্‌টার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। সকালে কিছু কোয়াসা ছিল বলিয়া Steward দ্বীপ-সান্নিধ্য বুঝিতে পারে নাই। এবং ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয় নাই। বেচারা তাহাতে

অপ্রস্তুত। আমাদের দেশী চাকরের নিকট এ বিষয়ে তাহারা পরাস্ত। কারণহীন "চোপা" তাহাদের অভ্যস্ত নয়। আটটার পর মাল্‌টা পৌছিবার কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব তাহার অপরাধও তত নয়, জাহাজ ক্রমশঃ দ্বীপের নিকটস্থ হইতে লাগিল। পাইলট-বোট আসিল। জল-মাপা, মাল-তোলা, নানাবার বন্দোবস্ত, সিঁড়ি-ফেলা প্রভৃতি সমস্ত কায পূর্ব্বের ন্যায় কলের মত হইয়া গেল।

আমাদের মাল্‌টায় নামিবার সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল। জাহাজ সচরাচর তীর হইতে কিছু দূরে দাঁড়ায়, জাহাজ হইতে তীরে যাইবার বিশেষ সুবিধাও নাই, সময় কম, এই সমস্ত কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। P. & O. জাহাজ আজকাল এ পথে আসেনা। City Line প্রভৃতি জাহাজ আসে। এজন্য আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে অনেকেই মাল্টা দেখে নাই। কাযেই দেখিবার ঔৎসুক্য ও উদ্যোগ স্বভাবতঃই হইতেছিল। অতএব নামিবার বন্দোবস্তের অভাব হইল না। মনে করিয়াছিলাম, মাল্টা কতকটা অন্যান্য সমুদ্রতীরস্থ নগরের মতই হইবে। এবং মানচিত্রেও বাল্যশ্রুত ও বাল্যস্মৃতি ক্ষুদ্র বিন্দু দেখিয়া কয়লা লইবার 'মধুপর্কের বাটীর' মতই ছোট আড্ডা বোধে মাল্‌টাকে তুচ্ছ নগণ্য বলিয়াই ধারণা ছিল। কিন্তু চাক্ষুষে সে ভ্রম দূর হইল। সমুদ্রের একেবারে মধ্য হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। তাহাই কাটিয়া দুর্গ, রাস্তা, সৈন্যাবাস, সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ পাহাড়ী-সহরের ধরণেই স্তরে স্তরে সহর উঠিয়াছে। রাস্তাও সাপের মত পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। তবে সিমলা, দার্জ্জিলিং, প্রভৃতি পাহাড়ী-সহরের সে সর্পসাদৃশ্য তত বোধগম্য হয় না, কারণ দর্শককে থাকে থাকে উঠিয়া কিংবা নামিয়া দৃশ্যমাধুর্য্য অনুভব করিতে হয়। খোলা সমুদ্র হইতে ছবিটা আংশিকভাবে চক্ষে পড়ে না; একখানি সম্পূর্ণ ছবি নয়নগোচর হয়। কাজেই দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা বেশী। ছোট ছোট শাখা চারিদিক সুরক্ষিত দ্বীপের দীর্ঘ বাহুর মধ্যদিয়া গভীর অথচ সংকীর্ণ সমুদ্র-পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বড় বড় জাহাজ অক্লেশে তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে। অথচ শত্রুর জাহাজ অনায়াসে রোধ করা যায়। এরূপ সুকৌশলের পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রদর্শিত। কামানের মুখ এড়াইয়া কোন জাহাজ এ পথে আসিলে তাহার অমোঘ বিনাশ ধ্রুব।

মার্সেল—Le Pont a Transbordeur

ছোট বড় অনেক যুদ্ধের জাহাজ বন্দরের স্থানে স্থানে রহিয়াছে। Torpedo, Destroyers, Cruiser এ সমস্ত বন্দরের ভিতরেই আছে। বাহিরে বড় Battleship ও Dreadnaught প্রভৃতি রহিয়াছে। হেয় নগণ্য সীসা রংএর ছদ্মবেশধারী এই দারুলৌহময় চলন্ত দুর্গগুলি প্রস্তরইষ্টকমৃত্তিকারচিত সুরক্ষিত দুর্গ অপেক্ষা চিরদিন ইংলণ্ডের রক্ষা ও রাজ্য-বিস্তারের প্রধান সহায়। যথাস্থানে এগুলির স্থাপন ও রক্ষা ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণের নিশিদিনের চিন্তা। জিব্রাল্টর, মাল্‌টার জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরে ইংরাজ-আধিপত্যের কেন্দ্রস্থান। অপর কোন জাতি কোন বৎসর একখানা নূতন রণতরী গঠন করিলেই তাহার প্রত্যুত্তরে ইংরাজকে অন্ততঃ দুইখানা রণতরী গঠন যে-কোন-প্রকারে করিতেই হইবে; নতুবা আন্তর্জাতিক জীবন-সংগ্রামে তাহার ভদ্রস্থ নাই। অন্যান্য জাতি আক্রোশে ও ইংলণ্ডকে বিপন্ন করিবার আশায় রণতরীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতে না পারিলেও এইরূপ ভয় দেখাইয়া, তাহার অর্থনাশের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইবে। সে যাহাই হউক,

ইংরাজ ক্রমশঃ জাহাজ বাড়াইতেছে, প্রাণের দায়ে। কেহ কেহ বলেন, জাতীয় দারিদ্র্যের ইহা প্রধান কারণ, কাহারও বা অন্য মত। নৌসেনা-স্থাপন সম্বন্ধে গুপ্ত পরামর্শের জন্য প্রধান ও অন্যান্য রাজমন্ত্রিগণের ও লর্ড কিচেনারের মাল্টা-আগমনের কথা যাহা পোর্ট সায়েদে শুনিয়াছিলাম, তাহা অমূলক।

একজন প্রবীণ Admiral আছেন, তাঁহার পরিবারবর্গ এই জাহাজে বিলাত যাইবেন, এইজন্য আমাদের জাহাজে এখানে থাকেন। যাত্রীকে তুলিয়া দিবার জন্য তিনি সদলে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন। Commander-in chief General Sir John Hamilton এর যে যাইবার কথা ছিল, তাহাও ঠিক নহে। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী কি ভাগিনেয়ী আমাদের জাহাজে যাইবেন। আর তারই জন্য এত ধূম-ধাম। কেল্লার ও সমবেত রণতরীর প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল। এও দর্শনীয় বটে। কারণ ঐরূপ লোকপ্রিয়তা সকলের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। দলে দলে বন্ধুগণ তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। কাষ্ঠহাসির মধ্যে সকলের ছল ছল নয়ন, ম্লান বদন দেখিবার জিনিস। পাছে কাহারও চক্ষের বিদায়-অশ্রুতে আমার স্বভাব দুর্ব্বল হৃদয় আরও দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়, তাই "কষ্ট সৃষ্ট" হাসির রাশির ভাণ করিতে আমিও বাধ্য হইয়াছিলাম। আজ পরের এই বিদায় দৃশ্য দেখিয়া সে সকল কথা মনে পড়িল। যাক্ সে কথা।

বম্বেতে প্লেগের অছিলায় যাত্রীদের বন্ধুগণকে জাহাজে আসিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু পোর্ট সায়েদ—বিশেষতঃ মাল্টায় দেখি, জাহাজ লোকে লোকারণ্য। নামিয়া যাইবার সময় উপস্থিত, এই সঙ্কেত স্বরূপ ঘনঘন ঘণ্টা বাজাইয়াও এই সমস্ত লোকের ভিড় কমাইতে অনেক সময় লাগিল। ভারতবাসীর ভিড় নয় যে, ধাক্কা দিয়া ধমকাইয়া নামাইয়া দিবে কিংবা মোটেই উঠিতে দিবে না। খাঁটী ইউরোপীয়ানের ভিড়। এস্থলে ব্যবহার স্বতন্ত্র। P. & O. কোম্পানীর জাহাজ প্রায় এপথে আসে না বলিয়া অনেকে আবার বাহুল্য করিয়া এই জাহাজে বন্ধু বিদায় দিবার ছলে আসিয়াছিল। ওয়াসিংটন আর্ভিংএর মত আমি এই প্রকাণ্ড এবং সুবেশ সৌষ্ঠবশালী অভিজাত-জনতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে লোক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলাম। কেহ হাসিতেছে, কেহ যেন ম্লান, কেহ আকুল, কেহ চিন্তাশীল, কেহ ব্যস্ত, কেহবা "খাতির নযদ্দার—" ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভিন্ন লোকের মুখে ব্যক্ত ও চিত্রিত। বিশাল জনতা সময়ে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে, মানব ব্যতীত মানবের দুর্জ্ঞেয়তর তত্ত্ব আর নাই। এই বিপুল জনতার মধ্যে এক একজন আমারই মত সুখদুঃখ চিন্তা-জালার সমষ্টি কিন্তু সমষ্টিতে মিলিয়া যেন ব্যক্তিগত পার্থক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই অধ্যয়ন পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ ও সুবিধা বারান্তরে অনেক মিলিবে কিন্তু মাল্টা ভ্রমণ আর হইবে না, কাজেই সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। গোলমালের মধ্যে আমরা নৌকা লইয়া গিয়া মাল্টা সহর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সমুদ্র হইতে নগরটীকে ছবি-খানির মত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রতি বন্দরে যেমন সকল আপিসের নৌকা, খাবার নৌকা, মালের নৌকা, কাষ্টমের নৌকা, পুলিসের নৌকা দেখা যায়, এখানে যেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা দেখিলাম। বন্দোবস্তও এখানে ভাল ;—আর দেখিলাম যুদ্ধ ও সৈনিক জাহাজের বৈচিত্র্য। বড়লোকের সমাগম বেশী বলিয়া এই সব নৌকা ও ষ্টীমারের সংখ্যা আজ কিছু বেশী। জাহাজের রাশি যেন সমুদ্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভিনিসের গণ্ডোলার বর্ণনা যেরূপ পড়িয়াছি, মাল্টার অনেক নৌকারও অগ্রপশ্চাৎ সেইরূপ ময়ূরপঙ্খী ধরণের প্রস্তুত গঠন দেখিলাম, তাহার উপকারিতা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নৌকার নম্বরটা তাহাতে সহজে দেখা যায়, এভাবে লেখা আছে। এইরূপ গঠনে সুদৃশ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, স্থানীয় তরঙ্গভঙ্গেরও ইহাতে সুবিধা হয় আর বোধ হয়, এ প্রকারের গঠনগুণে তরঙ্গ ভেদ করিয়া যাইবার সুবিধা হয়। কারণ, দেবীচৌধুরাণীর বজরা কতকটা এই গঠনেরই ছিল, বোধ হয়।

জাহাজ হইতে তীরে পৌঁছাইতে ছয় পেনী ভাড়া লাগে। পুলিস তদারকে এখানেও শক্ত যাত্রীর নিকট ঠকাইয়া অধিক লইবার যো নাই।

জাহাজ হইতে মনে হইয়াছিল, অনেকগুলি এক্কা গাড়ীতে সুন্দর ঘোড়া জুতিয়া আনিয়াছে। বাস্তবিক এক্কা গাড়ীতে নহে। চারিজন বসিবার ভিক্টোরিয়া ধরণের

গাড়ী আর একার মত ছাত চারিদিক খোলা। পাহাড়ের রাস্তায় উঠানামা করিতে হয় বলিয়া ট্রাম-মোটর ও রেল-গাড়ীতে যেমন ব্রেক কসিবার বন্দোবস্ত থাকে, এখানকার ঘোড়ার গাড়ীতেও সেইরূপ আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রাম, রেল, ঘোড়া ত আছেই। মাল বহিবার জন্য ও নিম্নশ্রেণীর গাড়ী টানিবার জন্য অশ্বতরের ব্যবহারও দেখিলাম। খাঁটী "শাদা"-লোকের সহরে এই প্রথম প্রবেশ। দেখিয়া নয়ন যেন ধাঁধিয়া গেল। এত শাদার মধ্যে আমরা কয়েকজন মাত্র "কালা"। লোকগুলি আমাদের বিশেষতঃ আমার পাগড়ীর প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মাল্টা

সহরটী বেশ বড়। প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে সৈনিক লইয়া বার হাজার ইংরাজ। মাল্টায় ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ন নানা জাতীয় লোক আছে; আরও দুইটী ছোট ছোট নগর দূরে আছে। সেখানে যাতায়াতের জন্যই রেলগাড়ীর প্রয়োজন। পাহাড়ে দেশ, গাছ পালা সামান্য। যত্ন করিয়া বাগানে যাহা রোপণ করা হইয়াছে তাহাই। কোথাও পাথরের বাড়ীর গায়েও যত্ন রোপিত লতান গাছ উঠিয়াছে। নতুবা হরিৎ বর্ণের সহিত প্রায় সংস্রবই নাই। শাদা বাড়ীর উপর শাদা বাড়ীর কাতার থরে থরে উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে রক্ত, পীত, শ্যামল বর্ণের বারান্দাগুলি নিত্য শ্বেত-দর্শন-জনিত নয়নক্লেশ কথঞ্চিৎ নষ্ট করিবার চেষ্টাকরে। পাহাড়ের উপর বলিয়া সকল রাস্তাই ঢালু। সমুদ্রের ধার হইতে সহরের সর্ব্বোচ্চ অংশ বোধ হয় ১৫০।২০০ ফুটের বেশী হইবে। কিন্তু ঘোড়াগুলি গাড়ী লইয়া অবলীলাক্রমে এই রাস্তায় যাতায়াত করিতেছে। তবে নামিবার সময় বুঝিয়া গাড়ীর ব্রেক কসিতে হয়।

বাজারে বাঁধা কপি, শাক, কড়াই সুঁটী, সালগম, গাজর, বড় বড় আলু, বড় বড় পেঁয়াজ দেখিলাম। অপর ফলমূল বড় দেখিতে পাইলাম না। শস্য-রক্ষার জন্য সরকার তরফ হইতে মাটীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের গোলা ঘর গাঁথা আছে। প্রকাণ্ড পাথর দ্বারা বন্ধ করা অনতিপরিসর এক সুড়ঙ্গ মুখে নামিয়া মাঝে মাঝে আবশ্যকমত শস্য বাহির করিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম এইরূপ শস্য বাহির করা হইতেছে। দ্বীপে শস্য অতি সামান্যই হয়। তাহাতে সমস্ত অধিবাসির প্রাণধারণ অসম্ভব। অধিকাংশ শস্য বড়সিয়া হইতে আমদানী হয়।

সহরের মধ্যে মাঠে ঘাস নাই বলিলেই হয়। খেলিবার ও বেড়াই-বার জায়গাগুলা সবই প্রায় পাথর-বাঁধা।

নীচে উপরে অনেকগুলি রাস্তা বেড়াইয়া বাজার, ব্যারাক, বাগান, গির্জ্জা, স্কুল, পোষ্টাপীস, সবই মোটা-মুটি দেখা হইল। অধিকাংশ বাড়ীই পুরাতন, সুদৃশ্য ও প্রকাণ্ড। ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপের বিশেষ সৌষ্ঠব ও শ্রী ছিল। বর্ত্তমান সহর সেই সময়েরই গঠিত। প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র।

Knights of St. John, ওরফে Knights Templars যাঁহারা Crusadesএর সময় বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন, এ দ্বীপ নগর তাঁহাদেরই রচিত। Palestine অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া ইহারা Rhodes দ্বীপ অধিকার করে। তুরস্কেরা যখন সেখান হইতেও তাড়াইয়া দিল, তখন ইহারা মাল্টা অধিকার করিল। সেই পর্য্যন্ত ইহা তাহাদেরই অধীনে ছিল। পরে Napoleon মাল্টা অধিকার করেন। Nelson, Battle of Nile জয় করিবার পর ইহা ইংরাজের দখলে আসিয়াছে। ইংরাজ-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্গ-শৃঙ্খলের মধ্যে মাল্টা দুর্গ অন্যতম প্রধান দুর্গ।

মাল্টায় এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সমসাময়িক যুদ্ধে

যে সকল ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাধি অতি যত্নে সমুদ্রতীরে এক সুন্দর উদ্যানে রক্ষা করা হইয়াছে। স্থানটী বড়ই মনোরম। দুদণ্ড বসিলে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সময় বেশী ছিল না বলিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারিলাম না। এখান হইতে Grand Harbourএর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকেই সমুদ্রের শাখা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার মধ্যে সহরটী অবস্থিত। Panoramic view বড়ই সুন্দর।

১৭৯৮ সালে যুদ্ধের সময় Napoleon যে বাড়ীতে সপ্তাহকাল বাস করিয়া তাহাকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই বাড়ীতে এখন General Post Office হইয়াছে। তাহার সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ—সেখানে Italian Knights of the Order of St. John বাস করিতেন। তাহার মার্ব্বেল পাথরের ফটকের সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। নিপুণ শিল্পী ধ্বজা, বাদ্যযন্ত্র, পতাকা, বর্ম্ম ও Knightsদিগের "Order"এর অন্যান্য চিহ্ন শ্বেত পাথরে খুদিয়া অতি সুন্দর কারু কার্য্য করিয়াছে। অল্পপরিসর পথের দুই ধারেই ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, মল্টীজ সকল ভাষায় সাইনবোর্ডযুক্ত সকল প্রয়োজনের দোকান রহিয়াছে। বাজার লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই শ্রমজীবী লোক। স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা ছাতা এবং ইউনিভারসিটির হুড এই দুই মিশাইয়া একরকম কাল ঘোমটার মত ব্যবহার করে। ধনী নির্ধন সকল স্ত্রীলোকেই এই ঘোমটা ব্যবহার করে, দেখিলাম। তুরকীদিগের অত্যাচারেই বোধ হয়, এইরূপ ঘোমটার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশের পরদা ও ঘোমটাও তাঁহাদিগের রীতিনীতি অনুযায়ী সহধর্ম্মিগণের কৃপায়। আর Nunদিগের ঘোমটাও যে, কতকটা সেই কারণে নহে, তাহা বলা যায় না। মাল্টা রোমান ক্যাথলিক-দিগের প্রধান স্থান।

মাল্টা ক্ষুদ্র স্থান বটে কিন্তু অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। সুন্দর গঠনের পুরাতন ধরণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জ্জাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সেণ্টের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহা ব্যতীত Presbyterianদিগেরও সুন্দর গির্জ্জা-ঘর আছে। সকল-গুলিই সুদৃশ্য। এই সামান্য ঘরের পাথরের যে Theatre বাড়ী, যে Public Library (Biblothra) দেখিলাম, তাহার চতুর্থাংশের একাংশও কলিকাতায় ও বম্বেতে দেখি নাই। ঠিক খাঁটি ইউরোপের অন্তর্গত না হইয়া, ইউরোপীয়দিগের সহরে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা বেশ অনুভূত হইতে লাগিল।

গির্জ্জাগুলির মধ্যে St. John's Churchই স্থপতি-শিল্পে উৎকৃষ্ট ও মনোহর। বহির্দৃশ্য তত সুন্দর নহে বটে; কিন্তু ভিতরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। চারিদিকে বড় বড় খিলান। প্রতি খিলানের কোনে Mosaic কাজ করা ছাদ। দুই পাসে Aisle ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন Saint এর পূজায় অর্পিত। মধ্যের প্রকাণ্ড হল প্রধান পূজার স্থান,—ধূপ, দীপ জ্বলিতেছে। যিশুখ্রীষ্টের ম্যাডোনার ছবি ও Statue চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। দেওয়ালে বড় বড় Italian Painter-দিগের জগদ্বিখ্যাত Master Pieces দেখিলাম। বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলেখ্য। Mosaicএর মেজেতে ভক্ত-দিগের সমাধিস্থান। লোকে তাহার উপর দিয়াই জুতা পায়ে দিয়া যাতায়াত করিতে সঙ্কোচ করিতেছে না। মৃতের পবিত্র সমাধির উপর এইরূপে পদার্পণ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পাশ কাটাইয়া গেলাম। দুই দিকের Aisleএর শেষে Sanctum Sanctorum অথবা Sarro Sanct ধরণের মন্দির। স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ বা বাতিগুলি ভক্তের ভক্তি নিদর্শন-স্বরূপ জ্বলি-তেছে। পুরোহিত ঠাকুর যত্নসহকারে সমস্ত দেখাইলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও রোমান কাথলিকের মধ্যে অর্চ্চনা-প্রণালীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। নিভৃত অন্ধকারে ধূপধুনা, দীপ, পুষ্প, মূর্ত্তি, আলেখ্যের সাহায্যে হিন্দু-সাধক ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ দেখিতে পাইতেন ও ভক্ত রোমান ক্যাথলিকও পাই-তেন। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের উদয় হইল। ভক্তিপূর্ণ প্রাণে বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রণাম জানাইলাম।

এখান হইতে Church of the Bones দেখিতে গেলাম। ১৩৬৫ সালে তুরস্ক সেনা পরাজিত করিয়া প্রায় দুই সহস্র যোদ্ধা এই দ্বীপ-রক্ষার জন্য প্রাণ দান করে। Capuchin Order এর Sacro নামধারী একজন Monk এই সকল নিহত যোদ্ধার কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া এই Church of Bones ভক্তি ও যত্ন সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় দুই সহস্র নরকঙ্কাল এইরূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রক্ষা করা হইতেছে। মৃত্যুকে অহরহঃ স্মরণ করাইয়া দিয়া মানবমনকে কর্ত্তব্যপথে নিয়োজিত রাখিবার জন্য খৃষ্টান-জগতেও নরকঙ্কাল ও অস্থির সমাদর হইয়াছে। কেবল আমাদের কাপালিক ও তান্ত্রিকদিগের মধ্যে এরূপ লোমহর্ষণ পূজা সীমাবদ্ধ ছিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নরকঙ্কাল ও নর-অস্থি সংগৃহীত হইয়া এই Church of Bones নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্বে তন্ত্রপ্রচার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ হিন্দুর সকল কীর্ত্তিই বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান্, এমন কি, মুসলমান অনুকরণে গঠিত বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল ! তাহাতে আসিয়া যায় নাই—বড় আসিয়া যাইবেও না।

ভূমধ্যসাগরের ইংরাজ প্রধান সেনাপতিই মাল্‌টার গভর্ণর। তিনিও পুরাতন এক প্রাসাদে বাস করেন। Crusades এর সময় St. John Knightগণ যে সকল লৌহবর্ম্ম ব্যবহার করিয়াছিল তাহা, এবং সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি Tapestry এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে।

আর সময় নাই। জাহাজ ১২টার সময় ছাড়িবে। অগত্যা এই সুন্দর প্রাচীন-জগতের নগরটীকে অনিচ্ছার সহিত শীঘ্র ছাড়িতে হইল। আমাদের জাহাজে বিদায়ের পালা তখনও শেষ হয় নাই। পুনঃপুনঃ ঘণ্টা ও বংশীধ্বনি করিয়া অতি কষ্টে যাত্রীর বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

আমাদের প্রায় ৮০ জন নূতন যাত্রী বাড়িয়াছে। খাবার ঘরে বা ডেকে কোথাও বড় স্থান নাই। বৈঠকখানা ঘর অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সদ্যবিদায়-ক্লিষ্ট যাত্রিগণের চক্ষে নিজ মনের ঘনান্ধকারের ছায়া দেখিতে দেখিতে উত্তর-পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহানুভূতিবশে সূর্য্যদেব মেঘান্তরালে লুকাইলেন। কি জানি কেন এত যে উৎসাহ, কৌতূহল ও উত্তেজনা, সব যেন শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। কেন যাইতেছি, কি করিতে যাইতেছি, যাইয়া কি করিব, এইরূপ শত চিন্তা যাহা অনেক কষ্টে কয়েকদিন দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, ক্ষণিক পরিবর্ত্তিত অবস্থাপরম্পরায় তাহার পুনর্দর্শন ঘটিতে লাগিল।

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তি চেতঃ !
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনীজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

দূর বলিয়া দূর ! কত দূর !!

ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘ ও কোয়াসায় সর্ব্বত্রই যেন উৎসাহের একটু শৈথিল্য দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিলেন যে, লণ্ডনের চিরপ্রসিদ্ধ সেই দুর্ভেদ্য কোয়াসার মধ্যে পড়িলে উৎসাহের উৎস আপনা আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ভাবনার বিষয় বটে। কিন্তু Sea-sickness, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, ভয়ানক তুফান ইত্যাদির ভয়—যাহা সকলে বরাবর দেখা ইয়াছিলেন—ভগবানের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কারণে বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার ভাবনা এখন হইতে ভাবিয়া কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি ?

হিংসুক মানুষের নিয়ম এই যে, নবাগতকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করিয়া তাহার প্রতি বিরূপ হওয়া। এমন কি, বাড়ীতে নূতন-বৌ আসিলে যে তাহার নিস্তার নাই। এ ঘটনা বোধ হয়, প্রত্যেক বাড়ীতেই ঘটে। তাহার ও এমন কি তাহার পিতৃপক্ষের বিরুদ্ধে সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে। পরে, অবশ্য এটা থাকেনা, কারণ, পরে ত সে আর নূতন-বৌ থাকে না। নচেৎ সংসার অশান্তির আগার হইয়া উঠিত। এক্ষেত্রে আমাদের যে সকল সহযাত্রী আমাদের সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না, এমন কি, আমাদের প্রতি চাহিয়াও দেখিত না, তাহারা আজ দল বাঁধিয়া নবাগতদিগের সম্বন্ধে আমাদের সহিত রহস্যবিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দিল !

মথুরার রাজ সভায়

[লেখক—শ্রীকালিদাস রায়।]

বাছা তোর দশা এরূপ করিল কে ?
মনে হয় কেহ যাদুরে আমার যাদু করিয়াছে রে।
ছলে বলে তোরে বন্দী করিয়া এখানে আনেনি ত ?
কি করিবে মোর বাছারে লইয়া কিছুই বুঝি না'ক'।
কেন বাবা তুই সেজেছিস্ ওরে পরের দেওয়া এবেশে
গোয়ালের ছেলে চল্‌রে গোকুলে, ফিরে চ নিজের দেশে।
হাতে ওটা কিরে ? কটিতে কি দুলে ?—শিরেই বা ওটা কি।
আয় বুকে আয়, বাছারে আমার, ফেলে দে' ও সাজ, ছি !
আমার বাছারে অমন করিয়া কে,
পরদেশী-সাজ পরায়ে আজিকে পরকরে' নিলেরে ?
ফেলে এসেছিলি বাঁশীটি, এনেছি নে।
পায়ের নূপুর, হাতের পাঁচনি, সঙ্গে এনেছি যে।
পর ধরাচূড়া দাঁড়ারে আবার ভুবনমোহন সাজে,
স্তন্যসিক্ত মুখখানি রাখ মায়ের বক্ষ মাঝে।

বনফুলহার এনেছি গাঁথিয়া গলায় পরায়ে' দি',
চন্দন দিয়ে তিলক কাটিয়ে বদনের চুমা নি'।
গুঞ্জাফলের রাখী পর হাতে, কটিতে ঘুঙুর পর,
কাণে পর দুটি বিকচ কদম—শিখি-চূড়া শিরে ধর।
আর,—রক্ত কমলে রাখ বাপ দুটি পা,
ও কচি চরণে শক্ত শিলার আঘাত সবেঃ না!
ভার হয়ে' আছে শুকানো বদন যে,
বুঝি এরা তোরে ধেনু চরাইতে, খেলিতে দেয়নি রে।
চোখ-দুটি ম্লান ক্ষুধা-ম্রিয়মাণ,—খেতে কিছু দেয় নি'
আঁচলে ঢাকিয়া আনিয়াছি ননী আয়রে খাওয়ায়ে দি'।
ওরে চঞ্চল, তোরে অচপল বসায়ে রেখেছে ঠায়,
তমালের ডালে ঝুলনে নাদুলে কেমনে আছিস হায় ?
গোঠে যেতে চাস্, ক্ষুধা পায় তোর হতে না হতেই ভোর,
শিরে চুমাদিয়ে না বুলালে কর ঘুম যে আসেনা তোর
বনের পাখীটি বাঁচিয়া রবে না তো,—
মণির খাঁচায় সোণার শিকলে তাহারে বাঁধিলে গো।

বর্ষা-বন্দনা

[লেখক—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়]

শ্যামল কাননে আওয়ে ধনি !
চঞ্চল-মানস-পরশমণি !
নবঘন-কেশিনী অম্বর বেশিনী
তৃষ্ণা-বিনাশিনী ত্রাসিনীরে !
তরঙ্গ-রঙ্গিণী বসন্ত-সঙ্গিনী
বঙ্কিম-লোচন-ভঙ্গিনী রে !
অন্তরবাসিনী মর্ম্মর-ভাষিণী
মল্লাররাগিণী বন্দিনীরে !
সুকৃষ্ণলোচনী তৃষ্ণাবিমোচনী
মোহন কবি-চিত-চমকানি রে !
যৌবন-কামিনী গৌরবগামিনী
দামিনী-চমক-সুহাসিনীরে !

নবনট-রঙ্গিণী অম্বরকম্পিনী
বজ্র-নূপুর-রব শিঞ্জিনীরে !
নবরসাবেশিনী জনম বিরহিণী
দুরু দুরু হিয়াতল-মন্থিনীরে !
কুসুম-বিলাসিনী তামসবিকাশিনী
তড়িত-রেখাঙ্ক-সীমন্তিনীরে !
রোদসী-চারিণী আভরণ-ভারিণী
চঞ্চলা-ভুজযুগ-বন্দিনী রে !
সান্ত্বনা-স্যন্দিনী আনন্দ-নন্দনী
তড়িত-অলক্তক-রঞ্জিনী রে !

ডাক্তারের আত্মকাহিনী

[লেখক—শ্রীডাক্তার]

(রোজ নাম্‌চা হইতে—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বার জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ। আমার পিতা ও পিতামহ বহু লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াও কিছু রাখিয়া যান নাই। এদিকে পঠদ্দশাতেই দুইটি এবং ডাক্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি কন্যা-"গ্রস্ত" হইয়া পড়িলাম। এক্ষণে উপার্জ্জন করিতে হইবে। 'সরকারী চাকুরী করি, কি স্বাধীন চিকিৎসা করি?' পাস হইবার পর প্রথমে অনেকেই এই সমস্যায় পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। আমি কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আমার গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদিগের (তাহার মধ্যে অনেকেই বয়োজ্যেষ্ঠ, সংসারাভিজ্ঞ) মধ্যে কেহই কখন কোন সন্দেহ করেন নাই, সে ব্যক্তি কি কখন চাকুরী করিতে যায়? মনে মনে একটা ভারি আগ্রহ যে, কলিকাতায় বড় বড় বিচক্ষণ ও পণ্ডিত ডাক্তারদিগের মধ্যে থাকিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইব। যেখানে যোগ্যতা অনুসারে জয়পরাজয়, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করিলে চলে না। এ বিষয়ে আমার মত যোগ্য লোক কখনই অপরের নিকট হারিতে পারে না। সরকারী কাযে সুদূর মফঃস্বলে চর্চ্চার অভাবে নিস্তেজ-মস্তিষ্ক হইয়া "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডদ্রুম" হইতে আমার কি প্রবৃত্তি হইতে পারে? তাহার উপর পঠদ্দশায় সরকারী ডাক্তারদিগের যে দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা মনে করিলে এখনও কষ্ট হয়। এখন সরকারী ডাক্তারী কর্ম্ম-বিভাগের কি অবস্থা তাহা জানি না। কিন্তু তখন নূতন ডাক্তারদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পাইবার পূর্ব্বে কলেজ হাসপাতালে সুপারনিউমেরারি (Supernumerary) অভিধানে মাসিক মাত্র ৫০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতে হইত, এবং 'উপরি' স্বরূপ কথায় কথায় রেসিডেন্ট্ অফিসরদিগের তাড়না ভোগ হইত; সময়ে সময়ে ফিরিঙ্গী নার্স ও ষ্টুয়ার্ডের অপমান হজম করিতে হইত। একদিনের ঘটনা বলি।

কলেজ হাসপাতালে প্রত্যহ দিবসে একজন ডাক্তার ও দুইজন ছাত্রকে থাকিতে হইত, সন্ধ্যার পরে পাহারা বদলির মত তাহারা চলিয়া যাইত এবং রাত্রির জন্য অপর একজন ডাক্তার ও দুইজন ছাত্র আসিত। এইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে দিবারাত্রির কার্য্যের-নাম ডে-ডিউটি এবং নাইট্-ডিউটি। একদিন আমার নাইট্-ডিউটি ছিল। সে রাত্রির ডিউটিতে ডাক্তার নি——গুপ্ত ছিলেন। নি——বাবু একজন মিষ্টভাষী, শান্তপ্রকৃতি ও সুযোগ্য লোক ছিলেন। মধ্য রাত্রিতে একটি অষ্টাবক্র বৃদ্ধলোক হাস-পাতালে আনীত হয়। তাহার রোগ শ্বাসনলীর প্রদাহ। অবস্থা সংকটাপন্ন। গ্রীবার সম্মুখে বায়ুনলী ছিদ্র করিয়া অবিলম্বে নিঃশ্বাসের পথ খুলিয়া দিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ রেসিডেন্ট অফিসরের নিকট সংবাদ পাঠান হইল। যে স্থলে বিলম্বে লোকের প্রাণহানি হইতে পারে, সে স্থলে অনেক রেসিডেন্ট সাহেব সংবাদ পাইয়াও শীঘ্র দেখা দিতেন না। আবার তাঁহারা না আসিলেও বাঙ্গালী ডাক্তারও কিছু করিতে পারেন না। এ দুঃখ জানাইবারও উপায় নাই। লালমুখ উপরওয়ালার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন, এত সাহস চাকুরীর মায়া রাখিয়া কাহারও হয় না; এবং কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে ছাত্রদিগেরও মুখ বন্ধ থাকিত।

যাহা হউক, যথাকালে রেসিডেন্ট অফিসর্ পে—সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সাহেবটিকে সকলে গণ্ডমূর্খ বলিত। আমি অনেকগুলি গণ্ডমূর্খ রেসিডেন্ট্ দেখিয়াছি। মেডিকেল সার্ভিসে যাঁহারা প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে অনেক দিন ধরিয়া যত্নলব্ধ ডাক্তারিবিদ্যা ভুলিতে হয়, কারণ প্রথমে তাঁহাদিগকে কয়েক বৎসর ধরিয়া সৈন্যাবাসে কার্য্য করিতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সৈনিক-দিগের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "বাছা বাছা" স্বাস্থ্যকর স্থান ব্যতীত সৈন্যাবাস স্থাপন করেন না। সুতরাং

তথাকার ডাক্তারদিগকে কালেভদ্রে বিসূচিকা, রক্তামাশয় প্রভৃতি দুই একটা সংক্রামক রোগ ভিন্ন অন্য রোগ বড় একটা দেখিতে হয় না। তাঁহাদিগকে ডেস্‌প্যাচ্ লিখিয়া প্রকৃত পক্ষে কেরাণীর মত দিনযাপন করিতে হয়। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি মূলেই অল্প, তাঁহারা এই কয়েক বৎসরে গণ্ডমূর্খত্ব লাভ করিয়া হয় "মুরুব্বির" জোরে কলিকাতায়, নতুবা মফঃস্বলে কোন সিভিল-ষ্টেশনে বদলী হইয়া লোকের প্রাণ লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করেন।

পো——সাহেব সেই অষ্টাবক্র রোগীর গ্রীবাদেশের বিকৃত গঠন দেখিয়া যেন কিছু "ফাঁফরে" পড়িলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া "আমি আসিতেছি" বলিয়া নিজগৃহে গেলেন। রোগী টেবিলেই পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। পুস্তকাদি উল্টাইয়াও বোধ হয় ছুরি ধরিবার সাহসে কুলাইল না, সেজন্য অপর একজন নবাগত রেসিডেণ্ট ডাঃ অ্যা—ন্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই সাহেবটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বিচক্ষণ; ইঁহার তুল্য সুযোগ্য রেসিডেণ্ট আমি আর দেখি নাই। কিন্তু ইনি একটুতেই রাগিয়া "আগুন" হইতেন। ইঁহার সাহায্যে রোগীর বায়ুনলী কাটা হইল। অতঃপর ক্ষতস্থানের সেবা সম্বন্ধে ডাক্তার বাবু ও পো——সাহেবের মধ্যে মতভেদ হইল। ডাক্তার বাবু সাহেবের চিকিৎসা দেখিয়া বলিলেন "আমরা হাসপাতালে এরূপ করি না।" বজ্রনাদে সাহেব বলিলেন "খবরদার, আমার কথার উপর কথা কহিও না।" বলা বাহুল্য যে ছাত্র এবং কুলিদিগের সমক্ষেই ডাক্তার বাবু এইরূপে ধমক খাইলেন। তৎপরে দুই সাহেবে মিলিয়া শ্লেষপূর্ণ বাক্যবাণে ডাক্তার বাবুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি উপরিওয়ালাদিগের মান রাখিয়া বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "জানি না কেন আমি এরূপে অপমানিত হইতেছি।" বজ্রনাদে আবার সাহেব বলিলেন, "তুমি জান, আমি একজন কমিশনওয়ালা (Commissioned) অফিসর! আমার সঙ্গে এরূপে কথা কহিলে তোমার চাকুরীর 'দফা রফা' হইবে।" ডাক্তার বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। পরদিন সকালে "রে" সাহেব আসিলে ডাক্তার বাবু তাঁহার হস্তে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি দরখাস্ত দিলেন এবং অশ্রু-মোচন করিতে করিতে মুখেও সমস্ত বলিলেন। "রে" সাহেব গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। পো——সাহেবের সহিত দেখা হইলে তাঁহার সাগ্রহ ও সাদর সম্ভাষণে দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ব্বরাত্রির সেই রোগীকে দেখিতে গেলেন, এবং ছাত্রদিগের সমক্ষেই বলিলেন যে "ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার বাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক, অপরে যাহা বলিয়াছে তাহা ভুল।" পরে পো——সাহেবকে অন্তরালে লইয়া তাহার হস্তে সেই দরখাস্ত দিয়া তাঁহার পূর্ব্ব রাত্রির তথাবিধ আচরণের কারণ লিখিয়া জানাইতে বলিলেন। কিন্তু তাহার ফল যে কি হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরে দেখিলাম যেখানকার পো——সাহেব সেইখানেই রহিলেন।

এই ব্যাপার এবং এতদনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া সরকারী কাযের উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। চাকুরীর মায়ায় ডাক্তার বাবুদিগকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। কিছু দিন চাকুরী করিয়া হাতে কিছু জমিলে তাহা লইয়া কোন স্থানে বসিয়া স্বাধীন চিকিৎসা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে অনেকেই প্রথমে সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে "উপস্থিত অন্ন" ত্যাগ করিয়া কষ্টসঞ্চিত অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক অনিশ্চিত লাভের আশায় প্রায় কেহই স্বাধীন চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন না। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনায় আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যদি কলিকাতা মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালে কোন কর্ম্ম পাই, তবে একবার দিন কতকের জন্য তাহা করিব এবং নি—— বাবুর মত অবস্থায় পড়িলে পো——সাহেবের মত উপরওয়ালাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া কর্ম্মত্যাগ করিব। কিন্তু তাহা হইল না। আমি যে বৎসর পাস হই, সে বৎসর সরকারী কর্ম্মবিভাগে কোন লোক লওয়া হয় নাই।

আমি স্বাধীন চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে সম্পূর্ণ আশা,—প্রসার ত হইবেই, টাকা ত আসিবেই, নহিলে এত লোক এত কথা বলিবে কেন? কিন্তু ডাক্তারিতেও কিছুকাল বেগার অ্যাপ্রেন্‌টিস্ খাটিতে হইবে। তখন জানিতাম না, এই সময় কত কষ্টে কাটে প্রচলিত দস্তুরমত কোন এক বহুজনাকীর্ণ চৌমাথার উপর এক ঔষধালয়ে সুন্দর অক্ষরে লেখা 'স-টাইটেল্' নামযুক্ত 'সাইনবোর্ড' ঝুলান হইল এবং আমি প্রত্যহ সকালে হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত তথায় বসিতে আরম্ভ

করিলাম। সে স্থানে এক জন প্রবীণ ডাক্তার বাবুও বসিতেন, আর একজন "না-পড়িয়া-পণ্ডিত" ডাক্তার প্রায় অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার বাবুটির বেশ প্রসার; তিনি বাহিরের রোগী লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, আমি রীতিমত "হাজিরি" দিতে লাগিলাম। সখের ডাক্তারটি আমাকে সদালাপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন "আপনি এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। আজ কাল (প্রবীণ ডাক্তার বাবু) হ——বড় একটা আসিয়া উঠিতে পারেন না। আর আমি যদিও পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক রোগী দেখিতাম কিন্তু এখন আর পারিয়া উঠি না। অন্যান্য রোগী দেখা ছাড়িয়াছি, কেবল যে কয়টা একান্ত 'নাছোড়-বান্দা' তাহাদেরই দেখিতে হয়। সেইজন্য আজকাল এত কম রোগী আইসে। এইখানে থাকিয়া অমুক (একজন প্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরত, বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন) মানুষ হইয়া গিয়াছে।

আশার স্বপ্ন

[লেখক—শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

মনের মানুষ মরে গেছে! একটা ভীষণ ঝটিকায়
উড়িয়ে দিয়ে সুখের বাসা,
তলিয়ে দিয়ে সকল আশা,
উড়ছে বালি চারিধারে জীবন-নদের কিনারায়!
হারিয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে, সর্ব্বনেশে দরিয়ায়
অমল স্নেহ, সরল প্রীতি;
বেদনা-ভরা করুণ-গীতি—
বিসর্জ্জনের তীব্র স্মৃতি—দীপ্ত নিজের মহিমায়!
সর্ব্বহারা চিত্ত ওরে, ভাবনা কিসের দুনিয়ায়!
আজ্‌কে না হয় থাক্‌বি একা,
পাবিরে পাবি আবার দেখা,
সকল বোঝা নাবিয়ে দিয়ে ছুট্‌বি যবে অজানায়!
সেদিন সুরে বাজ্‌বে বাঁশি, মিলন-সুরে সাহানায়।
রত্ন-বেদী'পরে বসে,
শান্তি-মন্ত্র শুভাশীষে,
কোন্ পুরোহিত বাঁধবে তোরে কোন্ বিধানের
সংহিতায়।

বিকলা

[লেখক—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, B. L.]

ভরমই রাধা প্রান্তর মাহ।
দিশি দিশি ঢূঁড়য়ি জীবন-নাহ॥
চিন্তিত অন্তর, চঞ্চল-চরণা।
লটপট অঞ্চল, ছলছলনয়না॥
কুসুম-কলেবর পথ-শ্রম-ভারে।
পড়তহি ঢরি ঢরি বিরহ-বিকারে॥
শশ-পদ-শবদে, ঝরয়িতে পর্ণে,
সচকিত ঠারই উরধ কর্ণে॥
দিগ্বধূ-ভালহি মোহন ইন্দু।
কান্ত-ললাটকি চন্দন-বিন্দু॥
কদম্ব-পল্লবে লাখ জোনাক।
হরি-উর-মণিগণ মানই তাক'॥
তমাল-তরুতল যৈখন গেল।
সব দুখ পাশরি' মুরছিত ভেল॥

[ভরমই—ভ্রমিতেছেন; মাহ—মধ্যে; ঢূঁড়য়ি—ঢুঁড়িয়া; নাহ—নাথ; পড়তহি—পড়িতেছে; ঢরি—ঢলিয়া; ঝরয়িতে—ঝরিতে; ঠারই—দাঁড়াইতেছেন; ভালহি—ভালে; মানই—মানিতেছেন; তাক'—তাহাকে; যৈখন—যখন; ভেল—হইল।]

বাঙ্গালায় 'মাসী'

(সটীক)

[লেখক—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা, F. F. C. & B'L. F. S'L.]*

প্রবন্ধের নামকরণটা বোধ হয়, ঠিক বিশদ হইল না।—শিরোনাম দেখিয়া প্রসঙ্গের বিষয় অনুমান করিতে গেলে, স্বতঃই মনে হইবে—লেখক বুঝি, 'শব্দ' বা 'ভাষা'-তত্ত্বের কি একটা উদ্ভট গবেষণা করিয়া, আমাদের এই চিরাগত, আবহমানকাল-প্রচলিত মধুর সম্পর্কটার অদ্ভুত ভাব-বিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টায় আছেন! অথবা হয় ত সমাজতত্ত্বেরই বা কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার-গোছ অভিনব সংস্কারের প্রস্তাবনা ফাঁদিয়া, আধুনিক তথাকথিত সংস্কারকদলের মতে, 'সস্তা দরে মস্ত নাম' কিনিবার আশায় উৎসুক হইয়াছেন!

পাঠকপাঠিকাগণ! আশ্বস্ত হউন;—অকিঞ্চনের তেমন কোন ধৃষ্টতা করিবার উদ্দেশ্য আদৌ নাই।—আমার নিজের মাসী নাই,—মাঠাকরুণ সখেদে প্রায়ই বলিতেন, তিনি 'একলা মায়ের একলা মেয়ে'!—কেবল মাত্র ছেলেমেয়েদের বিষম আব্দারে পড়িয়া—তাহাদের ও তাহাদের মাসীদের মধ্যে বিবাদের 'ব্রীফ্' লইয়া আমাকে আজ আপনাদের দরবারে হাজির হইতে হইয়াছে। আমি সকল কথাই খুলিয়া আপনাদের নিকট বলিতেছি; আপনারা একমনে ধীরভাবে সকল কথা শুনিয়া, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, এ সম্বন্ধে একটা সুবিচার ব্যবস্থা করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা!

মাতৃদেবীর ভগিনী, চিরকালই—সকল দেশেই—'মাসী' বলিয়া খ্যাতা এবং জননীর ভগিনী বলিয়াই সর্ব্বথা—সর্ব্বত্র—অতি ঘনিষ্ঠা কুটুম্বিনীরূপে সম্পূজিতা। তবে দেশভেদে—সমাজভেদে—একই রূপ সম্পর্কিত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ-ভক্তি-শ্রদ্ধাপ্রকাশের মাত্রা ও প্রকারভেদ দেখা যায়; অর্থাৎ, সমাজভেদে লোকে সম-সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বিভিন্ন-রূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, এবং সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্নেহ দেখাইবার—সেই আচরণের—রকমফের ও মাত্রাভেদও আছে। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, জাতি ও দেশনির্ব্বিশেষে এই 'মাসী' অভিভাষিতা আত্মীয়া-বর্গের প্রতি, ভগিনী-সন্তানদের সম্মান-প্রদর্শনের ও আচরণের ধারা ও মাত্রা পৃথক্‌রূপ হইয়া থাকে। তবে, যে দেশে জননী স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী, সে দেশের ভগিনী-সন্তান—বা, চলিত কথায় 'বোন্-পো' গণের নিকট মাসীরা যে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু মাসীকে—সমগ্র ভারতবর্ষে না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী 'বোন্-পো'রা—সাধারণতঃ কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাহা একটু দেখাইব। দেখিবেন?

আমাদের দেশে বহুবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত; কাজেই, মাতৃ-সংখ্যার অপেক্ষা মাসীর সংখ্যা অসংখ্য হইবারই সম্ভাবনা।

এখন মাতৃদেবীদিগের প্রীতি-সম্পাদন করিতে হইলে মাসীদিগের শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া হিন্দুর সন্তান পার পাইতে পারে না, কারণ পিতামাতার সন্তোষে দেবতাদেরও প্রীতি-সাধন হয়, আবার পুত্রদের মাসী বলিলেই পুত্রদের পিতার শ্যালিকা § বুঝায়। সুতরাং সে স্থলে পুত্রদের মাসীদিগকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-আদর কাজটায় যে গৃহসুখ বাড়ে, গৃহিণীর কাছে খাতির পাওয়া যায়, গৃহিণীর একটু সন্তোষ সাধন করিতে পারা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে এটার আর একটা

---

* Father of Four Children & Brother-in-Law of Four Sisters-in-Law.

§ শব্দটা আভিধানিক হইলেও লিখিতে কেমন একটু কুণ্ঠা বোধ হইতেছে—কারণ, লেখকের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত এবম্বিধ কয়েকটি শব্দের প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ। রহস্যের বিষয় এই যে, তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। যাহা হউক, আশা করি, শীলতাদুষ্ট হইলেও এই শব্দ প্রয়োগে কাহারও শীলতার হানি হইবে না।—লেখক।

দিক আছে, সেটা যথাস্থানে বলিব। বিলাতী মাসীবর্গের সহিত আমাদের দেশীয় 'মাসী'বর্গের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, বিলাতে শ্যালিকা-বিবাহ সমাজনীতিবিরুদ্ধ—বিধি-বিগর্হিত—আইনানুসারে দণ্ডার্হ—নিষিদ্ধ।—যে দেশে নিজ পিতৃষ্বসা-মাতৃষ্বসা মাতুলানীর—এমন কি পিতৃসহোদরের কন্যা প্রভৃতি ভগ্নী-সম্পর্কিতা ললনার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া চলে ;—শুধু তাহাই নহে, যে দেশে সেইরূপ বিবাহেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয়, সে দেশে কোন্ বিচিত্র যুক্তিবলে কোন্ বিকট বিবেক-বাণীর প্রণোদনে—কোন্ দুর্ব্বোধ্য—বুঝি বা অবোধ্য—দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কারণে পত্নীর ভগিনী বিবাহ করাটা ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর! —সে যাহা হউক, বিলাতে শ্যালিকাসহ বিবাহ-সম্ভাবনা না থাকায়,—এই নিষিদ্ধ নীতির প্রত্যক্ষফলে—বিলাতী 'পিতৃ'দিগের স্ব স্ব শ্যালিকাবর্গের সহিত আচরণটা যেন আড়ষ্ট—আলাপকুণ্ঠ—অযথা-সংযত হইয়া থাকে।—কথাটা একটু বিশদভাবে বলি— *

আমাদের দেশে কিন্তু পিতার সহিত পিতৃ-শ্যালিকার আচরণে এমন কোনও অবান্তর অন্তরায়—এমন সকল বেজায় বালাই—নাই।—এখানে শ্যালিকা-বিবাহটা সমাজ-নীতি—তথা দেশাচার-অনুমোদিত ও প্রচলিত থাকায়, গৃহিণী-অনুজা অবিবাহিতা—কোন দিন হয়ত—অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারেন, এই সুদূর—ক্ষীণ—ভবিষ্যৎ আশায়, তাঁহাদের সহিত ব্যবহারটা একটু মধুর রসাশ্রিত হইয়াই থাকে এবং কালে সেইরূপ সরস ভাবেই পরিপুষ্টও হয়। আমার, গৃহিণীর বয়োজ্যেষ্ঠা শ্যালিকাদের সহিত আন্তরিক ও খোলা-খুলি রকম ব্যবহার ঘটিবার কারণ বোধ হয় এই যে—তাঁহারাই প্রথমাবস্থায় গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগ-সুবিধা ঘটাইয়া দিবার, তথা প্রথম-প্রণয়ের চিরস্মৃতি মধুর সম্ভাষণগুলি শিখাইয়া দিবার একমাত্র গুরু,—তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের আলাপ-প্রবণ সরস ব্যবহারের প্রতি-দানে গম্ভীর বা পরুষ ভাব ধারণ করাও, পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার-বহির্ভূত বলিয়াও বটে। আবার, যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রকৃত রসিকা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার রসালাপপূর্ণ বাক্যবাণে নিতান্ত পেচক-প্রকৃতি ভগিনীপতিগণেরও গাম্ভীর্য্য-দুর্গ কতক্ষণ অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে?—তবে, প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, এদেশে শ্যালিকা সম্বন্ধটা যতই কেন পূর্ণ মধুভাণ্ড হউক না কেন, এবং শ্যালিকা-বিবাহ সমাজ-সঙ্গত হউক না কেন, কিন্তু পত্নী-বর্ত্তমানে কৌলিন্যাভিমানী স্বামি-প্রবরের পক্ষে শ্যালিকা-বিবাহ করাটা কোন রকমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ তাহাতে অণুমাত্রও সুখশান্তির সম্ভাবনা নাই।—সহধর্ম্মিণীগণও ইহার পক্ষপাতিনী নহেন—বুঝি প্রাণান্তেও অনুমোদন করেন না। একে তো বঙ্গ-বালাগণ সপত্নী নামেই খড়্গহস্ত, বলে—

'যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে'

তাহার উপর 'বোন্-সতীন'।—দেব-সমাজের চন্দ্রের পত্নীগণের কথায় এ বিষয় সপ্রমাণ আছে। পুরলক্ষ্মীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন—

"নিম তিত, নিসিন্দে তিত, তিত মাকাল ফল ;—
সব চেয়ে অধিক তিত—বোন্-সতীনের ঘর!"*

বোন্ যদি সতীন হয়, সে বড়ই বিকট তিক্ত-রসাশ্রিত সম্বন্ধ দাঁড়ায়!—উৎকৃষ্ট দ্রব্য মাত্রেরই বিকৃত-অবস্থা বড় বিষম হয়।—অমৃতোপম দুগ্ধ, বিকৃত-অবস্থায় পূতিগন্ধময়—বিষ্ঠাপেক্ষাও ঘৃণার্হ; অমৃতের বিকৃতি তীব্র হলাহল—ভগিনী-সতীন-কল্পনাও রমণী মাত্রেরই পক্ষে অসহ্য—তাহাতে কামিনীমাত্রেই নিতান্ত নারাজ।—সে যাক্, তবে এখানে বলিয়া রাখি, এতদ্দেশীয় পিতার, শ্যালিকার প্রতি আচরণের ভাবটা, কতকাংশে আমাদের ছেলেপুলেরও মধ্যে সংক্রামিত হয়।

---

* হতভাগ্য লেখকের ভাগ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা শ্যালিকালাভের সুকৃতি ঘটিয়া উঠে নাই; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই Theoryটি সম্পূর্ণ আনুমানিক প্রতিপাদন মাত্র।—লেখক।

* প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে কথাটা লিখিলাম; কিন্তু হায়! কথাটা শুনিয়াই গৃহিণী রোষান্বিতা—বুঝিবা অসূয়া পরতন্ত্রাও—হইতেছেন।—বুঝুন, 'বোন্-সতীনের' কল্পনাটাও তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ অসহ্য! তার পর আবার, ইহা পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ শ্যালীপতিরাও না জানি কি ভাবিবেন!—হয়ত কত কিরূপ মনে করিবেন! কিন্তু দোহাই ধর্ম্মের, আমি শুধু প্রসঙ্গচ্ছলেই কথাটা লিখিতেছি। উদ্দেশ্য—মনোভাব (intention) দেখিয়াই যখন অপরাধ বিচার্য্য, তখন আমি নিতান্তই নির্দ্দোষ।—তবুও যদি শ্যালীপতিগণ কেহ কথাটার কোন আধ্যাত্মিক

আমাদের দেশে—সমাজে—মোটের উপর বলিতে গেলে —পত্নী ও শ্যালিকা সম-পর্য্যায়ে আসীনা।—সম-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা! সুতরাং সন্ততিবর্গের নিকট 'মা ও মাসী' সমরূপেই পূজ্যা; তাই বঙ্গ-রমণীকুল সচরাচর কথাচ্ছলে বলেন—

"মা মাসী কি ভিন্ন?"

আবার সময়ে সময়ে এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে—

"মা মরুক মাসী বাঁচুক!"

অর্থাৎ, 'মা'র চেয়েও মাসীর স্নেহটা যেন সচরাচর প্রথমাবস্থাটায় প্রবল! সেই জন্যই বোধ হয়, এদেশের শিশু-সন্তানগণের আঁতুড়ে অবস্থানকালেই—বা অব্যবহিত পরেই—সর্ব্বাঙ্গে 'মাসী-পিসী' দেখা দেয়—মাসীপিসীর অঞ্চলচির গাত্রে স্পর্শ না করাইলে, সেগুলা মিলায় না! তাই সুললিত সুমধুর স্বরে 'ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসী'কে আবাহন আরাধনা না করিলে, মাতৃক্রোড়ে শায়িত শিশুসন্তানদের নিদ্রা আসে না! কিন্তু

"মার চেয়ে যে ব্যথার ব্যথী তাকে বলে ডাইন্!"

তবুও, সাধারণতঃ দেখা যায়, ছেলেপুলেরা মায়ের চেয়ে মাসীরই একটু বেশি বেশি 'নেওটা'—আদুরে—কোল্-ঘেঁসা হয়; কিন্তু নিজের পেটের ছেলেপুলে—বত্রিশ-নাড়ী ছেঁড়াধন যে অপর কাহারও প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবে, সে চিন্তাটাও আমাদের মেয়েরা মোটেই সহ্য করিতে পারে না!—তা' সে হউক না কেন সন্তানদের মাসীর প্রতি—কিংবা কন্যার স্বামীর প্রতি—অথবা পুত্রের পত্নীর প্রতি!—'অন্যপরে কা কথা!'—তাই ছেলে পুলেদিগকে মাসীর আঁচলধরা হইতে দেখিলেও, বিজাতীয় রোষপরতন্ত্র হইয়া—অসূয়ায় ফুলিয়া—মায়েরা বলেন—

"না বিয়োলো না—বিয়োলো মাসী;—
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।"

অর্থাৎ কি না, মাসীর স্নেহ কি মায়ের সমতুল্য! মাসীর স্থান মায়ের ঢের নীচে—পাড়াপড়শীর একটু উপরেই স্থাপিত! কিন্তু আমি বলি—"কেন গা ভাল-মানুষের ভগ্নীরা!—ছেলেপুলেদের মাসীর প্রতি—তোমাদের নিজ নিজ ভগিনীদের উপর—তোমাদের এত বিষ, এত ঝাল কেন? তাঁহারা তোমাদের কি 'ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী' দিয়াছেন—তোমাদের 'বুকে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়াছেন'? তাঁহাদের অপরাধ যে, তাঁহারা তোমাদের ছেলেপুলেদের একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-যত্ন করেন—শুধু এই জন্যই কি তাঁহাদের এত 'হেনস্থা'!—তাঁদের প্রতি এতটা অন্যায় অত্যাচার! কর; কিন্তু ধর্ম্মে সহিবে কি?"

মাসী ও পিসী একই পর্য্যায়ের সম্পর্ক;—একজন মাতৃদেবীর ভগিনী, অপর পিতৃদেবের ভগিনী,—উভয়েই তুল্য বরেণ্যা। তথাপি কিন্তু সমাজে—লৌকিক আচারে—দুইজনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! ইহার কারণটা বোধ হয় এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে;—সন্তানের মাসী, তাহার মাতার ভগিনী, পিতার শ্যালিকা; সন্তানের পিসী, তাহার পিতার ভগিনী, মাতার ননদ;—সুতরাং পিতার নিকট মাসী যে বস্তু, মাতার নিকট পিসীও সেইই বস্তু! কিন্তু এই যুগ্ম-শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি আচরণে দেখা যায়—ভগিনীপতি-শ্যালিকা হিসাবে প্রথমোক্ত সম্বন্ধি-যুগলের মধ্যে যতদূর লঘু ও তরল হাস্য-পরিহাস—ভাব-বিনিময়াদি—চলে, যতটা অন্তরঙ্গ হাবভাব দেখা যায়, ননদ-ভাজ হিসাবে শেষোক্ত যুগলের মধ্যে তেমনটি কদাচ দেখা যায় না—ঘটে না; যাহা কিছু রহস্যালাপাদি চলে, সে সকলই পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা বহুগুণে সংযত ও শিষ্ট। * অর্থাৎ, পিতার সহিত মাসীর যেমন খোলাখুলি—মেশামিশি আপ্তবৎ আচরণ, মাতার সহিত পিসীর ব্যবহারটা তদপেক্ষা অনেক অধিক সম্ভ্রমসূচক- শীলতাসমন্বিত। আর, সন্তানগণ সচরাচর পিতামাতার দোষগুণের যেমন অনুকারী হয়, বোধ হয়, তাহারা পিতামাতার নিকট হইতেই মাসীপিসীর প্রতি আচরণটাও শিক্ষা করে। তাই দেখিতে পাই—সন্তানদিগের তাহাদের পিসীর প্রতি ব্যবহারটা যেমন সংযত—ভয়-

---

নিগূঢ়-অর্থ আছে মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে,—তাঁহাদের বনিতাগণ আমার যে বস্তু, আমার গৃহিনীও ত তাঁহাদের সেই বস্তু। সুতরাং আমার এই সাধারণ বিশাল প্রতিজ্ঞাটি সকলের শ্যালিকার প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। কথাটায় যদি কিছু দূষ্য থাকে, তাহা হইলে সে দোষ সমভাবে সকলকেই অর্শিবে।—ব্যক্তিগত ভাবে মাত্র আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায়—অযৌক্তিক—অবৈধ হইবে। অলমতিবিস্তরেণ—ইতি—লেখক।

* অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার চারি যোড়া 'ননদ-ভাজের' চিত্রাঙ্কনে, কি এভাবটা বিশদ করিয়া দেন নাই?—লেখক।

ভক্তিমিশ্রিত, মাসীর প্রতি ব্যবহার তদপেক্ষা অনেকাংশে শ্লথ—বুঝি বা কতকটা অশিষ্ট—অথচ, অপেক্ষাকৃত অধিকতর আব্দার-সূচক হইয়া থাকে! কিন্তু তাহারা যদিও পিসী অপেক্ষা মাসীর বেশি অনুগত—তাঁহার কাছে অধিকতর আদর-যত্ন—অতিরিক্ত প্রশ্রয়—'নাই' পায় বটে, তবুও—

"পরের পোলা খায়,—
(আর) বন পানে চায়!"—

তা'দের স্বাভাবিক টান্ প'ড়ে থাকে নিজের সেই মাননীয়া পিসীর দিকে! তা'রা

"খায় দায়—ভোলে না;—
তত্ত্বকথা ছাড়ে না।"

তারা সেই ছেলেবেলা থেকেই আধ আধ বোলে সেই "তত্ত্বকথা"র আবৃত্তি করিতে শিখে; মাসীর প্রাণে তুহিন ঢালিয়া দিয়া সুললিত স্বরে গায়িতে আরম্ভ করে—

"মায়ের বোন্ মাসী—কাদায় ফেলে থাসি (ঠাসি ?);
বাপের বোন্ পিসী—ভাত-কাপড় দিয়ে পুষি!"

অর্থাৎ, 'মায়ের বোন্ মাসী—তাঁহার নিকট শত আব্দার-অত্যাচার করিয়া—তাঁহাকে উৎখাত করিয়া তুলিব, আর বাপের বোন্ পিসীকে সসম্ভ্রমে আহার্য্য-বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিব!'

বোন্‌পোর যখন এই মূল-মন্ত্র-শিক্ষা—এইরূপ মনোভাব—তখন মাসীরই বা শিশু-বোন্‌পোর প্রতি পূর্ব্বে যে আকুল অন্তরঙ্গ আচরণ দেখা গিয়াছিল—সেই প্রথম-প্রাদুর্ভূত অনাবিল স্নেহ-বাৎসল্য কতকাল অব্যাহত থাকিতে পারে? বলে,—

"নূতন নূতন তেঁতুল-বিচি,
পুরাণ হ'লে বাতায় গুঁজি"।

চিত্তবৃত্তি, যতই কেন নিম্নগামী হউক না কেন,—কনিষ্ঠ সম্পর্কিতদিগের প্রতি সহৃদয়াচরণই বল—আর স্নেহ-প্রীতিই বল—সবই পারস্পরিক ভাবের অনুপাতেই সঞ্জাত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতেও সেই 'আর্সির মুখ দেখাদেখি'—'যেমন দেখাবে, তেমনই দেখ'—আছে! বোন্-পোর যখন মাসীর প্রতি ভক্তির মাত্রা হ্রাস—শিথিল হইয়া আসিল, তখন মাসীর সেই পূর্ব্বের ভাব—বোন্-পোর প্রতি সেই প্রগাঢ় যত্ন-'আয়ত্তি'—কতকাল আর বজায় থাকিতে পারে!—বোন্-পো বয়ঃস্থ হইল, মাসী আর এখন বোন্‌পোর ভুলিয়াও তত্ত্ব লয়েন না!—মনের খেদে—অভিমানে—বোন্-পো যত্রতত্র বলিয়া বেড়ায়—

"মাসীটাসী কাট্-কাপাসী—কাপাস বনে ঘর; *
কখন মাসী বলেনা ক খৈ-লাড়ুটা † ধর!"

'—মাসীর ভারি ত টস্! কাঠ-কাপাসের অধীশ্বরী হইয়াও—বাড়ী-বেড়া কাপাস বন থাকিতেও—যথাসম্ভব সচ্ছল অবস্থাসত্ত্বেও—মাসী এখন আর ভুলিয়াও কোন দিন বোন্-পোকে ডাকিয়া, তুচ্ছ একটা খৈ-লাড়ু হাতে দিয়াও, আবাহন—আপ্যায়িত করেন না!—আমরা বলি, "ওরে বোকা ছেলে! 'যেচে মান, আর কেঁদে সোহাগ' হয় না—হয় না!"—কিন্তু তখন 'কে কা'র কড়ি ধারে?'—কে কা'র কথা শুনিতেছে বল!—তখন তার 'নিজের কথাই এক কাহন!'

শেষে—আর থাকিতে না পারিয়া—বিনা নিমন্ত্রণেই বোন্-পো একদিন সকাল বেলা মাসীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত!—মাসী তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত; অপ্রতিহতগতি বোন্-পো সরাসরি সেই পাকশালায় গিয়া দেখা দিল—জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা, মাসি! কি রান্না-বাট্না হ'চ্চে?' মাসী বলিলেন, 'এই বাবা—

আমি কি মন্দ রেঁধেছি!
বাড়ীর বেগুন কাঁচকলা আর ডুমুর ভেজেছি।'

অর্থাৎ, আভাষে জানাইয়া দিলেন, যে রান্না-বাড়া একরকম সবই হ'য়ে গিয়েছে! কিন্তু তা'বলিলে কি হয়!—'কুটুম্ব নারায়ণ'—কুটুম্বের ছেলে আহারের সময় অনাহারী আসিয়া উপস্থিত! আহা, চক্ষুলজ্জাটাও আছে ত?—অগত্যা আর কি করেন;—

"মাসী বড় টস্‌টসাল,
বোন্-পোকে দেখে মাসী খুদ চড়াল;
তাহে কিছু অকুলান হ'ল!—
তাই শেষে জল ঢালিল!"

বোন্-পো-প্রীতির আবেগে তখন মাসী—বুঝি তণ্ডুল মনে করিয়া ভুলক্রমেই কতকগুলা 'খুদ' সিদ্ধ করিতে

---

* সেকালে 'কাপাস বন'ই সঙ্গতির পরিচায়ক ছিল, এখন 'কোম্পানীর কাগজ' ও 'ভাড়াটীয়া বাড়ী' তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।—'কালস্য কুটিলা গতিঃ।'—লেখক।

† নাই বা হইল 'ধনেখালীর খৈচুর'!

চড়াইলেন!—তাই কি ঘরসংসারের সাত জ্বালায় মাথার ঠিক্ আছে!—সিদ্ধ হইলে, দেখা গেল যে খুদও এত পরিমাণে কম, যে তাহাতে বোন-পোর 'বাথড়-পুর্ত্তি' হওয়া দুর্ঘট হইবে। উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্না কার্য্যকুশলা মাসী তৎক্ষণাৎ 'কিং কর্ত্তব্য' স্থির করিয়া ফেলিয়া, তাহাতে পুনরায় কিঞ্চিৎ জল-প্রক্ষেপ দিলেন এবং তাহাই উত্তমরূপে ফুটাইয়া বলপ্রদ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া বোন্-পোকে 'পায়স' করিয়া দিলেন!—বোন্-পো স্মিতমুখে আহার করিতে বসিবে, এমন সময়ে 'মেসো' আসিয়া তথায় উপনীত! শ্যালিকা পুত্রের আহারের আয়োজন দেখিয়া তিনি বিস্মিত!—'হাঁগা গিন্নি! ক'রেছ কি? কুটুম্বের ছেলেকে কি তোমার শুধু খুদটা দেওয়া ভাল হইয়াছে?'—'আহা, তুমি থাও! তোমারই কুটুম্বের ছেলে;—আমার ত আর ও পর নয়!—ও আমার ঘরের ছেলে—খুদ্ কুঁড়া যা' হ'বে, সোণাপানা মুখ ক'রে তাই খাবে!—তোমার আর কুটুম্বিতা করিতে হ'বে না!'—'তা' হৌক্; তবু শুধু খুদটা খাবে!—তা' নিদান্ একটু লবণ, আর গোটাকএক সূর্য্যমুখী লঙ্কা দাও।' 'মেসো'র এ যুক্তিটা আর 'মাসী' এড়াইতে পারিলেন না;—অগত্যা বোন্-পোকে সেই খুদের পাত্রে গোটা দশেক লঙ্কা দিয়া ধরিয়া দিলেন। * বোন-পো পরিতোষপূর্ব্বক তাহাই আহার করিল। আহারান্তে যখন মাসীর কাছে বিদায় মাগিল, তখন মাসী বলিলেন,—

"যাবে যাও, থাক্‌বে থাক
থেকেই বা কি কর্‌বে!
এখনও ত বেলা আছে,
গেলেও যেতে পার্‌বে।"

অগত্যা বোন্-পো বাটী ফিরিল।

বাটী ফিরিয়া আসিবামাত্রই পিসী তাড়াতাড়ি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হ্যাঁরে, মাসীর বাড়ী গিয়াছিলি—তোর মাসী-মেসো কেমন যত্ন-'আয়ত্তি' করিল?"

বোন্-পো মাসীর বাড়ী যে আদরে-গোবরে আপ্যায়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সুবুদ্ধির মত তাহার উচিত ছিল, 'কিল্ খাইয়া কিল্ চুরি করা' কেননা বুদ্ধিমানের নীতিই এই, যে—

"আপনার মান আপনি রাখি,
কাটা কান্ চুল্ দিয়ে ঢাকি।"

কিন্তু হাবা ছেলে, প্রকৃত কথা পেটে রাখিতে পারিল না—সে বলিয়া ফেলিল—

"মাসীর বড় টস্—মেসোর বড় টস্—
এক খোরা খুদ-সিদ্ধ, লঙ্কা গোটাদশ!"

'খোকার' মেসো-মাসীর নাম-ডাক আছে,—তারা খুব বড় গৃহস্থ—কথা উঠিলেই গার্হস্থ্য সাচ্ছল্য—সুখ-সম্পত্তি সম্বন্ধে খোকার-মা প্রায়ই ভগিনী ও ভগিনীপতিদের সংসারের তুলনা দিয়া থাকেন!—সুতরাং তাহাদের সংসার-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পিসীর এযাবৎ একটা বিশাল ধারণা ছিল। আজ, খোকার মুখে, এই আপ্যায়নের কথা শুনিয়া পিসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন—বাবা!

"খুদের এত নাড়া!
থাক্‌ত ডাল, ভাংত হাঁড়ি, যেত' পাড়া পাড়া!"

খোকার মার কিন্তু কথাটায় প্রাণে বড় বাজিল—হাজার হৌক এক মায়ের পেটের বোন্ ত বটে!—তা'র নিন্দা, বিশেষ আবার ননদের মুখে,—এ কি সহ্য হয়!—বলে,—

"নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে;
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি নে!"

ননদের মুখে টিট্‌কারি শুনিয়া দুর্ব্বিষহ অপমানে রুষ্ট হইয়া, তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—আমার বোনেরা না হয় গরীব—না হয় খুদ খায়; কিন্তু কারুদের বাড়ীত পাত পাড়িতে আসে না! ও-ত কথাতেই আছে—

"দিলে থুলেই মাসী,—
না হ'লে সর্ব্বনাশী!"

'দেওয়া থোয়া লইয়াই মাসীর সঙ্গে সম্পর্ক বই ত নয়! যতক্ষণ দাও থোও, ততক্ষণই মাসী—মাসী—মাসী! আর দিতে না পারিলেই—দেওয়া বন্ধ করিলেই—মাসী সর্ব্বনাশী!'—এইত গেল মাসী-বোন্‌পোয়ের সংক্ষিপ্ত-সংবাদ। এ ছাড়া আবার মাসীর রকমফের—অপর

* এবংবিধ আদর-আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইতেই—বুঝি পর্য্যুসিত সলঙ্ক খুদ খাইবার লোভেই—৺মহাপ্রভু জগন্নাথদেব—ভ্রাতাভগিনী সমভিব্যাহারে প্রতিবৎসর অষ্টাহ তরে একবার করিয়া গুণ্ডিকা-বাড়ী যাইতে ছাড়েন না। মাসীর বাড়ীর যত্ন খাতিরের কি এতই মোহিনী প্রভাব! বলিয়াছি ত, হতভাগ্য লেখকের মাসীই নাই—সুতরাং এই রসাস্বাদনে তিনি একেবারেই বঞ্চিত!

নানা সংস্করণ আছে!—সে সম্বন্ধেও দু একটা কথা না বলিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যটা তেমন বিশদ হইবে না। তাই বলি,—

নিঃসম্পর্কীয়া বয়োজ্যেষ্ঠা পাড়াপড়সী প্রভৃতি রমণী-দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাব—আত্মীয়তা—জন্মিলে, 'মা'—'মাসী' প্রভৃতি রকম একটা গুরুতর সম্পর্ক পাতাইবার একটা রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, এমন সকল মহিলা, যাঁহাদিগকে একটু 'সমীহ'ও করিতে হইবে, অথচ নানা বিচিত্র সুখদুঃখের কাহিনী—ভালমন্দ নানা কথাও—বলা চলিবে, প্রায়শঃ এইরূপ শ্রেণীর কুলকামিনীদিগের সঙ্গেই মাসী'-সম্পর্কটা পাতান হয়। ফলে, ইঁহারা ঠিক 'মাসী' নহেন,—ইঁহারা যেন কতকটা মাত্র—

"মাসীর মায়ের বুটুম!"

ইঁহারা গুরুজনকে গুরুজন—বন্ধুকে বন্ধু—পরামর্শ-দাতা ও ইয়ার; একযোগে সবই!—একে তিন, তিনে এক!

আবার ভারতচন্দ্রের—বিদ্যাসুন্দরের আমল হইতে আর একশ্রেণীর পাতান-মাসীর প্রচলন হইয়াছে;—সেটা 'মালিনী মাসী', সে একটা অতি অশিষ্ট—নিতান্ত রুচিদুষ্ট প্রয়োগ! ভারতচন্দ্রের এই দৃষ্টান্তানুসরণেই যেন, ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও তাঁহার "সধবার একাদশী" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মাতাল নিমে দত্তর "মাসী" আখ্যায়িকার প্রতি এক উৎকট রসিকতা প্রয়োগ করিয়াছেন। *

শেষ কথা—আমি ত

"বরের ঘরের মাসী,
কনের ঘরের পিসী"

সাজিয়া উভয় পক্ষের সকল কথাই গাহিলাম। এখন কথা এই যে, বাঙ্গালায় মাসী-বর্গের পুণ্য-উপাধির—তথা তাঁহাদের চিরসম্ভ্রমসূচক পদের—এ যে সকল বিসদৃশ ব্যবহার ও অযথা অপমান—এগুলি কিরূপে—কোথা হইতে—উৎপন্ন হইল?—এই অপব্যবহারের—অপভ্রংশ করণের জন্য মূলতঃ—প্রকৃতপক্ষে—দায়ী কে?—আমাদের দেশাচার—লোকাচার?—না আমাদের সমাজ-নীতি?—অথবা আমাদের সামাজিকগণ? কিংবা পৃথক্ ও যৌথ ভাবে—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে ইঁহাদের প্রত্যেকেই এবং সকলেই?—কথাটার একটা সুমীমাংসা হইলে সুখী হইব।—ইতি

সন্ততিবর্গের মাসীদের ভগিনীপতি।

* সাহিত্য সাময়িক সমাজের ভাবগতি ধরিয়া রাখে—একথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, রায়গুণাকরের পূর্ব্বে এই নিঃসম্পর্কিতার সহিত "মাসী" পাতাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, এবং মাসীদিগের প্রতি আচরণ কতদূর শিথিল ছিল, ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকারিগণ তাহা সাব্যস্ত করিবেন।

বিহারী লাল

[লেখক— শ্রীরসময় লাহা]

এখনো জাগিছে মনে, হেরেছি সে ছেলেবেলা
ঋষির মুরতি;
কি তপ্ত কাঞ্চন-প্রভা, ফলিত বালক-নেত্রে—
হৃদয়ে ভকতি।

মনে পড়ে, তপোবনে তুমি ধ্যানমগ্ন কবি—
ললাট বিশাল;
বুঝি নাই সে সময়ে, কি সাধনে রত ছিলে
হে বিহারী লাল!

কি সাধনে রত ছিলে   মৌনব্রত মুনি সম,
প্রসন্ন আনন ;
'ভারত সঙ্গীত' ধ্বনি,   'পলাশীর যুদ্ধ' রবে
টলেনি আসন।
পশেনি তোমার কাণে   জগ-জন-কলরব ;
তুমি যোগাসনে,—
করুণাপ্লাবিত প্রাণে   'বঙ্গ-সুন্দরী'র ধ্যানে
ছিলে এক মনে।
সেই ধ্যানে যে আলেখ্য   ফুটে ছিল চিত্ত-পটে,
'আদ্‌রা' তাহার,—
রেখে গেছে প্রতিচ্ছায়া,   অক্ষরের পরিচয়ে
কাব্যেতে তোমার।
উচ্চ ভাবে ভরপুর   উচ্চে তুলেছিলে সুর
তোমার বীণায়,—
ভেদি কল্পনার স্তর   'সারদা মঙ্গল' গান
দীপ্ত মহিমায়!
দু'চারিটি রশ্মি তার   পশেছিল মর্ত্তালোকে
আজো তার রেখা,—
তোমার ছন্দের দোলে   বিভাসে ভাবুক নেত্রে
রত্ন-শ্লোক লেখা।—
মহাজন-পদাবলী   শাক্ত প্রসাদের গান,—
কি মধুর প্রীতি!
ভক্তিতে ভাসায় প্রাণ   ফুটে নরাকারে
দেবের আকৃতি।
কিন্তু, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম   তোমার সাধনা-লক্ষ্মী
ভাব-শতদলে—
শোভে—কায়াহীন ছায়া   একি, ধ্যান-ভরা মায়া
সারদা মঙ্গলে।
কবির যে কবি তুমি,   সৌন্দর্য্যের স্বর্ণভূমি
তোমার রচনা—
স্বচ্ছ, প্রহেলিকা-শূন্য ;   —তুমি যে সরল প্রাণ
[illegible] ছলনা।
সারদা—মানসী বালা   বিরহ-মিলন লীলা
অপূর্ব্ব সে রতি!

কবির নিষ্কাম সৃষ্টি   সুষমার সুধা-বৃষ্টি
আনন্দ ভারতী।
সে আনন্দময়ী পুনঃ   ফুটিল মানসে তব,
ত্রিদিব কিরণে ;—
বিশ্ব-জননীর রূপে   বিরাজে প্রতিমা যার,
'সাধের আসনে।'
তোমার সাধনা, কবি,   কি নিষ্কাম পুণ্যভরা,
হে উদারমনা!—
কি নিষ্কাম পুণ্যভরা   পণ্যরূপে হাটে তাই
করনি ঘোষণা।
ছিল তব ভক্ত-শিষ্য   নটকবি '**রাজকৃষ্ণ**'
কৃতী 'রামায়ণে' ;
স্বল্পায় '**অধরলাল**'   বাজে কাব্য-বেণু যাঁর
'কুসুম কাননে।'
তবপদ অনুসরি'   '**সুরেন্দ্র**' অমর বঙ্গে
কবি 'মহিলা'র,
অকালে পড়িল ঝরি   কতই কোরক-কবি
সাধক তোমার।
রবীন্দ্র তোমার শিষ্য   নিলা তব পুষ্পাকীর্ণ
পথ কাব্যময় ;
তোমারি সাধনা লভি'   ঘোষে দিগ্বিজয়ী **রবি,**
প্রতিভার জয়।
সংযত বীণায় তব   তুলি' সুর নব নব
'**অক্ষয়**'—অক্ষয় ;
তোমারে গুরুর পদে   বরি' সে '**বড়াল**' কবি
কৃতার্থ হৃদয়।
কত নবোদিত কবি   রত আজি বঙ্গবাণী
চরণ-সেবায় ;
আরতির দীপ তাঁরা   জ্বালে ভক্তিভরে, তব
হোমাগ্নি শিখায়।
তোমার শাশ্বত প্রভা,   দিন দিন দীপ্ততর
কবি-চিত্ত-'পর,
তুমি যে 'কবির কবি'   'যোগ[illegible] হে যোগেন্দ্র'
আরাধ্য অমর।

ছিন্ন-হস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্বাবৃত্তিঃ- ব্যাঙ্কার মিঃ ডরুজরেস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাঞ্চাঞ্চি ; রবার্টক'র্পোরেল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য, ম্যালিকম্ দ্বারপাল, ডেন্‌লেভ্যাণ্ট্ শাস্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-চ্ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ। তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, সেটা ম্যাক্সিম্ নিজের কাছে রাখিলেন।

রবার্ট্, এলিসের পাণিপ্রার্থী ; এলিসও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক ; তাই তিনি রবার্ট্‌কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ তাহাতে অসম্মত—সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক-শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই :—কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে দেখা গেল ৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্‌লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন ; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন ; সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথাবার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন। পথে গুণ্ডা পাছে লাগিয়াছিল।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরিসম্পর্কে সকলেই রবার্ট্‌কে সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহার কিন্তু ধারণা—সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্‌কে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্ম ম্যাক্সিম্‌কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসে সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, গোপনে তাঁহাকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন, তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস,—রবার্টের নিয়োজিত কোন রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্‌কেও সেইরূপ বলিলেন ; এবং জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর বিবাহ ঘটিবে ; আর চুরীর গুপ্ত তথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যা'ন। তথায় এক রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্‌লেট্‌টির পূর্ব্বাধিকারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্!—ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির। কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল ; দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্‌লেটের কথা উঠিতে ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্‌লেট্ ও ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল ;- ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন।

একমাস গত ;—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী। জর্জ্জেট্ সেদিন প্রাচীর হইতে পড়িয়া—তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াল্টা অসুস্থ ছিলেন,—আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। তিনি বলিলেন, ভিগ্‌নরীর সহিতই এলিসের বিবাহ হওয়া বিধেয় ; আর জর্জ্জেটের নিকট হইতে রবার্টের যথাসম্ভব সংবাদ আহরণ করা কর্ত্তব্য। অচিরে ব্যাঙ্কারের বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—এই আশ্বাস দিয়া ইয়াল্টা ম্যাক্সিম্‌কে বিদায় দিলেন।

কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার অনুরোধমত ম্যাক্সিম্, ম্যাঃ পিরিয়াকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া জর্জ্জেট্‌কে সঙ্গে লইয়া পথিভ্রমণে নির্গত হইলেন। আশা,—পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখিলে, জর্জ্জেটের লুপ্তস্মৃতি যদি পুনরাবির্ভূত হয়। কার্য্যতঃ কতকটা সফল কামও হইলেন,—জর্জ্জেটের পূর্ব্বস্মৃতি কতক কতক পুনঃপ্রদীপ্ত

হওয়ায়, সে প্রসঙ্গতঃ রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক আভাষ জ্ঞাপন করিল; যে বাটীতে রবার্টকে বন্দীভাবে থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহাও নির্দ্দেশ করিল; পরে সেই প্রাচীরের উপর হইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সে হতচেতন হয়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ পাইল। ঠিক্ সেই সময়ে তাঁহার প্যারীর আবাস-বাটীর কক্ষে বসিয়া, পরদিন রবার্ট্কে দেশান্তরিত করিবার বিষয় নিজ প্রধান পরিচারকের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন—সহসা ম্যাক্সিম্ গিয়া উপস্থিত। প্রসঙ্গতঃ ম্যাক্সিম্ বলিলেন যে, তিনি জানিয়াছেন "এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট্কে ধরিয়া এ বাটীতে আনা হইয়াছিল। এখনও কি সে এখানেই আছে,—না, স্থানান্তরিত হইয়াছে?" ইহাতে বোরিসফ্ ক্রোধের ভাণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সে পুলিশের সাহায্য লইবে, জানাইয়া গেল। ভয়ে কর্ণেল্ সেই রাত্রেই রবার্ট্কে স্থানান্তরিত করিবে স্থির করিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন;—সকল কথা প্রকাশ করিবার জন্য, ভয়মৈত্রী দেখাইয়া, পীড়াপীড়ি করিলেন;—সে কিন্তু অটল। অগত্যা তাঁহার মনে হইল,—"তবে কি ভুল করিয়াছি?" সেই দিন প্রভাতে এলিস্ পিতার অজ্ঞাতসারে কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেন। ঘটনাক্রমে ম্যাক্সিমও সেই সময় তথায় যায়—এলিস্ লুকাইয়া থাকেন; পরে সহসা আত্মপ্রকাশ হওয়ায় উভয়ে একযোগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।]

ম্যাক্সিমের সহিত কর্ণেল বরিসফের দেখা হইবার পর, কর্ণেল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন ম্যাক্সিম আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান ও কাল নির্ণয় করিবার জন্য সহকারী পাঠাইলেন না, তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু রবার্ট কার্ণোয়েল সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি সর্দ্দার খানসামার পরামর্শ-অনুসারে কাজ করাই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পর বরিসফ স্থির করিলেন, যখন কার্ণোয়েলকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে, তখন তাহার সহিত বারকয়েক দেখা করিয়া মসিয়ে ডরজরেসের কর্ম্মচারীদিগের রীতিপ্রকৃতি, গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া আবশ্যক; তাহাতে দলিলের বাক্সসংক্রান্ত সকল তথ্য জানিবার সুবিধা হইবে। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া বরিসফ অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। তাঁহার, সকল উদ্বেগ দূর হইল। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও ক্লাবে অপরাহ্ণ যাপন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং টেবিলে বসিয়া অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের সহিত বাজী রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। প্রথম বাজী জিতিয়া তিনি সান্ধ্য-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে একখানি কার্ড প্রদান করিল। কার্ডে যাঁহার নাম লেখা ছিল, বরিসফ তাঁহাকে চিনিতেন না। কিন্তু কার্ডের এক কোণে রুষিয়ান গুপ্তচরদলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া তিনি অবিলম্বে আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। আগন্তুক একটী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বরিসফের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লোকটি নব্যবয়স্ক, সুপুরুষ এবং সুসজ্জিত। তিনি কর্ণেল বরিসফকে দেখিয়াই রুষভাষায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সেই সঙ্কেত কথা শুনিয়া বরিসফ বুঝিলেন, আগন্তুক গবর্ণমেণ্ট-পুলিশ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

আগন্তুক বলিলেন, "প্রিয় আলেক্‌সিস ষ্টিভানোভিচ, এই স্থানটি কথোপকথনের উপযুক্ত নহে, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। চলুন, আমরা একটা বিশ্রামাগারে গিয়া আহারাদি করি।"

"স্বচ্ছন্দে, কোন্ বিশ্রামাগারে যাইবেন, প্রিয় মোরিয়াটাইন?"

"আমাকে আইভান আইভানোভিচ্ বলিয়াই ডাকিবেন। চলুন বিগনন্ হোটেলে যাই। ষাট ঘণ্টা ট্রেণে থাকিয়া আজ সকালে এখানে আসিয়াছি, বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে রাজপথে বাহির হইলেন। রাজপথ জন-বিরল। আগন্তুক বলিলেন,—"আমাকে আপনি চেনেন না, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আপনি যখন সেণ্টপিটার্সবর্গে জেনারেলের সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন, তখন আমি পোল্যাণ্ডে ছিলাম। আপনি বিদেশে আসিবার পর আমি সেণ্টপিটার্সবর্গে যাই। আমি আপনাকে আমার বন্ধু মনে করিয়াছি, সেই জন্য আমার পদের নিদর্শন দেখাই নাই। যখন হয় দেখাইলেই চলিবে, এখন সঙ্কেত কথা শুনুন।" আগন্তুক কর্ণেলের কাণে কাণে মৃদুস্বরে কি কথা বলিলেন। কর্ণেল বলিলেন, "না বলিলেও চলিত; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বিশেষ কোন কাজে আসিয়াছেন?"

"খুব জরুরী কাজ। পারি নগরে আসিবার আয়োজন

করিবার জন্য জেনারেল আমাকে দুইঘণ্টার বেশী সময় দেন নাই।”

“কাজটা কি?”

“এলেক্সিস, কাজটা আপনার সম্বন্ধে,—ভয় পাইবেন না। বড় আপিসে তুচ্ছ জনরবও কিরূপ যত্নের সহিত পরীক্ষা করা হয়, তাহা ত আপনি জানেন। আপনার বিরুদ্ধে জেনারেলের নিকট একটা নালিশ হইয়াছে।”

“কি নালিশ, মহাশয়?”

“কর্ত্তব্যে অবহেলা বা অসতর্কতা। প্রকাশ যে, আপনি প্রয়োজনীয় দলিলপত্র একটা বাক্সে রাখিয়া একজন ব্যাঙ্কারের নিকট বাক্সটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।”

“বাক্সটি নির্ব্বিঘ্ন স্থানে থাকিবে বলিয়াই ঐ ভাবে রাখিয়াছিলাম। নিহিলিষ্টরা আমার উপর কিরূপ নজর রাখিতেছে, জানেন ত? অন্য কথা দূরে থাকুক, বাড়ীর কয়েক জন চাকরকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না।”

“কিন্তু বাক্সটি যে চুরি গিয়াছে, নিহিলিষ্টরা বাক্স হাত করিয়াছে।”

“অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষকে এ কথা না জানাইয়া আমি অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু কেন করিয়াছি, তাহা খুলিয়া বলিতেছি। উপরে কে এই সংবাদ দিয়াছে বলিতে পারেন কি?”

“আপনার সন্দেহ হয় না? ঘরের ঢেঁকিই ত কুমীর হইয়া থাকে। আপনার একটা সর্দ্দার খানসামা আছে না?”

“কি ভ্যাসিলির এই কাজ!—পাজি বেটা!”

“তাহার উপর কর্ত্তাদের হুকুম আছে। পরস্পরের উপর এইরূপ নজর রাখিবার প্রথা রুষীয় পুলিশে চলিয়া আসিতেছে; তার অপরাধ কি? সে উপরিওয়ালার হুকুম তামিল করিয়াছে।”

“ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। বেটা আমার সর্ব্বনাশ করিবে দেখিতেছি; বোধ করি, হতভাগা দলিলের বাক্স চুরির কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই।”

“সে লিখিয়াছে, আপনি দলিলের অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রকৃত সূত্র ধরিতে না পারিয়া গোড়ায় গলদ করিয়াছেন, আর সেই ভুল পথের অনুসরণ করিতেছেন।”

“চোরের সহকারী বলিয়া আমি একটি যুবককে বন্দী করিয়াছি, সে কথাও বোধ করি, সে বলিয়াছে?”

“সব কথাই বলিয়াছে; আপনার সব মতলব কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়াছেন, সেই জন্য আপনার বড় নিন্দা হইয়াছে।”

“যুবকের নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে সাইবিরিয়ায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম সত্য। কিন্তু এখন সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছি, ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে ছাড়িয়া দিবার যদি কোন উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার হয়। ভ্যাসিলি ত তাহাকে, মুক্তি পাইলে কোন হাঙ্গামা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছাড়িয়া দিতে বলে।”

“প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। আচ্ছা, আহারের সময় এ সম্বন্ধে কথা হইবে। আহারের পর একবার থিয়েটারে গেলে হয় না?”

“তাই ত! আপনি দেখিতেছি কাজের সময়েও আমোদ করিতে জানেন।”

“কাজের সঙ্গে আমোদের সংস্রব আছে, একটু পরেই দেখিতে পাইবেন। চলুন, এখন আহার করা যাক্, পেট জ্বলিতেছে।”

আহারান্তে স্ফটিক পাত্রে শ্যাম্পেন-সুধা ঢালিতে ঢালিতে আগন্তুক বলিলেন, “আপনি হয় ত মনে করিতেছেন, আমি আপনার সর্দ্দার খানসামার পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিতে আসিয়াছি। সে কথা মনেও স্থান দিবেন না। তাহাকে কোন কথাই জানিতে দেওয়া হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষেরও সে অভিপ্রায় নয়; আপনি ও আমি দুইজনে মিলিয়া এ ব্যাপারের একটা কিনারা করিব। কতকগুলি জরুরী দলিল চুরি গিয়াছে। কিন্তু দলিল পুনর্ব্বার হাত করিবার উপায় নাই, এমন ত বোধ হয় না। প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদিগের সন্ধান লইতে হইবে, তাহাদিগের তাঁবেদারদিগকে ধরিয়া ফল হইবে না।”

“ষড়যন্ত্রকারীদিগের অধীন লোকদিগের অনুসরণ করিয়া প্রকৃত অপরাধীদিগকে ধরিব মনে করিয়াছি। রবার্ট কার্নোয়েল যদি এই ব্যাপারের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে কোন স্ত্রীলোকের কুহকে ভুলিয়াই ইহাতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আর সে সামান্য স্ত্রীলোক নহে, ধনগৌরবে পদ-মর্য্যাদায় সমাজে তাহার স্থান অত্যন্ত উচ্চ বলিয়াই বোধ হয়।”

“ঠিক বলিয়াছেন; কিন্তু কে এই রমণী আপনি জানেন

চিত্রশিল্পী—লর্ড লেটন্, P. R. A.]

না, আপনারা কয়েকটা রুষের পিছনে মিছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একটা ফরাসী মহিলাই এই পাপিষ্ঠ নিহিলিষ্টদিগের নায়িকা—আজ থিয়েটারে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।"

এই সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন ও ফন্দী আঁটিয়া উভয়ে হোটেল হইতে বাহির হইয়া থিয়েটারের দিকে চলিলেন। রাজপথে চলিতে চলিতে বরিসফ বলিলেন, "আমরা হোটেল ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছি। থিয়েটারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, এই সিগারটা শেষ করিতে পারিব।"

"আমি সেই স্ত্রীলোকটির আসনের নিকট দুইটি আসন পূর্ব্ব হইতে ভাড়া করিয়া রাখিয়াছি, তখন আর চিন্তা কি ?"

"আপনি দেখিতেছি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আপনি যদি আমার সাক্ষাৎ না পাইতেন—"

"আমি নিজেই থিয়েটারে যাইতাম। রমণীকে দেখিবার এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতাম না। পরে আপনাকে সকল কথা বলিতাম। কিন্তু যখন শুনিলাম আপনি ক্লাবে গিয়াছেন, তখন একেবারে ক্লাবে গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিলাম। ভাল কথা, আপনি এখানে বেশ সুখে আছেন? রুদে ভিগনীর ঐ চমৎকার বাড়ীটাতেই আপনার বন্দী আছে না?"

"হাঁ, তাহাকে খুব নিরাপদ স্থানে রাখা হইয়াছে। বাড়ীটা প্রকাণ্ড এবং উহার চারিদিকে খোলা। সেণ্টপিটার্স-বর্গের কোন দুর্গে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলে সে যেরূপ থাকিবে, ওখানেও ঠিক তেমনই আছে।"

"কিন্তু চাকরদের, বোধ হয়, বিশ্বাস করিয়া আপনাকে সব কথা বলিতে হইয়াছে।"

"হাঁ, কিন্তু ইহারা সকলেই পুরাতন সৈনিক। রুষ গবর্ণমেণ্ট গুপ্ত পুলিশের কাজে ইহাদিগকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিনাবাক্যে আদেশ পালনে ইহারা অভ্যস্ত। এই ফরাসীটাকে নিকাশ করিবার ইচ্ছা হইলে, ইহাদিগকে একটু ইঙ্গিত করিলেই সব সাফ্।"

"কিন্তু আপনি ত তাকে বন্দী করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন?"

"আমরা তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছি, তাহাতে তাহার পক্ষে পলায়ন অসম্ভব, বাহিরের লোকের সহিত কথোপকথন করিবার কোন সুবিধা নাই, আমার প্রতিবেশীও কেহ নাই।"

রাজপথের মোড় ফিরিয়া উভয়ে "প্লেস ডি ল' অপেরা'য় প্রবেশ করিলেন। তখন যদি দুইজনের মধ্যে একজনও পশ্চাদভিমুখে ফিরিয়া চাহিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, অনতিদূরে ম্যাক্সিম তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছেন। ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইহারা দুইজনেই থিয়েটারে যাইতেছে দেখিতেছি, উভয়ের ঘনিষ্ঠতাও খুব। এই কার্ডকিটা বিশ্বাসঘাতক, কাউণ্টেসকে এ কথা বলিতে হইবে।" ম্যাক্সিম নিয়মিত রূপে থিয়েটারে যাইতেন, সুতরাং তাঁহাকে আর টিকিট কিনিতে হইল না। বরিসফ ও মোরাটাইন থিয়েটারে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরে ম্যাক্সিম থিয়েটারে গমন করিলেন। তিনি নৈশ ভ্রমণোপ-যোগী পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই, তাই তিনি একেবারে আসন গ্রহণ না করিয়া রুষিয়ানদ্বয় কোথায় উপবেশন করিয়াছে, দেখিবার জন্য প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা ষ্টলে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থান হইতে অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত উহাদিগের উপর নজর রাখা যায়। ম্যাক্সিম যবনিকাপতন পর্য্যন্ত সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ম্যাক্সিম যে থিয়েটারে আসিয়াছেন, বরিসফ কি মোরাটাইনের মনে এরূপ সন্দেহ হয় নাই। তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বক্সগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বক্সগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মোরাটাইন বলিল,—"সুন্দরী এখনও আসে নাই।"

"সে আসিবে, এ কথা আপনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন?"

"নিশ্চয় করিয়া? না। একেই স্ত্রী চরিত্র বুঝা ভার, তাহার উপর তাহার ন্যায় রমণী সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া কঠিন।"

এই সময় বরিসফ বলিয়া উঠিলেন "ঐ যে আমা-দিগের দক্ষিণ দিকে একটি সুন্দরী আসিতেছেন।"

"ঐ ত সেই সুন্দরী, হাজার লোকের মধ্যে থাকিলেও তাহাকে চিনিতে আমার ভ্রম হইবে না। অমন চোক আর দেখা যায় না।"

"দেখুন দেখুন, সুন্দরীকে কি চমৎকার দেখাইতেছে!"

নবাগতা সুন্দরী সম্মুখস্থিত একটি আসনে উপবেশন

করিলেন। দর্শকগণের চক্ষু রূপসীর দিকে আকৃষ্ট হইল। সুন্দরী "অপেরা গ্লাস" নামাইয়া রাখিবামাত্র ম্যাক্সিম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সবিস্ময়ে মনে মনে বলিলেন, "একি ম্যাডাম সার্জ্জেট এখানে! তাই ত, খুব সাহস দেখিতেছি যে! আমার সঙ্গে সেরূপ চতুরালী করিবার পর সে অনায়াসে এখানে আসিয়াছে। বোধ হয় সে পারিস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই কার্পেথিয়ান শূকরটাকে সম্ভবতঃ দেশে রাখিয়া আসিয়াছে, এবং আবার ঐরূপ আর একটি লোক সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। কিন্তু আমি উহাকে ছাড়িব না, কে আমার জেঠার সিন্দুক হইতে দলিল চুরি করিয়াছে; উহার নিকট হইতে সে কথা বাহির করিতেই হইবে। বরিসফ যাহা করিবার হয় করুক, কাউণ্টেসকে তাহার কথা বলিলেই চলিবে। কিন্তু আজ এই সুযোগ ছাড়িলে, ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে আর ধরিতে পারিব না। এখনই তাহার বক্সে গিয়াই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। এইবারই ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের নিকট যাইবার সুযোগ উপস্থিত। ম্যাক্সিম বক্স যাইবার পূর্ব্বে আর একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বরিসফ ও তাঁহার বন্ধু আসন ত্যাগ করিতেছেন, ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন। একি ভ্রান্তি? না,—ঐ যে বিদেশীরা মস্তক নত করিয়া সুন্দরীকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে। ম্যাক্সিমের বড়ই বিস্ময় বোধ হইল। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। চোরের সহচারিণী, হৃতদ্রব্যের অধিকারী ও কাউণ্টেস ইয়াণ্টার তরবারি-শিক্ষক—এ তিনের এমন বিচিত্র মিলন সম্ভবপর হইল কিরূপে? ইহারা কি আজ তাঁহাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিবার জন্য অদ্ভুত কৌতুক-নাট্যের অভিনয় করিতে আসিয়াছে? কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা সম্বন্ধেও তাঁহার মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। "দেখিতেছি, কাউণ্টেস্ অনেক অদ্ভুত সংবাদ জানেন, ষড়যন্ত্র করিতেও ভালবাসেন। আজ একি হইল? এই "কার্ডকিটা কি কাউণ্টেসের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিতেছে, না কাউণ্টেস আমাকে প্রতারিত করিতেছেন? চুলায় যাউক সব। আমি এই ষড়যন্ত্রের ত অনেক দেখিলাম, এইবার তাহাদিগের জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে!" কিন্তু সংকল্প এক, কাজ করা আর। এই দীপালোকোদ্ভাসিত নাট্যশালায়, শত শত দর্শকের সম্মুখে, দুইটি ভদ্রলোকের পার্শ্বস্থিতা সুন্দরীর বক্সে প্রবেশ করা ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে বিবাদ ও বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই ম্যাক্সিমকে নিরস্ত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। সুন্দরী হাসির জ্যোৎস্না ছড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার নীলনয়নে কি গভীর ভাবময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টি! কটাক্ষে কটাক্ষে কি স্বপ্ন, কি মোহের সৃষ্টি! করপল্লবে মৌরিটাইনের হাত ধরিয়া সুন্দরী বলিতেছিলেন, "বন্ধু, আজ আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আপনি জানেন না। আমি এই মাত্র মোনাকো হইতে আসিয়াছি, একখানি পরিচিত মুখ চোখে পড়ে নাই। কিন্তু আপনি আমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য!"

আইভান বলিলেন, "আপনাকে একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না।"

"ছয়মাস অনুপস্থিতির পর সকলকেই ভুলিতে পারা যায়। তা যাক্, আপনি আপনার বন্ধুটির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিন।"

"কর্ণেল বরিসফ আমারই স্বদেশী,—প্রিয় কর্ণেল, আমরা ম্যাডাম গার্চেসের বক্সে আসিয়াছি।"

তখন তিনজনে হাসি, গল্প ও পরিহাস চলিতে লাগিল। কিন্তু বক্সে প্রবেশ করিবার পর হইতে বরিসফ কেমন অসচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ এই বন্ধু লাভ, তাহার পর এই মুখরা, মধুরাধরা, নক্ষত্র-ভাস্বর-কটাক্ষশালিনী সুন্দরীর সহিত আলাপ। বরিসফ কি বলিবেন, কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার উপর সুন্দরীর সেই ছলভরা, বলহরা চোখ-জোড়া ভারি উপদ্রব করিতেছিল। কথায় কথায় সুন্দরী আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার এই জীবন কেমন?" আইভান বলিলেন "বড়ই আনন্দময়। কোন কিছুর ঠিক নাই, কেবল খেয়ালের খেলা।" ম্যাডাম গার্চেস একাগ্র

দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মত ত শুনিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার বন্ধুর কি মত?"

কর্ণেল আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া বলিলেন, "বন্ধুর মতেই আমার মত, সুখ-সম্ভোগই জীবনের সার। আমিও যদৃচ্ছা সঙ্গী-নির্ব্বাচন করিয়া থাকি।"

"সত্য? আমি ভাবিয়াছিলাম রুষ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে কোন বিশেষ গোপনীয় কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন; জেনারেলের মুখে ত ঐরূপই শুনিয়াছিলাম—লোকটা আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। তার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন না, তার নাম মুখে আনিতেও আমার ইচ্ছা নাই।"

"আমার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি আপনার মনে আছে?"

"বেশ মনে আছে। আপনি আমাদিগের প্রতিবেশী বলিয়াই আপনার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। রুদে ভিগনির খুব নিকটেই আমার বাস।"

"বলেন কি? আমি কোথায় থাকি, তাহাও আপনি জানেন?"

"বইসে যাইবার সময় আমি একখানি সুন্দর ফিটনে আপনাকে অনেকবার দেখিয়াছি। আমি স্বভাবতঃ কিছু কৌতূহলপরবশ। জেনারেলকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য রুষ ভদ্রলোক।"

"আমার উপর তাঁহার খুব কৃপা।"

"তা হতে পারে, কিন্তু জেনারেল আমাকে বলিয়াছিল আপনি পুলিশের লোক।" এই কথায় কর্ণেল ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া বলিলেন, "পরিহাস করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন বুঝি?"

মৌরিটাইন বলিলেন,—"নেহাৎ নির্ব্বোধের মত পরিহাস যে! আমাকেও কি গুপ্ত পুলিশের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিল নাকি?"

"না, সে তামাসা করে নাই, আমাকে সে কর্ণেলের পরিচয় দিয়াছিল। আর তিনি কি উপলক্ষে আসিয়াছেন তাহাও বলিয়াছিল।"

বরিসফ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"তাহা হইলে আমার একটা কাজ একটা উদ্দেশ্য আছে? শুনিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম, আমার নিজের কাছে নিজের মহিমা অনেকটা বাড়িয়া গেল।"

"শুনেছি, নিহিলিষ্টদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য আপনি নিযুক্ত হইয়াছেন।" "তাহা হইলে ত আমার কাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা নিহিলিষ্টগণ আজ কাল খুব কাণ্ড বাধাইয়াছে।"

"রুষিয়ায় তাহারা নানা কাণ্ড করিতেছে বটে। কিন্তু পারিসের নিহিলিষ্টদিগের উপর দৃষ্টি রাখা আপনার কাজ, জেনারল ত আমাকে এই কথাই বলিয়াছিল।"

মৌরিটাইন বলিল,—"তাইত, আমি যখন সুইজারলণ্ডে ছিলাম, তখন একথা বলেন নাই কেন? আপনার গোয়েন্দাকে লইয়া খুব খানিকটা মজা করা যাইত।"

ম্যাডাম গার্চেস সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি একথা বিশ্বাস করেন না, বুঝি?"

"আমার ত ধারণা, বন্ধু বরিসফ পারিসে সত্য সত্যই মস্ত একটা কাজ করিতেছেন,—আর সে কাজটাও খুব শক্ত নয়। তাঁহার অনেক টাকা আয়, সেই টাকা খরচ করিয়া তিনি রূপরঙ্গিণীদের অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যস্ত আছেন।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া জানিতে পারিতাম;—কিন্তু আপনার বন্ধুরই আমার কথার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু আপনি একাই কথা কহিতেছেন।"

"প্রতিবাদ করিব?"—বরিসফ বলিতে লাগিল,—"তা আমি কখনই করিব না। বরং আপনি আমাকে রুষিয়ার পুলিশের বড় কর্ত্তা বলিয়া ঠাহরাইয়া লউন, তাহা হইলে আমি দেখাইতে পারিব আমি যত বড় লোকই হই না কেন, আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতে আমার কিছুই আট্‌কাইবে না।"

"বেশ কথা, আপনার কথায় আমার কত আনন্দ হইল কি বলিব। আপনি রাজনৈতিক কর্ম্মচারী নহেন—এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হইল। জেনারেলটা পাগল—তাই বা হবে কেন,—আপনাকে দেখিতেছিলাম বলিয়া হয়ত তাহার মনে ঈর্ষ্যা হইয়াছিল। তাই আপনার মিথ্যা নিন্দা করিয়াছিল। যাক্, আপনার সঙ্গে জানা-শুনা হইল, ভালই হইল। আমি কয়েক দিন প্যারিসে

থাকিব,—এ দিন কয়টা আপনাদিগের সঙ্গে আনন্দে কাটাইতে পারিব।"

সুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া দুই বন্ধুর মনেই বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। বরিসফ ত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, এই মনোমোহিনী সুন্দরীকে হস্তগত করিয়া তিনি যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন, পুনর্ব্বার কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। আইভান ইঙ্গিতে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছিল। ম্যাডাম গার্‌চেস মুগ্ধভাবে সঙ্গীতরসমাধুর্য্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ম্যাক্সিম যে অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তিন জনের মধ্যে কেহই জানিতেন না। আইভান আবার কি প্রকারে নিহিলিষ্টদিগের কথা পাড়িবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

সহসা সুন্দরী বরিসফের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি ভাবিতেছি, জানেন?"

বরিসফ বলিল,—"না, কিন্তু আমি আপনার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছি, তাহা আমি জানি।"

"আমি নাটকের চতুর্থ অঙ্কের নাট্যবৈচিত্রপূর্ণ দৃশ্যের কথাই ভাবিতেছি। মানুষের জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মৌরিয়াটাইন বলিল "সে কাল আর নাই, মানুষের প্রবৃত্তি এখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।"

"আপনি তাই মনে করেন না কি। কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া ত আমি মনে করি না। প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির একটু সংস্রব থাকিলে এইরূপ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি অনায়াসে হইতে পারে। মনে করুন, আপনাদিগের দেশের এক নিহিলিষ্ট-সুন্দরী সম্রাটের একজন পারিষদের প্রেমানুরাগিণী! ডিনামাইট দিয়া রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। সুন্দরীর প্রেমাস্পদকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজপ্রাসাদে থাকিতে হইবে। সুন্দরী ষড়যন্ত্রের কথা জানে,—তাহার প্রেমাস্পদ এখন তাহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে; কিন্তু সে নানা ছলে তাহার গমনে বিলম্ব ঘটাইতেছে। প্রেমিকার এই ব্যবহারের জন্য রাজ-পারিষদ তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতেছে। এখন প্রণয়ীকে ধ্রুব-মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অথবা, ষড়যন্ত্রকারীদিগের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা ভিন্ন রমণীর পক্ষে আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

কর্ণেল হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নিহিলিষ্ট-সুন্দরীদিগকে যেরূপ কাব্য-মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখিতেছেন, বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নয়।" এই বলিয়া বরিসফ নিহিলিষ্ট রমণীদিগের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অদ্ভুত সাহস, ব্রত পালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্তি, প্রভৃতির পরিচয় দিলেন।

তিন জনে কিছুক্ষণ এই বিষয়েই কথা হইতে লাগিল।

কথা শেষ হইলে আইভান বলিলেন, "যদি আমাদিগের ন্যায় দুইজন অনুগত বীরপুরুষ আপনাকে আপনার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দেন, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"আপনি নিজের ও আপনার বন্ধুর কথা বলিতেছেন, বুঝি?"

"হাঁ, এ ভিন্ন এখন আপনি আর কি করিবেন? আমরা আমোদে কাটাইতে চাহি। আমরা আনন্দের সহিত আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিব। কি বলেন?—আজ রাত্রি হইতেই আরম্ভ করা যাক্‌।"

"আজ কোথাও নাচ টাচ নাই?"

কর্ণেল বলিলেন, "কিন্তু একত্র ভোজনের সুবিধা সব সময়েই আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে রুদে ভিগনির সেই বাড়ীতে আহার করেন, তাহা হইলে"—

"আমি কেবল নিজ গৃহে ও ভোজনাগারেই আহার করিয়া থাকি।"

"নিজ গৃহে! আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি কয়েক দিনের জন্য এসেছেন।"

"কিন্তু এখানে আমার বাসের জন্য সুসজ্জিত গৃহ আছে, সে বাড়ীটি আপনার গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী নহে। আমার একার পক্ষে সেই গৃহই যথেষ্ট।"

মৌরিয়াটাইন হাসিয়া বলিল "আপনার ও জেনারেলের পক্ষে বলুন।"

"জেনারেল কখনই সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন নি। পথের সঙ্গী হিসাবে আমি তার সঙ্গ সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলে তা'কে প্রশ্রয় দিবার পাত্রী আমি নহি।"

"তা'রপর আর কাহাকেও তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত করেন নাই ?"

"না আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি কখনই কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করিব না। আমি একাকিনী বাস করি, যদি কথায় বিশ্বাস না হয়, আসুন, আজ আমার গৃহে আহার করিবেন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।"

কর্ণেল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার আতিথ্য-গ্রহণ করিবার জন্য আমার খুব লোভ হইতেছে, বুঝেছেন ?"

"যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, আমি বড়ই দুঃখিত হইব। বোধ করি, আমার বাটীতে পরিতোষরূপে ভোজনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আপনি কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। প্রত্যহ আমার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত থাকে। আমার অর্থ আছে। আর আমি ভোজন-বিলাসিনী, একথাও আপনাকে বলিয়াছি।"

মৌরিয়াটাইন বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি, আপনি রমণীকুলের মণি, আর আমি আপনার পরম ভক্ত। ভোজন-বিলাসিনী সুন্দরী দুনিয়ায় বড়ই দুর্ল্লভ।"

"শুধু তাই নহে, আমার গৃহে সুপেয় সুরারও অভাব নাই। এবার বোধ করি, আপনাদিগের আসিতে আপত্তি হইবে না।"

বরিসফ কথা কহিলেন না, তাঁহার বন্ধু একাগ্র-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। এই সুন্দরীর সহিত একত্র ভোজন, তাঁহার পক্ষে বড়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কার্য্যটা তাঁহার নিজ গৃহে হইলেই যেন ভাল হইত।

সুন্দরী অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখিতেছি, আমার নিমন্ত্রণ আপনাদিগের নিকট ভাল লাগিল না। আমিও আর আপনাদিগকে অনুরোধ করিব না।"

"সে কি, আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আপনার বাড়ীতে আজ না খাইয়াই ছাড়িব না।"

"কিন্তু আপনার বন্ধুর সে অভিপ্রায় দেখিতেছি না। তাঁর সঙ্গে আবার তেমন আলাপও নাই; তাহার উপর আজকালকার এই নিহিলিষ্টদিগের ষড়যন্ত্রের দিনে সাবধান হইয়া চলাই ত বুদ্ধিমানের কাজ।"

"কিন্তু নিহিলিষ্টদিগের সহিত এই সুখ-সম্মিলনের সম্পর্ক কি ?"

"আমি যে নিহিলিষ্টদলের কেহ নহি, তার স্থিরতা কি ? এইমাত্র আমি বলিলাম না, তাহাদের দলের একটি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। এই রমণীর সহকারীর মঙ্গলা-মঙ্গল সম্বন্ধেও আমি ভাবিতেছি। আর এক পা অগ্রসর হইলেই ত আমি তাহাদিগের দলের একজন হইতে পারি।"

"আপনি কি বলিতে চান, আজ সন্ধ্যাকালটা আপনার গৃহে গমন করিলে আমরা কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী ডাকাতের হাতে পড়িব ?"

হাসিতে হাসিতে সুন্দরী বলিলেন, "কর্ণেল বলিলেন না, নিহিলিষ্ট-রমণীরা সব করিতে পারে ?"

বরিসফ এতক্ষণে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা একবারও আমি মনে ভাবি নাই। আপনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যেখানে লইয়া যাইবেন, আমরা আনন্দিত চিত্তে সেখানেই যাইব; যদি পৃথিবীর সমস্ত নৃশংস ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত বসিয়া আহার করিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত নই। আপনি, আপনার সেই নিহিলিষ্ট-বান্ধবী, আর তাঁহার সেই প্রণয়ীকেও নিমন্ত্রণ করুন না, দেখিবেন, কেমন আমোদ করি।"

"আপনার কথাই আমি গ্রহণ করিলাম। বান্ধবীকে পাওয়া যাইবে না, সে বোধ করি, রুষ-পুলিশের হাতে পড়িয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে গিয়াছে।"

আবার পূর্ব্বের মত হাসি-গল্প চলিতে লাগিল। ম্যাডাম গার্‌চেস নিবিষ্টচিত্তে রঙ্গভূমির দিকে চাহিয়াছিলেন। নাটকের অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা তিনি অপেরা গ্লাস তুলিয়া লইয়া একটি বাক্সের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বাক্সে দুইটি মহিলা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে একটি পুরুষের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। ম্যাডাম গার্‌চেস মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য, আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, এই সেই ব্যক্তি।"

মৌরিয়াটাইন বলিল, "কে ? আপনার সেই জেনারেল ?"

"আমি তার কথা বড় একটা ভাবি না, কিন্তু যাহাকে দেখিলাম, তাহাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই!"

মৌরিয়াটাইন পূর্ব্ববৎ বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিল "আপনার নিহিলিষ্ট প্রণয়ী বুঝি ?"

সুন্দরী বাক্সের দিকে চাহিয়াই বলিলেন "তাহাতে আপনার কি আসিয়া যায় ?"

"না তা নয়, তবে যে দুইজন রমণীর পশ্চাতে তিনি বসিয়া আছেন, তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু যে ভদ্রলোকটিকে আপনি অমন করিয়া দেখিতেছেন, তাহার গোঁফ ছাড়া ত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। আর মহিলা দুইটি দেখিতেছি, সুন্দরীও নয়, যুবতীও নয়।"

"আমি ও দুইটি মহিলাকে চিনি, উহারা বড়ই ইতর প্রকৃতির বিধবা; কোন দেউলিয়া বড় লোককে বিবাহ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে।"

সুন্দরী বলিল "সাদৃশ্য বড়ই চমৎকার, কিন্তু সত্যসত্যই যদি সেই লোকই হয়, তাহা হইলে আরও বিস্ময়ের কথা।"

"আপনি যেমন করিয়া ভদ্রলোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিলে উনি বড়ই আনন্দিত হইতেন, এবং এখনই আপনাকে দেখা দিতেন।"

"সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ।"

"তাহা হইলে ঐরূপ করিয়া লুকাইয়া থাকিবার একটা বিশেষ কারণ আছে; না? লোকটাকে আপনি চেনেন, দেখুন দেখি।"

"পারিসে আমার যাতায়াত অতি কম যে, থিয়েটারে কাহাকেও চিনিতে পারিব। আপনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করুন না।"

"মসিয়ে বরিসফ হয়ত লোকটাকে চিনিতে পারেন, লোকটাকে বোধ হয় আমি চিনিতে পারিয়াছি, উহার নাম মসিয়ে কার্ণোয়েল।"

এই নাম শুনিয়া কর্ণেল ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন; তিনি ভাব গোপন করিয়া বলিলেন "ফরাসী রাজনীতিকের পুত্র মসিয়ে কার্ণোয়েল না?"

"আমার ত তাহাই বোধ হইতেছে। আপনার সঙ্গে তবে কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"হাঁ অনেকবার দেখিয়াছি, দেখিলেই চিনিতে পারিব।"

তখন আবার মসিয়ে কার্ণোয়েলের সহিত বক্সের রমণীদিগের বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় কর্ণেল বলিলেন, "মসিয়ে কার্ণোয়েল, পারিসেই আছেন। তিনি দরিদ্র হইলেও ঐ রমণীদিগের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভবপর নহে।"

মাড্যাম গার্‌চেস বক্সের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সহসা অপেরা গ্লাস রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বড়ই বিস্ময়ের কথা, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই ঠিক অনুমান করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি সেই লোক নহে। ইনি আসন ত্যাগ করিয়াছেন, মসিয়ে কার্ণোয়েলের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই।"

মৌরিয়াটাইন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "এই কার্ণোয়েল খুব ভাগ্যবান পুরুষ; আপনি দেখিতেছি, তাঁহার চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন। ইনি কেমন করিয়া কোথায় আপনার হৃদয় হরণ করিলেন, দয়া করিয়া বলিবেন কি?"

সুন্দরী কোপদীপ্ত নয়নে বলিলেন, "আপনার এ প্রশ্ন বড়ই অশোভন। কেহই আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। আমার ফ্লোরেন্স-প্রবাসিনী বান্ধবী এই যুবক সম্বন্ধে সংবাদ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার বিষয়ে আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। বান্ধবী আমার নিকট একটি বাক্স গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বলিয়াছেন, যদি আমি এই যুবকের সাক্ষাৎ পাই, তাহা হইলে, বাক্সটি তাঁহাকে দিব। আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

বরিসফ চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "যদি অনুমতি হয় বাক্সটি আমি মসিয়ে কার্ণোয়েলের নিকট প্রেরণ করিতে পারি। আমি তাঁহার ঠিকানা জানি। তিনি আমার নিকট পরিচয় মাত্র চাহিয়াছেন। আপনি আদেশ করিলে আমার খানসামা বাক্স লইয়া যাইবে।"

"আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু আমি স্বয়ং তাঁহার হস্তে বাক্সটি দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আমি এই ব্যাপার লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি, কারণ আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে পারি না। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিব, বোধ করি, তিনি আমার বাটীতে যাইতে অসম্মত হইবেন না।"

"কখনই না। কিন্তু আর প্রতীক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। কারণ তিনি যে কোন মুহূর্ত্তেই পারিস হইতে চলিয়া যাইতে পারেন। আমি তাঁহার মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি কালি অপরাহ্ণে চলিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে।"

ম্যাডাম গার্চেস আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার পক্ষে পারিস ত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এখন উপায় কি ?"

বরিসফ বলিলেন,—"আপনি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সত্যই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন ? আজই কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিবেন ?"

"কেন করিব না, অল্পক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে আমার কথা শেষ হইবে, আমাদের ভোজনের কোন বিঘ্নই হইবে না।"

"বেশ। আমি তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেছি; দেখা হইলে তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। আর যদি দেখা না হয়, আমার কার্ডে একছত্র লিখিয়া তাঁহাকে আনাইব। রুদে জেফ্রয়ে আমি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি স্বভাবতঃ মনে করিবেন, আমার নিকট যে অনুরোধ পত্র চাহিয়াছেন, সেই পত্র সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতে চাহি। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। আপনি যদি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে সজ্জনের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিব।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এখনই গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতেছি ! আপনি বাটী পঁহুছিলে আমি মসিয়ে কার্ণোয়েলের সন্ধানে বাহির হইবে।"

দুই বন্ধু বক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দুই জনের মধ্যে কেহই ম্যাক্সিমকে দেখিতে পাইলেন না। যাইতে যাইতে মৌরিয়াটাইন বলিলেন "কেমন, আমি ঠিক পরামর্শ দিয়াছিলাম না ? চোরের সঙ্গে এই সুন্দরীর আলাপ আছে। এখন আপনি একটু কৌশল খাটাইতে পারিলেই দলকে দল ফাঁদে ফেলা যাইবে।"

"কিন্তু খুব সাবধান না হইলে সমস্ত মাটী হইতে পারে।"

উভয়ে মৃদু স্বরে পরামর্শ করিতে করিতে চলিলেন। সোপান হইতে অবতরণ করিতে করিতে কর্ণেল বলিলেন, "শীঘ্র একখানি গাড়ী দেখা যাক, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়।"

শূন্য শৃঙ্খল*

[লেখক — শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

কোথায় পাখি, ওরে বালার
সাধের পোষা পাখি,
উড়িয়া গেলি কোন্ গগনে
দিয়ে সবায় ফাঁকি।
শিকল আজি জানায় কাঁদি
রাখিতে তোরে পারেনি বাঁধি,
ভাবিছে বালা কমল-করে
কপোল—রাঙা-আঁখি।
কোন্ গহন কাননভূমি
কোন্ শ্যামল শাখী,
কোন্ গগন কোন্ পবন
লইল তোরে ডাকি ?
কোন্ মধুর ফলের রাশি
কোন্ ফুলের মধুর হাসি
ভুলালো তোরে, ভুলালো তোর
পরাণ, মন, আঁখি।
কেমন করে ভুলিলি ওরে
ও মধু ভালবাসা,
মিলিবে কোথা এত আদর
এমন মধু ভাষা।
তিয়াসা মাখা কমল আঁখি
কোথায় গেলে পাবিরে পাখি,
অমন হৃদি ছাড়ি কোথায়
বাঁধবি বল বাসা।
ওরে সুদূরযাত্রী ওরে
ওরে অবোধ খল,
স্নেহের শত-বাঁধন তোরে
টানিবে কি না বল!
তুঁহার লাগি হতাশ প্রাণে
চাহিছে বালা শিকল পানে
সলিলে আহা উঠিছে ভিজি
নয়ন শতদল।
সোণার ওই শিকল খালি
শূন্য দাঁড়ে গাঁথা,
ভুলিতে তারে দেবে না যেরে
ভুলিতে তোর ব্যথা।
তুইত সেথা নূতন নীড়ে
কত যে গান গাইবি ফিরে
সে গীত মাঝে রহিবে কিরে
তাহার কোন কথা ?

* আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" চিত্র দেখিয়া লিখিত।

ইতালীয় শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি

[লেখক—শ্রীবিনয় কুমার সরকার, M.A.]

মধ্য-যুগের অবসানকালে ইউরোপে নবজীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইতালীর বেশ উন্নত অবস্থাই ছিল।

প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা ইতালী হইতে সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে নাই। অসভ্য বর্ব্বরগণের অবাধ তাণ্ডব-লীলার মধ্যেও প্রাচীন উৎকর্ষের নানা অনুষ্ঠান ইতালীতে বর্ত্তমান ছিল। কৃষিকর্ম্ম ও শিল্প-চর্চ্চা মন্দ হইত না। জলবায়ুর গুণে এবং ভূমির উর্ব্বরতায় ইতালীয় কৃষকেরা প্রচুর শস্যই উৎপাদন করিত। ইতালীর ভিতর যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের জন্য পথপ্রণালী সুবিস্তৃত ছিল না। কিন্তু সমুদ্র-পথে ইতালীয়েরা ব্যবসায় বেশ চালাইত। এই সমুদ্র-বাণিজ্যের ফলে ইতালীর কূলে কূলে সাহসী নাবিকগণের পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অধিকন্তু দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে ইতালীর বিশেষ সুবিধা ছিল। গ্রীস্, এসিয়া মাইনর্ এবং মিশর এই তিন দেশের অতি সন্নিকটেই ইতালীর অবস্থান। কাজেই এই দেশসমূহের পণ্যদ্রব্য উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রে চালান দিবার জন্য ইতালীর বণিক্ সম্প্রদায়কে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। পাশ্চাত্য ইউরোপ ও প্রাচ্যজগতের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় এবং ভাব বিনিময় সাধন করা ইতালীর সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইতালীয় জনগণ প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের নানা বিদ্যা ও শিল্প অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিত।

ইতালীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অল্প সাহায্য করে নাই। দশম শতাব্দীতে অটো দি গ্রেট্ ইতালীয় নগরসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তখন হইতে এই নগরপুঞ্জের রাষ্ট্রশক্তি শিল্প ও ব্যবসায়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই বৈষয়িক উন্নতি দেখা দেয়। জগতের ইতিহাসে এই সত্য অনেকবার সপ্রমাণ হইয়াছে। ইতালীর শিল্পোন্নতিও এই সত্যের সাক্ষী।

যেখানে শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসায়ের প্রসার লক্ষ্য করিবে, সেখানেই জানিবে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আগতপ্রায়। আর যদি কোথাও দেখ যে, স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িতেছে, সেখানেও বুঝিবে, জনগণের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন জাতি অন্নকষ্টে মরে না। আবার অন্নকষ্ট দূর হইলে পরাধীনতাও পলাইয়া যায়। ইহা সমাজচরিত্রের স্বাভাবিক গতি। যখনই মানুষ ধনসম্পদের অধিকারী হয় অথবা জ্ঞানবিজ্ঞানশিল্পের আবিষ্কারসমূহ আয়ত্ত করে, তখনই সেইগুলি রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এইগুলি রক্ষা করিবার জন্য এবং বংশানুক্রমে ভবিষ্য সমাজের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য আবশ্যক। কাজেই ঐশ্বর্য্যশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পাইতে চায়। আবার, মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইলে সে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রয়োগ করিতে সুযোগ পায়। এই স্বাধীন প্রয়াসের ফলে নানা বিষয়ে তাহার প্রতিভা ফলবতী হইতে থাকে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্র মার্জ্জিত হয়, এবং বৈষয়িক ও শারীরিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়।

স্বাধীনতা পাইয়া ইতালীয় নাগরিকগণ বিচিত্র উপায়ে সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে লাগিল। ইতালীর নানা স্থানে পল্লী, নগর ও জনপদ সুবৃহৎ ধন-কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ দিকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সংগ্রামের প্রভাবেও ইতালীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। ইতালীর অর্ণবপোতের সাহায্যে খৃষ্টান সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিত। ইতালীয় পোতেই তাহাদের যুদ্ধসামগ্রী এবং আহার্য্যদ্রব্য চালান হইত। অধিকন্তু, এই সুযোগে প্রাচ্য জগতের বিভিন্ন শিল্প ও কারুকার্য্য ইতালীয়েরা স্বদেশেই প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইল। ধনাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের ফলে ব্যবসায়িগণ অধিকতর সমৃদ্ধি-

---

* জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফ্রেড্রিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক বিভাগে'র এক অধ্যায়।

সম্পন্ন হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত দেশের ভূম্যধিকারীরা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় নগর-রাষ্ট্রসমূহ তাঁহাদের উৎপীড়ন ও অন্যায় আদায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এই কারণেও ইতালীর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ভেনিস্ ও জেনোয়া—এই দুই নগরই ইতালীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রায় সমকক্ষভাবে ফ্লোরেন্স্ নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার শিল্প, কারুকার্য্য এবং মুদ্রা-ব্যবসায় ইতালীর বৈষয়িক মহলে সুপরিচিত ছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স্ নগরে রেশম ও পশমের কারবার করিয়া লোকেরা যথেষ্ট লাভবান্ হইত। এই ব্যবসায়ের মণ্ডলীসমূহ রাষ্ট্রকর্ম্মে প্রধান হইয়া উঠিল। ইহাদের প্রভাবেই ফ্লোরেন্সের গণ-শক্তিমূলক প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়।

পশমের কারবারেই ২০০ কারখানা চলিত। প্রতি বৎসর ৪০,০০০ খানা বস্ত্র প্রস্তুত হইত। স্পেন্ হইতে পশম আমদানী করা হইত। তাহা ছাড়া, স্পেন্, ফ্রান্স্, বেলজিয়াম্ এবং জার্ম্মানি হইতে সেই সকল স্থানে প্রস্তুত বস্ত্র ফ্লোরেন্সে আনা হইত। পরে এই নগরের তন্তুবায়েরা সেই সমুদয় বস্ত্র নানা কারুকার্য্যে শোভিত করিয়া লেভাণ্ট্ দ্বীপ এবং এসিয়া মাইনরে রপ্তানী করিত।

মুদ্রাব্যবসায় ফ্লোরেন্সের একচেটিয়া ছিল। সমস্ত ইতালীর ব্যবসায়ীরা এই নগরের ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা ধার লইত। এই সকল লেন-দেন কার্য্যের জন্য এখানে ৮০টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতালীয় বণিকগণের ব্যবসায়ের পরিমাণ ইহা হইতেই বুঝা যায়।

ফ্লোরেন্স্ একটা নগর মাত্র ছিল সত্য। কিন্তু এই নগর-রাষ্ট্র তখনকার বড় বড় দেশ-রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। রাণী এলিজাবেথের আমলে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড্ এবং আয়র্ল্যাণ্ডের সম্মিলিত রাজস্ব অপেক্ষা ফ্লোরেন্স-নগরে রাজস্ব অধিক আদায় হইত। সেই সময়ে নেপ্‌ল্‌স এবং আরাগণ্, এই দুই রাজ্যের সমবেত কোষাগারে বার্ষিক যত রাজকর জমা হইত ফ্লোরেন্স্-নগরের এই বণিক্-রাষ্ট্রে তাহা অপেক্ষা বেশী আদায় হইত।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীর বৈষয়িক অবস্থা সর্ব্বাংশেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইতালী, শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ অগ্রগামী ছিল। ইতালীয় কৃষি, শিল্প ও কারুকার্য্য দেখিয়া অন্যান্য ইউরোপীয়েরা স্বদেশে নূতন নূতন ধনাগমের পথ প্রস্তুত করিত। ইতালীর দৃষ্টান্ত ইউরোপের সর্ব্বত্র আদৃত হইত। ইতালীর রাজপথ এবং খাল ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজকাল সভ্যজগতে যতগুলি রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই ইতালীতে প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। টাকা জমা-রাখা ও ধার দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক্-প্রতিষ্ঠা ইতালীতেই প্রথম হয়। সমুদ্রপথে নাবিকগণের দিক্-ভ্রম নিবারণ করিবার কম্পাস্-যন্ত্র ইতালীর আবিষ্কার। সমুদ্র-বন্দর সমুদ্র-পোত, পোতাশ্রয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার উন্নত উপায়ও ইতালীয় কারিগরেরাই প্রথম আবিষ্কার করে। ব্যবসায়ক্ষেত্রের জন্য সহজ বিনিময়-প্রণালী এবং দেনা-পাওনা শোধ করিবার সরল উপায় সমূহ ইতালীয় বণিকগণের কার্য্যফলেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আজকাল সভ্য-জগতের ব্যবসায়ীরা যে সকল বাণিজ্য-নিয়ম এবং শুল্ক-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমুদয়ের অনেকগুলি ইতালীয় বাণিজ্য-সংসারে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ভূমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণসাগরের পথেই সেই যুগের ব্যবসায়ের ধারা প্রবাহিত হইত। এই দুই সাগরেই ইতালীর প্রবল অধিকার ছিল। কাজেই সেই সময়ে ইতালীয় বণিকগণের সমকক্ষ কোন জাতিই ছিল না। জগতের সকল জাতিই ইতালী হইতে শিল্পোৎপন্ন-দ্রব্য এবং বিলাস-সামগ্রী আমদানী করিত। তাহারা কৃষিকর্ম্ম মাত্রে মনোযোগী হইয়া কৃষিজাত দ্রব্য ইতালীর শিল্পিগণের নিকট রপ্তানী করিত।

ইতালী তখন জগতের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইতে পারিত। আজ ইংলণ্ড পৃথিবীতে যে আসনে অবস্থিত, ইতালীও এই যুগে সেই আসনেই উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু একটি বস্তুর অভাবে তাহার প্রভাব জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারে নাই। ইতালীর বিভিন্ন অংশে একতা ছিল না। ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ থাকিয়া, যুক্তরাজ্য ইতালীর সংগঠনে বাধা দিয়াছিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে বিরাজ করিতে চাহিত। এই সমুদয় রাষ্ট্রের বিবাদ ও সংগ্রাম, ইতালীর ক্ষমতা-বিকাশের অন্তরায় ছিল। এতদ্ব্যতীত, আর একটা দোষেও ইতালীর ক্ষমতা আধুনিক ইংলণ্ডের ক্ষমতার সমান হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ক্ষুদ্ররাষ্ট্রেই অসংখ্য দলাদলি ও গৃহবিবাদ ছিল। কোন দল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, কোন দল প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী, কোন দল ধন-তন্ত্রের পক্ষপাতী। এই ত্রিবিধ সংগ্রামে ইতালীর শক্তি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

কেবল তাহাই নহে। ইতালীর দুর্ব্বলতার অন্য কারণ আছে। বিদেশীয় রাজারা ইতালীর এই অনৈক্য, দুর্ব্বলতা এবং বিরোধ বাড়াইয়া দিতে চেষ্টিত থাকিতেন। সুযোগ পাইলেই তাঁহারা ইতালীর নানা প্রদেশ আক্রমণ করিয়াও বসিতেন। অধিকন্তু ইতালীয় খৃষ্টান পুরোহিতেরা ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মের শাসনপ্রণালী লইয়া অসংখ্য গণ্ডগোল বাধাইয়া দিলেন। তাহার ফলে, ইতালীর রাষ্ট্রগুলি নূতন কারণে প্রধানতঃ দুইদলে বিভক্ত হইয়া থাকিত।

এতগুলি দুর্ব্বলতার কারণ ইতালীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। কাজেই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধনশক্তি সত্বেও সে বেশীদিন জগতে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে নাই। অল্পকালের মধ্যেই ইতালীয় বণিক-সম্প্রদায়ের ধ্বংস উপস্থিত হইল।

ইতালীর সমুদ্র-রাষ্ট্রগুলির কথাই ধরা যাউক। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাল্‌ফি নগর ইতালীর মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিয়া খ্যাত ছিল। আমাল্‌ফির অর্ণবপোতসমূহ সাগরময় ভ্রমণ করিত। রাষ্ট্রের সমুদ্র-বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসমূহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের সকল বন্দরেই আমাল্‌ফির কানুন প্রচলিত হয়। অধিকন্তু আমাল্‌ফি-নগরের মুদ্রাই সমগ্র ইতালীদেশে এবং লেভাণ্ট্ ও এসিয়া মাইনরে গৃহীত হইত।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আমাল্‌ফির সমুদ্রশক্তি পাইসা নগরী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পাইসাও আবার জেনোয়ার আক্রমণে হতশ্রী হয়। অবশেষে ভেনিসের নিকট জেনোয়া-রাষ্ট্র মস্তক অবনত করে। ভেনিসের অধঃপতনও এই সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ফলে সংঘটিত হয়। যে ক্ষুদ্রত্ব, হিংসাদ্বেষ ও অনৈক্যের প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী নগর-রাষ্ট্রসমূহ একে একে লুপ্ত হইয়াছে, সেই দোষেই ভেনিস্‌ও ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

এইরূপ অনৈক্যের পরিবর্ত্তে ইতালীতে যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইতালীয়েরা কি না করিতে পারিত? ইতালীর নগরসমূহের বণিক্-রাষ্ট্রপুঞ্জ ঐক্যবদ্ধ হইলে, তাহারা সমগ্র প্রাচ্যজগৎকে বহুকাল স্ববশে রাখিতে পারিত। গ্রীস্, এসিয়া মাইনর, সমীপবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ এবং মিশর চিরকাল ইতালীর প্রভাবে থাকিতে বাধ্য হইত। স্থলপথে তুরকীদিগের ইউরোপ-আক্রমণ বাধা পাইত। তাহাদের সমুদ্র-তস্করতাও কঠিন হইত। অধিকন্তু পর্ত্তুগীজদিগের পরিবর্ত্তে হয়তো ইতালীয়েরাই আমেরিকা ও ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার এবং দখল করিতে পারিত।

কিন্তু ভেনিসের বিপৎকালে কেহ তাহাকে সাহায্য করিল না। ভেনিস্-রাষ্ট্রকে একাকী শত্রুবিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল। এমন কি, ভেনিস্ যখন পরজাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, তখনও তাহার বিরুদ্ধে ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমীপবর্ত্তী ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতেও ভেনিস্ আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ভেনিস্ এতদিকে শক্তি প্রয়োগ করিতে যাইয়া যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ইতালীর শত্রুগণ যত বড়ই থাকুক না, তাহার নগর-রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যসূত্রে-গ্রথিত হইলে, তাঁহারা ইতালীর ক্ষতি করিতে পারিতেন না। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে একবার যুক্তরাষ্ট্র ইতালী-গঠন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু ঐক্যের প্রয়াস অতিশয় অল্পকালব্যাপী ছিল। ঐক্য-প্রতিষ্ঠাতা জন-নায়কগণ তত বেশী উৎসাহী ছিলেন না। বরং অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইতালীর গৌরবসূর্য্য এই ঘটনার পর হইতেই অস্তমিত হইল।

ভেনিস্ সর্ব্বদা নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের কথাই ভাবিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতালীয় নগরের বিরুদ্ধে, অথবা প্রাচীন অথর্ব্ব গ্রীক-রাজ্যের বিরুদ্ধে, যতদিন ভেনিস্-নগরের সংগ্রাম চলিয়াছিল, ততদিন তাহার এই ক্ষুদ্র 'নগর-জাতীয়তা'র কুফল বুঝা যায় নাই। এই নগর-রাষ্ট্র তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ী হইতেছিল। ততদিন ভূমধ্যসাগর

এবং কৃষ্ণসাগরের ঐশ্বর্য্য ভেনিসের করতলগত ছিল। কিন্তু যখন প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনিসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় কুলাইল না। ভেনিসের অধীনে কতকগুলি বিজিত দ্বীপ ও প্রদেশ ছিল সত্য; কিন্তু ভেনিস্ এই সমুদয়কে সুশাসন করিতে জানিত না। কাজেই এইগুলি ভেনিসের শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া দুর্ব্বলতার কারণ হইয়াছিল। ফলতঃ প্রতাপশালী সম্রাট্‌গণের বিরুদ্ধে ভেনিস্ তাহার অধীন জনগণ হইতে কোন সাহায্য পাইল না।

তাহা ছাড়া, ভেনিসের রাষ্ট্রীয় জীবনেও এই যুগে দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বযুগের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থত্যাগী এবং চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহাদের মনুষ্যত্বের গুণেই ভেনিসের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। জনগণের অধিকার যতদিন উদারভাবে বিতরিত হইত, ততদিন ভেনিসে কখনও জাতীয় শক্তির অভাব হয় নাই। কিন্তু কালে ধনি-সম্প্রদায় নগরে প্রধান হইয়া বসে। তাহার ফলে, রাষ্ট্রকর্ম্মে গণ-শক্তির প্রভাব কমিতে থাকে। জনসাধারণের চিন্তা ও কর্ম্ম স্বাধীনতা হারাইয়া নানা বিঘ্নের মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাজেই রাষ্ট্রের মূল শুকাইয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ধন-সম্পদ্ এবং ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারীরা তখনও সগৌরবেই জীবনযাপন করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু ভেনিস্-রাষ্ট্র অন্তঃসারশূন্য হইয়া স্বতই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

মন্টেস্কিউ বলেন, "যে জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছে, সে নূতনবস্তু অর্জ্জন করিতে উৎসাহী হয় না। পুরাতন যাহা আছে, সেইগুলি রক্ষা করিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট হয়। স্থিতিশীলতাই তাহার প্রধান লক্ষণ, গতিশীলতা নয়। কিন্তু স্বাধীনজাতি সর্ব্বদা নব নব পদার্থ অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত—যাহা আছে সেইগুলিতেই সে সন্তুষ্ট থাকে না।" এই সঙ্গে বলা যাইতে পারে,—"অধিকন্তু, পরাধীন জাতি তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত বস্তুও শীঘ্রই হারাইতে বাধ্য হয়। কারণ, যাহারা প্রতিদিন উন্নতির পথে উঠিতে পারে না তাহারা ক্রমশঃ জগতের নিম্নস্তরে নামিতে নামিতে অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়।"

ভেনিসেরও এই দুরবস্থা আসিল। নূতন নূতন আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, ভেনিস্-বাসীরা অন্যান্য স্থানের আবিষ্কৃত সত্যসমূহেরও সন্ধান রাখিত না। জগতের কত নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছিল, কত নব নব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। কিন্তু ভেনিস্ সেই সমুদয় তথ্য বা তত্ত্ব হইতে স্বকীয় উন্নতিসাধনের কোন চেষ্টা করিত না। ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু ভেনিস্ তাহাতে লাভবান্ হইল না। জগৎ যে অগ্রসর হইয়াছে, ভেনিস্ তাহা বুঝিতেই পারিত না। নূতনের দিকে মনোযোগী না হইয়া ভেনিসবাসিগণ পুরাতন পথেই বাণিজ্য চালাইতে থাকিল। তাহাদের চিত্ত হইতে অসমসাহসিকতার আদর্শ দূরীভূত হইয়াছে। বিরাট্ কারবার চালাইবার উৎসাহ তাহাদের চিত্তে স্থান পাইল না। তাহারা, ক্ষুদ্র দোকানদারী বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভব, সেইটুকু ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইয়া থাকিল। এদিকে নূতন পথে বাণিজ্য চালাইয়া স্পেন্ ও পর্ত্তুগালের অধিবাসিগণ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে লাগিল। কিন্তু ভেনিস্ তাহা দেখিয়াও লিস্‌বন্ ও কেডিজ্ নগরদ্বয় প্রাচীন ভেনিসের ন্যায় ধন-সম্পদে পূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু ভেনিস্ তাহা দেখিয়াও নব-প্রয়াসে যোগ দিল না। সে ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন পথেই চলিতে থাকিল। জগতের নূতন শক্তিপুঞ্জ মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া প্রাচ্য-খণ্ডে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিতেছিল, ভেনিস্ তাহা বুঝিতেও চেষ্টা করিল না। অন্ধ ও মূর্খের ন্যায় ভেনিসের লোকেরা ভেল্‌কিবাজীতে ও যাদু-মন্ত্রে সোণা তৈয়ারী করিতে মনোযোগী হইল। পরাধীনতার যুগে ভেনিসের এই শোচনীয় চিত্র।

ভেনিসের সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগে রাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর, ব্যবসায়-ধুরন্ধর এবং সেনানায়কগণের নাম একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইত। যাঁহারা স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদের নামই সেই গ্রন্থে স্থান পাইত। এমন কি, বিদেশীয় কোন লোক যদি ভেনিস্-রাজ্যের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামও গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হইত। ফ্লোরেন্স্ হইতে রেশম-ব্যবসায়ী জনগণ ভেনিসে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহাদের কার্য্যফলে ভেনিসের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। এই জন্য ইঁহাদের নাম জাতীয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভেনিসের অবনতির যুগে লোকেরা নিজে গৌরবজনক কায না করিয়াই গৌরবপ্রার্থী হইত।

পিতামহদিগের ধনসম্পত্তি এবং সুনামের উত্তরাধিকারীরূপে তাহারা নগরে প্রাধান্য চাহিত। আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, তাহারা রাষ্ট্র হইতে উচ্চ সম্মানের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। এই কারণে সেই গৌরবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকা-গ্রন্থ বন্ধ করিয়া রাখা সাব্যস্ত হয়।

পরে দেখা গেল, দেশের ধনিসম্প্রদায়কে সঞ্জীবিত করা আবশ্যক—এজন্য উপাধি-খেতাবাদি বিতরণ করিবার রীতি পুনঃপ্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই জন্য গ্রন্থে আবার উপাধিপ্রাপ্ত এবং সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের নাম লিখিত হইতে লাগিল। অবশ্য এক্ষণে স্বদেশসেবাই সম্মানপ্রাপ্তির মাপকাঠি ছিল না। উচ্চবংশে জাত এবং ধনসম্পদের মালিক হইলেই উপাধি পাইবার আশা থাকিত। ক্রমশঃ এই উপাধিসমূহের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া আসিয়াছিল। লোকেরা এই গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত না। এই সময়ে গ্রন্থে নাম লিখাইবার হুজুগও কমিয়া আসিল। একশত বৎসরের ভিতর একটি নামও উল্লিখিত হয় নাই।

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর—ভেনিস্ ও তাহার ব্যবসায় কেন নষ্ট হইল? ইতিহাস উত্তর দিবে—ধনিসম্প্রদায়ের মূর্খতা, ভীরুতা, ঔদাসীন্য এবং পরাধীনতা প্রাপ্ত জনগণের উৎসাহাভাবই ইহার প্রধান কারণ। ভেনিস্ অভ্যন্তরীণ কারণেই বিনষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত না হইলেও নিজ চরিত্র-দোষেই ভেনিসবাসিগণ তাহাদের প্রাচীন সম্পদ্ হারাইত। নূতন ব্যবসায়পথ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল মাত্র। ধ্বংসের বীজ তাহাদের ভিতরেই বর্ত্তমান ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেনিস্ এবং অন্যান্য ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রের অবনতির কারণ প্রধানতঃ চারিটি :—(১) ঐক্যের অভাব, (২) বিদেশীয় রাষ্ট্র-শক্তির প্রাবল্য, (৩) খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণের প্রভাব, (৪) ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে বৃহত্তর রাজ্য ও সাম্রাজ্যের গঠন।

ভেনিস্-নগরের ব্যবসায় প্রণালী বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আধুনিক ব্যবসায়ী জাতিসমূহ ভেনিসের নিয়মেই বাণিজ্য চালাইতেছেন। ভেনিস্ ক্ষুদ্রনগরের মধ্যে যাহা করিত, আজকালকার বৃহত্তর রাষ্ট্রের নায়কগণ বিস্তৃতক্ষেত্রে তাহাই করিয়া থাকেন মাত্র। ভেনিসের স্বদেশীয় বণিকগণকে বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সংরক্ষিত করা হইত। বিদেশীয় বাণিজ্যতরী সমূহের উপর কর বসান হইত এবং স্বদেশীয় ব্যবসায়-পোত-সমূহকে যথাসম্ভব সাহায্য করা হইত। শিল্পের উপাদান ও উপকরণ আমদানী করা হইত এবং স্বদেশে সেই-গুলিকে নূতন নূতন দ্রব্যের আকারে পরিণত করিয়া বিদেশে রপ্তানী করা হইত। ভেনিসের বাণিজ্যপ্রথা, আমদানী-রপ্তানীর নিয়ম এবং স্বদেশী-সংরক্ষণ ও বিদেশী-বর্জ্জন আজকালকার ব্যবসায়ক্ষেত্রের অনুরূপ নয় কি?

আজকাল ইউরোপের নানাস্থানে "অবাধবাণিজ্য"-প্রথার পক্ষপাতী নানা পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, ব্যবসায়-জগতে স্বদেশী-বিদেশী প্রভেদ না করাই ভাল। সহজে সস্তায় যেথানে যাহা পাওয়া যায়। তাহাই সকলের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে দ্রব্যবিনিময় ও বাণিজ্যের পথ যথাসম্ভব নির্ব্বিঘ্ন ও বাধাহীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই মতের প্রবর্ত্তক পণ্ডিতগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"ভেনিসের অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হয় নাই। ভেনিস্ স্বদেশী-বিদেশী বিচার না করিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিত না। সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভেনিসের রাষ্ট্রবীর ও ধুরন্ধরগণ স্বকীয় নগরীর স্বার্থ পূর্ণ করিতে অত্যধিক যত্নবান্ ছিলেন। এই জন্যই ভেনিসের অধঃপতন হইয়াছে—ভেনিসের ব্যবসায়-সম্পদ্ বেশী দিন টিকিল না।

এই মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভেনিসের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিব যে, "অবাধ-বাণিজ্য-নীতি" তাহার পক্ষে কোন কোন সময়ে উপকারী হইয়াছিল; আবার "সংরক্ষণনীতি" কোন কোন সময়ে উন্নতির কারণ ছিল। ভেনিসের শৈশব-অবস্থায় অবাধ-বাণিজ্য-নীতির ফলেই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ভেনিস্ তখন একটা সামান্য ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। তখন যদি সে বলিত, "আমরা বিদেশীয় কোন দ্রব্য গ্রহণ করিব না" তাহা হইলে কি কালে এই পল্লী বিরাট্ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিত? বিদেশীয় দ্রব্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে প্রথম অবস্থায় অত্যন্তই আবশ্যক ছিল।

কিন্তু আবার সংরক্ষণ-নীতিও তাহার পক্ষে বিশেষ উন্নতির কারণ হইয়াছিল। ক্রমবিকাশের ফলে তাহার

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শিল্পশক্তি ধীরে ধীরে গঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্য হইতে আত্মরক্ষা না করিলে যুবক-শিল্পীসমাজ বাঁচিত কি? কাজেই বিদেশীয় বণিকগণকে বাধা দেওয়া ভেনিসের এই যুগে আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ বাধাসমূহের ফলে ভেনিসের স্বদেশীয় শিল্প "সংরক্ষিত" হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এই সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে ভেনিস্ অবশেষে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া শিল্পজগতের শীর্ষস্থানে উঠিল। এই অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি তুলিয়া দেওয়াই ভেনিসের ধুরন্ধরগণের কর্ত্তব্য ছিল। কারণ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের পর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমানভাবে স্বাধীনরূপে প্রতিযোগিতা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে স্বদেশীয় শিল্পী ও বণিকেরা কার্য্যে ঔদাসীন্য ও আলস্যের প্রশ্রয় দিতে থাকে। এই অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতির কার্য্য চলিলে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতে থাকে। সুতরাং সংরক্ষণ-নীতির জন্য ভেনিসের অধঃপতন হইয়াছে, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। সংরক্ষণ-নীতির যখন আর প্রয়োজন ছিল না, তখনও এই নীতির অনুসরণ করাই ভেনিসের পক্ষে হানিকর হইয়াছিল।

আমি বলিলাম, সংরক্ষণ-নীতির দ্বারা ভেনিসের যৌবন অবস্থা পুষ্ট হইয়াছে। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যতদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রই ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ততদিন সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে ভেনিস্ উন্নত হইতেছিল। অন্যান্য নগরকে বাধা দিয়া ভেনিসের ব্যবসায়ীরা স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যখন বৃহত্তর রাজ্যের কর্ণধারগণ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইল, তখন সমগ্র ইতালীর অধীশ্বর হইতে পারিলে ভেনিস্ ব্যবসায়-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিত। এই যুক্তরাজ্য ইতালীর সমস্ত বাণিজ্যকে সংরক্ষণ-নীতির নিয়মে রাখিতে পারিলে, ভেনিস্ সাহসভরে বৃহত্তর শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিত।

কেবলমাত্র সংরক্ষণ-নীতির দ্বারাই উন্নতি হইবে, এমন কোন কথা নাই। দেশ ও সমাজের আয়তন ও বিস্তৃতির উপর জাতির উন্নতি নির্ভর করে। সংরক্ষণ-নীতির দ্বারা অসাধ্যসাধন হইবে না—প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিতে হইলে একমাত্র সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় লইলে চলিবে কেন? স্বকীয় রাষ্ট্রের আকার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করাও কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা প্রভৃতি শব্দের অর্থ লইয়া গোলযোগ বাধে। চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মকর্ম্মের স্বাধীনতা, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে স্বাধীনতার আমরা আদর করিয়া থাকি। কাজেই স্বাধীনতা শব্দের প্রয়োগ যেখানে দেখি আমরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তাহার আদর করিতে প্রবৃত্ত হই।

কিন্তু বাণিজ্যের স্বাধীনতা বা অবাধ-বাণিজ্য—ইহার প্রকৃত অর্থ কি? কোন দেশের ভিতরকার বাণিজ্য সম্বন্ধে দেশবাসী প্রত্যেকের পূর্ণ অধিকার প্রদান অবধি বাণিজ্যের এক লক্ষণ। আবার সমস্ত জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিকে পূর্ণ অধিকার প্রদান স্বাধীন-বাণিজ্যের আর এক লক্ষণ। কিন্তু এই দুই স্বাধীনতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কারণ প্রথম স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তিমাত্রের স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন-কর্ম্ম লোপ পাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বাধীনতা না থাকিলেও ব্যক্তিমাত্রের স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির চরম স্বাধীনতা,"সংরক্ষণ-নীতির" আমলেও থাকিতে পারে। আবার ব্যক্তিমাত্রের চরম পরাধীনতা, স্বাধীন বা অবাধবাণিজ্যের আমলেই বেশী দেখা যায়। এই জন্যই মন্টেস্কিউ বলিয়াছেন—"স্বাধীন দেশেই বাণিজ্যের সম্বন্ধে অসংখ্য নিয়মকানুন জারি হইয়া থাকে। কিন্তু পরাধীন দেশে প্রায়ই বাণিজ্য অবাধ বা স্বাধীন দেখা যায়।"

সতীন ও সৎমা

[লেখক—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, M.A.]

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

১। ইংরাজী শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে একাধিক বিবাহের কুফল—সপত্নীবিরোধ—বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সময়ে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিলেও নিন্দিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, তাঁহাদিগের বর্ণনায় তীব্র ঘৃণার বা কঠোর বিদ্রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, পরন্তু বেশ একটু কৌতুকপ্রিয়তার, একটু মজামারার, ভাব লক্ষিত হয়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে,শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বহুবিবাহ-প্রথার উপর দারুণ অশ্রদ্ধার, বিজাতীয় ঘৃণার ভাব জাগরিত হইল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে এবং ইংরাজ সমাজের রীতিনীতির অদৃশ্য প্রভাবে, দেশীয় সমাজ ভাঙ্গিয়াচুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার, 'সমাজশৃঙ্খলমালা নবসূত্রে গাঁথিয়া' ফেলিবার একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল; সমাজসংস্কারের, এমন কি ধর্ম্মসংস্কারের একটা প্রচণ্ড চেষ্টা দেখা দিল। যাহা কিছু ইংরাজসমাজের রীতিনীতির সঙ্গে মেলে না তাহাই বর্জ্জনীয়, সুসভ্য রাজার জাতির সর্ব্ববিধ অনুকরণই স্পৃহনীয়,—ইহার ভিতর এরূপ একটু মনের ভাব যে না ছিল তাহাও নহে। মুসলমানশাসনের শেষদশায়, রাজনীতিক বিশৃঙ্খলায়, হিন্দুসমাজের স্থির জলে, প্রকৃত জ্ঞানালোচনার অভাবে, নানারূপ কুসংস্কার ও কদাচারের আবর্জ্জনা জমিয়াছিল; এক্ষণে সেই আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই তুমুল আন্দোলনের, এই বিরাট্ বিপ্লবের, এই মহাসমরের প্রধান নেতা ছিলেন,—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তিনি সাধারণতঃ 'ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই বিখ্যাত। কিন্তু ইংরাজীশিক্ষা-প্রচলন, হিন্দুকলেজ স্থাপন, সহমরণ-নিবারণ প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানেও তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এ সকল বিষয়ে সবিশেষ কৃতিত্বলাভ করেন। এইখানে একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রাজা রামমোহন রায়ের এক সঙ্গে দুইটি পত্নী বর্ত্তমান

রাজা রামমোহন রায়

ছিলেন, এবং তাঁহার অগ্রজের চারিটী পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে মধ্যমা পত্নী সহমরণে গিয়াছিলেন। অতএব সহমরণ ও বহুবিবাহ ব্যাপারে রাজা ভুক্তভোগী ছিলেন। সমাজসংস্কারের ব্যাপারে যে দুই মহাপুরুষ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণবংশীয় ছিলেন, এ কথা স্মরণ করিয়া শাণ্ডিল্য ঋষি ও ভট্টনারায়ণের অযোগ্য বংশধর বর্ত্তমান লেখক বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করেন। রাজার পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ-বংশীয়

ছিলেন। যাক্, ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে কৃতকার্য্য হইয়া বহুবিবাহ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮৫৫ ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এতৎকল্পে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতেই নিশ্চিন্ত না থাকিয়া লোকমত-গঠনের জন্য, তাঁহার স্বভাবজ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত পুস্তক-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন (১৮৭১ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে)। বিধবাবিবাহের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও বিরুদ্ধবাদিগণ পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ৺তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি প্রতিবাদকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। আন্দোলন-

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

কারীদিগের মনে বহুবিবাহ ও বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেন-দেবীবর-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য সমার্থবাচী হইয়াছিল, কেননা কুলীন-দিগের মধ্যেই এই বহুবিবাহ-ব্যাপারের বাড়াবাড়ি ঘটিয়া-ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণাপ্রবণ হৃদয় বালবিধবা-দিগের ন্যায় কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে বিগলিত হইল, এবং তিনি অদম্য উৎসাহে এই কুপ্রথার উৎসাদন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কুলীনগণ বহুপত্নী বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ঘরসংসার করিতেন না, তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের ভার লইতেন না, স্বামীর কোন কর্ত্তব্যই পালন করিতেন না, পরন্তু বিবাহ-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন; এ সমস্ত কদর্য্য ব্যবহারের কথা তিনি প্রকাশিত করিলেন, এই শ্রেণীর কুলীনদিগের নাম-ধাম ও পত্নীসংখ্যার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সাহসের সহিত প্রচারিত করিলেন, এরূপ কুপ্রথার অপ্রতিবিধেয় ফল যে পাপাচরণ ও নৈতিক অধঃপতন তাহা স্পষ্টবাক্যে প্রক-টিত করিলেন; এবং কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথা যে মন্বাদি-ধর্ম্ম-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শাস্ত্রবিহিত নহে, যথেচ্ছবিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহাও প্রমাণিত করিলেন। ইহা ছাড়া শ্রোত্রিয়-বংশজ-দিগের মধ্যে কন্যাপণ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে উক্ত দুই শ্রেণীর পুরুষদিগের বিবাহ ঘটা সুকঠিন, এই অসুবিধার বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে ঐ পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় যখনই যে প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর মত শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আর এক শ্রেণীর সমাজসংস্কারকের মত যুক্তিবাদী (rationalistic) বিচারের পথে চলেন নাই। স্থিতিশীল হিন্দুর সমাজসংস্কারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথই প্রকৃষ্ট। স্থিতিশীল ইংরাজ জাতির constitution-সম্মত রাজনৈতিক সংস্কার ইহার সহিত উপমেয়।

এই প্রসঙ্গে আর এক জনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন বা অসাধারণপ্রতিভাশালী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ও

কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীদিগের জন্য কাঁদিয়াছিল এবং তিনি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একজন দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ। * তৎকাল-প্রচলিত নিয়মে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া চতুর্দ্দশটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল; ইচ্ছা করিলে এই 'ফুলিয়ার মুখুটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র' আরও বহুসংখ্যক বিবাহ করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উক্ত প্রথার প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া উহার উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মেলবন্ধন ও পালটিঘরের কড়াকড়ি শিথিল করিয়া দেবীবরের পূর্ব্বের সময়ের মত কুলীনদের সর্ব্বদ্বারী বিবাহ-প্রচলনের ও বহুদোষাকর বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, স্বরচিত গান গাহিয়া, সভা ডাকিয়া, দল বাধিয়া, বড় বড় কুলীন ও সম্ভ্রান্ত শ্রোত্রিয়বংশজদিগকে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করাইয়া, বড়লাটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়া, নিঃসম্বল অবস্থায় 'লাঠি আর থোলে হাতে' গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া, এবং নিজের পুত্রকন্যার বিবাহদ্বারা আদর্শ-স্থাপন করিয়া, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অশেষবিধ কষ্ট, লাঞ্ছনা, উপহাস, এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া এই কুপ্রথার সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

"বাড়ী ঘর ত্যজে, সমাজে সমাজে
একা যে এ কাযে করে দৌড়াদৌড়ি।
উপবাস রয়ে, উপবাস সয়ে
উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥"

শ্রোত্রিয়বংশজদিগের মধ্যে কন্যাপণ-নিবারণেও তিনি যত্নশীল ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কুলীন-সন্তানকে সহায়ক-স্বরূপ পাইয়া আহ্লাদ সহকারে বলিয়াছিলেন—'এইরূপ একটি রত্ন আমাদিগের পশ্চিম বাঙ্গালায়

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান থাকিলে আমরা পশ্চিম বাঙ্গালার যারপরনাই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম।' রাসবিহারী ও তাঁহার সহযোগীদিগের রচিত গানে অমরকীর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের সঙ্গে তাঁহার নাম সংযোজিত আছে, যথা—

'উকীল আছেন বিদ্যাসাগর, মোক্তারিতে রাসবিহারী';
'বিদ্যাসাগর সেনাপতি, রাসবিহারী হবে রথী',
'বিদ্যাসাগর বিচার করে, রাসবিহারী ঘুরে মরে'।

কিন্তু আমরা যখন দয়ার সাগর, বিদ্যার সাগর, জ্ঞানের সাগর, গুণের সাগর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ভুলিতে বসিয়াছি, তখন কি আর অল্পবিদ্য অল্পবিত্ত বহুবিবাহকারী, বহুবিবাহারি রাসবিহারীকে মনে রাখিব? তথাপি পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি কুলীনকন্যার রচিত একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করি।

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর)

"আয়লো আয় দেখি যেয়ে ঐ এল সে রাসবিহারী।
(এ যে) কলির কলুষ নাশিতে কুলীনকুলে অবতরি ॥

* ইনি পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা হইলেও ইঁহার পিতামহের পৈতৃক বাসস্থান পশ্চিম বাঙ্গালার বেলগড়িয়া গ্রাম, কিন্তু পিতামহ বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রামে মাতার মাতামহ-কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

লোকের সব কষ্ট হেরি, কতই বা কষ্ট করি,
উপদেশ দিয়ে বেড়ান বাড়ী বাড়ী,
(ওঁরে) মান্য লোকে মান্য করে বাতুলে করে চাতুরী ॥
আমাদের পুণ্যফলে, বিহারী উদয় হ'লে,
এ কথা বলে সরলাসুন্দরী,
(ও যে) বহুবিয়ে উঠাইল, নিজে বহু বিয়ে করি ॥

২। সমাজসংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্যসৃষ্টি।

তখনকার কালে সমাজসংস্কারের এই যে ঢেউ উঠিয়াছিল, লঘুসাহিত্যে পর্য্যন্ত তাহার ঢল নামিয়াছিল। ন্যূনাধিক বিশ বৎসর ধরিয়া এই আন্দোলন চলিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে লিখিত অনেকগুলি উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, নাটক ও প্রহসনে কুলীনের অথবা বিলাসী ধনীর একাধিক বিবাহ ও তাহার বিষময় ফল লক্ষ্য করিয়া সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া আখ্যানবস্তু গঠিত হইয়াছিল। যথা ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের (১) পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫২ খ্রীঃ), (২) কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক (১৮৫৪), (৩) নবনাটক (১৮৬৭); (৪) ৺হরিনাথ মজুমদারের বিজয়বসন্ত আখ্যায়িকা (১৮৫৯); (৫) ৺মনোমোহন বসুর প্রণয়-পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯); ৺দীনবন্ধু মিত্রের (৬) নবীন-তপস্বিনী (১৮৬৩), (৭) বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৫), (৮) লীলাবতী (১৮৬৯), (৯) জামাইবারিক (১৮৭২) ও (১০) কমলে কামিনী (১৮৭৩)। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর বিমাতা বা বিজয়বসন্ত নাটক 'বিজয়বসন্ত' আখ্যায়িকার অনেক পরে রচিত। ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলি' (১৮৫৮) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও (১৮৫৮) এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নাটক দুইখানির আখ্যানবস্তু পুরাণ বা সংস্কৃত নাটক হইতে গৃহীত, অতএব উপাখ্যানের মৌলিকতা না থাকাতে বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। এরূপ সপত্নীবৃত্তান্তাত্মক বিষয়নির্ব্বাচনে তখনকার কালধর্ম্ম স্পষ্ট প্রতীয়মান। টেকচাঁদ ঠাকুরের (৺প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলালে' বাবুরাম বাবুর নানা কীর্ত্তির মধ্যে বৃদ্ধবয়সে দুইটি যোগ্য পুত্র ও পুত্রবতী পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কথা ও তৎপ্রসঙ্গে কুলীনের বহুবিবাহের কথা (নারীগণের মুখে) বর্ণিত আছে (১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদ)। টেকচাঁদের অন্যান্য পুস্তকেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। তালিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির দুইখানি বাদ বাকী সমস্তগুলি নাটক

প্যারীচাঁদ মিত্র

বা প্রহসন। দৃশ্যকাব্যের অভিনয়-দর্শনে চিত্ত অধিকতর আলোড়িত হয় (Things seen are mightier than things heard—Horace) এই বুঝিয়াই লেখকগণ সমাজসংস্কার-রূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন নবনাটকের প্রস্তাবনায় স্পষ্টই বলিয়াছেন:—'উপদেশ দেওয়াই নাটক-প্রকাশের উদ্দেশ্য।'

গ্রন্থকারদিগের মধ্যে এক পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন বাদে আর সকলেই ইংরাজীনবীশ ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ও বোধ হয় একটু আধটু ইংরাজী জানিতেন—কেননা 'নবনাটকে' বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় ইংরাজীর বুকনি দেওয়ার ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করিতে বসিয়া তিনিও ইংরাজী কথার বুকনি দিয়াছেন। রঙ্গপুরের দেশহিতৈষী জমীদার ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এক বিজ্ঞাপন দেন যে 'বল্লালসেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব-সংবলিত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে

পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবেন।' এই বিজ্ঞাপনের ফল তর্করত্ন মহাশয়ের প্রথিতনামা নাটক। 'পতিব্রতোপাখ্যান'ও উক্ত জমিদার মহাশয়ের আর একটি পারিতোষিক-প্রতিশ্রুতির ফল। পরে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নাটক লিখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। তাহার ফল তর্করত্ন মহাশয়ের 'নবনাটক'। লোকশিক্ষার জন্য উভয় নাটকই পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র অভিনয়-ব্যাপারে দেশময় খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি পারিতোষিক-পুরস্কারের প্ররোচনা ব্যতিরেকেও সমাজের কল্যাণকামনায় লিখিত হইয়াছিল। ফলতঃ সমাজসংস্কারের এই আন্দোলন উপস্থিত না হইলে উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক-গুলিই লিখিত হইত না, ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

আরও এক কথা। এই সকল গ্রন্থকারের মধ্যে তর্করত্ন মহাশয় ছাড়া অপর কেহই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তর্করত্ন মহাশয়ও বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। অথচ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজেই এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তর্করত্ন মহাশয় বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই যে রাঢ়ীয় সমাজের কুপ্রথাবর্ণনে আমোদ বোধ করিয়াছিলেন, এ টিপ্পনী কাটিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি নিজের সম্প্রদায়ে প্রচলিত দূষিত প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী-চালনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার পুস্তকে বৈদিকদিগের পেটে পেটে সম্বন্ধের প্রথা ও সমবয়সী বর-কন্যার বিবাহের প্রথার বহুনিন্দা করিয়াছেন (এবং বৈদিক-দের ফলার-প্রিয়তা লইয়াও একটু রঙ্গ করিয়াছেন)। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইয়া স্বসমাজের দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কম প্রশংসার বিষয় নহে। তবে এ ভাবে দেখিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় আরও প্রশংসাযোগ্য—কেননা তিনি বহুবিবাহকারী কুলীন হইয়াও এই কুপ্রথার উচ্ছেদে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। গ্রন্থরচনা-বিষয়ে উৎসাহদাতা রঙ্গপুরের ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং কলিকাতার গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। (এস্থলে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পূর্ব্ব আমলের যে দুই জন কবি একাধিক বিবাহ-ব্যাপার তাঁহাদিগের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই,—মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।)

এই আমলে এক শ্রেণীর সাহিত্যশক্তি সর্ব্ববিধ সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন, বহুবিবাহ-নিবারণ, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ প্রভৃতি অনেক প্রথাই এই সকল নাটকাদিতে আলোচিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক নাটকেই এক এক জন বিদ্যাবতী কবিতারচনাকুশলা মহিলা আছেন।* অনেক স্থলে নাটককারগণ নাটকীয় কলাকৌশলে জলাঞ্জলি দিয়া রীতিমত দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিয়া দুইপক্ষের যুক্তিতর্ক আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন বিদ্যাসাগর ও তর্কবাচস্পতি মহাশয়দিগের বাদ-প্রতিবাদ-পুস্তক পড়িতেছি।

কবিগণও এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তবে বিধবাবিবাহের বেলায় গুপ্তকবি, দাশুরায় প্রভৃতি সেকেলে ধরণের কবিরা অবশ্য সংস্কারকদিগের পক্ষ লয়েন নাই। যাহা হউক, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে সেকেলে ও এ-কেলে উভয় দলের কবিই একমত হইয়াছিলেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন :—

মিছা কেন কুল নিয়ে কর আঁটাআঁটি
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি ॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিবে কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে ॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়া করে সেই ॥
দুধেদাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার ॥

ইহার পরে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, পাঠক-গণ ক্ষমা করিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ৺রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায়ও ধরিতে গেলে সেকেলে ও ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* যথা,—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে মাধবী, নবনাটকে চপলা, প্রণয়-পরীক্ষায় সরলা, নবীনতপস্বিনীতে কামিনী। লীলাবতীতে ও কমলে কামিনীতে ত বিদ্যার হাট।

এই সময়ে যে সকল ইংরাজীশিক্ষিত যুবক সমাজের নানাবিধ 'অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন' কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। ৺দীনবন্ধু মিত্রের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নাটকগুলির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি, তাঁহার কবিতায়ও দূষিত সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য আছে। সুরধুনী কাব্যের অষ্টম সর্গে গুপ্তিপাড়ার 'কুলীন বামন'দের বর্ণনা ইহার দৃষ্টান্ত। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে।
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে॥
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে।
'ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে'॥
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে।
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহার পর কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীগণের দুঃখদুর্দ্দশার করুণ বর্ণনা—আর তাহার পর, কুলীন স্বামীর যে পাষণ্ডোচিত কার্য্যের উপাখ্যান আছে, তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।

হেমচন্দ্রের 'ভারতকামিনী'-শীর্ষক কবিতায় কুলীনকন্যা-কুলের জন্য কবির করুণ উচ্ছ্বাস সকলেরই কর্ণে সুপরিচিত।

দেখরে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা।
কুলীনকুমারী অনূঢ়া অবলা।
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে।
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে।
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান।
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ।
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

তাঁহার 'কুলীনমহিলা-বিলাপ' শীর্ষক কবিতাও সকলের সুপরিচিত। তথাপি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আয় আয় সহচরি, ধরিগে ব্রিটনেশ্বরী
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কে বা আর!

* * * *

ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতোনা পতি থাকিতে জীবিত!
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা রাজমাতা, দুঃখী অনাথায়।

* * * *

কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতি দিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে!

* + *

হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য-আশ্রিত!
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস-পালিত!
আমাদের যা হবার হয়েছে, জননী
কর রক্ষা এই ভিক্ষা এ সব নন্দিনী।"

কবিতার পাদটীকা হইতে জানা যায় যে "বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহুবিবাহ-নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।" হিন্দুসমাজের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীগণ ব্রিটনেশ্বরীর নিকট আবেদন করিতেছেন, কবি এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গানেও ঠিক এইরূপ কল্পনা আছে।—

মেয়ের প্রজা হয়ে মেয়ে।
এত দুঃখের বোঝা বই।
কৈ কৈ করুণাময়ীর কৃপা কই।

এই কলিটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকায় প্রদত্ত কুলীনমহিলার উক্তি "স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত দুর্দ্দশা হইবেক কেন?" স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মন্তব্য "কুলীনমহিলার হৃদয়-বিদারণ আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে," ইত্যাদি, হেমচন্দ্রের কবিতার ও রাসবিহারীর গানের কল্পনার অনুরূপ। হেমচন্দ্রের কবিতার শেষ দুই চরণের ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকায় প্রদত্ত কুলীনমহিলার উক্তিতে পাওয়া যায়। যথা—"বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে সুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব; তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে যদি তাহারা, আমাদের মত, চিরদুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয়।"

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উপাখ্যান, আখ্যায়িকা ও নাটকগুলির পরিচয় দিই। ইহার মধ্যে ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির মত, অপর পুস্তকগুলি আজকালকার পাঠকদিগের নিকট তত সুপরিচিত নহে, তজ্জন্য সেগুলির পরিচয় একটু বিস্তারিত ভাবে দিতেছি।

(৵০) পতিব্রতোপাখ্যান।

এই পুস্তকে গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, সুশীলা পত্নীর অভাবে গৃহধর্ম্ম চলিতে পারে না, প্রিয়াবিরহে মনোদুঃখ (অজবিলাপ, পুরুরবার উন্মাদ, রামচন্দ্রের খেদ, পুণ্ডরীকের প্রাণত্যাগ) পতিপত্নীতে মনের অমিল হইলে সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে, 'স্ত্রীকোন্দলে' ঘরে ঘরে অশান্তি, অলঙ্কারদানে ও মিষ্টবাক্যপ্রয়োগে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করার আধুনিক প্রথা, স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের দুর্ব্যবহার ও অবজ্ঞা, স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার অপ্রচলনে এবং বিবাহের নানারূপ কুপ্রথা থাকাতে (যথা—বল্লালী কৌলীন্য প্রথা, বৈদিকদিগের পেটে পেটে সম্বন্ধ ও সমবয়সী কন্যার সহিত বিবাহ, জুয়াচোর ঘুষখোর ঘটকের দ্বারা সম্বন্ধ করাইয়া অপাত্রে কন্যাদান, শৈশব-বিবাহ) স্ত্রীর মনোমত পতির অভাবে স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না, ইত্যাদি কথা প্রথম অংশে (পুস্তকের প্রায় এক চতুর্থাংশ) আলোচিত হইয়াছে। এই শেষটুকুর আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। গ্রন্থকার এই অংশের উপসংহারে বলিতেছেন—'যদি এদেশে এতাদৃশ সৎপ্রথা থাকিত যে, কন্যাপাত্রের বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে তাহাদিগের বিবাহের নামোল্লেখ হইত না এবং তাহাদিগের পরস্পরের মতব্যতিরেকে বিবাহ নির্ব্বাহ হইত না, তাহা হইলে কি ভারতরাজ্য এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইত?' এবং তাঁহার অভিমতের অনুকূল বলিয়া পূর্ব্বকালের স্বয়ংবরপ্রথার ও লক্ষ্মী, ইন্দুমতী, দময়ন্তী, রুক্মিণী প্রভৃতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক ও রাজসিক বা ভাক্ত দুই প্রকার পতিব্রতার লক্ষণ, পতিব্রতা-মাহাত্ম্যখ্যাপন ও তাহার পৌরাণিক উদাহরণ-সংগ্রহ (যথা—কৌশিক ও সত্যশীলা, বেদবতী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যান), প্রোষিতভর্ত্তৃকার কর্ত্তব্য, মৃতপতিকার কর্ত্তব্য, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যপালন, ব্রহ্মচর্য্যের উদাহরণস্বরূপ কুন্তী প্রভৃতির নামোল্লেখ, সহগমনের উদাহরণস্বরূপ কপোতিকাখ্যান, অসতী স্ত্রীর উদাহরণস্বরূপ পৌরাণিক আখ্যান ও দশকুমারচরিতের ধূমিনীর বৃত্তান্ত, ইত্যাদি বিষয় পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আছে।

পুস্তকের কোন্ অংশে প্রচলিত বিবাহপ্রথার দোষোদেঘাষণ আছে, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের উপদেশ—'এক্ষণকার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি-মহাত্মারা এইরূপ বিবাহপ্রথার উক্ত দোষ সকল পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া তদ্বিধির পরিবর্ত্তনে যত্ন করুন, বল্লালদত্ত কুলমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিউন, বৈদিকদিগের গর্ভসম্বন্ধের প্রথা বিসর্জ্জন করুন, অবিশ্বস্ত ঘটকজাতির মুখাবলোকনে বিরত হউন এবং কন্যাপুত্রের চরিত্রপরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্যকালে বিবাহ-প্রদানে সচেষ্ট হউন।'

এই শিক্ষা কাব্যচ্ছলে প্রদত্ত হইলে মর্ম্মগ্রাহিণী হয়। পরবর্ত্তী 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে গ্রন্থকার সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

(১/০) কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

পূর্ব্বোক্ত নাটকগুলির মধ্যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' সর্ব্ব-প্রাচীন, অতএব প্রথমে ইহারই কথা বলি। নাটকে কুলীনের কন্যাদায়-কথা কীর্ত্তিত। (প্রস্তাবনায় সূত্রধার ও নটীর আলাপ হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদিগেরও কন্যাদায়!) কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়—'বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান প্রধান কুলীন'—তাঁহার 'সংসার রাজসংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুরই অনটন নাই।' কিন্তু তিনি 'সমযোগ্য পাত্র' অর্থাৎ দেবীবরী ভাষায়, পালটি ঘরের বর না পাওয়াতে বহুকাল কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করেন নাই, শেষে অনৃতাচার্য্য ঘটকের যোগাড়ে একজন কদাকার রোগগ্রস্ত একচক্ষুঃ জরাজীর্ণ গাঁজাখোর 'ষষ্টিবৎসরের যষ্ঠীর বৎস'—কিন্তু ফুলের মুখুটী বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান মহাকুলীনকে পাইয়া—তাঁহার হস্তে একত্র চারি কন্যা সম্প্রদান করিয়া 'কুলরক্ষা' করিতেছেন। কন্যা চারিটির একটি নিতান্ত বালিকা, আর একটি নবযুবতী, অপর দুইটী বিগতযৌবনা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ন্যায়ালঙ্কারের মুখ দিয়া নাটককার বলাইয়াছেন—ইহা বিবাহ নহে, বৃষোৎসর্গ।*

যাহা হউক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাদায়ে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত—এ তবু মন্দের ভাল। তাঁহার প্রতিবেশী 'বন্ধু' কুলধন মুখোপাধ্যায়ের ও বালাই নাই—তাঁহার অনূঢ়া কন্যার বয়সের গাছপাথর নাই অথচ কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার কোন দুর্ভাবনাই নাই। নাটককার ঘটকের মুখ দিয়া আধুনিক কুলীনদের নবগুণের হাস্যকর পরিচয় দিয়াছেন, মা ও মেয়ের কথোপকথনে 'কুলরক্ষা' তথা 'জাতিরক্ষা' সম্বন্ধে অনেক নির্ঘাত কথা শুনাইয়াছেন, কুলীনপত্নী ও প্রতিবেশিনীদিগের জোবানী, বল্লালী প্রথার উপর অশেষবিধ তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং পুরোহিত ধর্ম্মশীলের মুখ দিয়া এই প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কে, ভারতচন্দ্রের অনুকরণে লিখিত নারীগণের পতিনিন্দায়, সুলোচনানাম্নী কুলীনকন্যার শিশুবরের সঙ্গে বিবাহ, চন্দ্রমুখী ও ফলকুমারীর কথায় পত্নীর নিকট 'ব্যবহার' না পাইয়া কুলীন স্বামীর রাগভরে শ্বশুরালয় ত্যাগ, যমুনানাম্নী কুলীনকন্যার ষাট বছরেও অনূঢ়া অবস্থা ('যমবরা'), যশোদানাম্নী কুলীনকন্যার 'তারস্থ করা' বৃদ্ধবরের সঙ্গে বিবাহ ও তৎক্ষণেই বৈধব্য, এবং পঞ্চম অঙ্কে মাধবী ও মল্লিকার কথালাপে ইহা অপেক্ষাও কদর্য্য কথা বিবৃত আছে। আবার চতুর্থ অঙ্কে বিবাহবণিক্ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার মাণিকযোড় পুত্রদ্বয় অধর্ম্মরুচি ও উত্তম এই তিন 'বল্লালসেন প্রদত্ত-নিষ্কর-তালুকভোগী' অর্থাৎ বিবাহব্যবসায়ী কুলীনের বৃত্তান্তে কুলীনদের কদাচার এবং কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীগণের পাপাচারের ব্যাপার বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহার পরিচয় দিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না।

কুলীনের বহুবিবাহের পার্শ্বে, শ্রোত্রিয়ের কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে অনেক সময়ে পুরুষকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয় ও একবার গৃহশূন্য হইলে পুনরায় বিবাহ করা দুঃসাধ্য হয়, বিবাহবাতুল ও বিরহী পঞ্চাননের চরিত্রে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনগণ কন্যা জন্মিলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন এবং পুত্র জন্মিলে উল্লসিত হন, পক্ষান্তরে কন্যাবিক্রয়ী শ্রোত্রিয়গণ পুত্র জন্মিলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন ও পত্নীর লাঞ্ছনা করেন, কন্যা জন্মিলে হৃষ্ট হন, এই বিসদৃশ ব্যাপারও উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহার্থ কন্যা-ক্রয়বিক্রয়ের অশাস্ত্রীয়তা পুরোহিত ধর্ম্মশীলের মুখ দিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। †

নাটকখানিতে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গও আছে, বিদ্যাবতী নারীর চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে।

যাহা হউক, 'কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে,' এই নাটক হইতে 'তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে বটে' কিন্তু বহুবিবাহের বিষময় ফল সপত্নীবিরোধ ইহাতে বিবৃত হয় নাই। তাহার কারণ প্রথম প্রবন্ধেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। কুলীনপত্নীগণ আইবড় নাম ঘুচাইয়া পিত্রালয়ে বা মাতামহালয়েই পড়িয়া থাকিতেন, কচিৎ কেহ স্বামীর ঘর করিতে পাইতেন, সুতরাং সপত্নী-বিরোধের অবসর অল্পই ছিল। (এই নাটকে কথাটি

---

* ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি গানেও আছে—'নিদেন পক্ষে বৃষোৎসর্গ একটি বৎস চারিটি গাই।' ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুরাতন রসিকতাটুকু ঝালাইয়া লইয়া তৎপ্রণীত 'প্রমোদলহরী' বা 'বিবাহরহস্য' নামক পুস্তকে চালাইয়াছেন।

† ৺শিশিরকুমার ঘোষ 'নয় শো রুপেয়া' নাটকে কন্যাবিক্রয়-প্রথার উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন।

খোলসা করিয়া বলা নাই, কিন্তু 'নবনাটকে' চতুর্থ অঙ্কে কুলীনপত্নী চপলার প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে।)

নাটকখানিতে সুচরিত্র ও দুশ্চরিত্র ঘটকের (শুভাচার্য্য ও অনৃতাচার্য্য) এবং সুচরিত্র ও দুশ্চরিত্র পুরোহিতের (ধর্ম্মশীল ও অভব্যচন্দ্র) চিত্রচতুষ্টয় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যান্য অনেকগুলি চিত্রও (যথা রসিকা নাপিতপত্নী, মালিনী মাসীর বোনঝী নাকি?) সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেগুলির আলোচনা হইতে নিরস্ত থাকিলাম। নাটকখানি সংস্কৃত নাটকের প্রণালীতে লিখিত, এমন কি, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা ও সজীবতা আছে। এখানিতে ও এ সময়ের অন্যান্য অনেক নাটকে গদ্যে কথাবার্ত্তার মধ্যে মধ্যে পদ্যের উচ্ছ্বাসও বোধ হয়, সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে আসিয়া পড়িয়াছে। মোটের উপর, নাটকখানিতে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্রূপ সাতিশয় তীব্র।

(৶৹) নবনাটক।

প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, তখনকার দিনে কেবল যে কুলীনগণ বহুবিবাহ করিতেন তাহা নহে, ধনী লোকে বিলাসলালসায় পত্নীপুত্রসত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ করিতেন। এরূপ কার্য্যের বিষময় পরিণাম প্রদর্শন করাই 'নবনাটক' রচনার উদ্দেশ্য। ইহাতে সপত্নী ও সপত্নীসন্তানদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রাম্য জমিদার গবেশচন্দ্র (নামেই স্বভাবের পরিচয়) প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী ও তাঁহার গর্ভজাত দুইটি পুত্র, সুবোধ ও সুশীল, বর্ত্তমান থাকিতেও পঞ্চাশ বৎসর বয়সে—শাস্ত্রের আদেশ 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' অবহেলা করিয়া—কেঁচে গণ্ডূষ করিলেন অর্থাৎ পত্নীর বিনা সম্মতিতে আবার বিবাহ করিলেন। অচিরেই তিনি 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী' চন্দ্রলেখার দাপটে 'বিলক্ষণ নাকাল,' 'একেবারে লেজেগোবরে' হইলেন; ছেলে দুটিকে ফাঁকি দিবার মতলবে দ্বিতীয় পক্ষের নামে বিষয় বেনামী করিলেন এবং অবলা প্রবলার তাড়নায় জ্যেষ্ঠা পত্নীকে, রূপকথার দুয়ারাণীর মত, 'বাড়ীর বাইরে গোলপাতার ঘর' করিয়া দিলেন! (নাটককার এই প্রসঙ্গে দশরথ, উত্তানপাদ, যযাতি প্রভৃতি প্রাচীন কালের রাজাদিগের একাধিক বিবাহের কুফলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন)। সাবিত্রী এক আধবার স্বামিনিন্দা করিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন, প্রতিবেশিনীগণের সলাপরামর্শে স্বামীকে তুকতাক করিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং স্বামীর বা সপত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কখন প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বিমাতার দুর্ব্বাক্যে দেশত্যাগী হইয়া গেল, সাবিত্রীও সপত্নীর অত্যাচারে ঝালাপালা হইয়া ও পরিশেষে সপত্নীর মুখে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের (অলীক) মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে আর সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াইলেন। 'সতিনী গরলে ভরা সাপিনীর প্রায়' 'রাক্ষসী সতিনী' ছোট গিন্নীর কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। বরং তাঁহার কাণে 'সতীনের কান্না শুনতে মিষ্টি লাগে।' এততেও সন্তুষ্ট না হইয়া, এদিকে তিনি আবার স্বামীকে বশ করিবার জন্য রসময়ী গোয়ালিনীর কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া এমন 'ওষুধ' করিলেন যে তাহাতেই স্বামীর প্রাণবিয়োগ হইল। * মৃত্যুকালে, গবেশচন্দ্র স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন, এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন। কিন্তু 'আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার ঘরে আগুন দিয়ে মটকা জ্বলে উঠ্‌লে কর্ম্ম ভাল করিনি—বললে কি তা আর নির্ব্বাণ হয়?' সেকালের কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' অথবা—'ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ'।

'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র ন্যায় 'নবনাটকে'ও বিচারচ্ছলে বহুবিবাহের দোষ আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে, সুপণ্ডিত সুধীরের সঙ্গে দলপতি দম্ভাচার্য্য (তিনি নিজে কুলীনে কন্যা দিয়া কন্যাদিগের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে ভুক্তভোগী হইয়াও গোঁড়ামি ছাড়েন নাই) পণ্ডিতাভিমানী বিধর্ম্মবাগীশ ও মোসাহেব চিত্ততোষের বাদ-প্রতিবাদ-পাঠকালে বিদ্যাসাগর-তর্কবাচস্পতির বাদ-প্রতিবাদের কথা মনে পড়ে। তৃতীয় অঙ্কে, গ্রাম্য ও নাগরের কথোপকথনে বহুবিবাহ-

---

* প্রথম প্রবন্ধে বর্ণিত লহনা ও লীলাবতী ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্তের সহিত কিঞ্চিৎ মিল আছে। তবে সে ক্ষেত্রে ব্যাপার সাংঘাতিক হয় নাই; আর তথায় জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ওষুধ করিতেছেন ও সপত্নীকে যন্ত্রণা দিতেছেন, এখানে কনিষ্ঠা। এখানে কনিষ্ঠা সেই জন্য লহনার কথা তুলিয়া নিজের সাফাই গায়িয়াছেন যে, এ সব কায জ্যেষ্ঠাই করে, কনিষ্ঠা করে না!

নিবারিণী সভা কর্তৃক অনুষ্ঠিত আন্দোলন-আবেদনের কথা এবং সুধীর ও দন্তাচার্য্যের কথাবার্ত্তায় এই আন্দোলন উপলক্ষে দলাদলির কথা জানিতে পারা যায়। এই নাটকের কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও, প্রসঙ্গক্রমে (কুলীনপত্নী চপলার সঙ্গে কথালাপে, চতুর্থ অঙ্কে) কুলীনদের বহুবিবাহের কথা, (সুধীরের সঙ্গে দন্তাচার্য্য প্রভৃতির তর্কবিতর্কে, প্রথম অঙ্কে) কৌলীন্যের অপরিহার্য্য ফল পাপাচরণের কথা, এবং (গ্রাম্য ও নাগরের কথোপকথনে, তৃতীয় অঙ্কে) 'রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের বল্লালদত্ত নিষ্কর তালুক বাজেয়াপ্ত' করিবার জন্য দরখাস্তের কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, বিধবার দুর্দ্দশা, বিধবাবিবাহ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেশী বয়সেও অর্থাভাবে বিবাহ না হওয়া, প্রভৃতি নানা সামাজিক সমস্যা নাটকখানিতে উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে।

এ নাটকখানিও সংস্কৃত নাটকের প্রণালীতে লিখিত। বর্ণনা সর্ব্বত্র বিশদ ও স্বাভাবিক, তবে স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট (Vulgar), যথা—ছোট গিন্নী পুরোহিতকে স্বামিভ্রমে ঝাঁটাপেটা করিলেন এরূপ বৃত্তান্ত আছে (যদিও দৃশ্যটি 'জামাইবারিকে'র মত প্রদর্শিত হয় নাই)। (তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত চোরের বৃত্তান্তটির উপর কিঞ্চিৎ রং চড়াইয়া ৺দীনবন্ধু মিত্র এটিকে 'জামাইবারিকে' স্থান দিয়াছেন।) নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রীগণ এবং দলপতি দন্তাচার্য্য, মোসাহেব চিত্ততোষ, সাবি দাসী, রসো গোয়ালিনী,* কুলীনপত্নী বিদ্যাবতী চপলা, বিধবা নির্ম্মলা, (চন্দ্রলেখার সই ?) চন্দ্রকলা প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণ কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' হাস্যরসাত্মক, 'নবনাটক' করুণরসাত্মক। মূল আখ্যান ছাড়া অন্যত্রও কথাপ্রসঙ্গে সতীনপোড়ার কথা বহুস্থলে আছে। এখানিতেও বিদ্যাবতী কবিতা-রচনা-কুশলা মহিলার চিত্র আছে।

(১০) বিজয়বসন্ত (আখ্যায়িকা)।

৺হরিনাথ মজুমদারের বিজয়বসন্ত আখ্যায়িকায় রাজসংসারের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বিমাতার নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত চিত্র আছে। নবনাটকের বিমাতার চিত্রও তাহার নিকট ম্লান। রাজার দ্বিতীয় পক্ষ প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ঘটিয়াছে; প্রথমার গর্ভজাত দুইটি পুত্র সত্ত্বেও রাজা কুলপুরোহিত ধৌম্যের পরামর্শে অনিচ্ছায় আবার বিবাহ করিলেন। রাজার পত্নীশোক-প্রশমনের জন্য ধৌম্য এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিমাতা দুর্জ্জয়ময়ী প্রথমে মাতৃহীন সপত্নীপুত্রদ্বয়কে স্নেহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু মন্থরাসদৃশী দুর্লতানাম্নী দাসীর প্ররোচনায় নিজ ভবিষ্যৎ স্বার্থ বুঝিয়া বাকিয়া বসিলেন। তিনি রাজার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিলেন যে, জ্যেষ্ঠ বিজয় তাঁহাকে গালি দিয়াছে ও কনিষ্ঠ বসন্ত তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে; তৎক্ষণাৎ দশরথ-সদৃশ স্ত্রৈণ রাজা পত্নীর কথা বেদবাক্যজ্ঞানে পুত্রদ্বয়ের বন্ধন ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। প্রধান অমাত্য দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে গোপনে মুক্তি দিলেন এবং দেশান্তরে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা বালক হইলেও অগত্যা প্রাণের দায়ে তাহাই করিল। অনেক বিপদ কাটাইয়া তাহারা কয়েক বৎসর পরে রাজপদ ও রাজকন্যা লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, অনুতপ্ত রাজা পুত্রদ্বয়কে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। বিমাতাও, কৈকেয়ীর মত, 'সলজ্জবদনে আয়ুষ্মান্ হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।'

বৃত্তান্তটি কতকটা রামায়ণের ছায়া, আবার কতকটা রূপকথার মত। আখ্যায়িকাবর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে দাসী শান্তা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এক সময়ে বিজয়বসন্তের করুণকাহিনী যাত্রাগানে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে রণিত হইত।

(১০) বিমাতা বা বিজয়বসন্ত (নাটক)।

বিখ্যাত নাটককার (ও অভিনেতা) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, এই উপাখ্যানের বহু পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেও দুর্লতা দাসীর কুমন্ত্রণা আছে। কিন্তু রাক্ষসী বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারের এতদ্ভিন্ন একটা গুহ্য কারণ আছে। বিমাতা যৌবনসুলভ হৃদয়াবেগে যুবক বিজয়ের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন এবং সচ্চরিত্র সপত্নীপুত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ক্রোধবশে প্রতিহিংসাপরায়ণা হইলেন।* (রূপকথায় এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে

* 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে রসিকা নাপিতপত্নীর সঙ্গে দেবলের রসালাপ ও 'নবনাটকে' রসময়ী গোয়ালিনীর সঙ্গে কৌতুকের রসালাপ অনেকটা এক প্রকারের। গোয়ালিনীর চরিত্র কতকটা মালিনী মাসীর মত, আর কতকটা লীলাবতী ব্রাহ্মণীর মত।

* অশোকের পুত্র কুনালের প্রতি তাঁহার বিমাতার অত্যাচার এবংবিধ কারণে ঘটিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর-

শুনিয়াছি।) তিনি তখন সপত্নীপুত্রদ্বয়ের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজার কাছে উল্টা চাপ দিলেন। রাজাও ক্রোধে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিনা অনুসন্ধানে তাহাদিগের বন্ধন ও মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিলেন। বিজয়, বিমাতার প্রতি ভক্তিবশতঃ প্রাণান্তেও কলঙ্ককথা প্রকাশ করিলেন না। মন্ত্রী, শস্ত্রগুরু ও ধাত্রী শান্তা তিনজনে পরামর্শ করিয়া,গোপনে কুমারদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং তাহাদিগকে দেশান্তরে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা তাহাই করিল। রাজ্ঞী আত্মগ্লানিতে দগ্ধ ও হৃদয়-জয়ে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকট স্বমুখে পাপকথা স্বীকার করিয়া আত্মঘাতিনী হইলেন। পরে অনুতপ্ত রাজা, মন্ত্রী, শস্ত্রগুরু ও শান্তার নিকট কুমারদ্বয়ের পলায়নবৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বহুদেশ অনুসন্ধান করিয়া শেষে ঋষির আশ্রমে বিজয়-বসন্তকে পাইলেন।

উপযুক্ত পুত্র থাকিতে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ যে নিতান্ত দোষাবহ, নাটককার তাহা ভারদ্বাজ মুনির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। [পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলি ছাড়া এই নাটকে রাজশ্যালক দুর্বুদ্ধির চরিত্র মৃচ্ছকটিকের শকারের চরিত্রের মতই চমৎকার! বটুকচাঁদ মোসাহেব তাঁহার উপযুক্ত সুড়োদার।]

(১০) প্রণয়পরীক্ষা নাটক।

৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক তৎপ্রণীত

অমৃতলাল বসু

'সতী নাটক' ও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের ন্যায় সুপরিচিত নহে। ইহার উদ্দেশ্য ও আখ্যানবস্তু কতকটা 'নবনাটকে'র মত।* এখানিতেও ধনীর একাধিক বিবাহের ও তাহার আপাতমনোরম পরিণামবিষম ফলের বিবরণ আছে। তবে এ বিবাহ ঠিক রাগপ্রাপ্ত বিবাহ অর্থাৎ বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, ইহা বংশরক্ষার্থ অনুষ্ঠিত; গ্রন্থকারের কথায়—'নহে ধনকুল বশে, এ বিবাহ বংশ আশে।'

নাটকের আখ্যানবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—

মানগড়ের জমিদার শান্তশীল চৌধুরী প্রথমা পত্নী মহামায়ার বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বংশরক্ষার্থ আবার বিবাহে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামায়া শাশুড়ী ও স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিবাহে সম্মতি দিলেন। স্বামী শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহাকে

প্রসাদ শাস্ত্রী এতদবলম্বনে একটি আখ্যায়িকা পুরাতন বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন। গ্রীক পুরাণে Theseus এর পুত্র Hippolytus ও তাঁহার বিমাতা Phaedra সম্বন্ধে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার বর্ণিত আছে। গ্রীক নাটককার Euripides, ল্যাটিন নাটককার Seneca ও ফরাসী নাটককার Racine এতদবলম্বনে নাটক রচনা করিয়াছেন। ড্রাইডেনের ঔরঙ্গজেব নাটকে নূরমহল তাঁহার সপত্নীপুত্র দ্বারা এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা। বাইবেলে জোসেফ ও (তাঁহার প্রভুপত্নী) পটিফারের স্ত্রী-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত ও গ্রীক পুরাণে অতিথি পিলিউস (একিলিসের পিতা) ও এষ্টিডেমিয়ার ব্যাপার অনেকটা এই প্রকারের হইলেও এতটা বীভৎস নহে।

* মনোমোহন বাবু ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের পতিব্রতোপাখ্যান পড়িয়াছিলেন, 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকের মধ্যেই তাহার প্রমাণ আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তিনি নবনাটকও পড়িয়াছিলেন।

তুষ্ট করিবার জন্য একখানি তালুক তাঁহার নামে লিখিয়া দিলেন। [ধনপতি ও লহনার বৃত্তান্তের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।] স্বামী উভয়কেই সমান ভালবাসিবেন ও পালা করিয়া অপক্ষপাতে উভয়ের গৃহে থাকিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। ভারতচন্দ্র-বর্ণিত ভবানন্দ মজুমদারের নজিরে 'প্রেমের করাতে মন চিরিয়ে সমান। সমভাবে রব আমি দুজনার স্থান॥' কিন্তু বলা বাহুল্য, নবযুবতী কাব্যরসিকা কনিষ্ঠা পত্নী সরলার দিকে তাঁহার মনে মনে বেশ একটু পক্ষপাত ছিল।

মনোমোহন বসু

ইহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ['নবনাটকে' রূপযৌবন-সম্পন্না কনিষ্ঠা পত্নী জ্যেষ্ঠার নির্যাতন করিয়াছেন। এখানিতে কবিকঙ্কণের কাব্যের ন্যায়, জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নির্যাতন করিতেছেন।] জ্যেষ্ঠা প্রথমতঃ স্বামী কাহাকে ভালবাসেন পরীক্ষা করিবার জন্য কাজলা দাসীর সাহায্যে বেদেনীর নিকট ঔষধ লইলেন, কিন্তু ঔষধের ফল স্বামীর পক্ষে সাংঘাতিক না হয় তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা দেখাইলেন। [নবনাটকের সঙ্গে এইখানে প্রভেদ; ঔষধও স্বামিবশীকরণের নহে, স্বামীর 'প্রণয়পরীক্ষা'র জন্য; নবনাটকের রসো গোয়ালিনীর স্থানে বেদেনী ও মধ্যবর্ত্তিনী কাজলা দাসী। আবার কবিকঙ্কণের দুর্ব্বলা দাসীর সঙ্গে কাজলা দাসীর সাদৃশ্য আছে, লীলাবতী ব্রাহ্মণীর কাছ হইতে ঔষধ-সংগ্রহের সহিতও সাদৃশ্য আছে। ভারতচন্দ্র যেমন মুকুন্দরামের দুর্ব্বলা দাসীর বদলে মাধী মাধী দুই সতীনের দুই দাসী খাড়া করিয়াছেন, এই নাটককারও সেইরূপ কাজলা চাঁপা দুই সতীনের দুই দাসী খাড়া করিয়াছেন—তবে প্রভেদের মধ্যে এই, চাঁপা কোন বিবাদ বা ষড়্‌যন্ত্রে নাই। কাজলা দাসী দুর্ব্বলার মত বড় গিন্নীর মন্ত্রিণী, আবার দুর্ব্বলার মতই কার্য্য উদ্ধারের জন্য ছোট গিন্নীকেও মুখের ভালবাসা দেখাইতে মজবুত। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের সহিত এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।] মহামায়া 'আঠারমায়া' দেখাইয়া সর্ব্বদাই সপত্নীর যত্ন আত্তি করিতেন। যাহাহউক, তিনি ঔষধের গুণে স্বামীর সরলার প্রতি অনুরাগাধিক্যের প্রমাণ পাইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি কাজলের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া অন্তর্ব্বত্নী সপত্নী ও স্বামীর পরমবন্ধু সদারং † বাবুর নামে ঘোর অপবাদ দিয়া ও তাহার আপাতবিশ্বাস্য চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাইয়া স্বামীর চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিলেন। ‡ স্বামী বহুকষ্টে ক্রোধসংবরণ করিয়া স্ত্রীহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পতিব্রতা সরলাকে কলঙ্কিনী-জ্ঞানে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। যাহাহউক, অনেক ভাগ্যে শেষরক্ষা হইল। মহামায়ার ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তিনি লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, গৃহত্যাগ ও ব্যাঘ্রের মুখে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; শান্তশীল নিজের বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন কিন্তু শেষে নির্ম্মলচরিত্রা সরলাকে পাওয়া গেল। এইরূপে নাটকখানি নিদারুণ বিয়োগান্ত না হইয়া মিলনান্ত হইল। [সন্তানসম্ভাবিতা সপত্নীর নির্যাতনের কাহিনী অনেকটা রূপকথার মত। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীনতপস্বিনী'র সহিত আংশিক সাদৃশ্য আছে।

† সদারং 'নবনাটকে'র চিত্ততোষের মত মোসাহেব নহেন, সংস্কৃত নাটকের বয়স্যের মত বিদূষকও নহেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞানবান্ রসজ্ঞ হিতকামী সুহৃদ্।

‡ কৌশলটি সেক্‌স্‌পীয়ারের Much Ado About Nothing হইতে গৃহীত।

তবে সেখানে জ্যেষ্ঠার উপর অত্যাচার, এখানে কনিষ্ঠার উপর অত্যাচার। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী'র সহিতও সামান্য একটু সাদৃশ্য আছে।

'বহুবিধ দোষাকর বহু পরিণয়' যে বিষম বিষময় হয়, যাঁহারা মনে করেন, পত্নীগণকে সমান চক্ষে দেখিব, তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত, সপত্নীর ঈর্ষায় যে কতদূর অনর্থ হইতে পারে, তাহাই নাটকের প্রতিপাদ্য—প্রস্তাবনায় পদ্যে রচিত নটনটীর কথালাপচ্ছলে এই উদ্দেশ্য প্রকটিত। শেষ অঙ্কের শেষ গানের শেষ কলিতেও এই ভাব প্রস্ফুট। 'বহুবিবাহের ফল, সুধা কি শুধু গরল, এই ছলে বিধি দেখাইল।'

ইহা আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র, তবে অনুতপ্ত শান্তশীল বাবু যে বলিতেছেন—'বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মুখে উপদেশ পেয়েছিলেম যে—বহুবিবাহে বহুদোষ—এক ভিন্ন বিবাহ করা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ'—এটা অবশ্য ইংরাজী মত, 'সভাকালে'র 'সুশিক্ষিত' জনের মত; শান্তশীলের আত্মীয়বর্গের নিকট নিবেদন—'বহুদোষাকর বহুবিবাহ রীতি যাতে দেশ হ'তে দূর হয়, সতত পরতঃ তার চেষ্টা পাবেন। সভাস্থাপন, গ্রন্থপ্রকাশ, আমার অভাগ্যজীবনের ইতিহাস-প্রচার এবং রাজধানীস্থ বিজ্ঞ মণ্ডলীর পরামর্শে যা' কিছু সদুপায় বলে' অবধারিত হবে, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সকল উপায় অবলম্বন করবেন' (শেষ অঙ্কে)—তখনকার কালের বহুবিবাহ নিবারক আন্দোলনের নিদর্শন।

নবনাটকের ন্যায় এখানিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে লিখিত নহে, কিন্তু নবনাটকের ন্যায় এখানিতেও প্রসঙ্গক্রমে কুলীনের বহুবিবাহের নিন্দা, কুলীনদিগের চরিত্রের নিন্দা ইত্যাদি আছে। তন্মধ্যে 'বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান' গুলিখোর নটবরের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। ইহা সেই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের জের। তবে নটবর বিবাহবণিক্ প্রভৃতির মত বহুবিবাহ করেন নাই। 'আমি নাকি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হয়ে কুল ভেঙ্গে ওঁকে বে করেছি, আর ওঁর জন্যে নাকি কত লোকের কত সাধাপাড়াতেও আর বে কল্লুম না, দেখবে একবার বেরিয়ে গে কটা বে করে আসতে পারি।' (১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক)। লীলাবতীতে হেমচাঁদও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছে (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। নবনাটকের ন্যায় এখানিতেও স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রসঙ্গ আছে। ইহাও তখনকার কালের সমাজসংস্কারের একটা দিক্।

৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা', ৺দীনবন্ধু মিত্রের কোন কোন নাটকের পূর্ব্বে এবং কোন কোন নাটকের পরে লিখিত। এগুলির সহিত 'প্রণয়পরীক্ষা'র ঘটনাগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য কোথাও কোথাও দেখা যায়। ইহা ইচ্ছাকৃত কি দৈবঘটিত, বলিতে পারি না। বিশেষতঃ একই বৎসরে প্রকাশিত 'প্রণয়পরীক্ষা' ও 'লীলাবতী'তে অনেক মিল দেখা যায়। উভয়ত্রই কৌলীন্য ও বহুবিবাহের নিন্দা, তবে 'প্রণয়পরীক্ষা'য় কৌলীন্য অবান্তর বিষয়। 'লীলাবতী'তে উহাই নাটকের মেরুদণ্ড।

পূর্ব্বে 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটকে কুলীনের নবগুণের যে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার কথা বলিয়াছি, এ দুইখানি নাটকে নটবর ও হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ তাহারই মূর্ত্ত অবতার। নদেরচাঁদও নটবরের মত গুলিখোর ও মূর্খ এবং বদরসিক; তবে নদেরচাঁদ চরিত্রহীন ও ঘোর পাষণ্ড, পক্ষান্তরে নটবর আসলে মানুষটা ভাল, তাহার হৃদয় আছে। শান্তশীল চৌধুরীর কথাগুলি ঠিক; 'লোকে আমায় বলে, "তোমার ভগ্নীপতি মূর্খ", কিন্তু এমন মূর্খ যেন এ সংসারে সবাই হয়! আমার পিতৃপুণ্যেই এমন গ্রন্থবিদ্যায় অপণ্ডিত, কিন্তু হৃদয়ের সারল্য আর দয়াশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভগ্নীপতি পেয়েছি।' তাহার গুলি-ছাড়ার সময় গুলির আড্ডায় আগুন লাগাইয়া দেওয়া ব্যাপারটি বড় সুন্দর। চরিত্র-বিষয়ে হেমচাঁদের সঙ্গে নটবরের বরং বেশী মিল আছে। উভয়েই মোটের উপর মানুষ ভাল, উভয়েই পত্নীর অকৃত্রিম অনুরাগী, উভয়ের পত্নীই গুণবতী, বিদ্যাবতী ও সুশীলা (নটবরের স্ত্রী নামেও সুশীলা), উভয়ের চরিত্রই পত্নীর গুণে সংশোধিত হইল।

মনোমোহন বাবু সুশীলার মুখ দিয়া পতিনিন্দা বাহির করিয়াছেন এবং তজ্জন্য ভাজকে দিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন,* পক্ষান্তরে দীনবন্ধু বাবুর শারদাসুন্দরী নিজের সখীর সমক্ষেও পতিনিন্দা করেন নাই, বরং সখীর মুখেও নিন্দা

* প্রণয়পরীক্ষায় ননদ, ভাজের সমক্ষে পতিনিন্দা করিতেছেন। 'সধবার একাদশী'তে ভাজ, ননদের সমক্ষে পতিনিন্দা করিতেছেন।

শুনিতে কষ্টবোধ করিয়াছেন। তবে সধবার একাদশীতে কুমুদিনার পতিনিন্দা প্রণয়-পরীক্ষার মতই। পক্ষান্তরে নিমেদত্তর স্ত্রী নিমেদত্তের মত স্বামীরও কখন নিন্দা করে নাই। তিনখানি নাটকেই ননদ-ভাজ সম্পর্ক মধুর। 'প্রণয়-পরীক্ষা'য় তরলার ব্যাপার ও 'লীলাবতী'তে তারার ব্যাপারে সামান্য একটু মিল আছে! সুশীলার 'গুলি'-সপত্নী ও নিমেদত্তর স্ত্রীর বোতলবাহিনীসপত্নী একজাতীয় রসিকতা।

(৮০) ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসন।

৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলি পাঠকবর্গের সুপরিচিত, অতএব সেগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই চলিবে।

লীলাবতী।

লীলাবতীতে সপত্নী-বিরোধের কথা আদৌ নাই বলিলেই চলে*—'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র ন্যায়, কৌলীন্যপ্রথার দোষখ্যাপন এই নাটক-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়, 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায়, নির্গুণ, চরিত্রহীন কুলীন বরে কন্যাদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি 'কুলীনকুমারে দান ক'রে গোরী-দানের ফল লাভ' করবেন, 'জামাই লবেন বেছে কুলীন-নন্দন'

'কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে।
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র অসিতে॥'

পক্ষান্তরে সর্ব্বগুণাধার ললিত কুলীন নহে বলিয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে তাঁহার মাথাকাটা যায়। বহু অনুনয়-বিনয়, তর্ক-উপদেশে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। যাহা হউক, অবশেষে কন্যার শোচনীয় অবস্থা ও প্রাণ-সংশয় দেখিয়া, তিনি 'তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে' ললিতকে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। হেমচাঁদ ও তাঁহার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই নদেরচাঁদ মাণিকযোড়, বিবাহবণিক্-সম্প্রদায়ের মত বহুবিবাহকারী না হইলেও, 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে বর্ণিত বরের মত গুলিখোর। নদেরচাঁদ নিতান্ত 'নরপ্রেত' কিন্তু 'কুলীন চূড়ামণি, ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, তাঁহার তুল্য কুলীন পৃথিবীতে নাই।' শেষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, নদেরচাঁদ 'কুলীনের কালপেঁচা।' পুস্তকের বহুস্থলে গ্রন্থকার, ললিত, সিদ্ধেশ্বর ও মামাবাবু শ্রীনাথের মুখ দিয়া কুলীনের চূড়া নদেরচাঁদের নিন্দা করাইয়াছেন এবং সিদ্ধেশ্বরের বক্তৃতা দ্বারা কৌলীন্যপ্রথার যে ধর্ম্মের সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তাহা বুঝাইয়াছেন। জমিদার ভোলানাথ চৌধুরীর বংশরক্ষার জন্য, পত্নী বর্ত্তমানেও, আর একটি বিবাহ করা উচিত এ কথাও উঠিয়াছে। জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় ঐ কারণে আবার বিবাহ না করিয়া পোষ্যপুত্র লইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন কেন, ইহাই আশ্চর্য্য। পুস্তকে বিধবাবিবাহের কথাও আছে,

দীনবন্ধু মিত্র

তবে সে নদেরচাঁদের উদ্ভট বক্তৃতায়—"বিধবার বিয়ে হবে ...জাতিভেদ উঠে যাবে, বহুবিবাহ বন্ধ হ'বে, কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাকবে না...।" ব্রাহ্মসমাজের ভূয়সী প্রশংসাও আছে। এই পুস্তকের প্রায় সকল নারীই বিদুষী, তাঁহাদের পদ্যের উচ্ছ্বাস বহুস্থলে। ঘটকটি 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটকের ঘটকের মত কৌলীন্যপ্রথার গোঁড়া।

* লীলাবতীর নদেরচাঁদের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী বলিতেছেন, 'বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।' রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার স্বামী সিদ্ধেশ্বর আমোদ করিয়া বলিতেছেন, 'এতদিন তোমার ছোট বোনটি তোমার সতীন হ'ত।'

নবীন তপস্বিনী।

সপত্নীবিদ্বেষের দারুণ পরিণাম 'নবীন-তপস্বিনী'র প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। তবে 'প্রণয়-পরীক্ষা' বা 'নবনাটকে'র ন্যায় ইহা চক্ষের সমক্ষের ঘটনা নহে, অতীত ব্যাপারের বর্ণনা। তথাপি ছোটরাণীর প্ররোচনায় (এই প্রসঙ্গে স্বামীকে ওষুধ করার কথাও একটু আছে) রাজার হাতে বড়রাণীর অমানুষিক নির্যাতন-বৃত্তান্ত হৃদয়বিদারক (১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক ও ১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক)। বড়রাণীর অন্তর্ধানের পর হইতে পুনর্ম্মেলন পর্য্যন্ত রাজার গভীর অনুতাপ মর্ম্মস্পর্শী। ইহা 'প্রণয়-পরীক্ষা' বা 'নবনাটকে'র অনুতাপের মত কেবল শেষ অঙ্কে সংঘটিত নহে। গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারে 'প্রণয়-পরীক্ষা'র সহিত সামান্য একটু মিল আছে, তবে সেখানে কনিষ্ঠার, এখানে জ্যেষ্ঠার। বৃত্তান্তটি রূপকথার মত শুনায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলেন, রাজা রমণীমোহনের ব্যাপার প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। শেষে ছদ্মবেশিনী বড়রাণীর সঙ্গে মিলন 'প্রণয়-পরীক্ষা' অপেক্ষাও মধুর, রাজার যুবক কুমার-লাভ আরও মধুর। বড়রাণীর অন্তর্ধানের বহু বৎসর পরে ছোটরাণীর মৃত্যুর পরে রাজার আবার তৃতীয় পক্ষে পঞ্চদশী কন্যার সহিত বিবাহের উদ্যোগ আমাদের সমাজে প্রচলিত বিবাহপ্রথার আর একটা কুৎসিত দিক্ প্রকটিত করিয়াছে। সুখের বিষয়, রাজা এ বিবাহে নারাজ, কন্যাকে দেখিলে তাঁহার মনে 'বাৎসল্য উদয় হয়'; পরিশেষে রাজকুমারের সহিত সেই কন্যার বিবাহে প্রকৃত রাজযোটক মিল হইল। এ পুস্তকে কুলীনের প্রসঙ্গ নাই—কেবল এক স্থলে জলধর রঙ্গ করিয়া কুলীনের 'স্বজন' বিবাহের কথা বলিয়াছেন *। এই নাটকে কামিনী বিদুষী ও কবিতারচনাকুশলা। তিনি একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া পাড়ার মেয়েগুলিকে সযত্নে সুশিক্ষা দেন। এই নাটকেও কয়েকজন ঘটক আছেন, তবে তাঁহারা কেহই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অনৃতাচার্য্যের সঙ্গে তুলনীয় নহেন। সে পক্ষে বরং 'লীলাবতী'র ঘটকরাজ ও 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো'র জাল ঘটক উল্লেখযোগ্য।

কমলে কামিনী।

'নবীন তপস্বিনী'র ন্যায় 'কমলে কামিনী'তেও রাজরাজড়ার ঘরে সপত্নীবিরোধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও বৃত্তান্তটি হৃদয়-বিদারক, এখানেও ঘটনাটি অতীত; উভয় নাটকেই রাজপুত্র সম্বন্ধে রহস্যোদ্ভেদ শেষ অঙ্কে সংঘটিত। এই ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নাটকের পাত্রী-বিশেষের কথায় জানা যায়ঃ—'মণিপুররাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী ম'রে গিয়েছেন, ছোটরাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছোট রাণী হিংসায় কাঁকুড়ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহযোগে সোণার কৌটো শুদ্ধ মতির মালা আর বড় রাণীর হৃদয়-কৌটোর মতিটি নদীর জলে নিক্ষেপ কল্লেন। শোকে সূতিকাগারে বড় রাণীর প্রাণত্যাগ হ'লো।'...'সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর!' (২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)। পরে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ছোটরাণী গান্ধারীর অনুতাপের ভয়ঙ্কর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, এই পাপানুষ্ঠানের পরক্ষণ হইতেই ছোট রাণীর মনে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন অনেক চেষ্টায়ও সদ্যোজাত শিশুটি খুঁজিয়া পাইলেন না। সেই অনুতাপাগ্নি বৎসরের পর বৎসর তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া শেষে অসহনীয় হইল, ও উৎকট ব্যাধি জন্মিল। উন্মাদবশে তিনি নিজের কৃত কর্ম্মের রামায়ণোক্ত ব্যাপারের সঙ্গে অভেদ করিতেছেন—"কৌশল্যা—বড় রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ—মন্থরার কুমন্ত্রণা—বড়রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধুনিদাই আমার মন্থরা।......বড়রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাস্‌তেন' ইত্যাদি। শেষে রহস্যোদ্ভেদ হইলে ছোট রাণীর পুত্র মকরকেতন ও বড় রাণীর পুত্র শিখণ্ডিবাহন ঠিক ভরত ও রামচন্দ্রের মত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলেন। এখানেও নির্যাতন-বৃত্তান্ত অনেকটা রূপকথার মত। রাজার যুবকপুত্র-লাভ 'নবীন তপস্বিনী'র ব্যাপারের মতই মধুর, তবে পাটরাণীর মৃত্যু 'নবীন তপস্বিনী'র ব্যাপার অপেক্ষা শোকাবহ। উভয়ত্র ছোটরাণীর হস্তে বড় রাণীর নির্যাতন, তবে একখানিতে ছোটরাণীর মন্থরা ধাত্রী, অপরখানিতে শাশুড়ী এ কার্য্যে অগ্রণী।

ইহা ছাড়া, ব্রহ্মরাজেরও দুই রাণীর বৃত্তান্ত আছে। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব (২য় অঙ্কে ২য় গর্ভাঙ্কে) বড় রাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়। এ ক্ষেত্রে রাজার, দশরথের ন্যায়, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

* (রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গানে এবিষয়ে বিষম বিদ্রূপ আছে।

প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী, রাজা ছোটরাণীর 'ক্রীতকিঙ্কর'। যাহা হউক, ছোটরাণীর প্ররোচনায় উভয় রাজ্যের মধ্যে বিষম যুদ্ধ হইলেও শেষে বড়রাণীর কন্যা রণকল্যাণীর মনোমত বর মণিপুররাজের সহকারী-সেনাপতি (প্রকৃত-পক্ষে মণিপুররাজের পুত্র) শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে শুভ-বিবাহ হইলে বড়রাণী ছোটরাণীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন—'সপত্নী সর্ব্বমঙ্গলা।'

যুবরাজপত্নী সুশীলার সহিত শৈবলিনীর ঠিক সপত্নী-সম্পর্ক না হইলেও এ ক্ষেত্রেও বিরোধ বর্ত্তমান। তবে শৈবলিনীর উদারতায় শীঘ্রই ইহা তিরোহিত হইল। শিখণ্ডি-বাহনের উষ্ণীষে সুশীলার নাম অঙ্কিত দেখিয়া রণকল্যাণীর মনে সপত্নীশঙ্কা ঘটিয়াছিল, পরে সুশীলা উক্ত বীরের ধর্ম্ম-ভগিনী জানাতে রণকল্যাণীর আশঙ্কা দূর হইল, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকে বৈধব্যযন্ত্রণা সম্বন্ধে (৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) কথা আছে (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর উক্তি) বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা 'লীলাবতী'র জের। 'অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল।' ও কবিতার উচ্ছ্বাস—

'কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল-কলিকা,
অবিরত পাপে রত অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান অভিমান বশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে?
সযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখি দেহ ধর্ম্ম জ্ঞান।
পরিণয়কালে তায় দেহ অনুমতি,
আপনি বাছিয়া ল'তে আপনার পতি।'

(২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক)

বরপণের কথাও প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছে। 'পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোল টাকার দর পাকা সোণা ক'ষে লব।' (পরবর্ত্তী কালে 'বিবাহবিভ্রাট' ও 'বলিদানে' ইহার চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।)

এখানিতেও বিদুষী কবিতা-রচনানিপুণা রমণীর অভাব নাই। 'শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী,' 'তার বানান-শুদ্ধ লেখায়' প্রেমিক মোহিত; সুশীলা বড় বানান করিতে ভোলেন কিন্তু তিনিও কবিতায় কথা কহিতে পারেন; রণরঙ্গিণী ছড়া কাটেন, জয়দেব পড়েন, সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচেন। তাঁহার সখী সুরবালাও বড় কসুর যান না।

জামাইবারিক (প্রহসন)।

মিলনান্ত হইলেও 'নবীন তপস্বিনী'তে সপত্নীবিদ্বেষের বিবরণে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে 'জামাইবারিকে' সপত্নীবিরোধের বিবরণ নিরতিশয় হাস্যকর। দুইখানি পুস্তকে নাটককার নিপুণতার সহিত যথাক্রমে সপত্নী-বিরোধের শোকাবহ (tragic) ও হাস্যকর (comic) দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রহসনে অঙ্কিত সতীনের ঝগড়ার চিত্র বাস্তবজীবনের অনুকৃতি (realistic); ইহাতে গ্রাম্যতাদোষ আছে, কিন্তু মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্যের মত ইন্দ্রিয়-লালসা নগ্নভাবে দেখা দেয় নাই। মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র সপত্নীকলহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই আমলের গ্রন্থকার তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পত্নীদিগের হাতে স্বামীর নির্যাতনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা মধ্যবিত্ত সংসারের কথা, 'নবীন তপস্বিনী'র বা 'কমলে কামিনী'র মত রাজসংসারের কথা নহে। বঙ্কিমবাবু বলেন, এই বৃত্তান্ত প্রকৃত ঘটনা হইতে গৃহীত। পদ্ম-লোচনের দুই বিবাহের কারণ ঠিক বুঝা যায় না, কনিষ্ঠার একটি কথায় অনুমান হয় যে ইহা জ্যেষ্ঠার বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন। ইঁহাদের সপত্নীকলহ ও স্বামীর নিগ্রহের বিবরণ দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি গর্ভাঙ্কে বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী মহাশয় শেষে বিবাদ-বিদ্বেষ ও অত্যাচারের জ্বালায় রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন ও বৃন্দাবনে 'বৈষ্ণব-চূড়ামণি পদ্ম বাবাজী' হইলেন। স্বামীর পলায়নে সপত্নীদ্বয়ের জ্ঞান হইল। তাঁহারা দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নাই। পতিপরিত্যক্তা হইয়া তাঁহারা বিবাদ-বিসংবাদ ছাড়িয়া ঈর্ষ্যাদ্বেষ ভুলিয়া সমপ্রাণ সখীর মত পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবতী হইলেন। এই চিত্রটি বড় সুন্দর ও সম্পূর্ণ মৌলিক। পদ্মলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)। "অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়।...সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল-বিগলিত-জলধারাকুললোচনে গলা গলি করিয়া রোদন করিতেছেন। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন।...একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন; দেখিলে বোধ হয় যেন, দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা। কেবল 'হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে' বলিয়া বিষাদে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন আর বলিতেছেন 'পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এসো, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।'..." বলা বাহুল্য, এই সংবাদ পাইয়া স্বামী তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশযাত্রা করিলেন। সপত্নীবিরোধ ও দম্পতিকলহের অবসান হইল।

কিন্তু এই সপত্নীবৃত্তান্ত প্রহসনখানির মুখ্য আখ্যান নহে। 'জামাইবারিকে'র মূল গল্প আমাদের সমাজে স্থলবিশেষে প্রচলিত বিবাহপ্রথার একটি অদ্ভুত অঙ্গ—ঘরজামাই লইয়া। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ প্রথার দোষোদ্ঘাটন, 'জামাইবারিকে' কায়স্থদিগের 'আত্মিরস' প্রভৃতি কুপ্রথার দোষোদ্ঘাটন। 'নবনাটকে' ইহার সামান্য উল্লেখ আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ কায়স্থসমাজে প্রচলিত এই সকল কুপ্রথা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে কায়স্থ হইয়াও এই সকল কুপ্রথার নিরপেক্ষভাবে দোষ দর্শাইয়াছেন। বহুবিবাহ-নিবারণ কল্পে ধনীর গৃহে ঘরজামাই রাখিলে কি অত্যাহিত ঘটে, রোগের চেয়ে ঔষধ কিরূপ বিকট হইয়া দাঁড়ায় (the remedy is worse than the disease), ইহাই পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদ্য। কামিনী ও তাঁহার মেজদিদি ও ন-দিদির স্বামীদের দশা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রেও বঙ্কিম বাবু বলেন, প্রকৃত ঘটনা হইতে বৃত্তান্তটি গৃহীত। ঘরজামাইএর শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরীতে অপমানিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে মামুলি কারণ পরিজ্ঞাত আছে, এক্ষেত্রে তাহা বলবৎ নহে। যথা

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

জমিদার বিজয়বল্লভের গৃহে আহারের কষ্ট নাই, কিন্তু গরবিণী ধনিকন্যার অসহনীয় দুর্ব্বাক্যে অপমানিত অভয়কুমার দেশত্যাগী হইলেন। তবে কামিনী পরক্ষণেই নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইলেন, ইহাই হিন্দু-পত্নীর বিশিষ্টতা। তিনি দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া ময়রা দিদি ও ময়রা বুড়াকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর সন্ধানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া পতিপদে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এক্ষেত্রেও দম্পতিকলহের অবসান অতি সুন্দর। 'সব ভাল যার শেষ ভাল।'

ইহাতেও প্রসঙ্গক্রমে দু'এক স্থলে ওষুধ করার (চাল-পড়া খাওয়ানর) কথা আছে। ঘটক-কর্ত্তৃক কুলীনের গুণব্যাখ্যা 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অনুবৃত্তি। কুলীন বামুনের মত ঘরজামাইগুলিও গুলিখোর। কন্যাবিক্রয় ও বরপণের কথাও আছে। জমিদার বাবুর পুত্রদিগের বহুবিবাহের উল্লেখও দেখা যায়।

বিয়েপাগলা বুড়ো (প্রহসন)

'বিয়েপাগলা বুড়ো'য় বিবাহপ্রথার (বিশেষতঃ কুলীনদিগের) আর একটি কদর্য্য দিক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহশূন্য হইলে, 'ষষ্টি বৎসরের ষষ্ঠীর বৎস' 'কুলীনের চূড়ামণি' রাজীব মুখুর্য্যে, প্রৌঢ়া ও যুবতী-বিধবা-কন্যা বর্ত্তমানে এবং বিবাহযোগ্য দৌহিত্র বিদ্যমানে, ষোড়শী-বিবাহের জন্য লালায়িত, যুবতী-বিধবা-কন্যার দুর্দ্দশার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহেন না। এরূপ বিবাহ-লালসার হাস্যকর দিক্‌টা আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য, নাটককার ডোমনী পেঁচোর মাকে বিয়েপাগলী বুড়ী সাজাইয়া বিয়েপাগলা বুড়োর 'কনে' বানাইয়া দিয়াছেন। প্রহসনখানিতে প্রসঙ্গক্রমে বিধবাবিবাহের আলোচনাও হইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে বিবাহব্যাপারে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র বুড়া বরের কথা মনে পড়ে। তবে উভয়ত্র বিবাহবাসনা একই কারণে সমুদ্ভূত নহে। জাল ঘটকরাজ, সাজান কনে চম্পকলতা, তাঁহার পাতান-ভাজ ও পাতান-বেয়ান এবং বৃদ্ধের বিধবা দুহিতা রামমণি গৌরমণির কথায় সংস্কার সতীনঝিদের সঙ্গে অবনিবনাওএর প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে গৌরমণির কথা কয়টি বড় মিষ্ট।

"যথার্থ বিয়ে হয়, চারা কি? তিনি আমাদের মা হবেন, না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন করব, খাওয়াব, মাথাব......।" পক্ষান্তরে বড় মেয়ে রামমণির কথাগুলি বড় তিক্ত। এখানিতে দলাদলির প্রথা, স্বামী বশ করার ঔষধ, ঘটকের ধূর্ত্ততা ও মিষ্টভাষিতা প্রভৃতির কথাও (নবনাটক ও কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের মত) আছে। সুশীলের একটি কথা হইতে বুঝা যায়, গৌরমণি লেখাপড়া জানেন। বঙ্কিম বাবু বলেন, প্রহসনখানি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

(৷৷০) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ'।

৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ' এই আমলের পরে লিখিত হইলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেননা

রমেশচন্দ্র দত্ত

এই আমলের লেখকদিগের ন্যায় তিনিও সমাজ-সংস্কারের প্রকট উদ্দেশ্য লইয়া এই দুইখানি আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। বিষয়ী তারিণী বাবু বংশরক্ষার ধুয়ায় পত্নীর বিনা সম্মতিতে প্রৌঢ় বয়সে দৌহিত্রীর বয়সী গোপীবালা-নাম্নী বালিকার পাণিপীড়ন করিলেন (প্রণয়-পরীক্ষা' ও নবনাটকের সঙ্গে কতকটা মিল আছে।) যুবতী সপত্নীর ঝঙ্কারে ও স্বামীর অযত্ন-অনাদরে কন্যা-শোকাতুরা প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইল। শেষে গোপীবালার ব্যবহারে বৃদ্ধ তারিণী বাবুকে স্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনু-শোচনা করিতে হইয়াছিল। গ্রন্থকার এই চিত্রের পার্শ্বে দেখাইয়াছেন যে, তারিণী বাবু, পত্নী বর্ত্তমানে তাহাকে ঠেলিয়া অবাধে বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিতে পারিলেন, অথচ বালবিধবা সুধার পুনরায় বিবাহ হইলে তাহা সমাজে নিন্দিত হয়! ইহা ছাড়া, তিনি কন্যার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, নারীজাতীয় বিদ্যা-শিক্ষা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গও তুলিয়াছেন।

এই দুই খানি পুস্তকেরও বহু পরে লিখিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (টি. এন. মুখার্জ্জির) 'ফোকলা দিগম্বর' নামক পুস্তকে ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' নামক ছোট গল্পে এইরূপ বিবাহের হাস্যকর দিক্ সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক।

মন্তব্য।

এই সুদীর্ঘ ও নীরস আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, উল্লিখিত পুস্তকগুলির কতকগুলিতে কুলীনের কেচ্ছা ও কুচ্ছো (কুৎসা) প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু অনেকগুলিতেই সপত্নী ও বিমাতার বিদ্বেষের বিষময় ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। সারাজীবন ধরিয়া সপত্নীর সদ্ভাবের চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হয় নাই। হইবার কথাও নহে। কেননা লেখকগণ সকলেই একাধিক বিবাহের দোষকীর্ত্তন উদ্দেশ্যেই লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই সামাজিক কুপ্রথার অবাধ প্রচলনের দুর্দ্দিনে, সমাজ-সংস্কারের ঝঞ্ঝা-বাতের মধ্যে, তীব্র বাদ-প্রতিবাদের অশনি-নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে, যে সাহিত্যের জন্ম, বহুবিবাহপ্রথার দোষ-কীর্ত্তন যাহার বাক্স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন, সামাজিক অনিষ্ট-সংশোধন যাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সে সাহিত্যে মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় ফষ্টিনষ্টি থাকিবে না, ইহা অবধারিত। 'দু সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে', 'দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর' ইত্যাদি মজামারা কথা এই আমলের লেখকদিগের মনে স্থান পাইতে পারে না। ওরূপ তরল রস-সঞ্চারের অবসর তখন আদৌ ছিল না। কুন্তী-দ্রৌপদীর আদর্শ তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাঁহারা তাহা চাপা দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কৈকেয়ী সুরুচি, দেবযানী প্রভৃতির ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের

লহনা, লীলাবতী-ব্রাহ্মণী, সোহাগী প্রভৃতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহারা বিমাতার ও সপত্নীর চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে যেমন দেখা যায়, অনেক স্থলে দু'সতীনের এক জন প্রবলা, অপর জন মৃদুস্বভাবা ও স্নেহময়ী, এ সকল পুস্তকেও সেইরূপ দেখা যায়। 'নবনাটকে' সাবিত্রী, 'প্রণয়পরীক্ষা'য় সরলা, 'নবীন তপস্বিনী'তে বড়রাণী প্রমদা সুশীলতার আদর্শ। (জামাইবারিকে উভয়েই উগ্রচণ্ডা)। সপত্নীসন্তানগণের বেলায়ও দেখা যায়, তাহারা সরল ও মধুরস্বভাব, বিমাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ।

পাড়াগাঁয়ের একখানি বাড়ী

(পাড়াগেঁয়ে লোকের লেখা)

গৃহস্থ গিরিশ ঘোষ, গৃহিণী গিরীন্দ্র বালা,
নিবাস হুগলী জেলা, গণ্ডগ্রাম সেহাখালা।
গৃহস্থ শিক্ষিত যুবা, গৃহিণী ও সুশিক্ষিতা,
বিনয়ী গৃহস্থ খুব, গৃহিণীও সুবিনীতা।
রূপে গুণে কুলে শীলে গিরিশ-গিরীন্দ্রবালা,
উভয়ে সমান আহা! যেন এক ছাঁচে ঢালা!
দুইতালা বাড়ীখানি, সমুখে পথের ধার,—
ছোট বটে,—কিন্তু বড় ধবধ'বে পরিষ্কার!
সমুখেতে ক্ষুদ্র এক সাজান ফুলের বন,
মেহেদি গাছের বেড়া, কাটা ছাঁটা সুশোভন!
গেটেতে বকুল দু'টি,—দু'টি কামিনীর তরু,
পাছে চামেলির ঝাড়—পাতাগুলি সরু সরু,
কলমের আমগাছ, আর গোটাকত লিচু—
বাগানের বাহিরেতে দাঁড়াইয়ে, উঁচু, নীচু;
ওপাশে সবজী ক্ষেত,—তাই কি নিতান্ত কম?
ক'ঝাড় বেগুনগাছ, গোটাকত সালগম;
কয়েকটা কপি দেখ, বাঁধা নাই,—খালি ফুল,
এপাশে একটী গাছে ধরেছে বিলিতি কুল;
মাটিতে পালম্ শাক,—মাচা-ভরা লাউ গাছে,
গোল লণ্ঠনের মত লাউগুলি ঝুলে আছে;
গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া মাটির গোয়ালঘর,
দুয়ারে দরজা নাই, বাঁশের ভাঙ্গা আগড়;
কালো চক্চকে রঙ, বেশ মোটা সোটা গাই,
একেবারে নেড়ামাথা, শিঙের বালাই নাই!
ধব্ধবে সাদা খুব বক্না বাছুর তার,
চু মারে ও খায় দুধ, লেজ নাড়ে বার বার;
খিড়কীতে পুষ্করিণী, পাড়েতে খেজুর গাছ,
স্বচ্ছজলে দলে দলে কত রঙ্গে খেলে মাছ;
বাঁধা ঘাট নাই, তাই তালগাছ কেটে কেটে,
হাড়ি দাদা খুঁটো দিয়ে পঁইটে দিয়েছে এঁটে।
ওপারে বাগদী বউ, চালা ঘরে করে বাস,
পুকুরে ভাসিছে তার দলে দলে পাতি হাঁস,
বাগদী বোয়ের বেটা ছিপ হাতে হাঁটু-জলে,
দাঁড়ায়ে কোপীন প'রে, হেলা জামগাছ তলে;
হাড়ি দা' বিকাল বেলা কাটে খেজুরের রস,
নলী বেয়ে কলসীতে পড়ে বেশ টস্ টস্;
পাঁচিলের গায়ে গায়ে সারি সারি নারিকেল,
দক্ষিণে একটী গাছে ধরেছে প্রকাণ্ড বেল;
বাড়ীখানি ছোটখাট, উপরে কুটুরী দু'টি,
নীচেতে পাঁচটি ছ'টি, কোন দিকে নাহি ত্রুটি।
ফুট্‌ফুটে ধব্‌ধবে, বাড়ীটি দেখিতে বেশ,
প্রেমিকের প্রাণমত নাহি মলিনতা লেশ;
প্রভাতে উষার কোলে, উদিলে তরুণ রবি,
দূরে থেকে মনে হয়, যেন একখানি ছবি!
যেমন মানুষ দু'টি, তেমনি এ বাড়ীখানি—
স্বপন-শোভায় গড়া প্রণয়ের রাজধানী।

পুস্তক-পরিচয়

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম. এ. কর্ত্তৃক প্রণীত। একে ব্যাকরণ তাহাতে বিভীষিকা, কিন্তু তবুও বাঙ্গালী পাঠক এই বিভীষিকা ক্রয় করিয়াছে এবং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। অতএব, এখন এ কথা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, ললিতবাবু যে উদ্দেশ্যে এই বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যদি সার্থকও না হইয়া থাকে, অন্ততঃ লোকে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং হয় ত কেহ কেহ বা সাবধানও হইতে পারে। যাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার লেখক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই যে ব্যাকরণ জ্ঞান নাই, তাহা আর বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না; সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিয়া থাকেন, ভাষার উপর খিচুড়ী পাকাইয়া থাকেন; এই সমস্ত অসংযত চালককে সংযত করিবার জন্য বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের পরিবর্ত্তে ললিতবাবুর মত রসিক অধ্যাপকেরই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই তিনি এই বিভীষিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং এখন তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে বহু নূতন উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং "দোআঁশলা শব্দ ও শব্দ সজ্ব" ও "অধ্যায়ে বিভক্তিযোগ' নামক দুইটি নূতন পরিচ্ছেদ বসান হইয়াছে; অন্যান্য স্থানেও অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই জন্য পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম সংস্করণের পুস্তক কিনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকও আর একখানি কিনিতে হইবে; আর যাঁহারা এখনও এমন সুন্দর বই কেনেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে ছয় আনা পয়সা খরচ করিয়া এই বইখানি অবশ্য অবশ্য ক্রয় করিবেন।

মমতাজ

(মূল্য আট আনা মাত্র।)

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি. এ. প্রণীত; ইহা একখানি ইতিহাস-মূলক নাটক। আমরা এই নাটকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইহা বাহুল্য-বর্জ্জিত; মমতাজের চরিত্রের বিকাশ-সাধনের জন্য যে সমস্ত পাত্রপাত্রীর অবশ্য-প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অকারণ কোন পাত্রের আবির্ভাব এই নাটকে দেখিতে পাইলাম না। গানগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবুর দুই চারিটি ছোট-গল্প আমরা পাঠ করিয়াছি; বোধ হয় 'মমতাজ'ই তাঁহার রচিত প্রথম নাটক। প্রথমখানি দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি; তিনি ভবিষ্যতে নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম জীবন

শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্যের কথা কিছু উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ বাবু তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পবিত্র জীবনকথার আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে ছোট হইলেও ইহাতে অনেক সারবান কথা আছে। স্বর্গীয় নবীনবাবুর জীবনকথা আলোচনা করিলে সকলেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন এবং যথেষ্ট শিক্ষালাভও করিবেন।

শক্তি

(মূল্য বারো আনা)

নাটক।—শ্রীঅমলা দেবী প্রণীত। শক্তি Sign of the Cross-এর ছায়া-অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, উপরিলিখিত ইংরাজী নাটকের "নায়ক Marcusকে সেনাপতি শঙ্কর রাও, এবং Merciaকে পূর্ণরূপে চিত্রিত করিয়াছি।" তাঁহার এই উভয় আদর্শ চিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রেমের শক্তিতে কিরূপে কামকলুষ ক্রমশঃ ধৌত হইয়া যায়, এবং ধর্ম্মের শক্তিতে বিষম অত্যাচারী প্রবল বাজারও রাজাসন টলে, নাটকের এই দুইটী বীজ—অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও সফলও হইয়াছে। নাট্যকলায় এই বীজের ক্রমবিকাশ প্রকাশ করা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। নাটকখানির ভাষা সহজ, সরল, অথচ গ্রাম্যতা-দোষশূন্য এবং স্থানে স্থানে বেশ মর্ম্মস্পর্শী।

আদর্শ গৃহ-চিকিৎসা

(মূল্য দশ আনা)

এ খানি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা পুস্তক। ষ্টাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি হইতে এম্. এন. চৌধুরী, এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমাদের কোন চিকিৎসক বন্ধু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত তথ্যই প্রদত্ত হইয়াছে এবং সঙ্কলয়িতা বিশেষ যত্নসহকারেই বিবিধ ইংরাজী পুস্তক হইতে পীড়ার নাম ও লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ঔষধের ডাইলিউসনের কথাও যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সুন্দর।

কাহিনী (সচিত্র)

(মূল্য দশ আনা)

শ্রীগুরুদাস আদক প্রণীত। ইহাতে এগারটী প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশীলা আদর্শ-মহিলা-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। নারীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশকল্পে ইহা সহায়তা করিবে।

পর্ণপুট

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত *

[লেখক—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্. এ.]

আমরা কলির জীব, নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি। সুতরাং তরুণ কবির কালিদাস নাম শুনিয়া অবধি আশান্বিত হইয়াছি যে, তিনিও এককালে প্রাচীন কবি কালিদাসের ন্যায় স্বনামধন্য হইবেন। তরুণ কবির অনেকগুলি কবিতা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়াছি এবং সে-গুলির ভাবসৌন্দর্য্যে ও ভাষামাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে পুস্তকাকারে সেই সমস্ত কবিতাকুসুম একত্রগ্রথিত দেখিয়া প্রীত হইলাম। একেই ত কবির ফুলের মালা মনোলোভা, তাহাতে আবার সম্পাদক মহাশয় মালাটি যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহাতে মালার মূল্য আরও বাড়িয়াছে। অনেক কবিই বিনিসূতায় মালা গাথেন, কিন্তু এই কবির রচিত মালার মধ্যে ঐক্যের কনকসূত্র সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছে। তাহাতে কবিতাগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' ঝলমল করিতেছে।

আধুনিক অধিকাংশ কবিই জোছনা ছানিয়া, মলয়া মাখিয়া, (!) পীরিতি-সাগর মথিয়া কবিতা লেখেন। তাঁহাদের 'চাঁদে নিরখি, ভাসে দুটি আঁখি', তাঁহাদের চিত্ত-চকোর সুধাপানে বিভোর। স্বীকার করি, এ সব কবিতা পড়িতে পড়িতে সুন্দর ভাবাবেশ হয়, গোলাপী নেশা ধরে, চোখ ঢুলু ঢুলু করে, প্রাণ উড়ু উড়ু করে। কিন্তু নেশাটুকু কাটিয়া গেলে দেখা যায়, তাহাতে সার কিছুই নাই। সে সব কবিতার নিন্দা করিতেছি না, সেগুলি যখনই পড়ি, তখনই গলিয়া যাই, যেন আমাতে আর আমি নাই। কিন্তু এক এক সময়ে মনে হয়—বোধ হয় সেটা বয়সের দোষ—একটু স্থায়িভাব থাকিলে যেন ভাল হইত। শুধু 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করা' প্রীতিগীতি আর ভাল লাগে না। তাই এই কবিতাগুলি পাইয়া প্রীত হইয়াছি। এগুলিতে সার আছে, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সমাবেশে এগুলি হৃদয়গ্রাহী। ছন্দের ঝঙ্কারও বড় মিঠে। পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কবিতাগুলি মনে মনে না পড়িয়া যেন আবৃত্তি করেন, তাহা হইলে ছন্দোমাধুর্য্যে ও ভাষাচাতুর্য্যে চমৎকৃত হইবেন।

যাঁহারা তরুণবয়স্ক, প্রণয়ের কবিতা পড়িতে চাহেন, তাঁহারা তৃতীয় পর্য্যায়ের প্রেমগীতিগুলি পড়িতে পারেন। সেগুলিতে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তীব্রতা বা উদ্দামতা নাই। গ্রন্থারম্ভে 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কবির 'জননী বঙ্গভাষা'র প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সূচিত করে। 'জননী বঙ্গ' কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশে'র পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। 'সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি' কবিতাটি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি'র গৌরবকীর্ত্তন। ইহার প্রতি ছত্রে স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি প্রত্যেক ভারতসন্তানের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা উচিত। 'বিশ্ব ও বিশ্বনাথ', 'সর্ব্বত্যাগী বিশ্বরাজ', 'দুর্ব্বাসা', 'সত্য' (প্রহ্লাদ), 'ধ্রুব' 'শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল' প্রভৃতি কবিতা ধর্ম্মভাবময়।

বৃন্দাবন-গাথাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ভাবরাজ্যে গিয়া পড়ি। আর এটুকু বলিলেও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 'মথুরার দূত', 'অন্ধকার বৃন্দাবন', 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি', 'রাখাল-রাজ', 'মথুরার দ্বারে' প্রভৃতি কবিতা, যৌবনে রঙ্গমঞ্চে শ্রুত 'নন্দবিদায়' ও 'প্রভাসমিলনে'র বহু করুণ গীত—যথা 'আর ত ব্রজে যাব না ভাই', 'তোদের যিনি রাজা দ্বারী, রাখালরাজ সেই বংশীধারী'—এতকাল পরে স্মরণ করাইয়া দিল। ইহার মধ্যে 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'

---

* শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, M. A. B. L. সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতাটি বড়ই মধুর লাগিয়াছে। এ যে চিরপুরাতন অথচ নিতুই নব।

যে কবিতাগুলিতে তরুণ কবি বঙ্গমাতার সুসন্তানদিগের চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সাধককবি নীলকণ্ঠের প্রতি' আমার সব চেয়ে ভাল লাগিল—কেননা নীলকণ্ঠ আমাদের নিতান্তই আপনার, তাঁহার যাত্রাগান আজও কাণে বাজে, হৃদে রাজে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—'তোমার অমর কণ্ঠে শুনি আমি এবঙ্গের হিয়ার স্পন্দন।'

তরুণ কবির সকল পর্য্যায়ের কবিতাই মিষ্ট, কিন্তু সেগুলির মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট লাগিয়াছে—পল্লী-জীবনের অনাড়ম্বর অকৃত্রিম সরলতা, শুচিতা ও মঙ্গলমূর্ত্তির চিত্রগুলি। দৃষ্টান্তস্থলে 'পল্লীবধূ', 'বধূবরণ', 'বালিকা বধূ' 'শূন্যগৃহ', 'কুড়ানী', 'হাঘরে', 'কৃষকের ব্যথা' ও 'কৃষাণীর ব্যথা'র উল্লেখ করিতে পারি। শেষোক্ত কবিতাটির করুণরস অতুলনীয়—পড়িতে পড়িতে চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। বিলাতী-বিলাসের জৌলুসে ক্রমেই আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছে। কেরোসিনের আলোকে অভ্যস্ত হইয়া আর আমরা সেই গৃহকোণের ক্ষুদ্র দীপের স্নিগ্ধ আলোক দেখিতে পাই না। আমাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক আদর্শেও তাহাই ঘটিয়াছে। উদীয়মান কবিগণ যদি আবার আমাদের সেই বিস্মৃতপ্রায় পূত-স্নিগ্ধ আদর্শগুলি চোখের সমক্ষে আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আশা করি, এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে তরুণ কবি কৃতকার্য্য হইবেন।

'হাঘরে' কবিতাটি সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। দারিদ্র্য একটা অপরাধ (Poverty is a crime) ইহাই যে দেশের অর্থনীতির বোল, সে দেশের কবি কূপর (Cowper) হাঘরেদের (Gypsy) বর্ণনায় কেবল তাহাদের জীবনযাত্রার কুৎসিত দিক্‌টাই দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' যে দেশের প্রবচন, ভিখারী শঙ্কর যে দেশের দেবতা, সে দেশের কবি হাঘরেকে 'বাঁধনহারা মুক্তপুরুষ' বলিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? এইখানেই হিন্দু-কবির বিশিষ্টতা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তকের ছাপা, কাগজ, মলাট, সবই পরিপাটী। মুদ্রাকর-প্রমাদ বড় একটা দেখিলাম না, তবে পুস্তকখানির নাম পরিচয়ে যেন একটু খটকা বাধিল—পর্ণপুট না স্বর্ণপুট?

শোক-সংবাদ

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর ইহ জগতে নাই। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর বিগত ২২এ জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন সত্য সত্যই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের গুণিগণ তাঁহাকে জানিতেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠ [illegible]নামখ্যাত পরলোকগত মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। বাড়ীর পাঠশালায় সৌরীন্দ্রমোহনের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন; আট নয় বৎসর পরেই হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'ভূগোল ও ইতিহাস-ঘটিত বৃত্তান্ত' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহারই দুই বৎসর পরে 'মুক্তাবলী নাটিকা' নামক গ্রন্থ রচিত হয় এবং কিছুদিন পরে তিনি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। কলেজের পাঠ শেষ হইবার পর সৌরীন্দ্রমোহন বাড়ীতে পরলোকগত পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করেন। সেই সময়েই তিনি সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং সেই জন্যই সংস্কৃত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কি দেশীয় সঙ্গীত, কি ইউরোপীয় সঙ্গীত, তিনি উভয় সঙ্গীত বিদ্যায়ই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই কারণেই সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ বা ডক্‌টর অব মিউজিক বলিয়া তিনি দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
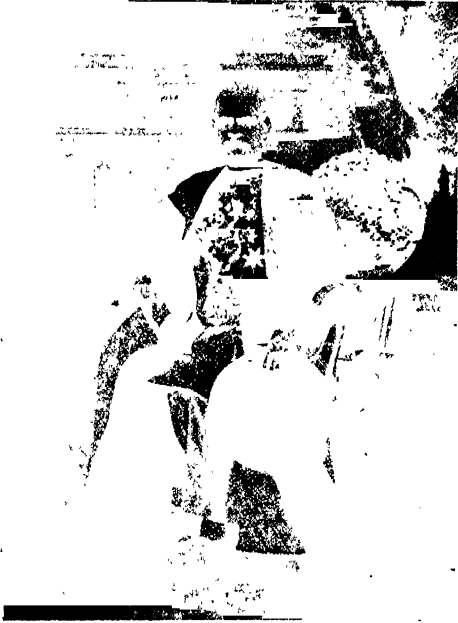
রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সৌরীন্দ্রমোহন তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সঙ্গীতসার' নামক পুস্তকখানি সঙ্গীতবিদ্যা-সম্বন্ধে সর্ব্ববাদি-সম্মত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইঁহার রচিত, প্রকাশিত বা অনুবাদিত অন্যূন ৫০ খানি পুস্তক আছে। সত্য সত্যই সঙ্গীতশাস্ত্রে সৌরীন্দ্রমোহন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। পৃথিবীর এমন দেশ নাই, যেখান হইতে তিনি এই জন্য উপাধি ও পারিতোষিক পান নাই।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল মিউজিক স্কুল" এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক" নামক দুইটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন এবং রাজা ও সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন রাজাবাহাদুর বঙ্গভাষায় তাঁহার অভ্যর্থনাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় বিভিন্ন রাগরাগিণী-সংযোগে ইংরেজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

পরলোকগত বটকৃষ্ণ পাল

বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় ঔষধের ব্যবসায়ে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি বঙ্গদেশে বিখ্যাত নহেন। যে সমস্ত গুণ থাকিলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়া থাকেন, বটকৃষ্ণপাল মহাশয়ের সেই সকল গুণ ছিল; তাহারই জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের এতদূর সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হাবড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরে বটকৃষ্ণ পাল বণিক্‌গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবার উক্ত গ্রামে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। বাল্য বয়সেই বটকৃষ্ণের পিতামাতার মৃত্যু হয়; তাঁহাদের অবস্থাও তখন ভাল ছিল না। বালক বটকৃষ্ণ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কলিকাতা বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে তাঁহার মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া ১২ বৎসর বয়সের সময়ই তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে হয় এবং নুতন-বাজারে তাঁহার মাতুলের যে বেণে-দোকান ছিল, তাহাতেই কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর এই স্থানে কাজ করিবার পর তিনি পাটের কাজ আরম্ভ করেন; কিন্তু এ কাজেও তাঁহার মন লাগিল না। এই সময়ে একবার তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া যান, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। এই কয় বৎসর কাজ কর্ম্ম করিয়া তিনি সামান্য যাহা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই দ্বারা ১৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি ১২১ নম্বর খেংরাপটী ষ্ট্রীটে একটী বেণে-দোকান ক্রয় করেন। কিন্তু অতি সামান্য পুঁজিতে দোকানের কাজ কর্ম্ম চলা অসম্ভব হওয়ায় তিনি জোড়াসাঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের অংশী হইয়া এই দোকানের কার্য্য চালাইতে থাকেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার একটা ঔষধের দোকান খুলিবার ইচ্ছা হয় এবং তাঁহার সেই মসলার

৺বটকৃষ্ণ পাল

দোকানের মধ্যেই তিনি বিলাতী ঔষধেরও আমদানি করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হয়। ক্রমে এই ঔষধের কারবার এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, ঐ দোকানে কাজ চালান অসম্ভব হইয়া উঠে; তখন তিনি ৭ নং বনফীল্ড লেনে দোকান খোলেন এবং এই সময়েই তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল মহাশয় পিতার সাহায্য করিবার জন্য দোকানের কার্য্যে যোগদান করেন। যেমন পিতা তেমনই উপযুক্ত পুত্র; পিতা-পুত্রের চেষ্টা ও যত্নে বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর বিলাতী ঔষধের দোকান দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এখন কলিকাতার নানা স্থানে উক্ত কোম্পানীর শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল মহাশয়ই কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। সামান্য অবস্থা হইতে চেষ্টা যত্ন, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে মানুষ কতদূর উন্নতিলাভ করিতে পারে, পরলোকগত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় তাহার দৃষ্টান্ত। তিনি এক দিকে যেমন উপার্জ্জন করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই মুক্তহস্তে নীরবে দান করিয়াছেন; কত দীনদরিদ্র যে, তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই প্রকারে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বিগত ২৯এ জ্যৈষ্ঠ বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন।

স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস

মৃত্যু—৮ই আষাঢ় সোমবার—১৩২১ পূর্ব্বাহ্ণ ৫৲ ঘটিকা।

সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি, ভূতপূর্ব্ব "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে"র সুযোগ্য সম্পাদক, ব্রাহ্ম সমাজের প্রথিতনামা কর্ম্মী, সহৃদয়, পূতচরিত্র, সৌম্যমূর্ত্তি ভুবনমোহন দাস ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব পুণ্যবান স্বর্গীয় কাশীশ্বর দাস মহাশয় ইঁহার জনক। কাশীশ্বর বাবুর খুড়তুত ভাই স্বর্গীয় জগবন্ধু দাস মহাশয় ইঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেলীর বাগ গ্রামে। ভুবনবাবুর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বনামধন্য স্বর্গীয় কালীমোহন দাস ও পুরুষসিংহ স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস। ভুবনবাবু মৃত্যুকালে দুই কৃতী পুত্র, চারিকন্যা ও বহু পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও প্রদৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঙ্গালার সুসন্তান বাঙ্গালীর গৌরবমণি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস।

ভুবনবাবু ঢাকা কলেজে শিক্ষা-লাভ করিয়া প্রথমে এটর্ণি ও পরে হাইকোর্টের উকীল হন। আইন ব্যবসায় ইঁহাদের পুরুষানুক্রমিক—আইন ইঁহাদের অস্থিমজ্জা ও রক্তের সঙ্গে জড়িত। এই ব্যবসায়ে ইঁহারা পুরুষানুক্রমেই যশঃ ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন।
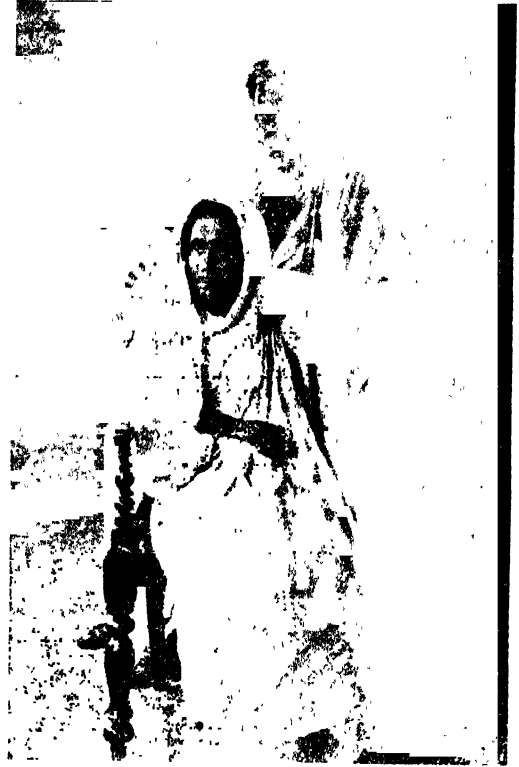
স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস

তবে আইন ব্যবসায় ইঁহাদের জীবনের অবলম্বন হইলেও সর্ব্বস্ব নহে। যাবতীয় সংস্কার ও সৎকার্য্যে দেশ-বিশ্রুত দাস-পরিবার চিরকালই অগ্রণী এবং অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া চিরদিনই দেশের ও জনমানবের সেবা করিয়া আসিতেছেন। কি সমাজ সংস্কারের কঠোর সংগ্রামে, কি রাজনৈতিক গভীর আন্দোলনে, ভুবনবাবু সর্ব্বত্রই বীর পুরুষের ন্যায় ধৈর্য্য ও সৎ সাহসের সহিত আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক-রূপে তাঁহার লেখনী অগ্নি বর্ষণ করিত—সে আগুন বহু আবর্জ্জনাকে দগ্ধ করিয়া এদেশে বিবিধ প্রকার সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। আর সেই উর্ব্বর জমিতে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক সুবাসিত পুষ্প প্রস্ফুটিত

হইয়াছিল। লর্ড লিটন তাঁহার লেখার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। স্বায়ত্তশাসনের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি যে সকল চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা Lord Lyttonএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল, তাঁহার লেখা সুমিষ্ট ও সার্থক ছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার-রূপে ও ভারতসভার সংশ্রবে তিনি বহুকাল দেশের সেবা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কুচবিহার-বিবাহ যখন তৎকালীয় সমাজকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল, মতের দ্বন্দ্ব প্রভঞ্জনের মত যখন সেই সুকুমার তরুটিকে আমূল কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্দ্দিকে তাঁহার যে সমস্ত শিষ্য বিষম আন্দোলন করিয়া দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভুবনবাবু তাঁহাদের অন্যতম। বিপ্লব মাত্রই ভয়াবহ সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের সেই করাল বিপ্লবও আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। যে পূত মন্দাকিনীর মধুর ধারা বঙ্গ দেশের শুষ্ক মরুভূমিতে অমৃত সঞ্চার করিয়াছিল, যাহা আজ বিধাতার কৃপায় সর্ব্বথা বরেণ্য হইত, তাহার এক অংশ স্থবির, অন্য অংশ মৃত এবং অবশিষ্টাংশ, অগ্নি-হোতার ক্ষীণ-প্রভ পবিত্র প্রদীপটির মত, আপনার অন্ধকার গৃহকোণের ক্ষুদ্রাংশে ম্লানরশ্মি আলোক-সম্পাত করিতেছে। ভুবনবাবু নবপ্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য আদর্শে ঘটিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্ব প্রকার সভা-সমিতির আলোচনা ও মন্ত্রণায় আপনার একটি ভোটের গুরুত্ব বহুকাল ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তবে যে আন্তরিকতা, যে উৎসাহ উদ্যম, যে সরলতা ও উচ্চ আদর্শ তাঁহার জীবনকে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও গৌরবমণ্ডিত করিয়া-ছিল, এই অপরিসর কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি তাহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদাই ঐকান্তিক যত্ন করিয়াছেন। তিনি খাঁটি সত্যের সরল উপাসক ছিলেন, কৃত্রিমতা ও বাহ্যাড়ম্বর কোন দিনই তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে অনাবশ্যক গোলযোগের সৃষ্টি করিতে পারে নাই! সুতরাং ভীরুর ন্যায় আত্মগোপন কিংবা দাম্ভিকের ন্যায় মিথ্যা আত্ম-প্রকাশ, সর্ব্বদাই তিনি ঘৃণা করিতেন এবং এই জন্যই তাঁহার ভোটটি অনেক সময় মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে সাধারণ সমাজের বিবিধ সভায় অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ শনৈঃ শনৈঃ সেই মর্য্যাদাহীন অর্থশূন্য কোলাহল হইতে আপনাকে অনেক দূরে অপসারিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহাস্পদ স্বজনবর্গ নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিয়া,—স্বার্থপর প্রবঞ্চকগণ বন্ধুতার মোহজাল বিস্তার করিয়া, শঠের ছলনা তাঁহার উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সাংসারিক হিসাবে নানা প্রকারেই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া-ছিল। বিবিধ ঘটনা তাঁহার আনন্দময়, শান্তিময় সংসারের চতুর্দ্দিকে এমন একটা বিকট চিৎকার, এমন কুৎসিত তাণ্ডব-নৃত্য ও এমন অস্থিপঞ্জর-পেষণকারী অকরুণ দৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, অমন সহিষ্ণু হৃদয়ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সে অস্থিরতা, হিংসার প্রকোপ বিস্তারের জন্য নহে; তাহা আপনার হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার কল্যাণের জন্য। যাহা হউক, ইহার ফলে সংসারের চক্ষে তাঁহাকে হেয় হইতে হইয়াছিল। উত্তমর্ণের দ্বারে সমাজের বহিরঙ্গণে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহাকে অপরাধীর মত দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়া-ছিল। কিন্তু ধন্য পিতৃভক্ত পুত্র চিত্তরঞ্জন! বহুকষ্টে উপার্জ্জিত প্রায় লক্ষ মুদ্রা আজ পিতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া ঋণ-পরিশোধার্থ তুমি এই স্বার্থময় সংসারে যে মহান্ আদর্শের পুণ্য দৃশ্য দেখাইলে, তাহা বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অনন্ত কাল স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। আর বাঙ্গালী জাতি এই পূত কর্ম্মের জন্য চিরকাল তোমার উচ্চশিরে মণিময় গৌরব-কিরীট পরাইয়া রাখিবে।

শান্তি ও মুক্তিপ্রয়াসী ভুবনবাবু ধীরে ধীরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া পুরুলিয়ায় তাঁহার চিত্তবিনোদন-কারী রমণীয় উদ্যানবাটিকায় আপনার আরাম-গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই তাপসাশ্রমে তাঁহার পুণ্যময়, কর্ম্মময় জীবন, প্রকৃতির উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিল। স্বভাবের সেই রম্য নিকেতনে, পারিবারিক স্নেহভালবাসার মধুর-তায় নিমগ্ন থাকিয়া, তিনি আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনার্থ বিবিধ আয়োজন করিলেন।

যিনি এক দিনের জন্যও সেই আশ্রমের আনন্দ ও শান্তির কোমল স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তিনি ইহ জীবনে তাহা বিস্মৃত হইবেন না। সন্তান-সন্ততির হাস্যকোলাহলে, অতিথি-অভ্যাগতের প্রফুল্ল মুখ-জ্যোতিতে, পণ্ডিত ও সাধু

সজ্জনের পবিত্র চরণধূলিস্পর্শে সেই ঋষি-গৃহ দেব-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল।

প্রায় আট মাস পূর্ব্বে এই আশ্রমেই ভুবনবাবুর সহধর্ম্মিণী, এতবড় পরিবারের অন্নপূর্ণা জননী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। কপোতীর অভাবে কপোত যেমন মিয়মাণ হইয়া পড়ে, এই পঞ্চাশ বৎসরের জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া ভুবন বাবুও তেমনি হইয়া পড়িলেন। যে হৃদয়ের বন্ধন তাঁহাকে এজগতে শিশুর মত আনন্দ-প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই প্রবল মধুময় আকর্ষণ অনতিবিলম্বে তাঁহাকেও এসংসার হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

ভুবনবাবুর প্রকৃতিতে যে সমস্ত বিশেষত্ব ছিল, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। তাঁহাকে দেখিলেই স্থিরতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও ভালবাসার একখানি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। বর্ত্তমান সময়ের জীবন-সংগ্রাম মানুষকে সর্ব্বদা যেরূপ অস্থির ও উত্তেজনাময় করিয়া রাখিয়াছে, ভুবন বাবুর জীবনকে তাহা কখনও স্পর্শ করে নাই। তিনি পারিবারিক ছোট বড় সুখদুঃখ, শোকদৈন্য, জীবনমৃত্যুর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। এবং সেই অমৃতময় মন্দিরে বসিয়াই সকল অবস্থায় গৃহদেবতাকে ধন্যবাদ দিতেন। এসংসারে যাহারা তাঁহার বক্ষের এক একখানি পঞ্জরের মত, তাহারা যখন তাঁহার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিয়াছিল, তখন তিনি বিরলে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের অশুভ কামনা করিয়া আপনার আত্মার অধোগতি আনয়ন করেন নাই। কঠোর দৈন্য যখন তাঁহার বহুজনসমন্বিত পরিবারে অন্নাভাব উপস্থিত করিয়াছিল, তখনও তিনি হাস্যমুখে, অযথেষ্ট ডালভাতে তৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই এই কথাটি লাগিয়া থাকিত—Clouds will roll by—দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। আর গায়িতেন "প্রবল সংসার-স্রোতে আমরা দুর্ব্বল অতি—কেমনে করিব নাথ প্রতিকূল-মুখে গতি।" তিনি শিশুর মত শিশুর সঙ্গে হাসিতেন ও খেলা করিতেন—অদম্য উৎসাহে যুবকদের সঙ্গে ক্রীড়া-কোলাহলে যোগ দিতেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতায় এমন ক্রিকেট খেলা, ফুটবল ম্যাচ ছিলনা যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন না। ক্রীড়াবসানে জেতাজিত উভয় পক্ষকে অনেক সময় স্বগৃহে আনয়ন করিয়া ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। লোকদিগকে বিবিধ খাদ্যে আহার করাইয়া কি পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহার সম্বন্ধে সহস্র রকম গল্প সহস্র লোকের মুখে শোনা যায়। বিপদ্-কালে তাঁহার কিরূপ ধৈর্য্য ছিল, তাহার একটি উদাহরণ দিব। একবার কলিকাতায় কোনও ধনীব্যক্তি তাঁহার নামে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা করেন। তিনি তখন হোসেনাবাদে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন দাসের প্রবাস গৃহে সপরিবারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সকলেরই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, পথমধ্যেই হয়ত ওয়ারেণ্ট দিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। এই জন্য সন্তানেরা সমস্ত পথ অতিশয় উদ্বিগ্ন ভাবে অতিক্রম করিলেন। পথে ঐরূপ কোনও বিপদ্ ঘটিলনা। গৃহে ফিরিয়া তিনি তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীকে, সত্য সত্য উক্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে, কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া শ্রান্তিহরা তামকূটের সেবনে মনোনিবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রাতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ও সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া, নাতিনাতিনীদিগকে পুরুলিয়া ধামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে দেখিয়াছেন, তাঁহারা একথা বলিতে পারিবেন না যে, কঠোর দারিদ্র্যের সময় এবং বর্ত্তমানের প্রচুর স্বাচ্ছল্যের সময় তাঁহার প্রকৃতিতে, আচারব্যবহারে কখনও বিশেষ কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে; ভুবনবাবুর জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার ঘড়ীর কাঁটার মত চলিত। তিনি প্রত্যেক দিনের প্রতি কার্য্য প্রত্যহ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ব্বাহ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি খাঁটি ইংরেজ ছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পুত্র ও কন্যা বিয়োগ বারবার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয় শোকে মুহ্যমান না হইয়া সর্ব্বদাই গায়িত "আর কি বলিব তোমার যা ইচ্ছা হয়"। যে প্রতিভাশালী যুবক উদীয়মান সূর্য্যের মত জ্বলন্ত উদ্যম, উৎসাহ ও উচ্চাভিলাষ লইয়া সবে মাত্র সংসার-ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিয়াছিল, যাহার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি স্বজন ও বন্ধুবর্গের নয়নানন্দ ছিল, যাহার স্বদেশ-প্রীতি এই অল্প বয়সেই সকলের আশা-পূর্ণ

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ভুবনবাবুর সেই প্রিয়তম পুত্র বসন্তকুমার অকালে নিষ্ঠুর কালের কবলে পতিত হইলে তিনি যেন একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা অতি অল্প দিনেই অতিক্রম করিলেন। তার পরেই তাঁহার হৃদয়ে পরকাল-তত্ব, মৃত্যুর পরপারে, মানবাত্মার পরিণাম, জানিবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এক অসাধারণ আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সহিত তিনি তখন হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ তন্নতন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। লেখক অনেক সময় তাঁহাকে গ্রন্থ-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মনের মধ্যে উত্তরোত্তর আলোক-সঞ্চার হইতেছে ও স্থিরবিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ও মুখে শান্তির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, নিবিষ্ট চিত্তে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দ অনুভব করিতেন। তখন তাঁহার মুখে ঐ এক কথা ছাড়া আর কথা ছিলনা, এক জিজ্ঞাসা ছাড়া প্রশ্ন ছিলনা।

ভুবনবাবু আমরণ সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণও উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃ-গুণের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব কাব্য প্রকাশ করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মালঞ্চ ও সাগর-সঙ্গীত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ স্বরূপ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাসও একজন সুকবি ও কৃতী ব্যারিষ্টার। তাঁহার একখানি ইংরাজী কবিতা পুস্তক শীঘ্রই বিলাতে প্রকাশিত হইবে। ভুবনবাবুর এক কন্যা শ্রীযুক্তা অমলা দেবীর ভিখারিণী ও শক্তি এবং অন্যতমা কন্যা শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর পুষ্পহার বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের লেখক।

শেষ বয়সে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দু-শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল আলোচনা করিয়া আপনার জাতীয় ভাবের গৌরব দিন দিনই তাঁহার প্রাণে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিপক্ক চিন্তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি-স্বরূপ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "A few thoughts on the Brahmo Somaj" এই পুস্তিকাখানিতে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের কষ্টিপাথরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে ঘষিয়া তাহার অনেক কৃত্রিমতার ও নিন্দনীয় বিজাতীয় ভাবের অস্থি-পঞ্জর বাহির করিয়া দিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে এই পুস্তকখানির মতামত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

শৈলেশচন্দ্রও আর নাই।—সেই শান্ত, সৌম্য, সদালাপী নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বিগত ১৯এ জ্যৈষ্ঠ অতি অল্প বয়সে দারুণ বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইয়াছেন। শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্রের সৌম্যদর্শন, তাঁহার শান্তশিষ্ট প্রকৃতিরই সম্পূর্ণ পরিচায়ক। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে—বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্রের অকাল বিয়োগে তাঁহাকে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইলেও তিনি সাহিত্যচর্চ্চা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি নিজের জয়ঢক্কা নিজেই নিজেই নিনাদিত করিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না। সরস রচনায় তিনি একজন অদ্বিতীয় শক্তিশালী লেখক না হইলেও একজন যশস্বী সুলেখক ছিলেন। সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে তিনিও একজন গণনীয় ব্যক্তি।

ঢাকায় সেনাসন্নিবেশ

গত নবেম্বর মাসে একদল গুর্খাসৈন্য ঢাকায় আসিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে ভীত ও উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল; তাহার পর যখন তাঁহারা শুনিলেন, যে দশ সহস্র সৈন্য ঢাকায় একত্র সমবেত হইবে, তখন সকলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই সৈন্যদিগকে ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, কুমিল্লা, প্রভৃতি জেলার শত শত গ্রামের উপর দিয়া আসিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং আতঙ্কের যে যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গুর্খাসৈন্যদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল কলোম্ব্ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া সকল আশঙ্কা দূর করিলেন, এবং একদিন ঢাকায় সাধারণ উদ্যানে আসিয়া সৈন্য-সমবেতের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিয়া, পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে "King's Own" Regiment ময়মনসিংহ দিয়া এবং "Black Watch", "Argyle" প্রভৃতি Regiment বিক্রমপুর দিয়া সকলের সহিত ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে করিতে যখন ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সকলের আতঙ্ক অনেকটা প্রশমিত হইল। অবশেষে তাহাদের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রামবাসিগণ কত কমলা লেবু, সিগারেট প্রভৃতি উপহার সামগ্রী লইয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন করিয়াছিল।

স্থানীয় অধিবাসিগণ সৈন্যদিগকে সমাদর করিবার জন্য যে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে; বিক্রমপুরের এক গ্রামে কিরূপে ব্ল্যাক-ওয়াচ রেজিমেণ্টএর একজন সৈন্য প্রবেশ করিয়াছিল; গ্রামবাসিগণ তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া, অতি সম্মানের সহিত সাধারণ স্থান সকল পরিদর্শন করিবার জন্য লইয়া গেলেন, স্থানীয় স্কুল পরিদর্শন করা হইয়া গেলে, পুস্তকাগারে একটি ক্ষুদ্র সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। সে বেচারা কি করে? অগত্যা স্কুল-গৃহের দ্বার জানালা প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাস্থান দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এবং গ্রামবাসিগণের সৌজন্যের জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কোনও ক্রমে একটি বক্তৃতা সমাপন করিয়া নিষ্কৃতি পাইল। "ইষ্ট্ সরে সৈন্যদল" বিক্রমপুরে উপহারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিয়াছিল, তাহারা যেন বৎসর বৎসর এখান দিয়া যাইবার হুকুম পায়।

যুদ্ধাভিনয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত রেজিমেণ্ট্গুলি ঢাকায় আসিয়াছিল,—'ব্ল্যাক্ওয়াচ', 'কিংস্ ওন্', 'আর্গাইল', 'ইষ্ট্সরে', '১১৪ সংখ্যক মহারাষ্ট্রীয়', '১০ সংখ্যক গুর্খা রাইফেল্', '১৭ সংখ্যক পদাতিক', '১২ ও ১৭ সংখ্যক অশ্বারোহী', কামানবাহী (R. F. A.) ও মজুর (Sappers and Miners) সৈন্যগণ। ইহাদিগের মধ্যে ব্ল্যাক-ওয়াচ সৈন্যদল বিগত বুয়র যুদ্ধে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। উক্ত যুদ্ধে ইহারা ইংরাজের দক্ষিণ হস্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দশ সহস্র সৈন্য ঢাকায় আসিয়া মিলিত হইবার কথা ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত সৈন্য আসিয়াছিল, তাহা ঠিক বলা শক্ত। লক্ষ্ণৌবিভাগের সেনাপতি লেফ্টেনাণ্ট্ জেনারেল্ সার্ রবার্ট্ স্কেলোনের উপর সমগ্র মিলিত সৈন্যের অধিনায়কত্ব ভার অর্পিত হইয়াছিল।

সৈন্যগণ ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলে তাহাদিগের বাসের জন্য ভূতপূর্ব্ব 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম' গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অট্টালিকাসমূহ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কামানবাহী ও দেশীয় সৈন্যগণের নিমিত্ত তাম্বুর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। যতদিন তাহারা ঢাকায় ছিল, প্রত্যহ ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসিত।

ঢাকায় অবস্থান সময়ে সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ সাধারণের সহিত যে প্রকার সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই আশাতীত। সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দর্শকদিগকে যুদ্ধাভিনয়ঘটিত সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন

এবং যাহাতে তাঁহাদের কোনও দিকে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য সতত যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি সাধারণের সহিত সমপদস্থ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেই সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাইবার জন্য সামরিক বিভাগ হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

"কিছুদিন হইতে ব্রহ্ম দেশের (নীল) সহিত মিলিত বঙ্গ ও বিহার রাজ্যের (লাল) মনোমালিন্য চলিতেছিল; ব্রহ্মদেশ সমুদ্রের উপরে অধিনায়কত্ব করিয়া আসিতেছে এবং নদীর উপরে যুদ্ধ করিবার দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত, তাহাতে উহার ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। প্রবেশ করিতে হইলে, ক্ষুদ্র নৌকায়

(১৩ই তারিখের কৃত্রিম যুদ্ধ) নীল পদাতিকগণ যুদ্ধ করিতেছে।

করিয়া মেঘনা ও ধলেশ্বরী দিয়া নারায়ণগঞ্জ বা তাহার উত্তরে আসা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ব্রহ্ম ও বঙ্গ-বিহার এই উভয় রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু শেষোক্ত দেশের সৈন্যগণ এখনও চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। রেঙ্গুন,ব্রহ্মের ও বাঁকিপুর বঙ্গবিহারের রাজধানী। আসাম নামক আর এক রাজ্য এত দিন নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত উহার সহানুভূতি আছে এবং সম্ভবতঃ উহা বঙ্গদেশেরই পক্ষ গ্রহণ করিবে। উহার রাজধানী শিলং। আসামের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং যুদ্ধেও উহারা তত পারদর্শী নহে। আসাম সৈন্যগণ গৌহাটিতে মিলিত হইতেছে। 'লাল' সৈন্য

(১৩ই তারিখের কৃত্রিম যুদ্ধ) লাল সৈন্যগণ নীল সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

অপেক্ষা উহাদের সেনা-সংগ্রহ কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ হয় নাই। অল্প আয়াসেই বঙ্গ-বিহারের সৈন্যদিগকে পরাজিত করা যাইবে এবং তাহা হইলে আসাম সৈন্যগণ বঙ্গবিহারের সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া নীল সৈন্যের সম্মুখভাগ নারায়ণগঞ্জে অবতরণ করিয়াছে; ঢাকা সহর, এবং ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত যে রেল্ লাইন্ গিয়াছে, তাহা অধিকার করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। বঙ্গবাসিগণের পরোক্ষে ব্রহ্ম দেশের প্রতি সহানুভূতি আছে। ঢাকা বঙ্গদেশের বৃহত্তম নগর, এবং যদিও সামরিক হিসাবে ইহার কোনই বিশেষত্ব নাই, কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে ইহার প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।"

সম্মিলিত সৈন্য (তখনও "East Surrey" প্রভৃতি সৈন্যদলগুলি আসিয়া পৌঁছায় নাই) ১৯শে জানুয়ারি কুচ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। জন্মাষ্টমীর মিছিল
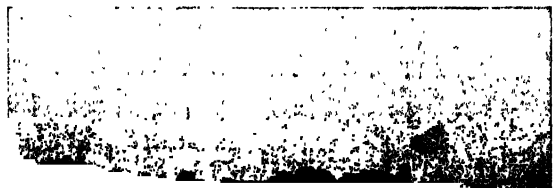
(১৫ই তারিখের সেনা পরিদর্শন) জনতার দৃশ্য।
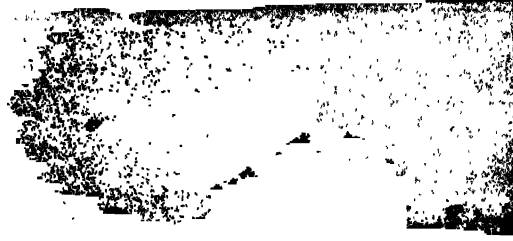
(১৪ই তারিখের সেনা পরিদশন)
গভর্ণর সাহেব সেনা পরিদর্শন করিতেছেন।

দেখিবার সময় স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু দশকদিগকে যেরূপ নাস্তানাবুদ হইতে হয়, এ ক্ষেত্রে যাহাতে সেরূপ কোনও অসুবিধা না ঘটে তজ্জন্য উহারা ঢাকার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়াই গমন করে।

"১৮ই জানুয়ারি পঞ্চদশ সহস্র শত্রু সৈন্য (ব্রহ্মদেশের) নারায়ণগঞ্জে অবতরণ করে, ১৯এ তারিখ সন্ধ্যাকালে সংবাদ পাওয়া গেল, নারায়ণগঞ্জের সৈন্যগণ তদুত্তরে অগ্রসর হয় নাই কিন্তু ঢাকা হইতে ৩।৪ মাইল দূরে, (পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে) ডেম্‌রার পথে ৩০০০ সহস্র সৈন্য অবতরণ করিয়াছে ; নামিয়াই তাহারা 'বামগীল', 'টৈপিত' প্রভৃতি গ্রামগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।" যে সৈন্যাধ্যক্ষের উপরে ঢাকা রক্ষা করিবার ভার ছিল,তিনি স্থির করিলেন, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবেন। পরদিন, অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারি, লাল সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইল। প্রথম ভাগ অতি প্রত্যূষে যুদ্ধস্থলে রওয়ানা হইয়া গিয়া শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিল ; প্রথম ভাগের যুদ্ধের ফলাফল দেখিবার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ সৈন্য ঢাকা হইতে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেলা ১০।১১টার সময় উহারা পশ্চাৎ দিয়া ঘুরিয়া প্রথম ভাগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে কামান স্থাপন করিয়া প্রথম ভাগ সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। বেলা ১২।১ টার সময় উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল এবং ৩ টার পর উভয় দলই ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নীল সৈন্যগণ, লাল সৈন্যাধ্যক্ষের একজন সংবাদবাহককে গ্রেপ্তার করায় এপক্ষের যুদ্ধের নক্সা (Plan) অবগত হয়, তাহাতে লাল সৈন্যদিগকে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল ! এই যুদ্ধ সেই দিনই শেষ হয় নাই, ইহার পরে আরও দুই দিন (কিছুদিন অন্তর) এই যুদ্ধের পরের অংশগুলি অভিনীত হইয়াছিল। পরিশেষে নীল সৈন্যগণ ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।
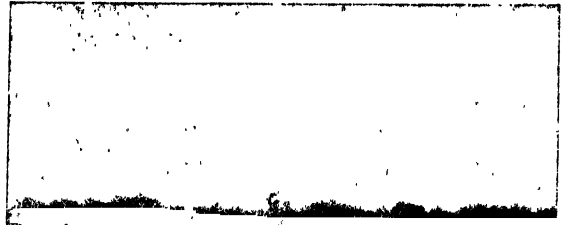
(১৪ই তারিখের সেনা পরিদর্শন)
সৈন্যগণ দলে দলে কাওয়াজ করিয়া যাইতেছে।

(১৩ই তারিখের কৃত্রিম যুদ্ধ)
কামানগুলি গোলাবর্ষণার্থ আসিতেছে।

কলিকাতার কৃত্রিম যুদ্ধ (Mock Fight) হইতে এই সকল যুদ্ধাভিনয়ের (Manœuvres) পার্থক্য এই, তথায় একস্থানে উপবেশন করিয়া সমগ্র যুদ্ধ দেখা যায় কিন্তু এই সকল অভিনয় উপভোগ করিতে হইলে, সৈন্যগণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হইতে অন্যগ্রামে হাঁটিয়া দেখিতে হয়। এই যুদ্ধ অভিনয়ের দিন আমাদিগকে কিঞ্চিদধিক ১২।১৩ মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল।

এই যুদ্ধাভিনয়ের পরের দিন, ঢাকা হইতে ৩।৪

মাইল দূরবর্ত্তী (দক্ষিণ-পশ্চিমে) সাতমস্‌জিদ নামক স্থানে কামান দাগা অভ্যাস করা হয়। যাহাতে কামান দাগিবার সময় সম্মুখস্থ গ্রামবাসিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া থাকে, তাহার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া রাখা হইয়াছিল, শত্রু-সৈন্যের অবস্থিতি বুঝাইবার জন্য প্রায় ১৫০ ফিট দীর্ঘ ও ১৫ ফিট প্রস্থ একটি চতুষ্কোণ ফ্রেমে কাপড় আঁটিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয়; উহাই কামানের 'টার্গেট'। তাহার পর প্রায় দুই মাইল দূর হইতে কামান ছুঁড়িয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করা,—ইহারই নাম কামান-দাগা অভ্যাস (Cannon practice)। যে স্থানে গোলা পড়ে, তাহার ঠিক উপরেই উহা ফাটিয়া যাওয়ায় তজ্জনিত ধূঁয়ার দ্বারা উহার পতন-স্থান নিরূপণ করা যায়। এ স্থলেও মধ্যস্থগণ ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

কামানবাহী সৈন্যগণের তাম্বু-রচনা।
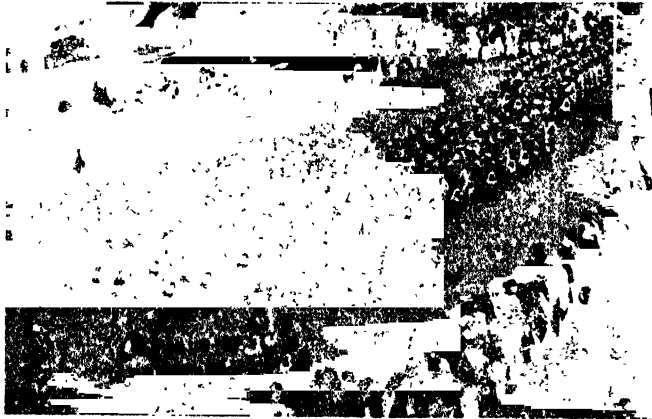
১৯শে জানুয়ারির নগর প্রদক্ষিণ ;
"Black Watch" Regiment সদরঘাটের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

এইরূপ কোনওদিন ডেমরার পথে যুদ্ধাভিনয়, কোনও দিন সাতমস্‌জিদ্ বা তন্নিকটবর্ত্তী মীরপুরে কামানদাগা অভ্যাস করা চলিতে থাকে। এই সকল অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, মোটের উপর পূর্ব্ববর্ণিত যুদ্ধাভিনয়েরই প্রকারভেদ মাত্র; ইহাদের মধ্যে শুধু দুইটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য ; প্রথম, "শত্রুসৈন্য" ঢাকার উত্তরে বহুদূরবর্ত্তী কালিগঞ্জ নামক স্থানে জলপথ দিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু "লাল" সৈন্যগণ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করায় শত্রুসৈন্য হটিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়, "২৯শে জানুয়ারি খবর পাওয়া গেল, শত্রু-সৈন্যের এক অংশ পূর্ব্বোত্তরে রোহাং নামক স্থানের দিকে গিয়াছে, উদ্দেশ্য ময়মনসিংহ হইতে ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া।" সংবাদ পাইয়াই জেনারল্ মে সসৈন্যে তথায় গমন করেন, এবং সমস্ত দিবস তুমুল যুদ্ধের পর উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া

১৯শে জানুয়ারির নগর প্রদক্ষিণ ;
"King's Own" Regiment সদরঘাটের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে

"East Surrey" Regiment যুদ্ধাভিনয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

(Mock Fight) প্রদর্শিত হইবার কথা, এবং এই যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে, এইরূপ রাষ্ট্র হইল।

সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, যাহাতে অন্যান্য স্থানের লোকেরাও ইহা উপভোগ করিতে পারে, এই জন্য ঢাকা বিভাগের সকল সরকারী আফিস ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত এই বিভাগের বিশিষ্ট লোক

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দুইটি যুদ্ধাভিনয় বহুদূরবর্ত্তী স্থানে হওয়ায় দর্শক সংখ্যা অধিক হয় নাই। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সার্পেণ্টাইন্ পণ্ড' নামক খালের উপরে কামান, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ কিরূপে নদী পার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল; কয়েক মিনিটের মধ্যে ইহাদিগকে সুশৃঙ্খলে পার হইতে দেখিয়া দর্শকমাত্রই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পর সকলেই ১৩ই ফেব্রুয়ারির অপেক্ষায় রহিলেন; উক্ত দিবস গভর্ণর বাহাদুরের সম্মুখে কৃত্রিম যুদ্ধ

কামানবাহী সৈন্যগণ যুদ্ধাভিনয়ের পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

মাত্রেই উক্ত উভয় দিবস অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

উপরি উক্ত দুই দিবসের কৃত্রিম যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। "নীল সৈন্যগণ ময়মনসিংহের দিক হইতে ঢাকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য লাল সৈন্যগণ রমণায় কামান স্থাপন করিয়া এবং খানিকটা স্থান বেড়া দিয়া আবৃত করিয়া, ব্যূহ-রচনা-পূর্ব্বক তাহাদের অপেক্ষায় থাকে।

সমবেত সৈন্তাধ্যক্ষগণের সহিত গভর্ণর বাহাদুর।

"নীল অশ্বারোহিগণ অগ্রবর্ত্তী লাল অশ্বারোহীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিল, তাহারা ফিরিয়া চীৎকার করিয়া জানাইল, "দুষ্‌মন্ আ গিয়া !"

"তারপর, নীল পদাতিক সৈন্যগণ বেড়া আক্রমণ করিল এবং বহু হতাহতের পর উহা দখল করিল। তখন লাল-কামান গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং লাল পদাতিক সৈন্য সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় অগ্রসর হইল। কিন্তু এই সময় নীল-কামানগুলি আসিয়া পড়ায় উহা গোলাবৃষ্টি করিয়া লাল-কামানগুলিকে একে একে নীরব করিয়া ফেলিল। তখন নীল সৈন্য হাতাহাতি যুদ্ধ করিবার জন্য সঙ্গিন আঁটিয়া দ্রুত বেগে লাল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল এবং লাল সৈন্যগণও উহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।"

মধ্যস্থগণের মীমাংসায় জানা গেল, নীল সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঢাকা অধিকার করিল।

পরের দিন, অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি গভর্ণরবাহাদুর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত সমস্ত সৈন্য পরিদর্শন (Review) করিলেন। গভর্ণর বাহাদুর রাজকীয় পতাকার তলে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিলেন, সৈন্যবর্গ দলে দলে কাওয়াজ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া গেল।

উক্ত দিবসের Review শেষ হইলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সৈন্য ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

প্রতিধ্বনি

মাসিকপত্র—আষাঢ়।

বাঙ্গালা ছন্দ

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বাঙ্গালা ছন্দ প্রবন্ধ-পাঠে ছন্দের উৎপত্তি এবং বাঙ্গালা-ছন্দের প্রকৃতি ও পরিণতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। মানুষ যখন ভাষা পায় নাই, যখন তাহার বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্তও পরিস্ফুট হয় নাই, তখনও কিন্তু মানব সঙ্গীতকে লাভ করিয়াছিল; ইতরপ্রাণীর ন্যায় অস্পষ্ট বিকৃত ভাবের উৎসাহকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিল। সরস্বতী মনুষ্যত্বের আদি দেবতা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটি নামের মধ্যেই মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত-পথে এই দেবতার ক্রমবিকাশ পদবী সূচিত হইতেছে। গীর্—বাক্—বাণী—বীণাপাণি। বাক্-প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম—ভাবের অস্পষ্টধৃত এবং প্রধানতঃ গীতাত্মক অবস্থার নাম গীর্। 'বাক্যের রস ঋক্, এবং ঋকের রস (essence) উদ্গীথ।' ইতর প্রাণি-জগৎ এখনও এই অবস্থায় আছে—মনুষ্যও এককালে ছিল। ক্রমে বর্ণাত্মিকা বাগ্দেবী প্রকটিত হইয়া, মনুষ্যের জ্ঞান, ভাব এবং ঈষণার প্রবৃত্তিকে সম্যক্ গর্ভে ধারণ করিয়া, যোগ্যতালাভ করিয়া বাণীরূপে—মানব-সভ্যতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত এবং কাব্য আত্ম-জাগরণ লাভ করিয়া, আপন আপন বিশিষ্টধারায় ছুটিয়া গিয়াছে। এই বাণীকে বীণাপাণি এবং পুস্তকধারিণী-রমণীরূপে ধারণা করিয়া মানব তাহার উপাসনা করিতেছে।

বঙ্গ-ভাষার সমস্ত ছন্দকে, আধুনিক কালের আবিষ্কৃত অসংখ্য মিশ্র ছন্দকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—পয়ার ও লাচাড়ী এই উভয় ছন্দই বঙ্গভাষার প্রধান শক্তি এবং তাহারাই বঙ্গভাষার অতীত ও ভবিষ্যতের অনন্ত ছন্দের মূলাধার। ছড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালী-হৃদয়ের গুপ্ত-গুহানির্গত গোমুখীধারা কৃত্তিবাসের পাঁচালীতে, সর্ব্বপ্রথম ভাব-কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে, ভাব-ছন্দের অপূর্ব্ব বাণী-সাধক বিদ্যাপতির পদাবলীতে উহাই বিকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের

অপূর্ব্ব পরিদর্শক কবিকঙ্কণের মধ্যে, বঙ্গ সাহিত্যের অদ্বিতীয় শব্দমন্ত্র-সাধক ভারতচন্দ্রের মধ্যেও উহারই বিভিন্ন বিকাশ। নানাপথে বিকশিত হইয়া আধুনিক যুগসীমায় মধু, হেম, নবীনের মধ্যেও উহারই বিভিন্ন বিকাশ। রবীন্দ্রনাথেও উহাই প্রসারিত ও পরিণত হইয়াছে।

পয়ার, লাচাড়ী ও পাঁচালী, এই তিনটি কথার প্রকৃত মর্ম্ম, উহাদের প্রকৃত শক্তি এবং ঋদ্ধি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস এখনো যেন সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। আমরা দেখিতেছি, পায়ে পায়ে চলে অথবা দাঁড়ায় বলিয়া উহার নাম পয়ার; এবং নাচিয়া নাচিয়া চলে বলিয়া উহার নাম লাচাড়ী। এই দুইটী কথা বাঙ্গালার প্রাচীনতার গাথা এবং গানের মজলিস হইতে পরিভাষা স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কথা যখন ছন্দকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রত্যেক পাদের নাম হয় 'পদ'—'শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ।' এইরূপে পদ বা পদকার হইতেই পয়ারের উৎপত্তি। পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাকৃত ভাষার লেখকগণকে কবি বলিতে যেন সঙ্কুচিত হইয়াই পদকর্ত্তা বা পাদকার নামেই নির্দ্দেশ করিতেন। আর ছড়ার ছন্দটাই পল্লীর আসরে আসিয়া নর্ত্তনশীলা লাচাড়ীর জন্মদান করিয়াছে। পাঁচালী বাঙ্গালী বাণী-পুত্রের আদিম কাব্যচেষ্টা—তাহার প্রথম উচ্চাভিলাষযুক্ত এবং সামাজিকগণের হৃদয়-বিজয়োদ্দিষ্ট ঝঙ্কার। খনা বা ডাকের বচন বা ছড়ার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে, উহাদের জ্ঞান-সঙ্কলনের আদর্শকে অতিক্রম করিয়া, পরিবার অথবা গার্হস্থ্য জীবনের আটপৌরে গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, বঙ্গকবি যখন বাহিরের দিকে প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—তখন সরস্বতীর অপর হস্তে যে পুস্তক মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল, তাহার নাম হইল পাঁচালী।

কেহ কেহ বলেন, জয়দেব হইতেই সংস্কৃত বিভক্তি বাদ দিয়া পয়ার, লাচাড়ী ছন্দ। কিন্তু ইহা অযথার্থ কলঙ্কের কথা। যাঁহারা সংস্কৃত কিংবা বৈদিক আর্য্যভাষার প্রকৃতি চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বৃত্ত ছন্দই উহাদের প্রধান শক্তি। হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণের একটা নির্দ্ধারিত ভাঁজই বৃত্তছন্দের প্রাণ, উহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই। দশম শতাব্দীতে বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থেও মাত্রা ছন্দের দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না। এই ছন্দ ভারতীয় আর্য্যহৃদয়ের পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি। জয়দেব ও লাচাড়ীর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত ভাষার বিপুল রাজত্বে এই জাতীয় মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মিলে। সুতরাং আমরা যদি একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলি যে, বাঙ্গালাই সংস্কৃতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া এই চতুর্দ্দশ অক্ষরের পদচ্ছন্দ বা ত্রিপদীর ছন্দ শিক্ষা দিয়াছে, তাহা হইলেও নিতান্ত বাহুল্য হইবে না।

পয়ারের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য এ স্থলে আমরা প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের এক একটি পংক্তি নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি। দেখিবেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণসংখ্যার উপর পয়ারের প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে না, অমিশ্র পয়ার সাধারণতঃ পরস্পর সংযুক্ত অথচ সঞ্চারী পদদ্বয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। পদ সংখ্যাকে ক্বচিৎ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ ঘটনা ব্যতিক্রম বই নহে। বিরাম যতি টুকুই পয়ারের প্রধান শক্তি, এবং উহার সংস্থান বিষয়েও কোন অপরিহার্য্য বিধি নাই বলিয়া, কবি-প্রতিভা বেশী কম স্বাধীন ভাবেই পয়ারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ৯ হইতে ১৮ অক্ষরযুক্ত পয়ারের বিরাম-যতিযুক্ত দৃষ্টান্ত।

৯। গাছ রুইলে। বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে। বড় ধর্ম্ম ॥ খনা।

১০। আজু কে গো। মুরলী বাজায়।
এত কভু। নহে শ্যামরায় ॥ চণ্ডীদাস।

১১। অঙ্গ মোড়া দিয়া। কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে। কি ভেল ব্যথা ॥ চণ্ডীদাস।

১২। নয়নযুগলে। সলিল গলিত।
কনক মুকুরে। মুকুতা খচিত ॥ রামপ্রসাদ।

১৩। সম্মুখে রাখিয়ে করে। বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার। ভয়ে কাঁপে গা ॥ চণ্ডীদাস।

১৪। কার কিছু নাই চাই। করি পরিহার।
যথা যাই তথায়। গৌরব মাত্র সার ॥ কৃত্তিবাস।

১৫। সরোবরে স্নান হেতু। যেও না লো যেও না।
কমল কানন পানে। চেওনা লো চেওনা ॥
ভারতচন্দ্র।

১৮। আদিম বসন্ত প্রাতে। উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
হাতে সুধাভাণ্ড। বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥
রবীন্দ্রনাথ।

পয়ারের ধীরোদাত্ত পদবন্ধকে অতিক্রম করিয়া নৃত্য-শীল লাচাড়ী ছন্দও বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। লাচাড়ী মূল, ছড়া—

বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদী এল বান।
শিবু ঠাকুরের। বিয়ে হল। তিন কন্যা দান॥
চিকণ কালা। গলায় মালা। বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে। ভ্রমর বুলে। তেরছ চোখে চায়।
গোবিন্দদাস।

বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াইয়া, পাঁচালী বা কাব্যকারগণের মধ্যে আসিয়া অক্ষর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল এবং এই চল্‌তির ঝোঁক হইতেই চৌপদী পঞ্চপদীর জন্ম হইল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লাচাড়ী ছন্দ একদিকে নিজের চরম লাভ করিয়াছে।

বসন্ত রাজা আনি। ছয় রাগিণী রাণী
রচিল রাজধানী। অশোক মূলে।
কুসুমে পুন পুন। ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ। ধনুক হুলে। ভারতচন্দ্র।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার :—

নয়ন কেবল। নীল উৎপল।
মুখ শতদল। দিয়া গঠিল।
কুন্দ দন্ত পাঁতি। রাখিয়াছে গাঁথি।
অধরে নবীন। পল্লব দিল।

পদক্রম আরও বাড়িল :—দ্বিতীয় তৃতীয়পদ আরও উচ্চাভিলাষী হইয়া পয়ার হইতে একাবলী প্রভৃতি ধার করিয়াও উল্লসিত হইতে চাহিয়াছে।—

অমিশ্র পয়ার ও লাচাড়ীর বিভিন্ন পদ গতি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া পূরাপূরি নির্ম্মলতা লাভ করে। তাহার শত বৎসরের পর এই শৈল-গুহাবদ্ধ ছন্দনির্ঝরে বঙ্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নবজীবনের কলকল্লোল আনিয়াছিলেন, মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন, কাব্যের ছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের বাহ্য মিলনের মধ্যে নহে—উহার মূল কবির হৃদয়ে। তবে মেঘনাদবধের ছন্দও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা পয়ার এবং লাচাড়ী ছন্দের হৃদয়নিহিত আত্মশক্তিকে ধারণা করিয়াই বিলসিত হইয়াছিল। মধুসূদনের পর হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ কত মত এই পয়ার এবং লাচাড়ীর মিশ্র পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের পর মিশ্র ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে কত শত সহস্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। তাঁহার অগণিত ছন্দের মূল রহস্য এই মনে হয়, যেন ছন্দটাই তাঁহার মনে সর্ব্বাগ্রে কবিপ্রতিভার ভাবোদ্দীপনার সুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরে পরে বাক্য ছন্দে আকার প্রাপ্ত হইয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ছন্দের লঘু গুরু ভেদ বা সংস্কৃত বর্ণের জাতিভেদ আমরা অনেক দিকে হারাইয়াছি। যাহা হারাইয়াছি, তাহা পরম গৌরবময় হইলেও যাহা লাভ করিয়াছি, ও ভবিষ্যতে লাভের আশা রাখি, তাহার মাহাত্ম্যও কোন অংশে কম নহে। প্রাচীন মন্দাকিনীই লোকপাবনী হইয়া বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে ভাবের অনন্ত উপাদান পরিগ্রহ করিয়া শতমুখে সাগর-গামিনী হইতেছেন। তাঁহার এই গতিরোধ করা কোন ঐরাবতের সাধ্য নহে।"—প্রবাসী

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ

(পরলোকবাসী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত)

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসিদ্ধ প্রচারক বিখ্যাত বাগ্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে ভগবানের কৃপায় এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাশ, এই শক্তিতে পরলোকগত বঙ্কিম বাবুর বিবিধ তত্ত্বকথা নগেন্দ্র বাবু লিখিয়া লইতেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি, এইরূপেই নগেন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রকাশিত হয়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এস্থলে তাহারই সার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।—

"পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এ দুই এক, না দুই? ইহা মহা প্রশ্ন। শঙ্কর বলেন, এক। রামানুজ বলেন, মূলে এক হইলেও, বাস্তবিক দুই। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। এমন বিষয়ে দু চারিটা কথা বলিতে খুব ইচ্ছা হয়। তাই আজ নগেন্দ্রের কাছে আসিয়া বলাতে তিনি অমনি বসিয়া গেলেন। আমার কি? আমার আর অন্য কাজ নাই। নগেন, তাঁহার আহার ফেলিয়া লিখিতেছেন। আমার ত

আর আহার নাই। আহার অনেক করিয়াছি। এই নগেন্দ্রের সঙ্গে বসিয়া এক সময়ে আহার করিয়াছি। এখন জ্ঞান আর ধর্ম্ম, দুই ছাড়া আহারীয় কিছুই নাই। আত্মার আহার জ্ঞান আর ধর্ম্ম। পরলোকে এ ছাড়া আর কিছুই নাই। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অনেক খাইয়াছি। এখন সত্য, প্রেম, ভক্তি এই সব স্বর্গীয় আহার্য্য দ্রব্য খাইতে হইবে।

এখন আসল কথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক কি দুই? আমি বলি, একে দুই, দুইয়ে এক। দ্বৈতাদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব। দুই যে এক, একে দুই, লোকে বুঝে না।

লোকে যদিও বুঝে না, তথাচ বুঝাইয়া দেওয়া ত উচিত। প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। একটি প্রমাণ এই যে, আমাদের দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান সমগ্রভাবে আমাদের মধ্যে থাকে না। এখন আমি যাহা লিখিতেছি, তাহাই জানি। আর কিছু জানি না। কিন্তু তাহা তো আমারই জ্ঞান। তবে গেল কোথায়? কেহ বলিবেন, মস্তিষ্কে। কিন্তু সে কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ। জড়ে জড় থাকিতে পারে। জড়ে জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিবে?

তারপর কথা এই যে, মস্তিষ্ক যে জড়, ইহা কে বলিল? জড় বলিয়া কি জগতে কিছু আছে? আমি বলি জড় বলিয়া কিছু নাই। কেন না, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচটি লইয়া জগৎ। কিন্তু এই পাঁচটি বিষয়ই জ্ঞান মাত্র। রূপ কি? না দর্শন জ্ঞান। রস কি? না আস্বাদ জ্ঞান। গন্ধ কি? না আঘ্রাণ জ্ঞান। এইরূপে পাঁচটিই হইল জ্ঞান। সমুদয় বাহ্য জগৎ যখন ঐ পাঁচটি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন প্রতিপন্ন হইল যে, সকলই জ্ঞান। জড় বলিয়া কিছু নাই।

এখানে একটি কথা এই যে, জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। জড় জগৎ যদি জ্ঞান মাত্র, তবে নিশ্চয়ই তাহার সহিত জ্ঞাতা একীভূত হইয়া আছেন। জ্ঞান আছে, জ্ঞাতা নাই, ইহা অসম্ভব বাক্য। সুতরাং এই যে দৃশ্যমান জগৎ, ইহা অবশ্য জ্ঞান ও জ্ঞাতায় সম্মিলন। গীতায় যে বিশ্বরূপের কথা আছে, তাহার এই তাৎপর্য্য।

রূপ, রস প্রভৃতি পাঁচটি লইয়া জগৎ। এই পাঁচটি আবার জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবেই হইল যে, এই যে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড, ইহা জ্ঞানময়। জীব জ্ঞান মাত্র। জগৎও জ্ঞান মাত্র। সকলই জ্ঞান। ব্রহ্মাণ্ড এক মহাজ্ঞানের প্রকাশ। কিন্তু জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই দৃশ্যমান জ্ঞানময় ব্রহ্মাণ্ডে একজন জ্ঞাতা আছেন। একজন মহাজ্ঞাতা, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত। কেমন সহজ যুক্তিতে একজন জ্ঞানময় পরম পুরুষকে পাইলাম।

এই পরম পুরুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? তিনি আমাদের মাতাপিতা; একাধারে মাতা পিতা। প্রকৃতি পুরুষ একাধারে। জগতের মধ্যে দেখি— পুরুষ, প্রকৃতি দুই ভাব। সমস্ত প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ একভাব প্রকাশ করিতেছে। আবার এই জগতের মধ্যেই দুই ভাব, প্রকৃতি ও পুরুষ। সমস্ত ত প্রকৃতি, কিন্তু তার মধ্যে আবার দুই, প্রকৃতি ও পুরুষ। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Negative ও Positive Principle, এই তাড়িত, ইহাও Negative and Positive সমগ্র জীবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ। দুইএর যোগে সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে। এই দুই লইয়া জগৎ।

পরমেশ্বরের সৃষ্টি লীলা এই দুই ভাবে চলিতেছে। প্রকৃতি, পুরুষ তত্ত্ব অতি গূঢ়। সে বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিব না। এখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আর কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি আমাদের মাতা পিতা। তিনি রাজা আমরা প্রজা, তিনি প্রভু আমরা দাস। তিনি স্বামী। এই স্বামী ভাব অতি চমৎকার ভাব। স্ত্রীলোক তাঁহাকে স্বামী জ্ঞান করিয়া ভজনা করিতে বিশেষ সক্ষম। আমি একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে স্বামী ভাবে ভজনা করি। আমি বলিলাম, তাহাতে মনে কোন মলিন ভাব আসে না? তিনি বলিলেন, না। পুরুষের পক্ষে এভাব কিছু কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। স্ত্রী জাতিকে ধন্য বলিলাম।" নব্যভারত

আমাদের মেলা

"জনসাধারণের সহিত শিল্পাদির পরিচয় করাইবার জন্য আধুনিক উন্নত জগৎকে প্রদর্শনীর সাহায্য লইতে হয়। এ পথটি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন নহে। আধুনিক একজিবিসন ও আমাদের মেলার উদ্দেশ্য প্রায় এক। তবে মেলার উদ্দেশ্য অধিক কার্য্যকারী বলিয়াই আমাদের

বিশ্বাস। ইহাতে আধুনিক এক্‌জিবিসনের ন্যায় বড় বড় চাঁদার খাতাও নাই, টিকিট করিয়া খরচা তুলিবার ব্যবস্থাও নাই, বড় হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারও নাই অথচ আধুনিক এক্‌জিবিসন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বিজ্ঞাপনের সুবিধাও বড় কম হয় না; যেহেতু দর্শকও কম নহে। এই মেলাগুলির উন্নতি করা সোজা? না এক্‌জিবিসন নাম দিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট ফিট করিয়া এক প্রদর্শনী করা সোজা?

অবশ্য কতকগুলি শিক্ষিত লোকের পক্ষে এক্‌জিবিসন সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ মেলাটাই অধিক বুঝে। ইহা সুনিশ্চিত, ধর্ম্মের নামে সে সব মেলা এ যাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক উন্নত শিল্পের ব্যাখ্যা ও প্রচার, যাহাতে জন-সাধারণের মধ্যে অতি শীঘ্র আরব্ধ হয়, তাহার জন্য সমাজ-হিতৈষিগণ সচেষ্ট হইবেন। ইহাতে অল্প ব্যয়ে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, দেশও উপকৃত হইবে।—গৃহস্থ

চিত্র-কথা

চণ্ডীর দেউলে লক্ষ্মণ

"মেঘনাদ বধ", পঞ্চম সর্গে আছে,—

"লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; * * *
* * * * *
আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে * * *
* * * * দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম শূল-পাণি!"

লক্ষ্মণ তথায় উপনীত হইয়া ভূতনাথকে চিনিলেন, বলিলেন—

"বিরূপাক্ষ! দেহ রণ, বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্মসাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।"

ইহাই চিত্রখানি পরিকল্পনার বিষয়।—চিত্রে বিরূপাক্ষের মুখমণ্ডলে দেবোচিত সৌম্য এবং সৌমিত্রির মুখে আন্তরিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্মবলের অদম্য শক্তি শিল্পী কেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা গুণগ্রাহীমাত্রেরই উপভোগ্য।

পূজার্থিনী

ইহার বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দেখিলেই বোধ হয়, ভক্তিময়ী পূজার্থিনী যুক্তকরে শঙ্কর-সকাশে কি প্রার্থনা করিতেছেন।

দেবতার দয়া

কার্ম্মেল্ শৈলে ইলাইজা সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াছেন; কিন্তু বালের ধর্ম্মোপদেশকগণ সকলেই নিহত হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে রাজ্ঞী জেঝেবেলের প্রতিহিংসাবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে। বিষম বিপদাশঙ্কায় ইলাইজা নিরাপদ হইবার আশায় প্যালেষ্টিনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত আতিথ্যবিমুখ অনুর্ব্বর প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ক্ষিণ্ণ ও ক্লান্ত দেহে তিনি তথায় মৃত্যু প্রার্থনা করেন;—"যথেষ্ট হইয়াছে; প্রভু! এখন আমার জীবন গ্রহণ কর।" বলিয়াই তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। সহসা দেবদূত তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া খাদ্য পানীয় প্রদান করে।—ইহাই চিত্রের বিষয়। মূল চিত্রখানি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে "রয়াল্ একেডেমি"তে প্রদর্শিত হয়।

শেষ প্রতীক্ষা

১৮৮৭ সালে চিত্রিত। নায়িকা সেষ্টস্-নগরস্থিত ভিনস্ দেবীর জনৈকা যুবতী পূজারিণী, এবিডস্-নগরবাসী লিয়াণ্ডর্ নামক এক যুবকের প্রণয়পাশে আবদ্ধা হন। যুবক প্রায়ই রাত্রি-সমাগমে সন্তরণযোগে ডার্ডেনেলিস্ প্রণালী উত্তীর্ণ হইয়া প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইত। এক বাত্যাবিক্ষুব্ধ রজনীতে তরঙ্গবেগে অভাগা জলনিমগ্ন হইল। যুবতী আশান্বিত অন্তরে সারানিশি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় যাপন করিয়া অবশেষে নিজে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

মাসপঞ্জী

জ্যৈষ্ঠ—১৩২১

১লা—অদ্য লণ্ডন হইতে "ইণ্ডিয়াম্যান" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইল।

২রা—"পঞ্জাব সমাচার" পত্রের সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আরম্ভ হয়।—কুচবিহারের মহারাজ তথাকার 'বারলাইব্রেরী'র ভিত্তি স্থাপন করেন।

৩রা—পুনায় বোম্বায়ের 'সোশিয়াল কন্‌ফারেন্‌সে'র তৃতীয় অধিবেশন হয়। মিঃ এম, ভী, থাজী সভাপতি ছিলেন।

৪ঠা—এড্‌মিরাল্‌ স্যর চার্লস ড্রুরীর (জন্ম ১৮৪৬) মৃত্যু হয়।—

৫ই—কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী মিঃ উইলিয়ম্ য়্যাল্‌ডিস্ রাইট্ দেহত্যাগ করেন।—

৬ই—এলবেনিয়ান্ ক্যাবিনেট পদত্যাগ করেন।—স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যু উপলক্ষে চতুর্থ সাম্বৎসরিক স্মৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই—এমেরিকার সহিত মেক্‌সিকোর সন্ধির কথাবার্তা আরম্ভ হয়। নায়েগ্রায় কমিশন্ বসে। ব্রেজিলের 'এম্‌বেসেডর' সভাপতি ছিলেন।—'সংস্কৃত এডুকেশন কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।—খাঁ বাহাদুর মহম্মদ কাজিম্ পঞ্জাবপ্রদেশের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হন।

৮ই—কলিকাতা 'প্রিজনার্স্‌এড্' সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

৯ই—ভারতবর্ষের নানা স্থানে এম্পায়ার ডে উৎসব সম্পন্ন হয়।—ডিউক্ অফ্ আর্গাইলের সমাধি হয়।—"মেদিনীবান্ধব" সম্পাদক শ্রীদেবদাস করণের মৃত্যু হয়।

১০ই—হংগেরীয়ান্ ক্যাবিনেটের ভূতপূর্ব্ব সভ্য মিঃ কশ্মথের মৃত্যু হয়।

১১ই—'আইরিশ্ হোমরুল বিল' কমন্স মহাসভায় পাশ হয়।—মান্দ্রাজের গবর্ণর তথাকার 'ললি হাসপাতাল' খুলেন।

১২ই—সমস্‌উল উল্‌মা মির্জ্জা আসরফ্ আলীর মৃত্যু হয়।—সম্রাজ্ঞীর জন্মদিন।

১৩ই—সিমলা শৈলে ভীষণ ভূমিকম্প হয়।—বোম্বায়ে আগুন লাগিয়া প্রায় ষোল লাখ টাকার তুলা পুড়িয়া যায়।

১৪ই—ইন্‌ক্যান্‌ডেসেন্ট্ ল্যাম্পের আবিষ্কর্ত্তা স্যর যোসেফ সোয়ানের মৃত্যু হয়।—'বেঙ্গল মেডিকেল্ রেজিষ্ট্রেশন্ বিল্' গবর্ণমেন্ট্ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয়।

১৫ই—"এম্প্রেস অফ্ আয়ারল্যাণ্ড" নামক জাহাজ 'ষ্টর্‌স্ট্যাড্' নামক নরওয়েজিয়ান্ জাহাজের সহিত সংঘর্ষণে ডুবিয়া যায়। প্রায় ১০০০ যাত্রীর প্রাণনাশ হয়। প্রসিদ্ধ রাইফেল নির্ম্মাতা মিঃ মসারের মৃত্যু হয়।

১৬ই—নারায়ণগঞ্জে ভীষণ ঝড় হয়।

১৭ই—শ্রীমতী ফুলহামের মৃত্যু হয়।

১৮ই—মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যু উপলক্ষে এক সপ্ততিতম বাৎসরিক উৎসব হয়।

১৯এ—রংপুর 'সাহিত্য পরিষদে'র ৯ম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন।—'মিউটিনি ভেটারেন্' মেজর জেনারেল স্যর এস, এল, মস্‌টিনের (জন্ম ১৮৩৫) মৃত্যু হয়।

"—ফ্রেঞ্চ ক্যাবিনেট্ পদত্যাগ করেন।—"বঙ্গদর্শন" সম্পাদক শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়।—হরিদ্বারে 'অলইণ্ডিয়া সংস্কৃত সাহিত্য সম্মিলনে'র অধিবেশন হয়। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভাপতি ছিলেন।

২০এ—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন।

২১এ—আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের ইন্স্‌পেক্টার্ জেনেরেল্ অফ্ পুলিশ স্যর ডগলাস ষ্ট্রেটের (জন্ম ১৮৬৯) মৃত্যু হয়।—রাজাবাজার বোমার আসামীগণের মধ্যে ৫ জনের দ্বীপান্তর হয়, ও একজন খালাস পায়।

২২এ—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চান্সেলর্ স্যর উইলিয়ম এনসনের (জন্ম ১৮৪৩) মৃত্যু হয়। —"অগণ্য পণ্ডিত" উপাধি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। এই উপাধি ভূষিত পণ্ডিতগণ ১০০ ্ টাকা বাৎসরিক পেনসন পাইবেন।—পুনা ব্যাঙ্কের নাগপুর শাখা কারবার বন্ধ করে।—"ওরিয়েণ্টাল লেনগোয়েজেস্" শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতগভর্ণমেণ্ট এক মন্তব্যপ্রকাশ করেন।—রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

২৩এ—আর্লঅফ্ লিউক্যানের (জন্ম ১৮৩০) মৃত্যু হয়। —বিলাতের বিখ্যাত চ্যাপলীন, মিলনে এণ্ড গ্রেণফেল কোং ফেল হয়।—চারখারীর মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল।

২৪এ—বিখ্যাত সমালোচক মিঃ টি, ওয়াটস্—ড্যাল্‌টনের মৃত্যু হয়।—মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান জজ্ স্যর ষ্টেন্‌লে ইস্‌মের মৃত্যু হয়।

২৫এ—শ্রীযুক্ত কারমাইকেল্-কর্ত্তৃক কলিকাতায় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়।

২৭এ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম. বী; ম্যাট্রিকুলেসন. আই. এ. ও আই, এস, সী; পরীক্ষার ফল বাহির হয়।"—সঞ্জ বর্ত্তমান" সম্পাদক মাফ্ চাওয়ায়, তাঁহার বিরুদ্ধে মিঃ কণ্ট্রাক্টর যে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন, তাহা খারিজ হয়।—মহীশূরে এক 'জুডিসিয়াল্ কন্‌ফারেন্‌সে'র অধিবেশন হয়। মহীশূরের প্রধান জজ বাহাদুর সভপতি ছিলেন। ভারতে এইরূপ কন্‌ফারেন্স-প্রতিষ্ঠা এই প্রথম।

২৮এ—এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাট্রিকুলেসন; আই, এ; বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হয়।—দার্জ্জিলিঙ্গে কাপ্তেন্ বার্গেসের সমাধি হয়।

২৯—বিখ্যাত ঔষধব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের মৃত্যু হয়।—ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারএ যে করোনেসন চেয়ার ছিল, সফ্রাজিষ্টগণ তাহা বোমার দ্বারায় ভাঙ্গিয়া ফেলে।—লণ্ডনে স্যাল্‌ভেশন্ আর্ম্মির এক কংগ্রেস বসে। ২০০০ এর উপর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।—সেকলেন্‌বার্গ-ষ্ট্রেলিজের গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুরের মৃত্যু হয়।—লাহোরের "জমীদার" বাজেয়াপ্ত মামলার শুনানি আরম্ভ হয়।

৩০এ—দম্পতী, প্রেমসঙ্গীত প্রভৃতি প্রণেতা "বরাহনগর হিতৈষী" "প্রতিবাসী" প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

৩১এ—বারাসতে ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট মোস্‌লেম্ লীগের তৃতীয় বৎসরিক অধিবেশন হয়। মিঃ এ রসুল সভাপতি ছিলেন।—মার্কিন দেশের ভূতপূর্ব্ব ভাইসপ্রেসিডেণ্ট মিঃ ষ্টিভেন্‌সনের মৃত্যু হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

"রিজিয়া"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত "লা মিজারেবলের" বঙ্গানুবাদ যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের "ফরিদপুরের ইতিহাস' যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি" নামক ভাবসম্পদময় পুস্তক বাহির হইয়াছে।

শ্রীমম্মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির ভারতবর্ষে প্রকাশিত "আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ" প্রথমখণ্ড যন্ত্রস্থ; ৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তিন অঙ্কে একখানি নূতন নাটিকা লিখিয়াছেন! নাটিকাখানি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী বিদ্যাভূষণ প্রণীত "ঐতিহাসিক কাহিনী" প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্যারী শঙ্কর দাশ গুপ্তের স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ "আর্য্যবিধবা"র তৃতীয় সংস্করণ ও "স্ত্রী শিক্ষা" তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। "কলেরা চিকিৎসার" পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

রাণাঘাটের (নদীয়া জেলার) 'বার্ত্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক এবং 'বেলা ও পরিমল' কাব্যযুগলের প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পত্র-পুষ্প' নববর্ষায় বিকসিত হইয়াছে। দেখিয়া নয়ন জুড়াইল। বলা বাহুল্য, এখানিও কবিতা গ্রন্থ।

ত্রিপুরার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের লিখিত "কৌশল্যা", "খেলার মাঠ", "খোকাবাবুর ঔষধ শেখা" নামক তিনখানি পুস্তক সত্বরই প্রকাশিত হইবে। 'খেলার মাঠ' ও 'খোকাবাবুর ঔষধ শেখা' নামক বই দুই খানি শিশুদের উপযোগী কবিতায় লিখিত; এবং এই উভয় পুস্তকের কয়েকটী কবিতা "শিশু" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত-হইয়াছিল।

মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক মৌলভী শেখ আবদুল-জব্বার সাহেব প্রণীত শিক্ষিত-সমাজ-আদৃত "মদিনা-শরীফের" ইতিহাসের দ্বিতীয়সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। এবং হজরতের জীবনী ও নুরজাহান বেগম (ঐতিহাসিক জীবনী) প্রকাশিত হইয়াছে। এই বই দুই খানি দুই রঙ্গে ছাপা; সিল্কের বাঁধাই। প্রকাশক ঢাকার আলবার্ট লাইব্রেরী।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calcutta.

ভাদ্র, ১৩২১

প্রথম খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

দূর্ব্বা

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

তিমির মথিয়া রচিত হইল প্রথম যখন বিশ্ব,
তুমি কোথা ছিলে, ওগো ভার্গবি, কোন্ দেব-গুরু-শিষ্য ?
কোন্ সুরপুরে—তিমিরের পারে কোথা হতে হলে যাত্রী,
ঢাকিতে ত্যাগের হরিতাঞ্চলে জলধি-বসনা ধাত্রী।
সৃষ্টির সেই প্রথম দিবসে শাশ্বত এই মর্ত্ত্যে,
কল্যাণ-ভরা করঙ্ক করে আসিয়াছ কোন্ সর্ত্তে ?
শিশিরসিক্ত শুভ্র বসনে অঙ্গ আবরি নিত্য,
প্রভাতে প্রদোষে নীরব ধেয়ানে সংযত কর চিত্ত।
তুমি যাহাদের মঙ্গল চাহ, কল্যাণ বহ বংশে,
নির্ম্মম তারা অস্ত্র হানিয়া তৃপ্ত তোমার ধ্বংসে।

বায়ু-চঞ্চল শ্যাম অঞ্চল বিছায়ে শুয়েছ বঙ্গে,
শতেক জনের শত পদাঘাত সহিতেছ কত অঙ্গে।
দুঃখ, দৈন্য, যন্ত্রণা-ভরা মানুষের এই রাজ্য,
বিপুল বেদনা, নিয়ত আঘাত, তুমিত করনা গ্রাহ্য।
তুমি দেখে আস, সর্ব্বপ্রথম সবার প্রেমের পাত্রী,
স্বস্তি তোমার লভিয়া শীর্ষে ধন্য নবীনযাত্রী।
মাতৃ-আশীষ বিবাহ-বাসরে, ভগিনীর পরিচর্য্যা,
তোমার পরশে সরস হয় গো নববরবধূসজ্জা।
সহোদরা যবে সহোদর-শিরে আশীষ-বাক্য বর্ষে,
তুমি এস মাথে ধান্যের সাথে কল্যাণ বাণি হর্ষে।
শিশুর যেদিন অন্নপ্রাশন আসন উপরে ত্রস্ত,
তুমি এস ছুটে শুভাশীষ লুটে ভরিয়া সবার হস্ত।
বাল-ব্রাহ্মণ উপবীতধারী, গৈরিক বাস গাত্রে,
মুণ্ডিতশির মণ্ডিত কর তোমার আশীষপত্রে।
গৃহিণী, পূজারী, বধূ ও কুমারী, লয়ে যায় তোমা নিত্য,
তাহাদের মাঝে দেবতার কাজে লুটায়ে দিয়াছ চিত্ত।
তুলসী, পুষ্প, চন্দনে হ'য়ে, দেববন্দনে অর্ঘ্য,
সার্থক হ'ল জন্ম তোমার, লভিলে চরম স্বর্গ।
সফল তোমার সর্ব্বকামনা, নাহি কোন সাধ অন্য;
শত পদাঘাত বক্ষে বাহিয়া দৈন্য তোমার ধন্য।
নাহিক গর্ব্ব, মান-অভিমান, নাহি কারু সনে দ্বন্দ্ব,
দেব-পদে তাই, লভিয়াছ ঠাঁই, তুমি দীন নির্গন্ধ।
শুধায়নি কেহ তব ইতিহাস—কে তুমি করুণাসিন্ধু,
দলিত তৃণের আত্ম-কাহিনী বুঝেছিল শুধু হিন্দু।

—

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট, বি. এ., বি, এল্.]

১। ব্যক্তিত্বের আদর্শ

[প্রাচীন হিন্দুসমাজে ব্যক্তিত্ব]—নদীর গতি সাগরের দিকে মুক্ত বলিয়াই তটের দিকে বদ্ধ। তাহা না হইলে তীরভূমি ছাপাইয়া সে যদি ক্রমাগতই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাহার সাগরলাভ ঘটিয়া উঠে না। আমাদের সমাজের "ব্যক্তিত্বকে" সমাজধর্ম্মের নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, তাহাকে তাহার চরম গতির দিকেই মুক্ত রাখা হইয়াছিল। ব্যক্তিত্বের এই ধারণাই হিন্দু-সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাভূমি। এবং ইহাই ব্যক্তিত্বের প্রাচ্য-আদর্শকে প্রতীচ্য-আদর্শ হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

[প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিত্ব]—প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিত্বের মূল-সূত্রটী Aristotleএর একটী কথায় ব্যক্ত হইয়াছে,—'Man is essentially a social animal', অর্থাৎ মানুষ মূলতঃ সমাজবদ্ধ পশু-বিশেষ। মানবের সমাজনিয়ন্ত্রিত পশুত্বই এই সংজ্ঞাদ্বারা সূচিত হইয়া প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে কোন্ দিকে চলিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সামাজিকত্বের মধ্যে মানবের পশুত্বের ভাবটাই যেন প্রাচীন গ্রীকগণের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই গ্রীসের সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ম দিয়াছিল। সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি জ্ঞানিগণ আত্মার স্বাধীনতা লইয়া যে এত মাথা ঘামাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার শিখাইয়া গিয়াছিলেন, মানুষ যেমন আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীন, সামাজিকভাবে বাহ্যভাবেও তেমনি পশুপক্ষীর ন্যায় বাধা-বন্ধহীন,—কেবল আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ বা সমাজভুক্ত হইয়া, সে তাহার পশুত্বের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনও কোনও বিষয়ে খর্ব্ব করিয়াছে মাত্র। এই সামাজিক স্বাধীনতার পূর্ণ অভিব্যক্তি প্লেটোর 'স্বত্ব ও ভোগ-সাম্য-বাদ' (Social Communism)। এবং সেই কথার প্রতিধ্বনি আজও পর্য্যন্ত Socialistগণের Socio-Economic Communismএর * মধ্যে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এমন কি, প্লেটোর Communism-in-wivesও নূতন আকারে Free-union নাম ধারণপূর্ব্বক বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজে দেখা দিয়াছে।

[ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব স্বত্বগত (according to *rights-in-rem*), কর্ত্তব্য-গত (duty) নয়]—প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপের সমাজতত্ত্বের মূল কথাটি এই যে, "মানুষপশু" জন্মিয়াছে স্বত্ব লইয়া, সে জন্মিয়াছে পরের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য। তাহার যে সমস্ত duties and liabilites আছে, তাহা তাহার পক্ষে আপনাকে খর্ব্ব করা। সে কর্ত্তব্যের জন্য জন্মে নাই, ঋণ-শোধ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই, সে জন্মিয়াছে ভোগ করিবার জন্য, পরের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য। ইহাই হইল, প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপের ব্যক্তিত্বের ধারণা। মানুষের স্বত্বই (*rights-in-rem*, or *inpersonun*) হইল তাহার সমস্ত অস্তিত্ব এবং তাহার ঋণ বা কর্ত্তব্যই (duties and liabilites) হইল তাহার নাস্তিত্ব, তাহার লোকসান। প্রাচীন রোমের Neo-Platonismএর চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতার সময়ে, যখন 'Emperor' হইতে দীন কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই Swooning in the infinite অর্থাৎ আত্মার পরিনির্ব্বাণ লইয়াই ব্যস্ত, যখন সমাজ-বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একটা কাল্পনিক 'প্রাকৃতিক জীবন-যাপনের (state of nature) চেষ্টায় রোম সাম্রাজ্যের নাগরিকগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখনও সেই একই কথা 'মানুষ পক্ষহীন দ্বিপদ মাত্র।' †

* Communism কথাটার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই নাই। ইহার ভাবার্থ ইংরাজীতে এই :—the doctrine of a community of property or the negation of individual rights in property অর্থাৎ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বত্বের অভাব বা সকলের সমান স্বত্ব।

† Plato এক স্থানে বলিয়াছেন—Man is a featherless biped—মানুষ পক্ষহীন দ্বিপদ-বিশেষ।

অতএব যদি পশুত্ব ছাড়িয়া Spirit হইতে চাও, তাহা হইলে সমাজশৃঙ্খল ছিঁড়িয়া প্রকৃতির উদার আকাশে feathered bipedএর মত উড্ডীন হও।

[ভারতীয় আদর্শে মানুষ কোন অবস্থাতেই পশু নয়—মানুষ সংসারেও spirit, সংসারের বাহিরেও spirit, আধ্যাত্মিকভাবেও spirit]—এইখানেই ভারতীয় আদর্শের সহিত ইউরোপীয় আদর্শের সনাতন বিভিন্নতা। ভারত কখনই, কোন অবস্থাতেই মানুষকে একেবারে পশু বলিয়া স্বীকার করে নাই। তাহার মতে মানুষ ভিতরেও আত্মা, বাহিরেও আত্মা। সমস্ত জগৎই যখন আত্মা হইতে জাত, তখন মানুষ ভিতর-বাহির উভয়তঃই spirit। যদিও সে জীব বটে তথাপি সে তাহার জীবত্বকে ছাড়াইয়া শিবত্বেরই চিরন্তন সত্ত্বাধিকারী। * সে তাহার এই শিবত্বকে ভুলিয়া থাকে, তাই তাহার মনে হয় সে পশু; কিন্তু সে পশু নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব পশুত্বের নামান্তর মাত্র নয়। সেই সতেজে বলিতে পারে—"নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।"

[হিন্দু আদর্শ—মানুষ জন্মিয়াছে ঋণ লইয়া, কর্ত্তব্য লইয়া, স্বত্ব লইয়া নহে। এই ঋণ-শোধ করাই তাহার ধর্ম্ম এবং সামাজিক অস্তিত্ব] মানুষ সমাজে পশু নয়, তাই সমাজে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই। উচ্ছৃঙ্খলতাই পশুত্ব, পশুত্ব অর্থেই স্বেচ্ছাচারিতা। আত্মার স্বাধীনতা কোথায়? না তাহার সর্ব্বপ্রকার বাধা-অতিক্রমের শক্তি-প্রকাশে;—সে স্বাধীন তখনই যখন সে সজোরে বলিবে আমি কামের নই, আমি ক্রোধের নই, লোভের নই—"একোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহং" আমি সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই শিবস্বরূপ—সেই মঙ্গলস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত মনুষ্য যিনি সর্ব্বভূতের পক্ষে মঙ্গল-স্বরূপ। যিনি "সর্ব্বভূতহিতে রত।" ভারতীয় ব্যক্তিত্বের ইহাই আদর্শ—ইহাই একমাত্র কথা। যাহাকে মঙ্গল-স্বরূপ হইতে হইবে, সে ত' বাহিরে অর্থাৎ সমাজে সর্ব্ব জীবের মঙ্গলেচ্ছার দ্বারা আবদ্ধ হইবে। আমাদের সমাজে ব্যক্তি জন্মায়—ঋণ লইয়া, ধর্ম্ম লইয়া।

[এই ধর্ম্মের দীক্ষা লাভ হয় সংসারের সুখ দুঃখানু- হইতে]—আবার এই ধর্ম্মের জন্য দীক্ষাও স্থির হই- রহিয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "স যদশিশিষতি, যৎপিপাসা যন্নরমতে তা অস্য দীক্ষা" (ছান্দোগ্য ৩ প্রা।১৭শ খণ্ড), যা সে ভোজন (ভোগ) করিতে চায়, যাহা সে পান করি- (অথবা পাইতে) চায়, যাহাতে সে সুখ পায় না, তাহা তাহার দীক্ষা, অর্থাৎ এই সমস্তের জন্য যে সুখ-দুঃখানুভ- হয়, তাহাই তাহার দীক্ষা। অর্থাৎ সংসারের সর্ব্বপ্রকা- চেষ্টা হইতে যে সুখদুঃখানুভূতি, তাহাই তাহার দীক্ষা।

২। সামাজিক ঋণ

[মনুষ্যত্ব লাভ—সমাজ-বন্ধন ও ধর্ম্ম-বন্ধন]—মনুষ্য- সংসারের কার্য্যের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিবে, সংসারে- বাহিরে নয়। তাই সংসার মানুষের পক্ষে দীক্ষা ও শিক্ষা উভয়েরই ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, নিবৃত্তি- মধ্য দিয়া, নিবৃত্তির পথে প্রবৃত্তির গতিকে একমুখী করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে মানুষকে অগ্রসর করিয়া দিবা- চেষ্টাই ভারতের সমাজবন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল। সমাজের দৃঢ়তটের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, ভারতের আত্মার ক্রমবিকাশ, অন্তরের দিকে—ঈশ্বরের দিকে গতিলাভ করিয়াছিল। চঞ্চল হইতে অচঞ্চলের দিকে, বাসনা-কামনার উত্থান পতন হইতে আত্মার অবিচল শান্তির দিকে, জীবনের গতি অব্যাহত রাখিবার চেষ্টাতেই ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদেরা আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন।

[প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তি]—তথাপি মানুষ যে অংশে পশু, সে অংশ যে, তাঁহাদের চক্ষে পড়ে নাই, তাহা নহে মনু বলিয়াছিলেন,

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

—মনু ৫।৫৬।

মাংসভক্ষণ, মদ্যপান, মৈথুন এ সমস্ত ব্যাপারে সাধারণতঃ কোন দোষ নাই, কারণ, ইহা জীবগণের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু নিবৃত্তিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদা। মাংসাদি-সম্ভোগে সাধারণতঃ দোষ নাই বটে কিন্তু জীবনের যাহা

* এই জন্যই বোধ হয়, জীবতত্ত্ববিৎ A. Russel Wallace বলিয়াছেন যে, জীবের ক্রমবিকাশের নিয়ম মানুষে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে। Natural Selection প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মের দ্বারা ক্রম বিকাশতত্ত্বের সমস্তটুকুরই অর্থ করা যায়, কেবল মানুষের ক্রমবিবর্ত্তনের বেলায় ঠেকিয়া যায়। মানুষে আসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ধপ্রকৃতি ছাড়াও একটা প্রজ্ঞাত চেষ্টার কার্য্য চলিতেছে।

লক্ষ্য, সেই চরম ফললাভ প্রবৃত্তির বশে চলিলে ঘটিবে না। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যের পশুত্বকে একেবারে কোথাও অস্বীকার করেন নাই বরঞ্চ তাঁহাদের বাঁধাবাধির ধুম দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহারা প্রকারান্তরে উহাকেই অধিক ভাবেই মানিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, পশুত্বে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, প্রকৃত মুক্তি নয়, পরন্তু উহা দাসত্বেরই নামান্তর মাত্র। তাই পশুত্বকে আবদ্ধ করাই আত্মার স্বাধীনতানুভবে একমাত্র উপায় বলিয়া আর্য্য-সমাজ প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপে সামাজিকভাবে বদ্ধ ও আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা হইতেই ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

[বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা]—ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, মনকে সেই অশ্বের বল্গা ও আত্মাকে রথিস্বরূপ জ্ঞান করা, ভারত যে কেবল আধ্যাত্মিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নহে, আধিভৌতিকভাবে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া মানবের বাহ্য পশুত্বকে সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহারের একটী নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার ফল হয়তো ইউরোপীয় হিসাবে মানবের উন্নতি-পথের অন্তরায় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, হয়তো ইউরোপীয় বুধগণের মতে ইহারই জন্য আমরা আজ প্রাণহীন গতিহীন জড়ভাবাপন্ন সমাজে পরিণত হইয়াছি, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের এই জড়তার কারণ, এই সর্ব্ব প্রকার Stagnationএর কারণ, অন্য কোনও স্থানে গুপ্ত ভাবে আছে, আমাদের চক্ষু সে দিকে এখনও ফিরে নাই বা ফিরিতে চায় না।

[সামাজিক জন্মলাভ বা দ্বিজত্বলাভ]—আমাদের ধারণা এই যে, জগতে জীব কর্ত্তব্য-পালন করিতে, ধর্ম্মাচরণ করিতে জন্মিয়াছে। সে পরের নিকট ঋণী—দেবঋণ, পিতৃঋণ ইত্যাদি ঋণশোধ করিতে তাহার সামাজিক জন্মগ্রহণ। কিন্তু এই সামাজিক জন্মের মধ্য হইতে তাহাকে আধ্যাত্মিক জন্মলাভ করিতে হইবে। সে যদি সমাজের মধ্যে আপনার স্বত্ব লইয়াই মারামারি করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক জগতে নবজন্মলাভ অর্থাৎ দ্বিজত্বলাভ আর ঘটিয়া উঠেনা। সেই জন্য আর্য্যশাস্ত্রকারগণের মতে সমাজে মানবের স্বত্ব অপেক্ষা ঋণিত্বই অধিক—সামাজিক মানবের স্বামিত্ব অত্যন্ত অল্প, ঋণিত্বই তাহার সামাজিক জীবনের অধিকাংশ।

৩। সামাজিক ঋণমুক্তির উপায়

[অথচ এই ঋণ-পরিশোধই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ঋণমুক্ত হইয়া আপনাকে বুদ্ধ স্বভাব জানাই জীবনের উদ্দেশ্য]—ক্রমাগত ঋণ-পরিশোধ করিতে করিতেই যদি তাহার জীবন অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে মানবজন্ম লাভের যাহা উদ্দেশ্য, সেই আত্মোপলব্ধি, আপনাকে ঋণ-মুক্ত—'নিত্যমুক্ত বুদ্ধস্বভাব' অবগত হওয়া তাহার ঘটিয়া উঠে না। আপনাকে পূর্ণভাবে মুক্তভাবে লাভ করিবার উপায়-বিধানের জন্য আর্য্যসমাজকর্ত্তৃগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আপনাকে অঋণী, আপনাকে মুক্ত জানা যাইবে, কি প্রকারে? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন;

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

—গীতা ৬অ।২৯

জীবন্মুক্তাত্মার একটী লক্ষণ এই যে, সে সর্ব্বত্র সমদর্শী; সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া এবং সেই বিশ্বাত্মার সহিত আপনাকে নিত্য যুক্ত রাখিয়া সে সর্ব্বদা যোগ-যুক্তাত্মা। এখন প্রশ্ন এই যে, সর্ব্বভূতে আপনাকে দর্শন বা আপনার সহিত সর্ব্ব জীবের যোগানুভব কি Neo-Platonistদিগের মত বা Synicদিগের মত সমস্ত জগৎকে একটা অপ্রাকৃত ঘৃণার দ্বারা লাভ করা যায়? কখনই নয়।

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

—গীতা ৬অ।৩২।

অর্থাৎ আপনার উপমা দ্বারা, আপনার সুখ দুঃখের দ্বারা, যে সর্ব্বত্র সমভাবে সুখদুঃখকে অনুভব করে, সেই পরম যোগী। এই শ্লোকের সামান্য অর্থ ছাড়িয়া গূঢ় ভাবে অর্থ করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত যোগ-যুক্তাত্মার লক্ষণের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইবে। তাই ইহার ব্যাখ্যা একটু বিশদ ভাবে করার প্রয়োজন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখিবে। অর্থাৎ আমি যেমন আমার দেহের সমস্ত অংশে অণু ও ভূমা উভয় ভাবেই বিরাজিত আছি, তেমনই এই বিশ্ব-জগতের আত্মা 'অণোরণীয়ান্' হইয়াও 'মহতো মহীয়ান্', 'গুহাহিত' হইয়াও 'সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'। আমার দেহের প্রত্যেক অংশ, এমন কি, প্রত্যেক জীবকোষ (cells) যেমন নিজের নিজের জন্য আছে, তেমনই আবার সমস্ত দেহের জন্যও আছে। তাহাদের প্রত্যেকের সুখদুঃখ এক ভাবে যেমন প্রত্যেকের তেমনই আর এক ভাবে সকলের। তাহারা যেমন আপন আপন সত্তায় সত্তাবান্, তেমনই সেই সমগ্র দেহ-ব্যাপ্ত যে 'অহং' সেই 'অহং'এর সত্তায়ও তাহারা সত্তাবান। চেতনারূপে তাহাদের মধ্যে আমি আছি, তাই তাহারা বাঁচিয়া আছে। সকলেই আপন আপন কার্য্য করিতেছে অথচ সেই কার্য্য সমগ্রের জন্য হওয়ায় সকলেই একটী মাত্র প্রাণে প্রাণবান হইয়া রহিয়াছে। এই সমগ্রব্যাপী অহংই যেন অংশের কার্য্যকে সমগ্রের কার্য্যে পরিণত করিতেছে। এইরূপে সর্ব্বত্র আত্মাকে দর্শন এবং সমস্তকে আত্মায় দর্শন করাই পরম যোগ। এই 'আত্মৌপম্যেন' ভারতের সমাজতত্ত্ববিদেরা জগৎকে দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা 'গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ' ভারতীয় জনগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

[প্রকৃতিগত কর্ম্মের জন্য বর্ণ ধর্ম্ম। এবং সেই কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কামতার ধর্ম্ম দিবার জন্য আশ্রম-ধর্ম্ম]—ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদেরা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া যে বর্ণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা মানুষকে আপনার প্রকৃতিগত কর্ম্মের মধ্যে আবদ্ধ করিবার জন্য; এবং যে আশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রকৃতিগত কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কামতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মাকে 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ', সেই পরম-লাভ ঈশ্বর লাভের দিকে মুক্ত রাখিবার জন্য। বর্ণ-ধর্ম্মের দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করিয়া আশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা সেই নিয়মিত ও একমুখীকৃত আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে গতি-দান করাই হিন্দুসমাজ-তত্ত্বের মূল কথা।

৪। জীবের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব :—ইউরোপীয় ও ভারতীয়

ক—অস্তির জন্য যুদ্ধ

[ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের (Sociologist) মতে প্রতিযোগিতার যুদ্ধ হইতে জীবের এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যের ক্রমবিকাশ]—স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে, কর্ম্ম যখন বর্ণগত হইল, তখন হইতেই ভারতীয় সমাজে কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ-বিভাগ, চেষ্টা-বিভাগ, চিন্তা-বিভাগও হইয়া যাওয়াতে, তখন আর পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের স্থান রহিল না। তখন পরস্পরকে আঘাত না করিতে পারি, কিন্তু সেই জন্য সহানুভূতি ও সাহচর্য্য বাড়িবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? উপরন্তু যদি একের কার্য্যাবলী অপরের অপেক্ষা অধিক অর্থকরী বা সম্মানকরী হয়, তাহা হইলে ত' সমাজে হিংসাদ্বেষেরই জন্ম হইবে। আর যদি তাহাও না হয়, তবুও সমাজস্থ লোকের বুদ্ধি বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে আবদ্ধ হইয়া অসম্পূর্ণ ও উন্নতি-বিহীন হইয়া যাইবে। কুম্ভকারকে চিরদিন কুম্ভকারই থাকিতে হইবে, এ কিরূপ কথা? আরও একটী কথা,—অর্থশাস্ত্রের (Economics)এর একটা সূত্র আছে, Competition enhances trade, monopoly damps it অর্থাৎ প্রতিযোগিতা বাণিজ্যের উন্নতিকারক, একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতিকারক। এই সূত্র বাণিজ্য বিষয়েও যেমন প্রযোজ্য, সামাজিক উন্নতির বিষয়েও তেমনই প্রযোজ্য। তাই মনে হয়, বর্ণধর্ম্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতিযোগিতার অভাবে কোন গুণই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। বর্ণ-ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল,—তাই ব্রাহ্মণ চিরদিন ত্যাগী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়ের ক্ষতত্রাণশক্তি মদমত্ত ঔদ্ধত্যে পরিণত হইয়াছিল, বৈশ্যের অর্থ অনর্থের জনক হইয়াছিল এবং শূদ্রের সেবা-পরায়ণতা, হীন দাসত্বে পরিণত হইয়াছিল।

[তাঁহার মতে বর্ণধর্ম্মের বাঁধাবাঁধির ফলে ভারতীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ জড়ত্ব]—এই যুক্তির সঙ্গে আধুনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যোগদান করাতে প্রতিপক্ষের কথা প্রায় অকাট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই এ বিষয়ে একটু ধীরভাবে আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের আধুনিক

হিন্দুসমাজের অবনতি দেখিয়া পাশ্চাত্য সুধীগণ যাহাকে ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই বর্ণ-ধর্ম্মকেই (Caste Systemই) আমাদের অবনতির এক-মাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লইবার পূর্ব্বে আমাদের এতদিনের এই সমগ্র জাতিগত ব্যাপারের বিষয়ে শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন।

[জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সর্ব্বপ্রকার জীবই জীবনে সংগ্রাম করিয়াই উন্নতি লাভ করে]—প্রথমেই দেখিতে হইবে, সংসারে জন্মিয়া মানুষ কি চায়? সুখ—না দুঃখ? যুদ্ধ—না শান্তি? আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ—না আধিভৌতিক অতৃপ্তিময় ক্ষণিক সুখ? অচঞ্চল আনন্দ—না নিত্যনব চাঞ্চল্যময় সুখের ক্ষণিক ছায়া? বর্ত্তমান অভিব্যক্তিবাদ বলে যে, বেষ্টনীর সহিত (with circumstances and environments) যুদ্ধ করিতে করিতেই জীবের ক্রম-বিকাশ হইয়াছে, প্রতিকূলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বা অনুকূল করিয়া জীব ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ, বেষ্টনীর সহিত যুদ্ধ, অনুকূলকে পাইবার জন্য যুদ্ধ, চতুর্দ্দিকেই যুদ্ধ,—যুদ্ধ—যুদ্ধ! এই জীবন সংগ্রামে যে জয়ী হইতে পারিয়াছে, সেই বাঁচিয়া গিয়াছে, যে পারে নাই সেই মরিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে বিশাল মানব-সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই বিবর্ত্তনের জন্য যুদ্ধই, এই আত্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধই, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের একমাত্র কারণ। এই বিশ্বব্যাপ্ত সমরাঙ্গনে কোথাও দয়ার স্থান নাই, সহানুভূতির স্থান নাই, প্রেমের স্থান নাই, আর্ত্তত্রাণের প্রচেষ্টার স্থান নাই, আছে কেবল এক জগদ্ব্যাপ্ত মহাশ্মশানে কাল রুদ্রের বিরাট তাণ্ডব! কালরূপী মৃত্যু বদন ব্যাদান করিয়া সমস্ত জগৎ তাঁহার করালদংষ্ট্রার মধ্যে চূর্ণিত করিয়া বলিতেছেন :—

“কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।”

জীবতত্ত্ববিদের এই কথার পোষকতা সমাজতত্ত্ববিদেরা এবং ঐতিহাসিকেরাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সমাজের এবং জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, এই যুদ্ধের দ্বারাই সামাজিক ও জাতীয় ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে। যে জাতি বা সমাজ যুদ্ধ বিদ্যায় যতটা পারদর্শী, সেই জাতি বা সমাজ সভ্যতার তত উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত। ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে জাতীয় বা সামাজিক যুদ্ধ-শক্তিই তার উচ্চতার মাপকাটি।

এই ত গেল Biologist এবং Sociologistদিগের কথা। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহাই কি জীবের জীবনের এক-মাত্র কথা? আমরা কি কেবল পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই জন্মিয়াছি? এই বিশাল মনুষ্য সমাজ কি কেবল একটা বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসু মনুষ্যের শিবির-সন্নিবেশ মাত্র! এই স্নেহ, এই প্রীতি, এই যে পরের জন্য পরের ক্রন্দন, এই যে, চারিদিকে এত মেশামিশি, গলাগালি, এ সমস্ত কিছুই নয়, কেবল গলায় ছুরী বসাইবার পূর্ব্বে উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র?

[ক্রমবিকাশ তত্ত্ব—হিন্দু সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মত]—এই বিশ্ব-রচনা বর্ত্তমান জীবতত্ত্ববিদেরা যে ভাবে দেখিতেছেন, আমাদের মনে হয়, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঠিক সেই ভাবে দেখেন নাই। তাঁহারা এই যুদ্ধের মধ্যেও একজন করুণাময় প্রেমময়ের অস্তিত্বের ও কার্য্যের সঠিক সংবাদ পাইয়া-ছিলেন। তাই তাঁহারা সংসারকে যুদ্ধের দিক দিয়া দেখেন নাই। জীবনকে সংগ্রামের দিক দিয়া না দেখিয়া, সাহ-চর্য্য ও সহানুভূতির দিক দিয়া দেখিয়া, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পরের রক্ত শোষণ করিয়াই মানব উন্নত হয় না, যুদ্ধের দ্বারাই সমাজ উন্নত হয় না। স্বার্থে স্বার্থে যুদ্ধ—লোভে লোভে যুদ্ধ হইতে মৃত্যুই আনে, জীবন আনিতে পারে না। জীবের জীবন এবং সেই সঙ্গে সমাজের জীবন পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থতা দ্বারাই উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

[ক্রমবিকাশের কারণ, সাহচর্য্য; যুদ্ধ নয়]—এক কথায়—Struggle of competition is not the cause of human evolution but co-operation অর্থাৎ প্রতিযোগিতার সংগ্রামই মানুষের ক্রমোন্নতির কারণ নয়, পরস্পর সাহচর্য্যই মানবজীবনের ও সমাজজীবনের ক্রম-বিকাশের কারণ।

খ—অস্তিত্বের জন্য সাহচর্য্য

[সাহচর্য্য জীবের প্রাথমিক বৃত্তি। এই বৃত্তিই সামা-জিক ক্রমবিকাশের প্রধান কারণ]—জীব প্রতিকূল অবস্থাদির সহিত যুদ্ধ করে বটে, কিন্তু ঐ যুদ্ধ তাহার জীবনেতিহাসের একাংশ মাত্র। তাহার অপরাংশ স্বজাতীয় জীবের সাহচর্য্য (Co-operation)। এই সাহচর্য্যই

তাহাকে রক্ষা করে এবং জীবনের পথে উর্দ্ধের দিকে লইয়া চলে। জীব-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান ভিত্তি জীবকোষ-বাদের (Cellulor Theoryর) উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জীব-কোষের মধ্যেও এইরূপ সাহচর্য্য প্রবল ভাবে বর্ত্তমান। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুগুলিও কোষ-সমাজে (Cell-community তে) বদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধন করে। তাহারও পরস্পরের মধ্যে সুখদুঃখ বিভাগ করিয়া লইয়া বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই জীবকোষ হইতেই উচ্চতর জীবের অভিব্যক্তি। কিন্তু যাহাদের জন্ম ও বৃদ্ধি এই প্রাথমিক সহচর বৃত্তি, হইতে তাহাদের মধ্যেই কি ইহার একান্ত অভাব? মেরুদণ্ডহীন খণ্ডপদী (Arthropoda) জীবগণের মধ্যে পিপীলিকার স্থান অতি উচ্চে। তাহাদের মধ্যে সহচরবৃত্তিই তাহাদের সর্ব্ব প্রধান বৃত্তি। মেরুদণ্ডী জীবগণের মধ্যে উচ্চতর জীবগুলি প্রায়ই সমাজবদ্ধ। যে জীবগণের মধ্যে এই প্রাথমিক সহচর-বৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সেই জাতীয় জীব প্রবল হইলেও ক্রমশঃ কি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে না? আর দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবের ক্রমবিকাশের কারণ কি এই প্রাথমিক সহচরবৃত্তির অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি নয়?

[ইউরোপীয় জীবতত্ত্ববিদেরা অস্তিত্বের যুদ্ধের দিক হইতে সমাজকে দেখিয়াছিলেন]—আমাদের মনে হয় যে, যাঁহারা কেবল এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য জাতীয় জীবের যুদ্ধকেই ক্রমাগত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা একদেশ-দর্শিতা দোষে দোষী। মাঠের মধ্যে দুইটা মহিষ যুদ্ধ করিতে করিতে বিকট গর্জ্জন করিতেছে বলিয়াই যে, তাহারাই সেই মাঠের দুইটী মাত্র অধিবাসী—তাহা নয়। হয়তো ঐ মাঠেই কত বৎস, কত মাতার দুগ্ধপান করিতেছে, কত যুগলজীব পরস্পরের গাত্রাবলেহন করিতেছে, কত রাখাল জটলা করিতেছে, কত পক্ষী তাহার সঙ্গীর কর্ণে প্রেমের মধুর কাকলী ঢালিতেছে। কিন্তু যে দেখিতে যাইবে, তাহার চক্ষে হয়তো এই সমস্ত মেলামিশার ব্যাপারের কিছুই পড়িবে না। সে দেখিবে, ঐ দুইটা যুদ্ধমান পশুর শৃঙ্গচালন-কৌশল এবং কর্ণে শুনিবে, হিংসার বিকট গর্জ্জন।

[জীবন-যুদ্ধও ভারতীয় সমাজ-কর্ত্তৃগণের চক্ষেও পড়িয়াছিল]—আমাদের সমাজকর্ত্তৃগণের চক্ষে যে সংসারের যুদ্ধব্যাপারটা পড়ে নাই, তাহা নয়। তাঁহারাও এই সংসারের মধ্যে মৃত্যুর লীলা দেখিয়াছিলেন—অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একটী শ্লোক আছে—

"অহস্তানি সহস্তানাং অপাদানি চতুষ্পদাং
ফল্গূনি তত্রমহতাং জীবঞ্জীবস্য জীবনং॥"

'হস্তহীন জীব সহস্ত জীবের খাদ্য, পদহীন জীব চতুষ্পদের খাদ্য, ক্ষুদ্রজীব বৃহতের খাদ্য, এইরূপ জীবই জীবের জীবন।'

[কিন্তু সমাজে যুদ্ধই একমাত্র সত্য নয়;—আর্য্যঋষিগণ স্নেহ, প্রেম এবং সাহচর্য্যের দিক দিয়া সমাজকে দেখিয়াছিলেন]—কিন্তু জীব যে কেবল পরস্পরের মধ্যে 'কামড়া কামড়ি' করিতে জন্মিয়াছে, এই কথাকে একমাত্র সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে সমাজ-রচনার—বিশ্বরচনার অর্থ করা না।* তাই তাঁহারা সংসারে মৃত্যুর লীলা পূর্ণভাবে অনুভব করিয়াও যেন নির্ভীকভাবে সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—

"হে মৃত্যু, হে হিংসা, হে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, তোমরাই জগতে একমাত্র সত্য নহ। তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে অতিমৃত্যু আছে, তাহাকে আমরা জানিয়াছি।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—"

[তাই ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল]—সেই মৃত্যুর অতীত মহান্ত পুরুষের অভয় ক্রোড়ের অস্তিত্ব তাঁহারা এই মৃত্যুময় সংসারের মধ্যেই দেখিয়াছিলেন। তাই 'মৃত্যুনৈবেদং আবৃতম্' (বৃহদারণ্যক) সমস্ত জগৎ মৃত্যুর দ্বারা আবৃত জানিয়াও জগৎকে জীবনের দিক দিয়া দেখিয়াছিলেন। তাই ভারতের সামাজিক নিয়মের সঙ্গে জগতের অন্যান্য জাতির সামাজিক নিয়মের এত পার্থক্য। তাই পল্লি সমাজ, একান্নবর্ত্তী পারিবার প্রভৃতি বহুপ্রকার অনন্য সাধারণ সামাজিকতা ভারতে এখনও দেখা যায়। এবং এই ভাবে জীবনের মধ্যে—সংসারের মধ্যে—যুদ্ধ, দ্বেষ

---

* এবং এই কারণেই বোধ হয় H. Spenser, E. Haecke প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকগণ জীবের প্রাথমিক সহচর-বৃত্তির উপর তাহাদের চারিত্র্যনীতি-শাস্ত্রের (Ethics এবং) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

হিংসা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কমাইবার জন্যই ভারতে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৫। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কার্য্য

[প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য স্বার্থসংঘাত কমাইবার জন্য বর্ণধর্ম্ম]—ইউরোপীয় সমাজে আজ জাতির সহিত জাতির সংঘাত, সবলের সহিত দুর্ব্বলের সংঘর্ষ, ধনীর সহিত নির্ধনের যুদ্ধ, অর্থের সহিত শ্রমের অভিঘাত,—সর্ব্বত্র আঘাত, সংঘাত ও প্রতিঘাত। আমাদের প্রাচীন সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বুঝিয়াছিলেন যে, যদি ক্রমাগত এই আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই মানুষকে জীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে, কখন সে সেই অতিমৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? কখন সে জীবনের যাহা একমাত্র লক্ষ্য, সেই 'পরমোপশান্তির' দিকে যাইবে? মৃত্যুসংসারসাগরাৎ যদি আপনাকে উদ্ধার করিতে না পারে, তাহা হইলে যে তাহার কিছুই হইল না! তাই তাঁহারা বাহিরের যুদ্ধ কমাইবার জন্য বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বার্থকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পরমার্থের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। স্বার্থ সেই জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে নাই, আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ছাড়াইয়া পরকে আঘাত করিতে পারে নাই—অন্ততঃ যাহাতে না পারে, সেই চেষ্টাই আমাদের সমাজ-নিয়ামকগণ করিয়া ছিলেন। যাহাতে বৈশ্যের ধনোপার্জ্জন-চেষ্টা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষতত্রাণ-প্রবৃত্তিকে আঘাত করিতে না পারে, ক্ষত্রিয়ের রাজগুণ, ব্রাহ্মণের ত্যাগের মহিমাকে আঘাত করিতে না পারে, এবং শূদ্রের নিঃস্বার্থ-সেবা, নীচ দাসত্ব বলিয়া না অনুভূত হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল।

[বর্ণ-ধর্ম্মের উপর আশ্রম-ধর্ম্মের কার্য্য]—আবার ক্রমাগত এক ব্যবসায় থাকিলে মানুষের বুদ্ধি স্বার্থের পাষাণ-প্রাচীরে বদ্ধ হইয়া জড়ভাবাপন্ন হইবার যে ভয় ছিল, তাহা আশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা প্রতিষেধিত হইত। বর্ণধর্ম্মের জমিয়া দানা-বাঁধার চেষ্টা, আশ্রম-ধর্ম্মের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। এই আশ্রম-ধর্ম্মের আঘাতে স্বার্থের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মানবাত্মা পরার্থপরতার উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে পারিত। তাই পূর্ব্বে—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগানান্তে তনুত্যজাং॥"

এই ধর্ম্মাক্রান্ত মহাক্ষত্রিয়দিগের জন্ম এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মী হিন্দুদিগের মধ্যে হইয়াছিল। তাই তখন গৃহস্থগণ—'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ' মনে করিয়া আপনাদের গৃহ, অতিথি-অনাথের জন্য বিস্তৃত করিতেন। এবং সময় হইলে সমস্তই ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। বর্ণ-ধর্ম্মের ক্ষুদ্রত্ব, আশ্রমধর্ম্মের এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবার চেষ্টায় বৃহত্তর মুক্ত-জীবনের দিকে ধাবিত হইত। তাই তখন দাসের দাস্যের মধ্যেও শূদ্রের সেবাধর্ম্মের মধ্যে বিদুরাদির ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারীর জন্ম হইয়াছিল। আশ্রমধর্ম্ম শিখাইয়াছে যে, সংসারই জীবনের চরমলক্ষ্য নয়; স্বার্থই জীবনের পরমার্থ নয়। তাই, এখনও এই সংসারে ত্যাগীর এত মান্য, সন্ন্যাসীর এত উচ্চ স্থান।

৬। ইউরোপীয় ও আধুনিক হিন্দু সমাজ

ফল দেখিয়া যদি কারণ অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ইউরোপের সংঘাতধর্ম্মী সমাজের নির্ম্মাণের মধ্যে যে, কোথাও না কোথাও দোষ আছে, ইহা নিশ্চিত। যদি আঘাত-প্রতিঘাতই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ-নির্ম্মাণের মধ্যে সমাজ-কর্ত্তৃগণ কোনও না কোনও স্থানে ভুল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ইহার উত্তরে হয়তো বলিবেন যে, ইউরোপ তাহার সমাজ, কাহারও দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে না; ইউরোপীয় সামাজিক ইতিহাসে এরূপ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কখনও ছিল না। এবং তাহা ছিল না বলিয়াই ইউরোপীয় সমাজ একটা জীবন্ত বস্তু, বাঁধাছাঁদা প্রাণহীন একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। এইরূপ কোন সম্প্রদায় জন্মে নাই বলিয়া, ইউরোপ একটা মস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। * ভারতে সেই বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সমাজ আজ প্রাণহীন।

বাঁধিয়া দেওয়ার একটা আশঙ্কার কথা এই যে, জন্মগত সংস্কার নামক একটা প্রবল শক্তির প্রভাবে মানুষের নড়িয়া চড়িয়া বসিবার শক্তি কমিয়া আসে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভারতে যখন বর্ণাশ্রম প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন কি

* Maine's Ancient Law,—Chapter I.

ভারতবাসী এইরূপ জড়ত্বের ভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল? পৌরাণিক যুগ ছাড়িয়া বৌদ্ধ যুগে ভারতবাসীর ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া, এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও রহিয়াছে। অথচ বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্বের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে গুপ্ত-অন্ধ্রাদি রাজগণের নবহিন্দুযুগেও হিন্দুগণের প্রবল কর্ম্মতৎপরতার নিদর্শন রহিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই আমাদের অধঃপতনের একমাত্র কারণ হইলে, শক-হুনাদির আক্রমণের সময়েই ভারত হইতে আর্য্য নাম লুপ্ত হইয়া যাইত।

এই জন্য আমাদের মনে হয় যে, ভারতের সামাজিক জীবনের উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কখনই কঠিন নিগড়ের ন্যায় কার্য্য করে নাই। পরন্তু বর্ণধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা তাহা মঙ্গলের দিকে—মুক্তির দিকেই ভারতীয় জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এই বর্ণ-ধর্ম্মের সহিত যদি আজ আশ্রম-ধর্ম্মের সাহচর্য্য থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সমাজকে মৃত-সমাজ বা মরণোন্মুখ সমাজ বলিবার শক্তি কাহারও থাকিত না। আজ আমরা আমাদের সমাজতরীর দুইটী ক্ষেপণীর—আশ্রম ও বর্ণ ধর্ম্মের একটিকে ফেলিয়া দিয়াছি। তাই আজ আমরা একস্থানে দাঁড়াইয়া সংসার-সাগরে ক্রমাগত পাক খাইতেছি;—তরী আর অগ্রসর হইতেছে না। জানি না, এই পাক খাইতে খাইতে কখন কোন্ আবর্ত্তের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অতলে তলাইয়া যাইব!

কিন্তু ইউরোপীয় প্রকৃতিপুঞ্জের আধুনিক অবস্থাই কি বিশেষ আশাপ্রদ? সোসিয়ালিষ্ট্‌দের আক্রমণে, ধনী ও শ্রমজীবিগণের চীৎকারে, ভূস্বামী ও প্রজাগণের সংঘর্ষে বর্ত্তমান ইউরোপ ভিতরে বাহিরে উৎপীড়িত হইতেছে। ইউরোপের সাহিত্যকুঞ্জ—এখন যুদ্ধমান কাক-চিল-পেচকাদির চিৎকারে মুখরিত। ইউরোপের 'দর্শনের' মন্দিরে আজ বিপ্লববাদী সোসিয়ালিষ্ট্‌গণের উন্মত্ত নৃত্য। ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন আর কিছুই নয়, কেবল ক্ষুধিত ও স্ফীতোদরের খাদ্য লইয়া হানাহানি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যজ্ঞাগারে এখন কেবল মারণ, উচাটন, বশীকরণের নব নব মন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। শান্তি নাই—স্বস্তি নাই—কেবল হন হন, দহ দহ, পচ পচ, মথ মথ, বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় এই শব্দ। মৃত্যুর দেবতা যেন—

"অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা"

হইয়া সদর্পে এই শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন।

ইউরোপের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দেখিয়া Carl Marks, Prince Kropotkin প্রভৃতি কয়েকজন মনস্বী ইউরোপীয় সমাজকে কতকটা নূতন ধরণে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। 'শ্রমের' সহিত 'ধনের' অশ্রান্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইঁহারা বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রই (State)—শ্রম (labour), এবং ধন (Capital) উভয়কে পরিচালিত করুক। শ্রম এবং ধন উভয়েই রাষ্ট্রের অধীন হইলে আর ইহাদের মধ্যে কোন গোলমাল থাকিবে না। রাষ্ট্র সকলের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবে এবং ধন বিভাগ করিয়া দিবে। রাষ্ট্র যদি জাতীয় অর্থ, ভূমি ও ভূমিজ সমস্ত দ্রব্যাদির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী হয়, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত সংঘর্ষ থামিয়া যাইবে। এক কথায় সোসিয়ালিষ্ট্‌গণের যে Socio-Economic Communismকে বিপ্লববাদ বলিয়া, ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদিন ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, তাহাকেই নূতন আকারে রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান দিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মনস্বিগণ চেষ্টিত।

৭। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্বত্বসাম্য (Communism)

এই বার বর্ণধর্ম্মের উপর আশ্রমধর্ম্ম কিভাবে কার্য্য করিত, তাহার বিষয় বলিতে চাই। বর্ণধর্ম্ম মানুষকে বর্ণনিষ্ঠ ব্যবসায়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিত। আশ্রমধর্ম্ম কোন বর্ণনিষ্ঠ ছিল না, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকলেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অন্ততঃ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের পর বাণপ্রস্থাদি আশ্রমে যে কেহ যাইতে পাইত। যখন হইতে আশ্রমধর্ম্ম জাতিনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই আর্য্য-সমাজ অবনতির প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়াছিল।

ওকথা যাউক। এই আশ্রমধর্ম্মের কার্য্যে বর্ণধর্ম্মের আচারাদির বন্ধন ও ব্যবসায়গত কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কামতার জন্ম দিয়া এবং বর্ণধর্ম্মাতীত তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের দিকে দৃষ্টিকে সতত জাগ্রত ও নিয়োজিত রাখিয়া, মানুষকে পরমগতির দিকে চালিত করিত। ইহাতেই বর্ণধর্ম্মের কুফল প্রতিষেধিত হইত।

এই নিষ্কামকর্ম্মই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একপ্রকার Communism। যাহা করিব, তাহা আমার জন্য নয়, সবই আমার পরমলাভের জন্য এবং পরের মঙ্গলের জন্য। এই যে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্ম্ম, ইহা কখনই বন্ধনের কারণ হয় না। আশ্রমধর্ম্মের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, এই সময় নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য, ইহাতে সেই শিক্ষাকে কার্য্যে লাগান হইত। তারপর বাণপ্রস্থাদিতে সেই শিক্ষার চরমপরিণতি। এই রূপে 'সুখে দুঃখে সমং কৃত্বা লাভালাভজয়াজয়ৌ' কার্য্য করিলে সে কার্য্যে সর্ব্বভূতের হিতসাধিত হয় অথচ সেই কর্ম্মে বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন হইয়া কর্ম্মীর বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায় না।

ইহাই আর্য্যগণের Communism অর্থাৎ ব্যক্তির কর্ম্মফল সাধারণের হওয়া। ইহার সহিত ইউরোপীয় সোসিয়ালিষ্ট্‌গণের Communismএর আকাশপাতাল প্রভেদ। ইউরোপীয় Communismএর অর্থ এই যে, আমি যাহা করিব, আমি যাহা উপার্জ্জন করিব,আমি যাহা ভোগ করিব, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। কিন্তু আমি যদি সে অধিকার অস্বীকার করি, তাহা হইলে বাহির হইতে জোর করিয়া, সে অধিকার আমায় স্বীকার করান হইবে, জোর করিয়া অর্জ্জিত বস্তু কাড়িয়া লওয়া হইবে। অর্থাৎ ইউরোপীয় Communism অর্থে আমার কোন প্রকার স্বাধীনতা নাই, একেবারে সমগ্রের অধীনতা। আমার কষ্টার্জ্জিত বস্তুতে যাহারা কিছুই করে নাই, কোনরূপে আমায় সাহায্য করে নাই, এমন কি, পদে পদে প্রতিযোগিতার দ্বারা আমায় বাধা দিয়াছে, তাহারা কাড়িয়া লইবার অধিকারী। হিন্দুর Communism ঠিক এর উল্টাদিক হইতে জন্মিয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর Communism তাহার আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টা হইতে, তাহার প্রাণের প্রসারশীলতা হইতে জন্মিত। এক কথায় দায়ে পড়িয়া, পরের সঙ্গে চুক্তিমূলক অবস্থা হইতে সোসিয়ালিষ্ট্‌গণ বিলাতী Communismএর জন্ম দিয়াছে। আর হিন্দুর Communism আত্মার অন্তর হইতে, তাহার স্বাভাবিক ও শিক্ষালব্ধ পরার্থপরতা হইতে জন্মিত। এই খানেই এই উভয়বিধ Communismএর চিরন্তন পার্থক্য।

ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সভ্য সমাজের ক্রমবিকাশ সমাজমূলক অবস্থা (Status) হইতে চুক্তিমূলক অবস্থার (Contract) দিকে। ইউরোপীয় বুধগণ চুক্তিমূলক সম্বন্ধ ব্যতীত সভ্যাবস্থায় অন্য কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। অতএব ইউরোপীয় Communism এক প্রকার পরের ধনে পোদ্দারি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, সোসিয়ালিষ্ট্‌দের Communismও চুক্তিমূলক; অর্থাৎ প্রাণের টানে—হৃদয়ের দয়াপ্রেমপ্রীতির টানে—মানুষ পরার্থপর হইবে না, হইবে কেবল কোন রকমে পরের সঙ্গে একটা রফা করার জন্য। আমাদের মনে হয় যে, এই রূপ চুক্তিমূলক বা 'রফা'মূলক সমাজের মধ্যে সত্বসাম্য বা ভোগসাম্যের (Communismএ) যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা একপ্রকার গোঁজামিল। সেই জন্য J. S. Mill প্রভৃতি Utilitarianগণের Greatest good to the greatest number এই মতটিও এই চুক্তিমূলক সমাজের পক্ষে মনোবিজ্ঞানানুসারে (Psychologically) ভিত্তিহীন। কেন মানুষ পরার্থপর (Altruist) হইবে, তাহার কারণ চুক্তিমূলক মতের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এরূপ চুক্তিমূলক নয়,—এইরূপে কোনগতিকে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, কোন প্রকার মারামারি কাটাকাটিকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য, হতগজ রকমের উপায়মাত্র নয়। বর্ণধর্ম্মের জড়ত্বের (Crystalization এর) চেষ্টাকে আশ্রমধর্ম্ম আপনার ভবিষ্যাভিমুখী গতির দ্বারা সদামঙ্গলপ্রসূ ও সর্ব্বভূতহিতে রত করিয়া এক অপূর্ব্ব Communism এর জন্ম দিয়াছিল।

৮। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যক্তিত্ব

বর্ণধর্ম্ম যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বকে বর্ণনিষ্ঠ কর্ম্মে আবদ্ধ রাখিত, তেমনই আশ্রমধর্ম্মের ব্রহ্মচর্য্যাদি সেই ব্যক্তিত্বকে জ্ঞানের দিকে মুক্ত রাখিত। এমন কি, গার্হস্থ্য আশ্রমেই যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মাদি ও জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতেন, তাঁহারা বর্ণানুযায়ী আচার ধর্ম্ম পালন করিয়াও জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণহীন হইয়া উঠিতেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ, গার্হস্থ্যাশ্রমেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে সামাজিক সম্মানদানে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু যখন জ্ঞানীর কোঠা হইতে উপদেশ প্রদান

করিতেন, তখন গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেবাদিকেও তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই যতি-আশ্রমেই বর্ণধর্ম্মকে অতিক্রম করিতেন। শিবি, অষ্টক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া জাতিবর্ণহীন ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎযোগৈরপিগম্যতে।" অর্থাৎ 'যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্য।' নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে, সেই নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞান স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া উঠে। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে জ্ঞানলাভ, ইহাই আমাদের ঋষিগণের মত ছিল। এবং তাহাই দেখাইবার জন্য মহাভারতে সেই স্বামিসেবাপরায়ণা সতীর এবং পিতৃমাতৃসেবাপরায়ণ সেই ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মের হিসাবে, জাতিগত ব্যবসায় হিসাবে উক্ত ব্যাধ মাংসবিক্রেতা ছিল কিন্তু বর্ণধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানের হিসাবে সে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও শিক্ষাগুরু হইয়াছিল। বর্ণধর্ম্মানুসারে সে নীচ-কর্ম্ম করিতেছিল বটে কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা ও আশ্রম-ধর্ম্ম পালনের দ্বারা জ্ঞানের দিকে তাহার আত্মা মুক্ত ছিল। আশ্রমধর্ম্ম মানুষকে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে শিখায়, সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও সময়ে সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই কথা অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিয়া বর্ণধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার উপায় বিধান করে।

এই কারণে আমার মনে হয়, গার্হস্থ্যধর্ম্মের সময়েই বর্ণানুযায়ী কর্ম্মের একটা বাধাবাঁধি ছিল। তারপর গার্হস্থ্যধর্ম্মকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি যখন বাণপ্রস্থ বা যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তখন আর কর্ম্মের বাঁধাবাঁধি থাকিত না। তখন বর্ণভেদ চলিয়া যাইত, জ্ঞান তখন সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইত। তখন সকলে একই অধিকারে বলিতে পারিতেন:—

"ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা
ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি।
অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহীনাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহং।"

৯। উপসংহার

যাহাই হউক, বর্ণাশ্রম আমাদের জাতীয় সাধনার ফল। সুধু ফল নয়, ইহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। ইহা যদি হারাই, তাহা হইলে আমাদিগকে নামগোত্রহীন পর-মুখাপেক্ষী ভিক্ষুকের মত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কিন্তু কেহই আমাদের আপনার করিয়া লইবার জন্য, তাহাদের জাতীয়তার দ্বার উন্মুক্ত করিবে না। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই এতদিন আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।—যিনি যতই বলুন, এখনও যে, আশ্রমধর্ম্মী মহাপুরুষগণ আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য; ভবিষ্যতেও নবতর আকারেই হউক আর পুরাতন আকারেই হউক, ইহাই আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবে। বাহিরের যুদ্ধ নিবারণ করিয়া, মানুষ যাহাতে আপনার চেষ্টায় আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহারই জন্য ইহার জন্ম। স্বার্থ সংঘাত প্রশ্নের ইহাই ভারতের উত্তর। এই উত্তর ঠিক হইয়াছিল, কি ভুল হইয়াছিল, দুদিনের শিশু বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার (যাহার জন্ম বাস্তবিক দেখিতে গেলে Renaissanceএর পরে অর্থাৎ ৪।৫ শত বর্ষের বেশী নয়) সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া নির্ণীত হইতে পারে না। যাহারা এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মরিয়াছে বলিয়া, তাহার বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ স্কন্ধে লইয়া খোলকরতাল সহযোগে উদ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে এই সময় একটু থামিয়া, এই বিষয়ে একটু প্রণিধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। হয়তো, তাঁহাদের মতে, আমিও মরণোন্মুখ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের 'হংস সঙ্গীতের' (Swan-song এর) 'আস্থায়ী' পদের একপদ গাহিতেছি তথাপি আমাদের এই জাতীয় জাগরণের সময় বুধগণকে এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এখন নূতন হাওয়া বহিয়াছে। জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া সংস্কারকে আর কেহ প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন না, তাহার আপাতমধুর কথাতেও কেহ ভুলিতেছেন না। জাতীয়তা, সমাজপ্রীতি, ভূতহিতৈষিতা আজ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। এই যুগ-সন্ধির সময় আমি সুধী-গণকে প্রশ্ন করিতেছি যে, আপনাদের মতে কি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন মরিতে বসিয়াছে, তখন মরিতে দেওয়াই উচিত, না

আমাদের সমাজ-তরণীর যে দাঁড়খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই আশ্রম-ধর্ম্মরূপী ক্ষেপণীকে আবার জোগাড় করিয়া আনিয়া সমাজ-নৌকায় লাগাইবার চেষ্টা করা উচিত? আমাদের সমাজ-পক্ষীর একটী পক্ষ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া কি আপনাদের মতে অপর পক্ষটিও ভাঙ্গিয়া দিলেই সে আবার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে? না সেই ভগ্ন পক্ষটীই যাহাতে আবার উদ্গত হয়, তাহারই ব্যবস্থা কর্ত্তব্য?

আশ্রম-ধর্ম্মকে যদি না ফিরাইতে পারি, তাহা হইলে বর্ণ ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে চির দিনের জন্যই অন্যায় অত্যাচার ও জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়া রহিবে। আশ্রম-ধর্ম্মের সাহচর্য্য হারাইয়া উহা সামাজিক বহু অন্যায় অত্যাচারের জনক হইয়াছে। এখন ব্রাহ্মণ আপনার ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, আপনাদের ত্যাগের মহিমা ভুলিয়া, আপনাদের জ্ঞান-গরিষ্ঠ নিঃস্বার্থতা হারাইয়া, কেবল মাত্র আপনাদের আভিজাত্যের (Heredity'র) দোহাই দিয়া সম্মান চাহিলে কে তাঁহাকে সম্মান দিবে? তিনি যখন বৈশ্যবৃত্তি হইতে শূবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তাঁহার বিদ্যার্জ্জন যখন কতকগুলি পুরাতন শাস্ত্রের বচন কণ্ঠস্থ-করণ ব্যতীত আর কিছুই নয়, যখন একমাত্র পংক্তি-ভোজনের সময় এবং শ্রাদ্ধাদির বিদায় গ্রহণের সময় ব্যতীত তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় আর কোন সময় পাওয়া যায় না, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের দাবী কে শুনিবে? তিনি পরবর্ণের কর্ম্মের মধ্যে যখন অনধিকার প্রবেশ করিতেছেন, তখন তাঁহার জন্মগত স্বত্ব লোপ পাইতে বাধ্য।

ঠিক এইরূপেই কায়স্থাদি জাতির মধ্যেও যে সামাজিক স্তর-বিভাগ ছিল, তাহা আর থাকিতেছে না। চতুর্দ্দিকেই ভাঙ্গাচুরা চলিয়াছে। এই জাতীয় বিপ্লবের সময় কোন্ পথই যে পথ, তাহা স্থির করিয়া লইবার জন্য আমরা আমাদের আধুনিক চিন্তা ও কর্ম্মের নেতৃগণকে এবং বিশেষভাবে যে মহাপ্রাণ, মহাশক্তিশালী জাতি বহুবিপ্লব, বহু উত্থান-পতনের মধ্যে বহু আক্রমণ নির্যাতন সহ্য করিয়া, দুঃখদৈন্য তুচ্ছ করিয়া, এই হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-তরণীকে এতদিন পর্য্যন্ত কাল-সাগরের উপর দিয়া চালাইয়া আনিয়াছেন, সেই অত্রি-বিষ্ণু-হারীত-বশিষ্ঠাদির বংশধরগণকে আহ্বান করিতেছি।

মাইকেল মধুসূদন

জন্ম—১৮২৪—২৫এ জানুয়ারী।—মৃত্যু—১৮৭৩—২৯এ জুন

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

দৃপ্ত সূর্য্য-রশ্মি যথা মধ্যাহ্ন আকাশে,
তেমতি তোমার কীর্ত্তি ভারত-ভুবনে!
তোমার ও কাব্যকুঞ্জ ত্রিদিব-সুবাসে,
রেখেছে ভরিয়া চিত্ত শোভার নন্দনে!
রত্নোজ্জ্বল 'চতুর্দ্দশ' কবিতা তোমার,
নক্ষত্রখচিত যেন শারদ-শর্ব্বরী।
'মেঘনাদে' মেঘমন্দ্রে ভৈরব ঝঙ্কার,
'বীরাঙ্গনা' যেন গঙ্গা যমুনা লহরী।
মুগ্ধ করে 'ব্রজাঙ্গনা' সকরুণ গানে,
মুকুতা-শিশিরে ঝরে কি প্রেম-মমতা;
ও কল্পনা কুহকিনী নিত্য বহি আনে,
গৌড়জনে সুখ-দুঃখ-স্মৃতির বারতা!
কোন্ মহা সাধনায় হে বিশ্বের কবি
অঙ্কিলে কালের ভালে শতস্বর্গ ছবি!

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

তুমি যম-দমী কবি, অতীত গৌরব
বাঙ্গালীর, মধুকণ্ঠ হে মধুসূদন!
অম্লান কল্পনা-পুষ্পে যে সুধা সৌরভ,
গেছ রাখি; উপভোগ করে গৌড়জন
কৃতজ্ঞ সানন্দ চিত্তে; ভাঙ্গিয়া নিগড়,
রতন নূপুর রচি' হে চির-সাহসি!
বঙ্গবাণী পদযুগ সাজালে সুন্দর,
অমিত্র অক্ষর তব অমৃত বরষী
অ-মৃত স্মরণ চিহ্ন, সুকৃতি সন্তান
তুমি বঙ্গ জননীর ওগো কল্পনার
মঞ্জুকুঞ্জবাসী পিক্! ওগো ভাগ্যবান্!
আজও ঝঙ্কৃত বঙ্গ সঙ্গীতে তোমার!
দুঃখ-রবিকর সহি' চন্দ্রমা সমান
ক'রে গেছ বিকীরণ কাব্য-জ্যোছনার!

বিদ্যাসাগর

জন্ম – ১৮২০ –২৬এ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু—১৮৯৩—২৯এ জুলাই

[শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়]

বর্ত্তমান-ভারত কোন্ কোন্ মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া আপনার উন্নতির উচ্চ চূড়াকে অভ্রভেদী করিতে সক্ষম হইয়াছে মনে করিতে যাইলে, সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও প্রাতঃস্মরণীয় কর্ম্মবীর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই মনে আসে। বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতার যে উন্নত প্রাসাদে আমরা বাস করিতেছি, সেই প্রাসাদ-ভিত্তি যে সকল ত্যাগীর ত্যাগ, যে সকল সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য এবং যে সকল মহাত্মার অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা গঠিত, তাঁহাদিগকে কি আমরা একবারও স্মরণ করিব না?—আজ আমরা যদি সেই সকল কর্ম্মী এবং ভাবুককে হৃদয়ের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিবেদন না করি, তবে যে আমাদেরই কর্ত্তব্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রের দুইটি দিক্ আছে; একটি ভাবের, অপরটি কর্ম্মের। একদিকে বিরাট্ ভাবের যজ্ঞাগ্নি জ্বলিতেছে। কত মহাপুরুষ আপনাদের ধ্যান, আপনাদের চিন্তা এবং আপনাদের সাধনাকে ঐ যজ্ঞে আহুতি দান করিয়া যজ্ঞানলকে নিত্য প্রজ্বলিত রাখিয়া আসিতেছেন। অপর দিকে, মানবের চিত্তশালায় প্রবল কর্ম্মের বিপুল আয়োজন—সেখানে বিচিত্র মানবের বিচিত্র-শক্তির বিকাশ। কত মানুষ আপনাদের জীবনদান করিয়া ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্মশালায় মানবের চিত্তকে ধীরে ধীরে গঠিত করিয়া চলিতেছেন। এই দুই স্থানেই ভারতবর্ষ অনবরত নিজের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করিতেছে। ভারতবর্ষের মহাপুরুষগণ ঐ দুইটির একটি-না-একটিতে নিজেদের ধরা দিয়াছেন, এ ধরা-দেওয়া একবারে প্রাণের ধরা-দেওয়া। ত্যাগে, মঙ্গলে, বৈরাগ্যে, আনন্দে ধরা-দেওয়া। এখানে অনেক কর্ম্মী অনেক ভাবুক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অদ্যকার স্মরণ্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ মহাপুরুষগণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না তিনি কি, ভাব-যজ্ঞের গুরু অথবা কর্ম্মশালার ওস্তাদ্। এমনই সামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ তাঁহার জীবন। তাঁহার জীবনে ভাব ও কর্ম্মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যখন তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মাবলীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করি, তখন মনে করি, এমন লোক ত আর হয় নাই। আবার যখন তাঁহার আশ্চর্য্য ধীশক্তি এবং অপরিসীম দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা পাঠ করি, তখন মনে হয়,—না, এমন লোক আর তো জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহাকে সেই ভাবের যজ্ঞবেদীতে গুরুর আসনে দেখিতে পাই। দেখি, তাঁহার উজ্জ্বল ললাট ত্যাগের অক্ষয়-তিলকে অঙ্কিত। তাঁহার অসামান্য তেজঃ এবং দীপ্তি যেন যজ্ঞানল-কেও লজ্জা দিতেছে।

আমাদের জীবন ত সামঞ্জস্যবিহীন। সেইজন্য আমাদের জীবন-সঙ্গীতে ঠিক্ সুরটি বাজিয়া উঠে না। ঐ সুরকে মিলাইবার জন্য আমাদিগকে মহাপুরুষগণের নিকট আসিতে হয়। তাঁহারা সামঞ্জস্যের রাজা। আজ আমরা জীবনের ঐ সুর মিলাইবার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি। আমরা নিজের চতুর্দ্দিকে নিজেকে ঘুরাইয়া মারিতেছি—সেইজন্য আমাদের সম্মুখের গতি নাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় আমাদের জীবনের গতি নিজের চতুর্দ্দিকে পাক খাওয়া। কিন্তু এ গতি ছাড়াও যে মুক্তির দিকে, বিশ্বের দিকে একটা গতি থাকার আবশ্যকতা আছে, তাহা আমরা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই। মহাপুরুষগণ আমাদের মাঝে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আসিয়া আমাদের সমস্তকে ওলট্ পালট্ করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন,—"ওগো, তোমার নিজের চারপাশটা একবার দেখো, নিজের স্বার্থের বেগটা একটুখানি কমাইয়া দাও।" তাঁহারা অনন্ত-পথের যাত্রী, তাই তাঁহারা মানবের চিত্তাকাশে প্রবল গতিতে আসিয়া আমাদের নয়নে পরমাশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হন এবং তাঁহাদের বিরাট আত্মার অক্ষয় জ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের দীনাত্মাকে লজ্জিত করিয়া, কোন্ অজ্ঞাতের অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে পুনর্ব্বার যাত্রা করেন, তাহা কে জানে? তাঁহারা ক্ষণজন্মা কিন্তু ঐ ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহারা যে আলোক দান করিয়া যান, তাহা অক্ষয়।

ভাব এবং কর্ম্ম, কাঠিন্য এবং কোমলতা, জ্ঞান এবং সাধনা, পর এবং আপন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে যেমন

এক হইয়া এক অপরূপ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, আর কাহারও জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই। ভাবের মধ্যে নিজেকে অতিমাত্রায় ছাড়িয়া দেওয়া বা কর্ম্মের প্রবল আবর্ত্তনের মধ্যে নিজেকে ধরা-দেওয়া—এ দু'য়ের মধ্যে কোনটাতেই যে, জীবনের সামঞ্জস্য নাই—তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ত্যাগ ছিল—সাধনামণ্ডিত, কর্ম্ম ছিল—ভাবের দ্বারা গঠিত এবং ধ্যান ছিল—আত্মার মধ্যে স্তব্ধ।

মানুষ যে কত বড় শক্তির অধিকারী, তাহা সে সহজে বুঝিতে পারে না। সে যে "অমৃতের পুত্র", সে যে "সিংহের বাচ্ছা" একথা সে ভুলিয়া যায়। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে মানবত্বের গৌরবকে একবার চোখ মেলিয়া দেখ।

একদা ভারতবর্ষের তপোবনকে ধ্বনিত করিয়া ঋষি কবি গায়িয়াছিলেন :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা!

তাহার পর কত শত বৎসর গত হইয়াছে, আবার বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে ঐ বাণীই ঘোষিত হইয়াছিল—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা!"

মানুষ যে "অমৃতের পুত্র" এই কথা যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালীকে শুনাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে,—নিজের জীবনে তাহাকে ভাবে, কর্ম্মে, চিন্তায় সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও অংশেই ফাঁকি ছিল না। স্বার্থের বন্ধন, সমাজের সংস্কার, বিদ্যার মিথ্যা গর্ব্ব এবং বংশ-মর্য্যাদাকে এক মুহূর্ত্তে ভেদ করিয়া তিনি যে অক্ষয় জ্যোতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীর আদর্শ। তিনি সত্যভাবে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে আমাদের বুকের ছাতি ফুলিয়া উঠে; শক্তি বাড়িয়া যায়। বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আজ সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইল। এখন আমরা জোর করিয়া বলিব "বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর।" মানুষ যে বাহিরে বড় নয়, সাজ-সজ্জায়, ধনরত্নে, গাড়ীজুড়িতে বড় নয়—অন্তরের দিক্ দিয়াই যে বড়, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের বিদ্যার ভাণ্ডে একটু কিছু সঞ্চয় হইলে অমনি গর্ব্বিত হইয়া উঠি কিন্তু অগাধ বিদ্যার জলধি ঈশ্বরচন্দ্র নিজের অসাধারণ শক্তি দ্বারা স্বীয় বিদ্যার সাগরকে এমনই অক্ষুব্ধ, এমনই স্তব্ধ রাখিয়াছিলেন যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বাহিরে বিন্দুমাত্র আড়ম্বর নাই অথচ ভিতরে জ্ঞানের সমুদ্র থই থই করিতেছে। অনেক জ্ঞানী, অনেক পণ্ডিত, অনেক বিদ্যার-জাহাজের জীবনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আহা, এমনটি কি দেখিয়াছ?

বাল্যকাল হইতেই তিনি বাঙ্গালীর মত বেশ চুপ্‌চাপ্ "ভালো ছেলে" ছিলেন না। নিজের বক্ষের ভিতরকার সেই তেজঃ তাঁহার বাল্যজীবনকেও নাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই, অন্যরূপে—সে বালকসুলভ চপলতার ভিতর। প্রভাত কালে পূর্ব্বাকাশে যেমন দিবসের প্রারম্ভটি সূর্য্যের অপর্যাপ্ত লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রারম্ভকালও তেমনি শক্তির অপর্য্যাপ্ত বর্ণবিস্তারে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। "ভালো ছেলে" হইয়া চুপচাপে বাড়িয়া উঠিলাম, তাহার পর পাশ করিলাম, বিবাহ করিলাম, সংসারী হইয়া উঠিলাম এবং চাকরী করিয়া অবশেষে মরিয়া গেলাম, এই যখন ছাত্রগণের জীবনের রুটিন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিদ্যাসাগর তখন কোনমতেই ঐ বাঁধা রুটিনে ধরা দেন নাই। সেই জন্য তাঁহার কেবল বাল্য-কালে নহে—সমস্ত জীবনে একটি স্বাতন্ত্র্যের পর্ব্বতশিখর মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। সকলে যাহা করিতেছে, তাহাকেই নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম, নিজের একটা কোনও স্বাতন্ত্র্য বজায় রহিল না—এমন আদর্শ যাহার জীবনে কাজ করে, সে কখনও বড় হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন বা যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের অন্তরের জিনিষ ছিল। তিনি কাহারও খাতিরে নিজের মতকে খাটো করিয়া রাখেন নাই এবং নিজের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আত্মার বাণীকে কর্ম্মক্ষেত্রে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজের ভিতর যথার্থ সত্যভাবে গ্রহণ না করিয়া তিনি কখন কোনও বাক্য, কোনও আদর্শ বা কোনও লিপিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সংস্কার এবং নিজের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধি এ'দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। সকল লোকেই কি যথার্থ ভাবে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিচার করিয়া সমাজের নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন? আমরা ত সংস্কারের দাস। আমরা নিয়ম পালন করি, সকলে করে দেখিয়া; নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরীক্ষা না

করিয়াই আমরা সমস্ত জিনিসকে গ্রহণ করিয়া বসি। এই জন্যই আমরা তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হই না। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবীর মধ্যে এই নিজের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধি কি পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জ্জিত উদার মাতৃহৃদয়ের তেজ যে পুত্রকে প্রতিদিন পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, সে যদি মানবের শ্রেষ্ঠস্থানীয় না হইবে, তবে আর কে হইবে? বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে এই সরল বিচারবুদ্ধি কি ঋজুতায় মহীয়ান্ ছিল। তিনি যাহা ভাল বলিয়া মনে করিতেন, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ এবং লোক-শিক্ষাদান তাহার দৃষ্টান্ত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভিতরে জাতীয়তার আশ্চর্য্য-প্রকাশ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন এবং এই বাঙ্গালীত্বই তাঁহার মস্তক বিজয়-মুকুটে ভূষিত করিয়াছে। পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করা এবং "আহা" বলিয়া সমবেদনা জানানো খুবই সহজ ব্যাপার কিন্তু কি করিলে আমাদের দেশের দরিদ্রজাতি অন্ন পাইতে পারে, এবং পতিত বলিয়া যাহারা পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য বলিয়া যাহারা দুরাহত, তাহাদের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ পরিশ্রম করা এবং চিন্তা করা মুখের কথা নহে। পরের দুঃখ দেখিয়া যদি তুমি যথার্থ বেদনা পাইয়া থাক, তবে পরের জন্য তুমি কাজ কর; তবেই তো তোমার সত্য দুঃখবোধ। নচেৎ বাক্যের বাষ্পেই যদি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া দাও, তবেত কিছুই করিলে না। বিদ্যাসাগর যেন পরের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার ক্ষুদ্র গৃহকে তিনি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই সামান্য মুদী হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধু ছিল। মানুষকে মানুষ তখনই ভালবাসিতে পারে, যখন সে নিজের মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকে অনুভব করিতে থাকে। তিনি নিজের মধ্যে সেই মনুষ্যত্বের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই অপরকে অমন করিয়া নিজের করিয়া লইতে পারিতেন। সংসারের চিন্তা, নিজের আর্থিক উন্নতি এবং পদমর্য্যাদা, এ সমস্তকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর পরের জন্য জগতের বিরাট্ আয়োজনে নিজেকে বলিদান দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই দেশের যথার্থ কল্যাণ এবং মঙ্গল-চিন্তা দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার শক্তি কয়জন লোকের আছে? দেশের প্রতি এই সজাগ কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বিদ্যাসাগর শেষ পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রাণপণ শক্তিতে নিজের দেশের জন্য অহোরাত্র খাটিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আচারে বেশভূষায় এবং কথাবার্ত্তায় তিনি নিজেকে কদাপি স্বদেশ হইতে দূরে রাখেন নাই। সেই জন্যই এক মোটা ধূতি চাদর এবং ঠন্‌ঠনিয়ার চটিজুতা ছিল, তাঁহার বেশভূষার উপকরণ। এই অতি সাধারণ বেশে তিনি কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলিতে একটুও লজ্জা বোধ করিতেন না। কারণ তিনি তাঁহার গভীর আত্মসম্মানকে কখনও কোনও বাহ্যাবরণে আবৃত করেন নাই। রাজদ্বারে, ভিখারীর পর্ণকুটীরে তিনি ঐ একই বেশে উপস্থিত! এ জন্য তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখিতেন না। বাঙ্গালী হইয়া দেশের দরিদ্র এবং দীন-দুঃখিগণকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের কোনও রূপ উত্তেজনা বা আন্দোলন ছিল না—শান্ত সমাহিত ধীর, কর্ম্মী বিদ্যাসাগরের কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে সুদূর-প্রসারিত ছিল। তাই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞান, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের স্থান সমান ছিল এবং তিনি তাহাদিগকে যে দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের কল্পনারও অগোচর। পরের জন্য তিনি এমন করিয়া খাটিয়াছিলেন যে—পিতা পুত্রের জন্য—পত্নী স্বামীর জন্য এবং প্রজা রাজার জন্যও তেমন করিয়া খাটিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার এ খাটুনি মজুরির জন্য নহে—তিনি ত কিছুরই প্রলোভনে পড়িয়া কর্ম্ম করেন নাই। যে জাতির দুইবেলা অশ্রুধারা ঝরিয়া না পড়িলে উদরান্নের সংস্থান হইত না, হে বিদ্যাসাগর, তুমিই সেই আমাদের হতভাগ্য জাতির জন্য যে জীবনপাত করিয়াছ, তাহার মজুরি দেয়, এমন দাতা কে আছে?—আমরা সকলে তোমার জন্য শতদল পদ্মের যে অর্ঘ্যরচনা করিয়াছি, তুমি আজ তাহা গ্রহণ কর। তুমি দিনের পর দিন দুঃখ দ্বারা, কষ্টের দ্বারা, তোমার কোমল হৃদয়ের করুণা

এবং তোমার পবিত্র অশ্রুধারায় যে প্রতিদিন এক একটি পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া মালা গাঁথিয়াছ, হে দিব্যধামবাসি! তোমার সেই পুরস্কার তোমারই গলে দোদুল্যমান হউক, আমার নয়নে তোমার ঐ তেজোময় মানবমূর্ত্তি চিরভাস্বর থাকুক।

তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল;—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার কর্ম্মজীবন এবং ভাবজীবন আশ্চর্য্যভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সমগ্র প্রাচীন শাস্ত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য দখল ছিল। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় যে গদ্য লেখার প্রচলন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত করেন। তৎপূর্ব্বে গদ্য লিখিত হইলেও তাহাতে কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন ইত্যাদি মাত্রাগুলি ব্যবহৃত হইত না—; প্রকৃতভাবে তখন গদ্য, মাত্রাশূন্য হইয়া অদ্ভুত শুনাইত। বিদ্যাসাগরই গদ্যলেখায় মাত্রা বসাইয়া তাহাতে প্রাণের স্পন্দন এবং লীলার গতি-ভঙ্গিমা সঞ্চারিত করিয়া দেন। তিনি বাঙ্গালীর ভাষার, বাঙ্গালীর সমাজের এবং বাঙ্গালীর জীবনের মেরুদণ্ড দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। দেশের ভিতর ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিকে পেচলিত করিবার জন্য তিনি যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে দেশ প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল শিক্ষা-ব্যাপার যেমন সুগম তখন তেমন ছিল না। বিদ্যাসাগরকে তজ্জন্য কত চিন্তা, কত অধ্যবসায় করিতে হইয়াছিল! আজকাল যে নানারূপ বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইতেছে,তাহার মূলভিত্তি তাঁহারই স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত। নিজের শক্তিকে কর্ম্মে পরিণত করিবার সময় তাঁহাকে কত যে বিদ্রূপবাক্য, কত যে বাক্য-শেল এবং কত যে প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘরের বন্ধু পর হইয়া যায়, তবুও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব, এমনই তাঁহার মনের জোর। তাঁহার অসামান্য চরিত্র-বল তাঁহার সর্ব্ব শক্তিকে ছাড়াইয়া আমাদের সম্মুখে আদর্শ হইয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত তখন বাঙ্গালা দেশে মন্দীভূত হইলেও আমাদের দেশ তাহার বাহ্য অনুকরণে ক্ষান্ত হয় নাই। বিদ্যাসাগর এ সমস্ত বাধাবিপত্তিকে ছাড়াইয়া পাশ্চাত্য জাতির সত্যটুকু গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের যথার্থ মূর্ত্তিটিকে জাগ্রত দেখিতে পারিয়াছিলেন। হিমাচলের পাদদেশে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত পুণ্য-মৃত্তিকার উপর শ্যামল শস্যের পাটে গেরুয়া-বাস-পরিহিত ভারতবর্ষের যে শুভ্রমূর্ত্তি বিরাজিত, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সমস্ত দুঃখ বিপদের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁহারই দীপ্ত চক্ষু এবং দক্ষিণ করের অভয় লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ও সাধনাক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত জয়-তিলকে শোভিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ডমরু শব্দ বিদ্যাসাগরকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহারই তপস্যা ও বৈরাগ্য বিদ্যাসাগরকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি তাঁহারই নিকট অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবন দুঃখের মন্ত্রে মন্ত্রিত; কারণ দুঃখই যে মানুষের পূজনীয়। দুঃখ দ্বারা, আনন্দের দ্বারা বিদ্যাসাগর জীবনের ভিত্তিভূমিকে কঠিন করিয়া গাঁথিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার অক্ষয় যশঃ-অট্টালিকা অভ্রভেদী। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কাঠিন্য ও কোমলতা দুইই পাশাপাশি বাস করিত।

তাঁহার জীবনে যেমন একটি পবিত্র ঋজু অগ্নি-শিখার অক্ষয়-দীপ্তি বিরাজিত, তেমনই তাহার সঙ্গে একটি মনোহর স্নিগ্ধতা এবং শীতলতাও ছিল। প্রদীপের শিখা যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে দগ্ধ করিয়া আলোক বিকীর্ণ করে, ঈশ্বরচন্দ্রও তদ্রূপ দুঃখের এবং সংগ্রামের দ্বারা নিজেকে, প্রতিদিন দগ্ধ করিয়া আমাদের সমাজে এবং আমাদের দেশে যে একটি পরম জ্যোতিঃ-দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও নিবিবার নয়।

হে মহাপুরুষ! তুমি তোমার ভারতবর্ষকে যে অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, তুমি যে এই হতভাগ্য অশিক্ষিতগণের তৎকালীন দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, নিত্য যে বিরাট্ অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলে, আজও তাহার অবসান হয় নাই। সেই দীপই কত মানুষের প্রাণে কত আগুন জ্বালাইয়া দিল, কত নর-নারীকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, দুঃখের বিজয়যাত্রার পথে আলোক-সম্পাত করিল। তোমার সেই অক্ষুব্ধ, অবাত-দীপের নিকট আমরা সমবেত হইয়াছি। তুমি তোমার প্রসন্ন হাস্য দ্বারা দক্ষিণ করে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। ত্যাগ যে কত মধুর, দুঃখ যে কত আনন্দময়, হে দুঃখজয়ী! চিরানন্দ! তুমি আমাদের দেখাইয়া দাও।

সাহিত্যে জনসাধারণ

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, M. A.]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডস্টোইভেস্কির বাণী

আমরা এক্ষণে দুইজন সাহিত্যিকের জীবনী ও ভাবুকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি; দুইজনেই যৌবনে Slavophileগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—সাহিত্যের ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে দুই জনেরই নাম চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে, বরং কালাতিবাহের সঙ্গে আরও দীপ্তিমান হইতে থাকিবে—Dostoievsky ও Tolstoy। Dostoievskyকে আধুনিক ইউরোপ মহাপুরুষ, মহাত্মা, Saint, Prophet বলিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ তাঁহার সাহিত্যে রুশিয়ার নবযুগের সাধনার পরিচয় পাইয়াছে। Shakespeare বা Goetheর মত তিনি শুধু একজন প্রতিভাবান লেখক নহেন; তাঁহার জীবনই একটা মহাকাব্য। তাঁহার সাহিত্য এইজন্য তাঁহার নিজের ও তাঁহার জাতির সাধনার ফল-স্বরূপ। তিনি ইউরোপকে একটা নূতন আলোক দিয়াছেন; সে আলোকে ইউরোপের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। বহুকাল অন্ধকারে বাস করিবার পর, একটা শুভ্র আলোকরশ্মি হঠাৎ দেখা যাইলে, যেমন তাহা অত্যন্ত তীব্র ও কষ্টকর মনে হয়, ইউরোপের চিন্তা-জগতের পক্ষে Dostoievskyর সাধনাও তাহাই হইয়াছে। এখনও তাহা স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ-পূর্ণ ধ্রুবতারার মত প্রতীয়মান হয় নাই।

Dostoievskyর বাণী এই,—রুশের নবযুগের সাধনা বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করিবে; পাশ্চাত্য জগৎ এখন ভয়ানক পূতি-গন্ধময় কুটব্যাধিগ্রস্ত, রুশিয়ার ধনী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও ঐ ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে; কিন্তু রুশিয়ার জন-সমাজ এখনও শুচি, পবিত্র, সুস্থ রহিয়াছে; রুশিয়ার নবজাগ্রত জন-সমাজ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, লক্ষ লক্ষ একত্র মিলিয়া, এক বিরাট্ খৃষ্টের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্ব-জগতের কুট-ব্যাধি আপনার করুণ-কোমল পবিত্র হস্তের স্পর্শে আরোগ্য করিয়া দিবে।

ইউরোপের চিন্তা-জীবনের নিকট Dostoievskyর সাহিত্য ও সাধনা একবারে নূতন ঠেকিয়াছে।

Shakespeareএর মত বিচিত্র ও সুন্দর চরিত্র-অঙ্কন Dostoievskyর উপন্যাসে আছে,—Dostoievskyকে the Shakespeare of Russia and of Fiction বলা হইতেছে; আবার Goetheর মত কল্পনার মৌলিকতা ও ভাবুকতাও Dostoievskyতে আছে। কিন্তু আরও একটা নূতনত্ব, মৌলিকতা ও নূতন প্রকার ভাবুকতা আছে, যাহা শুধু Shakespeare বা Goethe কেন,—গ্রীক সাহিত্য ও সভ্যতা হইতে যে সাহিত্য তাহার জীবনী-শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে পাওয়া যাইবে না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেমন একবারে একটা সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনাইয়া, একটা সরস নূতন জীবনের গান গাহিয়া, ইউরোপের সাহিত্য-আত্মাকে মুগ্ধ করিয়াছেন, Dostoievskyর সাহিত্য-সাধনাও ঠিক সেরূপভাবেই ইউরোপকে মুগ্ধ করিয়াছে। এক-জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, After Dostoievsky's writings, the literature of the West seems like a draught of distilled and boiled water after the freshness of a bubbling spring.

সাহিত্যের পতিতপাবন ধর্ম্ম

Dostoievskyর নূতন প্রকার ভাবুকতার মূল-প্রস্রবণ কি, তাহা জানিতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার ও সমগ্র রুশ-জাতির সাধনা সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিতে হইবে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই রুশের নবযুগের সাধনার কথা ইঙ্গিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য ইউরোপের ভাবুকতার পরিণতি হইয়াছে,

—Nietzche তে, তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের অবজ্ঞায়, মৈত্রী সেবা ও আত্মত্যাগ-ধর্ম্মের তিরস্কারে, তাঁহার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার আয়োজনে, আত্মশক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতি ও ধর্ম্ম অবলম্বনে। Nietzche পতিতপাবন খৃষ্টকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছেন। Dostoievsky খৃষ্টকে রুশ কৃষকের অন্তঃস্থল হইতে বাহির করিয়া পাশ্চাত্য জগতের হৃদয়সিংহাসনে বসাইতেছেন। ইউরোপকে, খৃষ্টের সেবাব্রতের মহিমা শুনাইতেছেন। পাপী তাপী, রোগী ঘৃণিতের জন্য যে খৃষ্ট তাঁহার জীবন দিয়াছেন, তাঁহার পূজা তিনি সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আধুনিক ইউরোপ সে খৃষ্টকে ভুলিয়া গিয়াছে, সে খৃষ্টকে এখন ইউরোপ চিনে না; তাই Dostoievskyর খৃষ্টকে সে আসল খৃষ্টের বিকৃত মূর্ত্তি মনে করিতেছে। তাই Dostoievskyর খৃষ্টকে পাইতে হইলে আমাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিতে হইবে, অথবা মধ্যযুগে সেই Assisiর মহাপুরুষ Francisএর জীবনী উপলব্ধি করিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু নিন্দ্য, ঘৃণিত, হেয়—তাহাই নিন্দা, ঘৃণা ও হীনতার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যে ও পবিত্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে;—Dostoievskyর প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে এক পতিতা রমণী—Sonia আশ্চর্য্য প্রেম, ধৈর্য্য ও ভগবানের উপর অটল নির্ভরতার সহিত তাহার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতেছে; নায়ক Rasobrikoff ঐ পতিতা রমণীর পায়ে পড়িয়া পূজা করিতেছে; যখন Sonia তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল, সে বলিয়া উঠিল,—"I am not bowing before you, I am prostrating myself before all the suffering humanity"—"আমি তোমাকে পূজা করিতেছি না, আমি মনুষ্যের নিখিল শোকদুঃখ, পাপ ও লজ্জার নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি।" ইহার সঙ্গে বুদ্ধ-অবতারের বারাণসীক্ষেত্রে পতিতা রমণীর গৃহে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ মিলাইলে সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে; আধুনিক ইউরোপের পক্ষে ইহার মর্ম্ম অনুভব করা অসম্ভব!

হীনতার মহিমা

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অপরিসীম দুঃখবেদনার ভিতর দিয়াই বিকাশ লাভ করে; অনুতাপ-যন্ত্রণা-প্রায়শ্চিত্তের হোমানলে দগ্ধ হইয়াই চরিত্র পূত শুদ্ধ পবিত্র হয়; মনুষ্যের পাপই আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সহায়; Dostoievsky তাঁহার উপন্যাস সমূহে ইহাই দেখাইয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে ইহার অনুরূপ ভাব পাই, আমাদের বিল্বমঙ্গলে একটি নিখুঁত সুন্দর উদাহরণ পাই; কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত একটিও মিলে না। পাশ্চাত্য ইউরোপে ব্যক্তি-চরিত্র আর এক ভাবে বিকাশ লাভ করে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন, দুঃখযন্ত্রণা, অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিতে করিতে ইউরোপে ব্যক্তির চারিত্র্য-মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অসম্পূর্ণতাই শেষে ব্যক্তির আপনার উদ্দেশ্য-সাধন,—চরিতার্থতা-লাভের সহায় হয়। প্রতিকূলতার উপর বিজয়লাভ, ইউরোপীয় ব্যক্তি-চরিত্র-বিকাশের পন্থা। Nietzcheর শক্তিপূজাতে ইহার সমাপ্তি দেখা গিয়াছে। Dostoievskyতে চরিত্রবিকাশ বিভিন্ন পন্থায় হইয়াছে। প্রতিকূলতার মধ্যে ব্যক্তি বাহিরে—সমাজে হেয়, ঘৃণিত, পদদলিত হইতেছে; কিন্তু অন্তরে তাহার অপরিসীম ধৈর্য্য, প্রেম ও বিশ্বাস বিকাশ লাভ করিতেছে; বাহিরে লজ্জা ও ঘৃণা, ক্রুশের যন্ত্রণা, ভিতরে ভগবানের অসীম প্রসাদ-লাভ—"Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." শক্তিপূজা নহে, খৃষ্টের প্রেম-ধর্ম্মের চরম বিকাশ—Dostoievskyর সাহিত্যে।

ইহজগতের দুঃখবেদনা যে, অন্তর্জগতের সম্পদ, তাহা Dostoievsky তাঁহার নিজজীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সামান্য অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হত্যাকারীর সম্মুখে তিনি দশ মিনিট কাল অটল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় হুকুম আসিল,—তিনি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। সাইবেরিয়ার কারাবাসে কঠোর পরিশ্রমে যখন তিনি ক্লান্ত অধীর—তখন একজন কৃষক সৈনিক তাঁহার কাণে কাণে বলিল,—"You are sorely tired. Suffer with patience. Christ also suffered."—'তুমি কষ্ট পাইতেছ? ধৈর্য্য অবলম্বন কর। খৃষ্টও দুঃখ পাইয়াছিলেন।' (রুশ কৃষক—শুধু Dostoievskyর কেন, তিনিই দেখাইয়াছেন—সমগ্র রুশ সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক) তিনি কারাবাসের কষ্ট ধৈর্য্যের সহিত

সহ্য করিয়াছিলেন। সশ্রম কারাবাসের দুঃখযন্ত্রণা তাঁহার আত্মাকে পবিত্র করিয়াছিল। সে দুঃখ, সে যন্ত্রণা, তাঁহার The Poor People এবং Memories of the House of the Deadএ বর্ণিত আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখবেদনার ভিতর চরিত্রের বিকাশ সাধন,—চারিত্র্য-মাহাত্ম্যেরও পরিচয় আছে। সাইবেরিয়ার জীবনের সহিত তাঁহার পরিচয় যদি না হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, শুধু বুদ্ধির দ্বারা তিনি পতিতপাবন খৃষ্টের ধর্ম্ম উপলব্ধি ও পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না। রুশ-সমাজ তাঁহার The Poor People, The Idiot, Crime and Punishment, Humility and Offence প্রভৃতি গ্রন্থে, তাহার অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাইল। তিনি যে শুধু রুশ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নহে; রুশ-চরিত্রের মৈত্রী, করুণা, ভ্রাতৃত্ব; রুশের বৈরাগ্য ও সেবাধর্ম্ম, "the religion of human suffering which is indulgent to everything that is unlovely", রুশ চরিত্রের মহিমা যে তাঁহার উপন্যাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে, শুধু তাহা নহে; তিনি রুশ-জাতীয়-জীবনের ভবিষ্যৎও সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন; জাতীয় জীবনের ভবিষ্য বিরাট্ বিকাশের জন্য তিনি রুশজাতিকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন; তিনি রুশসমাজকে বিশ্বমানবের নিকট আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন; রুশকৃষকের ধর্ম্মপ্রাণ মহাজীবনই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে, এই আশার কথা তিনি বিশ্বজগতে প্রচার করিয়াছেন।

তাই রুশ-সমাজ তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছিল, আর কখনও সেরূপ সে কাহাকেও করে নাই। মৃত্যুর পর যখন তাঁহার মৃতদেহ কফিনে সকল লোকের সম্মুখে রাখা হইয়াছে, তখন সমগ্র রুশজাতি এই স্বদেশাত্মার প্রেমমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া, মনে মনে Rasobrikoff এর কথা উচ্চারণ করিয়াছে, "আমি তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বমানবের নিখিল দুঃখ-বেদনা-পাপ-অনুতাপের সম্মুখে প্রণত হইতেছি।"

দুর্ব্বলহৃদয়, Dostoievskyর কথায় চমকাইয়া উঠিবে, পাগল হইবে, অথবা তাঁহাকে পাগল মনে করিবে; কিন্তু সবলহৃদয় তাঁহার কথায় নূতন বল, নূতন আশা, নূতন জীবন পাইবে।

টলষ্টয়ের সাহিত্য-সাধনা

আর একজন সাহিত্যিক ও ভাবুকের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; Leo Tolstoy এখন সাহিত্যজগতের নেপোলিয়ন। Dostoievskyর মত Tolstoy অসংখ্য দরিদ্র কৃষকগণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। Dostoievskyর মত তিনিও রুশিয়ার জনসমাজকে নূতন কর্ত্তব্যপথে আহ্বান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, Tolstoy একজন প্রচারক—যাহা তিনি প্রচার করিলেন, তাহাই তিনি জীবনে দেখাইলেন। যৌবনে যে Tolstoy আমোদপ্রিয়, ব্যসনাসক্ত, বিলাসী ছিলেন, সেই Tolstoy পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বহুবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, যুদ্ধে গিয়াছেন, বিবাহ করিয়া জমিদারী দেখিতেছেন, কৃষকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছেন। War and Peaceএ তিনি রুশিয়ার ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন, রুশ জাতীয়-জীবনের আদর্শ কি তাহা দেখাইয়াছেন, এবং ঐ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য রুশকৃষকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিরও পরিমাণ দেখাইয়াছেন। Anna Kareninaতে তিনি ধনিগণের তথাকথিত "Socinety"র বিবাহবন্ধনের শৈথিল্য ও তাহার পরিণাম দেখাইয়াছেন; অবৈধ প্রেমের ভীষণ-পরিণামের চিত্র আঁকিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের পবিত্রপ্রেমেরও অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। পারিবারিক জীবনের গৃহবন্ধন রুশজাতির আপনার সম্পদ; তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কুফল অবশ্যম্ভাবী; এবং রুশ-কৃষক এই গৃহজীবনের আদর্শকে কিরূপ ভক্তি করে, তাহাও দেখাইয়াছেন। Krentzer Sonataতে গৃহ-জীবনে পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য দেখাইয়াছেন; প্রকৃত প্রেম না থাকিলে পারিবারিক বন্ধনের ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। ইতোমধ্যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার জমিদারীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের নৈতিক উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছেন; লোকে যাহাকে

"philanthropy", দরিদ্রসেবা বলে, তাহা তিনি খুব করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর এরূপে কাটিয়া গেল; কিন্তু এক্ষণে তিনি ভয়ানক অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এমন অশান্তি হইল যে, তিনি আত্মহত্যাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

টলষ্টয় ও দরিদ্র-সমাজ

ইংলণ্ডের দুইজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক সেই অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়া, তিনজনই কাঁদিয়াছিলেন। Carlyle বলিয়াছিলেন, 'তুমি যদি দরিদ্রের দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাক, তুমি পাগল না হইয়া পারিবে না।'—"If you stop to brood upon *la miseri*, that way madness lies." Ruskin বলিয়াছিলেন,"তুমি যদি তোমার ভোজনের সময়ে দরিদ্রের অনাহার সম্বন্ধে একবার ভাব, তাহা হইলে আর তোমার খাওয়া হইবে না।" —"If the curtain were drawn from it before you at your dinner, you eat no more."

জগতের যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা এমনই করিয়া পরের দুঃখ দেখিয়া পাগল হন।

Tolstoy পাগল হইলেন। মস্কোতে যাইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের জন্য Relief Society খুলিলেন, তাহাদিগের দারিদ্র্যের পরিমাণ নিরূপণ করিতে লাগিলেন, ভিক্ষাসংগ্রহ করিয়া ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। যুবক সম্প্রদায়কে দেশের দারিদ্র্যসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অশান্তি যাইল না।

তাঁহার অশান্তি তিনি অতি সুন্দরভাবে What then must we do? নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মত দারিদ্র্যের চিত্র সাহিত্যে আর নাই। দারিদ্র্যের ভীষণ পরিণাম,—পাপ ও নরকবাস, মস্কো নগরীর দরিদ্রজীবন হইতে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণের করুণা, মৈত্রী ও সহানুভূতি এই নরকের অন্ধকারে স্নিগ্ধ জ্যোতির মত দেখাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"Terrible was the sight of these peoples' destitution, dirt, raggedness and terror. And terrible above all was the immense number in this condition. * * Everywhere the same stench, the same stifling atmosphere, the same overcrowding, the same commingling of the sexes, the same spectacle of men and women drunk to stupefaction, and the same fear, submissiveness and culpability on all faces. * * I suffered profoundly."*—

তিনি বুঝিলেন যে, ইহাদিগকে ভিক্ষা দিলে ইহাদের প্রকৃত দারিদ্র্য ঘুচিবে না, ইহাদের জীবনই পাপের জীবন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহারা তাহা বুঝে না—"They do not see the immorality of their lives. They know they are despised and abused, but cannot understand what there is for them to repent of and wherein they ought to amend." অর্থদিয়া তাহাদের জীবন পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব যখন তিনি বুঝিলেন, তখন তিনি নিরাশ হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

সাহিত্যে প্রেমধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্র

তিনি কি করিবেন? ইহাদিগকে শিক্ষা দিবেন? শিক্ষাদানও নিষ্ফল হইবে। জগতে দুঃখদারিদ্র্যের একমাত্র কারণ ধনিগণের বিলাসিতা ও শ্রমজীবিগণের হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম:—"If there is one man idle, there is another man dying of hunger"—তিনি ইহা উপলব্ধি করিলেন। যদি একজন লোক অন্য লোকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে আর একজন লোক অনাহারে মরিবে। এখন তাহাই হইতেছে। তাহার খুব টাকা থাকিতে পারে সত্য; কিন্তু টাকা জিনিষটা কি?

Tolstoy বলিলেন,"Money does not represent usually work done by its owner. It represents power to make other people work. It is the modern form of slavery."—টাকা যে পরিশ্রমের

* 'What then must we do.' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

মূল্য, তাহা খুব কম স্থলেই হয়। সবক্ষেত্রেই অন্যলোককে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ইহা একটি উপায় মাত্র। টাকার জন্যই একজন লোক আর একজন লোকের উপর যাবজ্জীবন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে। আধুনিক সভ্যতায় টাকাই দাসত্বকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। টাকাই তাহা হইলে দুঃখদারিদ্রের—দরিদ্রের নির্যাতনের প্রধান কারণ। সকল লোক যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিত, যদি খৃষ্টের উপদেশ 'In the sweat of thy face shalt thou eat bread' সকলে মানিত, তাহা হইলে দারিদ্র্য থাকিত না। নিজের ভরণপোষণের জন্য নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিলে, বিলাসিতা থাকিবে না, অর্থগৌরব লোপ পাইবে; সহর—যেখানে দেশের সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে—"where the riches of the country are devoured", সেখানে অসংখ্য শ্রমজীবিগণ আসিয়া তখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিবে না, অথবা lodgingsএ কলুষিত জীবন অতিবাহিত করিবে না। সহরসমুদয় লোপ পাইলে, আর্থিক ও নৈতিক দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ লোপ পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। Tolstoy ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের তথাকথিত শ্রমবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন, বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন লোক করিলে কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সত্য; কিন্তু কর্ম্ম অপেক্ষা মনুষ্যের জীবন কখনও হেয় নহে। আধুনিক সভ্যতার শ্রমবিভাগ মনুষ্যকে ঘৃণিত করিতেছে, তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ পরিশ্রমদ্বারা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিলে ও অভাব সমুদয়ের সংখ্যা হ্রাস করিলে, সমাজে দারিদ্র্য লোপ পাইবে।

Tolstoy বুঝিলেন, কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন। কৃষক ধনসম্পত্তির মর্ম্ম এখনও জানে না, রাষ্ট্রের প্রভাবের সে বাহিরে রহিয়াছে; কৃষক আপনার পরিশ্রমের ফলে তাহার অন্ন অভাব মোচন করে। তিনি নিজে কৃষকের জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, নিজে জমিতে লাঙ্গল দিতেন, নিজে জুতা তৈয়ারী করিয়া পরিতেন। Tolstoy কৃষক হইলেন।

তাঁহার সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন আসিল। এখন ধনী সম্প্রদায়ের গুণাবলী তাঁহার উপন্যাসে গল্পে নাটকে আর বিবৃত হয় না; সমাজে যে যত হীন সে তাহার চরিত্রে তত উজ্জ্বল, ইহা দেখান হয়। তাঁহার The Power of Darkness নাটকে মেথর Akeinএর চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মহৎ। কৃষকদিগের দুঃখ তিনি বিবৃত করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দারিদ্র্যমাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিলেন।

তিনি নিজে কৃষকের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ভাষারও পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তাহাকে কৃষক অথবা শ্রমজীবিগণের নিকট একত্র শিক্ষালাভ করিতে উপদেশ দিলেন।

"When his eldest son had taken his degree at the University, and asked his father's advice about a future career, the latter advised him to go as workman to a peasant." তাঁহার কৃষকের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ভগ্নীপতি Behrs আরও বলিয়াছেন, "Leo is now at times fond of employing peasant manner of Speech, as an indication of the simplictiy he recommends."

Tolstoy তাঁহার গল্পরচনাপ্রণালীসম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন, তিনি কৃষকগণের নিকট গল্প শুনিতেন, তাহারা কিরূপ ভাব ও ভাষায় গল্প বলিতে থাকে, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিতেন, এই উপায়ে তিনি কৃষকগণের উপযোগী করিয়া গল্প লিখিতে শিখিতেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ Ivan the fool গল্প এরূপভাবে একজন কৃষক তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। "I always do that", তিনি বলিয়াছেন "I learn how to write from them, and I test my work on them. That's the only way to produce stories for the people. My story, 'God sees the Truth' was also made that way." * * ইহা ছাড়া তিনি কৃষকরমণীগণের নিকটও গল্প বলিতে শিক্ষালাভ করিতেন। "Besides the help he got from peasants, Tolstoy also received literary assistance from peasant women." কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও উপন্যাসের এরূপে তিনি নূতন আকার দিতেন, সমাজে পুনর্জ্জীবিত করিয়া প্রচার করিতেন। লোক

সাহিত্যের প্রতিভাবান্, ও অকৃত্রিম সেবক তাঁহার মত কেহই নাই,—কেহই ছিল না।

Tolstoy কৃষিকার্য্য উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিলেন; কৃষকগণকে তাহাদের কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; কৃষকগণের দারিদ্র্য—তাহাদের দৈনন্দিন অভাব-মোচনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। প্রত্যহ অনেক কৃষক তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহার সহিত তাহাদের নানা বিষয়—বৈষয়িক, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধে—কথাবার্ত্তা হইত, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার বুদ্ধি, জ্ঞান ও সাধনার উপযোগী উপদেশ দিতেন।

কৃষক-জীবনের আদর্শ-প্রচার

রুশকে Tolstoy উপদেশ দিলেন—"Back to the people": "Go, and live as peasants with the peasants".—কৃষক হইয়া কৃষকের সঙ্গে বাস কর; নিজে দরিদ্র হইয়া পরের দারিদ্র্য মোচন কর; ব্যক্তিগত কর্ম্ম—ব্যক্তির চারিত্রমাহাত্ম্যের দ্বারা দারিদ্র্য-নিবারণ, দশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে; ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ভিন্ন সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ব্যক্তির উন্নতি-সাধন রাষ্ট্রের হাতে নহে, ব্যক্তির নিজেরই হাতে। রাষ্ট্রের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া ব্যক্তি আপনার ও দশের কল্যাণ সাধন করিবে—ইহাই তাঁহার 'non-resistance' তত্ত্ব। ব্যক্তি যে এরূপে প্রেমের ধর্ম্মে আপনাকে একবারে বিসর্জ্জন দিবে, 'Love thy enemies' উপদেশ আপনার জীবনে উপলব্ধি করিবে, তাহার একমাত্র সহায় খৃষ্টের নিঃস্বার্থ জীবন ও তাঁহার সেবা-ব্রতের মহিমা। "Back to Christ. Back to the simple, frugal life of the simple county peasant."—খৃষ্টের মত নিঃস্বার্থ হইতে হইবে; প্রেমিক হইতে হইবে; কৃষকের ন্যায় সরল, স্বল্পসন্তুষ্ট হইতে হইবে;—ইহাই Tolstoyর উপদেশ, নিজের জীবনে তিনি ইহাই দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার জমিদারী পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বত্বাধিকারীদিগকে দান করিয়াছিলেন; তাঁহার গ্রন্থাবলীর স্বত্বও তিনি জনসাধারণকে দান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকে সকলেরই স্বত্ব ছিল, শুধু তাঁহার নিজের স্বত্ব ছিল না। ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি দরিদ্র কৃষকের ন্যায় দরিদ্র কৃষকের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াছিলেন,—কৃষকদিগকে তাঁহার অযাচিত প্রেম ও ভালবাসা দিয়াছিলেন এবং কৃষকদিগের অভাবঅভিযোগ লইয়া তিনি ধনী, শিক্ষিত, রাজপুরুষ—এমন কি রুশিয়ার Tsarকেও লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রকৃত আর্ট সার্ব্বজনীন

আমরা Tolstoyর 'What is art?' গ্রন্থের আলোচনা করিয়া Tolstoy সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস—ইহা সমুজ্জ্বল থাকিবে। Art কাহাকে বলে? আমাদের মনের ভাব ও চিন্তা, যাহা আমরা নিজে অনুভব বা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাকে অন্যলোকের জন্য প্রকাশ করা, অন্যের জন্য সেই ভাব ও চিন্তার পুনরাবৃত্তি করার নাম Art.—সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে উহা সার্ব্বজনীন কি না, সকলের হৃদয়কে উহা স্পর্শ করিয়াছে কি না। Artএর দ্বারা একজনের মনের ভাব বা হৃদয়ের অনুভূতি অপরের মন বা হৃদয় অধিকার করে। "Let me make a nation's songs, and who will make its laws", 'আমাকে জাতির গানগুলি রচনা করিতে দাও; দেখিব কাহারা দেশের আইন-কানুন রচনা করে'। তাই Art জাতীয়জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় জিনিষ। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলে, Artভিন্ন অন্যকিছু মনুষ্যের উপর সেরূপ প্রভুত্ব করিতে পারে না। জাতীয় উন্নতি Artই নিয়ন্ত্রিত করে। Art, সাহিত্য হউক, সঙ্গীত বা চিত্রকলা হউক, যদি সহজ ও সবল হয়, তাহা হইলে তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে পারে। Artই ব্যক্তি বা জাতির উন্নতির পক্ষে প্রধান সহায়।

Tolstoy বলিয়াছেন, সাহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করে সেগুলি সার্ব্বজনীন। ব্যক্তির সহিত ভগবানের ও ব্যক্তির আধুনিক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যনির্ণয় Artএই প্রকাশিত হয়, Art সকলব্যক্তিরই সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলিয়া ইহা সার্ব্বজনীন। 'True art must be comprehensible.' Art যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করে; তাই যে Art সমাজকে আধুনিক কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করে না,

সে Artএর কোন মূল্য নাই। Artএর কর্ত্তব্য মনুষ্য-সমাজে যুগধর্ম্মের উপযোগী বিকাশের পথ-নির্দ্দেশ করা। Tolstoy লিখিয়াছেন, "The art which conveys sensations which result from the consciousness of a former time, which is obsolete and outlived, has always been condemned & despised." যুগধর্ম্মের যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয়, Artও সেইরূপ যুগোপযোগী নূতন নূতন বাণী প্রচার করে। কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে সেই যুগের নূতন বাণী সমানভাবে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রকাশ করে,—প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও আদর্শ তাহা সমানভাবে নির্ণয় করিয়া দেয়; সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবোধ,—যাহাকে Tolstoy বলিয়াছেন 'religious perception'—তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া Art কোন বিশিষ্ট দলের জন্য নহে, Art সকলেরই। "If art is a conveyance of sentiments which result from the religious consciousness of men, how can a sentiment be incomprehensible if it is based on religion, that is, on the relation of man to God. Such art must have been, and in reality has been, at all times comprehensible, because the relation of every man to God is one and the same."

তাই যেসকল সাহিত্যিক একটা দল গড়িয়াছেন, যাহারা সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন করিয়া কিছু লিখিতেছেন না, অস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া আপনাদের পাণ্ডিত্য সমাজকে দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে Tolstoy খুব তিরস্কার করিয়াছেন। সাহিত্য জাতীয় হওয়া চাই, সার্ব্বজনীন হওয়া চাই। Tolstoy দুঃখ করিয়াছেন, আজকাল সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইতেছে না, সাহিত্য একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে—সাহিত্যিক সমাজ, জাতি, ও জগতের জন্য কিছু লিখিতেছেন না, একটা দলের জন্য লিখিতেছেন,—'The artist composed for a small circle of men, who were under exclusive conditions,' সুতরাং সাহিত্যের যে প্রধান কর্ত্তব্য—যুগধর্ম্মকে ব্যক্ত করিয়া সমাজ ও মনুষ্য জাতির উন্নতি-বিধান করা, তাহা হইতে সাহিত্য স্খলিত হইতেছে।

রুশচিন্তা ও সাহিত্যের ধারা

আমরা রুশ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলাম; রুশ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর বিশেষ লক্ষিত হয়।

(ক) ফরাসী-বিপ্লব সাহিত্য-জগতে যে নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে এক তীব্র অশান্তি ও ব্যাকুলতা, আত্মকেন্দ্রতা ও আত্মসর্ব্বস্বতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কবিগণ পুরাতন রচনাপ্রণালী ত্যাগ করিয়া, একটা সহজ ও সরল রচনা প্রণালী তৈয়ারি করিলেন; বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা এক অপরূপ ভাবরাজ্য গঠন করিলেন;—সে রাজ্য সংসার হইতে অনেক দূরে, সে রাজ্যে অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনন্ত ভোগ; আর তাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতিকে মনুষ্যের বর্ত্তমানের বন্ধন ও শৃঙ্খলের মধ্যে Prometheusএর মত অনন্ত বেদনা ও Wertherএর মত অনন্ত নিরাশা, মনুষ্যের অনন্ত দুঃখের ভাগী করিলেন। Inkovesky, Pushkin, Lermentofএর সাহিত্য এই যুগের। বাস্তব জীবনের সহিত এ সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

(খ) স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। একটা অলীক ভাবরাজ্য কল্পনা করিয়া, অন্য জগতের মানুষের সৃষ্টি করিয়া, সাহিত্য তাহার আপনার কৃত্রিমতা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল; ভাবুকতা পাগলামিতে ও স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত হইল। এই সময়ে হেগেলের দর্শনবাদ রুশিয়ায় যুবকগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। যুবকগণ Schellingএর কল্পনা রাজ্য ছাড়িয়া হেগেলের বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতায় মাতিয়া উঠিল। সমালোচক Blienski প্রচার করিলেন, সাহিত্য একটা মিথ্যা ও কৃত্রিম ভাবুকতার ভাবে পঙ্গু হইয়াছে; সাহিত্য এখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হউক; সাহিত্যে জনসাধারণের সুখদুঃখ ব্যক্ত হইলে, নূতন বল ও নূতন প্রাণ পাইবে। Herzen বলিলেন, সাহিত্য, সমাজে নূতন আদর্শ প্রচার করুক—সমাজসংস্কার না হইলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। Blienski যে আদর্শ প্রচার করিলেন, সেই আদর্শ Gogol অবলম্বন করিলেন।

(গ) আমরা তৃতীয় স্তরে পৌছিলাম। Gogol

সাহিত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার সাহিত্যে প্রথম শুনা গিয়াছিল। সেই সময়ে আর একটি আন্দোলন সাহিত্যের এই পরিবর্ত্তনের সহায় হইয়াছিল। Slavophileগণ হেগেলের ইতিহাস-দর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া রুশিয়ায় জাতীয়তা প্রচার করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, প্রকৃত রুশ-মনুষ্যত্ব বিলাসী ও অনুকরণপ্রিয় ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যাইবে না, রুশ-জাতির প্রাণ কৃষকসমাজেই পাওয়া যাইবে। Slavophileগণ রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কৃষকগণের চরিত্র-মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শিক্ষিত রুশকে আশার কথা শুনাইলেন, দরিদ্র রুশকৃষকের ধর্ম্ম-প্রাণ জীবনই ইউরোপীয় সভ্যতায় যুগান্তর আনিবে—বিশ্বসভ্যতায় রুশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইবে। Blienskyকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাহিত্যক্ষেত্রে আন্দোলন ও Slavophileগণের জাতীয়তার আন্দোলন মিলিয়া রুশসমাজে যুগান্তর আনিয়াছিল।

Gogolএর অনুবর্ত্তী Turgenieffএর সাহিত্যে আমরা Realismএর উৎকট বিধান দেখিতে পাই, ভাবুকতার চরমও দেখিতে পাই। Uncle Tom's Cabin যেমন নিগ্রো দাসবর্গের স্বাধীনতাদানের সহায় হইয়াছিল, সেরূপ Turgenieffএর Sportsmans' Sketches রুশিয়ার Serfগণের দাসত্বমোচনের সহায় হইয়াছিল। রুশ Realismএর প্রভাবের আমরা পরিচয় পাইলাম।

তাহার পর, রুশ কৃষকের বাণী-প্রচারক Dostoievsky, ও Tolstoy দুইজনেই খাঁটী রুশ, দুইজনেরই সাহিত্যে রুশ-সমাজের যুগযুগান্তর সাধনা ব্যক্ত হইয়াছে। Dostoievsky বা Tolstoyতে যাহা নাই, রুশ তাহা জানে না। রুশ যাহা চাহে, তাহা Dostoievsky ও Tolstoyতে পাইবে। রুশজাতির হৃদয়মধ্যে Dostoievsky ও Tolstoy নবযুগের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন,—সমাজতত্ত্ববাদিগণের কবি Nekrassof তাঁহার ব্যঙ্গ ও তীব্র কবিতায় তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রচার করিয়াছেন, আধুনিক লেখকগণই তাঁহাদের বাণীর মর্ম্ম রুশিয়াকে বুঝাইতেছেন। রুশ-জাতির নবযুগের সাধনা, সবই প্রকাশিত হইয়াছে Dostoievsky ও Tolstoyতে। তাই রুশ সাহিত্য আর উন্নতি লাভ করে নাই। Tolstoy তাঁহার আর্ট-বিষয়ক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, আর্ট যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করে, সমাজের যুগোপযোগী নূতন কর্ত্তব্য ও সাধনা ইঙ্গিত করে। Dostoievsky ও Tolstoy দুইজনেই সেই যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন, রুশজাতিকে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন। আর্ট যুগোপযোগী আপনার বাণী প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে; তাই আর্টের এখন উন্নতি হইতেছে না; আর্ট যে সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে, এখন সমগ্র সমাজে তাহারই ধীর ও অক্লান্ত আয়োজন চলিতেছে। নবযুগ আসিলে আবার নূতন আর্ট আসিবে। নবযুগ এখনও আসে নাই।

আমাদের শিক্ষা

আমরা বলিয়াছি, আমাদের দেশে রুশিয়ার Slavophileগণের মত একদল চিন্তাবীর দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্যে এক নূতন ভাবুকতা আনিতে চাহিতেছেন,—যাঁহারা সাহিত্যে দেশ, জাতি ও সমাজের বাণী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—যাঁহারা বলিয়াছেন, আমাদের দেশ ও সমাজ বিশ্বসভ্যতাকে তাহার আপনার দান দিবার জন্য প্রস্তুত হউক্,—যাঁহারা বুঝাইয়াছেন, আমাদের দেশ ও সমাজের অন্তঃস্থল—যেখানেই জাতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইবে, অন্য কোন স্থানে নহে—কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট ধনী বা মধ্যবিত্ত সমাজ নহে,—দেশের জনসাধারণ, আমাদের কৃষকসমাজ; যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, আমাদের জনসাধারণের সুপ্ত মনুষ্যত্ব আবার না জাগিয়া উঠিলে, আমাদের দেশ তাহার অভিনব বাণী জগতে প্রচার করিতে সক্ষম হইবে না; রুশিয়ার Slavophileগণের যে ভাবুকতা ছিল, আমাদের চিন্তাবীর-গণের মধ্যে ঠিক সেরূপ ভাবুকতা লক্ষিত হয়।

কিন্তু Slavophileগণের আন্দোলন রুশসমাজকে যেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, আমাদের লেখক-গণের চিন্তা সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই,—Slavophileগণের আন্দোলনের পর রুশ-সাহিত্যের গতি একবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল; আমাদের সাহিত্যে সে বিপ্লব

আসে নাই। আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, আমরা এখন একটা *নূতন ভাব ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত*; কিন্তু আমরা সে ভাব ও আদর্শকে কাজে লাগাইতে পারিতেছি না; আমাদের হৃদয়ের সেরূপ বল, মনের সেরূপ তেজ, চিন্তার সেরূপ গভীরতা নাই; আমরা সাহিত্যে একটা কল্পনার জগতের সৃষ্টি করিয়া, সেই সমস্ত ভাব ও আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি; সে সব ভাব ও আদর্শ আমরা সমাজে এখনও আনিতে পারি নাই। রুশিয়ার Blienskyর সমালোচনার পর Gogol, Turgenieff, Dostoievsky ও Tolstoyর সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া রুশিয়ার নবযুগের ভাব ও আদর্শ যেরূপ সমাজের অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল, আমাদের আধুনিক সাহিত্যিক তাহা ধারণাই করিতে পারিবেন না। আধুনিক রুশসাহিত্যে যুগধর্ম্মের যেরূপ ইঙ্গিত আছে, এবং সে যুগধর্ম্ম সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেরূপভাবে সমাজকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। Tolstoy ও Dostoievskyর সাহিত্যে যে, ভাবুকতা নাই, তাহা নহে; তাঁহাদের উপন্যাসে চরম ভাবুকতা আছে; কিন্তু সে ভাবুকতা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবুকতার মত কৃত্রিম নহে; তাহা দৌর্ব্বল্য নহে, শক্তির পরিচায়ক; তাহা বস্তু-তন্ত্রহীন নহে, তাহা বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বর্ত্তমানসাহিত্যে যখন ভাবুকতার পরিচয় পাই, তখন তাহাকে একবারে বস্তুতন্ত্রহীন দেখি, তাহার সহিত বাস্তব-জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; যখন বস্তুতন্ত্র দেখি, তখন তাহার সহিত ভাবুকতার কোন সম্বন্ধের পরিচয় পাই না, তাহা একবারে প্রাণহীন—শক্তি-হীন, এমন কি নিম্নগামী। এখন বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে চরম-ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সম্মিলন প্রয়োজন হইয়াছে; এ সম্মিলন না হইলে, আমাদের সাহিত্য কখনই সমাজকে গঠন করিতে পারিবে না; আমাদের ভাবুকগণের চিন্তা কখনই জনসমাজকে স্পর্শ করিবে না। বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যে আমরা এ সম্মিলনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাইয়াছি; আমার আধুনিক রুশ-চিন্তা ও সাহিত্যের আলোচনার কারণ, সাহিত্যে ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের সম্মিলন হইলে তাহা কি অসীম শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করে, তাহার পরিচয় দেওয়া।

আমার বিশ্বাস, অচিরেই আমাদের সাহিত্য, ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের এক সুন্দর সম্মিলনের পরিচয় দিবে; ইহারই মধ্যে কয়েক জন নবীন লেখকের চেষ্টায় এই সম্মিলনের সূচনাও দেখা দিয়াছে। বঙ্কিম, ভূদেব, দীনবন্ধু, গিরীশ, ক্ষীরোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও হেম, নবীন, অক্ষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এক সঙ্গে মিশিলে, শুধু আমাদের সমাজে কেন, বিশ্বসভ্যতায় এক যুগান্তর আসিবে। রবীন্দ্রনাথে আমাদের সাহিত্যের ভাবুকতার দিক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে; একা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে এক যুগান্তর আনিতেছেন; ভাবুকতা ও বস্তু-তন্ত্র আমাদের সাহিত্যে মিশিলে যে যুগান্তর আসিবে, তাহার পরিমাণ বুঝা অল্পদৃষ্টি আমাদের পক্ষে এক্ষণে অসম্ভব।

মালা

[শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যারত্ন]

শৈশবের সাধ গিয়াছিল ম'রে
আপনারই সমাধির পরে
ফুল হয়ে ফুটেছে আবার।
মরণের হাত হ'তে যেন
আশাপূর্ণ শুভ্র হাসিগুলি
ছিনায়ে তুলেছে আপনার।

সেই শুভ্র হাসিগুলি সখা
এ মালার কুসুমের পাঁতি।
মরণের নির্ম্মাল্য লইয়া
জীবনের সায়াহ্ন-আরতি।

পুনর্ম্মিলন

[শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবেলা আপীস হইতে ফিরিয়া নিতাই যে দিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিত, যে ভাই-পো রাখাল বেশ নির্ব্বিঘ্নে পিসীমার সহিত দিন কাটাইয়াছে, সেদিন নিতাইএর মনে আর কোন উদ্বেগ থাকিত না, সে অমনি তাড়াতাড়ি হুঁকাটা ধরিয়া খানিকক্ষণ মনের সুখে তামাকু সেবন করিতে করিতে দিনের কাজকর্ম্মের একটা হিসাবনিকাশ করিয়া ফেলিত ;—সঙ্গে সঙ্গে মনে করিত যে, তামাকুর ধূমের মতই জীবনটাকে অত শীঘ্র উড়াইয়া দিবে।

নিতাই দিনের বেলায় আপীসে চলিয়া গেলে রাখালের যত অত্যাচার জুলুম আরম্ভ হইত, ভালমানুষ পিসীমাটির উপর। অম্লান বদনে তিনি সব সহ্য করিয়া যাইতেন, ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন ভাইকে ইহার বিন্দুবিসর্গ বলেন নাই। তাঁর মনের একমাত্র ধারণা যে, বড় হ'লে সব সেরে যাবে। দুই এক দিন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া নিতাইকে সব বলিয়া দিতেন, নিতাই সে দিন কড়া মেজাজ হইয়া রাখালকে পড়াইতে বসিত। নিতাই যে ভাইপোকে শাসন করিত না, এমন নয়, কিন্তু অতিরিক্ত শাসন করিতে গেলেই রাখালও কাঁদিয়া ফেলিত, আর তারও যে বুকের কোণটায় বাজিত, তা কেবল শুধু সেই জানিত।

রাখালের খুব ছোট বেলায় মা মারা যায়। বাপ ছিল, সেও আজ দুইবছর হইল, মারা গিয়াছে। মরণ-কালে পুত্রটীকে তিনি ভ্রাতার হাতে হাতে দিয়া বলিয়া যান, "ভাই আমিও চল্লাম, রাখাল রইল, তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি আর দিদি এই-দুজন ছাড়া ওর আর ত্রিসংসারে কেউ রইল না। আজ যদি সে,—"নিতাই রাখালকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া চোখের জলের ভিতর হইতে উত্তর করিল, "দাদা আমাদের ছেড়ে চল্‌লে! তোমার অভাবে রাখালও বাঁচ্‌বে না।"

স্ত্রী মারা যাওয়ার পরই বড় ভাই বলাই, নিতাইএর বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু নিতাই গোঁ-ধরিয়া বসে,—সে তখন বলিয়াছিল, দরকার কি দাদা ? আমার রাখাল বেঁচে থাক্‌লেই বংশে বাতি জ্বল্‌বে। দিদি আছেন বিধবা, তাঁকে নিয়ে আসা যাক্‌। ভ্রাতার কথায় বলাই আর বেশী আপত্তি না তুলিয়া দিদিকেই সংসারে লইয়া আসিলেন।

দাদা থাকিতেই নিতাই কোনও সওদাগরী আপীসে চাকুরী লইয়াছিল। সুতরাং এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর অন্ন-বস্ত্রের কোনই কষ্ট ছিল না। পিতৃ মাতৃহীন রাখাল, পিসীমা ও কাকার আদরযত্নে মানুষ হইতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট কে খণ্ডন করিবে! কিছু দিন পরে একদিন রাখালের পিসীমা মারা গেলেন। পাড়ার বন্ধুবান্ধবেরা নিতাইকে বলিতে লাগিল, এবার আর একটা বে থা না করে, থাক্‌তে পার না। নিজে আপীসই কর্‌বে, না ভাইপোটীকেই দেখবে, না রান্না-বাড়াই কর্‌বে ?—নিতাই উঁচু গলায় বলিল, "হাঁ, রান্না-বাড়ার জন্যে বে কর্‌তে হবে! কেন, একজন রাঁধুনী রাখ্‌লে চলে না।"

কিন্তু সেই দিন বিকালে সে একটু দেরী করিয়া আপীস হইতে ফিরিল। রাখাল মনে করিল, কাকা বুঝি রাঁধুনী খুঁজতে গেছ্‌লো, তাই আস্‌তে রাত হ'য়ে গেছে, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পরদিন সকাল বেলা যখন একটী নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, তখন আর রাখালের আনন্দ ধরে না। সে আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিল, "হেঁ বামুন ঠাক্‌রুণ, আজ থেকে তুমি আমাদের বাড়ীতে রাঁধ্‌বে।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আমি রাঁধুনী নই।"

"তবে তুমি কে ?"

"আমি ঘট্‌কী।"

মুহূর্ত্তে রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ঘট্‌কীর আগমনে যে কিছু একটা নূতনত্বের আশু সম্ভাবনা আছে, এধারণাটী তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। কি যে একটা হইবে না হইবে, তাহা সে ঠিক বুদ্ধির দ্বারা ঠাহর করিতে পারিল না, কিন্তু কিছু একটা যে ঘটিবে, সে বিষয়ে তাহার

অণুমাত্রও সংশয় রহিল না। কতরকম করিয়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া দেখিল, কিছুতেই একটা কিছুর মীমাংসা করিতে পারিল না। তার ত এই সবে ১৬ বছর বয়স, এসময়ে তার জন্যেই বা ঘট্‌কীর কি প্রয়োজন! তবে বোধ হয়, তাহার কাকার জন্যে। হাঁ, সেইটাই ঠিক। এবার মনকে যতরকম করিয়াই প্রশ্ন করুক্ না কেন, ওই একই উত্তর—"হাঁ কাকার জন্য।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই এক দিনের মধ্যেই পাড়াময় রাষ্ট্র হইল যে, নিতাই বাঁড়ুয্যে ওপাড়ার ফকির চাটুয্যের কুলরক্ষার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। নিতাই বন্দ্যঘটী বংশ রুদ্রোম চক্রবর্ত্তী সন্তান, তাহার মতন একটী স্বভাব-কুলীন সচরাচর মেলে না। ফকিরচাটুয্যেও ৫৬ পুরুষ নিরয়গামী হইতে বসিয়াছিল, এমন সময় সুযোগটি ঘটিল ভাল। পূর্ব্বপুরুষকে অনন্ত নরকের মুখ হইতে টানিয়া তুলিবার উপযুক্ত একটী লোক মিলিল। বন্ধুবান্ধবেরা হাসিয়া নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভায়া! রাঁধুনী নাকি রাখবে? তার কি হল? তখন না আমরা বলেছিলাম, কথাটা তখন তত গা করনি, এখন কি হচ্ছে বলত দেখি?"

নিতাই নিতান্ত অপ্রতিভের মত থাকিয়া বলিল, "কি করব ভায়া! আমার মত একটা কুলীন বেচারী কোথাও পেলে না। হাত জড়িয়ে ধরে বল্‌লে বাপু! আমার কুল রক্ষা কর্‌তেই হবে, এতকাল উঁচু ঘরে কাজ করে এখন কি ৫৬ পুরুষকে নরকে দোবো? এখন বল ত আমার দোষ কি?"

বন্ধুদের মধ্য হইতে বিপিন বলিল "সাধু! সাধু! পরোপকারায় সতাংহি জীবনম্।"

কয়েক দিনের মধ্যেই যখন নোলক-পরা একটী কিশোরী বধূ নিতাইএর শূন্যঘর পূর্ণ করিতে আসিল, তখন রাখাল ঘট্‌কীর শুভাগমনের শুভফল প্রত্যক্ষ করিল। যাক্, বেচারী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নতুন কাকী-মাকে রাখাল বেশ প্রীতির চক্ষেই দেখিল, কাকীমার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়। পড়িবার জন্য বাঙ্গালা বই আনিয়া দেয়। ইস্কুল হইতে আসিয়া লয়। দেখিয়া [illegible] হইতে লাগিল।

নিতাই আপিস করে, রাখাল ইস্কুলে যায়, নূতন বধূ ঘরসংসার করে, এইরূপ করিয়া ৩৪ বৎসর কাটিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাইএর স্ত্রীর নাম রমা। বহুদিন পরে একবার পিত্রালয়ে গিয়াছিল, প্রসবের জন্য। তিন মাসের একটি শিশু পুত্র ও রুগ্ন শরীর লইয়া রমা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আর সে রমা নাই। বাহিরের মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরকার মানুষটিও বদলাইয়াছে।

ইহা সকলের চেয়ে রাখালের চোখেই পড়িল বেশী। তাহার আগেকার সেই খুড়ী-মাটি আর নাই, তাহার স্থান যেন কতকালের অপরিচিত কোথাকার এক রুক্ষ-মেজাজী নারী আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার সঙ্গে যেন এতটুকু সম্বন্ধও নাই।

বাস্তবিকই রমা অনেক বদলাইয়াছে। তাহার মুখে আর আগের মতন যখন তখন হাসি নাই। সংসারের কাজ কর্ম্মেও আর তেমন তার মন বসে না।

দেখিয়া শুনিয়া নিতাই একদিন বলিল—"তোমার কি হয়েছে বল ত? আগের চেয়ে ঢের রোগা হয়ে ত গেছই, কিন্তু প্রায়ই খাও না, রাতে উপোস করে থাক, এর মানে কি বলত?"

রমা মুখ নীচু করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। নিতাই বুঝিল, ব্যাপার তত ভাল নয়, আর কোন কথা না বলাই ভাল। সে নীরবে সেথান হইতে চলিয়া গেল।

যাইবার সময় শুনিতে পাইল, রমা বলিতেছে, "বাপের বাড়ী থেকে এসে মর্‌তে বসেচি দেখ্‌চি। অনাহারে অচিকিৎসায় আর কতদিন এ সংসার চালাবো?" কথাটা নিতাইএর কাণে বাজিল, বুঝি বা বুকেও বাজিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ—এই কয়দিন ধরেত আমাকে কোন কথা বলনি; তা' না পার, কাজ কর্ম্ম নাই বা কর্‌লে। এক বেলা দুটো রাঁধ, তাই নয় ওবেলাও আমরা খাব; তোমার জন্যে আমি দুধ আর রুটী এনে দেবো।"

বলিল। রমারও মনটা অনেক নরম হইল। সে বলিল,—"বিকেলে জল খাবার না হ'লে যে চল্‌বে না।"

নিতাই রুক্ষ স্বরে বলিল "যার না চলে, সে নিজে করে খাক্‌, আমার চল্‌বে।"

সেদিন বিকালে রাখাল আর বাড়ী আসিয়া জল খাবারের থালা হাতে খুড়ীমাকে দেখিতে পাইল না। রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, কেউ নাই, আস্তে ব্যস্তে উপরের ঘরে গিয়া দেখে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া খুড়ীমা শুইয়া আছেন।

"কাকীমা, ও কাকীমা! তোমার অসুখ করেচে?"—বলিয়া রাখাল খুড়ীমার মাথায় হাত দিয়া দেখিল, মাথা ত গরম নয়, বরং কাপড়ের কৃত্রিম উত্তাপে বিন্ বিন্ করিয়া কপাল দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। কারণ কিছু বুঝিল না; কেন যে খুড়ী-মা এমন করিয়া শুইয়া আছেন, তাহা ত তাহার বুদ্ধির অগম্য। কোলের কাছে খোকা ঘুমাইয়া আছে।

রমা মুখ নীচু করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করার পরও যখন সে বুঝিল, যে খুড়ী-মার কথা বলার আদৌ মতলব নাই, তখন সে নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইল। খোলা ছাদের উপর আসিয়া পায়চারি করিতে করিতে খুড়ী-মার রোগের কারণ নির্ণয় করিতে লাগিল। শীতকালের সূর্য্য তখন প্রায় অস্ত যায় যায়। একটু একটু করিয়া অন্ধকার রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহার হিমসিক্ত অঞ্চলখানা বাতাসের ঝাপটে আসিয়া রাখালের গায়ে লাগিতেছিল। তবুও তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে জাগিতেছিল, কেবল ঐ একই কথা—শরীর ঠাণ্ডা, অথচ জ্বর হয়েচে ব'লে শুয়ে থাকা,—এত বড় রহস্যের কথা! এর মূলে কাকা ত নাই! যে এফ্‌এ পরীক্ষায় পাস হইয়া জলপানি পাইয়াছে, তার ত বাড়ীতে বেশী জলপানি পাবার কথা! তার জায়গায় যে এমন উল্টা ব্যবস্থা হতে পারে, এ'ত তার কোনদিন কল্পনায় আসে নাই।

কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় নিতাই দপ্ দপ্ করিয়া উপরে আসিয়া বলিল "তোমার আক্কেলটা কি বল ত বাপু! একজন জ্বর হ'য়ে পড়ে আছে, আর তুমি এখানে দিব্বি পায়চারি কর্‌চ!" নিতাই কোন দিন রাখালকে তুই ছাড়া তুমি বলিত না। আজ হঠাৎ এইরূপ নূতন সম্বোধন শুনিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া গেল। সে অপরাধীর মত বলিল "আমি ত কাকী-মার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লুম জ্বর নাই।"

নিতাই বলিল "হেঁ তুমি দেখেচ, না ছাই করেচ! ঘরে আলোটী পর্য্যন্ত জ্বালোনি! নব্যযুগের সভ্য ভব্য বাবু কিনা তোমরা!" শেষের শ্লেষোক্তিটি রাখালের বুকে গিয়া তীরের মতন বিঁধিল। সে মাথা হেঁট করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া রান্নাঘরে উনান জ্বালিতে লাগিল।

ইহার পরেও রাখাল নিজহাতে রান্না করিয়া খুড়াকে খাওয়াইয়া, পরে নিজে খাইয়া, কলেজে গিয়াছে; আর শুষ্কমুখে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রান্না করিয়াছে, নয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে খুড়ীমার রান্না খাই-

নিতাই বলিল—'মাইনে ঠিক করেচ ?

য়াছে ; কিন্তু সে ত খাওয়া নয় সে যেন বিষ গলাধঃকরণ করা।

একদিন খুড়ী-মা স্পষ্ট বলিলেন, আমি রাঁধ্‌তে পারব না। আমার শরীর দিন দিন যেরূপ খারাপ হচ্ছে, এতে দেখ্‌চি যে মা-বাপের কাছে না গেলে আর বাচব না। কথাটা শুনাইয়া শুনাইয়া নিতাইকে বলা হইল। নিতাই সহানুভূতির স্বরে বলিল—"বাস্তবিকই ত তোমাকে মেরে ফেল্‌তে এখানে এনেচি। কি করব বুঝ্‌তে পারচিনে।"

রাখাল বলিল, "একজন রাঁধুনী রাখ্‌লে হয় না ?

নিতাই রুক্ষ স্বরে বলিল—মাইনে কে দেবে ?

রাখাল। কেন আমরা দেবো।

নিতাই। দেবে ত—নিয়েই এস না কেন !

রাখাল দৌড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক রাঁধুনী লইয়া আসিয়া উপস্থিত। রাঁধুনীকে দেখিয়াই নিতাইএর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। রমা বিরক্ত হইয়া গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নিতাই বলিল—মাইনে ঠিক করেচ ?

রাখাল উত্তর করিল—সে আপনি থাক্‌তে আমি কি ঠিক করব ?

নিতাই রাগিয়া বলিল "বটে! আমার রাঁধুনীর কোন দরকার নাই!" স্পষ্ট জবাব শুনিয়া রাঁধুনী চলিয়া গেল। সেদিন আর রান্না হইল না। নিতাই না খাইয়াই আফিসে চলিয়া গেল। রাখাল কতক্ষণ কি চিন্তা করিল, পরে বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে কলেজ-মুখো রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় নিতাই আপীস হইতে আসিয়া দেখিল, রাখাল তখনও কলেজ হইতে ফেরে নাই। উপরে যাইয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সন্তোষজনক উত্তর পাইল না। মনে ভাবিল, রাগ করিয়া গিয়াছে, হয়ত একটু দেরীতে রাগ কমিয়া গেলে নিশ্চয়ই আসিবে। অমনি তাড়াতাড়ি নিতাই গিয়া রান্নার আয়োজন করিতে বসিল। রমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল "আবার তুমি কেন ? আমিই নয় দুটো রেঁধে দি।"

নিতাই দৃঢ়তার সহিত বলিল "এসোনা এখানে বল্‌চি" সে কথার মধ্যে যেন স্নেহের নাম গন্ধও নাই, ক্রোধের সহিত বিরক্তি মিশ্রিত। রমা ভয়ে ভয়ে সরিয়া গেল।

পুরুষ মানুষ হইয়াও নিতাই আজ কত যত্নে রান্না করিল, আর এক একবার দরজার দিকে তাকাইতে লাগিল। কই ? কারও ত পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। হেদোর ধার, মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ঘুরিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢংঢং করিয়া ১১ এগারটা বাজিয়া গেল। নিতাই আসিল, উপর নীচের ঘর তেমনি শূন্য। কেবল তাহার শয়ন কক্ষে স্ত্রী রমা, শিশু পুত্রটীকে কোলে করিয়া শুইয়া আছে।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "খাওনি ?"

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল "খাইনি, তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?"

রমা। আমি এই একটু আগে নীচেয় গিয়াছিলাম, গিয়ে দেখি কেউ নাই। রান্নাঘরে সব ঢাকা পড়ে আছে। এর মধ্যে এসে কি আর খাওয়া সম্ভব ?

নিতাই। না আমি খাব না।

রমা। কেন খাবে না ? তাহ'লে রাঁধ্‌বার কি দরকার ছিল ? তাঁকে বুঝি কোথায় পেলে না ?

নিতাই। দেখ রমা ! সব কথার সকল সময় জবাব দেওয়া যায় না। এই বুঝেই আমাকে আর কোন প্রশ্ন করোনা।

রমা চুপ করিয়া গেল।

নিতাই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উপরের একটা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাখালের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পরদিন সকাল বেলা রাখালের ঘরের দরজার গোড়ায় একখানা চিঠি পড়িয়া আছে, দেখা গেল। নিতাই চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু—

কাকা আজ আপনার সংসার হইতে বিদায় হইলাম। যদি ভগবান্ দিন দেনত, আবার দেখা হইতেও পারে। কিন্তু যতদূর পারি, নিজেকে দূরে দূরে রাখিতেই চেষ্টা করিব। মা বাপ ছিলেন না, আপনি ছিলেন, বলিতে কি আমার সকলি ছিল ; কিন্তু যখনই দেখিলাম যে, সেই আপনিও আমাকে একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখনই আর আপনার সংসারের মধ্যে আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার শত শত অপরাধ স্নেহবশে ক্ষমা করিবেন। সেবক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র পড়িয়াই নিতাইএর বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। একে একে অতীতের দিনগুলি মনে পড়িতে লাগিল। ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু, দাদার মৃত্যু, দিদির মৃত্যু—নাটকের দৃশ্যের ন্যায় একটির পর একটী করিয়া তাহার চোখের সাম্‌নে যেন সব ভাসিতে লাগিল। হায় ! কোথায় আজ তাহার সেই পণ-রক্ষা ! কোথায় তাহার দাদার কথার সেই সগর্ব্ব উত্তর ! নিজের চোখেই সে যে এতটুকু হইয়া গেল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিতাই নয়টা বাজিতেই জামা কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব রাত্রের অনাহারের দরুণ শরীর যদিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তবুও শরীরের প্রতি তার দৃষ্টি নাই। আধ ঘণ্টা চলিবার পরই ফ্রি চার্চ কলেজের সাম্‌নে আসিয়া সে পৌছিল। তখনও কলেজে ছাত্রদের তেমন ভিড় হয় নাই। দুই একজন ছাত্র আসিয়াছে মাত্র। ফটকের এক পাশে কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। ২।১ জন করিয়া ছাত্রেরা ফটক পার হইয়া কলেজে ঢুকিতে লাগিল। কিন্তু যাহার অপেক্ষায় সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ত দেখিতে পাইল না !

বেলা প্রায় এগারটা বাজে বাজে, এমন সময় সে দেখিল, আর দুইটী ছেলের সহিত গল্প করিতে করিতে রাখাল আসিতেছে। একবার ইচ্ছা হইল, নিজেই যাইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে। কিন্তু আবার ভাবিল, তাহা হইলে অপর ছেলে দুইটিই বা কি মনে করিবে। রাখাল যে ভাইপো হয়, একথাত আর অপ্রকাশ থাকিবে না। নিজেদেরই একটা লজ্জার কথা লোকের কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু রাখাল কি নিষ্ঠুর ! নিতাই এমন করিয়া তাহাকে দুইটী চক্ষু দিয়া প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আর সে একটীবারও চোখ চাহিয়া তাহাকে দেখিতেছে না। নিতাই বুঝিল, উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। ধীরে ধীরে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে হলুদের ফোঁটাযুক্ত এক পত্র আসিয়া নিতাইএর নামে উপস্থিত। পত্রে লেখা আছে—

মহিমবরেষু—

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন, আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার তারিখে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার কন্যা শ্রীমতী শশিকলা দেবীর শুভবিবাহ হইবে। মহাশয় ! অনুগ্রহ পুরঃসর বরকর্ত্তারূপে উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। পত্রের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

নিবেদক

শ্রীউমাকালী শর্ম্মা হালদার ;

১০।৬ পটুয়াটোলা লেন।

পত্র পড়িয়াই নিতাই একেবারে অবাক্। উমাকালী হালদার একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী। কলিকাতা সহরে তাহার ৪।৫ খানা বাড়ী, গাড়ীঘোড়া, লোকজন—সবই আছে। তা থাকুক্, তাই বলিয়া সে টাকা দিয়া তাহার ভাইপোকে কিনিয়া লইবে! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! সংসারে টাকাই এত বড়। না না, উমাকালীর কোন দোষ নাই। দোষ যত রাখালের। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিতাই, এই কথাগুলি ভাবিয়া লইল। পরে পত্র-বাহককে বিদায় দিল।

এখানে ভিতরকার কথাটা একটু বলিতে হইতেছে। উমাকালী হালদারের পুত্রদের সঙ্গে রাখাল বিএ ক্লাসে পড়ে। তাহাদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। অনেক সময়েই তাহাদের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণাদি হইয়া থাকে। রাখাল ছেলেটি লেখাপড়ায়ও যেমনি ভাল, তেমনি সচ্চরিত্র ও সুন্দর। বহুদিন হইতেই ইহার উপর উমাকালীর কেমন নজর পড়িয়াছিল।

শশিকলা রাখালের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায়, সে তাহা আদৌ নয়। তাহার রূপের মধ্যে চোখ দুইটীর উজ্জ্বলতা সাধারণতঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে তাহার স্বভাব যেরূপ মধুর, তাহাতে রূপের প্রশ্ন বড় একটা মনেই জাগে না। একটী দিনের একটু ব্যবহারেই তাহার প্রতি মুগ্ধ হইতে হয়।

উমাকালীর ঐ একই মেয়ে শশিকলা। তাঁহার বরাবরই ইচ্ছা যে, একটী সৎপাত্রের হাতে মেয়েটীকে দিয়া নিজের একখানা বাড়ী ও কিছু কোম্পানীর কাগজ তাহার নামে দানপত্রে রেজেষ্ট্রী করিয়া দেন। রাখাল যে উঁচু ঘরের ছেলে, তিনি তাও জানিতেন। ইহাকে উহাকে দিয়া কতবার তাহার কাছে প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু সে কেবল একই উত্তর দিয়াছে যে, কাকার মত না হইলে তাহার কোনই হাত নাই।

কিন্তু একটি দিনের একটি ঘটনায়, সেই কাকার মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! আত্মসম্ভ্রম হারাইয়া নিতান্ত দীনের মত যখন সে আসিয়া, এ কথায় সে কথায় উমাকালীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তিনি হাত বাড়াইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া উমাকালী নিতাইকে পত্র লেখেন।

খুব জাঁক জমকের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু নিতাই আসিল না। তাহার বংশ-মর্য্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে। কোথাকার কে উমাকালী হালদার, ব্রাহ্মণ কি না তারও পরিচয় নাই, সেই কি না তার ভাইপোকে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল! ধিক্ তাহাকে! আর শত ধিক্ তাহার সেই কুলাঙ্গার ভাইপোকে! সে এই সকলের মূল! অমন পাপিষ্ঠের মুখদর্শনেও পাপ! ক্রোধে অভিমানে তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্নেহ চিরদিনই নিম্নগামী। নিতাইএর এই অভিমান চিরদিন টিকিল না। রমার শত শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে আজ রাখালের বৌকে দেখিতে চলিল।

নিতাইকে দেখিয়া রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নিতাই কিন্তু রাখালকে অন্য কোন কথা না বলিয়া একেবারে সোজাসুজী বলিল, "বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যেতে হবে"। রাখাল মহা বিপদে পড়িল, একটা ঢোক গিলিয়া সে বলিল; "একবার এঁদের কাছে তাহ'লে—" নিতাই বলিল "তোমার শ্বশুরের কথা বল্ছ, তাঁর কাছে ত যাবই", —বলিয়া নিতাই যেমন উমাকালীর সহিত দেখা করিতে যাইবে, অম্নি বাধা দিয়া রাখাল বলিল "একটু বসুন, তাঁর এখন একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে।"

নিতাই দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া বসিয়া কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতে লাগিল "তাইত! বড় লোকের বড় দস্তুর, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই যে আমার পক্ষে মস্ত ধৃষ্টতা; বাবাজীও আমার ঠিক দুই দিনে তালিম হইয়া গিয়াছেন।"

উমাকালী পাশের ঘরে দুই তিনটি মক্কেল বন্ধুর সহিত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার উচ্চ হাসির সহিত শোনা গেল—"তখন আস্‌তে পার্‌লেন না, এখন এয়েছেন আমাদের স্বর্গে তুল্‌তে! বৌমাকে নিয়ে যাবেন!—বলিহারী যাই সাহসের!"

কথা কয়টী নিতাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কোথাও একটু জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই—তপ্ত লৌহশলাকার মত আসিয়া সেগুলি তাহার কাণে বিঁধিতে লাগিল।

রাখাল মুখ ভারী করিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁর এখন দেখা কর্‌বার আদৌ অবসর নাই।"

"বাস হয়েছে" বলিয়াই নিতাই যেমনি উঠিয়া পড়িবে, রাখাল অমনি তাড়াতাড়ি তাহার সাম্‌নে আসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "রাগ ক'রে এমনি চলে যাবেন না, আমি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা না করে পারবেন না। একটু জরুরী কাজ আছে কিনা, তাই আস্‌তে পারছেন না।"

নিতাই বিরক্তির সহিত বলিল "থাক্ থাক্ আর তুমি ওকালতী করতে যেয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু একদিন এ কথা মনে কর্‌তে হবে। তোমরা সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু আমার এবাড়ীতে আসা এই শেষ।"

বলিয়াই নিতাই বাহির হইয়া পড়িল। রাখাল সেখানে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল। খুড়ার আশীর্ব্বাদ যেন ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষের মত এক মুহূর্ত্তে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। যত দূর দেখা যায়, রাখাল চাহিয়া রহিল—চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া তাহার কাকাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। পরে যখন গলির মোড় ঘুরিলে আর দেখা গেল না, তখন তাহার হৃদয় কি এক তীব্র বেদনায় ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, দৌড়িয়া গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনে, কিন্তু তা পারে কৈ? সে যে এখন বড় ঘরের জামাই। লোকের কাছে তাহা হইলে মুখ দেখাইবে কিরূপে? তেওয়ারী দরোয়ানটাই বা দেখিয়া কি মনে করিবে! ভাগ্যে সে দিন তাহার শ্যালকেরা বাড়ী ছিল না, নইলে তাহাকে বিষম লজ্জা পাইতে হইত। কাকা আর এমুখো না আসেনত মঙ্গল।

একেবারে সোজাসুজি বলিল, "বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যেতে হবে"।

খুড়ার প্রতি তাহার শ্বশুরের এই অবজ্ঞা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। মুখে যদিও তাহার কোন কথা বলিবার কোন অধিকার নাই, তবুও অন্তরে অন্তরে সে বুঝিল যে, এই অপমান খুড়াকে যেমন লাগিয়াছে, তাহার শতগুণ তাহাকে লাগিয়াছে। শ্বশুরের উপর ভয়ানক ঘৃণা জন্মিল। কিন্তু এই ঘৃণাকে পোষণ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতেই শ্বশুরের সঙ্গে বাস করিতে হইবে। ক্ষণকালের জন্যও অন্ততঃ এই চিন্তায় তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

ক্রমে তাহার বড় অসহ্য হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। একখানা গাড়ী করিয়া বরাবর নিজের বাড়ীর দরজায় গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। গাড়ী হইতে নামিতেই দেখিল, নিতাই। রাখাল কাকার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিতাইএরও চোখের কোণে জল আসিয়াছিল। বহু কষ্টে তাহা মুছিয়া সে বলিল, "রাখাল, এমন করে চলে এলে, তোমার শ্বশুর শুন্‌লে কি মনে কর্‌বেন?"

রাখাল বলিল, "আমি আবার এখুনি যাব, তাই গাড়ী ক'রে এ'য়েচি। আসুন না গাড়ীতে।"

নিতাই গাড়ীতে না গিয়া ফুটপাথ ধরিয়া আপীসে চলিল; রাখাল মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল—কই? কাকাত আমাকে একটী বারও থাক্‌তে বল্লেন না! থাক্, তবে আর আমার দোষ কি? আগেকার কথাগুলিও তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইতে লাগিল।

নিতাই ততক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, রাখালের কথা। রাখাল কি সত্য সত্যই আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল? অথবা আসিলে অমন শুধু হাতেই বা আসিবে কেন? কিংবা যদি মনের আবেগেই আসিয়া থাকে! আমিত তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না; একদিনের একটা ভুলে যাহাকে হারাইয়াছিলাম, আজ তাহাকে হাতের মধ্যে পাইয়াও আর একটা মস্ত ভুলে হারাইলাম! আর কি সে আসিবে! কেনই বা আসিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার সময় আপীস হইতে ফিরিলে, রমা নিতাইকে বেশ শক্ত শক্ত দুই কথা শুনাইয়া দিল। নিতাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখ কাজটা আমার পক্ষে ত আর অন্যায় হয় নি, সে রাগ করে চলে গিয়ে সেধে ঘর-জামাই হ'তে গেল, আমার কি উচিত নয় যে তাকে ফিরিয়ে আনি?"

রমা বলিল, তখন আমার কথা শুন্‌লে না, দেখত অপমানটা হল কার? তুমি হ'লে সমাজের মাথা, পায়ে ধ'রে যাকে নেওয়া যায় না, সেই কি না নিজে সেধে গিয়ে এমনতর ছোট মুখে ফিরে এল! বাবা বলেন যে, "রমা আমার সকলের ছোট মেয়ে, ওকে নিয়ে যেমন ভাবিত হ'য়ে পড়েছিলাম, তেমনি ওকেই দিয়েছি সকলের চেয়ে উঁচু ঘরে।"

নিতাই তামাকুটাকে নিঃশেষ করিয়া সগর্ব্বে বলিল "সে কথা কি মিথ্যে, এমন ঘরে মেয়ে কয়জনে দিতে পারে! তবু তোমার বাবা আমাকে তেমন কিই বা দিয়েছিলেন! আজকালকার দিনে বরের বাজার যেমন চড়া, আর কেউ হলে ২০০০৲ দুহাজার টাকার কমে আর পেরে উঠ্‌ত না। তোমার বাবা বলে অত সহজে কাজ সেরে নিলেন, কি বল রমা?" রমা নিরুত্তর রহিল, নিতাই বলিতে লাগিল "ভদ্রলোক যে ভাল মানুষ, তাতে তাঁর কথা ঠেল্‌তে পারে, এমন লোক ত আমি বড় একটা দেখিনে!"

রমা এবারে কথা বলিল,—আসন্ন বৃষ্টির দিনে আকাশ যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে, মুখখানা তেমনি গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "এ নিয়ে বোঝাপড়া তখন বাবার সঙ্গে কর্‌লেই হত, আমাকে এমন করে খোঁটা দিয়ে লাভ কি?"

নিতাই গম্ভীর হইয়া বলিল "আমি বেশ জানি, জগতে উচিত কথার উচিত মূল্য কোনও দিনই নাই! সত্যটা বল্‌তে হবে, যতক্ষণ তা প্রিয়, অপ্রিয় হলেই ব্যস্, চেপে যাও,—এব্যবস্থা মন্দ নয়।"

রমা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। মাঝে মাঝে এরূপ তাহাদের হইত। কয় দিন পরে সে জেদ ধরিল যে, একবার তাহাকে বাপের বাড়ী রাখিয়া আসা হউক। নিতাই অনেক ওজরআপত্তি তুলিল, কিন্তু সে সব স্রোতের মুখে তৃণতুল্য। কোন যুক্তিই টিকিল না, কোন তর্কই খাটিল না। রমার জেদই বজায় রহিল।

নিতাই নিজে রাঁধিয়া খায়, আপীস করে, আর রাঁধুনী রাখিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এক দিন যে রাঁধুনীর অভাবে সংসারে এমন একটি বিভ্রাট চিরদিনের জন্য ঘটিয়াছে, সে বিভ্রাট ঘটিবার আর আজ কোনও সম্ভাবনা নাই, রাঁধুনীরও সেই জন্য প্রয়োজন নাই।

রাখালের অবস্থা এদিকে দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যে ঘর জামাই একথাটা বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসী-চাকরটা পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিত! এক দিন কয়েকখানা দামী ল-বুক কিনিবার জন্য শাশুড়ীকে দিয়া শ্বশুরের কাছে টাকা চাহিলে, তিনি উত্তর করিলেন, পরীক্ষায় পাসই ত হোক্, পরে প্রাক্‌টিস সুরু কর্‌লে দেখে শুনে যা দরকার হয় কিনে দেওয়া যাবে। যদি পরীক্ষায়ই ফেল্ হয় ত, মিছেমিছি টাকাগুলা লোকসান। এইত সবে লক্লাসে এডমিশন নিয়েছে।

রাখাল পাশের ঘরেই ছিল, সব শুনিতে পাইল, আর কথাটি না বলিয়া কলেজে চলিয়া গেল।

সেদিন রাত্রে শশিকলাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ

শশি! তোমরা বোধ হয়, বাড়ীশুদ্দো সকলেই আমাকে দয়ার চক্ষে দেখ?” শশিকলা একথার কোন অর্থ না বুঝিয়া তাহার উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল “কেন, একথার মানে কি?”

রাখাল তখন একে একে সকল কথাই বলিল। শুনিয়া শশিকলার চক্ষে জল আসিল। তাহার স্বামীকে যে এতটুকুও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, হোক্ না সে যত বড় আত্মীয়, তাহাকে সে কখনও ক্ষমা করিবে না। সে বলিল, “টাকার দরকার ত আমাকে বল্‌লে না কেন?”

“কেন তুমি কি কর্‌তে শশি?

“আমার কাছে বুঝি টাকা নেই তুমি মনে কর?”

“থাক্‌লেও সে যে তোমার বাবার দেওয়া টাকা, তাতে আমার কি অধিকার?”

হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে শশিকলা বলিল, “না না কখ্‌খন না! কে বল্‌লে আমার বাবার দেওয়া টাকা! আমি বুঝি বিয়ের সময় কিছু পাইনি! গয়না বাদে আমাকে যে যা আশীর্ব্বাদী দিয়াছে, সেও ত অন্ততঃ হাজার টাকা।”

রাখাল বলিল, “তা হয়না শশি! এতদিন তোমার বাবার খাচ্ছ যে! ও টাকায় তোমার বাবারই অধিকার।”

“বেশ কথা বল্লে যা হোক্। স্ত্রীধনে কারো অধিকার নেই!”

“তবে আমারও নাই শশি!”

“নাই যদি থাকে ত তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমাকে দিচ্ছি।”

“না! তা পারবনা। আজ আমার মনে যে আঘাত লেগেচে, তা তুমি বুঝ্‌বে না। তুমি আমার অবস্থায় কোনও দিন পড়নি, তাই এ কথা বল্‌চ।”

“আচ্ছা দান বলে মনে করচ কেন? আমার যা' তা তোমার নয় কি? আজ নয় স্বীকার না করতে পার কিন্তু কালই যদি আমি মরি ত, আইনআদালত তোমাকে ঠকাবেনা। আমার বাবাই ব্যবস্থা করে দেবেন যে, তাঁর মেয়ের যা সম্পত্তি, তা তাঁর জামাইএর প্রাপ্য।”

একথায় আর রাখাল কথা বলিতে পারিল না। তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। বহু কষ্টে তাহা থামাইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে সে বলিল—“শশি! শশি! তুমি এ কি বল্‌চ! তুমি মানুষ না দেবতা! জন্ম জন্ম তপস্যা ক'রে যদি স্ত্রীলাভ কর্‌তে হয় ত, সে তোমার মত স্ত্রী।” শশিকলা লজ্জায় বিছানার মধ্যে মুখ লুকাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাখালের শ্যালকেরা রোজ বিকালে বারান্দায় বসিয়া গল্পগুজব করিত, আর কোন্ প্রফেসর সেক্‌স্‌পীয়র ভাল পড়ান, কে মিল্‌টন ভাল পড়ান, তাই লইয়া তর্কবিতর্ক করিত। তাহারা দেখিত, একটি ভদ্রলোক, রুগ্ন চেহারা, পরিধানে সামান্য বেশভূষা, তাহাদের বাড়ীর দিকে ছলছল চোখে চাহিতে চাহিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে; কোন কোন দিন বা দেখিত, লোকটা বরাবর তাহাদের সদর দরজার নিকট আসিয়া তেওয়ারী দরোয়ানের সহিত কি কথোপকথন করিতেছে।

একদিন রাখাল সেখানে ছিল। তাহার বড় শ্যালক যতীন্ বলিল, “দেখেচ হে রাখাল বাবু! ঐ লোকটা রোজ যাবার সময় আমাদের বাড়ীর পানে তাকাতে তাকাতে যায়। কোন কোন দিন নীচের দরোয়ানদের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলে।”

রাখাল লোকটাকে দেখিয়া মুখ নামাইল,—কোন কথা বলিল না।

যতীন্ বলিল, “কি হে রাখাল বাবু, কথা কইচ না যে! একেবারে চুপচাপ কেন? আমরা কি পাপ করলাম যে, একেবারে আমাদের সঙ্গে কথা অবধি বল্‌তে নেই?”

রাখাল সে কথার সংক্ষেপে কি একটু উত্তর দিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। যতীনের ছোট ভাই মহীন্ বলিল, “রাখাল বাবুর আজকাল কি হয়েচে, যেন আমাদের সঙ্গে ভলে ক'রে কথাই বলেন না।”

যতীন্ বলিল, “বুঝ্‌তে পারচনা এর মানে! বি-এ টা একেবারে অনার নিয়ে পাস করে গেল কি না, তাই আর আমাদের সঙ্গে তেমন মিশ্‌তে চায় না।”

“বাপ্‌রে কি অহঙ্কার! তবুত বি-এল্ পাস্ করেন্‌নি! দেখা যাক্ কি হয়।”

রাখাল তাহার শ্যালকদিগকে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহারা মনে মনে তাহাকে ঈর্ষা করিত, সে বিষয়ে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। অনেক সময় সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সে তাহাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছে।

আর নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিয়াছে। আজিও সে যখন যতীনের মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি শুনিতে পাইল, তখনও তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত লাগিল। তাহার কাকা যে রোজ রোজ তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাড়ী যান, এ কথা মুখ ফুটিয়া সে কেমন করিয়া বলিবে!

নীচে দরোয়ানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার খুড়া নিতাই প্রায় প্রতিদিনই দরোয়ানের কাছে আসিয়া, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যান।

রাখালের হৃদয় হর্ষে বিষাদে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। কাকার হৃদয় যে কত উচ্চ, তাঁহার স্নেহ যে কত অগাধ, তাহা বুঝিতে তাহার এত টুকুও বাকি রহিল না। একেই বলে নিঃস্বার্থ স্নেহ।

ইহার পর প্রতিদিনই রাখাল সেখানে বসিয়া থাকিত, আর দেখিত, সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি শীর্ণ-কায় লোক তাহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, তাহাদের বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছে।—ওই অতটুকু মাত্র ব্যবধান! ইচ্ছা করিলেই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারে। কিন্তু সে শক্তি কোথায়! যে শৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়িয়াছে, সে যে দাসত্বের অধম! কি পাপ!

এক দিন রাখাল আর নিতাইকে দেখিতে পাইল না। ভাবিল, অন্যত্র কোথাও হয় ত কাজ আছে। কিন্তু উপরি উপরি চার পাঁচ দিনও যখন আর দেখিতে পাইল না, তখন তাহার মনে বিষম খট্‌কা লাগিল। কাকার ত কোন অসুখ হয় নাই! পর দিন দুপুর বেলা সে কাকার আপীসমুখো রওনা হইল। আপীসে গিয়া শুনিল, কাকার বিষম ব্যারাম, জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে কাশি,—ডাক্তার বলিয়াছে, খারাপ হইতে পারে। বেলা ৩ টার সময় নিতান্ত মলিন মুখে রাখাল নিঃশব্দে শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। রাত্রে তাহার বিমর্ষভাব দেখিয়া শশিকলা অত্যন্ত ভয় পাইল। সে বলিল "হাঁাগা কি হয়েছে তোমার? তোমাকে অমন দেখাচ্চে কেন?"

স্ত্রীর কাছে রাখালের এতটুকুও অভিমান নাই। সে বলিল, "দেখ শশি! কাকার আমার বড় ব্যারাম। আজ আপীসে গিয়ে খোঁজ করে এয়েছি; এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

শশিকলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "এঁ—বল কি! কি হবে তাহ'লে?"

রাখাল। কি আর হবে; আমাকে যেতেই হবে।

শশিকলা। কবে?

রাখাল। আজই,—এখনি।

শশিকলা। কখন ফির্‌বে?

রাখাল। তা বল্‌তে পারিনে।

শশিকলা। সে কি! এঁদের না ব'লে?

রাখাল। তা' হোক্, এঁরা জান্‌লে কি যেতে দেবেন?

শশিকলা। তবে আমাকেও নিয়ে চল।

রাখাল। চল।

শশিকলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

তখনই তাহারা নীচে নামিয়া আসিল। আষাঢ়ের রাত্রি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া কড় কড় শব্দে আকাশের বুকখানাকে চিরিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছিল।

সমস্ত বাড়ীখানি সুষুপ্ত। দেউড়ির দরোয়ানের নাসিকাধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে তাহারা ফটকের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৈ! একখানা গাড়ীও ত রাস্তায় নাই। বাহিরেও ত দাঁড়ান যায় না, যে দুর্য্যোগ! উদ্বেগে আশঙ্কায় দুই জনের বুক কেবল দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। হঠাৎ একখানা গাড়ী দেখা গেল। "যাক্ ভগবান্ বাঁচিয়েছেন! উঠে পড়—উঠে পড়।" তাড়াতাড়ি করিয়া রাখাল শশিকলার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। "চালাও! চালাও! জোরসে চালাও। সীতারাম ঘোষের গলি!"

জল বৃষ্টির মধ্যদিয়া তীর বেগে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রমা বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার পর নিতাইএর আপীসের খাটুনীর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের খাটুনী এত দূর বাড়িয়া পড়িল যে, শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইতে লাগিল। একবিন্দুও যত্ন নাই, অযত্নে অবহেলায় শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়া, তাহার জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি। সংবাদ পাইয়া রমা আসিল। একা স্ত্রীলোক—বহুকষ্টে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারই বা কতটুকু শক্তি!

দুইজন ডাক্তার অনবরত দেখিতেছে! আজও বিকালে তাহারা আসিয়াছিল।

রাখালের গাড়ী আসিয়া যখন দরজায় লাগিল, তখন রাত প্রায় এগারটা। দরজায় ঘা দিতেই একটী স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া দিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত রাখাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কর্ত্তা কেমন আছেন বলত?

স্ত্রীলোকটী বলিল, "বড্ড খারাপ, আমি আজকে এয়েচি। সন্ধ্যে অবধি এখানে বসে আছি, কতলোক আস্‌চে যাচ্ছে, তাই দোর আগ্‌লে থাক্‌তে হয়েচে।"

কত ভয়ে, কত সঙ্কোচে, পা টিপিয়া টিপিয়া, রাখাল যখন শশিকলাকে লইয়া উপরে গিয়া উঠিল, তখন নিতাইএর ঘরে রমা একা বসিয়া স্বামীকে বাতাস করিতেছিল।

আগে আগে রাখাল, পিছনে পিছনে শশিকলা,—দুই-জনে নিঃশব্দে গিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই ক্ষীণ কণ্ঠে নিতাই বলিল, "ও কে এসেচে দেখত!" রমা মুখ তুলিয়া দেখিল রাখাল, সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী একটী স্ত্রীলোক।

"কি দেখ্‌তে আজ এসেচ রাখাল" বলিয়া রমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে উঠিয়া শশিকলার হাত ধরিয়া বলিল, "ভিতরে চল বৌমা।" রাখালের চলিবার শক্তি ছিলনা। পা দুইখানি যেন কে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। দুই চক্ষু দিয়া কেবল অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে।

বহু কষ্টে খুড়ার শয্যার পাশে গিয়া বসিয়া সে বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "কাকা! কাকা! আমি যে এসেচি!"

নিতাইএর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। জড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "বাবা সত্যিই এয়েচিস। না বিশ্বাস হচ্ছে না! তুই যে এখন পরাধীন।" পরে শশিকলার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "মা লক্ষ্মি! আপনার ঘরে যখন আপনিই এয়েছ, তখন অচলা হয়ে থাক। আমার অদৃষ্টে নাই, তাই তোমাদের নিয়ে দুটি দিন সুখভোগ কর্‌তে পার্‌লেম না।"

রাখাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কাকা আমিই আপনাকে মেরে ফেল্‌লুম! চক্ষের উপর দেখ্‌লুম, আপনি তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন! কোনই প্রতীকার কর্‌লুম না! কাকা, পিতৃ-মাতৃঘাতীর পাপের কি মার্জ্জনা আছে?"

নিতাই বলিতে লাগিল, "কত করে তোকে মানুষ করেচি রাখাল, সেই তুই পর হয়ে গেলি, বুকে বড়ই ব্যথা পেয়েছিলুম। বাপের স্নেহ, মার স্নেহ, এই দুটোর মূলে আঘাত করে, তুই যে দিন চলে গেলি, সে যে কি দিন! সে দিন জীবনে আর আস্‌বে না। এ জন্মের মত শেষ হ'য়ে

গেছে! আজ যখন দেখতে পাচ্চি যে, তুই আবার ফিরে এসেচিস্, তখন আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা হচ্চে। কিন্তু সে যে অসম্ভব! সবই হোল কিন্তু বড় বিলম্বে! তুই বিনে নন্দর আর কে আছে?” বলিয়া ক্ষীণ হাত উঠাইয়া, নিতাই নিদ্রিত শিশু-পুত্রকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইল। রাখাল ছুটিয়া গিয়া ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। গভীর পুলকে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল!

জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে মিলনের এ কি অপূর্ব্ব অভিনয়! একটি দিনের একটু ত্রুটি যে মহানর্থের সূত্রপাত করিতেছিল, আজ এক মুহূর্ত্তের মিলনে তাহা রূপান্তরিত হইয়া সার্থক সুন্দর পুণ্যময় মঙ্গল রূপে দেখা দিল।

নিতাই আবার বলিতে লাগিল, “গুরুজনের কাছে উঁচু গলা করে বলেছিলুম, রাখাল রইল, বংশে বাতি জ্বলবে, আমার আবার ভাবনা কি? পরে একদিনের একটী মুহূর্ত্তে কি করে ফেল্‌লুম, ভগবান্ জানেন, ফলে তোকে হারালুম! দাদা স্বর্গ থেকে দেখচেন, আর মনে মনে আমাকে অভিসম্পাত কচ্চেন! আজ তোর পুণ্যে আমার আজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ধুয়ে মুছে যদি পবিত্র হতে পারি, তবেই সেখানে যেতে পার্‌বো। একবার কাছে আয়! ও কে? নন্দ? ওকে আর আনিস্ নে! ওর দিকে তাকাতে যে বুকখানা ফেটে যায়!”

রাখালের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল যে, তাহার কাকার জীবন-প্রদীপটী চিরদিন ধরিয়া কত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও প্রজ্বলিত থাকিয়া, আজ তৈলাভাবে নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়াছে—বুঝিয়াছে, কিন্তু সেটিকে প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য সে এতটুকুও চেষ্টা করে নাই! এ যে কি পাপ, তাহা আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল।

বাহিরে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া দেবতার শাসন-বাণীর মত বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল!

অভয়

[শেখ ফজলল্ করিম]

মানুষে বলে,—“নিমেষে শেষ—জীবন কিছুই নয়,—
রক্ত-রাঙা মেঘের মত ক্ষণেকে পায় লয়!”
আমার তাহা মোটেই যেন দেয় না প্রাণে শান্তি,
তবে কি এ মানবজন্ম বিফল?—শুধু ভ্রান্তি?
মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা আত্মার নাই লয়,
অন্তহীন জীবন-পথ সে কোথা শেষ হয়?

দেবতা হ’তে মানুষ বড়—সকল শাস্ত্র-বাণী,
সত্য নয় বলিয়া তাহা কেমনে বল মানি?
ধর্ম্মরাগে রাঙিয়া যদি মানুষ কর্ম্ম করে,
অমর-প্রেমে বাঁধিতে পারে নিখিলে প্রেমডোরে;
কীর্ত্তি তাহার বিশ্ব-জোড়া হবে না কভু লয়;
কোথায় লাগে দেবতা সেথা?—কিসের কর ভয়

তন্ত্রের বিশেষত্ব *

[শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ]

প্রাচীন কাল হইতে তন্ত্র শিবোক্ত শাস্ত্র বলিয়া আর্য্য-সমাজে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। অথর্ব্ব বেদের সহিত তান্ত্রিক যন্ত্র ও মন্ত্রের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং তন্ত্র যে, অথর্ব্ব বেদের সময় হইতে আর্য্য-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। নাদবিন্দু পরিসমাপ্ত যে প্রণব বেদের আদি-বীজ বলিয়া পরিগণিত, তন্ত্রোক্তবীজগুলি তাহা লইয়াই পরিপুষ্ট। সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, বেদের ন্যায় তন্ত্রেও প্রণবতত্ত্বের ব্যাখ্যান লক্ষিত হইবে।

মারণ-উচাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম ও পঞ্চমকারই তন্ত্রের বিশেষত্ব। মনুসংহিতায় ঐ সকল বশীকরণাদি অভিচার-কর্ম্মের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায়, প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিবার জন্য দৈত্য-পুরোহিতকে "কৃত্যা" প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহা যে, তান্ত্রিক আভিচারিক ক্রিয়া নহে, তাহা কে বলিতে পারে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে দারাপহারী আততায়ীর প্রতি আভিচারিক মন্ত্রপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং তন্ত্রকে আধুনিক বলা যায় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর হস্তলিখিত তন্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া, তন্ত্রের অভিনবত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের এত দিন যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অপনীত করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, নব্য লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত অমূলক যুক্তিতর্কের লূতাতন্তু বিস্তার করিয়া, সেই প্রাচীনতম তন্ত্রশাস্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া, প্রতিপাদনের নিমিত্ত সুদৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। তদপেক্ষা পরিতাপের কথা এই যে, নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় ত্রিকালদর্শী আর্য্যমহর্ষিগণের বহুসাধনালব্ধ সেই সকল শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করিয়া, অনায়াসে এইরূপ অপূর্ব্ব অলীক যুক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না।

আজকাল আর্য্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র ও নিরীহ ব্রাহ্মণজাতি একরূপ অস্বাভাবিক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। তাই ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহারে কেহ কোন বাধানুভব করেন না। অসভ্য মূর্খের অভিনয় প্রদর্শনে ব্রাহ্মণের স্থানই অগ্রগণ্য। অসভোচিত বেশভূষাধারী সুদীর্ঘ শিখা-বিলম্বিত মুণ্ডিত-শীর্ষ বিরাট্‌কায় ব্রাহ্মণ রঙ্গমঞ্চে হাস্যরসের অভিনেতা। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহার প্রণেতা আর্য্যঋষিগণ ঘোর স্বার্থপর বলিয়া অভিহিত। লেখকদিগের লেখনী-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইলে, ইহারই অন্যতম অবলম্বনে তাহার চরিতার্থতা-সাধনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্রোক্ত যন্ত্রের ঘটক "বকার" যন্ত্রের সম্পাদক, বকারের সহিত বঙ্গাক্ষর বকারের আকৃতিগত অবিকল ঐক্য দেখিয়া বর্ণমালা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বঙ্গাক্ষর-প্রবর্ত্তনার পরবর্ত্তী কালে, তন্ত্রের সৃষ্টি এরূপ অনুমান করেন। বঙ্গাক্ষর আধুনিক, কাজেই তন্ত্রও অভিনব, ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। বর্ণমালাতত্ত্বের পর্য্যালোচনার দ্বারা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। অবশ্য ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের লিপিচাতুর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পরস্পরের মধ্যে আংশিক সৌসাদৃশ্য দর্শনে, মূল এক দেবনাগরাক্ষর হইতে যে, দেশকালপাত্রভেদে লিপি-ব্যতিক্রমে ক্রমশঃ বিভিন্ন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়।

কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রিত নাগরাক্ষর বা বঙ্গাক্ষরই যে প্রাচীন প্রচলিত অক্ষর, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বিভিন্নদেশীয় হস্তলিখিত ও মুদ্রিত নাগরাক্ষরের মধ্যেও যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হয়, বঙ্গাক্ষরেও এরূপ বৈষম্য বিরল নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে সকল বহু-কালের হস্তলিখিত দেবাক্ষর ও বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন পুস্তক রক্ষিত আছে, তাহাদের লিপি-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও পরস্পরের সাদৃশ্য ও ক্রমপরিণতির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং নাগর বকার যে, তান্ত্রিক যন্ত্রসৃষ্টির সময়ে ত্রিকোণাকার ছিল না, বর্ত্তমানেও যে সর্ব্বথা ত্রিকোণ

* রঙ্গপুর সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে পঠিত।

নহে, এমন কথা বলা কঠিন। বিশেষতঃ নবাবিষ্কৃত দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত মুদ্রা হইতে বঙ্গাক্ষরের অভিনবত্ব সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। সুতরাং বরদা তন্ত্র, বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতিতে বঙ্গাক্ষরের লিপি-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলিয়া, তন্ত্রের আধুনিকতা কল্পনা করা অসঙ্গত। প্রকৃত পক্ষে তান্ত্রিক বর্ণাবলী আন্তর অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত, শুধু ব্যবহার-নিষ্পাদনার্থ কল্পিত নহে। প্রবুদ্ধকুণ্ডলীপ্রমুখ তান্ত্রিক সাধকেরা ইহার সত্যতা পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের অতিমাত্র দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গাক্ষরের মুদ্রণ-প্রথা-প্রবর্ত্তন কালে কোন বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষের সাহায্য লইয়া, সম্পূর্ণ তান্ত্রিক-প্রণালী-সম্মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অক্ষর খোদিত হয় নাই, কেবল প্রচলিত অক্ষরের আকারভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার ফলে, বাঙ্গালা বর্ণমালার আংশিক বিকৃতি ও কিয়ৎপরিমাণে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে।

তন্ত্রের আধুনিকতার অপর হেতু তন্ত্রোক্ত ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তন্ত্রের ভাষা লক্ষ্য করিয়া, ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে ইহা সত্য, কিন্তু যিনি যতই বিজ্ঞ বিচক্ষণ হউন না কেন, সকলকেই ক্ষেত্র-বিবেচনায় ভাষা-বিশেষের প্রয়োগ করিতে হয়। নিরক্ষর পল্লীবৃদ্ধের নিকট উন্নত সাহিত্যের ভাবপূর্ণ কাব্য-ঝঙ্কার দুর্ব্বোধ্য। তাই শাস্ত্র বলেন,

"দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।"

সুতরাং উপদেশার্থীর বোধগম্য ভাষায় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিলে, উপদেষ্টার সকল শ্রম বৃথা।

নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে অধ্যাত্ম তত্ত্বে উন্নীত করিয়া সাধনমার্গের পথিক করিবার জন্যই তন্ত্র শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন।

"কলৌ পাপসমাচারা ভবিষ্যন্তি জনাঃ প্রিয়ে।
কলৌ নান্যবিধানেন কলাবাগমসম্মতাঃ॥

উদ্ধৃত তন্ত্রবাক্য কৌশলে এই কথাই প্রতিপন্ন করিতে-ছেন। অধুনাতন কালেও নিম্ন শ্রেণীর ওঝা সম্প্রদায় মধ্যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রচলনাধিক্যও ইহার অন্যতম প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্য কাল-মাহাত্ম্যে তাহারা তন্ত্রতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অন্ধ-বিশ্বাস ও একাগ্রতার ফলে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশানুসারে তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানের দ্বারা অদ্যাপি আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর লোকের বোধগম্য সরল ভাষায় যে, তন্ত্র রচিত হয় নাই, তাহা কি করিয়া বলিব।

প্রাচীন কালে তন্ত্র অতি গূঢ়তম ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। শিষ্যব্যবসায়িগণ অতি সযতনে এবং সঙ্গোপনে ইহা রক্ষা করিতেন। রাজধানী প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে তন্ত্রের তাদৃশ প্রচলন ছিল না। খুব সম্ভব, চীন পরিব্রাজক এই কারণে তন্ত্রের অস্তিত্বের পরিচয় না পাইয়া, তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার উল্লেখ করেন নাই।

তন্ত্রের বিকৃতি আধুনিক হইলেও উহার অভিনবত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহপ্রণেতা বেদ-ভাষ্যকৃত মাধবাচার্য্য শৈব শাক্তাদি দার্শনিকের মত সংগ্রহ করিয়া-ছেন। শঙ্করাপরাবতার শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া, শৈবশাক্তাদি মত খণ্ডন করিয়াছেন। অবশ্য, শঙ্করাচার্য্য শাক্ত-মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া, উহা পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দেন নাই। উদ্যান পরি-পালকেরা সময়ে সময়ে বর্দ্ধমান বৃক্ষডালগুলি ছেদন করিয়া দেয় কিন্তু উহা সমূলে নির্ম্মূল করে না; নরসুন্দরেরা গোঁফ ও দাড়ী ক্ষৌর করে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, অনাবশ্যক অতিরিক্ত অংশ ফেলিয়া দেওয়া হয় মাত্র, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি টুকু বর্জ্জন করিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ বলিতে গেলে, শঙ্করাচার্য্যই তন্ত্রমত পৃথিবীতে দৃঢ়মূল করিয়া যান। শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলা তান্ত্রিক মকার সাধনেরই অভিব্যক্তি। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের নিকট বহুপ্রাচীন আর্য্যতন্ত্রানুরূপ তন্ত্রগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, তন্ত্রের বিকৃতি ন্যূনাধিক প্রায় দ্বিসহস্রবর্ষের পূর্ব্ব-বর্ত্তী ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তন্ত্র যদ্যপি প্রাচীনতম তবে উহা ভারতব্যাপী না হইয়া বঙ্গদেশে মাত্র সীমাবদ্ধ কেন? ইহার যথার্থ উত্তর, একমাত্র শঙ্কর-বিজয় হইতেই পাওয়া

যায়। মহাভাগ শঙ্কর পৃথিবীব্যাপী অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা, করিলেন বটে, কিন্তু দেশকালপাত্র ও লোকের মতিগতি পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, স্বকীয় প্রবর্ত্তিত সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদ ধারণা করিবার মত লোক পৃথিবীতে অত্যল্প। সুতরাং দ্বৈত হইতে তাহাদিগকে অদ্বৈতে লইয়া যাইতে হইবে। এইজন্য দেশকালপাত্র বিবেচনায় পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যদিগকে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া পদ্মপাদ ও আনন্দগিরিপ্রমুখ প্রিয়তম পঞ্চ শিষ্যকে ঐসকল ধর্ম্মমত প্রচারের আদেশ করিলেন। সেই হইতে ভারতে প্রধানতঃ এই পঞ্চোপাসনা প্রসার লাভ করে। শক্তি, সামর্থ্য ও রুচির আনুকূল্যে শাক্তপ্রধান মতেরই প্রাধান্য লাভ ঘটে। যদিও পঞ্চোপাসনার মূলে তন্ত্রের প্রভাব নিহিত রহিয়াছে, তথাপি শাক্তরাই বিশেষরূপে তান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। ঐহিক, পারত্রিক সকল শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির (দেহ-কেন্দ্রশক্তির) অভিব্যক্তি। সুতরাং, যিনি যেমতেরই উপাসক হউন না কেন, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা মূলতঃ স্বতঃই শক্তি-উপাসক, তাহারা যে, সাধনমার্গে সকলের পুরোবর্ত্তী তৎসম্বন্ধে কথাই নাই। এই কারণে, পঞ্চোপাসক তান্ত্রিক হইলেও শাক্তেরাই বিশেষভাবে তান্ত্রিক বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং এদেশে তন্ত্রের প্রচার-বাহুল্য থাকিলেও বঙ্গের বাহিরে যে, উহার প্রভাব বিস্তৃতি-লাভ করে নাই, একথা বলা যায় না।

যাহাহউক, তন্ত্রের আধুনিকতা বা তাহার প্রচার-বাহুল্যের অভাবেও তাহার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন,

"শ্রদ্দধানঃ শুভাংবিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
পিতৄনধ্যাপয়ামাস শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ॥"

শ্রদ্ধাশীলব্যক্তি কনিষ্ঠের নিকট হইতেও কল্যাণকারিণী বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। শিশুবৃহস্পতি পিতৃব্যদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। মনু কেবল এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ন হায়নৈর্ন পলিতৈ র্নবিত্তেন নবন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনুচানঃ মনোমহান্॥"

সুতরাং মাহাত্ম্যেই মহত্ব। সেই মহত্বটুকু যদি তন্ত্রে থাকে, তবে তাহা কনিষ্ঠ বলিয়া উপেক্ষিত বা স্বল্প-প্রচার বলিয়া ঘৃণিত ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে কেন? প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতিরাণীর বিশাল বিচিত্র বিশ্বভাণ্ডারে তন্ত্রের মত সমুজ্জ্বল মহার্হ রত্ন আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে, নিখিল শাস্ত্রের সারতত্ব একমাত্র তন্ত্রেই সংগৃহীত ও নিহিত হইয়াছে।

কর্ম্ম-প্রতীক ঈশ্বরোপাসনা বেদের সংহিতাভাগের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবতা ও জড়প্রতীক উপাসনাও তৎসহকারী বটে। তাই কর্ম্মমীমাংসা জৈমিনি-দর্শনে অতি সাবধানতার সহিত আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। সেই বেদ-প্রস্থিত মীমাংসাবিধৌত নক্ততত্ব বিষ্ণুপদ-বিনিঃসৃতা ভাগীরথীর ন্যায় জগৎ ও জীবতত্বে উদ্ভাসিত হইয়া, তান্ত্রিক অন্তর্য্যানে পর্য্যবসিত সাগর-সঙ্গমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাই বেদের মূলতত্ব তন্ত্রে প্রকটিত।

প্রণব-প্রতীক-ঈশ্বরোপাসনা ও ব্রহ্মাববোধনই বেদান্ত-বিচারে মুখ্যতম লক্ষ্য। সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য নিগূঢ় ভাব, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে সম্যক্ আলোচিত হইলেও, দেহও জীবতত্বের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া, সাধু ও সরলভাবে সাধারণের হৃদয়গ্রাহীরূপে একমাত্র তন্ত্রেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত-মুকুলিত তত্ব-কলিকা তন্ত্রে আসিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সাংখ্যোক্ত যোগ প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি শিবশক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে জীবতত্বের সহিত ঐক্য করিয়া, অতিসুন্দর ও সরলভাবে তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। অতএব সাংখ্যের অস্পষ্ট তত্বনিচয়ও তন্ত্রের ভিতর দিয়া সমুজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বেদোক্ত যোগ,যোগদর্শনে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য কিন্তু যোগবক্তা পতঞ্জলি ও তদীয় ভাষ্যপ্রণেতা ব্যাস, সেই নিগূঢ়তত্বের সূচনামাত্র করিয়া গিয়াছেন। সূচিত তত্ব তন্ত্রে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিকাশলাভ করিয়াছে। তাই তন্ত্রের যোগতত্ব নাজানা পর্য্যন্ত যোগদর্শনের অধ্যয়ন সফল হয় না। এই কারণেই আজকাল যোগদর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অনেককেই নির্জ্জল শুষ্ক তীর্থ সাজিতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিতত্ব, জীবতত্ব, দেহতত্ব, প্রাণতত্ব, জ্ঞানতত্ব, অধ্যাত্মতত্ব, সাকার-নিরাকার রহস্য, জোতিস্তত্ব ও ভৈষজ্য-

তত্ত্ব প্রভৃতি যাহাকিছু আর্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়ের অভিব্যক্তি তন্ত্রে লক্ষিত হইবে।

* * * *

যেরূপ স্বর্গীয়া মন্দাকিনী-ধারা হিমালয় শীর্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া পথমধ্যবর্ত্তী নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সরস্বতী ও যমুনার সহিত মিলিত হইয়া, একমাত্র প্রয়াগধামে আসিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ বেদবেদান্তপ্রবর্ত্তিত প্রণবতত্ত্ব পাষাণপ্রতিম দুর্ভেদ্য বিভিন্ন শাস্ত্রীয় কূটরহস্য ভেদ করিয়া, জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া, একমাত্র তন্ত্রে আসিয়াই সাগরসঙ্গমের ন্যায় প্রশান্ত, উদার, সাম্যভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি অবলম্বনপূর্ব্বক তন্ত্রের সারতত্ত্ব ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

* * * *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ষট্‌কর্ম্ম ও পঞ্চমকার লইয়াই তন্ত্রের তন্ত্রত্ব বা বিশেষত্ব। সেই ষট্‌কর্ম্ম এই,—

"শান্তিবৈশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচাটনে তথা।
মারণান্তানি সংসক্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥
রোগকৃত্যা গ্রহাদিনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতঃ।
বৈশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতং॥
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদাহৃতং।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতং॥
উচ্চাটনং স্বদেশাদেভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতং।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতং॥"

উল্লিখিত ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে শান্তিকর্ম্ম সাধারণের পক্ষে উপাদেয় হইলেও মনু "অভিচারং মন কর্ম্ম" "নপর দ্রোহ কর্ম্মধী" "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং" "স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ ক্ষত্রবধঃ" ইত্যাদি বাক্যে বেদের সেই "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া অপর পাঁচটী কর্ম্মের অবৈধতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।—সকল ক্ষেত্রে এবিধি প্রয়োজ্য নহে। স্থলবিশেষে যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে, অপর পাঁচটী কর্ম্মও সাধারণের কল্যাণকর হয়।

অনেক সময় দেশের স্তম্ভস্বরূপ রাজা ও তদধীন সামন্তবর্গের মধ্যে অকারণ বিরোধ-বিসম্বাদের উদ্ভব হইয়া, উভয় পক্ষ ধ্বংসমুখে পতিত হন। রাজদম্পতী ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গের মধ্যে এইরূপ কলহ ও মনোমালিন্যের ফলে যে, দেশে অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহা রাষ্ট্রীয় জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এরূপক্ষেত্রে শান্তির পক্ষপাতী রাষ্ট্রহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে বোধ হয়, বশীকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া দূষ্য নহে। এইরূপ রাজা বা রাজপুরুষের ব্যভিচারে যখন সুশাসনের অভাবে দেশে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠে, সেরূপ স্থলে তন্ত্রোক্ত বিদ্বেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বনে দেশরক্ষা করা, বোধ হয়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্ম ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া মনে করিবেন না।

শত্রুকুল সর্ব্বথা রাজশক্তির শাপ্য ও দণ্ডনীয় হইলেও যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত পুনঃ পুনঃ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও অত্যাচার উৎপীড়নে পরাঙ্মুখ না হয় এবং তাহার প্রতাপে প্রকৃতিপুঞ্জের স্ত্রীপুত্র লইয়া নিরাপদে বাসকরা কঠিন হইয়া উঠে, তখন সে অবস্থায় জনসাধারণ কি তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করেন না?

শাস্ত্রে দারাপহারী লম্পট ও দস্যুগণকে আততায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা ;—

"অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥"

আততায়ীর দমনকল্পে শাস্ত্র কি উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও শুনুন,—

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥"

এইরূপ দুর্ব্বৃত্তের অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিবার শক্তি প্রথমে স্তম্ভন-প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যর্থ করিবার চেষ্টাকরাই অতীব ভদ্রতর কার্য্য। শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সর্ব্বত্র সকল কার্য্য ফলপ্রদ হয় না। প্রথম চেষ্টা কার্য্যকারী না হইলে, তখন উচাটন ক্রিয়ার দ্বারা শত্রুকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে, চরম প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। তন্ত্রও এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মব্রতপরায়ণ ব্রতীদিগকে যদি প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষদমনে রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধনার অবকাশ কোথায়? এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান্‌ মনু স্বশক্তি-প্রয়োগে দুর্ব্বৃত্তদমনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

"স্ববীর্য্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরং।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্ণীয়াদরীন্ দ্বিজঃ॥
শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্ শস্ত্রংবৈ ব্রাহ্মণস্থ তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥"

ঈদৃশ শত্রুর দমনকল্পেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহার মন্ত্র ও প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদে "শ্যেনেনাভিচরেত" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক যে শ্যেনযাগের বিধি অমিত্রনিরাকরণ-কল্পে বিহিত হইয়াছে, শ্রুতি, উপনিষৎ ও তন্ত্রে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

ফলতঃ পদার্থের শ্রেণী কিংবা জাতিগত ভাবে ইষ্টানিষ্ট ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। দেশ, কাল, পাত্র ও প্রয়োজ্য-প্রয়োজক ভেদে ইষ্টও অনিষ্ট এবং অনিষ্টও ইষ্টকারী হইতে পারে। প্রাণমূল অন্নই সন্নিপাত ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে, আবার তদবস্থায় সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক যথাবিধি প্রযুক্ত সদ্যপ্রাণনাশক কালকূট বিষও সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করে। সুতরাং তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্মও যে, যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সুফলদায়ক হইবে, তাহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই। তবে হাতুড়ে চিকিৎসক-গণের ন্যায় অযোগ্য অনধিকারী কর্ত্তৃক অযথা প্রযুক্ত হইয়া এই সকল তান্ত্রিক প্রক্রিয়া জাগতিক অনিষ্টের হেতু হওয়া বিচিত্র নহে।

অতঃপর পঞ্চমকারই আমাদের আলোচ্য। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এ পাঁচটি "পঞ্চমকার" নামে অভিহিত। "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং—" এত গেল শাস্ত্রবচন। সাধারণ দৃষ্টিতেও যে সকল ক্রিয়া পশুপক্ষীমনুষ্যের সাধারণ নৈসর্গিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত, তাহাই কিনা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহীত হইল, বড়ই কৌতুকের কথা! যে তন্ত্রকার গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ বাক্যে বিজ্ঞানের চরমতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মতম বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া অসাধারণ জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনিই কিনা কদর্য্য কুক্রিয়ার প্রশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক তন্ত্রের উজ্জ্বল মহিমায় কলঙ্ককালিমা অনুলেপন করিলেন, কথাটা ঘোর প্রহেলিকাময় নয় কি?

মনু "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং" "প্রাণিনাং হিংসা, মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ" "নচপ্রাণিবধঃ স্বর্গ্যঃ" "পারদার্য্যাত্মবিক্রয়ঃ" "কন্যায়া দূষণঞ্চৈব" ইত্যাদি বাক্যে এই সকল দুষ্কার্য্য-যথাসম্ভব মহাপাতকাদির মধ্যে গণনা করিয়াছেন। তন্ত্র তাহারই অনুসরণপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

"নদদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকাম ব্রাহ্মণোহপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥ শ্রীক্রম
আব্রাভ্যাং পিশিতং মাংসং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্ম মবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ আগমসংহিতা
অর্থাদ্বা কামতো বাপি সোমপানেপি চ [illegible] নরঃ।
লিঙ্গযোনি রতো যোগী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

কুমারী তন্ত্র।

সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি বিরোধী ঐ সকল কদর্য্যানুষ্ঠানের অবৈধত্ব ঘোষণা করিতে যে তন্ত্রও বিরত নহেন, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যে তন্ত্র পঞ্চতত্ত্বের নিন্দাকীর্ত্তনে এইরূপ মুক্তকণ্ঠ, সেই তন্ত্রই আবার,—

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
মকারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্মনবিদ্যতে॥"—

এই বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা উপাসনার বিধান প্রদান করিতেছেন। বিষমসমস্যার কথা! এই রহস্যজাল ভেদ করিতে পারিলে বুঝিব, তন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। যদিও তন্ত্রে মদ্য-মাংসাদির ভূরি-ভূরি নিন্দাবাদ লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু তথাপি যে, তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবস্থা সর্ব্বথা বিহিত হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। তাহা না হইলে, তন্ত্রের তন্ত্রত্ব বা বিশেষত্বও থাকে না। তবে সে বিধান যে সকলের পক্ষে সকল সময়ের জন্য নহে, ইহা ধ্রুব সত্য।

সুচতুর তন্ত্রকার নিম্নাধিকারী সাধকগণের জন্য স্বয়ং কিছু না বলিয়া গুরুর উপর ভারার্পণ পূর্ব্বক দেখুন কিরূপ সুকৌশলে স্থূলমকারের অবতারণ করিতেছেন।

"পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রৈর্মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং নচান্যথা॥"

অথচ স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব রক্ষার জন্য অধিকারী-ভেদে সূক্ষ্মপঞ্চমকারের ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বরস-পিপাসু উন্নত সাধকগণকেও বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহা-দের জন্য আধ্যাত্মিক মকার-পরিপূরিত বিশাল তত্ত্বভাণ্ডা-রের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়া-

ছেন। আধ্যাত্মিক বা সূক্ষ্ম পঞ্চমকার কাহাকে বলে দেখা যাউক।

মদ্য—'সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥'

অর্থাৎ সহস্রারক্ষরিত অমৃতধারা-পানকারী সাধক প্রকৃত মদ্যসাধক।

মাংস—'মাংস নোতীতি যৎকর্ম্ম তন্মাসং পরিকীর্ত্তিতং।
নচকার প্রতীকস্তু মুনিভির্মাংসমুচ্যতে॥'

অর্থাৎ যে কর্ম্ম পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করে তাহাকেই মাংস-সাধন বলে।

মৎস্য—'গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স এব মৎস্যসাধকঃ॥'

অর্থাৎ প্রাণাপান-ভক্ষণকারী কৃতকুম্ভক ব্যক্তিই প্রকৃত মৎস্য সাধক।

মুদ্রা—'সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পরদোপমং॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে॥'

অর্থাৎ সহস্রারস্থিত কমল-কর্ণিকায় মহাকুণ্ডলিনী সমালিঙ্গিত পরমাত্মার অনুভূতিকেই মুদ্রা-সাধন বলে।

মৈথুন—'কুলকুণ্ডলিনীশক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতং॥'

সহস্রারাবস্থিত পরমাত্মার সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ-সমুদ্ভূত পরমানন্দানুভব করাকেই মৈথুন-সাধন বলে।

ভাবুক পাঠক দেখুন, ইহা কি সামান্য লোকের কার্য্য? যিনি যোনিমুদ্রায় ও শক্তিচালনী মুদ্রায় কৃতাভ্যস্ত, খেচরী ও মাণ্ডুকী মুদ্রায় সুশিক্ষিত, প্রাণায়ামের উচ্চস্তরে উন্নীত, কেবল তাদৃশ উন্নত সাধকই এই পঞ্চতত্ত্বসাধনের অধিকারী। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়পরিশোভিত স্ত্রীপুংশক্তির সমবায়ে আমরা এক এক জন দেহী। সাধক দেহী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কৌশলে মুদ্রা-সহায়তায় নিজ দেহগত স্ত্রীরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারাবস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলন করাইলে, সুশ্রুতোক্ত স্বপ্নগর্ভের ন্যায় একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-প্রবাহ উপজাত হয়। এই যোগজ পরমাহ্লাদমদে প্রমত্ত যোগী আত্মবিস্মৃত হন, তখন তিনি সংসার ভুলিয়া, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া চিৎপ্রেম ও অমৃতের রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। লৌকিক জগতের পার্থিব সুখ এ মহানন্দের নিকট খদ্যোজ্জ্যোতির ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন ও সংসারের যাবতীয় লালসাময় কাম্যবস্তুর আকর্ষণ অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া সেই চিদানন্দদায়ী অমৃতরস পানের জন্য প্রধাবিত হয়। এই সূক্ষ্ম ও মূল পঞ্চতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই মহাদেব বলিয়াছেন,—

'পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চাননো সমো ভবেৎ।'

ঈদৃশ পরানন্দোল্লাসে উন্মত্ত যোগী যে সাক্ষাৎ পঞ্চানন তুল্য সে বিষয়ে কি আর অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? সুষুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন ও সংযোগ ব্যতীত কোটি কোটি বোতল মদ্যপান, পর্ব্বতোপম মদ্যমাংস ভক্ষণ ও পঞ্চমে ছাগবৃত্তি সাধন করিলে পঞ্চানন তুল্য হওয়া দূরে থাকুক, পঞ্চাননের অনুচর শ্রেণীভুক্ত হওয়াও সুকঠিন। তাই কুলার্ণব বলিয়াছেন,—

'মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধি লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাসিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগমাত্রেণ যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ॥'
—কুলার্ণব।

যাঁহারা সাধনমার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য মানসিক তত্ত্বাভ্যাসের ব্যবস্থা।

'ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ।
মানসে নৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥'—তন্ত্র।

চিত্তচাঞ্চল্য-নিবন্ধন মানসিক তত্ত্বাভ্যাসে অসমর্থ হইলে তত্ত্ব-প্রতিনিধি অবলম্বনীয়।

'যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
গুড়াদ্রর্কং তদা দদ্যাৎ তাম্রে বারি পুজেন্মধু॥'
—তন্ত্রকুলচূড়ামণি।

মাংসাদি প্রতিনিধি লসুনাদি ব্যবস্থাপিতঃ।

পঞ্চম প্রতিনিধি,

'ততস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যা পদাম্ভোজে শ্রেষ্ঠমন্ত্র জপস্তথা'॥—তন্ত্র।

সুতরাং উপায়ান্তরসম্বন্ধে চিত্তসংযমের জন্য মদ্যাদি ব্যবস্থিত হয় নাই। কারণ সংশয়াত্মা সাধকের পক্ষে মদ্যাদি পানে বিপরীত ফলেরই উদয় হয়।

স্থূল-মকার কাহাদের জন্য ব্যবস্থিত এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়িল। কোন রাজকুমার বয়োধর্ম্মে বালস্বভাব-সুলভ চাপল্যপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি, লেখাপড়ার নাম পর্য্যন্তও তিনি শুনিতে পারিতেন না। কত সুযোগ্য শিক্ষক তদীয় শিক্ষাবিধানে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে এক সুদক্ষ চতুর শিক্ষক রাজকুমারের শিক্ষাভার গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় রুচি-অনুযায়ী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুত্র কপোত লইয়া ক্রীড়া করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। শিক্ষক বর্ণমালার সংখ্যানুযায়ী কপোতবৃদ্ধির আদেশ দিলেন। কুমার শিক্ষকের কার্য্যে নিরতিশয় আহ্লাদিত এবং তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। শিক্ষক কুমারের ক্রীড়ানুরক্তি দর্শনে সুযোগ বুঝিয়া কপোতগুলির এক একটি নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, কুমার সানন্দচিত্তে তাঁহাকেই সে ভার অর্পণ করিলেন। সুচতুর শিক্ষক এক একটি বর্ণমালার নামানুসারে প্রত্যেক কপোতের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ফলে ক্রীড়াচ্ছলে কুমারের বর্ণশিক্ষা হইয়া গেল। এবং এই প্রণালীতে ক্রমশঃ স্বরসমাবেশ, বানানশিক্ষা এবং শব্দার্থে ব্যুৎপত্তি-লাভ হইল। এইরূপে শব্দার্থজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কুমারের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া অচিরকালমধ্যে তিনি একজন পণ্ডিত-পদ বাচ্য হইয়া উঠিলেন। আমাদের তত্ত্বদর্শী তন্ত্র-বক্তাকেও সেইরূপ সাধারণ-মানব-সম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত প্রকার নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও শাসন-সীমার বিস্তৃতি অনুসারে তাঁহাকে নানা ভাবের ভাবুক ও নানা রসের রসিক হইয়া কার্য্যস্থলে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পার্থিবপ্রধান মনুষ্যেরা স্বভাবতঃই মদ্যপ্রিয়। আপ্যপ্রধান ব্যক্তিরা মাংসলোলুপ। তৈজসপ্রধান লোকেরা, মৎস্যভোজী। বাতপ্রধান লোকের মুদ্রাপ্রিয় আর নভঃপ্রকৃতিক মনুষ্যেরা মৈথুনপ্রিয় হইয়া থাকে। তাই সাধারণ জনসমূহের প্রকৃতিগত রুচি-অনুসারে ইন্দ্রিয়ভোগ্য লালসার বস্তু-পঞ্চককেই সাধনার আদি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরা হাতে হাতে স্বর্গলাভ করিল। তন্ত্রের বিজয়কেতনমূলে সমবেত হইয়া ভারতের হিন্দু নরনারী অবিলম্বে তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের দেহের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপিণী সুষুপ্তা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি যে পর্য্যন্ত না জাগরিতা (স্বেচ্ছা পরি-চালিতা) হন, সে পর্য্যন্ত বেদ-বেদান্ত-দর্শন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেও সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী যোগ, তপস্যা, পূজা ও অর্চ্চনার দ্বারা আমাদের পশুত্বের বিলোপ, হৃদয়ের মোহ-কালিমা বিদূরিত বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে না। স্বার্থের কলুষপঙ্কিল হৃদগর্ভে আমরা নিমজ্জিত থাকিবই থাকিব। পরানন্দের নির্ম্মল আলোকরশ্মি কখনই আমাদের চিরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইবে না। তাই তন্ত্র বলেন,—

'মূলচক্রে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥—তন্ত্রসার

সাধনমার্গের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধনচেষ্টা। ইহার অভাবে গৃহী বা উদাসী অথবা শাক্তশৈব, বৈষ্ণব যে সম্প্রদায়ের যে কেহ হউক না কেন, কোন বাহ্য বেশভূষা-ধারণ বা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এই শক্তির সচেতনতার অভাবে আমরা বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক সকল ক্রিয়ারই অধিকার হারাইয়া কেবল বিষহীন উরগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। এ ত গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা, লৌকিক জগতেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সংসারের নির্ম্মল পবিত্র সুখ যে দাম্পত্যপ্রণয়, তাহার মূলীভূতা পত্নীশক্তি যাঁহাদের স্বাধিগত নহে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপভোগেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত করিতে হয়। আনন্দানুভব তাঁহাদের অদৃষ্টে বড় একটা ঘটে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কুণ্ডলিনী-শক্তির আধার সুষুম্না যে পর্য্যন্ত শ্লেষ্মা-ভিভূত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বর পরিষ্কার ও কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইবেন না। যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুষুম্না পরিষ্কারের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গুরূপদেশ অনুসারে তাহার কোনও একটির অনুষ্ঠান করিলে, কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এই সুষুম্না পরিষ্কারের জন্যই সম্ভবতঃ

অন্যতম উপায়রূপে তন্ত্রে মদ্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে মদ্যের শ্লেষ্মানাশক ও স্বরপরিষ্কারক শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাতশ্লৈষ্মিক, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মদ্যসেবনের ব্যবস্থাও আছে। ঈদৃশ ক্ষেত্রেই "ঔষধার্থং সুরাং পিবেৎ" বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার সুরাপানের বিধান দিয়াছেন। সুতরাং সংসাররোগাক্রান্ত শ্লেষ্মাভিভূত তামসিক ব্যক্তির সুষুম্না ও স্বর পরিষ্কারার্থ মদ্যপানের ব্যবস্থা-প্রদান অসঙ্গত নহে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশ তাহার প্রমাণ।

'মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায়চ।

সেবাতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণায়া চেৎ সপাতকী'॥—মহানির্ব্বাণ।

ফলে, লালসাচঞ্চল ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য যাঁহারা মদ্যপান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তন্ত্রকার বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে 'তৃষ্ণায়াচেৎ সপাতকী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথাযুক্তভাবে প্রযুক্ত হলাহল কালকূটও সময়-বিশেষে অমৃতের ন্যায় উপকার করে, আবার অপপ্রয়োগে পরম কল্যাণকর অন্নরসও মানবদেহে প্রবেশ করিয়া জীবন-নাশের কারণ হয়। ফলতঃ অধুনা উচ্ছৃঙ্খল মানব-সমাজ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক যেরূপ অমিতাচারিতার পরাকাষ্ঠা অবলম্বনে সমাজ ও ধর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছে, তজ্জন্য তন্ত্র অপরাধী নহেন—অপরাধী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি।

বর্ত্তমান তান্ত্রিক সমাজে বালক জন্মমাত্র বামাচারী বীর এবং শৈশব উত্তীর্ণ না হইতেই কৌল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মদ্য না হইলে, তাহাদের নবজাত বালকের জন্ম-সংস্কার সুসম্পন্ন হয় না। তন্ত্র কিন্তু এইরূপ অবৈধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। একটির পর একটি, এইরূপ স্তরে স্তরে ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে আরোহণের কথাই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

'আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং।

বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং॥

তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং॥'

—রুদ্রযামল।

পক্ষান্তরে মদ্যপান করিলেই যে বীর হওয়া যায় না, তন্ত্র মুক্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তন্ত্র বলেন—

'সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো নবীরো মদ্যপানতঃ'।—তন্ত্র।

কিন্তু এক্ষণে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমরা মনে করি, "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পপাত ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন স্থূলবুদ্ধি ইন্দ্রিয়পরায়ণ কপটীদের ব্যবহারে তান্ত্রিক উপাসক-সম্প্রদায় কলঙ্কিত ও তন্ত্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। বেদের "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি প্রত্যাম্নপ্রাণিত ও "নকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।" "নচ প্রাণি-বধঃ স্বর্গ্য স্তস্মান্মাংসং পরিত্যজেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিনিষিদ্ধ বাক্যে অবৈধ প্রাণিহিংসা দূষণীয় হইলেও "বায়ব্যাং * * * ছাগং মালভেত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ও "দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসংন দুষ্যতি" ইত্যাদি স্মৃতিসম্মত প্রমাণে বৈধহিংসা সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয় না। বেদান্ত দর্শনের বৈধহিংসা বিচারেও ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মীমাংসিত ও সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরবতারণা অনাবশ্যক।

অধুনা দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে বলি উঠাইয়া দিয়া সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অনেকেই বদ্ধপরিকর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে যে, অকালে ও অস্থানে অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া মহাপ্রাণিহত্যার স্রোত প্রাবৃটের বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় খর বেগে প্রবাহিত হইয়া প্রতিনিয়ত মানব-সমাজের কি মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। শুধু দেবোদ্দেশ্যে বলি উঠাইয়া দিলেই অহিংসুক হওয়া যায় না।

গীতা বলেন,—'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়াণি বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥'

অর্থাৎ আসক্তিবশতঃ মনে মনে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সত্ত্বেও দৃশ্য কর্ম্মত্যাগ করাকে মিথ্যাচার বা কপটাচার কহে। ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ ইহা অতীব দূষণীয়।

'যস্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ সবিশিষ্যতে॥'

মানসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমপূর্ব্বক অগত্যা-কল্পে ইন্দ্রিয়ের সেবা করাও কপটাচার হইতে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ আন্তরিক হিংসাবৃত্তির নিরোধই অহিংসা এবং হিংসার আসক্তি নিবৃত্তি

হইলে অহিংসার ফলভূত বৈরতাও প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।'

—পাতঞ্জলদর্শন।

অর্থাৎ অহিংসার প্রতিরোধ হইতে বৈর-নিবৃত্তি সঞ্জাত হয়। সুতরাং আন্তরিক হিংসাবৃত্তি বিদ্যমানে বৈধ-হিংসার নিয়মে বাধ্য থাকিয়া ক্রমশঃ সংযম অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন কোন তৈল ঔষধ প্রস্তুতার্থ জীব-হিংসার আবশ্যক হয়। বহু প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্য এ স্থলে জীবহিংসা সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। সেইরূপ তন্ত্রকারও আপাপ্রকৃতিক লোকের সৌষুম্নরোগে স্বর-বিকার ও কুণ্ডলিনী শক্তির সুষুপ্তি-ঘোর নিরাময়ার্থ মাংস ব্যবস্থা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদেও মাংসের বাতশ্লেষ্মজ স্বর-বিকৃতি-বিদূরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'মকতাং মিমিনতঞ্চ গদগদার্দ্দিতকে তথা।'

মহর্ষি মনু অসকৃৎ মদ্যমাংস নিষেধ করিয়াও মানবীয় নৈসর্গিক প্রবৃত্তির অনুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

'ন মাংসভক্ষণে দোষো নমদ্যে নচ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥'

সুতরাং ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, অগণা মাংসলোলুপ মদ্যাসক্ত বাবাজী বিলাসীদিগকে আশ্রয়-প্রদানের জন্য মনু এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। মৎস্য ও মুদ্রা, মদ্যমাংসের আলোচনার অন্তর্নিহিত বলিয়া পৃথক্‌ভাবে আর তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা পঞ্চমতত্ত্বই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। বেদে আকাশপ্রকৃতিক অতিস্ত্রৈণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের জন্য পত্নী প্রতীক নামক এক উপাসনা বিধি দৃষ্ট হয়। বেদান্তের প্রশস্তি সংগ্রহকার পঞ্চদশী তাহার অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরাণকারও তাহার প্রতিধ্বনি করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই বেদকথিত স্মৃত্যনুবৃত্ত পুরাণতত্ত্ব তন্ত্রসম্মত শেষ মৈথুন-তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। কাজেই ইহা তন্ত্রের নিজস্ব হইলেও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে। একটু পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী অতি সহজে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসলীলা তান্ত্রিক মকার-সাধনের অত্যুত্তম উজ্জ্বল উদাহরণ। রাসলীলায় তন্ত্রের সেই নির্জ্জন নিশীথ রজনী, নয়নাভিরাম নিকুঞ্জ কানন, অনঙ্গ-বিনোদন উপকরণ পরকীয়া-শক্তি গোপকন্যা, আর সেই সুষুম্নার কলগম্ভীর স্বরে কামবীজ জপ সকলই আছে। "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" বামদৃশ দীর্ঘঈকার চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন অৰ্দ্ধচন্দ্র (নাঁদ) তদীয় হরণকারী কলং বলিতেই ক্লীং বা কামবীজ এবং বেণুই সুষুম্না। ফলতঃ শ্লেষ্ম-দোষহীন পরিষ্কার সুষুম্নসাধক স্বতঃই কলগম্ভীর-বংশী-নিনাদবৎ সুমধুরভাষী। তাই এস্থলে জপই বেণু-স্বরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য রাসলীলায় শক্তি-শোধনের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু গোপিকাদিগের ন্যায় ভগবৎপ্রেমোন্মত্তা স্বভাবশুদ্ধা নায়িকার শোধনের আবশ্য-কতা তন্ত্রেও বিহিত হয় নাই। সুতরাং তন্ত্রোক্ত মকার-সাধনের অনুরূপ পৌরাণিক রাসলীলা মকারসাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে ইহা ধর্ম্মের অঙ্গীয় কি না সন্দেহের বিষয় বটে। আর এ সংশয় নূতন নহে। মহা-রাজ পরীক্ষিত এ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেন, তাহাতে সন্দেহের আভাষ বেশ উপলব্ধি হয়।

'সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্যচ।

অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।

প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥'

—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

*　*　*　*　*

সুতরাং এ প্রকার অনুষ্ঠান যে তৎকালে নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত না, এমত নহে। শ্রীধরের উক্তিমতে যদি কামবিজয়-খ্যাপনার্থ এই লীলা-রহস্যের অবতারণা হয়, তাহা হইলেও কামবিজয়ে বিলাসলীলার প্রশ্রয় প্রদান—অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য ঘৃতনিষেকের ব্যবস্থার ন্যায় সর্ব্বথা হাস্যজনক।

কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, রাসলীলায় লালসাপূর্ণ পার্থিব পাশব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রাসলীলায় কামপ্রবণতার প্রধান ধর্ম্ম নায়িকানুকরণ দৃষ্ট হয় না বরং তাহার বিপরীত তনুমন-সমর্পণপ্রয়াসিনী উন্মনা গোপিকা-গণকে পরানন্দ লাভের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে সমাগতা দেখিতে পাওয়া যায়। নায়িকা

বাহুল্যও ভাববৈপরীত্যের অনুদ্যোতক। বিশেষ কামুকদিগের অবলম্বিত সনাতন প্রলোভন প্রথাও এক্ষেত্রে সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বরং সমাগত গোপললনাগণের চিত্তপরীক্ষার্থ তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্তির ছলে ভগবান্ বলিতেছেন,—

'দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভি রপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥'—ভাগবত।

এইরূপে প্রতিসিদ্ধা গোপিকারা বলিতেছেন,—

'যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ,
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেব মেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে।
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥'

অর্থাৎ হে প্রিয়তম ধর্ম্মবিৎ! তুমি পতিপুত্রসুহৃদের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু দেহধারী মাত্রেরই তুমি একমাত্র বন্ধু, আত্মা ও পরমপ্রিয়তম; অতএব উপদেশদাতা তোমাতেই তাহা সম্পন্ন হউক। অর্থাৎ পতিপুত্রাদির আত্মারূপে তুমিই বিরাজিত সুতরাং তোমার সেবাতেই আমাদের সে কার্য্য সফল হইবে। তথাপি শ্রীভগবান্ তাহাদের চিত্তপরীক্ষার্থ বলিতেছেন,—

'শ্রবণাৎ দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥'

আমার শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং ভাবানুকীর্ত্তন যেরূপ আশুফলদায়ক, মৎসন্নিকর্ষ (সংযোগ-বিশেষ) তত সহজ ফলপ্রদ নহে। অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হও। অবশ্য কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞানহীন, স্বার্থাপহতচেতন, অবিবেকী কথকের কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যার ফলে সরল বিশ্বাসিজনের স্বচ্ছ অন্তঃকরণে এ সম্বন্ধে কুৎসিত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে সত্য কিন্তু সে জন্য শাস্ত্রকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। তাদৃশ মূঢ়চেতা অনধিকার-চর্চ্চাকারিগণই সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সহৃদয় পাঠক বলুন দেখি, কোন্ কামাপহতচেতন ব্যক্তি লালসার প্রবল পীড়ন উপেক্ষা করিয়া এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ বাক্যে স্বেচ্ছায় স্বয়মাগত নায়িকাকে নিবারণ করিয়া স্থৈর্য্য, ও গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সমর্থ? গোপীরাও সাধারণের দৃষ্টিতে জারসঙ্গতা বিবেচিত হইলেও সামান্য নায়িকা নহেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিতেছেন শুনুন,—

'নোচেদ্বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা।
ধ্যানেন যামোপদবীং পদয়োঃ সমেতে॥'

—ভাগবত।

হে সখে! যদি তুমি আমাদিগকে সাধনসঙ্গিনী না কর, তাহা হইলে বিরহানলদগ্ধ দেহ বিশুদ্ধ হইয়া ধ্যানেই তোমার পদবী প্রাপ্ত হইব। ইহা শুধু তাহাদের কথার কথা নহে, কার্য্যতঃ তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে।

'অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠ-বিরহতীব্রতাপধুতা শুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যাক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাঽপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥'

ভাবুক পাঠক! একবার অন্তর্নিবিষ্ট মনে গোপীদের ভাবের সহিত নিজ ভাব ঐক্য করিয়া দেখুন দেখি, ইহা কি কামুকীর কামাভিনয়, না সাধনাসিদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তির চরম উৎকর্ষ? পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ চিত্র বিরল নহে কি? কৃষ্ণ দেখিলেন, গোপীরা পরমাত্মভাবে বিভোর হইয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। উপযুক্ত বিবেচনায় তিনি তখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার মূলে ভুল নাই। চঞ্চল গোপাঙ্গনাগণ যেমন ভ্রমে পতিত হইয়া "আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽহ্যধিকং ভুবি।" অমনি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

'তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥'—ভাগবত।

আবার বন-ভ্রমণে ক্লান্তিবশে যখন গোপিগণ আত্মসুখবিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণলাভ বা পরমার্থ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ঘৃণালজ্জাদি পাশপঞ্চক ছেদন করিলেন, তখনই প্রকৃত সাধনসঙ্গিনীরূপে পরিগৃহীত হইলেন। "তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ।" আবার সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথনকারী—কৃষ্ণ তখন আবির্ভূত হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাসলীলার বাহ্যানুষ্ঠান

দর্শনে প্রত্যক্ষ কাম বিকারানুকারী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মূলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।"

আপন ছায়ার সহিত ক্রীড়াসক্ত শিশুদের ন্যায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত রমাপতি আত্মশক্তির প্রতিচ্ছায়া-জ্ঞানে ব্রজ-সুন্দরীদের সহিত তাদৃশ ক্রীড়া-নিরত হইলেন। শ্রীধর ইহার ব্যাখ্যায় কামজয়োক্তি বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

এই যোগজ সুখ যে, দাম্পত্য মিলন-সুখের অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা ভুক্তভোগী সাধক ছাড়া বুঝিবার ও বুঝাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। একবার এই রসে নিমজ্জিত হইতে পারিলে, আর পার্থিব যোগজ সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কামভাবও সমূলে নির্ম্মূল হয়। সুতরাং ইহাকে কামজয় না বলিয়া আর কি বলিব? এ সকল সাধনা-গম্য সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের ধারণাতীত সত্য কিন্তু তা বলিয়া আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের ন্যায় রাসলীলাকে পাশবলীলার পরাকাষ্ঠা বা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা মনে করিতে অসমর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায়, দীর্ঘকাল এই ক্রীড়া চলিতেছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ-সংযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সন্তানসন্ততিজননের কথা উক্ত গ্রন্থের কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং রাসলীলা যে মন্মথবিকারের পরিচায়ক নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। বিশেষতঃ ঔপপত্য তৎকালে গুরুতর দোষাবহ বিবেচিত হইলেও স্ত্রীকন্যাগণকে পাপপথে পরিচালনের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ না করা কখনই সম্ভবপর নহে।

যুগমাহাত্ম্য এবং অনধিকারী দুর্ব্বৃত্তদের যথেচ্ছাচারিতার ফলে প্রকৃত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া, আজ তন্ত্রের এতাদৃশী দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, পাশ্চাত্য মনীষিবর্গ তন্ত্র সার-সত্যের অনুসন্ধান পাইয়া, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সাধনায় যথেষ্ট উন্নতিলাভও করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধি করুন—পৃথিবীর মঙ্গল হউক। তবে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয় যে, কন্দর্প বিজয়ের কি আর অন্য উপায় ছিল না, যাহার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই অশ্লীল ঘটনার অবতারণা করিতে হইয়াছিল? ছিল বৈকি।

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
নতথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"

—ভাগবত।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপায় অনেক বিদ্যমান আছে। বরং "নতথা সন্নিকর্ষেণ"—সংযোগজ উপায় সেরূপ নির্ব্বিঘ্ন নহে। এই জন্যই এই সকল উপাসনা অতি সংগোপনে অন্যের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠানের বিধি। সেই শাস্ত্রাদেশ অবহেলার ফলেই এই বর্ত্তমান দুর্গতি। যাহা হউক, মূল গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক।

"রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাংচৈব দুরাত্মতাম্॥"

—ভাগবত।

সর্ব্বশেষে উত্তর,—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

—ভাগবত।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"নন্বেবঞ্চেদাপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ আপ্তকামস্যেতি— শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোঽতিবহির্ম্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাব।" সুতরাং স্পষ্টই কথিত হইল যে, আদিরসসমাযুক্ত অতি-বহির্ম্মুখ বিষয়ীদিগকে আত্মপরায়ণ করিবার জন্য আদর্শ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লোকলোচনের কণ্টকস্বরূপ রাসলীলা অর্থাৎ তান্ত্রিক মকার-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে, মকার-সাধনের উন্নত-প্রণালী কি? যেরূপ শর্করাদি উৎকৃষ্ট মধু-দ্রব্য না দিয়া কদলীলোলুপ পিপীলিকার কদলা-প্রবণতা নিবারণ করা যায় না, তদ্রূপ কেবলমাত্র শুষ্ক উপদেশের দ্বারাও জীবের আসক্তি বারণের চেষ্টা করা বৃথা। শৈশবে ও বাল্যে ধূলি-খেলায় প্রমত্ত এবং যৌবনে যুবতী রসরঙ্গে নিমজ্জিত জীবকে তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর রসের আস্বাদ দিতে না পারিলে, তাহাকে সে আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত করা সম্ভবপর নহে।

শৃঙ্গার ও মধুর রসের মিষ্টত্ব, বিষয় রসের রসিক মানুষ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। অন্য রসের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন কিংবা অসংস্পৃষ্ট দূর ব্যবস্থাপনের দ্বারাও

তাহার চিত্তহরণ সম্ভবপর নহে। সকল প্রযত্ন, সকল চেষ্টা, স্রোতোমুখে নিক্ষিপ্ত তৃণ-খণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। সুতরাং তৈলাক্ত পলিতা সংযোগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অগ্নি লওয়ার ন্যায় ভোগের মধ্য দিয়া সংসারাসক্ত জীবকে মুক্তিপথে আকর্ষণের জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি। এবং এই উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক তন্ত্রকার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে মানুষের প্রকৃতি ও আসক্তি-অনুযায়ী মকার-সাধনের বিধান করিয়াছেন; যোগিজন-দুর্লভ মহাযোগজ পরমানন্দ হ্রদে লইয়া যাইবার জন্য জীবের প্রবৃত্তি-স্রোতস্বতীর সহিত মকাররূপ প্রণালী খননপূর্ব্বক পরস্পর সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। ইহাই তন্ত্রের বিশেষত্ব।

আগমনী

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

ঐ দেখা যায় মা তোর রথের চাকা
ইন্দ্রচাপের বাঁকের 'পরে রাখা—
চূড়ার ধ্বজা সুনীল আকাশ ভেদি
গেছে সে কোন্ পুরে—
হয়ত সুদূর নীহারিকাও ছেদি
অজ্ঞাত সুদূরে;
দখিণ হাওয়ায় চামর ঢুলায়, গন্ধ আসে ভেসে,
জ্যোৎস্না ধারায় মা তোর হাসি ধরায় পড়ে' এসে।
কালো দীঘীর কালো জলের তলে
পাতা' আছে ঘটটি কালো জলে
চূর্ণ ঢেউয়ের হাজার হাজার শিরে
জ্বল্‌বে শতে শতে
চন্দ্রহার আর সূর্য্যহারের হীরে
মা তোর কটি হ'তে;
অশোক চাঁপা কদম বনে লক্ষ জোনা'ক জ্বলে
তুল্‌বে গড়ে' মাথার মুকুট পর্‌বি মা তুই বলে'।
শানাই বাজায় শীশে শ্যামার দলে
মৃদং বাজায় ঝিল্লী মাটির তলে;
কৃষ্ণচূড়া বর্ষে লাজের রাশি
সর্জ্জ জ্বালায় ধূপে,
সন্ধ্যামণির রক্তাধরের হাসি
দীপারতির রূপে;
মিথিলখানি ভোগমন্দির মা তোর তরে গড়া'
বিশ্ব-মানব প্রাণের পাত্রে, অর্ঘ্য-ভক্তি-ভরা।

ধান্য দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপাতে,
চন্দন আর রক্ত জবার সাথে,
ভুবন তোমার রচে পূজার ডালা
শরৎ পুরুৎ সেরা
মানব জাতির দুখের মুক্তামালা
কণ্ঠে মা তোর বেড়া'।
মূর্ত্তিমতী মা আজ ভবে—দেখ্‌রে আঁখি চেয়ে,
বিরাটরূপা জগদ্ব্যাপী নগরাজের মেয়ে।

শাঁখের ধ্বনি চাষার হর্ষ গানে
ভোগ-আরতি বাধ্‌লে জঁটা ধানে,
জীবন-মরণ সন্ধি দিতে করে'
মায়ের চণ্ডী গীতা,
বিশ্ব-জনে অন্ন দিবার তরে
মা আজ উপনীতা!
গোধন-চরা' শ্যামল মাঠে মা তোর পূজার পীঠটি—
অন্নপূর্ণা, অন্ন দিয়ে বাঁচাও তোমার সৃষ্টি!

আন্‌বো লুটে মানস-সরসখানি
ইন্দীবরের সজ্জা—
অকাল-বোধন পূরাও, শিবরাণি,
রাখ' হীনের লজ্জা।
দিগ্বিদিকে বিস্তারিত তোমার দশটি হাতে—
বিশ্বভরাও বরাভয়ে—পুষ্প-রেণুর সাথে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাপানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, B. A.]

জাপান-সাম্রাজ্যের উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে একটা ধারণা আছে, সম্প্রতি মিঃ সি. ভি. সেল্ মহোদয় রয়াল্ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ সোসাইটীর সভ্যগণের সমক্ষে পঠিত একটি প্রবন্ধে গণিত-সাহায্যে সে ধারণার অমূলকতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাপানের জন-সংখ্যা সম্বন্ধে জাতি-সাধারণের একটা ধারণা এই যে, তাহা নিয়তই অতি দ্রুত-বর্দ্ধনশীল। মিঃ সেল্ কষিয়া মাজিয়া দেখাইয়াছেন, যদিও জাপানে জন্ম-সংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু মৃত্যু-সংখ্যাও অনুপাতে খুবই বেশী। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু সংখ্যা উভয় খতাইয়া দেখিলে, মোটের উপর তথায় লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অনুপাতে যুক্তরাজ্যের লোক-বৃদ্ধির পরিমাণ যে সমধিক, তাহা এই দুই স্থানের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা মিলাইলেই সহজে বুঝা যায়। তবুও কিন্তু বৃটেন্-বাসীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাপানে নিয়তই লোক বৃদ্ধি হইতেছে, আর ব্রিটেনের হ্রাস হইতেছে। পরিধি উভয় রাজ্যেরই প্রায় সমান—জাপানের ১,৪৮,০০০ বর্গ মাইল; যুক্তরাজ্যের ১,২১,০০০ বর্গ মাইল। জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় ৫,০০,০০,০০০ এবং যুক্তরাজ্যের ৪,৬০,০০,০০০। শ্রমশিল্পাদিতে কোন্ রাজ্য অধিকতর উন্নত, তাহা বলাই বাহুল্য। মিঃ সেল্ এ সম্বন্ধেও অঙ্কপাত করিয়া, সে বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে কৃষিটাই ধরুন; জাপানে এই সম্পর্কে যে লোক নিযুক্ত আছে, তাহাতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, অনুপাতে তাহা যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেক কম। অবশ্য, আনুমানিক মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি ইহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপাদিত পার্থক্যটা নিতান্তই বিষম। জাপানে মজুর, কৃষক, ক্ষেত্র-স্বামী প্রভৃতিতে ১,১৫,০০,০০০ জন লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত আছে; তাহাদিগের কর্ত্তৃক উৎপন্ন ফসলের মূল্য প্রায় ১২,৬০,০০,০০০ পৌণ্ড। যুক্তরাজ্যে কৃষিকার্য্যে ২০,৫৪,০০০ জন লোক নিযুক্ত আছে; আর তাহারা ১৭,৫০,০০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের ফসল উৎপাদিত করে। মূল্যটা অনুমানে ধরা হইয়াছে বলিয়া যতই কেন ইতর-বিশেষ হউক না, পার্থক্যের পরিমাণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জাপানে লোকের পরিশ্রমটার বড় অযথা ব্যয়, অর্থাৎ অপব্যয় হইয়া থাকে—পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ হয় না। মিঃ সেলের অভিমত, জাপানের ক্ষেত্রগুলি ছোট ছোট বন্দে বিভক্ত বলিয়াই পরিশ্রমের অত্যধিক অপব্যয় হইয়া থাকে। জাপানী কৃষি-ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রগুলি এতই ছোট, যে সেগুলি হইতে যে আয় হয়, তাহা হইতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত হয় না, যাহাতে কিছু মূলধন সঞ্চিত হইতে পারে; অথচ তেমন মূলধন না হইলে হস্তশ্রম-লাভাকর কলকব্জা যোগাড় করাও ঘটে না। ছোট ছোট ক্ষেত্রে আর একটা মহা অমিতব্যয় হয়—জাপানে এক একর পরিমিত ধান্যক্ষেত্রে এক ব্যক্তির পক্ষে ১১০ দিবস পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয়, অথচ আমেরিকার টেক্‌সাস্ বা লুইসিয়ানা প্রদেশে সেই কার্য্যের জন্য একটা লোক দুই দিন মাত্র অথবা একজোড়া ঘোড়ার সাহায্যে দেড়দিন মাত্র পরিশ্রম করিলেই যথেষ্ট হয়। প্রভেদটা—শ্রম অপব্যয়ের পরিমাণটা—বুঝিয়া দেখুন! কোথায় দুই দিন—আর কোথায় এক শত দশ দিন! তবে এখানে সত্যের মর্য্যাদার খাতিরে একটা কথা বলি,—মিঃ সেল্ ইংলণ্ড ও জাপানে কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্রের পরিমাণে যে বিষম ইতরবিশেষ বর্ত্তমান এবং জাপানে ঘনভাবে বপন করায় ফসলের যে হানি হয়, এই দুইটী প্রধান বিষয় ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। অথচ তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে যাবতীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয়।

শিল্পশ্রম-ক্ষেত্রেও জাপানী ও বিলাতী শ্রমের কার্য্য-

কারিতার প্রভেদ কি, মিঃ সেল্ তাহাও হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। ১৯০৭ সালে জাপানী বস্ত্র শিল্পের কারখানাগুলিতে মোট ৩,৫৫,০০০ জন শিল্পী নিযুক্ত থাকিয়া ৩,৮০,০০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের পশমী ও সূতি বস্ত্র, গড়ে প্রত্যেক লোকে ১০৮ পৌণ্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত করিয়াছিল। যুক্তরাজ্যে ঐ সালে ৮,০৮,০০০ জন উক্ত শ্রমশিল্পী মোট ২৪,৭০,০০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি শিল্পী ৩০৬ পৌণ্ড মূল্যের মাল প্রস্তুত করিয়াছিল। অবশ্য জাপানী অপেক্ষা বিলাতী মাল উৎকৃষ্ট বলিয়া সেগুলি কতকটা উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই উৎকর্ষও বিলাতী শিল্পীর কার্য্যকারিতার অন্যতম পরিচয়।

জাপানী শাসনতন্ত্রের রক্ষানীতি সম্বন্ধে মিঃ সেল্ বলেন, যদিও এই রক্ষানীতি প্রথমাবস্থায় স্থানীয় শিল্পশ্রম, ও জাতীয় জাহাজাদি প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছিল বটে কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সমগ্র জাতির উপর একটা দুর্ব্বিসহ ভার চাপাইবার কারণ হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে জাপানী গবর্ণমেণ্ট জাতীয় জাহাজগুলির স্বত্বাধিকারিবর্গকে বার্ষিক ১৩,০৫,০০০ পৌণ্ড সাহায্যকল্পে প্রদান করিয়া থাকেন। এই সাহায্য-প্রদানের উদ্দেশ্য, যাহাতে জাপানী জাহাজওয়ালারা জাপান-জাত দ্রব্যাদি স্বল্প ভাড়ায় দেশবিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। অধিকন্তু জাপানী জাহাজওয়ালারা গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি এই সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ফলে, এই সাহায্যের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। "নিপ্পন্ ইউসেন্ কোম্পানী" (Nippon Yusen Co.) জাপানের একটী বিশিষ্ট জাহাজওয়ালা সমিতি। ১৯০৯ সালে এই কোম্পানী অংশীদারগণকে মোট ২,২৪,০০০ পৌণ্ড মুনাফা হিসাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ সালে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ৬,৬৫,০০০ পৌণ্ড সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ জাপানী করদাতৃগণকে কেবল যে এই কোম্পানীর সম্ভাবিত ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে তাহাই নহে, উহার অংশীদারদিগকে মুনাফা দিবার জন্য যাবতীয় অর্থও সঙ্কুলান করিয়া দিতে হইয়াছে। মিঃ সেল্ বলেন, যে সকল জাপানী জাহাজওয়ালা গ্রহবৈগুণ্যে এই সাহায্য-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত, তাহারা ইহার মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের এই রীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আরও বলেন, যে পরিমাণ অর্থ এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে জাহাজওয়ালাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে, সেই অর্থ রেলপথ ও টেলিফোনাদি প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয়িত হইলে বিশেষ কার্য্যকর হইত। ফলে, এগুলিও দেশের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।—সংক্ষেপতঃ মিঃ সেলের মন্তব্য এই যে, যদিও জাপান, দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার উন্নতিতে অপরাপর ব্যবসাদার জাতির পক্ষে ভীত বা দ্বেষপরবশ হইবার অণুমাত্রও ভিত্তিমূলক কারণ নাই।

ভারতের দুর্ভিক্ষ

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, M.A., B.L., F.R.E.S.—London.]

দুর্ভিক্ষ বলিলে সাধারণতঃ আমরা আহার্য্য-সামগ্রীর অভাব বুঝিয়া থাকি। প্রয়োজনানুরূপ অর্থাৎ লোকসংখ্যাদ্বারা পরিমাপ করিলে, যাহা জীবন-ধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ না করিতে পারিলেই এই সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ ঠিক উক্তরূপ নহে। ভারতে দুর্ভিক্ষ যখন হয়, তখনই খাদ্যসামগ্রীর অভাব হয় না। ভারতে দুর্ভিক্ষ অর্থে সাধারণতঃ অর্থাভাব। প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী মজুত থাকিলেও ভারতে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে,—হইয়াও থাকে।

আমাদের দেশে কৃষক শ্রেণীর লোক প্রায়ই ঋণগ্রস্ত, বৎসরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ঋণেই নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, তাহাদের পুঁজি নিতান্তই অল্প, এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কেহ যেন বাঙ্গালা প্রদেশের কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের উক্ত মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা না করেন। নানাকারণে বাঙ্গালার কৃষকজীবন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও স্বল্প ক্লেশকর। বাঙ্গালার জমীস্বত্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক শত কুড়ি বৎসর হইল, কার্য্য করিতেছে।* বাঙ্গালার জমি

* ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক গভর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর বাঙ্গালায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' স্থাপন করিয়া যান।

শিল্পী - শ্রীনবেন্দ্রনাথ সরকার] দলনী বেগম। [মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের অনুমত্যানুসারে

'কেন আসিবেন ? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসী মাত্র।'

—চন্দ্রশেখর।

ভারতের অন্যান্য সর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ; প্রকৃতির স্নেহরস যেন বিশেষ করিয়াই এই প্রদেশকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে কেবল বাঙ্গালাতেই জমীতে জলসেচন-(Irrigation) কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। অপর পক্ষে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনাদিও প্রথম বাঙ্গালার জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।* তদ্ব্যতীত বাঙ্গালার কৃষককুল অন্যান্য প্রদেশের কৃষক অপেক্ষা অধিক ভবিষ্যৎ-দর্শী। এই সমস্ত কারণে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ কম; গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার এ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এবং একবার অন্নকষ্ট (Scarcity) হইয়াছিল (Famine Commission Report, 1880-85).

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা ঠিক এইরূপ নহে। তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই এবং প্রজাস্বত্ব রক্ষণ-বিষয়ক আইনও অতি অল্পদিন হইয়াছে;† এমন কি, প্রজার নিকট হইতে কি হারে কর লইতে হইবে, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাও অনির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লাট কর্জ্জন বাহাদুরই প্রথম এই বিষয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দেন।‡ ঐ বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের কর-সংক্রান্ত মন্তব্যে তিনিই নিয়ম জারি করিলেন যে, জমীদারের ব্যয় ইত্যাদি বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবে (net rent) তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট লইতে পারিবেন; বাকি অর্দ্ধেক জমীদার পাইবেন। এবং রাইয়তি প্রদেশসমূহে (বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আসাম এবং ব্রহ্মপ্রদেশে রাইয়তি নিয়ম প্রচলিত) সমগ্র ফসল (Gross produceএর) এক পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট লইতে পারিবেন। ইতঃপূর্ব্বেও নাকি এই নিয়মই প্রচলিত ছিল; তবে ১৯০২ খৃষ্টাব্দেই উহা প্রকাশিত হইল এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হইল।—উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশের ভূমিও বাঙ্গালার ন্যায় উর্ব্বর নহে; এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটী কারণে উক্ত প্রদেশসমূহের কৃষকের অবস্থাও নিতান্তই শোচনীয়।

কৃষিকার্য্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিষ্প্রয়োজন বহু কার্য্যের জন্য কৃষকগণ মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া থাকে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, তাহারা মহাজনের নিকট চিরঋণী থাকিয়া যায়, ঋণমুক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বীজ বপন করিবার সময় তাহারা ঋণগ্রস্ত হয়; জমী তাহাদের নহে সুতরাং তাহারা জমীর কোনও স্বত্বই মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিতে পারে না। তাহারা কৃষি-বৎসরের পূর্ব্বেই সেই বৎসরের ভবিষ্য-ফসল মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফল এই হয় যে, ভবিষ্য ফসল হইতে রাইয়ত কি পাইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে;* এবং যে হেতু রাইয়ত এবং মহাজন এতদুভয়ের মধ্যে মহাজনই প্রবল, সুতরাং ভবিষ্য-ফসলের মূল্যের হার যে, খুব বেশী রাইয়তের পক্ষে লাভ-জনক হইয়া থাকে, এ কথা আমরা স্থিরনিশ্চয় বলিয়া ধরিতে পারি না।

এইরূপে ফসল পূর্ব্ব হইতেই বিক্রয় করিয়া, রাইয়ত সম্বৎসর তাহার সাধারণ ব্যয় ইত্যাদিও অনেক সময় ঋণ করিয়া সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হয়, পর বৎসর আবার সেই ঋণ, আবার ভবিষ্য-ফসল বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করে। এইরূপ ভীষণ ইহাদের অবস্থা; তদুপরি আবার বার মাসে তের পার্ব্বণও তাহারা যথাসম্ভব পালন করিবার চেষ্টা করে, শ্রাদ্ধাদি করিতে বাধ্য হয়, এবং বিবাহাদি শুভকার্য্যে ব্যয়

---

* ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ম আইন (Rent Act), ১৮৬৯ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার প্রজাস্বত্বরক্ষণের আইন (Bengal Tenancy Act).

† ১। আগ্রায়, ১৮৮১।
২। Central Provinceএ ১৮৮৩।
৩। অযোধ্যা, ১৮৮৬।
৪। Central Provinceএ পুনরায় ১৮৯৮।
৫। আগ্রাতে পুনরায় ১৯০১।
৬। পঞ্জাবে ১৯০৫ (Punjab Land Alienation Act).
৭। মান্দ্রাজ, ১৯০৮ (Madras Land Estates Act).

‡ ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ বহু চেষ্টা করিয়া এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে মত প্রকাশ করিতে একখানি আবেদন করেন (১৯০০); তদুত্তরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লাট কর্জ্জন বাহাদুর Land Revenue Policy of the Indian Government নামে এক Resolution জাহির করেন। উহাই এ বিষয়ে বর্ত্তমান আইন।

* এইজন্য গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৩৪ টাকা করিয়া জিনিসের দর বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও রাইয়ত এই লাভ না পাওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্রই রহিয়াছে, অথচ অন্যান্য দ্রব্য যাহা তাহাকে কিনিতে হয়, তাহারও দর বাড়িয়া গিয়াছে।

করিবার সময়ও আবার মানুষের সহজ আনন্দের বশীভূত হইয়া মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না। †

এইরূপ অবস্থা কৃষকদের। তারপর হয়ত এক বৎসর ফসল কমিয়া গেল, দর চড়িয়া গেল, তখন উপায়? এক মুষ্টি চাউল কিনিবার মতনও অর্থ গৃহে নাই, কোনও প্রকারের পুঁজিও যে তাহাদের নাই। সময় বুঝিয়া মহাজনও কঠিন হইয়া উঠে, কঠিন হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়, কারণ সে যে "লগ্নী" টাকা ফিরাইয়া পাইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? হয়ত সে সম্বৎসরে যাহা ধার দিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের ফসল জন্মায় না, হয় ত খাজনা না দিতে পারার জন্য কৃষকের ভূমিখণ্ড আগামী বৎসরে নাও থাকিতে পারে;—এরূপ অবস্থায় মহাজন ধারই বা দেয় কি করিয়া?

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, খাদ্য সামগ্রীর অভাবই ভারতের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নহে। দেশ-মধ্যে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী মজুত থাকিলেও অর্থাভাবে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে। ভারতের দুর্ভিক্ষ সাধারণতঃ এই প্রকারেরই।

ভারতে শিল্প-সমস্যা

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, M. C. E., M. R. A. S.]

ভারতীয় শিল্পের যে ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে, তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণের সমবেত যত্ন ও সহানুভূতি না পাইলে, দেশের সমুদয় শিল্প একে একে নষ্ট হইতে থাকিবে; পক্ষান্তরে সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে, উহাদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

যে সমস্ত শিল্প প্রতিযোগিতার মহাসংগ্রামে আজও বাঁচিয়া আছে, সেগুলি জনসাধারণের একটু সাহায্য পাইলেই সজীব হইয়া উঠিবে। আমাদের এই বর্ত্তমান শিল্পসমস্যার জন্য বিদেশীয় প্রতিযোগিতা অপেক্ষা আমরাই অধিকতর দায়ী।

ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার পক্ষপাতী নহি। স্বার্থবিজড়িত না থাকিলে কোনও কাজে আন্তরিক যত্ন বা চেষ্টা সকলে করিতে পারেন না। অবশ্য কোনও কোনও মহাত্মা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কোনও কাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে তাহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ না করিলে, আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় না। এই কারণে নিঃস্বার্থপর লোকের পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। একথা বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বেশীদূর যাইতে হইবে না। দেশীয় ব্যক্তি-বিশেষের কারখানাগুলির সহিত যৌথ-কারবারগুলির তুলনা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

আমাদের দেশে যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনের ভার যে শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত হয়, তাঁহাদের আদৌ অবসর না থাকায় ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা কর্ত্তব্য-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন। যাঁহাদিগকে কায়িক পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারা অবৈতনিক (honorary) কাজে যে কতটুকু সময় দিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় দেশের কল্যাণকামী সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, যত দিন দেশের যৌথ-কারবারগুলি প্রকৃত ব্যবসায়িগণ কর্তৃক পরিচালিত না হইতেছে, ততদিন উহাদের উন্নতির কোনও আশা নাই। যে সকল ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন অথবা যাঁহারা রীতিমত ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া উহাতেই জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাই আমাদের এই অসময়ের একমাত্র কাণ্ডারী। এই শ্রেণীর লোকেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ কোন্ শিল্প প্রয়োজন এবং সুবিধাজনক হইবে বলিতে পারেন এবং কিরূপভাবে পরিচালিত হইলে, উহা লাভবান্ হইতে পারে তাহাও তাঁহারা যেরূপ বুঝিবেন, অন্য কেহ সেরূপ বুঝিতে পারিবেন না। এই সমস্ত কারণে কারখানা স্থাপন করিবার সময় এইরূপ লোকেরই আবশ্যক। নতুবা যে সে শিল্প, খেয়ালানুযায়ী আরম্ভ করিলে, তাহার ফলও যে তদনুরূপ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

---

† অধুনা যৌথ ঋণদানপ্রথা প্রচলিত হইয়া কৃষিকার্য্যবিষয়ক ব্যাপারে কৃষকের যথেষ্ট সাহায্য করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯০৪ হইতে এই নিয়ম আইনদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে উৎপন্ন জিনিষও মন্দ হয় নাই। আর কিছুদিন ঐ সকল কারখানা রীতিমত কাজ করিতে পারিলে, তাহারা নিশ্চয়ই বিদেশ হইতে আমদানী মালের ন্যায় উৎকৃষ্ট জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহাদের অধিকাংশই আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবই ইহার কারণ। যাহা হউক, যে গুলি এখনও আছে, তাহাদের সহায়তা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ঔদাসীন্য দেখা যায়। আমাদের আর একটী দোষে কারখানাগুলি স্থায়ী হইতেছে না বা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। আমরা শিক্ষিত শিল্পী দ্বারা কাজ আরম্ভ করিয়া, উৎপন্ন জিনিষ বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইলেই মনে করি, তাঁহাদের কাজ শেষ হইল;—উচ্চ বেতনে শিক্ষিত শিল্পীর তখন আর প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে যে বেতন দিতে হয়, তাহা বাঁচাইলে কারখানার লাভ হইবে। কিন্তু তাহাই কি হয়? অভিজ্ঞতার ফল কি আদৌ নাই? ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে না ছাড়িয়া বরং ক্রমশঃ কারখানার লভ্যাংশ তাঁহাদিগকে দিয়া, সেই সেই কাজে আরও উৎসাহিত করিলে কি কুফলই ফলিতে পারে! যাঁহার দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে, তাহা আজও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে শিখি নাই; সুতরাং কে কিরূপ কাজের লোক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলে এই হয় যে, প্রতিনিয়ত কম বেতনের নূতন নূতন শিল্পী রাখিয়া আমাদের কাজের কোনও উৎকর্ষ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ উহার অবনতি হইতে থাকে।

বর্ত্তমান কঠোর প্রতিযোগিতার সময় প্রস্তুত মাল যত উৎকৃষ্ট এবং সস্তা হইবে, তাহা তত আদরণীয় হইবে এবং সেই ব্যবসায়ে তত অধিক লাভ হইবে। "পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে" কথাটা বোধ হয় নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এদেশের ব্যবসা অধিকাংশ স্থলেই অশিক্ষিত লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহাদের অনেকেরই তাদৃশ ব্যবসা বুদ্ধি নাই। পাঁচ জন দোকানদার একত্র হইয়া কাজ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই, এই কারণে তাঁহারা পরস্পর অন্যায় প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব ব্যবসায়ের অপকার সাধন করেন এবং তৎসঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য এরূপ ভাবে কমাইয়া দেন যে, ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎকর্ষ করা দূরে থাকুক, তাহা প্রস্তুত করিতেও অনেক শিল্পীকে বিরত হইতে হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্বদেশজাত দ্রব্যের উপরই তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহার। এই সমস্ত শ্রেণীর দোকানদারগণ দেশী জিনিষ হইলেই ধারে চাহিয়া বসেন, অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ধারে স্বদেশজাত মাল দিতে হয়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শতকরা পাঁচজন লোকও স্ব স্ব অঙ্গীকার মত টাকা পরিশোধ করেন না। ইহাতে কোন্ বাজারে কি পরিমাণ মাল প্রতিমাসে বা বৎসরে কাটতি হইতে পারে, শিল্পিগণ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই শ্রেণীর দোকানদারদিগকে লইয়া 'ক্লব' ও এসোসিয়েসন করা আবশ্যক এবং তাঁহাদের সামান্য একটু যত্ন ও চেষ্টায় দেশের যে কি প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুগে সমস্ত সভ্য দেশের লোকই স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সেই কারণেই তাঁহারা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশকেই অবশ্য বাধ্য হইয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে। কারণ স্ব স্ব দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের উপর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চ শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় স্বদেশজাত দ্রব্য সেখানে অনেক মূল্যে অর্থাৎ উচ্চ লাভে বিক্রয় হয়। এ বিষয়ের একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকবর্গ সহজে বুঝিতে পারিবেন। 'ঈগল কপিং পেন্সিল' যাহা আমরা ভারতবর্ষে তিন পয়সায় কিনিতে পাই, তাহা আমেরিকায় প্রস্তুত হইলেও তথায় ছয় পয়সায় বিক্রীত হয়; তাহার কারণ এই যে, আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট উক্ত জিনিষের উপর শতকরা ১০০৲ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করায় যে কোনও বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাষ্টম-হাউসেই তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়া যায়, তৎপরে ব্যবসায়িগণের লাভালাভ আছে। এ অবস্থায় বিদেশ হইতে ঐ জিনিষ আমদানী করিলে যে দর হইতে পারে, সেই দরেই দেশে প্রস্তুত মাল বিক্রয় হয়। অর্থাৎ বিদেশী মাল সস্তা

না হওয়ায় আমেরিকাবাসিগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে হয়।

আমাদের দেশেও ঐরূপ ব্যবস্থার অতীব প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্য আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। অবশ্য যে সমস্ত জিনিষ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইয়া এখানে বেশীর ভাগ বিক্রীত হয়, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য জিনিসের উপর আপাততঃ উচ্চ হারে শিল্প ধার্য্য করিতে আমাদের বা গভর্ণমেণ্টের কোনও আপত্তি হইবার কারণ নাই। গভর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে কোনও দেশের শিল্পোন্নতি হইতে পারে না এবং এ পর্য্যন্ত হয় নাই; সুতরাং এবিষয়ে আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের পূর্ণসহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে। এজন্য আমাদের দেশীয় সরকার এবং বেসরকারী সকল সভ্যগণের নিকট একদল প্রতিনিধি (Deputation) যাওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া পরে উহা Councilএ উত্থাপন করাইতে হইবে। যাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে Protective Duty স্থাপিত হয়, এক্ষণে তাহা করাইবার উপযুক্ত সময়।

এই আজ দুই বৎসরও অতীত হয় নাই, আমাদের দুই জন প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি স্যর টি, পালিত এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অজস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান দেশের শিল্পোন্নতির জন্যও আবশ্যক হইয়াছে। দাতৃগণ দেশের সমগ্র বড় বড় সহরে Commercial Museums স্থাপিত করিয়া দিলে, দেশীয় শিল্পের প্রভূত উপকার সাধিব হইবে। শতবৎসর ধরিয়া প্রদর্শনী করিয়া যে ফল না হইবে, কতকগুলি স্থায়ী Commercial Museum স্থাপিত করিয়া দিলে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে অধিকতর কাজ হইবে। ঐ সমস্ত মিউজিয়ম বা যাদুঘরে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জিনিষের নমুনা ও মূল্য পাশাপাশি রাখিয়া দিতে হইবে এবং দেশের কোথায় কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শিল্পিগণ উহা হইতে নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারিবেন এবং জনসাধারণও কোথায় কোন্ জিনিষ কি মূল্যে পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অনেক মেলা ও প্রদর্শনী হইতেছে কিন্তু তাহাতে কি আমরা ঈপ্সিতফল পাইতেছি?

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, অল্লাধিক ১০।১২টী প্রদর্শনী দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রদর্শনী বন্ধ হইয়া গেলে কোথায় কি জিনিষ পাওয়া যায়, আর বলিতে পারেন কি? আমরা জানি, অনেকে স্বদেশজাত জিনিষের প্রাপ্তি-স্থান না জানায়, ইচ্ছা থাকিলেও উহার উৎসাহ দিতে পারেন না। জাপান এবং জার্ম্মাণীর ন্যায় যদি দেশের প্রতি সহরে এই ব্যবসায়ী যাদুঘর স্থাপিত হয় এবং বড় বড় সহর গুলির যাদুঘরে ভাল ভাল Expert Chemists থাকেন, তাহা হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশানুরূপ ফল হইতে পারে। এখন লোকের ঝোঁক অনেকটা শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে। এ সুযোগ ছাড়া আমাদের কোনও মতে উচিত নহে। আমাদের নেতৃবর্গ একটু চেষ্টা করিলেই একার্য্য সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে দেশে যাহাতে শিল্পের প্রবর্ত্তন হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বৃত্তি দিয়া যুবকবৃন্দকে শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাইতেছেন এবং কলা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। এসময় আমাদের সকলেরই উচিত গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত সহায়তা করা।

আমাদের বোধ হয়, প্রথমতঃ কতকগুলি টাকা বিদ্যা-মন্দির প্রভৃতি স্থাপনে ব্যয় না করিয়া, উহা দেশের চলিত কারখানার সাহায্যার্থে দিয়া সেখানে কতকগুলি শিক্ষার্থী পাঠাইলেই চলিতে পারে। উহাতে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথমতঃ যুবকগণ প্রকৃত কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা পাইবেন এবং দ্বিতীয়তঃ কারখানাগুলিও তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাইবেন। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিয়া অনেক যুবকই মূলধন অভাবে বসিয়া আছেন, সুতরাং দেশস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকের আশা কোথায়? তাঁহারা যদি চলিত কারখানায় ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে সেখানেই বেতনভোগী হইয়া থাকিতে পারিবেন।

আজকাল আমাদের দেশে বস্ত্রবয়ন, পটারি, টিন-প্রিণ্টীং ট্যানিং, ডাইয়িং, সাবান, চিরুণী, এসেন্স, বোতাম, পেন্সিল, দেশলাই, মাদুর প্রভৃতি প্রস্তুতের অনেকগুলি কারখানা, হইয়াছে এবং সকলগুলিই একভাবে চলিতেছে। যদি ঐ

সমস্ত কারখানা এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট বা দেশস্থ সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কিছু কিছু বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তথায় যুবকবৃন্দের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং কারখানা গুলিরও আর্থিক অবস্থা ভাল হইতে পারে।

দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির

[শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন]

কান্তজির মন্দির উত্তর-বঙ্গের দিনাজপুর জেলার সদর ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ দূরস্থিত কান্তনগর নামক গণ্ডগ্রামে অবস্থিত। এটি নবরত্ন-মন্দির। মন্দিরটি আগাগোড়া ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহাতে পাথর কিংবা লৌহের কোন সম্পর্ক নাই। মন্দির-গাত্রে ইষ্টক ক্ষোদিয়া বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিসমূহ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও শিল্পীর কৌশলে ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির অবস্থান ও বস্ত্র-সংস্থান নিবিষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই, মুসলমান আমলে বাঙ্গালা দেশে লোকের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ ছিল, আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইষ্টকনির্ম্মিত ইষ্টকক্ষোদিত এমন নিখুঁত সুন্দর, এমন বিচিত্র, এমন কারুকার্য্যময় মন্দির বাঙ্গালা দেশে— শুধু বাঙ্গালাদেশেই বা বলি কেন—জগতে আর কোথায়ও নাই। কি দেশের কি বিদেশের সকলেরই ধারণা, সকলেরই বিশ্বাস, আমাদের যত কিছু উন্নতি, শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যে যত কিছু জ্ঞান, দেশে ইংরাজ-আগমনের পরই তাহার সূচনা—তাহার অভ্যুত্থান; কিন্তু দুইশত বৎসরের প্রাচীন দেশ—ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের নির্ম্মিত বাঙ্গালী শিল্পিগণের এই বিরাট-বিশাল স্থাপত্য ও শিল্পকীর্ত্তির জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিয়াও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কোন্ বাঙ্গালী সন্তান আর সে ভ্রান্ত ধারণায় –সে অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে চাহিবে? আমাদের কথা নয়—যাহাদের কথায় আমরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করি, সেই জাতীয় Dr. Francis Benham বলেন, কান্তজির মন্দিরের তুল্য সুন্দর মন্দির তিনি আর দেখেন নাই। সেই জাতীয় বিখ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিৎ কাউসনের মতে, এই মন্দির 'is of a pleasing picturesque design." এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্যের পর বোধ হয়, মন্দিরের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ করিতে সাহস হইবে না।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন, রাজা প্রাণনাথ—ইনি দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুদত্তের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং উক্ত বংশের বর্ত্তমান সুসন্তান অনারেবল মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ। প্রাণনাথের পিতা রাজা শুকদেবের দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৬০৩ শকে রাজা শুকদেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব রাজা হন; কিন্তু তিনি তিন বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জয়দেব সম্পত্তিপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু ভগবানের এমনই বিধান যে, জয়দেবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদেবের ন্যায় ঠিক তিন বৎসর পরেই ১৬০৯ শকে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রামদেব কিংবা জয়দেবের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তাই পারিবারিক প্রথানুসারে প্রাণনাথই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃত্যক্ত রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। সব্বকালে সর্ব্বস্থানেই ভাল মন্দ উভয় জাতীয় লোকই দেখা যায়। ভাল যাহারা —তাহারা পরের দুঃখে সমবেদনা ও সুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে—আর যাহারা মন্দ, তাহারা পরের দুঃখ দেখিলে উৎফুল্ল হয়—পরের উন্নতি দেখিলে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, এবং কায়মনোবাক্যে তাহাদের মন্দ চেষ্টা করিতে থাকে। সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রাণনাথের রাজ্যপ্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং বৈমাত্রেয় ভাতৃদ্বয়ের অকালমৃত্যুতে তাঁহাকে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া মন্দলোকে ঈর্ষাজর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। রামদেব ও জয়দেব উভয় ভ্রাতাই রাজ্যলাভ করিবার পর ঠিক তিন তিন বৎসর অন্তর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় প্রাণনাথের শত্রুবর্গ তাঁহার নামে দিল্লীর দরবারে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল। আলমগীর তখন দিল্লীর সম্রাট। তিনি প্রাণনাথকে তলব দিয়া পাঠাইলেন। শত বাধা বিঘ্ন, শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া, শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনাথ বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন।

কি সেকাল, কি একাল, কি হিন্দুরাজত্বে কি মুসলমান রাজত্বে, মোকদ্দমা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, আসামী হইলেই যে কোন ভাবেই হউক, তাহাকে রাজদ্বারে কিছু না কিছু দিতেই হইবে। সুতরাং আসামী প্রাণনাথকেও দরবারে যথেষ্ট অর্থ দিতে হইয়াছিল অর্থে কি না হয়? অর্থবলে প্রাণনাথ মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে ত মুক্ত হইলেনই; অধিকন্তু বাদশাহ তাঁহাকে রাজোপাধির সহিত দিনাজপুর রাজ্যের উপর এক ফরমান দিয়া অভিনন্দিত করিলেন। রাজোপাধি ও রাজত্বের ফরমান এবং বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করিয়া ১৬১৪ শকে প্রাণনাথ বিজয়ী বীরের ন্যায় দেশাভিমুখে রওনা হইলেন। এই সময়েই তিনি কান্তজি বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দিল্লীতে অবস্থানকালে প্রাণনাথ একজন প্রধান হিন্দুরাজকর্ম্মচারীর আশ্রয়ে ছিলেন। এই রাজকর্ম্মচারীর গৃহেই 'কান্তজি' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিগ্রহের নয়নাভিরাম সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি দেখিয়া, রাজা প্রাণনাথ বিশেষ আগ্রহ সহকারে আশ্রয়দাতা রাজার নিকট উহা প্রার্থনা করেন। আশ্রয়দাতা রাজার প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিগ্রহটি তাঁহাকে দান করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহা নয়; দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে বৃন্দাবনধামে পূতসলিলা যমুনাজলে স্নান করিবার সময় প্রাণনাথ নদীগর্ভে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত প্রবাদদ্বয়ের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, এখন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; তবে তিনি যে দিল্লী হইতে দেশে ফিরিবার সময়েই বিগ্রহটি সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

দেশে পৌঁছিয়াই রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা প্রাণনাথ কান্তজির জন্য উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশের লোকে তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার স্বাদ পায় নাই। সেকালে রাজারাজড়া ও জমীদারবর্গ একালের রাজ্যহীন রাজা ও শূন্যগর্ভ রায় বাহাদুর গণের ন্যায় উপাধিব্যাধি ক্রয় করিবার আশায় রাজকর্ম্মচারিবর্গের অনুষ্ঠিত বা প্রস্তাবিত, কার্যসমূহের ব্যয় সংকুলান কিংবা নিজ পরিজনবর্গের বিলাসব্যসনাদির উপযোগী উপকরণাদি ক্রয় করিয়াই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। তাঁহারা 'পর-পীড়নেই পাপ—পরোপকারেই পুণ্য'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া, দেবায়তন গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ সদনুষ্ঠান দ্বারা দেশের, দশের ও সমাজের অশেষকল্যাণ সাধন করিয়া, ইহলোকে বিমল যশঃ ও পরলোকে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী হইতেন। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাণনাথ সেকালের লোক ছিলেন। তিনি মন্দির গঠন করিয়া কান্তজির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলেন। রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মন্দিরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজার যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬২৬ শকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসরের বিপুল পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টায় ১৬৪৪ শকে—১৭২২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাণনাথ ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৬৩১ শকে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা প্রাণনাথের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রের নাম রামনাথ। পিতার মৃত্যুর পর রাজা রামনাথ পিতার আরব্ধ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া ১৬৪৪ শকে বহু অর্থব্যয়ে বিপুল সমারোহে এই মন্দিরে 'কান্তজি' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিগ্রহের সেবা, পূজা ও ভোগ প্রভৃতির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বহু সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া পিতার সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া, প্রকৃত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন।

মন্দির গাত্রে একখানি শিলালিপিতে মন্দিরের নির্ম্মাণকাল, নির্ম্মাণ-কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ক্ষোদিত আছে :—

"শাকে বেদাব্ধি-কালক্ষিতি-পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদঞ্চাতিরম্যং সুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্ত তুষ্ট্যৈ সমুচিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজনগরে তাত-সঙ্কল্পসিদ্ধ্যৈঃ॥"

এই বিগ্রহের নাম হইতেই কালে মন্দির কান্তজির মন্দির ও স্থান কান্তনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কান্তজি অতি জাগ্রত দেবতা। প্রতিনিয়ত অখণ্ড বঙ্গের নানাস্থান হইতে বিগ্রহের পূজাঅর্চ্চনা ও মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অগণন ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এখানে

সমবেত হইয়া থাকেন। মন্দির শুধু ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও এই দীর্ঘকাল ধরিয়া, দুই শত বৎসরের জলবায়ুর অত্যাচার, উল্কাপাত ও বজ্রাঘাত সহিয়া, এখনও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অধম বাঙ্গালী জাতির স্থাপত্য গৌরব ও শিল্পকলা-কৌশলসহ একের বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণতা ও অন্যের অকৃত্রিম পিতৃভক্তির জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মন্দিরনির্ম্মাণকারী সেই বাঙ্গালী শিল্পিগণ, রাজা প্রাণনাথ,রাজা রামনাথ অনেকদিন হইল চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের ভৌতিক দেহ অণুপরমাণুতে লয় পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বিরাট কীর্ত্তি-স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। মানুষ যায়, কীর্ত্তি থাকে ; আবার যাহার কীর্ত্তি থাকে, তাহার মৃত্যু নাই। তাই কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"মরণ পরেও তত কাল ধ'রে
হেথা নর বেঁচে রয়।
যত কাল ধ'রে কীর্ত্তিগাথা তার
লোকমুখে গীত হয়।"

গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে]

ইংরাজ-শাসনের প্রথমাংশে, মানভূম, সিংহভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান আকৃতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে "জঙ্গল মহল" নামে একটা জেলা ছিল। সেকালের সুবিধা অনুযায়ী উক্ত চারিটি জেলার কতক কতক অংশ লইয়া জঙ্গল-মহল জেলা গঠিত হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জঙ্গল-মহল জেলার মধ্যে একটা ঘোরতর বিদ্রোহ হয়। তাহারই নাম গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা। এই প্রদেশের অতি বৃদ্ধ লোকদিগের অন্তঃকরণে গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার ক্ষীণস্মৃতি এখনও জাগরুক আছে। আর কিছুদিন পরে লোকে ইহার কথা ভুলিয়া যাইবে।

মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে বরাহভূম নামে যে একটী বিস্তৃত পরগণা আছে, প্রাচীন কালে ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব ছিল। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের যুদ্ধের বর্ণনায় লিখিত আছে, "বীরচাঁদ বরাভূঞা, চলিল যাচি মুঞা, শিখর ধাইল রঙ্গে," ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, বীরভূমরাজবংশের শৌর্য্য-বীর্য্যও সেকালের ইতিহাসে অনেকটা প্রসিদ্ধ ছিল। মানভূম জেলার আদিম অধিবাসী ভূমিজ কোল বা ভূমিজ নামক জাতির প্রধান বাসস্থান বরাহভূম পরগণা বা প্রাচীন বরাহভূম রাজ্য। এই ভূমিজ জাতি যথেষ্ট বলশালী ও দুদ্ধর্ষ, ইহাদিগের অন্য একটী দেশজ নাম চুয়াড়। ইংরাজের সুশাসনের মধ্যে সুখে অবস্থান করিয়াও ইহারা এখনও বোধ হয়, আপনাদিগের দুদ্ধর্ষ ও নৃশংস জাতীয় ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। জৈন ইতিহাসে লিখিত আছে, যখন মহাবীর পরেশনাথ তীর্থ দর্শনোদ্দেশ্যে মানভূমের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই দেশে পদে পদে বজ্রভূমি নামক এক প্রকার দুদ্দান্ত জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহারা তীরধনুক ও নরঘাতী কুক্কুর লইয়া অনেক স্থলে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। মহাবীরের সময়ের দুদ্দান্ত বজ্রভূমি জাতি বর্ত্তমান ভূমিজ বা ভূমিজ কোল। ইহারা প্রাচীন কালে মানভূম জেলার সর্ব্বাংশেই বাস করিত। বর্ত্তমান কালে ইহাদের প্রধান বাসস্থান বরাহভূম বা সাধারণতঃ কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা এই ভূমিজ জাতিকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল। হাঙ্গামার অপর একটী নাম চুয়াড় বিদ্রোহ। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ছোট নাগপুর বিভাগের অনেক গুলি রাজবংশ এই ভূমিজ জাতি হইতে সম্ভূত ; বরাহভূম রাজবংশেরও অতি পূর্ব্ব-বিবরণ বোধ হয় তাহাই। এই রাজবংশের গঙ্গানারায়ণ নামক একজন বংশধরই এই বিদ্রোহের মূল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অনেক দিন পূর্ব্বে বরাহভূম রাজবংশে বালকনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন ; রঘুনাথ ও লছমন নামে তাঁহার দুইটী সন্তান ছিল—লছমন কনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি পাটরাণীর সন্তান। সুতরাং কনিষ্ঠ হইলেও পাটরাণীর সন্তান বলিয়া রাজার মৃত্যুর পর তিনিই গদী পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সফলকাম হইলেন না। লছমন রাজগদী পাইলেন না বটে কিন্তু পঞ্চসর্দারী নামক ঘাটওয়ালী মৌজার মালিক হইলেন। নানাবিধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া লছমনকে জেলে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গঙ্গানারায়ণ পঞ্চসর্দ্দারী জমিদারী ভোগ করিতে থাকেন।

বরাহভূমের রাজা রঘুনাথের মৃত্যু হইলে রাজ-গদীর উত্তরাধিকার লইয়া মাধব সিংহ নামক এক ব্যক্তি ও গঙ্গা গোবিন্দ নামক অপর এক জনে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয় এবং মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে মাধব সিংহ পরাজিত হন। গঙ্গা গোবিন্দ রাজা হইলে মাধব সিংহ শত্রুতা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, তাঁহার দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন এবং যদিও রাজা হইতে পারেন নাই, কার্য্যতঃ বরাহভূম রাজ্যের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু নানাবিধ টেক্স্ ও খাজনা-বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাঁহার ক্ষমতা সাধারণ প্রজাবৃন্দের নিকট নিতান্ত বিরক্তির কারণ হইয়া পড়িল। প্রজাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করার পরিবর্ত্তে মাধব সিংহও অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়াই চলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত লছমন সিংহের পুত্র গঙ্গানারায়ণ পিতার পদবী অবলম্বন করিয়া বরাহভূম রাজ্য মধ্যে পঞ্চসর্দ্দারী তরফে কালাতিপাত করিতেছিলেন। দেওয়ান মাধব সিংহের অত্যাচার সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে জাগরিত করিল। মাধব সিংহ তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি পঞ্চসর্দ্দারী হইতে বিচ্যুত করিয়া বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। এক এক করিয়া প্রধান প্রধান ভূমিজ সর্দ্দারগণ আসিয়া গঙ্গানারায়ণের সহিত যোগ দিতে লাগিল। বিবাদের কার্য্যপরম্পরা এইরূপে পরিপুষ্ট হইলে বহু ঘাটওয়াল সর্দ্দার সঙ্গে লইয়া গঙ্গানারায়ণ এক দিন মাধব সিংহকে আক্রমণ করিলেন এবং বামনীর পাহাড়ে তাঁহাকে স্বহস্তে বধ করিয়া সঙ্গের ঘাটওয়ালগণকে মাধবের উপর তীর নিক্ষেপ করাইলেন। এইরূপে মাধবের হত্যাকাণ্ডের সহিত বড় বড় সমস্ত সর্দ্দারগণই গঙ্গানারায়ণের সহায়তায় জড়িত হইয়া পড়িল এবং পলাইবার বা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না পাইয়া গঙ্গানারায়ণের দলবল প্রবল হইল। জঙ্গল মহল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যাকারীকে ধৃত করিবার জন্য তৎপর হইলেন। এদিকে মাধব সিংহকে হত্যা করিয়া গঙ্গানারায়ণেরও খুন চড়িয়া গেল। তিনি সর্দ্দারগণের সহায়তায় বহুসংখ্যক ভূমিজ বা চুয়াড় সংগ্রহ করিয়া, আপনাকে বরাহভূমির মালিক বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং এক দিন তিন সহস্র ভূমিজ লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। বরাহবাজারের মুন্সেফী আদালত, লবণ দারোগার কাছারী, থানা প্রভৃতি জ্বালাইয়া দিয়া এবং বাজার লুট করিয়া রাজা গঙ্গা গোবিন্দকে এমনই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, রাজা তাঁহার সহিত নিষ্পত্তির ইচ্ছায় পঞ্চসর্দ্দারী তরফ পুনরায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। গঙ্গানারায়ণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া অশিক্ষিত দুর্দ্দান্ত ভূমিজগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল এবং গঙ্গানারায়ণ আপনাকে বিশিষ্ট বলশালী মনে করিয়া মানবাজার ও মেদিনীপুর জেলাস্থ শিলদা, বেল-পাহাড়ি এবং নিকটবর্ত্তী যাবতীয় পরগণার উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, বরাহভূমের ত কথাই নাই। গঙ্গানারায়ণের দল ঘোর জঙ্গলের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লয়, কেহ ধরিতে পারে না এবং সুবিধা পাইলেই লুঠ-তরাজের জন্য ভাল ভাল গ্রাম ও পরগণার উপর আসিয়া পড়ে। শুনিয়াছি, গঙ্গানারায়ণ আপন দলকে অপরাজেয় ও বিশিষ্ট ক্ষমতাবান মনে করিয়া তিতুমীরের মত বাশ, কাঠ ও মাটি দিয়া কেল্লাও প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দিন ফুরাইয়া আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বহুদিন ধরিয়া স্থানীয় সিপাহীবৃন্দ লইয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া, ইংরাজের সৈন্য দল আহ্বান করিলেন। কাপ্তেন, বরকন্দাজ ও গোরা সৈন্য আসিয়া জঙ্গল মহল জেলার থানা গাড়িল। তথাপি গঙ্গানারায়ণের দল বহুদিন ধরিয়া উক্ত জেলার বহু স্থানে অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছিল; কিন্তু অশিক্ষিত বর্ব্বর, সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট কতক্ষণ টিকিবে? গঙ্গানারায়ণ অবশেষে ধরা পড়িলেন। কেহ কেহ বলেন, জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গঙ্গা-নারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর ইংরাজের সুশাসনে বিদ্রোহ ও পাশব অত্যাচারের নিবৃত্তি হইয়া দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

মারহাট্টা-ভীতির ন্যায় গঙ্গানারায়ণ-ভীতিও প্রাচীন জঙ্গলমহল জেলায় অনেকদিন প্রবল ছিল। গঙ্গানারায়ণের ভয়ে প্রজা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া অন্য দেশে পলাইয়াছিল, ক্ষুদ্র জমিদার অর্থাদি লইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল এবং দেশের লোক বহুদিন পর্য্যন্ত গঙ্গানারায়ণের নামে আতঙ্কে ত্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিল। গঙ্গা-

নারায়ণী হাঙ্গামার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনও প্রাচীন জঙ্গল মহল জেলার বহুস্থানে শুনিতে পাওয়া যায়।

নারী-বিদ্রোহ

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, L. M. S.]

বিলাতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। সেখানে রমণীগণ এখন বলিতেছেন, সন্তান-পালন ও গৃহকার্য্যই নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। এখন তাহাদের চোক ফুটিয়াছে—এখন পুরুষের মত রাজ্য-শাসন এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা সমান অধিকার পাইতে চাহেন, না হইলে রাজ্য ও সমাজ রসাতলে দিবেন। স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার বা স্ত্রীস্বাধীনতার ধুয়া আজ যে, এই নূতন উঠিয়াছে, তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বে প্রায় সকল দেশেই বহুবার ইহার আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসাদি পাঠ করিলে, স্পষ্টই জানা যায় যে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি মানসিক বিষয়ে, নারীজাতি অনেকবারই পুরুষের অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনকার মত তখনও অনেক পুরুষই তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। Jacob Buckhardt (জেকোব বাকহার্ট) Renaissance (রিনেস্যান্স) এর উল্লেখ প্রসঙ্গে এক স্থলে বলিয়াছেন ;—"রিনেস্যান্সের সময় ইতালী দেশে যে সকল খ্যাতনামা রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই ছিল যে, কি বিদ্যা বুদ্ধিতে, কি মানসিক প্রকৃতিতে, তাঁহারা সর্ব্বাংশেই পুরুষেরই তুল্য ছিলেন।

প্রায় সকল দেশেরই পুরাণাদি গ্রন্থে এমন রমণীদিগের বিবরণ আছে, যাঁহারা পুরুষোচিত বীরত্বের জন্য বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। রণরঙ্গিণী কালিকা রণোন্মাদে স্বামীকেও পদদলিত করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের উপাস্যা হইয়া আছেন। কিন্তু এখন যদি কোন রমণীকে রণরঙ্গিণী বলা যায়, তাহা হইলে সেটা, গৌরবের না হইয়া বরং নিন্দাবাচকই হয়। য়ুরোপে virago (ভিরেগো) শব্দটিও এক কালে রমণীর পক্ষে গৌরব-বাচকই ছিল। কিন্তু এখন যদি কোন রমণীকে virago বলা যায়, তাহার দ্বারা তাঁহাকে নিন্দা করাই বুঝায়। ষোড়শ শতাব্দীতে নারীজাতি খুবই সম্মান পাইয়াছিলেন। সে সময়টাকে নারীস্তুতির একটা বিশেষ যুগ বলিলেই হয়। Sir Thomas More (স্যার্ টমাস্ মুর) প্রমুখ অনেকেই সে সময় স্ত্রী-স্বাধীনতার পাণ্ডা হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমস্যাটা আবার নূতন করিয়া প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই মনে হয়, এই সমস্যাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী দেখা দিয়াছে এবং আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছে। এবারও তাহাই হইবে। বর্ত্তমান কালে নারীপ্রকৃতি পুরুষ ও পুরুষপ্রকৃতি নারীর সংখ্যা কিছু অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এরূপই হইয়া আসিতেছে। এবার বিদ্রোহী দল, দিন দিন যেমন পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাতে কালে ইহা একটা বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইলেও হইতে পারে। তথাপি ইহার ক্ষয় অনিবার্য্য। যাঁহারা নারীর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাদের রিনেস্যান্সের যুগটার ইতিহাস স্মরণ করিতে বলি।

আমাদের বিশ্বাস, স্ত্রী-পুরুষের একটা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। যে সকল রমণী সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিতেছেন, হয়তো তাঁহাদের মানসিক শক্তি কোনও অংশেই পুরুষের অপেক্ষা কম নহে। একটু ভাল করিয়া দেখিলে, ইঁহাদিগকে পুরাপুরি নারী বলা ঠিক হয় না। ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রী-প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ-প্রকৃতিরই যেন অধিক বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার বাহ্যতঃও অনেকটা পুরুষেরই মত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ্জ ইলিয়টের চোক মুখের ভাব অনেকাংশেই পুরুষেরই মত। রমণীর পক্ষে ওরূপ বিশাল উচ্চ ললাট, খুবই সাধারণ বলা যাইতে পারেনা। শুনিয়াছি, তাঁহার চলন-ভঙ্গীও নাকি অনেকটা পুরুষেরই মত। নারীর স্বাভাবিক সুকুমার ললিত মন্থর গতি তাঁহার একেবারেই ছিল না। রুষিয়ার অসাধারণ বিদুষী Kowalevska (কাউয়ালএভ্স্কা) ও নাকি দেখিতে অনেকটা পুরুষেরই ন্যায় ছিলেন। রমণীর স্বাভাবিক দীর্ঘ কেশরাজি তাঁহার কোন কালেই ছিল না। রমণীর সর্ব্বময়ী স্বাধীনতার ইনি একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। Madam Blavatasky

(ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাটস্কি) তো একবারেই পুরুষ ছিলেন বলিলে হয়। এইরূপ পুরুষ-প্রকৃতি নারীর সংখ্যা যে খুবই অল্প তাহা নহে। ইঁহাদের ভাবভঙ্গী, আকারপ্রকার প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, বিশুদ্ধ নারী-প্রকৃতি কোন কালেই স্বাধীনতার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেনা; স্বাধীনতাভিলাষিণী রমণীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে পুরুষ-প্রকৃতি অবস্থান করে, তাহারই প্ররোচনায় ভামিনীকুল পুরুষের বশ্যতা-শৃঙ্খল উচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট হন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার পুরুষের নামটির পর্য্যন্ত লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। George Elliot (জর্জ্জ ইলিয়ট্), George Sand (জর্জ্জ স্যাণ্ড) প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইঁহারা সকলেই বিদুষী ও প্রতিভা-শালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দৈহিক উৎকর্ষ বিষয়েও নারীজাতি অনেকাংশেই পুরুষের পশ্চাতে আছেন এবং চিরদিনই থাকিবেন। ইঁহাদের দেহ সম্পূর্ণ পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের দেহলতা অনেক বিষয়ে শিশুর সৌকুমার্য্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত ভাস্কর Rhind (রিন্দ)

আদম ও ইবা

আদি পিতা আদম ও আদি মাতা ইবার যে মর্ম্মর মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছেন, এস্থলে তাহার একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। এই চিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই স্ত্রী পুরুষের শরীরগত ও মনোগত স্বাভাবিক পার্থক্য বুঝিতে কিছু মাত্র কালবিলম্ব হইবে না। পুরুষের বিশাল স্কন্ধ, সুগঠিত বৃহদাকার অস্থিপুঞ্জ, সুপরিণত মাংস-পেশীসমূহ জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার সামর্থ্য জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহার বদনমণ্ডলে সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার চিহ্ন দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া আছে। আর নারীর বিশাল বস্তি প্রদেশ, দেহের ঊর্দ্ধভাগের গুরুত্ব (Large Bust), সুগোল, সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গঠন-লাবণ্য তাঁহাকে পুরুষের কঠোর জীবনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে:—তাঁহার সস্নেহ বিনম্র মুখ-শ্রীতে তাঁহার প্রকৃতি ও জীবনের কর্ত্তব্য যেন সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

অতএব রমণী স্বাধীন হইয়া পুরুষের কোন ধার ধারিবেন না, এমন ইচ্ছা স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও নয় বলিয়াই মনে হয়।

প্রাচীন ভারতসাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হইত না

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, M. A.]

প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পৃথিবীব্যাপী বিপুল-বিশালতা হইতে "ব্রিটিশসাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না" এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিলে, আমরা জানিতে পারি যে, ভারতেরও এমন গৌরবের দিন ছিল, যখন ভারত পৃথিবী জুড়িয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, আপনার প্রতাপসূর্য্যকে দেদীপ্য-মান রাখিয়াছিল।

পৃথিবীর বিস্তারসম্বন্ধে যে ভৌগোলিক বিবরণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর প্রধান সাতটি স্থল-বিভাগের নির্দ্দেশ দেখা যায়। এই সাতটি বিভাগের প্রত্যেকটি "দ্বীপ" নামে আখ্যাত হইত; তাহাতেই পৃথিবীও 'সপ্তদ্বীপা মহী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সপ্তদ্বীপের দ্বারা প্রধান স্থলবিভাগের ন্যায় সপ্তসমুদ্রের দ্বারা প্রধান জলবিভাগেরও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়পতাকা উড্ডীন করা রাজমহিমা ও বিক্রমের চরমসীমা বলিয়া বিবেচিত হইত।

সংস্কৃত ভাষায় রাজ-বাচক যে সমস্ত শব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদের অর্থবিচার করিলে, রাজ্যের বিস্তার ও রাজক্ষমতা পরিচালনদ্বারা রাজাদিগের কিরূপ শ্রেণীবিভাগ হইত, তাহার অতি কৌতুকাবহ বিবরণ জানিতে পারা যায়। সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান কোষগ্রন্থ অমরকোষে এই শ্রেণীবিভাগ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথায় রাজা শব্দের সাধারণ পর্য্যায়ের শব্দসকল উল্লিখিত হইয়া, পরে ইহার বিশেষ ভেদগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ রাজা অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত ও রাজ্যাধিকারী নৃপতি "অধীশ্বর" নামে আখ্যাত হইয়াছেন; যথা—"রাজাতু প্রণতাশেষসামন্তঃ স্যাদধীশ্বরঃ।" যে রাজার নিকট অশেষ সামন্ত (চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী) রাজা অধীনতা স্বীকার করে, তিনি "অধীশ্বর"।

যিনি ইহার অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী এবং দ্বাদশ রাজমণ্ডলের ঈশ্বর তিনি "মণ্ডলেশ্বর" নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; যথা—"নৃপোঽন্যোমণ্ডলেশ্বরঃ॥"

যিনি কেবল মণ্ডলেরই ঈশ্বর নহেন পরন্তু রাজসূয় যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছেন এবং যাঁহার আজ্ঞাতে দেশ-বিদেশের অশেষ রাজগণ শাসিত হন, তিনি সম্রাট্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; যথা—

"যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলেশ্বরশ্চয়ঃ।
শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্॥"

যিনি সমগ্র ভূমণ্ডলে বা রাজমণ্ডলে অখণ্ড প্রতাপে অধিষ্ঠিত হন, তিনি 'চক্রবর্ত্তী' বা 'সার্ব্বভৌম' এই অনন্য-সাধারণ গৌরবখ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন; যথা—"চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমঃ"। "চক্রে ভূমণ্ডলে রাজমণ্ডলে বা বর্ত্তিতুং শীলমস্য" "সর্ব্বভূমেরীশ্বরঃ ইত্যণ্"। অমরকোষ টীকায় ভানুজিদীক্ষিত 'চক্রবর্ত্তী' ও 'সার্ব্বভৌম' শব্দ এইরূপে ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপে অশেষ মহিমান্বিত রাজাই পুরাণাদিতে "রাজচক্রবর্ত্তী" ও "সার্ব্বভৌমেশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিশ্ব ও মেদিনীকোষে "সার্ব্ব-ভৌম" স্পষ্টরূপেই সমগ্র পৃথিবীপতি-বাচক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—"সার্ব্বভৌমস্তু দিঙ্‌নাগেসর্ব্বপৃথ্বীপতাবপি॥" অমরকোষ-টীকায় ভানুজিদীক্ষিতধৃত।

ভারতনরপতিদিগের মধ্যে অল্পনরপতিরই "চক্রবর্ত্তী" হইবার মহাসৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ভারতের সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাসে অসংখ্য নরপতির মধ্যে কেবল সাতজন নরপতিই "চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে মণ্ডিত হইয়াছিলেন; যথা—

"ভরতার্জ্জুন-মান্ধাতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগরোনহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ॥"

"ভরত, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর, নহুষ এই সাত জনই চক্রবর্ত্তী।"

লোকোত্তর যশঃ-প্রভায় ইঁহাদের নাম ভারত-ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' নাম ভরতের অবিনশ্বর কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে। 'ভাগীরথী' ভগীরথকে চির-জীবিত রাখিয়াছে। সগরের স্মৃতি 'সাগর' নামে চিরঅঙ্কিত থাকিবে। নহুষ মর্ত্ত্যদেহে স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। 'রাজসূয়' যজ্ঞের সহিত যুধিষ্ঠিরের নাম চির-সংগ্রথিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইঁহাদের কীর্ত্তি এইরূপ দিগন্তব্যাপিনী ও চির-স্মরণীয়া হইলেও, ইঁহারা প্রকৃত সার্ব্বভৌম নৃপতি ছিলেন কি না সন্দেহ। কারণ ভারতবর্ষের বাহিরে ইঁহাদের অধিক বৈদেশিক অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল সগররাজ ও নহুষরাজেরই বিদেশ-বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সগররাজ যে ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার স্থাপন করেন, তাহার এই নিদর্শন তথায় এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথাকার অধিবাসীরা এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। নহুষ স্বর্গরাজ্যের রাজত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়, ইহাতে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর অত্যুন্নত ভূভাগে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু 'সগর', 'নহুষ', এইরূপে ভারতবর্ষের বহির্ভাগ আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেও পৃথিবীর সর্ব্বাংশে ইঁহাদের একাধিপত্য স্বীকৃত হওয়ার প্রমাণ আমরা পাই না। সুতরাং আমরা মনে করি যে, ইঁহারা "রাজচক্রবর্ত্তী" হইয়াছিলেন কিন্তু "সার্ব্ব-ভৌমেশ্বর" হইতে পারে নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তচক্রবর্ত্তীর মধ্যে অর্জ্জুন বা কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন এবং মান্ধাতা কেবল এই দুই জনই যে অখণ্ড ভূমণ্ডলকে একচ্ছত্র শাসনের অধীনে আনয়ন করিয়া যথার্থ সার্ব্বভৌমেশ্বর হইয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। নিম্নে আমরা ইঁহাদের অতুলনীয় রাজশক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

কার্ত্তবীর্য্য ভগবান্ দত্তাত্রেয় হইতে যোগ শিক্ষা করিয়া এরূপ অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে বিপক্ষের সাক্ষাতে যেন তাঁহার সহস্র বাহু আবির্ভূত হইত। ঈদৃশ অলৌকিক বিক্রমপ্রভাবে তিনি সমস্ত ভূমণ্ডলের বিজয় সাধন করিয়া, এরূপ ন্যায়ানুগত শাসন ও সাম্য-মূলক পালন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন যে,তৎপূর্ব্বে আর কোন রাজাই পৃথিবীতে সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তদীয় নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া, "রাজ"শব্দটী যেন নূতন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মহাকবি কালিদাস তদীয় রঘু-বংশকাব্যে কার্ত্তবীর্য্যের পূর্ব্বোক্ত অসীম কীর্ত্তি এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

"সংগ্রামনির্ব্বিষ্টসহস্রবাহু রষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভুব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ॥৬।৩৮

মল্লিনাথ ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন ;—

"সংগ্রামেষু যুদ্ধেষু নির্ব্বিষ্টা অনুভূতা সহস্রং বাহবোযস্য স তথোক্তঃ। যুদ্ধাদন্যত্র দ্বিভুজএব দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। অষ্টাদশ দ্বীপেষু নিখাতাঃ স্থাপিতা যূপা যেন স তথোক্তঃ। সর্ব্বক্রতু-যাজী সার্ব্বভৌমেতিভাবঃ। জগয়ঞ্জাদি সর্ব্বভূতরঞ্জনাদনন্য-সাধারণো রাজশব্দোযস্য সঃ। যোগী। ব্রহ্মবিদ্যানিত্যর্থঃ। স কিল ভগবতোদত্তাত্রেয়াল্লব্ধযোগ ইতি প্রসিদ্ধিঃ। কৃত-বীর্য্যস্যাপত্যং পুমান্ কার্ত্তবীর্য্যোনাম রাজা বভূব কিলেতি। অয়ংচাস্য মহিমা সর্ব্বোঽপি দত্তাত্রেয়বর প্রসাদলব্ধ ইতি ভারতে দৃশ্যতে।"

রঘুবংশের বোম্বে-সংস্করণে শঙ্করপণ্ডিত উদ্ধৃত শ্লোকের উপর এইরূপ টীকা করিয়াছেন ;—

Karthavirjya having propitiated Dattatreya is represented to have solicited and obtained from the sage these boons :—a thousand arms the extirpation of evil desires from his kingdom ("অধর্ম্মমেধ-নিবারণম্") the subjection of the world by justice and protecting it equitably, victory over his enemies, and death from the hands of a person renowned in all the regions of the universe.

উপরি-উদ্ধৃত মল্লিনাথটীকা ও শঙ্কর-পণ্ডিতটীকা উভয় হইতেই কার্ত্তবীর্য্যকে আমরা সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। বিষ্ণুপুরাণে কার্ত্তবীর্য্য-চরিত্র যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি যে, গুণগ্রামে পৃথিবীর সমস্ত রাজমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া, সার্ব্বভৌম হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হয় ; যথা—

"ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দ্দানৈস্তপোভির্ব্বা, প্রশ্রয়েণ শ্রুতেন চ॥" ৪র্থ অধ্যায়।

ইহা নিশ্চয় যে, রাজগণ, যজ্ঞ, দান, জপ, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে না।"

যিনি সমস্ত অষ্টাদশ দ্বীপ করতলগত করিয়া সার্ব্বভৌমেশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যে যে, সূর্য্যাস্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন করেনা। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইব যে,এখানে যাহা বলিবার অপূর্ণতা আছে, মান্ধাতার বিবরণে তাহাও পূরণ করা হইয়াছে।

মান্ধাতা এরূপই অসামান্য শক্তিশালী ছিলেন যে, তৎকালে পৃথিবীতে শৌর্য্যবীর্য্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই ছিল না। সুতরাং তদীয় অমিতভুজবলে সমস্ত ভূমণ্ডল বিজিত হইয়া যে তাঁহার পদানত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই প্রকারেই তিনি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সার্ব্বভৌমেশ্বর পদে বরিত হইয়াছিলেন। তদীয় অপ্রতিহত সাম্রাজ্য-প্রভাব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এরূপ ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁহার সাক্ষাৎ অধিকার জ্ঞাপন করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার নামে 'মান্ধাতার ক্ষেত্র' বলিয়া কথিত হইত।

তদীয় সাম্রাজ্যের বিশালতাসম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হন, তজ্জন্য পুরাণে তাঁহাকে কেবল সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—কিন্তু তৎসঙ্গে একটী প্রবাদ শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছে ; যথা—

"সতু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং বুভুজে।"

ভবতিচাত্রশ্লোকঃ—

"যাবৎ সূর্য্য উদেতিস্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ২য় অধ্যায়।

"যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্য উদিত হয়, যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্য

অবস্থান করে (আলোক প্রদান করে) তৎসমস্তই যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।”

“সপ্তদ্বীপের চক্রবর্ত্তী” বলিলে তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তার অনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়াই সূর্য্যের দ্বারা ইহার সীমা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মান্ধাতা যে অখণ্ড পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ ছিলেন, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আজ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হয় না - তাহা কিন্তু মান্ধাতার সাম্রাজ্যের ন্যায় অখণ্ড ভূখণ্ডের সাম্রাজ্য নহে, বা ইহার সম্রাট্ পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ নহেন।

পৃথিবীতে মান্ধাতাই প্রথম বিরাট্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া “সার্ব্বভৌমেশ্বর” হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যে শাসনপদ্ধতির প্রথম আদর্শ প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন - তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই জন্যই পুরাতন আদর্শের অর্থে “মান্ধাতার আমল”, এইরূপ সাধারণ কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী মান্ধাতার সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস যেমন “মান্ধাতৃঃ ক্ষেত্রম্” (মান্ধাতার ক্ষেত্র) রূপ প্রবাদে নিবদ্ধ ও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, তেমনই তদীয় প্রাচীনতম আদর্শ শাসনের ইতিহাস “মান্ধাতার আমল”—এই সাধারণ প্রবাদে পরিণত হইয়া অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

খেতু

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

কোন্খানে ফেরে মন তার, সব কাজে অনাবিষ্ট,
দেহখানা তার কদাকার, গলাটাও নহে মিষ্ট।
শরীরে তাহার কত বল, সকলি ত তার ব্যর্থ,
পর উপকারে বীতরাগ জানে নাক নিজ স্বার্থ।
সঞ্চয় কিছু নাহি তার, তবু অতি বড় অজ্ঞান,
গলগ্রহ সে যে সবাকার, গ্রামের অকেজো সন্তান।
অজয়েতে বসে ধরে মাছ, চির অলসের কার্য্য,
কোথা খায় কোথা থাকে সে কিছুরি নাহিক ধার্য্য।
কেহ কোনো কাজে নাহি পায়, সবে বলে তারে দুষ্ট,
গ্রামের অন্নে দেহখান, করে বসে বসে পুষ্ট।

হুর্পায় সব একাকার আজি গ্রাম নিরানন্দ
পড়িতে গিয়াছে পরপার গ্রামের বালকবৃন্দ।
নৌকা আসিছে নদীমাঝ চারিপাশে শত ঘূর্ণী,
ছুটেছে তীব্র জলরাশি দুটি পাড় বেগে চূর্ণি’।
নৌকা রাখিতে নারে আর, টুটিছে হালের বন্ধন,
এপারে উঠেছে মহারোল, উঠেছে নায়েতে ক্রন্দন।
খেতু ছিল রোগে ক্ষীণকায় না ফেলি পলক চক্ষে,
মারি মালকোঁচা একা হায় ঝাঁপালো নদীর বক্ষে।
সবল বাহুতে নদীজল ঠেলিয়া চলিল ক্ষেত্র—
চকিতে পড়িল তারি পর শতেক সজল নেত্র।

ধরি নৌকার ‘রসি’ গাছ গ্রাম-তীর করি লক্ষ্য
প্রাণপণে টানে অবিরাম সাঁতার কাটিতে দক্ষ।
লাগাইল তীরে তরীখান, সবাই বলিছে ধন্য,
লুটায়ে পড়িল বালুকায় দেহ তার অবসন্ন!
এনে দিলে খেতু শিশুদল গ্রামের নয়নানন্দ,
কই খেতু কই, একি হায়, আঁখি কেন তার বন্ধ।
কই খেতু, কই সাড়া নাই চিরনিদ্রায় মগ্ন—
আবালবৃদ্ধ কাঁদে হায় শেষ আশা হল ভগ্ন।

প্রধান পাণ্ডা দেবতার চিরনৈষ্ঠিক বিপ্র
খেতুর অসাড় দেহখান কোলে তুলে লয়ে ক্ষিপ্র।
বলেন কাঁদিয়া ওরে বীর, কহিয়াছি তোরে মন্দ,
কৃতী তুমি শুধু ধরা-গায় মোরা সব ভ্রম অন্ধ।
বাঁচাইলে তুমি শতপ্রাণ নিজপ্রাণ করি তুচ্ছ,
চণ্ডাল হয়ে হলে আজ, ব্রাহ্মণ চেয়ে উচ্চ।
গৌরব তুমি জননীর গ্রামের ধন্য সন্তান,
পূজা পাবে তুমি চিরদিন সাধু বীর খেতু পদ্মান।
পবিত্র হল দেহখান তোর মৃতদেহ স্পর্শে,
পাপভরা এই প্রাণে মোর পুণ্যের ধারা বর্ষে।

ভারত-শিল্পের ধারা

[শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়]

প্রায় যে কোনো দেশেরই সুকুমার-শিল্প-কলার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

ম্যাডোনা ও পবিত্র-পরিবার (র‍্যাফেল্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

লোক-সাধারণের বা কোনো শক্তিশালী নরপতির বিলাস-আনন্দ-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাই তাহার মূল কারণ। যে কোনও দেশেই ললিত-কলা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে—জগতের সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে,—বরাবর দেখা গিয়াছে যে, রাজ শক্তি স্বীয় বিলাস-আনন্দের ধ্বজা লইয়া অবলম্বন-স্বরূপ তাহার পশ্চাতে আছেই আছে।

গ্রীসের শিল্প-ইতিহাস আলোচনা করিলে এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়—রোম-শিল্প-কলার উদ্দেশ্যও এই উক্তির পোষকতা করে। প্রতাপশালী নরপতিগণ, বিজয়ী যোদ্ধৃ-বীরবৃন্দ আপনাদের কীর্ত্তিকে কালের উপরও জয়ী করিবার নিমিত্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলন করেন। কালে, মানব-সভ্যতা যত অগ্রসর হইয়াছে, এই সম্মান তত বিবিধ বিভাগের বীরগণের প্রতিও বর্ষিত হইয়াছে। তখন এই নৃপতির বা বিজয়ী বীরের সম্মান, দেশ ও সমাজ—ধর্ম্মবীর, সাহিত্যরথী ও কবিত্ব-রাজ্যের অধিপতিদিগের উপর বর্ষণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ললিত-কলার পরিপুষ্টি এমনি করিয়াই দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রথমে এই সম্মান সীজার, পম্পি, আলেকজান্দার প্রভৃতির মত বিজয়ী বীরগণের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল—পরে সক্রেটিস, সিসেরো, ডিমস্থিনিস, ভর্জ্জিল হোমর প্রভৃতির প্রতি প্রদর্শিত হয়। তাহারও পরে অনন্তের অভিমুখে এই সম্মাননার উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল। র‍্যাফেল, এঞ্জিলোর ন্যায় অনন্ত শক্তিকে মূর্ত্তি দিবার প্রয়াস—শিল্পের ভিতর দিয়া মানব-সাধারণের নিকট বিশ্ব-নিয়ন্তার বিচিত্র লীলা দেখাইবার চেষ্টা তাহার পূর্ব্বে সম্ভব হয় নাই।

ম্যাডোনা ও পবিত্র-পরিবার (এঞ্জিলো-কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

ম্যাডোনার অঙ্কুর,—ফ্লোরেন্সে বাইবেলের প্রাচীরাঙ্কিত চিত্রাবলীর সূচনা তাহার পূর্ব্বে তো দেখা দেয় নাই।

কিন্তু ভারত শিল্প-কলা সম্বন্ধে একথা কোনও মতেই খাটে না। জগতের শিল্প-ইতিহাসে ভারত-শিল্প এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যাহার সমতুল চিত্র এ পর্য্যন্ত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই! ভারত শিল্পের ধারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতেই উৎসারিত হইয়াছে এবং সেই কারণে পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে ভারত-অনুসন্ধান করিতেছে এবং লাভও করিতেছে, সেই মহতী শক্তি, অনন্ত পুরুষ, সেই নিত্য ও অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিচিত্র চিত্রাবলী ও তাহার হৃদয়ঙ্গমের উপায় মানব-সাধারণকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্তই—তাহার নিকটে পৌঁছিবার পথের সহিত লোকের পরিচয় ঘটাইবার জন্যই ভারত শিল্পের সৃষ্টি —অন্য কোনও ক্ষণিক উদ্দেশ্যের অশুভ লগ্নে তাহার জন্ম নহে। সে একেবারে বিশ্বের সামগ্রী হইয়াই জন্মিয়াছে—অসীমের সহিত মিলাইবার নিমিত্তই—সান্তের সহিত
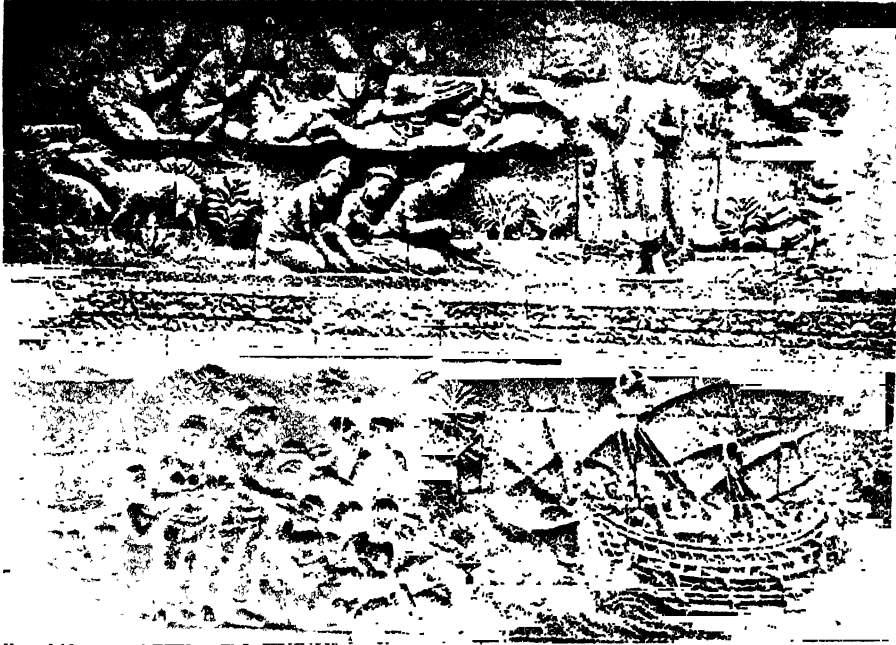
যবদ্বীপে বড় বুদ্ধ মন্দির গাত্রে খোদিত একটি চিত্র
(মিঃ ই. বি হ্যাভেল্‌-প্রণীত 'Indian Sculpture & Painting' হইতে গৃহীত)

শিল্পের স্থান এমন অভিনব ও এত গৌরবমণ্ডিত। কোনও নৃপতি-বিশেষের বিলাস-আনন্দ বা খেয়ালের উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—অশিক্ষিত জন-সাধারণের শুধু ক্ষণিক প্রীতির জন্য ভারত-শিল্পের সৃষ্টি নহে। যে অনন্তের উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতের বেদ-গাথা উদাত্ত গম্ভীর সুরে উত্থিত হইয়াছিল—যে নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত শত শত ঋষি-চিত্ত পূর্ণিমার জলধির ন্যায় ব্যাকুল ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের দর্শন, ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহার অনন্ত-শক্তির একটু আভাষ লাভের নিমিত্ত সেই আদিম যুগ হইতে আকুল ভাবে একান্ত আগ্রহে অনন্তের সম্মিলন ঘটাইবার নিমিত্তই অপরিপূর্ণতাকে পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইবার জন্যই ভারত-শিল্পের প্রকাশ এবং এই চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই—এই মুক্ত আকাশের নীচে প্রস্ফুট আলোকে ইহার জন্ম বলিয়াই সে পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোনও-দেশের শিল্প-কলার অপেক্ষা আপনার উদ্দেশ্যকে খাটি ও মহান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে ও সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম, দর্শন ও শিল্প-কলাকে কেহ কোনো দিন পৃথক্‌ আলোকে পৃথক্‌ ভাবে দেখে নাই—একই বেদীর উপর এই ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা প্রাচীন ভারত আপন

হাতে করিয়াছিল। একই উদ্দেশ্য সাধনের—একই চরমে উপনীত হইবার এই কয়েকটি পৃথক্‌ উপায়—বিভিন্ন পথ মাত্র। চারিদিকের দৃশ্যে—পারিপার্শ্বিকে শুধু প্রভেদ—উদ্দেশ্যে বা প্রকৃতিতে কোনও বৈষম্য,কোনও পার্থক্যই নাই।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য কেবল মাত্র তখনকার সমাজের এক একটা উজ্জ্বল ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—অসংখ্য বিচিত্র চিত্রের ইহারা সমষ্টি মাত্র নহে। ইহারা দেখাইয়াছে, কেমন করিয়া এই বিপুল বৈষম্য হইতে চিরন্তন ঐক্যের সূত্রটি বাহির করিতে হয়—বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কিরূপে সেই অপরিবর্ত্তনীয় একেতে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়।—ইহারা আরও দেখাইয়াছে যে, আমাদের যাবতীয় নৈমিত্তিক কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক নিত্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি ও তাঁহাকে প্রতিদিন লাভ করিতেছি—প্রতিদিনকার অসম্পূর্ণতাই সেই পরিপূর্ণ করিয়া পাওয়াকে আমাদের নিকটতর করিয়া দিতেছে। প্রতিদিনকার এই অসম্পূর্ণতা, এই অনিত্যতা দেখিয়া—এই খণ্ড খণ্ড চেষ্টার বৈষম্য দেখিয়া—আক্ষেপ করিবার আমাদের কিছু নাই যে, পরিপূর্ণতাকে—নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপকে আর আমরা পাইলাম না—সেই বিপুল অনন্ত একের লাভ আমাদের নাই! ভারতের এই ইতিহাসে সমস্ত যুগে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া এই এক অজ্ঞাতের একাগ্র অনুসন্ধান মানুষের প্রাণের ভিতর তাঁহাকে জানিবার ঐকান্তিক আগ্রহের যে ব্যাকুল প্রয়াস উঠিয়াছিল, আর কোনো দেশের ইতিহাসে তাহার সমতুল দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এই বৈষম্যের ভিতর একের মূর্ত্তি দেখিবার আগ্রহের উপরেই ভারত-ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও উদ্দেশ্যের, প্রথা ও পদ্ধতির এই বিভিন্নতাই জগতের দৃষ্টি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থকে অতি

এলিফেণ্টা গুহাগাত্রে খোদিত ভৈরব মূর্ত্তি
(মিঃ ই. বি, হাভেল্‌-প্রণীত 'Indian Sculpture & Painting' হইতে গৃহীত)

ভ্রান্ত ভাবে অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। কেবল যে বিচিত্র ঘটনাবলী জানিবার ক্ষণিক কৌতূহল—তাহার উপর ভারতের এই অমূল্য ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়াই, ব্যষ্টির ভিতর সমষ্টির সন্ধান সে করিয়াছে বলিয়াই, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক শর সন্ধান তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে! অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যের উপর সে আপনার আসনখানি বিছাইয়াছে, এই তাহার অপরাধ!

ঠিক এই একই আদর্শের উপর ভারতীয় শিল্প-কলারও প্রতিষ্ঠা বলিয়াই—একই আদর্শে ভারতীয় সুকুমার-শিল্প অনুপ্রাণিত বলিয়াই—পাশ্চাত্য সভ্যতার রথিগণ তাহার

করালী গুহার প্রবেশ দ্বার

করিতে পারিব না। যতদিন এই পাশ্চাত্য সভ্যতার রক্তবর্ণ ঠুলিটা খুলিয়া না ফেলিতেছি, ততদিন হাজার নির্দ্দেশ, হাজার ব্যাখ্যার প্রয়াস সত্ত্বেও আমাদের শিল্প-দেবতার শান্তোজ্জ্বল শুভ্র-শুচি মূর্ত্তিটি কোন মতেই তো আমাদের নয়নগোচর হইবে না। হৃদয়ঙ্গম করা—সেতো বহু—বহু দূরের কথা!

ভারতের শিল্প-কলার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে—ভারতের ধর্ম্ম শাস্ত্রের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বাহ্নে যেমন আপনার চিত্তকে শুচি ও প্রস্তুত করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে—কারণ ভারতের ধর্ম্ম ও শিল্প-কলা একই হিমাদ্রিজজ্জা হইতে উৎসারিত গঙ্গাযমুনার যুগল ধারা! আদিতে তাহাদের বিভেদবৈষম্য নাই—অন্তিমে তাহারা একই অনন্ত সমুদ্রের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! বিভেদ কেবল মধ্য-পথে! অনেকের কাণে হয়ত একথাটা একটু আশ্চর্য্যজনক শুনাইতে পারে যে, ছবি দেখিবার জন্য আবার মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে! কিন্তু ভারতের যে-কোনও বিষয়ের অন্তঃপ্রকৃতি যদি তাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ কিছুই নাই। ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, এমন কি, যুদ্ধনীতি, নিত্যকর্ম্ম যাহাই ধরি না

বিরুদ্ধে আপনাপন খড়্গ-চালনা করিতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র তড়িতালোকে আমাদের চক্ষু এরূপ ঝলসিয়া গিয়াছে, আমরাও এরূপ মোহান্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের চিরদিনের রক্তমাংসে জড়িত ভারতীয় শিল্পকলাকে একেবারেই আর চিনিতে পারি না। তাই রূঢ় ভাবে আমাদের সেই চিরায়মানা লক্ষ্মীকে দ্বারদেশ হইতে বার বার বিতাড়িত করিয়াছি এবং বিষম অজ্ঞানতার দম্ভে তাহাতে গর্ব্বই অনুভব করিতেছি! আসলে হইয়াছে—আমরা নিকষ পাথরকে তাহার বাহিরের কৃষ্ণতায় ঘোর অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের সোনা ও পিতল লইয়া এই বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছে। আজ আমরা তাই পিতলকে সোনা বলিয়া অতি সমাদরে ঘরে তুলিয়া লইয়াছি এবং সোনাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে আমাদের এতটুকু কুণ্ঠা, এতটুকু সন্দেহ আসে নাই! নিকষ পাথরের কৃষ্ণতাই যে তাহার মূল, ভ্রান্তির বশে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।

যতদিন এই নিকষ পাথরকে আমরা আবার কুড়াইয়া ধূলি ঝাড়িয়া সযত্নে ঘরে তুলিয়া না লইতেছি, যতদিন সেই খাঁটি ভারতবাসীর হৃদয়টি, ভারতের সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রাণটি, আবার আমাদের ভিতর আসিয়া দেখা না দিতেছে, ততদিন তো আমরা সোনা পিতল চিনিব না—খাঁটি সোনা ও খাদ-মিশানো সোনার কোনও পার্থক্যই নির্দ্ধারণ

করালী গুহা চৈত্যাভ্যন্তরের দৃশ্য

কেন, একটা সর্ব্বোচ্চ ভাবের অন্তর্নিহিত ধারা সবের ভিতর দিয়াই বহিতেছে। সেই নিগূঢ় ধারা—সেই সান্তের সহিত অনন্তের মিলন-ডোর, যদি আমরা ধরিতে চাই, তাহা হইলে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে, দাম্ভিকের তুলনামূলক দৃষ্টিতে, তাহা হইবে না—সহানুভূতিশীল আনম হৃদয় চাই—নহিলে শুষ্ক বালুকারাশি দেখিয়া নিজের অন্ধতায়, মূঢ়তায় নিজে গর্ব্ব অনুভব করিয়া, ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহার অন্তর দেশ দিয়া যে শান্তি ও স্নিগ্ধতার ফল্গুধারা বহিতেছে, তাহার সন্ধান আর কোনো কালেই পাইব না! ভারত-শিল্প কেন, ভিতরের ঐ অন্তর্ধারাটি—ঐ নিগূঢ় ভাবসূত্রটি ছাড়িয়া দিলে রামায়ণ মহাভারতকেও কেবলমাত্র আজগুবি গল্পের ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু ঐ এক নিগূঢ় সূত্রটি তাহাদের চরম সত্যে লইয়া তুলিয়াছে।

বুদ্ধদেব যবদ্বীপের
(মিঃ ই বি হ্যাভেল প্রণীত Indian Sculpture & Painting হইতে গৃহীত)

এইরূপ সকল বিষয়ই জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে তৎসম্বন্ধে একটা প্রাগ্‌জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; শিল্পকলা সম্বন্ধেও এই কথাটি ঠিক তেমনই স্থির অভ্রান্তভাবেই খাটে—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া কোনও লাভ নাই। বিজ্ঞান বা অঙ্কশাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতও আসিয়া যদি র্যাফেল, এঞ্জিলো বা অজন্তার উৎকৃষ্ট চিত্রাবলী সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন বা ও কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাহা হইলে তিনি অঙ্কে বা বিজ্ঞানে পণ্ডিত বলিয়াই যে, তাঁহার কথা মানিয়া লইতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই! চিত্রাদি সম্বন্ধে যাঁহারা একটা অন্ধ মতামত পূর্ব্বের কাহারো-মুখে-শোনা-কথায়-ধারণা-করা সিদ্ধান্ত অথবা বিচার-হীন সমালোচনা সহসা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, সর্ব্বদা তাঁহাদের এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, যেহেতু তাঁহাদের চক্ষু আছে, সেই কারণে তাঁহারা চিত্র দেখিতে জানেন, ইহা কদাচ যেন মনে স্থান না দেন। 'শুধু দেখা' আর 'দেখার মত দেখায়' বিস্তর প্রভেদ। উচ্চ ভাব-গৌরব-সম্পন্ন কবিতা অনেকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা আগাগোড়া গড় গড় করিয়া পড়িয়া যাইতে পারেন—সে জন্য মনে করা চলিবে না যে, কবিতাটি পাগলের প্রলাপ মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে যে একদল শিল্পকলা-সমালোচক আসরে দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া, প্রকাশ্য পত্রিকাদিতে ঐ প্রকার 'সমালোচনা'র ভগ্নঢাক পিটাইয়া থাকেন এবং নিজেদের মূঢ়তা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাঁহারা এতই অজ্ঞ যে, তাহাতে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। এরূপ 'সমালোচকের' সদ্ভাব প্রচুর হইলেও প্রকৃত সুকুমার শিল্পরসিকেরও আজকাল অভাব নাই। তাঁহারা ভারতশিল্পের অন্তরদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিগূঢ় সত্যটির সন্ধান লাভ করিয়াছেন। ভোগের উপর, বিলাসের উপর যে, ভারত-শিল্পের প্রতিষ্ঠা নয়—ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতেই যে তাহার কার্য্য পরিসমাপ্ত নয়—সত্যের উপর—ত্যাগের উপর—আনন্দের উপরই যে, তাহার ভিত্তিভূমি, ইহা কাহার স্বকপোলকল্পিত কথা নয়—ইহা চিরন্তন এবং একান্ত সত্য। প্রাচীন ভারতে ললিতকলার ব্যবহার একটু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলেই ইহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য দর্শন যেমন উপযুক্ত মধ্যম (medium) সাধারণ মনের জন্য চিত্র-ভাস্কর্য্যাদির জীবন্ত উদাহরণ সেইরূপ এবং এই উদ্দেশ্যেই সেই প্রাচীন কাল হইতে শিল্পকলার ব্যবহার এদেশে চলিয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্যের অজন্তা কৈলাস, করালী, ইলোরা, বোম্বাইএর নিকটস্থ এলিফেন্টা যবদ্বীপের 'বড়বুদ্ধ' (Borobudor) প্রভৃতির যুগবিখ্যাত

চিত্র-ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ শিল্প-ভাণ্ডারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল চিত্র বা ভাস্কর্য্য-ভাণ্ডারের কোথাও ভোগের চিত্র দেখা যায় না। দুই চারিটি চিত্র যাহা দেখিয়া অনেকে তাহাদিগকে ভোগের চিত্র বলিয়াছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ভোগের অলীকতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব দেখাইবার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছে। কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে একটি কি কয়েকটি ভোগের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না— যদিই বা কদাচ যায়, তাহা হইলে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে, সেই চিত্রগুলির পরে আরও কয়েকটি

অজন্তা গুহাগাত্রে খোদিত—ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্র
(শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত "অজন্তা" হইতে গৃহীত)

ক্রমিক চিত্র ছিল, সেগুলি কালের নিষ্ঠুর সংস্পর্শে মুছিয়া গিয়াছে। অজন্তা গুহায় ঠিক ইহারই একটি উদাহরণ ঘটিয়াছিল। একজন নরপতি নর্ত্তকী ও কামিনীবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভোগ-বিলাসে মত্ত আছেন। এই ছবিটি দেখিয়া অনেকে ইহাকে ভোগের ছবি বলিয়া দোষারোপ করেন। পরে সেই ঘোর অন্ধকার গুহার ভিতরে এই ছবিটির পার্শ্বে অনেকগুলি ক্রমিক ছবি দেখা গিয়াছে। প্রথমটির—যেটির কথার উপরে বলা হইল, সেটি—রাজার ভোগের ছবি; দ্বিতীয়টিতে রাজা হস্তি-পৃষ্ঠে বহু-লোক-লস্কর সৈন্য 'শাস্ত্রী' সমভিব্যাহারে বুদ্ধদেবের চরণ-সন্দর্শনে চলিয়াছেন। তৃতীয়টিতে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষের চরণোপান্তে একান্ত দীনভাবে শরণ মাগিতেছেন! এইরূপে একথা বার বার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যেখানেই চিত্রের ভিতর ভোগের উপাদান একটু আধটু লক্ষিত হয়, সেইখানেই তাহার হীনতা, অলীকতা ও অনিত্যতা প্রচার করিবার জন্যই দেখান হইয়াছে—তাহাকে ত্যাগ করিবার একান্ত আবশ্যকতাই প্রদর্শিত হইয়াছে—ভোগ-বাসনার উদ্রেকের জন্য কখনও অঙ্কিত হয় নাই।

তখনকার সমাজের জীবনযাত্রার একান্ত সরলতা ও বস্ত্রাদির অপ্রাচুর্য্যহেতু প্রাচীন চিত্র-ভাস্কর্য্যাদি অধিকাংশ অর্দ্ধ-নগ্ন ও কতক নগ্নই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ নগ্নতা ও প্রাতীচ্য নগ্নতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ! প্রতীচ্য চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে মূর্ত্তিগুলির নগ্নতা তখনকার দিনের সরলতা প্রসূত নয়। পদতলে বিপুল বস্ত্রভার লুণ্ঠিত, বা কটির শুধু এক প্রান্তে অঞ্চল-বিলম্বিত, মূর্ত্তিগুলি লালসার উদ্রেকের জন্যই—ভোগ-বাসনার ইন্ধন যোগাইবার জন্যই—নগ্ন করিয়া অঙ্কিত বা তক্ষিত হইয়াছে;—ইহার ভিতরে উদার উচ্চ এমন কিছুই নাই, যাহা এই মূর্ত্তির ইচ্ছাকৃত ও একান্ত অভীষ্ট নগ্নতাকে গোপন করিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে কি বিপুল প্রভেদ! ইহার নগ্নতা, বা অৰ্দ্ধনগ্নতা লালসার তো উদ্রেক করেই না পরন্তু তাহার ভিতরকার সুগভীর ভাবরাশির বিরাটত্ব চিত্তকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে—মূর্ত্তিগুলিকে এমনই এক অলৌকিক জ্যোতিতে ঘিরিয়া থাকে যে, তাহার নগ্নতার কল্পনার জন্য মনের কোনও গোপন কোণেও এতটুকু স্থানও থাকে না—ভাবের বিহ্বলতায় নগ্নতা কোথায় চাপা পড়িয়া যায়, দর্শক তাহা খুঁজিয়াই পান না!

তাই, খাঁটি ভারতশিল্পে উচ্চ আদর্শ ব্যতীত ক্ষণিক প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে, এমন চিত্র বা ভাস্কর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দু চারিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খাটি ভারত-শিল্প নয়—সেগুলি গ্রীকো-রোমীয় প্রভাবে

বিকৃত এবং গান্ধার-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। অনেক পাশ্চাত্য ও এদেশীয় পণ্ডিত এই গান্ধার শিল্পের স্থান ভারতীয় শিল্প-কলার উচ্চ স্তরে নির্দ্দেশ করিয়া নিতান্ত ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই উচ্চ-আদর্শ-বর্জ্জিত ব্যবসাদারী ভাস্কর্য্যমূর্ত্তিগুলির বাহিরের চাকচিক্যে ও পারিপাট্যে তাঁহারা ভারতশিল্পের ভাবসূত্রটি হারাইয়া, এই ভ্রান্তপথে আসিয়া পড়িয়াছেন। গ্রীকো-রোমীয় প্রভাববশে গান্ধারশিল্পের অবয়বাদি পেশী-বহুল মল্ল বীরের মত বলিয়া এই সকল সমালোচকেরা মোহান্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহাদের ভিতর-কার ভাবের দৈন্য ও অগভীরত্ব, বসনভূষণের ঘটা ও গঠনে সাধারণ মানবশরীরাবয়বের নকল করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিলে, ইলোরা, এলিফেণ্টা, বড় বুদ্ধ প্রভৃতির মূর্ত্তির তুলনায় ইহা-দের একান্ত হীনতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সুকুমার-শিল্পের অর্থ যে প্রকৃতির নকল নয়, ইহা এখনও অনেকের কাছেই প্রহেলিকাবৎ বোধ হয়; অথচ ইঁহাদের ভিতর অনেকেই রামায়ণ-কথিত সত্তর যোজন লাঙ্গুলধারী পবন-নন্দনের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করি-বার জন্য ঘোর গবেষণা করিয়া থাকেন ও তর্কের তুফান তুলেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা—যবদ্বীপে প্রাপ্ত

(মিঃ ই বি. হ্যাভেল্-প্রণীত 'Indian Sculpture & Painting' হইতে গৃহীত)

প্রকৃতির ভাষা ও ললিত-কলার ভাষা এক নহে। যদি তাহাই হয়, তবে ললিত কলার চরম পরিণতি হইয়াছে, আজ কাল বিজ্ঞানের দ্বারা ত্রিবর্ণ আলোক-চিত্র-পদ্ধতি আবিষ্কারে। অতঃপর আর কোনও নির্ব্বোধ চিত্রকর সারাজীবন একটি চিত্রের জন্য প্রাণপাত করিবে না—আর কোনও মূঢ় ক্রেতা একলক্ষ বা ততোঽধিক মুদ্রাব্যয়ে তাহা ক্রয় করিতে যাইবে না। তাহা হইলে, ইহার ভিত্তি এখন আর 'Art'এর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—আজ হইতে ইহা 'Science' হইয়া গিয়াছে। শিল্প-কলার বিষয়ের ব্যাপ্তিটি আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহা প্রকৃতির নকলে পর্য্যবসিত নহে। তথাকথিত প্রাকৃতিক জগতের অধিকাংশ বাহিরের জিনিষ লইয়াই ভারত-শিল্পের বিষয়; সুতরাং শিল্পের অন্তরটি যখন দৃশ্যমান্ প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্তর্গত নয়, বাহিরের উপরেই বা তখন কেমন

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর
বিজয়া বটিকা।
BIJOYA BATIKA
SOLE AGENTS IN INDIA
B. BASU & CO. CALCUTTA
THE WONDERFUL FEVER PILL
বিজয়া বটিকা
প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের অব্যর্থ মহোষধ।
মূল্য,—১নং (১৮ বটিকা) কোটা ৷৶৹ ;
২নং (৩৬ বটিকা) কোটা ১৶৹ ;
৩নং (৫৪ বটিকা) কোটা ১৷৶৹ ;
৪নং (১৪৪বটিকা) কোটা ৪৷৹ ; ডাঃমাঃ স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান,—বি, বসু এণ্ড কোম্পানী,
৭৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পূজার নূতন উপহার

আবার দুইখানি বই! দুইখানি নূতন বই!!

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের

কাঙ্গাল হরিনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড)

ও

পরাণ মণ্ডল

বিগত বৎসর পূজার সময় শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর 'কাঙ্গাল হরিনাথ' প্রথম খণ্ড 'করিম সেথ' পাঠকগণকে উপহার দিয়াছিলেন ; এবার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' দ্বিতীয় খণ্ড ও 'পরাণ মণ্ডল' পূজার উপহার দিতেছেন। কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয় দিতে হইবে না, যে পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যরথী বলিয়াছিলেন 'জলধর বাবু হিমালয় লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কাঙ্গাল হরিনাথ লিখিয়া পবিত্র হইলেন'—সেই কাঙ্গাল হরিনাথের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে জলধর বাবু কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে দেখাইয়াছেন কাঙ্গাল সাধনপথে কোন্ স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডে যে গানগুলি আছে তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া দেয় বলিলেই হয়।

তাহার পর 'পরাণ মণ্ডলের' কথা, এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, করুণ রসের অবতারণায় জলধর বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই, সেই জলধর বাবুর এই 'পরাণ মণ্ডল' তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ করুণ রসধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। এবার পূজার এই দুইখানি বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হইবে। দুইখানিরই ছাপা, কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট ; দুইখানিতেই চিত্র আছে ; বিশেষতঃ পরাণ মণ্ডলের চিত্রগুলি অতি সুন্দর। প্রত্যেক খানিরই মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। ১০ই ভাদ্র প্রকাশিত হইবে।

জলধর বাবুর অন্যান্য পুস্তক

(১) হিমালয় (চতুর্থ সংস্করণ) ১।০, (২) প্রবাস চিত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲, (৩) পথিক (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲, (৪) নৈবেদ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০, (৫) কাঙ্গাল হরিনাথ (প্রথম খণ্ড) ১।০, (৬) করিম সেথ ৸০, (৭) ছোট কাকী ৸০, (৮) নূতন গিন্নী ॥৵০, (৯) দুঃখিনী ৸০, (১০) পুরাতন পঞ্জিকা ৸০, (১১) বিশুদাদা ১।০, (১২) সীতাদেবী ১৲, (১৩) হিমাদ্রি ৸০।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত

নানা চিত্র সম্বলিত অপূর্ব্ব সরস চিত্তহারী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অতি মধুর সুখপাঠ্য গ্রন্থ

বারাণসী।

মূল্য ॥৵০ আনা।

তত্ত্বের ভাণ্ডার, অমৃত বল্লরী, সুধাসঞ্জীবনী

শ্মশান-সন্ধ্যা।

মূল্য চারি আনা।

নানা হাফ্‌টোন ছবি সংবলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল

সংবাদপত্রে একবাক্যে প্রশংসিত

প্রেম ও প্রকৃতি

প্রবীণ কবি শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত

মূল্য ৸০ আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কোহিনুর ব্যাঙ্কিং এণ্ড প্রভিডেণ্ট কোং লিমিটেড।

হেড অফিস :—৮৩ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—"কোব্যাপকল"।

মাসিক ৬৲ টাকা হইতে ॥০ আনা চাঁদা দিয়া জীবন, বিবাহ, উপনয়ন, শিক্ষা, গৃহ-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, তীর্থদর্শন ও অন্নাশন বীমা করা হয়। ৬০ দিবস পরে দাবী দেওয়াই এই কোম্পানীর বিশেষত্ব। সর্ব্বত্র উচ্চহার কমিশনে বা বেতনে এজেন্ট আবশ্যক।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—মেসার্স টি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

সেক্রেটারী—মিঃ এস, সি, অধিকারী।

[২১।৫—চ] এঃ সেক্রেটারী—মিঃ বি, সি, ঘোষ।

পপুলার ব্যাঙ্কিং প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ

হেড অফিস, ১৭৬।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে, জীবন, বিবাহ, উপনয়ন, শিক্ষা, পুষ্করিণী, গৃহ-নির্ম্মাণ, তীর্থদর্শনের বীমা করা হয় ; চাঁদার হার ২৲ টাকা, ১৲ টাকা, ॥০ আনা। উচ্চ, কমিশনে বা মাহিনাতে এজেন্ট আবশ্যক, সত্বর আবেদন করুন।

[২১।৫—চ]

"এখনই দুইটি লোক ও একটি স্ত্রীলোক এই বাড়ীর ভিতর গিয়াছে। আমি তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়াছি।"

"সেই প্রুসিয়ানটাও ওদের সঙ্গে আছে?"

"না, পুরুষ দুইটি বিদেশী ভদ্রলোক। আমি তাঁদের চিনি, আর স্ত্রীলোকটি সেই ম্যাডাম সার্জেন্ট।"

"তা'হলে বাড়ীটা রীতিমত নিশাচরের আড্ডা! হুজুর, পুলিশে খবর দেব কি?"

"না, পুলিশে খবর দিতে হবে না, ওরা কি করে দেখিতে হইবে, সেই জন্যই আমি তোমার ঘরে এসেছি।"

"কোন চিন্তা নাই, এখান থেকে কিছুই নজর এড়াবে না।"

"একটা কথা, ও বাড়ী থেকে বাহিরে যাইবার আর কোন পথ আছে?"

"বাড়ীর পিছনে একটা বাগান। পুলিশ যখন বাড়ীটা অনুসন্ধান করে, আমি তাহাদিগের সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু বাড়ীর পিছন দিকে আমি কোন দরজা দেখিনি।"

সহসা ম্যাক্সিম বলিলেন, "ঐ দেখ, দোতলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে।"

"তাইত। বড় বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছে যে! নিশ্চয় কতকগুলা লোক বাড়ীর ভিতর আছে। এযে একেবারে রোশনাই করে ফেল্‌লে দেখিতেছি। ঐ যে ভোজঘরে একে একে আলো জ্বলে উঠছে, মহিলাটি আজ হয় ভোজ, না হয় নাচ একটা কিছু দেবেই। বাহারে, এত চাকর বাকর কোথা থেকে এলো? যাদের মনে কুসংস্কার প্রবল, তারা দেখলেই ভাব্‌বে, বাড়ীটাতে আজ শয়তানের মজলিস বসিতেছে। বাড়ীটা তৈয়ারী হবার পর, এ পর্য্যন্ত কেউ ত রাত্রে ও বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখে নি!"

"তবুত বাপু বল্‌লে, আজ ক'দিনের মধ্যে ও বাড়ীতে কেউ প্রবেশ করে নি!"

"একটা বিড়াল পর্য্যন্ত নয়। যদি সকলে ঘুমিয়ে না থাকে, তবে তারা নিশ্চয়ই বাড়ীর জানালা থেকে এই ব্যাপার দেখছে। এখনি হয়ত এমনই হৈ চৈ পড়ে যাবে য, রাস্তায় লোকের ভিড় হবে।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "দেখ দেখ, বৈঠকখানার পর্দ্দার পর ঐ তিনটা ছায়া দেখিতে পাইতেছ?

"হাঁ, দেখিয়াছি। দুইটা লম্বা, একটা একটু খাট। এরা সেই দুইটি ভদ্রলোক—আর তাঁহাদিগের সঙ্গিনী। বোধ করি, এখনও আহারের আয়োজন শেষ হয়নি। তারা বোধ করি, আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। বাঃ, ঐ যে আবার পরস্পরকে নমস্কার করিতেছে। ঐ যে একজন চলে গেল, এখন কেবল দুইটা ছায়া দেখা যাইতেছে। লোকটা কোথায় গেল?"

পাঁচ মিনিট আর কিছুই হইল না। ছায়া দুইটি মিলাইয়া গেল। আলোক যেমন জ্বলিতেছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল। সহসা সদর দরজা খুলিয়া গেল, প্রথমে একটি লোক বাহির হইল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলোক হস্তে একটি ভৃত্য বাহির হইল। ম্যাক্সিম উজ্জ্বল আলোকে বরিসফকে চিনিলেন। তিনি ভৃত্যকে কি বলিয়া বুলোভার্দ মালেস হারবেস অভিমুখে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল। সুন্দরী ও তরবারিশিক্ষক বৈঠক-খানার বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া বোধ হইল, উভয়ে কার্ণোয়েলের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বাইডার্ডকে বলিলেন, "শোন, রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত আমি ঐ লোকটার অনুসরণ করিব।"

"আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি, আপনি দরজায় একটু ঘা দিলেই আমি আবার দরজা খুলিব।"

বাইডার্ড ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দিল, ম্যাক্‌সিম বাহির হইলেন। কয়েক হস্ত দূরে বরিসফ তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে-ছিলেন। রুদে জেঁরঁদের প্রান্তে আর একটি লোক ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিল। ম্যাক্‌সিম তাহাকে চিনিলেন, সে ব্যক্তি তাঁহারই গাড়োয়ান। ম্যাক্‌সিম মনে মনে বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, রুষটা চলিয়া যাউক, সে কোন্ দিকে গেল, গাড়োয়ান আমাকে সে খবর দিতে পারিবে।" ম্যাক্‌সিম অন্ধকারে লুকাইলেন।

কর্ণেল দ্রুতবেগে মালেস হার্ব্বিসে উপনীত হইয়া, গাড়োয়ানকে দেখিয়া একেবারে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল। শেষে কর্ণেল আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে, ম্যাক্‌সিম গাড়োয়ানের নিকট গমন করিলেন। গাড়োয়ান তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভদ্রলোকটি আমার নিকট হইতে কথা বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আমি

তাহাকে খুব ফাঁকি দিয়াছি। আমার গাড়ী দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি, ডাক্তার ঐ বড় বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়াছেন, বলিলাম।”

ম্যাক্‌সিম বলিলেন, “তুমি বেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে বকসিস্ দিব।’ লোকটা তোমাকে কোথাও যাইবার জন্য বলিয়াছিল কি ?”

“হাঁ, তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন,—এখান থেকে বাড়ীটা বেশী দূর নয়।”

“রুদে ভিস্‌নিতে বুঝি ?”

“আপনি ঠিক ঠাওরাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাকে একটা মোহর দিলেও আমি যাইতাম না। আমার দ্বারা কোন কাজ হইবে না দেখিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, তিনি এতক্ষণ বুলভার্দ দি কুরসেলেসে পৌঁছিয়াছেন।” “তুমি খুব বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। আমি তোমাকে ভাল রকম বকসিস দিব। লোকটা আবার ফিরিয়া আসিবে, তুমি উহার উপর নজর রাখিও। আমি ফিরিয়া আসিলে সকল খবর দেওয়া চাই। যদি প্রয়োজন হয়, তোমাকে পাওয়া যাইবে ত ?”

“পাবেন বৈ কি ? অগষ্টি বলিয়া ডাকিলেই হইবে। যদি হাঙ্গামা বাধে, তখন বুঝিবেন, আমি কেমন মজবুত লোক।”

“বেশ, দরকার হইলে আমি তোমাকে ডাকিব।”

ম্যাক্সিম পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেলেন। গৃহরক্ষক তৎক্ষণাৎ দ্বার মোচন করিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “লোকটা মালেস হারবিসে চলিয়া গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে।”

“লোকটা ফিরিয়া না এলে ওরা আহারে বসিবে না।”

“চুপ, ঐ দেখ, তিনজন লোক এই দিকে আসিতেছে। লোকগুলা আঁধারে আঁধারে লুকাইয়া আসিয়া বাড়ীর দরজার দুই পাশে দাঁড়াইল।”

ঠিক এই সময়ে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি ম্যাডাম সার্জ্জেন্টের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি লোক গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দরজার ঘণ্টা বাজাইল। অমনই দ্বার মুক্ত করিয়া একটি ভৃত্য বাহির হইল। আগন্তুক তাহার সহিত কয়েকটি কথা কহিয়াই গাড়ীর দরজার নিকট গেল এবং গাড়োয়ানকে কি বলিয়া গাড়ীর দ্বার মোচন করিল। মসিও কার্ণোয়েল গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, দুইজন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ম্যাক্সিম মহা বিস্মিত হইলেন। কার্ণোয়েল তাঁহার সঙ্গিদ্বয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক এখানে ধরিয়া আনা হয় নাই। বাড়ীর বহির্দ্বার মুক্ত ছিল এবং পরিচারক দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল। ভৃত্য কার্ণোয়েলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাইডার্ড মৃদুস্বরে বলিল, “দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই বাড়ীর লোকেরা এই যুবাপুরুষকে খুন করিবার মতলব করিয়াছে। লোক ডাকিবার জন্য আমার ভারি ইচ্ছা হইতেছে!” ম্যাক্সিম বলিলেন, “এখন না, আগে দেখা যাক, ইহাদের অভিসন্ধি কি।” “বৈঠকখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখুন, পর্দ্দার উপর আবার দুইটি ছায়া দেখা যাইতেছে।”

“সেই রমণী ও তাহার বন্ধুর ছায়া,—গাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া, তাহারা আবার জানালায় আসিয়াছে।”

“ওরা কখনই দরজা খুলিবে না। আমাদের তেতলার ভাড়াটিয়ারা দরজা খুলিয়াছে! ডাকাত বেটারা কখনই দেখা দিবে না। ঐ দেখুন, পর্দ্দার ছায়া সরিয়া গিয়াছে। এখন পথের উপর নজর রাখিতে হইবে।”

কিন্তু পথে কোন অদ্ভুত ঘটনাই ঘটিল না। গাড়ী যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছিল, লোক তিনটা প্রাচীরের গাত্রে মিশাইয়া নিঃশব্দে পাহারা দিতেছে। রবার্ট কার্ণোয়েল পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির সঙ্গে দ্বারের সন্নিহিত হইয়াছিল, আর একটি লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তবে সত্য সত্যই কার্ণোয়েল বরিসফের বন্দী। কিন্তু বরিসফ আজ রাত্রে তাঁহাকে এখানে আনিল কেন? ম্যাক্সিম নীরবে সমস্ত দেখিতেছিলেন। তাঁহার এক একবার পুলিশ ডাকিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাহাই হউক, এরহস্য ভেদ করিতে হইবে। রবার্ট কার্ণোয়েল বাহির দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ হইল :

"কোঁ—কোঁ—কোঁ—কোঁ—কোঁ!" গৃহরক্ষক বলিল, "তেতলার একজন ভাড়াটিয়া বড় মজার লোক। এখনই খুব মজা দেখা যাবে।" ম্যাক্সিম নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, হাসিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। রাস্তার সমস্ত লোক ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপরের দিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু কেহ কোন শব্দ করিল না। এই সময়ে আবার কুক্কুট-ধ্বনি হইল। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের বাটীর সম্মুখস্থিত লোকদিগের মধ্যে রবার্ট কার্ণোয়েল এই শব্দ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, ভৃত্যগণ দ্বার ছাড়িয়া দিল। যে তিনজন রবার্টের সঙ্গে ছিল, তন্মধ্যে একব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। অপর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, ভৃত্য তাহাদিগকে কি বলিল, তাহারা এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে কোচম্যান কোচবাক্সে ঘোড়ার লাগাম বাঁধিয়া বাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং যাহারা প্রাচীরলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের এক ব্যক্তির হস্তে চাবুক প্রদান করিল। লোকটা কষাহস্তে ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর কোচম্যান যাই মুখ ফিরাইল, অমনি ম্যাক্সিম দেখিলেন, কোচম্যান-বেশে স্বয়ং বরিসফ! এই সময়ে বাইডার্ড বলিল, "দেখুন, দেখুন, উপরের সমস্ত ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। অতিথি এলেন, আর সমস্ত আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল, এত বড় অদ্ভুত! এরা লুকোচুরি খেল্‌চে নাকি! কোচবাক্স থেকে যিনি নেবেছেন, ব্যাপার দেখে তিনি কিছু বিস্মিত হয়েছেন। ঐ যে পিছিয়ে এসে উপর পানে চাইচেন! যাদু দেখ কি, উপর সব আঁধার।"

বরিসফ কিয়ৎক্ষণ রাজপথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলেন। তাহার পর অন্যদিকে ফিরিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, যে লোকটা কুক্কুট-ধ্বনি করিয়াছিল, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে কিনা দেখিতেছিল। লোকটা চুপ করিয়াছিল। কিন্তু বরিসফ একেবারে অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে গমন করিলেন। দ্বারের উভয় পার্শ্বে তখনও দুইজন লোক পাহারা দিতেছিল। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল। বাইডার্ড বলিল—"আহা, বেশ! বেশ দরজা বন্ধ করেছে। লোকটা ভেবেছিল, মনিবের সঙ্গে সঙ্গে তারও বুঝি নিমন্ত্রণ হয়েছে?"

ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বলিলেন—"লোকটা কোচম্যান নয় হে।"

"আমারও তার পোষাক দেখে সন্দেহ হয়েছিল। ওঃ! লোকটা রেগে আগুন হয়েছে, দরজায় দমাদম লাথি মারছে, আরও ক'জন ওর সঙ্গে জুটল যে! কিন্তু বাবা ও দরজা ভাঙ্গবার নয়। কি গোলমাল কচ্ছে দেখুন। এখনই পাড়ার সমস্ত লোক জেগে উঠবে।"

"তা হলেই ভাল হয়।"

"কি আশ্চর্য্য, কেরাণীরা যে এখন পুলিশ ডাকাডাকি আরম্ভ করে নাই।"

"চুপ। ভোজ-ঘরের একটা জানালা খুলিতেছে, একটা লোক ওখানে দাঁড়াইয়া আছে।"

"যাহারা ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছিল, ও তাদেরই একজন, ওর কাজ দেখেই চিনতে পেরেছি; কোচম্যান জানালার নীচে যাইতেছে। এইবার কথা হবে।"

"ওরা কি বলে শুনবার জন্য আমার ভারি ইচ্ছা হচ্চে, আস্তে আস্তে জানালাটা একটু খোল।"

জানালার লোকটার সঙ্গে কর্ণেলের খুব জোরে জোরে কথা হইতে লাগিল, কিন্তু রুশভাষায় কথোপকথন হওয়াতে ম্যাক্সিম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

"ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট, রবার্ট কার্ণোয়েল, তরবারি-শিক্ষক, ইহারা সব কোথায় গেল? বাইডার্ড বলিল, "ঐ দেখুন, যে লোকটা দোতলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গীরা জানালার নীচে গাড়ী লইয়া গেল। ওখান থেকে কোচবাক্সের উপর লাফাইয়া পড়া শক্ত নহে। উহারা কথা বন্ধ করিয়াছে। এখন জানালাটা বন্ধ করি।"

বাইডার্ড জানালা বন্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ম্যাক্সিম বলিলেন, "তোমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাই উহাদিগের অভিপ্রায়। ঐ দেখ দুইজন কোচবাক্সের উপর উঠিতেছে। গাড়ীর সাহায্যে উহারা সিঁড়ির কাজ করিবে।" "ওদের সাহস আছে দেখছি। জানালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, খুব বুকের পাটাত। বেটারা নিশ্চয় ডাকাত। ওদের বাড়ীতে

ঢুকতে দেওয়া হবে না, আপনি আপত্তি না করেন ত লোক ডাকি।"

"আপত্তি? এই সময়ে উহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিলেই ভাল হয়, উহাদের সহজে পালাতে দেওয়া হইবে না। আমি নিজে গিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতেছি।"

ম্যাক্সিমের কথা শেষ হইতে না হইতে আর একবার কুক্কুট-ধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল "খুন" "ডাকাত" "চোর চোর!" "পাঁচিল ডিঙ্গাইতেছে।"

কোচবাক্সে দাঁড়াইয়া যে দুইজন লোক জানালায় উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, তাহারা এই চীৎকার শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বাইডার্ডের বাড়ীর সমস্ত জানালা খুলিয়া গেল। বাইডার্ড আনন্দে বলিয়া উঠিল, "সকলে জাগিয়াছে। কেরাণীরা সকলেরই ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে। এইবার খুব রগড় হবে।"

মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ। ও পারের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে, জানালা ভাঙ্গিয়া ঢুকিতেছে। পুলিশ ডাক, পুলিশ ডাক।"

একটা স্ত্রীলোক বলিল, "খুন কর, গুলি চালাও!"

আর একজন বলিল, "র'ও শালাদের দেখাচ্ছি! আমার রিভলবার? আমার রিভলবার কোথায়?"

এদিকে ম্যাক্সিম বরিসফের উপর নজর রাখিয়াছিলেন। বরিসফ এই অভাবনীয় ঘটনায় কিছু ভীত, কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রোধে কাঁপিতেছিলেন, এবং কোলাহলকারীদিগকে ঘুসি দেখাইতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পলায়ন ভিন্ন এখন আর উপায় নাই। তাঁহার আদেশে, কোচবাক্সের উপর হইতে একটি লোক নীচে লাফাইয়া পড়িল। উপরের বারান্দায় যে লোকটি ছিল, সে গাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া, আর এক লাফে রাস্তায় পড়িল। ঠিক সেই সময়ে বাইডার্ডের নীচের ঘর হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। বরিসফ তাড়াতাড়ি আপনার দলবল লইয়া গাড়ীতে উঠিল। কোচবাক্সের লোক বিদ্যুৎ বেগে এভিনিউ ডি ভিলিয়ার্স অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইল।

"কাপুরুষেরা পলাইতেছে।" বাইডার্ড চীৎকার করিয়া বলিল, "কাপুরুষেরা পলাইতেছে, কিন্তু উহাদিগকে পলাইতে দেওয়া হইবে না, চলুন মহাশয়, আমরা উহাদিগের পিছু লাগি, রাস্তার ঐ দিকে পুলিশের থানা আছে, তাহারা গাড়ী থামাইবে।"

বাইডার্ড ও ম্যাক্সিম রাজপথে বাহির হইলেন। বরিসফের গ্রেপ্তারের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু ম্যাডাম সার্জেন্ট, রবার্ট কার্ণোয়েল এবং তরবারি-শিক্ষকের কি হইল, জানিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ইহারা তিনজনেই ঐ বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, বাইডার্ডের ভাড়াটিয়াদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। ম্যাক্সিম রাজপথে বাহির হইবামাত্র ভিক্টোরিয়া গাড়ীখানি তাঁহার নিকট আসিয়া থামিল। পিস্তলের শব্দ শুনিয়া অগষ্টি দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল।

বাইডার্ড বলিল "সাবাস! আমরা গাড়ীতে উঠিয়া ডাকাতদের পিছু লইব।"

গাড়োয়ান বলিল "তাহারা যদি ঐ প্রকাণ্ড জুড়িতে উঠিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের পিছু গাড়ী চালাইয়া কিছু হইবে না। আমার ঘোড়া ভাল হইলেও দশহাজারী ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে না। ও গাড়ীর ঘোড়া ঘণ্টায় পনর মাইল যাইবে।"

ম্যাক্সিম গাড়োয়ানের কথার অনুমোদন করিলেন।

এদিকে পিস্তল ছোড়া লইয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে মহা তর্কযুদ্ধ চলিতেছিল। বাইডার্ডের ভাড়াটিয়ারা একে একে সকলেই বাহিরে আসিয়া জড় হইয়াছিল। ম্যাক্সিম্ ইহাদিগের দ্বারা নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির আশায় বলিলেন,"দেখুন, মহাশয়েরা, আপনাদিগের সঙ্গে আমার আলাপ নাই বটে, কিন্তু দৈবক্রমে আজ আমি এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছি—"

বৃদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা মসিয়ে পিন কর্ণেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বলিল "কে মহাশয় আপনি?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ম্যাক্সিম্ মনে মনে মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এখন ইহাদিগের মনস্তুষ্টি করা আবশ্যক, সেই জন্য তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি একটু অনধিকার চর্চ্চা করিতেছি সত্য, কেননা আমি এ বাড়ীর লোক নই। কিন্তু আমি গৃহরক্ষককে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। ফিরিয়া যাইব, এমন সময় ডাকাতগুলা গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই ভদ্রলোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমি এখানে

গুরগণ ও দলনী।

"তুমি নিপাৎ যাও, অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম"

(চিত্রে চন্দ্রশেখর হইতে)

—চন্দ্রশেখর

অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি রুদে সুরেসনেসের ব্যাঙ্কার মসিয়ে ক্লড ডরজেরেসের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ঔষধবিক্রেতা বলিল, "চমৎকার কারবার, ব্যবসাদার মহলে তাঁর খুব নামডাক আছে।"

ত্রিতলের একজন যুবক ভাড়াটিয়া বলিল,—"চুপ কর! আমি আপনার জেঠামহাশয়ের খাতাঞ্জিকে চিনি।"

ম্যাক্সিম্ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি?"

পূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, আমরা একত্র আহারাদি করিতাম। তাঁহার নাম জুলস্ ভিগ্‌নরী, গোলাপার্ডিন, তাঁহাকে তুমিও চেন,—না?"

নম্বর দুই কেরাণী বলিল "হাঁ চিনি। তাঁহার বর্ণনা শুনিবেন? জুলস্ ভিগনরী, ভিনোলে জন্ম, বড় ধার্ম্মিক, বয়স ছাব্বিশ বৎসর—"

ম্যাক্সিম্ হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আর সব আমি জানি, তিনি আমার পরম বন্ধু, আজ তাঁহার দুই-জন সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বড়ই প্রীত হইলাম।"

"ফ্যালট, ইহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দাও, পরে আমি তোমার সহিত ইঁহার পরিচয় করাইয়া দিব।"

ফ্যালট অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "গোলাপার্ডিন, হিসাবনবীশ, 'চিল্‌ড্রেন অফ্ এপলো' সভার সদস্য।"

কেরাণীযুগলের সহিত ম্যাক্সিমের যথারীতি পরিচয় হইয়া গেল। অনন্তর বহু তর্কযুদ্ধের পর বাড়ীটার ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করাই স্থির হইল। ম্যাক্সিম এই বে-আইনি কার্য্যের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি কেরাণীদ্বয়ের সঙ্গে বাড়ীর বারান্দায় আরোহণ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফ্যালট একটা দীপ-শলাকা জ্বালিল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, ঘরে জন-প্রাণী নাই, কেবল টেবিলের উপর ভোজনপাত্রসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি নাই। সমস্ত ঘরের দ্বার রুদ্ধ। গোলাপার্ডিন ও ফ্যালট এই সকল ব্যাপার দেখিয়া গণ্ডগোল করিতেছে, এমন সময়ে ঘটনা-স্থলে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা নীচে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা পুলিশকে সমস্ত ঘটনার কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য বক্তৃতা আরম্ভ করিল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, পুলিশের সহায়তা ভিন্ন অনুসন্ধান কার্য্য চলিবে না, তখন কেরাণীযুগলের সঙ্গে নীচে অবতরণ করিলেন।

পুলিশ দ্বার-মোচনের যন্ত্র তন্ত্র লইয়া আসিল। থানার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী বাটীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতরে ঘোর অন্ধকার। বাইডার্ড পূর্ব্ব হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া একটা লণ্ঠন লইয়া আসিয়াছিল। বৈটকখানা, ভোজগৃহ, পেসাধন-কক্ষ, একটি একটি করিয়া সমস্ত ঘর অনুসন্ধান করা হইল, কেহ কোথাও নাই। অবশেষে সকলে বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। পুলিশপ্রহরী অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল।

এই সময়ে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "দেয়ালের গায়ে একটা সিঁড়ি লাগান রহিয়াছে যে!" বাইডার্ড বলিল, "ইহারা পলাইয়া গিয়াছে। দেয়ালের বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা জায়গা। এতক্ষণে তাহারা কতদূর গিয়াছে।"

একজন পুলিশপ্রহরী সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া দেখিল, প্রাচীরের অপর পার্শ্বেও ঐরূপ একখানি সিঁড়ি সংলগ্ন রহিয়াছে। তখন বাটীর লোকদিগের পলায়ন সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পুলিশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। থানার প্রধান পুলিশকর্ম্মচারী তখন সমবেত লোক-দিগের নাম লিখিয়া লইলেন। ম্যাক্সিমও আপনার নাম-ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। কিন্তু পুলিশের নিকট ঘটনার কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বাইডার্ডকে পুরস্কার দিয়া ভাড়াটিয়া ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কেরাণীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রুজে ফ্রয়ের সেই বিচিত্র ঘটনার পর ম্যাক্সিম, বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতৃপ্ত তন্দ্রার পর যখন প্রভাতে তিনি নয়নোন্মীলন করিলেন, তখন গতরজনীর ঘটনাবলী নূতন আকারে তাঁহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইল। চিন্তা-তরঙ্গের পর চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, স্কেটিং রিঙ্কের এই সুন্দরী যে বরিসফের শত্রু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী কৌশলে রবার্টকে বরিসফের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই মনোমোহিনী ষড়যন্ত্রকারীদিগের

সহকারিণী, ছিন্নহস্তা সুন্দরীর সখী। কিন্তু রবার্ট কার্ণেয়েলের সহিত ইহার কি সম্পর্ক? কেন সে রবার্টের জন্য এরূপ বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল? উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধন না থাকিলে কি কখন এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে? দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, রবার্ট এই তরুণীর প্রেমাস্পদ, অথবা তাহার দুষ্কৃতির সহচর। রবার্ট, মুগ্ধহৃদয়া এলিসকে প্রতারিত করিয়াছে, সে এলিসের পবিত্র পাণি-পদ্মলাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। রবার্ট যদি সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর প্রেমানুরাগী না হইবে, তাহার নিকট চিত্ত বিক্রয় না করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে মুক্তিলাভের পর, সেই রূপসীর সহিত অদৃশ্য হইল কেন? বোধ করি, এই রহস্যময়ী রূপ-রঙ্গিণীর আরও গুপ্তভবন আছে, সেই খানেই সে তার প্রেমের উপাসককে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে ম্যাক্সিমের হৃদয় পরিতাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমার জেঠা মহাশয় যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন, কার্ণোয়েল যথার্থ অপরাধী, আমি ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া এই দুর্ব্বৃত্তকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। হায়, কুসুমকোমল-হৃদয়া এলিস, তুমি দেবতা-জ্ঞানে যাহার চরণে আপনার জীবনসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ, সে তোমাকে কি বিষম প্রতারণা করিয়াছে! আমি না বুঝিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া কি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি।" ম্যাক্সিমের অনুতাপবিদ্ধ হৃদয়ে কত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। মনে পড়িল, কাউন্টেস ইয়াল্টাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে রবার্ট কার্ণোয়েলের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তিনিই এলিসের মনে রবার্টকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতিফলিত করিয়াছেন, কুমারীর নির্ব্বাণোন্মুখ প্রেম-প্রদীপে তৈল-ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গত রজনীর ঘটনায় সমস্তই বিপরীত দাঁড়াইয়াছে।

অনেক চিন্তার পর ম্যাক্সিম স্থির করিলেন, তিনি প্রথমে কাউন্টেস ইয়াল্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে কারুডকির বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিবেন, পরে এলিসের নিকট গিয়া তাহার মোহমরীচিকা দূর করিবেন। নৈরাশ্যপীড়িত ভিগ্নরীকেও আশ্বাস দিতে হইবে। ম্যাক্সিম এই সঙ্কল্পানুসারে বাহির হইবার জন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ম্যাক্সিম ভৃত্যকে বলিতে যাইতেছিলেন, তিনি কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, এমন সময় আগন্তুকের কার্ডের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কার্ডে ডাক্তার ভিলাগোসের নাম লেখা ছিল। ডাক্তার ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ম্যাক্সিমের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কি অভিপ্রায়ে তিনি ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত? ম্যাক্সিম স্থির করিলেন, কাউন্টেস ডাক্তারকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন, সুতরাং ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কিন্তু এই চতুর হাঙ্গেরিয়ানের কাছে কোন কথা প্রকাশ করা হইবে না। ম্যাক্সিম ডাক্তারকে আনিবার আদেশ দিলেন।

ডাক্তার হাস্যমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিমের করমর্দ্দন করিলেন। "আপনি বোধ হয় আমাকে আজ এত সকালে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিম বলিলেন—"বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।"

"আপনার কোন প্রিয়জনের সংবাদ না আনিতে পারিলে, এই অসময়ে আপনার সহিত দেখা করিতাম না।"

"কাউন্টেস ইয়াল্টার কথা বলিতেছেন—তিনি কেমন আছেন?"

"বোধ করি, ভালই আছেন, আজ সকাল অবধি তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

"উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছেন দেখিয়া 'কাল বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে কাউন্টেস আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?"

ম্যাক্সিম অধর দংশন করিলেন, কিন্তু আর কথা গোপন করিবার উপায় নাই, তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে। ম্যাক্সিম বলিলেন, "হাঁ তিনি অনুগ্রহ, করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার পরামর্শ আমি ভুলি নাই, বেশীক্ষণ সেখানে ছিলাম না।"

"সে জন্য আমি কাউন্টেসকে তিরস্কার করিব না, করিয়াও কোন ফল নাই, তিনি আমার কথা শুনিবেন না। তিনি আপনাকে বড়ই পছন্দ করেন, তাঁহার ধারণা, পাঁচ

রকমে অন্যমনস্ক থাকিলে, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। কিন্তু আমি কাউণ্টেসের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা কহিতে আসি নাই।"

"তবে কাহার সম্বন্ধে কথা কহিতে চাহেন?"

"দুই মাস পূর্ব্বে স্কেটিং রিংকে আমি আপনাকে যে বিচিত্র সুন্দরী দেখাইয়াছিলাম, তাহার কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে বৈ কি!"

"পরদিন প্রাতঃকালে আপনি প্রাতরাশের সময় আমাকে সেই যুবতীর চতুরতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ সুন্দরী কোন্ সমাজের লোক জানিবার জন্য আপনার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। সে অবধি সুন্দরীর সহিত আর আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

এই অভাবনীয় প্রশ্নে ম্যাক্সিম মনে মনে বড়ই বিচলিত হইলেন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"থিয়েটারে আর একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

"আপনি তার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন?"

"না, তার সঙ্গে একটি বিদেশী ভদ্রলোক ছিল।"

ডাক্তার মৃদুস্বরে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" তাহার পর মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন। কিন্তু ম্যাক্সিম ডাক্তারের এই প্রকার অদ্ভুত প্রশ্নে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে সেই সুন্দরীকে চেনেন?"

"আমার একটি পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে চেনেন, কাল তিনি যুবতীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এই সুন্দরীর সম্বন্ধে এমন একটা অদ্ভুত গল্প আমাকে বলিয়াছেন যে, সেই গল্পটা বলিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এই স্বচ্ছন্দবিহারিণী সুন্দরী রুষ নিহিলিষ্ট!"

ম্যাক্সিম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, "অসম্ভব, অবিশ্বাসযোগ্য কথা! আপনার বন্ধুটি কি এই সুন্দরী সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ পাইয়াছেন?"

"আমার বন্ধু তাহার সমস্ত সংবাদ জানেন। এখনই তাহার প্রমাণ পাইবেন।"

"আপনার বন্ধু কি বলিয়াছেন যে, সুন্দরী আবার তাহার বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে?"

"হাঁ, সেই সংবাদ দিবার জন্যই ত আমি আপনার এখানে আসিয়াছি। সুন্দরী কাল এখানে আসিয়াছে, এখনও তার সেই বাড়ীতে আছে।"

"আপনার বন্ধু ভুল করিয়াছেন, সুন্দরী সে বাড়ীতে নাই।"

"কাল সন্ধ্যাকালে সুন্দরী নিজ বাটীতে ছিল তবে যদি রাত্রিকালে চলিয়া গিয়া থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই সুন্দরী আবার পারিসে কেন আসিল জানেন কি? সে তার সহকারীর সঙ্গে ঐ বাড়ীতে দেখা করিবার জন্যই আসিয়াছে,—সেই যুবকের সহিত আমার অপেক্ষা আপনার আলাপ অধিক—সেই আপনার পিতৃব্যের সেক্রেটারী ছিল।"

"রবার্ট কার্ণোয়েল?"

"হাঁ, এখন বুঝিলেন, কাউণ্টেস এই যুবকের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রম করিয়াছেন?"

"কাউণ্টেস যে এ যুবকের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তাহা আমি জানিতাম না।"

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ বেশ, আমি জানি, তিনি আপনাকে কথাটা গোপন করিতে বলিয়াছেন। আমি তাঁর এই কার্য্যে অনুমোদন করি নাই বলিয়া তিনি আমাকে একটু অবিশ্বাস করিয়াছেন। আপনি রবার্ট কার্ণোয়েলকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাও আমি জানি, কিন্তু এখন তিনি আমার কাছে সব কথাই স্বীকার করিয়াছেন।" ম্যাক্সিম কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"দেখিতেছি আপনি খুব সতর্ক, কিন্তু আমি আপনার কিছুমাত্র নিন্দা করিতে চাহি না। কাউণ্টেস আমাকে সব কথাই বলিয়াছেন, আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। বরং আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করিতেছি। কার্ণোয়েল যদি রু জেক্রয়ে না থাকে, তাহা হইলে সে এখন কোথায় আছে, তাহা আমি জানি।"

ম্যাক্সিম সাগ্রহে বলিলেন, "কোথায়?"

"এই না বলিতেছিলেন, আপনি রবার্ট কার্ণোয়েলের কোন তোয়াক্কা রাখেন না? রবার্টের সংবাদ জানিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন?"

ম্যাক্সিম্ মস্তক অবনত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ডাক্তার গুপ্ত রহস্য অনেকটা ভেদ করিয়াছে। এখন সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলা কর্ত্তব্য কি না? তিনি কাউণ্টেসের বিশ্বাসভাজন। তিনি হয় ত সমস্ত কথাই পরে ইঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছেন।

ডাক্তার ভিলাগোস বলিলেন,—"ভয় পাইবেন না, কাউণ্টেস্ আপনাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমি আপনাকে সাহায্য করিতে চাই। ইচ্ছা করিলে কার্ণোয়েলকে এই রমণীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি। এই রমণী আমার বন্ধুর বশীভূতা, বন্ধু ইচ্ছা করিলেই রমণীকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। আমরা রবার্ট কার্ণোয়েলকে রমণীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আমেরিকায় প্রেরণ কবিবার ব্যবস্থা করিব। আপনি বোধ করি, তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার এবং আপনার পিতৃব্য-কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন?"

"হাঁ, আমি সে সঙ্কল্প সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছি।"

"উত্তম, এখন রমণী সম্বন্ধে আমাদিগকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সে বোধ করি, আপনার দুইটি বাড়ীর মধ্যে কোন একটা বাড়ীতে আছে।"

"সে যে রু জেক্রব ত্যাগ করিয়াছে, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

"তাহা হইলে রমণী এই যুবককে লইয়া এখন যে বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছে, সেইখানেই আমাদিগকে যাইতে হইবে।"

"কখন?"

"আজ সন্ধ্যাকালে, অথবা রাত্রিতে গেলেই হইবে। লোকে আমাদিগকে এই রমণীর গৃহে প্রবেশ করিতে দেখে ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ফ্যবার্গ সেণ্ট অনরীকে তাহার বাস।"

"কি! অমন সুন্দরী একটা জঘন্য পল্লীতে বাস করে?"

"প্রয়োজন হইলে সে রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে লোকের চিত্ত হরণ করে। কিন্তু নিহিলিষ্টদিগের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সে ভিখারিণীবেশে পথে পথে ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত নহে।"

"অদ্ভুত বটে। আপনি সুন্দরীর এত সংবাদ রাখেন, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।"

"বন্ধুর নিকট আমি সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি। এক সময় বন্ধু এই যুবতীকে উন্মত্তের ন্যায় ভালবাসিতেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, এই যুবতী নিহিলিষ্ট দলভুক্ত, তখন তিনি হৃদয় হইতে প্রেমপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন। ফ্রান্সে যুবতীর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যুবতী অনেক সময়ে প্রেমাস্পদের নিকট নিহিলিষ্টদিগের নৃশংস ষড়যন্ত্রের গল্প করিয়া আমোদ করিত।"

"সংপ্রতি যে চুরি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সে কোন কথা বলে নাই?"

"আপার পিতৃব্যের বাটীতে চুরির কথা? না। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমার বন্ধুর সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছে। আর এই চুরি ত সে দিন হইয়াছে। যাক্, আপনি আমাদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না?

"যাইব বৈ কি, কোথায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে?"

"ক্যাম্প ইলিসিস সার্কাসে আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনার আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র না।"

"আচ্ছা, আমরা সেখান হইতেই রমণীর গৃহে গমন করিব।"

অতঃপর কি ভাবে রমণীর গৃহে গমন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতে লাগিল। কথায় কথায় ম্যাক্সিম বলিলেন "কাউণ্টেস ইয়াল্টার পরিচারকগণ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য?"

"তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহারা বহু দিন হইতে কাউণ্টেসের কাজ করিতেছে, তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতেও ইহারা কুণ্ঠিত নহে।"

"কাউণ্টেসের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধেও কি ঐ কথা?"

"হাঁ, সকলের সম্বন্ধেই ঐ কথা। সকলেই তাঁহার পরমবিশ্বাসভাজন।"

"আমি কেবল তাঁহার তরবারি-শিক্ষককেই দেখিয়াছি, লোকটা জাতিতে পোল না?"

"হুঁা, লোকটা রাজনীতিক পলাতক, বড়ই উৎসাহী লোক। কিন্তু পোল্যাণ্ডের সহিত নিহিলিষ্টদিগের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"আচ্ছা, সেই স্কেটিং রিংকের সুন্দরীর সহিত তাঁহার আলাপ আছে বলিয়া আপনি বিবেচনা করেন না ?"

"সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর কি করিয়া আলাপ হইবে? তিনি কোথাও যান না। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, প্রিয় ম্যাক্সিম্?"

"আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন তাঁহাকে ভদ্র-বেশে ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে দেখিয়াছি। আমার হয় ত ভুল হইয়া থাকিবে।"

"নিশ্চয়ই আপনার ভুল হইয়াছে। ভদ্রবেশে কার্ডকি —অসম্ভব কথা। তিনি রাজপুত্রের বেশে সজ্জিত হইলেও ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট তার সঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইবে না। আপনি হয় ত মনে করিয়াছেন, কার্ডকি ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছেন।"

"আমি তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে ধারণা এখন আর নাই।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এখন বিনা গণ্ডগোলে কাজটা শেষ করিতে পারিলেই হয়। আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় কাম্প ইলিসিসে মিলিত হইব। এই কথাই স্থির রহিল। এখন আমি চলিলাম, আমাকে অনেক রোগী দেখিতে হইবে।"

উভয়ে কর-মর্দ্দন করিলেন। ডাক্তার আবার বলিলেন, "ভাল কথা মনে পড়িল; কাউণ্টেস আজ পল্লীভ্রমণে গিয়াছেন, আজ বৃষ্টি পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শীতও প্রবল হইয়াছে, কিন্তু কাউণ্টেসের মন কিছুতেই ফিরিবার নহে। আজ সকালে তিনি পত্র লিখিয়া আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। এখন সাড়ে দশটা, সুতরাং এতক্ষণ তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। আমি কাল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আপনিও তাই করিবেন।"

"আচ্ছা, আপনার পরামর্শই শুনিব।"—বলিয়া বিস্মিত ম্যাক্সিম্ আবার ডাক্তারের করমর্দ্দন করিলেন। ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। কাউণ্টেস স্থানান্তর গমন করায় ম্যাক্সিমের পূর্ব্ব-সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি এভিনিউ ফ্রায়েড ল্যাণ্ডে গমন না করিয়া তাঁহার পিতৃব্য-গৃহে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতেছেন। ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, ঝড় উঠিবার আর বড় বিলম্ব নাই।

"এই যে বাপু, এসেছ! বেশ! আমি তোমার সম্বন্ধে কতকগুলি খুব চমৎকার কথা শুনিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিয়াছি, জেঠামহাশয়?"

"মহা অন্যায় করেছ। তুমি আমার কন্যাকে বলিয়াছ, বিনা অপরাধে সেই রাস্কেলের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া আমার সঙ্গত হয় নাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এলিস আমাকে বলিয়াছে, সে ভিগনরীকে কিছুতেই বিবাহ করিবে না; চিরকাল কুমারী থাকিবে। তাহার এই সংকল্প যদি অটল থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার ও এলিসের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে পারিবে। তোমার বন্ধুর সকল আশা ভরসা তুমি অতল জলে ডুবাইলে! কিন্তু আমি সে কথা তুলিতে চাহি না। তুমি এক আঘাতে তোমার ভগিনীর ভবিষ্যৎ সুখ বিনষ্ট করিলে কেন? তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভালবাসি বলিয়াই কি এইরূপ তাহার প্রতিশোধ দিলে।"

"আমি স্বীকার করিতেছি, আমি অতি অন্যায় করিয়াছি।"

"তুমি কি মনে কর, ঐ কথা স্বীকার করিলেই, সমস্ত অনিষ্টের প্রতীকার হইবে?"

"না কখনই নয়। আমি এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিব, সেই সঙ্কল্প করেই আমি এখানে আসিয়াছি; আমার সংকল্প বিফল হবে না। আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনই হইবে।"

"আর সে সময় নাই। তুমি যদি এখন এলিসকে নিজের ভ্রমের কথা বল, সে সেকথায় কর্ণপাত করিবে না।"

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে, নিশ্চয়ই সে নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে। যে রমণী সিন্দুক হইতে দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছিল, কার্ণোয়েল যে তাহার সহকারী, তাহার-

প্রেমের ভিখারী সে প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি আপনার কাছে, এখন যে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেছি, তাহা শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। সিন্দুক হইতে কাগজের বাক্স ও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি হইবার পূর্ব্বে আর একবার চুরির চেষ্টা হইয়াছিল। ভিগনরী ও আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম।”

“তুমি সে কথা আমাকে কেন বল নি?”

“ভিগনরী আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমিই তাহাকে নিবারণ করি।”

এই বলিয়া ম্যাক্সিম, চুরির চেষ্টা ও ছিন্নহস্ত সংক্রান্ত কথা মসিয়ে ডর্জেরেসের নিকট বিবৃত করিলেন। এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল “কর্ণেল বরিসফ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।”

মসিয়ে ডর্জেরেস বলিলেন, “তাহার সঙ্গে দেখা করিবার অবসর নাই।”

ম্যাক্সিম বলিলেন,—“আমার অনুরোধ, কর্ণেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত থাকিব। সম্ভবতঃ তিনি আপনার সাবেক সেক্রেটারী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসিয়াছেন।”

“তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি? আমার নিকট তাঁহার অনেক টাকা জমা রহিয়াছে, সুতরাং কাজের জন্যও ত তিনি আসিতে পারেন।”

ম্যাক্সিম্ অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, “তিনি এখন যে কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছেন তাহা দেনাপাওনাসংক্রান্ত কোন কাজ নহে—ইহাই আমার ধারণা; কর্ণেলের সহিত সাক্ষাৎকারকালে আপনি যদি আমাকে এখানে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেন, আপনি অনেক কথাই জানিতে পারিবেন।”

“বেশ! কিন্তু মসিয়ে বরিসফ যদি গোপনে আমার সহিত কথোপকথন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তুমি আমার ঘরে গিয়া বসিও, আমরা পরে এবিষয়ে কথা কহিব।” তাহার পর বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “কর্ণেলকে লইয়া আইস।”

তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত হইল। কর্ণেল প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আমি আজ সন্ধ্যাকালে রুষিয়ায় যাত্রা করিব, তাই চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

“আপনি যেরূপ ইচ্ছা অনুমতি করিতে পারেন। এই ভদ্রলোক আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি আপনি আমার সহিত গোপনে কোন কথা—”

“ইতঃপূর্ব্বে মসিয়ে ম্যাক্সিম ডর্জেরেসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। আমি আজ সেকথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, তাহার সহিত ইঁহার সংস্রব আছে; সুতরাং এখানে ইঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি সৌভাগ্য মনে করিতেছি। আমি কিজন্য প্যারিস্ পরিত্যাগ করিতেছি, তাহা, বোধ করি, আপনি জানেন?”

“না আমি বুঝিতে পারি নাই।”

“আমার প্রভু রুষ-সম্রাটের জীবন-নাশের জন্য আবার একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এবারে দুরাত্মারা কীব-প্রাসাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অদ্ভুত দৈব ঘটনায় সম্রাট্ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তবে কয়েকজন সাহসী সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছে।”

ডর্জেরেস সাগ্রহে বলিলেন, “অতি ঘৃণিত কাণ্ড। আপনি যাহাদিগকে নিহিলিষ্ট বলেন, এ, বোধ করি, তাহাদিগেরই কাজ?”

“আমাদিগের সম্রাট্ ও সমাজের বিরুদ্ধে এই পামরেরা চিরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিবাদের সময় তাঁহাদিগের অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগের আহ্বান করিয়াছেন। আমিও তাহাদিগের একজন, কাজেই আমি চিরদিনের মত প্যারিস্ ত্যাগ করিতেছি।”

“আপনার মঙ্গল হউক, কর্ণেল! যাহারা মানুষের ধন ও প্রাণের শত্রু তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি। আপনি, যে টাকা আমার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন, বোধ করি, এখন আপনার সেই টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি এখনই আদেশ দিতেছি, আজই আপনি টাকা পাইবেন।”

“কিন্তু আমি হিসাবকিতাব ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা কহিতে আসিয়াছি! আমি দুই বৎসর ধরিয়া প্যারিসে রহিয়াছি কেন জানেন?”

“আমি ত মনে করিয়াছি, আপনি এখানে থাকিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছেন।”

"আপনার ভ্রম হইয়াছে! কর্তৃপক্ষের আদেশে আমি নিহিলিষ্টদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছি।"

"রাজনীতি-বিশারদ ব্যক্তিদিগের দ্বারা রুষ-গবর্ণমেণ্ট এই সব দুষ্ট নিহিলিষ্টের উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

"কেবল রাজনীতিকদিগের সাহায্যে এ কাজ হইতে পারে না। আমি রুষীয় রাজদূতের সহচর নহি, আমি রুষ সাম্রাজ্যের রাজনীতিক পুলিশের প্রতিনিধি।"

বরিসফের বাক্যে মসিয়ে ডরজেরেস অনেকটা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বলিলেন "এ্যাঁ পুলিশ!" "হাঁ, আমি আপনাকে যে বাক্স রাখিতে দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অনেক জরুরী দলিল ছিল, রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিবরণ ছিল, নিহিলিষ্টদিগের দলে যে সকল লোক মিলিত হইয়াছিল তাহাদিগের নামের তালিকা ছিল, পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের পর যাহারা বিদেশে গিয়া বাস করিতেছিল তাহাদিগের কার্য্যের কতকগুলি বিবরণ ছিল———"

"আমি যদি পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিতাম———"

"তাহা হইলে আপনি বাক্সটি গচ্ছিত রাখিতেন না। আমিও তাহা বুঝিয়াছিলাম, সেইজন্যই বলিয়াছিলাম বাক্সে পারিবারিক দলিলপত্র আছে। বাক্সটি চুরি গিয়াছে, আপনারই একজন কর্ম্মচারী যে, চুরির ভিতর আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আপনিও আমার মতের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, আপনার সেক্রেটারীই চোরের সহকারী।"

"এখনও আমার সেই ধারণা! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট ইহার প্রমাণ আছে।"

ম্যাক্সিমের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বরিসফ বলিলেন, "বটে! তবে আমার অনুমান মিথ্যা নহে, ইনিও এই ব্যাপারে জড়িত আছেন।"

ঈষৎ ক্রোধপূর্ণ স্বরে ম্যাক্সিম বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

"আমার কথা শুনুন, তাহা হইলে সকলই বুঝিতে পারিবেন। মসিয়ে কার্ণোয়েল যে চোরের সহকারী, তাহার প্রমাণ আমার নিকটেও আছে। আমি তাহাকে খুঁজিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম,—অনেকদিন তাহাকে আমার বাটীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম!"

"আমাকে কোন খবর দেন নাই!"

"প্রয়োজন হয় নাই। আপনি আমাকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সমস্ত ভার দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার সেক্রেটারীর বিশ্বাস ছিল, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ত্যাগ করিবে না, সেইজন্য সে কোন কথাই প্রকাশ করে নাই।"

"এখন আপনি তাহাকে লইয়া কি করিবেন? যদি ফরাসী পুলিশের হাতে সমর্পণ করিতে চাহেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু———"

"সে পলায়ন করিয়াছে, এখন প্যারিসেই আছে।"

"আপনি আমাকে এই সংবাদ দিয়া আমার বড়ই উপকার করিলেন; আমি এখন সতর্ক থাকিতে পারিব।"

কর্ণেল গত রাত্রির ঘটনা এবং কার্ণোয়েলের পলায়ন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমি অদ্য প্রাতঃকালে সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। তাহাতেই গত রজনীর ঘটনা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে কোন দূত এখানে পাঠান হয় নাই,—কালিকার সেই রুষটা ছদ্মবেশী নিহিলিষ্ট।"

ম্যাক্সিম্ অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন "আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

"আপনি তাহা হইলে লোকটাকে চেনেন?"

"আমি তাহাকে চিনি না, তবে তাহাকে দেখিয়াছি বটে।"

ব্যঙ্গপূর্ণ সৌজন্য দেখাইয়া বরিসফ বলিলেন, "কোথায় দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?"

"কাল তাহাকে হোটেলে আপনার সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি; আমি থিয়েটার পর্য্যন্ত আপনাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলাম।"

"আপনিও তাহা হইলে ডিটেক্টিভগিরি করিতেছিলেন, দেখিতেছি!"

"যথার্থই তাই। চোরের সঙ্গে ধুঝাপড়া করিতে হইলে, ডিটেক্টিভগিরি করা চলে।"

ডরজেরেস ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ম্যাক্সিম!"

বরিসফ শান্তভাবে বলিলেন, "উঁহাকে বাধা দিবেন না,

মহাশয়, উহার মতামতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু উঁহাকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

"আমি কতদূর পর্য্যন্ত আপনাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলাম, আপনি বোধ করি সেই কথা জানিতে চাহেন। শুনুন, আমি সব জানি। সমস্ত ব্যাপারই দেখিয়াছি।"

"আপনি ধন্য! নিহিলিষ্টগণ একজন যোগ্য সহকারী পাইয়াছে!"

"নিহিলিষ্টদিগের সঙ্গে আমার যে কোন সম্পর্ক নাই, মহাশয় সেটা বেশ জানেন!"

"আপনি যখন বলিতেছেন, নাই, তখন কথাটা বিশ্বাস করিতেই হয়; কিন্তু আপনি বোধ করি, আমার সহায়তা করিবার জন্য অদ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ছিলেন না?"

"ছেঁদো কথা কহিবেন না। আপনি একব্যক্তিকে জবরদস্তি করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, এ সংবাদ আমি শুনিয়াছিলাম। আমি তাহাকে নিরপরাধ বিবেচনা করিয়াছিলাম, আপনি তাহাকে লইয়া কি করেন জানিবার জন্য আমার উৎসুক্য জন্মিয়াছিল।"

"বেশ, এখন রবার্ট কার্ণোয়েল সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, একবার শুনিতে পাইব কি?"

"রবার্ট কার্ণোয়েল গত রাত্রির সেই চতুরা সুন্দরীর বন্ধু।"

"বহুৎ আচ্ছা! তাহলে আপনারও বিশ্বাস, চৌর্য্য, গৃহদাহ ও নরহত্যা যাহাদিগের ব্যবসায় এই নারী তাহাদিগেরই দলভুক্ত!"

"আমি মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিতেছি, কেননা আমার কাছে উহার প্রমাণ বিদ্যমান!"

"আপনি সে প্রমাণ দিতে পারেন?"

"কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? আপনি ত চিরদিনের মত ফ্রান্স হইতে চলিয়া যাইতেছেন।—আমি স্বয়ং কয়টা ঘটনার দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আপনার সে কথা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে মসিয়ে কার্ণোয়েল যে এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। যে নষ্টচরিত্রা রমণী তাঁহাকে আপনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সে এখন তাহারই আশ্রয়ে আছে।"

বরিসফের অধরে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি, চমৎকার খবর রাখিয়াছেন।"

"আপনার অপেক্ষা অধিক নহে।"

"যাক্, মসিয়ে ডর্জেরেসের সাবেক সেক্রেটারী রুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে কিনা, তাহাতে তাঁহার আসিয়া যায় না। কিন্তু লোকটা যে চোর, তাহার প্রমাণ বোধ করি তিনি চাহেন?"

মসিয়ে ডর্জেরেস বলিলেন,—"যথার্থ বলিয়াছেন; ষড়যন্ত্রকারী সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যদি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম, মসিয়ে কার্ণোয়েল চোর———"

"কার্ণোয়েল আমার হাতে পড়িলে, আমি অন্যান্য দেশের পুলিশের মত তাহার শরীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার পকেটে পাঁচটি তাড়া নোট, দশহাজার করিয়া পঞ্চাশহাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাওয়া গিয়াছে!"

"ঐ টাকাই ত আমার সিন্ধুক থেকে চুরি গিয়াছিল। এই ত চূড়ান্ত প্রমাণ।"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"এমন চূড়ান্ত প্রমাণ, যে আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না!"

পকেট হইতে একতাড়া ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া কর্ণেল বরিসফ বলিলেন, "এই নিন, পঞ্চাশহাজার ফ্রাঙ্কের নোট, আমি যে অবস্থায় এগুলি পাইয়াছি, সেই অবস্থায়ই ফেরৎ দিতেছি।"

ম্যাক্সিম বরিসফের প্রতি সন্দেহসঙ্কুল দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টের তহবিল হাতে থাকিলে, পঞ্চাশহাজার ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করা সহজ।"

"কোথা হইতে এই টাকা আসিল, তাহা না জানিতে পারিলে আমি এ টাকা গ্রহণ করিতে পারি না।" মসিয়ে ডর্জেরেসের কণ্ঠস্বরেও ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল।

"যদি আপনি গ্রহণ না করেন, আমি এ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব, টাকা আমার নহে। কিন্তু আমি যে মসিয়ে রবার্ট কার্ণোয়েলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই টাকা সংগ্রহ করি নাই, তাহা আমি সপ্রমাণ করিব।" এই বলিয়া বরিসফ কার্ণোয়েলের পকেট মধ্যে প্রাপ্ত পত্র ডর্জেরেসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "এখন এই পত্র সম্বন্ধে আপনারাই বিচার করুন।"

ডর্জেরেস পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পত্রে কোন স্বাক্ষর নাই, কিন্তু এরূপ নামধামশূন্য পত্রের দ্বারা

টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বিশ্বাস করা যায় না। তুমি কি বল ?” ডর্জেরেস ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে চাহিলেন।

“পত্র দেখিয়াই বোধ হইতেছে, প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই মিথ্যা পত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিষয়ী লোকে যেরূপ কাগজে চিঠিপত্র লেখে, এ পত্রখানিও সেইরূপ কাগজে লেখা।”

“ব্যবসায়ী কি মহাজন শ্রেণীর লোকের মধ্যে, কার্ণোয়েলের পিতার কেহ বন্ধু ছিলনা, তিনি আমাকে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল না। তিনি টাকা ধার দিলে সমশ্রেণীর লোককেই দিতেন। কোন ব্যবসায়ী বে-নামা চিঠি লিখিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করে না।”

“এখন বোধ করি, নিহিলিষ্টদিগের সহকারীর চরিত্র সম্বন্ধে আপনারা নিঃসন্দেহ হইলেন ?”

ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিলেন,—“সম্পূর্ণ।”

“এখন এই অর্থ এবং পত্র আমি আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি ! যাত্রাকালে আমার একমাত্র সন্তোষ এই যে, যে লোকটা আপনার পরিবার মধ্যে বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে পিষিয়া ফেলিবার অস্ত্র আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিলাম। এখন আমি বিদায় হই, আমার প্রধান খানসামা আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।”

“কিন্তু এই টাকা লইয়া আমি কি করিব ?”

“যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন ! বিদায়, চিরদিনের মত এদেশ ছাড়িয়া চলিলাম। কুমারী ডর্জ্জের্সকে আমার শ্রদ্ধা জানাইবেন। আপনার উন্নতি হউক।” এই বলিয়া বরিসফ ম্যাক্‌সিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“আমার পরামর্শ শুনিবেন, কখনও কার্ণোয়েলের উদ্ধার-কর্ত্তাদিগের অনুসরণ করিবেন না ; তাহারা আপনাকে প্রাণে মারিবে।” বরিসফ প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল, “কুমারী ঠাকুরাণী বলিলেন, প্রাতরাশ প্রস্তুত।” “তাহাকে বল গিয়া আমি যাইতেছি।”

ভৃত্য চলিয়া গেল। মসিয়ে ডর্জেরেস বলিলেন— “চুলায় যাউক এই রুষটা, দৌড়িয়া গিয়া এ পাপ নোটগুলা ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে।”

“কেন ফিরাইয়া দিবেন ? আপনি কি মনে করেন, মসিয়ে কার্ণোয়েলকে কলঙ্কিত করিবার জন্য সে নিজে এই টাকা দিয়াছে ? এরূপ কাজ তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে।”

“তুমি মনে কর কি, সে সত্য বলিয়াছে ?”

“এই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে সে যথার্থ কথাই বলিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কে এই চিঠি লিখিল।”

কথায় কথায় কার্ণোয়েলের চরিত্রের কথা উঠিল, তাহার সহিত নিহিলিষ্টদিগের সংস্রবের কথা উঠিল। ম্যাক্‌সিম আবার, পূর্ব্ব ঘটনা একে একে পিতৃব্যকে বলিতে লাগিলেন। সকল শুনিয়া মসিয়ে ডর্জেরেস,—বলিলেন, “কিন্তু তুমি যে অপকার করিয়াছ, আমার কাছে এ সকল কথা বলিলে ত তাহার প্রতীকার হইবে না। এলিসকেও সব কথা বলিতে হইবে। আমার সংসারের অবস্থা কি হইয়াছে, তুমি জান না। জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এলিস কথাও কহে না, কিছু আহারও করে না, ভিগ্‌নরী মরার মত হইয়া রহিয়াছে ;—পাগল হইবার গোছ হইয়াছে !”

“একদিন পরে আমি তাহাকে সব কথা বলিব,— আমাকে একদিন সময় দিন।”

“বিলম্বে প্রয়োজন কি ? চল, আমার সঙ্গে আহার করিবে চল।”

“আজ থাক্, কাল না হয় খাইব,—আজ সন্ধ্যার পর কাজ আছে, কার্ণোয়েল আর তাহার প্রণয়িণীকে ধরিতে যাইতে”—

“বল কি ? সেযে ভয়ানক কাজ ! কর্ণেল কি বলিলেন, শুনি ত ?”

“ভয় নাই, আমাকে মারিতে পারিবে না।”

“তাহারা কি ভয়ানক লোক জান ত ? রুষ-সম্রাটের নিজ প্রাসাদ উড়াইয়া দিয়াছে !

“আমি রুষসম্রাট্‌ও নই, সেণ্টপিটার্সবার্গেও আমাদিগের বাস নয়। আমি একাকীও যাইতেছি না—”

এই সময়ে ভিগ্‌নরী চিন্তিত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মসিয়ে ডরজেরেস ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “ওঃ ! তোমার সঙ্গে কথা আছে।” ভিগ্‌নরী দেখিলেন, প্রবল ঝটিকা আসন্ন হইয়াছে। তিনি বলিলেন, “কি আজ্ঞা করুন।” “পূর্ব্বে সিন্দুক হইতে চুরির চেষ্টা হইয়াছিল,

সে কথা বল নাই কেন? বিস্ময়ের ভাণ করিও না। আমি সব জানি। ম্যাক্সিমের মুখে ছিন্নহস্তের কথা শুনিয়াছি।" খাতাঞ্জি তাড়াতাড়ি বলিলেন; "একথা তাঁর পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল। তিনিই আমাকে এ বিষয়ে নীরব থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।"

ম্যাক্সিম ভ্রূভঙ্গি করিলেন; বন্ধুজনের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজে নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন হইবার ইচ্ছা ভিগ্‌নরীর যেন খুব বেশী।

"আমি সে কথা জানি, সেই জন্য তোমার উপর ততদূর ক্রুদ্ধ হই নাই। এখন এই নোটের তাড়াগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি।"

ভিগ্‌নরী নোট গণিয়া বলিলেন, "পঞ্চাশখানি নোট আছে।"

"এ সব নোট কোথা হইতে আসিল?"

"আমার সিন্দুক হইতে, যে ভাবে নোটগুলির কোণে পিন গাঁথা রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।"

"বাস্; চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। এখন আমার সেই পাজী সেক্রেটারিটার বলিবার যো নাই যে, সে নোট চুরি করে নাই।

"বলেন কি, সেই—"

"হাঁ, সেই চোরা নোট পাওয়া গিয়াছে. এখন কার্ণোয়েলকে গ্রেপ্তার করিলেই হয়। সে পারিসে আছে, তার এই দুষ্কর্ম্মের প্রমাণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর, এই টাকা তাহার পিতার কোন বন্ধু পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহাকে দিয়াছে, এ কথা সে সাহস করিয়া বলিতে পারিবে? সে ঐ মর্ম্মে একখানি চিঠিও লিখাইয়া রাখিয়াছে। এই লও সেই চিঠি পড়িয়া বল দেখি, তোমার কি মনে হয়?"

ভিগ্‌নরীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কম্পিত-হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন।

"এত স্পষ্ট জুয়াচুরি; বোধ করি মশিয়ে রুদে কার্ণোয়েলের কোন বন্ধু তাঁহার কথা অনুসারে এই পত্র লিখিয়া থাকিবে। কিন্তু এ হস্তাক্ষর আমি চিনিতে পারিলাম না।"

"তুমি ত কার্ণোয়েলের বন্ধুদের চেন। তোমার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

"তার বন্ধুর সংখ্যা খুব কম—কয়জন কলেজের সহপাঠী, তাহাদিগের সঙ্গেও তাঁর বড় দেখাসাক্ষাৎ হয় না।"

মসিয়ে ডর্‌জেরেস বলিলেন, "এই পত্রলেখককে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা।"

"আমার ত ঐ অনুমান হয়; কিন্তু আপনি যদি আমাকে পত্রখানি প্রদান করেন"—"না, মিথ্যা সময় নষ্ট করিয়া আর কি হইবে! যাহারা আমার ধারণাসম্বন্ধে সন্দেহ করে, আমি যে অভ্রান্ত তাহাদিগের নিকট ইহা প্রতিপাদন করিব। এই পত্রই তাহার প্রমাণ; এ পত্র আমি নিজের কাছেই রাখিব।"

এই সময়ে এলিস ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন; কিন্তু গৃহমধ্যে অন্য লোক রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন। মসিয়ে ডর্‌জেরেস বলিলেন, "ভিতরে এস।"

তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই সুযোগে ম্যাক্সিমের সাক্ষাতেই আজ এই ব্যাপারের চূড়ান্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভিগ্‌নরীর সাক্ষাতে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারা যাইবে না বলিয়া তাহাকে একপার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া অন্যায় করিয়াছ; কিন্তু তাহাতে তোমার গুরুতর অপরাধ হয় নাই। এখন যাও, সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাদিগের সহিত আহার করিও।"

ভিগ্‌নরী অবনত মস্তকে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মসিয়ে ডর্‌জেরেস কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি অতি শুভক্ষণেই এঘরে আসিয়াছ, কিন্তু যদি আর একটু পূর্ব্বে এখানে আসিতে কর্ণেল বরিসফকে দেখিতে পাইতে।"

"আমি যে আরও পূর্ব্বে এখানে আসি নাই, তজ্জন্য আমি আনন্দিত হইলাম; আমি লোকটাকে দেখিতে পারি না।"

মসিয়ে ডরজেরেস ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তা পারবে নাই ত; তিনিও আমার মত মসিয়ে কার্ণোয়েলকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করেন কিনা। কিন্তু এখন স্পষ্ট কথা বলাই ভাল, তুমি যাহাকে ভালবাস সে লোকটা তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

"ও কথা ত আপনি আমাকে কতবার বলিয়াছেন,

কিন্তু আমি কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করিব না—ম্যাক্‌সিমও ওকথায় বিশ্বাস করেন না।"

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন—"ম্যাক্‌সিম! এইবার এলিস, তুমি ঠিক লোককেই ধরিয়াছ। কার্ণোয়েল সম্বন্ধে তাহার কি বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করিয়া শুন।"

এলিস প্রশ্নজিজ্ঞাসু নয়নে ম্যাক্‌সিমের প্রতি চাহিলেন; ম্যাক্‌সিমের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার পিতৃব্য বলিলেন—"বল, বল বাপু আমার এই অবোধ মেয়েটাকে বল, আমার সাবেক সেক্রেটারী একদল দুর্ব্বৃত্তের সহিত জুটিয়াছে। আমার কন্যার সম্মুখে কথা ফিরাইয়া লইও না।"

ম্যাক্‌সিম বলিলেন,—"না তাহা করিব না, আমি কোন অসত্য কথা বলি নাই।" অভাগিনী এলিস মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি! তুমিও তাঁহাকে ত্যাগ করিলে? তুমি না কাল শপথ করিয়া বলিয়াছিলে—"

"কাল আমার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমার ভুল হইয়াছিল। আমি স্বচক্ষে তাহাকে একটি রমণীর সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার এই সঙ্গিনী যে চোর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

হতাশ হৃদয়ে এলিস বলিল "রমণী!"

"হাঁ,—কিন্তু সে শুধু রমণীই নহে, সে নরহত্যা বিপ্লবকারীদিগের সহকারিণী!" "তুমি বলিতে চাও, তিনি সেই নারীর সহিত পলায়ন করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহার পলায়ন করিবার প্রয়োজন হইল কিসে?"

"এলিস, স্নেহের এলিস! এই অপ্রিয় ঘটনার সমস্ত কথা জানিবার জন্য অনুরোধ করিও না, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি না বলিয়া থাকিতে পারিব না। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলি, মসিয়ে কার্ণোয়েল অসাধু প্রকৃতির লোক, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও; আর কিছু জানিতে চাহিও না।"

"তবে তাহাই বল।"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, মসিয়ে কার্ণোয়েল যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তোমার ও তাঁহার মিলনের আর কোন উপায় নাই। আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, ততক্ষণ আমি তাহাই করিয়াছি। তাঁহার নিন্দা রটাইয়া ত আমার কোন লাভ নাই।"

এলিস্ বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "তবে তাহাই হউক; তিনি কোথায়?"

মসিয়ে ডরজেরেস্ বলিলেন, "তিনি কোথায়? তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে ছুটিবে না কি?"

"তিনি কোথায় আছেন, আমি জানিতে চাই।"

ম্যাক্‌সিম কথাটা এই খানেই শেষ করিবার সঙ্কল্প করিয়া বলিলেন, "জানিবার জন্য তোমার এতই আগ্রহ? তিনি সেই রমণীর গৃহে আছেন।"

"তোমার কথা যে সত্য, তাহা সপ্রমাণ কর।"

"কেমন করিয়া আমি একথা সপ্রমাণ করিব? আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি না, পারা কি সম্ভব? আজ সন্ধ্যাকালে আমি নিজেই সেখানে যাইব, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব, তাঁহার সেই কলঙ্কিনী সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, তারপর কাল যদি তোমাকে তাহাদিগের দুষ্কৃতির কথা বলিবার প্রয়োজন হয় ত বলিব, তাহারা এখন আমার হাতের মুঠার ভিতর আছে"—এলিস বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে; তোমার কথা এখন আমি বিশ্বাস করিতেছি, এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর উপায় নাই।"

এলিসের পিতা বলিলেন "মৃত্যু! অকৃতজ্ঞ সন্তান, বুঝিলাম, তুমি আর আমাকে ভালবাস না, তাই মৃত্যুর কথা কহিতেছ। আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিতেছ? যতদিন ভগবান আমাকে ইহলোক হইতে না লইবেন, ততদিন আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

পিতার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া কুমারী কাঁদিতে লাগিলেন। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে ম্যাক্‌সিমেরও চোখ ফাটিয়া জলধারা বহিতে চাহিল, তিনি আবেগভরে মস্তক অবনত করিলেন।

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—"বল, ম্যাক্‌সিম বল, আমার কন্যাকে বুঝাইয়া বল, আমাকে কষ্ট দেওয়া তাহার অন্যায়; বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে মনস্তাপ দেওয়া তাহার অনুচিত।"

পিতার বাহুপাশ মোচন করিয়া এলিস বলিল,—"আমি কখনই পিতাকে মনঃপীড়া দিব না। আমি

নিয়তির চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, কিন্তু কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পিতার সাক্ষাতে সে নাম আর মুখে আনিব না। তোমরাও আর সে কথা তুলিও না, তোমদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা।”

মসিয়ে ডর্‌জেরেস বলিলেন, “আমরা আর এই অপ্রিয় কথার আলোচনা করিব না। তোর এখন যাহা ইচ্ছা হয় কর মা, সময়ে তোর মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, আমি তোর মুখ চাহিয়াই থাকিব। এখন যা মা, আহারের আয়োজন কর গে।”

এলিস চলিয়া গেল। সে কক্ষত্যাগ করিবামাত্র ডর্‌জেরেস বলিলেন, “বাবা, তোমার প্রতি পূর্ব্বে আমার যেমন ভালবাসা ছিল, এখন আবার তুমি আমার তেমনই স্নেহ-ভাজন হইলে। তুমি এমন দৃঢ়তা প্রকাশ না করিলে, এ সঙ্কটে আর উপায় ছিল না।”

“কিন্তু আমার দৃঢ়তায় কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।”

“বাপু তুমি ভুল বুঝিয়াছ. তোমার কথায় তাহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। সময়ে তাহার হৃদয়-বেদনার উপশম হইবে।”

“তাহাই হউক ; কিন্তু আমার সে ভরসা হয় না, তবে এক উপায়—”

“উপায়,—আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেও যদি এলিসের প্রাণের ব্যথা ঘুচে, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি”—

“টাকায় ইহার প্রতীকার হইবে না। কিন্তু আপনি আমাকে এলিসের সঙ্গে যখন ইচ্ছা—যাহার সঙ্গে ইচ্ছা দেখা করিতে দিবেন ?”

“নিশ্চয়ই।”

“তবে আমি চলিলাম, আর সময় নাই।”

“কখন আবার তোমার সাক্ষাৎ পাইব ?”

“আমার কাজ শেষ হইলেই দেখা করিব।” ম্যাক্‌সিম ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন—“কাউণ্টেস ভিন্ন আর কেহ এলিসের মন ফিরাইতে পারিবে না।”

ক্রমশঃ

“চোখ গেল”

[শ্রীযুক্ত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী]

বিদগ্ধ করিয়া ধরা অরুণ স্বামিন্
অস্ত গেল, রাখি আভা চাঁদের হিয়ায় ;
বিধুরা হেরিয়া চাঁদে পাখী জ্ঞানহীন,
তাহারে ধরিতে ছোটে ব্যোম-নীলিমায়।
শ্রান্ত পাখী, চন্দ্রমুখ মেঘেতে ঢাকিল ;
নিরাশে ফাটিল বুক, বলে “চোখ গেল”।

একটি জৈনমূর্ত্তি খোদিত আছে। দক্ষিণদিকের কক্ষ-প্রাচীরে গণেশের একটি মূর্ত্তি ও নন্নটের পুত্র ভীমট নামক চিকিৎসকের একটি খোদিত-লিপি বর্ত্তমান। এই খোদিত-লিপির অক্ষরগুলি খৃঃ ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর। গণেশগুম্ফার বামদিকে দুইটি ক্ষুদ্র গুহা, ইহাদিগের একটির নাম উদয়গুম্ফা। উদয় গুম্ফার পশ্চাতে পাষাণময় বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে এক জলাশয়।

গণেশগুম্ফার সম্মুখের পথ ধরিয়া বড়হাতী গুম্ফায় ফিরিয়া যাইতে হয়। এই গুহাটি স্বাভাবিক গুহা,—মনুষ্য কর্ত্তৃক খোদিত নহে। গুহার উপরে কলিঙ্গরাজ খারবেলের একটি দীর্ঘ খোদিত-লিপি উৎকীর্ণ আছে। ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজীর মতানুসারে এই খোদিত-লিপি ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে, অর্থাৎ ১৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দে, উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার ফ্লিট্‌প্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এখন বলেন যে, ইহাতে কোন তারিখ নাই। খোদিত লিপির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'সর্ব্বপ্রথমে অর্হৎ ও সিদ্ধগণকে নমস্কার। মহারাজ কলিঙ্গাধিপতি মহামেঘবাহন চেতরাজবংশবর্দ্ধক, ক্ষেমরাজ, বৃদ্ধরাজ, ভিক্ষুরাজ (এই সমস্তগুলি রাজার উপাধি) শ্রীখারবেল পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং এই পদ নয়বৎসর কাল অধিকার করিয়াছিলেন, চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সে তিনি কলিঙ্গের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই রাজবংশের তৃতীয় রাজা। তাঁহার রাজ্যের প্রথম বৎসরে তিনি কলিঙ্গনগরীর কতকগুলি প্রাচীন সৌধের সংস্কার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির ভয়ে ভীত না হইয়া তিনি পশ্চিমদিকে সেনা প্রেরণ করেন এবং কুশম্বজাতির সাহায্যে কতকগুলি নগর অধিকার করিয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরে কলিঙ্গনগরবাসিগণ উৎসবামোদে উন্মত্ত হইয়াছিল। চতুর্থ বর্ষে কলিঙ্গের প্রাচীন রাজগণকর্ত্তৃক সম্মানিত একটি দেবস্থান তৎকর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছিল এবং প্রাদেশিক ও মহত্তরগণ (রাষ্ট্রিক ও ভোজক) তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিল। পঞ্চম বর্ষে একশত তিন বৎসর অব্যবহৃত একটি পয়ঃপ্রণালী রাজব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে নন্দবংশীয় রাজগণের সময়ে খাত হয়। অষ্টম বর্ষে তিনি রাজগৃহের নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাহাকে মথুরায় পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। নবমবর্ষে মহাবিজয় নামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। দশম বর্ষের কথায় ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে। একাদশ বর্ষে কোন পূর্ব্ব নরপতিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত নগরে হং র্শণ করিয়া একশত তের বৎসর পরে তিনি জিনপূজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষে তিনি উত্তরাপথের রাজগণকে পরাজিত এবং মগধগণের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তিযূথ গঙ্গানদীতে স্নান করিয়াছিল এবং মগধরাজ তাঁহার পদপ্রান্তে নতশির হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশবর্ষে কুমারী পর্ব্বতে অর্হৎগণের বাসস্থানের নিকটে তিনি কতকগুলি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

হস্তিগুম্ফার উপরে, বামে ও দক্ষিণে অনেকগুলি গুহা বর্ত্তমান কিন্তু অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হস্তি-গুম্ফার বামে একটি ক্ষুদ্র গুহার উপরে তিনটি ফণাযুক্ত একটি সর্পের মস্তক খোদিত আছে, সেই জন্য ইহার নাম সর্পগুম্ফা। সর্পগুম্ফায় দুইটি প্রাচীন খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রথমটি অনুসারে ইহা চূলকম বা ক্ষুদ্র কর্ম্মা নামক একব্যক্তির অনুষ্ঠান; কিন্তু দ্বিতীয়টি অনুসারে ইহা কর্ম্ম ও হলখিনা নামক ব্যক্তিদ্বয়ের অনুষ্ঠান।

সর্পগুম্ফার বামে পর্ব্বতের উপরে ব্যাঘ্রগুম্ফা অবস্থিত। গুহার উপরিভাগ দেখিতে ব্যাঘ্রের মস্তকের ন্যায়,—চক্ষু, মুখ ও দন্ত প্রভৃতি খোদিত; ব্যাঘ্রের মুখের ভিতরে একটি দ্বার, এই দ্বারপথে ভিতরের কক্ষে যাইতে হয়। এই গুহায় একটি খোদিত-লিপি আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, ইহা সুভূতি নামক নগর-বিচারপতির কীর্ত্তি। খোদিত লিপিটি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ।

ব্যাঘ্রগুম্ফার বামে 'জম্বেশ্বর' গুম্ফা। ইহাতে একটি বারান্দা ও একটি কক্ষ আছে। বারান্দায় একটি প্রাচীন স্তম্ভ ও কক্ষে প্রবেশ করিবার দুইটি দ্বার অবস্থিত। একটি দ্বারের উপরে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, এই গুহা মহামদের ভার্য্যা 'নাকিয়ার' দান। জম্বেশ্বর গুহার বামে দুইটি ক্ষুদ্র গুহা আছে, ইহার একটির নাম অস্তগুম্ফা। ব্যাঘ্রগুম্ফা হইতে পর্ব্বতের নিম্নপর্য্যন্ত নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী আছে, এই সোপানশ্রেণী অবলম্বন

করিয়া জগন্নাথগুম্ফা ও হরিদাসগুম্ফায় যাইতে হয়। হরিদাসগুম্ফায় একটি বারান্দা ও একটি কক্ষ আছে; বারান্দার তিনদিকে বেদী বা বেঞ্চ ও উহাতে একটি পুরাতন স্তম্ভ আছে। ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার আছে। একটী দ্বারের উপরে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি খোদিতলিপি আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রাসাদ ও কক্ষ চূলকম বা ক্ষুদ্র কর্ম্মার অনুষ্ঠান।

হরিদাসগুম্ফার বামদিকে জগন্নাথগুম্ফা। এই গুহাটি প্রাচীন হইলেও ইহাতে কোন খোদিত লিপি নাই। ইহাতে একটি বারান্দা ও তাহাতে তিনটি প্রাচীন স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলির ভিতরে ও বাহিরে ব্র্যাকেট্, এবং স্তম্ভশীর্ষ গুলিতে মৃগ, পক্ষযুক্ত সিংহ, শুক প্রভৃতি খোদিত আছে। ভিতরে একটি কক্ষ, তাহাতে প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার। কক্ষের প্রাচীরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি চিত্রিত। বারান্দার তিন দিকে বেদী বা বেঞ্চ এবং দক্ষিণ ও বামের প্রাচীরে তাক্ আছে। জগন্নাথগুম্ফার বামদিকে 'রসুই' গুম্ফা; কথিত আছে যে, ইহাতে হরিদাস বাবাজী নামক একজন সাধু রন্ধন করিতেন। ইহাতে একটি বারান্দা, এবং বারান্দায় একটি বেঞ্চ বা বেদী আছে। ভিতরে একটি কক্ষ এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র দ্বার। এই স্থান হইতে সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতের নিম্নে আসিতে হয়।

সোপানশ্রেণী যেস্থানে শেষ হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে—সরকারী রাস্তার অপর পারে—খণ্ডগিরিতে উঠিবার সোপানশ্রেণী। এই সোপানশ্রেণী পর্ব্বতের উপরে যে স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানেই খণ্ডগিরিগুম্ফা অবস্থিত। গুহাটি পরবর্ত্তীকালে ফাটিয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহার 'খণ্ডগিরি' নাম হইয়াছে, এবং তদনুসারে পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। খণ্ডগিরিগুহাটি দ্বিতল এবং ইহা সাতআটশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। খণ্ডগিরিগুহার বামদিকে একটি সমতল ক্ষেত্রের সম্মুখে ধানঘর, নবমুনি, বারভুজী, এবং ত্রিশূলগুম্ফা আছে। পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং সমতলভূমি হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া, এই সমতলক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ধানঘর গুহাটি আধুনিক, ইহার বয়স খণ্ডগিরি গুহার সমান। ইহাতে একটি বারান্দা, তাহাতে দুইটি স্তম্ভ, এবং ভিতরের কক্ষে যাইবার দুইটি দ্বার ছিল। কিন্তু স্তম্ভ ও

অনন্তগুম্ফা

দ্বারের মধ্যের প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ধানঘর গুম্ফার প্রাচীরে খৃঃ দশমশতাব্দীর দুইটি খোদিত লিপি আছেঃ—(১) বড় ঘর, (২) ল-। ধানঘরগুম্ফার বাম দিকে নবমুনিগুম্ফা। নবমুনি গুম্ফার সম্মুখে দুইটি নূতন স্তম্ভ আছে। ইহার ভিতরে দুইটি কক্ষ ছিল। ইহার ভিতরের প্রাচীর ও কক্ষদ্বয়ের মধ্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কক্ষের প্রাচীরে চতুর্ভুজ গণেশের মূর্ত্তি এবং ঋষভদেবপ্রমুখ আট জন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি খোদিত আছে। বারান্দার ভিতরে ছাদের নিকটে দুইটি খোদিত লিপি আছে। ইহার একটি হইতে জানা যায় যে, উৎকলরাজ শ্রীমদুদ্যোতকেশরীর রাজ্যের অষ্টাদশ সম্বৎসরে জৈনাচার্য্য কুলচন্দ্রের শিষ্য শুভচন্দ্রের আদেশে বা ব্যয়ে এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খোদিতলিপিতে আচার্য্য কুলচন্দ্র, তাঁহার শিষ্য শুভচন্দ্র ও তাঁহার ছাত্র বিজো বা বিজয়ের নাম আছে। এই গুহার বামদিকে পর্ব্বতের উপরে উঠিবার পাষাণে খোদিত প্রাচীন সোপানশ্রেণী আছে।

নবমুনিগুহার বাম দিকে বারভুজী বা দুর্গা গুহা। এই গুহার সম্মুখে দুইটি ও ভিতরে চারিটি নূতন স্তম্ভ আছে। বারান্দার বামদিকের ও দক্ষিণ-দিকের প্রাচীরে এক একটি দ্বাদশভুজা জৈন শাসন-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে উৎ-কলবাসিগণ এই মূর্ত্তি দুইটিকে দুর্গা ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে, সেই জন্যই এই গুহার নাম বারভুজী বা দুর্গা-গুম্ফা। ভিতরের কক্ষের প্রাচীরত্রয়ে জৈনগণের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর ও একটি শাসনদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই গুহা ও ইহার পরবর্ত্তী ত্রিশূল গুহার মধ্যে একটি আধুনিক মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

দুর্গাগুম্ফার বামে ত্রিশূলগুম্ফা। এই গুহাতেও চারিটি আধুনিক স্তম্ভ আছে। গুহার ভিতরের কক্ষে প্রাচীর গাত্রে ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই গুহার সম্মুখে একটি আধুনিক মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনন্তগুম্ফার একটি দ্বার

এই গুহার বামদিকে দুই তিনটি গুহার চিহ্ন আছে। গুহাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু কক্ষ-প্রাচীরের জৈনমূর্ত্তি-গুলি এখনও বিদ্যমান আছে। ত্রিশূলগুম্ফার পরের গুহায় তিনটি মূর্ত্তি আছে, দুইটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের উলঙ্গ জিনমূর্ত্তি তৃতীয় মূর্ত্তিটি শাসনদেবী। ইহার বামদিকে একটি বৃহৎ গুহা আছে, ইহা রাজার সিংহদ্বার বা ললাটেন্দু-কেশরীর সিংহদ্বার নামে পরিচিত। বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহার ঊর্দ্ধভাগে একটি গুহা ছিল কিন্তু পরে গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রস্তর খোদিত হওয়ায় ইহার দৈর্ঘ্য চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধভাগে দিগম্বর সম্প্রদায়ের কতকগুলি জিনমূর্ত্তি আছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় গতবৎসর এই স্থানে একটি নূতন খোদিত

লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, খণ্ডগিরির প্রাচীন নাম 'কুমার পর্ব্বত' এবং এই পর্ব্বতে শ্রীমদুদ্যোতকেশরী দেবের রাজ্যের পঞ্চম সম্বৎসরে বহু জীর্ণ বাপী ও জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার এবং চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে বনপথ অবলম্বন করিয়া আকাশ-গঙ্গা যাইতে হয়। আকাশগঙ্গা পাষাণে খোদিত একটি জলাশয়, ইহাতে জলে অবতরণ করিবার ও পর্ব্বতের উপরে উঠিবার পাষাণে খোদিত দুইটি প্রাচীন সোপান-শ্রেণী আছে। এই স্থান হইতে নবমুনি ও ত্রিশূলগুহার সম্মুখ দিয়া খণ্ডগিরি-গুম্ফায় ফিরিয়া যাইতে হয় অথবা উপরে উঠিয়া কতকগুলি আধুনিক জৈনমন্দির দর্শন করিতে হয়।

খণ্ডগিরি গুম্ফার দক্ষিণ পার্শ্বে তেন্তুলীগুম্ফা। এই গুহার সম্মুখে একটি প্রাচীন তিন্তিড়ি বৃক্ষ আছে, সেই জন্য ইহার নাম তেন্তুলী গুম্ফা। এই গুহায় একটি বারান্দা ও একটি কক্ষ আছে। বারান্দায় একটি প্রাচীন স্তম্ভ এবং উহার বাহিরে ও ভিতরে ব্র্যাকেট আছে। বাহিরের ব্র্যাকেটে একটি হস্তী ও ভিতরের ব্র্যাকেটে পদ্ম হস্তে নারীমূর্ত্তি খোদিত। কক্ষে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র দ্বার আছে, উহার দুই পার্শ্বে পারস্যদেশীয় দুইটি স্তম্ভ ও স্তম্ভদ্বয়ের উপর সকোণ খিলান, দক্ষিণের স্তম্ভের উপরে সিংহ ও বামের স্তম্ভের উপরে হস্তীর মূর্ত্তি আছে। তেন্তুলী গুহার দক্ষিণদিকে একটি নামহীন গুহা আছে, ইহার সম্মুখে একটি প্রাচীন স্তম্ভ এবং বারান্দায় বেদী বা বেঞ্চির চিহ্ন আছে। ইহার দক্ষিণ-দিকে 'তাতোয়া' গুম্ফা। এই গুহায় একটি বারান্দা ও একটি কক্ষ আছে। বারান্দায় একটি পুরাতন ও একটি নূতন স্তম্ভ আছে, বামদিকের স্তম্ভের পশ্চাতে ব্র্যাকেটে একটি নৃত্যশীলা নারীমূর্ত্তি ও বীণাবাদক পুরুষের মূর্ত্তি খোদিত আছে। দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পশ্চাতে পুষ্পপাত্র হস্তে নারীমূর্ত্তি খোদিত আছে। বারান্দার তিনদিকে বেঞ্চি বা বেদী এবং দক্ষিণ ও বামের প্রাচীরে তাক্ আছে। কক্ষে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার। দ্বারগুলির পার্শ্বে পারস্যদেশীয় স্তম্ভ ও উপরে সকোণ খিলান আছে। প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে দুইটি করিয়া পক্ষী খোদিত আছে। এই পক্ষীর নাম তাতোয়া এবং ইহা হইতেই গুহার নাম-করণ হইয়াছে। বারান্দার ভিতরের প্রাচীরে বামদিকে একটি সিংহ ও দক্ষিণদিকে একটি হস্তী, গৃহের ছাদ ও বৌদ্ধ-বেষ্টনী খোদিত আছে। এই গুহায় কোন খোদিত-লিপি নাই কিন্তু কক্ষের প্রাচীরে রক্তবর্ণে চিত্রিত খৃঃ ১ম শতাব্দীতে ব্যবহৃত ভারত-বর্ণমালা আছে। বোধ হয়, কোন ব্যক্তি প্রাচীর গাত্রে লিখিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিল।

এই গুহার নিম্নে আর একটি গুহা আছে, তাহার নামও তাতোয়া গুম্ফা। এই গুহায় যাইতে হইলে বনভেদ করিয়া নামিয়া যাইতে হয়। গুহার বাহিরে প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি মস্তকশূন্য দ্বারপাল আছে। এই গুহার একটি কক্ষ ও একটি বারান্দা আছে, বারান্দায় একটি পুরাতন স্তম্ভ, তিনদিকে বেদী বা বেঞ্চি এবং দুইদিকে তাক আছে। ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিবার দুইটি দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের পার্শ্বে দুইটি করিয়া পারস্যদেশীয় স্তম্ভ ও তাহার উপরে সকোণ খিলান আছে। কক্ষের প্রবেশ দ্বারদ্বয়ের মধ্যে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি খোদিতলিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে পাদমূলিকবাসী কুসুম নামক এক ব্যক্তি এই গুহা খনন করিয়াছিল। এই গুহা-তেও দ্বারের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে দুইটি করিয়া তাতোয়া পক্ষী খোদিত আছে। তাতোয়াগুম্ফা হইতে উপরে উঠিয়া অনন্তগুম্ফায় যাইতে হয়।

অনন্তগুম্ফায় একটি বারান্দা আছে এবং ইহার সম্মুখে কতকটা সমতল ভূমি আছে। বারান্দায় তিনটি প্রাচীন স্তম্ভ এবং প্রত্যেক স্তম্ভের ভিতরে ও বাহিরে ব্র্যাকেট আছে। বামের স্তম্ভানুকরণের বাহিরের ব্র্যাকেটে একটি অশ্বারোহী ও ভিতরের ব্র্যাকেটে দুইটি হস্তী খোদিত আছে। প্রথম স্তম্ভের বাহিরের ব্র্যাকেটে পদ্মের উপরে উপবিষ্ট একটি গণ ও ভিতরের ব্র্যাকেটে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা দুইটি রমণী মূর্ত্তি খোদিত আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের বাহিরের ব্র্যাকেটে একটি গণ ও ভিতরের ব্র্যাকেটে রমণীমূর্ত্তিদ্বয় খোদিত আছে। দক্ষিণের স্তম্ভানু-করণের বাহিরের ব্র্যাকেটে অশ্বারোহী এবং ভিতরের ব্র্যাকেটে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান হস্তী খোদিত আছে। বারান্দায় বেঞ্চ বা বেদির চিহ্ন আছে এবং বাম ও দক্ষিণের প্রাচীরে তাক্ আছে। বারান্দার ভিতরের প্রাচীরে বাম

হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধ-বেষ্টনী আছে। ভিতরে একটিমাত্র কক্ষ—তাহাতে প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার। প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারের ভিতরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অন্য সমস্ত গুহা অপেক্ষা এই গুহার দ্বারগুলিতে কারুকার্য্য অঙ্কিত আছে। প্রত্যেক দ্বারের পার্শ্বে দুইটি অষ্টকোণ পারস্যদেশীয় স্তম্ভানুকরণ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভানুকরণের উপরে এক এক সারি পুষ্প খোদিত আছে। খিলানের পাড়ে শ্রেণীবদ্ধ জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত। খিলানগুলি সকোণ নহে, গোলাকার, এবং প্রত্যেক খিলানের উপরে এক একটি চিহ্ন আছে; ত্রিরত্ন, ধর্ম্মচক্র ইত্যাদি। প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে দুইটি করিয়া তিনটি মস্তকযুক্ত সর্পের প্রতিকৃতি আছে, এই জন্যই ইহার নাম অনন্তগুম্ফা। অন্যান্য গুহার খিলানের নিম্নের স্থান কারুকার্য্যশূন্য কিন্তু এই গুহার প্রত্যেক খিলানের নিম্নে এক একটি খোদিত চিত্র আছে। প্রথম খিলানের নিম্নে মধ্যস্থলে হস্তিযূথপতি উপবিষ্ট, তাঁহার বামদিকে একটি ক্ষুদ্র হস্তী সনাল উৎপল স্তম্ভদ্বারা উৎপাটন করিতেছে। দক্ষিণদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় খিলানের পাড়ে কতকগুলি গণ ও সিংহের মূর্ত্তি খোদিত। একটি গণ সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, আর একটি গণ সিংহের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া, তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আর একটি গণ একটি মকরের ওষ্ঠের উপরে দাঁড়াইয়া সিংহের পদ আকর্ষণ করিতেছে ও অপর হস্তে মৃণাল ভক্ষণ করিতেছে। দ্বিতীয় খিলানের নিম্নে চতুরশ্বযোজিত সূর্য্যরথ খোদিত। রথারূঢ় সূর্য্য-দেবের দুইপার্শ্বে দুইটি রমণী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ভূতলে দণ্ডায়মান দণ্ড ও কমণ্ডলুহস্তে গণমূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় খিলানের পাড়ে গণ ও সিংহগণের ক্রীড়ার চিত্র খোদিত। পদ্মবনে পদ্মের উপরে দেবী দাঁড়াইয়া আছেন, দুইপার্শ্বে দুইটি পদ্মের উপরে দাঁড়াইয়া দুইটি হস্তী শুণ্ডে কলস ধরিয়া দেবীর মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি পক্ষী পদ্মের বীজ ভক্ষণ করিতেছে। চতুর্থ খিলানের নিম্নে একটি বোধিবৃক্ষ খোদিত। বৃক্ষের চারিপার্শ্বে চতুষ্কোণ বেষ্টনী এবং উপরে ছত্র, বাম পার্শ্বে একজন পুরুষ করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে একজন পরিচারক পুষ্পপাত্র ও কমণ্ডলু হস্তে দণ্ডায়মান। দক্ষিণ পার্শ্বে এক হস্তে পুষ্পমালা লইয়া একটি রমণী দণ্ডায়মান আছেন

দেবসভা

এবং তাঁহার পশ্চাতে একজন পরিচারিকা পুষ্পপাত্র ও কমণ্ডলু হস্তে দাঁড়াইয়া আছে।

এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ-বেষ্টনীর নিম্নে একটি দীর্ঘ খোদিত-চিত্র আছে, ইহাতে পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত গৃহের মধ্যে কতকগুলি গন্ধর্ব্বের মূর্ত্তি খোদিত আছে; ইহারা তাহাদিগের পশ্চাৎ-স্থিত গণদিগের মস্তকে রক্ষিত পুষ্পপাত্র হইতে পুষ্প ও মাল্য লইয়া উড়িয়া যাইতেছে। গুহার অভ্যন্তরের কক্ষে একটি জিন মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহার পদতলে কোন চিহ্ন বা লাঞ্ছন নাই। প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি সহচর দেবমূর্ত্তি ও মস্তকের পার্শ্বে দুইটি গন্ধর্ব্ব-মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তির মস্তকের উপরে প্রাচীরগাত্রে স্বস্তিক, ত্রিরত্ন প্রভৃতি সাতটি চিহ্ন খোদিত আছে।

অনন্তগুম্ফা হইতে পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়া দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কতকগুলি আধুনিক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির পশ্চাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণনির্ম্মিত জৈন ও হিন্দু-মন্দির পতিত আছে। গ্রামবাসিগণ ইহার দেবসভা নাম দিয়াছে। খণ্ডগিরির পুরাতন চৌকিদার অপর্ত্তিদলই বলিত যে, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ এইগুলি ভুবনেশ্বর হইতে আনিয়া পর্ব্বতশিখরে রাখিয়া গিয়াছে। খণ্ডগিরির দক্ষিণে নীলগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র শৈল আছে, ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র গুহা ও জলাশয় আছে। এতদ্ব্যতীত উদয়গিরি বা খণ্ড-গিরিতে আর কোন দ্রষ্টব্য স্থান নাই।*

পুরী

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

পুরী, তুই শুধু পুরী, না লীলার পুরী?
ও ধূলার তীর্থ ঘ্রাণে মুক্তি-রথ ভক্তি টানে,
কার নাভিমূল-ঝরা তুই রে কস্তুরী!
'সিদ্ধবকুলের' তলে আজও গোরা আঁখিজলে,
শূন্য মঠে শঙ্করের বাজে জয়তূরী।

পুরী, তুই নিসর্গের যেন স্বর্গপুরী!
দেব-পদরজবিন্দু, পা তোর ধোয়ায় সিন্ধু—
নেচে তুড়ি দেয় নাচে ধরণী-ময়ূরী!
সবুজে কাঁচায়ে প্রাণ নালে কর মুক্তিস্নান,
তাপসী সেজেছে যেন ষোড়শী মাধুরী!

পুরী, তুই কুহুভরা কুহকের পুরী!
আধা স্থূল ধূলে রচা, আধা তোর জ্যোৎস্না-খচা,
নারিকেল সূত্রে যেন শ্রীরথের ডুরি!
আধা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে', আধা পুষ্পকেতে চড়ে',
যেন ছিন্নপক্ষ পরী, অভিশপ্ত হুরী!

পুরী, তুই শুধু পুরী, না পাথারপুরী?
তরঙ্গ গরজি আসে, সুভদ্রা লুকায় ত্রাসে—
দুই ভাই মাঝে সেই বহিন আদুরী,
বামে বীর্য্য—পীতাম্বর, ডানে কৃষি—হলধর,
ধরা-ভদ্রা কাঁদে,—গ্রাসে অসূয়া-অসুরী!

পুরী, তুই চিরস্থির বসন্তের পুরী!
রৌদ্রে নাই খর-জ্বালা, বাতাসে চন্দন ঢালা,
তোর চাঁদ ঠিক যেন মিছরীর ছুরী,
'তা' দেয় কে নভ-তলে, ফোটে তারা পলে পলে,
চাঁদমুখে ফোটে যথা হাসির বিজুরী!

পুরী, তুই ভারতের যেন মধুপুরী!
পড়ে তব তরু-পাতা, শুনি বৃন্দাবন-গাথা,
ডাকে হেথা ব্রজ-পিক, গোকুল-দাহুরী,
আসে ভেসে গয়া-কাশী, তীর্থভাব রাশি রাশি
ধূ ধূ চক্রবাল হ'তে ঊর্ম্মিচক্রে ঘুরি।

পুরী, তুই জগতের যেন রসপুরী!
আনন্দবাজারময় সুধার জোয়ার বয়,
যত ওড়ে, তত ভরে মায়ার অঙ্কুরী,
মহাপ্রসাদের হাঁড়ী, নানা জাতে কাড়াকাড়ি,
ভেদ-শীত ভাগায়েছে প্রেমের শীতুরী।

পুরী, তুই বুঝি পূর্ব্বগৌরবের পুরী!
তোমার মন্দির-গায় কত পুঁথি পড়া যায়,
তোমাতে দাঁড়ায়ে আছে শিল্পীর চাতুরী,
সুর-স্বপ্ন ধরে' ধরে' মানুষ রচিল তোরে,
তুই যেন অমরার বেমালুম চুরি!

* এই প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলীর মূলগুলির জন্য আমরা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার্স Messrs. Jhonston & Hoffmann কোম্পানীর নিকট ঋণী।—ভাঃ সঃ।

মন্ত্রশক্তি

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবোত্তর, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবোত্তর ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে—নচেৎ, দুরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি মৃগাঙ্ক ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিমাত্র পাইবেন।—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না!

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না! স্নানযাত্রার 'কথা' হয় পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর পদমত পাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল।—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়; ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তর হয়! রমাবল্লভের দুরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন; তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল। মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল এবং অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল।

পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল। বিবাহের পররাত্রি—কালরাত্রি—কাটিয়া গেলে, পরে ফুলশয্যাও চুকিয়া গেল। পরদিন শাশুড়ী কৃষ্ণপ্রিয়াকে কাঁদাইয়া, শ্বশুরকে উন্মনা, বাণীকে উদাসী করিয়া অম্বরনাথ আসাম যাত্রা করিলেন।

বাণীর বিবাহের দুচারিদিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অজার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল,—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবনগতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল। গৃহাদি সংস্কার করিল—পূর্ব্ব-চরিত্র পরিবর্ত্তন-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের গৃহসজ্জাদিও দূর করিয়া দিল। অজা একদিন সহসা শশাঙ্কের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাতলে তাহারই নামাঙ্কিত একটি বাক্সমধ্যে এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া হার দেখিতে পাইল। পরক্ষণেই হর্ষে আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া সেই গৃহ হইতে সরিয়া গেল।

এদিকে অম্বর চলিয়া গেলে বাণীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বিবাহ মন্ত্রের শক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন তাহার মাতার মৃত্যু ঘটিল।

কুশার বিরহে ও কন্যার বিষাদমূর্ত্তি নিত্যদর্শনে রমাবল্লভ জীবন্মৃত হইয়া আছেন। সহসা একদিন তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। কন্যাও সম্মতা হইলেন।—কালীদর্শন করিয়া, তাঁহারা চন্দ্রনাথ চলিয়াছেন। রেলপথে অম্বরের সহিত সাক্ষাৎ। পিতা, কন্যা ও জামাতাকে কথোপকথনের অবকাশ দিবার উদ্দেশ্যে ছলে অপর গাড়ীতে গেলেন, কিন্তু অম্বর ও বাণীতে বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তাই হইল না। পথে অম্বর কার্য্যব্যপদেশে নামিয়া গেলেন।—রমাবল্লভ আশা করিয়াছিলেন, এ অসম্ভাবিত দেখা শুনায় কন্যা-জামাতায় মিলন ঘটিবে—কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হইল না, তাঁহারা পথ হইতেই বাড়ী ফিরিলেন!]

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বনের বিহঙ্গ খাঁচায় পোরা থাকিতে থাকিতে উড়িবার শক্তি হারাইয়া বসে; সে তখন দ্বার খোলা পাইলেও খাঁচার বাহির হইতে চেষ্টামাত্র করেনা, অথচ হয়ত স্বাধীন-জীবনের স্মৃতি লইয়াই সে তখন মনে মনে এই বন্দিদশাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছে।

মৃগাঙ্ক যেরূপ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাহার মধ্যে কোথাও সংযমশিক্ষার আভাষ নাই, যখন যেটা তাহার খেয়াল হইয়াছে, তাহা মিটাইতে দ্বিধাবোধও ছিল না। দিবালোকে দশের চক্ষের সম্মুখে খোলা নৌকায় খেমটাওয়ালী সঙ্গে লইয়া রাস-

দর্শনে যাত্রা প্রভৃতি বহু বীরোচিত কার্য্যেই সে অগ্রণী ছিল। কাহারও ভৎর্সনা, শাসন, অনুনয়ে তাহার উড়ন্ত মনকে এক দিনের জন্যও গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু সেই মৃগাঙ্ক আজ যখন উড়িবার সাধে বীতস্পৃহ হইয়া হঠাৎ গৃহকোটরে আপনাকে বন্ধ করিয়া ফেলিল, তখন সে দ্বারে কেহ অর্গল না লাগাইয়া দিলেও সে যে স্বেচ্ছাবন্দিত্বে নিজেকে সঁপিয়াছিল, সে তাহা হইতে চরণ মুক্ত করিয়া লইল না। অজা দূরেই রহিল; কিন্তু কি যে মোহিনীমায়াই সে দূরে দূরে থাকিয়া, তাহার স্বামী-বেচারার উপর প্রয়োগ করিতেছিল, তাহা সেই বলিতে পারে, অথবা সেও হয়ত জানে না; জানিতেছিল সেই মায়ামুগ্ধ একাকীই। অজা প্রত্যূষ হইতে দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের কাজ করিয়া যায়; কর্ম্মে শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, যেন কল ঘুরাইয়া কলের এঞ্জিন চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার মধ্য হইতে অফুরন্ত রাশি রাশি কর্ম্ম তৈয়ারি হইয়া বাহির হইতেছিল। সে কার্য্যে তৎপরতা নিপুণতাই বা কি! ঠাকুর ঘরের পরিচ্ছন্নতায় ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিতেছেন, এমনি মনে হয়। রন্ধন-ভোজন-স্থান, ভাণ্ডারের পরিপাটী শৃঙ্খলা-সৌকর্য্যে কমলার প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি দেদীপ্যমান: কত রকম করিয়া বাড়ী সাজান হইতেছে, কতপ্রকার ব্যঞ্জন-রাঁধা, মিষ্টান্ন-প্রস্তুত চলিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। কর্ম্মকর্ত্রী যেন একটা মানুষ সাতটা হইয়া খাটিতেছিল। মন উৎসাহে ভরা, সুখের উচ্ছ্বাসে যেন নিজের পরিধিকে শুদ্ধ হারাইয়া ফেলিয়া, সেই হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছিল। এ আনন্দে স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার ন্যায় সে সারাজগৎকে নিজের হাতে খাওয়াইবার মহাভার গ্রহণ করিতেও পিছায় না—এই ছোট সংসারটির সকল ভার মাথায় তুলিয়া লওয়া এমন বেশি কি? মৃগাঙ্ক চাহিয়া দেখে, দেখিয়া অবাক্ হয়, আর তাহার মনে গভীর অনুশোচনা জাগিয়া উঠে। সানন্দ গর্ব্বও যে অনুভূত হয় না, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার আগুন-তাতে রাঙ্গিয়া-ওঠা মুখখানির অপূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হয়, গৃহে দু-চারিটি প্রতিপাল্য আছে, তাহাদের প্রতি সকরুণ সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহপ্রকাশ তাহাকে ভক্তিভারে অবনত করে। তাহার নিজের জন্য একান্ত মনোযোগের প্রতি আবশ্যক অনাবশ্যক সেবার আয়োজন প্রত্যক্ষ করিয়া, স্নেহে প্রেমে সে কণ্টকিত হইয়া উঠে। তাহার মত লক্ষ্মীছাড়া মানুষের ঘরে এমন লক্ষ্মী! কিন্তু সে এমন একটা সুযোগ পায় না যে, সেই কর্ম্মলক্ষ্মীকে হৃদয়-সাম্রাজ্যের মহাভিষেক সংবাদটি স্পষ্টভাবে প্রদান করিয়া, বিদ্রোহসমাপ্তিতে সন্ধির শ্বেত পতাকা তুলিয়া ধরে। অজা তাহাকে আঁচাইবার জল, খড়িকাটি, হাত মুছিবার গামছাখানি শুদ্ধ যোগাইয়া দেয়; শুধু এই সুযোগটুকুই দেয় না। অনভ্যাসের লজ্জায় সেও মনে করে, কেমন করিয়া বলি যে, তুমি আমার বন্ধু নও, স্ত্রী!

সহসা একদিন বলিবার সুযোগ মিলিয়া গেল। দিদি-ঠাকুরাণী দৈপ্রহরিক নিদ্রামগ্না, পরিজনবর্গ সকলেই যে যাহার কাজে বাহিরে; যাহারা ঘরে আছে, সকলেই মহতের অনুকরণে তথাকার্য্যে ব্যাপৃত। নিরলস বধূ কেবল বিশ্রাম চিন্তা ভুলিয়া একরাশি পাকা তেঁতুল লইয়া কাটিতে বসিয়াছে।

একতাল কাটা তেঁতুলে একটা বড় বলের মত করিয়া পাকাইয়া অজা বঁটি কাত করিতে গিয়া দেখিতে পাইল, সে একা নয়, দ্বারের সম্মুখে আর একজন দাঁড়াইয়া আছে; সে যে তাহার বন্ধু বা স্বামী, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কাৎ-করা বঁটি সোজা করিয়া, সে আবার পূর্ব্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

অজা মেয়েটিকে নেহাৎ ভাল মানুষের মতই দেখায়, কিন্তু আজকাল বোধ হয়, সেও বেশ একটু চাতুরি শিক্ষা করিয়াছে।

মৃগাঙ্ক তাহার ভাবটা বুঝিয়া লইয়াছিল। সে একটু হাসিয়া কহিল, "শুনেছ বন্ধু! আমি কা'ল চাকরি করিতে কলিকাতা যাইতেছি।" শুনিয়াই অজা হঠাৎ এমনি চমকিয়া উঠিল যে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার একটা আঙ্গুল বঁটির ফলায় কাটিয়া গিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। "আহাহা কি করিলে!" বলিয়া মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, "কতখানি কেটে গেল! উঃ অনেকটা যে"—বলিতে বলিতে তাহার মৃদু আপত্তিটা উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া, রক্ত বন্ধ করিবার জন্য কাটাস্থান আঁটিয়া বাঁধিতে বসিল। জল দিলে হয়ত শীঘ্র উপকার

হইতে পারিত, কিন্তু পাছে জল আনিতে গেলে সে উঠিয়া পলায়ন করে, এই ভয়ে সোজা উপায় অবলম্বন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

অজ্ঞা বিস্তর আপত্তি ও কাপড়-ছেঁড়ার জন্য অনুযোগ করিয়া, কিছুতেই তাহার হাত এড়াইতে না পারায় আহত হাতখানা তাহাকেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া গিয়াছে। টানাটানি করিতে কতকটা শ্রমও না হইয়াছিল, এমনও নয়। মৃগাঙ্ক কহিল, "কত কষ্ট হইবে! এই কাটা হাতে যেন কিছু কাজ করিতে যাইও না! সারিতে বিলম্ব হইতে পারে!"

অজ্ঞা নতনেত্রে কহিল, "অমন কত কাটে, এটুকু গ্রাহ্য করিলে মেয়ে মানুষের চলে না। থাক, বেশ হইয়াছে, রক্ত আরতো পড়িতেছে না।"

"না, রক্তটা বন্ধ হইয়াছে। এত কাজ কর, তবু তোমার হাত কি নরম! যেন একমুঠো ফুল!"

ঘন রক্তের দ্রুত উচ্ছ্বাসে আরক্তগণ্ডে সে সেই প্রশংসিত হাতখানা টানিয়া লইতে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে সে থানার প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা লওয়া হইলেও সে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, লাভের মধ্যে সদ্য ক্ষত ঈষৎ আহত হইয়া শোণিত ক্ষরণ করিল।—"উঃ কি কর্‌লেম!" বলিয়া অপ্রতিভ মৃগাঙ্ক লজ্জায় হস্ত ত্যাগ করিল। আঁচলে হাত ঢাকিয়া অজ্ঞা সান্ত্বনার ভাবে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "না, না, ও কিছুই নয়।"

মৃগাঙ্ক নীরবে রহিল। সে মনে মনে যেটি গড়িয়া পিটিয়া আসরে নামিয়াছিল, ভাগ্য এক বঁটির ঘায়ে তাহার সবটা বদল করিয়া দিয়াছে! এখন কি বলিবে! কি রকমটা দাঁড়ায় তাই ভাবিয়া একটু ভেকা হইয়া রহিল।

অজ্ঞা অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহার হাতে লাগিয়া যাওয়ায় সে দুঃখিত হইয়াছে। আহা, এতটা যত্ন করিয়া উল্টা অপরাধের ভার মাথায় বহিবে? না? সে সহ্য হয় না। সে তাহাকে এই ছোট বিষয়টা হইতে অন্যমনা করিয়া দিবার জন্যই জোর করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল, "সত্যই কাল যাইবে?"

"হাঁ যাইব স্থির করিয়াছি। কেন যাইব না? কে আমায় নিষেধ করিবে? আমার কে আছে?"

কথাটা বড় অভিমানের, অথচ যথার্থ। কে নিষেধ করিবে, বলিবার ধরণে মনে যেন কি একটা কষ্ট জাগে, সহানুভূতি বোধ হয়। সে একটু হাসিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি ঈষৎ ছল ছল করিয়াও উঠিয়াছিল, সে বলিল—"ভাল কাজে কি বারণ করিতে আছে?"

"তা নাই থাক, তবু আত্মীয়জনে তো অমন বলিয়াও থাকে যে, দুদিন পরে যাইও, না হয় বলে 'আমাদেরও লইয়া চলো'। যার কেউ বলিবার নাই, সে দশ দিন আগে থাকিতে গেলেই বা ক্ষতি কি? সেখানে না খাইয়া, আপনি রাঁধিয়া, চাকর চলিয়া গেলে কাপড় কাচিয়া ঘর ঝাঁটাইয়া রোগে পড়িলেই বা কার কি আসিয়া যায়?"

মৃগাঙ্কের মুখখানা খুব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞা তাঁহার কথা শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিল। অজ্ঞাকে কে যেন সুতীক্ষ্ণ তীরে বিঁধিল। সে তখন যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া অকস্মাৎ চমকিয়া বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল, কহিল "সত্যি! সেখানে বামুন-চাকর পলাইয়া যায়? তবেতো তোমার বড় কষ্ট হইবে?"

"হইলে আর কি হইবে?"

"না, না, তুমি তবে যাইও না।"

"যাইব না! পুরুষ মানুষ চিরকাল ঘরের কোণে বসিয়া বাপের পয়সা উড়াইব, এ কি ভাল? তুমিই বলো, একি ভাল?"

"না।"—অজ্ঞা সরল চোখ দুইটি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিল, মৃদুস্বরে কহিল "না—সে ভাল নয়ইতো; তুমি চাকরী করিবে শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছিল। দিদি কিন্তু রাগ করিবেন, তিনি বলেন, তাঁর টাকার অভাব নাই। তবু—"

"ঠিক্, তবু আমার চিরদিন ধরিয়া তাঁর পয়সা বসিয়া খাওয়া ভাল দেখায় না। তাঁর কাজ তিনি করিতেছেন, আমরাও একটা কর্ত্তব্য আছে তো। কাজেই, না গেলে নয়। চাকরিটিও খুব ভাল, লেখাপড়ার কাজ, অথচ দুশো টাকার উপর দিবে, পরে আরও বাড়াইয়াও দিবে বলিয়াছে।"

"তবে যেও।"

"যাইব, কিন্তু যদি রাঁধিতে গিয়া গরম ফেনে হাত পুড়িয়া মরি, দোষ দিও না। তোমার আর ক্ষতিই বা কি!

শুধু সিঁদুরটুকু মুছিতে হইবে, আর ঐ লোহাগাছা,—তাহোক তাতেও তোমায় মন্দ দেখাইবে না, একাদশী করিবার তোমার প্রয়োজন নাই, আর মাছ"—

"ওকি বলো, ছিঃ!—" সহসা মৃগাঙ্কের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিয়া সেই "চুড়ির রুনঝুন্" বাজিয়া উঠিল, সেই "ফুলের মত" হাতখানা এক মুহূর্ত্তে তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। "ও সব কি বলিতে আছে? অমন করিয়া আর বলিও না—উহাতে আমার বড় কষ্ট হয়। তার চেয়ে তুমি যেমন ছিলে সেও ভাল। না হয় ভাল নাই হইলে, চাকরি না-ই করিলে। এখানেই থাক।"

"না বলিয়া কি করি? তুমি কি আমার সাহায্য করিতে যাইতে চাহিয়াছ? দিদি বলিলেন, বউ কিসের সুখে যাইবে? তুমিতো কিছুই বলোনা। অমন মানুষের বঁটিতে হাত কাটিয়া যাওয়া, উনুনের তাতে ঝলসাইয়া মরা, গরম ফেনে পুড়িয়া—"

"তা তুমি যদি আমার যাওয়া দরকার মনে করো তবে কেন যাইব না? কিন্তু—"

"কি কি—বলো না কি, কিন্তু?"

অজ্ঞা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, "লোকের কাছে কি বলিবে? বন্ধু!" "আবার বন্ধু! বলিয়াছি না, ও শব্দ আমি তোমার মুখে আর শুনিতে চাহি না।" অজ্ঞা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল—"তবে আমি কেমন করিয়া যাইব? তুমিতো আমার বন্ধুত্ব চাওনা বলিতেছ?"

"না—তোমার বন্ধুত্ব চাহিনা—আমি তোমায় চাহি। অজ্ঞা! আমার নবজীবনদায়িনি! কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে অটুট বন্ধনে বাঁধিতে চাহি। না—সরিয়া যাইও না, আমার সমস্ত মোহ কাটিয়া গিয়াছে! তোমার পুণ্যপ্রভাবে মনের অন্ধকার-কলুষ বিদূরিত হইয়াছে, আজ আমার জীবন-প্রভাত। অজ্ঞা তুমি আজ এ নবজীবনের অধিষ্ঠাত্রী। এসো—কাছে এসো—আমায় তোমার কাছে টানিয়া লও—ভুলভ্রান্তি মুছিয়া আজ দুজনে এক হইয়া যাই। ওকি—কোথা যাও? দিদি আসিতেছেন? আসিলেনই বা? দিদি কি মনে করিবেন? মনে করিবেন, তাঁর হাড়-লক্ষ্মীছাড়া ভাইটা আজ লক্ষ্মীলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এসো দিদি! দেখ তোমার বউ আমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না। বলিতেছি, দিদি তাঁর অধঃপতিত ভাইএর উদ্ধারকর্ত্রীর কাছে খুব কৃতজ্ঞ—তিনি তাকে আজ নিজের কর্ত্তব্যের পথে প্রবেশ করিতে দেখিলে যথার্থই সুখী হইবেন। ঠিক বলি নাই দিদি! ও কিন্তু এখনও বোধ হয়, আমার পূর্ব্বের পাপ ক্ষমা করিতে পারে নাই।"

এ সংসারে একজনের প্রভাবে সবারই নবজীবন লাভ ঘটিয়াছিল। প্রসন্নময়ী মৃত্যুমুখপ্রত্যাহত ভ্রাতৃবধূর প্রতি গভীর স্নেহসম্পন্না হইয়াছিলেন। ভাইএর অনুযোগে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিলেন, অজ্ঞা অবগুণ্ঠন টানিয়া একটু সরিয়া গিয়াছিল, সূক্ষ্ম বস্ত্রান্তরালে তাহার নেত্রপতিত আনন্দাশ্রু শুক্তিগর্ভে মুক্তাবিন্দুর মত শোভা পাইতেছিল। তিনি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন "কেন বউ! ওতো আর সে রকম নাই, তোমার গুণে ও যে নতুন মানুষ হয়ে গেছে! না—চোখের জল মুছে ফেল, স্বামীর দোষ-অপরাধ কি স্ত্রীর মনে রাখিতে আছে? সে সব ভুলিয়া যাও। আয় মৃগু, তোদের আজই যথার্থ বিয়ে। দুজনের হাতে হাতে সঁপে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি আয়। দুজনে চিরজীবী হইয়া মনের সুখে ঘর সংসার কর, ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।" তিনজনের চোখ দিয়াই অনাহূত সুখের অশ্রু টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহারই ভিতর রৌদ্রবৃষ্টির ন্যায় হাসি হাসিয়া গভীর আবেগের সহিত মৃগাঙ্ক কহিল, "এবার তা হবে দিদি! এইবার আমরা সুখী হতে পারিব। সেবার তো তুমি আমাদের এমন করিয়া এক করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ কর নাই, তাই অমনটা ঘটিয়াছিল।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া বাণী দেখিল, এগৃহ আর তাহার সেই সুখ-নিকেতন নাই। কে যেন এ গৃহের সমুদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়া নিঃসার গৃহখানাই শুধু ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। যে গৃহের জন্য সে আপনাকে এই মৃত্যুপণে বদ্ধ করিয়াছিল, এ যেন সে গৃহ নয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেল, মনে মনে ভাবিল, "আর কিছু না থাক, যাঁকে লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি, সেই চিরসুহৃদ্ তো আছেন!" কিন্তু নিজের মনের অপরাধের গুরুভারে সে আজ ভাল করিয়া তাঁহার স্থির সহাস্য দৃষ্টির দিকে

চাহিতে পারিল না। অহঙ্কারে জ্ঞানহীনা সে নিজের উদ্ধতগর্ব্বে কাহারও পানে চাহে না—তাঁহার এই বিপুল বিশ্বের দিকে সে অন্ধ চাহিয়া দেখে নাই।

সমস্ত জগৎ ছাড়িয়া নিজেকে শুদ্ধ এই মন্দির-গর্ভে বদ্ধ করিয়া ভাবিয়াছিল, সে তাঁহার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়াছে! কখন কাহারও সুখে দুঃখে এজীবনের একবিন্দু হাসি অশ্রু মিলায় নাই! কোন রোগতপ্তচিত্তে সমানুভূতি-ধারা ঢালিয়া দিতে চাহে নাই, শুধু—খেলা করিয়াছে!—পূজার ভাণে খেলা করিয়া গিয়াছে! হাঁ, খেলা ভিন্ন আর কি! অজস্র পুষ্প, চন্দন, ঢাকঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টার মহাড়ম্বর-আয়োজনেই জন্ম গোঙাইল কিন্তু সেই সঙ্গে আসল জিনিষ টুকুর দিকে কতটুকু চাহিয়াছিল? ফুলচন্দন চাই, শঙ্খঘণ্টা না চাই এমন নয়, সে সকল সাত্ত্বিক বাহ্যোপকরণতো চিত্তশুদ্ধিরই জন্য—মনকে সত্ত্বভাবাপন্ন করণের ইহারাতো সহায় মাত্র! তারপর? পূজা কোথায়? সে ধ্যানের মন্ত্র পাঠ করে, ধ্যান করে কি? শুধু উপকরণের আয়োজনে ব্যাপৃত; যাঁহার জন্য এ উদ্যোগ তাঁহার কথা স্মরণ থাকে কতটুকু! এক সময়ের কথা মনে পড়িল। ফুলচন্দন থরে থরে সাজান থাকে, ঘণ্টা স্থানত্যাগও করে না, নিঃশব্দে পূজা শেষ হইয়া যায়। সেই মূর্খ পুরোহিতের অজ্ঞ পূজা! গোপিবল্লভ! সেই একজনই তোমার প্রকৃত পূজা করিয়াছিল। এই মন্দিরের অন্য কোনও পূজারি তাহা একদিনও করে নাই। কেবল আড়ম্বরের ভার চাপাইয়াছি। সে পূজায়—পূজ্যপূজকে তন্ময়তা না হইলে, সে পূজা আবার পূজা কি! আত্মনাথের সাড়ম্বর দেবারাধনা আর তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারিল না, আজ তাহার কাণে কেবলি ঘণ্টার শব্দ বড় উচ্চ ঠেকিতে লাগিল, কোশাকুশির সংঘর্ষ বড় বেশি শান্তিভঙ্গ করিল! মনে হইল, ধ্যানের মধ্যে তেমন তন্ময়তা কই? যাহার দ্বারা বাহ্যোপকরণের কথা স্মরণ থাকে না! সে চলিয়া গেলে নিজে সে রুদ্ধদ্বার মন্দিরে পূজার আসনে আসিয়া বসিল। রাঙ্গা পা-দুখানি ফুলের ভারে ঢাকা পড়িয়াছে, দুদণ্ড চোখ ভরিয়া দেখিবে সে উপায় নাই। সে চারিদিকে চাহিয়া সভয় মৃদু কণ্ঠে কহিল, গোপিবল্লভ! শুধু আজ তুমি আমার সে গোপিবল্লভ নও। তুমি রাধার প্রেমে একবার নারীকুঞ্জে শ্যামরূপ ধারণ করিয়াছিলে, আজ আমার জন্য আর একবার সেই মূর্ত্তি ধারণ কর না! না বুঝিয়া একদিন তোমার চরণপদ্ম হইতে যে ভক্তের দান কাড়িয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি—লও মা, দীনের এ পূজা গ্রহণ কর। এ হৃদয়-রক্তজবা আজ ওই শিবসেবিত চরণে দিতেছি, তুমি ফিরাইও না! এতদিন শুধু স্বামী, শুধু সখা, ভাবিয়া আসিয়াছি। আজ সে স্থানে তোমার প্রতিনিধি, তোমার শরীরী মূর্ত্তি, তুমিই পাঠাইয়াছ, তাই আজ তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে তাঁহারি সহিত সমচিত্ত, একহৃদয় হইয়া তাঁহারি বিশ্বাসের ন্যায় ডাকিতেছি—মা, মা, মা! বিশ্ব জননি! মা আমায় শান্তি দাও! মনুষ্যত্ব দাও, তাঁহার যোগ্য কর! নাই বা পাইলাম—সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যেন কায়মনোবাক্যে পালন করিতে পারি। তিনি আদেশ করিয়াছেন "মম চিত্ত মনুচিত্তন্তেহস্ত।" আমার স্বামীর আদেশ—সেতো তোমারি আদেশ মা। সে আমার দেবাদেশ। তিনি বলিয়াছেন, আত্মা পরমাত্মা অভিন্ন! এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই! আমি বেশি কিছু জানিনা—শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট! তোমাতেই তিনি, তাঁহাতেই তুমি—আমার এ পূজা তাঁহার মধ্যে যখন, তখনও তোমাকেই, তোমার মধ্যে যখন তখনও তাঁহাকেই। তিনি যে বলিয়াছেন, "জগতে এক ভিন্ন অপর নাই।" পরম পরিতৃপ্তির অশ্রুজল অবিরলধারায় বাণীর নিরহঙ্কার শান্তমুখখানি প্লাবিত করিয়া দিল। মনের শত মনোভার যেন প্লাবন করিয়া সেখানে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ স্নিগ্ধশান্তিজল বর্ষণ করিয়াছিল।

সেদিন বাণীর যেন জীবনের স্রোত ফিরিল। সে আর কিছুতেই সুখ পায় না, কেবল পরের জন্য কর্ম্মে একটু সুখ পায়, তাই শুধু মন্দিরে ফুল-সাজান, মালা-গাঁথা এই একমাত্র কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মেও নিজেকে টানিয়া আনিল। সে দেখিল, নিজের দুঃখভারে সে এতদিন তাহার পিতার দিকে চাহে নাই, তাঁহার কতকষ্ট, সেকথা একবারও তাহার স্মরণ হইয়াছিল কি? অথচ তাহার চেয়ে কোন্ অংশে তাঁহার দুঃখ কম? স্নেহময়ী মায়ের মত পিতৃবৎসলা কন্যার সমস্ত ভার একদিন সে গ্রহণ করিল। দেখিল, শান্তি এইখানেই যা একটু আছে। রমাবল্লভও ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে যে ম্লানমুখে তাঁহার কাছটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে কাজ কখনও করে নাই, সে সব কাজ নিজের হাতে অতি সহজে সযতনে সম্পাদন করে, ইহাতে কিন্তু

তাঁহার তনয়া-বৎসল পিতৃহৃদয়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই জাগিয়া উঠিতে থাকে। কোন্ অবস্থা তাহার সেই সংসারের অতীত জীবনটিকে এমন করিয়া বদলাইয়া দিয়াছে! তাঁহার মানব চরিত্রানভিজ্ঞ বৃথাভিমানী হৃদয়ই না ইহার জন্য প্রকৃত অপরাধী! কৃষ্ণপ্রিয়াই ঠিক বুঝিয়াছিল! হায়, কেন সতীর উপদেশ গ্রহণ করিলেন না!

একদিন সামলাইতে না পারিয়া রমাবল্লভ হঠাৎ কন্যাকে বলিয়া ফেলিলেন, "এবার অম্বরকে কি রকম রোগা দেখিয়া আসিলাম! কিছু বলিল না, কিন্তু নিশ্চয় সে অসুস্থ! তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে রাণারাণি?" বাণী ঈষৎ চমকিয়া উঠিল, ঠিক কথা! তাহার স্বাস্থ্য সম্পদ-ভরা সবলশরীর কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে! সে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বই কি, তাহা যে স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে! কিন্তু নিজের অসীম দুঃখের চাপে সে সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিল। চিরস্বার্থপরায়ণা সে, শুধু নিজের কথাই ভাবিতে যে অভ্যস্ত। তাহাকে নীরব দেখিয়া রমাবল্লভ পুনশ্চ কহিলেন, "বোধ হয় সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। কিছুতো কখন লেখে না। আমি দুতিন খানা পত্রে তাহার শরীরের সম্বন্ধে খুলিয়া লিখিতে লিখিলাম, একই উত্তর দেয়, 'আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমি ভালই আছি।' তুমি একখানা পত্র লিখিয়া যদি জানিতে পার, চেষ্টা করোনা।"

শেষ কথা কয়টা রমাবল্লভ একটু দ্বিধার সহিতই উচ্চারণ করিলেন, বাণীও কথা কয়টা শুনিয়া মনের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার ইঙ্গিত সেও বুঝিয়াছিল। পিতাই যে গোপন চেষ্টায় সেদিন ষ্টেশনে অম্বরকে আনাইয়াছিলেন, সে সাক্ষাৎ আকস্মিক নয় একথাও সে জানিত। তারপর নির্জ্জনে সাক্ষাতের সুযোগ! তাহার চোখে হঠাৎ জল উথলাইয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু আজ আর সে স্বামীর সম্বন্ধে পিতার সম্মুখে এতটুকু আলোচনা করিতে সক্ষম নয়। যে প্রেমহীনতার দুরত্ব তাহাকে তাহার কাছে পর করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহার মৃত্যু হইয়াছে! এখন সে নাম স্মরণেও ললাটে কপোলে লজ্জার রক্তিমা ফুটিয়া উঠে, পিতার সমক্ষে কোন্ নববিবাহিতা কন্যা এমন নির্লজ্জ!

"লিখিবি তো বাণি! লিখিস মা, যে শরীর তার হইয়াছে, যত্ন না করিলে কতদিন টিঁকিবে।" বলিতে বলিতে রমাবল্লভ একটা ভবিষ্যৎ বিপদের কল্পনায় যেন শিহরিয়া উঠিলেন। "লিখিও সে একবার হাওয়া বদল করুক, না হইলে আমাদের ভাবনা দূর হইবে না।" বাণী বুঝিতে পারিল, তাঁহার গলা কাঁপিতেছে। পিতার ভাবনা দেখিয়া সেও তাঁহার সেই পাণ্ডুমুখ ও ক্ষীণ বাহু স্মরণে ভীত হইল।

অনেক ভাবিয়া সে শেষকালে একখানা পত্র লিখিল—"তোমায় এবার দুর্ব্বল ও অসুস্থ দেখিয়া আসিয়া অবধি বাবা চিন্তিত হইয়া আছেন। তিনি আমায় লিখিতে আদেশ করিলেন যে, কিছুদিনের জন্য তুমি ওখান হইতে এখানে—না হয় তো অপর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যাইয়া সারিয়া আইস। কি অসুখ তাহা জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, 'কিছু নয়' লিখিলে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যথার্থ কথা লিখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। এখানের সমস্ত মঙ্গল; বাবার ইচ্ছা, সত্বর স্থান পরিবর্ত্তন করা হয়।" পত্রখানা পাছে অশ্রু-চিহ্নিত হইয়া যায়, এই ভয়ে ছত্র কয়টা লিখিতে লিখিতে বাণী বারম্বার চোখ মুছিয়া ফেলিল। এই তাহার প্রথম পত্র! কত আশার বাণীতে কোথায় এলিপি পূর্ণ থাকিবে, তা নয় কে যেন কাহাকে এ পত্র লিখিতেছে! বর্ষার অজস্র বারিরাশিতে ভরা সজল জলদ তুল্য তাহার হৃদয় আসন্ন বর্ষণের আগ্রহে সঘনে কাঁপিয়া উঠিতেছে, একটুকু অনুকূল বায়ু ঠেকিলেই তাহা সাহারার তপ্ত মরুবক্ষে সমুদ্র সৃজন করিতে পারে। কিন্তু কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তাহাদের মাঝখানে, ইহার প্রভাব যে কাহারও রোধ করিবার সাধ্য নাই! অগস্ত্য ঋষির মত এ সমুদ্র গণ্ডুষে শুষিয়া রাখিতেই হইবে।

অল্প কয়দিন পরে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিত পত্রোত্তর আসিল। তাহার নামে নয়, তাহার পিতার নামেই তাহা লিখিত। সেখানা এইরূপ;—

প্রণাম শতকোটি নিবেদন,

আমার জন্য আপনি সবিশেষ উৎকণ্ঠিত জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমার স্বাস্থ্য বিশেষ মন্দ বলিয়া আমার মনে হয় না। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়া থাকে, সেজন্য কিছু চিন্তা নাই। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া জ্বর

মাত্র। আপাততঃ ভালই আছি। শীঘ্রই চট্টগ্রাম যাইতে হইবে। চট্টগ্রামের বায়ু উত্তম, আশা হয়, এই উপলক্ষে ম্যালেরিয়ার দোষটুকুও সারিয়া যাইবে। সেবক শ্রীঅম্বর

যথাকালে বাণী পত্রখানা সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিল। পাঠের পর সে সেখানার উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। যখন সে মুখ তুলিল, পত্রখানা তাহার চোখের জলে ভিজিয়া কালীমাখা হইয়া গিয়াছে। শাস্তি যেন এক এক সময়ে অপরাধকেও ছাপাইয়া উঠে।

গ্রীষ্ম কাটিয়া বর্ষা আসিল। অবিরল জলধারে ধরণী তপ্তবক্ষ জুড়াইয়া কেতকী-কদম্ব পরাগরেণুতে বিশ্বজননীর পাদবন্দনা করিয়া শ্যামশস্যসম্ভারে শ্বেতকাশকুসুমে ধৌতধূলি কোমল ঘনপত্রপল্লবে ভারতবক্ষ ভূষিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শরতের নির্মেঘ আকাশে বর্ণের ক্রীড়া, হেমপীতাভ রৌদ্রে মাঠের শ্যামলতার অপূর্ব্ব শোভা, নদীতড়াগের পূর্ণজল-স্রোতে স্নিগ্ধ বায়ুর সানন্দ বিচরণের মধ্যে শারদোৎসব জাগিয়া উঠিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সবিশেষ শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে বাণী সম্পন্ন করিল। সকলকে যথাযোগ্য সমাদর-সম্ভাষণ আপ্যায়নে একবিন্দু ত্রুটি করিল না। সমারোহ কার্য্য—পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অম্বরের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী সকল হইতে অধ্যাপকগণ আসিলেন, আসিলনা শুধু অম্বর, রমাবল্লভ ইহাতে মনে বড়ই আঘাত পাইলেন। এটুকু সে ইচ্ছা করিলে পারিত! লোকেই বা কি ভাবিল! বাণী শুধু নিশ্বাস ফেলিল। আসিবার যে পথ নাই সে তা জানে। শুধু সে কথা সেই জানে। তুলসী আজকাল দুটি ছেলেদের লইয়া সংসারে জড়িত, সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিতে অক্ষম, তবু সুবিধা পাইলেই আসে। সে বিস্মিত হইয়া গালে হাত দিয়া কহিল "দেশবিদেশের লোক আসিল, একা সেই আসিতে পারিল না, কি ব্যাপার বল দেখি? সেখানে আর একটা বিয়ে করে নাই তো?"

বিয়ে! আহা তাও যদি করিত! তবু একটা সান্ত্বনা থাকিত, যে সে নিজে সুখী হইয়াছে, সে নিজেই না হয় দুঃখে পুড়িয়া মরিত। তা নয় নিজের তো এই, সেও এজন্মটা তাহাদের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল, মানবজীবনের কোন সাধই সে তাহাদের অত্যাচারে মিটাইতে পাইল না। সে মুখ নত করিয়া শুধু ঈষৎ হাসিল।

হিমকণবাহী শীতল পবনসঙ্গে শীতকাল আসিয়া দেখা দিল। গাছগুলা আড়ষ্ট, তাহারা ফুল দেয় না; পাতাগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। শুষ্কপত্র হিমবিন্দুতে ভিজিয়া মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া যায়। মন্দিরের বৃহৎ দালানে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বাণী কুন্দকলির মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ভাবে,—'এই শীতে কত দরিদ্র বস্ত্রাভাবে কাঁপিতেছে, আর আমি পশমে রেশমে মুড়িয়া রহিয়াছি!' সে ঢোল পিটাইয়া দরিদ্র জড় করিয়া তাহাদের গরম কাপড় দান করিল। দরিদ্রের দুঃখ আজকাল তাহার প্রাণে বজ্রের মত বাজিয়া উঠে। তাই গ্রীষ্মে জলদান, বর্ষার দিনে ছত্র ও শীতে শীতবস্ত্র দিয়া, সে যে ক'টিকে পারে, তৃপ্ত করিতে চাহে। গরীব যে, তাহার স্বামীর প্রাণ। আর সে, সে নিজেও যে দরিদ্র! বাণী কি তাহা ভুলিতে পারে!

শীত কাটিয়া আবার বসন্ত আসিল। সারাজগৎ যেন নূতন প্রাণ পাইয়াছে এমনি করিয়া সাড়াদিয়া উঠিল। পত্রহীন কৃশকায় বৃক্ষগুলা কচি কচি রাঙ্গা পাতায় আপ্রান্ত খচিত হইয়া উঠিতেছে, কোনখানে সঙ্গে সঙ্গে থলোয় থলোয় রং বেরঙ্গের ফুলের কুঁড়ি মসৃণ পাতাগুলির শেষ প্রান্তে বাহার খুলিয়া দিয়াছিল। দিবালোকের মত পরিষ্কার, যেন দুঃখাবসানে নবীন সুখশান্তিতে ভরা হৃদয়ের মত চাঁদনি ফুটিয়া উঠিল। বাণী ভাবিল, এ কি পরিবর্ত্তন! যাহা গেল মাটিতে পড়িয়া মাটির সঙ্গে মিশিল। এই নূতন কি তাহারই পরিবর্ত্তিত রূপ! অথবা এ নূতন সম্পূর্ণই নূতন? সে পিতাকে গিয়া বলিল, "বাবা আমি পুকুর প্রতিষ্ঠা করিব, গাঁয়ের বাহিরে নদী হইতে দূরে আমায় পুকুর কাটাইয়া দাও। শুনিয়াছি পুকুর-প্রতিষ্ঠায় বড় পুণ্য হয়।" রমাবল্লভ সানন্দে উত্তর দিলেন, "তা করনা মা! তোমারই সব, তুমি যা ইচ্ছা করিতে পার।"

বাণীর মনে পুণ্যের লোভ ছিল না, দরিদ্রের অভাব বুঝিয়াই সে জলাশয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিল। সকল সময়েই তাহার মনে হয়, অম্বর থাকিলে কি করিত? সে স্বামীর চিন্তানুসরণে কায়মন সমর্পণ করিয়াছিল। অম্বর তাহাকে তাহার সকল অধিকারের মধ্যে শুধু এই আদেশ করিয়া গিয়াছে, "মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্ত মনু-

চিত্তস্তেহস্তু, মমবাচামেকমনা যুজ্যস্ব !” এ আদেশ অলঙ্ঘ্য, ইহা তাঁহার আদেশ, তাহার স্বামীর আদেশ যে ; তাই সে তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করে।

মহোত্মমে পুষ্করিণী-খনন কার্য্য চলিতে লাগিল। চৈত্রের মেষ-সংক্রান্তি বঙ্গদেশে বড় পুণ্যাহ দিন। এইদিনে পিতৃপুরুষকে জলদান, ভোজ্যোৎসর্গ, ব্রতনিয়মাদির বহুবিধি আছে। রমাবল্লভ ঘটোৎসর্গ করিলেন। বাণী অনেকগুলি ব্রত গ্রহণ করিয়া সধবা, কুমারী, ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রাদি দান পূর্ব্বক পরিতোষ-ভোজনে তৃপ্ত করিল। তারপর বৈশাখের প্রখর রৌদ্রতপ্তদিনে সে সাগ্রহে প্রত্যূষ হইতে মধ্যাহ্ন অবধি পূজা-জপ-ব্রত-দানাদিতে নিত্য যাপন করিতে লাগিল। নিজের হাতে প্রতিবেশী দরিদ্রের কুমারী মেয়েকে স্নান করাইয়া, আল্‌তা কাজল চন্দনে বসনে ভূষণে সাজাইয়া দেয়, আহার করাইয়া ফুলজলে ভগবতী-পূজা-মন্ত্রোচ্চারণে পূজা করে, শেষে কচি মেয়েটিকে অন্যের অলক্ষ্যে একবার বুকে চাপিয়া ধরে, মুখে একটি চুম্বন দেয়, বুকের ভার সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসে। কখনও কখনও তাহারি ছোট মুখখানির পরেই মেবফাটা জল ঝরিয়া পড়িয়া যায়! সে অম্বরভয়ে কখনও কাহারও ছোট ছেলে স্পর্শ করিত না। এখন সর্ব্বদা মনে হয়, যদি আমার একটি ছোট ভাই বোনও থাকিত! পাইবার আশা না থাকিলে মানুষের মন কোথাও একটা দিতে চাহে, বিনা দেনাপাওনায় মানুষ বাচিতে পারে না। সে শিশুর মধ্যে চোখ বুজিয়া বালগোপালের অমৃত-স্বরূপ চিন্তা করে, তাহাদের স্নেহ করিয়া মনে করে, তাঁহাকেই পূজা করা হইল। তাহার জীবনে একসঙ্গে দুইটি আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছিল, নারী-জীবনের সারধর্ম্ম পতিপ্রেম, অপরটি সকল প্রেমের কাষ্ঠা-প্রাপ্ত ভগবৎপ্রেম। সে বুঝিয়াছিল, প্রথমটি দ্বিতীয়েরই সোপান, তাই ইহাকে ছাড়িয়া অন্যটি টিঁকিতে পারে না। এই তন্ময়তা হইতেই স্বার্থচিন্তার বিলোপ, স্বার্থত্যাগে পরার্থে আত্মবিসর্জন। ফলে বিশ্বের সুখে সুখপ্রাপ্তি এবং বিশ্বনাথকেও সেই সঙ্গে যথার্থ পাওয়া। মন্দিরের পূজা-বিধির উপর অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সে যাহা না পাইয়াছিল, এই নূতন পথে তাহার চেয়ে অনেক বেশী লাভবান্ হইতেছে মনে হইল। সেই কৃতজ্ঞতায় সে যাঁহার জন্য এত বড় প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাঁহার চরণে বারে বারে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল, “স্বামী স্ত্রীর গুরু কেন বুঝিতেছি। এ শিক্ষা আর কে আমায় দিতে পারিত?” দুঃখের মধ্যে সুখের আয়োজন করিয়া, সে সেই দুই ধ্যানকে এক করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। ভোরের বেলা মন্দিরে গিয়া পূজার উপকরণ সাজাইয়া রাখে, তার পর দুয়ার রুদ্ধ করিয়া পদ্মাসনে পদ্মপলাশলোচনের ধ্যান করে। চির উপাস্যের স্থানে কখনও অরুণরাগলোহিতবরণা শববক্ষস্থিতা শিবানীর মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়ায়, সে ভক্তিভরে মানসপ্রসূন চয়ন করিয়া রক্তজবা বিল্বদলের অর্ঘ্য সাজাইয়া রাতুলচরণের শোভা সম্বর্দ্ধন করে। ইতঃপূর্ব্বে এ পরিবারে কেহ জিহ্বা-দ্বারা ‘বিল্বপত্র’ শব্দোচ্চারণ করিত না, উল্লেখ আবশ্যকে “তেম্বরকার পাতা” বলিত। জবা লইয়া যে কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা আজও মনে পড়িলে তাহার আপনার হাতে জিভটা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।

এমনি করিয়া দিন কাটিয়া তাহাদের তীর্থযাত্রার পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। বাণীর বিবাহ দুই বৎসর পূর্ণ হইল। যে দিন তাহার বিবাহতিথি দ্বিতীয়বার ঘুরিয়া আসিল, সে রাত্রে সেই বাসরগৃহের পালঙ্কে সে একা শয়ন করিয়াছিল। সারারাত্রি বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়া যাপনান্তে ভোরের আলোয় যখন সেই ঈপ্সিত দৃশ্য দর্শনের বৃথা আকাঙ্ক্ষায় সেই মসনদ শয্যার শূন্য স্থলের দিকে মুহু-প্রত্যাশিত নেত্রের দৃষ্টি সে ব্যগ্র আগ্রহে স্থাপন করিতে গেল, অমনি সেই দুই বৎসরের শূন্যস্থানের আশাহীন-শূন্যতায় তাহার স্বপ্নবিভোর প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল, সে নাই! সে নাই!

আবার সে অধীর আবেগে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য আজ আবার যেন নূতন করিয়া চিত্তফলকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। হায়, সমস্ত জীবনের বিনিময়ে সে যদি আর একটি বারের জন্যও সেই দিনটি ফিরাইয়া আনিতে পারিত! কিন্তু “প্রত্যায়াস্তি গতা পুনর্ন দিবসাঃ”।

বাণীর দিন কাটিতে লাগিল। মেঘমন্দ্রে যখন নব বর্ষার জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, এমন সময় পুষ্করিণীর খননকার্য্য সমাধা ও ঘাট-বাধান শেষ হওয়ার শুভসংবাদে সে বড় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া সে এবার উপবাসবহুল সাবিত্রীব্রত গ্রহণ

করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলসত্রে পথিকেরা কণ্ঠশোষ নিবারণপূর্ব্বক তাহাকে প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছিল, সে গুঞ্জন লোকমুখে কাণে আসিলে সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলে, "এই পরিতৃপ্তিটুকু তাঁহার নিকট পৌছাক, এ শুধু তাঁর জন্য! আমি কি পরের জন্য কখন ভাবিতে জানিতাম!" এমনি করিয়া সকলের প্রতি স্নেহমমতায় সে যেন ভরাইয়া দিল, কিন্তু নিজের প্রতি এতটুকু মায়া সে করিল না। সকলের জন্য সে নিজের বুক পাতিয়া দিল, নিজেকে শুধু বিশ্রামহীন কর্ম্মের মধ্যে ঠেলিয়া, তাহার চারিদিকে কঠোর তপস্যার বহ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া দিতে দ্বিধামাত্র করিল না। সেই আগুনে হরিবল্লভের রমাবল্লভের কৃষ্ণপ্রিয়ার আদরিণী, রাধারাণী পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলে, সেই ভস্মমুষ্টি পরে পতিপ্রেমের অমৃতসেকে নির্ব্বাপিত অম্বরের মন্ত্রশক্তি এক তপঃপূতচরিত্রা ব্রহ্মচারিণী, এক স্নেহপ্রেম করুণার জীবন্ত ছবি সতী-রমণীর প্রতিষ্ঠা করিল। সে রাজনগরের জমীদারদুহিতা নহে—দুঃখীর দুঃখিনী পত্নী, শোকার্ত্ত পিতার মাতৃহীনা কন্যা।

ক্রমশঃ—

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল]

কাঁদুনির দেশে যেথা অশ্রুরাশি করেছিল বাসা,
তুমি সেথা এনেছিলে শুভ্র হাসি চঞ্চল উজল;
জোয়ারে তটিনী সম খরবাহী স্বচ্ছ ঢল ঢল;—
সে হাসিতে নাহি মলা,—ছিল শুধু গাঢ় ভালবাসা!
সাহিত্য, সমাজ, দেশ, হয়েছিল মহা উচ্ছৃঙ্খল;
তুমি এনেছিলে শান্তি, বিদ্রূপের তীব্র কষা হানি',
রহস্যের আবরণে সুমধুর উপদেশ দানি'
আদর্শ দেখায়েছিলে,—নহ শুধু বচন-সম্বল।
স্বদেশের দুঃখ দেখি' কাঁদিয়া উঠিত তব প্রাণ!
দেশ-মাতৃকার পদে ভক্তি-অর্ঘ্য সঁপেছ যতনে,—
জননীর পূজা তরে ডেকেছিলে সুসন্তানগণে;—
আজীবন গেয়েছিলে জন্মভূমি-গৌরবের গান!
কাঁদিয়াছ, হাসিয়াছ,—কাঁদায়েছ, হাসায়েছ তুমি;
এবে চলে গেছ, সবে অশ্রুজলে সিক্ত করে ভূমি!

শৈলেশচন্দ্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

আজি সে মূরতি চোখে জাগে অবিরল
হে সৌম্য নিরভিমানী প্রশান্ত সরল
হৃদয় স্ফটিকস্বচ্ছ অমিয় বচন,
আঁখি-জলে পলে পলে হয় অদর্শন।
ক্ষুদ্র শিশু কতদিন ছিনু তব কোলে,
লভিয়াছি স্নেহ কত কত দয়া মায়া,
লভেছি সান্ত্বনা কত তব মধুবোলে,
এ প্রাণে পেয়েছি তব সুশীতল ছায়া।
সুদূর মানসযাত্রী হে স্বর্ণমরাল,
পঙ্কিল বরষা নাহি আসিতে ধরায়,
ইন্দ্রনীল বাঁধা সর, অমৃত মৃণাল,
নীল ইন্দীবর, বুঝি ভুলাল তোমায়!
যেথা নাহি শোক, দুখ, নিষাদের শর
দেবতাবাঞ্ছিত সরে বিচর অমর।

পুরাতন প্রসঙ্গ

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, M. A.]

(নব-পর্য্যায়)

৩

আজ প্রাতে চা খাওয়ার পর আচার্য্য দত্তমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তখনকার দিনে কলিকাতায় যাওয়া-আসা আপনাদের নৌকাযোগে হইত?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। আমরা নৌকায় আনাগোনা করিতাম। নাকাশিপাড়ার বাবুদের বাড়িতে এক চাকর ছিল, সে পদব্রজে কলিকাতায় যাইত; ভোর বেলায় রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পৌঁছিত, পরদিন ফিরিয়া আসিত। তাহার পর পাঁচ ছয় দিন সে আর বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিত না। এখান হইতে নৌকাযোগে শান্তিপুরে যাইতে দেড় দিন লাগিত; নৌকায় আমি চার পাঁচবার শান্তিপুরে গিয়াছি; পদব্রজে যাওয়াই আমাদিগের অভ্যাস ছিল; দিগ্‌নগরে তামাক্ সেবনের একটা আড্ডা ছিল। অনেকে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়িতে আসিয়া পূজা করিত। কোনও বৈদ্যসন্তান ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলস্পর্শ করিত না; সকলেই টিকি রাখিত। প্রত্যেক গৃহস্থের গরু ছিল; গোয়ালাকে মাসে এক আনা দিলে মাঠে গরু চরাইয়া লইয়া আসিত; চাউল কেনা হইত; আউস ধান এখানকার কেহ খাইত না। আট দশ জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আনন্দময়ীর ভোগ খাইতে পাইতেন। তখনকার দিনে কেবল মাত্র কবিরাজি চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল; নাপিতে ফোড়া কাটিত। তখনকার প্রধান রোগ ছিল জ্বর। কবিরাজ জ্বরকে সহজে জব্দ করিতে পারিতেন না; কেবলই লঙ্ঘন ও খই-বাতাসা পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে বৎসরে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিল, সে বৎসরে ইহার প্রকোপ বড় বেশী হয় নাই; পর বৎসরে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল; ১৮৮০ সাল হইতে ক্রমাগত চলিয়াছে; তবে ১৮৬০।৬৫ মধ্যে একবছর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল।"

আচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"বাট্‌সনের পদে আপনি উন্নীত হইলেন, এই পর্য্যন্ত কাল বলিয়াছেন; তার পরে?" তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"১৮৬৫ সালে বাট্‌সনের মৃত্যু হইল; আমার তিন শত টাকা বেতন হইল। ১৮৬৬ সালে আমি ঢাকা কলেজের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় বদলি হইয়া গেলাম। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তৎপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; বইখানির আবির্ভাবে সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। শুধু ভাষার জন্য নহে; ভাষা হিসাবে 'আলালের ঘরে দুলাল' খুব ভাল বই ছিল।

"ঢাকায় আমি প্রায় এক বৎসর ছিলাম। সে বৎসর উড়িষ্যায় বিষম দুর্ভিক্ষ। কলেজের প্রিন্সিপাল বেন্যাণ্ড্ (Brennand) সাহেব লেখা-পড়া বেশী জানিতেন না; গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। শাসনটা তাঁহার কিন্তু খুব কড়া ছিল। তাঁহার মত কৃপণ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না; কলেজের বাবদে খরচ করিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। আমাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতে হইত, কিন্তু লাইব্রেরিতে একখানিও Reference বই খুঁজিয়া পাইতাম না; যতদিন আমি ছিলাম একখানিও পুস্তক কেনা হইল না; পরে শুনিয়াছিলাম যে ক্রফ্‌ট্ (Croft) সাহেব লাইব্রেরির আমূল সংস্কার সংসাধিত করেন। আমি যে চেয়ারে বসিতাম, সেটি ভাঙ্গা ছিল; সাহেব কিছুতেই একটা নূতন চেয়ার ক্রয় করিলেন না, মিস্ত্রী আনাইয়া অল্প খরচে একরকম সারাইয়া লইলেন। তিনি নিজে খুব শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সর্ব্বদাই মজুরের মত খাটিতেন। তাঁহার পরিবার তখন বিলাতে; আমি ঢাকা হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পরেই তিনিও বিলাতে চলিয়া গেলেন।

"ইংরাজি সাহিত্যের একজন ইংরাজ অধ্যাপক ছিলেন,

তাঁহার নাম জর্জ্জ বেলেট্ (George Bellet), তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন; মেজাজটা কিছু গরম; কিন্তু স্বভাবটা যেন একটু ফচ্‌কে গোছের ছিল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন পড়াইতাম, তিনি একটা পাশের ঘর হইতে আড়ি পাতিয়া শুনিতেন। অনেক দিন পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র—চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, বেলেট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'সেক্ষপীয়র বাঙ্গালীর মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত জানে, আর কেহ জানে না'। চণ্ডীচরণ তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

"ঢাকায় আমার বাসা তত্রত্য Law Lecturer উপেন্দ্র মিত্রের বাড়ির পাশে ছিল। তাঁহার স্ত্রী একটি মহিলা-বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন যে, উমেশ বাবু তাঁহার স্বামীকে মদ ছাড়াইয়াছিলেন। সে সময়ে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যাইত না; কুষ্ঠিয়া হইতে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইত।

অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার

"আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। লেথ্‌ব্রিজ (Roper Lethbridge) সাহেব তখন প্রিন্সিপ্যাল। কলিকাতা হইতে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার Lethbridge সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন; আমার বাড়িতে আসিয়া আমার সঙ্গেও দেখা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উড্রো (Woodrow) সাহেব তাঁহার পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, লালবিহারী দেকে দিলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে প্যারীচরণের মৃত্যু হয়; নভেম্বর মাসে আমি তাঁহার পদে উন্নীত হই। লেথ্‌ব্রিজ সাহেব ছয় মাসের ছুটি লইলেন; আমি তাঁহার স্থানে officiate করিতে আরম্ভ করিলাম; তিনি নিজে জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি যেন প্রিন্সিপ্যালের কাজ করি। বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া officiate করেন, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে; সুতরাং ডাইরেক্টরকেও তাঁহার কথার অনুমোদন করিতে হইল। এমন সময়ে প্যারীচরণ সরকারের পদ খালি হইল। সট্‌ক্লিফ (Sutcliffe) সাহেব একজন ইংরাজের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লেথ্‌ব্রিজ আমার জন্য জিদ করিয়া বসিলেন; উড্রো সাহেবেরও ঝোঁক আমার দিকে। তিনি আমাকে বলিলেন—"What is Lalbehari De's qualification? He has written one book; You could write twenty books," লর্ড ইউলিক্ ব্রাউন (Lord Ulick Brown) তখন মুসুরি পাহাড়ে ছিলেন; পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে অনেকবার তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছি; তিনি আমাকে লিখিলেন—"শুনিলাম তুমি কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেছ, তোমার বেতন বৃদ্ধি হইল কি?" উত্তরে আমি লিখিলাম যে, উক্ত পদে আমি ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতেছি, বেতন বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা পদ খালি হইয়াছে, সেটার জন্য আপনি বোধ হয় কিছু চেষ্টা করিতে পারেন।" তিনি একেবারে স্যর রিচার্ড টেম্পল্‌কে আমার জন্য লিখিলেন। আমার বেতন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম না। লালবিহারী দে ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন হটিয়া গেলেন। ন্যায়রত্নের জন্য কলিকাতার কয়েকটি সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"সট্‌ক্লিফ সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের উপর বেজায় চটা ছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও ভাল কলেজ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না; অনেক সময়ে আমাদিগকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করিতেন। একবার ডাইরেক্টর ইয়ং (Young) সাহেব প্রিন্সিপ্যাল লজ্‌কে (Lodge) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—"আপনার কলেজের পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই, ইহার

কারণ কি?” সাহেব আমাকে ডাইরেক্টরের পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন—“ইহার উত্তরে কি লিখিয়াছি

৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
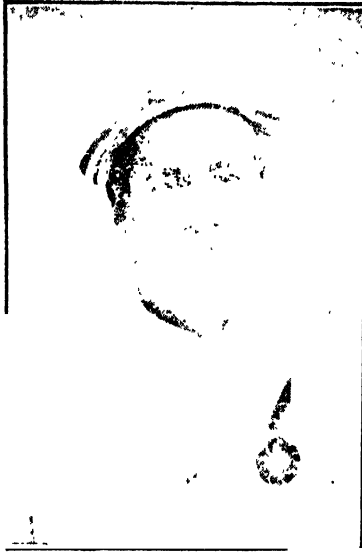
দেখিবে?” দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন—“আমি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র অনুগ্রহ চাহি না; আমি চাহি fair play; আমি আর উমেশ দত্ত থাকিলে কিছু ভয় করি না। আমার ছাত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালিকাদাস দত্তকে দশ টাকা বৃত্তি ঘুস দিয়া আমার কলেজ হইতে তোমাদের কলিকাতার কলেজে লইয়া গেলে; আগামী বৎসরে তাহাদের নিকটে আমাদের কলেজ পরাজিত হইবে।”

আচার্য্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন; পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—“আজ কাল কৃষ্ণনগর কলেজের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু একবার কেহ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি যে, এই দুর্গতির জন্য কে দায়ী? কেন কলেজের এই দুরবস্থা হইল? এ অঞ্চলের লোক কি পূর্ব্বাপেক্ষা লেখা-পড়ার জন্য কম আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? কলিকাতার Council of Educationএর অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল; যে কলেজ কলিকাতার হিন্দু কলেজের একমাত্র প্রবল ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনের সদস্য সট্‌ক্লিফ সাহেবের চক্ষুশূল হইয়াছিল; সে কলেজ এখন উঠাইয়া দিতে পারিলেই যেন একটা অনাবশ্যক ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়!” একটু সামলাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“Lodge সাহেব আমাকে বড় খাতির করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে, আমার অসুখ হইয়াছে; তখনও আমি ছুটির জন্য দরখাস্ত করি নাই; তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—‘শুনলাম তোমার অসুখ হইয়াছে; কলেজে এসন, আমি বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া লইব।’ তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে কলেজের কাজ করিতেন।

“ছয়মাস বিদায়ের পর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লেথব্রিজ সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; আমি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট হইলাম। হেডমাষ্টার হইলেন বীরেশ্বর মিত্র। বীরেশ্বর বহরমপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পানদোষ ছিল, তজ্জন্য তিনি অকালে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। লব (Lobb) সাহেব যখন প্রিন্সিপ্যাল, তখন আমাকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয়; লব বলিলেন—‘উমেশ দত্তকে এখান হইতে লইয়া গেলে আমার একজন ইংরাজ অধ্যাপক চাই, নহিলে আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না।’ লব Positivist ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্যও প্রগাঢ় ছিল; বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু সেক্ষপীয়রে দখল তাঁহার তাদৃশ ছিল না। একদিন আমাকে বলিলেন—‘দেখ, এই জায়গাটায় “so” শব্দটার অর্থ যদি “if” করা যায়, তাহা হইলেই একটা মানে দাড় করান যাইতে পারে; “So” শব্দের if অর্থে ব্যবহার সেক্ষপীয়র কোথাও করিয়াছেন কি?’ আমি তৎক্ষণাৎ সেক্ষপীয়রের কাব্য হইতে কয়েকটি passage আবৃত্তি করিয়া দিলাম। তিনি খুব সুখী হইলেন। পরে যখনই আট্‌কাইত, তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

“১৮৭৪ সালে আমি আবার প্রিন্সিপ্যালের পদে officiate করিলাম। লেথ্‌ব্রিজ সাহেব আমাকে বলিলেন ‘I wlll resist your being superseded unless it is by a Cambridge man;” তিনি কেম্ব্রিজ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন; ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন,

গণিত শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন; এক ঘণ্টা কেবল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন; ইংরাজি সাহিত্য অধিকাংশ আমাকেই অধ্যাপনা করিতে হইত; সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন তিনি এখানে আসিলেন, তখন তাঁহার নাম Ebenezzar Lethbridge; তাঁহার স্ত্রীর কাকা Roper মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যান; সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল Roper Lethbridge; ঐ সম্পত্তির জন্য তাঁহাকে

স্যর রিচার্ড টেম্পল।

প্রতি বৎসর বিলাত যাইতে হইত। স্যর রিচার্ড টেম্পলের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; স্যর রিচার্ড তাঁহার গোপনীয় চিঠিপত্রগুলিও স্যর রোপারকে দেখাইতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর বিলাত হইতে তিনি বরাবর আমাকে চিঠি লেখেন, Christmas Card পাঠান, কেবল গত ১৯১২ সালে তাঁহার নিকট হইতে বড়দিনে কার্ড পাই নাই।"

অধ্যাপক দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাঙ্গালীর সহিত সাহেবদের ব্যবহার বেশ ভাল ছিল বলিয়াই ত বোধ হয়।" তিনি বলিলেন—"তখনকার সাহেবেরা খুব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি,—কোম্পানির আমলের সাহেব কর্ম্মচারী ও Crownএর আমলের সাহেব কর্ম্মচারী যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।"

প্রশ্ন করিলাম—"কে, এম্, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আপনার আলাপ ছিল কি?" দত্ত মহাশয় বলিলেন—"কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না; আমি তাঁহার একখানি বই কিনিবার জন্য একবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম। তিনি খুব [illegible] ছিলেন ও [illegible] খুব স্বদেশ হিতৈষীও ছিলেন। Blac[illegible] গোল-যোগের সময় তিনি নির্ভীকভাবে রামগোপাল ঘোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি রামতনু বাবুর বন্ধু; লাটন সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়। রামগোপাল বিশাট [illegible] দিগকে খুব দু কথা শুনাইয়া দেন। D[illegible] সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন "[illegible] is a proud day for yo[illegible] c[illegible]ntryme[illegible]" [illegible] এম বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান পাদ্রী [illegible] বক্তৃতা করিতে পারিতেন না [illegible] নিকটে স্বতন্ত্র গির্জ্জাঘর [illegible] (Rochfort) একদিন আমাকে বলিলেন—[illegible] আমি কে. এম. ব্যানার্জ্জির নাম শুনিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইল যে, কালকাতায় তাঁহার চর্চ্চে গিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আসি। রবিবারে তাঁহার চর্চ্চে গিয়া বসিলাম; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, পাছে বক্তার কালো রংটায় আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত করে। যাহা শুনিলাম, তাহা ইংরাজের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর Sermon অপেক্ষা কম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল না।'

"রামতনু বাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করিতাম। পেন্সন্ লইয়া যতদিন তিনি এখানে ছিলেন, আমার বাড়িতে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার পিতা পূজা-আহ্নিক লইয়াই থাকিতেন। রামতনু বাবু কাশী গিয়া পৈতাগাছটি ফেলিয়া দিয়া আসেন। শুনিয়াছি বিশ্বেশ্বরের গলায় ঝুলাইয়া দিয়া আসেন। বাপ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন; তিনি বাপের

য়ুরোপে তিনমাস *

[মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী M. A., L. L. D.]

৩১শে মে শুক্রবার ১৯১২। জলপথে আজ চৌদ্দ দিন কাটিল। এইবার যেন কতকটা বিরক্তির ভাব আসিতেছে। যেন জাহাজ ছাড়িতে পারিলে বাঁচি—মনে হইতেছে। অথচ জাহাজের উপর কেমন একটা মায়াও পড়িয়াছে। ঘরদুয়ার বিছানাপত্র সব যেন নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ সহজে এত মায়ার বশ হয় বলিয়াই বুঝি এত কষ্টও পায়। যাহা ত্যাগ করা প্রয়োজন ও ইচ্ছা, তাহার উপরেও এইরূপ মায়া জন্মিয়া যায়। যাহা ছাড়িতে যথার্থ কষ্ট বা ছাড়া উচিত নয়, তাহার ত কথাই নাই। এই জাতীয় মায়ার অদ্ভুত প্রতাপ। মধুপুর হইতে কলিকাতায় যাইতেই হইবে।' অথচ যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই মনে হয়, আর দুদিন থাকিয়া যাই। মানুষ যখন যেথা, তখন সেথাই যেন নিজস্ব করিয়া লয়। উপন্যাস-কল্পিত বন্দী ৪০ বৎসর কারাবাসের পর সাধের কারাগৃহ ত্যাগ করিয়া সৌর-করোজ্জ্বল স্বাধীন অবাধ জীবনের পক্ষপাতী কেন হইতে পারে নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। গাছতলায় থাকিলেও তাহা আপনার করিয়া লইতে মানুষ বেশ পারে। তাই ছাড়িবার সময় গাছতলা ছাড়িতেও মায়া হয়।

Gulf of Lyonsএর যত নিকটবর্ত্তী হইয়া যাইতেছে, জাহাজের উদ্দাম নৃত্যলীলাও যেন ততই বাড়িতেছে। এ কয়দিন Rolling অর্থাৎ এপাশ ওপাশ দোলনই ছিল, কিন্তু আজ Pitching অর্থাৎ সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ আবার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। Rollingএ বড় কষ্ট হয় না। Pitchingএ অত্যন্ত কষ্ট। আমার ঘর আবার জাহাজের ঠিক সম্মুখভাগে। সেই জন্য Pitchingএ বেশী কষ্ট বোধ হইতেছে। স্নানাদির সময় দাঁড়াইয়া থাকাই মুস্কিল বোধ হইতেছিল। উপরে আসা অপেক্ষা কাবিনে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে আরামবোধ হইল। "অর্ণব ব্যাধিতে" কবুল জবাব দিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু এ নারাজীটা ভবানীপুরের সেয়ারের গাড়ীর আমলের আলিপুর-যাত্রী এবং ব্রাহ্মণের "জপান্তে প্রণামের" সমতুল্য। ব্রাহ্মণ সারা পথটা ঢুলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। সহযাত্রীরা যতবার ঠেলিয়া তুলিয়া দিতেছিল, ঠাকুর গোসা

মাসেলস—প্রবেশদ্বার

* ভ্রমক্রমে গত সংখ্যায় মার্সেলসের ছবিগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে;—সেগুলি বর্ত্তমান সংখ্যায় হওয়া উচিত ছিল। এই সংখ্যায় যে ছবিগুলি দেওয়া গেল, তাহার অধিকাংশের মূল শ্রদ্ধেয় লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার, এট্-ল, মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মাসেল্স—জেটী

Maltaয় Asquith (Prime Minister) Churchill (First Lord of the Admiralty) Kitchener (Agent of the British Government in Egypt) আসিয়া Sir John Hamiltonএর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন শুনিলাম। Lord Kitchener ১০ই জুন পর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন। ইংলণ্ডে Strike ব্যাপার লইয়া হুলস্থুল চলিয়াছে। আর দুইজন প্রধান রাজমন্ত্রী Maltaতে বসিয়া বায়ু-সেবন করিতেছেন, একথা বিশ্বাস হয় না। Germanyর Naval Programme, France ও Germanyর Northern Africa লইয়া মনান্তর ও Italy Turkeyর বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপারে Mediterranean Seaতে রণতরীর প্রাধান্য-স্থাপন বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে ইংলণ্ডের এখন সমর পদ্ধতির আলোচনা চলিতেছে। এ সময় এই সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ যে শুধু Maltaর মিঠা হাওয়া খাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, এ কথা বলিয়া চোক টিপিলে লোকে বুঝিবে কেন? নিশ্চয়ই একটা গুরু ব্যাপারের আলোচনা চলিতেছে।

রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। ডেকে আহারের পর বসা বা বেড়ান অসম্ভব। বৈঠকখানায়ও বসিবার সুবিধা নাই। কাজেই Cabinএ শয্যাশ্রয় করিলাম।

Mediterranean কতকটা নিজমূর্ত্তি ধরিবার উপক্রম করিতেছেন। অবিরাম চঞ্চলতায় সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইল। প্রত্যেকবার নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখি যে, তাণ্ডব নৃত্য যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ভয়ের কথা বটে। কারণ—ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগরের উচ্ছল তরঙ্গলীলা অক্লেশে সহ্য করিয়া আসিয়া, শেষে ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষাকৃত ধীরজলে সমুদ্র-পীড়া হওয়াটা

করিয়া বলিতেছিলেন, "কেন হে বাবু, আমার ঘুমই দেখ্‌লে কিসে! নিশ্চিন্তমনে অভীষ্টদেবতার জপ করিবারও কি তোমাদের জন্য যো নাই!" বার বার তাড়া খাইয়া সহযাত্রীরা চুপ করিল। পতন সময়ে সাবধান বা সাহায্যও করিল না। ব্রাহ্মণ নিদ্রাবশে যখন সজোরে গাড়ীর পাদান আশ্রয় করিলেন, একজন সহযাত্রী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, এইবার জপান্তে প্রণাম নাকি!" সমুদ্র-পীড়ার বাধাভিমান ক্রমশঃ আমার জপান্তে প্রণামের কাছাকাছি বা হইয়া পড়ে!

ক্যাবিনে শুইয়া সমস্ত রাত সমস্ত দিন কাটান অসম্ভব। রাত্রি প্রায় ৪॥টার সময় বেশ ফরসা হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে পৌছিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। আলোয় ঘুম হয় না, শুইয়া থাকিতেও ইচ্ছা হয় না। কাজেই ডেকের উপর বসিতে বেড়াইতে না পারিলে কষ্ট। আবার জাহাজে পা-মাথা ঠিক রাখিয়া এখন চলাও দুষ্কর। কষ্টে শ্রেষ্ঠে অনেকের অপেক্ষা সভ্যতা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। এত Rolling ও Pitchingতেও আমার ধৈর্য্য দেখিয়া Good Sailor পসারটা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু কষ্ট যে একেবারেই হইতেছে না তাহা নয়। কষ্টকে কষ্ট মনে করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। তাই এই সামান্য কষ্টে কষ্ট স্বীকার করিলাম না। কিন্তু Gulf of Lyonsএ Pitching আরও বাড়িবে, তাহার পর English Channel আছে। অতএব এখনও বাহাদুরী না করাই ভাল।

বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হইবে। Mediterranean ভূমধ্যসাগর বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। এই বেশ শান্তমূর্ত্তিতে আছে—আবার ক্ষণেকের মধ্যে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে।

"অব্যবস্থিতচিত্তানাং
প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর।"

'অপ্রসাদ' ত আরও ভয়ঙ্কর। রাত্রে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার টিউনিসের অনতিদূর দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে উত্তরমুখী হইয়া Sardinear রাস্তা লইল।

মার্সেল্‌স্ নত্রেডেম্ গির্জ্জা

রাত্রেই মার্সেলসের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পৌছান যাইবে। কিন্তু তখন navigation বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয় এবং ডকে সহজে স্থান পাওয়া যায় না বলিয়া, কাল বেলা আটটা নয়টা পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে হইবে। P. & O. Companyর নিকট Thomas Cookএর প্রতিপত্তি কিছু কম। মালপত্র পাঠাইবার কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। রেলে মালের অত্যন্ত বেশী ভাড়া। ফ্রান্সে অধিকদিন কাটান উচিত ও সম্ভব হইবে না, কি করি, এখনও স্থির করিতে পারিতেছি না। জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা বা প্যাক করা, আমার দ্বারা বহুকাল ঘটে নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় ট্রাঙ্কটা জাহাজের Hold হইতে লইয়া, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় প্রভৃতি বাহির করিবার ইচ্ছা ও শক্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ অবস্থায় বরাবর Bay of Biscay ও Gibralter হইয়া জাহাজের পথে গেলেই ছিল ভাল। কিন্তু, সমুদ্রের তাণ্ডব-চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে ইচ্ছা বড় হইতেছে না। এইরূপ অব্যবস্থিত মনে কিছু সময় গেল।

আজ আবার "আগুন লাগার" অভিনয় হইল। পূর্ব্বের মত নৌকা প্রস্তুত হইল, দমকলে জল চলিতে লাগিল। নৌকায় পালাইবার জন্য খানসামা রাঁধুনি চাকরেরা খাবার দাবার লইয়া যথাস্থানে কলের পুতুলের মত দাঁড়াইল। বাঁশীর সঙ্কেতে কাজ চলিতে লাগিল। খেলায় দেখিতে ভাল বটে। কাজের বেলায় কতদূর দাঁড়ায় বলা যায় না। নচেৎ সে দিন Titanicএর অমন ব্যাপারের পর Empress of Irelandএর এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটিত না। তবে ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হইয়া স্থির থাকিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা করা সর্ব্বদাই উচিত। তাই—এই সমস্ত fire drill ইত্যাদির অবতারণা।
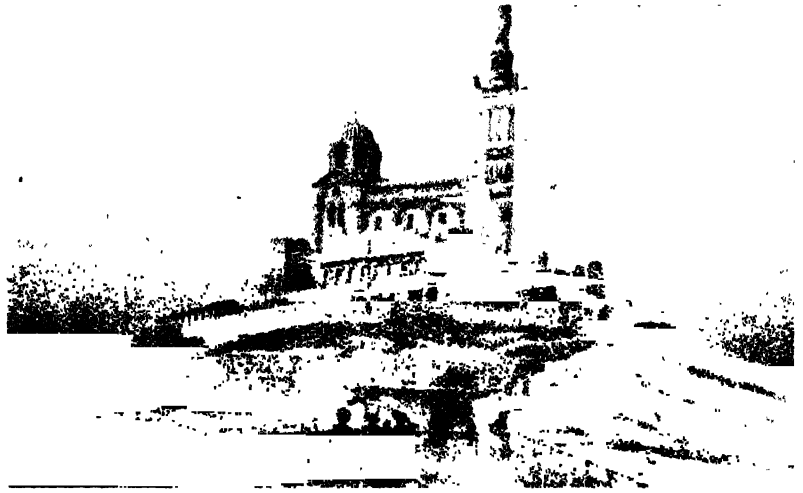
বেলা ১২টার সময় সার্ডিনিয়া ও তাহার দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপ দুইটি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তীরের অতি নিকট দিয়া যাইতেছে বলিয়া তরঙ্গ কিছু অধিক লাগিতে লাগিল এবং জাহাজের দোলাও কিছু বাড়িল। ইহার উত্তরেই নেপোলিয়নের জন্মস্থান কর্সিকা। আমরা কর্সিকা দেখিতে পাইব না। উহা দূরে দক্ষিণে রাখিয়া জাহাজ (Gulf de Lyons) অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্বে সার্ডিনিয়া ও কর্সিকার মধ্যে Straight of Boniface দিয়া জাহাজ যাইত। তখন কর্সিকা স্পষ্ট দেখা যাইত। এখন সে রাস্তা ত্যাগ করিয়া সোজা পথেই যাওয়া হয়। একদিন যাহার বিক্রম-প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ কেন—সমস্ত সভ্যজগৎ ত্রস্তব্যস্ত হইয়াছিল, সেই বীর-কেশরী নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করিয়া ইতিহাসে কর্সিকাকে ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে অভিসম্পাত করে, এমন লোকও অনেক আছে, কিন্তু এই দীনহীন সামান্য কর্সিকান্ বালক অতি অল্প বয়সে কি বীর অভিনয় করিয়া জগৎ চমৎকৃত করিয়াছিলেন, পরে সেই বালক অদ্ভুতকর্ম্মা

সম্রাট্ হইয়া কতরূপে কত মহৎ কার্য্য দ্বারা পৃথিবীর হিতসাধন চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থিরমনে তাহা আলোচনা করিলে, অভিসম্পাত অনেক অংশে অহেতুক মনে হইবে। নেপোলিয়ান সময়ে সময়ে অবশ্য নানা নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া পাতকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পৃথিবীতেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল। St. Helenaয় তাঁহার শেষ জীবনকাহিনী মনে করিলে চক্ষে জল আসে। জগতে এরূপ লোক কদাচিৎ জন্ম-গ্রহণ করেন। Maltaর Church of Bonesএর ভিতর পাচটি স্বতন্ত্র নরকপাল দেখিয়াছিলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। Maltaর পাঁচ জন তেজস্বী নাগরিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। বন্দুকের গুলি যেখানে মস্তক-ভেদ করিয়াছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশ সেই হিতৈষী নাগরিকগণের অস্থি সমাধিক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া, নেপোলিয়ানের অত্যাচারের স্থায়ী-অপরাধ ঘোষণার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সকল বিজয়ীবীরের বিরুদ্ধেই এরূপ অভিযোগ আনা যায়। ইংরাজের শত্রু নেপোলিয়ান ইংরাজ ঐতিহাসিক-বিশেষের লেখনী-সাহায্যে মসীধারাপ্লুত হইয়াছেন। কিন্তু Abbot, Scott, Rosebery তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথঞ্চিৎ করিয়াছেন।

সেই নেপোলিয়ানের কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল ফ্রান্সের দ্বারদেশে আমি আজ উপস্থিত। কত কথা ছায়াবাজীর মত হৃদয়-পটে উদিত ও বিলীন হইতেছে। ইউরোপের কথা, ইউরোপের ভাব, ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস যাহার অস্থি মজ্জার ভিতর প্রবেশ করিলেও দেশীয় স্বাতন্ত্র্য-পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছে,সেই বুঝিতে পারিবে,এই সন্ধিক্ষণে মনের কিরূপ চাঞ্চল্য হয়। অথচ ফ্রান্স এখনও একদিনের পথে রহিয়াছে। চিন্তাবলে মানুষ কত রাজ্য অধিকার করে, কত কত অধিকৃত প্রদেশ হারাইয়া ফেলে, তাহার সংখ্যা নাই।

শনিবার ১লা জুন। ১৮ই মে শনিবার বম্বেতে এরেবিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়াছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ ১৫ দিন সমুদ্রবক্ষে কোনরূপ কষ্ট, বিপদ, অসুখ ও বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। পিতৃ-মাতৃ-পুণ্য,প্রিয়জনের নিরন্তর ভগবৎ-পাদপদ্মে কাতর-ভিক্ষা ও ভগবানের অনন্ত কৃপা সকল বিঘ্নবাধাবিপত্তি কাটাইয়া,— নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত করিবে, স্থির বিশ্বাস আছে।

মার্সেল্‌স - লংক্যাম্প্ প্রাসাদ
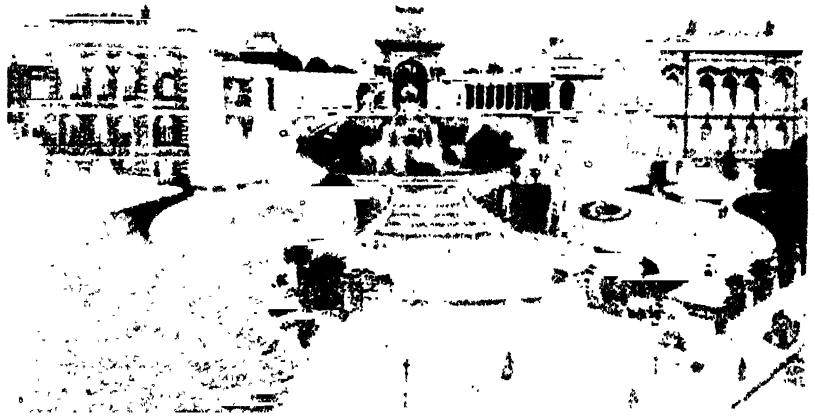
কখন মার্সেলস্ পৌঁছিব, মালপত্র বাঁধার কি হইবে, এই সকল ভাবনায় সমস্ত রাত্রিই ভাল নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি ৪টার সময় বেশ পরিষ্কার আলো হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া যতদূর পারি, জিনিষপত্র গুছাইতে ও বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এ সকল করা আমার মোটেই পোষায় না।

গল্‌ফ অব্ লায়নস্‌এ প্রায়ই ঝড় তুফান হয়। আমরা ভগবৎ-কৃপায় তাহা হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু কেমন ঠাণ্ডা—কোয়াসায় কিছুই ভাল লাগিল না। স্নানাহারে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হইল না।

ক্রমশঃ যাত্রীরা বিদায় গ্রহণ, পরস্পরের ঠিকানা আদান-প্রদান প্রভৃতি জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বোচিত কার্য্যে নিয়োজিত হইল। তাহার পর জাহাজে খরচের

মার্সেল্‌স্—ক্যাথিড্রাল

চা খাইয়া গাড়ীতে উঠিবে। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের গায়েই Special ট্রেণের Platform। P. & O. কোম্পানীর এই সব সুবিধার জন্তই লাঞ্ছনা সহিয়াও লোকে এই লাইনে আসে।

মাল্‌টার স্থায় মার্সেলস্‌ নগরের প্রান্তভাগও সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বাহু-তটে পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। ইহা ফ্রান্সের দক্ষিণের প্রধান বন্দর। তাই জাহাজে, নৌকায়, ষ্টীমারে ভিড় বড় বেশী।

ভিন্ন ভিন্ন (Mole) সমুদ্র-গর্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তর বাহুবিস্তার করিয়া জাহাজের নিরাপদ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। পাহাড়ের উপর বাড়ী ও গির্জা থরে থরে উঠিয়াছে। দূর হইতে মার্সেলসের পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ Notre Dame গির্জা ও মাতৃমূর্ত্তি দেখা যায়। বড় মনোহর দৃশ্য! Malta র ধরণে গঠিত হইলেও মাল্‌টা হইতে সমুদ্রের তীর অনেক বিভিন্ন। মাল্‌টা পুরাতন সহর—প্রয়োজন মত দুইচারিটা নূতন বাড়ী হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মার্সেলস্‌ অধিকাংশই নূতন গঠিত। তবে স্থানে স্থানে প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি স্থানও আছে। Chateau D' If পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর স্থাপিত—বন্দরের প্রবেশদ্বারেই একটি দুর্গ অবস্থিত। অনেক অপরাধী ব্যক্তি পূর্ব্বে এই দুর্গে অবরুদ্ধ হইত। Dumasএর Monte Christoর প্রধান ও আদিম দৃশ্য এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বীপ-সংশ্লিষ্ট।

বিল্‌ শোধ করা ও বকসীস দানের পালা পড়িল। সে এক বৃহৎ ব্যাপার। Cabin Steward এক পাউণ্ড, Table Steward দুই পাউণ্ড ও Bathroom Steward পাঁচ শিলিং Deck Steward ২॥ শিলিং নগদ ও ডেক চেয়ারখানি পাইবে, ইহাই আমার মত অর্থাৎ গরীব গৃহস্থ-পক্ষে সনাতন নিয়ম আছে। তাহা পালন করিতে হইল। ফ্রান্সে বকশীস-প্রণালী নাকি আরও গুরুতর। তবেই ত চক্ষু স্থির। নরসুন্দর এক শিলিং ঠকাইল। হিসাব রাখিতে বলিয়া কোথাও তাড়াতাড়ি যাইবার সময় হিসাব-নিকাশ করিলে কিছু বেশী দিতেই হয়। এইরূপে সর্ব্বত্র দেনা চুকাইয়া বেড়াইতে হইল। যাত্রী প্রাপ্য দেনা না দিয়া পালাইবে কোন কর্ম্মচারীর বা দোকানদারের সে ভয় নাই। অন্ততঃ ফাষ্ট ক্লাসে সেটা প্রকাশ হইতে পায় না। ভদ্রলোক খুঁজিয়া পাওনাদারের পাওনা চুকাইয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে সকল কাজ চলে। Purser মহাপ্রভুর মন্দিরে ৩।৪ বার গিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইলাম। টাকাকড়ি সব তাঁহার নিকট! নিজের পাঁজী পরকে দিয়া দৈবজ্ঞের যে অবস্থা হয়, টাকা পয়সা Purserএর নিকট রাখিতে দিয়া কয়দিন সেই অবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু একরকম নিশ্চিন্ত থাকা গিয়াছিল।

যাহারা বরাবর রাত্রের Special Express Trainএ যাইবে, তাহারা এখন নাবিবেনা। একবারে বৈকালিক

অন্যান্য বন্দরের মত এখানেও নানারকম তামাসা ও ভিক্ষা করিবার দৃশ্য চক্ষে পড়িল। নৌকা করিয়া দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ নাচগানবাজনা করিয়া ভিক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই যেন কিছু ধূমময় মেঘাকার। "সূর্য্যকরোজ্জ্বলধরণী" বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি. তাহা পদে পদে মনে করাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশঃ

জাহাজ "Mole C" অর্থাৎ P. & O. কোম্পানির নঙ্গর করিবার স্থানে লাগিল। নঙ্গর ফেলা, সিঁড়ি লাগান, মাল জাহাজের Hold হইতে কপিকলের সাহায্যে উপরে তোলা, মাল নাবান, গোলমাল চীৎকারের ধূম পড়িয়া গেল। পরের দেশে পরের মত একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই। এতদিনে জলযাত্রার অবসান হইল। ভগবানকে পূর্ণপ্রাণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিলাম। তিনি যে এ অধমকে নিরাপদে সুদূর সমুদ্রপথ বিনাক্লেশে পার করিলেন তজ্জন্য বার বার ধন্যবাদ দিলাম। এতদিনে উৎকণ্ঠারও কতকটা নিবৃত্তি হইল।

Thomas Cook কোম্পানির P. & O. কোম্পানির নিকট আদৌ প্রতিপত্তি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের কর্ম্মচারীদিগের জাহাজে উঠিবার হুকুম নাই। তাহারা সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সম্ভবক্সীসতুষ্ট Steward এর সাহায্যে ছোট ছোট জিনিসগুলি তীরে নামাইয়া Custom Officialদিগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। "মাসুল লাগিবার মত কোন জিনিস নাই" দৃঢ়স্বরে এই কথা বলাতেই বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া জিনিসগুলি ছাড়িয়া দিল। Grand Hotel De Russie and St. Angleterreতে চক্রবর্ত্তী আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম যে, তাহার ও কিট্নী সাহেবের সাহায্যে অল্প অল্প সময়ের মধ্যে সহর দেখিবার সুবিধা হইবে। ভাষার দৌড় কম বলিয়া তাঁহাদিগের এ যন্ত্রণা বাড়াইতে হইল। নিজেও যে যন্ত্রণা না পাইলাম, তাহা নহে।

তাঁহাদের কয়জনের মালপত্র অনেক। কাজেই কষ্টম দারোগা ও সাদা কুলীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে কষ্ট হইল। ২॥০ ঘণ্টা তাঁহাদের মালপত্র আদায়ের উপলক্ষে মোটরে বসিয়া বসিয়া নূতন জায়গার লোকচরিত্র ও ব্যবহার-বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। Moleএর পশ্চাতেই পাথরবাঁধা রাস্তা, তাহার পর রেলিংএর বাহিরে আবার পাথরবাঁধা রাস্তা। হঠাৎ হাবড়া পোল হইতে নাবিয়া বাড়ী যাইবার রাস্তায় পড়িলাম মনে হয়। পোর্ট কমিশনরদিগের কম্পাউণ্ডের দীর্ঘ উচ্চ রেলিং ও তাহারই পরে পাথর-বাঁধান রাস্তা প্রায় কলিকাতারই মত। কলিকাতায় প্রবেশকালে সহরসৌন্দর্য্য মার্সেলসের সহিত ভ্রমেও তুলনা হইতে পারে। কালা দেশের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্য নয়, তবে কালিমাখা কালা চক্ষেরই তাহা ভ্রম। শীঘ্র ভ্রম দূর হইল। বড় বড় ঘোড়ার গাড়ীতে

মার্সেল্‌স্ হইতে প্যারিস্ পথে—কৃষিক্ষেত্র

মাল লইয়া যাইতেছে। পাহাড় সমান মাল লইয়া গাড়ীর উপর বোঝাই করিয়া হাতীর মত দুইটা, কোথাও বা তিনটা ঘোড়া জুতিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ী যাইতেছে, মাল সরিয়া পড়িয়া যাত্রীর মাথায় পড়িবে কি না ভ্রূক্ষেপ নাই।

সহরের মধ্যে রেলের গাড়ীগুলির Shuntingএর কায প্রকাণ্ডকায় ঘোড়ার দ্বারা হইতেছে। কারণ, সর্ব্বদা সহরের ভিতর এঞ্জিন যাতায়াত করে না। গাড়ী Shuntingএর কাজ এবং সহরের লোকারণ্য রাস্তার উপর রেল পথে এঞ্জিন চালাইয়া সময়ে সময়ে অনেক বিপদ হয় বলিয়া এঞ্জিনের বদলে ঘোড়ার ব্যবহার। আশ্চর্য্য দৃশ্য। সাদা মুটে মজুর, গাড়োয়ান, বিচিত্রবেশী ফরাসী পুলিস, ট্রাম নূতন ধরণের বাজার, দোকান, ৭।৮ তোলা বাড়ী সব চক্ষে যেন ধাঁধা লাগাইতে লাগিল। কাহারও প্রতি কাহারও

ভ্রুক্ষেপ নাই। যেমন করিয়া হয় নিজে নিজেকে বাঁচাইয়া চল। কিন্তু পুলিসের চক্ষু চতুর্দ্দিকে। চুরি ডাকাতি মারামারি দাঙ্গাও বন্ধ করিবার প্রণালী যেমন শক্ত, লোকের প্রাণ, অঙ্গ, সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধেও যত্ন সেইরূপ। সতর্ক নয়নে পুলিসকে রাস্তার গোলমাল সব দেখিতে হইতেছে যে, ভিড়ে কাহারও যেন কোনরূপে বিপৎপাত না হয়। কাজেই এত ভিড়েও দারুণ দুর্ঘটনা যত হইতে পারে ও হওয়া সম্ভব তাহার অপেক্ষা কম হয়। দোকানপসার বিস্তর এবং নানা রকমের নানা ধরণের। মাল্টার মত অনেকগুলি রাস্তা ঢালু ও এই উপরে, এই নীচে গিয়াছে, কারণ পাহাড়ের উপর সহর প্রতিষ্ঠিত। ঘোড়ার গাড়ী ও মালের গাড়ীতে (গরুর গাড়ী বলিবার যো নাই কারণ তারা এ কাজ আদৌ করে না। মালটানা ঘোড়ারই একচেটিয়া।) সেইজন্য ব্রেক আছে, মালগাড়ীর ঘোড়ার ঘাড়ের উপর বড় বড় মহিষের সিং এর মত বাকান উচ্চ বিচিত্র সাজ। আবার কোন কোন গাড়ীতে ঘোড়া পাশাপাশি না জুতিয়া সামনাসামনি জুতিয়াছে। সিসিলি
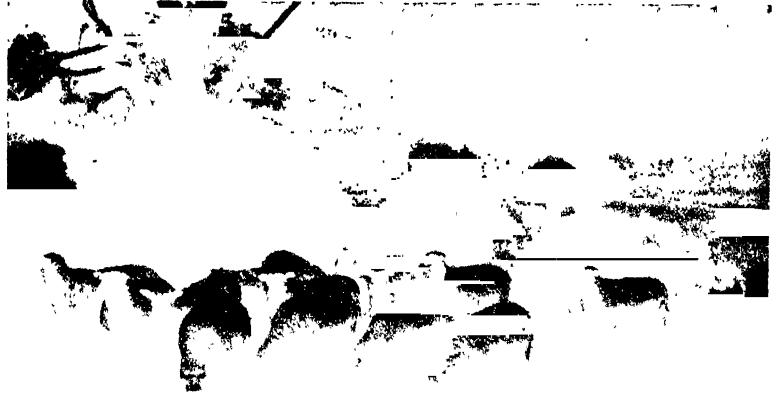
মার্সেলস্ হইতে প্যারিস্ পথে—মেষপাল

হইতে গন্ধকের রপ্তানি বিস্তর হয়, সমুদ্রের ধারে ও রাস্তার পাশে গুদামে পাহাড় সমান গন্ধক সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে পাথুরে কয়লা যেমন স্থানে স্থানে রাশি রাশি দেখা যায়, এখানে গন্ধকের গুদামও রাশি রাশি ও সেইরূপ। তাহার গুঁড়া উড়িয়া চোখে লাগিতেছিল। সেই জন্য মোটরসাহায্যে সহরের এ অংশটা দেখার বড় সুবিধা নয়।

হোটেলের Lift এ উঠিয়া ত্রিতলে বাসস্থান পাইলাম। বহুদিন পরে জাহাজের সংকীর্ণ শয্যার পরিবর্ত্তে সুপরিসর শয্যায় আশ্রয় পাইয়া কতকটা আরাম বোধ হইল।

মহাভ্রম

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু]

নীলিম গগন-কোণে কল্লোলিনী-ভালে
শোভিছে চন্দ্রমা ; মাগি' লইল বিদায়
সায়াহ্ন রক্তিম-রবি ; মন্দ মন্দ তালে
রূপসী ললনা এক তরী বেয়ে যায়।
ধরিয়াছে উচ্চকণ্ঠে সুমধুর গান ;
নীরবতা ঘেরা ব্যোম ভেদিয়া সে ধ্বনি,
ফুটায় তারকা-রাজি ; সে মোহন তান
মাখিয়া শেফালি অঙ্গে হাসিল আপনি ;
উঠিল চৌদিকে বিশ্ব-সুর-বাঁধা-গান।
হৃদয় পরশে আসি অতীত রাগিণী
বুকপোরা ব্যাকুলতা, শতেক বাঁধন,
ছিঁড়িয়া মিলিতে চায় কিছু নাহি মানি
হারায়েছি আপনারে আনন্দের পুরে ;
নিকট নিজের জনে রাখিয়াছি দূরে॥

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

পিতামহী গৃহে আসিলে, পিতা ও তাঁহাতে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, এখনকার বয়স ও এই কালোচিত মতি হইলে, আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া, সেই কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই। বালক 'আমির' বুদ্ধির দোষে বৃদ্ধ 'আমির' সে অমূল্য কথোপকথন শুনা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই সময় কতকগুলি খেলুড়ে সঙ্গী আমাকে আসিয়া ডাকিল। আমি অমনি সকল ভুলিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলাম। পিতামাতা অথবা পিতামহী কেহই আমাকে নিষেধ করিলেন না।

কবি বলেন, বালক 'আমি' বৃদ্ধ 'আমির' জনক। বৃদ্ধ 'আমি' বালক আমির বুদ্ধিমত্তা লইয়া যত কেন রহস্য করুন না, অনেক সময় তাহার শাসন-বাক্য দূর-অতীত সীমান্ত হইতে আসিয়া এমন কঠোরতার সহিত বৃদ্ধের কর্ণে ধ্বনিত হয় যে, তাহার জন্য বৃদ্ধ আমি'কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

মনে হয়, যে কোন উপায়ে হউক, একবার সেই বালকের কাছে ফিরিয়া যাই। এবং তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে এই বৃদ্ধের বিজ্ঞতা অঞ্জলি দিয়া আসি। বালক বৃদ্ধ হয়, কিন্তু হায়, এ সংসারে কয়জন বৃদ্ধ বালক হইতে পারিয়াছে। কবি কাতরকণ্ঠে জননীর কাছে ভিক্ষা করিয়াছেন—"হে জননী। কর পুনঃ বালক আমায়।" সংসারে মানযশ-প্রতিষ্ঠাজনিত অহঙ্কারের উচ্চ কোলাহলের মধ্য হইতে অসংখ্য বৃদ্ধের অন্তর একবার বলিয়া উঠিতেছে —"হে শিশুমূর্ত্তি গুরু, আমাকে যে কোন উপায়ে তোমার চরণসমীপে উপস্থিত কর।"

কিন্তু ফিরিবার উপায় নাই।—অন্ততঃ আমার নাই। এই সুদীর্ঘ জীবন পথে চলিতে চলিতে অন্যের শাসনে অথবা নিজের ইচ্ছায় এত কণ্টক-লতার কুঞ্জরচনা করিয়াছি। কেমন করিয়া ফিরিব? অনুকূল ঋতুবশে সেগুলা এত বড় ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে যে, ফিরিব কথা মনে উঠিতেই বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। বাঘ-আঁচড়ার কাঁটা— উলঙ্গ হইয়া সে দূরদেশে ফিরিতে গেলে, শুধু হাড় কয়খানি ফিরিবে। এতদিনের সযত্নরক্ষিত দেহাবশেষ শুধু ক্ষুধার্ত্ত চিতাভূমির ব্যাদিতমুখে বিশ্রাম লাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছে। ফিরিবার কথা মনে আনিতেই সে মজ্জার ভিতর হইতে স্পন্দন তুলিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ফেলে।

কাপড় পরিয়া ফিরিতে গেলে, একাংশের কণ্টক মুক্ত করিতে সহস্রাংশ কণ্টকযুক্ত হইবে। এক জননী—একমাত্র শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা জননী—মা! তুমি ভিন্ন সে মন্দাকিনীর তরঙ্গাকুলিতদেশে আর কেহ যে ফিরাইতে পারিবে না! তোমার কোল হইতে উঠিয়া তোমারই কোলে শুইতে চলিয়াছি। স্থিতিকে গতি-কল্পনা করিয়াছি। মা! এ মোহ ঘুচাইয়া দাও—আমাকে বালক কর।

পিতামহীর কথা অমূল্য—শুনি নাই, কিন্তু বুঝিয়াছি। তখন নয়—তখন বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না—বুঝিবার প্রয়োজনও ছিল না। যখন প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, তখন অনুমান করিয়াছি। অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। চিন্তার বিভিন্নমুখ স্রোতের মধ্যেও এক একটা মাথাভাঙা ঢেউ সময়ে সময়ে এই হৃদয় তটভূমিতে আঘাত করিয়া অনুমান নিশ্চয়াত্মক করিয়াছে। কথা অমূল্য—শুনিতে পাই নাই—শুনিতে পাইব না—তবু বুঝিয়াছি—কথা অমূল্য।

খেলার শেষে যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আমি বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতামহী তাঁহার ঘরের দাওয়ায় আহ্নিক

করিতে বসিয়াছেন। সে সময় তাঁহার কাছে যাইবার আমার অধিকার ছিল না। আমি পিতার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম মা চোখে আঁচল দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিতা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা মায়ের অঞ্চল মৃদু আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছেন—"কেঁদো না। আমি দেখিতেছি, আমার পিতার মৃত্যুতে মায়ের মাথা খারাপ হইয়াছে।"

মায়ের চক্ষু অঞ্চলেই চাপা রহিল, পিতা কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি আবার বলিলেন,—"মাথা খারাপ না হইলে আমি পাঁচটা পাস করিয়াছি,—মূর্খ স্ত্রীলোক আমাকে উপদেশ দেয়!"

এই সময় পিতা আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিলেন—"নাও, চোখ খোল। হরিহর আসিয়াছে। তাহার আহারের ব্যবস্থা কর।"

তথাপি মা উত্তর করিলেন না। চক্ষু অঞ্চলাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মায়ের এই ভাব দেখিয়া আমি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পিতা আমাকে বলিলেন—"যা' হরিহর, তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে যা; বল্, আমাকে খেতে দাও।" আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে বাবা?"

"কিছু হয় নাই। তোর ঠাকুর-মা কি বলিয়াছে। সেই জন্য ওঁর দুঃখ হইয়াছে।"

"আমি ঠাকুর মাকে বকিব?"

"না না তোকে কিছু বলিতে হইবে না। তুই ওঁর সঙ্গে যা।"

আমি পিতার আদেশমত মাতার অনুসরণে যাইতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ্ হরিহর! তোর ঠাকুরমা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, —আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা—তুই বলবি আমি জানি না। যদি কোন উপদেশ দেয়, ত সে কথা কাণেও তুলিস্ নি। ওরা সেই পূর্ব্বকালের অসভ্য, লেখাপড়া কিছু জানে না। তুই কালে লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইবি, আমার মত হাকিম হইবি। ও বুড়ীর কথা শুনিলে কিছুই হইতে পারিবি না। কেবল তোর গর্ভধারিণী তোকে যা উপদেশ দিবে, সেই মত কার্য্য করিবি। তোর ঠাকুরমার অমূল্য উপদেশ শুনিলে তোর দুঃখে শিয়াল কুকু[র] কাঁদিবে। যা—শিগ্‌গির যা। উনি কোথায় গেলে[ন] দেখিয়া আয়। তাঁহাকে ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া যা।"

আমি ঘরের বাহির হইয়া দেখিলাম, মা আগে হইতেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি, মায়ের পরিবর্ত্তে ঠানদিদি রাঁধিতেছেন। আর মা রন্ধনের পরিবর্ত্তে অঞ্চলে নাসিকা-ঝঙ্কার পরিত্যাগ করিতেছেন।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মার ঠানদিদি চুল্লী পশ্চাতে রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি হ'[ল] বৌমা?"

এমন সময়ে আমি উপস্থিত। মা চক্ষু অঞ্চলমুক্ত করিয়া বলিলেন—"পরে বলিব।" মায়ের মুখে না জানি কত ঝুড়ি দুঃখের চিহ্নই চাপানো রহিয়াছে! কিন্তু ও মা! তা নয়! মায়ের অন্তরের আনন্দউৎস অধর প্রান্ত দিয়া বাহির হইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। ঠানদিদিও তাহা দেখিলেন। দুইজনের চোখে চোখে কি ইঙ্গিত হইল। তিনি আবার রাঁধিতে লাগিলেন। আমি তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আহারে বসিলাম।

বালকের চক্ষু পাখীর চক্ষুর সঙ্গে তুলনীয়। আহারান্তে দেখি, পিতামহী তখনও আহ্নিকে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি তাঁহার উঠিবার অপেক্ষা না করিয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভিভূত হইলাম।

আমি পিতামহীর ঘরেই শুইতাম। শুধু শুইতাম কেন, আহারাদি যাবতীয় ব্যাপার আমার পিতামহীর নিকটেই নিষ্পন্ন হইত। মা শুধু গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আমার লালন-পালনের ভার পিতামহীর উপরেই পড়িয়াছিল। শিশুর উৎপাত-অত্যাচার যা কিছু একমাত্র পিতামহীই সহ্য করিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু'চারিটা কথাবার্ত্তা ছাড়া আমার অন্য কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

সে পিতামহীর সম্বন্ধে পিতার মত-প্রকাশে বালকের মন যতটা ব্যাকুল হইবার হইয়াছিল। পিতার কথায় ও মাতার পূর্ব্বোক্তভাবে অবস্থিতিতে কি বুঝিয়াছিলাম জানি না। কিন্তু মনের অন্তরালে চিরাবস্থিত রহিয়া যিনি বালকবৃদ্ধকে এক করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বোধ হয়, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মন সমস্ত ঠিক বুঝিতে

না পারিলেও তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে যেন মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইতেছিল।

আমি পিতামহীর আহ্নিকাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, রাত্রিও কত হইয়াছে বলিতে পারি না। সহসা কি জানি কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখি, পিতামহী একটী দীপ আমার মুখের কাছে ধরিয়া আমার মাথার শিয়রে তক্তপোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

শয্যায় মূত্রত্যাগ আমার রোগ ছিল বলিয়া পিতামহী প্রতিদিন মধ্যরাত্রে আমাকে ঘুম হইতে উঠাইতেন। কিন্তু উঠাইতে তাঁহাকে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা আর আপনাদের কি বলিব? প্রথম প্রথম তিনি আমার নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা রাখিতেন না। ঘুমন্ত আমাকে কাঁধে তুলিয়াই বাহিরে লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইদানীং আমিও কিছু ডাগর হইয়াছি, তিনিও অধিকতর বৃদ্ধ হইতেছেন। বিশেষতঃ পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এতই কৃশ হইয়াছে যে, একবৎসর যে তাঁহাকে দেখে নাই, সে এখন আমার ঠাকুরমাকে চিনিতে পারিবে না।

সুতরাং ইদানীং আমার ঘুম ভাঙ্গাইতে তাঁহাকে অনেক পদাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিতে হইত। তথাপি তিনি আমাকে না উঠাইয়া ছাড়িতেন না। আজিও তিনি সেইরূপ করিতে আমার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু আজ আর ঠাকুরমাকে উঠাইতে হইল না। আমার মুখের কাছে আলো ধরিতে না ধরিতে আমি জাগিয়াছি। জাগিয়াই বুঝিলাম, আমাকে কি করিতে হইবে। বুঝিবামাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিলাম।

শয্যা পুনর্গ্রহণের সময় ঠাকুরমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে ভাই, তোর বাপ মা কি তোকে কোনও তিরস্কার করিয়াছে?"

পিতামাতার কথা দূরে থাক্, তাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত আমার ঘুমচাপা পড়িয়াছিল। পিতামহী জিজ্ঞাসা করিতে মনে পড়িল। আমি উত্তর করিলাম—"না ঠাকুরমা, আমাকে বাবা মা কিছু বলে নাই।"

"আমাকে বলিয়াছে? তা'বলুক। তাহাতে আমার কোনও দুঃখ নাই। তবে তোমাকে কিছু বলিলে আমার কষ্ট হইবে। কেন না আমার কাছেই তোমার ভালমন্দ যা কিছু শিক্ষা। তোমার বাপ মা তোমাকে বড় একটা দেখে নাই।"

এই বলিয়াই পিতামহী চুপ করিলেন। এবং আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল, ঠাকুরমার মনে যেন বড়ই একটা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মনে হইল যেন একটা নিশ্বাস তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া আমার কপোল স্পর্শ করিতেছে।

আমি বলিলাম—"কই মা, বাবা তোকে বকিয়াছে, একথাত আমি তোকে বলি নাই!"

"তুমি বলিবে কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া জানিয়াছি। তুমি আপনা আপনি জাগিতে তাহা বুঝিয়াছি। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তোমার বাপ তোমাকে তিরস্কার করিয়াছে। যাহোক ভাই, তোমার দাদার স্বর্গে যাওয়ার পর আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, এমন লোক এ সংসারে আর কেহ রহিল না। এখন দেখিলাম আছে। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার দুঃখে দুঃখী হইতে আমার অঞ্চলের নিধি তুমি রহিয়াছ।"

"দেখ্ মা, তোকে কেউ কিছু বলিলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"তবে আর আমার কিসের দুঃখ! কিন্তু ভাই, দেখো, যেন কখনও কোনও কারণে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দেখাইয়োনা। তা করিলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইবে। কখন দুঃখ পাইতে হইবে না। পিতা-মাতার মত গুরু আর নাই।'

আমি শৈশবে ঠাকুরমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতাম। বাবা যা বলিতেন, মা যা বলিতেন, আমি তাই শুনিয়াই ওই কথা বলিতে শিখিয়াছিলাম। আর পিতামহীর সম্বোধনের অনুকরণে মাকে 'বৌমা' বলিতাম। বৎসর খানেক হইতে মা ও বাবা উভয়েই আমার এই সম্বোধনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে অনুনয়, তাহার পর আদেশ, শেষে এই কদভ্যাস দূর করিতে তাঁহারা আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

পিতামহীও আমাকে নিষেধ করিতেন। সকলের

পীড়াপীড়িতে অভ্যাসটা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে পিতামহীর অগাধ স্নেহে আত্মহারা হইয়া, তাঁহাকে ঠাকুরমা বলিতে ভুলিয়া যাই। আজ ভুলিয়াছি। অন্য সময়ে ভুলিলে পিতামহী তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু আজ কি জানি কেন, তিনি তাহা করিলেন না। সুতরাং মনের আবেগে আমি তাঁহাকে বারংবার মাতৃ সম্বোধন করিলাম। এবং তাঁহার মমতার্দ্র কোমল স্নিগ্ধ করকমল-স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৭)

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই শুনিলাম আমার পিতা হাকিম হইয়াছেন। পিতামাতার মুখে শুনিনাই—তাঁহারা তখনও পর্য্যন্ত ঘুম হইতে উঠেন নাই। পিতামহীও আমাকে বলেন নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ঠানদিদির মুখে।

আমি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চোখ দু'টা হস্তদ্বারা মার্জ্জিত করিতেছিলাম। চোখে তখনও পর্য্যন্ত ঘুমের ঘোর ছিল। সহসা ঠানদিদির কথার মত কথায় চমকিয়া উঠিলাম। চোখ মেলিয়া দেখি, সত্য সত্যই ঠানদিদি! অত প্রত্যূষে তাঁহাকে কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখি নাই। আজ প্রথম দেখিলাম।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন—"কিরে ভাই, সকালে এক চোখ দেখাইতেছিস কেন? আমার সঙ্গে কি ঝগড়া করিবি? তা ভাই, তোর সঙ্গে ঝগড়া হইলে বুড়ো ঠান-দিদিরই বিপদ। তোর বাপ্ হাকিম। সেত আর তোর ঠানদিদি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে না। একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া জিঞ্জিরে পাঠাইয়া দিবে। দে ভাই দু'-চোখে হাত দে।"

আমি চক্ষু হইতে হাত অপসারিত করিয়া ঠানদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাকিম কি ঠানদিদি?"

"সে কিরে শালা, শুনিস্নি?"

"কই না!"

"তোর বাপ্‌মা, কিংবা ঠাকুরমা, কেউ তোকে কিছু বলে নি?"

"কই, নাত ঠান্‌দি!"

"তা হ'লে দে ভাই, আমাকে কি বক্‌সিস্ দিবি দে আমিই সকলের আগে তোকে এ সুখের সমাচার শুনাইলাম।"

"হাকিম কি ঠান্‌দি?"

"তা ভাই আমি জানি না। সে তোর বাপ্ কিংবা মাকে জিজ্ঞাসা করিস্। আমি ভাই তোমার গরীব ঠান্‌দিদি। চরকায় পৈতার সুতো ভেঙে খাই। হাকিম যে কি, তা আমি কেমন করিয়া বলিব!"

এই সময় মা দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠানদিদি বলিলেন—"বৌমা! তোমার ছেলেকে হাকিম কি বুঝাইয়া দাও। সে বেছে বেছে তোমার চরকা-ভাঙ্গা খুড়শ্বাশুড়ীকে হাকিম বোঝাবার লোক ধরিয়াছে। দারগা হইলেও না হয় কতক মতক বুঝাইতে পারিতাম।"

"মাতা ঠানদিদির এ কথাতে কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপোকে বলিয়াছ?"

"আর বলাবলি কি! সে ত তোমাদেরই। তাহাকে যখন যা'হুকুম করিবে, সে তাই করিবে? সে কি না বলিতে পারে! তোমার হরিহরও যেমন, সেও তেমন। খাইতে না পাইলে, তার খাওয়া-পরার ভার তোমাদেরই লইতে হইবে।"

"বেশ, তা'হলে এখানে যদি তার কোন কাজকর্ম্ম সারিবার থাকে, সারিয়া লইতে বল। বাবু বোধ হয় কালই এখান হইতে রওনা হইবেন।"

"কাজকর্ম্ম সারিবার তার আর কি আছে। খায়, ঘুমোয়—আর তাসপাশা খেলিয়া দিন কাটায়। এইবারে তোমাদের কৃপা পাইয়া যদি সে মানুষ হয়।"

"বাবুর মন জোগাইয়া চলিতে পারিলে হইবে বই কি। বাবুত এখন যে সে লোক ন'ন। ইচ্ছা কর্‌লে রাজাকে ধরে জেলে দিতে পারেন।"

"বল কি বৌমা, অঘোরনাথ আমাদের এমন লোক হয়েছে?"

"এখন ওঁর কাছে যে সে লোক যখন তখন আর আসিতে পারিবে না। কোম্পানীতে বাবুকে অট্টালিকার মত বাড়ী দিবে। বাড়ী-ঘেরা বাগান, বাগান-ঘেরা ঝিল, আর ঝিল-ঘেরা আকাশের চেয়েও উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের উপরে উপরে শান্ত্রী পাহারা। তাহারা চব্বিশ

ঘণ্টাই কেবল তরোয়াল খুলে পাহারা দিতেছে। যে সে লোকের কি আর বাবুর কাছে পৌঁছিবার যো থাকিবে!"

"সে কি বৌমা, তা'হলে কি অঘোরনাথকে কোম্পানী কয়েদ করিয়া রাখিবে?"

এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। ঠানদিদি তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাসিয়োনা বৌমা, আমি মূর্খ স্ত্রীলোক। তুমি কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মূর্খ ছেলেটাকে অঘোরনাথ সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছে বলিয়াই বলিতেছি। তোমার বাবুই যদি কয়েদ হয়, তাহ'লে সে মূর্খটাকে কি কোম্পানী অমনি ছেড়ে দিবে?"

এই কথা শুনিবামাত্র মায়ের হাসি দ্বিগুণ সুরে চড়িয়া উঠিল। মা বলিলেন—"কয়েদ! আমার সোয়ামীকে কয়েদ দিতে পারে, এমন লোক কি আর ভারতে আছে! তিনিই কত লোককে যে কয়েদ দিবেন, তার ঠিক কি!"

"কেন মা, অঘোরনাথ তাদের কয়েদ দিবে কেন?"

"কেন একথা বলা বড় শক্ত। আর বলিলেও তুমি বড় বুঝিবে না। উঁর চাকরীই হচ্ছে কেবল কয়েদ দিবার জন্য।"

"তাই বটে! অঘোরনাথ তা'হলে দারগা হইয়াছে!"

"যাও যাও—তুমি বুঝিবে না, খুড়ীমা! দারগা বাবুকে দেখিলে ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিবে। দূর হইতে তাঁহাকে সেলাম করিবে। বাবুর কি চাকরী, তা তুমি কেন, এ গ্রামে এমন কেউ নেই যে, বুঝিতে পারে। আমার বাবা হাকিমের পেস্‌কারী করে। তাঁরই ভয়ে বাঘে গরুতে জল খায়। লাট সাহেব কাকে বলে, শুনেছ কি খুড়ীমা?"

ঠানদিদি মাথাটা একেবারে কটিদেশের নিকট পর্য্যন্ত হেলাইয়া, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন—"ও! তাই বল্ না বউমা! অঘোর আমার লাট হইয়াছে।"

মাতা ঈষৎ স্মিতমুখে বলিলেন—"একেবারে ততটা নয়। লাটত আর বাঙ্গালীর হইবার যো নাই। তবে অনেকটা সেই রকম। লাটসাহেব হচ্ছে মুলুকের লাট। আমাদের বাবু হবেন, জেলার লাট।"

এই কথা শুনিবামাত্র ঠানদিদির চক্ষু একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। মুখ ব্যাদিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মা বলিলেন—"আমাকে কি বাবা এই অসভ্য জঙ্গলীদের দেশে বিবাহ দিলেন! বাবুর ঠিকুজী দেখিয়া তিনি জানিয়াছিলেন, তিনি কালে হাকিম হইবেন! তাই তিনি ইঁহাদের বাড়ীতে আমার বিবাহ দিয়াছেন।"

ঠানদিদি এতক্ষণে যেন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাকে, বাবাকে ও আমাকে যত পারিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাবা ও আমি তাঁহার মাথার কেশ-প্রমাণ পরমায়ু লাভ করিলাম। মা তাঁহার ভবিষ্যতের শুভ্রমস্তকে সিন্দূর ধারণের অধিকার পাইলেন। আশীর্ব্বাদান্তে তিনি বলিলেন—"তা এ চাকরী আমাদের এ জঙ্গলা দেশের লোক কেমন করিয়া বুঝিবে! বাঙ্গালী এদেশে সর্ব্বপ্রথম এই চাকরী পাইয়াছে। ভোগ কর মা ভোগ কর। স্বামী পুত্র লইয়া, নাতীপুতি লইয়া, তুমি মনের মতন সুখভোগ কর। তবে মা তোমার গরীব দেওরটিকে কৃপানয়নে দেখিয়ো। তা হ'লেই আমি ধন্য হইব।"

মা ঠানদিদিকে ধন্য করিবার আশ্বাসটা না দিয়া বলিলেন—"অসভ্য জঙ্গলার দেশ না হইলে মা কখন সন্তানের সুখে ঈর্ষা করে?"

ঠানদিদি এ কথার উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পিতামহী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মা ও ঠানদিদি তাঁহার আগমন আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। বাটীর অঙ্গনে প্রবেশ মাত্র তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথোপকথন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঠাকুরমা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মাকে বলিলেন—"অঘোর নাথকে ঘুম হইতে তুলিয়া দাও, তাহাকে বল, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করিতেছে।" এই বলিয়া পিতামহী তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই ঘরের দাওয়াতেই বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিলেন না, কি দেখিতে পাইলেন না, সেটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা তিনি আমার সঙ্গে কোনও কথা কহিলেন না।

ঠাকুরমার সঙ্গে আমার কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল। মা ও ঠানদিদির কথোপকথন শুনিয়া আমি কতকটা হতভম্বের মত হইয়াছিলাম। তাহাদের অনেক কথা জানিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত কথা ভাল-

রূপ বুঝি নাই। মায়ের কাছে বুঝিতে চাহিলে তিরস্কার মাত্র লাভ হইবে। তিনি যে আমাকে কিছু বুঝাইয়া বলিবেন, এটা আমার বিশ্বাস ছিল না। বাবাকে ভয় করিতাম। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এসব কথা কহিতে আমার সাহস নাই। ঠানদিদি নিজেই বুঝিতে অপারগ। তখন সে আমাকে কি বুঝাইবে! তা' হইলে একমাত্র ঠাকুরমা ভিন্ন আর কাকে সুধাইব?

কিন্তু ঠাকুরমা আমার সঙ্গে কথা কহিল না! হঠাৎ কি জানি কেন মনে একটা দুঃখ উপস্থিত হইল। ঠাকুরমা দোষী কিনা বিচার করিবার আমার অবকাশ হইল না। আপনা আপনি তাঁহার উপরে আমার অভিমান জাগিল। আমি আর ঠাকুরমাকে না ডাকিয়া উঠিলাম। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে কাহারা আসিয়াছে, মনে করিলাম, তাহাদের একবার দেখিয়া আসি। ইহার পূর্ব্বে পিতার আগমনে তাহারাত কই আসিত না। কিন্তু আজ আসিয়াছে। এক আধজন নয়। পিতামহী বলিলেন, অনেক। বাবা হাকিম হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা বাবাকে দেখিতে আসিয়াছে। আমি চণ্ডীমণ্ডপে যাইবার জন্য দাঁড়াইলাম।

পিতামহী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—"দেখিলে খুড়ীমা ব্যাপারটা!"

ঠানদিদি উত্তর করিলেন—"দেখিতে ত পাচ্ছি মা। কার মন কি কেমন করিয়া বুঝিব! ছেলের সুখে মা ঈর্ষা করে, এত কোনও কালে শুনি নাই। সত্য কথা বলিতে কি মা, আমার ছেলের যদি আজ এ অবস্থা হইত আমি দু বাহু তুলে নাচিতাম। আর শত দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া কপাল ঢিপি করিয়া ফেলিতাম। ছেলেটাকে একটু বেশি রকমের ভালবাসি বলিয়া অমনি অমনি ত পাড়ার পোড়া লোক কত কথা বলে। দশ মাস দশদিন গর্ভেধরা কত কষ্টে মানুষ-করা ছেলে—সে সুখী হবে, এর চেয়ে মায়ের সুখ আর কি আছে! না মা—আমরা গরীব—আমরা বড় মেজাজের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

এই সময় পিতা গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। মা ও ঠানদিদির কথোপকথন বন্ধ হইল। ঠানদিদির পুত্রকে প্রস্তুত থাকিবার উপদেশ দিয়া মা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, মা পিতাকে বাহিরে জনাগমের সংবাদ দিলেন। পিতা তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া বাহিরে চলিলেন। মাতা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমিও পিতার অনুসরণে বাহিরে যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"কই হরিহর, এখনও বই লইয়া পড়িতে ব'স নাই।

আমার অবস্থাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তবু আমি তাহাকে বলিলাম—"পণ্ডিত ম'শাই এখনও আসেন নাই।"

"এখনও বৈকুণ্ঠ আসে নাই? মাসে মাসে মাহিনা লইবার ত খুব তাড়া আছে। কিন্তু পড়ায় সে কতক্ষণ? কাজে ফাঁকি দেয়, সেই জন্যই হতভাগ্যের উন্নতি হয় না।"

পিতা বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া আরও দুই চারিটা উপদেশ দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি বলিতেছ?"

"বৈকুণ্ঠ কতবেলায় পড়াতে আসে? তুমি কি তাহাকে কিছু বলনা না?"

"কি বলিব? সে যেমন সময় আসিবার প্রতিদিনই তেমনি সময়ে আসে। আজই কেবল আসে নাই। বোধ হয়, সে আর আসিবে না।"

"কেন?"

"কেন আমি জানিনা।"

"আমি জানিনা" এই উষ্মযুক্ত ঈষৎউচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃবাক্য শুনিবামাত্র পিতা চুপ করিলেন। এই সময়ে পিতামহী গৃহ হইতে বাহির হইয়াই বলিলেন—"কখন আসেনি মা, এরূপ সময়ে বৈকুণ্ঠ কখন আসেনি! আজ তুমি ভুলে একটু সকালে উঠে পড়েছ, তাই তাকে দেখিতে পাও নাই।"

মাতা ভুলে উঠিয়াছি কি রকম? ঠেস না দিয়া কি কথা কহিতে জাননা?

পিতামহী। ঠেস কাকে দিব। আর দিবার প্রয়োজন কি? সত্য কথা বলিব। তাতে কাকে ভয় করিয়া বলিব? নিত্য যে সময়ে উঠ, সেই সময়ে উঠিলেই বৈকুণ্ঠকে দেখিতে পাইতে। সে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবার সময় জানে।

পিতা তখন অনুচ্চকণ্ঠে উভয়কে উদ্দেশ করিয়া 'বলি-

লেন—"কিকর—কিকর! বাহিরে ভদ্রলোক সকল আসিয়াছে। এখনি আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হইবে।"

মাতা একটু বিশেষ রকমের রুক্ষস্বরে পিতাকে বলিয়া উঠিলেন—"আজই তুমি আমাকে কলিকাতা লইয়া না যাও, তাহলে তোমার অতি বড় দিব্য রহিল।"

পিতা কেবল হস্ত-সঞ্চালনে ও ইঙ্গিতে মাতাকে চুপ করিতে অনুরোধ করিলেন। কে সে অনুরোধ শুনে! মা ইঙ্গিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"যদি না নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি এ বাটীতে জলগ্রহণ করিব না।"

পিতার ইঙ্গিতমাত্র অবলম্বন। তিনি তারই সাহায্যে মাকে যথাসাধ্য নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া এবং আমাকে বৈকুণ্ঠ-পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ দিয়া, বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বাহির হইলাম। ভিতরে মা ও পিতামহীতে আর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা হইল কি না, জানিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ—

নিবেদন

[শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়]

আমূল বিঁধিয়া রেখেছ এ হৃদি
দুঃখের শরাঘাতে,—
ক্ষোভ নাই ; তবে, দেখো যেন নাথ!
নাহি লাগে সেই হাতে—
যেই হাতগুলি আসিবে ছুটিয়া—
মুছা'তে রুধির-ধার,
মূক আঁখি যেন চেয়ে চেয়ে, দেয়—
দুটি ফোঁটা উপহার।
ঠাঁই থাকে যেন ক্ষত বিক্ষত
বক্ষের এক পাশে,
কোলে তুলে নিতে সেই অবুঝেরে
মোরে দেখে যেবা হাসে।

আর,———

ভালবাসে যা'রা সুখে দুঃখে বিভো!
দীন দুঃখী অভাগারে
রাখিও চিত্তে শক্তি,—তাদেরি—
স্মৃতিটুকু বহিবারে।

সতীন ও সৎমা

তৃতীয় প্রবন্ধ

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় M. A.]

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। সমসাময়িক লেখকদিগের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভেদ

দ্বিতীয় প্রবন্ধে যে আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় সেই আমলেই হইয়াছিল। তাঁহার আখ্যায়িকাবলির প্রকাশ-কাল, 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক বা 'বিজয়বসন্ত' আখ্যায়িকার পরবর্ত্তী হইলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক পুস্তকদ্বয় বা ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলির সমকালবর্ত্তী। যথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকদ্বয় ১৮৭১-৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত, ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটক প্রভৃতি ১৮৬০-৭৩ খ্রীঃ প্রকাশিত; বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীঃ, 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৭ খ্রীঃ 'বিষবৃক্ষ' ১৮৭৩ খ্রীঃ, 'রজনী' ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত। 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' (নূতন সংস্করণ) উল্লিখিত পুস্তকগুলির অনেক পরে প্রকাশিত।* বঙ্কিমচন্দ্র ৺দীনবন্ধু মিত্রের বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, উভয়েই সাহিত্য-সাধনায় গুপ্তকবির শিষ্য ছিলেন, অথচ ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', 'জামাইবারিক' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো'য় কৌলীন্য ও একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে এবং 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলে কামিনী' ও 'জামাই বারিকে' সপত্নী ও বিমাতা সম্বন্ধে যে সুর বাজিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'রজনী' প্রভৃতিতে ঠিক সে সুর বাজে নাই। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুরের সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের সুরের সম্পূর্ণ প্রভেদ। ইহার কারণ কি ?

২। প্রভেদের কারণনির্ণয়

রুচি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের প্রভেদ উক্ত প্রভেদের মূলীভূত কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বা ৺দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃতি যে যে উপাদানে গঠিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি ঠিক সেই সেই উপাদানে গঠিত ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় নিরতিশয় করুণাপ্রবণ ছিল, তিনি বালবিধবাদিগের এবং কুলীনকন্যা ও কুলীনপত্নীগণের দুঃখদুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং উহার মূলোচ্ছেদের জন্য প্রবল আবেগ, গভীর সমবেদনা, অদম্য উৎসাহ ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এতদুভয় ব্যাপারে তিনি কেবল সাহিত্য-প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় সমাজসংস্কারের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সমাজসংস্কারের অনুষ্ঠানে তিনি কখন যোগদান করেন নাই।

প্রকৃতিগত ও উদ্দেশ্যগত এই প্রভেদের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহ-নিবারণ-চেষ্টার প্রণালী বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, পরন্তু বঙ্গদর্শনে তাঁহার এতদ্বিষয়ক পুস্তকের প্রতিকূল সমা-

* এই সাতখানি গ্রন্থে সপত্নী ও বিমাতার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই কয়খানিরই উল্লেখ করিলাম।

লোচনা করিয়াছিলেন। (এই প্রবন্ধের 'তীব্রাংশ' পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উহা 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।) উক্ত প্রবন্ধ, বহুবিবাহ যে বহুদোষাকর প্রথা তাহা বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তিনি বুঝাইয়াছেন যে, শাস্ত্রীয় বিচার নিষ্ফল, কেননা 'সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না।' তিনি আরও বুঝাইয়াছেন যে, শাস্ত্রীয় বিধান সকল ক্ষেত্রে মানিতে হইলে যেমন এক দিকে কুলীনের বহুবিবাহ কমিতে পারে, তেমনই আবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৈধ কারণে অধিবেদনের সংখ্যা বাড়িয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা ছাড়া, তিনি রাজব্যবস্থা দ্বারা সমাজসংস্কারের চেষ্টার ততটা পক্ষপাতী ছিলেন না। ফল কথা, দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় নীতির অমোঘ প্রভাবে এই কুপ্রথা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে, ইহার জন্য আবেদন ও নিবেদনের থালা সাজাইবার, আন্দোলন ও আস্ফালনের কাঁসরঘণ্টা বাজাইবার, প্রয়োজন নাই। প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, এই কুপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হইলেও বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার প্রকোপ যথেষ্ট কমিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই জন মনস্বীর সমাজসংস্কার-প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি বেশী সমীচীন, কোন্‌টি অধিক ফলপ্রসূ, তাহার বিচার করিতে বসি নাই। এ বিষয়ে চিরদিনই মতভেদ থাকিবে। উভয়ের প্রকৃতি ও প্রণালীর প্রভেদ-প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ৺দীনবন্ধু মিত্রের হৃদয়ও সাতিশয় পরদুঃখকাতর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন:— 'যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হয়, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ সে যেমন কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন।'.........সেই গুণের ফল নীলদর্পণ।' বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 'সধবার একাদশী' 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' এই তিনখানি প্রহসন ও 'লীলাবতী', 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে কামিনী' এই তিনখানি নাটক সম্বন্ধেও অনেকটা তাহাই বলা যায়। প্রহসন তিনখানিতে ও 'লীলাবতী' নাটকে সম্পূর্ণভাবে এবং অপর দুইখানি নাটকে আংশিক ভাবে, সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদের, সামাজিক অনিষ্ট-সংশোধনের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। ফলতঃ দীনবন্ধু তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা, কবিকল্পনা, বিদ্রূপ-ক্ষমতা (satiric power) এবং হাস্যরস ও করুণরস-সঞ্চারের অসাধারণ শক্তি এই মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি ঠিক এই ধাতুতে গঠিত ছিল না। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র ছিল। অল্প কথায় বলিতে গেলে, দীনবন্ধুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল,—'সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন', 'সমাজ-সংস্করণ'; আর বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—'সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।' ইহা হইতে কেহ বুঝিয়া না বসেন যে, দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতিতে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নাই অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে সন্নীতিমূলক আদর্শ-স্থাপনা নাই, বা সামাজিক কুপ্রথার উপর কষাঘাতের ব্যবস্থা নাই। কেবল উভয় লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্যের কথাই বলিতেছি। এই প্রভেদের জন্যই তাঁহাদিগের প্রণীত কাব্যের প্রকৃতির প্রভেদ। দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতির ন্যায় 'প্রণয়পরীক্ষা', 'নবনাটক' ও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকেও 'সমাজ-সংস্করণ' 'সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন' করিবার উদ্দেশ্য প্রকট। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ' সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। জীবিত লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (টি, এন, মুখার্জ্জি) কোন কোন আখ্যায়িকায় এই উদ্দেশ্য প্রকট।

যাহা হউক, সমাজসংস্কারের আন্দোলন যখন সমাজ ও সাহিত্যে পূর্ণবেগে চলিতেছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ও সাহিত্যের নূতন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নবপ্রণালীর সাহিত্য 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তথাপি কালের ধর্ম্মে তাঁহার রচনায় যে তখনকার সাহিত্যের প্রকৃতির ছায়া পড়িবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? তখনও আগুন নিবে নাই (The embers were not yet dead), সুতরাং সে আগুন তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, সহমরণ,

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ, † কৌলীন্য, বহুবিবাহ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার, লোকাচার, সমাজতত্ত্বঘটিত বহু প্রশ্নের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আলোচনা আছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে বিরত হন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি কুৎসিত প্রথা সম্বন্ধে ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। তবে তাঁহার বর্ণনায় ততদূর তীব্রতা নাই, তাঁহার বিদ্রূপে ততদূর গা-জ্বালানে ঝাঁঝ নাই, তিনি একটু রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বত্র সুসংস্কৃত সুসংযত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অপ্রধান পাত্রপাত্রীদিগের বেলায় ভিন্ন অন্য কোথাও বাস্তববর্ণনায় (realistic) গ্রাম্যতাদোষের (vulgarity) পরিচয় দেন নাই। দু'-চারিটি উদাহরণদ্বারা কথাটা পরিষ্কার করিতেছি।

৩। প্রভেদের দৃষ্টান্ত।

(৵০) কুৎসিত সপত্নীচিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি স্থলে উগ্রচণ্ডা সপত্নীর (realistic) বাস্তব কর্কশ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অপ্রধানা পাত্রী, যথা 'রজনী'তে চাপা ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে নয়ান-বৌ। চাপা সপত্নীবতী নহেন, সপত্নীসম্ভাবিতা। এ দুই জন ৺দীনবন্ধুমিত্রের বগী বিন্দীর সহিত উপমেয়। কিন্তু বোধ হয়, তুলনায় তাঁহাদিগের মত ততদূর ইতরপ্রকৃতি নহে। বর্ণনায় গ্রাম্যতাদোষও বগী বিন্দীর তুলনায় অনেক কম। তবে চিত্র দুইটি দীনবন্ধুর চিত্রসকলের ন্যায় পূর্ণায়ত নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উভয় গ্রন্থেই সুন্দর আদর্শের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার উদ্দেশ্যে, Contrast হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে উগ্রপ্রকৃতি চাঁপার (যদিও তাঁহারা পরস্পরের সপত্নী নহেন) এবং সাগর ও প্রফুল্লর পার্শ্বে কটুস্বভাবা নয়ানবৌএর চিত্র আঁকিয়াছেন। সুন্দর মধুর আদর্শের পার্শ্বে এই অশোভন কর্কশ বাস্তব চিত্র, masque এর anti-masque হিসাবে উপভোগ্য। এই masque-antimasque-তত্ত্ব, কাব্য-কলার, আর্টের, একটা বড় কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংযত রুচির আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। পাচিকাবৃত্তিধারিণী ইন্দিরা যখন স্বামীর মুখে শুনিল, তিনি আর বিবাহ করেন নাই, তখন সে বলিল :— .. ..

'নহিলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হইবে।' [১৪শ পরিচ্ছেদ।] এখানে গ্রন্থকার বগী-বিন্দীর আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কোন গ্রন্থে তাঁহার এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই।

(৵০) স্বামিবশীকরণের ঔষধ।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, স্বামি-বশীকরণের ঔষধের কথা সংস্কৃতসাহিত্যে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বহুস্থলে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও নিজ কাব্যে এই চিরাগত প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বগামীদিগের বা সমসাময়িকদিগের বর্ণনার সহিত বেশ একটু প্রভেদ আছে। 'নবনাটক' বা 'প্রণয়পরীক্ষা'র চন্দ্রলেখা বা মহামায়ার মত, সূর্য্যমুখী বা পদ্মাবতী, নন্দা বা রমা, প্রফুল্ল বা সাগর, কখন স্বামীকে ঔষধ করার কথা ভাবেন নাই। কপালকুণ্ডলা বনজঙ্গলে ঔষধ খুঁজিয়াছেন বটে, কিন্তু সে শ্যামার স্বামিসৌভাগ্যের জন্য। ঔষধ করার সঙ্কল্পও শ্যামার মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা কপালকুণ্ডলার কপোলকল্পিত নহে। প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :—

'কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন ?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া লাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে ?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না ?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন ? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। তা ভাই মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয় তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।'

… … … …

† বিষয়গুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

'নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও! আমি ওষধ তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোক এলোচুলে তুলিতে হয়।'

[কপালকুণ্ডলা। ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

শ্যামা এই তত্ত্বটুকু কোন্ লীলাবতী ব্রাহ্মণী বা রসো গোয়ালিনী বা বেদেনীর কাছে শিখিয়াছিলেন, সে কথাটি গ্রন্থকার উহ্য রাখিয়াছেন, এই সমস্ত প্রাকৃতজনোচিত সংস্কারের প্রসঙ্গ যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিয়াছেন। ব্যাপারও 'নবনাটক' বা 'প্রণয়পরীক্ষা'র ন্যায় সাঙ্ঘাতিক নহে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তুলনায় সমালোচনায় এ সকল খুঁটি-নাটিতেও অন্যান্য লেখকের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিগত ও রীতিগত প্রভেদ বেশ ধরা পড়ে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ওষুধ করার কথা একস্থানে আছে বটে,কিন্তু সেখানে ভ্রমর স্বয়ং উক্ত কার্য্যে কিছুমাত্র উদযোগী নহে। ভ্রমরের 'কপাল ভাঙ্গিয়াছে' মনে করিয়া যখন 'পালে পালে দলে দলে' সীমন্তিনীগণ 'সংবাদ দিতে' আসিলেন "ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে", তখন সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম,মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও,"...' [১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] ইহা 'রচনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণে'রই রসনা ও কল্পনার উপযুক্ত!

নূতন 'ইন্দিরা'য় বামন ঠাকরুণ সোণার মা যখন ইন্দিরার কাছে চুলের কলপ চাহিতেছেন, তখন ইন্দিরা না বুঝার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কোন্ ওষুধ? বামনীকে তা'র স্বামী বশ করবার জন্য যা দিয়েছিলাম?' বলা বাহুল্য, ইহা কেবল কৌতুকের জন্য। আর কথাটাও সর্ব্বৈব মিথ্যা।

'রজনী'তে লবঙ্গলতার বেলায় স্বামি-বশীকরণের উল্লেখ আছে—কিন্তু সত্যভামার নিকট দ্রৌপদী * যে স্বামিসেবাব্রতের কথা বলিয়াছিলেন ইহা সেই ব্রতেরই অনুষ্ঠান নহে কি? আর যদিই আর কিছু হয়, তবে সে তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ঠাকুরের যোগপ্রভাব, বেদেনী গোয়ালিনী-লীলাবতী ব্রাহ্মণীর 'ঠুকোঠাকা মন্ত্রতন্ত্র' তুকতাক নহে। 'মিত্র মহাশয় ষষ্টিবৎসর বয়সে যে এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবায় ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ত্রুটি করেন না।' [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

অতএব দেখা গেল, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি বিশুদ্ধতর।

(১১) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ।

কুলীনদের বহুবিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র টিপ্পনী কাটিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে অবান্তরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—আখ্যায়িকার মুখ্য বিষয়রূপে প্রকটিত হয় নাই। বিদ্রূপের সুরটাও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' বা 'লীলাবতী'র মত তত তীব্র নহে। 'কপালকুণ্ডলা'য় অধিকারী মহাশয়ের 'রাঢ়-দেশের ঘটকালি' ও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রভৃতি নাটকবর্ণিত ঘটকালিতে কত প্রভেদ! এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অধিকারী কুলাচার্য্যের মুখ দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 'কুলীনের সন্তানের দুই বিবাহে আপত্তি কি?' [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু 'কুলীনসন্তান'* নবকুমার এবিষয়ে অত সহজে মীমাংসা করেন নাই। বিবাহবণিক্-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কত প্রভেদ! গ্রন্থকার শ্যামা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন:—'শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেননা সে কুলীনপত্নী।' এ স্থলেও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', 'নবনাটক' প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে কত প্রভেদ! 'মৃণালিনী'তে পশুপতি মনোরমার সঙ্গে বিবাহের বিঘ্নবিচারকালে বলিতেছেন:—'তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দ্দন শর্ম্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।' [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] ইহারও 'লীলাবতী' প্রভৃতি নাটকে শ্রোত্রিয়পাত্রে কুলীনকন্যাদান সম্বন্ধে লম্বা লেকচারের সঙ্গে কত প্রভেদ! বলা বাহুল্য, এ সকল স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতাই বর্ণনা-প্রণালীর বিভিন্নতার কারণ।

'রজনী'তে গ্রন্থকার অমরনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন:—'মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক

* প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিবাহ করিতে পারিতাম।' [২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] এখানে গ্রন্থকার কুলীনদের উপর সামান্য একটু ঠোকর মারিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে গ্রন্থকার এবিষয়ের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন! এই পুস্তকে মাঝে মাঝে তিনি কুলীনদের উপর বেশ এক হাত লইয়াছেন। কিন্তু তথাপি বলিব, এ বিদ্রূপ 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের বিদ্রূপের মত তীব্র বা রুচিবিগর্হিত নহে। 'দেবী চৌধুরাণী'র নিম্নোদ্ধৃত অংশের সঙ্গে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র কোন কোন অংশের তুলনা করিলে, উভয় লেখকের উদ্দেশ্য, রুচি, প্রকৃতি ও প্রণালীর প্রভেদ বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

ব্রহ্মঠাকুরাণী ব্রজেশ্বরকে একাধিক পত্নীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যপালনে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে ব্রজেশ্বরের ঠাকুর-দাদার নজির তুলিয়াছেন ও বলিয়াছেন :—"তোর ঠাকুর-দাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল।" বাকীটুকু ঠাকুরমার রসিকতা, তাহা আর তুলিলাম না। [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।]

নিশি ঠাকুরাণী ও হরবল্লভ রায়ের কথোপকথনে কৌলীন্যপ্রথার বেশ একটি চিত্র ফুটিয়াছে।

নিশি। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার। আমার একটি পাত্র জুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের জুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে ?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ ত নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যত বড় মেয়েই হোক না কেন! নিশি যে উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হর-বল্লভ ঠিক সেই উত্তর দিল, বলিল, "এ আর বড় কথা কি ? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই আমি বুড়া হইয়াছি, আম বিবাহের বয়স নাই ; আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না

নিশি। তিনি রাজি হবেন ?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আ দিয়া যাইবেন।'

[তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ

'ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "......এক্ষণে আ একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদে পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পা পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষ কুলীনেরই কাজ, মুটে মজুরের ত কাজ নয়।......তা বল্‌ছিলাম যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্ত্তব্য হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীে বিবাহ কর।"

... ...

হর। তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানু নও—কুল, শীল, জাতিমর্য্যাদা, সব আপনি দেখে শু বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয় বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনাগণ্ড তাও ত জান ?' [৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।]

বিপদে পড়িয়াও হরবল্লভ রায় কুলীনের 'ন্যায্য পাওনা গণ্ডা' ভুলেন নাই, বাহাদুরী বলিতে হইবে। বলা বাহুল্য সমস্ত ব্যাপারটাই নিশিঠাকুরাণীর কারসাজি, 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বে'র মত প্রকৃত ঘটনা নহে। সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র কৌলীন্যপ্রথার উপর একটু টিপ্পনী কাটিলেন।

আর এক স্থলে গ্রন্থকার ব্রজেশ্বরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'কুলীনের ছেলের..."মর্য্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিলনা—এখনও বোধ হয় নাই।' [২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ব্রজেশ্বর তখন বড় দায়ে পড়িয়াই টাকাটা লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

প্রফুল্লকে নূতনবধূরূপে ঘরে আনিলে প্রতিবাসিনীদিগের টীকাটিপ্পনীতেও কুলীনদের উপর একটু ঠেস দেওয়া আছে।

'ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, "কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।"

তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড়ো বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মনু বাঁড়ুয্যা একটী প্রাচীনার অন্তর্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।' [৩য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।]

(১০) ধনীর অবরোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজারাজড়া নবাব-বাদশাহ আছেন। তাঁহাদিগের 'পরিগ্রহবহুত্ব' অবশ্য লোকাচার হিসাবে সহনীয়, কেননা মান্ধাতার আমল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধবাদী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই জাতীয় দৃষ্টান্তকে তত আপত্তিজনক মনে করেন নাই, 'তেজীয়সাং হি ন দোষায়' ও 'মহতী দেবতা হ্যেষা' প্রভৃতি শাস্ত্রবচন দ্বারা সারিয়া লইয়াছেন। অতএব কতলু খাঁ বা মানসিংহ, ঔরঙ্গজেব বা রাজসিংহ, সেলিম বা মীরকাসিমের কথা ধর্ত্তব্য নহে। তথাপি এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি টিপ্পনী উদ্ধৃত করিতেছি।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে গ্রন্থকার বলিতেছেন—'কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড়মান্দারণ-জয়ের পরদিবস......বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র নিজ বিলাসগৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন।' [২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] এ কদর্য্য কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মানসিংহ সম্বন্ধে মন্তব্যে একটু সরসতা আছে।—'মানসিংহের শত শত মহিষী', 'কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিত রমণীরাজী গ্রথিত থাকিত।' [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ও ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।]

'কপালকুণ্ডলা'য় সেলিমের প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষাও একটু অধিক সরসতা আছে। তিনি লুৎফউন্নিসা ও মিহরুন্নিসা উভয়কেই বেগম করিবার হেতুবাদ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—'এক আকাশে কি চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না?' [৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।]

৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা'য় ইহারই উপর রঙ্গ চড়াইয়া নটী বলিতেছেন :—

বহু ফুলে দেখ—এক মধুকর!
বহু চাতকিনী—এক জলধর!
বহু নদীপতি—একই সাগর!
বহু লতাকান্ত—এক তরুবর!
বহু রাজাপতি—এক নরবর!
বহু তারানাথ—এক শশধর!
এক সূর্য্যজায়া—ছায়া আর দিবা!
বহুনারী তবে—অসাজন্ত কিবা!

কিন্তু পরক্ষণেই নট তাঁহার 'ভ্রান্তিবিমোচন' করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়া যান নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

নবাব-বাদসাহের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ ধনীর বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিচার করিয়াছেন, দেখা যাউক।

'রজনী'তে লবঙ্গলতা শচীন্দ্রনাথকে অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিলেন 'বাবা—যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?' এ ঠিক সেকেলে রুচিপ্রবৃত্তির কথা। শচীন্দ্রের কথাগুলি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একেলে রুচিপ্রবৃত্তির প্রতিবাদ। "সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তারপর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে?"

ছোট মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড় মা কি ঠেলা আছেন?

একথার উত্তর ছোট মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি...দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব!' [৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।]

ইহাতে 'প্রণয়পরীক্ষা' বা 'নবনাটকে'র মত তীব্রতা নাই অথচ অতি অল্প কথায় বহুবিবাহের গর্হিত দিক্‌টা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সত্য বটে, 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ একাধিক বিবাহের সমর্থন করিয়া তর্ক যুড়িয়াছেন [২৩শ পরিচ্ছেদ] কিন্তু সে আপন গরজে এবং রূপোন্মাদবশতঃ। 'আমি একটি

যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে, সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি ?'

এটুকু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থিত বৈধ কারণে অধিবেদনের উপর টিপ্পনী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহেন, নগেন্দ্রনাথের মত অবস্থায়ও লোকে অনায়াসে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিতে পারে!

(।৴•) সমাজসংস্কার।

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, অধিকবয়সে কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও ৺দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ লেখকদিগের ন্যায় বহুস্থলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা তথাকথিত উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অনুকূলে নহে, প্রতিকূলে। এ বিষয়ে সমসাময়িক লেখকদিগের সহিত তাঁহার প্রভেদ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তিনি 'রজনী'তে অমরনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—'এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ' ইত্যাদি। [২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এখানে গ্রন্থকার তথাকথিত সামাজিক সঙ্কীর্ণতাকে বিদ্রূপ করেন নাই, সমাজসংস্কারকগণকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহা তাঁহার প্রকৃত মনের কথা নহে, ব্যর্থজীবন অমরনাথের নৈরাশ্যবিকৃত Cynical হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। [টেনিসনের কাব্যে (Maud) মডের ভগ্নহৃদয় প্রণয়ীর মনোবিকার ইহার সহিত তুলনীয়।] কমলাকান্তের কোন কোন পত্রের এবং 'লোকরহস্যে'র কোন কোন পরিচ্ছেদের সুরও এই রূপ। ইহা ছাড়া, গ্রন্থকার, 'রজনী'তে হীরালালের এডিটরী প্রভৃতির প্রসঙ্গে, হীরালালের মুখ দিয়া এবং 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক পুস্তকের প্রতিবাদ-প্রবন্ধে, ও 'বিষবৃক্ষে' তারাচরণ ও দেবেন্দ্র বাবুর চরিত্রচিত্রণে নিজের জোবানী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত সাজ্যাতিক। এ সকল স্থলে তিনি সংস্কারকদিগকেই বিদ্রূপ করিয়াছেন। আর এ সকল স্থলে শ্লেষের তীব্রতাও যথেষ্ট। যাহা হউক, সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া আপাততঃ পুঁথি বাড়াইব না। ভবিষ্যতে অন্যবিষয়ক প্রবন্ধে সে সব কথা তুলিব।

৪। একাধিক বিবাহ

নবাব-বাদসাহ প্রভৃতিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য যে সকল স্থলে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল স্থলেও অন্যান্য লেখকদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রভেদ পরিস্ফুট হয়। প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, এরূপ বিবাহ প্রধানতঃ কুলীনদের ঘরে অথবা ধনিগৃহে ঘটিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতেও যেখানে যেখানে এরূপ বিবাহ ঘটিয়াছে, সেখানে সেখানে এই নিয়মেই তাহা ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্র তিনি এরূপ বিবাহের সঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন। যাহাতে পাত্রগণ, বিশেষতঃ নায়কগণ, লোকনিন্দাভাজন না হয়েন, তদ্বিষয়ে তিনি যত্ন লইয়াছেন। আধুনিক রুচির মুখ চাহিয়া, যাহাতে ইহাদিগের প্রতি পাঠকের বিতৃষ্ণা না জন্মে, যাহাতে ইহারা পাঠকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি না হারায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিপত্নীক বা ত্রিপত্নীক পাত্রগণ হয় কুলীন, না হয় ধনী, অথবা উভয়ই। নবকুমার কুলীন ('নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না' একথাও আছে—[১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ], নবকুমারের ভগিনীপতি (শ্যামার স্বামী) কুলীন ;—ব্রজেশ্বর কুলীন ও ধনীর সন্তান, সীতারাম ধনী ; রামসদয় মিত্র ('রজনী'তে) ধনী ও সম্ভবতঃ কুলীন কায়স্থ ; পুরাতন 'ইন্দিরা'য় রামরাম দত্তের দুই পত্নী, তিনিও ধনী, তবে যখন 'দত্ত' তখন অবশ্য কুলীনত্ব ছিল না ; যাহা হউক, নূতন 'ইন্দিরা'য় ইহা সুবিবেচনার সহিত বর্জ্জিত। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র দত্তও ধনী, তবে তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ (বিধবাবিবাহ) পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহগুলির সহিত একত্র উল্লেখযোগ্য কিনা সন্দেহ ; ইহা বরং গোবিন্দলালের অসংযমের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত। উভয়ত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য—অসংযমের চিত্র অঙ্কিত করা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের মুখে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহের পোষক যে সমস্ত তর্কযুক্তি দিয়াছেন, সে সবই নগেন্দ্রনাথের গরজের কথা। পশুপতি ও মবারকেও এই অসংযমের বা রূপমোহের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরেন্দ্রসিংহের পূর্ব্বের জীবনেও

এবংবিধ অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তিনি কোন দিন নগেন্দ্র দত্তর মত দ্বিপত্নীক জীবন যাপন করেন নাই। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য ওরফে অভিরামস্বামীর পূর্ব্বজীবনেও অসংযমের ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।* অবশ্য, শেষের উদাহরণ কয়েকটি এক্ষেত্রে তাদৃশ প্রাসঙ্গিক নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিপত্নীক বা ত্রিপত্নীক পাত্রদিগের দোষক্ষালনের জন্য কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

(/০) তাঁহার দ্বিতীয় আখ্যায়িকায়, নবকুমার বন্দ্যঘটীয় কুলীন, অধিকারী ওরফে কুলাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচয়প্রসঙ্গে জানা যায় [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] ঐ পরিচ্ছেদে আরও জানা যায় যে, 'তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' ঘোষাল মহাশয় পাঠানদিগের হাতে পড়িয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। 'এ সময় নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল।' অতএব এই পত্নীত্যাগ বিষয়ে নবকুমার (ব্রজেশ্বর-সীতারামের ন্যায়) নিরপরাধ, কেননা পিতার আজ্ঞাধীন। বরং এ অবস্থায় 'নবকুমার বিরাগ-বশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না' ইহাতে নবকুমারকে প্রশংসা করিতেই ইচ্ছা হয়। তবে পিতা অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত বলা যায় না। তাহার পর, অধিকারীর প্রার্থনায় প্রাণদায়িনী কপালকুণ্ডলার প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য নবকুমার অনেক চিন্তার পর তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন [১ম খণ্ড, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ], ইহা ত নিরতিশয় প্রশংসার বিষয়। এই আদর্শচিত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নবকুমারের বহুবিবাহকারী কুলীন ভগিনীপতির চিত্র। কিন্তু শ্যামার স্বামীর কথা সংক্ষেপে ও পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুলীনের বহুবিবাহের কুৎসিত চিত্রপ্রদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না, বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি। সেই জন্যই তিনি শ্যামার স্বামী সম্বন্ধে 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ বা 'প্রণয়পরীক্ষা'র নট-বরের মত বেশী কথা বলেন নাই।

(৵০) 'রজনী'তে রামসদয় মিত্রের দুই গৃহিণী—অথবা কাণা ফুলওয়ালীর হিসাবে 'দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্ন এবং প্রাচীনা।' [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] বুঝা গেল, দ্বিপুত্রবতী * হইলেও প্রথমা পত্নী চিররুগ্ণা বলিয়াই মিত্রজা বৈধ কারণে অধিবেদন-তৎপর হইয়াছিলেন। শাস্ত্রের এ বিষয়ে অনুজ্ঞা আছে (প্রথম প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

(৶০) উক্ত গ্রন্থে চাঁপার স্বামী গোপাল বসু এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে অসম্মত নহে। তাহার কারণ সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 'গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' [১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] ইহা অবশ্য শাস্ত্রমতে বৈধ কারণ। আর সে তখনও পিতার অধীন। ইহার উপর আবার টাকার লোভ ও বাবুদের অনুরোধ ছিল। 'বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত।' 'ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।' ইহাতে আর বেচারা করিবে কি? যাহা হউক, চাঁপার ষড়যন্ত্রে সব যোগাযোগই বন্ধ হইল।

গ্রন্থকারের শেষ বয়সে লিখিত 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' সতীন তিন তিন জন করিয়া আছে। ইহা অনুপ্রাসের অনুরোধে না 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটাইবার বা 'তিন শত্তুর' যোটাইবার জন্য? একজন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, ইহাতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আছে, ইহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির নিদর্শন বা রূপক, এবং এই জন্যই পুস্তকদ্বয় তিন তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু এসব কথা বলিতে ভয় হয়। 'হিংটিং ছটে'র কবির কোন ভক্ত হয় ত বলিয়া বসিবেন :—

ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চ প্রকট।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্॥

---

* অথচ তিনি শেষ জীবনে সদাচারপরায়ণ সাধু। অতএব 'কৃষ্ণ-কান্তের উইলে'র আধুনিক সংস্করণে গোবিন্দলালের ঈদৃশ পরিণাম অসম্ভব নহে।

* শচীন্দ্র 'ছোট বাবু'। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

(।০) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রজেশ্বরের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কুলীনদের কীর্ত্তির কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি বলিব, বহুবিবাহ-ব্যাপারে ব্রজেশ্বরকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি বিবাহও করেন নাই, সবই পিতৃআজ্ঞায়। তখনকার দিনে পুত্র যত বড় বীরই হউক, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না, গ্রন্থকার এ কথাও বুঝাইয়াছেন। আর বহু-বিবাহও দূষ্য চলিয়া সেকালে ধারণা ছিল না। তথাপি প্রফুল্লকে একদিনের তরে পাইয়া ব্রজেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। 'অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব? আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।' [১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরি-চ্ছেদ।] কেবল প্রফুল্লর অনুনয়-বিনয়ে তিনি ইহার জন্য পিতার নিকট যাইতে পারিলেন না। নবকুমারের ন্যায় ব্রজেশ্বরেরও পত্নীত্যাগ পিতার কর্ত্তৃত্বেই ঘটিয়াছে। তাহার পরেও প্রফুল্লর তত্ত্বতল্লাস লইবার জন্য ব্রজেশ্বর যথেষ্ট উদ্বেগ দেখাইয়াছেন। 'ব্রজেশ্বর মনে করিল,— 'একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।...ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।' [১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ] প্রফুল্লহরণের 'অর্দ্ধ-দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে।' [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] তাহার পর প্রফুল্লর (অলীক) মৃত্যুসংবাদে ব্রজেশ্বরের কি হাল হইল তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।] সাধারণ কুলীন স্বামীর সঙ্গে কত প্রভেদ!

হরবল্লভ রায় প্রফুল্লর মাতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ শুনিয়া পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে ও পুত্রের আবার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা অবশ্য গর্হিত কার্য্য নহে। [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] (নবকুমারের পিতাও এই অপ্রতিবিধেয় কারণে পুত্রবধূ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে নবকুমারের আবার বিবাহও দিতেন।) নয়ান বৌএর সঙ্গে বিবাহের পরে অর্থলোভে হরবল্লভ পুত্রের আবার সাগর বৌএর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। সাগর বৌ বলিতেছেন "আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য——"। [১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।] ইহা হরবল্লভ রায়েরই উপযুক্ত।* নয়ান বৌএর রূপগুণ দেখিয়া ও সাগর বৌ বড় একটা ঘর করিত না বলিয়া, প্রফুল্লর শোক ভুলাইবার জন্য যখন মা বাপ ব্রজেশ্বরের আবার চতুর্থবার বিবাহ দিতে চাহিলেন, তখন ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, "বাপ মা যে আজ্ঞা করবেন, আমি তাই পালন করিব।" [২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।] বলা বাহুল্য, ব্রজেশ্বরের হৃদয় তখন প্রফুল্লময়, বিবাহে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, কেবল পিতার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিবে না বলিয়াই এরূপ কথা বলিল। ইহা কুলীনসন্তানের 'হাজারে নয় বেজার' গোছের বহু বিবাহ প্রবৃত্তির সহিত তুলনীয় নহে।

আবার যখন নিশি ঠাকুরাণী, দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লকে নিজের ছোট বোন বলিয়া চালাইবার ও ব্রজেশ্বরকে নূতন বধূরূপে গছাইয়া দিবার কৌশল করিলেন, সে ক্ষেত্রেও ব্রজেশ্বর প্রথমতঃ অতশত না বুঝিয়া পিতার আজ্ঞায় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকৃত হইল। [৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।] অবশ্য হরবল্লভ রায়ের ব্যবহার অনেকটা বিবাহব্যবসায়ী কুলীনের মত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাকে দায়ে ঠেকিয়া প্রাণরক্ষার জন্য এ কার্য্যে সম্মত হইতে হইয়াছিল, এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। যাহা হউক, এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক ব্রজেশ্বরের দোষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষালন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, ইহা বেশ বুঝা গেল।

(।/০) সীতারামও, নবকুমার ও ব্রজেশ্বরের মত, পিতার আজ্ঞাধীন, স্বাধীন নহেন। এখানেও প্রথমা বধূ শ্বশুরকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। তবে এই আখ্যায়িকায় পরি-ত্যাগের কারণ কলঙ্ককুৎসা নহে, জ্যোতিষবচন। এই প্রভেদটুকু স্ফুটতর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীর মুখ

---

* 'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র দত্তের পিতা 'ক্ষুণ্ন ধনগৌরব পুনর্বর্দ্ধিত করিবার জন্য' গণেশবাবু জমিদারের একমাত্র অপত্য 'কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা হৈমবতীর' সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া-ছিলেন। [১০ম পরিচ্ছেদ] তিনিও হরবল্লভের মত বিষয়ী লোক ছিলেন। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এক পত্নী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ দেওয়া নহে।
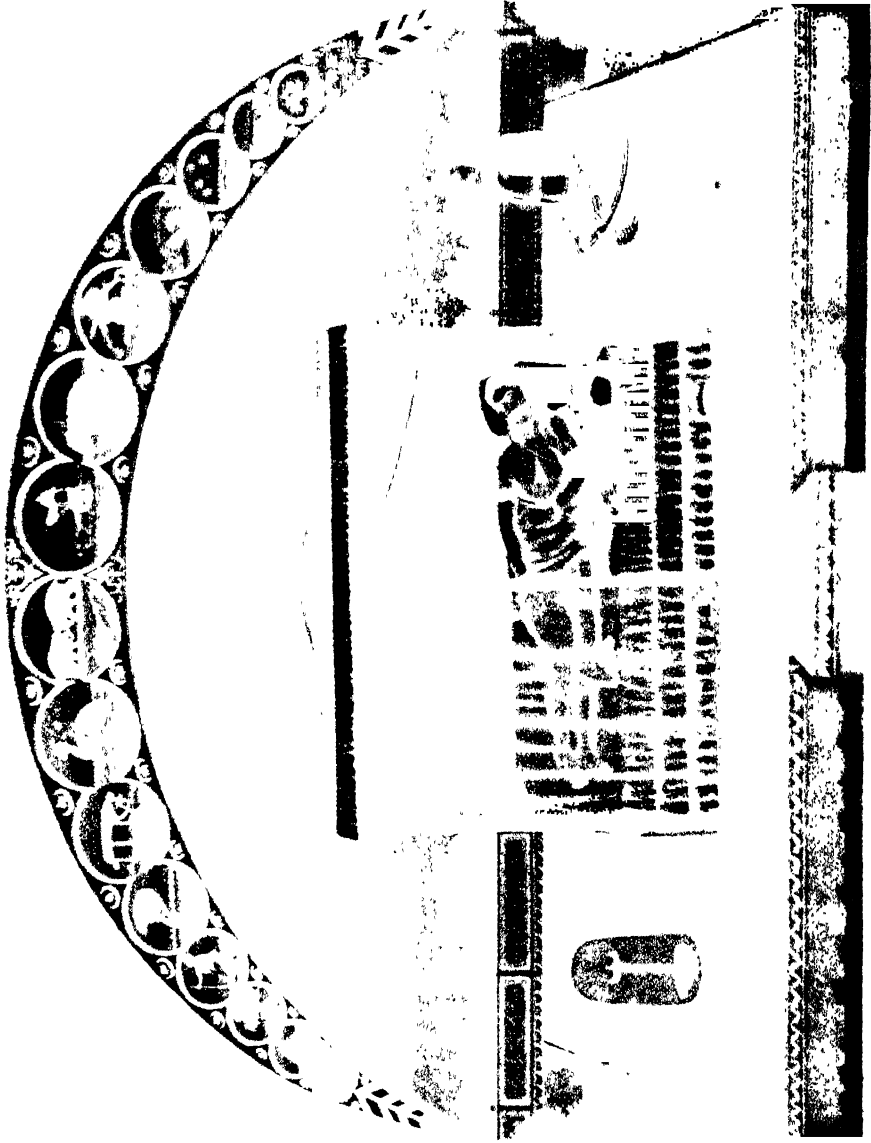
দিয়া বলাইয়াছেন "আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয়দিন পর হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ।" [১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] শ্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হইবে কোষ্ঠীর এই ফল জানিয়া সীতারামের পিতা জ্যোতিষীর নির্দ্দেশমত শ্রীকে 'পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন 'এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন, যে আমি তোমাকে গ্রহণ না করি।'···'তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল।' ইত্যাদি পূর্ব্ব ইতিহাস গ্রন্থকার সীতারামের মুখে বিবৃত করিয়াছেন [১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] সীতারামের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং পুনর্ব্বার বিবাহ দিলেন। 'তারপর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিতকৌমুদীরূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।' [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] অতএব দেখা গেল, সীতারামও, ব্রজেশ্বরের ন্যায়, পিতার আদেশে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আবার ব্রজেশ্বরের ন্যায় সীতারামও পূর্ব্বপরিণীতা ও পরিত্যক্তা পত্নীর দর্শনলাভ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সীতারাম বলিতেছেন :—'যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।···বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি' ইত্যাদি। [১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] এক্ষেত্রেও সীতারাম, ব্রজেশ্বরের ন্যায়, পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে নিরস্ত হইলেন। অতএব দেখা গেল, ব্রজেশ্বরের ন্যায় সীতারামের দোষক্ষালনেও গ্রন্থকার যত্নপর হইয়াছেন।

৫। বিপত্নীকের বিবাহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে বিপত্নীকগণও বিবাহ করিতে তাদৃশ ব্যস্ত নহেন। 'পুরুষ দু'দিন পরে, আবার বিবাহ করে,' কবির এই তিরস্কার তাঁহাদিগের পক্ষে বড় খাটে না। কৃষ্ণকান্ত রায় বুড়াবয়সে বর সাজেন নাই, একথা না হয় নাই তুলিলাম ; হরলাল অবশ্য আদর্শ পুরুষ নহে, কিন্তু সেও বিপত্নীক হইয়া পুনরায় বিবাহ করে নাই। রোহিণীকে ভোগা দিয়া কায উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে বিধবাবিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল এবং পিতাকে ভয় দেখাইবার জন্য বিধবাবিবাহ করিতেছি ও করিয়াছি এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়াছিল ; 'রজনী'তে শচীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত আছে 'বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। আর বিবাহ করেন নাই।' [১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।] (গ্রন্থকারের এ কৌশলটুকু অবশ্য ভবিষ্যতে রজনীর, পথ খোলসা রাখিবার জন্য।) 'রাধারাণী'তে রুক্মিণীকুমার বলিতেছেন 'রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।' [৭ম পরিচ্ছেদ।] অবশ্য রাধারাণী-সাক্ষাতের পর দীর্ঘ আট বৎসর তিনি রাধারাণীর প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান অপমান, ওরে বিধি তা'রে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?'

'রাজসিংহে' মাণিকলাল বিপত্নীক হইয়া শিশুকন্যার লালনপালনের সুবিধার জন্য নির্ম্মলকে বিবাহ করিলেন, ইহা অবশ্য আমাদের সমাজে অতি সাধারণ ঘটনা (যদিও মাণিকলাল বাঙ্গালী নহেন।) তথাপি এই ঘটনাতে সরসতা সঞ্চার করিতে গ্রন্থকার ত্রুটি করেন নাই। মাণিকলালের 'কোর্টশিপটা' উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে ? আমায় বিবাহ করিবে ?' [৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] ইহা ছাড়া নির্ম্মলের 'একত্র ঘোড়ায় চড়া'র আপত্তি খণ্ডাইবার জন্য, রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে নির্ম্মলের কাঙ্ক্ষিত মিলনের সহায়তার জন্যও, মাণিকলালের বিবাহ-প্রস্তাব। সর্ব্বোপরি, নির্ম্মলের চাঁদপানা মুখও অবশ্য ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছিল। 'মাণিকলাল দেখিল মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না।' যাঁহারা ঠিক দ্বিপত্নীক নহেন, বিপত্নীক হইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও তুলিতে হইল, কেননা বিমাতার প্রসঙ্গে ইহার প্রয়োজন হইবে।

বিপত্নীক না হইলেও ইন্দিরার স্বামী যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহাতে তিনি অক্লেশে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। (গ্রন্থকারের এ কৌশলটুকুও অবশ্য ইন্দিরার ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য।) বিপত্নীক না হইলেও দেবেন্দ্র দত্ত 'অপ্রিয়বাদিনী' পত্নী হৈমবতীকে ত্যাগ করিয়া অধিবেদনতৎপর হইতে পারিত, শাস্ত্রবিধি তাহার অনুকূলে, সৎপত্নীলাভে তাহার চরিত্র-সংশোধনও হইতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সে পথে লইয়া যান নাই।

পত্নী বন্ধ্যা বা কন্যাজননী বা মৃতসন্তানা হইলে শাস্ত্রানুসারে পুনর্দ্দারগ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করিতেও বীরেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি পাত্রগণ প্রবৃত্ত নহেন। তবে নগেন্দ্রনাথ যে ঐ অজুহত তুলিয়াছিলেন, সে কেবল আপন গরজে। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৬। সপত্নী-শঙ্কা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে, যে সকল স্থলে সপত্নীর অস্তিত্ব নাই, সে সকল স্থলেও সপত্নীশঙ্কা আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মৃণালিনী, ইন্দিরা, রাধারাণী ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ী, চারিজনই—প্রেমাস্পদের অপর কেহ প্রণয়ভাগিনী আছে কিনা জানিবার জন্য যথেষ্ট কৌতূহলবতী।

(/০) দীর্ঘ আট বৎসর প্রতীক্ষার পর যখন কুমারী রাধারাণীর রুক্মিণীকুমার-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল, তখন তাহার মনের অবস্থার বিবরণে দেখা যায়ঃ—'রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল—"...উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না। না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল, সতীন সহিতে পারিব না।" [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের পরিচয়গ্রহণ-কালে ছল করিয়া রাণীজির কথা তুলিলেন এবং রুক্মিণীকুমার ওরফে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন বলিলেন 'রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে' তখন রাধারাণীর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। [৭ম পরিচ্ছেদ।] অবশ্য তখনও রাধারাণীর রুক্মিণীকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয় নাই! তখনই সপত্নীশঙ্কা—না উঠতেই এক কাঁদি!

(৵০) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ী অমলার মুখে পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া অমলাকে জিজ্ঞাসা করিল "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?" অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।" [৫ম পরিচ্ছেদ।] ইহা ঠিক সপত্নীশঙ্কা না হইলেও, একই মূলের কাণ্ড। (হিরণ্ময়ী তখন জানিত না যে, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী তাহারই স্বামী।)

(৶০) কালাদীঘির ডাকাইতির পরে ইন্দিরা যখন বনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রিতা হইয়া পড়িল, তখন সে স্বপ্ন দেখিল যে, 'রতিদেবী আমার সপত্নী—পারিজাত লইয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেছি।" [৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এত আশা করিয়া বহুকাল পরে স্বামিদর্শনের জন্য শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিয়া, দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহার যখন সকল সাধ ফুরাইল, তখন এরূপ স্বপ্ন নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। স্বপ্নেও যে নারীজাতি সপত্নীশঙ্কা ভুলিতে পারে না!

তাহার পর বিধাতার—না কল্পনাকুশল কবির?—অপূর্ব্ববিধানে যখন পাচিকাবৃত্তিধারিণী ইন্দিরা স্বামীর দেখা পাইল, তখন সে নির্জ্জনে তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া লইয়া ছলক্রমে কথা পাড়িয়া জানিয়া লইল, স্বামী আর বিবাহ করেন নাই। 'সপত্নী হয় নাই শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল।' [১৪শ পরিচ্ছেদ।] *

(।০) নবদ্বীপে মৃণালিনী যখন অন্তরালে থাকিয়া হেমচন্দ্রের গৃহের দ্বারদেশে মনোরমাকে দেখিলেন, তখন 'মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।' তাহার পর মনোরমাকে আহত হেমচন্দ্রের শুশ্রূষাপরায়ণা দেখিয়া মৃণালিনী গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা?' যাহা হউক, মৃণালিনীর হেমচন্দ্রের উপর অটল বিশ্বাস। পরক্ষণেই সে দৃঢ়তার সহিত বলিল 'মনোরমা যেই হউক হেমচন্দ্র আমারই।' [৩য় খণ্ড,

* রামরাম দত্তের বর্ষীয়সী গৃহিণী সর্ব্বদা যে শঙ্কায় স্বামীর নিকট কোন যুবতী স্ত্রীকে যাইতে দিতেন না, তাহা অবশ্য একটা কদর্য্য বৃত্তি। তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

২য় পরিচ্ছেদ।] এই স্থলে মৃণালিনীচরিত্রের সৌন্দর্য্যের একদিক্ সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃণালিনীর বিশ্বাসের দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার পরপরিচ্ছেদে গিরিজায়ার মনে সন্দেহের ছায়া আনিয়া দিয়াছেন।

(।৵০) পক্ষান্তরে, 'রজনী'তে ইতর পাত্রী চাঁপার সপত্নীশঙ্কা প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। 'গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাহার পত্নীর নাম চাঁপা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ক্রটি করিল না।' [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] প্রথমে গুণধর ভ্রাতা 'হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল।' হীরালাল যখন 'সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে' ইত্যাদি ভাংচি দিয়া, সে স্বয়ং বর সাজিতে প্রস্তত এই প্রলোভন দেখাইয়া, নিজের অগাধ বিদ্যার পরিচয় জানাইয়া, এবং শচীন্দ্র বাবুর নামে অকথ্য কুৎসা করিয়াও, কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না, তখন চাঁপা স্বহস্তে তদ্বিরের ভার লইল ও একেবারে সশরীরে রজনীদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। 'দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।...জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা?" উত্তর "তোমার যম।"... "এখন জানবি। বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী, আবাগী ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হা দেখ, কাণি যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।" * বুঝিলাম চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম।' [১ম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] রজনীর ব্যবহার খুবই ভাল। তবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সেও ত বিবাহ বন্ধ করিতে ব্যগ্র। তাহার পর, চাঁপা রজনীর সম্মতিতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিল। সংক্ষেপে অমরনাথের কথায় বলি—'চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলি পাঠাইয়াছিল। বোধ হয় তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্‌যোগ পাইয়াছিল।' [২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] হীরালালের কুৎসিত চরিত্র জানিয়াও চাঁপা যে তাহার হাতে রজনীকে গছাইয়া দিয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায়, চাঁপার মত ইতরপ্রকৃতির স্ত্রীলোকে সপত্নীজ্বালা-নিবারণের চেষ্টায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া কোন কদর্য্য উপায় অবলম্বন করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। সুখের বিষয়, পদ্মাবতী ('কপালকুণ্ডলা'য়) বা সূর্য্যমুখী এরূপ কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই।

৭। সপত্নী ও বিমাতার চিত্র

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন্ আখ্যায়িকায় সপত্নী ও বিমাতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা তিলোত্তমার বিমাতা—যদিও এই সম্পর্ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নায়িকার (ও পাঠকের) অজ্ঞাত। তিলোত্তমা ও আয়েষা উভয়েই জগৎসিংহকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নাই। ইহা অবশ্য সপত্নীসম্পর্ক নহে, অতএব ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'কপালকুণ্ডলা'য় পদ্মাবতী ও কপালকুণ্ডলা পরস্পরের সপত্নী। লুৎফউন্নিসা ও মিহরুন্নিসার মধ্যে সেলিমের প্রণয়হেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা-যোগ্য নহে। শ্যামা কুলীনপত্নী, তাঁহার সপত্নী ছিল, কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ বা বর্ণনা নাই। 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীতে সপত্নীভাব। হীরারও কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্র দত্তের প্রেমলাভ লইয়া বিলক্ষণ ঈর্ষা আছে। তবে ইহাকে অবশ্য সপত্নীসম্পর্ক বলা যায় না। 'রজনী'তে রামসদয় মিত্রের দুই পত্নী। ললিতলবঙ্গলতা সপত্নী ও বিমাতা উভয় মূর্ত্তিতেই চিত্রিত। চাঁপার সপত্নীনিবারণের উৎকট চেষ্টাও পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর-রোহিণীর পরস্পরের প্রতি মনোভাবও অবশ্য সপত্নীসম্পর্ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 'চন্দ্রশেখরে' মুখরা নির্লজ্জা শৈবলিনী একবার নবাবের নিকট প্রতাপ-পত্নী রূপসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছে বটে [৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ] এবং 'রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য' নবাবের কাছে আবার আসি ব এইরূপ মনোভাব দেখাইয়াছে বটে [৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ] কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এই মনোভাবকে অবশ্য সপত্নীবিদ্বেষ বলা যাইতে পারে না। এই গ্রন্থে দলনীর বহু সপত্নী আছে। কিন্তু সে জানে 'হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসী

* (মিঃ টি, এন, মুখার্জি) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় 'ফোকলা দিগম্বরে' ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসময়ীর রসিকতা'য় ইহার উপরও রঙ্গ চড়াইয়াছেন।

মাত্র।' সে সপত্নীদিগের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। সপত্নীদিগের কোথাও স্পষ্ট উল্লেখও নাই। নবাব যে বলিলেন 'তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই' [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ] ইহাতেই তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। বেচারা হিন্দুর অলঙ্কারশাস্ত্র পড়ে নাই—তাহা হইলে শিখিত, ইহা উপচারপর, স্তোকবাক্য!

'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারী সপত্নীসত্ত্বেও রুক্মিণীর ন্যায় স্বয়ংবরা হইতে প্রস্তুত। যাহা হউক, তাঁহার সপত্নীদিগের সহিত আচরণ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই—কেননা পুস্তক বিবাহে শেষ। তাঁহার সখী নির্ম্মলকুমারী বিমাতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ঔরঙ্গজেবের বেগম উদিপুরী-যোধপুরীর বিরোধের সামান্য পরিচয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাহাজাদী জেব-উন্নিসা ও গরিব দরিয়া উভয়েই মবারককে নিজস্ব করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী—ইহার পরিণামে বিষময় ফল, সাহাজাদীর হুকুমে মবারকের সর্পদংশনে প্রাণদণ্ড এবং জীবনলাভের পর বহুদিন পরে আবার দেওয়ানা দরিয়ার হাতে তাঁহার প্রাণনাশ। যাক্, এ পাপকাহিনীর সামান্য উল্লেখই যথেষ্ট। 'আনন্দ- মঠে' শান্তি-নিমাইএর সম্পকোচিত দু একটি ঠাট্টায় ভিন্ন উভয়ের সপত্নীসম্ভাবনা একেবারেই দুরাপাস্ত। 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' তিন তিন সতীন।

এই সাধারণ আলোচনা হইতে জানা গেল যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথম বয়সে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমাতার চিত্র এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় ও 'বিষবৃক্ষে' সপত্নীচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মধ্যবয়সে রচিত 'রজনী'তে বিমাতা ও সপত্নীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মধ্যবয়সে রচিত ও শেষ বয়সে সংস্কৃত 'রাজসিংহে' বিমাতার একটি ক্ষীণ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এবং শেষ বয়সে প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' সপত্নী ও বিমাতার পূর্ণায়ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। স্থূল কথা, চৌদ্দখানির মধ্যে সাত খানিতে অর্থাৎ অর্দ্ধেকগুলিতে এই শ্রেণীর চিত্র আছে। প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যে আমলে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সে আমলে এই প্রশ্নের বহুল আলোচনা হইতেছিল; সুতরাং কালের ধর্ম্মে তাঁহার পুস্তকে এই শ্রেণীর এতগুলি চিত্র থাকিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে।

এক্ষণে এক এক করিয়া চিত্রগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

পরিচয়

[শেখ ফজলল্ করিম]

পৃথিবী আমারে যত টানিতে লাগিল
বক্ষে তার লুকা'তে যতনে,
তত তুমি যেতেছিলে দূরে—বহুদূরে
ফেলি' মোরে একেলা বিজনে!

যেমনি হারা'নু আমি তার সেই স্নেহ
—রোষভরে দিল সে বিদায়,
অমনি ধরিলে বুকে স্নেহ-মমতায়
আঁখি মোর চিনিল তোমায়!

কল্পতরু

অন্ধ-বিদ্যালয়

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার]

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানবজাতি পৃথিবীর জ্ঞান সাম্রাজ্য ও প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণা লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছে। সম্রাট হইতে পথের ফকির পর্য্যন্ত সকলেই এই অনন্ত-ভাণ্ডারের অধিকারী ;—কিন্তু অধিকারী হইয়াও আজ অসংখ্য নরনারী নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়া জগতের একপাশে পড়িয়া আছে ; অন্ধ ও ক্ষীণ-দৃষ্টি হইয়া, তাহারা পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার দিন দিন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, বিজ্ঞান-লক্ষ্মী তাঁহার নব নব গবেষণা ও আবিষ্কার দ্বারা মানবের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করিলেন ; কিন্তু এই অসংখ্য উপেক্ষিত দৃষ্টিহীন নর নারী বুঝি চিরদিন এই সকল পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল।

তাই অন্ধদিগের এই নিরাশ্রয়তা ও অপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগ্যবান মানব-হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। এই অন্ধ ভ্রাতৃগণ যদি চিরকালের জন্য পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হয়, তবে মানবের সমস্ত কর্ম্ম চির-কালের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কিংবা ফরাসী বিপ্লবের ৬৭ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে সকলের ধারণা ছিল যে, জন্মান্ধেরা কখনও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না ; পৃথিবীর কোন কাজই তাহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী Valentin Hany এই ভ্রান্ত ধারণাকে কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইলেন। জন্মান্ধ বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিবার আশায় তিনি উঁচু অক্ষর (Raised type) দ্বারা কতকগুলি পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকগুলি কাগজে ছাপা নহে ; বড় বড় সমতল 'পাতের' উপর যে কোন ধাতুর উচ্চ অক্ষর 'ঢালাই' করিয়া ইহা মুদ্রিত। এই পুস্তক পড়িতে হইলে চোখে না দেখিয়া সেই উচ্চ অক্ষরের উপর হাত বুলাইতে হইবে।

যাহা হউক, পৃথিবীর কোন আবিষ্কার একদিনে সম্পূর্ণতা লাভ করে না—সেই জন্য Valentin Hanyর উদ্ভাবিত প্রণালীতেও দোষ ছিল। 'পাতের' উপরিস্থিত ঢালাই-করা উচ্চ অক্ষরের উপর হাত বুলাইয়া ভাষা শিক্ষা করিতে এত সময় লাগিত যে, তাহা বিশেষ কোন কাজে আসিল না সমগ্র জীবন কেবমাত্র অক্ষর শিখিতেই কাটিয়া যাইত। ইহার পর হইতে অনেকে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন ; অবশেষে ফরাসী পণ্ডিত Louis Braille এক অভিনব প্রণালীর আবিষ্কার করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই Braille-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আশা করা যায়, এই অন্ধদিগেরই মধ্য হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক, কবি, দার্শনিক ও রাজ-নীতিক প্রাপ্ত হইতে পারিব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

লুই ব্রাইল জন্মান্ধ ছিলেন ; তিনি প্যারি সহরের Institution des Jeunes Avengles নামক অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, অন্ধদিগের বিদ্যাশিক্ষা লাভের তেমন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। তিনি ভাবিলেন—অন্ধেরা কি চিরকাল দেহের পরিশ্রম করিয়া কিংবা কারিগরী কাজ করিয়া জীবনযাপন করিবে—দৃষ্টিহীন বলিয়া তাহারা কি সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার হইতে চিরকাল বঞ্চিত হইয়া থাকিবে ?

সেই দিন হইতে তিনি নূতন প্রণালী উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সমস্ত অন্ধ-সমাজের—শুধু অন্ধ সমাজের কেন—সমস্ত মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রণালী Braille System নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় যেমন ২৬টী বর্ণমালা আছে, Braille-প্রণালীতে তেমনই কেবল ছয়টি দাগ (points) (⠿) আছে ; এই ছয়টী দাগের সাহায্যে
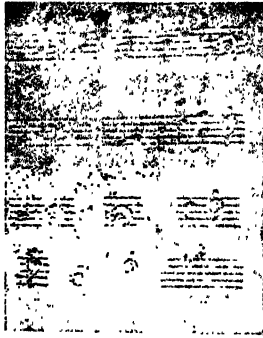
বর্ণমালা

৬৩টি অন্ধ-বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। ৬৩ বর্ণের মধ্যে কমা, সেমিকোলন, গণিত চিহ্ন, উপসর্গ ইত্যাদি সবই আছে। তিনটি parallel line বা সমান্তর রেখার উপর এই ছয়টী দাগের যে কয়টী ইচ্ছা বিভিন্ন স্থানে বসাইয়া নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা যাইতে পারে ; যেমন :—

≡ but ; ≡ can ;

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, Valentin Hany-আবিষ্কৃত প্রণালীর ন্যায় এই প্রণালীতেও 'পাতের' উপর উপরিউক্ত দাগগুলি উচ্চ করিয়া খোদাই করা হয় ; এই দাগের উপর হাত বুলাইয়া অন্ধেরা অনায়াসে পুস্তক পড়িতে পারে।

এই Braille প্রণালীর প্রধান দোষ হইতেছে, ইহা প্রস্তুত করিবার দুর্ম্মূল্যতা ও পরিশ্রম।

এই সকল দাগ সাধারণতঃ পাতলা Link Peate এর উপর খোদাই করা হয় এবং দেখা গিয়াছে যে একখানি পাতের উপর ৪০০ অক্ষর খোদাই করিতে এক ঘণ্টা লাগে ; আর সাধারণ মুদ্রিত পুস্তক হইতে Braille-খোদিত পুস্তকগুলি অনেক বৃহৎ ও ভারী। স্যার ওয়াল্টার স্কটের একখানা 'Ivanhoe' ব্রেল-প্রণালীতে মুদ্রিত করিতে হইলে তাহা ফুলস্কেপ আকারে ৬ খণ্ডে পরিণত হইবে। সাধারণ মুদ্রিত Ivanhoe এবং ব্রেল মুদ্রিত Ivanhoeর আকার বিশেষ বিভিন্ন। ব্রেল-মুদ্রিত ছয় খণ্ড Ivanhoeর মূল্য ১৫৲ টাকা করিয়া ৯০৲ টাকা! আর আমরা সাধারণতঃ বার আনা কিংবা ছয় আনা দিয়া অনায়াসে একখণ্ড Ivanhoe কিনিতে পারি। ব্রেলের প্রণালী অনুসারে অন্ধেরা যে, কেবল পড়িতেই
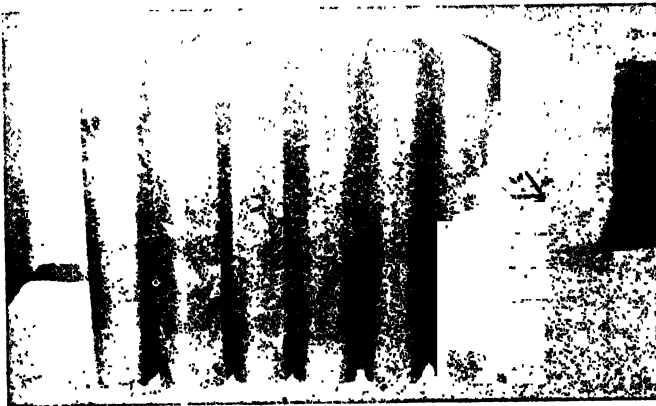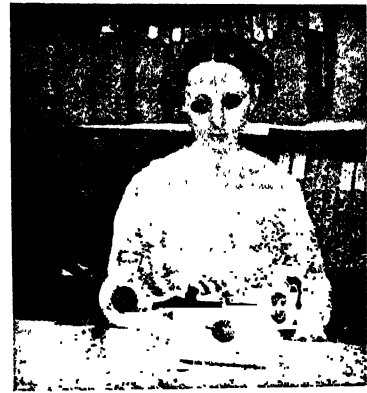
অন্ধ স্ত্রীলোক টাইপ-রাইটিংএ লিখিতেছে

শিখিয়াছে তাহা নহে, তাহারা সঙ্গীত-বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রস্তুত হইয়াছে ;—এই স্বরলিপির সাহায্যে ইংলণ্ডের বিভিন্ন গির্জ্জায় প্রায় ৭০ জন অন্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কাজ করিতেছে। এই প্রণালী অনুসারে একপ্রকার Short-hand যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; ইহার দ্বারা অন্ধেরা অনায়াসে সাধারণ Short-hand লেখকের ন্যায় বক্তৃতাদি লিপিবদ্ধ করিতে পারে। এই প্রণালীর সাহায্যে অন্ধেরা অনায়াসে এখন পাশা ইত্যাদি খেলিতে পারে।

আইভ্যানহো

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ব্রেল প্রণালীর প্রধান দোষ হইতেছে

ইহার দুর্মূল্যতা। এই দোষটী দূর করিবার জন্য সেদিন লণ্ডনে National Institute for the

অন্ধ হাতুড়ীর কার্য্য করিতেছে

Blind স্থাপিত হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ইহার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। এই বিদ্যালয়ের সভাগণ ১৯,৫০,০০০ টাকার জন্য দেশবাসীর নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা ছবি, পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রমুদ্রিত করিয়া অন্ধদিগকে দান করা হইবে। ইংলণ্ডের মনীষীরা বলিতেছেন—অন্ধ মিল্টন ও ফসেটের দেশবাসী হইয়া আমরা যদি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯,৫০,০০০ টাকা সংগ্রহ না করিতে

দুইজন অন্ধ 'দাবাবোড়ে' খেলিতেছে

পারি, তবে ইহা চিরদিন আমাদের জাতীয় কলঙ্করূপে রহিয়া যাইবে।

এইবার ঘরের কথা; ভারতে অসংখ্য অন্ধ নরনারী কি দুঃখের মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি! তাহাদের নিরানন্দময় জীবনকে আলোকিত করিবার জন্য আমাদেরও যে কর্ত্তব্য আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদের এই জাতীয় জাগরণের দিনে যদি এই দৃষ্টিহীনেরা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আমাদের কি কলঙ্কের সীমা থাকিবে? ইউরোপে যদি মিল্টন কিংবা হেলেন কেলার থাকে, তবে আমাদের দেশে কি হেমচন্দ্র নাই?

পশুপক্ষীর মুখভঙ্গী।

(Strand Magazine হইতে সঙ্কলিত)

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ]

একদিন বিখ্যাত প্রাণিচিত্রকর স্যার এড্উইন ল্যাণ্ড-সীয়ারকে তাঁহার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমাদের কুকুর 'বাউসারের' হাসির সহিত আপনার পাচকের হাসির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, —"হাঁ, আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয় আর কেহই ইহা লক্ষ্য করেন নাই। আমি যদি ঐ কুকুরের হাসি চিত্রে অঙ্কন করিতে সাহস করি, তাহলে সমালোচকগণ 'অস্বাভাবিক' বলিয়া তীব্র চীৎকার করিবেন।"

ল্যাণ্ডসীয়ার ব্যতীত আরও অনেক প্রাণিচিত্রকর যে তাঁহাদের অঙ্কিত অশ্ব, কুকুর ও বিড়ালের মূর্ত্তিতে মানুষের মুখভঙ্গী সকল আরোপ করেন, এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়।

একজন চিত্র-সমালোচক কোন মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "কুকুর লেজ নাড়িয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করে,

মুখের মাংসপেশীর চালনার দ্বারা নহে। ল্যাণ্ডসীয়ারের বিষম ভুল এই যে, তিনি মানুষের ন্যায় ইতরপ্রাণীদের মনের ভাবও একই চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

কুকুরের হাসি

ইহা কি সত্য? কুকুর বিড়াল কি তাহাদের প্রভু বা প্রভুপত্নীর ন্যায় একই প্রকারে, আংশিক পরিমাণেও, তাহাদের আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, শোক, নৈরাশ্য মুখে প্রকাশ করিতে পারে না? বৈজ্ঞানিক সন্দর্শকগণের এ বিষয়ে মতভেদ আছে। স্যার চার্লস বেল বলেন,—'পশুগণের মুখ প্রধানতঃ রাগ ও ভয় প্রকাশ করিতে সমর্থ।' ডারউইন এই উক্তি স্পষ্টাক্ষরেই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"যখন একটা কুকুর অপর একটা কুকুর বা মানুষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই যখন আবার তাহার প্রভুর নিকট সোহাগ প্রকাশ করে, কিংবা বানরকে তাহার রক্ষক যখন অপমান বা আদর করে, এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের মুখভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে, আমাদের বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের ন্যায় তাহাদেরও মুখভঙ্গী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা যথার্থই ভাবব্যঞ্জক। ইহা যে সত্য ঘটনা, তাহা এই প্রবন্ধের ছবিগুলি দেখিলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাইবে।

অপর একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বলেন যে, যাহারা দর্শনের উপযুক্ত শক্তির ব্যবহার করিতে জানেন না, যাঁহারা মনঃসংযোগের সহিত কোন জিনিষ দেখিতে পারেন না, তাঁহারা চিরদিনই অবিশ্বাসী থাকিয়া যাইবেন। তাঁহারা কুকুর-বিড়ালের মুখে কেবল পশুসুলভ ভঙ্গীই দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যের হাবভাবের সহিত ইহার সাদৃশ্যটুকু আদৌ লক্ষ্য করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুকুর যখন তাহার শত্রুর উপর লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হয়, তখন সে বিকটস্বরে গোঁ গোঁ করিতে থাকে, কাণ দুইটা পশ্চাদ্ভাগে পাশাপাশি চাপিয়া থাকে এবং উপরের ঠোঁট তুলিয়া দাঁত বাহির করে। ক্রীড়াকৌতুকরত কুকুর ও কুকুরশাবকদিগের মধ্যে এই সকল অঙ্গচালনা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু খেলা করিতে করিতে যথার্থই যদি কোনটা ভয়ানক রাগান্বিত হইয়া উঠে,তাহার মুখাকৃতি তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভাব ধারণ করে। তাহার ঠোঁট ও কাণ পশ্চাৎদিকে খুব জোরে টানিয়া ধরে বলিয়াই এরূপ ঘটে। কিন্তু সে যখন আবার অন্য কুকুর দেখিয়া কেবল চীৎকার করে, তখন কেবল এক-ধারেই (অর্থাৎ শত্রুর দিকেই) ঠোঁট তুলিয়া ধরে। ভয় ও বিরক্তির লক্ষণের ন্যায় এই সকল ভাবও অনায়াসে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। মানুষের সহবাসে শত শত বৎসর বাস করিয়া কুকুর ও বিড়ালগণও যে ক্রমশঃ মানুষের মুখভঙ্গী সকল আশ্চর্য্যরূপ অনুকরণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আরও করিতেছে, তাহা কয়জন বুঝে? গৃহপালিত উচ্চশিক্ষিত কুকুর ও তাহার পূর্ব্বপুরুষ নেকড়ে বাঘ ও শৃগালের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের জীবনীতে আমরা পাঠ করি যে, তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রে হাউণ্ড হাসিবার সময় দন্ত বাহির করিত। চীৎকার করিবার সময়ের ন্যায় হাসিবার সময়ও কুকুর উপরের ঠোঁট দাঁতের উপর টানিয়া তুলে; তখন তাহার তীক্ষ্ণ অগ্রদন্ত সমূহ বাহির হইয়া পড়ে এবং কর্ণদ্বয় পশ্চাৎদিকে নীত হয়। কিন্তু তখন তাহার সাধারণ আকৃতি দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, সে আদৌ রাগান্বিত হয় নাই। স্যার চার্লস বেল তাঁহার "মুখাকৃতি-তত্ত্ব" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "সোহাগ ও ভালবাসা প্রকাশ করিবার সময় কুকুরেরা ঠোঁট অতি অল্পই উণ্টায়; এবং আনন্দে নৃত্য করিবার সময় তাহারা এরূপভাবে দন্ত প্রদর্শন করে ও নাসারন্ধ্রে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে যে, তখন মনে হয়, যেন তাহারা ঠিক হাসিতেছে! কেহ কেহ এই দন্তবিকাশকে ঈষৎ হাস্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা যদি যথার্থই হাস্য হইত, তাহা হইলে কুকুর যখন আনন্দে

'ঘেউ,' 'ঘেউ' শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও কাণের সেই একই রকম কিংবা আরও স্পষ্ট সঞ্চালন দেখিতে পাইতাম। কিন্তু দন্তবিকাশের পরই আনন্দে ঘেউ ঘেউ শব্দ করিলেও এরূপ ঘটনা ঘটে না। পক্ষান্তরে তাহাদের সঙ্গী বা প্রভুদিগের সহিত খেলা করিবার সময় প্রায় সদাসর্ব্বদাই পরস্পরকে

কুকুরের বিচিত্র ভঙ্গী

কামড়াইবার ছল করে এবং তারপর ধীরে ধীরে তাহাদের ঠোঁট ও কান টানিয়া লয়। ইহা হইতেই আমার সন্দেহ হয় যে, অনেক কুকুর অভ্যাসবশতঃ পরস্পরকে বা তাহাদের প্রভুর হস্ত ক্রীড়াচ্ছলে কামড়াইবার সময় যেমন মাংসপেশী চালনা করে, স্নেহমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিলেও তাহারা ঠিক সেইরূপই মুখভঙ্গী করে।"

ডার্লিংটনবাসী বিয়ার্ড নামক একজন সাহেব লিখিয়াছেন, "আমার একটি 'ফক্সটেরিয়র' কুকুর আছে। আনন্দ হইলেই সে ঠিক মানুষের ন্যায় অতীব আশ্চর্য্য ভাবে দন্ত প্রদর্শন করে। একবার আমার ছোট ছেলের নাকের উপর এক টুকরা মিছরি রাখিয়াছিলাম; সে ইহা 'ভিক্ষা' করিবার ভাণ করিতেছিল। মিছরির টুকরা মেজের কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িল। পাশেই আমার কুকুর বসিয়াছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া দেখি যে, সেও সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া হাসিমুখে এই হাস্যকর ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছে। সেই সময় তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তাহার হাসির শব্দ থাকিলেই তাহা একেবারে নিশ্চয়ই মানুষের হাসি হইয়া যাইত।"

কতকগুলি বিড়ালের দন্তবিকাশের খ্যাতি বিশ্বজনীন। মিসেস ওয়াট্স নামের একটি বিড়াল আছে; সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হাস্য করিয়া থাকে। তিনি বলেন,—"সে যে কেবল তাহার দাঁতই দেখাইতেছে, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে যখন তখন সময়ে অসময়ে সে এরূপ করিত। কিন্তু আনন্দিত হইলেই সে কেবল হাসে। বিশেষতঃ, যখন আমি তাহাকে আনন্দিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করি, তখন মানুষের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া সে হাস্য করে।"

এই প্রবন্ধে প্রদত্ত একটি কুকুর ও বিড়ালছানার হাস্যময় ফোটো দেখিয়া কাহার সন্দেহ হইবে যে, তাহারা হাসিতেছে না? তাহাদের হাস্যপূর্ণ মুখভঙ্গী কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। কিন্তু শেফার্ড বা লুই ওয়েন প্রমুখ চিত্রকরগণ এই হাসি চিত্রে অঙ্কন করিলে, অবিশ্বাসী
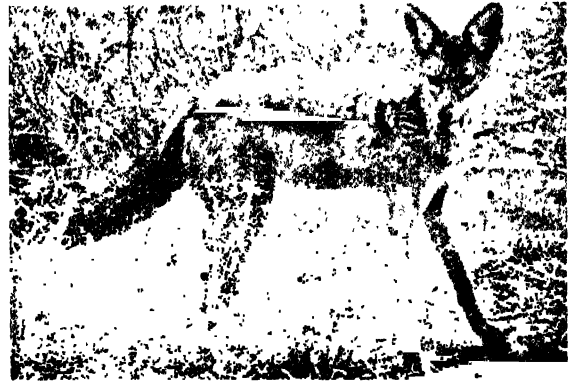
শৃগালের সচকিত ভঙ্গী

দর্শকগণ হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাহারা এরূপ মুখভঙ্গীকে অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের নিকট প্রচার করিতেন এবং এই কল্পনাপ্রসূত চিত্রাঙ্কনের জন্য ল্যাণ্ডসীয়ারের ন্যায় তাঁহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উপস্থিত করিতেন।

এই প্রবন্ধের ডালকুত্তার মুখে যে দুঃখের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি কেহ চিত্রে অঙ্কন করিতেন, তাহা হইলে তিনিও পূর্ব্বোক্ত তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিস্তার পাইতেন না। এই সঙ্গে মুদ্রিত "আলেকজান্দার ও ডিয়োজিনিস" এবং "টমকাকা ও তাহার স্ত্রীকে বিক্রয়

করা হইবে" নামক ল্যাণ্ডসীয়ারের ছই খানি চিত্রে অঙ্কিত কুকুরদের মুখে মনুষ্যসুলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিখ্যাত সমালোচক রাস্কিনও তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

কতকগুলি কুকুর ও বিড়ালের মুখে এইপ্রকার বিস্ময়জনক অন্যান্য ভঙ্গী সকলও দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের যতরকম মুখভঙ্গী আছে, তাহার মধ্যে ভ্রূকুটি খুব প্রসিদ্ধ। কতকগুলি কুঞ্চিত মাংসপেশীর সঙ্কোচের নিমিত্ত ভ্রূগণ একত্র হইয়া নীচে নামিয়া আসে এবং সেইসঙ্গে কপালের উপর সোজা সোজা রেখার সৃষ্টি করে। যথার্থই ভালকুত্তার মুখে ভ্রূকুটি সদাসর্ব্বদাই বর্ত্তমান। কুকুরেরা বিরক্তি বোধ করিলে ভীষণ ভাবে ভ্রূকুটি করে। ক্রোধে ঠোঁটফুলান-পশুপক্ষী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কোন সাহেব চিড়িয়াখানায় সিম্পাঞ্জীকে একটি

সিম্পাঞ্জীর মুখভাব ভঙ্গী

কাকাতুয়ার ভঙ্গী

কমলা লেবু দিয়া তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তখন সেই জন্তুর মুখে ক্রোধ ও অপ্রসন্নতার ভাব স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বানরগণ প্রায়ই হাসে; বিশেষতঃ তাহাদের বগলে কাতুকুতু দিলে আর রক্ষা নাই!

ওই সিম্পাঞ্জীর মুখে যে প্রেমবিহ্বল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কি আর কাহারও সন্দেহ আছে? ইহার ন্যায় কুৎসিতাকৃতি প্রণয়মুগ্ধ কোন মানুষ কি নীরবে ইহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসা জানাইতে পারিত! জন্তুর মুখে ইহা যদি মনুষ্যসুলভ ভাবভঙ্গী না হয়, তবে সেরূপ চিহ্ন আর কি আছে বলিতে পারি না। এই মুখভঙ্গী যে কেবল চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে। ছবির কাকাতুয়াজাতীয় পাখীটির মুখে কেমন হাস্যোদ্দীপক প্রগল্‌ভতা ও বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! দেখিলে মনে হয়,যেন রঙ্গমঞ্চের কোন দক্ষ অভিনেতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে ভাঁড়ের অংশ অভিনয় করিতেছে!

পশুপক্ষীর মুখে মনুষ্যসুলভ ভাবভঙ্গীব্যঞ্জক চিত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে, যথার্থই সেগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়াইবে। পরিশেষে আমার এই বিনীত নিবেদন যে, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ তাঁহাদের গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল কিংবা অন্যান্য পশুপক্ষীর এইরূপ বিশেষভাব-প্রকাশক ফোটোচিত্র পাঠাইলে লেখক বিশেষ বাধিত হইবে ও পত্রিকাসম্পাদক মহাশয়গণও বোধ হয় সেগুলি সাদরে গ্রহণ করিবেন ও প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিলে যথাকালে পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

বন্য জন্তুর ফটো

জঙ্গলে ক্যামেরা লইয়া সাহেব

পূর্ব্বে শিকারীরা বন্দুক লইয়া বন্য জন্তু শিকার করিতে যাইতেন; এখন, অনেকে ক্যামেরা লইয়া বন্যজন্তুর ফটো তুলিতে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে গমন করেন। জন্তু শীকার করা অপেক্ষা এ কার্য্যে প্রাণনাশের আশঙ্কা অধিক। এবং শিকারের ন্যায় ইহাতেও যে, বিশেষ সাহস, ধৈর্য্য ও বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। বন্যজন্তুদের নিকট হইতে ৫।৬ গজ মাত্র দূরে থাকিয়া প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ইহাদের ফটো তুলিতে হয়।

রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে উহাদের ফটো তোলাই বিশেষ সুবিধাজনক। এখানে একটি শৃগাল ও একটি বাঁদরের ফটো দেওয়া হইল। মিঃ কার্টন এই ফটোগুলি তুলিয়াছেন।

মিঃ কার্টনই প্রথম বোধ হয় বন্যজন্তুর ফটো তুলেন। একবার ব্রিটিস ইষ্ট আফ্রিকায় ভ্রমণের সময় তিনি একটি সিংহের ফটো তুলিয়াছিলেন। ব্রিটিস ইষ্ট আফ্রিকা বিভিন্ন প্রকার বন্য জন্তুর বাসস্থান। একটি ছোট খালের ধারে, যেখানে সিংহেরা আহারের পর জলপান করিতে আসে, সেখানে তিনি লুকাইয়া ছিলেন। নিকটেই ক্যামেরা ও বৈদ্যুতিক আলোর কল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অদূরে সিংহের গর্জ্জন নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। এই কার্য্যে তিনি যে কতবার আসন্নমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। একদিন রাত্রিকালে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি সিংহ জলপান করিতে আসিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ আলোর কলটি টিপিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটা ফাকা আওয়াজ করিলেন। সিংহ একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তারপর সব একেবারে চুপ চাপ! দিনের বেলা দেখিতে পাইলেন যে, সিংহটি ক্যামেরার উপর দিয়া লাফাইয়া গিয়াছে, এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে চামড়ার আচ্ছাদনটি তাহার উপর ছিল, সেটিও লইয়া গিয়াছে। উপরের ছবিটি মিঃ কার্টনের এবং নীচের খানি সেই সিংহের ছবি। যে রকম করিয়াই ছবিখানি ধরা হউক না কেন, সিংহটি সর্ব্বদাই দর্শকগণের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

জেব্রারা বড়ই লাজুক জন্তু। তাহাদের ফটো তোলা বড়ই শক্ত। রাত্রিতে তাহাদের সাদা সাদা ডোরা ডোরা দাগগুলি অস্থিপঞ্জরসার জন্তুর ন্যায় দেখায়।

একটি সিংহ জলপান করিতে আসিতেছে

জাহাজ ডুবি

[শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী]

সাগরে জাহাজ ডুবিয়া যায়, কত লোক মরে। কিন্তু জাহাজ-নির্ম্মাণের এত উন্নতির দিনে জাহাজগুলিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা তদ্দুর ফলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কতগুলি বড় বড় জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এইচ, এম্, এস, ব্যাকচারস্ নামক জাহাজখানি চীন উপকূলের চিক অন্তরীপের নিকট নিমজ্জিত হয়। ইহাতে ৯৯টী প্রাণী জীবন হারায়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশের কেপরেস নামক স্থানে অ্যাংলো স্যাক্সন নামক একখানি ডাকবাহী জাহাজ ডুবিয়া যায়। সেদিন ভয়ানক কুয়াসা হইয়াছিল, কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। এই জাহাজ-ডুবিতে ২০৭ জন লোক মারা যায়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন নামক একখানি জাহাজ মেলবোর্ণে যাইতেছিল। সেই সময়ে বিস্কে উপসাগরে জাহাজ জলে ভরিয়া যাওয়ায় ডুবিয়া যায়। ইহাতে ২২০ জন লোক ডুবিয়া যায়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৯এ অক্টোবর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভারজিন দ্বীপের সেণ্ট টমাস নামক স্থানে ভয়ানক ঝড় হয়। সেই ঝড়ে রাজকীয় ডাক জাহাজ "রোন ও ওয়াই" জাহাজখানি ও আরও ছোট ছোট পঞ্চাশখানি জাহাজকে ডাঙ্গায় লইয়া ফেলে ও তাহাতে জাহাজগুলি একেবারে টুকরা টুকরা হইয়া যায়। প্রায় ১০০০ লোক মারা যায়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর এইচ, এম, এস, কাপ্টেন ফিনিস্টারির নিকট ডুবিয়া যায়। ৪৮৩ জন লোক ডুবিয়া যায়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী নর্থফ্লিট জাহাজ ডান্জেনেস্ হইতে একটু দূরে গুতা লাগিয়া মগ্ন হইয়া যায়। ৩০০ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল হোয়াইট ষ্টার লাইনের আটলাণ্টিক জাহাজ হ্যালিফাক্সে যাইবার সময় জলে নিমগ্ন পাহাড়ের ধাক্কা খাইয়া নিমজ্জিত হয়। ৫৬০ জনের জীবন নষ্ট হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর কস্প্যাট্রিক্ জাহাজ নিউজিল্যাণ্ডের অক্ল্যাণ্ড নামক স্থানে যাইবার সময় আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ৪৭০টি লোক পুড়িয়া ও ডুবিয়া মরে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নবেম্বর বিটীশ কলোম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া হইতে কালিফোর্ণিয়া যাইবার সময় কেপ ফ্লাটারির নিকটে পেসিফিক্ জাহাজে জল প্রবিষ্ট হওয়ায় জাহাজখানি ডুবিয়া যায়। ১৫০ জন লোক মারা যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মার্চ্চ এইচ্, এম, এইচ্, ইউরিডাইস্ ওয়াইট দ্বীপের ভেণ্টনারের নিকট জল প্রবেশ করায় ডুবিয়া যায় ও ৩০০ প্রাণ নষ্ট হয়। ঐ বৎসরই ৩রা সেপ্টেম্বর "প্রিন্সেস্ আলিস্" উইলউইচের নিকট টেমস্ নদীতে নিমগ্ন হয়। ৬০০ হইতে ৭০০ জীবন নষ্ট হইয়াছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মাসে "বরুছিয়া" নামক একখানি ডমিনিয়ন ষ্টিমারের তলা ফুটা হইয়া যায় ও আটলান্তিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়। ১০০ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩০এ আগষ্ট উত্তমাশা অন্তরাপের নিকট জলে নিমগ্ন পাহাড়ের সহিত ধাক্কা লাগায় একখানি জাহাজ ডুবিয়া যায় ও ২০০ লোকের জীবন নষ্ট হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই "ল্যাকসহাম" জাহাজ ফিনিসটারির অন্তরীপে গুতা লাগিয়া ধ্বংস পায়। ১৩০ জন লোক মারা যায়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল "বোষ্টন" নামক একখানি সিঙ্গাপুরের ষ্টিমারে জল প্রবেশ করায় ডুবিয়া যায় ও ১৫জন লোক প্রাণ হারায়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারী "কোয়েটা" জাহাজ জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা লাগায় নিমগ্ন হয় ও ১৩০ জন লোক মারা যায়। ঐ বৎসরই ১০ই নবেম্বর এইচ, এম্, এচ,

সার্পেণ্ট জাহাজ করুণার উপকূলের একটু দূরে ধ্বংস হয়। ১৭৩টি লোক মারা যায়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে জিবরালটার উপসাগরে "উটপিয়া" জাহাজের সহিত "এনসন" নামক একখানি যুদ্ধ জাহাজের গুঁতা লাগায় তাহা ডুবিয়া যায় ও ৫৬০ জন লোক মারা যায়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী "ঋামোচা" নামক একখানি ব্রিটিশ ষ্টিমারে জল প্রবেশ করায় চীন উপকূলে ডুবিয়া যায়। ৫০৯ জন লোক মারা যায়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুন "ভিক্টোরিয়া" জাহাজের সহিত "কম্পনার ডাউন" নামক আর একখানি জাহাজের সংঘর্ষ ঘটে; এই সংঘর্ষে পূর্ব্বোক্ত জাহাজখানি সিরিয়ান উপকূলে ডুবিয়া যায় ও প্রায় ৩৫০ জন লোক মারা যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী লোয়েষ্ট অফ্টের নিকট "এল্ব" জাহাজ মগ্ন হয় ও ৩৩৪ জন লোককে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ক্যাসকোমেটের নিকট কুয়াসার মধ্যে যাইতে যাইতে "ষ্টেলা" জাহাজ এক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া মগ্ন হইয়া যায় ও ১৪০টি লোক মারা যায়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর সেণ্ট ম্যালো হইতে একটু দূরে "হিলতা" জাহাজ ডুবিয়া যায় ও ১২৮ জন লোক প্রাণ হারায়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ ফেব্রুয়ারী মাশ্বাসের মুখে "বার্দ্দিন" জাহাজ ডুবিয়া যায় ও ১২৮ জন প্রাণ হারায়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী "লিমা" জাহাজ হুয়ামব্রিন দ্বীপের নিকট ডুবিয়া যায়। ৫০ জন লোক মারা যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর স্পারটান অন্তরীপের নিকট "দিল্লী" জাহাজ ডুবিয়া যায় ও ছয়জন ফরাসী খালাসী আরোহীদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করে। ডিউক অব ফাইফ এই জাহাজে ছিলেন; তিনিও মারা যান।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ "ওশেনিয়া" বিচীহেডের নিকট একখানি জর্ম্মাণ জাহাজের গুঁতা লাগায় ডুবিয়া যায় ও ৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পরই সেই বিশালকায় জাহাজ "টাইটানিকে"র বিনাশে বিগত বৎসর ১৫ই এপ্রিল ১৫০০ লোক প্রাণ হারায়। পৃথিবীতে এত বড় জাহাজ ও এত লোক জাহাজ ডুবিতে কখনও ধ্বংস হয় নাই।

আর সেদিন "এম্প্রেস অব আয়র্লাণ্ড" ডুবিয়াছে।

শূন্যে রেলগাড়ী

অদ্ভুত আবিষ্কার! শূন্যে—কোনও অবলম্বন ব্যতীত, শুধু তাড়িতবলে রেলগাড়ি চলিবে। কোনও রূপ রেলপথ পাতিতে হইবে না, গাড়ীর চাকা বা এরোপ্লেনের মত পাখা থাকিবে না, অথচ শুধু তাড়িতবলে প্রচণ্ডবেগে এই গাড়ী চলিবে। বেগ অভাবনীয়—ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৫০০ মাইল। এমিলি বেস্‌লেট নামে একজন ফরাসী ইহার উদ্ভাবক। ইনি জাতিতে ফরাসী, কিন্তু আবাল্য আমেরিকা-প্রবাসী। কিরূপে ইনি এই অপূর্ব্ব-যানের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহার এক আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়াছেন।

এমিলি সাহেব বলেন, এই আবিষ্কার, তাঁহার এক দিনের আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রায় ২০ বৎসর তিনি এই বিষয়ের চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রথম কল্পনা হইতে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কত শত পরীক্ষা করিয়াছেন, কত বিনিদ্র রজনী অভাবের অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনই হতাশ হন নাই। একদিন না একদিন সুদিন আসিবে, আশার এই সঞ্জীবনী শক্তিবলে তিনি চিরসমুৎসাহী ছিলেন।

সে আজ ২০ বৎসরের কথা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাড়িতবলে বিবিধ পীড়া প্রতীকারের উপায় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে এক যুগ বা দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া যায়। এই দীর্ঘকালে বিভিন্ন স্নায়বিক ও যান্ত্রিক পীড়ার উপযোগী বিবিধ তাড়িতযন্ত্র নির্ম্মাণ ব্যতীত

বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অর্থোপার্জ্জনও তাহাতে হয় নাই। তবে পীড়া প্রতিকারের জন্য এই সকল পরীক্ষা হইতে লক্ষ্য করেন, তাড়িত-প্রবাহে শোণিতকোষ আকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট হয়। এই ঘটনা হইতে তাঁহার মনে হয়, যদি তাড়িতপ্রবাহে শোণিত-কোষ আকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট হয়, তবে এই শক্তি ধাতব পদার্থের উপরেই বা কেন না আপনার প্রভাব প্রকাশ করিবে। এই ধারণায় তিনি একে একে সকল ধাতুর উপরেই তাড়িতের পরীক্ষা করিতে থাকেন। সেই পরীক্ষায় দেখেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাড়িত-তরঙ্গ প্রতিহত করিবার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু ব্যবসায়ের পক্ষে দুর্মূল্য স্বর্ণরৌপ্যাদি অপেক্ষা এলুমিনিয়ম ও তাম্রই সর্ব্বাধিক উপযোগী। এই সম্বন্ধে পরীক্ষার প্রত্যেক বিবরণ প্রকাশ অনাবশ্যক এবং পাঠকদিগেরও তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। তবে মূল কথা এই, এইরূপেই তিনি স্থির করেন, কিরূপ তাড়িতশক্তি সঞ্চালনে কতটা মাধ্যাকর্ষণশক্তি বা দ্রব্যের ভার প্রতিহত করিয়া, কতটা পরিমাণে পদার্থ শূন্যে বিপ্রকৃষ্ট করিতে পারে? ইহা হইতেই গাড়ীর কল্পনা এবং উহার তলদেশ এলুমিনিয়মময় করিবার ব্যবস্থা। তাড়িতপ্রবাহ এই গাড়ীর তলদেশে বিপ্রকর্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়িত-পরিচালক স্তম্ভ-নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা আছে। এই হইল মূল সূত্র। এমিলি ইহার উদ্ভাবনা করিয়া বলিলেন, মূল এই, এখন অবশিষ্ট কার্য্য ইঞ্জিনিয়ারের। যেমন বিশ্বকর্ম্মা—সঙ্গে সঙ্গে অমনই বিয়াল্লিশকর্ম্মা; বার্মিংহাম-নিবাসী ইসন সাহেব যথোপযুক্ত রেলগাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর। কার্য্যপ্রণালী স্থির। বার্মিংহাম হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত এই গাড়ীতে দিবসে ৫০ বার মেল যাতায়াত করিতে পারিবে। এমিলি সাহেবের হিসাবে এক মণ দশ সের ভার বহিবার জন্য লইয়া এক মাইল পথ-প্রস্তুতে আনুমানিক ৫ হাজার পাউণ্ড পড়িবে এবং সমুদয় ঠিক করিতে ৩ মাস সময় লাগিবে। তবে এখন ইহাতে মাত্র মাল যাইবে, মানুষের গমনাগমন চলিবে না। কার্য্যতঃ, একটা হইলে অপরটাও বাকি থাকিবে না—তাহা ভবিষ্যতে নূতন উদ্যোগীর উদ্যোগসাপেক্ষ।

প্রবাসে

[শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী]

আজি এ প্রবাসে তোমারি আসন
পেতেছি মানস-কক্ষে,
তোমারি সরল সজল নয়ন
ভাসিছে আমারি চক্ষে;
এখানে তটিনী তোমারি বারতা
গাহিছে মধুর ছন্দে,
উতলা বাতাসে নব ঝরা ফুল
পাগল করিছে গন্ধে।
অতীতের স্মৃতি খেলিতেছে মনে—
দেখিতেছি দিবা-স্বপ্ন,
আকুল করিতে সুদূর প্রবাসে
আজিকে জাগিছে প্রত্ন।
ক্ষণ-ব্যবধানে আজিগো জেনেছি—
আমার তুমি কি রত্ন,
তোমাতে নিহিত রয়েছে আমার
বাসনা, সাধনা, যত্ন।
জেনেছি প্রবাসে—'কে তুমি আমার'—
বুঝেছি মিলন-অর্থ;
এ দূর প্রবাসে তোমার মিলন
অলীক-স্বপন ব্যর্থ।

আমার য়ুরোপ ভ্রমণ

[মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর্ শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ K. C. I. E., K. C. S. I., I. O. M.]

পেরিস

প্রাতঃকালে লুজার্ণ ত্যাগ করিলাম। এইবার ফ্রান্সের রাজধানী পেরিস যাইতেছি। অপরাহ্নকালে যখন পেরিসে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, বাদলা-বৃষ্টি ও মেঘ আমাদের পূর্ব্বের গাড়ীর আরোহী হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই পেরিসে উপস্থিত হইয়া, আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা পেরিসে পৌঁছিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে বেলি নামক ষ্টেসনে মালপত্র পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। বেলি হইতে পেটিট-ত্রয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত স্থান জার্ম্মানদিগের অধিকারভুক্ত।

পেরিস ষ্টেসনে আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; রাস্তাঘাট আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে; সুতরাং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও আমরা সহরের শোভা দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে ঠিক্ মানানসই অট্টালিকাসমূহ ও সুন্দর রাজপথগুলি দেখিয়া আমরা প্রথমেই বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিলাম। ষ্টেসন হইতে আমরা বরাবর বুলাভাঁর্ড ডি ক্যাপুসিনে অবস্থিত গ্রাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলের নামটী 'গ্রাণ্ড' হইলেও সেখানকার বন্দোবস্ত তেমন গ্রাণ্ড নহে। বাড়ীটী বেশ বড়, কিন্তু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত বড়ই অপ্রীতিকর, এমন কি, এত বড় বাড়ীটার উপযুক্তসংখ্যক ভৃত্য পর্য্যন্ত ছিল না। রাত্রিতে আর কোথাও বাহির হইলাম না; ফরাসী রাজধানীতে প্রথম রাত্রিটা বিশ্রামেই কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একখানি মোটর ভাড়া করিয়া রাজধানী দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই আমরা মেডিলিন গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। প্রথম নেপোলিয়ন এটিকে গৌরবমন্দির (Temple of Glory) করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্থির হইয়াছিল যে, এ ষোড়শ লুই ও এণ্টোইনেটির কীর্ত্তিমন্দির-রূপে ব্যবহৃত হইবে। আমরা যখন মন্দিরে পৌঁছিলাম, তখন উপাসনা হইতেছিল, আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই গান শুনিলাম; গানগুলি বেশ প্রাণস্পর্শী ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক; কিন্তু দেখিলাম, উপাসকমণ্ডলী তেমন ধর্ম্মপ্রাণ নহেন; তাঁহারা অতিশয় চাঞ্চল্য ও অমনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা সেই পৃথিবীবিখ্যাত ভ্রমণ-স্থান দেখিতে গেলাম; ইহার নাম প্লেস্-ডি-লা-কনকড। (Place de la Concorde) এই স্থানে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, পেরিসে এই সকল ভ্রমণস্থান, মনুমেণ্ট, চত্বর প্রভৃতি নির্ম্মাণে কত অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই স্থানের চারিদিকেই অশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় রহিয়াছে। একপার্শ্বে দেখিলাম, 'চেম্বার অব ডেপুটী' নামক বিশাল ও পরম সুদৃশ্য অট্টালিকা; তাহারই অপর প্রান্তে মেডিলিন
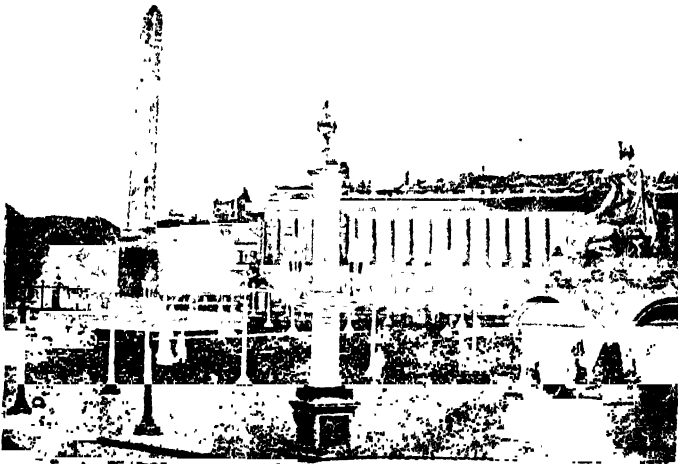
প্লেস্-ডি লা কন্‌কর্ড

গীর্জ্জা ; পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তুলারি উদ্যান শোভাসৌন্দর্য্যে দিক আলো করিয়া আছে ; তাহারই পশ্চাতে লুভ্রি রাজপ্রাসাদ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারই অপর পার্শ্বে পশ্চিমদিকে ভুবনবিখ্যাত সাঁপিলিজি (Champs Elysas ;) আবার ইহারই প্রান্তভাগে নেপোলিয়নের গৌরব তোরণ। এই স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিখণ্ড রহিয়াছে, তাহার চারি পার্শ্বে ফ্রান্স দেশের বিভিন্ন প্রদেশের রূপক প্রস্তরমূর্ত্তি সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রসিয়ান যুদ্ধে ষ্ট্রাসবার্গ ফরাসীদিগের হস্তচ্যুত হয় ; তাহারই একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে রহিয়াছে, উহা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত। এই চত্বরের কেন্দ্রস্থানে একটি প্রস্তরবেদী আছে ; তাহারই নিকটে হতভাগ্য ষোড়শ লুই ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গিলেটিনে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মোটামুটি বলিতে গেলে, প্লেস-ডি লা-কন্‌কর্ডকে কেন্দ্র করিয়া যথাযোগ্য ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, ফরাসী রাজধানীর যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সমস্তই ঐ বৃত্তের পরিধির মধ্যে পতিত হয়।

লুভ্রি প্রাসাদ

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা লুভ্রি বাগানের মধ্য দিয়া সাঁও সাপিল গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। সম্রাট লুই পায়স্ নির্ম্মিত এই গীর্জ্জায় এখন আর উপাসনা হয় না, ইহা এখন গীর্জ্জা রূপেই ব্যবহৃত হয় না—শুধু একটা দর্শনীয় অট্টালিকারূপে ইহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই গীর্জ্জার গম্বুজ এমন সুন্দর এবং এত উন্নত ও মনোহর কারুকার্য্য-খচিত যে, আমি য়ুরোপে এমন সুন্দর গির্জ্জা আর একটা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহারই পার্শ্বেই বিচারালয় (The Palaces of Justice) ; ইহাও একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। তাহার পরই আমরা সুপ্রসিদ্ধ নোটার ডেম (Notre Dame) দেখিতে গেলাম। রাজা নবম লুই জেরুজালেম হইতে এই পবিত্র মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত অনেক দ্রব্য আনিয়াছিলেন। এখান হইতে আমরা রাজধানীর শব-ব্যবচ্ছেদাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানকার দৃশ্য যে সুন্দর, তাহা নহে ; মৃতদেহ দেখিবার জন্য কাহারও তেমন ঔৎসুক্যও জন্মে না। আমার সহযাত্রিগণ এখানে যাইতে চাহিলেন না ; কিন্তু আমার অনুরোধেই তাঁহারা এখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পেরিসের রাজপথে বা এখানে সেখানে প্রতিদিন কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ; তাহাদের অনেকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ এখানে লইয়া আসা হয় এবং একটি বায়ুশূন্য কাচের ঘরে রাখা হয়। তাহাদিগকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, সেই পোষাকেই এই ঘরে রাখা হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত তাহাদের মৃতদেহ এই ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। দলে দলে লোক এখানে

সাঁপিলিজি

নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয় বন্ধুগণের সন্ধানে আগমন করিয়া থাকে; অনেকে হয়ত কোন মৃতদেহ তাঁহাদের আত্মীয়ের বলিয়া সনাক্ত করে এবং এখান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া থাকে; আর তিনদিনের মধ্যেও যাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগকে সমাহিত করা হয়। আমরা যখন এই স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনটি শবদেহ ঐ স্থানে ছিল। এ ব্যবস্থা আমার নিকট খুব ভাল বলিয়া মনে হইল; কারণ পেরিসের মত সহরে প্রতিদিন যে কত গুপ্তহত্যা হয়, তাহা বলা যায় না। এই ব্যবস্থা থাকায় অনেক মৃতব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্যান্টেয়ঁ

ইহার পরেই আমরা প্যান্টেয়ঁ (Pantheon) দেখিতে গিয়াছিলাম; রোমে যাহা দেখিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক তাই। এখানে যে সমস্ত চিত্র রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ফ্রান্স দেশের ইতিহাসেরই অনেকগুলি আলেখ্য। এই স্থানে ভলটেয়ার, ভিক্টর হুগো প্রভৃতির সমাধি-মন্দির দেখিলাম। ইহারই নিকটে সেণ্ট এটিনি ডুমোঁ গীর্জ্জা দেখিলাম; এই স্থানে ফ্রান্সের রক্ষকদেবতা মহাত্মা সেণ্ট জেনিভির প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির আছে।

হুস্থসৈনিকাশ্রম (ইনভ্যালিড্‌স্)

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা যে স্থানে গমন করিলাম, সেই স্থানটী দেখিবার জন্য বহুদিন হইতে আমার আগ্রহ ছিল। ইহার নাম ইনভ্যালিড্‌স্ (Invalides) বা দুস্থসৈনিকাশ্রম। এখানে অসমর্থ সৈনিকপুরুষগণের আবাসস্থানের নিকট রাজকীয় উপাসনা-মন্দিরের মধ্যে মহারথী নেপোলিয়নের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। সেণ্ট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের মৃতদেহ আনীত হইয়া এই স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়। ক্রিমিয়া যুদ্ধে যে সকল সৈনিক পুরুষ আহত হইয়া কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সপরিবারে এই অসমর্থাশ্রমে এক্ষণে বাস করিতেছেন, এবং ইহারই এক অংশে পেরিসের সৈনিকবিভাগের গবর্ণরও বাস করিয়া থাকেন। এখানকার রাজকীয় গীর্জ্জায় পূর্ব্বে উপাসনা হইত, এখন আর উপাসনা হয় না, তৎপরিবর্ত্তে ফ্রান্সের মহাবীর বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন এখানে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন। এই সমাধির একটা বিশেষত্ব আছে; ইহা সমতলভূমিতে নির্ম্মিত হয় নাই; সমতলভূমির অনেক নিম্নে ভূগর্ভে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। সমাধিমন্দির খুব যে সুদৃশ্য বা প্রকাণ্ড, তাহা নহে। রুষসম্রাট নিকোলাস এই সমাধি নির্ম্মাণের জন্য রক্তবর্ণের গ্রানাইট প্রস্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারই দ্বারা সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাধির উপরে মার্ব্বেল-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি আছে, তাহা যুদ্ধজয়ের (Victory) মূর্ত্তি। এই মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেকগুলি পতাকা সজ্জিত আছে;

নেপোলিয়ন এই সকল পতাকা ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুদ্ধজয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমাধিস্থানে যাইবার পথে দ্বার অতিক্রম করিলে একস্থানে নেপোলিয়নের তরবারি, তাঁহার সেই সর্ব্বজন পরিচিত টুপী এবং ধূসরবর্ণের অঙ্গাবরণ রক্ষিত হইয়াছে। সকলেই এই স্থানে প্রবেশ করিয়া এ সকল দ্রব্য দেখিতে পায় না; অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই এখানে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে; এমন কি, যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী ব্যতীত অপর মন্ত্রিগণও এখানে যাইতে পারেন না; কয়েকজন বিদেশীয় নৃপতির এখানে প্রবেশের অধিকার আছে। ভূগর্ভস্থ এই সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য উপরিস্থিত সমতল স্থানের চারিদিকে রেলিং দিয়া ঘেরা আছে। সেই স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিয়া সকলকে এই সমাধি-মন্দির দেখিতে হয়। মহাবীর নেপোলিয়নের সমাধি-মন্দির ভূগর্ভে নির্ম্মিত হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। আমি সেই ইতিহাস এখানে বর্ণনা করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনায় প্রাণত্যাগ করিলে প্রথমে তাঁহাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়; তখন ফ্রান্সের লোকেরা কিছুই বলিল না, বা কিছুই করিল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ফ্রান্সের অধিবাসিবৃন্দ বুঝিতে পারিল যে, নেপোলিয়নের মৃতদেহের প্রতি এ প্রকার অবজ্ঞাপ্রদর্শন কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে; তখন তাঁহার মৃতদেহ সেণ্ট হেলেনা হইতে মহাসমারোহে পেরিসে লইয়া আসা হইল। তখন বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ সমাধিমন্দিরের নানাপ্রকার নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজনের প্রেরিত নক্সা মঞ্জুর হইল; তিনি কিন্তু সমাধি-মন্দিরটি ভূগর্ভে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নাকি উত্তর দেন যে, "As all nations had bowed to the Emperor when he lived, let them still bow their head when looking at the tomb"—অর্থাৎ "সম্রাট যখন জীবিত ছিলেন, তখন সমস্ত জাতি তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক হইয়াছিল, এখন তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিবার জন্যও তাহাদিগকে অবনত-মস্তক হইতে হইবে।" এই কারণেই তিনি মন্দিরটি ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কথাটী অতি সুন্দর! এই মহাবীরের সমাধি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে এমন বিষাদের সঞ্চার হইয়াছিল যে, আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া ক্রিমিয়া-যুদ্ধাগত যে বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ আমাকে এই সমাধি মন্দির দেখাইতেছিলেন, তাঁহারও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি যদিও একজন সামান্য সৈনিক, এবং এখন তিনি এই সাধারণতন্ত্রের অধীনে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বসবাস করিতেছেন, তবুও তিনি তাঁহার সেই প্রিয় সম্রাটের কথা ভুলিতে পারেন নাই দেখিয়া, আমার হৃদয়ে বড়ই প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। নেপোলিয়ন দস্যু এবং হত্যাকারী তাহা জানি; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই একজন মহাবীর বলিয়া আমি তাঁহাকে গৌরবের উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আসিয়াছি। আজ তাঁহার সমাধি-স্থান দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। নেপোলিয়নের দুই ভ্রাতা জেরোমি ও লুইয়েরও সমাধিদ্বয় এই মন্দির-পার্শ্বেই রহিয়াছে। এই সমাধি-স্থান দর্শনের পরই আমরা পেরিস নগরী ঘুরিয়া দেখিতে গেলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা—কোনটি বা সরকারী অফিস, কোনটী বা হোটেল, কোনটি বা বড় বড় সওদাগরদিগের কার্য্যালয়। এতদ্ব্যতীত স্মৃতি-মন্দির, জয়-স্তম্ভ প্রভৃতিরও অভাব নাই। ফরাসী-বিপ্লবের সময় যে সকল অট্টালিকা রাজনৈতিক অপরাধীদিগের কারাগার-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা

নেপোলিয়নের সমাধি

দেখিয়া মনটা যেন কেমন দমিয়া গেল। এ বেলার মত ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্নকালে পুনরায় সহর দেখিতে বাহির হইলাম। পেরিসের মত সমৃদ্ধিশালী স্থান বোধ হয় আর কোথাও নাই; একবার সহরটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই ফরাসী রাজধানীর শোভাসৌন্দর্য্য ও প্রভূত ধনসম্পদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বেলা বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা রুঁ লাফেঁইটের ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড নাট্যশালা দেখিতে গেলাম; এত বড় নাট্যশালা নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। তাহার পর বুঁটে সাঁমোঁ ভ্রমণ-স্থানের মধ্য দিয়া আমরা পিবিলাসে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেক
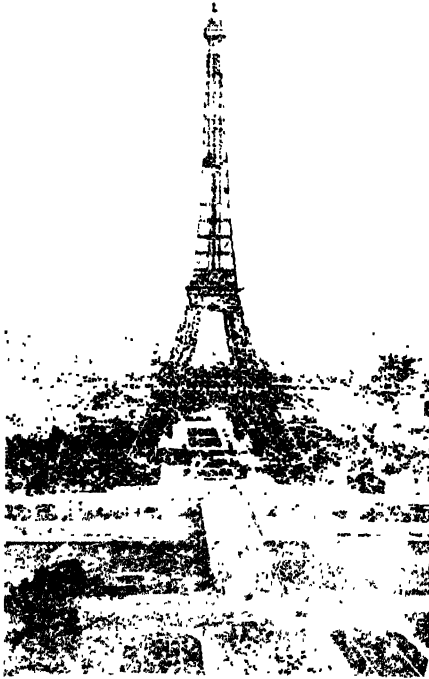
ইফেল স্তম্ভ

গুলি বড় বড় প্রেসিডেন্টের সমাধি-মন্দির দেখিলাম। নেপোলিয়ানের সমাধি-মন্দিরের যিনি নক্‌সা করিয়াছিলেন, সেই ভাইকন্‌টির সমাধি-মন্দিরও এইস্থানে রহিয়াছে। এইস্থানে আর একটি সমাধি-মন্দির আছে, তাহারও নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। এটি আবিলার্ড ও হিলোইসের সমাধি; প্রেমিক প্রেমিকাগণ এই মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন এবং ইহার ইতিহাস পাঠ করিয়া শিক্ষালাভও করিয়া থাকেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর।

এইবার আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্য দেখিতে গেলাম—ইহা সেই বিশ্ববিখ্যাত ইফেল স্তম্ভ! পথের মধ্যে সমাট চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলের সুন্দর তোরণদ্বার দেখিলাম; সেই সময়ের স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে এখন এইটি মাত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইফেল স্তম্ভ এক হাজার ফিট উচ্চ। ইহাতে কয়েকটি তলা আছে; প্রত্যেক তলায় নানাবিধ জিনিসের দোকান, হোটেল, বিশ্রামাগার প্রভৃতি রহিয়াছে। আমরা বৈদ্যুতিক অধিরোহণীতে আরোহণ করিয়া এই স্তম্ভের উপর উঠিয়াছিলাম। অধিরোহণী প্রত্যেক তলায় একবার করিয়া থামে এবং আরোহিগণ সেই সেই তলায় নামিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করে, পান ভোজন করে এবং সেই তলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিম্নের দৃশ্য দেখিয়া থাকে। অধিরোহণী এই স্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ তলা পর্য্যন্ত যায় নাই; এ তলায় উঠিতে গেলে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়। সর্ব্বোচ্চ তলা হইতে নিম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সহর, বাজার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া বোধ হয়, মানুষগুলাকে ছোট ছোট পিঁপড়ার মত দেখায়। আমরা যে অধিরোহণীতে চড়িয়া স্তম্ভে উঠিয়াছিলাম, সেই অধিরোহণীতে একটি রুষ মহিলা আমাদিগের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তিনি আমার কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমাকে ভারতীয় কোন রাজা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। ইফেল স্তম্ভের প্রত্যেক তলা ভ্রমণ করিয়া এবং চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া আমরা ক্রোকাদেরো প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রাসাদের প্রকাণ্ড হলে বড় বড় গানবাজনার মজলিস্, বড় বড় বক্তার বক্তৃতা ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক বিতরণের সভা হইয়া থাকে; ইহা লণ্ডনের আলবার্ট হলের মত।

পেরিস সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রতিধ্বনি।

মহালয়া

মহালয়া এই শব্দটি দুই প্রকারে গঠিত হইতে পারে। 'মহৎ' শব্দের সহিত 'আলয়' শব্দের যোগে এক প্রকারে এবং 'মহৎ' শব্দের সহিত 'লয়' শব্দের যোগে অন্য প্রকারে। এক্ষণে কোন্ প্রকারের যোগ গ্রহণ করিলে অর্থের সুসঙ্গতি হইবে, তাহাই বিবেচ্য। প্রথম প্রকারের যোগের সমর্থনে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় প্রকারে পাওয়া যায়। শেষোক্ত যোগ গ্রহণ করিলে এই হয় যে, "মহান্ লয় অর্থাৎ বিলয় হয় যাহাতে।" কৃষ্ণপক্ষ যখন "মহালয়" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং অমাবস্যাতে যখন মহালয় পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে, তখন "চন্দ্রের সম্পূর্ণ লয় হয় যাহাতে" এইরূপ তাৎপর্য্য সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য বা প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি না! কারণ, "চন্দ্রের লয় হয়" বলিয়া যদি মহালয়ার নাম হইবে, তবে প্রত্যেক 'কৃষ্ণপক্ষ ও প্রত্যেক 'অমাবস্যাই' 'মহালয়া' নাম পাইতে পারে; কেবল আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ ও অমাবস্যাই বিশেষ করিয়া এই নাম পাইতে যায় কেন? এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, "সূর্য্যের মহান্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ 'লয়' অর্থাৎ অস্ত হয় যাহাতে"—ইহাই "মহালয়া" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

আষাঢ় মাস হইতেই সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতি আরম্ভ হয়। আশ্বিনমাসে সূর্য্য বিষুব-রেখার উপর আসিলে দিবা-রাত্রি সমান হয়। সূর্য্য যে কাল পর্য্যন্ত বিষুবরেখার নিম্নে দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত গমন করিতে থাকে—সেকাল পর্য্যন্ত উত্তর-কুরু হইতে তাহা দৃষ্ট হইবার আর কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণে যখন সূর্য্যের উত্তর দিক হইতে গতি আরম্ভ হয়, তখনই আবার তাহার দেখা পাইবার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এই অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল উত্তর-মেরুর নিকট সূর্য্য অস্তমিতই থাকে। ইহাই সূর্য্যের "মহালয়" বা মহাস্ত।

কিন্তু এই মহাস্তের সহিত "মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের" সম্পর্ক কি? আমরা জানি যে, রাত্রিভাগে সাধারণ দৈব বা পৈত্র্যকার্য্য করিবার নিয়ম নাই। উত্তর-কুরু হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে কয়েক মাসের জন্য অস্তমিত হইলে তথায় সেই কয়েক মাস কেবল রাত্রিই বিরাজ করিতে থাকে। সুতরাং তখন শ্রাদ্ধাদি পৈত্র্য কার্য্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই আর্য্যগণ সূর্য্যাস্ত কালের জন্য পিতৃগণের পিণ্ডোদকের সঞ্চয় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপিয়া তর্পণ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়, আশ্বিন কার্ত্তিক মাস শ্রাদ্ধের কাজ বলিয়া তখন যমালয় শূন্য হইয়া পড়ে। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষই মহালয়া, প্রেতপক্ষ বা পিতৃপক্ষ। মলমাস স্থলে কার্ত্তিকেও মহালয়া বা পিতৃপক্ষ হইতে পারে। প্রাগ্বর্ণিত কালে উত্তর-কুরুতে যে কয়েকমাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, তাহাতে পিণ্ডোদক প্রদত্ত হইবে না বলিয়া ব্যগ্র হইয়াই পিতৃগণ যমালয় পরিত্যাগ করিয়া পিণ্ডোদক সংগ্রহার্থ ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়েন, ইহাই আমরা 'প্রেতপুর শূন্যে'র প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

নিমন্ত্রিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজন সমাপন করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে সূর্য্য বিষুব-রেখার উত্তর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে বলিয়াই উল্কা ধরিয়া তাঁহাদের গমনমার্গ প্রদর্শন করিবার কথা লিখিত হইয়াছে। সংক্রান্তি হইতে আকাশ-প্রদীপ দান ও কার্ত্তিকে যমদীপ দান এবং দীপান্বিতায় দীপাবলী প্রদানেরও অর্থ উল্কাদানের অনুরূপ মনে হয়।

উপনয়ন চূড়াকরণাদি বৈদিক সংস্কার যে, দক্ষিণায়নে নিষিদ্ধ এবং বিবাহ যে উত্তরায়ণেই প্রশস্ত, ইহা আর্য্যদিগের উত্তর-কুরুতে আদিবাসের প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার আর্য্যদিগের উত্তরায়ণে মৃত্যুকামনার গূঢ়রহস্যও এই আলোচনারই অন্তর্গত। কেন না, ভারতীয় আর্য্যগণ যখন উত্তর-কুরুতে বাস করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণায়নের সময় তাঁহাদের রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া

সেই সময়ে কেহ মরিলে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে পারিত না। ইহাতেই দক্ষিণায়নে মৃত্যু দুরদৃষ্ট।—ভারতী, শ্রাবণ।

গ্রামের কুমোর।

সামান্য মাত্র মূলধনে, সর্ব্বত্র সুলভ দ্রব্য উপকরণ বলিয়া এবং সর্ব্বত্রই ইহার প্রয়োজন বলিয়া, কুমোরের ব্যবসায় আমাদের দেশে এখনও পূর্ব্বভাবেই চলিতেছে। অন্যান্য শিল্পোন্নতির সহিত ইহারও উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "কুমোরেরা অধুনা যে সকল অসুবিধা ভোগ করে, কিছু মূলধন বাড়াইলেই সেগুলি দূর হইতে পারে। প্রথম অসুবিধা হইতেছে, পা দিয়া কাদা-মাখাতে কুমোরের যথেষ্ট সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয়। এই অসুবিধা একটি সাদাসিধা ধরণের যন্ত্র ব্যবহারে দূর হইতে পারে। একটি তিনফুট চওড়া চোঙের মধ্যে একটি দণ্ড ঘুরিতে থাকে এবং চোঙের তলায় একটি ছিদ্র দিয়া মাখা কাদা বাহির হইয়া যায়। দণ্ডটিতে একটি আড়া আড়ি হাতলের এক প্রান্ত সংলগ্ন থাকে, অপর প্রান্তে এক যোড়া বলদ জোড়া থাকে। উহারা ঘানির বলদের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দণ্ডটি দিয়া কাদা মাখিয়া যায়।

'কুমোরের চাকা যে ঘুরায়, তাহার আহত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দ্রুত ঘূর্ণমান চাকার খুব নিকটে দাঁড়াইলে বা বাঁশ দিয়া চাকা ঘুরাইবার সময় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলে বিপদ্ ঘটে। চাকার কয়েকটি জিনিষ তৈয়ারি করিতে যে সময় লাগে, আধুনিক উন্নত চক্র ব্যবহার করিলে তাহার চেয়ে অল্প সময়ে সেগুলি তৈয়ার করা যায়। একটি নূতন পাত্র গড়িবার পূর্ব্বে চাকা প্রথম ঘুরাইতে কতকটা সময় বাজে খরচ হয়। পাত্র গড়িয়া আবার পালিশ করিবার পূর্ব্বে চাকা ঘুরাইতে কতকটা সময় যায়। দিনের মধ্যে সাত ঘণ্টা কাজ হয়। উহার মধ্যে পৌনে পাঁচ ঘণ্টা মাত্র জিনিষ গড়িতে ব্যয় হইয়া থাকে, বাকি সময় বাজে বাজে নষ্ট হয়। এই সওয়া দুই ঘণ্টা সময় প্রকৃত কাজে লাগাইতে পারিলে কুমোর আরো ৫০টি জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে।—প্রবাসী, শ্রাবণ।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে অভাব কি ?

কৃষ্ণনগর এক সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের কেন্দ্র-স্থান ছিল। সম্প্রতি সেই কৃষ্ণনগরে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অভিভাবকতায় সাহিত্য-পরিষদ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহারই প্রথম পরিবেশনে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় মহাশয় "বাঙ্গালা-সাহিত্যে অভাব কি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে যাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইল।

"আমার বিবেচনায়, বঙ্গসাহিত্য আজিও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। বঙ্গসাহিত্য আজিও সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তাহার বিশাল মহিমা, সমাজের মঙ্গলবিধায়িনী বিপুলা শক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে না। আজিও যেন সে ক্ষুদ্র কোটর-গহ্বরে বাস করিতেছে। প্রকৃত সাহিত্য, মনুষ্যের হৃদয়ব্যাপী, সমগ্র সমাজপ্রসারী। আবার সাহিত্য এক প্রকার সংগ্রাম। উত্তমের সহিত অধমের সংগ্রাম, রাক্ষসের হস্ত হইতে দেবীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, অমঙ্গলের করাল কবল হইতে মঙ্গলকে রক্ষা করিবার প্রয়াস। সংক্ষেপে, সাহিত্য মানবজাতির মঙ্গল গীতি,—অনন্ত ভগবদ্গীতা। স্বয়ং ভগবান্ মনুষ্যের হৃদয়ে অনবরত লিখিতেছেন। যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, যাহাতে মনুষ্য মনুষ্যে প্রেম সম্পর্কে আলিঙ্গন করিয়া, ধরাধামে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য,—তাহাই সাহিত্যের প্রাণ, তাহাই সাহিত্যরূপী ভগবদ্গীতায় উপদেশ ও শিক্ষা। আশা করি, যে সাহিত্য আমাদের দেশে "সাহিত্য-পরিষদে" জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা কালে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিপুল দেহ ধারণ করিবে এবং সমাজের সমুদয় মঙ্গল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হইবে।

আমাদিগকে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে সত্য, কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। তবে কেবল অতীতের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড এবং জীর্ণ পুঁথিতে আমাদের প্রাণটা বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না। সাহিত্যের বিশাল সাম্রাজ্যে প্রত্নতত্ত্ব অতি অল্প স্থানই অধিকার করে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই একটি দোষের কথার উল্লেখ

করিতে হইলে, বলিতে হয়, সাধারণ লোকের সুখদুঃখের সহিত বঙ্গসাহিত্যের বড় সম্বন্ধ নাই। ইংরাজী সাহিত্যে অনেক গ্রন্থকারের সাধারণ লোকের সহিত যেরূপ সহানুভূতি দেখা যায়, আমাদের দেশে সেরূপ এখনও দেখা যায় না। স্কটল্যাণ্ডের কৃষক কবি বর্ণস্, "Man's a man for a that." যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজ দিগের, সাধারণ লোকের মধ্যে এক নবযুগ আনিয়াছিল। মনুষ্য মাত্রেরই সম্মান পাইবার যে অধিকার আছে, ওই কবিতাতে তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমাজে দরিদ্রগণ অতি সঙ্কুচিত ভাবে চলিয়া থাকেন। কবি তেজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন, 'দারিদ্র্য কিছুই লজ্জার বিষয় নহে।' উহা এমন ভাবে বলিয়াছেন যে, সাধারণের প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে। ইংরাজীতে এইরূপ অনেক উচ্চ শ্রেণীর রচনা আছে, যাহাতে সাধারণ লোকের সহিত—দরিদ্র শ্রমজীবিগণের সহিত গ্রন্থকারদিগের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা অতি বিরল।

প্রকৃত সাহিত্যে নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ তেজস্বী ভাব আছে। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহা বিরল। মনুষ্য হৃদয় এমনি দুর্ব্বল যে, অধিকাংশ লোকের মস্তকই ধনী লোকের পদ-প্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু মনুষ্যকে এই নীচতা হইতে রক্ষা করা প্রকৃত সাহিত্যের কর্ত্তব্য।

বঙ্গ-সাহিত্যের আর একটি দোষ, চিন্তাশীলতা অতি কমই দেখা যায়। আশা করি, আপনারা বঙ্গ-সাহিত্যের এই সকল অভাব দূর করিলেন। বঙ্গ-সাহিত্য বঙ্গ দেশে কল্যাণকে ডাকিয়া আনিবে, সুচিন্তা সৎকার্য্যকে টানিয়া আনিবে, সুনীতি বিকাসিত করিবে, বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে সেবাপরায়ণ দেবভাব প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং এইরূপে মনুষ্য জন্মের যে চরম উদ্দেশ্য, তাহা সংসাধিত করিবে।
—নব্যভারত, শ্রাবণ।

মন

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

মদমত্ত করী পারি করিতে বন্ধন,
রজ্জু হস্তে যেতে পারি সিংহের সদন,
গিরিচূর্ণ করিবারে পারি অনায়াসে,
সাগরে ডুবিতে পারি, উড়িতে আকাশে
জগতে কিছুই মোর অসাধ্য দেখিনা
সবাকে জিনিতে পারি, মনকে পারি না।

আঁধারে আলো

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১)

সে অনেক দিনের একটা সত্য ঘটনা। বলি শোন। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে, বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ী গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, "মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন, একবার দেখে আয়।"

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মা, এখন আমি কোন মতেই পার্‌বনা। তা' হ'লে পাশ হতে পার্‌বনা।"

"কেন পার্‌বিনে? বৌমা থাক্‌বেন আমার কাছে, তুই লেখা-পড়া কর্‌বি কলকাতায়, পাশ হতে তোর কি বাধা হবে, আমিত ভেবে পাইনে!"

"না মা, সে সুবিধে হবেনা—এখন আমার সময় নেই" ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল, মা বলিলেন, যাসনে,—"দাঁড়া, আরও কথা আছে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখ্‌বিনে?"

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "না জিজ্ঞেসা ক'রে কথা দিলে কেন?" ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন,—বলিলেন, "সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু, তোকেত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌তে হবে। তা' ছাড়া, বিধবার মেয়ে বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ'।"

"আচ্ছা পরে বল্‌ব' বলিয়া, সত্য বাহির হইয়া গেল। মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত আট বৎসর হইল, স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে, কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয়না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র-পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া, তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পর্য্যন্ত কোন কায কর্ম্ম হয় নাই। সে দিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে, মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী, তাহাও তিনি দুই চারিটি কথাবার্ত্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তারপর কেমন না পছন্দ হয় দেখা যাবে।"

পরদিন অপরাহ্ন বেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের যায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া, কে যেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটিকে হীরামণিমুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে!

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "খেতে বোস।"

সত্যের চমক ভাঙিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, "এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।"

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্চিস্‌নে—ঐ এক ফোঁটা মেয়ের সাম্‌নে তোর আর লজ্জা কি!"

"আমি কারুকে লজ্জা করিনে" বলিয়া, সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া, সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোন মতে নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমি কিছুতেই বস্‌তে পার্‌বনা—আমার ভারী মাথা ধরেচে।" বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোক

বুজিয়া, শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া, দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক খেলা হইল, অনেক চেঁচা-চেঁচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিলনা—একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ সব তাহার ভালই লাগিলনা।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?"

"শুতে নয়, পড়তে যাচ্চি। এম এ'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চল্‌বে কেন!" বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া, কড়িকাট ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙিয়া গেল! সে কাণ খাড়া করিয়া শুনিল—ঝম্। আর এক মুহূর্ত্ত—"ঝম্ ঝম্।" সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।" সত্য এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কার মা?"—মেয়েটি কহিল, "আমার মা।"

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, "আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জান্‌তে পার্‌বেন।" মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম রাধারাণী" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

(২)

এক ফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম-এ-পাশ করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না।—সে বিবাহই করিবেনা। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া উঠে, কোথাও কোন নারী মূর্ত্তি দেখিলেই, আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া, তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে, সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারেনা। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন, অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোন মতেই চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারম্বার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভাল বাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূরে নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া, স্থির হইয়া দেখিল, চার পাঁচ জন লোক এক দিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, এক সঙ্গে এতরূপ সে আর কখন নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স ১৮।১৯এর বেশী নয়। পরণে সাদাসিদা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কার-বর্জ্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে। এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা, একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদ-মুখের খাতির ত্যাগ করিয়া, হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া "বড় বাবুর" শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখোচোখি হইল।—সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা-হইল না, কোন মতে স্নান সারিয়া লইয়া, যখন সে বস্ত্র 'পরি-

বর্ত্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসামান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এম্‌নি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আল্‌না হইতে একখানা বস্ত্র টানিয়া লইয়া, গঙ্গা-যাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্ব্ব দিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, সে কোন মতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

(৩)

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু পূর্ব্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবী-তটে উপর্য্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারিচক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু, মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি, তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়াই থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কাণে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনের ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, ডান হাতে সিক্ত বস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভাল হয়।" অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যর মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাযটা ভাল নয় বলিয়া, একবার মনেও হইল, কিন্তু সে না বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন,—"ঝির অসুখ, সে আস্‌তে পারলে না, কিন্তু, আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাক্‌তে পারিনে—আপনারও দেখ্‌চি এ বদ্‌ অভ্যাস আছে।" সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল—"আজ্ঞে, হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।"

"এখানে কোথায় আপনি থাকেন?"

"চোরবাগানে আমার বাসা।"

"আমাদের বাড়ী যোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।"

"তাই যাব।"

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কাছেই আমাদের বাড়ী—এবার যেতে পার্‌ব—নমস্কার।"

'নমস্কার' বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানানো অসাধ্য। যৌবনে, পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জলস্থল, আকাশ-বাতাস, সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক শলাকার মত শুধুই সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্য অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল, সে নিশ্চিত বুঝিল—আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক্‌ দিয়া

কহিল, "হারামজাদা এত বেলা হয়েছে তুলে দিতে পারিস্‌নি ? যা, তোর এক টাকা জরিমানা।" সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল; সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দুই দিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু, গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ী হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, "এত দেরী যে ? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শীগ্‌গীর নেয়ে নিন্, আজও আমার ঝি আসেনি।"

"এক মিনিট সবুর করুন" বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার-কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোন মতে গোটা দুই তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার গাড়ী গেল কোথায় ?"

রমণী কহিলেন, "আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।"

"আপনি ভাড়া দিলেন !"

"দিলামই বা। চলুন।" বলিয়া আর একবার ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে, যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হউক, একবারও সন্দেহ হইত,—এ সব কি !

পথে চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, "কোথায় বাসা বল্লেন, চোরবাগানে ?" সত্য কহিল, "হাঁ।"

"সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে ?"

সত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কেন ?"

"আপনিও চোরের রাজা।" বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া, কটাক্ষে হাসিয়া, আবার নির্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল, "ছলাৎ-ছল্! ছলাৎ-ছল্!" শব্দে অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এ সব ছলনা—সব ফাঁকি বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, "গাড়ী ভাড়াটা"—রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল—"সে ত আপনার দেওয়াই হয়েছে।"

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—"আমার দেওয়া কি ক'রে ?"

"আমার আর আছে কি যে দেব ? যা' ছিল, সমস্তই ত তুমি চুরি ডাকাতি করে নিয়েচ।" বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি, উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখে নাই, তাই, এই চুরির ইঙ্গিত, তীব্র তড়িৎরেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তে সাধ হইল, এই প্রকাণ্ড রাজ-পথেই ওই দুটি রাঙা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমেষে, গভীর লজ্জায়, মাথা এম্‌নি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও ফুটপাথে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন ? বলি কিছু আছে টাছে ? দু'পয়সা টান্‌তে পারবে ত ?"

রমণী হাসিয়া বলিল, "তা' জানিনে, কিন্তু, হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।"

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল—"এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখ্‌তে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখ মুখ তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে যেন একটি জোড়া গোলাপ ফুটে ছিল!" রমণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয়, তুই নিস্।"

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, "না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পার্‌বে না, তা বলে দিলুম।"

(৪)

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই

অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা না কি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্যকথা যে, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন পড়িয়াছিল এবং ডনজুয়ানের বাঙলা তর্জ্জমা করিতে বসিয়াছিল। অত বড় ছেলে, কিন্তু, একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা, সহরের পথে ঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না!

দিন দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে, অপরিচিতা সহসা কহিল,—"কাল রাত্রে থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিলুন, সরলার কষ্ট দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়,—না?"

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল, "হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।"

রমণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উঃ কি ভয়ানক কষ্ট। আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাস্‌লে কি করে, আর তার বড় জা'ই বা পারেনি কেন বল্‌তে পার?"

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, 'স্বভাব।' রমণী কহিল, "ঠিক তাই। বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু, সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাস্‌তে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্য্যন্ত ভালবাসা কি জান্‌তেও পায় না। জান্‌বার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি কত লোক গান-বাজ্‌না হাজার ভালো হলেও মন দিয়ে শুন্‌তে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগ্‌তে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে আমার কিন্তু নিন্দে কর্‌তে ইচ্ছে করে।"

সত্য ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন?"

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'লনা।"

সত্য চুপ করিয়া রহিল,—সে পুনরায় কহিল, "আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়ে মানুষ! আমি থাক্‌তুম ত রাক্ষুসীর গলা টিপে দিতুম।"

সত্য সহাস্যে কহিল, "থাক্‌তে কি করে? প্রমদা বলে সত্যিই ত কেউ ছিল না,—কবির কল্পনা—"

রমণী বাধা দিয়া কহিল "তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু, প্রমদার চরিত্র দেখ্‌লে মনে হয় না যে, তার ভেতরও ভগবান ছিলেন। সত্যি বল্‌চি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাস্‌বে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়্‌লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে, সত্যিই সর্ব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে!

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া কহিল, "তুমি বুঝি খুব বই পড়?"

রমণী কহিল, "ইংরেজি জানিনে ত, বাঙলা বই যা' বেরোয় সব পড়ি। এক এক দিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চলনা আমাদের বাড়ী, যত বই আছে সব দেখাব।"

সত্য চমকিয়া উঠিল—"তোমাদের বাড়ী?"

"হাঁ, আমাদের বাড়ী—চল, যেতে হবে তোমাকে।"

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল—"না না, ছি ছি—"

"ছি ছি কিছু নেই—চল।"

"না না, আজ না—আজ থাক" বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল!

(৫)

সকাল বেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চার দিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই,—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই—হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়! কে জানে!

সে, গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ী, কোথায় বাড়ী কিছুই জানে না। মনে

করিলে, অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই,—কেন সেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল!

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ!

'বাবু!'

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাঁহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, "কি হয়েছে তাঁর?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল—সাম্‌লাইতে পারিল না। দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, "দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখ্‌তে চাই-চেন।"

"চল" বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, "কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?"

দাসী কহিল, "না তা' হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।"

সত্য মনে মনে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ী, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দরয়ান ঝিমাইতেছে, দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।"

দাসী কহিল, "দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।"

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বহিয়া তেতালার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজানো। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তব্‌লা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল, দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ ঘর—চলুন।" দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া সুউচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর!"

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক উলট পালট হইয়া গেল, তাহার মনে হইল হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোন মতে দোর ধরিয়া, সে সেইখানেই চোখ বুজিয়া, চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে, মেঝেয়, মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু' তিন জন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়ম, একজন বাঁয়া তব্‌লা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন। দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে, ত্বরিৎপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—"বঁধুর মির্‌গি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই ইয়ার্‌কি করিস্‌নে, ওঠ্‌—ওসবে আমার ভারী ভয় করে।"

প্রবল তড়িৎ স্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইঁহার করস্পর্শেও সত্যর আপাদ-মস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, "আমার নাম শ্রীমতী বিজ্‌লী,—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?—"

সমস্ত লোকগুলা হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে গড়াইয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল—"কি রঙ্গই জান দিদিমণি!"

বিজলী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিল, "থাম্ বাড়াবাড়ি করিস্‌নে—আসুন, উঠে বসুন, বলিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া সুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগ্যে পোহায়নু
 পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
 দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
 আজু মঝু দেহ ভেল দেহা
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
 টুটল সবহু সন্দেহা।

পাঁচ বাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিতেয়ত
তব হুঁ মানব নিজ দেহা ——

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের [কা]ছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, [কাঁ]দিয়া ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! বড় পাতকী [আ]মি—একটু পদরেণু—" অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান [ক]রিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল, তাহার [এ]কটু কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, "কেন [বে]চারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্চ?" বিজলী, হাসিতে [হা]সিতে বলিল, "বাঃ, মিছিমিছি কিসে? ও সত্যিকারের [স]ঙ্ বলেইত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের [ত]ামাসা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস্ বাবু, সত্যি বল্‌ত [দে]খি, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, [তা]জেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর [ঘ]রের এত বড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা, —কি [ম]তলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল্‌ত? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?"

ভারী একটা হাসি উঠিল। তারপর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল; সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতে-[ছি]ল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই [বা] কে! থাক্ সে।

বিজলী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঃ বেশ ত আমি! যা ক্ষ্যামা শীগ্‌গীর যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয়;—স্নান করে এসেচেন—বাঃ আমি কেবল তামাসাই কচ্চি যে।" বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্ব্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বক্রোক্তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থ ই জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজলী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল—"মুখ তোলো, খাও।"

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সাম্‌লাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল,—"আমি খাব না।"

"কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ি না মুচি?"

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, "তা'হলে খেতুম। আপনি যা' তাই।"

বিজলী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাবুবাবুও ছুরিছোরা চালাতে জানেন দেখ্‌চি!" বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু, তাহা শব্দমাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, "আমার নাম সত্য, 'হাবু' নয়। আমি ছুরিছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু নিজের ভুল টের পেলে শোধ্‌রাতে শিখেচি।"

বিজলী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, "আমার ছোঁয়া খাবে না?"

"না।"

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল, জোর দিয়া কহিল—"খাবেই। এই বল্‌চি তোমাকে, আজ না হয় কাল, দুদিন পরে খাবেই তুমি।"

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, কাল নয়, দুদিন পরে নয়, এ জন্মে নয়, আগামী জন্মে নয়—কোন কালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন আমি যাই—আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।"

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এত সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল "বিজ্‌লী বিবি, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্! যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে!"

বিজলী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই এমন মুখচোরা, শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী মৃদু স্বরে কহিল, "আর একটু বোসো।"

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"উঁ হুঁ হুঁ প্রথম চোটে একটু জোর খেল্‌বে—এখন যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—"

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বিজলী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ওরা দেখ্‌তে পাবে, তাই,—নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—"

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্ব্বার কহিল, 'এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখ্‌বে না? একটিবার এসো—মাপ চাচ্চি।"

"না" বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজলী পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, "কাল দেখা হবে?"

"না।"

"আর কি কখনো দেখা হবে না?"

"না।"

কান্নায় বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা, আমায় বিশ্বাস করবে?"

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর, যোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছেত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজলীর বুক ভাঙিয়া গেল। কিন্তু, সে করিবে কি? হায়, হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জ্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে?

সত্য প্রশ্ন করিল, "কি বিশ্বাস কোর্‌ব?"

বিজলীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু, অশ্রুর কি নকল নাই! বিজলী মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু, সেই কথাটা যে, মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। যে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে, সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত এক খণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু, কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী? অপরাধের শত কোটি চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারকের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ, কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দ্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে! সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল চল্‌লুম বিজলী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল; বলিল, "যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হোয়ো না। বিশ্বাস কোরো, সকলের দেহতেই ভগবান্ বাস করেন এবং আমরণ দেহটা তিনি ছেড়ে চলে যান্ না।" একটু থামিয়া কহিল, "সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না।" বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

* * * *

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না! বিজলী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবু যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্দ্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃত-স্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে কি যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্য্যন্ত টের পাইল। সেই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—"কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না! দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাওত হা"—বলিয়া নিজেই টানিয়া লইয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটা কথাও বিজলীর কাণে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা

ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "খুল্‌লে যে ?"

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—"আর পরব না বলে।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, আর না! বাইজী মরেছে—"

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল, কহিল—"কি রোগে বাইজী ?"

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল—"যে রোগে আলো জ্বাল্‌লে আঁধার মরে, সূর্য্যি উঠ্‌লে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল, বন্ধু!"

(৬)

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়ীতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ আহ্লাদ নাচ গানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

এক ধারে তিন চারিটি নর্ত্তকী—ইহারাই নাচ গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায়, চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, "এত মন দিয়ে কি দেখ্‌চ বলত ?" রাধারাণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "যা' সবাই দেখ্‌তে আস্‌চে—বাইজীদের সাজ সজ্জা—কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে ?"

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, "একলাটি বসে আছ, তাই, একটু গল্প করতে এলুম।"

"ইস্ ?"

"সত্যি! আচ্ছা, দেখ্‌চ ত, বল দেখি ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয় ?"

"ঐটিকে" বলিয়া রাধারাণী আঙুল তুলিয়া যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনে নিতান্ত শাদাসিধা পোষাকে বসিয়াছিল, তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, "ও যে নেহাৎ রোগা।"

"তা' হোক্, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু বেচারী গরীব—গায়ে গয়না টয়না এদের মত নেই।"

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা' হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান ?"

"না।"

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "এদের দুজনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বল্‌চ, তার দু'শ টাকা।"

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল—"দু' শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে ?"

"কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে চার পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত—কিন্তু, এখন পারবে কি না, বলা যায় না।"

"তবে, এত টাকা দিয়ে আনলে কেন ?"

"তার কমে ও আসে না। এতেও আস্‌তে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েচে।"

রাধারাণী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন ?"

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "তার প্রথম কারণ ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক্, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি। দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।"

কথাটা রাধারাণী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল- "তোমার গরজ ছাই। কিন্তু, ও ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন ?"

"শুন্‌বে ?"

"হাঁ, বল।"

সত্যেন্দ্র এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন, "ওর নাম বিজলী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়্‌বে যে রাণি, ঘরে যাবে ?

"যাব, চল" বলিয়া রাধারাণী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, "তাই আজ ওঁকে

অপমান ক'রে, শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?" এদিকে সত্যেন্দ্রের নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পারবে না। কেউ জানবেও না।"

রাধারাণী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে, এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চাৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজলী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টাদুই পূর্ব্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

"আপনাকে ডাক্‌চেন।" বিজলী মুখ তুলিয়া দেখিল, পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, "মা আপনাকে ডাক্‌চেন।" বিজলী বিশ্বাস করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমাকে ডাক্‌চেন?"

"মা ডাক্‌চেন।"

"তুমি কে?"

"আমি বাড়ীর চাকর।"

বিজলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এস।"

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনার নাম বিজলী ত? আপনাকেই ডাক্‌চেন—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।"

"চল" বলিয়া বিজলী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারাণী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজলী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই সে, সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; এবং একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসি মুখে কহিল, "দিদি, চিন্‌তে পার?" বিজলী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, "ছোট বোন্‌কে না হয় নাই চিন্‌লে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু, এটিকে না চিন্‌তে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব।" বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজলী তথাপি কথা কহিতে পারিলনা। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সে অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃ মুখ হইতে, সদ্য বিকশিত গোলাপ সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। রাধারাণী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বিজলী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাধারাণী কহিল, "চিনেচ দিদি?"

"চিনেচি বোন্।"

* * * *

রাধারাণী কহিল, "দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোন্‌টিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।"

সত্যেন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া লইয়া বিজলী একদৃষ্টে দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "বিষের বিষই যে অমৃত বোন্। আমিও বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।"

রাধারাণী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "একবার দেখা করবে দিদি?"

বিজলী এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, "না দিদি। চার বছর আগে যে দিন তিনি এই অস্পৃশ্য-টাকে চিন্‌তে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সে দিন দর্প করে বলেছিলুম আবার দেখা হবে, আবার

তুমি আসবে। কিন্তু, সে দর্প আমার রইলনা, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখ্‌তে পাচ্চি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙে দিলেন! তিনি ভেঙে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানেনা বোন্!" বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "প্রাণের জ্বালায়, ভগবানকে নিদ্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু, এখন দেখতে পাচ্চি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন! তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সব দিকেই মাটি হয়ে যেতুম। তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেল্‌তুম!"

কান্নায় রাধারাণীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজলী পুনরায় কহিল, "ভেবেছিলুম কখনো দেখা হলে, তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখ্‌ব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চল্লুম" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে দেখা হবে দিদি?'

"দেখা আর হবেনা বোন্। আমার একটা ছোট বাড়ী আছে, সেইটে বিক্রী করে যত শীঘ্র পারি, চলে যাব! ভাল কথা, বল্‌তে পার, ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাক্‌তে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?" লজ্জায় রাধারাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বিজলী ক্ষণকাল ভাবিয়া লইয়া বলিল, "হয়ত বুঝেচি। আমাকে অপমান করবেন বলে? না? তা' ছাড়া এত চেষ্টা করে আমাকে আন্‌বার ত' কোন কারণই দেখিনে।" রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজলী হাসিয়া বলিল, "তোমার লজ্জা কি বোন্? তবে, তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের ব'লে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগ্‌বে।"

"নমস্কার দিদি!"

"নমস্কার বোন্! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন্, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্। চল্লুম।"

অন্তর্দ্দৃষ্টি

[শ্রীকালিদাস রায় বি, এ]

তোমারে হেরিব বলিয়া যখন প্রভাতে নয়ন মেলি'
তব উজ্জ্বল কিরীট-ছটায় আপনা হারায়ে ফেলি'!
রিনি ঝিনি বাজে নূপুর নিকরে,
কণ্ঠের হারে আলোক ঠিকরে,
তোমারে হেরি না, হেরি শুধু তব দূরাগত কলকেলি,
তোমারে হেরিব বলিয়া যখন প্রভাতে নয়ন মেলি।

দুপুরে যখন হেরিব বলিয়া, নয়ন ভরিয়া চাই,
আঁখি ঝলসানো কিরীট-ছটায় দিশেহারা হ'য়ে যাই।
পদনখ আভা ভাসে নভঃ পথে,
আসে সৌরভ তব মালা হ'তে,
আপনি ঢলিয়া পড়ে যে নয়ন, তোমারে নাহিক পাই;
দিবাশেষে যবে হেরিব বলিয়া নয়ন ভরিয়া চাই।

পরলোকগত হইয়াছেন। শুক্রবার যথানিয়মে তিনি কার্য্যস্থলে গমন করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার সময় তাঁহার ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। রাত্রিতে অকস্মাৎ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণ আসিয়া নানা প্রকার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; রাত্রি এগারটার সময় তিনি সন্তানসন্ততিগণকে সম্মুখে রাখিয়া অনন্তধামে গমন করেন। মানব জন্মে লোকে সাধারণতঃ যাহা প্রার্থনা করে, গণেশ-চন্দ্র সে সকলই লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষায় সাফল্য, কার্য্যে কৃতিত্ব, অৰ্দ্ধশতাব্দীব্যাপী প্রভুত উপার্জ্জন, নানাকার্য্যে যশোলাভ পুত্ররত্নে সৌভাগ্য-বান, পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত এ সকলই তাঁহার ঘটিয়া-ছিল। তিনি পুত্ররত্নে সৌভাগ্যবান, রত্নতুল্য পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত, প্রিয় পরিজনামোদী কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ স্বধর্ম্মপরায়ণ স্বনামধন্য পুরুষ। পরলোকগত চন্দ্র মহাশয় ১৮৬৮ অব্দে হাইকোর্টের এটর্নী হন। আজ এই ৪৬ বৎসর তিনি বিশেষ যোগ্য-তার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নীগণের একজন অগ্রণী ছিলেন। কার্য্যতৎপরতা ও সততা গুণে তিনি দেশের মধ্যে এবং কলিকাতা সমাজে সর্ব্বজনমান্য হইয়াছিলেন। কলিকাতার মান্যগণ্য সমাজ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিবে। তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ও এটর্নীর কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছেন। আমরা স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের পরিজনবর্গের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

মাননীয় মিঃ জোসেফ্ চেম্বারলেন

মাননীয় মিঃ জোসেফ্ চেম্বারলেন

মাননীয় মিঃ জোসেফ্ চেম্বারলেনের মৃত্যুতে ইংলণ্ড একটি রত্নহারা হইলেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের একজন সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক ছিলেন। মিঃ চেম্বারলেন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং বিগত ৫ই জুলাই তারিখে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেন যখন যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন; ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে তিনি যখন যে সকল বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই গ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সকল শ্রেণীরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; তাই তাহার মৃত্যুতে প্রত্যেক দলের লোকেই শোক প্রকাশ করিতেছে।

———

৺রাখালদাস আঢ্য

৺রাখালদাস আঢ্য

চেতলার সুবিখ্যাত রাখালদাস আঢ্যও লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের একজন "সেকালের লোক" অন্তর্হিত হইল। ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী, ব্যবহারে সাদাসিধা, এবং ধর্ম্মকার্য্যে যথাযোগ্য ব্যয় তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বহু পরিজনবর্গ পরিবেষ্টিত একটী বৃহৎ সংসার রাখিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য তাঁহার এক পুত্র। পরলোকগত রাখাল বাবুর শো' পরিবারের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি করিতেছি।

পুস্তক পরিচয়

বীরবালক

(মূল্য আট আনা)

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত—বীরবালক কাব্য।—পুস্তকখানির নাম বীরবালক এবং বীররসের সহিত নিত্যসম্বন্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখিয়া প্রথমেই আতঙ্ক হইয়াছিল, কিন্তু অশ্রুসিক্ত নয়নে পুস্তকখানি পড়িয়া শেষ করিতে হইয়াছে। বাল্মীকির তপোবনে বালক কুশলবের বিচিত্র শরসন্ধানে লঙ্কাবিজয়ী শ্রীরামচন্দ্রের সসৈন্যে পরাজয়ের করুণ কাহিনী এই ক্ষুদ্র কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থারম্ভে এক স্থানে বলিয়াছেন—

> নিম্নে শোভে পাদদেশে বীচিমালা তুলি
> কলুষ-নাশিনী গঙ্গা কল নিনাদিনী,
> ঊর্দ্ধে শোভে মহাঋষি বাল্মীকি আশ্রম।
> মাথিয়া ভারতসিন্ধু পুত-রামায়ণ—
> অমৃত তুলিয়া যেথা দিলা মানবেরে।

আমরাও বলি, তাঁহার ভাষা গঙ্গারই ন্যায় বিশুদ্ধ, উহাতে কলতানও আছে এবং ঊর্দ্ধে বাল্মীকির প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টি রাখিয়া রামায়ণ সিন্ধু মথনে তিনি যে অমৃত উদ্ধার করিয়া মানবের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা সকলেই পরমানন্দে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।

ম্যালেরিয়া নাটিকা

(মূল্য তিন আনা)

শ্রীপরেশনাথ হোড় প্রণীত। ম্যালেরিয়া বিষম পীড়া, উহার ঔষধ কুইনাইনও বিষম তিক্ত, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু এরূপ বিষম নাটিকা বোধ হয়, এই প্রথম। যাহাহউক, নাটককার "চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, দুর্ব্বল শরীরে, যখন রঙটা ফেকাসে হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে লিভারে বেদনা হয়, মনে বড় অশান্তি," এমন সময়ে একটা এমন কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন,—"বিশেষতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু" তখন প্রার্থনা করি, অবিলম্বে তিনি সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ হউন।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব

(মূল্য দেড় টাকা)

শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব। ইহা শুধু সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-তত্ত্ব নহে—সঙ্গে সঙ্গে জীবতত্ত্ব, নাক্ষত্র যুগ, ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতি নানাতত্ত্বের ইহাতে আলোচনা আছে। এই পুস্তকের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব নহে। প্রধানতঃ যে ভাবে ইনি সৃষ্টির দুরূহ সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ চিন্তাশীলতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাশি ও রাশিসংক্রান্ত যুগবিচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয়গুলি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় মনীষিমণ্ডলীও এই সকল বিষয়ে আপন আপন মত অভ্রান্ত বা আপন আপন মীমাংসাই একমাত্র চূড়ান্ত মীমাংসা বলিতে সঙ্কুচিত হন। সুতরাং শিষ্টাচার বা বিনয়প্রদর্শনের জন্য নহে—সত্য সত্যই আমরা বলিতে বাধ্য, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা এক কথায় হইবার নহে, যুগযুগান্ত ধরিয়া এই বিষয়গুলি অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে—হয়ত সনাতন সমস্যাই থাকিয়া যাইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের আলোচনায় আমরা মধ্যে মধ্যে সত্যের আভাষ পাইলেও পাইতে পারি।

একটি কথা, গ্রন্থকার আপনার ভাষার দৈন্য বা অজ্ঞতা যেরূপ সঙ্কোচ-ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই! তিনি আপনার বক্তব্য অতি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

উপার্জ্জ- বান, পৌত্র ছিল। তিনি পৌত্রাদি পরি নিষ্ঠ স্বধর্ম্মপর চন্দ্র মহাশ হন। অ ত

The Life of Girish Chunder Ghosh.

(মূল্য আড়াই টাকা)

একখানি ইংরাজী জীবনী। এখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলিলেই যেমন নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকেই মনে পড়ে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এমন এক দিন ছিল, যখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলিলেই সেইরূপ এই বিখ্যাত বক্তা, হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলির প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্রকেই বুঝাইত! সেই গিরিশচন্দ্রের জীবনী তাঁহার পৌত্র—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার পূজনীয় পিতামহের অসাধারণ গুণগরিমা প্রকাশ করিতে তিনি ভাবাবেগে ভাসিয়া যান নাই, অতি সংযত ভাবে সত্যের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা গিরিশচন্দ্রকে জানিতেন বা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য ও গিরিশচন্দ্রের আপনারই পত্রাদি হইতে মন্মথ বাবু গিরিশচন্দ্রকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই জীবনী চতুর্দ্দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই কয়েকটি পরিচ্ছেদেই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালে পাঠানুরাগী, কৈশোর হইতেই ইংরাজী রচনাকুশল, যৌবনে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বাগ্মী, কর্ম্মী, সুলেখক, সহৃদয়, চিন্তাশীল গিরিশচন্দ্রকে সাধারণ কার্য্যেই অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াও ১৫ টাকা মাত্র মাহিনায় কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং আপনার কার্য্যনিষ্ঠায় (Military Auditor General's Office) আপীসের একটি উচ্চতম পদ লাভে সম্মানিত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলি পত্রিকা যখন প্রথম সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়, গিরিশচন্দ্রই তখন তাহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ভারতের দেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে বিশেষতঃ ইংরাজী-পত্র-সম্পাদকদিগকে রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যের অপ্রিয় সমালোচনা করিয়া প্রায়ই বিরক্তি বা ঘৃণাভাজন হইতে হয়, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ইংরাজ-বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়েরই পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই লোকপ্রিয়তা—সাধারণ গুণের পরিচয় নহে। সংক্ষেপে গিরিশচন্দ্রের জীবনী, নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মবীরের জীবনী। এবং এই জীবনী পাঠে আমরা যে, শুধু তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় মাত্র পাই, তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের ও দেশীয়পরিচালিত ইংরাজী সংবাদ-পত্রের বিশেষ পরিচয় পাই।

৪০ বৎসর মাত্র বয়সে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই যখন দেশের নানাস্থানে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে শোক-সভা হইতেছিল, সেই সময়ে বেঙ্গলি পত্রে লিখিত হয়, "গিরিশচন্দ্রের জীবনী-প্রকাশই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন।" অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সেই স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছে।

চীনের ড্রাগন

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় অবিশ্রান্ত লেখক; প্রতি বৎসরই তাঁহার সম্পাদিত তিন চারিখানি বড় বড় গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত, ভাষা তাঁহার হস্তে খেলিতে থাকে। অনুবাদের কোন স্থানে ইংরাজীর গন্ধও থাকে না; নাম গুলি ব্যতীত কোন ইংরাজী শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। আমরা তাঁহার এই 'চীনের ড্রাগন' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। যাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন চীন সাম্রাজ্য এই 'ড্রাগন' বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও পুজিত হইয়া থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই 'ড্রাগন' চীনদেশ হইতে আশ্চর্য্য ভাবে অপহৃত হয় এবং অনেক চেষ্টায় ইহার পুনরুদ্ধার হয়; তাহার পর পুনরায় এই ড্রাগন চুরী হইয়া যায়, এবং পুনরায় তাহা পাওয়া যায়। এই আশ্চর্য্য ইতিহাসই দীনেন্দ্রবাবু অতি সুন্দর ভাষায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ঘটনা-পরম্পরা এমন সুবিন্যস্ত হইয়াছে যে, পড়িতে বসিলে একেবারে শেষ না করিয়া পুস্তক ত্যাগ করা যায় না। এই পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা,
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা;
দীপ্ত করি' সে তিমির, জাগে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী, সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিগহ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী, সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে;
উজ্জ্বল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীর খানি—
আমার কুটীররাণী, সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখরবাণী,—
আমার কুটীররাণী, সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

———

স্বরলিপি

কথা—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়　　　　স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ

র্স - -　- - -　ন - -　ধ - -　ন ধ প　প হ্ম প　প প র্র র্র - -
য থ ন　স ঘ ন　গ গ ন　গ র জে　ব রি ষে　ক র কা　ধা - - রা - -

র্স - -　র্র র্স ন　ন র্স ন　ধ ন ধ　র গ হ্ম　হ্ম - -　গ হ্ম ধ প - -
স ভ য়ে　অ ব নী　আ ব রে　ন য় ন　লু - প্ত　চ - ন্দ্র　তা - - রা - -

র্স - - - - -　ন র্র র্স　ন ধ প　হ্ম প প　ন ধ প　হ্ম ধ ধ গ - -
জ্যোৎ স্না হ সি　নী - ল　আ কা শে　য থ ন　বি হ গ　গা - - হে - -
আঁধা রে আ লো কে　কা ন নে　কু - ঞ্জে　নি খি ল　ভু ব ন　মা - - ঝে - -
ব হু দি ন প রে　হ ই ব　আ বা ব　আ প ন　কু টী র　বা - - সী - -

র গ র　গ ম গ　র গ র　স র স　স র গ　হ্ম - - - গ হ্ম ধ প - -
স্নি - গ্ধ　স মী রে　শি হ রি　ধ র ণী　মু - গ্ধ　ন য় নে　চা - - হে - -
তা হা রি　হা সি টি　ভা - সে　হৃ দ য়ে　তা হা রি　মু র লী　রা - - জে - -
দে খি ব　বি র হ　বি ধু র　অ ধ রে　মি ল ন　ম ধু র　হা - - সি - -

প ধ প　র্স - -　- - -　- - -　র্স র্স র্স র্র　র্র র্র র্র র্গ　র্স র্গ র্র র্গ - -
দী - প্ত　ক রি সে　তি মি র　জা - গে　কা হা র　আ ন ন　খা - - নি - -
ত খ ন　স্ম র ণে　বা জে কা　হা - র　মৃ দু ল　ম ধু র　বা - - ণী - -
উ জ ল　ক রি য়া　আ ছে দূ　রে সেই　আ মা র　কু টী র　খা - - নি - -
শু নি ব　বি র হ　নী র ব　ক - ণ্ঠে　মি ল ন　মু খ র　বা - - ণী - -

র্প র্গ র্গ র্গ　র্র র্গ র্র　র্স র্র র্স　ন ধ প　প হ্ম প ধ ম　ন - -　ধ ন র্র র্স - -
আ মা র্　কু টী র　রা - ণী　সে যে গো　আ মা র　হৃ দ য়　রা - - ণী - -

চিত্র-কথা

কৈশোরে প্রতাপ ও শৈবলিনী

সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সকলেই পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম পরিচ্ছেদেই বালক প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনীর কথা আছে—"ভাগীরথী তীরে আম্রকাননে বসিয়া একটী বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটী ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল।"—প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ভি, সেয়ানী কোম্পানী, সেই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন।

মৃগাঙ্ক ও অজা

এই সংখ্যার 'ভারতবর্ষের' ৪৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—অজা নতনেত্রে কহিল "অমন কত কাটে, ওটুকু গ্রাহ্য করিলে মেয়ে মানুষের চলে না। থাক্, বেশ হইয়াছে, রক্ত আরতো পড়িতেছে না।"—ঐ দৃশ্যই এই ছবিতে অঙ্কিত হইয়াছে।

চন্দ্রগুপ্তের স্বপ্ন

সেণ্ট্রাল জৈন ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শেঠ করোরিচাঁদ জৈন মহাশয় এই সুন্দর চিত্র খানি ভারতবর্ষে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গুরগণ ও দলনী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' দলনী গুরগণকে বলিতেছেন—"তুমি নিপাত যাও, অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম"—তাহাই এই চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

দলনী বেগম

'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম যেখানে বলিতেছেন—"কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসী মাত্র।"—তাহাই এই চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার। বর্দ্ধমানের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে এই চিত্রখানি প্রকাশিত হইল।

ভ্রম-সংশোধন—বিগত শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' 'ঢাকায় সেনাসন্নিবেশ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে তাহাতে লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের লেখক এবং তিনিই উক্ত প্রবন্ধে প্রদত্ত আলোক-চিত্রাবলি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গ্রাহকবর্গের মধ্যে যাঁহারা আশ্বিন মাসের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা ২৫এ ভাদ্রের মধ্যে জানাইবেন।

মাসপঞ্জী

আষাঢ়—১৩২১

১লা—যুবরাজ, দক্ষিণ লণ্ডনে "হানস এলম্" নামক গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপন করেন।

২রা—প্যারিস সহরে বিষম ঝড়বৃষ্টি হয়।

৩রা—স্বদেশভক্ত বালগঙ্গাধর তিলক অব্যাহতি পান।

৪ঠা—গ্লাসগো নগরে কিংষ্টন্ ডকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ হয়।

৫ই—Automobile:Associationএর বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

৬ই—সেণ্ট পিটার্সবর্গে ২৬ জন বারিষ্টারের বিপক্ষে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। সকলেরই কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

৮ই—বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পাঠাশালার বালকদিগের ক্রীড়ার সরঞ্জামের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করেন।

১০ই—সার্ভিয়ার যুবরাজ বেলগ্রেডের রাজপ্রতিনিধি-পদে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন।

১১ই—হায়দরাবাদের ভূতপূর্ব্ব সচিবের পূজ্যপাদ পিতৃদেব রাজা হরিকিশোরী রায় বাহাদুর প্রাণত্যাগ করেন।

১২ই—লণ্ডন সহরে প্রিমস্লে নামক স্থানে অগ্নিসংযোগে প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ হয়।

১৩ই—চীনদেশে ভীষণ বন্যায় সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৬ই—লণ্ডনে আগুন লাগিয়া ১৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি পুড়িয়া যায়।

রেঙ্গুন টাইম্‌সের সম্পাদক মিঃ এন্. এ ঈ. গ্রেডনের সমাধি-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মাদ্রাজ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাদ্রাজ পোর্টের ট্রাষ্টী মহামান্য রবার্ট ম্যাক্‌লিউর স্যাণ্ডেজের মৃত্যু হয়।

১৮ই—বোম্বাই প্রদেশে রত্নগিরি জেলার মাল্বন নামক স্থানের ইংরাজি বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অনন্ত শিবাজি দেশাই ৭৫,০০০, টাকা দান করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ নৈল পেটনের মৃত্যু হয়।

১৯শে—হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউকের সমাধি হয়।—স্যর্ উইলিয়ম্ ডিউক বেহালার হাই ইংলিশ্ স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

লর্ড কারমাইকেল লস্করপুর মস্‌জিদ্ পরিদর্শন করেন।

২১শে—বুশায়রে তুর্কী কন্‌সালের মৃত্যু হয়।

২৩শে হাউস্ অফ্ লর্ডস্ ইণ্ডিয়া কাউনসিল-বিল প্রত্যাখ্যান করেন।

২৫শে—লেডি হার্ডিংয়ের অস্ত্র-প্রয়োগ হয়।

২৬শে—দ্বারবঙ্গের মহারাজা শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহোদয়ের প্রতিকৃতির জন্য শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পাঠশালায় ৫০০৲ টাকা দান করেন।

সার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সমিতিতে ১৩০১৲ টাকা প্রদান করেন।

২৭শে—লেডী হার্ডিংয়ের মৃত্যু হয়

সাহিত্য-সংবাদ

আলোচনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত পন্যাস-গ্রন্থাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে।—মূল্য ২॥০

'পণ্ডিত-মহাশয়ের' লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব ।-গুচ্ছ "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশিত হইয়াছে।—মূল্য ১ ০

মন্ত্রশক্তি-রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নূতন উপন্যাস "বাগ্‌দত্তা" কাশিত হইল।—মূল্য ১॥০

মহম্মদ মজিবার রহমন-প্রণীত নূতন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিনব মাজিক উপন্যাস "আনোয়ারা" প্রকাশিত হইল।—মূল্য ১৷০

বিজয়া-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা-লিখিত "মনোরমার বন-চিত্র" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।—মূল্য ১৷০

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত প্রণীত "রাজা রাজবল্লভ" ২য় সংস্করণ কাশিত হইল।—মূল্য ১৷০ বাঁধা ১॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-লিখিত ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর "জীবনী" প্রকাশিত ইল।—মূল্য ৸০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসু-প্রণীত "কুরুক্ষেত্র" নাটক প্রকাশিত ইল।—মূল্য ১৲

রিজিয়া-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়ের "লা মিজারেবল" পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বদূত সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত—"পণ-প্রথা" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অদৃষ্ট লিপি' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অন্যতম লেখক বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "ক্ষত্রবীর" প্রকাশিত হইয়াছে।—মূল্য ১

শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়ের 'সতী-দাহ' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সতীদাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে; পুস্তকখানি বহু চিত্র-শোভিত। কুমুদ বাবুর "মহম্মদ চরিত"-যন্ত্রস্থ।

বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্-প্রণীত "তাপস কাহিনী"—দ্বিতীয় সংস্করণ—বর্দ্ধিতায়তনে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা। হক্‌সাহেবের "মহর্ষি মনসুর"—তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কথিত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ মহোদয় লিখিত 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে ছাপা হইতেছে। ভাদ্র মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মিশর-মণি ক্লিওপেট্রার মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে মহলা চলিতেছে। শুনিলাম থিয়েটারের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ দৃশ্য ও পরিচ্ছদাদির যথাসম্ভব ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নাকি বিপুল আয়োজন করিতেছেন। ভাদ্রের প্রথমেই নাটক-খানির অভিনয় আরম্ভ হইবে। পুস্তকখানি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় অতি যত্নসহকারে দেখিয়া দিয়াছিলেন ও স্বয়ং কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকখানি, অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calcutta.

একটা কথা বলিয়া রাখি। নগেন্দ্রনাথের প্রতি তোমার যে ভালবাসা তাহা আশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয়হীনার কৃতজ্ঞতা; তুমি সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা, তাই কৃতজ্ঞতাকে প্রণয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলে। কৃতজ্ঞতা প্রণয় নহে। তাহা যদি হইত, তবে রজনী অবশ্যই অমরনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী হইত। আমার এই কথাটি প্রণিধান করিও।" [সন্ন্যাসী ঠাকুরের বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী বেশ পড়া ছিল।]

কুন্দ এবার একটু জোর গলা করিয়া বলিল :—"না প্রভু, আপনি উল্টা বুঝিলেন। মনে করিয়াছিলাম, 'আপনি কামচর না অন্তর্যামী?' 'এতক্ষণে জানিলাম আপনি অন্তর্যামী নহেন।' আমি আর আমার আশ্রয়দাতা নগেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্তা নহি। বিষের জ্বালায় সে ঘোর কাটিয়াছে। এখন আমার পূর্ব্বস্বামীকে পাইলে মাথায় করিয়া রাখি। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। তিনি অনেক দিন হইল অভাগিনীকে ফাঁকি দিয়াছেন। তিনি থাকিলে কি আমার এই দুর্দ্দশা হয়? হায়, 'কি করিলে যেমন ছিল, তেমনি হয়?'"

কুন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসী তখন চাপাগলায় বলিতে লাগিলেন—'গলাটা যেন ধরা ধরা'—"কুন্দ, আমি ত মরা মানুষ বাঁচাইতে পারি, প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি যদি তোমার পূর্ব্ব-স্বামীকে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তবে এখনই তাঁহার পুনর্জীবন দিই। মাতাল বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিও না। স্বামী মাতাল হইলেও নিজের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি প্রণয় কখন বিস্মৃত হয় না। নগেন্দ্রনাথকে দিয়াই দেখ না কেন?"

কুন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—"প্রভু, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কেন? আমি বিধবা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া ব্যভিচারিণী হইয়াছি, তাঁহার অস্পৃশ্যা।"

সন্ন্যাসী প্রসন্নবদনে বলিলেন—"বিষপানে তোমার সে ব্যভিচার-দোষের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। নতুবা শৈবলিনীর মত তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। 'তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।' কিন্তু আমি তোমাকে কল্যাণীর ন্যায় আবার বিবাহে মতি দিতেছি না, পূর্ব্বস্বামীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি। তিনিও স্বচ্ছন্দে তোমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। কলিকাতায় থাকিতে গোলদীঘীতে মাঝে মাঝে ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিতাম। 'গীতা'র একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম, তোমাকে শুনাইতেছি। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" ইহাতে বেশ বুঝিতেছি, তুমি এক্ষণে অপাপবিদ্ধা। [গীতা লইয়াও নাড়াচাড়া আছে, একেবারে ভবানন্দ ঠাকুর!]

সন্ন্যাসী এবংপ্রকার আশ্বাস দিলে, কুন্দ 'সজল-নয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর যদি তুমি সত্য হও, তবে যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"' ['সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।' পুস্তকের 'অন্তকালে সবাই সমান']

এই কথা বলিতে বলিতে কুন্দ সেই কঠিন শ্মশান-ভূমিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

উত্তম * পরিচ্ছেদ

আমার কথাটি ফুরাল, নটেগাছটি (সাধুভাষায়, বিষবৃক্ষ) মুড়াল।

কতক্ষণ কুন্দ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিল, জানি না। যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে যুগপৎ বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইল। সন্ন্যাসীর জটাজূট অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার নিম্নে চেরা সাঁথি দেখা দিয়াছে; গেরুয়ার স্থান কালাপেড়ে ধুতী ও সিল্কের পাঞ্জাবী অধিকার করিয়াছে; হাতে লোটা-চিমটার বদলে রূপাবাঁধান ছড়ি ও সিগারেটকেস্ শোভমান; পায়ে খড়মের পরিবর্ত্তে চীনাবাড়ীর গ্রীস্থান স্লিপার। [সবই সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ছিল। দোহাই পাঁচকড়ি বাবু, ডিটেক্‌টিভের কাছ হইতে চুরি নহে।]

---

* নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালাভাষাজ্ঞ পাঠক যেন এই শব্দটিকে লেখকের অহঙ্কারের পরিচায়ক মনে করিয়া 'অসহ্য!' বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন না। উত্তম অর্থাৎ চরম, যথা ব্যাকরণে উত্তমপুরুষ (পুরুষোত্তম নহে)। ষ্টীম ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর শক্তিতে কুলায় না, তাই পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্রাকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যাও হাল আইনে এই জন্যই কমে নাই কি?

কুন্দ দেখিল, চিনিল, (সে 'তামাটে বর্ণ ও খাঁদা নাক' ত ভুলিবার নয়). 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ-জলদান্তর্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদু মধুর দিব্য হাসি হাসিল।' তারাচরণ কুন্দর সেই 'আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।' কুন্দ তাহার পর একটু হাসিয়া, একটু কাসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল; ভিজা কাপড় সহজে সরিতে চাহে না। কুন্দ, গৌরী ঠাকুরাণীর ন্যায়, অপ্রস্তুত হইল।

তখন সেই পুরুষপ্রবর তারাচরণ তারস্বরে বলিলেন:—"কুন্দ, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, আমিই তোমার অযোগ্য স্বামী হতভাগ্য তারাচরণ। এখন বল, আমাকে গ্রহণ করিবে কি?" কুন্দ অস্ফুটস্বরে বলিল "হুঁ"। [আর সে 'না' বলে না।] 'মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল-কমলিনীর ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির কবিতা-কুসুমের ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়-সম্বোধনের ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না।'

তখন সেই তথাকথিত সন্ন্যাসী কুন্দনন্দিনীর 'হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর শ্মশানস্থলীতে ক্ষীণালোকে একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে।' কুন্দনন্দিনী প্রতিষ্ঠা, তারাচরণ বিসর্জ্জন। 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

* * * *

'আমার বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত' না ফলিলেও, মরা মানুষ বাঁচিবে।

একটি গান

ইমন কল্যাণ—ঢিমে-তেতালা

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

যাও হে সুখ পাও যেথানে সেই ঠাঁই,
আমার এ দুখ আমি দিতে তা পারি নাই।
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ, পূরিবে সব সাধ,
কখন নিরাশা যদি ললাট ঘিরে
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে॥
হয়'ত ধন দিবে সে সুখ আনি,
দিতে যা পারেনি এ হৃদয় খানি,
তাহাতে সুখী হও, ফিরিয়া চেওনাও
নিরাশ হও যদি ধনে কি সুখে,
তখনি ফিরে এসো আমার এ বুকে॥
অথবা ধন চেয়ে তুমি বা যশ চাও,
তাহাতে সুখী হও, আমায় ভুলে যাও—
(যদি) না পূরে অভিলাষ, অথবা মিটে আশ,
পরি সে গরিমার মুকুট শিরে,
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে॥
হয়'ত দিতে পারে অপর কেহ,
আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ;
মিটিলে সব সাধ, আসিলে অবসাদ,
প্রাণের নিরাশায় গভীর দুখে,
যদি বা প্রাণ চায় এসো এ বুকে॥
এ হৃদি যাও চলি চরণে দলি তায়,
অথবা তুলে ধর আমার বলি তায়;
রবে সে চিরদিন, তোমারই পরাধীন;
যখনি মনে পড়ে অভাগিনীরে,
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে॥

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(৮)

বাটীর বাহির হইতেই দেখি, চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামস্থ লোকে ভরিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে যুবা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনেককেই উপস্থিত দেখিলাম।

পিতা তাঁহাদের দেখিয়াই আমাকে বলিলেন—"তাইত হরিহর, আমার ডেপুটীগিরি পাইবার কথা তোমার গর্ভ-ধারিণী ভিন্ন আর কাহাকেও ত বলি নাই। তবে রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে গ্রামের ভিতরে একথা কেমন করিয়া রাষ্ট্র হইল! তুমি কি কিছু জানো? আমি এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

কি বলিতে কি বলিব, অথবা বলিলে নাজানি কি দোষ হইবে, এই ভয়ে আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম, মা একথা ঠানদিদিকে বলিয়াছে। আর ঠানদিদি একথা গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়াছে।

পিতা প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। তাঁহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদিগের সম্ভাষণ-আপ্যায়নে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের সম্ভাষণ শুনিবার আমি সুবিধা পাইলাম না। আমি বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকে ডাকিতে চলিলাম। পথে নানা চিন্তার উদয় হইল। পিতার একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তনে মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব উল্লাস হইয়াছে। সেই সঙ্গে পিতামহীর প্রতি মার ব্যবহারে মনে একটা বিষম বিষাদও উপস্থিত হইয়াছে। এ দুই বিভিন্ন ভাবের মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র বালকের হৃদয়টা যদি কিছু উদ্বেলিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিলনা। প্রকৃতই আমি যেন কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। মায়ের এরূপ ভাব ত আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এই দিন হইতে কেবল দেখিতেছি। ঠাকুরদাদা যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন পিতামহীর কোনও কথার উপর মায়ের একটিও কথা কহিবার শক্তি ছিলনা। সে সময় বরং সময়ে অসময়ে মাতাই পিতামহীর কাছে তিরস্কৃত হইতেন। অবশ্য পিতামহীকে কখনও মায়ের প্রতি তীব্রবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। পিতামহী কটুভাষিণী ছিলেন না। তথাপি তাঁহার মৃদুতিরস্কারে মায়ের চোখে কখন কখন জল আসিতে দেখিয়াছি। কিন্তু আজ মায়ের সহসা এ কিরূপ পরিবর্ত্তন! পিতা হাকিম হইয়াছেন বলিয়াই কি মায়ের মেজাজ এইরূপ হইয়াছে! হাকিম বস্তুটা যে কি তখনও পর্য্যন্ত আমি জানিতে পারি নাই। একে ক্ষুদ্র বালক, তাহার উপর সহর হইতে বহুদূরে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে বাস। হাকিমী ব্যাপার বুঝিবার তখন আমার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ আমি যেসময়ের কথা বলিতেছি, সেসময়ে ডেপুটীগিরি বাঙ্গালীর পক্ষে বড় সুলভ ছিলনা। আমাদের দেশের মধ্যে বোধ হয়, পিতাই তখন সর্ব্বপ্রথম ডেপুটী হইয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা দূরে থাক্, গ্রামের মধ্যে তখন কচিৎ কেহ ডেপুটী নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিল। দারগাগিরিই তখনকার বাঙ্গালীর একরূপ চূড়ান্ত চাকরী। তৎপূর্ব্বে দুই একজন জজ-পণ্ডিতের পদ পাইয়াছিলেন। দুই-চারিজন মুন্সেফ হইয়াছিলেন। কিন্তু ডেপুটী কেহ হইয়া-ছেন, একথা শুনি নাই। দারগাগিরিই তখনকার লোভনীয় চাকরী। কেহ দারগার পদ পাইলে লোকে বুঝিত, তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠকাম্য লাভ হইয়াছে; ইহজীবনে তাহার আর কিছু পাইবার নাই। পিতা সেরূপ পুত্র পাইয়া জন্মান্তরের রাশি রাশি পুণ্যের কল্পনা করিত। মাতা বুঝিত, তাহার গর্ভধারণ সার্থক হইয়াছে। ভাই, ভাগিনেয়, শ্যালক-সম্বন্ধীতে দারোগা বাবুর প্রতাপ শতরূপে প্রতিফলিত হইয়া গ্রামের মধ্যে তাহার একটা বিরাট আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিত। দারগা বাবুর পৈত্রিক পর্ণকুটীর ময়দানবের স্থাপত্য-

কৌশলে যেন এক রাত্রির মধ্যে সুশুভ্র আকাশস্পর্শী সৌধে পরিণত হইত। জমীদারে তাহার সখ্য কামনা করিত। কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে, স্মরণমাত্রেই যেন ভূতচালিত হইয়া, সেইদ্রব্য তাহার কাছে উপস্থিত হইত। চাকরি হইতে ছুটি লইয়া, দারগা বাবু যখন এক একবার ঘরে আসিত, তখন তাহার সদম্ভ পাদুকা-প্রহারে কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্যপথ লৌহপ্রহৃত শিলাখণ্ডের মত অগ্নি উদ্‌গীরণ করিত।

গল্প শুনিয়াছিলাম, এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এক সময়ে কোন হাকিমের নিরপেক্ষ বিচারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে দারগা হইবার বর দিয়াছিলেন।

আমি সেই অল্প বয়সেই 'দারগা বাবু' দেখিয়াছিলাম। একটা মারামারির তদন্ত করিতে এক 'দারগা বাবু' আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিতে গ্রামের লোক জড় হইয়াছিল। সঙ্গে তার চারি-পাঁচজন লাল-পাগড়ী চৌকিদার ছিল। সেই লাল-পাগড়ীগুলার ভয়ে দারগা বাবুর কাছে কেহ যাইতে সাহসী হয় নাই।

সেই দারগা বাবু বাবাকে দেখিলে সেলাম করিবে! বাবা না জানি কি কাণ্ডকারখানাই হইয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে আমি বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া জানিলাম, পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ হইল বাড়ীর বাহির হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীই আমাকে এই সংবাদ দিলেন। এবং এত প্রাতঃকালে তাঁহার স্বামীকে ডাকিতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে জন্য আসিয়াছি, আমি তাঁহাকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার স্বামীকে এরূপ সময়ে বাড়ী হইতে লইতে আসা তাঁহার মনোমত হয় নাই। তবে আমাকে স্পষ্টতঃ মুখে কিছু না বলিয়া, যথাসময়ে পণ্ডিত মহাশয়ের আমাদের গৃহে যাইবার আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু আমি যেই গৃহমুখে ফিরিবার উপক্রম করিলাম, অমনি কতকগুলা কর্কশবাণী আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। পণ্ডিতগৃহিণী অবশ্য সেগুলা তাঁর স্বামীর উদ্দেশেই বলিতে লাগিলেন। স্বামী তাঁর নির্ব্বোধ, নির্লজ্জ, হায়া এবং পিত্তশূন্য, তাই সামান্য মাত্র দুইটি টাকার জন্য গাঁয়ের লোকের চাকরি স্বীকার করিয়াছে। গাঁয়ের লোকটা যেন হাকিম! যাইতে একদিন একটু বিলম্ব হইয়াছে, অমনি বাড়ীতে যেন পেয়াদা পাঠাইয়াছে।

অন্য দিন তাঁর এরূপ তেজের কথা শুনিলে, নিশ্চয়ই আমার মনে ক্রোধ হইত। কিন্তু আজ ক্রোধ হওয়া দূরে থাক, তাঁহার কথায় আমার মুখে হাসি আসিল। গুরুপত্নী ক্রোধের বশে রহস্যের ছলে যাহা বলিতেছেন, সত্যইত আমি তাই! সত্যই ত আমি হাকিমের পুত্র! আমি একবার হাসিমাখা মুখখানা গুরুপত্নীর দিকে ফিরাইলাম। আমার মুখ দেখিয়া, অগ্নিদগ্ধ তৈলনিষিক্ত বার্ত্তাকুবৎ তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হাসিতেছিস্ কি ছোঁড়া, তোকে না পড়াইলে কি আমাদের দিন চলিবেনা?" আমি উত্তর করিলাম—"তা পণ্ডিত মহাশয় পড়াতে না চান, বাবাকে গিয়া বলিয়া আসুন। আমার উপর রাগ করিতেছ কেন?"

"তুই গিয়ে তোর বাবাকে বল্‌গে যা, সে আর তোদের ওখানে যাইবে না। সকালবেলায় বাড়ীর কাজ করিলে, অমন কত দু'টাকার সাশ্রয় হইবে।"

আমি বলিলাম—"বেশ—তাই বলিব।"

এই বলিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। আর তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলাম না। গ্রামে পণ্ডিত-পত্নীর প্রখরা বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। পিতামহীর কাছে শুনিতাম, তিনি পথের ঝগড়া কুড়াইয়া আনিতেন।

পণ্ডিত ম'শায়ের একটি বড় গোছের আমবাগান ছিল। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহসংলগ্ন অথবা গ্রামপ্রান্তে ছোট বড় একটা না একটা বাগান ছিল। সে সকল গাছে আম ধরিলে গ্রামের ছেলেরা যথেচ্ছা তাহা হইতে আম পাড়িয়া খাইত। সে সকল ফলের উপর বালকদিগের অবাধ অধিকার ছিল। অবশ্য অধিকার-প্রকাশটা তাহারা অনেক সময়ে অধিকারীর অজ্ঞাতসারেই করিত। সেটাকে বালকেরা চুরি মনে করিতনা। কোন গৃহস্থ দেখিতে পাইলে, নিষেধ করিত, কেহ বা করিত না। বালকদিগের মধ্যে কেহ বা নিষেধ শুনিত, কেহ বা শুনিত না। পণ্ডিত ম'শায়ের বাগানেও সেইরূপ বালকেরা আম পাড়িতে যাইত। শুধু যাইত বলি কেন, গ্রামের অধিকাংশ বালক তাঁহার বাগানের আম চুরি করিতেই সকলের চেয়ে

বেশি পছন্দ করিত। তাহার প্রথম কারণ পণ্ডিত ম'শায়ের বাগানের একটা গাছে সকলের আগে আম ফলিত, আর প্রচুর ফলিত। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ, পণ্ডিত-পত্নী তাঁহার বাগানে কাহাকেও আম পাড়িতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি তীব্রভাষায় গালি দিতেন। এমন কি, লাঠি লইয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইতেন। অবশ্য তাঁহার লাঠিকে কখন কাহারও পৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার তীব্রতিরস্কার তাহাদের কর্ণে কি যে মধুবর্ষণ করিত,কেহই সে মিষ্টতার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

পিতামহীর শাসনে অন্য বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া আমি কখনও অন্য কাহারও বাগানে আম পাড়িতে যাই নাই। বালকেরা যখন আমাদের বাগান হইতে আম লইতে আসিত, আমি তখন তাহাদের সঙ্গী হইয়া তাহাদের চৌর্য্যের সহায়তা করিতাম।

সুতরাং পণ্ডিত-গৃহিণীর মিষ্টবাক্য আমার ভাগ্যে কখনও শোনা ঘটে নাই। বিশেষতঃ তাঁর স্বামী আমার গৃহে পণ্ডিতি করিতেন বলিয়া, যদি সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত, আমি সত্য সত্যই তৎকর্ত্তৃক মিষ্ট ভাষায় সম্ভাষিত হইতাম। আজ সর্ব্বপ্রথম আমি তাঁর উগ্রমূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কথাতে আমার সামান্যমাত্রও ক্রোধ হইলনা। তাঁহার আদেশ যেন শিরোধার্য্য করিয়া 'তাই বলিব' বলিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

অন্যদিন হইলে সে সময় পথে কত বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু সে দিন সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলেও একজনকেও আমি দেখিতে পাইলাম না। সে দিন তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, আমি তাহাদিগকে আমার অবস্থাটা একবার শুনাইয়া দিই। হাকিমী বস্তুটা কি, না জানিলেও সেই অল্প বয়সেই নামের মোহ আমাকে স্পর্শ করিতেছিল। পূর্ব্ব দিবসের প্রগল্‌ভ বালক আজ ধীরে ধীরে—কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা না করিয়া—বিজ্ঞ হইতেছিল। প্রকৃতিকে আরসী করিয়া প্রতিবিম্বরূপে আমি যেন নিজেই সে বিজ্ঞতার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম।

এখন সমবয়স্ক বালকদিগকে সেই মুখ দেখাইবার আমার বলবতী ইচ্ছা হইল। বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের পড়ানর দায় হইতে নিস্তার পাইয়াছি। সুতরাং ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইলে পিতার কাছে তিরস্কৃত হইবার ভয় নাই। বাড়ী ফিরিবার পথে একটি চৌমাথা ছিল, কাহারও না কাহারও দর্শন প্রত্যাশায় আমি সেইখানে পাদচারণ করিতে লাগিলাম।

বার দুইতিন এদিকওদিক করিয়াছি, এমন সময় পণ্ডিত-গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া, আমার হাত দুইটি তাঁহার দুই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন; ধরিয়া, নানা বাক্য-বিন্যাসে অজস্র তাঁহার কৃত ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের আমি কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার যে কোনও ক্রোধ হয় নাই, এ কথা তাঁহাকে বারংবার বুঝাইতে লাগিলাম—শপথ করিয়াও বুঝাইলাম। তথাপি তাঁহার ক্ষমা-প্রার্থনার নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। ক্রমে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত আসিয়া পড়িলেন। তিনিও আমার হাত ধরিয়া স্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনায় যোগদান করিলেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে দুইচারিজন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ পণ্ডিতগৃহিণীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার হইয়া আমাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

তখন বুঝিলাম, সকলেই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন অবগত হইয়াছে। আর হাকিমের পুত্রকে কটু কহিয়া পণ্ডিত-গৃহিণীর ভয় হইয়াছে।

ক্রমে এক দুই করিয়া, পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা প্রায় দশ বার জন সেখানে সমবেত হইলেন। আমাকে লইয়া সেখানে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ইহাদের মধ্যে দুই চারিজন আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে যার বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন; এবং পিতার হাকিমীপ্রাপ্তির সমালোচনা করিতেছিলেন। কেহ পিতার ভাগ্যের সমালোচনা, কেহ পিতামহের কৃতিত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ, কেহ বা প্রকৃতির ক্ষুদ্রতায় পিতার এ সৌভাগ্যে অবিশ্বাস করিতেছিলেন।

একদল বলিতেছিলেন—"তোমরাও যেমন পাগল! বাঙ্গালীকে কি কখন জেলার কর্ত্তা করিতে পারে! এ বোধ হয়, হাকিমের একটা বড়গোছের মুহুরীগিরি-পায়া পাইয়াছে।"

২য়। বোধ হয় খাজাঞ্চী হইয়াছে।

১ম। হাঁ—চালকলা-বাঁধা বামুনের ছেলেকে খাজাঞ্চী করিবে! কোম্পানীর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! জমীদারের ছেলে হ'লে, সেটা সম্ভব হ'ত বটে।

২য়। অঘোরনাথ পাঁচটা পাশ করেছে তা জান?

১ম। তাতে কি হয়েছে! পাশ করিলেই যে হাকিমী পাইতে হইবে, তার মানে কি?

এইরূপে তাহারা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। ইহারা তখনও পর্য্যন্ত সেখানে আমার অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নাই। বাগ্‌বিতণ্ডা ক্রমে কলহে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছিল। পণ্ডিত ম'শায় তাই দেখিয়া তাহাদের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন এবং ইঙ্গিতে আমার অস্তিত্ব বুঝাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

এমন সময়ে দেখা গেল, এক দারগা এক চৌকীদার সঙ্গে লইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহাদের আসিতে দেখিয়া যাত্রীলোকেরা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পুরুষগণ কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আমিও দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দারগা আসিয়াই পুরুষদের মধ্যে একজনকে পিতার বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। সেই সময়েই দারগাবাবুর মুখে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ছোট লাটের দপ্তর হইতে পিতার হাকিমী চাকরির হুকুমনামা আসিয়াছে, আলিপুরের মেজেষ্টার সেই হুকুমনামা পিতাকে দিবার জন্য দারগার কাছে পাঠাইয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই যেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্থানটি কিয়ৎক্ষণের জন্য জনশূন্যের মত বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে অবিশ্বাসীর দল সরিয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত, দারগা বাবুর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে দিলেন। পরিচয়-প্রাপ্তিমাত্র চৌকীদার আমাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত পথ দেখাইয়া দারগাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

(৯)

বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোক ও বাড়ীর বাহিরে পুরুষ—জনসমাগমে আর কোলাহলে সমস্ত দিনটাই প্রায় কাটিয়া গেল। মা, পিতা, পিতামহী—কেহ কাহারও সহিত কথা কহিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইলেন না। আমিও ইস্কুলে যাওয়া, অথবা পড়াশুনা, কিছুই সে দিন করিতে পারি নাই। সেদিন শনিবার। ইস্কুলে না গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, পিতা আমার না যাওয়াতে কোনও আপত্তি করিলেন না। আমাকে বাড়ীতে রহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দভোগের অবসর দিলেন।

আর এ দেশের ইস্কুলে যাইয়াই বা কি করিব? ঠিক বুঝিয়াছি, দুইচারিদিনের মধ্যেই আমাকে ইস্কুল ছাড়িয়া পিতার অনুগামী হইতে হইবে। মাও তাই মনে করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি আর একদিনের জন্যও এবাটীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন।

কিন্তু মায়ের প্রতিজ্ঞা রহিল না। বেলা এগারটা না বাজিতে বাজিতেই ঠানদিদির অনুরোধে ও পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি জলও গ্রহণ করিলেন, অন্নও গ্রহণ করিলেন। কেবল রন্ধনটাই নিজে করিলেন না। পূর্ব্বদিন হইতে রন্ধনকার্য্যের ভার ঠানদিদিই গ্রহণ করিয়াছেন। পিতামহী, মাকে অনুরোধও করেন নাই। মা আহার করিলেন কিনা দেখেনও নাই।

সন্ধ্যার কিছু পরে, পিতা পিতামহীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতামহী তখন সবেমাত্র আহ্নিক সমাপন করিয়াছেন, আমিও আহার শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছি। আমি ঘরের মধ্যে নিজের বিছানায় শয়ন করিলাম। বাবা ও ঠাকুরমাতে কি কথা হয়, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের ভিতরে মায়ের সম্বন্ধ লইয়াই কথাবার্ত্তা হইবে। কেন না, প্রাতঃকালের সেই বচসার পর উভয়ের মধ্যে আর কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। পিতাও পিতামহীর কাছে সে সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই; অথবা প্রকাশ করিবার অবকাশ পান নাই। এমন সুখের দিনে আমার উভয় গুরুজনের মনোমালিন্য আমার পক্ষে বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছিল। বাস্তবিক বলিতে গেলে আমি সারাদিন সুখেও সুখ পাই নাই। এখন আমি আগ্রহসহকারে পিতার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন প্রার্থনা করিতেছিলাম।

কিন্তু পিতা, পিতামহীর কাছে মায়ের কথা আদৌ উত্থাপিত করিলেন না। পিতা প্রথমেই পিতামহীর কাছে

কথোপকথনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"মা! তোমার আহ্নিক শেষ হইয়াছে?"

ঠাকুর মা বলিলেন—"কি বলিতে চাও, বলিতে পার।"

"আমাকে কিছু টাকা যে দিতে হইবে।"

পিতার এই কথায় পিতামহীর কোনও উত্তর শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, তবু শুনিতে পাইলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা আবার বলিতে লাগিলেন—"নূতন চাকরীস্থানে যাইতে হইবে, চাকরীর উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিতে হইবে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।"

পিতামহী এইবার বলিলেন,—"কেন, টাকা ত তোমার কাছে আছে।"

"কই, কোথায় টাকা? টাকা থাকিলে তোমার কাছে চাহিব কেন?"

"তুমি ত গত মাসের মাহিনা আমাকে দাও নাই।"

"পিতা এই কথা শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সে টাকা! সে কি আছে, তা তোমাকে দিব!"

"কিসে সে টাকা খরচ হইল?"

"এত বড় একটা শ্রাদ্ধের হাঙ্গাম গেল। কিসে খরচ হইল, তা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়!"

"শ্রাদ্ধের খরচ তোমাকে কি করিতে হইয়াছে?"

"কি হইয়াছে, তা তোমাকে কি বলিব? আমি কি হিসাব রাখিয়াছি? আর সে কত টাকা? সামান্য ষাট টাকা বই নয়। এই চাকুরী জোগাড় করিতে কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাকি তুমি জান? আজই চৌকীদারকে দুই টাকা বক্‌সিস্ দিতে হইল। ষাট টাকা, সে কোন্ কালে ধূলোর মত উড়িয়া গিয়াছে। আমাকে আজই টাকা না দিলে চলিবে না।"

"কত টাকা?"

"অন্ততঃ পাঁচ শো।"

"বল কি! এত টাকা!"

"এ আর এত কি! যে চাকরী পাইয়াছি, তাহাতে এ আমার এক মাসের আয় বইত নয়।"

"তা হ'লে এত টাকা লইবার প্রয়োজন কি?"

"কিন্তু ছয়মাস আমি পঞ্চাশ টাকার বেশি পাইব না। এই ছয়মাস আমাকে শিক্ষা-নবীশী করিতে হইবে। এই ছয়মাস জলপানিস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে ত তা বুঝিবে না। তাহারা আমাকে হাকিম বলিয়াই জানিবে। হাকিমের মর্য্যাদায় থাকিতে হইলে, এই ছয়মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ হইবে। পাঁচশো টাকা ঘর হইতে লইব। পাচশো টাকা মাহিনা থেকে খরচ করিব।"

"অত টাকা ত আমি দিতে পারিব না। আমার নিজের বলিবার কুড়ি গণ্ডা টাকা আছে, তাই তোমাকে দিতে পারি।"

"সে কি! এত টাকা পিতা উপার্জ্জন করিলেন, আমি উপার্জ্জন করিলাম—তোমার হাতে টাকা নাই! এ তুমি কি বলছ মা?

"তা মা কি বলিবে? টাকা উপার্জ্জন করিয়া তুমি কি মায়ের হাতে দিয়াছ—না কর্ত্তাই তাঁর উপার্জ্জনের টাকা আমাকে কখন দিয়াছেন! তোমাদের উপার্জ্জনের কথা আমি শুনিয়াছি মাত্র। চোখে কখন দেখি নাই।"

"মৃত্যুকালেও কি টাকার কথা তিনি ব'লে যাননি?"

"কিছু না। হৃদ্‌রোগে মৃত্যু। কথা বলিবার সময় পান নাই।"

কিছুক্ষণের জন্য আবার উভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। বাবা কি করিতেছেন, দেখিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলাম। উঁকি দিয়া দেখি, পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। আর পিতামহী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ করিতে দেখি বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আহ্নিকের সময় কেবল তিনি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। আহ্নিকান্তে যখন তিনি জপে বসিতেন, তখন তিনি, প্রয়োজন হইলে, লোকের সঙ্গে কথাও কহিতেন।

অনেকক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া পিতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"মা, এরূপ করিয়া সন্তানের মাথায় বজ্র হানিয়ো না। টাকা তোমার কাছে আছে নিশ্চয় জানিয়া, আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।"

পিতামহী আবার নীরব রহিলেন। এখন বুঝিতেছি,

এ কঠোর বাক্যের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পিতা উত্তরের প্রতীক্ষায় মাতার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার বলিলেন—"কি বল?"

পিতামহী। কি বলিব! এই ত বলিলাম, কুড়ি গণ্ডা টাকা লইতে চাও, দিতে পারি। ইহার অধিক চাহিলে কেমন করিয়া দিব?

পিতা। তোমার হাতে আর কিছু নাই?

পিতামহী। কিছু নাই, এই মালা হাতে কেমন করিয়া বলিব? আরও দুই চারি টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা একত্র করিলেও তোমার পাঁচশো হইবে না!

পিতা। তা হ'লে তুমি কি আমাকে বুঝিতে বল, পিতা এই এতকাল কেবল চিনির বলদের মত বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন,—এক পয়সাও উপার্জ্জন করেন নাই?

পিতামহী। উপার্জ্জন করেন নাই ত, এত বিষয়-আশয় কোথা থেকে হইল? আমাদের কি ছিল? তবে, কি তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমিও কখন জানিতে চাহি নাই, তিনিও আমাকে বলেন নাই। জানিবার মধ্যে একজন কেবল তাঁর নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিত। টাকাকড়ি কিছু আছে কি না, তুমি গোবিন্দ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার। যদি কিছু থাকে, তাহার কাছেই আছে। না থাকে নাই।

পিতা। আমার বাবার উপার্জ্জন। কি আছে না আছে, আমি তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গোবিন্দ খুড়োকে জিজ্ঞাসা করিব? মা তোমার এমনি মতিচ্ছন্ন হইয়াছে!

পিতামহী। ও কি বলিতেছ অঘোরনাথ!

পিতা। আর না বলিয়া কি বলিব! আমি দেবতার দুষ্প্রাপ্য চাকরী শুধু তোমার জন্য পাইয়াও পাইলাম না। তোমার হাতে টাকা থাকিতেও তুমি বউএর উপর ঈর্ষায় আমাকে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছ।

পিতামহী। ঈর্ষা করিবার লোক না পাইলে, এ ছাড়া আর কি করিব অঘোরনাথ? তুমি একমাত্র পুত্র। তাঁহার কাছে দুই এক পয়সা চাহিলে তিনি তোমার দোহাই দিয়া আমাকে নিরস্ত করিতেন। বলিতেন—"ইহার পরে অঘোরনাথ তোমাকে কি খেতে দিবে না বলিয়া, আগে হইতে বৈধব্যের সম্বল করিতেছ? ভয় নাই। রত্ন গর্ভে ধরিয়াছ। যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহারই কাছে পাইবে। কখন সে তোমাকে অভাবে রাখিবে না।" তিনি দুইদিন মাত্র স্বর্গে গিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তোমার কাছে যা পাইলাম! ইহার পরে আরও না জানি কি পাইব, ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

পিতা। তা আমি কি মূর্খ, যে তোমার এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিব? বুঝিব তোমার হাতে কিছু নাই? যদি কিছুই নাই, ত শ্রাদ্ধের টাকা কেমন করিয়া দিলে?

পিতামহী। শ্রাদ্ধের টাকা কি আমি তোমার হাতে দিয়াছি?

পিতা। গোবিন্দ খুড়া আমার হাতে দিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, তিনি তোমার নিকট হইতে সে টাকা লইয়া আমাকে দিয়াছেন।

পিতামহী। না, ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে লয় নাই।

পিতা এই কথায় যেন কতকটা সত্যের আভাস পাইলেন। তিনি একটি গভীর হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তারপর বলিলেন—"ভাল, বিষয়-আশয়ের দলিলপত্র কোথায়? তাও কি তোমার কাছে নাই?"

পিতামহী। আমার কাছে কিছু নাই।

পিতা। তাও কি গোবিন্দ খুড়োর কাছে?

পিতামহী। তোমার কাছেত তাঁহার বাক্স আছে।

পিতা। তাহাতে ত শুধু একটি সিঁদুর মাখানো টাকা ছিল। আর কতকগুলা বাজে কবিতাভরা কাগজ।

পিতামহী। ছিল বলিতেছ যে! সে টাকা কি বাহির করিয়া লইয়াছ?

পিতা একথার কোনও উত্তর না দিয়া, আমার মাকে ডাকিলেন। "ওগো! একবার এদিকে এস ত!"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই মা আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম। কেন না পিতা সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে লাগিলেন—"কি ঘটিয়াছে, বুঝিয়াছ কি?"

পিতামহী আবার বলিলেন—"সে লক্ষ্মীর টাকা কি নষ্ট করিয়াছ?"

মাতাকে একটা আসন আনিতে আদেশ দিয়াই পিতা বলিয়া উঠিলেন—"আসুন, খুড়ো মহাশয় আসুন।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই স্বহস্তে একটি লণ্ঠন—গোবিন্দ ঠাকুরদা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। পিতামহীর ঘরের দাওয়াতেই তাঁহার বসিবার আসন প্রদত্ত হইল।

পিতামহী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবিন্দঠাকুরদা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবার পূর্ব্বে পিতামহীকে তিনি একবার প্রণাম করিয়া লইলেন—"বলিলেন, বউ! আজ সমস্তদিন তোমাকে দেখি নাই!"

পিতামহীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, পিতাও ঠাকুর-দা'কে প্রণাম করিলেন। মাতাঠাকুরাণীর প্রণাম আমি দেখিতে পাই নাই। ঠাকুরদা'র আশীর্ব্বাদে বুঝিলাম, তাঁহাকেও প্রণাম করিতে হইয়াছে।

পিতামহী বলিলেন—"ভাই! আজ আর আমি যাইবার অবসর পাই নাই।"

"পাও নাই, তা বুঝিয়াছি। অঘোরনাথ শুনিলাম ফৌজদারী হাকিম হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া গ্রামান্তর হইতে অঘোরনাথকে দেখিতে লোক আসিয়াছে। বুঝিলাম, সেই জন্যই তুমি অবকাশ পাও নাই।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"নাতীটে এক আধবার আমাদের বাড়ীতে যায়, আজ সেও পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিসীমানায় পা বাড়ায় নাই।"

এই কথা বলিয়াই পাছে ঠাকুরদা ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, এইভয়ে আমি আবার পা টিপিয়া টিপিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

শুইতে শুইতে পিতার কথা আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি ঠাকুরদা'র প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন।—ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করা তাঁর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা পারেন নাই। পিতা বলিলেন—'সারাদিন এমন ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছিলাম যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও আপনার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাইলাম না।"

এ কৈফিয়ৎ ঠাকুরদা' বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন—"তাই কি অঘোরনাথ! না মূর্খ ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করায় মানহানি হইবে বলিয়া পারিলে না!"

পিতা। ক্ষমা করুন কাকা, ওরকম অসৎ বুদ্ধি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হয় নাই। আর আশীর্ব্বাদ করুন কখন যেন না হয়।

ঠাকুরদা। আমিও ত তাই বিশ্বাস করি। তুমি যে লোকের পুত্র, তোমার অসদ্বুদ্ধি হওয়াত সম্ভব নয়। তথাপি আমার মনে অভিমান জাগিয়াছিল। ফৌজদারী হাকিম হওয়া, এত অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়! বাঙ্গালীতে এরূপ চাকরী পায়, আগে আমার এ ধারণাই ছিলনা। যখনই আমি এই খবর পাইয়াছি, তখনই দাদার শোকে অভিভূত হইয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। আক্ষেপ, পুত্রের এ সৌভাগ্য তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পিতা। আপনার ত দুঃখ হইবারই কথা, আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু।

ঠাকুরদা। শুধু বন্ধু বলিলেও ঠিক সম্বন্ধ বলা হয় না। তিনি আমার সহোদর—গুরু। আমাদের এ ভালবাসা কাহাকেও বলিবার নহে। কেননা বলিলেও সে বুঝিবেনা। অধিক আর কি বলিব, তুমি পুত্র, তুমিও তা বুঝিতে পার নাই। পারিলে, তুমি সবকাজ ফেলিয়া আগে এ শুভ সংবাদ আমার কাছে উপস্থিত করিতে।

পিতা। অপরাধ হইয়াছে কাকা, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার এরূপ অভিমান জাগিবে জানিলে, আমি, সর্ব্বাগ্রে আপনার চরণ দর্শন করিয়া আসিতাম।

ঠাকুরদা। আমি প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তুমি এই আস—এই আস ভাবিয়া আমি পথপানে চাহিয়াছিলাম। তুমি যখন একান্তই গেলেনা, তখন, তোমাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ব্যাকুলতা আসিল। কিন্তু কি করি, বড় লজ্জা বোধ হইল বলিয়া দিনমানে এথানে আসিতে পারিলামনা।

মাতা অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"আপনার কাছে যাইবার জন্য আমি উঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছি। বলিয়াছি, কাকাম'শায়ের সঙ্গে দেখা না করিলে, তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইবে। উনি কোনমতেই যাইতে পারিলেন না। আপনার পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের ক্ষমা করুন।"

"আপনাকে অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য করিয়া যাই নাই, কাকা ম'শায়, একথা আপনি মনের কোণেও স্থান দিবেন না। আপনার কাছে যাইবার একান্ত প্রয়োজন স্বত্বেও যাইতে পারি নাই, এইটে শুনিলেই আপনি আমার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া পিতা ঠাকুরদার কাছে টাকার কথা পাড়িলেন। পিতামহীকে ইতঃপূর্ব্বে যে সব কারণ দেখাইয়াছিলেন, গোবিন্দ ঠাকুরদা'কেও সেই সমস্ত কারণ দেখাইয়া পিতা সর্ব্বশেষে বলিলেন—"কাকা ম'শায়, কাল আপনাকে যেমন করিয়া হউক, পাঁচশত টাকা ঋণ দিতে হইবে।"

এতক্ষণ পরে ঠাকুরদা যেন পিতার নির্দ্দোষতায় বিশ্বাস করিলেন। টাকার প্রয়োজন স্বত্বেও যখন বাবা তাঁহার কাছে যান নাই, তখন তিনি যে একান্ত অশক্ত হইয়াছিলেন, এটা ঠাকুরদার যেন বোধ হইল। তিনি বলিলেন—"টাকার যখন প্রয়োজন, তখন তুমি যাইতে না পারিলেও, বৌমাকেও অন্ততঃ একবার আমার কাছে পাঠাইতে পারিতে। আর ঋণই বা তোমাকে করিতে হইবে কেন? তোমার পিতার সমস্ত টাকাই যে আমার কাছে রহিয়াছে।

পিতা। তাহা আমি জানিতাম না।

ঠাকুরদা। সে কি! দাদা কি তোমাকে টাকার কথা কিছু বলেন নাই?

পিতা। না। আর বলিবারও তাঁর প্রয়োজন হয় নাই। তিনি জানিতেন, টাকা তাঁর ঘরেই যেন তোলা আছে। আমাদের যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই পাইব।

ঠাকুরদা। তা হ'ক। তথাপি তোমাকে টাকার কথা বলা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। যদি আমিও ইহার মধ্যে মরিয়া যাইতাম, তাহ'লে আমার কি সর্ব্বনাশ হইত বল দেখি! আজকালকার ছেলে কি উপযাচক হইয়া তোমার টাকা শোধ করিত? ভগবান আমাকে বড়ই রক্ষা করিয়াছেন। তাহ'লে শুন অঘোরনাথ, তোমাকে যে কথা বলিতে আমি এত রাত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শুন। তোমার পিতার ন্যস্ত যে সকল টাকাকড়ি কাগজপত্র আমার কাছে আছে, কাল আমি সে সমস্তই তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

পিতা। অবশ্য আপনি যখন দিবেন বলিতেছেন, তখন আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। আপনার কাছে টাকা থাকায় আমি যত নিশ্চিন্ত, ঘরে সে টাকা রাখিলে আমার ততটা নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, বুদ্ধিমান আপনাকে একথা বুঝাইতে হইবে না। আমি এখন হইতে প্রায় বিদেশে বিদেশেই ঘুরিব। টাকা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফেরাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর মায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করাও যুক্তিযুক্ত নয়। পিতার এ উত্তরে মাতা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু যেন ভীত হইলেন। তাঁহার কথার ভাব স্মরণ করিয়া এখন আমি তাহা অনুমান করিতেছি। মাতা বলিলেন—"তা কাকা মহাশয় যখন আর টাকাকড়ি রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তখন উঁহার কাছে রাখিয়া উঁহার ঝঞ্ঝাট বাড়াইবার প্রয়োজন কি?

ঠাকুরদা। না মা, টাকা আর রাখিতে ইচ্ছা নাই।

মাতা। পরের টাকা—হিসাবনিকাস ঠিক রাখা কি, কম ঝঞ্ঝাট!

ঠাকুরদা। এই মা, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। ঝঞ্ঝাট কি সহজ! নিজেরই হ'ক, বা পরেরই হ'ক, এ বয়সে আর আমি ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে পারিব না। দাদার হঠাৎ মৃত্যুতে আমারও বড় ভয় হইয়াছে। অঘোরনাথ, তুমি কালই সমস্ত কাগজ পত্র বুঝিয়া লইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতামহীর একটিও কথা শুনিতে পাই নাই। পিতা-মাতা অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যা কহিতেছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কথা শুনিবার পর এ সকল কথা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি ঠাকুরমার কথা শুনিতে উদ্গ্রীব হইয়াছিলাম।

পিতামহীর কথা শুনিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। গোবিন্দ ঠাকুরদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বউ ঠাকরুণ, তুমি যে কোনও কথা কহিতেছ না?" অঘোরনাথকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি বুঝাইয়া দিই, তুমি অনুমতি দাও।"

পিতামহী উত্তর করিলেন—"বুঝাইয়া দিবে কি? অঘোরনাথ উপযুক্ত হইয়াছে, তোমারও এ বাপের বোঝা বহিতে ইচ্ছা নাই। তখন উহাদের সম্পত্তি উঁহাদের ফেলিয়া দাও। তার আর বুঝাইয়া দিবে কি?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি বলিলে। দাদা এতকাল

কি উপার্জ্জন করিল, কখনও কোন দিন সখ্ করিয়াও জানিতে চাহিলে না। তোমার বুদ্ধির যোগ্য কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু বিনা হিসাবে দিয়া আমি সন্তুষ্ট হইব কেন ?”

"তবে তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়—কর।"

"দাদার কাছে কতবার হিসাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। দাদা খাতা দেখিলেই ক্রোধ করিতেন, মুখ ফিরাইতেন। তোমার কাছে ত টাকার কথা তুলিতেই পারিতাম না। বউ! দাদার বিশ বৎসরের ন্যস্ত ধন। তিনি নিজে পর্য্যন্ত জানিতেন না, আমার কাছে তাঁহার কি ছিল। এই জন্য সত্য কথা বলিতে কি, এই বিশ বৎসর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি নাই। কি জানি, কোন মুহূর্ত্তে সহসা যদি আমার জীবন যায়, দাদা যদি সে সময় ঘরে না থাকেন, স্ত্রী-পুত্রে—করিবে না খুব বিশ্বাস—তবু কালবশে—যদি সে সম্পত্তি অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাকে অনন্তকাল অমুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। এই ভয়ে আমি সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতাম। অথচ পাছে দাদার ক্রোধ হয়, এই ভয়ে তাহার কাছে ইদানীং টাকার কথা উত্থাপনও করিতে পারিতাম না। কি করি বউ! সে অগাধ বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন—নিরুপায়ে আমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব রাখিয়াছি। কাল অঘোরনাথকে বুঝাইয়া দিব। নখদর্পণের হিসাব। বুদ্ধিমান অঘোরনাথ দেখামাত্র বুঝিতে পারিবে।”

পিতা। হিসাব আবার কি দেখিব? যাঁহার সম্পত্তি তিনি কখন দেখেন নাই! আমি কি এতই হীন হইয়াছি, কাকাম'শায় ?

ঠাকুরদা। বেশ, হিসাব না দেখিতে চাও, কাগজ-পত্রগুলাত তোমার কাছে রাখিতে হইবে!

পিতা। সে দিতে হয়, মায়ের হাতে দিবেন।

পিতামহী। না বাবা, আমি ওসব সামগ্রী আর হাতে করিব না। আমি এখন তোমাদের রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। কাগজ-পত্র টাকা-কড়ি সমস্ত তুমি বৌমার হাতে দিয়ো।

পিতা। সে যাহা করিবার পরে করা যাইবে। কাগজ-পত্রের জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত নই। যে জন্য আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা আপনাকে আমি বলিয়াছি। আমার টাকার একান্ত প্রয়োজন। হাজার টাকা হইলেই ভাল হয়, একান্ত না হয় পাঁচশো টাকা আপনাকে যেমন করিয়া হউক দিতে হইবে।

ঠাকুরদা। হাজার টাকা হইলেই যদি ভাল হয়, হাজারই দিব।

মাতা। আপনি যদি মনে কিছু না করেন, তাহা হইলে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

ঠাকুরদা। বল।

মাতা। আগে বলুন, কিছু মনে করিবেন না ?

ঠাকুরদা। কত টাকা আছে জিজ্ঞাসা করিবে ত ?

মাতা। আমার শ্বশুর বহুকাল হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুরদা। হাঁ বউ, তোমার কি জানিতে ইচ্ছা হয় না ? তোমার স্বামীর উপার্জ্জন, একদিনও কি তোমার মনে জানিবার খেয়াল হইল না!

পিতামহী। বেশত বলইনা ঠাকুরপো, আজ একবার শুনিয়া লই।

ঠাকুরদা। তুমি কি কিছু আন্দাজ করিতে পার অঘোরনাথ ?

পিতামহী। ও বালক—ও কি আন্দাজ করিবে ?

পিতা। গত তিন বৎসরের একটা আন্দাজ করিতে পারি। কেন না এই কয় বৎসর মাসে তাঁহার কি আয় ছিল, আমার অনেকটা জানা আছে। এই কয়বৎসর আমিও তাঁহাকে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা দিয়াছি। তাঁহার আয় ছাড়িয়া দিলে, এই তিন বৎসরে আমার অন্ততঃ দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আমি জানি না।

ঠাকুরদা। তিনি তোমার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। সব আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

পিতা। তাহ'লে এই দুই হাজার—

ঠাকুরদা। দুই হাজারের বেশি। প্রায় চব্বিশশো হইবে।

পিতা। তাহ'লে এই চব্বিশশো, আর পিতার হাজার চারেক। তাহার মধ্যে বাসা ও যাতায়াত খরচ বাবদে হাজার খানেক টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা।

ঠাকুরদা। তাহ'লে তুমি বলিতে চাও, গত তিন বৎসরে তোমাদের হাজার পাঁচেক টাকা সঞ্চয় হইয়াছে?

পিতা। এই আমার অনুমান। তারপর, ইহার পূর্ব্বেও আরো হাজার পাঁচেক, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশহাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আর কিই বা অবশিষ্ট আছে, আপনি জানেন।

এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুরদা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পিতা যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উত্তরেই সেইটিই যেন আমার অনুমান হইল। পিতা বলিলেন—"হাসিলেন যে কাকামশায়? তবে কি বুঝিব, পিতা আমার সারা জীবনে দশহাজার টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই?"

ঠাকুরদা পিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ! তাহ'লে আজ আর টাকার কথা তোমাকে বলিব না। কাল অঘোরনাথকে সমস্ত কাগজ দেখাইব।"

মাতা ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন—"কাগজ-পত্রও আপনার, হিসাবও আপনার। উনি আর দেখিয়া কি বুঝিবেন!"

ঠাকুরদা মায়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকেই পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ তাহ'লে যা বলিবার কালই বলিব, আজ আমি চলিলাম। পারত তুমিও কাল সকালে একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো।"

"না ভাই ওইটি আমাকে অনুরোধ করিয়ো না। টাকার কথায় আমি থাকিব না। উহাদের টাকা উহাদের ফেলিয়া দাও—আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

"বেশ, কাল তাই করিব। রাত্রি অধিক হইতেছে, আজ আমি চলিলাম।"

ইহার পর কিছুক্ষণের জন্য কাহারও কোন কথা আমি শুনিতে পাইলাম না। তাহাতেই অনুমান করিলাম, ঠাকুরদা চলিয়া গিয়াছেন।

কিছুক্ষণের নীরবতায় আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তারপর কে কি কহিল, আমি আর শুনিতে পাইলাম না।

(১০)

পরবর্ত্তী তিন চারি দিবসের ঘটনা আমার স্মৃতি হইতে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে।

অনুমানে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া তাহা বলিতে আমি নিরস্ত হইলাম। গোবিন্দ ঠাকুরদার কাছে পিতার কি যে প্রাপ্তি হইল, আমার পিতামহের সম্পত্তি কি ছিল, এসব আমি সময়ান্তরে জানিয়াছি। অনেক দিন পরে। সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া যথাসময়ে আপনাদের জানাইব। গুরুজন লইয়া কথা, অনর্থক তাহার অবতারণা করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

পিতার প্রথম চাকরী-স্থান হুগলী। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসের শেষে পিতা হুগলী যাত্রা করিলেন। আমার ও মায়ের তাঁহার সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হইল না। পিতা পুরাবেতন পাইবেন না। এই জন্য তিনি আমাদিগকে সে দূরদেশে লইয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। সঙ্গে যাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও মাতা কর্ত্তৃপক্ষের কার্পণ্যের উপর দোষারোপ করিয়া পিতার সঙ্গে যাইতে নিরস্ত হইলেন।

আমি বুঝিলাম, আপাততঃ ছয় মাসের জন্য আমাকে আর গ্রাম ছাড়িতে হইবে না। পিতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলাম, এই কয়মাস আমাকে বাড়ীতে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের শাসনাধীন থাকিতে হইবে।

এ কয়দিনের মধ্যে একটি দিনের জন্যও আমি সেই কমনীয় কান্তি ব্রাহ্মণকে দেখি নাই। তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কি না তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পিতার উচ্চপদ প্রাপ্তির উল্লাসে আমি বোধ হয়, সে সময় বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

গ্রাম হইতে পোয়াটাক পথ তফাতেই একটি খাল। সেই খালে কলিকাতা যাইবার ডোঙ্গা থাকিত। গ্রামের বহুলোক, স্ত্রী ও পুরুষ, পিতাকে শুভকার্য্যে শুভযাত্রা করাইতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই খালের ধার পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আমরাও গিয়াছিলাম।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণকে পিতার সমীপে উপস্থিত হইতে দেখিলাম।

অমনি সেই সময়ে পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া যাকে

বলিতে শুনিলাম—"মা! বাবুকে পিছু ডাকিতে বামুনকে নিষেধ কর।"

পিতামহী বলিলেন—"ভয় নাই, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ। যাতে তোমার স্বামীর অনিষ্ট হয়, এমন কাজ তিনি কখন করিবেন না।"

পিতামহীর অনুমান মিথ্যা হইল, তাঁহার আশ্বাসবাণী মিথ্যা হইল। পিতা ডোঙ্গায় উঠিবার জন্য সবেমাত্র পা'টি বাড়াইয়াছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ খালের তীর-ভূমি অবতরণ করিয়াই, পিতাকে বলিলেন—"অঘোরনাথ! একটু অপেক্ষা কর।"

মাতা অমনি নয়ন ঈষৎ বক্র করিয়া পিতামহীর মুখের পানে চাহিলেন, পিতামহীও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ কি বলেন, শুনিবার জন্য আমি যথাসম্ভব তাঁহার সমীপস্থ হইলাম।

পিতাও যেন ব্রাহ্মণের আচরণে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি উত্তোলিত চরণ নামাইয়া বলিলেন—"সমস্তই ত বলিয়াছি। আবার আপনার কি বলিবার আছে?"

"না আমার নিজের আর বলিবার কিছু নাই। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে তোমার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম, তোমার কর্ম্মস্থানে যাইতে অন্ততঃ সপ্তাহ বিলম্ব হইবে। তুমি এত শীঘ্র যাইবে, তাহা আমি শুনি নাই। তুমি আজ যাত্রা করিতেছ শুনিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি।"

"কি প্রয়োজন বলুন?"

"প্রয়োজন আমার নয়, তোমার। অবশ্য তোমার হইলেই আমার। কেননা তোমার মঙ্গলের উপর আমার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।"

"কি বলিতে চান, বলুন।"

"কোন্ মূর্খ তোমাকে এ সময় যাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছে?"

"তাতে কি হইয়াছে? এ সময় যাত্রা করিতে দোষ কি?"

"দোষ কি! যদিও তুমি বৈবাহিক, তথাপি তুমি স্নেহাস্পদ। কি দোষ তা আর তোমাকে কি বলিব? সূর্য্যাস্তের আর একদণ্ড সময় আছে। এই সময় অপেক্ষা করিয়া যাত্রা কর। আর যখন শুভকর্ম্মের জন্য যাত্রা করিতেছ, তখন এই সামগ্রীটা সঙ্গে লইয়া যাও।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শুষ্ক ফুলের মত কি একটা সামগ্রী পিতার হাতে দিলেন। তারপর তীর-ভূমি হইতে উঠিয়া পিতামহীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সকলেই ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য উৎসুক হইল। যখন সকলে সে সময়ে যাত্রার ফল শুনিল, যখন বুঝিল সে অশুভক্ষণে যাত্রা করিলে পিতার মৃত্যু, অথবা মৃত্যুতুল্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তখন সেই অজ্ঞাত অজ্ঞ পঞ্জিকা-দর্শকের উপরে সকলেই এক বাক্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় দেখি, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মাথা গুঁজিয়া মাতার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পিতা ব্রাহ্মণের এই কুসংস্কার-প্রণোদিত কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিলেন না। কেননা ব্রাহ্মণ পিছন ফিরিতেই তদ্দত্ত শুষ্ক পুষ্পটি তিনি খালের জলে নিক্ষেপ করিলেন। পুষ্প স্রোতের জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাঁহার অবজ্ঞায় ক্ষুণ্ণ হইয়াই যেন তীব্রবেগে স্থানান্তরিত হইয়া তীরস্থ একটা বেতসকুঞ্জে আত্মগোপন করিল। কিন্তু একদণ্ড বিলম্বে কোনও ক্ষতি হইবে না বুঝিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিনি শালতিতে পদার্পণ করিলেন না। তীরের উপরে উঠিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সেদিন শুক্লপক্ষীয়া একাদশী। পিতামহীর সে দিন নিরম্বু উপবাস। মাস অগ্রহায়ণ। খালের দুই পাশের শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্র সন্ধ্যার বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গসঙ্কুল হরিৎ সাগরে পরিণত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তগত হইল এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পীত কিরণ-তরঙ্গ যেন ঈর্ষায় প্রান্তর-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমার এখনও সে দৃশ্য বেশ মনে পড়ে। এখনও যেন দেখিতেছি, বায়ুবলে উত্থিত ধান্য-শীর্ষগুলা আকাশের কৌমুদীকে পাইয়া, আহ্লাদে তরঙ্গ-শিরে ভাসিয়া, অবিরাম রজত ফেনোচ্ছ্বাস ফুৎকার করিতেছে।

পিতা সেই সন্ধ্যায় আত্মীয়-বন্ধুগণের আশীর্ব্বাদ-প্রেরিত হইয়া শালতীতে আরোহণ করিলেন। সেই পীতশ্যাম সাগর দেখিতে দেখিতে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া শালতীকে চোখের অন্তরাল করিয়া দিল।

পিতার এই কর্ম্ম-প্রাপ্তিতে গ্রামের সকল লোকেই সুখী হইয়াছিল, মায়ের মুখ আনন্দে গর্ব্বে ভরিয়াছিল।

আমি সুখী কি দুঃখী হইয়াছিলাম, মনে নাই। কিন্তু পিতামহীর একটা কথায় আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। গৃহে ফিরিয়াই পিতামহী আমাকে বলিলেন—"যাহ'ক ভাই, আরও ছয়মাস বোধ হয়, আমি তোমাকে দেখিতে পাইব। 'সাভ্যোম' চাকরী স্বীকার করে নাই বলিয়া আমি আগে তাকে মূর্খ মনে করিয়াছিলাম। এখন গুরুজন হইয়াও তাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বাস্তবিকই পিতামহী করযোড়ে সাভোম ম'শায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদুটির প্রান্ত হইতে আমি দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

(১১)

যাক্, এতকাল আমার কনের কথা বলিবার অবসর পাই নাই। চাকরী, বাম্‌নাই আর বিষয়ের হাঙ্গামে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল কতকগুলা বাজে কথায় আপনাদের কর্ণকণ্ডূতি উৎপাদন করিয়াছি। সকল উপন্যাসের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সেই পরমাবলম্বন, সমাজ-চক্ষে এখনও দুষ্প্রাপ্য হইলেও কল্পনার দৃষ্টিতে চিরাবস্থিতা, সেই ষোড়শী নায়িকাই যদি আমার এ গল্পে না রহিল, তাহা হইলে এ শুষ্ক সমাজ-কথার ঝঙ্কার তুলিয়া লাভ কি? সুতরাং এইবারে মনের কথা—কনের কথা কহিব।

যে গ্রামে কনের বাড়ী, তাহা আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে। উভয় গ্রামের মধ্যে একটা মাঠ। এখন তাহাকে মাঠই বলি, কিন্তু বাস্তবিক এক সময়ে তাহা গঙ্গার গর্ভ ছিল। গঙ্গা স্রোতের মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। তার পূর্ব্বের প্রবাহ-পথ এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে আজিও পর্য্যন্ত এই দুইখানি গ্রাম—প্রান্তস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট নানাজাতীয় তরুশির অবনমিত করিয়া—ক্ষেত্রমধ্যে আপনাদিগের লুপ্ত ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আর একটি গণ্ড-গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী ইস্কুল ছিল। আমি প্রতিদিন দুইগ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে যাইতাম। বৈকালে ঘরে প্রত্যাগমন-মুখে লুপ্তগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত তরুগুলির মত, আমিও পরপারের সেই গ্রামখানির ভিতরে আমার সেই পাঁচ বছরের কনেটির আজিও না-দেখা মুখখানির অনুসন্ধান করিতাম।

আমার মনে হইত, সেই 'কি জানি কে' যেন আমার গ্রামস্থ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা আপনার। কিন্তু শৈশবের লুকোচুরি-খেলায় সে আমার নিকট হইতে এমন করিয়া লুকাইয়া আছে, যেন বহু অনুসন্ধানে—চারিদিক আতিপাতি করিয়াও—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। তাহাকে ছুঁইতে না পারায় আজিও পর্য্যন্ত যেন আমি চোর হইয়া ঘুরিতেছি। এক দিন তাহার চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, গ্রাম হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য মাঠে অবতরণ করিয়াছিলাম। গ্রামবুড়ী যদি তাহার দন্তহীন মুখব্যাদান করিয়া আমাকে ভয় না দেখাইত, তাহা হইলে হয়ত সে দিন আমি কনেদের দেশে উপস্থিত হইতাম।

তাহার প্রতি এতটা মমতা যে কেন আসিয়াছিল, এত অল্প বয়সে সে যে আমার আপনার হইতেও আপনার, এ বোধ কেন হইয়াছিল, তাহা এখন অনুমানে কতকটা যেন বুঝিয়াছি।

আমাদের দেশের অন্য শ্রেণীর বিবাহ সম্বন্ধ ও আমাদের বিবাহ-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে। অন্য শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ছাঁদনাতলাতে ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন কন্যার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কন্যাকে আবার অপর পাত্রে অর্পণ করা চলে, আমাদের সম্প্রদায়ের বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ সেরূপ নয়। সম্বন্ধই একরূপ বিবাহ। সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে কতকগুলা মাঙ্গল্য কর্ম্ম করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণে উভয়পক্ষের আদান-প্রদানের প্রতিশ্রুতি হয়। দেবদ্বিজের অর্চ্চনায় উভয় পক্ষের যথা-সম্ভব অর্থব্যয়ও হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে কন্যার নাম 'অন্যপূর্ব্বা'। পূর্ব্বে কোন কুলীনের গৃহে তাহার বিবাহ হইত না। শুনিয়াছি, কোন কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ এরূপ কন্যার আর বিবাহ দেন নাই; বাগ্‌দত্তা কুমারীকে অপর বরে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই। তাহাকে বিধবা-জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিতেন।

দশমবর্ষীয় বালকের শুদ্ধমনে বাগ্‌দানের মন্ত্রগুলা বুঝি ঘুমঘোরে উচ্চারিত আত্মনিবেদিত প্রিয়বচনের [illegible] থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইত, বুঝি তাহার প্রিয়তমার বালক স্বামীর অন্তরাত্মা মিলনাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

পুরাণো ঘাট

[শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়]

ওই ত বাঁধা ঘাট গঙ্গাতীরে,
নিবিড় বটছায়া স্বচ্ছ নীরে ;
অমল শীতল জল গায়িয়া কল কল
বহিছে অবিরল ধরণী চিরে,
পুরাণো বাঁধা ঘাট ওইত তীরে।

ওপারে গাছপালা ধূসর কালো,
উছল নদীজলে ঝলকে আলো,
এপারে বটছায় কোকিল কুহু গায়
সে গীত কার হায় না লাগে ভালো ?
ওপার হয়ে আসে ধূসর কালো !

কত না অলক্ত চরণ-দল,
করেছে রঞ্জিত পাষাণতল,
কত না কলসীতে ত্বরায় জল নিতে
এঘাট মুখরিতে বাজিত মল,
হাসিত থলথলি কলস-জল।

ফাগুন বেলা-শেষে সন্ধ্যাকাশে
রজনী ঘন-ছায়া ঘনায়ে আসে,
গাঁয়ের বধূগুলি ঘোমটা ফেলি খুলি
লহরমালা তুলি মধুর হাসে
কহিত কত কথা ঘাটের পাশে।

সারাটা দিন-শেষে পথিক কেহ
দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ
নদীর তীরে তীরে চলেছে ধীরে ধীরে
পথিক কোথা ফিরে কোথা বা গেহ—
চলেছে বেলা-শেষে পথিক কেহ।

সহসা ঘাটে চাহি চমকি উঠে
অমিয় [illegible] ফুটে,
[illegible] হিয়া-মাঝে [illegible] যেন উঁকি [illegible]
[illegible]
[illegible]

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চকিতে ঝুঁকি
চাঁদিমা মাঝে মাঝে মারিত উঁকি
রজত জোছনায় যেন বা পরী ভায়
লাবণী উছলায় চন্দ্রমুখী,
চাঁদিমা মাঝে মাঝে মারিত উঁকি।

যে যায় তরী বেয়ে সে দেখে চেয়ে
যে জন আবেগেতে চলেছে গেয়ে
ঘাটের কাছে আসি সে রাখি দিল বাঁশী,
দেখিল কলহাসি ঘাটটি ছেয়ে,
রয়েছে অলকার যতেক মেয়ে।

বুঝিবা অলকায় এসেছে ভুলি
সমুখে যবনিকা কে দিল তুলি
পথিক তরণীতে বিভল ভুল-চিতে
দিঠিটি ফিরে নিতে গেল সে ভুলি,
আজি এ যবনিকা কে দিল তুলি ?

চলেছে বেয়ে ওই তরণীটিরে
বীণাটি-লয়ে যেবা গায়িছে ধীরে,
কোথায় গেল তান মিলাল কোথা তান
কি জানি কোথা প্রাণ কাঁদিয়া ফিরে,
বেয়ে যে চলেছিল তরণীটিরে !

সেই ত বাঁধা ঘাট গঙ্গাতীরে
উছলি ঢেউ শুধু কাঁদিয়া ফিরে
কোথা সে কলহাসি কোথা সে রূপরাশি
শুধু গো উঠে ভাসি ব্যাকুল নীরে—
পুরাণো সেই স্তূর সোপান ঘিরে !

কোথা সে পুরাতন—কোথায় তারা ?
গাঁয়ের বধূগুলি ?—হেথায় যারা
কহিত কত কথা হড়াত [illegible]
[illegible] সে [illegible] হয়েছে [illegible]

আমি সুখী কি দুঃখী হইয়াছিলাম, মনে নাই। কিন্তু পিতামহীর একটা কথায় আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। গৃহে ফিরিয়াই পিতামহী আমাকে বলিলেন—"যাহ'ক ভাই, আরও ছয়মাস বোধ হয়, আমি তোমাকে দেখিতে পাইব। 'সাভ্যোম' চাকরী স্বীকার করে নাই বলিয়া আমি আগে তাকে মূর্খ মনে করিয়াছিলাম। এখন গুরুজন হইয়াও তাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বাস্তবিকই পিতামহী করযোড়ে সাভ্যোম ম'শায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদুটির প্রান্ত হইতে আমি দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

(১১)

যাক্, এতকাল আমার কনের কথা বলিবার অবসর পাই নাই। চাকরী, বাম্নাই আর বিষয়ের হাঙ্গামে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল কতকগুলা বাজে কথায় আপনাদের কর্ণকণ্ডূতি উৎপাদন করিয়াছি। সকল উপন্যাসের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সেই পরমাবলম্বন, সমাজ-চক্ষে এখনও দুষ্প্রাপ্য হইলেও কল্পনার দৃষ্টিতে চিরাবস্থিতা, সেই ষোড়শী নায়িকাই যদি আমার এ গল্পে না রহিল, তাহা হইলে এ শুষ্ক সমাজ-কথার ঝঙ্কার তুলিয়া লাভ কি? সুতরাং এইবারে মনের কথা—কনের কথা কহিব।

যে গ্রামে কনের বাড়ী, তাহা আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে। উভয় গ্রামের মধ্যে একটা মাঠ। এখন তাহাকে মাঠই বলি, কিন্তু বাস্তবিক এক সময়ে তাহা গঙ্গার গর্ভ ছিল। গঙ্গা স্রোতের মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। তার পূর্ব্বের প্রবাহ-পথ এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে আজিও পর্য্যন্ত এই দুইখানি গ্রাম—প্রান্তস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট নানাজাতীয় তরুশির অবনমিত করিয়া—ক্ষেত্রমধ্যে আপনাদিগের লুপ্ত ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আর একটি গণ্ডগ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী ইস্কুল ছিল। আমি প্রতিদিন আমাদের গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে যাইতাম। বৈকালে ঘরে প্রত্যাগমন-মুখে লুপ্তগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত তরুগুলির মত, আমিও পরপারের সেই গ্রামখানির ভিতরে আমার সেই পাঁচ বছরের কনেটির আজিও না-দেখা মুখখানির অনুসন্ধান করিতাম।

আমার মনে হইত, সেই 'কি জানি কে' যেন আমার গ্রামস্থ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা আপনার। কিন্তু শৈশবের লুকোচুরি-খেলায় সে আমার নিকট হইতে এমন করিয়া লুকাইয়া আছে, যেন বহু অনুসন্ধানে—চারিদিক আতিপাতি করিয়াও—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। তাহাকে ছুঁইতে না পারায় আজিও পর্য্যন্ত যেন আমি চোর হইয়া ঘুরিতেছি। একদিন তাহার চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, গ্রাম হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য মাঠে অবতরণ করিয়াছিলাম। গ্রামবুড়ী যদি তাহার দন্তহীন মুখব্যাদান করিয়া আমাকে ভয় না দেখাইত, তাহা হইলে হয়ত সেদিন আমি কনেদের দেশে উপস্থিত হইতাম।

তাহার প্রতি এতটা মমতা যে কেন আসিয়াছিল, এত অল্প বয়সে সে যে আমার আপনার হইতেও আপনার, এ বোধ কেন হইয়াছিল, তাহা এখন অনুমানে কতকটা যেন বুঝিয়াছি।

আমাদের দেশের অন্য শ্রেণীর বিবাহ সম্বন্ধ ও আমাদের বিবাহ-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে। অন্য শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ছাঁদনাতলাতে ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন কন্যার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কন্যাকে আবার অপর পাত্রে অর্পণ করা চলে, আমাদের সম্প্রদায়ের বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ সেরূপ নয়। সম্বন্ধই একরূপ বিবাহ। সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে কতকগুলা মাঙ্গল্য কর্ম্ম করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণে উভয়পক্ষের আদান-প্রদানের প্রতিশ্রুতি হয়। দেবদ্বিজের অর্চ্চনায় উভয় পক্ষের যথাসম্ভব অর্থব্যয়ও হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে কন্যার নাম 'অন্যপূর্ব্বা'। পূর্ব্বে কোন কুলীনের গৃহে তাহার বিবাহ হইত না। শুনিয়াছি, কোন কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ এরূপ কন্যার আর বিবাহ দেন নাই; বাগ্‌দত্তা কুমারীকে অপর বরে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই। তাহাকে বিধবা-জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিতেন।

দশমবর্ষীয় বালকের শুদ্ধমনে বাগ্দানের মন্ত্রগুলা বুঝি ঘুমঘোরে উচ্চারিত আত্মনিবেদিত প্রিয়বচনের [illegible] থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইত, বুঝি তাহার প্রিয়তমার বালক স্বামীর অন্তরাত্মা মিলনাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

পুরাণো ঘাট

[শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়]

ওই ত বাঁধা ঘাট গঙ্গাতীরে,
নিবিড় বটছায়া স্বচ্ছ নীরে ;
অমল শীতল জল গাহিয়া কল কল
বহিছে অবিরল ধরণী চিরে,
পুরাণো বাঁধা ঘাট ওইত তীরে।

ওপারে গাছপালা ধূসর কালো,
উছল নদীজলে ঝলকে আলো,
এপারে বটছায় কোকিল কুহু গায়
সে গীত কার হায় না লাগে ভালো ?
ওপার হয়ে আসে ধূসর কালো !

কত না অলক্ত চরণ-দল,
করেছে রঞ্জিত পাষাণতল,
কত না কলসীতে ত্বরায় জল নিতে
এঘাট মুখরিতে বাজিত মল,
হাসিত থলথলি কলস-জল।

ফাগুন বেলা-শেষে সন্ধ্যাকাশে
রজনী ঘন-ছায়া ঘনায়ে আসে,
গাঁয়ের বধূগুলি ঘোমটা ফেলি খুলি
লহরমালা তুলি মধুর হাসে
কহিত কত কথা ঘাটের পাশে।

সারাটা দিন-শেষে পথিক কেহ
দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ
নদীর তীরে তীরে চলেছে ধীরে ধীরে
পথিক কোথা ফিরে কোথা বা গেহ—
চলেছে বেলা-শেষে পথিক কেহ।

সহসা ঘাটে চাহি চমকি উঠে
[illegible] দেখা [illegible] লুটে,
[illegible] হিয়া-দ্বারে [illegible] যেন উঁকি [illegible]
[illegible]

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চকিতে ঝুঁকি
চাঁদিমা মাঝে মাঝে মারিত উঁকি
রজত জোছনায় যেন বা পরী ভায়
লাবণী উছলায় চন্দ্রমুখী,
চাঁদিমা মাঝে মাঝে মারিত উঁকি।

যে যায় তরী বেয়ে সে দেখে চেয়ে
যে জন আবেগেতে চলেছে গেয়ে
ঘাটের কাছে আসি সে রাখি দিল বাঁশী,
দেখিল কলহাসি ঘাটটি ছেয়ে,
রয়েছে অলকার যতেক মেয়ে।

বুঝিবা অলকার এসেছে ভুলি
সমুখে যবনিকা কে দিল তুলি
পথিক তরণীতে বিভল ভুল-চিতে
দিঠিটি ফিরে নিতে গেল সে ভুলি,
আজি এ যবনিকা কে দিল তুলি ?

চলেছে বেয়ে ওই তরণীটিরে
বীণাটি-লয়ে যেবা গাহিছে ধীরে,
কোথায় গেল তান মিলাল কোথা তান
কি জানি কোথা প্রাণ কাঁদিয়া ফিরে,
বেয়ে যে চলেছিল তরণীটিরে !

সেই ত বাঁধা ঘাট গঙ্গাতীরে
উছলি ঢেউ শুধু কাঁদিয়া ফিরে
কোথা সে কলহাসি কোথা সে রূপরাশি
শুধু গো উঠে ভাসি ব্যাকুল নীরে—
পুরাণো সেই সুর সোপান ঘিরে !

কোথা সে পুরাতন—কোথায় তারা
গাঁয়ের বধূগুলি ?—হেথায় যারা
কহিত কত কথা ছড়ায়ে [illegible]
কোথা সে সরলতা হয়েছে হারা [illegible]

হীরার হার

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

(১)

বহুদিন পূর্ব্বে প্রয়াগের 'পায়োনিয়ার' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"YESTERDAY, shortly before noon, the Maharaja of Tolah, a small native state in the Punjab, died at Mussoorie from heart trouble, consequent on a severe attack of rheumatic fever. His death was expected, and Mr. William Terrant, C.I.E., Political Agent at Tolah, was present during the Maharajah's dying hours. Tragic import is added to the event, however, by the fact that, five hours later, whilst the aged Diwan of Tolah State was hastening to convey the sad intelligence to the Maharajah's successor, he was fatally stabbed by some one unknown. He was found lying in a corridor of the palace, and expired shortly afterwards.

"The affair savours of the murder and intrigue so often associated with native states in India when a fresh occupant ascends the *guddi*, but, in this instance, there is no question of succession involving rival interests. The Maharajah's heir is a young prince of nineteen, his eldest son, a youth of much promise, and one who has received a liberal English education. His father, a wise and judicious ruler, appointed him head of the State during an enforced residence in the hills, and the relations between the two were of a most affectionate character. The murdered Prime Minister, too, was highly esteemed by all classes, so the assassin's object cannot be even guessed at.

"Tolah, our readers will be aware, is fully five hundred miles distant from Mussoorie, and it has been ascertained beyond all doubt that the only telegraphic message transmitted from the hill station to Tolah, between the death of the Maharajah and the foul murder of the Diwan, was that sent by Mr. Terrant to the Minister. This was couched in a secret code. Indeed, the fact of the Maharajah's demise could not be generally known in the state until this morning.

"The Government of India will institute a full and searching inquiry by its responsible Agent, as similar dramatic incidents are far too frequent in the self-governed states."

আমাদের যে সকল পাঠক-পাঠিকা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য এই ইংরাজি অংশটির মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"টলা পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। গত কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে টলার মহারাজা মুসৌরীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কঠিন বাতজ্বরের আক্রমণে হৃদ্-যন্ত্রের অবসাদই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহারাজার এবার অব্যাহতি নাই, ইহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল ; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই টলা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ উইলিয়ম টেরাণ্ট, সি. আই. ই. মহারাজার

ভগবানদাসের সহিত সাক্ষাৎ করা কিছু কঠিন হইল, কিন্তু মহম্মদ খাঁ পলিটিক্যাল এজেণ্টের সুপারিশ পত্র আনিয়াছিলেন, ভগবানদাস শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও মহম্মদ খাঁকে নিরাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার জহরত-ক্রয়ের আগ্রহ ছিল না; তাঁহার জহরৎ-খানায় যত জহরত আছে—মহম্মদ খাঁ তত জহরৎ কখন চক্ষেও দেখেন নাই। তিনি মহম্মদ খাঁর সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। জহুরীও সে জন্য দুঃখিত হইলেন না, কারণ তিনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। ভগবানদাসের ভাবভঙ্গী বুঝিয়া মহম্মদ খাঁ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন; সেই দিন হইতে জহরৎ-বিক্রয় বন্ধ হইল। কিন্তু জহুরী টলা ত্যাগ করিলেন না।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ টেরাণ্ট বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও ন্যায়বান রাজকর্ম্মচারী; তিনি সিভিলিয়ান, 'মিলিটারী'র ন্যায় সঙ্গীনের খোঁচায় কার্য্যোদ্ধার করা অপেক্ষা গায়ে হাত বুলাইয়া, 'বাপু বাছা' বলিয়া, বেশী কাজ আদায় হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি প্রথমে গোলাপ সিংহের প্রধান সহচরকে আহ্বান করিয়া, সে তাহার প্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে কি জানে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাইলেন না। কেবল এইটুকু জানিতে পারিলেন, যুবরাজ অদৃশ্য হইলে—ভগবান দাস তাঁহার অনিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া, তাঁহার অনুসন্ধানে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন, স্বয়ং প্রাসাদের সর্ব্বত্র তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

মিঃ টেরাণ্ট অতঃপর ভগবানদাসকে 'এজেন্সী আফিসে' আহ্বান করিলেন। মহম্মদ খাঁ, ছদ্মবেশে জহরত বিক্রয় করিতেন, তিনি সে সময় টেরাণ্ট সাহেবের বাঙ্গলাতেই ছিলেন; কাপ্তেন ওয়েনও সেখানে ছিলেন। ভগবান দাস জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পলিটিক্যাল এজেণ্টকে সেলাম দিতে আসিলেন।

মহম্মদ খাঁ তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত একখানি ময়লা ডিস্ পরিষ্কার করিতেছিলেন। তিনি ভগবান দাসকে দেখিয়াও দেখিলেন না। ভগবানদাসকে সমাদরে চেয়ারে বসাইয়া টেরাণ্ট সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

ভগবানদাস যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, গোলাপ সিংহের গর্ভধারিণী প্রধানা রাজমহিষী অনেক দিন পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজার অনেকগুলি রাণী, তন্মধ্যে রাণী মতিবাঈর একটি পাঁচ বৎসরের পুত্র আছে। রাজা এই শিশুর ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, তাহার সুশিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজগদী গোলাপ সিংহেরই প্রাপ্য।—গোলাপ সিংহ যদি জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে এই শিশুই রাজগদীর উত্তরাধিকারী।

টেরাণ্ট সাহেব যে এ সকল কথা জানিতেন না, এমন নহে। তথাপি তিনি ভগবানদাসের গল্প-স্রোতে বাধা দিলেন না। ভগবানদাসের কথা ফুরাইলে তিনি বলিলেন, "মতি বাঈর ভাবভঙ্গী কিরূপ?"

ভগবানদাস বলিলেন, "তাহা আমার অজ্ঞাত। শুনিয়াছি, তিনি পতিশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।"

টেরাণ্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলাপ সিংহ অদৃশ্য হইয়াছেন, এ সংবাদে তাঁহার কোনও ভাবান্তর দেখা গিয়াছে কি?"

ভগবানদাস বলিলেন, "তাহাও বলিতে পারি না।—তবে জানিতে পারিয়াছি, তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন।"

টেরাণ্ট সাহেব বলিলেন, "আহারনিদ্রার সহিত শোকের সম্বন্ধ বিচার করিয়া, সকল সময় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।—আমি মতি বাঈএর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

ভগবানদাস সবিস্ময়ে বলিলেন, "তা কি করিয়া হইবে সাহেব! আপনি কি পর্দ্দানসিনকে বে-পর্দ্দা করিবেন? জান-পর্দ্দানের মালিক হইয়া এমন অন্যায় আদেশ করিবেন না।"

টেরাণ্ট সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভগবানদাস, আমি বালক নহি। আমার ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি আছে। মতি বাঈ যে পর্দ্দানসিন স্ত্রীলোক, তাহাও আমার জানা আছে।—আমার কথার প্রতিবাদ করিবেন না, এক ঘণ্টার মধ্যেই মতিবাঈ সাহেবাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে; আমি একাকী যাইবনা, আমার বন্ধু কাপ্তেন ওয়েনও আমার সঙ্গে যাইবেন।—মতি বাঈ কোথায়?"

Published by **K. V. SEYNE & BROS.**
60, Mirzapur Street, Calcutta.
Sole Agents : **GURUDAS CHATTERJEE & SONS**
201 Cornwallis Street, Calcutta

চিত্রে চন্দ্রশেখর হইতে
একখানি ছবি
এরূপ ৫০ খানির উপর
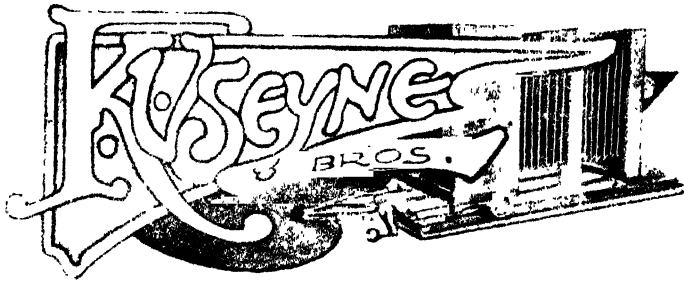
ভগবানদাস বলিলেন, "অন্দর মহলে।"

টেরাণ্ট সাহেব বলিলেন, "উত্তম, আমরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিব না, বাহিরে—দরবার-ঘরের পাশে থাকিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

ভগবানদাস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সাহেব, বড়ই শক্তকথা বলিতেছেন, কথাটা গোপন থাকিবে না। আপনি রাজার অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন, শুনিলেই রাজার লোক ক্ষেপিয়া উঠিবে, সিপাহীরা মনিবের ইজ্জত রক্ষার জন্য হাতিয়ার ধরিবে, তাহাদিগকে শান্ত করা কঠিন হইবে। আপনি রাজ্যের রক্ষক, বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি, আপনি ইচ্ছা করিয়া, এ অরাজক রাজ্যে আগুন জ্বালিবেন না।"

টেরাণ্ট সাহেব বলিলেন, "ভগবানদাস, আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে না। আমার কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিশ্বাস না থাকিলে গবর্মেণ্ট আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন না। আমি যে আদেশ করিয়াছি, তাহা রদ হইবে না; এক ঘণ্টার মধ্যে মতি বাঈ সাহেবার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি তাহার বন্দোবস্ত করুন।"

ভগবানদাস মাথা নাড়িয়া বলিলেন * * * * আপনি রাজ-অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন

ভগবানদাস কুর্ণিস করিয়া বিদায় লইলেন। মহম্মদ খাঁ এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভগবান দাসের মুখ গম্ভীর, মুখে অপ্রসন্ন ভাব। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি যেন হাসিতেছিল!—মহম্মদ খাঁর সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র মহম্মদ খাঁ মুখ নত করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তোয়ালে দিয়া ডিস্ ঘষিতে লাগিলেন।

ভগবানদাসের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

মহম্মদ খাঁ ডিস্ রাখিয়া টেরাণ্ট সাহেবের সম্মুখে আসিলেন। টেরাণ্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝিলে সর্দ্দার?"

কাপ্তেন ওয়েন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি?"

টেরাণ্ট সাহেব বলিলেন, "I dislike that fellow. He is altogether too immaculate for a native."

(৪)

দরবার হলের পার্শ্বস্থিত কক্ষে মতি বাঈর সহিত মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েনের সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

সাহেব মতি বাঈ সাহেবার সহিত দেখা করিবেন—এই সর্বনাশের কথা অবিলম্বে রাজপুরাতে রাষ্ট্র হইল। শুনিয়া সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত! যে খাইতে বসিয়াছিল, তাহার মুখে আর হাত উঠিল না, যে নাপিত কামাইতে বসিয়াছিল, তাহার হাতের ক্ষুর হাতেই রহিয়া গেল! মুহুরী লিখিতে বসিয়া যেমন এই কথা শুনিল, তৎক্ষণাৎ সে হাতের কলম কাণে গুঁজিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিল, "এ হ'লো কি?"

কিন্তু এই সকল আলোচনা ও চিন্তায় কাজ বন্ধ থাকিল না। রাজান্তঃপুর হইতে দরবারখানা পর্য্যন্ত পথ 'কাপড়' দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইল, দশ পনের হাত ব্যবধানে অস্ত্রধারী প্রহরী কোমরবন্ধ তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল। পুরুষ-মানুষকে সে অঞ্চল হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর রৌপ্যনির্ম্মিত পাল্কীতে মতি বাঈ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাত্রা করিলেন, পাল্কীর উপর লোহিত মখমলের আবরণ, তাহার চারিদিকে সুদৃশ্য সুবর্ণসূত্রের কারুকার্য্য। পাল্কীর চারিপাশে মুক্তার ঝালর ঝুলিতে লাগিল, এবং দুইজন পরিচারিকা পাল্কীর দুই পাশে পাল্কীর 'ঘাটাটোপ' ধরিয়া বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পাল্কীর অগ্রপশ্চাতে সশস্ত্র প্রহরী।—রাজবাড়ীর কাণ্ড এই-রূপ!

মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েন পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাল্কী সেই কক্ষের দ্বার-সন্নিকটে আনীত হইলে একজন পরিচারিকা পাল্কীর 'ঘাটা টোপ' তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মতি বাঈ কম্পিত হৃদয়ে কম্পিত পদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; পরিচারিকাদ্বয় কক্ষের বাহিরে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু-পত্নীর সহিত তাহারা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি পায় নাই

মতিবাঈ—সাহেব, আপনি এই অভাগিনীকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি

মতি বাঈ সাহেবার মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম ওড়নায় আবৃত ছিল। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ওড়নার ভিতর হইতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—টেরাণ্ট সাহেব ও কাপ্তেন ওয়েন ভিন্ন সেই কক্ষে অন্য কোনও লোক নাই; তখন তিনি ত্রস্তভাবে উভয়ের সন্নিকটে আসিয়া, অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিলেন। তাঁহার সুগৌর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ দেখিয়া দু'জনেই বিস্মিত হইলেন, কালা আদমীর গৃহে এমন সৌন্দর্য্য, এত রূপ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারা

স্থান, কাল বিস্মৃত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর রমণী —আয়া, মেথরাণী, মৎস্যনারী, কুলি-রমণী প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা হিন্দু-নারীর রূপের যে আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা মুছিয়া গিয়া, ম্যাডোনার অপূর্ব্ব সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি তাঁহাদের কল্পনা-নেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মতি বাঈ কিছুমাত্র চাঞ্চল্য-প্রকাশ না করিয়া, মিঃ টেরাণ্টের সম্মুখে জানু নত করিয়া উপবেশন করিলেন, তাহার পর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতর দৃষ্টিতে টেরাণ্ট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সাহেব, আপনি এই অভাগিনীকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি বিশ্বাস করুন, আর না করুন, ঈশ্বর জানেন, আমি নিরপরাধ। মহারাজা আমার গর্ব্ভে আমার প্রাণাধিক পুত্রের জন্মদান করিয়াছেন, তাহার মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি যুবরাজের অন্তর্ধানের কথা কিছুই জানি না। আমার প্রভু, আমার স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব—মহারাজকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, আমার এ জীবনে আর কাজ কি? কাহার জন্য আমি জীবন রাখিব? আপনি আমার হতভাগ্য সন্তানের ভার গ্রহণ করুন, আমি হাসিতে হাসিতে মহারাজের সহিত চিতানলে দেহ ভস্ম করি। সুপবিত্র সতীলোক ভিন্ন আমার আর কি প্রার্থনীয় আছে? সংসারে আর বাঁচিয়া সুখ কি? আমি দেওয়ান সাহেবকেও ভাগ্যদোষে হারাইয়াছি, তিনি আমাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন, সম্মান করিতেন; আমার মান মর্য্যাদার প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যুবরাজকে আমি কখন চক্ষে দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গুণের কথা সকলই শুনিয়াছি। আমি বিমাতা হইলেও মহারাজার অবর্ত্তমানে তিনি আমাকে জননীর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতেন, কিন্তু তাঁহাকেও পাওয়া যাইতেছে না! তিনি জীবিত আছেন কি না জানি না। তাই বলিতেছি, জীবন ধারণে আমার আর কিছুমাত্র আগ্রহ নাই, মহারাজার সহিত সহ-মৃতা হওয়াই এখন আমার একমাত্র কামনা। আপনি দয়া করিয়া আমার কামনা পূর্ণ করুন। সাহেব, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার মঙ্গল হইবে। আমি যে নিরপরাধ, ইহা কি আপনার বিশ্বাস হইতেছে না?"

মিঃ টেরাণ্ট মতি বাঈ সাহেবার কথা বিশ্বাস করিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "বাঈ সাহেবা, আপনি কোনও অপরাধ করিয়াছেন—এ কথা ত আমরা বলি নাই; তবে কেন আপনি দোষক্ষালনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন? ভাল, কোন্ বিষয়ে আপনি নির্দ্দোষ?"

মতি বাঈ সাহেবা বলিলেন, "দেওয়ানজির হত্যাকাণ্ডই বলুন, আর যুবরাজের অন্তর্ধানই বলুন, কোনও বিষয়েই আমি অপরাধিনী নহি। আমাকে অপরাধিনী বলিয়া কেহই কি সন্দেহ করে নাই? ভগবানদাস কি আপনাকে বলে নাই যে, আমার পুত্র রাজা হউক ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা?"

মতি বাঈ ক্ষণকাল নীরব হইলেন, একবার তিনি বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েনের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সাহেব, ভগবানদাসের কোন কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। দরবারীগণের মধ্যে তাহার ন্যায় স্বার্থপর কুটিল লোক আর কেহ আছে কি না জানি না, তবে শুনিয়াছি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সে আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা রটাইতেছে। আমার চরিত্রে কলঙ্কলেপনেও তাহার সঙ্কোচ নাই! আপনারা যদি সেই মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতকের কথা বিশ্বাস করিয়া মহারাজের প্রতি আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে করেন—তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমি—"

মতি বাঈ তাঁহার কথা শেষ না করিয়াই স্বীয় অঙ্গরাখার অভ্যন্তর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া তাহা ঊর্দ্ধে তুলিলেন; বোধ হয়, সেই ছুরিকা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ হইত! কিন্তু মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েন তাহার অবসর দিলেন না; তাঁহারা এক লম্ফে মতি বাঈএর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, কাপ্তেন তাঁহার হাত হইতে ছুরি-খানি কাড়িয়া লইলেন।

তাহার পর মিঃ টেরাণ্ট মতি বাঈকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "মতি বাঈ, আমার কথা শুনুন, আপনি কি জানেন না আত্মহত্যা মহাপাপ? আপনি আত্মহত্যা করিলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, আপনারও কোন লাভ

নাই; আপনার সম্বন্ধে যদি কেহ মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া থাকে, তবে পরের উপর রাগ করিয়া আপনি নিজের জীবন নষ্ট করিবেন? আপনি কি এতই নির্ব্বোধ? আপনি জানেন, আপনার জীবনের উপর আপনার পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আপনি যে নিরপরাধ, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু কে যে অপরাধী, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা স্থির করিতে পারি নাই। আমরা এই রহস্য-ভেদের চেষ্টা করিতেছি; আপনি যতটুকু পারেন, এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করুন। আপনি আপনার শিশু পুত্রকে সাবধানে রক্ষা করুন, আমার বিশ্বাস, তাহার অনিষ্ট করিতে পারে,—এখানে এরূপ লোকের অভাব নাই।"

মিঃ টেরাণ্টের কথা শুনিয়া মতি বাঈ অপেক্ষাকৃত সংযত ভাব ধারণ করিলেন, এবং অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মিঃ টেরাণ্টও কাপ্তেন ওয়েনকে সঙ্গে লইয়া এজেন্সী বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করিলেন।

(৫)

মিঃ টেরাণ্ট এজেন্সী বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সর্দ্দার মহম্মদ খাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহম্মদ খাঁর মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্দ্দার কোনও গুরুতর সংবাদ আনিয়াছেন।

মহম্মদ খাঁ, মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেনকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "হুজুর, আজ একটা নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। মহারাজের মৃতদেহ বরফে ঢাকিয়া বাক্সবন্দী করিয়া মুসৌরী হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা জানেন। মহারাজের মৃতদেহ যে ট্রেণে এখানে চালান দেওয়া হয়, রাত্রিকালে গাজিয়াবাদ জংসনে সেই ট্রেণ কয়েক ঘণ্টা দাঁড়াইয়াছিল; সেই রাত্রেই কোনও লোক বাক্স ভাঙ্গিয়া মহারাজের মৃতদেহ নাড়াচাড়া করিয়াছিল, মহারাজার গায়ে যে মের্জাই ছিল, তাহার গলার বোতাম ছিঁড়িয়া গলাটা আল্‌গা করিয়া রাখিয়াছিল; যে ইহা করিয়াছিল—সে যে বিনা উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি, ঠাহর করিতে পারিতেছি না। তবে, দেওয়ানকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, ইহা যে সেই দলেরই কোনও লোকের কাজ—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।"

মিঃ টেরাণ্ট কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোনও খবর আছে?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "আছে হুজুর। রাজ-প্রাসাদে মহারাজার দুই একজন দেহরক্ষীর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে, কথায় কথায় তাহাদের নিকট শুনিলাম, দেওয়ানের বক্ষস্থলে ছুরি মারিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়; তাঁহার মৃত্যুর পর হত্যাকারী বা অন্য কোনও লোক তাঁহার কোটের গলার বোতাম কাটিয়া তাঁহার গলা আল্‌গা করিয়া রাখিয়া যায়। ইহাতে অনুমান হইতেছে, দেওয়ানের কণ্ঠ-দেশে এমন কোন সামগ্রী ছিল—যাহার লোভেই হত্যা-কারীরা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে।"

মহম্মদ খাঁর কথা শুনিয়া মিঃ টেরাণ্ট চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে হঠাৎ এইরূপ উত্তেজিত হইতে দেখিয়া মহম্মদ খাঁ ও কাপ্তেন ওয়েন উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মিঃ টেরাণ্ট ব্যগ্রভাবে পকেটে হাত দিলেন, এবং পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগ বাহির করিলেন। এই ব্যাগের ভিতর একগাছি সরু স্বর্ণ-নির্ম্মিত চেনে জালের একটি ক্ষুদ্র থলিয়া আবদ্ধ ছিল, এই জাল সূক্ষ্ম সুবর্ণ-তারে নির্ম্মিত। তাহার কারুকার্য্য দেখিয়া কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁ উভয়েই মুগ্ধ হইলেন।

মিঃ টেরাণ্ট তাঁহাদের উভয়কে সেই সুবর্ণ-চেন-সংলগ্ন থলিয়াটি দেখাইয়া বলিলেন, "হত্যাকারীরা ইহারই লোভে মৃত মহারাজের ও নিহত দেওয়ানের কণ্ঠদেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, গত রাত্রে তাহারা আমার নিকট হইতেও ইহা চুরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম। আমার 'টেরিয়ার'টা তাহাদের সাড়া পাইয়া আমার শয়ন-কক্ষে আসিয়া চীৎকার আরম্ভ করে, সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আমাকে সজাগ দেখিয়া তস্করেরা তাড়াতাড়ি পলায়ন করে। তাহারা যে কিরূপে প্রহরীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু এ ষড়যন্ত্রের নায়ক কে, তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না!"

মিঃ টেরাণ্ট স্বর্ণ-জালের থলি খুলিয়া তাহার ভিতর

হইতে তিনটি চাবি বাহির করিলেন, লৌহনির্ম্মিত চাবি, কিন্তু তাহাদের আকার ও গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন; চাবি তিনটির নক্সায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। যে চাবিটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার দাঁতগুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, দেখিলে মনে হয়, একটি হাতী শুঁড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে! দ্বিতীয় চাবিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহার দাঁতগুলি ব্যাঘ্রাকৃতি; তৃতীয় চাবিটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, নবোদিত অরুণের হিরণ্ময় ছটার ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'পিন' তাহার গহ্বরের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত।

এইচাবি তিনটির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া, কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁ উভয়েই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা নির্নিমেষ নেত্রে চাবিতিনটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কাপ্তেন ওয়েন মিঃ টেরাণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার মধ্যে কোন্ চাবিটা দিয়া রহস্যের মঞ্জুষা উন্মুক্ত হইবে?

মিঃ টেরাণ্ট এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া, মহম্মদ খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজার মৃত্যুকালে আমি তাঁহার নিকটেই ছিলাম। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে মহারাজা তাঁহার পরিচারকগণকে সেই কক্ষের বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সকলেই সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল, কেবল আমিই তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। তখন মহারাজা তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে এই চেন খুলিয়া লইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। মহারাজা আমাকে বলিলেন, এগুলি তাঁহার গুপ্ত তোষাখানার চাবি; এই চাবি তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজের হস্তে প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু ইহা অন্য কাহারও জিম্মায় রাখিতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। যুবরাজ ও দেওয়ান ভিন্ন অন্য কেহই জানে না—কোথায়, কিরূপে, চাবিগুলি ব্যবহার করিতে হইবে। এই চাবির অনুরূপ আর এক 'সেট' চাবি আছে, মহারাজার কথার ভাবে এইরূপ বোধ হইতেছিল; তিনি হয় ত সে সম্বন্ধে সকল কথাই আমাকে বলিতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় দ্বারপ্রান্তে [illegible] পদশব্দ হওয়ায় মহারাজা সে সকল কথা বলিবার অবসর পাইলেন না। পাছে অন্য কেহ আমার হাতে এই [illegible] দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় মহারাজা এরূপ ব্যস্ত [illegible]ছিলেন, যে, আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে [illegible] লুকাইয়া রাখিলাম।" মহারাজের ত বাক্ রোধ হইল; তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাকিতে চলিলাম। আমার সহিত মহারাজের সেই শেষ কথা।"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আর এক সেট চাবি দেওয়ানের কাছে ছিল। আপনার কি মনে হয়?"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু সে চাবি এখন কোথায়?"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "সে সকল চাবি নিশ্চয়ই যুবরাজের নিকটে আছে।"

মিঃ টেরাণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ অনুমানের কারণ কি?"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, এই চাবির লোভেই কোন দুষ্টলোক দেওয়ানকে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই, দেওয়ান পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন বৃদ্ধ মহারাজা এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, বিশেষতঃ দেওয়ানও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং গুপ্ত ধনাগারের চাবি অতঃপর নিজের কাছে রাখা তেমন নিরাপদ নহে বুঝিয়া তিনি যুবরাজ গোপাল সিংহকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন।"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নহে, কিন্তু গোপাল সিংহের কি হইল, কিছুই যে বুঝিতে পারা যাইতেছে না!"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "গোপাল সিংহ সেই চাবি নিজের কাছে রাখিয়া থাকিবে, আততায়ী হস্তে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে; আর যদি তিনি তাহা স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জীবিত আছেন, বলিয়াই মনে হয়। চক্রান্তকারীরা সেই চাবী হস্তগত করিয়া তোষাখানা লুণ্ঠন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে মুক্তিদান করিবে না। গোপাল সিংহ চাবিগুলি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার সন্ধান লইবার জন্য তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, ইহাই আমার ধারণা।"

কাপ্তেন ওয়েন ইংরাজী ভাষায় মিঃ টেরাণ্টকে এ সকল কথা বলিতেছিলেন, মহম্মদ খাঁ তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিলেন।

তখন কাপ্তেন ওয়েন মহম্মদ খাঁকে তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

মহম্মদ খাঁ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি ভগবানদাস অগাধ টাকার মানুষ, ক্রোর টাকা, কি তাহারও অধিক সে জমাইয়াছে।"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "তাহাতে কি যায় আসে ?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "জনরব শুনিতেছি, ভবিষ্যতে ভগবানদাসই এ রাজ্যের দেওয়ান হইবে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ দেওয়ানকে সরাইয়া কি তাহার লাভ নাই ? আর এত টাকা সে যে সদুপায়ে সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাও ত বোধ হয় না।"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "কেবল জনরবে নির্ভর করিয়া কোনও কাজ করিতে নাই। ভগবানদাস পদস্থ কর্ম্মচারী, দেওয়ানের হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া সে কেন ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবে ? আর রাজার মৃত্যু-সংবাদও ত সে জানিত না ; বিশেষতঃ যুবরাজকে হত্যা করিয়া তাহার কোনও লাভ আছে, এরূপ বোধ হয় না। বরং গোপালসিংহ গদী পাইলে অল্পদিনের মধ্যে তাহারই দেওয়ানী লাভের আশা ছিল।"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "টেরাণ্ট, তুমি কোন্ পথে চলিতে চাও তাহা আমরা জানিনা, তুমি এখন এই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু আমরা নিজে যাহা ভাল বুঝিব—সেই ভাবেই তদন্ত আরম্ভ করিব ; ইহাতে তোমার আপত্তি থাকে আমরা তদন্তের ভার লইব না ; গবর্ণমেণ্টের কাছে তুমি যে কৈফিয়ৎ দিতে হয় দিও। তুমি আমাদের বুদ্ধিতে চলিতে সম্মত আছ কিনা জানিতে চাই।"

মিঃ টেরাণ্ট অল্পকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তোমরা এখানে আসিয়াছ, আমি তোমাদের সঙ্কল্পে বাধা দিব না।"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "আপনার কাছে যে চাবি আছে, ঐ 'প্যাটার্ণে'র চাবি আমাকে দিতে পারেন ?"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "এ 'প্যাটার্ণে'র চাবি আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? তবে তুমি যদি বল—আমি ঐরূপ তিনটা চাবি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিলাতে আমি কিছুদিন কামারের কাজ শিখিয়াছিলাম, হাতুড়ী দিয়া লোহা ঠেঙ্গাইবার অভ্যাসটা ভালই ছিল, চেষ্টা করিলে [illegible] চাবি প্রস্তুত করিতে পারিব।"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "তবে তাহাই করুন। সেই নকল চাবি যাহাতে চুরি যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই চাবির সাহায্যে কে গুপ্ত তোষাখানা খুলিবার চেষ্টা করে—তাহা দেখিতে হইবে ; যদি চোর ধরিতে পারি, তাহা হইলে রহস্য ভেদ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে সেই তোষাখানা আমাদের একবার দেখা আবশ্যক।"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "বেশ কথা, আজ মধ্যাহ্নকালে তোমাদিগকে গুপ্ত ধনাগারে লইয়া যাইব, কিন্তু যথাসম্ভব গোপনে একাজ করিতে হইবে।"

(৬)

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে মিঃ টেরাণ্ট রাজপ্রাসাদের কাহাকেও কোনও সংবাদ না দিয়া কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁকে সঙ্গে লইয়া গুপ্ত ধনাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যে প্রহরী ছিল, সে সম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইল। মিঃ টেরাণ্ট তাহাকে দূরে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন, এবং আদেশ করিলেন, সে যেন কাহাকেও একথা না বলে।

অনন্তর তাঁহারা তিন জনে অন্ধকারপূর্ণ অপ্রশস্ত গুপ্ত পথে অগ্রসর হইলেন, পথের দুই দিকে প্রাচীর, উর্দ্ধে খিলান ; তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা কোনও সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিতেছেন ; রুদ্ধ বায়ুতে তাঁহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া একটি অনতিবৃহৎ লৌহদ্বারের সম্মুখে আসিলে তাঁহাদের গতিরোধ হইল। এই দ্বার যেমন স্থূল, সেইরূপ দৃঢ়।

প্রকাণ্ড একটা তালা দিয়া এই লৌহদ্বার বন্ধ করা ছিল ; মিঃ টেরাণ্ট একটা চাবির সাহায্যে তাহা খুলিলেন। তালা খুলিবামাত্র লৌহ কপাটদ্বয় আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হইল ; দ্বারে স্প্রিং থাকিলে তাহা যেমন জোরে খুলিয়া যায়, সেই ভাবে খুলিয়া গেল। কিন্তু দ্বার পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবার পূর্ব্বেই মহম্মদ খাঁ এক লম্ফে চৌকাঠের উপর আসিয়া পড়িয়া, কপাট দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন। দ্বার এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, কপাট জোড়াটি পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবামাত্র তাহার প্রান্তভাগের [illegible] কক্ষাভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট একটি কামান [illegible]

সেই কামানের গোলার আঘাতে তাঁহারা নিহত হইতেন, এবং কামানের গভীর নির্ঘোষে প্রাসাদের রক্ষিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইত। দস্যু-তস্করগণ হঠাৎ যাহাতে কোষাগারে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহম্মদ খাঁ পূর্ব্বেই এ সন্ধান জানিতে পারিয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ কোষাগারে প্রবেশ করিয়া দ্বারের স্প্রিং আল্‌গা করিয়া দিলেন, তখন আর বিপদের কোনও সম্ভাবনা রহিল না। তিনজনে কোষাগারের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে ঘোর অন্ধকার বিরাজিত, কোনদিকেই দৃষ্টি চলে না। দেশীয় রাজ্যসমূহের গুপ্ত ধনাগার সম্বন্ধে মহম্মদ খাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি বাতি ও ম্যাচবাক্স সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বাতি জ্বালিয়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েন তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সঙ্কীর্ণ পথের দুই দিকে খিলানের মত গাঁথনী, প্রত্যেক খিলানে এক একটি প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক, সিন্দুকে ঢালের মত সুবৃহৎ তালা, তালাগুলি মরিচা ধরা, তাহা যে কোনও দিন খোলা হইত—দেখিয়া এরূপ অনুমান হয় না। সারি সারি সিন্দুক-দুই দশটা নহে, এমন সিন্দুক শতাধিক। তাঁহারা বুঝিলেন, ধনরত্নে এই সকল সিন্দুক পূর্ণ। দেখিয়া আরব্যোপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর গল্প তাঁহাদের মনে পড়িল!

অবশিষ্ট চাবি দুইটি এই সকল সিন্দুকের কোনও তালাতেই লাগিবে না, তালাগুলি দেখিয়াই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেই সকল সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূরে দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহারা একটি কক্ষের সঙ্কীর্ণ দ্বার দেখিতে পাইলেন, দ্বিতীয় চাবিতে সেই দ্বার সহজেই উন্মুক্ত হইল।

এই কক্ষটি দেখিতে অনেকটা চোর কুটুরীর মত, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। কয়েকটি লোহার সিন্দুকে কক্ষটি পূর্ণ; এই সিন্দুকগুলি এদেশে নির্ম্মিত নহে, বিলাতী। [illegible] লোহার সিন্দুক অপেক্ষা মজবুত।

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "আমার বোধ হয় এই সকল সিন্দুকে বহুমূল্য জহরতের অলঙ্কার আছে, মূল্যবান দলিল-পত্রাদিও থাকিতে পারে।"

অনন্তর বাতির আলোকে তাঁহারা সিন্দুকগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটি সিন্দুক বড়ই সুদৃশ্য, লোহার উপর রৌপ্যের কারুকার্য্য। এই সিন্দুকটির ভিতর, কি আছে দেখিবার জন্য তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তৃতীয় চাবিতে এই সিন্দুক খুলিল।

সিন্দুকের মধ্যে শুভ্র গজদন্তের কারুকার্য্য-খচিত একটি আধার দেখিয়া মিঃ টেরাণ্ট সেইটি তুলিয়া লইলেন, তাহা খুলিতেই তাহার ভিতর তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে, তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই কৌটায় তাঁহারা এক ছড়া হীরার হার দেখিতে পাইলেন। চল্লিশটি সুবৃহৎ নিখুঁত মুক্তায় এই হার গ্রথিত। এক একটি মুক্তার পর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কয়েকখণ্ড হীরা এমন সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট যেন, তাহাদিগকে এক একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প বলিয়া মনে হয়। এইরূপ একচল্লিশটি হীরার ফুলের মধ্যে চল্লিশটি, মুক্তা! বাতির আলোক সেই হারে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিল। এই হার দেখিয়া তিনজনেরই মুখে বিস্ময়-সূচক অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হইল; কাহারও মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। তাঁহারা নির্নিমেষ নেত্রে এই হার দেখিতে লাগিলেন।

বিস্ময় প্রশমিত হইলে মিঃ টেরাণ্ট মহম্মদ খাঁকে বলিলেন, "সর্দ্দার, তুমি ত অনেকদিন জহরত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছ, জহুরী সাজিয়া এখানে গোয়েন্দাগিরিও করিয়াছ; এই হারের কত মূল্য বলিতে পার?

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "না হুজুর, এমন সুবৃহৎ সুডৌল মুক্তা কখনও দেখি নাই, এমন উৎকৃষ্ট হীরা এতগুলি এক সঙ্গে কোথাও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। অনেক দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছি, অনেক রাজার তোষাখানাও দেখিয়াছি; কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহামূল্য হার কোথাও দেখি নাই। ইহার মূল্য নির্ণয় করিবার শক্তি আমার নাই।"

কাপ্তেন ওয়েন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আনুমানিক মূল্য কত হইতে পারে?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "এই হারের এক একটি মুক্তার মূল্য নিতান্ত অল্প হইলেও চল্লিশ হাজার টাকার কম নহে।

এইরূপ চল্লিশটি মুক্তা, ও অগণ্য ছোট বড় হীরা সাজাইয়া এক-চল্লিশখানি ফুল—সমগ্র হারের মূল্য কত, আমি অনুমান করিতে পারিব না। আমার বিশ্বাস, কোটি মুদ্রাতেও এরূপ সুন্দর হার নির্ম্মিত হইতে পারে না। ধন্য সেই শিল্পী, যে এই হার নির্ম্মাণ করিয়াছিল; ইহা প্রস্তুত করিয়া সে যে পারিশ্রমিক লইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, একখানি বড় তালুক কিনিতে পারা যায়! মিঃ টেরাণ্ট বোধ হয় তোষাখানার জহরতের তালিকায় এই হারের পরিচয় ও মূল্যাদির বিবরণ দেখিয়া থাকিবেন।"

মিঃ টেরাণ্ট। সর্দ্দার * * * এই হারের মূল্য কত বলিতে পার?

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "না, তোষাখানার 'ক্যাটালগে' এ হারের কোনও প্রসঙ্গ নাই; বাহিরের কোনও লোক এই হারের কথা জানে কিনা তাহাও আমার অজ্ঞাত। আমি দুই বৎসর এই রাজ্যের রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত আছি, কিন্তু কোনও দিন এই হারের কথা জানিতে পারি নাই। এ হার কতদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোথা হইতে ইহা এখানে আসিয়াছে,—ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস কি, জানিতে আগ্রহ হয়। জানি না, এই হারের জন্য কত রক্তপাত হইয়াছে—কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহা অপহরণ করিবার জন্য কত তস্কর কত চাতুর্য্য ও ষড়যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?"

মিঃ টেরাণ্ট নির্নিমেষ নেত্রে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই হারের অপরূপ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে তাহা গজদন্তের কৌটায় পুরিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন;—এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সিন্দুক বন্ধ করিলেন।—হার ছড়াটি কৌটায় বন্ধ করিবামাত্র বাতির আলোক যেন ম্লান হইয়া গেল!

অতঃপর মিঃ টেরাণ্ট তোষাখানার দ্বার বন্ধ করিয়া সহচরদ্বয়ের সহিত বাহিরে আসিলেন।—তিনজনেই অন্যমনস্কভাবে এজেন্সী বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করিলেন।

(৭)

মিঃ টেরাণ্ট যথাসাধ্য পরিশ্রমে চাবিতিনটির অনুরূপ তিনটি চাবি প্রস্তুত করিলেন। আসল চাবির সহিত নকল চাবির কোনও পার্থক্য রহিল না।

চাবি প্রস্তুত হইলে তিনি ভগবানদাসকে এজেন্সী বাঙ্গলায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভগবানদাস জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

মিঃ টেরাণ্ট ভগবানদাসের নিকট রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন, এবং কথায় কথায় তাঁহাকে জানাইলেন, স্বর্গীয় মহারাজা গুপ্তধনের চাবি তাঁহার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন।

এই কথা বলিয়াই মিঃ টেরাণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভগবান দাসের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহার মুখভাবের কোনও পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন না।

চাল ব্যর্থ হইল দেখিয়া মিঃ টেরাণ্ট ভগবানদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুবরাজ গোপাল সিংহের কোনও সন্ধান হইল?"

ভগবানদাস সোৎসাহে বলিল, "সাহেব, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, মতি বাঈ সাহেবার শিশু পুত্রকে রাজগদীতে বসাইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তবে এই ষড়যন্ত্র মতি বাঈ সাহেবার জ্ঞাতসারে হইয়াছে কি না, এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার যোগ আছে কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই শিশু রাজগদীতে স্থাপিত হইলে রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইবে। উচ্চাভিলাষী দরবারীগণের একটা প্রকাণ্ড দাঁও উপস্থিত।"

মিঃ টেরাণ্ট বলিলেন, "কাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, ভগবানদাস?"

ভগবানদাস বলিল, "তাহা আমি জানি না সাহেব! যাহারা গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাদের সন্ধান কিরূপে পাইব! মতি বাঈ সাহেবার শিশু পুত্রকে যদি আপনারা রাজগদীতে স্থাপিত করেন, তাহা হইলে মতি বাঈ নিশ্চয়ই এই নাবালক রাজার অভিভাবিকা হইবেন, তিনি স্ত্রীলোক, স্বয়ং রাজ্যশাসনে অসমর্থা; তাঁহাকে মন্ত্রী রাখিতেই হইবে। যাহাদের এই পদ-লাভের আশা আছে—তাহাদের সন্ধান করুন, কাহার ষড়যন্ত্রে এই সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে,—গোপাল সিংহকে কে সরাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

ভগবানদাসের কথাগুলি যে যুক্তিপূর্ণ, তদ্বিষয়ে মিঃ টেরাণ্টের সন্দেহ রহিল না, কিন্তু তথাপি তাহার সততায় তিনি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভগবানদাসের সাক্ষাতে নকল চাবি তিনটি ও কয়েকখণ্ড কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার টেবিলের দেরাজে রাখিলেন। তাহার পর ভগবানদাসকে বিদায় দান করিলেন। ভগবানদাস যে চাবিতিনটি দেখিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

অতঃপর চোর ধরিবার জন্য মিঃ টেরাণ্ট, কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্র খুব গোপনে চলিতে লাগিল। মিঃ টেরাণ্টের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার আপীসের দেশীয় কর্ম্মচারীরা বিপক্ষের বেতনভোগী গুপ্তচর, সুতরাং তাঁহাদের কোনও পরামর্শ যাহাতে বাহিরের কোনও লোক জানিতে না পারে—তদ্বিষয়ে তিনি সাবধান হইলেন। তাঁহার সাবধানতা সত্ত্বেও নকল চাবি-তিনটি চুরি গেল। মিঃ টেরাণ্ট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না।

টলার রেল ষ্টেশনে দুই জন ইউরোপিয়ান ছিল, এক-জন গার্ড, আর একজন ইঞ্জিন-চালক। মিঃ টেরাণ্ট তাহাদিগকে ছদ্মবেশে নিজের বাঙ্গলায় আনাইলেন। এক জন মিঃ টেরাণ্টের, অন্য জন কাপ্তেন ওয়েনের ছদ্মবেশ ধারণ করিল। এজেন্সী আফিসের দেশীয় কেরাণীরা—এমন কি, মিঃ টেরাণ্টের খিদ্‌মৎগারেরা পর্য্যন্ত এ কৌশল বুঝিতে পারিল না।

এই দুইজন 'রেলের সাহেব' মিঃ টেরাণ্টের বাঙ্গলার ছাদে বসিয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে হুইস্কি ও চুরুট টানিতে লাগিল। 'রেজিমেণ্টের' তিনজন শোয়ার সিঁড়িতে পাহারায় নিযুক্ত হইল; খিদ্‌মৎগারদের আদেশ করা হইল—সাহেবেরা স্ফূর্ত্তি করিতেছেন, তাঁহারা যেন উঁহাদের নিকট না যায়। মিঃ টেরাণ্টের 'ফক্স টেরিয়ার'টি সর্ব্বক্ষণ তাহার নিকটে থাকিত, টেরিয়ারটি সেখানে না থাকিলে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে ভাবিয়া, মিঃ টেরাণ্ট তাহাকে টেবিলের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিলেন। সকলে বুঝিল, টেরাণ্ট সাহেব কাপ্তেনের সঙ্গে বসিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছেন;—সমস্ত রাত্রি আমোদ চলিবে, কাজকর্ম্ম সমস্ত বন্ধ।

(৮)

সেই দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিঃ টেরাণ্ট, মসাল্‌চির ছদ্মবেশে কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁকে সঙ্গে লইয়া কখন রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। —পোষাকের বাণ্ডিল তাঁহাদের সঙ্গেই ছিল ; রাত্রি নয়টার সময় তাঁহারা ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুপ্তদ্বার দিয়া তোষাখানার দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্ধকারে এক পাশে লুকাইয়া রহিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তখন রাত্রি প্রায় দশটা, তাঁহারা অদূরে লণ্ঠনের আলো দেখিতে পাইলেন ; আলো ক্রমে তাঁহাদের নিকটে আসিল, অবশেষে একজন লোক কোষাগারের দ্বার খুলিয়া দ্বারের স্প্রিং খুলিয়া রাখিল, সুতরাং কপাটে কামান স্পর্শ করিতে পারিল না, কামানের আওয়াজও হইল না। মিঃ টেরাণ্ট বুঝিলেন, ধনাগারে প্রবেশ করিবার কৌশল আগন্তুকের অজ্ঞাত নহে।

আগন্তুক ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যে কক্ষে জহরৎ ছিল, সেই কক্ষের দ্বার খুলিল। সে যেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল, মিঃ টেরাণ্ট অমনই সহচরদ্বয়ের সহিত অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকের পাশে লুকাইলেন।

জহরতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া আগন্তুক কি করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য মিঃ টেরাণ্টের অত্যন্ত আগ্রহ হইল, কাপ্তেন ওয়েনও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা অধীরভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় মহম্মদ খাঁ তাঁহাদের হাত ধরিয়া ফেলিলেন,—আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

আগন্তুক জহরতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে চাহিল ; কোনদিকে জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না। রাজপুরী নিস্তব্ধ, প্রহরীরা ভাঙ্গের নেশায় উন্মত্ত। সে বুঝিল, কার্য্যোদ্ধারের ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর, এতদিনে তাহার দীর্ঘকালের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সফল হইবে! সাময়িক উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল, হর্ষে তাহার চক্ষু দুটি জ্বলিতে লাগিল। সে ল্যাম্পটা একটি সিন্দুকের উপর রাখিয়া, হীরার হার যে সিন্দুকে ছিল তাহা খুলিয়া ফেলিল, এবং গজদন্তের আধারটি তুলিয়া লইয়া তাহা খুলিবামাত্র হীরক হারের উজ্জ্বল প্রভায় তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

সে হীরার হার হাতে লইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন্ সময় মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন্ ওয়েন, দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল ধরিয়া লঘু পদ-বিক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মহম্মদ খাঁ তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণধার মুক্ত তরবারি!

আগন্তুকের দৃষ্টি তখন হীরক-হারেই সন্নিবদ্ধ ছিল, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায়! তিন জন লোক যে তাহার অলক্ষ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

মিঃ টেরাণ্ট কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান দাস, এই হারের লোভেই কি তুমি দেওয়ানকে ও গোপালসিংকে হত্যা কর নাই ?"

সেই কক্ষে যদি সেই মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাত হইত তাহা হইলেও ভগবানদাস বোধ হয় সেরূপ ভীত—সেরূপ বিস্মিত হইত না ; মিঃ টেরাণ্টের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, তাহার কেশ পর্য্যন্ত ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সভয়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে তিনমূর্ত্তি উপস্থিত! দুইজনের হস্তে পিস্তল, তৃতীয় ব্যক্তির হাতে সুদীর্ঘ তরবারি।

ভগবানদাস মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আত্ম-সংবরণ করিয়া ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে আগন্তুক ত্রয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার বিস্ফারিত নেত্রে নরকানল জ্বলিয়া উঠিল।—সে দৃষ্টিতে লজ্জা, সঙ্কোচ বা ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না, ভগবানদাস তখন উন্মত্ত! সম্ভব হইলে সে সেই মুহূর্ত্তে তিন জনকেই হত্যা করিত।

মিঃ টেরাণ্ট সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি পিস্তল উদ্যত করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন, পুনর্ব্বার কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে চোর, কথার উত্তর দিতেছিস্ না কেন ? বল্, গোপাল সিংকে কোথায় খুন্ করিয়া রাখিয়াছিস্ ?"

"হতভাগা ফিরিঙ্গী কেন এখানে মরিতে আসিয়াছিস্ ?" বলিয়া ভগবানদাস সিন্দুকের ডালার উপর হইতে ল্যাম্পটা তুলিয়া লইয়া মিঃ টেরাণ্টের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে

মিঃ টেরাণ্ট।—এই হারের লোভেই কি তুমি দেওয়ান ও গোপাল সিংহকে হত্যা করিয়াছ ?

ওয়েনের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকেও গুলি করিল; ভগবানদাস এতই তৎপরতার সহিত পিস্তল ছুঁড়িয়াছিল যে,—কাপ্তেন ওয়েন তাহাকে আক্রমণ করিবারও সুযোগ পাইলেন না; ভগবানদাসের পিস্তলের গুলি কাপ্তেনের 'মেস্ জ্যাকেটের' কলার ছিন্ন করিয়া দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, সেই আলোকে ভগবানদাস উন্মুক্তকৃপাণ হস্তে মহম্মদ খাঁকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিল। মহম্মদ খাঁ বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইয়া ভগবানদাসের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ সবলে চাপিয়া ধরিলেন। হঠাৎ অগ্নির লোলজিহ্বা অদৃশ্য হইল। তখন সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দুইজনে দুই ক্রুদ্ধ দৈত্যের ন্যায় ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। ভগবানদাসের দেহে সিংহতুল্য বল ছিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া পিস্তল ছাড়িল বটে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। মহম্মদ খাঁ, ভগবান

নিক্ষেপ করিল। মিঃ টেরাণ্ট এক লম্ফে সরিয়া না দাঁড়াইলে সেই ল্যাম্পের আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটিত, ল্যাম্পটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কাপ্তেন ওয়েন ও মহম্মদ খাঁর মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কেরোসিনের ল্যাম্প, অগ্নিস্পর্শ হইবামাত্র তৈল জ্বলিয়া উঠিয়া মেঝেতে আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল দেখিয়া ভগবানদাস মুহূর্ত্তমধ্যে অঙ্গরাখার মধ্য হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিয়া মিঃ টেরাণ্টকে গুলি করিল; মিঃ টেরাণ্ট আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, ভগবানদাস এক লম্ফে কাপ্তেন

দাসকে পুনর্ব্বার আক্রমণপূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলে জানু-স্থাপন করিয়া বসিলেন, এবং ভূতলশায়ী ভগবান দাস তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার তরবারির উভয় প্রান্ত উভয় হস্তে ধরিয়া তাহা ভগবানদাসের কণ্ঠে চাপিয়া ধরিলেন।

কাপ্তেনের ওয়েনের পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বালিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন।

মিঃ টেরাণ্ট ভূমিশয্যা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন,

আমি অল্প আহত হইয়াছি, আমার গলার হাড়ে গুলি বিঁধিয়াছিল।

কাপ্তেন ওয়েন বাতি ধরাইয়া মহম্মদ খাঁর দিকে চাহিলেন, মহম্মদ খাঁ ভগবানদাসের বুকের উপর হইতে নামিলেন। মিঃ টেরাণ্ট ও কাপ্তেন ওয়েন সভয়ে দেখিলেন, ভগবান দাসের মস্তক তাহার স্কন্ধ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, চারিদিকে রক্তের স্রোত বহিতেছে, মহম্মদ খাঁর হস্তস্থিত কৃপাণ হইতে রক্ত ঝরিতেছে।

মহম্মদ খাঁ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি আমার তলোয়ার উহার গলায় বসাইয়া দিয়াছিলাম, উহাকে বধ না করিলে এই শয়তান আমাদের তিনজনকেই হত্যা করিত, উহার নিকট জোড়া রিভলবার ছিল।"

বন্দুক-নির্ঘোষ শুনিয়া প্রাসাদের অনেক লোক ব্যস্ত ভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। মিঃ টেরাণ্ট কাপ্তেন ওয়েনকে একদল অস্ত্রধারী প্রহরী আনাইয়া ধনাগারের রক্ষায় নিযুক্ত করিতে বলিলেন, তাহার পর তিনি মন্ত্রণা-সভায় দরবারীগণকে আহ্বান করিলেন। সেই রাত্রেই প্রাসাদের দরবার গৃহে দরবার বসিল। কাপ্তেন ওয়েন, ভগবানদাসের অঙ্গরাখার অভ্যন্তরে অপহৃত হীরার হার দেখিতে পাইলেন। হার মিঃ টেরাণ্টের জিম্মায় রহিল।

প্রধান চক্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রকারীরা ভয়-বিহ্বল হইয়া ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অনেকেই বাঁচিবার আশায় অন্যান্য চক্রান্তকারীর নাম বলিয়া দিল। পরদিন প্রভাতে প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীতে হতভাগ্য যুবরাজ গোপাল সিংহের মৃতদেহ বস্তাবন্দী অবস্থায় পাওয়া গেল। মিঃ টেরাণ্ট আঘাত-যন্ত্রণায় কয়েকদিন শয্যাগত ছিলেন; তিনি আরোগ্য-লাভ করিয়া রহস্য-ভেদে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন টেলিগ্রাফ্ আপীসের লোকেই ভগবানদাসের নিকট মহারাজের মৃত্যু-সংবাদ প্রেরণ করে। টেলিগ্রাফ্ আপীসে ভগবানদাসের গুপ্তচর ছিল। মিঃ টেরাণ্ট মহারাজের মৃত্যু-সংবাদ সাঙ্কেতিক ভাষায় (Secret Code) দেওয়ানের নিকট পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মিঃ টেরাণ্টের আপীসে ভগবান দাসের যে গুপ্তচর ছিল, সে এই সাঙ্কেতিক ভাষার মর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া মিঃ টেরাণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছিল। ভগবানদাসের নিযুক্ত গুণ্ডার ছুরিকাঘাতেই দেওয়ানের মৃত্যু হয়, এবং ভগবানদাস তোষাখানার চাবি হস্তগত করিবার জন্য গোপনে যুবরাজ গোপাল সিংহকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ থলিয়ায় পুরিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে প্রোথিত করে। ভগবানদাসের গুপ্তচরই টেরাণ্ট সাহেবের দেরাজ হইতে নকল চাবি চুরী করিয়া তাহাকে দিয়াছিল। দেওয়ান বা গোপাল সিংহের নিকট যে চাবি ছিল, এত চেষ্টাতেও সে তাহা হস্তগত করিতে পারে নাই।

মতিবাঈ সাহেবার শিশুপুত্রকে গদীতে সংস্থাপিত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহাও ভগবান দাসের চক্র। মতিবাঈ সাহেবা ও তাহার দলস্থ লোকের প্রতি সন্দেহ উদ্রেকের জন্যই সে এই কাজ করিয়াছিল, কিন্তু সতর্ক ভগবানদাস স্বয়ং এ চক্রান্তে যোগদান করে নাই, পাছে মতিবাঈ সাহেবা এই চক্রান্তের সন্ধান পান। দুইজন সহকারীর সাহায্যে সে এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হইয়াছিল। সেই সহকারিদ্বয়ই আপন আপন প্রাণরক্ষার আশায় মিঃ টেরাণ্টের নিকট সকল কথা স্বীকার করে। ভগবানদাস হীরার কথা জানিত, সে ভাবিয়াছিল, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবে, হার ছড়াটি হস্তগত করিবে, দেওয়ানীটাও লাভ করিবে।

অতি লোভই ভগবানদাসের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মিঃ টেরাণ্ট বিস্তর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারিলেন না, গোপাল সিংহকে কিরূপে হত্যাকরা হইল।

গবর্ণমেণ্ট মতিবাঈ সাহেবের শিশু পুত্রকে সেই রাজ-গদীর উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মিঃ টেরাণ্টের চেষ্টা যত্নে অরাজক রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। মতিবাঈ সাহেব নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া টলা রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিল্লী

[শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিজামউদ্দিন। চিস্‌তি ফকির নিজামউদ্দিন একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যে বেদিতে বসিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেন,তাহা এখনও পর্য্যন্ত ইঁহার সমাধির নিকট বিদ্যমান আছে। আলাউদ্দিন খিলিজি ইঁহার প্রিয়শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ তোগলকও ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। মুসলমানগণ ইঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সেই জন্যই ইঁহার সমাধির চতুষ্পার্শ্বে এতগুলি বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি রহিয়াছে।

এই সমাধির প্রবেশ-পথ দিয়া অগ্রসর হইলেই **বাউলী** বা সিঁড়িবিশিষ্ট বড় কূপটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২০ হাত ও প্রস্থে ৮০ হাত। ইহা প্রায় ৩০ হাত গভীর। এই কূপ নিজামউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, মুসলমানগণ ইহার জলকে তীর্থসলিল জ্ঞান করে। কূপের জল সবুজ বর্ণ। এখানে অনেক সন্তরণপটু বালক আছে, তাহাদের ২।১টি পয়সা দিলেই নিকটস্থ গৃহের ছাদ হইতে এই কূপে ঝম্পপ্রদান করে।

বাউলী

এই বাউলীর সন্নিকটে দক্ষিণদিকে শ্বেত প্রস্তর-আচ্ছাদিত প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ।

উক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অনুচ্চ ভিত্তির উপর অবস্থিত শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত নিজাম উদ্দিনের সমাধিটি বড়ই সুন্দর। সমাধির কারুকার্য্যগুলি ফিরোজ সাহ তোগলকের আদেশে নির্ম্মিত হয়। শ্বেত-প্রস্তরের জাফরি গুলি সৈয়দ ফরিদ খাঁ প্রস্তুত করাইয়া দেন। পার্শ্বস্থ বারান্দাগুলিও সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত।

নিজামউদ্দিনের মস্‌জিদ বা জমাত-খানা।

এই রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্‌জিদ ফিরোজ-সাহ তোগলক নির্ম্মাণ করান। ইহার খিলানের উপর কোরাণের বয়েদ লিখিত আছে। মস্‌জিদটি দৈর্ঘ্যে ৬২ হাত ও প্রস্থে ৪৩ হাত। ইহা পাঠান-রাজত্বের শিল্পের পরিচায়ক।

জাহানারার সমাধি। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত এই সমাধিটি জাহানারা স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন। ইহার চারিপার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরের

জাফরি দিয়া সুগঠিত; কিন্তু উপরিভাগ প্রস্তরের পরিবর্ত্তে তৃণাবরণে সুশোভিত। এই সমাধির শিরোদেশের সন্নিকটে একটি ৪ হাত উচ্চ শ্বেতপ্রস্তর ফলকে এই কয়টি কথা লিখিত আছে:—

"আমার কবরের উপর তৃণভিন্ন অন্য আচ্ছাদনের প্রয়োজন নাই। শাহজাহানের কন্যা—চিসতির সাধুগণের শিষ্যা—দীনা জাহানারার ইহাই উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! ১০৯২।"

এইখানে আরও তিনটি সমাধি অবস্থিত। পশ্চিমেরটি দ্বিতীয় সাহ আলমের পুত্র মির্জ্জানিলীর; পূর্ব্বদিকেরটি সমাধি। অবশিষ্টগুলি মহম্মদ সাহের অন্যান্য আত্মীয়ের সমাধি।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিটি দ্বিতীয় আকবরের পুত্র মির্জ্জা জাহাঙ্গীরের। এটি তাঁহার মাতা মমতাজ মহাল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এ সমাধিটিও শ্বেতপ্রস্তরের সুন্দর জাফরিবেষ্টিত। দ্বারের উপরের ভাস্কর্য্য অতি সুন্দর। এখানকার অন্য চারিটি সমাধির মধ্যে দেওয়ালের নিকটেরটি সাহজাদা বাবরের এবং তন্নিকটস্থ সুন্দর পত্রপুষ্পখোদিত সমাধিটি সাহজাদা মির্জ্জা জাহাঙ্গীরের। ইনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের

জাহানারার সমাধি

দ্বিতীয় আকবরের কন্যা জমাল উন্নিসার এবং ছোট সমাধিটি তাঁহার বালিকা কন্যার।

জাহানারার কবরের পূর্ব্ব দিকে শ্বেতপ্রস্তরের জাফরিবেষ্টিত ও শ্বেতপ্রস্তরের দ্বারবিশিষ্ট কবরটি মহম্মদ সাহের। ইহা তাঁহার জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হয়। এখানে আরও সাতটি সমাধি আছে। দ্বারের নিকটের বৃহৎ সমাধিটিই মহম্মদ সাহের এবং তৎপরেরটি তাঁহার স্ত্রী নবাব সাহেবা মহালের। পাদদেশে তাঁহাদের কন্যা, নাদির সাহার পুত্রবধূর সমাধি। ইহার পশ্চিমে তাঁহাদের বালিকা কন্যার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। অপর দুটি সমাধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণে, মির্জ্জা জাহাঙ্গীরের কবরের নিকটের দ্বার দিয়া অগ্রসর হইলে প্রস্তরাচ্ছাদিত একটি ছোট প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে সঙ্গীতকলাবিৎ আমির খসরুর সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিরোদেশে সৈয়দ মেহ্‌দী খাজা প্রস্তর-ফলকে এই কয়টি কথা খোদিত করিয়া রক্ষা করেন:—

"বাণীর ঈশ্বর, বুলবুলের গানের অপেক্ষা সুমিষ্ট সহস্র

সঙ্গীতরচয়িতা, ... মধুরকণ্ঠ শুক-পক্ষী—তোমার তুলনা নাই"।

শ্বেতপ্রস্তরের অনুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সমাধির মধ্যে খসরু শায়িত। এ সমাধিটি সর্ব্বদাই বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার পদতলে ইঁহার ভাগিনেয়ের সমাধি। কবিবর আমির আবুল হসনই—'খসরু' নামেই অভিহিত হইতেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। ইঁহাকে দেখিবার জন্য কবি সাদী পারস্য হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মুসলমান-কবিদের মধ্যে অমর। খসরুকে নিজামউদ্দিন আউলিয়া বড় ভালবাসিতেন। খসরুর মৃত্যুর পর, নিজামউদ্দিনের অভিলাষ অনুসারে তাঁহাকে নিজামউদ্দিনের পার্শ্বে কবর দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জনৈক আমির ইহাতে মহাপুরুষের অপমান হইবে বলিয়া আপত্তি করায়, যেখানে নিজামউদ্দিন প্রিয়শিষ্যদের সহিত আলাপ করিতেন, খসরুকে সেই স্থানে সমাহিত করা হয়। এখনও বসন্ত-পঞ্চমীর দিন এখানে বৃহৎ মেলা হয়। খসরুর সমাধিটি সযত্ন-রক্ষিত।

নিজামউদ্দিনের সমাধির সন্নিকটে আকবরের পালক-পিতা আজম খাঁ ও তাঁহার স্ত্রীর সমাধিও দ্রষ্টব্য।

নিজামউদ্দিনের সমাধির দক্ষিণে **"চৌষট্টি খাম্বা"** বা মির্জ্জা আজিজ কোকলতাশের সমাধি মন্দির। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪৬ হাত। চারিদিকেই এক একটি প্রবেশ-পথ। এখন পশ্চিম দিকের পথটিতে ইংরাজের আমলে একটি লৌহদ্বার বসান হইয়াছে। সমাধিটি আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। স্তম্ভের মূলদেশ ও উপরিভাগ কারুকার্য্যময়। ছাদের উপরিভাগ ২৫টি গম্বুজ-পরিশোভিত। এই দালানের মধ্যস্থলে মির্জ্জা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সমাধি। মির্জ্জার সমাধিটি সুন্দর পত্রপুষ্পপরিশোভিত। মির্জ্জা আজিজ, আজম খাঁর পুত্র—এবং আকবরের অতীব প্রিয়-পাত্র ছিলেন। চৌষট্টি খাম্বার সন্নিকটেই মহম্মদ শাহ্ ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাধি। নিজামউদ্দিনের সমাধি হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে লঙ্গর খাঁর সমাধি। তাহার পর সৈয়দ-বংশীয় তৃতীয় নরপতি মহম্মদ শাহের সমাধি। তৎপরে সেকান্দর শাহ্-লোদীর সমাধি। এই সমাধিগুলির অনতিদূরে সফদর জঙ্গের সমাধি-ভবন। অযোধ্যার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ আবুল মনসুর খাঁ আহম্মদশাহ্, উজীর হইয়া সফদর জঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সমাধিভবনটি তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তৃক তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহা হুমায়ুন বাদশাহের সমাধি মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইলেও তাদৃশ সুন্দর নহে। এই সমাধি-মন্দির ও উদ্যানটি প্রাচীর-বেষ্টিত, চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ বুরুজ আছে। সম্মুখের দিক ব্যতীত অন্য দিকে দর্শকগণের জন্য কক্ষ আছে। সম্মুখের তোরণটি দ্বিতল, এবং ইহার বামে পর্য্যটকগণের জন্য একটি সরাই ও দক্ষিণে একটি মসজিদ আছে। সমাধিমন্দিরটি নয়টি কক্ষে বিভক্ত। ছাদের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি গম্বুজ ও ইহার চারি ধারে আরও ৯টি ছোট ছোট গম্বুজ আছে। মধ্যের কক্ষটির দেওয়ালের কতকদূর ও মেঝে শ্বেতপ্রস্তরের। আসল সমাধিদ্বয় এই কক্ষের নিম্নে। উপরের সমাধিটি অত্যুৎকৃষ্ট মর্ম্মরনির্ম্মিত। সমাধিদ্বয় সফদর জঙ্গ ও তাঁহার স্ত্রী খোজেস্তা বানুবেগমের। সমাধি-মন্দিরের সম্মুখেই একটি জলাধার। সমাধির পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের গাত্রে সফদর জঙ্গের মৃত্যুর তারিখ প্রভৃতি লিখিত আছে।

এখান হইতে দিল্লী অভিমুখে কিছুদূর গমন করিলে "যন্তর মন্তর" বা জয়পুরাধিপ রাজা জয়সিংহ নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ মান-মন্দির। এই মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল কিন্তু জয়-সিংহের মৃত্যুতে উহা অসম্পূর্ণ থাকে। জাঠেরা এখানকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি সমস্ত লুণ্ঠন করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই—আরও অনেক অত্যাচার করে। ইহার ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কুতুব মিনারের সন্নিকটে ওপথে এত অধিক দ্রষ্টব্য স্থান আছে যে, সেগুলি একদিন পৃথক্‌ভাবে দেখিবার জন্য রাখিলেই ভাল হয়।

দিল্লী হইতে কুতুবমিনারের পথে সাত মাইল পরে মবারক্ শাহের কবর।

মবারক সৈয়দ বংশের দ্বিতীয় নরপতি। তিনিই মবারকাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। এই নগরের এখন চিহ্ন-মাত্রও নাই। এ সমাধি-মন্দিরটি ধূসর-প্রস্তর-নির্ম্মিত।

এখান হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে হউজ খাস বা আলাউদ্দিনের দীঘী। ফিরোজ সাহ্ ও তাঁহার পুত্রপৌত্রের কবর এই দীঘীর পাড়ের উপর অবস্থিত।

নবম মাইলের সন্নিকটে প্রায় অর্দ্ধ মাইল বামদিকে "সিরি দুর্গ"। এই দুর্গটি আলাউদ্দিন খিলিজি কর্ত্তৃক ১৩০৩ সালে নির্ম্মিত হয়। ইহারই মধ্যে সহস্র-স্তম্ভ প্রাসাদ ছিল।

নবম মাইল অতিক্রম করিবার কিছু দূরে মহম্মদ শাহ্ তোগলক-নির্ম্মিত জাঁহাপানা "বিজয় মণ্ডল ও বেদী মণ্ডল" অবস্থিত। ইহাও এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট। 'জাঁহাপানার' [illegible] ১ ৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খাঁজাহান [illegible] দিল্লী [illegible]

[illegible]

[illegible] নাসির উদ্দিন মহম্মদ, [illegible] নিজামউদ্দিন আউলিয়া চিস্তি 'করের [illegible] ৮১ বৎসর বয়সের সময় একজন পাগলা ফকির তাঁহাকে ছুরি মারিয়া হত্যা করে। তিনি যে ঘরে বাস করিতেন, সেইখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয় বস্তুগুলি—লাঠি, পেয়ালা, গালিচা যাহা যাহা তাঁহার গুরুর নিকট পাইয়াছিলেন—তাহাও সমাহিত হয়। তাঁহার অদ্ভুত আত্মসংযম ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য লোকে তাঁহাকে 'চিরাগ-দিল্লী' বলিয়া ডাকিত।

বেহ্‌লুল্ লোদীর সমাধি।—এই সমাধিটি "যূধ বাগ" নামক উদ্যানে সিকন্দর সাহ লোদী কর্ত্তৃক ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সমাধিটি ৪৪ ফুট সমচতুষ্কোণ। উপরে ৫টি পাকা গম্বুজ আছে।

দশম মাইলের সন্নিকট হইতেই পুরাতন দিল্লী বা পৃথ্বীরাজের দিল্লীর আরম্ভ। পৃথ্বীরাজের দিল্লীর প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় পাচ মাইল। ইহার মধ্যেই কবাত-উল-ইসলাম বা কুতুব মসজিদ, কুতুব মিনার, লৌহস্তম্ভ, আলাউদ্দিনের ফটক, আলাই-মিনার, আল্‌তামাসের সমাধি, ইমাম জমানের সমাধি, আলাউদ্দিনের সমাধি, অনঙ্গতাল প্রভৃতি অবস্থিত।

দিল্লীর শেষ হিন্দু-নরপতি রায় পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক এই
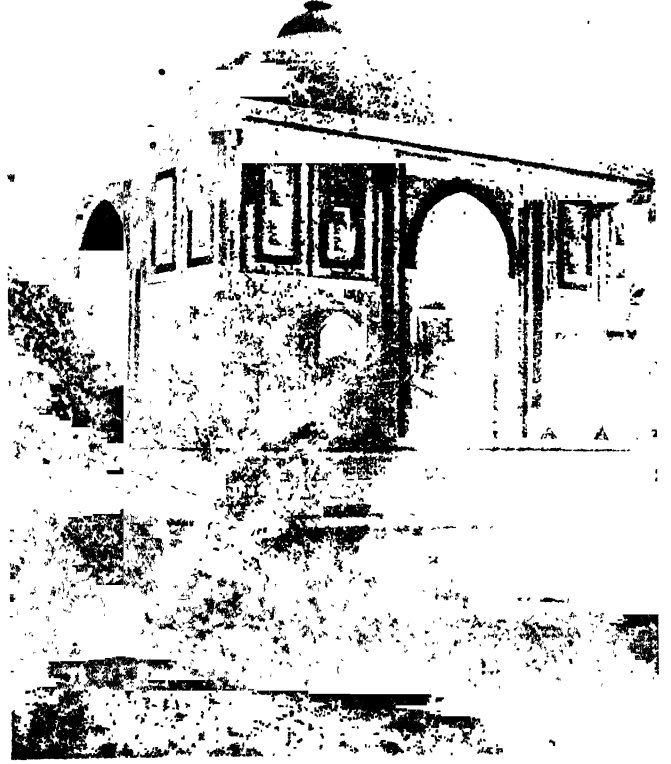
কুতুব মস্‌জিদ

নগর ও দুর্গ নির্ম্মিত হয়। কানিংহামের মতে ইহা ১১৮০ বা ১১৮৬ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মিত। এই সুরক্ষিত নগরী প্রায় এক ক্রোশ স্থান-ব্যাপী ছিল। ইহার প্রাচীর প্রস্থে ২০ হাত ও উচ্চে ৪০ হাত ছিল। প্রাচীর-পার্শ্বস্থ পরিখা ১২ হাত গভীর ও ২৪ হাত প্রশস্ত ছিল। ইহার উত্তর দিকের "ফতে বুরুজ" ও "সোহান বুরুজ" অতি সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। পশ্চিমদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কুতুবউদ্দিন জুম্মা মস্‌জিদের স্থান করেন। আলাউদ্দিন মোগল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ প্রাচীরের অনেক স্থানের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করেন।

কুতুব মস্‌জিদ।—মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী-বিজয়ের পর কুতুবউদ্দিন, পৃথ্বীরাজের বিষ্ণুমন্দিরের কয়েকটি স্তম্ভ ব্যতীত সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া, তাহার ভিত্তির

'পর কুতুব-মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেন। হিন্দু-ন্দির হইতে আনীত সুবর্ণ ও রত্নরাজি দিয়া কুতুব-মসজিদ ষিত হইয়াছিল।

আল্‌তামাস, এই মস্‌জিদের সম্মুখে মহাকালের মন্দির ইতে আনীত বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলাউদ্দিন খিলিজি সোমনাথের মূর্ত্তির টুক্‌রা দিয়া হার প্রবেশ-পথ আচ্ছাদিত করেন। ইহার প্রবেশদ্বারের 'পর খোদিত আছে যে, ২৭টি দেবমন্দিরের উপকরণে ১৬ ক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়।

স্তম্ভের উপর মস্‌জিদের ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই এত বড় মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। কিন্তু এখনও খিলানের উপর ও দেওয়ালের গাত্রে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত বয়েদ ও সুন্দর সুন্দর লতাপাতার চিত্র বিদ্যমান আছে।

মধ্য-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ "লৌহস্তম্ভ" বিদ্যমান। ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইল। এই প্রাঙ্গণ পার হইয়া ৫টি ঢেউখেলান খিলানের মধ্য দিয়া আসল মসজিদে উপনীত হওয়া যায়। কুতুবউদ্দিন গজনী হইতে ফিরিয়া আসিয়া

কুতুব মস্‌জিদের স্তম্ভশ্রেণী

এই মস্‌জিদের প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ১৪২ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট ছিল। ৭টি ধাপ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকের ১১ ফিট প্রশস্ত প্রধান দ্বারে প্রবেশ করিতে হইত। তাহার সম্মুখে চারি চারি স্তম্ভ-পরিশোভিত চক। উত্তর দিকের প্রবেশ-পথে দুইটি ধাপ ও দক্ষিণের প্রবেশপথে ৭টি ও পশ্চিমদিকে ৫টি ধাপ অতিক্রম করিতে হইত। সম্মুখের চক তিন সারি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে আসল মসজিদ। উপাসনার স্থানটি ১৪৭ ফিট দীর্ঘ ও ৪০ ফিট প্রস্থ। পাঁচ সারি সুন্দর

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই খিলানগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের বিষ্ণুমন্দিরের কতকগুলি স্তম্ভ এখনও এই মসজিদ মধ্যে বিদ্যমান আছে। কুতুবউদ্দিন যে এগুলিতে কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই, দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। এই স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশ ও গাত্র বহু কারুকার্য্যবিশিষ্ট। কাহারও কাহারও মতে এই মসজিদে পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই সহস্র স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। হিন্দু কারুকার্য্যের চিহ্ন-লোপের জন্য এই মসজিদের অনেক স্থল "পঙ্কের" কাজ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া, তাহার উপর কোরাণের শ্লোক খোদিত

হয়। কালে এই পঙ্কের কাজ খসিয়া যাওয়ায় হিন্দুদিগের কারুকার্য্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিকের চত্বরের স্থানে স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যে অনেক বৌদ্ধমন্দিরের উপাদানও এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মসজিদের দেওয়াল ও ছাদের স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রভৃতি খোদিত আছে। পূর্ব্বে চুণবালি আচ্ছাদিত ছিল কিন্তু সেগুলি ঝরিয়া যাওয়ায় এখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আল্‌তামাসের রাজত্বকালে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অনেক অংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আলাউদ্দিন খিলিজিও ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনঃসংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করেন। তাঁহার সময়ের নির্ম্মিত তোরণ ও কয়েকটি স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

কুতুব মিনার। এই কীর্ত্তি-স্তম্ভটি কুতুবউদ্দিন কর্ত্তৃক ১২০০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয় এবং আল্‌তামাস কর্ত্তৃক ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ইহা কুতুব মস্‌জিদের 'মিজানা'-রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য নির্ম্মিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফিদাও ঐ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

কুতুব মিনার

হিন্দুদের মধ্যে প্রবাদ, পৃথ্বীরাজের কন্যার নিত্য যমুনা-দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত। এই প্রবাদের মধ্যে কতটুকু সত্য আছে জানি না। মিনারটি ৫টি স্তরে বিভক্ত। ইহার প্রথম স্তর ৯৪ ফিট ১১ ইঞ্চি উচ্চ—ইহা কুতুবউদ্দিনকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দ্বিতীয় স্তর ৫০ ফিট ৮½ ইঞ্চি, ৩য় ৪০ ফিট ৯½ ইঞ্চি, ৪র্থ ২৫ ফিট ৪ ইঞ্চি ও ৫ম ২২ ফিট ৪ ইঞ্চি উচ্চ;—এই স্তরগুলি আল্‌তামাসের সময় নির্ম্মিত হয়। সকলের উপরে ফিরোজসাহের সময় একটি চূড়া নির্ম্মিত হয়। এখন তাহার দুই ফিট উচ্চ দণ্ডটি মাত্র বিদ্যমান আছে। ৫ম স্তরের প্রবেশপথের উপর লিখিত আছে যে, ১৩৬৮ খৃঃ অব্দে মিনারের উপর বজ্র পড়িয়া ইহার অনেক স্থান নষ্ট হয়। ফিরোজসাহ তাহা সযত্নে পুনরায় নির্ম্মাণ করান। ৪র্থ ও ৫ম স্তরটি তাঁহার সময় পুনর্নির্ম্মিত হয়, ও সর্ব্বোপরি একটি ১২ ফিট ১০ ইঞ্চি গম্বুজ নির্ম্মিত হয়। ১৮০৩ সালের ভূমিকম্পে এই গম্বুজটি পড়িয়া যায় ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ইঞ্জিনিয়ার মেজর স্মিথ, আর একটি গম্বুজ নির্ম্মাণ করাইয়া ইহার শিরোদেশ আচ্ছাদিত করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠায়, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশক্রমে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই গম্বুজটি নামাইয়া লওয়া হয়। ইহা এক্ষণে মিনারের সন্নিকটেই একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর রহিয়াছে। মিনারটি এক্ষণে ভূমিতল হইতে ফিরোজসাহের দণ্ডের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ২৩৮ ফিট ১ ইঞ্চি উচ্চ। সর্ব্বোচ্চ স্তরটিতে এক্ষণে লৌহ-রেলিং-বেষ্টিত বারান্দার মত করা আছে। ইহার প্রথম তিনটি তল বেলে-পাথরের, ৪র্থ ও ৫মটি শ্বেতপাথর ও লালপাথরে নির্ম্মিত।
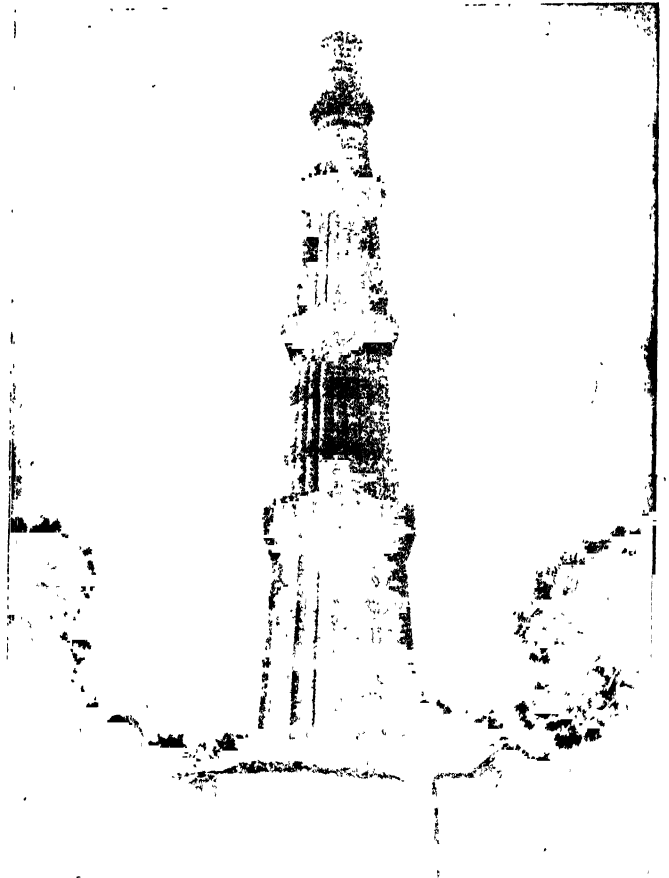
প্রথম তিনটি তল গোল পলতলা—শেষ দুইটি সাদা-সিধা। নিম্ন স্তরের ব্যাস ৪৭ ফিট ৩ ইঞ্চি এবং উপরের ব্যাস ৯ ফিট মাত্র। উপরটি ছাড়া প্রত্যেক স্তরে বারান্দা বাহির করা আছে। এক্ষণে যেগুলি আছে, উহা মেজর স্মিথ সাহেব পূর্ব্বের বারান্দার পরিবর্ত্তে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মিনারের গাত্রে খোদিত লিপি হইতেই ইহার ইতিহাস জানা যায়। কোরাণের শ্লোক ছাড়া ইহাতে মহম্মদ ঘোরী ও কুতুব-উদ্দিনের নাম আছে। ফজল বিন আবুল মাওয়ালি ও আবুল মুজফ্ফর আল্‌তামাসের নাম পাওয়া যায়। ফিরোজসাহ ও সেকন্দর শাহ, বিন বেহলোল্ শাহের নামও খোদিত আছে। উপরে উঠিতে সর্ব্বশুদ্ধ ইহার ৩৭৯টি ধাপ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—ইহার শেষের তিনটি ষ্টিফেনের মতে মেজর স্মিথ নির্ম্মিত।

লৌহ স্তম্ভ।—এই লৌহস্তম্ভটি কুতুব মসজিদের (যাহা পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল) প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই স্তম্ভটির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, বিলন দেব বনাম অনঙ্গপাল (তোমর বংশের প্রতিষ্ঠাতা) কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত। ইহার উপর খোদিত আছে যে, দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক ১০৫২ সালে দিল্লীনগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। আবুল ফজল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে এই পুরাতন দিল্লী, ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত হয়। কানিংহামের মতে এই পুরাতন দিল্লী এই লৌহস্তম্ভের সন্নিকটস্থ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এই স্তম্ভের গাত্রে (১৭৬৭ সম্বতে) খোদিত আছে, 'এই ধরণীর অধীশ্বর চন্দ্র…বিষ্ণুপাদ-গিরিতে বিষ্ণুধ্বজ উড়াইবার জন্য এই সুবৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান।" সৈয়দ আহম্মদ খাঁর মতে যুধিষ্ঠিরের বংশধর রাজা মাধব কর্ত্তৃক খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। হুইলার ইহাকে পাণ্ডবদের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল মতের কোন্‌টি সত্য নির্ণয় করা কঠিন।

এই স্তম্ভ-গাত্রে আরও কয়েকটি লিপি আছে। একটি হইতে বুঝা যায়, ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক দিল্লীর প্রতিষ্ঠা হয়। চৌহানরাজ ছত্র সিংহের ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দের দুইটি লিপি আছে। বন্দেলা রাজার আর একটি নাগরী অক্ষরের লিপি এবং দুইটি পার্শী অক্ষরের লিপি আছে। শেষ দুইটিতে দর্শকগণের নাম আছে।

প্রবাদ যে, ব্রাহ্মণেরা, এই স্তম্ভের প্রতিষ্ঠার পর অনঙ্গপালকে অভয় দিয়া বলেন যে, ইহা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে এবং তাঁহার রাজত্ব এই স্তম্ভের ন্যায় অটল হইবে। অনঙ্গপাল এই উক্তির সারবত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য স্তম্ভটি তুলিবার আদেশ দেন। স্তম্ভ উঠাইলে দেখা যায় যে, স্তম্ভের তলদেশে রক্ত লাগিয়া আছে। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও স্তম্ভটিকে আর সেরূপ সুদৃঢ় ভাবে বসান যায় নাই।

স্থানীয় লোকেদের মধ্যে প্রবাদ যে, নাদির শাহ এই স্তম্ভের মূল দেখিবার জন্য খনন করিতে আদেশ দেন। মজুররা কিছুদূর খুঁড়িবার পর ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ায় তাহারা পলাইয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহার উপর কামান মারিয়াছিল, তাহাতেও ইহা ভাঙ্গে নাই।

স্তম্ভটি নিরেট লোহের। কাহারও কাহারও মতে ইহা মিশ্র ধাতুর—কিন্তু ইংরাজের আমলে ইহার কয়েক টুকরা গলাইয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইহা বিশুদ্ধ লৌহ নির্ম্মিত। ইহা পেটালোহার তৈরী—ঢালাই লোহার নহে! এই স্তম্ভটি ২৩ ফিট ৮ ইঞ্চি উচ্চ; এই স্তম্ভের ১৫ ফুট পর্য্যন্ত বেশ পালিশ করা—মসৃণ। স্তম্ভের মূলের ব্যাস ১৬॥ ইঞ্চি; আর উপরে ১২ ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক। কানিংহাম লিখিয়াছেন "১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমার সহকারীরা এই স্তম্ভের তলদেশ খুঁড়িয়া দেখে যে, মাটির নীচে মাত্র দুই হাত স্তম্ভ আছে। মূলদেশটি ৮টি শক্ত মোটা লোহার ডাণ্ডার সহিত আঁটা। ডাণ্ডাগুলির নিম্নদেশে রাংদিয়া পাথরের সহিত আটকান।"

আলাই দরওয়াজা বা আলাউদ্দিনের তোরণ।—ইহার উপর লিখিত আছে যে, আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই তোরণটির নির্ম্মাণ কার্য্য অতি সুন্দর—ইহা কুতুব মিনারের অনতিদূরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এই দ্বারটি পাঠান-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই তোরণের স্তম্ভ-গাত্রে সুন্দর কারুকার্য্য করা। তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি উচ্চ দ্বার। এই প্রবেশ-পথগুলিও বহু কারুকার্য্যময়। ইহার উপরও স্থানে স্থানে কোরাণের শ্লোক লিখিত আছে।

ইহার অতি সন্নিকটেই ইমামজমানের সমাধি।

আলাই মিনার।—এই মিনারটি আলাউদ্দিন

কর্ত্তৃক ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হয়। কুতুব-মিনারের দ্বিগুণ একটি মিনার নির্ম্মাণের জন্যই ইহার আরম্ভ। ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহা কুতুব মিনারের দ্বিগুণ আকারেরই স্তম্ভ হইত।

সিরিদুর্গ।—ইহা আলাউদ্দিনের দিল্লী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা পুরাণ কেল্লা হইতে এক ক্রোশ দূরে ; ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ; মোগলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিত্তির সহিত প্রতিহিংসা-নিদর্শনস্বরূপ ৮ সহস্র মোগলের মুণ্ড গ্রথিত হয়। এই সিরি দুর্গের মধ্যেই সহস্র-স্তম্ভ প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। গিয়াসউদ্দিন তোগলকের পুত্র পর্য্যন্ত, রাজপ্রাসাদ-রূপে ব্যবহৃত হইত। সের সাহের সময় এই সিরিদুর্গ ভাঙ্গিয়া ইহাবই মালমসলায় শেরশাহী দিল্লীর নির্ম্মাণ হয়।

আলতামাসের সমাধি।—আল্‌তামাস দাস বংশের তৃতীয় নরপতি। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে আরামকে পরাজিত করিয়া আল্‌তামস সিংহাসন আরোহণ করেন। আল্‌তামসকে কুতুবউদ্দিন দাসরূপে ক্রয় করেন—কিন্তু পরে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আপনার কন্যাকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন। আল্‌তামাস বীর ও সুশাসক ছিলেন এবং বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। ২৬ বৎসর কাল সুশাসনের পর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মিঃ ফার্‌গুসনের মতে আল্‌তামাসের সমাধি ভারতের মধ্যে সর্ব্বপুরাতন। এই সুন্দর সমাধিটি মুসলমান-রাজত্ব-কালে হিন্দু-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। ইহা কুতুব মস্‌জিদের বাহিরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। সমাধির উপর এক্ষণে ছাদ নাই কিন্তু অনেকের মতে এক সময়ে নিশ্চয়ই ইহার উপর ছাদ ছিল। ফিরোজ সাহের জীবনচরিত হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। ইহার পূর্ব্বদিকের পথের খিলানের উপর কোরাণের শ্লোক ও অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য

আলাই দ্বার

আছে। দেওয়ালের গাত্রগুলিও সুন্দর কারুকার্য্যময়। গৃহমধ্যস্থ স্মৃতি-শিলাটি ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চ।

আলাউদ্দিনের সমাধি।—আলাউদ্দিন খিলিজি ১২৯৫-১৩১৮ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার সময়েই ভারতের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমাধিটি কুতুব মস্‌জিদের সংলগ্ন ; এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান।

আদম খাঁর সমাধি।—এই সমাধি-মন্দিরটি কুতুব মিনার হইতে মেরেউলীর পথে যাইতে ডান দিকে পড়ে। আদম খাঁ আকবরের জনৈক সেনাপতি। আদম খাঁ, শূরবংশীয় বাজ-বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অসামান্যা রূপবতী ভার্য্যা রূপমতীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন। আদম খাঁ রূপমতীর কক্ষে গিয়া দেখেন, তিনি অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া বিষপান করিয়া প্রস্তরবৎ বসিয়া আছেন। আদম খাঁ, আকবরের পালক পিতা আজম খাঁকে হত্যা করার অপরাধে আকবর কর্ত্তৃক নিহত হন। পরে তাঁহাকে এই খানে সমাহিত করা হয়। এই সমাধি-মন্দিরটি এক্ষণে ডাকবাংলারূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা "ভুল ভুলাইয়া" বা গোলকধাঁধা নামে পরিচিত।

যোগমায়ার মন্দির।—কৃষ্ণের ভগ্নী যোগমায়ার মন্দির যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পুরাতনের আর চিহ্ন মাত্র নাই। আধুনিক মন্দিরটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সেদমল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়—এবং পরে লালা হরধ্যানসিংহ কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার

[illegible] পরিবর্তন [illegible]। এই মসজিদটি কুতুবমিনারের [illegible] অবস্থিত।

আলতামাসের সমাধি।—বলবন ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পর দাসবংশের আর একজন

আল্‌তামসের সমাধি

মাত্র বাদশাহ রাজত্ব করেন। ইঁহার সময় বিদ্বান, কবি ও শিল্পিগণের রাজদরবারে বিশেষ সম্মান ছিল। ইনি বিশ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া ৮১ বৎসর বয়সে ১২৮৬ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সমাধিটি কুতুবমিনারের অতি সন্নিকটে;—ইহার অবস্থা এক্ষণে অতিশয় শোচনীয়। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, সমাধির উপরের প্রস্তরটিও আর নাই।

হউজ সমশি।—এই বৃহৎ দীঘীটি আল্‌তামাসের দীঘী বলিয়া বিখ্যাত। ইহা কুতুবমিনার হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। মুসলমানগণ ইহাকে তীর্থস্বরূপ মনে করেন বলিয়া এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাধি আছে। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌তামাস ইহার নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ যে,—হজরৎ মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্‌তামাস ও ফকির চিস্তি সাহেবকে একদিন স্বপ্নে দর্শন দেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ম এই স্থানে দীঘী খনন করান হয়। এখন ইহা বুজিয়া আসিয়াছে। আলাউদ্দিনের সময় একবার ইহার সংস্কার করা হয়, এবং ইহার মধ্যস্থলে তিনি একটি জলটুঙ্গি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, কিন্তু 'সমশি' হইতে পৃথ্বীরাজের সহায় চিতোর-রাজ 'সমরসিং' বা রাণা সমরসিংহের কথা মনে পড়ে। হইতে পারে, অন্যান্য হিন্দু-কীর্ত্তিধ্বংসের সময়ে, আল্‌তামাস সমরসিংহের নামে দীঘীকে সংস্কার করাইয়া নিজের নাম নির্ম্মাতা বলিয়া প্রচারিত করেন।

মেহরউলী ও মালিকপুর।

আদমখাঁর সমাধির সন্নিকটে,—মেহরউলী গ্রামে শাহ-আলমের মোতি মসজিদ, সমাধি ও কুতুবউদ্দিনের (বাউলী) কূপটি দ্রষ্টব্য।

কুতুবমিনার হইতে দুই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে মালিকপুর গ্রামে ঘোরি রুকুনউদ্দিন ও বাইরামের সমাধি দ্রষ্টব্য।

ঘোরির সমাধি। আল্‌তামাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদ ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার সমাধিটি সুলতান ঘোরির সমাধি বলিয়া প্রচলিত।

এই চতুষ্কোণ সমাধি-ভবনটির চারি কোণে চারিটি গোল মিনার অবস্থিত। প্রবেশ-পথটি ২০ হাত উচ্চ, এবং ২২টি ধাপ অতিক্রম করিয়া এই প্রবেশ-পথে পৌঁছিতে হয়। খিলানের উপরে ও পার্শ্বে কোরাণের শ্লোক লিখিত আছে। ইহার উপরার্দ্ধ শ্বেতপ্রস্তরের ও নিম্নার্দ্ধ লালপাথরে নির্ম্মিত। এই প্রবেশ-পথের ভিতরের ছাদটি সুন্দর কারুকার্য্য-খোদিত। ইহা আল্‌তামাসের অনুমতিক্রমে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্তও ইহার গাত্রে খোদিত আছে। ভিতরের প্রাঙ্গণের উভয়দিকে স্তম্ভশ্রেণী পরিশোভিত। পশ্চিমের দেওয়ালের সম্মুখে মধ্যভাগে শ্বেত-প্রস্তরের স্তম্ভ-পরিশোভিত একটি ছোট মসজিদ। মসজিদের ভিতর ও খিলানগুলি শ্বেত-প্রস্তর আচ্ছাদিত। খিলানগুলির উপর সুন্দর কারুকার্য্য ও কোরাণের শ্লোক লিখিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নাসিরউদ্দিনের সমাধি। ইহার মৃত্তিকা-নিম্নস্থ সমাধি-প্রকোষ্ঠটি অষ্টকোণ শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রকোষ্ঠটি ১৬ হাত গভীর। ১৩টি ধাপ অতিক্রম করিয়া নীচে নামিতে হয়।

রুকুনউদ্দিন ও বাইরামের সমাধি। এই সমাধিদ্বয়ের গঠন একই রূপ—কাজেই চেনা দুঃসাধ্য। আল্‌তামাসের পুত্র রুকুনউদ্দিন ৬ মাস কাল মাত্র রাজত্ব করেন, ও ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাইরাম, রিজিয়া বেগমের ভ্রাতা—১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিহত হন।—প্রথম সমাধিটি রিজিয়া বেগম নির্ম্মিত, দ্বিতীয়টি বাইরামের ভ্রাতুষ্পুত্র-নির্ম্মিত। এই সমাধিদ্বয় ভগ্নপ্রায় হইলে ফিরোজ কর্ত্তৃক ইহার গোলক প্রভৃতি পুনর্নির্ম্মিত হয়।

তোগলকাবাদ।—এইটি দিল্লীর ৪র্থ মুসলমান রাজধানী। গিয়াসউদ্দিন তোগলক ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন-আরোহণের পর এই নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়া ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এইখানে উঠিয়া আসেন। এই তোগলকাবাদ এক্ষণে ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এক সময়ে ইহা সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। ইহার পরিধি প্রায় ২ ক্রোশ। ইহার দুর্গটি পরিখা-বেষ্টিত ও সুবৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে সৈন্যবাসোপযোগী এই নগরের ১৩টি তোরণ এবং দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিবার ৩টি সিংহদ্বার ছিল। ভিতরের প্রকোষ্ঠগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন প্রধান প্রবেশ-দ্বারটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে ৭টি পুষ্করিণী ও বহুসংখ্যক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং এখনও তিনটি বাউলী বিদ্যমান আছে।

গিয়াস উদ্দিনের সমাধি-মন্দিরটি একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অবস্থিত। তোগলকাবাদ হইতে এই সমাধি পর্য্যন্ত পথটি ২৭টি খিলানের উপর অবস্থিত। সমাধি-গোলকটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে লোহিত-প্রস্তরের সমাবেশ থাকায় সাদা ও লাল ডোরা কাটা হওয়ায় দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার আছে। প্রধান প্রবেশ-পথের মধ্যভাগে একটি ছোট প্রবেশ-দ্বার—খিলানটি শ্বেতপ্রস্তরের জাফরি-আচ্ছাদিত। সমাধি-মধ্যস্থ তিনটি কবরের মধ্যে একটি গিয়াস উদ্দিনের এবং অপর দুইটির একটি তাঁহার স্ত্রী ও অন্যটি তাঁহার-পুত্রের কবর।

আদিলাবাদ। গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যুর পর
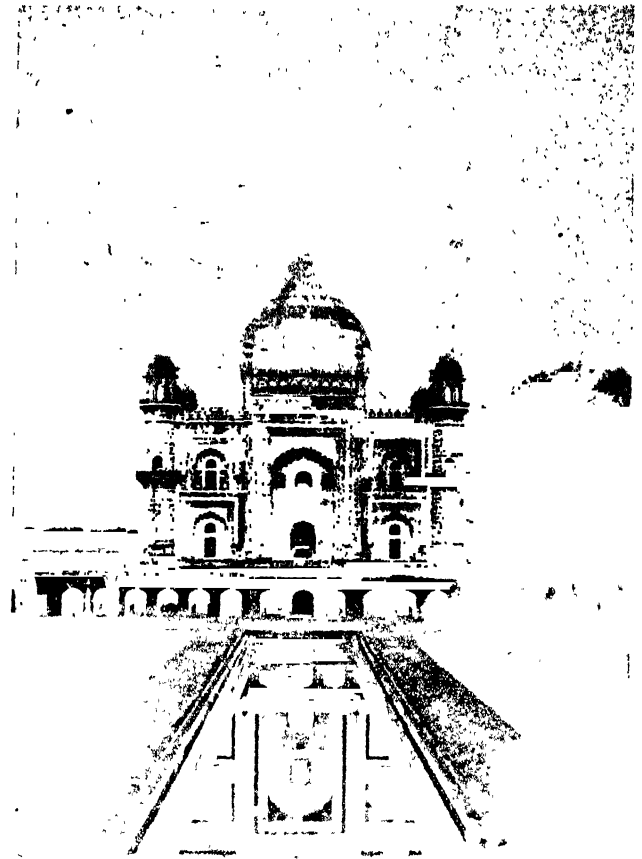
সফদর জঙ্গ

নির্ম্মাণ করান। ইহা তোগলকাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অনুচ্চ শৈলের উপর নির্ম্মিত। ইঁহার ন্যায় অত্যাচারী নৃশংস নরপতি আর কেহ দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইঁহার অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া দুই-বার পলায়ন করে ও ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি তখন তোগলকাবাদ হইতে ইলোরায় যাইয়া পুনরায় নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আদিলাবাদও তোগলকাবাদের ন্যায় সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহার রাজসভা সহস্র-স্তম্ভ-নির্ম্মিত ছিল। ইহাও এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট।

কালী মন্দির।—তোগলকাবাদের সন্নিকটে এই মন্দিরটি স্থাপিত। এখানে প্রতি মঙ্গলবারে মেলা হয়। মহাষ্টমীর দিন এখানে খুব ধুমধামের সহিত পূজা হয়। দেবী যে এখানে কতদিন আছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ছিলাম, কিন্তু এক বীরেন ভিন্ন অপর কতিপয় পুত্ররত্ন না প্রসব করার জন্য ক্রোধবশতঃ গৃহিণীকে আর কিছু অধিক দিলাম না। আহা! সগর রাজার ন্যায় পুত্র-ভাগ্য যদি আমার হইত! যাহাই হউক, সেই রত্নগর্ভার জন্যই ত' এই সব; তাই তাহার মনস্তুষ্টি অনেকটা করিলাম।

পাড়ার লোকগুলা এখন আমাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমার যে কি দোষ, তাহা ত খুঁজিয়া পাইলাম না। কনের বাপ যদি আমি না চাহিবামাত্র আমায় টাকা দেয়, তা হইলে আমি লইয়া যে কি মহাভারত অশুদ্ধ করিলাম, তাহাত জানি না। সকলে মিলিয়া আমার নামে ছড়া বাঁধিল। ছেলে-বুড়ো আদি করিয়া আমায় খ্যাপাইতে লাগিল; আরে মর, তোদের ব্যাটার বৌগুলা যদি মার্কণ্ডের পরমায়ু লইয়া আসিয়া থাকে, তাহাতে আমি কি করিব!

বেশ সুখে কাল কাটিতেছিল। বীরেন যখন চোগা-চাপকান আঁটিয়া আলিপুরের কাছারিতে যাইত, তখন আমার আশাদেবীও এরোপ্লেনে চড়িয়া শূন্যে বহু উচ্চে উঠিত। আবার যখন সে শুষ্কমুখে কাছারি হইতে রিক্ত-পকেটে ফিরিয়া আসিত, তখন আশাদেবী একটু নামিয়া পড়িত বটে, কিন্তু তবুও মাটিতে নামিত না। এইরূপে কয় বৎসর কাটিল। বীরেন ট্রাম ভাড়ার পয়সাটিও আনিতে পারিল না। বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইলেও বীরেন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যাহা বিবাহে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে আমাদের সংসারে দুঃখ প্রবেশ কখনও করিতে পারিবে, সে আশঙ্কা ছিল না। আর বীরেনের উপার্জ্জন-হীনতার আর একটি কারণও ছিল। গৃহিণী ঠিকই বলিতেন যে, বর্ত্তমান বধূমাতাটি বড়ই 'অপয়া'; শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়িয়াছিল, আর বৌমাটির দৃষ্টিতে কাছারীর মক্কেল উড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার ইহার উপর তাঁহার কন্যা-প্রসবিনী শক্তিটি এত অধিক যে, প্রতি বৎসরই এক একটি দৌহিত্রী আমার গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছিল; আর উপার্জ্জন-বিহীন বীরেন ব্যাচারির মস্তকে প্রতি বৎসর এক একটি চিন্তার বড় বড় গাঁটরি চাপিতেছিল। বর্ত্তমান বৌমাটি আমার কিরূপ 'অপয়া', তাত বুঝিলেন? যাহার মন্দ হয়, তাহার সবাই কি রকম?

এইবার বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। বোধ হয়, প্রতিবেশিগণের হিংসার তপ্তশ্বাস, আর 'অপয়া' বৌমাটির শনির দৃষ্টি, উভয়ে মিশিয়া গেল, আর আমার বাটীর পার্শ্বের কাঠগোলায় আগুন ধরিয়া আমার ঘর-বাড়ী, জিনিসপত্র—ব্রহ্মার এবং যাহা কিছু বাঁচিল, তাহা তস্করের উদরে গেল। হায়, হায়! আমি পথে বসিলাম, আমার সর্ব্বস্ব গেল। ব্রহ্মা কেন আমায় ভক্ষণ করিয়া মন্দাগ্নি নিবারণ করিলেন না! ঃঃ, কি পরিতাপ! বলিব কি, আমায় এক গৃহস্থের বাটীতে দুইখানি ঘর ভাড়া করিয়া মাথা রক্ষা করিতে হইল! অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি কাহারও সহানুভূতি পাইলাম না।

এই পাঁচ বৎসরের ভিতর বধূমাতা আমার পাঁচটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। আমার গৃহিণী ঠিকই বলেন যে, ভদ্রলোকের কন্যা হইলে বৌমা কখনও এত কন্যাসন্তান প্রসব করিতেন না। বীরেন বাচারা আহার-নিদ্রা পরি-শূন্য হইয়া অনবরত চিন্তাসমুদ্রে ভাসমান। কি করিয়া সংসার চালাইবে, আবার তাহার উপর কন্যাকয়টি পার অর্থাৎ পর হইবে কি করিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে বীরেন যৌবনেই বৃদ্ধ হইতে বসিয়াছে। কে জানে, এ কন্যা-প্রসবের পৌনঃপুনিক দশমিকাংশের বিরাম কোথা হইবে! একদিন দুঃখের কথা একজন প্রতিবেশীকে যেমন বলিতে গেলাম, তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, গোময় এখন শুষ্ক হইয়া পুড়িতেছে—তাই পূর্ব্বের হাসি কান্নায় পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই বলে প্রকৃতির পরিশোধ।

বলুন দেখি, আমি যে উচ্চমূল্যে পুত্রটিকে বিবাহের হাটে বেচিয়াছিলাম, তাহাতে আমি কি অন্যায় করিয়াছি? আমার ইহাতে দোষ থাকে, আমার কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিন, আপত্তি নাই। শুনিয়াছি যে, একদিন বাজারে এক মৎস্য-জীবী একটা বড় চিংড়িমাছ বিক্রয়ার্থে আনিলে, দুই জন অর্থযুক্ত জমিদারের ভৃত্য পরস্পর দর চড়াইয়া সেই চিংড়ি মাছটির এক টাকা মূল্য পর্য্যন্ত তুলিলে, উহার মধ্যে এক জন উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বলুন দেখি, ইহাতে মৎস্যজীবীর দোষ কি? আমি দর পাইয়াছি, আমার জিনিস অধিকতর উচ্চমূল্যে ছাড়িয়াছি। যদি আমাকে কোন কনের বাপ অর্থাদি প্রদানে অস্বীকৃত হইতেন, তা হইলে কি আমি সিঁদকাটি গড়াইয়া তাহাদের গৃহ হই

চুরি বা ডাকাতি করিয়া টাকা আনিতাম ? সুতরাং বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করুন, আমাতে বিন্দুমাত্র দোষ পাইবেন না। আমি পাইয়াছি, তাই লইয়াছি। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলি নাই বলিয়াই কি আমার দোষ ? আপনারাই ইহার বিচার করুন।

এখন আপনারা বলুন, আমি সেই পাঁচটি কন্যাকে আজকালকার ফ্যাসনে আত্মহত্যা করিতে শিক্ষা দিব কি না ? যদি তাহা না বলেন, তাহা হইলে হয় আমার জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার খুলুন, নতুবা পণ-গ্রহণে অনিচ্ছুক পাঁচটি সুপাত্র আমার জন্য যোগাড় করিয়া রাখুন।

নৃপ ও পাচক

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী]

সুচারু আসনে বসিয়া ভোজন
করিছেন মহীপাল।
ত্রস্ত পাচক যোগাইছে আনি
ব্যঞ্জন সুরসাল।
সম্মুখে বসি' প্রেয়সী মহিষী
হাসি' হাসি' ক'ন কথা,
কনকে হীরকে জড়িতা যুবতী
সুচারু-লাবণ্য-লতা।
সহসা ভূপের পট্ট বসনে
ব্যঞ্জন-রস-বিন্দু
হইল পতিত ;— রক্তিম ক্রোধে
নৃপতির মুখ-ইন্দু।
পাচকের পানে চাহিয়া সরোষে
গরজি কহে নরেশ—
"কহ জল্লাদে স্বরা পামরের
জীবন করিতে শেষ।"
আদেশ শুনিয়া, পাচক অমনি,
শূন্য করিয়া পাত্র—
ব্যঞ্জন দিল ঢালিয়া ;—রাজার
ভিজিল বস্ত্র—গাত্র।
বিস্মিতা রাণী ক'ন,—"উন্মাদ !
একি তব আচরণ !"
যুক্ত করিয়া হস্ত যুগল
দ্বিজ করে নিবেদন ;—
"সামান্য দোষে যদি নরপতি
নিতেন আমার প্রাণ,
অবিচারী ব'লে নিন্দুকে তব
কুযশ করিত গান।
এ জীবন দিয়া নিন্দা কিনিতে
কেন দিব মহারাজে ?—
গুরু অপরাধ করিনু, জননি,
তাই সে তাঁহার কাজে !"
শুনি' সহাস্যে কহেন ভূপাল,—
"ক্ষমিলাম তব দোষ,
হেরিয়া তোমার মহান্ হৃদয়
লভিলাম পরিতোষ।"

পদচিহ্ন

[শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী]

আমি মন্দিরের পরিচারক। বহুকালের পুরাণো মন্দিরটি যখন ভক্তবৃন্দের পদভরে কাঁপিতে থাকে, তখন আমি বাহিরে বসিয়া থাকি। যখন রাজপ্রাসাদ হইতে ভারে ভারে পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্য আসে, তখন সকলে আমাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেয়। পূজারির দল পাথরের ঠাকুরটিকে ঐশ্বর্য্যের অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখাইয়া যখন তাহা গৃহে লইয়া যায়, তখন আমার আবশ্যক হয়। তখন আমার অপবিত্রতা ঘুচিয়া যায়, হঠাৎ আমি শুচি হইয়া উঠি। কুণ্ড হইতে যখন শুষ্ক পুষ্পরাশি ও গলিত বিল্বপত্র তুলিয়া ফেলিবার আবশ্যক হয়, তখন সকলে আমার অনুসন্ধান করে।

যখন আলো নিবিয়া যায়, দিনের পাখী যখন কুলায়ে ফিরিয়া আসে, এবং রাতের পাখী যখন জাগিয়া উঠে, তখন সকলে মন্দির ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। সূর্য্যের তেজ যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, পুরোহিতের দলের দেহের বল তেমনি ক্ষীণ হইতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্দির জনশূন্য হইয়া যায়। একেবারে জনশূন্য নহে, কারণ মন্দিরে একজন লোক থাকে। যখন ছোট পাখীটি নীড়ের পথ ভুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, এবং অন্ধকারে দেবপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত পাইয়া বারবার পড়িয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র দীপের ক্ষীণ ম্লান জ্যোতিঃ মন্দিরের গভীর অন্ধকার ফুটাইয়া তুলে। যখন নৈশবায়ু ভীষণবেগে পুরাণো মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য জগতের অদৃশ্য কারণ—শব্দধ্বনি—বাহিরে বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন পুরাণো মন্দিরে কেহ থাকিতে চাহে না। কেন জান? তখন একজন ব্যতীত আর কেহ মন্দিরে থাকিতে পারে না। সে কে?—বলিতে পার?

সে আমি। পূজারির দল যখন ভক্তদলের উপহার লইয়া মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন আমি মন্দিরের অধিকারী হইয়া বসি। অরুণোদয়ে তাহারা যখন কম্পিত-পদে আবার ফিরিয়া আসে, তখন আমি মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাই। কেন?—বলিতে পার?

একদিন আমিও উঁহাদের মত রজত শুভ্র উপবীত-যুক্ত স্কন্ধে ঝুলাইয়া, বিচিত্র পট্টবাস পরিয়া, মন্দিরের পাষাণ-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতাম; দলে দলে ভক্ত সেবক আসিয়া পূজা করিয়া যাইত; পূজান্তে আমার পদধূলি লইয়া তাহারা চরিতার্থ হইত। তখন আমিও অস্পৃশ্য বলিয়া মন্দিরের পরিচারকগণকে দূরে রাখিতাম; কোনদিন ভুলিয়া যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে স্নান করিয়া শুচি হইতাম। আর এখন,—এখন আমি পরিচারক—আমি অস্পৃশ্য,—আমাকে স্পর্শ করিলে সকলে স্নান করিয়া শুচি হয়।

তখন সন্ধ্যাকালে পুরোহিতের দল ত্রস্তপদে পলাইত না, সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দের ভক্তিস্রোত হঠাৎ থামিয়া যাইত না, নরনারী ভয়ে মন্দির ত্যাগ করিত না। যখন আরতিকের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিত, বৃদ্ধ পুরোহিত যখন কম্পিত হস্তে ঘণ্টানিনাদ করিতেন, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা মন্দিরে ছুটিয়া আসিত, শঙ্খ-ঘণ্টার রবে মন্দির কাঁপিয়া উঠিত, তখন কেহ ভয় পাইত না। এখন কেন এমন হইল?—বলিতে পার?

তখন প্রহরে প্রহরে সুন্দরীগণের ভুবনমোহন সঙ্গীতে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিত; তখন পাষাণপ্রতিমাও বোধ হয়, কোমল হইত। নর্ত্তকীগণ যখন মণ্ডপে নৃত্য করিত, তখন ভক্তবৃন্দ তাহাদিগের পাদস্পৃষ্ট পাষাণস্পর্শে পুলকিত হইয়া উঠিত। তাহারা মনে করিত যে, অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণস্পর্শে, কোমল চরণের নূপুর-নিক্কণে পাষাণ প্রাণ পাইয়াছে, তাহারই স্পর্শে তাহাদিগের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, প্রাণমন অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে। মন্দির-তোরণে যখন করুণরাগে রজনীর দ্বিতীয় যামে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিত, তখনও নৃত্যগীত থামিত না।

আর এখন, ভুলিয়াও কেহ রাত্রিকালে মন্দিরের দিকে আসে না, মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠে না, কুসুমপেলব চরণস্পর্শে কঠিন পাষাণ নাচিয়া উঠে না, সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি মানুষের প্রাণ মাতাইয়া তুলে না। তাহারা কোথায় গেল?—বলিতে পার?

মন্দির মধ্যে রজত-সিংহাসনে বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া যিনি বসিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে ভক্তি করি না, তাঁহার উপাসনা করি না, দিনান্তেও একবার তাঁহার চরণে প্রণাম করি না। আমি জানি, তাঁহার পাষাণের কায়া নির্মম নিষ্ঠুর, তাঁহার দেহ প্রাণহীন। আর তখন,—তখন কথায় কথায় তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িতাম; ভাবিতাম—তিনি অন্তর্যামী, অনাথের নাথ, ভক্তের ভগবান। অন্তরের গূঢ় কথাটি নিভৃতে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া আসিতাম, মনে করিতাম—তাঁহার মত আপনার জন আমার আর কেহ নাই। বিপদে আপদে তাঁহার নিকট আশ্রয় লইতাম; ভাবিতাম—তাঁহার নিকটে থাকিলে কেহ আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।—তিনি যে আমার!—তিনি তাঁহার কোমল হৃদয়ের কঠিন আবরণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন।

মিথ্যা কথা—ওগো, সব মিথ্যা কথা! তাঁহার অন্তরে বাহিরে পাষাণ;—তাঁহাতে কোমলতা নাই,—যাহা দেখিতে কোমল, তাহা স্পর্শে কঠিন। তিনি কাহারও নহেন, তিনি কাহারও নহেন। তাঁহার শ্রুতি নাই, জিহ্বা নাই, দৃষ্টি নাই, স্পর্শ নাই,—কি আছে, তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। ভক্তের দল, পূজারির দল ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে যখন তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কামনা করে, তখন আমার প্রাণ হাসিয়া উঠে। সে হাসি কেন মুখে ফুটিয়া উঠে না,—বলিতে পার?

২

মন্দিরের সম্মুখে যেখানে ভোগমণ্ডপের ভাঙ্গা স্তম্ভগুলি অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানে আমার উপাস্য দেবতা আছেন। যেখানে ভগ্নমন্দিরের আবর্জ্জনা-রাশি শ্বেতমর্ম্মরের জ্যোৎস্নাধবলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সেইখানে আমার উপাস্য দেবতা আছেন। পাষাণের কোমল শয্যায়, পাষাণের কঠিন উপাধানে, মর্ম্মরের শ্বেত উত্তরচ্ছদে আমার মানসী প্রতিমা লুকাইয়া রাখিয়াছি। তাহাতে কি আছে জান? শুভ্র মসৃণ পাষাণে পুরাতন অলক্তকের ন্যায় শোণিতধারায় অঙ্কিত একটি **পদ-চিহ্ন**। সে পদচিহ্ন কাহার?—বলিতে পার?

সে কবে মন্দিরে আসিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। তাহার পিতা-মাতা তাহাকে দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিল। এই দেবতা! অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার পিতা-মাতা, স্নেহপ্রবণ হৃদয় কঠিন করিয়া, অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হইয়া, কুসুম কলিকা পাষাণের নিকট উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিল। সে যখন আসিয়াছিল, তখন সে ক্ষুদ্র বালিকা, তখনও কুসুমে কীট প্রবেশ করে নাই। নিতান্ত শিশু বলিয়া পিতা তাহাকে আমাদিগের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কি জানিতেন যে, ইহা হইতেই তাঁহার বংশ ধ্বংস হইবে? তিনি কি মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার জন্য আমাকে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, মন্দির-সেবক হইতে হইবে?

সে পিতার পালিতা কন্যার ন্যায় আমাদিগের গৃহে থাকিত, এবং নিত্য তাঁহার সহিত মন্দিরে আসিত। তখন নীল আকাশের অগণিত তারকা-মালার ন্যায় এই পাষাণ-প্রতিমার অগণিত দাসী ছিল, তাহারা নৃত্যগীতে দৃষ্টিহীন বধিরকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিত। সে আসিয়া ইহা-দিগের নিকটে নৃত্যগীত শিখিত। আমি তখন বালক। আমিও তাহার সহিত আসিয়া তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গায়িতাম, তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য করিতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিত, কিন্তু পিতা পুরোহিত-প্রধান ছিলেন বলিয়া, কেহ ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না।

কালে কুসুম বিকসিত হইল। তাহার অপরূপ রূপের প্রভায় তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে ও তাহার অতুলনীয় নৃত্যের যশঃ-সৌরভে দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সে আমাদের গৃহে থাকিত। পিতার পালিতা কন্যা বলিয়া পরিচিতা হইত, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিতাম। দেশ-দেশান্তর হইতে কত লোক তাহার নৃত্য দেখিতে ও গীত শুনিতে আসিত, দেখিয়া শুনিয়া মোহিত হইয়া যাইত। ধনী তাহাকে আশাতীত পুরস্কার দিত, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, গায়ক-গায়িকা ও নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল ঈর্ষায় মরিয়া যাইত। কালের প্রবল বন্যার

আবর্ত্তে সে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে,—তাহা বলিতে পার ?

সে যে সুন্দরী ছিল, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিতেছ। তাহাকে দেখিলে প্রভাতের শিশিরসিক্ত কামিনী-গুচ্ছ বলিয়া ভ্রম হইত, মনে হইত স্পর্শের পরুষতায় সে ঝরিয়া পড়িবে। তাহার যৌবনপুষ্পিত দেহলতাখানি সদাই যেন সৌন্দর্য্য-ভারে অবনত থাকিত। তাহারই জন্য আত্মীয়স্বজন হারাইয়া, ধন, মান, সম্ভ্রম, গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, আমি এখন মন্দির-সেবক হইয়াছি।

তাহার জন্য যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ত তখন বুঝিতে পারি নাই! তাহার গৌরবরণ চঞ্চল চরণ দুখানি যখন শুভ্র মর্ম্মরের মসৃণ বক্ষের উপরে অবিরাম গতিতে তালে তালে নাচিয়া যাইত, তখন আমি পূজা পাঠ ভুলিয়া, কাব্য-ব্যাকরণ বিস্মৃত হইয়া, ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে তাহার দুর্ল্লভ-দর্শন রূপের আরাধনা করিতাম। মন্দিরে ঐ পাষাণের দেবতার পার্শ্বে আমাকে দেখিতে না পাইয়া পিতা বিস্মিত হইতেন, মণ্ডপের স্তম্ভের অন্তরালে আমাকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিতেন। মণ্ডপ ছাড়িয়া যাইতে আমার প্রাণ চাহিত না। ইচ্ছা না থাকিলেও আমি মন্দিরে ফিরিয়া যাইতাম, তখন আমাকে দেখিয়া ঐ খল ক্রূর পাষাণ-প্রতিমার দৃষ্টিহীন নেত্রে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়া উঠিত, কঠিন পাষাণময় গণ্ডে তাহার রেখা স্পষ্ট দেখা যাইত। কেন,—বলিতে পার ?

হঠাৎ একদিন কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কেন—কেমন করিয়া—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে আগে যেমন ছিল, তখনও তেমনি ছিল। আমিও যেমন ছিলাম, তেমনি রহিয়া গেলাম; অথচ কি যেন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কে যেন আসিয়া আমাদিগের মধ্যে একটা লজ্জার ব্যবধান বসাইয়া দিল, তাহা যেন দুস্তর, দুর্ল্লঙ্ঘ্য। সে আর ছুটিয়া আমার নিকট আসিত না। তাহার উচ্চ হাস্যে আমাদিগের গৃহ আর মুখরিত হইত না। বনপথ আর তাহার কলকণ্ঠের মধুর গীতি শুনিতে পাইত না। সে যখন আসিত, তখন লজ্জারক্ত বদনে, ব্রীড়া-কম্পিতচরণে, অবগুণ্ঠনে তাহার মুখশ্রী ঢাকিয়া আসিত। কিন্তু তাহার সলজ্জ নতদৃষ্টি আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া আমার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত।

(৩)

আর একজন ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। সে ধন জন-সম্পদে গৌরবান্বিত, নবীন যৌবনে তাহারও অতুলনীয় রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চাতকের ন্যায় সেও দারুণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সে যখন মন্দিরে আসিত, তখন ভক্তের দল ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিত, তাহার সম্মুখে নর্ত্তকীর দল নৃত্য করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র হইয়া থাকিত, তাহার মুখের প্রশংসা বাণী শুনিয়া গর্ব্বে, আত্মগৌরবে, ফুলিয়া উঠিত। শত শত নর্ত্তকী তাহার চরণে অতুলনীয় রূপ ও নবীন যৌবন সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত। কে সে ?—বলিতে পার ?

সে রাজপুত্র! আর আমি—ভিখারী, দরিদ্র পুরোহিতের পুত্র। সে দোষ করিলে কেহ তাহার নিন্দা করিতে সাহস পাইত না; আর আমি—জীবনের বন্ধুর পথে যদি একবার আমার পদস্খলন হইত, তাহা হইলে আমার নিন্দায় দেশ ভরিয়া যাইত। আমি পুরোহিতের পুত্র, ভবিষ্যতে আমাকে আজীবন ঐ নিষ্ঠুর পাষাণের পূজা করিতে হইবে, সুতরাং আমার কলঙ্ক অসহ্য ভগবানের;—আর সে ভবিষ্যতে রাজা হইবে, সহস্র সহস্র নরনারীর দুঃখ-শোকের, অতীত-ভবিষ্যতের, জীবন-মরণের কর্ত্তা হইবে। কলঙ্ক কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, মসীমলিন রেখা তাহার শুভ্র যশোরাশি কখনও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।—ইহাই বিধান!

কে আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল?—ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ভরসা অতলের জলে ডুবাইয়া দিল? আমি যাহার দাস, সে তাহার সেবায় নিয়োজিতা। আমরা শত শত বর্ষ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের পূজা করিয়া আসিতেছি, সে তাঁহারই জীবনসঙ্গিনী। নিয়তি কি ক্রূর? কি নিষ্ঠুর? তাহার কুসুমকোমল দেহ পাষাণের প্রাণহীন পেষণে দলিত হইবে, ইহাই বিধিলিপি। আমি মন্দিরের পুরোহিত, সে আমার প্রভুর সম্পত্তি—তাহাকে স্পর্শ করিলে পাপ, তাহার আকাঙ্ক্ষা করিলে পাপ, তাহাকে দেখিলেও পাপ!

তাহার নৃত্যের যশ, তাহার সঙ্গীতের খ্যাতি দেশে

বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে যখন মন্দিরে নৃত্য করিত, তখন আমি সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতাম, মনে ভাবিতাম, তাহার পদস্খলন হইতে দিব না। কিন্তু রাজার আদেশে সে যখন প্রাসাদে নৃত্য করিতে যাইত, তখনত আমি তাহার সহিত যাইতে পারিতাম না। তখন পাপ-পুণ্য ভুলিয়া, স্নেহ-ভালবাসা ভুলিয়া, হিংসা-বিদ্বেষে আমার দেহ জ্বলিয়া যাইত।

মানুষ যেখান হইতে আসে, আবার যেখানে চলিয়া যায়, সেই অজানা-অচেনা দেশে পিতা যখন চলিয়া গেলেন, তখন আমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হইলাম। তখন আর আমাকে তিরস্কার করিবার কেহ রহিল না, তখন পাথরের ঠাকুর আপনার পূজার ব্যবস্থা আপনি করিয়া লইতেন, তখন আমি ছায়ার মত আমার দেবীর পাশে পাশে থাকিতাম। আমার দেবতার সেবায় মগ্ন থাকিয়া, পাথরের ঠাকুরের কথা ভুলিয়া যাইতাম। কেন?—বলিতে পার?

তাহার জগন্মোহন নৃত্যে যখন দর্শকগণ মুগ্ধ হইত, তখন আমি তোমাদের বিশ্ব-দেবতার পূজা ছাড়িয়া পাষাণের মূর্ত্তির মত মণ্ডপের স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। তাহার চঞ্চল নয়ন দশদিকে চঞ্চল দৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-জগৎকে অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় আকুল করিয়া তুলিত, তাহার কটাক্ষে কি মোহমদিরা ছিল, যাহাতে বিশ্ব-জন অপূর্ব্ব উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত; তাহার ভ্রূভঙ্গে কেমন মধুর ভীষণতা ছিল, যাহা সকলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু যে কটাক্ষটি আমার উপর বর্ষিত হইত, তাহার নেশা যেন ছুটিবার নহে; যে দৃষ্টি আমার উপর আসিয়া পড়িত, তাহার উন্মাদনা যেন নূতনতর, যে ভ্রূভঙ্গ আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহা যেন মর্ম্মস্থল ভেদ করিত।

সে যে দিন প্রাসাদে যাইত, সেদিন আমার প্রাণহীন দেহ মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। অন্য নর্ত্তকীরা যাহা গায়িত, তাহা আমার কর্ণকুহরে পশিত না, আমার শ্রুতির দুয়ারে সদা তাহার কণ্ঠের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইত। পশিবে কেমন করিয়া? তাহারা যখন নাচিত, তখন তাহাদিগের দোষগুলি আমার চোখে পড়িত। তাহারা কেমন করিয়া গত-যৌবন নবীন করিয়া রাখিত, অতীতের রূপ ফিরাইবার চেষ্টা করিত, আমি কেবল তাহাই দেখিতে পাইতাম, আমার নয়ন-পথে আর কিছু আসিত না, আমার শ্রবণপথে আর কিছু পশিত না।

আমি পাথরের ঠাকুর পূজা করিতাম, তাই আমার কলঙ্কে দেশ ভরিয়া গেল, আর বিশ্বজগতের পূজার ভার, রক্ষার ভার, যাহার হস্তে ছিল, তাহাকে কলঙ্ক স্পর্শিল না, মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিল না; বিনা অপরাধে যখন জগৎ আমার মস্তকে গালিবর্ষণ করিত, তখন তাহার মস্তকে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইত।

৪

দেবতার সেবায় সে যে যশটুকু অর্জ্জন করিয়াছিল, চারিদিক হইতে মলয় বাতাস আসিয়া তাহার সুরভি প্রাসাদে উড়াইয়া লইয়া গেল। ক্রমে দেবতার ফুল সিংহাসনের প্রান্তে গিয়া পড়িল। তখন রাজপুত্র রাজা হইয়াছিল, আর আমি মহা-পুরোহিত, সুতরাং আমার মহান্ পূজার আয়োজনের মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্পের স্থান নাই, আমি জ্বলিয়া মরিতেছিলাম, শান্তি লাভের উপায় ছিল না। আমার হাত-পা বাঁধিয়া কে যেন বেড়া-আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে আমার রক্ষার কোন উপায় ছিল না।

এখন সে নিত্যই প্রাসাদে যায়; দেবতার সম্মুখে নিত্য আসিবার অবসর নাই। সে কোন কোন তিথিতে মন্দিরে নাচিতে আসে, সে দিন রাজার দলে মণ্ডপ ভরিয়া যায়। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে, সে আবার প্রাসাদে ফিরিয়া যায়। সে যখন আসে, তখন যেন আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে। সে যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন আমি জগৎ ভুলিয়া যাই, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকি। কিন্তু সে কি করে?—বলিতে পার?

তাহার নয়ন দুটি নৃত্যের অবিরাম অঙ্গভঙ্গির অন্তরালে মদিরার বিহ্বলতার ছায়ায় কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ক্লান্ত হাসিটি ফুটিয়া উঠিলে তাহার সৌন্দর্য্য যখন পূর্ণ-বিকশিত হয়, তখনও তাহার মুখে আমি যেন উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখি। যেন নৃত্যে তাহার আনন্দ নাই, দুর্ল্লভ রাজপ্রাসাদে তাহার উল্লাস নাই, বিশাল জনতার প্রশংসা-বাদে তাহার স্পৃহা নাই। সে নর্ত্তকী, সেই জন্যই নাচিয়া যায়, না হাসিলে রাজা দুঃখিত হন, সেই জন্যই যেন তাহার

দিকে চাহিয়া নিরানন্দের হাসি হাসিয়া যায়, কিন্তু তথাপি কি একটা যেন অভাব তাহাকে কাতর করিতে থাকে। কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে কে যেন কি লইয়া গিয়াছে। কে সে?—বলিতে পার?

হঠাৎ কেন সে হাসিয়া উঠে, হঠাৎ কেন তার নয়নের তারকা দুটি নাচিয়া উঠে, নিরানন্দের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, তখন সে স্তম্ভের অন্তরালে মণ্ডপের অন্ধকার কোণে কি যেন দেখিতে পায়। হঠাৎ সে যেন তাহার হারাণ ধন খুঁজিয়া পায়, তাহার মনের অভাব যেন ঘুচিয়া যায়। তখন তাহার নৃত্যে প্রাণ ফিরিয়া আসে, সঙ্গীতে মোহিনী শক্তি আসে, এক মুহূর্ত্তে সে যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেন?—বলিতে পার?

সে যখন চলিয়া যায়, তখন আমার হৃদয় কে যেন ছিঁড়িয়া লইয়া যায়; তখন যন্ত্রণায় আমি অধীর হইয়া পড়ি। মধুকর-গুঞ্জনের মত তাহার অলঙ্কারের শিঞ্জন যত দূরে যায়, ততই যেন আমার প্রাণ আমাকে ছাড়িয়া পলাইতে চায়, আমার হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে, চলিবার শক্তি থাকে না।

সে চলিয়া যায়। যাঁহার পূজায় তাহার পিতা-মাতা তাহাকে উৎসর্গ করিয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে কে ছিনাইয়া লইয়া যায়; কিন্তু সে পাথরের ঠাকুর ত কিছুই বলে না। তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুটি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। তাহার সেবা হইতে তাহার দাসী অপরে লইয়া যায়, সে নিজে কিছু বলে না, লোকে কিছু বলে না; তাহাতে নিন্দা নাই, লজ্জা নাই। কিন্তু আমি তাহার সেবক; আমি যদি কিছু বলিতে যাই, তাহা হইলে নিন্দার শব্দ গগন ভেদ করে।

কতদিন তাহাকে দেখি নাই। না, না! মিথ্যা কথা —দেখিয়াছি,—দূর হইতে ছায়ার মতন দেখিয়াছি। তাহাতে তৃপ্তি হয় না—তাহাতে হৃদয়ে শান্তি পাই না; আকাঙ্ক্ষা শতগুণ বাড়িয়া উঠে—তৃষ্ণা অসহ্য হইয়া উঠে। সে আসে সুদীর্ঘ মাসে দুইটি দিন মাত্র—ক্ষণেকের জন্য আসে, দেখা দিয়া যায়। তাহাতে কি কখনও আশার নিবৃত্তি হয়? নৃত্য শেষ হয়, রাজার দল তাহাকে বেড়িয়া প্রাসাদে ফিরিয়া যায়, আমি ভাঙ্গা বুকে হতাশা চাপিয়া বসিয়া পড়ি। কিন্তু সে যখন চলিয়া যায়, তখন তাহার করুণ কোমল নয়ন দুইটি কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়, নিভৃত কোণে দর্শনলোলুপ জনসঙ্ঘের তৃষিত দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সেই দৃষ্টি যেন আমাকে বলিয়া যায়, সে আমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে চায়, মন খুলিয়া আমাকে বলিতে চাহে যে— সে কি কথা?—বলিতে পার?

আমাদের ব্যবধান বাড়িয়া যাইতে লাগিল, পাশব বল আমাদিগকে দূর হইতে দূরতর করিয়া দিল; কিন্তু বাধা-বিপত্তি না মানিয়া, বলবিক্রম অতিক্রম করিয়া, আমাদের মন একত্র হইয়া যাইত। একটি কায়া যখন অন্যমনস্ক হইয়া পাথরের প্রাণহীন ঠাকুরের পূজা করিত, তখন তাহার মন দূরে শ্বেত মর্ম্মর প্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও বা আর একটি সাথীর সহিত মিলিয়া কাননে, কান্তারে শৈশবের লীলাক্ষেত্রে চলিয়া যাইত। প্রাসাদের চিত্রবিচিত্র কক্ষে তাহার দেহ পড়িয়া থাকিত, তাহার মন তখন মন্দিরের অলিন্দে—চন্দনের শিলায়, পুষ্পোদ্যানে, কামিনী, বকুল, শেফালিকার তলে, কখনও বা দরিদ্র পুরোহিতের জীর্ণ মলিন গৃহে ব্যাকুল হইয়া কাহাকে অন্বেষণ করিত। কাহাকে?—বলিতে পার?

বনের পাখী যখন স্বর্ণপিঞ্জরের রসাল ফল উপেক্ষা করিয়া মুক্ত আকাশের নির্ম্মল বায়ুর জন্য ছট্‌ফট্ করিত, তখন তাহার খেলার সাথী পিঞ্জরের কঠিন পঞ্জরের উপর নীরব ব্যথায় আকুল হইয়া লুটাইত। শক্তিহীনের বেদনা কি সে কঠিন পিঞ্জর কোমল করিতে পারিত? না ভিতরে বাহিরে যাতনা বাড়াইয়া তুলিত?—বলিতে পার?

(৫)

ব্যাধ যখন তাহা দেখিতে পাইল, তখন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। সে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ দিয়া সোণার পিঞ্জর ঢাকিয়া রাখিল। কি হইল জান? সে আর মন্দিরে আসিত না। কি দেখিয়া, কি শুনিয়া, রাজা তাহাকে মন্দির হইতে কাড়িয়া লইল। যাহার ধন সে ত কিছু বলিল না, সে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না, সে ত চোরের শাসন করিল না। রাজা যখন চুরি করে, তখন তাহাকে কে শাসন করে,—বলিতে পার? তখন এই পাথরের ঠাকুরের কাছে ছুটিয়া গেলাম, তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, তাঁহার পাষাণ-চরণ জড়াইয়া ধরিলাম। আমার বক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা কেন? কাহার জন্য? তাহা

তাঁহার পাষাণের কর্ণে নিবেদন করিলাম।—পাথরের ঠাকুর তাহা শুনিল কি ?

পুত্রহীন পুত্র-কামনা করিলে, বিত্তহীন অর্থ চাহিলে, সে যেমন ভাবে চাহিয়া থাকে, কামনাহীনের নিষ্কাম পূজা পাইয়া সে যেমন চাহিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিল। আমার ব্যাকুলতাও তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল না, শঙ্খ বাজিল না, চক্র ঘুরিল না, জগৎ ধ্বংস করিয়া পদ্ম কাঁপিয়া উঠিল না, পাথরের হাতে পাথরের গদা স্থির হইয়াই রহিল। তখন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন একটা আবরণ সরিয়া গেল, অন্ধের আঁখি ফুটিল। সেত বিশ্বনাথ নয় যে, বিশ্ব শাসন করিবে, মন্দিরের প্রাচীরে যেমন পাথর আছে, সেও তেমনি পাথর। সে কেমন করিয়া আমার কাম্যবস্তু আনিয়া দিবে ?

সে অনাদি নহে, সে অনন্ত নহে, তাহার জন্মদিনে শিল্পী তাহাকে যেমন ভাবে গড়িয়া গিয়াছিল, সেত সেই ভাবেই আছে। সে জড়, সে নিশ্চল, সে শক্তিহীন, দৃষ্টিহীন, বধির। সে ত জগতের নাথ নয়; সে বিশ্বজগতের লক্ষ লক্ষ অংশের এক অনুমাত্র। তবে জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বজগৎ কেন তাহার পূজা করে ? পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও নির্ধন, কেন আকুল হইয়া তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে ? তাহাকে দেবতা বলিয়া কেন বিশ্বাস করে?—বলিতে পার ?

এই জড় পাষাণের মূর্ত্তিকে এতদিন দেবতা ভাবিয়া পূজা করিয়াছি। বিশ্ব-জগতের প্রভু বলিয়া সেবা করিয়াছি, সৃষ্টিকর্ত্তা ও ত্রাতা বলিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়াছি, এই ভাবিয়া মনে মনে আপনার উপর ঘৃণা হইলে, উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, পূজার অর্ঘ্য মন্দিরে ছড়াইয়া ফেলিলাম, অবশেষে পাথরের ঠাকুরকে সিংহাসন হইতে ফেলিয়া দিতে গেলাম, কিন্তু পাষাণ-প্রতিমা টলিল না। মন্দিরের বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম একজন দাঁড়াইয়া আছে। কে সে ?—বলিতে পার ?

মুহূর্ত্তের জন্য পিঞ্জরের দ্বার খোলা পাইয়া সেই বনের পাখী বনে ফিরিয়া আসিয়াছে। নীল আকাশের মুক্ত বায়ু, গাছের ঘন ছায়া, চাঁদের আলোর তৃষ্ণা, তাহাকে প্রাসাদের শ্বেত মর্ম্মর, কৌষেয় বস্ত্র, সুবর্ণ-রজত, মণি-মরকত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে। সে আসিয়াছে, সে কি তাহা দেখিতে পাইয়াছে ?—সে দেখিতে পাইলে কি মনে করিবে ? সে আসিলে কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কতদিনের সঞ্চিত ব্যথা তাহাকে জানাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছু ত বলিতে পারিলাম না।

সেই পাথরের মন্দির, সেই পাথরের ঠাকুর, সেই নীরব নিস্তব্ধ পুরাণো জগৎ, সেই সে, আর সেই আমি। আমি বাক্যহীন, আমি স্মৃতিহীন, ঐ পাথরের ঠাকুরের মত নীরব। রুদ্ধ উৎস উথলিয়া উঠিল না, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল না, বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথা তাহার নিকটে নিবেদিত হইল না। সে নিশ্চলা, কিন্তু তাহার মনে কি হইতেছিল, কে জানে ?—তাহা কি বলিতে পার ?

মন্দিরের অলিন্দে চন্দনের শিলা তখনও পড়িয়াছিল, কতদিন উহা লইয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছি। মন্দিরের পাশে পুষ্পোদ্যানে তখনও রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছিল। কতদিন তাহার সঙ্গে মন্দিরের ফুল বৃথা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। কত কথা মনে আসিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। মনের ভাব মনে রহিয়া গেল, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিয়া গেল ! সে আসিল, তবু কিছু বলা হইল না।

ক্ষণেকের দেখা ক্ষণেকেই সাঙ্গ হইয়া গেল। পা টিপিয়া টিপিয়া কে আসিতেছে ? কে আমাকে মারিল ? তাহার পর ঘোর অন্ধকার। সে কোথায় গেল ? কে তাহাকে লইয়া গেল ? আর-ত তাহাকে দেখিতে পাই না ? বনের পাখী পিঞ্জরের দুয়ার খোলা পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, এই তাহার অপরাধ। এই অপরাধে দারুণ ক্রোধে ব্যাধ তাহার প্রাণবধ করিল। পরুষ হস্তস্পর্শে সদ্য-বিকশিত মুকুল শুকাইয়া গেল। তাহার প্রাণহীন দেহ যখন লইয়া যাইতেছে, তখন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, শুভ্র পাষাণে তাহার নিষ্কলুষ দেহের শোণিতে একখানি চরণ চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে।

সেই অবধি আমি পাগল, সেই অবধি আমি অস্পৃশ্য, আমি আর মন্দিরের মহা-পুরোহিত নহি ; আমি ঘৃণ্য, ক্ষুদ্র পরিচারক মাত্র। সেই অবধি আর সন্ধ্যার পরে মন্দিরে নৃত্য হয় না, দর্শকের দল মন্দির-দ্বারে রজনীর দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত করে না, উদ্দাম নৃত্যের চঞ্চল চরণ পাষাণকে কোমল করিয়া তুলে না। এখন সন্ধ্যার সময় সকলে মন্দির

ছাড়িয়া পলায়। একটি মাত্র ঘৃতের দীপ জ্বলিতে থাকে, একটি মাত্র জীব পাথরের ঠাকুর রক্ষা করে। কে সে?— বলিতে পার?

সে আমি! আমি ব্যতীত কেহ আর মন্দিরে রজনী পোহাইতে চাহে না। তাহারা বলে—শতশত, লক্ষলক্ষ, প্রেত সন্ধ্যাকালে মন্দির পূর্ণ করে, তাহাদের অত্যাচারে মন্দিরে মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু আমি ত মানুষ; আমি ত তিষ্ঠিয়া থাকি! নৈশ বায়ুর বেগে যখন ঘৃতের প্রদীপ নিবিয়া যায়, তখন আমি তাহা আবার জ্বালিয়া দিই। নিশাচর পক্ষী যখন মন্দির অপবিত্র করিতে আসে, তখন তাহারা আমার ভয়ে পলাইয়া যায়। বাতায়নের রন্ধ্রপথ দিয়া নৈশবায়ু যখন অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রবেশ করে, তখন কি জানি, কেন তাহার হাসির সুরে সুর মিশাইয়া আমিও হাসিয়া উঠি।

আমি মন্দির ছাড়িয়া যাইতে পারি না, কে যেন আমাকে টানিয়া রাখে, ছাড়িয়া দেয় না। তাহা কি বলিতে পার?—শুভ্র মর্ম্মরবক্ষে শোণিতে অঙ্কিত এক-খানি ক্ষুদ্র "পদচিহ্ন।"

অনুরাগ

[শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা]

ভালবাস—ভালবাস—
 চাহিওনা প্রতিদান।
পূর্ণপ্রাণ ঢেলে দিও—
 নিওনা আধেক প্রাণ,
পূজা কর—পূজা কর,—
 চেওনা পূজার ফল,
পূজাই হউক তব
 শুধু বাসনার স্থল।
ভালবাসা যত সুখ,
 পাওয়া তত সুখ নয়;
ভালবাস তুমি যাকে,
 তাহাতেই হও লয়।

হৃদয়ে স্থাপন করি,
 পবিত্র প্রণয়-পাত্র,
নীরবে ভজনা কর—
 পরশ কোরোনা গাত্র।
ছুঁইলে পুরাণো হবে—
 ক্রমে হবে বিমলিন,
না ছুঁইলে প্রণয়ীর
 শোভা বাড়ে দিন দিন।
তুমি যারে ভালবাস
 তোমারি সে—তোমারি সে-
অন্তরের ধন সে যে—
 কাজ কি তা' পরকাশে।

আলেয়া

[নিরুপমা দেবী]

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত বম্পাস টাউনে, একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি "কুটীরের" ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লান্ত আমরা জন কয়েকে মাদুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবেনা। আবাস—'ভিলা', বা 'লজ'—দুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে 'কুটীর' নামে অভিহিত। ৺বৈদ্যনাথ-ধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয়, কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক এক খানি "কুটীর"ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই "কুটীরের" অভ্যাগতবর্গও সুবেশা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে শ্মশানেমশানে বিচরণ করিয়া, কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণাবদ্ধারাও বাঙ্গালা হইতে দুইপা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তামাঠে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সেকথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট, পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড়, দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে!) আকাশ নক্ষত্র বিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকার-মগ্ন প্রান্তরের জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনারীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফনের নানারসসমন্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুই দিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সেরাত্রে অগ্নি পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্ত-দত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কিনা, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা কাষ্টেয়ার্স এবং বম্পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাহী সঙ্কীর্ণা শুষ্কশরীরা "যমুনা-জোড়্‌" নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল, সেই আলোক বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে!

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, 'আলেয়া'—'আলেয়া'। আমরা আগ্রহের সহিত সেই আলোকের নির্ব্বাণ-প্রজ্বলন এবং ইতস্ততঃ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে, যমুনা-জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল, বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ "কান্‌হাইয়া জোড়্‌" নামে 'যমুনাজোড়' অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণা একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যমুনা-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময়-গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, "ওতো ভুলোর আলো! ও তো মাঠে মাঠে অমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক'রেই বেড়ায়। 'রাত-বিরাত্‌' বা রাস্তা-ঘাটে ওদের নাম ক'রলেও বিপদ্‌ ঘটে! যেমন অপদেবতার নাম কর্‌লেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠান হন, তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম কর্‌লে বা ঐ আলো ধ'রে চল্‌লে, মরণ ত' নিশ্চিত! তা'ছাড়া আবার ঘরে বসে রাত্রে ওর নাম কর্‌লে, কোননা

কোন পথিক,সে রাতে ওর খপ্পরে পড়বেই !”—তাঁহার কথায় তখন আর আমাদের কাণ দিবার অবসর ছিলনা। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে! হাত-পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া, থিয়জফিষ্ট-'চাঁই' তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই “আলেয়া” বলিতে দিবেন না,—এই তাঁহাব পণ। অভিজ্ঞের তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার রোখ্ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। অভিজ্ঞ বলিতেছিলেন, “নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! কে বল্‌তে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটাত খুব বেশী বড় নয়।” তাহার কথা তখন কে শোনে! ঐ আলোকটি যে ভৌতিক,ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এবিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। “চাঁই” তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্ ও মহামান্য ওয়ালাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদ বাবু, মণিলাল বাবুর “অলৌকিক রহস্য” এবং ভূতুড়েকাণ্ডের গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের অভিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, ”এগল্পগুলো কাল্‌কের জন্য রাখ্‌লে হত না?” শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। 'চাঁই' নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যূহিত বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, অভিজ্ঞের বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন—“কিসের ভয়!” তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া, অভিজ্ঞ বিনীত ভাবে বলিলেন, “না ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-বলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে, তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক্।” তখন একথার সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাইতেছিল, এমন সময়ে নীচে হইতে একব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ত্রিকূট দর্শনের সঙ্গী কাষ্টেয়ার্স-টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরেরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি-সমাচ্ছন্ন মুখে এতত্ত্বও প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে কিন্তু মনিবদের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা করিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন, “রাত্রে 'ভুলো'র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখ্‌লে ত'? তোমরা মাননা কিন্তু আমরা এম্‌নি কতশত প্রত্যক্ষ ফল ফল্‌তে দেখেছি।”

এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের পৌছানো খবর আমাদের দিয়ে যেও।—* তাঁহাদের চাকরদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত “ভুলোর আলো”র নাম-মাহাত্ম্য এইরূপে সপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবিবন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকা ডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হ'য়েছে! যদি কেউ এখন সাহস ক'রে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার, তা'হলে দেখ্‌তে পাও, যমুনা-জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধুনী জেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে সেই জ্বলন্ত ধুনার কাটটা দপ্ দপ্ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।”

---

* তাঁহারা সত্যই সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহুকষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন! কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটি (সেই পর্ব্বতে আছাড় খাওয়া মান্যবর ব্যক্তিটি) —ই সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন! তিনিও কোনও কার্য্যানুরোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়মস্ টাউনে গিয়া হাজির হন! শেষে সে স্থান হইতে গাড়ী করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই “প্রহসন ভ্রান্তিকে” তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।—কিন্তু তাঁহারা কেহই 'আলেয়া'র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।

বিস্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! অভিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসি টুকুতেই আমরা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলাম! এমন সময় হাসি!—বলিলেন, "তাতো এখন আমরা কেউ যেতে পারছিনা, অতএব"—

থিয়জফিষ্ট্ ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন! মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্ব্বদা অভিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয় পাইলেই 'চাঁই'—অভিজ্ঞত', বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির ক্রোড়-দেশটি সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বলতে চাও বল, বল!" ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য।

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা অভিজ্ঞ বলিলেন "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধূনীর গল্পই চলুক!"

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা! দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘনবৃহৎ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীরবনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানে স্থানের উচ্চতা-রেখা তখন ঐ নন্দনপাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রুক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাতথা-উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা—বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন 'পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়ামস্ সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়ামস্ টাউনের পত্তন করেন নাই; কাষ্টেয়ার্স বা বম্পাস্ টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর-অধিবাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বনমধ্যবাহিনী 'যমুনা-জোড়্' ও 'কান্হাইয়া-জোড়'ও তখন এইরূপ বালুকাবশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহারা 'দিগড়ীয়া' পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি খর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের 'ঢল' নামিয়া নদীতে 'বুগ' আসিত, সে দিন সেই সঙ্কীর্ণা অখ্যাতনাম্নী পার্ব্বতীদ্বয়ের স্রোতোবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্তহস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেবঘরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে গভীরবনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় থাকিতেন। তখন দেওঘরে বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই! যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিলনা যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুখে পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দূর-গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে "দেও" ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচর সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাসস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ জানিত না; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী কিংবা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে ৺বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী ৺বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্দ্ধস্ফুট শতদল! শ্যামল শালপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি পলাশআকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজান্তে উঠিবার সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মাল্য ও প্রসাদ-স্বরূপ "ত্যাগী বাবা"র হস্তে শিবসাগর-উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকিটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। তখন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহ্বল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শালশাল্মলী পলাশ-মধূক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি আপ্রান্ত নবপল্লবপুষ্পে ভূষিত; চ্যুতমুকুল, মধূক ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গানে যেন বনদেবীদেরই কণ্ঠ-

নিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জীর-রবে এবং অঞ্চল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রন্ধ্রে, প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের ওষ্ঠস্পর্শী- বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বন্য মহিষ, চমরীগাভী, কোথাও বা হরিণদল অদ্য যেন অধিকতর নির্ভয়ে—অধিকতর নিব্বিরোধ-ভাবে—যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই তরুণ যৌবনের পঠিত কুমার-সম্ভবের শ্লোকগুলা সহসা অদ্য তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত-সমাগমকে যেন অদ্য তাঁহার সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ॥
মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অৰ্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥”

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরে কাব্যের প্রতি এতখানি মোহ আছে? প্রকৃতির এই ঋতুবিপর্য্যয়ে সেই কাব্য-কথাই কেন তাঁহার মনে পড়িতেছে! তাঁহার অন্তর কি এখনও যে কোন ভোগসুখের উপরেই সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হয় নাই! তরুণ যৌবনের সুখলালসার লেশ এখনও কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে। অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই “অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি”র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—“কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপল্য সম্বরণ কর—নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ।”

সহসা সন্ন্যাসীর গতি-রোধ হইল। দক্ষিণের ডালপালা-গুলা বড়জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিতদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব! দুইহস্তে সেই কণ্টকময় ঘনবনের শাখা-প্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অঙ্গমালিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশলম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহারা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত-প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ঈষৎ আর্ত্তভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সেই বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মোহ আসিয়াছিল। ভাবিতেছিলেন, “এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহই নাই, নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ—অননুভূতপূর্ব্ব সুখ—অন্তরে কেন জাগিতেছে? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেবতা তুমি? হে কিশোর! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি! তোমায় কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে হইবে? কি কথা বলিতে হইবে?—কোন্ মন্ত্র সে?”

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি-স্থান-নির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাতপদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষে প্রশ্নভরা চকিত দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ।—“ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজ কে ডেরা হায়?”

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর

বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্ন্যাসীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, বাধাদিয়া বলিলেন—"আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমার কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না!" সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টাকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল! তাহার সেই ঘনকৃষ্ণলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্য্যস্ত কেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়টি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল!

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শিরনত করিয়া যুক্তকরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। "ঠাকুরজি! পাঁও লগে! আপ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?"—কি সুধাময় মধুর স্বর! সন্ন্যাসীর মনে হইতেছিল, কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী বালককে প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—"এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কিরূপে জানিল! সেই বা কে? এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল?" বালক তাহার চক্ষু দুইটি সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা। তাহারা 'হরদোয়ার' (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অল্প কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন ৺বৈদ্যনাথ জীর ধামে পৌছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু! আশ্রয়-প্রাপ্তির জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকটে অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ!

সন্ন্যাসী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ! ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবাগ্নিও হইতে পারিত?" বালক বলিল,—"তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না, কেননা কয়েক দণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইয়াছে; এক্ষণে দিবা অবসান-প্রায়! লোকালয়-প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন, হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে! ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।" সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা কোথায়?" বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসংকোচ সাহায্য-প্রার্থনার সারল্যে, বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায়, সন্ন্যাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি-সংযোগ হইল; বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল।

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল; এক্ষণে নিকটে মনুষ্য পদশব্দ বুঝিয়া ডাকিল, "পার্‌বতি!" বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল "বাবা! আব্ কুছ্ ডর্ নেহি হ্যায়! ঠাকুরজী সে মুলাকাৎ হুয়া, উন্‌নে আভি তুম্‌কো দেখ্‌নে আতে হেঁ! তুম আচ্ছা হো

যাওগে, পুরুষোত্তম কো দরশন করোগে, আব কুছ ডর নেই, ঠাকুরজী আগিহিন্।"

বালকের অকৃত্রিম সারল্যে এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতিকষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল, যুগ্মহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল "বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা! পার্‌বতী তুম্‌কো বহুৎ পুকারা। অব্ হামারে আরজ্ ইয়া যোকি হামারা পার্‌বতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও! হামারে লিয়ে মেরা কুছ হর্‌জ নেই! মেরি জনম্ মোগারৎ হো গিয়া বাবা,—লেকিন্ পার্‌বতী কো লিয়ে—"

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নয়—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়! এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান।" বালক ম্লানমুখে তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কি না সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।" দীর্ঘোন্নত দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রুগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজমনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, "এস পার্ব্বতীপ্রসাদ!"—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার পদ্ম ফুলটি!" রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, "উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভার পড়িয়া থাকুক!" "না। বৈদ্‌নাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?" সন্ন্যাসী সম্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল, তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ-আঘ্রাণের সঙ্গে 'আঃ' শব্দ করিয়া ফুলটি কাণের উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুঁজিয়া দিল এবং তল্পী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন; কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল পদ্মপুষ্পটি বালকের কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর তিনি হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা একবার দেখিয়া লইয়া, ভারস্কন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

(২)

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন লছমীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু-সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। সন্ন্যাসীকে ইহাদিগকে লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, রুগ্নের বলকর পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছমীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্যসংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী কিন্তু অবিরক্ত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদের জন্য এই শ্রম-স্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর পার্ব্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়; উভয়ে একেবারে কিছুদিনের মত আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সে জন্য সর্ব্বদা আর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া আসার পর লছমীপ্রসাদের পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে ফেলিবে কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল, মরিতে তো একদিন অবশ্যই হইবে, সে জন্য পুরুষোত্তম দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কে জানিত যে, তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং ৺বৈদ্যনাথ-দর্শন ঘটিবে। বাবা ৺বৈদ্যনাথ যখন মনুষ্য দেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত

করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম-দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে। ঠাকুরজীর তাহাদের জন্য বহুত তক্‌লিব হইয়াছে, যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদের থাকা উচিত নয়! সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, "সম্মুখে ঘোর বর্ষা। যদি তাহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাইয়া শরতের প্রারম্ভে যাত্রা করাই উচিত; নহিলে তিনি সে দুরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন। বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্ব্বতেই অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণ-উদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাঁহার উপর অগাধ নির্ভরতা এবং স্নেহাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সন্ন্যাসীকে যেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বালকের পিতা তাহার পার্ব্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল—"ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্ব্বতীকে রাখিয়া যাইতে পাইতাম, তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে, তাহার জন্য আর ভাবিতে হইত না। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিবার উপায় নাই। ঠাকুরজী বিরাগী সন্ন্যাসী—তাহাকে লইয়া কি করিবেন!" বৃদ্ধের নিঃশ্বাসটি যেন অন্তঃস্থল হইতেই পড়িল। সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয়-তুল্য কিশোর কুমার! তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ঐ বালকের সাধ্য? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্ব্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন্ প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তর কাহার কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস-গুহাটি বালক ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃক অধিকৃত; তাই তিনি পর্ব্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাত্রি-যাপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিঃসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সন্ন্যাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহা-সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন এমন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে—সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদম্য? ভগবান্ শঙ্কর এই মমতাকে এই জন্যই "পাশ" বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? আর না,—এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।

সেই প্রস্তরখণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকূটের কঠিন নীরস হৃদয়োত্থিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপল-ব্যথিত-গতি নির্ঝরিণী সন্ন্যাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরুঝুরু রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতেছিল। সন্ন্যাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন, স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতের অঙ্গে তাহার ছায়া ফেলিতেছে। আলোকস্নাত লতা-পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ-গগন ভাসাইয়া বৃষ্টি নামিবে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরের জলে পা ডুবাইয়া পার্ব্বতী উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই নির্ঝর-নীর-ধারার ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষেও মেঘের কৃষ্ণছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্ব্বতী একটুখানি হাসিল, সে হাসিতেও পূর্ব্বের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বা কলতান নাই; সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া

পড়িয়াছে। পার্ব্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিণের মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়াও আসিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীরমন্থর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার এক পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়া-ছিলে কেন? আমার নিকটে কেন এস নাই?" বালক নতনেত্রে বলিল "আপনি তো ডাকেন নাই!"

"প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?"

"না, কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল।"

"কেন পার্ব্বতী?"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার নত দৃষ্টি হইয়া বলিল, "আপনি আজ সারাদিনই আমার সঙ্গে কথা কহেন নাই, আর—"

"আর কি পার্ব্বতী?"

"আর কয়দিন হইতেই আপনি যেন আমার উপর 'গোস্বা' হইয়াছেন, আর কাছে ডাকেন্ না, ভাল করিয়া কথা"—বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বেদনা পাইলেন,—বালকের নিকট সরিয়া গিয়া, তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না পার্ব্বতী। তোমার উপর তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অন্যমনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।" পার্ব্বতীর অভিমান পড়িল না,—দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল,—"কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না—তাহা তো জানেন। তখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না, একা একা বেশ অন্যমনেই তো থাকিতে পারিবেন।" অত্যন্ত বেদনার স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায়, সন্ন্যাসীর মুখ সহসা তেমনি ম্লান হইয়া গেল, বালক ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার কোন্ বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে! সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন "হাঁ—তাহা জানি পার্ব্বতী!" সন্ন্যাসীর হস্ত ধীরে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অন্যমনে সেই অন্ধকারময় বনের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন-বক্ষে সহসা বিদ্যুৎ-স্ফুরণে সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দুষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে অব্যর্থলক্ষ্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার সে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরজী! এখান হইতে পুরুষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?"

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"তাহাতো ঠিক্ বলা যায় না। তবে তোমার পিতার যেরূপ শরীর তাহাতে অন্য যাত্রী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশী সময় লাগিবারই সম্ভাবনা।"

"ছয় মাস?—ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে?"

"না, উনি যদি সুস্থ থাকেন—শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পার।"

"ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয় ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহি-বেন। এই আগামী শীতের পরবৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী?"

সন্ন্যাসী এইবার একটু ক্ষোভের হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনা-স্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানেনা যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অলৌকিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাঁহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অবস্থার গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই, এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে চাহিবে? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে, তাহা হইবার নয়! চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া কি হইবে পার্ব্বতী?"

"কেন, আমি আপনার 'চেলা' হইব।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন "তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ জীবন। অধ্যয়ন আদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরুর হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এ পর্ব্বতবাসে তোমার তো কোন উপকার নাই পার্ব্বতী? এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এস্থান ভাল

লাগিত না। তোমাদের ন্যায় নবউন্মেষিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।" পার্ব্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার গুরু হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।" সন্ন্যাসী হাসিলেন। "হাসিলেন যে! 'চেলা'কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন! আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।"

"তুমি আমার চেলা হইবে পার্ব্বতী?"

"তাহাই ত বলিতেছি।"

"তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, তাঁহারা মহান্ত বা পরমহংস! আমি নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর 'চেলা' থাকিতে নাই।"

বালক যেন সেকথা কাণেই লইল না। বলিল, "বৃষ্টি আসিতেছে, নীচে চলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি এই খানেই থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে, তুমি এই বেলা শীঘ্র যাও।" তখন হু হু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপদিগকে পর্ব্বতের অঙ্গে আছড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরিণীর জলকে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্ব্বোন্নতশিখরে যেন লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মনে করিবেন না যে, বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব। আমি ইহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।" সেই বৃষ্টিধারা-প্লাবিত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পাদপ ও লতার শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্ব্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন "পার্ব্বতি—পার্ব্বতি! ফিরিয়া এসো।" বালক ফিরিল না, কিংবা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কর্ণেই প্রবেশ করিল না! সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন "অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?" প্রকৃতির সেই তুমুল বিপ্লবের মধ্যে তড়িৎপ্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল—"আমরা যে আর বেশি দিন এখানে থাকিব না, তাহা কেন আপনার মনে থাকে না?"—বালক ফিরিল না, পর্ব্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল, অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গেই চলিলেন। মুহুর্মুহুঃ তিনি তাহার পতন-শঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সে গর্ব্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে গুহার নিকটে পৌছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী একটা শিলার নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিণীর আকারে মেঘ-গলিত জলস্রোত কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষ লতা সব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধূমের আকারে নামিয়া তাহার শিখরদেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত গুহা-দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন—বালক বোধ হয়, তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া, সেইখানে বসিয়া সিক্ত কেশগুলা লইয়া অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অভিমানভরা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছে। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলী-প্রভা এবং সেই দৃষ্টি, অন্ধকার গুহার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে; দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভিমানও যেন সেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল! হাসি-মুখে তখন সে গুহার ভিতরে পিতার নিকটে সরিয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসীও আবার নিজ নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রারম্ভেই লছমীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইলেন কিন্তু পার্ব্বতীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উত্তেজনার কএটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখে চোখে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। যাত্রার জন্য সে পিতাকে পুনঃ পুনঃ সত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতাসূচক অভিভাষণের বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এজন্য একটু বিষণ্ণ ভাব কিংবা একফোঁটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সন্ন্যাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী যে বালককে অনেক খানিই ভালবসিয়াছেন তাহা বৃদ্ধ বেশ জানিত; এক্ষণে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সহসা কি যেমন বলি-বলি করিয়া বলিল—"উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল; স্নেহের প্রকৃত সম্মান জানেনা!"—সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন প্রভেদ নাই। উভয়কেই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই; উভয়েই স্নেহের পাত্র, কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না। সেজন্য দুঃখের কোন কারণ নাই, উহাই উহাদের প্রকৃতি।" বালক এইবারে পিতাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বহুবার নিম্নে গমনাগমন করিয়া পার্ব্বতী বনপথ বেশ ভালরূপেই চিনিত। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল গতিতে পার্ব্বতী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পোট্‌লা স্কন্ধে ছুটিয়া চলিল। তাহার চঞ্চল কেশগুচ্ছযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ "মুরাঠা"-বাঁধা বৃদ্ধের শির শীঘ্রই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, বৃদ্ধ পুনঃপুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া, শিলাখণ্ডে "ওঁচোট্‌' খাইয়াছিলেন; কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার নব-নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সন্ন্যাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতালেই সেই পদশব্দের তাল ও লয় হইতেছে। উৰ্দ্ধগতি হরিণীর মত সে-ই ছুটিয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসী চেষ্টার সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন "ফিরিলে যে?" "একটি জিনিষ ভুলিয়া ছিলাম!" পার্ব্বতী তেমনি দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুষ্কপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠায় বাঁধা! সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি জিনিষ?" সে কথার উত্তর না দিয়া পার্ব্বতী গুহার সম্মুখে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল! একপার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ ধীরে ধীরে ধুমাইতেছিল, পার্ব্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসিমুখে বলিল "এই ধূম লক্ষ্য করিয়াইত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার এই ধুনীতে তো সর্ব্বদাই আগুন থাকে, দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিবে! এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন 'ডেরা' খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব। কেমন? এ কথাটি মনে রাখিবেন ত?"—ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সন্ন্যাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন, পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসী সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য করিবার যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্ত্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতে-ছিলেন, তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্যভূমি যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই! আজ তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কাহার কলহাস্য বাজিতেছে, নির্ঝরিণীর কলস্বরে কাহার অবাধপ্রবাহিত কলকণ্ঠধ্বনি! বনের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ঐ যেন কাহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, সুলসুকুমার করলতা চকিতে খেলিয়া আবার তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্ব্বত অঙ্গেই সে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্ব্বত বক্ষে তাহার আবাসস্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধ ঐ যে নির্ঝরিণী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, গুহাদ্বারের ঐ যে সোপান-সমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বালঅশ্বত্থটি যাহার সঙ্গে তাহার হস্তের শতচিহ্ন রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হরিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য—সব শূন্য। নাই—সেখানে সে নাই, তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষস্পন্দনের সমতালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে! একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন। বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবার উপায় নাই, তথাপি বহুদিনের গতায়াতের অনুভবে সন্ন্যাসী

বনতল দিয়া সেইপথ যেথানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহ নাই, কিছু নাই,—প্রান্তর মনুষ্য-চিহ্ন-বর্জ্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে. এখন প্রদোষ! যাত্রার প্রথম উত্তেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আরক্তিম বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা!

তারাচন্দ্রসজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আবার প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোক-ধারা মাথাইয়া উদিত হইলেন। নির্ঝরস্নাত সন্ন্যাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন; মনে হইল, বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গাহিতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া "এহি সূর্য্য" বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে! সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই করসংযুক্ত বহ্নির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সন্ন্যাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যথন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূম-রেখা নাই! সন্ন্যাসীর অন্তরটি সহসা ধক্ করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল!—তবে কি অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে? সে যে বলিয়া গিয়াছে—সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না; কিন্তু অন্যমনে সন্ন্যাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠ খণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। অন্যমনেই সন্ন্যাসী আর একখানা শুষ্ক গুঁড়ি-কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া, সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ—হেমন্ত—শীত—অতীত হইয়া আবার সেই বসন্ত পার্ব্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল; কিন্তু কোথায় এবার তাহার সেই রূপ! তাহার পত্রপুষ্পে কোথায় সে রাগ! কোথায় সে সুগন্ধ!

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সেই সদ্য-প্রজ্বলিত ধূনীটি গুহার ঈষৎ অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন, জলধারায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ—হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনার চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসী ক্রমেই যেন শীর্ণ হইতেছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহরে প্রায় সর্ব্বক্ষণই তিনি নিজগুহা-সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন আর নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্ব্বাণ-অগ্নি ধূমরাশি দ্বিগুণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, এ কি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সন্ন্যাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জোর করিয়া নিত্য তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণবস্তু যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে! সে আসিবে মনে করিতেও সন্ন্যাসী অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কিংবা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকের এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া, এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে, আজ কালই সে আসিবে, ততই তাঁহার মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কিংবা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহার পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিঃশ্বাস। উত্তেজনার অশান্তিতে সন্ন্যাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটি শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন—আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে—সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধূনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল, সে আসিল না। বুঝি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে আর একটু

বড়ও হইয়াছে, বুঝিয়াছে যে, সে সংকল্পটা নিতান্তই বালকোচিত! তাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না! সন্ন্যাসী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকে আটকাইয়া রহিল,—নাসাপথে অগ্রসর হইল না।

বসন্তের পরে গ্রীষ্ম আসিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজকে শুষ্ক, দগ্ধ এবং ভস্মসাৎ করিয়া নিদাঘ রুদ্রপ্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষাণহৃদয়োত্থিত স্নেহধারা শুষ্ক, বিশীর্ণ, লুপ্তকায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দগ্ধ দেহের কালিমাও ভস্ম, নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গেল;—গিরি-নির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দগ্ধ তাম্রবর্ণ দিগন্তের ঘন মেঘ তাহার স্নেহধারা-সঞ্চিত স্নিগ্ধ শ্যাম সজল আভায় নিখিলের তপ্ত রুক্ষ হৃদয়-নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার করুণা-ধারার মত ধারায় ধারায় আশীর্ব্বাদ-বারি জগতের মস্তক ও বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী সংশয়াপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব! এই যেন সে অনুতাপে, ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দগ্ধভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল—আবার তাহার এ কি রূপান্তর! যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকেই আবার বাচাইতে এ কি অজস্র স্নেহাশ্রু-নিষেক! কই—এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষে উপ্ত সেই মায়ার বীজকে সে তো ধ্বংস করিতে পারে নাই! সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমনি ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে,—উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র! হায় প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে তাহা যে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অন্তরের ফলফুল, স্নেহ, আশা—সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়—অমনি করিয়া পোড়ে,—কিন্তু কই, তোমার মত তো আর তাহারা বাঁচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বহুদিনের নির্মেঘ আকাশে সহসা সে দিন প্রবল মেঘ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুষ্ক চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া, তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি একটু সবল হইতে লাগিলেন।

(৩)

কালরাত্রি খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী নিজ গুহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার বোধ হইল, রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্ব্বদিন দত্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ ভস্মরাশি ধুইয়া বহিয়া গিয়াছে। ধূনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নির্ব্বাপিত!

নিবিয়াছে?—অদ্য দুই বৎসর যাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সন্ন্যাসী নিজের অনিচ্ছায়ও সাগ্নিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তাহার সমিধ্ যোগাইয়া আসিয়াছেন, অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সন্ধুক্ষিত অগ্নিহোত্র আজ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দিয়াছে! কেহ জোর করিয়া নিবায় নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া গুহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল, পর্ব্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগস্নেহান্ধতার ফলভোগ-স্বরূপ কালব্যাপী জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্তও শেষ হইয়াছে; ঐ ধূনীর আপনা হইতে নির্ব্বাণই তাহার প্রমাণ! সন্ন্যাসী আজ বহু দিন পরে পূর্ব্বের মত নিজের আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতি-চিন্তালীন, মায়াবন্ধহীন, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিত্বকেও যেন অনুভব করিলেন!—এতদিন ভয়ে তিনি সে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।—মনে হইত, এখনি সে কোন্ নিভৃত স্থান হইতে "ঠাকুরজী" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সন্ন্যাসী নিজের আসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সেই গুহায় বহিয়া আনিয়া পূর্ব্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি-অন্তরালে অস্তমিত। গুহামধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বহুদিন তিনি এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতৃপ্ত অন্তরে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপট্টে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ও কে! রুক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহ্নে আকাশতলে মেঘাসনে যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাবৃট্-সন্ধ্যা। সন্ন্যাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সন্ন্যাসীর বোধ হইল, সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল, বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি-প্রভায় তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে, একটা অজানিত পুলকে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি এ! কে এ! সান্ধ্য-রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত সুবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরোষ্ঠ হইতে একটা "প্রভা-তরল জ্যোতিঃর" ছটা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন "কে এ! কার এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?"

"ঠাকুরজী!"

"কে তুমি? কে? তুমি কে?"

উত্তর না দিয়া সে সন্ন্যাসীর চরণতলে নত হইল, তাহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী চিনিলেন, হাঁ—সেই মুখই বটে! কিন্তু তবু এতো সে নয়! এই দুই বৎসরে তাহার এ কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! সন্ন্যাসী স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পার্ব্বতি?—না,—তবে কে তুমি? পার্ব্বতীরই মত, অথচ সে নও।—কে তুমি—তবে?" সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া—সেই গৈরিকবসনা সন্ন্যাসীর পানে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল—"কই আপনি ত ধূনী জ্বালিয়ে রাখেন নাই? আজ সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।"

হাঁ সেইই বটে! ঐ যে পর্ব্বত-অঙ্গে তাহার আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি, স্থির ভাবে অদ্য দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান করিতেছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর স্নিগ্ধভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসম্বলিত বনের ব্যগ্র বাহু তাহার হারান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবার জন্যই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম-স্নিগ্ধ স্নেহ-বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তাহার প্রাপ্ত-নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া লইতে চাহিল। হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ ব্যগ্র বাহু-প্রসারণ, এই বক্ষ-বিস্তার!—"আসিয়াছে, সে আসিয়াছে!" কাহার আগমনে নির্ঝরিণীর এই আনন্দোচ্ছ্বল কলধ্বনি! যাহার আগমন-প্রত্যাশায় তাহারা অদ্য দুই বৎসর অন্তরে বাহিরে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু এ বুঝি সে নয়! সে যে বুকে ধরিবার বস্তু—স্পর্শক্ষম রত্ন, আর এ কি? এ যে প্রজ্বলিত অনল-শিখা! তাহার স্বর, তাহার মুখ, তাহার হাসি, তাহার নাম লইয়া আজ এ কে আসিল? কেন আসিল? এই ব্যগ্রবুকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোঘ্রাণ লইবারও যে উপায় নাই, এ যে স্পর্শেরও অতীত! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাপট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্ব্বতীর অতীতদৃষ্ট বালক-মূর্ত্তির স্মৃতি এখনকার এই তরুণীর সঙ্গে মিলিয়া সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য-বোধের একটা আলোক জ্বালিয়া দিল।

পার্ব্বতী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনা হইতেই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী সহসা সচকিত হইয়া সরিয়া বসিলেন, মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার পিতা?"—পার্ব্বতী নতমুখে উত্তর দিল "আজ ছয় মাস হইল, পুরীসমুদ্রের স্বর্গদ্বার-সৈকতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" সন্ন্যাসী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"পার্ব্বতী?—তাহার কি হইল?" তরুণী আবার তাঁহার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, ঠাকুরজী!"

"না, কারণ, তুমিত সে পার্ব্বতী নও। তুমি ধূনী জ্বালিয়া না রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,—দুই বৎসরের দিবারাত্রি-প্রজ্বলিত ধূনী এই পর্ব্বত আজই নিবাইয়া দিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তখন এই বনতলেই ঘুরিতেছিলে। সেই পার্ব্বতীর দেহ লইয়া অন্য একজন তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়াই সে এ অগ্নিহোত্র নিবাইয়াছে। এ পার্ব্বতীকে তাহারা কেহই চিনে না।" সন্ন্যাসীর এই

নবাব ও শৈবলিনী
শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা—মার্জ্জনা করুন।

প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে পার্ব্বতী মস্তক নত করিল, কিন্তু উত্তর দিতে বিরত হইল না। "আমি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছি দেখিয়াও ত সে অনাবশ্যক অগ্নিটা নিবাইয়া দিতে পারে!" পার্ব্বতীর এ উত্তরে সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া উঠিলেন। "তাই কি? তাই কি তাঁহার অন্তরও আজ এত শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? আকর্ষণকারী অথবা আকৃষ্ট বস্তু নিকটে আসিয়াছে বলিয়াই কি এই নিশ্চিন্ত ভাব?"

পার্ব্বতী বলিয়া যাইতেছিল,—"পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমায় বালক সাজাইয়া রাখিতেন, আমিও চিরদিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া, পরে পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই আশঙ্কায় আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালক-বেশে রাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি এমন অন্যায় হইয়াছে? আমি তখনও পার্ব্বতী ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। কেবল পিতা শেষে এ জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। আপনি ছদ্ম-বেশ মনে করিতেছেন বলিয়াই একথা বলিতেছি, নইলে আমি জানি, সেইই আমার চিরদিনের বেশ! সারাপথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি। পিতা পুরুষোত্তমের পথে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার রুগ্ন হইয়া পড়িল। সেখানে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় এক বৎসর লাগে। ছয়মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"তাহার পরে?"

"তাহার পরে আর কি? শ্রাদ্ধ সারিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়ি।"

"কেন বাহির হইলে?"

"কেন বাহির হইলাম?" বিকশিত পদ্মনেত্রে যেন ব্যথার তড়িৎ স্পর্শ করিল!—"কেন? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব?"

সন্ন্যাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার পিতা কি তোমার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয় মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই? কাহারও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই?"

"রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

"তবে? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই?"

"কেন করিবে না? আমি সেখানে থাকিব কেন? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে?"

"কেন এমন কাজ করিলে?"

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, "বেশ করিয়াছি।" তাহার ব্যথিত ক্রোধপূর্ণ স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর পানে চাহিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার বৃক্ষতলে ঘনতর হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নাই, তাহা ত' তোমার পিতার মুখেই শুনিয়াছ।"

"আমি সে কথা মানি না। আমি আপনার 'চেলা' হইব, তাহাতো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তুমি স্ত্রীলোক!"

"হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা থাকে।"

"কাজ বড়ই অন্যায় করিয়াছ! তোমাকে আবার হয় পুরুষোত্তমে, নয় পূর্ব্ব-বাসস্থান হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"এই সুদীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি ততদূরে ফিরিয়া যাইব!"

"হাঁ!"

"যাইতে পারিব কেন?"

"তা তুমি পারিবে।"

"যদি না যাই?—তাড়াইয়া দিবেন,—কেমন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ।"

"আজই? এখনই কি? দেন্ তবে—"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসীর বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পর্ব্বতপৃষ্ঠ দ্বিগুণ কঠিন ও স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি একেবারে নিঃশব্দ—বায়ুস্পন্দহীন!—পূর্ব্ব-আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে যেন এই ব্যাপারের শেষ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, যেন বহুদূর হইতে রোদনধ্বনি

ভাসিয়া আসার মত সে শব্দ,—"তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই ?"

"তাহাতে কি ! আমার এমন কতদিন যায়।"

"আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি ! পার্ব্বতি ! তোমার ঝরণার জলে স্নান করিয়া এস।"

"আপনি ব্যস্ত হইবেন না ! আমার তেমন ক্ষুধা-বোধ হয় নাই।"

"আমার কিন্তু হইয়াছে, পার্ব্বতি ! আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি, তুমি স্নান সারিয়া লও।"

সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে গিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বহু চেষ্টায় অগ্নি জ্বালিলেন! এ দুই বৎসর আর এ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসর যাহার হস্ত-প্রজ্বলিত-অগ্নি এই গুহার বুকে তাহার স্মৃতির সঙ্গে দিবারাত্র ধুমাইয়াছে, আজ তাহারই এথানে স্থান নাই, বুঝি তাহাকে এথানে প্রবেশ করিতে দিলেও প্রত্যবায় আছে। হায় প্রভু শঙ্করাচার্য্য ! যে নারীজাতির দোষের কথা বলিতে তুমি "অচতুর্বদনো ব্রহ্মা" হইয়াছ, পার্ব্বতী সেই জাতি ! প্রাণিগণের শৃঙ্খলস্বরূপা, নরকের দ্বারকথিতা হেয় নারী ! সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝি দয়ারও অযোগ্যা সে !

সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে নাই—সরে নাই। বুঝিলেন, বালিকার পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। তাহার এই দারুণ অধ্যবসায় ও পথকষ্টের প্রথম সাফল্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিরিবার কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছে। এ কার্য্যটি তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযোগী হইলেও যে মহান্ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বহুদিন স্নেহযত্ন দেখাইয়াছিলেন, সেই মানব-ধর্ম্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্ব্বতী এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন ! হায় কেন তাহা হইল না ? কেন তাঁহার সেই সুখস্পর্শ কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিল ? যাক্ সে খেদ, সে স্নেহবন্ধও যে এইরূপে কাটিয়া গেল, সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এ ত সেই পার্ব্বতী,যাহার জন্য আজ দুই বৎসর—না,তাহাকে নিকটে রাখা হইবে না, তবে মিষ্ট কথায় অন্ততঃ আগামী কল্য ইহা বুঝাইয়া দিলেও চলিত ! আজ তাহার দুরন্ত পথ-শ্রমাপনোদনের জন্য আতিথ্য-স্বীকার করাই—সস্নেহ ব্যবহার প্রদর্শনই—কর্ত্তব্য ছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্ব্বতি ! স্নানে যাও।"—পার্ব্বতী নড়িল না—উত্তর দিল না ! তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর মাখা কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "পার্‌বতিয়া ! কথা শুনিবে না ?"

মুহূর্ত্তে পতনশীলা পার্ব্বত্য প্রবাহিণীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্ব্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্রহস্তে সন্ন্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল, "বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিবেন ? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না ? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। যাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধর্না দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনার কিছু খাইব না। দেখিব আপনি কিরূপে অতিথি-সৎকার করেন ! বলুন, শীঘ্র বলুন !"—হস্ত-মুক্ত করিয়া লইয়া সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্যে ও কার্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন, "এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার করিবে না ?"

"না।"

"আচ্ছা, তাহাই হউক ! তুমি এই পর্ব্বতেই থাক।"

আবার মুখের হাস্য-বিজলী খেলাইয়া পার্ব্বতী ঝরণার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল;—স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সন্ন্যাসী তখনও এক ভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল "এই বুঝি আপনার অতিথি-সৎকার ? সরুন, আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।" সন্ন্যাসী ত্রস্তে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহাস্থ আলোকও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া

সন্ন্যাসী গুহা মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্ব্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।" পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, "সারাদিন পথ-হাঁটার পর এরকম পরিশ্রম কি আমায় প্রায় প্রত্যহই করিতে হইত না! এখন আহারে বসুন; সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়েত ফলজল ছিল!"—সে কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্‌বতিয়া। আমায় বাকি আতিথ্যটুকুও অন্ততঃ করিতে দাও;—তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।" পার্ব্বতী এবার দুই বৎসর পূর্ব্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, "আপনার অতিথি-সৎকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রকমের হইয়াছে, এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এতো আমার গুহায় আমার গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটিতে তো আমার গৃহস্থালীই ছিল!"

"না, আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপণা প্রকাশ করিতেছ, দুই বৎসর পূর্ব্বের পার্ব্বতী এতখানি জানিত না! কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বালক পার্ব্বতীই আছ বটে কিন্তু কার্য্যতঃ"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী থামিলেন। পার্ব্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সেই নারীত্বের নবীন আভামণ্ডিত মুখের উপরে গুহার দীপ্ত আলোক পড়িয়া যে অপূর্ব্বশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, এই নারী যেখানে চরণপাত করিবে, সেইখানেই গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে! হায় রমা! নিজ শ্রী-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, পার্ব্বতী বলিল,—"কই বসুন!" "তুমি?"—আবার সেইরূপ সলজ্জ সহাস্যে মুখ নত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"এর পরে।" সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে দেবতাকে আহার্য্য নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস চক্ষে তখন বাল্য-যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই গৃহে স্বজনসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীর প্রীতি! তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্ত্তব্য ও স্নেহসেবায় পূর্ণ কল্যাণ-হস্তধেরা গৃহস্থালী! বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ, গৃহবাসে অনিচ্ছা, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই "গৃহ", অগ্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল!—

পার্ব্বতী গুহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, —নিজ মনে বলিল, "আপনার আসন-কমণ্ডলু আবার এই গুহাতেই আনিয়াছেন, দেখিতেছি! উপরের গুহায় লইয়া যান্—নহিলে আমি কোথায় থাকিব?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। আহারান্তে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষশাখার ব্যবচ্ছেদ-পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব্ব মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "তবে আমি এই গুহার মধ্যেই থাকি? আপনি উপরের গুহায় যান্।"

"যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই!"—"ভয়?"—অবজ্ঞার হাসির সহিত মস্তক নাড়িয়া পার্ব্বতী গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের কথা বলাই নির্ব্বুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে, সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! এই অসামান্যা নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বিংশবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এই ষোড়শবর্ষে কি এত খানি শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্য্যাগ্নিতেজ-মধ্যস্থা শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে? সেই ছদ্মবেশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ-উদ্ভূত অদ্ভুত স্নেহের তিনি প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার এই দুর্দ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু বালিকার কি গতি হইবে? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত

সুখাশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে! চিন্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। গুহামধ্য হইতে সেই পদশব্দ। তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী বাহিরে আসিল! "গুহার মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে।"—বলিয়া পার্ব্বতী সেই গুহা-দ্বারে শুইয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশরাশি শৈবালের মত চারিদিক আঁধার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতি! তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই?"

পার্ব্বতী একটু নড়িয়া চড়িয়া চোখ্ বুজিয়াই উত্তর দিল, "আঃ আপনি এখনো তাহাই ভাবিতেছেন?—করিয়াছিলেন।"

"কাহার সহিত?"

"যাহাকে আমার ভার দিয়াছিলেন, তাহার সহিত।"

"তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া, সে হয়ত তোমায় কত খুঁজিতেছে"! "তাহাতে আমার কি"! পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইল, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে! সেই অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হয়ত জগতের কত প্রার্থী হৃদয়ের অমূল্যরত্ন। সন্ন্যাসীর নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল! আপনার সেই প্রথম যৌবনে পঠদ্দশায় সদা জাগ্রত কামনার স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহাদের বর্ণনায় কবি তাহার সমস্ত কল্পনা-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, কবিকল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমার-সম্ভবের পার্ব্বতী, অদ্য যেন এই প্রস্তর বক্ষে অনাদরে অপমানে লুণ্ঠিতা হইতেছে।

ঘুমের ঘোরে পার্ব্বতী আবার পাশ ফিরিল, চুলগুলি মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধের অতি আদরের—গর্ব্বের সেই ভ্রমরনিন্দিত কেশগুলি অযত্নে এখন জটা বাধিয়া গিয়াছে।—সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে, একটু গুছাইয়া রাখিতে মন যেন বিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়!

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন!—বালিকার ভাগ্যে যাহা হয় হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে! "জিতং জগৎ কেন?—মনোহি যেন"! এ জগৎজয়ী "শূর" তাঁহাকে হইতেই হইবে।

৪

পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহনান্তে বর্ষা-বারিপূর্ণা খরস্রোতা "যমুনা-জোড়্"কে একটা কাষ্ঠের ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিম বনভূমে পৌছিলেন, এবং নিঃশ্বাস-ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ত্রিকূটের তিনটি চূড়ামাত্র জাগিয়া আছে, বাকী সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্ত-দশন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এবং নদীস্রোতের দুরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড মিলিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এবং বনের ব্যবচ্ছেদপথে নদীতীর ও ত্রিকূটশিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিন কতক ঐ স্থানেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া বনের ফল ও নদীর জল পানান্তে নিরাপদে রাত্রিযাপনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

রাত্রি আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি এই আলোকচ্ছটা দেখিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই!—কিন্তু এই কি তাঁহার মনোজয়? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ত্রিকূট-শিখর কয়টি দেখিবার বাসনাত কই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সে কি দুরন্ত অনির্ব্বাণ ধূনীই জ্বালিয়া দিয়াছে!

হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক পত্র-কম্পনে "ঐ সে আসিতেছে" ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না। সন্ন্যাসীর ভয় একটু কমিল! এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আন্দাজ না করিতেও পারে! সন্ন্যাসী এইরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন দেখিয়া অভিমানিনী সে—ত্রিকূট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিজদেশ অভিমুখে চলিয়া যাইতেও পারে! কিন্তু তাহা যদি সে না যায়? তাহার দুরন্তপণ ও

দুর্দ্দম প্রকৃতিবশে যদি সে ঐ পর্ব্বতেই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? ত্রিকূট-শিখর দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সন্ন্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ের উপর যেন একদল কৃষ্ণহস্তী যূথবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বপ্রক্রীড়ায় পর্ব্বতের শ্যামঅঙ্গে মুহুর্মুহুঃ উদ্ভাসিত! ক্রমে সেই গগনহস্তিদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইয়া ত্রিকূট, দিগ্‌ড়ীয়া প্রভৃতি পর্ব্বতগুলির মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন একখানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধরিল। তাহাদের গম্ভীর বৃংহিতের সঙ্গে "হু হু" বোঁ বোঁ রবে বায়ুও যোগ দিয়া শিলাকোটর-মধ্যগত সন্ন্যাসীর কর্ণে যেন একটা ঘোর উন্মত্ত হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ত্রিকূটপানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহার কি ভয় হইতেছে! কিসের ভয়!—এইত একটা বস্ত্রখণ্ডের নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন! মেঘের এই অপরূপ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটু সুখের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের মন্দ্রে বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া বলিতেছিল, "ভয় নাই, আমি এই নিকটেই রহিয়াছি!" কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল। যেন মনে হইতেছিল, নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! ইহা যে, তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু ব্যর্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না! বিরাট্ সমারোহে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুর্মুহুঃ শব্দময় করিয়া তড়িন্ময় ধারা বর্ষণে বনভূমিকে শোণিতরক্ত গৈরিকবারিতে প্লাবিত করিয়া তুলিল! ভূমির সেই শোণিতময় স্রোত, উচ্চভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকল্লোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া, নিম্ন-'খাদে' পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ্ উপ্‌চাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগিল। জল—জল—জল! আকাশ হইতে ধারার পর ধারা অশ্রান্ত ভাবে নামিয়া, ধরণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শুধু অনিবার জলস্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা; বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা পড়িতেছে মাত্র। জলস্থলশূন্য—সর্ব্বত্র সমান অন্ধকার কেবল এক একবার বিদ্যুৎ বিকাশ ও মেঘের স্বননে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ—নদী শোণিত-জলপূর্ণা, বৈতরণী ক্ষিপ্রবেগশালিনী। সন্ন্যাসী শিলা-কোটরসঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকার পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল! চকিতে তিনি দেখিলেন, নদী-তীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে! ভ্রম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন—এবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেই নিশ্চয়! এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সন্ন্যাসী সভয়ে ত্রস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিবাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল এ ভয় তাঁহার নিরর্থক। সম্মুখে এই তরঙ্গিণী ক্ষুরধারা নদী—কাহার সাধ্য এ সময়ে ইহার জল স্পর্শ করে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুরন্ত নদীই তাঁহার অসিহস্তা প্রহরিণী।

নদীর অপরতীরে সহসা ও কি শব্দ? হাঁ সেই ত'! তাহারই এ কণ্ঠস্বর! এত সেইই—উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতেছে! ভাষা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুনঃপুনঃ সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনে হইল, সে যেন বলিতেছে—"আলোক জ্বাল, ওগো, জ্বাল আলোক আবার! কেন নিবাইলে? কোথায় কোন্ দিকে তুমি—আমায় আর একবার বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল!"

আবার বিদ্যুৎ-বিকাশ! ঐ ত' নদীতীরে সেইই দাঁড়াইয়া! আবার সেই আর্ত্তকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই 'আলোক' শব্দটি ব্যতীত অন্যভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সন্ন্যাসীর মনে হইল, যেন সে চিৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে;—

"আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি ঐখানেই আছ! আবার যদি পলাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—।"

সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বুজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্ব্বাগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ উদ্রিক্ত করিয়া,

মাথা নাড়িতেছিল,—"না—আলো জ্বালা হইবে না। জয়ী হইতেই হইবে।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, "এখনও তোমার জয়ী হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনাযুক্ত স্নেহ-প্রেমের প্রতিঘাত-স্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উত্তেজক খেয়ালে নানাশাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোঁকের বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসপন্থা লইয়াছিলে—ইহাতে সেই মহা-সন্ন্যাসী মহাযোগীও প্রতারিত হন নাই। তিনি তোমার হৃদয় বুঝিয়াই সেই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই লোক-দুর্লভ নির্ম্মাল্যটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভোগ নহিলে তোমার দুর্ব্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল সঞ্চিত হইবে না! যাহা দিলাম, মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার অত্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে স্নেহ-প্রেম-ভোগে তৃপ্ত করিয়া লও! দম্ভ ত্যাগ কর, দম্ভ লইয়া আমার নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশির না হইলে আমার নিকটে আসিবার উপায় নাই।"

দর্পোন্নত মস্তক তাঁহার সে করুণা মস্তক পাতিয়া লয় নাই; বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত নিজ্জিত হইয়াও পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন, সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই; এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে! ঐ যে জলস্থল, বনপর্ব্বত একযোগে চিৎকার করিয়া বলিতেছে,—"অনল জ্বাল, তোমায় এ আগুনে পুড়িতেই হইবে।" তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, "আলোক জ্বালিলে না?—পলাইতেছ? কোথায় পলাইবে?—আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।"

বিমূঢ়ের ন্যায় সন্ন্যাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুনঃ-প্রজ্বালিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না! সহসা একটা অন্যপ্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—যেন জলের প্রবল আস্ফালন-শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে—এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে—ঝাঁপাইয়া পড়িল?—সন্ন্যাসীর হস্ত এবারে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চিৎকার—"এখনো একবার আলোক দেখাইয়া বুঝিতে দাও, কোন্ খানে তুমি আছ,—জ্বাল একবার আলোক।" বন-তল সমস্বরে চিৎকার করিল "আলোক, আলোক, আলোক!"

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গর্জ্জন! জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোল-শব্দ? পর্ব্বত হইতে 'বুহা' নামিয়া, 'যমুনা-জোড়'-বক্ষে 'বানের' ন্যায় প্রমত্ত স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-হস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী-বুহা-জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া, ঘোর রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে! সেই কাষ্ঠদণ্ডস্থ আলোক-রেখা সম্পাতে সেই ফুটন্ত রক্ত-ধারার মত জল যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে! কে কোথায়! কে আলোক দেখিবে? কে আলোক চাহিতেছিল,—কোথায় সে? সন্ন্যাসী আলোক-দণ্ড হস্তে সেই রক্ত-স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এইত উত্তাল নদী-তরঙ্গ! এইত তাহার অনুত্তরণীয় বেগ। ইহার মধ্যেও আলোক-হস্তে তোমায় খুঁজিতেছি, এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই! যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া লইতে দাও, খুঁজিয়া পাইতে দাও! কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির-প্রজ্বলিত অনির্ব্বাণ-আলোকের সম্মুখে একদিন আবার তোমায় পড়িতেই হইবে! এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে!

হুহু ধূধূ! লুপ্ত জল-ধারা, শুষ্ক নদীবক্ষ অফুরন্ত বালুকার রাশি! শুষ্ক রুক্ষ ভূমির প্রকট পঞ্জরাস্থি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল-স্রোত-মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে ত্রিকূট ও পশ্চিমে দিগড়ীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝ খানের অবাধ আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে! জ্বলিতেছে! সেই শুষ্ক নদীতীরেও সেই অনির্ব্বাণ ধুনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—"কোথায়, ওগো - কোথায় তুমি!"

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেই খানেই বসিয়া রহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে!"

বৰ্দ্ধমান

[শ্রীজলধর সেন]

'ভারতবর্ষে'র পাঠকপাঠিকা, অনুগ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী মহোদয় ও মহোদয়াগণকে আমি অভয় প্রদান করিতেছি যে, আমি বৰ্দ্ধমানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছি না। সে দিন আর নাই, যে দিন হাবড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া কোন্নগর ঘুরিয়া আসিয়াই পশ্চিম-ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিতাম। তখন লিখিতে লজ্জা করিত না—তখন মনে হইত ভারি একটা বাহাদুরী করিয়া বসিলাম; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই—আমারও নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যেরও নাই। এখন বঙ্গরমণী নেপালের ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতেছেন, এখন বঙ্গ-মহিলা সুদূর নরওয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের ভ্রমণ-কাহিনী ত জলভাতের মত হইয়া গিয়াছে; এখন হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী বোধ হয়, দুইতিন গণ্ডা পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সময়ে বৰ্দ্ধমান ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার জন্য অতি বড় নির্লজ্জও অগ্রসর হইবে না; আমি ত একটু—অতি সামান্য একটু—লজ্জা সরমের ধার ধারি। অতএব, আমি স্পষ্টবাক্যেই বলিতেছি যে, ইহা ভ্রমণ-কাহিনী নহে।

আবার ইহা প্রত্নতত্ত্বও নহে। পৃথিবীতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করি প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়গণকে,—যদিও আমার দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া এই শস্যশ্যামলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেকেই প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ হইয়াই পড়িয়াছেন। যাহা হৌক, আমার এই 'বৰ্দ্ধমান' প্রত্নতত্ত্ব নহে। আবার ইহা ঐ প্রত্নতত্ত্বেরই মত আর একটা—পুরাতত্ত্ব, তাহাও নহে। যতক্ষণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টাইব, যতক্ষণ বিক্রমাদিত্যের জন্মক্ষণের সঠীক সংবাদ-সংগ্রহের জন্য মস্তিষ্ক (যদি থাকে) আলোড়িত করিব, ততক্ষণ পাঁচ-সাতটা ছোটগল্প—অন্ততঃ একখানি ডিটেক্‌টিভের গল্প—পড়িয়া ফেলিতে পারিব। এ অবস্থায় আমি যে পুরাতন-পুঁথির পৃষ্ঠা পাঠান্তে (ললিত বাবু ক্ষমা করিবেন, বেজায় অনুপ্রাস হইল) একটা গভীর গবেষণার সৃষ্টি করিব, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আরও এক কথা,—আমি একটা কথা বলি, আর চারিদিক হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি, রাশীকৃত নজীর ও প্রমাণ সহ উপস্থিত হইয়া, 'যুদ্ধং দেহি' রবে আমাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া ফেলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ গররাজি। তাই বলিতেছি, আমার এ 'বৰ্দ্ধমান' পুরাতত্ত্বও নহে।

তবে ইহা কি? ইহা সাফ্ বর্ত্তমান-তত্ত্ব—ইহা বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান তত্ত্ব। দিল্লী-লাহোরে কি আছে, ত্রিচিনাপল্লীতে কি আছে, সুদূর কামস্কাট্‌কায় কি দ্রষ্টব্য আছে, তাহা আমাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য—সর্ব্বাগ্রে অনুশীলনযোগ্য; কিন্তু ঘরের কাছে হুগলী, বৰ্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর প্রভৃতি স্থানে এখন কি আছে, তাহা কি একেবারেই অবহেলার যোগ্য? তাই আমরা এবার, বৰ্দ্ধমান সহরে এক্ষণে কি কি দেখিবার মত আছে, তাহারই চিত্র দিতেছি—ইতিবৃত্ত দিতেছি না; সে ইতিবৃত্ত দেওয়া ঐতিহাসিকের কাজ—আমার নহে। আমি চিত্র দিয়াই খালাস; এবং চিত্রের নীচে অতি সংক্ষেপে—যতদূর কম কথায় হইতে পারে—চিত্রগুলির পরিচয় প্রদান করিয়াই আমার কর্ত্তব্য শেষ করিব। আর গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া আমি ছবিগুলি দেখাইতে থাকি। বৰ্দ্ধমানের মাননীয় শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই ছবিগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ষ্টার অব-ইণ্ডিয়া

সিংহদ্বার

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা এপ্রিল তারিখে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বর্দ্ধমানে পদার্পণ করেন। তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতি-রক্ষার জন্য বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর-কর্ত্তৃক এই সিংহদ্বার নির্ম্মিত হয়।
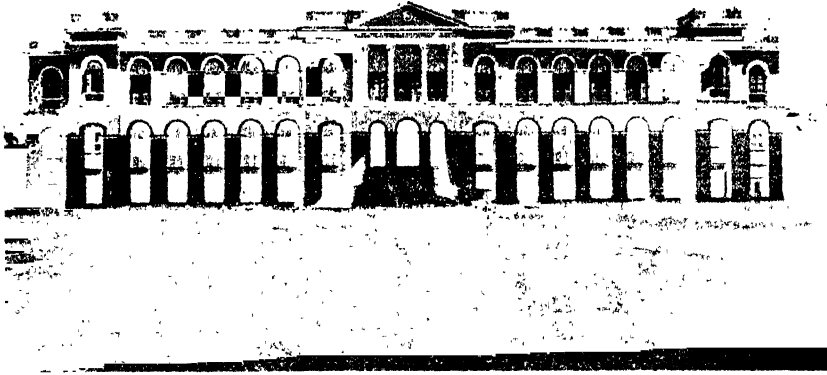
বৰ্দ্ধমান—ফ্রেজার চিকিৎসালয়

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর এনডু ফ্রেজার বাহাদুরের নাম স্মরণীয় করিবার জন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই দাতব্য-চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হয়; বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই চিকিৎসালয় নির্ম্মাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করেন।

আঞ্জুমান কাছারীর উত্তর পার্শ্বের দৃশ্য

আঞ্জুমান
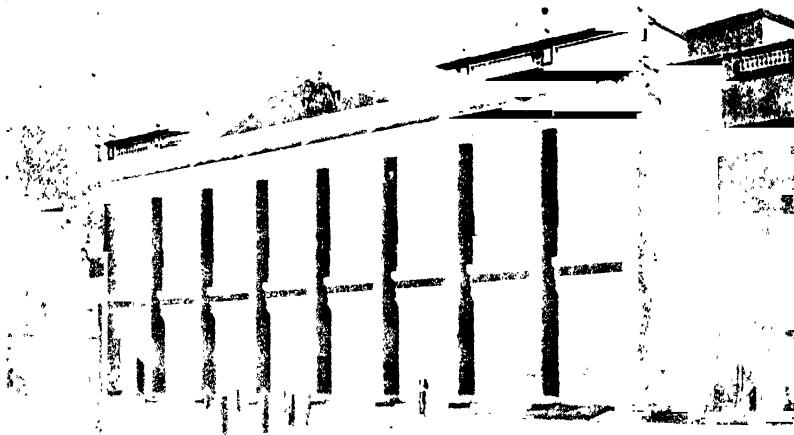
বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের রাজ-কাছারী; ইহার শীর্ষদেশে একটি চূড়ার উপর একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি আছে।
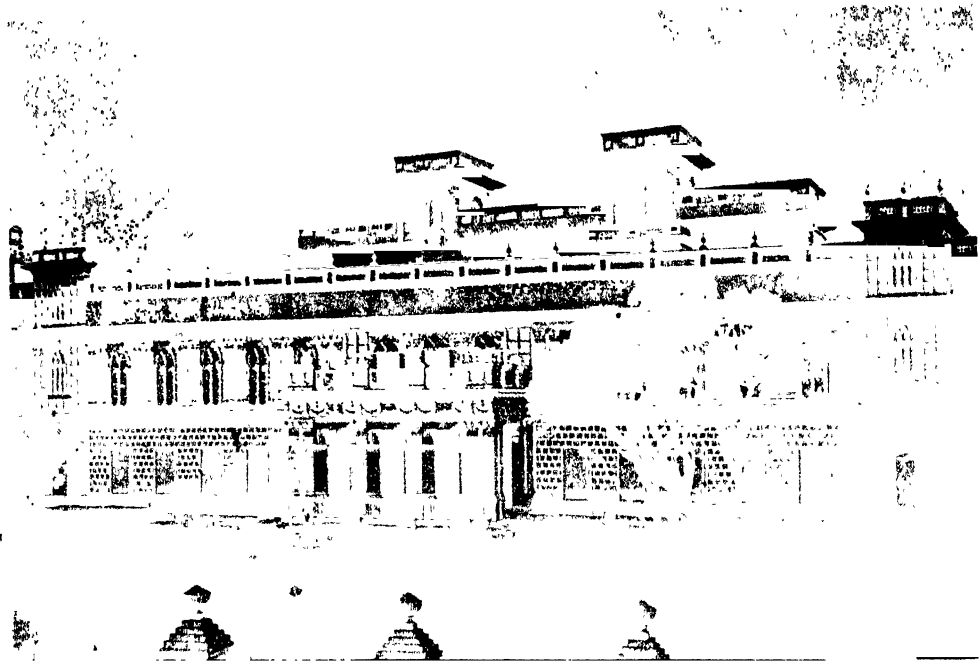
'মোবারক মঞ্জিল' রাজপ্রাসাদের উত্তর পার্শ্বের দৃশ্য
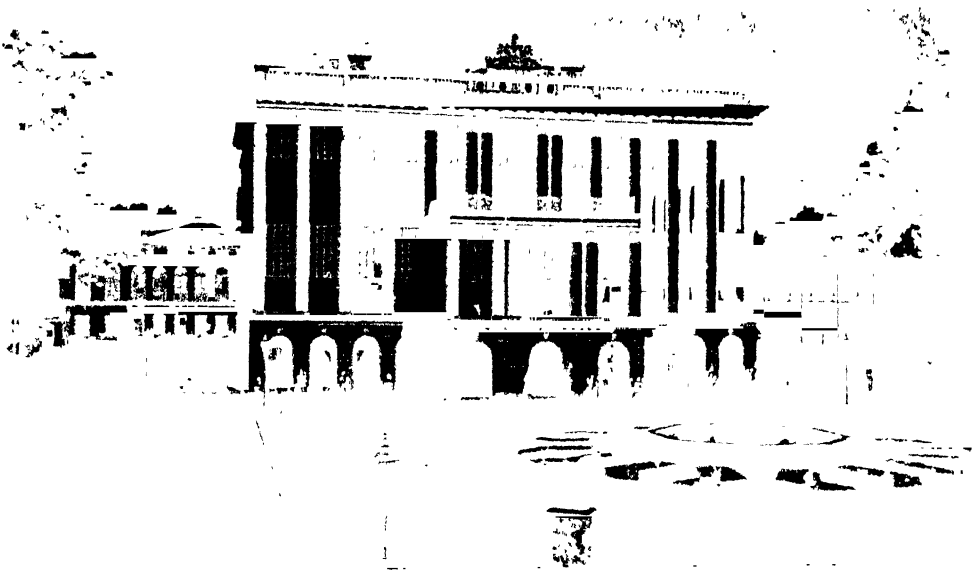
মহ্‌তাব্‌ মঞ্জিল

এই রাজ-প্রাসাদ বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রধান বাসভবন। এই বাসভবনটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত; ইহার মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলি সুদৃশ্য ও শোভন আসবাবপত্র ও বৰ্দ্ধমান-মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় রহিয়াছে।
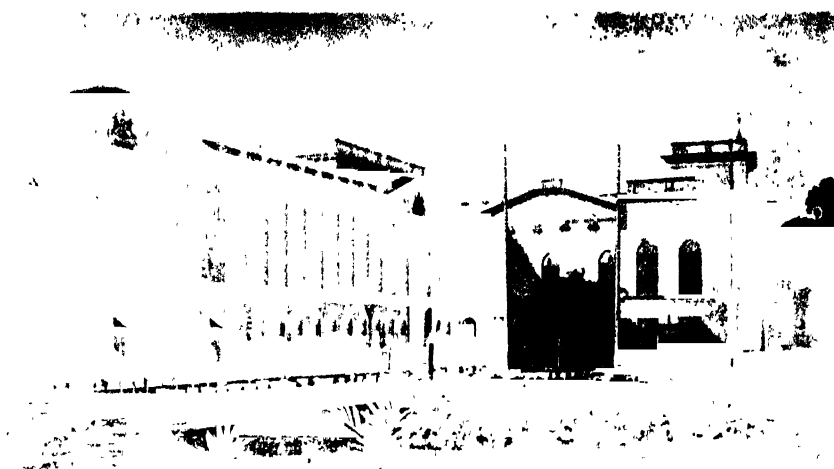
মহ্‌তাব্‌ মঞ্জিলের উত্তর পার্শ্বের দৃশ্য

বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ

পীর বহরম

পীর বহরম সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে হইবে; পাঠকপাঠিকাগণ এই অনধিকার চর্চ্চাটুকু নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। হজরত হাজি বহরম সেক্কা, তুর্কিস্থানের অধিবাসী ছিলেন; তিনি রায়েত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। যখন আকবর দিল্লীর সম্রাট্, সেই সময় বহরম সেক্কা দিল্লীতে আগমন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও মহত্ত্বের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। সম্রাট্ বহরমকে ডাকাইয়া লইয়া যান, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। এই প্রকারে বহরম সম্রাটের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়েন; সম্রাট্ তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন।—সেকালই হউক আর একালই হউক, রাজা-মহারাজা বা সম্রাট্, এমন কি বড়মানুষের, বিশেষ প্রীতি-ভাজন হওয়া বড় নিরাপদ নহে। ক্রমশঃ মহাত্মা বহরমের অবস্থাও বিপজ্জনক হইয়া পড়িল; সম্রাটের সভাসদ্ ও পার্শ্বচরগণ—বিশেষতঃ পণ্ডিত আবুল ফজল ও ফৈজি, বহরমের প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পড়িলেন! বহরম ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অবশেষে, অতিশয় বিরক্ত হইয়া, দিল্লী রাজধানী ত্যাগ করিয়া, একেবারে বৰ্দ্ধমানে চলিয়া আসেন। বৰ্দ্ধমানের লোকেরা পূর্ব্বেই তাঁহার নাম ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির কথা শুনিয়াছিলেন। সেই সময়ে বৰ্দ্ধমানে জয়পাল নামক এক সন্ন্যাসী ছিলেন। বহরম বৰ্দ্ধমানে পৌছিলে, এই সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া আপনার আশ্রমে লইয়া যান এবং সেই দিনেই তাঁহার শিষ্য হন। জয়পাল-সন্ন্যাসী যে বাগান-বাড়ীতে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই বাগান-বাড়ী তিনি বহরমকে দান করেন, এবং নিজে ঐ বাগানের একপার্শ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে থাকেন। এখনও সেই বাগানের মধ্যেই হজরত হাজি বহরমের সমাধি মন্দির, বা যাহাকে প্রচলিত কথায় 'পীর বহরম' বলে, স্থাপিত রহিয়াছে এবং সেই বাগানের প্রান্তভাগে সাধু জয়পালের সেই গৃহের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। সে যাহা হউক, বহরম বৰ্দ্ধমানে আসিয়া কেবল তিনদিন বাঁচিয়া ছিলেন; তিনদিন পরেই তাঁহার দেহাবসান হয়। বহরমের দেহাবসান-সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে সম্রাট্ আকবর শাহ অতিশয় দুঃখিত হন, এবং তিনি বাঙ্গালার নবাব নাজিম বাহাদুরকে আদেশ

করেন যে, পীর বহরমের সমাধিস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কয়েকখানি গ্রাম যেন নিষ্কর করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে এই সমাধিস্থানের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। পরে, সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সমাধিস্থানের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ৪১০৫ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা হাজি বহরমের সমাধির উপর ফার্শি-ভাষা-লিখিত যে প্রস্তর-ফলক আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, মহাত্মা বহরম ৯৭০ হিজরীতে প্রাণত্যাগ করেন। সেই প্রস্তর-ফলকে আর যে সমস্ত কথা লিখিত আছে, তাহার একটা অনুবাদ দেওয়া বিশেষ কষ্টকর হইত না; কিন্তু আমি ঐতিহাসিকেরই আসন গ্রহণ করিবার আয়োজন করিয়া বসিয়াছি—প্রত্নতাত্ত্বিকের নহে; অতএব সে অনধিকার চর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে।

সের আফগান ও কুতুবউদ্দীনের সমাধি মন্দির

এইবার যাহা বলিতেছি, এটিও খাঁটি ইতিহাস—এই ইতিহাস খুব বড়, তবে সেটা এক প্রকার সর্ব্বজন-বিদিত—স্কুলের নাবালকেরা পর্য্যন্তও জানে; তাই সংক্ষেপে বলিলেও বিশেষ দোষ হইবে না। তিহারাণ সহর হইতে এক ভদ্রলোক (অবশ্য পারস্যজাতীয়) ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। সেটা সম্রাট্ আকবরের সময়ের ঘটনা। তখন নানাস্থান হইতে নানালোকে অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিত। এই ভদ্রলোকের পত্নী সন্তান-সম্ভাবিতা ছিলেন; পথের মধ্যেই তিনি একটী কন্যা প্রসব করিলেন; কন্যাটির রূপে যেন ভুবন আলো হইল। ভদ্রলোকটি যে দলের সঙ্গে আসিতেছিলেন, সেই দলে একজন সওদাগর ছিলেন। সওদাগর বড়ই ভাল লোক; তিনি এই দরিদ্র দম্পতিকে সেই সময় যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আগমন করেন। এই সওদাগরও যেমন-তেমন লোক ছিলেন না—সম্রাটের দরবারে তাঁহার গতিবিধি ও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সওদাগর ঐ অলোকসামান্যা কন্যার পিতাকে সম্রাটের দরবারে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। ভদ্রলোকের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল; তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দরবারে দশ জনের একজন হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পত্নীও সম্রাট্ আকবরের অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যাও মাতার সঙ্গে থাকিত। এই সূত্রেই কন্যাটি যুবরাজ সেলিমের নজরে পড়ে; কুমারীর রূপ দেখিয়া সেলিম মুগ্ধ হন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে চান। সম্রাট্ আকবর এই বিবাহে আপত্তি করেন এবং কিশোরীকে যুবরাজের

দৃষ্টির বাহির করিবার জন্য, সের আফগান নামক একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ দিয়া, সের আফগানকে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার করিয়া সস্ত্রীক বাঙ্গালাদেশে প্রেরণ করেন। কালক্রমে সম্রাট্ আকবর প্রাণত্যাগ করিলেন; যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। সেলিম এতদিনেও সেই পরমাসুন্দররী যুবতী মেহেরউন্নিসাকে ভুলিতে পারেন নাই; কেবল পিতার ভয়ে এতকাল কিছু করিতে পারেন নাই। এখন পিতা নাই—তিনিই সম্রাট্; তিনি অচিরে তাঁহার ধাত্রীপুত্র কুতুবউদ্দিনকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তিনি যে প্রকারে পারেন, যেন সত্বর মেহেরউন্নিসাকে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। কুতুবউদ্দিন, আর কালবিলম্ব না করিয়া, বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন এবং সের আফগানকে পত্নী পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। সের আফগান এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; কুতুবেরও আর বিলম্ব সহিল না। সের আফগান তখনই কুতুবের বুকে শাণিত ছুরী বসাইয়া দিলেন, কুতুবও ছুরী বসাইতে ছাড়িলেন না; ফলে দুই জনেই ধরাশায়ী ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মেহের-উন্নিসাকে দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে কিছুদিন পরে তিনি জাহাঙ্গীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন। এই মেহেরউন্নিসাই সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। সে কথা যাক্,—সেই সের আফগান ও কুতুবউদ্দিনের সমাধির চিত্রই পূর্ব্বপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। সমাধিগাত্রে যে প্রস্তর-ফলক আছে, তাহাতে লিখিত আছে—১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সের আফগান ও কুতুব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই স্থানে আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নূর-জাহানের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে লাহোরে সমাহিত করা হয়। তাহার পর, এতকালের মধ্যে কেহ আর তাহার কোন তত্ত্বই রাখে নাই। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে একবার লাহোরে গমন করেন; সেই সময়ে তিনি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধিস্থল সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়েন। দিল্লীর সম্রাজ্ঞী বলিয়া এ অনুসন্ধান নহে, বর্দ্ধমানের সের আফগানের সহধর্ম্মিণী মেহেরউন্নিসার কথা স্মরণ করিয়াই বর্দ্ধমানাধিপতি এ অনুসন্ধান করেন। তিনি দেখেন যে, সমাধিটি জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কেহই সেদিকে দৃষ্টি করে না। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তখন পঞ্জাবের ছোট লাট বাহাদুরকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছে; পঞ্জাব গবর্ণ-মেণ্ট এই সমাধি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন;—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও এই কার্য্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।—এইখানেই এই ইতিহাসের পালা সমাপ্ত।
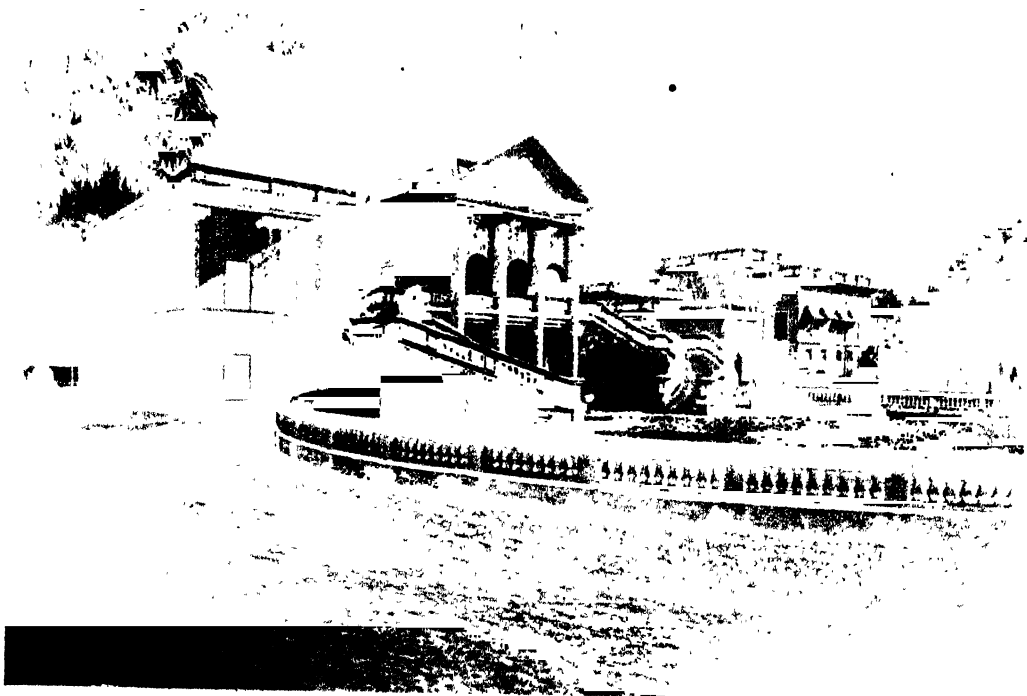
দেলকুশা বাগ
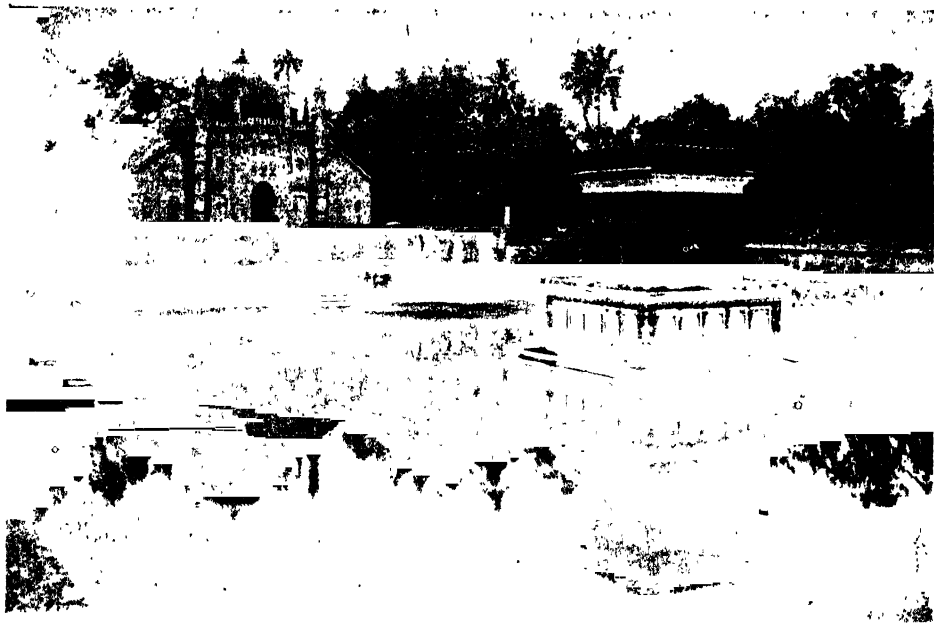
বেড়ের খাজা আন্‌ওয়ারা

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান রাজবংশের রায় জগৎরাম যখন বিদ্রোহীদিগের দ্বারা বিশেষ উৎপীড়িত হন তখন তাঁহাকে সাহায্যের জন্য দিল্লী হইতে খাজা আন্‌ওয়ারা নামক একজন সেনাপতি আগমন করেন। এটি তাঁহারই সমাধিস্থান।

দেলকুশা বাগ—ভ্রমণস্থান

দেলকুশা বাগ—মানস-সরোবরের অপরপার্শ্ব হইতে দৃশ্য

কৃষ্ণসায়র ও তাহার তীরস্থিত আফ্‌তাব্-ভবন

বৰ্দ্ধমান কৃষ্ণসায়র একটা ক্ষুদ্র সরোবর নহে, ইহা একটা প্রকাণ্ড হ্রদের মত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন

বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময়ে বর্দ্ধমান রাজ-বংশের রায় কৃষ্ণরাম দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে কার্য্য দিয়া ভরণপোষণ করিবার জন্য এই বৃহৎ কৃষ্ণসায়র খনন করাইয়াছিলেন। এই কৃষ্ণসায়রের সহিত একটী শোচনীয় ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত আছে। রায় কৃষ্ণরামের পুত্র ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রায় জগৎরাম একদিন এই কৃষ্ণসায়রে সন্তরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শত্রুপক্ষীয় এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই স্থানে নিহত করেন। এই কৃষ্ণসায়রে অনেক মৎস্য আছে ; কিন্তু সেই শোচনীয় ঘটনার পর হইতে বর্দ্ধমান-রাজবংশের কেহ এই সায়রের জল বা মৎস্য ব্যবহার করেন না।

মোকবারা

দেলকুশা বাগ—নহর
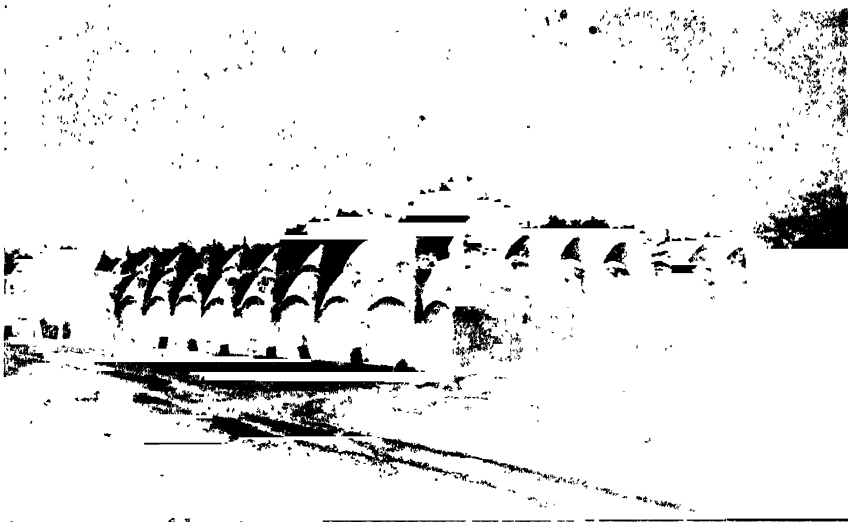
নবাবহাট—১০৮ শিবমন্দির

এখানে মন্দির ১০৮টি নহে, ১০৯টি। জপমালায় যেমন ১০৮টি বীজ গ্রথিত থাকে এবং অপর একটি বীজ মেরু স্বরূপ থাকে; এই মন্দির-মালায়ও তাহাই আছে। ১০৮টি মন্দির চক্রাকারে একটি স্থান বেষ্টন করিয়া আছে এবং

প্রবেশদ্বারের বাহিরেই আর একটি মন্দির। বাঙ্গালা ১১৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদের মহিষী,—মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদের জননী—মহারাণী অধিরাণী বিষ্ণুকুমারী দেবী এই মন্দির-রাজি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরিশেষে আমরা বৰ্দ্ধমানের ভূষণ—মহারাজাধিরাজগণের চিত্র দিয়া বৰ্দ্ধমান-চিত্র সম্পূর্ণ করিলাম।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরগণ

প্রেমের সার্থকতা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী]

মৃগ ব্যাধে ডাকি' কহে,—
বিলম্ব নাহিক সহে,
বধ, যদি, বধিবে পরাণ ;

কিন্তু এক ভিক্ষা মাগি,
মরিনু যাহার লাগি,
গাও, পুনঃ গাও, সেই গান।

যজ্ঞ-ভঙ্গ

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, B. A., Bar.-At-Law.]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্ধ্যাচলে, বিন্ধ্যদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গার তটভাগে একখানি দ্বিতল বাটী দেখা যাইতেছে,—বহির্দ্বারের উপর সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকে বৃহদক্ষরে লিখিত—"হিন্দু স্বাস্থ্যনিবাস।" নামটি যাহাই হউক, স্থানটি সাধারণ্যে 'বাঙ্গালী-বাবুকা-হোটেল' বলিয়াই পরিচিত। ভদ্রবাঙ্গালী, তীর্থদর্শনে আসিলে, অনেকেই এখানে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। তাহাছাড়া, প্রতিবৎসর পূজার পূর্ব্বে কতকগুলি সরলপ্রকৃতি স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের কুহকে ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়েন, কিন্তু আহারাদির ব্যবস্থা দেখিয়া কেহই স্থায়ী হন না।

আশ্বিন মাস পড়িয়াছে। একদিন প্রভাতে, এই স্বাস্থ্য-নিবাস বা বাঙ্গালী-বাবুকা-হোটেলের দ্বিতলস্থিত একটি কক্ষে, একজন স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বদ্ধ দ্বার ও ঈষন্মুক্ত জানালাগুলির ফাঁক দিয়া অল্প অল্প আলোক প্রবেশ করিতেছে। চক্ষু খুলিবার পর, প্রায় দুই মিনিটকাল, বাবুটি আলস্যবশতঃ শয্যায় রহিলেন। তাহার পর সহসা কি যেন মনে পড়াতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বিছানার পাশে চেয়ারের উপর তাঁহার গেঞ্জিটি, কামিজটি রাখা ছিল; তাড়াতাড়ি সেগুলি পরিধান করিয়া, দ্বার খুলিয়া, ডাকিলেন—"মথুরা!"

বাবুটির নিজস্ব খানসামা মথুরা তখন বারান্দার কোণে দাঁড়াইয়া গোপনে সিগারেট টানিতেছিল—তাড়াতাড়ি সেটি ফেলিয়া দিয়া, বলিল—"আজ্ঞে।"

"শীগ্‌গির তামাক দে"—বলিয়া বাবুটি জানালাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া দিলেন। মৃদু মৃদু শীতল বাতাস আসিতে লাগিল। বিছানার উপরে বসিয়া বাবুটি গঙ্গার শোভা [illegible]।

[illegible] বাড়ী চব্বিশ-পরগণার বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ—কিন্তু কিছু অধিক দেখায়। ইনি একজন নব্যতন্ত্রের হিন্দু; মস্তকে একটি সুপুষ্ট শিখা ধারণ করেন। দেহখানি ক্ষীণ, বর্ণটি রক্তাল্পতাবশতঃ পাণ্ডু, চক্ষু দুইটি কোটরগত, গাল ঝরিয়া গিয়াছে, অঙ্গুলিগুলি অস্থিসার। দেখিলেই মনে হয়—হাঁ, স্বাস্থ্যজিনিষটার ইঁহার খুবই অভাব বটে। কলিকাতার কোনও কলেজে ইনি এফ. এ. অবধি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দেন। সে অবধি বাড়ীতেই বসিয়া আছেন। মধ্যে মাছমাংস পরিত্যাগ করিয়া, ছাপার কেতাব দেখিয়া, যোগশিক্ষা আরম্ভ করেন। বৎসর খানেক যোগাভ্যাসের পর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল—সে ভাঙ্গা আজিও যোড়া লাগে নাই। এখন আর বঙ্কুবাবু যোগাভ্যাস করেন না, তবে ওসকল বিষয়ের চর্চ্চাটা একেবারে ছাড়েন নাই।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। ধূমপানান্তে, মুখখানি প্রক্ষালন করিয়া, বঙ্কুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, মথুরা ইহার মধ্যে মেঝেটি ঝাঁট দেওয়াইয়া মাঝখানে একখানি কুশাসন বিছাইয়া রাখিয়াছে—সম্মুখে গঙ্গাজলের কোশা প্রভৃতি সজ্জিত। বাসি কাপড় ছাড়িয়া তসর পরিতে পরিতে বঙ্কুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"চায়ের জল ঠিক আছে?"

"আজ্ঞে।"

"আর টোষ্টগুলো কাল কাঁচা ছিল, আমার জাতটে কি মারবি? আজ খুব লাল করে নিস্—একটু পোড়া-পোড়া হলেও ক্ষতি নেই।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মথুরা প্রস্থান করিল।

উত্তমরূপে অগ্নিশোধিত না হইলে, মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটিভক্ষণ বঙ্কুবাবু অতি অনাচার বলিয়া গণ্য করেন।

আহ্নিক-পূজা শেষ করিয়া বঙ্কুবাবু গীতা-পাঠ আরম্ভ

চা এবং একটা পাত্রে কয়েক টুকরা মাখন দেওয়া টোষ্ট আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। গীতার এক অধ্যায় শেষ করিয়া, চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া, চা-সহযোগে বন্ধুবাবু সেই পাউরুটি ভক্ষণে রত হইলেন।

গীতার এক অধ্যায় শেষ করিয়া, চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া, চা-সহযোগে বন্ধুবাবু সেই পাঁউরুটি ভক্ষণে রত হইলেন

চা-সেবনান্তে বাবু আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। বলিলেন—"তামাক সেজে একখানা এক্কা ডেকে আন্‌ত—অষ্টভুজা যাব।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই নিবাসে আসিয়া কেহ অধিক দিন থাকে না; বন্ধুবাবুও পলাইতেন—কিন্তু তাঁহার অবস্থিতির একটু বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। অষ্টভুজা তাঁহার নাকি আশ্চর্য্য শান্তদর্শিতা। কত লোকের কত কঠিন ব্যাধি নাকি তিনি আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। এই শেষোক্ত ক্ষমতার কথা শুনিয়া, কয়েকদিন হইতে মাঝে মাঝে বন্ধুবাবু, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেছেন—কিন্তু এখনও কোনও সুবিধা করিতে পারেন নাই। বাবাজী সহজে কাহাকেও ঔষধাদি দেন না। কেহ ঔষধ প্রার্থনা করিলে বলিয়া থাকেন "বাবা, রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যাও—আমি কি ডাক্তার?"—বন্ধুবাবুও রোগের কথা পাড়িয়া প্রথমদিন এই উত্তরই পাইয়াছেন। যাহার উপর বাবার বিশেষ দয়া হয়, সেই নাকি ঔষধ পায়। ঔষধ বিশেষ কিছুই নয়—নির্ব্বাপিত হোমকুণ্ড হইতে একমুষ্টি ভস্ম (বিভূতি) তুলিয়া বাবা দেন। বন্ধুবাবুর বিশ্বাস যে, যোগবল বা সাইকিক্ ফোর্সের দ্বারা সেই ভস্মগুলিতে পরমাণুগত এমন একটা বিপর্যায় ঘটিয়া যায়, যে সেগুলি মহৌষধে পরিণত হয়।

ধূমপান শেষ হইবার পূর্ব্বেই মথুরা আসিয়া সংবাদ দিল, এক্কা আসিয়াছে। তখন বেলা প্রায় আটটা। গলায় একখানা চাদর ফেলিয়া, ছাতা লইয়া বন্ধুবাবু বাহির হইলেন। ভৃত্যকে বলিলেন—এগারোটার সময় ফিরিবেন, স্নানের জন্য গরমজল যেন প্রস্তুত থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাখানি ঝণ্ ঝণ্ করিয়া বিন্ধ্যাচলের বাজারের ভিতর দিয়া চলিল। হিন্দুস্থানী ললনাগণ স্নানান্তে একহাতে ফুলের ডালি অন্যহাতে গঙ্গাজলপূর্ণ লোটা লইয়া, দলে দলে "বিন্ধ্যা-মাই"র মস্তকে জল চড়াইতে যাইতেছে—তাহারা পথপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

বাজার পার হইয়া প্রশস্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া এক্কা ছুটিয়া চলিল। দুইপার্শ্বে বিস্তর পাথরের কারখানা—শিল, নোড়া প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। [illegible]

অগাধ জলে সাঁতার

আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল। শৈবলিনী বলিল, 'এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রতাপ?'

"চন্দ্রশেখর"—১ম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ হইলে পথ রেলওয়ে লাইন পার হইয়া, আম্রবনের মধ্য দিয়া, অট্টঘুজা পাহাড়ের দিকে চলিল।

একা হইতে নামিয়া আশ্রমে পৌছিয়া বঙ্কুবাবু দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর শয়নকক্ষের কপাট বন্ধ,—তাঁহার একটি শিষ্য-বালক ছায়াময় বারান্দার একপ্রান্তে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছে। বঙ্কুবাবু নিকটে গিয়া বলিলেন—"পাঁও লাগি বাবাজী!"

"জীব সহস্রম্"—বলিয়া এই ক্ষুদ্র বাবাজী বঙ্কুবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিল। বলিল—"বৈঠিয়ে বাবুজী। আজ এৎনা সবেরে?"

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"বিকালে আসিলে সাধুবাবার সঙ্গে ভাল রকম কথাবার্ত্তা কহিতে পাই না—অনেক লোকজন থাকে—তাই আজ এবেলা আসিয়াছি। কিন্তু বাবাকে ত দেখিতেছি না—কপাট বন্ধ কেন?"

চেলা বলিল—"এখনও গুরুমহারাজ জাগেন নাই।"

এখনও জাগেন নাই!—বঙ্কুবাবু জানিতেন, সাধু-মহাত্মারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। তাই তিনি একটু বিস্মিত হইলেন।

চেলা বলিল—"কাল শনিবার ছিল কিনা—তাই আজ উঠিতে এত দেরী হইতেছে; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে উঠিবেন না।"

এ আবার কি কথা?—কলিকাতার বড়লোকেরাই ত বাগান-বাড়ীতে গিয়া শনিবার করিয়া থাকে—রবিবারে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ঘুম ভাঙ্গে না। সাধু-সন্ন্যাসীরাও কি শনিবার করেন নাকি? তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"শনিবার ছিল, ত কি হইয়াছে?"

চেলা বলিল—"প্রতি শনি ও মঙ্গলবার রাত্রে হোম হইতেছে কি না। সারারাত্রি হোম হয়। যে বাবুটি হোম করাইতেছিল, এই কতক্ষণ হইল তিনি ফিরিয়া গেলেন।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"হোম হইতেছে? কিসের হোম বাবাজী?"

কিসের হোম হইতেছে, বাবাজী আসলে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে হাল্কা হইতে হয়। তাই গম্ভীর ভাবে বলিল—"সে অতি গোপনীয় কথা।"

"কে করাইতেছেন?"

"[illegible] একজন বাঙ্গালীবাবু।"

"বাঙ্গালী? কে? নাম কি?"

"জানি না।"

"বাড়ী কোথা?"

"জানি না।"

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বঙ্কুবাবুর বড়ই কৌতূহল হইল! জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবুটি কতদিন এ হোম করাইবেন?"

বাবাজী আন্দাজে বলিল—"তিন রাত্রি হইয়া গিয়াছে—এখনও আট রাত্রি হইবে; একাদশ রাত্রিতে পূর্ণাহুতি।"

বঙ্কুবাবুর ধারণা হইল, নিশ্চয়ই কোনও পীড়ার উপশমার্থে এ হোম হইতেছে। বাবাজীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকমে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু সদুত্তর পাইলেন না। তখন বঙ্কুবাবু এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। বলিলেন—"বাবাজী! যদি সকল কথা ঠিক ঠিক আমায় বল—তাহা হইলে গাঁজা খাইতে তোমায় দুইটি টাকা দিব।"

টাকা দুইটির লোভ সম্বরণ করা বাবাজীর পক্ষে দুষ্কর, অথচ সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয়, "আমি কিছুই জানি না।"—সুতরাং বাবাজী বঙ্কুবাবুর চিত্তবিনোদনার্থ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবে স্থির করিল। বলিল—"আচ্ছা বাবু—যদি না শুনিয়া আপনি নিতান্তই না-ছাড়েন, তবে বলিতেই হইবে—টাকা দুইটি দিন। কিন্তু খবরদার, কাহারও কাছে প্রকাশ না হয় যে, আমি এ সব কথা বলিয়াছি। যদি প্রকাশ হয়, তবে গুরুমহারাজ আপনাকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন, আমাকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

বঙ্কুবাবু মৃদু হাসিয়া টাকা দুইটি দিলেন। বাবাজী তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

"সে বড় আশ্চর্য্য কথা বাবু! প্রতি রাত্রে দুইটি ক্যানেস্তারা করিয়া একমণ ঘি আসে। হোম হইতে থাকে—যখন আধমণ ঘি পুড়িয়া যায়, তখন অগ্নির মধ্য হইতে একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসে। গুরুমহারাজ তাঁহাকে হুকুম করেন, 'যাও, সমুদ্র হইতে ভাল ভাল মাণিকমুক্তা তুলিয়া আনিয়া এই বাবুটিকে দাও।' বলিতেই সে স্ত্রীলোক চলিয়া যায়। আবার হোম হইতে থাকে—আর এক ক্যানেস্তারা ঘি যখন পুড়িয়া যায় সে স্ত্রীলোক আবার

ফিরিয়া আসে, মুঠা মুঠা করিয়া কি সব জিনিষ বাবুকে দেয়, দিয়া আবার অগ্নির মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।"

এই কাহিনী শুনিয়া বঙ্কুবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—"তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে যোগিনী-সাধন বলে, ইহা বোধ হয় তাহাই। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ত!"—বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?"

বালক খুব দৃঢ়ভাবে বলিল—"স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"কোন্ খানে হোম হয়?"

"ঐ ঘরে"—বলিয়া বালক একটা জানালার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।—প্রাতে আসিয়া ভস্মাদি সে পরিষ্কার করিয়াছে, সুতরাং জানে।

বঙ্কুবাবু জানালাটির পানে চাহিলেন। দেখিলেন, একটি কবাটের কিয়দংশ উইপোকায় খাইয়া ছোট একটা গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছে। তখনি মনে মনে তিনি একটা মৎলব আঁটিয়া লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, বঙ্কুবাবু উঠিলেন—"সাধুবাবার উঠিতে ত অনেক দেরী দেখিতেছি—আজ তবে চলিলাম। তাঁহাকে আমার প্রণাম দিও।—আসি তবে বাবাজী. পাঁও লাগি।"

বাবাজী হাত উল্টাইয়া বলিল—"জীব সহস্রম্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রবি, সোম এবং মঙ্গল—এ তিনটি দিন বঙ্কুবাবুর যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা তিনিই জানেন।—যোগিনী-সাধন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে, তাহা তিনি পুস্তকেই পাঠ করিয়াছিলেন। সেই পরম গূঢ়ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন, এ চিন্তা প্রবল জ্বরের মত তাঁহার সমস্ত দেহ মনকে যেন আক্রমণ করিল।—দুই পাতা ইংরাজি পড়িয়া আজিকালি যাহারা অতি-প্রাকৃত কিছুই বিশ্বাস করে না—তাহাদিগকে মনে মনে খুব ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন; আর মাঝে মাঝে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"There are more things in Heaven and
Earth, Horatio,
Than are dreamt of in your Philosophy."

মঙ্গলবারের সূর্য্য অস্তগমন করিলেন। আর ঘণ্টা চারি পরেই যাত্রা করিতে হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি—বড়ই অন্ধকার। পথটিও জনশূন্য—রাত্রে একাকী সেই পাহাড়ের ধারে যাওয়া উচিত হইবে কি? যদি কোনও বিপদ-আপদ্ হয়? মথুরা খানসামাকে সঙ্গে লইলে কেমন হয়?—বঙ্কুবাবু মনে মনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর অন্ধকারও ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"এক জায়গায় একটা হোম হচ্ছে—তাই দেখ্‌তে যাব—ফির্‌তে যদি বেশী রাত্রি হয়,ত সেখানেই শুয়ে থাক্‌ব—কাল সকালে আস্‌ব।"

মথুরা বলিল—"যে আজ্ঞে।"

একটি বিদ্যুতের বাতি পকেটে করিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। বঙ্কুবাবু একটা মোটা এণ্ডির চাদর গায়ে দিলেন—অধিক রাত্রে একটু ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বাজারে গিয়া একখানি এক্কা ভাড়া করিলেন।

এক্কাওয়ালা বলিল—"কোথায় যাইতে হইবে বাবু?"

"অষ্টভুজা। যাতায়াতের কত ভাড়া লাগিবে?"

"এত রাত্রে অষ্টভুজা?"

"আমার পূজা মানত আছে। অনেক রাত্রি অবধি পূজা হইবে। পূজা শেষ হইলে ফিরিব।"

"সেই পাহাড়ের নীচে, সমস্তরাত্রি আমি থাকিব কি করিয়া বাবু? সেখানে জন মনুষ্য নাই!"

"তবে, কি হইবে?"

এক্কাওয়ালা একটু ভাবিয়া বলিল—"যদি এককাজ করেন বাবু—ত হয়।"

"কি, বল?"

"আমি আপনাকে পাহাড়ের নিকট অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া, রেল-ফটকের কাছে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষা করিব। আপনার কায শেষ হইলে, সেই খানে আসিয়া আপনি আবার এক্কা চড়িবেন। বেশী দূরত নয়—বড় জোর একপোয়া পথ।—আর, অর্দ্ধেক ভাড়া আমায় আগাম দিতে হইবে।"

অগত্যা বঙ্কুবাবু তাহাতেই রাজি হইলেন। ভাড়া কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া একাওয়ালাও চতুর্গুণ ভাড়া হাঁকিয়া বসিল। তাহাতেই সম্মত হইয়া বঙ্কুবাবু যাত্রা করিলেন।

আম-বাগানের মধ্যে একটা বৃহৎ পাকা ইন্দারা আছে; সেইখানে একা থামাইয়া, বঙ্কুবাবু নামিয়া পড়িলেন। একার সামান্য লণ্ঠনটি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে—সে আলোকে বড় কিছুই দেখা যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। একাওয়ালা বলিল—"আর খানিকদূর অবধি আপনাকে লইয়া যাইব ?"

"না—থাক্। তুমি রেল-ফটকের কাছে একা রাখিও। আমি ফিরিবার সময় তোমায় জাগাইয়া লইব।"—বলিয়া জুতাযোড়াটা একায় রাখিয়া দিলেন।

একা চলিয়া গেল। সেই সামান্য লণ্ঠনটির আলোকও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হওয়াতে অন্ধকার যেন ভীষণ হইয়া উঠিল। বঙ্কুবাবুর মনে হইতে লাগিল, চারিদিকে অদৃশ্য ডাকিনী-যোগিনীগণ ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছে। ভয়ে তাঁহার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

আশ্রমের অবস্থান অনুমান করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্কুবাবু অগ্রসর হইলেন। পাথরের টুকরায় হোঁচট খাইতে লাগিলেন, পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। উচনীচ স্থানে পা পড়িয়া, দুই একবার পতনোন্মুখ হইলেন। বিদ্যুতের বাতিটি টিপিয়া খানিক পথ দেখিয়া লন—আলো নিবাইয়া, সেই পথটুকু অতিক্রম করিয়া, আবার মুহূর্তের জন্য সেটি জ্বালেন। জ্বালিয়া রাখিতে সাহস হয় না।

বঙ্কুবাবু ছিদ্রপথে চাহিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর ধুনি জ্বলিতেছে— কিছুদূরে কালিকানন্দ বসিয়া আছেন

কিয়দ্দূর গমন করিলে, বৃক্ষশাখার অন্তরাল দিয়া ঊর্দ্ধে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, উহা দেবী অষ্টভুজার মন্দির। আর কিয়দ্দূর গিয়া, সাধুবাবার আশ্রম হইতে নির্গত ক্ষীণালোকরশ্মিও দেখিতে পাইলেন। ক্রমে অত্যন্ত সাবধান পাদবিক্ষেপে, আশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

বাহিরে কেহই নাই। দ্বার বন্ধ। দুই একটা জানালার ফাঁক দিয়া একটু একটু আলোক বাহির হইতেছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট সেই জানালাটির কাছে গিয়া বঙ্কুবাবু দাঁড়াইলেন। ছিদ্রপথে চাহিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর ধুনি জ্বলিতেছে—কিছুদূরে কালিকানন্দ বসিয়া আছেন। তাঁহার অন্তরালে আরএক ব্যক্তি—বঙ্কুবাবু ভাল দেখিতে পাইলেন না। কালিকানন্দের পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলায় বড় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, দীর্ঘকেশ মস্তকের উপরে ঝুঁটির আকারে বাঁধা। সম্মুখে একপাত্র খানকতক লুচি এবং একটা বাটিতে মাংস রহিয়াছে।

একটি বিলাতী মদের বোতলও রহিয়াছে। একটা কি শাদা পদার্থ—বাটির আকার—তাহাতে বাবাজী মদ ঢালিলেন। আঙ্গুলে করিয়া একটু মদ সেই লুচি ও মাংসের উপর ছিটাইয়া দিয়া, কি কতকগুলা মন্ত্র বলিতে লাগিলেন. তাহার পর খান দুই লুচির উপর কতকটা মাংস রাখিয়া, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। এই সময় অপর ব্যক্তিকে বঙ্কুবাবু দেখিবার অবকাশ পাইলেন—লোকটি যেন পরিচিত বোধ হইল—কিন্তু সেই ধুনির সামান্য আলোকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না। কালিকানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"চন্দ্রনাথ—এস, প্রসাদ লও।"

চন্দ্রনাথ নাম শুনিয়াই বঙ্কুবাবুর সন্দেহ দূর হইল। লোকটি উঠিয়া নিকটে আসিল। বঙ্কুবাবু দেখিলেন,—বিলক্ষণ চিনিতে পারিলেন—চন্দ্রনাথ আর কেহ নহে—তাঁহারই ভগ্নীপতি সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা!

চন্দ্রনাথ মাসখানেকের অধিক, গৃহত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কুবাবু শুনিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যাচলে আছেন, আর যোগিনী-সাধনে মাতিয়াছেন, তাহা বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও জানিতেন না।

আহার ও মদ্যপানের পর উভয়ে মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য বাহির হইলেন। সে সময়টা বঙ্কুবাবু জানালার নিকট হইতে সরিয়া, গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে লুকাইলেন।

ফিরিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া উভয়ে ধুনির নিকট বসিলেন। একখানা চকচকে লোহার তাওয়া লইয়া, কয়লা দিয়া কালিকানন্দ তাহার উপর কি লিখিতে লাগিলেন। শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখ—তোমার ভাইয়ের চেহারার সঙ্গে মিল্‌ছে কি?"

তাহার পর নানাবিধ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। কালিকানন্দ বলিলেন—"দেবীর ধ্যান কর। মনে মনে ভাব, মা দীর্ঘাকারা কৃষ্ণবর্ণা, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দুই হাতে যেন দুটো নৃমুণ্ড—তাই তিনি চিবুচ্ছেন। এমনি করে ধ্যান কর।"

চন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানান্তে কালিকানন্দ তাঁহাকে আরও কতকগুলা কি মন্ত্র বলিতে লাগিলেন। সবকথা বঙ্কুবাবু ভাল ধরিতে পারিলেন না, তবে নিম্নলিখিত কথাগুলি বেশ বোঝা গেল—

"ওঁ শত্রুনাশকার্য্যে নমঃ। সুরেন্দ্রনাথস্য শোণিতং পিব পিব * মাংসং খাদয় খাদয় * হ্রীং নমঃ।"

এই মন্ত্র শুনিয়া বঙ্কুবাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ইহা যোগিনী-সাধন নহে—সুরেন্দ্রনাথকে মারিয়া ফেলিবার জন্য মারণ-যজ্ঞ হইতেছে! কাঁপিতে কাঁপিতে বঙ্কুবাবু সেইখানে বারান্দার উপর বসিয়া পড়িলেন। বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইতেছে। ক্রমে তিনি ভূতলশায়ী হইয়া চেতনা হারাইলেন।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিল, বঙ্কুবাবু তাহা কিছুই জানেন না। যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন, পশ্চিম গগনে ক্ষীণদেহ চন্দ্রোদয় হইয়াছে। মন্ত্রধ্বনি তখনও ভিতর হইতে শুনা যাইতেছে। স্পষ্ট শুনিলেন—"সুরেন্দ্রনাথং মারয় মারয় * তস্য শোণিতং পিব পিব * মাংসং খাদয় খাদয় * হ্রীং নমঃ।"

বঙ্কুবাবু তখন নিঃশব্দে উঠিয়া, ধীরে ধীরে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। আম্রবনের ভিতরে থাকিয়া, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অনেক কষ্টে পথ চিনিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পড়িতেছে—হাতে পায়ে বল নাই—বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত।

দশ মিনিটের পথ অর্দ্ধঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বঙ্কুবাবু রেলফটকের কাছে উপস্থিত হইলেন। এক্কাওয়ালাকে জাগাইয়া, স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন তাঁহার মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। খানসামা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"বাবু, আপনার কি কোন অসুখ করেছে?"

বঙ্কুবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"হাঁ—শরীরটা ভাল নেই।"

সারাদিন বসিয়া বসিয়া বঙ্কুবাবু ভাবিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগত জমিদার ৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র—তবে ইহারা সহোদর নহে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথই বিষয়-সম্পত্তি দেখিতেন—সুরেন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত। সেই সময়েই সুরেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কুবাবুর পরিচয়। তিনবৎসর হইল, বঙ্কুবাবুর একমাত্র ভগ্নী টুনুরাণীর সহিত সুরেন্দ্রের

বিবাহ হইয়াছে। পরবৎসর সুরেন্দ্র বি. এ. পাস করিয়া বাড়ী গেল; বলিল সে চাকরি করিবে না, ওকালতীও পড়িবে না, বাড়ীতেই থাকিবে এবং দাদার সহিত মিলিয়া নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যাহাতে গ্রামের উন্নতি হয়, প্রজার উন্নতি হয়,—সেই সকল বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। চন্দ্রনাথ, ভ্রাতার সেই সংকল্পকে নিতান্তই আজ্‌গুবি খেয়াল বলিয়া গণ্য করিয়াছিল। কনিষ্ঠকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই—কিন্তু সুরেন্দ্র অটল রহিল। ফলে, চন্দ্রনাথের সিংহাসনে ভাগ বসিল, জমিদারীতে তাঁহার একাধিপত্য খর্ব্ব হইতে লাগিল, এবং উভয়ের আদর্শের, ধর্ম্মবুদ্ধির বিভিন্নতাবশতঃ পদে পদে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। যে প্রজাকে শাসন করিবার জন্য, যাহার ভিটামাটী উচ্ছন্ন করিবার জন্য চন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর হন, সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যেই তাহার পক্ষাবলম্বন করে। থানার দারোগাকে চন্দ্রনাথ এতদিন মৎস্য-মাংস-ঘৃত-দুগ্ধ ও নগদে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই দারোগা দুই প্রজার মধ্যে এক মোকর্দ্দমায় একজনের নিকট পান খাইবার জন্য ২০০৲ লইয়াছিল—এই মাত্র অপরাধে সুরেন্দ্র সেই প্রজাকে উত্তেজিত করিয়া নিজে খরচ দিয়া, দারোগার নামে ঘুষের মোকর্দ্দমা দায়ের করাইয়াছিল; এইরূপে দুই ভ্রাতায় বিচ্ছেদ ক্রমে বাড়িয়াই চলিল! অবশেষে চন্দ্রনাথ এক প্রজাকে হাত করিয়া সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধ এক মিথ্যা ফৌজদারী নালিস্ করাইয়া দেন। আদালতের বিচারে সুরেন্দ্র নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া, মুক্তিলাভ করিল। সেইদিন আদালত হইতেই চন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হইয়া যান—ইহা আজ দুই তিন মাসের কথা। এ সমস্তই বঙ্কুবাবু অবগত ছিলেন। মনোমালিন্য যতই হউক, ভাই হইয়া ভাইয়ের প্রাণনাশের জন্য চন্দ্রনাথ যে ক্রূরকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন,—ইহাতে বঙ্কুবাবু ক্রোধে, ভয়ে ও দুঃখে বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মনে মনে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, এ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিফল হইবার নহে। এসম্বন্ধে তাঁহার একখানি পুস্তক ছিল, তাহা বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

"জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্যান্নাত্রসংশয়ঃ
দণ্ডাধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেবরিপোর্ভবেৎ॥"

বঙ্কুবাবু ভাবিতে লাগিলেন—'ছোকরা বাবাজী বলিয়াছে, তিনরাত্রি এরূপ হইয়াছে, এখনও আট রাত্রি হইবে।' তাহার এ সংবাদটি সম্ভবতঃ সত্য। যোগিনী-সাধনের যে বর্ণনাটি করিয়াছিল, দেখা যাইতেছে, সেটি মিথ্যা; রাত্রিকালে আশ্রমে সে থাকে না, কেমন করিয়া জানিবে? বেশ বুঝা যাইতেছে, টাকা দুইটির লোভে মিথ্যা বলিয়াছে। আরও সাতরাত্রি এই ক্রূরকর্ম্ম হইবে—তাহার পর, সুরেন্দ্র রোগগ্রস্ত হইবে—একবিংশতি দিবস পরে অবধারিত মৃত্যু। বঙ্কুবাবু দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। একমাত্র ভগ্নী টুনুরাণী, সবে এই তিনবৎসর মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে; পনেরো বৎসরের বালিকা—সে বিধবা হইবে? মেয়েটি বড় ভাল—বড় সুন্দরী—যেন প্রতিমাখানি; কত আদরের একটি মাত্র বোন্—তাহার কপাল কি এমনি করিয়াই পুড়িয়া যাইবে?—টুনুর বৈধব্যবেশ বঙ্কুবাবু কল্পনা-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং বারম্বার রুমালে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন।

এখন উপায় কি? কি করিলে এ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়?—ভাবিয়া চিন্তিয়া বঙ্কুবাবু স্থির করিলেন, আজ রাত্রির গাড়ীতেই মনোহরপুর যাত্রা করা আবশ্যক। সুরেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া, দুইজনে পরামর্শ করিয়া, যাহা হউক একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যনিবাসেই মথুরাকে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া, বঙ্কুবাবু ট্রেণে উঠিলেন। বলিয়া গেলেন, দুইচারি দিন পরেই আবার তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন মনোহরপুর গ্রামে অপরাহ্ণকালে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহিত কথোপকথন করিতে-ছিল। সুরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কান্তিমান্ যুবক—গুম্ফ ও শ্মশ্রু ক্ষৌরীকৃত। নাক চাপিয়া একযোড়া সোণার ফ্রেমযুক্ত "পাঁস্-নে" চশমা—এক প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম রেশমী কার্ নামিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বউদিদি সুরেন্দ্রেরই সমবয়স্কা—হয়ত দুইএক বৎসরের বড় হইবেন। তাঁহার নাম কুমুদিনী। রঙটি সুরেন্দ্রের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। একখানি দুই-পাড়ের শাড়ী পরিয়া রহিয়াছেন। মুখখানি বিষণ্ণ। পুস্তকাদি বিক্ষিপ্ত একটি টেবিলের পাশে, চেয়ারে সুরেন্দ্রনাথ

বসিয়া—সম্মুখে কিয়দ্দূরে স্থাপিত সোফার একটি প্রান্তে তাহার বউদিদি হেলান দিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি বলিতেছিলেন—"ঠাকুরপো, যাও—তুমি গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আন। যা হবার তা হয়ে গেছে, তাই বলে চিরদিন কি ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছেদ থেকে যাবে? কোন্ সংসারে এমন না হয়? ঝগড়া-বিবাদ মনকষাকষি হয়—আবার ক্রমে মিটমাট হয়ে যায়, যেমন ছিল তেমনি হয়।"

সুরেন্দ্র বলিল—"তাই আশীর্ব্বাদ কর, বউদিদি। তাই যেন হয়। কিন্তু আমার কি দোষ বল?"

"তোমার দোষ ত আমি বলছিনে ভাই। তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, তবু তিনি তোমার দাদা—গুরুজন। দাদার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত? যা হয়ে গেছে, সেসব মন থেকে মুছে ফেল। তুমি যাও গিয়ে তাঁকে নিয়ে এস। পূজো আস্‌ছে—যারা অতি দীনদরিদ্র, পেটের দায়ে বিদেশে থাকে, তারাও হাসিভরা মুখে বাড়ী আসছে—নিজের স্ত্রী পুত্র ভাই বোন্‌কে পেয়ে সুখী হচ্ছে। আর তোমার দাদা—এত বড় জমিদারীর মালিক যিনি—তিনি এসময় গৃহত্যাগী হয়ে পথে পথে বেড়াবেন?"—শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে বউদিদির স্বর মোটা হইয়া আসিল—আর্দ্র চক্ষুযুগল সেই অপরাহ্ণের আলোকে চিক্ চিক্ করিতে লাগিল।

কাছারি হইতে চন্দ্রনাথ সেদিন পশ্চিম-যাত্রা করিবার পর, মাস-খানেক বাড়ীতে কোনও সংবাদই দেন নাই। মাসান্তে মথুরা হইতে তাঁহার পত্র আসিল। নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, কিছুদিন হইতে তিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। দেওয়ানের নামে এখন মাঝে মাঝে পত্র আসে, সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। কবে গৃহে ফিরিবেন, সে কথা চন্দ্রনাথ কিছুই লেখেন না।

আজ বিকালে দেওর-ভাজে সেই সকল কথাই হইতেছিল। কুমুদিনী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে কাঁদেন, দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে বড় কষ্ট হয়। তাহার জন্যই দাদা দেশত্যাগী হইয়াছেন, একথা ভাবিতেও তাহার ভাল লাগে না। সুরেন্দ্র এখন মনে করে অত করিয়া দাদার বিপক্ষতা করাটা ভাল কায হয় নাই। নিতান্ত উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াই তিনি ওরূপ আচরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"আমার ত কিছুতেই আপত্তি নেই বউদিদি; দাদা যদি ভালভাবে থাকেন, তা হলে সবগোলই মিটে যায়। তিনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, তাতে আমি রাগ করিনি বা দুঃখিত হইনি—এমন কথা বলতে পারিনে; তা হলে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু সেসব আমি ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি।"

কুমুদিনী বলিলেন—"বিন্ধ্যাচল কতদূর?"

"কাশী আর এলাহাবাদের মাঝামাঝি হবে।"

"তা হলে আর দেরী কোরো না ভাই।"—বলিয়া মিনতিপূর্ণ চক্ষে দেবরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্র বলিল—"যেতে আমি পারি বউদিদি। কিন্তু আস্‌বেন কি? আমার কথা রাখ্‌বেন কি? আমার প্রতি তাঁর কেমন ভাব, তা ত তুমি জান।"

বউদিদি বলিলেন—"এখন আর তাঁর মনের ভাব সে রকম নেই। কখ্‌খনো সে রকম নেই। তিনি ঝোঁকের মাথায় এক এক সময় একটা কায করে ফেলেন; তার পর যখন বুঝ্‌তে পারেন যে, অন্যায় করে ফেলেছেন, তখন তাঁর আপশোসের সীমা থাকে না। আমি তাঁকে ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি ত! নইলে দেখ না, কেবল তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?—মনে একটা অনুশোচনা তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছে।"

সুরেন্দ্র বলিল,—"আচ্ছা বউদিদি—আমি তা হলে পরশুই রওয়ানা হই।"

এ কথা শুনিয়া কুমুদিনী বড়ই আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন,—"তাই যাও ভাই—গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তিনি লজ্জায় আস্‌তে পার্‌ছেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে এসেছি—গিয়ে তার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? তুমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেই তাঁর মুখটি রক্ষা হয়।"

সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত দেবরের জলযোগের আয়োজন করিবার জন্য কুমুদিনী বাহির হইয়া গেলেন। সুরেন্দ্র চেয়ারখানি ঘুরাইয়া টেবিলের সম্মুখে লইয়া, ড্রয়ার হইতে একটু শাবরের চামড়া বাহির করিয়া তাহার "পাঁস্-নে" যোড়াটি পরিষ্কার করিল। তৎপরে গোপালন সম্বন্ধে এক খানি ইংরাজি বহি খুলিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বউদিদি বাহির হইয়া যাইবার পাঁচ মিনিট পরেই সুরেন্দ্রের স্ত্রী টুনুরাণী আসিয়া প্রবেশ করিল। পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাতে আসিয়া কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে স্বামীর বহিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল।

বৈজ্ঞানিক গোহালের বর্ণনামধ্যে নিমজ্জিত সুরেন্দ্রনাথের নাসারন্ধ্রে, টুনুরাণীর কেশকলাপ হইতে উত্থিত একটি মৃদু-সুগন্ধ প্রবেশ করিল। তাহার মৃদুতর নিঃশ্বাসের শব্দও কাণে গেল। সুরেন্দ্রের মনটি তখন গোহাল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পশ্চাতের দিকে হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া সে টুনুরাণীর বসনাঞ্চল ধরিয়া ফেলিল।

ধরা পড়িয়া বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুরেন, বন্দিনীকে টানিয়া পার্শ্বের দিকে আনিল।

টুনু বলিল—"ছাড়—ছাড়—কে এসে পড়বে।"

সুরেন বলিল—"চোরকে ধরেছি, ছাড়ব কেন?"

টুনু অঞ্চলাগ্র জোরে টানিতে টানিতে বলিল—"আঃ—কি কর? ছাড়—দোর খোলা রয়েছে—কেউ দেখতে পাবে; ছাড়—পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে আসি।"

সুরেন বলিল—"জরিমানা দাও—তবে ছাড়ব।"

নির্ম্মম বিচারক তদ্দণ্ডে জরিমানা আদায় করিয়া লইল। তাহার পর মুক্তি দিয়া বলিল—"পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে এস।"

পর্দ্দা টানিয়া দিয়া টুনুরাণী আসিয়া স্বামীর পার্শ্বদেশে দাঁড়াইল। বহিখানির প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কি বই গো? ছবি আছে?"

"আছে বৈকি, দেখ্‌বে?"—বলিয়া সুরেন্দ্র তার পর তার পর পাতা উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিল। নানা আকারের গোরু-বাছুর-গোহাল প্রভৃতির ছবি।

টুনু বলিল—"সবই গোরুর গল্প?"

"সব।"

"রাম বল। তাই বসে বসে পড়্‌ছ?"
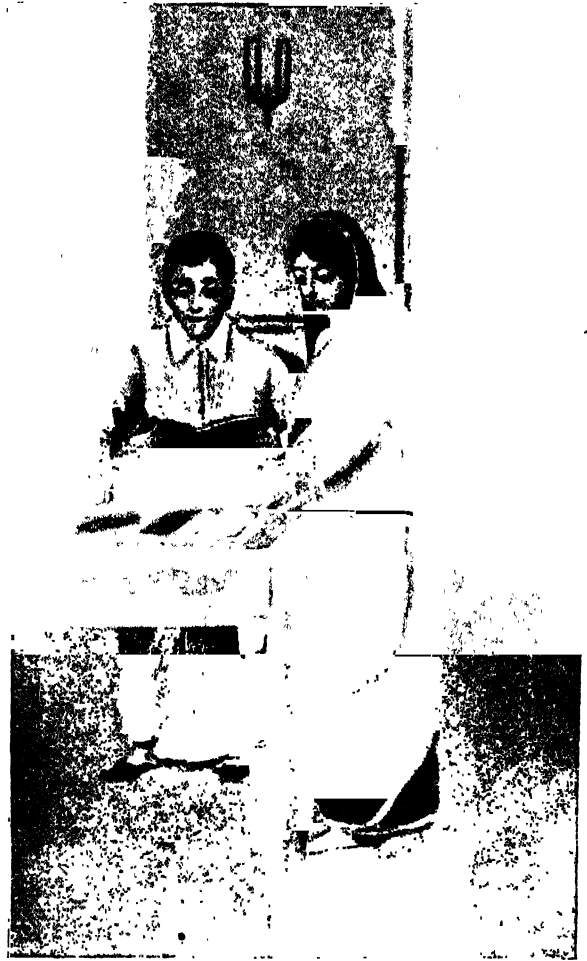
টুনুরাণী বলিল—"কি বই গো? ছবি আছে?"

"কেন, গোরুর গল্প কি মন্দ? তোমার ফার্ষ্টবুকেও ত কত গোরু, ঘোড়া, হাড়্‌গিলে পাখীর গল্প রয়েছে।"

গত বৎসর টুনুরাণী বাঙ্গালা লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া ইংরাজি ফার্ষ্টবুক আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গর্দ্দভের পাতা অবধি পড়িয়া, আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। আজ কয়েকমাস তাহার পড়া একেবারে বন্ধ আছে।

সুরেন্দ্র বলিল—"যাওবা একটু শিখেছিলে, তাও ভুলে গেলে। বইখানা আন দেখি—পড়া দিই।"

টুনু বলিল—"তোমার গোরুর গল্প ভাললাগে, তুমি পড়। আমি সেসব পড়ব না। আমার এখন এককাল গিয়ে, তিনকালে ঠেকেছে। ঐ সব গোরু-বাছুর-হাড়্‌গিলে-

পাখীর গল্প এবয়সে পড়া কি আমার শোভা পায়,—না ভালই লাগে? ছি!"

সুরেন হাসিয়া, স্ত্রীকে কাছে টানিয়া বলিল—"তবে এ বয়সে তোমার কিসের গল্প ভাললাগে?"

টুনু গম্ভীর মুখে বলিল—"যাতে সব ঠাকুরদেবতার কথা আছে—যেমন মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, স্বর্ণলতা, এই সব। পড়লে দুদণ্ড মনটাও ভাল থাকে—পরকালেরও কায হয়।"

সুরেন্দ্র এই নির্ভীক স্বীকারোক্তি শুনিয়া হাসিতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে ঝি বলিল—"বউদিদি, ছোটবাবুর জল-খাবার এনেছি।"

টুনুরাণী তখন ক্ষিপ্রহস্তে টেবিল হইতে বই কাগজ সরাইতে সরাইতে বলিল—"নিয়ে এস ঝি।"

ঝি প্রবেশ করিয়া জলখাবার প্রভৃতি রাখিয়া গেল।

সুরেন্দ্র জলযোগে মন দিল। টুনু টেবিলে কাগজপত্র গোছাইতে গোছাইতে বলিল—"হ্যাগা—তুমি নাকি পরশু বিন্ধ্যাচল যাচ্ছ!"

"হ্যাঁ। খবরটি পেয়েছ এরই মধ্যে?"

"আমায় নিয়ে যাবে?"

"তুমি!—তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়ে কি করবে?"

"কি করব? লোকে তীর্থে গিয়ে কি করে আবার? ঠাকুর দেখ্‌ব।"

"আমি সেখানে হয়ত দুইএকদিন মাত্র থাকব। শুধু দাদাকে আন্‌তে যাওয়া। দুইএকদিন থেকেই চলে আসব।"

"আমি কি বলছি, আমি সেইখানেই থেকে যাব? তোমরা আমাকে যতই বুড়ো মনে কর, তীর্থবাস কর্‌বার সময় এখনও আমার হয় নি। আমিও দুইএকদিন থেকেই তোমার সঙ্গে চলে আসব!"

জলযোগশেষে, গেলাসটি তুলিয়া ধরিয়া গম্ভীরভাবে সুরেন্দ্র বলিল—"না না—তুমি গিয়ে কি করবে?"

"বলছি ত—ঠাকুর দেখ্‌ব। আর, মেজদাদাকে অনেক দিন দেখিনি—তাঁকেও দেখে আস্‌ব।"

"বঙ্কুদাদা? তিনি বিন্ধ্যাচলে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন সেখানে আছেন?"

"দিনপনেরো হবে। আজই তাঁর চিঠি পেয়েছি।"

জলপানান্তে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সুরেন্দ্র বলিল—"ভালই হল। ঠিকানা কি লিখেছেন?"

"মনে নেই। চিটিখানা আনব?"—বলিয়া টুনু চলিয়া গেল। চিঠি আনিয়া স্বামীকে দেখাইল। ইহা তিনদিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল হইতে লেখা। পড়িয়া সুরেন্দ্র বলিল—"ভালই হল। বঙ্কুদাদার ওখানে গিয়েই উঠব।"

টুনু বলিল—"সে ত হোটেল। আমি তবে কোথায় থাকব? বরং দাদাকে টেলিগ্রাফ করে দাও—দুচার দিনের মধ্যে আমাদের থাক্‌বার মত একটা বাড়ী যেন ঠিক করে রাখেন।"

পান মুখে দিয়া সুরেন্দ্র বলিল—"না—না—পাগল!—তুমি কোথা যাবে!"

বারম্বার এক কথা! ক্রমাগত নিষেধ—নিষেধ—কেবল না—না। এবার টুনুরাণীর অভিমান হইল। রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল,—"আমি পাগল! আমি কোথা যাব!—কোথায় নিয়ে যেতে বল্লেই আমি পাগল! উনি সব জায়গায় যাবেন, আমায় কোথাও নিয়ে যাবেন না। এই সেদিন কল্‌কাতায় গেলেন—আমি এত করে বল্লাম, ওগো আমায় নিয়ে চল, শনিবার আছে, থিয়েটার দেখে আসি, তা নিয়ে যাওয়া হল না। আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি!"—টুনুরাণীর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, কথা শেষ হইতেই ফোঁটায় ফোঁটায় গড়াইয়া পড়িল।

"ওকি! ওকি!"—বলিয়া সুরেন্দ্র তাহার বালিকা বধূর হাতটি ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল। রুমাল দিয়া চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা—এবার যখন কল্‌কাতা যাব, তোমাকেও নিয়ে যাব। শনি-রবি দুরাত থিয়েটারে যেও।"

টুনু হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"না—আমি বিন্ধ্যাচল যাব।"

এই সময় দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠে করতাড়না করিয়া ঝি বলিল—"ছোটদাদা বাবু—আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকে কে এসেছেন।"

সুরেন, টুনু—দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সুরেন বলিল—"কে ঝি?

ঝি বলিল—"বঙ্কুবাবু!"

টুনু বলিয়া উঠিল—"মেজ্ দা এসেছেন!"

"মেজ্ দা!"—বলিয়া সুরেন্দ্র ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। মহাসমাদরে শ্যালকের হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"বঙ্কুদাদা, ব্যাপার কি? কি বিপদের কথা আপনি বলবেন, আমি ত কিছুই অনুমান করতে পারছিনে।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন,—"এখানে বলব? কেউ যদি শুনতে পায়? বড় গোপনীয় কথা।"

"না, এখানে কেউ আসবে না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

বঙ্কুবাবু তখন সকলকথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া সুরেন্দ্র বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিল।

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"ভাই, এর উপায় কি করা যায়!"

সুরেন্দ্র যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল; কোনও উত্তর করিল না।

বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন—"আমি আজ দুদিন ক্রমাগত ভাবছি। দুশ্চিন্তায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ হবার উপক্রম হয়েছে। কোনও দিকে কূলকিনারা দেখছিনে। এ সকল বিষয় তেমন কিছু জানিও না। তবে সহজ-বুদ্ধিতে যা মনে হয়, ঐরকম, কি ওরচেয়ে বেশী ক্ষমতাপন্ন কোনও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী যদি পাওয়া যায়, তা হলে ঐ যজ্ঞ নিষ্ফল করবার জন্যে তাঁকে দিয়ে কোনও ক্রিয়া ট্রিয়া করান যেতে পারে। কিন্তু সে রকম লোকই বা হঠাৎ খুঁজে পাই কোথা? তুমি কাউকে জান?"

সুরেন্দ্রনাথ নীরবে শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল—'না।'

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন,—"আরএক উপায় হতে পারে; কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কি না জানি না। আমরা সবাই—তুমি, আমি, টুনু—বিন্ধ্যাচলের সেই সাধুবাবার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি। সকল কথা তাঁকে জানাই। 'বলি—বাবা, সে কোনও অপরাধ করেনি, কোনও দোষের দোষী নয়—তাকে কেন নষ্ট করবেন আপনি? এই কচি মেয়েটা, একে আপনি কি অপরাধে এই বয়সে বিধবা করবেন?—টুনীর মুখ দেখলেও কি বাবার দয়া হবে না?—

তোমার কি মনে হয়?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিল,—"বঙ্কুদাদা, আপনি এই সব হাম্বাগ্ বিশ্বাস করেন? আমি রইলাম কোথায়, সে রইল কোথায়! কয়লা দিয়ে লোহার তাওয়াতে আমার মূর্ত্তি লিখে, 'মারয় মারয় শোণিতং পিব পিব' জপ করে, আমায় মেরে ফেলবে? এ আপনার বিশ্বাস হয়?"

"খুব বিশ্বাস হয়। মারণ, স্তম্ভন, উচাটন—এসব তন্ত্র-শাস্ত্রে লেখা রয়েছে যে ভাই। মুনিঋষিরা কি সব মিছে করে লিখেগেছেন?"

"আপনি পড়েছেন?"

"হ্যাঁ, অল্প সল্প কিছু পড়েছি। ওরকম হয়, তাও শুনেছি। এগারো রাত্রি ঐরকম প্রক্রিয়া করলে, রোগ উপস্থিত হবে—আর ঠিক একুশদিনের দিন মৃত্যু! না না—ওসব গোঁয়ার্ত্তুমি কোরোনা। আর তুমি, মুখে বলছ বিশ্বাস কর না, কিন্তু বুকে হাতদিয়ে বলদেখি ভাই, তোমার মনে ভয় হয় নি?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"বুকে হাত দিয়েই বলছি, কিছু ভয় হয় নি।"

"তবে অমন মুষড়ে পড়েছ কেন? মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছ কেন?"

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া সুরেন্দ্র বলিল—"দাদা, আমি কি তাই ভাবছি? আমি ভাবছি, আমার যিনি জ্যেষ্ঠ—যাঁর এবং আমার গায়ের রক্তমাংসহাড়গুলি পর্য্যন্ত একই বাপের কাছথেকে পাওয়া,—যিনি জন্মাবধি আমায় কত ভালবেসেছেন, কত স্নেহকরেছেন, নিজের খাবার থেকে কেটে আমায় খাইয়েছেন, আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিবাহ দিয়েছেন—তিনি এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে পড়লেন, যে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত!—এই ভেবেই মনে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। ভয়ে আমি মুষড়ে যাইনি, বঙ্কু দাদা!"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। ঝি আসিয়া সংবাদ দিল,—আহারের স্থান হইয়াছে।

মনের এরূপ অবস্থায় পাছে টুনুরাণী কিছু সন্দেহ করে, কি হইয়াছে জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাই সেরাত্রে

সুরেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করিল না। বহির্বাটীতে বঙ্কুবাবুর জন্য যেখানে শয্যাপ্রস্তুত হইল, তাহার নিকটেই ভিন্ন শয্যাতে সেও শয়ন করিল।

শয়ন করিয়াও অনেক রাত্রি অবধি দুইজনে কথাবার্ত্তা হইল,—কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না। বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন—"তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি ত বিশ্বাস করি। আমার মনের শান্তির জন্য, উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য, আমার পরামর্শ তোমার শোনা উচিত।"

সুরেন্দ্র ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—"আচ্ছা দাদা—কাল যাহয় একটাকিছু উপায় স্থির করা যাবে।"

ভোর-রাত্রে সুরেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া, কেবল সে মনে মনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, হঠাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—"বঙ্কুদাদা—ও বঙ্কু দাদা!"

ডাকাডাকিতে বঙ্কুবাবু জাগিয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্র বলিল—"দাদা, বিন্ধ্যাচল যাওয়াই স্থির।"

শুনিয়া সুখী হইয়া বঙ্কুবাবুও উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"বেশ ভাই, তবে আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাত্রা করি চল—আর দেরী নয়।"

সুরেন্দ্র বলিল—"হাতে পায়ে ধরা নয় দাদা। আমি একটা উপায় স্থির করেছি।"

"কি উপায়?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"সে এখন বল্‌ছিনে। বিন্ধ্যাচলে গিয়ে শুন্‌তে পাবেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডাকগাড়ী বিন্ধ্যাচলে দাঁড়ায় না, তাই মির্জ্জাপুরেই নামিবার পরামর্শ ছিল। মির্জ্জাপুর হইতে বিন্ধ্যাচল আড়াইক্রোশ মাত্র—ঘোড়ার গাড়ীতে একঘণ্টায় পৌছান যায়।

পরদিন বেলা সাড়েদশটার সময় সকলে মির্জ্জাপুরে নামিলেন। নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে, সেখানে গিয়া স্নানাহার সারিয়া, বেলা তিনটার সময় বিন্ধ্যাচল যাত্রা স্থির হইল।

ধর্ম্মশালার দ্বিতলে দুইটি ভাল ঘর পাওয়া গেল। জিনিষপত্র ও মেয়েদের সেখানে রাখিয়া, পাকাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া বঙ্কুবাবু গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন।

স্নান করিতে করিতে বঙ্কুবাবু বলিলেন—"কি মৎলবটা করেছ, এইবার বল; শুনি।"

সুরেন্দ্র বলিল,—"আগে কাজটা হ'য়ে যাক্, তার পর শুন্‌বেন দাদা।"

"হয়ে গেলে শুন্‌ব?—দেখ্‌তেই পাব।"

"না দাদা—আপনার সেখানে যাওয়া হবে না।"

"আমি যাবনা?—কেন?"

"যে কৌশলটি আমি উদ্ভাবন করেছি—আপনি সঙ্গে গেলে তা পণ্ড হ'য়ে যাবে।"

বঙ্কুবাবু একটু ভীত হইয়া বলিলেন—"কৌশল? তাঁর সঙ্গে কি কৌশল কর্‌বে তুমি? ওহে, না না—কৌশল টৌশল কর্‌তে যেও না—তাঁরা হলেন সিদ্ধপুরুষ, হয়ত বিপদে পড়ে যাবে।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আপনি যা বল্‌ছেন, তাই যদি সত্য হয়, তাহলে বেশী বিপদে আর কি পড়্‌ব দাদা? মরার বেশী ত আর গাল নাই! কিছু ভাব্‌বেন না, দাদা—ঠিক কার্য্যউদ্ধার করে আস্‌ব।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"যা ভাল বোঝ কর ভাই—দেখো যেন বিপদ-আপদ ঘটিয়ো না। আমায় যেতে বারণ কর্‌ছ, আমি কি তা'হলে ধর্ম্মশালাতেই থাক্‌ব?"

"না, আপনিও আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাবেন। বিন্ধ্যাচলের বাজারে নেমে, আপনি দাদার বাসায় গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা-কর্‌বেন। আমি টুনুকে, বউদিদিকে নিয়ে অষ্টভুজা দর্শনে চলে যাব। সন্ধ্যা নাগাৎ দাদার বাসায় এসে পৌছব।

বঙ্কুবাবু মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"তোমার দাদার বাসায় আমি যাচ্ছিনে।"

"কেন দাদা?"

"কেন?—সে কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? যেব্যক্তি আপনার ভাইয়ের প্রাণ নিতে উদ্যত—সেই খুনীর সঙ্গে ব'সে আমি মিষ্টালাপ কর্‌ব? সে আমার দ্বারা কোন মতেই হ'বে না।"

কথাগুলি শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখ লজ্জায়, দুঃখে এতটুকু হইয়া গেল। বিষণ্ণ-স্বরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি তবে সেই হিন্দুনিবাসেই গিয়ে উঠ্‌বেন। দাদার সঙ্গে দেখা ক'রে, সন্ধ্যার পর আমি আপনার কাছে যাব এখন।"

আহারাদি শেষ হইলে বঙ্কুবাবু গাড়ী ডাকিতে গেলেন, সুরেন্দ্রনাথ একটু নূতনতর বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল। সৌখীন পাঞ্জাবী কোর্ত্তাটি খুলিয়া ফেলিয়া প্রথমে একটা টুইলের টেনিস্ শার্ট, তাহার উপর একটা গলা-খোলা ইংরাজী কোট পরিধান করিল। কোটের বুকপকেটে একটা পেন্সিল গোঁজা পকেটবুক ভরিয়া দিল। মস্তকের বামভাগে সচরাচর যেরূপ টেড়ি কাটিত তাহা মুছিয়া ফেলিয়া ঠিক মাঝখানে চেরা সিঁথি কাটিল—কপালের কাছে দুই ধারের চুল বুরুষের সাহায্যে দুইটি শিঙের মত উচ্চ করিয়া দিল। পাম্প-সু ছাড়িয়া, সুতি মোজার উপর এক জোড়া নালবাঁধা হাতীকাণের বুটজুতা পরিল। কার্‌শুদ্ধ সোণার পাঁস্‌নে যোড়া চশ্‌মাটি খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিল। একখানা আধময়লা রেশমী চাদর গলায় জড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কুবাবু ফিরিয়া আসিয়া তাহার চেহারা দেখিয়া অবাক্। বলিলেন "একি সাজ? গলা-খোলা কোট, এ শার্ট, এ বুট, পেলে কোথা? কোনও দিন ত তোমায় এ সব পর্‌তে দেখিনি!"

"চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করে এনেছি। আজ আমি সে সুরেন নই। আজ আমি কে জানেন দাদা?"

"কে?

শ্যালকের কাণে কাণে সুরেন্দ্র বলিল—"পাটের দালাল।"

বঙ্কুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি যে মৎলব করেছ, কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা। দেখো ভাই, সাবধান; চালাকি কর্‌তে গিয়ে যেন সাধুবাবার অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এস না।"

গাড়ী আসিয়াছিল। ধর্ম্মশালার ভৃত্যগণকে বখ্‌সিস্ করিয়া, জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া ইঁহারা রওয়ানা হইলেন। সুরেন্দ্রের অনুরোধসত্বেও বঙ্কুবাবু গাড়ীর ভিতরে বসিলেন না—কোচবাক্সে উঠিয়া ছাতা মাথায় দিয়া, কোচম্যানের পাশে বসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথা-পরামর্শ বঙ্কুবাবু বিন্ধ্যাচলের বাজারে নামিয়া গেলেন, গাড়ী অষ্টভুজা-অভিমুখে চলিল।

অষ্টভুজা-পাহাড়ের নিম্নে পৌছিলে, সুরেন্দ্রনাথ সাধু-বাবার আশ্রমটি অনায়াসেই চিনিতে পারিল—বঙ্কুবাবু উত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। পাহাড়ে উঠিয়া প্রথমে ইঁহারা অষ্টভুজা-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। মন্দিরটি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গহ্বর-বিশেষ। মূর্ত্তির দক্ষিণভাগে গহ্বরের একটা স্থান হইতে এক সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই—ভিতরটা মহা অন্ধকার। পুরোহিত প্রদীপ লইয়া, সুরঙ্গের মুখে ধরিল—কতকটা অংশে আলোক পড়িল বটে—তাহার পর আবার অন্ধকার। দেখিয়া টুনুরাণীর বড় ভয় করিতে লাগিল।

দর্শন শেষ করিয়া সিঁড়ি দিয়া পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে সুরেন্দ্র বলিল,—"বউদিদি, ঐযে নীচে আমগাছগুলির মধ্যে একখানি একতালা পাকা বাড়ী দেখ্‌ছ, শুনছি ওটা একটি সাধুর আশ্রয়। তিনি নাকি একজন সিদ্ধপুরুষ —আর, খুব্ ক্ষমতা-টমতা আছে। যাবে, ওঁকে প্রণাম কর্‌বে?"

বউদিদি খুকী হইয়া বলিলেন—"চল না ভাই।"

আর কয়েকটি সিঁড়ি নামিয়া সুরেন্দ্র বলিল,—"আচ্ছা, বউদিদি প্রণাম কর্‌তে হ'লে, কিছু প্রণামীও দিতে হয় ত?"

"দিতে হয় বৈকি! শুধু হাতে কি প্রণাম কর্‌তে আছে?"

সুরেন্দ্র পকেট হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া বউদিদির হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই নাও—তোমরা দুজনে পাঁচটাকা করে প্রণামী দিও।"

সাধুবাবার আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে সুরেন্দ্রের ভাড়া গাড়ীখানিও অপেক্ষা করিতেছিল। নামিয়া, আশ্রমের দিকে কোচম্যানকে ইঙ্গিত করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইল। দূর হইতে দেখিল, আশ্রমের বারান্দায় বিপুল কলেবর জটাজূটধারী একব্যক্তি বসিয়া আছেন, একজন ভৃত্য তাঁহাকে পাখা করিতেছে। অল্পদূরে তিনচারি জন হিন্দুস্থানী ভক্ত করযোড়ে উপবিষ্ট; সুরেন্দ্র বলিল,—"উনিই

বোধ হয়, সাধুবাবা। ওখানে আরও সব লোকজন রয়েছে —তোমরা দুজনে প্রণাম করে গাড়ীতে এসে বসে থেক। আমি বাবার কাছে বসে একটু কথাবার্ত্তা কব এখন।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"আমরা তা হলে ত কিছুই শুন্‌তে পাব না।"

"কেন পাবে না? গাড়ী ঐদিকেই যাচ্চে। কাছেই গাড়ীখানা থাকৃবে এখন, তোমরা খড়খড়ি তুলে বেশ দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে।"

নিকটবর্ত্তী হইয়া বউদিদি বলিলেন,—"টুনীর কবে ছেলে হবে, জিজ্ঞাসা কোরো।"

ইঁহাদের লইয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। দেখিল, সাধুবাবা একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া, একটি ছবিকাটা পিতলের গেলাসে সিদ্ধিপান করিতেছেন। ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সাধুবাবা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলেন, ইহারা দরিদ্র নহে—সম্পন্ন-লোকের মত দেখিতে।

বারান্দার সমীপবর্ত্তী হইয়া ঝুঁকিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া সুরেন্দ্র বুট-যোড়াটির ফিতা খুলিল। জুতা ছাড়িয়া, স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া সহ ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিল।

সাধু-বাবা মোটা গলায় বলিলেন—"এস।" হিন্দুস্থানী ভক্তেরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দূরে বসিল। এক এক পা করিয়া কাছে গিয়া প্রথমে বউদিদি, পরে টুনুরাণী, টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সুরেন্দ্র কপট ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, বাবার পদপ্রান্তে একটি চক্ চকে গিনি রাখিয়া দিল।

সাধুবাবা বলিলেন—"জয়োহস্তু! মা অষ্টভুজা তোমাদের মঙ্গল করুন! বস। আরে চামারিয়া, একঠো দরী-উরী কুছ লাও ত রে।"

সুরেন্দ্র বলিল—"বাবা, ঐ আমাদের গাড়ী রয়েছে, এঁদের গাড়ীতে বসিয়ে রেখে আসি।"

যেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা।"

ইঁহাদের গাড়ীতে বসাইয়া, সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। ইহার মধ্যে ভৃত্য সাধুবাবার সম্মুখে একখানি শতরঞ্জ বিছাইয়া দিয়াছিল—সুরেন্দ্র তাহার উপর উপবেশন করিল;—বকো-ধার্ম্মিকের মত করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিল,—"যে রকম শুনেছিলাম—সেই রকম দেখ্‌লাম। বাবার দর্শনলাভ করে আজ কৃতার্থ হলাম।"

সাধুবাবা সহাস্যমুখে একবার দূরোপবিষ্ট সেই হিন্দুস্থানী ভক্তবৃন্দের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন,—"শুনছ ত তোমরা? শোন। দেশবিদেশে আমার কত নাম, তার প্রমাণ পেলে ত?"—পরমুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ী কোথা?"

গাড়ী হইতে বউদিদি শুনিতে না পান, এমন সাবধানতার সহিত অনুচ্চস্বরে সুরেন্দ্র উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, কল্‌কেতা।"

"বেশ। বাবুর নাম কি?"

সুরেন্দ্র আপনার প্রকৃত নামই বলিল—বউদিদি শুনিতে পাইবার মত স্বরেই বলিল।

"কি করা হয়?"

স্বর নামাইয়া সুরেন্দ্র উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, পাটের দালালী করি।"

"তোমরা কয় সহোদর?"

"আজ্ঞে আমি নিয়ে পাঁচটি। আমিই জ্যেষ্ঠ।"—এটাও পূর্ব্ববৎ অনুচ্চস্বরে।

"সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোক দুটি কে?"

"একটি আমার স্ত্রী"—(এই টুকু উচ্চকণ্ঠে)—"অন্যটি আমার স্ত্রীর দিদি।"—(এটুকু স্বর নামাইয়া)

"বেশ বেশ। এখানে কতদিন থাকা হবে?"

অনুচ্চস্বরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে স্বর তুলিয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে কাল এখান থেকে এলাহাবাদ যাব। এবছর আমাদের পাটের কাযটা খুব মন্দা কি না, তাই ভাবলাম, একবার তীর্থদর্শন করে আসি। অন্যবছর হলে এমন দিনে পূর্ব্ববঙ্গের নদীতে নদীতে নৌকো করে পাট কিনে বেড়াতাম। পথে আস্‌তে আস্‌তে দানাপুরে একজন লোকের মুখে বাবার মহিমার কথা শুন্‌লাম। তাই শুনে, ঐ শ্রীপাদপদ্ম দেখ্‌বার জন্য মনে ভারি আকাঙ্ক্ষা হল। বাবার দয়ায় সে আকাঙ্ক্ষা পূরণও হয়েছে। নৈলে বরাবার এলাহাবাদই চলে যেতাম। শুনেছি নাকি, বাবার অদ্ভুত-ক্ষমতা—আপনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—"কিছু না—কিছু না। তারা মা যা করান, তাই করি—যা বলান, তাই বলি।"

"শুন্‌লাম,—বাবা হাত দেখে যাকে যা বলে দেন, সব আশ্চর্য্য রকম মিলে যায়!"

"তারা মা বলান—তারা মা বলান। আমার ক্ষমতা কিছুই নেই বাপু। দেখি তোমার হাতখানি।"

সুরেন্দ্র দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া দিল; বাবাজী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া হাতখানি দেখিয়া বলিলেন—"ধনস্থান, পুত্রস্থান, পুণ্যস্থান অতীব শুভ। বিশেষতঃ পুণ্যস্থান। ধর্ম্মে মতি রেখ বাবা—তুমি সৌভাগ্যশালী পুরুষ।"

"আমার পুত্রকন্যা কয়টি হবে বাবা?"

হাতখানি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সাধু বলিলেন—"ঠিক করে বল্‌তে হলে, তোমার স্ত্রীর হাতখানিও দেখা প্রয়োজন।"

"আচ্ছা নিয়ে আসি"—বলিয়া সুরেন্দ্র উঠিয়া গেল; বউদিদিকে বলিল।

বউদিদি বলিলেন—"যা টুনী—হাত দেখিয়ে আয়।"

টুনু বউদিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ও গো মা গো—আমি যেতে পার্‌ব না। আমার বড্ড ভয় করছে।"

বউদিদি বলিলেন,—"তার আবার ভয় কিসের? বাঘ-ভালুক ত নয় যে, খেয়ে ফেল্‌বে। যা, নেমে যা।"

"নাগো দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—আমি যাব না।"

সুরেন্দ্র অগত্যা ফিরিয়া গেল। সাধুবাবাকে বলিল—"আমার পরিবার ভয়ে আস্‌ছে না।"

বাবাজী হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রের হাতখানি আবার গ্রহণ করিলেন। বলিলেন,—"পরমায়ু স্থানও মন্দ নয়।"

"কত বৎসর আমি বাঁচব বাবা?"—বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিল।

বাবাজী বলিলেন,—"চুয়াত্তর—সাড়ে চুয়াত্তর বছর বাঁচ্‌বে। কিন্তু বাবা, বছরখানেকের মধ্যে একটি যে বিষম ফাঁড়া দেখ্‌ছি।"

সুরেন্দ্র যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কি ফাঁড়া বাবা? কবে? কবে?"

"আগামী ভাদ্র মাসে। জল-ভয়!"

"আরে সর্ব্বনাশ! জল-ভয়? তা হলে বুঝতে পেরেছি। নৌকো করে পূর্ব্ববঙ্গ কোথাও পাট খরিদ কর্‌তে গিয়ে—বোধ হয়—"

বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"নৌকা-ডুবি।"

ভয়কম্পিত স্বরে সুরেন্দ্র বলিল—"কি সর্ব্বনাশ!—তা হলে এখন উপায় কি বাবা?"

"হোম করাতে হবে।"

"হোম?—তা বেশ ত।"

"কবে সুরু করা দরকার?"

"যত শীঘ্র হয়। যত দেরী হবে, তত খারাপ হবে।"

সুরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"তাই ত!"

বাবাজী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—"তার জন্য অত চিন্তিত হ'চ্ছ কেন? তোমার জানা তেমন কোনও ভাল লোক না থাকে, আমিই করে দেব এখন। কিন্তু ছ' মাস লাগবে।"

সুরেন্দ্র পুনর্ব্বার করযোড়ে বলিল,—"তা হলে বাবা, মাস-খানেক পরে, দয়া করে যদি আমার কলকেতার বাড়ীতে আসেন।"

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন,—"দুচার দিনের ত কায নয় বাপু—ছ—ছ'টি মাস লাগ্‌বে যে। ছ' মাস কি আমি এ আশ্রম ছেড়ে অন্যকোথাও থাকতে পারি? ভক্তেরা তা হলে প্রাণে মারা যাবে যে। তুমি বাড়ী ফিরে, আমায় টাকা পাঠিয়ে দিও—আমি এইখানে বসে হোমটি করে দেব।"

"তা বেশ, সেও মন্দ নয়। তা যদি করেন, তবেত বড়ই ভাল হয় বাবা। কত টাকা লাগ্‌বে?"

"আপাততঃ শ' খানেক হলেই কায আরম্ভ করা যাবে। পরে, যেমন যেমন লাগ্‌বে, আমি তোমায় জানাব।"

"সবসুদ্ধ কত লাগ্‌বে?"

মনে মনে হিসাব করিয়া বাবাজী বলিল,—"সাড়েতিন শো আন্দাজ। ছ' মাস ধরে হোম করতে হবে কি না। প্রতি অমাবস্যায় হোম হবে—এক রাত্রে একমণ ঘি পুড়ে যাবে। ছ' মণ গাওয়া ঘিয়ের দাম ধর ছ পঞ্চাশং তিনশো—ঘিটে এদিকে সস্তা।—আর অন্যান্য খরচ পঞ্চাশটে টাকা রাখা গেল!"

"বেশ বাবা। তা হলে এলাহাবাদে আমি আর বেশী দেরী করব না। বাড়ী ফিরে, হপ্তা-খানেকপরেই মনি-অর্ডার করে আপনাকে একশো টাকা পাঠিয়ে দেব। এ বিপদে যাতে উদ্ধার হই, বাবা তাই আপনাকে কর্‌তে হবে।"—বলিয়া বাবাজীর পা জড়াইয়া ধরিল।

বাবাজী বলিলেন—"কোনও শঙ্কা কোরো না। আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি।"

"বাবা, দয়া করে তা হলে আপনার নাম ঠিকানাটি লিখে দিন—মনি-অর্ডারে লেখবার জন্যে।"

"তা দিচ্ছি—আরে চামারিয়া, কলমদান আউর কাগজ লে আও তো রে।"

চামারি কাগজকলম আনিয়া দিল। বাবাজী লিখিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় সুরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"বাবা একটা নিবেদন আছে।"

"কি বল।"

"আমার হাত দেখে যা যা বল্লেন, সব ফলগুলি যদি দয়া করে শ্রীহস্তে লিখে দেন, তা হলে স্মরণ রাখবার পক্ষে বড় সুবিধা হয়। লিখে, শেষে আপনার নাম ঠিকানা তারিখও বসিয়ে দিন—তা হলে ঐ একখানি কাগজে দুই কাযই হবে।"

"ফলাফলও লিখে দেব? আচ্ছা বেশ। সংস্কৃতে লিখব, না বাঙ্গলায়?"

"সংস্কৃত আমি কি বুঝ্‌ব বাবা, মুখ্যু-সুখ্যু মানুস! দয়া করে বাঙ্গলাতেই লিখে দিন।"

বাবাজী তখন কাগজ লইয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া লিখিলেন। পরে তাহা সাবধানে একবার পাঠ করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। সুরেন্দ্র মনে মনে পড়িল,—

"শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দত্তস্য করকোষ্ঠি বিচারফলমেতৎ লিখ্যতে। ধনস্থান, পুত্রস্থান, পুণ্যস্থান, অতীব শুভ। পরমায়ু চুয়াত্তর বর্ষ পাঁচ মাস দ্বাবিংশতি দিবস। আগামী সৌরবর্ষস্য ভাদ্রে মাসি শ্রীমানের একটি গুরুতর ফাণ্ডা দেখা যায়। জলপথে নৌযাত্রায় বিপদ-সম্ভাবনা কিন্তু যথা-শাস্ত্র হোমাদি অনুষ্ঠান করিলে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেক।

লিখিতং শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী—মোং বিন্ধ্যাচল, অষ্টভুজা পাহাড়ের নিম্নে কালিকাশ্রম। তাং ১৬ই আশ্বিন।"

কাগজ লইয়া প্রণামান্তে সুরেন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বধূদ্বয়কে লইয়া সুরেন্দ্র যখন বিন্ধ্যাচলে দাদার বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানায় দেখিল, বঙ্কুবাবু বসিয়া আছেন।

এখানে তাঁহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কতক্ষণ? দাদা কৈ?"

বঙ্কুবাবু বলিলেন,—"তোমার দাদা মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে গিয়েছেন। মেয়েদের বাড়ীর মধ্যে রেখে এস।"

বাড়ীর ভিতর হইতে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলে বঙ্কুবাবু বলিলেন,—"ওদিকের খবর কি?"

সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কায হাসিল, বঙ্কুদাদা!—কেল্লা ফতে।"

"কি রকম?"

"এগারদিন মারণ ক্রিয়ার পর আমার কঠিন রোগ হবে, একুশ দিন পরে আমি মরে যাব—এই কথা ছিল ত?"

বঙ্কুবাবু অধীর হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—তা কি হল, বল।"

"এই দেখুন, বাবাজীর দস্তখতী স্বীকার-পত্র—সাড়ে-চুয়াত্তর বছর আমার পরমায়ু। একটা 'ফাণ্ডা' আছে বটে, তারও বছর-খানেক দেরী। এই দেখুন, বাবাজীর দস্তখৎ—এই দেখুন আজকের তারিখ। এখনও কালী শুকায়নি। কাগজখানি যে জাল নয়, খোদ্ বউদিদি তার সাক্ষী।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্র কাগজখানি বঙ্কুবাবুর হাতে দিল।

কাগজখানি পড়িয়া বঙ্কুবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে একটি বড় রকম নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"বাঁচা গেল!"

সুরেন্দ্র তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন বঙ্কুদাদা, এখন আপনার বিশ্বাস হল ত, লোকটা আসল জুয়াচোর?"

বঙ্কুবাবু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না।"

সুরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"অ্যাঁ! বলেন কি? এর চেয়ে কি বেশী প্রমাণ আপনি চান?"

বঙ্কুবাবু বলিলেন,—"এ থেকে এইমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তোমার দাদার মারণ-যজ্ঞটি মাঝখানেই শেষ হয়ে যাবে—আর বেশী অগ্রসর হবে না, পূর্ণাহুতি ঘটবে না।"

সুরেন্দ্র হঠাৎ কোনও উত্তর করিতে পারিল না। প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল নীরব থাকিয়া বলিল,—"আপনি হার মানালেন বঙ্কুদাদা! ধন্য আপনার সরলতা! সেকথা

থাক্। তার পর, আমরা আস্‌ছি শুনে দাদা কি বল্লেন টল্লেন ?"

"তোমার দাদার সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নি। আমি এসেছি আধঘণ্টা হবে। এসে শুন্‌লাম, তোমার দাদা বেরিয়েছেন। গাড়ী থেকে নেমে হিন্দু-স্বাস্থ্যনিবাসেই গিয়েছিলাম। সেখানে বসে বসে যতই এসকল কথা ভাবতে লাগলাম, ততই রাগ বেড়ে গেল। ভাবলাম—এরকম নির্লিপ্ত হয়ে থাকাটা কিছু নয়—যাই, চন্দ্রনাথকে দু চার কথা বেশ শক্তশক্ত করে শুনিয়ে দিইগে। ভালই হল। এবার ঐ লেখা তার নাকের উপর ধরে দিয়ে, আমার যা বলবার আছে তা বলে, চলে যাব।"

সুরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"না না বঙ্কুদাদা—তা করবেন না; সে হবে না।"

বঙ্কুবাবু কঠোরস্বরে বলিলেন—"কেন? হবে না কেন?"

"দাদা যে লজ্জা পাবেন।"

"লজ্জা পাবেন!—বেহায়ার কি লজ্জা আছে?"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না—না—সে হবে না।"

বঙ্কুবাবু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—"ঐ ত তোমার দোষ! তিনি তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, লজ্জা পাওয়ার চেয়েও অনেক গুরুতর দণ্ড তাঁর প্রাপ্য; তবে ত উপযুক্ত শিক্ষা হবে! তুমি না বল, আমি বলব।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"আপনার পায়ে পড়ি বঙ্কুদাদা—সে কোনমতেই হবে না। আমি হলাম তাঁর ছোটভাই—আমি তাঁকে লজ্জা দেব,—দুঃখ দেব? সেটা কি আমার উচিত? আমি ত কিছুই মানি টানিনে—নাস্তিক বল্লেই হয়। আপনি ত হিন্দু—আপনিই বলুন; আমি তাঁকে লজ্জিত অপমানিত করলে, আমার কি তাতে অধর্ম্ম হবে না?"

বঙ্কুবাবু রাগিয়া বলিলেন—"তিনি কি তোমার সঙ্গে খুব ধর্ম্মব্যবহার করেছেন?"

সুরেন্দ্র এবার একটু অধীর হইয়া বলিল,—"কি বলেন বঙ্কুদাদা!—একথার কি এই উত্তর?

বঙ্কুবাবু নীরবগম্ভীরভাবে বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"তা হলে—এ কাগজ তাঁকে দেখাচ্ছনা বল?—মারণযজ্ঞ যেমন চল্‌ছে, তেমনি চলবে?"

"না—তা নয়। একাগজ আমি তাঁকে দেখাব—শুধু তাঁর ভ্রমটি ভেঙ্গে দেবার জন্য। এ কাগজ দেখলে নিশ্চয়ই তাঁর মনে হবে,—যার সাড়েচুয়াত্তর বছর পরমায়ু সে এখনই মরবে কি করে? কাগজ দেখাব—কিন্তু আমি যে মারণ-যজ্ঞের কথা সবই শুনেছি, তা ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানতে দেব না। এ কাগজ দেখলেই দাদা বুঝতে পারবেন, ব্রহ্মচারী মশাই একটি আদত জুয়াচোর—যজ্ঞপূর্ণ করবার জন্যে তাঁর আর আগ্রহ থাকবে বলে বোধ হয় না।"

বঙ্কুবাবু উঠিতে চাহিলেন। সুরেন্দ্র বলিল,—"এখন কোথা যাবেন?—এইখানেই থাকুন—খাওয়া-দাওয়া করুন।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন,—"না ভাই—আমি যাই। তোমার মত আমার আত্মসংযম নেই—তোমার দাদাকে দেখলে, আমি কি বলে ফেলি, তার ঠিক কি? তুমি তখন রাগ করবে।"

এ কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। বলিল—"কাল সকালে স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

রাত্রি আটটার সময় চন্দ্রনাথবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; স্বীয় পূর্ব্বকৃত কার্য্যের স্মরণে অপরিমেয় লজ্জায় তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্র বুঝিল। সে তখন এমনভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, যেন কিছুই হয় নাই—যেন দুই ভ্রাতার মধ্যে সেই পূর্ব্বের স্নেহবন্ধন সমভাবেই দৃঢ় রহিয়াছে।

ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রের বউদিদিও আরামে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

এত বিলম্বে বাসায় পাকাদির ব্যবস্থা আরম্ভ করিলে, খাইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই চন্দ্রনাথবাবু বাজারে লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে বসিয়া থাকিয়া, ভাল লুচি ও কচুরি ভাজাইবে, কয়েক প্রকার আচার, কিছু মিষ্টান্ন এবং ভাল রাবড়িও একসের কিনিয়া আনিবে।

কুমুদিনী, স্বামী ও দেবরের কাছে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। দেশের কথা, পথের কথা, অষ্টভুজা-মূর্ত্তি-দর্শনের কথা—অবশেষে বাবাজীর আশ্রমে বিলম্ব হওয়ার কথা বলিয়া, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যা ঠাকুরপো, বাবাজী একখানা কাগজে কিসব লিখে যে তোমাকে দিলেন? বলেছিলে বাসায় এসে দেখাবে,—দেখালে না ত!"

বাবাজীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবা-মাত্র চন্দ্রনাথবাবুর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীর শেষ কথাটিতে আরও যেন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্র বলিল,—"সে আর দেখে কি হবে?—সে তোমাদের দেখে কায নেই।"

ব্যাপারটা গোপন করিবার প্রয়াসে কুমুদিনীর কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি রীতিমত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তখন নিতান্ত যেন অনিচ্ছার সহিত পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া, সুরেন্দ্র তাঁহার হাতে দিল।

কুমুদিনী, স্বামী ও দেবরের কাছে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন

চন্দ্রনাথবাবু "দেখি—দেখি" বলিয়া, কাগজখানি স্ত্রীর হাত হইতে লইলেন। মনে মনে পাঠ করিয়া তিনিও গোপনে একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কুমুদিনী কিন্তু কাগজখানি পড়িয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তাইত!—এ যে ভারি বিপদের কথা হল!—এখন উপায়?"

সুরেন্দ্র বলিল—"এই দেখ!—এই জন্যই ত তোমায় দেখাচ্ছিলাম না। ও সব বিশ্বাস কোরো না বউদিদি। সে বাবাজী হয় ত একটা ভণ্ড—আমি ওসব কিছু বিশ্বাস-ফিশ্বাস করিনে।"

বউদিদি বলিলেন—"তুমি ত কিছুই বিশ্বাস করনা—ঘোর নাস্তিক। আহা, বাবার কেমন খাসা চেহারা!—আমার ত দেখে খুব ভক্তিই হল। না—না—এর একটা কিছু প্রতিকার করতে হবে বৈকি। কাল সকালে না হয় সবাই আবার তাঁর কাছে যাই চল। ফাঁড়াটা কাটাবার জন্যে কি রকম হোম-টোম করতে বলেন, জিজ্ঞাসা করে আসি। হাঁা গা—তুমি কি বল?"

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রও প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা দাদা! আপনি এই কালিকানন্দকে দেখেছেন?"

মাথাটি অবনত করিয়া ক্ষীণস্বরে চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, —"না। তবে—তবে—লোকের মুখে অনেক—শুনি বটে।"

"লোকে কি বলে? সত্যি সাধু—না ভণ্ড?"

চন্দ্রনাথবাবু ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—"সবাই ত—বলে—আসল ভণ্ড।"

সুরেন্দ্র তখন উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল—"শুনলে বউদিদি! শোন। আমারত দেখেই মনে হয়েছিল, লোকটা জোচ্চোর। তোমাদের এত সহজে কি ক'রে বিশ্বাস হয়, কে জানে! মেয়েরা যদি গেরুয়াপরা ছাইমাথা জটাধারী কাউকে দেখ্‌লে—অমনি, ভক্তিরসে গলে গেল—ধরে নিলে ইনিই এ যুগের প্রধান অবতার।"—বলিয়া সুরেন হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথবাবুও সে হাসিতে যোগ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তেমন কৃতকার্য্য হইলেন না।

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শনের পরামর্শ হইল। বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও বঙ্কুবাবু ইঁহাদের সঙ্গগ্রহণ করিলেন না।

কবি-বিজয়

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.

করিয়াছে জয় কাশ্মীর-পতি দর্পী ললিতাদিত্য
কনোজ-রাজের রাজ্য-কিরীট আসন-প্রাসাদ-বিত্ত।
যশোবর্ম্মারে করেছে বন্দী,
বলেছে—'কিছুতে হবেনা সন্ধি',
কান্যকুব্জে আঁধার হয়েছে প্রজার নয়ন-চিত্ত।

সারা দেশ হায় করে হাহাকার, শেষ হয়ে গেছে দ্বন্দ্ব,
নৃপতি, নগরে করিল ঘোষণা অরুণ নয়ন, ক্রুদ্ধ;—
'বিজিতের যেবা গাহিবে কীর্ত্তি,
হবে তার চির-দাস্যবৃত্তি,
হবে লাঞ্ছিত কঠোর দণ্ডে—কারাগারে র'বে রুদ্ধ।'

ঘুরে দূতচর গোপনে খুঁজিয়া কেবা করে নামগন্ধ,
যশোবর্ম্মার যশোমঙ্গল-সঙ্গীত আজি বন্ধ!—
কে রাখে প্রহরী প্রাণের কক্ষে?
চলে তাঁর পূজা বক্ষে বক্ষে,
ছল ছল করে চক্ষে চক্ষে উছসিত প্রেমানন্দ।

বহ্নিভূতি কবি, দীন সে চারণ মানেনি ঘোষণা-ডঙ্কা,—
গায়িছে মহিমা যশোবর্ম্মার, করেনা কারেও শঙ্কা।
বলে—"রে চারণ!" নৃপতি ক্রুদ্ধ,
"কারাগারে চির রহগে রুদ্ধ"।—
তবু সে যে গায় কনোজরাজের কীর্ত্তি সে অকলঙ্কা।

"চাপি ধরে বীণা আপন বক্ষে"

কারাগারে দেহে পড়ে প্রহরীর বিষজ্বালাময় বেত্র,
তবু যশোগান করে দিনমান, জলভরা দুটিনেত্র।
নিঠুর শাস্তি, কঠোর কর্ম্ম,
ছাড়াতে পারেনি তেজের ধর্ম্ম,
দারুণ বজ্র-বর্ষণে তবু ত্যজেনি আপন ক্ষেত্র।

কারাগারে কবি সাধ করিয়াছে যশসঙ্গীত-তন্ত্রী,
নরপতি কহে,—"কেড়ে নিতে তাহা বলে দাও দেখি মন্ত্রী
ভাবগুলি সব করিবে ছিন্ন,
করিবে বীণাটা শতধা ভিন্ন
না ত্যজিলে বীণা বলো তার হবে বীণাই জীবনহন্ত্রী।"

কবি কয়—"বীণা আমি ছাড়িব না, হোক্ মোর প্রাণদণ্ড;
গাব যশোগান মহাপুরুষের হোক্ দেহ শতখণ্ড"।—
চাপি ধরে বীণা আপন বক্ষে
আগুনের কণা ছুটিছে চক্ষে,—
"জয় জয় যশোবর্ম্মণ" গায়,—ভেসে যায় দুটি গণ্ড।

চলেছে মশানে হাস্যবয়ানে—পরিধানে বাস রক্ত—
ললাটে লোহিত-চন্দন করে বধের চিহ্ন ব্যক্ত,
জবার মাল্য কণ্ঠে ন্যস্ত,
চলে জল্লাদ পরশু-হস্ত—
"জয় জয় যশোবর্ম্মণ জয়।"— তবু গায় কবি ভক্ত।

উঠেছে পরশু শীর্ষে, চারণে কে রাখে কাহার সাধ্য!
হেনকালে আসি রাজা কয়—"মূঢ়, এখনও হও বাধ্য।"
কবি কয়—"মহাজনের কীর্ত্তি—
—সঙ্গীত যথা লভে নিবৃত্তি,
সেই নারকীর শাসনে আমার মরণই পরমারাধ্য।"

রাজা ছুটে আসি বুকে ধরি কয়,—"পদধূলি দাও শীর্ষে!
সত্যের লাগি বরে যে মৃত্যু বিশ্বে প্রকৃত বীর সে।
পারেনি যা' শতরূপাণ-চর্ম্ম,
করিয়াছে তাহা কবির মর্ম্ম,
নরপিশাচের ঝরায়েছ কবি আজি নয়নের নীর যে।

"যে দেশ তোমায় ধরেছে বক্ষে, সেই দেশ মহাপুণ্য!
কনোজ-নৃপতি, লভুক মুকতি, কারাগার হোক্ শূন্য।
দেবপুরে আমি এসেছি বৃত্র,
ক্ষমা করো মোরে পরমমিত্র,
ফিরে পা'ক্ সবে আপন বিত্ত—কেহ নাহি রয় ক্ষুণ্ণ।

"যশোবর্ম্মন্! লহ এ রাজ্য; চাহি নাকো কিছু অন্য—
এ মহাপুরুষে সাথে দিয়ে মোর কাশ্মীর কর ধন্য!
অন্য বিভবে নাহিক যত্ন,
চিনেছি যে আমি পরমরত্ন,
নিয়ে যাবো কবি—কনোজ-জয়ের পরিচয় বলি গণ্য।"

রাজা কয়,—"প্রভু শীর্ষ আমার চারণে করেছে খর্ব্ব
পরাণদাতারে দিয়ে দাও দেব, নিয়ে যাও বাকী সর্ব্ব;
পথে ঘাটে মাঠে যেজন গুঞ্জে
সে থাক্ আমার হৃদয়কুঞ্জে,
ও'রে বুকে ধরি বনে যেতে পারি—ও-যে কবিকুল-গর্ব্ব।

"লহ শ্রীকণ্ঠে, সভা-কবি মোর, কিরীট সে সভা-অঙ্গে,
কবি-সম্রাট্ হইবে সহায় সমর-ক্লান্তিভঙ্গে।
ঘোষুক কীর্ত্তি পুরাণ বৃত্ত—
'কনোজ-বিজয়ী ললিতাদিত্য,
ফেলিয়া রাজ্য-রতন-বিত্ত, সভা-কবি নিল সঙ্গে'।"

ভক্ত ও ভগবান

[শ্রীমতী আশালতা সেন গুপ্তা]

প্রস্ফুট কুসুম আমি, তুমি হও দেব!—
হৃদয়ের সৌরভ আমার।
আমার মাধুরী শুধু তুমি আছ ব'লে,—
সার্থকতা অস্তিত্বে তোমার।
আত্মহারা মুক্তকণ্ঠ বনপাখী আমি,—
সুস্বর লহরী তুমি তার,
আমার গৌরব শুধু তোমারি প্রকাশে—

আমি তব পদতলে মুগধা ধরণী—
তুমি ত' উজ্জল দিবাকর,
আমারে সজীব করি কিরণ-চুম্বনে
করিয়াছ শ্যামল সুন্দর।
আমার হৃদয় দেব! ব্যাকুলা তটিনী—
তুমি তো মহান্ পারাবার
[illegible] আছ—তাই ধন্য চির-স্রোতোধারা—

মন্ত্রশক্তি

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

[পূর্ব্বাবৃত্তি ঃ—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবোত্তর, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি পুজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবোত্তর ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে—নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি মৃগাঙ্ক ঐ সকল বিষয় পাইবে,—রমাবল্লভ নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিমাত্র পাইবেন। —কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না।

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না। স্নানযাত্রার 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীবল্লভের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন—অম্বর পদচ্যুত হইলেন। টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়; ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তর হয়! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন; তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল। মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল এবং অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন, এই সর্ত্তে, বাণী বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল।

[illegible] আগে, অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে [illegible] বিবাহ, কুশণ্ডিকা, সুসম্পাদিত হইয়া গেল। চুকিয়া গেল। পরদিন শাশুড়ী কৃষ্ণপ্রিয়াকে কাঁদাইয়া, শ্বশুরকে উন্মনা, বাণীকে উদাসী করিয়া অম্বরনাথ আসাম যাত্রা করিলেন।

বাণীর বিবাহের দুচারিদিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অজার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল;—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবনগতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল। গৃহাদি সংস্কার করিল—পূর্ব্বচরিত্র পরিবর্ত্তন-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের গৃহসজ্জাদিও দূর করিয়া দিল। অজা একদিন সহসা শশাঙ্কের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাতলে তাহারই নামাঙ্কিত একটি বাক্সমধ্যে এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া হার দেখিতে পাইল। পরক্ষণেই হর্ষে আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া সেই গৃহ হইতে সরিয়া গেল।

এদিকে অম্বর চলিয়া গেলে বাণীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বিবাহ-মন্ত্রের, শক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন তাহার মাতার মৃত্যু ঘটিল।

কৃষ্ণার বিরহে ও কন্যার বিষাদমূর্ত্তি নিত্যদর্শনে রমাবল্লভ জীবন্মৃত হইয়া আছেন। সহসা একদিন তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। কন্যাও সম্মতা হইলেন।—কালীদর্শন করিয়া, তাঁহারা চন্দ্রনাথ চলিয়াছেন। রেল পথে অম্বরের সহিত সাক্ষাৎ। পিতা, কন্যা ও জামাতাকে কথোপকথনের সাবকাশ দিবার উদ্দেশ্যে ছলে অপর গাড়ীতে গেলেন; কিন্তু অম্বর ও বাণীতে বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তাই হইল না। পরে অম্বর কার্য্যব্যপদেশে নামিয়া গেলেন।—রমাবল্লভ আশা করিয়াছিলেন, এ অসম্ভাবিত দেখা-শুনায় কন্যা-জামাতার মিলন ঘটিবে, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হইল না, তাঁহারা পথ হইতেই বাড়ী ফিরিলেন।]

মৃগাঙ্ক আর সে-মৃগাঙ্ক নাই; অজার গুণে সে এখন নূতন মানুষ; লক্ষ্মীরূপিণী অজাকে সে হৃদয়-সাম্রাজ্যে অভিষেক করিয়াছে।

এদিকে বাটী ফিরিয়া বাণী যেদিন গোপীবল্লভের মন্দিরে প্রবেশ করিল, সেদিন হইতে সে আর কিছুতে সুখ পায় না, কেবল পরের জন্য কর্ম্মে একটু সুখ পায়! দরিদ্রের দুঃখ আজকাল তাহার প্রাণে বজ্রের মত বাজে—তাই গ্রীষ্মে জল, বর্ষায় ছত্র, শীতে শীতবস্ত্র দিয়া, সে কষ্টকে পায়ে ভূপ্ত করে।—তার পর, দরিদ্রের অভাব বুঝিয়া সে এক অন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিল।—এখন প্রত্যুষ হইতে মধ্যাহ্ন

আদরিণী বাণী, পতিপ্রেমের অমৃতসেকে—মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাবে—এখন স্নেহপ্রেমকরুণার জীবন্ত ছবি, তপঃপূতচরিত্রা ব্রহ্মচারিণী সতীরমণী—দুঃখী অম্বরের দুঃখিনী পত্নী!]

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বর্ষার প্লাবন বক্ষে বহিয়া চিত্ররেখা আপনার চির গন্তব্য-পথে প্রবাহিতা; ঘন মেঘে নদীতীরের গাছের মাথায় কালিমাখা; তাহারি কোলে দুগ্ধশুভ্র বকের শ্রেণী তারকা-বিন্দুর মত ছোট ছোট দেখাইতেছিল। বাণী সেই মেঘময় বেণী-এলাইত নববর্ষায় নদীতীরে অবগাহন করিতে গিয়াছিল, সেখানে পরাণে জেলে তাহাকে হাজারটা প্রণামের সহিত দাদাঠাকুরের সহিত তাহার সখ্যতার সংবাদ প্রদান করিয়াছে। সে খবর আজ তাহার কাছে একটা স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের সংবাদের চেয়ে কম নয়। সে ঘরে ফিরিয়াও সেই কথা ভাবিতেছিল। মানুষকে ভালবাসিতে জানিলে কত সুখ!—সুখ না দুঃখ?—না—সুখ বই কি! অজ্ঞতার সুখের চেয়ে জ্ঞানের দুঃখও শ্রেষ্ঠ। জন্মান্ধের চেয়ে আলো দেখিয়া অন্ধকারে ডোবা মঙ্গল। নহিলে সে অন্ধকারে সে অভাগা ধ্যান করিবে, কোন জ্যোতির্ম্ময়ের?

ছাদের কার্ণিসে মুক্তাবিন্দু সাজান, জানালায়ও তেমনি মুক্তামালা সাজান! সে বারেক তাহার মধ্য দিয়া বনবাজী-নীলা দূর-পরপারে দৃষ্টিপাত করিল। বৃষ্টি অবসানের পরে রৌদ্রে আকাশের গায়ে ইন্দ্রধনু আঁকা রহিয়াছে। সে আলোয় সম্মুখের দেওয়ালে হরিবল্লভের বৃহৎ তৈলচিত্র যেন জীবন্ত মনে হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে নিকটে আসিল, সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে হইল, চিত্র যেন তাহাকে কি প্রশ্ন করিতেছে! কি প্রশ্ন?—সে লজ্জায় যেন মুখ তুলিয়া সেই চিত্রিত নেত্রের অপলক দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না। মনে পড়িল, দাদাবাবু তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "সতী-মায়ের মেয়ে, যেমন স্বামীর হাতে পড়িবে, তাহাকেই দেবতা মনে করিবে, অত খুঁৎ কাড়িতেছ কেন?" পিতা উত্তর দিয়াছিলেন, "সে কি কখনও হয়?"

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেইখানে চিত্রচরণে প্রণাম করিল; অস্ফুট স্বরে কহিল, "তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে দাদাবাবু! যখন বলিয়াছিলে, তখন আমার বড় রাগ হইয়াছিল; কিন্তু তখন বুঝি নাই, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়—অনেক জ্ঞানী। তুমি থাকিলেও হয় ত এমন হইত না।"

বাণীর মন আজকাল আবার বড় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই পত্র লিখিবার পর হইতে পাঁচ-ছয়-মাসকাল অম্বর,—প্রত্যেক সপ্তাহে একখানি করিয়া পত্র তাহার পিতাকে লিখিয়াছে। তাহাতে সে সংবাদ দিয়া আসিয়াছে,—"তাহার সমস্ত কুশল।" অন্ধবিশ্বাসে তাহারা তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতেছিল। তারপর ক্রমেই পত্র-সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল;—সপ্তাহ—পক্ষে পক্ষ—মাসে—ক্রমশঃ দেড় দুইমাস পর্য্যন্ত বিলম্ব হইল। একবার লোক পাঠাইয়া খবর আনা হইল। সে আসিয়া বলিল, "জামাই-বাবু খুব রোগা হইয়া গেছেন; জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, চিরকাল কি কেহ এ রকম থাকে? আমি বেশ আছি, বেশী কাজ, যাইতে পারিব না।" রমাবল্লভ কহিলেন, "রাধারাণী! এসো, আমরা সেখানে যাই!" বাণী দুই করতলে করতল নিপীড়িত করিয়া উত্তর করিল, "ঠাকুর-দেবতা ফেলিয়া, কেমন করিয়া, এখন যাইব বাবা? আজ বাদে কাল জন্মাষ্টমী, তারপর রাধাষ্টমী, তারপর ঝুলন, তার পর মায়ের বাৎসরিক আসিতেছে;—এখন থাক।"

যাইবার তো উপায় নাই—কেমন করিয়া সে যাইবে? স্বামীর ধর্ম্মে বাধা দেওয়া তো স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়! সে কি হীন-স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার মহর্ষি স্বামীর তপস্যাভঙ্গ করিতে যাইবে? গোপীবল্লভ! এ অধঃপতনের তীব্র লোভ হইতে তুমিই তাহাকে রক্ষা কর!

অবশেষে একদিন অকস্মাৎ আকাশের সাজন্ত-মেঘ অশনি প্রেরণ করিল।—অম্বরের নিকট হইতে পত্র আসিল, "বহুদিন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। কয়দিন ধরিয়া এই পত্রখানি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য পারিতেছি না। আজ স্থির করিয়াছি, ইহা শেষ করিতেই হইবে; নহিলে বোধ হয়, আর লেখা হইয়া উঠিবে না। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ইদানীং সময়মত পত্রাদি লিখিতে পারিতাম না, আজ আমি আপনাকে আপনার আদেশ-মত তাহার কারণ জানাইব।

"আপনার অনুমান যথার্থ, আমার শরীর অসুস্থ। এতদূর অসুস্থ যে, আজকাল আমি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে

শান্তি অনুভব করিয়া থাকি। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, তাই আরব্ধ কর্ম্মগুলির সমাপ্তির দিকেই সমস্ত হৃদয় দিয়াছিলাম। সর্ব্বদাই জ্বরভোগ করিতে হয়, যেটুকু ভাল থাকি, কাজ কর্ম্মই দেখি, সেই জন্য পত্রাদি দিতে পারি নাই। আমার সে ত্রুটি কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

"আজ আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আপনি আমায় অনেক দিয়াছেন। জীবনের সাধ আপনার দয়ায় পূর্ণ করিতে পারিয়াছি; নতুবা আমার মত দীনহীনের সাধ্য কি যে, এই সুমঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করি! যাহা কিছু দোষ, অপরাধ, অবাধ্যতা করিয়াছি, সন্তান বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার পক্ষে কষ্টকর হইবে বলিয়া যে সংবাদ দিতে বসিয়াছি, তাহা এখনও দিতে পারিতেছি না, কিন্তু না দিলেও নয়; তাই লিখিতেছি, আমার এ পত্রের উত্তর দিবেন না, দেওয়া বৃথা, দিলেও আমি তাহা পাইব না। আমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। ডাক্তার বলিয়াছেন, জীবনের কিছুমাত্র আশা নাই। দু'তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। সেই তিনটা দিন আমি ইচ্ছামত যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। জানি না, সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিব কি না। আপনারা কেহ আমার পত্র পাইয়া এখানে আসিবেন না, আসিলে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব ওইখানেই থাকিবেন। আমার এই একান্ত মিনতি ও শেষ অনুরোধ।—সেবক শ্রীঅম্বরনাথ।"

রমাবল্লভ এ পত্র শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। যখন বাণী আসিয়া তাঁহাকে দেখিল, সে তাঁহার মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। "বাবা, এ কি!—কি হইয়াছে?"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেওয়ালটা চাপিয়া ধরিল। একটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। রমাবল্লভ কথা কহিতে পারিলেন না, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত ভিতরে ভিতরে ছট ফট করিয়া, কেবল সেই সাংঘাতিক পত্রখানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাণী তাহা দেখিতে পাইল। সে সঙ্কোচমাত্র না করিয়া,সে পত্র তুলিয়া লইল এবং সেই পত্রের সহিত আর একখানা তাহার নাম-লেখা পত্র ছিল, রমাবল্লভ তাহা লক্ষ্যও করেন নাই। সে তাহা খুলিয়া ফেলিল। সেখানা এইরূপ,—

"কল্যাণবরাসু—

সেদিন তোমার করুণাপূর্ণ পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, আজ দিতেছি। পিতৃদেবের পত্রে সকল সংবাদ পাইবে। জীবনে তোমার কাছে যে কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিও। তোমার দেবভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেমে আমি তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম। মূর্খ আমি, বুদ্ধিদোষে সেই নিষ্ঠায় কত আঘাত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, মনে করিয়া, আজও মনে মনে সর্ব্বদা অনুতপ্ত হই! অযোগ্যের কোন গুরুভার গ্রহণ করা অনুচিত, এই শিক্ষা ইহাতে পাইয়াছি। আমার সে অজ্ঞতার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

"তারপর আজ একটি কথা বলিব, এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা অনুচিত হইবে বলিয়াই আজ এ পত্রের অবতারণা; কিন্তু ইহাতে আমাদের সত্যভঙ্গ হইল না তো? তা যদি হইয়া থাকে, কুম্ভীপাক নরকেও আমার স্থান হইবে না।

"সে কথা এই, আমি তোমার কাছে মূর্ত্তি-পূজার উপকারিতা অনুভব করিয়াছি! পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম, বিশ্বনাথকে মন্দিরে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা অনুচিত। কিন্তু বুঝিয়াছি, ইহা আমার ভ্রম! বিশ্বনাথকে বিশ্বেই পূজা করিতে হয়, কিন্তু চিত্ত-স্থির তাহাতে হয় না, তাই নিজের মনকে অবলম্বন দিবার জন্য, মনকে একনিষ্ঠ করিবার জন্য, আমাদের মূর্ত্তি বা ভাবরূপ কল্পনা করা প্রয়োজন। গঠিত বা অঙ্কিত অথবা জীবন্ত মূর্ত্তি তাহার প্রধান সহায়। ইহাতে হৃদয় একনিষ্ঠ ও তন্ময় হয়। বিরাট বিশ্বের সকলি যখন তাঁহার রূপ, তখন তাহার মধ্যে একাংশের চিন্তায় হানি কি? তাঁহার মস্তক, তাঁহার চরণ, তাঁহারি করাঙ্গুলি ভিন্ন সে তো আর কিছুই নয়! এখন তোমায় একটি শেষ কথা বলিয়া যাইব।

"আমার মনে হইত, মন্দিরের পূজায় একটু রাজসিক আয়োজন অধিকতর হইয়া পড়িয়াছিল—দেবতার নামে বৃথাড়ম্বর অনুচিত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। পরমেশ্বরকে পিতা, পুত্র, স্বামী, সখা অথবা মা—যে কোন নামেই পূজা কর, ক্ষতি নাই; কিন্তু যেমন পুত্রাদি আত্মীয়জনের প্রতিও বৃথাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার নিকটেও তাই। দ্রব্যগুণ মান তো? ঐশ্বর্য্য-সমাসীন হইয়া মন সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু

ঐশ্বর্য্যবানের ঐশ্বর্য্য কেবল নিজোদ্দেশে ব্যয়িত না হইয়া দেবোদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়াতেও কতকটা সার্থকতা আছে, এ কথাও আমি মানি। তবু মনে হয়, মন্দির বৃথা উপকরণের ভারে ভারী না করিয়া, সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ করিলে, সে মন্দির অধিকতর পবিত্র, সমধিক চিত্ত-শান্তিকর হইবে। ঐ অজস্র স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি কত দরিদ্র-নারায়ণের তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই! আমার মনে যে কথাটা উঠিয়াছে, যদি অনুচিত মনে হয়, নিজগুণে এই অকিঞ্চনকে ক্ষমা করিও।

"এখন বিদায়।—মনে কোন অতৃপ্তি নাই। তোমাদের দয়ায় এ জীবনে অনেক পাইয়াছি; ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাদের নিকট কত ঋণী! আমার মৃত্যুতে তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শুধু একজন বিশ্বাসী শুভার্থী, আমার সম্বন্ধে এই টুকু কখনও কখনও মনে পড়িলে স্মরণ করিও। তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিয়াছিতো! আমার মরণে লোকে তোমায় না বুঝিয়া বিধবা বলিবে—হয়ত দেশা-চারক্রমে কিছু ক্লেশ-ভোগও অনিবার্য্য! কিন্তু আমি জানি, তুমি চির-সধবা! যে ভগবানে প্রাণ সঁপিয়াছে, তাহার বৈধব্য ঘটিতে পারে না।

"তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ, পিতৃদেব যদি তোমায় সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতে চাহেন, তুমি আসিও না। ইহলোকে আর কখনও কোন অনুরোধ করি নাই—করিবও না। এই একমাত্র প্রার্থনা। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।—চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অম্বর।"

পত্র সমাপ্ত হইয়া গেলে বাণী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবৎসর পূর্ব্বে সেই শেষ দেখার দিনে সে ষ্টীমারের নির্জ্জন কামরায় আছড়াইয়া পড়িয়া, বুকফাটা কান্না কাঁদিয়া, তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ এই গভীরতর যন্ত্রণা তাহাকে নিঃশব্দে পাষাণে পরিণত করিয়াছিল। সমস্ত শরীরের স্নায়ুজাল অবসন্ন হইয়া, রক্তচলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, হস্তপদ অসাড়, হিম, ও মুখখানা কাগজের মত ধবধবে সাদা হইয়া গেল। অথচ সে তাহা জানিতেও পারিল না। সে কেবল একদৃষ্টে সেই পত্র, তাহার স্বামীর প্রথম, এবং শেষপত্রখানা দেখিতে লাগিল।

সে মৃত্যু শয্যায়?—আর সে সেইখানে তাহাকে তাহার সহিত শেষ দেখা করিতে যাইতেও নিষেধ করিয়াছে! তাহার স্বামী নিম্নআসামের জলাজঙ্গলে মরণাপন্ন হইয়া, অসহায় পড়িয়া,—আর সে এই খানে তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে! ভগবান! একি শাস্তি! একি প্রায়শ্চিত্ত! রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া এ কি কেহ—যতবড়ই সে পাপী হোক্—সহিতে পারে?

প্রাণের যন্ত্রণায় তাহার পাংশু ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; প্রাণহীন দেহের মত নিশ্চল শরীরে কেবল এই একটি মাত্র জীবিত চিহ্ন! "আমার মৃত্যুতে দুঃখিত হইওনা!" "লোকে তোমায় বিধবা বলিবে, কিন্তু আমি জানি তুমি চিরসধবা .....বৈধব্য ঘটিতে পারে না।" হা ভগবান! একি নিষ্ঠুর বজ্রাঘাত! যে এই পৃথিবীতে তাহার একমাত্র ধ্যান ছিল, যাহার জন্য তাহার এ সুখের জীবন—সাধের পৃথিবী—কণ্টককাননে পরিণত হইয়া গিয়াছে, সে আজ তাহার সেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায়-সংবাদে দুঃখিত হইবে না!

পৃথিবী! হায়, এই শতআশাউদ্দীপনাময়ী সাধের পৃথিবীতে সে আর কতক্ষণই বা আছে! সেই সুন্দর মূর্ত্তি—সেই মহৎ প্রাণ! সে আর কত অল্পক্ষণের মধ্যেই এই পৃথি-বীর কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে! সে "বিধবা হইবে না!" "শুধু লোকে বলিবে?" সে এই কথায় জানাইয়াছে যে, সে তাহার যথার্থ স্ত্রী—ধর্ম্মপত্নী নহে—শুধু লৌকিক একটা নিয়মে বদ্ধ ছিল মাত্র! বন্ধন কাটিয়া গেল! এ কি তাই! শুধু কি তাহাদের লৌকিক বিবাহ হইয়াছিল? আর কিছু নয়? সেই ষ্টেশনে সেই যে "আমার স্ত্রী" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, সেও কি লৌকিক? তাই যদি হয়, সেই স্বীকারোক্তিটুকুও যদি একটা বাহ্য শব্দ-মাত্রই হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া সেই প্রাণস্পর্শী সুরটুকু তাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ভালবাসা, বিবাহ ও পত্নীর কর্ত্তব্য যে কি বস্তু, তাহার সম্পূর্ণ শিক্ষাদান করিয়াছিল? সেই যে বিবাহের মন্ত্র, সেও তবে লৌকিক? যাহার প্রভাব তাহার মত কাল-সর্পীকেও বশীভূত করিয়া, তোমার প্রতি সকল তাচ্ছিল্য ভুলাইয়া, তোমার দাসানুদাসীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেও কিছু নয়! এ কি তোমার কুটিলতা-হীন হৃদয়ের যথার্থ কামনা?—অথবা ইচ্ছা করিয়া, তুমি

তোমার প্রতি অকথ্য অত্যাচারের শাস্তি তোমার স্বামীকে দিয়াছ? কই—সেভাব তো কোথাও নাই! একটু ব্যথা—এতটুকু অভিমান!—উঃ অসহ্য! এ অসহ্য! জন্মের মত চলিয়া গেলে—জানিয়াও গেলে না, সেই হৃদয়হীনা পাষাণী তোমায় সুখী করে নাই, তাই সেই পাপের জন্য কাল ব্যাপী মহাপ্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া সে কি তুষানলে দগ্ধ হইতে বাঁচিয়া থাকিল! একবার শুনিয়াও গেলে না সে আজ তোমায় কত ভালবাসে! ওগো এসো, এসো, শুনিয়া যাও—তুমিই তাহার সর্ব্বস্ব! ইহ-পরলোকের একমাত্র প্রার্থিত! শুধু সেই কথার প্রতিজ্ঞা এতদিন এ ব্যাকুলতা ঠেলিয়া রাখিয়াছে, প্রকাশ করিতে দেয় নাই! নহিলে এই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় কতপূর্ব্বে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিত, "আমায় ওচরণে স্থান দাও।" কিন্তু আজ সকলি বৃথা! সে নাই।—এ পৃথিবীর আর সবই তেমনি আছে, কিন্তু এর মাঝখানে হয়ত তাহার এতটুকু স্থানই আজ চির শূন্য!

রমাবল্লভ শিশুর মত কাঁদিয়া বলিলেন, "মা! চল, আমরা তার কাছে যাই।"

বাণীর চোখে জল আসিল না, সমস্তটা তাহার যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সে পিতার দিকে শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই রক্তহীন ওষ্ঠাধর মধ্য হইতে উচ্চারণ করিল, "আমার যাবার উপায় নাই বাবা, যাইতে হয়—তোমরা যাও।"

একটা কথা—একমাত্র শেষ-আশা তাহার আশাহীন অন্ধকার নৈরাশ্যের মধ্যে বিদ্যুতের শিখার মত মুহূর্ত্তে চকিত হইতেছিল; সে আশা—হয়ত এখনও সে বাঁচিয়া আছে। হয়ত এযাত্রা রক্ষা পাইয়া যাইতেও পারে। একখানা পত্রে তাহাকে সকলকথা প্রকাশ করিয়া লিখিয়া, তাহার নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে। যদি সময় থাকে, ভালও যদি সে না থাকে—তথাপি তো সে মরণের পূর্ব্বে জানিয়াও যাইবে, তাহার স্ত্রী তাহাকে ভালবাসে—প্রাণঢালিয়া ভালবাসে! সে কম্পিত হস্ত অনেক কষ্টে একটু স্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিল। প্রথমপত্রে সে গভীর ভালবাসাপূর্ণ সম্বোধনে আপনার রুদ্ধহৃদয়দ্বারের সমস্ত কবাটগুলা খুলিয়া একেবারে তাহার রমণী-হৃদয়ের মাঝখানটাকে মুক্ত করিয়া ধরিল। কেমন করিয়া মানসিক যুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, সেই মন্ত্রশক্তি—বাসরঘর—বিদায়—তারপর সকলের চেয়ে সেই শেষের সাক্ষাৎ—তাহার মুখে সেই "আমার স্ত্রী" এই স্বীকারোক্তি শব্দ, এসকল দিনের সকল কথাই সে নিজের প্রাণের তুলিকায় চিত্রিত করিয়া তুলিল। অশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত কম্পিত লেখনী প্রসূত সে পত্র, বরুণ-প্রিয়া বাণী একখানি করুণ জীবন কাহিনীর মত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সে পত্র পাঠান হইল না। সহসা তাহার স্মরণ হইল, এ পত্র যখন পৌঁছিবে, তখন হয়ত তাহার অবস্থা অধিকতর মন্দ হইতে পারে! হয়ত সেই দুর্ব্বল শরীর-মনে এই উচ্ছ্বাস বাক্যভারাবনত লিপি সে সহিতে পারিবে না; হয়ত তাহার ব্যাকুলতা তাহার স্নেহশীল চিত্তকে ব্যথিত করিয়া, তাহার মুহূর্ত্তগুলি বিষম অশান্ত করিয়াও তুলিতে পারে।

স্বার্থপরায়ণা বাণী!—আজ মমতাময়ী পত্নী, সে নিজের চেয়েও স্বামীর সুখের জন্য অধিক ব্যাকুল। না—তাঁহার শেষ-সময় শান্তিপূর্ণ হউক, তাহার তো সকলি যাইতেছে, এ আর এমন বেশি কি?

মনে বল হৃদয়ে ধৈর্য্য-সংগ্রহ করিয়া, সে সাবধানে আর একখানা পত্র লিখিল। তাহার এক অংশ এইরূপ,—"আমায় যাইতে নিষেধ করিয়াছ! সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই! কিন্তু তোমার প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপূর্ণ ভালবাসা-ভক্তিতে আমার হৃদয় আজ পূর্ণ। আজ তোমার এ অনুপস্থিতিতে পাবা। আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক! কৃপা করিয়া তোমার রোগশয্যার পার্শ্বে গিয়া তোমার সেবা করিবার অনুমতি দাও! তারপর যে আদেশ করিবে, মাথা পাতিয়া লইব। অভাগিনী স্ত্রীকে এত বেশী শুকতৃক হইতে বঞ্চিত করিও না। বিবাহ মন্ত্রে সুখদুঃখের অংশ দিতে তো স্বীকার করিয়াছিলে। এ জগতে এই একমাত্র শেষ-প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কি? তোমার কৃপাপ্রার্থিনী দাসী—বাণী।"

অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। এ পত্র যখন অম্বরের, নির্জ্জন কুটিরদ্বারে পৌঁছিল, তখন সে কুটির শূন্য পড়িয়া আছে, কেহ কোথায়ও নাই।

ত্রয়োস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বাণীর প্রথমপত্র যখন অম্বরের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তখন সে নিজের ছোট ঘরখানির মধ্যে জ্বরের যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, ম্যালেরিয়া-বিষদুষ্ট কালাজ্বর

তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে ভীষণ-বেগে আক্রমণ করিত, এখন আর আক্রমণের প্রয়োজন হয় না। তাহার অধিকৃত দুর্গে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সে এখন রাজার গৌরবে বসবাস করিতেছে এবং দিনে দিনে তাহার পাণ্ডু-পতাকা সগর্ব্বে বিজিতের সর্ব্বশরীরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এখন প্রতিদিনের মধ্যে অধিককালই তাহার সঙ্গীদের পদভরে সে দেহদুর্গ কম্পিত হইয়া উঠে। দিন-রাত্রের মধ্যে পাঁচসাত ঘণ্টামাত্র একটু ভাল যায়। এই অবসরকালও প্রত্যহ দিন দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

ম্যালেরিয়া যে শরীরে বাস করিয়াছে, তাহার অবস্থা ভগ্নগৃহের মত। নিত্য চূণবালি খসিতেছে, কখন পড়ে-কখন পড়ে, এমনি একটা ভয়। স্থান-পরিবর্ত্তন ভিন্ন এ রোগের প্রতিকার বা প্রতিষেধকও নাই। শ্বশুরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে একবার একজন ডাক্তার ডাকাইয়াছিল, ডাক্তার কতকগুলা কুইনিন গিলাইয়া দিয়া, এই উপদেশই দিলেন, কাজেই সে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আর ডাকাইল না।

যতক্ষণ জ্বরের কম্প হইতে থাকে, ততক্ষণ নিজের পুরাতন লেপখানি মুড়িদিয়া সে শতচ্ছিন্ন বিছানাটায় পড়িয়া কাঁপে। প্রবলতৃষ্ণা প্রাণপণে রোধ করে, কম্পের বেগে সর্ব্বশরীরে খাল ধরিতে থাকে, দ্বিতীয় কেহ কাছে নাই যে, একটু জল আনিয়া দেয়, অথবা বুক-পিঠের কাছটা চাপিয়া ধরিয়া কম্পের কষ্ট কথঞ্চিৎ নিবারণ করে। তারপর, আবার জ্বরের প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে সে উঠিয়া বসে। কোনদিন রাঁধিয়া দুটি মুখে দেয়, কোনও দিন অনাহারে পুঁথিপত্র খুলিয়া পড়াশোনায় মনোযোগী হয়; বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ইষ্টমন্ত্রজপ অথবা শাস্ত্রমীমাংসা করে।—আবার কোন সময়ে চকিতের মত একজনের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সে দিন জ্বরের ঘোরটা কাটিয়া গেলে, সে যখন চোক চাহিল, গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকার আলোকে সম্মুখে এক-খানা লেফাফার মত কি পড়িয়া আছে, দেখিতে পাইল। পত্রই তো! সাগ্রহে মাথা তুলিল। কাহার পত্র কিছুই জানা নাই, তথাপি কিসের যেন একটা আশা তাহাকে একটুখানি চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। রমাবল্লভের পত্রে সে এই খবরটুকু পাইবে—"রাধারাণী ভাল আছে।"

শুধু এইটুকু—আর কিছুই নয়—শুধু একটু কুশল-সমাচার—যাহার কুশল-কামনায় সে আজ এই আত্মীয়-স্বজন-বিবর্জ্জিত সেবাসুখহীন নিরানন্দ মৃত্যু বরণ করিতেছে, তাহার ভাল-থাকা সংবাদটুকুমাত্র। তার চেয়ে বেশি ইহলোকে আর কিছু পাওনা নাই। আর বেশিকিছু আবশ্যকই বা কিসের?

মস্তকের ভার তখনও সমান আছে, সে উঠিতে না পারিয়া ক্লান্তভাবে তৈলাক্ত উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া, চোখ দুইটা মুদিয়া ফেলিল! দৃষ্টি তখনও অস্থির ও জ্বালাময়। মনে মনে বলিল, "আর একটু হোক, এখন চোখেও দেখিতে পাইব না।" কিন্তু চোখ বুজিতে আবার সেই ট্রেণের দৃশ্যটা কেমন সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল! কি অপ্রত্যাশিত অতর্কিত সে সাক্ষাৎ! দয়াময়! মনের গোপন-দুর্ব্বলতাটুকুও কি তোমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না? আমার মনে বড় অহঙ্কার ছিল, আমার মনে সুখদুঃখের বিকার নাই! যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি। এ চিত্ত কামনাহীন! তাই সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিলে; বুঝাইয়া দিলে—বিশুদ্ধ প্রেম সান্নিধ্য খোঁজে না কিন্তু পরিচ্ছিন্ন জাগতিক ভালবাসামাত্রেই যত উচ্চ হোক, একবারে নিষ্কাম হওয়া অসম্ভব! একবার তাহাকে ভালকরিয়া দেখিতে সাধ হইত। কখনও তো তাহাকে তেমন করিয়া দেখি নাই। তাই দেখাইলে? এই দীনহীনের প্রতিও তোমার-কত দয়া! আহা! প্রভু! আমি যেন তোমার এ দয়ার যোগ্য হইতে পারি।'

এবার সেই আকস্মিক সাক্ষাতের পর হইতে অম্বরের মনে একটা সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে চকিতের মধ্যেই দেখিয়া বুঝিয়াছে, বাণীর মধ্যে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়া-ছিল। সে যখন প্রথম কামরার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তে সে লক্ষ্য করিয়াছিল—এক বৎসর পূর্ব্বে যে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যযুক্তা লাবণ্যময়ী কিশোরীকে সে নিজের পার্শ্বে দেখিয়াছিল, ইহার অঙ্গে আর সে অটুট স্বাস্থ্যের পূর্ণজ্যোতিঃ বিরাজিত নাই! অসংযত কেশকলাপমধ্যবর্ত্তী ভুবনমোহন মুখখানা তেমনি মোহময়, কিন্তু তাহার সুললিত গ্রীবারও গণ্ডের পরিপূর্ণতা ঝরিয়া গিয়াছে। সে ঈষৎ বেদনা পাইল। কেন এমন হইল? তারপর একবারের জন্য একমুহূর্ত্ত সে যখন তাহার দিকে চাহিল, সে বাহিরে অপরি-

বর্জ্জিত থাকিলেও ভিতরে ভিতরে সে যেন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে কি দৃষ্টি! সেই স্বাধীন অনুগ্রহ-ভাব, বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ কালোমেঘের মত উজ্জ্বল আঁখিতারা আজ একি নূতনভাবে নূতন ধরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত শান্তশীতল দৃষ্টি, কোমল কিসলয়ের মত পাতা দুখানির মধ্যে অর্দ্ধ-বিকশিত—অর্দ্ধাবরিত, তাহার ভিতর যেন কত গভীরতা—কত মাধুর্য্য—কত সঙ্কোচ-লজ্জা-ভয় একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আছে! জলভারাকুল মেঘের মত তাহা নিবিড়ভাবে হৃদয়কে বেষ্টন করে, সরস-আনন্দে পাগল করিয়া দেয়। এ কি পরিবর্ত্তন! এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি?—সে অর্দ্ধমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয় আজও তাহার মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। এ দৃষ্টি কি সংসারাতীত নয়!—ইহার প্রতি ঈক্ষণে পলেপলে স্নেহ—প্রেম—প্রীতি—করুণা এবং সতীরমণীর গভীর ভালবাসা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে! তাহার সে সংসারানভিজ্ঞ আপনাভোলা ভাব আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু কিসে কে তাহার এ পরিবর্ত্তন ঘটাইল? ইহা যথার্থই, অথবা সকলি তাহার রোগ-দুর্ব্বল মনের কল্পনা?

কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, দুইবারের চেষ্টায়, সে এবার উঠিয়া বসিল; তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারের নিকট পত্রখানা কুড়াইয়া লইল, তখনও তাহার হাত-পা দুর্ব্বলতায় কাঁপিতেছে। পত্রখানায় খামের লেখা অপরিচিত, ধীর হস্তে আবরণ-মোচন করিয়া সে বিষম উল্লাসে পত্র পাঠ করিল। পত্র বাণীর! তাহার স্ত্রীর! সত্য!—না, সে জ্বরের ঘোরে যেমন সব অসম্ভব অলীকের বিজৃম্ভণ নিত্যপ্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এও তাই?

যদি মিথ্যা হয় তাহাতেই বা কি ক্ষতি? এ সংসার একটু দীর্ঘকালব্যাপী স্বপ্ন মাত্র, আরতো বেশি কিছুই নয়! এ না হয় একটু ছোট স্বপ্নই হইল।

বিছানায় শুইয়া সে চিঠিখানা প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল, কিন্তু যে জিনিষটি তাহার ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা মিলিল না। পিতার আদেশ-পালন ভিন্ন সে পত্রে লেখিকার অপর কোন উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইল না। সহানুভূতি কিংবা তার চেয়ে আর কিছু বেশি,—না কিছু না।

তবুতো সে পত্র তাহার স্ত্রীর লেখা—সে সেই জড় পত্রখানাকে অতি সাবধানে যেন ঘুমন্ত শিশুটির মত সযতনে ধরিয়া, নিজের বালিসের নিচে রাখিয়া দিয়া, প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে উত্তর লিখিতে বসিল। প্রথমেই লিখিল, "চিরায়ুষ্মতী,—তোমার পত্র পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তুমি আমায় আসামের অস্বাস্থ্যকর স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছ, কিন্তু বাণী" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই সে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, এ কি করিতেছে! শতখণ্ডে কাগজখানা ছিঁড়িয়া জানালার বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে ছিন্নাংশগুলা ছড়াইয়া দিয়া, সে স্খলিত-পদে কুটিরের বাহির হইয়া গেল। যেন সেখানে থাকিলে, এই দুর্দ্দমনীয় লোভের হাত হইতে অব্যাহতি-লাভ করা অসম্ভব হইবে।

সে যখন কুটীরে পুনঃ প্রবেশ করিল, তখন চারিদিকে প্রবলস্বরে ঝিঁঝি ডাকিতেছে, কালো অন্ধকার-আকাশের গায়ে ছিটান আলোকবিন্দুর মত তারাগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অদূরবর্ত্তী ডোবার পচাজলের দুর্গন্ধ-বাষ্প উড়াইয়া মৃদুমন্দ বাতাস গাছের পাতা নাড়িতেছিল বলিতেছিল,—সর-সর—সর। "যে বাঁচিতে চাহিস, সে এখান হইতে সরিয়া যা।" দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সে নিত্যপ্রত্যক্ষ ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ করিল। "না! আমি এত হীন, এত ছোট আমি? না ক্ষুদ্র এ জীবনে এই একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে দাও, তার বিশ্বাসটুকু যেন রক্ষা করিয়া যাইতে পারি। সে এইটুকু বিশ্বাস আমার পরে রাখিয়াছিল যে, প্রতিজ্ঞা করিলে, সেটা পালন করিব। এ বিশ্বাস যেন আমা হইতে ভঙ্গ না হয়।" পরদিন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রমাবল্লভকে পত্র লিখিল। সে পত্র বাণী পড়িয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রোত্তর প্রতীক্ষা করা অসম্ভব। যে লোক পাঠান হইয়াছে, সে পৌঁছিয়া তার করিল, তাহার অর্থ "জামাইবাবু নাই। তিনি কবে গিয়াছেন ঠিক জানা গেল না।"

আর ঠিক জানিয়াই বা লাভ কি? কিন্তু এ তার আসিবার পূর্ব্বেই বাণীকে লইয়া রমাবল্লভ রাজনগর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তাই এ সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিল না।

বাণী নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল! সে বিদ্রোহী মনকে বুঝাইতে চাহিতেছিল, "এ আদেশ আমার স্বামীর

আদেশ—আমার রাজার—আমার দেবতার আদেশ—এ আদেশ আমি লঙ্ঘন করিব না। ইহপরলোক যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব বলিয়া শালগ্রাম, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি, আমার প্রতি তাঁহার এই একমাত্র আজ্ঞা—এ আমি কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিব! ইহাতে আমার প্রাণ যাক আর থাক, আমাকে এইখানে পড়িয়া থাকিতেই হইবে।”

তথাপি মন কি এ যুক্তির বশে থাকে? কেমন করিয়া সে ভুলিবে যে, তাহার চির-অনাদৃত স্বামী, দূর-আসামে নির্বান্ধব স্থানে রোগশয্যায় মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে,—আর সে তাহার প্রতি বুকভরা অসীম ভক্তিপ্রীতি লইয়া, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ-প্রতীক্ষায় এখানে পড়িয়া আছে! মহা-পাতকের একটুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবার সামর্থ্য নাই! না,—নিশ্চয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত পাপকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। জগতে এমন কোন মহাপাতক বা উপপাতক নাই, যাহার জন্য এমন নির্ম্মম প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতে পারে! তুষানলের চেয়েও এ ভয়ানক, দগ্ধক্ষতে লবণাক্ত করিলেও বুঝি তাহার জ্বালাও এমন অসহনীয় হয় না।

এমনি করিয়া ছুইটি দীর্ঘতর দিন রাত্রি কাটিলে, শেষে আর কিছুতেই সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া, একান্ত মুহ্যমান হতবুদ্ধি পিতাকে আসিয়া বলিল,—“বাবা, চল, আমি মাসীমার বাড়ী চাঁদপুরে নামিব, তুমি সেখানে যেও।”

রমাবল্লভ গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেবল কন্যার অসম্মতির জন্যও কতকটা বটে, এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াও কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়বৎ ঘরের মধ্যেই পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ জমিদার-সন্তানের পক্ষে সাধারণের মত অকস্মাৎ কোন একটা কাজ করিয়া ফেলা সহজ নহে। চিরভ্যস্ত পদ্ধতির হাতছাড়ান মানুষের নিজের ইচ্ছারও খানিকটা বাহিরে। কিন্তু এবার আর বিলম্ব হইল না, কন্যার সম্মতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। পাঁচজনে আপত্তি করিয়া বলিল, “সেকি! এমন করিয়া কোথায় যাইবেন! কোন উদ্যোগ নাই, কষ্টের একশেষ হইবে যে! আপনার প্রাণ, মহৎ-প্রাণ, একি আমি তুমি হেঁজি-পেঁজি কেউ যে, হুট করিতেই বাহির হইয়া পড়িব? কখন কি কষ্ট সহা অভ্যাস আছে!”

পুরোহিত পাঁজি খুলিয়া কহিলেন, “সম্মুখে যোগিনী লইয়া যাত্রা—এযে সাক্ষাৎ কালের সঙ্গে খেলা করা! এমন কর্ম্ম করিবেন না, আগামী পরশ্ব অতি উত্তম দিন আছে। মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি ফললাভ ঘটে।”

রমাবল্লভ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “দিনক্ষণ দেখার আর সময় রাখিনি—আত্মনাশ যাই হোক, আজ যেতেই হবে।”

বাণী নীরবে পিতার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধপত্রগুলি গুছাইয়া লইল, শুধু এইখানেই তাহার অসাড় চিত্তে একটু-খানি স্পন্দন জাগ্রত ছিল মাত্র।

পথে বাহির হইয়াও সে যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত শোকা-হত পিতার সঙ্গে চলাফেরা করিতেছিল, কিন্তু তাহার নিজের একটা নিজস্ব যেন তাহার মধ্যে আর বর্ত্তমান ছিল না। এ সংসারের মধ্যে তাহার জন্য আর কিছুই সঞ্চিত নাই। এখন এইটুকু মাত্র শুনিবার জন্য সে শুধু উৎসুক আছে যে, তাহার পত্র সময়ে পৌঁছিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার স্বামী তাহার মনের কথা শুনিয়া গিয়াছেন। সে এই একমাত্র প্রার্থনাই গোপীবল্লভের নিকট বিদায়কালে জানাইয়া আসিয়াছিল। ইহার বাহিরে?—এইটুকু ব্যতীত তাহার সারাপ্রাণ যেন মরিয়া গিয়াছিল। আর সে মৃত্যু শুধু তাহার আসন্ন-বিপদের আতঙ্কেই যে ঘটিয়াছিল, তাহাও নয়, সে বজ্রের সহিত আরও একটা অতি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরবাণ ছিল। সেটা তাহার স্বামী মৃত্যুশয্যায় তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, ক্ষমাহীন সান্ত্বনাপরিশূন্য যে শাস্তি দিয়াছেন, তাহারি অসহ্য স্মৃতি! সে জ্বালা ক্ষতের চেয়েও ঔষধের জ্বালার মত সকল কষ্ট ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেদিন এই সংবাদ আসিয়াছে, সেইদিনই সে তাঁহাকে অনন্তকালের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে! মৃত্যু হয়ত তাহাদের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার চেয়ে বেশি ব্যবধান সৃজন করিতে পারিত না; কিন্তু তাহার স্বামী নিজের হাতে যে গণ্ডী দিয়া চলিলেন,—ওগো সে যে তাহার এজন্মের এই ভীষণ শপথের চেয়েও দুর্ল্লঙ্ঘ্য!

মৃত্যুর নির্ম্মমহস্ত তাহাকে যথার্থ বৈধব্য প্রদান করিবার পূর্ব্বেই ব্যাধবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-পত্নীর মত তাহার সারাচিত্ত তাহার স্বামীর ক্ষমাহীন বিদায়-সম্ভাষণে অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া লুটাইতেছিল। পাছে মৃত্যুর পূর্ব্বের দিনগুলা তাহার সঙ্গ, তাহার সেবাগ্রহণে অশান্ত হইয়া

উঠে, সেই ভয়ে তিনি তাহাকে তাহার এই অভিশপ্ত জীবনের শেষ সান্ত্বনাটুকু হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন!—এই নিদারুণ স্মৃতি বক্ষে বহিয়া বাঁচা তাহার পক্ষে কি কষ্টকর,—অথচ তাহার মরণেরও কোন পথ নাই।

শিয়ালদহে ট্রেণে উঠিতে হইবে। পথ বড় দীর্ঘ, অসুবিধাজনক, ও বিপদ্‌-সঙ্কুল। আকাশ মেঘেভরা, ঝড়বৃষ্টি নিত্য হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, রমাবল্লভ ভাবিলেন, "এমন দিনে বাণীকে আমার কখনও ঘরের বাহিরে যাইতে দিই নাই, আর আজ কি না—আর আজ কি না তাহাকে মেঘনা-পাবে যাইতে হইবে! "নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কবিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল।

বাণী আকাশে ভীমকান্ত সজল জলদ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে ভাবিল, "মেঘনায় যদি তুফান উঠে, মন্দ হয় না।"

রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরার দ্বারে দাড়াইয়া রমাবল্লভ অতর্কিতদৃষ্ট বহুদিনের পরিচিত প্রিয়বন্ধু, বিখ্যাত ডাক্তার জগতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে আসন্ন-বিপদের সংবাদ দিতে দিতে বিষাদছবি কন্থার মুখের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময় কতকগুলা লোকে একখানা চারপায়া বহিয়া প্লাটফরমের উপর দিয়া তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল।

বাহকগণ একটা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিসের লোক এবং আর একটি ভদ্রলোক, বোধ হয় ডাক্তার হওয়াই সম্ভব, হন্‌হন্ করিয়া চলিয়াছে।

বাণী জানালার নিকটেই বসিয়াছিল। এতগুলা লোকের একসঙ্গে চলার শব্দেই হউক, আর কি হেতু বলা না, সে সেই সময় বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—শীর্ণ, দুর্ব্বল একটি লোকের দেহ চারপায়ার উপর শায়িত। দিনের আলো পূর্ণতেজে সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখের উপর পতিত হইয়া পাণ্ডুরতর দেখাইতেছিল। সেই অস্থিসার কঙ্কালের উপাধান-হীন-মস্তক বাহকগণের অসাবধান পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এধারে ওধারে গড়াইয়া পড়িতেছিল। একখানা হাত অবশ-ভাবে পাশের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার সরু লম্বা আঙ্গুলের শেষে দীর্ঘ নখ নীল মাড়িয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, কোন দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়শীল রোগ-যন্ত্রণার অন্তে হতভাগ্য চিরবিরাম লাভ করিয়াছে। বাহকগণের দ্রুত-গতি মন্দীভূত করণার্থ, সঙ্গের ভদ্রলোকটি হাঁকিয়া উঠিলেন, "ধীরেসে!"

বাণী নিঃস্পন্দলোচনে সেই অনাচ্ছাদিত শবের পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশ্চয় সেই লোকটি অনেকক্ষণ হইল মরিয়া গিয়াছে। মুখে এতটুকু একটু জ্যোতিঃও নাই। যেন কোন শোণিতপায়ী জীব নিঃশেষ করিয়া তাহার সারাদেহের রক্তটুকু শুষিয়া লইয়াছিল।

বাহকগণ অগ্রসর হইতেছিল। বাণী মুখ ফিরাইল,—আকস্মিক বাণবিদ্ধের মরণ আর্ত্তনাদের মত তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া সহসা একটা ধ্বনি উঠিল, "বাবা! ও কে বাবা? দেখ,—দেখ ওকে? হা ঈশ্বর! এ আমায় কি দেখালে!—এ কি দেখালে!"

রমাবল্লভ নিজের কন্যার দুঃখভারে একান্ত অভিভূত থাকাতে অত্যধিক অন্যমনা ছিলেন, সেইজন্য শববাহক বা শবদেহের প্রতি এযাবৎ তাঁহার দৃষ্টি বা মন আকৃষ্ট হয় নাই। এখন কন্যার এই আকস্মিক উত্তেজনার অভি-ব্যক্তিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চমকিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহাদের দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাঁহার কিছুই বোধগম্য হইল না। তথাপি বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন সমুদ্র-তরঙ্গের মত উত্তাল হইয়া উঠিল। অতিমাত্র ব্যস্ত-ভাবে ফিরিয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "কোথায় রাধারাণি! কোথায়,—কে?"

বাণী বেতসপত্রের ন্যায় সঘনে কম্পিত হইতেছিল; তবু সে নিজেকে স্থির রাখিবার চেষ্টায় বাক্যোচ্চারণ করিবার জন্য প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। অবশ অঙ্গুলি কোনমতে উঠাইয়া মৃতের দিকে দেখাইয়া দিয়া, তাহার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহির করিল, "ঐ যায় বাবা, এখনি কোথায় নিয়ে যাবে! ঐ খানে সে,—যাও—তুমি দেখ কি হলো!"—মহাভয়ে রমাবল্লভকে যেন জড়বৎ করিয়া ফেলিল। তিনি হয়ত তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে জগতিবাবুর আকর্ষণে চমক ভাঙিতেই আসন্ন বিপদের মধ্যে হতাশ্বাসের শেষসাহসও যেন তাঁহার এই কয়টি কথায় আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল। "এসো রমাবল্লভ! আমি তো চিনিনে, দেখদেখি—মায়ের সন্দেহ সত্য কিনা!

বিচিত্র জগতে সকলই সম্ভব যে!" রমাবল্লভ শবের মুখে দৃষ্টি-পাত করিয়াই বুকফাটাভাবে ডাকিয়া উঠিলেন—"অম্বর!—বাপ আমার!" সঙ্গের ডাক্তারটি তাঁহাদের ভাব দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন, "তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় পড়িয়াছিল, প্রাণ আছে বলিয়া বোধ হওয়ায় হাঁসপাতালে পাঠাইতেছিলাম। ইনি আপনাদের পরিচিত নাকি? আমার তো বোধ হয় ভ্রম করিতেছেন! এব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র! সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও নাই।—দেখিতেছেন—পরা-কাপড়খানি পর্য্যন্ত গরিবের মত!"—

জগতি-বাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, এঁর জামাই ইনি।—সে অনেক কথা এখন থাক। আমার বাড়ী হ্যারিসন্ রোডে—নিকটেই। চল, সাবধানে সেইখানেই লইয়া যাই। আমিও তো ডাক্তার। আমায় আপনারা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারেন! সেখানে ওঁর জন্য মানুষের সাধ্যে যা হয়, তার ত্রুটি হইবে না; চল—খুব সাবধানে লইয়া চল। খাট্‌টা যেন দোলে না—দেখিস্!"—ডাক্তার বন্ধু সাবধানে লম্বিত হাতখানা উঠাইয়া দিবার সময় চমকিয়া উঠিলেন! সে হস্ত একেবারে নাড়ীর স্পন্দনহীন, শবহস্তের ন্যায় শীতল!

রমাবল্লভকে গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, বাণী আসিতেছে। সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ওঠো মা!" সে কিছু না বলিয়া যন্ত্রচালিতের মত গাড়ীরমধ্যে উঠিয়া বসিল। তাহার একবার মনে হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে যেন ইহলোকে নাই, যমযন্ত্রণায় সে এই সকল বিভীষিকা-দর্শন ও দণ্ডভোগ করিতেছে।

জগতি-ডাক্তারের খুব নামযশ, অর্থ-ঐশ্বর্য্যও সেইরূপ। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার সিঁড়ি বাহিয়া, শববাহকগণ উপরতলায় উঠিয়া গেল। ডাক্তারবাবু হাঁকিলেন, "বাঁয়ে।" বামপার্শ্বের একটি প্রশস্ত কক্ষে তাহারা প্রবেশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে বাণীও তাহাদের অতিক্রম করিয়া, গৃহের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ঢুকিল। তাহার মনে ভয় হইতেছিল, হয়ত তাহাকে ইহারা এঘরে প্রবেশ করিতে না দিয়া এখনি দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবে।

গৃহের মধ্যস্থলে খট্টার উপরে পরিষ্কার শয্যা বিছান, শয্যার নিকটে চারপায়াখানা নামাইয়া, সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল—যেন এইবারই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সময়টা আসিয়া পৌছিয়াছে। সে সমস্যা আর কিছুই নয়—তাহা জীবন-মরণের সমস্যা। তাহারা যে অযত্ন-লুণ্ঠিতদেহ এইবার সযত্নে উত্তোলন করিবে, তাহা মৃতের না—জীবিতের?

বাণী খোলা-মাথায় বিস্রস্ত-বসনে সেই অপরিচিত দলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার অম্বরের নাড়ীহীন হস্ত স্পর্শ করিতেই সে তাঁহার কাছে গিয়া কহিল, "আমার স্বামী—কাকাবাবু—আমার স্বামী এতদিন পরে আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন!" তাহার কণ্ঠ যেন কূপের মধ্য হইতে কথা কয়টা উচ্চারণ করিল।

ডাক্তার তাঁহার সহকারীর সাহায্যে অম্বরের মৃতবৎ শরীর বিছানার উপর স্থাপন করিলেন। কহিলেন, "এখনও প্রাণ আছে।—না বলিতেছ কেন? নাড়ী না থাক, অতিক্ষীণ হইলেও নিশ্বাস আছে বৈকি।—রমাবল্লভ! অধীর হইও না। বরং এখন বাহিরে যাও, স্থির হইবার চেষ্টা কর। রাধারাণি মা! জানালা খুলিয়া দিয়া, ওই খানে বাতাসের কাছে একটু দাঁড়াইয়া নিজেকে স্থির করিয়া লও। এখন কাতর হইলে চলিবে না, তোমার স্বামীর জন্য মনকে শক্ত করিয়া ফেল দেখি!"

এ অব্যর্থ শব্দ! সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আজ্ঞাপালন করিল। বাহিরে অবিশ্রামে বন্যাবেগে ট্রাম, মটর্ ও ঘোড়ার গাড়ী ছুটিতেছে, ফুটপাথে লোকচলারও বিরাম নাই। এই কর্ম্ম-কোলাহলময়ী ধরণীর বক্ষ হইতে আজ তাহার সকল আশা আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ঝরিয়া পড়িবে। ওই যে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রবিভাষিত উদার আকাশ, ওইখানের কোন্ এক অপরিজ্ঞাত নূতন রাজ্যে-তাহার জীবনসর্ব্বস্ব সকল ক্লেশমুক্তজীবন লইয়া চলিল! না জানি, সেখানে কি শান্তিই তাহার জন্য সঞ্চিত আছে!

শীতল বাতাসে তাহার লুপ্ত-বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হইলে সহসা সে বুঝিতে পারিল, কেন অম্বর তাহাকে তাহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া, সেইখানেই থাকিতে বলিয়াছিল! তাহার প্রতি অভিমান, অথবা অনাগ্রহে সে তাহাকে দূরে রাখিতে চাহে নাই, নিজে সে মরণের পূর্ব্বে তাহাদের মাঝখানে ফিরিতে চাহিয়াছিল। ভগবান্! সে যদি শূন্যগৃহে গিয়া পৌছাইত! সে ফিরিয়া দেখিল, ঘরে আরও দু'একজন নূতনলোক প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাদের যত্নে রোগীর নিঃস্পন্দ দেহের মলিন বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। সে নিকটে আসিল। বস্ত্রমধ্য হইতে একখানা

খামেভরা চিঠি পড়িয়া গিয়াছে—পত্রখানির উপর অম্বরের হাতের লেখা—সেখানায় ডাকটিকিট লাগান ছিল, ডাকে পাঠান হয় নাই। দূর হইতেও সে হস্তাক্ষর সে চিনিয়াছিল—তাই সাগ্রহে তাহা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইল। উপরে তাহারই নামে রাজনগরের ঠিকানা লেখা। তাহার কণ্ঠ মধ্য হইতে আকস্মিক একটা আর্ত্তস্বর বাহির হইয়া গেল। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সে তাহাকে—তাহারই নির্ম্মম হত্যাকারিণীকে বিস্মৃত হয় নাই! এমন ক্ষমাশীল স্নেহময় স্বামী সে হেলায় হারাইল!

ডাক্তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, স্নেহসান্ত্বনার সহিত তাহার অবসন্ন মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "রাধারাণি! সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় বিপদে অধীর হইও না। বাহিরে যাও, আমাদের উপর বিশ্বাস কর, ইঁহার কোনরূপ সেবাযত্নের ত্রুটি হইবে না। এখানের সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের আমি আনিতে পাঠাইয়াছি—যথাসাধ্য করিব। যাও—এখন তুমি গিয়া মাথা ঠিক কর। যতক্ষণ, প্রাণ আছে—ততক্ষণ যেমন অবস্থাই হোক, আমরা আশা ছাড়িতে পারিনা। কে জানে, হয়ত প্রতি মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞা ফিরিতে পারে। আর তা যদি হয়, তবে তোমার বড় ধৈর্য্য রাখা চাই! সে সময় কাতর হইয়া পড়িলে মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। এই বুঝিয়া নিজের মন কঠিন কর।"

"যদি সংজ্ঞা ফেরে?"—আহা কে একথা বলিলে গো! বাণীর ইষ্টদেব! এমন দিন কি তুমি সত্যই তাহাকে দিবে? সে সচেতন হইয়া উঠিয়া প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—আমায় তখন ডাকিবেন তো? যদিই—না, আমি, যাইব না। যদি সে সময় আমায় ডাকিতে আপনারা ভুলিয়া যান! যদি আমার আসিতে দেরি হইয়া যায়?—"না কাকাবাবু! দয়া করিয়া আমায় একপাশে থাকিতে দিন। আমি চুপ করিয়া থাকিব।"

"না, না—যাও—ডাকিব বই কি! অমৃত! ষ্ট্রীক্‌নিন্ ও হাইপোডার্ম্মিকটা আনা হইয়াছে? আচ্ছা যাও—ঐ পাশের ঘরটা খালি পাইবে, বোধ হয়; রাধারাণি! দেরি করিও না—শান্ত হয়ে এসো। যাও মা, ভয় নাই—তোমার ডাকিব বই কি! অস্থির হইলে কোন কাজই তো পারিবে না, যাও।"

বাণীর পিছনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া ডাক্তার জগতি বাবু রোগীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। রোগীর দুই হস্তের কব্‌জিতে ধমনী নিশ্চল, বক্ষ স্থির, কেবল নাসাপথে অতি মৃদুশ্বাস যেন সসঙ্কোচে বাহিরে পথ খুঁজিতেছিল। তাহাও এত ধীর যে, প্রতিক্ষণেই ভয় হয় বুঝি এই বার স্তব্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নের জাগ্রত স্মৃতির মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার মাঝখান হইতে বাহির হইয়া, বাণী সম্মোহিতবৎ বারান্দা অতিক্রম করিয়া, ডাক্তারের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। জোর করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যে, সেখানে থাকিবার চেষ্টা করিবে, এমন শক্তি তাহার মধ্যে ছিল না। শোকদুঃখের ব্যাকুলতার অপেক্ষা যেন বিস্ময়ের বিহ্বলতাই তাহার হত-বুদ্ধি চিত্তকে সমধিক অধিকার করিয়া এক প্রকার মূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন কাহারও জীবনে কল্পনারও অতীত কোন একটা বিশেষ ঘটনা অকস্মাৎ সত্য হইয়া দেখা দেয়, তাহার জীবনের এতদিনকার বাস্তবগুলাকে শুদ্ধ সে যেন সেই সঙ্গে অস্পষ্ট অবাস্তবে পরিণত করিয়া ফেলিয়া, সবটাকে একাকার লণ্ডভণ্ড করিয়া তোলে। সে যে কোথায় আছে, কি করিতেছে, সেসব তো দূরের কথা, পাথরের মেজের কঠিনত্ব, ও কলিকাতার রাস্তার অবিশ্রাম শব্দলহরী পর্য্যন্ত তাহার ইন্দ্রিয়বোধের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। সে যখন সেই অপরিচিত গৃহে প্রবেশ করিল, তখন এই একমাত্র সত্য কেবল তাহার মনে রহিল যে, তাহার স্বামী তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন! আর শুধু তাই নয়,—তিনি তাহারই জন্য পত্র লিখিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন!

সে যে মৃত্যু-শয্যায়, সে কথাতো মিথ্যা নহে? মৃত্যুর ওই বিভীষিকাপূর্ণ রূপ চোখের উপর দেখা, সেও অসহ্য! তথাপি সে যে আসিয়াছে,—নিশ্চয় তাহার গৃহেই আসিয়াছে। এই অনুভূতিটুকু যেন সমস্ত বিয়োগ-ব্যথা, হতাশাক্লেশ শান্ত করিয়া, শীতল প্রলেপের মত দগ্ধ ক্ষতজ্বালাপূর্ণ চিত্তের মধ্যে বুলাইয়া গেল। তারপর সহসা তাহার স্মরণ হইল, এখন তাহার উপর কি দায়িত্বের ভার পড়িবে! ডাক্তার বলিয়াছেন, 'হয়তো তাহার চেতনা ফিরিতে পারে?—পারে কি? ওই দেহ,—কি স্থির! কি বিবর্ণ! আর ম্লান সে মুখ! জীবন থাকিতে অমন হয় কি? ওঃ—!'

কিন্তু কেন,—পারিবে না কেন? যিনি তাহাকে এ অবস্থায় তাহার কাছে আনিয়া দিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না হয়! মৃতব্যক্তি জীবন পাইবে, এ আর বেশি কথা কি? সে গভীর নিঃশ্বাস লইল। তবে দেখি, সে কি লিখিয়াছে। হয় ত এমন কিছু থাকা সম্ভব, যা আমার এখনি জানা আবশ্যক।

তাহার শীতল করতলের শিথিল মুষ্টিমধ্যে পত্রখানা রহিয়াছে। আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া সে পত্রাবরণ মোচন করিতে গেল। উপরে এক পাশে লেখা আছে, "যিনি এ পত্র দেখিতে পাইবেন, মৃতের প্রতি দয়া করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।"—সে তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। পত্রে লেখা রহিয়াছে :—

"রাণী, সহধর্ম্মিণি আমার! চলিলাম! অনেক দূর রাজ্যে, জানি না কোথায়, কোন্ বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে, হয়ত যুগান্তরব্যাপী তামসী রাত্রির বিরাট উদর-গহ্বরে যন্ত্রণাময় নূতন জীবনে উদিত হইতে চলিয়াছি! কে জানে!—কে বলিতে পারে, মানবের কর্ম্ম অভাগা শরীরীকে মৃত্যুর পর কোন্ অবস্থান্তর প্রদান করিবে, স্বয়ং মহাজ্ঞানী ধর্ম্মরাজও একদিন এ প্রশ্নের সমুচিত সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। তাই স্বতঃই মনে উদয় হয়, কর্ম্মসূত্র কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ভয় নয়—শুধু কৌতূহল জাগে—জানিতে ইচ্ছা হয়—সাধ হয়।

"কিন্তু এখন আর এ চিন্তা নয়, এখন আমি সর্ব্বদা এই কথা ভাবি, মৃত্যুর যে চিরসুন্দর, চিরনবীনরূপ আবাল্য পরমসুহৃদের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারি স্নেহ-অঙ্কে এই সংসারমলময়, পঙ্কিল জীবন শান্তিপূর্ণ করিতে চলিলাম। সে কোন দূর-রাজ্য নহে, জীবনের চেয়ে মৃত্যু সেখান হইতে মানুষকে নৈকট্য দান করে। সকল কর্ম্মবিপাক সেখানে লয় পায় এবং অমৃতময় জীবনলাভ ঘটে। সেই চিরবাঞ্ছিত চরণপদ্মে আশ্রয় লইতে চলিলাম। বেশি কথা লিখিব না। এখন যাহা বলিবার বাকি আছে, তোমার সম্বন্ধে সেই একমাত্র কথা লিখিতে বসিলাম। রাণি! মৃতের অমার্জ্জনীয় অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবে না? তোমার কাছে আজ এই মানসিক অপরাধ গোপন করিয়া যাইতে পারিলাম না। তাই লিখিতেছি, তুমি আমায় একান্ত বিশ্বাস করিয়া, যে অধিকার দিয়াছিলে, আমি যথাসাধ্য তাহার পালনে যত্ন করিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জানো বোধ হয়; কিন্তু অনুচিত হইলেও মনের মধ্যে,—অযোগ্য অভাজন আমি তোমায় দূরে রাখিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী, আমার রাধারাণি বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। সেই প্রথম দিনেই, অর্থাৎ যে দিন তোমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া, তোমার পিতা আমায় ডাকিয়া পাঠান, সেই দিন এ বিবাহের অসঙ্গতি-বিচার করিবার সময়েই বুঝিতে পারি, তোমার নিষ্ঠা—ঐকান্তিকতায় যে পরিমাণে আমার মন তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, তাহাতে তোমায় স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা প্রদান করা আমার পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়। বিশুদ্ধ প্রেম—শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স্নেহেরই রূপান্তর। বুঝিলাম, ইহ-পরজীবনে মহাপাশ-বন্ধন শপথ-গ্রহণে আমার পক্ষে ধর্ম্মহানির ভয় নাই। বিশ্বাস করিবে কি রাধারাণি! এ সংবাদ নিজের অজ্ঞাত রহিয়া গেলে, আজ আমি তোমাদের কোন কাজে লাগিতে পারিতাম না। সেই প্রথম মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াও ছিলাম,—তুমি আমার কে!

"বেশি কিছু বলিব না। তারপর—তারপর বিবাহের মন্ত্রে সে ভালবাসার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তারপর দণ্ড, পল, বিপল। তোমার নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও দূরত্বের অনুভব খুব অল্পই হইয়াছে। পরিচ্ছিন্ন ভালবাসা হইলেও, আমার মনে বিন্দুমাত্র জাগতিক মোহ বা লাভাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, আমি তোমার প্রেম বড় উচ্চপ্রেমের মধ্যেই স্থাপন করিতে পারিয়াছিলাম। বিশ্বশক্তির একটি ক্ষুদ্র শক্তিরূপে তোমায় আমার হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শুধু একটুখানি আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়াছিল, তাহাতে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় অতৃপ্তি নাই। মনে পড়ে, সেই শেষ দেখা!—সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কিন্তু সেদিন যতটা আশা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ পাই নাই। তোমার চোখের দৃষ্টিতে যে মনের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, ব্যথিতও করিয়াছিল। তোমার চোখে অমন সলজ্জ বিষণ্ণ দৃষ্টি আমি কখনও দেখি নাই। সেতো সেই সংসারাতীত আত্ম-বিস্মৃত-ভাব নয়! সে যে স্নেহময়ী—প্রেমময়ী—নারীর দৃষ্টি!

"যাক্, সে কথা থাক্। এখন আমার এই অযোগ্য ভালবাসা প্রকাশ কি তোমায় বিরক্ত করিল? আমার মনের

এ ভালবাসা কি তোমার পক্ষে অপমানের বিষয় বাণি! কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিও যে, যে তোমায় এতদিন গোপনে ভালবাসিয়া আসিয়াছিল, সেতো আজ বাঁচিয়া নাই! মৃতের ভালবাসায় ক্ষতি কি বাণি? জীবনে তোমার সহিত সম্বন্ধ রাখিব না এই শপথ ছিল। মৃত্যুও কি তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না! শপথ-ভঙ্গ না করিলেও আমি মনেব এ পাপটুকু রোধ করিতে সক্ষম হই নাই"। তাই আজ সে অপরাধ তোমার কাছে স্বীকার করিয়া গেলাম।

"এইবার বিদায়—বাণি!—বিদায়! যদি আমায় ভুলিলে তুমি সুখী হও, ভুলিয়া যেয়ো। এই স্বার্থপর আমি হইতে চাহি না যে, তোমায় আমাকে মনে রাখিতে অনুরোধ করিব, কিন্তু যদি মনে থাকে,—কখন কখন মনে যদি পড়ে, মনে করিও, একজন আজ পৃথিবীব বাহিবে এখনও তোমায় ভালবাসে। হাঁ--এখনও,—তোমার প্রতি আমার ভালবাসা—কামনালেশহীন, পবিত্র, এবং সে ভালবাসা, সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের মধ্য দিয়াই আসিয়াছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমাব মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না। গোপীবল্লভের চবণে অচলা ভক্তি রাখিও।

তোমাব স্বামী অম্বব—"

"পুনশ্চ তোমাদের নিকট হইতে এত দূরে থাকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ডাক্তাব ডাকাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'মৃত্যু নিশ্চিত'—বড়জোর পাঁচসাত দিন কোন মতে কাটিতে পারে। তাই অবিলম্বে এস্থান ছাড়িয়া চলিলাম। যদি রাজনগরে পৌছিতে পারি, তবে একবার মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পূজারতা মূর্ত্তিখানি দেখিব, এই একটি শেষ-সাধ আছে; জানি না—এ সাধ পূর্ণ হইবে কি না। গোপনেই যাইব, তুমি বা আর কেহ জানিবে না। ইচ্ছা আছে, যদি সময় থাকে, তবে ইহার পর গঙ্গাতীরে শেষ-শয্যা পাতিব। তুমি সেখানে থাকিবে তো? গিয়া যদি দেখিতে না পাই, তবে বড় হতাশ হইব।—

অম্বর।"

যখন অম্বরের পত্র-পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন ঝটিকা-শান্ত প্রকৃতির ন্যায় বাণী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি অল্পক্ষণের জন্য তন্ময় থাকিয়া, নবজাগ্রত বিপুলমানসিক শক্তিতে সে আপনার অন্তর্দাহ সমস্তটাকেই প্রকৃতিস্থ করিয়া ফেলিয়া, ধীর অকম্পিত চরণে ঘরের বাহির হইল। মৃত্যুকে আজ সে ভ্রুক্ষেপও করে না,—সে তাহার দুই হিমশিলা-শীতল হস্ত প্রসারিত করিয়া, তাহার সম্মুখীন হইতেছে, সেই শীর্ণ করকাবর্ষী অঙ্গুলির স্পর্শানুভবে তাহার শিরার মধ্যে উষ্ণ শোণিতও থাকিয়া থাকিয়া, বুঝি তেমনি শীতল ও জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে;—তাহাতে কি আসিয়া যায়? আর সে তাহাকে ভয় করে না, এখন নির্ভীক চিত্তে সে তাহারি সহিত যুঝিতে চলিল। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কাছে মৃত্যুশয্যা পাতিতে আসিয়াছে, আর কি দুঃখ!—কিসের অভাব আব?

অৰ্দ্ধঅন্ধকাবকক্ষে যেখানে মৃত্যুশয্যায় অম্বর শায়িত, সেই গৃহে নিঃশব্দ চবণে প্রবেশ কবিয়া সে দেখিল, দরজা ও বিছানার মধ্যস্থলে একটা চৌকিব উপর একজন শুশ্রূষা-কারিণী বসিয়া মধ্যে মধ্যে রোগীর দিকে চাহিতেছে। সে প্রবেশ করিবামাত্র সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি চিনি না কে, যদি এই বোগীর স্ত্রী হন,—ডাক্তার সাহেব হুকুম দিয়া গিয়াছেন যে, যদিই বোগীর চেতনা ফিরে, তখনি আমি আপনাকে এই বাঁ দিকের ঘরে খবর দিয়া আসিব—এবং তাঁকেও জানাইব। তিনি ঠিক ঐ সামনের ঘরে ওষুধ ঠিক করিতেছেন। এখন আপনি অনায়াসে বাহিরে থাকিতে পারেন, কিন্তু রোগীর যে আর জ্ঞান হইবে, এমনতো আমার মনে হয় না।"

বাণী বারেক অন্তর্বিদ্ধেব ভয়ার্ত্ত নেত্রে শুশ্রূষাকারিণীর বিকারবর্জ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার সেই তীব্র বেদনাদিগ্ধ ভৎর্সনা-দৃষ্টি যেন তাহাকে ব্যাকুল অনুযোগে বলিল, এমন কবিয়া তুমি আমার আশার মূলে কুঠার তুলিয়ো না,—চুপ কর। পরক্ষণে সে শান্তস্বরে কহিল, "আমি এখানে একা থাকিতে ইচ্ছুক, তুমি বাহিরে গিয়া অপেক্ষা কর। যদি আবশ্যক হয়, আমিই তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিব। ডাক্তার সাহেব রাগ করিতে পারেন? না—আমি বলিতেছি, রাগ করিবেন না; আচ্ছা, তুমি তাঁকে ইচ্ছা করিলে জিজ্ঞাসা করিতে পার। সেই ভাল।" শুশ্রূষাকারিণী বারকত আপত্তি করিয়া শেষে তাহার আগ্রহাতিশয্যে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন বাণী ধীরে ধীরে শয্যার নিকট অগ্রসর হইল এবং অম্বরের পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া সেই সংজ্ঞাহীন

শীতল দেহ ধীরে অতি সন্তর্পণে নিজের বুকের কাছে টানিয়া উপাধানহীন মস্তক নিজের সুগোল বাহুলতায় তুলিয়া লইয়া, অশ্রুব্যাকুলতাহীন স্থির চক্ষে সেই মৃত্যুর পূর্ণ-অধিকার-বিস্তৃত মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন আর তাহার বক্ষে বেদনা, চক্ষে অশ্রু—কিছুই ছিল না।

এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে একবার রোগী ক্লান্তির মৃদুশ্বাস অতি ধীরে গ্রহণ করিয়া চক্ষু চাহিল, পরক্ষণেই অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আমি এ কোথায় ?—রাজনগর আর কত দূর ?"

অতি দুর্ব্বল ক্ষীণ স্বর, কথা কয়টি অনেক কষ্টে বাণীর বোধগম্য হইল।

ধীর স্থির কণ্ঠে বাণী কহিল, "আর তো দূরে নাই ! তুমি আমার কাছে, তোমার বাণীর কাছে রহিয়াছ, বুঝিতে পারিতেছ না ?"

"আমার বাণী ! আমার বাণীর কাছে !"—ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে যেন ঈষৎ বিস্ময়ে অম্বর এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিল।

"হাঁ তোমার বাণী, তোমারই স্ত্রী, তোমারই দাসী, তোমারই সহধর্ম্মিণী ;—ওগো, আর একবার চাহিয়া দেখ, আমার যাহা জানাইবার আছে, তাহা না শুনিয়াই চলিয়া যেও না। আমিও তোমায় ভালবাসি। তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, প্রধান অহঙ্কার। আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, তবু আমি তোমার স্ত্রী, তোমার শিষ্যা, তোমার দাসী ;—আমায় ক্ষমা করিবে কি ?"

"আমায় ভালবাস বাণী ?"

এই অবিশ্বাস্য সংবাদ, তাহার অতি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যেন তাহার মনে ঠিক পৌছাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল, তার পর তাহার শুষ্ক চর্ম্মে-ঢাকা পাণ্ডুওষ্ঠে হাসির মত কি একটা ভাব প্রকটিত হইতে গেল। বোধ হইল, সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু সে আনন্দ-প্রকাশের শক্তিও আর তাহার মধ্যে নাই। তাহার হাসি ও অশ্রুতে এখন কোন প্রভেদ ছিল না—দুই-ই তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে। সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল, "ওই কথাটা আবার বল বাণি !"

বাণী তেমনি অনুত্তেজিত, করুণা-তরল কণ্ঠে আবার সেই কথা বলিল। তাহার পর সে কহিল, "বিবাহ কি বস্তু আমি বুঝিয়াছি। বিবাহ-মন্ত্র যে, পতি-পত্নীকে একাত্ম হইতে অনুজ্ঞা করে, সে যে শুধু মৌখিক উপদেশ মাত্র নয়, নিজেই সে যে তার মহাশক্তি দ্বারা সেই সংযোগ-ক্রিয়া সাধনে সমর্থ, আমার নিকট ইহা স্থূল-প্রত্যক্ষ যাবৎ বস্তুর মতই সত্য ! এই মহাশক্তির যে কোথাও কোথাও প্রতিরোধ দেখা যায়,—বুঝিতে পারি না, কেমন করিয়া সেরূপ ঘটিয়া থাকে। তবে এও হইতে পারে, সে মন্ত্র তোমার মত সাত্বিক প্রকৃতি প্রকৃত বেদজ্ঞের মুখেই এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সবার কাছে বোধ হয়, তাহার এ পূর্ণশক্তি জাগে না। শুনিয়াছি, বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রশক্তিদ্বারা নূতন সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই বেদমন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিলে মৃত জীবনযুক্ত হইয়া উঠিত। এসব কথা মনে করিতে আমার এত আনন্দ হইতেছে, তাই তোমার কাছে বলিতেছি।"

"তুমি আমায় ভালবাস, রাধারাণি ! এখন আমার মৃত্যু আরও আনন্দের মধ্যে, অধিকতর শান্তির—"

"নানা ওকথা নয়, মৃত্যুর কথা কেন ভাবিতেছ ?"

"কেন ভাবিতেছি ?—আমায় যে যাইতেই হইবে বাণি ! তা হোক, সে দেশ আসামের চেয়ে বেশী দূরে নয়। আর তোমার জন্য ?—জেনো বাণি, মহৎ দুঃখ মানুষের পক্ষে একটা মহৎ শিক্ষা। দুঃখ না পেলে মন পরিপূর্ণতা লাভ করে না, হৃদয় সরস হয় না, পরদুঃখে দ্রব হয় না। তা ছাড়া, তুমি তাঁকে সেই রকমই ভালবাস তো রাধারাণি ? তাঁকে তো ভুল নাই ?"

"না, তোমায় ভালবাসিয়া আমি তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি, তাঁকে এত দিনে অতি নিকটে, আমার বুকের মধ্যে সত্যমঙ্গলরূপে, আনন্দময় মূর্ত্তিতে পাইয়াছি।"

গভীর সুখে অম্বর নিশ্বাস ফেলিল, "আঃ কি আনন্দ ! আহা কৃপাময় ! তোমার কত দয়া ! তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই প্রেমের সাধনায় তাঁকে কাছে পেয়েছ। রাধারাণি !"—

"কি ? বলো, বলো ? চুপ করলে কেন ?" বাণী অতি যত্নে স্বামীর অস্থিময় হাতখানি এক হস্তে তুলিয়া নিজের তপ্ত গণ্ড তাহার উপর রাখিল। উষ্ণ শোণিত

সেখানকার প্রতি সূক্ষ্ম শিরার মুখে মুখে বন্যাবেগে বাহির হইবার জন্য বিদারণ-চেষ্টায় ফাটিয়া উঠিতেছিল।

মুমূর্ষু ঈষৎ হাসিল, "মরণে এত শান্তি! পরে আরও কত! মা মৃত্যুরূপিণী জগজ্জননীর মধ্যে এ জীবনের পরিণাম শান্তিময়, আনন্দময় যদি হতে পারে, তার চেয়ে আর সুখ কি আছে? মৃত্যু! মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু তো এখানে;—সেখানে, তাঁকে পাইলে—যাঁ হতে এই অসীম চরাচর নিঃসৃত হইতেছে, যে আনন্দের মধ্যে এই অসীম চরাচর প্রবেশ করিতেছে, সেইখান হতেই জীবন ও মৃত্যুর জ্যোতিঃ এবং অন্ধকারের উন্মেষ ও নিমেষ হইতেছে, আর তিনি স্থির হয়ে আছেন; কারণ তিনিই যে এই সংসরণশীল সংসারে একমাত্র ধ্রুব। সেই তাঁকে—সেই শিব অদ্বিতীয়কে মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, মৃত্যু যে অমৃতে পরিণত হয়, তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়—বাণি!"

বাণী কথা কহিল না। সে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের বলে নিজের পূর্ণ শক্তিকে প্রাণপণে জাগ্রত করিতে চাহিতেছিল। যদি বেদমন্ত্রে অত বড় শক্তি থাকে, তবে এই বেদমন্ত্ররচয়িতা মানবের প্রবল ইচ্ছামন্ত্রে শক্তি নাই! এও কি সম্ভব? মানুষ, এই ক্ষুদ্র তাপজর্জ্জরিত দীন মনুষ্যই কি সর্ব্বশক্তির অংশ নহে? অম্বরই তো তাঁহাকে এখনি শিব অদ্বৈত-মন্ত্রে পূজা করিল! তবে?—সমুদ্রোত্থিত সলিলবিন্দু কি অম্বুরাশির লবণগুণবর্জ্জিত হইতে পারে?

অম্বর স্থির হইয়া রহিল। বাণীর মনে হইল, হয় ত শ্বাস বহিতেছে না! কিন্তু তথাপি সে ব্যস্ত হইয়া নড়িল না, স্থিরনেত্রে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! একটু পরে অম্বর কথা কহিল; বলিল, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে, তোমার শরীর হ'তে যেন একটা শক্তি, একটা তেজ বাহির হইয়া, আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।—সত্য কি বাণি! না এ আমার কল্পনামাত্র? আঃ কত সুখ—কত শান্তি আমি অনুভব করিতেছি! আমার যেন ঘুম আসিতেছে। বহুকাল ঘুমাই নাই; ঘুমাইব কি বাণি!"

"ঘুমাও।"

"বিদায় লইব কি?—কি জানি এ কি ঘুম!"

বাণী এক মুহূর্ত্তের জন্য কথা কহিতে পারিল না, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রাণান্ত দৃঢ়তায় বাঁধ দিয়া বাঁধা মনের বল উন্মাদ অজয়ের প্রচণ্ড বন্যাস্রোতের মতই যন্ত্রণা ও অশ্রুরাশির আকস্মিক প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার চক্ষু দিয়া নীরবে অজস্রধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণেকের দুর্ব্বল মানবত্বের অবভাষ তাহার অন্তরের জাগ্রত-দেবতার কাছে তখনি মাথা নত করিয়া ফেলিল। তখনি পাছে সে তাহার রোদন অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হয়, এই ভয়ে তাহার প্রতি গভীর প্রেমে নিজেকে অতি সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলিয়া শান্তভাবেই উত্তর দিল, "না—বিদায় কিসের? ঘুমাইলেই অনেকটা গ্লানি দূর হইবে, তুমি একটু ঘুমাও।"

অম্বর উত্তর দিল না; তাহার অবসাদক্লান্ত চোখের পাতা-দুখানি অতি ধীরে নামিয়া আসিতেছিল। বাণীর বুকের মধ্যে ধড় ফড় করিয়া উঠিল; তাহার ভয় হইল, বুঝি নিজে সে বড় বিলম্বে উত্তর দিয়াছে, তাহা তাহার নিকট পৌছে নাই। সে নিজের উভয় বাহু দিয়া রোগীকে নিজের বক্ষসংলগ্ন করিয়া রাখিল।

"বাণি!"—বাণী তাহার মুখ নত করিয়া রোগীর মুখের কাছে কাণ পাতিয়া তাহারই মত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিবে বল?" "বড় ঘুম আসচে,—মনে হচ্চে, সমস্ত শরীর-মন যেন আনন্দ-সাগরের নিস্তরঙ্গ শান্তিসলিলে একেবারে তলিয়ে যাচ্চে। যেন তুমি আমি দুজনে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা হারিয়ে, এক হয়ে গিয়ে, সেই অমৃত-সাগরের মধ্যে রোগতাপের অতীত শান্ত সুন্দর আনন্দময় সত্তায় শয়ান রয়েছি। এখানে কোন ক্ষুদ্র আক্ষেপ বিক্ষোভমাত্র উপস্থিত করতে পারে না, এখানে শান্ত-মঙ্গলে, পূর্ণস্বরূপে বাধাবিহীন নিত্য-সম্মিলন। এ ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার সেই ক্ষুদ্র বিয়োগ বিচ্ছেদ-শঙ্কিত জগতে বিচরণ করার জন্য দূরে যাওয়ার চেয়ে, এই এত কাছে,—তোমার বুকে মাথা রাখিয়া, তোমার এই বিপুল করুণা মনে প্রাণে সর্ব্বদেহে উপলব্ধি করিতে করিতে যদি এই ব্যাধি-জর্জ্জর জীর্ণ দেহের খেলা সাঙ্গ করা যায়, সে কি ভাল নয়?"—

বাণী দুই হাতে স্বামীর মস্তক বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার শীর্ণ হস্ত আপনার কোমল করে চাপিয়া ধরিল। এই কথাটার মধ্যের যতখানি বিষতিক্ত স্মৃতি ও তীক্ষ্ণ আশঙ্কা, সবটাই তাহার বুকে বজ্রবলে গিয়া বিঁধিয়াছিল, তাই তাহার অনিচ্ছাকৃত শরাঘাতেও সে যেন ব্যাধ-

বিদ্ধ কুরঙ্গের মত বারেক ঘুরিয়া পড়িতে গেল। সত্য কি আবার দূরে যাইতে হইবে! একটু থামিয়া থাকিয়া পরক্ষণে উদ্দীপ্ত সাহসের সহিত উত্তর করিল—"আবার দূরে! কেন?—তিনি নিজে সঙ্গে লইয়া যখন তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিয়াছেন, তখন অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগ কোথায়? এবার এ নবজীবনে তুমি আমারই।" মনে মনে জোর করিয়া বলিল, "আর তোমারও যে নূতন জীবন হইয়াছে, সে বাণী তো বেঁচে নাই। আমি এক জন্মের জন্যই শপথ করাইয়াছিলাম। জন্মজন্মান্তর শুদ্ধ তো আর বাঁধা দিই নাই। এ নূতন জন্মে মৃত্যুর কাছে তোমায় ভিক্ষা করিয়া ফিরাইয়া লইয়া তোমায় আমার করিব। পারিব না? কেন পারিব না? সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়াছিলেন—আর আমিই পারিব না?—কেন আমি কি সতী স্ত্রী নই? না—আমার শরীরে আমার সতী লক্ষ্মী পুণ্যবতী মা-ঠাকুরমায়ের রক্ত বহিতেছে না?"

অম্বর বারকয়েক আনন্দ-বিচলিতচিত্তে শিশুর মত তাহার বুকের মধ্যে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া স্থির হইয়া গেল, যেন বড় শান্তির স্থান সে লাভ করিয়াছে ও এইবার ভাল করিয়া সে ঘুমাইতে পারিবে।

বাণী তেমনি করিয়া তাহাকে নিজের নিকটে—অতি নিকটে,—বুকের মধ্যে বাহুপাশে বাঁধিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে সে কেবল এই প্রার্থনা করিল, যেন এমনি করিয়া সারারাত্রি আপনার শারীরিক সুবিধা-অসুবিধা ভুলিয়া, সে যাপন করিতে পারে। সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়াও যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া ফেলে না। তাহার মনের মধ্যে কোথা হইতে এই প্রতীতি সুদৃঢ় হইয়া উঠিল যে, তাহা হইলেই সে তাহার এই মৃতকল্প স্বামীকে আপনার সমগ্র শক্তি দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে। তাহার শোণিতোষ্ণতাহীন নীল শিরার উপর সে নিজের উষ্ণশোণিত-প্রবাহিতা ধমনী একাগ্র-চিত্তে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, যেন সেই সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে সে আপনার শরীর হইতে তপ্ত শোণিত-ধারা তাহার অঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, এমনি প্রবল অনুভূতি তাহার নিজের মধ্যেই জাগিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার একনিষ্ঠ একাগ্র হৃদয়ে চিন্তাভয়শোক কিছুই আর বর্ত্তমান ছিল না। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার, এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সেই সর্ব্বসমাহিত সতীচিত্তের সমুদয় শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া, সে তাহার মৃতবৎ স্তব্ধ স্থির স্বামীর দেহে আপনার জীবন হইতে জীবনীধারা ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিল।

প্রেমের অপেক্ষা জগতে কোন শক্তিই প্রবল নয়। প্রেমময় শুধু বিশুদ্ধ প্রেমেরই অধীন।

গৃহ গভীর নিস্তব্ধ! ডাক্তার বারবার আসিয়া ফিরিয়া গেলেন, সে দৃশ্যে তাঁহার আত্ম-বিশ্বাসী হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে একইভাবে বসিয়া এই যে মহাতপস্যাপরায়ণা যোগিনী শবসাধনে সমাধিমগ্না, সিদ্ধি কি আপনি দুই বাহু বাড়াইয়া এর কাছে ব্যগ্র আলিঙ্গন দিতে ছুটিয়া আসিবে না? যদি না আসে, তবে ধিক্ তাকে! মনে মনে ভাবিলেন "এই ভাল—এ রোগীতো আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার অতীতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাক্, যদি এই একান্ত একাগ্রতা ওকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারে!"

সতীর সে ধ্যানভঙ্গ করিতে স্বয়ং যমরাজও একদিন সাহসী হন নাই; ক্ষুদ্র মানব কোন ছার! রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। দূরে ঘড়ি বাজিয়া বাজিয়া থামিল। ট্রামের হড় হড় গড় গড় শব্দ থামিয়া গিয়াছে। জনকোলা-হল কিছু যেন শান্ত বোধ হইতেছিল। কেবল ষ্টেশন-যাত্রী গাড়ীগুলা মধ্যে মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া চলিয়াছিল, আর অদূরে প্রতিবেশিগৃহে কোন ভাবমুগ্ধ যুবক তাড়িত-জ্যোৎস্না-মিশ্রিতালোকে ছাদে বসিয়া গাহিতেছিল:—

"দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা—
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

সমাপ্ত

—

বিচার

[শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

দুই দুইবার জেলের ফের্‌তা
কাজল-গাঁর কাদের্‌ জোলা
তিনটি উপোস্‌ দিয়ে শেষটা
মার্‌ল' মদনমুদির-গোলা।

পুলিশ দু'জন নিচ্ছে ধরে'

পুলিশ দু'জন নিচ্ছে ধরে'
হেসে সে বেশ নাড়্‌ছে দাড়ী,
যাচ্ছেন যেন নূতন জামাই
জুড়ি চেপে' শ্বশুর-বাড়ী!

হাজতে আধমরা কাদের্‌
আদালতে এল যবে,
'জেলের হুকুম হোক্‌ না হুজুর।'
জেদ্‌ কচ্ছে সে, অবাক্‌ সবে!

লোকটা দাগী অপরাধী,
দায়রার জজ জানেন বেশ;
কিন্তু তাহার চোখে মুখে
নাই কলুষের চিহ্ন-লেশ।

দেখ্‌ছেন হাকিম অপরাধীর
ডাগর চোখ, উজল ভাল,
নাই সেথা ছাপ 'অপরাধী'
বল্‌লেন—'হুকুম হবে কা'ল।'

হাকিম পরদিন ডেকে তারে
বল্‌লেন কণ্ঠে স্নেহ-ভরে'
"এ প্রবৃত্তি কেন তোমার
ব'ল্‌বে কাদের্‌ সত্য ক'রে?"

কাদের ব'ল্‌লে—"ব্যবসা আমার
মাটি হ'ল পড়ে' বিলেত,
মহাজন শেষ কর্‌লে নীলাম
ছাগল, ভেড়া, হাঁস, গরু, ক্ষেত।

মনে আছে সে সব কথা,
প্রথম যখন কুকাজ ধরি,
ঘরে মড়া, ঘুর্‌লাম ঘর ঘর
জুট্‌ল না মা'র গোরের কড়ি।

'মর্‌লাম কেঁদে, এক ফোঁটা জল
কেউ ফেল্‌লে না আমার তরে,
কেউ বলে, 'যা—চর্‌গে মাঠে',
কেউ বলে, 'সিঁদ দেনা ঘরে!'

'দেশ বিদেশে পথে ঘাটে
করতে লাগ্‌লাম রাহাজানি,
ধরা প'লাম, জেলে গেলাম,
পেকে উঠ্‌লাম ঘুরিয়ে ঘানি !

'কয়েদ থেকে ছুটি পেয়ে
গেলাম মায়ের গোরের কাছে,
বল্‌লাম,—ছেলের মাটি পাও নি,
এর শোধ, মা, বাকী—আছে।

'বাস্তু উজাড়, গেরস্তি সাফ্‌,
দেশে পাই না কোথাও সুখ,
জেলই আমার আরাম-খানা
ঘানিই আমার স্বর্গ সুখ !"

হাকিম শুনে অনেকক্ষণ
হাত বুলা'তে লাগ্‌লেন টাকে,
বল্‌লেন—'কাদের্‌, বল তোমার
চাকরীর ইচ্ছা যদি থাকে।'

কেঁদে ফেল্‌লে কাদের্‌, ব'ল্‌লে—
'দাগীর চাকরী কোথায় জুটে ?'
হাকিম বল্‌লেন—'আমার ঘরে।'—
কাদের্‌ পড়্‌ল পায়ে লুটে !

হাত বুলা'তে লাগলেন টাকে

তুমি ও আমি

[শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রিয় হ'তে প্রিয়তর—প্রিয়তম তুমি,
যতনে আদরে ঘেরা পুলক-সম্ভার
তব প্রীতি ভালবাসা—সরল প্রণয়,
মানস-মোহন তুমি, শুভ্র ফুল-হার।
শ্রী যেন ধরিয়া মূর্ত্তি প্রতি অঙ্গে তব
মনের আনন্দে সদা খেলিয়া বেড়ায়।
তীর্থ-ক্ষেত্র সম তুমি পবিত্র মহান্‌
হে আমার চিরসঙ্গি সংসার খেলায়।

মঞ্জু-কুঞ্জ-বন তুমি স্নেহ-সুশীতল,
নবীন কুসুমে পত্রে ফলে মনোলোভা,
লিপ্ত সর্ব্ব অঙ্গে তব প্রণয়-পরাগ,
নীরব সংগীতে পূর্ণ তুমি গৃহ-শোভা।
প্রেমের দেবতা তুমি, আশার অতীত,
বীতংসে জড়িত আমি প্রণয়-মোহিত।

পুরাতন প্রসঙ্গ

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, M.A.]

(নব পর্য্যায়)

৪

আচার্য দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন :—

"রামতনু বাবুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী রাজবাড়ীতে কাজ করিতেন। কিছু জমি ছিল; বারুইহুদা গ্রামে তাঁহার প্রজা ছিল। আমি ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহাকে খুব বুড়া দেখিয়াছি; বোধ হয় তাঁহার আশী বৎসর বয়স প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পুত্র কেশব যশোহরে অনেক টাকা রোজগার করিয়া বাড়ীতে ভাল করিয়া পূজার দালান দিয়াছিলেন।

"তারাকান্ত রায়, উমাকান্ত রায়, শিবাকান্ত রায়, রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর শ্যালক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী

রাজবাটী—কৃষ্ণনগর

হইয়াছিল। তিনি তালপাতার ও নারিকেলপাতার ছাতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দুইগাছা পৈতা ছিল, একটি মৃগচর্ম্মের, অন্যটি সূতার। সর্ব্বদাই পূজা-আহ্নিক লইয়া থাকিতেন। ছেলে শ্রীপ্রসাদকে ডাকিতেন—'রাম-গঙ্গা'। দুর্গাপূজায় শ্যামাপূজায় ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়ান খুব ছিল; মেয়ে জামাই, দৌহিত্র কার্ত্তিক দেওয়ানের পিসী। কার্ত্তিকচন্দ্র খুব ফর্সা ছিলেন; ফার্সী ও ইংরাজি ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি গানবাজনায় ওস্তাদ ছিলেন। আমি তাঁহার গান শুনিতে যাইতাম। রাজবাড়ীতে গান-বাজনার চর্চ্চা ছিল। বৃদ্ধ দেলওয়ার খাঁ কেবলমাত্র হাতে তালি দিয়া গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। খয়েরুদ্দি খুব ভাল সানাই

বাজাইত; সেতারেরও ওস্তাদ বলিয়া মহারাজা তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতেন।

"মহারাজা গিরিশচন্দ্র খুব সুপুরুষ ছিলেন। অমন লম্বা মানুষ প্রায় দেখা যায় না। দেহে খুব বল ছিল। দোগেছের তাঁতীরা তাঁহার কাপড় বুনিত—১৩ হাত লম্বা। আমার জ্যাঠামহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন; মহারাজা একবার সেই কাপড় তাঁহাকে একজোড়া দিয়াছিলেন। মহারাজার আজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারী নিজের নিজের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিবে। একবার তিনি শুনিলেন যে, আমার জ্যাঠামহাশয় কন্যা-দায়গ্রস্ত বলিয়া দুর্গোৎসব করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, 'কি! আমার কর্ম্মচারী দুর্গোৎসব করবে না! যা' দরকার আমার তোষাখানা থেকে যাবে; পূজার সমস্ত খরচ আমার।' কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষ বৎসরে একদিন তাঁহার শুভাগমন হইত। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন; আমরা সব ছেলেপুলে গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আনন্দময়ীর পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইত। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, গাভীর বাঁটের প্রথম দুধ, গাছের প্রথম ফল, আনন্দময়ীকে দিয়া আসিতে হইবে। রাজবাড়ীতে বৈকালি ভোগ কি ছিল জান! দোলো গুড়ের পাক। একটা প্রকাণ্ড কটাহ হইতে সমস্তটা একটা বোরার মধ্যে ঢালা হইত; দশবারটা বোরা এই রকমে বোঝাই করা হইত। পূজা সাঙ্গ হইলে, সেই ভোগ কুড়ুল দিয়া কাটিয়া কর্ম্মচারী-দিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পূজার প্রতিমা গড়িত, শান্তিপুরের কারিকর। একজন দুর্গা, অসুর ও সিংহ গড়িত; একজন লক্ষ্মী-সরস্বতী; একজন কার্ত্তিক-গণেশ; একজন সাজ লাগাইত; একজন চালচিত্র করিত। প্রতিবারে প্রতিমার নূতন পাট হইত। প্রতিমা-গড়া শেষ হইলে মহারাজা করযোড়ে কারিকরদিগকে বলিতেন,—'তোমরা যদি অনুমতি কর, তা' হ'লে আমি মাকে পাটে বসাতে পারি।' তাহারা বলিত,—'আপনি বসান।' পূজার সময় একশত ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া জায়গা লাল শালু দিয়া মোড়া ও ঘেরা হইত; পূজার পরদিন আর সে শালু দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ জেলার ব্রাহ্মণ মাত্রই দেবোত্তর জমি পাইত, ও রাজ-বাড়ীতে খাইতে পাইত

"মহারাজা গিরিশচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ বড়রাণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ছোট রাণী খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বয়ং পাক করিয়া মহারাজাকে সোণার থালে পরিবেশণ করিয়া খাওয়াইতেন। আহারের পর মহারাজা খড়কে-কাটি লইতেন—ব্রাহ্মণের হাত হইতে; শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও 'খড়কী' নামে পরিচিত। ছোটরাণী শ্রীশচন্দ্রকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন।

"কুমার শ্রীশচন্দ্র যখন একটু বড় হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি খরচপত্রের অকারণ বাহুল্য যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে একটু কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবেন। মহারাজা গিরিশচন্দ্রের স্নানের জন্য একসের তেল বরাদ্দ ছিল; শ্রীশচন্দ্র কমাইয়া এক পোয়া করিলেন। যে ব্যক্তি তেল মাখাইত, সে এক পলা তেল লইয়া মহারাজের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি?" ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে তিনি বলিলেন—'তুমি বোঝ না; চাকর-বাকরের কিছু পাওয়া চাই, নহিলে উহাদের চল্‌বে কেন?"

"ব্রাহ্মণ পরিচারক মহারাজাকে খড়কে-কাটি দিত। অগ্রদ্বীপ হইতে যখন দ্বাদশগোপাল আনা হইত, নৌকা খড়িয়া নদীর ঘাটে পৌছিলে, ব্রাহ্মণ-পাল্কীবেহারা পাল্কী কাঁধে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিত।

"মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ফার্সী ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বামাসুন্দরী চমৎকার রাঁধিতে পারিতেন; আমি অনেকবার তাঁহার রান্না খাইয়াছি। মহারাজা সতীশচন্দ্রের স্ত্রী ভুবনেশ্বরীও চমৎকার রাঁধিতে পারিতেন। মহারাজা স্বয়ং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। মহারাণী তাঁহাকে বলিতেন,—'তুমি উমেশ বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছ; তিনি ত তোমাদের বাহিরের টেবিলের খানা খাবেন না; আমি নিজে তাঁহার জন্য রাঁধ্‌ব।' সে রকম রান্না আমি কোথাও খাই নাই। মহারাজা সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সম্পত্তি Court of Ward এ গেলে মহা-রাণীর একশত টাকা মাসিক allowance বরাদ্দ হইল। তাহাতে তাঁহার কষ্ট হইল। আমাকে তাঁহার কষ্টের

কথা জানাইলেন। আমি ষ্টীভ্‌ন্‌স্‌ সাহেবকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করায় মহারাণীর ছয়শত টাকা মাসহারা ধার্য্য করা হইল। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর মহারাণী আমাকে তাঁহার এষ্টেটের দেওয়ান হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন; আমি সম্মত হইলাম না।

আচার্য্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। একটু পরে বলিলেন—"রামতনু বাবুর কথা বলিতে বলিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু কৃষ্ণনগরের ইতিহাসের সহিত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের ইতিহাস কতটা জড়িত হইয়া আছে, তাহা বোধ হয়, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ। ইংরাজি শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের সময়ে মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের কতটা ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল, সেকথা পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি; আবার যখন এখানে ব্রাহ্মমন্দির-নির্ম্মাণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা দান করিলেন এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা হইলেন, তখনও তাঁহাদিগের কার্য্যে মহারাজের sympathy ছিল। কেশবচন্দ্র সেন একটা বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে যখন এখানে আসিলেন, সমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখনও মহারাজার sympathy ভিতরে ভিতরে তাঁহার দিকে ছিল। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে দল দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহার নেতা হইলেন তারিণীপ্রসাদ ঘোষ।"

কৃষ্ণনগর-রাজবাটীর সিংহদ্বার

*　　　*　　　*

আজ অপরাহ্নে দীনবন্ধু মিত্রের কথা উত্থাপন করিলাম। আচার্য্য দত্ত মহাশয় বলিলেন—দীনবন্ধু খুব আমুদে লোক ছিল; আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত; প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে আসিত; একবার আমার ব্যায়রামের সময় বঙ্কিম চাটুয্যেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। রামতনু বাবুর মত দীনবন্ধুরও একটু পান-দোষ ছিল; কিন্তু পাছে আমি টের পাই, এইজন্য সে সদাই সতর্ক থাকিত। সেক্ষপীয়র পড়িতে খুব ভালবাসিত। তাহার যে পাণ্ডিত্য খুব বেশী ছিল, তাহা নহে; তবে সেক্ষপীয়র হইতে মালমসলা আদায় করিয়া নিজের নাটকের পুষ্টিসাধন করিত। দেখ না, Merry Wives of Windsor-এর Falstaffকে কেমন সে তোদলকুৎকুতের পোষাকে খাড়া করাইয়াছে। তাহার 'সধবার একাদশী' যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমি ঢাকায়; যখন 'নীলদর্পণ' বাহির হইল, তখন আমি এখানে।

"ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী হইয়াও দীনবন্ধু এই বইখানা প্রকাশিত করিয়া, যে চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমরা আজিকার দিনে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। সৌভাগ্যক্রমে স্যর্ জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বড় বড় লোক নীলকরদিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

রাজবাটীর ঠাকুর দালান

"উত্তর।—হাঁ, খুব সহজ উপায় আছে (A very simple remedy)।

"প্রশ্ন।—কি ?

"উত্তর।—উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার (Justice between the parties)।

"প্রশ্ন।—তুমি কি বলিতে চাও যে, এই লোকগুলা বাস্তবিকই অত্যাচারপীড়িত (Do you mean to say that these people are really oppressed) ?

"উত্তর।—হাঁ, আমি বলিতে চাই (Yes, I do)।

"যখন পাদরী ব্রমহাডের জবানবন্দী লওয়া হয়, তিনিও জোর করিয়া বলিলেন যে, ন্যায়বিচার হয় না।

"১৮৬০ সালে গ্রীষ্মকালে এই কমিশন বসিয়াছিল ; পনের দিন ধরিয়া এখানে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল।

"যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশা অঞ্চলে একজন নীলকর ছিল ; তাহার নাম ম্যাক্ আর্থার। একদিন সে সেখানকার জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্‌ব্রিজ্ সাহেবকে সকাল বেলায় breakfastএ নিমন্ত্রণ করিল। বেন্‌ব্রিজ্ আগে হইতেই জানিতেন যে, ম্যাক্ আর্থার অত্যন্ত অত্যাচারী বলিয়া সেখানে একটা অখ্যাতি ছিল। তিনি সেই নীলকরের কুঠীর ২।১ মাইল দূরে নিজের তাঁবু ফেলিলেন। অতি প্রত্যূষে পদব্রজে ম্যাক্ আর্থারের বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন যে, কে যেন ক্রন্দনের সুরে ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে—'দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব'। সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ম্যাক্ আর্থারের গুদামের ভিতর হইতে এই কাতরধ্বনি আসিতেছে। নীলকরকে কিছু না বলিয়া, তিনি সর্দ্দার বেয়ারাকে বলিলেন, 'গুদামের চাবি লইয়া আমার সঙ্গে আয়'। চাবি খুলিতেই একটা কঙ্কালসার মানুষ ধস্ করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন

লর্ড ম্যাকনটনের একজন আত্মীয় এখানে জমিদার ছিলেন। হিন্দুপ্যাট্রিয়ট্ জিদ করিয়া বসিল যে, Indigo Commission বসান হক। নীলকরেরা বলিল যে তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাজারে প্রচারিত হইয়াছে ; প্যাট্রিয়ট্ তাহার উপযুক্ত জবাব দেয়। কমিশন বসিল। সভাপতি হইলেন সেটন্ কার্ (W. S. Seton-Karr) ; মিঃ রিচার্ড টেম্পল,চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড্ জে. সেল্ ও ফার্গুসন্ (W. F. Fergusson) কমিশনের মেম্বর ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হার্শেলের জবানবন্দী আমার বেশ মনে আছে।

"প্রশ্ন।—তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার মতে ইহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় আছে কি ?

না। ম্যাক্ আর্থার সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কি! আমার অজ্ঞাতসারে আমার গুদামের চাবি খুলিয়া লোকটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল! এই অত্যন্ত বে-আইনি ব্যাপার লইয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে সেই লোকটা একটু প্রকৃতিস্থ হইল, বেন্‌ব্রিজ্ নিজের তাঁবুতে বসিয়া তাহার জবানবন্দী লইলেন। সে বলিল, 'কুঠীর সাহেব আমাকে কিছু খেতে দেয় নি, শুধু ধান খেতে দিয়েছিল।'—তিনি একটা রিপোর্ট লিখিয়া তাহাকে সাদরে পাঠাইয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের রীতিমত তদন্ত করিলেন। তদন্তের ফলে ম্যাক্ আর্থারের অর্থদণ্ড হইল।

"সামান্য ছয় শত কি সাত শত টাকা অর্থদণ্ড হইল বটে; কিন্তু স্যর জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ খুব কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আর একটু গোড়ার ইতিহাস না জানিলে সে মন্তব্যটুকু বুঝিতে পারিবে না।

"যখন স্যর ফ্রেড্রিক্ হ্যালিডে বাঙ্গালার ছোটলাট, তখন যশোহরের মধুমতী চন্দনা নদীতে ঘন ঘন ডাকাইতি হইত; জেলার পুলিস কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। অনেক বিবেচনা করিয়া, কমিশনার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন—'মধুমতী চন্দনার উপরে একটা floating subdivision করিলে হয় না?' এই প্রস্তাব স্থানীয় জন-সাধারণের অনুমোদিত হইবে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হইল। বেশী আপত্তি করিল, নীলকর ম্যাক্ আর্থার! সে বলিল—এখানে একটা সব্‌ডিভিসন্ করিলে, মোক্তারের শুভাগমন হইবে; আর এই সরল চাষারা জুয়াচোর ও দুষ্টবুদ্ধি হইয়া নষ্ট হইবে!' তাহার এই আপত্তি শুনিয়া লাট্-সাহেব হ্যালিডে বলিলেন—'floating subdivision-এ কাজ নাই।'

"এই সমস্তই কাগজে কলমে লাটদপ্তরে লিপিবদ্ধ ছিল। স্যর জন্ পীটর্ গ্রাণ্ট্ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া, ম্যাক্ আর্থার-বেন্‌ব্রিজ্-ঘটিত ব্যাপারের উপর মন্তব্যপ্রকাশকালে লিখিয়াছিলেন—'These proceedings throw a strong light upon M'c Arthur's disinclination to have a subdivision.'

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়—সম্মুখে গোপালভাঁড়

"স্যর ফ্রেড্রিক্ হ্যালিডে নীলকরদিগের বন্ধু ছিলেন। ক্রস্ সাহেবের কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন এখানে জজ্, তখন লর্ড ডাল্‌হৌসি বাঙ্গালার গভর্ণরের কাজ চালাইতেছিলেন; তাঁহার সেক্রেটরি ছিলেন, স্যর সেসিল্ বীডন। ক্রস্, স্যর সেসিল্‌কে লিখিলেন—'আমি নীল-চাষের ব্যাপার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমার এই চিঠি ও minute আপনি অনুগ্রহ করিয়া লর্ড্ ডাল্‌হৌসির হস্তে দিবেন।' তখন লর্ড্ ডাল্‌হৌসি স্যর ফ্রেড্রিক্ হ্যালিডেকে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসাইবার ব্যবস্থা একরকম পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালের মার্চ মাসে তিনি লিখিলেন, The fittest man in the service of the Honourable Company to hold this great and most important office is, in my opinion, our Colleague the Hon'ble F. J,

দেওয়ান ৺কার্ত্তিকচন্দ্র

বলিয়া আহ্বান করায় তাহার মানহানি হইয়াছে। স্যর্ ফ্রেড্রিক কমিশনার বিড্-ওয়েলকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। মৌলভী সোজা জবাব দিলেন—'এই যে ছাপান ফর্‌ম্, এ ত আমি আবিষ্কার করি নাই; গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন; আমি শুধু ভরাট্ করিয়াছি মাত্র।' স্যর্ ফ্রেড্রিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"মৌলবী ঠিকই করিয়াছে; কিন্তু সে ওখানে অনেকদিন আছে, তাহাকে অন্যত্র বদলি করিয়া দেওয়া হউক।"

"স্যর জন্ পীটর্ গ্রাণ্ট বাঙ্গালার ছোট-লাট হইলে পর, সেই সকল কাগজপত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লর্ড্ ডাল্‌হৌসির প্রাইভেট সেক্রেটরি ছিলেন—কোর্টনে (F. F. Courtenay)। Courtenayর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু সণ্ডার্স্ (Saunders) যশোহরে ম্যাজি-ষ্ট্রেট ছিল। সণ্ডার্স্ জ্বরে বড় ভুগিতে-ছিল; বদলি করিবার জন্য Courtenay হ্যালিডেকে অনুরোধ করিল। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে একটি পদ খালি লইল; কিন্তু হ্যালিডে সণ্ডার্স্‌কে না আনাইয়া, অগষ্টস্ এলিয়ট্‌কে এখানে আনা-ইল। সণ্ডার্সের মৃত্যু হইল। Courtenay অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, লর্ড্ ডাল্‌হৌসিকে সকল কথা বলিয়া দেন; হ্যালিডেকে প্রাইভেট চিঠিও দিলেন। হ্যালিডে injured innocence-এর ভাণ করিলেন। Courtenay লিখি-লেন—"তোমার ethical laxity আছে; তোমার assumed surprise আমি বুঝি; আমি সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিব।" Friend of India ও Englishman পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটা বাহির হইল। Friend of Indiaর সম্পাদক সমস্ত চিঠিখানাকে file বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

"স্যর পীটর গ্রাণ্ট্ এই ব্যাপারটাও মুদ্রিত করাইয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিলেন!

"তিনি আমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন;

Halliday.' কাজেই স্কন্সের কাগজ-পত্র নূতন ছোটলাট হ্যালিডের হাতে পড়িল। তিনি চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—'স্কন্স্ জানে কি!' যশোহর, নবদ্বীপ, রাজসাহীর নীলচাষের উপর কমিশন বসাইলেন। কমিশন স্কন্সের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল; আরও বলিল,—"নীলকরেরা বনজঙ্গল কাটিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিয়াছে।"

একটু চুপ করিয়া আচার্য্য দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করি-লেন—"আব্দুল লতিফের Caseটা জান কি?" আমি উত্তর করিলাম,—'না'। তিনি বলিলেন—"গোবরডাঙ্গার নিকটে কোলার্‌ওয়া সব্‌ডিভিসনে হাবড়ায় আব্দুল লতিফ সব্‌ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তাঁহার নিকটে সেখানকার কুঠীর সাহেবের নামে একটা নালিশ হইল। সাহেবের নামে বাঙ্গালা-ভাষায়-ছাপান নোটিশ-জারি হইল। তাহাতে লেখা ছিল—"তুমি আসিবে।" সাহেব চটিয়া গেল; লাট সাহেবকে জানাইল যে, মৌলভী তাহাকে তুমি

মহারাজা গিরিশচন্দ্র

আমার সঙ্গে দেখা করিতেও আসিয়াছিলেন। খুব জোয়ান শরীর ছিল; সারা রাত্রি খাটিতেন—শেষে তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন; সমস্ত চিঠি নিজে লিখিতেন অথবা বলিয়া যাইতেন।

"বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গভর্ণরের আরম্ভ ও শেষ দেখিলাম। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, স্যর্ জন্ পীটর গ্রাণ্ট্‌ দেশের লোকের শ্রদ্ধা যতদূর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারেন নাই। নীলকরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা শুধু কথার কথা নহে; প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। ১৮৬০ সালে তিনি যে Minute লেখেন, তাহার এক স্থলে ছিল:—"On my return a few days afterwards along the same two rivers (the Kumar and Kaliganga), from dawn to dusk, as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villages, claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males stood at and between the river-side villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest."

"১৮৬২ সালে তিনি পদত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহাকে বিদায়কালে অভিনন্দন দিলাম। যে address দেওয়া হইল, তাহা আমারই রচনা; তাহাতে আমার স্বাক্ষর ছিল। উত্তরে তিনি আমাকে লিখিলেন—"It is impossible for one, whose humble endeavours in the public service of your country have

স্যর্ পিটার গ্রাণ্ট্‌

মহারাজা সতীশচন্দ্র

been so generously appreciated as mine have been by you, ever to forget you."

"হ্যালিডে ও গ্রাণ্টের মনোমালিন্যের কথা যে সকল বলিলাম, তাহাতে মনে করিও না যে, স্যার ফ্রেড্রিক হ্যালিডেকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করিত না। ছোটলাট হইবার পর তিনি ইংরাজিতে প্রথম অভিনন্দন পান,--কৃষ্ণনগরে—১৮৫৫ সালে; সে addressও আমি রচনা করিয়াছিলাম। তিনি রচনার ভাষায় মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে লিখিয়াছে?"—আমাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গেলে পর, তিনি অনেকক্ষণ আমার সহিত আলাপ করিলেন, ও আমার উন্নতি কামনা করিলেন।"

—ক্রমশঃ

আগমনী

[মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহতাব্ K.C.S.I., K.C.I.E., I.O.M., বাহাদুর]

(জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।)

বড়ই স্নেহ-পিপাসু কাঙ্গালী বাঙ্গালীগণ।
তাই কি এস মা বঙ্গে ঘুচাতে দীন-বেদন!
দুঃখে শোকে অপমানে, মরিয়া আছে জীবনে,
পুনরায় পায় প্রাণে নিরখি তব বদন।
অনাথ অধম সুতে, স্নেহে কোলে তুলে ল'তে,
কে আছে মা এ জগতে, তুমি তারিণি যেমন।
তাইতো মা দয়া-বশে, মা হয়ে দুহিতা-বেশে,
বাঁধ মহামায়া-পাশে, কাতরে করি যতন।

মার মুখে মা মা বাণী, মানসে মধুর শুনি,
দুঃখিনী বঙ্গরমণী করে সুখে সন্তরণ।
এস মা ভবমোহিনি! তুলে হাসি মুখখানি,
হৃদয় মাঝে জননি, পাত তব পদ্মাসন।
বিজয় পুলকে কয়, সতত বাসনা হয়,
হইয়া তব তনয়, করি মা মা সম্বোধন

সোহাগী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

'দরমা'য় ঘেরা ক্ষুদ্র কুটীর গঙ্গা নদীর তীরে,
নগরেতে যায় খাটিবারে স্বামী, সন্ধ্যায় আসে ফিরে।
সোহাগী তাহার কচি ছেলেটিরে একাকী রাখিয়া ঘরে,
আনিবারে জল গঙ্গায় যায় ভয়-ডর নাহি করে।
নাহিক কপাট, 'আগড়ের' ঘর চারিদিকে বেত-বন,
দিবসে বেড়ায় নেকড়ে ব্যাঘ, নাহি মানে লোকজন।

'সোহাগী তাহার কচি ছেলেটিরে একাকী রাখিয়া ঘরে,
আনিবারে জল গঙ্গায় যায় ভয়ডর নাহি করে।'

আজিকে গ্রামেতে শঙ্কা দারুণ, সারা গ্রাম তোলপাড়,
মুখেতে কেবল 'গেল' 'গেল' রব কোন কথা নাহি আর।
হসিতবদনা সে সোহাগী আজ কাঁদিছে অধীর হ'য়ে,
প্রাণের অধিক ছেলেটি তাহার কোথা কে গিয়েছে লয়ে।
খুঁজিছে সবাই প্রতি বন-ঝোপ সন্ধান নাহি মেলে,
ব্যাঘ্রের মুখ হ'তে উদ্ধার হয় কি কখনও ছেলে!
এক বছরের শিশুসন্তান সে কি পাওয়া যায় কভু!
মায়ের প্রাণ যে কিছুতে বোঝেনা, আশায় ফিরিছে তবু।
দিবস দুপুরে ছেলে ল'য়ে গেল আসি দূর হ'তে টানি,
সোহাগীরে হায় বকিছে সবাই—বলিছে অসাবধানী।
হেনকালে আসি চাষাদের বিশু বলিল সবার কাছে,
দেখিলাম ওই বাঁশের ঝোপেতে বাঘটা বসিয়া আছে।
ছুটিল সকলে, দেখিল সেথায় শিশুরে নামায়ে রাখি,
ওতপাতি বাঘ বসিয়া রয়েছে লাফাইছে থাকি থাকি।

হাসিতেছে শিশু ঝম্পনে তার, কোন ভয় নাহি জানে,
কাল সেও থাকে মুগ্ধ হইয়া, শিশুর স্নেহের টানে।
তাড়া পেয়ে, দূরে ব্যাঘ পলায়—বালকেরে কোলে করি,
কাঁদে আর বলে ধন্য দয়াল, ধন্য তুমি হে হরি!
গ্রামে গ্রামে রটে কতই কাহিনী ব্যাঘের মুখ থেকে,
এমন করিয়া বাঁচিতে শিশুরে কেহ নাহি কভু দেখে!
ধন্য জননী, পুণ্য সে কোল, ধন্য সুকৃতি তার,
মৃতেরে জিয়ায়, হারানিধি পায়, এমন দেখিনে আর!
বৃদ্ধ অনেক বলিল সকলে এ ত' সামান্য কথা—
মৃত তনয়েরে জিয়াইতে পারে আপন পুণ্যে মাতা।
সোহাগী গরিব গয়লার মেয়ে অতীব শুদ্ধমতি,
শৈশব হ'তে চিরদিন সে যে সব জীবে দয়াবতী।
পথহারা কোন বৎস দেখিলে দিত আনি মার কাছে,
ধুলায় পতিত পক্ষি-শাবকে তুলে দিত নীড়ে গাছে।

'ছুটিল সকলে, দেখিল সেথায় শিশুরে নামায়ে রাখি,
ওতপাতি বাঘ বসিয়া রয়েছে লাফাইছে থাকি থাকি।'

শিয়ালেতে এক মেষের শাবক যেতেছিল লয়ে টানি,
সোহাগী তাহারে যতনে মিলাল তার মার কাছে আনি
তাহার তনয়ে হরিতে কাহারো সাধ্য কি আছে ভবে?
বিশ্বনাথের জগতে কেমনে হেন অনিয়ম হবে!
হারাণো তনয় আনি মার ব্যথা যে জন ঘুচায় ভাই,
তাহার কোলটি করিবারে খালি যমেরও সাধ্য নাই!

ছিন্ন-হস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[পূর্ব্বাবৃত্তিঃ—ব্যাঙ্কার মিঃ ডবৃজুয়েস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি ; রবার্ট কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য, ম্যালিকম্ দ্বারপাল, ডেন্‌লেন্ত্যাণ্ট্ শাস্ত্রী। তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ এক নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখানার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ। সেটা ম্যাক্সিম্ গোপনে নিজের কাছে রাখিলেন।

রবার্ট, এলিসের পাণিপ্রার্থী ; এলিসও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহাতে অসম্মত ; তাই তিনি রবার্ট্‌কে মিশরে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ হইলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। পরদিন প্রাতেই তিনি কিছু টাকা লইতে আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের উপর। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে না জানাইয়া এবিষয়ে গোপনে অনুসন্ধান করা যুক্তি হইল।

ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্‌লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ রমণীর সহিত আলাপ করিলেন; সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, গোপনে তাঁহাকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন।

কর্ণেল বন্দী রবার্ট্‌কে জানাইলেন যে, সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর বিবাহ ঘটিবে ; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। তথায় ঘটনাক্রমে ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্‌কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বক্সে গিয়া হাজির। কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল; দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্‌লেটের কথা উঠিতে ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক এক অসভ্য প্রুষিয়ান্ সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্‌লেট্ ও ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল ;—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন।

একমাস গত,—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী। জর্জ্জেট্ সেদিন প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায়—তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াণ্টা অসুস্থ ছিলেন,—আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল।

কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার অনুরোধমত ম্যাক্সিম্, ম্যাঃ পিরিয়াকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া তাহার পৌত্র জর্জ্জেট্‌কে লইয়া পথভ্রমণে চলিলেন, ফলে—পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখিয়া, জর্জ্জেটের পূর্ব্বস্মৃতি কতক কতক পুনঃপ্রদীপ্ত হওয়ায়, সে প্রসঙ্গতঃ রবার্ট্ কার্ণোয়েল্‌কে যে বাটীতে বন্দীভাবে থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহাও নির্দ্দেশ করিল ; এই বাটীরই প্রাচীর হইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সে হতচেতন হয়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ পাইল। পরদিন ঠিক যে সময়ে কর্ণেল রবার্ট্‌কে দেশান্তরিত করিবার সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতেছিলেন—তখন ম্যাক্সিম্ গিয়া উপস্থিত। ম্যাক্সিম্ বলিলেন যে, তিনি জানিয়াছেন "এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট্‌কে এ ধরিয়া বাটীতে আনা হইয়াছিল। এখনও কি সে এখানেই আছে,—না, স্থানান্তরিত হইয়াছে?" ইহাতে বোরিসফ্ ক্রোধের ভাণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সে পুলিশের সাহায্য লইবে, জানাইয়া গেল। ভয়ে কর্ণেল্ সেই রাত্রেই রবার্ট্‌কে স্থানান্তরিত করিবে স্থির করিয়া, তাহাকে ভয়মৈত্রী দেখাইয়া, পীড়াপীড়ি করিলেন ;—সে কিন্তু অটল। অগত্যা তাঁহার মনে হইল,—"তবে কি ভুল করিয়াছি?"—সেই দিন প্রভাতে এলিস্ পিতার অজ্ঞাতসারে কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেন।

কর্ণেল্ বোরিসফের সহিত ম্যাক্সিমের দেখা হইবার পর একদিন ক্লাবে মোরিয়াটাইন নামক এক মধ্যবয়স্ক-সুপুরুষ রুষ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইল, সে অপহৃত বাক্স সম্বন্ধে কর্ণেলের

কর্ত্তব্যে অবহেলা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য রুষিয়া হইতে আসিয়াছে। কথাচ্ছলে আরও বলিল, এখনই থিয়েটারে যাইলে তথায় একটি ফরাসী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে,—সেই রমণী বাক্সচোর নিহিলিষ্টদিগের সংবাদ জানে। কর্ণেল সোৎসুকে তাঁহার সহিত চলিলেন—তথায় সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ। ম্যাডাম সার্জ্জেন্ট ওরফে ম্যাডাম্ গার্চ্চেস্! তিনজনে অনেক কথাবার্ত্তার পর রমণী কৌশলে জানাইল, তাহার পরিচিত এক রমণী তাঁহার প্রণয়পাত্র মঃ কার্ণোয়েলকে দিবার জন্য একটি বাক্স তাহাকে দিয়াছেন:—কর্ণেল্ চোরের সন্ধান পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। পরে যখন রমণী তাঁহার আবাসে যাইয়া পানভোজনের প্রস্তাব করিল, কর্ণেল সোৎসাহে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং কার্ণোয়েলকে তথায় আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর তিনজনে থিয়েটার হইতে বহির্গত হইলেন। ম্যাক্সিম্ প্রথম হইতেই তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল—রুষ-যুবকবেশী যে ম্যাডাম্ ইয়ান্টার তরবারি-শিক্ষক কার্ডিক, বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল।

অতঃপর ম্যাঃ গার্চ্চেসরূপী ম্যাঃ সার্জ্জেন্ট, কঃ বোরিসক্ ও রুষযুবক তিনজনে সার্জ্জেন্টের বাটীতে গেলেন। কর্ণেল তথা হইতে নিজভবনে গিয়া রঃ কার্ণোয়েলকে লইয়া আসিলেন; রবার্ট ঐ বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। কর্ণেল্ সদলে জোর করিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইলে, পীড়ার লোকজন ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল; বরিসফের দল পলাইল! ম্যাক্সিম্ বরাবর ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। গোলমালে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত;—দ্বার খুলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রুষযুবক, ম্যাঃ সার্জ্জেন্ট্ বা কার্ণোয়েল্, কেহই তথায় নাই—সিঁড়ি লাগাইয়া পশ্চাৎ দিক্ দিয়া পলাতক!

ম্যাক্সিম্ ব্যাকুল ও ব্যথিত হৃদয়ে পিতৃব্য-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে মাধুর্য্য-প্রতিমা এলিসের কথাই জাগিতেছিল,সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী-কুলরাণী কাউণ্টেসকে মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলেন, কেবল মধুর হৃদয় কাউণ্টেসই এলিসের দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষতে সান্ত্বনার অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিতে পারেন। ম্যাক্সিম স্থির বুঝিয়াছিলেন। এলিস আজি কার্ণোয়েলের বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া নীরব হইয়াছেন, কিন্তু যেখানে, তাহার "হিয়ার ভিতর লুটায়ে লুটায়ে কাতরে পরাণ কাঁদিতেছে," সেখানে এখনও আশার স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে। সে এখনও প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বাস হারায় নাই। কুহকী প্রেম বলিতেছে, "আবার সুদিন আসিবে, কার্ণোয়েল কলঙ্কমুক্ত হইয়া, তাহার তপ্ত-হৃদয়ে আনন্দ-জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিবেন।"

অভাগিনীর এই শেষ আশা, এই প্রেম-মরীচিকা দূর করিতে হইবে। কিন্তু কাউণ্টেস ভিন্ন এ কাজ করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই। এই দুষ্কর কার্য্যে ম্যাক্সিম প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিবেন। ভাবিতে ভাবিতে কাউণ্টেসকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি বিমনা হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে জর্জ্জেট্‌কে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; অনেকদিন হইল, তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। গৃহ-রক্ষককেও গত রজনীর ঘটনার কথা একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ম্যাক্সিম জর্জ্জেটের গৃহাভিমুখে চলিলেন। চিন্তামগ্নচিত্তে তিনি রুদে ভিসনি অতিক্রম করিয়া বুলোভার্দদে কর্সেলেস অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তেজস্বী অশ্বের উন্নত গ্রীবা,—এক সুন্দরী অতি কৌশলে তাঁহার যান-সংযোজিত অশ্বের বল্গা আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহার গতিরোধ করিয়াছিল, আর একটু হইলেই তাঁহাকে অশ্বপদতলে মর্দ্দিত হইতে হইত। ম্যাক্সিম এক লম্ফে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাক্সিম নিজ অসতর্কতার জন্য সুন্দরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপক্রম করিয়াই দেখিলেন, সুন্দরী কাউণ্টেস ইয়ান্টা! তিনি অতি কষ্টে অশ্বের বল্গা সংযত করিয়াছেন। কাউণ্টেস ভীতিপাণ্ডুর মুখে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি!" যে যুবক তাঁহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহে, আর একটু হইলেই তিনি তাহাকেই অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত করিতেন।

ম্যাক্সিম এই অভাবনীয় ঘটনায় বিস্ময়ভরে বলিলেন, "একি—আপনি?"

কাউণ্টস কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এখনি গাড়ীতে আসুন। নেদজী অধীর হইয়া উঠিয়াছে।"—ম্যাক্সিম এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া কাউণ্টেসের পার্শ্বে বসিলেন। কাউণ্টেস অশ্বরশ্মি শিথিল করিলেন। অশ্ব তীরবেগে ছুটিল। কাউণ্টেস বলিলেন, "আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম, আপনি আর এক পা অগ্রসর হইলে অশ্বপদতলে পড়িতেন।"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। যদি আজ আহত হইতাম, আপনাকে দেখিলেই আমি সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতাম। কাল পর্য্যন্ত আপনার

প্রতীক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"ফিরিয়া আসিয়াছেন! আপনি কি বলিতেছেন?—এই একঘণ্টা হইল, আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখন আপনার দর্শন-আশায় ফিরিতেছিলাম।"

"সে কি! আপনি আজ পারিসের অনতিদূরবর্ত্তী কোন দুর্গে থাকিবার অভিপ্রায়ে প্রাতঃকালে নগর হইতে যাত্রা করেন নাই?"

"না—না।"

"তবে ডাক্তার ভিলাগোস আমাকে এ কথা কেমন করিয়া বলিলেন?"—

"তাঁহার সহিত আপনি দেখা করিয়াছেন?"

"হাঁ, অদ্য প্রভাতে তিনি আমার নিকট গিয়াছিলেন।"

"তিনি আপনাকে কি বলিয়াছেন? বলুন—এখনই সব কথা খুলিয়া বলুন।"

বিস্মিত, হতবুদ্ধি ম্যাক্সিম একে একে সকল কথা খুলিয়া কাউণ্টেসকে বলিলেন। কাউণ্টেস বলিলেন, "ভালই হইল!"—পরে আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখন আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম।" কথা ম্যাক্সিমের কাণে গেল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন?"

কাউণ্টেস বলিলেন, "কিছুই নহে, আপনি বলিয়া যাউন, এইমাত্র আপনি না বলিলেন, মসিয়ে কার্ণোয়েল বদমায়েস লোক? ডাক্তারেরও বোধ করি, সেই বিশ্বাস?"

"আমিই তাঁহার মতাবলম্বী বলিলেই ঠিক হয়; এ বিষয়ে তিনি আমার সব সন্দেহ দূর করিয়াছেন। রুদে জেফ্রয়ের বাটী হইতে পলায়ন করিবার পর কার্ণোয়েল কি করিয়াছেন, তাহাও তিনি আমার নিকট বলিয়াছেন; কিন্তু সেখানে কি কি ঘটিয়াছে, পূর্ব্বেই আপনাকে বলা আবশ্যক।"

"সে কথা বলিতে হইবে না, পরে কি ঘটিয়াছে, বলুন।"

"আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন বলিতেই হইবে। ডাক্তার বলিয়াছেন, কার্ণোয়েল তাহার উপপত্নীর সহিত চলিয়া গিয়াছে। রমণী তাহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছে।"

"আপনি এই গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন?"

"না করিব কেন? ডাক্তার আজ রাত্রে আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন।"

"আপনি যাইতে পাইবেন না, আমি বারণ করিতেছি।"

"কেন যাইব না, বলিবেন কি?"

"মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়া হইবে বলিয়া।"

"বলেন কি!"

"ভিলাগোস আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ রাত্রে যদি আপনি তাহার সহিত যান, আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবেন না।"—ম্যাক্সিম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমাকে প্রাণে মারিয়া এই ডাক্তারের কি লাভ?"

"যে উদ্দেশ্যে তিনি আমার সহিত আপনার সাক্ষৎ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। আপনি যে সকল কথা জানিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় না জানিতে পারি, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়েই তিনি আপনার বাটীতে গিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন। দৈবাৎ আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হইলে, আজ আমি আপনার দর্শন পাইতাম না। ভিলাগোস ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কাল আপনি ইহলোকে থাকিবেন না।"

"কি! আপনার পরম বিশ্বাসী, গুণানুবাদী ভিলাগোসের এই কাজ? সে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে? আপনি আমাকে আপনার দলে লইলেও—সে আমাদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে কেন বলিতে পারি না।"

"উপহাস রাখুন। বড়ই বিষম সঙ্কট উপস্থিত, ব্যাপারটি এখনই আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। কাল রাত্রির ঘটনার পর আপনি আপনার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন কি?"

"আমি এই মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি, তাঁহার পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি কার্ণোয়েল সম্বন্ধে আমার ধারণা তাহার নিকট গোপন করি নাই, সেও আমার কথার কোন প্রতিবাদ করে নাই; কিন্তু বলিয়াছে, এ জীবনে সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

"ইহার অর্থ এই, সে আপনার কথার একবর্ণও বিশ্বাস করে নাই। সে তাহার প্রণয়ীর আশা-পথ চাহিয়া আছে। এলিস প্রকৃতই স্নেহময়ী নারী, সে বিশ্বাস হারায় নাই।"

"আপনার মতে এই প্রেম-মরীচিকামুগ্ধা বালিকার সংকল্প তাহা হইলে উত্তম? আমি আরও মনে করিয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিবেন। আপনার কথায় তাহার অগাধ বিশ্বাস, কেন না কার্ণোয়েলের বিরুদ্ধে আপনার কোন মন্দ ধারণা নাই।"

"সে যদি আমার কথা শুনে, তাহা হইলে সে কার্ণোয়েলকে পাইবে। কিন্তু আর ও কথায় প্রয়োজন নাই, এখন আমরা আবার পূর্ব্ব কথারই আলোচনা করিব।"

দেখিতে দেখিতে কাউণ্টেসের অশ্বযান উদ্যান-দ্বারে আসিয়া লাগিল। কাউণ্টেস প্রথমে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ম্যাক্সিম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ম্যাক্সিম প্রচ্ছায়-বনবীথি অতিক্রম করিয়া, কাউণ্টেসের সঙ্গে সঙ্গে এক অতি রমণীয় বৃক্ষ-বাটিকা মধ্যে উপনীত হইলেন।

সে কক্ষ, মঞ্জরিত তরুরাজির পীত উত্তরীয় এবং বিলোল লতাবলীর শ্যামাঞ্চলে রঞ্জিত, পর্য্যাপ্ত পুষ্পপর্ণে সজ্জিত, শিলাসঙ্গ শীতল শৈবালজালে স্নিগ্ধ, কুসুমগন্ধ সুরভিত। ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কাউণ্টেস বলিলেন, "এখানে আমরা সচ্ছন্দে কথা কহিতে পারি। কেহ আমাদিগকে বাধা দিবে না।"

ম্যাক্সিম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ডাক্তারও না?"

"না, তিনি যদি আসেন, শুনিবেন—আমি গৃহে নাই।"

"আপনি কি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না?"

"আর একবার সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু সেই দেখাই শেষ দেখা।"

"তবে কি তিনি শত্রুপক্ষে যোগদানে স্থির-সংকল্প হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিমের এই প্রশ্ন শুনিয়া কাউণ্টেস ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"না—আমিই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহি।"—ম্যাক্সিম বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া কাউণ্টেস পুনরায় বলিলেন,—"আসুন, আপনার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলি।" বৃক্ষবাটিকার এককোণে নবপুষ্পিত বনলতাজালজড়িত কমনীয় কুসুম-কুটীর। কুটীরস্থ আসনরাজিও তেমনিই সুন্দর। উভয়ে সেই কুঞ্জকুটীরে রম্য আসনে উপবেশন করিলেন। কাউণ্টেস বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে কাল রাত্রে মসিয়ে কার্ণোয়েলকে দেখিয়াছেন?"

ম্যাক্সিম সংক্ষেপে গতরজনীর ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "এই কুহকিনী কি কৌশলে তাঁহাকে উদ্ধার করিল, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আপনাকে বলিয়া রাখি, আপনার সেই তরবারি-শিক্ষক এই রমণীকে সাহায্য করিয়াছিল।"

ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই কথা শুনিয়া কাউণ্টেসের কোন ভাবান্তর ঘটিল না, তিনি পরম নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি কার্ডকিকে চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

"তিনি সৌখীন ভদ্রলোকের বেশে সজ্জিত হইলেও আমি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যখন বিগনন হোটেলে বরিসফের সঙ্গে আহার করিতে লাগিলেন, সে সময়ে বরিসফের মনে তাঁহার অভিসন্ধি-সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহের সঞ্চার হয় নাই।"

"কার্ডকি খুব চতুর লোক!"

"তাহাতে আমার সংশয় নাই, কিন্তু সে কি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই?"

"আপনার এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ?

"নিহিলিষ্টের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়, তাহার উপর আমার চক্ষের উপর এই সব কাণ্ড।"

"এই রমণী নিহিলিষ্ট কি না আমি জানি না, কিন্তু কার্ডকি যে নির্ব্বাসিত পোল, ইহা আমি অবগত আছি; রুষিয়ার গুপ্তচরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার অধিকার তাহার আছে।"

"তাহা হইলে সে এই চোরদিগের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া আপনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই? যাহারা আমার পিতৃব্যের সিন্দুক খুলিয়া দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছে, কার্ডকি ও কার্ণোয়েল নিশ্চয়ই তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছে।"

"এটা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম, মসিয়ে কার্ণোয়েলের সহিত তাহাদিগের আলাপ নাই, আর এই রমণীর সহিত তাঁহার গত রাত্রিতেই প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

"কিন্তু রমণী যে চোর, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।"

"কার্ণোয়েল যেমন চোর নহে, এ রমণীও তেমনই চোর নহে।"

"আপনি জানেন না যে, পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের চোরাই নোট, এই দুরাত্মার নিকট পাওয়া গিয়াছে। বরিসফ অদ্য প্রাতঃকালে সেই নোট আমার পিতৃব্যকে ফেরৎ দিয়াছেন। চুরি ঢাকিবার জন্য সে যে জাল চিঠি তৈয়ার করিয়াছিল, তাহাও নোটের সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। কার্ণোয়েল বুঝাইতে চাহিতেছে, নোটগুলি তাহার পিতার কোন পূর্ব্ব-বন্ধু তাহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"বন্ধু না হউক, কোন শত্রু, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নোটগুলি হয়ত তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছে। এই দুইটা কৈফিয়তের একটা যে সত্য, তাহাতে আর সংশয় নাই।"

কাউণ্টেস এই ভাবে কার্ডকির পক্ষসমর্থন করিতেছেন দেখিয়া ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎ-ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যেই ম্যাক্সিম এ বিষয়ে কাউ-ণ্টেসকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই একটা শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি দেখি-লেন, একজন উদ্যানপাল জলাধার হস্তে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। তাহার উন্নত বপুর বৃষস্কন্ধ দেখিয়া, তিনি লোকটাকে জাল রুষ-ভদ্রলোক এবং ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের রক্ষক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিস্ময়সূচক অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হইল।

কাউণ্টেস জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন করিয়া উঠিলেন কেন?"

ম্যাক্সিম কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "ঐ লোকটা!"

কাউণ্টেস বলিলেন, "হাঁ ঐ লোকটা আমার উদ্যানের মালী; সে বৃক্ষবাটিকায় আসিতেছিল, কিন্তু আমাকে দেখি-য়াই সরিয়া যাইতেছে।" বাস্তবিক লোকটা মস্তক নত করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল।

"ও লোকটাও চোরকে জানে, কার্ডকির মত সেই স্ত্রীলোকের সহিত ইহারও খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। পূর্ব্বের লোকটা রুদে জেফ্রয়ের বাটীতে ছিল, তাহার পর রুষ ভদ্র-লোক, আর সেই মেয়ে মানুষটার রক্ষকের অভিনয় করিয়া-ছিল। পিশাচী যখন আমার ব্রেসলেট লইয়া পলায়, তখন ঐ ব্যক্তিই তার সহকারী ছিল। উহার সঙ্গে আমার কলহ হয়, পরদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাও হয়।"

"এখন বুঝিতেছেন, উহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলে সামান্য একটা ভৃত্যের সঙ্গে যুদ্ধে তরবারি ধরিতে হইত।"

"আপনার মালী মসিয়ে কার্ণোয়েলের বন্ধুর চৌর্য্য-সহচর শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইতেছেন না?" কাউণ্টেস বলিলেন, "আমি কিছুতেই বিস্মিত হইতেছি না। এতদিন আমি যে সকল কথা আপনার নিকট লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলাম, আজ সে সকল কথা প্রকাশ করিবার দিন আসিয়াছে। শুনুন তবে, কে—কি উদ্দেশ্যে এই চুরি করিয়াছে, তাহা আমি সমস্তই জানি। প্রথমে ধরুন, আপনার পিতৃব্যের সিন্দুক হইতে রুষিয়ার গুপ্তচরের একটি বাক্স মাত্র অপহৃত হইয়াছে। আপনি বলিবেন, সঙ্গে কিছু টাকাও চুরি গিয়াছে। আমিও ঐ কথাই বলিতে যাইতেছি। আমি প্রমাণ করিব, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ পায় নাই।"

"এই চুরি তাহা হইলে নিহিলিষ্টেরাই করিয়াছে!— আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম।"

"যে গবর্ণমেণ্ট বরিসফকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন, নিহিলিষ্ট ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য শত্রুও আছে। যাঁহারা আজ দেশান্তরিত, যাঁহারা পোল্যাণ্ডের জন্য হৃদয়ের রক্ত দিয়াছেন, তাঁহারা এই রুষ-গবর্ণমেণ্টকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। বরিসফ কেবল নিহিলিষ্টদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য এদেশে আসে নাই। যে সকল পোল অত্যাচারপীড়িত স্বদেশবাসীকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের উপর দৃষ্টি রাখাও উহার অন্য উদ্দেশ্য। রুষিয়ার অত্যা-চারের বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, বাক্সে তাহার লিখিত প্রমাণ ছিল। এক কৃতঘ্ন দেশদ্রোহী ঐ কাগজ রুষ-গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছিল,—কিন্তু তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কাগজগুলি রুষ-গবর্ণমেণ্টের হস্তে পড়াতে যে সকল দেশ-ভক্ত পুরুষের বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ঐ সমস্ত দলিল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সংকল্পে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল সংবাদ রাখিতেন। তাঁহারা জানিতেন, রাত্রি ৭ টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত মসিয়ে

ডর্‌জরেসের সিন্দুকের উপর পাহারা থাকে না; সুতরাং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংকল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।"

"তাহা হইলে বাড়ীতে তাহাদিগের আপনার লোক ছিল?"

"একথা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু আমি যখন বলিতেছি, রবার্ট কার্ণোয়েল তাঁহাদিগের সহ-কারী নহেন, তখন কে সহকারী, সে কথায় প্রয়োজন কি? থাক্,—এই দেশভক্তদিগের মধ্যে দুইজন গুপ্ত দলিল হরণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।"

"এই দুই জনের মধ্যে একজন নারী?"

"হাঁ, নারীই বটে,—স্বদেশের হিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নারী-জীবনের সার-ধন সতীত্ব পর্য্যন্ত বিকাইতে অকুণ্ঠিতা নারী! আর একজন পলাতক পোল,—দীর্ঘকাল সাইবিরিয়ার খনিগর্ভে নিপীড়িত—এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সকল কার্য্য সাধন করিতে কৃত-সংকল্প।"

মৃদুস্বরে ম্যাক্সিম বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন, সকল কাজ করিতে কৃতসংকল্প!"—পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহী-দিগের নির্যাতনে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই, টাকার সিন্দুকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উছলিয়া উঠিতেছিল।

কাউণ্টেস সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"একদিন সন্ধ্যায় এই দুইজন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একত্র বাহির হইলেন, আপনার পিতৃব্যের আফিসে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাদিগকে সিন্দুকের চাবি প্রদান করিল, সিন্দুক খুলিবার সঙ্কেত-কথা বলিয়া দিল। রমণী স্বহস্তে সিন্দুক খুলিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, সিন্দুকের ভয়ানক কলের কথা তিনি জানিতেন না। তিনি তালায় চাবি দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ কলে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। তাঁহার বন্ধুরা স্প্রিং টিপিয়া, কল খুলিবার কৌশল জানিতেন না। এদিকে সময় বহিয়া যাইতেছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে সেখানে লোক আসিতে পারে। ধরা পড়িলে সমস্তই মাটি হইবে। রমণী আর দ্বিধা করিলেন না, সঙ্গীকে তাঁহার কর-পল্লব ছেদন করিতে বলিলেন।"

"সঙ্গী সেই ভয়ানক কাজ করিতে সম্মত হইলেন!"

"সঙ্গী তাঁহার আজ্ঞাবহ, আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ছিল, সেই ছুরিকার দ্বারা তৎক্ষণাৎ হস্তের মণিবন্ধ ছেদন করিলেন।"

"ইহাতে সেই অদ্ভুত বীর-নারীর মৃত্যু হইল না? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না?"

"যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার সঙ্গী সেনাদলে কাজ করিয়াছিলেন, অস্ত্রোপচারেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি মণিবন্ধ বাঁধিয়া রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ করিলেন, রমণী দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিলেও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।"

"রমণী পুরুষবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন,—না?"

"হাঁ।"

"আমি ও ভিগনরী পিতৃব্যের গৃহে উপস্থিত হইবা মাত্র পথে এই রমণীও তাঁহার সঙ্গীর সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"সম্ভব। তারপর যে ঘরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনারা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, ভিগনরী আলো দেখিতে পাইয়াছিল এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।"

"সেখানে আপনারা ছিন্নহস্ত দেখিতে পাইলেন! হাত-খানি সরাইবার জন্য ভিগনরী স্প্রিং স্পর্শ করিলেন। আপনারা ভাবিয়াছিলেন, কেবল আপনারাই সেখানে আছেন, কিন্তু অন্য আর এক ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিয়া-ছিল, আপনাদিগের কথা শুনিয়াছিল। এই উপায়ে সেই নারী—যাহাকে আপনি চোর বলিতেছেন—আপনি যে রমণীর অনুসন্ধানের জন্য ব্রেসলেট রাখিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন।"

"বিশ্বাসঘাতক তাহা হইলে আমাদিগের কথা শুনিয়া টাকার লোভে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল?

"আপনার অনুমান অনেকটা সত্য, কিন্তু সে টাকার লোভে একাজ করে নাই। রমণী সকল সংবাদ পাইয়া ব্রেসলেট হস্তগত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আর সেই কার্য্য সাধন করিবার জন্য তিনি একটি অতুল সাহসসম্পন্ন রমণীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—এই নারী আপনাদিগের সেই রিঙ্কের সুন্দরী। কিন্তু এইরূপ

বিপদে পড়িয়াও তাঁহার সংকল্প বিচলিত হয় নাই। পরের সমস্ত ঘটনা আপনি জানেন।"

"না, সে সব কথা আমি ভুলি নাই। বুঝিলাম, সে অন্যের আদেশে কাজ করিয়াছিল। আমিও ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, কারণ তাহার দুইটি হাতই আছে, আর হাতের ব্যবহারেও সে নিপুণা। কিন্তু এই অপক্কচুতফল-শ্যামা সম্ভবতঃ রুষদেশীয়া নহে।"

"সে ফরাসী-রমণী—একটি পোলকে বিবাহ করিয়াছে।"

"লোকটার কি দুর্ভাগ্য! থাক্, এই সকল প্রহসনের অভিনয়ে আপনার উদ্যানপাল তাহার সঙ্গী হইল কিরূপে?"

"সেই ব্যক্তি রমণীর স্বামী।"

"স্বামী! স্ত্রীর এই চরিত্র দেখিয়াও সে কিছু বলিতেছে না! খুব অমায়িক লোক ত'?"

"জাষ্টাইন সম্বন্ধে আপনার ভ্রম হইয়াছে—তাহার চরিত্র অনিন্দনীয়। সে স্বামীর পরম অনুরাগিণী, সে কেবল স্বামীর এবং তাহার কর্ত্রীর আদেশ অনুসারে কাজ করিয়া থাকে।"

"বুঝিয়াছি, সে ব্রেসলেটের অধিকারিণীর আজ্ঞা-বাহিনী। কিন্তু সে কার্ণোয়েলকে লুকাইয়া রাখিয়াছে কেন? বরিসফের গ্রাস হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া ভালই করিয়াছে, কিন্তু নিজের গৃহে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখায় ত তাহার এই অগাধ পতি-ভক্তির সহিত সামঞ্জস্য হয় না?"

"একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জাষ্টাইন কার্ণোয়েলকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছে না। ডাক্তার ভিলাগোস আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। আপনাকে বিপদে ফেলিবার জন্য তিনি এই গল্পটা রচিয়াছেন। আপনি তাঁহার সংকল্পের বিঘ্ন, তাই তিনি আপনাকে সরাইতে চাহেন।"

"ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সংকল্পে ত বাধা দিই নাই। তাঁহার সংকল্প কি? তিনিও বুঝি ষড়যন্ত্রকারী?"

"যে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, তিনিই তাহার প্রধান নায়ক। তিনি রুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, কিন্তু নির্ব্বাসিত পোলদিগের ন্যায় রুষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার আক্রোশের কোন কারণ নাই। লোকে তাঁহাকে হাঙ্গেরিয়ান বলিয়াই জানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি রুষিয়ার অধিবাসী! তাঁহার নাম ভিলাগোস নহে, গ্রিসেকো। তিনি নিহিলিষ্ট।"

"নিহিলিষ্ট! এই অমায়িক ডাক্তার, মহিলাদিগের এই আদর ও প্রীতির পাত্র নিহিলিষ্ট! একথা ত একবারও আমার মনে হয় নি! তাহা হইলে এই বাক্স-চুরির ব্যাপারে তিনিও আছেন, দেখিতেছি।"

"তিনিই বাক্স-চুরির ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই জানিতেন যে, মসিয়ে কার্ণোয়েল অদৃশ্য হইয়াছেন, বিনা অপরাধে তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, কিন্তু নিরপরাধের নিগ্রহেই তাঁহার আমোদ। কেননা এই ভ্রমবশতঃ প্রকৃত অপরাধীদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ জন্মে নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে যে রমণী প্রধানা নায়িকা, তিনি কার্ণোয়েলের হিতৈষিণী। তিনি অজ্ঞাতসারে তাঁহার যে ঘনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতীকারে সমুৎসুক। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্য সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সংকল্প, ভিলাগোসের প্রীতিকর হয় নাই। ভিলাগোসের ধারণা, তিনি কার্ণোয়েলের ব্যাপার উপলক্ষে বিপদে পড়িবেন এবং নিহিলিষ্টদিগকে বিপদে ফেলিবেন। মসিয়ে কার্ণোয়েল, কর্ণেল বরিসফের হাতে পড়াতে এরূপ আশঙ্কা করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ ঘটিয়াছিল।"

"তাহা হইলে এই মহিলা, নর-পিশাচ ডাক্তারের নিকট আপনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

"না। কিন্তু ডাক্তার সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মনে মনে ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। ডাক্তারের নিকট কার্ণোয়েলের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করেন, তাহাতেই ডাক্তার বুঝিয়াছে যে, মহিলাটি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই মহিলার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, মসিয়ে কার্ণোয়েল বরিসফের গৃহে আছেন, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি আপনার কর্ত্তব্য ও সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। পরে ভিলাগোস তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। আজ প্রাতঃকালে আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি কোন কথা বলেন নাই ত?"

"আমি!—আপনি যে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ

করিয়াছেন, আমি সে কথা প্রকাশ করিব! আমি সাবধান হইয়াই ডাক্তারের সহিত কথা কহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহাকে কোন কথাই—এক প্রকার কোন কথাই বলি নাই বলিলেই হয়।"

"যদি সামান্যও বলিয়া থাকেন, তাহাতেই অনেক হইয়াছে। ভিলাগোস বড় চতুর, বড় ধড়িবাজ! আমার ধারণা,—আপনি নিজ অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন।"

"আমার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততা, এই দুইয়ের কোন্‌টার উপর আপনার সন্দেহ?"

"কোনটার উপরেই নহে। যে ষড়যন্ত্রে ও কৌশল-উদ্ভাবনে সারা-জীবন ক্ষয় করিয়াছে, আপনি কখনই তাহার সমকক্ষ নহেন; আর নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া কে কবে পরের মন বুঝিতে পারে? তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সময় আপনি কি অনবধানতাবশতঃ কোন কথা বলিয়া ফেলেন নাই? আপনি কি কার্ণোয়েলকে রুদে জেফ্রের বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার কথা বলেন নাই?"

তিনি নিজেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন, আমি বলিলাম, "আপনি ভুল করিয়াছেন।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল আর সেখানে নাই এ কথাও কি বলেন নাই?"

"হাঁ, ও কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ জানিতেন।"

"আপনি কার্ডকির কথাও বলিয়াছেন!"

"আমি—না, আমি—"

"সব খুলিয়া বলুন, কোন কথা লুকাইবেন না। সমস্ত কথা আমার জানা দরকার।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমি কার্ডকি ও রুদে জেফ্রের বাটীর ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহাকে বলি নাই। আমি বলিয়াছি, থিয়েটারে কার্ডকিকে রিঙ্কের সুন্দরীর পাশে দেখিয়াছি; তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

কাউণ্টেসের অনিন্দ্যসুন্দর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ,—ভিলাগোসের সহিত আপনার কথোপকথনের ফল কি হইবে, তাহা এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

"কিন্তু তিনি আমাকে বলেন, আমি ভ্রম করিয়াছি, কার্ডকি গরিব লোক, জাষ্টাইনের সঙ্গে তাহার কোন আলাপ নাই।"

"আমি পল্লীগ্রামে গিয়াছি, এই কথা বলিবার পর তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন না?"

"হাঁ, কিন্তু এই মিথ্যা কথার সঙ্গে কার্ডকির নামোল্লেখের কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ভিলাগোস যখন এখানে আপনার আগমন বন্ধ করিবার জন্য এই গল্প-রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, কার্ডকির অদ্ভুত ব্যবহারের কথা যাহাতে আপনি আমাকে না বলিতে পারেন। আপনি জানেন, জাষ্টাইনের কর্ত্রীকে আমি চিনি। তিনিই কার্ণোয়েলকে বরিসফের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। এই কর্ম্মে হাত দিয়া, এই মহিলা এখানকার নিহিলিষ্ট-সমিতির আদেশ অমান্য করিয়াছেন; এই আদেশ-লঙ্ঘনের ভীষণ প্রতিফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। ভিলাগোস মনে করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার সহিত কথোপকথনের কথা আমাকে বলিবেন, তাহা হইলে আমি আমার বান্ধবীর বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিব। এই জন্য আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির সংকল্প করিয়াছেন।"

"ভাল হইয়াছে, তাঁহার পাপ-সংকল্প ব্যর্থ হইয়াছে, এখন আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি, এখন আমি মসিয়ে ভিলাগোসকে শিক্ষা দিতে পারিব! আপনি বলেন ত তাহাকে আজই গোটাকয়েক ঘুষা মারিয়া বুঝাইয়া দিই, আমার সহিত তাহার এ সকল চালাকি খাটিবে না।"

কাউণ্টেস শুনিবামাত্র বলিলেন,—"না, তাঁহার সঙ্গে আপনার জীবন-মরণের খেলা খেলিয়া কাজ নাই,—এ কলহে দুই পক্ষ সমান প্রবল হইবে না। এক্ষেত্রে আমি একাকিনী যুঝিব,—আমার বান্ধবী প্রভৃতি যাহারা নিহিলিষ্টদিগের কোপে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার ক্ষমতা কেবল আমারই আছে। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে বুঝাইতে চাহি যে, কার্ণোয়েল সম্পূর্ণ নিরপরাধ। দ্বিতীয়বার চুরির সময় আমার বান্ধবীর সঙ্গীই একাকী গিয়া, দলিলের বাক্স লইয়া আসেন। আমি এই ব্যক্তিকে চিনি, কেহই তাহার সাহায্য করে নাই।

মসিয়ে কার্ণোয়েলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তিনি জানিতেন না।”

“কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েল এই পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথায় পাইলেন? নোটগুলি যে চুরি গিয়াছিল, তাহাতে ত আর ভুল নাই। নোটগুলি যে ভাবে পিনের দ্বারা গাঁথা ছিল, তাহাও ভিগনরী আমাদের দেখাইয়াছেন।”

“মসিয়ে ভিগনরী হয় ভ্রান্ত, না হয় তিনি মিথ্যাবাদী।”

“আমার কাকাকে এ কথা বলিলে তিনি কখনই উহা স্বীকার করিবেন না।”

“কিন্তু আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছি, আমার বান্ধবী যদি আপনার পিতৃব্যের নিকট গিয়া সেই সকল কথা বলে, তাহা হইলে, এ কথা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।”

“সন্দেহস্থল! বিশেষতঃ আপনার বান্ধবীর নিজ অপরাধ-স্বীকার করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, কখনই আমার পিতৃব্যের নিকট যাইতে পারিবেন না।”

“আপনি বলিতেছেন, তিনি দেশের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, একথা স্বীকার করিবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলে, তিনি যাইতে পারিবেন না? সে কথা স্বীকার করিতেই বা তিনি কুণ্ঠিত হইবেন কেন? গোপন করা দূরে থাকুক, তিনি এই কার্য্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন।”

“মসিয়ে কার্ণোয়েল যদি সত্যই নিরপরাধ, তবে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে তাঁহার বাধা কি?”

“আমার বান্ধবী নিবারণ না করিলে, তিনি সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, নিজ নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিবেন।”

“আপনার বান্ধবী? তবে কি কার্ণোয়েল তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন?”

“অগত্যা। গতরাত্রির ঘটনার পর তিনি আর কোথায় আশ্রয় লইবেন? জাষ্টাইন তাঁহাকে সেই বাড়ীতেই লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেখানেই আছেন।”

“খুব স্বাভাবিক, কিন্তু যিনি চোর-দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে আপনার বান্ধবীর গৃহ উপযুক্ত আশ্রয়-স্থান নহে। কারণ, তাঁহারই সিন্দুক খুলিয়া দলিলের বাক্স হস্তগত করিয়াছেন।”

“যাহারা এই দলিলের ব্যাপারে লিপ্ত, আমার বান্ধবী তাঁহাদিগের সকলকেই প্রশ্ন করিবার জন্য মসিয়ে ডরজেরেসকে অনুরোধ করিবেন। তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এ ব্যাপারে মসিয়ে কার্ণোয়েলের কোন হাত নাই। কার্ণোয়েলের পক্ষ-সমর্থন করিতে গিয়া, তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহাদিগের অকপট ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারিবে না।”

“তবে কার্ণোয়েল অগ্রসর হউন, যদি তাঁহার কোন দোষ না থাকে, নিজপক্ষ সমর্থন করুন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সফলমনোরথ হইতে পারিবেন কি না সন্দেহস্থল। তবে ইহাতে তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।”

“যদি তিনি নিজ নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তিনি এ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহা আমি জানি।”

“আপনার সহিত তাহা হইলে তাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছে?”

“হাঁ—বান্ধবীর গৃহে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে।”

“তিনি আমার কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তত?”

“তিনি অদ্যই সেখানে যাইবেন, আমিও সেখানে যাইব। আপনাকেও যাইতে হইবে।”

“যাইব, আমার উপস্থিতি বোধ হয়, প্রীতিকর হইবে না। আমি আমার পিতৃব্যকে বলিয়াছি, তাঁহার সাবেক সেক্রেটারী অপরাধী। কেবল তাহাই নহে, আমি শপথ করিয়া এ কথা আমার ভগিনীকে বলিয়াছি। বলিয়াছি, কার্ণোয়েল তাহার প্রেমের যোগ্য নহে।”

“আপনি আপনার সরল বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিয়াছেন, এখন আপনি সকল সংবাদ শুনিয়াছেন, এখন আপনি অন্য রকম কথা বলিবেন। আপনার ভগিনী, আপনার কথায় বিশ্বাস করিবেন, কেননা আপনি কখনই তাঁহার নিকট আত্মগোপন করেন নাই।”

“হতে পারে, কিন্তু আমার পিতৃব্য আমাদিগকে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন কি না, ঘোর সংশয়স্থল।”

“আমি পূর্ব্বেই এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি এবং আপনার ভগিনীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছি। লিখিয়াছি, আমি কার্ণোয়েলের নির্দ্দোষিতার সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, আপনি অবিলম্বে এখানে আসিবেন। তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াই আমরা তাঁহার সঙ্গে আপনার পিতৃব্যের

গৃহে যাইব, তিনি আমাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইবেন।"

ম্যাক্সিম এলিসের চরিত্র জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, এই সরলা কুমারী শেষ পর্য্যন্ত আশার অবলম্বন ত্যাগ করিবে না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সহসা সামান্য একটু শব্দে তাঁহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। তাঁহার বোধ হইল, কে যেন লতাজালের অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। কাউণ্টেস চিন্তামগ্ন ছিলেন, এদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। সহসা একখানি কমনীয় করপদ্মলতা যবনিকা সরাইল। পুষ্পিত লতাজালের মধ্যে পুষ্পাধিক সুন্দর একখানি মুখ উঁকি মারিল। যেন বিলোল পল্লবের অবচ্ছেদে সূর্য্যরশ্মি ক্ষণেক হাসিয়া লুকাইল। ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ সে—ঐ সেই রিঙ্কের সুন্দরী!"

কাউণ্টেস চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু এই বিহ্বলতা ক্ষণেক মাত্র, তিনি আত্মসংবরণ করিয়া ডাকিলেন,—"জাষ্টাইন!"

লতাজাল সরাইয়া সুন্দরী আবার দেখা দিল, স্কেটিং রিঙ্কের সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী এখন দাসীবেশে সজ্জিতা; প্রজাপতি যেন রেশম-কীট হইয়াছে। ম্যাক্সিমকে দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না; ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

কাউণ্টেস বলিলেন, "কি হইয়াছে?"

"সেই মহিলাটি আসিয়াছেন, বৈঠকখানায় আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"মসিয়ে ভিলাগোস আসেন নাই?"

"না, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে একটি বাক্স আসিয়াছে। আপনার শয়ন-কক্ষে বাক্সটি রহিয়াছে।"

জাষ্টাইন মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া গেল।

ম্যাক্সিম নীরব নিশ্চলমূর্ত্তিতে বসিয়াছিলেন, কাউণ্টেসকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না; তিনি অনিমেষ-লোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন।

কাউণ্টেস বলিলেন,—"বালিকা আমাকে বলিয়া গেল, কুমারী ডব্রুজেরেস আসিয়াছেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

ম্যাক্সিম কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু দেখা করা সঙ্গত কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কিন্তু আমাদিগের সাক্ষাৎকার-কালে উপস্থিত থাকা আপনারা পক্ষে ভাল।"

"আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত; কিন্তু এই যুবতী, এই চোরের সহচরী—যাকে আপনি জাষ্টাইন বলেন,—"

"আমার পরিচারিকা?—আসুন, আর সময় নাই।"—এই বলিয়া কাউণ্টেস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাক্সিম বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভাবিলেন, "তাঁহার পরিচারিকা আমার ব্রেসলেট চুরি করিবার পরও তাঁহার কাজ করিতেছে! বাগানের মালী ও কার্ডকিরও ঠিক এই অবস্থা। ইনিই ত এই মাত্র আমাকে বলিলেন, ইহারা সকলে এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত। তবে কি বুঝিব, তিনিই ইহাদিগকে চুরি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন?"

কাউণ্টেস ইয়াল্টা রাজহংসীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া প্রশান্ত আননে শুচিস্মিত লোচনে ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন। উভয়ে নীরবে উদ্যানভূমি অতিক্রম করিয়া, একটি কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কাউণ্টেস তাঁহাকে দ্বিতলের একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। এই কক্ষে ম্যাক্সিম পূর্ব্বদিন একটি উন্নত পর্য্যঙ্ক দেখিয়াছিলেন। কাউণ্টেস যবনিকা-মণ্ডিত দ্বারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুমারী ডব্রুজেরেস ঐ ঘরে আছেন। আপনি আগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে ভাল হয় না কি?"

"না; তাহার ধারণা, আমি কার্ণোয়েলের বিপক্ষ, সে আমার কথা শুনিতে চাহিবে না। আপনার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস।"

"যথার্থ বলিয়াছেন, চলুন—দুই জনেই যাই।"

কথা কহিতে কহিতে কাউণ্টেসের দৃষ্টি একটি অদ্ভুত বাক্সের দিকে আকৃষ্ট হইল। বাক্সটির তলের দিক হইতে উপরের দিকের পরিসর অধিক, উপরে একটি ডালা। বাক্সটি টেবিলের উপরে ছিল।

ম্যাক্সিম কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এটা নিশ্চয়ই মসিয়ে ভিলাগোসের প্রেরিত বাক্স?"

কাউণ্টেস তৎক্ষণাৎ টেবিলের নিকট গিয়া ক্ষুদ্র শবা-

ধারের মত বাক্সটি খুলিয়া পুষ্পগুচ্ছ বাহির করিলেন। ম্যাক্সিম বলিলেন, "এ যে অদ্ভুত উপহার, দেখিতেছি !"

কাউণ্টেস কথা কহিলেন না, পুষ্পরাজি তাঁহার করচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ম্যাক্সিম দেখিলেন,কাউণ্টেসের প্রভাত-প্রসন্ন পদ্মতুল্য মুখ পাণ্ডুর ছবি ধারণ করিল। সুন্দরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমিও ইহারই প্রত্যাশা করিতে ছিলাম।"

"মসিয়ে ভিলাগোস এই উদ্ভট উপহার কাহাকে পাঠাইয়াছেন ?"

"আমার উদ্দেশেই পাঠাইয়াছেন, এই উপহার পাঠাইয়া তিনি আমাকে আমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ শুনাইলেন ; আমি প্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত অপরাধিনী।"

"কে আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল ?—এই নরাধম ভিলাগোস ?"

"নিহিলিষ্টগণ দিয়াছে, ভিলাগোস তাহাদিগের নায়ক মাত্র।

"আপনি তাহাদিগের নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী ?"

"তাহাদিগের সহিত আমার সংস্রব আছে, ইহাই তাহার উপযুক্ত প্রতিফল।"

ম্যাক্সিম কাউণ্টেসের কথার প্রতিবাদ করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে পরিচারিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিমের দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলিল। কাউণ্টেসের ইঙ্গিতে পরিচারিকা চলিয়া যাইবা মাত্র কাউণ্টেস দ্রুতভাবে বলিলেন, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এখনই যে কথোপকথন শুনিতে পাইবেন, তাহাতেই সমস্ত প্রকাশ পাইবে। ঐ কক্ষে কুমারী ডর্‌জেরেস আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ; ঐ ঘরে প্রবেশ করুন, তাঁহাকে আপনার সঙ্গে সকল কথা শুনিতে বলিবেন। কার্ণোয়েল যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে সে প্রমাণ তিনি পাইবেন। যান,—কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করুন।"

"শপথ করুন,আপনার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই ?—"

"কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনারা যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতে পাইবেন।"

"আমি ওখানেই থাকিব, কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইলেই আমি আসিব।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এই সুন্দরী নিহিলিষ্টদিগের ভয়াবহ কার্য্যের সহকারিণী হইলেও তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। কাউণ্টে তাঁহার নিকট যে রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এখন তিনি সমস্ত ব্যাপ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

ম্যাক্সিম যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইবামাত্র, মসিে ভিলাগোস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মূ অতি স্থির ও গম্ভীর, নয়নে উজ্জ্বল জ্বালা। কিং ভিলাগোসকে আসিতে দেখিয়াও কাউণ্টেস অণুমাত্র শঙ্কি হইলেন না,—স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি আমাকে দণ্ডাদেশের সংবাদ জানাইয়াছেন, আপনার এখন আমায় করিতে বলেন ?"

"আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"যখন দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তখন আর জিজ্ঞাসা করিয়া কি ফল ?"

"আপনার কয়েকজন সহকারী আছে, আমি তাহা-দিগকে জানিতে চাহি ! আপনি আমাদিগের সকলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, বিশ্বাসহন্তাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে।"

"যখন জানিব আমার কি অপরাধ, তখন উত্তর দিব কি না বিবেচনা করিব।"

"আপনি অবিবেচনার বশবর্ত্তিনী হইয়া, আমাদিগের সঙ্কল্প-সিদ্ধির পথ কণ্টকিত করিয়াছেন,—ইহাই আপনার অপরাধ। মসিয়ে ডর্‌জরেসের ব্যাঙ্কে চুরির জন্য যে ফরাসী-টার উপর সকলে সন্দেহ করিতেছিল, তাহার সন্ধান লইতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। আপনি সে আজ্ঞায় কর্ণপাত করেন নাই। আপনি যে কেবল মসিয়ে কার্ণো-য়েলের সন্ধান করিবার জন্য আর একজন ফরাসীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, আমাদিগের দলের যে সকল লোকে সমিতির গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত—বহুদিন ধরিয়া যাহারা সমিতির কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও আপনি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনার তরবারি-শিক্ষক কার্ডকি—আপনার পরিচারিকা জাষ্টাইন, একজন বিদেশীর উদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল ; এই ব্যক্তি নিজ নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রকৃত অপরাধীদিগের নাম প্রকাশ করিতে কখনই ক্ষান্ত হইবে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, সে এখনও প্রকৃত অপরাধীদিগকে জানে না,

কিন্তু আপনি বাঁচিয়া থাকিলে, পরিশেষে সে সকলের নাম প্রকাশ করিবে। আপনি আমাদিগের উপর দোষারোপ না করিলে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে পারেন না।"

"আমি নিজ অপরাধ স্বীকার না করিলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন করিতে পারিব না, ইহাই আপনার বক্তব্য?—আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। আমি মসিয়ে ডর্জেরেস ও তাঁহার কন্যাকে চুরির যথার্থ ইতিহাস বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছি। কি উদ্দেশ্যে কে এই কাজ করিয়াছে, তাহা আমি তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিব, তাঁহারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইব। কিন্তু বলিয়া রাখি, আমি কেবল আমারই নাম করিব।"

"আর আপনাকে আমার বিশ্বাস নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দীর্ঘকাল বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেন আপনি আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন?"

কাউণ্টেস গর্ব্ববিস্ফারিত নয়নে ভিলাগোসের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যাহারা সে দিন রুষ-সম্রাটের শীত-প্রাসাদ উড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদিগের সহিত কোন সংস্রব রাখি, এ সাধ আর আমার নাই।"

ডাক্তার স্কন্ধদেশ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন, "আপনার মুখে আজ এমন কথা শুনিতে পাইব, এরূপ আশা আমি করি নাই। কিন্তু বহু বিলম্বে আপনার মনে এই ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। আপনি যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুঝিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, তখন অত্যাচারের ধ্বংসের জন্য আমরা যে অসি ও অগ্নির আশ্রয় লইব, তাহা আপনার অপরিজ্ঞাত ছিল না।"

কাউণ্টেস গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনারা রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দীপনা করিবেন, কিন্তু আপনারা যে ঘৃণিত নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইবেন, রুষসম্রাটকে ধরিবার জন্য সাহসী সৈনিকদিগের প্রাণবধ করিবেন, ইহা ভাবি নাই। আপনাদিগের সম্প্রদায়ের কেহ কেহ নরহত্যা করিয়াছে, এ কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ঐ সকল হত্যাকাণ্ডকে সমিতির কার্য্য-নীতির ফল বলিয়া মনে করিতে পারি নাই;—ভাবিয়াছিলাম, ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া সমিতির কেহ কেহ ঐরূপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ প্রাতে সেণ্ট-পিটার্সবার্গ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতেই আমার চোখ ফুটিয়াছে। আপনারা আমাকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু আমাকে আর আপনাদিগের দলে রাখিতে পারিবেন না।"

"তাহা হইলে, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ফরাসীর জন্য জীবন-বিসর্জ্জন করিতেই কৃত-সংকল্প হইয়াছেন! আপনি অন্যায়ের প্রতীকারপরায়ণা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনি রুষদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন।"

কাউণ্টেস ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আপনাদিগের সহিত বিরোধ করিব না, কিন্তু আমাকে অবমাননা করিবেন না। ঐরূপ করিবার অধিকার আপনার নাই। আমার অতীত জীবনের ঘটনাবলীই তাহার সাক্ষী। যিনি পোল্যাণ্ডের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সাইবিরিয়ায় বন্দি-দশায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—আমি তাঁহারই কন্যা। স্বদেশকে অধীনতাপাশ-মুক্ত করিবার জন্য আমি আপনাদিগের সহিত মিলিয়াছিলাম, আর যে সকল নির্ভীক নর-নারীকে আপনাদিগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম, তাহাদিগেরও অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আজ সে জন্য লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। কোর্ডকি দেশের সেবা করিয়াছে, আমার আজ্ঞাপালন করিয়া, সে দেশের কাজ করিতেছে বলিয়া, তাহার ধারণা। জাষ্টাইন প্যারিসের রমণী, কিন্তু তাহার পিতা ও স্বামী পোল। আর সাহসী জর্জ্জেট—যে আমার জন্য তাহার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছিল, সে এক-জন ফরাসী ভদ্রলোকের পৌত্র। এই ফরাসী পোল্যাণ্ডের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। আর যে রমণী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সময় ইহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সুখদুঃখের ভাগিনী হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভ্রান্তবংশ-প্রসূতা কাউণ্টেস ওয়েলে-স্কা। তিনি দেশের জন্য তাঁহার সুখ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধনজন, কুলগৌরব সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়াছেন, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর-ধরিয়া তিনি সামান্যা নারীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছেন, দেশের মুক্তির জন্য এখনও তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হন নাই। কিন্তু যে সকল কাপুরুষ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নৃশংস নরহত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছে,

এই মহীয়সী মহিলা তাঁহাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন, এ কথা মনেও স্থান দিতে পারেন কি ?”

ডাক্তার বলিলেন, “তিনি ইহাদিগের চৌর্য্য-ব্যবহারে তাঁহার পৌত্রকে সহায়তা করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।”

“যে দলিল-পত্রের জন্য আমার স্বদেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, সেই কাগজ হস্তগত করিবার জন্য সে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল, সে আমার আজ্ঞাপালন করিয়াছিল। আমিই এই কর্ত্তব্য-পালনের জন্য জীবন-উৎসর্গ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই কার্য্য সাধনে আমাকে কি যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নহে।”

“হাঁ, আপনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন এমন নিপুণতা ও নির্ভীকতার সহিত সম্প্রদায়ের কাজ করিয়া কোন্ উন্মাদনার বশে আপনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন, তাহাই আমি ভাবিতেছি ! যে দিন সেই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে, তদবধি আপনি কত অদ্ভুত কাজই করিয়াছেন। কার্ডকি শবাগার হইতে ছিন্নহস্ত চুরি করিয়াছে, জাষ্টাইন হারা-ব্রেসলেট উদ্ধার করিয়াছে, এ সকল আপনার প্রতিভার অদ্ভুত ফল। যে দুর্ঘটনায় আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত, আপনার কৌশলে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ আপনি সেই পুরাতন ঘটনাকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও আপনার বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এত কষ্টে এত যত্নে যে ফল ফলিয়াছে, তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সহসা কেন এই ভাবান্তর ঘটিল, বলিতে পারেন কি ?”

“কেন ?—নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করা ভিন্ন আর কোনও কারণ নাই। যখন শুনিলাম, মসিয়ে কার্ণোয়েল বিনা অপরাধে চৌর্য্যপাপে কলঙ্কিত, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি অজ্ঞাতসারে তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়ভাগিনীর যে ক্ষতি করিয়াছি, সে ক্ষতির প্রতীকার করিব।”

“আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি স্বীকার করিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রণোদনায় আপনি আমাদিগের বিবাদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তথাপি দুইটি সর্ত্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।”

“থাক্, আপনাকে আর কষ্ট করিয়া সর্ত্তের কথা বলি হইবে না, আমি কোন সর্ত্তে সম্মত হইব না।”

ডাক্তার অবিচলিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—“প্রথ আপনি জন্মের মত ফ্রান্স পরিত্যাগ করিবেন। দ্বিতীয়,—কাল রাত্রিতে জাষ্টাইন ও কার্ডকি, মসিয়ে কার্ণোয়েল আপনার গৃহে রাখিয়া গিয়াছে,—যদি বাঁচিবার সাধ থাবে তাহা হইলে এই ব্যক্তিকে এখনই আমার হস্তে সমর্প করুন।”

ঘৃণার হাসি হাসিয়া কাউণ্টেস বলিলেন, “মসি কার্ণোয়েলকে আপনার হস্তে দিব ?—তাঁহাকে প্রাণে মরিবার জন্য বুঝি ?”

“তাহারও প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।—আপনি যাহাই করুন না কেন, তাহার নিষ্কৃতি নাই।”

“আর আপনিই আমার কাছে এই ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত প্রস্তাবের কথা বলিতে আসিয়াছেন ? আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে অনেকটা চিনিয়াছেন।”

“আপনি এ প্রস্তাবে অসম্মত”—কাউণ্টেস কথার উত্তর করিলেন না, ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ভিলাগোসকে দ্বার দেখাইয়া দিলেন। ভিলাগোস পরুষভাবে বলিলেন,—“উত্তম, আপনি আমাকে দূর করিয়া দিলেন, আমি আর আসিব না, আপনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। আজি হইতে একপক্ষ মধ্যে আপনাকে ইহলোক হইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল একটি কথা বলিয়া যাই, শুনিয়া রাখুন, যে যে আপনাকে সাহায্য করিয়াছে, যে যে আপনার বিশ্বাসভাজন হইয়াছে, তাহাদিগের আর নিস্তার নাই। আপনার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা পরিত্রাণ পাইবে না। বিদায়, কাউণ্টেস, আপনার মৃত্যুতে আমি ব্যথা পাইব, আপনি ইচ্ছা করিলে অতি প্রবলভাবে আমাদিগের সংকল্প-সিদ্ধির সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু বিশ্বাসহন্ত্রীর মৃত্যু আপনার ঘটিবে, কেন না উহাই আপনার বাঞ্ছা।” এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিবার পর ভিলাগোস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কার্ডকি বাহিরে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিল। ম্যাক্সিম তৎক্ষণাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন। কাউণ্টেস ম্যাক্সিমের নিকট গিয়া দেখিলেন, কুমারী এলিস তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন।

স্রোততাড়িত বেতসীর ন্যায় এলিসের কমনীয় তনুলতা কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ম্যাক্সিম ধীরস্বরে বলিলেন, "আমরা সকল কথাই শুনিয়াছি।" অতি কোমল করুণহাস্যে কাউণ্টেসের অধর রঞ্জিত হইল;—তিনি বলিলেন, "এখন আমার মৃত্যু উপস্থিত।"

"মৃত্যু! ঐ দুরাত্মারই মৃত্যু উপস্থিত! আমি স্বয়ং তরবারির আঘাতে পাষণ্ডকে ইহলোকের পরপারে পাঠাইব।"

"না—এই নরহন্তার জন্য আপনার অমূল্য জীবন বিপন্ন করিতে পারিবেন না। মসিয়ে কার্ণোয়েল নিরপরাধ, একথা আপনারা শুনিয়াছেন, এখন আমি মরিলে ক্ষতি কি।"

"আমার মত এলিসেরও কার্ণোয়েলের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমার পিতৃব্যও উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবেন। কার্ণোয়েল দীনভাবে গর্ব্বিত হৃদয়ে যে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, আমি তাঁহাকে সেই গৃহে লইয়া যাইব। তিনি আজ উন্নত মস্তকে সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন। তিনি কি এখানে,—না অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছেন?"

"হাঁ, তিনি এখানেই আছেন, আমি স্বয়ং তাঁহাকে ডর্জেরেসের নিকট লইয়া যাইব, আমি তাঁহার যে অপকার করিয়াছি, স্বয়ং তাহার প্রতীকার করিব।" ম্যাক্সিম উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার পিতৃব্য—"

"আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইবেন কি না?—কিন্তু আপনাকে এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্মত করাইতে হইবে। এই মাত্র আপনারা যে কথা শুনিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিবেন, আর আমার গোপন করিবার কিছুই নাই। এই দুর্বৃত্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া যে আত্মব-মাননা করিয়াছি, এ কথা লোকে জানিলে, আমার আর ক্ষতি নাই। আমি ইহাদিগের ভয় প্রদর্শনে ভীতা নহি। আমি এ বিষয়ে এরূপ ভয়শূন্য হইয়াছি যে, মসিয়ে ডর্-জেরেসকে এই গুপ্তকাহিনী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিব।"

"উহা ঘোর অবিবেচনার কাজ হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি একাজ করিবেন না। কেন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন! কার্ণোয়েল কলঙ্কমুক্ত হইল, ইহাই যথেষ্ট—আমি আমার পিতৃব্যকে আপনার আগমন-সংবাদ বলিতে চলিলাম। কিন্তু বিষয়ে অন্য আলোচনা অনাবশ্যক।"

কাউণ্টেস এলিসের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন তাহার নয়নে যেন দ্বিধা ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাউণ্টেস কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি আপনাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন কি?"—এলিস কথা কহিতে পারিল না। তাহার কোমল কপোল বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল।

কাউণ্টেস আবার বলিলেন, "বাস্তবিক আমি আপনার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি। যখন শুনিলাম, আপনার প্রেমাস্পদের নামে কলঙ্ক রটিয়াছে, তখন আপনার পিতার নিকট আমি অপরাধ স্বীকার করিলেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইত। আমি নীরব থাকিয়াই পাপ করিয়াছি—উহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। এ জীবনে আমার আর অধিকার নাই, আততায়ীরা এ জীবন গ্রহণ করিবে, সুতরাং আপনাদিগের নিকট আমার জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি আপনাদিগের দেশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, আপনাদিগের বিবেচনায় আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আত্ম-সমর্পণেও প্রস্তুত। আমি জগতের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিব, আমি এই নরপিশাচদিগের সহকারিণী,—তাহাদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি।"

কম্পিতকণ্ঠে এলিস বলিল, "আপনি এই কাজ করিবেন?"

"কেন, ইহাতে কি আপনার সন্দেহ হইতেছে? তা হইলে বোধ করি, সেই নরাধমকে এই মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহা আপনি শুনিতে পান নাই। আমি নিজেই আপনার পিতৃগৃহে চুরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ কথা কি শুনেন নাই? আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইতেছে না? তবে চাহিয়া দেখুন।"

এই বলিয়া কাউণ্টেস নিজ প্রসাধনকক্ষস্থ একটি কুলঙ্গীর কৃষ্ণ-যবনিকা অপসারণ করিলেন। এলিস অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাউণ্টেস আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলি-লেন,—"এই দেখুন—সেই ছিন্নহস্ত।"

ম্যাক্‌সিম মৃদুস্বরে বলিলেন—"তাহা হইলে আপনারই হস্ত ছিন্ন হইয়াছে!"

কাউণ্টেস বাম বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই?"—কাউণ্টেসের বাহুর মণিবন্ধে একখানি কৃত্রিম হস্ত সংলগ্ন ছিল। একে একে সকল কথা ম্যাক্সিমের মনে পড়িল। কাউণ্টেস কখনও কর-পল্লবের আবরণী মোচন করেন নাই। তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না।

কাউণ্টেস আবার বলিলেন,—"হস্ত-ছেদনকালে আমি নীরবে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, শোণিতপাতে আমার যত না যন্ত্রণা হইয়াছিল,ভিলাগোসের ষড়যন্ত্রে সম্মতি-দানে আমার ততোধিক ক্লেশ হইয়াছিল; আমি জানিতাম, দেশের জন্য আমি শোণিত দিতেছি। ভিলাগোসই সর্ব্ব-প্রথমে অপূর্ব্ব সুন্দরী জাষ্টাইনের রূপমোহে আপনাকে মুগ্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিবার সংকল্প করিয়াছিল। সে সংকল্প ব্যর্থ হইলে সেই আপনাকে আমার গৃহে আনিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যে কার্য্যে জাষ্টাইন বিফলমনোরথ হইয়াছে, আমার দ্বারা সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এই চেষ্টায় আমার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। সে সময় আমার উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমি তখন যে অভিনয় করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ভয়ানক পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু আমার জীবন-মরণে তাহার কি আসিয়া যায়। চুরির সহিত আমার সংস্রবের সকল প্রকার চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হয়। তাহার মনে মনে ধারণা হইয়াছিল, আমি ধরা পড়িলে লোকে তাহাকে এই ষড়যন্ত্রের নায়ক বলিয়া সন্দেহ করিবে। আপনি যে আমাকে মসিয়ে কার্ণোয়েলের বিপদের কথা বলিবেন, আমি নিরপরাধ ব্যক্তির কলঙ্ক-ক্ষালনে প্রবৃত্ত হইব, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, ভাবিলে সে কখন আপনাকে আমার গৃহে আনিত না। যে দিন সে বুঝিল, আমি মসিয়ে কার্ণোয়েলকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করি-তেছি, সেই দিন হইতে সে আমার শত্রু হইল। সে আমার সহিত গোপনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, আমার উপর নজর রাখিতে লাগিল, আমার অনুগত ব্যক্তিদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিল। কিন্তু যখন দেখিল, আমরা তাহাকে পরাজিত করিয়াছি, বন্দী নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, ষড়যন্ত্রের গুপ্তরহস্য প্রক শিত হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন সে বন্ধুত্বের ছদ্মবে খুলিয়া ফেলিয়া, আমার প্রাণনাশের আদেশ প্রচা করিল।"

"কিন্তু আপনারও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছে, এ কথা সে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার এই দণ্ডাদেশ হাস্যোদ্দীপক বিদ্রূপবাক্যে পরিণত হইবে।"

কাউণ্টেস ম্যাক্সিমের কথার উত্তর না দিয়া এলিসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসুন, এখন আপনার কথা কই। আপনার ভাবী পতি উদারচেতা, উন্নত-হৃদয়, মহৎ ব্যক্তি। আমি তাঁহার কোন অপকার না করিলেও, আপনার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার জন্য প্রফুল্ল-হৃদয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম। আপনাদিগের মিলন ঘটাইয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি যখন মসিয়ে কার্ণোয়েলকে আপনাদিগের গৃহে লইয়া যাইব, সে সময় মসিয়ে ডরজেরেস উপস্থিত থাকিবেন।"

এলিসের কথা কহিবার শক্তি ছিল না, তাহার হৃদয়ে তুমুল ঝড় বহিতেছিল। ম্যাক্সিম ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কাউণ্টেস মৃদুস্বরে বলিলেন—"যান, আপনি কুমারী এলিসকে তাঁহার পিতার নিকট লইয়া যান, তাঁহাকে আমার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করুন,—আর সময় নাই, বিলম্ব করিবেন না। আজ আমি যে কাজ করি-তেছি, কাল্ হ'য়ত আর তাহা করিতে পারিব না। আমার দিন ফুরাইয়াছে।"

কাউণ্টেসের কথার প্রতি ম্যাক্সিমের যেরূপ লক্ষ্য ছিল না। কাউণ্টেস ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্তে যে কোন মুহূর্ত্তে নিজ মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা প্রকারান্তরে বলিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবিতে-ছিলেন। ম্যাক্সিম বলিলেন, "কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট কিরূপে কার্ণোয়েলের হস্তগত হইল, তাহা প্রকাশ না পাইলে, আমার পিতৃব্য কার্ণোয়েলকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।"

কাউণ্টেস তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কোন শত্রু তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঐ টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া-ছিল। হয় ত এটা ভিলাগোসের কাজ, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।—অর্থেরও তাহার অভাব নাই। কিন্তু মসিয়ে

কার্ণোয়েল যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র আপনাদিগের নিকট আছে। আমি পত্র দেখিব। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, মসিয়ে কার্ণোয়েলের অকস্মাৎ অর্থ-লাভ যে ঘোর ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা আমরা সপ্রমাণ করিতে পারিব। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি আপনার পিতৃব্যগৃহে উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া কাউণ্টেস দক্ষিণ হস্তে এলিসের কর-পল্লব গ্রহণ করিলেন। এলিস আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না ;—কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ম্যাক্সিম আর কথা কহিলেন না, তিনি এলিসকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাক্সিম কাউণ্টেসের গৃহ-পরিত্যাগের পর একেবারে পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইবার সংকল্প করিলেন ; পিতৃব্যকে সকল কথা সরল ভাবে খুলিয়া বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। মুগ্ধ-হৃদয়া এলিস তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কাউণ্টেস ইয়াল্‌টা বলিয়াছিলেন, মসিয়ে ডরুজেরেসের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা কালে যখন সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখনই তিনি দেখা দিবেন। কিন্তু ম্যাক্সিম পিতৃব্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি অল্পক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এলিসের মঙ্গলের জন্য—নিরপরাধের কলঙ্ক-ভঞ্জনের জন্য—তাঁহাকে এই যুদ্ধে মসিয়ে কার্ণোয়েলের পক্ষাবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কার্ণোয়েলের জন্য যুঝিতে গেলেই তাঁহার বন্ধু ভিগনরীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে ; সুতরাং কথাটা পূর্ব্বেই তাঁহাকে খুলিয়া বলা কর্ত্তব্য। ভিগনরী সাধু প্রকৃতি সদাশয় ব্যক্তি, এ বিবাহে সে সুখী হইবে না ; এলিস অন্যের অনুরাগিণী এ কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেই সে নিরস্ত হইবে। ম্যাক্সিম এইরূপে নিজ সঙ্কল্প স্থির করিয়া ভিগনরীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, জর্জ্জেট সেই দিকে আসিতেছে। জর্জ্জেট সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সহাস্যমুখে আনন্দ-প্রদীপ্ত নয়নে, দুই পকেটে দুইখানি হাত পুরিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। জর্জ্জেটের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ম্যাক্সিম জর্জ্জেটকে বলিলেন, "এখন তুমি বেশ আরোগ্য হইয়াছ না ?"

"হাঁ, কখনও যে আমার অসুখ হইয়াছিল, তাহা এখন আর বোধ হইতেছে না ; আমার স্মরণ শক্তিও ফিরিয়া আসিয়াছে। সব কথাই মনে পড়িয়াছে।"

"তাহা হইলে তোমাকে এখন আমি যাইতে দিব না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এত তাড়াতাড়ি করিয়া কোথায় যাইতেছ ?"

"যাহারা বাক্স চুরি করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া সিন্দুক খুলিতে হয় বলিয়া দিয়াছিলাম, সেই কথাই মসিয়ে ডরজেরেসকে বলিবার জন্য যাইতেছি।"

"আমারও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। তুমি কি নিজ ইচ্ছায় কাকাকে এই কথা বলিতে যাইতেছ ?"

"না, আমার ঠাকুরমা আমাকে ঐ কথা বলিতে পাঠাইয়াছেন।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এ সমস্তই কাউণ্টেসের কার্য্য। তাঁহার উপদেশেই ম্যাডাম পিরিয়াক্, জর্জ্জেটকে পাঠাইয়াছেন। তিনি জর্জ্জেটকে বলিলেন, "তুমি মসিয়ে ডরুজেরেসের নিকট এ কথা প্রকাশ করিলে, তিনি তোমাকে পুলিশে দিবেন,—তোমার প্রাণে কি ভয় নাই ?"

"কথাটি প্রকাশ করিয়া যদি আমাকে জেলে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও সম্মত আছি ; কিন্তু আমার আশা আছে, কুমারী এলিস তাঁহার পিতাকে ঐরূপ কাজ করিতে দিবেন না, আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন।"

"মসিয়ে ডরুজেরেসের মনে দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য তুমি বুঝি সুন্দর সাজগোজ করিয়া আসিয়াছ ? জানিনা তোমার কথা শুনিয়া তিনি কি মনে করিবেন।"

"না মহাশয়, কাউণ্টেস আমাকে এই পোষাক দিয়াছেন। আজ সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে ও ঠাকুরমাকে লইয়া চলিয়া যাইবেন। আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে না, সেই জন্য মন কেমন করিতেছে।"

ম্যাক্সিম ভাবিলেন, কাউণ্টেসের প্যারিস পরিত্যাগ সম্বন্ধে সংবাদ লইবার সময় এ নহে। তিনি বলিলেন, "কাকা এখন বাড়ী নাই,—এস একটু বেড়াইয়া আসি, পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিও।"

উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে ভিগনরীর গৃহদ্বারে উপ-

স্থিত হইলেন। সেখানে একটি দীর্ঘাকার ব্যক্তি দ্বারবানের সহিত কথা কহিতেছিল, সে ম্যাক্সিমকে দেখিয়া নমস্কার করিল। সে বলিল, "আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? এই সে দিন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হইল, সেই যে। আমি রুদে জুক্রেতে মোরগ-ডাক ডাকিয়াছিলাম, মনে নাই?"

ম্যাক্সিম সহসা এই প্রকার সাক্ষাৎকারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"হাঁ চিনিতে পারিয়াছি।"

"এঞ্জিনর গালোপার্ডিন, হিসাবনবীশ, এপলো সভার সভ্য। বাল্যবন্ধু জুলস্ ভিগনরীর সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। দুই মাস ধরিয়া তিনি আমার কোন খবরই রাখেন নাই। আজ সকালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য খবর দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বাহিরে গিয়াছেন, আমার ছুটির আমোদটা মাটি হইল।"

"আমিও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, বড় মুস্কিল হইল দেখিতেছি।"

"আপনার সঙ্গেও তাহা হইলে চাল চালিতেছেন। টাকা হইলে মানুষের স্বভাব বদলাইয়া যায়। দুইমাস পূর্ব্বেও তাঁহার এত দেমাক ছিল না, একটা কাজের জন্য নিজে আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তখন আমার উপর তাঁহার বিশ্বাসই বা কত, আমাকে দিয়া একখানা বেনামী চিঠি পর্য্যন্ত—লিখাইয়া লইয়াছিলেন।"

ম্যাক্সিম সাগ্রহে বলিলেন, "কি বলেন আপনি?—ব্যাপার কি মহাশয়?"

"ব্যাপার অতি সোজা, যাঁহারা মসিয়ে ডর্জেরেসের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রলোকের পঞ্চাশ হাজার টাকা ধারতেন, সেই টাকাটা তিনি আপনার নাম গোপন রাখিয়া ফেরত দিবার ব্যবস্থা করেন, বেনামী চিঠি লিখিয়া টাকা ফেরত দেওয়া হয়। মহাশয়, আপনা-আপনির মধ্যে কথা, কিছু মনে করিবেন না, আমার বিশ্বাস, লোকটা টাকা চুরি করিয়াছিল।"

"ভিগনরী আপনাকে টাকা পৌঁছিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন?"

"হাঁ, আমি গরীব বটে কিন্তু আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। আমি ঠিকমত ভদ্রলোকটির বাড়ীতে টাকা পৌঁছাইয়া দিই। টাকার সঙ্গে যে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল, সে চিঠিখানি পর্য্য আমার নিজের হাতে লেখা। নোটগুলি কোন্ ব্যা হইতে আসিল, পাওনাদার একথা জানিতে পারে, দেনাদারে ইহা ইচ্ছা ছিল না। পাওনাদার ভিগনরীর হাতের লেং চিনেন, এই জন্য ভিগনরী আমাকে ধরিয়াছিল। ভিগনরী আমায় আশা দিয়াছিল, দেনদার ভদ্রলোকটি আমাকে কিছু পুরস্কার দিবেন, কিন্তু পুরস্কারটা এ পর্য্যন্ত চক্ষেও দেখি নাই।"

সকল কথা শুনিয়া ম্যাক্সিমের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, —"আপনি সেই পত্রখানি দেখিলে চিনিতে পারিবেন?"

"ভিগনরীর কথামত যে পত্র লিখিয়াছিলাম?—খুব পারিব। ভিগনরী দেখিবেন, আমি তাঁহার একটি কথাও বদলাই নাই।"

"আমার সঙ্গে অসুন।"

"কোথায় যাইতে হইবে, মহাশয়?"

"এই মসিয়ে ডরজেরেসের বাড়ীতে। এজন্য তিনি আপনার ধন্যবাদ করিবেন।"

"যাইতে আমি খুব রাজি আছি। কিন্তু ভিগনরী যদি অসন্তুষ্ট হয়—"

"আসুন মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মত কাজ করুন। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, এজন্য আপনি পুরস্কৃত হইবেন।"

গালোপার্ডিন, ম্যাক্সিমের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জর্জ্জেটও তাঁহাদিগের সঙ্গী হইল। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইতেছিল যে, সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। তাঁহারা শীঘ্রই সুরেসনেসে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্সিমের পিতৃব্যের গৃহ যখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে শতহস্ত দূরে, সেই সময় তিনি দেখিলেন, ভিগনরী অন্যদিক হইতে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছেন। ভিগনরী দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদিগকে দেখিয়াই সহসা ফিরিয়া দাড়াইলেন এবং বেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গালোপার্ডিন বলিল, "ওর কি অহঙ্কার! এখন আমাদিগকে দেখিয়াই মহাত্মা চম্পট দিলেন। এক সময়ে এ গরিবের সঙ্গে তাঁহার যে পরিচয় ছিল, সে কথা স্বীকার করিতেও তাঁহার

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। বেশ, আমি একদিন এই দেমাকের শোধ দিব।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "হাঁ, তিনি এখন আমাদিগের সঙ্গ এড়াইতে চান। আমাদিগকে হাত-ধরাধরি করিয়া যাইতে দেখিয়াই তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। চলুন, মহাশয়, একটু তাড়াতাড়ি করিয়া চলুন। কাকার সঙ্গে আপনার দেখা করিয়া দিবার জন্য আর আমার তিলার্দ্ধ বিলম্ব সহিতেছে না।"

গালোপার্ডিন বিনা বাক্য ব্যয়ে ম্যাক্সিমের সঙ্গে চলিল। বন্ধুর প্রতি তাহার আর মমতা ছিল না, বন্ধুর ইষ্টানিষ্টের প্রতিও আর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

ম্যাক্সিম বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, তাঁহার পিতৃব্য ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং আপিসে আছেন। জর্জ্জেটকে ম্যাক্সিমের সঙ্গে দেখিয়া দ্বাররক্ষক দেনলিভাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাহার পর সে যখন দেখিল, দরজায় একখানি সুন্দর গাড়ী আসিয়া লাগিল এবং মসিয়ে কার্ণোয়েল, কাউণ্টেস ইয়াণ্টাকে গাড়ী হইতে নামাইবার জন্য তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, তখন সে একেবারে হতবুদ্ধি হইল। ম্যাক্সিম সাদরে উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"এখনই পিতৃব্যের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে। সফলতা সম্বন্ধে এখন আর আমার সন্দেহ নাই। জর্জ্জেট আমাদিগকে সাহায্য করিবে; তদ্ভিন্ন ভগবানের কৃপায় আর একটি লোককে আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তিনি আপনার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ দিবেন।"—ম্যাক্সিম অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন হিসাবনবীশকে দেখাইলেন।

কাউণ্টেস ধীরভাবে বলিলেন, "চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক্।" কাউণ্টেসের স্বভাবসুন্দর মুখ পাণ্ডুর ছবি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েলকে তাঁহার অপেক্ষাও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। দীর্ঘকাল বন্দিদশায় থাকিয়া, তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। কাউণ্টেস ধীর পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। মসিয়ে কার্ণোয়েলের সেই আত্ম-গরিমা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তাঁহারা যেন ন্যায়-বিচারের প্রার্থী হইয়া আজ এ গৃহে পদার্পণ করেন নাই, যেন অপরাধীকেই ক্ষমা করিতে আসিয়াছেন। ম্যাক্সিম সেনাদলের পুরোবর্ত্তী অটলসংকল্প সেনানীর ন্যায় সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মসিয়ে ডরজেরেসের কার্য্যালয়-সংলগ্ন বৈঠকখানার দ্বারে উপনীত হইলেন। জর্জ্জেট বৈটকখানার দরজা খুলিয়া দিল। ঘরে কেহ ছিল না, কিন্তু মসিয়ে ডরজেরেসের উচ্চকণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছিল। সঙ্কটকাল উপস্থিত, কিন্তু ম্যাক্সিমের মনে তিলমাত্র দ্বিধার সঞ্চার হইল না, তিনি হিসাবনবীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি মহাশয় লোক, এই সঙ্কটের সময় আমরা আপনার সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছি। আমার একজন বন্ধুর মানসম্ভ্রম এবং চরিত্র মিথ্যাকলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। আশা করি, আমি যতক্ষণ না আপনাকে ডাকি, ততক্ষণ আপনি এই বালকের সঙ্গে এই খানে প্রতীক্ষা করিবেন।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া ম্যাক্সিম, কার্য্যালয়ের দ্বার উন্মোচন করিলেন এবং কক্ষমধ্যে কাউণ্টেসের প্রবেশার্থ দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কাউণ্টেস কার্ণোয়েলের বাহু অবলম্বন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাঁহা-দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এলিস একটি সোফায় বসিয়া বাহুমধ্যে মুখ লুকাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল, ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। মসিয়ে ডরজেরেস উচ্চকণ্ঠে বকিতে ছিলেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আগন্তুকদিগকে দেখিয়া ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন। কার্ণোয়েল ইহাদিগের সঙ্গে না থাকিলে, তিনি ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারিতেন না, যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু কন্যার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মসংযম করিলেন। অভাগিনী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

কিন্তু একজনের উপর ঝাল না ঝাড়িলে ত' তাঁহার শান্তি নাই, কাজেই তাঁহার ক্রোধের বজ্র ম্যাক্সিমের মাথায় পড়িল। অরক্ত নয়নে ম্যাক্সিমের মুখপানে চাহিয়া ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—"যাহাদিগের এখানে কোন কাজ নাই, তাহাদিগকে কোন্ সাহসে আমার নিকট আনিয়াছ?"

ভ্রাতুষ্পুত্র স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন, "যে কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য এখনই আপনি আমাকে সাধুবাদ করিবেন।"

"সাধুবাদ করিব? আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছ?"

কাউণ্টেস বলিলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা আছে, আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুনুন।"

"কোন প্রয়োজন নাই, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি জানি। সে কথা আমার কন্যাই আমাকে বলিয়াছে; কিন্তু আপনি যে উপন্যাস রচিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি নাই। আর যে লোকটাকে আমি আমার গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছি, তাহাকে আমার বাড়ীতে পা দিতে দিব না ইহাই আমার পণ।"—এই বলিয়া তিনি কার্ণোয়েলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কার্ণোয়েল চমকিয়া উঠিলেন, তিনি উপযুক্তভাষায় মসিয়ে ডরজেরেসের বাক্যের উত্তর দিতে যাইতেছিলেন; কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলে বিরোধ মিটাইবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত কিন্তু সহসা এলিসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কার্ণোয়েল আর কথা কহিলেন না। মসিয়ে ডরজেরেস, কার্ণোয়েলের এই গর্ব্বদৃপ্ত অটলভাব দর্শনে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিষদিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"এ যে দেখিতেছি নির্লজ্জতার চূড়ান্ত,—কিন্তু এখনই এ ব্যাপারের উপসংহার করিতে হইতেছে। ভদ্রে, আপনার নিকট বক্তব্য এই যে, আপনি আমার কন্যাকে যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, আপনি আমার সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কাজের জন্য লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই কাজ করিয়াছেন বলিয়া যদি আপনি গৌরব-বোধ করেন, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী যে আপনার সহকারী ছিলেন না, আমার মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন না। আমি তাঁহার কোন সন্ধান রাখিতে চাহি না, আপনার এই অমার্জ্জনীয় আচরণও আমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি আপনাদিগের কোন কথাই শুনিব না। আপনারা যাহার পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঐ সকল কথায় তাহার কলঙ্ক ক্ষালন হইবে না। আপনি যে বরিসফের কাগজ হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েল আমার সিন্দুক হইতে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়াছিলেন। কল্পিত চিঠিই তাঁহার এই দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিজের দোষ ঢাকিবার জন্ম এই চিঠি প্রস্তুত করা হইয়াছে। যদি তাঁহার সাহস থাকে, তাহা হইলে সে দেনদারকে খুঁজিয়া বাহির করুন, এখানে তাহাকে উপস্থি করুন। ঐ সেই চিঠি, ঐ টেবিলের উপর রহিয়াছে।"

ম্যাক্সিম দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া ধীরভাবে জিজ্ঞা করিলেন, "সত্যই আপনি এই পত্র-লেখককে দেখিতে চাহেন? তিনি আপনার বৈঠকখানায় আছেন। আপ অনুমতি দিন আর নাই দিন, আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া গলা বাড়াইয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "আপনি একবার এই ঘরে আসুন, আমার পিতৃব্য আপনার সহিত কথা কহিবেন।"

গালোপার্ডিন বাধ্য হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কুক্কুট-কূজনে কণ্ঠকলার পরিচয় দিবার সাধ তাহার একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। সে আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিতে লাগিল। মসিয়ে ডরজেরেস রুক্ষ স্বরে বলিলেন। "কে আপনি?"—

হিসাবনবীশ চঞ্চল কণ্ঠে বলিল,—"গালোপার্ডিন—এজিনর গালোপার্ডিন, ফ্রাণ্ড্রের কয়লার মহাজন মসিয়ে চারুলের আড়তের হিসাবনবীশ;—আপনি যদি আমার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে চাহেন, আমার মনিব—"

"আমি আপনার মনিবকে জানি, কিন্তু সে কথা হইতেছে না। এখানে কেন আসিয়াছেন?"

"আমি ত—আমি ত তা' জানি না—"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "আমি জানি, আসুন ত মহাশয় এ দিকে; আমার কাকার ডেস্কের উপর যে কাগজখানি রহিয়াছে, উহার দিকে একবার চাহিয়া দেখুন দেখি।"

গালোপার্ডিন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল এবং কাগজখানি হাতে করিয়াই বলিয়া উঠিল—"এ যে আমার লেখা সেই চিঠি!"

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন, "আপনার লেখা! আচ্ছা,—দেখিতেছি, আপনি সত্য বলিতেছেন কি না; ঐ কালীকলম রহিয়াছে—চিঠিখানি নকল করুন দেখি।"

গালোপাৰ্ডিন মনে করিল, মসিয়ে ডরজেরেস তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে হস্তাক্ষর ভাল কি না দেখিতে চাহিতেছেন। সে চিঠি নকল করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকটি কথা লিখিত হইবা মাত্র মসিয়ে ডরজেরেস কাগজ

খানি টানিয়া লইলেন এবং কার্ণোয়েলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাস, আপনিই এই ভদ্রলোকের আদেশমত বেনামা চিঠি লিখিয়াছিলেন ?"

গালোপার্ডিন কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তাঁহাকে চিনি না।"

মসিয়ে ডর্‌জেরেস, গালোপার্ডিন ও মসিয়ে কার্ণোয়েলের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলেন, পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না। তাঁহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে কাহার কথামত আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন,—বলুন।"

গালোপার্ডিন বলিল, "আপনার কোষাধ্যক্ষ জুলস্ ভিগনরী আমাকে পত্র লিখাইয়াছিলেন।"

"মিথ্যা কথা।"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মিথ্যা বলি নাই। ভিগনরী আমার বাল্য-বন্ধু; তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে এই চিঠির খসড়া লইয়া কার্দ্দিনেট ভোজনালয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিই আমাকে চিঠিখানি নকল করিতে বলেন, তিনি আপনারই কথামত আমার সহিত সাক্ষাৎ—"

"কি! এতদূর সাহস—কিন্তু এ অসম্ভব! ভিগনরী অতি সচ্চরিত্র, আপনি তাহার অসাক্ষাতে যে কথা বলিতেছেন, তাহার সাক্ষাতে কখনই উহা বলিতে পারিবেন না।"

"ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আপনি আদেশ করিলেই আমি তাহার সাক্ষাতে এই কথাই বলিব, আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তাহাকে ডাকিয়া আনিলে, সে আমার কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

গালোপার্ডিন এরূপ সরল ভাবে কথা কহিতেছিল যে, মসিয়ে ডর্‌জেরেসের পূর্ব্ব-বিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ম্যাক্সিম স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "এখন এ বিষয়ে আপনার কি মত—কাকি ?"

"আমার বোধ হইতেছে, ইহা তোমাদিগের ষড়যন্ত্র; যতক্ষণ না আমি স্বয়ং ভিগনরীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সহসা জর্জ্জেট কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, মসিয়ে ডর্‌জেরেস ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন—"তুই এখানে এলি কেন, পাজী ?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "তোমাকে না ডাকিতেই এখানে আসিলে কেন ?"—মসিয়ে ডর্‌জেরেস বলিলেন, "জানিস্, বেটা, তোকে জেলে দিবার জন্য পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দেওয়া উচিত ? আমার কন্যা আমাকে সব বলিয়াছেন। যাহারা নূতন চাবি দিয়া আমার সিন্দুক খুলিয়াছিল, তুই তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছিস্—বেটা চোর!"

বালক ধীরভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, গুপ্তচর কতকগুলি বীরপুরুষের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে সকল কাগজ-পত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল দলিল উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছি। সে জন্য আপনি আমাকে জেলে দেওয়া যদি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমাকে বিনানুমতিতে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

"আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, মসিয়ে ভিগনরী আমায় পাঠাইয়াছেন।"

"কে, মসিয়ে ভিগনরী ? তুই আজ পাগল হইলি না কি ?"

"তিনি পাগলের মত বেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া, আমার হাতে এই পত্র দিলেন, তার পর আমাকে আপনার হাতে পত্র দিতে বলিয়া ছুটিয়া গেলেন।"

মসিয়ে ডর্‌জেরেস বলিলেন, "পত্র ?—ভিগনরীর পত্র-খানি দাও ত।"

জর্জ্জেট পত্র দিল। মসিয়ে ডর্‌জেরেস কম্পিতহস্তে পত্র খুলিলেন। সকলেই বুঝিল, এইবার ব্যাপারের চরম দাঁড়াইল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মসিয়ে ডর্‌জেরেস নীরবে পত্র পড়িতেছিলেন, পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া সকলে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ললাট কুঞ্চিত হইল, দুইটি নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাহার পর তাঁহার কপোল বাহিয়া বৃহৎ অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া কম্পিত, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"শোন"—

ভিগনরী লিখিয়াছিল:—"মহাশয়, এখানি আমার

অপরাধ-স্বীকার-পত্র। আপনি এতক্ষণ নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, আমি ঘোর কুকর্ম্ম করিয়াছি। আমার যে বন্ধু নিজ অজ্ঞাতসারে আমার এই কুকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, এইমাত্র তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, জর্জ্জেট উভয়ের অনুসরণ করিতেছিল। আমি তাঁহাদিগকে আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনাকে আমার কুকর্ম্মের কথা বলিতে যাইতেছিলেন। এখন চিরজীবনের মত ফ্রান্স হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আজ সন্ধ্যাকালে আমি পারিস হইতে বহু দূরে চলিয়া যাইব। ইহাই আমার উপযুক্ত শাস্তি, তজ্জন্য আমার দুঃখ নাই। আপনাকে পত্র লিখিতেছি বটে, কিন্তু নিজের কলঙ্ক-ক্ষালন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার পাপের কথা সমস্ত শুনিলে, বোধ করি, আপনি আমাকে তত তীব্র ভাবে তিরস্কার করিবেন না, এই ভরসায় পত্র লিখিলাম। যে দিন মসিয়ে বরিসফ বাক্স লইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিন আমি তাঁহার আগমনের কিছু পূর্ব্বে আপিসে যাই, গিয়া দেখি সিন্দুক খোলা রহিয়াছে। আমি আপনাকে প্রথম চুরির চেষ্টা সম্বন্ধে যথাসময়ে সংবাদ প্রদান করি নাই বলিয়া, মনে মনে অনেকবার আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, চোরেরা দ্বিতীয়বার চুরি করিতে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে চুরি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি জ্ঞান হারাইয়াছিলাম,—ভ্রমবশে বলিয়াছিলাম, পূর্ব্বে যে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাওয়া যায়, তাহা চুরি গিয়াছে। কিন্তু একটা দেনা-টাকা দিবার জন্য সিন্দুক হইতে যে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে নোটগুলি বাহির করিয়া লইয়াছিলাম, সে কথা মনেই ছিল না। নোটের প্যাকেট পাঁচটি আমার ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়াছিলাম। তিন দিন পরে নোটগুলি আমি দেখিতে পাই।

"রবার্টের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলি নাই, কেন না তিনি আমার বন্ধু, কিন্তু তাঁহাকে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যখন নোটগুলি আবার ফিরিয়া পাইলাম, তখন প্রথমেই আমার মনে আনন্দ হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, আমার বন্ধু যে নিরপরাধ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিব, বন্ধুর নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নোটগুলি আপনাকে দেখাইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন অকারণে তাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে দিন আপিসে ছিলেন না; চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যাকালেও আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। কাজেই পর দিন নোট দেখাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম।

"এই সকল কথা আপনাকে বলিলে আমাকে তিরস্কার সহিতে হইবে, আপনি আমাকে অসাবধান বলিয়া গালি দিবেন, তাহা জানিতাম। যে খাতাঞ্জি হইয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক একটা ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দেয়, তাহার শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়। তাহার পর আমার মনে একটা কুবুদ্ধি জাগিল। আমি অনেক সময়ে মনে করিতাম, আপনি আমাকে আপনার ভাবী অংশী এবং জামাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা আমার স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, তাহাতে সে স্বপ্নের সফলতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু আমার এই আশার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, গোপনে হৃদয় মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি নীরবে কুমারী এলিসকে ভালবাসিতাম, ভাল বাসাকেই জীবনের সার করিয়াছিলাম, স্বার্থের বশে ধনের লোভে আমি তাঁহাকে ভালবাসি নাই, আমার ভালবাসা স্বার্থশূন্য। কতবার মনে হইয়াছে, এলিস যদি আমারই মত দরিদ্র হইতেন, আমি অবাধে বিবাহের প্রস্তাব তুলিতে পারিতাম। আমার বন্ধু, আমার সহচর মসিয়ে কার্ণোয়েলকে বিবাহ করিবেন বলিয়া কুমারী তাঁহাকে গোপনে বাক্‌দান করিয়াছেন জানিয়া আমার ক্লেশের সীমা ছিল না।

"সে যাহা হউক, রবার্ট যখন আপনার গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি জন্মের শোধ দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহলোকে তাঁহার সহিত আর আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে না। এতদিন কুমারী এলিস ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। নির্ব্বোধের ন্যায় আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, রবার্টের অবর্ত্তমানে কুমারী এলিস আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিবেন না। কিন্তু নোটগুলি যেদিন আমার হাতে আসিল, তাহার পরদিন আমি বন্ধুর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি কয়েকদিনের জন্য বৃটানিতে গিয়াছিলেন, আবার পারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আমেরিকায় যাত্রা

রবার পূর্ব্বে তিনি কয়েকদিন পারীতেই থাকিবেন, মারী এলিসের সহিত একবার দেখা করিবেন, পত্রে তিনি নজ ঠিকানা লিখিয়াছিলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত াক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই পত্র পাইয়া আমি উৎকণ্ঠায় আত্মহারা হইলাম; আমার বিশ্বাস হইল, তিনি সুযোগ পাইলেই নিজ নির্দ্দোষিতা অনায়াসে প্রতিপাদন করিতে পারিবেন। আমার হৃদয় নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইল, ঈর্ষাবশে আমার মনে পৈশাচিক সংকল্পের উদয় হইল।

"নোটগুলি রাখিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিরস্কারের ভয়ে নোটগুলি আপনাকে ফিরাইয়া দিতেও সাহস হইতেছিল না। নোট ফিরিয়া পাইবার আশাও আপনার ছিল না, আর এরূপ ক্ষতিতে আপনার ন্যায় ব্যক্তির আসিয়া যায় না। আমি ঋণ পরিশোধের ছলে নোটগুলি কার্ণোয়েলকে প্রদান করিবার সংকল্প করিলাম। আমি মনে মনে বলিলাম, এই অর্থ তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি বিদেশে বাস করিতে সমর্থ হইবেন, হয়ত এই অর্থের সাহায্যে তিনি ধনী হইতে পারিবেন। যে বন্ধু দেশত্যাগী হওয়াতে আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার পথ মুক্ত হইল, এইরূপে তাঁহাকে দারিদ্র্যের কবল হইতে রক্ষা করিব, তাহাতেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এইরূপে আমি আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি যে অতি নীচ দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে কথা মন হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলতঃ রবার্ট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার যাহাতে সর্ব্বনাশ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করাই আমার প্রাণের কামনা হইয়াছিল। আমি জানিতাম, মসিয়ে বরিসফ তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি যদি অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে, রবার্টের নিকট অপহৃত নোট পাইবেন, আপনিও অবিলম্বে এই ঘটনার কথা জানিতে পারিবেন, তখন কুমারী এলিস চৌর্য্যপাপে কলঙ্কিত ব্যক্তিকে কখনই বিবাহ করিবেন না।

"আমার এই পাপ-সংকল্প অতি হেয়, অতি নীচ, অতি কাপুরুষোচিত, কিন্তু ধন্য ভগবান, তিনি এ পাপ-সংকল্প ব্যর্থ করিয়াছেন,—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের চেষ্টায় সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে। আপনি এখন সকলই জানিয়াছেন। রবার্টের কি হইয়াছে, আমি জানি না, কিন্তু আমার আন্তরিক কামনা এই, সময় থাকিতে আমার এই অপরাধ-স্বীকার-পত্র আপনার হস্তগত হইবে, এবং আপনি একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ঘোর অন্যায়াচরণে বিরত হইবেন। ধর্ম্মের নাম করিয়া, শপথ করিয়া, কোন কথা বলিবার অধিকার আর আমার নাই; কিন্তু আমি যখন জন্মের মত দেশত্যাগী হইতেছি, তখন আপনাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ? আমি সত্য বলিতেছি, রবার্ট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কর্ণেল বরিসফের বাক্স তাঁহার শত্রুগণ চুরি করিয়াছে। পরিজনবর্গের মধ্যে কেবল জর্জ্জেট তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছে। আমার কথা শেষ হইল, এখন কেবল আপনার নিকট আমার এক ভিক্ষা আছে;—আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি না, কেন না আমি ক্ষমারও অযোগ্য,—আমার শেষ-ভিক্ষা আপনি আমাকে বিস্মৃত হউন। বিদায়,—চিরকরুণাময় হিতাকাঙ্ক্ষী প্রসাদবিতরণে চিরমুক্তহস্ত মহানুভব—বিদায়! এ জীবনে যাহাদিগকে প্রাণের অধিক ভালবাসিয়াছি, তাহাদিগের নিকট আজ বিদায়! আমি চলিলাম, এ মুখ আর দেখাইব না। আপনাদিগের কল্যাণ হউক, আপনারা সর্ব্বসুখ-সম্পদের অধিকারী হউন। বিদায়—চির-বিদায়! ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই আশাশূন্য, আনন্দশূন্য, আশ্রয়মাত্রশূন্য অভাগাকে দয়া করেন।"

ইহাই পত্রের মর্ম্ম। যাহা বাকী ছিল, পত্রপাঠে তাহাও ব্যক্ত হইল। মসিয়ে ডর্‌জেরেস্ রবার্টের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। তারপর স্নেহভরে কন্যার ললাট চুম্বন করিলেন। সেই স্নেহ-করুণ দৃশ্যে—ম্যাক্সিমের শুষ্কচক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি ম্যাডাম্ ইয়ান্টার দিকে চাহিলেন। জর্জ্জেট আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ কাউণ্টেসের মুখ বিবর্ণ হইয়া তিনি স্খলিতচরণে পিছাইয়া গেলেন। ম্যাক্সিম তাঁহার পতনোন্মুখ দেহ ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে ছুটিয়া গেলেন। কাউণ্টেস মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "সব শেষ!—পাপিষ্ঠ আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে।" বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল।

সকলেই তাঁহাকে তুলিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন।

কিন্তু সব বৃথা হইল। তাঁহার রমণীয় নয়নযুগল আর উন্মীলিত হইল না। দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছিল।

*　　*　　*　　*

এই দুর্ঘটনার পরে একমাস অতীত হইয়াছে। এলিস ও রবার্টের এখনও বিবাহ হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্রী সেই মহীয়সী মহিলার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান-প্রকাশের জন্য একমাস কাল শোকবস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। আগামী মে মাসে তাঁহারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

কাউণ্টেস ইয়াল্‌টার হত্যাকারী ডাক্তার ভিলাগোসের মহা-অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয় নাই। সে হত্যার দিন হইতে নিরুদ্দেশ; বহু চেষ্টাতেও তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, কাউণ্টে ইয়াণ্টার পানীয় জলে সে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিল কাউণ্টেস পূর্ব্বেই উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন তিনি আসন্ন বিপদের আভাষ মনে মনে অনুভব করিয় ছিলেন।

সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি রবার্ট কার্ণোয়েলকে দা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকেও বঞ্চিত করেন নাই। ম্যাক্সিমকে তিনি মহামূল্যবান অঙ্গুরীয় ও ব্রেসলে উপহার দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি কাউণ্টেসের সাধের অলঙ্কার ছিল। ম্যাক্সিমের হৃদয়ে কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার স্মৃতি চিরজাগরুক থাকিবে। হৃদয়ের অশান্তি দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দীর্ঘ-প্রবাসে যাইবেন বলিয়া, সংকল্প করিয়াছিলেন। ভগিনীর বিবাহের পরই তিনি দেশত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত।

দেবদূত

[শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, B. A.]

সেদিন পুণ্যবারাণসী-ধামে জাহ্নবীতট-ভাগে
ভকতি-মৌন পুলককম্প্র লক্ষ পরাণ জাগে;
গভীর নিশীথে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন অভিলাষে
'মুক্তি-সিনান'পুণ্য-পিয়াসী নরনারী ছুটে আসে।
কাঁশর-মুখর মন্দ পবনে ভাসে হোমানল গন্ধ,
অযুত কণ্ঠে উচ্ছ্বসি' ওঠে বন্দন-গীতছন্দ;
কল্লোলি' বহে অধীরা গঙ্গা গম্ভীর বেদ-গানে,
নিশীথগগননীলিমানিবিড় কুহেলি-সীমার পানে।
পাণ্ডুর ক্ষীণ জোছনার ধারা লক্ষ শিরের পরে
স্নেহ-সিঞ্চিত আশীসের মত ঝর ঝর ঝর ঝরে।
গাহন-ক্ষুব্ধ উচ্ছল জল পুলকে আপনাহারা
লুটায়ে পড়িছে তটের প্রান্তে উল্লাসে মাতোয়ারা।
কারো বা ধেয়ান-স্তিমিত-নেত্র, কারো অঞ্জলিবদ্ধ,
কেহ বা গায়িছে বন্দনা-গান, কেহ বা আবেগ-স্তব্ধ;
মহারাজ ওই সিক্তবসনে, ভিখারী দাঁড়ায়ে পাশে,
দেবতার রাজপ্রাসাদ-দুয়ারে পুণ্য-বিভব আশে;—
দেবতার দ্বারে ভেদাভেদ নাহি—নাহি নীচ, নাহি উচ্চ,
কাম্য যেথায় অমরা-বিভব মর্ত্ত্য-বিভেদ তুচ্ছ।
সম্ভ্রমমূক পরতটরেখা চমকিছে থাকি' থাকি,'
বিস্মিত নভঃতারকাপুঞ্জ—পলক-বিহীন আঁখি।
সন্ন্যাসী এক বিজনপ্রান্তে, মুদ্রিত আঁখি দুটি,
পরশ লোলুপ গঙ্গাসলিল পদপাশে পড়ে লুটি;
অঞ্জলিবাঁধা হস্তযুগল, দেহ গৈরিকে ঢাকা,
সুস্থ সুঠাম শুভ্রঅঙ্গ যজ্ঞ-বিভূতি-মাখা;
দীর্ঘ ধবল শ্মশ্রুর জাল দীপ্ত আনন মাঝে,
পদচুম্বিত জটাজূটভার উন্নত শিরে রাজে;
সাধনশুদ্ধ উজল অঙ্গ স্পন্দিছে ক্ষণে ক্ষণে,—
কাহার সে চিরবাঞ্ছিত ছবি জেগেছে বুঝিবা মনে।

—কোথা ভূমে—কোথা চন্দ্রগ্রহণ, জাহ্নবীতট দীপ্ত,
কোথা সে যোগীর বেপথু মর্ম্ম-মিলন-পরশ তৃপ্ত!

সহসা নিশীথশীকরসিক্ত শান্ত পবনে ভাসি'
শিশুর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণে পশিল আসি।
চমকি' জাগিল ব্যথিত তাপস, ত্রস্ত চরণপাতে
অন্বেষি' ফিরে কে কাঁদে কোথায় গভীর বিজন রাতে।
জনহীন সারা সৈকতভূমি, শান্ত তটিনী-বারি,
মন্দিরচূড়ে ডাকি' মরে শুধু পেচক নিশীথচারী।
চন্দ্র তখন পশ্চিমে হেলা রাহুর গরাসমুক্ত,
পুণ্যসলিলগাহনক্লান্ত নিখিল নগরী সুপ্ত।
শিশু এক হেথা স্বজনত্যক্ত বিজন তটের মাঝে
জননীরে ডাকি' কাঁদি' ছুটে ফিরে, নূপুর চরণে বাজে;
স্নেহমার্জ্জিত নিটোল নগ্ন ত্রাসকম্পিত অঙ্গ,
কপোলচুম্বি কুঞ্চিত কেশ, ললিত চরণভঙ্গ,
নয়ন-ধারায় সিক্ত আনন, কিঙ্কিণী কটিতটে,
যতন লেখা চারু ছবি যেন শুভ্র বালুকাপটে।
'কার বাছা ওরে,' সুধাল তাপস, 'পদ্মকলিকা পারা!
কোন্ অভাগীর হারাণো মাণিক?—কাহার বক্ষ-হারা?
কোথা তার ঘর? শয্যা তাহার কোন্ সে প্রাসাদমাঝে?
আজি এ নিশীথে হাহাকার ওগো কাহার মর্ম্মে বাজে?'
তাপসের ধীর সৌম্য আনন স্নেহসিঞ্চিত আঁখি,
ভয়কম্পিত আশ্রয়হারা শিশুরে লইল ডাকি'।
মৃণাল-কোমল হস্ত প্রসারি' তুলিয়া নয়ন দুটি,
ক্ষুদ্র সে শিশু যোগীর বক্ষে ঝাঁপায়ে পড়িল ছুটি'।
'বাড়ী নিয়ে চল'—কহিল বালক লুটায়ে আনন বক্ষে,
সহসা উছাসি' অশ্রুর ধারা বহিল তাপস-চক্ষে;
ডাকিল তাপস,—'আয় বুকে আয়, ওরে সুদূরের স্বপ্ন!
ওরে নন্দন-পারিজাত-বাস! ছিন্ন-মালিকা-রত্ন!
যাক্ খুলে যাক্ রুদ্ধ দুয়ার, টুটুক পাষাণ-বন্ধ,
তমগুণ্ঠিত মৌন শ্মশানে জাগুক অযুত ছন্দঃ।'—
সুপ্ত বালকে চাপিয়া বক্ষে নীরবে জননী পারা
বৃদ্ধ তাপস আশ্রম-মাঝে প্রবেশে আপনাহারা।
কঠিন অজিন শয্যার 'পরে বালকে শোয়ায়ে রাখি'
শিহরে জাগিয়া রহিল তাপস—অশ্রু-সজল-আঁখি।
শিশুর সুপ্ত কোমল আননে খণ্ড-জোছনা-রাশি
জননীর করপল্লব সম নীরবে পড়িল আসি।
নিম্নে উজল গঙ্গার জল কল্লোলে কলগাথা
মন্দপবনে গুঞ্জরি' ওঠে লুপ্ত অতীত কথা।—

কোথা সে সুদূর শান্ত মধুর পল্লীভবন আজি!
আজো কি তাহার ভগ্ন দেউলে আরতি ওঠে গো বাজি'?
পল্লবঘন তরু ছায়াতলে তৃণ-প্রান্তর-পাশে
আজো কি গোধন তাড়ন-ক্লান্ত বিশ্রামলাগি' আসে?
কোথা আজি বেলাচরণচুম্বি সিন্ধু-উরমি-পুঞ্জ!
কোথা পুরাতন নারিকেল বন! কোথা তালীবন কুঞ্জ!
আজো কি এমনি জ্যোৎস্নানিশীথে সাগর-সলিল ছুটি'
সুদূর বেলায় শ্যাম-রেখা-গায় কল্লোলে পড়ে লুটি?
গভীরসিন্ধু জলদমন্দ্রে তরুমর্ম্মের তানে
নিখিল গগন মৌন পবন ঝঙ্কারি' ওঠে গানে?
কোথা সে মুখর কলগুঞ্জিত পর্ণকুটীরখানি!
ধূম্র-আঁধার গোধন-গোষ্ঠ কোথায় আজি না জানি!
আজো কি কুটীরদুয়ার-প্রান্তে তুলসীমঞ্চ-তলে
স্নিগ্ধ সাগর-বায়ু-চঞ্চল সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে?
কোথা সে অতীত মোহন স্বপ্ন—দূর সঙ্গীত সম!
—বর্ণবিহীন অঙ্কনলেখা,—সুন্দর অনুপম!
সেদিনো এমনি চন্দ্রকিরণ ফুটেছে আকাশ ছাপি,'
এমনি সলিল-কল্লোল-গানে বাতাস উঠেছে কাঁপি,'
সেদিনো এমনি সুপ্ত শিশুর আনন জোছনা-দীপ্ত,
এমনি কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ কপোল-পরশ-তৃপ্ত,
শিশুর জননী নিদ্রিতা পাশে, মুদ্রিত আঁখি দুটি,
খণ্ড জোছনা কোমল আননে এলায়ে পড়েছে লুটি'।
—সহসা নীলিম নৈশ গগনে কে ডাকিল 'আয় ত্বরা!
উন্মাদ বায়ে কেঁপে ফিরে বাণী মর্ম্ম-আকুল-করা;
ছুটি' বাহিরিল উতলা পরাণ নির্জ্জন পথমাঝে,—
কোথা জাগে দুটি করুণনয়ন? কোথা আহ্বান বাজে?
সেদিনো যামিনী এমনি মধুর, জগত স্বপন-মগ্ন,
ঊর্ম্মি-ফেনিল সিন্ধু-সলিল ধরণী-চরণ-লগ্ন।'

—হায়, যোগি, হায় কোথা সংযম?—ভগ্ন পাষাণ-কারা।
মুক্ত প্রাকারে যায় ছুটে যায় নির্ঝর-জল-ধারা।
বাহিরে উড়ুক ত্যাগের নিশান—মানুষ সে জাগে প্রাণে,
রুদ্ধ প্রবাহ উচ্ছ্বসি' ওঠে ক্ষণিক গন্ধে গানে!

পরদিন প্রাতে ধনীর ভৃত্য প্রভু-নন্দন-হারা
গঙ্গার তীরে জিজ্ঞাসি' ফিরে বিফল খুঁজিয়া সারা।

তাপস তখন শিশুর গণ্ডে স্নেহচুম্বন আঁকি'
কহিল,—'আমার টুটেছে স্বপ্ন, ফুটেছে আমার আঁখি ;
ওরে অমরার সংবাদ-বাহি! আজি যে এনেছ বাণী,
স্নেহের নিদেশ মস্তকে তুলি লইব গরব মানি'।
শিশুরে স্থাপিয়া ভৃত্যের কোলে, বক্ষ চাপিয়া করে
ফিরিল তাপস—গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িছে ঝ'রে।
চারিদিকে ওঠে উল্লাস ধ্বনি, শুধু তাপসের প্রাণে
কি গভীর ব্যথা মথিয়া উঠিছে, কি বেদনা সে কে জানে!

ধীরে চাপি' বুকে দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রু মুছিয়া বাসে
নীরবে তাপস দাঁড়াল আসিয়া শূন্য-কুটীর-পাশে ;—
তখন প্রভাত কুহেলি মুক্ত দীপ্ত তপন-রাগে
মন্দির-মঠ-তোরণ-শোভিতা পুণ্যনগরী জাগে ;
সৌধ-শিখরে গঙ্গার নীরে তরুণ অরুণ-লেখা
গলিত উজল হেমধারাসম দিকে দিকে যায় দেখা,
ভবনে ভবনে ওঠে কোলাহল, পণ্যবীথিকা পূর্ণ,
—শুধু তাপসের রুদ্ধ দুয়ার,—শুধু সে কুটীর শূন্য !

শ্যাম গেছে মথুরায়

[শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য M.A.B.L., M.R.A.S.]

তোমরা ভেবেছ প্যারী শ্যাম গেছে মথুরায়,
সে যে ভ্রান্তি সে যে ভুল
সে যে মিথ্যা নাহি মূল
আ'ছে কি সে শ্যামচাঁদ—কালাচাঁদ আর নাই,
যমুনা পুলিনে তার প্রেমতনু হ'ল ছাই!

কেবলি মানের ভরে গরবিণী তুমি রাই,
দিলেনা হৃদয় তার
শুধু প্রেম-আব্দার,
রমণী প্রেমিকে করে দেহমন সমর্পণ,
তোমার চরণতলে কাঁদে পড়ি ব্রজধন!

বসন্ত-জোছনা রাতে বহে মৃদু মন্দ বায়,
অনুগতা গোপাঙ্গনা,
করে কৃষ্ণ-আরাধনা,
স্বার্থহীনা চন্দ্রাবলী চায় শুধু দরশন,
বনমালী রাঙ্গাপায় সঁপেছে সে প্রাণমন।

উঠিতে আবেশভরে সিঁদুর লেগেছে গালে,
অভিমানে গরবিণী,
কাঁদাইলে প্রাণমণি,
চরণ ছুঁইতে রোষে দিলে বাধা হে পাষাণি,—
প্রেমের নাগর কৃষ্ণ সকলেরি জেনো ধনি।

এক প্রাণে বাঁধা প্রাণ স্রোতোহীন সে তটিনী,
মহান্ অর্ণব সনে,
মিশে যায় প্রাণে প্রাণে,
কুলু কুলু রঙ্গে ভরা কত স্নিগ্ধ প্রবাহিনী,
সম্মিলনে উদ্বেলিত শত-উর্ম্মি-গরজিনী।

তুমি গঙ্গা বারীশ্বরী তুমি উর্ম্মি হৃদয়ের,
ক্ষুদ্রতোয়া স্রোতস্বতী,
পদতলে পুণ্যবতী,
নিভৃতে জলধি-তলে সচকিতে আলিঙ্গন,
চঞ্চল বারিধি করে চঞ্চল সে বিচুম্বন।

সেদিন মেঘেতে ঘেরা ছিল যে আকাশতল,
সলিলে ডুবিল গোষ্ঠ
তবু তব প্রাণ-কৃষ্ণ,
নিশান্তে কুঞ্জের দ্বারে চেয়েছিল আলিঙ্গন,
ভাসালে আঁখির জলে গোপিকা-হৃদয় ধন!

তোমরা ভেবেছ প্যারী শ্যাম গেছে মথুরায়,
যমুনার নীল জলে,
ভালবাসা দিল ফেলে,
প্রেম-দেহ বিসর্জ্জন প্রেমতনু হ'ল ছাই,
আছে কি সে শ্যামচাঁদ—কালাচাঁদ আর নাই!

অবুঝ পত্র *

[আবুল্ ফাজেল্—কপিঞ্জল]

সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি হওয়ায়, পরস্পর পরস্পরকে নিন্দাবাদ করিতে ও গালাগালি দিতে বিরত হইয়াছেন; বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু 'ভারতী' নামক পত্রিকায় (পত্রিকাখানি হিন্দু—কি মুসলমানের দ্বারা পরিচালিত, তাহা আমি অবগত নহি) 'ও বাড়ীর পূজা' ও 'সব চলে তলে তলে' নামক চিত্র দু'খানি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উহা আমার কোন স্বজাতীয়ের অঙ্কিত এবং স্থির করিয়াছিলাম, ঐ চিত্রশিল্পীকে ওরূপ চিত্র দিতে নিষেধ করিব। কিন্তু পরে শুনিলাম, উহা একজন 'ঠাকুরে'র অঙ্কিত; জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আল্লা রক্ষা করিয়াছেন;—ধন্য পীর, ধন্য আলি! হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ ঘটাইয়ো না। উক্ত পত্রিকায় 'টিকি' ও 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক সনেট্ দুইটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। মহাভারতের অনুবাদ করা ত অতি সোজা, তাহার জন্য সিংহ মহাশয় স্থায়ী যশের দাবী করিতে পারেন না। তিনি মূল্য দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের টিকি কাটিয়াছিলেন,—ইহা সত্য হউক, অসত্য হউক, তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে। ইহা তাঁহার বীরত্বের ও ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক। হায়, বেচারা যদি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ততদিন টিকির নির্বোনেদ হইত। আমার বন্ধু 'কপিঞ্জল' ঐ দুইটি কবিতার দেখাদেখি, দুটি সনেট্ তৈয়ার করিয়াছেন এবং কয়েকটি কবিতায় একটি প্রথম-শ্রেণীর মাসিকপত্র বাহির করিবার আভাস দিয়াছেন। তিনটি কবিতাই আপনার নিকট পাঠাইলাম, যদি বুঝিতে না পারার দরুণ ছাপিতে অস্বীকার করেন—ফেরৎ পাঠাইবেন; আমার বন্ধু 'বীরবলের' 'সবুজ পত্রে' ছাপিতে পাঠাইব। ইতি—

ভবদীয়—আবুল্ ফাজেল্।

কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতি-

হে কালি! আইস তব বদলিয়া নাম,
স্বচ্ছ নিরাকার-রূপে এ ভারতমাঝে,
স্বরগে এখন বল আছে বা কি কাম,
দেখ নব নব টিকি এখনো বিরাজে!
'ভারতের' অনুবাদ কীর্ত্তি ক্ষুদ্র তব,
সে যশের রশ্মি নাহি করে ঝিকিমিকি
তোমারে করিত আর কিসে হে অমর,
যদি তুমি না কাটিতে বামুনের টিকি!
এসো এসো বীরবর, এসো কাঁচি লয়ে,
তোমার 'হুতুম' ডাকে এসো কৃপা করি;
টিকির দৌরাত্ম্য আর সহ্য নাহি যায়,
দাও ও সোণার তরী টিকিতেই ভরি।
কৃপা করে এনো সাথে, ওগো অনুরাগী,
গোটাকত লেজ,—টিকি-বিরাগীর লাগি।

আমার গান

(১)

করবো বাহির নূতনপত্র—
উড়্বে যাহা ফুরফুরিয়ে,
থাক্‌বে নাক' দামটি তাহার—
আস্‌বে গ্রাহক সুড়সুড়িয়ে।
তাহাতে লিখবে 'রামী',
মোহিনী, বিন্দি, শ্যামী,
তাহাতে লিখব আমি—
দুরদুরিয়ে।

* আমরা পত্রখানির সম্যক্ অর্থ বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু বড় লোকের নাম দেখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

—ভাঃ সঃ।

(২)

তাহাতে থাকবে কেবল
নূতন ভাবের উদ্বোধনই,
'সাকী'দের ভরপিয়ালা,
ডাগর আঁখির ফনফনানি।
ভাষাটা হিঁজির পিঁজির
করিয়া ছিঁড়বে জিঁজির,
উঠিবে ভাবটি ঝিঁঝিঁর—
ভুরভুরিয়ে।

(৩)

সে খাঁটী গোলাপী সিল্ক্,
নয় গো ঝুটা—নয় গো সূতি,
থাকিবে নিন্দা হিঁদুর—
সমাজ-দেবীর বক্ষে শুঁতি।
পড়িতে চক্ষু মেলি
হবেনা, আগেই বলি ;
নিরাকার চরণ-ধূলি
পড়্‌বে প্রাণে—ঝুরঝুরিয়ে।

(৪)

ইংরেজের গড়ের মত
হিঁদুদের ওই সমাজখানা,
ভাঙ্গিতে কঠিন বড়—
দিইনা তবু দিইনা হানা।
যা পড়ে পড়ুক টুটে,
যে আছে পলাক ছুটে,
হাঁটুক না যতেক কুটে—
থুরথুরিয়ে।

(৫)

আমাদের লেখনগুলা
হবে যে 'বম শেলের' মত,
দেখি না বামুন-দলের
বুকেতে আর শোণিত কত ?
এসো ও সমাজ-খুড়া !
ঘুসিতে করবো গুঁড়া,
কত আর কাঁপবে বুড়া—
থুরথুরিয়ে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রতি

হে কালীপ্রসন্ন ! দেখ, সাহিত্যের খেতে
ভ্রমিতেছে ব্রহ্মদৈত্য, বেড়াইছে মেতে
অসংখ্য ধর্ম্মের ষণ্ড, দলি কিসলয়
করিছে বিকট শব্দ, কত আর সয় !
ব্যস্ত ছিল যে গর্দ্দভ বিচালী-চর্ব্বণে,
আজি উপপ্লবে দেখ দেবতা-ব্রাহ্মণে
ধরিয়া বিকট গীতি। কোথা ক্ষেত্রপাল !
এসো লয়ে বিদ্রূপের লগুড় করাল ;
গলে বাঁধি উদুখল, পা চারিটি ছাঁদি,
ভারতীর খোঁয়াড়েতে দাও ওরে বাঁধি।

'হাঘরে'দের গান *

(১)

আমার সবাই 'ভবঘুরে,'
গৃহ কি আর করবে ;
নিখিলেরি শ্যামল শোভা
ভ্রমণ-ব্যথা হরবে।
পাষাণকারা ঘরের মাঝে
বোকা পেচক কেবল রাজে ;
গাঁথুনির ওই বিরাট্ পাষাণ
কখন হঠাৎ সরবে—
মরবে ওরা মরবে।

(২)

আমাদের এই চটের ঘরে
নাইক আঁধার কক্ষ,
উদার আকাশ চারিপাশে—
উদার মোদের বক্ষ।
ভাতের হাঁড়ি, খেজুর ঝাঁপি,
বক্ষে লয়ে রাত্রি জাপি,
নাইক বাধা গাধাগুলা—
সবুজ ঘাসে চরবে—
মরবে ওরা মরবে।

* কবিবর রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে

(৩)

আমরা নূতন ভাবের ভাবুক—
বহুরূপীর বংশ ;
আহারে নাই কোনই বাধা—
সবাই পরমহংস।
স্বাধীন মোরা দিবসনিশি,
মুক্ত মোদের সূর্য্যশশী,
আষাঢ়েতে মোদের ঘরে
জলের ধারা ঝর্‌বে—
মর্‌বে ওরা মর্‌বে।

(৪)

ওই যে বিশাল পাষাণ-দেউল—
নাইক হাওয়ার গন্ধ,
যারা আছে মর্‌বে তারা—
মর্‌বে গো নিঃসন্ধ !
এমন প্রেমের আলোর বানে,
নাইক পুলক ওদের প্রাণে,
দেখ্‌বে ওদের বাস্তুভিটায়
কেবল ঘুঘু চর্‌বে—
মর্‌বে ওরা মর্‌বে।

(৫)

প্রকৃতির রাজছত্রতলে
হচ্ছি মোরা পুষ্ট,
ন্যাংটা মোরা—বাট্‌পাড়েরে
দেখাবো অঙ্গুষ্ঠ।
ভেবে ভেবে হলাম খেপা,
পড়্‌বে ওরা পাষাণ চাপা,
নাদিলে হায় গলায় দড়ি
বাঘেই শেষে ধর্‌বে—
মর্‌বে ওরা মর্‌বে।

(৬)

ধর্ম্মরাজের সঙ্গী মোরা—
নাইক মোদের ধর্ম্ম,
পরকে ধর্ম্ম-উপদেশটা
দেওয়াই মোদের কর্ম্ম।
বর্ত্তমানের পক্ষপাতী,
পুরাতনকে দেখাই লাথি,
সুদূরেরি যাত্রী মোরা—
কে কি মোদের কর্‌বে—
মর্‌বে ওরা মর্‌বে।

(৭)

ইন্দ্রজালের মালিক মোরা—
নাইক খেলা বন্ধ ;
দিয়া ভাবের "ধূলি পড়া"
কর্‌বো আঁখি অন্ধ,
কইবে ওরা নূতন-কথা,
ভাঙ্‌বে ওরা প্রাচীন-প্রথা,
হর্ম্ম্যখানা চূর্ণ করে
পর্ণকুটীর গড়্‌বে—
নৈলে ওরা মর্‌বে।

(৮)

সেওড়া তরু রুইবে,—করি'
নন্দন-বন ভগ্ন,
ছাড়বে ওরা শাস্ত্র "বয়া"—
নইলে হবে মগ্ন,
তুলসী গাছ উপ্‌ড়ে ফেলে,
ক্রোটন্‌গুলি পুত্‌বে পেলে,
শালগ্রামেতে মার্ব্বেল খেলে
তর্‌বে ওরা তর্‌বে—
নইলে ওরা মর্‌বে !

বিদগ্ধ জননীর খেদ

(১)

এ বুদ্ধি তোর দিলে কে ?
ফেলে দিয়ে কাগজ-কলম—
গামছা-গাড়ু আবার নে।
জুতা পরে ঠাকুর-ঘরে
উঠ্‌লি রে তুই কেমন করে,
বামুন দেখে হতভাগা
মাথাটা তোর নোয়াস্ নে।

রকম উপবাসে ও অনাহারে আমি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং একবেলার আহারের জন্য ছুটাছুটি করিবার কোনই প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। বিশ্রাম করিবার জন্য একটা গাছতলায় হাত-পা ছড়াইয়া শয়ন করিয়া, মহারাজাধিরাজের মত, স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। নিদ্রাদেবী এই সময়ে ধীরে ধীরে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। আমার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখি—সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকের পর্ব্বতের আড়ালে যাইয়া পড়িয়াছেন, সন্ধ্যা-সমাগমের আর বিলম্ব নাই। বুঝিলাম, আমি এ দিন কুম্ভকর্ণের সহিত বাজি রাখিয়া নিদ্রা দিয়াছিলাম; কিন্তু তাও বলি, এমন স্থানে এমন প্রস্তরময় সুখশয্যায় শয়ন করিলে এমন নিদ্রাকর্ষণ সকলেরই হয়। পবনদেব চামর ব্যজন করিতে থাকে, বৃক্ষশাখা সকল দুলিতে দুলিতে ঘুম-পাড়ানিয়া গান গায়, স্বয়ং হিমালয় বুকের মধ্যে করিয়া শোয়াইয়া রাখে; এমন সুখের আয়োজনের মধ্যেও যাহার নিদ্রা হয় না, সে হয় নরহন্তা—আর না হয় ঘোর পাপী। এত অধিক পাপ ত করি নাই, কাজেই প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অকাতরে নিদ্রাদিয়া উঠিয়া দেখি, গাছের মাথায় সূর্য্যদেব একটু মাত্র রক্তিম আভা রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গাছের তলায় অন্ধকার জমা হইতেছে।

একবার মনে হইল, তাড়াতাড়ি লোকালয়ের সন্ধানে যাই; আবার মনে হইল, এমন সুন্দর সময়টা কি আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করিয়াই কাটাইব! তার চাইতে বসিয়া বসিয়া একটা গান গাই না কেন? আজ যদি বরাতে দুই খানি রুটি থাকে, তাহা হইলে জগজ্জননী এই জঙ্গলের মধ্যেই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। হায়, সে কালের নির্ভরের ভাব! সে সব কোথায় গেল!

আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলাম—

"আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায়।
ওগো ডাক নাহি, হাঁক গো নাহি,
সেযে আপনি আপনি চ'লে যায়।
ও সে, এমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা
সে যে, উড়ায়ে দেয় প্রাণের পাখী মানা মানে না;
পাখী, উড়ে যায় বিমানের পথে,
শীতল বাতাস লাগে গায়।"

আমি চক্ষু মুদিয়া গান করিতেছিলাম, বাহিরের কোন শব্দই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। গান শেষ হইলে যখন আমি চক্ষু চাহিলাম, তখন দেখিলাম, তের চৌদ্দবৎসর বয়সের একটি বালক ও কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের একটি যুবতী সেই গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা যে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই।

এই গভীর অরণ্যের মধ্যে তাহাদিগকে এমন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। তাহার পরই বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিকটে লোকালয় আছে কি? বালক বলিল, তাহাদের বাড়ীই এই পাহাড়ের গায়ে—থোড়া দূর। আমাদের কথাবার্ত্তা হিন্দিতেই হইয়াছিল, আমি এখানে তাহা বাঙ্গালা ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি পুনরায় কথা বলিবার পূর্ব্বেই বালকটি বলিল, "আপনি এখানে এমন করে ব'সে গান গাইছেন কেন? এখনি যে রাত হবে, জানোয়ার বাহির হবে। তখন আপনি কি করবেন?"

আমি বলিলাম "পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে এই গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এইমাত্র জেগে দেখি, সন্ধ্যা হয় হয়। এখন এ জঙ্গল থেকে বাহির হতে গেলে হয় ত আরও গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়ব; তার চেয়ে এখানেই কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে সকালে কোন বসতির খোঁজে যাব।"

বালক বলিল, "আপনি যদি চেঁচিয়ে গান না গাইতেন, তা হলে এখানে যে কেউ আছে, তা আমরা জানতেও পারতাম না। আপনি এখানে থাকবেন কেন,—এই একটু গেলেই আমাদের গ্রাম; সেখানে আপনি থাকবার জায়গাও পাবেন, খেতেও পাবেন।"

জগজ্জননী যখন এই গভীর বনের মধ্যে এই বালকের মুখে তাঁহার এই অশান্ত মাতৃদ্রোহী সন্তানের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন, তখন সে নিমন্ত্রণ কি আর অস্বীকার করা যায়! আমি বালককে বলিলাম, "বেশ, চল তোমাদের গ্রামেই যাই।"

তখন যুবতীর হাত ধরিয়া বালকটি আগে আগে যাইতে লাগিল, আমি তাহাদের পশ্চাতে চলিলাম। বালকের সহিত আমার যতক্ষণ কথা হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুই

তিনবার আমি যুবতীর দিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার মুখে যেন কোন প্রকার স্ফূর্ত্তির চিহ্ন দেখিলাম না, একটা মলিন ঔদাস্ত যেন অমন সুন্দর মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মুখের দিকে চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই মুখ যাহার—সে সংসারের কিছুরই ধার ধারে না, সে যেন ভালতেও নাই—মন্দতেও নাই। যুবতীকে দেখিয়া, আমার মনে ঠিক এইভাবের সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু যুবতীকে বা তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন কথা বালককে জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিলাম না। দেখিলাম, যুবতী যন্ত্রচালিতবৎ বালকের সঙ্গে যাইতেছে—পা ফেলিতে হয় তাই সে পা ফেলিতেছে!

পথের মধ্যে আমি আর বালককে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে গ্রাম বেশী দূর নহে; সন্ধ্যা হইতে হইতেই আমরা গ্রামে পৌঁছিলাম। তখন আমি বালককে বলিলাম, "তা হ'লে তোমরা এখন ঘরে যাও, আমি একটা আশ্রয় খুঁজিয়া নেই।"

বালক বলিল, "না, না—আপনি আমাদের বাড়ীতেই আসুন। আমাদের বাড়ীতে বহুত জায়গা হইবে। বাড়ীতে ত বেশী মানুষ নেই—বাবা, মা, আমি, আর আমার দাদার এই পাগ্‌লী স্ত্রী; আপনার থাক্‌বার বহুত জায়গা আছে।" এই বলিয়া বালক আমার কম্বল চাপিয়া ধরিল। এ নিমন্ত্রণ, এ স্নেহের আকর্ষণ আমি কি উপেক্ষা করিতে পারি! আমি বলিলাম, "চল, তবে তোমাদের বাড়ীতেই আজ অতিথি হওয়া যাক্।"—বালক বলিল "আসুন।"

বালকের কথায় বুঝিলাম, তাহার সঙ্গিনী যুবতী তাহার বড় ভাইয়ের স্ত্রী—আর সে পাগল। আমি তাহাকে দেখিয়া যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাইত ঠিক। বালকের কথা হইতে যেন বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার দাদা নাই। তখনই আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, বালকের বড় ভাই মারা গিয়াছে, যুবতী স্বামী-শোকে পাগলিনী হইয়াছেন। করুণায় আমার হৃদয় ভরিয়া গেল! এমন পরমা সুন্দরী যুবতী পতিশোকে পাগলিনী! হায় ভগবান!

গ্রাম আর কি, সামান্য দশপনর ঘর গৃহস্থ, পর্ব্বতের পার্শ্বে এই কথঞ্চিৎ সমতল-স্থান পাইয়া এবং নিকটে দুই তিনটি স্বচ্ছসলিল নির্ঝর পাইয়া এখানে বাস করিতেছে। বালক আমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল। দেখিলাম, ছোট ছোট দুইখানি কুটীর, পাথরের দেওয়াল এবং ছাতেও পাথর-বসান। একখানি ঘরের ছোট একটি বারান্দা আছে। বাড়ীখানি একেবারে পাহাড়ের প্রান্তে, সম্মুখেই প্রকাণ্ড খদ। ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলে দক্ষিণ দিকের দৃশ্য অতি মনোরম, অতি সুন্দর, অতি মহান্। এত কাল পরে আর তাহার বর্ণনা দিতে পারিব না—আমার সে শক্তি নাই—সে দিন নাই!

ঘরের বারান্দায় একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিল। বালক তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া অনুচ্চস্বরে কি বলিল। বৃদ্ধ তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া, 'নমো নারায়ণ" বলিয়া আমাকে নমস্কার করিল। ভণ্ড সাধু আমি, কি করিব! "নমো নারায়ণ" বলিয়াই তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। বৃদ্ধ তখন এক নিঃশ্বাসে—তাহার পরম সৌভাগ্য যে, এমন একজন সাধুকে অতিথিরূপে পাইয়াছে,ইত্যাদি ইত্যাদি—অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। সাধুসন্ন্যাসীদিগের প্রাপ্য এই সকল স্তুতিবাদ আমাকে বেমালুম হজম করিতে হইল।

বৃদ্ধ তখন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্য হইতে একখানি মৃগচর্ম্ম আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিল। আমি পরম সাধুর ন্যায় তাহাতে উপবেশন করিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার 'সেবার্' কি হইবে?—আমি বলিলাম যে, সারাদিন কিছুই আহার হয় নাই, এখন যাহা হয়, তাহাতেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।

আমি কিছু আহার করি নাই শুনিয়া বৃদ্ধের স্ত্রী তখনই রুটি বানাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইল; বালক তাহার সাহায্য করিবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী বারান্দা হইতে একটু দূরে এক উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপরে যাইয়া বসিল। তাহাকে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, বা কেহ তাহাকে ঘরের মধ্যেও ডাকিল না।

বৃদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিয়া আমাকে দিতে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি তামাক খাই না। সাধুসন্ন্যাসী কোথায় গাঁজার ফরমাইস করিয়া বসিবে—আর আমি তামাকই খাই না,ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের মনে কি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল,আমি তাহার নিকট সাধুশ্রেণী হইতে কতখানি নামিয়া পড়িয়াছিলাম,

তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া নিজেই ছিলিমটির সদ্ব্যবহার করিতে বসিল।

চুপ করিয়া কি বসিয়া থাকা যায়! বৃদ্ধ তামাক খাইতেই লাগিল—কথা আর বলে না। আমিই তখন কথা আরম্ভ করিলাম। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ছেলের কাছে শুনিলাম, তোমার পুত্রবধূটি পাগল। কত দিন হইতে উহার এ দশা হইয়াছে?"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কলিকাটি নামাইয়া রাখিল; তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "স্বামীজি, আমার দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। কি কষ্টে—কি দুঃখে যে দিন যাইতেছে, তাহা নারায়ণই জানেন।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ চুপ করিল। আমি তখন কেমন করিয়া কথাটা পাড়িব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, অথচ এই গৃহস্থের কথাগুলি জানিবার জন্যও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে দেখিলাম, যুবতী তাহার প্রস্তর-আসন ত্যাগ করিয়া, ঘরের মধ্যে গেল এবং তখনই এক-খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ লইয়া সেই প্রস্তরের পার্শ্বে চলিয়া গেল। একটু পরেই সেই প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।

বৃদ্ধ ইহা দেখিয়াই বলিল, "ঐ দেখ স্বামীজি, পাগলী আগুন জ্বালাইয়া বসিল। সারারাত ও ঐখানেই ঐ পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে, আর যেদিন ইচ্ছা হইবে, আগুন জ্বালাইবে। রাত্রিতে ও কিছুতেই ঘরে আসিবে না; শীত হোক, বর্ষা হোক, ও ঐখানেই বসে থাকবে। পাগলামি আর কিছুই নয়, সকালে উঠে বনে বনে কাঠ, ঘাসপাতা কুড়াইয়া ঐখানে আনিয়া জমা করিবে, তাহার পর ডাকিয়া ধরিয়া বসাইয়া দুইখানি রুটি দিলে, তাহার কিছু খাইবে, কিছু ফেলিবে। তাহার পর বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সন্ধ্যার সময় কখন আপনিই আসে, কখন বা বনের মধ্যে খুঁজিয়া আনিতে হয়। একটা কথাও বলে না, কোন অত্যাচারও করেনা। স্বামীজি, বলিতে পারেন, এ ভোগ কতদিন আছে?"

এই ভোগের জ্বালায় আমিই তখন অস্থির; আমি আর বৃদ্ধের প্রশ্নের কি উত্তর দিব! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌটি পাগল হ'ল কেন?"

বৃদ্ধ এই প্রশ্ন শুনিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর বলিল, "সে বড় কষ্টের কথা, স্বামীজি,—বড় কষ্টের কথা। আপনি দেবতা, আপনার কাছে বলি। দুটি ছেলে আর বউটি নিয়ে আমরা বুড়াবুড়ী বেশ ছিলাম। চারটা ভঁইস আছে, তিনটা গাই আছে, জমিও অনেকখানি আছে; সংসার বেশ চল্‌ছিল। তারপরই অদৃষ্ট মন্দ হইল। একদিন হঠাৎ গ্রামের দশজনে মিলিয়া এক পঞ্চায়েৎ বসাইল। আমি তার কিছুই জানি না, কথাটা আমার কাছে গোপন ছিল। পঞ্চায়েতে আমার ও আমার বড়ছেলের ডাক পড়িল। আমাদের এই গ্রামের যিনি প্রধান, তিনি আমাকে বলিলেন, 'শোন রঘুবীরদয়াল! তোমার বড়ছেলে বুলাকিরাম অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে; এই পঞ্চায়েতে তাহার বিচার হইবে।' কথা শুনিয়া আমি ত আকাশ হইতে পড়িলাম; আমার ছেলেও কিছু বুঝিতে পারিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমার ছেলে ত কোন মন্দ কাজ কখন করে নাই। সকলেই জানে, সে ভাল ছেলে।' প্রধান বলিলেন, 'আমরাও ত তাই জানিতাম; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক নালিস হইয়াছে।' আমি কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমার পুত্র বলিল 'কি নালিস?'—প্রধান বলিলেন, 'সে কথা আমার বলা অপেক্ষা, যে নালিশ করিয়াছে সেই বলুক।'—এই বলিয়া তিনি আমাদেরই গ্রামের হরিকিষণলালের কন্যাকে ডাকিলেন। হরিকিষণলালের কন্যা মাস তিনেক পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছিল। মেয়েটি সেই পঞ্চায়েতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'বুলাকিরাম বনের মধ্যে বল-প্রকাশে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে! সাক্ষী আর কে থাকিবে?' আমার পুত্র বুলাকিরাম গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'ঝুটা বাত! মতিয়া আমাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য এই দুইমাস কত চেষ্টা করিয়াছে, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। তাই সে আমার নামে এই ঝুটা বদ্‌নাম দিতেছে।' তখন এই কথা লইয়া খুব গোলমাল, খুব তক্‌রার আরম্ভ হইল। শেষে এই রায় হইল যে, বুলাকিরামের কথা বিশ্বাস করা যায় না, অনেকে তাহাকে মতিয়ার সঙ্গে অনেক দিন দেখিয়াছে; আরও এক কথা, স্ত্রীলোকে অনেক মিথ্যা কথা বলিতে পারে, কিন্তু নিজের ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে, এমন মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। অতএব মতিয়ার কথাই বিশ্বাসযোগ্য। বুলাকিরামকে এ জন্য

কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দণ্ড যে কি, তাহা আর স দিন স্থির হইল না। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, সেই জন্য স দিনের মত পঞ্চায়েত ভঙ্গ হইল, পরের দিনে আবার পঞ্চায়েত বসিয়া দণ্ড স্থির হইবার ব্যবস্থা হইল। পরের দিন স্বামীজি! আর পঞ্চায়েত বসাইতে হইল না—সেই রাত্রিতেই আমার বুলাকিরাম কোথায় চলিয়া গেল; কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। সে আজ দুই বৎসরের কথা।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ চুপ করিল। আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল "স্বামীজি, এই কলিযুগে এখনও ধর্ম্ম আছে। যে দিন বুলাকিরাম চলিয়া গেল, সেই দিন বৌমা বলিয়াছিল যে, তাহার স্বামী নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; কিন্তু তখন সে কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। কয়েক দিন পরেই মতিয়া, পাহাড়ের উপর হইতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে যখন খাদ হইতে তুলিয়া গ্রামে লইয়া আসা হইল, তখনও তাহার জ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহার বাঁচিবার আশা ছিল না। তখন মৃত্যু সময়ে সে তাহার অপরাধ স্বীকার করে। বুলাকিরাম যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য; মতিয়াই বুলাকিরামকে কুপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, বুলাকি-রাম কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায়, সে তাহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ দেয়। সে পাপের ফল সে হাতে-হাতেই ভোগ করিল। মতিয়া মরিয়া গেল, সকলেরই বিশ্বাস হইল, আমার পুত্র নিরপরাধ। আমার পুত্রবধূ যখন এই এই কথা শুনিল, তখন সে আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিল; তাহার পরই বলিল, "ওগো, সে আস্‌বে। সে যদি রাত্রিতে এসে কাউকে না দেখে চলে যায়, তারই জন্য আমি সারারাত ঐ পাথরের উপর বসে থাক্‌ব।" এই বলিয়াই সে কি জানি কেন বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর হইতে এই প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে পাগলী আর একটি কথাও বলে নাই। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে বুলাকিকে খুঁজিয়া বেড়ায়, আর সারারাত্রি ঐ পাথরের উপর অমনি করিয়া বুলাকির জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। স্বামীজি! এর কি কোন দাওয়াই নাই। বুলাকি আর ফিরবে না। সে বেঁচে নাই।"

আমি বলিলাম; "তাহা হইতেই পারে না বুড়া; সে যদি মরিয়াও থাকে, তাহা হইলেও যমরাজ তাকে ছেড়ে দেবে, ধর্ম্মরাজ তাকে তার সতী স্ত্রীর কাছে পৌছিয়ে দিয়ে যাবে; নইলে সতীধর্ম্ম মিথ্যা। আমি বল্‌ছি তোমার পুত্রবধূর এ স্বামী-সাধনা বৃথা হবে না—বৃথা হতে পারে না। বুলাকিরাম নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে।"

কেন এমন কথা বলিলাম, কেন এমন ভবিষ্যৎবাণী করিলাম, তাহা বলিতে পারি না; তবে এই কথা বলিতে পারি, প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট সেই দেবীপ্রতিমা দেখিলে, তাহার সেই একাগ্র স্বামী-সাধনা দেখিলে, সকলেরই মনে হইত যে, এ সাধনা বিফল হইতে পারে না—কিছুতেই পারে না।

আমার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ হইয়াছিল; তাই আমার কথাগুলি সতীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; সে একবার আমাদের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার পরই আবার পথের দিকে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল।

বৃদ্ধ আমার কথা শুনিয়া আনন্দে এতই অধীর হইয়া-ছিল যে, সে কথা বলিতে পারিল না; সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আহারের দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, আমি সেই বারান্দায় বসিয়াই আহার শেষ করিলাম। বৃদ্ধা যাইয়া পাগলীকেও রুটি খাওয়াইয়া আসিল। তাহার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক গল্প হইল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও তাহাদের পুত্রটি ঘরের মধ্যে শয়ন করিতে গেল; আমাকেও ঘরের মধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়াছিল; কিন্তু আমি সেই বারান্দাতেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। সে রাত্রিতে আর আমি শয়ন করি নাই; সমস্ত রাত্রি সেই মৃগচর্ম্মাসনে বসিয়া সতী রমণীর সাধনা দেখিয়াছিলাম—তপস্যা দেখিয়াছিলাম।

আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, দুর্গোৎসবের কয়টা দিন এখানেই—এই কুটীরেই কাটাইয়া দিই। এমন পবিত্র স্থান কোথায় পাইব? এমন পবিত্র দৃশ্য কোথায় কোন্‌ দেবালয়ে দেখিতে পাইব? কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ যখন বলিল যে, আমাকে দেরাদুনের সোজা পথ দেখাইয়া দিবার জন্য তাহার পুত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তখন আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না, অষ্টমীর দিনই দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সেই পাহাড়ী-পরিবারের কথা আমি ভুলিতে পারিলাম না। প্রায়ই ইচ্ছা হইত, একবার যাইয়া শুনিয়া আসি, বুলাকিরাম ঘরে ফিরিয়াছে কি না।

মাসখানেক পরে এক রবিবারে সেই পাহাড়ীর গৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এবার আর সাধুসন্ন্যাসীর বেশ ছিল না, ভদ্র লোকের পোষাকেই গিয়াছিলাম। পথ জানা ছিল। প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধের গৃহের সম্মুখে যাইয়া দেখি, শূন্যগৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, জনমানবের সম্পর্কও নাই। তখন পার্শ্বের বাড়ীতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, মাসখানেক আগে এক সাধু আসিয়াছিল। সেই সাধু বলিয়া যায় যে, বুলাকিরাম পরের দিনই বাড়ী আসিবে। সাধুর কথা মিথ্যা হয় নাই, ঠিক পরের দিনই বুলাকিরাম বাড়ীতে আসে এবং দুই দিন এ গ্রামে থাকিয়া সকলকে লইয়া শিভালিক পাহাড়ের মধ্যে কোন্ গাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা গাঁয়ের নাম বলিতে পারিল না। তাহাদের নিকটই সংবাদ পাইলাম, বুলাকিরামের স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়াই প্রকৃতিস্থা হইয়াছিল,—তাহার পাগলামি সারিয়া গিয়াছিল।

হতভাগ্য আমি! যদি একদিন সেই কুটীরে থাকিয়া আসিতাম, তাহা হইলে পতি-পত্নীর এই পবিত্র সম্মিলন দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিতাম। তখন আর কি করিব! যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া সতী রমণী স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় কত নিশা অনিদ্রায় কাটাইয়াছিল, সেই সতীর আসন পবিত্র প্রস্তরখণ্ডকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর কতদিন গিয়াছে; এখনও মহাষ্টমীর দিন সেই পাহাড়ী-পরিবারের কথা আমার মনে হয়, আমি সেই দেবীরূপিণী রমণীর পবিত্র প্রেমের কথা মনে করিয়া, একবার মস্তক অবনত করি।

বন্ধন-মুক্তি

[মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর]

আমার একি হ'ল দায়,
এই পথে যায় চিকনকালা—
চাইতে নারি হায়!
ওগো একি বিষম জ্বালা,
কেন দিবানিশি মোহনবাঁশী
বাজায় মোহন কালা?
আমি কেমনে রই ঘরে,
আবার কুঞ্জ পথে যাই কেমনে
কাল-ননদীর ডরে?
হানি' লাজের মাথায় বাজ,
জল ফেলে জল আন্‌তে যাওয়া—
সে কি সহজ কাজ?

এই দিনের পরে দিন,
গলায় শিকল কাল কাটান'
বড়ই যে কঠিন।
ও তার দুটি পায়ে ধরি,
বলে' আয় তার বাঁশের বাঁশী
রাখুক বন্ধ করি'।
আর নয়ত একেবারে
হাত ধরে, সে নিয়ে চলুক
গোপসমাজের পারে।
আমি তারি চরণ ধরি'
গোপগোয়ালার গোঁয়ার শাসন
ভয় কি আমি করি?

মাতৃ-মিলন

(দুর্গোৎসব)

[শ্রীবীরকুমার বধ-রচয়িত্রী]

ঐ আস্‌ছে আমার মা !
সোণার বরণ মেঘের শিরে অই যে রাঙা পা !
সত্য সত্য দেখ্‌ছি আমি,
ঐ যে মা মোর আস্‌ছে নামি,
আলো আমার চণ্ডীমণ্ডপ—শিউরে উঠে গা !
আয় তোরা ভাই, আয় তোরা বোন, দেখ্‌বি যদি মা।

মায়ের— হাসি মুখে উছ্‌লে উঠে স্নেহের পারাবার,
যদিও বেশ রণমত্তা—তবু মূর্ত্তি মা'র !
অস্ত্র-ধৃত দশ হস্ত,
শিশু কোলে নিতে ব্যস্ত—
যেন— ঝাঁপিয়ে গেলে, নেবে তুলে, ছাড়্‌বে নাক' আর,
মহাশক্তি মাতৃ-স্নেহ হবে একাকার !
তখন— দেখ্‌বে চেয়ে মা কমলা পদ্ম-নয়ন খুলি,
দেখ্‌বে তা' মা বীণাপাণি বীণার লহর তুলি ;
ঐ গজানন আর ষড়ানন,
রইবে চেয়ে ভাই দুইজন,
অবাক হয়ে রইবে ভোলা তিনটি নয়ন তুলি,
চিত্র-পুতুল হয়েই রবে তেত্রিশ কোটিগুলি !

অধম আমি, ক্ষুদ্র আমি, তায় কি গেছে ব'য়ে ?
এই এনেছি মায়ের পূজা "যথাশক্তি" হয়ে,
অপরাজিতা আর অতসী,
অমল কমল, চন্দন ঘষি,
চাউল কলা, দুগ্ধ চিনি, ভোগের জিনিস লয়ে ;
সুপবিত্র গঙ্গাজল,
নব নব বিল্বদল,
ষোড়শোপচার—যাহা ঠাকুর দেছেন ক'য়ে,
পূজা নেবেন দয়াময়ী, "মা আমারি" হয়ে !

মায়ের সনে শুভ মিলন অনেক দিনের পরে,
থাকুক অসুর—থাকুক সিংহ কেবা সে ভয় করে ?
মায়ের কোল যে সুধামাখা,
শত স্বর্গ সেথায় আঁকা,
মায়ের কোলে উঠ্‌তে পেলে, শমনে কে ডরে ?
এসেছে আজ আমার মা,
তোরা সবাই দেখে যা,—
মায়ের ছেলে, মায়ের মেয়ে, আয়রে মায়ের ঘরে।
একত্রে আজ ডাক্‌ব মা, মা, কোটি কণ্ঠ-স্বরে,
সিদ্ধি হবে দুর্গাপূজা সিদ্ধেশ্বরীর বরে।

পরিত্রাণ

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

সুপ্রসার নদ*-বক্ষে তরণীর তরঙ্গ-বিক্ষেপে
ছল্ ছল্, সমুজ্জ্বল, জলরাশি ওঠে কল হাসি'।
পরিচিত সে কল্লোল পশিল শ্রবণে যবে আসি'
আনন্দ-আগ্রহভরে চেতনায় উঠিলাম কেঁপে'।
এই যে জননী মোর—নীলাম্বরে আঁখি দুটি তুলি',
কাঞ্চন কুন্তলরাশি হিরণ কিরণে মুক্ত করি',
বিশ্রাম-আলসে আজি আছেন বসিয়া, মরি মরি—
কিবা মৌন স্নেহাবেশে !
মা আমার, কারা-দ্বার খুলি'
অভাগা এসেছে তোর শান্তি-সুধা করিবারে পান।
ওরা মোরে ধরে' রাখে বন্ধ করি' নিরন্ধ্র কারায়,
আসিতে দেয় না ; তাই, আইলাম আজি মা পালায়ে ;
মা জননি, তোর কোলে আজি মোর হ'ল পরিত্রাণ !
এখন কেবলি ওই সোণাগালা স্নেহের প্রবাহে
ভেসে' যাবে,—দয়াময়ি, আর্ত্ত হিয়া এই শুধু চাহে

* বিষখালি নদ-বক্ষে

ক্লিওপেট্রার বিদায়

[শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী]

'প্রিয়তম প্রাণাধিক,
যত ভালবেসেছিলে তুলনা নাইক তার ;
আদর সোহাগ তব জাগে প্রাণে অনিবার।
চরণের যোগ্য তব—
রূপে গুণে কোন দিন নহি আমি প্রিয়তম,—
যোগ্য আমি ধূলিসম,
চরণে বিলিপ্তা হয়ে থাকিবারে অনুক্ষণ।
এ দুঃখিনী হায় তার শত পূর্ব্ব পুণ্যফলে,
কুসুমের মালা সম—
শোভিল যে প্রেমময় তব প্রেম-বক্ষঃস্থলে!
শত সাধ দুঃখিনীর—
পূর্ণ তুমি চিরদিন করিয়াছ প্রিয়তম,
এই শেষ সাধ মম—
মিটাইও এই ভিক্ষা এই শেষ নিবেদন।
মরণের পরে আসি—
পরশি এ শিরে মম তব পুণ্য শ্রীচরণ,
পবিত্র করিও নাথ এ অপবিত্র দেহ মম।
এই সাধ ভিন্ন নাথ,—
দুঃখিনীর কোন সাধ পূরাতে হবে না আর,
দিবানিশি শত পত্রে
পাঠাবে না এ দুঃখিনী আর প্রেম-সমাচার।
আসিতে হবে না আর,—
দুঃখিনীর কৃতাঞ্জলি সকাতর সম্ভাষণে,
ফলফুলে সুসজ্জিত তোমার এ কুঞ্জবনে।
অভাগীর প্রেম-কণ্ঠে—
উঠিবে না শতকলে সঙ্গীতের সুধাসার,
বাজিয়া প্রেমের বীণা—
স্পর্শিবে না আর তব মরমের প্রেম-তার।
শত দোষ অভাগীর ক্ষমা করো প্রিয়তম,
তব প্রেমার্থিনী আজি করে সব সমাপন।
আজি তুমি দূরে নাথ,
মরমে আঁকিয়া তব বিধুমুখ অতুলন,
শতভাগ্যবতী আমি—
চলিলাম বুকে করি ও আরাধ্য শ্রীচরণ।
অপরাধ করে সবে জ্ঞানে কিংবা মতিভ্রমে,
এ তব সেবিকা নাথ
ভ্রমেও যে অপরাধ করে নাই শ্রীচরণে।
ছিঁড়িয়া মরম তল, উষ্ণ শোণিতের ধারে ;
প্রক্ষালি চরণ তব—
পূজিয়াছি তব পদ প্রেম-ভক্তি-উপচারে ;
প্রতি দিন শত সুখে,—
পাতিয়া দিয়াছি বুক, তুমি যে বসিবে বলে!
মুছিয়া দিয়াছি পদ মুক্ত করি এ কুন্তলে!
এত যে বেসেছি ভাল, সকলি হয়েছে সাধ ;
পেয়েছি তোমায় নাথ,
পরিপূর্ণতমরূপে এই বক্ষে অনিবার।
পূরিয়াছে সব আশা এখন বিদায় নাথ,
চলিনু জনম শোধ করি শেষ-প্রণিপাত।
বড় সাধ অই তব ভরন্ত সরসী-জলে,
ফুটিব কমল রূপে বিকাসি সহস্র-দলে,
আসিয়া দেখিবে নিত্য
ফুটে আছে আদরের তোমার কমল-রাণী
খুলিয়া কমল-আঁখি,
আমিও দেখিব নিত্য তব প্রেম মুখখানি!
তা'হলেই তৃপ্ত হবে মরমের যত সাধ।
প্রেম যে অমর নাথ, নাহি তার অবসাদ।'

কবি-অভিমানী

[শ্রীভাব-রাজ্যের ভ্যাক্‌সিনেটর্]

না ছাপায়ে পদ্য আমার, পত্রিকারে মুখপাতে,
পদ্য দিলে অন্য কবির অহিফেনের মৌতাতে !
কি গুণে তায় প্রথম দিলে, কৈফিয়ৎ দাও এক্ষণি,
কষ্টে আমার ওষ্ঠ কাঁপে দষ্ট হের স্কন্ধনী ।
সমালোচক-ষণ্ড আমি, গোময় মাখা পুচ্ছতে,
প্রতিভারেই ঝাপ্‌টা মারি, তৃপ্ত তৃণ-গুচ্ছতে ।
'গল্প' এবং পদ্য আমি লিখেই চলি হরদমে,
হিংসা 'ছালা' বহেই চলি—পড়িনা কই কর্দ্দমে ।
ভবের মাঝে আমার লেখা বুঝ্‌বে বল কোন্ জনে,
লিপ্ত সে যে ক্ষিপ্ত-হিয়ার দীপ্ত-প্রেম অঞ্জনে ।
অর্থ সেথা ব্যর্থ বটে সর্ত্ত শুধু ঝন্‌ঝনি,
জমায় আসর ফাটা কাঁসর—আমার ভাঙ্গা খঞ্জনী ।
ভক্তি নাহি শক্তিতে মোর, দেখ আমার লম্ফটাই—
'তা' দিয়ে হায় অশ্ব-ডিমে নিতুই আমি 'ছা' ফুটাই ।
দীর্ঘ আমার জিহ্বাখানা, দীর্ঘতর কর্ণ যে,
ভাঙ খেয়ে রাঙ স্বর্ণ বলি, রঙ্গ বলি স্বর্ণকে ।
না পড়ে মোর কাব্য সুধী—দেখেই করে সুখ্যাতি ।
দুষ্ট পাঠক রুষ্ট হয়ে রটায় আমার অখ্যাতি ।
মহত্ত্ব মোর বুঝ্‌লে নারে দেশের যত বর্ব্বরে ;
ভক্ত আমি, রক্ত তাদের ঢালবো দ্বেষের খর্পরে ।

আহ্বান

[শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

পতিত ধরায় কে আছ কোথায়,
এস গো এস গো ছুটিয়া ,
পতিতে তারিতে পতিতপাবন,
রয়েছে হেথায় বসিয়া ।
ওই যে চরণ কর গো স্মরণ,
যাতনা বেদনা রবেনা মরণ,
বারেক সে নাম করিলে স্মরণ
জীবনে ফুটিবে জোছনা ;
তোমার ভাবনা সে যে গো ভাবিবে,
তোমায় ভাবিতে হবেনা ।
ডুবে থাক যদি উঠ গো ভাসিয়া,
উঠ গো আবার তাঁহারে স্মরিয়া,
অধমতারণ অধমের তরে
অধমের দেশে এসেছে ;
তোমার কারণে তাহার নয়নে
করুণার ধারা বয়েছে ।
ওই শুন বাঁশী বাজে পুনরায়,
এস গো ছুটিয়া যে আছ যথায়,-
প্রেমের ঠাকুর প্রেম বিলাইতে
তোমারে আদরে ডাকে গো ,
কে আছ কোথায় মরমে মরিয়া
সে ডাক শুনিয়া এস গো !

রামেন্দ্র-মঙ্গল

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৫০ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আয়োজনে কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে বিগত ৫ই ভাদ্র তারিখে সন্ধ্যার সময় একটি উৎসবের আয়োজন হয়। বলিতে গেলে কলিকাতার সাহিত্যসেবীমাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মফঃস্বল হইতেও অনেকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ছয়টার সময় উৎসব আরম্ভ হয়। গানবাদ্য, কবিতাপাঠ, আশীর্ব্বাদ, মাল্যচন্দন-প্রদান প্রভৃতি সমস্ত মাঙ্গলিক ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যে, সর্ব্বজনপ্রিয়, তাহা এই দিনের উৎসবে সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি শেষ হইলে, কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার প্রতিলিপি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিলাম। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সুন্দর সরল সরস রচনায় তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাড়িয়াছে। তোমার সোনার দোয়াত-কলম হউক।" তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"চিত্তানুবন্ধিলিপিকৌশলকীর্ত্তিকেতু-
কর্পূরপূর-করকাকৃতিকুণ্ডলান্ত!
ত্রৈবিষ্ণবংশধর-ধীর-ধরামরেন্দ্র
রামেন্দ্রসুন্দর শুভায় চিরায় জীব॥"

তাহার পর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

প্রত্যুত্তরে নিবেদন

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদত্ত সম্মানের জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ক্ষমতা আজি আমার নাই। মনের মধ্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ভাষা পাই না; ভাষা যদি জুটিয়া যায়, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার প্রথা আমাদের দেশে অনুমোদিত ছিল; আমারও ছুটি লইবার সময় উপস্থিত; ছুটি লইবার সময় সময়োচিত শিষ্টাচার-প্রদর্শনেরও আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আজি আমার প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার ভারে আমার চিত্ত

অভিভাষণ-লিপির সম্মুখ পত্র
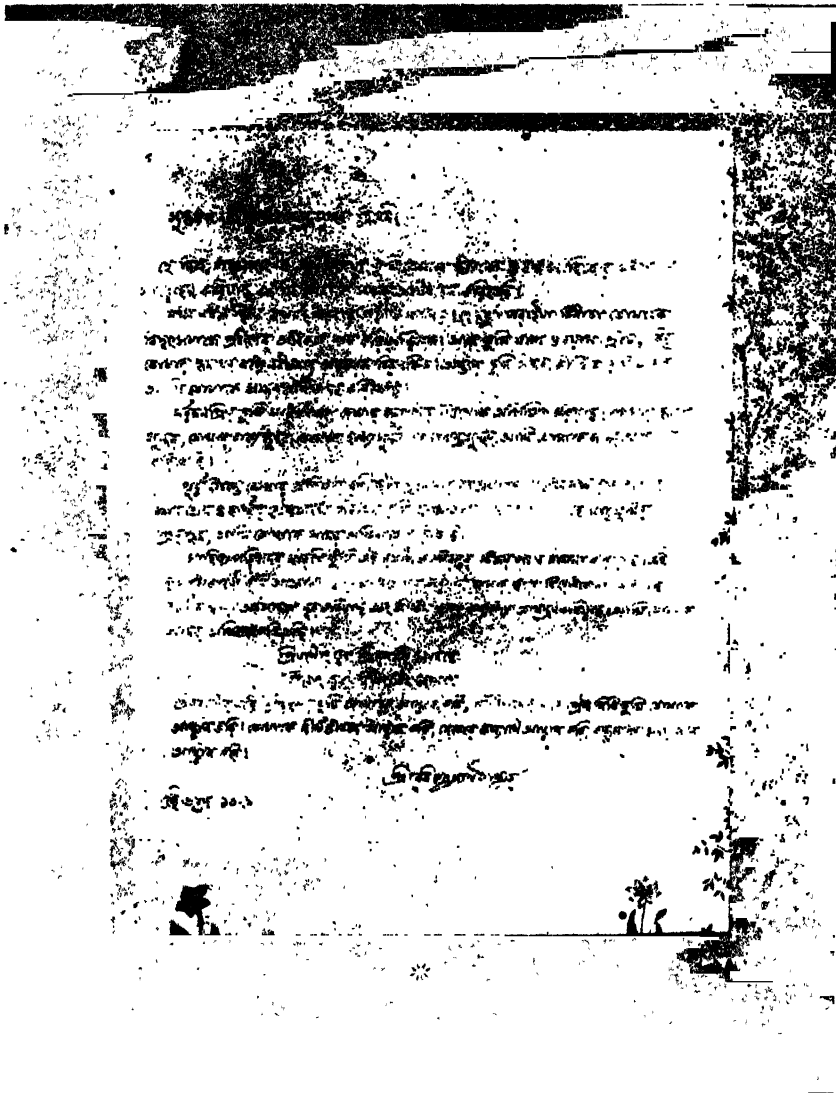
অভিভাষণ-লিপি

পীড়িত। আমার হৃদয় পূর্ণ, কিন্তু আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ; অবসন্ন দেহ সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অসমর্থ।

"আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান বা সম্বর্দ্ধনা বলিলে, উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে।

"পরিষদের সহিত আমার সেবা-সেবক সম্পর্ক। এতকাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্তী ভক্তের মত কায়েন মনসা বাচা পরিচর্য্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘা মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সর্ব্বজনমান্য সভাপতির হাত দিয়া, আমাকে যে প্রসাদ দান করিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

"অধিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমি যে কয়টা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হইয়া যায়। তখন হইতেই

আমি বিধাতৃ-বিধানের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ধরা-পৃষ্ঠে অসঙ্কোচে পা ফেলিয়া চলিয়াছি। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক।

"একটা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারি নাই। যথাশক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।

"শৈশবে আমি জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্র দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আমার প্রতি আজিও চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।

"আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে; তাহা আমি মনে করি এবং মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। বঙ্গ-সাহিত্যের পথে আমি বঙ্গ-জননীর সেবা-কর্ম্মে আমার শক্তি অর্পণ করিয়াছি; শক্তি অর্পণ করিয়াছি বটে; কিন্তু সে বিষয়ে আমার যোগ্যতা নাই এবং কোনও স্পর্দ্ধা নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, আমি তাঁহাদের অনুযাত্রী অনুচর মাত্র; তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার আমার অধিকার নাই, তাঁহাদের পশ্চাতে চলিবার অধিকার মাত্র আমি পাইয়াছি।

"সাহিত্য-সেবা উপলক্ষ করিয়া, আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অতি নিকট সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। সেখানেও আমি কোনও কৃতিত্বের স্পর্দ্ধা করিনা। সেখানে যাঁহারা আমার নেতা ছিলেন, যাঁহারা আমার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব ও সাহায্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না। সেখানে আমার কর্ম্মের জন্য আমি কোনরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারিব না। কিন্তু পরিষদে আসিয়া আমার একটা পরম লাভ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আমি গর্ব্বিত ও গৌরবান্বিত।

"এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার বয়োবৃদ্ধ ও নমস্য; অনেকেই আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধু; সকলেই আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও দেখেন। পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি; তাঁহাদের প্রীতি পাইয়া আমার জীবন মধুময় হইয়াছে; তাঁহাদের শ্রদ্ধালাভে আমি ধন্য হইয়াছি। আমি যে তাঁহাদের অনুচর ও সহচর হইবার সুযোগ পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমার জীবনের এই পরমলাভ; আমার জীবনের এই পরম সার্থকতা। আজ তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি তাঁহাদের প্রীতির পরিচয় দিতেছেন; ইহাতে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। সংসার-বিষবৃক্ষের যে দুইটি মধুর ফল, তার মধ্যে একটি আর একটি অপেক্ষা বহুগুণে মিষ্ট; সজ্জন সঙ্গমরূপ এই মধুর ফলের আস্বাদনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

"অবিমিশ্র আনন্দ আমার অদৃষ্টে নাই। পরিষৎ-মন্দিরে সমবেত আমার এই বন্ধুসঙ্ঘের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে দেখিতে আজি পাইতেছিনা, যাঁহাকে আমি অতি অল্পদিন হইল, বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, যাঁহার অসামান্য প্রতিভাকে বাঙ্গলার সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত-স্বরূপ হইয়া আমি গর্ব্বিত ছিলাম, তাঁহার আকালিক তিরোভাব আজিকার আনন্দকে পূর্ণ হইতে দিবে না। উহা আমার নিজের কথা, সভাস্থলে প্রকাশযোগ্য নহে। অতএব সে কথা যাক্। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক।

"সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য পরিষদের নিকট আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। পরিষদের অনুরক্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহাদের স্থান আমার উপরে। তাঁহা-দিগকে সম্মান দেখাইলে এবং সম্বর্দ্ধনা করিলে, পরিষৎই গৌরবান্বিত হইবেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিকের দাবি করিতে পারি। আমি বহু বৎসর ধরিয়া, পরিষদের ঢোল বাজাইয়াছি, ঢুলীকে শিরোপা দেওয়া এ দেশের সামাজিক প্রথা; আমি সেই শিরোপা মাথায় লইয়া পরিষদের নিকট ছুটি পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। আর আমার বক্তব্য নাই। যাঁহারা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ধুর বহন-কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রযত্নে সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় করি না। আমি তাঁহাদের অনুচর হইতে আর বোধ করি পারিব না;

দূরে থাকিয়া পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিতে পাইলেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত থাকিবে—আমার জীবনের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা পূর্ণ হইবে। আমার জীবন যে নিরর্থক হয় নাই, এই আশ্বাস পাইয়া আমি বিদায় লইতে পারিব।

"আমার বন্ধুসঙ্ঘ আমার প্রতি স্নেহবান্, তাঁহারা আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের প্রীতিলাভে আমি যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠলাভ; তাঁহাদের কৃপায় এই মহতী সভাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবার সুযোগ পাইয়া, আমি আজ কৃতার্থ হইলাম —

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী"

অভিনন্দন-প্রদান শেষ হইলে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের উৎসাহী সদস্যগণ কয়েকটি অভিনয় করিয়া সভাগণের মনোরঞ্জন করেন। সাহিত্য-পরিষদ্ এই উপলক্ষে জলযোগেরও বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন।

৺ক্ষেত্রমোহন

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

৺ক্ষেত্রমোহন

আজিকে কার অভয়বাণী পশেছে তব শ্রবণে
ত্যজিয়া গেলে শিষ্য সখা-বরগে,
সুদূর-পথ পান্থ কেন শ্রান্ত আজি ভ্রমণে,
পড়েছে—ডাক পড়েছে—বুঝি স্বরগে!

কবিতা চেয়ে মধুর হতো,'গণিত'তব পরশে,
হাসির সাথে বুঝায়ে দিতে সকলি,
আজিও প্রাণে সেসব কথা অমিয়-ধারা বরষে,
তোমার তরে হৃদয় উঠে ব্যাকুলি'।

'সাদা-সিধার' সেবক তুমি, করিতে ঘৃণা 'নকলে'
সরল হিয়া উঠিত ফুটি' আঁখিতে,
ছিলনা মতি 'হুজুগে'—তব ছিলনা প্রীতি 'বদনে'
হৃদয়-ভরা ভকতি ঢাকি রাখিতে।

হে গুরু, দ্বিজ, ভকত, সুধি—গেছ শ্রীহরি-চরণে,
চিরদিবস গেছ শিখায়ে হাসায়ে,
আজিকে কেন এমন করে অকাল তব মরণে
যাবার কালে সবারে গেলে কাঁদায়ে?

পূজার কাঙ্গাল

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

"বাবা কই এলনাত ফিরে,
পূজাত মা আসিল আবার;"—
শুধাইল খোকা ধীরে ধীরে
মুখখানি ধরিয়া আমার।

প্রতিদিন পাঠশালা-শেষে
খেয়া-ঘাট দেখে ফিরে আসে,
"আসে নাই"—সজল নয়নে
বলে মোরে রোজ দীর্ঘশ্বাসে।

"মোহিতের বাবা কত ভাল—
দেশে ফিরে এসেছে কেমন;
রাঙা বাঁশী এনেছে কিনিয়া,
জুতা তার হয়েছে নূতন!

"আর যে মা নাহিক সময়
পূজা-বাড়ী বাজিছে বাজনা,
আমি কি মা 'শুধু'-পায়ে রব?
বাবা কই এখন এলনা!"

"বাছা তোর মুখপানে চেয়ে,
শুনে তোর সকরুণ সুর,—
আমার যে বুকের পাঁজর
ভাঙিয়া হ'তেছে আজ চূর।

আমি তোরে কেমনে বলিব—
বৃথা খোঁজ করিস্‌না তার,
জলভরা চোখ দুটি নিয়ে
পথপানে তাকাস্‌না আর।"

ইংরেজের শ্রেষ্ঠ -ড্রেড্‌নট্‌—"আয়রণ্‌ ডিউক", ইহাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রণতরী ; ইহা ৫৭৫ ফীট্‌ দীর্ঘ

সেনাপতিবেশে সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ্জ

লেফ্‌টেন্যান্ট্‌বেশে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার

সাধারণবেশে মধ্যম রাজকুমার

নাবিকবেশে কনিষ্ঠ রাজকুমার

সমুদ্রগর্ভে নিহিত শত্রুপোত-নিধনকারী রণতরী। দক্ষিণদিকের জাহাজখানি শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে সাগরতলস্থ গুপ্ততরীর দিকে ভুলাইয়া আনিতেছে

ইংরেজ প্রধান-সেনাপতি
আর্ল কিচ্‌নর্

ইংরেজ সৈন্যপরিদর্শক,
ফিল্‌ড্‌ মার্শাল্‌ ফ্রেঞ্চ

লর্ড অব্‌ দি অ্যাড্‌মিরাল্টি
ডব্লিউ চার্চ্চহিল্‌
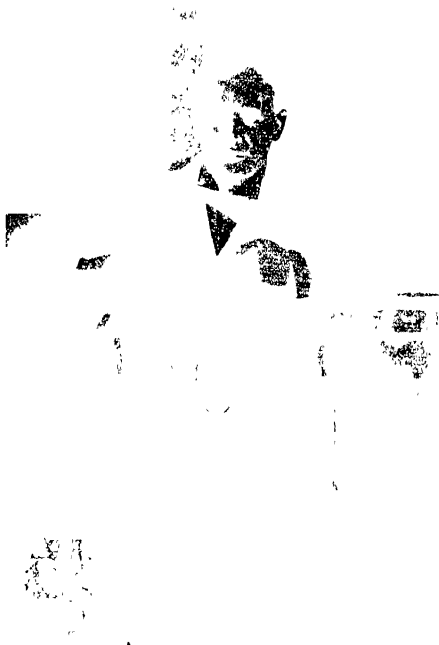
রণপোতাধ্যক্ষ
অ্যাড্‌মিরাল্‌ জেলিকো

মাসপঞ্জী

শ্রাবণ—১৩২১

১লা—কুমার উদয়চাঁদ বাহাদুরের জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদে মহোৎসব।—মিঃ জর্জ্জ রিকেটস্, C. B., এবং কটকের উকিল নরেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যু।

২রা—কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য সঙ্গতে'র প্রথম অধিবেশন।—

„ রাজসাহীর শ্রীরাজকুমার সরকারের মৃত্যু।—খুলনা সেনহাটী-নিবাসী, ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মরণার্থে স্বগ্রামে একটি স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা।

৩রা—কলিকাতার উপকণ্ঠ চেৎলানিবাসী স্বনামখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী রাখালদাস আঢ্যের মৃত্যু।—ঢাকার প্রকাশ্য রাজপথে জনৈক গুপ্ত-ঘাতক কর্ত্তৃক রামদাস নামক এক পুলিশ গোয়েন্দার হত্যাকাণ্ড।

৪ঠা—মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন আরম্ভ। নবাব সালর জঙ্গবাহাদুরের হায়দ্রাবাদ নিজামের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিরোহণ।—দিব্রুগড়ে ভূমিকম্প।

৫ই—পারস্য শাহের অভিষেকোৎসব।

„ লাহোরে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি।

„ হোমরুল ব্যাপারে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের মত-

„ সমন্বয়ের জন্য লণ্ডনে সভাধিবেশন।

„ মেজর জেনেরেল ইনিগো জোন্সের মৃত্যু।

৬ই—৺প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে শতবার্ষিকী স্মৃতি-সভা।

„ ফ্রান্সের রাষ্ট্র-সভাপতি পইন্ কেয়ারের রুষ-রাজধানীতে আগমন।

„ হায়দ্রাবাদে ভীষণ জলঝড়।

„ লেডী হার্ডিঞ্জের মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতায় শোক সভা।

„ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ এ, ওকেলীর মৃত্যু।

৭ই—বড়লাটের সদলবলে সিমলা হইতে দেরাদুন যাত্রা।

„ লণ্ডনে মাকুইস্ অব ক্রু কর্ত্তৃক কপূর্‌রতলার টীকা সাহেবের সম্ভাষণ।

„ বর্ণেল স্যর র‍্যানডস্ পার্কিনের মৃত্যু।

৮ই—'ওভারটুন্ হলে' স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের স্বাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভা।

„ 'গ্রাসভালিন'-সম্পাদক প্রিন্স্ মেস্টোহেড্‌স্কীর মৃত্যু।

৯ই—ইজিপ্টের খেদিভ্‌কে হত্যার চেষ্টা। পার্শ্বচর কর্ত্তৃক গুপ্ত-শত্রু নিহত।

„ সার্ভিয়াকে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধে আহ্বান।—

„ "কলিকাতা ফুটবল ক্লব" এবং "কিংসওন"—উভয় দলে আই. এ. এফ্ শীল্ডের জন্য শেষ খেলায় শেষোক্ত দলের জয়।

১০ই—লণ্ডনে লর্ড বেলপারের এবং কলিকাতার চিত্র-ব্যবসায়ী বসন্তকুমার মিত্রের মৃত্যু।

„ সার্ভিয়ার সেনাপতি সানুচর পুটনিক্ হাঙ্গেরীতে বন্দী।

১১ই—অষ্ট্রিয়ার সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

„ লেডি হার্ডিঞ্জের মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতা টাউনহলে শোক সভা।

১২ই—রেঙ্গুনে ছোটলাটের দরবার।

„ সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম কর্ম্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আগড়তলার ডাক্তার জে এন, চৌধুরী, কলিকাতা পোস্তা রাজষ্টেটের অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ রসিকলাল মল্লিক এবং দিনাজপুর-রাজ্যের কার্য্য-পরিদর্শক সুরেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু।

১৩ই—৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মেট্রপলিট্যান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে কাঙ্গালী ভোজন।

১৪ই—অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক বেল্‌গ্রেড্ সহর বিদগ্ধ।—

„ অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্ রায় অশ্বিনীকুমার গুহ বাহাদুরের মৃত্যু।

১৫ই—সমগ্র য়ুরোপের সমর সজ্জা।

„ নানাদেশের 'ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের' অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কার্য্য স্থগিত।

„ ধ্রলরাজ্যের অধিপতি ঠাকুর সাহেব হরিসিংজীর মৃত্যু।

১৬ই—জর্ম্মানীর ফ্রান্স ও রুষকে সমরে আহ্বান।—

„ কৃষ্ণানদী-প্লাবনে ৫০ খানি গ্রাম জলমগ্ন।

„ গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক ফরাসী সোশিয়ালিষ্ট-নায়ক এম, জরে নিহত।

„ বাঁকীপুরের উকিল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার আসবাব-ব্যবসায়ী ল্যাজেরাস্ কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার মিঃ সি, লারমুর এবং সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক মেজর্ জেনারেল জি, এফ, ডিবেরীর মৃত্যু।

১৭ই—জর্ম্মানীর রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

„ গ্রাণ্ড্ ডিউক্ নিকোলাস্ রুষ সেনানীর সেনাপতিপদে বৃত।

১৮ই—জর্ম্মানীর বেল্‌জিয়মকে যুদ্ধে আহ্বান।

„ বড়লাট হার্ডিঞ্জের দেরাদুন্ হইতে শিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯এ—বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

„ লর্ড কিচনারের ডোভর্ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন।

„ ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মানীর যুদ্ধ সূচনা।

„ মিঃ জন বর্ণসের পদত্যাগ।

২০এ—কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ধন্নুলাল আগরওয়ালার মৃত্যু।

২১এ—ঢাকা অঞ্চলের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়াদি পরিদর্শনার্থ ভাইস্-চান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যাত্রা।

„ আইরিশ্ 'আর্মস্ প্রোক্লেমেশন্'-বিধি রদ।

২২এ—লণ্ডনের প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিঃ গর্ডন্ হেক্ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট্-পত্নী মিসেস্ উইল্‌সন্ের মৃত্যু।

২৩এ—উত্তর সমুদ্রে জর্ম্মানদিগের সহিত যুদ্ধে ইংরেজের বিজয়-বার্ত্তায় সিমলা-শৈলে আনন্দোৎসব।

" ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক অণ্টকার্ক আক্রমণ।

২৪এ—য়ুরোপের বর্ত্তমান মহাসমর উপলক্ষে কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ারে বাঙ্গালীদের সভা; বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি।

২৫এ—ফরাসী সেনানী কর্ত্তৃক অল্সস্ অধিকার ও তদুপলক্ষে ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিজয়োৎসব।

" প্রিন্স্ আর্থার অব্ কনটের এক নবকুমারের জন্ম।

" লেডি হার্ডিঞ্জের স্মৃতিকল্পে দিল্লীতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার্থে কাশিমবাজারের মহারাজ কর্ত্তৃক ৫০০০৲ টাকা দান।

২৬এ—কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রেহাম্ কোম্পানী কর্ত্তৃক 'হান্সা' লাইনের এজেন্সি পদত্যাগ।

" অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

" সালেমপুরের রাজা স্যর্ সভান্ আলী এবং কোঠীর রাজা অভেদেন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু।

২৭এ—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্য ও শেষ আইন-পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

" যুদ্ধাহত সৈনিকগণের সাহায্যার্থ চাঁদা তুলিবার জন্য এলাহাবাদ, মুইর্ সেণ্ট্রাল্ কলেজের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে এক সভাধিবেশন।

২৮এ—ইংলণ্ড কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা।

২৮এ—বেল্‌জিয়ম হাইলিস্ নগরে দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ।

" বাঁকীপুরে রাঁচির উকিল শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সভাধিবেশন।

" কলিকাতা রিপনকলেজের গণিতাধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিসর্প রোগে মৃত্যু।

২৯এ—শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে বাঙ্গালীর রাজভক্তি প্রদর্শন এবং য়ুরোপে বর্ত্তমান মহাসমর সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণ-কল্পে সভাধিবেশন।

" স্যর্ ফিরোজ সা মেটার সভাপতিত্বে বোম্বায়ে ঐরূপ একটি সভাধিবেশন।

" ময়মনসিংহে এক শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন।—

" মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার সুপ্রশস্ত বাসভবনে সন্ধ্যার সময় 'নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনে'র সাধারণ বৈঠক।

৩০এ—রুষিয়ার জার কর্ত্তৃক পোলাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার-প্রদান।

" মাননীয় স্যর্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীকে সম্মান প্রদর্শনোদ্দেশে 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্' হলে কলিকাতার নাবতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্রবর্গের মহাসভা।

৩১এ—মুর্শিদাবাদ, নসীপুরের রাজাবাহাদুরের খুল্লতাত-পত্নী রাণী সুভদ্রাকুমারী সাহেবার মৃত্যু।

" "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা"র অষ্টম বার্ষিক উৎসব।

বরিসাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মৃত্যু।

৩২এ—নাগপুরে মধ্যপ্রদেশের চিফ্‌কমিশনর বাহাদুরের সভাপতিত্বে তত্রত্য নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

দুর্গোৎসব—ষষ্ঠী

[কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন]

গৌরী—একতালা

দেখে আয় তোরা হিমাচলে ওকি আলো ভাসে রে।
উমা আমার আসে বুঝি, উমা আমার আসে রে॥
এ নহে অরুণ আভা, এ নহে শশাঙ্ক বিভা,
হিম মাঝে বুঝি গৌরীর গৌরআভা হাসে রে॥
বাজেরে বোধন আরতি, আসিছে আমার পার্ব্বতী,
জুড়াতে মায়েরি প্রাণ, উমা আমার আসে রে।
বৎসর অন্তরে আজি উমা আমার আসে রে॥

স্বরলিপি

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম্‌. এ, এম্‌, আর্‌, এস্‌, এ, (লণ্ডন) &c.]

০ ১ ২´ ৩ ॥
I দ্‌া দ্‌া সা | সা সা ঋা | গা মা গা | ঋা সা -া I
দে খে আ য় তো রা হি মা ০ চ লে ০

০ ১ ২´ ৩
I -া -া পা | পা হ্মপদা পহ্মা | গা গা -া | ঋা সা -া I
০ ০ ও কি অা০০ লো০ ভা সে ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা -া | র্ঋা র্সা -া | না না -া | দা পা -া I
উ মা ০ আ মা র আ সে ০ বু ঝি ০

০ ১ ২´ ৩
I পা পা -া | পা পহ্মা পদপহ্মা | গা গা -া | ঋা সা -া II
উ মা ০ আ মা০ ০০০র্‌ আ সে ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I দা দা -া | দা দা -া | না না না | র্সা র্সা -া I
এ ন ০ হে অ ০ রু ণ ০ আ ভা ০

০ ১ ২´ ৩
I র্ঋা র্ঋা -া | র্সা -া না | র্সা -া র্গা | র্ঋা র্সা -া I
এ ন ০ হে ০ শ শা ০ ঙ্ক বি ভা ০

০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা -া | র্ঋা র্সা -া | না না -া | দা পা -া I
হি ম ০ মা ঝে ০ বু ঝি ০ গৌ রী র

০ ১ ২´ ৩
I হ্মা পা -া | দা পা -া | হ্মপা গা -া | ঋা সা -া II
গৌ র ০ আ ভা ০ ভা০ সে ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I দা দা দা | দা দা না | র্সা -া না | র্সা -া -া I
বা জে রে বো ধ ন আ ০ র - তি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্সা র্সা না | র্সা র্গা র্ঋা | র্সা -া -া I
আ সি ছে আ মা র পা র্‌ ব তী ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I -া -া র্সা | র্সা র্ঋ´ র্সা | না না -া | দা পা -া I
০ ০ জু ড়া তে মা য়ে রি ০ প্রা ণ ০

০ ১ ২´ ৩
I হ্মা পা -া | দা পা হ্মপা | গা গা -া | ঋা সা -া I
উ মা ০ আ মা ০র আ সে ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I র্গা র্গা -া | র্ঋা র্সা র্সা | না না -া | দা পা -া I
বৎ স ০ র অ ন্‌ ত রে ০ আ জি ০

০ ১ ২´ ৩
I হ্মা পা -া | দা পা পা | হ্মপা গা -া | ঋা সা -া II
উ মা ০ আ মা র আ০ সে ০ রে ০ ০

ঋ=কোমল 'ঋ' ; হ্ম=কড়ি 'ম' ; দ=কোমল 'ধ' ।

দুর্গোৎসব—সপ্তমী

[কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন]

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

এস মা আনন্দময়ী—এস মা গৃহে আমার,
রাঙ্গা পায়ে আলো করি মাগো অখিল সংসার।
কি আছে আমার ওমা, করিব পূজা তোমার,
লও তৃণ ফুল জল প্রেম-অশ্রু উপহার,
লও সুখে লও দুঃখে চিরভক্তিপুষ্পহার॥
জীবের জননী তুমি, তুমি সর্ব্ব জীবাধার,
জীব বলি নহে পূজা স্নেহময়ী মা তোমার,
লও কামক্রোধ বলি ছয় রিপু দুর্নিবার॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম্, এ, এম্, আর্, এস্, এ (লণ্ডন) &c.]

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ॥
I ণ্‌া সা | জ্ঞা -া মা | পা দা | পা -া মা I জ্ঞা ঋা | জ্ঞা -া মা | জ্ঞা ঋা | সা -া -া I
এ স মা ০ আ ন ন্দ ম ০ য়ী এ স মা ০ গৃ হে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা | ণর্সা র্ঋা র্সা | ণা ণা | দা দা পা I পা পা | পমা পা পা | ণদা ণা | পা -া -া I
রা ঙ্গা পা০ ০ য়ে আ লো ক ০ রি মা গো অ০ ০ খি ল০ সং সা ০ র

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা ঋা | জ্ঞা -া মা | জ্ঞা ঋা | সা -া -া II
এ স মা ০ গৃ হে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I দা দা | দা -া ণা | র্সা র্সা | র্সণা র্সা র্সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্মা | র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া I
কি আ ছে ০ আ মা র ও০ ০ মা ক রি ব ০ পূ জা তো মা ০ র
জী বে র ০ জ ন নী তু০ ০ মি তু মি স ০ র্ব্ব জী বা ধা ০ র

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা | ণর্সা র্ঋা র্সা | ণা ণা | দা -া পা I মা মা | পা মা পা | ণদা ণা | পা -া -া I
ল ও তৃ০ ০ ০ ণ ফুল জ ০ ল প্রে ম অ ০ শ্রু উ০ প হা ০ র
জী ব ব ০ লি ন হে পূ ০ জা স্নে হ ম ০ য়ী মা০ তো মা ০ র

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -া র্সা | ণা ণা | দা -া পা I মা পা | জ্ঞা -া মা | জ্ঞা ঋা | সা -া -া II
ল ও সু ০ খে ল ও দু ০ খে চি র ভ ০ ক্তি পু ষ্প হা ০ র
ল ও কা ০ ম ক্রো ধ ব ০ লি ছ য় রি ০ পু দু র্নি বা ০ র

ঋ=কোমল 'র'; জ্ঞ=কোমল 'গ'; দ=কোমল 'ধ'; ণ=কোমল 'ন'।

সাহিত্য-সংবাদ

কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র রায়-প্রণীত নূতন উপন্যাস 'সাবিত্রী' যন্ত্রস্থ--৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে ; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত সচিত্র 'মিশরমণি ক্লিওপেট্রা' প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নূতন কবিতা-সংগ্রহ 'বিজয়-বিজলী' ও 'কতিপয় পত্র' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৸৹ ও ১৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত নূতন উপন্যাস 'রূপসীর প্রতিহিংসা' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৸৹।

অন্ধকবি শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত নূতন উপন্যাস 'পাঁচফুল' ও 'লক্ষ্মী গিন্নী' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১ ও ১৷৹।

'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী-প্রণীত 'অশোক সঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৷৶৹।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত 'হিন্দোলা' কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইল ; মূল্য ॥৹।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত 'করুণাকণা' প্রকাশিত হইল ; মূল্য ॥৹।

'রাজস্থানে'র অনুবাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'জগতের সভ্যতার ইতিহাস' (সূচনা খণ্ড) প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২৲।

সুলেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন গল্প-সংগ্রহ পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

নবীন কবি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক "মুকুল" শারদ মহাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

"লর্ড রিপন ইন্ ইণ্ডিয়া"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেততত্ত্ব" নামক পুস্তক যন্ত্রস্থ ;—সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

বিখ্যাত পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত জলধর সেন-প্রণীত 'কাঙ্গাল হরিনাথ' দ্বিতীয় খণ্ড ও গল্পপুস্তক 'পরাণ মণ্ডল' প্রকাশিত হইল ; মূল্য প্রত্যেক খানি ১৷৹।

উদীয়মান নবীন লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের 'অঞ্জলি' নামক ছোটগল্পের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

'নির্ম্মাল্য'-রচয়িত্রী সুপ্রতিষ্ঠলেখিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন গল্পের বহি "কেতকী" ৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে ; পুস্তকখানিতে বারটি বিভিন্ন রকমের গল্প স্থান পাইয়াছে।

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র-বিরচিত "সাঁজের কথা" নামক গল্পের পুস্তক, বিবিধ চিত্রসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

ত্রিপুরা—ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রাচীন সাহিত্য-উপাসক 'বিদুর' ও 'হাসন-হোসেন' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামকানাই দত্ত মহাশয়ের "সন্তান" সত্বর প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'পরিণয়' নামক কবিতা পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'পরিণয়' পরিণয়-কালোপযোগী উপহার-পুস্তক। মূল্য ॥৹ আট আনা।

ঐতিহাসিক সমাদ্দার মহাশয় 'খাট্টা' বলিয়া একখানি গল্পের বই বাহির করিতেছেন। 'ভারতবর্ষ' 'ভারতী', 'প্রবাসী' প্রভৃতিতে সমাদ্দার মহাশয় যে ছোট ছোট গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই সমষ্টি।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিজ্ঞানাচার্য্য, বিজ্ঞানতত্ত্বান্বেষী ও সুলেখক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় "প্রাকৃতিকী" নামক একখানি নূতন বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন ; ৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে ৪০ খানি হাফটোন চিত্র থাকিবে। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ ; এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'উত্তরপশ্চিম ভ্রমণের' নূতন সংস্করণ বাহির হইতেছে। এবার অনেক ছবি ও যাত্রীর প্রয়োজনীয় কথা সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ অচিরেই বাহির হইবে। এই খণ্ডে কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্যদর্শনীয় তীর্থস্থানগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও ছবি আছে ; মূল্য ১৲ টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, [illegible]

অনাথা।

শিল্পী-ইহব্‌লিন্‌।

কার্ত্তিক, ১৩২১

প্রথম খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

আতিথ্য

(ভক্তমাল)

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, B. L.]

"পিপাজী—পরম ভক্ত—পত্নী সীতাদেবী সহ
আসি' বৃন্দাবনে,
বহু পুণ্যফলে মোর উভয়ে অতিথি আজি
দীনের ভবনে।
হায় কি দুর্ভাগ্য তবু!—কেমনে করিব এবে
আতিথ্য-পালন,
ভাণ্ডার যে শূন্য, প্রিয়ে!"—কহিলা বিষণ্ণ মুখে
শ্রীধর ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণী কহিলা, "হায়, কিছুই যে নাহি ঘরে
আছি অনশনে ;
অর্থাভাবে আজি কি গো বিমুখ করিব মোরা
অতিথি-সজ্জনে !
এই লহ পরিধেয় শেষ বস্ত্রখানি মোর,
করিয়া বিক্রয়,
অতিথি-সেবার তরে যাহা কিছু প্রয়োজন
আন সমুদয় ।"

রন্ধন হইলে শেষ শ্রীধর আনিলা ডাকি'
পিপাজী-সীতায়,
বিস্ময়ে দেখিলা দোঁহে—শূন্য-অন্তঃপুর, নাহি
গৃহিণী কোথায় ।
গৃহ মাঝে খুঁজি খুঁজি শেষে গোধূমের ডোলে
দেখিলেন সীতা—
বিবসনা নারী এক আছে লুক্কায়িত হ'য়ে,
লাজে সঙ্কুচিতা ।

বুঝিলেন সেইক্ষণে, কি উপায়ে অন্নহীন
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ
করেছেন ভক্তিভরে অতিথি সেবার আজ
যত আয়োজন !
নিজ-অঙ্গবাস ছিঁড়ি বস্ত্রখণ্ড দেহে তার
জড়ায়ে যতনে,
সীতা, পিপাজীর সহ, হইলা লুণ্ঠিত সেই
দেবীর চরণে ।

বিকাশ

[শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী]

বায়ু সমুদ্রের মধ্যে থাকিলেও বায়ুর সামান্য গতি আমাদের অনুভূত হয় না। বিকাশের মধ্যে থাকিয়াও সামান্য বিকাশ আমাদের লক্ষ্য হয় না। কিন্তু জগৎ জুড়িয়া বিকাশ-বিলাস। জ্ঞানবিজ্ঞান, বলবুদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্য, ক্ষুদ্রমহৎ, সকলই বিকাশের বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি। দার্শনিক বলেন, জগৎটাই বিকাশ। তুমি আমিও বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। বাল্যের চপলতা, যৌবনের উদ্যম, বার্দ্ধক্যের সংযম, মানবের সকল অবস্থাই বিভিন্ন বিকাশ। ভগবান্ গীতায় যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাও বিবিধ বিকাশ-লীলা। আর জগতের বিভিন্ন জাতীয় অগণ্য মনুষ্য যে গুণ-গৌরবে গরীয়ান্, তাহাও মনুষ্যত্বের বিভিন্ন বিকাশ বলা যাইতে পারে। ফলতঃ বিকাশ—বিবিধ—বিচিত্র—প্রকৃতিগত নিয়ম—জগতের স্ফূর্ত্তি। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে, সুখদুঃখ-বিস্ময়ে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে সর্ব্বত্রই বিকাশ।

সাহিত্যের কথাই ধরা যাউক। সাহিত্য কি এবং কখন ইহার উৎপত্তি, এই দুরূহ সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও বলা যাইতে পারে যে, মানবের মনোভাব প্রকাশের প্রয়াসই সাহিত্যের মূল। সুতরাং যতদিন মানব, সাহিত্যও তত দিনের। মনোভাব নানা প্রকারে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে;—অতি পূর্ব্বেও কোনও না কোনও রূপে তাহা প্রকাশিত হইত। যখন লিখিত ভাষা ছিল না, যখন বর্ণমালা ছিল না, তখনও মানব-হৃদয়ে—আশা—আকাঙ্ক্ষা, ভয়-বিস্ময়, সুখ-দুঃখ ছিল। তাহার প্রকাশও হইত। হয়ত দূর অতীতে দ্রব্য-বিশেষের সংখ্যা-সঙ্কেত, চিত্র-চিত্রণে বা অন্য কোনও চিহ্নে সেই ভাব লিপিবদ্ধ থাকিত। যখন মনোভাব-প্রকাশের অভিনব সঙ্কেত-চিহ্ন বর্ণমালা হইল, তখন ভাব-ভ্রূণ নূতন আকারে দেখা দিল। প্রকৃত সাহিত্য জন্মিল। তৎপরে মানবের মানবত্ব যেখানে যতই পরিস্ফুট হইল, ইহার বৈচিত্র্যও ততই বিকশিত হইতে লাগিল।

সৃষ্টিতেও এই বিকাশলীলা। সৃষ্টি সম্বন্ধে যতই মত-ভেদ থাকুক না কেন, একথা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, জগতের বর্ত্তমান পরিণতি চিরন্তন নহে। পৃথিবী আজ যাহা দেখিতেছি, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। সেই পূর্ব্ব-কথার আলোচনায় কেহ বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না—ছিল কেবল স্রষ্টা—আর ছিল শূন্য দেশ ও শূন্য কাল। স্রষ্টার ইচ্ছা হইল, আলোক হউক, আলোক হইল; চন্দ্র-সূর্য্য হউক, চন্দ্রসূর্য্য হইল; জগৎ হউক, জগৎ হইল। বেদে পুরাণে আরও কত কথা আছে। এই সৃষ্টি-ব্যাপারের আলোচনায় স্রষ্টার সগুণত্ব-নির্গুণত্ব লইয়া, তুমুল তর্কের প্রলয়-কাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। তবে বিকাশ যে ঘটিয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের দার্শনিকগণ দেখা দিলেন। তাঁহাদের কেহবা বলিলেন, জগৎ দেখিয়া যদি জগৎকর্ত্তা বা জগৎ-স্রষ্টার অনুমান করা হয়, তাহা হইলে সেই অনুমানের মূল সুদৃঢ় নহে। ঘট দেখিয়া ঘটকার বা কুম্ভকারের কল্পনা—আর জগৎ দেখিয়া জগৎকারের কল্পনা, এক নহে। কুম্ভকার ঘট গড়িয়াছে, কিন্তু তাহার উপাদান মৃত্তিকা গড়ে নাই। বুদ্ধিবলে সুকৌশলে উহা কার্য্যে লাগাইয়াছে মাত্র। জগৎ-স্রষ্টার জগৎ গড়ার উপকরণ কই! সাংখ্যকার ঘোষণা করিলেন, কিছু না থাকিলে, কিছু হয় না। এরূপ সৃষ্টি নাই। সৃষ্টি অনাদি—সৃষ্টি-প্রবাহ অনন্ত কাল হইতে চলিতেছে। সাংখ্যের সৃষ্টির অর্থও স্বতন্ত্র। সৃজ্ ধাতু হইতে সৃষ্টি। সৃজ্ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা। সৃষ্টি অর্থে ত্যাগ—নিক্ষেপ। কিসের ত্যাগ? কিসের নিক্ষেপ? জ্ঞেয়ের উপর জ্ঞানের নিক্ষেপ। ভিন্ন ভাষায় সূক্ষ্মভূত স্থূলভূতে পরিণতিই সৃষ্টি। ইহাই পাতঞ্জলের পরিণাম বলিলেও বলা যায়।—গুটিপোকার আবরণ কেহ কেহ ইহার সুন্দর উদাহরণ-স্বরূপে প্রকাশ করেন। মধ্যে গুটিপোকা—উহার

চতুর্দ্দিকে রেশমের কোয়া। এই রূপকে মানবের সৃষ্টি-সাদৃশ্য এই, "মানব চারিদিকে আপনার সংসারের (ব্যক্ত জগৎ বা স্থূল ভূত) তন্তুজালে আবৃত। উহা দার্শনিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং মানব-জীবনের মূল তত্ত্ব একই কথা। সাংখ্য এই সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশের এক পর্য্যায়ও প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—

(১) প্রকৃতে র্মহাং

(২) স্ততোঽহঙ্কারঃ

(৩) তস্মাচ্চ গণঃ ষোড়শকঃ

(৪) তস্মাচ্চ ষোড়শকাং পঞ্চভ্য পঞ্চভূতানি

অর্থাৎ

(১) প্রকৃতি হইতে (প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে) মহৎ,

(২) তাহা হইতে (সেই মহৎ নামক পদার্থ হইতে) অহঙ্কার,

(৩) সেই অহঙ্কার হইতে ষোড়শ পদার্থ (পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়)

(৪) এবং সেই ষোড়শ পদার্থ হইতে—পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত (স্থূল পদার্থ) উৎপন্ন হয়।

এই ক্রম বা বিকাশ সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও আলোচনা করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও মানব-জীবনের বহু মূল তত্ত্বেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে, দর্শনের দুরূহ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আভাষ ছাড়িয়া, সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তমসার কূলে যেরূপ বিকাশ, যে গভীর করুণা, যে প্রকার প্রেম, যেরূপ জ্ঞান-গবেষণা ছিল, টেম্‌সের কূলে তাহা না থাকিতে পারে। জাহ্নবীর স্রোতে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ভাসিয়া যাইত, জর্দ্দনের জলে তাহার অস্তিত্ব আবর্ত্ত সম্ভব না হইতে পারে। নৈমিষারণ্যে যে বিজ্ঞান ছিল, জড়াত্মক নিউইয়র্কে তাহার সূতিকাগার হয়ত সম্ভবে না। বিক্রমের রাজধানীতে যে শারদ শশধর ফুটিত, বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে তাহার মোহিনী মাধুরী হয়ত দেখা দেয় নাই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরিণতির পার্থক্য আছে। একের মূল-মন্ত্র ভোগরাগ, অপরের উপাসনা, উপবাস, নিরাময় শান্তি। একজন লালসায় পিপাসায় বিস্ফুরিত, অপরে সংযমে বৈরাগ্যে উপসংহৃত। একজনের জাতীয় সঙ্কেত—একদল বা একস্তবক গিরিমল্লিকা; অপরের জাতি নিশান—প্রফুল্ল ইন্দীবর। একের অর্থ, ক্ষণেকের পরিমিত স্তবকৈক-বিকাশ বা এক জন্মের স্ফুটত্ব; অপরের অ দলে দলে, স্তবকে স্তবকে, জন্মে জন্মে বিস্তীর্ণ পরিধিতে বিকাশ। গ্রীসের দেবপত্নী প্রাচুর্য্যের শৃঙ্গে অধিষ্ঠিতা ভারতের শ্রী, পদ্মালয়া—পদ্মহস্তা—মন্থনসম্ভূতা। একে পরিণতি পশুত্ব হইতে নরত্বে; অপরের দৃষ্টিতে নরত্ব কেব দেবত্বের কনিষ্ঠ সহোদর।

কিন্তু এই বিভেদ, প্রভাত-প্রদোষের মত এক দিবসের দুইটি প্রান্ত মাত্র বা বিভিন্ন বিকাশ। অদ্বৈত বাদের দার্শনিক বিভীষিকা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণত ইহাকেই অদ্বৈতবাদের মূল-সূত্র বলা যাইতে পারে বেদান্তদর্শন উপাসকের হস্ত হইতে যৌবনের আনন্দ মোদকটি কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসের শুষ্ক হরীতকী দেয় না, জীবনের আরব্যোপন্যাস ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে কতকগুলা সজীব ঊর্ণনাভের সৃষ্টি করে, এরূপ বিভীষিকাও বোধ হয় অসঙ্গত। বরং বিশ্বব্যাখ্যানের এই বেদব্যাস, তোমার আমার আত্মিক-সাগরের ফরাসী লেসেপ্‌স্‌ বিভেদের মধ্যে একতার সূত্র দেখাইয়া দেন। ভারতের এই বিশিষ্ট জ্ঞান অদ্বৈতবাদকে আমরা নমস্কার করি।

অনেকে হয়ত বলিবেন, শুধু অদ্বৈততত্ত্ব ভারতের একমাত্র বা বিশিষ্ট-জ্ঞান নহে। ষড়্‌দর্শন, ধর্ম্মনীতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের এই ভগ্ন প্রতিমার আমরা পূজা করিব কেন? আমরা সসঙ্কোচে উত্তর দিব, অদ্বৈতবাদ বলিলেই প্রাচীন জ্ঞানের জাত-কর্ম্ম-গত আখ্যার উল্লেখ করা হইল। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে নামকরণ হয়, জাতকের সেই নামই প্রশস্ত হইয়া থাকে। যে তত্ত্বে অন্য জ্ঞানের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল, যে মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া, সে জ্ঞান বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার নাম অদ্বৈততত্ত্ব। এই অদ্বৈততত্ত্ব ভিত্তি না করিলে, যোগ বা পাতঞ্জল সূত্রের সম্যক্ সার্থকতা থাকে না। জীবাত্মা পরমাত্মার ভিতর কথার প্রকাশে না হউক, তত্ত্বতঃ অভেদ্য একত্বের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতির ভিতর কোন যথার্থ বা মূলতঃ বিরোধ নাই। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা আপাতপ্রতীয়-

মান অসঙ্গতি—তোমার আমার পাণ্ডিত্যের মল্লযুদ্ধের ফল। তাহা কেবল কথার শৃঙ্খলে সত্যের চরণে নিগড়বন্ধের প্রয়াস। ফলতঃ চরম বিকাশ বা অদ্বৈতবাদের সাধারণ-তন্ত্রে, বৈচিত্র্যবিকাশের এই একীকরণে, জেতা-বিজিত নাই, ঈর্ষাদ্বন্দ্ব নাই, ভেদ-বিরোধ নাই। জ্ঞান সেখানে গরীয়ান্, সত্য তথায় একচ্ছত্র সম্রাট, স্নেহ-প্রীতি তথায় সার্ব্বজনীন শাসন এবং আধ্যাত্মিকতা একমাত্র পরিণতি।

এ তত্ত্ব সর্ব্বজন বিদিত না হইলেও ভারতীয় সাহিত্যের অক্ষরে অক্ষরে তাহার নিদর্শন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহা প্রচারিত। আমরা যে এত অধঃপতিত, তবুও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি বিদেশী মনীষিমণ্ডলীর এতই সসম্ভ্রম দৃষ্টি। রাজা সন্ধান করিতেছেন, কোথায় কাহার গৃহে সেই মণিমণ্ডপের রত্নবেদিকার ধ্বংসাবশেষ আজিও পাওয়া যায়। বিদেশী পণ্ডিত দেখিতেছেন, কোথায় কোন প্রান্তরে প্রাঙ্গণে সেই কল্পবৃক্ষের অম্লান কুসুম পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুসন্ধান করিতেছেন, কোন্ নির্জ্জন আশ্রমে সেই সারস্বত বল্লভীর অস্ফুট মূর্চ্ছনা শুনিতে পাওয়া যায়। আর আমরা? হয় জড়-প্রায় উদাসীন অথবা সেই অতুল্য তাজমহলের এক এক খণ্ড রত্ন বাহির করিয়া মৎসাহট্টের প্রশস্ত বর্ম্ম প্রস্তুত করিতেছি! উন্মাদে স্বগৃহে অগ্নি দিয়া করতালি দিয়া নাচিতে পারে, দুগ্ধপোষ্য শিশু জননীর চিতানল দেখিয়া, ক্রীড়াচ্ছলে উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু তোমার আমার কার্য্য ততোধিক বিচিত্র—বীভৎস। এই চরম-পরিণতির দেশে এ কি লীলা-বিকাশ!

ভীষ্মদেব

[শ্রীকালিদাস রায়]

হে রাজেন্দ্র! দাশ-রাজগৃহে তুমি যৌবরাজ্য
পরিত্যাগ-ছলে
মহাভারতের আর ভারতের,— দুই রাজ্যে
রাজা তুমি হ'লে।
তারপর হ'তে তুমি ক্লান্তিহীন দুটী রাজ্য
করিলে শাসন,
ভ্রাতা ভ্রাতৃসুতগণে তব সিংহাসন তলে
করিলে পালন।
ধর নাই রাজদণ্ড রাজার মুকুট-ভার
বাহ্য আভরণ
তবু তুমি মহারাজ পুত্রহীন পিতামহ
হে শ্রেষ্ঠ রাজন্।
তারপর হে গাঙ্গেয় ভাগ ক'রে দিলে যবে
সমগ্র বৈভব,
দুই পাশে দুই দল দাঁড়াইল পৌত্রগণ,—
কৌরব, পাণ্ডব।

নেহারিয়া দুই দিক্ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধিমতে
করিলে বিচার
দুটী রাজ্য দুই দলে শেষে তুমি ভাগ করে'
দিলে উপহার।
ভারত-রাজত্ব দিলে, শরাসন, বাহুবল—
কুরু পুত্রগণে,
যার লাগি' প্রাণপণে যুঝিলে হে মহারথী,
রণ আরোহণে।
মহাভারতের রাজ্য,— পাণ্ডবে করিলে দান,—
ব্রহ্মজ্ঞানালোক,
রাজনীতি, শান্তিপর্ব্ব, মহারাজ্য যুড়ি' যার—
দ্যুলোক, ভূলোক।
সে রাজত্ব লুপ্ত আজি যে রাজত্ব দিয়াছিলে
রণে, ধনুঃশরে,
অটল রয়েছে তাহা যা দিয়াছ, মহারাজ
শরশয্যা'পরে।

নক্ষত্রের গতিবিধি

[শ্রীজগদানন্দ রায়]

আকাশে যত নক্ষত্র আছে, তাহাদের মধ্যে আমরা কেবল ছয় হাজারটিকে খালি চক্ষে দেখিতে পাই। সমগ্র আকাশ আমরা কোন সময়ে দেখিতে পাই না, রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধাংশই আমাদের নজরে পড়ে; সুতরাং বলিতে হয়, নির্ম্মল রাত্রিতে মোটামুটি তিন হাজারের অধিক নক্ষত্র আমরা খালি চক্ষে দেখিতে পাই না। উজ্জ্বলতার হিসাবে জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া থাকেন। যেগুলি খুব উজ্জ্বল সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীর। কাল-পুরুষের (Orion) নিকটবর্ত্তী লুব্ধক, দক্ষিণ আকাশের অগস্ত্য, উত্তর আকাশের ব্রহ্মহৃদয় (Capells), বৃষরাশির মধ্যবর্ত্তী কৃত্তিকা নক্ষত্রের রোহিণী(Aldebaran)প্রভৃতি তারাগুলি খুব উজ্জ্বল, এইজন্য ইহারা প্রথমশ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলির তুলনায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্র এবং কালপুরুষের অধিকাংশ তারা অনুজ্জ্বল; এই কারণে এই সকল নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রিতে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের অনেকেই চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর তারা। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাঁহারা খালি চক্ষে কখনই ষষ্ঠ শ্রেণী অপেক্ষা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পান না। ভাল দূরবীণে চোখ্ লাগাইলেই আমাদের দৃষ্টির সীমা বৃদ্ধি পায়; আকাশের যে সকল অংশে খালি-চোখে তারা দেখা যায় না, দূরবীণের সাহায্যে দেখিলে, সেখানে শত শত তারা ফুটিয়া উঠে। আবার যেখানে দূরবীণেও তারার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না, সুকৌশলে দূরবীণের সাহায্যে তথাকার ফোটোগ্রাফের ছবি উঠাইলে, ছবিতে সহস্র সহস্র ছোট ছোট নক্ষত্রের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, খুব ভাল দূরবীণে চোখ্ লাগাইলে, একাদশ শ্রেণীর নক্ষত্রগুলিকেও আমরা দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হার্সেল্ সাহেব নিজে যে একটি দূরবীণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতি দূরের নক্ষত্র দেখিতে পাইতেন। যে সকল নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে দুই হাজার বৎসর অতিক্রম করে, হার্সেলের দূরবীণে সেই সকল নক্ষত্রেরও অস্তিত্ব ধরা পড়িত। আলোক-রশ্মি মোটামুটি হিসাবে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে; যে সকল নক্ষত্রের আলোক আমাদের নিকটে আসিতে দুই হাজার বৎসর লাগে, সেগুলি যে কত দূরে অবস্থিত, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না!

বলা বাহুল্য, প্রাচীন জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদিগের এই বিপুল দূরত্বের কথা জানিতেন না। নাক্ষত্রিক জগৎ-সম্বন্ধে আমরা যে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহার জন্য আমরা আধুনিক জ্যোতিষীদের নিকটেই ঋণী। প্রাচীনেরা নক্ষত্রগুলিকে দূরস্থিত নিশ্চল জ্যোতিষ্ক বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের সৌরজগতের চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি এবং শুক্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণের যেমন নিজেদের এক একটা গতি আছে, নক্ষত্রদেরও যে, সেই প্রকার গতি থাকার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহাদের মনেই হইত না। আধুনিক জ্যোতিষীদের মধ্যে হার্সেল্ সাহেবই নক্ষত্রদের গতির কথা প্রথমে প্রচার করেন। পরস্পর খুব দূর-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা যে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া আকাশে বিচরণ করে, হয় ত এ কথাও তাঁহার মনে উদিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, হার্সেল্ সাহেব দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের ফলে কতকগুলি নক্ষত্রের যে স্থান-চ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অপর জ্যোতিষীরা তাহা নক্ষত্রদের স্বকীয় গতির ফল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আমাদের সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া মহাকাশের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে যে, নিয়তই ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা জানা ছিল। কাজেই অনেকের মনে হইয়াছিল, আমাদের সমগ্র সৌর-জগৎ প্রতি সেকেণ্ডে যে, চারি মাইল বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাই নক্ষত্রদের স্থানচ্যুতি দেখাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন জ্যোতিষীদের মন হইতে এই সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, আমাদের পৃথিবী, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের যেমন

নিজেদেরই এক একটা গতি আছে, আকাশের সকল নক্ষত্রেরই সেই প্রকার গতি রহিয়াছে। জিনিস যত দূরে থাকে, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা ততই কঠিন হয়। চন্দ্র আমাদের অতি নিকটের জ্যোতিষ্ক; শুক্লপক্ষে পশ্চিম আকাশে দেখা দিয়া, সে কেমন এক একটু করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, প্রতিদিনই তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। নক্ষত্রেরা পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত, কাজেই দুই দশ বৎসর তাহাদের একটু বিচলনও লক্ষ্য করা যায় না; যেগুলি খুব নিকটে তাহাদের বিচলন ধরিতে গেলেও বহু বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। আধুনিক জ্যোতিষীরা শত শত বৎসরের পূর্ব্বের আকাশের মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া, নক্ষত্রদের তখনকার অবস্থানের সহিত এখনকার অবস্থানের মিল আছে কি না পরীক্ষা করিতেছেন এবং যে সকল নক্ষত্র আমাদের নিকটে আছে, তাহাদের স্থানচ্যুতি ঘটিল কি না, তাহাও বৎসরের পর বৎসর মিলাইয়া দেখিতেছেন; এই প্রকারে অনেকগুলি নক্ষত্রের বিচলন ধরা পড়িয়াছে, এবং কি প্রকার বেগে কোন্ দিকে তাহারা ধাবমান হইতেছে, তাহাও জানা যাইতেছে। এই সকল দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, কোন নক্ষত্রই মহাকাশে নিশ্চল অবস্থায় নাই।
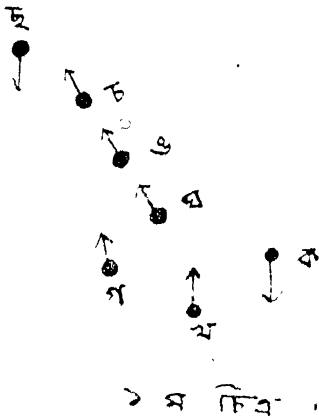
বর্ত্তমান সপ্তর্ষিমণ্ডল

যাহা হউক, গতি থাকিলেই, গতির একটা দিক্ থাকে এবং গতির দিক্ জানিলে, তাহা কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। আমাদের পৃথিবীর গতি আছে, এই গতি নিয়ত দিক্-পরিবর্ত্তন করিতে করিতে এক বৃত্তাভাস-পথে পৃথিবীকে ঘুরাইতেছে। তার পর এই গতির লক্ষ্য কি, অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই, সূর্য্যকে এক নির্দ্দিষ্ট কালে প্রদক্ষিণ করা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। সুতরাং অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের গতির কথা শুনিলেই তাহারা কোন্ দিক্ ধরিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া, ছুটিয়াছে, জানিবার কৌতূহল হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রোক্টর সাহেব বোধ হয়, সর্ব্ব প্রথমে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নক্ষত্রদের গতি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন, আকাশের নানা অংশে যে সকল মহাসূর্য্যকে ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুর আকারে আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি খুব এলোমেলো ভাবে অবস্থান করিয়া ও পরস্পরের সহিত একটা যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তিনি কতকগুলি নক্ষত্রকে অবিকল একই বেগে একই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে দেখিয়াছিলেন। খরস্রোতা নদীর জলে ভাসমান তৃণ বা পল্লব যেমন প্রায় সমান বেগে স্রোতের সহিত একই দিকে ছুটিয়া চলে, কতকগুলি নক্ষত্রকে সেই প্রকার ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিতে দেখা গিয়াছিল। প্রোক্টর সাহেব নক্ষত্রদের এই গতিকে Star drifts বা নাক্ষত্রিক-প্রবাহ নামে প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল নক্ষত্রকে আমরা পৃথিবী হইতে কাছে কাছে সজ্জিত দেখিতে পাই, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পর নিকটবর্ত্তী নয়। বহুদূরের নক্ষত্রগুলি পরস্পর দূরে থাকিয়াও যখন আমাদের দৃষ্টিরেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখনি তাহাদিগকে আমরা আকাশপটে কাছাকাছি সজ্জিত দেখি। এই কারণে প্রোক্টর সাহেব যে সকল নক্ষত্রকে একই বেগে একই দিকে ধাবমান হইতে দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ রাশির কাছাকাছি নক্ষত্ররূপে দেখিতে পান নাই। হয় ত বৃষ-রাশির কতকগুলি নক্ষত্রকে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের কতকগুলির সহিত সমবেগে একই দিকে ছুটিতে দেখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল, মহাকাশে যে সকল নক্ষত্র দৃশ্যতঃ এলোমেলো ভাবে সাজান রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই গতিবিধিতে শৃঙ্খলা আছে; আমাদের চক্ষুতে

যাহারা অসম্পর্কিত ও দূরবিচ্ছিন্ন, তাহারাই ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পাখীর ঝাঁকের মত এক একটা গন্তব্য দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক ঝাঁকের গন্তব্য দিক্ পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু একই ঝাঁকের নক্ষত্রেরা কখনই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য দিকের কথা ভুলিয়া যায় না।
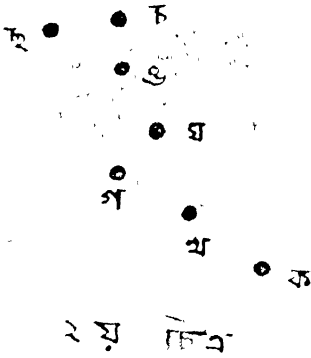
সপ্তর্ষিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ

স্বকীয় গতির জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডলের এবং কৃত্তিকারাশির নক্ষত্রদিগের কি প্রকার স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে, আধুনিক জ্যোতিষিগণ তাহার এক হিসাব করিয়াছেন। এই হিসাব অনুসারে এখনকার সপ্তর্ষিমণ্ডল লক্ষ বৎসর পরে কি প্রকার নূতন আকৃতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা ২য় চিত্রে দেখান গেল। প্রথম চিত্রখানি সপ্তর্ষিমণ্ডলের এখনকার ছবি। চিত্রে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ নক্ষত্রগুলি পরে পরে সাজান হইয়াছে। তাহাদের সহিত যে শর-চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই কোন্ নক্ষত্রটি স্বকীয় গতির দ্বারা কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে। খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ নক্ষত্রের শরগুলি যে দিকে প্রসারিত আছে, ক ও ছ নক্ষত্রের শর সে দিকে নাই। কাজেই বুঝা যাইতেছে খ, গ, ঘ, এবং ঙ নক্ষত্রেরা দল বাঁধিয়া যে দিকে ছুটিয়াছে, ক এবং ছ নক্ষত্র সে দিকে চলিতেছে না। তার পরে উভয় দলের বেগের পরিমাণও এক নয়; সুতরাং দীর্ঘকাল পরে, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের আকৃতি সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যাইবার কথা। কৃত্তিকা-রাশিস্থ নক্ষত্রদের স্বকীয় গতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া হিসাব করিলে উহাদের ভবিষ্য আকৃতি এই প্রকারে নির্ণয় করা যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা। নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা এইখানেই শেষ হয় নাই, সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত জ্যোতিষীরা নক্ষত্র-জগৎ সম্বন্ধে নূতন তথ্য-সংগ্রহে অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা সার্থকও হইয়াছে। এই সকল আধুনিক জ্যোতিষীদের কথা স্মরণ করিলে অধ্যাপক কাপ্টেনের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়। ধ্রুব নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশের প্রায় ৬০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া, তিনি প্রায় আড়াই হাজার নক্ষত্রের স্বকীয় গতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই নীরব সাধনায় তিনি যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর! একত্র আকাশের সর্ব্বাংশের নক্ষত্রদিগের গতি পরীক্ষা করা কঠিন, এই কারণে তিনি আকাশের পূর্ব্বোক্ত অংশটিকে আটাশটি ভাগে খণ্ডিত করিয়া, প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রগুলির গতিবিধি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার পরে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, পরীক্ষিত নক্ষত্রগণ দুইটি সুস্পষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া, আকাশের দুইটি দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, প্রত্যেক দলের নক্ষত্রেরা তাহাদের সহচরদিগের গন্তব্য পথের সহিত সমান্তরাল হইয়া যে ছুটাছুটি করিতেছে, ইহাও অধ্যাপক কাপ্টেন সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন।

অধ্যাপক কাপ্টেন (Kaptyen) নক্ষত্রদের গতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারের কথা গত ১৯০৫ সালে ব্রিটিস্ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রচার করিয়াছিলেন। যে নক্ষত্রগুলিকে এপর্য্যন্ত সকলেই উচ্ছৃঙ্খল গতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, এখন তাহাদেরই গতিবিধিতে সুশৃঙ্খলার কথা শুনিয়া জ্যোতিষীরা বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল নূতন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অভাব নাই। যাঁহারা একটু স্বাধীন চিন্তার অবসর পান, তাঁহারা প্রায়ই নূতন রকমে প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, দেশবিদেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে পড়িলে, এই নূতন সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়। কাপ্টেন্ সাহেবের নব সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে, আধুনিক প্রসিদ্ধ

জ্যোতিষীরা তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এডিংটন্ (Eddington) এবং ডাইসন্ (Dyson) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সোৎসাহে আবিষ্কারটির সত্যতা পরীক্ষার জন্য পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এডিংটন্ সাহেব গ্রুমব্রিজের (Groombridge) নক্ষত্র-তালিকায় লিখিত আকাশের উত্তরার্দ্ধের সাড়ে চারি হাজার নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নক্ষত্রগুলি সপ্তম, অষ্টম বা নবম পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এদিকে ডাইসন্ উত্তরাকাশের যে সকল নক্ষত্র শত বৎসরে কুড়ি সেকেণ্ড মাত্র বিচলন দেখায়, সেগুলির অবস্থানের বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাপ্টেন্ সাহেব একাকী নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, এডিংটন্ ও ডাইসন্ সাহেবও পরীক্ষায় সেই ফলই পাইয়াছিলেন। ডাইসন্ সাহেবের পর্য্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছিল, এক হাজার আট শত নক্ষত্রের মধ্যে এক হাজার এক শতটি এক দলভুক্ত হইয়া, এক নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, এবং ছয় শত নক্ষত্র আর একটি পৃথক্ দল রচনা করিয়া বিপরীত মুখে চলিতেছে। অবশিষ্ট এক শত নক্ষত্র যে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহা তিনি নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত গবেষণাগুলি হইতে কেবল যে নক্ষত্রদিগের গতিরহস্যের সমাধান হইয়াছে, তাহা নয়; নক্ষত্রগুলি কি প্রকারে মহাকাশে সজ্জিত আছে, তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছে। আকাশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যেন কৃষ্ণবর্ণ কাগজের উপরে কতকগুলি শ্বেত-বিন্দুর ছিটাফোঁটা পড়িয়াছে, হঠাৎ দেখিলে এই ছিটাফোঁটার মধ্যে কোনও শৃঙ্খলাই ধরা যায় না, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলে, সেই এলোমেলো শ্বেতবিন্দুগুলির মধ্যেই কোন শৃঙ্খলা আছে বলিয়া মনে হয়। কতক-গুলি বিন্দু সজ্জিত থাকিয়া, যে কোন কোন স্থানে অর্দ্ধচন্দ্রের আকার বা মালার ন্যায় বক্ররেখা উৎপন্ন করি-তেছে, তাহা তখন স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রাচীন জ্যোতিষীরা বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত সহস্র সহস্র নক্ষত্রের মধ্যে এই প্রকার একটু আধটু শৃঙ্খলার আভাস পাইয়া, নক্ষত্র-বিন্যাসের মূলে হয় ত কোন নিয়ম আছে বলিয়া কল্পনা করিতেন। কিন্তু নিয়মটা যে কি, তাহা ইঁহারা জানিতে পারেন নাই। তার পর জ্যোতিষিগণ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছিলেন, যদি সূর্য্যকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া, দুই লক্ষ কোটি মাইল ব্যাসার্দ্ধে মহাকাশে বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে কোন নক্ষত্রই বৃত্তের সীমার অন্তর্গত হয় না কিন্তু ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ ইহারই দ্বিগুণ ও তিনগুণ করিয়া অপর দুইটি বৃত্ত টানিলে প্রথম বৃত্তে একটি এবং দ্বিতীয় বৃত্তে চারিটি নক্ষত্র আসিয়া পড়ে। এই ব্যাপারে জ্যোতিষিগণ নক্ষত্র-বিন্যাসের একটা নিয়ম পাইয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিয়াছিলেন, দূরত্ব সমান সমান করিয়া বাড়াইতে থাকিলে, নক্ষত্রের সংখ্যা চারি চারি গুণ করিয়া বাড়িয়া চলে। নক্ষত্রের বিন্যাস সম্বন্ধে এই নিয়মটিই জ্যোতিষিসম্প্রদায়ে আদৃত হইয়া আসিতেছিল এবং অনেকে বিশ্বাস করিতেছিলেন, আমাদের পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সকলই যেমন গোলাকার বস্তু, মহাকাশের যে স্থানে নক্ষত্রেরা অবস্থিত, তাহাও একটা শূন্যগর্ভ বিশাল গোলক। আচার্য্য কাপ্টেন্ ও ডাইসন্ প্রমুখ জ্যোতিষীদের আবিষ্কারে এখন এই বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা যে প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাতে নক্ষত্র-অধিকৃত মহাশূন্যটিকে পূর্ণ গোলকাকৃতি বলা যাইতে পারে না; যেমন পৃথিবীর উত্তর-পূর্ব্ব কিছু চাপা ও পৃথিবীর ভ্রমণ-পথেরও দুই প্রান্ত ঈষৎ চাপা, সেই প্রকার নক্ষত্রেরা মহাশূন্যের যে অংশে চলাফেরা করে, তাহারও আকৃতি দুইপ্রান্তে চাপা গোলকের ন্যায়।

নক্ষত্র-রাজ্যের অনেক স্থূল ব্যাপারও অদ্যাপি অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে; যে মহাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া আমাদের সৌরজগতের গ্রহ চন্দ্র-ধূমকেতুরা সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, দূর নক্ষত্রলোকে সেই নিয়ম অনুসারে গতিবিধি হয় কি না, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কাজেই আধুনিক জ্যোতিষিগণ বহু গবেষণায় নক্ষত্রদিগের যে একটু আধটু সংবাদ পাইতেছেন, তাহাকেই এখন পরম-লাভ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ললিতকলা-ভাবে হিন্দুসঙ্গীতের বিশেষত্ব

[শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত, M. A., B. L.]

আমি যাহা ভালবাসি, আমার পক্ষে তাহা সুন্দর, এবং আমি যাহা ঘৃণা করি, আমার পক্ষে তাহা কুৎসিত,—আমার নিজের সম্বন্ধে সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য নির্দ্দেশ এভাবে করিলে, তর্কশাস্ত্র অনুসারে কোন দোষ হয় না। তাহার কারণ, আমি কোন জিনিষকে কুৎসিত জানিয়াও ভালবাসি, একথা একেবারেই বলা চলে না, বলিলে তাহার কোন অর্থই হয় না। তবে এরূপ হইতে পারে যে, আমি যাহা ভালবাসি, তাহা অপর একজনের পক্ষে কুৎসিত, এবং আমি যাহা ঘৃণা করি, তাহা অপর একজনের পক্ষে সুন্দর। এ স্থলে দাঁড়ায় এই যে, আমরা উভয়ে একই জিনিষকে সুন্দর বলিতে পারি না বা একই জিনিষকে কুৎসিত বলিতে পারি না। তথাপি একথা ঠিক যে, আমি যাহা ভালবাসি, তাহাই আমার পক্ষে সুন্দর এবং তিনি যাহা ভালবাসেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সুন্দর।

একই জিনিষকে সকলেই সুন্দর দেখেনা, একথা যেমন একদিকে সত্য, অপর দিকে বেশীর ভাগ লোকে একই জিনিষকে সুন্দর দেখে, এ কথাও তেমনই সত্য। সরসীবক্ষে প্রস্ফুটিত শতদল বেশীর ভাগ লোকেরই নয়নরঞ্জন। যাঁহারা পঙ্কিল জলাশয়ে মহিষের কর্দ্দমলেপন দেখিয়া অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। বেশীর ভাগ লোকেই কোকিলের কুহুতান শুনিতে ভালবাসে। যাঁহাদের পক্ষে বায়সের কাকা রব তদপেক্ষা অধিক প্রিয়, তাঁহাদিগকে আমরা সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ করিয়া থাকি। এরূপ অসাধারণ লোকের কথা বাদ দিয়া, আমরা অনায়াসে সুন্দরের একটা সাধারণ সংজ্ঞা মোটামুটি এই ভাবে দিতে পারি, যাহা ভাললাগে তাহাই সুন্দর। এ প্রকার সংজ্ঞায় বড় বেশী গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজগতের উপলব্ধি করি। কিছু দেখা, বা কিছু শোনা বা কিছু স্পর্শ করা—এ সমস্ত এক একটি উপলব্ধি। আমাদের উপলব্ধি-সমূহের মধ্যে কতকগুলি সুখপ্রদ, অবশিষ্ট সুখপ্রদ নহে। যে উপলব্ধি সুখপ্রদ, তাহার মূলে যে বস্তু থাকে, তাহা আমাদের প্রিয়। সুতরাং তাহাকেই আমরা সুন্দর বলি। শারদ-পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিয়া আমরা সুখ পাই। সেই জন্য শারদ-পূর্ণিমার চাঁদ আমরা ভালবাসি এবং সুন্দর বলি। এ হিসাবে আমাদের ইন্দ্রিয়, সুন্দর ও কুৎসিতের কতকটা পরীক্ষক, এরূপ বলা চলে।

ইন্দ্রিয় স্থূলভাবে সুন্দর ও কুৎসিতের যে পার্থক্য-নির্দ্দেশ করে, তাহার ব্যাখ্যা সহজেই করিতে পারা যায়। ব্যাখ্যা এই যে, ওরূপ পার্থক্য-নির্দ্দেশ জীবনরক্ষার পক্ষে উপযোগী। যে প্রকার রূপ, যে প্রকার রস, যে প্রকার গন্ধ, যে প্রকার স্পর্শ, যে প্রকার শব্দ, আমাদের জীবন-রক্ষার অনুকূল, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সাধারণতঃ তাহা-দিগকেই সুন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইন্দ্রিয়গণ জীবন-যাত্রায় এবম্প্রকার পথ-প্রদর্শক না হইলে পদে পদে আমা-দিগকে বিপন্ন হইতে হইত।

কিন্তু একশ্রেণীর সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে, তাহার ব্যাখ্যা এত সহজে হয় না। একখানি ছবি দেখিয়া বা একটি গান শুনিয়া, যখন ভাল লাগে, তখন এ সৌন্দর্য্যানুভূতির দ্বারা জীবনযাত্রার কি সাহায্য হয়, তাহা বড় বুঝা যায় না। ছবি না দেখিয়া, বা গান না শুনিয়া, জীবনযাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারে। এরূপ সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত জীবন-যাত্রার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না।

তবে কি এ সৌন্দর্য্যানুভূতি সম্পূর্ণ নিরর্থক? যদি জীবন যাত্রাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উহা নিরর্থক। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য যদি তদতিরিক্ত কিছু হয়, তাহা হইলে উহা নিরর্থক বলা চলে

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সপ্তম অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

না। অন্ততঃ উহার দ্বারা যে আনন্দ লাভ হয়, সেটা ত স্বীকার করিতে হইবে।

শুধু আনন্দলাভ নহে, আনন্দলাভের সঙ্গে আরও কিছু হয়; তাহা জীবন-রক্ষার জন্য আবশ্যক না হইলেও মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য আবশ্যক। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের উপভোগের সময় চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম দেওয়া যায় রস। এই রসোদ্দীপনা কোমল চিত্তবৃত্তিগুলির উন্মেষে সাহায্য করে। চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ হইতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। সুতরাং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের উপভোগের দ্বারা আনন্দের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

অতএব একদিকে যেমন জীবন-যাত্রার সৌকর্য্যার্থ স্থূল সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনই মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রয়োজন।

এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের উপভোগ বিষয়ে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় যেরূপ উপযোগী, অন্য ইন্দ্রিয় তাদৃশ নহে। এই হেতু বিশ্বের যে অংশ শব্দময় ও যে অংশ দৃশ্যময়, প্রধানতঃ তাহারাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের আকর।

এই শব্দময় ও দৃশ্যময় বিশ্ব সমস্তটাই সুন্দর নহে। সমস্তটা সুন্দর এ কথার কোন অর্থই হয় না। সুন্দর,অসুন্দর হইতে পৃথক্ হইয়া—তবে সুন্দর। বিশ্বের সর্ব্বত্র সুন্দর, অসুন্দরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র হাসি বা সর্ব্বত্র জ্যোৎস্না থাকিতে পারে না। যেখানে হাসি আছে,সেখানে কান্নাও আছে; যেখানে জ্যোৎস্না আছে, সেখানে অন্ধকারও আছে; সুন্দর ও অসুন্দরের এরূপ সমাবেশ না হইলে সুন্দরের উপভোগ সম্ভবপর হইত না।

জড়জগৎ ও জীব-জগৎ লইয়া এই বিশ্ব। জড়জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত, ঝড়, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, সরিৎপ্রবাহ সমস্তই প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। ওদিকে জীব-জগতে জীবন-সংগ্রাম নানা মূর্ত্তিতে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। বিশ্বজগৎকে এ ভাবে দেখিলে, উহাতে মুগ্ধ হইবার কিছুই নাই। স্রষ্টার রচনা-কৌশল দেখিয়া যে আনন্দ বা জীবন-সংগ্রামে যোদ্ধৃবর্গের রণ-কৌশল বা জয়-পরাজয় দেখিয়া যে আনন্দ, তাহা সৌন্দর্য্যের উপভোগ নহে, কতকটা কৌতূহল-পরিতৃপ্তি ও বিস্ময়ের ভাব হইতে সঞ্জাত। বস্তুতঃ বিশ্বজগৎটা যদি শুধু একটা কলকারখানা, এবং কেবল মাত্র টিকিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে যুযুৎসু জীব-সমূহের রণক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে সংসারে কার্য্য ও ললিত-কলার একেবারে স্থান হইত না।

কিন্তু সংসারে মানব-হৃদয় বলিয়া একটা মস্ত রাজ্য আছে। সে রাজ্যে সৌন্দর্য্যই প্রভু। মানব হৃদয়ে উচ্ছ্বাস যখন আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করে, তখন তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র খেলা দেখা যায়। আর্ত্তের করুণ বিলাপ, মর্ম্মপীড়িতের উষ্ণনিঃশ্বাস, লাঞ্ছিতের অভিমান, এ সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে। তবে এ সৌন্দর্য্য পৃথক্ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। যিনি পারেন, তাঁহাকে আমরা ভাবগ্রাহী বা ভাবুক বলিয়া থাকি। সংসারের আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতে সৌন্দর্য্যটুকু বাহিরে উপভোগ করা মরালধর্ম্মী ভাবুকেরই অধিকার।

প্রকৃতিতে যখন কল্পনায় সহৃদয়তার আরোপ করা যায়, অথবা যখন মানব হৃদয়ের সহিত তাহার সহানুভূতি বা বিরোধ কল্পনার চক্ষে দেখা যায়, তখনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। নচেৎ নিয়মের জড়-প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য কোথায়? শান্তবারিধিবক্ষ যখন পবন-হিল্লোলে কাঁপিয়া উঠে, তখন উহাকে হাইড্রো ডাইনামিক্সের ভিতর দিয়া বিচার করিলে, উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ভাবুকের চক্ষে উহা অন্যভাবে প্রতিভাত হইবে। তিনি হয়ত দেখিবেন, উহা প্রণয়ী হৃদয়ে প্রথম প্রণয়ের অভিঘাতে—লজ্জা, ভয় প্রভৃতি তরঙ্গ-বিক্ষোভ। স্রোতস্বিনীর প্রবাহ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকের মনে হইবে, সমুদ্র হইতে উত্থিত বাষ্পরাশি মেঘে পরিণত হইয়াছে, সেই বারি নদীর আকার ধারণ করিয়া, ভূমধ্যস্থ লবণরাশি এবং ভূপৃষ্ঠস্থ আবর্জ্জনারাশি বহন করিয়া সাগরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভাবুক হয়ত দেখিবেন, স্রোত-স্বিনী তাহার চিরবাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে কুলু কুলু রবে অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিতে করিতে গরবভরে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

সে যাহা হউক, মানব-হৃদয় ও প্রকৃতি, ভাবুকের নিকট আপনাদের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়, ইহা সত্য।

একশ্রেণীর ভাবুক আছেন, তাঁহারা কেবল নিজে সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, অপরকে তাহার অংশভাগী

করিতে চাহেন না বা পারেন না। অপর এক শ্রেণীর ভাবুক আছেন, তাঁহারা নিজে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সন্তুষ্ট হন না, সাধারণের মধ্যে সে সৌন্দর্য্য বিলাইতে চাহেন। যাঁহাদিগকে আমরা কবি, শিল্পী বা কলাবিৎ বলি, তাঁহারা এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভাবুক। কবি—ভাষার সাহায্যে কাব্যের দ্বারা, শিল্পী—চিত্র কারু প্রভৃতি শিল্পের দ্বারা, এবং কলাবিৎ নৃতগীতবাদ্যের দ্বারা তাঁহাদিগের অনুভূত সৌন্দর্য্য কল্পনার সাহায্যে বিচিত্র ও অভিনব ভাবে ব্যক্ত করেন। যাঁহার যে পরিমাণ কল্পনা-শক্তি ও রচনা-কৌশল, তাঁহার তুলিকা-স্পর্শে সৌন্দর্য্য সেই পরিমাণ ফুটিয়া উঠে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যের উপভোগের দ্বারা চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম রসোদ্দীপনা। সুতরাং কাব্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দ্বারা রসোদ্দীপনা। কাব্য যদি রসোদ্দীপক না হয়, তবে তাহা শুদ্ধ কথার সমষ্টি মাত্র। যে চিত্র শুধু নয়নরঞ্জন কিন্তু তাহাতে কল্পনার সাহায্যে রসোদ্দীপনা হয় না, সে চিত্র সুকুমার শিল্পের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। যে সঙ্গীত কেবল শ্রুতিসুখকর কিন্তু কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে না, তাহা ললিতকলার পক্ষ হইতে বিচার করিলে, অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত।

আমরা ভাষার সাহায্যে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি। মনোভাব যখন আবেগশূন্য বা উত্তেজনাবিহীন, তখন উহা সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়; কিন্তু উহার মধ্যে যখন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস থাকে, তখন নানা প্রকার স্বরভঙ্গীর দ্বারা ভাষার উপর কারিগরি করিবার প্রয়োজন হয়। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের প্রকৃতি অনুসারে স্বর উচ্চ বা নিম্ন, প্রবল বা মৃদু, দ্রুত বা শ্লথ, যেখানে যেরূপ হওয়া আবশ্যক, আপনা হইতে ঠিক সেইরূপ হয়। যেখানে এই স্বরভঙ্গীর অভাব বা বিকৃতি দৃষ্ট হয়, সেখানে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতায় প্রবল সন্দেহ জন্মে—হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও তদুপযোগী স্বরভঙ্গী, এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। যেখানে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অভিনয় মাত্র, সেখানেও অভিনেতাকে জোর করিয়া, উপযুক্তস্থলে উপযুক্তভাবে স্বরভঙ্গী করিতে হয়, নচেৎ সহজেই কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া, অভিনয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

দেবাসুরের দ্বারা সমুদ্র-মন্থনে যে সুধার উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সুধা সুরলোকের জন্য। এ মর্ত্ত্য-ধামের জন্য সঙ্গীত-সুধার কখন কি ভাবে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যে, অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম অসভ্য জাতিগণের মধ্যে যে সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ধ্বনির সাহায্যে ব্যক্ত হইবার সময় যে স্বরভঙ্গী হয়, তাহা হইতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, একথা যদিও জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না, তথাপি এই স্বরভঙ্গীর মধ্যে যে, সঙ্গীতের উপাদান আছে, সে কথা জোর করিয়া বলা চলে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, এই স্বরভঙ্গীর মধ্যে একটা ভগ্ন আকারের ছন্দ ও অনিয়মিত সুরের বৈচিত্র্য পাওয়া যায়।

এইখানে বলা চলে, শুদ্ধ নকল করাই কবি বা কলাবিদের কার্য্য নহে, এবং অবিকল নকল করিতে পারাই যে কবি বা কলাবিদের কৃতিত্ব, তাহাও নহে। বিশ্ব-সংসার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, ইহা সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য সকলের চক্ষে পড়ে না। কবি বা কলাবিৎ এই বিশ্বসংসার হইতেই সৌন্দর্য্যের উপাদান সংগ্রহ করেন, এবং কল্পনার সাহায্যে উহা হইতে একটি অভিনব সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া, লোক-চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করেন। নির্দ্দোষ অনুকৃতিই যদি কৃতিত্বের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে, কবি, শিল্পী বা-কলাবিদের অপেক্ষা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা ও গ্রামোফোনের উচ্চে স্থান হইত, কেননা নির্দ্দোষ অনুকরণ বিষয়ে ঐ দুইটি যন্ত্রের নিকট কবি, শিল্পী বা কলাবিৎ সকলকেই হারি মানিতে হয়। কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার তান, বা ব্যথিতের করুণ বিলাপ অনুকরণ করিলেই তাহা সঙ্গীত হয় না। উহাদের মধ্যে সঙ্গীতের উপাদান আছে, উপযুক্ত কারুকারের হস্তে পড়িলে সেই উপাদান হইতে যাহা রচিত হয়, তাহাই সঙ্গীত, এবং কারুকারের যে পরিমাণ রচনা-নৈপুণ্য, সঙ্গীতেরও সেই পরিমাণ মনোহারিত্ব।

মোটামুটি দেখিতে গেলে সঙ্গীতে একটা ছন্দ ও খানিকটা সুরের খেলা থাকে। কেবলমাত্র হিন্দু-সঙ্গীতে নহে, ছন্দ ও সুরের খেলা—সঙ্গীত মাত্রেই থাকিবে। অস্থি ও মাংস লইয়া যেমন জীবদেহ গঠিত, ছন্দ ও সুরের

খেলা লইয়া সেইরূপ সঙ্গীত রচিত। হিন্দু-সঙ্গীতে এই ছন্দের নাম দেওয়া হইয়াছে—তাল এবং সুরের খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে—রাগ-রাগিণী।

ছন্দোমঞ্জরীতে যে সকল ছন্দের বিবরণ আছে, তাহাদের অনেকের সহিত হিন্দু-সঙ্গীতে ব্যবহৃত অনেক তালের মিল আছে। তবে উহাদের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে, ছন্দের লক্ষণ অপেক্ষা তালের লক্ষণ অধিক ব্যাপক। ছন্দোমঞ্জরীর উল্লিখিত ছন্দের পরিধি যেরূপ সংকীর্ণ, হিন্দু-সঙ্গীতের তালের পরিধি সেরূপ সংকীর্ণ নহে। তাহা ছাড়া, তালের সংখ্যা অপেক্ষা ছন্দের সংখ্যাও অনেক বেশী। ছন্দোমঞ্জরীর অনেকগুলি ছন্দকে হিন্দু-সঙ্গীতের একটা তালের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। যথা, তোটক, বিদ্যুন্মালা, কুসুমবিচিত্রা, প্রহরণ-কলিকা এই কয়টি ছন্দকেই এক ত্রিতালী তালের অন্তর্গত বলিয়া ধরা চলে।

ছন্দের যে একটা ব্যঞ্জনা শক্তি—ইংরাজিতে যাহাকে বলে, expressiveness—আছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোন একটি সুন্দর ভাব ছন্দোহীন ভাষায় ব্যক্ত হইলে যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইবে, তদুপযোগী ছন্দে ব্যক্ত হইলে, তাহার অপেক্ষা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে। ছন্দের এই গুণ আছে বলিয়া, কাব্যে ছন্দের এত আদর। সকল ছন্দে সমান ভাবে সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত হয় না। বীররসের পক্ষে যে ছন্দ উপযোগী, করুণ রসের পক্ষে তাহা ঠিক উপযোগী নয়। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শান্ত রসের উদ্দীপনা করিতে হইলে, ছন্দের গতি ধীর হওয়া আবশ্যক, এবং বীর বা রৌদ্র রসের উদ্দীপনা করিতে হইলে, ছন্দের গতি দ্রুত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং মেঘদূতের ধীরগামী মন্দাক্রান্তা-ছন্দে যদি বীররসাত্মক কাব্য রচিত হয়, কিংবা দ্রুতগামী তনুমধ্যা-ছন্দে যদি শান্ত-রসাত্মক কাব্য রচিত হয়, তাহা হইলে কাব্যে ছন্দের সার্থকতা থাকে না।

ছন্দের এই পৃথক্ ব্যঞ্জনাশক্তি কাব্যে বড় লক্ষ্য হয় না। তাহার কারণ ছন্দকে কাব্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার অবসর আমরা পাই না। কাব্যে যেখানে ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই উহার নিজের গুণ কাব্যের গৌরবের মধ্যে ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতে ছন্দের স্থান ওরূপ গৌণ নহে। সঙ্গীতের একটা শাখা কেবল ছন্দের মূর্ত্তি প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা, ঢোলক প্রভৃতি যন্ত্র যাহাদিগের সংস্কৃত নাম আনদ্ধ, * কেবল ছন্দের নানা ভঙ্গী দেখাইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, এবং নৃত্যের হাবভাব ছাড়িয়া দিলে, উহাও শুধু ছন্দেরই মূর্ত্তি প্রকাশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্গীতে ব্যবহৃত ছন্দ, অন্ততঃ হিন্দু-সঙ্গীতে ব্যবহৃত ছন্দ, যাহার সাধারণ নাম তাল, কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের ন্যায় সংকীর্ণ নহে। এ জন্য হিন্দু-সঙ্গীতের ছন্দোবিভাগে কলাবিদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। অবশ্য প্রত্যেক তালের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণ বজায় না রাখিলে, তালের ছন্দোভঙ্গ হয়। তবে উহা বজায় রাখিয়া, কলাবিৎ ইচ্ছামত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন, এবং তাহাতেই তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। এই সংযত স্বাধীনতাই হিন্দু-সঙ্গীতের মূলমন্ত্র। একটা গণ্ডী দেওয়া আছে, সেই গণ্ডীটা পার হওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে।

ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য লইয়া সঙ্গীত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। হিন্দু-সঙ্গীতে ছন্দের ন্যায় সুরের বৈচিত্র্যকেও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সংযত করা হইয়াছে। এই রূপ বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট সুরের বৈচিত্র্যের নাম দেওয়া হইয়াছে, রাগ-রাগিণী। কোন একটি রাগিণীতে যে যে সুর, যে যে ভাবে লাগে, অপর একটি রাগিণীতে সেই সেই সুর, সেই সেই ভাবে লাগে না। তবে তালের লক্ষণ যত সহজে বুঝান যায়, রাগরাগিণীর লক্ষণ তত সহজে বুঝান যায় না। তাহার কারণ তাল ছন্দমাত্র, এবং ছন্দ শুদ্ধ সময়ের মাপ-জোঁকের ব্যাপার, সুতরাং গণিতের হিসাবের অন্তর্গত। কিন্তু রাগরাগিণীতে সেরূপ কোন মাপ-জোঁকের ব্যাপার নাই, সেই জন্য উহাদের লক্ষণ সহজে বুঝান যায় না।

প্রত্যেক রাগিণীর একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে, সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া মূর্ত্তির নানা প্রকার বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। যেমন অশ্ব এই জন্তুটির মূর্ত্তির একটা বিশিষ্টতা আছে; যাহা থাকায় উহাকে দেখিয়া অপর সকল জন্তু হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায়। এখন যদি আমাকে একটা অশ্বের ছবি আঁকিতে হয়, তবে

* ততং বীণাদিকং বাদ্যং আনদ্ধং মুরজাদিকং।

সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, আমি যে রকমের ইচ্ছা একটা অশ্বের ছবি আঁকিতে পারি। রাম যেরূপ অশ্বের ছবি আঁকিয়াছে, শ্যামকে যে ঠিক সেই রকমেরই ছবি আঁকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। হয়ত রামের ছবি কুৎসিত এবং শ্যামের ছবি সুন্দর। তথাপি উভয়েরই ছবিতে একটা বিশিষ্টতা বজায় আছে বলিয়া, উভয়েরই ছবিকে অশ্বের ছবি বলা যায়। শ্যামের ছবি ঠিক রামের ছবির মত না হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাহার ছবিতে অশ্বের মূর্ত্তির বিশিষ্টতা বজায় থাকা চাই। নচেৎ যতই সুন্দর হউক, উহাকে অশ্বের ছবি বলা চলিবে না। সেইরূপ হিন্দু-সঙ্গীতে রাগরাগিণীর একএকটা রূপ আছে। সুরের খেলার দ্বারা সেইরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে হয়, রূপের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, তাহাকে যেমন ইচ্ছা বিচিত্রিত ও অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। বেহাগ রাগিণীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, যাহা থাকায় উহাকে বেহাগ রাগিণী বলিয়া চিনিতে পারা যায় এবং অপর সকল রাগিণা হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায়। এখন রাম ও শ্যাম উভয়ে যদি এই বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, বেহাগ রাগিণী আলাপ করেন, তাহা হইলে যিনি যে ভাবেই আলাপ করুন না কেন, উহাকে বেহাগ বলিয়া ঠিক চিনিতে পারা যাইবে। এমন কোন কথা নাই যে, উভয়কে একই সুর একই স্থানে একই ভাবে লাগাইতে হইবে। বিশিষ্টতা রক্ষা করাটা হইল, গণ্ডী। এই গণ্ডী পার না হইয়া, যাঁহার যেমন খুসী তিনি তেমনই ঘুরাইতে, ফিরাইতে বা মোচড়াইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই। এইখানে কলাবিদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি তাঁহার কল্পনার সাহায্যে যতদূর ইচ্ছা রাগিণীর রূপের শ্রীসম্পাদন করিতে পারেন। এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারেই তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয়।

এইখানে কেহ যদি প্রশ্ন করেন, রাগিণীর রূপের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি, ইচ্ছামত সুরের বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিয়া কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না? তাহার উত্তর এই যে, সংযত স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। স্বাধীনতা যেখানে নাই, সেখানে সজীবতাও নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু যেখানে সংযম নাই সেখানে সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহাও তেমনই সত্য। কোন কোন কবির কাব্যরচনার সময় ভাবের বেগ এত বেশী হয় যে, তিনি সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার কল্পনাবিহঙ্গমকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে কল্পনার খুব দৌড় দেখান চলে বটে কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় না। আমাদের হিন্দুসঙ্গীতে একদিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা, অপরদিকে তেমনই স্বেচ্ছাচারের অভাব। এই উভয়ের সমবায়ে যাহা রচিত হয়, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

রাগিণীর রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই যে, এইস্থান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং এই স্থানে শেষ করিতে হইবে। ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা হইতে প্লেট বাহির করিয়া, আরকে ডুবাইয়া, নাড়িতে থাকিলে, ছবি ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। প্রথমে কোন একটা অংশ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ক্রমশঃ অন্য অংশগুলিও অস্পষ্টভাবে বাহির হইতে থাকে। শেষে সমস্ত ছবিখানি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কলাবিৎও যখন কোন একটা রাগিণী আলাপ করেন, ঠিক এই ভাবেই সেই রাগিণীর রূপটি অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে এবং শেষে শ্রোতার কল্পনাচক্ষুর সম্মুখে জীবন্তভাবে প্রতিভাত হয়। যতক্ষণ মূর্ত্তি অস্পষ্ট থাকে, ততক্ষণ শ্রোতার তৃপ্তি হয় না। ক্রমে মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তাহা উপভোগ করিতে করিতে শ্রোতার ভোগের পরিতৃপ্তি হয়।

ছন্দোভঙ্গ না করিয়া, নানা ভঙ্গীতে তালের মূর্ত্তিপ্রকাশ করা যেমন কলাবিদের কারিগরি—ইংরাজীতে যাহাকে বলে art—সেইরূপ বিশিষ্টতা নষ্ট না করিয়া, নানাভাবে রাগিণীর মূর্ত্তিপ্রকাশ করাও কলাবিদের কারিগরি।

ছন্দের যেমন পৃথক্ একটা ব্যঞ্জনাশক্তি আছে, সেইরূপ রাগরাগিণীরও পৃথক্ একটা রসোদ্দীপিকা শক্তি আছে। কোন একটি সুন্দর ভাববিশিষ্ট কবিতা শুদ্ধ আবৃত্তি করিলে যে পরিমাণ রসোদ্দীপনা করিবে, উপযুক্ত সুর-সহযোগে গীত হইলে যে, তদপেক্ষা অধিক রসোদ্দীপনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ভাগবত-কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা এটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কথক যেখানে ভাবের গভীরতা দেখেন, সেখানে সুরসহযোগে তাঁহার কথা আবৃত্তি করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য, শুদ্ধ বৈচিত্র্য-সম্পাদন নহে, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য রসোদ্দীপনা।

কালীয়দমন যাত্রার দূতীও এই উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন।

হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ধ্বনির সাহায্যে বাহিরে ব্যক্ত করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বরভঙ্গীর প্রয়োজন হয়, ইহা যেমন সত্য, ভিন্ন ভিন্ন সুরের বৈচিত্র্য অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রসের উদ্দীপনা হয়, ইহাও তেমনই সত্য। কোন কোন রাগিণী আছে, তাহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তে করুণরসের সঞ্চার হয়। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পিলু রাগিণীর আলাপ শুনিয়াছেন, তাঁহারা এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। দূর হইতে বংশীতে পিলু রাগিণীর আলাপ শুনিলে মনে হইবে, সে যেন আপনার মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিতেছে। সেইরূপ কোন কোন রাগিণী আছে, তাহাদের আলাপ শুনিলে চিত্তে শান্তরস বা বীররস বা অন্য কোন রসের উদ্রেক হয়।

ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপিকাশক্তি কেন হইল, তাহার কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ প্রদর্শন বড় কঠিন কথা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 'উত্তেজনায় সাড়া' নির্ণয় করিবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন, রসোদ্দীপনার দ্বারা মস্তিষ্কে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যদি সেইরূপ কোন প্রণালী উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপিকাশক্তি কেন, তাহার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মিলিবে এবং কোন্ রাগিণীর কি প্রকার রসোদ্দীপিকা-শক্তি, তাহাও বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত রাগরাগিণীর সহিত রসের বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রাগিণী মাত্রেরই একটা সুরসংযোজনার বিশিষ্টতা আছে। এই বিশিষ্টতা থাকায় উহা কোন একটি বিশেষ রসের উদ্দীপনায় সমর্থ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। হিন্দু-সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর আলাপ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। কতকগুলি রাগিণীর জন্য উষাকাল, কতকগুলির জন্য প্রাতঃকাল, কতকগুলির জন্য মধ্যাহ্ন, কতকগুলির জন্য অপরাহ্ণ, কতকগুলির জন্য সন্ধ্যাকাল এবং কতকগুলির জন্য নিশীথকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। দিবারাত্রির বিভিন্ন অংশের সহিত রাগরাগিণীর সকলের কিরূপ সম্বন্ধ, বা আদৌ কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও আলোচিত হয় নাই; সুতরাং এ বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার, তাহা প্রধানতঃ অনুভূতি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিব। অনেকে স্বীকার করেন না যে, এপ্রকার সময়-নির্দ্দেশের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে। তাঁহাদের মতে সকল রাগিণী সকল সময়েই গাওয়া চলে, সময়ের ইতরবিশেষে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর উহাদের ক্রিয়ার তারতম্য হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা কতকটা সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সকল সময়ে সকল রাগিণী সমান ভাল লাগে না। ভৈরব রাগ, সচরাচর যাহাকে ভয়রোঁ বলা যায়, উষাকালে যেমন শ্রুতিমধুর হয়, অন্য সময়ে তেমন হয় না। ইমনকল্যাণ রাগিণী সন্ধ্যাকালে এবং বেহাগ রাগিণী নিশীথকালে যেমন ভাল লাগে, অন্য সময় তেমন লাগে না; এমন কি, ভয়রোঁ রাগের আলাপ শুনিলে মনে হয়, যেন প্রভাত হইয়াছে, এবং উহা জীবজগৎকে জাগরিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইমনকল্যাণ রাগিণীর আলাপ শুনিলে মনে হয়, যেন সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হইয়াছে, দেবালয়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিতেছে। বেহাগ রাগিণীর আলাপ শুনিলে মনে হয়, যেন গভীর রজনী, জীবজগৎ শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে, সব নিস্তব্ধ। অবশ্য প্রতিপক্ষ তর্ক করিবেন যে, এটা শুদ্ধ সাহচর্য্য অর্থাৎ associationএর ফল। ভয়রোঁ রাগ উষাকালে বা বেহাগ-রাগিণী নিশীথকালে শুনিয়া শুনিয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ভয়রোঁ রাগ শুনিলে, উষাকালের স্মৃতি এবং বেহাগ রাগিণী শুনিলে নিশীথকালের স্মৃতি আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রতিপক্ষের মতে বেহাগ-রাগিণী যদি ভোরের বেলা শুনা অভ্যাস থাকিত, তবে উহার দ্বারা ভোরের বেলার স্মৃতিই জাগরিত হইত। বেহাগরাগিণীর নিজস্ব এমন কোন গুণ নাই, যদ্দ্বারা উহা নিশীথকালেরই স্মৃতি-উদ্দীপনে সমর্থ। প্রতিপক্ষের এই যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা সহজে বলিবার উপায় নাই। তাহার কারণ বিষয়টি অদ্যাপিও বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হয় নাই; তবে একটা কথা বলা চলে যে, দিবারাত্রির সকল সময়ে প্রকৃতির মূর্ত্তি একভাবে থাকে না। উষাকালে

প্রকৃতির যে মূর্ত্তি দেখি, মধ্যাহ্নে সে মূর্ত্তি দেখি না; সন্ধ্যায় যে মূর্ত্তির দেখা পাই, নিশীথকালের মূর্ত্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির মূর্ত্তি যেমন বিভিন্ন, বিভিন্ন রাগিণীর রূপও সেইরূপ বিভিন্ন। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয়, অন্যায় হইবে না যে, যে রাগিণীর রূপের সহিত যে সময়ের প্রকৃতির মূর্ত্তির মিল আছে, সেই রাগিণী সেই সময়ের উপযোগী হওয়া উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কোন্ রাগিণীর রূপের সহিত কোন্ সময়ের প্রকৃতির মূর্ত্তির মিল আছে, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন; কেননা রাগিণীর রূপ বা প্রকৃতির মূর্ত্তি মাপ-জোঁকের ব্যাপার নয়, অনুভূতির বিষয়। কাজেই তুলনার দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপন করা সহজ নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া, কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত থাকিব। নিশীথকালে প্রকৃতির শান্তভাব সকলেই নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছেন। এখন যে রাগিণীর আলাপ শুনিলে চিত্তে শান্তভাবের উদয় হয়, সে রাগিণী যে নিশীথ-কালের উপযোগী, এবং যে রাগিণীর আলাপ শুনিলে চিত্তে রৌদ্ররসের উদ্দীপনা হয়, সে রাগিণী যে উহার উপযোগী নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাগরাগিণীর রসোদ্দীপিকাশক্তি বিভিন্ন কি না তাহা সুধী-গণের বিচার্য্য বিষয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, বেহাগরাগিণী শান্তরসাত্মক, তাহা হইলে উহা নিশীথকালের উপযোগী এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে রাগ রাগিণীর সময় নির্দ্দেশ একটা মনগড়া ব্যাপার নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাগিণী ও তাল ইহাদের পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর ইহাদের মিলনে যাহার উৎপত্তি হয়, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাগিণী যদি তাল-সহযোগে আলাপ করা যায়, তবে তাহার নাম দেওয়া হয় গান কিংবা গৎ। কণ্ঠে গীত হইলে উহাকে বলা যায় গান, এবং সেতার, এস্রার প্রভৃতি যন্ত্রে বাদিত হইলে উহাকে বলা যায় গৎ! বিনা তালে রাগিণী আলাপ করিলে, রাগিণীর রূপটি স্থির ভাবে প্রকট হয়, তাহাতে কোন চাঞ্চল্য থাকে না। কিন্তু তালের সাহায্য পাইলে, উহা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকে। সুতরাং সে হিসাবে উহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া যায়। শুদ্ধ রাগিণী আলাপে কলাবিদের যতদূর স্বাধীনতা থাকে, রাগিণী ছন্দোবদ্ধ হইলে উহা ততদূর থাকে না, ইহা সত্য। তবে এ সংযমের দ্বারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। বরং ছন্দ-অলঙ্কারের দ্বারা রাগিণীর রূপের আরও মাধুরী হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাগিণী ও ভিন্ন ভিন্ন তাল লইয়া প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌গণ বহুদিন হইতে বিভিন্ন আকারের গান ও গৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। এই সকল গান ও গতে যথেষ্ট রচনানৈপুণ্য থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না। অন্ততঃ যাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত রচনা-নৈপুণ্য থাকে, তাহারা 'survival of the fittest' এই বিধি অনুসারে টিকিয়া যায়। এই সকল গান কিংবা গৎ রাগ-রাগিণীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাদের রূপের একটা মোটামুটি ভাব প্রকাশ করে মাত্র। কলাবিৎ তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া নিজের কারিগরির দ্বারা রাগ-রাগিণীর সমগ্র মূর্ত্তি প্রকট করেন। গান কিংবা গৎটি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবে ব্যক্ত করিতে পারাই কলাবিদের নৈপুণ্য নহে। ইহাতে তাঁহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃত কলাবিদের সাধনার সহিত কল্পনারও বিশেষ প্রয়োজন। কবি বা কলাবিৎ পরের কোন ভাল জিনিষ পাইলে যে গ্রহণ করেন না, তাহা নহে। তবে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর নিজের কল্পনা খাটাইয়া নূতন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করাই কবি বা কলাবিদের কৃতিত্ব। অনেক সময় কবি হয় ত একটা পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা করেন। সেখানে ঐ উপাখ্যান শুদ্ধ একটা ভিত্তি মাত্র। কবি কল্পনার সাহায্যে উহার উপর কারিগরি করিয়া, যাহা রচনা করেন, তাহাই কাব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাগিণীর সহিত ছন্দের মিলন হইতেই গানের উৎপত্তি। এই গানের দ্বারা যে রসোদ্দীপনা হয়, সেটা রাগিণী ও ছন্দের গুণে। উহাতে যদি নিরর্থক ধ্বনির পরিবর্ত্তে অর্থব্যঞ্জক বাক্যের প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, তবে বাক্যের অর্থ ঐ রসের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। অর্থ যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা রসোদ্দীপনার সাহায্য না হইয়া বরং উহার ব্যাঘাত হইবে। পিলু রাগিণী করুণরসাত্মক ইহা পূর্ব্বে উক্ত

হইয়াছে। এখন পিলু-রাগিণীর কোন গানে যদি করুণ-রসাত্মক বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইতে রসোদ্দীপনার সাহায্য হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি বীর-রসাত্মক বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, এই বীররস ও করুণ-রসের মিশ্রণে একটা খেচরান্ন প্রস্তত হইবে, তাহা বীররসও নহে, করুণ-রসও নহে।

সঙ্গীতে রাগিণী ও ছন্দই মুখ্য, বাক্যের অর্থ গৌণ—রাগিণী ও ছন্দের রসোদ্দীপনার সহায় মাত্র। একখানি চিত্রের নিম্নে সেই চিত্রের ভাবব্যঞ্জক একটি কবিতা লিখিয়া দিলে, যেরূপ হয়, ইহাও সেইরূপ। সুতরাং, যাঁহারা গানের অর্থের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী, সেরূপ শ্রোতার প্রকৃত সঙ্গীতের রসগ্রহণ হয় না। রাগিণী ও ছন্দের দ্বারা রসোদ্দীপনাতেই সঙ্গীতের সার্থকতা। অর্থব্যঞ্জক বাক্যের দ্বারা তাহার সাহায্য হয় হউক, কিন্তু তাহাকে উচ্চে স্থান দেওয়া চলিবে না। যেখানে বাক্যের অর্থই প্রধান, সুর ও ছন্দ গৌণ, সেখানে উহা সঙ্গীত নহে, উহা কাব্য। সঙ্গীত ও কাব্য উভয়েই সমান স্থান অধিকার করিয়া আছে, এরূপ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উহা আমাদের বঙ্গদেশীয় কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনে বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর লালিত্যও যেরূপ, সঙ্গীতের মধুরত্বও সেইরূপ; কাব্য ও সঙ্গীতের এরূপ মধুর সম্মিলন আর কোথায়ও নাই।

ললিত-কলা-স্বরূপে হিন্দু-সঙ্গীতের বিশেষত্ব কি, তাহা এক প্রকার বলিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হিন্দু সঙ্গীতে পূর্ণভাবে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে হইলে, এক দিকে যেমন স্বেচ্ছাচার বর্জ্জনীয়, অপরদিকে তেমনই সংযত অথচ স্বাধীন কল্পনারও প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা কলাবিৎ নামধেয়, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বড় এভাবে হিন্দু সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে দেখা যায় না। সুতরাং কলাবিৎ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা পূর্ণ-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না।

এই খানে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, "তবে অনেক সময় সাধারণ শ্রোতার পক্ষে কলাবিদের সঙ্গীত-শ্রবণ প্রাণান্তকর হয় কেন?"

উত্তরে দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, সূক্ষ্ম ও উচ্চ-অঙ্গের সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপভোগ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। শ্রোতা হয় ত তত টুকু কষ্ট স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি সম্পূর্ণ রসগ্রাহী হইবার দাবী রাখেন। কাজেই অনেক স্থলে তাঁহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। কাব্যরসই হউক, আর ললিতকলার রসই হউক, যেখানে অরসিকে রসের নিবেদন হয়, সেখানে উভয় পক্ষেরই অদৃষ্টে বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অনেক সময় কলাবিৎ সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া সুর ও তাল লইয়া কুস্তী আরম্ভ করেন, এবং কুস্তীর নানা রকম প্যাঁচ দেখাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস পান। কতিপয় শ্রোতা হয় ত সেই বাহাদুরী দেখিয়া অদ্ভুত-রসের উপভোগে সমর্থ হন। কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতারই তাদৃশ শুভাদৃষ্ট হয় না। কাজেই সে সকল শ্রোতা কলাবিদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন। এক্ষেত্রে শ্রোতার কোন দোষ নাই। শুধু সুর ও ছন্দ লইয়া কুস্তী করা সঙ্গীত নহে। যে কাব্যে শুধু বাক্যের ছটা ও অলঙ্কারের ঘটা থাকে, তাহা কাব্য নহে। কাব্য ও ললিতকলার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। তাহা যদি না হয়, তবে উহাদের সার্থকতা থাকে না। কবি বা কলাবিৎ স্বয়ং রসে ভিজিলে তবে অন্যকে রসে ভিজাইতে সমর্থ হইবেন। যে কলাবিৎ কেবল নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহার নিজে রস-গ্রহণের অবসর কোথায়?

এইবার একটি কথা বলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথাটা এই। আজি কালি বৈদেশিক রুচির সংস্পর্শে আমাদের এরূপ রুচিবিকার ঘটিয়াছে যে, দেশীয় জিনিষের নাম শুনিলেই আমরা নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকি, যেন উহার মধ্যে কিছুই পদার্থ থাকিতে পারে না। যদি দেশীয় জিনিষকে বৈদেশিক ছাঁচে ঢালিয়া কতকটা বিকৃত করিয়া দেওয়া যায়, তবেই উহা কিয়ৎ পরিমাণে রুচিকর হয়। ললিতকলা সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ রুচিবিকার ঘটিয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এ দেশে 'যাত্রা' বলিয়া একটা জিনিষ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। জিনিষটা যে আমাদের খাঁটি স্বদেশী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে না হউক, অন্ততঃ অশিক্ষিত-সমাজের মধ্যে যে, আনন্দের ভিতর দিয়া উন্নত চিত্ত-বৃত্তির উন্মেষে সহায়তা

করিয়া আসিতেছে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈদেশিক মার্জ্জিত রুচির প্রভাবে উহা শিক্ষিত-সমাজে অসভ্য বোধে ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং সুসভ্য নাট্যশালা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। নাট্যশালার প্রবর্ত্তনে সমাজের উপকার হইয়াছে, কি অপকার হইয়াছে, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। তবে এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য যে, বঙ্গীয় নাট্যশালারূপ গয়াধামে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতকলার যথারীতি নিত্য পিণ্ডদান হইতেছে এবং আশা করা যায়, কালে উহা একেবারে উদ্ধার-লাভ করিবে।

আমাদের দেশীয় সঙ্গীত-কলার প্রতি শিক্ষিত সমাজের ঈদৃশী অনাস্থার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে না বিলাতী না দেশী, একটা বিস্তৃত কিমাকার সঙ্গীতের উদ্ভব হইতেছে। বাঙ্গালীর সন্তান, বাঙ্গালীর ভাষায়, বাঙ্গালীর ভাবে, গান রচনা করিলেন, কিন্তু গায়িবার সময় তাহাতে বৈদেশিক ধরণে সুর সংযোজনা করা হইল। দীর্ঘশিখা-সংযুক্ত মুণ্ডিত-মস্তক ভট্টাচার্য্য, কোট-পেণ্টুলন-কলার-নেক্‌টাই পরিধান করিলে তাঁহার যেরূপ শোভা হয়, এই প্রকার গানেরও ঠিক সেইরূপই শোভা হয়। যিনি উন্নতিশীল তিনি আমার প্রতি ভ্রুকুটি করিয়া বলিবেন, "বিদেশীয়' যাহা ভাল, তাহা লইবার বাধা কি?" উত্তরে আমি বলি যে, আমাদের নিজের ঘরে পরমান্ন থাকিতে, পরের দ্বারে কদন্ন ভিক্ষা করিতে যাইব কেন? আমাদের যাহা আছে, তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা না জানিয়া বা জানিবার চেষ্টা না করিয়াই আমরা বিদেশীয় অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, ইহা আমাদের একটা প্রকৃতিগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের জাতীয়-জীবনের সংস্কার করিতে হইলে, এই দোষের মূলচ্ছেদ অগ্রে কর্ত্তব্য। যে জাতি আপনাদের গৌরবের জিনিষের মর্য্যাদা বুঝে না, সে জাতি কখনও পরের অনুকরণ করিয়া, আপনাকে বড় করিয়া তুলিতে পারে না। পরের লইয়া বড় হইব, এই আশার মরীচিকা যদি আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, তাহা হইলে আমাদের জাতীয়-জীবনের উন্নতি চিরদিন সুদূর-পরাহত থাকিবে।

গৌরাঙ্গী

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

নিশান্তে নিথর নীল নির্ম্মল গগনে,
তুমি কি প্রভাত তারা গৌরাঙ্গী সুন্দরি?
অরুণ-অলক্ত-রাগ রঞ্জিত বদনে,
হাস কি বিমল হাসি দিব্যকান্তি ধরি!
নদীর হিল্লোলসম বিলোল চাহনি;
ঝলিছে হীরক-দ্যুতি রূপের কিরণে!
কনক রুচির অঙ্গে পরাগ যেমনি,
তেমতি চম্পক-কান্তি এ মর্ত্ত্য ভুবনে।
তুমি বসন্তের উষা—শরতের শশী,
প্রাবৃটের নির্ঝরিণী—নিদাঘের ফুল;
মুগ্ধ মনোমধুকর মুখপদ্মে বসি,
কি স্বর্গ-সৌরভে করে হৃদয় আকুল!
কি প্রেম-সৌন্দর্য্য ওই বক্ষে বহে যায়,
হে গৌরাঙ্গি! হেমজ্যোতিঃ ঝলে কি প্রভায়।

শ্যামাঙ্গী

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

মানিনী সন্ধ্যার সম চাহনি নয়ানে
মরি কি মধুর তুমি শ্যামাঙ্গী সুন্দরি!
কোমল করুণ হাসি তরুণ বয়ানে,
লাবণ্য লতিকাসম আছে চিত্ত ভরি!
সলাজ মাধুরী চির জড়িত তোমায়,
অঙ্গরাগে কমরুচি নব অনুরাগে;
শ্যামায়িত প্রীতিস্নেহ প্রেম মমতায়,
ধরেছ শ্যামল বুকে আদরে সোহাগে!
তুমি কোন্ শান্ত রশ্মি এ মর্ত্ত-নয়নে,
সন্ধ্যায় প্রদীপ সম দেবতা দেউলে;
অলক্ষ্যে সৌরভরাশি লয়ে ও জীবনে,
জুড়াও তৃষিত-আঁখি স্নিগ্ধরূপ-ফুলে।
কি প্রেম সুধীরে ওই বক্ষে উথলায়,
হে শ্যামাঙ্গি, কি মোহিনী তুমি এ ধরায়!

পরগণাতি সন

[শ্রীআনন্দনাথ রায়]

প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমাদের ঘরের প্রাচীন দলিলাদি অনুসন্ধান উপলক্ষে একখানা বাটওয়ারা-পত্র আমার হস্তগত হয়; কিন্তু উহাতে যে সনটির উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান পঞ্জিকার উল্লিখিত সনগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উহার একটিরও সহিত এই সনের সামঞ্জস্য-সাধন হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সনের অনুসন্ধান করিয়াও কোনও কূল-কিনারা করিতে না পারিয়া, আর ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই।

ঘটনাক্রমে উহার প্রায় দশ বৎসর পরে আমাদের অপর অংশীর কতকগুলি প্রাচীন দলিল আমার হস্তগত হয়; তাহাতে দেখিতে পাইলাম, পরগণাতি সন বলিয়া একটি সনের উল্লেখ উহাতে রহিয়াছে, এবং উহার সহিত বাঙ্গালা সন-তারিখও নির্দ্দিষ্ট আছে। তখন আমার পূর্ব্ব-হস্তগত সেই বহুদিনের দলিলের কথা স্মরণ হইল, বুঝিলাম সেটিও এই পরগণাতি সন হইবে। পরে হিসাব করিয়া, যে ফললাভ করিয়াছি, তাহাতে আর আমার অনুমানের প্রতি কোনও সন্দেহ থাকে নাই।

প্রথম বাটওয়ারার পত্রখানায় যে সন দেখিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল——৪৯৭ সন। জপ্সাবাসী গোপীরমণ সেন মহাশয় তাঁহার ছয় পুত্রকে নিজ ভদ্রাসন বাটী ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দলিল-খানা সেই বাটওয়ারা পত্র। মূল দলিল বহুদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আদালতে দাখিল হওয়ায় ইহার যে সহি-মোহরের নকল লওয়া হয়, তাহা আমাদের নিকট বর্ত্তমান আছে; এই হিসাবে ২১৩ বৎসর পূর্ব্বে উহা সম্পাদিত হয়। বিভক্ত হইবার পর উহা ছয় হাবেলী নামে বিখ্যাত হয়। বলা বাহুল্য, তদীয় উত্তর-পুরুষগণ এই ছয় হাবেলীকে বিবিধ হর্ম্ম্যে ও মন্দিরে বিভূষিত করিয়া, হাবেলী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানে উহা নদীগর্ভে।

পরের যে দলিলগুলির কথা বলিলাম, উহা উক্ত সেন-মহাশয়ের প্রপৌত্রদিগের সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার সহিত সন মিলাইয়া দেখিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছি। নিম্নে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইখানি দলিলের কথা বলা যাইতেছে; উহার একখানা পরগণাতি ৫৬৬—বাঙ্গালা ১১৭৫ সনের। গোপীরমণ সেন মহাশয়ের প্রপৌত্র সদাশিব সেন ও হরেকৃষ্ণ সেনের সম্পাদিত কবেলা পত্র। অপরখানা উক্ত সেন-মহাশয়ের অপর প্রপৌত্র জয়নারায়ণ সেন বরাবর রামকান্ত শর্ম্মার ভূমি-বিক্রয়-পত্র। সন পরগণাতি ৫৭৪—বাঙ্গালা ১১৮৩। এখন এই সনগুলিকে ইংরাজী সালে পরিণত করা যাউক।

বাঙ্গালা ১১৭৫ সনে পরগণাতি ৫৬৬ সন হইলে, বাঙ্গালা সনের ৬০৯ বৎসর পরে পরগণাতি সনের আরম্ভ হইয়াছে। এই হিসাবে বাঙ্গালা ১১৮৩ সনের সহিত পরগণাতি ৫৭৪ সনের সংযোগ থাকায় ঠিক ৬০৯ বৎসর পরে পরগণাতি সনের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই দুই দলিলের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ৪৯৭ পরগণাতির দলিলখানা ১১০৬ সনে সম্পাদিত হইয়াছিল। গোপীরমণ সেনের ৪৯৭ পরগণাতির দলিল-খানা সম্পাদনের ৬৯ বৎসর পর তৎপ্রপৌত্রদের একখানা ও ৭৭ বৎসর পর আর একখানা দলিল লিখিত হইয়াছিল। এই হিসাবে আরও দেখা যায় ১২০২ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পরগণাতি সন আরম্ভ হয়।

এই সনটির সহিত একটি ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। পরগণা শব্দটি সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্ব হইতেই সূচিত হইয়াছে। মহম্মদীয়গণের প্রথম বঙ্গবিজয়ের সহিত এই সনের যে ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে, তাহাও ভাবিবার কথা।

১৩১৪ সনের "ঐতিহাসিক চিত্রে" মহারাজ রাজবল্লভ নামীয় প্রবন্ধে আমি এই সনের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। তৎপর বাঙ্গালা ১৩১৬ সনে "বিক্রমপুরের ইতিহাস"-প্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহাশয় এই সন-যুক্ত একখানি দলিল তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন। উপরে যে দুইখানা দলিলের কথা বলা হইল, উল্লিখিত "বারভুঞা"র পরিশিষ্টে উহার একখানা সংযোজিত করা হইয়াছে।

দলিলের প্রতিলিপি
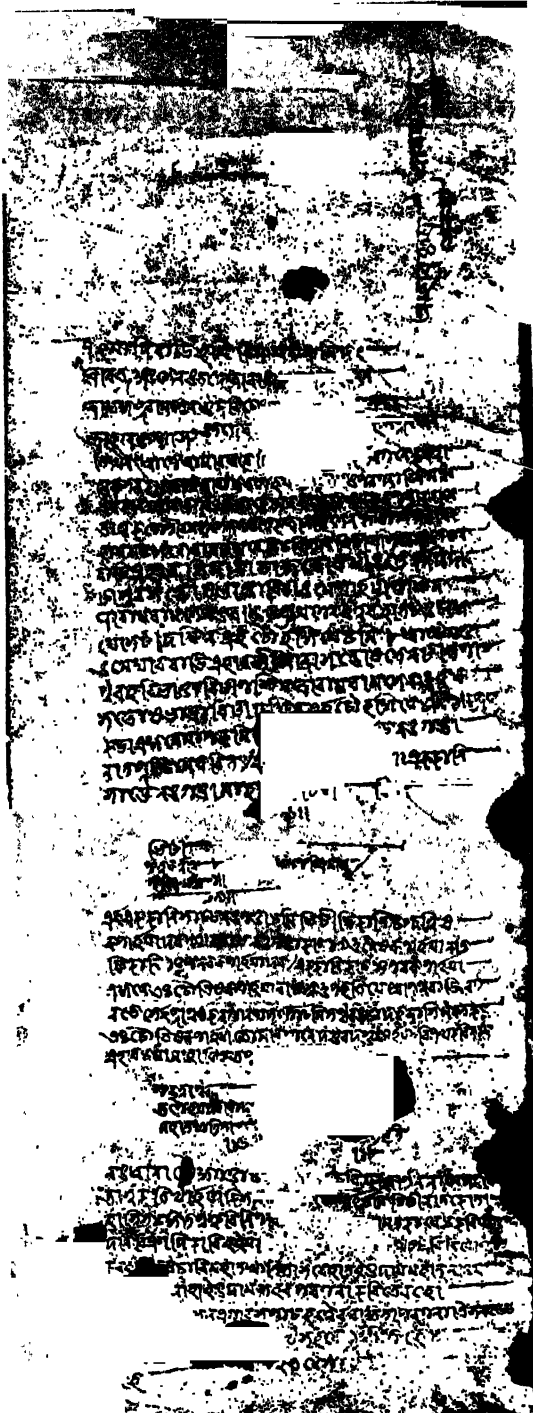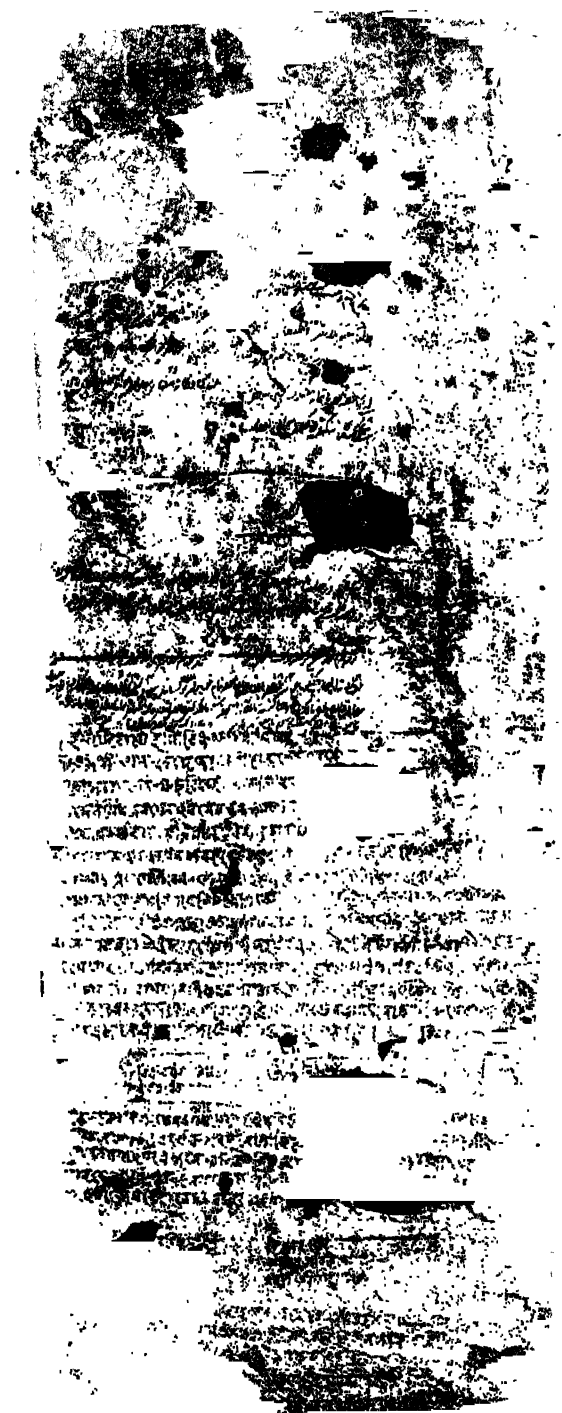
পরে অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ পরগণাতি-সন-সংযুক্ত দলিল আরও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথিতনামা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিপ্রাপ্ত স্বর্গীয় ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের খুল্লতাত শ্রীযুত চন্দ্রকুমার সেন মহাশয় তাঁহাদের গৃহের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে আমাকে এরূপ আরও দুই তিন খানা দলিল দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ডিঃ কালেক্টর শ্রীযুত রসিকলাল সেন মহাশয়ের মুখে অবগত হইয়াছি, সরকারী কার্য্যোপলক্ষে এই পরগণাতি-সন-যুক্ত কাগজপত্র তিনি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমার স্মরণ হয়, যেন কোন পত্রিকায় একজন লেখক দাসখতের সহিত একটা সনের উল্লেখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'উহা কোন্ সন্!' আমরা তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারি, 'উহা পরগণাতি সন্।' এক সময়ে এই সনের প্রচলন যে এ দেশে বিশেষ ভাবে ছিল, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

একখানা দলিলের প্রতিলিপি অন্যত্র সন্নিবেশিত হইল; তৎসহ প্রাচীন দলিল-সম্পাদনের একটু বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

পূর্ব্বে জমি-জমা বিক্রয় করিতে হইলে একই বিষয়ের জন্য দুইখানি বাঙ্গালা দলিল লিপিবদ্ধ করিতে হইত। উহার একখানার নাম হইত 'বিক্রয় পত্র', অপরখানার নাম 'কবজ'; বিক্রয়পত্রে বিশদভাবে এবং কবজে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইত। এতদ্ভিন্ন পারস্য-বাঙ্গালা-ভাষায়ও আর একখানা ঐরূপ দলিল লিপিবদ্ধ হইত। একই কাগজে একাংশ বাঙ্গালা ও অপর অংশ পারসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা এই প্রবন্ধের সহিত উহা প্রকাশ করিলাম। এই দলিলে কেবল সহরে ১০ জিল হেজ কথাটি স্পষ্ট বুঝা যায়। মুসলমানী সনটার কোন চিহ্ন নাই; দলিল কয়েকখানা এত জীর্ণ হইয়া ক্ষয় পাইয়াছে যে, উহা সম্যক্‌ভাবে উদ্ধৃত করিবার কোন উপায় নাই।

যে মোহরটি এতন্মধ্যে অঙ্কিত আছে, তাহার পাঠ এই রূপ, উহা পারস্য ভাষায় লিখিত।

"খাদি মে শরা, শরিফ কাজি মহম্মদ জরিফ। নায়েব মহম্মদ রেজা ১৪"।

এই চৌদ্দ অঙ্কটি যে কি, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। তবে মহম্মদ রেজা খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের নগরের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন, তৎসময়ে শরিফ কাজি মহম্মদ জরিফ নামে এই রাজকীয় মোহরটি ব্যবহৃত হইত। ১১৭৫ সনের দলিল—অতএব উহা যে ছয় হত্তর মন্বন্তরের পূর্ব্ব বৎসরের তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তেই শাসন ও কর আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। শরিফ কাজি মহম্মদ যে রেজা-খাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎবিষয়েও সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তৎকালেও দলিল রেজেষ্টারীর নিয়ম ছিল; কাজি দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইত।

উপসংহার-কালে বক্তব্য এই যে, সুধীগণ এই পরগণাতির প্রকৃত নিদান নির্ণয় করিয়া, বঙ্গীয় পাঠকগণের কৌতূহল অপনোদন করিয়া দিতে পারিলে, তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

পরিচয়

[শেখ ফজললকরিম]

পৃথিবী আমারে যত টানিবারে ছিল
বক্ষে তার লুকা'তে যতনে,
তত তুমি যেতেছিলে দূরে—বহুদূরে
ফেলি' মোরে একেলা বিজনে!
যেমনি হারানু আমি তার সেই স্নেহ
—রোষভরে দিল সে বিদায়,
অমনি ধরিলে বুকে স্নেহ-মমতায়
আঁখি মোর চিনিল তোমায়।

রহস্য

যত কাছে মনে হয়, তুমি তত দূরে
অগম্য অলক্ষ্য কোন্ মায়াময় পুরে।
যেথা অনুভূতি গিয়া আপনা হারায়
বৈচিত্র্য-রহস্যময় আলোক-ছায়ায়।
যদি যাও বহুদূর, অধীর হৃদয়
বর্ষে কত অভিশাপ—নিষ্ঠুর নির্দ্দয়।
আঁখি মুদি ভাবি যবে মনপ্রাণ দিয়া
তখন নিরখি—তুমি আমারে ব্যাপিয়া!

"Plain-living and high-thinking are no more"—

ইংরেজ-সাধারণ না বুঝিলেও—চিন্তাশীল, সুবোধ ইংরেজেরা বুঝিয়াছেন যে, এই ধন-পিপাসা, পরস্পর-বিরোধিতা,নীচ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, এবং এই ধনবত্তার সম্মাননা হেতু, তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ কি প্রকার শোচনীয় অধঃপতনের পথেই চলিয়াছে। আমরা ইংরেজের যেটি দোষ সেইটিই অনুকরণ করিতে মজবুত। সুতরাং যে ধন সম্পত্তি ইংরেজের চাকচিক্যময় সভ্যতার প্রধান অঙ্গ এবং যে ধন-সম্পত্তিতে বিবিধপ্রকার বিলাসের আয়োজন-প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া দেয়, তাহার সম্মান করিব না কেন? এবং এই ধনসম্পত্তি লাভ করিবার জন্য,—সদুপায় হউক আর অসদুপায় হউক, অবলম্বন করিব না কেন? যেটুকু বিদ্যা অর্থকরী, যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি বিলাস-সুখের সহায়তা করে, সেই টুকুইতো আমার প্রকৃতপক্ষে দরকার।—যে বিদ্যায় অর্থ আসিয়া উছলিয়া পড়ে না,—সুতরাং যাহাতে সম্মানও নাই—সেই শূন্যগর্ভ বিদ্যার চর্চ্চার প্রয়োজন নাই; এই একটা ভাব শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই ভিতর লক্ষিত হয়। বিশিষ্ট চিন্তাশীল, সাহিত্যসেবী সুলেখক ও সুপণ্ডিত ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় (মিষ্টার এন. ঘোষ) একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন (তখন আমরা বিদ্যার্থী, তাঁহার নিকট পড়াশুনা করি) যে, "উপাধিধারিগণের একটা ধারণা যে, তাঁহারা যখন এম.এ., বি.এ. বা বি.এল. তখন তাঁহারা বিলাস-বিভবের অধিকারী, এবং গাড়ীঘুড়ী তাঁহাদিগের প্রাপ্য অধিকার; এবং এই সকলই যেন তাঁহাদিগের চিত্তাদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষিত সাহিত্যসেবী, তাঁহাদিগের অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। দেখ, জার্ম্মানিতে যাঁহারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—প্রসিদ্ধ অধ্যাপক—যাঁহাদিগের কথায় চিন্তাশীল সহৃদয় সভ্যজগৎ মুগ্ধ, চালিত ও উদ্বুদ্ধ—তাঁহারা মাসিক দেড়শত দুইশত টাকাতেই পরিতুষ্ট।" জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ডাক্তার ওলডেন্‌বার্গ গত বৎসর বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। আজ কয়েক-মাস হইল শুনিলাম, তাঁহার আয় মাসিক দুইশত টাকার অধিক হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকের মাসিক আয় একশত হইতে দুইশত টাকা হইবে; কিন্তু তাঁহারা যে তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট, এবং পরিতুষ্ট চিত্তে একান্ত মনে বিদ্যাচর্চ্চায় নিরত, তাহা তো বোধ হয় না। সাহিত্যসেবায়—বিদ্যাচর্চ্চায় যে একটা মহৎ সুখ আছে,তা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারি না। যে সাহিত্যসেবার আনন্দে "অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু" আনিয়া দেয়, যে আনন্দ সমস্ত পার্থিব সুখকে মলিন-হীন করিয়া দেয়, সুকুমার সাহিত্যোন্মাদনা সম্বন্ধে জন্ মর্লি একদা বলিয়াছিলেন—"Literature gives you everything, provided you can get out of it"—সাহিত্যসেবা আমাদিগের কোথায়? আমরা কথায় কথায় হঠাৎ সাহিত্য-সম্রাট্, পদ্য-সম্রাট্, গদ্য-সম্রাট্, ইতিহাস-সম্রাট্, প্রত্নতত্ত্ব সম্রাট্ হইয়া পড়ি, এবং সেই আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি। যেভাবে, শিক্ষাপরীক্ষা চলিতেছে, শিক্ষায় যে প্রকার ধর্ম্মভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছে, যে প্রকার সাধু পণ্ডিত-সহৃদয় সাহিত্যসেবী শিক্ষকের অভাব, তাহাতে বিদ্যার আদর বাড়িবে না, বরং ধনের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইবে; ছাত্রবর্গ ক্রমেই হৃদয়শূন্য, স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইবে।

আজকাল আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বের ও বিজ্ঞানের কথাবার্ত্তা বড়ই সজোরে চলিয়াছে। সুকুমার সাহিত্য যেন 'কোণঠ্যাসা' হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত সুকুমার সাহিত্যের চর্চ্চা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া পড়িতেছে। জন্ মর্লি তাঁহার উৎকৃষ্ট "কম্‌প্রোমাইস" (COMPROMISE) পুস্তকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, ইউরোপ খণ্ডে, প্রধানতঃ বিলাস ও স্বার্থপরতার অনুকূল হইতেছে এবং এই জন্যই, যে সুকুমার-সাহিত্যে সহৃদয়তা (Humanities) বৃদ্ধি পায়, স্বার্থপরতা-নিষ্ঠুরতা চলিয়া যায়, যাহার প্রভাবে ধনবত্তার পার্থক্য মন্দীভূত হয়, এবং ধনসম্পত্তির ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বণ্টন ও বিভাগ হয়, সেই সৎসাহিত্য—সেই সুকুমার সাহিত্য-প্রচারকল্পে সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা রস্‌কিন্, সুযুক্তি-পরম্পরায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ইউরোপে বিজ্ঞান অধিকাংশস্থলে বিলাস যুদ্ধোপকরণ ও কলকারখানা সৃষ্টি করিতেছে এবং ধন সম্পত্তিকে নিতান্ত ক্ষুদ্রগণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।—"The distress of any population means that they need food, house-room clothes and fuel. You can, never, therefore be

wrong, in employing any labourer to produce food, house-room, clothes or fuel ; but you are generally wrong if you employ him to produce works of art or luxuries, because modern art is mostly on a false basis and modern luxury is criminally great. * * * For, a great part of the earnest and ingenious industry of the world is spent in producing munitions of war, that is to say, the materials not of festive but of consuming fire." (Ruskin's MUNERA PULVERIS).—তাই দেখে কি,—দেশের ঋষিতুল্য-নায়ক-পরিচালিত হইয়া ও বঙ্গের বিজ্ঞান-রসায়ন-কার্য্যাগার তাহার কতকটা বলবুদ্ধিভরসা,—সম্ভোগ-লালসার সুবাস-সুগন্ধি প্রস্তুতীকরণে নিযুক্ত এবং ভোগ-বহ্নির বৃদ্ধি-কল্পে—অন্ততঃ অংশতঃ—ইন্ধনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই বিলাসিতা ও ধনাকাঙ্ক্ষার ফলে, আমাদিগের ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ, এবং সাহিত্যও দুর্দ্দশাপন্ন। সেদিন লর্ড ব্রাইস্ সাহিত্যের গতি ও পরিণতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে বিলাসের উদ্ভব হইয়াছে ; বিলাসের পিপাসা মিটাইবার উদ্দেশ্যে সকলেই পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। মানসিক ভাবটা এতদূর হেয়, হীন ও নীচ হইলে,—এতটা সুখলিপ্সু হইলে,—সৎ-সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হয় না।"

যেদেশে টাকাকড়িই সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়, যে দেশের নরনারী টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে ব্যস্ত, এবং লাভা-লাভের খতিয়ান করে, সেদেশের সাহিত্যে সত্য, ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, শুদ্ধি, আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা, বীরত্ব, তত্ত্বতথ্য,—ফুটাইবার বা ফলাইবার চেষ্টা বিফল ;—সে দেশে সৎসাহিত্য-সৃষ্টি-চেষ্টা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মাণ্যস্থান হিসাবে ধনবত্তার স্থান এত নীচে কেন?—যখনই দেখিবে একজন সহসা বিশিষ্ট ধনশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই বুঝিবে, তাহার পশ্চাতে—মূলে আছে—ঠকামি, নীচতা, শঠতা, অন্যায়পরতা হৃদয়হীনতা, কুসীদপিশাচিকতা, বা উৎকোচ-গ্রাহিতা!—অন্যের গ্রাস কাড়িয়া না লইলে, অনেকস্থলেই সফলতা লাভ হয় না ; অন্যের অভাব-দুঃখ-যন্ত্রণা ভাবিতে গেলে, সমাজের এখন যে প্রকার মতিগতি, তাহাতে নিজের আর্থিক ক্ষতি হইয়া পড়ে।—ধর্ম্মপথে থাকিয়া মোটাভাতকাপড় মিলিতে পারে,—এই পর্য্যন্ত!—

"Success, while society is guided by competition, *signifies always so much victory over your neighbour*, as to obtain the direction of his work. *This is the real source of all great riches. No man becomes largely rich by his personal toil.* The work of his own hands, wisely directed, will, indeed always, maintain himself and his family and make fitting, provision for his age."—(Ruskin's MUNERA PULVERIS).

"Honesty is the best policy."—অর্থাৎ "সৎপথ শ্রেষ্ঠ নীতি"—এই একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে সত্য বটে ; কিন্তু এই প্রবাদের মোহে বা ভরসায়, লোকে পার্থিব বিষয়ের সফলতা পক্ষে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না।—কোন সমাজই কেবলমাত্র সৎলোকের সমষ্টি নয় ;—সমাজে অসৎলোকেরই বাহুল্য, এবং অনেক স্থলে প্রাবল্যও বটে। সুতরাং সৎলোক, ভাল-মানুষ, প্রতিযোগী জীবন সংগ্রামে হটিয়া যায় এবং ভগ্ন-মনোরথ হইয়া দীনভাবে দিনযাপন করে। এই উপরোক্ত অভিমতি প্রকাশে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছি। যে মহাপুরুষ, যাহা লিখিয়াছেন, যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই নিজের জীবনের কার্য্যপরম্পরায়, দেখাইয়া গিয়াছেন ;—যে মহাজন, উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ পিতার অর্জ্জিত ধনরাশি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা 'চ্যারিটী এণ্ড্ এডুকেশন্যাল এন্ডাউমেণ্টে' বিলাইয়া দিয়া, রাস্তায় কুলী-মজুরের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যিনি, স্বোপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব, দরিদ্রের দুঃখনিবারণ ও উন্নতিকল্পে চিরজীবন ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই মহামতি রস্কিন্, স্বীয় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাফলে, উপরোক্ত উক্তি সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

"I have also to note the material law expressed in the proverb 'Honesty is the best

policy'. That proverb is wholly inapplicable to matters of private interest. It is *not* true that honesty, as far as material gain is concerned, profits individuals. A clever and cruel knave, in a mixed society, must always be richer than an honest person."—(Ruskin's MUNERA PULVERIS.)—

সুতরাং দেখিতেছি—যে সমাজে ধনবত্তার সম্মাননা, সে সমাজে বিলাস-বাহুল্য, স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা বর্ত্তমান ; এবং সে সমাজের পতনও অবশ্যম্ভাবী। সমাজে ধনি-সম্প্রদায় চিরকালই থাকিবে ; কিন্তু সামাজিক গঠন ও ব্যবস্থায়, সামাজিক আদর্শে, সামাজিক সমাদরে, বিদ্যাবত্তার আসন সর্ব্বোচ্চ হওয়াই বিধেয়। আমাদের বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সেই শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী, সেই স্বার্থত্যাগী—সেই 'সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ'—সেই দ্বিজরক্তে পূতপবিত্র ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ,—যাঁহারা শিক্ষিত সংখ্যার অনুপাতে ও বিদ্যাবত্তায় অন্যান্য বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর,—তাঁহাদিগের ভিতর শিক্ষা—বিদ্যানুরাগ, বিষয়বিতৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তশুদ্ধি, পরদুঃখ-কাতরতাকে, সজীব ও সতেজ না করিয়া, বিদ্যাবিরাগ, বিষয়-স্পৃহা, ইন্দ্রিয়লিপ্সা, অসত্য ও অধর্ম্মের আপাত-সুমোহনমূর্ত্তি, প্রকট ও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

সুখ ও আনন্দ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য ; সেই সুখ-পন্থা বাছিয়া লওয়াই কঠিন। মহাজনেরা—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কি বৌদ্ধবাদী—অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দর্শনের ফলে, বলিয়া দিতেছেন যে, সেই সুখ, যাহার জন্য মানুষ এত ব্যগ্র ও উগ্র, সেই সুখ অধিগম্য—ধনে নহে, প্রাচুর্য্যে নহে, বিলাসের ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিবিধ আয়োজনে নহে—সেই সুখ ও আনন্দ লাভ করা যায়, বিদ্যা-চর্চ্চায়, ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলনে। সে আনন্দ লাভ করা যায়, সম্মিলনে ও আলিঙ্গনে।—সমাজ উন্নত ও সুদৃঢ় হয়, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে,—অন্তঃসম্মিলনে। কাড়াকাড়িতে নহে, বিচ্ছেদে নহে, বিচ্ছিন্নতায় নহে। তজ্জন্যই ইংরেজ ঋষি তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক, 'সার্টাস্ রিসার্টসে' বলিয়াছেন,—"Misery commences only when we isolate ourselves from others."—এই ঋষিবাক্য, নব্য-ইউরোপ তেমন করিয়া শুনে নাই ; তাই আজ দেখিতেছি, তথাকথিত সাম্যবাদী সভ্য ইউরোপে ভীষণ-সংগ্রাম—সমগ্র জগদ্ব্যাপী ভীতি ও আতঙ্ক !

ভারত-নারী

[শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, B. L.]

কে বলে ভারত-নারী অবরোধ-কারাগারে
দলিত জীবন যাপে পুরুষ-পীড়ন-ভারে !
কে বলে ল'য়েছে কাড়ি' স্বার্থ-অন্ধ ভীত-প্রাণ
নর তার স্বাধীনতা প্রফুল্লতা যশ মান !
শিক্ষা-কলুষিত আঁখি! এখনো দেখরে চেয়ে,
কোন্ দেশে রমণীর আছে পূজা হেথা চেয়ে।
কোথা অজানিতা বামা মাতৃ-পূজা পেয়ে থাকে ?
কোথায় পুরুষ তারে জননী বলিয়া ডাকে ?
সপ্তবর্ণে সংহৃচিত বিরাট রজত-কায়,
ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু—দেব, যেই শক্তি প্রেরণায়,
ভাঙ্গিতে গড়িতে বিশ্ব, অনাদি অনন্তকাল,
লইতেছে বক্ষ পাতি' প্রকৃতি নর্ত্তন তাল।
কোন্ দেশে নারী পদে দেয় নর পুষ্পাঞ্জলি ?
কোথা হেন অধীশ্বরী গৃহ-রাজ্য সিংহাসনে,
কমলারূপিণী নারী আনন্দ-সস্মিতাননে ?
পতি-পুত্র-প্রজা সুখে স্বেচ্ছায় আপন সুখ
দিয়া বলি, সুখে দুঃখে হেন প্রীতিভরা মুখ !
মূর্ত্তিমতী স্নেহ-দেবী, প্রেমের স্বরূপ-রূপা।
স্নেহের নির্ঝর, শান্তি, কোমলতা অনুরূপা।
হেন দেবী কোথা মিলে ? আবার আবার কোথা ?
ভারতের অন্তঃপুরে নহে অন্য যথা তথা।
সে পবিত্র প্রতিমায় কে ধিক, জীবন ধ'রে,
দিবে যেতে পূতিময় জীবন-সংগ্রাম-নীরে ॥
কে দিবে স্পর্শিতে তায় ঘৃণ্য কলুষিত করে ?

বড় হওয়া

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ নিয়োগী, B.A কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

ভাই-বোন্

[শ্রীসুধীন্দ্রনাথ গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

কলিকাতায় ঝড়—ভাগীরথী-দৃশ্য—২৮এ এপ্রেল, ১৯১৪

সম্রাটের জন্মদিনে (৩রা জুন, ১৯১৪) কলিকাতায় সৈন্য-প্রদর্শন

"রয়াল্‌ ফিউজিলিয়ার্স্‌" দল
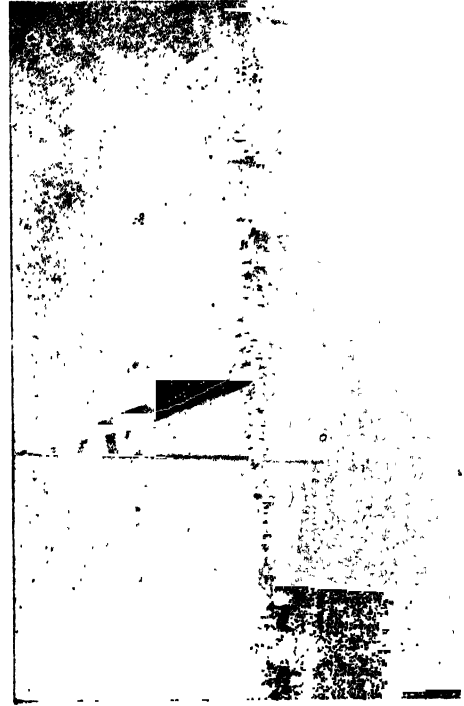
দশহরায় (২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) গঙ্গাস্নান

কলিকাতা—গঙ্গার-ঘাটের দৃশ্য
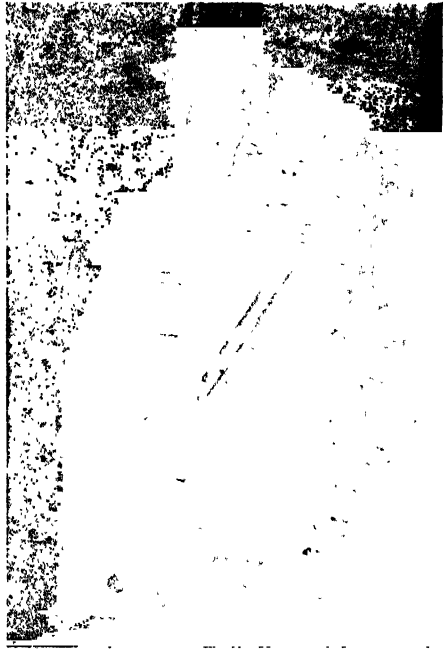
কলিকাতা—গঙ্গার-ঘাটের দৃশ্য

[শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

সতীন ও সৎমা

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, M.A.]

তৃতীয় প্রবন্ধ

(ভাদ্রসংখ্যার অনুবৃত্তি)

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে)

'দুর্গেশনন্দিনী'

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রারম্ভে বিমলা, নায়িকা তিলোত্তমার সহচরী ও পরিচারিকারূপে পরিচিতা। তিনি 'বীরেন্দ্রের কন্যার লালন-পালন রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন।' [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] 'মৃণালিনী'তে মণিমালিনী ও গিরিজায়ার ন্যায় বা 'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারীর ন্যায়, তিনি নায়িকার ব্যথার ব্যথী, এবং প্রয়োজন হইলে প্রেম-দৌত্যেও প্রবৃত্ত। ইহা নাটক-আখ্যায়িকায় সখীজনের কার্য্যের অনুরূপ (১)—কিন্তু বাস্তবিক উভয়ের বিমাতা ও সপত্নীকন্যা-সম্পর্ক। বিমাতা হইয়া সখীর মত ব্যবহার করা একটু কেমন কেমন ঠেকে বটে, কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের সহিত সম্বন্ধ গোপন করিবার জন্য বাধা হইয়া বিমলাকে এই বিসদৃশ ভাব দেখাইতে হইয়াছে। (২) প্রকৃত সম্পর্ক প্রথম খণ্ডে গোপন থাকাতে তিলোত্তমার ও পাঠকের মনে এই বিসদৃশ অবস্থার (anomalous position) কথা উদয় হয় না, গ্রন্থকারের এটুকু কলাকৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে।

শৈলেশ্বর-মন্দিরে যখন চারিচক্ষুঃ 'সংমিলিত হইল', তখন বিমলা তিলোত্তমাকে সখীর মত কৌতুক করিয়া বলিলেন বটে 'কি লো! শিবসাক্ষাৎ স্বয়ংবরা হবি না কি?' কিন্তু তিনি পরক্ষণেই, তিলোত্তমা 'অপরিচিত যুবা পুরুষে' অনুরাগিণী হইলে 'ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে' এই আশঙ্কায় সে 'পথ রুদ্ধ' করার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি জগৎসিংহের নিকট তিলোত্তমার পরিচয় প্রদানে যে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও সুবিবেচিত কার্য্য। [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] উভয় কার্য্যই হিতৈষিণী মাতার উপযুক্ত। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন:—'দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার

---

(১) স্পেনদেশের সমাজ ও সামাজিক নাটক আখ্যায়িকায় তরুণী কুমারী কন্যাদিগের রীতিনীতির উপর খরদৃষ্টি রাখিবার জন্য একজন বর্ষীয়সী নারী রক্ষয়িত্রী-স্বরূপ (duenna) নিযুক্ত থাকেন। তরুণী যাহাতে মাতাপিতার অজ্ঞাতে প্রণয়লীলার অভিনয় না করেন, তদ্‌বিষয়ে এই শ্রেণীর রক্ষয়িত্রীকে সাবধান থাকিতে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিই প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করেন। ইংরাজী সাহিত্যে শেরিডান-প্রণীত 'Duenna' নাটক ইহারই অনুকরণে লিখিত। সংস্কৃত সাহিত্যে 'মালতী-মাধবে' জননীস্বরূপা কামন্দকীর ঘটকালী এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। ইংরাজসমাজে তথা ইংরাজী নভেলে মাতা, কন্যার পূর্ব্বরাগ ও বিবাহের সহায়তা করেন (match-making mamma)। আমাদের সমাজে পূর্ব্বরাগের অবকাশ নাই, কিন্তু যাহাতে নববিবাহিতা কন্যার প্রতি জামাতা অনুরক্ত হয়েন সে বিষয়ে মাতা অনেক সময়ে চেষ্টাযত্ন করেন—তবে অবশ্য পরোক্ষভাবে। 'মৃণালিনী'তে মৃণালিনীর গোপনবিবাহে 'অরুন্ধতী মাসী'র সহায়তাও বিমলা-তিলোত্তমা-প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। জুলিয়েটের ধাই মা ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব।

(২) পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে বিমলার পত্রে জানিতে পারা যায় যে, বীরেন্দ্রসিংহ মানসিংহ কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া, বিমলার 'যথাশাস্ত্র পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন' কিন্তু 'বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবৎমানে কখন উল্লেখ না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়', এই সর্ত্তে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমার মাতা তখন পরলোক-গতা। (ধরিতে গেলে ইঁহারা বোন-সতীন ছিলেন।) তিলোত্তমার মাতার পরিণয় ও পরলোক-প্রাপ্তির কথা প্রথম খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে।

পরিচয় মন্দিরমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন।' [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] জগৎসিংহের প্রতি তিলোত্তমার প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার লক্ষ্য করিয়া বিমলার মনে সাতিশয় উৎকণ্ঠার উদ্ভব হইয়াছিল। 'তিলোত্তমার কি উপায় হইবে?' 'আমি আজ চৌদ্দদিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি' ইত্যাদি বাক্য তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। তিনি পূর্ব্বরাগের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া স্বীয় পিতা অভিরামস্বামীকে সকল কথা জানাইলেন এবং (রোমিওজুলিয়েটের ন্যায়) উভয় বংশের শত্রুতা-বশতঃ বিবাহে প্রবল বাধার বিষয় অবগত থাকিয়াও যাহাতে এই বিবাহ ঘটে ও তিলোত্তমার সুখশান্তি জন্মের মত বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] ইহা মাতৃহৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, সখীজনের মিনতি নহে। প্রবল প্রণয়রোধ কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার, বিমলা নিজে যুবতীজীবনে তদ্বিষয়ে ভুক্তভোগী ছিলেন। তথাপি তিনি হিতৈষিণী মাতার ন্যায় তিলোত্তমাকে অভিরামস্বামীর অভিপ্রায় বুঝাইয়া এই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবারও চেষ্টা করিলেন। [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রণয়ের প্রকৃতি জানিয়া এবং নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষাহেতু জগৎসিংহের নিকট প্রেমদৌত্যে প্রস্থান করিলেন। 'গমনকালে বিমলা একহস্ত তিলোত্তমার অংসদেশে ন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে তাঁহার চিবুক গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সরল প্রেম-পবিত্র মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন; তিলোত্তমা দেখিতে পাইলেন, যখন বিমলা চলিয়া যান, তখন তাঁহার চক্ষে একবিন্দু বারি রহিয়াছে।' [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।] এই দৃশ্যটি গভীর মাতৃস্নেহেরই পরিচায়ক।

তাহার পর, [১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ] বিমলা এই প্রণয়সঞ্চারে নায়ক-নায়িকা উভয়েরই অশান্তি ও অমঙ্গল ঘটিবে বুঝিয়া জগৎসিংহকে তিলোত্তমার আশা ছাড়িতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, ('উভয়ের মঙ্গল হেতু বলিতেছি, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন') এবং বিবাহে বাধার কারণ বুঝাইবার জন্য যুবরাজকে তিলোত্তমার বংশ-পরিচয় দিলেন। কিন্তু জগৎসিংহের কাতরতা দেখিয়া ('আমি কেবল একবারমাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী') তাঁহাকে তিলোত্তমার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সঙ্গে আনিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা-বিচারের এ স্থল নহে, (৩) কেবল তাঁহার হৃদয়সঞ্চিত মাতৃস্নেহের পরিচয় দিতেছি। মাতৃস্নেহের আতিশয্যবশতঃই তিনি এই অবিবেচনার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।(৪) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবল প্রণয় যে কিরূপ দুর্দ্দমনীয় তদ্বিষয়ে বিমলা ভুক্তভোগী ছিলেন। সুতরাং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রতি তাঁহার এক্ষেত্রে অনুকূলতা স্বাভাবিক।

তাহার পর, [১ম খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ] প্রেমিকপ্রেমিকাকে দুর্গমধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দিয়া 'বিমলার মুখ অতি হর্ষপ্রফুল্ল।' (৫) যখন দুর্গমধ্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখন 'বিমলা অকস্মাৎ তিলোত্তমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কৌতূহল প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে স্বভাব! এ সময়েও বিমলার কৌতূহল।' [১ম খণ্ড ২০শ পরিচ্ছেদ।] আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, বিমলা খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলেও, এই 'আড়িপাতা' টুকু ঠিক বাঙ্গালীর মেয়েরই উপযুক্ত। তবে এইরূপ সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া ও 'আড়িপাতা' বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহিত কন্যা-জামাতার বেলায়ই ঘটিতে পারে, এরূপ প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনমিলনে নহে। সে যাহাই হউক, মাতৃস্নেহ বশতঃই বিমলা এই ঘোর বিপত্তিকালেও উল্লিখিত দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ।

প্রহরীর খর্পর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিমলা তিলোত্তমার রক্ষার জন্য জগৎসিংহকে বারংবার কাতর প্রার্থনা করিলেন

(৩) ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় উপসংহার-রচনাচ্ছলে বিমলার কার্য্যের উপর অভিরামস্বামীর মুখ দিয়া কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) ইহার ফলে যে অত্যাহিত ঘটিল তাহাই বিমলার অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রকৃত শাস্তি।

(৫) শেক্‌স্‌পীয়রের সিম্বেলিন (Cymbeline) নাটকে প্রথম দৃশ্যে বিমাতা সপত্নীকন্যা ও তাহার প্রণয়ীর (প্রকৃতপক্ষে বিবাহিত স্বামী) মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু সে তাহাদের সর্ব্বনাশের জন্য।

ও মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমার শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'বিমলা পলকমধ্যে তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, "আমি তিলোত্তমাকে লইয়া যাইতেছি।..." 'তিলোত্তমা বিচেতন হইয়া বিমলার ক্রোড়ে রহিয়াছেন। বিমলা তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন।' [১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] এই করুণ স্নেহদৃশ্যেই প্রথম খণ্ডের প্রায় শেষ। তাহার পর, কেবল একটি ঘটনা। বহুশত্রু-পরিবেষ্টিত জগৎসিংহ পরাজিত, মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইবার পূর্ব্বেই 'বিমলা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ও উপায়ান্তর-বিরহে পালঙ্কতলে তিলোত্তমাকে লইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।' পরে পাঠান-হস্তে বন্দী হইয়া তিনি তিলোত্তমার 'কাণে কাণে কহিলেন "অবগুণ্ঠন দিয়া ব'সো।" [১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] তিলোত্তমার রূপরাশি বিজয়ী শত্রুর চক্ষুঃ হইতে গোপন করিবার জন্য এই সতর্কতা। ইহাও তিলোত্তমার প্রাণরক্ষা ও প্রাণাধিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য—মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা।

প্রথম খণ্ডে তিলোত্তমা বিমলার সহিত প্রকৃত সম্পর্ক অনবগত ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ১২শ পরিচ্ছেদ আমরা যখন বহুদিন পরে দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর কতলু খাঁর অবরোধে তাঁহাদিগের দর্শনলাভ করি, তখন তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারি যে তিলোত্তমা এক্ষণে প্রকৃত সম্পর্ক জানিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি 'মা' ও 'বাছা' সম্বোধনে প্রীতিস্নেহ উৎসারিত। এ দৃশ্যেও দেখি, বিমলা তিলোত্তমার ধর্ম্মরক্ষার জন্য, আত্মরক্ষার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ ওসমান-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক তিলোত্তমাকে দিলেন। 'তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না (৬)...বিমলার প্রস্তাব শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন।' তিলোত্তমার প্রশ্নের উত্তরে জগৎসিংহের নিষ্ঠুরতার কথা বলিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন ও 'চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।' এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কি আর পাঠকবর্গকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে? ইহাও গভীর মাতৃস্নেহের পরিচায়ক। 'বিমলা যে তাঁহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, বিমলা হইতেই যে তাঁহার উদ্ধার হইবার উপায় হইল, তিলোত্তমার ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না।' [২য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, 'পিতৃহীনা অনাথিনী' লাঞ্ছিতা প্রত্যাখ্যাতা তিলোত্তমা যখন 'রুগ্নশয্যায়,' তখন 'সেই দীনা শব্দহীনা বিধবা' তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। [২য় খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] এ করুণ দৃশ্যও মাতৃস্নেহরসে মধুর।

এতগুলি মর্ম্মচ্ছেদী করুণ দৃশ্যের পরে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' [২য় খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] জগৎসিংহ যখন অভিরামস্বামীর কাছে তিলোত্তমার পাণিপ্রার্থনা করিলেন (বিমলা বাঙ্গালীর মেয়ের মত 'বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিয়াছিলেন') তখন সেই শুভসংবাদশ্রবণে 'বিমলার অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি; অনবরত হাসিতেছেন আর আশ্‌মানির চুল ছিঁড়িতেছেন ও কিল মারিতেছেন; আশ্‌মানি মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া, বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে।' বিমলা যে কমলমণির ন্যায় নিজেই 'এক একবার নৃত্য করিতেছেন' না, ইহাই ঢের। বঙ্গগৃহে কন্যার বিবাহকালে অনেক সময়েই মাতৃহৃদয়ের আনন্দাতিশয্য এইরূপ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে মাতৃহীনা তিলোত্তমার প্রতি বিমলার প্রকৃত মাতৃস্নেহ ছিল। সপত্নীকন্যা বলিয়া কোনরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তিলোত্তমার মাতা জীবিত না থাকাতে বিমলার মনে সপত্নীবিদ্বেষ জন্মিবার অবসর ঘটে নাই এবং বিমলার গর্ভজাত সন্তান না থাকাতে নিজ সন্তান ও সপত্নী-সন্তানে ইতরবিশেষ করিবার ও তাহাদের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ হইবার অবসর ঘটে নাই। এ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবয়সে রচিত 'রজনী'তে ললিতলবঙ্গলতা বিমলা অপেক্ষা একধাপ উচ্চে, কেন না তাঁহার সপত্নী জীবিতা ছিলেন তথাপি সপত্নীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের প্রমাণ পাওয়া যায় না, পরন্তু সপত্নীপুত্রের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। (তবে তিনিও বিমলার ন্যায় নিঃসন্তানা।) নিজে সন্তানবতী হইয়াও সপত্নীসন্তানদিগকে নিজসন্তান-নির্ব্বিশেষে লালনপালন করার আদর্শ আমরা গ্রন্থকারের শেষবয়সে রচিত 'সীতা-

(৬) ২য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে বিমলা এই ত্যাগ স্বীকারের আভাস দিয়াছেন। 'দুইজন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।'

রামে' নন্দার বেলায় দেখিতে পাই। যাক, সে পরের কথা পরে হইবে। আপাততঃ দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থেই স্নেহময়ী বিমাতার একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থেই বিমাতার এরূপ একটি সুন্দর আদর্শ স্থাপন করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। (৭)

'কপালকুণ্ডলা'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সপত্নীবিরোধের কোন অবসর নাই, কেন না বিমলার বিবাহের পূর্ব্বেই তিলোত্তমার মাতা গতাসু হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' উভয় গ্রন্থেই সপত্নীবিরোধে সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। অন্ততঃ স্থূলদৃষ্টিতে ইহাই প্রতীতি হয়। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে 'কপালকুণ্ডলা'য় নায়িকার প্রাণহানির মূলীভূত কারণ—অদৃষ্ট। (বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাটি প্রথম কয়েক সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকটিত করিয়াছিলেন। আধুনিক সংস্করণে পরিচ্ছেদটি পরিত্যক্ত।) 'বিষবৃক্ষে'ও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সকল অত্যাহিতের মূলীভূত কারণ—নগেন্দ্রনাথের এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীগণের অসংযম। (এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-নামকরণে এবং মধ্যে মধ্যে ঐ নামের সার্থকতা-বিচারে পরিষ্কার করিয়াছেন।) তথাপি লৌকিকভাবে দেখিলে, কপালকুণ্ডলার শোচনীয় পরিণামের ও নবকুমারের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার পরিদৃশ্যমান কারণ—সপত্নীর প্রতি পদ্মাবতীর বিষম বিদ্বেষ এবং তৎসঙ্গে ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি। বস্তুতঃ দ্বিতীয় কারণই বলবত্তর। সে সব কথা ক্রমে বুঝাইব। 'বিষবৃক্ষে' এই সপত্নীবিরোধের বিষময় ফল আরও বিশদভাবে বর্ণিত; একদিকে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ ও অশেষ ক্লেশভোগ, অপরদিকে কুন্দর গৃহত্যাগ ও অবশেষে বিষপানে যন্ত্রণার অবসান। উভয় ব্যাপারেই স্বামী নগেন্দ্রনাথের মর্ম্মান্তিক যাতনা।

উভয় গ্রন্থেই পতিপ্রেমের জন্য রেষারেষিতে অনর্থ। (সন্তানের স্বার্থ লইয়া বিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থেই (৮) প্রদর্শিত হয় নাই। অন্য বাঙ্গালা লেখকের রচনায়ও ই দেখা যায় না। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই—কৈকেয়ী সুরুচির ব্যবহারে—ইহার চিত্র আছে।) 'কপালকুণ্ডল বিবাদটা একতরফা, কেন না কপালকুণ্ডলার স্বামীর জ বিশেষ দরদ ছিল না। 'বিষবৃক্ষে' ব্যাপারটা আ ঘোরালো। সূর্য্যমুখী ও কুন্দ কেহই নগেন্দ্রনাথকে ছাড়ি ইচ্ছুক নহেন। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের কাব্যের নায়িকাদিগের ন্যায় এই দুইখানি গ্র সপত্নীদ্বয়ের মনে ইন্দ্রিয়লালসার লেশমাত্র নাই, শুধু প্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যত অনর্থ। অবশ্য এ প্রভেদে বঙ্কি চন্দ্রের অসাধারণত্ব নাই, কেন না তাঁহার আমলের অন্যা লেখকের রচনায়ও ('নবনাটক,' 'প্রণয়পরীক্ষা,' 'জামা বারিক' ইত্যাদিতে) উক্ত দোষ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উ গ্রন্থেই সপত্নীচিত্রে গ্রাম্যতাদোষ নাই। এ অংশে 'নবনাটক 'প্রণয়পরীক্ষা'ও 'জামাই বারিকে'র তুলনায় বঙ্কিমচ বিশুদ্ধতর রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (ভাদ্রে প্রকাশিত যে বৈপরীত্যের (contrast) তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছিলাম, এ গ্রন্থে পদ্মাবতীর স্বামিলাভের ভীষণ চেষ্টা ও শ্যামার স্বামি বশীকরণের ঔষধসংগ্রহের চেষ্টার মধ্যেও সেই contras প্রতীয়মান হয়।

অবান্তর কথা ছাড়িয়া এক্ষণে সপত্নীচিত্রের আলোচ করি।

যে অবস্থায় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে অধিকারী মহা শয়ের হস্ত হইতে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহার বিবর এই প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (ভাদ্রে প্রকাশিত দিয়াছি। নবকুমার নববধূকে লইয়া মেদিনীপুর হইতে সপ্তগ্রাম-গমনকালে পথমধ্যে মতিবিবির দর্শনলা করিলেন। এই মতিবিবিই নবকুমারের পূর্ব্বপরিণীত জাতিভ্রষ্টা পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী। নবকুমা পদ্মাবতীর দশাবিপর্য্যয়ের বহু বৎসর পরে তাঁহার দর্শ

(৭) পাঠকবর্গ বিস্মৃত হইবেন না যে, এই প্রবন্ধে বিমলা-চরিত্রের বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নাই, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছি।

(৮) তৎপ্রদর্শনের পথও বঙ্কিমচন্দ্র মারিয়া রাখিয়াছেন। কেন না এই দুইখানি গ্রন্থেই যুগল সপত্নী নিঃসন্তানা, সম্ভবতঃ বন্ধ্যা। অন্যান্য 'দেবী চৌধুরাণী'তে শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্ল বন্ধ্যা; কেবল শেষ গ্রন্থ 'সীতা রামে' নন্দা রমা উভয়েই পুত্রবতী। সে কথা পরে হইবে। এই আমলের অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও হয় এক সতীন, না হয় উভয়েই বন্ধ্যা। কেবল 'কমলেকামিনী'তে উভয়েই পুত্রবতী, কিন্তু একজন

পাইয়া, তখনকার নবোঢ়া বালিকা বধূ যে এখনকার এই অসামান্যা সুন্দরী হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে আপন পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু পদ্মাবতী তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন, যে টুকু খটকা ছিল, স্বামীর নাম-পরিচয়শ্রবণে তাহাও দূর হইল। [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] তখনই স্বামীর প্রতি প্রেমের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, তখনই 'পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল'—যদিও কলাকুশল কবি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ও সেই মানসিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বহুপরে (তৃতীয় খণ্ডে) বিবৃত করিয়াছেন।

নবকুমারের মুখে কপালকুণ্ডলার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কথাশ্রবণে মতিবিবির সপত্নী-দর্শনের কৌতূহল জন্মিল। তিনি বসন-ভূষনে সজ্জিতা হইয়া নবকুমারের সঙ্গে দোকানঘরে গেলেন। 'কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি হাসি ভাব দূর হইল; মতির মুখ গম্ভীর হইল;—অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন।...মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।' [২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।] এই 'অদ্বিতীয় রূপসী'কে দেখিয়া তাঁহার সপত্নীহৃদয় বিষাদকালিমাচ্ছন্ন হইল, তাই 'মতির মুখ গম্ভীর হইল'। যাহা হউক, সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সৌন্দর্য্যের মোহিনী শক্তিতে 'মতি মুগ্ধা'। তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইল। 'ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন।' নবকুমার ইহাতে আপত্তি করিলে তাঁহাকে বলিলেন, "ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন?" ইহা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'সমাপ্তি' নামক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আয়েষা কর্ত্তৃক তিলোত্তমাকে অলঙ্কার পরানর ন্যায় বড় সুন্দর, বড় মধুর। অবশ্য আয়েষার ত্যাগস্বীকার ইহা অপেক্ষা অনেকগুণে মহত্তর। দুঃখের কথা, এই ভাব, আয়েষার ন্যায়, মতিবিবির হৃদয়ে চিরদিনের তরে স্থায়ী হইল না।

তৃতীয় খণ্ডে দেখা যায়, মতিবিবি সেলিমের আশায় নিরাশ হইয়া, উচ্চাভিলাষ ও পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ইতিহাস গ্রন্থকার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। [৩য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] 'পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।' 'মেরা শৌহর' এখন তাঁহার কাছে দিল্লীর বাদসাহ অপেক্ষাও লোভনীয়।

তিনি স্বামিসঙ্গলাভের চেষ্টায় দিল্লী ত্যাগ করিয়া 'সপ্তগ্রামে আসিলেন, রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন।' [৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] কিন্তু যে আশায় এত কষ্ট স্বীকার করিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না। নবকুমার সংযত শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—আদর্শ ব্রাহ্মণ। 'কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী'—মতির এ কাতরোক্তিতেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। তিনি অবজ্ঞার সহিত যবনীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মতিবিবির প্রকৃত পরিচয় পাইয়াও তাঁহার সঙ্কল্প টলিল না।

তখন পদ্মবাতী স্বামিলাভের উপায়-সন্ধানে সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কঠোর সংকল্পসিদ্ধির জন্য তিনি এতদিনে সপত্নীবিদ্বেষকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। নিজের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, বাধা দূর করিবার জন্য, 'কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ' ঘটাইবার জন্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেম। [৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] স্বকার্য্যসিদ্ধিকল্পে সপত্নীর 'সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া' দিবার জন্য [৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ] তিনি পুরুষবেশ ধারণ করিলেন। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কাপালিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এরূপ 'অননুভূতপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত সহায়' পাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধা হইল। কিন্তু এই স্থলে প্রতিভাশালী কবি সপত্নীবিদ্বেষের তীব্রতা কমাইয়া সুবিবেচনা ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। পতিপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে তফাৎ

করিবার জন্য পদ্মাবতী কাপালিকের সহিত ঘোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত সন্ধিবন্ধন-কালে সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ-সত্ত্বেও সপত্নীর প্রাণবিনাশের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 'যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।' [৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] 'নবনাটক,' 'প্রণয়পরীক্ষা' প্রভৃতিতে বর্ণিত সপত্নী-চরিত্রের সহিত প্রভেদ এ স্থলে পরিস্ফুট। কবিকঙ্কণের লহনা-খুল্লনার ব্যাপারও এ ক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা নহে কি?

এই খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে 'সপত্নীসম্ভাষে' পদ্মাবতী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনে কথাটা আরও বিশদ হইয়াছে। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার নিকট 'আমি তোমার সপত্নী' বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাঁহার সহিত 'স্বামীর চির-বিচ্ছেদ জন্মাইবার' অভিপ্রায়ে তাঁহার 'সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া' দিবার চেষ্টার কথাও অকপটে বলিলেন, কিন্তু সপত্নীর মৃত্যু তাঁহার অভীষ্ট নহে তাহাও স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিলেন। 'আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যু সাধন করি।'

পদ্মাবতী নিষ্ঠুরা নিষ্করুণা নহেন, কিন্তু স্বামিলাভকামনা তাঁহাকে সপত্নীকণ্টক দূর করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। তিনি বলিতেছেন:—'তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।...আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কপালকুণ্ডলা স্বামীর মর্ম্ম বুঝিতেন না। সুতরাং তিনি এ প্রস্তাবে সহজেই রাজি হইলেন। তাঁহার মনে এতটুকুও সপত্নীবিদ্বেষ নাই। 'কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?' বলিলেন 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না।' 'লুৎফউন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন "ভগিনী—তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবন দান করিলে।"' তিনি কপালকুণ্ডলার স্থানত্যাগের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবারও প্রস্তাব করিলেন। সপত্নীবিরোধের পরিণাম আপাততঃ মধুরভাবেই সমাপ্ত হইল।

তাহার পর, পুরুষবেশীর পত্র উপলক্ষ্য করিয়া যে শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহার জন্য পদ্মাবতীকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করিলে তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার হইবে। তিনি 'নিমিত্তমাত্র'। (৯)

'বিষবৃক্ষ'

(১০) সূর্য্যমুখী

'বিষবৃক্ষে'র 'বিষবীজ' উপ্ত হইলে, সূর্য্যমুখী কৌতুক করিয়া নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন:—'একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? ...যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।' [৫ম পরিচ্ছেদ।] হায়! সূর্য্যমুখী জানিতেন না, তিনি সে দিন কৌতুক করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই একদিন কঠোর সত্যে পরিণত হইবে। তিনি জানিতেন না, অদৃশ্যে ভাগ্যবিধাতা তাঁহার এই কৌতুকবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া সায় দিয়াছিলেন। (য়ুরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের Classical Ironyর ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।) পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী শয্যাগৃহের ভিত্তিগাত্রে সত্যভামার দর্পচূর্ণের চিত্র বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং 'এই চিত্রের নীচে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "স্বামীর সঙ্গে সোণারূপার তুলনা?"' [৪৪শ পরিচ্ছেদ।] কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মধুসূদন তাঁহার অদৃষ্টে রুক্মিণীর 'অধরপ্রান্তের ঈষন্মাত্র হাসিতে সপত্নীর আনন্দে'র পরিবর্ত্তে দুঃসহ সপত্নীযন্ত্রণা লিখিয়াছিলেন। যাক্, তাঁহার ভবিষ্যতের কথা আগেই তুলিব না।

নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপজ মোহ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া সূর্য্যমুখী কমলমণিকে লিখিতেছেন:—'পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী। সেই স্বামী

(৯) এ ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সপত্নী-চিত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি, পদ্মাবতী বা কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছি না।

কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না।' [১১শ পরিচ্ছেদ।] পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের দৈনন্দিন ব্যবহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছেন, নগেন্দ্রের হৃদয় কুন্দময়। সমগ্র পরিচ্ছেদব্যাপী পত্রে সূর্য্যমুখীর মনের ভাব প্রকাশিত; তাঁহার হৃদয়ের বেদনা পত্রের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পরে নগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'যখন জানিয়াছিলাম অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম।' [২১শ পরিচ্ছেদ।] নগেন্দ্রনাথের তখনও কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তখনই বিবাহের—বিধবাবিবাহের কথা উঠিয়াছে। তখনই সূর্য্যমুখীর যন্ত্রণার সূত্রপাত, স্বামিপ্রেমবঞ্চিতার হৃদয়জ্বালার প্রথম স্ফুলিঙ্গ। যন্ত্রণার আরম্ভে উল্লিখিত পত্রে তিনি কমলমণিকে লিখিতেছেন:—'পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?' [১১শ পরিচ্ছেদ।] বুঝিলাম, সূর্য্যমুখী কণ্টক উদ্ধার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। এটুকু পত্রের 'পুনশ্চ।' স্ত্রীলোকের পত্রে আসল কথাটা 'পুনশ্চ'র মধ্যেই থাকে।

হরিদাসী বৈষ্ণবীর সহিত কুন্দর কথাবার্ত্তার ধরণ দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যমুখী হীরাকে বৈষ্ণবীর প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার মুখে, দেবেন্দ্র দত্ত বৈষ্ণবীর বেশে কুন্দর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, এই রহস্য অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কুন্দকে তীব্র তিরস্কার করিয়া বাড়ী হইতে দূর হইতে বলিলেন। [১৭শ পরিচ্ছেদ।] স্বীকার করি, অন্তঃপুরিকাগণের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা বাটীর গৃহিণীর সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। কিন্তু সূর্য্যমুখীর এই নিষ্ঠুর কার্য্যে 'পাপ বিদায়' করার, সতীনের বালাই সরানর, ইচ্ছাও যে তলায় তলায় একটু না ছিল তাহা বলা যায় না। সূর্য্যমুখী এ কথা পরে নগেন্দ্রনাথের নিকট এক প্রকার স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন। [২১শ পরিচ্ছেদ।]

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা ও পতিপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি বিরাগের উদয় হইয়াছে। উভয়ের অবস্থার বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও, 'কপালকুণ্ডলা'য় বর্ণিত পদ্মাবতীর মনোভাবের সহিত সূর্য্যমুখীর মনোভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী লেখকদিগের চিত্রে যে সপত্নীবিদ্বেষরূপ সাধারণ ধর্ম্ম দেখা যায়, সূর্যমুখীর মনোভাব ঠিক সেরূপ নহে। কেন না 'সূর্য্যমুখী রাগ বা ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন।' শুধু তাহা কেন, কুন্দকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া পরক্ষণেই তজ্জন্য অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। কমলমণি বুঝাইলে, 'সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল।......শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন। সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।' [২০শ পরিচ্ছেদ।] তিনি নগেন্দ্রের নিকট অকপটে বলিলেন, 'আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি।' [২১শ পরিচ্ছেদ।] এখানেই অন্যান্য লেখকদিগের বর্ণিত সপত্নীচরিত্রের তুলনায় সূর্য্যমুখীর অসাধারণত্ব বেশ বুঝা যায়। তবে এ কথা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখনও পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের বিবাহিতা ভার্য্যা নহেন।

কিন্তু এই অনুতাপের উপর নগেন্দ্রনাথের নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি আরও ব্যথা পাইলেন। নগেন্দ্রনাথ যখন স্পষ্ট বলিলেন 'তোমাতে আমার আর সুখ নাই।...আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি...'তখন 'এই শেলসম কথা শুনিয়া' সূর্যমুখী যে যন্ত্রণা পাইলেন তাহা বর্ণনাতীত। [২১শ পরিচ্ছেদ।] যাহা হউক, সূর্য্যমুখী সেই সুতীব্র যন্ত্রণা অনেক কষ্টে সহ্য করিয়া কুন্দকে পাইলেই স্বামীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, স্বামীর সুখের জন্য আত্মস্বার্থ বলি দিবেন, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি পরে গৃহত্যাগকালে কমলমণিকে যে পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেই পত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'পত্র এইরূপ;—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর

হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।...” [২৮শ পরিচ্ছেদ।] পত্রে এ কথাও আছে—“কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না।” কিন্তু ইহাকেও ঠিক সপত্নীবিদ্বেষ বলা চলে না। পদ্মাবতীর ঈর্ষ্যার তীব্রতার তুলনায় এ কথা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

বরং ইহাতে স্বামীর প্রেম হারাইয়াছেন বলিয়া নিদারুণ হৃদয়বেদনা অথচ স্বামীকে—‘সর্ব্বস্বধন’কে আত্মস্বার্থ বলি দিয়াও সুখী করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, এই উভয় মনোবৃত্তিই অতি বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা হউক, হৃদয়ের দারুণ বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া, তিনি কুন্দর সন্ধানের ক্রটি করিলেন না। তাহার পর কুন্দ যখন আপনা হইতেই গৃহে ফিরিল, তখন নগেন্দ্রনাথ বা কুন্দর প্রতি বিরাগ পোষণ না করিয়া সূর্য্যমুখী আদর করিয়া কুন্দকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, ‘কুন্দ! এসো দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।’ [২৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, তিনি কুন্দর সহিত স্বামীর বিবাহ দিলেন, স্বামীর সুখের জন্য আত্মস্বার্থ বলি দিলেন, বলিলেন ‘প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব।’ [২৭শ পরিচ্ছেদ।] এই স্বার্থত্যাগ অপূর্ব্ব, অনন্যসাধারণ।

কিন্তু এই আত্মবিসর্জ্জন-কালেও—তিনি স্বামিপ্রেম হারাইয়াছেন, স্বামী তাঁহাকে পায়ে ঠেলিয়াছেন, এ কথা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি কমলকে আশীর্ব্বাদ (!) করিলেন, ‘যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।’ [২৮শ পরিচ্ছেদ।] পতিপ্রেম-বঞ্চিতার মর্ম্মান্তিক যাতনার নিদর্শন সূর্য্যমুখীর অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যে পরিস্ফুট। ইহার পূর্ণ পরিণতি তাঁহার গৃহত্যাগে। এই কার্য্য অন্যায় হইলেও অস্বাভাবিক নহে। অন্যান্য লেখকদিগের বর্ণনায় সপত্নীর সর্ব্বনাশের চেষ্টা অপেক্ষা এই পথ অবলম্বন যে শ্রেয়ঃ, তাহা অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রেও সূর্য্যমুখীচরিত্রের অনন্যসাধারণতা দৃষ্ট হয়।

গৃহত্যাগের পর তাঁহার যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগভোগ ঘটিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। যখন তাঁহার মন হইতে সকল অভিমান চলিয়া গেলে সুবুদ্ধির উদয় হইল, তখন তিনি গৃহে ফিরিলেন ও স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। পতিপ্রেম ফিরিয়া পাইয়া আর তাঁহার কুন্দর প্রতি কোনরূপ বিরাগ রহিল না। তিনি সপত্নীচিত্রাত্মক সংস্কৃত নাটকের শেষ অঙ্কে চিত্রিত পাটরাণীদিগের মত বলিলেন ‘সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।’ [৪৮শ পরিচ্ছেদ।] এই কথা বলিয়া তিনি কমলকে সঙ্গে লইয়া ‘কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।’ গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার চিরজন্মের মত ভগিনী-স্নেহের সাধ ফুরাইল। ‘কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল।’ কুন্দর অন্তিম কালে সূর্য্যমুখী স্বামীকে তাহার শিয়রের কাছে বসাইয়া নিজে ডাক্তার-বৈদ্যের চেষ্টায় গেলেন। তাহার পর যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, সকল আশা বিফল করিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া ‘অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল’ তখন ‘প্রথম রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।”’ [৪৯শ পরিচ্ছেদ।] রাগ-বিরাগ, অভিমান অপমানের এতদিনে চির-বিরাম।

(৵৹) কুন্দনন্দিনী

এইবার অভাগিনী কুন্দর কথা তুলিব। বিধবা কুন্দ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া যে অসংযমের পরিচয় দিয়াছে, তাহার বিচারের এ স্থল নহে। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, এই প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হওয়াতে গ্রন্থকার তাহার যে শাস্তির, যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। যাহা হউক, অভাগিনী নগেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্যবশতঃ স্নেহময়ী, উপকারিণী সূর্য্যমুখীর স্বামিসুখের কথা একবারও ভাবিল না; কমল সকল কথা বুঝাইয়া দিলে বুঝিল, ‘অনেকক্ষণ পরে’ ‘নগেন্দ্রের

মাতৃহারা।

শিল্পী-আর্গার্ ষ্টকস্]

মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল,' কমলের সঙ্গে কলিকাতা যাইতে সম্মত হইল। [১৪শ পরিচ্ছেদ।] কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার তাহার হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, সে সূর্য্যমুখীর সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝিয়া পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে গেল, কেবল নগেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার সব ওলট পালট করিয়া দিলেন। তাহার আর ডুবিয়া মরা হইল না। 'সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র'— 'আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো' [১৬শ পরিচ্ছেদ]—এ সব কথায় হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, কিন্তু সূর্য্যমুখীর প্রতি অণুমাত্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা প্রকাশ পায় না।

তাহার পর সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে তিরস্কৃতা হইয়া নিরপরাধা কুন্দ গৃহত্যাগ করিল, কিন্তু তাহার মনের নিভৃত কোণেও সূর্য্যমুখীর উপর রাগ নাই। [১৮শ পরিচ্ছেদ।] হীরার আশ্রয়ে কিছু দিন থাকিয়া কুন্দর মন আবার নগেন্দ্রকে দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ভুলিয়া, সূর্য্যমুখীর প্রতি অণুমাত্র রাগ পোষণ না করিয়া, সে প্রণয়ের প্রাবল্যে আবার গৃহে ফিরিল। [২৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। 'কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজ সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।"— [৩১শ পরিচ্ছেদ।]

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আপনা হইতেই সপত্নীকণ্টক উদ্ধার হইল, ইহাতে কুন্দর আহ্লাদ হইবার কথা। কিন্তু 'সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি' কুন্দনন্দিনীর 'সম্পূর্ণ সুখ কোথায়?' সে সর্ব্বদাই ভাবিত 'কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?' তাহার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে যে নগেন্দ্রের 'অন্তর্দাহ' হয় সরলা কুন্দ তাহা বুঝিত না। নগেন্দ্রের মুখে 'তোমার জন্যই সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল' এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া কুন্দ ব্যথিত হইল। এখন পর্য্যন্ত দেখা গেল, কুন্দর মনে সপত্নীর প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ ত নাইই, পরন্তু সপত্নীর জন্য তাহার হৃদয় কাতর।

তাহার পর, নগেন্দ্রনাথ যখন সূর্য্যমুখীর সন্ধানে প্রবাস-যাত্রা করিলেন, সেই দিন হইতে 'কুন্দ ভাবিত' "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন।" কুন্দ সূর্য্যমুখীর (অলীক) মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।" [৪২শ পরিচ্ছেদ।]

দেখা গেল, কুন্দর হৃদয়ে এতটুকুও সপত্নীবিদ্বেষ নাই বরং সে নিজেই সূর্য্যমুখীর দুর্দ্দশার মূলাধার ইহা মনে করিয়া তাহার হৃদয় অনুশোচনায় পরিপূর্ণ।

তাহার পর সূর্য্যমুখীর (অলীক) মৃত্যুসংবাদ 'শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল।' গ্রন্থকার নিজেই এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

'এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতীন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতীনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বল্‌তেছ, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে—" তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।'

[৪৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, মরণাহতা কুন্দর গভীর অনুশোচনার কথা:—"মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না।.." [৪৯শ পরিচ্ছেদ।]

ইহা সূর্য্যমুখীর স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। 'সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। অন্তকালে সবাই সমান।' তাহার পর শেষ দৃশ্যে কুন্দ সপত্নীর

'পদধূলি গ্রহণ করিল' ও সকল দ্বন্দ্বদ্বেষের অতীত দেশে প্রয়াণ করিল।

অতএব দেখা গেল, কুন্দচরিত্রের অন্য দিকে যতই অসংযমের প্রমাণ থাকুক, সপত্নীসম্পর্কে কুন্দের আচরণ অনিন্দ্য। ইহার নিকট সূর্য্যমুখীর চিত্রও ম্লান।

(৶০) হীরা

নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর প্রতি প্রণয় 'রূপজ মোহ' হইলেও ইহা কলুষিত প্রকৃতির নহে, পক্ষান্তরে দেবেন্দ্র দত্তের হীরার প্রতি অনুরাগ বা অনুরাগের ভান নিতান্ত কলুষিত। ইহাও কাব্যকলায় (Contrast) বৈপরীত্য-প্রদর্শনের জন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, দাম্পত্যপ্রণয়ের ন্যায় অবৈধ-প্রণয়েও ঈর্ষ্যাদ্বেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাহাতেও সর্ব্বনাশ ঘটে। হীরার আচরণে ইহার প্রমাণ। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে, দেবেন্দ্র দত্তর হীরার প্রতি প্রণয় যেরূপ কৃত্রিম ও কলুষিত, হীরার দেবেন্দ্র দত্তর প্রতি প্রণয় সে প্রকৃতির নহে এবং দেবেন্দ্র দত্তর কুন্দর প্রতি প্রণয়ও কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট নহে। এ ক্ষেত্রে কুন্দর প্রতি হীরার বিষম বিদ্বেষ বশতঃ বহু অনর্থ ঘটিয়াছে, ক্রমে বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যায়, [১৭শ পরিচ্ছেদ] হীরা সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক হরিদাসী বৈষ্ণবীর স্বরূপনির্ণয়ে নিযুক্তা হইয়া সকল সংবাদ আনিয়া দিল কিন্তু 'কুন্দ যে নির্দ্দোষী', তাহা বলিল না। হীরা তখনই দেবেন্দ্র দত্তর অনুরাগিণী হইয়াছে, সে কুন্দর প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্যই এ কথা গোপন করিল। তাহার প্রত্যাশাও পূর্ণ হইল, সূর্য্য-মুখীর তিরস্কারে কুন্দ গৃহবহিস্কৃত হইল। হীরার পাপকথা বিশদভাবে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 'হীরার দ্বেষ' নামক ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আবার ৩৩শ পরিচ্ছেদে দেখা যায় 'হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গল-চিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।'

ইহা ছাড়া সে কুন্দকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহাও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত। হীরা কুন্দকে অপমানিত তিরস্কৃত করিয়া, তাহার ক্লেশ দেখিয়া, পরম আনন্দ পাইত।

তাহার পর দেবেন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক 'পরিত্যক্ত, অপমানিত, মর্ম্মপীড়িত' হইয়া, হীরা দেবেন্দ্রের 'প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী'কে বিষ খাওয়াইয়া ইহার শোধ তুলিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

[৪০শ পরিচ্ছেদ।]

কি করিয়া হীরা এই দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, তাহা ৪৭শ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইহাও দেখা যায় যে, নগেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কুন্দর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তজ্জন্য কুন্দর যে মর্ম্মান্তিক পীড়া হইয়াছিল, হীরা কপট মিত্রতা দেখাইয়া তাহার সমস্ত ইতি-হাস শ্রবণ করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিল। 'কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল।' 'হীরা মনে মনে বড় প্রীত হইল।' তাহার পর সে বাক্‌চাতুরীতে কুন্দকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিল এবং ইচ্ছা করিয়াই কুন্দর দারুণ মনঃকষ্টের সময় বিষের মোড়ক (যেন তাড়া-তাড়িতে 'অন্যমন বশতঃ' ভ্রমক্রমে) তাহার নিকট রাখিয়া কক্ষান্তরে গেল।

এই তিনটি চরিত্রের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগ, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ, ও কুন্দনন্দিনীর বিষপান এই তিনটি অত্যাহিত ঘটিল। তবে অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থে এক সপত্নী অপর সপত্নীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে এবং সে চেষ্টায় অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছে এইরূপ বর্ণনা আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া দারুণ মনোদুঃখে নারী নিজেরই অনিষ্টসাধন করিয়াছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কেবল ইতর পাত্রী হীরা কৌশলে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যার সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছে এইরূপ দেখা যায়। ফল কথা, অপর লেখকদিগের গ্রন্থে সৎকুলজা প্রধানা পাত্রীরা যে পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, এখানে চরিত্রহীনা ইতর পাত্রী সেই পাপে লিপ্ত হইয়াছে—এবং তাহাও দারুণ অপমানে লাঞ্ছনায় মর্ম্মপীড়ায় একপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্ক অবস্থায়। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালীর অনন্যসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? (১০)

(১০) বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী ও হীরার চরিত্র-বিশ্লেষণ বর্ত্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নহে। কেবল প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে তাহাদিগের চরিত্রের ও আচরণের যে সমস্ত দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহারই বিচার করিয়াছি।

'রজনী'

কি জন্য রামসদয় বাবু দ্বিপুত্রবতী পত্নী থাকিতেও আবার ললিতলবঙ্গলতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (ভাদ্রে প্রকাশিত) বলিয়াছি। 'রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী'—যাক্, আর গ্রন্থকারের রসাল বর্ণনা উদ্ধৃত করিব না। [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] কিন্তু স্বামিসোহাগে বা রূপগর্ব্বে অন্ধ হইয়া তিনি সপত্নী ও সপত্নীপুত্রদিগের উপর খড়্গহস্ত নহেন। 'ষোল আনা গৃহিনী' হইলেও তিনি সপত্নীকে কোণঠেসা করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কথাই যে একমাত্র প্রমাণ ('তোমার বড় মা কি ঠেলা আছেন ?' ৩য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ) তাহা নহে। অন্যত্র অমরনাথ বলিতেছেন 'স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।' [৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রের তাঁহার উপর শ্রদ্ধাভক্তি হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই সপত্নীকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন না ও তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেন না। তবে অবশ্য তাঁহার দিকে স্বামীর বেশ একটু পক্ষপাত ছিল, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাই লক্ষ্য করিয়া শচীন্দ্রনাথের স্বগত উক্তি 'তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব!' [৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিব, 'নবনাটক', 'প্রণয়পরীক্ষা' প্রভৃতি নাটকে বর্ণিত বিদ্বেষবতী সপত্নীদিগের সহিত ললিতলবঙ্গলতার সম্পূর্ণ প্রভেদ ; এমন কি 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে' বর্ণিত সপত্নীদিগের ব্যবহারের সহিতও তাঁহার ব্যবহারের প্রভেদ যথেষ্ট। বাস্তবিক তিনি, প্রফুল্ল বা নন্দার মত না হইলেও, সুশীলা ও কোমলপ্রকৃতি সপত্নী।

যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে, তাঁহার সপত্নীপ্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে, তথাপি বিমাতা হিসাবে তিনি যে আদর্শ চরিত্র, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। তবে বিমলার মত তিনিও বন্ধ্যা, (১১) নিজে সন্তানবতী হইলে গর্ভজ সন্তানের সহিত সপত্নীপুত্রের প্রভেদ করিতেন কি না, বলা যায় না। গ্রন্থের একাধিক স্থলে 'ছোট মা' ললিতলবঙ্গলতা ও 'বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্র' শচীন্দ্রনাথের কথোপকথন হইতে বেশ বুঝা যায়, মায়ে পোয়ে কি মধুর স্নেহ-সম্পর্ক, সপত্নীপুত্র বিমাতার কত বাধ্য, বিমাতাও কেমন সপত্নীপুত্রগতপ্রাণা। তিনি সর্ব্বত্র নিজেকে শচীন্দ্রের মাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'আমি শচীর মা', 'শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে', 'আমার ছেলের বৌ করিব' ইত্যাদি। এবং শচীন্দ্রকে স্নেহভরা 'বাবা' 'বাছা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। শচীন্দ্রনাথ যখন রজনীকে বিবাহ করিতে অসম্মত, তখন সে এই বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'ছোট মা'র শরণ লইল। তখনকার কথাবার্ত্তার শেষ অংশটুকু এইরূপ :—

'ছোট মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয় তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমার এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

'ছোট মা বড় দুষ্ট। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।'. [৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর শচীন্দ্র যাহাতে রজনীকে বিবাহ করিয়া 'দারিদ্র্য-রাক্ষসে'র হস্ত হইতে সম্পৎসুখাভ্যস্ত পিতাকে উদ্ধার করেন, এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ললিতলবঙ্গলতা সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরণ লইলেন এবং সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধের প্রভাবে যখন শচীন্দ্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটিল, ললিতলবঙ্গলতার তখনকার উৎকণ্ঠা, অনুশোচনা, (১২) আকুলতা ও কাতরোক্তি মর্ম্মস্পর্শিনী। 'আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন মনে জানিতাম যে রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে

(১১) শচীন্দ্রের উক্তি 'বিমাতা বন্ধ্যা'। [৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] এই একটি মাত্র স্থানে শচীন্দ্র লবঙ্গকে বিমাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অন্য সর্ব্বত্র তাঁহার অসাক্ষাতেও 'ছোট মা' বলিয়াছেন।

(১২) ললিতলবঙ্গলতা শচীন্দ্রের ব্যাধি সম্বন্ধে নিজেকে দোষী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর কথায় স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্ন্যাসীই শচীন্দ্র 'দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান' দ্বারা এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। [৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।]

যে কাণা ফুলওয়ালীও দুর্লভ হইবে? কে জানে যে সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে; স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে, আমি মরিলাম না কেন?' [৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।]

অমরনাথ আসিয়া দেখিলেন 'লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে।' অমরনাথকে দেখিয়া তাঁহার আত্মধিক্কার গভীর পুত্রস্নেহের পরিচায়ক।

'তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজপুত্রের (১৩) অধিক প্রিয়, পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়!' [৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

যে অমরনাথকে তিনি অকথনীয় লাঞ্ছনা ও শাস্তি দিয়াছিলেন, আজ তিনি সেই অমরনাথের 'পা জড়াইয়া ধরিলেন।'

যখন হইতে ললিতলবঙ্গলতা বুঝিলেন, শচীন্দ্র রজনীর প্রেমে পাগল, তখন হইতে তিনি যাহাতে শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ হয়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সে সমস্ত কথা বলিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায়, তাঁহার মাতৃহৃদয় শচীন্দ্রের সুখের জন্য কত ব্যাকুল। এই পরিপূর্ণ মাতৃভাব বিমলার মাতৃভাব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

ললিতলবঙ্গলতা একস্থলে বলিয়াছেন:—[৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] "দিদি ত একবার দেখিবেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না।' এটুকু পীড়িত পুত্রের উপর অভিমানের কথা। এই সূত্র ধরিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন 'মায়ের চেয়ে মায়া যা'র তা'রে বলি ডাইনী' তবে তাঁহাকে বলিব, আমাদের সাহিত্যের আদর্শ বাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি যশোদাও বালগোপালের গর্ভধারিণী ছিলেন না।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মধ্যবয়সে রচিত 'রজনী'তে ললিতলবঙ্গলতার চরিত্রে সপত্নী ও বিমাতার সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে' সপত্নীবিরোধের চিত্রের পরে অঙ্কিত এই চিত্র পাঠকের হৃদয়ে শান্তিপ্রীতি আনিয়া দেয়।

'রাজসিংহ'

বড় সাধ করিয়া মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে ঘরে আনিয়াছিলেন। 'আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে?' [৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইল না। মা-মরা মেয়ের স্নেহময়ী মা হইতে নির্ম্মলকুমারীর কিছুমাত্র উৎসাহ লক্ষিত হইল না। কিন্তু ইহাতে নির্ম্মলের নিন্দা নাই। নির্ম্মল আদর্শ সখী—আদর্শ পত্নী, আদর্শ বধূ, আদর্শ গৃহিণী বা আদর্শ বিমাতা নহে। সে সখীর উপকারের জন্য মোগলের অন্তঃপুরে 'ইমলি বেগম' হইয়া অকুণ্ঠিতচিতে বাস করিল, সখীর সুখের জন্য স্বামিসঙ্গসুখই অম্লানবদনে ত্যাগ করিল, সপত্নীকন্যা ত কোন্ ছার! রাজসিংহের অন্তঃপুরে চঞ্চলকুমারী একাকিনী; তিনি নির্ম্মলকে কাছে পাইয়া ছাড়িতে চাহিলেন না, নির্ম্মল প্রথমতঃ থাকিতে চাহিল না বলিয়া একটু মৃদুভর্ৎসনা করিলেন; নির্ম্মল 'আপনাকে শত ধিক্কার দিল, এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া এবং সপত্নীকন্যার একটা বিলি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চঞ্চলকুমারীর সঙ্গিনী হইতে স্বীকৃতা হইল। 'একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।...সে খ্যান খ্যান প্যান প্যান এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসি আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া দিব।' [৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] ইহা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুর, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্ম্মলকে বিমাতা বা বধূ বা পত্নী বা গৃহিণীভাবে দেখিলে চলিবে না। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' গার্হস্থ্য চিত্রের আশা করা সঙ্গত নহে।

যোধপুরী উদিপুরীর রেষারেষির কথা, জেবউন্নিসা দরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ও রাজসিংহের অবরোধে চঞ্চলকুমারীর বহু সপত্নীর কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশের সপ্তম পরিচ্ছেদে (ভাদ্রে প্রকাশিত) সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিয়াছি।

'দেবী চৌধুরাণী'

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সে রচিত আখ্যায়িকাগুলিতে আদর্শস্থাপনের প্রকৃষ্ট চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। দেখা যাউক,

(১৩) এ কথাটিতে অবশ্য একটু অতিশয়োক্তি আছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা।

বিমাতা ও সপত্নীসম্বন্ধে গ্রন্থকার কিরূপ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'র প্রায় প্রারম্ভেই আমরা সাগরের সাক্ষাৎ পাই। শ্বশ্রূঠাকুরাণী যখন প্রফুল্লকে গ্রহণ করাইবার চেষ্টায় কর্ত্তার কাছে গেলেন, প্রফুল্লর তখন মাথায় মাথায় ভাবনা। দুঃখে, অভিমানে, দুশ্চিন্তায়, অপমান ও প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কায়, সে তখন বড়ই কাতরা। সেই সময়ে মূর্ত্তিমতী করুণার মত, শরীরিণী প্রফুল্লতার মত, সাগর বৌ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। 'সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।' [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।]

পরপরিচ্ছেদে দেখা যায়, গৃহিণী ওদিকে কর্ত্তার মন নরম করিবার ব্যর্থপ্রয়াস করিতেছেন, আর এদিকে সাগর প্রফুল্লর ব্যথিতহৃদয়কে সমবেদনা ও স্নেহমাখা বাক্যে স্নিগ্ধ করিতেছে। প্রফুল্ল বলিল 'তুমি কে, ভাই?' সাগর বলিল 'আমি ভাই, তোমার সতীন'। সাগর এমন মিষ্ট সুরে নিজের পরিচয় দিল যে, তাহাকে তখনই সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। অল্পক্ষণ আলাপেই 'প্রফুল্ল দেখিল যে সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না।' সাগর নয়ানবৌয়ের পরিচয় দিতে তাহার সম্বন্ধে যে সব টিপ্পনী কাটিল, তাহাতে একটু সতীনঝালা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ইহা অযথার্থ পরিচয় নহে, আর সাগরও ছেলেমানুষ, একটু প্রগল্‌ভা, একটু স্পষ্টবাদিনী। শ্বশুরের অর্থগৃধ্নুতার কথাই সে বলিতে ছাড়িল না, তা' সতীনের গুণ প্রকাশ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, ঐ পরিচ্ছেদের কথোপকথনেই দেখা যায়, সাগরের মায়ামমতা আছে, হৃদয় আছে, বুদ্ধিবিবেচনা আছে; 'আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ। এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই।'—বলিয়া প্রফুল্লর অভিমান দূর করা, প্রফুল্লর মাকে কোন বামুনবাড়ীতে ব্রহ্মঠাকুরাণী দ্বারা খাওয়ানর চেষ্টা করা প্রভৃতিতে বুঝা যায়, সে এই বয়সেই সংসারধর্ম্মের প্রথাপদ্ধতি বুঝে, মানুষের মনে কিসে ব্যথা লাগে, কিসে বেদনার সান্ত্বনা হয়, তাহা জানে। সে বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বতী।

তাহার পর সাগর যখন প্রফুল্লকে চলিয়া যাইতে বারণ করিল, তদুত্তরে প্রফুল্ল বলিল 'থাকি যদি—তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।' সাগর ছেলেমানুষ, কথাটা বুঝিতে একটু বিলম্ব হইল। যখন বুঝিল, তখন 'একটু ভাবিয়া, একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও।" 'একটু ভাবিয়া, একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া'—মতলব আঁটিতে একটু ভাবিতে হইল; আর 'দীর্ঘনিঃশ্বাস' টুকু হৃদয়জয়ের, স্বার্থত্যাগের, সপত্নীর সুখের জন্য আত্মসুখেচ্ছার ক্ষণিক দমনের নিদর্শন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত সাগর প্রফুল্লকে নিজের শয়নগৃহ দিয়াছে—আর প্রফুল্লর প্রথম স্বামিসম্ভাষণক্ষণে—সেই 'অনন্তমুহূর্ত্তে'—ঘরের দুয়ারের আড়ালে সাগরের 'পদ্মপলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে।' 'সাগর স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল।..সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল।' এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কি আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নয়ানবৌয়ের সঙ্গে সাগরের কথাবার্ত্তায় একটু সতীনঝালা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে নয়ানবৌয়ের স্বভাবদোষে। তাহার ভিতরও সাগরের এক একটা কথায় প্রফুল্লর সঙ্গে সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা—'কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগদীর মেয়ে হবে?' পক্ষান্তরে নয়ানবৌটি বাঙ্গালীর ঘরে সতীনের (realistic) কর্কশ বাস্তবচিত্র। যাক্, সে কথা পরে বলিব।

প্রফুল্ল শ্বশুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যখন সাগর বৌয়ের নিকট বিদায় লইতেছে, তখনকার দৃশ্যও সুন্দর। প্রফুল্ল 'জন্ম সার্থক' করিয়াছে বলিয়া সাগর আজ প্রফুল্লর সুখে সুখী, সে নয়ানবৌকে আমোদ করিয়া বলিতেছে 'কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়া ছিলেন।' এ কথায় দ্বেষের লেশমাত্র নাই—সাগরের হৃদয় আনন্দময়। বুঝা গেল, একদিনের পরিচয়েই দুইজনে পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে। যাইবার সময় প্রফুল্ল সাগরের বাপের বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবে

প্রতিশ্রুত হইয়া গেল। পক্ষান্তরে, নয়ান বৌয়ের প্রকৃতি ঠিক সাধারণ সতীনের মত, সে প্রফুল্লকে শ্বশুরের রূঢ় হৃদয়হীন উত্তর শুনাইয়া যেন কৃতার্থ হইল। প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকবর্গকে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, সাগরের মধুরস্বভাব সত্ত্বেও তাহার মধ্যে মধ্যে নয়ান বৌয়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিত—সেটা কতকটা নয়ান বৌয়ের স্বভাবের দোষ, আর কতকটা সম্পর্কের দোষ। সাগর কৌতুকপ্রিয়, নয়ান বৌকে রাগাইবার জন্য তাহার সহিত ফষ্টিনষ্টি করিত, ইহাতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যাবিষ ছিল না। নয়ান বৌ কিন্তু বাস্তবিকই 'সতীনী গরলে ভরা'। ইংরাজী করিয়া বলিতে গেলে প্রফুল্ল idealistic, সাগর romantic, নয়ান বৌ realistic—এখানেও সেই পূর্ব্বোল্লিখিত (Contrast) বৈপরীত্য ফুটাইবার জন্য এই ত্রিবিধ চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল সাগরের বাপের বাড়ী গিয়া দেখা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। সে যথাকালে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ঠিক সাগর-ব্রজেশ্বরের দম্পতি-কলহ-কালে প্রফুল্ল আসিয়া পড়িল (এটা অবশ্য গ্রন্থকারের কৌশল) এবং কৌতুকোচ্ছ্বসিতা দেবী চৌধুরাণী, সাগর তাহাকে যে দুর্লভ সুখ দিয়াছিল, তাহার প্রতিদান করিবার উদ্দেশ্যে, সাগরের মুখ দিয়া দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। ঘটনাটি পাঠকবর্গের অবশ্যই স্মরণ আছে, গ্রন্থের সেই অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] কিরূপে দেবী সপত্নীর প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইল, কি কৌশলে ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে মানভঞ্জনের পালা শেষ করিল, তাহা পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন। [২য় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] সে সরস বর্ণনা স্বল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া রসভঙ্গ করিব না। এই ব্যাপারের উপসংহারে দেবী একটি বুদ্ধির কায করিল; সাগর স্বামীর সঙ্গে পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া না গেলে তাহার কলঙ্ক হইতে পারে, এই আশঙ্কায় দেবী 'ঘোড়ে' যাইবার ব্যবস্থা করিল। এই ঘটনার আদি অন্ত দেখিলে বুঝা যায়, সাগরের প্রতি প্রফুল্লর কি অকৃত্রিম স্নেহ!

বাস্তবিক, প্রফুল্ল সাগরকে প্রথমদর্শনেই ভালবাসিয়াছিল। সে যখন দেবী চৌধুরাণী-রূপে ইংরেজের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ব্রজেশ্বরকে চিরবিদায় দিতে গেল, তখন তাহার শেষ কথা 'সাগর যেন আমায় না ভুলে।' [৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] দেবীর বজরা হইতে পিত্রালয় গমন-কালে সাগরের স্বামীর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায়, সাগরও প্রফুল্লকে কত ভালবাসে।

পক্ষান্তরে, নয়ান বৌ সতীনের কঠোর বাস্তব মূর্ত্তি। প্রফুল্লর (অলীক) মৃত্যুসংবাদ পাইয়া 'নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য এই নাওয়াটা নাইতে পারিলেই শরীর জুড়ায়।"' [১ম খণ্ড,১৪শ পরিচ্ছেদ।] ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

ইহার অনেক দিন পরে সাগর, নয়ান বৌকে লইয়া একটু মজা করিবার জন্য ব্রহ্মঠাকুরাণীকে বলিল যে স্বামী একটা বয়ঃস্থা কৈবর্ত্তকন্যা বিবাহ করিয়াছে; 'সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়া কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছুদিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারামহল হইয়া রহিলেন। সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।' [২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।] পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসব কতকটা সাগরের ছেলেমানুষি ও কৌতুকপ্রিয়তা, আর কতকটা সতীনবাদ, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত সপত্নীবিদ্বেষ নাই।

তাহার পর অনেক দিন পরে, যখন উভয় পক্ষেই নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের পর ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে লইয়া আবার সংসারী হইল, তখন 'প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নীরও সাধ, তিনটি বৌ একত্র করেন।

'যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। "ছি! বুড়ো মেয়ে।" বড় রাগ হইল, "আবার বিয়ে?—আমরা

কি স্ত্রী নই?" দুঃখ হইল, "হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয় ত আর বিয়ে করিতেন না।"

'এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান বৌ, সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুই জন এক, দুই জনের এক বিপদ। তাই ভাবিয়া, সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

'সাপকে হাঁড়ির ভিতর পূরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। এক বার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক্, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয় দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়াছিল। তাদেরই বিপদ বেশী। এ কয় দিন মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।'

[৩য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।]

অবশ্য সাগর প্রথমে বুঝে নাই যে প্রফুল্লই ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাহার ঘৃণা, দুঃখ, অভিমান স্বাভাবিক। নয়নতারার মনোভাবও তাহার প্রকৃতির অনুরূপ। তাহার পর সাগরবৌ ও নয়ানবৌ দুই সতীনে নূতন বৌএর যে ব্যাখ্যানা করিলেন, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। কিন্তু সাগর যখন নূতন বধূকে প্রফুল্ল বলিয়া চিনিলেন, তখন সকল গোল মিটিয়া গেল। সাগর ভবানীঠাকুরের শিষ্যাকে বলিলেন 'তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।'

তাহার পর তিন সতীনের একত্র ঘরকরনার কথা গ্রন্থকারের কথায়ই বলি।

'কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল।...শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে, আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।'.........

'প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?" ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত "আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।'

[৩য় খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।]

এতক্ষণে বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ বয়সে লিখিত 'দেবী চৌধুরাণী'তে সপত্নী ও বিমাতার কিরূপ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার আর বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

'সীতারাম'

'দেবী চৌধুরাণী'তে দেখা গিয়াছে, প্রফুল্ল প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্তা, কেবল শেষ দুইটি পরিচ্ছেদে তাহার সপত্নীদিগের সহিত ঘরকরনার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। সাগর বৌ বড় মানুষের মেয়ে, প্রায় স্বামীর ঘর করিত না; সুতরাং সপত্নীত্রয়ের একত্রবাস ও সদ্ভাব-অসদ্ভাবের সুযোগ অল্পই ছিল। আখ্যায়িকার শেষে তিন সতীন একত্র বসবাস আরম্ভ করিল। এই হিসাবে 'দেবী চৌধুরাণী'তে অঙ্কিত সপত্নীচিত্রকে পূর্ণায়তন বলা যায় না। এক্ষণে দেখা যাউক, ইহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'সীতারামে' গ্রন্থকার এতদপেক্ষা পূর্ণায়তন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কি না?

'সীতারামে' শ্রীর দশা প্রফুল্লর ন্যায়, সেও পরিত্যক্তা। কিন্তু নন্দা-রমা বরাবর একত্র ঘর করিত। তাহাদের নিত্যজীবনে সদ্ভাব ছিল কি অসদ্ভাব ছিল, তাহার পরিচয়

স্পষ্ট করিয়া গ্রন্থের প্রথম অংশে দেওয়া নাই, তবে উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন ছিল, একথা গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে খোলসা করিয়া বলিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন:—'রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো। রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥' তাই 'যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভালবাসিতেন—নন্দার অপেক্ষাও ভালবাসিতেন!' [৩য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।] কেন না 'হিমরাশিপ্রতিফলিতকৌমুদীরূপিণী' রমা অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন। অতএব বুঝা গেল, গ্রন্থারম্ভে রূপবতী কনিষ্ঠা পত্নী রমাই 'সুয়া' ছিলেন।

কিন্তু রমার উপর সীতারামের সে ভালবাসা রমার স্বভাব-দোষে গিয়াছিল। কিরূপে গিয়াছিল, সে ইতিহাস প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। রমা যখন নারী-সুলভ ভীরুতা বশতঃ ও সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্যে তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় স্বামীকে মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ করিতে নিষেধ করিল এবং 'পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়,' 'সীতারাম সে কথায় কাণ দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল।...শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রিদিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই...নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।' 'রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তারপর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—............সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।' [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।]

কিন্তু এ জুলুম দীনবন্ধুর বগী-বিন্দী বা ভারতচন্দ্রের পদ্মমুখী-চন্দ্রমুখীর মত স্বামীকে দখল করিবার জন্য নহে, সন্তানের কল্যাণকামনায়। 'রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া একদিন সীতারাম বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"...কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল।' রমা বুঝিল, বিনাপরাধে, আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি।' [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।]

যাহা হউক, নন্দা জ্যেষ্ঠা ('শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা'), রমা কনিষ্ঠা, নন্দাই ঘরণী গৃহিণী, রমা বিলাসসামগ্রী, 'রমা সুখ, নন্দা সম্পদ্।' সীতারাম দিল্লীযাত্রাকালে 'অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না।' [২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

রমা যখন মুসলমানের ভয়ে পুত্রস্নেহের আতিশয্যে আকালকূল ভাবনায় পড়িয়া গেল, তখন সতীন সম্বন্ধে দু'একটি মামুলি সংস্কার তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। 'তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়ে যাওয়া যায় না; সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে?' ইত্যাদি। [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] ইহাতে বুঝা গেল, রমার সতীন সম্বন্ধে একটু খারাপ ধারণা—সেটি চিরাগত সংস্কার--থাকিলেও, সে সতীনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিত না। নতুবা সে বিপৎকালে সংশয়চ্ছেদের জন্য সতীনের কাছে ছুটিত না। ইহা তাহার সপত্নীপ্রীতির নিতান্ত দুর্ব্বল প্রমাণ নহে। নন্দা-রমায় যে কথা হইল, তাহাতে দেখা যায়, নন্দার কথাগুলি বড় মিষ্ট, ব্যবহার বড় স্নেহময়। সে কনিষ্ঠ-সপত্নীকে 'দিদি' বলিয়া আদর করিল, হিন্দুর ঘরের মেয়ের মত পতির প্রতি অনন্ত বিশ্বাস ও ভগবানের উপর অনন্ত নির্ভরের কথা বলিয়া ভরসা দিল। শেষে রমাকে অন্যমনা করিবার অভিপ্রায়ে, রমার চিত্তবিনোদনের জন্য, পাশা খেলার প্রস্তাব করিল। 'কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও। আয়; পাশা খেলিবি? তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।' (১৩) ইহা সুয়ার দামী নোলকটি আত্মসাৎ করিবার ফন্দী নহে। 'নন্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল।' বুঝা গেল, নন্দার ব্যবহার কত স্নেহময়, কত সমবেদনাপূর্ণ। অবশ্য, ইহাতেও রমার ভাবনা গেল না, সন্দেহ মিটিল না, সে তাহার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা ও অপত্যস্নেহের প্রবলতা বশতঃ;—'স্নেহঃ সদা পাপমাশঙ্কতে।'

পরপরিচ্ছেদে দেখা যায়, যখন মুসলমান আসিতেছে এই দুঃসংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল, তখন 'রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা

(১৩) লহনাও সপত্নী খুল্লনার সঙ্গে সম্প্রীতির আমলে তাহার সহিত পাশা খেলিয়াছিল।

হইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।” তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।’ গোড়ার কথাটায় নূতন বৌয়ের মত সপত্নীবিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সতীনের যত্ন-আত্তির, স্নেহ আদরের কোন ত্রুটি হয় নাই। গোড়ার কথাটুকু না থাকিলেই চরিত্রটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, কিন্তু নারীপ্রকৃতির দুর্ব্বলতাটুকু অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—নন্দা মানবী, দেবী নহে। যাহা হউক এই চরিত্রের ক্রমবিবর্ত্তনে দেখা যাইবে, ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্রতাটুকু লোপ পাইবে এবং রমার বিষম বিপদের সময় নন্দার পরিপূর্ণ সপত্নীপ্রীতি দেখা দিবে। এইবার সেই বিষাদকাহিনীর কথা তুলিব।

ইহার অনেক দিন পরে আবার দুই সতীনের দেখা পাই। গঙ্গারাম-ঘটিত ব্যাপার লইয়া যখন রমার অখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই বড় বিপদে, নারীর চরম অপমানে, নন্দা তাহাকে স্নেহময়ী বড় দিদির মত, হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখীর মত, পাখা দিয়া ঢাকিয়াছিল, সান্ত্বনা ও সাহস দিয়াছিল, বুদ্ধিমতীর ন্যায় বিপদুদ্ধারের উপায় স্থির করিয়া দিয়াছিল, কলঙ্কিনী মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করে নাই, বা এমন সুযোগে সপত্নীর উচ্ছেদ করিবার, কণ্টক উদ্ধার করিবার, প্রবৃত্তি পোষণ করে নাই।

‘নন্দা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া, সস্নেহবচনে বলিল, “কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস্ ত উঠিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চুণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এলজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী তা মনে করিস্ না। আর মহারাজ আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কানে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব।’

[৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

ইহাকেই বলে ব্যথার ব্যথী। নন্দা রমার মন সুস্থ করিবার জন্য, রমার দোষ সারিয়া লইয়া নিজের ঘাড়ে দোষ চাপাইল। তাহার পর, সমবেদনার সুরে কথা পাড়িয়া রমার মুখ হইতে সকল কথা জানিয়া লইয়া, কৃত কর্ম্মের জন্য বিন্দুমাত্র তিরস্কার না করিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিল। রমার সেই কর্ত্তব্যসাধনে সম্মতি আছে জানিয়া নন্দা গিয়া রাজার কাছে সপত্নীর কলঙ্ক-ভঞ্জনের প্রস্তাব করিল, সে দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহাতে রমার সহিত নন্দার সমপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

“আমরা দুইজনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) বলিতেছি, যে এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুজনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।”

[৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

এই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে নন্দা শ্রীর সম্বন্ধে যে একটু টিপ্পনী কাটিয়াছিল, একটু ঠেস দিয়া কথা বলিয়াছিল, (‘মহারাজ, যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?’) ইহা দোষের নহে, স্ত্রীলোকের স্বভাব। আর কথাটাও ত লৌকিক আচার হিসাবে মিথ্যা নহে।

তাহার পর রমার বিচারের দিনেও নন্দা রমার প্রতি স্নেহ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সহায়-স্বরূপ রাজসভায় যাইতে চাহিয়াছে, বিচারকালে যাহাতে রমার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, তজ্জন্য মুরলাকে হাত করিয়াছে, ফলতঃ যাহাতে রমার এ মহাসঙ্কটে মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়, কলঙ্ক-অপনোদন হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। [৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] পূর্ব্বখণ্ডে একটি মাত্র স্থলে যে একটু সপত্নী-বিদ্বেষের প্রমাণ পাওয়া যায়, এই ব্যবহারে তাহার ক্ষালন হয় নাই কি?

যাহা হউক, সেই একমাত্র দোষের যদি ইহাতেও ক্ষালন না হইয়া থাকে, তবে আবার রমার রোগশয্যায় শুশ্রূষা-পরায়ণা স্নেহময়ী অশ্রুময়ী নন্দার চিত্র দর্শন করি।

‘সেই যে সভাতলে রমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই।’ [৩য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।] সীতারাম তখন শ্রীর রূপধ্যানে মগ্ন, শ্রীর পুনর্দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র।

তাঁহার নন্দার উপর এমন বিশ্বাস ছিল যে তিনি নন্দাকেই পীড়িতা রমাকে দেখিবার ভার দিলেন। সীতারাম পদসেবারতা নন্দাকে বলিলেন :—'বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও।' [৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] নন্দা যে ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিল, তাহা স্নেহশীলতার, সপত্নীপ্রীতির অভ্রান্ত নিদর্শন। সীতারাম যখন চিত্তবিশ্রামে শ্রীর জন্য পাগল, তখন নন্দা রোগশয্যাশায়িনী রমার একমাত্র সহায়, অকৃত্রিম স্নেহময়ী সখী ও ভগিনী। ভ্রমরও বোধ হয় সহোদরা ভগিনী যামিনীর নিকট এত সমবেদনা পায় নাই। চাকরানীরা সহজেই প্রকৃত ও ভানের প্রভেদ বুঝিতে পারে, তাহারাও বুঝিত যে নন্দা প্রকৃতই রমার প্রতি স্নেহশালিনী। তাই রমা যখন ঔষধ খাইতে চাহে নাই, তখন প্রধানা দাসী যমুনা বলিল :—"আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম ; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।' [৩য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।]

'নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া যায়।' সে কবিরাজদিগের চিকিৎসায় শৈথিল্য মনে করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ তিরস্কার করিল, বোধ হয় সূর্য্যমুখীও নগেন্দ্রনাথের জন্য সেরূপ করেন নাই।

রমার দেহে 'মৃত্যুর' ছায়া পড়িয়াছে, দেখিয়া সপত্নীহৃদয় স্নেহে বেদনায় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল। রমার সাজ্ঘাতিক স্বীকারোক্তি, 'আমি ওষুধ খাই নাই' শুনিয়া নন্দা বড় ব্যথা পাইল। আর রমা যখন বলিল, "ঔষধ খাব—যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন"—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল।' স্নেহময়ীর বুঝিতে বাকী রহিল না, পতিপ্রেমবঞ্চিতার কোথায় ব্যথা লাগিয়াছে। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

কিন্তু রমাকে আশা দেওয়া যত সহজ আশা পূর্ণ করা তত সহজ নহে, কেন না রাজার দেখা পাওয়াই দুর্ঘট। দেখা পাইলেও তিনি 'আজ না—কাল' বলিয়া প্রস্থান করেন। এই জন্যই 'ডাকিনীর উপর নন্দার রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী তাহা নন্দা জানিত না ;' অতএব ইহা ঠিক সপত্নীবিদ্বেষ নহে, (১৪) তবে ডাকিনীটা স্বামীর পদ ষোল আনা দখল করিয়াছে বলিয়া এরূপ রাগ স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক। নন্দা বলে 'একবার তাকে পাবে নখে মাথা চিরি।' কিন্তু গ্রন্থকার সুকৌশলে এই বিদ্বেষে স্বার্থপরতার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ভাবের, ঝাঁজটুকু যথাসম্ভব কমাইয়াছেন। রাজা রমাকে দেখিতেছেন না অথচ রমা মরিতে বসিয়াছে,এই জন্যই নন্দা ডাকিনীর উপর জাতক্রোধ।

নন্দা যখনই রাজার দেখা পাইত, তখনই রমার কথা সীতারামকে জানাইত—বলিত "সে বড় কাতর—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্চি যাব করিয়া যান নাই। তাহার পর রমার ব্যর্থজীবনের শেষ দিনে নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, "আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।" সীতারাম গিয়া যাহা দেখিলেন, রমার মুখে যাহা শুনিলেন, সে সব কথা বলিয়া আর ফল কি? রমা মৃত্যুকালে 'স্বামীর কোলে পুত্তুর দোলে' হিন্দুনারীর এই সাধ পূর্ণ দেখিয়া চক্ষুঃ বুজিল। তাহার একটি কথা,—'বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম', শুনিয়া বুঝা যায় যে, সে শেষ জীবনে নন্দার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে স্নেহময়ী ভগিনী বলিয়া চিনিয়াছিল, পূর্ব্বে একবার যে একটু সপত্নীবিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা তাহার কৃতজ্ঞহৃদয় হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল। [৩য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।]

নন্দার অকৃত্রিম স্নেহের কথা আর কত বলিব? সে নিজের প্রতি স্বামীর নিরন্তর অবহেলায় অধৈর্য্য হয় নাই, তাহার স্বামিভক্তি টলে নাই,এবার রমার প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে টলিল। সে সতীনের জন্য স্বামীর সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে প্রস্তুত হইল। 'নন্দা বড় চটিয়াছিল।..... রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল, তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল, কেন না আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশী হইল যে, অনেক

(১৪) বহুবিবাহের একটি বিষময় ফল, স্বামী যদি একজনের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করেন, তবে সংসার ছারখার হয়। সীতারামের শ্রীর উপর দম ঠিক এই শ্রেণীর নহে। যদিও বিষবৃক্ষের ন্যায় এক্ষেত্রেও ইহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিল, সীতারামের রাজ্য গেল, সুনাম গেল, চরিত্র গেল—রমাও গেল। তথাপি ইহাকে ঠিক বহুলোকাকর বহুবিবাহের ফল বলা যায় না।

চেষ্টা করিয়াও নন্দা, সকল টুকু লুকাইতে পারিল না।' ৩য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।] অবশ্য তখন নন্দা রমার শোকে একটু অসংযতহৃদয়া, তজ্জন্যই এই ত্রুটি ঘটিল। ইহাতে একটু নিজের জন্য অভিমানও ছিল, গ্রন্থকার তাহা খোলসা একরার করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীও একেবারে 'আমি' ভুলিতে পারে নাই।

তাহার পর, আর একবার নন্দার দেখা পাই, শেষ খণ্ডের ২১শ পরিচ্ছেদে। 'রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে।' অন্যান্য আখ্যায়িকার বেলায় আক্ষেপ করিয়াছিলাম, পুত্রবতী বিমাতা সপত্নীসন্তানের প্রতি নিজসন্তাননির্ব্বিশেষে স্নেহবতী এই চিত্র কোথাও অঙ্কিত হয় নাই। নন্দার চিত্রদর্শনে সে আক্ষেপ মিটিল। হিন্দুগৃহিণী নন্দা মহাভারত-বর্ণিত কুন্তীর ন্যায় সপত্নীসন্তানকে নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিতেছেন।

নন্দার চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত মাধুর্য্য নিষ্কাশিত করিতে পারি নাই। তাহার পত্নীত্বের কথা, তাহার পতিভক্তির কথা এক্ষেত্রে তুলিতে পারি নাই—কেননা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। বিমাতা ও সপত্নীর আদর্শ-রূপেই তাহার চরিত্রবিচার করিয়াছি। এক হিসাবে দেখিতে গেলে নন্দা প্রফুল্ল অপেক্ষাও বড়,কেননা প্রফুল্ল নিঃসন্তানা হইয়া সপত্নীসন্তানে স্নেহবতী, নন্দা পুত্রবতী হইয়াও নিজ সন্তানে সপত্নীসন্তানে ইতরবিশেষ করে নাই। আরও দেখিতে হইবে, প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র, নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষিতা। আর নন্দার পতিভক্তিতে, গৃহিণীধর্ম্মে, সপত্নীপ্রীতিতে, সপত্নীসন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহে, অশিক্ষিতপটুত্ব।

উপসংহার

অদ্বিতীয়-প্রতিভাশালী সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট এই চিত্রপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, শুধু পরিণতবয়সে লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে কেন, যৌবনে ও মধ্যবয়সে লিখিত একাধিক আখ্যায়িকায় তিনি বিমাতা ও সপত্নীর সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সপত্নীবিরোধস্থলেও তিনি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের ন্যায় লালসার দিক্ প্রদশন করেন নাই। এবং তিনি ঈর্ষ্যান্বিতা সপত্নীদিগের বেলায়ও বিদ্বেষের পরিমাণ ও প্রকৃতির অনেক হ্রাস করিয়াছেন। এরূপ আদর্শ তাঁহার সমসাময়িক বা ঈষৎপূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের রচনায় ছিল না, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আদৌ ছিল না, সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও ছিল না বলিলে চলে। (এসকল তত্ত্ব আষাঢ় ও শ্রাবণে প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি।) ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সামাজিক আদর্শের প্রভাবে যখন সমাজসংস্কারের ভীষণ আন্দোলনে বঙ্গীয় লেখকগণ বিক্ষিপ্তচিত্ত, সেই পরিবর্ত্তনের কালে বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরধীরগম্ভীরভাবে সুন্দর আদর্শপ্রচারে প্রবৃত্ত। এ কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে (ভাদ্রসংখ্যায় প্রকাশিত) বুঝাইয়াছি। এই সুন্দর আদর্শ, ইংরাজী সাহিত্য বা সমাজ হইতে আমদানী নহে, আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার পঞ্চম বেদ মহাভারত হইতে গৃহীত। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাস-বর্ণিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। লঘুসাহিত্যেও তিনি ব্যাসবর্ণিত কুন্তীদ্রৌপদীর আদর্শ পুনঃপ্রচারিত করিয়াছেন, প্রাচীন মহাভারতীয় আদর্শ ফিরাইয়া আনিয়াছেন, আর্য্য সাহিত্যের পবিত্র ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাও অন্যভাবে বাদরায়ণের সূত্রের বৃত্তিরচনা।—অলমতি বিস্তরেণ।

তীর্থের পথে

[শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পরেশ কোলে এবং উমেশ মণ্ডল উভয়েরই তিনকাল গিয়া এক কাল ঠেকিয়াছিল। আবাল্য উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী। আবাল্য তাহারা পরস্পরের বন্ধু।

অনেক দিন হইতে দুইজনে স্থির করিয়াছিল, একবার পুরী যাইবে, কিন্তু আজ না কাল করিতে করিতে, দিন ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তাহাদের পুরী-যাত্রা আর ঘটিয়া উঠিতেছিল না।

পরেশ কোলে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ; বাড়ীতে তাহার দশটা ধানের মরাই বাঁধা, গোলা-ভরা রবিশস্য, ক্ষেত্র-ভরা শাকসব্জি; তবে নগদ টাকা অধিক ছিল না।

উমেশও চাষ করিত; সে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ধান কলাই ছাড়া তাহার আর একটা চাষ ছিল, সেটা গুটির আবাদ; প্রতি বৎসর এই গুটির চাষে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত। এই উপায়ে সে নগদও কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল।

একদিন উমেশ, পরেশের নিকট আসিয়া বলিল—"তবে, পরেশ, পুরী যাচ্ছ কবে?"

অপ্রসন্ন মুখে পরেশ বলিল,—"আরে রোস ভাই, এবছরটা আমার মহা-দুর্বৎসর; এই দেখ না, এই আটচালা ছাইতে বসলুম, মনে করেছিলুম শ' খানেক টাকা হলেই হ'য়ে যাবে; আর প'ড়ে গেল কিনা তিনশ টাকা, তাতেও সব শেষ হয়নি। নাগাত গ্রীষ্ম যাওয়া যাবে, অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? জগবন্ধু যদি টানেন ত' সেই সময়েই যাব।"

"আমার ত' মনে হয়, আর যাচ্ছি যাব করা উচিত নয়, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি চল। আর বসন্তকালই ত' সব চেয়ে ভাল।"

"তা ত' বুঝলুম, কিন্তু আমার যে এখনও ঘর ছাওয়াই শেষ হয়নি। এমন ক'রে আর্দ্ধেক ক'রে ফেলে যাই কি ক'রে।"

"আহা কি কথাই ব'ল্লে! কেন বাপু, তোমার বাড়ীতে দেখবার কি আর কোন লোক নেই?"

"কাকে ভার দিয়ে যাই বল? বড় ছেলেটা যে তেড়েল, তাকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি কই?"

"কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, আমাদের মৃত্যুর পর ওদেরই ত' এসব দেখেশুনে চালাতে হবে,—তখন? আমার ত' মনে হয়, এই বেলা থেকেই তাদের এসব বিষয়ে একটু একটু ভার দেওয়া উচিত; তা নইলে শেষে পারবে কেন?"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে কি জান, একটা কাজে হাত দিয়ে সেটা যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণ ছেড়ে যেতে মন কেমন করে।"

"হায় বন্ধু! মানুষ কি সব কাজই শেষ ক'রে যেতে পারে? আর……"সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পরেশ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"এবছর এই ঘরটা তুলতে আমার অনেক খরচ পড়ে গেছে, তাই ব'লছি খালি হাতে ত আর তীর্থ-যাত্রা করা চলে'না; অন্ততঃ শ' দুয়েক টাকা হাতে রাখা দরকার, হাঁটা-পথ কি জানি, কখন কি দরকার পড়ে! তা হ'লেই দেখ সেত বড় চাট্টি-খানি টাকা নয়!"

উমেশ হাসিয়া বলিল,—"পথে এস বন্ধু! তোমার আবার টাকার অভাব! নাও—এখন একটা ঠিক ক'রে ফেল কবে যাবে, আমিও টাকাটা যোগাড় ক'রে ফেলি।"

"ও হরি! কে জানে বাপু, তুমি এমন টাকার কুমির! আচ্ছা কোত্থেকে এখন টাকা পাবে?"

"বাড়ীতে গিয়ে দেখিগে, ক'টাকা আছে, তার পর গোটাকতক রেশমের পোকা হরিশ পোড়েলকে বেচে দেব। সে অনেক দিন থেকে কিনতে চাচ্ছে।"

"কিন্তু এবছর রেশম যদি বেশী হয়, তা হ'লে পরে তোমায় পস্তাতে হবে।"

"পস্তাব?—আমি? না বন্ধু, জীবনে কখনও পস্তাইনি; আর এ বয়সেও পস্তাব না। জীবনটাকে বিশ্বাস কি? এই আছি, এই নেই; সামান্য কটা টাকার জন্যে জগবন্ধু দেখা হবে না, এও কি একটা কথা হ'ল?"

২

অবশেষে উমেশেরই জয় হইল। পরদিন প্রাতে পরেশ তাহার নিকট আসিয়া বলিল,—"সেই ভাল, চল আমরা পুরী যাই। জীবন-মরণ ভগবানের হাতে; কবে মরে যাব কে জানে, এই বেলা শক্তি থাকতে থাকতে চল একবার ঘুরে আসি।"

ইহার এক সপ্তাহ পরে উভয়ে হাঁটা-পথে পুরী-যাত্রা করিল। পরেশ সঙ্গে প্রায় পাঁচ শত টাকা লইয়াছিল, উমেশ লইয়াছিল তিন শত টাকা।

যাইবার সময় পরেশ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৃহস্থালীর সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া যাইতেও ভুলে নাই। কখন কোন্ জমির ঘাস নিড়াইতে হইবে, কোন শস্য কাটিতে হইবে, অসম্পূর্ণ চালাটার আর কি কি করিতে হইবে প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়াছিল। উমেশ কেবল স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহার বিক্রীত গুটিগুলা হইতে তাহাদের গুটিগুলা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে। বিক্রীত গুটির কোনটা তাহার গুটির নিকট পলাইয়া আসিলে ক্রেতাকে সেটি ফিরাইয়া দিবে। অধর্ম্ম যেন কোন মতেই করা না হয়। তাহার পর গৃহস্থালীর কথা উঠিলে, সে তাহার পুত্রকে বলিল,—"এখন তোমরাই এর মালিক হ'লে; যেমন ক'রলে সুবিধে হয়, তেমনি ক'র।"

এইভাবে গৃহস্থালীর সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া দুইজনে পুরীযাত্রা করিল। পুত্রেরা গ্রামের শেষ অবধি পিতাদের সহিত আসিয়া বিদায় লইল।

উমেশ তীর্থযাত্রা করিয়া প্রাণে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিল এবং গ্রাম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন হইতে গৃহস্থালীর সমস্ত চিন্তা মুছিয়া গেল। এখন তার একমাত্র চিন্তা হইল, পরেশকে তুষ্ট করা। কি করিলে তাহার সহিত মনোমালিন্য হইবে না, সে তাহাই ভাবিতেছিল। আর ভাবিতেছিল, কি করিলে ভালয় ভালয় পুরী পৌছিবে এবং সেখান হইতে গৃহে ফিরিবে। পথে সে অন্য কোন কথা কহে নাই; মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব কবির ভক্তির গাথা গুন্ গুন্ করিয়া গায়িতেছিল,—

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥"

রাত্রে যখন কোন গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইত, তখন সে গৃহস্বামীর সহিত নানা ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিত। এইভাবে তাহার যাত্রা বেশ আনন্দময়ই হইয়া উঠিতেছিল। একটা অভ্যাস সে কিন্তু তখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই,—সেটা নস্য। পথে ঘাটে যেখানে সেখানেই সে নস্য লইত, এটা না হইলে সে এক পাও চলিতে পারিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে সে নস্যর ডিবাটা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; পথে একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে তাহার নিকট হইতে খানিকটা নস্য সংগ্রহ করিয়া লইল; মধ্যে মধ্যে পিছাইয়া পড়িয়া সে তাহাই লইতেছিল; পিছাইয়া পড়িবার উদ্দেশ্য—পাছে পরেশ দেখিতে পাইয়া, তাহার ভাগ বসায় এই মাত্র!

পরেশও বেশ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল; কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা বা কটুকথা বলা, সেও এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু উমেশের মত মন হইতে গৃহস্থালীর সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই। মন তাহার তখনও সেই চিন্তায় পূর্ণ; গৃহে কে কি করিতেছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ চলিতেছিল। পুত্রকে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে ভুল হয় নাই ত?—সে কি সব ঠিক তাহার উপদেশ-মত কাজ করিতেছে?—ইত্যাদি চিন্তা একটির পর একটি করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। পথে যাইতে যাইতে কোথাও আলু-পোতা হইতেছে বা জমি-চষা হইতেছে দেখিলে, সে মনে মনে ভাবিত, তাহার পুত্রও ঠিক সেইটি করিতেছে কি না। তাহার তখন ইচ্ছা হইত, একবার ফিরিয়া গিয়া দেখিয়া আসে, তাহার পুত্র এখন কি করিতেছে, তাহার উপদেশ-মত কতদূর কি করিল। আর যদি গিয়া দেখে, সে তেমনটি করে নাই তবে না হয় সেই করিয়া দিয়া আসিবে!

৩

তাহারা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া পথ চলিতেছিল। হাবড়া আর বেশী দূর নহে, ক্রোশ ত্রিশেক মাত্র। সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি থাকায় তাহারা বরাবর টানা পথে যাইতে সাহস করিল না; হাবড়া পুলের নিকট গঙ্গার

পূর্ব্বকূলস্থ আর্ম্মাণি ঘাট হইতে হোর্ম্মিলার কোম্পানীর জাহাজে পুরী যাইবে স্থির করিল। পথে দস্যু-তস্করের ভয় থাকায় তাহারা মাত্র দুইজনে অতগুলি টাকা লইয়া পথ চলিতে সাহস পাইল না।

পথে রাত্রি-যাপন ও তাহার ব্যয়-স্বরূপ তাহাদের প্রত্যেক চটিতেই কিছু কিছু খরচ হইতেছিল। শেষে একটা পরগণায় আসিয়া, আর তাহাদের টাকা দিয়া আহার করিতে হইল না; সে স্থানের অধিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদের গৃহে তাহাদের আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিল। এমনি ভাবে ত্রিশ ক্রোশ পথ চলিয়া, তাহারা এক্ষণে যে স্থানে আসিল, সেখানে দুর্ভিক্ষ সশরীরে বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে আর্ত্তের হাহাকার, দরিদ্রের ক্রন্দন ও কাতর প্রার্থনা; এমন স্থানেও তাহারা আহারীয় পাইল কিন্তু বিনা অর্থে নহে—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী রৌপ্যের বিনিময়ে! মধ্যে মধ্যে এক এক দিন টাকা দিয়াও তাহারা আহার করিতে পাইত না। তাহার কারণ দারুণ খাদ্যাভাব! লোকেরা বলিল—গত পূর্ব্ব বৎসর আবাদ একেবারে হয় নাই; যাহারা সঙ্গতিপন্ন ছিল, তাহারাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। মধ্যবিত্তরা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিল; দরিদ্রেরা দলে দলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিল।

মধ্যে মধ্যে পিছাইয়া সে নস্য লইতে লাগিল

তাহারা একদিন রাত্রিবাসের জন্য একটা গ্রামে রহিয়া গেল। দোকানে মুড়ি বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, তাহারা এককালে চারি আনার মুড়ি কিনিয়া রাখিল; কি জানি, কাল যদি আর খাদ্য না জুটে! সে রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া, ব্রহ্মমুহূর্ত্তেই তাহারা আবার পথ চলিতে লাগিল। প্রায় ক্রোশ তিনেক পথ চলিয়া তাহারা আহারে বসিল। পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া, তাহাতে মুড়ি ভিজাইয়া, আহার করিতে বসিল। তাহার পর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আরও একটু সেই স্থানে বসিয়া রহিল; অবসর বুঝিয়া উমেশ নস্যের মোড়ক খুলিয়া এক টিপ নস্য লইতে লাগিল।

পরেশ বলিল,—"ছিঃ এখনও ও বদ অভ্যেসটা ছাড়্তে পার নি?"

হাসিয়া উমেশ বলিল,—"জানই ত' স্বভাব যায় না ম'লে!"

তাহার পর তাহারা উঠিয়া আবার পথে চলিতে লাগিল; ফাল্গুন-চৈত্রের দারুণ রৌদ্রে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আরও প্রায় ক্রোশ তিনেক চলিবার পর উমেশের অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইল; নিকটে কোন জলাশয় নাই, অদূরে একখানি মৃৎকুটীর মাঠের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া লোকালয়ের পরিচয় দিতেছিল।

উমেশ বলিল,—"পরেশ চল, ঐ বাড়ীটে থেকে একটু জল খেয়ে আসি।"

পরেশ বলিল,—"আচ্ছা, তুমি তা হ'লে চট্ করে খেয়ে এস, আমার তেষ্টা পায়নি, আমি ততক্ষণ গুটি-গুটি এগুই।"

"তবে তুমি এগোও, আমি এক দৌড়ে গিয়ে জল খেয়েই তোমার কাছে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা।"—বলিয়া পরেশ অগ্রসর হইল। উমেশ জলপানার্থ কুটীরের দিকে চলিতে লাগিল।

সেটি একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কাদার লেপ দিয়া পরিষ্কারভাবে দেওয়ালগুলি মাটি-ধরান। দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র জানালা ঝাঁপের মত কাঠি দিয়া বন্ধ। মধ্যে একটি দ্বার। চালের পাতাগুলা অতি পুরাতন, মট্‌কায় খড় মোটেই ছিল না। সেটি যে বহুদিন সারান হয় নাই, দর্শকমাত্রেই প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা বুঝিতে পারিত। চালের বামদিকের কতকটা অংশে গোলপাতারও অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। দ্বার ঠেলিতেই সেটি খুলিয়া গেল। উমেশ দেখিল, এটি ভিতরে যাইবার রাস্তা বা সদর ঘর মাত্র, ভিতরে আরও কয়েকখানা চালা আছে; তবে সকলগুলির অবস্থাই প্রায় একরূপ।

দ্বারপথে উমেশ দেখিতে পাইল, সম্মুখে মাটির উপরে একটা লোক পড়িয়া আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝিতে পারিল, লোকটা কৃষক। লোকটা যখন সে স্থানে শয়ন করিয়াছিল, তখন বোধ হয়, সেখানে রৌদ্র ছিল না কিন্তু এখন সূর্য্য ঘুরিয়া আসায় তাহার সমস্ত রশ্মিটুকু লোকটার মুখের উপর পড়িয়াছিল; উমেশ দেখিল, সে নিদ্রিত নহে, কিন্তু তথাপি একইভাবে মড়ার মত পড়িয়া আছে! সে তাহাকে ডাকিয়া একটু জল চাহিল। কিন্তু লোকটা একবার নড়িলও না!

তাহার মনে হইল,—লোকটার বোধ হয়, অসুখ ক'রে থাকবে! আর তা না হয়ত অতিথি-ভিক্ষুককে মুখ তুলে দেখেও না। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় দ্বারের নিকট গিয়া শুনিল, একটা শিশু কাঁদিতেছে। সে আবার বাহিরের দ্বারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল।

"ওগো ও বাছা!" কোন উত্তর নাই।

সে হাতের লাঠিটা দোরের উপর মারিয়া তারপর ডাকিল।

"দোহাই বাপু কেউ যদি থাক ত সাড়া দাও।"

তথাপিও কোন উত্তর পাইল না—

"ভগবানের দোহাই, অতিথি আমি, বড় তেষ্টা পেয়েছে, শুধু একটু খাবার জল চাই।"

তথাপিও কোন উত্তর আসিল না।

বিরক্ত হইয়া সে ফিরিতে যাইতেছিল, এরূপ সময়ে তাহার মনে হইল ঘরের মধ্যে কে যেন গোঙাইতেছে।

"তাই ত' এদের ব্যাপার কি? কোন বিপদ আপদ হয়নি ত? যাই হ'ক একবার ঢুকে দেখতে হ'ল।"

উমেশের আর ফেরা হইল না। সে কুটীরে প্রবেশ করিল।

৪

সেই অপ্রশস্ত গলিপথে অগ্রসর হইয়া সে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারটি ভেজান ছিল, সে ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। এবার সে গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই রন্ধন গৃহ; কাষ্ঠ ও ধূমের চিহ্ন ঘরটিকে দাগা-ষাঁড়ের মতই যে কোন লোকের সম্মুখে পরিচিত করিয়া দিত। এ ঘরের দ্বার খোলা ছিল। উমেশ একেবারে গিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, একজন প্রৌঢ়া উপু হইয়া বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আছে, তাহার পার্শ্বে একটি মলিন শীর্ণ বালক পড়িয়া রহিয়াছে;—ক্ষুধায় বালকের উদরের অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। সেই বালক প্রৌঢ়ার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিয়া খাবার চাহিতেছিল এবং কোন উত্তর না পাইয়া দারুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিল। এমনি একখানি কক্ষে উমেশ প্রবেশ করিল। কক্ষের বায়ুটা দারুণ কষ্টকর; উমেশের মনে হইল, যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। সে একেবারে ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল—গৃহের এক কোণে আর একজন রমণী পড়িয়া আছে; রমণী সটান হইয়া পড়িয়াছিল; গলা হইতে একটা অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইতেছিল; মধ্যে মধ্যে এক একটা হস্ত-পদ ছুড়িতেছিল; ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ রমণীর দিক হইতে হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। উমেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, রমণী বিষম পীড়িত কিন্তু তাহার সেবা করিবার কেই নাই। এই সময় প্রৌঢ়া মুখ তুলিয়া উমেশের দিকে চাহিল।

"কি চাও গা ? কি ক'ত্তে এসেছ বাছা ? আমাদের ত' আর কিছু নেই !"

"আমি একজন তীর্থযাত্রী, পথে যেতে যেতে ভারি তেষ্টা পেলে, তাই একটু জল-খেতে এসেছি।"

"হুঁ, জল ? কেউ নেই—ওগো কেউ নেই, আমাদের একটু জল এনে দেয়, এমন একজন লোকও আমাদের নেই ; তুমি তোমার পথ দেখ বাছা।"

"আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এমন এক-জনও কেউ সুস্থ নেই যে, ঐ রমণীটির সেবা করে ?"

"না—কেউ নেই, কেউ নেই। বাইরে আমার ছেলে ম'রছে, আর আমরা মরছি, এই ঘরের ভেতর।"

আগন্তুককে দেখিয়া ছোট ছেলেটা থামিয়াছিল। কিন্তু প্রৌঢ়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, সেও আবার নবীন উদ্যমে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। আবার তেমনি করিয়া প্রৌঢ়ার বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া খাবার চাহিতে লাগিল।

"বড় ক্ষিদে পেয়েছে ঠাকুমা,—ও ঠাকুমা খেতে দে না !"

একজন প্রৌঢ়া উপু হইয়া বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আছে

উমেশ প্রৌঢ়াকে আরও কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময়ে পূর্ব্বোক্ত লোকটা মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ! এতক্ষণ হাতে ও পায়ে ভর দিয়া সে কোনরূপে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া আর কিছুতেই আপনাকে সোজা রাখিতে পারিল না, এক কোণে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার উঠিবার প্রয়াস মাত্র না করিয়া অস্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"রোগে ধ'রেছে......আমাদের......বড় ......দুর্ব্বৎসর !...ছোঁড়াটা......ক্ষিদেয় ম'রে গেল।"—এই বলিয়া সে রোরুদ্যমান বালকের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল, তাহার পর হাঁপাইতে লাগিল !

উমেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। আপনার বস্ত্রাঞ্চল-বদ্ধ মুড়ির রাশি সকলের সম্মুখে খুলিয়া দিল। লোকটা একবার লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিল কিন্তু লইয়া আহার করিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া সেই ক্ষুদ্র বালক এবং অদূরে শায়িতা একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখাইয়া বলিল,—"ওদের দাও।"

বালক সেই মুড়ির রাশি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তাহার দুইটি ক্ষুদ্র হস্তে যতগুলি ধরে, সবগুলি একত্র মুখে পুরিবার ব্যর্থপ্রয়াস করিল ; কিন্তু পারিল না, অধিকাংশই মাটিতে পড়িয়া গেল। বালিকা এতক্ষণ একপার্শ্বে নীরবে শুইয়াছিল, এক্ষণে মুড়ি দেখিয়া, সেও উঠিয়া আসিল এবং লোলুপনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু আহার করিতে সাহস করিল না।

উমেশ তাহার ভাব বুঝিয়া বলিল,—"ভয় কি দিদি, আয়, খা।"

বালিকাও আহারে বসিল। অতঃপর উমেশ প্রৌঢ়াকেও কতকগুলি মুড়ি দিল; ক্ষুধার দারুণ তাড়নায় বিনা দ্বিধায় সে ভোজন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল,—"একটু জল; একটু জল যদি এনে দিতে বাছা, ছোঁড়া-গুলোর মুখে আটা বেঁধে গেছে! কাল আমি একবার জল আনতে গেছলুম—কাল কি না আজ?—কে জানে বাছা, মনে নেই—তা খানিকটে গিয়েই পড়ে গেলুম, আর জল আনতে পারলুম না; যদি কলসীটা কেউ না নিয়ে গিয়ে থাকে ত' সেই খানেই পড়ে আছে।"

পুকুরঘাট কোথায় প্রৌঢ়ার নিকট তাহা জানিয়া লইয়া উমেশ বাহির হইয়া গেল। মধ্যপথে দেখিল, তখনও কলসীটা পড়িয়া আছে, তবে কেহ লইয়া যায় নাই! শীঘ্রই সে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল; সকলে মিলিয়া আকণ্ঠ জলপান করিল। প্রৌঢ়া এবং শিশুদ্বয় জলে ভিজাইয়া আরও চারিটি মুড়ি খাইল; কিন্তু পুরুষটা একটা মুড়িও দাঁতে কাটিল না।

উমেশের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের উত্তরে সে বলিল,—"আমি ও খেতেই পারব না।"

এইবার উমেশ বাজার গিয়া কয়েকটা হাঁড়ি, চাউল, ডাল প্রভৃতি রন্ধনের উপযোগী সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া আসিল। সম্মুখেই একখানা কুঠার পড়িয়াছিল; উমেশ সেই কুঠারের সাহায্যে কাঠ কাটিয়া রন্ধন করিল এবং অভুক্ত গৃহস্থকে আহার করিতে দিল। এতক্ষণ অবধি যুবতীর সংজ্ঞার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই, সে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল। উমেশ একটু একটু করিয়া তাহার মুখে সদ্যপ্রস্তুত উষ্ণ ঝোল ঢালিয়া দিল।

ক্ষুদ্র বালিকা উমেশকে রন্ধন-কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল।

৫

রন্ধন শেষ হইলে সকলে আহার করিল; পুরুষটি এবং প্রৌঢ়া খুব অল্পই আহার করিল;—অধিক আহার করিল, বালক-বালিকাদ্বয়। তাহারা আহার শেষ করিয়া শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল।

মাতা ও পুত্র উমেশের পার্শ্বে বসিয়া একে একে তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

"বরাবরই আমরা গরীব। যে বছর আকাল হল, সে বছরে আমাদের চাষের ফসল যা পেলুম, হেমন্ত অবধি অতি কষ্টেস্৷ষ্টে দিন কেটে গেল। যখন আমাদের সমস্ত সঞ্চয় খরচ হ'য়ে গেছে, এমন সময় শীত এসে উপস্থিত! নিরুপায় আমরা, পোড়া পেটের দায়ে প্রতিবেশীর কাছে, রাস্তার লোকের কাছে, ভিক্ষে ক'রে কোন রকমে দিন চালাতে লাগলুম। প্রথম প্রথম লোকের কাছে বেশ ভিক্ষে মিলতো কিন্তু ক্রমাগত আর ক'দিন তারা দিবে, শেষে নিরাশ করে তাড়িয়ে দিতে লাগল। জনকতক আমাদের বড় ভাল বাসতো, তারা কিন্তু আমাদেরই মত ফকির, নিজেদেরই দিন কাটে না, আমাদের দেবে কি? রোজ রোজ চাইতে আমাদেরও লজ্জা ক'রত; চারদিকে দেনা, চারদিকে দেনা, টাকার দেনা, চালের দেনা, ডালের দেনা, সংসারের সব জিনিষ ধার ক'রে খেয়েছি কিন্তু দেবার সামর্থ্য নেই; দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যোগাড়।"

তাহার পর পুত্র বলিতে লাগিল,—"আমি কাজের চেষ্টায় বেরুলুম। মজুররা তখন কেবল আপনার খোরাক নিয়ে সারাদিন কাজ ক'রছে। তাও আবার রোজ কাজ মেলে না; একদিন যদিবা ঘণ্টা চারেকের কাজ মিল্‌লো ত, অমন দুদিন মোটে কিছুই মিল্‌লো না, কাজের বাজার ত' এই! তারপর আমার মা, আর এই মেয়েটা ভিক্ষে ক'রতে বেরুল; কিন্তু চালের বাজার এমনি গরম যে, লোকে এক মুঠো ভিক্ষে দিতেও নারাজ। তবু আমরা কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলুম, মনে করলুম; আসচে বছরের ধান-কাটা অবধি এমনি ক'রে কোন রকমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকবো। কিন্তু বসন্ত নাগাদ লোকে ভিক্ষে দেওয়া একবারে বন্ধ ক'রে দিলে; তারপর সময় বুঝে রোগও এসে শরীরে ঢুকলো; দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকেই গড়াতে লাগলো; একদিন দুটো ভাত মুখে দিয়ে দুদিন উপোস দিতুম। তারপর ঘাস খেতে আরম্ভ ক'রলুম; সেই ঘাস খেয়েই কি, কি খেয়ে কে জানে, আমার স্ত্রীর অসুখ হ'ল; সেই থেকে ও আর উঠে দাঁড়াতে পারত না, আমারও গায়ে একটুও জোর ছিল না; সারবারও ত' কোন উপায় দেখতে পেলুম না।"

এইবার প্রৌঢ়া বলিতে লাগিল,—"দিন কতক একাই আমি যুঝতে লাগলুম; কিন্তু অনাহারে আর কদিন যুঝব?

শরীর ভেঙ্গে প'ড়ল, ভয়ানক দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়লুম। মেয়েটাও বড় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ল। আমি ওকে পড়্সীদের কাছে যেতে ব'ললে ও আর নড়ত না, গুড়িমেরে এক কোণে প'ড়ে থাকত। এই পরশু দিন একজন পড়্সী আমাদের দেখতে এসেছিল; কিন্তু যখন দেখলে যে, আমরা রোগে প'ড়ে, ক্ষিদেয় হাঁ ক'রে আছি, তখন সে ছুটে পালাল। তারই স্বামী মরণাপন্ন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে দেয়, এমন ক্ষুদটুকু পর্য্যন্ত তার ঘরে নেই। কাজেই নিরুপায় আমরা মরণের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলুম।"

তাহাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়া উমেশ সেদিন আর পরেশের উদ্দেশে যাত্রা করিল না। সারারাত্রি সেই স্থানেই কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়াই সে নিজের ঘরের মত এই কৃষক-গৃহস্থের গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়া দিল, প্রৌঢ়ার সাহায্যে তরকারি কুটিয়া সে উনন জ্বালিল। তাহার পর বালিকাকে সঙ্গে লইয়া বাজার হইতে রন্ধন করিবার দ্রব্যাদি কিনিতে গেল। দুর্ভাগ্য পরিবার পেটের দায়ে গৃহের সব কয়খানি বাসন বেচিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই হাতা-বেড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া, উমেশ পরিবার কাপড় পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই দুই একটা করিয়া কিনিয়া আনিল। একদিন, দুইদিন করিতে করিতে এই কৃষক-গৃহে তাহার তিন দিন কাটিয়া গেল। ক্ষুদ্র বালক ও বালিকা, বৃদ্ধ উমেশকে নূতন করিয়া মায়ার জালে জড়াইয়া ফেলিতে ছিল। সারাদিনের মধ্যে একবার ও তাহারা উমেশের কাছ ছাড়া হইত না, দিবারাত্র "দাদামশাই! দাদামশাই!" করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিত।

দিনে দিনে প্রৌঢ়া বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। একদিন সে প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াইতেও গেল। তাহার পুত্রও দিন দিন সুস্থ হইতেছিল; দেওয়াল ধরিয়া এখন সে একটু একটু হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল;—তখনও পর্য্যন্ত সুস্থ হয় নাই, কেবল সেই যুবতী; কিন্তু দিনে দিনে সেও একটু একটু করিয়া সারিয়া উঠিতে ছিল; তৃতীয় দিনে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

এই সময় উমেশের মনে হইল,—"পথে এত দেরী ক'রতে হবে, তা'ত একদিনও ভাবিনি, এইবার বেরিয়ে প'ড়ব।"

৬

চতুর্থদিন একাদশী। উমেশ ভাবিল, আজ আর যাই না, দ্বাদশীর দিন যাইব।

সে দিন বাজার হইতে দুগ্ধ ও ময়দা আনিয়া উমে প্রৌঢ়ার সহায়তায় রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিল এতদিন পরে আজ যুবতী উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল তাহার স্বামী পূর্ণ সে দিন উমেশের আনীত একখানি ন বস্ত্র পরিয়া আহারাদি সারিয়া মহাজনের নিকট গমন করিল এই মহাজনের নিকট তাহার চাষের জমিটুকুও মর্ট্‌গেজ দেওয়া ছিল; এক্ষণে পূর্ণ তাহার নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া জমিটা চষিবার অনুমতি আনিতে গেল। সন্ধ্যার সময় যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখখানি অত্যন্ত বিষণ্ণ; উমেশ নিকটে আসিতেই বেচারা নৈরাশ্যের দারুণ যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলিল। মহাজন বলিয়াছে—"দয়া টয়া আমার নেই; টাকা দিয়ে তারপর অন্য কথা কও।"

উমেশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল;—"তাইত' এখন এদের চলে কি ক'রে? অন্য লোকে আর দুদিন পরেই ধান বুনবে কিন্তু এরা তখন ক'রবে কি? এবছর যে রকম ধান হ'য়েছে, সে গুলোও যদি বেচারা ঘরে তুলতে পারে, তাহ'লেও খাবার জন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু মহাজনের কাছে জমি মর্ট্‌গেজ দেওয়া রয়েছে, সে ধান কাটতে দেবে কি? তা যদি না দেয়, তবে আমিও চ'লে যাব, আর এরাও আবার যমের বাড়ী যেতে ব'সবে।"

উমেশ দুমনা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতে ছিল, আর তিলমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, পুরীর পথে অগ্রসর হইবে; আবার দয়া আসিয়া, তাহার সে ইচ্ছায় বাধা দিতে ছিল। অবশেষে সে স্থির করিল, সে দিন আর যাইবে না, পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিবে। দাওয়ায় একখানা চেটা পাতিয়া সে শয়ন করিল; কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিল, পুরী-যাত্রায় আর কোনমতেই বিলম্ব করা উচিত নহে; কিন্তু তাহা হইলে এ অভাগা পরিবারের কি উপায় হইবে?

"এর দেখছি শেষ নেই। প্রথমে আমি এদের চারটি মুড়ী একটু জল দিয়ে যাব মনে করলুম; কিন্তু দেখ গড়াল কতদূর! মাঠটা ত উদ্ধার না ক'রলে চ'লবে না; তারপর

মাঠ উদ্ধার হ'লেই দুটো ছেলে গরু চাই, একখানা নাঙ্গল চাই। বাঃ ভাই উমেশ, বেশ জালে জড়িয়ে পড়েছ তুমি!"

উমেশ উঠিয়া বসিল। কোমর হইতে নস্যের মোড়কটা বাহির করিয়া এক টিপ নস্য হইল। তাহার পর আবার ভাবিতে বসিল।

কিন্তু না। চিন্তার ত শেষ নাই। একটার পর একটা করিয়া, কত কথাই সে চিন্তা করিল; কিন্তু কই কিছুত স্থির করিতে পারিল না। আবার শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছিল; উমেশের এতক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা আসিতেই সে স্বপ্ন দেখিল,—অকস্মাৎ কে যেন তাহাকে ডাকিয়া উঠিল। সে উঠিয়া চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, পুঁটুলী ও লাঠি লইয়া, যেন পুরী যাইবার জন্য যাত্রা করিল। বাহিরে আসিতে তাহার চাদরটা বেড়ায় আটকাইয়া গেল, কাছাটা কিসে বাধিয়া গেল। সেগুলা ছাড়াইতে গিয়া দেখিল, চাদর বেড়ায় আটকায় নাই, পূর্ণর সাত বৎসরের কন্যা তাহার চাদর টানিয়া ধরিয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের বালক তাহার কাছাটা ধরিয়াছে। সে তাহাদের দিকে ফিরিতেই উভয়ে বলিয়া উঠিল,—"দাদামশাই, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে না!" পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, পূর্ণ এবং তাহার মাতা জানালা দিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

এই সময়ে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া উঠিল; মনে মনে বলিল,—"আজ আমি এদের মাঠটা উদ্ধার করে দেব, এক জোড়া ছেলে আর একটা বকনা কিনে দেব; লাঙ্গলও একটা কিনতে হবে। তা না হলে পুরী যাওয়াই আমার মিথ্যে, জগবন্ধু এ পাপীকে দেখা দেবেন না।"

সকালেই সে মহাজনের ত্রিশটি টাকা সুদ সমেত দিয়া পূর্ণর জমিটি ছাড়াইয়া আনিল; এক খানা কাস্তে ও একটা নিড়ানও সেই সময় বাজার হইতে কিনিয়া আনিল; পূর্ণ এইগুলা লইয়া ধান কাটিতে গেল। উমেশ আবার গ্রামের দিকে চলিল। পথে যাইতে যাইতে শুনিল, ফাঁড়িতে আজ দুইটা ছেলে গরু নিলাম হইবে। সে সত্বর সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, বাইশ টাকায় সে দুইটি কিনিয়া লইল; তাহার পর কুড়িটাকার ধানকিনিয়া গরুর উপর বোঝাই দিয়া পূর্ণর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। পথে একটা গাইগরু এবং একখানা লাঙ্গল সংগ্রহ করিতেও ভুলিল না।

উমেশের আনীত দ্রব্যাদি দেখিয়া পূর্ণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—"এসব কোথায় পেলে খুড়?

"ভারি সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল, তাই কিনে আনলুম। যাও, গরুগুলোকে বেঁধে দিয়ে ধানগুলো গোলায় তুলে রাখ। যতদিন ক্ষেতের ধান ঝাড়া না হয়, তদ্দিন এগুলোতে তোমাদের একরকম দিন কেটে যাবে।"

সে উমেশের নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য করিল। সে রাত্রে বড়গরম বলিয়া উমেশ বাহিরের দাওয়ায় চেটা পাতিয়া শয়ন করিল। আপনার জিনিষ-পত্রগুলাও কাছে রাখিতে ভুলিল না। তাহার পর বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে, সে ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িল। পরেশকে ধরিবার উদ্দেশে সে জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল।

৭

প্রায় চারিক্রোশ পথ চলিবার পর উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে আগমনের পূর্ব্বাভাষ অঙ্কিত করিয়া দিলেন। উমেশ শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। কোমর হইতে গেঁজে খুলিয়া অবশিষ্ট মুদ্রা গুণিয়া দেখিল, মোট কুড়িটি টাকা পড়িয়া আছে!

এই সামান্য পাথেয় লইয়া সে সমুদ্র-যাত্রা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। পথে ভিক্ষাকরা অপেক্ষা পুরী না যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হইল। তখনই তাহার পুরী যাইবার অঙ্গীকারের কথা মনে পড়িল। সে মনে মনে বলিল,—"এজন্মে আর সে অঙ্গীকার পূর্ণ হ'ল না। জগবন্ধু, ক্ষমা কর!"

কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া বাটীর পথে চলিতে আরম্ভ করিল। পাছে পূর্ণর সহিত আবার সাক্ষাৎ হয়, এইভয়ে সে আর সে পথে না গিয়া অন্য পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আসিবার সময় যে পথ তাহার নিকট দীর্ঘ ও ক্লেশকর হইয়াছিল, ফিরিবার সময় ভগবানের করুণাস্নাত উমেশ, সে পথে কিছু মাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিল না। অবলীলাক্রমে দিনে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

সে যখন বাটী পৌঁছিল, তখন ধান-কাটা শেষ হইয়াছে। তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া, বাটীর সকলেই আনন্দ প্রকাশ

করিল। সকলেই উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করিয়া সে পরেশের পিছনে পড়িল, তাহার পর আর পুরী অবধি যাইল না কেন? উমেশ কাহাকেও সদুত্তর দিল না।

সে বলিল,—"জগবন্ধুর ইচ্ছে নয় যে, আমি পুরী যাই। পথে আমি পেছিয়ে পড়েছিলুম, টাকাগুলোও সব খরচ হ'য়ে গেছে; দোহাই জগবন্ধুর, আর তোমরা কিছু জান্‌তে চেও না।"

তাহার অবর্ত্তমানে, পুত্র সকল কার্য্যই যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিল;—কোন কথাই ভুলে নাই। গৃহেও বেশ শান্তি ছিল।

পরেশের বাটীতে উমেশের আগমনের সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা পরেশের সংবাদ জানিবার জন্য তাহার নিকট আসিল। উমেশ তাহাদিগকেও ঐ উত্তর দিল—"পরেশ একটু জোরে চলে কিনা! আমি খানিক দুর গিয়ে, নউমীর দিন তার কাছে থেকে অনেকটা পেছিয়ে পড়ি; আবার আমি তাকে ধ'রতে চেষ্টা ক'রেছিলুম কিন্তু মেলা বেগড়া প'ড়ে গেল আর তাকে ধ'রতে পারলুম না। তার পর সঙ্গের পুঁজিও খোয়ালুম, কাজেই বাধ্য হ'য়ে ফিরতে হ'ল।"

লোকে তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উমেশের মত লোকেও এমন বোকামি করে! এক জায়গায় যাব বলে বেরিয়ে, পথের মাঝে পুঁজি খুইয়ে ফিরে এল গা! দুই একদিন লোকে তাহার বিবেচনাকে ধিক্কার দিয়া, তাহার পর সে প্রসঙ্গ এক প্রকার ভুলিয়াই গেল। উমেশও স্মৃতি হইতে এই অতীতের ঘটনাটি মুছিয়া ফেলিল। পূর্ব্বের ন্যায় আবার সে গৃহস্থালী কাজকর্ম্মে মন দিল।

৮

উমেশ যেদিন জলপান করিবার জন্য পরেশকে অগ্রসর হইতে বলিয়া পূর্ণর কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল, পরেশ সে দিন বহুক্ষণ অবধি উমেশের প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটা গাছতলায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে উমেশের প্রত্যাগমন-পথ চাহিয়া রহিল কিন্তু উমেশ ফিরিল না। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। ওদিকে সূর্য্যও প্রায় ডুবু ডুবু। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত উমেশের দেখা নাই!

অবশেষে তাহার মনে হইল, তবে বোধ হয়, সে অন্য পথ দিয়া আগে গিয়াছে, তাহা না হইলে এখনও ফিরিল না কেন? এ পথ দিয়া যাইলে, নিশ্চয়ই সে উমেশকে দেখিতে পাইত এবং পরেশও তাহাকে দেখিতে পাইত। তবে সে কি করিবে, আবার ফিরিয়া যাইবে নাকি? কিন্তু সে যদি আগে গিয়া থাকে, তবে ত ফিরিয়া গেলে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না! কাজেই সেও অগ্রসর হইতে লাগিল; মনে করিল, রাত্রি-বাসের জন্য তাহাকেও ত চটিতে আশ্রয় লইতে হইবে, সেই স্থানেই আবার উভয়ে একত্র হইবে।

রাত্রি-বাসের জন্য চটিতে উপস্থিত হইয়া, সে উমেশের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু উমেশ কই? সারারাত্রি সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিল, উমেশ কিন্তু আসিল না। অবশেষে তাহার সহিত সাক্ষাতের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়া, সে একাকীই আর্ম্মাণি ঘাটের দিকে চলিতে লাগিল। পথে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে উমেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেও বিস্মৃত হইল না; কেহই কিন্তু উমেশের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। পরেশ বিস্মিত হইল, তবে সে গেল কোথা?

তখনও সে উমেশের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই; তখনও তাহার মনে হইতেছিল—"তারসঙ্গে আর্ম্মাণির ঘাটে দেখা নিশ্চয়ই হবে। সে এগিয়ে যাবার লোকই নয়!"

যথাসময়ে সে ষ্টীমার-ঘাটে পৌছিল। পথ মধ্যে তাহার আর একজন সঙ্গী জুটিয়াছিল; সে এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীও পুরী যাত্রী। পরেশ তাহার নিকট শুনিল, সে নাকি আরও দুইবার পুরী গিয়াছিল,—এই তাহার তৃতীয় যাত্রা। কাজেই এরূপ একজন 'সবজান্তা' লোকের সাহচর্য্য পাইয়া, সে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

অন্যান্য যাত্রীর সহিত সেও একখানা যাওয়া-আসার টিকিট কিনিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া বসিল।

সারাদিন জাহাজখানা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই সমুদ্র-জল আলোড়িত করিয়া অগ্রসর হইল; কিন্তু রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল, দারুণ পূর্ব্ব-বাতাস এবং বৃষ্টি-বজ্রপাতে জাহাজখানা বিশাল সাগরে মোচার খোলার মতই দুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আরোহি-মহলে একটা দারুণ আতঙ্ক মাথা তুলিয়া উঠিল। পরেশও যথেষ্ট ভয়

পাইয়াছিল। দুইদিন ঝড়-বৃষ্টি সমভাবেই বহিয়া চলিল, তৃতীয় দিনে আকাশ অনেকটা মেঘশূন্য হইয়া আসিল ; এই সময় জাহাজ একটা বন্দরে কিয়ৎক্ষণের জন্য নঙ্গর করিল।

ক্রমে দিনের পর দিন সমুদ্রে কাটাইয়া জাহাজখানা পুরীতে আসিয়া পৌছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে আসন্ন দেবদর্শন জন্য একটা আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। পাণ্ডার দল মধুলোভমত্ত মক্ষিকাকুলের ন্যায় যাত্রীদিগকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। বহুকষ্টে অন্যান্য পাণ্ডার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরেশ একজন পাণ্ডার আশ্রয় লইল। সন্ন্যাসীও তাহার সঙ্গী হইল।

ধূলিপায়ে দেবদর্শন করিয়া সে বাসায় ফিরিয়া কাপড়চোপড়গুলা আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে রাখিয়া স্নান করিতে গেল।

স্নান সারিয়া বাসায় আসিয়া সে যখন টাকা বাহির করিতে গেল, তখন দেখিল, যে দিকটায় দুইশত টাকার কুড়িখানি নোট বাঁধা ছিল, সে দিকটা শূন্য।

পরেশ অতগুলা টাকার শোক সম্বরণ করিতে পারিল না, শোকে দুঃখে হতাশায় সে মাথায় হাতদিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার অর্থপিপাসু প্রাণ অতগুলা টাকা হারাইয়া, দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় সন্ন্যাসীকে সে আর খুঁজিয়া পাইল না।

৯

মর্ম্মাহত পরেশ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল—"অতগুলো টাকা গা!......হায়, হায়, দু'শ টাকা অনর্থক নষ্ট হল! এ সেই ভণ্ড বেটা সন্ন্যাসীর কাজ......আর কেউ না......" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইলে,..."—না, এযে, আমি অন্যায় কথা বলছি—সে যে নিয়েছে, তারই বা প্রমাণ কি?—লোক ভাল কি মন্দ সে কথা বিচার করবার আমার কি অধিকার?—কেন আমি মিথ্যে তার নামে দোষ দিচ্ছি—আরও কেউ ত নিয়ে থাকতে পারে!"

তাহার মন কিন্তু এ কথায় সায় দিতে চাহিল না; সে বলিল,—"আচ্ছা নয় বুঝলুম, সন্ন্যাসী নেয় নি; কিন্তু সে যদি সাধু—তবে পালায় কেন?"

অমনি তাহার মনে হইল,—"সত্যিই ত' তবে সে পালায় কেন?—কিন্তু সে যে পালিয়েছে, তাই বা কে বল্লে? এমনও ত' হ'তে পারে যে, সে দেবদর্শনে গেছে!—আচ্ছা—এসেছি এখানে তিথি করতে, এখানে ব'সে টাকার ভাবনা কেন? মনে কর, আমার সঙ্গে মোট একশ' খানি টাকা ছিল। আর যাবার টিকিটও ত' কেনা র'য়েছে, এদিকে নগদ কুড়ি টাকাও রয়েছে, তবে আমি মিছে ভেবে মরি কেন?—মনে কর, সে টাকা আমার ছিল না—মিথ্যে অতগুলো টাকা সঙ্গে ছিল, ভগবান আর একজনের কাজে লাগিয়ে দিলেন।—বেশই হ'য়েছে। দূর হ'কগে ছাই—ও কথা আর ভাববো না।"

সে চেষ্টা করিয়া মন হইতে টাকার ভাবনা তাড়াইয়া দিয়া দেবদর্শনে চলিল। জগন্নাথ দেবের বিরাট মন্দির মাথা তুলিয়া যেন গগন স্পর্শ করিতে চাহিতেছিল। শুধু মন্দির দেখিয়াই কি এক আনন্দ-বিস্ময়ে প্রাণ পুলক-নৃত্য করিয়া উঠিয়া পরেশের মনে হইল—"এমন জিনিষ আমার চোখের সামনে র'য়েছে, আর আমি তুচ্ছ টাকার ভাবনায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলুম, ছিঃ!"

নাটমন্দির হইতে বিরাট জনসঙ্ঘ মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে এবং বাহিরে আসিতেছে। পরেশ সেই মানবসাগরে মিশিয়া গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিল। পার্শ্বেই তাহার পাণ্ডা। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়া দুই পার্শ্ব হইতে এমনি চাপ পাইল যে, সে আর আগেও যাইতে পারিল না—বাহিরেও আসিতে পারিল না। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখে বিরাট অন্ধকার, দুই পার্শ্বে বিষম চাপ; পরেশের যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

১০

কতক্ষণ পরে সে দেবতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—কি প্রাণোন্মাদক দৃশ্য। সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তিত্রয় পাশাপাশি—একটা বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। মূর্ত্তিত্রয়ের উপর বসান মণিমুক্তাগুলি সে আলোকে নক্ষত্রদলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। পরেশ পলকহীন নেত্রে দারুমূর্ত্তিত্রয় দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার একটা লোকের উপর দৃষ্টি পড়িল, তাহার মনে হইল, ঠিক যেন উমেশ দাঁড়াইয়া আছে!

"হ'তেও পারে, আশ্চর্য্য কি। কিংবা হয়ত ও উমেশ নয়, আর কেউ; তবে ঠিক তার মতন দেখ্‌তে বটে! উমেশ আমার চেয়ে আগে আসবে কি ক'রে! কিন্তু হ্যাঁ এযে সেই!—"

লোকটা পূজা করিতেছিল। এইবার সে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহার মুখ, সেই দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে যে উমেশ! নিশ্চয়ই উমেশ,—সে না হইয়া যায় না! সেই মুখ, সেই চোখ, ঠিক সেই টাক, এ যে পরেশের আবাল্য-পরিচিত উমেশ।

পরেশ তাহাকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইল; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, উমেশ কি করিয়া তাহার পূর্ব্বে পুরী আসিয়া পৌছিল।

"বাঃ বাঃ উমেশ যে একেবারে ঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়েছে; বোধ হয়, কেউ ওকে আগে এনেছে। যাই হোক, আজ আর ওকে ছাড়ছি না, এক জায়গাতেই তুজনে থাকা যাবে।"

উমেশ পাছে ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে পরেশ তাহার উপর বরাবর দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু পূজা শেষ হইলে, সে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল; কোমরে কয়টা টাকা ছিল, পাছে কেহ সেগুলাও চুরি করে, এই ভয়ে সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর যখন সে বাহিরে আসিল, তখন উমেশকে আর দেখিতে পাইল না। অন্যান্য কয়েকটা মন্দির ঘুরিয়া সে ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় ফিরিল।

পরেশ পরদিন আবার যথাসময়ে মন্দিরে আসিল। সেদিন সে সম্মুখে যাইতে চাহিল কিন্তু পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও দারুণ ভিড়ের মধ্যে সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সেদিনও উমেশ দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে!

"ঐ যে উমেশ, আজ আর ওকে ছাড়ছি না।" সে প্রাণপণে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল; কিন্তু যখন সে সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল, তখন উমেশকে আর দেখিতে পাইল না!

পরদিন আবার যখন সে মন্দিরে আসিল, তখন দেখিল, উমেশ ঠিক সেই এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পূজা করিতেছে।

"আজ কিছুতেই উমেশকে ছাড়ছি না। দোর-গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াইগে; ওকেত ওখান দিয়ে যেতেই হবে, সেই সময় ধরবো।"

বেলা প্রায় একটা অবধি সে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কত লোক আসিল যাইল, কিন্তু উমেশ কই?

তিন রাত্রি পুরী-প্রবাস করিয়া অবশেষে পরেশ দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে আর্ম্মাণি ঘাটে নামিয়া পদব্রজে সে বাটী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে পরেশ বাটী ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই শুনিল, উমেশ তাহার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিয়াছে। একথা সে একরূপ শুনিয়াই ছিল। পথে তাহাকে তুই দিন পূর্ণর বাড়ী থাকিতে হইয়াছিল। উমেশ জলপান করিবার জন্য সেই বাড়ীতেই যে একদিন ঢুকিয়াছিল, তাহা সে ভুলে নাই। সেই খানেই সে তাহার বিষয় সকল কথা শুনিল।

পরেশ বাড়ী ফিরিয়াছে শুনিয়া, উমেশ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

প্রথম কুশল প্রশ্নের পর উমেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর পরেশ, জগবন্ধু দেখলে কেমন বল! বেশ নির্ব্বিঘ্নে পৌছুতে পেরেছিলে ত?"

"হাঁা ভাই, পাপ দেহটা একরকম ক'রে টেনে নিয়ে গেছলুম; কিন্তু মন তাঁর চরণে রাখতে পেরেছিলুম কি না......"

"সে কি কথা! আর সে কথা ভেবেই বা ফল কি? পূজো ক'রেছ দেবতাকে—নেওয়া না নেওয়া তাঁর হাত!"

"পূজো ত' করলুন কিন্তু সে অর্ঘ্য দেবতার চরণে পৌছেছে কি? তোমার অর্ঘ্য কিন্তু ঠিক পৌচেছে, নিজে চোখে আমি দেখে এলুম।"

"কি জান ভাই সবই ভগবানের ইচ্ছে, আমরা কি ক'রতে পারি!"

"হাঁা, আর ফেরবার সময় পূর্ণর কুটীরে তু দিন থেকে এলুম। আঃ তারা কি যত্নই ক'রলে, আর তোমার কি সুখ্যাতিটাই......"

পূর্ণর প্রসঙ্গ তুলিতে দেখিয়া উমেশ তাড়াতাড়ি সে কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"থাক এখন ওকথা—আমায় আগে মহাপ্রসাদ দাও!"

পরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পূর্ণর প্রসঙ্গ বন্ধ করিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, দেবতার পূজা করিতে হইলে, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে হইলে, উমেশের মত তাঁহার সৃষ্টজীবের তুঃখমোচন করিয়া, তাঁহার তুষ্টি-বিধান করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আলোকের প্রকৃতি

[শ্রীহেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A.]

দেনমার্ক-নিবাসী রোমর (Romer) নামক এক যুবক জ্যোতির্ব্বিদ্ আলোকের বেগ সসীম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। রোমরের পূর্ব্বে আলোকের বেগ অসীম বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। গ্যালেলিও পরীক্ষা দ্বারাও এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; তবে তাঁহার পরীক্ষা এ বিষয়ে অসম্পূর্ণ। চন্দ্র-উপগ্রহ যেমন আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে সেইরূপ বৃহস্পতি-গ্রহের কতকগুলি উপগ্রহও ঐ গ্রহটিকে বেষ্টন করিয়া অন্তরীক্ষে ঘুরিতেছে। রোমর বৃহস্পতি গ্রহের সর্ব্ববৃহৎ উপগ্রহটির গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং কত কাল পরে পরে ঐ উপগ্রহটি বৃহস্পতির অপরপার্শ্বে পড়িয়া পৃথিবী হইতে দৃষ্টির অগোচর হয়, তাহা দেখিতেছিলেন। ইহা হইতে কোন্ কোন্ সময় উপগ্রহটি দৃষ্টির অন্তরাল হইবে, তাহা গণনা করিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিলেন যে, গণিত সময় ও উপগ্রহটির দৃষ্টির অগোচর হইবার সময়ের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। আরও দেখিলেন যে, গণনা এবং ঘটনার সময়ের প্রভেদের সাধারণ কোন কারণ দেখা যায় না। 'আলোকের বেগ সসীম' এই কথা ধরিয়া লইলে, গণনার সময় ঘটনার সময়ের সহিত মিলান যায়। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, সেই জন্য পৃথিবী বৃহস্পতির কখনও নিকটবর্ত্তী ও কখনও দূরবর্ত্তী হয়। মনে করা যা'ক, পৃথিবী যখন বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী, তখন উপগ্রহটি দৃষ্টির অগোচর হইল এবং গণনা করিয়া দেখা গেল যে, পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে যখন অতি দূরবর্ত্তী স্থানে, তখন কোনও সময়ে ঐ উপগ্রহটি অদৃশ্য হইবে। কিন্তু ঘটিল, গণিত-সময়ের ১৬ মিনিটের কিছু পরে। রোমর ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পৃথিবীর কক্ষার (orbit) ব্যাস অতিক্রম করিতে আলোকের এই ১৬ মিনিট সময় লাগিয়াছে; এবং গণনা করিয়া নির্ণয় করিলেন, আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৯২,০০০ মাইল। ফিজো এবং ফুকোঁ (ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয়) বহুকাল পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, আলোকের বেগ প্রত্যেক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। আলোকের গতি কি ক্ষিপ্র, তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা ধারণা করা যাইতে পারে। পার্থিব কোন দ্রুতগামী বস্তুর কথা মনে করিতে হইলে, আমরা অনেকেই হয়ত বাষ্পীয় শকটের কথা মনে করিব। কিন্তু বাষ্পীয় শকটের বেগ, আলোকের বেগের তুলনায় অতীব তুচ্ছ। প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মাইলগামী একখানা রেল এঞ্জিন চারিমাস কাল দিবারাত্র চলিয়া যে পথ অতিক্রম করিবে, আলোক এক সেকেণ্ড মাত্র সময়ে সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলোক এত দ্রুত চলে বলিয়াই গ্যালেলিও যে ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার বেগের সসীমতা সম্বন্ধে কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আলোকের বেগের ধারণা হইতে আমরা স্থির নক্ষত্রগুলির দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারি। অতি নিকটবর্ত্তী তারকা হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছিতে ৪ বৎসরের অধিক লাগে। এরূপ তারকা আছে, যাহা হইতে আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে শত বৎসরের অধিক সময় লাগে; এবং এরূপ তারকাও আছে, যাহা হয়ত বহুকাল নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, তাহার আলোক এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই, হয়ত শীঘ্রই আসিবে। যে আলোক এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ গমন করে, সেই আলোক যে সকল নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে এত দীর্ঘ সময় লাগে, তাহাদের দূরত্ব কি অসীম!

রোমরের পরে প্রায় ৫০ বৎসর কাল আলোকের বেগের সসীমতা সম্বন্ধে আর কেহ কোন প্রমাণ দেন নাই এবং কোন কোন স্থানে রোমরের আবিষ্ক্রিয়ার উপর অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। এমন সময় (১৭২৮ খৃষ্টাব্দে) ব্রাড্‌লি (Bradley) তাঁহার একটি আবিষ্কারের দ্বারা রোমরের মতের সমর্থন করেন।

যখন প্রমাণিত হইল, আলোকের বেগ সসীম এবং যখন

ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইল যে, প্রকাশমান বস্তু মাত্রই কোন এক প্রকার শক্তির কেন্দ্রস্থল—যাহাকে আলোক নামে অভিহিত করা যায়—এবং আলোক ও তাপের ঘটনাগুলি একই শক্তির কার্য্য-বিশেষ মাত্র,তখন বৈজ্ঞানিক-গণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইল—এই শক্তি প্রকাশ-মান বস্তু হইতে নির্গত হইয়া, দর্শকের চক্ষুতে পতিত হইবার পূর্ব্বে কি ভাবে কোথায় অবস্থিতি করে? সূর্য্য হইতে আলোক অথবা তাপ আমাদের পৃথিবীতে পৌছিতে ৮ মিনিট সময় লাগে; এই ৮ মিনিট কাল আলোকের গতির সময় কি ভাবে এবং কোথায় এই শক্তি নিহিত থাকে এবং কি উপায়েই বা আমাদের নিকট পৌছায়? সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া এই শক্তি অন্তর্হিত হয় এবং ৮ মিনিট কাল পরে কোন অজ্ঞাত, কল্পনার বহির্ভূত উপায়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, ইহা কখনও হইতে পারে না।

বস্তুর ধারণার সহিত শক্তির ধারণা এরূপ জড়িত যে, বস্তু ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে, এ কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না এবং বস্তুকে শক্তির বাহকরূপে ধরিয়া লই। এখন বিবেচ্য এই যে, কোন একটি বস্তু, এই আলোক অথবা তাপ-শক্তিকে সূর্য্য হইতে আমাদের নিকট বহন করিয়া লইয়া আইসে (যেমন একটি ঢিল নিক্ষেপ করিলে নিক্ষেপে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, ঢিলটি সেই শক্তি বহন করিয়া চলে), অথবা এই শক্তি আগমনকালে কোন সর্ব্বব্যাপী ক্রিয়াধারের পরস্পর নিকটবর্ত্তী অণু-গুলির একটি হইতে অপরটিতে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের নিকট পৌছায়! এই দুইটি মত অবলম্বন করিয়া আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমটি নিউটনের নিস্রবণবাদ (Emission theory)। নিউটন্ ধরিয়া লইয়াছেন, প্রকাশমান বস্তু মাত্রই অতি সূক্ষ্ম আলোকের কণা সকল সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিতেছে; এই সকল কণা তাহাদের গতিশক্তি (Kinetic energy) সহিত, আলোকের বেগে, অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে। ইহাতে আলোক এক প্রকার বস্তুরই মত এরূপ প্রতীয়মান হয়। এই আলোক-কণাগুলি চক্ষুতে পতিত হইয়া দর্শনানুভূতি হয়। এই বাদানুসারে আলোকের সরলরেখায় গতি, পরাবর্ত্তন, বর্ত্তন প্রভৃতি সাধারণ ঘটনাগুলি সহজে বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু এই বাদের সত্যতা ধরিয়া লইলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার সম্পূর্ণ বিরোধী। উদাহরণরূপে দেখান যাইতে পারে,এই বাদানুসারে আলোকের বেগ—জল, কাচ প্রভৃতি ভারী দ্রব্যের বায়ুতে ইহার যে বেগ তাহা অপেক্ষা অধিক হইবার কথা, কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, আলোকের বেগ ঐ সকল বস্তুতে বায়ু হইতে অধিক না হইয়া কমই হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল ঘটনা, আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বাদটির সম্পূর্ণ অনুকূল। এই বাদটিকে আমরা আন্দোলন বাদ (Undulatory Theory) বলিব। এই বাদানুসারে আলোকের প্রকৃত কারণ ঈথার নামক (আকাশ) সর্ব্বস্থানব্যাপী কোন আধারের সূক্ষ্ম অংশের সাময়িক বিলোড়ন। প্রত্যেক প্রকাশমান বস্তু ঈথার-বিড়োলনের এক একটি কেন্দ্র এবং এই বিলোড়ন, ঈথার নামক ক্রিয়াধায়ে তরঙ্গরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোকের বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং এই তরঙ্গগুলি আমাদের চক্ষুতে পতিত হইয়া দৃষ্টির উদ্রেক করে। এই বাদানুসারে আলোক শক্তি-বিশেষ, বস্তু-বিশেষ নহে।

আলোকের পরাবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের নিয়মগুলির মত আলোকের আন্দোলন-বাদের আবিষ্কারও ভুলক্রমে দেকার্ত্তের উপর আরোপিত হইয়াছে। দেকার্ত্তের মতে আলোক কোন সর্ব্বস্থানব্যাপী স্থিতিস্থাপক ক্রিয়াধারে অসীম বেগশীল চাপ-বিশেষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাহার মতের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সসীম বেগশীল ঈথার-তরঙ্গের কোন সাদৃশ্য নাই। আরিষ্টটল্, লিওনার্ডো-ডিভেঞ্চি (Leonardo devinci) ও গ্যালেলিওর লেখাতে আন্দোলন-বাদের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ সকল আন্দোলন-বাদের অনুরূপ, একথা বলা যাইতে পারে না। গ্রীমণ্ডী ও হুক্ (Hooke) অল্পাধিক অস্পষ্টভাবে আন্দোলন-বাদের কতকটা ধারণায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যিনি স্পষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্তের বিষয়টি প্রকাশ করেন তিনিই সেই সিদ্ধান্তের প্রবর্ত্তক। যাহারা কেবল আভাষ দিয়া যান, তাঁহারা নহেন। এই ভাবে আমরা হয়্যাগু-

[বে]বাসী হাইগেন্স্‌কেই (Christian Huygens) আন্দোলন-বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানি। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বাদটি সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন এবং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আলোকের পরাবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ব্যাপার এই বাদানুসারে বুঝাইয়া দেন। আলোকের দ্বি-বিবর্ত্তনের (Double refraction) কারণও এই বাদানুসারে নির্দ্দেশ করেন এবং ইহাও লক্ষ্য করেন যে, আলোকের দ্বি-বিবর্ত্তিত দুইটি রেখাই ধ্রুবীভূত (Polarised); কিন্তু আলোকের সরলরেখায় গতি এই বাদানুসারে বুঝান যায় নাই বলিয়া, হাইগেন্সের পরে আন্দোলনবাদের উপর লোকের অনাস্থা জন্মে এবং প্রায় শতাব্দীকাল ইহার আর কোন আলোচনা হয় না। ইহার পর ইংলণ্ডের ডাক্তার ইয়ং (Doctor Young) আলোকের ব্যতিকরণ (Interference) আবিষ্কার করিয়া, এই বাদটিকে পুনরায় জাগরিত করিয়া তুলেন।

হাইগেন্স (Huygens) আলোকের ধ্রুবী-ভবন আবিষ্কার করিলেও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ডাক্তার ইয়ংও পারেন নাই, কারণ আলোক যে ঈথার-কণার কম্পনে হয়, সেই কম্পনগুলি আলোকের যে দিকে গতি সেই দিকেই ঘটে বলিয়া, এই বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল। কেন না, তাঁহারা এইরূপ কম্পনের সহিত পরিচিত ছিলেন। শব্দের বায়ু-কম্পনও শব্দের যে দিকে গতি, সেই দিকেই ঘটিয়া থাকে। তৎপর ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফ্রেনেল্ (Fresnel) যখন প্রচার করিলেন যে, ঈথার-কণাগুলির কম্পন, আলোকের গতির রেখায় সংঘটিত না হইয়া, আড়াআড়ি ভাবে হইয়া থাকে, তখন আন্দোলন-বাদের বিরুদ্ধে যত বাধাবিঘ্ন ছিল, তাহা যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নাবিকের দিশাহারা অবস্থায় হঠাৎ সূর্য্যকিরণে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিভাত হইয়া, কুজ্ঝটিকা অপসৃত হইলে, মনে যে আনন্দ হয়, আন্দোলন-বাদের পক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকগণের মনে হয় ত এই নূতন তত্ত্বের সংবাদে তাহা হইতেও অধিক আনন্দ হইয়াছিল। এই মতের সাহায্যে কেবল আলোক সম্বন্ধে তৎকালে জ্ঞাত যাবতীয় ঘটনার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, আলোকের যে সকল তত্ত্ব তখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা গিয়াছিল। এই মত-প্রচারের পর একজন বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে, পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে কেবল একটি বড় নামের খাতিরে আর কোথাও সত্য এতকাল চাপা পড়িয়া থাকে নাই। এই কথাটি নিউটনের নিস্রবণ বাদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল। আলোকের এই ধ্রুবী-ভবনের (Polarisation) ঘটনাই নিউটনের আন্দোলন-বাদ পরিত্যাগের প্রধান এবং শেষ কারণ। তরঙ্গের গতির রেখায় আধারের (medium) অণুসমূহের যে কম্পন সংঘটিত হয়, নিউটন্ তাহারই বিষয় অবগত ছিলেন। বায়ুতে শব্দতরঙ্গ এইরূপ কম্পনেরই উদাহরণ। আধারের অণুসমূহের এইরূপ কম্পনের ধারণা গিয়া তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, আলোকের প্রকৃত কারণ যদি, ঈথার-কণার কম্পনেই হইয়া থাকে, তবে আলোকের ধ্রুবীভবন (Polarisation) অর্থাৎ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে! এই জন্য আন্দোলন-বাদের কথা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দেন এবং নিস্রবণ-বাদটিকে তাঁহার অমানুষী ধী-শক্তি দ্বারা উন্নীত করিয়া তোলেন।

বিষয়টি বুঝিবার জন্য ঈথার-তরঙ্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। কম্পনশীল বস্তু মাত্রই যে আধারে থাকিয়া কম্পিত হয়, সে আধারে ঊর্ম্মি উৎপাদন করে। জল অথবা পারার উপর যদি কোন বস্তু কাঁপিতে থাকে, তবে ঐ সকল তরল পদার্থের উপর ঐ কম্পনশীল বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া, বৃত্তাকার ঊর্ম্মিমালার উৎপত্তি হয়। যদি ঐ সকল তরল পদার্থের উপর কোন একটি বস্তু দ্বারা কোন এক বিন্দুতে একটি মাত্র আঘাত করা যায়, তবে ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া, একটি মাত্র ঊর্ম্মি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে; এবং বারম্বার যদি সমসময়ান্তর ঐরূপ আঘাত করা যায়, তবে তৎসম সময়ান্তর এক একটি বৃত্তাকার ঊর্ম্মি ঐ বিন্দুতে উৎপন্ন হইয়া, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং এই ঊর্ম্মিগুলিরও পরস্পর নিকটবর্ত্তী যে কোন দুইটির দূরত্ব সমান থাকিবে। এখন দেখা যা'ক, কোন বস্তুকে কম্পমান অবস্থায় জল, পারা কি অন্য কোন তরলপদার্থপৃষ্ঠে রাখিলে কি হয়। ঐ বস্তুটি তরলপদার্থপৃষ্ঠে প্রতি-সম-সময়ান্তর আঘাত করিতে থাকিবে, কেন না কম্পনশীল বস্তু মাত্রেরই এই ধর্ম্ম যে, যতক্ষণ যে বল বস্তুটির উপর কার্য্য করিতেছে, তাহা সমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কম্পনগুলি

ছোটই হউক আর বড়ই হউক, প্রত্যেক কম্পনেই সমান সময় লাগে। প্রত্যেক আঘাতের জন্য এক একটি উর্ম্মি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং উর্ম্মিগুলির পরস্পরের দূরত্বও সমান থাকিবে। যখনই কোন কম্পমান বস্তু দ্বারা কোন ক্রিয়াধারে উর্ম্মিমালার উৎপত্তি হইবে, তখনই পরস্পর নিকটবর্ত্তী যে কোন দুইটি উর্ম্মির দূরত্ব সমান হইবে। এই দূরত্বকে উর্ম্ম্যন্তর বলা যাইতে পারে। বায়ু মধ্যেও বস্তুর কম্পনের জন্য কম্পমান বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া গোলকাকার উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। বায়ুতে উর্ম্মি বৃত্তাকার না হইয়া গোলকাকার হইবার কারণ, কম্পমান বস্তু তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুকেই সমভাবে বিলোড়িত করে এবং ঐ বিলোড়ন চতুর্দ্দিকে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বস্তুটি প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিতে থাকে, বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে ততগুলি উর্ম্মির উৎপত্তি হয়; এবং প্রতি সেকেণ্ডে যদি কম্পন সংখ্যা প্রায় ১৬ হইতে ২৪০০০ মধ্যে থাকে, তবে এই কম্পন-জনিত উর্ম্মিগুলি আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিলে আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়। সেইরূপ প্রকাশমান বস্তু-মাত্রেরই সূক্ষ্ম কণার কম্পনে ঈথার বিলোড়িত হইয়া, তাহাতে উর্ম্মিমালার সৃষ্টি হয় এবং এই উর্ম্মিমালার কিয়দংশ চক্ষুতে পতিত হইয়া বস্তুকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে। যে কণাগুলির কম্পনে ঈথার-আধারে উর্ম্মির সঞ্চার হয়, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম,—এত সূক্ষ্ম যে, তাহাদের ক্ষুদ্রত্বের কল্পনা করাও কঠিন। অতএব তাহাদের প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন-সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইবে; কারণ বস্তু যত বৃহৎ হইবে, তাহার প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা তত কম হইবে এবং বস্তুটি যত ক্ষুদ্র হইবে, তাহার কম্পন-সংখ্যা তত অধিক হইবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কি প্রকারে যে এই সূক্ষ্ম কণাগুলি কম্পিত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তবে এইরূপ ধরিয়া লইবার কারণ দেখা যায় যে,বস্তুর অণুগুলির ঘাত প্রতিঘাতেই এই কণাগুলি কম্পিত হয়। বস্তু যতই উষ্ণ হইতে থাকে, ততই এই অণুগুলির ঘাতপ্রতিঘাত দ্রুততর হইতে থাকে এবং বস্তুর উষ্ণতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যখন বস্তুটি স্বপ্রকাশ হয়, তখন অণুগুলির ঘাত-প্রতিঘাত এত দ্রুত চলিতে থাকে যে, অণুর সূক্ষ্ম কণাগুলিও অতি দ্রুত কম্পিত হইতে থাকে। এই কম্পমান কণাগুলি চতুর্দ্দিকস্থ ঈথার-কণা বিলোড়িত করিয়া ঐ ঈথার-ক্রিয়াধারে উর্ম্মি উৎপাদন করে এবং চক্ষুতে ঐ উর্ম্মি পতিত হইয়া বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করে।

বন্ধু*

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B.A.]

না পোহাতে নিশি কে উঠায় যেতে মাঠে,
হাটবারে কেগো ডাকে যাইবারে হাটে,
বাড়ীতে কে আসি কেটে দেয় শণদড়ি,
বুনে দেয় 'পেকে' দেয় গো 'আগড়' গড়ি।
কে আসি আপনি তামাকু সাজিয়ে নেয়,
আপনি খাইয়া হুঁকাটী বাড়ায়ে দেয়।
ভাল কিছু পেলে কে আসে আগেই দিতে,
সে যে বন্ধু আমার—আমার 'সাঙাত' মিতে।

বাতে ভুগি 'যবে উঠিতে পারিনে বসি
মোর "কুঁড়ো" জমি কেগো দেয় আগে চষি'
আমার লাগিয়া কেগো ধরে দেয় 'ভুনী'
পাঠায়ে চাউল ঘরে চাল নেই শুনি'
আপনার জমি বাঁধা দিয়ে মোর তরে,
কে মোর মেয়ের বিয়ে দিল ভাল ঘরে
কে বলে আমায় পুনঃ সংসারী হতে,
সে যে বন্ধু আমার—আমার 'সাঙাত' মিতে।

সে বছর সেই পেয়দারে আমি মারি,
লুকায়ে ছিলাম বহুদিন কার বাড়ী ?
বেচে' ধান খড় এত টাকা ব্যয় করে,
মিটালো নালিশ কেগো তদ্‌বির করে ?
আমার বিপদে কে সদা বিপদ গণে,
আমার সুখেতে কেগো সদা সুখী মনে ?
পূজা-পার্ব্বণে কে আসে নিতুই নিতে ?
সে যে বন্ধু আমার—আমার 'সাঙাত' মিতে।

কেগো রেগে উঠে ফিরে দিতে গেলে ধান
কার মোর প্রতি সবাকার চেয়ে টান, ?
বিপদে আপদে হরিরে ডাকিতে ভাই
কে মোরে শিখালো তুলনা কাহার নাই।
কার সনে মোর পরাণ পড়েছে গাঁথা
তৃষ্ণার জল মোর সে যে গো শীতের কাঁথা।
এক সাথে গুরু—সহোদর—মাতা—পিতে,
সে যে বন্ধু আমার—আমার 'সাঙাত' মিতে।

* ভারতবর্ষের "ভাদুরে বন্ধ" পাঠান্তে।

সীতারামের ক্রমবিকাশ

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, M.A.B.L.,]

(১)

পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্য-সমালোচনার একটি নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও লেখক নিজ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যাহা লিখিলেন, পরবর্ত্তী সংস্করণসমূহে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ কোনও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ত তাহা সমীচীন কি না, এই পরিবর্ত্তনে রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট হইল, তাহার বিচারেরও একটা চেষ্টা হইয়া থাকে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাঠকের পক্ষে বড়ই কৌতূহলজনক। কারণ ইহার দ্বারা দুইটি বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রথম গ্রন্থকারের মতপরিবর্ত্তনের ইতিহাস। দ্বিতীয় নিজগ্রন্থের দোষ বুঝিতে পারিয়া গ্রন্থকারের সংশোধনচেষ্টা। এই দুইটি বিষয় জানিবার জন্য সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে কৌতূহল থাকে। বিশেষ লেখক যদি খ্যাতনামা হন, তাহা হইলে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন বা তাঁহার রচনা-সংশোধনের কথা বড়ই আগ্রহজনক হয়। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনার এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজ কবিতার বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ;—'রাজা ও রাণী'র বিদূষক ও বিদূষক-পত্নীর কথোপকথনের বহুল অংশ পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র নিজ উপন্যাসসমূহে বহুস্থলে প্রথমে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ; পাঠককে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। পরে এ সমস্ত উঠাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার এইরূপ পরিবর্ত্তনের আলোচনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রথম তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয় তাঁহার সংশোধন-চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে মত-পরিবর্ত্তন-হেতু গ্রন্থে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণচরিত্রের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;—

"আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম-সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত-পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত-পরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক-অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।

মতপরিবর্ত্তন—বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।"

[কৃষ্ণচরিত্র, দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্র ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের কৃষ্ণচরিত্র তুলনা করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মত-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আমরা বুঝিতে পারি। বয়োবৃদ্ধি মতপরিবর্ত্তনের কারণ, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন। এই নিমিত্তই অনেক লেখক নিজ বাল্যরচনা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের সংশোধন-প্রয়াস তাঁহার উপন্যাসগুলি হইতে দেখাইতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার নব্য লেখকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

"যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য' দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি নিজের পুস্তকগুলি বহুলরূপে সংশোধিত করিয়া "Example is better then precept" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি দুইভাবে প্রথম প্রকাশিত

হয়। কতকগুলি একেবারে রচিত ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আর কতকগুলি প্রথমে সাময়িক পত্র 'বঙ্গদর্শন' 'প্রচার' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়; পরে সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলিই বহুলরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন হওয়াও স্বাভাবিক। কেননা মাসিক পত্রের রচিত উপন্যাসাদির অংশসকল ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। লেখককে অনেক সময়ই বিশেষ সংশোধন ও বিচার না করিয়াই রচনা ছাপাইতে হয়। অনেকদিনের আলোচনা বা গভীর চিন্তায় যে সকল দোষের নিরাকরণ হইতে পারে, তাড়াতাড়ি প্রকাশ হেতু সে সকল দোষ থাকিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না" এনিয়মটি সাময়িক পত্রের লেখকগণ অতি অল্পস্থলেই মানিয়া চলিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাহা পারেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়মরক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।"

[বাঙ্গালার নব্য লেখকগণের প্রতি।

কিন্তু এইরূপ ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসাদিও উপযুক্ত সংশোধন বা পরিবর্ত্তনে কিরূপ বিচিত্র ভাব ধারণ করে,তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা প্রবন্ধান্তরে কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিয়াছি। * আজ সীতারামের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দিব।

১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য-সূচনাতে এই বলিয়া লেখা হইয়াছিল, "সত্য, ধর্ম্ম এবং আনন্দের প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম, প্রচার।" বাস্তবিকই সত্য, ধর্ম্ম ও আনন্দ প্রচাররূপ মহাকার্য্যে 'প্রচার' অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। এই মাসিকপত্রে একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের "হিন্দুধর্ম্ম," "কৃষ্ণচরিত্র" "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা", অপরদিকে তাঁহার "সীতারাম" রমেশচন্দ্রের "সংসার" ও দামোদর বাবুর "শান্তি" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। একদিকে "বেদ," "মহাভারতের ঐতিহাসিকতা," "কালিদাসের উপমা" প্রভৃতি প্রবন্ধ অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৌশলের অদ্ভুত উদাহরণ— "গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি।"

১২৯১ হইতে ১২৯৪ পর্য্যন্ত তিনখণ্ড প্রচার প্রকাশিত হয়। 'সীতারাম' উপন্যাস এই তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। ১২৯৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন সম্পূর্ণ সীতারাম পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"সীতারামের" আলোচনা করিবার সময় গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে :—

"এই গ্রন্থ-রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' গীতার আলোচনা করিতেছিলেন, এবং 'নবজীবনে' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' লিখিতেছিলেন। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র'ও এই সময় 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়।......

'সীতারাম' হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়কালের লেখা"—বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রথমে সীতারাম যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাতে সীতারামের হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন-চেষ্টা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত মুসলমান ফকিরের অন্যায় অত্যাচার হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনে সীতারামকে উত্তেজিত করিবার জন্যই অবতারিত হইয়াছিল।

সীতারাম উপন্যাসের সর্ব্ব প্রথম প্যারাটি অধুনা পরিত্যক্ত। তাহা এই ছিল—

"এখনও এ প্রদেশে এমন অনেক স্থূল-বুদ্ধি লোক আছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহাস করেন। এখনও অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা আমাদের অপেক্ষা ভাল। কিন্তু যখন, কলিকাতা ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, বাঘের ভয়ে রাত্রে লোক বাহির হইত না, তখন পূর্ব্ববাঙ্গালা জনপূর্ণ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামনগরাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালায় অনেক বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থে তাহারই মধ্যে এক জনের কথা বলিব। আমার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার অনেক কথা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, উপন্যাসে গাঁথিয়া বলিতে হয়, কিন্তু এ

* ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২০ ও অর্চ্চনা, কার্ত্তিক ১৩১৯ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ উপন্যাস হইলেও সে মহাত্মা ঐতিহাসিক, তাঁহার কাজও ঐতিহাসিক। মুসলমান ইতিহাস-বেত্তারা তাঁহাকে দস্যু বলিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় শিবজীকেও তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সংশোধন-প্রণালীর প্রথম বিশেষত্ব এই যে, তিনি মন্তব্যগুলি উঠাইয়া দিতেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটি মন্তব্য বলিয়াই পরিবর্জ্জিত হয়। কিন্তু এই মন্তব্যে যে অংশটুকু আমরা অধোরেখাঙ্কিত করিয়া দিলাম, তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসরচনার কারণ বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ধর্ম্মতত্ত্ব, গীতা, কৃষ্ণচরিত্র ও বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি আজ বাঙ্গালার সকলের কাছে পরিচিত হইতেন কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমি প্রচারের একজন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারের একজন পাঠক আমাকে বলিলেন, প্রচারে অত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না। আমি বলিলাম, 'কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।' তিনি বলিলেন, ঐ একটু বৈ ত নয়।' "

[বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রচারের পূর্ব্বোক্ত পাঠকের ন্যায় পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আজিকার দিনেও মাসিকপত্র গল্প ও উপন্যাসের জোরেই চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। আজিকার দিনেও গল্প ও উপন্যাস যত বিক্রীত হয়, অন্য কোনও শ্রেণীর পুস্তকই তত হয় না। তাই বড় দুঃখেই বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের প্রথমে লিখিয়াছেন, "আমার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার অনেক কথা, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া উপন্যাসে গাঁথিয়া বলিতে হয়।"

কিন্তু লেখক যদি সাধারণের রুচির দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া রচনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র যে তাঁহার অধঃপতন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের যুগে উচ্ছৃঙ্খল নরনারীর সম্মুখে অশ্লীলভাবপূর্ণ নাটকাবলীর অভিনয় প্রদর্শিত হইত। সেই সকল নাট্যকার এখন তাঁহাদের রুচির জন্য ঘৃণিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সেরূপ ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, "সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।" তাই সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতিতে তিনি ধর্ম্মতত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিলেও জনসাধারণের চিত্তের এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজকাল "Art for art's sake" বলিয়া যে সকল লেখক রচনা করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রচারে প্রকাশিত সীতারামের প্রথম অংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রধান ঘটনা (Episodes) সংযোজিত হইয়াছিল ; পরে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। তাহার কারণ এই, যে সকল স্থলে এইরূপ অপ্রধান ঘটনা, প্রধান ঘটনা বা উপন্যাসের কোন চরিত্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এবং যে স্থলে এইরূপ ঘটনা উঠাইয়া দিলেও প্রধান ঘটনা বা কোনও চরিত্রের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, সেখানে এগুলি পরিবর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ কতকগুলি উত্তেজক ঘটনার অবতারণা করা ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসের উপযোগী হইলেও, জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ কখনও বৃথা রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহেন না।

এইরূপ পরিত্যক্ত প্রথম ঘটনা প্রচারে নিম্নলিখিতরূপ ছিল।

গঙ্গারাম ধৃত হইলে শ্রী সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সঙ্গে পাঁচকড়ির মা। জীবন ভাণ্ডারীকে প্রলোভন দেখাইলে সে বলিল—"কি?—বল।" তখন—

"শ্রী একটু মাথা তুলিয়া, একটু ঘোমটা কম করিয়া, লজ্জায় বড় জড়সড় হইয়া, কোন রকমে কিছু বলিল। কিন্তু কথাগুলি এত অস্ফুট যে, ভাণ্ডারী তাহার কিছু শুনিতে পাইল না। ভাণ্ডারী তখন পাঁচকড়ির মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলে? কিছুই ত শুনিতে পাই না।' তখন পাঁচকড়ির মা কথা বুঝাইয়া দিল। সে বলিল 'উনি বলিতেছেন যে, আমি তোমার হাতে যা দিতেছি, তাহা তোমার মুনিবের হাতে দিও। তিনি যা বলেন, আমাকে আসিয়া বলিও। আমি এই খানে আছি।'

এই বলিয়া শ্রী, কাঁকালের কাপড় হইতে একটা মোহর বাহির করিল, সেই মোহর পাঁচকড়ির মা ভাণ্ডারীর হাতে দিল। ভাণ্ডারী লইয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে জীবন দরজার প্রদীপে সেই মোহরটি একবার দেখিল।

দেখিল একটা সোণার আকব্বরি মোহর। কিন্তু তাহাতে একটা ত্রিশূলের দাগ আছে। ভাণ্ডারী মহাশয় স্থির করিলেন ‘এ বেটী ত ভিখারী নয়—এই ত আমার মুনিবকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে। প্রভু আমার ধনবান্, তাঁর মোহর দরকার কি? এটা জীবন ভাণ্ডারীর পেটরার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শোভা পায়। তবে কি না, যে ত্রিশূলের দাগ দেখিতেছি, এ ধরা পড়া বড় বিচিত্র নহে। ও সব মতিগতি আমার মত দুঃখী প্রাণীর ভাল না। যার ধন তার কাছে পৌছাইয়া দেওয়াই ভাল।’ এইরূপ বিবেচনা করিয়া জীবন ভাণ্ডারী লোভসম্বরণপূর্ব্বক যেখানে প্রভু গদীর উপর বসিয়া আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু টানিতেছিলেন, সেইখানে মোহর পৌছাইয়া দিল। এবং সবিশেষে বৃত্তান্ত নিবেদিত হইল।

জীবন ভাণ্ডারীর মুনিব অতি সুপুরুষ। ত্রিশ বৎসরের যুবা, অতি বলিষ্ঠ গঠন, রূপে কার্ত্তিকেয়। তিনি মোহরটি লইয়া দুই চারিবার আলোতে ধরিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘দুর্গে! এ কি এ!’

ভাণ্ডারী বলিল ‘কি বলিব।’ প্রভু বলিলেন ‘যে তোকে মোহর দিয়েছে, তাকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে কেহ আছে?’

ভাণ্ডারী মহাশয় তরকারীর কথাটা একেবারে গোপন করিবার মানসে বলিলেন ‘একজন মেছুনি আছে।’

প্রভু। সে যেন আসে না, তুইও পৌছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবি।

শুনিয়া ভাণ্ডারী বেগে প্রস্থান করিল এবং অচিরাৎ শ্রীকে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, ‘আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি আমাকে চিনিয়াছ কি?’ ব্রীড়াবতী কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

গৃহকর্ত্তা। আমি সীতারাম রায়। শ্রী মনে মনে হাসিল; মনে মনে বলিল, ‘এত পরিচয় দেওয়ার ঘটা কেন? আমি না জানিয়া আসিয়াছি মনে করেন না কি?’

শ্রী সীতারামের মনের ভাব বুঝিল না। সীতারামের কাছে পরস্ত্রী মাতৃবৎ। ইহা তাঁহার দৃঢ়ব্রত। তবে এই ত্রিশূলাঙ্কিত মোহরের ভিতর একটা নিগূঢ় কথা ছিল তাই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াই সীতারাম এরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। বলিলেন ‘আমি সীতারাম রায়। তুমি কে? তোমার মুখে ঘোম্‌টা—কথা কহিতেছ না, আমি চিনি কি প্রকারে?”

[প্রচার ১ম খণ্ড ৩৩—৩৫পৃষ্ঠা]

এই মোহর শ্রী কিরূপে পাইল, প্রচারে তাহা এইরূপে উল্লিখিত ছিল:—

“একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোক-মুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া একজন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে আমি তাই দিব। শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই, কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণরক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।”

[প্রচার, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা]

আবার অন্যত্র আছে—

“শ্রী...বলিল ‘এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে, বিপদে পড়িলে নিদর্শনস্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা পাইয়াছি।”

[প্রচার, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা]

শেষে শ্রী “সেই সুবর্ণার্দ্ধ নদী-সৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া” চলিয়া গেল।

এখন দেখা যাক্, এই মোহরের বৃত্তান্ত সৃষ্টি করিয়া কি লাভ হইয়াছিল? সীতারাম শ্রীকে পিতার আদেশে শপথ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে শ্রী বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট আসিলে সাহায্য করেন, এই ঘটনাই স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, সীতারাম একবার শ্রীকে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ও আধখানা মোহর দিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় সীতারাম যে শ্রীকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও বুঝিতে পারা যায়, সীতারামের নিম্নলিখিত বাক্য হইতে,—শ্রী যখন সীতারামের কাছে আসিল, তখন সীতারাম

...লিলেন 'আমি তোমাকে চিনিয়াছি।' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ...ষ্টম পরিচ্ছেদে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন "তবু শ্রীকে মনে করা ...তারামের উচিত ছিল।...যাহার নিত্য টাকা আসে, সে ...বে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় ...নে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা, আর দিকে রমা,—...ার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে ?" ইহা হইতে ...শ জানিতে পারি, সীতারাম শ্রীকে ভুলিয়াছিলেন। তবে ...তার উদ্ধারার্থ সাহায্য-ভিক্ষা করিতে আসিলে, শ্রীকে ...দখিয়া সীতারাম শ্রীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে যত্নবান্ হন। ...ঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পংক্তিই তাহার প্রমাণ—"তা, ...কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল ? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল ? হাঁ। তা বৈকি।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ) এখন আগেকার পরিচ্ছেদে বর্ণিত সীতারামের ব্যবহারের সহিত এই কথার মিল কোথায় ? এই অসঙ্গতি-নিবারণের জন্যই উক্ত মোহরের কাহিনী প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আর মোহরেরই বা দরকার কি ? সীতারাম বাঙ্গালী ...দার। তাঁহার দ্বার ভোজপুরী দ্বারবান্ রক্ষিত হইলেও ...হার সহিত দেখা করা, এমন একটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার ...হে। বিপদে পড়িয়া স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যই যদি হয়, ...শ্রী একজন লোক পাঠাইয়া, নিজ নামের উল্লেখ করিলেই ...তারাম সন্ধান করিতেন। সুতরাং রোমান্টিক (...omantic) ঘটনাসৃষ্টি করিতে এইরূপ সুবর্ণার্দ্ধের ...বতারণা করার কোনও সার্থকতা নাই।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রচারে প্রকাশিত অংশের আরও একটু ...শেষত্ব আছে। ভাণ্ডারী শ্রীকে প্রশ্ন করিলে, শ্রী "লজ্জায় ...জড় সড় হইয়া কোন রকমে কিছু বলিল।" কিন্তু এই ...য় জড় সড় হওয়া শ্রীর পক্ষে স্বাভাবিক নহে। তাহার ...র্ত্তী কথোপকথন ও ব্যবহার আদৌ অত্যধিক লজ্জার ...চায়ক নয়। এখনকার গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীচরিত্রের সহিত ...ত্যধিক লজ্জা ত খাপ খাইতেই পারে না ; 'প্রচারেও' ...ইরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার এরূপ বেশী ...ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। কেবল একটিমাত্র ...হরণ দিতেছি।

চন্দ্রচূড় বলিলেন "হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।" তখন শ্রী বলিল "ঠাকুর, হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব ? এই ত' এখনই দেখিলেন ?" বলিতে বলিতে শ্রী দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

[প্রচার, ১ম খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।]

যে শ্রী স্বেচ্ছায় সিপাহী হস্তে ধরা দিয়া কারাগারে যায়, † সে লজ্জায় জড় সড় হইতে পারে না।

কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্তই পরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীর চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীর পরিচয়ব্যঞ্জক নিম্নলিখিত কয়েকপংক্তিও বঙ্কিমচন্দ্র পরে পরিবর্জ্জন করেন—"গঙ্গারামের ভগিনীর নাম শ্রী। বোধ হয়, প্রথমে নামটা শ্রীমতী কি শ্রীমালিনী—কি এমনি একটা কিছু সুশ্রাব্য শব্দ ছিল। কিন্তু এখন সে সকল লোপ পাইয়াছিল। নামের মধ্যে কেবল শ্রীটুকু অবশিষ্ট ছিল। সকলেই তাহাকে শ্রী বলিয়া ডাকিত, আর কিছু বলিত না।"

[প্রচার ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা]

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীর অবস্থার একটু বর্ণনাও পরে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে ; সেটুকু এই—

"তখন গঙ্গারাম ক্ষণেক কাল অতিশয় চীৎকার-পরায়ণা স্বীয় ভগিনীকে শান্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন, তাহার পর তাহাকে একজন প্রতিবাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া মার সৎকারের জন্য পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেলেন।"

[প্রচার, ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা]

এ সকল সামান্য পরিবর্ত্তন। কিন্তু বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সীতারামের চরিত্রে। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের প্রথম অংশে সীতারামকে সংযমশীল পুরুষরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখিয়া ফেলিলেন যে, সীতারাম শ্রীর রূপমুগ্ধ হইয়াই গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। প্রথম অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। তাই পরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই সীতারামের রূপমোহ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রথমে প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল—সীতারাম শ্রীকে দেখিয়া বলিলেন "তুমি শ্রী ?" পরে বঙ্কিম লিখিলেন "তুমি শ্রী ? এত সুন্দরী!" এই কথা হইতেই সীতারামের

† এই ঘটনা পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মানসিক ভাব বেশ বুঝিতে পারা গেল। বিপন্না বনিতার রূপই সীতারামের চক্ষে আগে পড়িল।

প্রচারে ছিল,—সীতারাম কেবল ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

যেন হিন্দুকে রক্ষার জন্যই সীতারাম অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নয়। তাই পরে পরিবর্ত্তন হইল—

"মনে মনে আবার একবার ভাবিলেন "শ্রী? এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব তার পর অন্য কথা।"

[প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

এখানে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, গঙ্গারামকে রক্ষা করা কেবল হিন্দুকে রক্ষা করা নয়, শ্রীর কাজ। তাই সীতারাম এত আগ্রহে অগ্রসর হইলেন।

আপত্তি হইতে পারে, সীতারামের চরিত্র ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাহা না করিয়া উপায় নাই। সীতারামকে আদর্শ পুরুষরূপে সৃষ্টি করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। সীতারামের নিজদোষে পতন দেখানই উদ্দেশ্য। গীতার যে শ্লোকগুলি সীতারামের শিরোভূষণ, সীতারামের চরিত্রে সেগুলির জলন্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তাই সীতারামের রূপমোহের উপরই বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়াছিলেন।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চাতুরীর কথা উল্লেখ করিব। বঙ্কিম লিখিলেন, "তবে সেদিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল, ছল ছল, জলভরা, বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি ছি! তা না। তবে তার রূপেতে, আর দুঃখেতে আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে এই তিনটায় মিলিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল।" পাঠক দেখিবেন, বঙ্কিম সীতারামের রূপমোহ অস্বীকার করিতেছেন না। তিনি 'ছি, ছি তা না' বলিয়াই পরে স্বীকার করিতেছেন 'তার রূপেতে' দুঃখেতে ও সীতারামের অপরাধে এই মানসিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সুতরাং এই মানসিক বিপ্লবে রূপমোহ বিশেষ হেতুই ছিল। সীতারামের অধঃপতনের প্রধান কারণই এই রূপমোহ। শ্রীর রূপদর্শনে আরম্ভ হইয়া চিত্তবিশ্রামের বিলাসিতায় ইহার সমাপ্তি। তাই সীতারামে পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়া বঙ্কিম প্রথমে এই রূপমোহই বর্ণন করিলেন।

গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইবার পর সীতারাম যাহা করিলেন, তাহা প্রথমে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পরিচ্ছেদ পরে আগুন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেগুলি আবার অতি দীর্ঘ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া সেগুলি অধুনা বিরল-প্রচার 'প্রচার' হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই দীর্ঘ হইলেও এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দণ্ড চারি ছয় পরে সীতারাম দ্বার খুলিয়া, জীবন-ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মেনাহাতীকে ডাকিয়া আন।"

শুনিয়া জীবন শিহরিয়া উঠিল। ও নামটা শুনিলে, অনেকেই শিহরিয়া উঠিত। জীবন নিজে এ রাত্রিকালে মেনাহাতীর সম্মুখীন হওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিল। বুদ্ধি খরচ করিয়া অলাবুলোভী সেই মিশ্র ঠাকুরকে মেনাহাতীর আহ্বানে পাঠাইলেন। মিশ্রঠাকুর নির্ভীকচিত্তে মেনাহাতীর সন্ধান করিয়া তাহাকে প্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন।

"মেনাহাতী" একটা হাতী নহে—মনুষ্য, ইহা বোধ হয় বুঝা গিয়াছে। তবে ইহার অতি প্রকাণ্ড আকার দেখিয়া লোকে তাহার হাতী নাম রাখিয়াছিল। ইহার প্রকৃত নাম মৃণ্ময়। ইনি সীতারামের স্বজাতি ও কুটুম্ব, এবং অতিশয় বশম্বদ। তবে তাঁহার আকার এবং অগাধ বল ও সাহস বড় বিখ্যাত ছিল। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বড় ভয় করিত, হঠাৎ কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সম্মত হইত না। মৃণ্ময়,পর্ব্বতাকার কলেবর লইয়া সীতারামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি জন্য ডাকিয়াছেন?"

সীতারাম বলিলেন "বড় জরুরি কাজ আছে। আমার পরিবারবর্গ এখান হইতে লইয়া যাইতে হইবে।"

মৃণ্ময়। কবে?

সীতা। আজ রাত্রেই—এখনই।

মৃ। কোথায় নিয়ে যাব?

সীতা। তাহা কেবল তুমিই জানিবে, আর কেহ যেন না জানে। ছয় কাণ না হয়। নিকটে আইস। তোমার কাণে কাণে বলিয়া দিই।

সীতারাম মেনাহাতীর কাণে কাণে একটা স্থানের নাম বলিয়াছিলেন। মেনাহাতী জিজ্ঞাসা করিল "জিনিষপত্র ক লইয়া যাইতে হইবে ?"

সীতা। নগদ টাকাকড়ি, গহনাপত্র, যা দামে বেশী, তাই যাইবে। আর যা সঙ্গে না লইলে নয়, তাই যাইবে।

মৃ। আপনি সঙ্গে থাকিবেন ?

সীতা। না। কিন্তু আমি শীঘ্র তোমাদের সঙ্গে জুটিব। তুমি বাড়ী বন্ধ করিয়া যাইও।

মৃ। কেন ? আজ আপনি কোথা থাকিবেন ?

সীতা। আমি আজ এখন বাহির হইব। আজ আর ফিরিব না।

মৃ। তবে আপনি অন্দরে সংবাদ দিন যে যাত্রা করিতে হইবে।

সীতা। আচ্ছা ; আমি অন্দরে যাইতেছি, তুমি উদ্যোগ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম অন্তঃপুরমধ্যে গেলেন। অন্তঃপুরে প্রশস্ত চত্বরমধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারিদিকে রোয়াক। কোথাও বঁট পাতিয়া বিপুলস্থূল ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা মৎস্য-জাতির প্রাণাবশিষ্ট সংহারে সমুদ্যত। কোথাও ঘটোধ্নী গাভী কদলীপত্রাদি বিমিশ্র উদ্ভিদ্ প্রভৃতি কবলে গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত লোচনে সুখে রোমন্থন করিতেছে। পারিস্ নগরী কবলিত করিয়া চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উইলিয়মের সে সুখ হইয়াছিল কি না জানি না,কেন না তিনিত রোমন্থন করিতে পারেন নাই। কোথাও কৃষ্ণশ্বেতবর্ণ-বিমিশ্র মার্জ্জার মৎস্যা-ধারের কিঞ্চিৎ দূরে লাঙ্গুলাসনে অবস্থিত হইয়া মৎস্যকর্ত্তন-কর্ত্রীর কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধানতার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথাও নিঃশব্দে কুকুর অতি ধূর্ত্তভাবে কোন্ ঘরের দ্বার অবারিত, তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। কোথাও বহু বালক-গণ একমাত্র অন্নপাত্রকে বেষ্টন করিয়া বর্ষীয়সী কুটুম্বিনীর বহুবিধ প্ররোচনে উপশমিত ক্ষুধাতেও আহারে নিযুক্ত। কোথাও অন্য বালকবালিকা-সম্প্রদায় কৃতাহার এবং কৃত-কার্য্য হইয়া সাতুরেপাটী পাতিয়া ঈষচ্চঞ্চল শীতল মন্দানিল-স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে শয়ন করিয়া অতি প্রাচীনার নিকট সহস্র-বার শ্রুত উপন্যাস পুনঃশ্রবণ করিতেছে। কোথাও নবোঢ়া যুবতী এবং বালিকাগণ বাট্‌নাবাটা, কুটনোকোটা, দুধজাল ইত্যাদি গৃহকার্য্য উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের কাছে আপনাপন আশাভরসা, সুখসৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা বলিতেছে। এমন সময় অকালোদিত জলদবৎ, উদ্যান-বিহারকালে বৃষ্টিবৎ, দুঃখের চিন্তার কালে অপ্রার্থিত বন্ধুবৎ, নিদ্রাকালে বৈদ্যবৎ, গুরু-ভোজনের পর নিমন্ত্রণবৎ এবং অর্থশেষকালে ভিক্ষুকবৎ, সীতারাম আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন।

"এত কি গোল কচ্চিস্ গো তোরা।" সীতারাম এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণকায়াশালিনী মৎস্যবিধ্বংসিনীর মৎস্য-কর্ত্তনশব্দ সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তাহাকে অনাবৃত শিরোদেশে কিঞ্চিন্মাত্র অবগুণ্ঠন সংস্থানের উদ্যোগিনী দেখিয়া ছিদ্রান্বেষিণী মার্জ্জারী মৎস্যমুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক যথে-প্সিতস্থলে প্রস্থান করিল। গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র অন্য পরিচারিকা সেই সুখনিমীলিতনেত্রা কদলীপত্রভোজিনী গাভীর প্রতি ধাবমানা হইয়া, তাহার প্রতি নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল। এবং তস্যা স্বামিনীকে চক্ষুরাদিভোজিনী ইত্যাদি নবরসাত্মক বাক্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিল। উপন্যাসদত্তমনা পাত্রাবশিষ্টভোজী শিশুগণ অকস্মাৎ উপন্যাসের রসভঙ্গ দেখিয়া আহার্য্যের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ পূর্ব্বক অধৌত বদনে দশদিকে প্রস্থান আরম্ভ করিল। যাহারা আহার সমাপন পূর্ব্বক চন্দ্রকিরণ-শীতল শয্যায় শয়ন করিয়া উপন্যাস শ্রবণ করিতেছিল, তাহার অকালে সমাপন দেখিয়া ঘোরতর অস্বাস্থ্যসূচক সমালোচনার অবতারণা করিল। উদ্ভিদ্‌কর্ত্তনপরায়ণা সুন্দরীগণ অস্পষ্টালোকে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তথাপি অবগুণ্ঠন দীর্ঘীকৃত করিলেন। যে মেয়েরা বাট্‌না বাটিতেছিল, তাহারা বড় গোলে পড়িল। এত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দই বা করি কি করে ? আর কাজ বন্ধ করিলেই বা কি মনে করিবেন ? আর যাহারা দুগ্ধকটাহের তত্ত্বাব-ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা আরও গোলে পড়িল। তাহারা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় সব দুধটুকু উছলিয়া পড়িয়া গেল।

সীতারাম বলিলেন "তোমরা কেউ গঙ্গাস্নানে যাবে গা ?" অমনি "বাবা, আমি যাব," "দাদা, আমি যাব," "জ্যাঠা, আমি যাব," "মামা, আমি যাব" ইত্যাদি শব্দ নানাদিক হইতে

উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়স্কা, প্রৌঢ়া, যুবতী, *কিশোরী, বালিকা,পোগণ্ড* ও অপোগণ্ড শিশু সকলেই এক-স্বরে বলিল "আমি যাব।" অকর্ত্তিত মৎস্য অরক্ষিত হইয়া কুকুর এবং বিড়ালের মনোহরণ করিতে লাগিল। যত্ন প্রস্তুত এবং কর্ত্তিত অলাবু এবং বার্ত্তাকুরাশি রোমন্থশালিনী গাভী জিহ্বা-প্রসারণ পূর্ব্বক উদরসাৎ করিতে লাগিল, কেহ দেখিল না। কাহারও দুধ আঁকিয়া গেল, কেহ শিল নোড়া বাধিয়া পড়িয়া গেল। কাহারও ছেলে কাঁদিয়া বড় গণ্ড-গোল করিল কিন্তু কিছুতেই কাহারও দৃক্‌পাত নাই।

সীতারাম বলিলেন "তবে সকলেই চল। কিন্তু আর সময় নাই। আজ রাত্রে দিন ভাল, খাওয়া দাওয়ার পর সকলকেই যাত্রা করিতে হইবে, অতএব এইবেলা উদ্যোগ কর।"

তৎপরে সীতারাম যথাকালে গৃহিণীর নিকট দেখা দিলেন। গৃহিণী বলিলে একটু দোষ পড়ে। কেন না গৃহিণী শব্দ একবচন। এদিকে গৃহিণী দুইটি! তবে বাঙ্গলায় দ্বিবচন নাই। আর একবারেও দুই গৃহিণীর সাক্ষাৎ হইতে পারে না। এই জন্য বৈয়াকরণদিগের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া, আমরা গৃহিণী শব্দই প্রয়োগ করিলাম।

গৃহিণী দুইটি বলিয়া লোকে নাম রাখিয়াছিল সত্যভামা আর রুক্মিণী। সত্যভামা এবং রুক্মিণীর চরিত্রের সঙ্গে তাহাদের চরিত্রের যে কোন সাদৃশ্য ছিল এমন আমরা অবগত নহি। তাহাদিগের প্রকৃত নাম নন্দা ও রমা। যাঁহার কাছে এখন সীতারাম আসিলেন, তিনি নন্দা। লোকে বলিত, সত্যভামা।

নন্দা অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছিল। সীতারামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"হঠাৎ গঙ্গাস্নানের এত ঘটা কেন?"

সীতারাম বলিলেন "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ—"

নন্দা। তা জানি; তিনি মাথায় থাকুন। হঠাৎ তাঁর উপর এ ভক্তি কেন?

সীতা। দেখ, তোমাদের ঐহিক সুখের জন্য আমার যেমন জবাবদিহি, তোমাদের পরকালের সুখের জন্যও আমার তেমনি জবাবদিহি। সামনে একটি যোগ আছে, তোমাদের গঙ্গাস্নানে পাঠাব না?

নন্দা। তুমি যখন কাছে আছ তখন আবার আমাদের স্নান কি? তুমিই আমাদের সকল তীর্থ। তোমার পাদোদক খাইলেই আমার একশ গঙ্গাস্নানের ফল হইবে। আমি যাব না।

সীতা। (সত্যভামার নিকটে হার মানিয়া) তা তুমি না যাও, না যাবে, যারা যেতে চায় তারা যাক্।

নন্দা। তা যাক্, সবাই যাক্, আমি একা থাকিব। একটু ভূতের ভয় করিবে, তা কি করিব? কিন্তু আসল কথা কি বল দেখি?

সীতা। আসল আর নকল কিছু আছে না কি?

নন্দা। তুমি ত ভাজ পটল ত বল উচ্ছে।

সীতা। তবু ভাল, উচ্ছে ভেজে ত পটল বলি না।

নন্দা। তা বল না। কিন্তু আমাদের কাছে দুই সমান। লুকোচুরিতেই প্রাণ যায়। ভিতরের কথা কি বলিবে?

সীতা। বলিবার হইত ত বলিতাম।

অমনি নন্দার মুখখানা মেঘঢাকা আকাশের মত, জল-ভরা ফোটা পদ্মর মত, হাই দিলে আরসি যেমন হয়, সেই এক রকম কি হইয়া গেল। একটু ধরাধরা ভরাভরা আওয়াজে নন্দা বলিল "তা নাই বলিলে। তা সন্ধ্যার পর তোমার কাছে কে এয়েছিল, সেইটা বল।"

সীতা। তা ঢের লোক ত আমার কাছে আসে। সন্ধ্যার পর অনেক লোক এয়েছিল।

নন্দা। মেয়েমানুষ কে এয়েছিল?

সীতা। তাও ত ঢের আসে। খাজানা মিটাতে ভিক্ষা মাঙ্গতে, দায়ে অদায়ে পড়িয়া ঢের মাগী ত আমার কাছে আসে। স্ত্রীলোক প্রায় সন্ধ্যার পরই আসে।

নন্দা। আজ সন্ধ্যার পর কজন স্ত্রীলোক এয়েছিল?

সীতা। মোটে একজন।

নন্দা। সে কে?

সীতা। তার ভাই বাঁচে না।

নন্দা। তা নয়, সে কে? নাম কি?

সীতা। আর এক দিন বলিব।

এইবার মেঘ বর্ষিল। দর্পণস্থ বাষ্পরাশি জলবিন্দুতে পরিণত হইল। সত্যভামা কাঁদিল।

তখন সীতারাম নন্দার চিবুক গ্রহণ পূর্ব্বক বড় মধুর আদর করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যেখানে রমা ঠাকুরাণী দর্পণ লইয়া সরু সরু কালো

চকুচে চুলের দড়িগুলি গুছাইতেছিলেন, সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। রমা কনিষ্ঠা—নন্দার অপেক্ষা একে বয়সে ছোট আবার আকারেও ছোট সুতরাং নন্দার অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। নন্দার যৌবন এবং রূপ উভয়ই পরিপূর্ণ, শ্রাবণের গঙ্গা। রমার দুইই অপরিপূর্ণ, বসন্ত-নিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী ক্ষুদ্রা কল্লোলিনী। নন্দা তপ্তকাঞ্চনবৎ শ্যামাঙ্গী—রমা হিমানী-প্রতিফলিত-কৌমুদীবৎ গৌরাঙ্গী। সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। বলিলেন "রুক্মিণী! গঙ্গাস্নানের কথা শুনেছ?"

রমা। ছি, ছি, ও কি কথা?

সীতা। কোন্‌টা ছি ছি? গঙ্গাস্নান ছি ছি? না রুক্মিণী ছি ছি?

রমা। তাঁরা হলেন দেবতা, লক্ষ্মী, আর সেই একটা কি নাম মনে আসে না—

সীতা। শিশুপালের গল্পটা বটে? তা সে কথা রহিল। গঙ্গাস্নানের কথাটা কি শুনেছ?

রমা। শুনেছি বই কি?

সীতা। যাবে?

রমা। তাই ত চুলের দড়ী গোছাচ্ছি।

সীতা। কেন যাবে? এই ত আমি তোমার সর্ব্বতীর্থ কাছে আছি।

রমা। যেতে না বল, যাব না।

সীতা। তবে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে কেন?

রমা। যাইতে বলিয়াছিলে বলিয়া।

সীতা। আমি ত যাইতে বলি নাই—আমি কেবল সবাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে কে যাবে? তা তুমি যাবে কি?

রমা। তুমি যাবে কি?

সীতা। যাব।

রমা। তবে আমিও যাব।

সীতা। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। কাল পথে মিলিব।

রমা। আজ আমাদের নিয়ে যাবে কে?

সীতা। মেনাহাতী নিয়ে যাবে।

রমা। বাপ্‌রে! তা হোক্‌। একটা কথা বলিবে?

সীতা। কি?

রমা। (সীতারামকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) বলিতে হইবে। তোমার বড় সাহস, আমার ভয় করে, তুমি কোন দুঃসাহসের কাজ করিবে—তাই আমাদের সরাইয়া দিতেছ।

সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া রমার খোঁপা ধরিয়া টানিয়া মারিবার জন্য এক চড় উঠাইল, শেষ রমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। বলিল "আমি বড় দুঃসাহসের কাজ করিব সত্য, কিন্তু কোনও ভয় নাই।"

রমা। তোমার ভয় নাই, আমার আছে। তোমার ভয় আমার ভয় কি স্বতন্ত্র? শোন, আজ সবার গঙ্গাস্নানে যাওয়া বন্ধ। তুমি আজ আমার এই ঘরের ভিতর কয়েদী।

বলিতে বলিতে রমা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল। বলিল "যাইতে হয় আমার গলায় পা দিয়া যাও। এখন বল দেখি, আজ তোমার কাছে কে আসিয়াছিল?"

সীতা। তোমাদের কি অষ্টপ্রহর চর ফেরে নাকি?

রমা। ভাণ্ডারী মহাশয় কিছু তরকারীর প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়েছেন, তাই আমরাও কথাটাও শুনিয়াছি। সে কে?

সীতা। শ্রী।

রমা। সে কি? শ্রী? কেন আসিয়াছিল?

সীতা। তার একটি ভিক্ষা ছিল।

রমা। ভিক্ষা পাইয়াছে কি?

সীতা। তুমি কি ভিক্ষুককে ফিরাইয়া থাক?

রমা। তবে সে ভিক্ষা পাইয়াছে। কি দিলে?

সীতা। কিছু দিই নাই। দিব স্বীকার করিয়াছি।

রমা। কি দিবে শুনিতে পাই না?

সীতা। এখন না। দ্বার ছাড়।

রমা। সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে আমি দ্বার ছাড়িব না।

সীতা। তবে শুন। কাজি সাহেব শ্রীর ভাইকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন। শ্রীর ভিক্ষা আমি তাহার ভাইকে রক্ষা করি। আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি।

রমা। তাই আমরা আজ গঙ্গাস্নানে যাইব। তুমি

আমাদের পাঠাইয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে লাঠালাঠি দাঙ্গা করিবে।

সীতা। সে সকল কথায় মেয়েমানুষের কাজ কি?

রমা। কাজ কি? কিছুই কাজ নাই। তবে কি না, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব না।

এই বলিয়া রমা ভাল করিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল। সীতারাম অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। রমা দৃক্‌পাতও করিল না।

সীতারাম বড় ফাঁপরে পড়িলেন,—দেখিলেন, অনর্থক সময় যায়। অতএব যাহা বলিবেন না মনে করিয়াছিলেন তাহাই বলিতে বাধ্য হইলেন। "তুমি জান, আমার সত্য-ভঙ্গ হইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি তা জান ত?"

তখন রমা বলিল "তবে আমারও কাছে একটা সত্য কর, দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি।"

সীতা। কি বল?

রমা। তুমি বিনা বিবাদ বিসম্বাদে—দাঙ্গালড়াই না করিয়া শ্রীর ভ্রাতার জন্য যাহা পার, কেবল তাহাই করিবে, ইহা স্বীকার কর।

সীতা। তাতে আমি খুব সম্মত। দাঙ্গা-লড়াই আমার কাজও নয়, ইচ্ছাও নয়। কিন্তু যত্ন সফল হইবে কি না সন্দেহ।

রমা। হোক্ না হোক্—বিনা অস্ত্রে যা হয়, কেবল তাই করিবে, স্বীকার কর।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সীতারাম বলিলেন "স্বীকার করিলাম।"

রমা প্রসন্ন মনে দ্বার ছাড়িয়া দিল। বলিল "তবে আমরা গঙ্গাস্নানে যাইব না।"

সীতারাম ভাবিলেন। বলিলেন "যখন কথা মুখে আনা হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল।"

রমা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। সীতারাম আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

[প্রচার, ১ম খণ্ড ৪৬—৬৭ পৃষ্ঠা]

এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র পরে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে লিপিবদ্ধ করেন :—

"সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনা পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীতী পাঠাইয়া দিলেন।"

[সীতারাম ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ

এখন দেখা যাক্ এই পরিচ্ছেদগুলি কেন পরিত্যক্ত হইল? মৃণ্ময়ের বিস্তৃত পরিচয় সীতারামের কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। প্রধান চরিত্ররূপেও মৃণ্ময় অঙ্কিত হয় নাই। মৃণ্ময়ের সহিত কথোপকথন ও সীতারামের পরিবারবর্গকে দূরে প্রেরণ করার বন্দোবস্তের বিস্তৃত বর্ণনার কোন সার্থকতা নাই। এই বন্দোবস্ত দেখাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে বৃহৎ পরিবারের কোলাহলময় অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বিষবৃক্ষে তাহার অনুরূপ চিত্র থাকিলেও উহা আমাদের ভাল লাগে বটে কিন্তু নন্দা ও রমার সহিত রসালাপ উহাদের পরবর্ত্তী চরিত্রের সহিত খাপ খায় নাই। যে রমা মুসলমান আক্রমণ করিবে বলিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশীথে গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠায়, যে রমার মুখে কথা ফোটে না, যে সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি রমণীর কোমল বৃত্তিগুলির সজীব প্রতিমূর্ত্তি, সে যে তীক্ষ্ণধীশালিনী প্রগল্‌ভা রমণীর ন্যায় এক কথায় সীতারামের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবে বা সীতারামকে কক্ষে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইবে, তাহা অসম্ভব। অতিশয় প্রগল্‌ভা নারী ব্যতীত প্রচারে প্রকাশিত রমার আচরণের ন্যায় আচরণ অন্য নারীর অসাধ্য। তাই সঙ্কোচকুণ্ঠিতা লজ্জাজড়িতা রমাকে ফুটাইবার জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত পরিচ্ছেদগুলি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

এই সকল বর্ণনার পর চন্দ্রচূড়ের দাঙ্গার আয়োজন বর্ণনাত্মক এক পরিচ্ছেদ ছিল, এই উদ্যোগপর্ব্বের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক বলিয়া পরে পরিত্যক্ত হয়। সীতারাম যে দাঙ্গা করিয়াছিলেন, তাহাতে কতক তাঁহার পক্ষের লোক কতক বা শ্রীর উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত জনসাধারণ ছিল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের নিশীথে টাকার থলি ও প্রসাদী ফুল লইয়া প্রজাদের গৃহে গিয়া উত্তেজনা করার বর্ণনা বঙ্কিম পরিবর্জ্জন করিলেন; কেন না চন্দ্রচূড়ের এতাদৃশ লোকো-ত্তেজন শক্তি পরে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকার সময় কেন স্ফূর্ত্তি পাইল না, তাহা পাঠকের মনে উদিত হইতে পারে। আর সীতারাম দাঙ্গায় অনিচ্ছুক হইলেও চন্দ্রচূড় সীতা-

রামকে মিথ্যাকথায় ভুলাইয়া দাঙ্গার আয়োজন করিলেন, এটাও কেমন কেমন ঠেকে ; কারণ দাঙ্গার ফলাফল সীতারামকেই ভোগ করিতে হইবে, চন্দ্রচূড়কে নহে। তাই এত বড় কার্য্যের উদ্যোগ সীতারামের অনভিমতে হইল, ইহা বড়ই বিচিত্র বলিয়া, পাছে মনে হয়, সেই জন্য নিম্নলিখিত অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে ঃ—

চন্দ্রচূড়ের কাছে লুকাইবার যোগ্য সীতারামের কোনও কথাই ছিল না। শ্রীর কাছে আর রমার কাছে যে দুইটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সীতারাম তাহা সবিস্তারে নিবেদিত হইলেন। বলিলেন—"এই উভয় সঙ্কটে কি প্রকারে মঙ্গল হইবে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। নারায়ণ মাত্র ভরসা। মারামারি কাটাকাটিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি সেই জন্যই মেনাহাতীকে সরাইয়াছি। কিন্তু স্তুতিমিনতিতেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন ভরসা করি না। যাই হোক্, প্রাণপাত করিয়াও আমি এ কাজ উদ্ধার করিতে রাজী আছি। সিদ্ধি আপনার আশীর্ব্বাদ। যদি সিদ্ধি না হয়, তবে পাপ-শান্তির জন্য কাল প্রাতে তীর্থযাত্রা করিব। তাই আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি!"

চন্দ্রচূড়। আমি সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি, এখনও করিতেছি, মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি এই রাত্রেই কি তুমি কাজীর নিকট যাইবে?

সীতা। না। আজ রাত্রি-জাগরণ করিয়া নিভৃতে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব। কাল উপযুক্ত সময়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইব।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহজ লোক নহেন। মেনাহাতী শরীরে যা, ইনি বুদ্ধিতে তাই। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "বাবাজী একটু গোলে পড়িয়াছেন দেখিতেছি। যুদ্ধবিগ্রহে যে ইচ্ছা নাই সে কথাটা মনকে চোকঠারাই বোধ হইতেছে। সেই রুক্মিণী বেটীই যত নষ্টের গোড়া। ঐ বেটী মনে করে কি, রুক্মিণী আছে, নারদ নাই। জাত নেড়ে, বাবু-বাছার কি কাজ! নারায়ণ কি নেড়ের দমন করিবেন না? কতকাল আর হিন্দু এ অত্যাচার সহ্য করিবে? একবার দেখি না, সীতারামের বাহুতে বল কত? বৃথাই কি নারায়ণকে তুলসী দিই?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তর্কালঙ্কার বলিলেন "তুমি তীর্থযাত্রা করিবে এবং পরিবারবর্গকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবে শুনিয়া আমি বড় বিপন্ন হইলাম।"

সীতা। কি? আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। আমি তোমার মঙ্গলার্থ কোনও যজ্ঞের সংকল্প করিয়াছি। তাহাতে এক সহস্র রৌপ্যের প্রয়োজন। তাই বা আমায় দিবে কে? উদ্যোগই বা করিয়া দেয় কে?

সীতা। টাকা এখনই আনাইয়া দিতেছি। আর উদ্যোগের জন্য কাহাকে চাই?

চন্দ্র। যজ্ঞের যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, জীবন ভাণ্ডারী তাহাতে বড় সুপটু। জীবন ভাণ্ডারীকেও আনাইয়া দাও। আমার এই তল্পিদার ভৃত্য রামসেবক বড় গুণবান্ আর বিশ্বাসী। তার হস্তে খাতাঞ্চীকে পত্র পাঠাইয়া দাও, টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীকে আনিবে।

সীতারাম তখন একটু কলাপাতে বাঁকারির কলমে খাতাঞ্চির উপর এক হাজার টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীর জন্য চিঠি পাঠাইলেন। রামসেবক তাহা লইয়া গেল। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন সীতারামকে বলিলেন "এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মঙ্গল হইবে।"

তখন সীতারাম গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বে জীবন ভাণ্ডারী সহস্র রৌপ্য লইয়া আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিল। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "কেমন জীবন! এ সহরে তোমার মুনিবের যে যে প্রজা যে যে খাতক আছে, সকলের বাড়ী চেন ত?"

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, সব চিনি।

চন্দ্র। আজ রাত্রে সব আমায় দেখাইয়া দিতে পারিবে ত?

জীবন।—আজ্ঞা হাঁ, চলুন না। কিন্তু আপনি এত রাত্রে সে সব চাঁড়াল বাগ্দীর বাড়ী গিয়া কি করিবেন?

চন্দ্র। বেটা, তোর সে কথায় কাজ কি? তোর মুনিব আমার কথায় কথা কয় না,—তুই বকিস্! আমি যা বলিব তাই করিবি, কথা কহিবি না।

জীবন।—যে আজ্ঞা, চলুন। এ টাকা কোথা রাখিব?

চন্দ্র। টাকা সঙ্গে নিয়ে চল্। আমি যা করিব, তা যদি কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিস্, তবে তোর শূল বেদনা ধরিবে—আর তুই শিয়ালের কামড়ে মরিবি।

এখন জীবন ভাণ্ডারী শূল-বেদনা এবং শৃগালএ উভয়কেই বড় ভয় করিত— সুতরাং সে ব্রহ্মশাপ-ভয়ে আর দ্বিরুক্তি করিল না। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন পূজার ঘর হইতে এক আঁজলা প্রসাদী ফুল নামাবলীতে লইয়া জীবন ভাণ্ডারী ও সহস্র রৌপ্য সহায় হইয়া বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া জীবন ভাণ্ডারী একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই একজন।"

চন্দ্র।—ইহার নাম কি?

জীবন।—এর নাম যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

চন্দ্র।—ডাক তাকে।

তখন জীবন ভাণ্ডারী "মণ্ডলের পো! মণ্ডলের পো!" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিল। যুধিষ্ঠির মণ্ডল বাহিরে আসিল। বলিল, "কে গা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কাল গঙ্গারাম দাসের জীয়ন্তে কবর হইবে, শুনিয়াছ?"

যুধিষ্ঠির।—শুনিয়াছি।

চন্দ্র।—দেখিতে যাইবে?

যুধিষ্ঠির।—নেড়ের দৌরাত্ম্য, কি হবে ঠাকুর দেখে?

চন্দ্র।—দেখিতে যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর হুকুম। এই হুকুম নাও।

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর একটা প্রসাদী ফুল নামাবলী হইতে লইয়া যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে। যাইব।"

চন্দ্র।—তোমার হাতিয়ার আছে?

যুধি।—আজ্ঞে, এক রকম আছে। মুনিবের কাজে মধ্যে মধ্যে ঢাল-শড়কী ধরিতে হয়।

চন্দ্র।—লইয়া যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম লও।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার জীবন ভাণ্ডারীর থলিয়া হইতে একটি টাকা লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিলেন।

যুধিষ্ঠির টাকা লইয়া—মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "অবশ্য লইয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা বলিতেছিলাম কি—একা যাব?"

চন্দ্র।—কাকে নিয়ে যেতে চাও?

যুধি।—এই পেসাদ মণ্ডল। জোয়ানটাও খুব, খেলোয়াড়ও ভাল—সে গেলে হইত।

তখন চন্দ্রচূড় আর একটী প্রসাদী ফুল ও আর একটা টাকা যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। বলিলেন, "তাহাকে লইয়া যাইও।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর সেখান হইতে জীবন ভাণ্ডারীর সঙ্গে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সেখানেও ঐরূপ টাকা ও ফুল বিতরণ করিলেন। এইরূপে সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া রাত্রি-শেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীতে রমাতে সে রাত্রে এমনিই আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সান্ত্বনা

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে]

যদিও না পার উঠিতে শৃঙ্গে, শকতি তোমার যদি না হয়,
অর্দ্ধ-গিরিপথে ভীষণ ঝটিকা, যদি বা তোমারে ঘেরিয়া লয়,
সান্ত্বনা তবু পাইবে তুমি,
যদি হয় তব মনে,—
মানবের মত করেছ প্রয়াস,
যুঝিয়াছ প্রাণপণে।

মরুভূমি-মাঝে রবিকর তাপে প্রখর তাপিত বালুর স্তরে,
পান্থপাদপের সুশীতল বারি তোমার শ্রান্তি যদি না হরে,
সান্ত্বনা তবু পাইবে তুমি,
যদি হয় তব মনে,—
মানবের মত করেছ প্রয়াস,
যুঝিয়াছ প্রাণপণে।

যদিও আশার রক্তিম আভা না পড়ে তোমার জীবন-স্রোতে,
তীব্র নিরাশার ঘোর ঘূর্ণিপাকে যদি ডুবে তরী আঁধার রাতে,
সান্ত্বনা তবু পাইবে তুমি,
যদি হয় তব মনে,—
মানবের মত করেছ প্রয়াস,
যুঝিয়াছ প্রাণপণে।

নরওয়ে ভ্রমণ

[শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা]

আমরা বেলা ২টার সময় পারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ আর জাহাজের খেয়া-পার হওয়া নয়। ছোট ছোট কতকগুলি মোটার-বোট ভাড়া খাটিতে আসিয়াছিল, তাহারই একটা দখল করিয়া বসিলাম। বস্তু-বিশেষের নূতনত্বের একটা মোহ আছে ত ; তাই পারে গিয়া দুই চার পা চলিতেই সেই পোড়া বাড়ীগুলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। আহা! বড় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কেহ বা বসিয়া, তাদের সাধের দ্রব্যজাতের দশা দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, কেহ বা তাহা হইতে দুই একটা আস্ত অংশ বাহির করিয়া অবশিষ্ট ভাগের জন্য তন্ন-তন্ন করিয়া তল্লাস করিতেছে। সকলেরই মুখ মলিন, সকলেরই হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেবল অবোধ শিশুর দলে আজ আর আনন্দের সীমা নাই, আজ আর তাদের ঘরে আটক থাকিতে হইবে না, জানিয়া তাহারা খেলায় মত্ত। কিন্তু খেলিতে খেলিতে যখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, দৌড়িয়া গিয়া, মা বোন্‌কে তাড়না করিতেছিল, আর তারা তখন কিছু দিতে না পারিয়া, সজল নয়নে শিশুদের মুখের দিকে চাহিতেছিল, তখন এ করুণ দৈন্যের দৃশ্য বড়ই অসহ্য হওয়ায় দর্শকবৃন্দ সকলেই কিছু না কিছু দিতে বাধ্য হইল।

এই ফিয়ডের আশে পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। কত কৃষকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই ক্ষণকালের জন্য আপন আপন কার্য্য ছাড়িয়া, আমাদের দিকে সকৌতুকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, ইহাদিগের সহিত কিছু বাক্যালাপ করি। ভ্রবিলাস-অনভিজ্ঞ অমার্জ্জিত সরল-প্রাণের সুখদুঃখের কথা কিছু শুনিয়া যাই। পরের মুখে ঠিক তেমনটি শোনা হয় না। কিন্তু ভাষা জানা না থাকাতে বিদেশের ব্যবধান এতটুকুও ঘুচাইতে পারিলাম না, এই

একবর্গ হইতে ক্রিষ্টিয়ানার দৃশ্য

বড় দুঃখ, সকল সময়েই মনকে পীড়িত করিতেছিল। বাক্‌শক্তি সত্ত্বেও ইহাদের কাছে বোবা বনিয়াই আছি। এদেশের পর্ব্বত-বিশেষের স্তরে স্তরে বিস্তর শ্লেট (Slate) প্রস্তর পাওয়া যায়। তাহা যন্ত্রদ্বারা বাহির করিয়া, নানা আকারে কাটিয়া, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া, দালানের ছাদ, কি মেজের কারুকার্য্যে ব্যবহার করে। ইহাতে বাড়ীর শ্রী বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করে। এ কার্য্যে যুবা-বৃদ্ধ বিস্তর লোক নিযুক্ত দেখিলাম।

তারপর পাহাড়ের উপরের জঙ্গল আবাদ করিবার ইহাদের একটা নূতন কায়দা দেখিলাম। পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, অনুমান ৫।৭ শত ফিট উপরে, জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গায়ের গাছপালাগুলি কেমন বিনা বাতাসেই নড়িতেছে। প্রথমে কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তার পর দেখি কি, একটা মোটা তারের মধ্য দিয়া ২।৪ আঁটি, কাটা লতাপাতা ডালপালা তরতর করিয়া নামিয়া আসিয়া, একেবারে কৃষকের আঙ্গিনায় পড়িতেছে। তখন বুঝিলাম যে, উপরে লোক থাকিয়া এ কার্য্য করিতেছে। ঘন বন এবং উঁচু বলিয়া উহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। জঙ্গল সাফ হইয়া, এই কৌশলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অনেক বোঝা নীচে জড় হইতেছে। শুনিলাম, এই সকল লতাপাতা রৌদ্রে শুকাইয়া গৃহপালিত পশুদিগের শীতের খাদ্য ও শয্যার নিমিত্ত, আর ডালপালাগুলি নিজেদের ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। দেখিলাম, কিছু শুকানো হইয়া গিয়াছে, কিছু কিছু বাড়ীর চারিদিকের বেড়ার উপর ঝুলানো রহিয়াছে, অবশিষ্টগুলি মাটিতে ছড়ানো আছে। সময়মত ঘরে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা হইবে। আহা! শীতের দেশের দীন-দুঃখীর কষ্ট আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। কত গৃহহীন অনাথা নাকি পথের ধারে পড়িয়া, শীতে রক্ত জমাট হইয়া মরিয়া থাকে। কাহারও যদি বা মাথা রাখিবার স্থান থাকে, তবুও আগুনের অভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। কত লোক খড়কুটার উপরে শুইয়া রাত কাটায়। সেও একদিন দুইদিন নয়, ক্রমাগত আট মাস, অর্থাৎ যত দিন বরফ-পড়া ক্ষান্ত না হয়। ততদিন খাওয়া-পরারই বা কি হাল শুনি। অনেকের ভাগ্যে শুধু সিদ্ধ-আলু আর নুন, তাও নাকি রোজ জোটে না। শিকারের শুষ্ক মাংস সঞ্চিত রাখিবার মত স্থানই বা তাদের কোথায়? এই কারণে, এই সব শীতপ্রধান দেশে, অনেক শিশু ও বৃদ্ধ প্রতি বৎসর মারা যায়। বয়স্কেরা আপন আপন শরীরের রক্তের জোরে যা বাঁচিয়া যায়। এতদিন এ সব শোনা-কথায় বিশ্বাস করি নাই, আজ স্বচক্ষে ইহাদের ঘরবাড়ী আস্‌বাব দেখিয়া, দারুণ শীতের প্রকোপে ইহাদের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। বেলা পড়িলে জাহাজে ফিরিবার মুখে, নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে চায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা গেল। গিয়া দেখি, সেখানে আজ মহা ধূমধাম চলিয়াছে। সেই জর্ম্মনীর রাজা, আজ তাঁহার জাহাজের সকল কর্ম্মচারীদিগের এখানে রাত্রি-ভোজের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। আহারের স্থানসকল শোভন-রূপে সজ্জিত করা হইয়াছে বলিয়া, হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, আজ আগন্তুকদিগের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে সব ঘর একেবারে ভরপুর দেখিয়া, আমরা খোলা বারান্দায় আসিয়া কোন প্রকারে একটু বসিবার স্থান যোগাড় করিয়া লইলাম। আমরা জানি, বিলাতের হোটেলের মত দশটা লোক তৎক্ষণাৎ আসিয়া, আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষা করিবে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই দেখিলাম না। বস্ বসিয়াই আছি। এতদিন কুক্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এ সব ঝঞ্চাটে কখনও পড়িতে হয় নাই। স্থানীয় ভাষা না-জানা বিদেশে, গাইড হেন বন্ধুজন ব্যতীত যে, আমাদের অন্যগতি নাই, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম; এবং ভবিষ্যতে আর এমন জনে কখনও বিতৃষ্ণ হইব না, মনে মনে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলাম। কেহ কাছে আসিলেই "Tea Tea" এই কথাটি বার দুই তিন বলা হয়, কিন্তু কেহই তাহা কাণেই তুলিতেছে না দেখিয়া, হাসিও পাইতেছে, বড় বিরক্তও লাগিতেছে। আমার ভ্রাতা ভাবিলেন, এ সময় দুই চার কথা শুনাইতে পারিলে, তবে মনের ঝালটা একটু মিটিত। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, "বেঁধে মার্‌লে সয় ভাল" তাঁর আজ সেই দশা; অসময়ে জাহাজেও এই পানীয়লাভ দুর্ঘট হইবে জানিতেন, সুতরাং রাগের মাথায় সেখানে গিয়াও কোন লাভ নাই। ইত্যবসরে কে যেন একটু বিনীত ভাবে আসিয়া, আধা আধা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল "আমরা কি চাই?" আমাদের যদি মনে থাকিত যে, এ দেশে চায়ের চলন তত নাই,

..ফ আর চকলেট-পানেরই প্রথা, তবে কি আর এ ..াহাম্মুকী বলিতে হইত ! এখন বুঝিলাম যে, বিনা দোষে ..দের উপর অবিচার করা হইতেছিল। চা চাহিয়া যে চা পাওয়া গেল, তা আদৎ চায়ের দেশের অধিবাসিগণের গলাধঃকরণ করা কিছু কষ্টকর। তাদের একটু ভাল ভাল চায়ের আস্বাদ রাখাই অভ্যাস। যাক্ সে দুঃখের কথা। এ স্থান হইতে চিরবিদায়-গ্রহণের আগে সে বৃহৎ ভবনের চিত্রপট সকল না দেখিয়া, আসা গেল না। নরউইজীন

এক ভরসা যে, আমরা কাল কয়জন একেবারে "Hall Mark" করা—হারাইলেই খানাতল্লাস হইবেই হইবে। সুতরাং কাপ্তেন সাহেব জানিয়া শুনিয়া নির্ম্মমের মত ফেলিয়া যাইবে না নিশ্চয়। বিশেষ এত দূরদেশ হইতে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি তার খাতিরও ছিল যথেষ্ট। নিয়ম ছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত আধ ঘণ্টার বেশী কাহারও জন্য কর্ণধার অপেক্ষা করিবেন না, আমরা তার আগেই আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তরী খুলিয়া দিল।
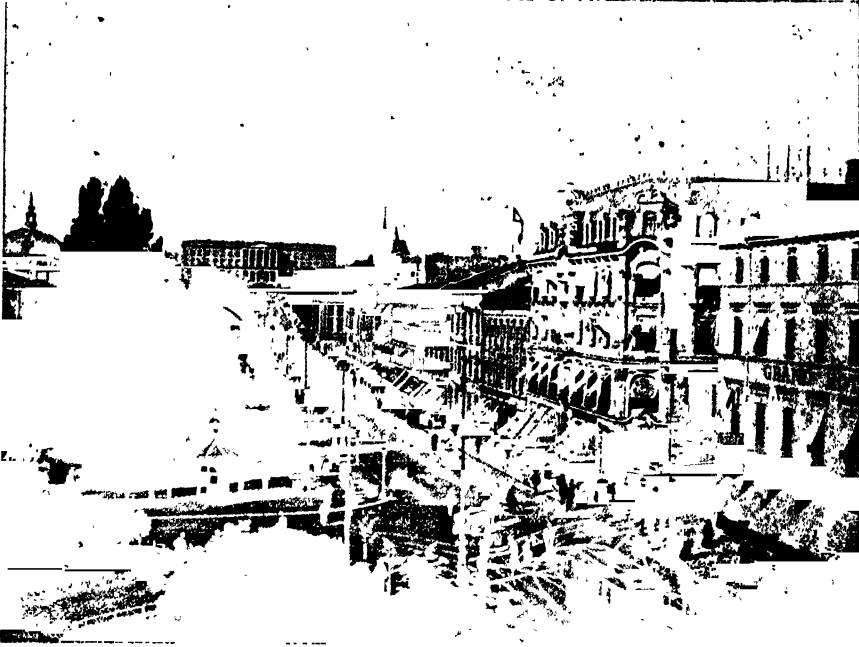
ভেয়াক্স্ গেড্

চিত্রকরেরা কলাবিদ্যায় পারদর্শী বটে ! যেমন সুন্দর বর্ণ-বিন্যাস, তেমন তাদের লিখনও চমৎকার দেখিলাম। আর অভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও এখানে অভাব নাই; কাজেই এ সবের চিত্রই বেশী ছিল। মনোনিবেশপূর্ব্বক ইচ্ছামত সময়, ইহাতে অতিবাহিত করিব, আমাদের সে যো ছিল না। বংশীরব ক্রমাগত আমাদিগকে কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে আদেশ করিতেছে। এ ডাক শোনা না শোনা নিজেদের ইচ্ছাধীন নয়। এখানে বেতনভোগী হুকুমের দাসের হুকুম না শুনিলে দণ্ডভোগ আছে। সেও আবার যে সে দণ্ড নয়, আমাদের পক্ষে প্রায় আণ্ডামানে বাস ..াছ্। তখন প্রাণের দায়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম।

ক্রমে আবার শৈলশিখরসমন্বিত, ফিয়ডের একাধিপত্য ছাড়াইয়া, সেই অসীম অতল নীলসিন্ধুর জলে আসিয়া পড়িলাম। তখন সেই স্বচ্ছ সলিলে আপনার সসীমরূপ প্রতিফলিত দেখিয়া, যেন লজ্জা পাইয়া প্রকৃতিসুন্দরী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সীমার সুশোভন সাজ বেশ, অসীমের বিরাট মূর্ত্তির কাছে কেমন খেলো দেখায়। অনন্ত আকাশ আর অতল জলধির তুলনায় সকলি যে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর এ অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন সকল রূপোন্মত্ততায় অবসাদ আসে। কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি চাতুর্য্যময়ী, তিনি কি আর বেশীক্ষণ অন্তরালে থাকিতে পারেন ? যেই দেখিলেন যে, ভাস্কর সেই প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে আপনার মুখচ্ছবি প্রতি-

বিস্মিত করিয়া, দিগ্‌বধূগণকে আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেছেন, অমনি কোথা হইতে অলক্ষিতে একখণ্ড মেঘ আসিয়া, সেই সমুজ্জ্বল মুখের উপর ফেলিয়া তাহা ঢাকিয়া দিলেন। আর প্রভাকরের প্রণয়িনীগণ তৎক্ষণাৎ বিরহ-ব্যথায় বিমলিন হইয়া পড়িলেন; পরক্ষণেই করুণার পরবশ হইয়া সে আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়া সকলকে হাসাইলেন। আবার কি মনে করিয়া, ইঙ্গিতে সমীরণকে মৃদুমন্দে সঞ্চালনে বারিধিবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, দিনমণির কনককান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। প্রভঞ্জনও অচিরাৎ দেবীর আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। এইরূপে ক্ষণে দর্শন ক্ষণে অদর্শনে, দিঙ্মণ্ডলকে অভিভূত করিয়া দিনের পালা সাঙ্গ করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকে টানিয়া আনিয়া, এতদিন পরে নিশারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন, কিন্তু নিশার পতি-দেবতা চুপে চুপে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইতেই সন্ধ্যা সরমে সরিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে দেবী তারকার মালা গাঁথিয়া বিলাসী নিশাপতির আনমিত গলদেশে অর্পণ করিয়া সকৌতুকে ঈর্ষান্বিতা বিভাবরীকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন

"নবীনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।"

আমরা প্রকৃতি আর পুরুষের এই চির মাধুর্য্যময় প্রণয়াভিনয় দেখিতে দেখিতে, সেই এক ঘেয়ে জলে-জলাকার ভাবটা ভুলিয়া থাকিতাম।

পরদিন আমরা রাজধানী খ্রিষ্টিয়ানার সম্মুখীন হইতেই আমাদের জাহাজে Royal Flag উড়াইয়া দিল। সেদিন কাপ্তেন সাহেব আমাদিগকে জাহাজের কিছু কলকারখানা দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কেননা বিদেশী বলিয়া আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি চতুর্থ ডেকে একখানা ঘেরা-দেওয়া ছোট কুটরীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখি, এক প্রকাণ্ড কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে দিঙ্-নির্ণয় করিয়া, একখানা চাকা এদিক ওদিক ঘুরাইয়া, সেই বৃহৎ জলযানের প্রান্তদেশস্থিত হালকে নিয়মিত করিতেছে। যে ব্যক্তির উপর ইহার চালনার ভার, তাহার আর অন্যদিকে দৃক্‌পাত করিবার যো নাই। তবে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসিয়া ইহাকে অব্যাহতি দেয়, এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে একখানা টেবিলের উপরে যে মানচিত্র দেখিলাম, তাহাতে জাহাজখানার গমনের পথ নির্ণীত করা আছে, এবং সে পথের দুই পাশের জলের গভীরতার পরিমাণ লেখা রহিয়াছে। তদনুসারে গতিবেগ কম বেশী করা হইতেছে। আমাদের সামান্য জ্ঞান বুদ্ধিতে এসকল দুরূহ সামুদ্রিক তত্ত্ব কিছুই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল কৌতূহলবিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। তারপর যাহা দেখাইলেন, তাহা আরও বিস্ময়জনক। রঙ্ বেরঙের নিশান উড়াইয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের কর্ম্মচারীদের সহিত কিরূপে রীতিমত কথাবার্ত্তা চালান যায়, তাহার নমুনা-স্বরূপ একখানা মোটা পুস্তক বাহির করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক দেশের রাজকীয় পতাকার বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও নমুনা লিখিত আছে, এবং সেই বর্ণানুসারে নাকি প্রশ্নোত্তর চলে। এই সকল হরেক রকমের চিত্র দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ "ইণ্ডিয়ার" পতাকার দিকে নজর গেল। সেই চিরপরিচিত ধ্বজ! গ্রেটব্রীটনের সঙ্গে একীভূত হইয়া আছে, কোন পার্থক্য নাই। জন্মাবধি ইহা দেখিয়া আসিয়াছি। তবু আজ কেমন চোখে একটু ধাঁ ধাঁ লাগাইল! প্রত্যেক পতাকার বিভিন্ন আকার দেখিয়া সহসা এ অভিন্নতা কেমন যেন একটু খাপ্ ছাড়া বোধ হইল। আর কলকারখানা দেখার দিকে মন গেল না। এরপর যা দেখিলাম, সে কেবল বাহিরের চক্ষে। সব দেখা শেষ হইলে, নাবিক মহাশয়কে যথোচিত ধন্যবাদ দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। ততক্ষণে রাজধানী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দূর হইতেই দেবতার হাত ছাপাইয়া এখানে মানুষের হাতের নিদর্শন সব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। অভ্রভেদী সৌধ-চূড়া সকল, যেন নভোমণ্ডলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তথাকার বৃহৎ বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করিবা মাত্র, অনেক দিন পরে আবার সেই ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া এবং জনতা দেখিয়া প্রাণের এতদিনকার উদার প্রফুল্ল ভাবটা যেন হারাইয়া ফেলিলাম। বাইরেও কলরব। ভিতরেও মহাগোলযোগ বাঁধিয়া গেল। আমরা যদিও রাজধানীরই লোক বটে, তবু সে রাজধানীর তুলনায় এর সবই অন্য রকম লাগিতে লাগিল। এদের রাজাও ফরসা প্রজাও ফরসা; রাজারও যে মাতৃ-ভাষা, প্রজারও সে ভাষা।

এক স্থানেই দুইএর জন্ম, দুই এর একই ধর্ম্ম, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম, একপ্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাপের দেহান্তে সম্রাটের দেহের যে গতি, তাঁহার অধীন জনেরও সেই বিধি!

এ দেশের চিরন্তন প্রথানুসারে ঊষার মুখ কেহ বড় একটা দেখে না, দেখিতে পায়ও না। পাছে ঊষার নব উন্মেষিতমোহন মধুর রূপের ছটায় কেহ সজাগ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে যেন নিদ্রাদেবী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আগুলাইয়া বসিয়া থাকেন। দিবাকর নিদ্রাদেবীর এই অনধিকার চর্চ্চায় রোষান্বিত হইয়া আপনার রশ্মিজাল বিস্তারপূর্ব্বক সেই নিরাশ্রয়া মুগ্ধাবালিকাকে সস্নেহে তন্মধ্যে রক্ষা করিয়া, নিদ্রাদেবীকে অন্তর্ধান হইতে আদেশ করেন। তখন চৈতন্য লাভ করিয়া, পুরুষ-রমণী অভেদে দিনমানের জন্য, সেই বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে যে যার ছুট্ দেয়। আমাদের দেশে কিন্তু এতটা ছুটাছুটি দেখি না, সব র'য়ে স'য়ে হয়। এখানে পিতা পুত্র, ভাই, ভগিনী স্বামী, স্ত্রী, শত্রু, মিত্র,—কে কার আগে যাবে, প্রাণপণ এই চেষ্টা—সর্ব্বত্র এক লক্ষ্য—পদবৃদ্ধি। এই পদ অনুসারেই মান-সম্মান! নইলে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। এসব স্বাধীন রাজ্যে জাতিবিচার নাই বটে এই পদবিচারই বা কম কিসে?

আজ প্রথমেই আমাদিগকে টুরিষ্ট হোটেলে যাইয়া সে স্থান হইতে নগরটির সমগ্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে হইবে, আমাদের প্রতি কুক্ কোম্পানীর এই আদেশ জারী হইল;—পারে নামিয়া, লেগো গাড়ীতে চড়িয়া, কিছুদূর গিয়া নির্দ্ধারিত এক ট্রেম গাড়ীর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং ইহারই সাহায্যে এক পাহাড়ের পাদদেশে আগমন করিয়া, পদব্রজে সে পর্ব্বতের সানুস্থিত পান্থশালায় পৌছান। এখানেও আমাদের সঙ্গে এক পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ জন্য পরিচয়-পত্র ছিল। গাড়োয়ানকে সে বাড়ীর কর্ত্তার আফিসের ঠিকানা বলাতে, আমাদিগকে সেখানে নিয়া উপস্থিত করিল এবং কার্ড পাঠাইবা মাত্র তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জানি না, কি মনে করিয়া তাঁর মুখে আর হাসি ধরে না। একেবারে দুই হস্ত বাড়াইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং স্বেচ্ছা-ক্রমে আমার ভ্রাতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্বচালককে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাহার অমায়িক ব্যবহারে মনে হইতে লাগিল, যেন কতদিনকার পরিচয়। নরওয়েজীনদের মত আগন্তুকদের প্রতি এমন সরল স্বাভাবিক ব্যবহার সচরাচর সভ্যদেশে দেখা যায় না। কুক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ট্রেমের নিকটে আসিতেই

ষ্টটিঃ গেট,

আমাদের গাড়ীগুলি থামিল। আমরাও সকলে নামিয়া সেই বৈদ্যুতিক শকটের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান লাভ করিলাম। লণ্ডনে আসিবার আগে আর কখনও ট্রেমে চড়া ভাগ্যে ঘটে নাই। সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে একত্র বসিয়া সদর রাস্তায় এ ভাবে যাতায়াত, বঙ্গমহিলার পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার বলিতেই হইবে। কাজেই প্রথম প্রথম কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকিত। কিন্তু এতদিন এই সব পাশ্চাত্য সভ্য দেশের সংস্রবে সে বাধো-বাধো ভাবটা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। মানুষ এম্নি অভ্যাসের দাস! আমরা তখন দুইতিনখানা ট্রেমগাড়ী বোঝাই হইয়া চলিলাম। সব সহযাত্রী এভাবে একত্র বসিয়া যাওয়ার একটা বেশ আমোদ আছে। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া বাইরে আসিতেই আবার পাহাড়ের পাট আরম্ভ হইল। এবারে একটি পাহাড়ের পদতলে আসিয়া আমাদের ট্রেম থামিল। নামিয়া আমাদিগের নূতন পরিচিত বন্ধু সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে চড়াই-পথ ধরিলেন। আমরাও তাঁর অনুগামী হইলাম।

দেখিলাম কি প্রশস্ত পাহাড়টি! কি দিব্য পরিপাটী হোটেলটি! কি চমৎকার চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি! একটু বিশ্রামের বাসনায় ব্যাকুল হইয়া আমরা হোটেলের বারাণ্ডায় গিয়া বসিলাম। তখন আমাদের প্রতিকৃতি তুলিবার মানসে নিকটস্থিত এক ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার আসিয়া সম্মুখে হাজির। তার নিবেদন এই যে, এক ঘণ্টার আগেই ফটো তুলিয়া এবং ছাপাইয়া আমাদিগকে দিয়া যাইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। আমরা প্রথমে একথা বিশ্বাস করিতে চাই নাই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, না দিতে পারিলে ইহাতে লোকসান্ সে ব্যক্তিরই, তখন স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু চেষ্টা করিয়া চেহারায় ইচ্ছামত চারুতা ফলাইতে গেলেই যত সব গোল বাঁধায়। হুকুমের হাসি যেন তখন দন্তপীড়াজনিত দুঃখকেই প্রকটিত করে। দেহকে নিশ্চল রাখিতে গিয়া, নয়নযুগল চঞ্চল হইয়া পড়ে। তখন তাকে শাসনে আনিতে গেলে মস্তক বিদ্রোহ করে। সুতরাং প্রতিকৃতি তোলাইবার বিড়ম্বনা বহু। তা কে শোনে! নাছোড়বান্দা! অগত্যা কাজ হাঁসিল হইলে পর সে লোকটির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বন্ধুবর আমাদিগকে লইয়া ঘরের ভিতর যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুহিতা, জামাতা ও বনিতা আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। তখন কর্ত্তা মহাশয়, ছোট গলায় একটু গর্ব্বভরে আমাদিগকে বলিয়া রাখিলেন যে, তাঁহার এই কন্যা, এদেশে একজন অসামান্য রূপসীর মধ্যে পরিগণ্যা। একথা শুনিয়া আর বিশেষভাবে সে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া কি উদ্ধার আছে? কিন্তু মূলেই যে ভুল! যে ভ্রমর-কৃষ্ণ-লোল-লোচন আমাদের ধারণায় সৌন্দর্য্যের সার ভূষণ, তাহ্ পরিবর্ত্তে পিঙ্গলনয়ন হইলেই—হউক্ না সে অঙ্গনা "পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী" "মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা" "শিখরি দশনা," আমরা সেখানে রূপের সে মাহাত্ম্যই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু কি করি, এস্থলে স্বয়ং জনকই বড়াইকর্ত্তা, তখন ভদ্রস্ততার অনুরোধে তাঁর কথাই স্বীকার করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে এসব বিষয়ে অনৃতভাষণ, মোটেই নাকি দোষাবহ নহে বরং যথার্থ মনোগত ভাব ব্যক্ত করাই ভারি অসঙ্গত। তারপর কর্ত্তীঠাকুরাণীর বিশাল বাহু দেখিয়া আমরা একটু থম্‌কিয়া গেলাম। দেশাচারের অনুরোধে "মধ্যে ক্ষামা" হইতে গিয়া তিনি যেন ভারি অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। দেখিলাম, তাঁর নিটোল কপোল যুগল, প্রসারতা লাভ করিতে গিয়া নেত্রদ্বয়কে বিলুপ্তপ্রায় করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, পক্ষ্মসকল প্রহরী রহিয়াছে। নাসিকাটি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের পক্ষপাতিতা জানাইতেছে। তাঁর স্থূল গ্রীবা, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমণ্ডল সহ মস্তকের ভারবহনে অসমর্থ হইয়া, একেবারে অন্তর্ধান হইয়া গেছে, ভাগ্যে তখন সুদৃঢ় চিবুক সে ভারসহ বক্ষস্থলে ভর করিয়া সে উত্তমাঙ্গ ধারণ করিয়াছিল! নতুবা বোধ হয় বিভ্রাটের সীমা থাকিত না। তার পরিপুষ্ট বাহুলতা যেন সততই আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিছুতেই হস্তের দোহাই মানিতেছে না। আর তার নিরীহ পদদ্বয়ের কেবল বেগার খাটাই সার! হাঁ—জামাতাটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ সুপুরুষ বটে। বিভাগটি হইয়াছিল ভাল। জননী আর জামাতা—ইংরেজীভাষায় সম্পূর্ণ অনধিগত, পিতার আর দুহিতার তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। বেশীর ভাগ আমরা কন্যাটির সঙ্গেই কথাবার্ত্তা করিয়াছিলাম। কর্ত্তা-মহাশয় বোধ হয়, শিষ্টাচারের অনুরোধে আমাদের আহারাদির অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিলেন, আমরাও আজ অতিথি-

জ্ঞানে তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। ইত্যবসরে আমরা সেই হোটেলের মধ্যে যত কিছু দেখিবার দেখিয়া লইলাম। আহারে বসিতে গিয়া দেখি, ফলেফুলে আহার স্থান সুশোভিত, আর নরওইজীনদিগের বিশেষ বিশেষ আহার্য্য দ্রব্যের তালিকাসহ আমাদিগের প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এখন চাই কোন দিকে? সে স্থানে বসিয়া নৈসর্গিক শোভা ত না দেখিয়া উদ্ধার নাই; প্রকৃতি-সুন্দরীর একেবারে মাথার দিব্যি! এদিকে এত জন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আর আলাপের অবসরই বা পাই কোথায়? কি করি! দোটানায় পড়িয়া কোনমতে কাজ গত। কিন্তু আমাদের অভিভাবক মহাশয় যখন হিসাব দেখিয়া ইংরেজীতে তাহা তর্জ্জমা করিয়া, অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমার অগ্রজকে লক্ষ্য করিয়া কাগজখানা সেদিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন দেশভেদে ভদ্রোচিত ব্যবহারের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া, আমার ভ্রাতা সস্মিতমুখে সকল পাওনা চুকাইয়া দিলেন। তখন উঠিয়া আমাদিগকে এই হোটেলের চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিতে যাইতে হইল। একটু যাইতেই পাইন ফরেষ্টের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এসব নিজ্জন স্থান মনটাকে বড় উদাস করে, এরাজ্যে থাকিতে দেয় না। গাছগুলি দাঁড়া-

টুরিষ্ট্ হোটেল—হল্মেন্ কোলেন্

[চা]লাইতে লাগিলাম। আসেপাশের লোকেরা এরূপ সাদা-[কা]লর জটলা দেখিয়া, কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, [য]েন কোন যন্ত্রসাহায্যে তাহাদের ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন [হ]ইতেছিল। আহার-পাত্রে নেত্রদ্বয়কে সন্নিবেশিত রাখে, [ত]াহাদের সাধ্য কি? আমরা কিন্তু এমন ব্যাপারে [অ]ভ্যস্ত হওয়ায় একেবারে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছি! [বে]শ খোস্ মেজাজে সময়টা কাটিয়া গেল। আহারান্তে এই [হো]টেলের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ একখানা মস্ত ফর্দ্দ লইয়া আমা-[দে]র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহাতে দৃক্‌পাত [ক]রা উচিত মনে করিলাম না; কেন না আজ আমরা অভ্যা-ইয়া, এখানে আরও যে, কতলোক আসিয়াছিল, যেন তাদের কথা বলিতে লাগিল। এই চির-পুরাতনের সঙ্গে কেবলি নূতনের পরিচয়! আসা আর যাওয়ার মধ্যে এই দৃঢ় নিশ্চল ভাব! কিছুই ত বুঝি না। এরা ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া মরে না! অথচ জন্মাবধি এরা এই একই স্থানে দাঁড়াইয়া, যে সন্ধান পাইয়াছে, যে সাক্ষী দিতেছে, আমরা ভবঘুরে হইয়া তা পাইয়াছি কি? তা পারি কি? এদের মত কখনও কি এত উন্নত হইতে পারিব? আপনার পূর্ণবিকাশ দেখাইতে সক্ষম হইব? যা কিছু শুষ্ক, মলিন, অমনি ত এরা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

সরলতাই এদের জীবন! বিস্মৃতিই এদের ধর্ম্ম। যখন এ সব ফুরাইয়া যায়, তখন আপনার ধ্বংস প্রার্থনা করে, নবীনকে স্থান দিবে বলিয়া। এ কি নিঃস্বার্থপরতা! আমাদের এসব শুধু দেখাই সার! আর ভাবাই কর্ম্ম! গ্রহণের ক্ষমতা রাখি না—উপায়ও জানি না।

দেখিতে দেখিতে এক বৃহৎ হ্রদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। কত লোক ছোট ছোট নৌকায় তাহা পার হইতেছে। সময় সংকীর্ণ জানিয়া, আমাদের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমাদের নবপরিচিতা গিন্নীমাতা তখন আমাদিগকে তাঁহার বাড়ী গিয়া চা-পান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও সাদরে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। এ ভদ্রতাটুকু হইতে তাঁকে বঞ্চিত করা উচিত মনে করিলাম না। স্থূলাঙ্গিনীগণ স্বভাবতঃই প্রায়শঃ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন; পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার অনাদিকাল হইতেই এই বিধান চলিয়া আসিয়াছে। নয় ত সৌখীন মানবচক্ষু যে কিসে কি করিয়া বসিত, বলা যায় না। হোটেল হইতে সেই প্রবীণার বাড়ী পৌছিতে আমাদের যেন মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞান হইল, তিনি আমাদের দলবলকে এমনি জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীটির যেমন বাহির সুন্দর, তেমনি ভিতরটি মনোহর! কথায় কথায় জানিলাম, এটি তাঁদের নিজস্বমত বাটী এবং এ বাড়ীর মালিক এ দেশের একজন সমৃদ্ধিশালী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বণিক। যে পাইন ফরেষ্ট দেখিয়া আসিলাম, সে বৃক্ষের জন্য নরওয়ে বিখ্যাত। এখানকার ভাগ্যলক্ষ্মী নাকি ইহারি আশ্রয়ে বাস করেন, আর তাঁর বসতি—মৎস্যজীবীদের গৃহে শুনিলাম। “সেমন” নামক মৎস্যে নাকি তিনি বিশেষ অনুরক্তা। মন্দ নয়! মৎস্যের যে পূতিগন্ধে, প্রেতযোনিরা পর্য্যন্ত পলায়ন করে, কমলবাসিনী হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া সতত তাহা নাসারন্ধ্রে ধারণ করেন, আমরা ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী, এ রহস্য কেমনে বুঝিব? বেশীক্ষণ সে গৃহে থাকা হইল না, কারণ কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃঠাকুরাণীর দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন অন্যত্র রাত্রি ভোজনের (dinner) নিমন্ত্রণ ছিল; বলিলেন, আগন্তুক ছাড়িয়া এভাবে চলিয়া যাওয়ায় অভদ্রাচরণের জন্য তাঁহারা উভয়েই বড় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। সেই বিল্ না চুকান ভিন্ন আর তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটী পাইলাম না। দিন থাকিতেই তাঁরা রাত্রি-ভোজের নিয়মিত বেশ পরিধান পূর্ব্বক আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইলেন; এবং এই অসময় এহেন বেশ-ধারণের কারণ বিশেষ করিয়া এই বলিলেন যে, বৎসরের বেশীর ভাগ তাঁহাদিগকে রাত্রির অন্ধকার লইয়াই থাকিতে হয় বলিয়া ডিনার ব্যাপারটা তাঁরা বিকালের মধ্যেই সারিয়া ফেলাব নিয়ম করিয়াছেন। বৎসর-ভরা একই নিয়ম চলে তাতেই এই কটা মাস তাঁদের সময়োচিত পরিচ্ছদ ব্যবহার হইয়া উঠে না। অতএব যেন তাঁহারা আমাদের নিকট হাস্যাস্পদ না হন, সেজন্য আগেই ইহা বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। আমরা কিন্তু এই সামান্য বিষয় লইয়া, এতটা করিবার কিছু আবশ্যক দেখিলাম না। সময়ভেদে আহারের পরিতৃপ্তির সঙ্গে, অঙ্গের পরিবর্ত্তনের যে কি সম্বন্ধ তাহা ত আমরা বুঝি না। কোন কালে বুঝিব কি না কে জানে! বিদায়কালে কন্যার উপর আমাদের চা-পানের তদারকের ভার দিয়া গেলেন।

সে সুন্দ্র, তদ্দেশীয় রুচি অনুসারে মহা খাতিরজমা দে. তার মত সুলোচনার ঈপ্সিত সঙ্গ ছাড়িয়া, সহজে কেহ যাইতে চাহিবে না। কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে যে রুচির পার্থক্য হইয়া থাকে, সে বেচারা ত আর তা জানেন না। তিনি তাঁর সুমিষ্ট গলার দুই একটি গান করিলেন, তাঁর চিত্র-বিদ্যার বহু নিদর্শন দেখাইলেন, শিল্পকলায় যে তিনি সিদ্ধহস্তা, তাহার প্রমাণসকল আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। প্রকৃতই মেয়েটি যে সর্ব্বগুণসমন্বিতা, তাহা বলিতেই হইবে। ইংরাজীতে যাকে বলে “Acomplished”—তাই। এ সকল ছাড়াও তাঁর চরিত্রগত একটা সহজ-সুন্দর বৈচিত্র্য ছিল, যাতে আমাদের সকল ভেদবিচার ভুলাইয়া দিল। খুসী মনে তাঁকে ছাড়িয়া যাইতে আর পারিলাম কৈ? তাঁহার স্বহস্তে মিশ্রিত, অতি উপাদেয় কফি পান করিয়া, আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। যাত্রার সময় আগত জানিয়া গাত্রোত্থান করিবামাত্র আমাদিগকে আর কিছুক্ষণ বসিতে অনুরোধ করিলেন। কোনদিন জর্ম্মানিতে গিয়া তাঁহার আপন আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার স্বামীও শিরঃকম্পনে তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া, আমাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাঁহাদিগের যুগল শিষ্টাচারে বলিতে কি, আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম, আ[illegible]

ভাবিলাম, এত যারা খাতির জানে, তাদের সেই বিল হেন ব্যাপারে অতটুকু গলদ রাখার তাৎপর্য্যটা কি হইতে পারে? অথবা "অল্পস্য হেতোঃ বহু হাতুম্" ইচ্ছায়, বিচার-মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়। যাক্ তারপর ধন্যবাদাদি, শিষ্টাচার-বিধি পালন করিয়া, সময়ের স্বল্পতা জ্ঞাপনান্তর, সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়া, নির্দ্দিষ্ট ট্রেনের নিকট দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সকলে সমবেত হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই দম্পতি গবাক্ষ-দ্বার হইতে রুমাল উড়াইয়া, আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আমরা অদৃশ্য হইবার আগে তাহা হইতে বিরত হইলেন না।

গাড়ী আজ আমাদিগকে সহর দেখাইয়া চলিল। অনেক স্কুল, কলেজ, যাদুঘর, চিত্রাগারের পাশ দিয়া গেলাম। কৈ, যা দেখিতে আসিলাম, তার ত কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই না। এই বলিতেই ছোট্ট একটি পাহাড়ের গায়ে একটি কাল চূড়া দেখা গেল, বুঝিলাম এই তবে সেই হবে। বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, দুনিবার কাল, বসিয়া বসিয়া ইহাতে এই কালের রঙ ধরাইয়াছে। বস্তুতঃই তবে উহা প্রাচীন। কিন্তু সে স্থানে পৌছিয়া যা দেখিলাম, তাতে উহা প্রাচীন কীর্ত্তির উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের মধ্যে, কত শত কারুকার্য্য আজও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে! কৈ! কালের ধ্বংস

পাইন্-বনানী-বেষ্টিত বৃহৎ হ্রদ

রাজধানীতে আরও দুইদিন থাকিবার কথা। পরদিন এক অতি প্রচীন গির্জ্জা পরিদর্শন। এখানকার অধিবাসি-গণের মতে ইহাই নাকি সর্ব্বপ্রথম ভজনালয়; শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য যেন আর তর সয় না। মনের আগ্রহ দেখিলে, সময়ও দীর্ঘ হইয়া বসে, বড় সহজে নড়িতে চায় না।

কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাকে উপর-ওয়ালার হুকুম মানিয়া নড়িতেই হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখান সকল আসিয়া হাজির, আমরাও চড়িয়া বসিলাম।

কুশলী হস্ত ত দুই চার হাজার বৎসরেও তাহা পুঁছিয়া ফেলিতে পারে নাই! সে সকল এমনি পাকা হাতের কারিগরি! আর একি! একখান যেন কাঠের তৈয়ারি খেলাঘর! না আছে তাতে কোন নৈপুণ্য, না আছে তাতে বৈচিত্র্য!

যদি বল, শুধু কালের মাহাত্ম্যই কি কম? তা নয়। কিন্তু যদি সে মাহাত্ম্য কেবল অনুমান-সাপেক্ষ হয়! তবে ধন্য পাশ্চাত্য জাতি! যে কোন তত্ত্ব প্রাচীন বলিয়া একবার কাণে গেলেই তাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে।

তার প্রমাণ-স্বরূপ আমাদের চক্ষে এই নগণ্য গৃহটির, কেহ কেমেরা লইয়া কেহ বা Sketch book বাহির করিয়া তুলিকা সহযোগে প্রতিকৃতি তুলিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা তখন কুক্ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে মাতৃ ভাষার আশ্রয়ে কিছু কটু কথা ব্যয় করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আর রাজধানী ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু পরাধীন জনের ত আত্ম-ইচ্ছায় কার্য্য করা চলে না! সে দিন ম্লান মুখে ঘরে ফিরিলাম, কেননা আজকার কেবল যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হইল। কাল নাকি বড় বড় Musium আর Art Gallery দেখান হইবে। ইচ্ছা ছিল না যে যাই, কিন্তু পাছে বাঙ্গালী নারী জাতির "অবলা" নামের সার্থকতা প্রমাণীকৃত হয়, সেই লজ্জার খাতিরেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহযাত্রিগণের সঙ্গ লইতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমেই এক প্রকাণ্ড যাদুঘরে প্রবেশ করিতে হইল। সেখানে মোটেই মন বসিল না। গাইড্ মহোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ ভিন্ন শরীরের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। চোখের দৃষ্টি ত কোন্ রাজ্যে যে অপসারিত হইয়াছিল তা নিজেই জানি না। বিদেশী বেচারা তাহা দেখিয়া, তার ভাঙ্গা ইংরেজীকে একটু ঘোরান-গোছ করিয়া, একটু বড় গলায় বক্তৃতা করিতে কৃতসংকল্প হইল, কিন্তু কর্ণ তাতে আদপে আমল দিল না। তারপর "আর্ট গেলেরীতে গিয়া আর বেশী কি দেখিব! লণ্ডনে ত আর্টের চূড়ান্ত দেখা হইয়াছে," মনে এই অবসাদ আসিল। কিন্তু যখন আসিয়াছি, তখন দেখাই যাউক, এই বলিয়া একটু অলসগমনে চলিলাম। দূর হইতে যেই মর্ম্মরপ্রস্তরমূর্ত্তি সকলে নয়ন নিপতিত হইয়াছে, অমনি চরণদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, আচম্বিতে দৃষ্টিকে চোখের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত পাইলাম। প্রাণমন তৃপ্ত হইল। কাছে গিয়া যত অগ্রসর হইতেছি, ততই নগ্নমূর্ত্তি সকল দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল—

ইউনিভর্সিটি

"তুমি চির-বাক্যহীনা তব মহাবাণী!
পাষাণে আবদ্ধ ওগো সুন্দরী পাষাণী

দুই একটি নয়, শত শত মূর্ত্তি! যেন অফুরন্ত! এখানে সবই সুন্দর—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। পুরুষ আকৃতি যেন রমণীর উদ্দেশ্যে বলিতেছে—"ওগো রূপসি! কি তুমি রূপের বড়াই কর? চাহিয়া দেখ আমার দিকে, নয়ন ফিরাইতে পারিবে না।" আর রমণী অমনি উত্তর করিতেছে "কঠিন তোমরা—পাষাণ তোমরা! কি বুঝিবে তনুর তনিমা! দেখ দেখ এই পাষাণ ভেদ করিয়া

আমাদের সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যচ্ছটা কেমন উছলিয়া পড়িতেছে ? অথবা তোমরা যে চক্ষুহীন ! বুঝিবেই বা কেমন করিয়া ?" আমরা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ জানিনা, কাজেই যাচাই করিয়া, এ বিবাদের মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কেবল দেখিলাম, স্থানে স্থানে সেই বিশ্বশিল্পীর দুই একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ, নির্নিমেষ নেত্রে এই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। চক্ষে পলক নাই, সম্পূর্ণ আত্মহারা! তাঁহার যেন এই জড় চক্ষুতেও দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছেন, সে মুখের চির-নিস্তব্ধতার মধ্যেও বিলাস-বিভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সে অঙ্গের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন, তাই এই শিল্প দ্রব্য দেখিতে দেখিতে যেন "ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্তা" তাদের এই তন্ময় ভাব উপস্থিত! ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা সৌন্দর্য্যকে এভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন!

তারপর চিত্রফলক সকলের মধ্যে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কি বর্ণবিন্যাস? কি বৈচিত্র্য? একটি ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল, কে যেন দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। একটু থম্‌কিয়া গাইড বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "এটি দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি ছবি!" প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। পরে কাছে গিয়া সেই কেন্‌ভাসে হাত বুলাইয়া দেখি, প্রকৃতই তুলির লিখা! সে চিত্রটি বিশেষ ভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত রহিয়াছে —পুঁছিয়া ফেলিবার জো নাই। আজ সময় কাটিতেছে, বড় প্রফুল্ল মনে। এবারে এ স্থান পরিত্যাগের তাগাদা আসিল, কেননা আর একটি ভজনালয় অদ্যকার দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার অন্তর্গত রহিয়াছে। কুক কোম্পানী যে অতবড় ধার্ম্মিক লোক, আগে তার পরিচয় বড় পাই নাই।

মন্দির-পথে

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

কোন্ মহাকাল মন্দিরতলে
দীপ-বর্ত্তিকাখানি,
সন্ধ্যারতির অগুরুগন্ধে
নামাইবে অয়ি রাণী ?
চন্দ্রশেখর-কীরীটের ভাতি
উজলিবে তব বাসরের রাতি,
চির-জীবনের শিবসুন্দরে
নিবেদিবে ফুলদানী।
কোন্ সে বিত্ত বিহনে চিত্ত
উতলা আজিকে বালা ?
ঢেকেছ আঁচলে অরুণ-বর্ণ
স্থলকমলের ডালা!

গিরিকন্দরে সুরঙ্গতলে
দূর দেউলের পথ গেছে চলে,'
ধাও নিরভয়ে আনন্দময়ে
সঁপিতে পূজার মালা।
মধুমঞ্জরী ঝরিয়া ঝরিয়া
পথ-রেখা দেছে ঢাকি'
অয়ি নবাঙ্গি, চরণ ফেলিছ,
কাঁপিছে পরাণ-পাখী ;—
কোথায় তোমার পাষাণ-দেবতা
পূজারতি-শেষে কহিবেন কথা ?
ভাসিবে তরুণ-রূপের সাগরে,
ধেয়ানে মুদিয়া আঁখি!

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M.A.]

(১২)

একদিনের শুভ সুযোগে কনের সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল। চারিটা বাজিলে যেমন ইস্কুলের ছুটী হইত, অমনি আমি আমার সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ীতে চলিয়া আসিতাম। আমার পিতার হাকিম হওয়া অবধি পণ্ডিত মহাশয় আমাকে সমধিক যত্ন করিতেন। পাছে পথে কোথাও খেলা করিয়া, আমি বাড়ী পৌছিতে বিলম্ব করি, এই জন্য তিনি আমাদের গ্রামের দুই একটি বড় ছেলের উপর আমাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবার ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায়ই তাহারা যথাসময়ে আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইত। তবে মাঝে মাঝে পথের মধ্যে খেলার জন্য দুই একদিন বাড়ীতে পৌছিতে বিলম্ব যে না ঘটিত এমন নয়; কিন্তু গৃহে পৌছিতে কখনও কোন কালে আমি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করি নাই।

গ্রামের এক প্রান্তে একটি চৌরাস্তার মোড়ের উপর আমাদের ইস্কুল। তাহার একটি ধরিয়া কিছু দূর গেলেই গ্রামের জমীদারদের একটি বাগান। সেই বাগান পার হইলেই পঞ্চবটীর বন। সেখানে কালুরায় দক্ষিণদার, আমরা এক কথায় ঠাকুরকে 'দক্ষিণ রায়' বলিতাম। যে ভীষণ অরণ্য নিম্ন বঙ্গের সমস্ত উপকূল-ভাগ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই নরখাদক 'রাজকীয় বাংলা বাঘে'র আবাসভূমি সুন্দরবন পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের অতি নিকটেই ছিল। বন কাটিয়া আবাদ হওয়ায় এখন তাহা গ্রাম হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

পিতামহের বাল্যাবস্থায় গ্রামে প্রায়ই বাঘের উপদ্রব হইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় গ্রামের মধ্যে কোনও উপদ্রব না থাকিলেও, গ্রামের দুই এক ক্রোশের মধ্যে বাঘ আসিয়াছে শুনিয়াছি। গ্রামে বাঘ আসার কথা না শুনিলেও, গ্রামের লোকে বিশেষতঃ বালক বালিকারা তখন সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইত না।

দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। তাঁহাকে পূজা-উপচারে তুষ্ট করিলে বাঘের ভয় দূর হয়, এই বিশ্বাসে গ্রামের লোকে শনিমঙ্গলবারে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। শরীররক্ষী দেশরক্ষী সিপাইগণের মধ্যে আমরা যেমন কাহাকে পাহারাদার, কাহাকেও বা জমাদার রেসেলদার বলিয়া থাকি, এই ঠাকুর দক্ষিণদিক রক্ষা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে 'দক্ষিণদার' বলা হইত। দক্ষিণ রায়ের আস্তানা পার হইলেই লুপ্তগঙ্গার তীরস্থ পথ। সেই পথ ধরিয়া পোয়াখানেক পথ আসিলেই আমাদের গ্রাম।

দক্ষিণ রায়ের আস্তানার কাছে যে পঞ্চবটী, তাহারই একটি আমলকী বৃক্ষের তলদেশে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী চারপাঁচখানি গ্রাম হইতে গ্রাম্য রমণীরা প্রতি চৈত্রমাসে বনভোজন করিতে আসিত। কেহ কেহ বা সেই সঙ্গে দক্ষিণরায়ের পূজাও সারিয়া যাইত।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন অনেক রমণী পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলে সমবেত হইয়াছিল।

সে দিন শনিবার। দেড়টার সময়েই আমাদের ছুটী হইয়াছে। সকাল সকাল বাড়ীতে পৌছিব বুঝিয়া, আমার সহচর রক্ষী সে দিন আমাকে সত্বর বাড়ী ফিরিতে, অর্থাৎ পথের কোনও স্থানে বিলম্ব না করিতে, উপদেশ দিয়া কোনও কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সঙ্গে আরও যে দুই চারি জন বালক ছিল, তাহারা কিয়দ্দূর আমার সহিত চলিয়া, নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল। পঞ্চবটীর সন্নিকটে যখন আমি উপস্থিত হইলাম, তখন আমি সঙ্গিহীন। কিন্তু আমি তখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি। সুতরাং একাকী পথ চলিতে আমার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না।

সেদিনকার নির্জ্জনতা আমার কেমন মিষ্ট লাগিল। আমি যেন একটা অভিনব উল্লাসে এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে দেখি, অনেকগুলি স্ত্রীলোক আমলকী গাছের তলে বসিয়া আহার করিতেছে।

তখন বনভোজন কা'কে বলে জানিতাম না। আমলকীর

...ল বনভোজন প্রশস্ত বলিয়া মহিলামণ্ডলী গাছটিকে ...রূপ ঘেরিয়া অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আহারে ...সিয়াছিল। মেয়েদের এরূপ ভাবে ভোজনে বসিতে আমি আর কখন দেখি নাই। সকলেরই আহার্য্য প্রায় একরূপ ছিল। চিঁড়ে, চালভাজা, দৈ, কলা, গুড়—কেহ কেহ বা গুড়ের পরিবর্ত্তে বাতাসা লইয়াছিল।

বাঙ্গালীর ভোজন—পুরুষেরই হউক, অথবা স্ত্রীলোকেরই হউক—বড় একটা নীরবে নিষ্পন্ন হয় না। ক্ষুধার প্রাবল্যে, ভোজনারম্ভে কতকটা নীরবতা থাকে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়েরই জন্য। একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে না হইতে আবার যে কোলাহল সেই কোলাহল। মহিলাদের মধ্যে কতকগুলি নীরবে আহার করিতেছিলেন, কতকগুলির মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে যে সকল বালকবালিকা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতক গুলি স্ব স্ব গুরুজনের প্রসাদ পাইতেছিল, কতকগুলি পূর্ব্বাহ্ণেই "ফলার" খাইয়া দূরে ক্রীড়াকৌতুকে রত ছিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রলোভনীয় আহারের প্রবল আকর্ষণে আমার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। আমার ইচ্ছা হইল, আমিও উহাদের মধ্যে বসিয়া পেট ভরিয়া 'ফলার' খাইয়া লই। কিন্তু আমার ত মা অথবা ঠাকুরমা আসে নাই. আমি কাহার কাছে খাবার চাহিব।

ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, ক্ষুন্ন মনে আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটু দূরেই দক্ষিণ-...য়ের স্থান. পঞ্চবটীকে বামে রাখিয়া আমি যেমন ...কুরের কুটীর-প্রাঙ্গণে পা দিয়াছি, অমনি একটি বৃদ্ধা ...শ্চাৎ দিক হইতে আমার হাত ধরিয়া বলিল —"কি বাবা! ...লিয়া যাইতেছ কেন? একটু মিষ্টমুখ করিয়া যাও।"

আমার বগলে বই ও শ্লেট ছিল। হাত ধরাতে বগল ...লগা হইয়া বইগুলি পতনোন্মুখ হইল। বৃদ্ধা ক্ষিপ্রতার ...হত সে গুলা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল—"এস ...মার সঙ্গে। আমি দেখিতেছি, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, ...খানি মলিন হইয়াছে।"

আমি তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ...লাম—"আমার বই ফিরাইয়া দাও—আমি খাইব না।"

বৃদ্ধা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল—"তাও কি হয়, তুমি এই তৃতীয় প্রহর বেলায় প্রসূতিদের নিকট হইতে শুষ্ক মুখে চলিয়া যাইলে, তাহারা কেমন করিয়া মুখে আহার তুলিবে। তোমাকে কিছু মুখে দিয়া যাইতেই হইবে।"

এই বলিয়াই বৃদ্ধা আমার পশ্চাতে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"খুকা, এই বই গুলা ধর্ ত দিদি, আমি বাছাকে কোলে করিয়া লইয়া যাই।"

বৃদ্ধার কথা শেষ হইতে না হইতে একটি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে বই-শ্লেট গ্রহণ করিল। বালিকার পরণে একখানি লাল পেড়ে শাড়ী। পাছে তাহা খুলিয়া যায়, এই জন্য আঁচলটা তাহার কোমরে বাঁধা ছিল। বেণী-সম্বদ্ধ কেশগুলি ঝুঁটির আকারে মাথার উপর বিন্যস্ত ছিল। কপালে একটি কাঁচপোকার টিপ, গলদেশে গুটি-কয়েক মাদুলি, হাতে কালো কাচের চুড়ী, বাম হস্তের চুড়ীর নিম্নভাগে একগাছি 'নোয়া।' এই সামান্য অলঙ্কারে নিরলঙ্কারা বালিকা শুদ্ধমাত্র তাহার দেহের বর্ণে দক্ষিণ-রায়ের আশীষ পুষ্পের মত আমার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিল। দশমবর্ষীয় বালকের চোখে সৌন্দর্য্য দর্শনের যতটুকু শক্তি, এখন স্মরণে আনিয়া অনুভবে বলিতে পারি, তাহাই আমি বলিতেছি। পরবর্ত্তী বক্ষ্যমাণ ঘটনায় এই রূপের সঙ্গে আমার হৃদয়ের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে বালিকার সেই শ্রী আমি আজিও স্মরণে রাখিতে পারিতাম কি না, সে কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না। কিন্তু আজিও আমি তাহা স্মরণে রাখিয়াছি। যৌবনে পদার্পণ করা অবধি এ বয়স পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরীর রূপ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু নির্জ্জনে বসিয়া কোনও সময়ে সেই সকল রূপের চিন্তা করিতে গেলে, সকলকে অতিক্রম করিয়া, সেই বালিকার রূপটাই আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। যে কামগন্ধহীন রূপ সকল রূপের মধ্য দিয়া মানুষের মনকে অনন্তের দিকে টানিয়া লয়, এখন আমার মনে হয়, এরূপ বুঝি সে রূপেরই প্রতিবিম্ব।

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। কোলে উঠিলাম না, বৃদ্ধার অনুসরণ করিলাম। শ্লেট-বই বগলে লইয়া বালিকা আমার পশ্চাতে চলিল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধা পরিচয় জানিতে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। লজ্জা, সঙ্কোচ এবং ভয়ে আমি তাঁর প্রশ্নের

উত্তর দিবার অবসর পাই নাই। উত্তর দিতে না দিতে আমি মহিলামণ্ডলী মধ্যে উপস্থিত হইলাম ; আর উপস্থিত হইতে না হইতে সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমাদের গ্রাম হইতেও দু'চারিটি স্ত্রীলোক সেখানে বন-ভোজনে আসিয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"ওগো মা, তুমি কাকে ধরিয়া আনিতেছ ?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন মহিলা সাক্ষাৎ ভগবতীর মত পার্শ্ববর্ত্তিনী অপর একটী মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও খুকীর মা ! এযে তোমারই জামাই গো !"

'জামাই' এই কথা শুনিবামাত্র এই দশমবর্ষীয় বালককে দেখিয়াই তিনি আহার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কতই যেন সঙ্কোচের সহিত অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন দান করিলেন।

যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন, তিনি একথা শুনিয়া বিস্ময়ে উল্লাসে এমন কতকগুলি রহস্যের বাক্য প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া লজ্জায় আমি যেন গুটাইয়া গেলাম। এই অবস্থায় লুকাইয়া লুকাইয়া আমি একবার বালিকার পানে চাহিলাম। সে এ সকল রহস্যের একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ছিল।

বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"ও দাখী ! এখন থেকে এত ক'রে দেখিসনি, পার্শ্বে তোর সতীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোক আর বড় বেশি দিন থাকিবে না। তাহাকে একটু দেখিবার ভাগ দে।"

অতি মধুর কণ্ঠে বালিকা বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল—"দিদিমা ! এ কে ?"

"চিনতে পারলিনি ! তোর বর।"

তড়িতাকৃষ্টবৎ আমার দৃষ্টি আর একবার বালিকার মুখের উপর পড়িল ! বালিকাও পূর্ণবিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিল। তাহার বগল হইতে বই-শ্লেট পড়িয়া গেল ! সঙ্গে সঙ্গে রমণীমণ্ডলীর হাস্য পরিহাস পঞ্চবটীর পত্রান্তরাল-নিঃসৃত চৈত্র বায়ুর 'হো হো' হাস্যের সহিত মিশিয়া একটা হাসির ফলার রচিয়া আকাশে উপহার প্রদান করিল। আমি চক্ষু মুদিলাম।

তার পর ? তার পর আর কি বলিব ? বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে যাহা আর কোনও বঙ্গ বর-বধূর ভাগ্যে ঘটিবে না, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। আজি কালিকার বয়স্থ নায়ক ও বয়স্থ নায়িকার অনেকের মধ্যে বহুপত্র ব্যবহারে, বহুবার নির্জ্জন সাক্ষাতে পরস্পরের কাছে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন ঘটিতে পারে, কিন্তু বর-বধূর, একত্র বসিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হাতের 'ফলার' খাওয়া, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে না।

বালিকার মাতা অতি যত্নে ফলার মাখিয়া, নিজ হস্তে আমার মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। 'দিদি মা' এখন বসনাঞ্চলে বালিকার দেহ ও মস্তকের কিয়দংশ ঢাকিয়া দিয়াছিল। সে তদবস্থায় আমার নিকটে বসিয়া বসিয়া 'ফলার' খাইতেছিল এবং এই অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুটির প্রতি তাহার মায়ের আদর নিরীক্ষণ করিতেছিল। রমণীদের মধ্যে যাহারা আহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিল, তাহারা আমাদের তিনজনকে ঘেরিয়া—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া, তুলনায় আমাদের মিলন সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেক আহার করিয়াছি, এমন সময়ে এক বজ্রের মত চপেটাঘাত আমার পৃষ্ঠের উপর পড়িল। বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, রমণীগণ স্তম্ভিত হইল, বালিকার মাতা কম্পিত কলেবরে মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে পতনোন্মুখী হইলেন। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আনন্দ-কলকল যেন বিষাদ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল—পঞ্চবটীর সমীরণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

আমি মাথা তুলিয়া দেখি, আমার মা ! তাঁহার রোষ-কষায়িত চক্ষু দেখিয়া আমি প্রহার-যাতনা ভুলিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

কাহারও কোন কথা কহিবার অবসর রহিল না। আমি মাতৃকর্ত্তৃক কেশাকৃষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে নীত হইলাম।

(১৩)

আমার বাড়ী ফিরিতে অযথা বিলম্ব দেখিয়া মাতা ও পিতামহী উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বাড়ীতে তখনও পর্য্যন্ত চাকর নিযুক্ত হয় নাই। গো-সেবা, বাসন-মাজা ও বাড়ীর উঠান ঝাঁট দিবার জন্য একজন নীচ

জাতীয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। সদানন্দ অধিকাংশ সময় চাষের কাজেই নিযুক্ত থাকিত। বাড়ীর কাজে তাহাকে বড় একটা পাওয়া যাইত না। পরিবারবর্গ অধিক ছিল না। গৃহের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পিতামহী ও মাতার দ্বারাই সম্পন্ন হইত। ঝি কাজ সারিয়া তাহার গৃহে বোধ হয় চলিয়া গিয়াছিল। সদানন্দও বোধ হয়, তখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। বেলা যায় দেখিয়া, উদ্বেগে আত্মহারা জননী গঙ্গার তীর ধরিয়া একটু একটু অগ্রসর হইতে হইতে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতামহী একে বৃদ্ধা, তাহার উপর স্বামিশোকে তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঘর ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পথের মাঝে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠার সহিত তিনিও আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিবামাত্র আমার অবস্থা বুঝিতে পিতামহীর বাকী রহিল না। তিনি বুঝিলেন, আমার অকার্য্যের জন্য আগে হইতেই মায়ের হাতে যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি। এই জন্য তৎসম্বন্ধে আমাকে কিংবা মাকে তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। নীরবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্যে আমি পিতামহ ও পিতামহীর কাছেই একরূপ পালিত হইয়াছিলাম। আমার পালনে ও শাসনে আমার মাতা কিংবা পিতার কোনও অধিকার ছিল না। এমন কি, কোনও সময়ে তাঁহারা আমাকে শাসন করিলে, উভয়েই পিতামহী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। পিতামহ পিতামহীকে নিষেধ না করিয়া, তাঁহার কর্য্যের পোষকতা করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ কয়টা মাস তৎকর্ত্তৃক আমি একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিলাম।

কিন্তু আজ মায়ের শাসনে আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর চৌকাটে পা দিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ ভাই! এখন কোন দিন ত তোমাকে পথে বিলম্ব করিতে দেখি নাই, তবে আজ এমন অন্যায় কাজ করিলে কেন?"

তখনও প্রহারের জ্বালা আমার পৃষ্ঠদেশে প্রবল ভাবেই লগ্ন ছিল। পিতামহীর প্রশ্নে সেই জ্বালার সঙ্গে প্রবল বেগে অভিমান জাগিয়া উঠিল। আমি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। পিতামহী সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন—দেখিলেন, মায়ের পাঁচটা আঙ্গুলের চিহ্ন এখনও আমার পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া রহিয়াছে।

এ অবস্থা দেখিয়া পিতামহীর চোখে জল আসিল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছ?"

মাতা রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"অপরাধ! অপরাধ কার? তোমাদের। তোমাদের অপরাধে বালক আজ শাস্তি পাইল।"

"তোমাদের"—এই বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, আমার মাতামহী বুঝিতে পারিলেন, পুত্রবধূ তাঁহার পরলোকগত স্বামীকেও লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে।

ইদানীং মায়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, তথাপি পিতামহী আমার মাতার নিকট হইতে এরূপ ভাবের উত্তর কখনও শুনেন নাই, শুনিবার প্রত্যাশাও করেন নাই।

উত্তর শুনিয়া তিনি স্তম্ভিতার ন্যায় নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মা মুখ অবনত করিয়া ভূমিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন অস্ফুটস্বরে আর কতকগুলা কি কথা বলিলেন—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না; পিতামহী বোধ হয়, পারিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—"তা আমাদেরই যদি অপরাধ বুঝিয়া থাক,—আমাদের অবশিষ্ট আমি আছি—আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? আমাদের অপরাধে নিরপরাধ বালক শাস্তি পাইল কেন?"

মাতা একটু অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কথার কু ধর কেন?"

পিতামহী। যেমন স্বভাব সেইরূপ করিব ত। তুমি যে হাকিমের গৃহিণী হইয়াছ, তাহা ত বুঝি নাই।

মাতা। তুমি আমার ভাগ্যে ঈর্ষা করিতেছ নাকি?

পিতামহী। করিতে হয় বই কি। হাকিমের বউ না হইলে ত এরূপ মেজাজ হয় না।

মাতা। মেজাজ কি দেখিলে!

পিতামহী। আর দেখাইতে বাকি কি রাখিতেছ। তবু এখনও তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের এক তণ্ডুলকণাও মুখে তুলি নাই। আজিও পর্য্যন্ত সেই মূর্খের অন্নে জীবন রক্ষা করিতেছি।

মাতা। তা'বলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর যিনি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে পারেন, তিনি বেদবেদান্ত গুলিয়া খাইলেও তাঁহাকে আমি পণ্ডিত বলিতে পারিব না।

ইহার পর মাতা ও মাতামহীর মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইল, বাঙ্গালীর এই যৌন-বিবাহ সমর্থন যুগে, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমি অপ্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা করিনা। সেই সকল কথা শুনিয়া যে তথ্যটুকু আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহার যে অংশটুকু প্রকাশযোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই আমি আপনাদিগকে শুনাইব।

বংশানুক্রমিক আমাদিগের মধ্যে এইরূপ বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্বন্ধ অতি শৈশবে হইলেও বরের উপনয়ন-সংস্কারের পরে বিবাহ হইত। বিবাহের অব্যবহিত পরেই বালক গুরুগৃহে প্রেরিত হইত। অন্ততঃ বারো বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে সে গৃহে ফিরিবার অনুমতি পাইত না। সেখানে শাস্ত্রশিক্ষা ও গুরুসেবা তাহার কার্য্য ছিল। যাহার একাধিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা-লাভে অভিলাষ হইত, তাহাকে এক গুরুর নিকটে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া, আবার অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী—এমন কি দ্রাবিড় পর্য্যন্ত কেহ কেহ শাস্ত্রশিক্ষার্থে গমন করিতেন। একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে, দ্বাদশ বৎসরেও কুলাইত না। পিতামহী শুনিয়াছেন, কনের বাপের ঘরে ফিরিতে কুড়ি বৎসরকাল লাগিয়াছিল। আমার পিতামহ বারো বৎসর পরেই ফিরিয়াছিলেন।

পাছে শাস্ত্রজ্ঞানের ফলস্বরূপ বৈরাগ্যোদয়ে যুবক সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়, ঘরে আর না ফিরিয়া আসে, এই জন্য বর কন্যা উভয়েরই এরূপ অজ্ঞাতসারে উভয়কে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। পুরুষ যে সময়ে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু—বিশেষতঃ সে সময়ের হিন্দু—কন্যার ত আর কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে দিতে পারিতেন না, কাজেই ওই অতি অল্পবয়সেই বিবাহের ব্যবস্থাটা তাঁহাদের কাছে সমীচীন বোধ হইয়াছিল।

স্বামীর অনুপস্থিতিকালে বধূ শ্বশুরগৃহে আনীত হইতেন। বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে দ্বিতীয় বার আসাতেও একটা হাঙ্গামা ছিল। এরূপ আসাকে দ্বিরাগমন বলিত। বলিতই বলিতেছি, কেননা পাঁজিতে এ কথাটার অস্তিত্ব থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এ প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র বধূকে ঘরে আনিবার যে প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, আজিকালিকার কোন বিবাহিত হিন্দুসন্তানের অবিদিত নাই। কিন্তু পূর্ব্বে রীতিমত শুভদিন দেখিয়া, বধূকে দ্বিতীয়বার বাড়ীতে আনিতে হইত। এ দ্বিরাগমনের দিন এতই অল্প যে, কাহারও কাহারও ভাগ্যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্বশুর-গৃহে আগমন ঘটিয়া উঠিত না।

শ্বশুর-গৃহে আসিলে, কুমারী ব্রহ্মচারিণীর মত তিনি শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবাতৎপরা—গৃহের সৌভাগ্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেন। আমার পিতামহীও বহুকাল সেইরূপভাবে আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর গৃহপ্রত্যাগত পিতামহকে যেদিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, সেদিন নবোঢ়া বধূর সমস্ত লজ্জা নবভাবে তাঁহাকে আবৃত করিয়াছিল।

মাতা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডায় আমি পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলাম। পিতামহী বাল্যবিবাহের সমর্থনে তাহাকেই প্রকৃত যৌন-বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; মাতা সে প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং সেই সঙ্গে গুরুজনের বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন।

এরূপভাবে শাশুড়ীর সঙ্গে মায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা এই প্রথম। অন্ততঃ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আমি এরূপ বিতণ্ডা দেখি নাই।

বিতণ্ডায় মাতাই যেন জয়লাভ করিলেন। বিতণ্ডা শেষে কলহে পরিণত হইল। পিতামহী হার-স্বীকার ও নাসিকা-কর্ণমর্দ্দন করিয়া, স্থানত্যাগ করিলেন। মাতার এই অভাবনীয় আচরণে ক্ষুন্ন পিতামহীর মুখের ভাব এখনও আমার মনে পড়ে। সে মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, পিতামহী বুঝি আমার উপর অধিকার পরিত্যাগ করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি আমার পানেও আর ফিরিয়া চাহেন নাই।

(১৪)

পরবর্ত্তী সোমবারে ডাকঘরে দিবার জন্য মা আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। ইহার সপ্তাহ পরেই পিতা কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পিতার শিক্ষানবীশীর ছয়মাস পূর্ণ হইয়াছে। তিনি হুগলি সহরেই ডেপুটীর পদে পাকা হইয়াছেন এবং আমাদের সকলকেই তিনি সেখানে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রথমেই পিতামহীকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"আমি গেলে ঘরে সন্ধ্যা দিবার লোক থাকিবে না। গরুর ও নারায়ণের সেবা হইবে না।"

কাজেই পিতামহীর হুগলি সহর দেখা ভাগ্যে ঘটিল না। আমি, মা, ঠানদিদির পুত্র গণেশ-খুড়ো এবং নবনিযুক্ত এক-জন ভৃত্য পিতার সঙ্গে চলিলাম।

আমাদের বিদেশ যাইবার কথা কাহার মুখে শুনিয়া কনের বাপ আবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, শুনি নাই। কেননা পিতা আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে দেন নাই। তবে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, পিতামহী পিতাকে যে সব কথা কহিয়াছিলেন, ঘটনাবশে, তাঁহাদের কথোপকথন সময়ে, তাহার কিয়দংশ আমি শুনিয়াছিলাম।

পিতামহী বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারে ও কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি হরিহরের বিবাহ দিবে না।"

"বিবাহ দিব না তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

"বিবাহ দিবে না কেন? আমি বলিতেছি, সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত—"

"এখন দিব না। তবে ও ব্রাহ্মণ যদি বিবাহের কথা লইয়া আমাকে বারংবার বিরক্ত করে, তাহ'লে দিব না।"

"একি পাগলের মতন কথা বলিতেছ?"

"পাগল আমি, না তোমরা? এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছ!"

"সম্বন্ধ করিয়াছ ত তুমি।"

"আমি করিয়াছি!"

"আদানপ্রদানের প্রতিজ্ঞা কি আমরা করিয়াছি?"

"করিয়াছি একান্ত অনিচ্ছায়—কেবল তোমাদের অত্যাচারে।"

"তুমি সে সময় কর্ত্তাকে মনের কথা বল নাই কেন?"

"সেইটিই আমার বোকামি হইয়াছে।"

"তাহ'লে ব্রাহ্মণের কি হইবে, অঘোরনাথ?"

"ব্রাহ্মণের কি হইয়াছে, তা হইবে?"

"সে যে সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছে।"

তা হ'লে কি আমি কচিছেলের বিবাহ দিয়া, তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিব?"

"ইহকাল পরকাল যাইবে কেন?"

"বালকের এই পঠদ্দশা—এ সময় বিবাহ হইলে এ জন্মের মত তার পড়াশুনা শেষ হইয়া যাইবে।"

"কেন, তোমার পিতার কি পড়াশুনা শেষ হইয়াছিল?"

"সেকালে হইতে পারিত। এখন আর সে বর্ব্বরতার যুগ নাই। আমার বাল্যে বিবাহ হইলে, আমাকে আর তিনটা পাশ দিতে হইত না। আমাদের বংশে বিচারক জন্মিবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল কি! আমার অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা তুমি এখানে আমাকে দেখিয়া কি বুঝিবে? আমার সঙ্গে হুগলি চল, তাহ'লে কতকটা বুঝিতে পারিবে। ছেলেবেলায় বিয়ে হইলে কি এসব হইত? তা হ'লে চালকলা উপার্জ্জন করেই জন্ম কাটা'তে হইত।"

পিতামহী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন মনে করিয়া, পিতা বলিতে লাগিলেন, "এই আমার নূতন চাকরী—একটা পুতুলখেলার ব্যাপার লইয়া কি চাকরীটি খোয়াইব—আখের নষ্ট করিব?"

"হুঁ! তাহ'লে সপিণ্ডীকরণের কি করিবে?"

"তুমি কি সত্যসত্যই পাগল হইয়াছ? একাজ—আর তোমার নাতির বিবাহ—এ দুই কি এক সমান? সপিণ্ডী-করণের সময় সবকাজ ফেলিয়াও আমাকে আসিতে হইবে। তখন ছুটি চাইলে ছুটি পাইব। আর এ কার্য্যে ছুটি পাওয়া দূরে থাক্, শিশুপুত্রের বিবাহ দিয়াছি, একথা যদি মেজেষ্টার সাহেবের কাণে ওঠে, তখনি আমার চাকরী যাইবে।"

চাকরী যাইবার কথা শুনিয়াই পিতামহী নিরুত্তর রহিলেন। তথাপি পিতা বলিলেন—"ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইলে, তাহাকে নিরাশ হইতে নিষেধ করিও। তাহাকে বলিয়ো, যদিও আমার একান্ত অনিচ্ছা, তথাপি যখন কথা দিয়াছি, তখন তাঁহার কন্যার

সহিত হরিহরের বিবাহ আমাকে দিতে হইবে। কিন্তু এখন নয়—কিছুদিন পরে। পুত্র দুইটা পাশ না হইলে, তাহার কাছে বিবাহের কথা তুলিতেই দিবনা।"

"সে কতদিন পরে?"

"সেখানে হরিহরকে যদি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেও অন্ততঃ ছয় বৎসর। তাহার কমেত হইতেই পারে না।"

"ততদিন ব্রাহ্মণ মেয়েকে রাখিতে পারিবে কেন?"

"তা কি করিব!—তাব'লে আমি শিশু পুত্রের বিবাহ কিছুতেই দিতে পারিব না।"

"বিবাহ?—কার বিবাহ?"—বলিয়া আমার মা রণ-চণ্ডিকার আবির্ভাবের মত পিতা ও পিতামহীর কথোপকথন-স্থলে উপস্থিত হইলেন।

পিতা বোধ হয়, তাঁহার আকস্মিক উপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তিনি মাতাকে বলিলেন—"তুমি এখানে আসিলে কেন?"

মাতা পিতার কথায় উত্তর না দিয়া, পিতামহীকে বলিতে লাগিলেন—

"পুত্রকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে ফুস্‌লাইয়া আমার কচিছেলেটার মাথা খাইবার চেষ্টায় আছ! ও কেমন করিয়া আমার ছেলের বিবাহ দেয়—দিক দেখি।"

পিতা। ছেলের বিবাহ দিতেছি, তোমাকে কে বলিল? ভবিষ্যতে দিবার কথা হইতেছে।

মাতা। কার সঙ্গে? ওই মড়ুইপোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে? আজই হ'ক, কালই হ'ক, যেদিন তা দিবে, সেই দিনই আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব।

এই বলিয়া মাতা পিতামহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি কি মনে করিয়াছ, বামুন সেদিন প্রাতঃকালে আসিয়া তোমাকে যা বলিয়া গিয়াছে, আমি শুনি নাই? আমি হাড়ী-মুচি-ঘরের মেয়ে—কেমন?"

পিতামহী বিস্মিতার মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাড়ী-মুচির ঘরের মেয়ে, একথা তোমাকে কে বলিল?"

"কে বলিল, জাননা? এখন ন্যাকা সাজিতেছ?"

পিতা, মাতাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মাতা নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন—"সে বামুন, সেদিন ভোরে আসিয়া বলে নাই, আমি অঘরের মেয়ে। আমি আমার পুত্রকে শাসন করিব, তাহাতে সে বামুনের এত মায়া উথলিয়া উঠিল কেন? সে আমাকে অকথ্য কথা শুনাইবার কে? আমি কে সে জানে না? তার মত কত বামুন আমার বাপের ঘরে রসুয়ের বৃত্তি করিতেছে।"

পিতামহী বলিলেন—"তা করিতে পারে। কিন্তু মা ব্রাহ্মণত মিথ্যা কথা ক'ন নাই। তুমিত আমাদের ঘর নও।"

"তবে ভালঘরের বধূ আনিয়া আগে ছেলের বিবাহ দাও, তারপর নাতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।"—বলিয়াই ক্রোধান্ধ জননী পিতার ঘাড়ের উপর দিয়াই যেন এক রকম চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে দেয়াল না থাকিলে. পিতা বোধ হয়, ভূপতিত হইতেন।

পিতা দেওয়ালের সাহায্যে পতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াই, "কর কি—কর কি, লোকে জানিবে, আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে"—বলিতে বলিতে মাতার অনুসরণ করিলেন।

এই কথোপকথন হইতে আমি বুঝিলাম, আমার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, সমবেদনা জানাইতে, ব্রাহ্মণ কোন একদিন পিতামহীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। মা অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। আর বুঝিলাম, কনের সঙ্গে আমার দেখা এজন্মের মত বুঝি আর হইবে না।

অল্পক্ষণ-পরেই পিতা ফিরিলেন। পিতামহী, মাতা ও পিতা উভয়েরই আচরণে স্তম্ভিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিতা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে বলিলেন—"মা! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার জন্য অন্য কোনও স্থানে পাত্র দেখিতে বলিয়ো। আমার পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পারিব না।"

"বলিতে হয় তুমিই বলিয়ো।"

"বেশ—আমিই বলিব।"—বলিয়াই পিতা আমাকে ডাকিলেন। আমি বই পড়িবার ব্যপদেশে পিতামহীর ঘরের তক্তপোষে বসিয়া, একটি ক্ষুদ্র জানালার ফাঁক দিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। পিতার ঘরের দাওয়ায় এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

আমি পিতার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি আমার বই-শ্লেট সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিলেন। আমাদের সেই

দিনেই বৈকালে রওনা হইতে হইবে। পিতামহী বলিলেন,—"মিস্ত্রী আসিলে তাহাকে আমি কি বলিব?"

"এখন থাক্। আমি ফিরিয়া আসিলে ঘর করিবার ব্যবস্থা করিব।"

আমাদের মেটে বাড়ী। তবে ঘরগুলা যথাসম্ভব বড় ও সুদৃশ্য ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে কোটা করিবার অভিলাষে পিতামহ একলক্ষ ইট পোড়াইয়াছিলেন। তাহা দিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি একটি ঠাকুরঘর ও একটি বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পিতার বিএ পাশের পর হইতে দেশের দুইচারিজন ভদ্রলোক প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। সুতরাং একটি বৈঠকখানার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট ঘরগুলিও তাঁহার কোটা করিবার ইচ্ছা ছিল। এখন পিতা হাকিম। তাঁহার চালাঘরে বাস ত' কোনও ক্রমেই চলিতে পারে না, এইজন্য পিতামহী ঘরগুলাকে কোটা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

মিস্ত্রীও আসিয়াছিল। কথা ছিল, কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে পিতা বাড়ী করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

সে ব্যবস্থা আর করা হইল না। আমার এক কুক্ষণে-খাওয়া-ফলার সকল কাজের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

সেই দিন অপরাহ্নে পিতা আমাদের লইয়া হুগলি যাত্রা করিলেন।

যুবার গান

[কপিঞ্জল]

(কবিভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকরণে)

সবুজ পরীর পাড়ের জরির আকুল করা মুখ চুমে,
ভাসবো মোরা আবির-বানে সোহাগ-রঙীন কুঙ্কুমে।
যৌবনেরি ছত্রতলে আসবো ছুটে ঝুম্‌ঝুমি,
মরবো বরং, ধরবো নাক শৈশবেরি ঝুম্‌ঝুমি।

মাতা পিতার আওতাতলে সমাজ-টবের একভিতে,
বাড়বো মোরা কেমন করে প্রেমাঙ্গনার ইঙ্গিতে।
যৌবনেরি আলোক-মধু সমাজ-বধূর গর্ব্ব যা,
বুড়ার লাগি কেমন করে কর্‌বো বল খর্ব্ব তা।

শুভ্রকেশী মগ্ন রহ শ্যামের পদ অঙ্কনে,
বুঝবে নাক কি সুর বাজে আমার প্রিয়ার কঙ্কণে।
তাহার মলের রুণ্‌ঝুণিতে চঞ্চল তার অঞ্চলে,
জরা তোমার জীবনরবি ডুবে যাবে কোন তলে।

তোমার আলাপ শীতের গোলাপ, নাইক তাতে গন্ধ আর,
বৃন্তশ্লথ ঝরছে কত মূর্ত্তি, সে ত বঞ্চনার।

এসো সাকী দারুর সখী এসো প্রাণের পঞ্চালী,
কল্‌কে-ফুলের গেলাস ভরি রূপের সুধা দাও ঢালি।

একেবারে অসঙ্কোচে কর আমায় আলিঙ্গন,
তালে তালে ফুটাও গালে চুম্বনেরি অলিম্পন।
তোমার প্রবল পদাঘাতে ওগো প্রেমের কুঞ্জরী,
সমাজ-তরুর বুকে ফুটুক আকুল অশোক-মুঞ্জরী।

অভাগা সেই রাজার ছেলে যুবক কুলের কুলাঙ্গার,
নিলো পিতার জরার ভরা মূর্খ অতি চমৎকার।
ছিল নাত অভাব বুড়ার অগ্নি ছিল মূর্ত্তিমান,
করতে হত তেমন পিতার সৎকার এবং পিণ্ডদান।

আমরা যুবা রুধবে কেবা ছন্দ মোরা অবন্ধন,
রঙীন ভাবের ভাবুক মোরা করি সবুজ রোমন্থন,
দেখো ওগো স্নিগ্ধ-শ্যামল দেখো যুবা হাস্যমুখ্,
যৌবনেরি হাড়কাঠেতে প্রাচীন বলির নিত্যসুখ্।

সভ্যতার যুগ-বিভাগ *

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, M.A.B.L.]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সভ্যতার উদ্বর্ত্তন

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে যে সকল সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটিমাত্র সভ্যতা এযুগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে—ভারতবর্ষের ও চীনের। মিশরের সভ্যতারও দীর্ঘজীবন লাভ হইয়াছিল (৬ সহস্র বৎসরেরও অধিক) এবং উহা এ যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত কোনও রূপে বিদ্যমান ছিল। যে সকল সভ্যতা অকালে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাই অধিক। যথা:—প্রাচীন ভূখণ্ডে আসীরিয়া, ফিনিসিয়া,গ্রীস, রোম এবং পারস্য-দেশের; এবং নূতন ভূখণ্ডে মেক্‌সিকোর ও পেরুর। অন্যান্য দেশের সভ্যতার বিনাশের পরও চীনের ও ভারতের সভ্যতা কেন অবশিষ্ট রহিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, কিরূপ অবস্থায় ঐ উদ্বর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের গোচর হইবে। সভ্যতা-লোপের ও সভ্যতার উদ্বর্ত্তনের উদাহরণ এত অল্প যে, তাহা হইতে কোনও নির্দ্দোষ সাধারণ-মত স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। যদিও ইহার কোনও চূড়ান্ত মীমাংসার আশা করা যায় না; কিন্তু বিষয়টি এত গুরুতর যে, ইহা চেষ্টা করিবার যোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু ঐ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বুঝাইবার আবশ্যক আছে। কোনও সভ্যতার বিলোপ বলিলে, এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঐ অবস্থায় সঞ্চিত জ্ঞান-রাশিরও উচ্ছেদ হইয়াছে। যে ব্যক্তি মুখ্যভাবে অথবা পূর্ণ মাত্রায় পার্থিব উন্নতির অনুরাগী—যাহার অস্তিত্ব কেবল পাশব জীবনের সুখ ও বিলাসিতায় আবদ্ধ, সে যদি এইগুলি হারায়, তাহা হইলে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের জন্য রাখিয়া যাইবার আর তাহার কিছু থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তির পার্থিব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা—অভ্যান্তরীণ বৃত্তিসমূহের উন্মেষ-চেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং যাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব সমৃদ্ধিতে নিমগ্ন না থাকিয়া, তদিতর আদর্শের ও অপার্থিব বস্তুর সন্ধানে ফেরে, তাহার পক্ষে ঐ প্রকার পার্থিব ভোগের অভাব, কিছুই কষ্ট-কর নহে, এবং এরূপ ঘটনার পরও সে নিজ অন্তরস্থ সদ্বস্তুর প্রভাবে অটুট থাকে। তাহার উন্নত জ্ঞান তাহার শরীর-নাশের সহিত নষ্ট হয় না, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের জন্য থাকিয়া যায়, এবং মানবজাতির উপকারে লাগে। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমষ্টি সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটে। কোনও জাতির জ্ঞানোন্নতি-বিধায়িনী-শক্তি, জড়-জীবনের প্রতিযোগিতায় উদ্বর্ত্তন মূল্যহীন হইলেও, উহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,কারণ উহারই সাহায্যে উক্ত জাতি অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক জড়জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হইলেও, নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে; এবং ঐ শক্তি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অমূল্য; কারণ অতীত বংশাবলীর পার্থিব-উন্নতি অপেক্ষা উহাদের জ্ঞানোন্নতি দ্বারাই মানবের যথার্থ উপকার হয়।

সক্রেটিসের মহার্ঘ জ্ঞান ও নীতি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই, বরং সেইগুলিই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানাদির আত্মিক শক্তির অবসান হয় নাই এবং একালেও অনেক আন্তরিক সত্যান্বেষীকে জ্ঞানালোকিত, উৎসাহিত ও উন্নত করিতেছে। গ্রীসের সৌন্দর্য্য-বোধ ও জ্ঞানানুশীলন, রোমের সহিত সংঘর্ষে উহার কোনও সাহায্য করে নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহা ভাল তাহা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং মনুষ্য-জাতির অশেষ উপকার করিতেছে।

একটি গুরুতর বিষয়ে চীনের ও ভারতের সভ্যতার ঐক্য এবং অন্যান্য সভ্যতার সহিত অনৈক্য ছিল। উভয়েই

---

* "Epoch of Civilization." W. Newman & Co, Calcutta.

তৃতীয় স্তরে এতটা উন্নত হইয়াছিল যে, উহারা পার্থিব, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়ক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একটা সাম্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার পরিপুষ্টির জন্য কিয়ৎ পরিমাণে পার্থিব উন্নতির আবশ্যক। প্রতি সভ্যসমাজে দুইটি শক্তি একযোগে কার্য্য করিয়া থাকে; একটি পার্থিব উন্নতির পথে চালিত করে—উহাকে লৌকিক শক্তি (Cosmic) বলা যাইতে পারে এবং আর একটি জ্ঞানোন্নতির পথে লইয়া যায়। উহাকে আমরা অলৌকিক শক্তি বলিয়া বিশেষিত করিয়াছি। সভ্যতার প্রথম স্তরে যে শক্তিপুঞ্জের সাহায্যে পার্থিব উন্নতি হয়, তাহারা—যে শক্তিপুঞ্জ জ্ঞানোন্নতি-সাধন করে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে। সভ্যতার পরবর্ত্তী স্তরসমূহে মানসিক ও নৈতিক জ্ঞানোন্নতিকর শক্তিপুঞ্জের কার্য্যের প্রসার হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত শক্তির বেগ ও প্রবলতারও হ্রাস হইতে থাকে; এবং এই বিরোধী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের উপর সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

অত্যধিক জড়োন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফলে অর্থের বিভাগে অত্যন্ত বৈষম্য ঘটে। ঐ বৈষম্যের জন্য সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়;—একটি ক্ষুদ্রতর—যাহা অর্থের প্রাচুর্য্য ও বিলাসিতায় পরিপূর্ণ,—অপরটি বৃহত্তর, দারিদ্র্যে ও দুঃখে নিমগ্ন। দুইটি শ্রেণীরই মনে পার্থিব উন্নতির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ, এবং শারীরিক সুখভোগের উপর কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, ইহাদের মধ্যে অবিরত বিদ্বেষ ও বিরোধ চলিতে থাকে। গ্রীস তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল কিন্তু উহাতে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির অসম্পূর্ণতাই গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। গ্রীসের নৈতিক চৈতন্য—যাহা আমরা উহার শ্রেষ্ঠতম বক্তা প্লেটো কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত দেখিতে পাই, চারিটি মুখ্য গুণের কথা স্বীকার করিয়াছে। যথা—বিজ্ঞতা, সাহস, অপ্রমত্ততা এবং ন্যায়। এই তালিকার উপর আরিষ্টটলের গুণ-তালিকা সহিত। দুইটির কোনটিতেই সার্ব্বজনীন প্রেমের তো [illegible]পাই নাই, সমস্ত জাতি-সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ দয়ারও স্থান নাই। [illegible]কদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি কোনও কালেই উহাদের [illegible]র্থিব উন্নতির সমতুল্য হয় নাই।

দ্বিতীয় স্তরে সোলন অর্থকে সামাজিক প্রতিপত্তির [illegible]নদণ্ড-স্বরূপ করিয়াছিলেন, এবং ঐ আদর্শ তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। * বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ দেশে দরিদ্রে ও ধনবানে, নিম্ন শ্রেণীতে ও উচ্চ শ্রেণীতে অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। গ্রীসে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির এত উৎকর্ষ হয় নাই যে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করিতে পারে। তিন শতাব্দী ধরিয়া ইহারা পরস্পরকে ঘৃণা ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন নিম্নশ্রেণী ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোকগুলিকে হয় নির্ব্বাসিত করিত, নয় তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। আবার যখন উচ্চশ্রেণীর কাছে ক্ষমতা ফিরিয়া আসিত, তখন তাহারাও নিম্নশ্রেণীর সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিত। ক্ষমতার কেন্দ্র কখনও এদিকে কখনও ওদিকে হেলিয়া পড়িত এবং মধ্যে মধ্যে যে অস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইত, তাহা পার্থিব ও পার্থিবেতর শক্তিপুঞ্জের সামঞ্জস্য দ্বারা নহে, পার্থিব শক্তিসমূহের সুব্যবস্থা দ্বারা। ঐরূপে ক্রমাগত জাতীয় উৎসাহের ও সংহতির ক্ষয় হইত, এবং তজ্জনিত আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার জন্যই গ্রীক সভ্যতার অবসান হইয়াছে। গ্রীস যদি ঐক্যময় সভ্যতা স্থাপন করিতে পারিত, যদি তাহার সভ্যতার জড় ও আত্মিক উপাদানগুলিতে সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে উহা তাহার স্বাধীনতা-নাশের সহিত বিনষ্ট হইত না। যাহা হউক, রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পরও গ্রীক-সভ্যতা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মিশর ও এসিয়া মাইনরে রহিয়া গিয়াছিল।

অতিরিক্ত জড়ভক্তির—বিশেষতঃ সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশের কাছে সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষময় ফল রোমের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান। গ্রীক সভ্যতা হইতে ঋণ

* প্লেটো যে সমাজ-গঠন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা চীন ও হিন্দু সমাজের ছায়া মাত্র। "তিনি যে সুনিয়ন্ত্রিত সমাজযন্ত্রের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে জ্ঞানের আধার-স্বরূপ একটি শাসক-শ্রেণী এবং বিশিষ্ট সাহসসম্পন্ন একটি যোদ্ধৃ-সম্প্রদায় থাকিবে এবং এই দুই শ্রেণীকে সাধারণ জনসমষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে; ঐ সাধারণ জনসমষ্টি ব্যক্তিবিশেষের জড়োপভোগবাসনার ন্যায় কেবল উপভোগ-কামনা পরিতৃপ্ত করিবে, এবং সমগ্র সমাজের সহিত তাহাদের কেবল নিয়ন্ত্রিত আজ্ঞাবর্ত্তিতার সম্পর্ক থাকিবে। (সিজুউইক্-নীতির ইতিহাস—৪৫ পৃঃ)।

প্লেটোর কল্পনা কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

লইয়া রোম দ্বিতীয় স্তরে কতক উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় স্তরে পদার্পণও করিয়াছিল, এমন বলা যায় না। অতএব ঐদেশ নিরতিশয় ঐহিকতায় নিমগ্ন ছিল। রোমের জনসাধারণের পাশবপ্রবৃত্তি কিরূপ বীভৎস ছিল, তাহা রোমক সাম্রাজ্যের সকল প্রধান নগরীর রঙ্গভূমিতে নিষ্ঠুর ক্রীড়া-প্রদর্শনেই সুব্যক্ত। কখনও কখনও রঙ্গভূমিস্থ হিংস্রজন্তুগুলিকে সশস্ত্র লোকের সমক্ষে না ছাড়িয়া দিয়া, উলঙ্গ ও আবদ্ধ লোকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

এই কদাচার সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যগণকে জনসাধারণের আমোদের জন্য ঐরূপ ক্রীড়া-প্রদর্শনে বাধ্য করা হইত। এই রূপে জনসাধারণের চক্ষের সমক্ষে স্ত্রী-পুরুষ ও বয়ঃক্রমনির্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক—যাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যোগী (Martyr) খ্রীষ্টানগণও থাকিত—হিংস্র পশুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইত। কিন্তু রোমের জাতীয় আমোদ ছিল, গ্ল্যাডিয়েটরের (যাহারা তরবারি লইয়া যুদ্ধ করে) যুদ্ধ। সশস্ত্র মনুষ্যগণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমরণ যুদ্ধ করিত। জুলিয়স্ সিজারের সময় হইতেই ৩২০ জোড়া গ্লাডিয়েটরকে রঙ্গভূমিতে নামান হইত। অগষ্টস্ তাঁহার জীবিতকালে দশ সহস্র গ্লাডিয়েটরকে যুদ্ধ করাইয়াছিলেন, এবং ট্রেজান চারি মাসেই ঐ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে ঐ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারিয়া যাইত, তাহার প্রতি সমবেত দর্শকমণ্ডলী কৃপা করিতে ইচ্ছা না করিলে, উহাকে রঙ্গভূমিতেই বধ করা হইত। কখনও কখনও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ঐ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইত বটে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ক্রীতদাস ও যুদ্ধের বন্দীদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। এইরূপে প্রত্যেক যুদ্ধজয়ের ফলে অসংখ্য অসভ্য জীব রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণের আমোদের জন্য পরস্পরকে ধ্বংস করিত।

অর্থ ও ক্ষমতা পাইয়া রোমের জন-সাধারণ নিতান্ত ভ্রষ্ট-চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিধি-ব্যবস্থার কোনও মূল্য ছিল না, কোনও বিচারার্থীকে পূর্ব্বে উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়া, তবে বিষয়ের আশা করিতে হইত। সমাজ অতিশয় কলুষিত ও বিকৃত হইয়াছিল। জনসাধারণ অজ্ঞ জনসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা পৈশাচিক প্রবৃত্তিপর হইয়াছিল এবং নগরী যেন নরক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনুতাপহীন হত্যাকাণ্ড, পিতামাতা, পতি-পত্নী, বন্ধু সকলকেই প্রতারণা, রীতিমত বিষ-প্রয়োগ, পরদারহরণ, অগম্যাগমন ও অন্যান্য অকথ্য পাপ—ফলতঃ মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি-প্রসূত যত প্রকার কদাচার হইতে পারে, কোনটাই অনাচরিত থাকে নাই। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা এতদূর লালসাময়ী, ভ্রষ্টচরিত্রা এবং ভয়ঙ্করী হইয়াছিল, যে কোনও পুরুষকে উহাদের বিবাহ করিতে প্ররোচিত করা অসম্ভব হইয়াছিল। অবৈধসহবাস, বিবাহের স্থল অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এবং অবিবাহিতা কন্যাগণও অভাবনীয় নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিত, এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ও রাজপরিবারের কামিনীরা একত্র স্নান করিত, এবং নগ্নতা প্রদর্শন করিত। সিজারের সময়ে এই বিষয়ে শাসনতন্ত্রের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি বিবাহের পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বহুসন্তানবতী রমণীকে তিনি পুরস্কৃত করিতেন এবং ৪৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ও সন্তানহীনা স্ত্রী-গণকে অলঙ্কার ধারণ করিতে ও শিবিকারোহণে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল যে, ঐ সকল প্রতিষেধক বিধিদ্বারা তিনি সমাজ হইতে উক্ত দোষ সকলের নিরাকরণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু কমা দূরে থাকুক, দোষগুলি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অগষ্টস্ যখন দেখিলেন, কেহ আর বিবাহ করিতে চাহে না এবং জনসাধারণ ক্রীতদাসীদের সহিত অবৈধ সহবাসই ভালবাসে, তখন তাঁহাকে অবিবাহিতের উপর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কেহ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও বিষয় উইলসূত্রে পাইতে পারিবে না। ইহাতেই যে রোমের রমণীরা লালসা-পরিতৃপ্তি করিতে ছাড়িয়াছিল তাহা নহে, তাহাদের নষ্টচরিত্র তাহাদিগকে এমন কুৎসিৎ কার্য্যনিচয়ে প্ররোচিত করিত যে, তাহাদের বর্ণনা করা আধুনিক কোনও গ্রন্থে সম্ভব নহে। কন্‌সল পরিবর্ত্তনের হিসাবে বর্ষ-গণন না করিয়া, তাহারা বর্ষ-গণনা করিত, নিজেদের নায়ক-পরিবর্ত্তনের হিসাবে। সন্তানহীন হওয়া সুখের বিষয় বিবেচিত হইত, কারণ আমোদের পথে সংসার-চিন্তার বিঘ্ন উপস্থিত হইত না। প্লুটার্ক ঠিকই বলিয়াছেন যে, রোমের

লোকেরা উত্তরাধিকারী পাইবার জন্য নহে, উত্তরাধিকারী হইবার জন্য বিবাহ করিত। উদরপরায়ণতা ও জঘন্য বিলাসিতা প্রভৃতি কদাচার—যাহাদিগকে মহাপাতকের সম্মান দেওয়া যায় না অথচ যাহারা আমাদের ঘৃণা উদ্রেক করে,—তখনকার ইতিহাসে ভূরি ভূরি বিবৃত হইয়াছে। কথিত হয় যে, "উহারা ভোজন করিত বমন করিবার জন্য এবং বমন করিত ভোজন করিবার জন্য।" পেরুসিয়ম্ জয় করিয়া অক্টেভিয়ন্ তত্রত্য তিনশত প্রধান নাগরিককে ডাইভস্ জুলিয়সের মন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এই কি সভ্য মানবের কার্য্য? না রক্তপানোন্মত্ত নরমাংসাহারী বর্ব্বরের কার্য্য? *

রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তজ্জনিত পার্থিবোন্নতির পরিপুষ্টি এমন কতকগুলি হেতুর সঞ্চার করিয়াছিল, যাহাদের ফলে রোমক জাতি ও সভ্যতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি যে, সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অমিতব্যয়িতার ও নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়পরতার কতদুর প্রসার হইয়াছিল। যে সমাজ অতদুর পতিত, তাহার দীর্ঘজীবনের আশা করা যায় না। জাতির মুখ রাখিতে পারে, এমন সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে, ঐ জাতির রমণীগণের সতীত্বের আদর্শ, পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ হওয়া প্রয়োজন কিন্তু সেই আদর্শ রোমে নিতান্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

রোমক সাম্রাজ্যের অতিবিস্তারে অবিরত যুদ্ধ সংঘটনও রোমক জাতির ক্ষয়ের একটি বিশেষ কারণ হইয়াছিল। প্রতি বৎসর রোম অনেকগুলি করিয়া সুসন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়া আসিত। ইহাদের গৌরবময় বিজয়-লাভের ফলে রোমের সাম্রাজ্য এবং দাসের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু ঐ ঘটনাই রোমকগণকে নষ্টচরিত্র করিয়া শেষে রোমের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই স্বহস্তে ভূমিকর্ষণকারী সামান্য ভূম্যধিকারী প্রাচীন রোমকগণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু রোম রাজ্যের মেরুদণ্ড-স্বরূপ রোমক কৃষকগণের তিরোধানের একটি প্রধান হেতু হইয়াছিল, রোম-সাম্রাজ্যের বিস্তার। যখন সিসিলি ও আফ্রিকা হইতে প্রচুর শস্য আসিতে লাগিল, তখন আর ইটালীর সামান্য ভূম্যধিকারীরা শস্য-উৎপাদনে লাভ করিতে পারিত না। তাহারা আপন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ধনাঢ্য প্রতিবেশিগণের হস্তে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। জ্যেষ্ঠ প্লিনি যথার্থই কহিয়াছেন যে, বিস্তৃত ভূম্যধিকারই ইটালীর সর্ব্বনাশের কারণ। বিস্তৃত ভূম্যধিকারীরা দেখিল যে, ক্রীতদাসের পরিশ্রমে নিজ নিজ ভূমিতে শস্যোৎপাদন সুবিধাজনক। তাই আর পুরাতন কৃষককুল কোনও কাজ পাইত না এবং গৃহহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। টাইবিরিয়স্ গ্র্যাকস্ বলিয়াছেন—"ইটালীর বন্য জন্তুদেরও মাথা গুঁজিবার স্থান আছে, কিন্তু যাহারা ইটালীর জন্য নিজ হৃদয় শোণিত দিতে প্রস্তুত, তাহাদের আছে—কেবল আলো আর নিঃশ্বাসের বাতাস—তাহারা আশ্রয়ের অভাবে স্ত্রী-পুত্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সেনানীগণ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলেন—"তোমাদের সমাধি-ভবন ও দেবমন্দিরের জন্য যুদ্ধ কর," তিনি তাহাদের উপহাস করেন মাত্র। তাহাদের কয়জনের পবিত্র গৃহ-মন্দির এবং পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধি-ভবন আছে? যাহারা নামে পৃথিবীর অধিপতি তাহাদের নিজস্ব এক ফুট জমিও নাই!"

যখন এইরূপে কৃষিক্ষেত্রগুলির সর্ব্বনাশ হইতেছিল, তখন রোম-নগরী এক শ্রেণীর নূতন লোকের দ্বারা পূর্ণ হইতেছিল। যে কৃষিকুল উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাদের সন্তানগণ নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া নগরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। তদ্ভিন্ন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ক্রীতদাসগণের সন্তানগণও নগরী পরিপূর্ণ করিতেছিল। গ্রীস, সীরিয়া, মিশর, এসিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স্, পৃথিবীর সকল দিক্ হইতে সকল জাতির লোক স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও দাসরূপে বিক্রীত ও পরে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়া নাগরিক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমক-নামধারী এ এক নূতন জাতি। একদিন কার্থেজ ও নিউমিডিয়া-বিজয়ী সিপিও ফোরমে (বক্তৃতা-মঞ্চে) জন-সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে করিতে নিম্ন শ্রেণীর শ্রোতৃগণের চীৎকারে বাধা পাইয়া বলিয়াছিলেন—"চুপ্ কর, রোমের কৃত্রিম সন্তানগণ! তোদের যা ইচ্ছা তাই কর, যাহাদের আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারা এখন স্বাধীন হইলেও আমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। জনসঙ্ঘ শান্ত হইল বটে কিন্তু তখনই বিজিতের বংশধর ঐ কৃত্রিম

* ড্রেপার—"ইউরোপের মানসিক উন্নতি" ১ম খণ্ড, ২৫৩—৫৫পৃঃ

সন্তানগণ রোমের অকৃত্রিম সন্তানদিগের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই নূতন নিম্নস্তর নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না, তাই তাহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া সমাজের একটি কার্য্য হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১২৩ অব্দে সকল নগরবাসীকে অর্দ্ধমূল্যে শস্য যোগাইয়া এই কার্য্যের সূত্রপাত করা হয়। ঐ শস্য আসিত, সিসিলি ও আফ্রিকা হইতে। খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দ হইতে বিনামূল্যে শস্য-বিতরণ এবং তৈলের যোগান দেওয়া আরম্ভ হয়। এই বিতরণের তালিকা থাকিত এবং উহার জন্য একটা পরিচালক-সমিতি, এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণের জন্য বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ নিযুক্ত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৬ অব্দে জুলিয়স্ সিজার ৩,২০,০০০ নাগরিককে ঐ তালিকাভুক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই হতভাগ্য অলস ব্যক্তিগণই নির্ব্বাচন-দিনে ফোরম্ জুড়িয়া থাকিত এবং বিধি-প্রণয়ন ও ম্যাজিষ্ট্রেট-নিয়োগ করিত। ঐ সকল পদের প্রার্থিগণ প্রদর্শনী দেখাইয়া প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন করিয়া, এবং খাদ্য বিতরণ করিয়া উহাদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিত। প্রকাশ্য দিবালোকে ভোট-বিক্রয়ের বিস্তৃত আয়োজন হইত। সমিতিগুলির সভ্য জন-সাধারণ দারিদ্র্যবশতঃ নষ্টচরিত্র হইয়াছিল, এবং প্রাচীন বংশোদ্ভব ব্যবস্থাপক-সভার (Senate) সভ্যেরা বিলাসকলুষিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। *

রোমের দিগ্বিজয় দ্বারা ক্রীতদাস-সংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সাম্রাজ্য কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারিল না। উহারা প্লিনি, সেনেকা ও সিসেরো প্রভৃতি কতিপয় সহৃদয় প্রভুর কাছে সদ্ব্যবহার পাইত বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের প্রতি অমানুষ অত্যাচার হইত। সেনেকা বলিয়াছেন, 'যদি কোনও ক্রীতদাস খাইবার সময় কাশে কি হাঁচে, যদি সে মাছি তাড়াইতে বিলম্ব করে, কিংবা সশব্দে মাটিতে চাবি ফেলে, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত রাগ করি। প্রায়ই তাহাকে অতিরিক্ত বলের সহিত প্রহার করি, কখনও তাহার কোনও অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিই, কখনও বা তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া দিই।" কোনও এক রোমক ধনী মৎস্যময় পুষ্করিণীতে বাইন মাছের খাদ্য-স্বরূপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার ক্রীতদাসগণকে অসাবধানতার জন্য দণ্ডিত করিতেন। স্ত্রীগণও ইহার অধিক দয়াবতী ছিলেন না। কোনও রমণীর প্রশংসা করিয়া অভিড (Ovid) বলিয়াছেন, "অনেকবার সে আমার সম্মুখে কেশ-বিন্যাস করিয়াছে কিন্তু কখনও দাসীর বাহুতে সূচিবিদ্ধ করে নাই।" প্রভুর বিরক্তিভাজন হইলে ক্রীতদাসগণকে সচরাচর ভূতলস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত। দিবাভাগে তাহাদিগকে গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া পরিশ্রম করিতে হইত। যে যন্ত্রে ক্রীতদাসগণ পরিশ্রম করিত, জনৈক রোমক লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"হা ঈশ্বর! ঐ লোকগুলি কি ভয়ঙ্কর অস্থিচর্ম্মসার! উহাদের শ্বেত চর্ম্ম বেত্রাঘাতে চিহ্নিত, উহাদের পরিধান জীর্ণ টিউনিক, (রোমক পরিচ্ছদ-বিশেষ) উহারা বাঁকিয়া গিয়াছে, উহাদের মস্তক মুণ্ডিত, পদে লৌহশৃঙ্খল, শরীর অগ্নির উত্তাপে কদাকার, ধূমে অক্ষিপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ শস্যরেণুতে আবৃত।"

সর্ব্বদা বেত্রাঘাতের কিংবা অত্যাচারের ভয়ে হয় নিদারুণ পরিশ্রম করিতে, নয় আলস্যে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া, ক্রীতদাসগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, হয় বিমর্ষ এবং ভয়ানক—নয় অলস ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইত। উহাদের মধ্যে যাহারা উৎসাহশীল হইত, তাহারা আত্মহত্যা করিত; যাহারা তাহা না পারিত, তাহারা যন্ত্রচালিতবৎ জীবনযাপন করিত। অধিকাংশেরই আত্মসম্মান-বোধ লুপ্ত হইত। প্রভু-সম্প্রদায়কে তাহারা যেন ঘৃণায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। স্নানাগারে কোনও প্রভুকে ক্রীতদাসেরা হত্যা করিবার কল্পনা করিয়াছে শুনিয়া কনিষ্ঠ প্লিনি বলিয়াছেন—"আমরা সকলেই ঐপ্রকার বিপদের মধ্যে বাস করি।" আর একজন রোমক লেখক বলিয়াছেন—"অত্যাচারী রাজার হস্তে যত রোমক নিহত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।" বহুবার ক্রীতদাসগণের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে পশুরক্ষার জন্য দাসগণের হস্তে অস্ত্র থাকায় ঐস্থান দ্বয়েই ঐ বিদ্রোহের সংখ্যা অধিক হইয়াছে।"*

যে সমাজ জড়োন্নতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহার আভ্যন্তরিক বিপৎসমূহের কথা আমরা এতক্ষণ বিচার

* সীনবস—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস—২৭৫—৭৭

* সীনবস—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস—২৫৯—৬০ পৃঃ।

করিতেছিলাম। ঐ সমাজের বাহ্য-বিপদ্ আরও গুরুতর। পার্থিব-উন্নতির লোভ-পরবশ জাতিকে—যাহারা উহার অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, অথবা যাহারা উহারই মত লুব্ধ,—এমন সব বহিঃশত্রুর আক্রমণ সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হয়। জড়োন্নতির ফলে যেমন হিংসা, তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা এবং অবিশ্রান্ত বিরোধ প্রসূত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। প্রায়ই এই প্রতিযোগিতায় ও দ্বন্দ্বে প্রাচীন জাতিদিগের অপেক্ষা নবোত্থিত জাতিদের কতক সুবিধা হয়, কারণ প্রাচীন জাতিরা অর্থ-সঞ্চয়ের অনিবার্য্য ফলে বিলাস-ভোগ এবং আত্ম-বিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এইরূপেই গ্রীস—রোমের হস্তে, এবং রোম—গথ, ভিসিগথ ও ভ্যাণ্ডালগণের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। আসীরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন্ ও মিশর এই সকল প্রতিবেশী দেশের সহিত বিবাদ করিত। বিজিত জাতি সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইত, তাই যুদ্ধের আর বিরাম হইত না। এমনি করিয়া আসীরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মিডিয়া নামক একটি সবল জাতি অনায়াসে তাহাকে পরাভূত করিল। ইহুদী ধর্ম্মবক্তারা যাহাকে সিংহের বাসভূমি, রক্তাপ্লুত এবং বধ্যপূর্ণ নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই নিনেভেহ নগরী খ্রীঃ পূঃ ৬৫ অব্দে বিজিত ও ধূলিসাৎ হইয়াছিল। ধর্ম্মবক্তা (Prophet) নাহুম বলিয়াছেন, "নিনেভেহ ধ্বংস হইয়াছে—কে তাহার জন্য শোক করিবে ?"

যে স্তরে মনের উপর জড়ের প্রভুত্ব এবং আত্মিক জীবন অপেক্ষা জড়-জীবনের মূল্য অধিক থাকে, সভ্যতার সেই প্রথম স্তর অতিক্রম করা কোনও জাতির পক্ষে কত কঠিন, তাহা উপরের বৃত্তান্ত হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। খুব সম্ভব, তাহাদের বিচ্ছিন্নতার জন্যই চীন, হিন্দু ও মিশরীরা সভ্যতার প্রথম স্তরের তো কথাই নাই, তৃতীয় স্তরও কাটাইয়া উঠিয়াছিল। উহাদের দেশের ভৌগোলিক সংস্থান উহাদের ও বাহ্য-জগতের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর উহারা মুখ্যতঃ কৃষি-পরায়ণ জাতি হওয়ায় উহাদের আত্মভরণের ক্ষমতা ছিল, এবং উহারা মানসিক ও নৈতিক উন্নতির মুখপাত্র-স্বরূপ পার্থিব উন্নতির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বড় নির্ভর করিত না। তদ্ভিন্ন ইহারা কৃত্রিম উপায়ে বিদেশী বস্তু বর্জ্জন করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।* লিউ-নিবাসীরা চাউএর রাজাকে কতকগুলি কুকুর উপহার দিতে চাহিলে, রাজমন্ত্রী নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়া তাঁহাকে ঐ উপহার-গ্রহণে নিরস্ত করেন—"রাজার উচিত নয়, প্রয়োজনীয় বস্তু সকলের যাহাতে অশৌচ হয়, এমন বিদেশী দ্রব্য ভালবাসা। তবেই তাঁহার প্রজারা তাঁহার সকল আবশ্যক দ্রব্যই যোগাইতে পারিবে। বিদেশী কুকুর বা অশ্ব তিনি রাখিবেন না, সুন্দর হইলেও অপরিচিত পক্ষীও তিনি নিজ দেশে পোষণ করিবেন না। যখন তিনি বিদেশী দ্রব্যকে মূল্যবান্ বলিয়া না ভাবিবেন, তখন বিদেশীরা তাঁহার কাছে আসিবে ; যখন তিনি কার্য্যকেই মূল্যবান্ বলিয়া ভাবিবেন, তখন তাঁহার প্রজারা শান্তিতে থাকিবে।" অধ্যাপক ডগ্‌লাস্ বলেন, "সকল চীন-সম্রাট্ এই উপদেশকে অমূল্য ভাবিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন এবং চীনেদের মতে উহাতে অতিশয় সুফল ফলিয়াছে। মিশরও তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল এবং খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে তাহার বন্দরগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ দেশ রহস্যে আবৃত ছিল। হিন্দুদিগের বর্ণভেদ-প্রথা অনেক পরিমাণে উহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

কোনও ব্যক্তির বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক এবং আভ্যন্তরিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনে সামঞ্জস্য ঘটিলে যেমন তাহার দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তেমনি কোনও দেশের সভ্যতা যদি তৃতীয় স্তরে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে, যদি জড় ও চৈতন্যের মধ্যে উত্তমরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারে, তবেই তাহার দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। চীনের মানসিক উন্নতি নিঃসন্দেহে গ্রীস এবং ভারত অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ অনেকটা ভারতবর্ষের প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। চীনে কখনও নাটকের প্রসার হয় নাই, এবং সৃষ্টি-চাতুর্য্যময়ী কবিতারও নিতান্ত অভাব। তাহার কলাশিল্পেও সৃষ্টি চাতুর্য্যের অতি সামান্যই নিদর্শন পাওয়া যায়। উহাতে প্রচুর অলঙ্কার এবং বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ আছে, কিন্তু কল্পনা ও স্বাধীন চিন্তা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীসে

* কন্‌ফিউসিয়নিস্‌ম ও টাওইস্‌ম্—১৭পৃঃ

ও ভারতে সাহিত্যচিন্তা যত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, চীনে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চীন প্রথম যুগেই সম্রাট্ ইয়াকুর (আনুমানিক ১৩৫৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী সুনের রাজত্বকালেই তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল, এবং জড়োন্নতির ও নৈতিক-উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। ঐ সামঞ্জস্য পরে অনেকবার স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই চীন নিজ সঞ্জীবনী-শক্তির বলে উহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছে। চীনগণ রীতিমত বাস্তবাভিজ্ঞ। তাহারা ভৌতিক ও অভৌতিক শক্তি-পুঞ্জের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া, এবং এই শক্তিদ্বয়ের কোনটির প্রেরণায় নিজেদের চারিদিকে রক্ষণশীলতায় যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার বাহিরে না গিয়া, আপন সভ্যতার মৌলিকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা সকল সময়েই পার্থিব উন্নতিকে নৈতিক উন্নতির অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সাহিত্যে যদিও গভীর চিন্তা বা উদ্দাম কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু উহাতে জীবন সম্বন্ধে নিয়মাবলী ও সূত্রাবলী, মিতাচারের উপদেশ, আত্মসংযম ও সাংসারিক নীতি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। একা লাউট্সেই রহস্যবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন—তিনি ভিন্ন চীনের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দর্শনশাস্ত্রের কূট সমস্যা অপেক্ষা কার্য্যকরী নীতির এবং সামাজিক ও রাজ নৈতিক আচারের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। কন্‌ফিউসিয়স্ ও মেন্‌সিয়স্ (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান্ ছিলেন) দার্শনিক সন্ন্যাসী ছিলেন না—তাঁহারা স্ব স্ব নির্জ্জন চিন্তাগারে লীন হইয়া কেবল মত-প্রচারেই ব্যস্ত ছিলেন না—তাঁহারা উভয়েই রাজসভায় বাস করিয়া, মনুষ্য প্রকৃতি, সমাজ এবং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্ব স্ব মতাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসুক ছিলেন এবং কন্‌ফিউসিয়াস্ একবার সে সুবিধা পাইয়া, কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

চীনের শিল্প-ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য; কিন্তু তাহার নৈতিক উন্নতিও কম নহে। চীনের মনীষিগণ চিরদিন এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। চীন-বণিক্‌গণের সাধুতা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার কথাই তাহার দলীল। দেশের শিক্ষকগণের শিক্ষার সারভূত পরোপকারের উচ্চভাব, নৈতিক প্রবচন ও অনুশীলন-সমন্বিত পুস্তক ও পুস্তিকারাশি বহুল পরিমাণে জনসাধারণে বিতরিত হইত। পরোপকারী ধনীদিগের আবেদনে কণীরিংপনে (পুরস্কার ও দণ্ডের বহি) এবং ইয়িন চিহ্‌ওয়ান (আনন্দ-রহস্যের বহি) প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকার সংস্করণের পর সংস্করণ স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হয় এবং উক্ত ধনীরা ঐগুলি ক্রয় করিয়া, যে দরিদ্রেরা ঐ সকল গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে বিতরণের আয়োজন করেন। *

প্রথম যুগের তৃতীয় স্তর হইতেই চীন-নীতিতে পরোপকার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপ কথিত হয় যে, খ্রীঃপূঃ ২৪ ৩৫ অব্দে সম্রাট্ কুহ শিখাইয়াছিলেন যে, মনুষ্য মাত্রকেই ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, সকল লোকের উপকার করা অপেক্ষা শাসন-তন্ত্রের আর উচ্চতর লক্ষ্য নাই। †

---

* কন্‌ফিউসিয়স্ ডিউক চিং কর্তৃক নগরাধিপের (Magistrate) পদে নিযুক্ত হইয়া, জীবিতের ভরণ-পোষণের ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও যুবার উপযুক্ত আহারের এবং স্ত্রী-পুরুষে যথাযোগ্য ব্যবধানেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, আর্থারের সময় ইংলণ্ডে যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার শাসনে পথে কোনও দ্রব্য পড়িয়া থাকিলেও কেহ তাহা কুড়াইয়া লইত না, পাত্র-খোদনাদি কার্য্যে প্রবঞ্চনা ছিল না, এবং বাজারে একদর প্রচলিত হইয়াছিল। ডিউক মহাশয় এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিধি সমগ্র প্রদেশে খাটিবে কি না? কন্‌ফিউসিয়স্ উত্তর করিলেন, শুধু লু সম্বন্ধে কেন, সমগ্র সাম্রাজ্য সম্বন্ধেই খাটে। ডিউক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সহকারী কার্য্য-প্রদর্শক নিযুক্ত করিলেন, পরে দণ্ডবিধি-বিভাগের সচিব-পদে উন্নীত করিলেন। এখানেও তিনি পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, তাঁহার নিয়োগের দিন হইতে পাপ একেবারে তিরোহিত এবং দণ্ডবিধির ব্যবস্থাগুলি নিষ্প্রয়োজন হইয়াছিল।

† ডগ্‌লাস্—কন্‌ফিউসিয়নিসম্ এবং টাওইসম্, ৩২—৩৩পৃঃ।

পুরস্কার ও দণ্ডের বহির কতকগুলি নিয়ম ও প্রবাদ—"পশুদের প্রতি সদয় হও"। "কীট, চারাগাছ কিংবা বড় গাছের অনিষ্ট করিও না।" "অন্যের দুঃখে সহানুভূতি করিও।" "অন্যের সুখে সুখী হইও।" "যাহাদের অভাব তাহাদের সাহায্য করিও।" "অপরের দোষ প্রকাশ করিও না।" "নির্দ্দয় হইও না, হত্যা বা আঘাত করিও না।" "নিজ অদৃষ্টের জন্য ভগবানের উপর বিরক্ত হইও না বা অন্যলোকের দোষ দিও না।" "যে ব্যক্তি সাধু সে তাহার বাক্যে, আকারে ও কার্য্যে ও সদাচারী হয়।"

কন্‌ফিউসিয়স্ শিখাইয়াছেন, যে ব্যবহার নিজে পাইতে চাহ না, পরের সহিত তেমন ব্যবহার করিও না!" লাউট্‌সে গৌতম বুদ্ধের ও তাঁহাদের পাঁচশত বৎসর পরে অবতীর্ণ যীশু খ্রীষ্টের মত শিখাইয়াছেন, "যে তোমার অপকার করিয়াছে, তাহার উপকার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিও।" প্রথম যুগ হইতেই প্রজা-সাধারণের উপকার করাই রাজ্যের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। [এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতি কর্ত্তব্যমাত্মনঃ। মুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥ ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্ম প্রজানামেব পালনম্। নির্দ্দিষ্টফলভোক্তাহি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥ মনু ৭।১৪২।১৪৪; অনুবাদক] কন্‌ফিউসিয়সের মতে রাজা তাবৎ ঈশ্বরানুগৃহীত যাবৎ তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য সুরীত্যনুসারে রাজ্যশাসন করেন। ঐ সকল রীতি ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার পন্থা বিবৃত হইয়াছে। প্রজাবর্গের জন্য কি করা কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নের উত্তরে কন্‌ফিউসিয়স বলিয়াছেন—"উহাদের অভাব মোচন কর;" উহাদের জন্য আর কি করা উচিত, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "উহাদের শিক্ষিত কর।" সুকিং গ্রন্থে শাসন-তন্ত্রের কর্ত্তব্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—"খাদ্যের ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বিহিত যজ্ঞকর্ম্মের রক্ষা-বিধান, পূর্ত্ত, শিক্ষা ও দণ্ডবিধি বিভাগের সচিব-নিয়োগ, দূরাগত অতিথিগণের সংকারের ব্যবস্থা, এবং সৈন্যগণের পোষণের ব্যবস্থা করা।" "যতদিন রাজা ঈশ্বর-নির্দ্দেশিত পথে বিচরণ করেন ও ঈশ্বরানুশাসন প্রতিপালন করেন, ততদিনই তাঁহাকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত বলিয়া ভাবিতে হইবে, ততদিনই তাঁহার রাজদণ্ড ধারণে অধিকার।" কন্‌ফিউসিয়সের এই শিক্ষায় পুরাতন অবস্থা বজায় থাকিবার যত সুবিধা হইয়াছিল, তত আর কিছুতেই হয় নাই। রাজারা ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেই নিন্দাভাজন হইতেন এবং প্রজারা তাঁহার আজ্ঞাপালনে বাধ্য থাকিত না। মেন্‌সিয়স্ অধার্ম্মিক রাজাদের বিপক্ষে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিবার যে অধিকারে পরে দাবী করিয়াছিলেন, তিনি এই প্রকারে আভাসে তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এ অধিকার নিষ্ফল কল্পনায় পর্য্যবসিত থাকে নাই। কন্‌ফিউসিয়সের পরে ৩০ বারের উপর রাজবংশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং প্রতিবারেই ঐ মহাজ্ঞানীর ও তাঁহার শিষ্য মেন্‌সিয়সের শিক্ষার উল্লেখ করিয়া ঐ বিপ্লবের সমর্থন করা হইয়াছে।*

চীনে সম্পত্তিকে কখনও সমাজ মর্য্যাদার মানদণ্ড করা হয় নাই। একমাত্র ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশেই পুণ্য ও জ্ঞান, জন-সাধারণের দ্বারা এমন পূজিত ও সম্মানিত হয় নাই। বুদ্ধ, কন্‌ফিউসিয়স্ ও লাউট্‌সে এই সকল মহাত্মার পূজা চীনের ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে কন্‌ফিউসিয়সের গ্রন্থপাঠ ও তাঁহার পূজা করা সার্ব্বজনীন কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরগুলির মধ্যে স্যান্‌টুং নামক স্থানে তাঁহার সমাধির কাছে যে মন্দিরটি আছে, সেইটিই সর্ব্ব প্রধান। ঐ মন্দিরে একটা প্রস্তর-ফলকে—"পবিত্রতম সাধু কন্‌ফিউসিয়স্ তাঁহার আত্মার বিশ্রামস্থল।" এই কয়টা কথা উৎকীর্ণ আছে। প্রদেশসমূহে কন্‌ফিউসিয়সের পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত ১৫০০ মন্দির আছে এবং তাঁহার সহিত তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্যবর্গ মাং (মেন্‌সিয়স্) ইয়েন টুসাং, ট্‌ সেস্‌জ্ঞেও পূজা পাইয়া থাকেন। বৎসরে দুইবার

আনন্দ-রহস্যের বহির কতকগুলি শিক্ষা—"ন্যায়বান ও অকপট হও এবং হৃদয়কে নূতনত্ব দাও। দয়াশীল ও স্নেহশীল হও—মানবের জাতিকল্পে সৎশিক্ষা প্রচার কর এবং তোমার ধনরাশি পরোপকারে ব্যয় কর।"—ডগলাস্—কন্‌ফিউসিয়নিস্‌ম্ ও টাওইস্‌ম্—১৭২ পৃঃ

* মাননীয় বসু মহাশয় ভারতে রাজাদের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থে কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে বিস্তৃত উপদেশ আছে। রাজা গুণসম্পন্ন না হইলে ও প্রজাপীড়ক হইলে, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইতেও হইত, তাহার উল্লেখ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যে দৃষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন, "বহবো বিষয়াভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।" তিনি স্পষ্ট উদাহরণ দিয়াছেন, "বেণো বিনষ্টোঽবিষয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিব। সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ। মনু আর এক স্থলে রাজার অর্থদণ্ড হইবার কথাও বলিয়াছেন।৮ম।৩৩৬। মনু আরও বলিয়াছেন—'যে রাজা মোহবশতঃ উগ্রভাবে প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংস হন।" ৭ম—১১১। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রজাপীড়ন-সন্তাপ-সম্ভূত অনল রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।"১ম—৩৪১। রাজতরঙ্গিণীতে প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজার রাজ্যচ্যুতির কয়েকটা বৃত্তান্ত আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও রাজার কর্ত্তব্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—ইতি অনুবাদক।

সম্রাট্ সদলবলে সাণ্টুংএ যান এবং দুইবার জানুপাতিয়া ও ছয়বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া, এইরূপে তাঁহার উদ্বোধন করেন—"হে সম্পূর্ণ মহাত্মন্! তুমি মহান্—তোমার পুণ্য সম্পূর্ণ, তোমার শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। মর্ত্তোর মধ্যে তোমার সমান কেহ হয় নাই। রাজা মাত্রেই তোমার সম্মান করেন; তোমার বিবিধ ব্যবস্থা আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই যে শিক্ষার আধার সাম্রাজ্য, তুমিই তাহার আদর্শ। ভক্তির সহিত যজ্ঞপাত্রগুলি প্রেরিত হইয়াছে। ভক্তিমিশ্র-ভয়ের সহিত আমরা দামামা ও ঘণ্টা ধ্বনিত করি।"

প্রথম যুগ হইতেই চীন যুদ্ধপ্রিয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। চীনে সৈনিকের ব্যবসায় চিরদিন ঘৃণিত হইয়াছে—সামাজিক উপকারিতা-পর্য্যায়ে তাহার স্থান, সর্ব্বনিম্নে। যুদ্ধনিপুণতায় যাহারা খ্যাতির একমাত্র হেতু তাহাকে চীন কোনও দিনই শূরিত্ব প্রদান করে নাই। নরপতি-সমাজে বোধ হয়, একা চীনের সম্রাট্ তরবারি ধারণ করেন না।

অনেকের কাছে বিরোধোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা সত্য যে, চীনের সৈন্যবল অথবা পার্থিব উন্নতি, তাহার সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে নাই—করিয়াছে তাহার নৈতিক উন্নতি এবং উহার ইতিহাসের আদিমকালে পার্থিব ও নৈতিক উন্নতির মধ্যে সে যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল, সেই ঘটনা। চীনকে বহুবার বহিরাক্রমণ সহিতে হইয়াছে, কিন্তু চীনগণের নৈতিক জীবনীশক্তি এত বেশী যে, কেহই তাহার হৃদয়ের দমন করিতে পারে নাই। তাহারা বিদেশিগণকে তাহাদের সমাজভুক্ত করিয়া লইতে কখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই। স্বীয় নৈতিকশক্তির বলে সমস্ত বিদেশী বস্তুকে নিজেদের সভ্যতায় মিশাইয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব এত সুনিশ্চিত হইয়াছে। টার্টার, মোঙ্গল কিংবা মাঞ্চু, এই সকল বিদেশী বিজেতৃগণ কিছু দিন পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের লোক হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই চীনের ভাষা, আচার ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া কন্‌ফিউসিয়স্ প্রভৃতি চীনমহাত্মগণের ভক্ত উপাসক হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুরাও তাহাদের নৈতিক উন্নতির ফলে বিদেশী উপকরণগুলি তাহাদের সভ্যতায় মিশাইয়া লইয়া, উহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষ তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল, তখন আর্য্য ও অনার্য্যগণের জাতীয় পার্থক্য অপসৃত হইয়া, উভয় জাতির সংমিশ্রণে ইতিহাস বিশ্রুত, এক আদর্শে অনুপ্রাণিত, এক দেবদেবীর উপাসক হিন্দু নামক এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে ভারতবর্ষ—গ্রীক, পার্থিয়ান, শক এবং হূণ প্রভৃতি অনেকগুলি বিদেশী জাতির আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল, এবং উহারা অনেক স্থলে নিজেদের অধিকার-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। অচিরে কিংবা কিছু বিলম্বে—হয় ইহারা বিতাড়িত, নয় হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও আচার গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাঁহার কাবুলে রাজধানী ছিল, সেই গ্রীক নরপতি মীনাণ্ডার খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং ইনি মিলিন্দ নাম ধারণ করিয়া "মিলিন্দপংহো" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। * শক-রাজ কুশান (দ্বিতীয় কাড্‌ফাইমিস্) অন্তরের সহিত শিবভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কণিষ্ক, এবং তাঁহার পুত্র হুস্ক বুদ্ধের উৎসাহী ভক্ত হইয়াছিলেন। পার্থিয়ান বংশের পহ্লবগণ চারিশতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং সর্ব্বতোভাবে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সময় হইতে কাঞ্চী নগরী (কঞ্জিভেরম্) হিন্দুধর্ম্মের একটি পীঠস্থান-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সৌরাষ্ট্রের (আধুনিক কাথিওয়াড়ের) শক-অধিপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের হয় ব্রাহ্মণ্য—নয় বৌদ্ধ-শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন—"কোনও কোনও বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাকাল শাখার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাপেক্ষা জাতিহীন বিদেশী ভূপতিগণকে আকর্ষণ করিবার শক্তি অধিক ছিল, এবং ইহা আশা করা অন্যায় হইবে না যে, তাহারা ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মকেই আদরের চক্ষে দেখিত; কিন্তু যতটুকু তথ্য

---

* ভারতবর্ষে গ্রীক-প্রভাব সম্বন্ধে মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আলেক্‌জাণ্ডার, অ্যাণ্টায়েকাস্ দি গ্রেট, ডিমেট্রিয়স্, ইউক্রাভিডিস্ ও মীনাণ্ডার,তাঁহাদের অভিযানের যে উদ্দেশ্যই কল্পনা করিয়া থাকুন, উঁহাদের ভারতাক্রমণকে বিজয়-অভিযান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ঐ অভিযান ভারতের আচার-ব্যবহারের উপর কোনও প্রকাণ্ড চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—২১৩ পৃঃ।

অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এমন বলা চলে না যে, বৈদেশিক সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মেরই অধিক প্রভাব ছিল। (ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস— ২৬৪-৬৫ পৃঃ)

চীনদিগের মত হিন্দুরাও দ্বিতীয় যুগের তৃতীয় স্তর হইতেই যুদ্ধ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির হাত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। উহারাও পরোপচিকীর্ষাকে একটি মুখ্য পুণ্যের মধ্যে গণ্য করিয়া আসিয়াছে। চীনের মত ভারতেও কখনও অর্থকে সামাজিক মর্যাদা-নির্ণয়ের ভিত্তি করা হয় নাই, জ্ঞান ও পুণ্য বহু সম্মান লাভ করিয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল। গ্রীসের মত এই দুই দেশে কখনও মনীষিগণকে অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু দুইটি বিষয় ভারতে ও চীনে প্রভেদ ছিল। চীনের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে পরিমাণে বস্তুতন্ত্রী ও ঐহিকানুরক্ত ছিলেন, ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই পরিমাণে কল্পনা-প্রিয় ও পারত্রিক ভক্ত ছিলেন। ভারতের জ্ঞানীরা জন-সমাজের অন্তরালে আশ্রমের নির্জ্জনতায় থাকিতে ভালবাসিতেন এবং রাজনীতি ও সাধারণতঃ সকল ঐহিক বিষয়েই বীতশ্রদ্ধ হইয়া, দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির সৌষ্ঠব-সম্পাদনে ব্যস্ত থাকিতেন। (কথাটা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারা রাজাকে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, এবং মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব হইতে জানা যায় যে রাজ-মন্ত্রীদিগের মধ্যে অন্ততঃ ৪ জন ব্রাহ্মণ থাকিতেন। মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে ইহাও দেখা যায় যে, বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ রাজসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন, এবং রাজাকে উপশিক্ষা ও হিতোপদেশ দিতেন, অনুবাদক)। ঐ পদ্ধতি-গুলি চিন্তার মহত্বে ও গভীরতায় এখনও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহাদের সাধারণ প্রবৃত্তি শান্তির দিকে ও পার্থিব উন্নতির প্রতিকূলে গিয়াছে। হিন্দুদিগের বর্ণভেদ-প্রথা আর একটি বিষয়—যে সম্বন্ধে চীন ও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথম এই প্রথাটা এতটা প্রসারক্ষম ছিল যে, কোনও নিম্ন-বর্ণের লোক উচ্চবর্ণে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু তৃতীয় স্তরের শেষ ভাগে বর্ণভেদের নিয়মাবলী এত কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল যে, বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দুরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহাদের কল্পনা-প্রবণতা ও জাতিভেদ প্রথার জন্য।* যোদ্ধৃজাতি রাজপুতেরা আক্রমণকারী মুসলমানগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক তাহাদের হৃদয়ে যত ব্যথার সৃষ্টি করিত, আর কিছুই তেমন পারিত না। যুদ্ধে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা প্রায়ই তাহারা যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করিত। রাজপুতেরা সাধ্যমত মুসল-মানের গতি প্রতিহত করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কখনই জন-সাধারণের সাহায্য পায় নাই; কারণ তাহারা ভাবিত যে, রাজ্য-রক্ষা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, তাহার সহিত উহাদের কোনও সংস্রব নাই।

কিন্তু হিন্দুদিগের সভ্যতা উহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাইবার পরও উদ্বর্ত্তিত হইল, এবং এই উদ্বর্ত্তনের হেতু তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। ঐ কারণেই শস্ত্রাঘাতের ভয়ে বা পার্থিব উন্নতির লোভে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিবার সাহস তাহাদের ছিল। হিন্দু-সভ্যতা যে শুধু মুসলমান-বিজয়রূপ সংহার-প্রবণ শক্তির মুখে অদমনীয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নহে; সময়ে মুসলমান হৃদয়কেও আকর্ষণ করিয়া, মুসলমান-সভ্যতার ও শাসন-নীতির উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সারাসেন-গণ ভারতবর্ষের কাছে তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, বীজগণিত, ও রসায়নের জন্য ঋণী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ভারতে সুস্থির হইয়া মুসলমানগণ ক্রমশঃ কতক পরি-মাণে হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারের উৎসাহ কমিয়া আসিয়াছিল। মুসলমানদের অন্ধ ধর্ম্মানুরাগ হিন্দুগণের দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে ক্রমশঃ সংযত হইয়া আসিয়াছিল এবং মুসলমান ধর্ম্মের ও শাসনতন্ত্রের উপর হিন্দুর প্রভাব ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়াছিল।

আকবরের সিংহাসনারোহণ হইতে সাহজাহানের রাজ্য-চ্যুতি পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম কাল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময়ের মধ্যেই হিন্দু-প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। আকবর এবং তাঁহার সুশিক্ষিত

---

* এ কথার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। আত্মবিচ্ছেদই ভারতের মুসলমান-করতলগত হওয়ার কারণ—জাতিভেদ নহে। অনুবাদক।

সভাসদ্ ভ্রাতৃদ্বয় ফইজি ও আবুল ফাজ্‌ল্ বিশেষরূপে হিন্দু-ভাবাপন্ন ছিলেন। আবুল ফাজ্‌লকে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে হিন্দু বলিয়া ভাবিতেন। (আইনি আকবরী, ২৭ পৃঃ দেখ) আকবর হিন্দুদিগের মত গোহত্যাকে পাতক বলিয়া ভাবিতেন এবং গো-মাংস-ভোজন নিষেধ করিয়াছিলেন। * আকবরের পত্নীদের মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এবং জাহাঙ্গীর ইঁহাদের মধ্যে একজনের সন্তান। জাহাঙ্গীরের দশটি স্ত্রীর মধ্যে অন্যূন ছয়টি হিন্দু ছিলেন, এবং সাহজাহান ইঁহাদের মধ্যে একজনের সন্তান। † তাঁহার ধমনীতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু শোণিতই বেশী ছিল। আকবর সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি তাঁহার হিন্দু-পত্নীগণের উপর প্রীতিবশতঃ যৌবনাবধি হোম করিতেন। ঐ হিন্দু-পত্নীগণের তাঁহার উপর এত প্রভুত্ব হইয়াছিল যে, তাহাদের খাতিরে তিনি শুধু গোমাংস নহে, লশুন ও পলাণ্ডু-ভোজন এবং শ্মশ্রু রাখাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। গোঁড়া মুসলমান বেদৌনি কহিয়াছেন, "হিন্দুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি নিজ অদ্ভুত মতানুসারে অনেকগুলি হিন্দু আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস আপনার রাজদরবারে চালাইয়াছিলেন, এবং এখনও চালাইতেছেন।" কেহ কেহ বলেন, আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র রাজা বীরবল তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়াইয়াছিলেন। বেদৌন বলেন যে, বীরবলের মৃত্যুতে আকবর যেমন শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তেমন কোনও মুসলমান ওমরাহের মৃত্যুতে হ'ন নাই। আকবরের হিন্দু-প্রীতিমূলক নীতি গোঁড়া মুসলমানগণের হৃদয়ে যে হিংসানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহা বেদৌনি প্রভৃতি গোঁড়া মুসলমান লেখকগণের লেখা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। * হিন্দু মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল এবং ফৈজি ও আবুল ফাজ্‌ল্ যাঁহার হিন্দুর মধ্যেই গণ্য, আকবরের বিশ্বস্ততম না‌ও যদি হ'ন অন্ততঃ বিশ্বস্ততম সচিব-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন আকবরের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যাহা করিতে পারেন নাই এই কয়জনে তাহাই করিয়াছিলেন; ন্যায়সঙ্গত ও উদার নীতির ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া, মোগল-সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। *

আকবরের হিন্দু-প্রীতিমূলক নীতি জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের সময়ও চলিয়াছিল। দারা ও ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ—আসলে উদারমতের ও সঙ্কীর্ণমতের, হিন্দু-প্রীতিমূলক ও হিন্দু-বিদ্বেষ-মূলক নীতির যুদ্ধ। দারা আকবরের মতাবলম্বী ছিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমান মতসমূহের সামঞ্জস্য করিয়া, একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চাশখানি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আকবরের মত তিনিও বিধর্ম্মী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতেন এবং বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি ঈশ্বরের মহম্মদীয় নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু "প্রভু" নাম ব্যবহার করিতেন এবং অঙ্গুরীতে হিন্দিভাষায় ঐ নাম খোদিত করিরা রাখিতেন। আলমগীর-নামার লেখক কহিয়াছেন—"ইহা স্পষ্টই দেখা গেল যে, যদি দারা সেকো সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলে সত্যধর্ম্মের ভিত্তি নিরাপদ থাকিবে না।" গোঁড়া মুসলমানগণ বহুদিবস যাবৎ যেমনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল, ঔরঙ্গজেব ঠিক তেমনই অনুদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাই তাহারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল, এবং হিন্দুরা তাঁহার জ্যেষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের পক্ষ জয়লাভ করিল বটে কিন্তু সে জয় ক্ষণস্থায়ী এবং ঔরঙ্গজেবের রাজ্য শেষ হইতে না হইতে উহারও অবসান হইয়াছিল।

---

* সম্রাট্ নাসিরুদ্দিন বৃষহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা কহিয়াছেন যে, তিনি হিন্দুদিগের মত পৌত্তলিক হইয়াছিলেন, কাজেই কোরাণকে বসিবার আসন-স্বরূপ করিয়া উহার উপার বসা হইত।

† আইন-ই—আকবরী—৩০৪—৩০৯ পৃঃ।

* বেদৌনি বলিয়াছেন—যে হেতু সে সময়ে কোরাণের মত এবং আদেশের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল, এবং হিন্দু কাফেরগণ ও হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমানগণ প্রকাশ্যে আমাদের পয়গম্বরকে নিন্দা করিত, তাই অধার্ম্মিক লেখকগণ তাহাদের গ্রন্থের প্রস্তাবনায় চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার স্তুতিবাদ করা উঠাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার নাম লওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ উহাতে ঐ মিথ্যাবাদিদ্বয় (ফইজী ও আবুল ফাজ্‌ল্) রাগ করিত।

* অবশ্য হিন্দুরা না হইলে চলেই না; অর্দ্ধেক সৈন্য ও অর্দ্ধেক ভূমি উহাদের অধিকারে। না হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ—না মোগলগণ নিজেদের মধ্যে এমন একটি ওমরাহ দেখাইতে পারেন, যেমন হিন্দুদের মধ্যে আছে।

দেশের যে সকল অংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুসলমানের অধীনে ছিল, সে সকল স্থলেও হিন্দুরা রাজনীতিক্ষেত্রে একেবারে প্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। তাঁহারা বিশ্বাসসাপেক্ষ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতেন। মুসলমান রাজাদের অধীনে তাঁহারা সেনা-চালনা করিয়াছেন, রাজ্য-শাসন করিয়াছেন এবং সচিবের কার্য্যও করিয়াছেন। আকবরের অধীনে একজন হিন্দু (টোডরমল্ল) রাজস্ব-সচিবের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অপর একজন (মদন সিংহ) যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সে পদ তাঁহার পূর্ব্বে সম্রাট্ বংশের কুমারগণের একায়ত্ত ছিল। *

* এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখক-প্রণীত প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা ১৭০—৭২ পৃ. দেখ।

গোলকোণ্ডার চতুর্থ মুসলমান রাজা ইব্রাহিম, জগদেব নামক একজন হিন্দুকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ সা সুর আদিল যিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন হিমু নামক একজন হিন্দুর উপর নিজ সাম্রাজ্য-শাসনের ভার দিয়াছিলেন। এই হিমু এক সময়ে একটি খুচরা বিক্রয়ের দোকান করিত এবং তাহার আকৃতি ও তাহার বংশ হীন ছিল। কিন্তু ঐ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও হিমুর এত ক্ষমতা ও এত মনের জোর ছিল যে, সে রাজ্যের গর্ব্বিত যুদ্ধবিশারদ ওমরাহগণের মধ্যে থাকিয়াও নিজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এবং রাজ্যেশ্বরের মূর্খতা ও যথেচ্ছাচারে জর্জ্জরিত রাজ্যকে ধ্বংসপথ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

এল্ফিন্‌ষ্টোন ভারতবর্ষের ইতিহাস; কাওয়েলের সংস্করণ; ১৬০—৬৩ পৃঃ।

সম্রাট ফরোক্‌সার, রাফিউদ্‌দর্জাৎ, রাফিউদ্‌দৌলা এবং মহম্মদ সাহের রাজ্যের কতক সময় রতনচাঁদ নামক জনৈক হিন্দুর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। ইনিও এক সময় খুচরা বিক্রয়ের দোকান রাখিতেন। তিনি রাজ্যের উজীর আবদুল্লা খাঁর সহকারী ছিলেন। তাহার এবং রাজা অজিতের প্রভাবেই ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পুনঃস্থাপিত জিজিয়া কর (হিন্দুদের উপর বিশেষ কর) উঠিয়া গিয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকের অনুযোগ যে, তিনি বিচার-কার্য্যে ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য শূন্য পরিণত হইয়াছিল। এই হিন্দুর মত না লইয়া কোনও স্থানের কাজী নিযুক্ত হওয়াও অসম্ভব হইয়াছিল।

সিয়রমুতাক্ষরীণ—ব্রীগের অনুবাদ ৮৯ পৃঃ

যখন আলিবর্দ্দী খাঁ সুজাখাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন, ন তিনি তাঁহার অনুগামী [illegible]

[illegible]

মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দু-সভ্যতার বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। তৃতীয় স্তরে যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমান-রাজত্বকালে তাহাই বজায় ছিল। বারাণসী এবং নদীয়ায় সংস্কৃত শিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিয়াছিল। উৎসাহদাতার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল বটে কিন্তু চলিত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য্য পরিপুষ্টি দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইয়া গিয়াছিল। মহারাষ্ট্রে একনাথ ও তুকারাম, উত্তর ভারতে সুরদাস ও তুলসীদাস, [বঙ্গে মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং বৈষ্ণব কবিগণ—অনুবাদক] সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্ন-আহরণপূর্ব্বক হিন্দু-মনীষিগণের শিক্ষা লোকমধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার উপর রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্যপ্রমুখ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মসংস্কারকগণ জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ করিয়াছিলেন। মুসলমানের আগমনে জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কোনক্রমেই হীন হয় নাই, বরং শিল্পব্যবসায়ী-দিগের অবস্থা, কতক ইউরোপের সহিত বাণিজ্যবৃদ্ধির ও কতক মুসলমানের আনীত বিলাস-প্রবৃত্তির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধই হইয়াছিল। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে যে ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে ভারতের শিল্পপ্রসূত দ্রব্যসমূহকে ইউরোপীয় বস্তুনিচয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং ভারতবাসীরা যে সাংসারিক স্বচ্ছলতার অধিকারী ছিল, তাহাও কহিয়া গিয়াছেন। *

উপরে আমরা যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, যে দুইটি সভ্যতা বর্ত্তমান

বলেন—"তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণ ছিল এবং তাঁহার উপর যে পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন করা হইত, তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।" যখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গলার নবাবপদে উন্নীত হইলেন, তখন তিনি ক্ষমতাবান্ জানকীরামকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ জানকীরাম রাজপ্রতিনিধির সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হইয়াছিলেন। মোহনলাল বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার মন্ত্রী ছিলেন, এবং সিরাজের অপরাপর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দুর্লভ-নারায়ণ ও রামনারায়ণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণের জন্য এইচ, মারে-প্রণীত "আফ্রিকায় ভ্রমণ" এবং লেখক প্রণীত ব্রিটিশরাজ্যে ভারতীয় সভ্যতার [illegible] উপক্রমণিকায় ৭২—৭৮ পৃঃ দেখ।

কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে—তাঁহাদের সাংসারিক উপাদান, নৈতিক উপাদানের অধীনস্থ ; এবং যে সভ্যতাগুলি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এক বিষয়ের সাম্য ছিল ;—তাহাদের পার্থিব উন্নতির মাত্রা অনুচিতরূপে নৈতিক উন্নতির উপরে উঠিয়াছিল। ঐ দ্বিবিধ ঘটনায়—বিশেষতঃ উদ্বর্ত্তনের উদাহরণ এত কম যে, তাহা হইতে কোনও সাধারণ-মত স্থাপন করা নিরাপদ নহে। ভবিষ্যৎ সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি-স্বরূপ আরও অনেক নিদর্শন পাইবেন। আপাততঃ আমরা যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না, যে পার্থিব ও নৈতিক উন্নতি-বিধায়ক বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে পারার উপর সভ্যতার উদ্বর্ত্তন নির্ভর করে। যে দুইটি দীর্ঘজীবী সভ্যতার বিষয় আমরা উপরে বিচার করিয়াছি, তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, এই সামঞ্জস্য পাইবার পর ইহাকে বজায় রাখিতে পারার উপর উহার ভবিষ্যৎ জীবনের দীর্ঘতা নির্ভর করে। ঐ সামঞ্জস্য নানা কারণে অবিরত বিস্রস্ত হয় ; সেই কারণ-সমষ্টির মধ্যে মনুষ্যের পাশব প্রবৃত্তিই প্রধান—কেন না, ঐ প্রবৃত্তির বশে মানবজাতি আভ্যন্তরিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়া বাহ্য জীবনের পক্ষপাতী হয়। একটি সমাজ যতই উন্নত হউক না কেন, তাহার মধ্যে সভ্যতার প্রথম অর্থাৎ জড়-ভক্তির স্তরে অবস্থিত লোকের সংখ্যাই অধিক থাকে। এই জন্য ঐ সমাজের অল্পসংখ্যক বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের প্রভাবের কিঞ্চিন্মাত্র হানি হইলেই পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ও তাহার ফলে সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটে। প্রথম যুগের তৃতীয় স্তরে অধিরূঢ় হওয়া অবধি চীনের মহাত্মগণ কোনও নূতন পথ আবিষ্কার না করিয়া,ঐ স্তরে যে সামঞ্জস্য লাভ হইয়াছিল, জনসাধারণকে তাহাতে ফিরাইয়া আনাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত-স্বরূপ করিয়াছিলেন। কন্‌ফিউসিয়াস্‌ আপনাকে সর্ব্বদাই পূর্ব্ব-শিক্ষার বাহকমাত্র বলিয়া পরিচিত করিতেন। * প্রথম যুগের তৃতীয় স্তরে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৬ হইতে ২০০০ অব্দ পর্য্যন্ত) ইয়াযু, শূন প্রভৃতি যে মহাত্মারা ঐ স্তরকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,তিনি তাঁহাদেরই পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেন কন্‌ফিউসিয়সের কার্য্যভার মেনসিয়সের উপর পড়িয়াছিল, এবং তিনিও কেবল নিজ মহিমান্বিত গুরুর শিক্ষাবলী যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়াযু ও শূনের সময় চীনে যে জীবনাদর্শ গঠিত হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ্যতঃ অবিকৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও উহার সভ্যতার তৃতীয় স্তরের শেষ হইতে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী [রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ স্বামী] পর্য্যন্ত কোনও মহাপুরুষই নূতন কিছু শিখাইবার পান নাই। পথভ্রষ্ট ভারতসন্তানকে তাঁহারা প্রাচীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে ফিরাইয়া আনিয়াছেন মাত্র। তৃতীয় স্তরে স্থাপিত সামঞ্জস্যের পুনঃ-প্রাপ্তি—তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হওয়া অবধি চীনের ও ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র কার্য্য হইয়াছে, তাহার গতি উহাতেই নিরুদ্ধ আছে। আপাততঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষণে ঐ সামঞ্জস্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। দেখা যা'ক,চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতার এত জীবনী ও সঞ্জীবনী শক্তি আছে কি,না যে, ঐ সামঞ্জস্য পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে।

কোনও সভ্যতার উদ্বর্ত্তনের জন্য জ্ঞানানুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অলীক নহে, তাহা মানসিক উন্নতির সহচর, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবিয়াই আমরা ইহার বিষয় পূর্ব্বে বিশেষ কিছু বলি নাই। সভ্যতার ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আমরা যে মতাবলম্বী, তদনুসারে ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-লাভের পূর্ব্বে জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইয়াছে ; কারণ জ্ঞানের উন্নতি না হইলে নৈতিক উন্নতি হইবে কি করিয়া ? যে জাতি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা উচ্চ নৈতিক আদর্শ পাইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহাকে ঐ আদর্শ দিতে চাহিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলে। মধ্যযুগে ইন্‌কুইজিসন্‌ নামক অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার বিচারালয়ের অত্যাচার স্পেনে যত প্রবল ছিল, তত ইউরোপের আর কোনও দেশেই ছিল না, অথচ স্পেনের মত অত্যধিক উৎসাহী "খ্রীষ্টান" দেশও ইউরোপে আর দ্বিতীয় ছিল না, স্পেন তথাপি যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত মহানধর্ম্মে উচ্চ আদর্শ-গ্রহণের উপযুক্ত

* কন্‌ফিউসিয়সের আত্মবিবৃতি এইরূপ—"প্রাচীনদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া তাঁহাদের শিক্ষার বাহকমাত্র —উদ্ভাবক নহি।"

জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সারাসেনদিগের মধ্যে যাহারা অধিক উৎসুক ও ধর্ম্মান্ধ ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের মঙ্গলকামনায় তাহাদিগকে তরবারির সাহায্যে স্বধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করিত।

"জ্ঞানই ধর্ম্ম" সক্রেটিসের এই উক্তিতে অনেকটা সত্য-নিহিত আছে। ভারতের জ্ঞানীরা সকলেই শিখাইয়াছেন যে, মুক্তির যত পথ আছে, তাহার মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ,—অনেকে এমনও বলেন যে, জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র পথ। বুদ্ধ যে প্রশস্ত অষ্টপথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আটটি সৎবিধির উপর স্থাপিত। যথা—সত্যবিশ্বাস,সত্য-লক্ষ্য, সত্য-বচন,সত্য-কার্য্য, ন্যায্য জীবিকা, সত্য-চেষ্টা, সত্য-জ্ঞান ও সত্য-চিন্তা; এবং সক্তিই ন্যায়-অন্যায় নির্দ্ধারণের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ইচ্ছাশক্তিকে নিরাপদ ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইলে, জ্ঞানের কত প্রয়োজন, তাহা চীনের মনীষীরাও জানিতেন। কন্‌ফিউসিয়স্ কহিয়াছেন—"১৫ বৎসর বয়সে আমার মন জ্ঞানান্বেষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, ৩০ বৎসর বয়সে আমি জ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থির হইলাম, ৪০ বৎসরে আমার কোনও সংশয় রহিল না; ৫০ বৎসর বয়সে আমি ভগবানের বিধান সকল বুঝিতে পারিলাম, এবং ৭০ বৎসর বয়সে আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া অন্তঃকরণ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারিতাম। * কন্‌ফিউসিয়স্ শিখাইয়াছেন, যথার্থ জ্ঞান মানুষকে সত্যমিথ্যা বাছিয়া লইতে এবং অধিগত বিষয়ের যাহা সৎ তাহা আত্মসাৎ করিতে ও যাহা অসৎ তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ করে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাহার উচ্চ স্তর আছে; তাহার শুধু সত্যজ্ঞান লাভ করিলেই চলিবে না, উহাকে ভালবাসিতে হইবে; শুধু ভালবাসিলেও চলিবে না, উহাতে আনন্দ অনুভব করিতে হইবে।" †

আমরা এই পরিচ্ছেদে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, তাহা পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইতেছে :—

প্রথম—যে সকল সভ্যতার জড় উপকরণ নৈতিক উপকরণ অপেক্ষা প্রবল তাহারা ক্ষণস্থায়ী। উহারা পিচ্ছিল বালুকার উপর নির্ম্মিত সুরম্য সৌধের ন্যায়; অচিরেই হউক বিলম্বেই হউক, উহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়—যে সকল ভৌতিক শক্তি সাংসারিক উন্নতি বিধান করে এবং যে সকল পার্থিবেতর শক্তি উচ্চ বিষয়ে—বিশেষতঃ নীতি-সংক্রান্ত উন্নতি বিধান করে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার উপর সভ্যতার উদ্বর্ত্তন নির্ভর করে।

তৃতীয়—এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে, একযুগ হইতে অন্য যুগে উপস্থিত হইবার পরও কোনও সভ্যতার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতিপ্রসব তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, কোন জাতির জাতীয়জীবনে সামরিক,রাজনৈতিক ও আর্থিক কার্য্যপটুতা অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানানুশীলনের সার্থকতা অধিক।

সমাজ-শক্তির অভিব্যক্তির মাত্র দুইটি উপাদানে—দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা—এই প্রচলিত পাশ্চাত্য-মতের সহিত আমাদের মীমাংসার বিরোধ দৃষ্ট হইবে। সভ্যতার প্রথম স্তরের বিশেষ লক্ষণ পাশবকার্য্যপটুতা; অতএব পার্থিব উন্নতির জন্য যে ঐ দুইটি উপাদান অপরিহার্য্য, সে বিষয় সন্দেহ নাই। পাশব-জগতে জীবনের জন্য সংগ্রাম এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, এবং মনুষ্যের পাশব অংশটুকু অবশ্য ঐ নিয়মের অধীন। কিন্তু মানুষকে পশু হইতে বিচ্ছিন্ন করে, যে নৈতিক ও আত্মিক শক্তি, তাহা যে কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী, সে কথা এখনও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু তাহা যে, অন্যান্য জন্তরা যে নিয়মের বাধ্য, তাহা হইতে ভিন্নপ্রকৃতির, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যে হেতু সভ্যতার উদ্বর্ত্তনের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিতান্ত প্রয়োজন, এবং ঐ উন্নতি পরিপুষ্ট হয়, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর-কথিত বিরোধ-ধর্ম্মের বিপরীত প্রেমের ধর্ম্ম দ্বারা;—অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে,সামাজিক উৎকর্ষের প্রধান উপকরণ—অবিরাম সংগ্রাম নহে, ঐরূপ সংগ্রাম হইতে বিরতি; শারীরিক বল নহে—আত্মিক বল; যুদ্ধের ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি নহে—ন্যায়পরতা এবং পরোপচিকীর্ষা। *

* কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে বলিয়াছেন—"সতাং হি সন্দেহপদেষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।" ১ম অঙ্ক।

† ডগ্‌লাস—কন্‌ফিউসিয়নিসম্ ও টাওইসম—৯৬ পৃঃ—

* প্রফেসর বসুর এই সিদ্ধান্তের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের মতের বিলক্ষণ মিল আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মত এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না—"নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য মতে Struggle for Existence, Survival of the fittest, Natural Selection প্রভৃতি

যে সকল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনার জানা আছে। পাতঞ্জল দর্শনে উহাদের একটিও কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পাতঞ্জলির মত হচ্ছে এক species থেকে আর এক speciesএ পরিণতি প্রকৃতির পূর্ণতা দ্বারা সংসাধিত হয়।

আবরণ বা obstacles-এর সঙ্গে দিনরাত struggle করে যে,উহা সাধিত হয়, তাহা নহে ! আমার বিবেচনায় struggle এবং competition জীবের পূর্ণতা লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয় (যাহা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে) তা হ'লে বল্‌তে হয় যে, এই evolution দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনও উন্নতি হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশ কল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে উহাদিগকে অতিক্রম করা যায়, তাহা নহে। দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিক আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়।

Animal kingdom বা প্রাণি-জগতে আমরা সত্য সত 'struggle for existence','survival of the fittest'প্রভৃতি নি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। তাই Darwinএর theory কতকটা সত্য ব প্রতিভাত হয়। কিন্তু Human kingdom বা মনুষ্য-জগতে যেখা rationality র বিকাশ, সেখানে ঐ নিয়মের উল্টাই দেখা যায়। ম কর, যাদের আমরা really greatmen বা ideal বলে জানি, তাদে বাহ্য struggle একেবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। Anim kingdomএ instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কি যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationalityর বিকাশ। এই জ Animal kingdom এর ন্যায় rational human kingdom পরের ধ্বংস সাধন করে progress হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রে Evolution একমাত্র sacrifice দ্বারা সাধিত হয়।............

স্বামীশিষ্যসংবাদ—উদ্বোধন।

কলিকাতায় ঝড়—গড়ের মাঠের দৃশ্য—২৮এ এপ্রেল, ১৯১৪

Reproduced from a Pen and Ink-sketch—By Courtsey of Dr. W. C. Hossack M. D.

নাস্তিক

[শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, M. A.]

একাকী বৈকালে বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। রাস্তার উপরই আমার ঘর, জানালা দিয়া বাহিরের সমস্তই দেখা যায়। আমার তখন কিছুই করিতে ভাল লাগিতেছিল না; তাই আমি অন্যমনস্কভাবে রাস্তার লোক-চলাচল দেখিতেছিলাম।

হঠাৎ আমার চোখ একজনের উপর পড়িল। লোকটা যেন আমার বাড়ীর দিকেই আসিতেছিল। নিকটে আসিতেই আমার বাল্য-বন্ধু হরিশকে চিনিতে পারিলাম। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। উঠিয়া তাহাকে সাদরসম্ভাষণ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে সে ঝড়ের মত আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা ও ভাবগতিক দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। তারপর যখন আমার কুশল প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া উদাস ভাবে সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তখন তাহার বিষণ্ণ মুখ ও আলুথালু বেশ দেখিয়া, মনে বড় ভয় হইল। একটা খুব অমঙ্গল সংবাদের জন্য মনটাকে প্রস্তুত করিয়া ধীরে ধীরে স্নেহকরুণ স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভাই হরিশ, কি হইয়াছে, শীঘ্র আমাকে বল।'

হরিশ মুখ তুলিল; আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, ভাই, সত্য করিয়া বল, পরলোক সম্বন্ধে তোমার আন্তরিক বিশ্বাস কি? আমি পরলোকে কখনও বিশ্বাস করি নাই। এই বিষয় লইয়া তোমার সঙ্গে কত তর্ক করিয়াছি। এখন আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি পরলোক আছে? যদি না থাকে, যদি পরলোকেও তার সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে,— উঃ!" সে পাগলের ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

সমস্তই আমার নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছিল। বিস্ময় ও ভীতি-বিজড়িত স্বরে তাহাকে বলিলাম, "তুমি কি পাগলের মত বকিতেছ? ব্যাপারখানা কি? কি হইয়াছে?"

হরিশ বলিল,—"আমি সেই কথা বলিতেই আজ তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি এখনও পাগল হই নাই কিন্তু হইতেও বোধ হয়, বেশী বিলম্ব নাই। এখনই সমস্ত বলিব। কিন্তু তার আগে বল, পরলোক আছে কি না? মনে একটু শান্তি আনিয়া দাও,—তা' না হ'লে আমার সে দুঃখের কাহিনী বলিবার ক্ষমতা হইবে না।"

আমি বলিলাম,—"কেন, সে কথা ত আমি তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। পরলোক আছে বৈ কি। সকল ধর্ম্মেই একবাক্যে সে কথা বলে। তুমি নাস্তিকের মতন ছিলে বলিয়া এসকল কথা বিশ্বাস করিতে না।"

হরিশ আমার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর আমি নাস্তিক নই, আর আমি নাস্তিক নই! ধর্ম্মের কথায় বিশ্বাস করিয়া পরলোকে তাহার সহিত মিলনের আশায় জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিব। সে জানিয়া গিয়াছে আমি অপরাধী, আমাকে যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, আমার দোষ নাই।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বলিতে লাগিল, —"আমার জীবনের ইতিহাস মোটামুটি ত তুমি জান। কিন্তু একটা যে ভীষণ ট্র্যাজিডী হইয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা কেহই জান না। সেই কথা বলিতেছি শুন; তারপর বলিও, আমার মত হতভাগ্য আর কেউ আছে কি না।"

আমি তাহার বলিবার আগ্রহ ও আমার শুনিবার কৌতূহলকে বাধা দিয়া, এই সময়ে রামকিষণকে বলিলাম,— "রোস, এক পেয়ালা চা খাইয়া লও; একটু অপেক্ষা কর।"

হরিশ উদাসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। হরিশকে আমি ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার যখন যাহা হইয়াছে, সমস্তই আমি জানি। তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছু যে তাহার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহা ত আমার জানা ছিল না।

চা-পান শেষ হইলে আমি হরিশকে বলিলাম,—"এবার বল।"

তপন-দেব পশ্চিম গগনপ্রান্তে ডুবিলেন। তাঁহার শেষ ম্লান কিরণরাশি বৃক্ষশিরে ও সৌধশিখরে ছড়াইয়া পড়িল। হরিশ একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়াছিল।

আমার কথায় যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে একটু অস্বাভাবিক করুণাজড়িত স্বরে বলিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, সূর্য্যটা ডুবিয়া গেল। কিন্তু ডুবিবার সময় একবার তার অবস্থাটা দেখিলে? পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে যেন সে কিছুতে চাহে না। তাই তার সহস্র কর দিয়া বাড়ী গাছ প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে আঁকড়িয়া ধরিতেছে। কিন্তু হায়, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাকে ধরিয়া রাখে। আমার সেও এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসিত, সেও বুঝি মৃত্যুর সময় তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহরাশি দিয়া তাহার স্বামীকে, তাহার কন্যাকে, তাহার সংসারকে, তাহার পৃথিবীকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু হায় প্রতিদানে পাইয়াছিল কেবল ঔদাসীন্য। তাই সে তার গভীর মর্ম্মবেদনার সঙ্গে এক নিদারুণ বিশ্বাস লইয়া চলিয়া গেল। তার সে বিশ্বাসের যে যথেষ্ট কারণ ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু ভাই, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি এতদূর নারকী নহি।"

আমি অধীর হইয়া বলিলাম,—"তুমি কি তোমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বলিতেছ? ভাল করিয়া গুছাইয়া বল, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।" সে যে তাহার স্ত্রীর কথাই বলিতেছে, তাহাতে আর আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

হরিশ তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলিতে লাগিল, "তাকে যখন বিবাহ করিয়া আনিলাম—কি কুক্ষণেই আমার সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছিল!—তখন তার বয়স তেরো বৎসর মাত্র। সে আজ আট বৎসর হইল; কিন্তু সেই সময়কার কথা আমার সমস্তই মনে আছে, আর এখন আমি সে সব যেন একটা নূতন আলোকে দেখিতেছি। কাঁদিতে কাঁদিতে সে গাড়ীতে উঠিল। আমি মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম—What a whimpering bride! তখন আমি তার সে কান্নায় বাঙ্গালী মেয়ের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাই, বরং তাহা আমার বড়ই ছেলেমানুষি ঠেকিতেছিল। দেখ, ছেলেবেলা থেকেই আমি ভাব বা sentiment-এর ধার বড় ধারিতাম না। তারপর যখন কলেজে ঢুকিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চায় মন দিলাম, তখন আমার সেই ভাবলেশশূন্যতা প্রথমে ঘোর তর্কপ্রবণতা ও পরে নাস্তিকত্বে পরিণত হইয়াছিল। আমি যে তখন কি রকম হৃদয়হীন হইয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

"আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম ছয় বৎসর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই। বিবাহের পরই আমি বাঁকীপুরে ওকালতি করিতে যাই; মা ও বালিকা-স্ত্রী লইয়া আমার ক্ষুদ্র পরিবার। তিন বৎসর পরে কন্যারূপে একটি নবীন আগন্তুক আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র নিরালা গৃহটি ক্রন্দনে ও কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিল।

"আমি যেমন নাস্তিক ছিলাম, রাণীর দেবদেবীতে তেমনই অচলা ভক্তি ছিল। সে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। অনেক সময়ে তাহার ব্রত-উপবাসটা আমার কাছে বড় বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিত। আমি কখনও তিরস্কার করিতাম, কখনও বা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের স্বরে তাহাকে উপহাস করিতাম। তাহার চক্ষু তখন জলে ভরিয়া আসিত; একবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়া তাহার নীরব বেদনা জ্ঞাপন করিত। হয়ত কোন দিন একটু ভর্ৎসনাপূর্ণ অথচ মৃদু স্বরে বলিত,—'আচ্ছা, ভগবানের প্রতি তোমার কি একটুও ভক্তি হয় না?'

"হায় সরলা নিষ্ঠাবতী বালিকা! তোমার নিকট আমার এই বিশ্বাসভক্তিলেশশূন্য শুষ্কহৃদয় কিরূপ পীড়াদায়ক প্রহেলিকার মত বোধ হইয়াছিল, তাহা আমি এতদিন পরে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। নিছক বিচার ও তর্কের তীব্র তাপে যে হৃদয় হইতে ভক্তি ও ভাবের উৎস একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহা যদি সেই বালিকা-হৃদয়ের বিশ্বাস ও ভক্তিরাশির এক বিন্দুও সহানুভূতি-সাহায্য লইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত এই শুষ্ক হৃদয়ও নূতন সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিত, হয়ত দুইটি হৃদয়ের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের বন্ধন সৃষ্ট হইয়া, আমাদের প্রেমকে নিবিড় করিয়া তুলিতে পারিত, হয়ত আজ তাহা হইলে আমাকে এই মর্ম্মন্তুদ দুঃখকাহিনী তোমার নিকট বলিতে হইত না। কিন্তু সে যে ছিল অশিক্ষিতা! তাহার দেবদেবীতে বিশ্বাস ত ঘোর

কুসংস্কার মাত্র! আর সেই অন্ধ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তাহারই বা মূল্য কত? আমার মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন তাহার সহিত ভাবের আদান-প্রদান কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইল না, দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়া গেল। আমি তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, সে আমাকে ভয় ও ভক্তি করিত।

"আত্মাভিমান এইরূপেই মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অশিক্ষিতা পত্নীর কাছে আমার যে কিছু শিখিবার আছে, তাহার সংসর্গে যে আমার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা আমার শিক্ষাভিমানপূর্ণ বিদ্রোহী হৃদয় কিছুতেই মানিতে চাহিত না। শিশিরসিক্ত কুসুম-রাশির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য যেমন উষার অরুণালোকই যথেষ্ট, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র আলোকের প্রয়োজন হয় না, তেমনই যে রমণীহৃদয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত বিকাশ, উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের অপেক্ষা রাখে না, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে, তাহার হৃদয়টি চিনিতে, আমি চেষ্টামাত্র করিলাম না;—তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য আমার কাছে লুকান রহিল। আমার প্রাণে যে প্রেমের আলো জ্বলে নাই! তাই তাহার গুণগুলি পর্য্যন্ত আমার চক্ষে দোষের আকার ধারণ করিত। সে বড় বেশী কথা কহিত না;—আমার কাছে তাহার এই অল্পভাষিতা তাহার শিক্ষাহীনতার ফল ব্যতীত আর কিছু মনে হইত না; তাহার অত্যধিক লজ্জাশীলতার কোন অর্থ দেখিতে পাইতাম না, আর তাহার বিনয়-নম্র মৃদুস্বভাব বুদ্ধি-হীনতার রূপান্তর মাত্র বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম।

"আমার এই ঔদাসীন্য, এই অনাদর সে কি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত না? কিন্তু কি করিব, আমার প্রকৃতিই আমাকে এই রকম করিয়া তুলিয়াছিল। আমি যে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে কখনও কষ্ট দিয়াছি, এমন ত আমার মনে পড়ে না। তবে আমার হৃদয় যে তাহার প্রতি বিমুখ ছিল, এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না।"

হরিশ একটু থামিল; পরে আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"আমার এই কথাগুলো তোমার কাছে বোধ হয়, একটু নভেলি রকমের লাগিতেছে—না? বিশেষতঃ আমার মত কবিত্বহীন, নীরস লোকের মুখে। কিন্তু, ভাই, আমি এখন আর সে লোক নাই। মানসিক কষ্টের প্রবল চাপে আমার শুষ্ক হৃদয় ভেদ করিয়া, কত কি ভাব যে, এখন বাহির হইতেছে, তাহা আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি পাগলের মত হইয়া গিয়াছি; তাই কথাগুলো হয়ত একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আবেগপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তবুও আমি মনের অবস্থা ভাল করিয়া তোমার কাছে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

"আমি বলিলাম,—আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। তারপর কি হইল বল।"

২

হরিশ বলিতে লাগিল,—"এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল। রাণী আমার ব্যবহারে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে মেয়েটিকে পাইয়া আর সমস্ত কষ্ট ভুলিয়াছিল। শিশু কন্যা উমা যেন অভাগিনীর নিরানন্দ জীবনে একটা ক্ষীণ আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যে মাতৃ-দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। রাণীই এখন গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

"দিন এক রকম করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই সময়ে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। আমার তিন বছরের মেয়ে উমা—রাণীর ব্যথিত জীবনের সম্বল উমা 'টাইফয়েড' রোগে আক্রান্ত হইল।

"বাঁকীপুরে ভাল চিকিৎসার সুবিধা হইবে না জানিয়া, রোগের সূত্রপাতেই আমরা তাহার চিকিৎসার জন্য কলি-কাতায় আসিলাম. আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটি ছোট দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইলাম। এসব তুমি জান, কারণ কলিকাতায় আসিয়া তোমার সঙ্গেই আগে দেখা করি। আমার আর যে কয়জন বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রায় সকলেই আমাকে ডাক্তার দত্তকে ডাকিতে পরামর্শ দিলেন। তুমি ত জান, হরিহর দত্ত একজন বিলেত-ফের্ত্তা প্রবীণ ও বিচক্ষণ ডাক্তার এবং সুচিকিৎসার জন্য তিনি সহরে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন।

"আমি বন্ধুদের পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। আর তখন আমার মনেও পড়িল যে, হরিহর বাবুর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল; এবং যদিও সে অনেক দিনের কথা,

তবু তাঁহার নাম করিলে বোধ হয়, আমাকে চিনিতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে তিনি আমার উমাকে একটু অধিক যত্নের সহিত দেখিবেন, এরূপ আশা করাও অসঙ্গত মনে করিলাম না।

"আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া, যত শীঘ্র পারিলাম, একদিন সকালে ডাক্তার দত্তের বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, বেশী সকালে গেলে হয়ত তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না; তাই ইচ্ছা করিয়াই একটু বেলা করিয়া গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন। কি করি, তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দেওয়ালের গায়ে একটা টেব্‌লেটে লেখা রহিয়াছে দেখিলাম, Consulting hours, morning, 7 to 8 A.M. আমি যখন গিয়াছি, তখন বেলা নয়টা।

"ঘরে তখন আর কোন লোক ছিল না; কারণ আমা ছাড়া বোধ হয়, আর সকলেই জানিত যে, আটটার পর আসিলে আর ডাক্তারের দেখা পাওয়া যাইবে না। আমার সেখানে একা বসিয়া বসিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল।

"কিছুক্ষণ এইরূপ বসিয়া আছি, এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর থেকে রমণী-কণ্ঠের স্বর আমার কর্ণে আসিল। আমি শুনিলাম,—'সুশীল,ক'টা বেজেছে, বাইরের ঘর থেকে দেখে আয় না, ভাই!'

"উত্তর হইল,—'কেন, তুমি ত কাছেই রয়েছ, নিজেই দেখে এস না। এখন ত আর লোকজন ওখানে নেই।'

"'না দেখে দিদি বয়ে গেল', এই বলিয়াই রমণী চুপ করিল। মুহূর্ত্তকাল পরেই আমি যে ঘরে বসিয়াছিলাম, তাহার একটা দরজা খুলিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি একবার চাহিয়াই চক্ষু নত করিলাম; কিন্তু তাহাকে ত আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মতন দৌড়িয়া পলাইতে দেখিলাম না! সেও একবার আমাকে যেন দেখিয়া লইল, তারপর অবিচলিত ভাবে ঘড়ি দেখিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল। আমার কৌতূহলী চক্ষু যে তাহার অনুবর্ত্তী হয় নাই, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

"এই ব্যাপারে আমার প্রতীক্ষা-জনিত বিরক্তির ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। মেয়েটির চালচলন, বেশভূষা, ভাবভঙ্গি, আমার কাছে বেশ একটু নূতন রকম ঠেকিতেছিল। যতক্ষণ বসিয়াছিলাম, আমার পীড়িতা কন্যার কথাই যে কেবল ভাবিয়াছিলাম, তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

"আর বেশীক্ষণ বসিয়াও থাকিতে হইল না। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—'কি হে, হরিশ যে! তুমি এখন এখানে!'

"হরিহর বাবু যে এত শীঘ্র আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন, এরূপ আমি আশা করি নাই। আমার মনে বড় আনন্দ হইল। আমি বলিলাম,—'আমার তিন বছরের মেয়েটির ভারি অসুখ, টাইফয়েড হয়েছে, চিকিৎসার জন্য তাকে কল্‌কাতায় এনেছি। আপনাকে তার চিকিৎসার ভার নিতে হ'বে।'

"হরিহর বাবু একটু সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিলেন, 'টাইফয়েড হয়েছে! কতদিন হ'য়েছে?'

"'আজ পাঁচদিন হ'ল।'

"'কা'কে দেখাচ্ছিলে?'

"'বাঁকীপুরের একজন ডাক্তারকে দেখাই। তিনি পরীক্ষা করে' বল্লেন যে, রোগ টাইফয়েড। তখনই তাকে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে' এসেছি।'

"ডাক্তার বাবু একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—'তাই ত' এখনই একবার গিয়ে দেখে আস্‌তে পার্লে হ'ত। কিন্তু আমার মেয়েরও কলেজের সময় হ'ল; তার যে গাড়ীখানা চাই।' বলিয়া একটু চুপ করিলেন, কিন্তু তখনই আমার কাতর অনুনয়পূর্ণ মুখভাব দেখিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, দেখি, যদি একটা ব্যবস্থা কর্‌তে পারা যায়।' এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আমার কোন সন্দেহই রহিল না যে, আমার সেই পূর্ব্বদৃষ্টা তরুণীই তাঁহার কন্যা।

"দু'চার মিনিট পরেই হরিহর বাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'তোমাকে আরও একটু অপেক্ষা করিতে হইবে; এই গাড়ীতেই হেমকে বেথুন কলেজে নামাইয়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব।' এই বলিয়া তিনি একখানি চেয়ার লইয়া বসিলেন।

"ডাক্তার বাবু দেখিলাম তাঁহার কন্যার অপেক্ষাই [illegible]

ছয় বৎসরের কন্যা হেমপ্রভা ও তিন বৎসরের পুত্র সুশীলকে রাখিয়া ডাক্তার-গৃহিণী যখন পরলোকে গমন করেন, তখন হরিহর বাবুকে সন্তানদ্বয়ের পিতা ও মাতা উভয়ের স্থানই লইতে হইয়াছিল। অতঃপর যত্নপূর্ব্বক তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার কোন প্রভেদ হওয়া উচিত নয়,ইহাই তাঁহার ধারণা। হেমপ্রভা প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া, বেথুন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে; সুশীল স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

"ডাক্তার বাবুর এই কাহিনী আমি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিতেছিলাম; আর আমার সেই অশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্না পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া, হিন্দু সমাজকে জাহান্নমে পাঠাইতেছিলাম। কবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হেমের ন্যায় কলেজে পড়া মেয়ে বিরাজ করিবে? হায়! এইরূপ একটি শিক্ষিতা রমণী আমার যদি জীবনসঙ্গিনী হইত! আমার এই প্রার্থনা শুনিয়া, আমার ভাগ্য-দেবতা নিশ্চয় হাসিয়াছিলেন।

"হরিহর বাবুর গল্প এবং আমার চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া এই সময়ে দরজার নিকট হইতে হেম ডাকিল, 'বাবা।' তাহার পূর্ব্বশ্রুত স্বর তখনও আমার কাণে বাজিতেছিল।

"পিতার আহ্বানে হেম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। হরিহর বাবু কন্যার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তিনি যে আমার স্বর্গীয় পিতার আবাল্য বন্ধু ছিলেন, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। হেম আমাকে ছোট্ট রকমের একটি নমস্কার করিল। আমি প্রতি-নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলাম। কেন,—কি জানি কেন?

এখন একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। অপরে তাহাকে খুব সুন্দরী বলে কি না জানি না; কিন্তু আমি প্রথম হইতেই তাহার গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম বলিয়াই হউক কিংবা আমার মানসিক অবস্থার আকস্মিক বিপর্য্যয়বশতঃই হউক, আমি তাহাকে বড় সুন্দরী দেখিলাম। সে যে রূপলাবণ্যবতী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

"কিন্তু সে কি আমার রাণীর চেয়ে সুন্দরী? বোধ হয়, না। কিন্তু রাণীকে আমি কখনও ভালবাসিতে পারি নাই; তাই বুঝি, এই দুঃসময়েও আমার হৃদয় এত সহজে এই নবীনার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

"তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমি খুব সঙ্কুচিত ভাবেই বসিয়া রহিলাম, কিন্তু আমার উপস্থিতি যে হেমের বিশেষ সঙ্কোচের কারণ হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবভঙ্গীতে তেমন প্রকাশ পায় নাই। এইরূপই ত চাই! শিক্ষিতা, সঙ্কোচহীনা ও নির্ভীক। আমি মনে মনে আদর্শ-রমণীর যে চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই যেন দেখিতে পাইলাম।

"হরিহর বাবু আমার পীড়িতা কন্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তারের প্রশ্নে আমার চমক ভাঙ্গিল। কি লজ্জার কথা!"

৩

"বেথুন কলেজে হেম নামিয়া গেল। ডাক্তার লইয়া আমি বাড়ী পৌঁছিলাম। তিনি উমাকে বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন; তারপর ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

"ডাক্তার চলিয়া গেলে রাণী উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—'হাঁগা, ডাক্তার উমাকে দেখে কি বল্লে?'

"আমি বলিলাম, 'আশা ত দিয়ে গেল। তবে হপ্তা খানেক না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না। শুশ্রূষাটা ভাল হওয়া দরকার।

"রাণী দিনরাত প্রাণপণে কন্যার সেবা করিতে লাগিল। ডাক্তার প্রত্যহ আসিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া ঔষধ দিয়া যাইতেন। ভগবান সুপ্রসন্ন হইলেন। উমা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল। রাণীর মুখে হাসি ফুটিল।

"এ কয়দিন আর হেমের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কিন্তু তাহার কথা আমার প্রায়ই মনে হইত। একটা নূতন ভাবের আবেশ তাহার চিন্তার সঙ্গে মাঝে মাঝে জড়িত থাকিত বটে। কিন্তু সেটা যে ভালবাসা বা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ, তাহা আমি নিজের কাছে স্বীকার করিতে চাহিতাম না। তবে হেম যে আমার চিরপোষিত আদর্শের অনুরূপা বঙ্গরমণী, সে কথা আমার মন সহস্রবার বলিত, আর হয় ত কখনও কখনও আক্ষেপ করিয়া বলিত 'এই রকম একটি মেয়ে যদি আমার জীবনসঙ্গিনী হইত!'

"আহারের অনিয়মে ও অনিদ্রায় রাণীর শরীর যে ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছিল, তাহা আমি দেখিয়াও দেখি নাই। তাহার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের কিছুমাত্র লাঘব ত হয়ই নাই, বরং হেমের চিন্তা আমাকে একটু অন্যমনস্ক করিয়া তুলিয়াছিল। আর সে যে রোগীর সেবা কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানে না বলিয়াই এইরূপ করিয়া নিজের শরীর মাটি করিতেছে, তাহাই আমার মনে হইত। একদিন আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম,—'দেখ, তোমার সবই বাড়াবাড়ি। তোমার যদি একটু শিক্ষা থাকত, তা' হ'লে নিজের শরীর বাঁচিয়েও মেয়েকে বাচাতে পারতে।' সে মুখ তুলিয়া যেন কিছু বলিতে যাইতেছিল, আমার এই অবজ্ঞাপূর্ণ তিরস্কারের একটা উত্তর বোধ হয়, তাহার মুখে আসিয়াছিল ; কিন্তু সে কিছুই বলিল না, শুধু আমার দিকে একটা বেদনা-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। সে দৃষ্টি আমার এখনও মনে পড়িতেছে, আর এতদিন পরে তাহার নীরব ভর্ৎসনা আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে।

"একদিন বৈকালে আমি একেলা বসিয়া আছি। মনের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিলাম। এমন সময়ে একখানা গাড়ী আমার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল, দেখিবার জন্য দ্বারের নিকট আসিতেছিলাম, কিন্তু প্রাঙ্গণেই হেমপ্রভা ও সুশীলকে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আমি তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলাম। হেম বলিল,—'আমি রোজই মনে করি, একবার আপনার মেয়েকে দেখ্‌তে আসবো, কিন্তু এতদিন যে তা' পেরে উঠিনি, সে জন্য মাপ কর্ব্বেন। চলুন তাকে দেখে আসি।'

"আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া উমার ঘরে লইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী তাহাদিগকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার বাবুর ঐকান্তিক যত্ন ও সুচিকিৎসার গুণেই যে আমরা মেয়েকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছি, তাহাও সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভাষায় জানাইল।

"হেমপ্রভা মৃদুস্বরে দুএকটি কথায় যে কি তাহার উত্তর দিল, তাহা আমার মনে নাই। আমার তখন মনের মধ্যে এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। আমার এই ভাবান্তর প্রথমে রাণী লক্ষ্য করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যখন হেমের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি একট নিতান্ত অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, আর সেই উত্তর শুনিয়া হেম হাসিয়াছিল, তখন রাণী সে হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাইয়াছিল। আমার মনে হইল, আমি বুঝি ধরা পড়িয়া গেলাম।

"তাহারা চলিয়া গেলে আমি নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে,আমি এমন কোন ভাব দেখাই নাই যে,আমাকে হেম কি রাণীর কাছে সঙ্কুচিত হইতে হইবে। আর রাণীর সঙ্গে কথা ত কখনই বেশী হইত না। এখন আমি আরও দূরে দূরে থাকিতে লাগিলাম।

"এদিকে উমার রোগ অনেক কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া, ডাক্তার বাবু আর প্রত্যহ আসা প্রয়োজন মনে করিতেন না, মাঝে মাঝে আসিতেন মাত্র। আমাকে কিন্তু রোজ গিয়া তাঁহাকে উমার সংবাদ দিয়া আসিতে হইত। ডাক্তার বাবু যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে হেমকেই রোগীর অবস্থার কথা বলিয়া আসিতাম। তাহাকে আমার আগমনসংবাদ জানাইলেই সে আগ্রহের সহিত আমাকে তাহার পড়িবার ঘরে লইয়া যাইত। কতক্ষণ গল্প চলিত। ইহার মধ্যে হয় ত হরিহরবাবু আসিয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া আসিতাম।

"এইরূপ আরও কিছুদিন কাটিল। উমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু আবার এক বিপদ হইল। রাণী অসুস্থ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মানসিক কষ্ট এবং আহারনিদ্রার অনিয়মই যে, ইহার কারণ,তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং তাহার শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছিল, দেখিয়াও যে, আমি তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম, সে জন্য একটু আত্মগ্লানি অনুভব করিলাম। এত দিন যেন সে কন্যার আরোগ্যলাভের জন্যই কোনরূপে শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

"আবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হইলাম। ঔষধপত্র রীতিমত চলিতে লাগিল ; কিন্তু রোগোপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হেম এ সময় প্রায়ই আসিত। কিন্তু সে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বেশীক্ষণ বসিত না ; পাশের ঘরে আসিয়া আমার সহিত নানা অবান্তর বিষয়ে গল্প আরম্ভ করিয়া দিত। আমিও তখন রাণীর কথা, তাহার পীড়া কথা—সমস্ত ভুলিয়া হেমের সহিত গল্পে মত্ত থাকিতাম।

“মাঝে মাঝে হেমই সঙ্গে করিয়া ঔষধ লইয়া আসিত এবং নিজেই অনেক সময়ে তাহা খাওয়াইয়াও দিত। আমার শ্বশুর রাণীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার পুরাতন দাসী রামমণিকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে আমার স্ত্রীকে মানুষ করিয়াছিল এবং অনেক দিনের দাসী বলিয়া সে বাড়ীর লোকের মতই হইয়া গিয়াছিল। সে আসিয়া আমার সংসারের ভার গ্রহণ করিল।

“রাণীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি যে সেজন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার মনে হয় না। একদিন আমার ঘরে বসিয়া হেমের কি একটা কৌতুককর কথা শুনিয়া আমি খুব হাসিয়া উঠিয়াছি, এমন সময়ে রামমণি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল—‘বাবু, রাণু মা আপনাকে একবার ডাক্‌ছে।’ হেম বলিল,—‘তবে আমিও আজ আসি।’ বলিয়া সে উঠিল, আমিও রাণীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি! তাহার মুখে যে মৃত্যুর কালিমা আসিয়া পড়িয়াছে! আমি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম। এতকাল তাহাকে যত অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, পীড়ার মধ্যেও তাহার প্রতি যত অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখাইয়াছি, তাহা সমস্তই যেন তখন তাহার সেই শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে পুঞ্জীভূত হইয়া আমাকে তীব্রভাবে উপহাস করিতেছিল। আমি মরমে মরিয়া গেলাম। চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। গভীর দুঃখের সহিত একটা ধিক্কার আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

“আমি বসিয়া তাহার শিথিল হাতখানি ধরিলাম। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল; এখন আমার দিকে চাহিল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টিতে কত দিনের সঞ্চিত অভিমান, কত মর্ম্মবেদনা যে ব্যক্ত হইতেছিল, তাহা আমার ন্যায় হৃদয়হীন পশুরও বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের অতি নিকটে মুখ লইয়া গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলাম ‘রাণি’। আর কোন কথা মুখে ফুটিল না; কুশল প্রশ্ন যেন তখন একটা বিদ্রূপের মত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখার ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় তাহার চক্ষে এক নূতন দীপ্তি খেলিয়া গেল। চক্ষের সেই দীপ্তিময়ী ভাষাও যেন আমি তখন বুঝিতে পারিলাম। সে যেন বলিতেছিল,—‘এই আদর, এই স্নেহসিক্ত স্বর এতদিন কোথায় ছিল? ইহা কি শুধু শেষ-মুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়াছিলে? তুমি আমাকে অনাদর করিলে, আমাকে যিনি আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লইবেন আমি তাঁহারই নিকট যাইতেছি।’ সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—‘আমি চল্‌লাম। উমাকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল।’ দ্বারের নিকটেই রামমণি দাঁড়াইয়া ছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। তখন রাণী ক্ষীণতর কণ্ঠে বলিল, ‘আমি তোমাকে সুখী করিতে পারি নাই। তুমি আবার বিবাহ করিয়া সুখী হও, ইহাই আমার শেষ কামনা।’ আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। অশ্রুধারায় কেবল তাহার বক্ষ সিক্ত করিতেছিলাম। রামমণি ইহার মধ্যে উমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। সে তাহার মাতার বুকের উপর পড়িয়া বলিল,—‘মা, তোমার অসুখ কবে সারবে?’ রাণী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিল। তারপর সে আমার পদস্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় ঠেকাইল।”

৪

“রাণীর মৃত্যুর পর উমাকে তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আমি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম। কিছুদিন মনটা বড় খারাপ হইয়া রহিল। কাজকর্ম্মে বড় মন লাগিত না।

“এইরূপ প্রায় ছয়মাস কাটিল। যাহাকে জীবনে বড় প্রীতির চক্ষে দেখি নাই, তাহাকে ভুলিতে অধিক সময় লাগিবার কথা নহে। কিন্তু কেন জানি না, একটা অজ্ঞাত বেদনা প্রায়ই তাহার বিষাদমাখা মুখখানি আমার চক্ষের সাম্‌নে আনিয়া দিত। অশ্রুসলিলে তাহার পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়াই কি, অতীত জীবনের উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া দিয়া, নূতন করিয়া সুখের সংসার পাতিবার কল্পনা করিতেছিলাম বলিয়াই কি, ভাগ্যদেবতা আমাকে এইরূপে দিতেছিলেন? গড়িয়া

“এই সুখের কল্পনা হেমকে কেন্দ্র ক জন্যও ভুলি উঠিতেছিল। তাহার কথা আমি এক ভালবাসে? আর নাই। কিন্তু সে কি আমাকে স হরিহর বাবু এ বিবাহে যদিই বা বাসে, তাহা হইলেও সম্মত হইবেন?

"এইরূপ আশায় ও আশঙ্কায় যখন দিন কাটাইতেছিলাম, তখন একদিন হরিহর বাবুর পত্রই আমার সমস্ত সমস্যা মীমাংসা করিয়া দিল। তিনি হেমের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন; এবং লিখিয়াছেন যে, আমি যদি সম্মত হই, তাহা হইলে এক বৎসর পরে বিবাহ হইতে পারিবে, কারণ তখন হেমের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য! যাহা আমার আশার অতীত ছিল, তাহা যে এত সহজে আমার নিকট ধরা দিবে, তাহা আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। আমি তৎক্ষণাৎ হরিহর বাবুকে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া লিখিলাম যে, শীঘ্রই আমি কলিকাতায় গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিব।

"আরও ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। আমার আজীবন পোষিত কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই; আমার জীবনের অবশিষ্ট পথ প্রেমে উজ্জ্বল ও আনন্দে স্নিগ্ধ করিতে আমার আদশ-নারী আমাকে বরণ করিতে আসিতেছেন। কিন্তু এই সুখের আশায় যতই উৎফুল্ল হইতেছিলাম, ততই একটা কিসের কাঁটা নিরন্তর আমার হৃদয়ে বিঁধিতেছিল কেন? যাহাকে লইয়া জীবনে কখনও সুখী হইতে পারি নাই, তাহারই কথা এত বেশী মনে হইতেছিল কেন?

"কয়েকদিন থেকে মনটা বড় উতলা হওয়াতে আমি আজ সকালে উমাকে দেখিতে একবার হুগলীতে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম। গত বৎসর এই সময়েই রাণীর মৃত্যু হয়, সেই জন্যই বোধ হয়, তাহার স্মৃতি আমাকে এত অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। মনে করিলাম, কন্যাকে ক্রোড়ে ইয়া, আমার এই অন্তর্জ্বালা নিবারণ করিতে পারিব, ব আধ আধ মিষ্ট বাণী শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইব। শা!

এই নূতন বিবাহ সম্বন্ধের কথা শ্বশুরালয়ে জানিতেন, কিন্তু কেহই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন

দাদির পর নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, করিয়া আমার কোলে ন্ত কই, যে শান্তির আশায় সেখানে গিয়াছিলাম, সে শান্তি পাইলাম কই উমা যে আমার তাহাকেই বেশী করিয়া মনে করাইয়া দিতে লাগিল। আমার সমগ্র বিবাহিত জীবনটি চিত্রের মত আসিয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। আর ঐ চিত্রের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—লাজ-কুণ্ঠিতা অথচ কর্ম্মনিরত অনাদৃতা অথচ পতিপরায়ণা, রমণীটি কে? এ যে রাণী তুমি কি আজ আমাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিতেছ? তোমার রুদ্ধ অভিমান আজ কি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে? না, তাহা ত নয়;—ও স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে ত ভর্ৎসনার লেশ মাত্র নাই, অভিমানের কোন লক্ষণ নাই। তবে কি তুমি আমাকে সত্যসত্যই ক্ষমা করিয়াছ? বল, রাণী, বল।

"সহসা কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধা দাসী রামমণি প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা বাবু, তুমি নাকি সেই ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করছ?

"আমার চিন্তা-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধার এই প্রশ্নের ভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া শুধু 'হাঁ' বলিয়াই চুপ করিলাম।

"সে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর আরও একটু কাছে আসিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'আমার কথা শোন, তাকে বিয়ে ক'রো না।' তাহার স্থির দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল, যেন সে আমার অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। একটু থামিয়া আবার সে বলিতে লাগিল, 'আমি তা কখনও বিশ্বাস করি নি, সে হ'তে পারে ব'লে আমি মনেই কর্ত্তে পারি না। কিন্তু তুমি যদি তাকে বিয়ে কর, তা' হ'লে আমাকে তা' বিশ্বাস কর্ত্তে হ'বে।'

"কি বিশ্বাস কর্ত্তে হ'বে? ব্যাপারখানা কি?"

"সে তাহার স্বর আরও একটু নামাইয়া বলিল, বিশ্বাস কর্ব্বো যে, রাণুমার মৃত্যুর কারণ তুমি জান, এবং হয় ত তুমিও তার মৃত্যুকামনা ক'রেছিলে। তাই সে রাক্ষুসী মেয়েটা তাকে মেরে ফেল্লে।'

"আমি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলাম; তীব্র স্বরে বলিলাম,—'তাকে মেরে ফেল্লে! আর আমি তাই চেয়েছিলাম!'

"হাঁ; তুমিও যে এর মধ্যে ছিলে তা' আমি এতদিন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সেই মেয়েটাকে বিয়ে কল্লেই আমি তা' বিশ্বাস কর্ব্বো।'

"আমার ললাট স্বেদসিক্ত হইল। একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ আমাকে হতজ্ঞান করিবার উপক্রম করিল। আমি অধীর ভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিলাম। তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'কিন্তু তোর প্রমাণ কই? আর একথা এতদিন আমাকে জানাস্ নি কেন?'

"প্রমাণ আমার আছে। আর তোমাকে যে এতদিন বলি নাই, তা' সে রাণুমারই নিষেধে। আমাকে শপথ করিয়েছিল, যেন আমি এ কথা কখনও কারু কাছে প্রকাশ না করি।'

"আমারো কাছে নয়?

"না। তেনার সন্দেহ হয়েছিল—'

"যে আমি সমস্তই জানি! উঃ! কি ভীষণ! এ'ও কি সম্ভব? এই কথা সে বিশ্বাস ক'রে গেছে! কি জানিস, কি দেখেছিস্ আমায় সব খুলে বল্। শীঘ্র বল্।'

"রামমণি মেজের উপর বসিল। তারপর সে যে কাহিনী বিবৃত করিল, তাহা সংক্ষেপে এই। প্রথম প্রথম ডাক্তারের ঔষধে বেশ উপকার হইতেছিল। কিন্তু তারপর যে দিন হইতে হেম নিজে ঔষধ আনিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন থেকে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহাতে রামমণির সন্দেহ হয়,এবং সে এই সন্দেহ রাণীর কাছে ব্যক্ত করিয়া আমাকেও তাহা জানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাণী তাহাকে বারণ করিয়া বলে, 'তুই দেখিস না যে, হেম যখন ওষুধ নিয়ে আসে, তখন ইনিও প্রায়ই সঙ্গে থাকেন, এবং ইনিই আমাকে অনেক সময়ে সেই ওষুধ খাইয়ে দেন? এখন যদি তাঁকে এ কথা বলা হয়, তা' হ'লে তিনি হয় ত মনে করবেন যে, আমি তাঁকেও সন্দেহ করেছি। আসল ব্যাপার কি তাহা ভগবান জানেন, কিন্তু আমি কখনও মনে করিতে পারি না যে, ইনিও আমার মৃত্যু কামনা করেন। এরূপ বিশ্বাস করার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।' এই কারণে এবং হেমের সহিত আমার অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রামমণি আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু আর বেশী ঔষধ খাইতে দিত না। তারপর তাহার অবস্থা যেদিন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিল, সে দিন আমার মনে আছে, আমি স্বহস্তে একদাগ ঔষধ তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিলাম। সে একবার মুখটা একটু বিকৃত করিল, তারপর আমার দিকে এক করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। এখন আমার মনে হইতেছে, তাহার চক্ষু যেন জলে ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তখন আমি তাহা তেমন লক্ষ্য করি নাই। রামমণি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং তখন তাহার কথায় আমার সমস্তই মনে পড়ে গেল। তার পরেই আমি নিজের ঘরে চলিয়া আসিয়া হেমের সহিত গল্পগুজবে মত্ত হইয়া পড়ি। সেই সময়ে রাণী রামমণিকে শপথ করাইয়া লয় যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে,সে সেই সন্দেহের কথা আমাকে কখনও জানাইবে না, এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই আমাকে ডাকিতে পাঠায়। সে কথা আমি আগেই বলিয়াছি।

"রামমণি এই শোকাবহ কাহিনী শেষ করিয়া বলিল, 'আমি আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্য ক'রে বল্‌তে পারি, বাবু, আমি যা' বল্লুম তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। তুমি সেই মেয়েটাকে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছো দেখে সব কথা তোমাকে বলে ফেল্‌তে হ'ল।' হায় রামমণি! তোমাকে শপথ করিতে হইবে কেন? আমি হেমকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম, কোন্ ঔষধের কিরূপ ফল হইতেছিল, তাহার ত খোঁজই রাখিতাম না; এবং যখন আমার কুশল প্রশ্নে 'ভাল আছি' ছাড়া আর কোন উত্তর পাইতাম না, তখন তাহার শারীরিক অবস্থার সহিত সেই উত্তরের বৈষম্য ত লক্ষ্য করা কখনও প্রয়োজন মনে করি নাই। কিন্তু একি ভীষণ সন্দেহ!—হেম নিজেকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে! আর তাহার মৃত্যুতে আমিও বোধ হয় সুখী হইব, হয়ত আমিও হেমের সহকারিতা করিয়াছি,—ইহাই ভাবিয়া আমার রাণী স্বেচ্ছায় সেই মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছে! উঃ! এ যে আর সহ্য হয় না, ভগবান্! হেম কি করিয়াছে, ঠিক জানিবার উপায় নাই, আর আমার এই অন্তর্দ্দাহের ফলে তাহার প্রতি আসক্তিটাও কাটিয়া গিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহার প্রতি আমার প্রকৃত প্রেম সঞ্চারিত হয় নাই। কিন্তু রাণী কিনা অবশেষে এই ভীষণ বিশ্বাস লইয়া চলিয়া গেল যে, আমিও হয়ত তাহার মৃত্যুকামনা করিয়াছি! তাহারই বা দোষ কি?—মানুষ ত বটে! যে আমার কাছে অনাদর ও অবহেলা ব্যতীত কখনও কিছুই পায় নাই, সে যে জীবনের শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার প্রতি এতটা শ্রদ্ধা রাখিতে পারিয়াছিল, তাহাই কি যথেষ্ট নহে? তারপর যখন তাহার কঠিন রোগের প্রতিও ঔদাসীন্য দেখাইয়া, আমি হেমকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম, তখন কি অভাগিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত না? তখন যদি তাহার মনে এইরূপ সন্দেহ আসিয়া থাকে, তাহাকে অন্যায় বলিবার অধিকার আমার কি আছে?

"আমি আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিলাম না; ক্ষিপ্তের মত বাহির হইয়া পড়িয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। তোমার বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িতেই আমার দুঃখের বোঝা একবার তোমার কাছে নামাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যতদিন বাঁচিব, ততদিন এই দুর্ব্বিষহ দুঃখ-ভার ত বহন করিতেই হইবে, কিন্তু কিরূপে যে পারিব তাই, ভাবিয়াই আকুল হইতেছি। রাণীকে আমার বুঝাইতে হইবে যে, তাহার সন্দেহ সত্য নহে। তাহার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ করিতে হইবে; তাহার প্রতি আমার সমস্ত অনাদর অযত্নের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহাকে সন্দেহমুক্ত করিতে হইবে। আমি জানি, সে আমাকে ক্ষমা করিবে, আমার কথা বিশ্বাস করিবে। কিন্তু কোথায় তাহা পাইব? পরলোকে? পরলোক ত আমি এতদিন বি[illegible] করি নাই। কিন্তু এখন যে তাহাই আমার এক[illegible] সান্ত্বনা। এ সান্ত্বনা কি তবে মিথ্যা? না—না, ইহা মি[illegible] নহে, পরলোক নিশ্চয়ই আছে, এখন আমাকে সে বি[illegible] করিতেই হইবে। মানুষ মরিলেই সব শেষ হইয়া [illegible] না। রাণীকে আমি আবার পাইব, নিশ্চয়ই পাইব,—সে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।"

হরিশ থামিল। তাহার এই প্রলাপবৎ উচ্ছ্বাস চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিয়া আমি বড় শঙ্কিত হইলাম পাশের বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে তখন গা[illegible] হইতেছিল—

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!*

---

* বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক ওয়াল্‌টার পেটার-কৃত ফরাসী উপন্যাস বিশেষের সমালোচনা পাঠে গল্পটি লিখিত।

নবরূপ

[শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, B.A.]

কোথা তব শিখি-চূড়া হে শ্যামসুন্দর!
কোথা আজি বনমালা হরিত বসন?
যমুনা-উজান-করা বাঁশরীর স্বর,
ত্রিভঙ্গ ললিত-ঠাম ভুবনমোহন?

আজি একি জটাভার ধ'রেছ মাথায়!
একি এ রজত-শুভ্র অঙ্গের বরণ!
পরিধানে বাঘছাল, ভস্ম সারা গায়,
করেতে বিষাণ বাজে ফুকারি' মরণ!

কোথা আজি বৃন্দাবনে কেলি-কুঞ্জবন?
এ যে হেরি শ্মশানের ভীম অট্টহাস!
নাহি সে মধুর দিঠি—রক্ত ত্রিনয়ন!
শিরেতে ভুজঙ্গ শ্বসে গরল নিশ্বাস!

ফেল এ ভীষণ সাজ, জটাজূট ভার,
অন্তর-মোহন এস অন্তরে আবার।

পূজার ছুটি

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ]

উদ্যোগ পর্ব্ব।—আমাদের অফিস,—ইট পাথরে দিয়া তৈরিও বটে, রেলিং দিয়ে ঘেরাও বটে; ইহা ছাড়া "কেরাণী দপ্তরী যারা, কোথায় এমন খেটে সারা" প্রভৃতি লক্ষণগুলিরও যখন যথাযথ মিল রহিয়াছে, তখন নিঃসন্দেহে ইহাকে 'সব অফিসের সেরা' বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। এ হেন অফিসে আজকাল কাজের ভিড়ও যেমন বেশী, অ-কাজে অর্থাৎ বে-সরকারী কাজ করিবার চেষ্টাও তেমনি প্রবল—কারণ, পূজার ছুটির আর এক মাস মাত্র বাকী। সুযোগ পাইলেই এখন উদ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নজরান্তরালে গোপন কমিটি বসিতেছে এবং কিভাবে ছুটির সদ্ব্যবহার করা হইবে, তৎসম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

এক, দুই করিয়া ছয়জনে একমত হইলাম—বেড়াইতে যাইব। মতিস্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের মানচিত্র বস্তৃত হইল, নিউম্যানের Bradshaw আনীত হইল, এবং গন্তব্য স্থান-সম্বন্ধে একাধিক প্রস্তাব গৃহীত ও পরিত্যক্ত হইয়া গেল। জগদীশ বাবু বলিলেন—'রামেশ্বর মন্দ কি?' নলিন, ঝাঁ করিয়া Bradshawএর শেষ পৃষ্ঠা-সংলগ্ন ম্যাপ্ খুলিয়া ফেলিল এবং ওয়াল্‌টেয়ার, মাদ্রাজ, মাদুরা প্রভৃতির উপর দিয়া ভারত-পূর্ব্বসীমার রেলপথ-রেখায় পরিচালিত তর্জ্জনীটা, একেবারে ভারতমাতার চরণপদ্মকলিকার ডগায় টানিয়া আনিল। এক একটা স্টেশনে অঙ্গুলি অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎসাহ-দীপ্ত চক্ষু দুটো এম্‌নি একটা ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন ভ্রমণ-জনিত আনন্দের উপভোগ-ক্রিয়া এখনই তাহার মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, ১০।১২ দিনের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘুরিয়া আসায় তৃপ্তির চেয়ে শান্তির পরিমাণ অনেক বেশী; বিশেষতঃ, এতগুলি প্রসিদ্ধ স্থানের উপর দিয়া যাইব, অথচ ভাল করিয়া কিছুই দেখা হইবে না। রমেশ বাবু বলিলেন, —"নাঃ, ও সুবিধের কথা নয়; তা'র চেয়ে জলপথে চলুন, আরামে যাওয়া যাবে।" এই প্রস্তাবের অনুকূলে রমেশ-বাবু আরামের বহুবিধ তালিকা প্রদান করিলেও নিছক জলযাত্রায় অনেকের মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে রফা হইল যে, স্থলপথে গৌহাটী ঘুরিয়া এবং সীতাকুণ্ডে দিনদুয়েক অবস্থিতি করিয়া চট্টগ্রাম যাইব এবং সেখান হইতে আদিনাথ ঘুরিয়া বরিশাল ও খুলনা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

Map খুলিয়া নলিন বহুক্ষণ পথটি পরীক্ষা করিল। পাহাড়, সমুদ্র, দ্বীপ, নগর, পল্লী, সেতু, ট্রেণ, ষ্টীমার, নৌকা—হাঁ, এ লোভনীয় বটে, অন্ততঃ মনে কর্‌তেই স্ফূর্ত্তি হচ্চে—তদ্ব্যতীত একটি বিশেষ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া এবং একপথে দুবার না চলিয়া, আবার সেইখানে ফিরিয়া আসায়, পৃথিবীর গোলত্ব আবিষ্কারকগণের অবস্থাটাও অনুভব করিয়া লইতে পারিব; নলিন বলিল,—"আর দ্বিতীয় কথা নয়, এইই final."

অনতিবিলম্বেই Tour programme প্রস্তুত হইয়া গেল; দীর্ঘ প্রোগ্রাম। Changing stationসমূহে কোথায় কতক্ষণ সময় পাওয়া যাইবে, কোথায় কতদিন থাকা ও কি কি দেখা হইবে, কোন্ দিন কোথায় স্নানের সুবিধা, কোন্ কোন্ ষ্টেশনে চা-সেবন, কোথায় প্রাতর্ভোজন প্রভৃতি বিবিধ খুঁটিনাটির বিবরণ প্রোগ্রামে প্রদত্ত হইল। কেহ কেহ ক্রটী দেখাইয়া বলিলেন—"নস্যগ্রহণ ও ধূম-পানের সময় নির্দ্দেশ না থাকায় প্রোগ্রাম নিখুঁত হয় নাই।" সংক্ষেপে, ভ্রমণের ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, নলিনের উৎসাহকে বাহন-রূপে পাইয়া, ঐ প্রোগ্রামের আড়ম্বরটাই বর্ত্তমানের পক্ষে যথেষ্ট হইল। অতঃপর কি কি জিনিষপত্র সঙ্গে যাইবে এবং কে কি লইবে, তাহার একটি তালিকা করিয়া 'ফ্রি-পাশে'র আবেদন পেশ করা গেল।

হতভাগ্য জগদীশ বাবু বৎসরে দুইমাস পত্নীকে ও তাঁহার ছয়টি কন্যারত্নকে রাঁধিয়া খাওয়ান, অতএব রন্ধন-কার্য্যে তাঁহার হাত একেবারে পাকা; ইহা ছাড়া ধন-দৌলত না বাড়িয়া বৎসরে যাঁহার কন্যা বাড়িতে থাকে, তিনি 'গোছালো ও হিসাবী গৃহস্থ' হইতে বাধ্য; এক্ষেত্রে, tour accountantএর পদ তাঁহারই ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল—ভ্রমণে বাহির হইয়া পয়সার হিসাব রাখা একমাত্র তাঁহাকেই মানায়।

ছুটির দিন-পাঁচছয় বাকী থাকিতে 'পাশ' আসিল। নলিনের বিপুল উৎসাহ—বারংবার খুলিয়া, মুড়িয়া, দেখিয়া, পড়িয়া, সে পাশগুলোর হস্তলিপি, টান, ছাঁদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ মুখস্ত করিয়া ফেলিল। কখনও বা অফিসের উপর বিরক্ত হইয়া আপন মনে বকিতে লাগিল -"আর পারা যায় না ছাই, এখনও ৫।৬ দিন এই কর্ম্মভোগ করতে হবে।" সকলেই আপন আপন পাশ জগদীশ বাবুর নিকট জমা দিল, নলিন চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিল না; এ দু'খানা কাছ-ছাড়া করা, আর প্রণয়ের প্রথম অবস্থায় পত্নীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা, তাহার নিকট সমান আপত্তিজনক!

(২)

যাত্রা।—ছুটি—ছুটি—ছুটি! কাল পূজার ছুটি হইয়া গিয়াছে! সুখের ছবি বুকে করিয়া প্রবাসী বাটী চলিয়াছেন, আর গৃহবাসী আমরা অনির্দ্দিষ্ট প্রীতির ছবি স্মৃতিতে আঁকিয়া লইবার জন্য দেশ-ভ্রমণে চলিয়াছি। কাহারও হস্তে ব্যাগ, কাহারও হস্তে খাবারের হাঁড়ি, কাহারও হস্তে হারমোনিয়ম—সকলেই বিষম ব্যস্ত! বাহির হইতে তিনজন যোগদান করিয়া 'ষড়রিপু'কে 'নবগ্রহে' পরিণত করায়, আমরা নয়জনে এখন ষ্টেসন-অভিমুখী। অবশ্য 'নয়'এ 'নবরত্ন'ও হয়, কিন্তু এ গোপন মনের কথাটা বিনয়ের খাতিরে আর নাই বা প্রকাশ করিলাম।

আমরাও ষ্টেসনে আসিলাম, গাড়ীরও 'ডাউন' পড়িল। প্ল্যাট্‌ফরমে অসম্ভব জনতা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িতে-ছিলাম, এমন সময় গাড়ী দেখা দিল; বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল—আনন্দে না, উঠিতে না পারিবার আশঙ্কায়? গাড়ী থামিতেই বুঝিলাম, অবস্থা গুরুতর—ভয়ানক ভিড়, একেবারে 'পেষাপিষি' ব্যাপার! হতাশভাবে একবার এ-দোর একবার সে-দোর করিতে লাগিলাম——ঐ বুঝি ঘণ্টা দেয়!

সহসা আমার নামের পশ্চাতে 'দাদা'-সম্ভাষণ জুড়িয়া কে একজন ডাকিল—"এদিকে এদিকে"? এই ভিড়ে এত বড় একটা দলকে জায়গা দিবার উদারতা দেখাও কে তুমি দুঃসাহসিক? কিন্তু চিন্তার অবসর নাই—স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। দ্বার আকর্ষণ করিতেই সকলে 'হাঁ—হাঁ' করিয়া উঠিল, আমরাও তখন 'নাছোড়বান্দা'—বলিলাম, যুদ্ধং দেহি'। দেখিতে দেখিতে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল; তখন—"একদল রাজ্য-আক্রমণকারী, আর একদল তা' রক্ষা কর্ত্তে চাহে"; খাবারের হাঁড়ি ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইল এবং সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় অদ্ভুত রণকৌশলে নলিন তাহা রক্ষা করিতে লাগিল; অবশেষে এই ঘোর কলির কালধর্ম্ম, শান্তিভঙ্গকারী আমাদিগের কণ্ঠেই জয়মাল্য প্রদান করিলেন এবং খাদ্য-ভাণ্ডও অক্ষত রহিয়া গেল!

রাজ্য-অধিকার করিবার পর আহ্বানকর্ত্তাকে দেখিবার অবকাশ পাইলাম; ইঁহার সহিত আমাদিগের পরিচয় দু'একদিনের মাত্র; লোকটি সঙ্গীত-উন্মাদ ও থিয়েটার-পাগল। পরিচিত হইবার আগ্রহ আসলেই ছিল না, তবু এই ভাবিয়া আজ আমাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিল যে, অসংখ্য আরোহীর বিরক্তি ও আপত্তিকে গ্রাহ্য না করিয়াও তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু প্রসন্ন হইয়াই নিষ্কৃতি পাইলাম না, অবিলম্বেই কঠোর পরীক্ষা দিতে হইল; হারমোনিয়ম টানিয়া লইয়া ও প্রাণ-পণে গান করিয়া, তিনি আমাদিগকে অধিকতর তৃপ্ত করিতে চাহিলেন। যদিও তৃপ্ত হইবার জন্য আমরাও আজ প্রাণ-পণ করিতেছিলাম, তথাপি প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতে লাগিল, বুঝি বা কৃতজ্ঞতার খাতিরেও এ প্রসন্নভাবটা শেষ পর্য্যন্ত টেঁকিবে না। যাহা হউক, জায়গা দিয়াই যখন তিনি ছাড়িবেন না, উপরন্তু গানও শুনাইবেন, তখন হতাশভাবে অগত্যা তাঁহার সকল অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলাম।

রাণাঘাট হইতে ভিড় কমিতে লাগিল এবং শিবনিবাস ছাড়াইয়া ধ্রুবজ্যোতিঃ (সপ্তম গ্রহ) চায়ের জলের জন্য আকুল হইবামাত্র নলিন একবার জয়দৃপ্ত দৃষ্টিতে আমার

দিকে চাহিল। ধ্রুবজ্যোতিঃ 'ব্রাহ্ম' এবং 'বি, এ,— সুতরাং নলিনের মতে চা খাইতে বাধ্য। নলিন 'নৌকাডুবি' ও (লোকমুখে প্রশংসা শুনিয়া) 'গোরা'র কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াছিল। ঐ দু'খানা হইতে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, শিক্ষিত ব্রাহ্মমাত্রেই চা খাইবে এবং যাহারা চা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা অবিলম্বেই ব্রাহ্ম হইয়া চায়ের টেবিলে প্রেমে বসিবে।

পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক সঙ্গীতকুশলী কাঁচরাপাড়া হইতে উঠিয়া এতক্ষণ অন্য গাড়ীতে ছিলেন; কেট্‌লী ও ষ্টোভের দখলীসত্ব লইয়া আমাদের রমেশ বাবুও তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন; এক্ষণে উভয়েই আমাদের গাড়ীতে আসিলেন। প্রথমে বিশেষ কেহ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও, ধ্রুব যখন শুনিল যে, রেকর্ডে পুলিন বাবুর গান আছে, তখন পরমোৎসাহে তাঁহাকে চায়ের রসদ যোগাইতে লাগিল; ফলে দামুকদিয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সুরের স্রোতেই ভাসিয়া আসিলাম, কোথা দিয়া কোন্ ষ্টেসন যে চলিয়া গেল, তাহার আর হিসাবই পাইলাম না। ষ্টেসনে ষ্টেসনে সাহেব মহোদয়গণ আপনাপন কক্ষ ছাড়িয়া আমাদের গাড়ীর দ্বারদেশে সমবেত হইতেছিলেন এবং কেহ কেহ বা আনন্দাতিশয্যে প্ল্যাটফরমের উপর নৃত্য করিয়া আমাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যাইতেছিলেন; আক্ষেপের বিষয়, আমাদের সঙ্গে 'ডুগডুগি' ছিল না, নতুবা একার্য্যে তাঁহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিতে পারিতাম।

৩।

পদ্মাবক্ষে।—ষ্টীমারের একটি কক্ষে সতরঞ্চ বিছাইয়া ধ্রুব, আমি ও পুলিন বাবু উপবিষ্ট। বাকী দল ডেকের কোণে জমায়েত হইয়া দার্জ্জিলিং মেলের-লোকনামা দেখিতেছেন। তীব্রোজ্জ্বল আলোকমালাপরিশোভিত পদ্মা-তটের নীলাভা ভেদ করিয়া, দলে দলে আরোহিবর্গ ষ্টীমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—কাহারও মুখে-চোখে উৎকণ্ঠার ভাব, কেহ বা দিব্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কেহ গল্প করিতে করিতে, কেহ হাসিতে হাসিতে, কেহ হাত ধরাধরি করিয়া, কেহ কেহ বা বেষ্টিত-কটি মেম-সাহেবের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছেন; ঘোমটায়, ঘাঘরায়, টুপীতে, পাগড়ীতে, চাদরে, ওড়নায়, সর্ব্বশুদ্ধ সে যেন একটা Phantasmagoria, যেন বায়স্কোপের একখানি বিশেষ দৃশ্যচিত্র।

এই সময় 'ব্যস্তসমস্ত' হইয়া ঝাড়নে-বাঁধা একটি 'টিন' হস্তে নলিন আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং ধপাস্ করিয়া টিন্‌টা ফেলিয়া বলিয়া গেল—"এটা রাখ্—আমি আস্‌ছি এখুনি।"

"কা'র টিন রে? কোথায় পেলি?"

"এসে বল্‌ছি—এসে বল্‌ছি" বলিতে বলিতে সে ছুটিল। ইহার মধ্যে ডেকের কোণে পরিবেষণ আরম্ভ হইয়াছিল; প্রবেশপথে পেটুক নলিন তাহা দেখিয়া আসিয়াছে।

ধ্রুব ঢাকনি খুলিতেই আমরা সানন্দে ও সবিস্ময়ে দেখিলাম—টিনের মধ্যে স্তরে স্তরে চাঁপাকলা। এই সময় আশু আসিয়া খবর দিল—"ওরা ফাঁকি দিয়ে সব খাবার খেয়ে ফেল্লে, শীগ্‌গির ওঠো"। তথাকথিত টিন ততক্ষণ কয়েকখণ্ড কেক্, টোষ্টরুটি ও দিব্য জেলি-লাগানো বিস্কুট প্রসব করিয়াছে, সুতরাং ধ্রুব বলিল—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গমিষ্যামি"; কলার ছড়া প্রভৃতি দেখাইয়া বলিল—"দেখ্‌ছো? এস, বসে যাও"। আশু কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ধ্রুব বলিল—"তত্ত্বানুসন্ধান পরে করিলেই চল্‌বে।"

ইহার পর দ্বিধা করিবে কোন্ অহম্মুক? দেখিতে দেখিতে সমস্তই প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল এবং আশু বলিল—"সৎকর্ম্মের পুরস্কার আছেই; ভাগ্যে নলিনের মত নিজে না ছুটে তোমাদের খবর দিতে এসেছিলাম।"

টিনের ইতিবৃত্ত।—শিলং মেলে উঠিয়া নলিন যখন তাহার উপার্জ্জিত দ্রব্যটির পরিণাম শুনিল, তখন আক্ষেপের আতিশয্যে সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ফেলিল—"আমার মত গাধা আর দুটো নেই।" কোথা হইতে কি-ভাবে ওটা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ সে এইরূপ দিল:—

সর্ব্বপশ্চাতে গাড়ী হইতে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে যূথভ্রষ্ট হওয়ায় সে ইতস্ততঃ ডাকাডাকি করিয়া ফিরিতেছিল; সহসা প্রথমশ্রেণীর মুক্তদ্বার পথে দৃষ্টি পড়ে এবং ঐ 'একাকিনী শোকাকুলা' টিনটিকে দেখিতে পাইয়া করুণার্দ্রচিত্তে স্কন্ধে তুলিয়া লয়। ইচ্ছা ছিল, ষ্টীমারে আসিয়া তাহার contents পরীক্ষা করিবে, কিন্তু খাবার পরিবেষণ দেখিয়া তাহার মন

একেবারেই ডেকের কোণে ছুটিয়াছিল। অতঃপর সে বলিল—"নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে আমার এ কাজটার ঠিক মিল ছিল না, সেইজন্যে তোমরা নীতিবাগীশের দল এর ফল-ভোগ করে' আমাকে বিশেষ অনুতপ্ত করেছে।" অবশেষে অনুতাপ নিষ্ফল বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল—"যাক্, বাঁদরগুলোকে কলা খাইয়ে তবু হাতে হাতে প্রায়শ্চিত্তটা হ'য়ে গেল"। বলা বাহুল্য, এরূপ compliment পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রায়শ্চিত্তও হইয়া গিয়াছিল।

সারারাত্রির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই, তবে সুখসুপ্ত পুলিনবাবুর গণ্ডদেশে গরম চা পড়িয়া একটা ট্র্যাজিডির যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত সৌভাগ্য-বশতঃই সে আসন্নট্র্যাজিডি হইতে একটা হাস্যরসাত্মক কমিডি গড়িয়া উঠে।

৪।

শিলং মেলে ও গৌহাটীতে।—লালমণির হাট ষ্টেশন। আকাশের পূর্ব্বপ্রান্ত রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। নিশাশেষের শুকতারাটি পাণ্ডুর হইতে পাণ্ডুরতর হইয়া এক্ষণে Superlative degreeর অবস্থাও অতিক্রম করিতে উদ্যত। রমেশ বাবু গলায় Comforter জড়াইয়া সারারাত বাঙ্কের উপর পড়িয়াছিলেন, এইবার গলা ঝাড়িয়া ও একটি mixture ধরাইয়া নামিয়া আসিলেন। জগদীশ বাবু আড়ামোড়া ভাঙ্গিলেন, যামিনী বাবু পাশ ফিরিলেন, ধ্রুব চোখ রগড়াইল, আশু কাসিল এবং আমি নস্য লইয়া হাঁচিলাম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়—অনুমানমাত্র; কিন্তু হেমন্তকালে ভোরের কাসি যে সংক্রামক হয়, এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য; এই সত্যকে ভিত্তি করিয়া অতঃপর প্রত্যেক কামরাগুলি হইতেই কিছুক্ষণ ঐ কাসির 'রিহার্সাল' চলিতে লাগিল। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলের যাত্রিবর্গ এইখানে নামিয়া যাওয়ায় ফাঁকা গাড়ীতে আমাদের চায়ের জল চড়িল ও ডিম সিদ্ধ হইতে লাগিল।

প্রাতরাশ সমাধা হইবার পুর্ব্বেই আমরা গোলোকগঞ্জ ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছিলাম। প্রস্তরস্তূপ ও বনভূমি দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া পুলিন বাবু গান ধরিলেন, কিন্তু এবার আর তাহা জমিল না। পুলিন বাবুর গন্তব্যস্থল গৌহাটী, এ হিসাবে সুদূরের যাত্রী আমরা তাঁহাকে নিতান্ত করুণার চক্ষে দেখিতেছিলাম; যেন ভ্রমণ উপলক্ষে এইটুকু আসিয়া সন্তুষ্ট থাকা মানবমাত্রেরই পক্ষে অসম্ভব! অবশ্য এমন একদিন গিয়াছে, যখন আমাদিগকেও কেহ না কেহ এমনিই করুণার পাত্র ভাবিয়াছিল।

আমিনগাঁয়ে যখন পৌছিলাম, তখন দ্বিপ্রহর অতীত। ব্রহ্মপুত্রবক্ষে ষ্টীমার ভাসিতেছিল। পরপারে 'পাণ্ডু' ষ্টেশন ও কামাখ্যা-পাহাড়ের ভুবনেশ্বরের-মন্দির-শীর্ষ দেখা যাইতেছিল, জগদীশ ও যামিনীবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, আমি মনে মনে তাঁহাদের ভক্তিকে নমস্কার করিলাম। ব্রহ্মপুত্রের তুহিন-শীতল জলে একে একে স্নান করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম; কামাখ্যার যাত্রিবর্গ এই ষ্টেশনেই 'পাণ্ডা-কবলিত' হইলেন।

পাণ্ডু ষ্টেশনের একদিকে ট্রেণ ও অপরদিকে টিনের ছাউনির তলদেশে ৫।৬ খানি 'মোটর' দাঁড়াইয়া ছিল। পূর্ব্বে গৌহাটী হইতে মোটর ছাড়িত, এক্ষণে Shillongএর যাত্রিবর্গ এখান হইতেই মোটরে আরোহণ করেন। কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া প্রশস্ত মোটর-রোড চলিয়া গিয়াছে এবং গৌহাটী ষ্টেশনের অল্প অগ্রে রেলপথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদক্ষিণে ছুটিয়াছে। Shillong এখান হইতে ৫৪ মাইল, যাইতে ৬।৭ ঘণ্টা লাগে।

গৌহাটী নামিয়া হোটেল-অন্বেষণে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে নরেন্দ্রনাথ বসু নামক জনৈক পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ইঁহার আদিবাটী চুঁচুঁড়া, গৌহাটী কর্ম্মস্থল। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে আনন্দ ছড়াইয়া বলিলেন—"রেল হ'য়ে ভারী মজা হয়েছে, না? ফি বছরই গৌহাটী আগমন হ'চ্চে, ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম—"গৌহাটী নয়, আপাততঃ সীতাকুণ্ডু পর্য্যন্ত যাবো।"

"বটে; তা বেশ—আমি আস্‌ছি রোসো"। বলিলাম, "আমরা যে হোটেলে যাচ্ছি, এখন"।

"আমি বা কোন্ বাধা দিচ্ছি তা'তে, একটু দেরীই না হয় হ'ল" বলিয়া তিনি গাড়ীর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। দলের কেহই তাঁহাকে চিনিতেন না, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেই বলিলাম—'নিতাইয়ের দাদা' এবং সকলেই পরিষ্কার চিনিলেন।

অনতিপরেই যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ওরফে যগু বাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কলেজের ছুটি উপলক্ষে তাঁহার এই সোদর-প্রতিম প্রতিবেশী কবি-ভ্রাতাটি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন ; এবং কে একজনের আসিবার কথা থাকায় উভয়েই এ সময় ষ্টেসনে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জিনিষপত্র কোনও পরিচিতের জিম্মায় রাখিয়া এই নবগ্রহকে তাঁহারা বাসায় লইয়া চলিলেন। যগুবাবুর সহিত ধ্রুবরও পরিচয় ছিল সুতরাং এরূপ সাক্ষাতে সেও আনন্দিত হইল। পশ্চিমাভিমুখী একটি রাস্তার সীমাপ্রান্তে শুক্রেশ্বরের মন্দির সম্মুখে রাখিয়া আমরা দক্ষিণে ফিরিলাম এবং অবিলম্বেই বাসায় উপনীত হইলাম।

বাসাটির অবস্থিতি পরম রমণীয়। সম্মুখেই ব্রহ্মপুত্রনদ, মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত রাজপথমাত্র ব্যবধান। ঈষৎ বামে এক নয়নরম্য বাঁধাঘাট, লর্ড নর্থব্রুকের স্মৃতিকল্পে নির্ম্মিত বলিয়া নর্থব্রুক-ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। বাসার সমান্তরালে নদবক্ষে উমানন্দ পাহাড়, পরপারে সুবিন্যস্ত শৈলমালা, অল্প দক্ষিণে নদীর একটি বাঁক। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তপনদেব সে সময় বাঁকের মুখে অন্তর্হিত হইতেছিলেন, তির্য্যক্‌ভাবে জলের উপর রূপার ঢেউ খেলিতেছিল এবং নদীর অপর অংশ ও বাসার সম্মুখভাগ ছায়ামলিন হইয়া আসিতেছিল—সর্ব্বাপেক্ষা মধুর—মধ্যে মধ্যে রবিকর-রঞ্জিত পাহাড়গুলির বিচিত্র ছায়া, যাহার প্রতিবিম্ব নদবক্ষকে 'সচিত্র মাসিকপত্রের' আকার দান করিতেছিল। মুক্ত প্রাঙ্গণে সারি সারি চেয়ার পাতিয়া দিয়া গৃহস্বামী তাঁহার অতিথিগণের জন্য সেই রমণীয় অপরাহ্নের দৃশ্য-সুখলাভের ব্যবস্থা করিলেন।

এতবড় একটা দলসমেত ইঁহাদের স্কন্ধে পড়িয়া আমরা যতই সঙ্কুচিত হইতেছিলাম, নরেন বাবু ও যগুবাবুর স্বাভাবিক আনন্দ ও ব্যবহার ও মাধুর্য্য ততই আমাদের সঙ্কোচকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছিল। চক্ষের নিমেষে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া গেল এবং সারাদিনের পর পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া সকলেই দিব্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আহারান্তে যগু বাবু একখানি ছবি দেখাইলেন—হ্যাম্‌লেটের ছবি :—

অভিনয় অগ্রসর হইয়াছে, সাধারণ দর্শকেরা সাগ্রহে উপভোগ করিতেছে, হ্যাম্‌লেট্ ও তাঁহার বন্ধু তীক্ষ্ণ সতর্ক অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে, জননী ও খুল্লতাতের মুখভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন ; কি বিবর্ণ ইহাদের মুখভাব! কি জ্বালাময় হ্যাম্‌লেটের চাহনি! এরূপ সুন্দর জীবন্ত চিত্র অল্পই দেখা যায়। বহুক্ষণ ধরিয়া দলের মধ্যে এই চিত্রণ-নৈপুণ্যের উপভোগ চলিতে লাগিল—তবুও চিত্রখানি মূল চিত্রের ফটোগ্রাফমাত্র।

নলিন ইহার মধ্যে নরেন বাবুর দ্বিচক্রযানযোগে শহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ দেশের সব বাড়ীগুলো এ রকম কেন ভাই ?

"কি রকম বল্ দিকিন"।

"এই, সবই 'কোটা' বাড়ীর মতন, অথচ ঠিক 'কোটা' নয়"!

"সোজা কারণ ; তুইত যেমন মানুষের মতন, অথচ ঠিক মানুষ নয়"।

"কি তবে আমি ?" ভয়ে ভয়ে নলিন জিজ্ঞাসা করিল।

"সে তো সারায় গাড়ীতে উঠে নিজেই স্বীকার করেছিস্"

অভিমানের সুরে নলিন বলিল—"গাধা ?" রমেশ বলিল—"বালাই, আমি কি তা বলতে পারি !"

সে যাহা হউক, প্রকৃতই বাড়ীগুলির বিশেষত্ব ছিল। চাঁচের বেড়ার দুধারী গুরুমাটির প্রলেপ, তদুপরি যথারীতি চুণকামকরা বা রং-ফলানো এবং যেমন হইতে হয়, দ্বার-জানালা বসনো। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই, কিন্তু ইষ্টকনির্ম্মিত নয় বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই। ধুবড়ীতেও এই একই ছাঁচের বাড়ী দেখিয়াছি। কেন এরূপ বিধান ? পাহাড়-প্রধান দেশে ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী বলিয়া কি ? কি জানি !

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইদলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্নপথে ষ্টেসন অভিমুখী হইলাম ; রুটি ও মাখন লইবার ভার ন্যস্ত হইল, আমাদের উপর।

রুটি ত কিনিলাম, এখন মাখন পাই কোথা ? স্থানীয় কোনো যুবক একটি রাস্তা দেখাইয়া বলিল—"এইটে দিয়ে যান, ধারেই গয়লাবাড়ী মাখন পাবেন"। যথাউপদেশে কিয়দ্দূর আসিয়া সন্ধান পাইলাম বটে কিন্তু প্রয়োজন-সঙ্কুলান হইবার মত না পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলাম "আর

কোথা পাওয়া যায় বল্‌তে পার?" সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে ৫।৬ খানা বাড়ীর পরে একখানা কুটীর দেখাইয়া দিল।

অগ্রসর হইয়া দেখি, বাড়ীর দ্বারদেশে তাম্বুল-রাগ-রক্তাধরা সুবিন্যস্তবেশা দুইটি রমণী মূর্ত্তি! যে কোনও ব্যক্তিই হয়তো ইহাদিগকে গোয়ালিনীভ্রমে সম্ভাষণ করিত না, কিন্তু মাখন-গত-চিত্ত যামিনী বাবু তখন মরুভূমে মরীচিকা দেখিতেছিলেন; তিনি সটান জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—"হাঁগা, এ বাড়ীতে মাখন পাওয়া যায়?"

তিনি "হাঁগা" বলিতেই আমরা গতির বেগ বাড়াইয়াছিলাম। হাসির রোল কাণে পৌছিল এবং কি একটা রসিকতার আওয়াজও যেন ভাসিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখি, যামিনীবাবু অতিরিক্ত রকম চটিয়া মাখনের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে করিতে আমাদিগকে তাড়া করিয়াছেন—দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিলাম।

এই দুর্ঘটনার পর মাখনের দর করিবার সাহস আর কাহারও বড় রহিল না, সুতরাং ক্রয় করাও হইল না। মাখন আনি নাই শুনিয়া জগদীশ বাবু তিরস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলেন, তিরস্কার অপেক্ষা করুণার দাবীই আমাদের বেশী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল।—নির্ব্বিবাদে দুখানি কামরার সম্পূর্ণ দখল লইয়া 'আধজাগা ঘুমঘোরে' Lumdingএর নিকটস্থ হইয়াছি। ষ্টেসনে ষ্টেসনে ঘণ্টানিনাদে জাগরিত হইয়া, দূরবিসর্পী প্রান্তরের প্রগাঢ় নির্জ্জনতায়, সশব্দে ধাবমান বাষ্পযানের গতি-ছন্দে, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আধিপত্য ও মহিষলাঞ্ছিত-বপু যামিনী বাবুর নাসিকা-গর্জ্জনের মাঝখানে তখনই ঢুলিয়া পড়িয়াছি। মধ্যে একটা ষ্টেসনে খাবার বিক্রয়ের বেশ অভিনবত্ব দেখিয়াছিলাম। প্লাটফরমের সীমাপ্রান্তে বিক্রেতার তাঁবু—গাড়ী হইতে আরোহী হাঁকিতেছে—"এই খাবার"; বিক্রেতার গ্রাহ্যও নাই, সে 'আপন কোটে' বসিয়া পরমানন্দে 'ন্যাজ নাড়িতেছে' আর বকিতেছে—"চ্যালে আও, পুরি-মেঠাই লে-নে-ওলা চ্যালে আও"। এ অবস্থায় ক্ষুধাতুরও গাড়ী ফেল করিবার ভয়ে মনকে বুঝাইতেছিল—"কাজ নেই মন মেঠাই খেয়ে।"

Lumding হইতে নূতন গাড়ী ছাড়িতে ভোর হইয়া গেল। একটু পরেই পার্ব্বত্য অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যমালা আরম্ভ হইবে, সুতরাং তৎপূর্ব্বেই আহারাদির ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া লইবার জন্য ধ্রুবজ্যোতিঃ রন্ধনদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া রুটির স্লাইস ও ডিম্বাদি নিপুণভাবে ঘৃতপক্ব করিতে লাগিল, আর নলিন পার্শ্বে বসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার নৈপুণ্য দেখিতে লাগিল।

* * * *

একটু একটু করিয়া বেলা বাড়িতেছিল; একটু একটু করিয়া যবনিকা উঠিতেছিল; একটু একটু করিয়া অপসারিত অবগুণ্ঠনা নিসর্গলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উদ্ভাসিত হইতেছিল।

তিন চারিটা ষ্টেসন পার হইলাম; তিন চারিটা টানেলের অন্ধকারে আলোককে নূতন করিয়া আনিলাম; দুই একটা সেতুও পার হইয়া, ঘড়ি দেখিলাম—নয়টা বাজিয়াছে; পরক্ষণেই নয়ন সমক্ষে—

"নীলে ধবলের চূড়া!—মৃত্যুত্থিত জীবনের মত
দৃশ্য এক দেখিলাম, সসম্ভ্রমে হইনু প্রণত;
দ্রব হয়ে গেল চিত্ত, দেখিলাম এ কি নেত্র-আগে।
বিস্ময়? আনন্দ? স্বপ্ন?—চিন্তা ঊর্দ্ধে—মহা ঊর্দ্ধে লাগে!
সৃজন-প্র্য যে কি এ ´ রাটের বিরাট কল্পনা,
আপনি দেখিয়া মুগ্ধ .পনার অপূর্ব্ব রচনা
বুঝি সে কবির ক !—করেছিলা পার্থ ছিন্ন মায়া
হেরিয়া যে রূপে ৢাস, তাহারি কি অমৃত এ ছায়া?
কেমনে বাখানি আমি? রূপ, না এ আঁখির গৌরব?
প্রাণে প্রাণে একি নৃত্য, অঙ্গে অঙ্গে একি কলরব!"

ইহার পর এ সৌন্দর্য্যের আর কি পরিচয় দিব, কেমন করিয়া দিব? "অন্তরমাঝে সবাই সমান, বাহিরে প্রভেদ ভবে" এই অভিব্যক্তি যদি সত্য হয়, তবে আমার দেশের কবি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া ছাড়া এই দর্শন-আনন্দকে কোন্ নূতনত্বে যথার্থ সত্যরূপে পাইব? এই তপঃপুঞ্জকায় যোগিবর, যিনি "শতশৃঙ্গ বাহুতুলি' স্থিরনেত্রে চাহি" জননী বঙ্গভূমিকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যাঁহার "শুভ্রমেঘ জটাজাল বায়ুভরে" দুলিতেছে, যাঁহার বক্ষপ্লাবী স্নেহ-নির্ঝরিণী অজস্রধারায় "রবিকিরণ বিদগ্ধ বসুধার ওষ্ঠ" সিক্ত করিয়া ছুটিতেছে—এই পাষাণে ঘনীভূত আনন্দ-স্বপ্ন, যাহা "সহস্র

বিশ্রাম

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে।

যোজন জুড়িয়া ব্রহ্মদেশ হইতে তাতার" পর্য্যন্ত "ভারত-লক্ষ্মীর মাথার অক্ষয় হীরক-মুকুটের মত" ঝলমল করিতেছে, যাঁহার "হৃদয়-বীণার নিঝর তারে" মহোল্লাসের কলগীতি অবিশ্রান্ত ঝঙ্কৃত হইতেছে—বিমূঢ় বিস্ময়ে তাহার পানে 'কে তুমি?' এই নিরুত্তর প্রশ্নে চাহিয়া থাকা ছাড়া আর আমরা কি করিতে পারি? চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, ভাবিতে লাগিলাম, সে কোন্ মহাতেজার অভিসম্পাত, যাহার প্রভাবে এতবড় একটা আত্মসমাহিত অম্বর-চুম্বি মহিমাকে, এই মানববিস্ময় অতল-বিশাল-বিরাট হৃদয়-খানাকে অম্নি জমাট পাষাণ-কাঠিন্য প্রদান করিল—অথবা, সে কোন্ বিচিত্রকর্ম্মার বিচিত্র আশীর্ব্বাদ, যাহার প্রভাব এই জমাট পাষাণের ভিতরও প্রেমের কোমলতাকে, ভাবের রসস্পন্দনকে, এমন অভ্রভেদী করিয়া তুলিল, যাহাতে দর্শন-বিগলিত-চিত্ত মানবের সুখদুঃখ একাকার হইয়া প্রাণে প্রাণে অঙ্গে অঙ্গে নৃত্য ও কলরবে ফুটিয়া উঠে।

* * * *

ষ্টেসনে ষ্টেসনে পাহাড়ীরা ফলমূল, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আসিয়া আমাদের খাদ্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল,এবং আমরা পরমোৎসাহে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে টানেলের পর টানেল,সেতুর পর সেতু পার হইতে লাগিলাম। এমন সুমিষ্ট সদ্যগন্ধযুক্ত দুগ্ধ, এত অপর্য্যাপ্ত ফলমূল তিনগুণ মূল্য দিয়াও আমরা পাই না।

এইরূপে, খাদ্য-বৈচিত্র্যে রসনা তৃপ্ত করিয়া—বিচিত্র বর্ণের তরুলতা, বিচিত্র বর্ণের পুষ্পস্তবক দেখিতে দেখিতে—মোনিয়া, টিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য পক্ষীর নয়নরম্য ঝাঁকের ভিতর দিয়া, কলকাকলীমুগ্ধ চিত্তে বেলা প্রায় দুইটার সময় শতাধিক মাইলব্যাপী পর্ব্বতমালা হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেসনের সন্নিকটস্থ হইলাম এবং ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য উত্তর-প্রাচীর-শৃঙ্গগুলি ধীরে ধীরে পশ্চাতে সরিতে লাগিল, তখন মনে মনে এই বলিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম :—

"দাঁড়াইয়া থাক গিরিবর! এম্নি অনন্তের ধ্যানে মগন
মেঘমণ্ডিত চূড়ায় চূড়ায় স্পর্শিয়া নীল গগন—
কল্লোলিয়া যাক্ ঘটনার সম পদতলে জলনিধি
তুমি থাক দৃঢ় দৃঢ় যেইমত আদি নিয়ম ও বিধি"।

কিন্তু হায় এতক্ষণ ধরিয়া যে গভীরতা আমাদের মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, নিমেষেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। নলিনের এ পর্য্যন্ত সাড়া পাই নাই—বহুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পাহাড়গুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া এইবার সে আপন মনে বিস্ময় প্রকাশ করিল; বলিল—"ম্যাপের গায়ের সেই 'শুঁয়োপোকা গুলো' যদি এত বড় পাহাড় হয়, তবে মাথার কাছের সে 'তেঁতুলে বিছেগুলো' না না জানি কত বড়ই হবে!" প্রবাদ আছে, 'মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে'—আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাহার উপমার বাহারের ভিতর দিয়া কোন্ অলক্ষ্য দেবতা আমাদের চিন্তার গাঢ়তাটুকু লঘুহাস্যে চূর্ণ করিয়া দিলেন।

২

লাকসাম্ হইতে সীতাকুণ্ড। খটাং খট্ খট্—খটাং খট্ খট্—খটাং খট্ খট্। লাক্সামে গাড়ী বদল করিয়া নিশীথরাত্রে সীতাকুণ্ডুর দিকে চলিয়াছি—শব্দটা গাড়ীর চাকার।

চারিদিক স্তব্ধ; বিস্তীর্ণ প্রান্তর হা হা করিতেছে; ক্বচিৎ দূরে দূরে জমাট অন্ধকারের মত পাহাড়ের ছায়া আসিতেছে ও ভাসিয়া যাইতেছে—সর্ব্বোপরি, রেলের যোড়ের মুখে ঐ কর্কশ কঠোর শব্দ নৈশপ্রকৃতির পেরেক-বিদ্ধ বক্ষের উপর হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! যে কেহ হয়ত এরূপ শাস্তির যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিত, কিন্তু নৈশপ্রকৃতির মুখে কথাটি নাই—প্রত্যেক আঘাত সে বুক পাতিয়া নীরবে গ্রহণ করিতেছে!

ভোরের একটু আগে, ৺কবিবর নবীনচন্দ্রের বহুস্মৃতি-বিজড়িত 'ফেণী'তে আসিয়া, জায়গাটাকে একবার দেখিয়া লইবার জন্য গাড়ী হইতে নামিলাম, কিন্তু নিশাশেষের আবছায়া দৃষ্টিশক্তিকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় নিরাশ হইতে হইল। সকাল বেলায় মাঠের দিকে চাহিয়া রমেশ বাবু বলিলেন—"এটা যে বাঙ্গলা দেশ নয় তা' কিসে বোঝা যায় বলুন দেখি?" তাঁহার মনোভাবটি দৃষ্টিপথে ধরা পড়িয়া যাইতেছিল—তাহা দেখিয়া লইয়া উত্তর দিলাম—'মাঠের রঙে'। তিনি বলিলেন—"ঠিক; আমাদের দেশে এ সময় ধানের রং এ রকম দেখ্‌বার উপায় নেই, কারণ"—বলিয়া তিনি ধান্যের শ্রেণীবিভাগ ও রঙের তারতম্য ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; কিছুই বুঝিলাম না, কেবল

এইটুকু বুঝিলাম যে, মানুষের কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ফাঁকি'ই প্রশস্ত।

সীতাকুণ্ড। গাছপালাগুলি সবে মাত্র প্রভাতের প্রথম স্বর্ণকিরণে স্নান করিয়া উঠিতেছে, আর আমরাও গোপীনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের প্রেরিত কর্ম্মচারীটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি; তীর্থস্থানে আত্মদানের ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর সন্ধিক্ষণ কখন্ পাইব? ষ্টেসনটির পারিপার্শ্বিক এইরূপ :—

পূর্ব্বদিকে Chinese wallএর মত (যদিও প্রত্যক্ষ করি নাই) চন্দ্রশেখর পর্ব্বত; পশ্চিমে, একটি দক্ষিণাভিমুখী পথ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া, পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত আর একটি পথের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। এই দ্বিতীয় পথটি পশ্চিমমুখে বাজার ও লোকালয়ের ভিতর দিয়া প্রসারিত এবং পূর্ব্বমুখে চন্দ্রশেখরের কোলে পরিসমাপ্ত।

আমরা যখন পৌছিলাম, তখন পাণ্ডা মহাশয়ের যাত্রিনিবাস-কক্ষগুলি সমস্তই পরিপূর্ণ থাকায় তদীয় পুত্র হরকিশোর বাবু একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; পরে 'দরমা পরিপূর্ণ এক ভাণ্ডারগৃহ পরিষ্কার করাইয়া আমাদিগকে স্থান দিলেন। ইনি 'চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য' নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা এবং একজন কৃতবিদ্য সাহিত্যসেবক। যথা-উপদেশ দরমার উপর দরমা সাজাইয়া সমস্ত ঘরটি আমরা matting করিয়া ফেলিলাম এবং এই ভাবিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, এত বড় একপাল জানোয়ারের জন্য এহেন গোয়ালের ব্যবস্থা তীর্থগুরুর অসাধারণ চিন্তাশীলতারই পরিচায়ক। অতঃপর, প্রাভাতিক চা-সেবন করিয়া (পুণ্যাত্মা বন্ধুগণ অবশ্যই করেন নাই) সেই প্রভাতেই একজন গাইড সহ ৺চন্দ্রনাথ দর্শন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ব্যাসকুণ্ড। নগ্নপদে প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া, এক্ষণে আমরা 'ব্যাসকুণ্ড' নামক সরোবর-তীরে সমবেত হইয়াছি। এই ব্যাসকুণ্ডের পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবিশ্বাসীর ভাষায় সংক্ষেপে এই :—

তপস্যানিরত ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণের 'মুখ-ঝাম্টায়' কাশীক্ষেত্রে 'কলিকা' না পাইয়া, ব্যথিতচিত্ত ব্যাসদেব যখন ক্ষেত্র-ত্যাগে উদ্যত, বৃষারূঢ় মহাদেব তখন তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, চন্দ্রশেখর-গমনের উপদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে এইখানে আসিয়া তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তপস্যাতুষ্ট মহাদেব তাঁহাকে 'বরং বৃণু' বলায়, ব্যাসদেব 'তিষ্ঠ সিন্ধু সমীপে চ শ্রীচন্দ্রশেখরে হরঃ' এই শুভবর প্রার্থনা করেন। "তথাস্তু" বলিয়া মহাদেব ত্রিশূল প্রোথিত করিবামাত্র, এ স্থান কুণ্ডরূপে পরিণত ও জলপূর্ণ হইয়া যায় এবং অভ্যন্তর হইতে ধূম বেষ্টিত অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে থাকে। আনন্দিত ব্যাসদেব এতদ্দর্শনে পাষাণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পুষ্করিণীতীরে পরব্রহ্মধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন।

পর্ব্বতারোহণের পূর্ব্বে পুষ্করিণীটির চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। পশ্চিম পাড়ে একটি মন্দির, মধ্যে ধ্যানমগ্ন ব্যাসদেব; উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রসারিত শতশাখায় একটি অশ্রুতপূর্ব্বনামা বৃক্ষ—নাম বটুবৃক্ষ—উকারান্ত নামকরণ বোধ হয়, বটগাছের সহিত সাদৃশ্যশূন্যতা সূচনাকল্পে; ইহা ব্যতীত ভৈরবের মন্দির, বাঁধাঘাট ও ঘাটের সোপানে কি এক উৎকীর্ণ-লিপিও যেন ছিল।

জ্যোতির্ম্ময়। ব্যাসকুণ্ডকে দক্ষিণে রাখিয়া বক্রবিসর্পিত পার্ব্বত্যপথে উপরে উঠিতে উঠিতে একস্থানে

বাড়বানল

আজানুপঙ্কমগ্ন হইয়া আমরা নিম্নে নামিলাম ও 'জ্যোতির্ম্ময়' দর্শন করিলাম। উপর হইতে ঝরণার জল ঝরিয়া পড়িতেছে এবং জলসিক্ত পাষাণ-গাত্রের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে—দৃশ্য প্রকৃতই মনোরম। জলের ঝাপ্‌টা দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং ৮।১০ মিনিট বাদে আবার জ্বলিয়া উঠে; অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য না থাকিলে 'দেশালাই' ব্যবহার করিয়া কৌতুক দেখিতে পারেন। পৌরাণিক আখ্যায় ইহা 'শিবের নেত্রানল'—বৈজ্ঞানিকবাণী অবশ্য স্বতন্ত্র।

কালীবাটী ও স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির।

এখান হইতে আরও খানিকটা চড়াই ঠেলিয়া, কালীবাটীর সম্মুখে আসা যায়। এই মন্দিরের অল্প উত্তরে ১০০টি ইষ্টকসোপান স্বয়ম্ভুনাথ-মন্দির সংলগ্ন নহবৎখানায় উঠিয়াছে —এ নহবৎখানা চট্টগ্রামের ৺প্রভাবতী চৌধুরাণীর অর্থ-সাহায্যে নির্ম্মিত। আমাদের গাইড্ বলিলেন "এইখানে পূজা দিতে হইবে।" আমরা বলিলাম—"ফিরিবার পথেই উহা সুবিধাজনক নহে কি? এখন বেলা বাড়াইয়া ফেলিলে অবশেষে রৌদ্রে কষ্ট পাইতে হইবে।" গাইড্ বলিলেন— "বেশ, সেই ভাল, তবে এই বেলা স্নান সারিয়া লউন, উপরে আর সুবিধা নাই।" যথা-পরামর্শ আমরা একে একে মন্দির-সংশ্লিষ্ট জলের কলে স্নানাদি শেষ করিয়া চড়াইএর মুখে অগ্রসর হইলাম।

বিরূপাক্ষ মন্দিরগামী-পার্ব্বত্য-পথ। এতক্ষণ বেশ উঠিতেছিলাম; কোথাও সোপান, কোথাও চড়াই, কোথাও সমতল পাওয়ায়, পাহাড়ের বিশেষত্ব অনুভবই করি নাই; কিন্তু এইবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এমন একটি জংসনে পৌছিলাম, যেথান হইতে দুইটি পথ উর্দ্ধে গিয়াছে এবং মধ্যে একটি ঝরণার ধারা প্রবলবেগে সুদূর নিম্নভূমিতে ছুটিতেছে—পথদ্বয়ের একটি সোপানপথ, আর অপরটি দর্শক-ভীতিকর 'সম্পূর্ণ খাড়াই'—ভীষণ পাষাণ-পঞ্জর!

আমি ত দেখিয়াই অবাক! এই পথে মানুষ উঠিতে পারে! বলিলাম, "আমি এই সিঁড়ি দিয়া যাইব।" রমেশ বাবু বলিলেন—"বলেন কি আপনি? সিঁড়ির ধাপগুলো কত উঁচু উঁচু দেখ্‌ছেন, এই রকম প্রায় ৮০০ ধাপ ভেঙ্গে ওঠা কি বড় সহজ ব্যাপার! পা ভেঙ্গে আস্‌বে, তা' ছাড়া পৌছতেই বেলা একটা বাজ্‌বে।"

আমি বলিলাম—"বাজুক মশাই, তবু পৌছতে যে পার্‌বো তা' নিঃসন্দেহ—কিন্তু ও পথে পৌছান যাবে, এ আশা খুব কম; দর্শনের আগেই মোক্ষলাভে আমার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে।"

রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কোনও ভয় নেই, আসুন আপনি; এইটুকুই যা' কষ্ট, তারপর বেশ পরিস্কার রাস্তা।"

'ভগবান! এ কি দারুণ সমস্যায় ফেলিলে!'—মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তাহার উপর জগদীশ বাবু, যামিনী বাবু প্রভৃতিও রমেশের পক্ষে ওকালতী আরম্ভ করিলেন,—"চলুন মশাই, young man আমরা" ইত্যাদি।

পূর্ব্বদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সমস্ত পথ রীতিমত পিচ্ছিল হইয়াছিল। যতই পথটা চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ততই তাহাদের এই দুঃসাহসিকতায় মর্ম্মে মর্ম্মে চটিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বিধা করিতে করিতে ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সঙ্গিগণের উপর, তৎসহিত বিশ্বটার উপরও, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। 'যাক্—পড়ে ত মরবোই, তবে নেহাৎ একলা যাচ্চি নে, আরও দু'এক-টাকেও সহমরণে যেতে হবে'—বলিলাম—"চল, না মেরে ত আর ছাড়্‌বে না।" ইহারা যতই হাসিতে লাগিল, বর্দ্ধিত রোষে ততই আমি অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলাম।

প্রথমে রমেশ বাবু, তৎপরে ধ্রুব, তৎপশ্চাতে আমি—তৎপরে গাইডের পশ্চাতে ধূমকেতুর ল্যাজের মত বাকী দল! শুনিয়াছিলাম, ব্যাস-কাশীতে মরিলে গাধা হয়—ব্যাসকুণ্ডুরও যে ঐরূপ কোনও মাহাত্ম্য থাকা বিচিত্র নয়, এম্‌নি একটা ধারণা, পূর্ব্ব হইতেই মনে জাগিয়াছিল। মরা ত পরের কথা, স্নানও করি নাই—তথাপি কেবলমাত্র দর্শনের ফলে—হা ঈশ্বর—শুধু দর্শনের ফলে আমরা আজ এ কি অদ্ভুত চতুষ্পদ হইলাম! হায়, হায়, হায়, এই পর্ব্বতারোহণভঙ্গীর যদি কেহ ফটো লইয়া সাধারণ্যে প্রচার করে, তবে সে—নাঃ, মনে করিতেই কান্না আসিতেছে।

সে কথা আর কি বলিব? হস্ত ও পদ তখন সহজেই

চরণের কর্ত্তব্য ভাগ করিয়া লইয়াছে ; হাত বলিতেছেন—"দেখিস্ ভাই পা, গণ্ডগোল বাঁধাস নে, আমি শেকড় কি মাটি আঁকড়ে ধর্‌ছি, তুই সুবিধে দেখে আপনাকে দাঁড় করা।" পা বলিতেছেন—তুইও খুব হুঁসিয়ার থাকিস্ ভাই, যেন পচা শেকড় ধরিস্ নে।" এইভাবে প্রথম ধাক্কাটা ত সামলাইয়া উঠিলাম। মোড় ফিরিয়াই দেখি, আবার একটা—তেমনি উঁচু, তেমনি খাড়াই, আর, সুবিধার উপর আবার রাস্তার মাঝে মাঝে ঝরণার জল চলিতেছে! রমেশ বাবু বলিলেন—"বেশ সাবধানে উঠ্‌বেন, এর পর আর ভয় নেই।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, বলিলাম—"ধন্যবাদ!"

তাহার পর, আবার একটা—আবার একটা—আবার একটা! Hopeless—hopeless! হায় রে, আর ফিরিবারও উপায় নাই—নিম্নে চাহিলেই মনে হয়, এই বুঝি পড়িয়া গেলাম! গায়ে জোঁক ধরিতেছে, ছাড়াইবার উপায় নাই! কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, মুছিবার সময় নাই! সমস্ত প্রাণ, মন, শক্তি, হাতে আর পায়ে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে—অন্য চিন্তার অবসর নাই! কোনও কোনও স্থলে পিচ্ছিল গিরিগাত্র বহিয়া আর একটি সংলগ্ন গিরিগাত্রের খাড়াই-সম্মুখে পড়িতেছি—সংকীর্ণ পথ, একটি মানুষ কোনপ্রকারে যাইতে পারে—নিম্নে অতল গুহার গভীর খাদ। একটু সুবিধা এই ছিল যে, আমাদের নিম্নগামী দৃষ্টিশক্তি লতা-গুল্মের আবরণে কতক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছিল।

যামিনী বাবু অতিরিক্ত রকম হাঁফাইতেছিলেন; শুষ্কতালু জগদীশ বাবুর বমন-উপক্রম হইতেছিল এবং তাঁহার চরণযুগলের ইলেকট্রো-কম্পনদর্শনে বুদ্ধিমান নলিন সভয়-ভঙ্গীতে সরিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। নলিনের চক্ষুর্দ্বয় ঠিকরাইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তখনও তাহার মাথায় বুদ্ধিটুকু দিব্য সজাগ ছিল—জগদীশ বাবুর পদ-স্খলনের সহিত পশ্চাতস্থিত নলিনের ভবিষ্যৎ যে কি-ভাবে চেপ্টা হইয়া পর্ব্বত নিম্নে নিরুদ্দেশ হইবে, তাহা তখনও সে চিন্তা করিতে সক্ষম ছিল। এইরূপ প্রাণপণ পরিশ্রমের পর বহুপুণ্যফলে একটু সমতল পাইলাম; জগদীশ বাবু সেই জোঁকের রাজ্যে শুইয়া পড়িলেন—একেবারে বাত্যাহত কদলীবৃক্ষবৎ।

তখন রমেশ বাবু আর তাঁহার উকীলগণের উপর আক্রোশে আমার প্রত্যেক হাড়খানা আগুন হইয়া উঠিয়াছে—এ অবস্থায় রমেশ বাবু আসিয়া যখন বলিলেন "মশাই, আসুন আসুন, কি চমৎকার দৃশ্য দেখ্‌বেন আসুন"—তখন—কি বলিব—আমার সর্ব্বশরীর যদি অবসন্ন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে—যাক্, আর কথা কহিতে পারিতেছি না!

এইখানে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ও বক্ষের স্পন্দনকে কতকটা সহজ অবস্থায় আনার পর আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। রমেশ বাবু ভলফ করিয়া বলিয়াছিলেন, আর এরূপ দুর্গম খাড়াই নাই—আশ্বস্তও হইয়াছিলাম—কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই দেখি, আবার সেই কাণ্ড! না মশাই, এরা খুনে—সত্যই খুনে! তখন আমার জ্যোতিঃ শরীরের (Astral body?) মধ্যে, ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, হতাশায়, পরস্পর interpenetrated হইয়া যে ভাবতরঙ্গ ফেনাইয়া উঠিতেছিল, যদি কোনও অতীন্দ্রিয়-পদার্থ-দর্শনক্ষম তাহা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে 'থিয়সফি'র রত্নভাণ্ডার আর একখানি বিশেষ-চিত্র উপহার পাইত। এইরূপ ভাবের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত বিশ্ব যখন আমার দৃষ্টির অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, ঠিক সেই সময় সম্মুখের গিরিসঙ্কট হইতে মধুর বালককণ্ঠের এক পরিপূর্ণ উৎসাহবাণী কর্ণে প্রবেশ করিল :—

"জয়, বাবা চন্দ্রনাথ জী কি জয়"!

বালকের উৎসাহ বাণী।—বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় আমার অন্তরের সহস্রতারে সেই বালককণ্ঠ-সমুত্থিত জয়ধ্বনি কাঁপিয়া উঠিল—বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় আমার সমস্ত বিরুদ্ধবৃত্তি ঐ আচম্বিত স্বরের আঘাতে আনন্দে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটিমাত্র তারে বাজিয়া উঠিল!

"জয়, বাবা চন্দ্রনাথ জী কি জয়।"

আবার—আবার! কে তুমি বালক-প্রচারক, এমন আশ্বাসে এমন পরিপূর্ণ উৎসাহে এমন মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে করিতে এ হেন দুর্গম গিরিবর্ত্ম বহিয়া উপরে উঠিতেছ? লজ্জায়, হর্ষে, উৎসাহে, গর্ব্বে নয়নদ্বয় বাষ্পে ভরিয়া আসিল—প্রাণ মাতিয়া উঠিল, শিহরিয়া উঠিল; মিথ্যা বলিব না—চন্দ্রনাথ নয়, বিরূপাক্ষ নয়—ঐ বালক-টিকে দেখিবার বিপুল আগ্রহেই বাকীপথ যন্ত্রচালিতের

ন্যায় অনায়াসে অতিক্রম করিলাম, এবং যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় গাহিতে চাহিল :—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ
ওরে দীন, তুই যোড় করি কর, কর্ তাহা দরশন।"

বালকটির বয়স ৬।৭ বৎসর মাত্র—সঙ্গে তাহার জনক ও জননী। এই জননীর শ্রদ্ধাস্নাত শান্তপ্রসন্ন আননখানির পানে চাহিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, বালকটির এত উৎসাহের ভিত্তি কোথায়? বহুসন্তানের জনক জগদীশ বাবু বিরূপাক্ষের মন্দির পার্শ্বে অশ্রুপ্লাবিতগণ্ডে এই

৺চন্দ্রনাথ

বালকের মুখচুম্বন করিলেন, তাঁহার জননীর নয়নদর্পণে বাৎসল্যের অমৃত-সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল—আর সেই পবিত্র দৃশ্য-তীর্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি প্রাণের ভিতর হইতে শুনিতে লাগিলাম—"চন্দ্রনাথ জী কি জয়"!

চন্দ্রনাথের মন্দির-ছায়ে।—এখান হইতে চন্দ্রনাথের মন্দির আরও উর্দ্ধে—আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে। এখানে যখন পৌছিলাম, বালকটি তখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি, যতই তাহার পানে চাহিতেছিলাম, ততই যেন 'মহাজনারণ্য মাঝে নিস্তব্ধ নির্জ্জনে' প্রাণের সুদূর পুরী হইতে বারংবার শুনিতেছিলা —"জয়, বাবা চন্দ্রনাথ জী কি জয়।" মন্দির সম্মুখের ত [illegible] বেদির উপর বসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলাম—দিগ্ [illegible] লতাগুল্মশস্যরাজির বর্ণবৈচিত্র্যরঞ্জিত প্রান্তরসমূহ প্রগাঢ় মিলনে জড়াজড়ি করিয়া, বঙ্কিম-গতি নদনদ গুলিকে বঙ্গোপসাগরের অসীমায় প্রাণ ঢালিবার ইঙ্গিত করিতেছে; লোহিতে, পীতে, শ্যামলে, শুভ্রে, হরিতে, হিরণে দলাদলি ভুলিয়া, যেন গলাগলি করিবার জন্যই আকুল হইয়া উঠিয়াছে; আর এই ভুবনভুলানো আলিপনার দাক্ষণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত বারিরাশির অচঞ্চল নীলিমা আরও বড় মিলে—আকাশনীলে হৃদ মিলাইয়া দিয়াছে! দেখিলাম, অতৃপ্ত-নয়নে দেখিতে লাগিলাম! মনে হইতে লাগিল, যেন এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরতম বাণীটুকুই আজ ঐ মানবশিশুর 'বহুজনের একটি কণ্ঠে,' 'বহু মনের একটি সুরে' আমার প্রাণের ভিতর নাচিয়া নাচিয়া শুনাইতেছে—"জয়, বাবা চন্দ্রনাথ জী কি জয়"! জয়, জয় সেই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা পৃথিবীনাথের, সেই কেন্দ্রীভূত-প্রেমরূপী-মহাশক্তিমানের, যাঁহার নিক্ষর্ষিত প্রেম-জ্যোতিঃ কাল ও ব্যাপ্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কোটী কোটী জগৎ প্রসব করিয়া, ভাবে স্পন্দিত, রূপে বিকশিত, রসে প্রবাহিত ও শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া, ঐ বালককণ্ঠে বাণীতে ফুটিয়া, তাহার জননীর আননে প্রসন্নতায় ফুলিয়া, জগদীশের স্নেহাশ্রুতে গলিয়া, আজ আমার হৃদয়ে আনন্দরূপে বাজিয়া উঠিয়াছে!

৩।

প্রত্যাবর্ত্তন পথে।—আরোহণ-ক্লান্তি ও অবতরণ-চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়া, অন্তরের আনন্দরস যখন এইরূপে জগতের বাহ্যরূপটাকে নূতন অর্থে কল্পিত করিতেছিল, ঠিক সেই সময় যামিনীবাবুর চকিত আহ্বান-কষাঘাতে আমার শান্তির তন্দ্রা সহসা আর্ত্তনাদের জাগরণে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন—"চলুন, নাব্‌তে হবে না?"

একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"নিশ্চয়ই হবে; যখন ওঠ্‌বার আর পথ পাওয়া যাচ্চে না, তখন নাব্‌তে হবে বৈ কি!"

মন্দির হইতে দক্ষিণমুখে কিয়দ্দূর 'উৎরাই' আসিয়া

সোপান-পথ পাওয়া গেল এবং ৭৮২টি সোপানের চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই পূর্ব্ব-কথিত জংসনে উপনীত হইলাম। অতঃপর, উৎরাইএর মুখে মাধ্যাকর্ষণের টানে আমরা বিনা আয়াসে ছুটিতে বাধ্য হইলাম। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে পৌছিবার পূর্ব্বে একস্থানে প্রায় ৫০টি সোপান নিম্নে নামিয়া 'পাদগয়া' নামক একটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

প্রকাশ 'পাদগয়া' মন্মথ নদতটে অবস্থিত; আমরা কিন্তু নদের পরিবর্ত্তে এক সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যজলধারামাত্র দেখিয়াছিলাম। স্থানটি বেশ নির্জ্জন, নির্ঝরগীতিধ্বনিত ও শান্তিময়। সন্তোষের জমীদার ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরীর স্মৃতিকল্পে তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা দিনমনি চৌধুরাণী অজস্র অর্থব্যয়ে এই স্থানের মন্দিরটি ১৩১২ সালে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ মন্দিরের চতুর্দ্দিক অনাবৃত, অর্থাৎ প্রাচীর তুলিয়া আকাশ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে পৃথক্ না করিয়া রেলিংএর সাহায্যে তাহাদের সংযোগ রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের ছাদ কতকগুলি লৌহস্তম্ভের উপর রক্ষিত, ভূমিপৃষ্ঠে সিমেণ্ট করা, একপার্শ্বে একটি নাতিগভীর চতুষ্কোণ কুণ্ড, তন্মধ্যে প্রবাহিত জলধারা। যাত্রিবর্গ ঐ কুণ্ডে পিণ্ডাদি দান করিয়া থাকেন। 'ঊনকোটি শিব' 'পাতালপুরী' প্রভৃতি আরও অনেক দর্শনীয় ছিল, কিন্তু আমাদের পুণ্যের বোঝা ইহার পূর্ব্বেই যথেষ্ট ভারী হইয়াছিল।

ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া এদিনকার মত বাসায় ফিরিলাম। পাণ্ডা মহাশয়ই এ যাত্রা আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখানকার আহারের একটু বিশেষত্ব আছে; ডাল জিনিষটাই এখানে তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়, উহাকে ভাতের আনুষঙ্গিক ধরিয়া সমস্ত মিশ্রিত পদার্থটার উপর দ্বিতীয় ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয় না; তবে, ডাল রাঁধেন এঁরা চমৎকার—আমাদের দেশে এত সুন্দর ডাল-রান্না দেখি নাই।

* * * *

বাসায়।—অপরাহ্ণে নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু চলৎ-শক্তি ফেরৎ পাইবার পূর্ব্বে আঠারখানি পায়ের জন্য দুবাটী উত্তপ্ত সরিষাতৈল খরচ হইয়া গেল। জগদীশ বাবু ও অন্যান্য গৃহস্থ বন্ধুগণ বাজার করিতে বাহির হইলেন; রমেশ, ধ্রুব ও আমি আহারকালে উপস্থিত হইবার শুভ-পরামর্শ করিয়া, লোকালয়ের বাহিরে, মাঠের দিকে ধাবিত হইলাম। অনেকদূর চলিয়া "পশ্চাতে মাঠ, সম্মুখে বাগান মধ্যে গ্রাম্যপথ" এম্‌নি একটা রাস্তার বাঁকে বসা গেল এখান হইতে বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথের মন্দিরচূড়া দেখা যাইতেছিল; রমেশ বাবু বলিলেন—"দৃষ্টির অগ্রে, নির্দ্দিষ্ট পদার্থের ক্রমক্ষুদ্রত্ব হিসাব ক'রে, স্থানের দূরত্ব কষ্‌বার কোনও অঙ্ক-প্রণালী আছে কি?" কথাটা না বুঝিতে পারায় তিনি বলিলেন—"ধরুন, ঐ চন্দ্রনাথের মন্দিরটা ১৫ হাত উঁচু, এখান থেকে কিন্তু এক হাত মাত্র মনে হচ্চে; আমরা যে কতদূর এসেছি, সেইটে দৃষ্টিশক্তির standard ঠিক করে নিয়ে কষা যায় না?"

ধ্রুব বলিল—"Astrology'র ভেতর এরকম প্রণালী থাক্‌তে পারে—ঠিক জানি না। রমেশ বাবুর গতিক খারাপ দেখিয়া আমি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। বলিলাম—"আচ্ছা মশাই, A. B. Railwayতে আমাদের গাড়ী যতটা উঁচুতে উঠেছিল, তার চেয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড় উঁচু না নীচু?"

রমেশ বাবু বলিলেন—"অনেক নীচু, অনেক নীচু; সেই Bridgeগুলোর ওপর থেকে নীচের বাঁশবন কি রকম ঘাসের মত বোধ হচ্ছিল ভাবুন দেখি! আর অতই বা কেন, সেই Loopটার কথাই মনে করুন না—তার পরও ত যথেষ্ট উঠেছিলাম"। ধ্রুব বলিল—"তা' হোক্, তবু বড় বেশী নীচু নয়, প্রায় সমান হবে"। একটা তর্ক বাঁধিত, কিন্তু সন্ধ্যাদেবী সাবধান করিয়া দিলেন।

এদিন মহাষ্টমী তিথি ছিল। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বাজারের নিকট একটা বাড়ীতে আমরা দশভুজার সন্ধ্যারতি দেখিয়া আসিলাম; ঐ একটিমাত্র বাড়ীতেই প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছিল। পাণ্ডা মহাশয়ের বাটীতেও দুর্গাপূজা হইতেছিল, কিন্তু তাহা পট-পূজা। ঘট, পট ও প্রতিমাপূজার মধ্যে পটপূজা এইখানে এই প্রথম দেখিলাম।

রাত্রে জগদীশ বাবু পোলাও বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার রন্ধনের যে আমরা গুণগ্রাহী, তাহা প্রবন্ধারম্ভেই সূচিত হইয়াছে। এক্ষণে, পরমানন্দে সে গুণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং প্রত্যূষে 'বাড়বানল' ও 'সহস্রধারা' সন্দর্শনে যাইব স্থির করিয়া শয়ন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

কুঞ্জ-ভঙ্গ

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, M.A.B.L.]

আজ, কত যুগের যোগে, কত জন্মের সাধনায়, ভক্তের সাধন-কুঞ্জে—শরীরিণী ভক্তি-রূপিণী রাধিকার মানস-কুঞ্জে আরাধিতের শুভাগমন ঘটিয়াছে। সংসার ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, রসিক-শেখরের রস-শরীর প্রেমার্দ্র বক্ষে ধারণ করিয়া, পুলকাঞ্চিত ভুজপাশে বাঁধিয়া, কিশোরীর রস-দ্রব হৃদয় আজ সমাধি-মগ্ন, সুষুপ্তির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত। প্রাণ বন্ধুর দেহাতীত প্রেমময় স্পর্শে দেহের চেতনা বিলুপ্ত। সুখাতিশয্যে সুখানুভূতি বিবশা। ভাব-তরঙ্গ ধ্যান-সিন্ধুর অতল-দেশে সুপ্ত। নাথ-সঙ্গম জনিত আনন্দের অমৃত-ধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত। নিদ্রার পালঙ্কে আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্ত্তি একাঙ্গীকৃত—যেন 'বহু'-ভাবময়ী দ্বৈত-বুদ্ধি—অদ্বৈতানুভূতির একত্বে অধিষ্ঠিত !

মীটল চন্দন টুটল অভরণ,
..ছুটল কুন্তল-বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলী,
ধূসর দুঁহু মুখচন্দ॥
হরি ! হরি ! অব দুঁহু শ্যামর গোরী !
দুঁহক পরশে রভসে দুঁহু মুরুছিত,
শূতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণ পঁহু আপি'।
নওল কিশোরী আগোরি কোলে পঁহু
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥
কিএ মদন-শর- ভীত হি সুন্দরী
পৈঠল পিয়-হিয়-মাহ।
কব বলরাম নয়ান ভরি' হেরব,
করব অমিয় অবগাহ॥

[খলিত—স্খলিত ; অব—এখন ; পঁহু—প্রভু ; পৈঠল—পশিল ; মাহ—মধ্যে।]

যিনি মদন-মোহন,যাঁহার চিন্ময় তনুর স্পর্শে ভোগেন্দ্রিয়-গণের রূপাদি বিষয়জ মত্ততা নির্ব্বাপিত হয়, যাঁহার অকৈতব প্রেমের আস্বাদনে সংসারের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, দেহের সম্ভোগ-বাসনা আপনা আপনি পরিতৃপ্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, সেই অপ্রাকৃত মদনের জনয়িতা শ্যামসুন্দরের অমৃতময় বক্ষে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন, সংসারের কামনা-কণ্টক, মদনশর আর তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। তাই বুঝি আজ ব্রজ-সুন্দরী ব্যাধশর-ভীতা কুরঙ্গিণী-বৎ জগদাশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রের নিবিড় মর্ম্ম-গহনে মুক্তির আশায় প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তথায় আশ্রয়লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিঃশঙ্ক অন্তরে নিদ্রামগ্ন হইলেন !

দেখিতে দেখিতে মিলন-রজনীর শুভ্র জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিল, কুঞ্জ-ভঙ্গের সময় হইল, সমাধি-ভঙ্গের উপক্রম ঘটিল। কৃষ্ণ-গত-প্রাণা প্রেমময়ী রাধিকা বুদ্ধি-দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যান-কক্ষে কৃষ্ণ-বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন ; প্রেমের রত্ন-প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিবিয়া গিয়াছিল ; সোহাগের সুগন্ধি ধূপ কক্ষময় আপনার গন্ধ-সম্ভার পুড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নিঃশেষভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল ; শান্তির বিমল চন্দ্রালোকে সুষুপ্তির গাঢ় স্তব্ধতা, মহাভাবের সান্দ্র নীরবতা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে সংসারের ভগ্ন-দূত লোক-লজ্জারূপী

কোকিল গাহিয়া উঠিল, শাল-সঙ্গে ১-রূপা শুকসারী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল :—

"রাই জাগো, রাই জাগো" সারী শুক বোলে।
"কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকের কোলে॥"

ধ্যান ভঙ্গে অৰ্দ্ধ বাহ্যদশায় রাই-কমলিনী স্বপ্নাতুর নেত্র-পল্লব একবার ঈষৎ উন্মীলন করিলেন। কিন্তু পার্শ্বে—

নাগর হেরি' পুন হি দিঠি মুদল,
পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে।

এমনি ঘটিয়া থাকে। বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে দেহের কূলে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে; কিন্তু সেই অৰ্দ্ধ-জাগরণের মৃদু আঘাতে যোগারূঢ় চিত্ত, ক্ষুদ্র লোষ্ট্রনিক্ষেপে ঈষদান্দোলিত সরোবরবৎ কিঞ্চিন্মাত্র বিলোড়িত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যান-সাম্য প্রাপ্ত হয়। তখন সংসারের কোলাহল, দরদী সঙ্গিগণের সশঙ্ক আহ্বান, শ্রুতির ভিতর দিয়া, চিত্তের বাহ্যস্তরে তরঙ্গিয়া উঠে; কিন্তু নিগূঢ় মর্ম্ম মধ্যে তাহার কঠোরতা প্রবেশ করিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে নবোত্থিত ধ্যান প্লাবনে, নিঃস্বপ্নতার খরস্রোতে নেত্রপুট পুনরায় ঢুলিয়া পড়ে; প্রাণ-বন্ধুর শীতল স্পর্শে শারীর চেতনা তন্ময়তার অগাধ সলিলে আবার ডুবিয়া যায়!

জীবন-সঙ্গিনী সখীগণ কলঙ্ক-শঙ্কায় কাতর কণ্ঠে শ্রীমতীর উদ্দেশে বলিতেছেন :—

"কি জানি সজনি! রজনী ভোর,
ঘু—ঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী, জিত-দামিনী কামিনীকুল লাজে।
ফুকরত হত-শোক কোক,
জাগহুঁ অব সব লোক,
শুক সারী'ক কল-কাকলী নিধুবন ভরি' আজে॥"

কিন্তু সখীগণের সেই আকুতিধ্বনি কিশোরীর গূঢ় মর্ম্ম-কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলিতে পারিতেছে না। সেই অরুণোদ্ভাসিত মিলন-কুঞ্জে—

তড়িত-জড়িত জলদ-ভাতি
দোঁহে সুখে শুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস-বাদর শেষে।
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী
ঘুমল বিমল কমল-বরণী,
কৃত-লালিস ভুজ-বালিশ আলিস নাহি তেজে॥

বুঝি সখীদিগের সেই জাগরণ-চেষ্টা বিফল হইল! অথবা সহচরীবৃন্দের মৃদু ভৎর্সনায় যদি বা শ্রীমতী জাগরিত হইলেন, তথাপি সেই ধ্যান-ভঙ্গ-জনিত জাগরণ প্রেমালিঙ্গিত ভুজ-বন্ধন শিথিল করিতে পারিল না, সঙ্গম-সুখ-নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত করিতে পারিল না, চিত্তের তন্ময়তা খণ্ডিত করিতে পারিল না।

শুনইতে জাগি রহল দুঁহু ভোর।
নয়ান না মেলই, তনু তনু জোর॥

আহা! ধ্যানযোগে সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয় যদি প্রাণ-বল্লভের প্রীতি-বন্ধনে বাঁধা পড়িল, তবে কে এমন হতভাগিনী আছে যে, সেই চির-বাঞ্ছিত বন্ধন-পীড়ার সুখময়ী বেদনা ভুলিয়া পুনরায় সংসারের তুচ্ছ সুখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে? ধ্যান-স্তিমিত লোচনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কে মন্দভাগিনী আছে যে, চক্ষু খুলিয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন ধরণীর কঠিন স্পর্শে নিষ্ফল করিয়া দিবে? তাই জাগরণে নিদ্রা-ভাণ করিয়া, শ্রীমতী নাথ-স্পর্শের নিবিড়তায় নিমগ্ন রহিলেন।

সখীগণ তৈখনে করে অনুমান।
কপট কোটি কত করত ভিয়ান॥

হায়! কতক্ষণ আর কিশোরী কপট-নিদ্রার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিবেন? সখীগণের শাসন-বাক্যে কপট কোপে, উপেক্ষা সম্ভব। কিন্তু তাহাদের কাতর বাণী, প্রাণসখীর কলঙ্ক-শঙ্কায় তাহাদিগের ব্যাকুলতা শ্রীমতীকে চঞ্চল করিল। রুদ্ধ রোদনের প্রবলতা অন্তরে চাপিয়া, আসন্ন বিপুল উৎকণ্ঠা চিত্ত মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া, প্রাণনাথের আকাঙ্ক্ষিত বাহু-বন্ধন শিথিল করিয়া, শিশির-

সিক্তা ব্রজ-কমলিনী সখী কর অবলম্বনে ধীরপদ গৃহপানে গমন করিতে লাগিলেন—যেন বৃন্তচ্যুত পুষ্প সুমন্দ মলয় সমীরণে বাহিত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে ভাসিয়া চলিল! প্রেমিকযুগলের সেই "কুঞ্জভঙ্গ" বিষয়ক নিশান্ত বিদায়ের বিচিত্র চিত্র বৈষ্ণব কবির অমর তুলিকার অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে। যথা:—

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন
দোঁহে দুঁহু বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম-পয়োনিধি,
নয়ানে গলয়ে ঘন বারি॥
কাতর নয়ানে হেরইতে দোঁহে দোঁহা,
উথলল প্রেম-তরঙ্গ।
মুরুছল রাই, মুরছি পড়ি মাধব,
"কব হ'ব তাকর সঙ্গ॥"
ললিতা "সুমুখি! সুমুখি!" করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী "কানু! কানু!" করি ফুকরত,
ঢরকত লোচন-লোর॥

[উয়ল—উদিল; তাকর—তাহার; আগোর—আগুলিল; ঢরকত—ঢলিল।]

তখন, যে লোক-নয়ন-রূপী নিষ্ঠুর দিবাকরের রোষারুণ উপহাস-দৃষ্টির ভয়ে সখীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রভাত-সূর্য্যের আলো-দীপ্ত কুঞ্জ পথে দাঁড়াইয়া, লোক-লজ্জা ভুলিয়া, নিন্দা-গঞ্জনা তুচ্ছ করিয়া, সহচরীবৃন্দ রাধার চৈতন্য-সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন।—

কতি গেও মারুণ কিরণ-ভয় দারুণ,
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ এত হুঁ নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত॥

[কতি—কোথায়; গেও—গেল, উদভট—উদ্ভট।]

অন্যত্র:—

পদ আধ চলত, খলত পুনবেরি।
পুন ফিরি চুম্বই দুঁহু মুখ হেরি॥
দুঁহু জন-নয়ানে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখীগণ চলই ন পার॥

[পুনবেরি—পুনর্ব্বার; রোই—কাঁদিয়া।]

প্রেম-রাজ্যে ক্ষণিকের অদর্শন যুগ-বিরহবৎ অনুভূত হয় সত্য; কিন্তু সেই আকুলতা ভগবানের ক্ষণিক অদর্শনে ভক্তের হৃদয়ে কতদূর তীব্র হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত—আমাদের গৌরচন্দ্র। মনে পড়ে—একদা শ্রীগৌরাঙ্গ, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সমীপে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হইয়া, চির-সুন্দরের অমৃত-স্যন্দী বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাভাবের প্রবল বন্যায় বাহ্য বোধ বিলুপ্ত হইল; সন্ন্যাসীর তপঃক্লিষ্ট সুগৌর দীর্ঘ দেহ বাতাহত কদলী-তরুবৎ পাষাণ-ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। সঙ্গীগণের অবিশ্রান্ত কৃষ্ণ-ধ্বনিতে যখন বাহ্য দশা ফিরিতে লাগিল, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিগ্রহ-সন্নিধান হইতে দূরে আশ্রমের দিকে লইয়া চলিল। যন্ত্রচালিতের ন্যায় নত-নেত্রে কয়েকপদ মাত্র গমন করিয়াছেন—সহসা দীর্ঘায়ত নেত্র-পল্লব তুলিয়া প্রেমোন্মাদী সন্ন্যাসী বিগ্রহ-বদন পুনর্ব্বার অবলোকন করিলেন। আর চরণ চলিল না, নেত্র-পলক পড়িল না, বাক্য ফুটিল না! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাব-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দুলিতে লাগিলেন! পুলক-কদম্ব-মুখে রক্তরেণু জমিতে লাগিল! সম্ভ্রম সঙ্কোচ লোক-লজ্জা লুকাইল! অঙ্গাবরণ ভূমিতে লুটিতে লাগিল! যে চিত্ত ভগবানের চিন্ময়মূর্ত্তিতে তন্ময় ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা তন্ময়তার সীমা ছাড়াইয়া না জানি অনুভবাতীত কোন্ শূন্যে উড্ডীন হইল, কে তাহার সন্ধান করিবে? এই অপূর্ব্ব ভাবের প্রতিচ্ছায়া সেই মৃণ্ময় মূর্ত্তির ভাবাভাব বিবর্জ্জিত চিন্ময় বদন-মণ্ডলে কোনও রেখাপাত করিয়াছিল কি না কে বলিতে পারে?

পাণিনির জন্মভূমি দর্শন

[শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী]

যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

১৩১৫ সালের পূজার পর আমি পঞ্জাবের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পেশোয়ারে গমন করিয়াছিলাম। এই বৎসর বাঙ্গালার বোমার মামলা সুরু হয়। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদের উপর—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদের উপর—পুলিসের নজর একটু প্রখররূপে পড়িয়াছিল। দিল্লী, লাহোর, রাওলপিণ্ডী, পেশোয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান রেল-ষ্টেসনে বাঙ্গালীর গতিবিধি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য পুলিস নিযুক্ত হইয়াছিল। আমার উপর কোন স্থানেই পুলিশের নজর পড়ে নাই। আমার রামজামা বা মাথার পাকড়ি এই নজর হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল কি না তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু সর্ব্বত্র আমি পরিচিতের ন্যা গমনাগমন করিয়াছিলাম, কোথাও কোনও রূপ পুলিসের হস্তে বিড়ম্বিত হই নাই। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে পুলিসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি যে রেল-গাড়ীতে পেশোয়ারে উপস্থিত হই, সেই গাড়ীতে একজন কোটপেন্টুলানপরা বাঙ্গালীও উপস্থিত হন। দেখিলাম, তিনি পুলিসের নজরবন্দী হইলেন—পুলিস নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। আমি কুলির মাথায় বোঝা চাপাইয়া, পুলিসের সম্মুখ দিয়া উন্নতমস্তকে চলিয়া গেলাম। পুলিসের লোক আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না, আমিও তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া গন্তব্য অভিমুখে গমন করিলাম। ইংরাজরাজের সীমার বাহিরে যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সেই সকল—বিশেষতঃ মহাবনের বিশাল গিরিদুর্গ দেখিতে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সকল স্থানের মালিকদের উপর রক্ষা-পত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হওয়াতে অগত্যা আমাকে এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এখন আমি ভগবান পাণিনির জন্মভূমি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পেশোয়ার প্রদেশের অন্তর্গত লাহোর নামক গ্রাম পণ্ডিতগণ পাণিনির জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই গ্রাম রেলষ্টেসন হইতে প্রায় ১৪ মাইল। সে স্থানে যদি আমি, বাঙ্গালী এই অপরাধে ধৃত হই, তাহা হইলে, এথানা হইতে ওথানা হইয়া পেশোয়ার আসিতে, ৭।৮ দিন অতিবাহিত হইবে। এরূপ অবস্থায় ২ দিনের স্থানে বৃথা ৭।৮ দিন ব্যয় করা যাইতে পারে না। আর এক কথা, এতদূর আসিলাম যাহারা বাঙ্গালীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কাছে জানান না দেওয়াটা আমার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তাই সঙ্কল্প করিলাম কোতোয়ালের সহিত একবার দেখা করিব। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল—আমি লাহোর যাইব, ইহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন বলিয়া, কোতোয়াল সাহেবকে অনুরোধ করিলাম। কোতোয়াল সাহেব হচ্চেন একজন পাঠান—যথেষ্টশক্তিশালী—বড়ঘরের লোক। খাস বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ-পরিহিত বাঙ্গালীর অনুরোধ শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পেশোয়ারে গুজব উঠিয়াছিল যে, কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয়দের মধ্যে কিরূপে বোমা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে গমন করিয়াছে। আমি সেই বাঙ্গালী জাতির একজন বাঙ্গালী। স্বয়ং সিংহের বিবরে উপস্থিত হইয়া, লাহোরে যাইবার সুব্যবস্থার জন্য আমার অনুরোধ! আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, কোতোয়াল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কতদিন এস্থানে আসিয়াছি? প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, ৬৭ দিন আসিয়াছি। চকিত হইয়া বলিলেন, এতদিন! তৎপরে পরামর্শ দানচ্ছলে বলিলেন, যদি সাহেব আমি কবে আসিয়াছি, একথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে যাহাতে আমি কাল আসিয়াছি, এই কথা বলি, সে জন্য কোতোয়াল সাহেব অনুরোধ করিলেন। "দেখা যাইবে" বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। কোতোয়াল আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমাকে লইয়া ডেপুটি কমিসনারের কাছে উপস্থিত হইলেন। কোতোয়াল মনে করিতে লাগিলেন, এইবার তাঁর একটা বড় রকম পদোন্নতি হইবে, আমার মতন একজন লোককে তিনি বন্দী করিতে সমর্থ হওয়াতে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আমার মুখশ্রীতে কোনরূপ ভীতির লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া, আমাকে দুর্দ্দান্ত পাঠান অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন! আমরা সাহেবের বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলাম। কোতোয়াল, সাহেবকে আমার আসল কথা জানাইলেন।

সাহেব কোতোয়ালকে ডাকিলেন। কোতোয়াল বাহিরে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কথোপকথনে বোধ হইল, কোতোয়াল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় আমাকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—আমার সীমার বাহিরে গমন করিবার বাসনাও সাহেবকে জানাইয়া আমি যে একজন অত্যন্ত খারাপ লোক, তাহাও বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইবার সাহেব আমাকে ডাকিলেন। আমি সপাদুকা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম ও কেদারাতে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাহেবকে আমি বলিলাম,আলেকজেণ্ডার সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি। এজন্য আমি পঞ্জাবের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি। তক্ষশীলাতে আমার প্রাচীন মুদ্রাসংগ্রহও সাহেব যত্নের সহিত দেখিলেন—আর দেখিলেন, লর্ডকর্জ্জন-প্রদত্ত পার্চমেণ্ট পত্র। এই পত্র দেখিয়া সাহেব বলিলেন, সব ভাল বটে, এটার তারিখ একটু বেশী দিনের। আমি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিলাম, সকল সময় নূতন নূতন পত্র লওয়া বা দেওয়া সামান্য কথা নহে, ইহা দাতা ও গৃহীতা উভয়ের পক্ষেই উদ্বেগজনক। সাহেব আমার কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং লাহোরপথে পুলিসের নজরে পড়িতে হইবে না বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমাদের কথোপকথন কোতোয়াল সাহেব এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, সাহেব আমার প্রতি কি একটা কঠোর আজ্ঞাপ্রচার করিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে হাস্যমুখে আমাকে বিদায় দিলেন,ইহা দেখিয়া,কোতোয়াল সাহেব মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যাদু জানে। যাদুবলে পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিয়াছে, আর যাদুবলে সাহেবকেও মুগ্ধ করিয়াছে। ইংরাজ জাতির উদার প্রকৃতির প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলাম।

কোতোয়াল সাহেবের গাড়ীতেই আমরা আমার বাবাস-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবার কোতোয়াল সাহেবের একটু ভাবান্তর দেখিলাম্—আমাকে বিশেষ সম্মানের সহিত বাঙ্গালাদেশের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; আর বাঙ্গালা দেশে 'ইলেম' খুব বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কথাও তিনি বারংবার কহিতে লাগিলেন।

পেশোয়ার-প্রবাসী আমার স্বদেশবাসীর অনুকম্পায় শয়নভোজনাদির জন্য আমাকে কিছুমাত্র ভাবিত হইতে হয় নাই। পেশোয়ারের স্মৃতির সহিত তাঁহাদের সহৃদয়তার কথা আমার সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়। তাঁহাদের আচরণে বিমুগ্ধ জন-সাধারণ-পেশোয়ারবাসীর কাছে আমি অপরিচিত হইলেও সাদরে গৃহীত হইয়াছিলাম। একজনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উন্নতকায় বলিষ্ঠ পার্শ্ববর্ত্তী অপর পাঠান সানন্দে সাহায্য করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

৭।৮ দিন অবস্থান করিয়া একদিন প্রাতঃকালে রেল-যোগে আমি পেশোয়ারপরিত্যাগ করিলাম। পেশোয়ারের কতিপয় ষ্টেসনের পর জাহাঙ্গীরারোড়। কিছুদিন হইল, দুর্দ্দান্ত পাঠানরা এই স্থানে রেললুঠ করায় ইহা সাধারণের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে। প্রায় আটটার সময় গাড়ী এই ষ্টেসনে উপস্থিত হয়। আমি আমার পোঁটলাপুঁটলি ষ্টেসনমাষ্টারের জিম্মাতে রাখিয়া, আমার সঙ্কল্পের কথা খুলিয়া বলিলাম। আমাব কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; আর একলা যাওয়া সব সময় নিরাপদ নহে,একথাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। মানুষের কাছে মানুষের কোন প্রকার ভয় হইতে পারে না, ইহা বলিলাম; আর আমার দ্রব্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া জাহাঙ্গীরা অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেসনের প্রায় তিন পো রাস্তা দূরে লুণ্ডী নদী, এই নদীর অপর পারে জাহাঙ্গীরা গ্রাম। পেশোয়ার-মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী এই গ্রামের একজন মুসলমান ভদ্রলোকের নামে আমাকে এক-খানি অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, তিনি বাড়ীতে নাই—ইঁহার একজন লোককে বলিলাম, আমি লাহোর যাইব, অতএব ঘোড়া বা টমটম সংগ্রহ করিয়া দিন। যে স্থানে আমি নদী পার হইয়াছিলাম, নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইবার জন্য সেই স্থানে এক্কা সকল অবস্থান করে। আমি যদি নদী উত্তীর্ণ হইয়াই তাড়াতাড়ি একখানা টমটম ভাড়া করিতাম, তাহা হইলে আমাকে গাড়ীর জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। অসুবিধা হইলেও একটা বিষয় আমার প্রচুর আনন্দজনক হইয়াছিল, তাহা এস্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার প্রেরিত লোক যখন কোন রূপে একখানি গাড়ী

সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই সময় আমি একজন হিন্দু বেণের দোকানে কিছু আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য গমন করি। এই গ্রামে মুসলমান পাঠানের সংখ্যা যেমন বেশী, হিন্দুর সংখ্যা তেমনিই কম। ৫।৭ ঘর হিন্দু, তাহাও মুসলমান-ভাবাপন্ন—এরূপ না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায় নাই। বণিককে একটি টাকা দিয়া বলিলাম, আমাকে পুরি প্রস্তুত করিয়া দাও। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে পুরি প্রস্তুত করিল, আচার ও শর্করাযোগে আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। আমার ভোজনকালে বণিক নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া, স্বীয় কৌতূহল দূর করিতে লাগিল। যখন সে শুনিল, বাঙ্গালা দেশ আমার জন্মভূমি - লাহোর আমাদের হিন্দুর পুণ্য তীর্থভূমি, সেই তীর্থস্থান দর্শন করিবার জন্য আমি গমন করিতেছি—তখন সে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল। আমার ভোজনের পর সেই হিন্দু বণিক প্রণাম করিয়া টাকাটি ফিরাইয়া দিল, মূল্য লইবার জন্য তাহাকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিছুতেই সে স্বীকৃত হইল না। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, টমটম যোগে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

জাহাঙ্গীরা ও লাহোরের মধ্যে টুডের নামে একটি গ্রাম আছে। আমার টমটম সেই পর্য্যন্ত যাইবে, তারপর ঘোড়া করিয়া লাহোর যাইতে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। রাস্তায় মাটির ঢিপি ও সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া টুডের উপস্থিত হইলাম। এস্থানে ঘোটক ভাড়া করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্ষেত্র সকল শস্যশ্যামল ও উর্ব্বর। আমি ঘোটকের প্রভুর সহিত নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে প্রায় ৪ টার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কালে একটা উচ্চ ভূমির উপর এস্থানের পুলিস-গৃহ অবস্থান করিতেছে। হিয়ংসান এস্থানের যে স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই উচ্চ ভূমিই সেই স্তূপের বর্ত্তমান পরিণতি। আসপাসের দৃশ্য দেখিয়া আমি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই গ্রামে ৫।৭ ঘর হিন্দু আছে। কালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিলাম। যে গ্রাম এক সময় বিদ্যার জন্য জগৎ মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, যে গ্রামবাসীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান কালের ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষিগণ বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যে গ্রাম দর্শন করিবার জন্য চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, সে গ্রাম বর্ত্তমান কালে নগণ্য ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান কালে ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও জগতের সুধীসম্প্রদায়ের কাছে চিরকাল শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে।

লাহোরে একটি ধর্ম্মশালা আছে। স্থানীয় হিন্দুরা তাহাদের আতিথ্য-গ্রহণের জন্য আমাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। আমি এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়া জাহাঙ্গীরা অভিমুখে গমনের উদ্যোগ করিলাম। এস্থানে আমি কয়েকটি শক ও গ্রীকদের সময়ের প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পাণিনির জন্মভূমি শলাতুরে প্রাপ্ত বলিয়া তাহা আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান।

পদব্রজে, টমটমে ও অশ্বারোহণে প্রায় ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, আবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক অশ্বের প্রভু পরামর্শ দিল যে, টুডেরে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিলে, ৮টার ট্রেন পাওয়া যাইতে পারিবে। এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লাহোরে অবস্থান কালে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এই গ্রামের একটি হিন্দুযুবক আমার সঙ্গী হইয়াছিল। এই যুবক এপ্রদেশের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছে। সকল স্থানেই মুসলমানের প্রাধান্য—হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি অবহেলায় নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় কহিয়া, মর্ম্মবেদনা জানাইতে লাগিল। যখন আমি বলিলাম, আমাদের দেশে এরূপ অনেক স্থান আছে, যথায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম বা একেবারেই নাই, তখন একথা শুনিয়া সেই যুবক বড়ই প্রসন্ন হইল। অশ্ব-প্রভু পাঠান মনে করিয়াছিল, আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার জন্য গুপ্ত ভাবে স্বচক্ষে সমস্ত দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছি, আমার নানা প্রকার প্রশ্নে তাহার এভাবকে সুদৃঢ় করিয়াছিল।

রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় টুডেরের ধর্ম্মশালা আগমন করিলাম। পাঠান অশ্ব লইয়া, অভিবাদন করিয়া, চলিয়া-গেল। আমার হিন্দু-সঙ্গী আমার কম্বল লইয়া ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিল। দেখিলাম, একজন সাধু বেদির উপর উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন,

একদিকে স্ত্রীলোকেরা অপর দিকে পুরুষেরা উপবেশন করিয়া নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছেন। আমাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, একজন প্রধান আসিয়া, আমার উপবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উপদেশ সমাপ্ত হইলে উপদেষ্টা সাধুমহাশয় আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, আমার এই প্রদেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে পাণিনি ও তাঁহার জন্মভূমি শলাতুর—বর্ত্তমান লাহোর সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। আমার কথা তাহারা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, এদেশে একটা কিম্বদন্তী আছে, লাহোরে রাত্রিকালে একপ্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্যোতিঃ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, আমি কয়েকটা কথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি। উপদেশ-সমাপ্তির পর আমি কি ভোজন করিব, একথা তাহারা জিজ্ঞাসা করে। তাহাদের ইচ্ছা, আমি কিছু পাক করিয়া ভোজন করি। যখন আমি বলিলাম, আমি কিছু ভোজন করিব না, তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কিছু ভোজনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করে। একজন অতিথি ভোজন না করিয়া রাত্রি-যাপন করিবেন, ইহাতে গ্রামের অমঙ্গল হইবে, ইত্যাদি কহিলে, একটু দুগ্ধ-পান করিব, এই কথা কহিলাম। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর একজন দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহা পান করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে ৬।৭ ব্যক্তি দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকের ইচ্ছা, প্রত্যেকের দুগ্ধ আমি পান করি। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলে প্রত্যেক পাত্র হইতে অল্প অল্প দুগ্ধ লইয়া পুনরায় তাহাদের প্রীতির জন্য পান করিতে বাধ্য হইলাম। তাহার পরদিবস থাকিবার জন্য গ্রামবাসী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলাম। তাহাদের বাসনা পরিপূর্ণ করিতে অসমর্থ বলিয়া রাত্রিতেই তাহাদের কাছে বিদায় লইয়া শয্যা-গ্রহণ করি। শয্যা-গ্রহণ করিয়াও তাহাদের শুশ্রূষা হইতে বঞ্চিত হই নাই। কেহ কেহ আমার হস্তপদ সংমর্দ্দন করিয়া আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছিল। কার্ত্তিক মাসে এ দেশে বেশ কনকনে শীত অনুভূত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে আমার সঙ্গী একখানা টমটম ভাড়া করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমিও সেই প্রাচীন স্মৃতি স্মরণ করিয়া পুলকিত হই, আর সেই সরল-প্রকৃতি গ্রামবাসীদের অনাবিল আচরণে বিমুগ্ধ হই। এদেশে অতি উত্তম চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাষ্যকারও প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘোটক ও টমটমের ভাড়া প্রভৃতিতে তিন টাকার বেশী আমার ব্যয়িত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে এ প্রদেশ অত্যন্ত মূল্যবান—ব্যাক্ট্রো-গ্রীস-সিথিয়ান সময়ের মুদ্রা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভূমিখনন করিলে নানাপ্রকার মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

আশা করি, লাহোর খনন করিয়া, অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

মহাকবি-ভাস

[শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সাংখ্যবেদান্তদর্শনতীর্থ]

আমাদের এই ভারতবর্ষে কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের পূর্ব্বে এবং মহর্ষি বেদব্যাস ও বাল্মীকির পরে কত কত সুকবি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ভারতজননীকে সাহিত্য গৌরবে পরম গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা বড়ই সুকঠিন; কেননা ইতিহাস-স্রোতস্বিনীর প্রবাহ মধ্যে মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রকৃতি-সুন্দরীর বিশ্বমোহন বর্ণনা কবিরাজ কালিদাসের সুধাময়ী লেখনী দ্বারা যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, সেরূপ ভুবন-মোহন ভাব অপর কোন কবির লেখনীদ্বারা ফুটে নাই। তাহাতেই কালিদাসের কবিতা-প্রসূন-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে এবং অপর কবিগণের কবিতাবলী বিক্ষিপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। * আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকখানি স্বর্গীয় ম, ম, ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয়ের টিপ্পনীর সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। এই নাটক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত তর্কবাচস্পতি মহোদয় স্বীয় টিপ্পনী ও ভূমিকার সহিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পারিপার্শ্বিক বাক্যে ভাস-কবির নামের স্থানে 'ধাবক, সৌমিল্লক, ও কবিপুত্রের কথা তিনি

---

* "যস্যাশ্চোর শ্চিকুর-নিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরঃ, ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ। হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ, কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়" (প্রসন্নরাঘব)

উল্লেখ করিয়াছেন। † কিন্তু দক্ষিণাপথের ও বঙ্গের মুদ্রিত পুস্তকে, প্রথমে মালবিকাগ্নিমিত্রের পারিপার্শ্বিক বাক্যে ভাস-কবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত নাটকের প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে বলিতেছে ‡ খ্যাতনামা ভাস, ধাবক, ও কবিপুত্র, প্রভৃতির মনোহারী নাটকসমূহ বর্ত্তমান থাকিতে, সেগুলি ত্যাগ করিয়া, আধুনিক কালিদাস-কৃত নাটকের প্রতি বহু-সম্মান-প্রদর্শন করিতেছ কেন? ইহার উত্তর সূত্রধার সেখানে এভাবে দিয়াছেন,—"পুরাণমিত্যেব নসাধু সর্ব্বম্..."। পুস্তকান্তরে 'কবিপুত্র' স্থলে কবিরত্ন এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরত্ন যে কে, তাঁহার বিবরণ এখনও ঠিক পাওয়া যায় নাই। কবিধাবক 'নাগানন্দ' 'রত্নাবলী' প্রভৃতি স্বপ্রণীত গ্রন্থগুলি দৈন্যবশতঃ অর্থলোভে শ্রীহর্ষরাজের নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ইহা কাব্যতত্ত্বপ্রকাশকার মম্মট-ভট্ট লিখিয়াছেন। অপর কোন কোন পণ্ডিত 'ধাবক' নামে অন্য এক কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যে বম্বে ও বঙ্গদেশে চারিখানি অভিনব টীকার সহিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক মুদ্রিত হইয়াছে। এই নাটক সমস্ত নাটকের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদিরসপূর্ণ, প্রাকৃত-ভাষা বহুল।

সম্প্রতি ভাসকবির রূপক-(নাটক) সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যেরূপ পাণিনিকৃত পাতালবিজয় কাব্যের নামমাত্র শুনা যায়, সেইরূপ ভাসেরও অবস্থা ছিল। গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথার' নাম-শেষ দেখা যায়। সংস্কৃত-চন্দ্রিকার স্বর্গগত সম্পাদক অপ্পা শাস্ত্রি-মহাশয়, পাণিনিকৃত 'পাতালবিজয়' কাব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। 'জাম্ববতী বিজয়' কাব্যেরও ঐরূপ দশা। গুণাঢ্যকবির বিরচিত "বৃহৎকথা নামক" অতিবৃহৎগ্রন্থের অল্পাংশ মাত্র বিদ্যমান আছে। মহাকবি বররুচির কৃত 'কণ্ঠাভরণ' কাব্যেরও সংজ্ঞামাত্র বর্ত্তমান। মেণ্ঠের 'হয়গ্রীব বধ' কাব্য নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। উমাপতিধর প্রভৃতির কাব্য-নিচয় কাল-সাগরের অতীত স্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথার' ছায়া অবলম্বনেই সোমদেব ভট্ট কাশ্মীররাজমহিষীর চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত 'কথাসরিৎ সাগর' রচনা করিয়াছেন। এবং শিলাভট্টারিকা, বিপুলনিতম্বা, বিজ্জকাফল্গুহস্তিনী, মারুলা সুভদ্রা, মোরিকেন্দুলেখা প্রভৃতি ভারতীয় বিদুষী রমণী-কবিগণের কাব্যসন্দর্ভগুলিও কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডারাগার, সুভাষিত-রত্নাবলী, কাব্যমালা প্রভৃতিতে কেবলমাত্র উক্ত কবিদিগের নাম ও সূক্তি সংগৃহীত কবিতা-কুসুমের বিমল সৌরভে সুধীগণ বিশেষ প্রীত হইলেও তাঁহাদের মূল গ্রন্থের অবলোকনে গৌরব ও আনন্দানুভব করিতে পারিতেছেন না। অমর কবি কালিদাস যেরূপ, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রারম্ভে ভাস-প্রমুখ কবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ বাণও হর্ষচরিতের উপক্রমে ভাসের সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। * সূক্তিমুক্তাবলীর লিখিত শ্লোক ‡ দ্বারা জানা যায় যে, ভাসকবির নাটকগুলি পরীক্ষার জন্য বা অপর কোন কবির জয়ের নিমিত্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নিদেব স্বপ্নবাসবদত্ত নাটক ভিন্ন অপর নাটকসমূহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, এক স্বপ্নবাসবদত্ত রূপক ভিন্ন ভাসের সকল কাব্য-গ্রন্থই অগ্নিসাৎ কিংবা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গতবর্ষে দক্ষিণাপথের শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় 'ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সীরীস' নামক গ্রন্থ-মালায় নিম্নলিখিত রূপক-(নাটক) গুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ভিন্ন আরও বহু পুস্তক বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তশয়নে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত নাটকসমূহ, দক্ষিণা-পথ ভ্রমণকালে শাস্ত্রি-মহাশয়, মননিক্কর মঠে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ পিসারোটি মহাশয়ের নিকট তালপত্রে লিখিত একটি সম্পুটের মধ্যে প্রাপ্ত হন।

কেরল দেশে লব্ধ নাটক যথা,—স্বপ্নবাসবদত্ত (১) প্রতিজ্ঞা-নাটিকা (২) পঞ্চরাত্র (৩) চারুদত্ত (৪) দূতঘটোৎকচ

† "ভাস-(ধাবক) সৌমিল্লক কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্তকৃতৌ কিংকৃতোবহুমানঃ॥" (মালবিকাগ্নি-মিত্রম্)

‡ "সচ স্বপ্রণীতমপি গ্রন্থং ধনলিপ্সয়া শ্রীহর্ষনাম্না প্রকাশিতবান্"। (মম্মট ভট্টঃ)

* "সূত্রধারকৃতারম্ভৈ র্নাটকৈর্ব্বহুভূমিকৈঃ। সপতাকৈর্যশোলেভে ভাসো দেবকুলৈরপি॥" (হর্ষচরিতারম্ভে)

† "ভাস-নাটকচক্রেহপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুং।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোহভূন্নপাবকঃ।" (সূক্তিমুক্তাবলী)

‡ "সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ ভানুঃ" পাতালবিজয়কাব্যে সুভাষিতরত্ন-ভাণ্ডারাগারেচ।

(৫) অবিমারক (৬) বালচরিত (৭) মধ্যমব্যায়োগ (৮) কর্ণভার (৯) উরুভঙ্গ,(১০) এই দশ খানির পরে শাস্ত্রি-মহাশয় ভাসের আরও দুইখানি নাটক বাহির করিয়াছেন। উক্ত নাটকগুলি কাহার? এই বিষয়ে তত্ত্ব অবধারিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। নাটক-প্রণেতা স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থানে (অর্থাৎ আদিতে বা অন্তে) স্বীয় নামের উল্লেখ করেন নাই। (১) প্রকাশক শাস্ত্রি-মহাশয়ও পুস্তকাবলির সুদীর্ঘ ভূমিকায় নিঃসন্দেহরূপে এই সকল নাটক ভাস-কবির বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন নাই। (২) অপর কবিগণ ভাসের নাম ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের পংক্তি নাম উল্লেখ করেন নাই (৩) মধ্যকালিক অলঙ্কারের নিয়মানুসারে সকল স্থানে নাটকের রীতি (প্রণালী) রক্ষিত হয় নাই। (৪) ভাসের কাব্যে যেখানে যেখানে দেখিয়াছি, তন্মধ্যে চারুদত্ত নাটকখানিতে সকল স্থানেই মৃচ্ছকটিকের (শূদ্রককৃত) ছায়া পতিত হইয়াছে। কালিদাস ও শূদ্রকের রচিত নাটকের ছায়া-অবলম্বনে ভাস নাটকাদি লিখিয়াছেন; অথবা কালিদাস ও শূদ্রক প্রভৃতিই ভাস-রচিত নাটকের ছায়ার আশ্রয় লইয়াছেন? আমার ধারণা হয় যে, ভাসকবি যেন স্বপ্ননাটক ও প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতিতে বিশেষরূপে রত্নাবলীর ছায়া-হরণ করিয়াছেন। চারুদত্ত নাটকে, মৃচ্ছকটিকের ভাব ও ছায়া এবং অন্যান্য রূপকেও উক্ত নাটকের ছায়া আসাদন পূর্ব্বক নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং স্বপ্ননাটক (†) ও যৌগন্ধ-রায়ণের নান্দীশ্লোকে কবির রচনা-কলা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে নাই। (‡) এইরূপ অঙ্কন-নিপুণতা দ্বারা কবিকে অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীতি হয় না। এখন কবির গ্রন্থ ও রচনা-কাল সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে চাই। ভাসের নাটকাবলীতে এই * শ্লোকটি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। "এই সাগর-বিশ্রান্তহিমাদ্রি ও বিন্ধ্যাটবীদ্বারাকুণ্ডলীকৃত একমাত্র বিস্তৃতভূভাগ যাঁহার ছত্রের অঙ্কে (ক্রোড়ে) বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রাজসিংহ (নৃপতি) আমাদিগের মঙ্গল করুন।" এই শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, ইনি কেরল দেশের প্রান্ত ভাগে রাজসিংহ নরেশের সদস্য ছিলেন। ভাস তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্ত নাটক, মৃচ্ছকটিক ও অন্যান্য কবিগণের প্রবন্ধনিচয়কে আশ্রয় করিয়া অনেক রূপক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বোধ হয়, পণ্ডিত-সাধারণের অতি আদরণীয় নয় বলিয়া উক্ত গ্রন্থাবলীর বিস্তার ও প্রকাশ কেরল দেশ ভিন্ন অপর কোন দেশে ঘটিতে পারে নাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে, "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ" কবিগণের উক্তিদ্বারা ভাস-কবির নাটকগুলি অপর কোন রূপকের (নাটকান্তর) ন্যায় বোধ হয়। নান্দীপূর্ব্বক আরব্ধ নয়, অথচ নান্দীপাঠের প্রথমেই সূত্রধার দ্বারা সমারব্ধ। এইরূপ প্রথা (নিয়ম) কেবল ভাসেরই দেখিতেছি। এই প্রণালী অবলম্বনে পরে কেরল দেশীয় অপরাপর কবিগণ বহুনাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সূক্তি (সুভাষিতাবলি) সংগ্রহকারগণ, ভাসকবির শ্লোক বলিয়া যে সকল শ্লোক স্বীয় স্বীয় পুস্তকে সংগৃহীত করিয়াছেন, সে গুলির মধ্যে একটি শ্লোকও এই মুদ্রিত ভাসের নাটকসমূহে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার সকল নাটক অগ্নিতে দাহ হইয়া গেলে পরে পরিশেষ কেবল স্বপ্নবাসবদত্তই বিদ্যমান ছিল। এখন এত গুলি নাটক কোথা হইতে আসিল? যদিও কেরলীয় অপর কবিকৃত স্বপ্ন-নাটক ও ভাসের স্বপ্নবাসবদত্ত এই দুই এক হইত, তাহা হইলে, ভাসের লুপ্তমাত্র অবশিষ্ট পদ্যাবলী হইতে সূক্তি-সংগ্রহকারগণের উদ্ধৃত কোন কোন শ্লোক দেখিতে পাওয়া যাইত। কাব্যালঙ্কার সূত্রকার বামন * "শরচ্ছশাঙ্ক-গৌরেণ"—ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা স্বপ্ন নাটকেও দেখিতে পাইতেছি। ইহা দ্বারা বলা যায় না যে, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তারই এই শ্লোক; কেরলীয় অন্য কোন কবিরও হইতে পারে। বাণের পরবর্ত্তী সুরসিক শ্লেষ-কবি সুবন্ধু, স্বীয় বাসবদত্তা নামক গদ্য-কাব্যে বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর প্রভৃতির নামের উল্লেখ ভিন্ন প্রাচীন কবি ভাসের নাম (উপমাচ্ছলে) উল্লেখ করেন নাই। কেরলীয়

(†) "উদয়নবেন্দু-সবর্ণা বাসবদত্তাবলৌ বলস্যত্বাং। পদ্মাবতীর্ণ-পূর্ণৌ বসন্তকম্রৌভুজৌপাতাম্"। (স্বপ্নবাসবদত্ত নান্দী।

(‡) "পাতু বাসবদত্তা বো মহাসেনোঽতিবীর্য্যবান্। বৎসরাজশ্চ (?) নাম্না স শক্তি যৌগন্ধরায়ণঃ॥" (যৌগন্ধরায়ণনান্দী)

(*) "ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাং। মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

(*) "শরচ্ছশাঙ্কগৌরেণ বাতাবিদ্ধেন ভামিনী। কাশপুষ্পলবেনেদম্ সাশ্রুপাতং মুখং মম॥" (বামনঃ)

কোন প্রাচীন নাটক হইতে স্বপ্নবাসবদত্তাতে ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইতে পারে। আরও দণ্ড্যাচার্য্য প্রভৃতির শ্লোক (অনুরূপ) তাঁহার গ্রন্থে দেখিতেছি :—যথা,—"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানিবর্ষতীবাঞ্জনংনভঃ" * "যাসাংবলির্ভবতি-মদ্‌গৃহদেহলীনান্‌" ইত্যাদি। দণ্ড্যাচার্য্যও শূদ্রকের শ্লোক স্বগ্রন্থে নিবিষ্ট করাতে, কবি আমাদের সন্দেহাস্পদ হইয়াছেন। ধ্বন্যালোকাচনের একটি শ্লোকও স্বপ্ন নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। (†) বামন প্রভৃতির উদ্ধৃত শ্লোকের যে দশা, এই শ্লোকেরও তাহাই অবস্থা। বামন, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি ভাসের স্বপ্ন-নাটক হইতে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক হইতে কিংবা অপর প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেও পদ্যসমূহ সংগৃহীত করিয়াছেন কিন্তু কেরলীয় কবির গ্রন্থ হইতে যে নয়, ইহা বেশ বুঝা যায়। "উৎসাহাতিশয়ং" প্রভৃতি শ্লোক যে বালচরিতের বলিয়া সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কিন্তু কেরলীয় বালচরিতে দেখিতে পাই না ; এই কথা প্রকাশক শ্রীযুত গণপতি শাস্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। যেরূপ সুপ্রাচীন 'বৃহৎকথা' হইতে "কিলিঞ্জ হস্তি-প্রয়োগ" প্রভৃতি ভামহ প্রভৃতির প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইরূপ কৌটিল্য (চাণক্য) প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' হইতেও "নবং শরাবম্‌" ‡ ইত্যাদি শ্লোক স্বীয় যৌগন্ধরায়ণে তুলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা চাণক্য যে খুব প্রাচীন নয়, তাহা বলা যায়। অন্য এক স্থানে "ভো! কাশ্যপগোত্রোঽস্মি সাঙ্গোপাঙ্গংবেদমধীয়ে" ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের ছায়ানুরূপ বিষয় কেরল কবির পূর্ব্বতর সন্দর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশক শাস্ত্রীও বলিয়াছেন। কেরল-কবি রাজসিংহের সমকালিক বলিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি রাজসিংহের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। ইতিহাসে অনেক রাজসিংহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ড্যনরপতি রাজসিংহই প্রাচীনতম। ইনি (শকাব্দাঃ ৯০০) নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চোলেশ্বর বীর-নারায়ণ (তাঁহার অপর নাম কেশরী বর্ম্মা) ব্যাঘ্র নামক অগ্রহারে সুবর্ণময় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ও কেরল-রাজ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ এবং বাণরাজ লক্ষেশ্বরকে জয় করিয়া, অতিশয় প্রথিত যশা হইয়াছিলেন। ইহা কেরলীয় রাজপ্রশস্তি হইতে জানা যায়। এই কেরলীয় রাজসিংহ, বালরামায়ণ-প্রণেতা মহাকবি রাজশেখরের শিষ্য, কান্যকুব্জেশ্বর মহেন্দ্রপাল নৃপতির সমকালিক ছিলেন। এই রাজসিংহের অথবা প্রান্তীয় কোন পাণ্ড্য-কেরল নৃপতির সমকালিক কেরল-কবি স্বীয় কবিত্বের অভ্যাসের জন্য ভাস, শূদ্রক, কালিদাস প্রভৃতির কাব্য হইতে অনুরূপ পদ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া উক্ত কয়েকখানি রূপক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্য হইতে গণপতি শাস্ত্রী এই দশখানি প্রাচীন নাটক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেরল-কবির গ্রন্থে অপর মহাকবির ছায়ানুরূপ শ্লোক যথা,—

"কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা, (স্বপ্ননাটক)
চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ।"
(মেঘদূতের ছায়া) "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশাচক্রনেমি ক্রমেণ॥"

শাকুন্তলের অনুরূপ শ্লোক
"যস্যাম্মপ্রিয় মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী...... ..
... ...
সেয়ং শক্র-রিপো-রশোকবনিকা ভগ্নেঽপি বিজ্ঞাপ্যতাং॥"
(অভিষেক নাটক)

চারুদত্ত নাটকখানি যে, মৃচ্ছকটিকের সর্ব্বাঙ্গ অনুকরণ করিয়াছে, চারুদত্ত নাটক যিনি পড়িবেন, তিনিই তাহা স্পষ্ট দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মহাকবি শূদ্রক-কালিদাসাদির কাব্যনিচয় হইতে ছায়া অপহরণ করিয়া, ভাস কিংবা জনৈক কেরল-কবি উক্ত দশখানি নাটক লিখিয়াছেন ; অথবা শূদ্রক প্রভৃতি মহাকবিগণ, ভাস কবি কিংবা অপর কেরল-কবির গ্রন্থের ভাব অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্য-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ গ্রাহ্য ও রুচিকর, তাহা সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। যদি বামন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ "শূদ্রকাদি-বিরচিতেষু প্রবন্ধেষু অস্ত ভূতান্ প্রপঞ্চোবুঞ্জতে" এইরূপ বলিয়াছেন, তবে কেন

---

† "ভাস-(ধাবক) লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনংনভঃ" (দণ্ড্যাচার্য্যঃ)
বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য, যাসাংবলির্ভবতি মদ্‌গৃহদেহলীনাং। হংসৈশ্চ সারসনকঃ)
মিশ্রম্‌)

‡ "নচ যশ্রমীতমপি গ্রহং নিলস্ত পূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্‌।
(মন্নট ভট্টঃ) তত্তু পিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেত॥"
(কৌটিল্যার্থশাস্ত্র)

মনের উদ্ধৃত বাক্যসমূহকে শূদ্রকের বলিয়া উল্লিখিত না করিয়া, অনৈক কেরল-কবির বলিয়া কল্পনা করিব? এই কেরল-কবি নবম শকাব্দের লোক ছিলেন। সেই হেতু তিনি আধুনিক সূক্তি-সংগ্রহের ভাস-কবির পদ্য-সমূহ দেখিতে পান নাই। যে সকল পদ্য ভাস-কবির দেখিতে পাইতেছি, সেইগুলি গণপতি শাস্ত্রীর প্রকাশিত ভাসকবির গ্রন্থে নাই। অতএব তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থোক্ত পদ্যসমূহ ভাসের বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় না। সূক্তি-সংগ্রহে ভাসের পদ্য নিচয়; যথা,—

"দগ্ধে মনোভব তরৌবালাকুচকুম্ভসম্ভূতৈরমৃতৈঃ।
ত্রিবলীকৃতালবালা জাতা রোমাবলী বল্লী॥"

"পেয়াসুরা প্রিয়তমা মুখমীক্ষণীয়ম্।
গ্রাহ্য-স্বভাবললিতো বিকটশ্চবেষঃ (শঃ)॥"

"যেনেদমীদৃশ-সদৃশ্য তমোক্ষবস্ম্য।
দীর্ঘায়ুবস্তু ভগবান্ সপিণাকপাণিঃ॥" ইত্যাদি। এই পদ্যটি দ্বারা ভাস কবিকে শৈব বলিয়া বোধ হয় কিন্তু শাস্ত্রি-প্রকাশিত গ্রন্থে কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশ্বসমস্যা

[শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী]

নন্দদুলালের বয়ঃক্রম সাত বৎসর। বিদ্যালয়ে নূতন যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহার যাহা দেখে, তাহার তাহা লইতে চায়, যাহার মুখে যাহা শুনে, তাহাই শিখে। এক-দিবস বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে বাটীতে আসিয়া পিতার নিকট কতকগুলি দ্রব্য কিনিবার জন্য আবদার করিল। পিতার তাদৃশ স্বচ্ছল অবস্থা নহে, সুতরাং পিতা, পুত্রের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি আনিয়া দিতে পারিলেন না। ইহাতে নন্দ-দুলালের বিরক্তির সীমা রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিল, "বাবার যদি টিকি থাকিত, তাহা হইলে আমি উহা ধরিয়া জোরে টানিতাম।"—নন্দদুলাল বিদ্যালয়ের কোন বালককে তাহার সহপাঠীর টিকি টানিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং পিতার প্রতি তাহার তদ্রূপ আচরণের ইচ্ছা হইয়াছিল।

অবোধ পুত্রের পিতাও অবোধ। পিতা অনন্যমনে চিন্তা করেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আপনার অল্পবুদ্ধি ভাবিয়া ধিক্কার দেন, আর পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া ভাবেন, যদি এ বিশ্বের আদিদেবকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহার টিকিতে টান দিয়া বলিতাম, নারায়ণ! তোমায় চিনিতে এত বিবাদ-বিসম্বাদ কেন? এত তর্কবিতর্কই বা কেন? তোমার সৃষ্টি বুঝিতে পারিলে তোমায় বুঝা হয়। তুমি দয়াময়! কৃপা করিয়া জীবের মুক্তিবিধানের জন্য একটি সুগম পথ বাহির করিয়া দাও না কেন?

গ্রামের অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষমূলে প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। সহস্র সহস্র লোক নতশিরে সেই প্রস্তরখণ্ডকে প্রণাম করিয়া থাকে। সেই ষষ্ঠী দেবীর যাঁহার প্রতি কৃপা হয়, যিনি ষষ্ঠীদেবীকে ভক্তিসহকারে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করেন, তাঁহারই গৃহে পুত্রকন্যা শোভিত, আর যিনি দেবীকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহার বংশ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠী-দেবীকে উত্তম নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিলেই কি বংশবৃদ্ধি হয়? অবোধ পুত্রের অবোধ পিতা বুঝিতে অক্ষম। পুরোহিত মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা, পরিচ্ছদাদি দান করা হয় না, তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করেন না। গৃহে কোন অকল্যাণ ঘটিলে পিতা ভাবেন, পুরোহিত মহাশয়ের অসন্তোষ কি তাঁহার গৃহে অকল্যাণের কারণ? কোন পুত্রের পীড়া হইল। চিকিৎসক মহাশয় বলিলেন, পুত্রের শোণিত বিষাক্ত হইয়াছে, ঔষধের দ্বারা বিষ নষ্ট করিবার প্রয়োজন। পিতা ভাবিলেন, বালকের প্রাণ-নাশের জন্য কি নারায়ণ বিষের সৃষ্টি করিয়াছেন? দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিলেন, বালকের জন্মপত্রিকা-বিচারে বলিলেন, শনির কুদৃষ্টি হেতু বালকের পীড়া হইয়াছে, শনিগ্রহের শান্তি করা প্রয়োজন। পিতা ভাবিলেন, শনির কুদৃষ্টিই কি বালকের রোগের কারণ? মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশিনীগণ বলিলেন, গ্রামের বৃদ্ধা-ডাইন বালককে কুদৃষ্টি করিয়াছে; তাহাই বালকের রোগের কারণ। রোজার দ্বারা ঝাড়াইলে বালকের রোগ শান্তি হইবে। পিতা ভাবিলেন, ডাইনের কুদৃষ্টিই কি বালকের রোগের কারণ? কতিপয় বন্ধু বলিলেন, বাসের বাটীটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, বাটী পরিবর্ত্তন করিলেই বিনা ঔষধে রোগ উপশম হইবে। পিতা ভাবিলেন, পুরুষানুক্রমের বাস্তুবাটী ত্যাগ করিলেই কি রোগ উপশম হইবে?

বালকের মাতা বলিলেন, অন্নপ্রাশনের দিবস ছেলেটিকে স্বর্ণের অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই, স্বর্ণের সংস্পর্শে সকল রোগ আরোগ্য হয়। যদি অন্নপ্রাশনের সময় হইতে বালক স্বর্ণ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে কখনই বালকের এমন রোগ হইত না। পিতা ভাবিলেন, গৃহিণীর কথা কি বেদবাক্য নহে? অর্থাভাব কি বালকের রোগের কারণ? একজন দার্শনিক পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের প্রাধান্য বলিয়া গিয়াছেন; বালকের এজন্মে কোন পাপ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বালক রোগে কষ্ট পাইতেছে। পিতা ভাবিলেন; জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই কি রোগের কারণ?

অবোধ পিতা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করেন, সেখানে মহাতেজস্বী সূর্য্য, কিরণজালে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া জগতকে পবিত্র করিতেছে। মল, মূত্র, পূতিগন্ধ, কিছুই সূর্য্যের ত্যাজ্য পদার্থ নহে। এই পবিত্রীকরণশক্তি কি দেবশক্তি? সূর্য্য কি দেবতা-বিশেষ? না সূর্য্য সর্ব্বশক্তিমানের একখানি বিচিত্র অশ্বচালিত রথ? রথে আরোহণ করিয়া সেই আদিদেব পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া পাপী ও পুণ্যবানের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন? অথবা সূর্য্য কেবল নানাবিধ বাষ্পে পরিবেষ্টিত, গলিত ও প্রজ্বলিত লৌহাদি ধাতুর সমুদ্র-বিশেষ? আর সেই ধাতুরাশি কতশত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গ্রহনক্ষত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে যথানিয়মে সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত অবিরামে ধাবিত হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালিত করিতেছে? কতপ্রকার ধাতুতে সূর্য্যদেহ গঠিত, মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকগণ নানা যন্ত্রের সাহায্যে এখন স্থির করিতে পারেন নাই। মানবশক্তির চরম বিকাশেও তাহা আবিষ্কৃত হইবে কিনা বলা দুঃসাধ্য। সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনির দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই একই ভাব হৃদয়ে জাগরূক হইবে। চারিদিকে বিস্তৃত অনন্ত আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অবোধ পিতার কেন, কতশত যোগী-ঋষির বুদ্ধিভ্রংশ হয়। অনন্তব্যাপী আকাশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রাশি রাশি পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজিত—এবং সেই রাশি রাশি পরমাণু সর্ব্বত্র আলোক ও উত্তাপ সঞ্চালিত করিয়া সূর্য্যাগ্নির সমিধ-স্বরূপ হইতেছে, এই চিন্তা করিলে, কোন্ মানবের জ্ঞান বিমোহিত না হয়? এদিকে পরমাণুগুলি এক অদ্ভুত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির বলে কত প্রকার অবয়ব ধারণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণীশক্তি এমনই নিয়মিত যে, কখন তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না। সকল পদার্থেরই উপযোগিতা আছে, সকল পদার্থেরই সার্থকতা আছে। অবিচলিত নিয়ম, চরম সার্থকতা, অভ্রান্ত উপযোগিতা। গ্যালেলিও, কোপর্নিকস্, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, নিউটন, কেপলার, ল্যাপলাস্ প্রভৃতি মহাশক্তিশালী বৈজ্ঞানিকগণ অন্য এক নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, কল্য সে নিয়ম ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। অবোধ পিতা কি বুঝিবেন? কাজেই অবোধ পিতার স্বতন্ত্র চিন্তা আসিয়া পড়ে।

অবোধ পিতা জীব-জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, একে অপরকে গ্রাস করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি পশুগণ অপর জীবদেহ উদরস্থ করিয়া স্বস্বদেহ ধারণ করিতেছে। পক্ষিগণ, পতঙ্গদেহগ্রাসে অভ্যস্ত। মশক, ছারপোকা প্রভৃতি কীটগণ মনুষ্য-শোণিতপানে তৎপর। শাখামৃগ প্রভৃতি জন্তুগণ সজীব বৃক্ষলতাদি ভক্ষণ করে। আর মানবের ত্যাজ্য ও অভক্ষ্য কিছুই নাই; বৃক্ষলতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জলজ, স্থলজ সকল জীবকে উদরে স্থান দিয়া বিশ্বরাজ্যের সিংহাসনে আসীন। মানব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। এই জন্য কেবল স্বয়ং জীব-শোণিতপানে তৃপ্ত হন না। মাতৃক্রোড় হইতে বৎসকে কাড়িয়া লইয়া কল্পনাসম্ভূত দেবদেবীর তৃপ্তি-কল্পে জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার শোণিত সোপচারে উৎসর্গ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন।

রামের ধন, শ্যাম অপহরণ করিতেছে, আবার শ্যামের ধন, মাধব কাড়িয়া লইতেছে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান, নির্ভীক, সহস্রগুণান্বিত রামচন্দ্র, পতিব্রতা বিমাতা কৈকেয়ীর প্রার্থনায় বনবাসী হইলেন। তথায় পতিপরায়ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে বলবান রাক্ষস রাবণ ছলে ও বলে অপহরণ করিলেন। প্রাণান্ত শ্রম করিয়া বন্ধুগণের সহায়তায় সীতা উদ্ধার হইল। উদ্ধারেও নিষ্কৃতি নাই, রাবণগৃহে বহুকাল একাকী বাসের জন্য অপবাদ ঘোষিত হইল। সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে প্রজাগণের সন্দেহ জন্মাইল। আজন্ম দুঃখভোগ করিয়া সীতা দেহত্যাগ করিলেন। আজন্ম-

শুদ্ধা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতার কি জন্য এত দুঃখভোগ? কেহ বলিলেন, লোকশিক্ষার্থ সীতার জন্ম; কেহ বলিলেন, দেবতার অভিসম্পাতে সীতার কষ্ট, কেহ বলিলেন, জন্মান্তরের পাপের ফলে সীতা জনম-দুঃখিনী। তবে যখন ইহজন্মে সীতার পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন জন্মান্তরে অবশ্য সীতার পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকিবে? ইহজন্মের পূর্ব্বে যে জন্ম ছিল, তাহাই জন্মান্তর। তাহার পূর্ব্বে যে জন্ম ছিল, তাহা কি নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল? না তাহা নয়। তাহার পূর্ব্বে আরও জন্ম ছিল, আবার তাহার পূর্ব্বেও জন্ম হইয়াছিল। এই প্রকার অনন্তকাল হইতে জন্মের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। জন্মজন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই কেন? স্মরণশক্তি যে যন্ত্রের বা বস্তুসমষ্টির সাহায্যে উদিত হয়, জীবাত্মা দেহকে ত্যাগ করিলে, সেই বস্তু-সমষ্টির ধ্বংস হয়. সুতরাং জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকে না, কিন্তু জন্মান্তর আছে, ইহা সত্য। তবে সীতার জন্মান্তরের পাপ কোথা হইতে আসিল? বহুপূর্ব্ব হইতে। কত পূর্ব্ব হইতে কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং বলিতে হইবে, অনন্তকাল হইতে। ভাল যদি সীতার পাপ অনন্তকাল হইতে সীতার সঙ্গে সঙ্গে আছে, তবে সীতা আজ কেমন করিয়া সেই পাপকে ত্যাগ করিবে? অনন্তকে কল্পনায় আনা যায় না। সীমাবদ্ধ জীবের—নিতান্ত পক্ষে অবোধ পিতার—অনন্তকে কল্পনায় আনা অসম্ভব।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিল। স্বয়ং বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহায়। বাসুদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি যে পক্ষের সহায় সে পক্ষের কি পরাজয় সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহায় কেন? পাণ্ডবগণ ধার্ম্মিক, আর যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন অধার্ম্মিক, দুর্য্যোধনের পরাজয় অনিবার্য্য। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথিগণ সহায় হইলেও পাপের পরাভব সংসারের নিয়ম। ধর্ম্মের গ্লানি নারায়ণ সহ্য করিতে না পারিয়া কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কোটী কোটী অশ্ব, গজ, পদাতি নিধন প্রাপ্ত হইল। দুর্য্যোধন অত্যাচারী, তাঁহার ভ্রাতারা, অনুচরবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি পুত্রপৌত্রগণের সহিত অত্যাচারী, তাহাদের বাহনগুলিও অত্যাচারী; তাহাদের সকলের বিনাশ-সাধন নারায়ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই জন্য বাসুদেবরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরপক্ষীয় বহুসৈন্যসামন্ত আত্মীয়স্বজন অশ্বগজাদির সহিত ধর্ম্মপক্ষাবলম্বন করিয়াও কেন অকালে যমপুরীতে পৌছিলেন? মৃত্যুর আবার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ কি? কল্য মরিত না হয় অদ্য মরিল। কালকে অনন্ত ধরিলে দুই মাস, দুই বৎসর অগ্রপশ্চাৎ কিছুই নহে। ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই হইল। ভাল, ধর্ম্মের বৃদ্ধি হউক, সকলে রসাতলে যাউক, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু এমন সর্ব্বসংহারক অধর্ম্মের সৃষ্টির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে, অধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। এক শ্রীকৃষ্ণ, এক বাসুদেব, এক নারায়ণই ত সব। সেই নারায়ণের নামে যদি ধর্ম্মের গৌরব-বৃদ্ধি না হয়. অধর্ম্মের সৃষ্টিতে কি ধর্ম্মের গৌরব-বৃদ্ধি হইতে পারে? নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা, পাপের সহিত জড়িত কেন হইলেন? জগতে লীলা দেখাইবার জন্য। অবোধ পিতার লীলা-তত্ত্ব বুঝিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িল।

অবোধ পিতা ভাবেন, সেদিন মাতৃক্রোড়ে ছিলাম, পরে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম। বিবাহ হইলে সন্তানসন্ততি লইয়া ঘোর সংসারী, ক্রমে বৃদ্ধ, দুইদিন পরে কোথায় যাইব স্থির নাই। দেহস্থিত যাহাকে জীবাত্মা বলে, তাহার কোথায় গতি হইবে, নিশ্চয়বুদ্ধিতে বুঝিবার উপায় নাই। স্থূল দেহটি ভস্মীভূত হইবে। অগ্নির সংস্পর্শে কতক অঙ্গারে, কতক ধূমে বা বাষ্পে পরিণত হইবে। অঙ্গারগুলির শেষ দৃশ্যমান পরিণতি মৃত্তিকা। বাষ্প আকাশে উড়িয়া যাইবে। রাশি রাশি বাষ্পের সহিত মিশিয়া যাইবে। আমার দেহের বাষ্প, রামের দেহের বাষ্পের সহিত একত্র হইয়া যাইবে, আবার রামের দেহের বাষ্প শ্যামের দেহের বাষ্পের সহিত মিলিত হইবে। অঙ্গারগুলিরও সেই পরিণতি। ফলে যাহাকে প্রাণ বলা যায়, তাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে, রামের তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ দেহের, শ্যামের কদর্য্য দেহের সহিত প্রভেদ থাকিবে না। বাষ্প, বৃষ্টিতে পরিণত হইতে পারে, বৃষ্টি, মৃত্তিকা-সংযোগে লতাবৃক্ষাদি উৎপাদন করে, বৃক্ষলতাদিতে ফলশস্য উৎপন্ন হয়, ফলশস্য আহারে জীবদেহ বর্দ্ধিত হয়, জীবদেহে সন্তান উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির বীজ, ক্ষিতি, অপ্‌ প্রভৃতির সমষ্টি, আর যাহাকে প্রাণ বলা যায় তাহা, এক অলক্ষিত তেজ। তাহা কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য, রামের ভৌতিক

দেহ যখন শ্যামের ভৌতিক দেহের সহিত মিলিত হইতে পারে, রামের সূক্ষ্ম দেহ বা প্রাণ কি তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না? কেহ বলেন, এই রাম-শ্যামের ক্ষয় নাই। অনন্তকাল পর্য্যন্ত রামশ্যাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান থাকিবে। প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বজগৎ সংকোচ প্রাপ্ত হইবে, রামশ্যামও সঙ্কুচিত হইবে—এবং পুনঃ-সৃষ্টি-কালে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে ও কর্ম্মফল-ভাগী হইবে। এই প্রকার সংকোচ ও বিকাশ কার্য্য চলিতে থাকিবে। অবশেষে রাম, শ্যাম মুক্তি পাইবে। কেহ বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, রাম-শ্যামের কোন পার্থক্য নাই। রাম যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আর শ্যাম যে পর্ণশালায় বাস করিতেছে, ফল সমানই। ধনবান ও দুঃখী সকলই সমান। সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়, কেবল রামশ্যামকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখাইতেছে। রামও অপ্রকৃত, শ্যামও অপ্রকৃত। অদ্য রাম সুন্দর, কল্য সে কদাকার; অদ্য তুমি যুবা, কল্য তুমি বৃদ্ধ; অদ্য তুমি ধনী, কল্য তুমি দুঃখী। জগতে এই পরি-বর্ত্তন অবিরামে চলিতেছে। এক্ষণে বাষ্প, পরক্ষণে বৃষ্টি, তৎপরে শস্যাদি। বাষ্পের, জলের, স্থলের, শস্যের পরমাণু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে পারিলে প্রমাণিত হইতে পারে, সকল সামগ্রীর পরমাণু একই পদার্থ। এ সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মতভেদ আছে। অবোধ পিতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মনের ক্ষোভে যদি তাহার বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ক্ষণৈক বিরক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, সে অপরাধ ক্ষমার্হ।

কেহ কেহ বলেন বস্তু ও চৈতন্য একই পদার্থ। চৈতন্যের দৃশ্যমান অবস্থাই পদার্থ। বিজ্ঞানের সাহায্যে কত কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা সাধারণের অজ্ঞাত, তাহাই বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু যে মহাশক্তি এই সমস্ত বিদ্যমান পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ্য? বিজ্ঞানবিদ্ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, আকাশকে মধ্যে না রাখিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অনুমান করা যায় না। নিউটনের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কালে কালে প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু মহত্তত্ত্বগুলির কর্ত্তাকে উপলব্ধি করা কি বিজ্ঞানের কার্য্য? কাল, পরমাণু, আকাশ, চৈতন্য প্রভৃতিকে কে সৃষ্টি করিল? ইহা কি যন্ত্রে সাহায্যে স্থির করা যায়?' চিন্তায় কি ভগবানকে আন যায়? যে মহাশক্তি বস্তুনিচয়ে পরস্পর সম্বন্ধ, অবিরাম গতি, আকার-পরিবর্ত্তন ও পুনঃ-সংগঠন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি? যে মহাশক্তি, যে আদিদেব, যে অনির্ব্বচনীয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভক্তি-অভক্তি, ভাব-অভাব প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অতি সূক্ষ্ম পরমাণুকে অভ্রান্ত নিয়মে চালিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি? যে সাধনাবস্থায় তর্কের বা চিন্তার শক্তি থাকে না, যে অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, যে অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখদুঃখ, শোকতাপ, নিন্দাস্তুতি, আত্মীয়পর জ্ঞান থাকে না, যে অবস্থায় আপন অস্তিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, সেই এক অপূর্ব্ব অবস্থাতেই সেই বিশ্ব-স্রষ্টার শক্তি বা বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সাধনাবলে ও ভগবৎ-কৃপায় সেই চরম অবস্থায় পৌছিতে পারিলে, সকল জীবের হৃদয়ে এমন এক শক্তি লুক্কায়িত ভাবে আছে, তাহা স্বতঃই জাগরূক হইয়া হৃদয় মধ্যে নারায়ণে একান্ত বিশ্বাস আনিয়া দেয়। তাহাই শ্রদ্ধা—তাহাই ভক্তি; সে সময়ে আর আদিদেবের টিকিতে টান দিতে ইচ্ছা হয় না, বরং জীবে তাঁহার অপার কৃপা লক্ষিত হয়। তাহাই বোধ হয়, ঋষিগণের কল্পিত অপূর্ব্ব সোঽহং অব-স্থার পূর্ব্বভাব। দেশদেশান্তর উচ্চনিম্নভূমি পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মহাসাগরে পতনোন্মুখ হইবার পূর্ব্বে তাহার যাদৃশ অবস্থা হয়, মানবের পক্ষে সে অবস্থাও তাদৃশ অবস্থা। পুরাকালে ধ্রুবের একদিন হয় ত সেই অবস্থা হইয়াছিল—যেদিন ধ্রুব মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া, হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত পদ্মপলাশ-লোচন জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন। সম্ভবতঃ সেই অবস্থা একদিন বৃন্দাবনের গোপীগণেরও হয়—যেদিন তাঁহারা তাঁহাদের স্তন্যপায়ী শিশুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কৃষ্ণকুঞ্জে অপার্থিব সুখ আস্বাদন করেন, আর যেদিন স্ত্রীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের নিকট বস্ত্রহীনা হইয়াও লজ্জা পান নাই। সেই অবস্থাতেই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকল শাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন সকল শাস্ত্র-জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, অনন্ত, অতুলপ্রতাপশালী, অসংখ্যবক্ত্র,

অসংখ্য নয়ন ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়দেহযুক্ত বিশ্বের যোনিস্বরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করেন :—

'পশ্যামি দেবাংস্তবদেবদেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥'

সমুদ্রমন্থনের ঐতিহাসিক সত্তা

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী M. A.]

মানবজাতির উন্নতি ইতিহাসে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিই সভ্যতার চরমবিকাশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। সমুদ্রমন্থন ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার সেই চরম বিকাশের রূপক বলিয়াই আমরা মনে করি। এই রূপকটির মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা এস্থলে প্রয়াস পাইব।

শিল্প ও বাণিজ্য যেরূপ বিপুল জাতীয় উন্নতির বিষয়, আমরা সমুদ্রমন্থনে তদনুরূপ বিশাল আয়োজনও দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের পৌরাণিক আর কোনও ব্যাপারে এরূপ বিরাট ঘটা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবাসুর একত্র এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা ইহার স্থূলবৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

দেবগণ আপনাদের বলক্ষয় লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর নিকট আপনাদের বলসঞ্চয়ের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে বিষ্ণু অসুরদিগকে লইয়া সমুদ্রমন্থন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ প্রদান করেন। অসুরগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে, মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া মন্থন আরব্ধ হয়। প্রথমেই সমুদ্রে যাবতীয় তরুলতা ও গুল্মাদি নিক্ষিপ্ত হয়। মন্থন হইতে উচ্চৈঃশ্রবা-অশ্ব, ঐরাবত-হস্তী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি উত্থিত এবং পরিশেষে অমৃত উৎপন্ন হয়। সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটি বস্তু উৎপন্ন হয়। এই সকল 'চতুর্দ্দশরত্ন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্থনোৎপন্ন দ্রব্য সকলের সারভূত অমৃত গ্রহণ করিয়া দেবগণ পুনর্ব্বার আপনাদের বলবিধান করিয়া অসুরদিগকে জয় করেন।

উপরে বাসুকিকে যে, আমরা সমুদ্রমন্থনের মন্থনরজ্জুরূপে বর্ণিত দেখিয়াছি, সমুদ্রমন্থনের প্রকৃত রহস্য তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি। বাসুকি সর্পরাজ ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী পাতালপুরীতে ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ানের বর্ণনায় সিন্ধুনদতীরে 'পাতাল' নামক একস্থানের উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হই। এই পাতাল এক সময়ে সমৃদ্ধ বাণিজ্যবন্দর ছিল। এইস্থান হইতেই ভারতীয় 'সিন্ধু' নামক মসলিন বস্ত্র প্রাচীন বেবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। প্রাচীন বেবিলোনিয়াতে মসলিনের এই 'সিন্ধু' নাম হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। * রেগোজিন্ মনে করেন, পূর্ব্বোক্ত পাতালপুরীর রাজা বাসুকি দ্রাবিড়জাতীয় রাজা ছিলেন। দ্রাবিড়জাতীয়েরা সর্পপূজা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের সর্প নাম হইতে বাসুকিও সর্পরাজ হইয়াছেন। রেগোজিন্ পাতাল ও বাসুকি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

'The late Greek historian Arrian mentions a maritime city, Patala, as the only place of note in the Delta of the Indus. This city, very probably the port from which the muslin went forth, and which is identified with modern Hyderabad, is renowned on legend and epic as the capital of a king of the Snake-race i.e. Dravidian King, who ruled a large part of the surrounding country. This native dynasty is closely connected with the mythical tradition of the two races, through its founder, King Vasuki—a name which at once recalls the great Serpent Vasuki who, played so important, if passive a part, on a memorable mythic occasion'.—VEDIC INDIA. p.308.

* The old Babylonian name for muslin was Sindhu Vedic India—p.306.

উপরে যে বৈদেশিক বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, -পাশ্চাত্য পণ্ডিত রেগোজিন্ মনে করেন, এই বাণিজ্য দ্রাবিড় জাতিরই হাতে ছিল। তাঁহার মতেই বস্ত্রবাণিজ্য দ্রাবিড়জাতির হাতে থাকিলেও বস্ত্র-শিল্প আর্য্যদিগের আয়ত্ত ছিল। আর্য্যগণ যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতেন, তৎসমস্ত দেশের ব্যবহারে লাগিয়া, যাহা উদ্বৃত্ত হইত, দ্রাবিড়জাতি কর্ত্তৃক তাহা বিদেশে নীত ও বিক্রীত হইত। আর্য্যগণ পঞ্জাবে বদ্ধ থাকিয়া, সমুদ্রের সহিত পরিচিত হইতে না পারায় বা অর্ণবপোত নির্ম্মাণ-কৌশল না জানিতে পারায়, তাঁহাদের স্বয়ং সমুদ্রবাণিজ্য পরিচালন সম্ভবপর ছিল না। রেগোজিনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"This is very strong corroborative evidence of several important facts, viz. that the Aryan settlers of Northen India had already begun, at an amazingly early period, to excel in the manufacture of the delicate tissue which has ever been and is to this day—doubtless in incomparably greater perfection—one of their industrial glories, a fact which implies cultivation of the cotton plant or tree probably in Vedic times already ;—that their Dravidian contemporaries were enterprising traders, that the relations between the two races were by no means of an exclusively hostile and warlike nature. For, if the name 'Sindhu' proves the stuff to have been an Aryan product, it was not Aryan export trade, which supplied the foreign market with it, for there was no such trade, the Aryans of Punjab not being acquainted with the sea, or the construction of seagoing ships. It is clear that the weaving of fine stuffs must have been an Aryan home-industry, that Dravidian-traders, probably itinerant merchants or peddlers, collected the surplus, left over from home consumption, certainly in the way of barter, the goods then finding their way to some convenient centre in the Western coast, where the large vessels lay which carried on the regular export and import trade."
—VEDIC INDIA—pp. 306-7.

রেগোজিন আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির বাণিজ্যসহযোগিতার যে ঐতিহাসিক চিত্র উপরে অঙ্কিত করিয়াছেন, সমুদ্রমন্থনে আমরা তাহারই আভাস দেখিতে পাই। দেব ও অসুরের একযোগে সমুদ্রমন্থন, সমুদ্রবাণিজ্য পরিচালনে তাঁহাদের পরস্পর সহকারিতারই রূপকমাত্র বাসুকি মন্থনরজ্জুরূপে বর্ণিত হওয়ায় এবং দেবগণ সমুদ্রতীরস্থ থাকিয়া রজ্জুকর্ষণ করেন বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় আর্য্যগণের হাতে অন্তর্ব্বাণিজ্য ছিল এবং অনার্য্য বা দ্রাবিড়দিগের হাতে বহির্ব্বাণিজ্য ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ড হইয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট পূর্ব্বভারত মহাসমুদ্রেরই পর্ব্বতবিশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরাণের বর্ণনায় ভারতীয় অনুদ্বীপ সকলের বিবরণে মলয়দ্বীপে মন্দর-নামক একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বতের স্পষ্ট উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ ॥২১
আকরং চন্দনানাং চ সমুদ্রাণাং তথাকরম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদীপর্ব্বতমণ্ডিতম্ ॥২২
তত্র শ্রীমাংস্ত মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতোবরপর্ব্বতঃ ॥২৩
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদাক্ষিতৌ ॥"২৪
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫২ অধ্যায়

"'মন্দর' নামে অন্য এক পর্ব্বত আছে।"—বঙ্গবাসীর অনুবাদ

উপরিউক্ত মলয়দ্বীপ যে বর্ত্তমান মালয়োপদ্বীপ, পুরাণে যবদ্বীপের সঙ্গে ইহার উল্লেখ হইতেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মলয়দ্বীপকে মূল কার্য্যস্থ

ও মন্দর পর্ব্বতকে প্রধান লক্ষ্য-স্থান করিয়াই ভারত সমুদ্রের সকল দিকে বাণিজ্যকর্ম্ম পরিচালিত হইত বলিয়াই মধ্যস্থান স্বরূপে মন্দরপর্ব্বত মন্থনদণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। ইউরোপীয় বণিক্‌দিগকেও আমরা মসলা-বাণিজ্যের জন্য প্রথমতঃ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই মূলকার্য্যস্থল (Basis of operation) নির্ব্বাচন করিতে দেখিতে পাই।

বাণিজ্য-সমৃদ্ধিই লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বাণিজ্যের শেষফলরূপ আর্য্যদিগের জাতীয় মহাশক্তিই 'অমৃত' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্য বা সমুদ্র-বাণিজ্য অনার্য্যদিগের হস্তগত থাকায় তাহারা আর্য্য-দিগের অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সমুদ্র-বাণিজ্যের নবোপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সহযোগিতা স্থাপন দ্বারা আর্য্যগণ বিশেষভাবেই পূর্ব্ব-প্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাই সমুদ্র-মন্থনের অমৃত পান করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরদিগের পরাজয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র-বাণিজ্য হইতেই প্রথম সমৃদ্ধিলাভ হয় বলিয়াই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

সমুদ্রমন্থনে প্রথমেই, তরুলতা, গুল্মপ্রভৃতি সমুদ্রে নিক্ষেপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ভারতীয় সমুদ্রবাণিজ্যের মধ্যে তাহারও সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যাইতে পারে। আমরা উপরে যে ভারতীয় বস্ত্র-বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়াছি, সেই বস্ত্র বৃক্ষজাত বলিয়া, ভারতীয় সমুদ্রবাণিজ্যের সহিত প্রথম বৃক্ষের সম্বন্ধেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে যে, মসলাদ্রব্যের বাণিজ্যই ভারতের প্রধান সমুদ্র-বাণিজ্য হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি। সুতরাং সমুদ্রে উদ্ভিজ্জ নিক্ষেপ, আমরা এই মসলার প্রথম সমুদ্র-বাণিজ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে পারি।

সলোমনের বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে চন্দন, গজদন্ত, বানর ও ময়ূরের যে সমস্ত নাম পাওয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত যে হিব্রু ভাষার নাম নহে, পরন্তু দ্রাবিড় ভাষার নাম, তাহাই পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতেও দ্রাবিড় জাতিকেই ভারতের প্রথম বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বলিয়া জানিতে পারা যায়।

দ্রাবিড় জাতি এই প্রকারে বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী হওয়াতে সম্ভবতঃ ধনের 'দ্রবিণ' নাম হইতে তাঁহাদের নাম দ্রবিড় বা দ্রাবিড় হইয়া থাকিবে। 'ড়' ও 'ণ' এক টবর্গীয় বর্ণ বলিয়া একের স্থলে অন্যের প্রয়োগ অস্বাভাবিক বোধ হয় না। পক্ষান্তরে বাণিজ্যের জন্য দ্রুতগমন ও সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি দ্বারাও 'দ্রু' ধাতু হইতে দ্রাবিড় নাম উৎপন্ন হইতে পারে।

সমুদ্রমন্থনে যে চতুর্দ্দশ রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এই চতুর্দ্দশরত্ন আমাদের নিকট সমুদ্র-বাণিজ্যের বিবিধ উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি বলিয়াই মনে হয়। 'রত্ন' শব্দ উৎকৃষ্টার্থেরই বাচক; যথা—জাতৌজাতৌযদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিহকথ্যতে।" প্রত্যেক জাতির যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের মধ্যে সমুদ্র-পথের সম্বন্ধ দ্বারা কোন কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিদেশ হইতে লব্ধ বলিয়াও প্রতীয়মান হয়। বাণিজ্য-ব্যাপারটি বিনিময়ের ব্যাপার সুতরাং স্বদেশের দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশের দ্রব্যলাভ বাণিজ্যের সাধারণ নিয়মেই হইতে পারে। পূর্ব্বের চতুর্দ্দশ রত্নের মধ্যে 'ঐরাবত' ও 'উচ্চৈঃশ্রবা' এই প্রকারে লব্ধ বলিয়াই অনুমিত হয়। 'ঐরাবত' ব্রহ্মদেশীয় শ্বেতহস্তী এবং উচ্চৈঃশ্রবা, আরবদেশীয় অশ্ব বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া ইরাবতী নদী প্রবাহিত। 'ইরাবতী' নামের সহিত ঐরাবত নামের ভাষাগত বিশেষ সম্বন্ধই বর্ত্তমান। ইরাবতী নদীর দেশে জাত বলিয়াই ঐ দেশের হস্তীর নাম 'ঐরাবত' হওয়া বিশেষরূপে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশের শ্বেত-হস্তী, হস্তী-জাতির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তজ্জন্য ইহা দেবরূপে পূজিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে ঐরাবতের জাতি বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হইবে না। আরবদেশের অশ্ব এখনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। সমুদ্রবাণিজ্য-যোগে এই অশ্ব ভারতে আনীত হইলে ইহা অপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই 'উচ্চৈঃশ্রবা' এই বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। উচ্চৈঃশ্রবা শব্দ সাধারণতঃ উচ্চ কর্ণবিশিষ্ট অর্থে ব্যুৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চশব্দ-বিশিষ্ট অর্থেও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। 'শ্রবস্‌' শব্দ যেমন কর্ণ বুঝাইতে পারে, তেমনই ইহা 'শব্দও' বুঝাইতে পারে। 'শ্রবণ করা যায় ইহা দ্বারা' এই অর্থে যেমন 'শ্রবস্‌' কর্ণ, বুঝায়—তেমনই শ্রবণ করা যায় ইহা এই অর্থে 'শ্রবস্‌' শব্দও বুঝাইতে পারে। আরব দেশের নামে এই

'উচ্চশব্দের' অর্থই বিদ্যমান কি না বলা যায় না। আরব শব্দটি 'আ' ও 'রব' এই দুই ভাগ করিয়া লইলে, রব শব্দের 'শব্দ' অর্থ হইতে 'আরব' শব্দের অর্থও উচ্চশব্দবিশিষ্ট হয়। আরব বা 'উচ্চ শব্দবিশিষ্ট' অশ্বের দেশ বলিয়া ইহার নাম আরব হওয়া অসম্ভব নহে। 'আরব' শব্দ যে এখনও অশ্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও ইহাই প্রমাণিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

এক্ষণে কোন্ সময়ে সমুদ্রমন্থন বা ভারতীয় প্রথম সমুদ্র-বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিষ্ণু যে সমুদ্রমন্থনের প্রধান নায়ক ছিলেন, তাহা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং বিষ্ণু উপাসনার প্রাধান্য সময়েই সমুদ্রমন্থন হয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণু যে সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনদণ্ডরূপ মন্দর পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠান করেন বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাও এই সম্বন্ধেই প্রমাণ দিয়া থাকে। লক্ষ্মীদেবী যে তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী হন, তাহাতেও দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। 'কৌস্তুভমণি' ও 'শঙ্খ'ও বিষ্ণুই প্রাপ্ত হন। এইরূপে বিষ্ণুকেই মন্থনোৎপন্ন দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ প্রদত্ত হওয়ায় সমুদ্রমন্থনে তাঁহার কর্তৃত্ব বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। তিনি চক্রান্ত করিয়া যে, অসুরদিগকে অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহাতেও তাঁহারই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু ব্যতীত কেবল ইন্দ্রই স্বতন্ত্রভাবে মন্থনোৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ প্রাপ্ত হন তিনি ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করেন। ইহাতে বৈদিক সময়ের শেষে পৌরাণিক সময়ের প্রারম্ভে যখন বিষ্ণু সর্ব্ব প্রধান দেবতারূপে পরিণত হইয়াছিলেন অথচ ইন্দ্রের বৈদিক প্রাধান্যও তাঁহার পৌরাণিক দেবরাজরূপে স্বীকৃত হইতেছিল, তখনই অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু-উপাসনার সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব সময়েই সমুদ্রমন্থন বা ভারতীয় সমুদ্রবাণিজ্য প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

আদর্শ প্রেম

[শ্রীমতী সুভাষিণী রায়]

সুখের আশায় কভু ভাল ত বাসিনি তায়,
অথবা বাসিনি ভাল প্রতিদান পিপাসায়।
অকাতরে অসন্দেহে দিয়াছি হৃদয়ে ধরি—
বিলায়ে দিয়েছি হেসে আমারে তাহার করি—
এ ভালবাসার নাম যত স্বার্থ বলিদান,
আত্মসুখ বিসর্জ্জন, বিসর্জ্জন নিজ প্রাণ।
গর্ব্ব, অভিমান, স্বার্থ, সুখের কামনা লেশ—
এ প্রেমে সে সকলেরি হয়েছে সমাধি-শেষ।
শিরায় শিরায় প্রতি ধমনীতে বহে মোর,
প্রেমের প্রবাহ উষ্ণ—কে বলে শোণিত-লোর ?
চিরসুখ অভিলাষী যাহারা ধরণী পরে,
প্রেমের এ আত্মদান বুঝিবে কেমন ক'রে ?
তাদের দারুণ তৃষা ছুটে মৃগাতৃষ্ণিকায়,
মোর সুশীতল বক্ষ স্বচ্ছ বারি নাহি চায়।
আলেয়া তাদের আলো, মোর শুধু ধ্রুবতারা,
আমি চিরভ্রান্তিহীন, তারা চিরপথহারা।
কেমনে বুঝিবে তারা আমার এ ভালবাসা ?
ইহাতে ছিলনা—নাই—কখন সুখের আশা॥

প্রার্থনা

[শ্রীমতী বিজনবালা দাসী]

চাহিনা হইতে প্রভু, অসি খরশাণ
পীড়ন করিতে দুরবলে,
ক'রো মোরে ক্ষুদ্র যষ্টি, খঞ্জ অন্ধ যেন
আশ্রয় করিয়া পথে চলে।

চাহিনা হইতে প্রভু, বিরাট গম্ভীর
সুমহান্ উচ্চশৈলমালা,
ক'রো মোরে শ্যাম শস্য, নিবাইতে পারি
ক্ষুধিতের উদরের জ্বালা।

চাহিনা হইতে প্রভু, অসীম অতল
লবণাক্ত ফেনিল সাগর,
ক'রো মোরে নির্ঝরিণী, স্বচ্ছ সুশীতল
পানে যেন তৃপ্ত হয় নর।

সাহিত্য-সঙ্গত

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর

ত ২৭এ ভাদ্রে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয়ের টীতে সাহিত্য সঙ্গতের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। এই ধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয় ম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন;—

"সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণ,

মার সৌভাগ্যক্রমে আজ সাহিত্য-সঙ্গত আমার গৃহে আহূত হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি স্বয়ং সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত, সাহিত্যিক-রূপে আপনাদিগকে আহ্বান করিবার আমার অধিকার নাই কিন্তু সাহিত্যের যে মাধুর্য্য আপনাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমিও তাহার রসাস্বাদনের জন্য উৎসুক, আপনাদিগের ন্যায় আমিও

কোন বাড়ীই পাঁচসাততোলার কম নহে। বাড়ীগুলি বাহির হইতে দেখিতে সুন্দর। নীচের তালার ঘরগুলি জেলের মত গরাদে দেওয়া। মাটির নীচেও ঘর (Cellar) আছে। বাজার দোকান অনেক। সুসজ্জিত থিয়েটার, বায়স্কোপ ও অন্যান্য আমোদের স্থানও বিস্তর। রাস্তা ও ফুটপাথ পাথর-বাঁধা, রাস্তার দুই ধারেই গাছের শ্রেণী; দেখিতে বড় সুন্দর। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, ট্রাম, মালগাড়ী, জনস্রোত রাস্তায় ক্রমাগত চলিতেছে। কোনরূপে জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে হয়, এমন ভাবে ফরাসী জীবন-যাপন করে না। চিন্তাশীল অথচ কর্ম্মঠ লোকের লক্ষণ চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। সাধারণ গরিব ঘাটে স্ত্রীলোকের মুখাবরণও যথেষ্ট দেখিয়াছি। মার্সেলসে প্রকৃত য়ুরোপীয় গৃহস্থজীবনের প্রথম পরিচয় পাইলাম। এখানে পুলিসের সকল লোকেই সশস্ত্র। কারণ, ফরাসী বদমাইস আজকাল প্রবল হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈনিক-দলও দেখিলাম।

নগরে অশান্তি ও আবর্জ্জনার লক্ষণ নাই। আমাদের দেশের ধরণেরই মিউনিসিপাল আবর্জ্জনার গাড়ী ক্রমাগত রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে। পাহাড়ে রাস্তা অত্যন্ত গড়ানে বলিয়া এত বৃষ্টিতেও জল দাঁড়াতে পারে নাই। ড্রেনেজও খুব পরিষ্কার থাকে কিন্তু ঢালু রাস্তার জন্য গাড়ী ও পথিকের পক্ষে পথচলা কিছু কষ্টকর।
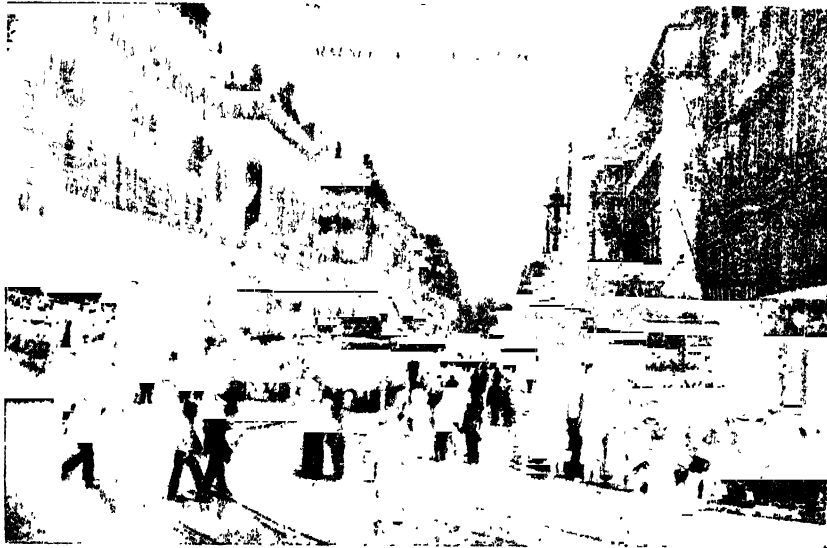
মার্সেলস্—সহরের রাজপথ-দৃশ্য

লোকেরাও সৌখীন; কাপড় ময়লা হইবার ভয়ে, সৌখীন কোট-ওয়েষ্টকোটের উপর রাস্তায় চলার ও কাজকর্ম্ম করিবার সময় আলখাল্লার মত একটা লম্বা জামা পরে। "বাবু" লোকেরা অবশ্য তাহা পরে না। তাহারা সর্ব্বদাই সুসজ্জিত। কাপড় নষ্ট হইবার ভয় করে না। কত প্রকার বেশধারী কত রকমেরই লোক যে রাস্তায় দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাইতেছে আসিতেছে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সার্ব্বজনীন বিভিন্নতা এই প্রথম দেখিলাম। পোর্টসায়েদ ও মাল্টায়-গৃহস্থ জীবন বড় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পথে

আবার বৃষ্টি আসিল বলিয়া অগত্যা Fiacre গাড়ী একখানা ভাড়া লইতে হইল। গাড়ীর হুড তুলিয়া দিয়া নগরদর্শনের বড় ব্যাঘাত হইল। Zoological Garden বাড়ীটা বাহির হইতে দেখিয়া আসা গেল। পাথরের সুন্দর বাড়ী। বোটানিক্যাল গার্ডেন, (Notre dame) গির্জ্জা প্রভৃতি দূরে। বৃষ্টিতে দেখা দুষ্কর—অকারণ কষ্ট করিয়া ফল নাই। অগত্যা ক্ষুণ্নমনে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। গাড়ীতে দুইজনের অধিক তিনজন উঠিলেই ডবল ভাড়া;— এটাও নুতন। কলিকাতায় নাকি এইরূপ আইন-প্রচলনের চেষ্টা সম্ভব শুনিতেছি। তাহা

হইলে পরিবারশুদ্ধ সকলে থার্ড্‌ক্লাস গাড়ীতে যাওয়ায় বিপদ।

হোটেলে ফিরিয়া, মুখহাত ধুইয়া, বেশ-পরিবর্ত্তনে ৭॥০টা বাজিল। স্নানাগারের প্রয়োজনীয় তোয়ালে, কাগজ সম্বন্ধেও হোটেলওয়ালার কৃপণতা। মুখ ধুইবার জলের নলও সরু সরু! সাবান দেয় না। স্থানভেদে নিয়ম ভেদ!
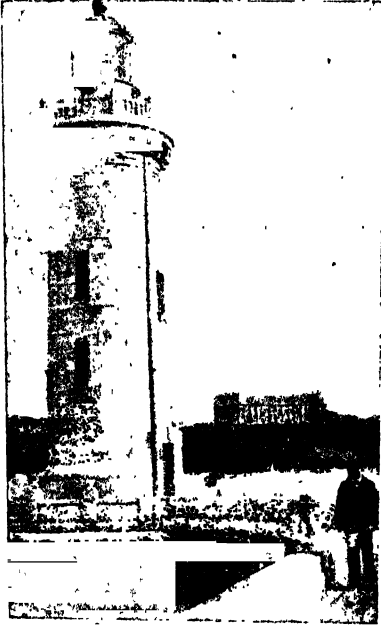
মার্সেলস্—সেন্ট্‌মেরি ভজনালয়

শরীর ক্লান্তবোধ হইতেছিল। আর শরীরেরই বা দোষ কি, তাহার উপর জুলুমটা ত বড় কম হইতেছে না! বড় রুচি ছিল না। তবে সমস্তদিন প্রায় অনাহার গিয়াছে এবং ফরাসী-হোটেলের সৌখিন খাওয়াটা কিরূপ দেখিবার জন্যও বটে যথেষ্ট অপব্যয় করিয়া "দেখাগেল।" আহার অতি সামান্য করিলাম। কিন্তু পরিবেশন-প্রণালী ও সাজসজ্জা দেখিয়া কিছু শিক্ষা লাভ হইল। ইংরাজী-হোটেলের মত যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুলিয়া লওয়া দস্তর নহে। পরিচারক কাঁটা-চামচ এক হাতে ধরিয়া, চীনেম্যানেরা দুইটি কাঠী দিয়া যেমন ভাত খায়, সেইভাবে পরিবেশন করিল; পরিবেশন-কালেও সভ্যতাসূচক মাথা নোয়াইয়া একটু নৃত্যশীল গতিতে চলিতে লাগিল। একহাতে পাঁচ-ছখানা কাঁচের রেকাব অক্লেশে লইতে লাগিল। ইহাদের ব্যবহার আমাদের দেশের ইংরাজী-হোটেলের অভ্যস্ত ধরণের নয়। রান্নাও বেশ পরিষ্কার। "অখাদ্য" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়া দেওয়াতে সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। ফল-পরিবেশনের সাজীটি সুন্দর সাজাইয়া আনিল। নবোঢ়া বধূর রক্তবর্ণ চেলাঞ্চলের ন্যায় সুন্দর ঘোমটার মত কাপড় দিয়া সাজীটি সাজান। তাহাতে সলজ্জ বধূর বেশবিন্যাসের ন্যায় বেরী, কলা, কমলালেবু, সবুজ বাদাম থরে থরে গুছান রহিয়াছে। দেখিয়াই তৃপ্তি হইল। কিছু ফল খাইয়া আজিকার মত ভোজন ব্যাপার সমাধা করিলাম।

ভোর রাত্রি হইতে প্যারিস-গমন-উদ্যোগ আরম্ভ হইল। মোটঘাট বাধাই আবার মুস্কিল। তাহার উপর দেখি, Hold Allএর বাধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পেণ্টালুন গেঞ্জির বোতাম নাই। সূচ সূতাও সঙ্গে নাই। বোতাম টাঁকিয়া দিবার লোক নাই। প্রবাসের সুখ আরম্ভ হইল! যাহা-হয় করিয়া গুছাইয়া লইলাম।

প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিয়া, কফিরুটি খাইয়া লইলাম। সময় অনেক আছে দেখিয়া লেখা আরম্ভ করিলাম। এই ভ্রমণ-কথা লিখিতেছি দেখিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এজীবনটা লিখিবার জন্যই আসিয়াছেন। ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কপালের ও স্বভাবের দোষ। কাজ-আর-লেখা লইয়া বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? Frederic Harrison প্রত্যহ ১৫০০ কথা লেখেন। গণনা করিলে একয় দিনে আপনার কত কথা লেখা হইয়াছে, তাহা দেখিবার লোক নাই।" কথাত নয়—আবর্জ্জনা। গণনা করবে কে করিবে?

হোটেলের দাম চুকাইবার ভার কিট্‌নি সাহেবের উপর ছিল। টাকা-কড়ি তাঁহারই হাতে দিলাম। এ সম্বন্ধে যন্ত্রণা সহ্য যত কম হয়, তত ভাল। নতশিরে, দস্তুরমত ফরাসী নমস্কার করিয়া, হোটেল-অধিকারী ও ভৃত্যগণ বিদায় লইল।

৩রা জুন, ১৯১২, সোমবার।—বেলা ৮টার সময় হোটেলের মোটর গাড়ীতেই ষ্টেসন রওনা হইলাম। কাল বৃষ্টিদুর্য্যোগের জন্য সহর দেখার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল। আজ যতদূর সম্ভব দেখিয়া লইলাম। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ফ্রান্সের জলবায়ু বেশ মিষ্টে। ফ্রেঞ্চ রেপব্‌লিক্ ঘোষণার সময় সহরের

মার্সেলস্ সহরের সিংহদ্বার

মধ্যস্থলে স্মরণার্থ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার উপর Republicএর নেতাদিগের প্রস্তরময় মূর্ত্তি রহিয়াছে। কিছুদিন তাহা দেবতাস্থানীয় হইয়া আদর পাইত; এখন তাহার প্রতি বড় কাহারও লক্ষ্য নাই। নিকটেই মিউনিসিপালিটি সাধারণের কাপড় কাচিবার জায়গা করিয়া দিয়াছেন। ধরিতে গেলে যথার্থ Republic Spiritএর পরিচয়! Republicanদেরমধ্যে কাপড় কাচানর পয়সা যাহাদের জোটেনা, অথচ কাপড় কাচাও প্রয়োজন, তাহাদের সহরের কর্ত্তারা রাস্তার মাঝে কাপড় কাচিবার জন্য জলের চৌবাচ্চা করিয়া দিয়াছেন। Republic Leaderদের চরণচ্ছায়া-তলে বসিয়া, পাথরের উপর আছড়াইয়া, নিজ নিজ কাপড় কাচার মধ্যে হয়ত ভবিষ্যৎ Presidentএর কাপড়ও পরিষ্কার হইতেছে! দেখিবার শিখিবার এইরূপ সামান্য সামান্য অনেক জিনিসের মধ্যে

মার্সেলস্—ইংরেজদিগের গির্জ্জা ও মনুমেণ্ট
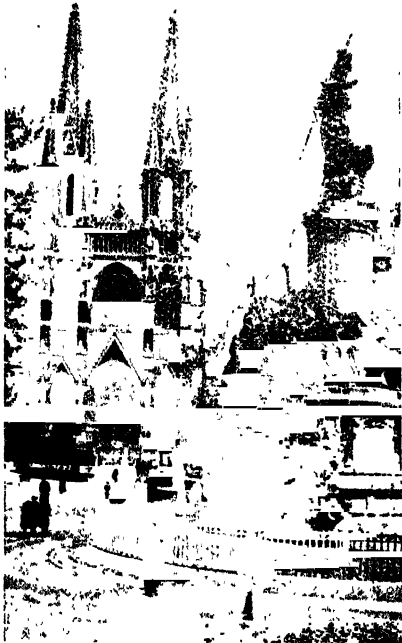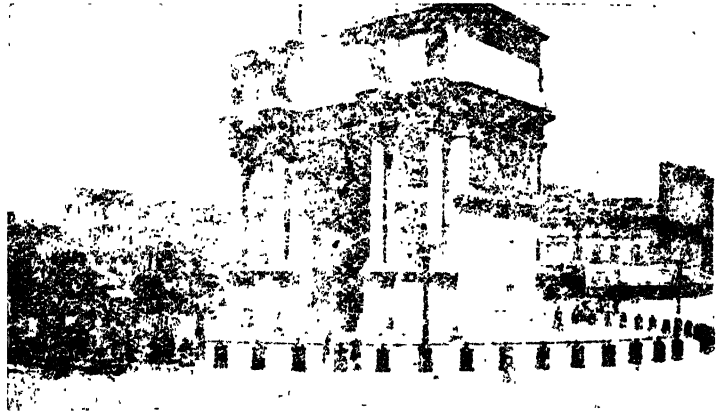
থাকে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ষ্টেসনে পৌছান গেল। আমাদের যদিও ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট ছিল এবং দিনের বেলা যাইতে বিশেষ কিছু কষ্ট হইবে না, তথাপি সীট্ রিজার্ভ করা ভাল বিবেচনায় তাহা করা গেল। কিন্তু তাহার দক্ষিণা স্বতন্ত্র। হাবড়ায়—শিয়ালদহে চিঠি লিখিয়া বা টেলিফোঁ করিয়া সীট্ রিজার্ভ করা যায়। এখানে নগদ অতিরিক্ত মূল্য কিছু দিতে হইল। এসকল ব্যবস্থা কিটনী সাহেব সকলের পক্ষ হইতেই করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত। ফরাসী ভাষার ফরাসী টাকার, তত্ত্বভেদ করিতে সময় লাগে। পয়সা দিয়া আজকাল সকল বিদ্যাই উপার্জ্জন করিতে হয়। পয়সা দিয়া অভিজ্ঞতাও লাভ করিতে হয়। বিদেশী দেখিলেই পয়সা ঠকাইয়া লইবার চেষ্টা সর্ব্বত্র। এখানে কিছু বেশী। আমাদের গাড়ী Express নয়—ইহার নাম Rapide অর্থাৎ দ্রুতগামী। সেই জন্য সঙ্গে Dining Saloon আছে। এক গ্লাস জলের চেষ্টায় যাওয়াতে হোটেলরক্ষক বলিল, 'জল নাই'! হোটেলওয়ালারা জল রাখে না কেবল মদ রাখে। স্নানের ঘরের ভিতর কাঁচের কুঁজা-গেলাসে যাত্রীদের জন্য জল থাকে। উহা পানে প্রবৃত্তি হয় না। যাহারা মদ খায় না, তাহাদিগকেও এইরূপে বাধ্য হইয়া মদ খাইতে হয়। কারণ মদ বড় সস্তা। দেশে কুঁজা-গেলাস সঙ্গে থাকে, ভাবনা থাকেনা। এখানে সে বন্দোবস্ত না থাকায় অসুবিধা হইল। অথচ কুঁজা-গেলাস, বিছানা-বালিস লইয়া কেহই এ পথ ভ্রমণ করে না, বিছানা-

মার্সেলস্ এক্সচেঞ্জ বাটী

...লিসও রেলে ভাড়া পাওয়া যায়। এক রাত্রের ভাড়া প্রায় এক টাকা। কা'র ব্যবহৃত বিছানা-বালিস ব্যবহার করিতেছি, ঠিক নাই। যাহা হউক, জলপিপাসা সহ্য হইল না। আবার চেষ্টাতে অনেক কষ্টে Peria water পাইলাম। দাম ৭৫ সেণ্টিম, অর্থাৎ প্রায় আট আনা! জাহাজে তাহার দাম চার আনা দিতেছিলাম; আর Peria water এর জন্মস্থানে আট আনা লইল! মদের দাম ইহা অপেক্ষা সস্তা। তাহা না লইয়া দুর্ম্মূল্য অকর্ম্মণ্য পানীয়ের জন্য কেন আমি এত ব্যস্ত, ফরাসী বিজ্ঞ হোটেলরক্ষী তাহা কিছুতেই বুঝিল না!

মার্সেলস্ ষ্টেসনটি বেশ সুন্দর গঠনের। কাচের ছাদ বলিয়া খুব আলো হয়, প্লাটফর্ম্মও বেশ প্রশস্ত। অধিকাংশ ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্ম অত্যন্ত নীচু—প্রায় মাটির সঙ্গে সমান। আমাদের দেশের মত মাটি হইতে অধিক উঁচু নহে। গাড়ী লাইনে shunting করা প্রভৃতি কাজ এঞ্জিনে না হইয়া ঘোড়া দ্বারাই হয়। সদর রাস্তাতেও কাল ইহা দেখিয়াছি। ষ্টেসনের ভিতর লাইনেও তাই; ঘোড়া সস্তা, কয়লা মহার্ঘ্য। কাজেই এই বন্দোবস্ত! লোকস্রোত এবং লোকচরিত্র এইরূপ বড় বড় ষ্টেসনে প্রগাঢ়রূপে "গবেষণ" করা যায়। শুধু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিলেই হয় না। একটু প্রখর দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বোঝা যায়। ষ্টেসনে বহুলোক। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত। কিন্তু অনুসন্ধান দৃষ্টির সাহায্যে একএক জন যেন একএকটা স্বতন্ত্র জগৎ মনে হয়। একএকজন একএকভাবে অনুপ্রাণিত। কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক আছে, বোধ হয় না। এই প্রকাণ্ড লোকচক্রের ভিন্নভিন্ন অংশ যেন স্বাধীনভাবে, কাহারও মুখ না চাহিয়া, নিজ গন্তব্য পথে চলিয়াছে। অথচ ইহা বিষম ভ্রম। কেহ কাহারও ছাড়া নয়। নূতন তন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া, হাঁ করিয়া, নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবার ও দেখিবার স্পৃহা শুধু আমারই একলার ছিল, তাহা নহে।
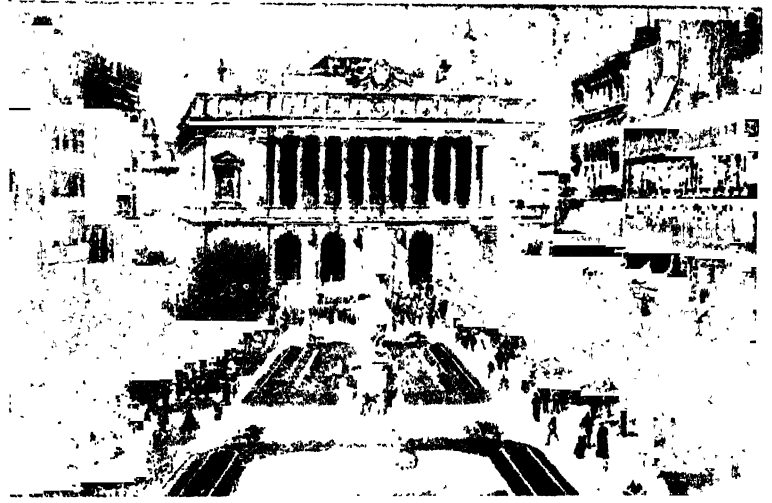
মার্সেলস্—প্রধান শাসনকর্ত্তার আবাস-বাটী

আমার পাগড়ী এবং মিস্ চক্রবর্ত্তীর সাড়ীর দিকে অনেকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অথচ সে দৃষ্টিতে কোনরূপ অভদ্রতা বা ইতরতা নাই। রেলের গাড়ীর ভিতর, কামরার পাশ দিয়া, বারান্দা আছে। একগাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাওয়া যায়। সবগাড়ী হইতে হোটেল
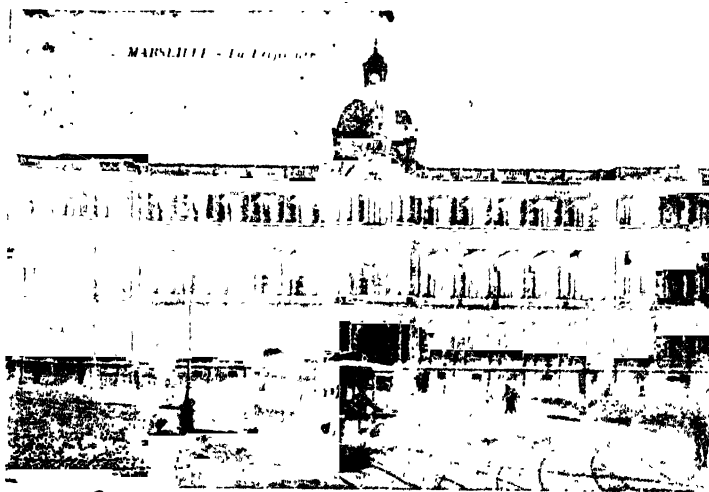
গাড়ীতে যাওয়া যায়। কতকটা আমাদের দার্জ্জিলিঙ্ মেলের মত। এক একটা ঘর আলাদা বন্ধ করিবার সুবিধাও আছে। তাহাতে অবশ্য চুরী ডাকাতি বন্ধ হয় না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া থাকিবার
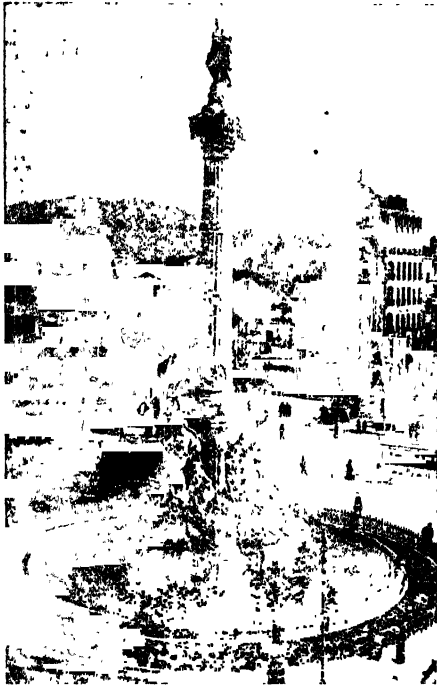
মার্সেলস্— ক্যান্টিনি ফোয়ারা

সুবিধা আছে। আজকাল আমাদের দেশেও এ শ্রেণীর গাড়ীর চলন বাড়িতেছে। অতএব নূতন কিছু নয়। নূতনের মধ্যে গাড়ীর ঘর গরম করিবার যন্ত্র আছে। কিন্তু দারুণ শীতে তাহাতেও বড় কাজ হয় না। আর নূতনের মধ্যে দেখিলাম যে, থার্ডক্লাসের গাড়ীগুলিতে পর্য্যন্ত অয়েলক্লথের গদি ও পায়খানা আছে। আমাদের দেশের মত ভেড়া-গরুর মত মানুষ-বোঝাই করা ও রেল-কর্ম্মচারীদের দুর্ব্বিনীত অত্যাচার কোথাও দেখিলাম না। অতি বিনীতভাবে ভদ্রতার সহিত কর্ম্মচারীরা যাত্রী মাত্রেরই সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। ক্রমশঃ ট্রেন ছাড়িয়া দিল। য়ুরোপীয় রেলে এই প্রথম ভ্রমণ। লাগিতেছে মন্দ নহে।

পথের কথা বলিবার ইচ্ছা যথেষ্টই আছে; কিন্তু সাধ্যে কুলাইতেছে না। সমস্ত দিন পথের দৃশ্য যাহা দেখিলাম, তাহা বলিবার নহে। তাহা বলা আমার সাধ্যাতীত।

পর্ব্বত, নদী, গ্রাম, সহর, বন, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা, পরে পরে চতুর শিল্পী কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। যেখানে যেটি হইলে মানায়, সেইটি যেন সেইখানে রাখা! Sleeping carএ ৪ পাউণ্ড বেশী ভাড়া দিয়া সমস্ত রাত্রি এই সুন্দর বর্ণনাতীত দৃশ্যের মধ্য দিয়া যে ঘুমাইয়া যাই নাই, ইহা আমার সৌভাগ্য। মার্সেলসে একদিন দুর্য্যোগে হোটেলের বিছানায় কাটাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহার শোধ হইল। রাত্রে এ পথ অতিবাহন করিলে, এ সৌভাগ্য ঘটিত না।

মার্সেলসের সমুদ্রতীর হইতে রেলপথ আরম্ভ। সমুদ্রের মধ্য হইতেই পর্ব্বত উঠিয়াছে, তাহার উপর বাড়ী, ঘর, গির্জ্জা ও দুর্গ। এ সকলের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।—পর্ব্বত ও সমুদ্র দৃশ্য একাধারে উভয়েরই উপর "উজ্জ্বল সৌরকররাশি" পড়িয়া দৃশ্যকে প্রতিফলিত করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদীপার্শ্বে অতলস্পর্শ গভীর উপত্যকা। তাহার উপর পুল বাঁধিয়া রেল চলিয়াছে।

অপর পার্শ্বেই শিরস্পর্শী গিরি আলপ্‌সের ফ্রান্সস্থিত বহুতর শাখা বাহু বিভিন্ন করিয়া, P. L. M. (Paris-Lyons Mediterranean Rail) চলিয়াছে। বম্বের পথে ৮।১০টা, আর হাজারীবাগের নিকট ৫।৭টা টনেল দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়াছিলাম; এ পথে যে কত অধিক ও কত বৃহৎ বৃহৎ টনেল দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। ইহার সুদূর পূর্ব্বে ইটালী হইতে সুইজার্লাণ্ড যাইতে প্রসিদ্ধ সেই সিম্প্লন্ টনেল, ফিরিবার সময় যদি হয়, তবে দেখা যাইবে। আপাততঃ যাহা দেখিলাম, তাহাই যথেষ্ট।

যে গুলি দেখিলাম, তাহা Simplon ও St. Gothard-এর ক্ষুদ্র সংস্করণ হইলেও অনুকরণ নহে। কারণ তাহার বহুপূর্ব্বেই জন্মিয়াছে। ইটালী-বিজয়োন্মুখ Napoleon, তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী রোমান বীরের অনুকরণে গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "Alps,—there shall be no Alps." তাঁহাকে অনেক সৈন্যক্ষয় করিয়া Alps পার হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী শান্তিপ্রিয় প্রজারা বিজ্ঞান-কৌশলে নিশিদিন আল্‌প্সের বক্ষভেদ করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের নিকট যথার্থই "Alps,—there shall be no Alps" গরিমা খাটে। দেখিতে দেখিতে বাল্যের "ভূগোল

ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসরণে।

শিল্পী—জি, এফ, ওয়াটস R. A.:]

পাঠে" পরিচিত রোণ নদী দেখা দিল। রোণ এইস্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

'Rapid turbid turgid, rushing muddy Rhone.'—প্রথম দেখিয়া এই ধারণা হয় বটে; কতবার কত পুলের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পোল পার হইলাম, সংখ্যা নাই। কখন নদী হইতে লাইন অনেক উচ্চে, কখন লাইন নদীকূলের সহিত সমান। বুঝি দামোদর প্রকোপের ন্যায় প্রকোপে ভাঙ্গিয়া ধুইয়া মুছিয়া যায়। কোথাও বা লাইনের উভয় দিকে, কোথাও বা একদিকে অতলস্পর্শ উপত্যকা। আবার উচ্চ পর্ব্বত—কোথাও বা শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে রেলপথ স্থান দিতেছে। যেন সাজান বাগানের মাঝখান দিয়া খেলাঘরের রথ চলিয়াছে। নদীতে ছোট ছোট ষ্টীমারে মালের ফ্লাট্ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, জেলে ডিঙ্গী সংসারীর নিত্যকার্য্যের চেষ্টায় ফিরিতেছে। নদীমধ্যে বন বন, নিবিড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, ক্ষুদ্রতম নৌকার গতিরোধ করিতেছে। অল্প সময়ের জন্যে এইরূপে রোণের অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার চক্ষে মাতৃকা-মূর্ত্তিই প্রবল দেখিলাম। "পুণ্য পীযূষস্তন্যদায়িনী" মাতৃকা-মূর্ত্তিতে রোণ দক্ষিণ ফ্রান্সকে শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গুরের ক্ষেত রহিয়াছে। Olive, Cypress, Poplar, Fir, প্রভৃতি পরিচিত ও কত অপরিচিত গাছ, Season flowerএর মত কত পরিচিত ও কত অপরিচিত লাল,নীল,সাদা ফুলে গিরিশিখর, পর্ব্বত ও ক্ষেত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে। শোভা-বৈচিত্র্যের বর্ণনা করা দূরে যাউক, শুধু তালিকা লিখিয়া শেষ করাও অসম্ভব!

কোথাও সমতল ভূমিতেই কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে। কোথাও পর্ব্বতের ধার কাটিয়া স্তরের উপর স্তর, তাহার উপর উপর ছাদের আকারের অসংখ্য স্তর উপর্য্যুপরি হেলান কৃষিক্ষেত্র। তাহাতে আঙ্গুর, ছোলা, গম, প্রভৃতি রোপিত রহিয়াছে। সমতল ক্ষেত্রের অভাব বলিয়া ফ্রান্সের কৃষক দমিয়া পড়ে নাই। তাহারা আকাশে সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। কত যত্নে এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ফলফুল ও শাক-সব্জীর বাগান করিয়াছে।—চারিদিকে বেড়া বাঁধিয়া পাহাড়ের ধ্বস বন্ধ করিতে হইয়াছে। এ সাজান পাহাড়ের গায়ে যেন "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধের" পরিচিত বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। যেন ছবির মত গরুগুলি এখানে সজীব হইয়া চরিতেছে।

প্রথমে ভ্রম হইল, জমাট দুগ্ধের বিরাট বিজ্ঞাপন এই অজানা দেশের ধূসর আকাশের গায়ে কোন চতুর শিল্পী ভ্রান্তিবিলাস অভিনয়ের আয়োজন উপলক্ষে আঁকিয়া দিয়াছে! পশুগুলি নদীর গর্ভে এবং গভীর উপত্যকার মধ্যে চরিতেছে। ধান্যের নিতান্ত অসদ্ভাব না থাকিলে, কবির কল্পনা "ধনধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার" কথা বলিতাম। কিন্তু শস্যপুষ্প ফলভরা বলিতে হইবে। কচিৎ সেই জীব-প্রবাহ সূর্য্যালোকে লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। কখন বা বৃষ্টি-শীতে কম্পিত দেহে তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। পথে রৌদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, সকল অভিনয়ই বিশিষ্ট রূপে দেখা গেল। লম্বা লম্বা সারি সারি আঙ্গুরের ক্ষেত-গুলির শোভা বড়ই মনোহর। কৃষক, পৃষ্ঠে জলের পাত্র বাঁধিয়া, নলে করিয়া গাছগুলি ধীরে যত্নে সন্তর্পণে ধুইয়া দিতেছে। অক্টোবর মাসে ফলগুলি অগণন আত্মার ধ্বংস সাধন করিয়া কৃষকের জন্য অগণন ধনরত্ন প্রসব করিবে।

অকর্ম্মণ্য অথচ উচ্চশির "পপ্‌লার", নিম্নশির অথচ ফলশালী অলিভ, শোকম্লান সাইপ্রাসের সারি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ এই সকল বৃক্ষরাজির সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রগুলি যেন সুসজ্জিত উদ্যানের মত দেখাইতেছে। কোথাও গিরি-শির নিবিড় বনজঙ্গল পরিপূর্ণ, আবার কোথাও সুকোমল তৃণদ্বারা যেন কার্পেটমণ্ডিত বোধ হইতেছে। কোথাও বহু উচ্চে, কোথাও বহু নিম্নে সমতল ক্ষেত্র; পর্ব্বত গাত্রে ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম, কচিৎ বা বৃহত্তর নগরী।

আমাদের সহরে বাড়ীগুলি যেমন অত্যন্ত গায়ে গায়ে এখানেও সেইরূপ। দেশে এত উন্মুক্ত প্রান্তর থাকিতে মানুষ একত্র একস্থলে কেন এত জনতা করে, ইহার তথ্য এখনও নিরাকরণ হয় নাই—হইবেও না। আমাদের ট্রেন Taraca, Arigum, Lyons, Valentia, Dijon, La Roche এই সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেসনে দাঁড়াইল। কিন্তু সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠবে এবং মানব "সৌকার্য্যার্থে" পথপার্শ্বস্থ অপর গ্রাম-গুলিও অপ্রধান নহে। ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে দক্ষিণ-ফ্রান্সের এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পল্লী ও সহরগুলি বিখ্যাত।

কৃষকদিগের ক্ষুদ্র কুটীরগুলিও বড় সুন্দর। পাথরের

বা Reinforced Concreteএর দেয়ালে লাল কিংবা নীল খোলার ছাত। এ সকলের বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ প্রবন্ধে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। কারণ আমি গাইড্‌বুক্ লিখিতে বসি নাই। লিখিবার সাধ্যও নাই। সকল স্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ এ ভ্রমণকথার উদ্দেশ্যও নয়। যাইতে যাইতে যাহা দেখিতেছি এবং দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি, প্রিয়জনকে সে আনন্দের কিছু অংশ দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

এক এক স্থানের অট্টালিকা ও নগর বর্ণনা করিতে এক এক খানি পুস্তকের প্রয়োজন হয়; এবং এরূপ পুস্তকও বিস্তর আছে। তাহা পাঠ করিয়া ও তদনুসারে দর্শন করিবার সময় ও সুবিধা আমার নাই। কিন্তু মানব-হস্ত নির্ম্মিত নগর অপেক্ষা এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান দেখিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে আমি বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ শোভাসম্পদ দেখি নাই। কাশ্মীর প্রদেশের শোভা কতকটা এইরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাশ্মীর গিয়াছিলেন। একথা আমি কখনও শুনি নাই, কিন্তু তিনি ফ্রান্সে বহুদিবস কাটাইয়াছিলেন।

মার্সেলস্ নগরে তাঁহার চতুর্দ্দশপদী অনেক কবিতার সৃষ্টি হয়। আমার বিশ্বাস, 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তিনি দণ্ডকারণ্যের যে সুন্দর বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এই দক্ষিণ-ফ্রান্সের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া অনুপ্রাণিত। নাসিকাচ্ছেদ-ধন্য নাসিকনগরের নিকট ত এরূপ কিছুই দেখি নাই।—একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যদি ফ্রান্স হইতে প্রতিগমনের পর মাইকেল "মেঘনাদবধ" লিখিয়া থাকেন, তবে দক্ষিণ-ফ্রান্সের দৃশ্য দেখিয়া আমার মনের যেরূপ অবস্থা মাইকেলের দণ্ডকারণ্য বর্ণনা তাহারই ফল।

তবে, মাইকেলের লেখনী আর আমার লেখনীর যাহা-প্রভেদ—তাহা "অত্র বর্ণনায়" ও তৎবর্ণনায় প্রমাণ। সীতা সরমাকে দণ্ডকারণ্যে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সে কান্তার কান্তি আমি বর্ণিব কেমনে?" মহাকবির অতুল দৃষ্টিতে যাহা সুসম্পন্ন হয় নাই, তাহা আর হইবে না। কবির অমর ভাষায় আমিও সেই খেদের পুনরুক্তি করিয়া, এই অসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। সমস্তদিন প্রাণভরিয়া এত সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করিয়া মন যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িল।

বড় বড় ষ্টেসন ছাড়া আমাদের ট্রেন কোথাও থামিল না। এখানা কোন্ গাড়ী, কোথায় যাইবে, তাহা জানিবার জন্য যাত্রীদিগকে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। গাড়ী ষ্টেসনে পৌছিবার পূর্ব্বে একথা জানাইয়া দিবার জন্য বড় বড় অক্ষরে লেখা Paris Rapide, এই সাইন-বোর্ড টাঙ্গাইয়া দিল।—দিনের মধ্যে প্রতি ষ্টেসন দিয়া এত অধিক সংখ্যক গাড়ী যায়, যে এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে যাত্রীর সুবিধা হইতেই পারেনা। এক Paris Nord ষ্টেসন দিয়া নাকি প্রত্যহ ২২০০ট্রেণ ভিন্ন ভিন্ন লাইনে যাতায়াত করে! ব্যাপারটা কি ভাবিতেও সময় লাগে। আজকাল Paris Nordএর অনুকরণে আমাদের মামুলী শিয়ালদহ ষ্টেশনেও "North Station" হইয়াছে।—আবার গাড়ী ছাড়িবার সময় সেই সাইনবোর্ড সরাইয়া লইল। ট্রেন পাঁচ মিনিটের বেশী কোথাও থামিল না। Expressএ প্যারিস্ পৌছিতে এগার ঘণ্টা লাগে; আমাদের তেরঘণ্টা লাগিল। রবিবার অনেকে আমোদ-আহ্লাদের জন্য Fontainebleu, Morlaix প্রভৃতি উপনগরে যাতায়াত করে। সেই সকল গাড়ীর জন্য আমাদের প্যারিসের উপকণ্ঠে পৌছিয়াও ষ্টেসনে পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইল। বিশেষতঃ সেদিন উত্তর-প্যারিস (Paris Nord)এর ঠিক বাহিরেই রেলদুর্ঘটনা হইয়া কয়েকজন মারা পড়িয়াছে। সেইজন্য ট্রেন রাত্রে এখন একটু অধিক সাবধান হইয়া চলে। জাহাজেই বল, রেলেই বল, রাস্তাতেই বল, আর ঘরেই বল, যখন দুর্ঘটনা হইবার তখন কাহার সাধ্য তাহা রক্ষা করে? "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে"?—এই মন্ত্রের উপর যদি অটল বিশ্বাস রাখা যায়, তবে চিন্তার কারণ কি? ভগবানে স্থির নির্ভর করিয়া এসকল বিষয়ে ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই; তবে সাধ্যমত সাবধানতা ত্যাগকরা উচিত নহে। জানিয়া শুনিয়া বিপদের মুখে যাওয়া বাতুলতা। যখন ষ্টেসনে পৌছিলাম, রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। কুলী (Porter) পাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। অগত্যা—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" ভাবিয়া নিজেরাই কোন রকমে মাল নামাইয়া লইয়া, মোটরে চড়িয়া হোটেলে আসিলাম। সমস্তদিন শ্রান্তির পর রীতিমত আহারে রুচি হইল না। সামান্য কিছু

খাইয়া 'পদ্মনাভ' স্মরণে শয্যাশ্রয় লইলাম।—দীর্ঘ দিবসের পথশ্রমের পর পাপপুণ্য, বিলাসব্যসন, সৌন্দর্য্য-শোভা, সৎ ও অসৎ, সাহস এবং জ্ঞানবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল প্যারিসের ক্রোড়ে সুনিদ্রার অভাব হইল না।—

প্যারিস

প্যারিস-তল প্রবাহিত সেন্ নদীর তীর দিয়া রাত্রে ষ্টেসন হইতে হোটেলে আসিলাম। Palace of Justice, Foreign office, Town Hall, Palace de Concord, Opera, Champs de Elysee প্রভৃতি পথে পড়িল। ক্রমশঃ Louvre, যাহার নাম আবাল্য পরিচিত ও যাহা শিল্পচাতুর্য্য ও কলাবিদ্যার প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বিখ্যাত। রাত্রের ঘন অন্ধকারে তাহার দীপোদ্ভাসিত অথচ ছায়াময় গাম্ভীর্য্য দেখিতে দেখিতে কত কথাই মনে উদয় হইতে লাগিল। হলাণ্ডের রাণী, প্যারিস-দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলোকমালা ও আতসবাজীর প্রদর্শনীও পথে কতক দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র থাকিলেও,বৈদেশিক কোন রাজা বা রাণী আসিলে ফরাসীরা যেরূপ আদরঅভ্যর্থনা করে। তাহাতে মনে হয় যে, তাহারা নিজের রাজারাণী হারাইয়া প্রজাতন্ত্রী শাসন-প্রণালীতে যেন বড় সন্তুষ্ট নয়। সময় ও সুবিধা পাইলেই রাজ-অতিথির পূজা-সম্মান, দেশের পূর্ব্ব রাজ-পূজা-প্রিয়তার পরিচয় দেয়। ধূমধাম ফরাসী জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বলিয়াই রাজপূজা-প্রিয়তার এত আধিক্য; মনে হয়। প্রজাতন্ত্র-শাসিত আমেরিকা দেশে ও ইউরোপের লর্ড ও কাউন্টদিগের যে সমাদর, সুদীন লর্ডপুত্রকে কন্যাদান করিয়া আমেরিকার ধনকুবেরগণ যেরূপ ধন্য হয়, তাহা দেখিয়া মনে হয়,মুখে প্রজাতন্ত্র-ভাবের মনে রাজ-পূজাপ্রিয়তার সহিত বিসম্বাদী নয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড সর্ব্বদা ফ্রান্সে আসিয়া আমোদপ্রমোদময় Paris নগরে রাজোচিত আতিথ্যে সম্মানিত হইতেন এবং তাহারই বলে য়ুরোপিয়ান্ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ব্রিটীশ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, ইউরোপব্যাপী সমর-আশঙ্কা দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও মহারাজ সপ্তম এডওয়ার্ড জগতের শান্তি-রক্ষা বিষয়ে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ-জর্ম্মান-সম্রাটের উন্মাদ সমরপিপাসা শান্তিকল্পে যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়া বা মহারাজ এডওয়ার্ডের ন্যায় মোহিনী-শক্তি প্রয়োজিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সমগ্র য়ুরোপ আজ কলির কুরুক্ষেত্রের রঙ্গ-স্থল হওয়া সম্ভব হইত না এবং সে লীলা-তরঙ্গ সুদূর ভারতের শান্তি ও সম্পদ ধ্বংসেও সক্ষম হইত না।

বর্ত্তমান Prince of Wales এখন বিদ্যাশিক্ষার্থে ফ্রান্সে রহিয়াছেন ও কয়েক মাস থাকিবেন। মরোক্কোতে ফরাসী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ফ্রান্সের বড় সুবিধা হইতেছিল না। সে জন্য ফরাসীরা কিছু নিয়মাণ। প্যারিসের চির-আমোদ-প্রফুল্ল পথঘাটেও আমোদপ্রমোদের বাহুল্যও যেন কিছু কম; হলাণ্ডেশ্বরী উইল্‌হেল্‌মিনার শুভ-আগমনে প্যারিসবাসীরা তাঁহার অভ্যর্থনা-অবসরে আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ করিয়া নিজেদিগের একটু উৎফুল্ল করিয়া লইতেছে মাত্র। প্রতিদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া দেখ, সুসভ্য য়ুরোপের বা আমেরিকার কোন না কোন প্রবলজাতি, কোথাও না কোথাও, একটা না একটা লড়াই-ঝগড়া লইয়াই আছে। সর্ব্বদাই এইরূপ পরের দেশে যাইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া, নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য সভ্যজাতিমাত্রেই নিশিদিন এত চেষ্টা করে; অথচ তাহাদের ইহাতে কি সুখশান্তি বাড়িতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের এ ব্যবসা বহু দিন ঘুচিয়াছে, তাই বোধ হয় বুঝিতে পারি না; কিংবা ভগবৎ কৃপায় আমরা এ বুদ্ধি-শক্তির কিছু-উপরে উঠিয়াছি। নিশিদিন রণবেশে থাকিলে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রণসজ্জা নিলাম-ডাকের মত ডাকের উপর ডাক,বৎসরের পর বৎসর,বাড়াইয়া শান্তিপ্রিয় প্রজার শান্তিসুখের বাধা দিয়া রণসম্ভার বৃদ্ধি করিলেই একদিন জগৎপ্রলয়কারী সমরঅনল প্রজ্বলিত হইতেই হইবে;—একথা যাহারা বরাবর বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের কথা সফল হইয়াছে,—রক্তস্রোতে ধরা প্লাবিত হইয়া পবিত্র হইবে, কি বীভৎসতর হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তাই তাহা জানেন! চিত্রের অপরাঙ্ক বুঝিতে য়ুরোপের বহুদিন লাগিবে।—এইরূপ নানা চিন্তায় বহুক্ষণ কাটাইয়া অবশেষে নিদ্রার আশ্রয় লাভ করিলাম। পরদিন প্রভাতে নরসুন্দর-গৃহে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিলাম। জাহাজের নাপিত অপেক্ষা এব্যক্তি লোক ভাল; অতি যত্ন

করিয়া সুন্দরভাবে কামাইয়া দিল। দোকানঘরের সাজসজ্জা ও দোকানীদিগের এইরূপ ভদ্রতা একবারে বশ করিয়া ফেলে। কামাইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হোটেলের খানসামা প্রভৃ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে বলিল "আপনাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে।"—অর্থাৎ একদিন রেলে আবদ্ধ হইয়া না কামানতে এত অসুন্দর দেখাইয়াছিল;—সভ্য ফরাসীভাবে তাহাই রূপান্তরে বলা হইল। নতুবা ফ্রান্সের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই আমার লুকান-সৌন্দর্য্য মুকুলিত হইয়া উঠিল—উছলিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় "গার্স" (Garcer)এর প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তবে নাপিতের দোকানের সহিত তাহার যদি কমিশনের বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে, যে উক্ত নরসুন্দর-সাহায্যই মদীয় সৌন্দর্য্য-উদ্ভাসনের একমাত্র কারণ। এই সকল হাল্কা কথায় যাহাদের মাথা গরম হয়, তাহাদের কিন্তু বহিরাকৃতির উপর এত লক্ষ্য বিলাতে আসিয়াই কেন হয়, তাহা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু আমার ছেঁড়া ওভারকোট ও আধ পাঞ্জাবী ময়লা পাগড়ী খোসা-মোদের সুভাষায় শীঘ্র ভিজিয়া রূপান্তরিত হইবে তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিতে বাহিরে একলা বেড়ান বড় সুবিধার নহে। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যাঁহাদের বাড়ী উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা ১২টার সময় আমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অতএব আহারাদির পর নগরভ্রমণে বাহির হওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছিল কিন্তু রু দী মোজার্ট—যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়াছেন, তাহা অধিক দূর নহে বলিয়া পদব্রজেই বাহির হইলাম। বিদেশে একা পথঘাট চিনিয়া চলাফেরার অভ্যাসের সময় আসিয়াছে। ভাষাজ্ঞান-সাহায্যব্যতীত য়ুরোপীয় সহরে এই প্রথম একলা বাহির হওয়া। পাগড়ীর দিকে সকলেরই দৃষ্টি যেন কিছু ঘন ঘন পড়িতেছে।

ফরাসী, রুশ, মুসলমান, তুর্কী, ইজিপ্সিয়ান—অনেকে আসে এবং বাধ্য হইয়া ঝটিতি বেশ-পরিবর্ত্তন করে। ছাঁকা-ভারতীয় পাগড়ী বোধ হয় বড় বেশী দেখা যায় না। অনেক পথিক, অপরিচিত লোক দেখিয়া সম্মানের সহিত সেলাম করিল; দেখিয়া একটুখানি খট্‌কা লাগিল। তার পর বুঝিলাম, ইহা ফরাসী ভদ্রতার রীতি। অপরিচিত হইয়াও পথে খাতিরের ত্রুটী হইল না।—বুঝিলাম, এটা শুধু পাগড়ীর কৃপায়! স্থানান্তরে মাথার পাগড়ী পথে গড়াগড়ি যাইবে কি না, জানি না।

বাড়ীর নম্বর জানা ছিল;—নম্বরে ত পৌঁছিলাম নীচে দোকান ঘর। সাততালা—রাজার বাড়ীর মত বাড়ী এমন বাড়ীতে একজন গৃহস্থলোক বাস করে, সহসা বিশ্বাস হইল না। পল্লীগ্রাম হইতে সহরের বড়-মানুষের বাড়ী তত্ত্ব আনা ঝিএর মত ঠিকানাটি দোকানদারদের দেখাইতে তাহারা ফটকের ভিতর পথ দেখাইয়া দিল। একজন স্ত্রী-দ্বারবান (?) আসিয়া লিফ্‌টে তুলিয়া দিল। লিফ্‌ট চালকের বিনাসাহায্যে নিজেই উঠিতে লাগিল। অন্যান্য জায়গায় লিফ্‌টে একজন পরিচালক থাকে; কিন্তু ইহাতে কেহই নাই। ক্রমশঃই উপরে উঠিতে লাগিলাম; একটু ভয়ও হইল। মনে হইল, সমুদ্র-তরঙ্গ এড়াইয়া শেষে লিফ্‌ট-রঙ্গে বুঝি প্রাণ যায়। যাহা হউক, অবশেষে সকলের উপরের তালায় আসিয়া লিফ্‌ট থামিল; আমিও দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলাম। গৃহকর্ত্রী, চক্রবর্ত্তী এবং কাটনি সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

Madame Le Craik নাম্নী অপরা একজন নিমন্ত্রিতা ছিলেন; তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। ইনি টানিয়া টানিয়া অল্প ইংরাজী কহেন; কিন্তু তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিলে বুঝিতে পারেন না। কষ্টেসৃষ্টে কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

প্যারিস-রমণী বলিলে একটা বিলাস-তরঙ্গে নিশিদিন হাবুডুবু বিকৃত কিমাকার জীব বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ হওয়া উচিত। ফল, Lyons ষ্টেশনে Madame Zelona Bleck বলিয়া আর একজন ভদ্ররমণী অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিয়াও এই কথা মনে হইয়াছিল।

গৃহকর্ত্তা Piere Berterand কোন রেলের ডাইরেক্টার। তাঁহার স্ত্রী, জাতিতে ইংরেজ—বহুকাল ফ্রান্সে বাস করিয়া পুরা ফরাসী হইয়া গিয়াছেন।—তাঁহাকেও এইরূপ অন্য-শ্রেণীর দেখিলাম। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে আসিলে কেবল দুষ্টা স্ত্রীলোক ঘরে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিদেশীর অধঃপাত ও সর্ব্বনাশ তাহাদের একমাত্র কার্য্য, ইহা মনে করা বড় ভুল। ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই আছে। যাহারা মন্দ

...মন্দ চেষ্টায় আসে, তাহাদের চক্ষেও পথে যে মন্দই ...ড় তাহার আশ্চর্য্য কি ?

আহারাদি ও কথাবার্ত্তার মধ্যে মুঃ Berterand বলিলেন, যে যদি Parisএর ইউনিভার্সিটি Sorbonne দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ; কিন্তু কিছু বিলম্ব হইবে। আমি বুধবার লণ্ডনে যাইব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন বিলম্ব হইলে যদি Sorbonne দেখিয়া যাওয়া যাইতে পারে, সে সুবিধা ত্যাগ করা উচিত বোধ হইল না। যখন Oxford, Cambridge জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন ফ্রান্সের সোর্বো এবং স্পেনের কর্ডোভা বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। আমি যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি, তাহাতে সরস্বতীর ... পাঠস্থানগুলি যথাসম্ভব না দেখিয়া যাওয়া উচিত হবে না। এক দিন কেন, এক বৎসর থাকিলেও প্যারিসের সকল দৃশ্য উত্তমরূপে দেখা সম্ভব নয়। ...ন্তু ইউনিভার্সিটি না দেখাটা ভাল হইবে না, মনে হইল। আহারান্তে এক মোটরে কিটনী সাহেবকে লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। আজ সোমবার। Museum প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। ইংলণ্ডের মত রবিবারে এসব জায়গা বন্ধ থাকে না। ফরাসীরা বলে যে, রবিবারে যখন সকলে ছুটী পায়, তখন রবিবারে সকলের দেখিবার সুবিধার জন্য এই সব জায়গা খোলা রাখা উচিত। সেইজন্য পরিষ্কার করার, ও কর্ম্মচারীদিগের বিশ্রামের জন্য রবিবারের পরিবর্ত্তে সোমবার বন্ধ থাকে। ইংলণ্ডেও ক্রমশঃ এই চলনের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অগত্যা বাহিরে বাহিরে যতদূর দেখা যাইতে পারে, সহর দেখিয়া বেড়াইলাম। কিটনী সাহেব অনেক দিন ফ্রান্সে আসিয়াছেন, ফরাসীর মত ফ্রেঞ্চভাষা কহিতে পারেন। তাঁহার যতদূর জানা আছে, সকলস্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন। নিজের অগাধ ফ্রেঞ্চ বিদ্যা এবং ইতিহাস ও জনশ্রুতির সাহায্যে বাকীটা গড়িয়া লইতে হইল।

মোটর, অম্নিবস্, ট্রাম, মাটীর নীচে রেল, ঘোড়ার গাড়ী, ষ্টীমার, ও পদব্রজে অসংখ্যলোক ক্রমাগত ...য়াছে। এক ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট লইয়া কলিকাতার ...দ-অহঙ্কার। প্যারিসের সামান্য গলিঘুঁজিতেও সেরূপ দোকান-বাড়ী বিস্তর আছে। Arc d'Triumph হইতে Palace de la Concord পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার মত প্রশস্ত ও সুদৃশ্য রাস্তা লণ্ডনেও নাই, শুনিয়াছি। চৌমাথার উপর বিস্তার্ণ খোলা জায়গার মধ্য-স্থলে "বিজয় তোরণ" বা আর্ক ডি ট্রায়স্ফ্—প্রকাণ্ড পাথরের ফটক—নেপোলিয়নের বিজয়কীর্ত্তির ধ্বজা। অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তিতে তাহা সুশোভিত; সেখান হইতে Palace de la Concord পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে রাস্তা উঠিয়া গিয়াছে। পথে Champs de Elysee "সাঁজ দে ইলিসী" (দস্তরমত ফরাসী উচ্চারণ লিখিলাম; চিরকাল-কৃত "শ্যাম্প্ ডি ইলাইসী" লিখিলাম না)। রাস্তার দুই দিকে বাগান; বসিবার চেয়ার-বেঞ্চ আছে। মাঝে মাঝে Concert Hall, Saloon ইত্যাদিও আছে।

১৮৯০ সালের একজিবিশনের সময় নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কয়েকটি বাড়ী দেখিলাম। সেই সময়েই জগদ্বিখ্যাত আইফিল টাউয়ার (Eiffel Tower) নির্ম্মিত হয়; এক্ষণে ইহা একটি Wireless Telegraphএর প্রধান ষ্টেশন হইয়াছে। নিকটেই Jones' Great Wheel বা

প্যারিস্—জোন্সের প্রকাণ্ড চাকা

নাগর-দোলার মত বৃহৎ চক্র রহিয়াছে। উপরে উঠিলে সমস্ত প্যারিস ও তাহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমাদের দেশে একজিবিশন, কি সম্রাট্-আগমনের সময়

যেমন সমস্ত ফাঁস কাগজের বাড়ী ও ফটক করিয়া টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়, এখানে তাহা নহে। স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় বাড়ীঘরদ্বার তৈয়ার হইয়াছে। ইহাতে খরচ ও সময় বেশী লাগে বটে; এখন কিন্তু তাহা অন্য অন্য
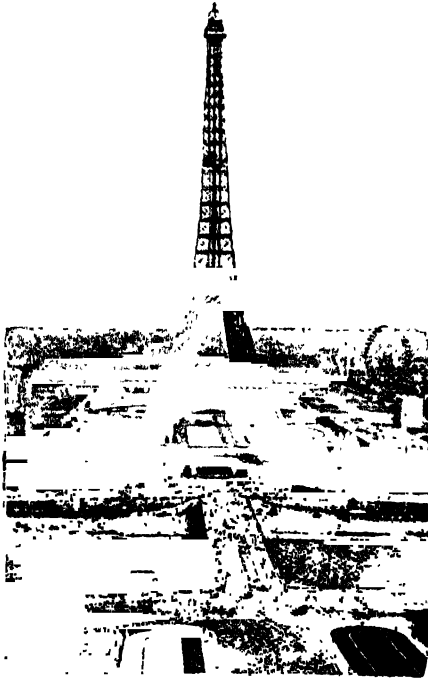
প্যারিস্—আইফেল্ টাউয়ার্

প্রয়োজনীয় কাজে লাগিতেছে। একজিবিশনের সময় Eifiel Tower এর উপর, প্রতি তালায় ও ঘরে, ভিন্ন ভিন্ন আহার, অভিনয়, আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল; এখন তাহার সে কাজ শেষ হইয়াছে। এই Towerএ এখন Wireless Telegraphyর প্রধান ষ্টেসন হইয়া, এই যুদ্ধের সময় Morccoর সহিত তারহীন-বার্ত্তা আদান-প্রদান করিয়া, জাতির ও গবর্ণমেণ্টের কত সাহায্য করিতেছে। ইহাতে উঠিবার লিফ্‌ট-টা খারাপ হইয়াছে বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। তারপর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদ Louvre দেখিলাম। ভিতরে প্রকাণ্ড বাগান;—বাগানের পারিপাট্য নাই বটে, কিন্তু তথায় যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার একএকটি এক এক দিন দেখিলেও শিল্পচাতুর্য্যের যথার্থ উপলব্ধি হয় না। প্যারিসের পথে, মাঠে, পুলের উপর এরূপ শতশত প্রস্তর-মূর্ত্তি যথার্থই যেন ছড়ান রহিয়াছে; তাহার সংখ্যা করাই দুরূহ—সবিস্তার বর্ণনা ত দূরের কথা। পুরাতন রাজাদের সময়, নেপোলিয়নের সময়, প্রজাতন্ত্রের সময়—সকল সময়েই ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পীর প্রচুর আদর হইয়াছে। এখন ধনী আমেরিকানরা সেই সমস্ত মূর্ত্তি ও চিত্র প্রচুর মূল্য দিয়া লইয়া যাইতেছে;—কারণ ফরাসীরা আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছে। পতনোম্মুখ গৃহস্থ যেমন পৈতৃক আমলের বহুমূল্য দ্রব্যাদি জলের দামে, মাত্র আহার্য্যের বিনিময়ে, বিক্রয় করিয়া বসে—এখন ফরাসীদিগেরও যেন কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছে। ফ্রান্স কেন, ইংলণ্ড হইতেও শিল্পচাতুর্য্যের গরিমার আদর্শ-স্বরূপ অনেক জিনিসই ধন-গর্ব্বিত আমেরিকায় চলিয়া যাইতেছে। ফরাসী-বিপ্লবের সময় অদ্ভুত শিল্প-কার্য্যজড়িত Tuileries প্রভৃতি রাজ-প্রাসাদ অগ্নিদাহে ধ্বংস হইয়া যায়। Hotel de Ville প্রভৃতি এক একটি প্রাসাদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে বটে; কিন্তু Louvre-এর পার্শ্বে যে Tuileries ছিল, তাহা আর পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। Louvre বলিতে একত্রশ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি অট্টালিকা বুঝায়। এখানে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চিত্র ও কলা বিদ্যার সমস্ত নমুনা সযত্নে রক্ষিত; সরকারী আফিস ও সেক্রেটারিয়েট্‌ও এইখানেই; রাজা গিয়াছেন, তাই রাজ-প্রাসাদের আর গরিমা নাই। যেখানে রাজা-রাণী বিরাজ করিতেন, সেখানে বিপ্লবতন্ত্রী সেক্রেটারী মদগর্ব্বে রাজ-অভিনয়
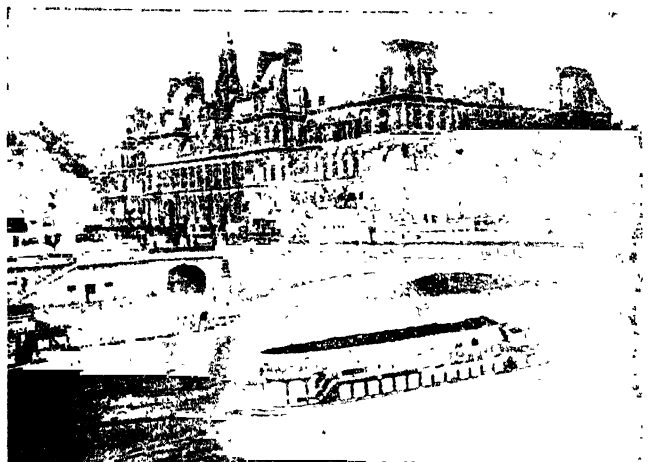
প্যারিস—হোটেল্ দে ভিলি

করিতেছে ! ক্রমশঃ নেপোলিয়নের সমাধিস্থল Invalides, Instiiute of France, Chamber of Deputies প্রভৃতিও এইরূপে তাড়াতাড়ি দেখা হইল। বড় বড় দোকান ও জগতের ফ্যাশনের নেতা প্যারিসের বস্ত্র-শিল্পীদিগের কার্য্যক্ষেত্রও দেখা গেল ; আবার White-away Laidlawর দোকানের মত গৃহস্থ-গরীবের শস্তার জিনিস পাইবার "Stores"ও অনেক দেখিলাম। স্থানে স্থানে ঠেলাগাড়ী করিয়া ফুল-ফল বিক্রয় হইতেছে। সহরের মধ্যস্থলে Notre Dame গির্জ্জা যেরূপ দেখিলাম, তাহার স্বরূপ আর কোথাও কিছু দেখিব কি না জানি না ;—Victor Hugoর Notre Dame-খানি নিকটে থাকিলে আজ রাত্রি জাগিয়া আদ্যন্ত আবার পড়িতাম।

যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনার সাধ্য আমার নাই। আমি অসম্পূর্ণ অপ্রকৃত বর্ণনাচেষ্টায় বৃথা সেই দেশবিখ্যাত জগদ্বিখ্যাত পরমার্থ-প্রধান স্থানের অবমাননা করিব না। বাহ্যদৃশ্যে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই ; স্থপতি-কৌশল অবশ্য যথেষ্টই আছে। ফ্রান্সের রাজা-রাণীদের মূর্ত্তি, ঋষিগণের মূর্ত্তি, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদিয়া যাঁহারা Martyr হইয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিতে মন্দিরের বহির্ভাগ অলঙ্কৃত। সেননদীতটে গির্জ্জা-সংলগ্ন উদ্যানটির শোভাও অতিশয় মনোহর ; দুদণ্ড চাহিয়া দেখিতে হয়। দেখিলাম, একজন চিত্রকর তন্ময় হইয়া পূর্ব্বদিকের উচ্চচূড়ায় বসিয়া চিত্র আঁকিতেছিল।

প্যারিস্—ইন্‌ভ্যালাইডিস্‌, অর্থাৎ অক্ষম সৈনিকাশ্রম

কিন্তু ভিতরে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহার তুলনায় বাহিরের দৃশ্য কিছুই নহে। মিল্টনকথিত "Dim religious light" কথার অর্থ এতদিন ঠিক বুঝি নাই,— Notre Dame "মা আমার" কথার অর্থ ও তাহার ইউরোপীয় পরিকল্পনার গূঢ়তত্ত্বও এতদিন সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই—আজ বুঝিলাম ; কিন্তু বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শুধু যে শিল্পী ছিলেন, তাহা মনে হয় না। তিনি যে পরমার্থভাবে অনুপ্রাণিত—ভক্তিমান কবি ও দার্শনিক ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। মধ্যস্থলের হলটি অতিদীর্ঘ ও অতি উচ্চ ;—এই উচ্চতাতেই ইহার সৌন্দর্য্য
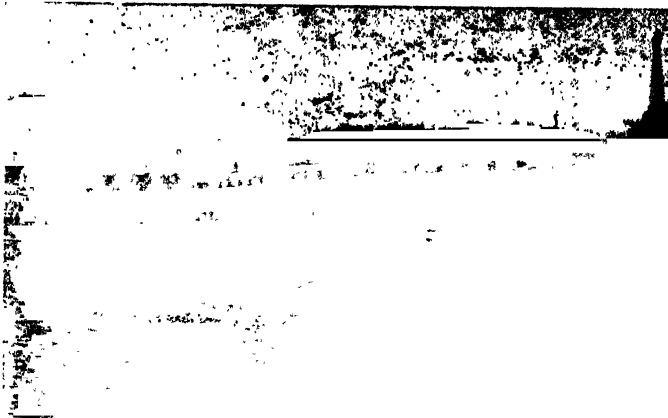
প্যারিস—কঙ্কর্ড সেতু ও ডেপুটীদিগের মন্ত্রণা-মন্দির

এত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। চারিদিকের জানালায় অতি সুন্দর বিচিত্রবর্ণের সারসী (stained glass window); তাহাতে পুরাতন ধর্ম্মকীর্ত্তিসমূহ সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার কয়েকটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এক যিশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ দেহ এক কৃষ্ণবর্ণ পেটিকামধ্যে স্থাপিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে শোকাকুল ভক্তগণ দণ্ডায়মান পদতলে এক সুকুমার ভক্ত শোকে বিবস্ত্র—উন্মাদপ্রায়
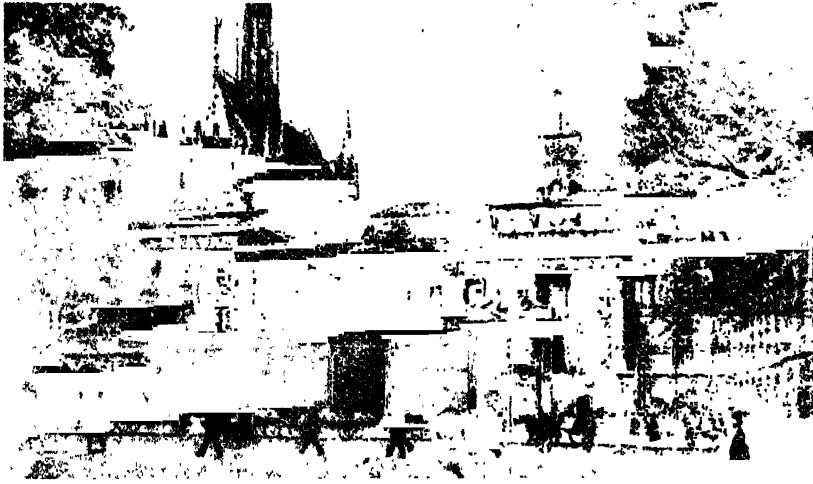
প্যারিস—নোটর্ ডেম্ ও বিচারালয়

মধ্যদিয়া সূর্য্যরশ্মি ম্লানভাবে আসায়, মন্দিরের dim religious light অত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হলের দুইদিকে উচ্চ Gothic থামের উপর double aisle; তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত কয়েকটি chapel. মাল্টাতে St. John Church দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানান-মত ছিল; এবং ছাদ বহু উচ্চ হইলেও সুন্দর আলোকিত ছিল। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকের অভাবই Notre Dameএর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। যিশু খৃষ্ট ও তাঁহার ভক্ত অনুচরবৃন্দের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপিত;—ধূপ-দীপ-পুষ্পদানে শত শত ভক্ত জানুপাতিয়া মুদিতনয়নে পূজা করিতেছে; দেখিয়া নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। সাধারণ তীর্থস্থানে গোলমাল, চীৎকার, পাণ্ডার উৎপীড়ন, ভিখারীর কোলাহলে ধর্ম্মভাব শতক্রোশদূরে পলায়ন করে; Notre Dameএ তাহার কিছু চিহ্নও দেখিলাম না। দানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা প্রার্থিসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বাক্স আছে। আর দ্বারদেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নির্ব্বাক একজন Nun বসিয়া আছে;—ইচ্ছা হয় কিছু দাও, না হয় দিওনা। কিন্তু প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে শিরোদেশে স্বয়ং "মৃত্যু" আবৃত-বদনে অবনতমস্তকে হাহাকার করিতেছে—"হায়, কি করিলাম! কাহাকে কালগ্রাসে ফেলিলাম!"—জীবন্ত "মৃত্যু" যন যেন এই কথা হাহাস্বরে বলিতেছে। আর একটি মূর্ত্তি 'জোয়ান্ অব্ আর্কের';—ফ্রান্সের রক্ষয়িত্রী হুতাশনে নিজ প্রাণ দিয়াও দেশের মান—রাজার মান রাখিতেছেন। কিন্তু যাহা হইতে Notre Dame নাম হইয়াছে, সেই "মা আমার" মূর্ত্তিতে স্থপতি-শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে; মাতা-মেরী যীশুর মৃতখৃষ্ট-মূর্ত্তি কোলে করিয়া হাহাকার করিতেছেন!—প্রস্তরময় সেই বিরাটমূর্ত্তির মধুর-কঠোর ছবি, একবার দেখিলে ভুলিবার নহে। এই মূর্ত্তিতে মাতৃস্নেহ আছে—শোক আছে—কাতরতা আছে—মধুরতা আছে—আর তাহার সহিত দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণে এক মহান্ দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একাধারে এত ভাবের বিকাশ শিল্পী কি করিয়া করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর। প্রথম যে স্থান হইতে দেখিতেছিলাম, সেখান হইতে মাত্র Sacro Sanct (পবিত্রাদপি পবিত্র) এক বিরাট মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলাম; অপরদিকে যাওয়াতে হঠাৎ

মূর্ত্তির উপর আলো পড়িল, তাহাতেই এই দিব্যভাব দেখিতে পাইলাম। যেন দৈবকৃপায় আমার চক্ষে এই সুন্দরভাবের প্রগাঢ় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত করিবার জন্যই আচম্বিতে সেইদিক হইতে সেই দিব্য আলোক-চ্ছটা আসিয়া পড়িতে লাগিল!—আমি মুগ্ধ, স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া সেই মহান্ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ধন্য সেই শিল্পী, যিনি কঠিন-পাষাণে কঠিন অস্ত্রাঘাতে কোমলে-কঠিনের এই অপূর্ব্ব-সমাবেশ সংঘটন করিতে পারিয়াছেন। এ যাত্রায় আর কিছু দেখা—আর কিছু কাজ—যদি না হয়, এই বিরাট্ মাতৃমূর্ত্তির এরূপ প্রকটভাব সন্দর্শনেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে! ইটালীর বিখ্যাত চিত্রকরও এই মাতৃ (Madona) মূর্ত্তিঅঙ্কনে শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন।—সেটি দেখা আমার ভাগ্যে ঘটিবে কি না জানি না; না ঘটিলেও এখন আর দুঃখ নাই—Notre Dame দেখিয়া সকল দেখার সাধ মিটিয়াছে। ক্রমশঃ

(পল্ গুস্তাভে ডোরি-কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

খ্রীষ্টধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গকারিগণ

মেজদিদি

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১)

কেষ্টার মা মুড়ি-কলাই ভাজিয়া, চাহিয়া-চিন্তিয়া অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ-বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, "যা' কেষ্ট, তোর দিদির বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌গে। সে বড় মানুষ, বেশ থাক্‌বি, যা'।"

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া, শ্রাদ্ধ করিল। তারপরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুলি বহিয়া দিদির বাড়ী রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে নিজের নিয়মে ছেলে পুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ, একি উৎপাত!

পাড়ার যে বুড়া মানুষটি কেষ্টাকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কাদম্বিনী খুব কড়া-কড়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিল, "ভারী আমার মাসীমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মার্‌তে!" সৎমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "বজ্জাত মাগী জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেছেন। যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ সব ঝঞ্চাট আমি পোয়াতে পারবনা।"

বুড়া জাতিতে নাপিত। কেষ্টার মাকে ভক্তি করিত, মা-ঠাকরুণ বলিয়া ডাকিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তোমার। কত দাস দাসী, অতিথ-ফকির, কুকুর-বেরাল এ সংসারে পাত-পেড়ে মানুষ হয়ে যাচ্চে, এ ছোঁড়া দুমুটো খেয়ে, বাইরে প'ড়ে থাক্‌লে তুমি জানতেও পারবে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদি ঠাকরুণ। ভাই বলে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে বলেও বাড়ী কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।"

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়ে মানুষ মাত্র! কাযেই সে তখনকার মত চুপ করিয়া রহিল। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় হইল।

কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুর্য্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টাকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রশ্ন করিলেন—এটি কে?

কাদম্বিনী মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল—"তোমার বড়-কুটুম গো, বড়-কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কায হোক্‌।"

নবীন সৎ শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন; কহিলেন, "বটে! বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত!"

স্ত্রী বলিলেন, "বেশ হবে না কেন? বাপ আমার বিষয় আশয় যা' কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই মাগী ওর গভরে ঢুকিয়েচে! আমিত তার একটি কাণা-কড়িও পেলুম না!" বলা বাহুল্য, এই বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রী করিয়া ছেলের ইস্কুলের মাহিনা যোগাইতেন। নবীন রোষ চাপিয়া বলিলেন, "খুব ভাল!"

কাদম্বিনী কহিলেন, "ভাল নয় আবার! বড়-কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখ্‌তে হবে ত! এতে আমার পাঁচু গোপালের বরাতে এক বেলা এক সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভরে যাবে।" বলিয়া পাশের বাড়ীর দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এই ঘরটা তাহার মেজ যা' হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দার একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া

লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল-মালায় একটুখানি তেল আনিয়া তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, "আর মায়া-কান্না কাঁদ্‌তে হবেনা, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসোগে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাথা অভ্যাস নেই ত?" স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "তুমি চান করতে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়োগো, নইলে ডুবে মলে-টলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।"

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "কেষ্টাকে আর দুটি ভাত দাও গো"—"দিই" বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তবেই হয়েছে! এ হাতীর খোরাক নিত্য জোগাতে গেলে যে, আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে! ওবেলা দোকান থেকে মণ দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হতে হবে, তা বলে রাখ্‌ছি।"

মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কি না, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ার অপরাধে কোন দিন যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখনও তাঁহার মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সে দিনও ঘুড়ি-লাটাই কিনিবার জন্য দু-মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ-হাতটা তুলিয়া মুছিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্ব্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃশোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

(২)

পৈতৃক বাড়ীটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। পাশের দোতালা বাড়ীটা মেজভাই বিপিনের। ছোট ভায়ের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড় ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়ীটাই দোতালা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। সে দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বছর চারেক পূর্ব্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিল। সেই অবধি প্রকাশ্য কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ সেটা বড় যা কাদম্বিনীর নিজস্ব। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না; কিন্তু, মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিত না। ঝগড়াটা প্রথমে সেই করিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু সেই মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য, ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিত। শেষে, হাতে পায়ে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড় যা'কে নিজের ঘরে ধরিয়া লইয়া গিয়া, ভাব করিত। এম্‌নি করিয়া দুই যায়ের অনেক দিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূপের পার্শ্বে সিমেণ্ট বাঁধানো বেদির উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল; কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজ যা'কে দেখিবা মাত্রই বলিয়া উঠিলেন, "মাগো,—ছোঁড়াটা কি নোঙ্‌রা কাপড় চোপড় নিয়েই এসেচে!"

কথাটা সত্য। কেষ্টার সেই লাল পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া, কেহ কুটুমবাড়ী যায় না। দুটাকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু, রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল, পুত্র পাঁচু গোপালের জোড়া দুই এবং তাহার পিতার জোড়াদুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্টা আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইল, বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু, সে উল্লেখ না

করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কে দিদি ?" ইতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিল, "দিব্যি ছেলেটিত ! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি, বাপের বাড়ীর কেউ নাকি ?" কাদম্বিনী বিরক্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিকে একটা প্রণাম করনা রে ! কি অসভ্য ছেলে বাবা ! গুরুজনকে একটা নমস্কার করতে হয়, তাও কি তোর মা মাগী শিখিয়ে দিয়ে মরে নিরে ?"

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন—"আ মর্, হাবা-কালা না কি ! কাকে প্রণাম করতে বললুম, কাকে এসে করলে !"

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাড়ার ঝাঁঝে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"থাক্ থাক্ হয়েছে ভাই—চিরজীবী হও।" কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত, অসহায় মুখখানির পানে চাহিবা মাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, যা'কে কহিল, "আহা একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন ?"

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক হইয়া গিয়া, জবাব দিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিমেষে সাম্‌লাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন,"আমি ত তোমার মত বড় মানুষ নই, মেজ-বৌ যে, বাড়ীতে দশবিশটা দাসদাসী আছে ? আমাদের গেরস্ত ঘরে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, 'উমা, শিবুকে একবার এবাড়ীতে পাঠিয়ে দেত মা, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্।" বড় যায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "এবেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল, আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই।" কেষ্টকে কহিল, "ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে" বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু, হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এবেলার খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

(৩)

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, "কি খেয়ে এলিরে কেষ্ট ?"

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, "লুচি।" "কি দিয়ে খেলি ?" কেষ্ট তেম্‌নি ভাবে বলিল, "রুই মাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—"

"ইস ? বলি, মেজ-ঠাকরুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন ?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেম্‌নি ধারা করিতে লাগিল। দেরি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, "তোর পাতে বুঝি ?"

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বলি, শুন্‌লেত ?" নবীন সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন—"খুড়ী, আপনার লোক, তার ব্যাভারটা ত্থাখো ! পাঁচু গোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বল্‌তে অজ্ঞান, সেকি তা' জানেনা ? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে ব্যানা-বনে মুক্ত ছড়িয়ে দিলে ? বলি, হাঁরে কেষ্ট, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেটভরে খেলি ? সাত জন্ম কখন ত এসব তুই

চোখেও দেখিস্নি।" স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দুটিভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বল্‌চি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগ্‌ড়ে না দেয়, ত আমাকে কুকুর বলে ডেকো।" নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ, স্ত্রী বিদ্যমানে মেজ বউ তাহাকে বিগ্‌ড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর কিন্তু নিজের উপরে বিশ্বাস ছিল না। বরং ষোলআনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেষ্টর মানসিক উন্নতি অবনতির প্রতি সেই অবধি প্রখর দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়াইয়া দিয়া কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কায করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী করে, চার পাঁচ কোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগ্‌লায়। দিনদুই পরে তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতে-ছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায়, বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু, দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপ্‌টি করিয়া দিদির ঘুম-ভাঙার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—"কেষ্ট?" সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কাণে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি তাঁহার দোতালার ঘরের জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদিন দেখিনি ত? এখানে এমন চুপ করে বসে কেন কেষ্ট?" একেত ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর। তাহার দু'চোখ টল্‌টল্ করিতে লাগিল, সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজ-খুড়ীমাকে সব ছেলে-মেয়েরা ভালবাসিত। তাঁহার গলা শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, "কেষ্ট মামা, রান্না ঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাওগে। মা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্চে।" হেমাঙ্গিনী অবাক হইয়া কহিলেন, "কেষ্টর এখনো খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কিরে? হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হ'ল কেন?"

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, "কেষ্ট মামার রোজত এম্‌নি বেলাই হয়। বাবা খেয়েদেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবেত ও খেতে আসে।" হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানে কাযে লাগানো হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ানো হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু, একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার ওই ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত শিশু দেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। মিনিট দুই পরে একবাটি দুধহাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্না-ঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুক্‌নো ড্যালা পাকানো ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল, ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একবারটি মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটি ভাতও পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় এই বয়সী। নিজের অবর্ত্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

(৪)

সর্দ্দি উপলক্ষ্য করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন দুই থাকিয়া আপ্‌নি ভাল হইয়া যাইত। দিন কয়েক পরে এম্‌নি একটু জ্বর-বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়াছিলেন। ঘরে কেহ ছিলনা, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন অতি সন্তর্পণে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া,

উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, "কেরে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত ?"

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে আড়াল হইতে জবাব আসিল, "আমি।" "কে আমি রে ? আয়, ঘরে এসে বোস্।" কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে কেষ্ট ?" কেষ্ট আর একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুটি আধ্‌পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, "জ্বরের ওপর খেতে বেশ।" হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "কোথায় পেলিরে ? আমি কালথেকে লোকের কত খোসামোদ কচ্চি, কেউ এনে দিতে পারেনি" বলিয়া পেয়ারাশুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও, এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুর বেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বল্‌লে আমার জ্বর হয়েচে ?" কেষ্ট জবাব দিল না। "কে বল্‌লেরে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি ?" কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরুস্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া, 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত-কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা-সংগ্রহ করিবার কথা হইতে সুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, এখানে খাওয়া দাওয়ার কথা, দোকানে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহার কথা—একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া, চোখ মুছিয়া বলিলেন, "এই তোর মেজ্‌দি'কে কখনও কিছু লুকোস্‌নে কেষ্ট, যখন যা' দরকার হবে, চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্—নিবি ত ?"

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল—"আচ্ছা।"

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল। এই মেজ্‌দি'র মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া, কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় সে মেজ্‌দি'র পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু, তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়।—আবশ্যক হইলেও অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং, যখন রাখিতেই হইবে, তখন, যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন,—"সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিলিরে কেষ্ট ?"

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, "বল্ শীগ্‌গীর।" কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচু গোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কাণ পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্ব্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙেনা, ভাঙে শুধু তখনই যখন পদতলস্পৃষ্ট কঠিন ভূমি সেই বেগ -প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভর-স্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিল না। সে দুঃখীর ছেলে কিন্তু কখন দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখ-কষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিলনা বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না। আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃ-স্নেহের সুকঠিন ভিত্তির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই, আজিকার এই অত্যাচার-অপমান তাহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরুপায় নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া,

চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূশয্যায় পড়িয়া আজ অনেক দিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদি'র নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৫)

পরদিন সকালেই কেষ্ট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুটো একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "দোকানে যাস্‌নি কেষ্ট?"

কেষ্ট। এইবার যাব।

হেমা। দেরি করিস্‌নে দাদা, এই বেলা যা। নইলে এক্ষণি আবার গালাগালি করবে।

কেষ্টর মুখ একবার আরক্ত একবার পাণ্ডুর হইল। 'যাই' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, "কিছু বল্‌বি আমাকে রে?"

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতিশয় মৃদুস্বরে বলিল—"কাল কিছু খাইনি, মেজ্‌দিদি—"

"কাল থেকে খাস্‌নি? বলিস্‌ কি কেষ্ট?" কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, "কাল রাত্তিরেই কেন এলিনে?„

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমার মাথার দিব্যি রইল ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা বলে মনে করবি।"

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কাণে গেল। তিনি নিজের বাড়ী হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, "ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারিনে, যে তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বল্‌তে গেছ?"

কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা-জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, "যদি গায়ে পড়েই বলে থাকি, তাতেই বা দোষ কি?" কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এমনি করে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন করে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি করে বল দেখি?"

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "দিদি, পনর ষোল বছর এক সঙ্গে ঘর করচি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে কোরো, তখন গায়ে পড়ে কথা কইতে যাব না।"

কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, "আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি বলে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ!"

মেজ-বৌ উত্তর দিল—"কে দেবতা কে বাঁদর সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি'ত এই যে, তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়ে মানুষ আর সংসারে নেই।" বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সেইদিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্ত্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বৌ নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জনগর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—"যিনি দিন রাত কচ্চেন তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! আমার ভাইয়ের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে! কখ্‌খন ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌লে ধর্ম্ম সইবেন না—তা' বলে দিচ্চি" বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় যায়ের মধ্যে এই ধরণের গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু, আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক সময়ে হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিত না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল,—"এর মধ্যেই চুপ্‌ কর্‌লে কেন দিদি? ভগবান হয়ত শুন্‌তে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধরে আমার সর্ব্বনাশ কামনা কর,—বট্‌ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন,—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চল্‌বে কেন?"

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আমি কি কোন সর্ব্বনাশীর নাম মুখে

এনেচি ?” হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিল—“মুখে আন্‌বে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা আর পৃথিবী শুদ্ধ হ্যাকা ? ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কার কপাল ভাঙ্‌চ, সে কি কেউ টের পায় না ?”

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, “টের পেলেই বা। যে দোষে থাক্‌বে, তারই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাইনে ? কেষ্টা যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বলতুম মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুর বেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল জিজ্ঞাসা করে হ্যাখো, এই প্রসন্নর মাকে”—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, “সে কথা সত্যি মেজ-বৌমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে, মা বল্‌লেন, “এই পিণ্ডিই না না গিল্‌লে যখন যমের বাড়ী যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে ?” সে বলে গেল, “আমার মেজ্‌দি থাক্‌তে কাউকে ভয় করিনে।”

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, “কেমন হ’লত ? কার জোরে এত তেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি একশ বার ডেকো না। আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থেকো না।”

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিল না। কেঁচো সাপের মত চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কতবড় পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, “বোঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ ? কারু মানা শুন্‌বে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষীছাড়া আছে, দেখ্‌লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজ বৌ। আজ বোঠান আমাকে না-হক দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।”

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, “বোঠান হক্-কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক কথা বলেচেন ?”

বিপিন বলিলেন, “কিন্তু, আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্নের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝনা ? কবে এ স্বভাব যাবে ?”

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, “আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তা’র আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিয়োনা—তুমি যাও।” বলিয়া গায়ের র‍্যাপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না ; কিন্তু, মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

(৬)

পরদিন সকালে জানালা খুলিয়াই হেমাঙ্গিনীর কাণে বড়যায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, “ছোঁড়াটা কালথেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না ?”

স্বামী জবাব দিলেন,—“চুলোয় যাক্। কি হবে খোঁজ করে ?”

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্তপাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন,—“তা’হলে যে নিন্দের চোটে গ্রামে বাস করা দায় হবে ! আমাদের শত্রুত দেশে কম নেই, কোথাও পড়ে মরে টরে থাক্‌লে ছেলেবুড়ো বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা’ বলে দিচ্চি।”

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুর বেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খানকতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক। “কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট ?”

“পালাইনি ত’। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে পড়ে

ছিলুম, ঘুম ভেঙে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েচে মেজ্‌দি।”

“ও বাড়ীতে গিয়ে খেগে, যা।” বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন। এবং সেই খানেই ঠাঁইকরিয়া রাঁধুনিকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময়ে উমা বহির্বাটী হইতে ত্রস্তব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আস্‌চেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—“তাতে তুই অমন কচ্চিস্‌ কেন লো?”

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ মুখ নাড়িয়া তেম্‌নি ইশারায় প্রকাশ করিল—“খাচ্চে যে!”

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল।

উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইশারা তাহার চোখে পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ শাদা হইয়া গেল। কি ত্রাস যে তাহার মনে জন্মিল, সেই জানে। “মেজ্‌দি, বাবু আস্‌চেন” বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, ইহারা ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল। প্রথমটা হেমাঙ্গিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিলেন, তারপরে পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে ও ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন—“ওকি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে?”

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “আবার জ্বর হল না কি?” অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, “এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? ললিত বুঝি?” হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “না সে নয়—ওবাড়ীর কেষ্ট।—খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে দোরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।”

“কেন?”

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, “কেন তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়। তুমি আস্‌চ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।”

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। তাই বোধ করি, সোজাপথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, “ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?”

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—“কি জানি! বোধ করি, মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েচে।” পরক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “কেষ্ট পরের ছেলে সেত লুকাবেই। পেটের মেয়েটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো, ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে!”

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায় এই জন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—“না:—তোমার কোন অধিকার নেই! ভিখিরে এলে ভিক্ষেও না। সে যাক্‌—কালথেকে আর মাতা ধরেনি ত? আমি মনে কর্‌চি সহর থেকে কেদার ডাক্তারকে পাঠাই—না হয় একবার কল্‌কাতায়—”

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা ঐখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—“উমার সাম্‌নে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে?”

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন,—“আমি? কৈ—না। ওহো—সে দিন যেন মনে হচ্চে বলেছিলুম—বোঠান রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি, সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—”

‘জানি’ বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘরে গিয়া ঢুকিতেই তিনি কেষ্টকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, “কেষ্ট, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে মুড়ি টুড়ি কিছু কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিস্‌ নে

আমার কাছে। তোর মেজ্‌দির এমন জোর নেই যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।"

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে কড়মড় করিলেন।

(৭)

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "এ সব কি তুমি সুরু করলে মেজ-বৌ? কেষ্টা তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন রাত আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্চ। আজ দেখ্‌লুম, দাদা পর্য্যন্ত ভারী রাগ করেচেন।"

অনতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ ও মেজ-বৌকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার শব্দে যে সকল অপভাষার তীর ছুঁড়িয়াছিলেন,তাহার একটিও নিষ্ফল হয় নাই। সব ক'টি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিঁধিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া আনিয়াছিল, তাহার সহিত জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না। কিন্তু, মাঝখানে ভাশুর বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিল না।

আগেকার দিনে যেমন যবনেরা গরু সুমুখে রাখিয়া রাজপুত-সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত ও যুদ্ধ জয় করিত, বড়-বৌ, মেজ-বৌকে আজকাল প্রায়ই তেম্‌নি করিয়া জব্দ করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "বল কি, তিনি পর্য্যন্ত রাগ করেচেন? এতবড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌লে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন, কি করলে রাগ থাম্‌বে বল?"

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন কিন্তু, বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন, "হাজার হলেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী কহিল—"সব জানি, ছেলে মানুষটি নই যে, গুরুজনের মানমর্য্যাদা বুঝিনে! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্রি বিঁধতে থাকেন।" তাহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাশুরের সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া ফেলিয়া, সে নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু, তাহারও গায়ের জ্বালাটা না কি বড় জ্বলিতেছিল, তাই রাগ সাম্‌লাইতে পারে নাই।

বিপিন গোপনে ওপক্ষে ছিলেন। কারণ এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া যো পাইয়া জোর দিয়া বলিলেন "বোঁধা-বিঁধি কিছুই নয়, তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করচেন, কায শেখাচ্চেন, তা'তে তোমাকে বিঁধ্‌লে চল্‌বে কেন? তা'ছাড়া যা করুন, তাঁরা গুরুজন যে!"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কারণ, এই পনর ষোল বছরের ঘর-কন্না স্বামীর এতবড় ভ্রাতৃভক্তি সে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল কহিল—"তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আন্‌লে আমি কি দিয়ে ভক্তি কোরব।" বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি, দিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিত-কণ্ঠের বিনম্র ডাক শোনা গেল, "মেজ্‌দি?"

স্বামী-স্ত্রীতে চোখোচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কপাটের কাছে সরিয়া, নিঃশব্দে কেষ্টর মুখের পানে চাহিতেই সে আহ্লাদে গলিয়া প্রথমেই যা' মুখে আসিল কহিল, "কেমন আছ মেজ্‌দি?"

হেমাঙ্গিনী এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না। যাহার জন্য স্বামীস্ত্রীতে এই মাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকেই সুমুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কঠোর স্বরে কহিল, "এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস্‌ বল্‌ত?"

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক্‌ করিয়া উঠিল। এই কঠোর কণ্ঠস্বরটা সত্যই এত কঠোর শুনাইল যে,হেতু ইহার যাই হোক, বস্তুটাকে সস্নেহ পরিহাস নয় বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগা বালকটারও বিলম্ব হইল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালীমাখা হইয়া গেল। কহিল, "দেখ্‌তে এসেছি।"

বিপিন হাসিয়া বলিলেন,"দেখ্‌তে এসেচে তোমাকে।" এ হাসি যেন দাঁত ভ্যাংচাইয়া হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। সে দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার

চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল—"আর এখানে তুই আসিস্‌নে।—যা।"

'আচ্ছা' বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালী হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া, সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী—বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

সেই বিকৃতির কালো ছায়া হেমাঙ্গিনী নিজের মুখের উপর লইয়া স্বামীর পানে আর একবার চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(৮)

দিন পাঁচ ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দ্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবে মাত্র জ্বালা হইয়াছিল, ললিত ভাল কাপড় জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"মা, দত্তদের বাড়ী পুতুল নাচ হবে দেখ্‌তে যাব?" মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁরে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ ছ'দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস্‌নে।" ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "এই অসুখ যদি না সারে, যদি মরে যাই, কি করিস্ তুই? খুব কাঁদিস্?" "যাঃ—সেরে যাবে" বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জ্বরের উপর এই স্পর্শ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এম্‌নি করিয়া বহুক্ষণ কাটান। কিন্তু, একটু পরেই ললিত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, পুতুল-নাচ হয়ত এতক্ষণে সুরু হইয়া গিয়াছে, মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যা দেখে আয়, বেশী রাত করিস্‌নে যেন!"

"না মা এক্ষণি ফিরে আসব" বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, একটা কথা বল'ব?" মা হাসিমুখে বলিলেন, "একটা টাকা চাই ত? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে নিগে—দেখিস্ বেশী নিস্‌নে যেন।"

"না মা টাকা চাইনে। বল তুমি শুন্‌বে?"

মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"টাকা চাইনে? তবে কি কথা রে?" ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "কেষ্ট মামাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুক্‌বে না—ঐ দোর-গোড়া থেকে একবারটি তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।"

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন—"যা যা ললিত এখ্‌খনি ডেকে নিয়ে আয়—আহা হা বসে আছে, তোরা কেউ আমাকে জানাস্‌নিরে?"

"ভয়ে আস্‌তে চায় না যে" বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া মাটির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, 'এস দাদা এস।' কেষ্ট তেম্‌নি ভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি, নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁরে কেষ্ট, বকেছিলুম বলে তোর মেজদিকে ভুলে গেছিস্ বুঝি?" সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ, কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট-যাতনা দিলেও সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সুমুখে চোখের জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটা হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ছি, কান্না কিসের? বেটা ছেলেকে চোখের জল ফেল্‌তে আছে কি!" প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল—"ডাক্তার বলে যে বুকে সর্দ্দি বসেচে?"

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—"এই জন্যে? ছি ছি! কি ছেলে-মানুষ তুই রে?" বলিতে বলিতেই তাঁর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বাঁ হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া, তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন—"সর্দ্দি বসেচে—বস্‌লেই বা রে! যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁধে করে গঙ্গায় দিয়ে আস্‌বি—কেমন, পারবি নে?"

"বলি মেজ-বৌ, কেমন আছ আজ?" বলিয়া বড়-বৌ দোর গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল কেষ্টর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এই যে ইনি এসে হাজির হয়েচেন। আবার ওকি? মেজ গিন্নীর কাছে কেঁদে

সোহাগ করা হচ্চে যে! ন্যাকা আমার, কত ফন্দিই জানে!" ক্লান্তি বশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়া ছিল, তীরের মত সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"দিদি, আমার ছ' সাত দিন জর, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।"

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে ত বলিনি মেজ-বৌ। নিজের ভাইকে শাসন কচ্চি, তুমি অমন মার-মুখী-হয়ে উঠ্‌চ কেন?"

হেমাঙ্গিনী কহিল—"শাসন ত রাত্রিদিনই চল্‌চে—বাড়ী গিয়ে কোরো, এখানে আমার সাম্‌নে করবার দরকার নেই, করতেও দেব না।"

"কেন, তুমি কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে নাকি?" হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমার বড় অসুখ দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চুপ কর—নয় যাও।"

কাদম্বিনী বলিলেন—"নিজের ভাইকে শাসন করতে পাব না?"

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল—"বাড়ী গিয়ে করগে।"

"সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগানো ভাঙানো আজ বার কোরব—বজ্জাত মিথ্যুক কোথাকার। বল্‌লুম গরুর দড়ি নেই কেষ্ট, দু-আটি পাট কেটে দে;—না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি পুতুল-নাচ দেখে আসি—এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্চে রে?" বলিয়া কাদম্বিনী গুম্ গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "কেন তুই পুতুল-নাচ দেখ্‌তে গেলিনে কেষ্ট! গেলে ত আর এই সব হোতো না। আস্‌তে যখন তোকে ওরা দেয় না, ভাই, তখন আর আসিস্‌নে আমার কাছে।"

কেষ্ট আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাদের গাঁয়ের বিশালক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজ-দি। পূজো দিলে সব অসুখ বিসুখ সেরে যায়। দাও না মেজ্‌দি!" এইমাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাঙ্গিনীর মনটা ভারী বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। ঝগড়া-ঝাটি ত হয়ই—সে সেজন্যও নয়। এমন একটা রসালো ছুতা পাইয়া এই হত-ভাগার দুর্দ্দশাটা যে কিরূপ হইবে, আসলে সেই কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর ক্ষোভে ও নিরুপায় আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কে[ষ্ট] ফিরিয়া আসিতেই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিলেন। এ[কেবারে] কাছে ডাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি ভাল হয়ে তোকে লুকি[য়ে] পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পার্‌বি একলা যেতে?"

কেষ্ট উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"একলা যেতে খুব পারব।. তুমি আজকেই আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না মেজদি—আমি কাল সকালে পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খে[লে] তক্ষণি অসুখ সেরে যাবে। দাও না মেজ্‌দি আজকে পাঠিয়ে।"

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাহার আর সবুর সয় না বলিলেন, "কিন্তু, কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারী মার্‌বে।" মার-ধরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "মারুক্‌গে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।"

আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন,"হাঁরে কেষ্ট, আমি ত তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝিবে, তাহার পীড়িত আর্ত্তহৃদয় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মা খুঁজিয়া ফিরিতেছে! একটু-খানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"তোমার অসুখ যে সারচেনা মেজদি,—বুকে সর্দ্দি বসেছে যে!"

হেমাঙ্গিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন—"আমার সর্দ্দি বসেচে তাতে তোর কি? তোর এত ভাব্‌না হয় কেন?"

কেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ভাব্‌না হবে না মেজদি, বুকে সর্দ্দি বসা যে বড় খারাপ। অসুখ যদি বেড়ে যায়, —তা হলে?"

"তা'হলে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস্‌নে ভাই।"

"কেন মেজদি?"

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তোকে

আর আমি এখানে আস্‌তে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস্, তাহলে ভারী রাগ করব।"

কেষ্ট মুখপানে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'তা'হলে বল, কাল সকালে কখন্ ডেকে পাঠাবে।"

"কাল সকালেই আবার তোর আশা চাই?" কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুর বেলায় আস্‌ব,—না মেজদি?" তাহার চোখে মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্যাতন সুরু করিয়াছে, কোন কারণেই আরত তাহা বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। সে হয়ত সহিতে পারে; মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতরই হোক, সে হয়ত সহ্য করিতে পিছাইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে কি করিয়া সহিবেন?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "বিরক্ত করিস্‌নে কেষ্ট, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস্, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে।"

"না বিরক্ত করিনি ত" বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুইচোখ বহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে। তাঁরই আঁচলের অল্প একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে!

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট, মুখখানি অমন করে গেলি ভাই, কিন্তু, তোর এই মেজদি যে তোর চেয়েও নিরুপায়! তোকে জোর করে বুকে টেনে আন্‌ব, সে ক্ষমতা যে নেই ভাই!

উমা আসিয়া কহিল, "মা, কাল কেষ্ট মামা তাগাদায় না গিয়ে, তোমার কাছে এসে বসেছিল বলে, জ্যাঠা মশাই এমন মার মারলেন যে, নাক দি—"

হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া উঠিলেন—"আচ্ছা হয়েচে হয়েচে —যা তুই এখান থেকে।" অকস্মাৎ ধম্‌কানি খাইয়া উমা চম্‌কাইয়া উঠিল। আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, মা ডাকিয়া বলিলেন, "শোন রে! নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল?"

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"না খুব নয়, একটুখানি।" "আচ্ছা তুই যা।" উমা কপাটের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—"মা, এই যে কেষ্ট মামা দাঁড়িয়ে রয়েচে।"

কেষ্ট শুনিতে পাইল। বোধ করি, ইহাকে অভ্যর্থনা মনে করিয়া মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—"কেমন আছ মেজদি?" ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কেন্ এসেচিস এখানে? যা যা বল্‌চি শীগ্‌গীর। দূর হ' বলচি—"

কেষ্ট মূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলিনে?"

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু "যাচ্চি" বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নির্জ্জীবের মত বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুট রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"একশ বার বলি হতভাগাকে, আসিস্‌নে আমার কাছে—তবু 'মেজদি!' শিবুকে বলে দিস্ ত উমা, ওকে না আর ঢুক্‌তে দেয়।"

উমা জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল—"কোন দিন ত তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের ওপর একটা ভিক্ষা চাইচি, দেবে?"

বিপিন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি চাই?"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"কেষ্টকে আমাকে দাও—ও বেচারি বড় দুঃখী—মা বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেল্‌চে, এ আর আমি চোখে দেখ্‌তে পারচিনে।"

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা'হলে চোক বুজে থাক্‌লেই ত' হয়।" স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল। অন্য কোন অবস্থায় সে ইহা সহিতে পারিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"তোমার দিব্বি করে বল্‌চি, ওকে আমি পেটের

ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয়, তোমাদের তাই কোরো। বড় হলে আমি একটি কথাও কব'না।"

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, "ওকি আমার গোলার ধান-চাল তোমাকে এনে দেব? পরের ভাই, পরের বাড়ী এসেচে—তোমার মাঝখানে পড়ে এত দরদ কিসের জন্যে?"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিল—"তুমি ইচ্ছে করলে বট্‌ঠাকুরকে বলে, দিদিকে বলে স্বচ্ছন্দে আন্‌তে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়্‌চি, দাও তাকে।"

বিপিন বলিলেন, "আচ্ছা, তাও যদি হয়, আমিই বা এত বড় মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব?"

হেমাঙ্গিনী বলিল—তুমি আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেল্‌তে না, এখন কি অপরাধ করেচি যে, যখন এমন করে জানাচ্চি—বল্‌চি সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্চে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখ্‌তে চাইচ না? সে দুর্ভাগা বলে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেল্‌বে? আমি তাকে আমার কাছে আস্‌তে বলব, দেখি ওঁরা কি করেন।" বিপিন এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আমি খাওয়াতে পারব না।" হেমাঙ্গিনী কহিল—"আমি পারব। আমি কি বাড়ীর কেউ নই যে, নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পরাতে পারব না? আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখ্‌ব। দিদিরা জোর করেন, ত আমি তাকে থানার দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন—'আচ্ছা সে দেখা যাবে'—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচু গোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কাণে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতেছিল—"মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে হাজির হয়েচে।"

"খ্যাংরা কোথায় রে? যাচ্চি আমি" বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদরবাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাত বাবা ওবাড়ীর সদরে। দেখ্‌ত, তোর কেষ্টমামা কোথা থেকে এল?"

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"পাঁচু দা' তাকে নাড়ুগোপাল করে মাথায় দুটো থান ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।"

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করেছিল সে?" ললিত বলিল—"কাল দুপুর বেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে, তিন টাকা আদায় করে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ করে এই আস্‌চে।"

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "কে বল্‌লে সে টাকা আদায় করেছিল?"

"লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে" বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় রাঁধুনি খানকতক রুটি দিয়া গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এম্‌নি সময়ে তাঁহারই ঘরের বাহিরে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া গেল। বড় গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কাণ ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড় কর্ত্তাও আছেন। মেজকর্ত্তাকেও আসিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেই বড়কর্ত্তা তীব্র কটুকণ্ঠে সুরু করিয়া দিলেন—"তোমার জন্যে আরত আমরা বাড়ীতে টিক্‌তে পারিনে মেজ বৌমা! বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ীর দামটা ফেলে দিক্‌, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।"

হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন, বড়গিন্নী যুদ্ধ-পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাতমুখ নাড়িয়া বলিলেন, "মেজবৌ, আমি বড় যা, তা' আমাকেও কুকুরশিয়াল মনে কর—তা, ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি, মিছে লোক-দেখানো আহ্লাদ দিয়ে, আমার ভায়ের মাথাটি খেয়োনা—কেমন এখন ঘট্‌লত? ওগো, দু'দিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটিত তুমি নেবে না? সেত আমাকেই সইতে হবে?"

ইহা যে কটূক্তি এবং আক্রমণ তাহাই শুধু হেমাঙ্গিনী বুঝিল—আর কিছু নয়। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে ?"

কাদম্বিনী আরও বেশী হাতমুখ নাড়িয়া কহিলেন, "বেশ হয়েচে—খুব চমৎকার হয়েচে। তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দুদিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা'হলে সিন্দুক ভাঙতে, সিঁদ কাট্‌তেও শিখ্‌বে।"

একে হেমাঙ্গিনী পীড়িত, তাহার উপর এই কদর্য্য বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ—আজ সে জ্ঞান হারাইল। ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন কারণেই ভাশুরের সুমুখে কথা কহে নাই; কিন্তু, আজ থাকিতে পারিল না। মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি কি তা'কে চুরি-ডাকাতি করতে শিখিয়ে দিয়েছি দিদি ?"

কাদম্বিনী সচ্ছন্দে বলিলেন, "কেমন করে জান্‌ব কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন ? এত লুকোচুরির কথাবার্ত্তাই বা তোমাদের কি, আর এত আহ্লাদ দেওয়াই বা কি জন্যে ?" কতদিনের পুঞ্জীকৃত আবদ্ধ বিদ্বেষরাশি যে, এই একটু পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন।

মুহূর্ত্ত কালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না। কিন্তু, ঐ মুহূর্ত্ত কালের জন্য। পরক্ষণেই সে মর্ম্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভাশুরকে সুমুখে দেখিয়া মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া দিল, কিন্তু রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না। বড় যা'কে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ অতি কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি এত বড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এত বড় বেহায়া মেয়ে মানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষ্‌লে তাকেও পেটভরে খেতে দেয়, কিন্তু, ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাষ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্য্যন্ত একদিন পেটভরে খেতে দাও না। আমি না থাক্‌লে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত। ও পেটের জ্বালায় শুধু ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ-আহ্লাদ করতে আসে না।"

বড় যা বলিলেন—"আমরা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ ?"

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল—"ঠিক তাই। আজ পর্য্যন্ত কখনও ওকে দুবেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মার ধর করেচ, আর যত পেরেচ খাটিয়ে নিয়েচ। তোমাদের ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আস্‌তে বারণ করেচি, কিন্তু, ক্ষিদে বরদাস্ত করতে পারে না, আর আমার কাছে পেট-ভরে দুটো খেতে পায় বলেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না। কিন্তু তোমরা এত বড় হিংসুক যে, তাও চোখে দেখ্‌তে পার না।"

এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতের ঠোঙা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"হিংসুক আমরা, কেন যে ওর ভালো চোখে দেখ্‌তে পারিনে, তা' তুমিই নিজের চোখে দ্যাখো। মেজ বৌমা, তোমার শেখানোর গুণেই ও আমার টাকা চুরি করে, তোমার ভালোর জন্যে কোন্ একটা ঠাকুরের পূজো দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও" বলিয়া তিনি গোটা দুই সন্দেশ ও ফুল-বেলপাতা ঠোঙার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন "মা গো! কি মিট্‌মিটে সয়তান্, কি ধড়িবাজ ছেলে! বেশত মেজ-বৌ, এখন তুমিই বল না, কি মৎলবে ও চুরি করেচে ? ওকি আমার ভালোর জন্যে ?"

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। একে তাহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, সে দ্রুতপদে কেষ্টর সম্মুখীন হইয়া, তাহার দুইগালে সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, "হারামজাদা চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েচি ? কত দিন তোকে আমার বাড়ী ঢুক্‌তে বারণ করেচি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়িচি ? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তুই চুরির মৎলবেই যখনতখন এসে উঁকি মেরে দেখ্‌তিস্।"

ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীর সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চোখে দেখেচি মা, পরশু রাত্তিরে ও তোমার ঘরের সুমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে

দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়্‌লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি করত।"

পাঁচু গোপাল বলিল, "জানে মেজ-খুড়িমার অসুখ শরীর —সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন—ওকি কম চালাক!"

মেজ-বৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকার ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখন এরূপ হন নাই। অত্যন্ত সুখী হইয়া কহিলেন—"ভিজে বেরাল! কেমন করে জান্‌ব মেজ-বৌ, তুমি ওকে বাড়ী ঢুক্‌তেও বারণ করেচ! ও বলে বেড়ায়, মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে।" ঠোঙা শুদ্ধ নির্ম্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "টাকা তিনটে চুরি করে কোথা থেকে ছুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে—হারামজাদা চোর!"

বাড়ী লইয়া গিয়া বড়কর্ত্তা চোরের শাস্তি সুরু করিলেন। সে কি নির্দ্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভারীগাড়ীশুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া, যেমন করিয়া মার খায়, তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল। এমন কি কাদম্বিনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, হাঁ মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে! কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্ব্বে, নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বল্‌লেন, "কেষ্ট মামা বড় হলে ডাকাত হবে। ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—"

"উমা?" মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে উমা চম্‌কাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

"হাঁরে,এখনো কি তাকে সবাই মিলে মারচে?" বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে কাছে বসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া, জননীর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "পেসন্নর মা কেষ্ট মামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।"

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে, তেম্‌নি করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। বেলা দুটা তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেক দিনের পর পথ্য করিতে বসিয়াছিলেন—সে পথ্য তখনও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বিপিন ওবাড়ীতে বোঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,"মা জ্বরে অজ্ঞান রয়েচেন।"—বিপিন চম্‌কাইয়া উঠিলেন—"সে কিরে? আজ তিন চার দিন জ্বর ছিল নাত।"

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কত যে বাসিতেন তাহা বছর চার পাঁচ পূর্ব্বে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটীর উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে, এ জ্বর আর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।" বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া, স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—"দেবে?" বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া মুছিয়া বলিলেন, "তুমি যা' চাও তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠো।"

হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না, বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হাতমুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া দোকানে বাহির হইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী আসিয়া বলিলেন, "মার খেয়ে কেষ্টর ভারী জ্বর হয়েচে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌চি।"

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাকে এ বাড়ীতে আন্‌বার দরকার কি? যেখানে আছে সেখানেই থাক্ না।"

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে তাকে আশ্রয় দেবে?"

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হাঁ—সে কে যে তাকে ঘরে এনে পুষ্‌তে হবে! তুমিও যেমন।"

গত রাত্রে স্ত্রীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ সকালে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহাই তুচ্ছ করিয়া দিলেন। ছাতাটা বগলে চাপিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পাগ্‌লামি কোরনা—দাদারা ভারী চ'টে যাবেন।"

হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "দাদারা চ'টে গিয়ে এক তাকে খুন ক'রে ফেল্‌তে পারেন, না, আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হ'য়েচে। আমি কেষ্টর মা।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে" বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এ বাড়ীতে তাকে আন্‌তে দেবে না?"

"সর, সর,—কি পাগ্‌লামি করো?" বলিয়া বিপিন চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন—"শিবু, একটা গরুর গাড়ী ডেকে আন, আমি বাপের বাড়ী যাব।"

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "ইস্! ভয় দেখানো হচ্ছে।" তারপর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট, চণ্ডিমণ্ডপের একধারে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্বরে, গায়ের ব্যথায় এবং বোধ করি, বুকের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন—"কেষ্ট!"

কেষ্ট যেন প্রস্তুত হইয়াছিল, এইভাবে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "মেজদি?" পরক্ষণে সলজ্জ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এইভাবে মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচা দিয়া ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, বোসো।

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আর ত বোস্‌বো না, দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ী আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।"

'চল' বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ীর সদরে গোযান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ী যখন গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল! ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, আরক্ত মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সভয়ে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় যাও মেজবৌ?"

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, "এদের গ্রামে।"

"কখন ফিরবে?"

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল—"ভগবান যখন ফেরাবেন তখনই ফির্‌ব।"

"তার মানে?"

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল—"কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আস্‌তে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাক্‌তে হবে।"

বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনেও স্ত্রীর এম্‌নি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এম্‌নি কণ্ঠস্বরই শুনিয়াছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলানো যায়।

বিপিন নম্র স্বরে বলিলেন—"মাপ কর মেজবৌ, বাড়ী চল।" হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া কহিল—"আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোনমতেই বাড়ী ফিরতে পারব না।" বিপিন আর এক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কেষ্টর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কেষ্ট, তোর মেজদি'কে তুই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই—শপথ কচ্চি, আমি বেঁচে থাক্‌তে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক্ করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদি'কে নিয়ে আয়।"

পিট্‌স্‌ ফর্ষ্টার

[শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ]

বঙ্গভাষার প্রথম আভিধানিকের নাম ফর্ষ্টার। "বঙ্গ-ভাষার আলোচনার সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মা ফর্ষ্টারের নাম উল্লেখ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মহাত্মা ফর্ষ্টার জাতিতে ইংরেজ, ধর্ম্মবিশ্বাসে খৃষ্টান—গুণে বাঙ্গালা-বৎসল।
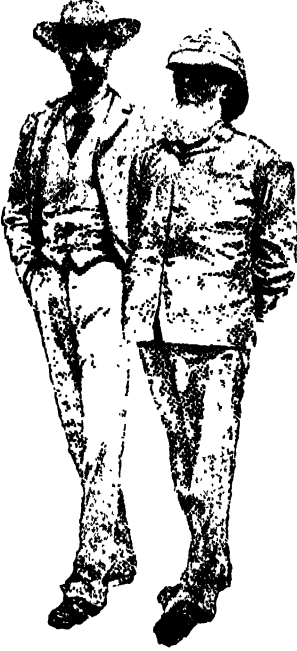
হেন্‌রি পিট্‌স্‌ ফর্ষ্টার

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাঁহার জীবনের যে অংশটুকু সংশ্লিষ্ট..................ততোধিক উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। ইঁহার পুরা নাম হেন্‌রি পিট্‌স্‌ ফর্ষ্টার (জন্ম ১৭৬৬ খৃঃ—মৃত্যু ১৮১১ খৃঃ)। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট্‌ তারিখে তিনি ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে চিহ্নিত কর্ম্মচারী হইয়া ভারতে পদার্পণ করেন *। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরা কালেক্টারের পদে অভিষিক্ত হন এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টার পদে নিযুক্ত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচলন ও উন্নতি কামনায় ১৭৯৯ খৃঃ বাঙ্গালা ও ইংরেজি উভয় ভাষা-সম্বলিত একখানি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ঐ বৎসর প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা হইতে ইংরেজির অংশ ১৮০২ খৃ. প্রকাশিত হয়। ভারতে তৎকালে যে সকল ইংরেজ আসিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন না। বাঙ্গালীরাও বড় একটা ইংরেজি জানিত না। অথচ এ অবস্থায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে, উভয় জাতির মধ্যে একটা আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রয়োজন। অথচ, কেহ যদি কাহারও ভাষা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সম্বন্ধ-সংস্থাপনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইবে। বাঙ্গালা-ভাষী বাঙ্গালী যদি রাজপুরুষদিগের নিকট তাহাদের নিজের ভাষায় তাহাদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে না পারে এবং রাজপুরুষেরাও যদি তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হইলে সুবিচার ও সুশাসনের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিবে। এই দুইটি রাজনৈতিক যুক্তি ও তাঁহার সাহিত্যানুরাগ এই কারণত্রয়ের সম্মিলনে তাঁহার অভিধানের সৃষ্টি হয়। †

সাধারণতঃ অভিধানে সাহিত্য-সম্মত সাধু শব্দেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অভিধান হইতে কোন গ্রাম্য কথা বাহির করিতে হইলে, সেই কথার সাধু শব্দ কি তাহা জানা চাই। তাহা যাহার জানা নাই, তাঁহার পক্ষে অভিধান হইতে বাহির করিবার চেষ্টা দুরাশা। কিন্তু, ফর্ষ্টার সাহেব-কৃত অভিধানে সাধু অসাধু উভয় ভাষার শব্দই একত্র সংগৃহীত ও ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। নিদর্শন-স্বরূপ এস্থলে দুই একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, সাধু ভাষায় যেখানে "পূর্ব্বে" "অগ্রে" বা 'প্রথমতঃ' ব্যবহৃত হয়, গ্রাম্য ভাষায় সে স্থলে 'আগে' এই কথাই প্রচলিত।......................যে সময় তাঁহার অভিধান প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজের আদালতে বা দপ্তরে গ্রাহ্য হইত না। যে দেশে

* Dodwell and Mibs Bengal Civil Servants, Calcutta Gazette.

† ফর্ষ্টারের অভিধানখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ইংরেজি Webster's Dictionaryর ন্যায়। ইহাতে ৪৪২ খানি পৃষ্ঠা আছে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি Wilkins কর্ত্তৃক খোদিত। শব্দসংখ্যা ১৮০০০। পুস্তকখানি কলিকাতায় Post Pressএ P. Ferris কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অভিধানখানির নাম " Vocabulary, in two parts, Bengal English, Vice Versa.

যে জাতি যখন রাজত্ব করে, সে দেশে তখন রাজভাষারই সর্ব্বত্র সমাদর ও সম্যক্ প্রচলন হইয়া থাকে। মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে পারসী ভাষার সমাদর ও আইন আদালতে ঐ ভাষাই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু, বাঙ্গালার অসংখ্য অধিবাসীর অধিকাংশই নিরক্ষর ছিল। তাহারা কোন ভাষাই লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। কথা-বার্ত্তায়ও বাঙ্গালা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার করিতে পারিত না। অথচ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা জানিতেন না, পারসীতে সুপণ্ডিতও ছিলেন না; তাঁদের কাজ চালান গোছ সামান্য জ্ঞান ছিল মাত্র—ইহাতে অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট ঘটিত। ফর্ষ্টার মহোদয় বাঙ্গালা প্রদেশের আইন-আদালতে পারসী ভাষা প্রচলনের অনৌচিত্য ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধসহকারে উক্ত ভাষার ব্যবহার স্থগিত রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। কেরি সাহেব, মার্সম্যান সাহেব, শ্রীরামপুরের যাবতীয় পাদরীগণ, মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বন্ধু, এবং ফর্ষ্টার সাহেব-প্রমুখ মহাত্মাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা যে কেবল বাঙ্গালা বিভাগের আইন-আদালতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই নহে; বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য গ্রন্থ, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস ও ভৈষজ্য গ্রন্থাদি আজ সাহিত্য-জগতে বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদর ও খ্যাতিলাভ করিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।"—[Xaviourএর মূল পোর্ত্তুগীজ গ্রন্থাংশের অনুবাদ]

পরলোকবাসীর আলোকচিত্র
বা
ভূতের ফটো

যোগবিদ্যাদির জন্মভূমি ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ের আলোচনাটা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; অথচ পাশ্চাত্য জগতে গুপ্তবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি যোগেতর বিদ্যার গবেষণা-পরীক্ষা দ্বারা এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, তত্ত্ববিদ্যা-চর্চ্চায় ব্রতী পণ্ডিতমণ্ডলী শক্তিমান্-মধ্যবর্ত্তী (Medium) সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট পরলোকবাসীকে আহ্বান বা উদ্বোধিত করিয়া, সেই সূক্ষ্ম শরীরীকে স্থূল দেহ পরিগ্রহণ করাইয়া, তাহার আলোকচিত্র-গ্রহণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভূতের ছবি তোলা যে সম্ভব, বহুদিবস পূর্ব্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ মৃত মহাত্মা লিন্‌কনের (President Lincohn) বিধবার ফটো লইবার সঙ্গে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সেই মৃত মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশ হওয়ায় সর্ব্ব প্রথম সভ্য জগৎবাসী বিশ্বাস করিয়াছিল। ফলে, সেই হইতেই এ সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা সূচিত হয়। সম্প্রতি বিলাতের তত্ত্ববিদ্যানুসন্ধিৎসু বুধমণ্ডলীর মুখপাত্র বহুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত প্রথিতযশা সাহিত্যরথী কয়েকজনের ফটো গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এইখানে তাহার কয়েকখানির প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

বিখ্যাত ইংরেজ-কবি হেন্‌রি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লংফেলো।
জন্ম—১৮০৭; মৃত্যু—১৮৮২)

"টমকাকার কুটীর"-রচয়িত্রী
মার্কিন-গ্রন্থকর্ত্রী
শ্রীমতী হ্যারিয়েট্ এলিজাবেথ্ বীচর্ ষ্টো
(জন্ম—১৮১২; মৃত্যু—১৮৯৬)

সুবিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার চার্লস্ ডিকেন্স্ ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার রচিত 'এড্উইন্ ড্রুড্' নামক পুস্তকখানি অসমাপ্ত রহিয়া যায়। ১৮৭৩ সালে,
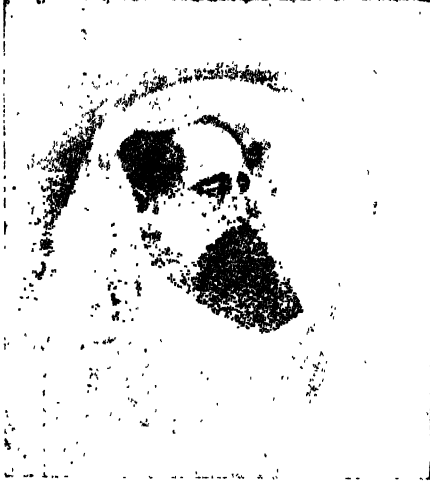
চার্লস ডিকেন্স

মৃত্যুর তিন বৎসর পরে, তাঁহার পরলোকগত আত্মা জনৈক মধ্যবর্ত্তীর উপর "ভর" করিয়া পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করেন।

নিম্নে প্রদত্ত চিত্রখানি বিলাতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত টমাস্ কার্লাইল্ মহোদয়ের আত্মার স্থূল-বিকাশের 'ফটো'র প্রতিলিপি। ইঁহার জন্ম ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে,

টমাস্ কার্লাইল

মৃত্যু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। কার্লাইলের আত্মা জনৈক মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে স্থূল-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, সেটি যে তাঁহারই অভ্রান্ত মূর্ত্তি-বিকাশ, সাধারণের মনে এই স্থির-ধারণা জন্মাইবা জন্য বলিয়াছিলেন—"I must tell the world wha I have been doing; so it will believe it i my *ghaist* which croons so loudly."

এই ভূতের ছবিগুলি নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যা যে, প্রত্যেকটিরই শিরোপরি যেন একখানি সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠ আবৃত রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি পরলোকবাসীর চি গৃহীত হইয়াছে, সকলগুলিতেই এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।—উহাই বোধ হয়, পরলোকের ছায়া!

বিখ্যাত কবি মিল্টনের সূচি-চিত্রের ফটোগ্রাফ

এই চিত্রখানি শুধু সূচি ও সূতার দ্বারা তৈয়ারী করা (সেলাই করা) ছবিখানি দেখিলে চিত্রিত বলিয়া বোধ হয় যেখানে যে রংএর সেড-লাইটের দরকার ও যে রংএর প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে সেইরূপ সিল্কের সূতার দ্বারা সেলাই করা। ইহার রচনা-কৌশল কিরূপ আশ্চর্য্য, অথচ কিরূপ মনোহর, তুই একখানি প্রতিকৃতি হইতেই তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে। নিম্নে একখানি সূচি-চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

সূচি-চিত্রের ফটো

মোরগের লড়াই

[শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, B.A.]

পুরাকালে—সভ্যতার প্রথমাবস্থায়—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ব্বরতামূলক নানা অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল;—কৌতুক-দর্শনের জন্য পশুপক্ষীর যুদ্ধ তাহারই অন্যতম। রোম, গ্রীস্, ইতালী প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশে যখন মানুষের শারীরিক পাশবিকবলের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল, তখন, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে, শৌর্য্যবীর্য্য-উদ্দীপনকল্পে অবকাশ-রঞ্জনোদ্দেশ্যে—অথবা অবসাদ-অপনোদনার্থে—জননায়কবর্গ নানাবিধ পশুপক্ষীর যুদ্ধানুষ্ঠান করিতেন। হস্তীতে হস্তীতে, হস্তীতে ব্যাঘ্রে, বৃষে মানুষে, মেষে মেষে, শ্বাপদে শ্বাপদে, বন্যে বন্যে, বন্যে গৃহপালিতে, গৃহপালিতে গৃহপালিতে এইরূপে বিচিত্র বিষম যুদ্ধ ঘটাইয়া, পাশ্চাত্যজগতে তখনকার লোকে কৌতুক দেখিত। ভারতবর্ষেও মুসলমান রাজত্বে এইরূপ অনুষ্ঠান হইত। মানুষের পশুপ্রকৃতি যে দেশে যখন প্রবল ছিল, বোধ হয়, তখনই সেই দেশে এই সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। সভ্যতাবিকাশের—মনুষ্যত্ববিকাশের—সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। শুনা যায়, দর্শকবর্গের হৃদয়ে বীরভাব উদ্বোধিত করিবার জন্য থেমিস্টকল্স্ সর্ব্বপ্রথমে মোরগের লড়াই ক্রীড়া উদ্ভাবিত করেন; বোধ হয়,

বিজয়ী মোরগ

তাহা হইতেই পরবর্ত্তীকালে তিতির (টিটিভ) প্রভৃতি পক্ষীর যুদ্ধও প্রবর্ত্তিত হয়। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এসকল দৃশ্য যে নৃশংস, বীভৎস, বর্ব্বরোচিত, সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গেসঙ্গেই লোকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিবর্জ্জন করিয়াছে। তবে অসভ্য সমাজে ইতর শ্রেণীয়দিগের মধ্যে—মোরগ, তিতির বুল্‌বুল্, মেড়া প্রভৃতির লড়াই এখনও প্রচলিত আছে। আণ্ডামানাদি দ্বীপপুঞ্জে, মেক্সিকো প্রভৃতি প্রদেশে বর্ব্বরজাতীয়দিগের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে—বিশেষতঃ দক্ষিণ-ক্যানাড়ার ব্যাণ্ট্ জাতির মধ্যে মোরগের লড়াই এখনও প্রচলিত আছে। লড়াইএর জন্য যাহারা যে কোনও পশুপক্ষী পালন করে, তাহারা নাকি সেগুলিকে সন্তানসন্ততি অপেক্ষা অধিকতর আদরযত্নে রাখে। যে সকল মোরগ লড়াইএর জন্য পালিত হয়, পালকেরা তাহাদের নখরগুলি ছুরিকাদ্বারা সুতীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। আবার অনেকস্থলে তাহাদের পাদদ্বয়ে নানা বিচিত্র সুতীব্র অস্ত্র নিবদ্ধ করিয়া থাকে। আবার যে সময় প্রতিদ্বন্দিতা সাধনের উদ্দেশ্য না থাকে—যে স্থলে মাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিয়া, আনন্দ-লাভ করাই উদ্দেশ্য, সে স্থলে লড়াইয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে সেই সকল মোরগের নখরগুলি বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়। সমকক্ষ মোরগের লড়াই অনেক সময় দীর্ঘকালব্যাপী হয়; আবার অসমবলীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিলে, অল্পকাল মধ্যেই হীনবলটি আহত ও
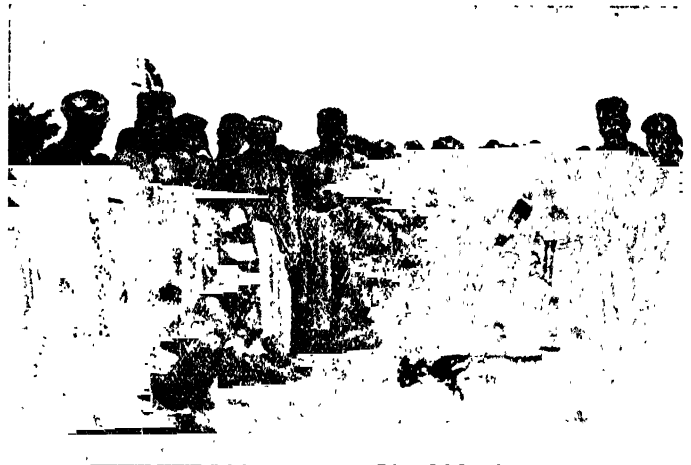
দর্শকমণ্ডলী

তুমুল যুদ্ধ

পরাজিত হয়। চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ললাটভাগ এবং চঞ্চু-তলই নাকি ইহাদের সাংঘাতিক মর্ম্মস্থান। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইতে মোরগদ্বয়কে নিবৃত্ত করিতে হইলে, তাহাদের গাত্রে জল দেওয়া হয়; তখন ক্রোধক্ষিপ্ত উত্তপ্ত-শোণিত মোরগ সহসা শীতলতা স্পর্শে ভূতলে চঞ্চুবিদ্ধ করিয়া মুদ্রিতনয়নে হতচেতন হইয়া পড়ে। লড়িতে লড়িতে মোরগযুগলের মধ্যে একটি যখন নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়, তখনও ঐরূপ বারিবর্ষণে দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তবে প্রকৃত জয়পরাজয় মীমাংসা করিতে হইলে, যে পর্য্যন্ত না একটি আহত হইয়া পতিত হয়, সে পর্য্যন্ত লড়াই চলিতে থাকে। দ্বন্দ্ব-অবসানে

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ

মধ্যস্থব্যক্তি আহত মোরগটির মস্তক ও ক্ষতস্থানে জলসেক করে, ক্ষতস্থান গভীর বা দীর্ঘ হইলে তৎক্ষণাৎ সূচসূত্রযোগে তাহা সীবন করিয়া দেয়, গ্রীবাদেশ হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে নিম্নদিকে রুজিয়া দিতে থাকে এবং গুহ্যদেশে তালবৃন্ত ব্যজন করে। অনেক সময় এই জয়-পরাজয় উপ-লক্ষ্য করিয়া কলহসূচিত হয় বলিয়া, অধুনা সভ্যরাজ্য মাত্রেই প্রকাশ্যভাবে এইরূপ মোরগের লড়াই আইনবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধে মোরগের লড়াইএর যে চিত্র-গুলি প্রদত্ত হইল, এই চিত্রস্থিত মোরগগুলি স্বতঃই জীবন্ত মোরগের প্রতিকৃতি বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এগুলি ইতরজাতীয়া মেক্সিকোবাসী রমণীদিগের হস্তরচিত কৃত্রিম মোরগের চিত্র মাত্র—একখণ্ড স্থূল কাগজ মোরগের আকৃতিতে কর্ত্তন করিয়া তদুপরি পালক ও পক্ষগুলি এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে, যে দূর হইতে সেগুলি দেখিলে জীবন্ত মোরগ বলিয়া ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃই এক্ষেত্রে বর্ব্বর মেক্সিকো-রমণীদিগের এই শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

ঘুম-পাড়ান গান

[শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী]

শব্দের শক্তির কথা আমাদের দেশে নূতন নহে। বেদপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের শক্তি-সাধনা ভারতের চিরসংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও ইংরাজী-পত্রে সঙ্গীতের শক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম যে, ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে। এমন কি, তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উৎকট জ্বরতাপও সঙ্গীতবিশেষের সুমধুর স্বরতরঙ্গে কতকটা হ্রাস

১ম চিত্র

হইয়াছে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি ডাক্তার ফ্যানেস্ট্রিনি নামে একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, ঘুম-পাড়ান গানের শিশুর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে। এবং ইহা একরূপ স্থির যে, চিরপ্রচলিত ঘুম-পাড়ান গানের মধ্যে কতকগুলির আবার বিশেষ ক্রিয়া আছে। তিনি এই উপলক্ষে জাগ্রৎ ও নিদ্রিত, উভয় অবস্থাতেই বহুসংখ্যক শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, ব্রহ্মরন্ধ্র-স্পন্দন প্রভৃতির পরীক্ষা করেন। শুধু পরীক্ষামাত্র নহে, উহার সংখ্যাদি-নির্ণয়ের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রও নির্ম্মাণ করেন। কোনটি বা সম্মুখ-ললাটাস্থির উপর কোনটি বা উদরের উপর রাখিয়া স্পন্দনাদি পরীক্ষা করিতে হয়। শিশুর ব্রহ্মরন্ধ্রে হস্ত স্থাপন করিয়া অঙ্গুলিস্পর্শে তাহার স্পন্দন লক্ষ্য করা হইতেই তাঁহার মনে হয়, ইহার সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য কোনও প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে কি না।

তাহারই ফলে নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাস সংখ্যা-নির্ণয় প্রভৃতির কয়েকটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন।

২য় চিত্র

ডাক্তার ফ্যানেসটিনি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে, সদ্যোজাত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস সংখ্যা সাধারণতঃ মিনিটে ৪০ হইতে ৫০ ও নাড়ীর গতি ১২০ হইতে ১৪০ হইয়া থাকে; এবং যন্ত্রযোগে এই ঘাত-তরঙ্গে যে লহরী লক্ষিত হয়, তাহারও একটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু কোনও প্রতিকূল ঘটনায় বা বিরক্তিকর ভাবে নাড়ীর এই গতি প্রভৃতির বিশৃঙ্খলা ঘটে। বিরক্তিকর ও প্রতিকূল ঘটনায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, নাড়ীও দ্রুত ও উল্লম্ফিত হইয়া থাকে এবং অনুকূল বা প্রীতিকরভাবে উহা সমধিক মৃদু ও ধীরভাবে প্রবাহিত হয়। কয়েকখানি চিত্রে ইহা আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে।

৩য় চিত্র

প্রথম চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শিশু ক্রন্দন করিতেছিল কিন্তু সান্ত্বনার জন্য শিসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উহার শ্বাসসূচক রেখার বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের নাড়ীর স্পন্দনও অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যায়, শ্বাস-রেখায় উত্তুঙ্গ লহরী উঠিতেছে। উহার কারণ, এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া এই শিশুটিকে বিরক্ত করিয়াছে।

তৃতীয় চিত্রে যে স্থলে বজ্রচিহ্ন আছে, তথায় ব্রহ্মরন্ধ্র-নাড়ীর গতি অকস্মাৎ উল্লম্ফিত দেখাইবার কারণ এই যে, বাহিরে একটি খেলনার বন্দুকের শব্দ হইয়াছিল।

শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী পাল

খুলনা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরপাশা নামক গ্রামে সুনিপুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পালের জন্মস্থান। ইঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী পাল, বর্ত্তমান বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে। ইনি সূচি-শিল্পে সিদ্ধহস্ত, সূচি-শিল্পের প্রতিষ্ঠাকারিণী, দেশের ও দশের সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত, স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরব-স্থল; ইঁহার অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অভিনব সূচিচিত্রের সৃষ্টি করিয়া, স্বদেশবাসী ও পাশ্চাত্যদেশের নরনারীদিগকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়াছেন; গুণগ্রাহী, সহৃদয়, সসাগরা ধরার অধিপতি স্বয়ং ইংরাজরাজ পঞ্চম জর্জ্জ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়াছেন। এই মহিলা লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রদর্শনী হইতে সম্মান-সূচক প্রশংসাপত্র, ও সুবর্ণ-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ইঁহার সূচি-চিত্র (Needle-work Picture)"Battle of Plassy" পলাসীর যুদ্ধ নামক চিত্রখানি ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের চিত্রখানি লণ্ডন-আর্ট-গ্যালারীতে ইংরেজ রাজপুরুষের দ্বারা যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহার প্রস্তুত পঞ্চম জর্জ্জের সূচিচিত্রখানি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত Bengal Government কলিকাতা আর্ট গ্যালারীতে রাখিয়া দিয়া, প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীতে (ভবানীপুরে কংগ্রেসের সহিত ১৯০৬।১৯০৭ খৃঃঅঃ) যে Indian Industrial Exhibition বা ভারতীয় শ্রমশিল্প প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনী হইতে এবং এলাহাবাদে সমস্ত এসিয়া-খণ্ডের যে শিল্পপ্রদর্শনী হয়, সেই স্থান হইতে শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী পাল কয়েকটি সুবর্ণপদক পুরস্কার পান। ইহা ভিন্ন, ধুবড়ি, কলিকাতা, যশোহর প্রভৃতি যে কোন স্থানে বা যে কোন শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁহার সূচি-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান হইতে তিনি সম্মানসূচক প্রশংসা-পত্র ও সুবর্ণ-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি কখনই সুবর্ণপদক ভিন্ন রৌপ্যপদক পুরস্কার পান নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট-মহিষী Lady Minto শ্রীমতী কামিনীসুন্দরীর সূচি-চিত্র দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হন যে, শ্রীমতীর নিকট পত্র

শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী পাল

লিখিয়া, একখানি ছবি ক্রয় করেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি সুবর্ণ সূচ ও একগাছি সুবর্ণ সূতা উপহার পাঠাইয়া দেন। ভারতমহিলাদিগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য তিনি উহা ক্রিষ্টাল প্যালেসে রাখিয়া দিয়াছেন। ঝালোয়ারের মহারাণা, শ্রীমতী কামিনীসুন্দরীর একখানি সূচি-চিত্র (এলাহাবাদ শিল্প-প্রদর্শনীতে) দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং ১০০৲ টাকায় উহা ক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষীয় ললনাগণের শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইবার জন্য মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের বিলাতের করোনেশন সময়ে উহা সম্রাটকে উপঢৌকন দেন। ইহা ভিন্ন, অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে তাঁহার চিত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছে, অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ শশিভূষণ ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরীর এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের শিল্প-কার্য্য দেখিবার জন্য তাঁহাদের পর্ণকুটীরে পদার্পণ করিয়া, শিল্পী-দম্পতীকে ধন্য করিয়া থাকেন। যুক্ত-প্রদেশের লাট মহিষী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, কুচবিহারের মহারাণী, মিস্ পি, এন, বসু প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমতী কামিনীসুন্দরীকে প্রচুর পুরস্কার ও ধন্যবাদপূর্ণ পত্রাদি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

রেলে এক সপ্তাহে বোম্বাই হইতে লণ্ডন-যাত্রা

এই রেলপথের আনুমানিক ব্যয় দুই কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড

রুষ-ডুমার বিখ্যাত সদস্য মিঃ ভেজিনসেফ (M. Zvegentseff) বলিতেছেন, রুষ সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের ও রেলপথ বিস্তারের সমুদ্যোগীদিগের মধ্যে অনেকের মত, ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপীয় রেলপথের সংযোগের সময় আসিয়াছে। রুষ-রেলপথের সর্ব্বদক্ষিণস্থ বাকু অঞ্চল হইতে বরাবর পারস্যের অভ্যন্তর দিয়া এংলো ইণ্ডিয়ান রেলের নুস্‌কি পর্য্যন্ত সংযোগ করা যাইতে পারে। এই রুষ ও ভারতীয় রেলপথ সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০০ মাইল হইবে। ইহার নির্ম্মাণে আনুমানিক ২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে লণ্ডন হইতে বোম্বে-মেল ঘণ্টায় গড়ে ২৮ মাইল বেগে চলিলেও ৮ দিন ৬ ঘণ্টা মাত্র সময়ে বোম্বে পৌছিবে। প্রস্তাবক মিঃ ভেজিন্‌সেফ আরও স্থির করিয়াছেন, লণ্ডন হইতে একেবারে বোম্বের টিকিট কিনিলে ৪০ পাউণ্ড মাত্র লাগিবে।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

[মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর্ শ্রীবিজয়চন্দ্ মহতাব্, K. C. I. E., K. C. S. I., I. O. M.]

পূর্ব্ব-প্রস্তাবে পেরিসের সমস্ত কথা বলিতে পারি নাই; এবার অতি সংক্ষেপে অবশিষ্ট স্থানগুলির পরিচয় প্রদান করিব। আমরা ট্রোকাডেরো রাজবাটীর কথা বলিয়াই পূর্ব্ব-প্রস্তাব শেষ করিয়াছিলাম। উক্ত রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া,আমরা বোয়া ডি বুলোঁ (Bois de Boulogne) উদ্যান-ভ্রমণে গিয়াছিলাম। সমস্ত উদ্যানটি দেখিলে যেন একটা পরীস্থান বলিয়া মনে হয়; যেখানে যেটি সাজে, সেখানে তাহাই সজ্জিত রহিয়াছে। স্থানটি দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম এবং ফরাসীজাতির সৌন্দর্য্যবোধের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছিলাম।

পেরিস—বুলেভাদ মণ্ট্‌মার্ট্রে

এখান হইতে বাহির হইয়া, আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিবার সময় শাঁ জি লিজির (Champs de Elysees) মধ্য দিয়া মোটরে চড়িয়া আসিয়াছিলাম। পথের মধ্যে ভেনডোম প্লেস (Vendome Place) দেখিয়া আমরা সেই স্থানে নামিয়াছিলাম। এই স্থানে নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। এটি ঠিক রোমের-ট্রাজান কলমের মত—একেবারে নকল বলিলেই হয়। শুনিলাম, অষ্ট্রালিজের যুদ্ধে যে সমস্ত কামান অধিকার করা হইয়াছিল, তাহাই গলাইয়া এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পরেই আমরা সে দিনের মত হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমি ফরাসী রাজধানীতে যে বৃটিস রাজদূত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নাম সার ফ্রান্সিস্ বার্টি। তিনি আমাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিলেন।

সেই স্থান হইতে বাহির হইয়াই লুভ্রি (Louvre) রাজভবন দেখিতে গিয়াছিলাম; ইহা পূর্ব্বে রাজভবনই ছিল; এখন আর এখানে রাজা নাই, এখন এই ভবনে যাদুঘর স্থাপিত হইয়াছে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড; এই যাদুঘরে প্রধান দ্রষ্টব্য সুন্দর চিত্রাবলি; ইটালি হইতে নেপোলিয়ন যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই গুলিও এখানে আছে এবং তাহাও দ্রষ্টব্য। এখানে প্রায় তিন হাজারের উপর ছবি রহিয়াছে, সেগুলি দেখিবার মত। নূতন ও পুরাতন অনেক উৎকৃষ্ট ছবি এইস্থানে দেখিলাম। নূতন ছবিগুলির মধ্যে ফরাসী ইতিহাসের দৃশ্যাবলি এবং নেপোলিয়নের কীর্ত্তিপ্রকাশক চিত্রগুলি আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিল। ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ব্যাপার সকল চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরগণের অঙ্কিত উৎকৃষ্ট চিত্র সকল এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য যাদুঘরে নানারকমের যে সকল দ্রব্য থাকে, এখানে তাহা না থাকিলেও এই চিত্রগুলিই এই যাদুঘরের অমূল্য সম্পদ এবং এইগুলি দেখিলেই এ স্থানে আগমন সার্থক বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে ফরাসীদেশের পূর্ব্বকালের

ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র দেখিলাম; রাজভাণ্ডারের অনেক বহুমূল্য জহরতও এখানে প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। আমরা এই যাদুঘরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ দেখিতে দেখিতেই অনেক সময় কাটাইয়া দিয়াছিলাম; সেই জন্য সে দিন প্রাতঃকালে আর কোথাও যাওয়া হইল না; আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্নকালে আমরা প্রথমে মুঁসি-ডি-ক্লুনি (Musee de Cluny) দেখিতে গেলাম। ইহাও একটা যাদুঘর। এখানে অনেক পুরাতন আসবাবপত্র ও একালের দ্রব্যাদিও দেখিলাম। পুরাতন দ্রব্যগুলি সম্রাট পঞ্চদশ লুইর আমলের। এই স্থানে ভ্রমণ সময়ে আমার পরম বন্ধু বোম্বাই-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত আগা খাঁ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এত দূরদেশে আমার দেশবাসী একটি বন্ধুকে পাইয়া মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাহার পর লাক্সেমবর্গ ভবন দেখিতে গেলাম। সেখানে একালের অনেক প্রস্তর-মূর্ত্তি ও চিত্র দেখিতে পাইলাম। এই রাত্রিতে আমরা পেরিসের অপেরা-গৃহে গিয়াছিলাম। সে রাত্রিতে সালাম্বো (Salambo) নামক একখানি গীতি-নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল। এই অপেরা-গৃহ সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং রিপব্লিকের আমলে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। এই গৃহ-নির্ম্মাণে এত অর্থব্যয় হইয়াছিল যে, শুনিলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমি ফরাসীভাষা জানি না, সুতরাং অভিনয় বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু দৃশ্যপট ও গানগুলি আমার খুব ভাল লাগিল। অপেরা-গৃহ হইতেই হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আহার, পরেই বিশ্রাম।

পরদিন প্রাতঃকালেই আমি পাষ্টুর ইন্‌ষ্টিটিউট দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা দেখিবার ইচ্ছা আমার বড়ই বলবতী হইয়াছিল। আমি যখন ইন্‌ষ্টিটিউটে উপস্থিত হইলাম, তখন অনেকগুলি কুকুরদষ্ট রোগী চিকিৎসার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল; সুতরাং চিকিৎসাপ্রণালী প্রায় আগাগোড়া দেখিবার আমার বড়ই সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি দেখিলাম, রোগীর উদরের দুই পার্শ্বেই বীজ (serum) প্রবেশ করান হইল। ইহাতে যে রোগীর বিশেষ যন্ত্রণা হয় তাহা নহে, তবে যে সমস্ত বালকবালিকাকে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছিল, তাহারা এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিতেছিল। এই বীজের টিকা লইবার পরও যদি কেহ ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পুনরায় টিকা লইতে হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, একবার কুকুরে কামড়াইলে যে টিকা লওয়া হয় তাহার কার্য্য সেইবারেই শেষ হয়, দ্বিতীয়বার কুকুরে কামড়াইলে পুনরায় টিকা লইতে হয়। একস্থানে দেখিলাম, সুস্থশরীরে জীবজন্তুর শরীরে এক বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদের কখন কি অবস্থা হয়, তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহাতে

পেরিস্—নাট্যশালা

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু চক্ষের উপর সুস্থকায় জীবের এই প্রকার যন্ত্রণা দেখিলে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। এই স্থানেই মহামতি পাষ্টুর মহাশয়ের সমাধি রহিয়াছে; তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা আছেন এবং তিনি ইন্‌ষ্টিটিউটেই বাস করেন। যে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে এই স্থান দেখাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে, এখানে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে গড়ে প্রতি তিন শতে একজন মাত্র মারা যায়; তাহারও কারণ এই যে, সেই রোগীকে এমন অবস্থায় এখানে লইয়া আসা হয়, যখন তাহার একপ্রকার শেষ সময় উপস্থিত। এখানে প্লেগ, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপ্‌থিরিয়া ও ক্ষয়রোগ নিবারণের বীজও প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং সেই সকল বীজ পৃথিবীর প্রায় সকল

স্থানেই প্রেরিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।

এই স্থান ত্যাগ করিয়াই আমরা মোটরারোহণে ভেয়ারসেইল (Versailles) দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান পড়িয়াছিল; সেগুলিও একটু একটু দেখিয়াছিলাম; তাহার মধ্যে সেণ্ট ক্লাউড (St. Cloud) সহর এবং সেখানকার ভ্রমণোদ্যানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সহরের পার্শ্বেই তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রিয় আবাসস্থান ছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় এই রাজপ্রাসাদ বিনষ্ট হয় এবং ভ্রমণোদ্যানও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

পেরিস হইতে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় ৪৫ মিনিটে ভেয়ারসেইলে পৌঁছিয়াছিলাম, অবশ্য আমাদের মোটর
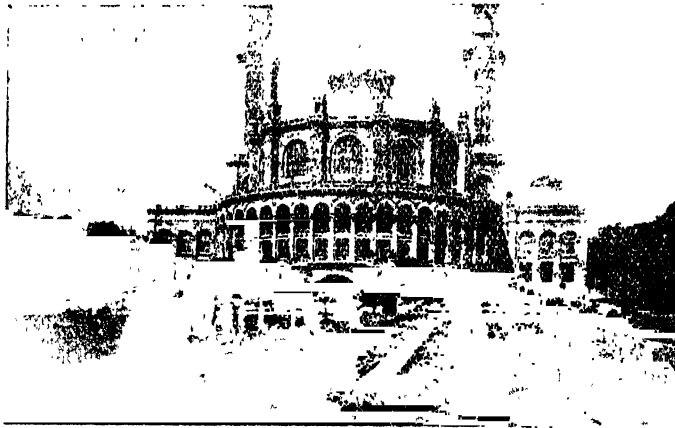
পেরিস—ট্রোকাডেরো

এই পথে একটু দ্রুত চলিয়া ছিল। ফ্রান্স দেশের মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বপ্রকারেই দেখিবার উপযুক্ত; এখানকার রাজপ্রাসাদ, এখানকার উদ্যান, এখানকার সৌন্দর্য্য প্রকৃতই উপভোগের সামগ্রী। শোভা, সৌন্দর্য্য ও বিলাসিতার যত কিছু উপকরণ আছে, তাহার সমস্তই এখানে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণের সময়ে এই স্থানের যে কি শোভাসম্পদ্ ছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এখানকার রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলি বড়ই সুসজ্জিত; তাহারই মধ্যে একটি মহল দেখিলাম, সেখানে বিলাসিতার বা বাহ্যাড়ম্বরের কোন চিহ্ন নাই; এই মহলটি বেশ সাদাসিদে রকমের। এই স্থানেই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হতভাগিনী মেরি আন্তোনেতি বাস করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নানা বিলাস দ্রব্যে বেষ্টিত হইলেই সুখ হয় না; সাদাসিদে ঘর-গৃহস্থালীই সুখের নিদান। এইস্থানে একটি আরসী-মহল (Hall of Mirrors) আছে। এই আরসী-মহলের একটা ইতিহাস আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন পেরিস অবরুদ্ধ হয়, তখন বিস্মার্ক বাভেরিয়ার উন্মত্ত রাজার সাহায্যে এই আরসী-মহলে প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়মকে জর্ম্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। এই রাজপ্রাসাদে যে সকল চিত্র রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই যুদ্ধের দৃশ্য। ফ্রান্সের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই রাজপ্রাসাদটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ভেয়ারসেইল হইতে বাহির হইয়া আমরা ফরাসী সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাস গ্রাণ্ড ট্রায়েনন দেখিতে গিয়াছিলাম। নেপোলিয়ন এইস্থানে থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। এখানে নেপোলিয়ন ও অন্যান্য ফরাসী সম্রাটগণের ব্যবহৃত শকট সকল রক্ষিত হইয়াছে। রুষজার দ্বিতীয় নিকোলাস যখন ফ্রান্সে শুভাগমন করেন, তখন তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে বহুমূল্য সুদৃশ্য শকট নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও এইস্থানে রহিয়াছে। এখনও কোন মহামান্য বিদেশীয় অতিথি পেরিসে আগমন করিলে, এই শকটখানি তাঁহার ব্যবহারের জন্য বাহির করা হইয়া থাকে। ভেয়ারসেইল হইতে ফিরিবার সময় আমরা সিভ্রি (Sevres) সহরের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলাম। এইস্থান চিনে-বাসনের জন্য বিখ্যাত। আমরা একটা বাসনের কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিলাম; কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। এখানকার কারিগরগণের শিল্পনৈপুণ্য এবং কার্য্যকুশলতা দর্শনে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। এখান হইতে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম এবং সে দিনের মত বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা প্রথমে সেণ্টডেনিস নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন উক্ত গির্জ্জায় কতক-

রু-দে লা রিপব্লিক্

সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি নিজে টেবল-ছুরীদ্বারা যে ছোট টেবিলটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং যাহার পার্শ্বে বসিয়া তিনি এল্বায় গমন সময়ে সাম্রাজ্য-ত্যাগপত্র লিখিয়া দেন, সেই টেবলটি এখনও সেই স্থানেই আছে। আছে বটে, কিন্তু আমেরিকান ভ্রমণকারীদিগের অনুগ্রহে তাহার আর সে চেহারা নাই; যিনি সুবিধা পাইয়াছেন, তিনিই উক্ত টেবিলের একটু একটু কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। এখন
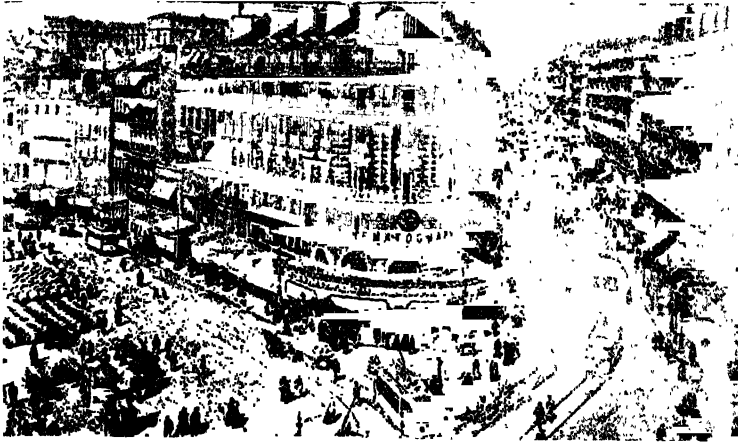
গুলি যুবকযুবতীর অভিষেক ক্রিয়া হইতেছিল; সেইজন্য আমরা গির্জ্জার মধ্যে যাইতে পারিলাম না। তখন সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া পেরিসে ফিরিয়া আসিলাম এবং অনতিবিলম্বেই ফন্টানাব্লো (Fontainebleau) দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। ফন্টানাব্লো সহর পেরিস হইতে ৪০ মাইল দূরে। এটিকে সহর না বলিয়া গ্রাম বলিলেই ঠিক হয়; কিন্তু এই গ্রামে একটি রাজপ্রাসাদ আছে এবং এই প্রাসাদের একটু ঐতিহাসিকতাও আছে। ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সম্রাট লুই এ স্থান পছন্দ করিতেন না, তিনি ভেয়ারসেইলেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং তাঁহার আমলে এ স্থানের প্রতি তেমন যত্ন ছিল না। পরে নেপোলিয়নের সময় এই স্থানের পূর্ব্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন এইস্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করায় সে সময়ের অনেক ব্যাপারের স্মৃতি এই স্থানের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে। তোমার পথপ্রদর্শক তোমাকে এই প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের বারান্দার সম্মুখের একটি স্থান দেখাইয়া বলিয়া দিবে যে, ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ন এল্বায় গমন সময়ে তাঁহার শরীররক্ষীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন নেপোলিয়ন সাতদিনের জন্য ফিরিয়া আসেন, তখন এই স্থানেই তিনি অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে ঘরে যে সমস্ত আসবাব সাজাইয়া বসিতেন, সে ঘর তেমনই আছে, সে সকল আসবাব তেমনই

ভ্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে টেবিলটির ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য তাহার চারিদিকে দড়ি দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নির্জ্জন রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলিতে
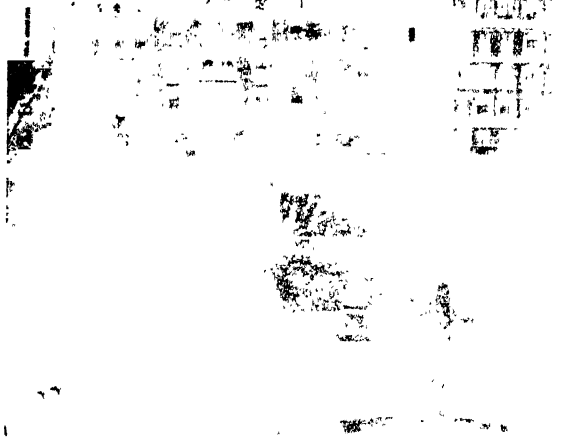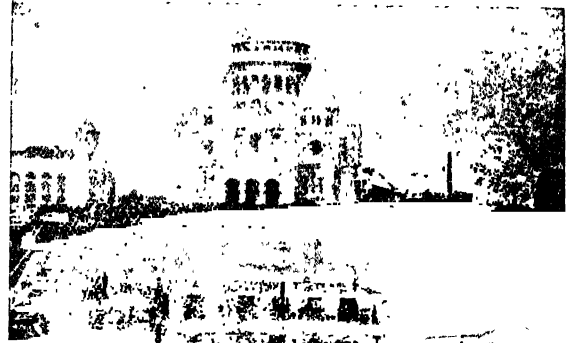
পেরিস বিচারালয় ও ষ্যানভার্স রাজপথ

ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার পূর্ব্ব-গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়ে কেমন একটা বিষাদের সঞ্চার হইতে লাগিল। এই প্রাসাদের পুস্তকালয়টি অতি সুন্দর এবং আমার মনে হইল, ইহাই এখানকার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকালয়ে এখনও একটা পৃথ্বীগোলক রহিয়াছে; নেপোলিয়ন এই গোলকের সম্মুখে বসিয়া পৃথিবীজয়ের কল্পনা করিতেন। গোলকের স্থানে স্থানে

পেরিস—ম্যাভিলে'

এখনও পিন বসাইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; সম্রাট ঐ সকল স্থানে পিন বসাইয়া, তাঁহার রাজ্যজয়ের ব্যবস্থা স্থির করিতেন। এই পৃথ্বীগোলকটি বোধ হয়, সম্রাট নেপোলিয়নের ফরমাইস-মত প্রস্তুত হইয়াছিল; কারণ সুধু য়ুরোপ নহে, এমন কি, ভারতবর্ষেরও সামান্য নগরটির অবস্থিতিস্থান পর্য্যন্ত এই গোলকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের আসবাব পত্র, এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানকার উদ্যান ভেয়ারসেইলের মত সুন্দর না হইলেও সুদৃশ্য বটে। এই রাজপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে রাজকীয় নাট্যশালা রহিয়াছে। এই সুন্দর নাট্যশালাও একটা দেখিবার মত জিনিস। এই ফন্টানাব্লো রাজপ্রাসাদ এখন কেবল লোকের দেখিবার জন্যই রহিয়াছে কিন্তু আমরা শুনিলাম যে, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট কার্ণো এই প্রাসাদের শোভাসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিতেন। এই ফন্টানাব্লো নামেরও একটা ইতিহাস আছে। ফ্রান্সের সম্রাট নবম লুই একদিন এই প্রদেশের জঙ্গলে মৃগয়া করিতে আসিয়া পথ ও সঙ্গীহারা হইয়া যান। একাকী পথের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হন। তখন জলের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একটি অতি সুপেয় জলধারা দেখিতে পান। সেই নির্ঝরের জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তিনি বলিয়া উঠেন, 'Quelle fontaine de belle, eau' অর্থাৎ 'কি সুন্দর ও সুপেয় জলপূর্ণ নির্ঝর!' তিনি এই স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে এমনই মুগ্ধ হন যে, এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন; ক্রমে ক্রমে এইস্থানে নগর স্থাপিত হয়, প্রাসাদাবলি নির্ম্মিত হয়। তিনি যে নির্ঝরের জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'Fontaine de belle eau' অর্থাৎ সুপেয় সুন্দর নির্ঝর, তাহা হইতেই স্থানের নাম প্রথমে হইয়াছিল,ফন্টে-ডি-বেলি-ইউ; তাহার পর ক্রমে ক্রমে নামটি সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফন্টানাব্লো। এইস্থানের নিকটেই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "Field of the Cloth of Gold" অর্থাৎ 'স্বর্ণনির্ম্মিত বস্ত্রের প্রান্তর' ছিল, যেখানে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস তাঁহার পরমবন্ধু ইংলণ্ডের রাজার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ফন্টানাব্লোতে যাইবার সময় এবং আসিবার সময় সর্ব্বশুদ্ধ আমরা সাতটি মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। আর একটু হইলেই এই সাতটি, আটটিতে পরিণত হইত; কারণ আমরা যখন মোটরে চড়িয়া ফন্টানাব্লো হইতে পেরিসে ফিরিতেছিলাম, তখন বনের মধ্যে কয়েকজন লোক গোপনে শিকার করিতে আসিয়াছিল। আমাদের মোটরগাড়ীকে তাহারা পুলিশের লোকের গাড়ী মনে করিয়া দূর হইতে আমাদের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি আমাদের মোটরের হাত দুই সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য ব্যর্থ না হইলে, সেইদিন আমরাও সমাধিযাত্রার একটি সংখ্যা বাড়াইয়া দিতাম।

আমাদের পেরিস দর্শন শেষ হইল। আজ ২৭শে মে, আগামী কল্য ২৮শে তারিখে আমরা পেরিস ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে যাইব। এই কয়দিন ফ্রান্সের রাজধানীতে আমরা
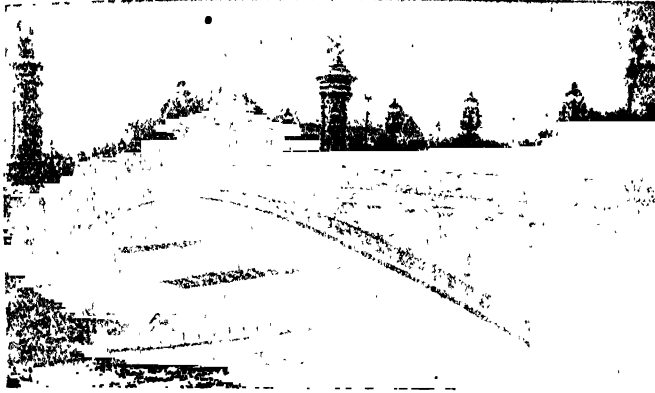
পেরিস—তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের পুল

কি দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। পেরিস সম্বন্ধে আমার ধারণা কি, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ অল্প কয়েকদিন দেখিয়া যে ধারণা করা যায়, তাহা অনেক সময় ঠিক হয় না। তবে উপর উপর দুই চারিটি কথা আমি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে পেরিস নগরীকে কেহ সহজে পরাজিত করিতে পারিবে না। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ খুব পরিশ্রমী; কিন্তু আমি ফরাসীজাতির মধ্যে দেখিতে খুব জোয়ান লোক অধিক দেখি নাই। পথেঘাটে হাটেবাজারে যে সমস্ত লোক দেখিলাম, তাহাদের সকলেরই মুখের ভাব ঐ যেন এক রকমের। প্রায় সকলকে দেখিলেই ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত বলিয়া মনে হয়; চক্ষু কোটরগত—কেমন একটা অবসন্নভাব; আমার মনে হয়, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারেই এই ভাব হইয়া থাকে। সহরময় নাট্যশালা, প্রমোদাগার, সঙ্গীতশালা প্রভৃতি আড্ডা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ জাতি যেমন বিলাসী তেমনই আমোদপ্রিয়। পেরিস নগরী যে বর্ত্তমান শতাব্দীর বিলাসের কেন্দ্র, তাহা এই স্থান দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। দিবাভাগে শোভাসৌন্দর্য্যে বিলাসিতায় এই রাজধানী একেবারে তাক্ লাগাইয়া দেয়। কিন্তু রাত্রি দশটার পর কেহ যদি ঘরের জানালা খুলিয়া, সহরের রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে, তখন তাঁহার মনে হইবে, এ কি সভ্যতার লীলাস্থল পেরিস, না ইহা নরকপুরী! সন্ধ্যার পর যদি রাস্তায় বাহির হইলে, তাহা হইলে দলে দলে সুবেশধারী ভদ্র-আখ্যায় পরিচিত ব্যক্তি তোমার সঙ্গ লইবে; তাহারা আপনাদিগকে ইংরাজ বা আমেরিকাবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে এবং তোমাকে নানা কুস্থানে লইয়া যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে থাকিবে। ভারতীয় অনেক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি, অনেক রাজা-মহারাজও এই রাজধানীতে আসিয়া এমন চলাইয়া গিয়াছেন যে, সে সকল কথা শুনিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় আমার দেশের মহোদয়গণের কুকীর্ত্তির অনেক গল্প একদিন করিতেছিলেন; আমি সেই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করায় ভদ্রলোক যেন অবাক হইয়া গেলেন এবং আমি যে দলছাড়া মানুষ, তাহাই মনে করিয়া, হয়ত আমাকেও কৃপাপাত্র মনে করিতে লাগিলেন। আমার ত মনে হয়, আমাদের দেশে লোককে পাপের পথে লইয়া যাইবার জন্য যত প্রলোভন রহিয়াছে, য়ুরোপে তাহার শতগুণ প্রলোভন চারিদিকে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। এই জন্যই য়ুরোপ-ভ্রমণেচ্ছু আমার স্বদেশবাসী বড়লোকের ছেলেদিগকে আমি বলিতে চাই, দেশভ্রমণ ও সুশিক্ষা লাভের জন্য য়ুরোপে যাইবে বই কি; নানাবিধ কলা-শিল্প দেখিবার জন্য পেরিসে যাইবে বই কি; য়ুরোপের সমস্ত নগরে যাইবে বই কি; কিন্তু আমার অনুরোধ, কোথাও এমন কোন কাজ করিও না, যাহাতে তোমার স্বজাতীয়ের মুখে কলঙ্ককালিমা পড়ে, যাহাতে তোমাদের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া অবনতমস্তক হইতে হয়। সত্যসত্যই একজন ভারতীয় মহারাজাকে লোকে পৃথিবীর মধ্যে অতি জঘন্য পাপাসক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? পেরিসের লোকের দিকে একবার চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিলাসিতাই ইহাদের একমাত্র কার্য্য, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য; ইহারা যে সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কল্পনাও করিতে পারে না। নাস্তিকতা ও দানবতাই এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহা পেরিসবাসীদিগের একদিকের চিত্র; অপর দিকে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে,

কলাশিল্প, সূক্ষ্মশিল্প, শোভা ও সৌন্দর্য্যের সম্ভার-সংস্থানে পেরিস অদ্বিতীয়। ভাল দিক অপেক্ষা মন্দ দিকটাই বেশী নজরে পড়িয়াছিল; সেই জন্য আমি পেরিস সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলিলাম।

৺সার তারকনাথ পালিত।

৺সার তারকনাথ পালিত।

মনস্বী, দানবীর সার তারকনাথ পালিত আর ইহজগতে নাই; ৭৩ বৎসর বয়সে গত ৩রা অক্টোবর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মরদেহের অবসান হইল বটে, কিন্তু তাঁহার যশঃ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সার তারকনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অকাতর পরিশ্রম করিয়া, তিনি ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় ১৮৯৮ অব্দ হইতে তিনি বিশ্রামলাভ করেন; গত ৩রা অক্টোবর তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারী করিয়া অনেকে যশঃ ও অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। সার তারকনাথও তাহাই করিয়াছেন; ইহার জন্য তিনি স্মরণীয় হন নাই—দানই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সার তারকনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনর লক্ষ টাকা দান করেন; বলিতে গেলে, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি দান করেন। এই অর্থে কলিকাতায় স্বদেশী অধ্যাপকগণের দ্বারা পরিচালিত একটি উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এমন ভাবে উপার্জ্জিত প্রায় সমস্ত অর্থদান বাঙ্গালার মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছিলেন; তাহার পরই সার তারকনাথ। অনেকেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, সদ্ব্যয়ও করিয়া থাকেন; কিন্তু এমনভাবে, এমন উদ্দেশ্যে সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেই দান করিয়া গিয়াছেন। আরও একটি কথা, যাঁহারা নিঃসন্তান, তাঁহারা এমনভাবে দান করিতে পারেন; কিন্তু সার তারকনাথ নিঃসন্তান ছিলেন না; তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তবুও তিনি স্বদেশবাসী যুবকগণের শিক্ষাবিধানের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন দান করিয়া গিয়াছেন। এই দানের উল্লেখ করিয়া আমাদের মাননীয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর বলিয়াছিলেন, 'He gave all his worldly possessions for the intellectual progress of Bengal'. এই দানের জন্যই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট'-উপাধিভূষিত করেন।

সার তারকনাথ অনেক দিন হইতেই হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন না, তাঁহার মৃত্যুসময় যে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিতেন। গত ৩রা অক্টোবর সেইদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিকটে ছিলেন না, তিনি চক্ষু-রোগের চিকিৎসার জন্য বিলাতে রহিয়াছেন; তাঁহার পুত্র খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান এবং বর্ত্তমানে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ও সেদিন কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি পিতার দেহাবসান সময়ে উপস্থিত না থাকিলেও শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পরিয়াছিলেন।

আমরা সার তারকনাথের সহধর্ম্মিণী, পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজনের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ত্রুটি-স্বীকার

ভারতবর্ষ-সম্পাদক-মণ্ডলী সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত ভাদ্রমাসের নবপর্য্যায় পুরাতন প্রসঙ্গে ঢাকার উকীল ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, তাঁহার স্ত্রী একজন মহিলা-বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন যে উমেশবাবু তাঁহার স্বামীকে মদ ছাড়াইয়াছিলেন। আপনারা উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের যে পত্র আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে উপেন্দ্রবাবুর বিধবা পত্নী সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছেন যে তিনি এমন কথা কখনও কাহাকে বলিয়াছেন। পত্রখানি পাইয়া আমার প্রথম ঝোঁক হইয়াছিল, কৃষ্ণনগরে গিয়া উমেশবাবুর সঙ্গে এবিষয়ে আর একবার আলাপ করিয়া আসি; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিলাম যে তাহা করিলে প্রবীণা বিধবার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। উমেশবাবুরও ওটা শোনা কথা। অতএব আমি ৺মিত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নীর প্রতিবাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। তিনি আমায় ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অসাবধানতাবশতঃ তিনি ও তাঁহার সন্তানগণ মনঃকষ্ট পাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় এই অংশ অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে।

এই পত্রের Copy তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন; আপনারাও আগামী সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত করিবেন।

বশম্বদ—

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

৫ই আশ্বিন, ১৩২১।

পুস্তক পরিচয়

বসন্ত-প্রয়াণ

শ্রীমতী সরযূবালা দাস গুপ্তা-প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়া এই পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তিনি সমালোচনার অতীত স্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন—নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহার কিছু আসে যায় না—সামান্য একটু সহানুভূতিরও তাঁহার প্রয়োজন নাই। এই 'বসন্ত-প্রয়াণ' পুস্তকের সমালোচনা করিতে নাই, আমরা সমালোচনা করিব না; পুস্তকের একটু পরিচয় মাত্র দিব।

কিন্তু সে পরিচয় দেওয়াও বড় সহজ কথা নহে। সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন "আমাদের সাহিত্যে কিংবা অন্য কোনও সাহিত্যে অন্য কোনও বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে লেখক নিজের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহার কোনটার সঙ্গে এই রচনাকে ঠিক মিলাইতে পারি না।" তাহার পর কবি স্পষ্ট বলিতেছেন "বসন্ত-প্রয়াণ লেখিকার নিজের জীবনের একটা পরিচয় বটে, কিন্তু সে পরিচয় পরের কাছে নহে। সে পরিচয় স্বতঃই প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ইহা রাঁধা তরকারী নহে, ইহা গাছের ফল। সোজা কথা এই যে, এই বসন্ত-প্রয়াণ পুস্তকখানিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় না—ইহা শ্রেণীর গণ্ডী কাটিয়া অনেক ঊর্দ্ধে আপনার আসন স্থাপন করিয়াছে; বাঙ্গলা সাহিত্য-ভাণ্ডার বহুকাল পরে একখানি অমূল্য রত্ন পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।"

কথাটা অতিরঞ্জন নহে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "বইখানি পড়িতে পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের আসন হইতে নীচে নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ রহিল না যে, এ একটা নূতন সৃষ্টি বটে।" আর একস্থলে কবিবর বলিয়াছেন "এই গ্রন্থের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আমি করিলাম না, তাহার কারণ আমি পারি না, আমি দার্শনিক নহি এবং সেরূপ ব্যাখ্যা আমার স্বভাবসঙ্গত নহে। আমাদের দেশে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র আছে, আমি তাহার কিছুই জানি না; এ গ্রন্থ যাঁহার রচনা, নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে এ বিষয়ে অনেক বেশী আলোচনা করিয়াছেন। তাই আমার বিশ্বাস, তিনি যাহা লিখিয়াছেন ও যাহা পাইয়াছেন, তাহা পুরবর্ত্তী গ্র নিজেই উত্তরোত্তর উদ্ঘাটন করিবেন এবং এইরূপে, তাঁহার জী সহিত প্রকাশের যোগে, যে তত্ত্ব আপনাকে আপনি ব্যাখ্যা ক চলিবে, তাহারই জন্য নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকা আমি সঙ্গত করি।" পুস্তকখানির পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি দে যাইতে পারে?

তবুও মূল পুস্তক হইতে একটি স্থান তুলিয়া দিতেছি। লেি বলিতেছেন "আধার দ্বন্দ্ব যে এক নহে। অনন্ত মূর্ত্তি বিশ্বরূপই অ চৈতন্যের দ্বন্দ্ব। একে ত মুক্তি নাই। রূপে রূপে প্রতিষ্ঠা পাও জীবন। অংশে অংশে, জীবে জীবে মুক্তিই মুক্তি। এই যে বহু হই সঙ্কল্প, এই অংশে অংশে পূর্ণ হইবার বাসনা, এ আমার কোন্ সাধ পরিণাম? কোন্ পুণ্যের ফল? কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত? এ যে ম চক্র। এ কালচক্রের বহির্ভূত কি করে হব? ইহাই জন্মমৃত্যুর ঘো তাই আলো আঁধার, মোহ-জাগরণ। তাই পাইবামাত্র হারাই ভোগ মুহূর্ত্তেই অরুচি। প্রণয়ডোর দিয়া বাঁধি আর ছিঁড়িয়া যা ইহাই আমার চির অভিশাপ। ইহাই বাসনার রূপ, রূপের বাসনা ইহাই দুঃখবীজ। ইহাই দুঃখ।" পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় এইপ্রক অমূল্য তত্ত্ব সকল রহিয়াছে। বইখানি শুধু পড়িলে হইবে ন প্রত্যেক কথাটি পড়িতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, লেখিকা অ সংক্ষেপে যে সকল গভীর তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন "এরূপ রচনাকে একেবারে জলের মত বোঝা যায় না—যে বেদনা পাইয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া দিয়া তবে বুঝিতে হয়। নিজের যদি এই জাতীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভব-শক্তি এবং অন্যের চিত্তের রহস্যালোকে প্রবেশ করিবার সহায়স্বরূপ কল্পনাবৃত্তি থাকে, তবে অল্প হোক বেশি হোক বোঝা যায়—সেই বোঝা বুদ্ধিগত না হইলেও তাহা কোন না কোন প্রকারে হৃদয়ের অধিগম্য হয়। পাঠকদিগকে এই বইখানি তেমনি করিয়া পড়িতে হইবে—বুঝিলাম না বলিয়া ইহাকে গালি দিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সাহিত্য-সভায় এই রচনাকে সম্মানের স্থান দিতেই হইবে, ইহাকে উপেক্ষা করিবার যো নাই।"

মাসপঞ্জী

ভাদ্র—১৩২১

১লা—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার দাদাভাই পেষ্টোন্‌জির মৃত্যু।—ইংরাজ সৈন্যের নিরাপদে ফ্রান্সে অবতরণ-সংবাদ ভারতে প্রচার।

২রা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আইন পরীক্ষার ফল বাহির। —বরিশালের বিখ্যাত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু-সংবাদ-প্রাপ্তি।—আলিপুরের উকীল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৩রা—রোমের পোপমহোদয় ইহলোক ত্যাগ করেন। বাঁকুড়ার ডেপুটী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু।—জর্ম্মানীর ব্রসেলস্ অধিকার।—ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশমান্য আনন্দমোহন বসুর অষ্টম বার্ষিক স্মৃতিসভা।

৪ঠা—"সঞ্জবর্ত্তমান" ও "জামে জামসেদ্" পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী ক্ষমাপ্রার্থনা করায় মিঃ কাওয়াসজী তাঁহার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।—পঞ্জাব, রামপুর বাসহরের অধিপতি রাজা সমসের সিংহের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ।—নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ১০ম বার্ষিক স্মৃতিসভা।

৫ই—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনোৎসব ও তদুপলক্ষে অভিনন্দন।—মাননীয় লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে কলিকাতা সন্তরণ-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা-উৎসব।

৬ই—জাপানের জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৭ই—জর্ম্মানী কর্তৃক নামুর অধিকার।—লাহোরের হিন্দু পত্রিকার পরিচালকগণকে ৩০০০৲ টাকা জামিন দিতে হয়।

৮ই—জর্ম্মান সৈন্য সম্মিলিত সেনার অভিমুখে অগ্রসর; মনস্ ও লাক্সেমবুর্গে ভীষণ যুদ্ধ।

৯ই—গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল পরীক্ষার ফল বাহির।—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ফল বাহির।—ইংরাজ কর্তৃক টোগোল্যাণ্ড অধিকার।—পুনায় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ-ক্রেডিট্ সোসাইটির অধিবেশন।—মান্দ্রাজের প্রাচীনতম সলিসিটর মেঃ জেম্‌স্ সর্টের মৃত্যু।—যুক্তপ্রদেশের অনারেবল রায় বাহাদুর শ্রীরাম অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ সহরে এক সভায় বক্তৃতা করিবার পরই অসুস্থবোধ ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।—ভাগলপুরের বিখ্যাত রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১০ই—জেনারেল গেলিয়েনি প্যারিসের মিলিটারী গবর্ণর নিযুক্ত হন।—পূর্ব্বপ্রুসিয়ায় রুষসেনার জয়লাভ।

১১ই—ইংরাজের "হাইফ্লায়ার" জাহাজ জর্ম্মনীর "কৈসার উইল্‌হেল্‌ম্" জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।—লর্ডসভায় লর্ড কিচেনার বলেন, ভারতীয় সৈন্যদল ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে যাইবে।

১২ই—মেট্রপলিট্যান কলেজের অধ্যাপক অনাথনাথ পালিতের মৃত্যু। —মিঃ এস, পি, সিংহের সভাপতিত্বে কলিকাতা অর্ফানেজের ২২ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩ই—ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গক্লার্ক ও হাইকোর্টের উকীল যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

১৪ই—ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের ২৪শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভাধিবেশন। বরোদার মহারাণী সুইজার্লণ্ডে পৌঁছিয়াছেন, সংবাদ-প্রাপ্তি।

১৫ই—লেডী উইলিয়ম মায়ারের মৃত্যু।

১৬ই—রুষ জেনারল স্যাম্‌সনফের মৃত্যু।

১৭ই—ফরাসী রাজধানী বোর্দোতে স্থানান্তরিত হয়।—মাননীয় বড়লাটের পুত্র যুদ্ধে আহত হন।—বলোনার ভূতপূর্ব্ব আর্কবিশপ কার্ডিনাল ডেলাকিসা পোপ নির্ব্বাচিত হন। ইনি পঞ্চদশ বেনিডিক্ট আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

১৮ই—দাদাভাই নারোজীর নবতিবর্ষে পদার্পণ।

১৯এ—৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে এক স্বদেশী বাজার খোলা হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হইয়া এই বাজার খুলেন।—দক্ষিণ আফ্রিকার জজ, লর্ড ডি, ভিলিয়ার্সের মৃত্যু।—জ্যোতিঃ-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ নন্দী ক্ষমাপ্রার্থনা করায় সীতাকুণ্ড মানহানি মোকদ্দমা মিটিয়াছে।

২০এ—জর্ম্মানীর প্যারিস-আক্রমণ চেষ্টা পরিত্যাগ ও ভিন্নপথ অনুসরণ। মবিউজে বিষম যুদ্ধ।

২১এ—স্যর এডওয়ার্ড গ্রের কয়েকখানি সামরিক পত্র প্রকাশ। ভারত গবর্ণমেণ্ট নবেম্বরের মধ্যে দিল্লী-সিমলা টেলিফোন সংযোগ করিবেন, সংবাদ প্রকাশ।

২২এ—ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলের শারদ সেসন আরম্ভ।—সিমলায় সংবাদ, বড়লাট-পুত্র কতকটা ভাল আছেন।

২৩এ—পঞ্জাব বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্ণেল ওয়েন্‌সের মৃত্যু।

২৪এ—সম্রাট মহোদয়ের প্রজাগণের প্রতি সহানুভূতিসূচক সংবাদ প্রেরণ।—সুপণ্ডিত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থের মৃত্যু।

২৫এ—শিয়ালদহ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে সমগ্র ভারতীয় এসিষ্ট্যাণ্ট-সার্জ্জনদিগের সভাধিবেশন।

২৬এ—বরোদার ভূতপূর্ব্ব জজ দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সখেরলাল দেশাই মহাশয়ের মৃত্যু। ইনি মাননীয় তেলাঙের সমসাময়িক ও কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

২৭এ—অষ্ট্রেলিসিয় সৈন্য নিউগিনির নিকট হার্ব্বাটসোহি নামে একটি জর্ম্মান তারহীন সংবাদের ষ্টেশন অধিকার করিয়াছে।

২৮এ—পূর্ণিয়ায় পূর্ণিয়া-বিহারী-সভার তৃতীয় বার্ষিক সভাধিবেশন।

২৯এ—জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী নবাব স্যর ফয়াজ আলিখাঁর একমাত্র পুত্র কনোয়ার ইক্‌রাম আলিখাঁর মৃত্যু।

৩০এ—শ্রীভবনাথ সেনের ইহলোক ত্যাগ।—বিখ্যাত বুয়ার জেনারল ডিলারীর হত্যা।

৩১এ—বর্ম্মায় বিষম বন্যায় ২৩০০০ একর কৃষি-ক্ষেত্র প্লাবিত। বিখ্যাত আগা খাঁর সপ্তত্রিংশত্তম জন্মদিনোৎসব।

সাহিত্য-সংবাদ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক "অহল্যাবাই" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত-প্রণীত গল্পের বহি "কাহিনী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ।৵৹।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গো, গঙ্গা ও গায়ত্রী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।

নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী-প্রণীত "প্রণব" নামক সাধু ও সাধ্বী জীবনী প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৸৹।

ভারতবর্ষের অন্যতম লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ-প্রণীত "বিচিত্র প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।৹।

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ,-প্রণীত "সাবিত্রী" নামক সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "কমলা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।৹।

৺কাঙ্গাল হরিনাথ-প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস "বিজয়বসন্ত" বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল। মূল্য ॥৵৹।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল বি, এল-প্রণীত "মহাভারতীয় নীতি-কথা"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸৹।

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত নূতন উপন্যাস "নরকোৎসব" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত নূতন উপন্যাস "ক্রীতা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।৹।

শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত মজুমদার-প্রণীত নূতন উপন্যাস "মাতৃমূর্ত্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸৹।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ-প্রণীত "অভিসির গল্প" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৷৹।

সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক "তু লিখন" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

রিজিয়া-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়-প্রণীত "লা মিজারেবলে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১.০।

শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাস গুপ্তা-প্রণীত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সু ভূমিকা সম্বলিত "বসন্ত প্রয়াণ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।৹।

"লক্ষ্মী বৌ" "লক্ষ্মী মেয়ে" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ প্রণীত নূতন উপন্যাস "বনবালা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸৹।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার-প্রণীত "সমসাময়ি ভারতের অষ্টম খণ্ড, চৈনিক পরিব্রাজক" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৩৲।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী-প্রণীত নূতন কবিতা পুস্ত "পাথার" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲।

ভারতবর্ষের অন্যতম লেখক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়-প্রণীত নূতন উপন্যাস "অগতির গতি" প্রকাশিত হইল মূল্য ৸৹।

সাবিত্রীসত্যবান প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণী উত্তর-পশ্চিম-ভ্রমণ ২য় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সচিত্র হইয়া, প্রকাশি হইল। মূল্য ১৲।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত রামকানাই দ মহাশয়ের "সন্তান" প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি আনুকূল্যে রামকানাই বাবু সত্বরই তাঁহার "বড়লোক" নামক বহিখানি প্রকাশ করিবেন।

ধম্মপদ নামক সুবিখ্যাত পালিগ্রন্থের অনুবাদক, অশোকের জীবনী ও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস-লেখক বাবু চারুচন্দ্র বসু, অধ্যাপক ললিত মোহন কর কাব্যতীর্থ এম্, এর সহযোগে সমগ্র অশোক-অনু শাসন সম্পাদন করিতেছেন।

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বড়ই সংবাদ "উপাসনা" ১লা কার্ত্তিক হইতে আবার সচিত্র হইয়া বাহির হইবে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদকতা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calcutta.

হংসদূত

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা।]

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

অগ্রহায়ণ, ১৩২১

প্রথম খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

শূদ্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

সেবা তোমার ধর্ম্ম মহান্ ধৈর্য্য তোমার বক্ষভরা
যত্ন কেবল পরের লাগি আপনারেই তুচ্ছ করা।
ভক্তিভরে দাস হয়েছ হওনি নত অত্যাচারে,
গুণজ্ঞ যে নোয়ায় মাথা নিত্য গুণীজ্ঞানীর দ্বারে।
নাইক তোমার কৃচ্ছ্র-সাধন হোম কর না দর্ভ জ্বেলে
তপোবলের গর্ব্ব নাহি সেবায় তোমার মোক্ষ মেলে।
সত্ত্বগুণের ভৃত্য তুমি নর-দেবের আজ্ঞাবহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(২)

জানতে তুমি চাওনি কভু বেদপুরাণের গুপ্ত কথা,
গুরুর মুখে শুনেই সুখী অন্বেষণে যাওনি বৃথা।
চাওনা তুমি জ্ঞান-গরিমা নওহে ধন-রাজ্য-লোভী
আপনারে ধন্য মানো ব্রাহ্মণ-পাদ-পদ্ম সেবি।
অভ্রভেদী বিন্ধ্যগিরি উচ্চ হয়ে তুচ্ছ ছিল,
গুরুর পদে লুন্ঠিয়া শির গণ্য এবং ধন্য হ'ল।
মহত্ত্ব ও গৌরবে তার বিশ্বে কেবা তুল্য কহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(৩)

দাস্য তোমার মাথার মণি উচ্চ চূড়া গৌরবেরি,
ভক্ত থাকে মুগ্ধ হয়ে তোমার হিয়ার শৌর্য্য হেরি।
সমাজ দেহের ভিত্তি তুমি নিম্নে আছ অন্তরালে,
উঠতে তোমায় বল্‌বে শুধু মূর্খ-লোকের তর্কজালে।
নদনদী চায় নিম্নে যেতে, মেঘ নত হয় সলিল-ভরে,
হাল্‌কা বায়ু অল্প আয়ু ঊর্দ্ধে যেতেই চেষ্টা করে।
করুক তোমার নিন্দা লোকে হাস্যমুখে নিন্দা সহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

ঋগ্বেদের পরিচয়

[শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য]

বেদই জগতের আদিম সাহিত্য। জগতের ইতিহাসে বেদ অপেক্ষা পুরাতন শাস্ত্রের উল্লেখ পাই না। এই বেদ ভারতের নিজস্ব,—তাই এই দুর্দ্দিনেও জ্ঞানের রাজ্যে জগতের সমক্ষে ভারত উচ্চশীর্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু জানি না, কেন আমাদের বঙ্গভূমি চিরদিনই বেদের আলোচনায় পরাঙ্মুখ। এই বঙ্গ-ভূমিতেই এক-দিন বুদ্ধদেব বেদবিহিত যজ্ঞাদিকে হিংসাদি দোষ-দুষ্ট বলিয়া, তাহার প্রতি জগৎবাসীর এক উৎকট বীতরাগ জন্মাইয়া দিয়া—"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি"—এই অভিনব মতের প্রবল তরঙ্গে নিখিল ভারত আপ্লুত করেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে এখনও ভারত মুখরিত। আবার এই বঙ্গদেশে কত বিভিন্ন যুগে কত ভাবে বেদের আলোচনা-প্রবর্ত্তনার উদ্যম হইয়াছে কিন্তু কালবশে সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। দেখুন, আদিশূর বঙ্গে বেদালোচনার জন্য এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অবনতি দেখিয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। ইঁহারা প্রথম প্রথম বেদালোচনা দ্বারা বঙ্গভূমিকে প্রবল বৌদ্ধপ্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া, বেদের গৌরব-রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্‌লার মাটির দোষে,—জল হাওয়ার দোষে—তাঁহাদের বংশধরগণই বেদালোচনায় বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপেও উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। সেই স্বাধ্যায়পূত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণ যে এমন পরিবর্ত্তিত হইবেন, তাহা ভাবিতেও হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে অভিভূত হয়,—নয়ন ফাটিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্‌লার মাটির দোষ ভিন্ন আর কি বলিব? অদ্য আমি ক্ষুদ্র হইলেও বেদের মহিমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া,—দেশ-বাসীকে বেদের আলোচনায় প্রণোদিত করিবার অভিপ্রায়ে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দেশবাসিগণ ইহাতে কিছুমাত্র উপকার বোধ করেন এবং আমার দেখাদেখি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ আপনাদের অনন্য-সাধারণ প্রতিভা এবং উর্ব্বর মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা এবং তাঁহাদের অমৃতময় লেখনী সঞ্চালন করিয়া, বেদবিষয়ক তত্ত্বগুলি নব নব ভাবে বঙ্গীয় পাঠকগণের নয়নসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া, বেদালোচনায় তাঁহাদের মনে প্রগাঢ় ঔৎসুক্য জাগাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

ঋগ্বেদের আদিমত্ব।—বেদ যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত,—ইহা ভারতবাসী মাত্রই অবগত আছেন। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রাচীন এবং আদিম। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমরা নিম্নে কয়েকটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিব। ছান্দোগ্যোপনিষদে সনৎকুমারের প্রতি নারদের বাক্য যথা—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চ"।—মুণ্ডকোপনিষদেও একটি বাক্য দেখিতে পাই- "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বণঃ", আবার তাপনীয়োপনিষদে মন্ত্ররাজের চতুষ্পাদ-নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণশ্চত্বারোবেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদাভবন্তি।" এইরূপ সর্ব্বত্রই ক্রমিক পাঠে ঋগ্বেদের প্রথম নাম উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের আদিমত্ব বিষয়ে ইহা কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

শাখা, মণ্ডল ও অষ্টক।—এক্ষণে দেখা যাউক, ঋগ্বেদ কি? ঋগ্বেদসংহিতা বলিতে আমরা ঋক্-সমুদায়াত্মক গ্রন্থ-বিশেষ বুঝিয়া থাকি। ঋক্ অর্থে বৃত্ত বা ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র-বিশেষ। জৈমিনিপ্রদত্ত ঋকের লক্ষণ যথা—"ঋঙ্ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা"—অর্থাৎ যে মন্ত্রে অর্থানুসারে পাদ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে, (প্রতিপাদ এরূপভাবে স্থাপিত, যাহাতে অর্থবোধ জন্মাইতে অপর পাদের অপেক্ষা রাখে না) তাহাই ঋক্। সায়ণাচার্য্য ঐ লক্ষণটি নিম্নলিখিতরূপে বিশদ করিয়াছেন; যথা—"পাদেনার্দ্ধর্চ্চেন চ উপেতা বৃত্তবদ্ধাঃ মন্ত্রাঃ ঋচঃ।" সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতাকে ত্রিবিধ ভাগ

করা যাইতে পারে,—(১) শাখা, (২) মণ্ডল এবং (৩) অষ্টক। সর্ব্বসমেত শাখা-সংখ্যা একবিংশতি। শাখা ও উপশাখার সংখ্যা-বিষয়ে মহাভাষ্যে লিখিত আছে—"এক বিংশতিধা বহ্বৃচাঃ"—অর্থাৎ অধ্যয়ন-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-গণের সংখ্যা একবিংশতি। সুতরাং শাখা-সংখ্যাও এক-বিংশতি। শাখাভেদের বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। মণ্ডল দশটি। প্রতি মণ্ডল কতকগুলি অনুবাকে বিভক্ত, প্রতি অনুবাক আবার কতিপয় সূক্ত লইয়া গঠিত। অষ্টক-গুলি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং অধ্যায়গুলি বর্গে বিভক্ত। * অনুবাক-সংখ্যা মণ্ডল অনুসারে বিভিন্ন। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অনুবাক। দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪টি। তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে পাঁচ পাঁচ করিয়া অনুবাক। পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম মণ্ডলের প্রত্যেকের অনুবাক সংখ্যা ছয়টি। অষ্টম মণ্ডলে দশটি। নবমে সাতটি, দশমে বারটি।

সূক্তসংখ্যা,—সমগ্র সংহিতায় ১০১৭ এক সহস্র সতেরটি সূক্ত আছে। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত,—দ্বিতীয়ে ৪৩ সূক্ত,—তৃতীয়ে ৬২ সূক্ত,—চতুর্থে ৫৮ সূ,—পঞ্চমে ৮৭ সূ,—ষষ্ঠে ৭৫ সূ,—সপ্তমে ১০৪ সূ,—অষ্টমে ১০৩ সূ, নবমে ১১৩ সূ, দশমে ১৯১ সূ, এই সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৭টি সূক্ত। ইহা হইল, শাকল শাখার অনুসারে গণনা। ইহা ব্যতীত "বালখিল্য" নামে পরিচিত একাদশটি অতিরিক্ত সূক্ত অষ্টম মণ্ডলের মধ্যভাগে (৪৮ সূ হইতে ৫৯ সূ পর্য্যন্ত) সন্নিবেশিত হইয়াছে; এই গুলি ধরিলে মোট সূক্তসংখ্যা ১০২৮ হয়। এই সকল সূক্তের মধ্যে কতকগুলি "আপ্রী" নামে পরিচিত। 'আপ্রী' সূক্তের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ একাদশটি, —দশ মণ্ডলের দশটি এবং খিলান্তর্গত প্রৈষাধ্যায়ে একটি,—শেষোক্তটিকে "প্রৈষকাপ্রী সূক্ত" বলা হয়। আপ্রী সূক্তের দেবতাগণ যথা—১, সমিৎ, ২, তনূনপাৎ, ৩, নরাশংস, ৪, ইল, ৫, বর্হি, ৬, দেবীদ্বার, ৭, উষাসানক্তা, ৮, হোঁতা ও প্রচেতস্, ৯, সরস্বতী, ঈলা, ভারতী, ১০, ত্বষ্টা, ১১, বনস্পতি, ১২, স্বাহাকৃতি।

আপ্রী সূক্তগুলির মধ্যে ৮ আটটিতে এগারটি করিয়া ঋক্, অবশিষ্ট তিনটিতে বারটি করিয়া ঋক্ আছে। সূক্তের মধ্যে আবার মহাসূক্ত ও ক্ষুদ্রসূক্ত এই দুই বিভাগ আছে। কোন সূক্তে দশাধিক ঋক্ থাকিলে আমরা তাহাকে মহাসূক্ত বলিয়া থাকি। শৌনক ঋষি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে মহাসূক্তের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—"দশর্কতায়া অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ।" এবং তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক ঋক্‌যুক্ত সূক্তকে ক্ষুদ্রসূক্ত বলা হয়।

সমগ্র সংহিতায় আটটি অষ্টক আছে; প্রত্যেক অষ্টক আট আট অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় আবার বিভিন্ন-সংখ্যক বর্গসংখ্যায় বিভক্ত। শৌনকমতে বর্গসংখ্যা ২০০৬টি, চরণব্যূহকারের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০১০টি। বিভিন্ন বর্গে ঋকের সংখ্যা বিভিন্ন। আশ্বলায়নশাখাবলম্বিগণের মতে একটি বর্গ মাত্র চারিটি করিয়া ঋক্‌দ্বারা গঠিত।

শৌনক ও চরণব্যূহকারের মতানুসারে নিম্নে বর্গ ও তৎসংগঠক ঋকের সংখ্যাভেদের একটি তালিয়া দেওয়া গেল—

শৌনক মতে

বর্গসংখ্যা	প্রতিবর্গ-সংগঠক ঋক্‌সংখ্যা	মোট ঋক্‌সংখ্যা
১	১	১
২	২	২
৯৭	৩	২৯১
১৭৪	৪	৬৯৬
১২০৭	৫	৬০৩৫
৩৪৬	৬	২০৭৬
১১৯	৭	৮৩৩
৫৯	৮	৪৭২
১	৯	৯
২০০৬		১০৪১৭

* ঋগ্বেদের মণ্ডল ও অষ্টক এই দ্বিবিধ বিভাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর ৺ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মত এই যে—"মণ্ডল ও অষ্টক বিভাগ অনুসারে পূর্ব্বে ঋগ্বেদের দুই প্রকার পুঁথির প্রচলন ছিল, অর্থাৎ কোন কোন পুঁথিতে মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ইত্যাদি ক্রমে পাঠ ছিল, আবার অন্যগুলিতে অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ এইরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান পাঠের মত মণ্ডল ও অষ্টক এই দ্বিবিধবিভাগের একত্র সংমিশ্রণ ছিল না। এইরূপ শুদ্ধ মণ্ডল-অনুসারে বিভক্ত পাঠকে দশতয়ী বলা হইত এবং অষ্টক বিভাগানুসারি-পাঠ অষ্টতয়ী নামে প্রখ্যাত ছিল। সায়ণাচার্য্য যে পুস্তক দেখিয়া ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহার লিপিকর অষ্টতয়ী ও দশতয়ী এই দ্বিবিধ প্রকার পাঠযুক্ত পুস্তক দেখিয়া দ্বিবিধ বিভাগই মিশাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সায়ণ দুই রকমই বিভাগ বজায় রাখিয়া ভাষ্য করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন, ঋগ্বেদী ছিলেন না, সুতরাং স্থির করিতে পারেন নাই।"

চরণব্যূহকারের মতে

বর্গসংখ্যা		প্রতিবর্গসংগঠক ঋক্	...	মোট ঋক্‌সংখ্যা
১	..	১	...	১
২	..	২	...	৪
১০০	..	৩	...	৩০০
১[illegible]	..	৪	...	৭০০
১২১১	..	৫	...	৬০৫৫
৩৪৫	..	৬	...	২০৭০
১২০	..	৭	...	৮৪০
৫৫	..	৮	...	৪৪০
১	..	৯	...	৯
২০১০				১০৪১৯

ঋক্‌সংখ্যা-বিষয়ে শৌনক এবং "সর্ব্বানুক্রম"কার কাত্যায়নের মতের ঐক্য আছে। কিন্তু চরণব্যূহের মত অন্য গ্রন্থেও এই ঋক্‌সংখ্যার বিভিন্ন রূপ গণনা দৃষ্ট হয়। রামভট্টকৃত "অনুক্রমণিকা বিবরণে"—ঋকের সংখ্যা ১০,৪০২ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ঋক্‌সংখ্যাবিষয়ক অনৈক্য যে শাখা-বিভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, শাকল-শাখা অপেক্ষা বষ্কল শাখায় ৮টি সূক্ত অধিক গণিত হইয়াছে, এবং কোন বিশেষ শাখা একটি মাত্র পদকে স্থানবিশেষে ঋক্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কখন কখন বা দুইটি পদকে ঋক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহাতেই বিভিন্ন শাখানুসারে ঋক্-সংখ্যাগত ন্যূনাধিক্য উৎপন্ন হইয়াছে, মনে হয়।

ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ।—আবার বিভিন্ন ঋকের বিভিন্ন দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ। যে ঋকে যাঁহার স্তুতি করা হয় বা যাঁহার উদ্দেশে হোম করা হয়, সেই ঋকের তিনিই দেবতা। ঋগ্বেদে প্রায় ২৫০ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যে ঋক্ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রথম রচিত হইয়াছে—হিন্দুর ভাষায় প্রথম দৃষ্ট হইয়াছে,—কেননা তাঁহাদের মতে বেদ অপৌরুষেয়,—তিনিই তাহার ঋষি। ঐরূপ ঋষির সংখ্যা ৩২০। উঁহাদের মধ্যে ঋগ্বেদের মধ্যে মণ্ডলদর্শী ঋষিগণ 'শতর্চ্চিন' নামে পরিচিত, মধ্যমণ্ডল-সমূহের দ্রষ্টা ঋষিগণ 'মধ্যম' নামে অভিহিত এবং অন্ত্যমণ্ডলদর্শিঋষিগণ "ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত" এই দুই নামে বিদিত। যে ঋক্ যে ছন্দে নিবদ্ধ, সেই তাহার ছন্দঃ। ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋক্, দেবতা, ঋষি, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ উল্লেখ করিয়া পাঠ করিতে হয় নতুবা পাঠের উদ্দেশ্য সফল হয় না; এই হেতুই প্রত্যেক সূক্তের শিরোদেশে ঐগুলির যথাযথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দশ মণ্ডল ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য।—ঋগ্বেদস্থিত দশটি মণ্ডলের মধ্যে সকলগুলির সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতিগত সাম্য বা ঐক্য দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্য্যন্ত এই মণ্ডল-ষটকের প্রকৃতি কতকটা একরূপ। এগুলির প্রত্যেকটিই কোন এক প্রখ্যাত ঋষি বা তাঁহার উপযুক্ত বংশধর কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা রচিত এবং তাঁহারই নামে অদ্যাপি পরিচিত। দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষির, তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র ঋষির, চতুর্থ মণ্ডল বামদেব ঋষির, পঞ্চম মণ্ডল অত্রি ঋষির, ষষ্ঠ মণ্ডল ভারদ্বাজ ঋষির এবং সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠ ঋষির বিরচিত বা দৃষ্ট। নবম মণ্ডলে বিশেষত্ব এই যে, যদিও বিভিন্ন সূক্ত বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, কিন্তু ইহার প্রত্যেক সূক্ত দ্বারাই সোম দেবতা স্তুত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৬টি মণ্ডল এবং নবম মণ্ডলের মধ্যে অনুবাকগত বৈষম্য আছে। পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল ৬টির অনুবাক দেবতা-সাম্যজনিত এবং নবমমণ্ডলের অনুবাকগুলি ছন্দঃ-সাম্য-ঘটিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলগুলিতে একই দেবতার প্রতি উদ্দিষ্ট কতিপয় সূক্ত লইয়া, এক একটি অনুবাক গঠিত হইয়াছে এবং নবম মণ্ডলে একই ছন্দে নিবদ্ধ কতকগুলি সূক্ত দ্বারা অনুবাক গঠিত হইয়াছে। এই সাতটি মণ্ডল ব্যতীত অবশিষ্ট তিনটিতে অর্থাৎ প্রথম, অষ্টম ও দশমে এইরূপ সন্নিবেশের সুচারু পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। এগুলিতে বিভিন্ন সূক্ত বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক নিবদ্ধ, এই তিনটি মণ্ডলে অনুবাকগুলি ঋষি-সাম্যজনিত অর্থাৎ একই ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট কতিপয় সূক্ত লইয়া অনুবাক গঠিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের আদিম অংশ।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, যে সুচারুরীতিতে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত ৬টি মণ্ডল নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, ঐ মণ্ডল কয়টি ঋগ্বেদের কেন্দ্রভূত আদিম অংশ, এবং পরবর্ত্তীকালে আবার কয়টি মণ্ডল উহাতে যোজিত হইয়া বর্ত্তমান সংহিতাকারে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে,—প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে ৯টি অনুবাক আছে, ঐ গুলির সহিত ঐ মণ্ডলেরই প্রথমার্দ্ধের কোনই ঐক্য নাই;—পরন্তু ২য়

হইতে ৭ম মণ্ডলের সহিত উহাদের সাম্য দৃষ্ট হয়, যেহেতু ঐ সকল অনুবাক সম্পূর্ণরূপে এক এক ঋষি কর্তৃক পরিদৃষ্ট এবং উহাদের নামে পরিচিত। ঐ সকল অনুবাকস্থিত সূক্ত প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্দ্ধের মত বিভিন্ন ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয়ার্দ্ধটি ঐ মণ্ডলষটকের অনুকরণেই রচিত হইয়া, পরে যোজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি মণ্ডলের মত অষ্টম মণ্ডলেও অনেক সূক্তে একই বাক্য এবং চরণের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। অষ্টম মণ্ডলের সহিত ঐ মণ্ডল-ষটকের আর একটি ঐক্য এই যে, ইহার অধিকাংশ সূক্তই কাণ্ববংশীয় ঋষিগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট সুতরাং কাণ্ববংশের প্রাধান্য এ মণ্ডলে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে অষ্টম মণ্ডলের বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রধানতঃ প্রগাথ ছন্দে রচিত। প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্দ্ধের সহিত অষ্টমমণ্ডলের প্রচুর সাম্য আছে। প্রায় অর্দ্ধাধিকসূক্ত কাণ্বগণ কর্তৃক দৃষ্ট এবং অষ্টমমণ্ডলের পরিচিত প্রগাথছন্দে অধিকাংশ সূক্ত নিবদ্ধ। আবার এই দুই স্থলে (অর্থাৎ ১ম মণ্ডলের প্রথমার্দ্ধ এবং অষ্টম মণ্ডল) একই ঋকের অনেকবার পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই মণ্ডলগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে নির্ণয় করা সুকঠিন।

দশম মণ্ডল বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহার সূক্তগুলি পূর্ব্বোক্ত নয় মণ্ডলের পরে রচিত হইয়াছিল।

দশম মণ্ডলের পরবর্ত্তিত্ব।—ইহার রচয়িতা ঋষিগণ স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল কয়টির সহিত তাঁহাদের পরিচয়ের কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের বিংশতি হইতে ষড়্‌বিংশতি পর্য্যন্ত সূক্ত-সপ্তকের রচয়িতা ঋষি—"অগ্নিমীড়ে"—এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদপাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋক্—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" ইত্যাদি ক্রমে আরব্ধ হইয়াছে। আবার প্রথম মণ্ডলে সূক্ত সংখ্যা ১৯১টি, দশম মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যাও তাহাই। ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথম নয়টি মণ্ডল অপেক্ষা দশম মণ্ডল পরবর্ত্তিকালে রচিত হইয়াছে। কেননা পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলগুলিতে স্তুত অনেক দেবতার স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—কোন কোন দেবতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডল অপেক্ষা দশম মণ্ডলে উচ্চতর স্থান পাইয়াছেন, কেহ কেহ বা অধস্তন স্থানে অবরূঢ় হইয়াছেন কিংবা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। যদিও অগ্নি ও ইন্দ্র—যাঁহারা তৎকালে ঋষিগণের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে সম্মানের পদ পাইয়া আসিতেছিলেন,—দশম মণ্ডলে সেই পদবী হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু যে উষাদেবী পূর্ব্ব নয় মণ্ডলের অলঙ্কারস্বরূপ এবং যাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট এক একটি সূক্ত এক একটি সৌন্দর্য্যের খনি এবং বৈদিক কবিগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভব শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, দশম মণ্ডলে তাঁহার নামোল্লেখও নাই। আবার অন্যদিকে বিশ্বদেবগণের পদ সমধিক সম্মানভাজন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রদ্ধা, মন্যু ইত্যাদি কতকগুলি মনোরাজ্যের বৃত্তি দেবতারূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দশমমণ্ডলে সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিক তর্ক, বিবাহাদি সংস্কার,—সামাজিক রীতিনীতি, মন্ত্র, এবং ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিষয়ক অনেক সূক্ত আছে, যাহা দ্বারা এ মণ্ডলের বিশেষত্ব এবং আপেক্ষিক আধুনিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ভাষাগত বিচার দ্বারাও অন্যমণ্ডল কয়টি হইতে দশমমণ্ডলের পার্থক্য স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্বরূপ এস্থলে কয়েকটি ভাষাগত পরিবর্ত্তন দেখাইতেছি। যথা,—(১) সন্ধিঘটিত স্বরের সঙ্কোচ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডল অপেক্ষা সন্ধির প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; (২) পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের মত 'ল' এই অক্ষরটির ব্যবহার 'র' এর তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে; যথা,—পূর্ব্বমণ্ডলে 'কৢপ্ত' পঠিত হইয়াছে, এ মণ্ডলে 'কৢপ্ত' হইয়াছে; আর পূর্ব্বমণ্ডলের 'ঈড়ে' দশম মণ্ডলে 'ঈলে' হইয়াছে; আর (৩) অন্যান্য মণ্ডলে প্রথমার বহুবচনে "আজ্জশেরসুক্" বলিয়া যে "অসুক্" প্রত্যয়ের ব্যবহার হইয়াছে (দেবাসঃ, জনাসঃ ইত্যাদি) তাহা দশম মণ্ডলে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। (৪) অনেক প্রাচীন শব্দের ব্যবহার একেবারে লোপ পাইয়াছে; উদাহরণ-স্বরূপ "সম" এই কথাটি পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলগুলিতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইলেও দশমমণ্ডলে ইহার প্রয়োগ কেবল একস্থানে মাত্র দৃষ্ট হয়। এবং (৫) অনেকশব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে যে যে অর্থে

ব্যবহৃত হইয়াছে, দশম মণ্ডলেও সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—'লভ' ধাতু লওয়া অর্থে, 'কাল'—শব্দটি সময় অর্থে, 'লক্ষ্মী'—ভাগ্য অর্থে ও 'এবম্' শব্দটি এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'সোম' শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে ঋষিগণের প্রিয় 'সোমরস' অর্থে 'সোম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কিন্তু ১০ম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ ৮৫ সূক্তে 'সোম' শব্দটি চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হেতু পণ্ডিতবর 'রথ' (Roth) এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। এইরূপে অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় দশমমণ্ডলের রচনারীতিগত পরবর্ত্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই রীতিগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, বিভিন্ন সূক্তের রচনাকালের পূর্ব্বাপরত্ব স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সমগ্র ঋগ্বেদের রচনা-কাল তিন কি ততোধিক স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমি বলিব,—একরূপ অসম্ভব। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনার নেশায় বিভোর হইয়া স্ব স্ব মনোমত এক একটা সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিগত গভীরতার একান্ত অভাব হেতু ঐগুলি আমাদের হৃদয়ে একেবারেই স্থান পায় না, এই জন্য এস্থলে নিরর্থক বোধে উল্লেখ করিলাম না।*

ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য।—যাহা হউক, ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদখানি একদিনে রচিত, সঙ্কলিত এবং বর্ত্তমান আকারে সংগঠিত হয় নাই। ইহার রচনা, সঙ্কলন এবং বর্ত্তমানাকারে পরিণতি হইবার মধ্যে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম কয়েক মণ্ডলের অনেক ঋষি ঋগ্বেদের সহিত সংস্রবশূন্য প্রাচীন কবিগণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহাদের স্তুতি পূর্ব্বতন কবিগণের রীতিরই অনুসারী। এই সকল বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, ঋগ্বেদই ভারতীয় আর্য্যগণের প্রথম রচনা নহে। যদিও ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তি-সাহিত্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু উহা যে এককালে উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং ভাগ্য-দোষে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, ইহা মানিতেই হইবে; নতুবা ভারতীয় সাহিত্য-লতিকা অঙ্কুর অবস্থায়ই ঋগ্বেদের মত সুপুষ্ট ফল প্রসব করিয়াছিল, এইরূপ একটা অসঙ্গত কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তবে জিজ্ঞাস্য যে, ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের রচনা কোন্ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সুযুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যখন ভারতীয় আর্য্যগণ মধ্যএসিয়াস্থিত আদিম বাসস্থান হইতে অন্যান্য আর্য্য ভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই বিচ্ছেদের সময়েই তাঁহাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের উদ্ভব হয়; ইহাই ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য এবং ইহা হইতেই ঋগ্বেদীয় সাহিত্যের জন্ম।

ঋগ্বেদের পাঠভেদ।—অনেকে উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঋগ্বেদ সংহিতা কি অনন্তকাল হইতে একই ভাবে অপরিবর্ত্তিতাকারে চলিয়া আসিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পাঠভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাঠভেদ (difference in readings) সংগ্রহ করিতে হইলে প্রায়ই বিভিন্নদেশীয় বিবিধ প্রকার পুঁথির পরীক্ষণ আবশ্যক হয়; কিন্তু পুঁথির সাহায্যে বৈদিক সংহিতার পাঠভেদ স্থির করা অসম্ভব, কেননা বেদের অপর নাম শ্রুতি, শ্রুতি-পরম্পরাতেই উহার পঠন-পাঠনের প্রচলন ছিল, উহা তৎকালে কদাচ লিখিত হইত না। যখন লিখনের প্রচলন হইল, * —যখন বেদ পুঁথিতে উঠিল,

* অঃ ম্যাক্সমূলরের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ, এবং সঙ্কলনকাল খৃঃ পূ ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দ। কোলব্রুকের মতে ইহার রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ। এলফিন্‌ষ্টোনের মতে সঙ্কলন-কাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ, কিন্তু রচনাকাল ইহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। হুইট্‌নি বলেন, ঋগ্বেদ খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ হইতে ১৫০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইরূপ কত মত দেখাইব, নিরর্থক-বোধে নিরস্ত হইলাম।

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কতকটা সুযুক্তিদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে লিখন-পদ্ধতি একেবারে ছিল না। এ বিষয়ে অধ্যাপক Macdonell বলিয়াছেন (১) "The Asoka descriptions are the earliest records of Indian writings" এবং (২) "References to writing in ancient Indian literature are, it is true, very rare and late, in no case, perhaps, earlier than the 4th century B. C. or not

তখন বৈদিক যুগ চলিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সংহিতার পাঠ একরূপ স্থিরপদই হইয়াছে। প্রাণিজগতে যাহা সত্য, সাহিত্যেও তাহা সত্য। কি মানুষ, কি পশু,—বাল্যে, কৈশোরে এবং যৌবনে যে ক্ষিপ্রতা, যে কার্য্যতৎপরতা, যে চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে, বার্দ্ধক্যে তাহার শতাংশেরও একাংশ দেখি না, তখন সে চলৎশক্তিরহিত জড়পিণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়। সাহিত্যেরও ঠিক সেই অবস্থা। সাহিত্যের যখন পূর্ণ প্রতাপ,—যখন সাহিত্য জীবনময়,—তখন নিয়তই তাহার নব নব পরিবর্ত্তন, নব নব স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। আবার যখন কালের বশে,—দৈবের তাড়নায়, নূতন সাহিত্যের সংঘর্ষে, সাহিত্য হৃদয়ের সমুচ্চ মঞ্চ হইতে ভ্রষ্টশ্রী হইয়া শ্লথপদে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়,—যখন সাহিত্য জীবনহীন,—মৃত, তখন তাহার সে অভিনবত্ব, সে স্ফূর্ত্তি, সে চটুলতা, ইন্দ্রজালশক্তি পরাগতের মত একেবারে লোপ পায়। সুতরাং বেদ যখন লিখিত হইল, তখন বৈদিক সাহিত্য প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তনশীলতাও সঙ্গে সঙ্গে অনন্তশূন্যে মিশাইয়াছে, লিপিকরেরও "যন্মুখস্থং তল্লিখিতং" করা ছাড়া একবর্ণও নিজে রচিয়া দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় পুঁথি হইতে পাঠভেদ নিরাকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে এই পাঠভেদ সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্য বেদগুলির পরীক্ষণ একান্ত আবশ্যক, কেননা ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত, যজুঃ ও ও সামবেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমগ্র সামবেদে মাত্র ৭৫টি নিজস্ব ঋক্ ব্যতীত সকল সূক্তই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্ব্বেদে এতটা না হইলেও প্রায় ইহার এক-চতুর্থাংশ ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত। এই যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদে উদ্ধৃত পাঠের সহিত তুলনায় খাঁটি ঋগ্বেদীয় পাঠের কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত যাস্কের নিরুক্তে এবং প্রাতিশাখ্যে ঋগ্বেদীয় পাঠভেদের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু উক্ত পাঠভেদ অনেক হইলেও কোনটি একেবারে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচক নহে, সুতরাং একরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদ-সংহিতা জগতের ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে প্রায়ই একই ভাবে ক্বচিৎ কোন স্থলে একটু আধটু পরিবর্ত্তিত হইয়া, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অটুট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের দুই অবস্থা,—(১) আদিম (২) সংহিতা।—ঋগ্বেদীয় পাঠ-বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে উক্ত বেদের দুইটি অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। (১) প্রথম অবস্থা, যখন সাহিত্যক্ষেত্রে ঋগ্বেদ একক অবস্থায় দণ্ডায়মান, যখন অপর বেদের আবির্ভাব হয় নাই, (২) দ্বিতীয় অবস্থা, যখন ঋগ্বেদ বৈয়াকরণিকগণের সাহায্যে উদাত্তাদি স্বরগত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সংহিতাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় ইহার স্বরের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায় এবং শ্রুতি-পরম্পরা অর্থাৎ মুখে মুখে উহার পাঠের প্রচলন থাকায় ঐ অবস্থায় উহার যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল,—ইহা যে নিখুঁৎ খাঁটিরূপে থাকিতে পারে নাই, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা সংহিতাপাঠের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পাই। সংহিতাপাঠের শত শত স্থলে আদিম পাঠের ব্যতিক্রম বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল শব্দগত ঐক্য উভয় পাঠেই দেখা যায়। তবে ব্যতিক্রম কোথায়? পার্থক্য কি লইয়া? পার্থক্য সন্ধিসমাসাদিঘটিত স্বরের পরিবর্ত্তন লইয়া, অর্থাৎ সংহিতা-পাঠে ব্যাকরণের প্রভাব হেতু সন্ধিসমাসাদির নূতন নিয়মদ্বারা পরিচালিত হইয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যে মারকাট পড়িয়া গিয়াছে,—আদিম পাঠে এমনটি নাই। উদাহরণ-স্বরূপ, আদিম পাঠে যেখানে—"ত্বং হি অগ্নে" উচ্চারিত হইয়াছে, সংহিতাপাঠে তাহা—"ত্বং হী' অগ্নে" ইত্যাদিরূপ স্বরভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সন্ধি ও তজ্জনিত স্বরাদির বৈলক্ষণ্য-হেতু সংহিতাপাঠে স্থানে স্থানে ছন্দেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই সকল অল্পবিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও আদিম পাঠে বর্ণিত ব্যাপারাবলী সংহিতাপাঠে যথাযথই রক্ষিত হইয়াছে, অধিকন্তু পাঠগত পরিবর্ত্তন বোধ করিবার জন্য স্বর-সম্বন্ধের সূক্ষ্ম বৈয়াকরণিক নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। উক্তরূপ কারণে, ঋগ্বেদীয় পাঠ,—স্মরণের অতীত যুগ হইতে অগণনীয় সম্বৎসর ধরিয়া, একই ভাবে অপরিবর্ত্তিতাকারে

---

long before the date of "the Asoka description," এবং তাঁহাদের মতে খুব কম করিয়া ধরিলেও বৈদিক যুগ খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ ও তাহার কাছাকাছি। সুতরাং লিখন-প্রচলনের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বৈদিকযুগের অবসান হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্য নিশ্চয়ই জীবৎ শক্তি হারাইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্থিরপদ হইয়াছে। তখন আর পাঠ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। জগতের অন্য কোন্ সাহিত্যে এ বিশেষত্ব,—এ স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, কত শত বৎসর জলবুদ্বুদের মত অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, ভারতের নৈতিক আকাশে কত কত ভীষণ বিপ্লব প্রলয়-পয়োধরের মত উদিত হইয়াছে, আবার অন্তর্হিত হইয়াছে,—সাহিত্য কতই না বিপ্লবঝঞ্ঝা বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়াছে—সহ্য করিতে গিয়া কত স্থলে কুঞ্চিত, প্রসারিত বা বিকলাঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু বেদ কালের বিধ্বংসী কবল সতেজে উপেক্ষা করিয়া, অসংখ্য বিপ্লব দূরে অপসারিত করিয়া, অনন্তকাল হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য,—নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের পূর্ণতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা বেদের অলৌকিকত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই জন্যই ত সহৃদয় হিন্দুগণ ইহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন,—এই জন্যই ত তাঁহারা ইহাকে অনাদি,—অনন্ত বলিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের পাঠ কোন্ সময়ে স্থির হইল।—কোন্ সময়ে ঋগ্বেদ সংস্কৃত হইয়া সংহিতাকারে পরিণত হইল, তাহা সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইলেও তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এ বিষয়ে সূত্র ও ব্রাহ্মণ নিবন্ধগুলি হইতে অনেক প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মণস্থিত ব্যাখ্যা ও বিচারাদির পরীক্ষণদ্বারা আমরা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ঋগ্বেদের অধুনাতন প্রচলিত পাঠই উহাতে অনুসৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যুগ হইতে ঐ পাঠের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণের একস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন অপেক্ষা করে বটে কিন্তু যাঁহারা ঋগ্বেদের একটিমাত্র ঋকের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন, এরূপ পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের কল্পনাও মনে স্থান দেওয়া অনুচিত।" শতপথ ব্রাহ্মণের এই বাক্যাংশ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, উহার সময়ে যজুর্ব্বেদে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনাপেক্ষা থাকিলেও, ঋগ্বেদীয়পাঠ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আবার অনেক ব্রাহ্মণে কোন বিশেষ বিশেষ [illegible] বা [illegible] উল্লেখ করিয়া তদন্তর্গত [illegible] নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ সংখ্যাগুলির সহিত প্রচলিত সেই সেই নির্দ্দিষ্ট সূক্ত বা বর্গের অন্তর্গত ঋক্-সংখ্যা মিলাইলে কোনই ভেদ দৃষ্ট হয় না।—ইহাও ঋগ্বেদীয় পাঠের অচলত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে কম প্রমাণ নহে। এই ভাবের প্রতিধ্বনি আমরা সূত্র-নিবন্ধগুলিতেও যথেষ্ট পাইয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, সুপ্রসিদ্ধ শাঙ্খায়ন-সূত্রে কোন কোন সূক্তস্থিত ঋক্গুলির মোট সংখ্যা এবং তাহাদের যথাবিহিত স্থানের যে নির্দ্দেশ আছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান ঋগ্বেদীয় পাঠান্তর্গত সেই সেই সূক্তের ঐ ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র অনৈক্য দেখা যায় না।

সংহিতাপাঠের বিশেষত্ব।—উদাত্তাদি স্বরের রীতিমত ব্যবহার এবং স্বর-সংক্ষেপ-জনিত শব্দের অক্ষরগত বৈষম্যই ঋগ্বেদ-সংহিতার বিশেষত্ব। আদিম পাঠে যে ঐগুলি ছিল না, তাহার আভাস আমরা ব্রাহ্মণগুলি হইতে পাইতে পারি। ব্রাহ্মণ-রচনার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিলে, ঐ সময়কে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) প্রথম ভাগ, যখন আসল ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইয়াছিল, (২) দ্বিতীয়ভাগ, যখন ব্রাহ্মণেরই অঙ্গীভূত আরণ্যক ও উপনিষৎগুলি নিবদ্ধ হয়। ঐ যুগের প্রথমভাগে রচিত ব্রাহ্মণগুলিতে উদাত্তাদি স্বরসম্বন্ধে বিচারের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয় না,—স্বর-সংকোচজনিত শব্দের অক্ষরগত বৈষম্য ত নাইই, পরন্তু স্থানে স্থানে শব্দ-বিশেষের অন্তর্গত অক্ষরের মোট সংখ্যা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত ব্রাহ্মণযুগের শেষভাগে নিবদ্ধ আরণ্যক ও উপনিষদে বৈদিক পাঠের স্বরগত সূক্ষ্ম নিয়ম এবং অক্ষর বা শব্দগত বৈয়াকরণিক পরিভাষাদি উল্লেখ আছে। ঐ সকল নিবন্ধে (আরণ্যক ও উপনিষদে) শাকল্য ও মাণ্ডুকেয় প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাতিশাখ্য-রচয়িতৃ বৈদিক বৈয়াকরণিকগণের প্রথম নাম নির্দ্দেশ আছে। এই ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের উল্লিখিত বিবরগত বৈসাদৃশ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ রচনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যের প্রাদুর্ভাব হয় এবং উহাদেরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত সংহিতাকারে ঋগ্বেদের সংস্কার সাধিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এ ঘটনা খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদীয় "পাঠ্যপ্রণয়ক" [illegible] "পাঠ"ভেদ।—[illegible]

ঋগ্বেদের সংস্কারসাধনের পর, ইহার পাঠগত পরিবর্ত্তন পরিহারের জন্য বৈদিক ঋষিগণ কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাঁধ যেমন স্রোতোবেগ হইতে নদীকূল রক্ষা করে,—প্রাকার ও পরিখা যেমন দুর্দ্ধর্ষ বিপক্ষাক্রমণ হইতে দুর্গ ও নগর রক্ষা করে, ঐ উপায়গুলিও সেইরূপ প্রবল বহু-সাহিত্য-বিপ্লব হইতে ঋগ্বেদ-সংহিতার পাঠ যথাযথ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নিম্নে ঐ উপায়গুলির সাধ্যমত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।—প্রধানতঃ ঋগ্বেদীয় পাঠের দুইটি প্রকার বা ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে (১) প্রকৃতি, এবং (২) বিকৃতি। সংহিতা-পাঠের নামই 'প্রকৃতি' এবং ঐ প্রকৃতির রক্ষার জন্যই কতকগুলি অভিনব পদ্ধতির সৃষ্টি করা হইয়াছে;—ঐ গুলির নাম 'বিকৃতি'। উহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত আটটি। যথা,—(১) জটাপাঠ, (২) মালাপাঠ, (৩) শিখাপাঠ, (৪) লেখাপাঠ, (৫) ধ্বজাপাঠ, (৬) দণ্ডপাঠ, (৭) রথপাঠ, এবং (৮) ঘনপাঠ। মহর্ষি ব্যাড়ী-প্রণীত—"বিকৃতিবল্লী" নামক গ্রন্থে এই সকল বিকৃতি-ভেদের সুবিস্তৃত আলোচনা সুচারু ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আবার এই সংহিতা পাঠ (প্রকৃতি) এবং বিকৃতিগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া "পদ" এবং "ক্রম" নামক আরও দুই পাঠভেদ আছে। এই সকল পাঠভেদের বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না, তবে উহাদের মধ্যে কতকগুলির আভাস দিব মাত্র। পদপাঠে—ঋক্‌স্থিত প্রত্যেক পদে স্বতন্ত্র রূপ অর্থাৎ সন্ধিসমাসাদি ভাঙ্গিয়া তাহার একক অবস্থার নিজস্ব-রূপ দিয়া ছেদ দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক্‌করণ বিহিত হইয়াছে। যথা,—

—"অগ্নিং। ঈড়ে। পুরঃ হিতং। যজ্ঞস্য।".. ইত্যাদি অনেক ঋকস্থিত অসঙ্গত পদচ্ছেদ দেখিয়া মনে হয়, সংহিতাপাঠের সঙ্কলন-সময়ে উহার আবির্ভাব হয় নাই, কেননা একই কালে ঐ দুই পাঠপদ্ধতির সঙ্কলন আরম্ভ হইলে, এমন অসঙ্গতি-দোষ দৃষ্ট হইত না। তবে যে উহা সংহিতা-পাঠপ্রণয়নের অব্যবহিত পরেই কল্পিত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে 'পদপাঠে'র উল্লেখ আছে এবং পদপাঠের আবিষ্কারক মহর্ষি শাকল্য যে নিরুক্তপ্রণেতা যাস্ক ও প্রাতিশাখ্য রচয়িতা শৌনকের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা শেষোক্ত মুনিদ্বয় কর্ত্তৃক স্ব স্ব নিবন্ধে শাকল্যে[র] নামোল্লেখ ও তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন দ্বারাই প্রতী[ত] হইবে। পূর্ব্বে আমরা যুক্তি দ্বারা সংহিতাপাঠের রচন[া]কালও এই সময়ে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সুতরাং পদপাঠ [যে] সংহিতাপাঠের অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়াছিল, এরূ[প] কল্পনা একেবারে অসঙ্গত হইবে না। পদপাঠ যে ঋগ্বেদী[য়] পাঠের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে প্রধান সহায়,—এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে (৭ম মণ্ডলের ৫৯ সূ, ১২ ঋ,—১০ ম ২০ সূ ১ ঋ,—১২১ সূ, ১০ ঋ,—১৯০ সূ ১—৩ ঋ) এই ৬টি ঋকে[র] একেবারে পদপাঠ নাই। মহর্ষি শাকল্য এ গুলিকে নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। তিনি যদি উহাদিগকে যথার্থই ঋগ্বেদের নিজস্ব ঋক্ বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের পদপাঠ দিয়া যাইতেন। এগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গত-বিচার দ্বারাও প্রতিভাত হয়। ইহা ব্যতীত বালখিল্য নামধেয় যে কতকগুলি নবসংযোজিত সূক্ত আছে, উহাদেরও পদপাঠ নাই। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পদপাঠ না থাকিলে কোন্‌টি ঋগ্বেদের নিজস্ব ঋক্, কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইত। এবং এইরূপ একটা প্রতিবন্ধক আছে বলিয়াই, চতুর ভারতীয় লিপিকরগণ ঋক্ বা সূক্ত সংখ্যা বাড়াইবার বাসনা সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তা' না হইলে হয়ত মহাভারতের ন্যায় ঋগ্বেদখানিও প্রক্ষিপ্ত সূক্ত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আকার অপেক্ষা দশ বিশ গুণ বৃদ্ধি পাইত।

অতঃপর 'ক্রম-পাঠ' আমাদের আলোচ্য বিষয়। ঋকে যেরূপ পূর্ব্বাপর ক্রমে পদ-রচনা হইয়াছে, তাহা সেই ক্রমেই রাখিয়া, মধ্যস্থিত এক একটি পদের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী পদের সহিত দুইবার অন্বয় করিয়া পড়িবার পদ্ধতিই ক্রমপাঠ নামে খ্যাত। যথা,—

"অগ্নিমীলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য দেবম্।" ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যকে ক্রমপাঠেরও উল্লেখ আছে।

জটাপাঠের লক্ষণ মহর্ষি ব্যাড়ী এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"ক্রমে যথোক্তপদজাতমেব * দ্বিরভ্যাসেদুত্তরমেব পূর্ব্বম্।
অভ্যস্ত, পূর্ব্বঞ্চ তথোত্তরে পদে ২ বসানমেবং হি জটা-
ভিধীয়তে ॥" *

"বিকৃতি কৌমুদী" নামক গ্রন্থে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এই অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—কোন ঋক্-স্থিত পদসমূহকে ক্রমপাঠ অনুসারে দুইবার পড়িবে এবং ঐ দুইবারের মাঝখানে একবার উল্টা করিয়া পড়িবে অর্থাৎ প্রথমবার ক্রমপাঠ-অনুসারে পড়িয়া, দ্বিতীয়বার ব্যুৎক্রম অনুসারে পাঠ করিবে এবং পুনরায় ক্রম-অনুসারে পাঠ করিবে। ইহার নাম জটাপাঠ। যথা,—

"অগ্নিমীলে ঈলে ২ গ্নিমগ্নিমীলে, ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতমীলে ঈলে পুরোহিতং ইত্যাদি।" এইরূপে ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া ঘনপাঠে বিকৃতিভেদের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। কোন ঋক্স্থিত প্রথম চারিটি পদকে ক, খ, গ ও ঘ এই চারিটি অক্ষর রূপে কল্পনা করিয়া পাঠভেদে উহাদের পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, এই জটিলতা অনেকটা সহজবোধ্য হইবে, এই আশায় নিম্নে উহাদের পূর্ব্বোক্ত পাঠভেদে বিভিন্ন প্রকার রূপ (Combination) দেওয়া গেল :—

সংহিতা পাঠে—ক খ গ ঘ...

পদপাঠে—ক। খ। গ। ঘ।—।—। (+ছেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে)

ক্রমপাঠে—কখ, খগ, গঘ...

জটাপাঠে—কখ, খক, কখ; খগ, গখ, খগ; গঘ, ঘগ, গঘ।...

... ...

ঘনপাঠে—কখ, খক, কখগ, গখক, কখগ; খগ, গখ, খগঘ, ঘগখ, খগঘ ইত্যাদি।

এইরূপ উপরি উক্ত দশবিধ পাঠ সংহিতা-পাঠের সংস্থিতি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে, সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত প্রাতিশাখ্য এবং অনুক্রমণীগুলি দ্বারাও ঐ উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইয়াছে।

শাখা।—অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ঋগ্বেদীয় পাঠ ত শাকল শাখার অনুসারী, তবে কি উহার অন্য শাখাভেদ ছিল না? এবং থাকিলেই বা তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, "চরণ-ব্যূহ",—"আর্য্যবিদ্যা সুধাকর,"—"শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য" ও "বৃহদ্দেবতা" আমাদের প্রধান সহায়স্থল। চরণব্যূহ ও শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের শাখা-সংখ্যা পাঁচটি। (১) শাকল, (২) বাস্কল, (৩) আশ্বলায়ন, (৪) শাঙ্খায়ন, (৫) মাণ্ডুকেয় বা মাণ্ডুক। এই পঞ্চবিধ শাখার মধ্যে শাকল, আশ্বলায়ন এবং শাঙ্খায়নের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নাই; উহাদের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ, তাহা সূক্ত সংখ্যা লইয়া; শাকল-শাখা অনুসারে বালখিল্য নামধেয় নবসংযোজিত একাদশটি সূক্ত ঋগ্বেদের নিজস্ব নহে—পরন্তু প্রক্ষিপ্ত। আশ্বলায়ন শাখার মতে উহা ঋগ্বেদেরই অন্তর্গত, প্রক্ষিপ্ত নহে। শাঙ্খায়ন শাখার মতে উহাদের মধ্যে কতকগুলি ঋগ্বেদের অন্তর্গত, কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত। এই প্রভেদ অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় পরবর্ত্তিকালে শেষোক্ত শাখা দুইটিকে শাকল শাখারই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই জন্যই পুরাণে শাকল, বাস্কল, এবং মাণ্ডুক এই তিনটি মাত্র ঋগ্বেদীয় শাখার উল্লেখ আছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে মাণ্ডুক শাখার অনুসৃত পাঠের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, পুরাণেও কেবল ইহার নামটি ব্যতীত কোনরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তির উল্লেখ নাই। প্রাচীন ভারতের কি এক সাহিত্যিক বিপ্লবে উহা ধ্বংস পাইয়া থাকিবে। ফলে 'ঋগ্বেদীয় শাখা, শাকল ও বাস্কল এই দুই ভেদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আবার অনেক বৈদিক নিবন্ধ হইতে অবগত হওয়া যায়, শাকল-শাখা

---

* বিকৃতি কৌমুদীতে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম চরণস্থিত "পূর্ব্বং" এই পাঠই বজায় রাখিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীস্থ বৈদিক ৩৫নং পুঁথিতে মূলে "সর্ব্বং" এইরূপ পাঠভেদ আছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা গঙ্গাধর পণ্ডিত এইরূপ করিয়াছেন—"ক্রমে যথোক্তে ক্রমোষাভ্যামিত্যাদ্যুক্ত ক্রম প্রকারে, পদজাতং—পদদ্বয়ং পদক্রমং বা দ্বিরভ্যাসেৎ,—দ্বিবারং পঠেৎ। অভ্যাস প্রকারমাহ—"উত্তরমেব পূর্ব্বং" ক্রমবৎ পদদ্বয়ং গৃহীত্বা 'পূর্ব্বং' প্রথমং উত্তরপদমভ্যস্ত ততঃ সন্ধানদ্বারা· পূর্ব্বং পদমভ্যস্তোত্তরপদে ? ভ্যাসেৎ, এবং প্রকারেণ যদধ্যয়নং তজ্জটাভিধীয়তে। পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রি-মহাশয়-প্রণীত কলিকাতা সংস্কৃত লাই-ব্রেরীর Discriptive Catalogue of the Sanskit Manuscript গ্রন্থে [illegible] পাইবেন।—লেখক।

অপেক্ষা বাষ্কল-শাখানুসারে ঋগ্বেদে আটটি সূক্ত অধিক গণিত হইয়াছে। এবং প্রথম মণ্ডলস্থ একটি বর্গের স্থানান্তরে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এগুলির সহিত বর্ত্তমান পাঠের মিল নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাষ্কল-শাখারও প্রাধান্য লোপ পাইয়াছে। কেবল শাকল-শাখাই অমিত প্রভাবে ঋগ্বেদের উপর অনাদিকাল হইতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে।

স্বর।—সকল বৈদিক সংহিতার মত ঋগ্বেদ সংহিতাতেও স্বর-চিহ্ন সন্নিবেশিত আছে। এই সকল চিহ্ন থাকায় এখনও আবৃত্তি নির্ভুল এবং শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষার মত বৈদিক ছন্দেও 'মাত্রা'—কণ্ঠস্বরের উচ্চারণের উপর নির্ভর করিত। এরূপ মাত্রা সঙ্গীতের উপযোগী। পাণিনির সময়ে এবং তাহার পরও সংস্কৃত সাহিত্যে উক্তরূপ মাত্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের বশে ঐরূপ মাত্রার পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে এক অভিনব মাত্রার প্রচলন হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই মাত্রার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য প্রাকৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী। যাহা হউক, বৈদিক মাত্রা প্রধানতঃ তিনটি,—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। এই সকল স্বরের চিহ্নকরণ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে চারি প্রকারে সাধিত হইয়াছে। (১) ঋগ্বেদীয় প্রকার,—ইহাতে স্বরিত স্বর তদনুপ্রাণিত অক্ষরের মস্তকে ছেদাকারে (ক̍) চিহ্নিত হইয়াছে। অনুদাত্ত ঐ প্রকার অক্ষরের তলদেশে সরল রেখা দ্বারা (ক̱) চিহ্নিত হইয়াছে। উদাত্তের কোনই চিহ্ন নাই। (২) কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণী এবং কাঠক শাখার প্রকার,—ইহাতে উদাত্ত উপরিস্থিত ছেদ দ্বারা চিহ্নিত। (৩) শতপথ ব্রাহ্মণের প্রকার,—ইহাতে উদাত্ত তলস্থ সরলরেখাকারে চিহ্নিত, এবং (৪) সামবেদের প্রকার,—ইহাতে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত যথাক্রমে ১, ২, ৩ এই সংখ্যাত্রয় দ্বারা চিহ্নিত।

ইহাই হইল, ঋগ্বেদের গ্রন্থগত মোটামুটি পরিচয়। এই প্রবন্ধরচনাকালে আমি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রণীত Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Sanskrit College, Vol. I হইতে বহুতত্ত্ব এবং তাঁহার অনেক বাচনিক উপদেশ পাইয়াছি; তজ্জন্য সাধারণ সমক্ষে তাঁহার নিকট আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করিতেছি। প্রবন্ধটি নীরস হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ইহার নীরসতা গ্রহণ না করিয়া, কেবল তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমার আশা।

খেলার শেষ

[শ্রীমতী অমলা দেবী]

"শঙ্কর দাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?" শঙ্কর চলিতে চলিতে কহিল, "নদীর ঘাটে।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব"; শঙ্কর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, পেয়ারা গাছের ঘন পল্লবের অন্তরালে দুইখানি ছোট পা ঝুলিতেছে; চোখোচোখি হইলে দেখিল, পদযুগলের স্বত্বাধিকারিণী অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তাহার উন্নত আসন হইতে ঝুঁকিয়া করুণ চক্ষে চাহিয়া আছে। বোধ করি, সে শঙ্কর দাদার উপেক্ষা সন্দেহ করিয়াই অমন দুটি চোখের দৃষ্টি পাতিয়া তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল।

কবিকুলচিত্রিত শ্রেষ্ঠ সুন্দরী না হইলেও দশমবর্ষীয়া সুহাসিনীকে সুনয়না, সুবর্ণা, সুকেশা, সুশোভিনী সবই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সুবেশিনী কিছুতেই নয়। সে যাই হোক, সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য শঙ্করের অভ্যস্ত নয়নকে নূতন করিয়া আকৃষ্ট করিল না। আকৃষ্ট করিল, তাহার হস্তের পাখীর বাসাটা।

শঙ্কর কহিল, "সুশী, আবার পাখীর বাসা নিয়েচিস্ ?"

সুশী তখন দৃঢ়তর হস্তে পাখীর বাসাটিকে বক্ষের নিকট ধরিয়া কহিল, "এ গাছটা তো কেটেই ফেলবে"—তাহার কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর কহিল "কেটে ফেল্‌বে তাতে তোর কি ? কতবার বলেচি, পাখীর বাসা নষ্ট করিস্‌নে। ভেবে দেখ দেখি, কতদিন ধ'রে কত কষ্টে ওই বাসাটুকু করেচে; কত আশা ক'রে আছে,—বাসায় ডিম দেবে, তার পর বাচ্ছা হবে, তুই কিনা তার সব আশায় ছাই দিলি !"

অনভ্যাসবশতঃ শঙ্করের ভর্ৎসনায় সুহাসিনীর বড় অভিমান হইল। একবিন্দু জল—তাহার অজ্ঞাতে না জানি কেমন করিয়া নয়নপ্রান্তে সঞ্চিত হইয়া গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, দ্রুত হস্তে শঙ্করের অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সুহাসিনী কহিল, "তাঁতে তোমার কি ?"

"সুহাসিনী ?" শঙ্করের মুখে গম্ভীর স্বরে তাহার সম্পূর্ণ নাম শুনিয়া সুহাসিনী বিস্মিত হইল। শঙ্করই আদর করিয়া তাহার নামের অপভ্রংশ করিয়া, তাহাকে সুশী নামে অভিহিত করিয়াছিল, শঙ্করের মুখে সেই নামই সে চিরকাল শুনিয়া আসিতেছে। শঙ্কর কহিল, "বল, এমন কাজ আর করবিনে ? অসহায় জীবের অনিষ্ট করা ভয়ানক পাপ জানিস ?

সুহাসিনী দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বল্‌ব না।" শঙ্কর আপনার গন্তব্য পথে চলিতে চলিতে কহিল, "আচ্ছা, এর পরে টের পাবে—আমি চল্লাম।"

শঙ্করকে সত্যই চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সুহাসিনী বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া কহিল, "তুমি সত্যি যাচ্ছ শঙ্কর দাদা ?—কোথায় ?"

"ডিঙ্গি ক'রে নদীতে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"আমায় নিয়ে যাবে না ?"

"তুই আমার কথা শুন্‌লিনে কেন ?"

এই বলিয়া শঙ্কর অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে চলিল। সুহাসিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বালিকা হৃদয়ের গভীর ভালবাসা সহজ সরলভাবে এক শঙ্কর দাদাতেই নিহিত ছিল। অতি শৈশবে মাতৃ-বিয়োগ হয়; পিতা—তত্ত্বনিধি মহাশয়—পত্নীবিয়োগের পর হইতে, সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, সংসারের মায়া কাটাইবার সংকল্পে শাস্ত্র-অধ্যয়নে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া, সকল রকম সাংসারিক চিন্তা ও কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কতিপয় ধনীশিষ্যের অনুগ্রহে একমাত্র কন্যার ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সুহাসিনীর জন্য সময় অতিবাহিত করিবার অবসর না থাকায়, দূর সম্পর্কীয় এক বিধবা ভগ্নীকে আনাইয়া রাখিলেন। সেই পিসী সুহাসিনীকে প্রতিপালন করিয়াছিল সত্য কিন্তু স্নেহ দিতে পারে নাই। যে পারিয়াছিল, তাহার নাম শঙ্কর—তাহাদিগের গ্রামে একমাত্র ভদ্রপ্রতিবেশী রামানন্দ ঠাকুরের ভাগিনেয়। শঙ্করের সহিত প্রথম পরিচয়, যখন সুহাসিনীর তিনি বৎসর বয়ঃক্রম, শঙ্কর তখন দ্বাদশবর্ষীয় বালক। সুহাসিনীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব

সৌখ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়াকৌতুকে কিছুদিন কাটিল; ক্রমশঃ গ্রামস্থ দশজনের তিরস্কারে শঙ্কর সম্বন্ধে সুহাসিনী অনেক সংযত হইল, কিন্তু তাহার সরল মনের ভাব কখনও গোপন করিতেও পারিল না—চেষ্টাও করিল না।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শঙ্কর যখন কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করিতে গেল, তখন সুহাসিনী বড় কান্না কাঁদিয়াছিল; কিন্তু, দুই বৎসর পরে ফিরিয়া পাইয়া, সেই অভাব মিটাইয়া লইতে গিয়া, সুহাসিনী ব্যথিত হইয়া থামিল। শঙ্কর দাদার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! প্রথম সাক্ষাতের পর বহুদিন পর্য্যন্ত সে সুহাসিনীর সন্ধানও করিল না। বৃক্ষতলে বসিয়া তাহাকে কাহিনী শুনাইতে আসিল না, গাছ ঝাঁকাইয়া অজস্র শিউলি ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া দিতে কহিল না, দেখা হইলে তেমন করিয়া কথাও কহিল না—শঙ্কর যেন গম্ভীর, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। সুহাসিনী কতবার মনে করিল, শঙ্কর দাদার একি হইল? আজ শঙ্করের ভর্ৎসনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কথা মনে উদয় হইল। এই সকল চিন্তার মধ্যে এক সময় হস্তস্থিত পাখীর বাসাটি সত্বর ত্যাগ করিল, ভূমিতলে পড়িয়াও যেন বাসাটি তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। উহারই জন্য শঙ্কর অসন্তুষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া, অগ্রসর হইয়া পদদ্বারা বাসাটিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, যে পথে শঙ্কর গিয়াছে, সেই পথে ছুটিল। পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নদীতীরে চলিয়াছে, শেষ বাঁকের মাথায় তখনও শঙ্করকে দেখা যাইতেছে।

শঙ্কর ততক্ষণে ডিঙ্গি টানিয়া নদীতে ভাসাইয়াছে; সে দিন তাহার মন বড় কাতর। যে জন্য নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতে সংকল্প করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। অনুসন্ধান করিবারও কেহ ছিলনা। তাই শঙ্কর অনায়াসে তাহার ব্যর্থ জীবন শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কৃতসংকল্প হইয়া চলিয়াছে। শৈশবে মাতৃহীন অনাথকে মাতুল অনুগ্রহ করিয়া এতদিন গৃহে স্থান দিয়াছিলেন, দশজনের অনুরোধে অন্নবস্ত্রের এবং বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার অনিচ্ছা সত্বেও এতদিন বহন করিয়াছেন; এবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া, মাতুলের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে শঙ্কর আপনি ভীত ও লজ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু, মাতুল যখন জন্মের মত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে আদেশ করিলেন, তখন শঙ্কর একেবারে অকূল সাগরে গিয়া পড়িল। পৃথিবীতে দাঁড়াইবারও আর স্থান নাই—অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ডিঙ্গিতে উঠিয়া বসিয়া সে একবার মুখ ফিরাইল। যে গৃহে এতদিন বাস করিয়াছে, যে বৃক্ষচ্ছায়া চিরদিন আরাম দিয়াছে, যে গ্রামে এতদিন বিচরণ করিয়াছে, এত বৎসরের স্মৃতি সেখানে জড়িত রহিয়াছে, একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইবার ইচ্ছায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সেইদিকে চাহিল। সহসা দেখিতে পাইল, অদূরে কাহার বস্ত্রাঞ্চল বাতাসে উড়িতেছে, কে যেন ছুটিয়া নদীতীর অভিমুখে আসিতেছে। শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীর হইতে বাহির-জলে ডিঙ্গি ঠেলিয়া দিয়া দাঁড় ধরিল। এমন সময় এ কাহার ব্যথিত কোমল স্বর কাণে আসিল, "শঙ্কর দাদা, একটু দাঁড়াওনা।" সুদীর্ঘ একত্র বাসের মায়া শঙ্করকে আকর্ষণ করিল, সে দাঁড় টানিতে পারিল না, তীরস্থ বালিকার পানে চাহিয়া কহিল, "সুহাসিনী কেন আমাকে ডাকলে?"

সুহাসিনীর ওষ্ঠাধর অভিমানে স্ফীত, কম্পিত হইল; কহিল,—"আজ বারবার কেন অমন ক'রে ডাকছ? আমি যে সুশী, অন্য নাম তোমার মুখে ভাল শোনায় না।" সে কথার উত্তর না দিয়া অধীর হইয়া শঙ্কর কহিল, "আমার দেরী করলে চলবে না, বল কেন ডাকলে?" সেবার সুহাসিনীর অশ্রুধারা কোনও বাধা মানিল না, দুই হস্তে নয়নের জল মুছিতে মুছিতে অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি আর পাখীর বাসা নষ্ট ক'রব না।" এবার শঙ্কর কথা কহিল না—শুধু চাহিয়া রহিল দেখিয়া, সুহাসিনী পুনরায় কহিল, "তুমি আমার ওপর রাগ কোরোনা শঙ্কর দাদা! আমি আর গরুবাছুরকে মারব না, ছাগলছানা তাড়া ক'রে বেড়াব না, আর কখনও পাখীর বাসায় হাত দেব না, তোমার কাছে দিব্বি করছি।" তথাপি শঙ্কর কথা কহিল না; কিন্তু, তাহার মুখের উপর একটুখানি ম্লান হাসির আভাস পাইয়া, সুহাসিনী কহিল, "এখন তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

"এবার নয়।"

"কেন তুমি যে বল্লে, তোমার কথা শুনলে নিয়ে যাবে?"

"আমি কি ঠিক তাই বলেছিলাম? তবে বুঝি বেড়াতে যাবার লোভেই ছুটে এসে আপনা হ'তে অত বড় একটা দিব্বি ক'রে ফেলা হোলো? ছিছি সুশী?"

সুহাসিনী সেবার দৃঢ় [illegible] অভিমানে ফুলিয়া

তীরস্থ বালিকার পানে চাহিয়া কহিল, কেন আমায় ডাক্‌লে

ভাবে কহিল "তোমার কি হয়েছে, বলত ?"—

সুহাসিনীর প্রশ্নে শঙ্কর চমকিয়া কহিল,— "কি হয়েচে ? কই কিছুই হয়নি ত।" সুহাসিনী কহিল, "নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তুমি আর কথা কও না, খেলা কর না, আমার সঙ্গে গল্প করতে এস না—পিসী বলছিল, তোমার খারাপ সময় পড়েচে, তার মানে কি বলনা ? তাতে কি হয় ?" শঙ্কর হাসিয়া কহিল, "সত্যি খারাপ সময় পড়েচে, তাতে সবই খারাপ হয়।"

"কি খারাপ হয়েচে—পাশ দিতে পারনি তাই ?"

শঙ্কর আবার হাসিয়া কহিল, "পাশ দিতে পারিনি সত্যি।" "তুমি চেষ্টা করে-ছিলে ?"

"যতটা চেষ্টা করা উচিত ছিল, ততটা বোধ হয় করিনি।"

সেবার সুহাসিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কহিল ; "তবে এবার ভাল ক'রে চেষ্টা করলেই নিশ্চয় পাশ দিতে পারবে।" শঙ্কর নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া, যাইবার উদ্যোগ করিতেই সুহাসিনী কাতর হইয়া কহিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি শঙ্কর দাদা আমাকে সঙ্গে নাও। কতদিন তোমার সঙ্গে যাইনি— চুপটি করে বসে থাকব।"

কহিল, "কখ্খন না। আচ্ছা তুমি নাই,—নিয়ে গেলে।" আবার সুহাসিনীর চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল ; নদীর পানে চাহিয়া দেখিল, আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় জল গাঢ় বর্ণ ধারণ করিয়াছে। শঙ্কর দাদার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, সেও তেমনি ছায়া-সমাচ্ছন্ন,—তেমনি রহস্যময়। নিজের সম্বন্ধে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন নিশ্চিত বুঝিয়া সুহাসিনী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—আজ তাহার চির-উজ্জ্বল মুখে এই প্রথম বিষাদের ছায়া পড়িল। এবং সেই ছায়া শঙ্করের নীরব মুখের উপর সহসা যেন গাঢ়তর ছায়াপাত করিল। শঙ্কর দাদার মুখপানে চাহিয়া, সুহাসিনী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, এবং আর উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া, বিনীত

শঙ্কর ভাবিল, দু এক ঘণ্টার বিলম্বে ক্ষতি কি ? সে বালিকার সরল ভালবাসায় তাহার অনেক অভাব মোচন করিয়াছে—শেষ মুহূর্ত্তে তাহার মনে ব্যথা দিয়া কি লাভ ? কহিল, আচ্ছা এস "গোলমাল কোরোনা, এবার পড়ে গেলে আর তুলতে পারব না।" সুহাসিনীর মনে পড়িয়া গেল, একবার অবাধ্য হইয়া শঙ্করকে বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিল। প্রফুল্ল মুখে কহিল, "না শঙ্কর দাদা, এবার তোমার কথা শুনব।"

শঙ্করের বলিষ্ঠ হস্তে ক্ষেপণীর সুদৃঢ় আকর্ষণে ক্ষুদ্র নৌকা খালপথে নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন নদীর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলে রক্তাভ ছায়া ফেলিয়া, ধীরে ধীরে সূর্য্য

অস্তাচলে চলিয়াছে এবং শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্র পূর্ব্বদিকের বৃক্ষান্তরালে উঁকি মারিতেছে। শঙ্কর মাঝে মাঝে সুহাসিনীর মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, এই দশমবর্ষীয়া বালিকার উচ্ছৃঙ্খল সরলতার অন্তরালে গভীর আবেগপূর্ণ বিচিত্র রমণীহৃদয় ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, সেও তাহারই ন্যায় মাতৃহীন নিঃসঙ্গ। চঞ্চল বলিয়া গ্রামে সুহাসিনীর অপযশ ছিল। তাহার সহিত কাহারও খুব সদ্ভাব ছিল না, অথচ সে অভাবে সুহাসিনী ভ্রুক্ষেপও করিত না। শঙ্করের নিঃসঙ্গ মন সমব্যথায় ব্যথিত সুহাসিনীকে চিনিয়া লইয়াছিল এবং সেই স্নেহশীল হৃদয়টুকু সহস্র চঞ্চলতার অন্তরালেও শঙ্করের কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই।

আকাশের বিচিত্র বর্ণ, শোভা, সুহাসিনী মগ্ন হইয়া দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে হঠাৎ শঙ্করের মুখের দিকে চোখ পড়ায় সে চকিত হইয়া সোজা হইয়া বসিল। সহসা তাহার মুখ প্রবীণার মত গম্ভীর হইয়া উঠিল; একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "শঙ্কর দাদা! আমার একটা কথা রাখবে?" শঙ্কর দেখিল, সুহাসিনী তাহার অঞ্চলস্থিত সযত্নরক্ষিত পেয়ারাগুলি একে একে নদীজলে বিসর্জ্জন দিল, তারপর হস্তদ্বয়ে চিবুক রক্ষা করিয়া, একাগ্র নয়নে তাহারই পানে চাহিয়া কহিল, "বল রাখবে?"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

শঙ্কর "তুমি প্রতিজ্ঞা কর এবার খুব চেষ্টা ক'রে পাশ দেবে?

"চেষ্টায় কি সব হয়?"

"আর কারু না হয় তোমার হবে! আমি জানি চেষ্টা করলে তুমি সব পার।" শঙ্করকে নিরুত্তর দেখিয়া সুহাসিনী আবার আকাশপানে চাহিল, আপন মনে কহিল—"নিশ্চয় পারবে—আমি জানি পারবে।"—বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। সেই অশ্রুভারাক্রান্ত কাতর দৃষ্টি শঙ্করের নয়নে রাখিয়া কহিল, "তোমাকে লোকে নিন্দা করলে আমার যে বড় কষ্ট হয়। তুমি ত নিন্দার যোগ্য নও।"

বালিকার এই গভীর বিশ্বাস শঙ্করের বুকে গিয়া বাজিল। কিন্তু, সে কথা কহিল না, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত দেখিয়া সে দ্রুত বাহিয়া ডিঙ্গি তীরে ভিড়াইয়া দিল। তখন চন্দ্রালোকে নদীতীর এবং বনপথ প্লাবিত হইয়াছে, সুহাসিনী অগ্রে অবতরণ করিয়া শঙ্করের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। তাহার সংকল্প অনুমান করিয়া শঙ্করও তীরে না নামিয়া পারিল না, তারপর উভয়ে ডিঙ্গিখানি টানিয়া তীরে তুলিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। পথে সুহাসিনী কহিল "শঙ্কর দাদা, তুমি আমার কথা রাখবে না?"

শঙ্করের মনে যে কি ঝড় বহিতেছিল, বালিকা সুহাসিনীর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। সে তখন উত্তরের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে দেখিয়া, শঙ্কর কহিল, "আমি কথা দিলে কি হবে সুণী! কথা রাখলাম কি না, কি করে জানবে?"

"কেন?"

"আমি জন্মের মত এখান থেকে চ'লে যাচ্চি আর আসব না। মামা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।" সুহাসিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—"তাড়িয়ে দিয়েচেন!"

"হাঁ। দাড়াস্‌নে সুণী চল্।" সুহাসিনী ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে ডাকিল—"শঙ্কর দাদা?" "কেন?"

"তোমাকে পাশ হতেই হবে যে।"

"কি হবে হয়ে?"

সুহাসিনী সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্করের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "তখন সকলে জানবে, তুমি কি! বল, আমার কথা রাখবে?"

বালিকার সেই স্পর্শে ও তাহার গভীর বিশ্বাসের বলে শঙ্করের দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। অকস্মাৎ নিজের উপর বিশ্বাসের জোরে সঙ্গিনীর আর একটা হাত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া কহিল, "সুণী, তোমার কথা সত্য হোক্, তোমাকে ছুঁয়ে আজ শপথ করচি, যেমন করে হোক, আমি মানুষ হব।" তাহার পর হাত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে নিঃশব্দে গৃহাভিমুখে চলিল।

নিভৃত গভীর বেদনায় উভয়ে নির্ব্বাক। সুহাসিনী ভাবিতেছিল, শঙ্কর চলিয়া যাইবে, কতদিনের জন্য কে জানে! অদূরে তাহাদের গৃহ-প্রদীপ জ্বলিতে দেখা গেল, আর পথ নাই, তখনি শঙ্করকে যাইতে দিতে হইবে। হঠাৎ সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কালই যাবে?"

"হাঁ।"

"আবার কবে আস্‌বে?"

"ভগবান জানেন।"

সুহাসিনীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তাহার জননীর মৃত্যুর পরে তেমন বেদনা সে আর কখনও অনুভব করে নাই। গৃহ-দ্বারে পৌছিয়া সুহাসিনী কহিল, "আমি জানি তুমি শিগ্‌গিরই আবার আস্‌বে।" শঙ্কর গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, সুহাসিনীর কথায় তাহার চেতনা হইল, স্নেহভরে সুহাসিনীর শিরঃস্পর্শ করিয়া কহিল, "তা হবে সুশী! তোমার কথা আমার ভাগ্যলক্ষ্মী-স্বরূপ হোক।"

(২)

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে শঙ্কর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আবার সেই গ্রামের পরিচিত ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। কি করিয়া যে তাহার এই পাঁচটি যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, সে কাহিনীতে আবশ্যক নাই। কিন্তু, শঙ্কর আজ কৃতী। যাহার একান্ত কামনার বলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাকে দয়া করিয়াছেন, অন্তরের অন্তরে এ কথা সে জানিত।

সে দেখিল, গত পাঁচ বৎসরে কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সেই ছোট ডিঙ্গিখানি তীরে পড়িয়া আছে, সেই নদীতীরে বৃক্ষ-রাজির অন্তরালে দীর্ঘ সন্ধ্যার মধুর ছায়া, সেই বিহঙ্গকুলের অবিশ্রাম সঙ্গীত, সেই অধীর তরঙ্গ-ভঙ্গের মৃদু কলধ্বনি, সেই নদীতীরের বাঁকাপথ, যে পথে নিরাশাব্যথিত প্রাণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বাল্যকাল হইতে গ্রাম ত্যাগ করিবার দিন পর্য্যন্ত সকল কথা তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইল, মাতুলালয়ের পথে সুহাসিনীকে একবার দেখিয়া যাইবার ইচ্ছায় সেই পথে চলিল।

সুশী, তোমাকে ছুঁয়ে শপথ কচ্চি, যেমন করে হোক, মানুষ হব

সেই গ্রামের সহিত শঙ্করের একমাত্র স্নেহের বন্ধন সুহাসিনী; এখন সে না জানি কত-বড় হইয়াছে। অপরিস্ফুট বালিকা সুহাসিনী ক্রমে অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীতে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। তাহার বিবাহ হয় নাই নিশ্চিত, হইলে শঙ্কর সংবাদ পাইত। সুহাসিনী কোনও দিন শঙ্করের নিকট পত্রাদি লিখিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ গাছের ফুলটি, ফলটি পিতার কলিকাতা যাতায়াতে পাঠাইতে কখনও বিস্মৃত হইত না। পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অদূরে সুহা-সিনীদের বাড়ীর সম্মুখে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান এক রমণীমূর্ত্তি শঙ্করের নয়নগোচর হইল। শঙ্করের পদশব্দে রমণী ফিরিয়া চাহিবামাত্র তাহার মুখের আনন্দোদ্ভাসিত জ্যোতি-টুকুতে পরিচয় পাইতে শঙ্করের বিলম্ব হইল না। রমণী কাছে আসিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "শঙ্কর দাদা, কবে এলে?" শঙ্কর হঠাৎ দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, "এই আস্‌ছি।" সেই সুহাসিনী বটে, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুগঠিত ভ্রূযুগল—কিন্তু সে চঞ্চল ভাব কৈ?

সে সুণী পাগলী কোথায় ?—এ যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

আমিও তোমার কথা রেখেছি।" কি কথা, শঙ্করের কিছুমাত্র স্মরণ নাই বুঝিয়া, সুহাসিনী আর একবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "এরই মধ্যে সব ভুলে গেচ ? তুমি পাখীর বাসা নষ্ট করতে বারণ করেছিলে মনে নেই ? সে দিন আমার উপর কত রাগ করেছিলে মনে পড়ে ?"

চকিতের ন্যায় সেদিনকার সকল ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। শঙ্কর কহিল, "তোমার মনে পড়ে, ছুটে গিয়ে নদীতীরে আমাকে ধরেছিলে ? আর একটু দেরী হ'লে আমি চ'লে যেতাম। সে দিন কোথায় যাচ্ছিলাম জান সুহাসিনী ?"

"জানি, নদীতে বেড়াতে যাচ্ছিলে।"

"শুধু বেড়াতে নয়, একেবারে শেষ যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আর ফিরব না।"

সুহাসিনী শিহরিয়া উঠিল, কহিল "কেন ?" শঙ্কর তখন কহিল, "তুমি জান তো, এ সংসারে এক মামা ছাড়া আমার আর কেউ নেই—এক মুঠো অন্ন দিয়ে প্রাণরক্ষা করবার দ্বিতীয় লোক নেই। সেই মামা যখন বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলেন, লজ্জায়—ঘৃণায় ভাবলাম, জীবন শেষ করে ফেলাই শ্রেয়ঃ। কেউ টের পাবে ব'লে মনে করেছিলাম, ডিঙ্গি ক'রে নদীর মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।" শুনিতে শুনিতে সুহাসিনীর মুখের উপর গাঢ় ছায়া পড়িল। সে মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "আমাকে জীবহত্যা কর্ত্তে কত নিষেধ করতে, আর তুমিই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে ? ছিঃ ছিঃ শঙ্কর দাদা, আমি কখনো ভাবিনি, তুমি এ কাজ করতে পার।"

তাহার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া, শঙ্কর বুঝিল, সে অন্তরে কতবড় ঘা খাইয়াছে। একটু খানি থামিয়া কহিল, "তুমি ভাগ্যলক্ষ্মীরূপে সে পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলে, তাই চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।" বলিয়া দেখিল, তাহাতেও মেঘ কাটিল না; তখন

সেই প্রযত্নহীন বেশভূষা, সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৈ ? ক্ষণেক পরে ঈষৎ হাসিয়া শঙ্কর কহিল, "আমার সে সুণী পাগলী কোথায় ?' এ যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী।" সুহাসিনী সলজ্জ মৃদু হাস্যে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না না; আমি তোমার সেই সুণী।" তারপর অধিকতর মৃদুস্বরে, স্নেহপরিপূর্ণকণ্ঠে কহিল, "তুমি পাশ হয়েচ, ভাল কাজ পেয়েচ, সব শুনেছি; আমি জানতাম, তুমি চেষ্টা করলে সব পার—ঠিক বলিনি ?"

শঙ্কর হাসিয়া কহিল, "তুমিই করিয়েছ, আমার বাহাদুরী কিছু নেই।" সংসারে কোনও কার্য্যই যে শঙ্কর দাদার অসাধ্য, ছেলেবেলা হইতেই সুহাসিনী তাহা মানিত না; কহিল, "তোমারই চেষ্টায় সব হয়েচে জান শঙ্কর দাদা।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "তোমার বাবার খবর কি বল শুনি।—এখনও শাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন!—তোমার বিয়ের কথা তাঁর মনে কি এখনও উদয় হয়নি?"

বিবাহের প্রসঙ্গে সুহাসিনী লজ্জা পাইল। সে আরক্ত মুখখানি শঙ্করের চোখে কি মধুর দেখাইল! সে ক্ষুদ্র-মুষ্টি বদ্ধ করিয়া, কৃত্রিম রোষের সহিত কহিল, "শঙ্কর দাদা, তোমার সঙ্গে আর খেলব না, সত্যি বল্‌ছি।" শঙ্কর হাসিয়া কহিল, "কিন্তু ওকথা না বল্‌লে খেলবে তো? আগেকার মত?"

"ঠিক আগেকার মত কি ক'রে হবে?"

"কেন নয় সুশী?"

"কিছুই ঠিক আগেকার মত নেই—এই দেখনা চুলগুলো বাঁধিতে হয়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে গাছে উঠতে পাই না—আর ছুটোছুটি করতে দেয় না, কত রকম আপদ।"

শঙ্কর বুঝিল, অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সুহাসিনীর অন্তর গোপনে অনুভব করিতেছে, কিন্তু সুহাসিনী তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আরও ভাল করিয়া তাহার মন জানিবার নিমিত্ত শঙ্কর কহিল, "গাছে না চড়লে কি খেলা হয় না?" সুহাসিনী খেলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, "সে দেখা যাবে, আগে তোমার গল্প বল, এই চারবৎসর কি ক'রে কাট্‌ল।"

"বল্‌ব বইকি—তারপর খেলবে তো? আমি বেশীদিন থাক্‌ব না—এই কটাদিন আগেকার মত খেলায় ধূলায় আনন্দে কাটাতে হবে, যেন চারটা বছর মাঝখানে কেটে যায়নি—কি বল?"

সুহাসিনী "মৃদু হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই।"

তারপর আপনার পথে চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিল, না জানি কাহার ভাগ্যকে লইয়া এই রমণীর অপূর্ব্ব খেলা আরম্ভ হইবে।

(৩)

আপনার অজ্ঞাতে শঙ্করের মন ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও সুশীর কাছে ঠিক সেই পুরাতন দিনগুলিই ফিরিয়া আসিল। সেই বাল্যলীলা, সেই অকপট সরল সৌখ্য। চক্ষের পলকে দুইটি সপ্তাহ কাটিয়া গেলে, সুহাসিনীর অনুরোধে শঙ্কর আর এক সপ্তাহ ছুটি বাড়াইয়া লইল; কিন্তু সেই তৃতীয় সপ্তাহে তাহাদিগের অগাধ আনন্দে একটু গোলোযোগ ঘটিল। সে দিন পেয়ারা সংগ্রহ করিতে করিতে একটি পেয়ারা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, সুহাসিনী বাল্যস্বভাববশতঃ তাহার অঞ্চলের সমস্ত পেয়ারাগুলি মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শঙ্কর বিরক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত পেয়ারাগুলি তুলিতে আদেশ করিলে, সুহাসিনী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "আমি তুলব না।" তাহার সেই অশিষ্ট আচরণ অকস্মাৎ শঙ্করকে বিচলিত করিল। সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তুলবে না! অবাধ্য মেয়ে! তোমাকে তুলতেই হবে।" শঙ্করের মুখে এত বড় কঠিন বাক্য শুনিয়া, সুহাসিনী আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল—মাথা উঁচু করিয়া সগর্ব্বে কহিল, "বটে! তুমি হুকুম করবার কে? আমি কিছুতেই তুলব না—তোমাকেই তুলতে হবে।" সেই আত্মসম্মানে দীপ্ত মহীয়সী রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরক্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুহাসিনীর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া, কম্পিত হস্তে বিক্ষিপ্ত পেয়ারাগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে সেই প্রথম অনুভব করিল, তাহার অন্তরে বালিকা সুহাসিনীর জন্য যে স্নেহ সঞ্চিত ছিল, তাহা তাহারই অজ্ঞাতে আজ গভীর ভালবাসায় পরিণত হইয়াছে। সুহাসিনীর সহিত সে পূর্ব্ব-সম্বন্ধ আর নাই। হঠাৎ মৃদুহাস্যধ্বনি শুনিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, সে গর্ব্বিত মূর্ত্তি আর নাই—সেই চির-পুরাতন বালিকা সুশীলা নতজানু হইয়া, তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া, নম্র হইয়া কহিল, "আর তোমাকে তুলতে হবে না শঙ্কর দাদা, আমায় ক্ষমা কর—আমি ছড়িয়েচি, আমিই তুল্‌চি।" শঙ্কর কথা কহিল না, নীরবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া তাহার অঞ্চলে পূর্ণ করিতে লাগিল। শেষ হইলে উভয়েই যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন শঙ্করের অস্বাভাবিক গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সুহাসিনীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, ভীত স্বরে কহিল, "মাপ চাহিলাম, তবু, তোমার রাগ গেল না শঙ্কর দাদা?" শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল। সুহাসিনী আরও কাছে আসিয়া, তাহার একটা হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কথা কইচ না শঙ্কর দাদা? সত্যিই কি খুব রাগ করেচ?" এবার শঙ্কর কথা কহিল—"তোমার উপর রাগ করব কি সুশী, তুমি বুঝিতে পারচ না, তোমাকে আমি কত ভালবাসি।" সুহাসিনী তাহার কথাটা বুঝিতে

পারিল না—চাহিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্কর যখন দৃঢ় হস্তে তাহার হাত দুটি চাপিয়া ধরিল, তখন কি যেন একটা অস্পষ্ট অনিশ্চিত আশঙ্কায় সে ঈষৎ পশ্চাৎপদ হইয়া, শঙ্করের কঠিন গ্রাস হইতে নিজের হস্তদ্বয় মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "চিরদিনই আমাকে তুমি স্নেহ কর।" শঙ্কর অধিকতর গম্ভীর ব্যাকুল স্বরে কহিল, "স্নেহ নয়, এ শুধু স্নেহ নয়, সুহাসিনী! আমার অন্তরাত্মা অনেক দিন থেকে নীরবে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রেছিল, আজ সহসা তোমার মধ্যে রমণীর বিকাশ দেখে তৃষিত হ'য়ে উঠেচে। আজ আর শুধু স্নেহেতে মন তৃপ্তি পাচ্ছে না সুহাসিনী, গভীর ভালবাসায় মনঃপ্রাণ জেগে উঠেছে। এবার তোমাকে চাই—একেবারে আমার আপনার ক'রে পেতে চাই।" সুহাসিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "সেকি শঙ্কর দাদা! অমন ক'রে কথা কইলে আর তোমার সঙ্গে খেল্‌তে আসা হবে না।"

শঙ্কর কহিল, "খেলার শেষ হবে না কি?"

"না শঙ্কর দাদা! খেলার শেষ হবে না।"

সুহাসিনীর কাতরোক্তি শুনিয়া শঙ্কর বুঝিল, তাহার অন্তর এখনও সেই বাল্যাবস্থাতেই আছে, শঙ্করের মনের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা বুঝি এখনও তাহার হয় নাই। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করাও বৃথা। ব্যর্থ আশায় পীড়িত হইয়া শঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, তবে তাই হোক্, তোমার খেলা যেন শেষ না হয়—আমাকে এই খেলা-ঘর থেকে এবার বিদায় দাও।" সুহাসিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, আর্দ্র কণ্ঠে কহিল—"কেন শঙ্কর দাদা!" শঙ্কর কহিল, "তুমি এখনও বালিকা, কেন তা বুঝবে না। বোঝাতে চেষ্টা ক'রে তোমাকে ক্লেশ দেবার অধিকারও আমার নেই; কিন্তু যদি কখনও বুঝ্‌তে পার, তেমন সময় যদি কখনও আসে, মনে রেখো, তোমার শঙ্কর দাদা যেমন মনে প্রাণে তোমায় ভালবেসেছিল, আর কেউ তেমন পারবে না।"—শঙ্করের কথা শুনিতে শুনিতে সুহাসিনী আপন অজ্ঞাতসারে শঙ্করের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে ক্রমে ভীতা পক্ষিণীর ন্যায় তাহার বাহুযুগলের মধ্যে আশ্রয় লইল। শঙ্কর তখন তাহার উত্থিতমুখ দুই হস্তে ধারণ করিয়া কহিল, "যে জীবন দান করেচ, সে জীবন তোমারই; ভুলনা—এবারকার মত বিদায়—আর দেখা নাও হ'তে পারে।" সহসা হৃদয়ের উন্মত্ত আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই কম্পিত ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া ফেলিল। সুহাসিনী শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে বিবর্ণ হইয়া গেল। দুই হাতে জোর করিয়া বারম্বার নিজের ওষ্ঠ হইতে সেই তপ্ত স্পর্শ মুছিয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল—"ছিছি! তুমি কি মানুষ! তোমার এত দুঃসাহস!" তারপর উদ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। এবং নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রোধে অভিমানে দুই দিন কাটিল, প্রথম উত্তেজনার অবসানে, শঙ্করের চলিয়া যাইবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সুহাসিনী ততই চঞ্চল হইয়া উঠিল। শঙ্করের নয়নের সেই ব্যাকুল দৃষ্টি, তাহার আবেগভরা কথাগুলি, আর সেই চুম্বনস্পর্শ, ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল। জানি না, কেন সে সকল কথা স্মরণ হইলে, এখন তাহার অন্তর এমন মধুর আবেগে কাঁপিয়া ওঠে, যতই ভুলিতে চায়, ততই তাহাকে বিকল করিয়া ফেলে। ক্রমে শঙ্করের মূর্ত্তি তাহাকে যেন গ্রাস করিয়া বসিল। সে কেবলি ভাবিতে লাগিল, কিসের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, না জানি কি পাইলে অন্তরের এ ব্যাকুলতা মিটিবে?

গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, তৃতীয় দিবস সুহাসিনী বাহিরে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল; সেখানে তাহাকে বহু বৎসরের স্মৃতি বেষ্টন করিল। সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া দেখিল, সমস্ত স্মৃতিই শঙ্করময় হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরে বাহিরে শঙ্কর ছাড়া আর কিছু নাই; তথাপি তাহাতে বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, তখন শঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইলে বুঝি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে। কিন্তু শঙ্কর আর আসে না কেন? সুহাসিনী কঠিন কথা কহিয়াছে বলিয়া কি তাহার অভিমান হইয়াছে? অভিমান করিলেই কি সুহাসিনীকে না দেখিয়া থাকা সম্ভব? তবে তার এ কেমন ভালবাসা! সুহাসিনী অজ্ঞাতসারে যে ভালবাসা বালিকাস্বভাববশতঃ উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই ভালবাসাই আজ তাহাকে সম্পূর্ণ দাবী করিয়া বসিল। চতুর্থ দিবসে শঙ্কর নদীতীরপথের সেই

পেয়ারা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সুহাসিনীকে দেখিয়া, যখন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, সেদিন সুহাসিনীর মন আর আপনার নিকটও গোপন রহিল না; একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়া নয়নের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গভীর ক্লেশের মধ্যে সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার প্রাণ কি চায়। সে স্থির করিল, চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে সে শঙ্করের নিকট ক্ষমা চাহিবে।

ভাবিয়াছিল, সে সময় শঙ্কর একবার না আসিয়া পারিবে না। কিন্তু ব্যর্থ আশায় যখন সারাদিন কাটিয়া গেল, তখন আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আপনি নদীতীরপথে চলিল। তখনও বেলা ছিল—সন্ধ্যার পর শঙ্করের যাওয়ার কথা। চলিতে চলিতে সুহাসিনী দেখিল, পথের মাঝখানে সেই পরিচিত বৃক্ষতলে বসিয়া শঙ্কর,—মুখ বিষণ্ণ, চিন্তাগ্রস্ত—সে মুখ দেখিয়া সুহাসিনী ব্যথিতচিত্তে দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। শঙ্কর মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "একি! তুমি এখানে যে?"

সুহাসিনী কহিল, "আমাকে না ব'লেই তুমি চ'লে যাচ্ছিলে কেন?"

"তাই তুমি আপনি দেখা করতে এসেচ?"

"শুধু তাই নয়"—সে আর বলিতে পারিল না—তাহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। শঙ্কর কহিল, "এসময় কেন এলে? আমি এখুনি চলে যাব—তুমি একা ফিরবে কি করে, অন্ধকার হ'য়ে আসচে যে?" সুহাসিনী নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল "কেন কাঁদচ সুহাসিনী?"

সুহাসিনী কহিল "আমাকে ক্ষমা করবে বল? সেই কথা শুনতে এসেছি।"

"ক্ষমা! কিসের জন্য? তুমি তো কোনো অপরাধ কর নি?"

"তোমার উপর অন্যায় রাগ করেছিলাম—অকারণে কঠিন কথা"—সুহাসিনীকে বাধা দিয়া শঙ্কর কহিল, "অসময়ে বালিকার মনে ব্যথা দিয়ে আমি অন্যায় করেছিলাম—আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি যে আত্মসম্বরণ করতে পারিনি, তুমি তারই উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ—সে জন্য দুঃখ কোরো না। চল তোমাকে রেখে আসি, আমার সময় হ'য়ে এল।"

সুহাসিনী মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহাতে অসম্মতি জানাইয়া একই ভাবে দণ্ডায়মান রহিল; তারপর সহসা শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে কি তবে আর চাও না?" শঙ্কর মুখ ফিরাইয়া কহিল, "চাই কি না, তা তুমি কি বুঝবে?" সুহাসিনীর হস্তদ্বয় তখন নিভৃতে শঙ্করের হস্ত অন্বেষণ করিতেছিল। শঙ্করের হস্ত আপনার দৃঢ় মুষ্টিতে লইয়া কহিল "আমিও যে তোমাকে ভালবাসি।"

শঙ্কর আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি ভালবাসার কি জান?"

"কিছু জানতাম না—কি ক'রে জানব বল? সেদিন তোমাকে কঠিন কথা শুনিয়ে অবধি এ কয়দিনে বেশ বুঝেছি, আমিও তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে চাই।"

শঙ্কর কহিল, "তুমি এখনও বালিকা, নিজের মন বুঝবার ক্ষমতা এখনও তোমার হয়নি। আমার জন্য স্নেহ বশতঃ ভুল করচ; ভাবচ, আমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হয়নি। আমার জন্য তোমার জীবন নষ্ট করবার দরকার নেই, আমার কথা রাখ। আর সময় নেই, আমি চল্লাম। যদি সত্যি তোমাকে ভালবেসে থাকি, তো একদিন তোমাকে পাবই, এখন তোমার খেলা অসময়ে নষ্ট ক'রতে চাই না।"

শঙ্কর চলিয়া গেলে সুহাসিনী ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়া, দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল "ওগো, আর আমি বালিকা নই। বিশ্বাস কর যে, আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝ্‌তে পেরেছি।"

কিন্তু কে কবে বিশ্বাস করে? কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, কোন্ মাধুরী পরশে বালিকা-হিয়ার মাঝে প্রবল পিপাসা লইয়া রমণী জাগিয়া ওঠে, কে তার সন্ধান রাখে? তখন গোপন অন্তরে কোথায় কে জানে কোন্ ভিখারী কাঁদিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ভিক্ষা চাহে; সে গোপন-ব্যাকুলতা কে কবে বুঝিয়া থাকে? প্রথমতঃ বুঝিয়া ওঠাই যে কঠিন, কে চায়? কি চায়? কিন্তু যাহার পরশে অন্তরতম প্রথম জাগিয়া ওঠে, সে কি ভুল করিবার, না উপেক্ষা করিবার?

বহুদিন অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা সুহাসিনী উপেক্ষা করিয়াছিল, একদিন একমুহূর্ত্তের পরশে তাহার সেই সংশয় ঘুচিয়া গেল। এতদিনের খেলা-ঘর ভাঙিয়া দিয়া তাই আজ শঙ্করের জন্য অন্তরাত্মা ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—"চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

(৪)

এদিকে ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তথাপি তত্ত্বনিধি মহাশয়ের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগ নাই। সুহাসিনীর মলিন মুখ এবং অশনে বসনে নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া পিসী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, সময় অসময়ে ভ্রাতাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। সেবার এক শিষ্য-পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তত্ত্বনিধি মহাশয়কে কলিকাতা যাইতে হইবে শুনিয়া তাঁহার ভগ্নী প্রস্তাব করিলেন, সেই সঙ্গে সুহাসিনীকে লইয়া গেলে কলিকাতায় একটা কিছু সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। ভগ্নীর যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। আপাততঃ শঙ্করের বাসাবাটীতে স্থান লইয়া, পরে অন্য বন্দোবস্ত করা হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির হইল।

সে প্রস্তাবে সুহাসিনীর মনে হর্ষ ও বিষাদের একত্র উদয় হইল। এতদিন পরে শঙ্করকে দেখিবে, সেই আনন্দ; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে গিয়া সে দাঁড়াইবে কি করিয়া?

ভগিনী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় কলিকাতায় শঙ্করের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিষম বিপদ্‌। শঙ্কর সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। তাহার কাছে বসিয়া রোগের ক্লেশ লাঘব করিবার অথবা শুষ্কওষ্ঠে এক বিন্দু জল দিবার কেহ নাই। সুহাসিনী দ্বিধা ও অভিমান মুহূর্ত্তে জলাঞ্জলি দিয়া রুগ্ন বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল। তত্ত্বনিধি মহাশয়ও উদাসীন রহিলেন না। সুহাসিনীর সেবা লক্ষ্য করিয়া পিসীর মনে সহসা এক নূতন প্রস্তাবের উদয় হইল; যথাসময় সে প্রস্তাব তিনি ভ্রাতার নিকট জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা করিলেন না। শঙ্করের রোগটা সত্যই অতিশয় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনে যাতনা কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, সে বুঝিতে পারিল, কে একজন কায়-মনোবাক্যে তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে; তেমন ধৈর্য্য, তেমন স্নেহকোমল স্পর্শ কাহার, তাহা তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, কিন্তু ক্রমশঃ জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে বুঝিতে পারিল, সেই ধৈর্য্যশীলা, স্নেহশীলা, তাহারই সুশী; কিন্তু এ তো সেই ক্রীড়াশীলা চঞ্চলা বালিকা নয়!

চলিতে ফিরিতে শঙ্কর তাহাকে অনিমেষ নয়নে দেখিয়া লয়, কিন্তু নিকটে আসিয়া বসিলেই নয়ন মুদিয়া নীরবে সময় অতিবাহিত করে। সুহাসিনী সমস্ত বুঝিয়াও ধৈর্য ধরিয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এখন না হোক, একদিন সময় আসিবে, একদিন আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর ঘটিবে। তাহাই হইল, সে দিন আসিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আন্তরিক অনুরাগ অন্তরে পোষণ করিয়া কয়দিন গোপন করিয়া রাখা চলে। সুহাসিনী কাছে না থাকিলে শঙ্করের সময় কাটেনা; চঞ্চল চিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকে, উৎসুক নয়নদ্বয় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়; কতক্ষণে পরিচিত পদশব্দ কর্ণে পৌছিবে, কতক্ষণে দুটি কোমল হস্তস্পর্শে নিমীলিতনয়ন উন্মীলন করিয়া, করুণাভরা দুটি জীবন্ত নয়নে মিলিত হইবে। সুহাসিনীর বিলম্ব হইলে শঙ্করের অসময়ে পিপাসার সঞ্চার হয়, এবং কখনও অকারণে শিরঃপীড়ার আবির্ভাব হয়; এ সকল নিত্য-উদ্ভাবিত কৌশল সুহাসিনীর নিকট গোপন রহিত না।

সেদিন শঙ্কর উঠিয়া বসিয়াছে, সুহাসিনী অলক্ষ্যে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শঙ্করের চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া নীরবে হাসিতেছে। সহসা বস্ত্রাঞ্চল সন্নিবেশিত করিতে হাতের চুড়ি বাজিয়া উঠিল; শঙ্কর সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কে, সুশী?" সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "না, শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী।" পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কর হাসিল, ততক্ষণে সুহাসিনী সম্মুখে আসিয়া বসিল। শঙ্কর, "তোমরা নাকি শিগ্‌গিরই অন্য বাড়ীতে যাবে?"

সুহাসিনী গম্ভীরভাবে কহিল "আমি যাব না।"

"তুমি যাবে না?"

"না, আমি থাকব ব'লেই এসেচি।"

"কেন?"

"তোমাকে চাই, তাই—আর কেন?

এমন করিয়া অসঙ্কোচে মনোভাব ব্যক্ত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সুহাসিনী কহিল, "তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে চাই, এবার আমায় ফিরাতে পারবেনা।" শঙ্করের শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে বিষন্ন হাসি দেখা দিল; সে কহিল, "আমি কি তোমাকে চাই না? আমার অন্তর্য্যামী জানেন, সে কি চাওয়া! আমার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, কাজ সব তোমাতে লোপ পেয়েছিল; তাই অধীর হয়ে

সব নষ্ট করেছি। তোমার চোখে যে ঘৃণা, যে বিরক্তি দেখেছি, সে কি আর ভুলতে পারি?"

সুহাসিনী কাছে আসিয়া কহিল, "কিছু নষ্ট হয় নি, আমি ভুল করেছিলাম, সে ভুল ভেঙ্গেছে। দেখ দেখি, আমার চোখে আর কি ঘৃণা আছে। আমি সব বুঝেছি, বেশ ভাল করেই বুঝেছি আমি তোমাকে ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি, আমায় আর ফিরাইওনা?"

শঙ্করের হস্তদ্বয় নীরবে সুহাসিনীকে বেষ্টন করিল; তাহার একাগ্র নয়ন অপর দুটি উৎসুক নয়নে সম্মিলিত করিয়া সত্য জানিয়া লইল, শঙ্করের সংশয় দূর হইল, হাসিয়া কহিল, "তোমার খেলাঘরের কি হবে সুশী?" সুহাসিনী ধীরে ধীরে শঙ্করের প্রসারিত দুই বাহুর অন্তরালে তাহার বক্ষোপরি মস্তক রাখিয়া প্রসন্ন চিত্তে মধুর হাসিয়া কহিল, "এবার খেলাঘর ভেঙ্গে এসেচি।" আজ তৃষিত ব্যথিত ক্ষিপ্ত চিত্ত দুটি আশ্রয় পাইয়া শান্ত হইল।

মধুর হাসিয়া কহিল, এবার খেলাঘর ভেঙ্গে এসেচি

তত্ত্বনিধি মহাশয় সেই সময় ভগিনীর তিরস্কারে অনন্যোপায় হইয়া শঙ্করের নিকট কন্যাদানের প্রস্তাব করিতে আসিয়া, শঙ্করের বাহুপাশে আবদ্ধ সুহাসিনীর আনন্দোচ্ছল মুখপানে চাহিয়া বুঝিলেন, ধূলাখেলায় মত্ত যে শিশু সুহাসিনীর মায়া কাটাইতে তিনি গভীর তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুহাসিনীর সে শৈশবের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার উপেক্ষা সত্ত্বেও শৈশব-অন্তে স্বভাব তাহার জীবন্ত স্পর্শে সুপ্ত কিশোর হৃদয়কে জাগরিত করিয়াছে। পিতা যখন শাস্ত্র-অধ্যয়নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, কন্যার বিরহী অসম্পূর্ণ আত্মা পরিপূর্ণতার জন্য লালায়িত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে। তত্ত্বনিধি মহাশয় একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "মিথ্যাময়" বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বোধ হয়, শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া সংসার মিথ্যা মায়া মাত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ দেখিয়া, করুণ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সান্ত্বনা পাইলেন।

পূজার ছুটি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ]

তৃতীয় খণ্ড।

বাড়বাকুণ্ড হইতে বাড়বানলের মন্দির। পরদিন উষার আলোকে উদয়-অচল-পথের শুকতারাকে সাক্ষী রাখিয়া, সীতাকুণ্ড ষ্টেসন হইতে ট্রেণে উঠিলাম; কিন্তু তরুণ তপনকে অরুণরথে দেখিবামাত্র বাষ্প-রথ ত্যাগ করিতে হইল। ষ্টেসনটির নাম বাড়বাকুণ্ড; রেলপথের লৌহ-শৃঙ্খল উভয় 'কুণ্ড'কেই পাশাপাশি বাঁধিয়াছে।

সারারাতের হিমে দানাবাঁধা ধূলির কণাগুলি তখনও পায়ের ভরে গুঁড়া হয় নাই—পথের ধারের লতায় পাতায় টুপাইয়া-পড়া জলকণাগুলি তখনও জ্বলিয়া উঠে নাই—ঘাসের গালিচায় ছড়াইয়া-থাকা শিশির-গুঁড়ির পুঁতির-জালগুলি তখনও রবির করে চুরি যায় নাই। আম্রকানন-প্রান্তবাহী গ্রাম্য-ধূলিপথে "সাপ গেছে পার হয়ে, ক্বচিৎ পাখীর নখের ভঙ্গী চোখে পড়ে রয়ে' বয়ে'" প্রভৃতি বহু-বিধ সূক্ষ্ম-কাব্য-লক্ষণ দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধমাইল চলিয়া আসার পর উপত্যকায় পড়িয়া, আমরা জাগ্রৎ অবস্থায় "নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে" "তন্দ্রাপথে" অগ্রসর হইলাম। আশার কথা এই যে, রৌদ্রপুলকিত প্রভাতে কোন অনিশ্চিত তারকা ইঙ্গিতের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না এবং গন্তব্যস্থানটিও নির্দ্দিষ্ট ছিল—বাড়বানল।

অপূর্ব্ব-পরিচিত উপত্যকা-পথের এই মধুর প্রভাতটিকে আজ একটি বিশেষ কেহ বলিয়া মনে হইতেছিল। কবির মনস্তুষ্টির জন্ম যে প্রভাতকে "বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে" দেখা দিতে হয়, এ যেন সে প্রভাত নয়—এ যেন সেই হাসিতে-ফাটিয়া-পড়া কোলে-কোলে-ফেরা কচি মেয়েটি, যাহার বসনও নাই, ছিঁড়িবার আবশ্যকতাও নাই। এ মেয়ের কথা ফোটে নাই কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা ফুটিয়া উঠিতেছিল; কলহাস্যে ছুটিয়া-চলা তটিনী-বালিকার করতালিতে নাচিয়া, এক পাহাড়ের বুক হইতে আর এক পাহাড়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, হাজার পাখীর হাজার ডাকে কল্‌কল্‌ করিয়া, বনের ফুলে হাসির লহর তুলিয়া, এই 'চুলবুলে' মেয়েটি আজ লতার ফাঁকের পাতার ফাঁকের সকল শূন্য ভরিয়া তুলিতেছিল!

গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই দৃশ্যবহুল উপত্যকায় আরও দেড়মাইল চলিতে হইল। বনপথ হইতে ৮৷১০টি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের উচ্চ প্রাঙ্গণভূমি পাওয়া যায়। এখানে উঠিতেই প্রথম সাক্ষাৎ হইল, একটি শাখাবহুল শেফালীবৃক্ষের সহিত; তাহার পল্লব-ওষ্ঠ-অন্তরালের অপর্য্যাপ্ত শুভ্রহাস্যই মন্দির-দেবতার সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দন! পদতলে চাহিবামাত্রই কিন্তু আমাদের গতিরোধ হইয়া গেল; রাশি রাশি ঝরাফুলের ধবল-ধারায় রক্ত-প্রাঙ্গণখানির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুগ্ধের ঝরণা ছুটিয়াছে—কোন্‌ প্রাণে ইহার উপর দিয়া নির্ম্মম চরণ-ক্ষেপে অগ্রসর হইব? সন্তর্পণে সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া, মন্দিরদ্বারে সমবেত হইলাম বটে কিন্তু তখনও দ্বাররুদ্ধ থাকায় মোহান্ত মহাশয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় থাকিতে হইল।

বাড়বানলের মন্দির ব্যতীত এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে আরও কতকগুলি জীর্ণ মন্দির দেখিলাম; এ সকল মন্দিরের কোনটিতে শিবলিঙ্গ, কোনটিতে কালভৈরব, কোনটিতে অর্দ্ধভগ্নহস্তপদ কালীমূর্ত্তি। প্রান্তরভ্রমে কোন মন্দিরের ভগ্নচূড়ায় কাননরাণী তৃণশয্যা বিছাইয়াছেন; আর তাহার পত্রাচ্ছন্ন জীর্ণ-কক্ষতলে বাণপ্রস্থ-ধর্ম্মী ছাগবৃন্দ ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণ অংশ পরিত্যাগ করিয়াছে।

রুদ্ধদ্বার-মন্দিরের মুক্তবাতায়নপথে যাত্রিবর্গ এতক্ষণ

বাড়বের অগ্নিদীপ্তি দেখিতেছিলেন, এক্ষণে মোহান্ত আসিয়া দ্বার খুলিতেই মন্দির-বহিঃস্থ কুণ্ড হইতে স্নান করিয়া একে একে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী; প্রবেশপথে প্রথমেই মার্ব্বেল-মণ্ডিত মেঝে এক-দালান কক্ষ; এইটি অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় দ্বারপথে ৩।৪টি সোপান নামিলেই কুণ্ডপার্শ্বে পৌছান যায়। এই দ্বিতীয়কক্ষের মধ্যস্থলে কাষ্ঠ-বেষ্টনীর আবরণে বাড়বাকুণ্ড-রূপ চৌবাচ্চা। কুণ্ডমধ্যস্থ বারিপৃষ্ঠের অর্দ্ধাংশ অনাবৃত এবং অপরার্দ্ধের উপর কূর্ম্ম-পৃষ্ঠাকার মৃত্তিকা-প্রলেপ-আবরণ; ঐ আবরণের মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখা-নির্গম-রন্ধ্র। যেদিকে বারিপৃষ্ঠ অনাবৃত, সেইদিকের রন্ধ্রমুখে সর্পজিহ্ব-অগ্নিদেব লেলিহান রসনা বিস্তারপূর্ব্বক জলপান করিতে উদ্যত; অপরাপর রন্ধ্রপথেও মহাতেজে শব্দায়মান শিখা-সমূহ উত্থিত হইতেছে। জলের ঝাপ্‌টা দিলে বিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা অনাবৃত বারিপৃষ্ঠে 'ঝিল্‌মিল্' করিয়া বেড়াইতে থাকে। কুণ্ডের জল ঈষদুষ্ণ; অনেকে ইহার মধ্যে নামিয়া স্নানও করিয়া থাকেন; একসঙ্গে তিনচারজন স্নান করিতে পারা যায়। যাঁহারা কুণ্ডমধ্যে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বস্ত্রে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ে যাহার আভাস দেখিয়া আসিয়াছিলাম, এখানে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইলাম—সেই একই জলধারা এখানে বাড়বানল-রূপে প্রজ্বলিত।

হরকিশোর পাণ্ডা মহাশয়ের প্রেরিত একটা অভদ্র ও দুর্ম্মুখ কর্ম্মচারী বহুযাত্রীর বিরক্তি-কারণ হইয়া উঠিতে-ছিল। প্রথম প্রথম এক পয়সা প্রবেশ-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াও, তাহারই সৎপরামর্শে অত্রস্থ মোহান্তপ্রভু সহসা তাম্রখণ্ডগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু চারটি পয়সা একত্র করিবামাত্র আশ্চর্য্যরূপে তাহাদের তাম্রত্ব ঘুচিতে লাগিল। নলিন দুইটি পয়সা দিবামাত্র মোহান্ত মহাশয় সশব্দে তাহা মর্ম্মর হর্ম্ম্যতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"একি ভিক্ষে নাকি?" অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত নলিন বলিল—"ঠিক নয়, এ বিদুরের খুদ; তবে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষে মনে কর্‌তে পারে"। রুদ্ধ যাতনায় মন্দিররক্ষীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; নলিন সটান ভিতরে চলিয়া গেল।

একজন স্নান না করিয়া শুষ্কবস্ত্রে মন্দির-প্রবেশ করিতে-ছিলেন; তথাকথিত কর্ম্মচারী তাঁহার পথরোধ করিয়া তর্জ্জনীকম্পনের সহিত বলিল—"তুমি হিন্দু, না ম্লেচ্ছ?" ভদ্রলোক একেবারে থ!—ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কেন বাপু?" "কেন! শুক্‌নো কাপড়ে, না নেয়ে দেবমন্দিরে ঢুক্‌তে লজ্জা হচ্চে না?" তাহার কর্কশ বচনভঙ্গীতে উপ-স্থিত জনমণ্ডলী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—একজন বলিলেন, "তোমার লজ্জা করে না, যে বামুনের ছেলে হয়ে সকাল বেলা র‍্যাপার জড়িয়ে, মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলোম্বিয়া সিগারেট টান্‌ছো?" দেখিতে দেখিতে হস্তপদের উৎক্ষেপে বিক্ষেপে লোকটা সেই প্রাঙ্গণখানিকে দারুণ কোলাহলময় করিয়া তুলিল—আর একটু হইলেই যাত্রিবর্গের নিকট হইতে মার খাইয়া মরিত কিন্তু রমেশবাবু যখন বলিলেন, "ওগো মন্দির-দ্বারের খেঁকীকুকুর, এ মন্দিরে যদি ঠাকুর থাকেন, তবে মানুষের অশুচিতায় তিনি অপবিত্র হবেন না বরং তাঁর পবিত্রতাই মানুষকে শুচি করে নেবে, মাঝখান থেকে তুমি কেন ঘেউ ঘেউ করে ঘুসিটা আশ্‌টা খাবে বল দেখি," তখন আপন মনে গজ্‌গজ্ করিতে করিতে কি ভাবিয়া সে সরিয়া গেল।

২।

জগদীশ বাবুর ডায়েরী। বর্ত্তমান ভ্রমণবৃত্তান্তের উত্তমপুরুষটি ত প্রত্যাবর্ত্তন পথে সীতাকুণ্ডে নামিয়া গেলেন; রাস্তার মাঝখানে তাঁহার কি যে কল বিগ্‌ড়াইল, বলিতে পারি না। তাঁহার দেখাদেখি রমেশ-বাবুও বিগড়াইয়াছিলেন, কিন্তু দল ভাঙিবার লক্ষণ দেখিয়া যামিনী এবার চটিয়া উঠিল। সে, Courtmartial Law অনুসারে এই দ্বিতীয় Decampterটির উপর গুলি চালাইতে চাহিল, 'Mean Deserter' বলিয়া গালি দিল, 'অস্থিরচিত্ত' বলিয়া বিদ্রূপ করিল, অবশেষে, কবে কোন্ ভট্টাচার্য্যের সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া সে হরদম্ কাঁচকলা ভাতে ভাত খাইয়াছে, তথাপি অসুবিধা সত্ত্বেও ছাগমাংস আহার করিয়া এক যাত্রায় পৃথক্ ফল করে নাই, নিজের এইপ্রকার রাশি রাশি নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, প্রতিপন্ন করিতে চাহিল যে, দলবদ্ধ অবস্থায় কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়াও দলের সকল ভাগ্য বরণ করিয়া না লওয়া কাপুরুষতা।

তর্কে-অপরাজেয় রমেশ বাবু যদিও শেষে ধ্রুবজ্যোতির কৃতাঞ্জলি-পুট-অনুনয়ের নিকট নত হইয়াছিলেন, তবুও যামিনীর নীতিসূত্রকে উদ্ধত-মস্তকেই অবজ্ঞা করিলেন।

তথাকথিত ভট্টাচার্য্যকে ছাগমাংসভক্ষকের উচ্চতর-নীতি-তত্ত্ব পথে না টানিয়া, সেই যে কাঁচকলার দলে নামিয়া গিয়াছিল, ইহাতে রমেশবাবু তাহার কাপুরুষতা দেখা দূরে থাক্, তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞানহীনও প্রমাণ করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া ও বিবর্ত্তনবাদের 'থিয়রি' খাটাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অতএব দেখা যাচ্চে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা, লতা-পাতা-কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীর ভেতর দিয়ে তা'র ক্রমবিকশিত জীবন-ধারাকে পরব্রহ্মের দিকে প্রসারিত করে তুল্‌ছে।"

ইহার পর বাদে প্রতিবাদে রমেশ বাবুর সূক্ষ্ম যুক্তি, সৃজন হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সমস্ত পথটার জমাট কুয়াসার উপর দর্শনের তপনরশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এদিন-কার সকল তর্ক ও মীমাংসা একত্র করিলে একখানা অভিনব দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কেবলমাত্র সহস্রধারার বিবরণটুকু দিতেই 'আমি' এক 'আমি' যাবে, অন্যে 'আমি' হবে, আমিত্বের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে) অনুরুদ্ধ হইয়াছি। জগদীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা আপাততঃ 'আমি' হইয়া বলিতেছেন—আপনারা অবহিত হউন।

সঞ্জয় উবাচ :—

বারইয়াঢালা ষ্টেসন হইতে সহস্রধারা। সীতাকুণ্ডের বামদিকের সর্ব্বপ্রথম ষ্টেসন বারইয়াঢালায় নামিয়া প্রায় একমাইল দূরের একটা 'গুম্‌টী' পর্য্যন্ত আমরা রেলপথ ধরিয়া দক্ষিণে আসিলাম এবং সেখান হইতে 'মেঠো পথে' পূর্ব্বদিকে চলিলাম। রাস্তার দু'ধারে মাঝে মাঝে গ্রাম, মাঝে মাঝে মাঠ। রৌদ্রকিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল; পিপাসাও হইয়াছিল; একস্থানে এক কৃষকের নিকট হইতে কতকগুলি ইক্ষু সুলভে ক্রয় করা গেল। সহস্রধারার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই মন্দাকিনী নদী পাওয়া যাইবে, সেই নদী ধরিয়া চলিলেই সহস্রধারার সম্মুখে উপনীত হইব।

সম্প্রতি এদিকে বন্যা হইয়া গিয়াছিল; প্রান্তরের বিধ্বস্ত অবস্থা ও উৎপাটিতমূল মহীরুহসমূহ তখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছিল। অবিলম্বেই আমরা নদী পাইলাম এবং তাহার তীরে তীরে, বাঁকে বাঁকে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পাহাড়ের গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ তিন মাইল পথ চলিয়া, একই নদীকে ৫।৬ বার পার হইয়া, অগ্রবর্ত্তী দলের পাষাণে-প্রতিধ্বনিত চীৎকার-শব্দে পথনিরূপণ করিতে করিতে, রবি-কিরণ-দগ্ধ মধ্যাহ্নে সম্মুখের এক শৈলমালা-পরিবেষ্টিত স্থান হইতে সহসা আমরা জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম এবং ত্বরিতপদে সেই পাষাণ গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম —এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

এ কি সহস্রধারা, না ইন্দ্রধনুর বর্ণধারা! এ জলপ্রপাত, না সহস্র-ফনঅনন্তনাগ! কিন্তু না—অনধিকারী আমি —সৌন্দর্য্য-বর্ণনার অক্ষম-চেষ্টায় এ সৌন্দর্য্যকে আর মলিন করিয়া দেখাইব না, হয়তো অচিরেই কোন উপযুক্ত কবি সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমি শুধু এইটুকু বলি যে, জগতের মাঝে মাঝে এই প্রকারের প্রাণগলানো সৌন্দর্য্য-উৎসের ইঙ্গিতেই বুঝি প্রাণে প্রাণে কবিত্ব-সাধনার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ পর্ব্বত-শিখর হইতে সূর্য্যকিরণের সপ্তবর্ণে সুরঞ্জিত বক্র বারিধারা মাণিক-জ্বলা-হাজার-থানায় নিম্নভূমির পাষাণ-পৃষ্ঠ চুম্বন করিতেছে; গুঁড়ি গুঁড়ি জল-কণার উপর রবির রশ্মিপাতে ঐ ভূমিচুম্বিধারার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিচিত্র এক বর্ণ-পরিধি সৃষ্ট হইয়াছে—যেন নীলকান্ত-চন্দ্রকান্ত-সূর্য্যকান্ত-মণিবিভূষিত পন্নগ-ফণা-সহস্রের দীপ্তি-আভা!

মূল ধারাটি ৪।৫ হস্ত প্রশস্ত; উভয় পার্শ্বে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা দেখা গেল; পাষাণ-গাত্র বহিয়াও অসংখ্য ধারা নামিয়া আসিতেছিল। যে স্থানটিতে উক্ত প্রপাত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহার চারিদিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় ২৫০ হস্ত বিস্তীর্ণ এক নাতিগভীর পাষাণ-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইহারই একপার্শ্বে বন্যা-উৎপাটিত কোন বৃক্ষকাণ্ডে উপবেশন করিয়া আমরা এই শোভা-উৎসটির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

প্রপাতের নিম্নে মাথা পাতিয়া স্নান করিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না—আশু ও ধ্রুব 'গণস্যাগ্রতঃ' হইয়া এবং বারকতক Shock পাইয়া, অবশেষে মাথায় বেশ করিয়া গামছা জড়াইল—তখন সকলেই উক্ত উপায়ে আরামে স্নান করিতে লাগিলাম। স্নান-শেষে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া, স্নিগ্ধ হইবার পর, আমাদের পুরোহিত আসিলেন ও গোটাকতক মন্ত্র আবৃত্তি করাইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে সহস্রধারা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য গল্প শুনিয়াছিলাম—যাঁহারা ঐ পর্ব্বতশীর্ষে উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, উপরের আর এক শৃঙ্গ হইতে, তাহার উপর আবার এক শৃঙ্গ হইতে, এইরূপে জল আসিয়া পড়িতেছে—এবং কোন কোন পাণ্ডা ঐরূপ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে ৩।৪ দিনের পথ চলিয়া উহার মূল আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। মূল আবিষ্কার হউক আর নাই হউক, ভুল আবিষ্কার করিলাম কিন্তু একটা মস্ত—ভুলটা মানব-সাধারণের বিশ্বাসের। প্রস্তরখণ্ডের যে বৃন্ত আছে এবং তাহা ঐ বৃন্ত অবলম্বনেই মাটিতে ফলে, এ বিশ্বাস হয়তো কাহারও নাই। আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, মাটির ভিতর বোঁটায় বোঁটায় বড় বড় পাথর ফলিয়াছে এবং জলপ্রবাহ উপকার মাটি সরাইয়া দিয়া, এই গোপন রহস্যটাকে মানব-চক্ষুগোচর করিতেছে!

প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া আসিয়াছি এবং এতদুপলক্ষে একটা ভীষণ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীকে চকিত করিয়া তুলিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় ধ্রুব ও আশু টানাটানি করিয়া একটাকে তুলিয়া ফেলিল—আশাহতচিত্তে শুনিলাম, ঐ দেড়মণ ভারী জীবটা পাথর নহে—"ভুঁইকুমড়ো"! এতবড় আশায় ছাই পড়ায়, মুহূর্ত্তেই সমস্ত জগৎটা চোখের কাছে বিসদৃশ হইয়া গেল—বুঝিলাম, জগত বাস্তবিকই দুঃখময়।

৩।

বেলা দুইটার সময় জগদীশ বাবুর দোর ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, সহস্রধারা হইতে সহস্রকর-দগ্ধ হইয়া এতক্ষণে মূর্ত্তিগুলি ফিরিয়াছেন। শুনিলাম, গাড়ী ধরিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিয়াও তাঁহাদিগকে চলন্ত ট্রেণে উঠিতে হইয়াছে—টিকিট ক্রয় করা হয় নাই—এবং বাড়বানলের সেই কর্ম্মচারীটা ষ্টেসন মাষ্টারের কাণে মন্ত্র দিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে লাকসামের fare ও penalty আদায়ের চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক, শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয় তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্রোগ্রাম অনুসারে আজ রাত্রি দশটার গাড়ীতে আমাদিগকে চট্টগ্রাম যাইতে হইবে, সুতরাং অপরাহ্নে আর কোথাও বাহির না হইয়া, বাসাতেই [illegible] জমাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হইল। হরকিশো[illegible] বাবু তাঁহার একটাকা মূল্যের "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যখানি" আমাদিগকে পড়িবার জন্য দিয়াছিলেন—নলিন এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিল।

দেবীপুরাণের নামে আর সংস্কৃত শ্লোকের যাদুপ্রভাবে এখানকার প্রত্যেক দেবতা ও তীর্থবিবরণকে সে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং রমেশ বাবুর আচরণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ধ্রুব না হয় বেহ্মদত্যি, তার সংস্কারে বাধে, কিন্তু সে কি বলে হিঁদুর ঘরে বামনের ছেলে হয়ে একটা ঠাকুরকেও গড় করলে না!

রমেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"মনের মধ্যে যখন ভক্তির আনন্দকে অনুভব করি, তখনই বুঝি যে দেবতাকে কাছাকাছি পেলুম, কাজেই প্রণামের ভেতরের কথাটাও আপনা হ'তেই সেখানে খুলে পড়ে; আমার ভয় হয়, এর চেয়ে বেশী কিছু করতে গেলে সেটা কেবল বাড়াবাড়িই করা হবে। যাই হ'ক, তোদের কাছে জবাবদিহির হাত এড়াবার জন্যে বাহ্যলক্ষণের সামনে বাহিরটাকে নত করে দিতে আমার আপত্তি নেই।"

নলিন ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"তোমার পোড়ারমুখে কি সোজা ভাষা বেরোয় না? যা' জিজ্ঞেস্ করলুম, তা'র মানে বুঝতে কারুর কষ্ট হয় না, কিন্তু যা' বল্লি তা'র একবিন্দু যদি স্পষ্ট বোঝা গেল!"

গম্ভীরভাবে রমেশবাবু বলিলেন—"The water in the pitcher is bright and transparent, but that in the ocean is dark and deep; little truths have words that are clear, but great truths are obscure and silen

সব্যঙ্গহাস্যে নলিন বলিল—"চমৎকার! রবিবাবুর বুলি আওড়াতে শিখেছো ত; আর ভাবনা নেই, তোমার ঋষিত্ব প্রাপ্তি এগিয়ে এসেছে। আরে মুখ্খু, এটা বুঝিস্‌নে যে গর্ব্বী অপরাধীর দোষ ঢাকবার ছুতো ছাড়া ও সব বাক্যজালের আর কোনও মানে নেই।

আমিও উপমা দিতে পারি,—"The colour of the ocean is dark deep, but that of the sky is blue and transparent; large truths have

words that are obscure, but the greater the truth the more clear and silent it is."

রমেশ বাবু বলিলেন—"বুঝি সবই, তবে গর্ব্বমাত্রই যে খারাপ এইটে মানিনে।"

"বালাই, তা' মানবে কেন? ওটাকে 'আভিজাত্যের লক্ষণ' বলে' মানতে শিখেছো ত?"

রমেশ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"বিদেশীর অভিমত শোনবার অনেক আগেই নিজের মন দিয়ে গর্ব্বকে ওর চেয়ে বড় বলে জেনেছি। আসল কথা, গর্ব্ব যেটা তার সঙ্গে অন্তঃসারশূন্য আত্মাভিমানের স্বর্গনরক তফাৎ। একটা আসে আপনার গৌরব-উপলব্ধি থেকে, আর একটা আসে কল্পিত অপমানজনিত অভিমান থেকে—একটা আনন্দ ও উৎসাহ থেকে, আর একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ থেকে—একটা Virtue থেকে, আর একটা Vice থেকে—একটা Self থেকে, আর একটা Not-self থেকে। এদের একটি হচ্চে Pride, অপরটি Vanity—দুটো ঠিক পরস্পরবিরুদ্ধ মনোবৃত্তি। 'অমৃতের পুত্র মোরা, শক্তির সন্তান, আনন্দের উত্তরাধিকারী'—এ গর্ব্বের উজ্জ্বল দীপ-শিখা মনকে আলো করে না থাকলে বাঁচবো কি নিয়ে, এগিয়ে যাবো কি অবলম্বন করে?"

রস-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে পথ হারাইয়া নলিনের বুদ্ধি দমিয়া গেল; তখন যামিনী বাবু তাহার পক্ষ লইয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন—"তুমি যে মনস্তত্ত্বের যুক্তি খাটাতে চাইছ, সেই মনস্তত্ত্বই আবার এও বলে যে, শ্রেষ্ঠ লোকের গর্ব্বে নিকৃষ্ট লোকেরাই ভয় পায়, কিন্তু অপরপক্ষ সমান হলে তারও গর্ব্ব জাগবে। তা' যদি হয়, তবে গর্ব্বী এ অধিকারকে অপর লোকের ভেতর দেখবা-মাত্র ঠোকাঠুকি করে মরে কেন?"

রমেশ বাবু বলিলেন—"মরে তার কারণ, তারা অবিমিশ্র-গর্ব্বী নয় বলে। আনন্দ বা আনন্দজাত বৃত্তি-সমূহের ধর্ম্মই হ'চ্চে আকর্ষণ করা, সকলের অধিকারকে মুক্ত করে দেওয়া;—repulsion সৃষ্টি করি সেই খানেই, যেখানে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে Pride ভ্রমে Vanityকে বরণ করি। বেশীর ভাগ সময়ই গর্ব্বকে আমরা সত্যের পথে প্রকাশ করিনে, আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপেই ব্যবহার করি—বস্তুতঃ গর্ব্ব বার করবার জিনিস নয়, মনের ভেতর জ্বালিয়ে রাখবারই জিনিষ"—

বাধা দিয়া নলিন এই সময় গললগ্নীকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল—"ব্যস্ কর, ব্যস্ কর। আমার ঘাট হয়েছে ভাই, তুই ঠাকুর প্রণাম না হয় নাই করলি কিন্তু অমনভাবে কথা কসনি, দোহাই তোর। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় ঘুলিয়ে এসেছে—একসঙ্গে থেকে ঐ ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কথা কয়ে যে তুই আমার পর হয়ে পড়বি, এ আমি আসলেই সইতে পারব না।"

একটা উচ্ছ্বসিত হাস্যরোলের প্রবলতা সহসা সেই কর্ম্ম-চারীটার আবির্ভাবে অর্দ্ধপথে গম্ভীর হইয়া গেল। সে বলিল—'বাবুর বইখানা দিন শিগ্‌গির;' কথাটা এমনি কর্কশ ও মুরুব্বিয়ানাধরণের শুনাইল যে, আশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"কে হে তুমি? তোমার কাছ থেকে আমরা কোনো বই পাইনি—তোমাকে চিনি নে।" ততো-ধিক কর্কশকণ্ঠে লোকটা বলিল—"চালাকী করতে হবে না, আমার কাছে বই দেবেন কি না?" অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলাম—"নিশ্চয়ই না।" লোকটা রাগে ফুলিতে লাগিল; বলিল—"নিয়ে সরে পড়বার ইচ্ছা আছে তা' বুঝেছি, সেটি হচ্ছেনা।" ধ্রুব তখন ধৈর্য্যচ্যুত—দ্বারের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতেই লোকটা বলিল—"কি, মার্ব্বে না কি?" ধ্রুব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"মার্ব্বো কেন, আসুন, ঘরের ভেতর আসুন, দুটো আলাপ সালাপ করি।" দু'এককথায় বিলক্ষণ চটাচটি হইয়া গেল—তখন আশুর ঘুষি, যামিনীর চড় ও ধ্রুবর ধাক্কায় "মেরে ফেল্লে গো—মেরে ফেল্লে" করিতে করিতে লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে বহির্কক্ষপানে ছুটিল।

সকাল হইতে এ পর্য্যন্ত লোকটার সমস্ত দুর্ব্যবহার শুনিয়া হরকিশোর বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন; ইহার পর তিনি গ্রন্থও ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন না—দাম দিতে গেলেও লইতে পারিলেন না। বহুবিধ বিনয়নম্র বচনে সান্ত্বনা দিয়া, তিনি আমাদিগকে লোকটার অপরাধ মনে না রাখিতে অনুরোধ করিলেন; আমরাও যথাবিহিত এ পক্ষের অপরাধের মার্জ্জনা চাহিয়া সেই রাত্রেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, এখানে যাত্রীপিছু আট আনা করিয়া গভর্ণমেণ্টের টেক্স আদায় করা

আছে। পাণ্ডা মহাশয়েরাই তাহা আদায় করেন। পাণ্ডা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন জোরজুলুম নাই।

৪।

"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে যদিরে শুধু আসিত।" জ্যোৎস্না-স্নাত নবমী নিশায় ষ্টেসন-প্রাঙ্গণে বসিয়া, রমেশ বাবুর হারমোনিয়মের সুরের আড়ালে যামিনী তাহার হৃদয়ের বিরহিণী নারীকে সাহানায় কাঁদাইতেছিল; কিন্তু গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই "তাহার" পরিবর্ত্তে যে আসিল, সেটা—কলের গাড়ী।

রাত্রি বারটার অল্প পূর্ব্বে "পাহাড়তলী" ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এ, বি, রেলওয়ের বড় বড় আফিসগুলি এই পাহাড়তলীতেই অবস্থিত; শুনিলাম, স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর ও দৃশ্য মনোরম; কোকিল যে বসন্তকালের অবসানে দেশ-ছাড়া হয় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া, এখান হইতে জনৈক লেখক প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—সহসা তাহা স্মরণ হওয়ায় প্ল্যাটফরমের চারিধারে একবার চাহিলাম; ভাবটা, তাঁহার উচিত ছিল, এই সময় ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া চেহারাখানা আমাদের দেখানো।

ইহার পরেই চট্টগ্রাম; আমরা প্রস্তুত হইয়া লইলাম। কিয়ৎকাল পরেই বাষ্পযানখানি সকলকেই সেই রেলওয়ের শেষ সীমায় নামাইয়া দিল। সেই নিশুতি রাতেই হোটেল খুঁজিতে বাহির হওয়া গেল—অনেক হোটেলের নাম শুনিলাম, তন্মধ্যে একটির নাম কাণে মন্দ ঠেকিল না; খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিলাম বটে কিন্তু ডাকাডাকি করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া আসিবার পর এমন ভাষায় প্রত্যাখ্যাত হইলাম, যাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না—কেবল বুঝিলাম যে, উহা প্রত্যাখানের ও কাঁচা-ঘুম-ভাঙ্গা অধিকারী-মহাশয়ের ক্রোধ-গর্ভ উক্তি! নামটার পশ্চাতে যে মাধুর্য্য কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহাতে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, সে রাত্রি ষ্টেসনেই কাটাইতে হইল, তবে দুইজন রেলকর্ম্মচারীর সদয় ও উদার ব্যবহারে রাত্রিটি সুনিদ্রাতেই কাটিয়াছিল।

সকাল হইলে আমরা কয়েকজন শহরের বাহির দিয়া ঘোসেলডাঙ্গাঘাট উদ্দেশে বাহির হইলাম; এবং ভারী ভারী জিনিষগুলো লইয়া এখানকার প্রথম সবজজ রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় রাখিতে গেল; বাকী কয়েকজন আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য শহরের ভিতর দিয়া ঘাট-অভিমুখে অগ্রসর হইল। ঘাটটি ষ্টেসন হইতে প্রায় দুইমাইল দূর এবং শহরের প্রান্তসীমায়।

যে নদীটি চন্দ্রহারের মত চট্টগ্রামের কটিতট বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম কর্ণফুলি। কলিকাতার গঙ্গা অপেক্ষা এ নদী ছোট কিন্তু হুগলীর সম্মুখের গঙ্গা অপেক্ষা বড়। আমরা কক্সবাজারের টিকিট ক্রয় করিলাম; আদিনাথ ও কক্সবাজারের একই ভাড়া—পাঁচসিকামাত্র; টিকিটের পশ্চাতে ষ্টীমারের নাম ছাপা ছিল, "S. S. Mallard", কিন্তু তিনি তখনও "ডকে"; একখানি বাচ্ছা ষ্টীমার তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতেছে দেখা গেল; এ প্রতিনিধির নাম "Mavis."

৭।৮ মাইল পথ অতিক্রম করার পর কর্ণফুলির মোহানায় পড়িলাম; এখানকার দৃশ্য ফটো লইবার মত। পূর্ব্বদিকে ছোট ছোট পাহাড়; পশ্চিমে সমতল ভূমি; উভয় তীরে বহুদূরবিস্তৃত বালুচর; নারিকেল ও সুপারিকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে গ্রাম্যকুটীর ও ধান্যক্ষেত্র; সম্মুখে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপ-সাগরের নীলবারিরাশি—আর মাথার উপর আকাশের লঘুনীল চন্দ্রাতপ।

সমুদ্রে যখন পড়িলাম, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। সর্ব্বপ্রথমেই চক্ষে ঠেকিল, নদীর জল ও সাগর-জলের অর্দ্ধবৃত্তাকারে বক্র-ভেদরেখাটি, এবং তৎপরেই দক্ষিণ-পশ্চিম-বেলাভূমি অভিমুখে নাচিয়া-ছুটিয়া-ভাসিয়া-ওঠা-শুভ্রফেনার ফুলের ঢেউ! ইহার পর 'সাগর-তটে নেইকো কেউ' ভাবের একটা কিছু জুড়িয়া দিলে কবিতা হইতে পারিত কিন্তু তাহা করিবার আর সুবিধা পাইলাম না; কারণ—

ঝাঁকে ঝাঁকে সিন্ধু-শকুন আসিয়া ষ্টীমারের জয়পতাকারূপে উড়িতে লাগিল এবং চক্রঘূর্ণনের সহিত উৎক্ষিপ্ত জলরাশি হইতে মৎস ধরিবার কৌতুককর কৌশলের ভিতর আমাদের চিত্তকে একেবারেই আকর্ষণ করিয়া লইল। যতক্ষণ খাড়ির মধ্যে প্রবেশ না করিয়াছিলাম, ততক্ষণ তাহারা ষ্টীমারের সঙ্গ ছাড়ে নাই।

সাগর-তরঙ্গের মৃদুদোলে জাহাজ নাচিতেছিল—সমুদ্রের তিনদিক চক্রবালরেখায় আকাশ আলিঙ্গন করিতেছিল এবং পূর্ব্বতীরে রৌদ্রধৌত শৈল-বেদির উপর তরু-অঞ্চল উড়াইয়া শ্যামা যেন মেঘে মেঘে চুল শুকাইতেছিল। বেলা

সাড়ে বারটার কুতুবদিয়ার কাছাকাছি আসিয়া আমরা একটি খাড়ির মুখে অগ্রসর হইলাম এবং খোলা সমুদ্রের দিকে, দূরে একটা Light house দেখিতে পাইলাম। দূরবীণ সহযোগে অনেকেই সমুদ্র-দৃশ্য দেখিতেছিলেন; মেঘ ও রৌদ্রের বর্ণতুলিকা সাগরবক্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রং ফলাইতেছিল।

মগের মুল্লুক। সঙ্কীর্ণ খাড়ি-পথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কুতুবদিয়া ছাড়াইয়া আমরা আর একটি খাড়িতে পড়িলাম; এ খাড়িটি প্রায় তুই মাইল প্রশস্ত এবং মূল সমুদ্রের সকল দোষগুণের অংশী। বেলা পড়িয়া আসিলেই মহেশখালির ঘাটে জাহাজ থামিল, জাহাজগাত্রে সাম্পান আসিয়া লাগিল এবং একে একে তাহাতে অবতরণ করিয়া, আমরা দ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এই খাড়ির পূর্ব্ব-দক্ষিণ-উপকূলে প্রকৃতির লীলাভূমি কক্সবাজার দেখা যাইতেছিল; সাগর ও সাগরাংশের সঙ্গমতটেই চট্টগ্রামের এই সব-ডিভিসনটি অবস্থিত; চট্টগ্রাম হইতে ইহার দূরত্ব ৯৪ মাইল।

যে স্থানটিকে মহেশখালির ঘাট বলিয়াছি, তাহা প্রকৃত-পক্ষে সমুদ্রের মধ্যস্থল; তীর এখান হইতে প্রায় ৪০ মিনিটের পথ। মাঝিদের মধ্যে একজন মগজাতীয়, দৃঢ়-কায় ও বলিষ্ঠ। শুনিলাম, কক্সবাজারেই মগ অধিবাসী অধিক এবং তাহাদের মধ্যে ধনবান লোকেরও অভাব নাই। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ তাঁতের সাহায্যে সিল্কের কাপড় বয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে; আর পুরুষেরা নেশা করিয়া চেরাংঘর বা idle-clubএ আড্ডা দেয়। আরও অনেক গল্প শুনিতে শুনিতে খাড়ি ছাড়িয়া আমরা একটি খালে প্রবেশ করিলাম—এ সকল গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, বৌদ্ধমন্দিরকে মগেরা ক্যাং বলে এবং দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহারা মৃত-দেহগুলিকে মশলাসংযোগে বৎসরাবধি রক্ষা করিয়া থাকে।

খালপথে প্রবিষ্ট হইয়া যামিনী বাবুর কবিত্ব-সমুদ্রে বন্যা আসিয়াছিল, তিনি যে কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন তাহা এই:—

"হেমন্তের স্নিগ্ধ শান্ত অপরাহ্ণ কালে
জাহাজ যখন ছুটছে নেচে উর্ম্মিমালার তালে
ঠিক সে সময় 'কম্যাণ্ডারের কেবিনের' এক কোণে
পদ্মকরে ন্যস্তকপোল—একলা আপন মনে
বেতের একটি মোড়ার ওপর—পিটপিটিয়ে চেয়ে
অকাতরে ঘুমুচ্ছিল কিশোরী এক মেয়ে!
সযত্নে অযত্নন্যস্ত কোঁকড়ানো তা'র কেশ
ছড়িয়ে পড়ে মুখের ওপর মানাচ্ছিল বেশ—
গাউনআঁটা বাহুলতার পার্শ্ব দিয়া টানি'
ঢাকাই সাড়ীর পাড়ের রেখা নিপুণভাবে আনি'
দিইছিল সে ঢেউ খেলিয়ে কোলের ওপর দিয়ে;
ভঙ্গীটুকু খাসা—তবে হয়নি মেয়ের বিয়ে।"

ধ্রুব আপত্তি করিয়া বলিতেছিল "হ'ল না মশাই হ'ল না, ওখানে লিখ্‌তে হবে:—

"তল্ তল্ ছল্ ছল্ কাঁদিছে গভীর জল
ঐ দু'টি বুট-পরা চরণ ঘিরে—
এস, তবে, এস মোর হৃদয় নীরে!"

মহেশখালির বাজার সম্মুখে সাম্পান ভিড়িল। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, একটি মগ-পল্লী ও ধান্য-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ রেখা-পথে মগনারীবৃন্দের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে আমরা অবিলম্বেই আদিনাথ শৈলের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। এখানে আর শৈলারোহণ ক্লেশ নাই—শৈল-দক্ষিণেই ক্রমশঃ ঢালু সোপান-পথ; দেখিয়া মনে হইল, অল্প দিন মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

আদিনাথ। উপরে আসিয়া দেখিলাম, প্রস্তরের সহিত এ শৈলের সম্পর্ক খুবই কম—এ যেন একেবারেই মাটির মানুষ! জোঁকের জ্বালাই নাই, বন্ধুরতা নাই—যেন ত্রিতল গৃহছাদকে রাঙা মাটি ছড়াইয়া সমতল করা হইয়াছে। শৈলের পূর্ব্বপাদমূল হইতেই সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বালুচরের আরম্ভ; তৎপরেই গর্জ্জন-গভীর সমুদ্র; শৈলোত্তর-প্রান্তে মন্দিরবাটী; পশ্চিমে একখানি আটচালা; দক্ষিণে দুখানি ছোট ছোট কুটীর এবং দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত কাননভূমির পরিখা। আটচালা-খানির কোলে, খোলা সমুদ্রের দিকে, শৈল-সোপান হইতে মন্দির দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সমতল পথ বারান্দার অভাব পূর্ণ করিতেছিল এবং ঐ পথের পূর্ব্ব কোলে বা শৈল-পূর্ব্ব-সীমায় সারিবদ্ধ দোপাটী ও গাঁদা ফুলের গাছ

সরল রেখায় লম্বিত থাকিয়া শৈল-ছাদের আলিসা রচনা করিয়াছিল।

আমরা উঠিবামাত্র, কানন-কোলের কুচো পাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাল আকাশকে চূর্ণ করিয়া দিয়া সূর্য্য অস্তে গেল।

চতুর্থ খণ্ড।

সন্ধ্যায়। জনমানবহীন সাগরতীর; উভয়পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, উর্ম্মি-রেখাঙ্কিত বালুকাসৈকত আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া-অঞ্চলে অস্পষ্ট; পশ্চাতে মসীম্লান পাদপশ্রেণীর ছায়া-বসনের অন্তরালে খদ্যোতহারের এক একটি হীরক চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে; ঝিল্লীমন্দ্রমুখরিত সৈকত-শয্যার উপর কৃষ্ণদেহ সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোল গম্ভীরতর হইয়া আসিতেছে। তিনটি মাত্র প্রাণী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছি —এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া না যায়!

বস্তুতঃ এইদিনকার সন্ধ্যা জীবনের উপর একটি চির-মধুর স্মৃতির রেখা টানিয়া দিয়াছে। এ দিবাবসানে এমন একটি বিশেষ মাধুর্য্য মণ্ডিত ছিল, যাহার সমস্ত প্রকৃতিটুকু পূরবী রাগিণী দিয়া গড়া—যাহার বাহিরের ধ্বনি অন্তরের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়, অন্তরের স্বর বাহিরে বাজিয়া উঠে —যাহার কোলে দাঁড়াইয়া কবির উদাস বীণা আপনিই গায়:—

"ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশী, চুকিয়ে এলাম কান্না হাসি
শ্রান্তকায়ে সন্ধ্যাবায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে!"

দেখিতে দেখিতে দশমীর চন্দ্রকরে সাগর-বক্ষ ও বালুকা-তট বিধৌত হইয়া গেল—ঝিনুকগুলি জ্বলিতে লাগিল — অতীত ও ভবিষ্যৎকে ডুবাইয়া দিয়া আজিকার পরিপূর্ণ বর্ত্তমান প্রগাঢ় শান্তির সুধা-ধারায় স্নান করিয়া দাঁড়াইল। সমুদ্রতীরের হেমন্তকুমারীকে আজ বসন্তরাণীর বেশেই আমরা দেখিতে পাইলাম! লবণ-জলে স্নান করিয়া স্পর্শ-মধুর বাতাসে অঙ্গ শুকাইতে শুকাইতে যখন শৈলশীর্ষে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি।

* * * * *

মন্দির মধ্যে। রাত্রেই মন্দির-প্রবেশ করিয়াছিলাম। মন্দিরের এক কক্ষে শ্বেতপ্রস্তররচিত অষ্ট-ভুজা মূর্ত্তি ও অপর কক্ষে ভৈরবরূপী শিবলিঙ্গ। অষ্ট-ভুজার মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর—ইহার কারুকৌশলের বিশেষত্ব এই যে, প্রভাতে দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত করিলে এটিকে অবিকল রৌপ্যরচিত বলিয়া মনে হয়। ভৈরব সম্বন্ধে প্রবাদ শুনিলাম—যাহার উপর ইঁহার আক্রোশ থাকে, তাহাকে শৈল আরোহণ করিতে না দিয়া, সমুদ্রগর্ভেই ইনি নিমজ্জিত করেন। আমাদের উপর অবশ্যই তাঁহার আক্রোশ ছিল না —তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ এই যে, আমি সশরীরে সকলের হইয়া এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

রাত্রে মন্দিরেই প্রসাদ পাইলাম; বিজয়া-দশমী বলিয়া মন্দিরে আজ প্রসাদের রীতিমত আড়ম্বর ছিল। সামুদ্রিক মৎস্য এখানে পর্য্যাপ্ত; এ সকল মৎস্য অতি সুস্বাদ, নবনীত-কোমল এবং অতিশয় সুলভ। রাত্রে পাহাড়ের চারিদিকে তক্ষক ডাকিতেছিল; আটচালাতেই এ রাত্রি কাটাইতে হইল; সাগর কলস্বরে এ সুখনিদ্রা সুখমৃত্যুতে পরিণত হইলেও কাহারও আপত্তি ছিল না।

প্রভাতে মাঝি আসিয়া আমাদের বিছানাপত্র ঘাটে লইয়া গেল এবং শীঘ্র শীঘ্র যাইবার জন্য তাড়া দিতেও ভুলিল না। মন্দির-পশ্চাতের সরোবরে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি পূজা দিয়া লইলাম—এখানেও পূজা ও প্রণামী সম্বন্ধে কোনও গোল নাই—পাণ্ডা বা পূজারীগণ আশাতীত অমায়িক।

সাড়ে সাতটায় কক্সবাজার হইতে ষ্টীমার ছাড়িবার কথা, কিন্তু এক হাঁড়ি ভাত রাঁধিতেই নলিন সাতটা বাজাইল। দ্বিতীয় হাঁড়ি চড়িবামাত্র ষ্টীমার ছাড়ার বাঁশী বাজিল; অগত্যা ঐ অদ্ধসিদ্ধ প্রথম হাঁড়ি লইয়াই কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। প্রস্তুত হইবার পুর্ব্বেই মহেশখালির ঘাটে ষ্টীমারথামার দ্বিতীয় বাঁশী শুনিতে পাইলাম! সকলেই বলিতে লাগিলেন, আর চেষ্টা বৃথা—ষ্টীমার পাওয়া যাইবে না। তখন একবার দ্বিতীয় হাঁড়িটির পানে করুণ-নয়নে চাহিয়া আমরা দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। দৌড়, দৌড়, দৌড়! বাতাসে উড্ডীন-গাত্র-বস্ত্র-স্পর্শে সোপান-কোলের লজ্জাবতীবন এই নির্লজ্জদের কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল—পথপার্শ্বের ধান্যশীর্ষে বাতাসের ঢেউ লাগিয়া মাথা লুটাইয়া কি হাসিটাই হাসিল!

খানা-পগারের উপর দিয়া, বালুচরের ঝিনুক ছিট্‌-কাইতে ছিট্‌কাইতে, রক্তাক্ত পদে জলের উপর গিয়া পড়িলাম—নৌকা তখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল।

একহাঁটু জলের উপর গিয়া তাহাকে ধরিলাম এবং পানের বস্তার ঘাড়ে চড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলাম। শ্রান্তি দূর হইলে, আবার ভাতের হাঁড়িটির শোক উথলিয়া উঠিল—শেষে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, যদি কখনও দেশের পুণ্যে স্বর্গে জায়গা পাই, তাহা হইলে ঐ তীর্থের রাঁধাভাত সেখানকার অন্নকষ্ট দূর করিবে!

জাহাজখানির নাম 'নীলা'। খাসা নামটি—লোকও মন্দ নয়—প্রায় একটি ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া, সকলকে ডাকিয়া-ডুকিয়া লইয়া, বেলা সাড়ে চারিটার সময় সে আমাদিগকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছাইয়া দিল।

২।

চট্টগ্রামে অবস্থিতির কথা আমাদের প্রোগ্রাম-রূপ রামায়ণে লেখা ছিল না, তবে যে ছিলাম, তাহা নিতান্তই বাধ্য হইয়া। Time-table অনুসারে পরদিন প্রত্যুষেই ষ্টীমার পাওয়া যাইবার কথা, কিন্তু বরিশাল ঘাটে গিয়া শুনিলাম, আজই সকালে একখানি ষ্টীমার ছাড়িয়া গিয়াছে—একদিন পরে আর একখানা যাইবে। আমাদের প্রোগ্রামের নিয়ম ইহারা মানিতে প্রস্তুত হইল না! কি করি—হোটেলে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া, রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম—তার পর, সেখান হইতে যে উঠিতে হইবে, এমন লক্ষণ কাহারও ভঙ্গীতে আর প্রকাশ পাইল না!

দোষ একা আমাদেরই নহে। রজনীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীল বাবুই অতিথি-বরণ করার অপরাধে অপরাধী। রজনী বাবু বা ধ্রুবর পরিচিত সতীর্থগণ তখন ছুটী-উপলক্ষে দেশে গিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সুশীল বাবুই সপরিবারে এখানে ছিলেন। ইনি একজন Oxypathist—এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই তিনি আমাদিগকে এই চিকিৎসা-প্রণালীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিলেন। 'মিসেস আরনেষ্ট' ও 'ডবলিউ আইচ' নামে তাঁহার দুইজন বেতন-ভোগী সহকারীর নাম হ্যাণ্ডবিলে মুদ্রিত ছিল। ভাবিয়াছিলাম, উভয়েই বুঝি ফিরিঙ্গি, শেষে দেখিলাম 'আইচ' মহাশয় নিরীহ 'উমেশচন্দ্র' মাত্র—'আইচ' চাটুয্যে-মুখুয্যেরই মত একটি পদবী।

পরদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম শহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। প্রকাণ্ড শহর; অধিকাংশ দোকানই মুসলমানের; জনবিরল পথগুলির উভয় পার্শ্বে টিলার উপর বড় বড় আপিস ও সাহেবদের বাঙ্গালা; মধ্যে মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু ও শিরীষ-গাছের রৌদ্র-ছায়াময় উপবন। সহরের কেন্দ্রে বক্সীবাজারের দিকটাই খুব সরগরম দেখিলাম; দোকানে পসারে, অট্টালিকায়, উদ্যানে, দীর্ঘিকায়, গাড়ীঘোড়ার যাতায়তে, সালঙ্কারা যুবতীর ন্যায় এ দিকটা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছিল। চট্টগ্রাম কলেজ ও মাদ্রাসা, শহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে; এই মাদ্রাসা যে শৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই এখানে সর্ব্বোচ্চ বোধ হইল। অত্যন্ত দূর বলিয়া চট্টলেশ্বরীর মন্দির দর্শনে যাওয়া ঘটে নাই।

সকাল হইতেই সুশীলবাবু 'টেলিফোন' লইয়া বিব্রত ছিলেন—অল্পদিনমাত্র পূর্ব্বে এই খেলনাটি বাটী আসায়, কারণে অকারণে এটা নাড়াচাড়া করিবার ছেলেমানুষী তাঁহার রীতিমতই রহিয়া গিয়াছিল। Mr. Mukerjee, নামক কোনও নেপথ্যবাসী বন্ধুর সহিত সমস্ত দিনই কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল; তদ্ভিন্ন গ্রামোফোনের গানও ইহার ভিতর দিয়া প্রেরিত হইতেছিল। যাহা হউক, ইঁহার একটি ছেলেমানুষী আমাদের খুবই ভাল লাগিতেছিল—সেটি মুসলমান মক্কেলগণের মুখ হইতে হরিনাম-আদায়; তিনিও অবশ্য আল্লার নাম করিতেছিলেন—তথাপি এরূপ আদান-প্রদানে বেশ একটু নূতনত্ব ছিল। খেলাচ্ছলেও এই তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া, অশিক্ষিত সুতরাং সংস্কারাচ্ছন্ন মুটেমজুরদের গোঁড়ামীর মূলদেশ শিথিল করিয়া দেওয়ায় যত বেশী কাজ হইতেছিল—বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান বাগ্মী বা লেখকের চেষ্টায় বোধ হয় ততটা হয় না; কারণ শেষোক্ত দলের চেষ্টার ফল কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ই উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাত্রি দশটার সময়, আহারাদির পর আমরা ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হইলাম। টেলিফোন করায়, ষ্টীমারের একদিকে আমাদের শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; ষ্টীমার-ক্লার্ক আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই—ঘাট-আফিস হইতেও একটি বাবু তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছিলেন। জগদীশ বাবু বলিলেন—"এবার যাত্রার সময় গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান যে কি রকম ছিল তা' বলতে পারিনে, এ রকম

আদরযত্ন পেলে ইচ্ছে হয় যে, বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিই।"

ভোর পাঁচটায় ষ্টীমার ছাড়িল। এবার পাঁচ ঘণ্টাকাল থাকিতে হইয়াছিল এবং একটি মাত্র স্থানে, চঞ্চল সমুদ্র ও স্থির আকাশের মিলন-ক্ষেত্ররূপে দিক্-চক্রের সম্পূর্ণ পরিধিটি দেখিতে পাইয়াছিলাম—অন্যত্র একদিকের অস্পষ্ট তীর সর্ব্বক্ষণই দেখা যাইতেছিল। হাতিয়া প্রভৃতি বাল্যশ্রুত দ্বীপ অতিক্রম করার পর মেঘনার মোহানামুখে আমরা সমুদ্রকে পরিত্যাগ করিলাম এবং অসংখ্য অজ্ঞাতনামা নদনদীর ভিতর দিয়া, পরদিন বেলা ৯টার সময় বরিশালে পৌঁছিলাম। রাত্রি নয়টায় পৌঁছিবার কথা কিন্তু মালের প্রাচুর্য্যই এই ১২ ঘণ্টামাত্র বিলম্বের কারণ। আসল কথা, প্যাসেঞ্জার বড় একটা এ পথে যায় না, প্রধানতঃ মাল-বহন করিবার জন্যই এ সকল Serviceএর প্রয়োজন—কাজেই time-tableএ যাহাই থাক্, কার্য্যক্ষেত্রে অমন একটু আধটু দেরী প্রায়ই হইয়া থাকে।

বরিশাল সহরটিও দিব্য একখানি ছবির মত। নদী-তীরের প্রশস্ত ভ্রমণ-পথটি নদীর সহিত সমদূরত্ব বজায় রাখিয়া বাঁকিতে বাঁকিতে বহুদূর গিয়াছে—ধারে ধারে ঝাউ ও অন্যান্য তরুশ্রেণী। এখানে নামিয়াই আমরা, বরিশাল-গৌরব অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের বাটী ও ব্রজমোহন কলেজ দেখিয়া আসিলাম। অশ্বিনী বাবু এ সময় সপরিবারে কলিকাতায়। খাবারের দোকানে এ দেশে ঘৃতের ব্যবহার নাই—সমস্তই তৈলে পাক করা হয়। পুলিস-আইন-অনুসারে এখানকার হোটেলের খাতায় বিদেশী-দিগকে নামধাম লিখিয়া আসিতে হয়, আমাদিগকেও লিখিতে হইয়াছিল।

খুলনার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কিরণচন্দ্র কীর্ত্তি মহাশয়কে, খাবার রাখিবার জন্য, চট্টগ্রাম হইতে টেলিগ্রাফ করিয়া-ছিলাম। প্রাতে ষ্টীমার পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম, তিনি ভৈরবতটে লোকজনের সহিত দাঁড়াইয়া আছেন। আঁখির মিলনের ভিতর দিয়াই "বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি, প্রেমের বিরহকতে চন্দন-লেপন" হইয়া গেল। আমরা গাড়ীতে উঠিবামাত্র, তিনি কলাপাতা, মাটির গ্লাস ও জলের কুঁজো হইতে আরম্ভ করিয়া 'চ্যাঙারী', 'মাল্‌সা' ও হাঁড়ির পর হাঁড়ি তুলিয়া দিতে লাগিলেন; ভক্তিভরে 'চিরসুন্দর'-উদ্দেশে আমরা গাহিতে লাগিলাম :—

"আজো তুমি যাওনি ছেড়ে 'চ্যাঙারী' তা'র সাক্ষ্য দেয়,
লুকিয়ে হাসো হাঁড়ির ভেতর, ছানাবড়ার লাল্ শোভায়"

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহার পর আমাদের মত উদর-পরায়ণ লোক আর 'ভ্রমণ-চিত্র' লইয়া ভুলিতে চাহে না। সম্ভবতঃ, পাঠকবর্গও বহু পূর্ব্বে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। অতএব ভাঙা আসরে এইবার যবনিকা ফেলা গেল।

শক্তি-সাধনা *

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B.A.]

উঠ সংযমী হে রাজ-তাপস
সফল তোমার সাধনা,
সার্থক তব পূজা-আয়োজন,
শ্মশানেতে নিশি যাপনা।
সার্থক হ'ল পঞ্চমুণ্ডী,
চণ্ডাল শব-পরশন,
মোহ-মেঘ আজ কাটিয়া গিয়াছে,
দিয়াছেন দেবী দরশন।
জয় করি ভীতি শত প্রলোভন
মায়ার ব্যূহটি ভাঙিয়া,
হৃদয়-রক্ত অলক্তে দে'ছ
দেবীর চরণ রাঙিয়া।
লভেছ অভয় চির বরাভয়,
হেরেছ জ্যোতির্ম্ময়ীরে,
লভিয়াছ দাগ রাঙা চরণের
হয়েছ মরণজয়ীরে।
ঘৃণ্য শবের সঙ্গ-দূষিত
শ্মশানেতে নিশি গুঞ্জারি,
নীরব সাধনে তুষেছ দেবীরে,
ঘরে ফিরে এসো পূজারি।

---

* বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের 'বিজন বিজলি' কাব্যগ্রন্থের 'শক্তি-সাধনা' নামক মনোরম চিত্র দর্শনে।

ভারতে আর্য্য-অভিযান

[রায় বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, M. A. B. L.]

সমস্ত ভূমণ্ডল এখন আর্যাজাতির গৌরবকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, প্রশান্ত সাগরের মহাদ্বীপ সকল, সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ এবং আসিয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশে উপনিবেশ করিয়াছেন। চীন, জাপান, তুরুস্ক ইত্যাদি দেশ ব্যতীত অন্য সকল দেশই তাঁহাদের অধীন। স্লাভোনিয় রুসগণ উত্তর-পশ্চিম আসিয়া হইতে সমস্ত আসিয়া ছাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই যে আমরা অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবকারী মহাসমর দেখিতেছি, ইহা এই আর্যাজাতির দুই শাখা, টিউটন ও স্লাভোনিয়, ইহাদের মধ্যে কে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবে, তজ্জন্য পরস্পরের বল-পরীক্ষা মাত্র। যদি জার্ম্মান জয়লাভ করে, তবে আসিয়া-মাইনর দিয়া সমগ্র আসিয়া ছাইয়া যাইবে। আর যদি রুষ জয়লাভ করে, তবে কনষ্টান্টিনোপল, তুরুস্ক-পারস্য দিয়া সমস্ত আসিয়া অধিকার করিবে। উভয়েই মনে করে যে, তাহাদের বৃদ্ধিশীল জাতির জন্য তাহাদের দেশে স্থান নাই এবং সমগ্র পৃথিবী না হইলে সে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। এইজন্য এই ভীষণ মহাসমর। এইজন্য আর্য্য-জাতি সকল প্রাণার্পণ করিয়া প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় বর্ত্তমান যুগের কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিধ্বংসকারী অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত।

এই আর্যাজাতি গত পঞ্চসহস্র বৎসরে সভ্যতার আলোক, বিজ্ঞানের প্রভাব, দর্শনের রশ্মি, সাহিত্যের স্নিগ্ধতা, সর্ব্বপ্রকার কাব্যকলার সৌন্দর্য্য ও নৈতিক পবিত্রতা পৃথিবীতে বিস্তার করিয়া মানবজীবন মহিমান্বিত করিয়াছে। মানব এখন বিজ্ঞানবলে প্রায় প্রাচীন দেবতা-গণের সমান প্রভাবশালী হইয়াছে এবং সেই দেবতাগণের নৈতিক ব্যবহার শুনিয়া পরিহাস করিতেছে। এই মহান্ জাতির প্রথম গৌরবের অধিষ্ঠানভূমি ভারতবর্ষ ও ইরাণ। এই প্রবন্ধে সেই আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পর হইতে কি প্রকার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সঙ্কুচিত বর্ণনা করিতে একজন গিবনের ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের প্রয়োজন। আমি ভরসা করি যে, কোন দিন ঐরূপ মহান্ ঐতিহাসিক এই বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া ধন্য হইবেন। আমি এই সামান্য প্রবন্ধে সেই বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব যেন ভবিষ্যতে কোন মহান্ ব্যক্তি এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া, তাঁহার গবেষণার ফল উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত করেন। এই মহান্ আর্য্যজাতি সর্ব্বদাই বিজয়ী—কখনও অনার্য্য জাতির অধীন হন নাই। বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পারস্য ও ভারতবর্ষে তাঁহারা বিজিত হইয়া পরাধীন হইয়াছেন। ইহার কারণও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ইতিহাসের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে, যে সকল ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত বলেন, আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আমাদের সহিত অন্য জাতির কোন সম্বন্ধ নাই, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন বিজ্ঞান, প্রাচীন সভ্যতা দেবদত্ত, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু হইতে পারে না এবং আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ—সকলের—আমাদের বিজেতা প্রভুগণেরও, পূজার্হ, তাঁহাদের তর্কশক্তি ও পাণ্ডিত্য অসামান্য। অসামান্য বিষয়ে সামান্য পৃথিবীবাসী মানবের প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের তর্ক, পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাদেরই আছে ও থাকিবে, মানবজাতির তাহাতে কিছু আসিবে বা যাইবে না। সুতরাং সে সকল মোটেই আলোচনা করা উচিত নহে। সে সমস্ত বিচার করিলে প্রবন্ধ-কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক গবেষণার ফল-সকল সিদ্ধান্ত-স্বরূপ গণ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য।

প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপীয় আর্য্যগণ ও ইরাণ ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ মূলতঃ একজাতি। ভাষার ও সামাজিক নিয়মকানুনের মূলে ঐক্য, প্রমাণ করিয়া

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত অহঙ্কারে তাহা গ্রাহ্য করেন না এবং ইদানীং রিসলি-প্রমুখ হিন্দু-বিদ্বেষী কোন কোন ইংরাজ পণ্ডিতও হীন পরাধীন জাতি যে আর্য্য, তাহা অস্বীকার করিতেছেন। এই উভয় শ্রেণীর লোকের মতই উপেক্ষণীয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ইরাণীয় ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অন্য শাখা সকলের ইউরোপ অভিমুখে অভিযানের পরেও একত্র ছিলেন এবং পরে পৃথক্ হয়েন। এক শাখা পারস্যে থাকেন; আর এক শাখা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবাসী আর্য্যগণ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে যখন পারসীকগণের সহিত একত্র ছিলেন, সেই সময়েই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। এই তিন জাতি পারসীকদিগের মধ্যেও ছিল। আমাদের দেশের অসামান্য পণ্ডিতগণ ও সমাজ সংস্কারকগণ জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সকল অসাধারণ মীমাংসা করেন, তাহাও উপেক্ষণীয়। *

যজ্ঞোপবীত, অগ্নিহোত্র ও দ্বিজত্ব পারসীকগণের মধ্যেও ছিল এবং এ সকল বিষয়ে ভারতবাসী ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব দেখা যায় না—পরন্তু বুদ্ধ-যুগে অগ্নিহোত্র ভারতবর্ষে উঠিয়া যায় এবং আদিত্যপুরাণের বচনবলে তাহা সমুদ্রযাত্রার ন্যায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়; † কিন্তু প্রাচীন পারসীকদের মধ্যে তাহা বরাবর ছিল এবং মুসলমান দৌরাত্ম্যে যখন তাঁহারা তাঁহাদের জাতি ভারতবাসী-আর্য্যগণের আশ্রয় লন, তখন তাঁহারা প্রাচীন বিশুদ্ধ আর্য্যরীতি সকল পুনরায় ভারতবর্ষে লইয়া আসেন এবং এখনও সেই সকল পালন করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্রাচীন আর্য্য-ব্রহ্মণ্য পার্সিদিগের মধ্যে যে পরিমাণে বিশুদ্ধ আছে, ভারতবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সে পরিমাণে নাই। অঙ্গিরা-প্রবর্ত্তিত অগ্নিহোত্র, যাহার জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পূর্ব্বে গণ্য হইতেন, তাহা ভারতবর্ষে কেবল পারসীকগণের মধ্যেই আছে। ব্রাহ্মণ-সভার সভ্যগণ এবং তাঁহাদের পৃষ্টপোষক পণ্ডিত ও লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয় অনুধাবন করিবেন।

এখন দেখা যাউক, আর্য্যগণ কি প্রকারে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ যাযাবর জাতি ছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাডিস বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকগণ যাযাবর জাতি ছিলেন। রোমক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন টিউটন বা জার্ম্মানগণও যাযাবর জাতি ছিলেন। আর্য্য শব্দের অর্থ কৃষক, ইহার প্রামাণিকত্বে সন্দেহ আছে। এই শব্দ মাননীয় অর্থে পারসীকদের ও ভারতবাসী আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহাতে বোধ হয় যে, আর্য্যগণ ইরাণ দেশে প্রথম কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সে যাহাই হউক, ইঁহারা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ইঁহাদের অধিকাংশ যাযাবর পশুপালক ছিলেন এবং ইঁহাদের প্রধান ধন গোধন ছিল।

সেই দীর্ঘকায় উন্নতনাসিক উন্নতললাট শ্বেতবর্ণ বীরগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প ছিলেন। প্রথমে ভারতবর্ষ অর্থাৎ গান্ধার ও কাবুল প্রদেশ ও পঞ্জাবে তাঁহারা অভিযান করেন, ইহা বেদোক্ত নদীগণের নামের দ্বারা প্রমাণ হয়। সমস্ত যাযাবরগণের ন্যায় তাঁহারা অভিযান-কালে নানা বিঘ্নে ব্যতিব্যস্ত হইতেন। এই জন্য ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে এই প্রার্থনা রহিয়াছে—"আমাদিগকে সুন্দর তৃণযুক্ত দেশে লইয়া যাও, আমরা যেন পথে বিঘ্ন না পাই।" পুনরায় সপ্তম মণ্ডলের ৭৭।৬৫ সূক্তে মিত্রাবরুণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—"আমাদের গোচারণ স্থান সকল উত্তম জলযুক্ত কর—আমাদিগকে বিস্তীর্ণ তৃণযুক্ত পশুচারণ স্থান দেও, যেখানে কোন উপদ্রব না থাকে।" কিন্তু এই যাযাবরজাতি কেবল গো ও পশুপালক ছিল না। তাঁহারা

---

* হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলেন যে তাঁহারা প্রথম হইতেই ব্রহ্মার মুখ হইতে সমুদ্ভূত। সমাজসংস্কারক পণ্ডিতগণ বলেন যে, জাতিভেদ বৈদিক সময়ে ছিল না, পরে দুষ্ট ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি। প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে অথর্ব্বান্ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, ক্ষত্র অর্থাৎ সংগ্রামশীল রাজন্য ও বিশ্ অর্থাৎ সাধারণ প্রজা এই তিন জাতি ছিল। See Civilizations of Eastern Iranians in ancient times by Dr. Wilhelm Geiger.

† অগ্নিহোত্রংগবালম্ভ লেহোলীঢ়া পরিগ্রহঃ **
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। আদিত্যপুরাণম্।

জয়ব্যস্ত্রী বীর, রথ, অশ্ব ও নির্জ্জিত দাসসকল তাহাদের সম্পদ। এইজন্য ঋগ্বেদের ৭ম, সূক্তে ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন "আমাদিগকে বীর পুত্র সকল এবং গোধন ও অশ্ব প্রদান কর।" পুনরায় ৮ম, ৫, সূক্তে ঋষি এই প্রার্থনা করিয়াছেন— "আমাদিগকে শত গর্দ্দভ, শত লোমযুক্ত মেষ ও শত দাস প্রদান কর।" যখন হইতে ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে এই জাতি লোকগোচর হয়, তখনই ইহাদিগকে মহাবীর, অশ্বারোহী এবং গো, মেষ ও বিজিত দাসগণ দ্বারা পরিবৃত দেখিতে পাই। যখন সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষে ইহাদের অবনতির চরম সীমায় ইহাদিগকে দেখি, তখনও ব্রাহ্মণশাসনসমূহে ইহাদিগকে গো, মেষ ও দাস পরিবৃত দেখি। ইহারা হয় রাজন্য, নয় ভূদেব ব্রাহ্মণ। এই যাযাবর জাতি ভারতবর্ষে যখন প্রথম অভিযান করেন—তখন কিরূপ সমাজ-শাসন ছিল, তাহা একবার দেখা যাউক।

সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যেই ইঁহারা এক একজন বিশ্‌পতির অধীনে যুদ্ধ করিতেন। ঋগ্বেদে এই প্রধানকে বিশ্‌পতি আখ্যায় অভিহিত দেখি। জার্ম্মানেও বিশ্‌পতি, জেন্দ পারসীক বেশপৈতে, লিথোনীয় উইস্বপতি, রুস বিস্বপতি- -শব্দদ্বারা প্রকাশ সর্ব্বত্রই ইহারা ঐ প্রকার প্রধানের অধীনে অভিযান করিতেন। ইহাদের মধ্যে গোত্র ও গ্রাম, গ্রামসমষ্টি বিশ্‌ ও বিশ্‌-সমষ্টি জন ছিল। এই জন-পতি রাজন্‌-আখ্যায় সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে অভিহিত হইতেন। রাজার বংশীয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্র, রাজন্য নামে আখ্যাত ছিলেন। যখন এই জনসকল রাজন্য-গণের অধীনে একত্র হইয়া অভিযান করিতেন, তখন এক মহাবীর বিশ্‌পতিকে তাঁহারা নির্ব্বাচন করিয়া প্রধান করিতেন। এই বিশ্‌পতির ক্ষমতা অসীম ছিল। তিনি বিজিত দেশসকল রাজন্যবর্গের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। এই ক্ষত্র বা রাজন্যগণ একজন মহারাজের অধীনে সংগ্রামে যোদ্ধা দিবার অঙ্গীকারে ভূমি ভোগ করিতেন। আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত না হইলে ইঁহাদের চলিত না। দেবতায় ও মন্ত্রতন্ত্রে ইঁহাদের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। সংগ্রামে অভিচারমন্ত্রবিদ্‌ অথর্ব্বন্‌ সংগ্রামস্থলে অবস্থিত পুরোহিত ইন্দ্রকে আবাহন করিয়া তাঁহার দ্বারা জয় দান করিতেন। সকল কার্য্যে এই ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রয়োজন ছিল, তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্‌, মন্ত্রবিদ্‌, তপস্বী এবং বীর। ব্রাহ্মণগণ রাজন্যগণের নিকট গো, মেষ ও বহুদাসযুক্ত শাসন গ্রাম প্রাপ্ত হইতেন এবং সর্ব্বকার্য্যে বহুদান গ্রহণ করিতেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণগণ সংগ্রামশীল বীর ছিলেন,— ভার্গবপরশুরাম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা তাহার দৃষ্টান্ত। পরে ইঁহারা বিদ্যা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সংগ্রাম পরিত্যাগ করেন। উত্তম ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রধান কার্য্য যুদ্ধগমন, অভিচার, জ্যোতিষ ও রোগ-উপশম কার্য্য সকল ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব এসকল কার্য্য শ্রমণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া নিয়ম করেন। উত্তম ব্রাহ্মণগণও বোধ হয়, সেই দৃষ্টান্তে এই সমস্ত কার্য্য হীন বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

প্রাচীন পারস্য-ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বৈশ্যগণ প্রাচীন পারস্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দাসস্বরূপ, গ্রীকগণের হিলটের ন্যায়, ভূমিকর্ষণ করিত। ইহারা যখন ভারতে আগমন করে, তখন আর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং বিজিত আদিম অধিবাসিগণ দাসস্বরূপ গণ্য হয়। যাহা হউক, এই বীরজাতি গান্ধার ও কাবুল ও সপ্তসিন্ধু-সেচিত উত্তর ভারতের প্রান্তে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। তখন সিন্ধু মহানদী, স্বরস্বতীও মহতী বেগবতী নদী, এখনকার ন্যায় রাজপুতানার মরুভূমিতে লুপ্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নহে।

যে সকল বিশ্‌পতি প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন, মহাবীর সুদাস তাঁহাদের প্রধান। বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত। ইন্দ্র তাঁহাদের অভীষ্টবর্ষী দেবতা। এই বশিষ্ঠের পৌরহিত্যে ও অভিচার-মন্ত্রের বলে এবং ইন্দ্র ও বরুণরক্ষিত সুদাস পঞ্চ-নদপ্রান্তে দশ জন সম্মিলিত আদিম ভারতবাসী যজ্ঞ-রহিত অনার্য্য রাজাকে বিধ্বস্ত করিয়া, ভারতে আর্য্য-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (ঋগ্বেদ, ৭ম ৮৩ সূক্ত)। সেই মহাযুদ্ধের সময়,—যাহার কোলাহল দ্যুলোক আরোহণ করিয়াছিল,—পুরোহিতগণের পৌরোহিত্য সফল হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ও স্তোত্রপাঠকারী জটাধারী তৃৎসুগণ ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিলেন। (৭ম ৮৩ সূ)। সেইযুদ্ধে অসুর, মিত্র (বরুণ ও অর্য্যমা) হিন্দু ও পারসীক উভয়ের দেবতা, সুদাসের সহায় হইয়াছিলেন। সেই দেববান রাজার পৌত্র, পিজবন বা দিবোদাস রাজার পুত্র সুদাসের প্রদত্ত চতুরশ্বযুক্ত রথ তাঁহার পুরোহিত শক্তিপুত্র পরাশরবশিষ্ঠকে বহন করিয়াছিল। সেই সুদাস্‌ ইন্দ্রের রাজার পৌত্র ও রাজার পুত্র, হইলেও যখন

" Mercy "—কৃপা-ভিক্ষা

চিত্রশিল্পী—স্যর্ জে. ই. মিলে. Bart., P. R. A.]

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

ভারতে অভিযান করেন, তখন তৈমুরলঙ্গের প্রপৌত্র বাবরের ন্যায় স্বদেশ-বিতাড়িত দরিদ্র যোদ্ধামাত্র ছিলেন। তিনি কাবুলের নিকট অদীনা নদীর তীরে পারসীক চয়মানের পুত্রে কবি দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। * সেই চয়মান সম্রাট ও যজ্ঞকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (৬ ম ২৭ সূ)। সুদাস বহু শত্রু দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। দূরদেশ হইতে অশ্বারোহী ও রথী সকল লইয়া শতদ্রু ও বিপাসা নদীর সঙ্গমস্থলে সলিলরাশি কষ্টে পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। (৩ম ৩৩ সূ)। যদু ও তুর্ব্বসুও বহুদূরদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। (৬ম ৪৫সূ)। তাঁহারা বোধ হয় পরে আসিয়া সুদাসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

"ইন্দ্র সেই দরিদ্র সুদাসের দ্বারা" ভারত-জয়-রূপ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। "প্রবল সিংহকে ছাগ দ্বারা হত করিয়াছিলেন," "সূচী দ্বারা যূপাদির কোণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।" (৭ম ১৮ সূ) বহুজনপদ এই সুদাস জয় করেন। ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ ইঁহার সহায় হইয়াছিলেন। পৌরবগণের পূর্ব্বপুরুষ পুরু সুদাসের একজন সেনানী ছিলেন। (৭ম ১৯সূ)। যদুকে এই সুদাস জয় করিয়া বশীভূত করেন। যদু ও তুর্ব্বসু অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। (৮ম ৭সূ)। 'আর্য্য শ্বেতবর্ণ পবীরু' তাঁহার সেনানী ছিলেন। (৮ম ৫১সূ)। ইন্দ্র তাঁহার জন্য দশ সহস্র সৈন্যের সহিত "দ্রুতগামী অনার্য্য কৃষ্ণকে অংশুমতী নদীতীরে বধ করিয়াছিলেন।" (৮ম ৯৬সূ)। হিমালয়প্রান্তে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে তিনিই প্রথমে ভারতে যজ্ঞ করেন। (৮ম ৬সূ)। বেদে সুদাস-বিজিত অনেক অনার্য্য রাজার কথা আছে। দাসগণ দ্বারা আর্য্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা লেখা আছে এবং ক্রমশঃ অনেক দাসগণ আর্য্যগণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা বর্ণিত আছে যে এক বিপ্র "গো ও অশ্ব রক্ষক" বল্বুথ নামক দাসের নিকট শত গো ও অশ্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন (৮ম ৪৬সূ)। এই সংগ্রামশীল বীরজাতির কীর্ত্তিবর্ণনাকারী ঋগ্বেদের এবং রামায়ণ-মহাভারতাদির যুদ্ধবর্ণনায় একটু পার্থক্য আছে। বেদ সত্য ইতিহাস। সুদাস ও তাঁহার আর্য্য যোদ্ধাগণ শিরে শিরস্ত্রাণ ধারণ করিতেন ও মর্ম্মস্থান সকল বর্ম্মে আবৃত করিতেন। রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ হস্তত্রবক্ষিতহস্তে ধনুঃ ও পৃষ্ঠে রিষ্টি বা বর্ষা, শরপূর্ণ তূণীর ও কটিদেশে খড়্গ ধারণ করিয়া ও রথিগণের সারথী সকল কশাহস্তে অশ্বতাড়ন করিয়া যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ গাত্রে হিরণ্ময় কবচ ধারণ করিতেন। শর সকল মন্ত্র দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হওয়ার কথা একস্থানে আছে সত্য, কিন্তু গ্রীক পারসীক আদির ন্যায় তাঁহারা পরস্পর "স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে" সত্য যুদ্ধ করিতেন। পুরাণে বর্ণিত বহুচক্র রথসকল জগন্নাথের শোভাযাত্রার রথের ন্যায়, হয়ত হনুমান চূড়ায় বসিয়া আছেন, মধ্য-প্রকোষ্ঠে ধন্বী এবং বাহিরে রথী অবসরমত গভীর দর্শন চর্চ্চা করিতেছেন। ইহা কাব্যের ও শোভাযাত্রার উপযোগী। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণের একজন-সংলগ্ন চতুরশ্বযুক্ত ভীষণ তীক্ষ্ণ কৃপাণ-গ্রথিত দ্বিচক্র যুদ্ধরথ ভুবনবিজয়ী গ্রীক ও পারসীক বীরগণের রথের ন্যায় ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, গন্ধর্ব্ববাণ, বানর ও রাক্ষস যোদ্ধাদের বর্ণনায় পূর্ণ। এসকল কথা বেদে নাই। এইজন্য বেদে সত্য ইতিহাস পাওয়া যায়। এই মহান্ ভারতবিজয়ী ইন্দ্ররক্ষিত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবীর সুদাস রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণাদির কল্পনায় ঋতুপর্ণের পৌত্র ও সর্ব্বকামের পুত্র একজন সামান্য রাজা এবং তাঁহার পুত্র সৌদাস অভিশপ্ত পাপদগ্ধ রাক্ষস রাজা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার হীনত্ব ও ব্রাহ্মণ বশিষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা ইহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য। কিন্তু দেববান রাজার পৌত্র সুদাসের "পুত্রবৎ পালনীয় পুরোহিত বশিষ্ট" (৭ ম ১৯সূ) পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের এই কার্য্যে কিরূপ অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তাঁহাদের কি শাস্তিবিধান করিতেন, তাহা বিশ্বামিত্র একবার বুঝিয়াছিলেন এবং তাহা পাঠকও একবার কল্পনা করিবেন। পুরুকুৎস সুদাসের একজন সেনানী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ত্রসদস্যু ও পুরু (৭ম ৯সূ)। বিষ্ণুপুরাণে পুরুকুৎস ত্রসদস্যুকে নর্ম্মদাতীরে জয় করিতেছেন, বর্ণিত আছে। (বিষ্ণুপুরাণ ৩অ ১৩)

দ্রুহ্য, অনু, তুর্ব্বসু, সুদাস-বিজিত রাজগণ (৭ম ১৮ সূ) তাঁহার বশীভূত হইয়া (৭ম ১৯ সূ), তাঁহার সেনানী মধ্যে পরে পরিগণিত হয়েন। পর্ব্বতশিখরস্থ (৭ম ৮ সূ) মহান্ ইন্দ্রদেব সুদাসের সহায় হইয়া কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য যজ্ঞহীন জাতিসকলের পর্ব্বতশিখরস্থ পুরী সকল বিদীর্ণ করিয়া

* চয়মান পৃথু বংশের ও তাঁহার পুত্র অভ্যাবর্ত্তী সম্রাট (৬ম ২৭সূ)

পুরন্দর নাম প্রাপ্ত হয়েন। সুদাস সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগের ন্যায় এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে বেলজিয়ানদিগের ন্যায় প্রয়োজন হইলে গিরিনদীর কুল ভেদ করিয়া শত্রুসেনা ভাসাইয়া দিতেন। তিনি সমুদ্র ও নৌপথে গান্ধার ও বেলুচিস্থান হইয়া সিন্ধুপ্রদেশে দাসগণকে অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি কাবুলের উত্তরে ইরাণীয়গণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবের নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়া পদাতি, অশ্বারোহী ও রথীসহস্র লইয়া বর্ম্মপরিহিত জীমূতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন (৬ম ৭৫সূ), এবং দশজন মিলিত দ'সরাজাগণের সহিত যুদ্ধে, "যেখানে ধ্বজায় আয়ুধ সকল পতিত হইয়াছিল," "যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করিয়া মিলিত হইয়াছিল ও দূতগণ স্বর্গদর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিল," "যেখানে ভূমির অন্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল" এবং "কোলাহল দ্যুলোক আরোহণ করিয়াছিল,"—সেই ভীষণ সংগ্রামে বিজয়-মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। (৭ম ৮৩সূ)। সেই মহারাজ-চক্রবর্ত্তী যাঁহাদ্বারা পরাজিত "অজ, শিগ্র ও যক্ষু * এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।" "যে সুদাসের যশঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীমধ্যে অবস্থিত, সেই দাতাশ্রেষ্ঠ যিনি শ্রেষ্ঠলোককে ধনদান করেন, সপ্তলোক যাহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করিত," সেই বীরশ্রেষ্ঠ সুদাস যাঁহার সেবায় পরিতৃপ্ত মিত্রগণের পূজয়িতা "অগ্নি ও যজ্ঞহীন দস্যু-গণকে স্থানচ্যুত করিয়া ভারতভূমি আর্য্যজাতিকে প্রদান করিয়াছিলেন, (৭ম ৫ সূ)।" যিনি দানের মহত্ত্বে ও অতিথি-সেবার জন্য আতিথিগ্ব এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,—তিনি পুরাণে সামান্য রাজা মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া রাক্ষস-বানরের যুদ্ধের কথা, অগ্নিবাণ বরুণবাণদ্বারা কাল্পনিক যুদ্ধের কথায় মগ্ন থাকিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কখনও সত্য মহা-সমরে বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাহাও অপ্রমাণ করিতেছেন। অশোকের পর বহুদিন বৌদ্ধ-ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকায় ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের অদ্ভুত গল্পের প্রভাবে, হিন্দু তান্ত্রিক-গণও পুরাণ-রচনা-কালে সত্য যুদ্ধ কিরূপ তাহা না বর্ণনা করিয়া অদ্ভুত যুদ্ধ সকলের বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদাসের যুদ্ধ সকল সামান্য যুদ্ধ নহে। তাঁহার কোন কোন যুদ্ধে ৫০ সহস্র ও ৩০ সহস্র কৃষ্ণবর্ণদাস বিনাশের কথা লিখিত আছে। (৪ম ১৬সূ)।

সুদাসের সামাজ্য মগধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল (৩ম ৫৩ সূ)। গঙ্গা, যমুনা ও সরযূ তীরে তাঁহার রণকীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছিল।

সুদাস, যদু, অনু, দ্রুহ্যু, তুর্ব্বসু, পুরু, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু ও চেদিবংশীয় কশু* সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সুদাস প্রাচীন ইরাণীয় ভরতবংশীয়, স্বদেশ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া ভারত অভিযান করিয়াছিলেন। যাদব ও পৌরবগণও আর্য্য-রাজন্য সুদাস কর্ত্তৃক পরাজিত ও তাঁহার বশীভূত ‡ সেনানী ভারতজয়ের সহায়ক ছিলেন। শ্বেতবর্ণ, মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারী বাশিষ্ঠগণ §, ভার্গবগণ, কণ্বগণ, অঙ্গির বংশীয়, অত্রিবংশীয় ও অগস্ত্যবংশীয় পুরোহিতগণ ও পারসীক উশনাকবিবংশীয়, বিশ্বামিত্রবংশীয়, কশ্যপবংশীয়, গোতম বংশীয়, ভরদ্বাজবংশীয় ও অন্যান্য বিপ্রগণ সুদাসের সঙ্গে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

দাস-রাজশ্রেষ্ঠ কুলিতরের পুত্র শম্বর, যাঁহার শত পাষাণ-নির্ম্মিত পুরী ছিল এবং যিনি তাঁহার পুরী সকল দুর্ভেদ্য মনে করিতেন, তিনি পার্ব্বতীয় যুদ্ধে সুদাস কর্ত্তৃক নিহত হন (৪ম ৩৮ সূ)। যেমন পরে রোমান ও গ্রীকগণ, যাহাদের কথা বুঝিত না, তাহাদিগকে বাক্যহীন বর্ব্বর বলিত, সেইরূপ আর্য্যগণ দাসদিগকে বাক্যহীন ও যজ্ঞহীন বলিয়া ঘৃণা করিত। (৫ম ২৯ সূ)। সেই দাস মনুষ্যগণ নিন্দনীয় ও সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত ছিল। (৪ম ২৮ সূ)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুদাস সহস্রসূ বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র একজন পুরোহিত ছিলেন (৩ম ৫৩সূ)। কিন্তু বাশিষ্ঠগণ তাঁহার কুল-পুরোহিত। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে বাঁধিয়া আনিয়াছিল এবং দুইবংশে অশ্ব ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা যুদ্ধ হইয়াছিল। (৩ম ৫৩সূ)। কুৎসাদি ঋষি তখন শুষ্ণাদি দাস রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (১ম ৫১সূ)। ব্রাহ্মণগণও তখন মহাবীর

---

* বোধ হয় অক্সাস্ বা অক্ষু নদীর তীরবর্ত্তী অধঃস্থল তুর্কীপ্রদেশ।

* (৮ম ৬ সূ)

‡ ৮ম ৭ সূ)

§ (৭ম ৩৩ সূ)

ছিলেন, এবং এইজন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহমন্ত্রে কন্যাবীরপ্রসূ হউক এই প্রার্থনা আছে।

সুদাসের সময়েই ভারতের অনেক স্থানে আর্য্য সামন্ত রাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু তন্মধ্যে একজন মহান্ রাজা। ৮ম ১৯ সূ। যদু ও তুর্ব্বসু অনভিষিক্ত হইলেও পরে রাজপুতানার মরুদেশ জয় করিয়া পরাক্রান্ত রাজা হয়েন। পঞ্জাবের গোমতী তীরে রথবীতি আর্য্যরাজা ছিলেন (৫ম ৬১ সূ)। প্রতর্দ্দনের পুত্র ক্ষত্রশ্রীও একজন আর্য্যযজ্ঞকারী রাজা ছিলেন। চেদিবংশীয়গণও এই সময়েই কশু রাজার অধীনে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। (৮ম ৫সূ)। অনার্য্য কীকট অর্থাৎ মগধ দেশ সুদাসের রাজ্যের প্রান্তে ছিল। তখন মগধের রাজা অনার্য্য প্রমগন্দ ছিলেন। (৩ম ৫৩ সূ)। অনুর বংশধর চিত্ররথ সরযূর অপর পারে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সুদাস দ্বারা বিজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

উগ্রদেব, নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ, তুর্ব্বীতি প্রভৃতি বহু আর্য্যবীর সুদাসের আহ্বানে "দূরদেশ" হইতে ভারতে আগমন করিয়া অবস্থানের ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুতবউদ্দিন আইবেক ও বাবরের সময়েও এইরূপ দূরদেশ হইতে পাঠান ও মোগল বীরগণ ভারতে আহূত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় বেদে প্রকাশ, ভরতবংশীয়গণ বিশ্বামিত্র ও (৪ম ৩০ সূ) সুদাসের সহিত দূরদেশ হইতে রথী ও অশ্বারোহী সহিত শতদ্রু পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। এই ভরতবংশীয় হইতে ভারতের নাম হইয়াছে। পুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় পৌরব দুষ্মন্তের বিশ্বামিত্র-কন্যা শকুন্তলার গর্ভোৎপন্ন রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের নামে ভারতবর্ষ নামকরণ হয়। ভরত নামে রাজচক্রবর্ত্তী কোন মহারাজের বিষয় পুরাণ ব্যতীত অন্তত্র পাওয়া যায় না। ভারত নাম ব্যতীত পুরাণেও তাঁহার অন্য কোন কীর্ত্তির বর্ণনা নাই। সেই সকল পুরাণে লিখিত আছে যে, তাঁহার সমস্তপুত্র নষ্ট হইলে যজ্ঞ দ্বারা লব্ধ তাঁহার পুত্রের নাম ভরদ্বাজ ঋষি। তাঁহার সন্ততি অনেক অনেক প্রসিদ্ধ ঋষি। বেদে ভরদ্বাজ বৃহস্পতির অপত্য বলিয়া বর্ণিত •। এরূপ অবস্থায় ভরত-রাজের বিবরণে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যদিও থাকে, ভরদ্বাজ যখন একজন বৈদিক ঋষি, ভরত রাজা ঋগ্বেদ রচিত হইবার পূর্ব্বে ছিলেন এবং তাঁহার বংশীয়গণ প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভরত ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ভরত-বংশীয়গণ রথারোহী ও অশ্বারোহী হইয়া বহুদূরদেশ হইতে পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং তাঁহাদের নামে ভারতবর্ষ হইয়াছে।

ঋগ্বেদে ৩ম ৫৩ সূক্ত পড়িলে বোধ হয় যে, সুদাস ভরতবংশীয় ছিলেন। কিন্তু অনেক স্থানে এরূপ বোধ হয় যে, বিশ্বামিত্র ভরতবংশীয়। বিশ্বামিত্রের বংশধরেরা "আমরা কুশিক গোত্রোৎপন্ন ইহা অনেক স্থানে বলিয়াছেন।" (৩ম ২৬সূ)। বিশ্বামিত্রের অপত্য অনেক ঋষির নাম ঋগ্বেদে আছে। বিশ্বামিত্রবংশীয় গাধির অপত্যগণ কান্যকুব্জের স্থাপয়িতা এবং পাঞ্চাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ভারতযুদ্ধ কুরু এবং পাঞ্চালের যুদ্ধ। কুরু কিন্তু পুরুবংশীয় সুতরাং ভরতবংশীয়। অতীতের ঘোর অন্ধকারে এখন এ বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ভরতবংশীয়গণ সুদাসের সহিত বহুদূর হইতে পঞ্জাব প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ভারতবর্ষের নামকরণ করেন। •রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণাদির কাল্পনিক বংশবৃত্তান্ত বৈদিক সত্য বৃত্তান্ত পাঠে বিশ্বাস করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণে সুদাসের পিতা সর্ব্বকাম ও পিতামহ নলোপাখ্যানের ঋতুপর্ণ। এ সমস্ত উপাখ্যান মাত্র। •সুদাস প্রাচীন আর্য্য রাজা পিজবনের পুত্র ও দেববানের পৌত্র।

যখন আর্য্যগণ ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহস্রস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন।* তাঁহারা রথ, গজ,

অহুর মাজ্‌দার একমাত্র উপাসনা না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা আরম্ভ করিলেন, তখন লোকের উৎপাতে তাঁহাকে দেবপূজক বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ যদিও ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিতেন, তাঁহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ কি দেবালয় করিতে সাহসী হন নাই। প্রতিমা নির্ম্মাণ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধদের অনুকরণে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে।

* পারস্যে এই প্রকার বহুস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা নিম্নে খনন করিয়া ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অশ্ব, স্বর্ণালঙ্কার, বর্ম্ম ও নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। রথকার, বস্ত্রবয়নকারী, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ইত্যাদি শিল্পী তাঁহাদের মধ্যে ছিল। মনুলিখিত ব্যবহার সমস্ত তখন স্থির হইয়া গিয়াছিল। আমি আমার হিন্দু আইনের পুস্তকে দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান দায়বিভাগের সমস্ত নিয়ম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। † সে সমস্ত প্রমাণ এখানে পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধবিস্তার হইবে। আমি ইহাও দেখাইয়াছি যে, দ্বিজগণের বিবাহের নিয়ম সকল সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত একই আছে। সেই সকল নিয়ম আধুনিক সময় পর্য্যন্ত স্লাভোনিয় জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সামাজিক নিয়ম সকলের, এ পর্য্যন্ত দ্বিজগণের মধ্যে, সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মণগণ যে যুদ্ধ-ব্যবসায় করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহের নিয়মও অপ্রচলিত হইয়াছে। শূদ্রের সহিত বিবাহ কখনই ছিল না। বৈশ্য-কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু হীন বলিয়া গণ্য হইত। তাহাও কালক্রমে বন্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

কিন্তু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালীর। যখন পারসীক ও হিন্দুগণ এক জাতি ছিলেন, তখন অসুর মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, অগ্নি, উষা, যম, অশ্বি বা অসত্যদ্বয় ইঁহারা প্রধান দেবতা ছিলেন। ঋগ্বেদেও ইঁহারা প্রধান দেবতা। পারসীকদের মধ্যে জরথুস্ত্র এক নিরাকার পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলন করেন। অগ্নি ও সূর্য্য তাঁহার বিশুদ্ধির চিহ্নস্বরূপ উপাসিত ছিলেন। বেদেও সেই একেশ্বরবাদের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

পারসীক ও ভারতীয় বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে মূর্ত্তি-পূজা কি দেবালয়-নির্ম্মাণ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কোন সময়ে বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার পূজাকারী আর্য্যগণের সঙ্গে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী পারসীকগণের বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবপূজকগণ তাঁহাদের পুরোহিতগণের সহিত তাড়িত হইয়া ভারতে আগমন করেন। এই প্রকার অনুমান, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করেন। তাঁহারা যে সকল প্রমাণ দেন, তাহাতে এ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। বেদের অসুর বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমার স্তব সকল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ স্তব বলিয়া এখনও পরিগণিত। মহান্ দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী পরম পবিত্র এক ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের জ্ঞান বৈদিক হিন্দু-গণের মধ্যেও ছিল। কালক্রমে সেই ধর্ম্ম বহুযাগযজ্ঞে পরিণত হয়। পরে যাগযজ্ঞাদি, দেবতার অপেক্ষা ফলপ্রদ, এই মীমাংসকগণের কর্ম্মফলের মাহাত্ম্যসূচক ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। পরে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এবং সমস্তই ব্রহ্ম এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মবাদ হিন্দুমন অধিকার করে। তাহার পরে নিষ্প্রয়োজনীয় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবাসী বিশুদ্ধ নীতিমূলক যাগযজ্ঞবিরোধী করুণা-প্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। সর্ব্বশেষে বৌদ্ধদের মধ্যে তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয় এবং তাঁহাদের অনুকরণে নানা তান্ত্রিক মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত হয়। এখনও আমরা সেই সকল ভাবতরঙ্গ অনুভব করিতেছি। "নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি," সেই কর্ম্মকে নমস্কার যাহা ঈশ্বরও অতি-ক্রম করিতে পারেন না; "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, মায়াযুক্ত জীব ও মায়ামুক্ত হইলেই শিব ইত্যাদি বাক্য ব্রাহ্ম-সমাজের বেদিতে এবং সমস্ত হিন্দুপণ্ডিতের মুখে এমন কি চাষাদের মুখেও সারধর্ম্ম বলিয়া শুনা যায়। গোঁড়া ব্রাহ্ম, গোঁড়া পণ্ডিত, কি যোগরত ব্রাহ্মণ, কি ঘোর পৌত্তলিক বৃক্ষপূজক চাষা, ইহাদের সকলের মুখে এক কথা "আমি বস্তুতঃ ব্রহ্ম"। ইহাদের সকলের ধর্ম্মের মূলে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্ন। এ সমস্ত স্বপ্ন বৈদিক মহারথী আর্য্যগণের মনে স্থান পায় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা সংগ্রামশীল নানা শত্রু ও বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, আপনাদিগকে ব্রহ্ম ভাবা দূরে থাকুক, দেবতাদের সাহায্য ব্যতীত নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম বিবেচনা করিতেন, এবং সর্ব্বদা দেবতাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইন্দ্র স্বয়ং সুদাসের যুদ্ধে সহায় হইতেন। এই প্রকার মানব-হৃদয়ের সত্য আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাঁহারা প্রণোদিত ছিলেন। অলস, ভীরু, কল্পনাপ্রিয়, স্বপ্নশীল লোকসকলের ভাব তাঁহাদের মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। সে সময়ের আর্য্যগণ এখনকার হিন্দু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ

† ইহা লইয়া ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত আমার মত-ভেদ হয়। তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু যখন ঋগ্বেদ হইতে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া দিলাম, তখন তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। এখনও অনেক আমাদের দেশের পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা ইউরোপীয়গণের কথায় নির্ভর করিয়া স্মৃতির শ্রুতিমূলত্ব বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদিগকে আমার গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণগুলি দেখিতে অ য একবার অনুরোধ করি।

ছিলেন এবং এমন কি, দেখা যায়, যাহা এখন হিন্দুর মধ্যে আছে অথচ তাঁহাদের ছিল না। ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে সুদাস রাজা ও ভরতবংশীয়গণ, বিশ্বামিত্রবংশীয় ও বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ, যাদব ও পৌরবগণ কি মহাবিক্রমে শেতয়াবরী, শর্ষণাবতী, সুসোমা (সিন্ধু), কুভা (কাবুল), বিপাসা (বিয়সী), অসিক্নী (চিনাব), অর্জ্জিকীয়া (বেয়া), পুরুষ্ণী (রাবী), শতদ্রু ইত্যাদি নদীসকল ও ভীষণ হিমগিরি-সঙ্কট-সকল উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যদিগের সহস্র দুর্ভেদ্য গিরি-দুর্গ অধিকার করেন, এবং সম্মুখযুদ্ধে ৩০ সহস্র, ৫০ সহস্র অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রাচীন অনার্য্যভূমি জয় করিয়া, ইহাকে ভারতবর্ষ নাম দিয়া আর্য্যভূমি করেন, তাহার সত্য-ইতিহাস ঋগ্বেদে লিখিত আছে। ঋগ্বেদে সুদাস পুত্র মহারাজ সহদেব ও তৎপুত্র সোমকের কথা পর্য্যন্ত আছে। সোমককে স্নেহে কুমার বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। সোমকের পুরোহিত পরাশর-বশিষ্ঠ-পুত্র বামদেব ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ-মতে এই বংশে দ্রুপদ তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎবংশে কুরু ও তদ্বংশে কুরুপাণ্ডব উৎপন্ন হন। ইহার অধিকাংশই কাল্পনিক। কিন্তু কুমার সোমক ঐতিহাসিক আর্য্য সম্রাট। অদ্য তাঁহার সময় পর্য্যন্ত আর্য্য-গণের ইতিহাস বর্ণিত হইল। তৎপরে তাঁহাদের কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্য ইউরোপীয় আর্য্যসম্রাটগণের রুদ্রপ্রতাপে ভূমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদেরই জ্ঞাতি সহস্রস্ব, অতিথিগ্ব সুদাসের বীর্য্যে কিরূপ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ ও বহুজনপদ কম্পিত হইয়াছিল এবং অনার্য্যসম্মিলিত দশজন মহাবীর রাজগণ পরাজিত ও তাহাদের পাষাণ ও লৌহনির্ম্মিত গিরিদুর্গ-সকল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা স্মরণে তাঁহার ও তাঁহার অনুচর মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের হীন বংশধরগণের এবং ভীষণ সেনা-সমুদ্রের পুরোগামী অসমসাহসিক বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য সুদাসসহচর ব্রাহ্মণগণের সন্তান-গণের কিঞ্চিৎ সুখবোধ হইতে পারে এই আশায় "তাঁহার যশঃ যাহা বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবী মধ্যে অবস্থিত" বলিয়া বেদে ঘোষিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

ব্রজগাথা

[বীরকুমারবধরচয়িত্রী]

বাঁশী যে করেছে দোষী—
আমার কি দোষ সই ?—
পরে ক'বে "কলঙ্কিনী"
সে মেয়ে ত আমি নই!
শুনেছ নিতুই সাঁঝে,
যমুনায় বাঁশী বাজে,
"আয় রাধে, বন-মাঝে,
কই রাধে, এলি কই ?"
শুনি সে আকুল তান,
কে না ভোলে কুল-মান,
হিয়া ত পাষাণ নহে—
না গিয়ে কেমনে রই ?
পুলকে কদম্ব ফোটে,
নীল জলে ঢেউ ছোটে,
পরাণ উথলি ওঠে,
সে বুঝি আসিছে অই—
স্বেদসিক্ত চন্দ্রানন,
ছল ছল দুনয়ন,
অধীর চাহনি বুঝি
খুঁজিছে "কিশোরী কই ?"—
কুলেতে লাগুক কালি,
দিবে লোকে দি'ক্ গালি,
দিব তারে প্রাণ ডালি,
সে আমার কোথা—কই ?
পায়ে দলি শত বাধা,
শ্যামেরে বরিবে রাধা,
ডুবিবে নিখিল ধরা
সে প্রেম-তুফানে সই,
বাঁশী যে করিছে দোষী,
"কলঙ্কিনী" আমি নই।

মেঘবিদ্যা

[শ্রীআদীশ্বর ঘটক]

স্বরোদয়-শাস্ত্রে ভগবান্ মহাদেব মেঘশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই বর্ষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের নাম, "সপ্তনাড়ী-চক্র।" বর্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ এই শাস্ত্রে প্রথমতঃ কয়েক প্রকার ঋতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ সে নাম কয়টি এই :—চণ্ড, বায়ু, দহন, সাম্য, নীর, জল, এবং অমৃত। এই সাত প্রকার ঋতু আমরা বর্ণনা করিব।

চণ্ডঋতু।—এই ঋতু অত্যন্ত বলবান্, ইহা উপস্থিত হইলে প্রচণ্ড ঝড় হয়। বায়ুর এমন একটা গোঁ গোঁ শব্দ হয় যে, তাহাতে সর্ব্ব জীবের ভয় হইয়া থাকে। একটি রেখা অবলম্বন করিয়া ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত, এবং মেঘগর্জ্জনের প্রচণ্ড শব্দ হইতে থাকে; এবং সময়ে সময়ে ভূমিকম্পও হয়। দিবা দুই প্রহর কালেও এই ব্যাপার হইলে সন্ধ্যার মত অন্ধকার হয়। এই ঋতুতে অধিকাংশ সময়ে প্রবল ঝড়ই হইয়া থাকে, বৃষ্টিবর্ষা কদাচিৎ হয়।

বায়ু-ঋতু।—এই ঋতুতে মেঘাদি বড় হয় না, এবং মেঘ হইলেও তাহা প্রবহমাণ বায়ুভর করিয়া উড়িয়া যায়, মাঠের উপর মেঘের ছায়া দ্রুত গতিতে ছুটিয়া যায়। প্রবহমাণ বায়ু এতই বেগসম্পন্ন যে, এই বায়ুর বিপরীতে পথচলাও কষ্টকর হয়। এই ঋতুতে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক হয়। ইহার সঙ্গে মেঘবৃষ্টির বড় সম্বন্ধ নাই। ধূলিবৃষ্টি, ধূমবশতঃ অন্ধকার ঘূর্ণ্যবায়ু, অথবা কদাচিৎ জলস্তম্ভ হইয়া মৎস্য অথবা জলধারা পতিত হয়; মরুভূমিতে এই ঋতু হইলে, বালুকার ঘূর্ণ্যমান্ বিশাল স্তম্ভ সকল উত্থিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দিনের বেলা একপ্রকার অন্ধকার হয়, তাহাকে লোকে "আন্ধি" অথবা "ধূমর" বলিয়া থাকে, তাহাও বায়ুঋতুবশতঃ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই বায়ু-ঋতুকেই বর্ত্তমান কালে "দক্ষিণাবর্ত্ত বায়ু" অথবা Anti-cyclone নাম দেওয়া হয়। এই ঋতুতে বৃষ্টিবর্ষা প্রায়ই হয় না।

দহন-ঋতু।—মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে প্রখর রৌদ্র হইলেই দহন-ঋতু বলা যায়। উত্তাপ সময়োচিত না হইয়া প্রবল হইলে, অথবা রৌদ্র কয়েক দিবস প্রখর হইলে, পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, পর্ণকুটিরাদি শুষ্ক হইয়া থাকে, এবং সহজেই অগ্নি লাগিয়া প্রজ্বলিত হইতে পারে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যায়, অথচ মেঘের চিহ্নমাত্রও থাকে না। বড় বড় বনমধ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং সাধারণতঃ অসহ্য গ্রীষ্ম অনুভূত হয়।

সাম্য-ঋতু।—এই ঋতুতে সকল বিষয়ে সাম্যভাব দেখা যায়। মেঘ সকল তুষার-কুন্দ মুক্তা-সন্নিভ শুভ্র, এবং মৃদু মৃদু সুস্নিগ্ধ জলবাহী পবন সর্ব্ব জীবের আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। পক্ষিগণ বৃক্ষে বসিয়া আনন্দে গান করিতে থাকে। রৌদ্র কষ্টকর নহে, অথচ মেঘশূন্য অবস্থায় সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণ প্রদান করেন। প্রাকৃতিক শোভা এই ঋতুতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। এই ঋতুতে মহামেঘ হইলেও তাহা কাটিয়া যায়, কিন্তু কিছু কাল রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলেই, চন্দ্রাতপের ন্যায় এক প্রকার উচ্চ জাতীয় মেঘ (Cirro-Stratus) হইয়া, সূর্য্যোত্তাপ কমাইয়া থাকে। এই ঋতুতে উত্তাপ, শৈত্য, ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলই সাম্যভাব ধারণ করে। এই ঋতুতে বৃষ্টি হইলেও ছিটাফোঁটা মাত্র হয়।

নীর-ঋতু।—নীরঋতু প্রধানতঃ মেঘবাহক। এই ঋতুতে নানা প্রকার মেঘ প্রবহমাণ বায়ুভরে উড়িয়া যায়। দিবসে সূর্য্য প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, এবং সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে মেঘসকল পরিষ্কার হইয়া সন্ধ্যা হয়। রাত্রিকালে বৃক্ষপত্রাদির উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া, বৃক্ষ সকল অধিকতর শোভান্বিত হইয়া থাকে। এই ঋতুতে সামান্য বৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহাদ্বারা কৃষি-কর্ম্মের উপযোগী জল হয় না। ইহাতে মেঘের খুব প্রবলতা হয়, কিন্তু প্রায়ই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ঘটে।

জল-ঋতু।—ইহাতে প্রবল বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে যে দিন জল-ঋতুর প্রাধান্য থাকে, সেদিন স[illegible] সকল দেশেই প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ঋতু আষাঢ় এবং

শ্রাবণ মাসে প্রবল বর্ষার কারণ হয়। এমন কি, শীত-কালে এই জল-ঋতু উপস্থিত হইলেও প্রায়ই বৃষ্টি হয়।

অমৃত-ঋতু।—আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে পূর্ব্বাবাদল আসে। ইহাকে নাবিকগণ 'মনসুন্' (monsoon) নাম দিয়াছেন। এই জাতীয় বাদ্‌লা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই এক সপ্তাহ, এমন কি, এক পক্ষ পর্য্যন্ত দিবারাত্রি বৃষ্টি পড়িতে থাকে। ইহাকেই 'সাইক্লোন্' (Cyclone) বলে; এই ঋতুতে বৈদ্যুতিক ব্যাপার প্রায়ই থাকে না। মেঘগর্জ্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। মেঘগর্জ্জনাদি হইলে, এই বাদল কাটিয়া যায়। মেঘের চন্দ্রাতপ ফাটিয়া স্থানে স্থানে নীলাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃত-ঋতুতে এত বৃষ্টি হয় যে, জলাশয়াদি পূর্ণ হইয়া যায়। নদীতে বাণ অসে; এবং স্থানে স্থানে জল-প্লাবন হয়। অমৃত-ঋতুর বৃষ্টিদ্বারাই শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই জন্যই এই ঋতুর নাম 'অমৃত-ঋতু'।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দ্বারা আকাশ মণ্ডলকে বিভক্ত করিয়াছেন, স্বরোদয়-শাস্ত্রে সেই সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্রকেই কথিত সপ্তপ্রকার ঋতুর কারণ বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে নক্ষত্রের নাম সকলেই জানেন, কিন্তু ঐ সকল নক্ষত্র বলিতে কি বুঝায়, তাহা জ্যোতিষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝেন। আমরা বিশদ বর্ণনা দ্বারা নক্ষত্রগুলি পাঠকবর্গকে বুঝাইব।

নক্ষত্র এবং রাশিচক্র

রাত্রিকালে আকাশমণ্ডলে যে অসংখ্য তারা দেখা যায়, ঐগুলি বহু পূর্ব্বকালে সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ খগোলটি (Visible Universe) কথিত ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে এক একটি নক্ষত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। খ-গোলক চক্রাকার, এজন্য অঙ্কশাস্ত্রমতে উহাতে ৩৬০ ডিগ্রী অথবা অংশ আছে। ৩৬০ অংশকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগে ১৩ অংশ ২০ কলা হয়; এই জন্যই ১৩ অংশ ২০ কলায় এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে।

বহুপূর্ব্বকালে পারস্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অসুর-জাতিরা (Assyrians) আকাশমণ্ডলকে আর এক প্রকারে চিহ্নিত এবং বিভক্ত করিয়াছিলেন। আর্য্যেরা চন্দ্রের গতি অনুসারে নক্ষত্রবিভাগ করেন, অসুরেরা সূর্য্যের গতি অনুসারে আকাশমণ্ডলকে দ্বাদশরাশিতে বিভক্ত করেন। ঈজিপ্ট্ দেশের বৃহৎ পিরামিডেও রাশিচক্র খোদিত আছে বলিয়া কোনও কোনও পুরাতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঈজিপ্ট্‌বাসীদের কর্ত্তৃক দ্বাদশ রাশি কল্পিত হইয়াছে। আমারাও ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার ভ্রমবশতঃ চিত্রবিদ্যা পুস্তকে শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু পরে Assyria এবং ব্যাবিলনের পুরাতত্ত্ব পাঠ দ্বারা বুঝিয়াছি যে, মেষাদি দ্বাদশরাশি অসুরদিগের দ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। এক এক রাশি আকাশমণ্ডলের ৩০ অংশ লইয়া হইয়াছে।

আজকাল চৈত্র এবং আশ্বিন মাসে বিষুবন্ (দিবারাত্রি সমান) হইতেছে, বহু পূর্ব্বকালে উহা বৈশাখ মাসে হইত।* গণিত দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ৪৩১ শকে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে সূর্য্য অবস্থিত হইলে বিষুবন্ হইত। মহারাজা বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ের ২৪,০০০ সহস্র বৎসর, ৮৪,০০০, সহস্র, এবং ৭২,০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ঐ অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে দিবারাত্রি সমান হইত। এই বিষুবন্ ক্রমশঃ পিছাইয়া হইতে থাকে। কিছুকাল অশ্বিনী নক্ষত্রে হইতে হইতে উহা পিছাইয়া রেবতী নক্ষত্রে, আরও কিছুকাল পরে উত্তরভাদ্রপদে, এই প্রকারে ২৪০০০ বৎসরে উহা বক্রগতি অনুসারে পুনরায় অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হয়। এই গতিকেই অয়ন-গতি বলে।

ভারতীয় ঋষিগণ আকাশমণ্ডলের যে নক্ষত্রগুলিকে অশ্বিনী নাম দিয়াছেন, অসুরেরাও ঠিক সেই নক্ষত্র-গুলিকেই মেষরাশির আরম্ভ বলিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে, ইহা এক বিচিত্র ঐতিহাসিক রহস্য। সম্ভবতঃ একই সময়ে, (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে) উভয় জাতিই আকাশের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই আকাশবিভাগের সময় বিষুবন্ বৈশাখ মাসেই হইত। ভারতীয় ঋষিগণের নক্ষত্রবিভাগ বহুপ্রাচীন কালে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। আমরা অন্য পুস্তকে

---

* Precession of the Equinoxes.

লিখিয়াছি যে, অন্ততঃ ২৬,০০০ সহস্র বৎসর, অথবা ৫০,০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক নক্ষত্র-কল্পনা হইয়াছে। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময় যদি নক্ষত্র সকল কল্পিত হইত, তাহা হইলে বহুপুরাতন বেদাদি শাস্ত্রে নক্ষত্র সকল উল্লিখিত হইতে পারিত না। ভারতীয় দ্বাদশ মাসের নামও নক্ষত্রানুসারে হইত না।

স্বরোদয়-শাস্ত্রের অন্তর্গত "সপ্তনাড়ী চক্র" নামক যে মেঘবিদ্যা ভগবান্ মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তাহা নক্ষত্রমূলক। ইতঃপূর্ব্বে যে সপ্তঋতুর বর্ণনা করিয়াছি, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, এবং সপ্তগ্রহ (রাহু এবং কেতুকে ভগবান্ শিব গ্রহ বলিয়া ধরেন নাই, একারণ উহা

"কৃত্তিকাদীনি ঋক্ষাণি সাভিজিন্তি ক্রমেণচ।
সপ্তনাড়ী রেখাস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ পন্নগাকৃতিঃ॥" ২

প্রথমতঃ সপ্তরেখা পন্নগাকার করিতে হইবে। সে সর্পাকার সপ্তরেখার উপরে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আর: করিয়া অভিজিৎ নক্ষত্র সমেত সপ্তনাড়ীর সজ্জা করি: হইবে।

"তাসাঁচতুষ্কবেধেন নাড়ীকৈকা প্রজায়তে।
তাসাং নামান্যহং বক্ষে তথাচৈব ফলানি হ॥"

চারিটি করিয়া নক্ষত্র এক এক রেখায় বিদ্ধ হইবে, এব তাহারা এক এক ঋতু (নাড়ী) প্রকাশ করিবে। ঐ সক: নক্ষত্রের নাম, এবং প্রত্যেক নাড়ীর ফল বলিব।

পন্নগাকৃতি সপ্তনাড়ী চক্র।
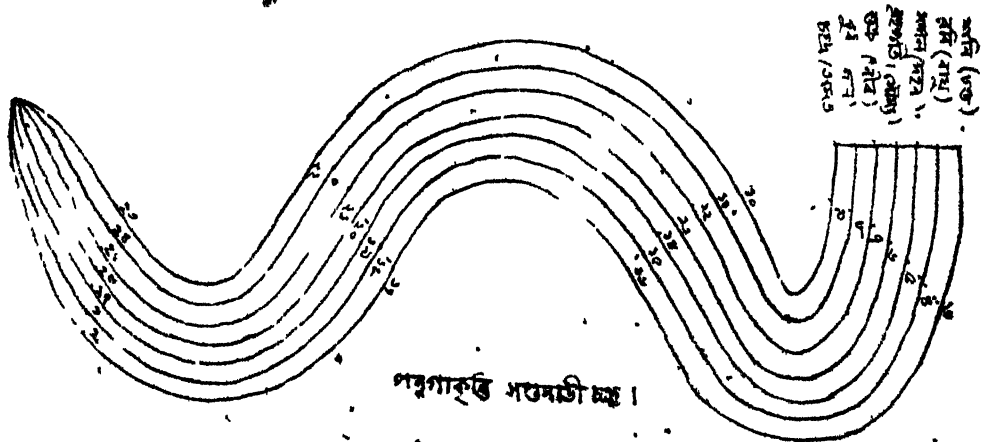
বৃষ্টিবর্ষা বিষয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে) বৃষ্টিবর্ষার মূল-কারণ কথিত হইয়াছে। একটি গ্রহ এবং চারিটি নক্ষত্র এক এক ঋতু উৎপন্ন করিয়া থাকে। এক্ষণে মূল সংস্কৃত শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষা অর্থ লিখিব। মূলসূত্রগুলি অভ্যাস করিতে পারিলে, কার্য্যের বড় সুবিধা হয়।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ষচ্চক্রং সপ্তনাড়ীকম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেন বৃষ্টিং জানন্তি সাধকাঃ॥ ১

অতঃপর আমি সপ্তনাড়ী-চক্রের বর্ণনা করিব, ইহা অবগত হইলে, সাধকেরা বৃষ্টির কথা জানিতে পারিবেন।

† পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অয়নচক্রের সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ হইতে প্রায় ২৬,০০০ সহস্র বৎসর লাগে।

"কৃত্তিকাচ বিশাখাচ মৈত্রাখ্যা ভরণী তথা।
৩ ১৬ ১৭ ২
ঊর্দ্ধাস্যা শনিনাড়ী স্যাচ্চণ্ডনাড্যা বিধামতা॥" ৩

প্রথম রেখায় কৃত্তিকা, বিশাখা, অনুরাধা, এবং ভরণী-নক্ষত্রের বেধ হয়। এই চারিটি নক্ষত্র চণ্ডনাড়ীর অন্তর্গত, এবং উহারা শনিগ্রহের সহিত গৃহীত। শনিগ্রহ বৃষ্টিবর্ষা বিষয়ে যাহা করেন, ঐ চারিটি নক্ষত্রও তাহা করিয়া থাকে। একারণ উহাদিগকে শনির নাড়ী অথবা "চণ্ডনাড়ী" বলে; উহারাই প্রবল ঝড়ের হেতু। এই কৃত্তিকা, বিশাখা, অনুরাধা এবং ভরণী নক্ষত্র আকাশের কোন স্থানে? মৎপ্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থ

হইতে * ঐ কয়টি নক্ষত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।
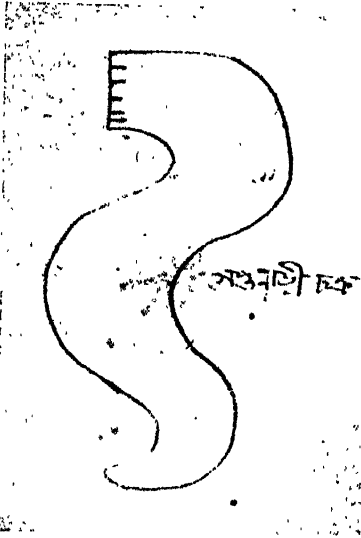
"কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বদিকের চক্রবালের উপর মেষরাশির উদয় হইতে থাকে, এই মেষরাশির শেষ ভাগে এবং বৃষরাশির প্রথম ভাগেই কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিত। আকাশমণ্ডলের কতকগুলি তারা লইয়া একটি বৃষের আকার কল্পিত হইয়াছে, কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রপুঞ্জে ঐ বৃষের দক্ষিণ শৃঙ্গ কল্পিত। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম প্রহর রাত্রিতে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বেশ দেখা যায়। ইংরাজীতে উহাকে Pleiades বলে। ঐ কৃত্তিকানক্ষত্র পুঞ্জ একবার চিনিতে পারিলে, আর সহজে উহাদের ভুলিতে পারা যায় না।"

ইতঃপূর্ব্বে রাশি এবং নক্ষত্র সকলের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিশাখা নক্ষত্র তুলা এবং বৃশ্চিক রাশিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। কৃত্তিকা এবং বিশাখা নক্ষত্রদ্বয় প্রায় ঠিক বিপরীত। একটি মেষরাশির শেষে, অপরটি তুলারাশির শেষ ভাগে অবস্থিত। বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাকালে তুলারাশির পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে উহা আকাশের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।
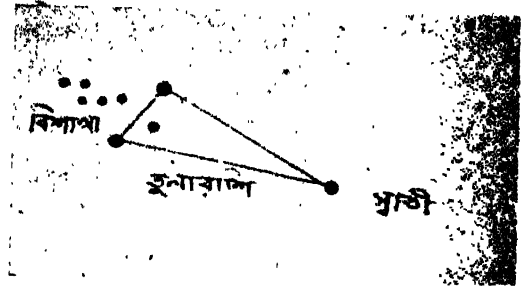
এই রাশির প্রথমে চিত্রা নক্ষত্রের কিয়দংশ, মধ্যে স্বাতী, এবং শেষ ভাগে বিশাখা নক্ষত্রের অধিকাংশ অবস্থিত। কুঙ্কুম সদৃশ লোহিতবর্ণের একটি তারকা স্বাতী * নক্ষত্র বলিয়া কথিত হয়, এবং তোরণাকার চারিটি তারা, কোনও মতে পঞ্চতারা বিশাখা নক্ষত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"মৈত্রাখ্যা" অর্থাৎ অনুরাধা নক্ষত্র, বিশাখারই পরবর্ত্তী। বৃশ্চিকরাশির প্রথমে বিশাখা নক্ষত্রের শেষভাগ, বিশাখার পরে অনুরাধা নক্ষত্রের আরম্ভ হইয়া, বৃশ্চিক রাশির ১৬ অংশ ৪০ বিকলায় অনুরাধা নক্ষত্রের সমাপ্তি হইয়াছে।

কালিদাস-কৃত রাত্রিলগ্ননিরূপক গ্রন্থে "সর্পাকৃতি সপ্ততারাময়ম্" বলিয়া অনুরাধা নক্ষত্রের আকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দীপিকা গ্রন্থের টীকাকার বলেন, "বলিনিভতারা চতুষ্টয়াত্মকম্"—যাহা হউক, বিশাখার পরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি যে অনুরাধা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সপ্তনাড়ীরূপ সর্পাকৃতি

চিত্রে শনি (চণ্ড) রেখার শেষে ২ অঙ্ক ভরণী নক্ষত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ভরণী নক্ষত্র মেষরাশির অন্তর্গত। ইতঃপূর্ব্বে যে কৃত্তিকা নক্ষত্র বর্ণিত হইয়াছে, ভরণী তাহারই পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

* "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

* কালিদাস-কৃত "রাত্রিলগ্ন নিরূপণ" গ্রন্থ।

সূর্য্যনাড়ী।—দ্বিতীয় নাড়ী সূর্য্যের অধিকৃত। মেষশাস্ত্রে ইহাকে বায়ু-নাড়ী বলে। ইহার মূল সূত্র ;—

"রোহিণী ৪ স্বাতী ১৫ জ্যেষ্ঠা ১৮ শ্বি ১
দ্বিতীয়া নাড়িকামতা।
আদিত্যপ্রভবা নাড়ী,
বায়ুনাড়ী তথৈবচ ॥"

সূর্য্যাত্মক বায়ু-নাড়ী রোহিণী, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা এবং অশ্বিনী নক্ষত্রকে বিদ্ধ করিয়াছে। সর্পাকৃতি দ্বিতীয় রেখায় ৪, ১৫, ১৮, ১ সংখ্যা ঐ চারিটি নক্ষত্রের সাঙ্কেতিক-রূপে লিখিত।

পূর্ব্ববর্ণিত কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ইউরোপীয় অথবা আরবদিগের প্রদত্তনাম "এল্‌ডেবারান্" (Aldebaran) একটি প্রথম শ্রেণীর তারা। আর্য্য ঋষিগণ ঐ তারাকেই "রোহিণী" নাম দিয়াছেন। রোহিণী, চন্দ্রের প্রিয়া ভার্য্যা। এই এক রূপক। ইহার অর্থ এই যে, চন্দ্রের নিকট অন্যান্য তারকা থাকিলে, চন্দ্রের জ্যোতিঃ বশতঃ তাহা দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্র যখন রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত হন, চন্দ্রের পার্শ্বে রোহিণী থাকিলেও অদৃশ্যা হন না। হেমন্তকালে চন্দ্র-রোহিণীসমাগম জল যন্ত্রদ্বারা * দেখিবার জন্য পূর্ব্বকালের রাজারাণীদের বড় সখ্ ছিল। "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকে কালিদাস এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে কয়েকটি নক্ষত্রকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন, রোহিণী তাহাদের অন্যতম।

তুলারাশির মধ্যভাগে স্বাতী নক্ষত্র দেখা যায়। উহাও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহাকে 'বুটস্' নামক নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত করিয়া 'আর্কটরস্' (Arctaurus) নাম দিয়াছেন। কালিদাস ঐ তারাকেই স্বাতী বলিয়াছেন। "কুঙ্কুম-সদৃশৈক তারকে"—"কুঙ্কুম সদৃশ পীতাভ লোহিত বর্ণের একটি তারা"—এই প্রকার বর্ণনায় নিঃসন্দেহ ঐ তারকাই বুঝায়।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিকরাশির শেষভাগে অবস্থিত। শূকর-দন্তাকৃতি তিনটি তারায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে তুলা এবং বৃশ্চিকরাশির যে দুইটি চিত্র দিয়াছি, উহা দেখিলেই স্বাতী এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র চিনিতে পারা যাইবে।

অশ্বিনী নক্ষত্র মেষরাশির প্রথমেই অবস্থিত। তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিকোণ ভখণ্ডকেই অশ্বিনী নক্ষত্র (Triangula) বলে। রোহিণী, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, এবং অশ্বিনী ; এই চারিটি নক্ষত্র বায়ু-নাড়ী বলিয়া কথিত হয়। উহারা সূর্য্যের সমান গুণবিশিষ্ট ; এই জন্য উহাদিগকে বায়ুর কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

দহন-নাড়ী।—

"সৌম্যং ৫ চিত্রা ১৪ তথামূলং ১৯
পৌষ্ণর্ক্ষঞ্চ ২৭ চতুর্থকম্।
তৃতীয়াঙ্গারকা নাড়ী দহনাখ্য চ সম্মতা ॥"

মৃগশিরা, চিত্রা, মূলা, এবং রেবতী এই চারিটি নক্ষত্রে তৃতীয়া অর্থাৎ দহন-নাড়ী হইয়াছে। বৃষরাশির শেষভাগ এবং মিথুনরাশির প্রথম ভাগ লইয়া মৃগশিরা নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। এই সকল নক্ষত্রের চিত্র করিয়া দিলে, পাঠক-বর্গের আকাশ চিনিবার সুবিধা হইত, কিন্তু তাহা করিতে গেলে, এই প্রবন্ধ অত্যধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ; বিশেষতঃ মৎপ্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থে সকল নক্ষত্রের চিত্র প্রকাশিত হইবে ; সেই কারণে এই প্রবন্ধে আমি নক্ষত্র সকলের চিত্র না দিয়া, উহাদের বিশদ বর্ণনা মাত্র দিলাম। কন্যারাশির পূর্ব্বদিকের উজ্জ্বল তারকাটি চিত্রা নামে অভিহিত। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ নক্ষত্রটির "Spica" নাম দিয়াছেন। ধনুরাশির প্রথম হইতে ১৩⅓ অংশ পর্য্যন্ত আকাশখণ্ডের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলিকে মূলা নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত অশ্বিনী নক্ষত্রের পশ্চিমে, অর্থাৎ মীনরাশির শেষ ভাগে রেবতী নক্ষত্র কথিত হয়। মৃগশিরা, চিত্রা, মূলা, রেবতী, এই চারিটি নক্ষত্র মঙ্গল গ্রহের গুণ সম্পন্ন, এবং উহারা দহন-নাড়ী।

সৌম্যনাড়ী।—চতুর্থী নাড়ীকে সৌম্য কহে। ইহার সূত্র এইরূপ।—

"রৌদ্রং হস্তং তথাপূর্ব্বাষাঢ়া ভাদ্রপদোত্তরা।
৬ ১৩ ২০ ২৬
চতুর্থী জীবনা নাড়ী সৌম্যনাড়ী প্রকীর্ত্তিতা ॥"

আর্দ্রা, হস্তা, পূর্ব্বাষাঢ়া, এবং উত্তরভাদ্রপদ এই

* কেচিৎ বিচিত্রং জল-যন্ত্র মন্দিরং—এই জলযন্ত্র কি ? ইহা কি কোনও প্রকার Optical Appliance ?—লেখক।

চারিটি নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি গ্রহ সৌম্য-নাড়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নীর-নাড়ী

"পুনর্ব্বসুস্তর ফল্গুন্যুত্তরাষাঢ় তারকাঃ।
৭ ১২ ২১
পূর্ব্বভদ্রাচ শুক্রাখ্যা পঞ্চমী নীরনাড়িকা॥"
২৫

পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই চারিটি নক্ষত্র শুক্রের গুণসম্পন্ন, এজন্য উহা নীর-নাড়ী।

মিথুনরাশির ২১ অংশ হইতে কর্কটরাশির ৪ অংশ ২০ কলা অবধি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, সিংহ রাশির ২৬ অংশ ৪০ কলা হইতে কন্যারাশির ১০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তরফল্গুনী; ধনুরাশির ২৬ অংশ ৪০ কলা হইতে মকররাশির ১০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তরাষাঢ়া, এবং কুম্ভরাশির ২১ অংশ হইতে মীনরাশির ৪ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র কথিত হয়।

জল-নাড়ী

৮ ১১ ০ ২৪
"পুষ্যার্ক্ষং ফল্গুনী পূর্ব্বা অভিজিৎ শততারকাঃ।
ষষ্ঠী নাড়ী চ বিজ্ঞেয়া বুধাখ্যা জলনাড়িকা॥"

পুষ্যা, পূর্ব্বফল্গুনী, অভিজিৎ, এবং শতভিষা নক্ষত্র বুধগ্রহের গুণসম্পন্না, এবং উহারা জল-নাড়ী বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্যা নক্ষত্র কর্কটরাশির মধ্যস্থলে স্থিত। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র সিংহরাশির প্রথম ভাগে কল্পিত। অভিজিৎ নক্ষত্র সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। জ্যোতিষ-মতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ পঞ্চদশ দণ্ড, এবং শ্রবণা নক্ষত্রের প্রথম চারি দণ্ড একত্র উনবিংশতি দণ্ড (৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কালকে অভিজিৎ নক্ষত্র বলা হয়। এই অভিজিৎ নক্ষত্র মকররাশির মধ্যভাগে কল্পিত হইয়াছে। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ নক্ষত্র ধরা হয় না, একারণ অভিজিৎ নক্ষত্রের সাঙ্কেতিক ০ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। "শততারকা" শতভিষা নক্ষত্রের নামান্তর মাত্র, ইহা কুম্ভরাশির অন্তর্গত নক্ষত্র। পুষ্যা, পূর্ব্বফল্গুনী, অভিজিৎ, এবং শতভিষা নক্ষত্র এবং বুধগ্রহ জল-নাড়ীরূপে বিভক্ত হইয়াছে।

অমৃত নাড়ী

৯ ১০ ২২ ২৩
"অশ্লেষর্ক্ষং মঘা বিষ্ণুং ধনিষ্ঠাভং তথৈবচ।
অমৃতাখ্যা হি সা নাড়ী সপ্তমী চন্দ্রনাড়িকা॥"

অশ্লেষা, মঘা, শ্রবণা, এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, আর চন্দ্র উপগ্রহকে লইয়া অমৃত-নাড়ী কথিত হয়।

অশ্লেষা কর্কটরাশির শেষ নক্ষত্র, মঘা সিংহরাশির প্রথম নক্ষত্র; চন্দ্রনাড়ীর প্রথম ভাগটায় রাশিচক্রের ২৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অপর দিকে মকর এবং কুম্ভরাশিদ্বয়ের ২৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া চন্দ্রনাড়ীর অপরার্দ্ধ অর্থাৎ শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র রহিয়াছে।

বৃষ্টি-বর্ষা-বিষয়ক সপ্তনাড়ী, এবং সপ্তবিংশতি (অভিজিৎ সমেত অষ্টাবিংশতি) নক্ষত্র, আর শনি, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, এবং চন্দ্র এই সপ্তগ্রহের শ্রেণী বিভাগানুসারে যে সপ্তপ্রকার ঋতু (weather) হইতে পারে, তাহা আমরা বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে দেখাইব, কি উপায়ে ঐ সপ্তনাড়ী-বিচার দ্বারা আকাশের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ নির্ণয় করিতে পারা যাইবে; যাহাকে ভাবী বর্ষার খণ্ডা অর্থাৎ Weather Forecast প্রস্তুত করা বলে, তাহা কি প্রকারে হইবে, তাহাও বিশদ ভাবে লিখিবার ইচ্ছা; কিন্তু সকল কথা এবারে প্রকাশিত করিলে "ভারতবর্ষের" অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিতে হয়। সুতরাং মেঘবিদ্যার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি এবারেও বলা হইল না। কবি কালিদাসের "স্বর্গের সিঁড়ি" গোছ এবারকার প্রবন্ধ বড়ই নীরস এবং সূত্রসমষ্টি মাত্র। সুতরাং পাঠকবর্গের ইহাতে বিরক্তি হইবেই। কেবল Theory হইলে চলে না, ইহার Practiceও চাই। মেঘবিদ্যার Practical অংশ এবারেও সমাপ্ত করিতে পারিলাম না।

ভগবান্ মহাদেব যে ভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্র করিয়া বর্ষাবিজ্ঞান প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া দেখিলে, মনুষ্য বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। ব্যারোমিটার্, হাইগ্রোমিটার্ প্রভৃতি লইয়া আমরা বায়ুসমুদ্রের নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। একজন কি দুই জন বৈজ্ঞানিক প্রাণপণ করিয়া বেলুন-যন্ত্র সাহায্যে একক্রোশ উপরে উঠিলেন মাত্র। কিন্তু

তাহাতে কি হয় ? দশ ক্রোশ উপরেও জলীয় বাষ্প বরফ হইয়া ভাসিতেছে। সেই বরফের ভিতর দিয়া সূর্য্য রশ্মি বিভক্ত হইয়া, প্রিসমের ন্যায় সপ্তবিধ বর্ণ প্রকাশ করে। বর্ষাকালে মেঘের উপর যে ময়ূরকণ্ঠী বর্ণসকল দৃষ্টিগোচর হয়, উহা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা এসকল কথা বুঝিতে পারিতেছেন।

বায়ু-সমুদ্রের দশ ক্রোশ উপরে কি প্রকারে বরফের মেঘ হয়, তাহা পড়িয়াই বা যায় না কেন, এ সকল কথা লইয়া কেবল এখন আচাঁআঁচি চলিতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি, পার্থিব তাড়িত প্রবাহ, * উত্তাপের বিভিন্ন অবস্থা, বায়ুর চাপ, জলীয় বাষ্পের বিভিন্ন অবস্থা, এমন কি বিভিন্ন বর্ণের বিকাশ হেতুও ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে পারে; সৌর কলঙ্কের সহিতও বৃষ্টিবর্ষার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইতেছে।

এবার বর্ষাও খুব প্রবল হইয়াছে। কিন্তু এবার বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণ Weak Monsoon হইবে, অর্থাৎ এবারে ভারতে বৃষ্টিবর্ষা ভাল হইবে না, এই প্রকার ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু সেই বহু পুরাতন খনার বচনটি মনে পড়িতেছে।—

"চৈতে থর্ থর্
বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে,
তবে জান্‌বে বরষা বটে।"

এবার চৈত্রমাসে খুব শীত ছিল, বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি এবং ঝড় খুব হইয়াছে, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসও শুকা গিয়াছে। অতএব এবার যে প্রবল বর্ষা হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বাপর বলিয়াছি।

"করকট্ ছরকট্
সিংহে শুকা,
কন্যা কাণে কাণ,—
বিনা বায়ে তুলাবর্ষে,
কোথা রাখ্‌বি ধান্ ?

এবারে কর্কটে রবি আসিয়াই বেজায় 'ছরকট্' করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে রৌদ্র ভাল করিয়া প্রকাশ হইলই না। শ্রাবণও ঐ প্রকার। ভাদ্র মাসে এবার বৃষ্টি অধিক হইল না, কিন্তু আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসেও বৃষ্টি হইবে, এবং "কোথা রাখ্‌বি ধান" অর্থাৎ এবারে ভারতবর্ষে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। এবার সর্ব্ব শস্যই প্রচুর উৎপন্ন হইবে। বারান্তরে মেঘবিদ্যার ক্রিয়াসিদ্ধ-অংশ পাঠকবর্গের গোচর করিব।

* Terrestrial Magnetism.

অষ্ট্রিয়ার নিহত রাজকুমার ও পরিবারবর্গ

সুযোগ

[শ্রী :—   ]

"তোমাকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!" পার্শ্বো-পবিষ্ট যুবক তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময়বিকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "তা হবে!"

প্রথমোক্ত যুবক বলিল, "হুঁ, তা হবেই তো, এ সব বিষয়ে কালীকান্তের ভুল হবার যো নেই।"

তখন গোলদীঘীর কালো জলের উপর নির্ব্বাণোন্মুখ দিবালোক অল্পাধিক শিহরিয়া উঠিতেছিল, সেই আলোকে সেনেট হাউসের থামগুলি জলমধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া নৃত্য করিতেছিল।

কালীকান্ত পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া তাহাতে টোকা দিয়া বাজাইল; পরে কল টিপিয়া ডালা খুলিতেই বিড়িগুলি বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলিকে গুছাইয়া লইয়া কালীকান্ত কেস্‌টি দ্বিতীয় যুবকের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "একটা নাও, তোমার নাম কি?"

দ্বিতীয় যুবক এইরূপ অকস্মাৎ আলাপনে বিশেষ তুষ্ট না হইলেও শিষ্টাচারের অভ্যাসবশতঃ উত্তর করিল, "আমি বিড়ি খাই না।"

"সিগারেট খাও?"

"না।"

কালীকান্ত হাসিয়া বলিল, "বাঃ রে, বাপ প্রহ্লাদ আর কি!"

দ্বিতীয় যুবকটি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি তো ভারি অসভ্য দেখ্‌ছি! কোথাকার কে তার খোঁজ নেই, উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, তার উপর আবার ঠাট্টা!"

কালীকান্ত তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আরে রাগ কর কেন? এখন না হয় অসভ্য আছি, সভ্য হ'তে কতক্ষণ লাগে? আর তোমাকে আমি যখন হঠাৎ পছন্দ করে ফেলেছি, তখন বুঝলে কিনা, আমার একটু আধটু আব্দার সহ্য ক'রতে হবে—তা যাক্‌, তোমার নামটি কি?"

যুবকটি গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার নাম শ্রীকৃষ্ণকুমার বসু!"

কালীকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "বটে! বসু? আমিও বসু। তোমরা মাহিনগরের বসু, না বাগাণ্ডার?"

"তা জানি না।"

"মাহিনগরেরই হবে—আমিও তাই। তাহলে তুমি দেখছি আমাদের জ্ঞাতি। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল ত ভাই কৃষ্ণকুমার!"

"দর্জ্জিপাড়ায়।"

কালীকান্ত গাহিল—

"তুমি দর্জ্জিপাড়ায়   ননীছানায়
খাও সুখে পেট ভরি,
আমি শ্যামবাজারে   পুকুর পাড়ে
কিবা হরি-মটর করি।"

গান শুনিয়া কৃষ্ণকুমার হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "কালীকান্ত দেখ্‌ছি গানও ক'রতে পার। ছড়াটা কি তোমার নিজের তৈরি?"

"নয় তো কি! কবির লড়া'য়ে আমি ওস্তাদ। আচ্ছা কৃষ্ণকুমার, তোমার কবিতা-টবিতা আসে?"

"না।"

"কোন কালে ওসব বিষয়ে চর্চ্চাও করনি?"

কৃষ্ণকুমার নির্ব্বাক হইয়া বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে কালীকান্ত অকস্মাৎ কৃষ্ণকুমারের নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "কৃষ্ণকুমার তুমি কখন লভ্‌ করিয়াছ?"

কৃষ্ণকুমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "আরে যাও। তুমি ত আচ্ছা লোক দেখছি? বাজে কথা কও কেন?"

কালীকান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠাট্টা নয় কৃষ্ণকুমার, ভাল না বাসলে জীবনের পূর্ণতা হয় না—জগৎ-সংসার ফাঁকা, ভুয়ো, ভোজবাজী হ'য়ে থাকে। লভ্‌ ক'রতে জানলে মানুষ আপনাকে চিনতে শেখে। আমি তোমার

বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষা, তাই তোমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করছি এবং বলছি—নইলে তুমি আমার কোন হরির খুড়ো ?"

কৃষ্ণকুমার নির্ব্বাক হইয়া রহিল—তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ সন্ধ্যার অন্ধকারে মড়ার মত ফেকাশে হইয়া গেল।

কালীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ কেলাসে পড় কৃষ্ণকুমার ?"

"আমি এবারে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েছি।"

"বটে! বেশ ছেলে ত! তুমি সেক্সপিয়ার পড়েছ ?"

"হাঁ।"

"তবে ওথেলো, ডেসডিমোনা, হ্যামলেট, ওফেলিয়া প্রভৃতি বড় বড় লোকের কথা সব জান ?"

"কৃষ্ণকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিছু কিছু জানি বৈকি।"

"তবেই তো বুঝতে পারচ সত্য বলেছি কিনা। এখন আমাকে বল দেখি, কোন সুন্দরী বালিকার গোলাপফুলের মত মুখখানি দেখে তোমার মনের মধ্যে হঠাৎ ট্রামের তার ছিঁড়ে গেছে কি না ?"

"তুমি কোন্ কেলাসে পড় কৃষ্ণকুমার ?"

"আরে যাও। আমি ওরকম লভ্ করার আদপেই পক্ষপাতী নই। আমি চাই সব মডার্ণ্। লেখা-পড়া জান্‌বে, আমার চিন্তাগতির সঙ্গে তার চিন্তাস্রোত এক হ'য়ে যাবে। আমি যখন রুশিয়ার রাজনীতি আলোচনা ক'র্‌ব, তখন সে স্লাভদের আদিম সভ্যতা থেকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সব কথা নিমেষের মধ্যে বুঝে নেবে। বুঝলে ত? প্যান্‌পেনে আল্‌তাপরা, নোলক-নাকে, কুণো, হতভম্ব, দুগ্ধপোষ্য শিশুর সঙ্গে লভ্ করা আমার কুষ্টিতে লেখেনি।"

উচ্ছ্বাসের আবেগে কৃষ্ণকুমার যখন তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল, তখন কালীকান্তের অধর প্রান্তে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ক্ষুরধার সম তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রত্যেক বিকম্পনে ভবিষ্যৎ সাফল্যের প্রত্যেক ছবি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহার চক্ষুদুটি বলিতেছিল—শিকার পাইয়াছি—টোপ খাইয়াছে।

কালীকান্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাঃ বেশ কথা! এখন বলত, এরূপ বালিকা অথবা যুবতী—কে?"

কৃষ্ণকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না বিশেষ কেউ নয়। তোমাকে আমার আইডিয়াটা দিলাম।"

"অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে তবে আমি জান্‌তে চাই না।"

"না, আপত্তি কিছুই নেই, তবে তুমি দেখ্‌ছি যে রকম লোক তাতে সব ফাঁস ক'রে দেবে, আমাকে বড় বিপদে প'ড়তে হবে।"

"সে ভয় নেই। কালীকান্ত লোহার সিন্দুক আর কি!"

"তবে শোন্ বলি। আমাদের বাড়ীর পাশে কৃপারাম

বাবু থাকতেন। খুব ভাল লোক, তাঁর পরিবারের সকলেই ভাল, এখন তাঁরা উঠে গেছেন। পটলডাঙ্গায় বাড়ী-ভাড়া নিয়েছেন। তাঁর একটি কন্যা আছে; বয়স অল্প হলেও সে রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে একেবারে অসাধারণ।"

কৃষ্ণকুমার কালীকান্তের দিকে তাকাইল। কালীকান্ত তখন দিয়াশলাই জ্বালাইয়া বিড়ি ধরাইতেছিল, মাথা নাড়িয়া সায় দিল। কৃষ্ণকুমার বলিতে আরম্ভ করিল, "মেয়েটির নাম ঊষাবালা। তার সঙ্গে আমার অবশ্য বিশেষ আলাপ আছে। লেখাপড়া প্রভৃতি নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছে। পরে তারা উঠে যাবার পর থেকে আমার মনটা অবশ্য একটু খারাপ হয়েছিল—এবং সেই থেকেই আমি দু'চারটে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি। তারপর—"

তাহাকে বাধা দিয়া কালীকান্ত বলিল, "আর ব'লতে হবে না, আমি সব বুঝেছি। কিন্তু দেখ কৃষ্ণকুমার, এ বড় গুরুতর বিষয়। কেবলমাত্র কবিতার খাতিরে যাঁরা কবিতা লেখে, সে সব ভুয়ো-কবির কথা আলাদা। তোমার কবিতার সঙ্গে যখন একটা আস্ত মানুষ গাথা রয়েছে, তখন তার একেবারে আঁটঘাট বেঁধে চালাতে পারলে, চাই কি সময় মত তোমার আশা পূর্ণ হবে।"

"হুঁ, কিন্তু আমি তার বড় একটা উপায় দেখছি না। মা যদিও অমত না করেন, বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না।"

"উপায় আছে—আমি সব ব্যবস্থা ক'রব এখন। মা যদি সদয় থাকেন, তবে বার আনা পথ এগিয়ে থাকা গেল।"

"তাই ত! কিন্তু তুমি কি উপায় ক'রবে বল ত কালীকান্ত?"

"উপায় আর কি ক'রব বল? যাতে তোমাদের দুজনের মধ্যে প্রেম বিশেষভাবে গজিয়ে ওঠে, আর যাতে তোমরা সুখী হও, তার জন্যে আমি মনে করছি, একবার কৃপারাম বাবু এবং সেই উপলক্ষে ঊষাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা ক'রব।"

"ঊষাঙ্গিনী নয়, ঊষাবালা! গোড়াতেই যদি নাম ভুল ক'রলে, তবে দেখছি তুমি একটা বিভ্রম বাধাবে।"

"আরে কুছ পরোয়া নেই! নামে কি আসে যায়—ওতো তোমার সেক্সপিয়ারই বলে গেছেন। আর আমি নাম ভুল করলামই বা, আমি তো আর লভে পড়িনি—তুমি নাম ভুল না ক'রলেই হ'ল।"

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। গোলদীঘীতে প্রতিবিম্বিত আলোকমালায় অসংখ্য হীরক জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দুই বন্ধু বিদায় লইল। কৃষ্ণকুমার দর্জ্জিপাড়ায় গৃহে গমন করিল। কালীকান্ত বিড়ি টানিতে টানিতে দেশস্থ ছাত্রদের মেসে ফিরিল।

তাহাকে দেখিয়া জনৈক ছাত্র বলিল, "বেশ বাবা, আমার কোটটি পরে' কোথায় যাওয়া হয়েছিল? আমার যে সে জন্যে ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকতে হয়েছে, সেটা জ্ঞান আছে?"

কালীকান্ত উপরের বারাণ্ডা হইতে লম্বমান একখানি ধূতির প্রান্তভাগ দ্বারা আপনার ঘর্ম্মসিক্ত কপাল মুছিয়া উত্তর করিল, "চট কেন হে বিনোদ, আমি কি তোমাকে পর ভাবি? আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু।"

"তোমার মত ভূত নইলে একাজ আর কে করে! আচ্ছা, এখন আত্মবৎ ভেবে সতেরটা টাকা দিয়ে ফেলতো! দু'মাস ধরে' চাকরির উমেদারী করে বেড়াচ্ছ, চাকরি তো চুলোয় গেছে, এদিকে মেসের দেনা যে বেড়ে গেল।"

"ওহে বিনোদ, তোমরা ছেলে মানুষ, এ সব কথার কি বুঝবে বল। এই মেটিয়াবুরুজকা নবাব হামারা-দোস্ত হ্যায়, হামাকে হরদম খুড়া খুড়া করতে হ্যায়। চাকরির ভাবনা কি বাবা! আর দেনাই যদি না থাকবে তবে মেসে থাকব কেন? উইল্‌সনের হোটেলে কি দোষ করেছে?"

২

"দেখুন, কৃপারাম বাবু, যেদিন থেকে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সেই দিন থেকেই মনে হ'চ্ছে যে, জীবনটাকে একটা কাজে লাগাতে হবে। পূর্ব্বের ন্যায় আর ভেসে ভেসে বেড়ান চলবে না। অনির্দ্দিষ্ট, দায়িত্বহীন কর্ম্মশূন্য অবস্থার বিষম ফল যেন কতকটা উপলব্ধি ক'রতে পারছি। এই সব ভেবে চিন্তে আমি একটা উপায়ও করেছি। তা—"

কৃপারাম বাবু কালীকান্তের এই সদিচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "বেশ বাবা, খুব ভাল কথা।

তোমার কথা শুনে যে আমি কি পরিমাণে খুসি হলুম, তা' ব'লতে পারি না। তা তুমি কি করবে বলে মনে করেছ?"

কালীকান্ত মাথা চুলকাইয়া বলিল, "দেখুন কাজটা কতদূর ভাল তা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু ঠিক ঠাহর হ'চ্ছে যে কাজ যেমনই হোক্ না কেন, সাধু ইচ্ছা এবং সৎসাহসের উপর নির্ভর ক'রে চ'লতে পারলে অনেক মন্দ কাজও ভাল হ'তে পারে। তাই আমি—আমি পুলিশে ঢুকব মনে করেছি।"

"এঁ—কি বল্লে পুলিস?"

"কেন? তাতে দোষ কি? হ'তে পারে, পুলিশে অনেক মন্দ লোক আছে—তা কোন্ ব্যবসায়ে মন্দ লোক নেই? হ'তে পারে পুলিশের কাজের রকম ফেরে অনেক অন্যায় ন্যায় এবং ন্যায় অন্যায় হ'য়ে যায়, কিন্তু তাই ব'লে যদি তাতে ভাল লোক না ঢোকে, তবে পুলিশেরও কোন কালে ভাল হবার সম্ভাবনা নেই, দেশেরও একটা স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হবে না।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, কিন্তু তবুও মনে হয় যে, তোমার মত একজন বিদ্বান্ সজ্জন ছেলে কিনা পুলিশে ঢুকবে?"

"এঁ,—কি বল্লে পুলিস?"

"আজ্ঞে, বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই। আর তা থাকলেও আমি যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'পয়সা রোজগার ক'রতে যাচ্ছি, তখন সততা রক্ষা করাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হবে। এবং আমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি আর পাঁচজন ভদ্রসন্তান পুলিশে প্রবেশ করেন এবং ডিপার্টমেণ্টের উন্নতি চেষ্টা করেন, তবে ম্যাকারনেস সাহেবকে কলম ছেড়ে দিতে হবে।"

কৃপারাম বাবু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ কালীকান্ত; তোমার কাছে আমাকে হার মানতে হ'ল। তা তুমি যেরূপ সদিচ্ছা করেছ, সে খুব ভাল। তোমার আশা পূর্ণ হোক্, তুমি সুখে আছ দেখলে আমি বড়ই আনন্দলাভ ক'রব।"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদ আমি মাথায় ক'রে নিলুম। তবে আমার আশা পূর্ণ হ'তে আপনার একটু সাহায্য দরকার হবে। যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে—"

"তবে কি?"

"আজ্ঞে একখানা সুপারিশ চিঠি চাই।"

"হুঁ।" কৃপারাম বাবু একটু গম্ভীর হইলেন। তাঁহার কপালের রেখাগুলি একটু চঞ্চল বক্রগতি ধারণ করিল।

"আজ্ঞে বেশী কিছু নয়। পুলিশের বড় সাহেবকে একটু লিখিয়া দিবেন যে, আপনি আমাকে জানেন।"

"বেশ কথা" বলিয়া কৃপারাম বাবু একখানা পত্র লিখিয়া কালীকান্তের হাতে দিলেন।

"আপনার নিকট যে আমি কতদূর ঋণী, তা বলতে

পারি না। ভগবান যদি কখন দিন দেন, তবে আমার অন্তরের ভক্তি জানাতে চেষ্টা ক'রব" বলিয়া কালীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

কৃপারাম বাবুও উঠিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "Young man! ভগবানের নিকটেই মাথা নত কর, মানুষের কাছে নয়।" কৃপারাম বাবু একটু হাসিলেন, কালীকান্ত প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে কৃপারাম বাবু অন্দরের দিকে চলিলেন। ভিতরে গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল; ওর সন্ধান নিলে হয় না?"

স্ত্রী বলিলেন—"কে?"

কৃপারাম বাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "কালীকান্ত। ঐ যে ছেলেটি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। সে পুলিশের চাকরির জন্য চেষ্টা ক'রছে।"

"ওগো না, আমি পুলিশের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না, কিছুতেই দেব না।"

কৃপারাম বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সব পুলিশ কি সমান?"

স্ত্রী বলিলেন, "তা হোক্, আমার দৈত্যকুলের প্রহ্লাদে কাজ নেই।"

৩

"তারপর?"

"তারপর আর কি? একেবারে লড়াই ফতে! ভয়-ভাবনা কিছুই নেই—তুমি এইবার টোপর অর্ডার দিতে পার। আমি বরপক্ষের আর সব ব্যবস্থা করিগে" এই বলিয়া কালীকান্ত একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণকুমার বলিল, "ব্যবস্থা পরে হবে। তুমি বলত উষাবালার সঙ্গে তোমার ঠিক কি কি কথা হয়েছিল।"

কালীকান্ত বলিল, "অত শত বাপু মনে নেই; এই নাও তোমাকে সে একটা কবিতা পাঠিয়েছে, এতে সব লেখা আছে। আজকাল আমার এমনি হয়েছে যে, কোন্ দিক যে সাম্‌লাই তার ঠিক নেই—কাজের কথা অবধি ভুলে যাই।"

পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া কালীকান্ত কৃষ্ণকুমারের হাতে দিল। সে খুলিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিল।—

"লোহিত বরণ ভানু
দিবসের শেষে,
গোঠে হ'তে ফিরে কানু
পীতাম্বর বেশে।
কলসী ভাসিয়া যায়
যমুনার জলে
শ্রীরাধা চকিতে চায়
কদম্বের তলে।"

কবিতা পড়িয়া কৃষ্ণকুমারের মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল—সে বারবার কাগজখানি নিকটে দূরে মধ্যপথে রাখিয়া দেখিতে লাগিল। সিগারেট টানিতে টানিতে কালীকান্ত বক্রদৃষ্টিতে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ কৃষ্ণকুমার দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "সত্যি ব'লছ কালীকান্ত, কবিতা উষাবালা লিখে তোমাকে দিয়েছে?"

"না ত কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?"—পরে কালীকান্ত সিগারেটগৃহীত ধূমত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল "দেখ কৃষ্ণকুমার, তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার মনটা আশীবছরের বুড়োর মত পাকা—মানুষকে বিশ্বাস ক'রতে পার না। অবশ্য তুমি লভে পড়েছ, মনের মধ্যে জ্বালা ধরেছে, সে জন্যে যদি অবান্তর কথা দু'চারটে বল, তাতে আমি রাগ ক'রব না। কিন্তু তুমি কি মনে কর, যে আমি যখন তোমার জন্যে সকাল সন্ধ্যে রাত্তির পর্যান্ত কোথায় পটলডাঙ্গা কোথায় দর্জ্জিপাড়া আনাগোনা করছি—বুড়ো কৃপারামের সঙ্গে প্রাণপণে ভাব করছি, দাসীকে হাত ক'রে উষাবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তোমার মনোবেদনা জানাচ্ছি—সে কি আমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডিলোপের ভয়ে? আর এই যে এত খাটুনি, এত ভাবনা-চিন্তা, ফন্দি আবিষ্কার, তথ্য সংগ্রহ, তা এর জন্য এই জামা জুতো চাদর সিগারেট ছাড়া তোমার কাছে কখনো একটা পয়সা নিয়েছি? দেখ কৃষ্ণকুমার, কালীকান্তের মস্তিষ্কের দাম ঢের—তা অবশ্য যে দেশে জন্মেছি, সেখানে সবার মাথাতেই যখন গোবরপোরা, তখন এ পক্ষের মগজের মূল্য বোঝবার ক্ষমতা কারো নেই। আজ বিলেতে কি

আমেরিকায় হ'লে তুমিই আমাকে দু' পাঁচ হাজার পাউণ্ড বক্‌শিশ দিয়ে ফেল্‌তে। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর—হায়রে অদৃষ্ট!"

এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণকুমারের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কালীকান্তের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "আরে ভাই, রাগ কর কেন? আমিত তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই; আমার মনে হ'ল যে হাতের লেখাটা ঠিক উষাবালার মত নয়, তাই আমি জিজ্ঞাসা করলুম।"

কালীকান্ত বলিল, "হাঁ, তা সেটা খুলে বল্লেই হ'ত! আর হাতের লেখা কার তা কেমন করে' জানব? আমার সঙ্গে তার দুই চার মিনিটের দেখা বইত নয়! সে আমাকে লেখা কাগজই দিয়েছিল। আর তুমিই যে তার বর্ত্তমান হাতের লেখা চিনতে পারবে, তার মানে কি? তুমি ত তাকে বহুদিন দেখনি! এতদিন মক্স ক'রতে ক'রতে যে তার লেখা পেকে অন্যরকম হ'য়ে যায়নি, তাই বা জান্‌লে কিসে? বুঝলে কৃষ্ণকুমার, একটা ব্যাপারের আঁটঘাট বিবেচনা করে' তবে কথা ব'লতে হয়।"

কৃষ্ণকুমার কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা ঠিক কালীকান্ত; তাহলে তুমি কি ব'লতে চাও, যে মাকেও এ বিষয়ে কিছু ব'লব না?"

"নিশ্চয়ই না। তিনি ত ঠিক তোমার দিকই নেবেন—একেবারে বৌ এলে তাঁকে বলবে, 'মা এই নাও তোমার দাসী এনেছি'—তিনি জল হ'য়ে যাবেন। তাতে তোমার বাবাকেও ক্রমে জল হ'তে হবে!"

"আচ্ছা, তাহ'লে আমাকে এখন কি ক'রতে হবে?"

"কি আর ক'রবে? কিছু খরচা ক'রতে হবে। বরের যোড়, জামা চাদর জুতো টোপর ইত্যাদি কেনবার জন্যে টাকা চাই। আর আমি একটা জুড়িগাড়ী ঠিক করেছি, তার কোচম্যান-সহিসের বক্‌শিশের জন্যও কিছু চাই, তা বাদে হাতখরচা গোটা পঞ্চাশেক চাই। সবশুদ্ধ শ' দেড়েক হলেই ঢের হবে।"

"বলকি? দেড়্—শ'—টাকা!"

"ওকি! অবাক হ'চ্ছ কেন? এতো সামান্য কথা। বিয়ে কি অম্‌নি হয় নাকি? তাতে আবার তুমি যে রকম বিয়ে ক'রছ, তাতে দেড়শ' কেন, দেড় হাজারই তো লাগতে পার্‌ত। আমি আছি বলেইত, এত সস্তায় সারা যাচ্ছে তা এতেও যদি তুমি সন্দেহ কর—"

কৃষ্ণকুমার বাধা দিয়া বলিল, "থাম থাম, ফের চট কেন? আমি সন্দেহ ঠিক করছি না, আমি বলছিলুম কি, আজ আমার হাতে অত টাকা নেই। আজ গোটা পঞ্চাশেক হ'লে হয় না?"

"হুঁ, তাই বল। সোজা কথা সোজা করে, বল্লেই পার। অত ঘোর প্যাঁচ কেন? আচ্ছা, তা আজ পঞ্চাশই দাও—আমি এতে করে' সব ফরমাস দিয়ে আসি। তারপর দিনটা পাকা হ'লে, বাদবাকি দিও এখন। এর মধ্যে সব ঠিক করে' রেখো।"

কৃষ্ণকুমার অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে পাঁচখানি নোট আনিয়া কালীকান্তকে দিয়া বলিল, "এই নাও। তাহ'লে সব ঠিক থাকে যেন। কবে দেখা হবে?"

"দেখা এবার দু'চার দিন বাদে হবে। কারণ আমার সেই চাকরিটার জন্যে কাল একবার পুলিশ আফিসে যেতে হবে। এ বিষয়ে একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে, তোমার বিয়েতে একেবারে প্রাণপণ লেগে প'ড়ব। তা আমি আস্‌চে শনিবারে আসব এখন।" এই বলিয়া কালীকান্ত নোটগুলি কোটের ভিতরকার বুক-পকেটে রাখিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে প্রস্থান করিল।

মেসে ফিরিয়া আসিয়া কালীকান্ত বিনোদের দিকে দুইখানা নোট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "তোমার সতের টাকা কেটে নাও, আর বাকি তিন টাকার মাংস আন্‌তে দাও—আজ একটু ভাল ক'রে খাওয়া যাক!"

নোট দুখানা গুছাইয়া লইয়া বিনোদ বলিল, "একি রকম হ'ল বল ত? কারো ট্যাঁক কেটেছ নাকি? পুলিশে না ঢুকতেই রোজগার আরম্ভ ক'রলে দেখছি!"

"ট্যাঁক ফ্যাঁক নয় বাবা—আস্ত ব্রেণ! এ পক্ষের মস্তিষ্কের সিকি খানাও যদি তোদের থাক্‌তো, তবে বি, এল্ পাস করে' ঘাস কেটে খাবার জন্যে হয়রাণ হ'য়ে বেড়াতিস্ নে।"

৪

"দেখুন কৃপারাম বাবু, আমার আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আমি সবার আগে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আজ আমি পুলিসের কাজটা পেয়েছি। বড়

সাহেব আমার ইংরাজি কথাবার্ত্তা শুনে, রকম সকম দেখে এবং সব চেয়ে আপনার চিঠি পেয়ে, আমার প্রতি খুব খুসি হলেন এবং আমাকে একেবারে সব্‌-ইনেস্পেক্টরী-পদে ভর্ত্তি করলেন। আপনি আমার প্রণাম নিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বৃদ্ধ কৃপারাম বাবু কালীকান্তকে নিকটে টানিয়া লইলেন; তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বড় খুসি হলেম বাবা, সৎপথে থেকে কর্ম্ম কর বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

"আজ্ঞে, আপনার উপদেশ আমি সব সময়ে মনে রাখব। আর আপনিই হলেন, আমার গুরুস্থানীয়। ছেলে বেলায় পিতামাতার মৃত্যু হয়; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'লেও, আমার প্রতি ঠিক সদয় ন'ন। আর লেখাপড়াও শিখিনি বলে' লোকেরা গ্রাহ্য করে না। তবে জানলেন কৃপারাম বাবু, আমার অন্তর বলে' একটা পদার্থ আছে, আর সেটা যেদিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সেই দিন থেকে আপনার চরণে প'ড়ে আছে।"

"এই নাও। তাহলে সব ঠিক থাকে যেন।"

কৃপারাম বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বড় খুসি হই বাবা তোমাকে দেখে; একটু চা খাও, সুখবর এনেছ, একটু মিষ্টি-মুখ কর। আমার স্ত্রীকে ডাকি, তিনি তোমার মায়ের মত, তিনিও খুসি হবেন।"

কৃপারাম বাবুর স্ত্রী আসিলে, কালীকান্ত তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিনি অস্ফুটস্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া আহার্য্যের রেকাব তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "খাও বাবা; তোমার কথা শুনে পর্য্যন্ত তোমাকে দেখবার খুব সাধ হয়েছিল, আজ দেখে চক্ষু জুড়লো। যেমন রূপ গুণ, ঠাকুর তেমনি সুখে রাখুন।"

কালীকান্ত ভক্তিবিকম্পিত স্বরে বলিল, "আপনাদের দয়াতেই বেঁচে আছি। এমনি অনুগ্রহ চিরদিন রাখবেন।"

সেই রাত্রেই কৃপারাম বাবুর স্ত্রী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কালীকান্তের মত উপযুক্ত পাত্রের হাতে উষাবালাকে অর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

৫

কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "সব ঠিক ত?"

সিগারেট ধরাইয়া কালীকান্ত বলিল, "ঠিক!"

"কখন বেরুতে হবে?"

"তুমি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমার মেসে এসে উপস্থিত হবে।"

"তাহলে তুমি যা ব'লছ, সেই রকমই করব। আমি সাদা ধুতিচাদর পরে যাব; তুমি বর সেজে যেয়ো। কিন্তু সেখানে গিয়ে পোষাক-পরিবর্ত্তনের কি হবে?"

কালীকান্ত ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল, "পোষাক-পরিবর্ত্তন নেই বা হ'ল—আমি ত আর বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি না।"

কৃষ্ণকুমার কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও কিছু বলিল না। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময়ে সে শ্যামবাজারে কালীকান্তের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। একখানি ঘরের জুড়ী-গাড়ী এবং চারপাঁচখানি ভাড়াগাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। মেসের ছেলেরা সাজগোজ করিয়া শশব্যস্তে যে যে রূপে সুবিধা পাইতেছিল, সেইরূপে গাড়ীতে চড়িয়া বসিতেছিল। বিনোদ বরবেশী কালীকান্তকে জুড়ীগাড়ীতে উঠাইল। কালীকান্ত কৃষ্ণকুমারকে সেই গাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া বিনোদকে বলিল, "ইনিই আমার সেই বন্ধু।" বিনোদ বলিল, "মশায়ের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে সুখী হলুম।" কৃষ্ণকুমার মাথা নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। ভাড়া-করা পুরোহিতও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, বিবাহের অভিযান পটলডাঙ্গা অভিমুখে রওনা হইল।

পথে কৃষ্ণকুমার কালীকান্তের আনন্দ-পুলকিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "খুব এক্‌টিং করছ দেখছি—দেখ যেন সব ঠিক থাকে!"

কালীকান্ত বলিল, "কুছ্ পরোয়া নেই—স্বয়ং দারোগা সাহেব বলেছেন, রাহাজানি কর্‌তে দেবেন না। দেখ, কৃষ্ণ কুমার, তুমি তাঁদের বাড়ীতে পৌছে, গাড়ী থেকে নেমেই এই কাগজখানা পড়ে' দেখবে; এতে সব লেখা আছে।" এই কথা বলিয়া কালীকান্ত কৃষ্ণকুমারের হাতে একটা মোড়া কাগজ গুঁজিয়া দিল।

যথাসময়ে বরের গাড়ী কৃপারাম বাবুর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃপারাম বাবু এবং তাঁহার কয়েকটি আত্মীয় বন্ধু কালীকান্তকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অবতরণ করাইলেন। সানাই বাজিয়া উঠিল, পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি সহকারে শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া কৃষ্ণকুমার নিকটস্থ গ্যাস-পোষ্টের তলায় গিয়া সেই কাগজখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন:—

'ভাই কৃষ্ণকুমার—এ বিবাহ আমিই করিতেছি, তুমি রাগ করিও না। তোমার মত তরুণ বয়সে, যাকে বলে প্রেম, তা গজায় না, যাকে বলে লভ্ তা বরং হতে পারে। তবে লভ্ পদার্থটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আর কেবল মাত্র লভে পড়ে' বিবাহ করলে বসন্ত-কালটাও বার মাস টেঁকে না। এ সব কথা তুমি যদি এখন না বুঝতে পার, তবে আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, সাত দিন বাদে ঠিক বুঝতে পারবে, তখন মনে মনে আমাকে অনেক ধন্যবাদ দেবে। আমি নিজে বিবাহ করে' বাস্তবিক তোমার উপকার করলুম।

তোমার দেড় শ' টাকা আমি ধারি। ঠকাইয়া লইবার মতলব নাই—এই সঙ্গে একটা হ্যাণ্ডনোট দিলাম। তোমার যে দিন ইচ্ছা টাকা আদায় করিয়া লইয়ো। এই ঋণের জন্য আমি তোমার কাছে কেনা হইয়া রহিলাম।

তুমি পরশুদিন আমার মামার বাড়ীতে আসিয়া বৌ দেখো। আমিই গিয়ে তোমায় নিয়ে আস্‌ব'। আর আজ রাত্রে কৃপারাম বাবুর বাড়ীতে দু'খানা লুচি অবশ্য অবশ্য খেয়ে যেয়ো। আবার বলি ভাই, আজকার দিনে রাগ ক'রো না। তুমিই আমার পরম সুহৃদ্।

তোমার প্রণয়মুগ্ধ কালীকান্ত!'

পত্রখানি পড়িয়া কৃষ্ণকুমারের শরীরের মধ্যে একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সে একবার কৃপারাম বাবুর বাড়ীর প্রতি চাহিয়া দেখিল। মুক্ত জানালা দিয়া আলোক-মালার উজ্জ্বল জ্যোতির সহিত কুটুম্ব এবং অভ্যাগতজনের কলহাস্য বহিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণকুমার সেখানে আর দাঁড়াইল না।

দুগ্ধ

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন]

শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন পৃথিবীর অন্য কোন পদার্থের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই দুগ্ধের সহিত তাহার প্রথমে পরিচয় হয়। সূতিকা-শয্যায় একমাত্র দুগ্ধই তাহার জীবন-সম্বল.; আবার অন্তিম শয়নে মানব যখন আর কিছুই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, তখনও "দুধ-গঙ্গাজল"ই তাহার সম্বল। মধ্যে সমস্ত জীবন ত পড়িয়াই রহিয়াছে। রোগশয্যায় মানব যখন অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখনও এই দুগ্ধ তাহার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়। আর এই দুগ্ধের মধ্যে গাভীদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ; তাই হিন্দুর "জীবনে মরণে গাভী"—তাই হিন্দু "গোমাতার" উপাসক। গোসেবা হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ। সাধারণতঃ আমরা, ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস, লবণ, তৈল, ঘৃত, মস্‌লা, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করি; কারণ আমাদের শরীরের রক্ষণ এবং পোষণের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার দ্রব্য আবশ্যক। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে দুগ্ধই একমাত্র পদার্থ, কেবল মাত্র যাহা পান করিয়া আমরা জীবন-ধারণ করিতে পারি। কারণ আমাদের শরীর-পোষণের নিমিত্ত যে যে পদার্থ যে পরিমাণে আবশ্যক, দুগ্ধের মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

দুগ্ধের উপাদান :—দুগ্ধ-বিশ্লেষণ করিলে আমরা নিম্নলিখিত পদার্থগুলি প্রাপ্ত হই :—

উপাদান পদার্থ		নারী-দুগ্ধ	গো-দুগ্ধ	ছাগী-দুগ্ধ	গর্দ্দভী-দুগ্ধ	মেষী-দুগ্ধ
অন্নসার বা প্রোটিড্ (পনীরময় পদার্থ-দুগ্ধ-লাল ইত্যাদি)	...	১'৬২	৪'২৮	৩'৮৫	১'১৫	৭'০০
লবণময় উপাদান.. salts বা খনিজ-পদার্থ ইত্যাদি।	...	'২৭	'৯৮	'৬৫	'৫৫	
মেদময় পদার্থ	...	৩'১৪	৩'৫০	৪'১০	১'৪০	৬'৫০
দুগ্ধ-শর্করা	...	৬'২৬	৩'৯০	৫'৮০	৬'৪০	৪'৫০
জল	...	৮৮'৭১	৮৭'৩৪	৮৫'৬০	৯০'৫০	৮২'০০
মোট	...	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০

এই সমুদায়ের মধ্যে একমাত্র মেদময় অংশ বা মাখন ব্যতীত অন্য সকল পদার্থই দুগ্ধের জলীয়াংশের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মেদ-কণিকাগুলি দুগ্ধের মধ্যে অণুর আকারে ভাসমান থাকে। ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল পরীক্ষা করিয়া বঙ্গরমণীগণের দুগ্ধে সাধারণ নারী-দুগ্ধ অপেক্ষা সারাংশ কম এবং জলীয়াংশ অধিক প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এদেশীয় নারীদুগ্ধে অন্নসার বা

প্রোটীন	শতকরা	১'২০	অংশ
লবণময় উপাদান বা ধাতব পদার্থ	"	'২৪	"
মেদময় পদার্থ	"	২'৮০	"
দুগ্ধ-শর্করা	"	৫'৯০	"
জল	"	৮৯'৮৬	"
মোট	"	১০০'০০	

বঙ্গরমণীগণের অন্ন-ভোজনই এই তারতম্যের প্রধান কারণ। অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা ভাতের মধ্যে জলীয়াংশ অধিক। দুধের উক্ত অন্নসারময় অংশ (proteid) আবার দুই অংশে বিভক্ত (১) ছানা এবং পনীরের উপাদান কেসিন্ অর্থাৎ ছানাজনক বা পনীরময় পদার্থ এবং (২) ল্যাক্‌টো য়্যাল্‌বুমেন বা দুগ্ধ-লাল। গোদুগ্ধের মধ্যস্থিত ৪·২৮ ভাগ অন্নসারের মধ্যে প্রায় ৩·৬২ ভাগ কেসিন বা ছানাজনক পদার্থ এবং ·৬৬ ভাগ দুগ্ধ-লাল। সাধারণতঃ ১০০ ভাগ অন্নসার বা প্রোটিনের মধ্যে—

অক্‌সিজেন বা অম্লজান	২২ ভাগ
নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান	১৬ "
কার্ব্বন বা অঙ্গার	৫৪ "
হাইড্রোজেন বা উদজান	৭ "
গন্ধক	১ "
	১০০

প্রোটিন বা অন্নসার।—নাইট্রোজেন-ঘটিত এই প্রোটিন বা অন্নসার অর্থাৎ দুগ্ধের ছানাজনক উপাদান এবং দুগ্ধ-লাল আমাদের জীবনধারণের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক। উহা আমাদিগের শরীরের শক্তিরক্ষক এবং শক্তিসংস্থাপক। উহাদ্বারা আমাদের শরীরের বিধান-তন্তু-(tissue) গুলি নির্ম্মিত হয় এবং পুরাতন বিধানতন্তুর জীর্ণসংস্কার সাধিত হয়। আমাদের অস্থি, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শরীরের সর্ব্বস্থানেই যবক্ষারজানময় তন্তুসকল বিদ্যমান আছে। এই সমুদায় খাদ্য আমাদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে। যে সকল পদার্থের মধ্যে অন্নসার বা নাইট্রোজেনঘটিত কোন পদার্থ নাই আমরা কেবল মাত্র তাহা আহার করিলে আমাদের শরীর দিন দিন শুষ্ক হইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। মেষীর দুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং গর্দ্দভীর দুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে অন্নসার আছে।

মেদময় পদার্থ।—দুগ্ধের মেদময় অংশই মাখনের উপাদান। সকল স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ হইতেই মাখন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সদ্য-দোহিত দুগ্ধের মধ্যে মেদ-কণিকাগুলি সূক্ষ্ম অণুর আকারে ভাসমান থাকে। উক্ত মেদকণিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দুধ কিছু সময় রাখিয়া দিলে দুগ্ধের জলময় অংশ হইতে লঘু বলিয়া উহার অধিকাংশ দুগ্ধের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। মাখনের মধ্যে নাইট্রোজেন আদৌ নাই; উহাতে কেবল কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন আছে। কিন্তু যে পরিমাণ অক্‌সিজেন থাকিলে হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলে পরিণত হইতে পারে, উহাতে তাহা অপেক্ষা কম। দুগ্ধের এই মেদময় অংশ পাকস্থলী হইতে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় নির্গত হইয়া অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্লোমরস ও পিত্তরসের সাহায্যে জীর্ণ হয়। দুগ্ধের মেদময় অংশ হইতে আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল পরিপোষিত হয়। আমাদের শরীরের চর্ব্বিময় অংশও ইহাদ্বারা গঠিত ও পোষিত হয়। আমাদের শরীরের তাপরক্ষার্থও মেদময় পদার্থের প্রয়োজন।

দুগ্ধ-শর্করা।—দুগ্ধের শর্করাময় অংশ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন এই তিন পদার্থে গঠিত এবং যে পরিমাণে অক্‌সিজেন বিদ্যমান থাকিলে হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলে পরিণত হইতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণেই আছে। দুগ্ধের এই অংশ দেহে উত্তাপ এবং পেশীতে শক্তি সঞ্চার করে এবং মেদতন্তু-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু মেদময় অংশের ন্যায় ইহার অভাবে আমাদের শরীর একান্ত ক্ষীণ হয় না। ইহা ব্যতীত আমাদের দেহরক্ষা একেবারে অসম্ভব নহে। এই অংশ হইতে ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড্ ব্যাসিলাস (Lactic acid bacillus) বা দধিবীজ নামক উদ্ভিদাণুর সাহায্যে এক প্রকার অম্লরস উৎপন্ন হয়, উহাকে ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড্ বলে। *

অক্‌সিজেন সাহায্যে আমাদের শরীর মধ্যে অনবরত যে দহন কার্য্য চলিতেছে, খাদ্যের তৈলময় এবং শর্করাময় অংশই তাহার ইন্ধন যোগায়। দুগ্ধ-শর্করাকে lactose বলে। উহা রসায়ন শাস্ত্রের কার্ব্বোহাইড্রেড্ শ্রেণীভুক্ত।

লবণময় উপাদান।—লবণময় উপাদান বা খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ, ম্যাগ্‌নিসিয়া, চূণ, ক্ষার (potash) ফস্‌ফরাস্ ও সোডা-ঘটিত লবণই প্রধান। এই সমুদায় খনিজ

---

* Lactic acid কথার বঙ্গানুবাদে আজকাল "দুগ্ধাম্ল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে "দধ্যম্ল" কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। শব্দকল্পদ্রুমে দধি-কূর্চ্চিকা শব্দ দ্রষ্টব্য—"উষ্ণ দুগ্ধে দধ্যম্লসংযোগাৎ" এস্থলে দধ্যম্ল শব্দ Lactic acid অর্থে ব্যবহৃত

পদার্থের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে শরীরের উত্তাপ ও শক্তি সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত হইলেও ইহাদের প্রধান কার্য্য দন্ত, অস্থি প্রভৃতি শরীরের কঠিন অংশ সকল গঠন ও পোষণ করে। দুগ্ধমধ্যস্থ ফস্‌ফেট অব্ লাইম নামক ফস্‌ফরাস ও চূণঘটিত পদার্থ আমাদের শরীরের তন্তুসকল (tissue) নির্ম্মাণের সহায়তা করে এবং স্নায়ুমণ্ডলের গঠনের জন্যও উহা আবশ্যক। এই ফস্‌ফরাসঘটিত লবণগুলি কি জীব কি উদ্ভিদ্ সকলেরই অন্যতম উপাদান।

নারী-দুগ্ধ।—সাধারণতঃ আমাদের শরীর-ধারণের নিমিত্ত তিন শ্রেণীর পদার্থ আবশ্যক—

(১) প্রোটিন অর্থাৎ অন্নসার বা নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ।

(২) তৈলময় পদার্থ।

(৩) শর্করা প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ বা কার্ব্বোহাইড্রেড্।

এই তিন শ্রেণীর পদার্থই দুগ্ধের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় দুগ্ধ আমাদের শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ। দুগ্ধের মধ্যে মাতৃস্তন্যই মানবশিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। ইহার মধ্যে পনীরময়, মেদময় ও শর্করাময় অংশ প্রায় সমপরিমাণে বিদ্যমান। ইহার জলীয় অংশ গর্দ্দভী-দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক এবং পনীরময় অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই নিমিত্ত মাতৃ-দুগ্ধ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা কম পুষ্টিকর হইলেও লঘুপাক। বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় রমণীগণের দুগ্ধে প্রোটিন অর্থাৎ অন্নসার প্রভৃতি গুরুপাক পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এই অন্নসার বা প্রোটিনের মধ্যেও আবার অন্যান্য দুগ্ধের তুলনায় নারী-দুগ্ধে কেসিনের বা ছানাজনক পদার্থের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প ও দুগ্ধ-লাল বা ল্যাক্‌টোয়্যাল্‌বুমেন নামক পদার্থের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। এই নিমিত্ত এবং দুগ্ধ-শর্করার ভাগ অধিক থাকায় নারী-দুগ্ধ, গো-দুগ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অম্লসংযোগে সহজে "ছিঁড়িয়া" যায় না বা নষ্ট হয় না। গো দুগ্ধ উদরস্থ হইলে উহা উদরস্থ পাচকরস সংযোগে এক প্রকার গুরুপাক নিরেট এবং ঘন ছানা কাটে (যাহার অধিকাংশ মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়) কিন্তু নারী-দুগ্ধ এবং গর্দ্দভী দুগ্ধ এক প্রকার লঘুপাক তুলার আঁসের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুবিশিষ্ট (flocculent) পাতলা ছানা কাটে। (যাহার অধিকাংশ জীর্ণ হইয়া রক্ত, মাংস প্রভৃতিতে পরিণত হয়)। উভয়ের উপাদানসমূহ তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশীয় নারী-দুগ্ধ ও গর্দ্দভী-দুগ্ধ প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। নারী-দুগ্ধে শতকরা ১·২০ ভাগ প্রোটিন বা অন্নসার, গর্দ্দভী-দুগ্ধে শতকরা ১·১৫ ভাগ। শর্করা নারী-দুগ্ধে শতকরা ৫·৯০ অংশ, গর্দ্দভী-দুগ্ধে ৬·৪০ অংশ এবং জল নারী-দুগ্ধে শতকরা ৮৯·৮৬, গর্দ্দভী-দুগ্ধে শতকরা ৯০·৫০ অংশ বিদ্যমান থাকায় উভয় দুগ্ধ সম লঘুপাক। এই নিমিত্ত মাতৃ-স্তন্যের অভাবে গর্দ্দভী-দুগ্ধের দ্বারা শিশুপালন করার পক্ষে কোন বাধা নাই; বরং নারী-দুগ্ধের শতকরা ৩·১৪ ভাগ (বঙ্গ-মহিলার দুগ্ধের ২·৮০ ভাগ) মেদময় পদার্থের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভী দুগ্ধে ১·৪০ ভাগ মেদময় পদার্থ থাকায়, উহা উদরাময় রোগগ্রস্ত শিশুদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। শিশুর বয়স ৬ মাস হওয়ার পূর্ব্বে তাহাকে গো-দুগ্ধ খাওয়ান উচিত নহে; কারণ ঐ সময়ে গো-দুগ্ধে যে পরিমাণে পনীরময় বা ছানাজনক পদার্থ থাকে, তাহা পরিপাক করিবার উপযোগী ক্লোম রস শিশুর উদরে নির্গত না হওয়ায় শিশু উক্ত দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না এবং উদরাময় ও যকৃত রোগে (infantile liver) পীড়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং ৬ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে স্বীয় জননীর স্তন্যপান করিতে দেওয়া উচিত এবং তাহাতে বিশেষ কোন বাধা থাকিলে বা শিশু মাতৃহীন হইলে তাহাকে "গাধার দুধ" দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, জননীর শরীর অসুস্থ হইলেও অনেক স্থলে দুগ্ধ তত বিকৃত হয় না। গো-দুগ্ধের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, নারী-দুগ্ধে দুগ্ধ-শর্করার অংশ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক কিন্তু প্রোটিনের ভাগ অনেক কম; এই প্রোটিনের মধ্যে আবার নারী-দুগ্ধে গো-দুগ্ধ অপেক্ষা কেসিন বা ছানা-জনক পদার্থের ভাগ কম এবং দুগ্ধ-লাল বা ল্যাক্‌টোয়্যাল্-বুমেনের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। ছানার উপাদান কম ও দুগ্ধ-শর্করা অধিক থাকায় নারী-দুগ্ধ গো-দুগ্ধের ন্যায় সহজে "ছিঁড়িয়া" যায় না বা ছানা কাটে না। লবণময় উপাদানগুলি নারী-দুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে অধিক। কিন্তু নারী-দুগ্ধে ক্ষারের অংশ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক, বিশেষতঃ যে সকল গাভী খোলা মাঠে চরে না তাহাদের দুগ্ধ অম্লগুণ (acid in reaction) কিন্তু সাধারণতঃ নারী-দুগ্ধ

ক্ষারানুরস (alkaline in reaction); এই সমুদায় কারণে মাতৃস্তন্যে অভ্যস্ত শিশুদিগকে গোদুগ্ধ দিলে তাহাদের 'অম্ল হয়' এবং তাহারা ছানা বমন করে। আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের দুগ্ধ স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট। ইহাতে বোধ হয়, এক স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ অন্য স্তন্যপায়ী জীব-শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। বোধ হয়, একের শিশু অন্যের স্তন্য পান করিবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। গো-দুগ্ধের মধ্যে নীল লিট্‌মাস্ কাগজ দিলে যদি উহা রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উক্ত দুগ্ধ অম্লানুরস। এইরূপ দুগ্ধে অল্প পরিমাণে চূণের জল বা দু এক রতি বাইকার্ব্বনেট অব পটাস (Potas bicarb) দিলে দোষ সংশোধিত হইতে পারে।

মেষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ।—সমুদায় স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধের মধ্যে মেষীর দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; কারণ উহার মধ্যে ছানাজনক পদার্থ বা পনীরময় অংশ ও মেদময় অংশ উভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ছানা এবং মাখন মেষদুগ্ধে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্য কোন দুগ্ধে সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ছাগী-দুগ্ধ, গোদুগ্ধ অপেক্ষা বলকারক অথচ ধারক গুণবিশিষ্ট এবং নিরাপদ। ইহার মধ্যে জীবাণু, উদ্ভিদাণু বা ব্যাকটিরিয়া, ব্যাসিলি না থাকায় ইহা রোগীর পক্ষে নিরাপদ পথ্য, বিশেষতঃ যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে ইহা ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে। পশুদিগের মধ্যে ছাগল সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু এবং যথেষ্ট ঋতুবৈষম্য বা শীতগ্রীষ্মের ব্যবধান সহ্য করিতে পারে। উদরাময় বিশেষতঃ আমাশয় রোগে ছাগদুগ্ধ সুপথ্য। উদরস্থ হইলে ইহা গোদুগ্ধের ন্যায় নিরেট ছানা না কাটিয়া নারীদুগ্ধ ও গর্দ্দভীদুগ্ধের ন্যায় সুপাচ্য পাতলা ছানা কাটে বলিয়া পনীর-ময় ও মেদময় পদার্থের আধিক্যসত্ত্বেও গোদুগ্ধ অপেক্ষা লঘুপাক। গর্দ্দভী-দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা লঘুপাক কিন্তু কম পুষ্টিকর। ইহাও ছাগদুগ্ধের ন্যায় উদরাময় রোগে এবং বসন্ত-রোগে সুপথ্য।

মহিষদুগ্ধ।—মহিষদুগ্ধ একমাত্র মেষ-দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা গুরুপাক এবং এক প্রকার তীব্র গন্ধ-বিশিষ্ট; এই নিমিত্ত উহার ব্যবহার কম। কিন্তু উড়িষ্যায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে মহিষ-দুগ্ধ এবং মহিষ-দধি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহিষ-দুগ্ধ এবং মহিষ-দধি ব্যবহারে শরীর স্থূল হয়। এই সমুদায় প্রদেশে মহিষই এক প্রকার প্রধান সম্পত্তি। এক একজন অবস্থাপন্ন মহিষ-পালকের চারি পাঁচশত পর্য্যন্ত মহিষ থাকে। ইহাদের মধ্যে একটি কুপ্রথা আছে, ইহারা পুরুষজাতীয় মহিষ-বৎসগুলি অনাহারে হত্যা করিয়া থাকে এবং একটি বৎসের সাহায্যে অনেকগুলি মহিষী দোহন করে। একটি সুস্থকায়া পালিতা মহিষী প্রতিদিন দশ হইতে চৌদ্দসের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে; এই নিমিত্ত এবং মহিষ-দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মেদময় পদার্থ বা মাখন বিদ্যমান থাকায় গব্যঘৃত অপেক্ষা মাহিষাঘৃত অধিকতর সুলভ। একসের বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ হইতে এক ছটাক হইতে দেড়ছটাকের অধিক মাখন পাওয়া যায় না কিন্তু একসের খাঁটি মহিষদুগ্ধ হইতে যে পরিমাণে মাখন পাওয়া যায়, তাহা দুই ছটাকের কম নহে। বঙ্গদেশে মহিষ-দুগ্ধ বা মহিষ দধি সচরাচর ব্যবহৃত না হইলেও মহিষ-ঘৃতের প্রচলন অতিশয় অধিক। মহিষদুগ্ধে গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছানা পাওয়া যায়। মহিষদুগ্ধ দেখিতে গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র। মহিষদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধি এবং মাখনও গব্যদধি ও গব্য-মাখন অপেক্ষা অধিক শুভ্র। মহিষ-দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত মাখনের এই শুভ্র বর্ণের জন্য অনেকে উহা ব্যবহার করিতে অসম্মত; এই নিমিত্ত নানা উপায়ে মহিষ-মাখন রংকরা হইয়া থাকে। একটি মহিষীকে ছয় সের পরিমাণে মিশ্র খাদ্য দিলে সে প্রত্যহ ১০ দশ হইতে ১৪ চৌদ্দসের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়; উহা হইতে পাঁচপোয়া হইতে সাত পোয়া পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মাখন পাওয়া যায়। এজন্য মহিষ-পালন একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়।

গোদুগ্ধ।—মেষদুগ্ধ দুর্গন্ধ এবং দুষ্পাচ্য বলিয়া কেহ ব্যবহার করে না। মহিষদুগ্ধ অতিশয় গুরুপাক, ছাগদুগ্ধ এবং গর্দ্দভী দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, এইরূপ নানাকারণে গোদুগ্ধই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোদুগ্ধ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু, সুগন্ধ, সুপাচ্য এবং সুলভ। ভারতবর্ষে হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই গাভী-পালন এবং গোসেবা একটি অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে, এবং গোধন প্রধান সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত। এমন কি, সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণও গাভীপালন করিতেন। এখনও পল্লীবাসী গৃহস্থগণের মধ্যে কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, প্রায় সকলেই গাভীপালন করিয়া থাকেন। বলিতে

গেলে গোদুগ্ধই পল্লীবাসীদিগের অন্নভোজনের প্রধান উপকরণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নগরবাসিগণ বিশেষতঃ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ এরূপ সুসেব্য পদার্থে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল স্থানে খাঁটি দুগ্ধ কেবল দুর্ম্মূল্য নহে—দুষ্প্রাপ্য। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কোন চেষ্টাই হইতেছে না। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ হইতে "ভারতবর্ষের গোসংরক্ষণ কোম্পানী" নামক পঞ্চাশ কোটি টাকা মূলধনের একটি কোম্পানী খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। কোম্পানীর কার্য্য ক্ষেত্র হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ। প্রত্যেক জেলার প্রধান নগরে পাঁচশত গাভীর একটি গোশালা এবং প্রত্যেক পাঁচখানি গ্রামের নিমিত্ত পঞ্চাশটি গাভীর একটি গোশালা নির্ম্মিত হইবে। প্রার্থনা করি, কোম্পানী এই শুভ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হউন।

দুগ্ধের গাঢ়তা।—যে দুগ্ধে যত অধিক পরিমাণে মাখন এবং ছানা আছে, তাহা তত গাঢ় বা সারবান। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে দুগ্ধের মধ্যে মাখন এবং ছানার অংশ অধিক পরিমাণে থাকে। এই নিমিত্ত শীতকালের দুগ্ধ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা গাঢ়তর। আবার গো-দোহন সময়ে প্রারম্ভকালের দুগ্ধ অপেক্ষা শেষ সময়ের দুগ্ধ অধিকতর গাঢ়। দোহনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ মাখনের অংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম কয়েক টানে যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে শতকরা এক অংশ মাত্র মাখন থাকে কিন্তু শেষ কয়েক টানের দুগ্ধে কোন কোন সময়ে শতকরা ৮ হইতে ৯ অংশ পর্য্যন্ত মাখন দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীর আহারের উপরও দুগ্ধের গাঢ়তা নির্ভর করে। যে সকল গাভী কাঁচা ঘাস ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ অপেক্ষা যে সকল গাভী খ'ইল বিচালি প্রভৃতি ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ অধিকতর গাঢ়। যে সকল গাভী জলজ তৃণাদি ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধে জলীয়াংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সারাংশ বা ছানা ও মাখনের ভাগ কম। দেশ-ভেদেও দুগ্ধের গাঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে। নিম্ন-বঙ্গের গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলের গাভীর দুগ্ধ অধিকতর গাঢ়। গাভীর প্রসবের পর প্রথম অবস্থায় যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহাতে সারাংশ কম এবং জলীয়াংশ অপেক্ষাকৃত অধিক; পরে গো-বৎসের বয়স বৃদ্ধিতে সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধেরও গাঢ়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই নিমিত্ত "নূতন গাভীর" দুগ্ধ অপেক্ষা "পুরাতন গাভীর" দুগ্ধ লোকে অধিক পছন্দ করে। অনেকেই প্রসবের পর ২১ দিন গত না হইলে গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করেন না। দুগ্ধের গাঢ়তা গাভীর বয়সের উপরও অনেকটা নির্ভর করে; গাভীর প্রথম প্রসবের পর হইতে ক্রমশঃ যতই তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, দুগ্ধের গাঢ়তাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। দুগ্ধের গাঢ়তা গাভীর জাতির উপরেও নির্ভর করিয়া থাকে। কাঁচা ঘাস খাওয়াইলে দুগ্ধ পাতলা এবং খইল বিচালি, ছোলা প্রভৃতি খাওয়াইলে দুগ্ধ গাঢ় হয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রসবের পর কিছু দিন গাভীকে চাউল, মাসকলাই এবং লাউ একত্র সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে ঐ গাভী যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ প্রদানে সমর্থ হয়।

দুগ্ধ-পরীক্ষা।—সাধারণতঃ দুগ্ধমান যন্ত্রের (lactometer) দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু উহাতে দুগ্ধের কেবল জলীয়াংশেরই পরীক্ষা হইতে পারে, ছানা অথবা মেদময় অংশের পরীক্ষা হয় না। তাহাও আবার সকল ক্ষেত্রে সফল নহে; কারণ সহর এবং সহরতলি-নিবাসী চতুর দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ দুগ্ধে প্রথমে জল দিয়া পাতলা করিয়া লয়, পরে ক্রমশঃ চিনি ও এরোরুট প্রভৃতি শ্বেতসারময় দ্রব্য মিশাইয়া উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific-gravity) দুগ্ধমান যন্ত্র সাহায্যে ঠিক করিয়া দেয়। এরূপ স্থলে দুগ্ধমান যন্ত্রের পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দুগ্ধের বর্ণ এবং গন্ধ উহা ভাল কি মন্দ দেখিয়া লইবার সহজ উপায়।—যে দুগ্ধ ঈষৎ হরিদ্রাভ তাহাই উৎকৃষ্ট; গো-দুগ্ধের মধ্যস্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখন-কণিকাগুলিই এই হরিদ্রাভ বর্ণের কারণ। দুগ্ধের মধ্যে মাখন-কণিকা যত অধিক হইবে, উহার বর্ণ তত গাঢ় হইবে, কিন্তু মাখন তুলিয়া লইলে ঐ বর্ণ আর থাকিবে না ও বড় বড় মাখনের কণা দুগ্ধের উপর ভাসিতে দেখা যাইবে। এইরূপে মাখন-তোলা দুগ্ধ চিনিয়া লওয়া যায়। অন্য পদার্থের দ্বারা রং ফলাইলে, উহা গন্ধ হইতে ধরা যায়। গাভী-দোহনের দু' তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে কতকগুলি গোলাপ-পাপড়ি খাইতে দিলে দুগ্ধে সুন্দর গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়। ঐ রূপ বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প অথবা অন্য কোন গন্ধ দ্রব্য খাইতে দিলে দুগ্ধে সেইরূপ

গন্ধ পাওয়া যায়। অনেক গাভী মাঠে চরিতে গিয়া "গোরশুন" নামক এক প্রকার গাছ ভক্ষণ করে; তাহাদের দুগ্ধে ঠিক রশুনের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। আবার মৃগনাভি প্রভৃতি কোন তীব্রগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য কাঁচা দুগ্ধের নিকট রাখিয়া দিলে তাহাতেও সেই গন্ধ পাওয়া যায়। কাঁচা দুগ্ধ অতি সহজেই বায়ু হইতে গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে; কেবল গন্ধ নহে, অন্যান্য দূষিত পদার্থও গ্রহণ করিতে পারে। এই নিমিত্ত কাঁচা দুগ্ধ যত সত্বর সম্ভব সিদ্ধ করা উচিত। অধিক সময় কাঁচা অবস্থায় রাখিয়া দিলে দুগ্ধ এত অধিক পরিমাণে এই সমুদায় দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে যে, জ্বালে চড়াইয়া দিবা মাত্র উহা "ছিঁড়িয়া যায়।" দুগ্ধে কোন প্রকার অস্বাভাবিক গন্ধ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, উহা খারাপ হইয়াছে। সামান্য অম্লগন্ধ পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, সে দুগ্ধ জ্বালে টিকিবে না অর্থাৎ জ্বাল দিবার সময় "ছিঁড়িয়া যাইবে"।

রোগ-বীজাণু।—আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণশীল রোগ-বীজাণুসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্কটময় জীবন ধারণ করিতেছি বা ভীষণ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত আছি। এই সমুদায় বীজাণু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—জীবাণু (protozoa) এবং উদ্ভিজ্জাণু (bactirea)। উদ্ভিজ্জাণু আবার দুই প্রকার; উহাদের গোলাকারগুলিকে ককাই এবং লম্বাগুলিকে ব্যাসিলি বলে। এই সমুদায় উদ্ভিজ্জাণু এবং কোন কোন জীবাণু দুগ্ধ মধ্যে অতি সহজে ও নানা উপায়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। ধরিতে গেলে দুগ্ধকে জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণু-শূন্য অবস্থায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব, তথাপি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিলে অনিষ্টকর জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণুর পরিমাণ যথাসম্ভব কমান যাইতে পারে। অনেক সময় এই গোদুগ্ধের দ্বারাই কলেরা, ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্ জ্বর, রক্তামাশয় বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বীজ, আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। প্রথমতঃ যে সমুদায় গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করা হয়, তাহাদের এই সমুদায় সংক্রামক রোগ থাকাতে রোগবীজাণু দুগ্ধ মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধ-ব্যবসায়িগণ দুগ্ধে ভেজাল দিবার নিমিত্ত যে অপরিষ্কার জল ব্যবহার করে, তাহার মধ্যে উহা থাকিতে পারে। তৃতীয়তঃ দোহনকারীর হস্ত অপরিষ্কার থাকিলে, তাহার হস্তেও রোগ-বীজ থাকিতে পারে এবং দোহন-কালে ঐ হস্ত হইতে দুগ্ধ মধ্যে সংক্রামক আকারে দেখা দেয়। চতুর্থতঃ কাঁচা দুগ্ধ অধিক সময় অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে উহা বায়ু হইতেও এই সমুদায় রোগ-বীজাণু গ্রহণ absorb করিতে পারে। এই সমুদায় উদ্ভিজ্জাণু ফারেনহিটের ৮০° ডিগ্রী উত্তাপে উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায় কিন্তু দুগ্ধের তাপাংশ ৪৫° ডিগ্রী অথবা তাহার নিম্নে থাকিলে উহার মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত দুগ্ধ দোহন করিবার অব্যবহিত পরেই অতিশয় ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিলে সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

দুগ্ধ-রক্ষা।—দুগ্ধ যাহাতে সহজে নষ্ট হইয়া না যায়, এই নিমিত্ত "বোরিক য়্যাসিড" ফরম্যালিন, ভিনিগার, স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic acid) প্রভৃতি পদার্থ দুগ্ধে প্রক্ষেপ করা হয়। উহা দ্বারা দুগ্ধমধ্যস্থ উদ্ভিদাণুগুলির ধ্বংস হইয়া থাকে। সামান্য পরিমাণে "সোহাগার খই" দুগ্ধের মধ্যে দিলেও দুগ্ধ সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু এই সমুদায় পদার্থের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষতঃ শিশুদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। শোধিত সুরাসার (রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট) অথবা হুইস্কি দিয়া বোতল ধুইয়া লইয়া তাহার মধ্যে দুগ্ধ রাখিলে, উহা অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আজকাল অল্পমূল্যে "ষ্টিরিলাইজার" নামক এক প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়। উহাতে করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া লইলে দুগ্ধের জীবাণু ও উদ্ভিদাণুসমুদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি বোতলের ভিতর দুগ্ধ পূরিয়া উহার গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে এরূপ ভাবে একটি জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর বসাইয়া, অন্ততঃ ৪৫ মিনিট কি এক ঘণ্টা কাল ফুটাইয়া লইয়া, উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে, ঐ দুগ্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। পাত্রটি যথোপযুক্ত পরিমাণে জলপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে বোতলগুলি বসাইয়া অথবা বোতলগুলি বসাইয়া পাত্রটি যথোপযুক্ত পরিমাণে জলপূর্ণ করিয়া দিয়া তৎপরে জ্বাল দেওয়া উচিত নতুবা গরম জলের মধ্যে বোতল বসাইলে উহা ফাটিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বোতলে পূরিয়া বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুগ্ধ অনেক সময় পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। একখণ্ড ন্যাক্‌ড়া ফেলিয়া দিলে

অথবা দুগ্ধপাত্রের মধ্যে একখণ্ড পত্রসহিত খেজুরের শাখা ডুবাইয়া রাখিলে দুগ্ধ সহজে নষ্ট হয় না। দু এক ফোঁটা খাঁটি সরিষার তৈল দিলেও দুগ্ধ কিছু সময় পর্য্যন্ত ভাল থাকে। উত্তমরূপ বায়ু চলাচল করিতে পারে এরূপ যথাসম্ভব শীতল স্থানে দুগ্ধ রাখা উচিত। উহার নিকট অন্য কোন খাদ্য রাখা উচিত নহে। দুগ্ধের পাত্রসকল উত্তমরূপে ধুইয়া পুড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং উহা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে উহার ভিতর বিকৃত দুগ্ধকণিকা লাগিয়া থাকিতে না পারে।

রোগীর পথ্য।—রোগ-শয্যায় মানবের আহার্য্য বস্তু মধ্যে দুগ্ধই প্রধান। একমাত্র মসুরের যূষ ব্যতীত ইহার ন্যায় লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য আর নাই। পথ্যরূপে রোগক্ষীণ শরীরের ক্ষয়পূরণে দুগ্ধের মূল্য অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রবল উদরাময় প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি রোগে দুগ্ধ সহজে সহ্য হয় না, কিন্তু দুগ্ধের মেদময় এবং ছানাজনক অংশ পৃথক করিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অর্থাৎ ছানার জল (whey) সুপথ্য। জটিল টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি যে সকল রোগে অন্য কোন পথ্য সহ্য হয় না, তাহাতেও ছানার জল অবাধে সহ্য হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ অথবা ক্ষত প্রভৃতি রোগে ছানার জলের ন্যায় সুপথ্য আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রক্তামাশয় প্রভৃতি অন্ত্রপীড়া-ঘটিত রোগে ঘোল কেবল পথ্য নহে ঔষধেরও কাজ করে। অর্শ প্রভৃতি রোগে মাখনও ঐরূপ ঔষধ এবং পথ্য। সমপরিমাণে দুগ্ধ এবং জল মিশাইয়া লইয়া জ্বাল দিয়া তাহার অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া লইয়া রোগীর পথ্যরূপে প্রায় সর্ব্বরোগেই নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফলতঃ দুগ্ধ কোন না কোন প্রকারে সর্ব্বরোগেই সুপথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ কোন কোন চিকিৎসককে কুক্কুটশাবকের যূষ বা তরলসার, গোমাংসের রস এবং তরলসার, beef tea, প্রভৃতির অযথা পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পথ্য অর্থাৎ রোগীর খাদ্য (Food) হিসাবে এই সমুদায়ের আদৌ কোন মূল্য নাই। উহার দ্বারা সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত শরীরের পোষণ অথবা ক্ষয়-পূরণের কোন সাহায্যই হয় না। বরং উহার মধ্যে ইউরিক এসিড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ থাকায় উহা দ্বারা সময়ে সময়ে অপকার ব্যতীত কোন উপকার দর্শে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে তথ্যানুসন্ধান করিয়া এক বিবরণ (report) প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে পত্রান্তর হইতে দু এক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"The tests of the United States Government demonstrated, that they are practically not food at all—that is mere stimulants. The journal of the American Medical Association commented editorially upon this report thus :—

The claims regarding the food value of meat-extracts and meat-juices are ridiculous. There is no excuse for employing such preparations, except on the understanding that what is given is essentially not a food. Let us be thankful that the Bureau of Chemistry has furnished us with exact knowledge as to the value of a class of preparation, than which none has had more claimed for it with less basis of facts."

আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েসন, চিকিৎসকদিগের এই অযথা মাংস-রস ও মাংসের তরলসারের পক্ষপাতিতাকে যেরূপ বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন কথা নাই। আশাকরি, আমাদের দেশীয় পাশ্চাত্য মতাবলম্বী বিজ্ঞচিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে যথোচিত পরীক্ষাসিদ্ধ আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

গোদোহন।—আমাদের দেশে সাধারণতঃ সকাল বেলা ও সন্ধ্যার সময় গাভী দোহন করা হয়। ধরিতে গেলে, ন্যূনাধিক বার ঘণ্টা অন্তর আমরা গোদোহন করিয়া থাকি। এই সময় ঠিক থাকা আবশ্যক। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাভীদোহন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং গাভীর শরীরও সুস্থ থাকে। বার বার দোহনকারী পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। যে প্রত্যহ দোহন করে, সে ব্যতীত অন্য কেহ দোহন করিতে

গেলেই সাধারণতঃ দুধ কম হইয়া থাকে; কারণ নূতন লোকের অনভ্যস্ত হস্ত স্পর্শে গাভীর সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। প্রাচীন কালে বাটীর অবিবাহিতা কন্যাগণ গাভী দোহন করিতেন; এই নিমিত্ত কন্যাকে দুহিতা বলে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই ভাল দোহন করিতে সমর্থ। গাভী যাহাকে অপছন্দ করে অথবা ভয় করে, তাহাকে দোহন করিতে দেয় না। বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে গাভী দোহন করা উচিত নহে কারণ গাভীর শরীরে বৃষ্টিবিন্দু পতিত হওয়ায় তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া দুগ্ধ "উঠিয়া যায়" বা "টানিয়া যায়"। ঘরের ভিতর গো-দোহন করা ভাল; নিকটে বিড়াল-কুকুর যাহাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। দ্রুত অথচ ধীরভাবে দোহন করা কর্ত্তব্য। দোহনকারিণীর সহিষ্ণু এবং শান্ত প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক; কারণ উগ্র স্বভাবসম্পন্ন লোকের দ্বারা দোহনকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। দোহনের প্রারম্ভে বৎসকে দুগ্ধ-পান করিতে দিয়া নিঃশেষে দুগ্ধ দোহন করা উচিত, কারণ দোহন-শেষে গাভীর স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ রহিয়া যাইবে, ক্রমশঃ সেই পরিমাণে দুগ্ধ কমিতে থাকিবে। গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খট্‌খটে ও ঢালু হওয়া আবশ্যক; নতুবা গাভীর স্বাস্থ্য খারাপ ও দুগ্ধ বিকৃত হয়। গাভীর স্তনে বেদনা হইলে উহাতে কর্পূরের তৈল (camphor oil) মালিস করিলে আরোগ্য হয়।

দুগ্ধের গুণ।—এ পর্য্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে দুগ্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উপসংহারে দুগ্ধের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাবলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আয়ুর্ব্বেদ দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পদার্থ-সমুদায়কে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দুগ্ধের সাধারণ গুণ :—

দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্।
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্বশরীরিণাম্॥
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যবাজীকরং পরম্।
বয়ঃস্থাপন-মায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্॥
বিরেক-বান্তি-বস্তীনাং তুল্যমোজো বিবর্দ্ধনম্।
জীর্ণজ্বর মনোরোগে শোষমূর্চ্ছা ভ্রমেষুচ॥
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে।
শূলোদাবর্ত্ত গুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে॥
রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে।
গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্॥
বাল-বৃদ্ধ-ক্ষত-ক্ষীণা ক্ষুদ্‌ব্যবায়কৃশাশ্চ যে।
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ দুগ্ধ মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, সারক, সদ্য শুক্রকর, শীতল, সকল জীবেরই হিতকর, জীবনীশক্তি-বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, অতিশয় বীর্য্য-বর্দ্ধক, বয়ঃস্থাপক, যোড়নকারী (অর্থাৎ ভগ্ন হাত ছিন্ন মাংস চর্ম্ম প্রভৃতি যোড়া লাগিবার পক্ষে সাহায্য করে) জরা ব্যাধি-বিনাশক। বমন-বিরেচন-বস্তিক্রিয়ার উপযোগী এবং ওজো-বর্দ্ধক। ইহা জীর্ণ জ্বর, মানসিক পীড়া, যক্ষ্মা, মূর্চ্ছা, মাথা ঘোরা, গ্রহণী, পাণ্ডু, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত (অন্ত্রপীড়া বিশেষ) গুল্ম, বস্তি রোগ, অর্শ, রক্ত-পিত্ত, অতিসার, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের রোগ, শ্রম, ক্লান্তি, গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগে মুনিগণ কর্ত্তৃক হিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ রোগীদিগের পক্ষে এবং ক্ষুধা বা অধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনায় কৃশ ব্যক্তি-গণের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় হিতকর। উদ্ধৃত শ্লোক কয়টি হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ দুগ্ধকে অশেষ গুণের আকর বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহারা সর্ব্ববিধ রোগে এমন কি অতিসার উদরাময় প্রভৃতি রোগেও উহা হিতকর পথ্য বলিয়া দুগ্ধ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। এমন কোন রোগ দেখা যায় না, যাহাতে তাঁহারা দুগ্ধ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহারা দুগ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এই সভ্যতার যুগেও দুগ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এইত গেল দুগ্ধের সাধারণ গুণ এবং ব্যবহার, ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধের বিশেষ বিশেষ গুণও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান কয়েক প্রকার দুগ্ধের গুণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) নারীদুগ্ধের গুণ ও প্রয়োগ—

নার্য্যালঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চোতনয়োর্বরম্॥

অর্থাৎ নারীদুগ্ধ লঘু, শীতল, পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক, বায়ুপিত্তনাশক, চক্ষুশূল এবং অভিঘাতরোগনাশক। ইহা নস্য ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়ায় উপযোগী।

(২) গোদুগ্ধের গুণ ও প্রয়োগ—

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রস-পাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎস্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতু মলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।

অর্থাৎ গব্যদুগ্ধ মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, স্তন্যকারক, ও স্নিগ্ধ এবং ইহা দোষধাতু, মল ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদকারক এবং গুরু। ইহা বায়ু, রক্ত-পিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকর। আর্য্য ঋষিগণ গোদুগ্ধকে জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক বলিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবাণুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও বলিতেছেন, গব্য দধি ও ঘোল সেবনে জরা নিবারিত হইতে পারে; কারণ দধিমধ্যস্থ ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড্, ব্যাসিলি নামক উদ্ভিদাণু সকল, মানব-শরীরের অন্ত্রমধ্যস্থ জরা-উৎপাদক উদ্ভিদাণু-গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত নিয়মিত দধি-সেবী অতুল বলশালী বুলগেরিয়গণ পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। শতবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত তাহারা যৌবনের শক্তি ও উৎসাহ রক্ষা করিতে সমর্থ।

(৩) মহিষী দুগ্ধের গুণ—

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকর মভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মহিষ-দুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা মধুর রস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী (রস নির্গতকারী) ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

(৪) ছাগদুগ্ধের গুণ ও ব্যবহার—

ছাগং কষায়-মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং বিদুঃ॥

ছাগদুগ্ধ কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক অর্থাৎ ধারক, এবং লঘু। ইহা রক্ত-পিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, যক্ষ্মা, কাস ও জ্বরনাশক। ছাগের অল্পকায়ত্ব হেতু এবং তাহারা কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্প জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক।

ছাগদুগ্ধের গুণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোন মতভেদ লক্ষিত হয় না। যক্ষ্মা-রোগে ছাগদুগ্ধ সর্ব্বত্রই পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তামাশয় এবং অন্ত্রের ক্ষয় (intestinal tuberculosis) রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জগতের মধ্যে একমাত্র ছাগ-পশুই যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগের হস্ত হইতে মুক্ত, ইহারা কখনও ক্ষয়-রোগাক্রান্ত হয় না। যক্ষ্মা-বীজাণুসকল ইহাদের শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, বরং ইহাদের শরীর হইতে নির্গত ঘর্ম্মাদিজাত গন্ধ এবং ইহাদের দুগ্ধদ্বারা ঐ সকল বীজাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর্য্য ঋষিরা যক্ষ্মা-রোগীর শয়নগৃহে ছাগপশু রাখিবার ব্যবস্থাও দিয়া গিয়াছেন।

(৫) গাধার দুধের গুণ ও ব্যবহার—

শ্বাসবাতহরং সাম্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ।
কফকাসহরং বালরোগঘ্নং গর্দ্দভী-পয়ঃ।

গর্দ্দভীদুগ্ধ অম্ললবণ রস, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও শিশুদিগের রোগনাশক। "গাধার দুধের" গুণ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোন মতভেদ লক্ষিত হয় না। শিশুদিগের পক্ষে "গাধার দুধ" যে বিশেষ হিতকর, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। জীবের মধ্যে ছাগের যেমন যক্ষ্মা হয় না, গাধারও সেইরূপ বসন্ত হয় না। গাধার দুধ বসন্তরোগের প্রতিষেধক পথ্য।

(৬) "ভেড়ার দুগ্ধের" গুণ ও ব্যবহার—

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরী প্রণুৎ।
আহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেহ নিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥

অর্থাৎ "ভেড়ার দুধ" লবণ-মধুর রস, স্নিগ্ধ, গরম, পাথুরিনাশক, বিস্বাদ, তৃপ্তিজনক, কেশবর্দ্ধক, গুরু, শুক্র-বর্দ্ধক, কফপিত্ত বৃদ্ধিকর; ইহা বাতজ কাস ও বায়ুরোগে হিতকর।

মথিত দুগ্ধ বা মাখনতোলা দুগ্ধের গুণ—

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বর-হরং বাতপিত্তকফাপহম্॥

ঈষদুষ্ণ মথিত গোদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ লঘু, বলকারক, এবং বায়ুপিত্ত কফ ও জ্বরনাশক।

গাভী দোহনকালে দুগ্ধ স্বভাবতঃ গরম থাকে; উহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ বলকারক, লঘু,

শীতল, অমৃতসদৃশ, অগ্নিদীপক এবং বায়ুপিত্তকফনাশক। কিন্তু শীতল হইলে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘুশীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ॥

কোন্ দুগ্ধ কি অবস্থায় হিতকর পথ্য তাহাও আর্য্য ঋষিগণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষং।
শৃতোষ্ণং আবিকং পথ্যং শৃত শীতমজাপয়ঃ॥

অর্থাৎ গোদুগ্ধ ধারোষ্ণ অবস্থায় এবং মহিষদুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে হিতকর; মেষদুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পর গরম অবস্থায় এবং ছাগদুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল অবস্থায় হিতকর।

অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ।

অর্থাৎ অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ একত্র জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা লঘুপাক হয়।

সাধারণতঃ আমরা দুগ্ধ ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, উহাতে দুইটি উপকার হয়; প্রথম দুগ্ধ-মধ্যস্থ রোগবীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয় কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা সুসিদ্ধ দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয়। দুগ্ধ পরিপাকের নিমিত্ত আমাদের পাচক রসের মধ্যে রেনেট্ (rennet) নামক একপ্রকার পদার্থ আছে; কাঁচা দুগ্ধ রেনেট-সংযুক্ত হইলে উহা অত্যন্ত নিরেট হইয়া জমাট বাঁধে, কিন্তু সুসিদ্ধ হইলে উহা ধোনা তুলার ন্যায় আঁস আঁস এবং পাতলা হইয়া ছিঁড়িয়া যায় এবং ইহার প্রত্যেক কণিকাই পাচক রসে জীর্ণ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত সহজে পরিপাক হয়, কাঁচা দুগ্ধ তত সহজে জীর্ণ হয় না। অজীর্ণ রোগী কাঁচা দুগ্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। (ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণীর রণতরী ও জেপেলীন

শিকার-স্মৃতি

[শ্রী—আখেটক]

প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইতেছি, এমন সময় জগচ্চন্দ্র সহাস্য বদনে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, বাঘের 'খবর' আসিয়াছে। অন্য দিন এই শুভ সংবাদ পাইলে মন যতটা নাচিয়া উঠিত,আজ তাহা না হইয়া মনটা কেমন দমিয়া পড়িল। কারণ আজ শ্রাদ্ধবাসর এবং শ্রাদ্ধের পর যে শিকারে যাইব, তাহার সময় থাকিবে না। যাহা.হউক, "খবরিয়াকে" (ব্যাঘ্রের সংবাদদাতাকে) ডাকিয়া কোন্ জঙ্গলে বাঘে গরু মারিয়াছে, কখন মারিয়াছে, কত বড় গরু, কত বড় বাঘ, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। সে ইহার উত্তরে যাহা যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, ঝালরআলগায় কা'ল সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা বড় গরু বাঘে মারিয়াছে। সে বাঘ দেখে নাই, কিন্তু 'পাঞ্জা'—(পদচিহ্ন) দেখিয়া তাহার অনুমান হইয়াছে যে, বড় বাঘে (Royal Tiger এ) গরু মারিয়াছে। তাহার ভাষায় প্রকাশ পাইল যে, সে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী নূতন 'ভাটিয়া' (১) প্রজা। 'ভাটিয়ারা' বাঘের সংস্রবে খুব কম আসিয়াছে—সুতরাং ইহাদের প্রদত্ত খবর সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই লোকটির কথায় ও ভাবে যতটা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে এই খবর যে ঠিক এবং আজ শিকারে গেলে যে, বাঘের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ সম্ভাবনা আছে—সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কি করিব? শ্রাদ্ধ ফেলিয়া ত শিকারে যাইতে পারি না। জগৎকে 'খবরিয়ার' আহারের ব্যবস্থা করিতে পাঠাইয়া দিয়া, আমি পুনরায় মুখ ধুইতে আরম্ভ করিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই জগৎ ফিরিয়া আসিয়া, হাতী আনিতে লোক পাঠাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। বুঝিলাম, সে এখনও শিকারের আশা ছাড়িতে পারে নাই। আমি প্রথম হইতেই নিরাশ হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু জগতের আশাপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমি তাহাকে নিরাশ করিতে পারিলাম না; হাতী আনিতে বলিলাম।

স্নানের পর শ্রাদ্ধ করিতে চলিলাম। শ্রাদ্ধাদি শেষ করিতে তিনটা বাজিয়া গেল। তখন বাহিরে আসিয়া দেখি, হস্তী প্রস্তুত হইয়া আছে এবং জগচ্চন্দ্র ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত স্বজাতিবর্গ কেহই আসেন নাই; তাঁহাদের আহারাদি না হইলে ত আর শিকারে যাইতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে দুই একজন করিয়া আসিতে লাগিলেন। আমরা যতই তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম, তাঁহারা যেন সকলে পরামর্শ করিয়া ততই দেরী করিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে ভোজনাদি ব্যাপার শেষ হইতে ৫টা বাজিয়া গেল। জগচ্চন্দ্র তখনও শিকারে যাইবার জন্য ব্যগ্র। আমি কিন্তু তাহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ এইরূপ অসময়ে শিকার করিতে যাইয়া অনেকবার বাঘ ত মারিতেই পারি নাই, লাভের মধ্যে কেবল তাহাকে সেই বন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বরং পরদিন শিকারে গেলে বাঘ পাওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা থাকে। পুরাতন শিকারী বৃদ্ধ চুনীলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, তাহার মত আমার মতের সহিত মিলিয়া গেল। সুতরাং সেদিন আর শিকারে যাওয়া হইল না, 'খবরিয়াকে' ডাকিয়া বলিয়া দিলাম যে, "মৌড়ের"—(ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত জন্তুর) নিকট শকুনি বসে কি না এবং বাঘের আর অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, এই সকল বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কা'ল সকালে আসিয়া আবার যেন খবর দেয়। হাতীগুলিকেও পরদিন বেলা একটার সময় প্রস্তুত রাখার জন্য জমাদারকে আদেশ করা গেল।

তারপর, কিছুক্ষণ ধরিয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পড়াশুনা কিছুতেই ভাল লাগিল না। ভাল লাগিবেই কেন? এতবড় শিকারটা একরকম হাতে পাইয়াও "ফস্কাইয়া" গেল—ইহা কি কম দুঃখের,

(১) স্থানীয় লোকে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীদিগকে 'ভাটিয়া' বলে।

শিকারের ব্যাঘ্র

বিষয় ? সমস্ত রাত্রি ভাল ঘুম হইল না, কেবল বাঘের স্বপ্নই দেখিতে লাগিলাম। কখনবা বাঘকে তাড়া করিয়া যাইতেছি, আবার কখনবা সে আমাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে !

প্রত্যুষে উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখি, পূর্ব্বদিনের 'খবরিয়া' আর একটি লোক সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া বলিল, "কা'ল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বাঘ ঐ জঙ্গলে খুব 'ডাহিয়াছে' (ডাকিয়াছে) এবং তাহারা আজ সকালে জঙ্গলের 'চারি মুরায়' (চারিদিকে,) ঘুরিয়া দেখিয়াছে, বাঘ বাহির হইয়া যাওয়ার কোন 'পাঞ্জা' (foot print) দেখে নাই। তবে যদি সে কঠিন জমির উপর দিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা 'লাচার'—অর্থাৎ দায়ী নহে।" উহাদের কথা শুনিয়া মনে একটু আশার সঞ্চার হইল বটে—কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল যে, বাঘ গরুটি নিঃশেষ করিবার জন্য সম্পূর্ণ দুই রাত্রি সময় পাইয়াছে, তখনই আবার নিরাশার গর্ভে ডুবিলাম।

যাহা হউক, স্নান-আহার সমাপনান্তে প্রায় বেলা ২টার সময় বাহিরে আসিয়া দেখি, ছয়টি হাতী লাইন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্যান্য ভাল ভাল হাতীগুলি এই সময় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে স্থানান্তরে থাকায় অগত্যা এই কয়টি হাতী লইয়াই শিকারে যাইতে হইল। এই ছয়টি হাতীর মধ্যে গজমতিই পুরাতন, তাই উহার উপরেই 'হাওদা' 'কসা' হইয়াছে। হস্তিনীটি বড় বেশী উঁচু নয় ৭′—১০″ মাত্র। আর দুইটীতে কেবল 'গদি'। একটি বনোয়ারীলাল, ইহার উচ্চতা ৭′—৮″ও অপরটি জয়মালা, এও প্রায় বনোয়ারীলালের সমান। অবশিষ্ট তিনটি নূতন, ধরা পড়িবার পর এক বৎসরও যায় নাই। তন্মধ্যে বড়টি লক্ষ্মীবাই, 'গজমতির' মতই উঁচু, অপর আলাউদ্দিন ৬′—৭″ ও চামেলী ৬′—৫″। শেষোক্ত তিনটির উপর 'গদি' নাই ; ইহারা জঙ্গল তাড়াইবে মাত্র। হাতী সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল দেখান যে, কিরূপ সরঞ্জাম লইয়া বাঘ শিকারে চলিয়াছি। হাতীর অবস্থা ত এইরূপ, এখন শিকারীর অবস্থা কিরূপ এইখানেই তাহার একটুকু পরিচয় দেওয়া ভাল। প্রথম জগচ্চন্দ্র ; ইনি ইতঃপূর্ব্বে আলিপুরের বাগান ব্যতীত জঙ্গলে একবার মাত্র জীবিত বন্যব্যাঘ্র (Royal tiger) দেখিয়াছেন। দ্বিতীয় বরদা, ইনি জঙ্গলে দুই তিনবার বড় বাঘ দেখিয়াছেন সত্য ; কিন্তু ব্যাঘ্র-শিকার যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা গল্পে শোনা ছাড়া কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

এখন বাকী রহিলাম কেবল আমি। আমাদের ভাল ভাল শিকারীরা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে কেহই উপস্থিত হইতে পারে নাই। সুতরাং "এরণ্ডোপি দ্রুমায়তের" মত আজ আমিই প্রধান শিকারীর পদ গ্রহণ করিলাম। ইয়াহু ও জহুরুদ্দি শিকারীদ্বয়কে 'খবরিয়া', 'হাওদা' ও খালি হাতিগুলি সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া, আমরা শিকারী বেশ পরিধান করিতে চলিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ, হ্যাট কোটে সজ্জিত করিয়া যেখানে 'গদির' হাতী দুইটি অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হাতী বসিলে আমি ও বরদা উঠিলাম জয়মালায়; আর বনোয়ারীলালে উঠিল জগৎ ও চুণীলাল। তারপর হস্তিদ্বয় আমাদিগকে লইয়া শিকার-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল।

পূর্ব্বদিনের প্রায় সমস্ত দিন উপবাসের জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, আজ শরীরটা তত ভাল বোধ হইতেছিল না। কেমন একটু শীত শীত করিতেছিল, তাই মনেও সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোটের বোতাম কয়েকটি আঁটিয়া দিলাম এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতীর উপর 'নিঝুম' হইয়া বসিয়া রহিলাম। একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল। হঠাৎ ইয়াহুর কেকাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল; চক্ষু খুলিয়া সম্মুখে দেখিলাম, প্রায় চারিদিক বিস্তীর্ণ সরিষা ফুলের গালিচা বিছাইয়া এবং উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া, একটি নলবন, গাঢ় সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি রুক্ষ-কেশধারী ঝাউগাছ, মাথা উঁচু করিয়া কতকগুলি নলফুলের শ্বেত চামর লইয়া যেন সন্তর্পণের সহিত অতি মৃদুভাবে ব্যজন কার্য্যে নিয়োজিত। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া এই সমস্ত বর্ণের একত্র সমাবেশ, যে কিরূপ অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহা কৌতূহলী পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিবার বড়ই সাধ হইতেছে। কিন্তু কি করিব? বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সে সাধ অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। কারণ আমি কবি নই। ভাব ও ভাষার উপর তেমন দখল নাই যে, এই মনোহর দৃশ্যটি নানারূপ বাক্যবিন্যাসের দ্বারা পাঠকের হৃদয়পটে প্রতিফলিত করিয়া দিই। অথবা চিত্রকরও নহি যে, এই নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রখানি যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরি।

যেখানে ইয়াহু পূর্ব্বপ্রেরিত হস্তীগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠের কলরব গ্রামবাসী শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে,—আমরাও সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত 'খবরিয়া' বলিতে লাগিল, তাহারা বাড়ীতে আসিয়া শুনিয়াছে, যে আমাদের নিকট "খবর" দিবার জন্য রওনা হইবার পর, এদিকে নিকটস্থ অপর একটি বন হইতে কতকগুলি "শুয়ার" (শূকর) আসিয়া এই বনে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই অবিলম্বে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া পড়িল এবং দলশুদ্ধ সে চর পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি চরের দিকে পলাইয়া গেল। কথাটা আশাপ্রদ বটে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া হাওদার উপর উঠিলাম। ইয়াহু হাওদার পশ্চাদ্ভাগে উঠিল। বরদা জয়মালার গদির উপরেই রহিল, তাহার পশ্চাতে জহুরুদ্দি। জগচ্চন্দ্র ও চুণীলাল পূর্ব্ববৎ বনোয়ারীলালেই রহিল। তারপর কার্ট্রিজ ও বন্দুক গোছান চলিতে লাগিল। জগৎ ৫০০ এক্সপ্রেস্ রাইফল (Express Rifle) লইল। বরদা লইল একটি ১২নং বন্দুক (Gun) এবং আমার নিকট রহিল '৫৭৭, ৪৫০ এক্সপ্রেস্ রাইফল (Express Rifle) ও একটি ১২নং প্যারাডক্স (Paradox)। তারপর নিজ নিজ বন্দুকে কার্ত্তুস্ (Cartridge) পুরিয়া প্রস্তুত হইয়া বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই অবসরে হাওদার উপর দাঁড়াইয়া বনটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বনটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪০০ গজ লম্বা। যেস্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেস্থান প্রায় ১০০গজ হইবে। ইহার প্রায় চারিদিকই একটি বিস্তৃত সরিষা-ক্ষেত্র দ্বারা বেষ্টিত। জঙ্গলটি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাকে তিন খণ্ডে (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ) বিভক্ত করিয়া লওয়া অতি সহজ, এবং তাহা হইলে এই অল্পসংখ্যক হাতী লইয়া শিকার চলিতে পারে। উত্তরের অংশটি কতিপয় নলবনের ঝোপ ও ঝাউগাছ আর বেশীর ভাগ 'কাশিয়া' (কাশ) বনে আচ্ছাদিত। ইহার তিনদিকে সরিষা-ক্ষেত্র; কেবল দক্ষিণে একটি 'গো-রাস্তা' পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া

ইহাকে মধ্য-অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর মধ্য-অংশ, এইটিই খুই ভাল জঙ্গল। ইহা ঘন নল ও 'কয়দী' (Wild rose) বনে পরিবৃত এবং জঙ্গলের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা একটু বেশী প্রশস্ত। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত 'গো-রাস্তা,' দক্ষিণে একটা স্থানে কিছু জঙ্গল কম, সেই স্থানটি হাতী দিয়া মাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া, দক্ষিণের অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া লইলাম। ইহারও অপর ডুই পার্শ্বে সরিষা-ক্ষেত্র। তারপর শেষভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ অংশ। উত্তর অংশের মত ইহারও স্থানে স্থানে কেবল কয়েকটি নলের ঝোপ ও ঝাউগাছ আর কাশ-বন এবং তিন পার্শ্বেই সরিষা-ক্ষেত্র। ইহা স্বভাবতঃ মধ্য-অংশ হইতে পৃথক না হইলেও, ইতঃপূর্ব্বেই হস্তীদ্বারা জঙ্গল ভাঙ্গাইয়া পরিষ্কার করিয়া পৃথক্ করা হইয়াছে।

উত্তরদিক হইতে জঙ্গলভাঙ্গা আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাওয়াই সকলের অভিমত হইল। এক পার্শ্বে জগৎ ও অপর পার্শ্বে বরদা এবং মধ্যে বাকী তিনটি হাতী দ্বারা একটি "লাইন" রচনা করিয়া দিয়া আমি জঙ্গলের মধ্য-অংশে আসিয়া, 'গো-রাস্তা'টি সম্মুখে করিয়া উহার মাঝামাঝি স্থান হইতে অনুমান ৮।১০ হাত ব্যবধানে 'ছেপায়' (Stopএ) দাঁড়াইলাম। লাইন যখন অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উভয়দিকে খুব সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

"লাইন"টি বেশ সমান ভাবে আসিতেছে বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক হাতী বলিয়া, হাতীগুলি পরস্পর এতদূর তফাতে পড়িয়াছে যে, যদি ডুই হাতীর মাঝে কোন 'জানোয়ার' লুকাইয়া থাকে—তাহা হইলে হাতী কিংবা মাহুতের জানিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এদিকে 'লাইন' ক্রমে উত্তরের অংশ শেষ করিয়া গো-রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু পালিত হস্তী কয়েকটি ব্যতীত আর কোন 'জানোয়ারই' বাহির হইল না।

'লাইন'টিকে পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর করিতে বলিয়া দিয়া, আমি কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে মধ্যঅংশের দক্ষিণ দিকে—অর্থাৎ যেখানে অল্প জঙ্গল ও যাহা পূর্ব্বেই হাতীদ্বারা ভাঙ্গাইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, সেইখানে আসিয়া উহার মধ্যভাগ হইতে কিছুদূর পিছু হটিয়া ছেপায় (Stop এ) দাঁড়াইলাম। এই স্থানটি এতই প্রশস্ত যে, মধ্যস্থলে একটি মাত্র 'ছেপা'র (Stopএর) হাতীতে দাঁড়াইয়া উভয়দিক রক্ষা (Cover) করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্ততঃ তিনটি 'ছেপার' (Stopএর) প্রয়োজন। কিন্তু কি করিব? যেরূপ সরঞ্জাম আছে, তাহার দ্বারাই কার্য্য চালাইতে হইবে। একবার লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল জঙ্গল-ভাঙ্গার 'হড় মড়' শব্দ ও মাঝে মাঝে মাহুত "ত্রি-বি১", "দেলে দেলে২" "মাইল মাইল৩" চীৎকার শোনা যাইতেছে মাত্র। যতক্ষণ উত্তরখণ্ডে লাইন ছিল, জঙ্গল কম বলিয়া ততক্ষণ হাতীগুলি বেশ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু মধ্য-খণ্ডে 'লাইন'টি প্রবেশের পর হইতে, হাতী দূরের কথা তদুপরিস্থ একটি মনুষ্য-মূর্ত্তিও এপর্য্যন্ত নয়নগোচর হইল না। 'লাইন' ও 'ছেপার' বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপ কূলকিনারা পাইতেছি না; এমন সময় 'লাইনে'র দিকে কি একটা গোলমাল হইতে লাগিল। পরক্ষণেই খুব জোরে জঙ্গল আলোড়িত করিয়া, দুইটি হাতী দ্রুতবেগে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল; বোধ হইল, যেন হাতী দুইটিকে বাঘে তাড়া করিয়া আনিতেছে। বন্দুক লইয়া আমি প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

যখন ইহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইল, তখন চিনিতে পারিলাম, একটি লক্ষ্মীবাই ও অপরটি চামেলী। চীৎকার করিয়া মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাঘ কোথায় গেল?" উত্তর পাইলাম—"হুজুর! বাঘ-না হয়—(নয়)—মৌ-মাছি।" বিরক্তির সহিত বন্দুক রাখিয়া বলিলাম, "বুড়া হইয়া গেলে এখনও সাবধানে চলিতে শিখিলে না।" তখন চামেলীর মাহুত লক্ষ্মী-বাইর মাহুতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "মতিবুড়া, চ'খে দেখিতে পায়না, তাহারই সম্মুখে একটি ঝাউগাছে একখানা বড় মৌ-চাক ছিল; সে হাতী দিয়া যেই উহার ডাল ভাঙ্গিয়া দিল, অমনি সমস্ত মৌ-মাছি আসিয়া উভয়কে ঘিরিয়া ফেলিল এবং হুল ফুটাইতে লাগিল। তাই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে।"

১। শুণ্ডের দ্বারা ধৃত বস্তু পরিত্যাগের আদেশ, কিম্বা জল কাদা নিক্ষেপ করিতে নিষেধআজ্ঞা।

২। কোন বস্তু ধরিবার আদেশ।

৩। অগ্রসর হওয়ার আদেশ।

এ দিকে 'লাইন' মধ্যখণ্ড শেষ করিয়া আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় 'লাইনে'র সঙ্গে যোগদান করিতে বলিয়া দিয়া, এবার আমি জঙ্গলের দক্ষিণপ্রান্তে গিয়া কিছুদূরে জঙ্গলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে, সেই হাতী দুইটি আবার দৌড়াইয়া আসিতেছে। কিন্তু এবার উহারা একা নহে, প্রত্যেকের মাথার উপর শত শত মৌ-মাছি—ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরিতেছে ও সুবিধা পাইলেই কামড়াইতেছে! মাহুতদ্বয় প্রথমতঃ তাহাদের আসনের 'চটি' * দ্বারা স্বস্ব অঙ্গ আচ্ছাদনের চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু উহা এত ছোট যে, সমস্ত অঙ্গ ঢাকা পড়িল না। সুতরাং অনাবৃত স্থানগুলি মক্ষিকাদিগের লক্ষ্যস্থল (Target) হইয়া পড়িল। মাহুত বেচারিরা দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গাত্রাচ্ছাদনি 'চটি'খানি হস্তে লইয়া আশেপাশে ঘুরাইতে লাগিল। তাহাতেও তাহারা নিস্তার পাইল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের হাত, মুখ, নাক ও কাণের দষ্ট স্থানগুলি, ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। হাতী দু'টী আমাদের নিকটে আসিলে, আমাদের মাথার উপরেও মৌমাছির দল বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল (Rug) লইয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া বসিলাম। ইতোমধ্যে একটি মক্ষিকা, আমার মাহুত বেচারীর নাকের উপর বসিল—সে হস্ত দ্বারা মধুমক্ষিকাটিকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। মক্ষিকা স্থানচ্যুত হইল বটে, কিন্তু উহার "হুল" নামক শস্ত্রটি সেই স্থানে রাখিয়া গেল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাকে ব্যতীত, এ পর্য্যন্ত আর কোন হাতী কিংবা লোককে,—একটি মাছিও কামড়ায় নাই। উহাদের আক্রোশ যেন কেবল সেই লক্ষ্মীবাই ও চামেলীর উপর। মতু তাহার নাসিকা মর্দ্দন করিতে করিতে ঐ হাতী দুইটীকে, আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিল। তাহারা সরিয়া গেলে, মাছির দলও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এতক্ষণ পরে লক্ষ্মীবাইর মাহুত বৃদ্ধ মতির মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। সে কতকগুলি কেশের ডগা একত্র করিয়া একটা 'আটী' বাঁধিল এবং তাহাতে দেশলাই দ্বারা অগ্নিসংযোগ করিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। যতক্ষণ আগুন ছিল, ততক্ষণ এক রকম বেশ কাটিল; কিন্তু যেই আটিটি পুড়িয়া আগুন নিবিয়া গেল, অমনি আবার দ্বিগুণ তেজে মৌমাছির আক্রমণ আরম্ভ হইল। মাহুতদ্বয়কে এইরূপে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া, তাহাদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া গ্রামে আশ্রয় লইতে আদেশ দিলাম।

তাহারা চলিয়া যাইবার কিয়ৎকাল পরেই, লাইনের হাতী কয়েকটি দেখা দিল। এই তিনটি হাতীর লাইন দ্বারা এই বৃহৎ জঙ্গল যে কিরূপে ভাঙ্গা হইল, তাহা শিকারী মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক, লাইন নিকটে আসিলে, চুণীলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহারা বাঘের কোন চিহ্নই দেখিতে পায় নাই। এমন কি 'মৌড়টি' (ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক হত জন্তু) যে কোথায়, তাহাও খুঁজিয়া পায় নাই। চুণীলালের কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া 'হাওদায়' বসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ শিকারের উত্তেজনায় ছিলাম বলিয়া অসুস্থতা বোধ করিতে পারি নাই; এখন আমার সমস্ত শরীর কেমন যেন "ঝিম্ ঝিম্" করিতে লাগিল। মনে হইল, হাতী ও হাওদা পরিত্যাগ করিয়া এখন যেন একখানা বিছানা ও লেপের সংশ্রবে আসিতে পারিলে ভাল হয়।

বৃদ্ধ শিকারী চুণীলাল, আমাকে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, বোধ হয় যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাই সে নিজেই নায়কত্ব করিবে স্থির করিয়া, 'খবরিয়াকে' 'মৌড়টি'—(ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত জন্তুটি) কোথায় আছে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করিল। সে পদব্রজে অগ্রে অগ্রে বনমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বনোয়ারীলাল ও জয়মালা প্রভৃতি সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। আমিই কেবল একেলা বাহিরে চুপ করিয়া হাওদার উপর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু একা এইরূপ অলসভাবে বসিয়া থাকা অধিকক্ষণ ভাল লাগিল না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর, চুণীলাল ও খবরিয়ার দেশী ও ভাটিয়া কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। "খবরিয়া" বলিতেছে, "আজ সকালে আমি 'মৌড়টা' য়াহানে (এইখানে) দ্যাখ্‌ছি (দেখিয়াছি)।" আর চুণীলাল বলিতেছে "যদি 'এটি (এইখানে) দেখ্‌ছিস্ (দেখিয়াছিস্) ত গেইল (গেল) কুত্তি (কোথায়)?" এবং অন্য একজন কে বলিল "এই যে,

* মাহুতের হস্তি-স্কন্ধে পাতিয়া বসিবার একখণ্ড চট।

এ দিয়া (এই দিক দিক দিয়া) টানিয়া নিয়া (লইয়া) গেইছে (গিয়াছে) ; চোস * আছে।

এমন সময় আমার হাতী সেইখানে উপস্থিত হইল। চুণীলাল 'খবরিয়াকে' জঙ্গলের বাহিরে যাইতে বলিয়া, উক্ত "চোস্" ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। একটু গিয়াই চুণীলালের হাতী হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। চুণীলাল একবার এদিক ওদিক দেখিয়া, খুব উত্তেজনার সহিত আমার হাতীকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। তাহার ইঙ্গিতানুযায়ী গজমতি সেথানে উপস্থিত হইলে, সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি স্থান দেখাইয়া দিল। 'হাওদার উপর বসিয়াই (কারণ এখনও দাঁড়াইবার উৎসাহ ফিরিয়া আসে নাই) সেইদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, একটি মৃত গো-দেহ একটি ঝোপের নীচে পড়িয়া আছে। চুণীলাল "মৌড়টির" নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল, এবং বলিল "মৌড়টাকে টাট্‌কা খাইছে, (খাইয়াছে) বাঘ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।" বোধ হয়, শরীর অসুস্থ বলিয়াই আজ একথা শুনিয়াও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না। বন্দুক লইয়া কিছুতেই হাওদায় দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইল না। বসিয়া বসিয়াই মাত্র ৪টি হাতী দিয়াই একটি লাইন রচনা করিলাম। লাইনটি পূর্ব্বমুখী হইয়া রচিত হইল। সকলের বামে বরদা, তারপর আমি, আমার পর বাচ্চা আলাউদ্দিন, তারপর সকলের ডাইনে জগচ্চন্দ্র।

লাইন কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় 'হুম' করিয়া কি একটা শব্দ হইল। অবশ্য এরূপ শব্দ হাতীও অনেক সময় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কেমন যেন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উদিত হইল। এই-রূপ শব্দ আবার হয় কি না, শুনিবার জন্য 'কাণ পাতিয়া' রহিলাম। হাতী চলিতে লাগিল, আর কিছুই শোনা গেল না। এইরূপে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সমস্ত লাইন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। লাইনের সম্মুখে প্রায় ২০।২৫ হাত দূরে, বিড়াল লড়াই করিবার পূর্ব্বে যেমন "গরর্ গরর্" ও "ফ্যাস্ ফ্যাস্" (Snarling) শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ একটা শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। অবশ্য এই শব্দের তুলনায় বিড়ালের শব্দ, হোমিওপ্যাথিক, ঔষধের ১০০০ সহস্র ডাইলিউসনের এক ফোটা মাত্র। যাহা হউক, শব্দ কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই বৈদ্যুতিক ধাক্কা (Electric shock) প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, এক লম্ফে বন্দুক হস্তে হাওদার উপর দাঁড়াইলাম। সমস্ত ধমনীতে যেন উষ্ণ রক্ত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্তই যেন সজাগ হইয়া উঠিল। আর কোন সংশয়ের কারণ রহিল না, সম্মুখেই বাঘ।

এখন হইতে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইবে; তাহাতে আবার প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে একরূপ বিনা কারণে যে প্রকার উগ্র দেখিতেছি, তাহাতে সংগ্রামটি বেশ ঘোরতর হইবে বলিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার হাতীর অবস্থা মনে হওয়াতে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলাম।

সে যাহা হউক, ব্যাঘ্র মহাশয় যে স্থানটিকে নিরাপদ মনে করিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা দক্ষিণ-অংশের পূর্ব্ব-প্রান্ত। জঙ্গলের প্রান্তভাগ বলিয়াই, সর্ব্বদা গ্রাম্য গো-মহিষাদি চরিতে চরিতে স্থানটিকে প্রায় জঙ্গলশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কয়েকটি নিস্তেজ নল ঝোপ—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইলে যে কি দশা প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে কোনরূপে বাঁচিয়া আছে।

ইহারই একটা ঝোপে বসিয়া ব্যাঘ্র মহাশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন। এই স্থানটির দুইদিকেই সরিষা ক্ষেত—কেবল পশ্চিমদিকে বড় জঙ্গল। সেই দিকেই আমরা লাইন লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। এখন যদি আমরা এই অল্পসংখ্যক হাতী লইয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে কথনই বাঘকে সরিষা-ক্ষেত্রে বাহির করিতে পারিব না। বরং খুব সম্ভব,সে আমাদের লাইনকে সহসা আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া পশ্চিমের বড় জঙ্গলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে, পুনরায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিবে। তাই জগৎ ও বরদাকে ব্যাঘ্র মহাশয়ের সাদর-অভ্যর্থনার জন্য লাইনটিকে তদবস্থায় রাখিতে বলিয়া, আমি একাই গজমতিকে লইয়া জগতের দিক দিয়া পাশ কাটিয়া, জঙ্গলের বাহির হইয়া পড়িলাম; এবং একটু ঘুরিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া, পুনরায় বনের

* হত জন্তুকে টানিয়া লওয়ায় মাটি কিংবা জঙ্গলে যে চিহ্ন পড়ে।

ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই উপায়ে লাইন ও আমার মধ্যে ব্যাঘ্র পড়িল। তখনও সেই ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস ধ্বনি অবিরাম গতিতে চলিতেছে। অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে গজমতি লাইনের দিকে চলিতে লাগিল। এরূপে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পর প্রায় ৭।৮ হাত দূরে একটি ঝোপের ফাঁক দিয়া, ব্যাঘ্র-শরীরের কিয়দংশ নয়ন-পথে পতিত হইল। কিন্তু উহা সম্মুখভাগ কি পশ্চাৎ ভাগ, অথবা পৃষ্ঠদেশ কি পার্শ্বদেশ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এদিকে আমরা যে বাঘের এত নিকটে আসিয়াছি, বাঘ বোধ হয় তাহা জানিতে পারে নাই।

উহার যত রাগ যেন ঐ লাইনটিরই উপর। বোধ হইল, সে সেই দিকেই লক্ষ্য করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে। আমি অতি মৃদুস্বরে মতুকে 'ধাৎ' * বলিয়া উঠিলে, হাতী তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ব হইতেই আমার হাতে, ৫৭৭ প্রস্তুত হইয়া আছে। কেবল আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। আর অপেক্ষা করিতে হইল না—পায়া টানিলাম। তখন সেগুলি, অগ্নি-উদ্গীরণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, সমস্ত বনভূমি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহকে কম্পিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই দেখিলাম, বাঘ খুব জোরে বন 'নড়াইয়া' বরদার হাতীর দিকে ধাবিত হইতেছে। বরদার নিকটে গিয়াই সে আর একবার গর্জ্জন করিল। বরদার বন্দুকও তাহার উত্তর-স্বরূপ গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন বাঘ সেদিকের পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া, বরদার হাতীর পাশ কাটাইয়া, উত্তরাভিমুখে ছুটিল। কিছুদূর পর্য্যন্ত "হালি" †—(বন নড়া) দেখিতে পাইলাম। তারপর আর কিছুই দেখা গেল না।

তবে কি সত্য সত্যই বাঘ অক্ষতদেহে চলিয়া গেল? এ কি করিলাম? এমন সুযোগ পাইয়াও বাঘ মারিতে পারিলাম না! জীবনে এরূপ সুযোগ শিকারীর ভাগ্যে কয়বার ঘটিয়া থাকে? অতবড় বাঘটা এত নিকটে শুইয়া ছিল, অথচ তাহার গায়ে গুলি লাগাইতে পারিলাম না! ছিঃ ছিঃ—ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? আমি কি করিয়া আর শিকারী-সমাজে মুখ দেখাইব?—ইত্যাদি চিন্তা আসিয়া, শিকারী বলিয়া আমার যে আত্মগরিমা আছে, তাহার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বিষণ্ণ মনে বরদার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; "কি হে, তোমার গুলি লাগিল?" সে বলিল—"না, গুলি লাগে নাই—বাঘের পেটের নীচে পড়িয়াছে।" "বাঘটাকে সম্পূর্ণ দেখিয়াছিলে কি?" "হাঁ, ঐ ফাঁকা জায়গায় বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল যে, ভাল করিয়া 'নিশানা' করিবার সময় পাইলাম না। কিন্তু দেখুন, আপনার গুলি বোধ হয় বাঘের কোমরে লাগিয়াছে। তাহার কোমরের দিকটা কেমন যেন হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছিল।" জহুরুদ্দিও এই কথার সমর্থন করিল। কথাটা আমার তত বিশ্বাস হইল না। কারণ উভয়েই ব্যাঘ্র-শিকারে অনভিজ্ঞ। যাহা হউক "থোস খবরের ঝুটাও ভাল।" মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শিকারী মাহুত সকলকেই সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিলাম, "দেখ, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, বাঘ সামান্যরূপে আহত হইয়াছে, আহত বাঘের সহিত খেলা "ছেলে খেলা নয়"। এখন হইতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত খেলা চলিবে। এবার বাঘের সহিত দেখা হইলেই, সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সকলে খুব সাবধান। যেন সেই সময় কেহ হাতী হইতে পড়িয়া না যাও। যে পড়িবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।" এইরূপ বলার পর পুনরায় লাইন-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু বাচ্ছা আলাউদ্দিনকে লইয়া এক বিষম বিপদে পড়া গেল। সে বাঘের গন্ধ পাইয়াই একেবারে আমার হাতীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে তাহাকে আর কিছুতেই লাইনের মধ্যে আনা গেল না। আহা! অতটুকু বাচ্ছাকে এইরূপে আহত বাঘের মুখে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা সত্যসত্যই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। থাক, ও আমার হাতীর পেছনে পেছনেই আসুক—এই বলিয়া আমি অবশিষ্ট তিনটি হাতী দিয়াই লাইন করিলাম; এবং বনের পশ্চিম পার্শ্ব ছাড়িয়া দিয়া, কেবল পূর্ব্ব পার্শ্ব ধরিয়া উত্তরাভিমুখে (অর্থাৎ যে দিকে বাঘ পলাইয়াছে) অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে দক্ষিণ অংশ ছাড়িয়া মধ্য অংশে পড়িলাম। আবার তাহা অতিক্রম করিয়া উত্তর অংশে আসিলাম, তাহার পর জঙ্গল ফুরাইয়া গেল। কিন্তু বাঘের কোন

* হস্তীকে দাঁড়-করান শব্দ।

† জানোয়ার গমনকালে বন-নড়াকে 'হালি' বলে।

সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বনের পূর্ব্ব পার্শ্ব ভাঙ্গা হইল, এখন পশ্চিম পার্শ্ব বাকি। তাই লাইনটি ঘুরাইয়া পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া, এবার দক্ষিণমুখে বন ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। কিয়দ্দূর গিয়াছি মাত্র, এমন সময় জয়মালা একটি ঝাউগাছ ভাঙ্গিতে গিয়া, একখানা বড় মৌ-চাক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে শতসহস্র মাছি, উহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া দংশন করিতে লাগিল। কেহই নিস্তার পাইল না; হাতী, মাহুত, বরদা এমন কি মৌ-চাক ভাঙ্গার নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ জহুরুদ্দিও নিস্তার পাইল না। বেচারীরা দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে গ্রামের দিকে পলাইয়া যাইতে বলিলাম। ইঙ্গিত পাইবামাত্র জয়মালা যতদূর সম্ভব "থপ্ থপ্" করিয়া গ্রামের দিকে ছুটিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে মাছির দল, তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া চলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একটা মাছিও এবার আমাদিগকে কিছু বলিল না।

হাতীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাওয়াতে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও বুদ্ধি ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে ছয়টি হাতী লইয়া শিকারে আসিয়াছিলাম। কিন্তু মৌমাছির উপদ্রবে কমিতে কমিতে এখন তিনটিতে দাঁড়াইল। তাহার মধ্যে আবার আলাউদ্দিনের দ্বারা কোন কার্য্যই হইতেছে না। অতএব কেবল দুইটি মাত্র কার্য্যোপযোগী হাতী রহিল। অবশেষে কি "হারাধনের" নয়টি ছেলের মতন "রইল না কেউ" হইবে নাকি? যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন ভাগ্যলক্ষ্মী আজ ব্যাঘ্রেরই পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন।

যাহা হউক, এখন জগৎ ও আমার এই দুই হাতীই পাশাপাশি হইয়া বন ভাঙ্গিতে লাগিল। কিন্তু কেবলমাত্র ইহাদের দ্বারা, পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমস্ত বন ভাঙ্গা সুবিধা হইবে না; এইজন্য এখন হইতে 'এড়োএড়ি' ভাবে বন ভাঙ্গিয়া চলিলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বদিক হইতে যখন বন ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, বনের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া পড়ি—তখন আবার ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া, আগের ভাঙ্গা জঙ্গল বামে রাখিয়া নূতন বন ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলি; এবং যখন বনের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া পড়ি, তখন ইতঃপূর্ব্বে যে বন ভাঙ্গিলাম, তাহা ডাইনে রাখিয়া, পুনরায় ঘুরিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে থাকি। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া বন ভাঙ্গিয়া চলিতেছি; ক্রমে উত্তরখণ্ড শেষ করিয়া মধ্যখণ্ডেরও কিছুদূর আসিয়া পড়িয়াছি; এমন সময় দেখি যে, জগতের হাতী একটি ঝোপের নিকট গিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে না। আমি তাড়াতাড়ি ঐ ঝোপটির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর জগৎ এখন যেখানে আছে, তাহাকে সেইখানে থাকিয়া চারিদিকে ভালরূপ লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া দিয়া—ঐ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় মতু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, সে বাঘ দেখিতে পাইতেছে; এবং ইহাও প্রকাশ করিল যে, ব্যাঘ্র মহাশয় নাকি মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আমাদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আমি যখন হাওদার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বহু চেষ্টা করিয়াও, ঐ কমনীয় ব্যাদিতবদনমণ্ডলের দর্শন পাইলাম না, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, এ'টি মতু সেখের ব্যাঘ্র-ভীতি-নিবন্ধন বিকৃতমস্তিষ্কসম্ভূত একটি অপচ্ছায়া মাত্র। কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ ভাবে তাহাকে পুনরায় ভাল করিয়া দেখিতে বলিলাম। এবার সে কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া স্বীকার করিল যে, পাতার ফাঁক দিয়া রৌদ্রকিরণ প্রবেশ করিয়া একটি স্থানকে চিত্রিত করিয়াছে। ইহাকেই সে এতক্ষণ ধরিয়া বাঘ মনে করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া আমার রাগের মাত্রাটা আরও চড়িয়া উঠিল। তখন তাহাকে দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া হাতী অগ্রসর করাইতে বলিলাম। সেও আবার তাহার তরফ হইতে অগ্রসরে অনিচ্ছুক গজমতিকে দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইল। অধিকন্তু দুই চারিটা 'কোল গ্রাঠার' (হাতী চালাইবার অস্ত্র-বিশেষ) খোঁচাও বসাইয়া দিল। হাতী 'হড়মড়' শব্দে ঝোপটি পদদলিত করিয়া, একেবারে জগতের কাছে গিয়া থামিল। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলাউদ্দিন আসিতেছিল, তাহার মাহুত "রক্ত রক্ত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে, ঝোপের ভিতরে একটা স্থান রুধিরসিক্ত। তবে ত বাঘ নিশ্চয়ই আহত হইয়াছে। সে বিষয় আর কোনই সন্দেহ রহিল না। বোধ হয়, এতক্ষণ সে এই খানেই চুপ করিয়া লুকাইয়া ছিল, হাতী আসিবার শব্দ পাইয়া সরিয়া গিয়াছে। আর বিলম্ব নাই, এখনই 'ডুরে' (Mr. Stripe) মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ হইবে।

প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নাচিতে লাগিল। আর একবার সকলকে সাবধান হইতে বলিয়া দিয়া, পূর্ব্ববৎ দুই হাতী পাশাপাশি করিয়া চলিতে লাগিলাম। অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, সম্মুখস্থ বন ঈষৎ কম্পিত হইয়া আবার স্থির হইল। বুঝিতে পারিলাম, বাঘ এবার আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য, প্রস্তুত হইয়া 'ওত' পাতিয়া বসিল। এখন যদি এভাবে অগ্রসর হইতে থাকি, আর বাঘ আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই ১০।১২ ফীট উচ্চ নলবনের ভিতর কিছুই দেখা যাইবে না; কাজে কাজেই গুলি করিবার সুবিধাও পাইব না। অতএব রণ-কৌশলের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। জগৎকে সেইস্থানে রাখিয়া যে ঝোপের ভিতর বাঘ আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে জঙ্গল ভাঙ্গিবার আশায় আমি একবার ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু তাহাতে জঙ্গল ভালরূপ পরিষ্কার হইল না দেখিয়া, আর একবার সুবিধার জন্য প্রায় অর্দ্ধেক পথ গিয়াছি, এমন সময় একটা হরিদ্রাবর্ণের স্তূপ অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে আমার হাতীর বাম পার্শ্বের পশ্চাৎ ভাগের উপর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটি শত্রুকে চাপিয়া মারিবার উদ্দেশ্যেই হউক কিংবা প্রাণভয়েই হউক্, আর্ত্তনাদ কৰিতে করিতে পশ্চাতের পায়ের উপর বসিয়া পড়িল। তখন ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের সহিত, হস্তী-আর্ত্তনাদ মিশ্রিত হইয়া যে একটি অপূর্ব্ব 'হারমনির' (Harmonyর) সৃষ্টি হইল, তাহা আত্মরক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু বরদা প্রভৃতি যাহারা অদূরে গ্রামের নিকট হইতে এই ধ্বনি শুনিয়াছিল, তাহারা পরে প্রকাশ করিয়াছিল যে, প্রাণে ভীতিরস সঞ্চারোপযোগী এরূপ 'হারমণি'—পৃথিবীতে ইতঃপূর্ব্বে কখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা, সে বিষয় তাহারা বড়ই সন্দিহান।

হাতী ত বসিয়া পড়িল। তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের সহিত প্রায় সমান্তরালে (Horizontal) হাওদাখানিও পশ্চাদ্দিকে অন্যূন ৬০ ডিগ্রী ঢলিয়া পড়িল। ইয়াছু বেচারা ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে না পারিয়া,—তাহার সম্মুখস্থ হাওদার বাক্সের (Seat) এর উপর পড়িয়া গেল। আর আমি যে কেন পড়িলাম না, এবং কোন্ সময়—যে দিকে বাঘ উঠিয়াছে—সেই দিকে ফিরিয়া, কিরূপেই বা বাম হস্তে হাওদার রেলিং ধরিয়া ও দক্ষিণ হস্তে বন্দুক লইয়া লক্ষ্য করিয়া—দাঁড়াইয়া আছি—তাহা এ পর্য্যন্ত একটি প্রহেলিকাই রহিয়া গেল। যদি বাস্তবিকই বাঘ সেই অবস্থায় হাওদার উপরে উঠিত, তাহা হইলে "এক হাত্‌মে তলোয়ার আউর দোসরা হাতমে ঢাল" ধারী সিপাহীর ন্যায়—এক হস্তে রেলিং ও অপর হস্তে বন্দুক লইয়া আত্মরক্ষায় কতদূর সমর্থ হইতাম,—তাহা শ্রীশ্রীভগবানই জানেন। তবে প্রাণের মায়া বড় মায়া। যে ব্যক্তি ডুবিতে বসিয়াছে, সে একগাছি তৃণ পাইলেও আঁকড়াইয়া ধরে। তাই বুঝি—আমিও সেইরূপ শেষ চেষ্টার জন্য ঐ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

ফিরিয়াই যাহা দেখিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না বটে—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যাহা দেখিলাম, তাহাও এ জীবনে কখন ভুলিব বলিয়া মনে হয় না। মনে করিয়াছিলাম, ফিরিয়াই ব্যাঘ্রের ভীতি-উৎপাদক বদনমণ্ডল দর্শন করিব; কিন্তু তাহা না হইয়া ইয়াছুর ভীতিব্যঞ্জক বদনমণ্ডল নয়নপথে পতিত হইল।

আমি ও ইয়াছু পরস্পর মুখোমুখী হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রের হাওদার উপর শুভারোহণের প্রতীক্ষা করিয়া আছি;—এমন সময় সহসা হাওদাখানি পুনরায় সমান্তরাল (Horizontal) ভাব ধারণ করিল এবং একটি হরিদ্রাভ কেহ চকিতে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, এবারের মত ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

(বারান্তরে সমাপ্য।)

মীমাংসা।

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম,এ, বি, এল]

পাঁচ কাঠা জমীর অধিকার—স্বত্ব লইয়া সুরবালা ও তাহার দেবর অবিনাশের মধ্যে যে ভয়ানক জিদ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কতকটা আভাস এই ঘটনা হইতে পাওয়া যাইবে যে, সুরবালা স্বয়ং পাল্কী করিয়া মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল।

স্বামীর বর্ত্তমানে দেবরের সহিত বিষয় বিভাগ হইয়াছিল, —এবং সুরবালা স্থির জানে যে, তাহাদের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের এই জমিটা তাহার স্বামীর অংশেই পড়িয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে অবিনাশ নানাপ্রকার কৌশলে ইহা আপনার অধিকারে আনিবার চেষ্টা করিতে থাকে; তাহার ফলে সুরবালা তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল।

মোকদ্দমার দিন, অবিনাশ এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত পেশ করিল যে, সুরবালা যদি তাহার একমাত্র পুত্র বসন্তের মাথায় হাত দিয়া শপথ করে যে, এ জমি তার, তাহা হইলে সে সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিবে এবং সুরবালার স্বত্ব স্বীকার করিবে।

অবিনাশ ভাবিয়াছিল এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে। মা হইয়া সুরবালা কিছুতেই ছেলের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতে পারিবে না, এবং তাহার ফল এই হইবে যে, বিচারক বিশ্বাস করিবেন অবিনাশের কথাই সত্য।

কথাটা শুনিয়া সুরবালা একবার ভাবিল, তাহার পর কহিল, "হাঁ, আমি শপথ করিব!" শুনিয়া অবিনাশ স্তব্ধ হইয়া গেল এবং তাহার উকীল নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

সুরবালার উকীল প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ—কিছু ধর্ম্মভীরু; পাল্কীর নিকট ঝুঁকিয়া কহিলেন "মা, এ বড় ভীষণ শপথ, বুঝিয়া করিও। এ ধর্ম্মের মন্দির, মিথ্যা সহিবে না।"

সুরবালা কহিল "যদি ধর্ম্মের স্থান হয় ত' আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

তাহার পর সুরবালা পাল্কী হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া আপনার পুত্রের মাথায় রাখিয়া কহিল, "এ জমি বিষয়-বিভাগের পর হইতে আমার স্বামীর এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমার পুত্রের—ইহাতে আর কাহারও অধিকার নাই।"

কথাগুলো স্পষ্ট করিয়া যখন সুরবালা উচ্চারণ করিতেছিল, তখন বিচার-গৃহ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ মূকের মত দাঁড়াইয়া ছিল!

বিচারক লিখিয়া লইয়া সুরবালাকে যখন ডিক্রি দিলেন, তখন জনতার মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন-শব্দ শোনা গেল, কেহ ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয়ঘোষণা করিল। বুকের মধ্যে ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া সুরবালা পাল্কী করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল, এবং অবিনাশ সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিল যে, ইহার ফল ফলিবেই।

২

সুরবালার মনের মধ্যে কেমন একটা আশঙ্কা যেন ক্রমাগতই ঘনাইয়া উঠিতেছিল; সে তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভাবিতেছিল, ভগবান যদি থাকেন এবং সত্য যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয় ত' সে নির্ভয়। ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে দুর্গা ও কালীর প্রতিমূর্ত্তিকে বার বার প্রণাম করিল।

আজকার ঘটনা যেন তাহার পুত্রকে আরও তাহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করিতে ভয় হয়। বুকের ভিতর ছেলেকে লইয়া সুরবালা শয়ন করিল।

অর্দ্ধেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সুরবালা দেখিল ছেলের গা আগুণের মত গরম!

বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল, মনে হইল বোধ হয়, মনের ভুল। ছেলের মুখে বুকে আপনার গাল দিয়া অনুভব করিল, সত্যই যেন আগুণ!

থার্ম্মমিটার লইয়া দেখিল ১০৫ জ্বর। সুরবালা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল। এত রাত্রে সে কাহাকে ডাকিবে? কেই বা তাহার আছে? তাহার ভাইএর বাড়ী দু'দিনের পথ।

সে দেবতার স্থানে গিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল, "ঠাকুর এ কি করিলে? আমি ত' মিথ্যা কথা বলিনি, একমাত্র তুমিই জান, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না! তবে এ কি ঠাকুর!"

ছেলের মুখের উপর পড়িয়া সুরবালা ডাকিল 'বাবা!"

ছেলে রক্তবর্ণ চক্ষু চাহিয়া মা-র মুখের দিকে চাহিল।

সুরবালা কহিল "কি হ'য়েছে বাবা?"

ছেলে তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল "বড় কষ্ট!"

অন্ধকার রাত্রের নির্জ্জনতার মধ্যে পীড়িত পুত্রকে বুকে লইয়া সুরবালার মনে হইল নিয়তির অমোঘ বজ্রহস্ত তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে,—যেমন করিয়াই হউক সেই লৌহ-হস্তের কঠিন পীড়নকে সে যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে; তাহার নিবারণ নাই, তাহার ক্ষমা নাই, তাহা হইতে নিষ্কৃতির আর উপায় নাই!

৩

দুই বাড়ী পাশাপাশি—মাঝে শুধু একটা পাঁচিলের অন্তরাল। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই; সুরবালা অবিনাশের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কতদিন যে সে এখানে আসে নাই, তাহা তাহার স্মরণ হইল না; পা যেন চলিতে চায় না। কিন্তু উপায় কি? রুদ্ধ দুয়ারের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সুরবালা কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল "ঠাকুর-পো!"

ভিতর হইতে বিস্মিত কণ্ঠের উত্তর আসিল "কে?"

পর মুহূর্ত্তেই দুয়ার খুলিয়া অবিনাশ কহিল "বৌঠাকরুণ! এমন সময় এখানে যে!"

একটা পরাভবের জ্বালা মুহূর্ত্তের জন্য সুরবালাকে যেন ফিরাইতে চাহিল; কা'ল সে সর্ব্বসমক্ষে বিচারালয়ে যে দেবরের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, আজ তাহারই কাছে তাহাকে বাচিয়া আসিতে হইল!' কিন্তু পীড়িত ছেলের ম্লান মুখ মনে পড়িল।

সুরবালা কহিল "ঠাকুর-পো, খোকার ভারি জ্বর হয়েছে!"

অবিনাশ শিহরিয়া উঠিল, "জ্বর হয়েছে! খুব?"

সুরবালা কহিল, "খুব,—গা পুড়ে যাচ্ছে! কি হবে? ঠাকুর-পো তুমি না দেখ্‌লে—"

অবিনাশ বাধা দিয়া কহিল,—"চল!"

৪

দশ বৎসরের মনোমালিন্য নিমেষে দূর হইয়া গেল। অবিনাশ খোকার শিয়রে গিয়া বসিল,—বলিল "বৌ-ঠাকরুণ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মানুষের সাধ্যে যদি থাকে ত' খোকার জন্য কিছু ভয় নেই!"

অবিনাশের সেবা দেখিয়া মনে হইল যে অসাধ্যও সময়ে মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়। দিবারাত্রের মধ্যে বিশ্রাম লইবার অবসর তাহার হইত না। এ যেন যমের সহিত মানুষের যুদ্ধ।

অবিনাশের স্ত্রী নিস্তারিণী, আপনার ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া সুরবালার বাড়ীতে আসিয়া আপনার সংসার বাঁধিল। সুরবালাকে কহিল "দিদি, সংসারের জন্যে তুমি ভেবোনা, দু মুঠো ভাত আমি তোমাদের দু'বেলা রেঁধে দিতে পারবো, তুমি খোকাকে দেখ!"

সুরবালার চোখে জল আসিয়াছিল, কহিল "ছোট বৌ—তোরা কি, তা এতদিন জান্‌তাম না! খোকা যদি বাঁচে ত তোদের কল্যাণে!"

দীর্ঘ একচল্লিশ দিন জ্বরভোগের পর খোকা বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু সে অনেক কষ্টে! অবিনাশের ঘরে যাহা কিছু ছিল, তাহা ডাক্তারের ফি-এ নিঃশেষিত হইয়া গেল, এবং অবিনাশ নিজে এমনই দুর্ব্বল হইয়া গেল যে, তাহাকে সহসা চেনা কঠিন হইত।

কিন্তু যেদিন ছেলের জ্বর ছাড়িয়া প্রথম বিজ্বর হইল, সেদিন অবিনাশের কি আনন্দ! সে কহিল "বৌঠাকরুণ, আজ এই দিনটাকে কোন রকমে চিরস্মরণীয় করতে ইচ্ছে করছে!"

সুরবালা কহিল "ঠাকুর-পো, আজ আর আমার বলতে কোনও ভয় নেই,—তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে ত দুই বাড়ীর মাঝখানে অভিশাপের মত ঐ দেওয়ালটাকে ভেঙ্গে দেও।"

অবিনাশ কহিল "এখনই!"

সেদিন খোকা পথ্য পাইয়াছিল। সুরবালা অবিনাশকে কহিল "ঠাকুর-পো, ভগবান যখন দিন দিয়েছেন তখন একটা কথা বল্‌ব।"

অবিনাশ কহিল "কি ?"

সুরবালা কহিল "খোকা এখন তোমার, নিস্তারিণী তার মা! আমি ত' তাকে শেষ করতে ব'সেছিলাম। আমার ইচ্ছে খোকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দি, ওর ভেতরে কোথায় অধর্ম্মের বিষ আছে,—তুমিই সাম্‌লে চল্‌তে পারবে।"

অবিনাশ কহিল "বৌ-ঠাকরুণ,আমি ভেবে দেখেছি, অধর্ম্ম যদি কারো হ'য়ে থাকে ত' সে আমার। ভগবান তারই প্রতিফল দিয়েছেন! আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি যেদিন থাকবো না, সেদিন খোকাই সব; যে জিনিষ তার, তাই নিয়ে আমরা মাথা কুটোকুটি করছিলাম। তাই ভগবান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, যে আমি আর তুমি কেউ নই, খোকাই সব! এক খণ্ড জমির জন্যে আমি সেদিন যে পাপ ক'রেছিলাম, খোকার মাথায় হাত দিয়ে তোমাকে দিব্য করিয়েছিলাম, তার ফলে আমরা তাকে হা'রাতে ব'সেছিলাম—নইলে ত' তুমি মিথ্যা কথা বলোনি!"

সুরবালা কহিল "ঠাকুর-পো, আমারও ঐ কথাটাই বার বার ক'রে মনে হচ্ছে। পাপ আমার! আমি মেয়ে-মানুষ হয়ে এক খণ্ড জমিকেই সব চেয়ে বড় মনে ক'রে-ছিলাম, তাই ভগবান আমার সত্যি-কার সব-চেয়ে বড় থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রছিলেন! মেয়েমানুষ হ'য়ে তোমার বিপক্ষে এত বড় জিদ্‌ দেখিয়েছিলাম ব'লে তোমাকে দিয়ে তিনি আমার চোখ ফুটিয়েছেন,—ও সব তুমিই নেও!"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও কথা এখন থাক্‌। আমার নিজের ওপরও আমার সন্দেহ হয়; আবার কেমন ক'রে ধর্ম্মকে আঘাত করে, বিপদ ডেকে আন্‌ব! বাঁচিয়ে চলতে আমিও জানিনে!"

* * *

দু'দিন পরে প্রভাতের নবীন রৌদ্র দেবতার শুভ্র আশীর্ব্বাদের মত সুরবালার ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। স্নান সমাপনান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সুরবালা ঠাকুর প্রণাম করিতেছিল।

এমন সময় একখানা গোল করিয়া ভাঁজ করা কাগজ হাতে লইয়া অবিনাশ প্রবেশ করিয়া কহিল "বৌ ঠাকরুণ!"

সুরবালা প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল "কি ঠাকুর-পো!"

অবিনাশ কহিল "একটা উপায় বা'র করেছি! আমার সমস্ত সম্পত্তি খোকাকে লিখে দিয়েছি! ও নিষ্কলঙ্ক, ওর ওপরে ভগবানের প্রসাদ আছে, ওর জিনিষ ওকেই এখন থেকে দিলে ধর্ম্ম প্রসন্ন হবেন, আমরাও নির্ভয়ে থাকব।" কাগজখানা সুরবালাকে দিয়া কহিল "এই নাও"।

সুরবালা মূঢ়ের মত, মূকের মত চাহিয়া রহিল! তাহার দুই চোখ বহিয়া জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যে দেবতাকে সে এইমাত্র প্রণাম করিতেছিল, মনে হইল তাঁহার অপূর্ব্ব-শ্রীর এক কণা যেন অবিনাশের মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে!

ধীরে ধীরে কাগজ-খানা অবিনাশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে নম্র-করুণ স্বরে কহিল "ঠাকুর-পো, ও তুমিই রাখো! খোকার সব জিনিষ রাখ্‌বার ভার এখন থেকে তোমার ওপর!"

আমার য়ূরোপ-ভ্রমণ

[মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহতাব বাহাদুর, K. C. S. I.]

দশম অধ্যায়

লণ্ডন

২৮মে প্রাতঃকালে আমরা পেরিস ত্যাগ করি এবং সেই দিন অপরাহ্ণ কালেই লণ্ডনে উপস্থিত হই। পেরিস হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত পথটিতে তেমন কিছু বিশেষ ঘটনা হয় নাই। তাহার পরই ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে হইল। সমুদ্রের মধ্য হইতে যেমন ডোভারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা ইংলণ্ডের সমীপস্থ হইয়াছি, আর একটু পরেই ইংলণ্ডের তীরভূমিতে অবতীর্ণ হইব, আর একটু পরেই বৃটিশ-রাজের রাজ্যে পদার্পণ করিব। আমার মনে তখন কত ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, আমি কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, আমাদের বোট যখন তীর-সংলগ্ন হইয়াছে, তখনও আমার হুঁস ছিল না। আমার সঙ্গী একজন আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করায় আমার তন্ময়তা ভঙ্গ হইল; দেখিলাম যে, আমি অনেকের যাতায়াতের পথরোধ করিয়া বসিয়া আছি।

ডোভার হইতে লণ্ডনের পথে আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল পথের উভয় পার্শ্বের শ্যামল তৃণ-ক্ষেত্রগুলির উপর; তাহারা যেমন সুন্দর তেমনই নয়ন-তৃপ্তিকর; সত্যসত্যই এই সকল তৃণক্ষেত্র দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইয়া গেল, আমি সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারি নাই। তাহার পর সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্থানগুলি দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল;—সুধু ভাল লাগিল বলিলেই কথাটা ঠিক বলা হয় না;—এমন পরিপাটী দৃশ্য আমার দেশে এবং য়ুরোপেরও যে সমস্ত দেশের মধ্য দিয়া আসিলাম, তাহার কোথাও দেখি নাই; এ স্থানের মনোরম দৃশ্যের তুলনা হয় না। এই সকল মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী লণ্ডনের প্রধান ষ্টেসন ভিক্টোরিয়া টার্মিনসে উপস্থিত হইল। আমি গাড়ী হইতে নামিবামাত্রই দেখিলাম আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সিসিল ফিসার (Mr. Cecil Fisher, I. C. S.) মহাশয় আমার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম মিঃ ফিসার একাকী ষ্টেসনে আসেন নাই; তাঁহার পিতা এড্‌মিরাল সার জন্ ফিসার মহোদয়ও পুত্রের পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সার জন্ একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি বলিতে গেলে নৌ-বিদ্যায় ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান; ইংলণ্ডের নৌবলের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক। এ হেন মহাশয় ব্যক্তি আমার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া আমি সুধু যে আনন্দিত হইলাম তাহা নহে, বিশেষ গৌরবও অনুভব করিলাম।

হাইড পার্ক

তৎপরে আমরা ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া হাইড পার্কের প্রান্তস্থিত আলেকজান্দ্রা হোটেলের দিকে অগ্রসর হইলাম। এই হোটেলেই আমার অবস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ,

হাইড পার্ক প্রভৃতি স্থান দেখিলাম। ইঁহাদের কথা এতকাল পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, আজ সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল।
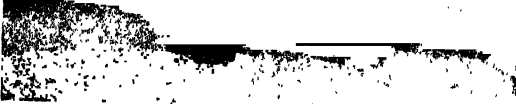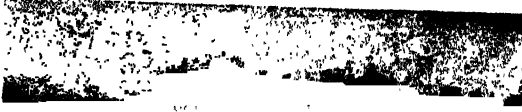
বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ

পথে যাইবার সময় সর্ব্বপ্রথমেই একখানি ক্রহাম গাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং সেই গাড়ীর আরোহীর দিকে চাহিবামাত্রই আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। এই আরোহী ব্যক্তি আর কেহই নহেন, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয়। লণ্ডনের পথে পৌছিয়াই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের কথা আমার এই ভ্রমণ-কাহিনীতে অনেকবার বলিতে হইবে, কারণ তাঁহারই অনুগ্রহে এবং সাহায্যে আমি ইংলণ্ডের নানাস্থান দর্শন করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম; তাঁহারই চেষ্টায় আমি ইংলণ্ডের রাজনীতিক পণ্ডিতগণের ও বৃটীশ রাজনীতির জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলাম।

আমাদের হোটেলটা বড় নহে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই; আমরা এই হোটেলে বেশ সচ্ছন্দে ছিলাম। হোটেলে যখন পৌছিলাম তখনও সন্ধ্যা লাগে নাই; তাই আর বিলম্ব না করিয়া তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম; বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সিসিল ফিসার আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা হাইড পার্কে ভ্রমণ করিতে গেলাম এবং বন্ধুবর ফিসার মহাশয় আমাকে এই লণ্ডন সহরের বিশেষ পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন; আমাকে এখানে কি ভাবে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে লাগিলেন।

আমি এতদিন আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ডাইরী বা রোজনামচার মত করিয়া লিখিতেছিলাম; দিনের পর দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন হইতে আমি সে পদ্ধতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। এখন এই লণ্ডনই আমার প্রধান আড্ডা—আমার Head quarters; এই স্থানকেই আমি ২৮এ মে হইতে ১৯এ জুলাই পর্য্যন্ত আমার প্রধান আড্ডা করিয়াছিলাম। এখন হইতে রোজনামচা না লিখিয়া, আমি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। আমি সমস্ত বিবরণ ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত করিব; যথা,—সামাজিক লণ্ডন, রাজনৈতিক লণ্ডন, ধর্ম্মনৈতিক লণ্ডন, জনহিতকামী লণ্ডন, রাজধানী লণ্ডন, ক্রীড়াশীল লণ্ডন, ও লণ্ডনের দ্রষ্টব্য স্থান। এমনভাবে বিভক্ত করিয়া বলিলে, কথাগুলি বেশ গোছাইয়া বলা হইবে।

এবার তাহা হইলে এই স্থানেই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। আগামী বার হইতে একটি একটি করিয়া লণ্ডনের সকল বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করিব।

ফরাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণতরী

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(১৫)

রাত্রির শেষভাগে আমরা কালক্লিষ্টা ভাগীরথীর বিশীর্ণ দেহে ভর করিলাম। আজ ভাগীরথীর এই দুর্দ্দশা; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি পূর্ণাঙ্গী, নিত্যবেগবতী ও তরঙ্গমালিনী ছিলেন। অসংখ্য পোত তৎকালীন বণিকগণের আশার ভাণ্ডার বুকে করিয়া, এক সময় এই গঙ্গারই বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে এক দিন সপ্তগ্রামের—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী বন্দরের—যে অবস্থা হইয়াছিল, জাহ্নবী-স্রোতের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী গ্রামসমূহেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।

অনুমান ভিন্ন এখন আর অন্য কোন উপায়ে এদেশে জাহ্নবীর অস্তিত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। এখনও গ্রামপ্রান্তে অনেক ভগ্নদেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা-প্রোথিত অনেক দেবমূর্ত্তি জলাশয়-খননকারীর খনিত্র আশ্রয় করিয়া সূর্য্যমুখদর্শনের জন্য উপরে উঠে। সময়ে সময়ে দুই একটা নৌকার ভগ্নাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন ইহার একটি ক্ষুদ্র শালতী-সঞ্চালনেরও শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এক সময় ইহার উপর দিয়া শ্রীমন্ত সদাগরের সাত ডিঙ্গা পণ্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া সিংহল গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পার্ষদ সঙ্গে লইয়া এই গঙ্গারই উপর দিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন।

এখন ইহাকে গঙ্গা বলিতে লজ্জা বোধ করে। মধ্যে একটি সামান্য শীর্ণ খাল। আর খালের উভয় পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র। স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। তথাপি দেশবাসী ইহাকে গঙ্গা বলিতে ছাড়ে না। জাহ্নবীর আকৃতি গিয়াছে, প্রকৃতি গিয়াছে; তথাপি উহার উপর দেশের লোকের ভক্তি যায় নাই। এই ক্ষুদ্র শীর্ণদেহ খালের জল এখনও গঙ্গাজলের ন্যায়ই তাহাদের চক্ষে পবিত্র। লোকে ইহার বক্ষে স্থানে স্থানে সরোবর খনন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জলজ গুল্মবহুল। সেই সকল গুল্মাচ্ছাদিত পানাভরা পঙ্কিল জলে এখনও হিন্দু নরনারী "সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সুখদা মোক্ষদা" জ্ঞানে অসঙ্কোচে ডুব দিয়া থাকে।

আমরা এই গঙ্গায় শালতী ভাসাইয়া চলিয়াছি। ভাসাইয়া বলি কেন, গঙ্গাকে প্রহার করিতে করিতে শালতীকে বংশদণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর করিতেছি। পিতা যখন প্রথম বার হুগলীতে যান, তখন বর্ষার শেষ। শস্যক্ষেত্র জলপূর্ণ, খালেও যথেষ্ট স্রোত ছিল। এখন জ্যৈষ্ঠের শেষ। সবেমাত্র বর্ষার সূচনা হইয়াছে। সেই জন্য খালটা শালতীর পক্ষে কতকটা সুগম হইয়াছে।

এই খাল ধরিয়া আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মগরায় উপস্থিত হইব। সেখানে আহারাদি সমাপন করিয়া আবার যাত্রা করিব। সকাল সকাল পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে আমরা রাত্রিশেষেই যাত্রা করিয়াছি। মাকে ও বালক আমাকে লইয়া বারবার উঠানামা করিতে হইবে বলিয়া, পিতা বরাবর জলপথেই আমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। যাইতে কিছু বিলম্ব হইবে বটে কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম।

আমরা যে শালতীতে উঠিয়াছি, তাহা সেই জাতীয় যানের পক্ষে যতটা বড় হওয়া সম্ভব, তত বড়। পিতা বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ শালতী ভাড়া লইয়াছেন। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ চারি জন আরোহী, তাহার উপর আবার মায়ের সেই সেকালের মন্দিরাকৃতি পেঁটরা, কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, ও বালিশ-বিছানার মোট। ছোট শালতীতে সকলের স্থান হইত না।

শালতীর টাপরের মধ্যে পেঁটরা ও সিন্দুকটি রাখিয়া মা তাহার নিকটে বসিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে এবং আমার পার্শ্বে পিতা ঝাঁপি ও কাপড়ের মোট লইয়া, গণেশ খুড়া টাপরের বাহিরে বসিল।

টাপরের আচ্ছাদনে এতটুকু ফাঁক নাই যে, উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিব। রাত্রি তখন তিনটা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। দুই পাশে কেবল মাঠ। মাঠের প্রান্তে দূরে গাঢ় অন্ধকার কোলে করিয়া গ্রামপ্রান্তস্থ আম, কাঁটাল, অশ্বথ, বটের গাছ। দেখিবার এমন বিশেষ কিছুই ছিল না যে, তাহা দেখিতে আগ্রহ হইবে। তথাপি আমি টাপরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগিলাম। তাহাতে টাপরে আমার মাথা দুই তিন বার আহত হইল। প্রথম দুই এক বার চাঞ্চল্যের জন্য পিতৃ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলাম। মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু ঘুমত তাঁহার আদেশ-অনুযায়ী আমার চোখে আশ্রয় লইবে না। আমি কিয়ৎক্ষণ মায়ের কোলে মাথা দিয়া চোক টিপিয়া পড়িয়া রহিলাম। ঘুম আসিল না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "যাক্ বাঁচা গেল। গ্রাম পার হইয়াছি।"

মা বলিলেন,—"আপদ চুকিল।"

আমি তাঁহাদের কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে অক্ষম হইলেও, গ্রামপারের কথা শুনিয়া, সহসা মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম। কেন যে উঠিলাম, তাহা বুঝি নাই। বুঝি, জন্মভূমির জন্য চিরান্তঃস্থিত মমতা সহসা আহত হইয়া মস্তিষ্কপথে ছুটিল। আমি বসিয়াই দাঁড়াইতে গেলাম। অমনি মাথাটা বিষমবেগে টাপরে লাগিয়া গেল। আমি মায়ের বক্ষের উপর সবেগে পতিত হইলাম।

মায়ের বক্ষে আঘাত লাগিল। তিনি মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া আমার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিলেন। মায়ের অঙ্গে আঘাত লাগায়, আমি নিজের আঘাত-যন্ত্রণা মনেই রাখিয়া, আবার তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম।

পিতা এইবারে আমার প্রতি সদয় হইলেন। বলিলেন —"মাঠ দেখিতে কি তোর বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে? তা'হলে আমার সুমুখে আসিয়া বোস্।"

মা বলিলেন—"তোমারই কাছে রাখ। আর বোঝ, অসৎশিক্ষায় ছেলে কতটা বেসহবৎ হইয়াছে।"

আমি পিতার সম্মুখে বসিলাম।—পিতা বলিলেন, "সাবধান, এখানে যেন উঠিবার চেষ্টা করো না। তা'হলেই জলে পড়িয়া যাইবে।"

যেখানে বসিলাম, সেখান হইতে মুখ বাহির করিলেই খালের উভয় তীরই দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মুখ বাহির করিয়াই দেখিলাম। যেস্থানের উপর দিয়া শালতী চলিয়াছে, গঙ্গার একটি তীর তাহার অতি নিকটে। অপরটি প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে।

নিকটের তীরে যে গ্রাম, আমরা যেন তার গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম। ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি পিতাকে বলিলাম—"কৈ বাবা এত আমাদের গ্রাম নয়।"

পিতা কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কথাটা যেন তিনি শুনিতে পাইলেন না। তিনি গণেশ খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে গণেশ, ঘুমাইতেছ নাকি?"

সত্যই তখন গণেশখুড়া ঘুমাইতেছিল। পিতার কথা শুনিবামাত্র সুপ্তোত্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিল—"এঁ"

পিতা বলিলেন—"বেশ গণেশ, বেশ! এই অবস্থায় তুমি যে ঘুমাইতে পারিয়াছ, ইহাতে তোমার বাহাদুরী আছে।"

বাহাদুরীই বটে; তাহার পার্শ্ব দিয়া মাঝির বোঁটে অবিরাম যাতায়াত করিতেছে; খুড়ার তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। লেপ-বালিশের নীচে মাথা গুঁজিয়া খুড়া বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লইল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ ঠাকুরপো, ইহারই মধ্যে কখন তোমার ঘুম আসিল?"

পিতা বলিলেন—"ডোঙ্গায় উঠিবামাত্র। ইহা আর বুঝিতে পারিলে না! জাগিয়া থাকিলে গণেশ কি অন্ততঃ একটা কথাও কহিতে ছাড়িত! কেমন গণেশ, না?"

খুড়া বলিল—"হাঁ দাদা, তাই বোধ হয়।"

পিতা। গণেশ! দেখিতেছি, তুমিই যথার্থ সুখী।

গণেশ। হাঁ দাদা, আমি কিছু সুখী। যাত্রার উদ্যোগ করিতে, এবং মা ও বউকে বুঝাইতে ভুলাইতে সারা রাত্রিটাই চলিয়া গেল। একটি বারের জন্য চোখের পলক ফেলিতে পাই নাই। রাত্রিটা আমি আদতেই জাগিতে পারি না। এই জন্য চোখ দু'টা কখন আপনি বুজিয়া গিয়াছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাকে কি বলিয়া ভুলাইলে?"

খুড়া। বউ কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম—"কাঁদিস্‌নে ক্ষেপী, আমি তোর জন্য গেঁজে পুরিয়া টাকা আনিতে চলিয়াছি।" মা বলিল—"বাবা! কোম্পানীর চাকরী করিতে চলিয়াছ। খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিবে। কোনও রকমে কোম্পানীকে চটাইয়োনা।" আমি বলিলাম—"আমার কাজ দেখিয়া কোম্পানীর বাপ পর্য্যন্ত খুসী হইয়া যাইবে। কোম্পানীত ছেলে মানুষ।" এই রকম কথার উপর কথা—রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। তারপর তোমাদের তল্পীতল্পা বাঁধিতে, গোছ করিতে, ডোঙ্গায় উঠাইতে দুইটা। ঘুমাইবার আর এক মিনিটও সময় পাইলাম না।

পিতা। এমন কি কাজ করিতে জান যে, কোম্পানী দেখিয়া তুষ্ট হইবে?

খুড়া। এমন কি কাজ আছে যে, আমি করিতে জানি না। ঘর-ঝাঁট হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত বাড়ীর সমস্ত কাজ ত আমিই করি। মা দিনরাত এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। বউ নিজের শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কাজ করিবে কখন?

পিতা। রান্নার কাজও কি করিতে হয়?

খুড়া। দুইবেলা। করিতে হয় বলিয়া করিতে হয়!

পিতা। বেশ ভাই, বেশ! তাহ'লে তোমার চাকরীর ভাবনা কি!

মাতা। চাকরী করিতে হইলে যে কিছু বিদ্যা থাকা চাই ঠাকুরপো!

খুড়া। কেন! বিদ্যের অভাব কি! গোপাল গুরু-ম'শার পাঠশাল। অঘোর দা'র যেথান থেকে বিদ্যে, আমারও বিদ্যে সেইখান থেকে। কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্যে; কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিজ্যে। গোবিন্দ খুড়ার বাগানের কলাগাছ শেষ করিয়াছি। বাঁশ ঝাড়ের কঞ্চি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। আমার বিদ্যা নাই! তবে বিদ্যা দাদার মতন হয় নাই এই যা বলিতে পার। তবে দাদার বিদ্যা দাদার মতন, ছোট ভাইয়ের বিদ্যা ছোট ভাইয়ের মতন।

পিতা। শুধু বিদ্যা হ'লেত হবে না। কোম্পানী বড় পেটুক। তাহাকে ভাল ভাল তরকারী না খাওয়াইলে সে খুসী হবে না।

খুড়া এই কথা শুনিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"অঘোর দা, তবেত কোম্পানীকে হাতের মুঠোর ভিতর পুরিয়াছি।"

মা বলিলেন—"কই ভাই, তোমার বিদ্যাইত আমি জানিতে পারিলাম না।"

"বেশ আগে মগরায় চল। আজই তোমাকে বিদ্যার পরিচয় দিব।"

এই কথোপকথনেই গণেশ খুড়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় হইল।

আমি কিন্তু গ্রামের পানেই চাহিয়াছিলাম। আমাদের গ্রাম কি না বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই অবস্থায় গণেশ খুড়ার কথা যতটা শুনিবার শুনিয়াছিলাম। আমি বিশেষ দৃষ্টিতে যখন দেখিলাম, সেটা আমাদের গ্রাম নয়, তখন সে সম্বন্ধে পিতাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কই বাবা, এত আমাদের গ্রাম নয়!"

আমার এই কথা শুনিয়াই গণেশ খুড়া বলিয়া উঠিল—"ও হার! আমাদের গ্রাম সে কোথায়! কখন তাকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তোমার ওই শ্বশুরের গাঁকেও ফেলিয়া আসিয়াছি।"

পিতা কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"থাক্ থাক্।"

গণেশ খুড়া পিতার আদেশ মানিল না। আবেগের সহিতই বলিয়া উঠিল—"ওই ওই! ওই দেখ বাবাজী, সাভ্যোম ম'শায়ের বাগানের অশথ গাছ লা লা করিতেছে।"

"চুপ কর না গণেশ!" পিতা ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন।

কিন্তু নিষেধ মানে কে? গণেশ খুড়ার তখন প্রাণের কবাট খুলিয়া গিয়াছে। সে আবার বলিল—"সত্যি অঘোর দা! হয় না হয় তুমি দেখ। ওই অশথ গাছ আঙুল নাড়িয়া যেন হরিহরকে যাইতে ইসারা করিতেছে।"

আমি অশথ গাছটার আঙুল-নাড়া দেখিবার জন্য টাপর হইতে সাগ্রহে গলা বাড়াইতে গেলাম। পিতা আমার ঘাড়টা ধরিয়া আমাকে যথাস্থানে বসাইলেন।

মাতাও ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কর কি গণেশ. বাবু বারবার তোমাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, আর তুমি পাগলের মত কি ছাইপাঁশ বকিয়া যাইতেছ।"

মায়ের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে গণেশ খুড়া এই প্রথম শুনিল। সে আর গ্রাম সম্বন্ধে কোনও কথা না,

কহিয়া বলিল—"ঐ ঠাকরুণ! যখন তোমার মুখ থেকে আমার নামটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন বুঝলুম, তোমার সত্যি সত্যি রাগ হইয়াছে। আর ও গাঁয়ের কথা বলিব না।"

পিতা বলিলেন—"তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও।"

"বেশ দাদা!" বলিয়াই গণেশ খুড়া আবার মোটের উপর মস্তক রক্ষা করিল।

শালতী-চালক বলিল—"ওইটাই সাভ্যোম ম'শায়ের বাস্তু বটে। খুড়াঠাকুর ভুল করে নাই।"

পিতা বলিলেন—"বেশ। তুমি এখন একটু জোরে চালাইয়া চল।"

গণেশ খুড়া মোটের উপর মাথা দিতে না দিতেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পিতা সেটা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাতাকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"মূর্খটা ঘুমটাকে দেখিতেছি খুব সাধিয়াছে।"

মা বলিলেন—"ওর আর সাধিবার কি আছে! কাজের মধ্যে দুই। খাই আর শুই।"

এই বলিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন—"কেন মিছে বসিয়া আছিস্ হরিহর? এখনও অনেক রাত আছে। আমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমা। এ পোড়া দেশে কি দেখিবার আছে, তা দেখ্‌বি। যে দেশে বাবু আমাদের লইয়া যাইতেছেন, সেই দেশে চল্‌। কত কি দেখিতে পারিস্ বুঝিব।"

পিতা বলিলেন—"তোকে কাল কলকেতা দেখাইব। তারপর হুগলীতে গিয়া ইমামবাড়ী দেখিবি। সে দেখিলে আর তোর এ দেশের নাম পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হইবে না।"

নূতন দেশ দেখিবার আশ্বাসে আশ্বাসিত আমি আবার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলাম।

তখনও ঘুম আসে নাই। সবেমাত্র আসে আসে হইয়াছে। পিতা মনে করিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছি, সেই মনে করিয়াই বোধ হয়, তিনি মাকে বলিলেন—"এখন বুঝিতেছি, মা ছেলেটার মাথা খাইতে বসিয়াছিলেন।"

মাতা। দেখ বুঝে দেখ। শ্বশুরবাড়ী দেখিবার জন্য বালকের আগ্রহটা দেখিলে! তবু ত এই কয়মাস ওকে শাসনে শাসনে রাখিয়াছি।

পিতা। এখন বছর পাঁচ ছয় ত ওকে এদিকে পাঠাইবার নাম করিব না।

মাতা। তুমি যে পুরুষ, তুমি কি তা পারিবে? মা চিঠিতে একটু কাঁদাকাটার কথা লিখিলেই তুমি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া আসিবে।

পিতা। কিছুতেই না। এখন বুঝিতেছি, ছয়মাস আগেই তোমাদের লইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

মাতা। আমার কথাতেত মূল্যজ্ঞান কর না। আমি কে ত কে। তোমাদের শত্রু বইত নয়। অথচ ছেলেকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিয়াছি।

পিতা। এত রাত্রিতে বাহির হইলাম কেন জান? পাছে বামুন খবর পাইয়া পথ আগুলিয়া বিরক্ত করে। যতক্ষণ না বামুনের গ্রাম পার হইয়াছি, ততক্ষণ মনে বড়ই উদ্বেগ ছিল।

মাতা। উদ্বেগ কি গিয়াছে মনে করিয়াছ! বামুন সেই হুগলী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবে।

পিতা। সেখানে গেলে তাহাকে বুঝিয়া লইব।

মাতা। পারিবে?

পিতা। দেখিয়ো।

মাতা। তবে তোমাকে মনের কথা বলি। ছেলের আমার বিবাহ না হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি ও মড়ুই-পোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিব না। সে আমাকে অঘরের মেয়ে বলিয়াছে।

পিতা। বামুন অতি নির্ব্বোধ।

মাতা। নির্ব্বোধ নয়—হারামজাদা। সে কি আমাদের ঘর কি জানে না! আমার বাপের মত কুলীন তোমাদের দেশে আর কেউ আছে?

পিতা। সে কথা ছাড়িয়া দাও না। আর কি কুলীন-মৌলিকের ইতরবিশেষ থাকিবে?

মাতা। ও বামুনত মড়ুইপোড়া। তোমরা বোকা, তাই উহার বেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছ। আমার বাবা হইলে উহাদের ঘরের ছায়া মাড়াইত না।

পিতা। যাক্, বিবাহ ত আর হইতেছে না। তখন ঘরের কথা তুলিবার আর প্রয়োজন কি? তা যাহ'ক, একি করিলে? এক আপদ হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছি, আবার এ আপদ সঙ্গে লইলে কেন? এ গণ্ডমূর্খটাকে সেখানে লইয়া কি করিব?

মাতা। ওর মা আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছে।

অন্ধের যষ্টি

শিল্পী—জন্ লরেন্স্ ডিক্‌ম্যানস্]

আর আমার হাত দুটি ধরিয়া প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে। কাছারিতে যে কোন একটা কাজ উহাকে করিয়া দিয়ো।

পিতা। কাজের মধ্যে এককাজ রাঁধুনি-বৃত্তি। অন্য কোনও কাজ ও মূর্খের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।

মাতা। ভাল, এখন চলুক। কোন কাজ করিতে না পারে, আমাদের রসুই করিবে।

ইহার পরেই পিতামাতা নিস্তব্ধ হইলেন। এবং এই নিস্তব্ধতার অবসরে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(১৬)

প্রভাতে মগরায় উপস্থিত হইলাম। সেথানে চটিতে আহার-কার্য্য সমাধা করিলাম। গণেশ খুড়াই রাঁধিল। তাহার হাতের রান্নার অপূর্ব্ব আস্বাদন আজিও পর্য্যন্ত আমার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পর অনেক স্থানে ভাল ভাল রসুয়ের রান্না খাইয়াছি। কিন্তু সেদিন যেমন তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলাম, এরূপ আহারে তৃপ্তি আর কথনও লাভ করি নাই। আমি যে শুধু একাই তৃপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে। পিতা ও মাতা উভয়েই পরম তৃপ্তির কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মাতা বলিলেন—"তাইত ঠাকুরপো, রান্নায় তোমার এমন মিষ্টি হাত, তাতো আগে জানিতাম না। আগে জানিলে যে, উপযাচক হইয়া তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতাম।"

পিতা বলিলেন,—"তোমার যথন হাতের এতগুণ, তথন তোমার চাকরীর ভাবনা কি গণেশ!"

গণেশখুড়া বলিল—"কেমন অঘোরদা' কোম্পানী খুসী হইবে না?"

পিতা ও মাতা উভয়েই তথন গণেশখুড়াকে চাকরী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার আশ্বাস দিলেন। আমি বুঝিলাম, গণেশখুড়ার কি চাকরী হইবে। কিন্তু গণেশখুড়া বুঝিল না।

আহারান্তে আবার আমরা শালতীতে উঠিলাম। এবারে প্রখর রৌদ্র। সুতরাং গণেশখুড়ার আর টাপরের বাহিরে থাকা চলিবে না। পিতা তাহাকে টাপরের ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খুড়া ভিতরে আসিল না। গামছাখানা জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া বাহিরে বসিল। বলিল—"না দাদা। আমি বাহিরেই থাকিব। রোদজল আমার সওয়া আছে। আর বামুনের ছেলে হয়ে যথন চাকরী করিতেই হইবে, তখন রৌদ্রজলকে ভয় করিলে চলিবে কেন!"

পিতা। চাকরী করাটা কি খারাপ কাজ?

খুড়া। খারাপ বই কি দাদা। যে কাজ বাপ-ঠাকুরদা করেন নাই, সে কাজ ভাল কেমন করিয়া বলিব! তাহারা ত কেহ মূর্খ ছিল না। বংশের মধ্যে মূর্খ কেবল আমি। ওইত আমাদের সবার বড় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মশাই। কোম্পানী তাকে কত টাকা দিতে চাইলে, তবু বামুন চাকরী নিলে না।

মাতা। সে যে সবার বড় পণ্ডিত একথা তোমাকে কে বলিল?

খুড়া। সকলে বলে তাই শুনি। আমি মূর্খ, আমি কি জানিব?

পিতা। বটে! তাহ'লে তুমি বুঝি অনিচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যাইতেছ?

খুড়া। ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝি না। মা তোমাদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছে—চলিয়াছি। আবার আসিতে বলে—আসিব। না বলে, আসিব না।

মাতা। একথা আগে বলিলে ত আমরা তোমাকে সঙ্গে আনিতাম না।

খুড়া একথার কোন উত্তর করিল না, চাকরীর দুঃখ চিন্তায় বুঝি ব্যাকুল হইয়া আপনার মনে গান ধরিল—

"তারা কোন্ অপরাধে সুদীর্ঘ মিয়াদে সংসার গারদে খাটি বল্।"

এই সময়ে পিতা ও মাতা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। মাতা বলিলেন,—"তবে আর কেন? পার ত এস্থল হইতেই বিদায় দাও!"

পিতা ডাকিলেন—"গণেশ!"

খুড়া। কি অঘোর দা'।

পিতা। তুমি এই খান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিতেছি।

খুড়া। কেন, আমি কি চাকরী করিতে পারিব না?

পিতা। না। তুমি লেখাপড়া জান না। তুমি সেখানে কি চাকরী করিবে? তোমার মায়ের একান্ত অনুরোধে তোমাকে লইয়া চলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে কে

কি কাজে লাগাইব, এখন পর্য্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

মাতা। আমাদের বাসায় রসুইকরা ভিন্ন সেখানে তোমার অন্য কোন কাজ করিবার নাই।

খুড়া। বেশ, তাই করিব। বউ ঠাকরুণ! তোমাদের সেবা ত আমার চাকরী নয়!

পিতা। তা যদি কর্‌তে ইচ্ছা কর চল। যতদূর যত্নে তোমাকে রাখা সম্ভব, ততদূর যত্নে তোমাকে রাখিব। হুগলী সহরে অন্যান্য ব্রাহ্মণে যাহা পায়, তোমাকে তাহার দ্বিগুণ দিব।

খুড়া। সে কি অঘোরদা'! তোমার ঘরে রাঁধিব, তাহাতে মাহিনা লইব! মূর্খ বলিয়া কি আমি এতই হীন হইয়াছি!

পিতা। তা' লইতেই হইবে। তুমি একা হইলে কথা স্বতন্ত্র ছিল। তা' নয় তুমি সংসারী। তোমার মা আছে, স্ত্রীপুত্র আছে। সংসার স্বচ্ছন্দে চলে না বলিয়া তোমার মা আমাদের সঙ্গে পাঠাইতেছেন। আমরাই কি এত হীন যে, তোমাকে শুধু শুধু খাটাইব?

খুড়া। বেশ, তবে যা ইচ্ছা হয় দিয়ো।

মাতা। তোমার না লইতে ইচ্ছা থাকে, আমরা তোমার মার নামে তোমার বেতন মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব।

খুড়া। হাঁ, তাই দিয়ো; আমি আর চাকরীর টাকা হাতে করিব না।

পিতা। আর এক কথা। তুমি সেখানে বউঠাকরুণ বলিয়া ডাকিতে পারিবে না।

খুড়া। তবে কি বলিব?

পিতা। 'মা' বলিবে।

খুড়া। তা উনি ত মা! 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা জ্যেষ্ঠা-ভার্য্যা সম মাতা।' বড় ভাই যখন বাপের তুল্য, তখন বড় ভাজ মা নয় ত কি?

সংস্কৃত শ্লোক গণেশখুড়ার মুখ হইতে নির্গত হইতে শুনিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ ভাই, এইবার ঠিক বলিয়াছ।"

মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আর ইঁহারও নাম ধরিতে পাইবে না।"

"বেশ, শুধু দাদা বলিব।"

"না—তাও বলিতে পাইবে না।"

"তবে কি বাবা বলিব!"

"তা কেন? হয় হুজুর আর তা বলিতে যদি না পার, শুধু 'বাবু' বলিবে।

"বাবু, হুজুর, কি দাদার চেয়ে বেশী মানের কথা হইল?"

"হোক, না হোক, তোমাকে বলিতে হইবে।"

"আর হরিহরকে?"

"খোকাবাবু বলিবে। নাম তুমি কাহারও ধরিতে পাইবে না।"

"কেন, ওরা কি সব আমার ভাসুর যে, নাম ধরিতে পাইব না।"

"তামাসা রাখ। যা বলিলাম করিতে পারিবে?"

"চাকরী করিতে গেলেই কি এইরূপ করিতে হয়।"

"স্থানবিশেষে করিতে হয়। উনি ত আর যে সে লোক ন'ন। উনি হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। উঁহার সঙ্গে তোমার যে কোন সম্বন্ধ আছে, একথাও কেহ জানিবে না। জানিলে মানে খাট হইতে হইবে।"

গণেশখুড়া এই স্থানে কথা বন্ধ করিয়া শুধু সানুনাসিক সুরে গানের ভাঁজ করিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন—"ঠাকুরপো, পারিবে ত?"

"আর ঠাকুরপো কেন মালক্ষ্মী! সম্পর্কটা এই এইখান থেকে শেষ করিলেই ভাল হয়।"

"পারিবে না?"

"কস্মিন্‌ কালেও না।"

এই বলিয়াই খুড়া তাহার তলপীটি মাথায় লইয়া ঝপাও করিয়া জলে পড়িল। সেখানে জল তাহার এক বুক হইবে। গণেশ হাঁটিয়া খালের পাড়ের উপর উঠিল। পিতা বলিলেন—"গণেশ! পাঁচটা টাকা সঙ্গে লইয়া যাও।"

খুড়া উত্তর করিল না—মুখও ফিরাইল না। "তারা কোন অপরাধে" গাহিতে গাহিতে খালের ধার ধরিয়া চলিয়া গেল।

(১৭)

এইবারে হুগলীতে আসিয়াছি। এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা সহর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।

বিপুলপ্রবাহিণী ভাগীরথীর বুকে প্রায় একটা পুরাদিন অবস্থিতি করিয়াছি। বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তনশীল গ্রামের বালক একেবারে পরিবর্ত্তনের পর পারবর্ত্তন দেখিয়াছে। কূপ-মণ্ডূক ঘুম হইতে উঠিয়া একবারে সাগরে পড়িয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহার নাসিকারন্ধ্র আক্রমণ করিয়াছে, তথাপি সে সাগরের বিশালতার মধুরতা ভুলিতে পারিতেছে না।

হুগলী কলিকাতার মত সহর নয়, তথাপি সে আমাদের গ্রামের তুলনায় বড় সহর। তাহার উপর কলিকাতারই মত ভাগীরথী তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমি এত বড় নদী পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। যেখানে আমাদের বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছিল, সে স্থানটা হাকিম-দিগেরই বাসপল্লী। তাহার কিছু দূরে বড় বড় উকীলেরা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। হাকিমপাড়া ও উকীলপাড়া একরূপ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। সুতরাং সেস্থানটা একরূপ পাকা সহরেরই মত দেখাইত। অদূরে কাছারী, কাছারীর সন্নিকটেই ভাগীরথী। মধ্যে একটি সুসংস্কৃত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে ঝাউগাছের সারি। আমি বহুকালান্তর হইতে কথা কহিতেছি। সুতরাং স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু বিভ্রম হইতে পারে। সহৃদয় পাঠক বর্ণনার ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

আমার মত রুগ্ন পল্লীবাসী বালকের পক্ষে এইরূপ সহরই যথেষ্ট। আমি নূতন মানুষ হইতে নূতন দেশে আসিলাম। পর্ণকুটীরবাসী ব্রাহ্মণপুত্র প্রথমে সভয়ে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন ভয় ঘুচিল, তখন পৈতৃক খড়ের ঘরখানি অল্পে অল্পে মমতাবিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

সে দিন মনে পড়ে। মনে করিতে গেলে কতকগুলা অশ্রুবিন্দু আমার মনশ্চক্ষুকে আবৃত করিয়া ফেলে। তথাপি গৈরিকাঞ্চলে মুছিয়া মুছিয়া আমি তাহাকে যথা-সাধ্য পরিষ্কার রাখিয়াছি। কেন রাখিয়াছি? সে দৃশ্য পুনর্দ্দর্শনের সময় আসিয়াছে। মহাভারতে শুধু বাসুদেব-চরিত্র পড়িলে চলিবে না। ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরাদিকে শুধু দেখিলে দেখা সম্পূর্ণ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধনকে দেখিতে হইবে, শকুনি দুঃশাসনাদির সহিত পরিচয় করিতে হইবে। নতুবা মহাভারত-পাঠ সম্পূর্ণ হইবে না। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের মর্ম্ম বুঝিবে না। আর বুঝিবে না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট সদ্রৌপদী যাজ্ঞিক পঞ্চভ্রাতার মহাপ্রস্থান।

হুগলীতে আসিবার দুই চারি দিন পরেই পিতা আমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ইস্কুলে পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমার নূতন সঙ্গী জুটিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উকীলের ছেলে। দেশী হাকিমের পুত্রও যে ছিল না এরূপ নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। সকলেই এক ক্লাসে পড়িতাম না। দুই একজন উঁচু নীচু ক্লাসের ছাত্র লইয়া আমরা এক সঙ্গী হইলাম। তাহাদের ভাষাভাব আমার গ্রাম্য সঙ্গীগুলির ভাষা ও ভাব হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম প্রথম আমি সলজ্জভাবে তাহাদের সহিত মিশিতাম। ক্রমে দিনের পর দিন যখন আমার সঙ্কোচ-ভাব দূর হইয়া আসিল, এবং আমি সহরবাসে বিশেষ রূপে অভ্যস্ত হইলাম, তখন আমার সহচরগুলির মধ্যে আমিই প্রকৃত নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

মাতারও দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। আমার পিতামহীর শাসনে আমাদের পল্লীগৃহে মা যেরূপ ভাবে দিন যাপন করিতেন, হুগলীতে আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি সে ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিতার সপরিবারে আসিবার সংবাদ পাইয়া, আমাদের আসিবার দুই দিন পরেই হাকিম ও উকীল-মহিলারা মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। প্রথম দিন ব্রীড়ানম্র অবগুণ্ঠনবতী সঙ্কোচশীলা কুলবধূর সহিত তাঁহাদের প্রগল্‌ভ সম্ভাষণের সুবিধা হইল না।

মাসেক সময়ের মধ্যে মায়ের এই সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। একমাস পরে একদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি, মা হাস্য-পরিহাসে ও প্রগল্‌ভতায় অপর মহিলাদের সমকক্ষ হইয়াছেন। আরও দুই চারি দিন পরে, আমি যেমন বালকবৃন্দের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছি, রমণীমণ্ডলী মধ্যে তাঁহারও সেই রূপ লাভ হইল। মা স্বভাবতঃ অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। অল্পদিবসের মধ্যেই তিনি সহরের আদবকায়দায় সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন।

যাক্, এসব পরিবর্ত্তনের কথা আর কহিব না। পরি-বর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, পরদিবসের অবস্থার তুলনায় পূর্ব্বদিবস বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস,

বলিয়া লাভ নাই; বক্তারও নাই—শ্রোতারও নাই। যুবকবৃন্দ এ ইতিহাস শুনিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবে। আর সেই পরিবর্ত্তন-যুগের পরিবর্ত্তিত বৃদ্ধ কপোলকণ্ডূয়নে মৃদুহাস্যে পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালীজীবনের স্বপ্নকথা গাঢ়তর নিদ্রায় ঢাকিয়া দিবে।

বলিয়া ফল কি? নবীন শ্রোতা বুঝিবে না। অধিকন্তু গোঁড়া বামুনের বামনাই বলিয়া রহস্য করিবে। প্রবীণ বন্ধু বুঝিলেও, যদি ফিরিতে ইচ্ছা করে, ফিরিতে পারিবে না। খাঁটি দুগ্ধ অম্লস্পর্শে দধিতে পরিণত হইয়াছে। দুগ্ধ দধি হয়। দধি আর দুগ্ধ হয় না।

হুগলীতে এক বৎসর কাটিল। দৈনন্দিন পরিবর্ত্তনে এই এক বৎসরেই আমরা নূতন জীবে পরিণত হইয়াছি। এই এক বৎসরে পিতামহীর সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধই এক রূপ বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আমরা মাতা-পিতা-পুত্রে—তিন জনেই সে বৃদ্ধার মৃত্যুকামনা করিতেছি। কিন্তু সে দুষ্টা বৃদ্ধা কাকভুষুণ্ডির জীবন লইয়া বসিয়া আছে। কিছুতেই মরিতে চাহে না।

তাহার মরিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। কেননা পিতামাতা দেশে যে আর ফিরিবেন না, এটা স্থির হইয়া গিয়াছে। আমারও ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। নিম্ন-বঙ্গের, বিশেষতঃ আমাদের 'দক্ষিণ' দেশের পথগুলা বর্ষাকালে বড়ই দুর্গম হইয়া থাকে। কখনও কোন দিন গ্রামে ফিরিবার ইচ্ছা হইলে, আমার সে দুর্গম পথের কথা মনে পড়িত। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও যেন কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইত।

প্রথম মাসে পিতামহীর অভাব অনুভব করিয়া অনেক-বার দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তখন মায়ের কাছেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করিতাম। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কৃত হইতাম। শেষে তাঁহার কাছে পিতামহীর নাম তুলিলেই তিরস্কৃত হইতে হইত।

দ্বিতীয় মাসে অনভ্যাসবশে পিতামহীর কথা আর মায়ের কাছে উত্থাপন করি নাই। মনে ইচ্ছা জাগিলে মন দিয়াই তাহাকে আচ্ছাদিত করিতাম। তৃতীয় মাসে ইচ্ছা আপনা আপনি দমিত হইয়াছে। চতুর্থ মাসে তাঁহার স্মৃতি বড় ভাল লাগে নাই। এইরূপে মাসের পর মাস, পিতামহীর নিকট হইতে মন অল্পে অল্পে বহুদূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। বৎসরের শেষে শিক্ষার গুণে পিতামহীর উপরে আমার একরূপ শত্রু-ভাবই জাগিয়া উঠিল।

কেন এরূপ হইল, অল্পে অল্পে বলিব। কেননা বহু-কালের কথা—পরস্পরে অসংলগ্ন হইতে পারে। আমি তখন বালক। পারিবারিক সমস্ত রহস্য বুঝিতে আমার উপায় ছিল না। সমস্ত কথা শুনিতে অধিকার ছিল না। সুতরাং অনেকগুলা ঘটনার সূত্র আমাকে অনুমানে ধরিতে হইতেছে। অথবা অপরের মুখে শুনিয়া কারণ-নির্ণয় করিতে হইতেছে। পিতামহীর নামে পিতার যে সকল পত্র আমি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেও অনুমান করিয়াছি।

(১৮)

পিতার চাকরী হইবার পূর্ব্বে ঠানদিদির সঙ্গে কিছু-দিন মাতার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পিতামহী জানিবার পূর্ব্বেই মাতা এই চাকরীর সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। পিতা এ গূঢ় কথা মাতা ব্যতীত আর কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি হাকিমের গৃহিণী হইবার উপযোগিনী হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

মা আমার "অন্য-পূর্ব্বা" কন্যা। এরূপ কন্যার প্রায়শঃ মৌলিকের ঘরেই বিবাহ হয়। পিতামহ কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির আশায় পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইজন্য মাতার অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। আমার মাতামহ মুঙ্গেরে জেলার হাকিমের পেস্কারী করিতেন। দেশ হইতে অনেক দূরে থাকিতেন বলিয়া তিনি কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দিতে পারেন নাই। মাতার যে বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সে সময়ে তত অধিক বয়সে বিবাহ লোকের চক্ষে একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

জন্মাবধি কাছারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেন বলিয়া, হাকিমী সম্বন্ধে মাতার একটু আধটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার ফলে, তিনি হয়ত কোন একটি হাকিম-পত্নীকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছিলেন।

স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া বাবু অভিধানে সম্বোধন, কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত লোক সহ আলাপন, এবং রন্ধনাদি হিন্দুললনার অত্যাবশ্যক কার্য্যে পরনির্ভরতা এইরূপ কতকগুলি সদ্‌গুণ অবলম্বনে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। সেই

জন্য গোপনে তিনি ঠানদিদির সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠানদিদি আসিয়া মায়ের কবরীবন্ধনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা মাঝে মাঝে রন্ধন-কার্য্যটিও নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। মায়ের এইরূপ কার্য্যে ঠানদিদির যে বিশেষ অর্থসাহায্য হইত, তাহা নহে। তবে তাঁহার ভবিষ্যতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিল। সে কথা শুনিয়া ঠানদিদির আশা হইয়াছিল, এই সময়ে মাকে সাহায্য করিলে, তাঁহার পুত্র গণেশ ভবিষ্যতে একটা চাকরী পাইবেই। মাও বোধ হয় তাহার চাকরীর একটা আভাস দিয়াছিলেন।

পিতা ও মাতার কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম, গণেশ খুড়াকে আনিতে তাঁহাদের উভয়েরই ইচ্ছা ছিল না। পিতা তাহাকে বুদ্ধিহীন গণ্ডমূর্খ বলিয়া জানিতেন। সে এখানে আসিয়া কি চাকরী করিবে? অথবা আমাদেরই কি উপকারে আসিবে? বিশেষতঃ তাহাকে আনিলে আমাদের অনেকটা সম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দেশে সে আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়। আমার অতি দরিদ্র প্রপিতামহ শুদ্ধমাত্র কৌলীন্য সম্বল লইয়া পূর্ব্বে ইঁহাদিগেরই এক আত্মীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এবং বিবাহসূত্রে গণেশ খুড়ারই এক খুল্ল-বৃদ্ধ-পিতামহের ভূমিসম্পত্তিতে অধিকার পাইয়াছিলেন। সুতরাং খুড়া আমার পিতামহের মাতুলবংশীয়। তাহার আত্মীয়তা আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

এইজন্য পিতা তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে আনিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মাতা ও পিতা এবং আমি ছাড়া, শ্বশুরকুলের আর কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাহার ইচ্ছা নয়, আমাদের গ্রামের কুটুম্বদের মধ্যে কেহ তাহার এই নব-স্বাধীনতা-সুখলাভের অন্তরায় হয়।

পিতামহীর অস্তিত্বে মা দেশে গৃহিণীপণা করিতে পারেন নাই। পিতার উপার্জ্জনের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া ইচ্ছামত সে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে সমর্থ হন নাই। পিতামহী কখন পিতামহের উপার্জ্জনের টাকা হাতে পান নাই বটে, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে যে সমস্ত ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন, পিতামহ সেগুলি সুসম্পন্ন করিয়া দিতেন। সে সমস্ত কার্য্যে প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। গোবিন্দ ঠাকুরদা' পিতামহীকে এই সকল কার্য্যে প্ররোচিত করিতেন।

দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী—নানাজাতীয় সংক্রান্তি—এমন ব্রত নাই, যাহা পিতামহী গ্রহণ করেন নাই। এসকল ব্রতের কতকগুলা আমি দেখিয়াছি, কতকগুলার কথা শুনিয়াছি। তবে পিতামহীর মহা-সমারোহের জগদ্ধাত্রী পূজাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মূর্খজনোচিত অর্থের অসদ্ব্যয় মাতা অত্যন্ত মানসিক ক্লেশের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। জগদ্ধাত্রী-পূজার উদ্‌যাপনের বৎসরে সহস্রাধিক কাঙ্গালীকে অন্নদান করা হইয়াছিল। তাই দেখিয়া মায়ের এরূপ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি মুখ ফুটিয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন—"বুড়ী আর আমাদের খাইবার জন্য কিছু রাখিবে না দেখিতেছি।" পিতা বলিয়াছিলেন—"উপায় নাই। বুড়ী আর গোবিন্দখুড়া যতদিন না মরে, ততদিন অর্থের বিষম অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিব না।"

বুড়া মরিল না। উদ্‌যাপনের পর বৎসর বুড়ী মরিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর সকল ব্রতেরই একেবারে উদ্‌যাপন হইল।

সেই সমস্ত উৎসব-ব্যাপারে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক-গুলাই সাগ্রহে যোগদান করিত। এইজন্য মা আমাদের গ্রামের নামটার উপর পর্য্যন্ত চটিয়াছিলেন। অনেকবার নামের উদ্দেশে মৌখিক শতমুখী প্রহার করিয়াছিলেন। এমন কি, হুগলীর ঘোলঘাটে নৌকা হইতে নামিবার সময়ে, মায়ের চরণতলে যেখানে এক বিন্দু গ্রামের মাটি লুক্কায়িত ছিল অথবা ভক্তিবশে চরণ জড়াইয়াছিল, মা সে সমস্ত মৃত্তিকা জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা এক, বিধাতার ইচ্ছা আর; আমাদের গ্রামের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলে কি হইবে? বিধাতার ইচ্ছা নয়, গ্রাম আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তা হইলে ত আমি এই অপ্রীতিকর কাহিনীর বর্ণনার দায় হইতে রক্ষা পাইতাম। মা'ই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার প্রধান বাধা। কর্ম্মবিপাকে সেই মাকেই আবার বাধ্য হইয়া দেশের সঙ্গে হুগলীর সম্বন্ধের ঘটকালী করিতে হইল।

আমরা হুগলীতে আসিবার পূর্ব্বেই পিতা তাঁহার পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া এই বাসাই মনোনীত করিয়াছিলেন। বাসাটি আজিকালিকার বাংলার ধরণে প্রায়

বিঘে তিনেক জমীর মধ্যস্থলে একেবারে পরস্পর-সংলগ্ন কতকগুলা ঘর। বাংলার আকৃতি সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, প্রায় সেইরূপ। ইহাকে নূতন করিয়া বর্ণনা করিবার কিছু নাই। দেখিতে সুদৃশ্য বটে। ফ্লোরের উপর বাড়ী। একতালা হইলেও দোতালার কার্য্য করিয়া থাকে। কেন না, ফ্লোরটা এত উঁচু যে, তাহার তলে ভৃত্যাদি সুশৃঙ্খলে বাস করিতে পারে।

সুদৃশ্য হইলেও বাড়ীটি কিন্তু তখনকার হিন্দু-গৃহস্থের বাসের পক্ষে সেরূপ সুবিধার ছিল না। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফুলের বাগান। পশ্চাতে কিছু দূরে রান্নাঘর। রান্নাঘর কেন—বাবুর্চিখানা।

পূর্ব্বে কোন সাহেব ইঞ্জিনীয়র বাংলাখানা নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমস্ত জমীটা ঈষদুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ফুলবাগানের পশ্চাৎ হইতে প্রাচীর-গাত্র পর্য্যন্ত কতকগুলা আমকাঁঠালের গাছ। গাছগুলা ঘন-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে।

ইঞ্জিনীয়র সাহেব এরূপভাবে গাছগুলি রোপণ করেন নাই। তিনি যখন কর্ম্মাবসরে পেন্‌সন্ লইয়া বিলাত চলিয়া যান, তখন বাংলাটি জনৈক উকীলকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উকীল মহাশয় জিনিষের অপব্যয় দেখাটা বড় পছন্দ করিতেন না। বাড়ীর মধ্যে এতটা মৃত্তিকা অকর্ম্মণ্য থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহাতে আম কাঁঠাল লীচুর চারা যেখানে যেরূপ সুবিধা বুঝিয়াছিলেন, রোপণ করিয়াছিলেন। গাছগুলা শৈশবাবস্থায় পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। এখন বড় হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন—আলিঙ্গন বলি কেন—আক্রমণ করিয়াছে। তাহাতে গাছগুলার ক্ষতি হউক না হউক, স্থানটা জঙ্গলের ভাব ধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ যেখানে রান্নাঘর, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগটা একেবারে অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল।

এইজন্য এখানে বাসের সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধুনী-বিভ্রাট ঘটিল। ব্রাহ্মণ আসে আর চলিয়া যায়। কেহ সাহেবের বাড়ী ছিল বলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই চাহে না! কেহ বা দুইদিন কাজ করিয়াই ঘরের নির্জ্জনতায় ভীত হইয়া প্রস্থান করে। শেষে লোক খুঁজিতে খুঁজিতে পিতার আরদালীর প্রাণ যায় যায় হইল।

এস্থলে বলিয়া রাখি, পিতার আসিবার পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইজন ফিরিঙ্গী ডেপুটী ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া সপরিবারে এখানে বাস করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থান-চিহ্ন বাড়ীর ভিতরের সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই। যে স্থানটায় তাহাদের মুরগী-পেরুগুলা থাকিত, সে স্থানগুলা আমাদের আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত ছিল। তখনও পর্য্যন্ত বামুনগুলা একেবারে বামনাই ছাড়িতে পারে নাই। অথবা অন্য জাতি গলায় পৈতা বামুন সাজিয়া রাঁধুনীবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।

এই সকল কারণে এখানে বাসের কিছুদিন পরে পিতা বাসস্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ীখানা মায়ের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। তাহার উপর যে সকল মহিলা মাঝে মাঝে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এক বাক্যে বাড়ীখানির প্রশংসা করিতেন। যে ভাড়ায় ইহা পাওয়া গিয়াছিল, অন্যত্র সেরূপ ভাড়ায় সেরূপ বাটী মিলা দুর্ঘট। এই সকল কারণে আমাদের আর বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করা হইল না।

তথাপি মা গণেশখুড়াকে আনিবার ইচ্ছা করিলেন না। তিনি আমার মাতামহকে পত্র লিখিলেন। মাতামহ উত্তর লিখিলেন, তিনি দেশে আসিয়া রাঁধুনীর অভাবে বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। দেশে আসিবার পর হইতেই আমার মাতামহীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। নিত্যই তাঁহার মাথা ঘুরে। পশ্চিম অথবা উঁড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবারও উপায় নাই। তাহা হইলে জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই তাঁহার গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। অথচ ঈর্ষান্বিত জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে কেহ এক দিনও আসিয়া তাঁহার রুগ্ন পরিবারকে দুইমুঠা অন্ন রাঁধিয়া দিবে না। অনেক দিন মাতামহকে নিজে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইয়াছে। মাতামহী একটু সুস্থ হইলেই মুঙ্গেরেই ফিরিবার ব্যবস্থা করিবেন।

অগত্যা গণেশখুড়ার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর রহিল না। গণেশখুড়াকে পাঠাইবার জন্য পিতা পিতামহীকে পত্র লিখিলেন। হুগলীতে আসার পরেই পিতা তাঁহাকে পৌছান সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি নিজ হাতে লিখেন নাই। আমাকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। শেষে নিজের নামটা দস্তখত করিয়াছিলেন এইমাত্র। এবারে স্বহস্তে তিনি পত্র লিখিয়াছেন।

'পিতা কি লিখিয়াছেন জানি না, তবে আমরা সকলেই সপ্তাহ যাবৎ পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আরদালী যে বামুনটাকে আনিয়া দিয়াছিল,সেটা সাহসী ও নিরভিমান হইলেও তাহার রাঁন্না আমাদের কাহারও পছন্দ হইল না। বিশেষতঃ মায়ের। তিনি ত তাহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন মুখেই তুলিতে পারিলেন না। মাতা একদিন রন্ধন সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনিবার পর তাহার রন্ধন মাধুর্য্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়া পড়িল। সেই 'অতি' উল্লাসে আত্মহারা হইয়া মা বড় একটা রুই মাছের মুড়াযুক্ত ঝোলের বাটি পুরস্কার-স্বরূপ বামুনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বামুন পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া পলাইল।

ইহার পর নিরুপায়ে মাকে দুই দিন রাঁধিতে হইয়াছে, রাঁধিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়াছে! বাবার চিঠি লিখিবার সপ্তম দিবস সন্ধ্যার পর আমরা দোকান হইতে খাবার আনাইয়া ভক্ষণ করিতেছি, এমন সময় বাহিরে ফটকের কাছে কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমাদের পরিচারকবর্গের মধ্যে এক চাকর, এক ঝি এবং কোম্পানীদত্ত এক আরদালী। বাড়ীখানার উদ্বাস্ত বড় বলিয়া আরও দুই চারিজন লোক বেশি থাকা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু পিতার তখনও পর্য্যন্ত দুই শত টাকার অধিক বেতন ছিল না বলিয়া অধিক লোক রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি দুইটা বিলাতী কুকুর পুষিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেগুলা রাত্রিকালে প্রহরীর কার্য্য করিত।

সেদিন সে সময়ে ভৃত্য ও আরদালী কেহই বাড়ীতে ছিল না। তাহারা রাঁধুনীর অন্বেষণে সহরের মধ্যে গিয়াছিল।

কুকুর দুইটা আকারে ছোট ছিল। কিন্তু তাহাদের চীৎকার তাহাদের আকৃতির অসংখ্যগুণ অধিক ছিল। তাহাদের চীৎকারে অনেকদিন আমি মধ্যরাত্রিতে ঘুম হইতে শিহরিয়া উঠিয়াছি। আজ তাহারা ফটকের কাছে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অবকাশে উকীল-মোক্তার প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রায়ই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কুকুর-গুলা ভদ্রলোক চিনিত। তাহারা ফটক পার হইয়া আসিলে চীৎকার করিত না।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ। হয় দ্বিতীয়া—না হয় তৃতীয়া। কিছু-ক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিবে বলিয়া আমরা ফটকে আলোক দিই নাই। কুকুরের অস্বাভাবিক চীৎকার শুনিয়া, এবং নীচে কেহ নাই জানিয়া, আমরা মনে করিলাম, বুঝি বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে।

মা পিতাকে বলিলেন—"কুকুরগুলা এত চেঁচায় কেন দেখিয়া আইস।"

"বুঝি চোর বাড়ীতে ঢুকিয়াছে।"

"সে কিগো! তুমি হাকিম—তোমার বাড়ীতে চোর!"

"চোর ঢুকিবার কারণ হইয়াছে। আমি আজ কয়দিন ধরিয়া চোরগুলার কঠিন কঠিন শাস্তি দিতেছি। বিশেষতঃ আজ একটা দাগী ছিঁচকে চোরকে পাকা ছয়টি মাস জেল দিয়াছি। আমার শাস্তি দিবার ধুম দেখিয়া সাহেব এই ছয়মাসের মধ্যেই আমাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই জন্য চোর বেটাদের আমার উপর আক্রোশ হইয়াছে।"

মাতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো! তবে কি হবে?"

মাতার ভয় দেখিয়া আমিও ভয়কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।

পিতা বিশেষ রকমের একটা আশ্বাস দিতে পারিলেন না। বলিলেন—"তাইত! চাকর-আরদালী কেহই যে বাড়ীতে নাই!"

এমন সময় ঝি ভিতরের বারাণ্ডা হইতে "বাবু! বাবু!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা মধ্যের হলঘরে বসিয়াছিলাম। ব্যাপারটা কি জানিতে তখন পিতা অথবা মাতা কাহারও সাহস হইল না। তাঁহারা আমাকে ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একেবারে পার্শ্বের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝিও আমাদের অনুসরণ করিল।

পিতা তাহাকে ব্যস্তভাবে হলঘরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

সে বলিল—"বন্ধ করিতে হয় তোমরা কর। ঝি বলিয়া কি আমার প্রাণ প্রাণ নয়? কতকগুলা লোক দুড় দুড় করিয়া বাহির হইতে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র মাতা ভয়ে পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দারুণ

ভীতিবশে পিতারও বসন অর্দ্ধস্রস্ত হইয়া গেল। এমন সময় বাহিরে শব্দ উঠিল, "চোর—চোর।" পিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কেবল আরদালীকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ঘরে চোর-দস্যুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অস্ত্র একটি পিস্তল ছিল। কিন্তু ভীতিবিহ্বল পিতা তাহা আর হাতে করিবার সময় পাইলেন না। চোর চোর শব্দ শুনিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি ঝিটা যদি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

সত্যসত্যই যদি সে দিন প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন দস্যু আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিত,তাহা হইলে তাহারা অক্লেশে গলাটিপিয়া আমাদিগকে মারিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশে সে দিন আমাদের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে নাই। ঝি দরজা বন্ধ করিতে না করিতে বাহির হইতে আরদালী ডাকিল—"হুজুর!"

পিতা ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"চোরের কি হইল?"

আরদালী বলিল—"তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

তখন পিতা কাপড়খানা গুছাইয়া পরিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঝি দরজা খুলিল। মাতা চোর অথবা আরদালী কাহাকেও না দেখিয়াই, চোর ধরিবার বিলম্বের জন্য আরদালীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

পিতা ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমে চোরের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া আমার কিন্তু যথেষ্ট সাহস হইয়াছে। আমি একেবারে একলম্ফে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আরদালী, চাকর ও দুই তিনজন বাহিরের লোক চোরকে ধরিয়াছিল। পিতা চোরটা সুচারুরূপে ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা চোরকে ভিতর দিক হইতে আনিয়াছিল। ভিতরের বারান্দায় আলোর বেশি জোর ছিল না। এই জন্য ঘর হইতে চোরের মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। আমিও পিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি।

চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, ঝিও পার্শ্বের কামরা হইতে হলঘরে আসিয়াছে। মা কিন্তু এখনও বাহির হন নাই। দ্বারের পার্শ্বেই হলঘরের কোণে বাবার ছড়ি থাকিত। চোরকে প্রহার করিবার সঙ্কল্পে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই ছড়ি হাতে করিলেন।

চোরকে একটু মিষ্ট আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া যেমন তিনি ছড়িগাছটি উঠাইয়াছেন, অমনি চোর "অঘোর দা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সমস্ত রহস্য তখন প্রকাশিত হইল। চোর এই বারে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দোহাই দাদা, আমাকে মেরো না। আমি গণেশের মার গণেশ।"

জার্ম্মানির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণতরী—দ্রুচার
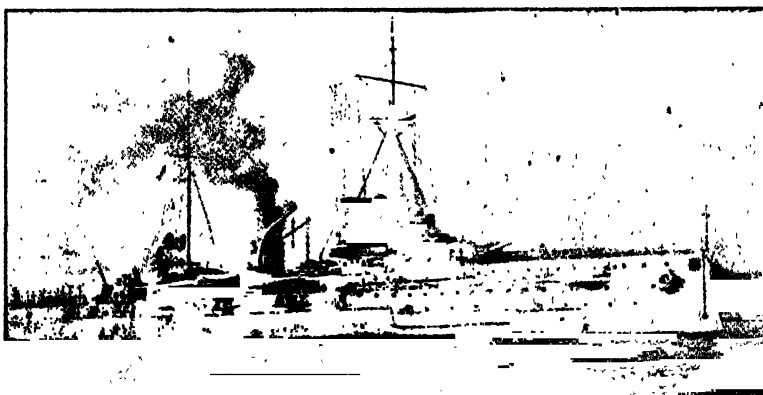
অতিথির আবেদন

[শেখ ফজলল করিম]

ওগো !

খোল গো—খোল তোরণ-দ্বার,
দিওনা আশা দলি',
(শুধু) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

একটু স্নিগ্ধ সমবেদনায়—
বরষ' শান্তি ব্যাকুল হিয়ায়,
আর্ত্ত পথিক দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
যেয়ো না তারে ছলি',
(শুধু) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

ব্যগ্র পরাণে অসহ বেদনা
—প্রকাশের নাহি ভাষা,
এসেছি আজি তোমারি দ্বারে
যাপিতে তামসী নিশা।
তোমার হাসি, তোমার গান,
মৃতের দেহে আনিবে প্রাণ,
মরুভূ মাঝে ফুটায়ে দিবে
সুরভি ফুলকলি,
(ওগো !) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

শোকের বাজ পড়েছে কত—
ক্ষুদ্র বুকে মোর,
শ্রাবণ-ধারে ঝরেছে কত—
তপ্ত আঁখি-লোর !
তবু তো নাহি মরণ হয়
কি জানি যম কোথায় রয়,
সবারে দেখে, আমারেই শুধু
অবহেলে যায় ফেলি',
(ওগো !) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

বাগানে কত ফুটেছে ফুল
ভুবন-আলো-করা,
অন্ধ অলি আসিছে উড়ি',
গন্ধে মাতোয়ারা !
সবারি প্রাণের মিটিবে তিয়াষ
একেলা আমি কি ফিরিব নিরাশ
তুমিও আজি ক্লিষ্ট হৃদয়ে
অমৃত দাও ঢালি',
(ওগো !) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

অন্ধ নয়ন ঝলসি' দিও না
ধনের প্রভায় তব,
দগ্ধ হিয়ায় অমিয়-বিন্দু
ঢালিও চির নব !
তাতেই পাব অতুল সুখ,
ঘুচিবে খেদ, সকল দুঃখ,
ভগ্ন প্রাণ শান্তির বায়ে
ঘুমা'বে নিরিবিলি,
(শুধু) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

দীর্ঘ পথ—অন্তহীন
—জানি না কোথা শেষ,
ক্লান্ত পদ উঠে না আর,
সহিতে নারি ক্লেশ !
আশার আশে অতিথি আজ
এসেছে দ্বারে দেখিয়া সাঁজ,
কত যে দূরে যাইব আরো
জানি না, কেমনে বলি,
(ওগো !) একটি নিশার অতিথি যে আমি
প্রভাতে যাইব চলি' !

দুইখানি পুস্তক

পাষাণের কথা *

পাষাণ কথা কয়, কিন্তু শোনে কয় জন? জড় যে চির-পুরাতন হইয়া অতীতের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান; সে বলিলে অনেক কথা বলিতে পারে। বিশ্বে তাহারই প্রাধান্য; জীবজগতের সহিত তাহার সম্পর্ক নিত্য অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সে যদি কথা কয়, তাহার কি অন্ত কল্পনা করা সম্ভব?

কিন্তু সে অন্তহীন কথা ত আমরা শুনিতে চাই না। আমরা মানুষ; মানুষের সহিত তাহার যে কথাগুলি সংশ্লিষ্ট, তাহাতেই আমরা সাধারণতঃ কাণ দিই। পাষাণের কথায় যদি আমরা দেশের পুরাতন কাহিনী, সমাজ ও মানুষের বৃত্তান্ত শুনিতে পাই, তাহা হইলে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না কেন?

গ্রন্থকার পাষাণের কথা শুনিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের চিত্তও আকর্ষণ করিয়াছেন।

বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ছিল। তাহারই একখানা পাথর এই গ্রন্থে কথকের আসনে বসিয়া নিজের কাহিনী বলিতেছে। সমুদ্র-সৈকতে যখন সে একটি ক্ষুদ্র বালুকা-কণারূপে ঘূর্ণাবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত, সেই সময় হইতে বৌদ্ধস্তূপের অঙ্গীভূত হওয়া পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণের পর গ্রন্থকার ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৌদ্ধস্তূপ হইতে কোন্ সময়ে কি অবস্থায় পাষাণটি কলিকাতার চিত্রশালায় আসিয়াছিল, তাহার বর্ণনা প্রাঞ্জল ও মধুর।

গ্রন্থখানি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্যের সুমধুর সংমিশ্রণ। সামান্য বালুকাকণা কিরূপে বৌদ্ধস্তূপের অংশে পরিণত হইল, তাহার বর্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত। গ্রন্থকার একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সুকৌশলে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহাতে কবিত্বরস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সমস্ত গ্রন্থখানির ভিতর দিয়া একটি সরস ইতিহাসের ধারা বহিয়া গিয়াছে। সেকালের বৌদ্ধদের চিত্রটি বেশ সুস্পষ্ট; গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে বোধ হয়, যেন প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছি। তখনকার মনুষ্যজাতি, আচার-ব্যবহার, রাজসমৃদ্ধি ও সভ্যতার বর্ণনা ইতিহাস-সম্মত; কিন্তু লেখক স্থানবিশেষে কল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই—একটু রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র।

গ্রন্থের কাব্যাংশ মধুর. ভাষাটি সুসংযত—কোথাও লালিত্যের অভাব নাই। উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতার উদাহরণ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়—তবে তাহাতে কোথাও রসহানি হয় নাই।

'পাষাণের কথা,' নাম শুনিলেই মনে হয়, গ্রন্থখানাতে কেবল খোদিত লিপির কথাই আছে; সংস্কৃত বা পালি ভাষায় লিখিত সাধারণের দুর্ব্বোধ্য কথা ও তদনুরূপ জটিল ব্যাখ্যাই ইহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু গ্রন্থকার সে সব বিষয় মোটেই আলোচনা করেন নাই। খোদিত লিপি হইতে তিনি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শুধু তাহারই আলোচনায় গ্রন্থ পূর্ণ করেন নাই।

বিজ্ঞান বা ইতিহাসে কবিত্বের অবসর নাই। বৈজ্ঞানিক যখন যখন বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করিতে বসেন, তখন তিনি বাজে কথা কহিতে চান না। অনেকে তাঁহার কথা না শুনিতে পারেন,—তাঁহাতে বৈজ্ঞানিকের কিছুই আসে যায় না। কারণ তিনি জানেন—শিক্ষিত বা তত্ত্বান্বেষী তাঁহার কথা যতই নীরস হোক না কেন, শুনিবার জন্য লালায়িত হইবেই। ইতিহাস সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। বিজ্ঞান বা ইতিহাসে অধিক কবিত্বের প্রয়োগ করিলে তাহার মূল্য প্রকৃতই কমিয়া যায়।

কিন্তু সাহিত্যের সকলক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা চলে না। সাধারণকে যাহা বলিতে হইবে, তাহাকে চিত্তাকর্ষক করা চাই। "পাষাণের কথা" সাধারণের জন্য—ইহা বিজ্ঞান বা ইতিহাস নয়, কাব্যও নয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারত-ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রথমভাগ আর প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের গুরুস্থানীয় মনীষী যাহা করিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে তাহা একটা সনাতন প্রথার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের দ্বিতীয়ভাগ আছে, প্রথমভাগ নাই। ইংরাজী ভাষায় আমরা প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পাঠ করি। লিখিবার সময় বঙ্গভাষায় প্রথমভাগের আলোচনা করা মূর্খতা মনে করি। দ্বিতীয়ভাগ আলোচনা না করিলে যে পাণ্ডিত্যাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন নাই, তাঁহারা প্রথমভাগের কথা মোটেই জানেন না। কাজেই বঙ্গভাষায় লিখিত দ্বিতীয়ভাগ তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। আমরা বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ মাঝে মাঝে পাঠ করি, কিন্তু তাহাদের সোজা কথাগুলি কোথাও সহজ ভাষায় আলোচিত হইতে দেখি না।

তারপর, আমাদের দেশের সাহিত্যের অবস্থা আর এক দিয়া দেখিতে হইবে। দেশে এখন বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের আদর নাই। দরিদ্র বাঙ্গালী কর্ম্মের পেষণে এমনই ক্লান্ত, যে তাহারা এসব কঠিন বিষয়ের আলোচনা মোটেই পছন্দ করে না; যে সময়টুকু তাহারা অবসররূপে লাভ করে, তাহা কোন সরস বিষয়ের আলোচনায় অতিবাহিত করিতে চায়। কাজেই কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি সুবোধ্য রচনার পাঠক বাড়িয়া উঠিতেছে। কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ, যাহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহারও তেমন আদর নাই। বটতলার অপাঠ্য রচনার পাঠক যত বেশী, রবিবাবুর কবিতা ও ছোট গল্প বা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির পাঠক তত বেশী নয়।

এমন দিন আসিবে কোথা হইতে একটা আত্মার অনেক

---

* পাষাণের কথা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A. প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

পাঠকের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহারা সামান্য জ্ঞানে যে গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া অন্য গ্রন্থের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে না।—আলস্য আত্মশ্লাঘার ফল। অনেক পাঠকের মধ্যে এখন যে আলস্য ও জড়তা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অচিরে দূরীভূত না হইলে দেশের—মঙ্গল হইবে না।

রাখাল বাবুর এই গ্রন্থখানি সময়োপযোগী —আশা করি, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। যাঁহারা ইতিহাস পড়িতে চান, তাঁহারা বিফলমনোরথ হইবেন না; যাঁহারা ইতিহাস পড়িতে চান না, তাঁহাদের ইতিহাস পাঠে রুচি জন্মিবে। রাখালবাবু দেখাইয়াছেন —ইতিহাসেও কাব্যের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসও, উপন্যাসের মত, পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

এই গ্রন্থখানি কোথাও দুর্ব্বোধ্য নহে। যাঁহারা ইতিহাস জানেন না, বা অল্প জানেন, তাঁহাদেরও এ গ্রন্থখানি পাঠ করা আয়াসসাধ্য হইবে না।

গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। আশা করি, ইহা সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হইবে। বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে লেখক কোনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার সেজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। ভূমিকাটি সরস ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

রাখালবাবু 'পাষাণের কথা'য় শুধু ইতিহাস শিখাইতে চান নাই, ইতিহাস পড়িতে শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। "পাষাণের কথা" ঐতিহাসিক সাহিত্যে একটি নূতন জিনিস। আজকাল ইহার মূল্য অপরিমেয়।

আজকাল এইরূপ রচনার বিশেষ প্রয়োজন—পাঠকের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। এইরূপ সরস রচনা শুধু ঐতিহাসিক সাহিত্যে নয়, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সাহিত্যেও বিশেষ আবশ্যক।

রাখালবাবু ইতিহাসে সুপণ্ডিত। তিনি ইচ্ছা করিলে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ অনেক লিখিতে পারিতেন; তাহাতে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইত; কিন্তু দেশের পাঠকদের কাছে ইতিহাস সুপাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, রাখালবাবু নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিয়া, ইতিহাসেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

অনাথ বালক

শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি, এ,-প্রণীত

মূল্য একটাকা

আজ আমরা একখানি বইয়ের পরিচয় দিব। বইখানি নূতন প্রকাশিত হয় নাই,—পুরাতন; অনেক দিন পূর্ব্বে বইখানি প্রকাশিত এবং এই অনেক দিনের মধ্যে ইহার কেবল তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। যে বইয়ের ত্রিশটি সংস্করণ হওয়া উচিত ছিল, তাহার তিনটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছে! এই জন্যই এই পুরাতন বইখানির কথা উল্লেখ করিতেছি।

বলিয়াছি, বইখানি অনেক দিনের; বইখানি যিনি লিখিয়াছেন, তিনিও নবীন যুবক নহেন, তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক। লেখক বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, বিশেষভাবেই পরিচিত। কিন্তু তাঁহার যে বইখানির কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই তেমনভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে পরিচিত হয় নাই,—এতদিনের মধ্যে সবে তিনটি সংস্করণই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

বইখানির নাম 'অনাথ বালক'; এবং যিনি এই বইখানি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা অনেকেই চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের নাম জানেন; কিন্তু তিনি যে 'অনাথ বালক' নামক একখানি বই লিখিয়াছেন, তাহা হয় ত—হয় ত কেন, নিশ্চয়ই অনেকে জানেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাহার কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন, এই প্রশ্ন যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তিনি—শুধু তিনি কেন, সমস্ত বাঙ্গালীই একবাক্যে একজনের নাম করিবেন। তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু যেমন তেমন সমালোচক ছিলেন না—তিনি এখনকারমত দুই হাতে প্রশংসাপত্র ছড়াইতেন না—তাঁহার কাছে মেকি চলিবার যো ছিল না—তাঁহার কাছে সই-সুপারিস খাটিত না। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক, সেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই 'অনাথ বালক' পড়িয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "It is an exceedingly charming story, charmingly written. The style is one of the best of its kind in the language, chaste and pure, simple and elegant. The unpretending story is told with inimitabl grace and simplicity, and is in beautiful contrast to the rant and bombast and morbid sensationalism which disfigures Bengali literature at present. The pathos is genuine, and shows much power in that style of writing. The satire is often good, though rare. But the highest merit of the work lies perhaps in its pure and lofty morality. It strongly reminded me of the Vicar of Wakefield as a parallel, but the Bengali writer is perfectly original, and in no way indebted to his English predecessor."

এখন বাঙ্গালা দেশের পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এমন প্রশংসাপত্র পাইয়া বাঙ্গালা ভাষার আর কোন পুস্তক, কোন গল্পের বই বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল কি? এমন পরিচয়পত্র আর কোন লেখক কোন দিন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন কি?

সকলেই এখন অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীকার করিবেন, 'অনাথ বালকের এই পরিচয়ই যথেষ্ট। তবুও আর দুইখানি পরিচয়-পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

যে দুইজনের কথা বলিব, তাঁহাদের একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক পরলোগত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তিনি এই 'অনাথ বালকের' পরিচয় প্রসঙ্গের একস্থানে বলিয়াছেন—"Faith, earnestness and enthusiasm appear to be the qualities which have inspired the author throughout his little story One feels that the author has written from his heart, and one cannot therefore help being deeply impressed by his performance. The style of the book possesses all the artless simplicity of a genuine utterance."

তাহার পর যাঁহার নাম করিব, তিনি পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর। তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার লেখা সরল, বর্ণনা স্বভাবের অনুগামিনী, বিষয়বিন্যাস সর্ব্বতোভাবে সুনীতির পরিপোষক।"

ইহার পর আর 'অনাথ বালকের' পরিচয় দিতে হইবে না। এই তিন মহারথের কথা পড়িয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'অনাথ বালক' একখানি অতি উৎকৃষ্ট গল্পপুস্তক।

এখন কথা এই যে, 'অনাথ বালক' এমন সুন্দর বই, তাহার প্রশংসা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে ধরে নাই; কালীপ্রসন্ন মুক্তকণ্ঠে তাহার গুণগান করিয়া গিয়াছেন; তবুও বইখানি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত হইল না কেন? লোকে এই বইখানির আদর করিল না কেন? অনেকে এই বইখানির নাম জানে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে 'অনাথ বালকের' লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের কথা বলিতে হয়। চন্দ্রশেখর বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করেন, সুবিচারক ও সুশাসক বলিয়া রাজসরকারে এবং দশের কাছে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু তিনি নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে জানেন না;—তিনি বিজ্ঞাপন রূপ মহাস্ত্রের সন্ধান জানেন না—তিনি আপনাকে দশজনের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারেন না—তিনি দরবারে হাজির হইতে চাহেন না—জাহির হইতে চাহেন না।

এইবার 'অনাথ বালকের' গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। ফতেপুরে কালাচাঁদ ও গোরাচাঁদ মিত্র নামে দুই ভাই বাস করিতেন। কালাচাঁদটি দেশে নায়েবী করিতেন, গোরাচাঁদ বাড়ীতে থাকিত। নায়েব মহাশয় খুব খরচপত্র করিতেন, ক্রিয়াকাণ্ড, দানধ্যানে আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন। শেষে যাহা হয় তাহাই হইল, কালাচাঁদ একদিন মারা গেলেন; তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীও মারা গিয়াছিলেন। কালাচাঁদ মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার কন্যা মোক্ষদাকে এক বড় মানুষের বাড়ীতে বিবাহ দিয়াছিলেন; এখন তাঁহার পুত্র ইন্দুর ভার খুড়া গোরাচাঁদের ও খুড়ী জ্ঞানদার উপর পড়িল। গোরাচাঁদ দাদার ভাই ছিলেন, কখন চাকরী করেন নাই দাদার মৃত্যুর পর অভাবে পড়িয়া সাহেবের কুঠিতে চাকরী করিতে গেলেন কিন্তু সে চাকরী রাখিতে পারিলেন না; মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় চাকরী গেল। তখন ঘরে যা জিনিষপত্র ছিল, তাহাই একে একে বেচিয়া সংসার চলিতে লাগিল। তাহার কয়েকদিন পরেই কার্ব্বঙ্কল হইয়া গোরাচাঁদ মারা গেলেন। মিত্রবাড়ীতে রহিলেন, গোরাচাঁদের বিধবাপত্নী জ্ঞানদা ও কালাচাঁদের বালক-পুত্র ইন্দু। জ্ঞানদার ভাই খোঁজ লইয়াছিলেন কিন্তু জ্ঞানদা শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইন্দুর বড়মানুষ মামা বা ভগিনীপতি এই দুঃসময়ে খোঁজও লইলেন না

জ্ঞানদার সহায় রহিলেন—উপরে ভগবান, আর লোকালয়ে একজন প্রজা—রঘু। জ্ঞানদা এই দুইজনের উপর নির্ভর করিয়া বড় কষ্টে দেবরপুত্রকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ইন্দু একবার মামা-বাড়ীতে ও একবার ভগিনীপতির বাড়ীতে গিয়াছিল। সেখানে, সেই বড় মানুষের বাড়ীতে দরিদ্র কুটুম্বপুত্রের যে দুরবস্থা ও অবমাননা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল; সেসকল কথা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এ দিকে ইন্দুকে যে কত কষ্টে দূর গ্রামে যাইয়া পড়িতে হইত, তাহা শুনিলে চক্ষে জল আসে। এক ডাক্তার তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। জ্ঞানদার প্রধান সহায় ছিল রঘু। সেই রঘুকে গ্রামের কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোকে চক্রান্ত করিয়া যেখানে সরাইয়া দিল, সেখান হইতে সে আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার অপরাধ যে, সে ইন্দুর যে সামান্য জমি ছিল, তাহা ঐ ভদ্রলোকদিগের হস্তগত করিবার বাধা জন্মাইয়াছিল। রঘুর অভাবে জ্ঞানদার কষ্ট বাড়িল কিন্তু তিনি ভগবানকে আরও চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য গ্রামের লোকেরা একদিন এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ইন্দুকে লইয়া যাইল না, বলিল তাহার খুড়ীমা চরিত্রহীনা। জ্ঞানদা ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাও সহ্য করিলেন, তাহাতেও তিনি শ্বশুরের ভিটা ছাড়িলেন না। ইহার ফলে যাহা হয়, তাহাই হইল; অনাথ বালক ইন্দু লেখাপড়া শিখিল, পাশ করিল, বড় উকিল হইল। তখন আবার বাড়ীঘর লোকজন হইল, সুসময়ের আত্মীয়স্বজন আসিয়া জুটিল। ইহাই গল্পের কঙ্কাল। এই গল্পটিকে চন্দ্রশেখর বাবু যেমন করিয়া সাজাইতে হয়, তেমনই করিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের অনেক সময় সহরের বাহিরেই কাটিয়াছে, তিনি পল্লীভবনেই প্রতিপালিত; তাই আমাদের দেশের সামান্য পল্লীর চিত্র তাঁহার লেখনীতে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; আর তিনি এই মিত্র-পরিবারের করুণ-কাহিনী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল সুন্দর প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্যই 'অনাথ বালক' বইখানি এত ভাল লাগে। আর এই জন্যই এমন সুন্দর বইখানির তিনটি সংস্করণ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সকড়ি তত্ত্ব

[শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, M. A.]

প্রভাত বাবুর "প্রত্যাবর্ত্তন" সমালোচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব ছিল, আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি, অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব আমাদের দেশের অভিনব শ্রেণীর 'উঠন্ত' পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না; ও সকল সারতত্ত্ব ইঁহাদের নিকট ছারতত্ত্ব, যেহেতু Grapes are sour; ইঁহাদের উচ্চদৃষ্টিতে বারোয়ারিতত্ত্ব, শিখাধারণতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব এই সকল তত্ত্বই তত্ত্ব।" সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে এখনকার দিনে 'সকড়ি'-তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বাংলাদেশে 'সকড়ি' (অনেকে ইহাকে এঁটোও বলিয়া থাকে) বলিয়া পদার্থের একটি অবস্থা আছে। এই সকড়ির সংজ্ঞা (definition) ঠিক করা বড় শক্ত, তবে মোটামুটি এইরূপে ইহার উৎপত্তি:—চাউল সিদ্ধ হইলে 'সকড়ি'; তরকারি সিদ্ধ হইয়া লবণসংযুক্ত হইলে সকড়ি; জল, দুধ ইত্যাদি তরল বা জলীয় পদার্থে কোন রকম কিছু ভাজা জিনিষ দিলেই সকড়ি। আবার প্রত্যেক সকড়ি দ্রব্য অন্য জিনিষকে সকড়ি করিয়া দিতে সমর্থ; তাহার দুইটি উপায় আছে প্রথম—সোজাসুজি সংস্পর্শ (direct contact) দ্বিতীয়—পরোক্ষভাবে পরিচালন (through a conducting medium).

সকড়ির এই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু Exception proves the rule—ব্যতিক্রম না থাকিলে কোন নিয়মই সিদ্ধ হয় না—অতএব এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকা চাই;—

সাধারণ নিয়ম—চাউল সিদ্ধ হইলে সকড়ি;

ব্যতিক্রম—সিদ্ধ চাউল সকড়ি নহে।

এখন সাধারণ নিয়মের কথা ধরা যাউক। তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল জিনিষ অ-সকড়ি অবস্থায় জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে অবাধে স্বচ্ছন্দতার সহিত চলাফেরা করিতে পারে, তাহারা যেই সকড়ি হয়, অমনি তাহাদের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমান চাউল আনিলে হিন্দু তাহা খাইতে পারে; কিন্তু মুসলমানের ছোঁয়া ভাত হিন্দুর পক্ষে স্পর্শও নিষিদ্ধ। হিন্দুর মধ্যেও শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণ খাইবে না, ব্রাহ্মণের মধ্যে বারেন্দ্রের ভাত রাঢ়ীর অভক্ষ্য, এবং রাঢ়ীর মধ্যে বংশজস্পৃষ্ট অন্ন কুলীন ভোজন করিবে না।

চাউল সিদ্ধ হইলে সকড়ি। একটি পরিষ্কার পাত্রে কিছু চাউল ও জল আছে; তলায় উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল, এবং মনে করা যাউক, পাত্রটি একজন শূদ্র ছুঁইয়া আছে। যেই জল ফুটিয়া উঠিল, বোধ হয়, সেই সময় সব সকড়ি হইয়া গেল। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বোধ হয়—একটি অবস্থা আছে, যাহার একদিকে সকলেই ইহা অবাধে খাইতে ছুঁইতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই অবস্থাটি পার হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অতি ভয়াবহ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, খাইলেই একেবারে জাতিনাশ। সেই 'critical temperature' যাহার একদিকে welcome (স্বাগতম্) এবং অপর দিকে don't touch লেবেল লটকান আছে, চাউলের জীবন-ইতিহাসের সেই ভীষণ সন্ধিস্থলে ইহার physical এবং pysiological পরিবর্ত্তন কিরূপ হয়, তাহা না হয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মীমাংসা করিবেন, কিন্তু শারীর-তত্ত্ববিৎ কোন্ মনীষী বলিয়া দিবেন যে, সেই ভীষণ মুহূর্ত্ত পার হইলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দেহে ইহা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাজ করে!

লবণ-সংযুক্ত সিদ্ধ তরকারি সকড়ি। চাউলের ন্যায় তরকারিরও সিদ্ধ হইবার একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্ত আছে, না হয় ধরা গেল; কিন্তু পরিমাণে কতটুকু লবণ দিলে সিদ্ধ তরকারি সকড়ি হইবে? পৃথক্‌রূপে লবণ না দিয়া নদীর লবণাক্ত জলে সিদ্ধ করিলেও কি তরকারি সকড়ি হইবে? আর ইহা যদি সত্য হয় যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে শাক-সবজি মাত্রেই লবণ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে

তরকারিকে সকড়ির কবল হইতে পরিত্রাণ করিবার আর উপায় নাই।

জলীয় পদার্থে ভাজা জিনিষ দিলেই সকড়ি হয়। খেজুর-রসে খৈ দিলে সকড়ি হয়, খেজুর-গুড়ে খৈ দিলে সকড়ি হয় না—মুড়কি হয়। রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে; এখন, Temperature কত Degree হইলে বা Specific gravity কত হইলে, খৈ দিলে সকড়ি হয় না?

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে—নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তনে পদার্থ সকড়িতে পরিণত হয়। এইবার—সকড়ি কিরূপ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, দেখা যাউক। বিদ্যুৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে যেমন কতকগুলি বস্তু সম্পূর্ণ অনুকূল, আবার কতকগুলি একান্ত প্রতিকূল, সকড়ি সম্বন্ধেও সেইরূপ পদার্থকে conductor ও non-conductor, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক হিন্দুসমাজে প্রচলিত—অন্যান্য তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বেরও বিশেষত্ব এই যে, সামঞ্জস্য বলিয়া ইহাতে কিছু পাওয়া যাইবে না।

সকড়ি থালার তলা হইতে যে জল গড়াইয়া আসিতেছে, সেই জল যাহাতে ঠেকিবে, তাহাই সকড়ি হইয়া যাইবে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকড়ি জলের মধ্য দিয়া যায়—জল conductor of সকড়ি। সকড়ি হাঁড়িতে যখন জল ঢালা হয়, তখন জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলা হয় না। একটি বিচ্ছেদহীন জলধারা জলাধারকে হাঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু এখানে জল non-conductor-রূপ কার্য্য করিয়া জলভাণ্ডকে সকড়ি হইতে রক্ষা করে।

শরীর non-conductor; হাতে করিয়া ভাত খাইলে শরীরের অন্যস্থান সকড়ি হয় না; কিন্তু এই শরীরই আবার বিকল্পে conductor হইয়া দাঁড়ায়,—যথা নিরামিষ হাঁড়ি লইয়া যাইতে যাইতে আমিষ সকড়ি মাড়াইলে আমিষ সকড়ি শরীরের মধ্য দিয়া গিয়া হাঁড়িকে আক্রমণ করে,—হাঁড়ির নিরামিষত্ব তখনই ঘুচিয়া যায়।

ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড সকড়ি হয়—বৃহৎ নৌকা হয় না; এখানে টীকা এই, বৃহৎ বস্তুতে কোন দোষ স্পর্শে না; কিন্তু এই বৃহৎ কথাটির—ভাষ্য কৈ?

এ সকড়ি বাংলা দেশে কে আনিল? 'যে' বিধান শ্রুতিতে নাই স্মৃতিতে নাই—তাহা শুধু পদী পিসীরই বিধান না তাহার ভিত্তি আর কোথায়ও আছে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণা করুন।

কোরবানী-কাহিনী

[মোজাম্মেল হক]

কোরবানী মুসলমান জগতের একটি প্রধান ধর্ম্ম-ক্রিয়া। এই ক্রিয়া লইয়া কয়েক বৎসর হইতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে কিরূপ ভয়ানক অনর্থোৎপত্তি হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু কোন্ সূত্র হইতে যে, এই ইস্লামিক ধর্ম্মানুষ্ঠানটির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন। তজ্জন্য এস্থলে সংক্ষেপে সে কাহিনী বিবৃত হইল।

অনেক দিনের কথা—ইস্লাম ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের জন্মগ্রহণের আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাত্মা হজরত ইব্রাহিম একদা নিশীথ-কালে স্বপ্নযোগে দৈবাদেশ পাইলেন,—"ইব্রাহিম! আমার সন্তোষবিধানার্থ কোরবানী কর।" স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল. ইব্রাহিম জাগ্রৎ হইলেন। তিনি দৈবাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং প্রভাতেই তাহা সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া চিন্তিতচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশাবসান হইল, তখন ইব্রাহিম অবিলম্বে প্রাভাতিক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া, প্রফুল্লমনে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশে একশত উট কোরবানী করিলেন।

উষ্ট্র উৎসৃষ্ট হইল। দৈবাদেশ পালন করিলেন ভাবিয়া ভক্ত ইব্রাহিমের আর চিন্তা রহিল না। তিনি নিরুদ্বেগে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রভাত ক্রমে মধ্যাহ্নে,—মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে পরিণত হইল। দিনমণি অস্তাচল-গত হইলেন। রজনীর অন্ধকার ধরণী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জীবগণ সুকোমল নিদ্রার কোলে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। তাপস ইব্রাহিমও যথাকালে বিশ্বপাতার নামোচ্চারণ করিয়া শয়ন করিলেন। গভীর রজনীতে আবার সেই স্বপ্ন!—সেই প্রত্যাদেশ!—"ইব্রাহিম, কোরবানী কর।" সাধুবর চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তব

ও ভাবনায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল,—হৃদয় নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল! তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দৈবাদেশ-পালনে ত্রুটি ঘটিয়াছে—কোরবানী গৃহীত হয় নাই। তিনি সেই ত্রুটির সেই অপরাধের ক্ষালন-মানসে প্রভাতে উঠিয়া অপার ভক্তিভরে করুণ প্রার্থনার সহিত আবার যথাশাস্ত্র শত উট কোরবানী করিলেন।

দ্বিতীয়বার উট কোরবানী করিয়া পয়গম্বর ইব্রাহিম ভাবিলেন, হয় তো এবার তাঁহার প্রার্থনা দয়াময় বিধাতা শ্রবণ করিয়াছেন, কোরবানী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তৃতীয় রজনীতেও তিনি নিদ্রাভিভূত হইবামাত্র আবার সেই প্রত্যাদেশ! তখন নিদ্রিত অবস্থাতেই ভয়বিহ্বল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু! হে আমার সর্ব্বজ্ঞ বিধাতঃ! তুমি এ অধম দাসের কার্য্য, প্রাণ, মন ও হৃদয়ভাব সকলই দেখিতেছ, সকলই বুঝিতেছ। কিন্তু অজ্ঞান আমি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, আমি কি করিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।" এই করুণ প্রার্থনায় তখনই স্বপ্নাদেশ হইল, "ইব্রাহিম! তুমি এ মরজগতে আমা অপেক্ষা যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাস, যাহার প্রফুল্ল মুখকমল দেখিলে তোমার স্নেহের সাগর উথলিয়া উঠে, হৃদয়ে আনন্দস্রোত সহস্রধারে বহিয়া যায়, যাহার মধুমাখা বাক্য শুনিলে তোমার প্রাণ জুড়ায়, তুমি তোমার সেই প্রিয়তম পুত্রকে আমার উদ্দেশে কোরবানী কর।"

কি অদ্ভুত স্বপ্ন! কি অপূর্ব্ব প্রত্যাদেশ!! কেহ জীবনে এরূপ রহস্যময় ভীষণ স্বপ্ন তো কখন দেখে না। ইব্রাহিম জাগ্রত হইলেন। প্রতিবেশী জনগণ জাগিল, সকলেই আপনাপন কর্ত্তব্যসাধনে ব্যস্ত হইল; কিন্তু সাধুবর ইব্রাহিম আজ অন্যমনস্ক। তিনি বিস্মিত—ভীত ও চমকিত। সতত স্বপ্নের কথা তাঁহার অন্তরে জাগিতেছে, কিন্তু কাহারও নিকটে সে কথা ব্যক্ত করিতেছেন না। ভাবিতেছেন, "প্রিয়তম পুত্রকে স্বহস্তে নিধন, কি নিষ্ঠুর আদেশ! কিন্তু এ প্রভুর আদেশ! বিধাতার অনুজ্ঞা! ইহা তো লঙ্ঘন করিবার নহে। এ আদেশ তো এক তিল এদিক ওদিক হইবার নহে। অতএব কিসের পুত্র-স্নেহ! কিসের মায়া-মমতা! আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন, আজই এ আদেশ প্রতিপালন করিব। হায়, আজ যদি আমার শত পুত্র থাকিত, তবে তাহাও প্রভুর নামে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করিতাম।" ধর্ম্মবীর ইব্রাহিম এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যসাধন জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিল, তাঁহার প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে কি যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

ধর্ম্মাত্মা ইব্রাহিম প্রতিদিন কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য পুত্রের সহিত জঙ্গলে গমন করিতেন। আজও অভ্যাসমত চলিলেন। কিন্তু আজ বাড়ার ভাগ সঙ্গে একখানি শাণিত ছুরি; পিতা অগ্রে, পুত্র পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। পাপমতি শয়তান সকল সময়েই সৎকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সময় বুঝিয়া হজরত ইব্রাহিমের সমীপবর্ত্তী হইল এবং আত্মীয়তা দেখাইয়া কত কৌশলে কুহক-জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রবধ করিয়া কোরবানী করিতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না; মহামতি ইব্রাহিম "দূর হ দুরাচার" বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

দুরাত্মা শয়তান পিতার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া স্বীয় ভাবে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, এস্মাইল শিশু, তাহাকে সহজেই ভুলাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে। তাই সে মহানন্দে হজরত এস্মাইলকে কহিল, "বালক! তুমি কোথায় যাইতেছ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি পিতার সহিত কাষ্ঠ আনিতে যাইতেছি। আমরা রোজ রোজ কাষ্ঠ লইয়া আসি।" ইহা শুনিয়া শয়তান স্নেহ-কোমল বাক্যে কহিল, "বালক! আজ এ গমন কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য নহে। তোমার পিতা তোমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া লইয়া যাইতেছেন। শাণিত ছুরি দেখিতে পাইতেছ না কি?" শুদ্ধমতি এস্মাইল ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলিতেছ, পিতা কি কখন পুত্রকে হত্যা করিতে পারেন? তিনি আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, স্নেহ করেন। আমাকে চক্ষের আড়াল করেন না। জগতে কোন পিতা আপন পুত্রকে মারিয়াছে, শুনি নাই। আমি তোমার এ অন্যায় কথায় বিশ্বাস করি না।" তখন শয়তান আসিয়া বলিল, "বালক! তোমার অন্তর নির্ম্মল ও সরল। তাই তুমি

সরল কথাই বলিতেছ। কিন্তু তুমি জান না, তোমার পিতা কি আপন ইচ্ছায় তোমাকে বধ করিতে লইয়া যাইতেছেন? খোদার হুকুম হইয়াছে, তাই তোমাকে কোরবানী করিতে লইয়া যাইতেছেন।"

এই কথা শ্রবণে সুবুদ্ধি এস্‌মাইল আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদনে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ হইল। তিনি দেহের স্তরে স্তরে, প্রাণের ভিতরে কি যেন অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আল্লার আদেশে আমার কোরবানী! এতদপেক্ষা সুখের ও সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? তাই যদি হয়, তবে ধন্য আমার পিতামাতা; ধন্য হইব আমি। আমি অকাতরে হাসিতে হাসিতে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন সেই জীবনদাতা বিধাতার নামে উৎসর্গ করিব।" শয়তান দেখিল, এ তো সামান্য বালক নহে, ইহার নিকটেও ভণ্ডামি খাটিল না; তখন সে বেগতিক দেখিয়া ম্লানমুখে অদৃশ্য হইল।

এদিকে ইব্রাহিম যাইতে যাইতে মনে করিলেন, "পুত্রের অজ্ঞাতসারে কৌশলে বা বল-প্রয়োগে তাহাকে কোরবানী করা সঙ্গত নহে। তাহাতে আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে বটে, কিন্তু পুত্রের পরীক্ষা তো হইবে না? পুত্র পিতৃ-অনুগত ও প্রভুভক্ত কি না, তাহা তো জানা যাইবে না? অতএব তাহাকে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বলাই উচিত। যদি সে প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লয়, যদি সে প্রভুর নামে জীবন দেয়, তবে পিতাপুত্র উভয়েই ধন্য হইব,—প্রভুর নিকটে পুণ্যভাগী হইব। আর যদি সে অবাধ্য হয়, তবে আমার কবল হইতে পলাইবে কোথায়? আমি হৃদয় দৃঢ় করিয়াছি,—বুক পাষাণে বাঁধিয়াছি, আমি এই বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা তাহাকে সবলে ধরিয়া কোরবানী করিয়া দৈবাদেশ পালন করিব। আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে।"

ধর্ম্মপ্রাণ ইব্রাহিম এইরূপ চিন্তা করিয়া হজরত এস্‌মাইলকে স্নেহ-গদ্‌গদ-স্বরে স্বপ্ন-ভাষিত বিধাতৃ-আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সহিষ্ণুতার অবতার শুদ্ধমতি এস্‌মাইল তাহা শ্রবণমাত্র হাস্যবদনে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "পিতঃ! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? যাঁহার দেহ, যাঁহার প্রাণ, তাঁহাকেই দিব, তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিব, ইহা যে পরম প্রীতিপ্রদ সংবাদ! আপনি এ শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করুন, আর ক্ষণবিলম্ব করিবেন না। প্রভুর আদেশ সত্বর পালন করাই অনুগত ভৃত্যের কার্য্য! হায়, আজ যদি আমার সহস্র প্রাণ থাকিত, তবে সেই জীবনদাতা বিধাতার নামে সেই সহস্র প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতাম।" ধর্ম্মপ্রাণ এস্‌মাইল ইহা বলিয়া আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইলেন, চিন্তা বা ভয়ের লেশমাত্র তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল না।

এক্ষণে সেই মহা-পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পিতা হইয়া স্নেহাধার পুত্রের গলে তীক্ষ্ণধার ছুরি চালাইবেন, এক্ষণে সেই লোমহর্ষণ,—সেই ভীষণ শুভ-মুহূর্ত্ত আসিল! কিন্তু পিতাপুত্র উভয়ে নির্ভয়-চিত্ত—সৎসাহসে উদ্দীপ্ত! কোরবানী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পিতা বলিলেন, "বৎস! প্রস্তুত হও, এই নিভৃত স্থানই দৈবাদেশ-পালনের প্রশস্ত ক্ষেত্র!" পুত্র অকাতরে বলিলেন, "পিতঃ! আমি প্রস্তুত হইয়াই আছি। কিন্তু আপনার এই সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে শান্তির সহিত মরিতে দিউন। আপনি প্রথমতঃ আমার হস্তপদ বন্ধন করুন, যেন আমি ছুরিকাঘাতে ক্ষণিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হস্তপদ সঞ্চালনে শুভ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া অভিশপ্ত না হই; দ্বিতীয়তঃ কোরবানী-কালে আমার মুখ মৃত্তিকার দিকে স্থাপন করিবেন; কেননা আমার মুখদর্শনে স্নেহবশে পাছে আপনার হস্ত অবশ হইয়া পড়ে। আর একটি কথা—শেষ কথা, পিতঃ! আমার স্নেহময়ী—আমার অভাগিনী জননীর চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম প্রদান করিবেন।"

হজরত এস্‌মাইল ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার বদন প্রশান্ত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত, হৃদয় স্থির, ধীর, গম্ভীর। মহামতি ইব্রাহিমও তদবস্থাপন্ন। তিনি বুক পাষাণে বাঁধিয়াছেন, মায়া-মমতার ডোর ছিন্ন করিয়াছেন। অচিরে সঙ্কল্প-সাধনে অগ্রসর হইলেন; পুত্রবাক্য সঙ্গত মনে করিয়া তিনি প্রথমেই এস্‌মাইলের হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন এবং তাঁহাকে মৃত্তিকামুখী করিয়া স্থাপন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। এইবার বুঝি সব যায়, সব ফুরায়, কোমল দেহের শোণিতস্রোতে ধরা ভাসিয়া যায়! ধর্ম্মোন্মত্ত ইব্রাহিম অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, উজ্জ্বল শাণিত অস্ত্র

বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, ভক্তবর ইব্রাহিম সেই তীক্ষ্ণ ছুরি সেই কমনীয় কোমল কণ্ঠের উপরে যেই সবলে চালাইতে উদ্যত হইলেন, অমনি দয়াময়ের আসন টলিল, তাঁহার ভক্তের পরীক্ষা হইল, ভক্তের হৃদয়বল, প্রভু-ভক্তি কিরূপ, তাহা পরীক্ষিত হইল। তখনই প্রত্যাদেশ হইল, "ইব্রাহিম! নিরস্ত হও, তোমার প্রাণাধিক পুত্রের বন্ধন উন্মোচন কর। তুমি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, জগতে তোমার প্রেম-ভক্তির তুলনা নাই। তুমি আমার স্বপ্নাদেশ পালন করিয়া পুণ্যের এক উজ্জ্বল দ্বার উদ্ঘাটন করিলে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। আমি স্বর্গ হইতে একটি দুম্বা প্রেরণ করিলাম, তুমি তাহাই কোরবানী করিয়া তোমার সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন কর।"

ইব্রাহিম চমকিত হইয়া স্থিরনেত্রে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তিনি স্থির অচঞ্চল, যেন প্রস্তর-প্রতিমা, মুখে কথা নাই, হাতের অস্ত্র হাতেই ধৃত রহিয়াছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি মায়াময় বিধাতার অপূর্ব্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পুত্রের বন্ধন মুক্ত করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলেন, অদূরে একটি হৃষ্টপুষ্ট শ্বেতবর্ণের দুম্বা আসিতেছে। তিনি হৃষ্টচিত্তে তখন সেই দুম্বাটি গ্রহণ করিয়া, লীলাময় জগৎস্রষ্টার জয়োচ্চারণ করিতে করিতে কোরবানী-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ভক্তের নিকট ভক্তি-পরীক্ষায় ভগবানকেও হার মানিতে হইল। ধর্ম্মপ্রাণ ইব্রাহিম আপনার পরম স্নেহের ধন পরমেশ্বরের আদেশে কোরবানী করিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জগতে ঈশ্বর-ভক্তির অপূর্ব্ব উদাহরণ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইতেই ইস্‌লাম-জগতে কোরবানী-ব্রত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কত কাল হইল, ধর্ম্মপ্রাণ ইব্রাহিম ও তাঁহার ধার্ম্মিক পুত্র পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজও লোকে তাঁহাদের এই করুণ-কাহিনী স্মরণ করিয়া ও তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, তাঁহাদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিগত বর্ষের অগ্রহায়ণ-মাসের "ভারতবর্ষে" মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষার উপর এখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করা উচিত, একথা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। শিক্ষিত জগতের সকল জাতিরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে, তাহাতে সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা-ভাষায় কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান-বিষয়ক সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা যে একরূপ অসম্ভব তাহাও বলা যায় না। বাঙ্গালা-ভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ যথেষ্ট আছে। আমাদের বঙ্গের অদ্বিতীয় কবির প্রাপ্ত 'নোবেল-পুরস্কার' সে সম্বন্ধে জগৎকে সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনা বাঙ্গালায় অতি অল্পই হইতেছে। অতি অল্পদিন হইল, এ সম্বন্ধে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন অনেকেই বলিতেছেন, আমাদের ভাষায় বিবিধ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করা উচিত। কিন্তু কিরূপ ভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু বিশেষ বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সমিতি দেশের গণমান্য বৈজ্ঞানিকদের লইয়া বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা নামে একটি সমিতি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিষদের পত্রিকায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা ভাষার কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। পরিভাষা-সমিতি কেবল কতকগুলি শব্দের তালিকা দিয়াছেন মাত্র। এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া পুস্তকাদি প্রণয়ন, প্রবন্ধাদি রচনা চলিতেছে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। আর এক কথা এই যে, এইরূপ পরিভাষা ব্যবহার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলে সাধারণ বোধগম্য হইবে কি? আমি আমার কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট ঐ সকল পরিভাষা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা উহার কিছুমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই।

আমরা স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে; কাজেই অনেকেরই মত যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি আমাদের ভাষার অনুযায়ী হওয়া চাই। বিশেষতঃ সংস্কৃতের অগাধ সমুদ্র অনুসন্ধান করিলে অনেক পরিভাষা পাওয়া যাইতে পারে। অনেকের মতে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুসারিণী হওয়া উচিত (২) এবং যেখানে সংস্কৃত-ভাণ্ডারে প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সেই স্থলে অনুবাদ করিয়া নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করা উচিত।

এ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি বক্তব্য আছে। আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের ধর্ম্ম, ভাষা ও ভাব পাশ্চাত্য জগৎ হইতে পৃথক্ সত্য; কিন্তু বিজ্ঞানেও এ পার্থক্য থাকা কোনমতেই শ্রেয়ঃ নহে। সারদাবাবু সত্যই বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান-জগতের ইহা ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের একচেটিয়া নহে।" ইহাতে পার্থক্য থাকিবার আবশ্যকতা কি? ধরিয়া লইলাম, বাঙ্গালার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংস্কৃতের মূল হইতে গ্রহণ করা গেল; আর কতক বা অনুবাদ করা গেল। তাহাতে লাভ কি? যদি বাঙ্গালার পরিভাষা, বিহার না গ্রহণ করে, যদি বিহারের পরিভাষা পঞ্জাব না গ্রহণ করে, তবে এরূপ চেষ্টা বৃথা নয় কি? বাঙ্গালা আজ অন্যান্য দেশকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং উন্নত হইতে পারে না। ভাষায়, ব্যবহারে, আচরণে, ধর্ম্মে, সর্ব্বকার্য্যেই প্রত্যেক প্রদেশে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এই পার্থক্য যে, আমাদের উন্নতির অন্তরায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এই সমস্ত কারণে পরস্পরে মিলিত হইতে পারিতেছি না। ভাষার পার্থক্য হেতু পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের সমতা হইতে পারে না। ইংরাজী-ভাষার প্রভাবে শিক্ষিতের মধ্যে এরূপ প্রাদেশিকতা একটু কমিয়াছে; কিন্তু ভারতে শিক্ষিত লোক কয়জন?

বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের স্থান অতি নিম্নস্তরে। যদিও আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য মাননীয় ডাঃ পি, সি, রায়, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি কতিপয় বঙ্গবাসী, বৈজ্ঞানিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর ভারতের বিজ্ঞানচর্চ্চা সবে আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রারম্ভ কাল হইতেই যদি আমরা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় একটা প্রাদেশিকতা আনিয়া ফেলি, তাহাতে লাভ কি হইবে? অনেকে হয়ত বলিবেন, সংস্কৃত সকল ভাষারই মূল, কাজেই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পরিভাষা ব্যবহার করিলে সকল ভারতবাসীরই সুবিধা হইবে। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, সংস্কৃত ভারতীয় সমস্ত ভাষার মূল হইলেও যেরূপ একটি ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে; সেইরূপ সংস্কৃত পরিভাষা উচ্চারণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বৈষম্য আনিয়া দিবেই দিবে। এতদ্ব্যতীত এই অনন্ত ভাষা সমুদ্রে একই অর্থমূলক এত ধাতু ও শব্দ আছে যে, তাহা ব্যবহার করিলে অনেক অসুবিধা হইবে।

একটা সামান্য উদাহরণ দিব। Hydrogenএর প্রতিশব্দ জলজান, উদ্‌জান ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে। এখন কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব? কাজেই একটা বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে যে নানারূপ মতভেদ হইতে পারে, সারদা বাবু সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতেও নানামুনির নানামত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ লইয়া ও বিভিন্ন প্রদেশের মত লইয়া, একটি সমিতি বা সঙ্ঘ Conference করিয়া, যদি আমরা আমাদের ভারতবর্ষের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলির নামকরণ Standard Nomencleture করিয়া লই, তাহা হইলেই বা কি উপকার হইবে? বিংশ শতাব্দীর এ ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে আমাদের যে সভ্য পাশ্চাত্য জগতের সহিত সংঘর্ষে আসিতে হইবে, সে বিষয়ে কি কাহারও সন্দেহ আছে? যদি তাহাই হয় এবং যদি আমরা তাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাষা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে প্রভূত ক্ষতি হইবে না কি? ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে যে বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে?

এতক্ষণ ত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পরিভাষার কথা বলিলাম; এক্ষণে অনুবাদিত পরিভাষার কথা একটু আলোচনা করা যাউক। অনেক অনুবাদিত শব্দ আমাদের ভাষায় চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে; কারণ, যাহা আমাদের ভাষায় অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিক শব্দ অনুবাদ করা অনেকস্থলে অত্যন্ত কঠিন। অনুবাদ করিলেও এক এক স্থানে এত শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে যে, তাহা ব্যবহার করা অনেক সময় ক্লেশদায়ক হয়। কতকগুলি উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু স্মরণ করিয়া দিতেছি। বিজ্ঞানের কতকগুলি শব্দের বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে, যথা—Voltic Electricity, Galvanic current, ইত্যাদি। ইহাদের অনুবাদ কিরূপ হইবে? কতকগুলির নামকরণ গুণ হইতে হইয়াছে। এক সময় ধারণা ছিল, Oxygen হইতে অম্ল উৎপন্ন হয়, সেই জন্য ইহার নাম Oxygen বা Generator of acids দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রই acids বা অম্ল উৎপন্ন হয় না, তবুও Oxygen নাম রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে Oxygenএর অনুবাদ অম্লজান কি ন্যায়সঙ্গত? Oxygen কথাটা এখন বৈজ্ঞানিক জগতে "চলিয়া" গিয়াছে; এক্ষণে মূল-উৎপত্তি বা rootএর অর্থ লইয়া, কেহই মাথা ঘামায় না। কিন্তু যখন আমরা নূতন নামকরণ করিতেছি, তখন এইরূপে ভুল রাখা কি ন্যায়সঙ্গত?

তাহা ছাড়া Organic Chemistryতে এমন অনেক শব্দ আছে, এমন অনেক জিনিস আছে, যাহার বাঙ্গালায় নামকরণ করিতে বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে। অবশ্য কতকগুলা জিনিসের নাম আছে; কিন্তু সেইগুলির সহিত পরিচিত হইতে অনেক দিন লাগিবে। Acetic acid ধান্যাম্ল, Citric acid বীজপুরাম্ল একথা কয়জন জানেন? আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয়, শতকরা দুই এক জন জানেন মাত্র। ক্রমাগত ব্যবহার করিলে সময়ে অবশ্য ইহার ব্যবহার বেশ চলিয়া যাইবে সত্য; কিন্তু সময় বড় অমূল্য ধন। এখন এই নামের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কত সময় কত লোকে ব্যয় করিতে পারেন, তাহাও ভাবিতে হইবে। এইরূপ শব্দ বাঙ্গালার "অস্থি মজ্জায়" মিশিতে অন্ততঃ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর লাগিবে। পাশ্চাত্য জগৎ দিন দিন উন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিতেছে, আর আমরা যদি এখনও নামকরণ করিয়া দেশের ভাষার সহিত মিশাইয়া লইতে ৫০।৬০ বৎসর কাটাইয়া দিই, তবে এই বিংশ শতাব্দীর জীবন-সংগ্রামের দিনে আমাদের স্থান কোথায়, তাহাই বিবেচ্য। রসায়ন শাস্ত্রের ত অনেক পরিভাষা হইয়াছে কিন্তু অন্য অন্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কি করা যাইবে? জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র ইত্যাদির পরিভাষা, পাশ্চাত্য জগৎ এই কয়েক শত বৎসর ধরিয়া করিয়াছে, তাহা আবার নূতন করিয়া গঠন করিতে কত সময় লাগিবে, তাহা অনুমেয়। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক স্থলে অন্য দ্রব্যের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত সমতা হইতে নূতন দ্রব্যের নামকরণ করিতে থাকেন। আবার অনেক স্থলে প্রথম বৈজ্ঞানিক "খেয়াল" বশে একটা নামকরণ করিয়াছেন। এই সকলেরই বা কিরূপে অনুবাদ হইবে? ধরুন, কব্জির একটা অস্থির নাম Scaphoid বা "নৌকা।" Scaphoid যদি নৌকা হয়, তাহা হইলে কাকের পশ্চাদ্ভাগে ময়ূরপুচ্ছ লাগাইলে কাককে ময়ূর বলিয়া ভ্রম হওয়া উচিত। মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নের অস্থির নাম Coccyx বা কোকিলচঞ্চু। কোকিলের চঞ্চুর সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায় তাহা বিশেষজ্ঞরাও বলিতে পারেন না; তবে এক্ষণে ইহার মূল অর্থ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে ইহা কেবল উক্ত অস্থিদ্বয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আর একখানি অস্থির নাম Sacrum বা Sacred Bone, কেননা গ্রীকগণ উহাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এখন সকলে ইহার পবিত্রতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এ সকল শব্দের অনুবাদ কিরূপ করা উচিত, তাহা বলা কঠিন। এইরূপ শত সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিবার বাসনা নাই।

দেখা যাইতেছে, এইরূপ পরিভাষা সম্বন্ধে অনেক প্রকার অসুবিধা আসিয়া জুটিতেছে। প্রথমতঃ ইহাদের নামকরণ সময়সাপেক্ষ। তাহার পর ইহাদের প্রচলনে কত অধিক সময় লাগিবে। যাঁহারা শিক্ষকতা করিবেন, তাঁহাদের প্রথমে ইহা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতেও সময় বড় কম লাগিবে না।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, আমরা যদি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম পরিভাষাগুলির (International Nomencleture) একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের ভাষার সহিত সমঞ্জস করিয়া লই, তাহা হইলে অন্যান্য জাতির উন্নতির সহিত আমরাও অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন

পরিভাষা ব্যবহারের কুফল ত্যাগ করিবার জন্য সভ্যজগতে International Nomencleture অবাধে চলিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে একই নামকরণ প্রথা nomencleture ব্যবহৃত হইতেছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে একরূপ পরিভাষা অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। সম্প্রতি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা বা Anatomyতে B. N. A. Terminology ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হইতেছে। সম্প্রতি দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু মহাশয়ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

সার্ব্বজনীন পরিভাষা 'International Terminology' সভ্যজগতের বৈজ্ঞানিকদের বহুসাধনার ফল। এক্ষণে সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। এই সাধনার ফল ত্যাগ করিয়া আবার নূতন নাম দিয়া আবার নানা প্রকার ভুলভ্রান্তির মধ্যে আসিয়া লাভ কি? আর এরূপ করিলে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কিছুই না। বিজ্ঞান যখন কাহারও একচেটিয়া নহে, তখন এই সমস্ত প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে যে কোনও প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে, সে কথা আমরা মনে স্থানই দিতে পারি না। এবং পাশ্চাত্য জগতের পরিভাষাগুলিকে বর্জ্জন করিয়া "একটা নূতন কিছু" করিবার প্রলোভনে, সময় নষ্ট ও পরিশ্রমের অপব্যবহার করা কি যুক্তিসঙ্গত?

অনেকের ধারণা এই যে, বিদেশী শব্দগুলি লইয়া আমাদের ভাষা পুষ্ট হইবে না; কিন্তু এই ধারণার মূলে কিছু মাত্র সত্য নাই। সারদা বাবু সামান্য কয়েকটি মাত্র কথায় বেশ স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালায় যথেষ্ট ইংরাজি শব্দ আছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ভাষার জাতি-বিচার নাই। বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ ভারতীয় অনেক নাম আছে; এমন কি খাঁটী বাঙ্গালা নাম বিদেশীরা গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রত্যেক পৃষ্ঠা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। Hooker, Roxburgh, Thomsonপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ অনেক ভারতীয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এস্থানে দুই চারিটি উদাহরণ দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। পালমশাকের বৈজ্ঞানিক নাম Beta Bengalenis. পান-মৌরী Anethum Panmori, কাঁটালী চাঁপা—Michelia Champaca, শিরিশ—Mimosa Sirissa; এইরূপ ভূরি ভূরি খাঁটি ভারতীয় শব্দ, বাঙ্গালা শব্দ, এমন কি গ্রাম্য দেশজ শব্দও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে।

বিজ্ঞানে নকল করাতে লজ্জা নাই। প্রাণিতত্ত্বে অনেক জন্তুর নাম খাঁটী ভারতীয় শব্দ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, Indian Museumএ গিয়া একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিবেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতীয় নামের অভাব নাই। Kalazar, Dumdum fever, Delhi-sore ঔষধের নাম Chirata, Neem Bark, Beal fractus, এ সমস্ত যখন অবাধে পাশ্চাত্য জগতে চলিয়াছে, তখন আমরা উহাদের শব্দ গ্রহণ করিলে লজ্জার কি আছে?

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ মিলিয়া পরামর্শ করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য একটা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার (Standard nomencleture) ব্যবস্থা করিয়া দিন। যতদিন এরূপ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁহার যেরূপ প্রাণ চাহিতেছে, তিনি সেইরূপ পরিভাষা প্রচলন করিয়া বৈষম্যেরই সৃষ্টি করিতেছেন। আর প্রত্যেক শব্দের পর যদি ইংরাজি শব্দবন্ধনীর ভিতর দিতে হয়, তবে একেবারে ইংরাজি শব্দটা ব্যবহার করিলে আপত্তি কি? এ সম্বন্ধে বঙ্গের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, আশা করা যাইতে পারে, ইহার সুমীমাংসা অদূরবর্ত্তী।

খাই কি?

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, B. A.]

প্যারীর ডাঃ গুরোঁ (Dr. F. X. Gouraud—Formerly Chief of the Laboratory of the Medical Faculty, Paris) খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহার নাম 'What Shall I Eat?' পশুমাংস সম্বন্ধে তিনি মোটামুটি বলেন, যে ইহাকে

অন্নের মধ্যে অধিক পরিমাণ সহজপাচ্য "নাইট্রোজেন", অর্থাৎ যবক্ষারজান, আছে। তজ্জন্য, যাহারা সবে মাত্র অসুখ হইতে উঠিয়াছে, অথবা ধাতু-দৌর্ব্বল্য পীড়িত, কিংবা যাহাদিগের ইতঃপূর্ব্বে কোনও কারণে জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়াছে, কেবল তাহাদের পক্ষেই পরিমিত পরিমাণ মাংস আহার করা হিতকর। মাংসাহারীরা আহারের পরই কতকটা তৃপ্তি অনুভব করেন বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কেমন একটা অসচ্ছন্দতা—আলস্য এবং পুনরায় আহার করিবার আকাঙ্ক্ষা—বোধ করেন। যাঁহাদিগকে মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে মাংস আহার করা সুবিধাজনক নহে; কারণ, মাংস আহার করিবার পরে এমন একটা আলস্য—নিদ্রালুভাব আসিয়া জুটে, যাহাতে আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। বক্ষের, রক্ত-প্রবাহের, প্লীহার, স্নায়ু মণ্ডলীর, মূত্রাশয়ের (kidney) এবং বাতের পীড়ায় মাংস একান্ত অপকারী। মাংস স্বতঃই দুষ্পাচ্য, আধ্মান এবং কোষ্ঠবদ্ধতাজনক। এই গেল, পশুমাংসের কথা।

পশুমাংস অপেক্ষা **পক্ষিমাংস** সহজপাচ্য। যে সকল পক্ষিমাংস শ্বেতাভ বর্ণের, তাহা অপেক্ষা যে সকল পক্ষিমাংস রক্তাভ, সেগুলি অধিকতর বলকর; কারণ তাহাতে লোহের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে আছে।

উক্ত লেখকের মতে **মৎস্য** মানবের নিতান্ত উপযোগী খাদ্য। তিনি বলেন যে, মাংসের অহিতকর একটি দোষও মৎস্যে নাই, অথচ মাংসের তাবৎ উপকারী গুণ মৎস্যে আছে।

আহার্য্য প্রস্তুতের পার্থক্যে **ডিম্ব** উপকারী বা অহিতকর হয়। কাঁচা ডিম বলকারক, কিন্তু সকলের পক্ষে রুচিকর নহে। বাতগ্রস্তের পক্ষে প্রত্যহ অল্পসিদ্ধ ডিম্ব-ভোজন উপকারী। সদ্যঃরোগমুক্ত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে নিম্নলিখিত মিশ্রণটি বিশেষ হিতকর;—দুইটি ডিম্বের কুসুমে দুইছটাক আন্দাজ চিনি দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে থাক, যখন বেশ শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন দেড়পুয়া আন্দাজ গরম জল মিশ্রিত করিয়া, সহমত শীতল হইলে অল্প অল্প পান করিতে দাও। ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ডিম্বের কুসুম আহার্য্য এবং ঔষধ, দুইই বটে।

পাঁউরুটী অপেক্ষা সুসিদ্ধ **সটীর** ও **মসুর** এবং **পনীর** সুপাচ্য; তন্নিম্নেই পাঁউরুটী; অতঃপর **ভাত** এবং সর্ব্বশেষে মাংস ও আলু। শ্বেতবর্ণ ময়দার রুটী অপেক্ষা, "চোকর্" বা ভূষিমিশ্রিত আটার রুটীই বল-কারক। গমে যে পরিমাণ ফস্ফরস্, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য আছে, তাহার চারিভাগের তিনভাগ এই ভূষিতে থাকিয়া যায়।

শাকসব্জী—যদিও সেরূপ বলকারক নহে, তথাপি ইহাতে নানাবিধ ধাতব লবণ প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদিগের দৈনিক আহার্য্যের অন্ততঃ এক পাঁচভাগের একভাগ কেবল টাট্‌কা শাকসবজির দ্বারা প্রস্তুত হওয়া বিধেয়।

চা-কাফি ইত্যাদি—সাময়িক ক্লান্তি-নাশক এবং স্ফূর্ত্তিদায়ক, অর্থাৎ পরিশ্রমাদির পর চা বা কাফি পান করিলে তৎক্ষণাৎ অবসাদাদি দূর হয় এবং শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি আইসে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্রাম ও নিদ্রা ব্যতীত শারীরিক ক্লান্তি বিদূরিত হয় না। ফলে, চা ও কাফির সহিত কতকটা মাখন বা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমের কুসুম আহার করিলেই, তবে ক্লান্তি-অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা ধাতুপুষ্টি হয়। কোকো এবং চোকোলেট্ পান করিলে ক্লান্তিদূরও হয়, উপরন্তু বলবৃদ্ধিও ঘটে।

জৈনকবি শুভচন্দ্র

[শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য]

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—যাঁহাদিগের গ্রন্থসন্দর্ভ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে সগৌরবে স্থান পাইবার যোগ্য। কয়েকখানি জৈন গ্রন্থ এতই উপভোগ্য যে, সকলেই তাহা পাঠে মুগ্ধ হইবেন। ব্যাকরণ গ্রন্থের মধ্যে 'কাশিকা'বৃত্তি, কোষের মধ্যে 'অভিধান-চিন্তামণি', অলঙ্কারের মধ্যে 'অলঙ্কার চিন্তামণি'র আলোচনা সর্ব্বজাতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়। আমরা আজ এক অল্পজনশ্রুত জৈনকবি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। ইঁহার নাম—শুভচন্দ্রাচার্য্য।

কাশীস্থ "জৈনধর্ম্ম প্রচারিণী সভার" সম্পাদক, নানা জৈন গ্রন্থের অনুবাদক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পান্নালাল

বাকলীওয়াল, "জ্ঞানার্ণব" নামক একখানি সুন্দর জৈনগ্রন্থ, স্বরচিত সুন্দর হিন্দী অনুবাদের সহিত, প্রকাশ করিয়াছেন।

"জ্ঞানার্ণব" একাধারে কাব্য ও যোগশাস্ত্র। প্রসন্ন গম্ভীর মনোমদ কবিতায় গ্রন্থকার জৈনাচার্য্য শুভচন্দ্র এই গ্রন্থে জৈন ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৪২ প্রকরণ বা অধ্যায়ে সমাপ্ত।

গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের পর দ্বাদশবিধ ভাবনা, ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতির বিশদবর্ণনা আছে। মঙ্গলাচরণের দুইএকটি শ্লোকের ভাব অবিকল হিন্দু-মতানুযায়ী। শুভচন্দ্র, মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"ভুবনাম্ভোজমার্ত্তণ্ডং ধর্ম্মামৃতপয়োধরম্।
যোগিকল্পতরুং নৌমি দেবদেবং বৃষধ্বজম্॥"

এ নমস্কার যেন ঠিক মহাদেবের উদ্দেশ্যে।

গ্রন্থারম্ভে শুভচন্দ্র, অত্যন্ত বিনীত ভাবে লিখিয়াছেন,—

"ন কবিত্বাভিমানেন ন কীর্ত্তি-প্রসরেচ্ছয়া।
কৃতিঃ কিন্তু মদীয়েয়ং স্ববোধায়ৈব কেবলম্॥"

"নিজের কবিত্ব-গৌরবের অভিমানে বা যশোরাশি-লিপ্সায় আমি এ গ্রন্থরচনা করি নাই,—কেবল আত্ম-বোধের জন্যই আমার এ উদ্যম।"

গ্রন্থকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংসারের অনিত্যতা, অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

"গীয়তে যত্র সানন্দং পূর্ব্বাহ্নে ললিতং গৃহে।
তস্মিন্নেব হি মধ্যাহ্নে সদুঃখ মিহ রুদ্যতে॥"

"যে গৃহে প্রভাতে আনন্দোৎসবের মঙ্গল-গীতি ধ্বনিত হইতেছিল, হয় ত মধ্যাহ্নেই সেই গৃহে অরুন্তুদ বেদনার হৃদয়-ভেদী ক্রন্দনরব উত্থিত হইল।"

শুভচন্দ্র, এই অনিত্য দুঃখময় সংসারে ধ্যানকেই আত্মার পরমকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"মোক্ষঃ কর্ম্মক্ষয়াদেব স সম্যক্‌জ্ঞানতঃ স্মৃতঃ।
ধ্যানসাধ্যং মতং তদ্ধি তস্মাৎ তদ্ধিতমাত্মনঃ॥"

"কর্ম্মক্ষয় হইলেই মোক্ষ হয়, কর্ম্মক্ষয়ের হেতু সম্যক্‌ জ্ঞান; ধ্যানের দ্বারাই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং ধ্যানই আত্মার কল্যাণকর।"

গ্রন্থকার, জৈন-সিদ্ধান্তানুসারে মুক্তিলাভের পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"এবং দ্রব্যানি তত্ত্বানি পদার্থান্ কায়সংযুতান্।
যঃ শ্রদ্ধত্তে স্বসিদ্ধান্তাৎ স স্যান্মুক্তেঃ স্বয়ংবরঃ॥"

"স্বধর্ম্মানুমোদিত সিদ্ধান্তানুসারে যিনি ছয় দ্রব্য, সপ্ত তত্ত্ব ও পঞ্চাস্তিকায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন, মুক্তি তাঁহাকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন।"

জৈন ধর্ম্মের মূলমন্ত্রই হইল অহিংসা। তাই এই গ্রন্থে অহিংসা নরকপাতের হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"শান্ত্যর্থং দেবপূজার্থং যজ্ঞার্থমথবা নৃভিঃ।
কৃতঃ প্রাণভৃতাং ঘাতঃ পাতয়ত্যবিলম্বিতম্॥"

"পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা প্রাণই মানুষের অধিক প্রিয়তম। যদি কেহ জীবনের বিনিময়ে স্বর্ণরত্নাদি পরিপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী দান করিতে চায়, তথাপি মানুষ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে না।" তাই শুভচন্দ্রাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"সকলজলধিবেলাবারিসীমাং ধরিত্রীং
নগনগরসমগ্রাং স্বর্ণরত্নাদিপূর্ণাম্।
যদি মরণনিমিত্তে কোঽপি দদ্যাৎ কথঞ্চিৎ
তদপি ন মনুজানাং জীবিতে ত্যাগবুদ্ধিঃ॥"

স্বধর্ম্মপরায়ণ শুভচন্দ্র, সেইজন্য অহিংসাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"পরমাণোঃ পরং নাল্পং ন মহদ্ গগনাৎ পরম্।
যথা কিঞ্চিৎ তথা ধর্ম্মো নাহিংসা লক্ষণাৎ পরঃ।"

"পরমাণুর অপেক্ষা যেমন সূক্ষ্ম বস্তু নাই, আকাশের অপেক্ষা যেমন মহান্ পদার্থ নাই, তেমনই অহিংসা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই।"

গ্রন্থকার এইরূপ সহজবোধ্য ভাষায় জৈন-সিদ্ধান্তের প্রায় সকল মর্ম্মই সংক্ষেপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক একটি কবিতা পড়িলে তাঁহার নিপুণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেখুন, পশ্চাল্লিখিত কবিতাগুলি কেমন সুন্দর!

"সন্ধ্যেব ক্ষণরাগাঢ্যা নিম্নগেবাধরপ্রিয়া।
বক্রা বালেন্দুরেখেব ভবন্তি নিয়তং স্ত্রিয়ঃ॥"

"নারীজাতি স্বভাবতঃই সন্ধ্যার ন্যায় ক্ষণরাগবতী, নদীর ন্যায় অধরপ্রিয়া ও বালেন্দুলেখার ন্যায় বক্র।"

[এই শ্লোকে 'রাগ' শব্দ ও 'অধর' শব্দ শ্লিষ্ট। নারী-

পক্ষে 'রাগ'—অনুরাগ, সন্ধ্যাপক্ষে 'রাগ'—'রক্তিমা।' নারীপক্ষে 'অধর'—নিম্ন ওষ্ঠ, নদীপক্ষে—নিম্নস্থান।]

"যাসাং সীমন্তিনীনাং কুরবকতিলকাশোকমাকন্দবৃক্ষাঃ
প্রাপ্যোচ্চৈর্বিক্রিয়ন্তে ললিতভুজলতালিঙ্গনাদীন্ বিলাসান্।
তাসাং পূর্ণেন্দুগৌরং মুখকমলমলং বীক্ষ্য লীলারসাঢ্যং
কো যোগী যস্তদানীং কলয়তি কুশলো মানসং নির্ব্বিকারম্॥"

"যে সীমন্তিনীদিগের স্পর্শে অশোক প্রভৃতি তরু জড় হইলেও বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অমল মুখবিম্ব দেখিয়া এমন কোন্ যোগী আছেন, যিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন?"

"এবং তাবদহং লভেয় বিভবং রক্ষেয়মেবং তত
স্তদ্‌বৃদ্ধিং গময়েয়মেবমনিশং ভুঞ্জীয় চৈবং পুনঃ।
দ্রব্যাশারসরুদ্ধমানস ভৃশং নাত্মানমুৎপশ্যসি
ক্রুদ্ধৎ ক্রূরকৃতান্তদন্তপটলীযন্ত্রান্তরালস্থিতম্॥"

"রে মূঢ়, তুমি কেবল এই ভাবে ধন উপার্জ্জন করিব, এই ভাবে তাহার রক্ষা করিব, ঐরূপ করিয়া অর্থ বাড়াইব এবং এই উপায়ে তাহা ভোগ করিব,—এই আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া আছ। তুমি যে রোষকষায়িত লোচন ক্রূর কৃতান্তের দন্তপংক্তির অন্তরালে রহিয়াছ, ইহা ত একবারও মনে কর না।"

শেষের কবিতাটি পড়িলে ভগবদ্‌গীতার—

"আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্।"

ইত্যাদি শ্লোক মনে পড়ে।

এই জৈনগ্রন্থে ভগবদ্‌গীতার অনুকরণে লিখিত আরও অনেক কবিতা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।" আর শুভচন্দ্রাচার্য্য লিখিতেছেন,—

"সাম্যবারিণিশুদ্ধানাং সতাং জ্ঞানৈকচক্ষুষাম্।
ইহৈবানন্তবোধাদিরাজ্যলক্ষ্মীঃ সখী ভবেৎ॥"

এই গ্রন্থে "ভগবদ্‌গীতা" হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"যা নিশা সর্ব্বভূতেষু তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

এই "জ্ঞানার্ণবে" জৈন সিদ্ধান্তের অনুযায়ী এই রূপ অনেক শ্লোক আছে। পুস্তক খানি ২১০৯ শ্লোকে সম্পূর্ণ। একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে গদ্যও আছে।

শুভচন্দ্র কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সুসঙ্গত প্রমাণের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিশ্বভূষণ আচার্য্য-প্রণীত "ভক্তামরচরিত্র" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থে মুঞ্জ, ভোজ, ভর্ত্তৃহরি ও এই প্রবন্ধোক্ত শুভচন্দ্রকে সমসাময়িক বলা হইয়াছে। বিশ্বভূষণ, "ভক্তামরচরিত্রের" পীঠিকায় যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই :—

"পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনীতে সিংহ (সিংহভট?) নামক এক নরপতি রাজ্য করিতেন। তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্যই অতুলনীয়, কিন্তু পুত্রাভাবে রাজ সংসারে সর্ব্বদাই বিষাদের মলিন ছায়া জাগিয়া ছিল। একদিন রাজা, মহিষীর সহিত উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে, সহসা সরোবরের নিকট মুঞ্জবনের মধ্যে শায়িত একটি সদ্যোজাত সুন্দর শিশু দেখিতে পাইলেন। রাজা, করুণাময় পরমেশ্বরের দান ভাবিয়া, সেই বালকটিকে রাণীর কোলে দিলেন এবং রাজভবনে আসিয়া মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্ঞীর গর্ভবার্ত্তা প্রচার করিলেন। অল্পদিনের পরই সিংহরাজের পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই বালকের নাম রাখা হইল—মুঞ্জ। মুঞ্জ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা সিংহ, রত্নাবতী নাম্নী এক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

"ইহার কিছুদিন পরে সত্য সত্যই সিংহরাজের মহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাণী যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের সিংহল (সিংহরাজ?) নাম রাখা হইল। প্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমার সিংহল, মৃগাবতী নামক এক রাজকুমারীর সহিত পরিণীত হইলেন। এই সিংহলের ঔরসে মৃগাবতীর গর্ভে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শুভচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম ভর্ত্তৃহরি।

"একদিন সহসা মহারাজ সিংহের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল,—তিনি মুঞ্জ ও সিংহলের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জৈন-দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন।

"শুভচন্দ্র ও ভর্ত্তৃহরি বাল্যকাল হইতেই, কি জানি কেন, সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। একদা তাঁহাদের সম্বন্ধে

মহারাজ মুঞ্জের এক ঘোর গুপ্ত-অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া উভয় ভ্রাতাই সংসার পরিত্যাগ করিলেন। শুভচন্দ্র অরণ্যে গিয়া জৈনযতি হইলেন, আর ভর্ত্তৃহরি এক তাপসের নিকট গিয়া তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

"বহুকালের পর একবার শুভচন্দ্র ও ভর্ত্তৃহরির পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরস্পর যোগ-সমৃদ্ধির পরীক্ষায় ভর্ত্তৃহরি পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভর্ত্তৃহরি অনুতপ্ত-হৃদয়ে অগ্রজের শরণাগত হইয়া শুভচন্দ্রের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক দিগম্বর জৈন-যোগী হইলেন। শুভচন্দ্র কনিষ্ঠ ভর্ত্তৃহরিকে সহজে জৈনধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য "জ্ঞানার্ণব" গ্রন্থ রচনা করেন।"

এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া বোম্বাইয়ের "জৈন-হিতৈষী" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমী "জ্ঞানার্ণবের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভর্ত্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকে' জৈনধর্ম্মের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়। 'একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ। কদাহং সম্ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ॥'—'বৈরাগ্যশতকের' এই শ্লোকে ত ভর্ত্তৃহরি স্পষ্টভাবে দিগম্বর জৈন মুনি হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, ভর্ত্তৃহরি পূর্ব্বাবস্থায় 'নীতিশতক' ও 'শৃঙ্গারশতক' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আর শুভচন্দ্রের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'বৈরাগ্যশতক' রচনা করেন।"

শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমীর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ; কারণ বৈরাগ্যশতকের—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥"

"কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন,
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥"

ইত্যাদি শ্লোকে পাঠ করিলে সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, যে ভর্ত্তৃহরি একজন পরম শৈব ছিলেন। নাথুরাম প্রেমী যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভর্ত্তৃহরির জৈনত্ব প্রতিপাদন করিতে চাহেন, সে শ্লোকের তৃতীয় চরণে "কদাহং সম্ভবিষ্যামি—" এরূপ পাঠ "বৈরাগ্যশতকে" নাই,—"কদা শম্ভো ভবিষ্যামি—" এইরূপ পাঠই মুদ্রিত আছে। শতকত্রয়ের টীকাকার রামচন্দ্র, এই পাঠানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ভক্তামরচরিত্রকার" যে মুঞ্জ, ভোজ, শুভচন্দ্র ও ভর্ত্তৃহরিকে সমসাময়িক বলিয়াছেন, তাহাই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করা যাউক।

মহারাজ মুঞ্জের কালনির্ণয় করা কঠিন নহে। জৈনাচার্য্য অমিতগতি, মহারাজ মুঞ্জের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি স্বকৃত "সুভাষিত রত্নসন্দোহ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১০৫০ বিক্রমসম্বতে (খৃঃ ৯৯৪) মুঞ্জ-নৃপতির রাজত্বকালে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল (১)। রাজবল্লভ-কৃত ভোজচরিত গ্রন্থে ও তৈলপের একখানি লিপিতে (২) তৈলপকর্ত্তৃক মুঞ্জের মৃত্যু হইয়াছিল, লিখিত আছে। মুঞ্জের মৃত্যুর পর মহারাজ ভোজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মেরুতুঙ্গসূরি-কৃত "প্রবন্ধচিন্তামণি" গ্রন্থে ১০৭৮ বিক্রম সম্বতে (খৃঃ ১০২২) ভোজের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা অভিহিত হইয়াছে (৩)। পুরাতত্ত্বজ্ঞ কেনেডি সাহেবও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী, ভোজের রাজত্বকাল অবধারণ করিয়াছেন (৪)।

তৈলপবংশীয় জয়সিংহ, ১০১৯ খৃষ্টাব্দীয় তাঁহার একখানি লিপিতে ভোজরূপ পদ্মের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (৫)। সুতরাং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে মুঞ্জ বা ভোজের অবস্থান প্রতিপন্ন করা যায় না। কিন্তু রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরি ইহার বহুপূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।"

জৈন-দার্শনিক পাত্রকেশরী বিদ্যানন্দ, ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত "বাক্যপদীয়" হইতে—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিবাভাতি সর্ব্বং শব্দে প্রতি-

(১) "সমারূঢ়ে পূতত্রিদশবসতিং বিক্রমনৃপে,
সহস্রে বর্ষাণাং প্রভবতি হি পঞ্চাশদধিকে।
সমাপ্তং পঞ্চম্যামবতি ধরণিং মুঞ্জনৃপতৌ,
সিতে পক্ষে পৌষে বুধহিতমিদং শাস্ত্রমনঘম্॥"

(২) J. R. A. S. Vol. IV. P. 12 and Ind Ant. Vol. XXI, P 168.

(৩) "বিক্রমাদ্বাসরাদষ্টমুনিব্যোমেন্দুসম্মিতে।
বর্ষে মুঞ্জপদে 'ভোজভূপঃ পট্টে নিবেশিতঃ।—১ম সর্গ. অন্তিম শ্লোক।

(৪) Imperial Gazetteer, Vol. II, P. 311.

(৫) Ind. Ant., Vol. V P. 17.

ষ্ঠিতম্॥"—এই কারিকা স্বকৃত "অষ্টসহস্রী" গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। জৈনাচার্য্য জিনসেনের রচিত "আদিপুরাণের" প্রথমে পাত্রকেশরী বিদ্যানন্দের নামোল্লেখ আছে (৬)। আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই,—সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার ফ্লিট লিখিয়াছেন যে, (৭) জৈন নৈয়ায়িক প্রভাচন্দ্র, ভর্ত্তৃহরির [illegible]না নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। জিনসেনের "আদিপুরাণে" প্রভাচন্দ্রেরও যশোগীতি লিখিত হইয়াছে (৮)। এই জিনসেন, প্রবন্ধ প্রতিপাদ্য শুভচন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীন। কারণ, শুভচন্দ্র স্বরচিত "জ্ঞানার্ণবের" মঙ্গলাচরণে জিনসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৯)।

জিনসেন স্বকৃত 'জয়ধবলা' টীকার প্রশস্তি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ৭৫৯ শকাব্দে (খৃঃ ৮৩৭) কষায় প্রাভৃতের জয়ধবলা টীকা সমাপ্ত হইয়াছে (১০)। জিনসেন স্বারব্ধ "মহাপুরাণের" রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই,—তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য গুণভদ্রাচার্য্য পরে এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। সেই জন্য জিনসেন-প্রণীত "মহাপুরাণে"র প্রথমাংশ "আদিপুরাণ" ও গুণভদ্র-প্রণীত শেষাংশ "উত্তর পুরাণ" [illegible]রচিত। গুণভদ্রাচার্য্য, "উত্তরপুরাণে"র প্রশস্তি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ৮২০ শকাব্দে (খৃঃ ৮৯৮) সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত এই পবিত্র পুরাণ সমাদৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে (১১)। সুতরাং ভর্ত্তৃহরিকে শুভচন্দ্রের সমসাময়িক বলা উন্মত্ত প্রলাপবৎ ভিত্তিশূন্য।

যদি এইরূপ শঙ্কা করা হয় যে, শুভচন্দ্র "আদিপুরাণ"কার জিনসেনের উল্লেখ করেন নাই,—রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের সমকালিক "হরিবংশ"কার প্রথম জিনসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন (১২); তাহা হইলেও ভর্ত্তৃহরির সহিত শুভচন্দ্রের এককালবর্ত্তিতা প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ডাক্তার ফ্লিট বলিয়াছেন, চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিংএর লেখা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভর্ত্তৃহরি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩)।

এই বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরিই যে "নীতিশতক" ও "বৈরাগ্য শতকে"র প্রণেতা, তাহা সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ম্যাকডোনাল সাহেবের অভিমত পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The Bhatti Kāvya ascribed to the poet and Grammarian Bhartrihari, who died in A. D. 651, relates the story of Rama with the sole object of illustrating the forms of Sanskrit Grammar.

"* * * The most distinguished writer of this type is Bhartrihari, who having long

(৬) "ভট্টাকলঙ্ক শ্রীপাল পাত্রকেশরিণাং গুণাঃ।
বিদুষাং হৃদয়ারূঢ়া হারায়ন্তেঽতি নির্ম্মলাঃ॥"—১ম পর্ব্ব, ৫৩ শ্লোক।

(৭) Bombay Gazetteer, Vol, I. Part. 2, P. 408

(৮) "চন্দ্রাংশু শুভ্রযশসং প্রভাচন্দ্রকবিং স্তুবে।
কৃত্বা চন্দ্রোদয়ং যেন শশ্বদাহ্লাদিতং জগৎ॥
চন্দ্রোদয়কৃতং তস্য যশঃ কেন ন শস্যতে।
যদা কল্পমনাম্লায়ি সতাং শেখরতাং গতম্॥"—১ম পর্ব্ব, ৪৭—৪৮ শ্লোক।

(৯) "জয়ন্তি জিনসেনস্য বাচস্ত্রৈবিদ্যবন্দিতাঃ।
যোগিভির্যৎসমাসাদ্য স্খলিতংনাত্মনিশ্চয়ে॥" —১৬শ শ্লোক।

(১০) জিনসেন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, ১৩১৯ সালের ফাল্গুন-সংখ্যার "আর্য্যাবর্ত্তে" "মেঘদূতের সমস্যাপূরণ" এবং "ভারতবর্ষ" প্রথম-বর্ষ, প্রথমখণ্ড ৪৪০ পৃষ্ঠায় "জৈনাচার্য্য জিনসেন" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(১১) "শকনৃপকালাভ্যন্তর বিংশত্যধিকাষ্টশতমিতাব্দান্তে।
মঙ্গলমহার্থকারিণি পিঙ্গলনামনি সমস্তজনসুখদে॥
শ্রীমঞ্চম্যাং বুধার্দ্রাযুজি দিবসে মন্ত্রিবারে বুধাংশে
পূর্ব্বায়াং সিংহলগ্নে ধনুষি ধরণিজে বৃশ্চিকার্কৌ তুলায়াম্।
সূর্য্যে শুক্রে কুলীরে গবি চ সুরগুরৌ নিষ্ঠিতং ভব্যবর্য্যৈঃ
প্রাপ্তেজ্যং শাস্ত্রসারং জগতি বিজয়তে পুণ্যমেতৎ পুরাণম্॥" (?)
—৩২-৩৩ শ্লোক।

(১২) ডাক্তার ফ্লিটের মতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ "হরিবংশে"র রচনা-কাল। Bombay Gazetteer, Vol. I, Part II, P. 407 দ্রষ্টব্য।

(১৩) "* * * That both Vidyānanda and Prabhā Chandra quote the Sanskrit Grammarian Bhartrihari, author of the Vākyapadia—Prabha Chandra also mentioning Kumārila who again quotes Bhartrihari—and that, according to the statement of the Chinese pilgrim I-t Sing, Bhartrihari died in A. D. 650."—Bombay Gazetteer, Vol. I, Part II, P. 408.

fluctuated between worldly and monastic life, died in A. D. 651. Of his three 'Centuries' of detached stanzas, two are of a sententious character. The other entitled *Sringar Sataka* or 'Century of Love' deals with erotic sentiment."—(Imperial Gazetteer, Vol. II, PP. 240—243).

অতএব ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, শুভচন্দ্র যখন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম জিনসেন অথবা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় জিনসেনের পরবর্ত্তী (কারণ, শুভচন্দ্র "জ্ঞানার্ণবে" জিনসেনের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন) তখন কোনরূপেই ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ত্যক্তদেহ রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরির সহোদর হইতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে "ভক্তামরচরিত্র"-কারের আখ্যায়িকাকে কল্পনার বিকাশ বলা ভিন্ন উপায় নাই।

আর এক কারণেও "ভক্তামরচরিত্র"-কারের আখ্যায়িকাকে কাল্পনিক বলিতে হয়। 'ভক্তামরচরিত্র'কার লিখিয়াছেন, ভর্ত্তৃহরির শিক্ষার জন্যই শুভচন্দ্র "জ্ঞানার্ণব" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু স্বয়ং শুভচন্দ্র "ন কবিত্বাভিমানেন ন কীর্ত্তিপ্রসরেচ্ছয়া। কৃতিঃ কিন্তু মদীয়েয়ং স্ববোধায়ৈব কেবলম্" এইরূপ লিখিয়া কেবল আত্মজ্ঞানলাভই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির শিক্ষার উদ্দেশে "জ্ঞানার্ণব" প্রণয়ন করিলে শুভচন্দ্র তাহার উল্লেখ না করিয়া "স্ববোধায়ৈব কেবলম্"—লিখিবেন কেন? সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিজপুত্র রাজীবের শিক্ষার জন্য "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" রচনা করিয়াছিলেন। তাই মুক্তাবলীর প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন,

—"নিজনির্ম্মিতকারিকাবলীমতিসংক্ষিপ্ত চিরন্তনোক্তিভিঃ।
বিশদীকরবাণি কৌতুকান্নু রাজীব দয়াবশংবদঃ॥"

"ভক্তামরচরিত্রে"র আখ্যায়িকায় আস্থা স্থাপন না করিলে, শুভচন্দ্রের সময় নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। তবে শুভচন্দ্র যখন জিনসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী, এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অষ্ট্রিয়ার বৃদ্ধসম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফ্

কর্ণেল্ প্রতাপসিংহ

সীতারামের ক্রমবিকাশ

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, M. A., B. L., কাব্যতীর্থ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২

বর্ত্তমান "সীতারামে" যেরূপ গঙ্গারামের দণ্ডের সময় সীতারাম ও কাজীর কথোপকথন, গঙ্গারামের পলায়ন, শ্রীর সৈন্য-সঞ্চালন প্রভৃতি বর্ণিত আছে, প্রথম প্রকাশিত "সীতারামে"ও ঠিক তাহাই ছিল। তাহার পর শ্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া বৃক্ষচ্যুত হইল। এইখানে প্রথম প্রকাশিত সীতারামে বহু নূতন ঘটনা সংযোজিত ছিল। পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা অগ্রে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহার পরিবর্জ্জনের ঔচিত্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর মূর্চ্ছিতা শ্রীকে "ঝাড়ফুঁক" করিতেছিলেন—যদি সভ্য ভাষায় বলিতে হয়, বল মেস্মেরাইস্ করিতেছিলেন। পরে শ্রী, যে কারণেই হউক, চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া দাঁড়াইল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে কিছু দূর গেলে সীতারাম চন্দ্রচূড়কে বলিলেন, আপনি ওঁর পিছুপিছু যান। ওঁর যাহাতে রক্ষা হয়, সে ব্যবস্থা করিবেন। আপনাকে বেশী বলিতে হইবে না।

চন্দ্র। আর তুমি এখন কি করিবে?

সীতা। আপনাকে কিছু বলিতে পারি না, কেন না আপনার কাছে যাহা বলিব, তাহা ঘটনাক্রমে যদি মিথ্যা হয়, তবে বড় পাপ হইবে। অতএব কিছুই বলিব না। আপনি শ্যামপুরে গমন করুন। যদি জীবিত থাকি, সেইখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে'।

শুনিয়া চন্দ্রচূড়, বিষণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গুরুশিষ্য, পরস্পরকে ভাল চিনিতেন সুতরাং চন্দ্রচূড় কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সকলেই চলিয়া গেল। মাঠে আর কেহ নাই। কেবল একা সীতারাম সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপর চণ্ডীমূর্ত্তি শ্রী দাঁড়াইয়া, রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া সীতারাম একা। আমাদের সকলেরই কখনও কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের দ্বারা সমস্ত জীবন শাসিত হয়। সীতারামের তাই হইল। ভাবিতেছিলেন, এ কাণ্ড কি? কেন হইল? কে করিল? ভাল হইয়াছে কি?' ইহার কারণ কি? উপায় কি? কিসের লক্ষণ?

যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, মুসলমানের অত্যাচার।

সুরাসুর মনে পড়িল। বৃত্র, সম্বর, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ, বলি, প্রহ্লাদ, বিরোচন, কে মারিল? কেন মারিল? কেনই বা হইল? কেনই বা মারিল?

তাহার পর রাক্ষস—মানুষ, ইহাদের কথা মনে পড়িল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, অলম্বুষ, হিড়িম্ব, বক, ঘটোৎকচ দন্তবক্র, শিশুপাল, একলব্য, দুর্য্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, কে মারিল? কেন মারিল? নহুষ কেন অজগর হইল?

শেষ মনে মনে স্থির হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রক্ষিপ্তসার এই পাইলেন—দেব। দেব অর্থে ধর্ম্ম।

তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সীতারামের মনের ভিতর উপস্থিত হইল। যেমন আলোক দেখিতে দেখিতে চোক্ বুজিলে, তবু অন্ধকারের ভিতর একটু রাঙ্গা রাঙ্গা ছায়া দেখা যায়, প্রথমে মনে হয়, ভ্রমমাত্র, তারপর বুঝা যায় যে, সব ভ্রম নয়, সত্য আলোকের ছায়া—সীতারাম সেই রকম একটু রাঙ্গা ছায়া দেখিলেন মাত্র। তারপর, যেমন বনস্থ

ভূপতিত পত্ররাশি মধ্যে প্রথম যেন একটু খদ্যোতোন্মেষবৎ অগ্নি দেখা যায়, বড় ক্ষীণ বটে, কিন্তু তবু আলো, তেমনি আলো বলিয়া, সীতারামের বোধ হইল। হায়! হৃদয়ের ভিতর আলো কি মধুর! কি স্বর্গ! অথবা স্বর্গ ইহার কাছে কোন ছার! যে একবার আপনার হৃদয়ে আলো দেখিয়াছে, সে আর ভুলে না! জগতের সারসুখ প্রতিভা। প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।

জোনাকীর মত তেমনি একটা আলোক, সীতারাম আপনার হৃদয়মধ্যে দেখিলেন। যেমন বনতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশি মধ্যে সেই খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, ক্রমে একটু একটু করিয়া বাড়ে, ক্রমে একটু একটু করিয়া জ্বলে, সীতারামও আপনার হৃদয়ে তাই দেখিলেন। দেখিলেন, ক্রমে অনেক শুষ্ক পত্র ধরিয়া গেল, ক্রমে সেই অন্ধকার ঘন আলো হইতে লাগিল।

ক্রমে সে শ্যামল পল্লবরাশি শ্যামলতা হারাইয়া উজ্জ্বল হরিৎপ্রভা প্রতিহত করিতে লাগিল, ফুলে ফলে, পাতায় লতায়, কাণ্ডে, দণ্ডে, উজ্জ্বল জ্বালা কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সব আলো, শেষ ঘোর দাবানল, সব অগ্নিময়, শত সূর্য্য প্রকাশ! তখন সীতারাম বুঝিলেন, হৃদয়ের সে আলোটা কি, বুঝিলেন হৃদয়ে সহসা যে প্রভাকর উদিত হইয়াছে, তাহার নাম—হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন। বুঝিলেন, এই সূর্য্যে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সীতারাম বুঝিবামাত্র ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। প্রতিভাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধৈর্য্য রক্ষা করে। প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করিয়া, বলিলেন, এই বাহু! ইহাতে কি বল নাই? কে এমন তরবারি ধরিতে পারে? কাহার বন্দুকের এমন লক্ষ্য! কাহার মুষ্টিতে এত জোর? এ রসনায় কি বাগ্দেবীর প্রসাদ নাই? কে লোকের এমন মন হরণ করিতে পারে। আমি কি কৌশল জানি না—"

সহসা যেন সীতারামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হৃদয়ের আলো একেবারে যেন নিবিয়া গেল। "এ কি বলিতেছি! আমি কি পাগল হইয়াছি! আমি কি করিতেছি! আমি কে? আমি কি? আমি ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা—সমুদ্র তীরের একটি বালি! আমার এত দর্প! এই বুদ্ধিতে হিন্দু-সাম্রাজ্যের কথা আমার মনে আসে! ধিক্ মনুষ্যের বুদ্ধিতে!"

তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত অব্যয় নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। [illegible] বুঝিলেন, তিনিই বাহুবল, তিনিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মচ্যুত যে বাহুবল, তাহা পরিণামে দুর্ব্বলতা।

সীতারাম তখন বুঝিলেন, ধর্ম্মই হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়। সীতারামের হৃদয় অতিশয় স্নিগ্ধ, সন্তুষ্ট ও শীতল হইল।

তখন প্রান্তর পানে চাহিয়া সীতারাম দেখিলেন, মাঠ অশ্বারোহী মুসলমানসেনায় ভরিয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান সেনা নির্গমনের পূর্ব্বেই ফৌজদারের হুজুরে, সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থে সেনা নির্গত না হইয়া কেবল বিদ্রোহীর ধৃতার্থ অশ্বারোহী সেনাগণ নির্গত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সেনা প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও না দেখিয়া, কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে, ধাবমান হইতেছিল। তাহারই একজন সীতারামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "তোম্ কোন্?"

সীতা। মনুষ্য।

সিপাহী। সো তো দেখ্‌তে হেঁ। নাম কিয়া তোমরা!

সীতা। কি কাজ্ বাপু তোমার নামে?

সিপাহী। তোম্ বদমাস্।

সীতা। হবে।

সিপাহী। খানব দোষ।

সীতা। অসম্ভব নহে।

সিপাহী। ডাকু হো?

সীতা। বোধ হয় কি?

সিপাহী। চোট্টা হোগে।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে?

সিপাহী। কিয়া বোলো?

সীতা। বলি তুমি আমার দিক করিতেছ কেন?

সিপাহী। তোম্‌কো গিরেফ্‌তার করেঙ্গে।

সীতা। আপত্তি কি?

সিপাহী। চল্‌।

সীতা। কোথায়!

সিপাহী। ফাটকমে।

সীতা। চল। কিন্তু তুমি ত ঘোড়ায়। আমি হাঁটিয়া তোমার সঙ্গে যাব কি প্রকারে?

সিপাহী। কদম কদম আও।

সিপাহী সাহেব কদম কদম চলিলেন। সীতারাম সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সিপাহী একজন পাইকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে হুকুম দিলেন যে, "এই ব্যক্তি চোর, ইহাকে ফাটকের জমাদ্দারের কাছে পঁহুছাইয়া দিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার শ্রীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাহাকে লইয়া এক নিভৃত ক্ষুদ্র বাটিকা মধ্যে গমন করিলেন, বলিলেন,—

"আইস, বাছা! এখানে বড় জাগ্রত কালী আছেন, প্রণাম করিয়া যাই। তিনি মঙ্গল করিবেন।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রী দেখিলেন, গৃহ বড় নিভৃত, তাহার এক ঘরে এক কালী-মূর্ত্তি, ফুলবিল্বপত্রে অর্দ্ধেক ঢাকা পড়িয়া আছেন। গৃহে কেহ নাই, কেবল এক অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। তিনিই দেবীর অধিকারিণী। চন্দ্রচূড়কে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "তর্ক বাবা যে গো?"

চন্দ্র। কেমন মা! মার পূজা চলিতেছে কেমন?

অশীতিপর বৃদ্ধার শ্রবণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ নহে। সে শুনিল, "তোমার বোন্‌পো আছে কেমন?" উত্তরে বলিল, "আজও জ্বর সারে নাই, তার উপর পেটের ব্যামো, মা কালী রক্ষা করিলে হয়। চন্দ্রচূড় এইরূপ দুই চারিটা কথাবার্ত্তা বৃদ্ধার সঙ্গে কহিবাতে শ্রী বুঝিল, বুড়ী ঘোর কালা। চন্দ্রচূড় তখন শ্রীকে বলিলেন, এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ঘরে তুমি আজকাল থাক। তার পর গঙ্গারাম সুস্থির হইলে, আমি তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইব। তোমার নিজ বাড়ীতে এখন একা থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষ মুসলমানের ভয়।"

শ্রী। ঠাকুর, মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কত দিন আর থাকিবে? শাস্ত্রে কি কিছুই নাই?

চন্দ্র। কিছু না, মা এ শাস্ত্রের কথা নয় মা। হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।

শ্রী। ঠাকুর। হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এই ত এখনই দেখিলেন? বলিতে বলিতে শ্রী, দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

চন্দ্র। যা দেখিলাম মা, সে তোমারই বল—এমন কি আবার হইবে?

দৃপ্তা সিংহী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। আবার মুখ তুলিয়া বলিল, "হিন্দুর গায়ে বলের এত অভাব কেন? কত লোকের বলের গল্প শুনি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় শ্রীর অলক্ষ্যে, শ্রীর আপাদমস্তক, নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বেশ বাছা বেশ! আমার মনের মতন মেয়ে তুমি। আমিও সেই কথাটা ভাবিতেছিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"হিন্দুর মধ্যে বলবান কি নাই? আছে বৈ কি। কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়। এই দেখ সীতারাম—সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত—অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না। কাজেই কে ধর্ম্ম রক্ষা করে?"

শ্রী। কারণ কি নাই?

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী আবার লজ্জায় মুখ নামাইল। বলিল "আমি অবলা আপনাকে কেন এত জিজ্ঞাসা করিতেছি জানি না, আমার মার শোকে, ভাইয়ের দুঃখে মন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাই আমার জ্ঞান বুদ্ধি নাই।"

চন্দ্রচূড় সে কৈফিয়ৎটা কাণেও না তুলিয়া, বলিলেন,

"কারণ ত ঘটে নাই, ঘটিলে কি হইবে বলিতে পারি না। সীতারাম যত দিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধ হয় তত দিন তিনি রাজদ্রোহ-পাপে সম্মত হইবেন না।"

শ্রী অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। চাতক পক্ষী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রচূড় তাহার মুখ প্রতি সেইরূপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শ্রী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে, সংজ্ঞালক্ষণ নাই দেখিয়া শেষে চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মা! তবে তুমি এক্ষণে এখানে বাস কর, আমি এখন যাই।"

শ্রী কোন উত্তর করিল না—কথা তাহার কাণে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না।

চন্দ্রচূড় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—প্রতিভা কখন ফুটে, কখন নিবে, কখন স্থির, কখন আন্দোলিত, চন্দ্রচূড় তাহাকে চিনিতেন, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষায় নীরবে শ্রীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শেষে দেখিলেন, শ্রী সুস্থিরা, প্রফুল্লমুখী, ভাস্বর কটাক্ষবিশিষ্টা হইল। তখন বুঝিলেন, এবার মেঘ বারিবর্ষণ করিবে—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিবে।

শ্রী, অল্প ঘোমটা টানিয়া,—অল্প সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল,"ঠাকুর! এখন কি একবার সে মাঠে যাওয়া যায় না?"

চন্দ্র। কেন? সেখানে এখন বিশেষ ভয়, চারি দিকে ফৌজ বেড়াইতেছে।

শ্রী। আমি সেখানে একটা কোন বিশেষ সামগ্রী হারাইয়া আসিয়াছি—আমার না গেলেই নয়। আপনি না হয় এইখানে থাকুন, আমি একা যাইতেছি। কিন্তু আপনি আসিলে ভাল হইত।

চন্দ্র। যে সাহস তোমার আছে, সে সাহস কি আমার নাই? চল, তোমার সঙ্গে যাইব।

তখন, শ্রী আগে, চন্দ্রচূড় পিছে পিছে, সেই মাঠে চলিলেন। সেখানে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল, একজন আসিয়া চন্দ্রচূড়কে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল,

"তোম্ কোন্ হো।"

চন্দ্র। এইত দেখিতেছ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। যজমানের বাড়ী পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ তাই গ্রামান্তরে যাইতেছি, কি করিতে হইবে বল—করি।

সিপাহী। আচ্ছা তোম্ যাও তোম্‌কো ছোড়্ দেতেহে। যেহি আবরৎ তোমারা কোন লগতী।

চন্দ্র। না বাপু ও আমার কেহ হয় না। এই বলিয়া চন্দ্রচূড় শ্রীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, এখন শ্রীর বুদ্ধিতে চলিতে হইবে।

তখন সিপাহী শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হো? বোলকে ঘর যাও। হম্ লোগোঁকো হুকুম নেহি হৈ কি অওরৎকে পকড়ে। শ্রেফ্ এক বেওয়া কো হম্ লোগ্ ঢুণ্ড়তে হেঁ।"

শ্রী। যে ঐ গাছের উপর দাঁড়াইয়া, তোমাদের দুর্দ্দশা করিয়াছিল?

সিপাহী। হাঁ—হাঁ—চণ্ডী বস্‌কী নাম হৈ।

শ্রী। চণ্ডী নাম নয়। চণ্ডী নাম হউক আর যা নাম হউক—আমিই সেই হতভাগিনী।

সিপাহী। (শিহরিয়া) তুম্‌!!

শ্রী। আমিই সেই হতভাগিনী।

সি। তোবা!! এছা মৎ [illegible] বোলো মায়ি মোম্ বহ নেহি। ঘর যাও।

শ্রী। তোমার কল্যাণ হউক আমি ঘরে চলিলাম।

এমন সময়ে আর এক জন সিপাহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আরে আবরৎ কো পকড়্‌তে হো কাহে?" প্রথম সিপাহী দেখিল, বিপদ। যদি দ্বিতীয় সিপাহীর সহিত স্ত্রীলোকটার কথাবার্ত্তা হয়, আর স্ত্রীলোক যদি স্বীকার করে, তবে প্রথম সিপাহী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা—প্রধান-বিদ্রোহিণীকে ছাড়িয়া দেওয়া অভিযোগ তাহার নামে হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব সেই দয়ার্দ্র সিপাহী অগত্যা বলিল, "যেস্কি তোম্ ঢুণ্ড়্‌তে হো সো যেহি হোতী হৈ।"

দ্বিতীয় সিপাহী। আল্লা আকবর্। চলো, বস্‌কী হুজুর মে লে চলো—হম্ দোনোকে বখ্‌শিস্ মিল্ যায় গা।

প্রথম সিপাহী। ভাই। তোম্ লে যাও। হমারা কুছ কাম হৈ।

দ্বিতীয় সিপাহী এ কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল—শ্রীর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল। প্রথম সিপাহী বড় বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনের নাম দুইটা বলা যাক—প্রথমের নাম খয়েরআলি, দ্বিতীয় পীরবক্স।

সিপাহীর কাছে ঘাড়ধাক্কা খাইয়া শ্রী মৃদু হাসিল। তখন সে ডাকিয়া, চন্দ্রচূড়কে বলিল,

"ঠাকুর! যদি আমার স্বামীকে চেনেন, তবে বলিবেন আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ" শুনিয়া চন্দ্রচূড়ের চক্ষে দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, তুমিই ধন্যা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সিপাহীরা পালে পালে বিদ্রোহী ধরিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা লাঠি চালাইয়াছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে অন্তর্হিত

অবস্থান পূর্ব্বক তামাসা দেখিতে লাগিল। যাহারা ধৃত হইল, তাহারা প্রায় নির্দ্দোষী। লোক ধরিয়া আনিতে হইবে, কাজেই সিপাহীরা যাহাকে পাইল, তাহাকে ধরিয়া আনিল। দোষীরা সাবধান ছিল, তাহাদিগকে পাওয়া গেল না, নির্দ্দোষীরা সতর্ক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই—তাহারা ধৃত হইতে লাগিল। কেহ হাঁ করিয়া সিপাই দেখিতেছিল, অতিসাহসী বলিয়া সে ধৃত হইল। কেহ সিপাহী দেখিয়া ভয়ে পলাইল, যে পালায় সে দোষী বলিয়া ধৃত হইল। কেহ সিপাহীর প্রশ্নে চোট পাট উত্তর দিল, সে চতুর, কাজেই, "বদমায" বলিয়া ধৃত হইল। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না,—অপরাধীই নিরুত্তর হয়, এই বলিয়া সেও ধৃত হইল। কেহ দুর্ব্বল, তাহাকে ধৃত করার কোন কষ্ট নাই, সিপাহীরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধৃত করিলেন, কেহ বলবান কাজেই দাঙ্গাবাজ, সেও ধৃত হইল। কেহ দরিদ্র, দরিদ্ররাই বদমায হইয়া থাকে, এজন্য সে ধৃত হইল; কেহ ধনী, ধনীরা টাকা দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া এই দাঙ্গা উপস্থিত করিয়াছে সন্দেহ নাই, তাহারাও ধৃত হইল। এইরূপে অনেক লোক ধৃত হইল। একজন মাত্র স্ত্রীলোককে ধরিবার আদেশ ছিল, যে গাছে চড়িয়া মার্ মার্ শব্দে হুকুম দিতেছিল, তাহাকে। একের স্থানে শত জনে শত জন স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিল। কেহ শুনিয়াছিল সে বিধবা অতএব অনেক বিধবা দেখিয়া ধরিল, কেহ শুনিয়াছিল সে সুন্দরী, সে সুন্দরী দেখিয়াই ধৃত করিল, কেহ শুনিয়াছিল, সে যুবতী, এজন্য অনেক এক কালীন বন্ধন ও পূজা প্রাপ্ত হইল। কেহ জানিয়াছিল যে, সেই বৃক্ষবিহারিণী মুক্তকুন্তলা ছিল, অতএব স্ত্রীলোকের এলো চুল দেখিলেই তাহাদের হুজুরে আনিয়া সিপাহীরা হাজির করিতে লাগিল।

এইরূপে ফৌজদারী কারাগার স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—ধরে না। তখন সে দিনের মত কারাগার বন্ধ হইল। সে দিন কয়েদীরা বন্ধ রহিল—তাহাদের নিস্‌বতে পরদিন যাহা হয় হুকুম হইবে। সীতারামও এই সঙ্গে আবদ্ধ রহিলেন। সীতারামকে অনেকেই চিনিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় করিতে পারিতেন, অথবা যাহাতে সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি সে চেষ্টা কিছুই করিলেন না। তাঁহাকে চিনে এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, ইঙ্গিতে তাঁহাকে চিনিতে নিষেধ করিলেন। তিনি মনে মনে এই ভাবিতে-ছিলেন, "আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই, তবে ইহা-দিগের মুক্তির কোন উপায় হইবে না।"

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারের একটি মাত্র দ্বার, প্রহরীরা সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

কেহ কিছু খাইতে পায় নাই। সন্ধ্যার পরে যে যেখানে পাইল, কাপড় পাতিয়া শুইতে লাগিল। সীতারাম তখন সকলের কাছে কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ ঘুমাইও না, ঘুমাইলে রক্ষা নাই।"

সকলে সভয়ে শুনিল। কথাটা কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না কিন্তু কেহ ঘুমাইল না।

পেটে ক্ষুধা—মনে ভয়, নিদ্রার সম্ভাবনা বড় অল্প। এক বার প্রহর বাজিয়া গেল—ঝিঁঝিট-খাম্বাজে নবতওয়ালা একটু মধুরালাপ করিয়া, আহারাদির অন্বেষণে নবতখানা হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন সীতারাম এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি কয়েদীর খেদোক্তি শুনিতে ছিলেন। তাহাদের কথা সমাপ্ত হইলে সীতারাম বলিলেন, "ভাই অত কাঁদা কাটার দরকার কি? আমরা মনে করিলেইত বাহির হইয়া যাইতে পারি।"

এক জন বলিল, "কেমন করিয়া যাইব?" সীতারাম বলিলেন, "কেন দ্বার ভাঙ্গিব। আর এক ব্যক্তি বলিল, "তুমি কি পাগল?" সীতারাম বলিলেন, "কেন বাপু! এখানে আমরা কত লোক আছি মনে কর?"

একজন বলিল, "তা জন শ পাঁচ ছয় হইবে। তাতে কি হলো?"

সীতারাম বলিলেন, "পাঁচশ লোকে একটা—দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারি না?"

সকলে হাসিতে লাগিল। একজন বলিল, "দরওয়াজা যে লোহার?"

সীতা। মানুষ কি মিছরির? না কাদার?

আর একজন বলিল, "লোহার কপাট কি হাত দিয়া ভাঙ্গিব? না দাঁত দিয়া কাটিব? না নখ দিয়া ছিঁড়িব?"

সকলে হাসিল।

সীতারাম বলিলেন, "কেন, পাঁচশ লোকের লাথিতে এক জোড়া কপাট কি ভাঙ্গে না? হোক না কেন লোহা—এক হয়ে কাজ করিলে, লোহার কথা দূরে থাক, পাহাড়ও ভাঙ্গা যায়, সমুদ্রও বাঁধা যায়। কাঠবিড়ালীতে সমুদ্র-বাঁধার কথা শোন নাই?"

তখন একজন বলিল, "লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। তা ভাই, না হয় যেন লোহার কপাটও ভাঙ্গিলাম—বাহিরে যে সিপাহী পাহারা?"

সীতারাম। কয় জন?

সে ব্যক্তি বলিল "দুই চারি জন থাকিতে পারে।

সীতারাম। এই পাঁচশ লোকে আর দুই চারি জন সিপাহী মারিতে পারিব না?"

অপর একজন কহিলেন, "তাদের হাতিয়ার আছে। আমরা আঁচড়ে কামড়ে কি করিব?"

সীতারাম বলিলেন, "এখন আমি তোমাদিগকে হাতিয়ার দিব।"

"তুমি হাতিয়ার কোথা পাইবে?"

"আমি সীতারাম রায়।"

শুনিয়া, যাহারা সীতারামের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতেছিল, তাহারা একটু কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া বসিল।

একজন বলিল, "বুঝিলাম, আমাদের উদ্ধারের জন্য আপনি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

যে কয় জনের সঙ্গে সীতারাম কথোপকথন করিতেছিলেন, সকলেরই এই মত হইল। সীতারাম তখন আর এক স্থানে গিয়া বসিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন, তাহারাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উদ্যত, এবং উত্তেজিত হইল। এইরূপে সীতারাম ক্রমে ক্রমে, অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ কৌশল, অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে সেই বহুসংখ্যক বন্দিবৃন্দকে একমত, উৎসাহিত, এবং প্রাণপাতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন।

তখন সীতারাম সেই সমস্ত বন্দিবর্গকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দাঁড়াইল। তখন সীতারাম তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। দ্বারের সম্মুখে প্রথম সারি, তার পর আর এক সারি, তার পর আর এক সারি—এই বরাবর। প্রতি শ্রেণী-মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে তিন তিন জন করিয়া বিভাগ করিলেন। আবার সেই তিন জনকে এমনঃ করিয়া দাঁড় করাইলেন যে, দুই জনের মধ্য দিয়া, একজন মনুষ্য যাইতে পারে। তাহাতে এই রূপ ফল দাঁড়াইল যে, অনায়াসে পলক মধ্যে কোন তিন ব্যক্তি পিছনের সারিতে পিছাইয়া দাঁড়াইতে পারে, আর পিছনের সারি হইতে তিন জন আগু হইয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইতে পারে—ঠেলাঠেলি হয় না।

এই সকল বন্দোবস্ত করিতে করিতে আবার প্রহর বাজিল।

"দগড়া নগড়া গড়াগড়ি" বলিয়া দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর বেহাগ রাগিণী যামিনীকে গম্ভীরা, মূর্ত্তিমতী, ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। তখন সীতারাম বুঝিলেন, উত্তম সময়; পাহারার সিপাহী ভিন্ন অন্য সিপাহী সকল ঘুমাইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষেরা নিদ্রিত। তখন সীতারাম দ্বারের সমীপস্থ তিন জনকে বলিলেন,—

"তোমরা তিন জন প্রথমে দ্বারে লাথি মার। গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে তিন বার মাত্র লাথি মারিবে। তার পর পিছে সরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু দেখিও, তিন খানা পা যেন একেবারেই কপাটের উপর পড়ে, অগ্রপশ্চাৎ হইলে সকল বৃথা। একেবারে তিন জন লাথি মারিবার স্থান এ কপাটে আছে—তাই মাপ করিয়া তিন তিন জন করিয়া সাজাইয়াছি। মুখে বলিও লছমীনারায়ণজিকি জয়!"

বন্দীরা বুঝিল। "লছমী নারায়ণজিকি জয়!" বলিয়া তিন জনে ঠিক এক তালে, প্রাণপণ শক্তিতে, সেই লোহার কপাটে পদাঘাত করিল।

বাহিরে চারি জন সিপাহী পাহারায় ঢুলিতেছিল, বজ্রের মত শব্দ সহসা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাহারা চমকিয়া উঠিল। কোথায় কিসের শব্দ তাহা না বুঝিতে পারিয়া, এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

এদিকে প্রথম তিন জন সরিয়া পিছনে গিয়াছে, আর তিন জন আসিয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইয়া সেই এক তালে তিন বার কপাটে পদাঘাত করিল। লোহার কপাটের তাহাতে কি হইবে? কিন্তু বড় ঝঞ্ঝনা বাজিতে লাগিল। এক জন সিপাহী বলিল, "কিয়া রে?"

"Prince Arthur & Hubert"—প্রিন্স আর্থার ও হিউবার্ট

চিত্রশিল্পী—ডব্লিউ. এফ. ঈম্‌স. R. A.]

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

কিন্তু ভিতর হইতে "লছমী নারায়ণকি জয়!" ভিন্ন অন্য কোন উত্তর হইল না। দ্বিতীয় সিপাহী বলিল,—

"শালা লোক কেওয়াড়ি তোড়্নে মাঙ্তাহৈ।"

তৃতীয় সিপাহী। কেওয়াড়ি খোল্কে, দো চার থাপ্পড় লাগা দেঙ্গে?

প্রথম সিপাহী। আরে যানে দেও। আপ হি সে বহুৎ লোক ঠাণ্ডা হো [illegible]।

এ সকল কথা বন্দীরাও বড় শুনিতে পাইল না। কেন না এখন, বড় ঝড়ের সময় [illegible] থামে না, তাহার যেমন উপর্য্যুপরি শব্দ থামে [illegible] লোহার কপাটের উপর পদাঘাত বৃষ্টি হইতেছিল—[illegible] যায় নাই। কয়েদীরা মাতিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সীতারাম তাহাদিগকে ধৈর্য্যবিশিষ্ট করিয়া, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, তাহাকে সেই থানে স্থির রাখিতে লাগিলেন। ফাটকের ভিতর কিছুমাত্র গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।

সিপাহীরা প্রথমে রঙ্গ দেখিতেছিল। মনে করিতেছিল যে, কয়েদীরা কৌতুক করিতেছে, এখনই নিবৃত্ত হইবে। ক্রমে দেখিল যে, সে গতিক নহে—ক্রমে কয়েদীদিগের বল বাড়িতে লাগিল। তখন তাহারা কয়েদীদিগকে [illegible]ত করা নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করিল। তিন জনে পরামর্শ এই করিল যে, তাহারা কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদিগকে ভাল রকম প্রহার করিয়া [illegible] করিবে।

তিন জনের মত হইল, কিন্তু একজনের হইল না। আলিয়ার খাঁ সকলের প্রাচীন—দাড়ি একেবারে শণের মত। সে বলিল, "বাবা! যদি সত্যই কয়েদী ক্ষেপিয়া থাকে, তবে আমরা চারি জনে কি তাহাদের থামাইতে পারিব? বরং দ্বার খোলা পাইলে, তাহারা আমাদের চারি জনকে পিষিয়া ফেলিয়া পিল পিল করিয়া পলাইয়া যাইবে! তখন আমরা কি করিব? বরং জমাদ্দারকে খপর দেওয়া যাক।"

দ্বিতীয় সিপাহী। কেন জমাদ্দারকে খপর দিবারই তবে প্রয়োজন কি? সত্য সত্য উহারা কপাট ভাঙ্গিতে পারিবে, সে শঙ্কা ত আর করিতেছি না। তবে বড় দিক্ করিতেছে—তার জন্য জমাদ্দারকে দিক্ করিয়া কি হইবে? আজ থাক, কাল প্রাতে উহাদিগের উচিত সাজা হইবে।

কিছুক্ষণ সিপাহীরা এই মতাবলম্বী হইয়া নিরস্ত রহিল। কয়েদীদিগের দ্বারভঙ্গের উদ্যম দেখিয়া নানাবিধ হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "বাঙ্গালী লোহার কপাট ভাঙ্গিবে, আর বানরে সঙ্গীত গায়িবে, সমান কথা।"

লোহা সহজে ভাঙ্গে না বটে, কিন্তু দেয়াল ফাটিতে পারে। লোহার চৌকাট দেয়ালের ভিতর গাঁথা ছিল। দুই চারি দণ্ড পরে আলিয়ার খাঁ জ্যোৎস্নার আলোকে সভয়ে দেখিল, অবিরত সবল পদাঘাতের তাড়নে, দেয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে বলিল "আর দেখ কি? জমাদ্দার ঠিক সংবাদ দাও এইবার কপাট পড়িবে।"

এক জন সিপাহী জমাদ্দারকে খবর দিতে শীঘ্র গেল। আর তিন জন হাঁ করিয়া কপাটপানে চাহিয়া রহিল।

দেখিল, ক্রমে দেয়াল বেশী বেশী ফাটিতে লাগিল। তার পর দেয়ালটা একটু কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে চৌকাট ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়িতে লাগিল—ঝম্ ঝম্ শব্দ বড় বাড়িয়া উঠিল। লাথির জোর আরও বাড়িতে লাগিল—বজ্রাঘাতের উপর বজ্রাঘাতের মত শব্দ হইতে লাগিল—শেষ, চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই লোহার কপাট সমেত দেয়াল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। "লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর জয়" শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল।

নির্ব্বোধ হিন্দুস্থানীরা, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সরিয়া দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যখন কপাট পড়িতেছে দেখিল, তখন দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। দুইজন বাঁচিল, কিন্তু একজনের পায়ের উপর কপাট পড়িয়া সে ভগ্নপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এদিকে কপাট পড়িবামাত্র ভিতর হইতে, বাঁধ ভাঙ্গিলে জলপ্রবাহের মত, বন্দিস্রোত পতিত কপাটের উপর দিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত প্রহরীকে পদতলে পিষিয়া, গভীর গর্জ্জনে ছুটিল। সর্ব্বাগ্রে সীতারাম বাহির হইয়া আহত প্রহরীর ঢাল সড়্কী তরবারি কাড়িয়া লইয়া আর দুই জনকে যমদূতের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তখনকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার [illegible] প্রহারে আহত হইয়া প্রহরিদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। জমাদ্দার সাহেব তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।

বন্দিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—

সীতারাম অসিহস্তে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বাহির হইয়া গেল, সীতারাম আবার একবার কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, এক কোণে এক জন বন্দীকে মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সে একবারও উঠে নাই বা কোন সাড়া দেয় নাই। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, সে পীড়িত। এখন তাঁহার মনে হইল, সে হয় ত বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে নাই, বা বাহির হইতে পারে নাই। সে বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য সীতারাম কারাগৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তেমনি ভাবে সেই কোণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া আছে।

সীতারাম ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! সবাই বাহির হইল, তুমি শুইয়া কেন?"

যে শুইয়াছিল সে বলিল, "কি করিব?" এত স্ত্রীলোকের গলা। চেনা গলা বলিয়াই সীতারামের বোধ হইল। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?" সে বলিল, "আমি শ্রী।"

এখন এই অংশ পরিত্যাগের প্রধান হেতুর কথা বলিব। প্রথমে "সীতারাম" উপন্যাসের প্রথম ভাগে বঙ্কিম যে মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, পরে সে উদ্দেশ্যই একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। সে উদ্দেশ্য এই—সীতারামকে আদর্শচরিত্র করিয়া তাঁহার দ্বারা হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনচেষ্টা। আনন্দমঠে ধর্ম্মসহায় করিয়া সন্ন্যাসিগণ একবার অরাজকতার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বর্ণিত হইয়াছে! "সীতারামে"ও প্রথমে মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে ধর্ম্মসহায় করিয়া সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, বর্ণিত হইয়াছিল। পরে কিন্তু "সীতারামের" এ উদ্দেশ্যই পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরিবর্ত্তিত "সীতারামে" প্রথম হইতেই সীতারামের রূপমোহ অবতারিত হইয়াছে। আদর্শ হিন্দু রাজা সীতারাম আঁকিবার চেষ্টা প্রথমেই হইয়াছিল, পরিবর্ত্তিত সীতারামে তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

যখন এই মূল উদ্দেশ্যই পরিবর্ত্তিত হইল, তখন ইহার আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি যে পরিত্যক্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সাম্রাজ্যস্থাপনে সহায়করূপ মৃন্ময় ও চন্দ্রচূড় প্রথমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রচূড় দ্বিতীয় চাণক্যের ন্যায় লোক উত্তেজিত করিতেছেন। চন্দ্রচূড়ের ম[illegible] অভিলাষ, সীতারাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ[illegible] তাই পাকে-প্রকারে সীতারামের সহিত মুসলমানে[illegible] বিরোধ ঘটাইতে চান। চন্দ্রচূড় শ্রীকে বুঝাইলে[illegible] "সীতারাম যতদিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত হন, বোধ হয় ততদিন তিনি রাজদ্রোহ পাপে সম্মত হই[illegible] না।" চন্দ্রচূড়ের চেষ্টাই এই অত্যা[illegible]র ঘটান। কেন এই অত্যাচার হইতেই সীতা[illegible] হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতি[illegible] হইবে। এই চেষ্টা[illegible]সূচনা[illegible]গুরীকে লইয়া তাঁহ[illegible] [illegible] বাড়ী যাওয়াতেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু চন্দ্রচূড়কে একাকী এ কাজ করিতে হইল না অতর্কিত ভাবে তাঁহার এক সহায় জুটিল। সে সহায় শ্রী এখনকার "সীতারামে" আমরা যে শ্রীর দর্শন পাই, সে [illegible] নহে; মহাভারতের দ্রৌপদীর ন্যায় নিজ অবমাননার দ্বা[illegible] স্বামীর উৎসাহদায়িনী, আনন্দমঠের শান্তির ন্যায় দৃপ্ত তেজস্বিনী শ্রী। সেই শ্রীর কার্য্য দেখিয়া চন্দ্রচূড় কাঁদি[illegible] কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "মা তুমিই ধন্যা।"

[illegible]ই শ্রী যখন চন্দ্রচূড়ের নিকট শুনিল যে, যতদি[illegible] সীতারাম মুসলমানের [illegible] প্রাপ্ত না হন, ততদি[illegible] তি[illegible] হিন্দুদের হইয়া অভ্যুত্থান করিবেন না, তখন [illegible] শ্রী [illegible]রামকে উত্তেজিত করিতে, সীতারামকে মহান্ প[illegible] [illegible] করিতে, আত্মনিগ্রহ উপেক্ষা করিয়া মুসলমা[illegible] সিপাহীর হস্তে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া কারাগারে গেল। যাইবা[illegible] সময় চন্দ্রচূড়কে বলিল, "ঠাকুর, যদি আমার স্বামীকে চেনেন তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।"

শ্রীর নিগ্রহে সীতারামকে উৎসাহিত করা বঙ্কিমে[illegible] উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেবল শ্রীর উদ্ধারের জন্যই সীতারামকে যদি কারাগারে যাইতে দেখিতাম, তাহা হইলে বলিতাম, সীতারাম স্বার্থপর। তিনি হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনে[illegible] অনুপযুক্ত। কারণ সীতারামের হাঙ্গামায় অনেক নির্দ্দো[illegible] ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধার কর[illegible] সীতারামের কর্ত্তব্য। বঙ্কিম তাই দেখাইলেন, সীতারা[illegible] স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। বঙ্কিম লিখিলেন, গ্রেপ্তার হইবার প[illegible] সীতারাম "ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন অথবা যাহাতে সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্র গাদাগা[illegible]

করিয়া থাকিতে না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি সে চেষ্টা কিছুই করিলেন না।........ ভাবিতেছিলেন "আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই, তবে ইহাদিগের মুক্তির কোনও উপায় হইবে না।" এইখানে সীতারামের মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইল ; যে আদর্শ বঙ্কিম অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তাহাও অক্ষুণ্ণ রহিল। তারপর কারাগার মধ্যে সীতারামের কার্য্যকলাপ, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোককে এক সঙ্গে আনা, পাঁচ ছয় শত ব্যক্তিকে সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা প্রভৃতি বর্ণনায় সীতারামের জননায়ক হইবার ক্ষমতা, অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশলের [illegible] পাওয়া যায়। নেতা হইবার, শাসক হইবার আদর্শ হিন্দুরাজ হইবার জন্য যে সকল গুণ প্রয়োজন, তাহার সকলই সীতারামে ছিল, তাহা দেখানই ঐ সকল ঘটনার উদ্দেশ্য।

সীতারামের মানসিক পরিবর্ত্তনও অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছিল। শব্দচিত্র হিসাবে "সীতারামের" পরিত্যক্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অতুলনীয়। ধীরে ধীরে সীতারামের মনে মুসলমানের অত্যাচারের কথার উদয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারের বাসনা, প্রথমে আত্মনির্ভর—পরে আত্ম-সহায়ে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের চিত্রটি অতি নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছিল। এই সমস্ত অবতারণার মূল কারণও—"সীতারামে"র অধুনা পরিত্যক্ত প্রধান উদ্দেশ্য—আদর্শ হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সব গেল। চন্দ্রচূড়ের নিশীথে উত্তেজনা, সীতারামের মানসিক অবস্থার চিত্র, কারাগারে গমন, শ্রীর কারাগার-বাস, কারাগার ভাঙ্গিয়া বন্দিগণের পলায়ন প্রভৃতি সমস্তই এই প্রধান উদ্দেশ্যের সহায়ক ছিল। মূল ছিন্ন হওয়াতে শাখা প্রশাখা সকলই ঝরিয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি দোষও ঘটিয়াছিল। মাঠে দাঙ্গার সময় বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন যে, চন্দ্রচূড়—

"অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে পথে শ্রীকে নগর হইতে প্রান্তরে আসিতে হইবে, সেই পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীকে দেখিয়া উপযাচক হইয়া তাহার সহায় হইয়াছিলেন। শ্রী তাঁহাকে চিনিত, তিনিও শ্রীকে চিনিতেন। সে পরিচয়ের কারণ পরে জানা যাইতে পারে।"

কিন্তু এ পরিচয়ের কারণ বঙ্কিম পরে কোথাও লেখেন নাই। এটুকুর কোনও বিশেষত্বও নাই। তা ছাড়া, কালীমন্দিরে সেই কালা বৃদ্ধার সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন ছিল না। মৃণালিনীতে এক কালা ব্রাহ্মণ আছে, দেবীচৌধুরাণীতেও এক কালা পরিচারিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে, আবার "সীতারামে"ও তাহার পুনরাবির্ভাব আমরা দেখিতে চাই না। ওটুকু বর্জ্জন করিয়া বঙ্কিম ভালই করিয়াছেন।

শ্রীও যেরূপভাবে প্রথমে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পুরুষোচিত ভাবগুলি স্পষ্ট দেখান হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে শ্রী অনেক সংযতা। একবার সে বৃক্ষে উঠিয়া সৈন্য-সঞ্চালন করে বটে কিন্তু সে সাময়িক উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায়—উত্তেজনা কাটিয়া গেলেই অবসাদ আসে, ও সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হয়। কিন্তু আগে বঙ্কিম শ্রীকে তেজস্বিনী ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ আর্কের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছিলেন। এখন যে শ্রী আমরা দেখি, সে ভাইকে বাঁচাইতেই সচেষ্ট কিন্তু আগেকার শ্রী দেশকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সীতারামকে উত্তেজনা করিতেছে। নিজে কারাগারে গিয়া স্বামীকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইতেছে। আগেকার শ্রী "দৃপ্ত সিংহীর মত ফুলিয়া উঠে।" সঙ্কোচে নতা বঙ্গবধূ সে নহে।

কিন্তু বঙ্কিম অনেকগুলি উপন্যাসে প্রথমে পুরুষভাবাপন্ন রমণী চরিত্রের অবতারণা করিলেও পরে সেগুলিকে কোমল প্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমে রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী "অসি ঘুরাইয়া" রাজপুত ও মোগলের মাঝে দাঁড়াইত। প্রথমে আনন্দমঠের শান্তি কি অশান্তই না ছিল! সেইরূপ প্রথমে সীতারামে শ্রীও তেজোগর্ব্বময়ী রমণী। পরে চঞ্চল স্থির হইল, শান্তি শান্ত হইল, শ্রীরও শ্রী ফিরিল।

শ্রীর পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু আমরা হিন্দু সম্রাজ্ঞীর আদর্শ হারাইলাম। বঙ্কিম প্রচারে প্রকাশিত সীতারামের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছিলেন,

"যিনি হিন্দুসাম্রাজ্যের সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত মহিষী কই? নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা?"

এই কয়পংক্তি পাঠ করিলেই বঙ্কিম কেন পূর্ব্বে শ্রীকে পূর্ব্বোক্তভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আদর্শ হিন্দু-সাম্রাজ্যের মহিষী, শ্রী তাই

কারাগার হইতে বাহির হইবার পরও সীতারামকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথম বর্ণিত হয়। পরে নিম্নোদ্ধৃত সেই অংশটুকু পরিত্যক্ত হয়।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কারারুদ্ধ বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া বিদায় দিয়া, সীতারাম দেখিতে আসিয়াছিলেন যে, আর কেহ কারাগার মধ্যে আছে কি না। আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, শ্রী সেখানে পড়িয়া আছে। সীতারাম বলিলেন, 'শ্রী! তুমি এখানে কেন?'

শ্রী। সিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা ইহাদের তে বোধসোধ নাই। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃ আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কে আপনার স্থানে যাও।......

শ্রী। আমার উপর এখন ব্রাহ্ম[illegible] দৌরাত্ম্য।

সীতা।...এ যে কারাগার......[একাদশ পরিচ্ছে

(ক্রমশঃ—)

কাঙালের ঠাকুর।

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

রিক্ত আমরা—নিঃস্ব আমরা—কিছুই মোদের নাই,
দেবতা মোদের কাঙাল-ঠাকুর কাঙাল হয়েছে তাই।
আমাদেরি লাগি সেজেছে ভিখারী,
হয়েছে নাবিক, সেজেছে দুয়ারী,
কাঙালের বেড়া বেঁধে দিয়ে যায় বালিকার বেশে ছলি,
আমাদের নায়ে পার হয়ে পায়ে সোণা করে যায় চলি।

আমার দেবতা সে যে আশুতোষ তুষ্ট ধুতুরা ফুলে,
ভস্ম মুষ্টি দিলেও ঝুলিতে তাও হেসে নিবে তুলে।
চণ্ডালে সে যে দিয়াছে গো কোল
কিরাতের দলে হরি হরি বোল
আমার জননী ফেলি হেম মণি হাতে নিয়েছিল শাঁখা,
ধূলি-মাখা পায়ে বটতরু ছায়ে তারি যে আলতা আঁকা।

কাঙাল সে যে গো বন্দী হয়েছে কাঙালের বাহুপাশে,
কাঙালেরে বক্ষে ধরে সে যে ঐ চক্ষের জলে ভাসে।
রাখালের দলে বাজাইল বেণু
চরাইল সে যে কাঙালের ধেনু

গোয়ালের ঘরে বহিল পশরা, ধরিল গোপীর পায়,
[illegible]বা তাহারে যত চাই সে যে তার বেশী মোদে' চায়

হুলুধ্বনি আর আলপনা-দাগে ডাকি তারে গৃহে মম,
আতপ চালের নৈবেদ্যই তার কাছে সুধাসম।
কুবেরের দান জননী না চায়,
জবাফুল মোরা দিই তার পায়,
জ্ঞানের ডঙ্কা কোথা পাবো, পুঁজি রামপ্রসাদের গানে-
সম্বল যাহা মোদের, দেবতা ভাল করে তাহা জানে।

বিদুরের ক্ষুদে, শামলীর দুধে, তার ক্ষুধা-তৃষা হরি
তার স্নান লাগি হৃদি-যমুনায় আঁখির কুম্ভ ভরি।
শিখীর পালক চুলে দেই গুঁজি,
তুলসী দূর্ব্বা আমাদের পুঁজি,
কিবা দিব তারে বনমালা আর গুঞ্জার রাখী বই—
কেমনে খুঁজিব বুঝিনা তাহায় বাহুতে বাঁধিয়া রই।

গুলিস্তানের গল্প

[শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, M. A.]

অষ্টাদশ গল্প

কতকগুলি দরবেশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহাদের মূর্ত্তি যেমন [illegible], অন্তরও সেইরূপ পবিত্র। কোন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাদিগকে মান্য করিতেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে একজন অনুপযুক্ত কার্য্য করাতে দাতার মনে ভাবান্তর হইল ও তিনি সকলের বৃত্তি বন্ধ করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহারা ঐ বৃত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হন, আমি সেই চেষ্টায় রহিলাম। মনে করিলাম, ভদ্রলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিব কিন্তু দ্বারস্থ হইলে দ্বারপাল আমাকে ভিতরে যাইতে দিল না অধিকন্তু আমাকে অনেক কটু কথা বলিল। আমি তাহাকে মনে মনে ক্ষমা করিলাম। [illegible]তগণ বলেন :—

চেনালোক যদি সঙ্গে না করে গমন
যেও-না উজীর, ধনী, রাজার ভবন।
দ্বারী কি কুকুর, যদি দেখে দীন জন,
একে গলা ধরে তার অপরে বসন।

ধনীর পার্শ্বচরগণ আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আমাকে সম্মানপূর্ব্বক তাহাদের প্রভুর নিকট লইয়া গেল এবং আমাকে উচ্চ আসনে বসিতে স্থান-নির্দ্দেশ করিল; আমি নিম্ন স্থলে বসিয়া বলিলাম :—

অনুগত ভৃত্য বলে জানিও আমায়,
আমার ভৃত্যের মাঝে বসা শোভা পায়।

ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক বলিলেন :—কি আশ্চর্য্য! এমন কথা ত শুনি নাই!

মাথার উপর যদি বসো মহাশয়!
সহিতে তা' পারি, তুমি প্রিয় অতিশয়।

অবশেষে আমি বসিলাম এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলাম, পরে আমার সেই বন্ধুদিগের কথা উত্থাপন করিলাম।

কি দোষ পাইলে প্রভু! আজি অকিঞ্চনে,
যে কারণ দেখ তারে ঘৃণার নয়নে?
করুণা, মহিমা আছে পরম ঈশ্বরে,
দোষীকেও তিনি অন্ন দেন অকাতরে।

ভদ্রলোকটি এই কথার প্রশংসা করিয়া আমার বন্ধুদিগের বৃত্তি যে দিন হইতে বন্ধ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে দিবার আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার বদান্যতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম ও তাঁহার সম্মুখে যে সাহসপূর্ব্বক আসিয়াছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিলাম। শেষে বিদায় লইবার সময়ে বলিলাম—

সকল কামনা হয় মক্কায় পূরণ
দূর হতে লোকে যায় তথা সে কারণ।
মাদৃশ জনের দুখ করিও মোচন,
ফলবান বৃক্ষ লোকে করে সংতাড়ন।

ঊনবিংশ গল্প

কোন রাজপুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে অতুল ধনলাভ করিয়া অকাতরে মুক্তহস্তে উহা সৈন্য ও প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

অগ্নি-সন্দীপনে ধূপ সুগন্ধ বিস্তারে,
না হলে কি ঘ্রাণেন্দ্রিয় কভু তৃপ্ত করে?
সুনাম লভিতে চাও সদা কর দান,
বীজ না ছড়ালে কভু হয় নাক ধান।

একজন অবিবেকী সভাসদ্, রাজপুত্রের অতি-দানের দোষ দিয়া বলিলেন—"আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ, ভবিষ্যতে কোন মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া, বহু কষ্টে এই সকল ধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। আপনি উহার অসদ্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হউন। সম্মুখে কত বিপদ আছে; শত্রুগণও অবসরের

অপেক্ষা করিতেছে, অতএব যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখন যেন অনটন না হয়।

এক রাশি ধন যদি কর বিতরণ,
তিল তিল করে দিলে হবে না তুলন।
প্রজা হ'তে লও রৌপ্য এক রতি করে,
বহুধন উপার্জ্জন হইবে অচিরে।

এই সকল কথা রাজপুত্রের উচ্চাশয় ও বদান্যতার বিপরীত বলিয়া তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন:—আমি স্বয়ং অর্থ ভোগ করিব ও দান করিব এই জন্য সর্ব্বশক্তিমান আমাকে এই রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন; অর্থ রক্ষা করিব বলিয়া, প্রহরী-স্বরূপ আমি নিযুক্ত হই নাই।

বিদ্যাবলে বহুধন কারুণ পাইল,
শেষে কিন্তু তার নাম সকলে ভুলিল।
ধর্ম্মপ্রাণ নুসিরাণ দয়ার সাগর,
কেহ ভুলে নাই তাঁরে যেন সে অমর।

বিংশ গল্প

একদা ধার্ম্মিকবর নুসিরাণ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। অরণ্য মধ্যে তাঁহার আহারের জন্য ভৃত্যগণ পশুমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছিল। লবণ না থাকাতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন ভৃত্যকে লবণ আনিতে পাঠান হইল। নুসিরাণ বলিলেন:—"মূল্য দিয়া লবণ লইবে, বলপূর্ব্বক প্রজার দ্রব্য লওয়া—এ কুপ্রথা যেন চলিত না হয় ও শেষে গ্রামখানি না নষ্ট হয়।" তাহারা বলিল:—"এমন সামান্য বিষয় হইতে কি হানি হইতে পারে?" তিনি বলিলেন:—"পূর্ব্বে অধর্ম্মের মূল অতি অল্পই ছিল, ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইল, এখন দেখ! কি বিষম আকারে পরিণত হইয়াছে!"

প্রজার একটি ফল রাজা যদি চায়,
সমূলে সে বৃক্ষ ভৃত্য উপাড়ি ফেলায়;
জোর করি ডিম্ব এক লইলে সুলতান,
সহস্র কুক্কুটে দেয় সৈন্যগণ টান।
অত্যাচারী নরপতি আশু পায় লয়,
প্রজাদের শাপ কিন্তু চিরদিন রয়।

একবিংশ গল্প

রাজস্ব-আদায় করিবার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্ম[illegible] সুলতানের ধনাগার পরিপূর্ণ করিবার মানসে প্রজা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি [illegible] তানের মনোরঞ্জন করিবার জন্য [illegible]াকে কষ্ট দেয়, [illegible] শক্তিমান ঈশ্বর সেই সকল [illegible] সুলতানের বি[illegible] উত্তেজিত করেন এবং অবশেষে তা[illegible]দের হস্তেই সুলতা[illegible] মৃত্যু হয়, এই মহাজনবাক্য [illegible] বিস্মৃত হইয়াছি

দাবানলে তৃণাঙ্কুর দগ্ধ নহে তত,
পীড়িতের আর্ত্তনাদে অত্যাচারী যত।

লোকে বলে সিংহ পশুরাজ আর গর্দ্দভ পশুর অ[illegible] তথাপি পণ্ডিতদিগের মতে মাংসভোজী সিংহ অপে[illegible] ভারবাহী গর্দ্দভ শ্রেষ্ঠ।

গর্দ্দভের নাহি বুদ্ধি, নাহি কোন জ্ঞান,
কিন্তু ভার বহে তাই এত মূল্যবান।
সুনৃশংস অত্যাচারী মানবের চেয়ে,
শ্রেষ্ঠ ভারবাহী গাধা, বলদ—উভয়ে।

[illegible]র্ম্মচারীর অত্যাচারের [illegible] রাজা কো[illegible] সু[illegible] কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে অশে[illegible] যন্ত্র[illegible] দিয়া শেষ তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

তুষিতে অক্ষম যদি হও প্রজাগণ,
পড়িবে না সুলতানের তুমি সুনয়নে।
ক্ষমা যদি আশা কর ঈশ্বর সদনে,
কর সর্ব্বজীবে তাঁর দয়া সযতনে।

যে ব্যক্তি তাহাদিগকে পীড়ন করিত, তাহাদের মধ্যে এক জন তাহার মস্তক ধূলায় অবলুণ্ঠিত দেখিয়া, তাহার দুর্দ্দশার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রভুত ক্ষমতা আছে, আছে বাহুবল,
তা বলে কি পরধন লুটিবে কেবল?
করিলেও কোন মতে গলাধঃকরণ,
সে হাড় উদর শেষে করে বিদারণ।

দ্বাবিংশ গল্প।

একদিন এক অত্যাচারী ও নৃশংস সৈন্যাধ্যক্ষ কোন সাধুর মস্তকে প্রস্তর ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। সাধুর

প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি প্রস্তরখণ্ড আপনার নিকট রাখিলেন। এদিকে রাজা কালক্রমে সৈন্যাধ্যক্ষের উপর কুপিত হইয়া তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। এই সুযোগে সেই দরবেশ আসিয়া সেই প্রস্তর তাঁহার মস্তকে মারিলেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল :—"তুমি কে? ও আমাকে কেন মারিলে?" তিনি বলিলেন :—"আমি অমুক, আমাকে অমুক দিনে তুমি এই প্রস্তর ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলে।" সে ব্যক্তি বলিল :—"তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?" দরবেশ বলিলেন :—"তুমি পদস্থ ছিলে বলিয়া আমি তোমাকে এত দিন ভয় করিতাম, আজি তোমাকে কারাবদ্ধ দেখিয়া অবসর পাইয়াছি ;" পণ্ডিতেরা বলেন :—

অযোগ্য পুরুষ যদি উচ্চ পদ পায়
সুবুদ্ধি বাহিরে তাকে সম্মান দেখায়।
না থাকে তোমার যদি ধারাল নখর,
দুষ্ট সহ দ্বন্দ্ব নাহি হবে শুভকর।
লৌহসম সুকঠিন বিপক্ষের কর,
ধরিলে কোমল হস্তে লাগিবে বিস্তর।
[illegible] থাক [illegible];
সুখী হবে শত্রুশির শেষে চূর্ণ করে॥

ত্রয়োবিংশ গল্প

কোন রাজার এক দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। গ্রীক দেশীয় কতিপয় চিকিৎসক সমবেত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত কোন ব্যক্তির পিত্ত সেবন করা ভিন্ন সে রোগের কোন ঔষধ নাই। রাজাজ্ঞায় সেরূপ লোকের অন্বেষণ হইতে লাগিল। শেষে কর্ম্মচারীরা বৈদ্যদের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত এক কৃষকের পুত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে রাজসমীপে আনিল। রাজা তাহার পিতামাতাকে ডাকিয়া, প্রচুর অর্থ দিয়া, সন্তানের প্রাণনাশের সম্মতি পাইলেন। কাজিও রাজার আরোগ্যের জন্য প্রজার প্রাণবধ বৈধ এই মত প্রকাশ করিলেন। জল্লাদও উপস্থিত হইল। এমন সময়ে রাজা দেখিলেন, যুবক ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া যেন মনে মনে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছে। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন!—"এমন অবস্থায় তাহার হাসিবার কারণ কি?" সে বলিল ;—সন্তান পিতামাতার চির আদরের ধন ; যদি সে সন্তানের প্রতি কেহ অন্যায় করে, তাহা হইলে পিতামাতা কাজিকে জানায়, শেষে রাজা তাহার বিচার করেন। আমার পিতা আমায় মৃত্যুমুখে দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কাজিও আমার মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন ; সুলতান আমার সর্ব্বনাশে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে, এই আশায় আছেন ; এমন অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভিন্ন আমাকে আর কে রক্ষা করিবে?

কার কাছে অভিযোগ করিব এখন?
বিচারের জন্য কার লইব শরণ?

ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ করুণ রসে দ্রবীভূত হইল ও তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন :—"এই নিরপরাধ যুবকের রক্তপাত করা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর।" অতঃপর রাজা যুবকের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রচুর ধনদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। লোকে বলে, রাজা সেই দিনই ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিলেন। এই প্রসঙ্গে নাইল নদীর তীরে এক মাহুত একদা যে কবিতা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। কবিতাটি এই :—

পিপীলিকা মাড়াইলে কত ক্লেশ তার
বুঝিবার নাহি থাকে ক্ষমতা তোমার ;
তবে ভেবে দেখ হস্তী মাড়ালে তোমায়,
কত কষ্ট পাবে তুমি তার যাতনায়।

চতুর্বিংশ গল্প

পারস্য দেশের কোন রাজার একজন ক্রীতদাস পলায়ন করিয়াছিল। কতিপয় কর্ম্মচারী তাহার অনুধাবন করিয়া তাহাকে শেষে ধরিয়া আনিল। তাহার উপর রাজমন্ত্রীর বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাহার প্রাণবধের পরামর্শ দিলেন, যেন তাহার দৃষ্টান্তে অন্য কোন ক্রীতদাস এরূপ কর্ম্ম করিতে না পারে। রাজার সম্মুখে দাস ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া বলিল :—

তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য নাহি অন্য গতি,
তুমিই বিচারপতি, কি করিব স্তুতি।

আমি এতকাল আপনার সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছি; আমার ইচ্ছা নহে যে, ঈশ্বর যখন বিচার করিবেন, তখন আমার রক্তপাতের জন্য আপনি দায়ী হইবেন। বিনা অপরাধে আমার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা করেন, করুন কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত হইলেই ভাল; কবর হইতে উত্থানের দিন আমার প্রতি অবিচার করাতে আপনার যেন শাস্তি না হয়।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন:—"শাস্ত্রে কি বলে তাহা ঠিক বুঝিব কেমন করে?" সে বলিল:—"আমায় এই মন্ত্রীকে বধ করিতে অনুমতি প্রদান করুন, পরে এই অপরাধের জন্য আমার প্রাণবধের আজ্ঞা দিবেন, তাহা হইলেই আপনার বিচার শাস্ত্রানুগত হইবে।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আপনার কি মত?" মন্ত্রী বলিলেন:—প্রভো! আপনার পিতার প্রেতাত্মার মঙ্গলকামনায় তাঁহার কবরের নিকট এ দুষ্ট বাচালের স্বাধীনতা দান করুন, তাহা হইলে সে আর আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আমার দোষ, আমি পণ্ডিতদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন:—

সমরে যাহার হস্ত ক্ষিপ্র অতিশয়,
যুঝিতে তাহার সহ মরণ নিশ্চয়।
শত্রু প্রতি শরক্ষেপ করিবার আগে,
দেখ যেন তার বাণ তোমারে না লাগে।

হেলেন ও প্যারিস

মুক্তি

[শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার]

বাহির হইতে বৃদ্ধ হৃদয়নাথের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক উচ্চ শোনা যাইতেছিল। গম্ভীরপ্রকৃতি হৃদয়নাথকে পূর্ব্বে কেহ এরূপ ভাবে কথা কহিতে শোনে নাই সুতরাং আজ বাড়ীর লোকে ও রাজীবপুরের দুই এক জন লোকে যাহারা কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কক্ষের ভিতরের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

শোনা গেল, "দেখ বাপু অমরনাথ, তুমি এখন ছোটটি নও, বয়স হইয়াছে, যাহা বলি তাহা শোন। তুমি যখন আমার সহিত দেখা করিবার জন্য পত্র দিয়াছিলে, তখনই মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে এখানে আসিতে বারণ করিয়া দিই ; কিন্তু তুমি সে কথা লিখিবার অবসর পর্য্যন্ত আমাকে দাও নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম—তুমি [illegible] জন্য এখানে আসিতেছ এবং আমিও সাবধান হইয়াছি। তুমি এখানে না আসিলেই ভাল করিতে, তোমার মুখদর্শন করাও—"বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

অস্বাভাবিক জড়তাসম্পন্ন আর একটি কণ্ঠে তাহার পর শোনা গেল, "আপনি একমাত্র পুত্র আমাকে আপনার সকল সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া শশী দাদাকে আপনার বিষয়ের অধিকারী করিলেন, এ কথা শুনিয়াছি। শুনিয়া আমি কিছুমাত্র বিস্ময় অনুভব করি নাই, তাহা সত্যই বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান আমার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে উদ্ধারের একটা উপায় শীঘ্র না করিয়া দিলে—"

পুত্রের বক্তব্য শেষ না হইতেই বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তোমার অবস্থা জানিবার জন্য আমি বিন্দু মাত্রও উৎসুক নহি। আমার পুত্র হইয়া তুমি যেরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছ, তাহাতে আমাদের কুলে ত যথেষ্ট কলঙ্ক লেপন করিয়াছ অধিকন্তু কি মুখ লইয়া তুমি এখানে দেখা করিতে আসিয়াছ, তাহাও আমার ধারণার অতীত। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, তোমার অবস্থার কথা বলিয়া আমার মনে যে দয়ার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবে সেরূপ পিতা আমি নহি, এবং এ কথাও তুমি বেশ জান,—সুতরাং আমাকে নিরর্থক বিরক্ত করিতে আসা তোমার পক্ষে কত দূর যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই—রাইচরণ!"

ভৃত্য রাইচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলে হৃদয়নাথ তাহাকে তামাক দিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন ও কিছুক্ষণ পরে তাম্রকূট-সেবনে তাঁহাকে অতিরিক্ত মনোযোগী দেখা গেল। কক্ষে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত আছে, তাহা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন।

অমরনাথ কঠিনচিত্ত পিতার নিকট যে এরূপ ব্যবহার পাইবে, তাহা সে কতকটা অনুমান করিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু দারিদ্র্য যখন তাহার জীর্ণদংষ্ট্রা বাহির করিয়া চিত্তকে অস্থির করিয়া তোলে, তখন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। অমরনাথেরও এইরূপ দশা হইয়াছিল, দৃঢ়চিত্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতাকে সে বিলক্ষণই চিনিত ;—চিনিয়াও অনেক চিন্তা ও সঙ্কোচের পর অবশেষে সে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ফল যে ঠিক এইরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে কতকটা অনুমান করিলেও সম্পূর্ণ অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা পিতাকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে, হয় ত কঠিনচিত্ত পিতার হৃদয় দ্রব হইতেও পারে। কিন্তু সে আসিয়া দেখিল যে, পিতাকে সে এখনও সম্পূর্ণ চিনিতে পারে নাই। অধিক বাক্-বিতণ্ডা নিষ্ফল জানিয়া অমরনাথকে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিতে হইল।

২

উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে একদিন হৃদয়নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শশিভূষণের সহিত অমরনাথের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল :—

শশী। খুড়া-মহাশয়ের মৃত্যুর কথা বোধ করি, তুমি শুনিয়া থাকিবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কিছু বলিয়া যাইতে

পারেন নাই, তাহা আমি এখানে আসিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অনুসারে তোমায় কোনও সংবাদ দেওয়া হয় নাই জানিয়া আমিই তোমাকে এ সংবাদ পাঠাই ও আমার সহিত দেখা করিবার জন্য লিখি। তোমাকে এখানে ডাকাইয়া পাঠাইবার অভিপ্রায় কি তাহা বোধ করি, তুমি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়া থাকিবে—

অমর। বাবা ত আর অনুমান করিবার জন্য কিছু রাখিয়া যান নাই, তোমার যাহা বলিবার আছে, তাহাই তোমার মুখে শুনিবার জন্য এতটা কষ্ট করিয়া আসা—বিষয়ের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে শেষ কথাটা শুনিবার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার না করিলেও চলিতে পারিত, কিন্তু—

শশী। কিন্তু কি?

অমর। কিন্তু আর কি! যাহার সব গিয়াছে, সে তবু আশা ত্যাগ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, উইলে তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী তোমাকে করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জগতের সম্মুখে ন্যায্য অধিকারীকে আজ পথে দাঁড় করাইয়া তিনি কি সুবিচারই করিয়া গিয়াছেন?

অমরনাথের মুখনিঃসৃত সুরাগন্ধে কক্ষটি প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। শশিভূষণ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "দেখ, খুড়া-মহাশয়ের প্রতি তোমার আর যাহা বক্তব্য তাহা অন্যত্র ব্যক্ত করিতে পার, তাঁহার ন্যায় দেবতুল্য ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিলে এখন আর কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত স্থানে গিয়াছেন। আমার সমক্ষে তাঁহার প্রতি তোমার বক্তব্য প্রকাশ করা যে আমার বিশেষ প্রীতি-কর হইবে না, তুমি তাহা বেশ জান,—জানিয়াও—"

অমর। বাঃ দেখিতেছি যে, ইহারই মধ্যে তুমি বিষম রুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছ! বাবার মৃত্যুর পর তোমার এইরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তনের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাবা ত চিরজীবনের জন্য আমাকে যথেষ্ট সুখী করিয়া গিয়াছেন, এখন দেখিতেছি, শুভানুধ্যায়ী তুমিও আমার সে সুখবৃদ্ধির পক্ষে কম যত্নবান নহ। এখন যাহা বলিবার জন্য আমাকে ডাকাইয়াছ, দয়া করিয়া তাহা শীঘ্র শেষ করিয়া ফেল। দরিদ্র বলিয়া যে আমার সময়ের মূল্য অত্যল্প, তাহা মনে করা—

শশিভূষণ অমরনাথের কথায় বাধা দিয়া কহিল, "দে[illegible] অমর, খুড়া-মহাশয় যে তোমার প্রতি অন্যায় করি[illegible] গিয়াছেন, এ কথা তোমার মনে অহরহ জাগিতেছে, তাহ[illegible] আমি বেশ বুঝিতেছি,—হয় ত ইহাই স্বাভাবিক। কি[illegible] তাঁহার প্রতি তোমার ব্যবহারটা একবার ভাবিয়া দেখ তুমি মাতৃহীন হইলে তোমাকে তিনি ক[illegible] যত্নে মানুষ করি-বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুত্রই যে শেষ বয়[illegible] তাঁহার কিরূপ পীড়াস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তোমা[illegible] না বলিলেও চলে। তুমি আজ আপনাকে আশ্রয়শূন্য [illegible] উপেক্ষিত মনে করিতেছ কিন্তু খুড়ামহাশয়ের কথাটা[illegible] একবার ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এক মাত্র পুত্র তোমা[illegible] সম্বন্ধে কত আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলে[illegible] জানি, তুমিও জান; সমাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তি[illegible] তোমাকে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ-শিক্ষার অধিকারী করিবার জন্য আধুনিক সভ্যতার তীর্থক্ষেত্র ইংলণ্ডে পাঠাইতে কিছুমা[illegible] সঙ্কোচ ও দ্বিধা বোধ করেন নাই; কিন্তু সেই সুদূ[illegible] প্রবাস-ভূমি হইতে যখন তুমি জ্ঞান-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে সভ্য[illegible] [illegible] কতকগুলা আবর্জ্জনা লইয়া দেশে ফিরিলে, খুড়া-মহ[illegible] অবস্থা স্মরণ করিলে আজও চক্ষে জল আ[illegible]। তোমার সে সময়কার দুর্ব্যবহারের কথা মনে হইলে এখ[illegible]ও আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু তোমার [illegible] খুড়া-মহাশয়ের তৎকালীন ব্যবহার একবার স্মরণ করিয়া দেখ। বাহিরে তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও তাঁহার অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় করুণার ধারা বহিত। তোমার এত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি তোমাকে স্বতন্ত্র মাস-হারা দিয়া আসিয়াছেন, তোমার যাহাতে অর্থকষ্ট না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, শেষ তুমি যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলে—"

অমর বিরক্ত হইয়া কহিল, "নাঃ আমি চলিলাম। বেশ সময় বুঝিয়া আজ কথাগুলি শুনাইবার জন্য আমাকে ডাকাইয়া আনিয়াছ, এ যেন অনেকটা তোমার বর্ত্তমান বিষয়-অধিকারের কৈফিয়তের ন্যায়; তোমার এ সকল উপদেশ শোনার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। তুমি পরম সুখে আমার পিতার বিষয় ভোগ কর,—দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য তোমার অযাচিত উপদেশের কোন দরকার নাই—আমি চলিলাম।"

গমনোদ্যত অমরনাথকে শশিভূষণ বসাইয়া কহিল, 'দেখ রাগ করিবার সময় এ নহে, তোমাকে যাহা বলিবার ছিল, তাহা এখনও বলা হয় নাই, কথাগুলি শুনিয়া গেলে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না।" অমরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার যাহা বক্তব্য তাহা সোজা কথায় শীঘ্র শেষ করিয়া ফেল না। আমাকে এখনি ফিরিতে হইবে, কতকগুলা বাজে কথা শুনিবার সময় আমার নাই।"

অমরনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে শশীভূষণ শান্ত ভাবে বলিল, "খুড়া-মহাশয়ের মৃত্যুর পর শুনিলাম যে, তিনি আমাকে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া আমি কিছু মাত্র বিস্ময় অনুভব করি নাই। কিন্তু তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমার সম্পত্তি তোমাকেই যথাসম্ভব শীঘ্র সমর্পণ করিব। কিন্তু সম্প্রতি তোমার বর্ত্তমান অবস্থার [illegible] লইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হইয়াছে। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, এই বিপুল সম্পত্তি এখন তোমার হাতে পড়িলে ইহার অস্তিত্ব বেশী দিন থাকিবে না; সুতরাং আমি মনে করিয়াছি যে, খুড়ামহাশয় পূর্ব্বে যেমন তোমার মাসহারা দিতেন, আমিও সেইরূপ দিব—সংসার-যাত্রার পক্ষে তোমার তাহা অত্যল্প নাও হইতে পারে—"

গমনোদ্যত অমরনাথকে শশিভূষণ বসাইয়া কহিল, দেখ রাগ করিবার সময় এ নহে

মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও দারিদ্র্যনিষ্পীড়িত অমরনাথের চক্ষে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার বলিবার ইচ্ছা নাই,—জীবনের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিবার এই একটা সুযোগ বলিয়া মনে হয়। ভবিষ্যতে যদি শুনি যে, তুমি এ সুযোগ নষ্ট কর নাই,তাহা হইলে ভাই আমি বড়ই সুখী হইব।"

"তোমার কথা শেষ হইয়াছে, আমি এখন আসি। তোমার অনুগ্রহপূর্ণ প্রস্তাবের কথা আমি বিবেচনা করিয়া পরে তোমাকে জানাইব।" এই বলিয়া অমরনাথ একটুও অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজীবপুরের মল্লিকদের বাটীর ত্রিতলের একটি নিভৃত কক্ষে ফাল্গুনপূর্ণিমা আপনার মোহ বিস্তার করিতেছিল। নিকটস্থ বাগানের চাঁপাগাছের ঘনপত্রের ভিতর হইতে একটা পাপিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। উন্মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া দক্ষিণা বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া শশিভূষণের স্ত্রী কমলিনীর অযত্নসংন্যস্ত কেশরাশিকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছিল। বাতায়ন-পার্শ্বে শশিভূষণ উপবিষ্ট। তাঁহার স্ত্রীর হস্তে একখানি বহি। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে উভয়ে মিলিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করা তাহাদের একটা অভ্যাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর পুরাতন ও আধুনিক কয়েকজন কবির পুস্তকরাজি সজ্জিত। কমলিনীর হস্তে যে কাব্যগ্রন্থখানি ছিল, তাহা সে শশিভূষণকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। পড়িতে পড়িতে মধ্যে যখন সে

কমলিনী তাহার স্কন্ধে হাত রাখিলে শশিভূষণের চমক ভাঙ্গিল

অধিবাসী? তোমাকে দেখিতে পাও যায়, কিন্তু কাছে পাওয়া যায় না। শশিভূষণ আপনাকে সামলাইয়া লই কমলিনীকে পার্শ্বে বসাইয়া গম্ভী ভাবে কহিল, "দেখ এমন সুন্দ রাত্রি, এমন আকাশ-বাতাস সমস্ত এক মুহূর্ত্তে যাহার দ্বারা মিথ্যা হই যাইতে পারে, এমন পরশ-কাটি সন্ধান আমি জানি!" কমলিনী হাসি কহিল, "যদি জান ত সেটা বাহি করিয়া এমন রাত্রিটা মাটি করিও না বরং তাহার পরিবর্ত্তে এমন কো পরশ-কাটির সন্ধান যদি জান, যাহাতে প্রত্যেক রাত্রিই এমন জ্যোৎস্নাময় হয় ত সেটা পরীক্ষা করিয়া দেখ বলিয়া কমলিনী শশিভূষণের আর এক কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। শশিভূষণ তাহ লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া গেল, "দে ... কয়দিন হইতে তোমাকে একটা কথা বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই, আজ এই সময় সেই কথাটি বলিবার এত আগ্রহ মনে মধ্যে কেন জাগিতেছে, তাহা জানি না —কথাটি এই যে, শীঘ্রই আমাদে এই বাটী ও সম্পত্তি ছাড়িয়া অন্য

একবার আসিল, তখন দেখিল, শশিভূষণের দৃষ্টি জ্যোৎস্না-ধৌত অসীম আকাশের প্রতি স্থির ভাবে নিবদ্ধ। কমলিনী যাহা পড়িতেছে কিছুই তাহার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। শশিভূষণের এই অবস্থা দেখিয়া কমলিনী ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিলে শশিভূষণের চমক ভাঙ্গিল। কমলিনী ঈষৎ অভিমানভরে বলিয়া উঠিল, "তুমি আজ আছ কোথায়? এতক্ষণ এই বহিখানি পড়াই আমার বৃথা হইল। এমন চমৎকার রাত্রি, জ্যোৎস্না, ফুলের সৌরভ, দক্ষিণা বাতাস, সবই আছে, কেবল তাহার মাঝে তুমি নাই! তোমার আজ হইয়াছে কি? মনে হইতেছে, আকাশের কোণে ঐ যে তারাটি দেখা যাইতেছে, তুমি তাহারই

যাইতে হইবে। এ বাটীতে আমাদের আর কোনও অধি কার নাই। এই বিষয়সম্পত্তি যে অমরকেই প্রত্যর্প করা উচিত, তাহার প্রমাণ আমি সম্প্রতি পাইয়াছি।"

লোকে হঠাৎ খুব বেশী আঘাত পাইলে যেমন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে, কমলেরও তাহাই হইল, সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না। শশিভূষণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, গত সপ্তাহে খুড়া মহাশয়ের অযত্নরক্ষিত একটা পুরাতন বাক্সের উপর আমার দৃষ্টি পড়ে ও তাহার ভিতর কি আছে তাহা দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়। বাক্স খুলিয়া কয়েকখানি পুরাতন চিঠিপত্র গোছাইতে গোছাইতে একটা কি কাগজের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাগজ

খানি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, উহা খুড়ামহাশয়ের শেষ উইল। তারিখ দেখিয়া বুঝি, তিনি তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে উহা করিয়া গিয়াছেন। এই উইল তিনি পূর্ব্বের উইলের—যাহাতে তিনি আমাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া গিয়াছিলেন—সে কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরিবর্ত্তে অমরকেই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী ঠিক করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ এই সম্পত্তিতে আমাদের আর কোনও অধিকার নাই, অমরের বিষয় অমরকেই যথাসম্ভব শীঘ্র প্রত্যর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।"

শশিভূষণ এক নিঃশ্বাসে সব কথাগুলি বলিয়া গেল। মুখে সে কোনরূপ ভাব প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে কথাগুলি বলিয়া সে শান্তি বোধ করিল। তাহার বক্তব্য কথাগুলি কেমন করিয়া সে কমলিনীর নিকট প্রকাশ করিবে, এ কয় দিন তাহা একটা বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া ছিল। বক্তব্য শেষ হইয়া গেলে তাহার মনে হইল, যেন একটা গুরুভার মন হইতে নামিয়া গেল।

শেষ উইলখানি পাইবার দিন [illegible] শশিভূষণের অন্তরে কি তুমুল সংগ্রামই বাধিয়া উঠিয়াছিল! ইচ্ছা করিলেই সে উইলখানি ভষ্মসাৎ করিয়া নিষ্কণ্টক হইতে পারিত কিন্তু ন্যায়পরায়ণ শশিভূষণ ন্যায্য অধিকারীকে যতক্ষণ বিষয় প্রত্যর্পণ করিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি ছিল না। হৃদয়নাথের বিপুল সম্পত্তি তাহাকে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছিল। কিন্তু একটা কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। রাজীবপুর গ্রামে আসিয়া গ্রামের কল্যাণার্থ সে যে কয়টি মঙ্গল-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা সব অসমাপ্ত রাখিয়াই যাইতে হইবে, এই তাহার দুঃখ। গ্রামের দীনদরিদ্র ও বিধবা-অসহায় প্রভৃতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার চিত্ত উদ্বেলিত হইতেছিল। অমরনাথের হস্তে বিষয় অর্পিত হইলে সে যে, গ্রামের কল্যাণকল্পে কিছু করিবে না, ইহা স্থির-নিশ্চিত। বিষয় তাহার হস্তগত হইলে তাহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক হইবে। অমরনাথের সম্বন্ধে শশিভূষণ ইতঃপূর্ব্বে যে সংবাদ পাইয়াছে, তাহাতে অমরনাথ যে ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে, তাহা সে জানিতে পারিয়াছিল। তাহার একবার মনে হইল যে, এরূপ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন লোককে তাহার বিষয় প্রত্যর্পণ করা হয় ত অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার অন্তরপ্রকৃতি ইহা স্বীকার করিতে চাহিল না সুতরাং বিষয় ফিরাইয়া দেওয়া ভিন্ন তাহার আর কোনও উপায়ই রহিল না।

কমলিনীকে কথাগুলি বলিবার পর শশিভূষণ যেন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে বিশীর্ণ দেখাইতে লাগিল। কমলিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এ কয় দিন হইতে তোমাকে চঞ্চল দেখিতেছি, তুমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাক বলিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর মাত্র আমি পাই নাই, এখন বুঝিতেছি, কি দুঃসহ বেদনা তোমাকে এ কয়দিন পীড়া দিতেছিল। কিন্তু কেন যে তুমি ইহা আমার নিকট গোপন রাখিয়াছিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দুঃখদারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লওয়াই যদি—"শশিভূষণ কমলিনীর কথায় বাধা দিয়া কহিল, "আমার জন্য ভাবিও না কমল, ভবিষ্যতে তোমার অবস্থা—" কমলিনী বলিয়া উঠিল, "তোমার নিকট থাকিয়া আমি যাহা পাইয়াছি তাহা আমার জীবন-যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট নহে কি? কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া আমার মনে ভারি দুঃখ হইতেছে যে, আমরা উভয়ে মিলিয়া যে কয়টি কাজে হাত দিয়াছি, তাহা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, আমাদের পরস্পরের ভালবাসাতেই যে সকল ভালবাসার অবসান নহে, তাহা আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। দীনদরিদ্রের মধ্যে থাকিয়া আমরা তাহাদের আরও বেশী পরিচয় ও সেবা করিবার অবসর পাইব। দুঃখদারিদ্র্যের ভিতর দিয়া সুখের পরিচয় আমরা বেশী করিয়াই পাইব বলিয়া মনে হয়; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে ঘটনাটি হইয়াছে, ইহা তাঁহারই বিধান যিনি এতকাল আমাদের এত সুখে রাখিয়াছিলেন।"

শশিভূষণ আনন্দাতিশয্যে কমলিনীকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, কমলিনীর লাজরক্ত মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

৪

তাহার পর কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। হৃদয়নাথের শেষ উইলখানি পাওয়ার পর হইতে শশিভূষণ অমরনাথের

বাসস্থানের অনেক খোঁজ করিয়াও ঠিক সংবাদ কিছুই জানিতে পারে নাই। অবশেষে তাহার এক বন্ধুর পত্রে অমরনাথের সংবাদ পাইয়া, তাহার উদ্দেশে সে একদিন কলিকাতা যাত্রা করিল।

ট্রেণ হইতে নামিয়াই শশিভূষণ দেখিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে ও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। একখানি গাড়ী করিয়া সে অমরের বাটীর যে সন্ধান পাইয়াছিল, সেখানে গিয়া দেখিল, তথায় সে নাই। পার্শ্বের বাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, আজ কয়েক দিন হইল, অমরনাথ বাটী-পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি শশিভূষণকে এই সংবাদ দিল, সে ঠিক কিছুই বলিতে না পারিলেও অমরনাথের নূতন বাটীর একটা আন্দাজি ঠিকানা দিল।

নিতান্ত স্যাঁতসেতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শশিভূষণ প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, শীর্ণদেহ অমরনাথ একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর রোগশয্যায় একাকী পড়িয়া আছে। শশিভূষণকে যখন সে অনেক কষ্টে চিনিতে পারিল, তখন সে একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ইঙ্গিত করিয়া শশিভূষণকে সে পার্শ্বের খবরের কাগজপাতা একটা প্যাকিং-কেসের উপর বসিতে বলিল।

শশিভূষণ সেখানে না বসিয়া অমরের শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিল। অমরনাথ ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, "আঃ বাঁচালে শশীদা, তোমাকে দেখবার জন্য আমার মনটা যে কি রকম হয়েছিল! এর আগে ভগবানকে কখনই স্বীকার করে-নি—আজ আমার প্রার্থনা তিনিই সফল করেছেন, বুঝতে
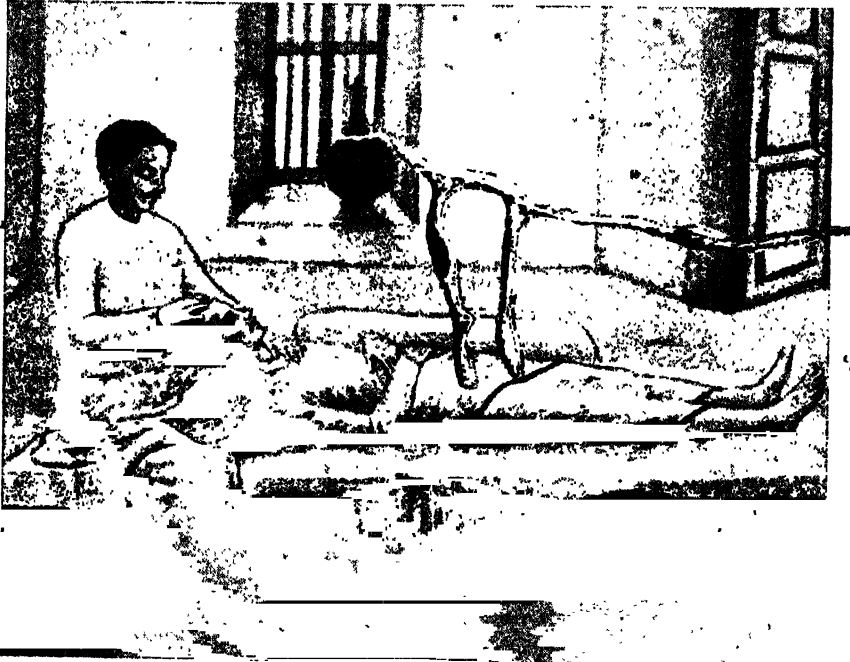
আঃ বাঁচালে শশীদা, তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমার মনটা যে কি রকম হয়েছিল।

অনেক ঘুরিয়া অবশেষে শশিভূষণ অমরনাথের বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিল। একটা অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলি, তাহারই শেষ প্রান্তে একটা পুরাতন জীর্ণ বাটী। বাটীটির বাহিরে চূণকাম ও রং দিয়া তাহার প্রাচীনতা গোপন করিবার চেষ্টা যথেষ্ট থাকিলেও তাহার জীর্ণ বক্ষপঞ্জর নানাদিক হইতে আপন দৈন্যদশা জ্ঞাপন করিতেছিল।

পাচ্ছি—"বলিয়া হস্ত দুইটি জোড় করিয়া নিজের বক্ষে স্থাপন করিল।

শশিভূষণ প্রথমে কিছু বলিতে পারিল না। অমরনাথকে যে কখনও এমন অবস্থায় দেখিবে, সে আশা সে করে নাই।

শশিভূষণ অতি কাতর ভাবে বলিল "ভাই অমর,

তোমার এমন অসুখের কথা ত আমাকে একটুও জানাও নাই।"

অমর বলিল, "জানিয়ে কি হবে ভাই! আমার ত কাহারও নিকট হইতে দয়াটুকু পাইবারও দাবী নাই—নিজেই সব হারাইয়াছি।"

পরে কথাবার্ত্তায় শশিভূষণ যাহা জানিতে পারিল, তাহাতে বুঝিল, অমরনাথ গত কয়েক মাস হইতে সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগিতেছে। অর্থাভাবে ভালরূপ চিকিৎসা হয় নাই, এখন সে সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হইবার আশায় একমাত্র মৃত্যুকে অপেক্ষা করিয়া আছে।

শশিভূষণের নিকট কোনও কথা সে গোপন রাখিল না। অতীত জীবনের দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিল; বলিল, "শশীদা, জীবন-প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, আজ আমারও তাহাই হইয়াছে; গতজীবনের কথা মনে করিয়া নিজের প্রতি যথেষ্ট ধিক্কার বোধ হইতেছে।" অমরনাথের শীর্ণ হস্ত শশিভূষণ আপনার হস্তের উপর তুলিয়া লইল। বেশী কথা কহিতে [illegible] করিলেও অমরনাথ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে [illegible] আরম্ভ করিল, "নিজের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা কখনও করি নাই—মৃত্যুর ছায়ায় আমার অতীত জীবনের দিনগুলা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতেছে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান [illegible] জীবনকে কি ভাবেই না নষ্ট করিয়াছি!"

শশিভূষণ সান্ত্বনার কোনও বাণী খুঁজিয়া পাইল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা বলিবারও কোন সুযোগ পাইল না। চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে অমর বলিল, "পাড়ার একজন বৃদ্ধ ডাক্তার দয়াপরবশ হইয়া দেখিয়া যান ও বিনামূল্যে ঔষধও পাঠাইয়া দেন। লোকটি বড় ভাল"—বলিতে বলিতে কক্ষে একজন ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। শশিভূষণ বুঝিল, ইনিই ডাক্তার। অমরনাথকে পরীক্ষা করিয়া তিনি ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শশিভূষণ গোপনে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিল, তাহাতে অমরনাথের জীবন সম্বন্ধে সে হতাশ হইল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে শশিভূষণ পুনরায় অমরের শয্যা-পার্শ্বে বসিল; পরে কহিল, "দেখ অমর, ডাক্তার বাবু বলিয়া গেলেন যে, তোমার এ রকম বাটীতে থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে, স্থান-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। তাহার পর তোমার সহিত যে উদ্দেশ্যে আমি দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহাও এতক্ষণ বলা হয় নাই। তোমাকে যে আজ এই অবস্থায় দেখিব, তাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই—তোমাকে আজ আমি তোমারই বাটীতে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছি।"

অমর ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে!" "হাঁ, তোমাকেই! এত দিন জানিতে পারি নাই, তাই তোমার বিষয় আমি অন্যায় ভাবে অধিকার করিয়াছিলাম; তোমার বিষয় তোমাকে দিয়া আজ আমি মুক্তিলাভ করিব। এই দেখ আমি কি আনিয়াছি।"

অমর বলিল, "থাক্, তুমি যাহা আনিয়াছ তাহা আমি জানি।"

শশিভূষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি জান?"

"হাঁ, জানি বৈকি? বাবার শেষ উইল ত? বাবার মৃত্যুর পর তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিবার পর পথে একদিন অন্নদা উকিলের সহিত দেখা হয়। তিনিই বাবার শেষ উইল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই এই কথা জানিতে পারি।"

"জানিয়াও তুমি এতদিন চুপ করিয়াছিলে কেন?"

খানিক থামিয়া অমর বলিল, "কি জানি! মানুষের মনে কখন কি যে হয়, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। যখন উইলের কথাটা শুনিলাম, তখন একবার মনে হইল, তোমার নিকট হইতে বিষয়সম্পত্তি আদায় করিয়া লই; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না, যে বিষয় বাবা আমাকে হাসিমুখে দিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহা স্নেহের দান নহে—কর্ত্তব্যের অনুরোধ, তাহা আমি গ্রহণ করিব না। জীবনে যাঁহাকে সুখী করিতে পারি নাই, এখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রদত্ত বিষয় আমি ভোগ করিতে পারিব না। দারিদ্র্য—তাহাতে আর ভয় করি না। ক্ষমা করিও ভাই; আরও একটা কথা মনে হইয়াছিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তুমি বাবার শেষ উইলখানি গোপন করিয়া বিষয় হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে; তাই ঘৃণায় লজ্জায় তোমার প্রদত্ত মাসহারা লই নাই। আমি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিলাম; বিষয়সম্পত্তি আমাকে আর প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। আমি

অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম। তাই শেষ-উইলের কথা জানিয়াও বিষয়ের জন্য দাবী করিতে চাই নাই। এত যে কষ্টে পড়িয়াছি, অর্থাভাবে যে মরিতে বসিয়াছি, তবুও ভাই, তোমার নিকট সাহায্য চাই নাই। আজ যে তুমি আমার কাছে আসিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই শান্তিলাভ করিলাম; এখন মরিবার জন্য প্রস্তুত।"

এতগুলি কথা কহিয়া অমরনাথ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। উত্তেজনায় মস্তিষ্ক দুর্ব্বল বোধ হওয়ায় সে শশিভূষণের ক্রোড়ে মাথা রাখিল। শশিভূষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। প্রাতঃকাল হইতে যে বৃষ্টি হইতেছিল, তাহার থামিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বাহির হইতে বৃষ্টির অবিরাম ধ্বনি কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল।

অমরনাথের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শশিভূষণ দেখিল, তাহার জ্বর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে তাহার বোধ হইল, যেন সে ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। শশিভূষণ স্পষ্ট শুনিতে পাইল, অমরনাথ বলিতেছে—"শশীদা, তোমরা আমাকে ক্ষমা করেছ কি না ঠিক জানি না, কিন্তু ঐ দেখ বাবা আজ আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন—এবারে আমি নির্ভয়ে বাড়ী ফিরে যেতে পার্ব্ব—এবার আমার মুক্তি—।"

"নিস্তব্ধতা"

(শ্রীআর্য্য কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রের প্রতিলিপি)

গোরক্ষপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্ত্তি

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, B. A.]

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্ব সীমান্তে গোরক্ষপুর জিলা অবস্থিত। গোরক্ষপুর নগর রেবতী (বর্ত্তমান সময়ে রাপ্তি নামে কথিত) ও রোহিণী নামক দুইটি নদীর সঙ্গম স্থলে স্থাপিত। এই জেলার মধ্যে বৌদ্ধযুগের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের ইহলোক পরিত্যাগের স্থান কুশীনগর এই জেলাতেই, বর্ত্তমানে কাশিয়া নামে পরিচিত। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রবন্ধান্তরে লিখিবার ইচ্ছা থাকিল।

গোরক্ষপুর নগরের উত্তরাংশে অতি প্রাচীন একটি পুষ্করিণী আছে। ইহাকে অসুরদিগের পুষ্করিণী (অসুরান্‌কে পোখ্‌রা) বলে। প্রবাদ এই যে, অসুরদিগের কর্ত্তৃক এক রাত্রির মধ্যে এই পুষ্করিণী খনিত হয়। পুষ্করিণীটি সুবৃহৎ [illegible] কতকাল ইহা [illegible] কাঠিন্য [illegible]ন অনেক অংশ মজিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে চাষআবাদ পর্য্যন্ত চলিতেছে। মধ্যের অংশটিতে এখনও জল আছে। জলে পদ্মবন। সহরের রজকগণ এই পুষ্করিণীতে বস্ত্র ধৌত করে। অতি অল্পদিন হইল, এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ের ভূগর্ভে প্রোথিত একটি সুন্দর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি 'উবু' হইয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত ছিল। পশ্চাৎভাগের প্রস্তরের কতকাংশ উপরে দৃষ্ট হইত। লোকে উহাকে সাধারণ একটা পাথরের চাঁই বলিয়া মনে করিত। ঘেষেড়াগণ উহার উপর আপন আপন 'খুরপা' শাণাইয়া লইত। এইরূপে কত কাল গত হইয়াছে। সম্প্রতি এক জন সাধারণ লোকের মনে এই খেয়াল হইল যে, পাথরখানা উঠাইয়া লইয়া গেলে অনেক কাজ হইতে পারে।

ইহা মনে করিয়া সে ভূমি খনন করিয়া উহা উঠাইবার চেষ্টা করে, শেষে দেখিতে পায় যে, উহা একটি দেবমূর্ত্তি। তাহাতে সে বিশেষ ভক্তির সহিত উহা উঠাইয়া লইয়া নিকটেই এক স্থানে উহা স্থাপিত করিয়া, উহার পূজার ব্যবস্থা করে এবং বেশ প্রণামী পাইতে থাকে। এইরূপে দুই তিন দিন গত হইলে ঐ সংবাদ স্থানীয় কলেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি মূর্ত্তিটি সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া মালখানা ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। যে জমিদারের জমিতে ঐ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তিনি উহা পাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিয়াছেন এবং মন্দির প্রস্তুত করিয়া ঐ মূর্ত্তি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রলোক-গণ, উকীল, মোক্তার, বারিষ্টার প্রভৃতিও যাহাতে মূর্ত্তিটি হিন্দুদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সেজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। স্থানীয় উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র "মসরি[illegible]" ও অনুরোধ করিয়াছেন যে, হিন্দুগণের এই সঙ্গত [illegible]না যেন সরকার বাহাদুর মঞ্জুর করেন। এখনও এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চূড়ান্ত কোন অভিমত জানা [illegible]য় নাই।

আমি ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য মূর্ত্তিটির একখানি ফটোগ্রাফ্ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহারই চিত্র এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। এই চিত্রদর্শনে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। প্রাচীন এত বড় মূর্ত্তি এরূপ অক্ষুণ্ণ অবস্থাতে প্রাপ্ত হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। মূর্ত্তিটি কষ্টি-পাথরের। আর ইহার ভাস্কর্য্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হয়। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও এমন সাবধানতার সহিত খোদিত হইয়াছে যে, তাহাতে শিল্পীর নৈপুণ্য পরিস্ফুট। কি গলদেশের মাল্যাবলী, কি বাহু ও হস্তের অলঙ্কারসমূহ, কি কটিদেশের পরিচ্ছদ, সর্ব্বত্রই নিপুণ হাতের কারিগরীর চিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিক চিত্রাবলীতে চালচিত্রের কারুকার্য্যও দর্শনীয়।

মূর্ত্তিটির গঠনভঙ্গী দর্শনে উহা বহু প্রাচীন কালের বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। আমি প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ নহি,
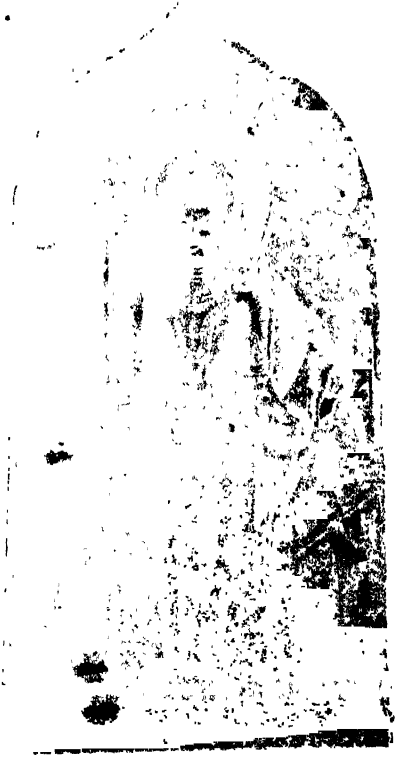
বিষ্ণু মূর্ত্তি

সুতরাং কোন্ যুগে কোন্ শিল্পীর দ্বারা এই মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে অক্ষম, তবে গঠনপ্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া অনুমিত হয় যে, উহা বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি আমার নিকট বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান, তাহারই মধ্যে সম্মুখের দক্ষিণ হস্ত বরপ্রদভাবে স্থাপিত। গলদেশে নানাবিধ মাল্যভূষণ। কটিতটে পীতধড়া। আবক্ষলম্বমান উপবীত।

অতি প্রশান্ত মৃদুমধুর হাস্যোদ্ভাসিত কমনীয় মুখমণ্ডলে যেন বিশ্বের শান্তি ও মঙ্গল দেদীপ্যমান। উভয় পার্শ্বে বীণাবাদনরতা সরস্বতী ও ধনসম্পদভাণ্ডহস্তা লক্ষ্মী আসীনা। পাদদেশে করযোড়ে ভক্তগণ উপবিষ্ট।

মূর্ত্তিটির সর্ব্বত্র যেন একটা প্রশান্ত উদার ভাবপরিস্ফুট।

কঠিন কাষ্ঠপ্রস্তরস্তম্ভ হইতে যে শিল্পীর নিপুণ হস্ত এইরূপ কমনীয় সজীব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আজ সেই সব শিল্পী কোথায়? প্রস্তরের উপর এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন করা বড় সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে কিন্তু যাহাদের হস্ত ভুবনেশ্বর, এলোরা, এলিফাণ্টা প্রভৃতি শত-শত স্থলে নৈপুণ্যের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বড় বেশী কথা নহে!

তবে এমন ভাস্কর্য্য-শিল্প দেশ হইতে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একথা মনে হইলে, বড়ই বেদনা বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে সেই অতীতের উদ্দেশ্যে নয়নের কোণে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হয়।

যাহা হউক, যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তাঁহারা মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দর্শনে তাহার নির্ম্মাণের সময় আবিষ্কারে অবশ্যই যত্নপর হইবেন। যদি কেহ মূর্ত্তিটি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এখানে আসিলেই অনায়াসে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইবে। এখন একটা কথা হইতেছে যে, মূর্ত্তিটি ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে আসিল কি করিয়া। যে স্থলে উহা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে বা তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মন্দিরাদির কোনও চিহ্নই নাই সুতরাং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারপর মন্দির ধ্বংস হওয়াতে মূর্ত্তির এই দশা ঘটিয়াছে, ইহা বলা চলে না।

এই আসুরিক পুষ্করিণীটির সম্বন্ধেও সমস্ত বৃত্তান্ত অপরি-স্ফুট। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়টিই সর্ব্বোচ্চ এবং উহা এখনও অনেকটা ঠিকই আছে। উহা একটু বিশেষভাবে দেখিলে বোধ হয়, উহার অভ্যন্তরে কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। ঐ পাড়ের মধ্যে একটি গুহা আছে, সেই গুহায় এখনও একজন সাধু বাবাজি বাস করেন।

আমার বোধ হয়, উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঐস্থান পরীক্ষিত হইলে, কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের সম্বন্ধে কিছু জানা যাইতে পারে। মূর্ত্তিটির কোনও স্থানে উৎকীর্ণ কোন লেখা, কি সন তারিখ কিছুই নাই সুতরাং তাহা দ্বারা যে উহার কাল নির্ণীত হইবে, সে সম্ভাবনাও নাই। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হিন্দুগণের প্রার্থনায় সদয় হইয়া মূর্ত্তিটি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে উহার পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা হইলে সর্ব্বসাধারণের উহা ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইবে না সুতরাং যদি কোন প্রাচীনইতিহাসরসিক মহাত্মা ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

মূর্ত্তির গঠন-সৌন্দর্য্যে ও ভাবে উহা যে একটি দর্শনীয় বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই।

'চা'য়ে জ্যোতিষ-তত্ত্ব

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]
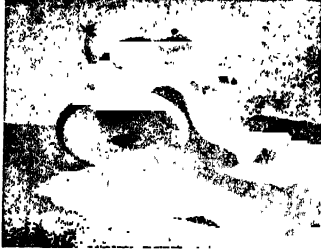
পেয়ালা হইতে চা ঢালা

'চা'য়ের পিরিচ-পেয়ালা-পাতায় যে জ্যোতিষ নিহিত আছে, অর্থাৎ চায়ের পাতা যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে পারে—এ কথা শুনিলেই লোকে 'আড্ডা'ধারীর গাল-গল্প বা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিবেন! ফলে, শিরোনামা পড়িয়াই অনেকে নানা 'উপহাস' করিবেন; আর নিতান্ত নিরীহ সরল-বিশ্বাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন! কথাটা কিন্তু একেবারে তেমন [illegible]—অশ্রদ্ধেয় [illegible] নহে। আমাদের এক বন্ধু জ্যোতিষী—অবশ্য সাইন্‌বোর্ড-ওয়ালা, বিজ্ঞাপন-প্রচারত, পেশাদর জ্যোতিষী নয়; দেশীবিদেশী নানা জ্যোতিষ-পুস্তক-অধীত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সৌখিন, 'অবৈতনিক' জ্যোতিষ্‌বিদ্যাচর্চ্চাকারী পরিণতবয়স্ক ভদ্রলোক মাত্র—আছেন; তিনি 'চা' ও 'পেয়ালা-পিরিচ' সাহায্যে উদ্বিগ্ন বন্ধুবান্ধবদিগের জটিল
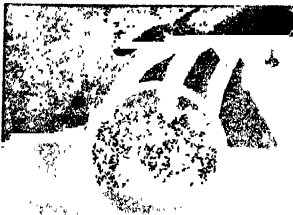
দীর্ঘ পত্র রেখা

প্রশ্নাবলীর ঝটিতি সমাধান করিয়া দেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই যথাযথ মিলিয়া যায়। তিনি বলেন, বিদ্যাটা নিতান্তই সহজ-সাধ্য,—তবে মাত্র একটু দিব্যদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন! কিন্তু এই 'একটু দিব' আয়ত্ত করাটা যে কত সহজ-সাধ্য, সেটা তিনি প্রকাশ করেন না!—সে যাহা হউক, আমরা এইটুকু বুঝি, যে বিদ্যাটায় 'দিব্যদৃষ্টি থাকা' প্রয়োজনীয় হউক বা না হউক, প্রবল কল্পনা-প্রবণতা থাকাটা যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা স্থিরনিশ্চয়। বন্ধুবরের দুই একটা জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিচয়-কাহিনী বলি, শুনুন—
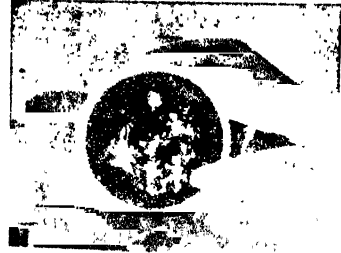
মনুষ্যাকৃতি যেন ভ্রমণ করিতেছে

তাঁহার এই আশ্চর্য্যবিদ্যার ক্ষমতার কথা লোক-মুখে শুনিয়া, একদিন প্রাতঃকালে এক ইংরেজ-রমণী আসিয়া উপস্থিত। বলিয়া রাখি, এই 'চায়ের জ্যোতিষী' বন্ধুর বাটীতেই আমাদের প্রাত্যহিক দুবেলা চায়ের আড্ডা বসে; সেদিন সেই সবে মাত্র আমাদের চা-পানকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া দু-একটা আনুষাঙ্গিক খোসগল্পের অবতারণা হইয়াছে, এমন সময় মেম-সাহেব আসিয়া হাজির! আমরা একবার

অঙ্গুরীয়

তাঁহার প্রিয়দর্শন মুখ-গোলাপের পানে, একবার বন্ধুর সকৌতুক অপরাজিতানন পানে, সকৌতুহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বন্ধু মেমসাহেবকে সাদরাভ্যর্থনা করিয়া একখানি চৌকিতে বসাইলেন। মেমসাহেব আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করণান্তে জানাইলেন, বন্ধুবরের অদ্ভুত

ক্ষমতাবার্ত্তা শুনিয়াই তিনি প্রশ্নজিজ্ঞাসার্থিনী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া, বন্ধু

যেন ঘন মেঘ

পার্শ্বস্থ 'চা-পিয়ালা পিরিচ'-রূপ চণ্ডালের হাড় (কথাটার বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধেয় চা-পায়িগণ যেন ক্রুদ্ধ হইবেন না) লইয়া গণনাকার্য্যে রত হইলেন। ক্ষণ পরেই বলিলেন, "দুই ভ্রাতার ভগ্নী, ঝটিকা-আবর্ত্তে বিপন্ন জাহাজ, মৃত সৈনিক, পর্য্যটনেচ্ছা, বিচ্ছেদ" পাঁচবার চায়ের পাতা

কীটাকৃতি

পাড়াইয়া এই পাঁচটি কথা বলিয়া বন্ধু নীরব হইলেন। সকৌতূহলে তিনি মেমের মুখের দিকে তাকাইলেন, আমাদের উন্মুখ নয়ন সেইদিকে সংযত হইল। রমণীও কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সাশ্চর্য্যে বন্ধুর মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইবার আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আপনার! বাস্তবিকই দুই ভ্রাতার ভগিনী আমি; আমার জ্যেষ্ঠ এক জাহাজের কর্ম্মচারী, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সমুদ্রমধ্যে এক প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার জীবন খুবই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর আমার কনিষ্ঠ কমিসরিয়েট্ বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। আমি দেশপর্য্যটন করিতে বড় ভালবাসি; অগ্রজের সহিত নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। তবে 'বিচ্ছেদ' কথাটার অ[illegible] ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।" বন্ধু বলিলেন, "অচি[illegible] বোধ হয়, আপনার কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছে[illegible] ঘটিবে!"

রমণী ম্রিয়মাণা হইলেন; ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] "আপনি ভবিষ্যতের কোন কথাই তো বলিলেন না?"

বন্ধু আবার তাঁহার সেই প্রক্রিয়া করিয়া বলিলে[illegible] "কথাটা অপ্রিয়, কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলি—অচিরে আপনার একটা দারুণ মনকষ্টের কারণ ঘটিবে।"

অনন্তর, আবার একবার চায়ের পাতাগুলি বাটীতে লইয়া, তিনবার ঘুরাইয়া, পিরিচে ঢালিয়া নিরীক্ষণ করিলেন শেষে সহাস্যে বলিলেন—"আপনার প্রিয়দর্শন স্বামী জুটিবে!"

রমণীর মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইল, হাস্য গোপন করিয়া ব্রীড়াবনত নয়নে বলিলেন—"পুরুষদের হৃদয়হীনতা দেখিয়া আমার ত বিবাহে অভিরুচিই নাই।"

মেমসাহেব সস্মিত মুখে শিষ্টাচারে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় লইলেন।—জানি না, তাঁহার সম্বন্ধে [illegible] হইয়াছিল কি না। তবে অতী[illegible] [illegible]জ্ঞাত ঘটনাগুলি, যে বন্ধুপ্রবরের দিব্যদৃষ্টি সমক্ষে যথাযথ [illegible]বির্ভূত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে মেমসাহেব আমাদিগের [illegible]ক্ষাতে স্পষ্টই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছিলেন।

বন্ধুবর আমাদের, তাঁহার এই চা-পাতা দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান গণনা সকলকেই অকাতরে শিখাইয়া দিয়া থাকেন। ফলে সেই ইংরেজ-মহিলাকে তখনই তিনি কয়েকটি লক্ষণ-পাঠ রহস্য দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই আমরা যে আলোক-চিত্রগুলি তুলিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধে সেইগুলিরই প্রতিলিপি পাঠকবর্গের নিকট উপহার দিলাম। তবে কল্পনা বা অনুমান বিদ্যাটা—যাহাকে তিনি দিব্যদৃষ্টি বলেন, সেটা তো আর শিখাইবার জিনিষ নয়; সেটা মানুষ-বিশেষের প্রকৃতি বা ভগবানপ্রদত্ত ধীশক্তি বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপরেই সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। উদাহরণচ্ছলে একটা অবান্তর গল্প বলি।—কোনও রাজার সভায় এক সুপ্রথিত জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার পুত্রটি কিন্তু নিতান্তই স্থূলবুদ্ধি। জ্যোতিষী অতি যত্ন সহকারে পুত্রকে সুচারুরূপে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পুত্রের জ্যোতিষ সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে, একদিন তাহাকে রাজ-সমীপে উপনীত করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমার পুত্র কেমন জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা করুন।" রাজা তখন সকলের অলক্ষ্যে নিজ অঙ্গুলিস্থ বহুমূল্য প্রস্তর সমন্বিত একটি অঙ্গুরীয় মুষ্টিমধ্যে লইয়া, বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কৈ, তুমি গণনা করিয়া বল দেখি, আমার মুষ্টিমধ্যে কি আছে?" বালক শাস্ত্রে লিখিত নিয়মানুসারে খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিল—"মহারাজ, আপনার করতলমধ্যে একটা প্রস্তরসমন্বিত দ্রব্য আছে।" রাজা সস্মিত মুখে স্বীকার করিলেন। আবার যথারীতি গণনা করিয়া বালক, বলিল, "সেটা গোলাকৃতি।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" জ্যোতিষী-পুত্র আবার অঙ্ক কষিয়া বলিল, "তাহা মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট।" রাজা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বাঃ বেটা! ঠিক বলিয়াছ।"—এইখানে শাস্ত্রের বচনের দৌড় নিঃশেষিত হইল; এইবার অনুমান করিয়া বলিতে হইবে,—দ্রব্যটা কি? পণ্ডিত-মূর্খ বালক বলিয়া বসিল—"মহারাজ, আপনার মুষ্টিমধ্যে 'জাঁতা' আছে।" সভাস্থ [illegible] হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল—পিতা অপ্রতিভ হইলেন—রাজা বালকের শাস্ত্র-জ্ঞান-সত্ত্বেও স্বাভাবিক স্থূলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন।—ফল কথা, মানুষের ভাগ্য, অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ফলাফল গণনা—কেবল সাহায্যেই বল, আর করকোষ্ঠি, ঠিকুজি-কোষ্ঠি দেখিয়াই বল—শাস্ত্রগত বিধিমাত্রের সাহায্যে কখনই সুসম্পাদিত হয় না;—গণকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি—বিচারযুক্ত অনুমান শক্তির উপরেই তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।—যাক—যাহা বলিতেছিলাম।

একটি বেশ শুষ্ক পেয়ালাতে তিন চুটকি (বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বয়যোগে যতগুলি উঠে) শুক্‌নো চা দিয়া, বাটীটির হাতল ধরিয়া তিনবার চক্রাবর্ত্তে ঘুরাইয়া যে প্রশ্নসমাধান করিতে চাও, তাহা এক মনে ভাবিতে ভাবিতে একখানি শুক্‌নো পিরিচের উপরে সামান্য উচ্চ হইতে উপুড় করিয়া ধীরে ধীরে পাতাগুলি ঢালিয়া দাও। এইরূপে পতিত হইয়া পাতাগুলি যে বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে, তাহা হইতেই উত্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সন্ধানের গুটিকয়েক বলিতেছি;—

পাতাগুলি পিরিচে পড়িয়া যদি মুকুটাকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে সম্মান সূচিত হইবে, বুঝিতে হইবে।—যদি ক্রসের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে আসন্ন দুঃখ বুঝিবে।

অনেকগুলি বক্র রেখার আকার দেখিলে, আশু ক্ষতি ও অশান্তি সম্ভাবনা বুঝিবে।—চতুষ্কোণাকৃতি হইলে সুখ ও শান্তি লাভ।—আংটীর মত সুগোল চক্রাকৃতি হইলে অচিরে বিবাহ-সম্ভাবনা—বৃত্তটি সুসংবদ্ধ হইলে সে বিবাহ সুখের কারণ, অন্যথায় পরিণয়ে পরিণামে দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা।—বৃত্তটি ঠিক গোলাকার না হইয়া ডিম্বাকৃতি বা অন্যবিধ হইলে সম্প্রতি বিবাহ সম্ভব নহে, বুঝিতে হইবে। পিরিচের ঠিক মধ্যস্থলে নঙ্গরের মত আকার ধারণ করিলে, ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ ও একপার্শ্বদেশে হইলে সহানুভূতি—স্নেহ—প্রণয় লাভ; অন্যত্র হইলে কাজকর্ম্ম জুটিবার আশা সূচিত হয়।

মধ্যস্থলে কুকুরের মত আকার ধারণ করিলে প্রবঞ্চিত; প্লেটের ধারে হইলে, বিশ্বস্ত—প্রকৃত বন্ধুলাভ; অন্যত্র হইলে পর-প্রপীড়নে অশান্তি-ভোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

পরিষ্কার ত্রিকোণাকৃতি দেখা গেলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থলাভ ঘটে। তবে ঐ ত্রিকোণের মধ্যে যদি আবার কোনও অক্ষর দেখা যায়, তবে—অক্ষরটি স্পষ্ট লক্ষিত হইলে, পত্রযোগে সুসংবাদ আগমনের সম্ভাবনা এবং অস্পষ্ট হইলে অশুভ সংবাদ হস্তগত হইবার আশঙ্কা হয়।

যদি কোন মানবাকৃতি পুরুষমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তবে প্রশ্নকারিণী কুমারী হইলে প্রিয়দর্শন পতিলাভ এবং অবিবাহিত পুরুষ হইলে বন্ধুলাভ এবং বিবাহিত পুরুষ বা নারীর পক্ষে পুত্রলাভ ঘটে। মূর্ত্তিটি যদি হস্ত-প্রসারিত করিয়া আছে মনে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে কোনও আত্মীয়-স্বজন উপহার লইয়া উপস্থিত হইতেছে।—হস্ত প্রসারণ না করিয়া পুরুষ যদি দৌড়িতেছে মনে হয়, তাহা হইলে পুরুষের ও বিবাহিতা রমণীর পক্ষে দেশ-ভ্রমণ, এবং কুমারীর পক্ষে পরিশ্রমী স্বামিলাভ সম্ভাবনা হইবে।—রমণী-মূর্ত্তি প্রকটিত হইলে সকলের পক্ষেই ইষ্টলাভ ও শুভ সূচিত হয়। তবে মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে মেঘাকৃতি পরিদৃষ্ট হইলে হিংসাদ্বেষজনিত অশুভ ও বিরক্তি সম্ভাবনা হইতে পারে, এইরূপই বুঝিতে হইবে।

যে কোনও পুষ্পাকৃতি শুভজনক চিহ্ন; কিন্তু পদ্মফুলের আকার অশান্তিজনক বলিয়া জানিবে।

মেঘাকৃতি যদি গাঢ় হয়, তবে দারুণ দুঃখভোগ, ছিন্ন-ভিন্ন বা বিরল হইলে, অল্পাধিক মানসিক ক্লেশভোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, বুঝা যায়।

কীটাকৃতি চিহ্ন পিরিচের প্রান্তভাগে প্রকাশ পাইলে অর্থলাভ, অন্যথায় অনর্থপাত সম্ভাবনা থাকে।

দীর্ঘ সরলরেখা জলভ্রমণ প্রকাশ করে; একাধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ সরলরেখা কার্য্যে সাফল্যলাভের পরিচায়ক।

মোটের উপর সকল চিহ্নই যদি পরিষ্কার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ, এবং অস্পষ্ট লক্ষিত হইলে অশুভ—পিরিচের পার্শ্বে হইলে অচিরে এবং মধ্যবর্ত্তী হইলে অপেক্ষাকৃত দূর-ভবিষ্যতে ঘটনা-সংঘটিত হইবে। সকল প্রকার চিহ্নের বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। তবে, মোটামুটি যে চিহ্নগুলির অর্থ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই অপরাপর চিহ্নের অর্থ অনুমান করিয়া লওয়া বোধ হয় কঠিন হইবে না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

[শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, B.A.]

যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় লিখিত কবিতাবলি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম জানেন। তবে আমাদের মনে হয়, অনেকে হয় ত তাঁহার পরিচয় জানেন না। নামটির প্রথম অংশ দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালীর কন্যা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু দ্বিতীয় অংশ মান্দ্রাজী পদবী, বাঙ্গালা দেশে নাইডু বলিয়া কোন উপাধি নাই। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব।

শ্রীমতী সরোজিনী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নানা ভাষায় অভিজ্ঞ; য়ুরোপ অঞ্চলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। তিনি য়ুরোপের অনেক দেশপরিভ্রমণ করিয়াছেন। কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে অতিবাহিত করায় বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত-সমাজ ব্যতীত জনসাধারণ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পান নাই।

শ্রীমতী সরোজিনী এই প্রতিভাশালী পিতার কন্যা। বাল্যকাল হইতেই তিনি হায়দরাবাদে ছিলেন, মধ্যে মধ্যে কখন কখন অল্প সময়ের জন্য তিনি পিতার সহিত বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়াছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদেই তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে তিনি হায়দরাবাদেই শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তিনি সেখানে "কিংস্ কলেজে" ও 'গটনে' কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন; কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং কিছু দিন য়ুরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করেন।

তাঁহার বয়স যখন এগার বৎসর, তখন হইতেই তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এ অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেন নাই; ত্যাগ করেন নাই বলিয়াই য়ুরোপ ও আমেরিকায় তিনি এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার কবিতাবলি পাঠ করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাকে এত প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রথমবার বিলাতে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার কবিতার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার একজন ইংরেজ সাহিত্যিক বন্ধু তাঁহাকে পরামর্শ

দেন যে, তিনি যেন বিলাতী ভাবের কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। বন্ধুর এই উপদেশ তিনি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পরবর্ত্তী কবিতাসমূহ ভারতীয় ভাবে পূর্ণ। তাঁহার "The Bird of Time" এবং "The Golden Threshold," য়ুরোপের কবি ও সুধী-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইনি তথায় "রয়েল-সোসাইটী অব লিটরেচার—বা "সাহিত্যের রাজকীয় সভা"র ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সভা,—ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ্জের প্রতিষ্ঠিত। এ পর্য্যন্ত তিনটি মাত্র শ্বেতাঙ্গ রমণী এই সম্মান পাইয়াছেন, ইনি এইবার চতুর্থ এই সম্মান পাইলেন।

১৮৯৮খ্রীঃ অব্দে তিনি যখন হায়দরাবাদে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোবিন্দ্রাবজি নাইডু। ইনি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত নাইডু মহাশয়ের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর হইতেই তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। শ্রীমতী সরোজিনী একণে চারিটি সন্তানের জননী। তিনি বিদুষী [illegible] বি বলিয়া কোন দিন সংসারের কার্য্যে অমনোযোগ করেন নাই, কেবল লেখাপড়া লইয়াই সময় অতিবাহিত করেন না। তিনি আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী। তিনি দেশীয় প্রথা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতির বিশেষ পক্ষপাতিনী; তিনি বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধান করেন না। বিলাতের কোন এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত কথোপকথন উপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের পুরুষগণ রমণীজাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রমণীগণ যদি কোন দেশহিতকর কার্য্যের জন্য অগ্রসর হন, পুরুষেরা তাঁহাতে কখনও বাধা-প্রদান করেন না। ইংরেজ-রমণীরা ভোট, ভোট করিয়া, এত চীৎকার করিয়াও সে অধিকার লাভ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমাদের দেশের রমণীরা যদি ভোটের অধিকার প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের পুরুষেরা তাহাতে কোনই বাধা জন্মাইবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহার পর ইংরেজ নরনারীরা মনে করেন যে, ভারতে আমাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমাদের দেশের পুরুষগণ রমণীদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বিলাতে অনেকে আমাদের দেশের বিধবার দুঃখ ও কষ্টের কথা বলিয়া থাকেন। সকল বিষয়েরই দুইটা দিক আছে। বিধবারা যে কষ্ট পান না, তাহা আমি বলিতেছি না; কিন্তু আমি বলিতে পারি, আমাদের অনেক হিন্দু-পরিবারে বিধবাগণ পরম সম্মান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহস্থের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে আদৃতা হন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মভাবপূর্ণ জীবনযাত্রানির্ব্বাহের আদর্শে হিন্দুগৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, আমাদের অবরোধ-প্রথা অতি নিন্দনীয়। আমিও তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অবরোধ-প্রথা অনেকটা শিথিল হইয়াছে। [illegible] জানি, আমাদের দেশের মুসলমানগণ অবরোধ-প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহারা অবরোধ-মুক্তাদিগের প্রতি কখনও কোনও প্রকারে অসম্মান প্রদর্শন করেন না। আমি স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদের বিশেষ পক্ষপাতী। আমি বুঝিতে পারি না যে, ভারতীয়গণ কেন এ দেশের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদের বিকৃত অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের লাভ ত হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়; কারণ এই অনুকারীদিগকে ইংরেজেরাও ভাল চক্ষে দেখেন না, দেশের লোকেরাও ঘৃণা করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাব সমস্তই আমাদের ভারতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল এবং তাহারই উন্নতি, পরিপুষ্টি ও বিকাশ-সাধন করাই আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

য়ুরোপে তিনমাস

মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M. A., L.L.D., C.I.E

প্যারিস—৪ঠা জুন, ১৯১২। আজ সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। তজ্জন্য ভালরূপে সহর দেখার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিল। যাহা হউক, বেলা ৭টার সময় মোটরে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই Pantheon দেখিতে গেলাম। গ্রীক মহাপুরুষদিগের শেষ বিশ্রাম-স্থানের নামানুকরণে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। প্রকাণ্ড মন্দির, চূড়াও তদুপযুক্ত। সম্মুখে ভল্টেয়ারের প্রস্তরমূর্ত্তি ও মন্দিরের দ্বারে জ্যান জাকোয়েস রুসোর মূর্ত্তি বিরাজমান। যাঁহাদের চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত কার্য্যাবলী ফ্রান্সের কেন, ইউ-রোপের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া মহা-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মহাপুরুষ দিগের স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল; পুণ্যতীর্থ-দর্শন-ভাবের আবির্ভাব হইল। মন্দিরের দ্বারে ও ভিত্তিগাত্রে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। এদিকে আবার আধুনিক চিত্রকরদিগের অঙ্কিত কতকগুলি অপরূপ চিত্রও অঙ্কিত দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তর রোমের St. Peterএর অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এবং মধ্য মন্দিরের চূড়াটি নাকি ২২৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। সেই চূড়ার তলে ও ছাতের খিলানে চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত অদ্ভুত চিত্রলেখা রহিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা দূরে থাক, শুদ্ধ নামোল্লেখ করিতে গেলেও পুঁথি বাড়িয়া যায়।

Pantheon মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে National Convention নামে প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শ্বেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড বেদীর উপর ফ্রান্সের গম্ভীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তরবারি-করা, রণোন্মুখিনী অথচ স্থিরা, গম্ভীরা, উত্তেজনাবিহীনা, ত্রাসবিহীনা অপরূপা মূর্ত্তি। মুখে আশার, জয়ের, শান্তির আভা প্রকটিত। মহাবিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্র ঘোষণা সম্বন্ধে অগ্রণী দাঁন্তন, মিরাবো, রোবস্পিয়র, মুরাট প্রভৃতি নেতৃগণ চারিভিতে ঊর্দ্ধ-হস্তে জয়ধ্বনি করিতেছেন; অপর পার্শ্বে অশ্বারোহণে জেনারেল অর্সের প্রতিমূর্ত্তি যেন সৈন্যচালনা করিয়া প্রজাতন্ত্র-স্থাপনের সাহায্য অভিনয় করিতেছেন। এই মূর্ত্তি-গুলির উভয় পার্শ্বে বারান্দার দেয়ালের গায়ে যে সকল প্রকাণ্ড ও বহুযত্নচিত্রিত সুন্দর চিত্র রহিয়াছে,
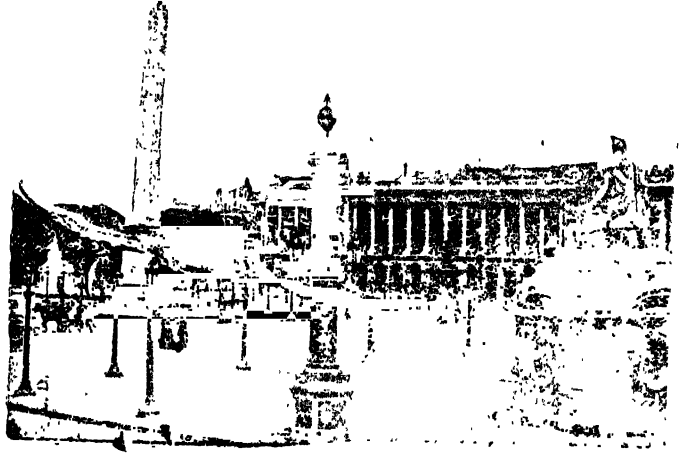
কন্‌কর্ড প্রাসাদ

তাহার মধ্যে ঋষিবর St. Deime'sএর মৃত্যু, Charle-magneএর অভিষেক, Athla the Hunএর রণযাত্রা, Clove'sএর রণযাত্রা ও পরিশেষে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ, জোয়ান অফ্ আর্কের কাহিনী ও নবম্ লুইর জীবন-চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের নীচের তালা অত্যন্ত অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। তথায় আলোক ও পথপ্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকে যাওয়া কঠিন! এই স্থানেই রুসো, ভল্টেয়ার, জোলা, ভিক্টর হুগো, কারনট, প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সমাধিস্থান এবং তাঁহাদের সমাধি-সময়ে যে সকল সম্মানসূচক "স্থায়ী জয়মাল্য" তাঁহাদের শেষযাত্রার সহচর ও লোক-প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাও অতি যত্নে রক্ষিত আছে। একজন পথপ্রদর্শক প্রকাণ্ড চাবি

লইয়া প্রকাণ্ডতর ফটকের পর ফটক খুলিতে খুলিতে নীচের তলায় দল বাঁধিয়া যাত্রিগণকে এই পুণ্য-সমাধি দর্শনের জন্য লইয়া যায় এবং সুর করিয়া করিয়া তাঁহাদের জীবনের কথা ও গুণাবলী পাণ্ডাসুলভ ভাষা ও ভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। মিরাবো ও মুরাটের সমাধিও এই স্থানেই প্রথমে হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবকালে তাঁহাদের অপ-কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অস্থিরাশি পরে অসম্মানের সহিত স্থানান্তরিত করা হয়। অতি কঠোর নির্ব্বাচনের ফলে Pantheonএ ফ্রান্সের অবিনশ্বর-কীর্ত্তি মহাপুরুষদিগের অস্থি স্থান পায়। যে সে সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। মরণেও জাতিভেদ ঘোচে না! রাজা প্রজা, দীন ধনী, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের শেষ একী-করণের স্থান বলিয়াই কি ভারতের মহাশ্মশানের মহাসম্মান! কে জানে?

Pantheon হইতে Pont Alexander, অর্থাৎ Exhibition এর সময় রুষিয়ার সম্রাট্ Alexander IIIএর সম্মানার্থ নির্ম্মিত বিচিত্র সেতুর উপর দিয়া Invalides দেখিতে গেলাম। ইহা পূর্ব্বে হাসপাতাল ছিল, নামের উৎপত্তির কারণও তাহাই। [illegible] পর ইহার পশ্চাতে রম্য সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শেষ বিশ্রামমন্দির এই স্থানে নির্ম্মিত হয়। নেপোলিয়নের ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে যে সকল ধ্বজা-পতাকা ব্যবহৃত হইয়াছিল,তাহা যত্নের সহিত এখানে রক্ষিত হইয়াছে। বাহিরে সেই সকল যুদ্ধে ব্যবহৃত রাশি রাশি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি সজ্জিত আছে। যে ফরাসী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সমস্ত বিষয়ের পূর্ব্ব-কথা বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না; বরং আমি তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক কথা অনুমান করিয়া বলিতে লাগিলাম দেখিয়া, তিনি যেন কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলেন। নিজের দেশের গৌরবের কথা স্মরণ রাখে না—এ বিষয়ে শুধু আমরাই অগ্রণী বলিয়া মনে করিতাম। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। অধঃপতিত বা অধঃপতনোন্মুখ জাতি মাত্রেরই দশা এই!

নেপোলিয়নের সমাধি-স্থানটি অতি মনোরম এবং ইহা তাঁহার কীর্ত্তিগৌরব স্মরণ করিয়া দিবার সাহায্যকল্পে সম্পূর্ণ উপযোগী। সেণ্ট হেলেনায় প্রথমে যেখানে রাজবন্দী নেপোলিয়নকে সমাহিত করা হয়, তাহা নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের ছিল। শত্রুর প্রতি সম্মানের সে চিহ্নও উঠাইয়া আনিয়া এই মহাসমাধির পার্শ্বের একঘরে রাখা হইয়াছে। যে কামানের গাড়ীতে তাঁহার মৃতদেহ আনা হয়, তাহাও নিকটেই রহিয়াছে। মৃত্যুর পর Plaster of Paris দিয়া তাঁহার মুখের casts অথবা Death mark (মৃত্যু-মুখস) তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা রহিয়াছে। যে কিংখাব কাপড়ে তাঁহার মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া আনা হয়, তাহাও রহিয়াছে। এ সকল স্মৃতিচিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। সকল কক্ষই সসম্মানে সযত্নে সজ্জিত।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম Invalidesএর পশ্চাৎ ভাগের নবনির্ম্মিত সমাধিমন্দির। চারিদিকে স্বর্গ-দূতগণের বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সমাধিস্থান ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে দেওয়ালের গাত্রে বারান্দার ভিতর প্রস্তরে অঙ্কিত নেপোলিয়নের ভিন্ন ভিন্ন রণকীর্ত্তি-কাহিনী ও ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ। তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষদিগের নামও চতুর্দ্দিকে লিখিত রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণবিন্দুশোভিত সুবর্ণ বর্ণের বঙ্কিম মর্ম্মর স্তম্ভ-রাজীর উপর প্রস্তরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ-তলে দেবালয়কল্প গঠন অপূর্ব্ব। সূর্য্য-কিরণ (Stained glass windows) হরিদ্রাভ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িয়া যেন স্বর্গের আলোকে সেই পবিত্র সমাধি-মন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে। এই ইলেক্ট্রিক লাইটের যুগে হঠাৎ মনে হয়, যেন দীপালোক তুচ্ছ করিয়া মোলায়েম মিঠেন বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীধাম আলোকিত। হরিদ্রাভ কাচের অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় এই ভুবনমোহন আলোর সৃষ্টি হইয়াছে, হঠাৎ দৃষ্টিবিভ্রম অহেতুক নহে। মন্দিরের এক দিকে লেখা আছে, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমার প্রিয় ফরাসী জাতির মাঝে সীন নদীর তীরে আমার সমাধি হয়।" সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন মৃত্যুকালে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ বিজয়ীযোগ্য উদারতার সহিত তাঁহার অস্থিগুলি ফরাসীজাতির হস্তে সমর্পণ করেন এবং ফরাসী জাতিও যোগ্য মন্দিরে সেই অস্থি সমাহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত কীর্ত্তি-নিদর্শন দেখিতে

দেখিতে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলাম এদিকে বেলাও বেশ বাড়িয়া উঠিল। অগত্যা Taverne Passel নামক মহা ফ্যাসনেবল Restaurantএ মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। কত ঐশ্বর্য্য, কত সমৃদ্ধি যে এই স্থানে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পান-ভোজনের সূক্ষ্ম তদ্বিরের জন্য ফরাসী জাতির বিশ্বজনীন প্রসিদ্ধি। সুবেশ নরনারী রাত্রিদিন এই সকল রম্য ভোজনালয়ে পানভোজনে নিরত। পান-ভোজন, বেশ-ভূষা, আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত পারিসের নরনারীর আর কোন কাজ সারা জীবনে আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু মনুষ্যত্ব, শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রণকৌশল, উচ্চ দার্শনিক ভাব, কিছুতেই ফ্রান্স কোন কালে কোন জাতি হইতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়।

নেপোলিয়নের সমাধি

সহরের মাটির নীচে Railway Metropole দিয়া পারিসের দূর উপনগরে 'Clemans Bayard' কোম্পানির মোটর কারখানা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড কারখানা। কত মোটর যে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে চতুর্দ্দিক দেখাইতে বুঝাইতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কতরকম কার্য্যই হইতেছে, দেখিলাম। এই সময় বৃষ্টি বেশ ঝাঁকিয়া আসিল। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হইয়া আসিল। অতএব আজকার মত ঘুরিয়া বেড়ান শেষ করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

বুধবার ৫ই জুন।—বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পেয়ারি বারট্রাণ্ড ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিলেন, এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ধ্যার সময় আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের বন্দোবস্তে সহর হইতে এত দূরে পড়িয়াছি যে, সহর দেখা বিশেষ কষ্ট, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পারিব, এই জন্যই এই হোটেলে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু সহরে থাকার যাহা সুবিধা তাহাত হইতেছেই না, অথচ তাঁহাদের নিকটে থাকার সুবিধাও কিছু দেখিতেছি না।
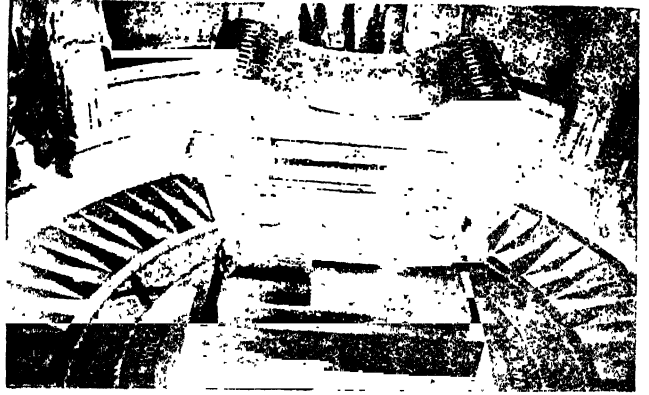
সমস্ত দিন বেড়াইয়া ক্লান্ত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় শাস্তিবিশেষ হইলেও প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। বিশেষ পারিস-গৃহস্থের রীতি-ব্যবহার-ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণের এমন সুবিধা অল্পকাল থাকার মধ্যে পুনরায় ঘটা শীঘ্র সম্ভব নয়।

আজও বৃষ্টি পড়িতেছিল। গত কল্যের আমার ভ্রমণ-সঙ্গী বন্ধুটির সহিত কিয়ৎ দূর পদব্রজে যাইয়া Metropolitan Under-Ground Railway trainএ চড়িয়া Louvre ষ্টেশনে গেলাম। আমার সঙ্গী মহাশয়কেই ষ্টেশন্ ঠিক করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। আমি একা ত কোন মতেই পারিতাম না। পকেট হইতে সহরের ম্যাপ বাহির করিয়া ও পুলিসম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তা ঠিক করিতে হয়। অতএব এক্ষেত্রে একাকী আমার দশা যে কি হইত, তাহা বুঝিতেই পারিলাম। রাস্তা পার হইবার সময় মহাবিভ্রাট। এ দিকে ঘোড়ার গাড়ী, ও দিকে মালের গাড়ী, সে দিকে ষ্টীম ট্রাম, অপর দিকে ঘোড়ার Bus (বস্), Motor Bus; একটু অন্যমনস্ক হইলেই চক্ষুস্থির; "স্বর্ণলতার" বর্ণিত নীলকমলের গতিক অনেক বার হইবার জোগাড় হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া রাস্তা পার হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ করিলাম। পুলিসের বেশ শাসন আছে দেখিলাম। প্রতি মোড়ে ২।৩ জন পুলিসম্যান আছে। তাহাদের হস্ত-স্থিত শ্বেত শাসনদণ্ড দেখাইলেই এক দিকের গাড়ীর স্রোত চকিতের ন্যায় বন্ধ হইয়া যায়, অন্য দিকের গাড়ী

ও লোকজন রাস্তা পার হইয়া যাইলে পর এদিকের স্রোত চলিবার হুকুম পায়। এত ভিড় সত্ত্বেও এরূপ সুবন্দোবস্তের ফলে রাস্তায় দুর্ঘটনা অপেক্ষাকৃত বিরল।

বৈকালে বৃষ্টির পর যখন রৌদ্রপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিসিক্ত, ম্রিয়মাণ পারিস সজাগ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন জনস্রোত যেন শতগুণ বাড়িল; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নগরীর মনোহারিণী শোভাও পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া উঠিল। পথে এত লোক সমাগম আমার চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!

এখানে দেখিলাম, Omnibusএ স্থান পাইবার জন্য রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া বহু উমেদারী করিতে হয়। রাস্তায় গ্যাস-পোষ্টের গায়ে টিকিট টাঙ্গান আছে। যে আগে আসিয়া যে নম্বরের টিকিট লইতে পারিবে, সে সেই হিসাবে Omnibusএ উঠিতে পাইবে। জোর করিয়া আসিয়া উঠিলেই হইবে না; নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী পৌছিলেই টিকিটের "পারম্পর্য্য" হিসাবে গাড়ীতে উঠিবার অধিকার। এত ভিড় হয় যে, এমন একটা বন্দোবস্ত না করিলে ভিড় সামলান দায়। সকলে নত মস্তকে এ শাসন স্বীকার করে।

পূর্ব্বে লুভরে রাজপ্রাসাদ ছিল। সে গৌরব গিয়াছে, কিন্তু রাজকীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। লক্ষ্ণৌএর কাইসারবাগ বোধ হয় লুভরেরই প্রাঙ্গণের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চারিদ্দিকে চকমিলান প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যস্থলে স্থাপত্যের পূর্ণশিল্প-বিকশিত রাজবাটী। এখন প্রজাতন্ত্র আমলে বাড়ীটিতে রাজসুলভ "কায়-দা কানুন" বিবর্জ্জিত। ভূতপূর্ব্ব রাজবাটীর উঠান এখন সাধারণের গমনাগমন স্থান হইয়াছে। প্রশস্ত রাস্তাগুলিতে এমন কি মোটর অম্নিবস পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া প্রজাতন্ত্রের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গৃহভিত্তির চতুর্দ্দিকে মনোহর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নানা কারুকার্য্যখচিত, অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি। প্রাঙ্গণেও বহু প্রধান পুরুষগণের প্রস্তরমূর্ত্তি, কাহারও কাহারও নাম তলদেশে খোদিত আছে; কাহারও বা তাহাও নাই। ইহা ব্যতীত উঠানের চারিদিকে মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর উৎস ও পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকের panorama দৃশ্য বড়ই সুন্দর!

কিন্তু প্রাসাদাভ্যন্তরে যাহা দেখিলাম, তাহার তুলনায় এ সমস্ত কিছুই নহে। তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।
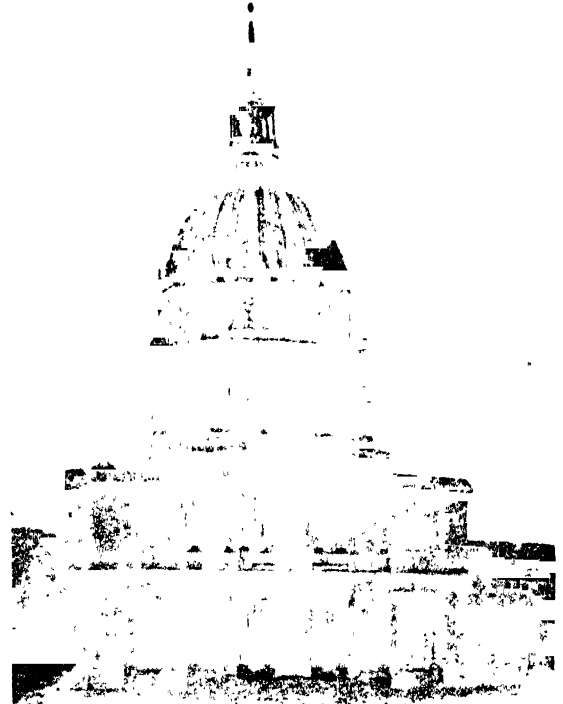
ইনভেলিডে

তাহা একদিনে, এক সপ্তাহে, একমাসে, বুঝিবা এক বৎসরেও দেখিবার ও বুঝিবার নয়। আমি তিন চার ঘণ্টা বেড়াইয়া তাহা কি দেখিব? কি বুঝিব? যাহা হউক, চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। শরীরের, চক্ষের ও মনের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে বসিতে হইল। প্রকাণ্ড হলের মাঝে মাঝে দর্শনক্লান্ত শিল্পামোদিগণের বিশ্রামের জন্য সুখসেব্য আসন যথাস্থানে প্রচুর পরিমাণে আছে। বসিয়া বসিয়াও দুই দিকের রম্য চিত্রাবলী পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। আমি যেখানে বসিয়া অতৃপ্ত-নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড জানালা আছে। চিত্র দর্শনের জন্য আলোকের সাহায্য যথেষ্টই সে জানালায় হয়; আবার "আলেখ্য-দর্শন-শ্রান্তি-বিনোদনের" জন্য জানালার কাছে যাইয়া "চোক বদলাইবার" উপায়-স্বরূপ বিপুল জীবন্ত অশ্রান্ত জনস্রোত ও বহির্জগতের কোলাহল দেখিবারও যথেষ্ট

সুবিধা হয়। আমার সঙ্গীও আমার এই অটুট অধ্যবসায় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিবার জন্য আহার ও আপিসের কাজের অছিলায় পলায়ন করিলেন এবং বহুপরে আসিয়া পুনর্ম্মিলিত হইলেন। ময়রার মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের প্রতি যত্ন ও আদর যেরূপ, কলাবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্যে লালিত সাধারণ ফরাসীরও প্রায় তদবস্থা। অপরিচিত সহরের অভিজ্ঞতা আমার এত অধিক যে, তিনি ফিরিয়া না আসিলে পল্লীগ্রামের বুড়া ঝির মত আমার বাড়ী ফিরিবার উপায় ছিল না। তথাপি তাঁহার বিশেষ কার্য্য থাকায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। একাই ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। "বেতো রোগী" যে এত চলিতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। কয়টা ঘর মাত্র বেড়াইতে যে কত ক্রোশ ভ্রমণ হইল, তাহা বলিতে পারি না। কি কি দেখিলাম, তাহার একটা মোটামুটি তালিকা পর্য্যন্ত দিবার স্থান ও সাধ্য নাই। যে মুদ্রিত সচিত্র তালিকা-পুস্তক দর্শকগণের সুবিধার্থে বিক্রয় হয়, তাহার শত শত পৃষ্ঠা কেবল মাত্র চিত্রগুলির নাম ও বিবরণে পূর্ণ। আমি কলিকাতা মিউজিয়মের ট্রষ্টী-স্বরূপে এইরূপে একটা দর্শক-সাহায্যের বন্দোবস্তের জন্য অনেক দিন চেষ্টা করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইহা পরিতাপের বিষয়। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এ বিষয়ে পুনরায় চেষ্টা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি।—এখানে স্থানে স্থানে শিক্ষিত প্রহরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা দর্শকবৃন্দকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই সাগ্রহে প্রস্তুত। এত বাঁধাধরা নিয়ম সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে চুরির কথা শুনা যায়। মোনা লিসা (Mona Lisa) নামক প্রসিদ্ধ চিত্র চুরি ও পুরস্কারের কথা এখনও সাধারণের মনে জাগরূক রহিয়াছে। তাহার পর হইতে পাহারার কড়াকড়ি আরও বাড়িয়াছে, কিন্তু সুবিধা-মত চুরি বন্ধ হইবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা যে চিত্রের মূল্য, তাহার অপহরণ জন্য শিল্পতস্করেরা প্রভূত ব্যয় ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে। বহু শিক্ষার্থী—এমন কি খ্যাতনামা চিত্রকরগণও—Easel এবং Stool লইয়া, মলিন "Painter's Coat" পরিয়া সেইখানেই বসিয়া বিখ্যাত চিত্রাবলীর অনুকরণ করিতেছে। এই সকল প্রতিলিপিই বহুমূল্যে বিক্রীত হয়! কোথাও কোথাও বা ক্রেতার প্রয়োজন ও পাণ্ডিত্য ভেদে নকলই আসল বলিয়া বিক্রয় হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীর শিল্পীই তন্ময় হইয়া—উদয়াস্ত অর্থাৎ মিউজিয়াম খোলা হইতে বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত, অক্লান্ত মনে এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ফ্রান্সে শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ইহাই প্রধান অংশ। এই সমস্ত অমূল্য চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি, পৌরাণিক দ্রব্যসম্ভারে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ; এমন কি ভিত্তিগাত্রে, গৃহের ছাদ খিলান প্রভৃতি স্থানেও যে সকল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাও অপূর্ব্ব এবং বহুমূল্য। ফ্রান্স, ইটালী, হলাণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রধান প্রধান পুরাতন শিল্পীর প্রধান প্রধান চিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। Titian, Rubene, Rembrandt, Vandyke, Corrigan Botticelli—প্রভৃতি যাঁহারা চিত্র ইতিহাসে অগ্রগণ্য—যাঁহাদের নামে শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শরীর রোমাঞ্চিত হয় তাঁহাদের প্রধান প্রধান চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। লুভরে রাজপ্রাসাদে পুরাতন চিত্র-শিল্পিগণের চিত্রই অধিক। আধুনিক শিল্পিগণের চিত্রের নমুনা এখানে বড় স্থান পায় নাই। সেগুলি Luxemburg Museum ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজ চিত্রকরদিগের মধ্যে Constable ব্যতীত আর কাহারও চিত্র বড় বেশী দেখিতে পাইলাম না। তাহার কারণ, বোধ হয়, ইংলণ্ডে চিত্রবিদ্যার আদর ও উৎকর্ষ তত প্রাচীন নয়; দ্বিতীয় কারণ ফরাসী চিত্রবিশারদদিগের নিকট তাহা তত আদরণীয় নয়। তৃতীয় কারণ, নমুনা-সংগ্রহ বড় সহজে হয় না। ফ্রান্স ও ইটালী হইতে বহু "master pieces" "ডলার"-মহামন্ত্রে দীক্ষিত আমেরিকাবাসী ধনকুবেরগণের করতলস্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডে তাঁহারা এখনও বড় কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু ফ্রান্সের অনেক অপূর্ব্ব রত্ন তাঁহাদের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। একের শিল্পকীর্ত্তিতে উদাসীনতা এবং অপরের উহাতে একান্ত আগ্রহই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে।

দেয়ালে স্তরে স্তরে পাশাপাশি করিয়া সহস্র সহস্র চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। সবগুলি দেখিতে চক্ষু ও মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভাল মন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। এক এক দিনে এক একটি চিত্র ভাল করিয়া দেখিলেও মস্তিষ্কে তাহার যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবন করা সুকঠিন। মোটামুটি দেখিতে গেলেও এক একটি ঘরে অন্ততঃ এক এক দিন কাটাইলেও যাহা হউক এক রকম বুঝিবার চেষ্টা

করা যায়। এইরূপ ছোট বড় কত ঘর যে চিত্রে পরিপূর্ণ তাহার সংখ্যা নাই।

এক Grand Galleryতেই বোধ হয় সহস্রাধিক চিত্র আছে। পুস্তকে পঠিত যে সমস্ত চিত্রের বিবরণ জানা ছিল, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমাদের পুরাতন বাড়ীর বৈঠকখানায় যীশুখৃষ্টের কণ্টকমুকুট-শোভিত রক্তাক্তশীর্ষ একখানি চিত্র দেখিয়া আবাল্য স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। তাঁহার মুখখানি এইস্থানে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইলাম। আবাল্য-স্মৃতিবিজড়িত সেই চিত্রখানির চাক্ষুষ সন্দর্শনে নয়ন মন যে মোহিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শিল্পীর নাম "Reni"। আমার নিজের নিকট যীশুর যে কমনীয় মূর্ত্তির চিত্র আছে, তাহাও কোন প্রসিদ্ধ শিল্পীর চিত্রের নকল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার আসল দেখিতে পাইলাম না। Correganএর এই ছবি ইটালীতে থাকিবার সম্ভাবনা। পুরাতন বোঁর্ব্বো ও অন্যান্য রাজারা সদসদুপায়ে যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ত আছেই; তাহার উপর নেপোলিয়ন্ দিগ্বিজয়সূত্রে রোম প্রভৃতি শিল্প-প্রধান স্থান হইতে যে সকল শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও সজ্জিত রহিয়াছে। তবে এক স্থানে নাই, চারিদিকে ছড়ান আছে।—তিনি "Cleopetra's Needle" আনিয়া Place de Concordএর সম্মুখে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়-লব্ধ কতক কামান "Invalides"এ সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং কতক বা গালাইয়া Colonnade Vauderie নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপ চারিদিক হইতে শিল্প-সম্ভার আহরণ করিয়া নিজ কলাবিদ্যা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। চিত্রশালাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। তাহারই নীচে মার্ব্বেল ও ব্রন্জের মূর্ত্তি-সংগ্রহ। ইহারও কেবল পুরাতন নমুনাই এই স্থানে রক্ষিত;—আধুনিক নমুনার সংগ্রহ Luxemburgএ। Louvreএ নীচের তালায় প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি সংস্থিত। যে স্থলে Byzantine mosaicএর নমুনা রক্ষিত, সে স্থানে যেন গ্রামকে গ্রাম উঠাইয়া আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রোমের স্নানাগার, পাথরের চিত্রবিচিত্র কত চৌবাচ্চাই যে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। উত্তর-আফ্রিকার পৌরাণিক শিল্প-সংগ্রহের স্বতন্ত্র ঘর। "কার্থেজের" নমুনাও বিস্তর রহিয়াছে; গ্রীস, রোম, ইত্যাদির পৌরাণিক নমুনার ত কথাই নাই। "Venus of Milo"—যাহার নামে সমগ্র ইউরোপ পাগল—সেই অপূর্ব্ব ভগ্ন শ্রীমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহার জোড়া নাকি আর নাই। অন্যান্য শিল্পীর "ভিনস্" অনেক আছে বটে; কিন্তু Venus of Miloর নমুনা একটি মাত্র সমগ্র পৃথিবীতে পাওয়া গিয়াছে এইরূপ প্রসিদ্ধি। তাহাই প্যারিসের Louvreএ পরম যত্নে রক্ষিত। অপূর্ব্ব বঙ্কিম ঠাম মর্ম্মর-শিল্প মুনিজন-মনোলোভা। মূর্ত্তির হস্তদ্বয় ভগ্ন, তাহারই বা শ্রীছাঁদ কত! পাছে নষ্ট বা অপহৃত হয়, তজ্জন্য ১৮৭০ সালে ফ্রান্স-জর্ম্মাণ যুদ্ধের সময় এই মূর্ত্তিটি মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। আবার ফ্রান্স-বেলজিয়মে জর্ম্মাণি যে দুর্দ্ধর্ষ সমরানল জ্বালিয়াছে, তাহাতে পারিস প্রায় হস্তগত হইতে হইতে আপাততঃ বাঁচিয়া গিয়াছে; তাহারও জ্বালায় এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নাকি আবার মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বর্ব্বরোচিত ক্রূরতার সহিত জর্ম্মাণ সৈনিকগণ নিদারুণ ভাবে চারি দিকে শিল্পসম্ভার নষ্ট করিতেছে, তাহাতে এইরূপ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

Egypt, Babylon, Chaldea, Assyria—কোন স্থানেরই পৌরাণিক মূর্ত্তিসংগ্রহের ত্রুটি হয় নাই। ভারতের সামান্য কিছু নমুনা আছে মাত্র; তাহার কারণ, পৌরাণিক শিল্প-প্রধান ভারতের কোন অংশে ফ্রান্সের স্থায়ী আধিপত্য কখন স্থাপিত হয় নাই, কাজেই নমুনা-সংগ্রহেরও সুবিধা হয় নাই। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে কত কথারই উদয় হইল; Greece, Rome, Carthage, Babylon, Syria, Chaldea, Assyria প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত। তাহাদের পৌরাণিক শিল্পকীর্ত্তি Smith এর Rome ও Greeceএর ইতিহাসে ও F.A. ক্লাসে পরিচিত। অশ্রুজলসিক্ত Laylor এর ইতিহাসের ভীষণ নীরস কঠোর পৃষ্ঠায় যাহার বিকাশ, তাহা থরে থরে সাজান রহিয়াছে; আর এই চিহ্নমাত্রই এই সকল লুপ্ত সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও অতীত পাপ-ভার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভারত এখনও পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে প্রাণ লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া

রহিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত নিজ প্রাচীন কীর্ত্তি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট ধন্যবাদের বিষয়। লুপ্ত-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধারে বোধ হয় ইংরাজ ও ভারতবাসী কেহই নিরুদ্যম নয়। ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়, সামান্য আশার স্থল নয়। পুরাতন মুদ্রা, মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, গৃহসজ্জা ইত্যাদি সব ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রক্ষিত রহিয়াছে।

লুভরে প্রাসাদ

পুরাতন দেখিয়া নূতন দেখিতেও ইচ্ছা গেল; নতুবা দেখা যে সম্পূর্ণ হয় না। Louvre হইতে Palace of Justice, অর্থাৎ বড় আদালত দেখিতে গেলাম। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিস ও আদালত একই বাড়ীতে; প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় হলগুলি অর্থী প্রত্যর্থী, ব্যবহারাজীব ও সাধারণের ব্যবহারার্থ রহিয়াছে। খাস আদালতগুলি বরং একটু ছোট। সকল আদালতেই একাধিক জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট। দরজা বন্ধ করিয়া বিচার এখানে পুরাতন রীতি। তবে অনেক আদালতেই এখন সাধারণে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। Advocateগণ আমাদের ব্যারিষ্টারদিগের গাউনের ধরণেরই গাউন ব্যবহার করেন; উপরন্তু মাথায় ছোট ছোট কাল গোল টুপী পরেন, তাঁহাদের পোষাক পরিবর্ত্তন ও বসিবার পৃথক পৃথক ঘর আছে; আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর মত হরিঘোষের গোয়াল নহে। বিনয়ী কর্ম্মচারীরা, জিজ্ঞাসা করিলেই ভদ্রতার সহিত কথার উত্তর দেয় ও বুঝাইয়া দেয়; আমাদের দেশের পুলিসম্যান কিংবা চাপরাসীদের চিরপরিচিত ভদ্রতার সহিত এ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কম দেখিলাম।

Palace of Justice হইতে ছাত্রদিগের বোর্ডিং ও Latin Quarter দেখিয়া Luxemburgএ গেলাম। "প্যারিস রহস্যে"চিত্রিত সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু"The School Masterএর" প্রেয়সীর অপূর্ব্ব কুৎসিত মূর্ত্তি মনে পড়িল। দৈবযোগে ঠিক সেইরূপ কুৎসিত এক ডাকিনীকেও পথে দেখিলাম। পুস্তকবর্ণিত চেহারার অবিকল প্রতিকৃতি! 'ইউজেন স্যু' যেন এইমাত্র ইহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া গিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Luxemburg Palaceএ আধুনিক চিত্রাবলী ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীনে আধুনিকে প্রভেদ অনেক দেখিলাম; কিন্তু কে বড় কে ছোট তাহার বিচার করা বড় কঠিন, আর সে বিচারের সময় এখনও আসে নাই। প্রথমেই একটি অতি সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলাম; দেহ শ্বেত প্রস্তরময়, পরিধেয় বস্ত্রখানিও অতি সুন্দর রঙ্গের মার্ব্বেল প্রস্তরের, ওড়নাখানি হরিদ্রাভ [illegible] জাতীয় প্রস্তরের নির্ম্মিত, এইরূপ নানাবর্ণের প্রস্তর বস্ত্রের আকারে ঢেউ খেলাইয়া মূর্ত্তিটিকে আবৃত রাখিয়াছে। শিল্পী কিরূপে এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের অবতারণা করিতে পারিয়াছে, কিছুই বুদ্ধিতে আসিল না! মিউজিয়ামের কতক অংশ দেখা হইতে না হইতেই পাঁচটা বাজিয়া গেল, Museumও বন্ধ হইল। কাল লণ্ডন রওয়ানা হইতেই হইবে, কাযেই এযাত্রা অনেক দেখা বাকী রহিল। ফিরিবার সময় পথে ফরাসী ছাত্রদিগের আমোদ-উল্লাস ও কোলাহল চোখে পড়িল। পাছে তাহাদের আমোদের ব্যাঘাত হয়, (অথবা বোধ হয়, পাছে তাহারা অপরের উপর অত্যাচার করে) এই জন্য তাহাদের সহিত পুলিস-প্রহরী চলিয়াছে। বিশেষ কোন হেতু নাই বা উৎসবের সময়ও নহে—তথাপি এই উদ্দাম উল্লাসের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আর সে উল্লাস-প্রকাশের ভঙ্গী যে কত রকমের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। পথিকগণ শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগের ব্যাপার দেখিতেছে। এইরূপ তিনচার স্থানে তিনচার দল দেখিলাম। বোধ হয়, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকিলে, এখানের ছাত্রেরা এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করে। স্বাধীন দেশের

কথাই আলাহিদা। ইংলণ্ডের ছাত্রেরাও "অশ্ব ক্রীড়া" (Horse play)তে যথেষ্ট পারদর্শী। এ পর্য্যন্ত Universityর কোনও Rectorই বিকট উন্মাদ তাণ্ডবের মধ্যে ব্যতীত বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। barnegie, burzon, Roseberry—কেহই পরিত্রাণ পান নাই। এই-রূপ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রাজা ও রাজপরিষদ্‌বর্গের অত্যাচারে প্রজ্জ্বলিত ও "রুসো" "ভল্টেয়ার" প্রভৃতির উত্তেজনাময়ী লেখনীর সাহায্যে উত্তেজিত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবাগ্নি যখন পূর্ণমাত্রায় জ্বলিতে থাকে, তখন সেই অত্যাচারের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সদৃশ Bastille দুর্গ ভূমিসাৎ হয়। সে স্থানটা প্যারিস হইতে কিছু দূরে। তথাপি একবার দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। দুর্গ ভূমিসাৎকালে যে সকল নাগরিক প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ এক উচ্চ সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আজ কয়দিন বৃষ্টির পর রৌদ্রের দেখা পাইয়া প্যারিস-নাগরিকগণ দলে দলে নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথে, ঘাটে, গাড়ীতে বাগানে, সহস্র সহস্র নরনারী; পথে চলা দুষ্কর—"অমনি বাসে" স্থান পাওয়া তাহার অপেক্ষাও দুষ্কর। অগত্যা Tax-icab লইয়া হোটেলে আসিতে হইল। অন্ধকার মত ভ্রমণের পালাও এইস্থানে সাঙ্গ হইল। হোটেল বিল, চাকরের বক্‌সীস্‌, কুলীর বক্সীস্‌, গার্ডের বক্‌সীস্‌ দিতে দিতে ভ্রমণ-চেষ্টা ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, অতি কষ্টে এসকলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া Gar de Nond ষ্টেসনে আসিলাম। রেলওয়ে ব্যাপার অতি বিস্তৃত। এই ষ্টেসনটি, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা বড় না হইলেও, ঠিক New York ষ্টেসনের নীচে। প্রত্যহ এদিক ওদিক হইতে ১,৬০০ ট্রেণ যাতায়াত করে! দুর্ঘটনা যে নিত্য ভয়ানক রকম হয় না, বরং কালে ভদ্রে কখন ঘটে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। Bertrand সাহেব ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় ষ্টেসনে আসিয়া তুলিয়া দিয়া যাওয়াতে আমার যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইল।

একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী ভদ্রলোক আমার গাড়ীতে ছিলেন। ইংরেজটি জাপানের Consul—নাম Smith, বাড়ী Manchesterএ; যথারীতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র না বুঝিয়া জানিয়া, বিচার ও ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে সে সম্বন্ধে যথার্থ কথা দুই চারিটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতের যে এত কথা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। কথাবার্ত্তায় তিনি ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্য ইংরাজ-চরিত্র! অবশেষে Manchesterএ তাঁহার বাড়ীতে আমায় নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিলেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের যে সব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, উত্তর ফ্রান্সে তাহার বিশেষ কিছুই নাই। পাহাড় বা জঙ্গল আদৌ নাই। তবে সাজান বাগান, অথবা কৃষিক্ষেত্র, কিংবা বৃক্ষশোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিস্তর আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে ঘরবাড়ীগুলি সব পাথরের; কিন্তু উত্তর ফ্রান্সে ইষ্টক-নির্ম্মিতই অধিক। ক্রমশঃ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Calais নগর দেখা যাইতে লাগিল। বাল্যকালে পঠিত Calais অধি-বাসিগণের স্বার্থত্যাগ ও অবরোধকারী ইংরাজহস্তে আত্ম-সমর্পণের কথা মনে পড়িল। প্যারিসে Pantheonএ Rodin এর এক সুন্দর Bronze মূর্ত্তি এই ইতিহাস-কথা ঘোষণা করিতেছে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে এই ক্যালে নগরে কত ঘটনাই যে ঘটিয়াছে!

ক্রমশঃ Light House, Cathedral, বন্দর, চোখে পড়িতে লাগিল।—নগরে পৌছিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাইতে লাগিল। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ইংলণ্ড যাওয়া যায়, এবং খোলা সমুদ্র দিয়া যাইলে তরঙ্গ-ভঙ্গও কিছু অল্প সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সময় অধিক লাগে। ক্যালে হইতে ডোবর-পথেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময় লাগে। সেইজন্য রাজকীয় ডাক এই পথেই যায়। ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, সকল জাহাজই এখান হইতে যাতায়াত করে। আমরা যে জাহাজে উঠিলাম, তাহার নাম Pas de Calais; এটি ফ্রেঞ্চ জাহাজ। ফার্ষ্ট সেকেণ্ড, সকল ক্লাসের লোকেই খোলা ডেকের উপর যায়। "সমুদ্র-পীড়ায়" যাঁহারা পীড়িত হন, মাত্র তাঁহাদের জন্য দুই একটা ক্যাবিন আছে; তাহার জন্য এক পাউণ্ড ভাড়া বেশী লাগে।

জাহাজের উপর বেঞ্চ আছে। আর স্বতন্ত্র ভাড়া দিয়া লইবার জন্য ডেকচেয়ারও আছে। দ্রুত চলিবার

সময় ঢেউগুলি গায়ে লাগে; তাহা নিবারণের জন্য মাঝীরা নিজেদের বড় বড় ম্যাকিণ্টশগুলি যাত্রীদিগকে ভাড়া দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। আর সমুদ্র-পীড়ায়—বমনেচ্ছা হইলে—প্রয়োজন হইবে বলিয়া বমন-পাত্র (!) হস্তে মাল্লারা বেড়াইতেছে; কাহারও উহা ব্যবহারের আবশ্যক হইলে পৃথক ভাড়া লাগে!

ইংলিশ চ্যানেলে প্রায় কেহই বমনোদ্রেক হইতে পরিত্রাণ পান না, এইরূপ জনশ্রুতি। কারণ, তরঙ্গক্রীড়া কিছু অধিক থাকায় জাহাজখানি কিঞ্চিৎ বেশী রকমই দোলে। কিন্তু সমস্ত পথটা ভগবানের কৃপায় আমাতে সমুদ্র-পীড়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। হাওয়া পশ্চিমে ছিল, সেইজন্য খুব কনকনে শীত বোধ হইল না। সূর্য্যালোক মেঘালোকে মিশাইয়া আমাদের চ্যানেল-পার হওয়াটা বেশ সুখকরই করিয়াছিল। তবে ঠাণ্ডার ভয়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে হইল। আর ছেলেরা বুদ্ধি করিয়া ফ্লানেলের যে মোজা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল, তাহাও পরিতে হইল। ইহাতে ঠাণ্ডায় বিশেষ কিছু কষ্ট বোধ হইল না। ডোবরের নিকটবর্ত্তী হইতে তরঙ্গ যেন কিছু বাড়িল। ক্রমে ডোবরের ক্যানেল, নগর, Dover Cliffএর সাদা সাদা খড়িমাটির উপকূল দেখা যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ জাহাজ Doverএ আসিয়া লাগিল। অবশেষে, এতদিন পরে, "শ্বেতদ্বীপে" সত্যসত্যই পদার্পণ করিলাম! জীবনের প্রারম্ভে এ ঘটনা ঘটিলে, বোধ হয়, জীবন-স্রোতঃ অন্যদিকে প্রবাহিত হইত! এখন কোন্ পথে যাইবে, কে জানে?

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক; কিন্তু কেহ কাহারও উপর লক্ষ্য বা দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করে না!—ইহাই ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব। সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। মন নানাভাবে উদ্বেলিত থাকায় এই প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘের মাঝে নিজেকে নিতান্তই একা মনে হইতে লাগিল। যাহা হউক, জিনিষপত্র লইয়া অবশেষে একখানা First class গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়িল। Folkstone, Shorn Cliff, Ashford প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম; যেন কতকালের পরিচিত স্থানগুলি। পুস্তকাদি পাঠে এগুলির সহিত বাল্যকাল হইতেই পরিচিত। অতএব "অজানা" দেশ দিয়া যাওয়ার ভাবটা যেন ক্রমশঃ ঘুচিয়া গেল। ডোবার হইতে লণ্ডনের উপনগর পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বের দৃশ্য অতি সুন্দর। রেলের ধারেই অনেকগুলি কৃষিক্ষেত্র দেখিলাম; অধিকাংশই যেন এক একটি সাজান বাগান। গাছের বেড়া দেওয়া ক্ষেতগুলিতে গৃহপালিত পশু চরিতেছে, Hopক্ষেতে লতান গাছগুলি আমাদের পানের বরোজের লতার মত উঠিয়াছে। দেখিতে বড় সুন্দর। আমার মনে হয়, উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণপূর্ব্ব ইংলণ্ড স্বাভাবিক শোভায় কতকটা একই রকমের। এই হপ্ হইতেই "বীয়র" প্রস্তুত হয়। ফ্রান্সে যেমন আঙ্গুর-ক্ষেত যত্ন করিয়া প্রস্তুত করে, এখানে "হপ"-ক্ষেতগুলিও সেইরূপ প্রস্তুত। হপ পাড়িবার সময় খুব ধূমধাম হয়। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে গাছগুলি যেন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। "Leafy England"এর কতকটা আভাস পাওয়া গেল। এখানেও ফ্রান্সের মত ক্ষেতের মাঝে মাঝে বড় বড় অক্ষরে কাঠ বা টিনের উপর নানা ভাবের বিজ্ঞাপন—ইহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যত লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই বাড়ী এবং ধোঁয়া ও ময়লা বাড়িতে লাগিল। লণ্ডনের Surreysideএ কেবল "চিম্‌নীষ্ট্যাক", আর বিজ্ঞাপনের রাশি; রাস্তাগুলিও অতি সঙ্কীর্ণ এবং অপরিষ্কার।

ক্রমশঃ টেমস্ নদীতীরে উপস্থিত হইলাম; পারেই লণ্ডন। লৌহসেতুর মধ্য দিয়া বামদিকে London Tower দেখা গেল। এসমস্ত এত পরিচিত মনে হইতে লাগিল যে, কাহাকেও বড় জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। নদীতীরবর্ত্তী রাস্তাটিতে লোকে লোকারণ্য। আমরা উপর দিয়া যাইতেছি, রাস্তা অনেক নীচে।

অবশেষে চ্যারিংক্রসে গাড়ী আসিয়া থামিল এবং সত্যসত্যই লণ্ডনে নিরাপদে পদার্পণ করিলাম। ষ্টেসনে সুশীল উপস্থিত ছিল; Cromwell Houseএর পক্ষ হইতে Pearsonসাহেব এবং আরও কয়েকটি বন্ধু অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া এক মোটর ট্যাক্সী লইয়া বাসায় চলিলাম। প্রথমেই পুলিসম্যানের অকারণ ও সবিনয় অভিবাদন লক্ষ্য করিয়া

বড়ই প্রীত হইলাম ইহা লণ্ডনের পক্ষ হইতেই অভিবাদন মনে করিয়া লইলাম।

পথে Hyde Park, Horse Guard, frafalgar Square প্রভৃতি চিত্রে চিরপরিচিত স্থানগুলি চোখে পড়িবামাত্র চিনিতে পারিলাম; একটিও ভুল হইল না। ইহারা চিরকাল স্বপ্নরাজ্যের এক অংশ অধিকার করিয়া আমার অংশীভূত হইয়াছে; কাজেই ভুল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে নূতন নূতন রাস্তাঘাট, টিউব রেলওয়ে, District Railway, Tram, Bus ইত্যাদি ভুল হইতে লাগিল বটে। আমার লণ্ডন—Dickens, Thackerayর লণ্ডন—এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

Earl's Lane 18 Cardley Crescentএ ডাক্তার P. C. Ray বাসা লইয়াছেন; সেইখানেই বাসা স্থির ছিল। অতএব সেই খানেই আসিয়া উঠিলাম। বাড়ীটি, বাড়ীর ধরণটি, চাকরাণীটি, এমন কি আসবাব বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত, সকলই ডাক্তার রায়ের মত—সেকেলে নিরীহ ও স্পর্দ্ধাশূন্য। আমার মত লোকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

স্থানটি নির্জ্জন। নিকটে Earl's Court Theatreএ Shakespeare England অভিনয় চলিতেছে। London University, Northbrook Sociey, সবই এস্থান হইতে নিকটে। রাত্রি নটা পর্য্যন্ত দিনের আলো; অতএব সময় বিভাগ করা বড় মুস্কিল। বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা; "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" এই মহাবাক্য অনুযায়ী ভগবৎ স্মরণ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ যে, তিনি এত বাধাবিঘ্নবিপত্তি কাটাইয়া নিরাপদে এখানে উপস্থিত করিলেন!

কাম

[শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়]

বিশ্বভুবনে তোমার মহিমা,
তোমার বিজয়ী নাম,
সুন্দর ওগো ভুবনমোহন,
মনসিজ মধু কাম!
অঙ্গে তোমার আবেশ মাখানো
চক্ষে মদিরাভাস,
নিখিল বিশ্ব শিথিল হ'ল গো
পরি তব প্রেম-ফাঁস!
পুষ্পধনুর সায়কে বল গো
কি বিষ মাখানো, হায়!—
তিল তিল করি ধীর তুষানলে
হৃদয় জ্বলিয়া যায়!
বিশ্বকাব্যে তুমি আদি রস
অফুরান্ সুধাধারা;
তোমার দহনে পুড়িয় পুড়িয়া
মানুষ শান্তি-হারা!
তোমারে দেবতা দহন করিল—
দম্ভের পরাজয়!
তোমার হস্তে জীবন সঁপিলে
মানুষ 'মানুষ' নয়!

তবু কত ভাব, কত নীরবতা,
কত রূপ, ভাষা, মরি!—
একখানি যেন শরতের মেঘ
রয়েছে জগৎ ঘিরি!
মধুর মন্ত্রে দীক্ষিত করি
শিখাইলে মধুরতা,
কঠিন জীবনে সরস করিলে
মিশায়ে চঞ্চলতা!
নয়নে তোমার স্বপন মধুর
সুন্দর অভিরাম,
কুসুম কোমল ওগো কুসুমেষু,
তোমার বিজয়ী নাম!
জীবন যে দিন মিশাইয়া যাবে
মরণ-সিন্ধু মাঝে,
তখনও তুমি কি দাঁড়াইবে আসি
নবীন বিজয়ী সাজে?
প্রেম-পুরোহিত, হে চির-কিশোর!
সুন্দর অভিরাম,
যৌবনাকুল বক্ষে হের গো,
অঙ্কিত তব নাম!

ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্
ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ

[শিখ্ সর্দ্দারবেশে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ]

"মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার স্বদেশ ও সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ একমনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিবাদের, কারণ ও বিসম্বাদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই সমস্ত বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিশ্রুতি-পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি

সুবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেল্‌জিয়ম. আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্ম-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ আমার সহিত একমত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও জাতিসমূহের কৃত সন্ধি ও তাঁহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলণ্ড ও ভারতের সাধারণ জাতিগত ধর্ম্ম আমার সমগ্র প্রজাবর্গ আমার সাম্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। যে কয়েকটি ঘটনায় ঐ অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্তনৃপতিবর্গ আমার সিংহাসনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনায় স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে বিরাট সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি, এমন আর কিছুতেই হই নাই। যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী হইবার জন্য তাঁহারা একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। ও যে নীতি ও অনুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই প্রীতি ও অনুরাগকে প্রকৃষ্টতম ফল-লাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দিল্লীতে আমার অভিষেকোৎসবার্থ মহাসমারোহে যে দরবার আহূত হয়, সেই দরবারের অবসানে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ভারত ইংরাজ জাতির প্রতি অনুরাগ ও সৌহৃদ্যসূচক যে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ-বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য আমার স্মরণ পথে উদয় হইতেছে।, গ্রেট্‌ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া আপনারা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই সঙ্কট সময়ে আমি দেখিতেছি যে তাহা প্রচুর ও সুমহৎ ফল প্রসব করিয়াছে।"

"সে আমার"

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

শুধু ক্ষণিকের নহে সে আমার,
সে আমার চির-জনমের !
শুধু জীবনের নহে সে আমার,
সে আমার চির-মরণের !
শুধু আপনার নহে সে আমার
সে আমার সারা মানবের !
শুধু মরতের নহে সে আমার
সে আমার সারা জগতের !
শুধু বিলাসের নহে সে আমার
সে আমার চির-বিরহের !
শুধু সোহাগের নহে সে আমার,
সে আমার মধু নীরবের !
শুধু পীরিতির নহে সে আমার,
সে আমার চির-ভকতির !

শুধু পুরুষের নহে সে আমার,
সে আমার সারা প্রকৃতির !
শুধু ভূতলের নহে সে আমার,
সে আমার সারা আকাশের !
শুধু আবাসের নহে সে আমার,
সে আমার চির-প্রবাসের !
শুধু নয়নের নহে সে আমার,
সে আমার সারা হৃদয়ের !
শুধু গরবের নহে সে আমার,
সে আমার মধু সরমের !
শুধু আদরের নহে সে আমার,
সে আমার চির-বেদনার !
শুধু ধারণার নহে সে আমার,
সে আমার চির-সাধনার !!

মাতৃহারা

[শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী]

এটর্ণি হেমেন্দ্রনাথের প্রাসাদতুল্য সাদা বাড়ীখানা দূর হইতে দর্শকের মুগ্ধ চক্ষুকে আপনার শোভাসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিত। বাড়ীখানা বড় রাস্তার ঠিক ধারেই; বাড়ীর চারিদিকে অনেকখানি খোলা সবুজ জমি—স্থানে স্থানে বাগান, বাড়ীর পশ্চাতের অংশেও বাগান। বাড়ী হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিয়ে, তারপর গেট পর্য্যন্ত, একটি কাঁকরফেলা প্রশস্ত রাস্তা—রাস্তার দুইধারে পত্র-শোভা অনতিউচ্চ ক্রোটন গাছের সারি। দক্ষিণ দিকে, কিছু দূরে, বাগানের জমির ভিতরেই ছোটখাট একতল দ্বিতল কয়েকখানি ঘর; এইগুলি বাগানের মালী, দ্বারবান্, এবং চাকরবাকরদের থাকিবার গৃহ। বাড়ীখানির ভিতরের যতটুকু অংশ দেখা যাইত, তাহার মূল্যবান্ সজ্জাদি দর্শনে পথিকের মনে গৃহস্বামীর ধনশালিতার সম্বন্ধে জন্মিত।

বেলা প্রায় পাঁচটা। মাথার উপর আকাশ কোথাও পরিষ্কার নীল—কোথাও লঘু মেঘখণ্ড রৌদ্রে রঞ্জিত; আকাশের গায়ে পাখীর দল সার বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। বাগানের কন্ঠিধারী উড়িষ্যাবাসী মালী দুইজন, গাছে জল দেওয়া, গোলাপ গাছের শুষ্ক পাতা বাছিয়া ফেলা, এবং সিঁড়ির ধারের টবের গাছ গুলার মাটি উস্‌কাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষিপ্র-হস্ততা দেখাইতেছিল। বাড়ীখানি একেবারেই নীরব।—গেটের ধারে যে দ্বারবান্ বসিয়াছিল, গেট খুলিয়া দেওয়া ও বন্ধ করাই যেন তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য; কলের মতই সে ঐ কাজ করিত! বাড়ীর চাকরবাকরেরা কাজ করিত, চলাফেরা করিত, কিন্তু সবই যেন সংযতভাবে;—পাছে গৃহস্বামীর শান্তি ভঙ্গ হয়, এমনই একটা সাবধান সতর্কতা যেন সকলেরই মনে সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল।

বাগানের ভিতর, চাকরদের ঘরের অদূরে, রাধানাথ দ্বারবানের ঘর। রাধানাথ দ্বারবান্ বাঙ্গালী, শৈশবে লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছিল; কিন্তু অল্পবয়সে সিদ্ধি ও গঞ্জিকা সেবায় অভ্যস্ত হওয়ায় মা স্বরস্বতীর নিকট বিদা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। লক্ষ্মীর উপাসনায় রাধানাথের আপত্তি ছিল না, বরং প্রয়োজনই ছিল; কিন্তু হৃষ্ট পুষ্ট সবল দেহ ছাড়া তাহার দেহে এমন কোন গুণ ছিল না যাহাতে পেচকবাহিনী চঞ্চলা দেবীটির প্রসন্নতা আকর্ষণ করিতে পারা যায়। বাটীতে রাধানাথের বৃদ্ধা মাতা এবং ভগিনী মঞ্জরী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। মা বৃদ্ধা, তাহার উপর বারমাসই রুগ্না; ভগিনীরও বিবাহের বয়স হইয়াছে, রাধানাথ অন্য উপায় না দেখিয়া গঞ্জিকা ও সিদ্ধির মাত্রা বাড়াইয়া দিল। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিন কার্য্যেই বিধাতার হস্ত—এই চিরপ্রচলিত বাক্যের সম্মান দেখাইতেই যেন রাধানাথের সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের মধ্যেও মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেল! বর পশ্চিমে রাণীগঞ্জে কয়লার খনিতে সামান্য সরকারের কাজ করিত; তাহার তিন কুলে কেহ ছিল না। দ্বাদশবর্ষীয়া মঞ্জরী বিবাহের পর একেবারে গৃহিনীর পদগ্রহণ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল। রাধানাথের শূন্যগৃহ একেবারেই শূন্য হইয়া গেল। রুগ্না মাতার সেবা হয় না—নিজেও ক্ষুধায় অন্ন পায় না। শেষে, মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, বাড়ী বাঁধা রাখিয়া, গৃহহীন রাধানাথ শূন্য-ভাণ্ডারে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিল; রাধানাথের জননী অনেকদিন হইতেই রোগে ভুগিতে ছিলেন—সেবারকার শীত তাঁহার রুগ্ন ও ভগ্ন হাড়ে সহিল না। সংসারের অভাব ও পুত্রের হাত হইতে বৃদ্ধা মুক্তি লাভ করিলে রাধানাথ অকূলে ভাসিল! পঁচিশ বৎসর বয়সেও সে মায়ের অঙ্কের নড়ি—শিবরাত্রের সলিতা হইয়া, আপনার আহারনিদ্রা এবং নেশা ছাড়া, সংসারের অপর কোন ভাবনা ভাবিবার অবকাশ পায় নাই। ছিপ হাতে, গম্ভীর মুখে রাধানাথ সারাদিন ধরিয়া পুকুর পাড়ে বসিয়া বসিয়া আপনার ভবিষ্যৎ-ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া সে একটা উপায়ও স্থির করিল। ভাবিল, কলিকাতায় গিয়া চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। রাধানাথ শুনিয়াছিল,

কলিকাতার পথে টাকা ছড়ান আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়। রাধানাথ বাড়ী বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিল। তারপর অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতায় গেল। মহানগরী কলিকাতার পথে যে অর্থ ছড়ান আছে, তাহা রাধানাথ অল্প দিনেই বুঝিয়া লইল কিন্তু কুড়াইবার উপায় বা সন্ধান জ্ঞাত না থাকায় তাহার আর টাকা-কুড়ান তত সহজ বোধ হইল না।

(২)

এই ঘটনার পর অসংখ্য সুখদুঃখের কাহিনী বক্ষে ধরিয়া চক্রনেমির আবর্ত্তনে দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মঞ্জরী ভায়ের কোন সংবাদই পায় নাই, ভাইও তাহার কোন সংবাদ লয় নাই। মঞ্জরী চিঠি লিখিয়া চিঠি ফেরৎ প্যাইয়াছে; শেষে দেশের লোকের নিকট শুনিল, ভাই বাটী বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় চাকরী করিতে গিয়াছে। ঠিকানা না জানায় সে চিঠি লিখিতে পারিল না। মা নাই —ভাই কোথায়, তার সন্ধান নাই। দরিদ্র স্বামীর স্নেহ-ভালবাসাই তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা! মঞ্জরী ভাবিল, ভাই একটু থিতবিত হইলেই তাহার সংবাদ লইবে। দিন গণিয়া গণিয়া মঞ্জরীর দিন ফুরাইয়া গেল—স্বামীর কোলে হীরককণার মত ৪ বৎসরের ছেলেটিকে দিয়া মঞ্জরী সংসারের কাছে বিদায় লইল। মাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেটিকে প্রবোধ দ্বিগুণ স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিল। ছেলেটিও তেমনি শান্ত—তেমনি সুন্দর! মঞ্জরী সুন্দরী ছিল—ছেলেটি মঞ্জরীর চেয়েও সুন্দর, বড় ঘরেও তেমন ছেলে কদাচিৎ চোখে পড়ে। মাতৃহীন বালক পিতার গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা কোথা গেল? আমার মা?" পিতা উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমার মা স্বর্গে গ্যাছে রবি।" বালক রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি তবে কার কাছে শোব? কার কাছে থাকব? মাগো! বাবা—আমার মা?" বালক ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পত্নীহীন পিতা ছেলেটিকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেঁদনা—বাবা আমার—আমার কাছে তুমি থাকবে। আমার কাছে শোবে মাণিক?" কিন্তু এ প্রবোধ বাক্য যে মিথ্যা তাহা শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া গেল। ঠিক এক মাস পরে কাল কলেরায় প্রবোধও পত্নীর অনুগমন করিল।

৪ বৎসরের শিশু রবি পিত ফুলটির মত মৃত্তিকায় লুটাইে বেশীরা দয়া করিয়া ছেলেটিকে নি তারপর অনেক চেষ্টায় প্রায় ছয় মাস একদিন রাধানাথের সন্ধান পাইল। র সস্ত্রীক আছে। সে চাকুরী করে।

সব শুনিয়া রাধানাথ ছেলেটিকে নিজে গেল। তাহাদেরও ছেলেপিলে নাই। বঞ্চিতা বন্ধ্যা মগ্নময়ী প্রথম এই আগন্তুকেং আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; মনে করিয়াছি দেবতা ও শুচিতাসম্পন্ন গৃহে এ আবার ভগবান উপগ্রহ জুটাইলেন? কিন্তু ছেলেটির মুখ দেখিয়া সে আর তাহার মনে হইল না। "এস বাবা আমার—এ তোমার ঘর" বলিয়া মগ্ন ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল

এই তাহার ঘর! অনেক দিনের পর রবি শুনিল, ইহাং তাহার ঘর। আশান্বিত চোখ তুলিয়া তাই সে ঘর ও ঘরের মানুষগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল। আগ্রহ অবসাদে পরিণত হইয়া গেল। কোথায় ঘর!—এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত গৃহ, আর ততোধিক অজ্ঞাত এই গৃহের মানবেরা! বালক ইহাদের কিছুই জানে না—কে জানে এখানে তাহার আবদার কেহ সহ্য করিবে কি না। কে জানে এখানে তাহার দুঃখ কেহ বুঝিবে কি না। তাই সে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে—আর চুপ করিয়া মামা-মামীর আদেশ পালন করে।

রাধানাথ লোকটা কিছু গম্ভীর প্রকৃতির। তবু সে ভাগিনেয়কে ভালই বাসিত। দিনের মধ্যে বিশবার সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া বলিত, "চুপ করে বসে থাক খোকা, কিছু দুষ্টুমি কোর না—লক্ষ্মী ছেলে!" রাধানাথ একটিলে দুই পাখী মারিতে চাহিত; সে মনে করিত, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই খোকার শিষ্টতা শিক্ষা এবং তাহারও নিরুপদ্রব অভিভাবকত্ব—দুইই চলিয়া যাইবে। খোকার প্রতি যত্নেরও সে ত্রুটি করিত না; আমটি—চুটি—বাতাসাখানি কিছু না কিছু নিত্য বাজারের সঙ্গে খোকার জন্য আমদানী হইত। অন্তঃপুরে মগ্নেরও যত্নের ত্রুটি দেখা যাইত না। সকাল সকাল দুইটি ঝোলভাত বা একটু আমসত্ত্ব দিয়া দুইটি দুধভাত স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়া ঘুরাইয়া মুছাইয়া

ও সেলাই-করা ছিটের
ূতন-কেনা লাল ফিঁতা-
াটি পরাইয়া, সে তাহাকে
বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতে
। আবার কাজকর্ম্মের মধ্যেই
বাজিলে সে খোকাকে ডাকিয়া
খাবার খাওয়াইত; সন্ধ্যায় ভাত
য়া দিয়া নিজের বিছানায় লইয়া শয়ন
। ছেলেটির খাওয়া-পরার এদিক ওদিক
না—ঠিক যেন কলের মতই তাহার
র-ধারণোপযোগী কার্য্যগুলি চলিয়া যাইতে-
ন।

রাধানাথের স্ত্রী লোক ভাল। কিন্তু সে কাজের লোক, বসিয়া থাকা তাহার একেবারে অনভ্যাস। সারাদিন কাজ লইয়াই তাহার জীবনের দিনগুলি কাটিতে ছিল। রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ সারিয়া সে কাপড় খারে কাচা, ছেঁড়া সেলাই করা এবং অভাবে বাবুদের বাড়ীর সুপারিকাটা, বড়ি দেওয়া প্রভৃতি করিয়া দিত। এই কার্য্যদক্ষতার সুখ্যাতি ঝি মহলেও তাহাকে খুব উচ্চাসন দিয়াছিল। বাজে গল্প না করায় অনেকে তাহাকে "অহঙ্কেরে" বলিত; কিন্তু নিজেদের কাজ করাইয়া লইবার এমন সুদক্ষ যন্ত্রটিকে বিগড়াইয়া দিবার সাহস না থাকায় তাহারা প্রকাশ্যে তাহার কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসাই করিত। বালক রবি সারাদিন ধরিয়া এই আলস্যহীন নারীর কার্য্য দেখিত, আর মনে মনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইত, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথাই বলিতে পারিত না। শিশুসুলভ চঞ্চলতায় পাছে সে বাগানের ফুল ছিঁড়িয়া ডাল ভাঙিয়া বাবুর অপ্রীতিভাজন হয়, সেই ভয়ে মগ্ন বারবার করিয়া রবিকে স্মরণ করাইয়া দিত, সে যেন বাগানে না নামে—যেন দুষ্টামি না করে। সম্ভবতঃ শান্ত প্রকৃতির বালক কোন উৎপাত উপদ্রবই করিত না, তথাপি দিনরাত অনবরত "চুপকরে থাক, দুষ্টামি কোর না" শুনিয়া শুনিয়া তাহারও মনে কেমন জড়ত্ব ও অবসাদ আসিয়াছিল, সে নিজেদের ঘরের দালানে বসিয়া গেটের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিত। একবার ইচ্ছা করিত, মামার মত সেও গেট খুলিয়া দিবে এবং বন্ধ করিবে। একদিন সাহস করিয়া কথাটা মামার নিকট উত্থাপন করিল। রাধানাথ হাসিয়া বলিল, "তুমি ছেলে মানুষ, চুপ করে বসে থাক, লক্ষ্মী ছেলে।" রবির বড় বড় কালো চোখ দুটি অভিমানে জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, সে চোখ নামাইয়া হাতের ছবির বইখানির ছবির পৃষ্ঠাটির দিকে নতমুখে চাহিয়া রহিল। রাধানাথ কখনও কোন জিনিষেরই ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিত না, আজও সে বালকের অন্তরের ভাষা বুঝিল না, তুষ্ট মনে শিস্ দিতে দিতে যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

এস বাবা আমার—এই যে তোমার ঘর

(৩)

এই সন্তানহীন দম্পতির নিস্ক্রিধরা নিয়মবদ্ধ ভালবাসায় বালকের প্রাণ যেন দিন দিন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। খেলা করিবার সঙ্গী নাই, কথা বলিবার, মনের কথা প্রকাশ করিয়া বুকের বেদনাটা লঘু করিয়া লয় এমন শ্রোতা নাই, প্রাণ খুলিয়া মায়ের জন্য কাঁদিবার এতটুকু নির্জ্জন স্থান পর্য্যন্ত নাই। তোমরা হয়ত বলিবে, পাঁচবছরের ছেলের আবার মনের কথা কি? কি যে কথা তাহার, তাহার মত পাঁচ বছরের ছেলেই বলিতে পারে; তবে পাঁচ বছরের ছেলেরও যে মন আছে, আর তাহারাও যে ভাবিতে জানে, সে কথা আমরা রবিকে দেখিয়াই বেশ বুঝিয়াছি। তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও সময় সময় কোথা হইতে হু হু করিয়া দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে। বামহস্তের উল্টা পিঠ দিয়া সে চোখ দুইটাকে ক্রমাগত মুছিতে থাকে, কিন্তু বৃষ্টির জলের মত অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটা ঝরিতেই থাকে, থামিতে আর চাহে না। মামী একদিন বলিয়াছিলেন, "রবি তুমি ভারী ছিঁচ্‌ কাঁদুনি—ছিঃ, বেটাছেলে কি কাঁদে?" মামীর অবশ্য উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না, তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই উপায়ে রবির চোখের জল সহজে বন্ধ করা যাইবে। এ মুষ্টিযোগে কিন্তু সুফল দেখা যায় নাই—চোখের জল বর্দ্ধিতই হইয়াছিল।

রবি যে কাহারও সঙ্গ চাহিতেছিল, তাহাও ঠিক নহে; তবু কেমন একটু নিঃসঙ্গতার বেদনায় তাহার প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে যদি কোন সহৃদয় সঙ্গী পাইত, পুলকে পূর্ণিত হইয়া বলিতে পারিত, তাহার আর খুব বেশী কান্না পায় না। সে মনে করিত, একটা নির্জ্জন যায়গা যদি সে পায়, তাহা হইলে বেশ হয়। এক একবার সেই খানে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সব কান্নাটা কাঁদিয়া আসে, তাহা হইলে আর চোখে জল আসিবে না। রবির মা লেখাপড়া জানিত, রবির বর্ণপরিচয় হইয়া গিয়াছিল। বাবা তাহাকে দুইখানি ছবিওয়ালা পড়িবার বই কিনিয়া দিয়াছিলেন, এক খানি "প্রথম ভাগ" আর একখানি "পরীর গল্প"। রবি বানান করিয়া যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া পরীর গল্পখানি অনেক বার পড়িয়া ফেলিয়াছে—যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া পড়ায় অর্থবোধ হয় নাই, তবু পরী, দৈত্য এ সব সে বেশ বুঝিতে পারিত। সুধু যে বুঝিতেই পারিত তাহাও নহে, বিশ্বাসও করিত। যাঁহারা শিশুচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বালকটি সিঁড়ির উপর একা বসিয়া র[illegible] নহে; খেলাধূলার চেষ্টা না করিয়া অমন করিয়া বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া পারে? বালকের হাতমুখ, কাপড়জামা সাফ থাকে? কিন্তু রবির সহিত সামা[illegible] কহিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। বালিকার মত পূর্ণ ঘন পাতায় ঢাকা বড় বড় কালো তারা আসন্নবর্ষণমুখর সজল চোকদুটি কত সুন্দর গুলি কেমন মিষ্টি,—কি নম্র ব্যবহার? আর তার কি কোমল—করুণ, অল্প আঘাতেই কত বেদনা অবশ্য এটা চেষ্টা না করিলে বুঝিতে পারা যায় [illegible] তোমার যদি হৃদয়স্পর্শক কোনরূপ স্নায়বিক দুর্ব্বলত[illegible] বালাই থাকে—তাহা হইলে উহাকে ভাল না বা[illegible] কোলে না তুলিয়া, কখনই তুমি সরিয়া যাইতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সময় দেউড়াতে বসিয়া প্রদীপের ক্ষীণালোকে রাধানাথ ভাগিনেয়ের পাঠ বলিয়া দিত, কিন্তু শিক্ষকের বিদ্যা ছাত্রের অপেক্ষা খুব বেশী না থাকায় রবির শিক্ষার বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছিল না। বালক যদি সাহস করিয়া কোনও দিন কোনও কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিত, রাধানাথ এমনি অপ্রতিভ অভিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া এমন একটা দুর্ব্বোধ্য ভাষা উচ্চারণ করিত, যাহার অর্থ বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় মল্লিনাথের আবশ্যক হইলেও বালক মাতুলের বিদ্যার বিশালতায় চমৎকৃত হইয়া গিয়া, নির্ব্বাক হইয়া থাকিত। প্রশ্নের অর্থ প্রশ্ন অপেক্ষা জটিল হইয়া গেলেও তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে মাতুলের বিদ্যা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ আনয়ন করিত না। মামার সম্বন্ধে কয় দিনে রবির এই টুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল যে, মামা তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু কি[illegible] যে রবি তাহা বুঝিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে কিন্তু [illegible] তাহার ঠিক উত্তর দিতে পারিত না। তথাপি যে [illegible] চুম্বককে লৌহের নিকটে টানে, [illegible] নিয়মেই রবি বালক হইলেও বুঝিত, মামা তা[illegible]কে [illegible]বাসে। তাহার ইচ্ছা করিত, মামার হাত ধরিয়া সে ঐ প্রকাণ্ড দেউড়ী পার হইয়া বাহিরে চলিয়া যা[illegible] ঐ ব[illegible] বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর চলিয়া যেখানে রাস্তার শেষ

চলিয়া যায়। রাস্তায় যে সব
ন্ করিয়া দ্রুত পদে তাহারা
এত লোক কোথায় যায়? রবি
ার লোক হইত, তাহা হইলে বেশ
ৎ সম্বন্ধে রবির অভিজ্ঞতা বড় বেশী
সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন, বাহিরে
ছেলেদের সহিত মিশিতে পর্য্যন্ত দিতেন
ত রবির কোনও অভাব বোধ ছিল না,
মায়ের সহিত ছোট খাট কাজ করিয়া মায়ের
তে পারায় মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব
মায়ের সহিত সে খেলা করিত, সন্ধ্যার সময়
সারিয়া চুল বাঁধিয়া কাপড় কাচিয়া ঘরে প্রদীপ
দুয়ারে জল দিয়া শাঁক বাজাইয়া মা কতক্ষণে
ক মাদুরের উপর তাহাকে লইয়া গল্প বলিতে
বেন, সেই সময় টুকুর জন্যই পুলকিত চিত্তে সে অপেক্ষা
রিয়া থাকিত। কত বিচিত্র স্বপ্নপূর্ণ পরীর গল্প, সাত
মুদ্র তের নদীর পারে সলিলগর্ভে প্রবাল অট্টালিকায়
নিদ্রিত রাজপুরীতে যে রূপসী রাজকন্যা শিয়রে সোণার
কাটি রূপার কাটি লইয়া সর্পমস্তকের মণিহস্তে রাজ-
পুত্রের প্রতীক্ষায় গভীর নিদ্রায় সময় যাপন করিত,
বিমাতার হিংসাতাড়িত যে হতভাগ্য রাজকুমার দ্বাদশহস্ত-
পরিমিত যে কাঁকুড় ফলের ত্রয়োদশ হস্ত বীচির অনুসন্ধানে
সহৃদয় মনুষ্যভাষাবিৎ পক্ষিপুঙ্গবের ছিন্নপক্ষ আরোহণে
"তেপান্তর মাঠে"র রাক্ষসরাক্ষসীর কোন অভিনব দেশে
যাত্রা করিত, সেই সব আশ্চর্য্য মনোরম কাহিনী কখনও
সভয় দুরুদুরু বক্ষে—কখনও পুলকিত দেহে শ্রবণ করিত।
পিতার সহিত কখনও তাঁহার কার্য্যস্থানে যাইত, সেখানে
কেবলি খনি আর কয়লার পাহাড়; কত বিচিত্র অবোধগম্য
যন্ত্রপাতি—মাটির নীচে কত বড় সুড়ঙ্গ! তাহার মনে হইত,
ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া বরাবর নামিয়া গেলে বোধ হয় পাতাল-
পুরীতে পৌঁছান যায়। সেখানে বাসুকি নাগ হাজার
ফণায় মাণিকের বাতি জ্বালাইয়া পৃথিবীটাকে মাথার উপর
ধরিয়া রাখিয়াছে। কপিল মুনি হয় ত তাহারই অদূরে
ঋষিদের চল্লের উপর বসিয়া চোখ বুজিয়া তপস্যা করিতে-
ছেন! আরও কত কি আছে। রবি সব জানে না, বড়
হইয়া সে যখন মায়ের রামায়ণখানা পড়িয়া ফেলিবে, তখন
এক মুহূর্ত্তেই এই সব অস্পষ্ট অজ্ঞাত কাহিনীর সবটুকু
রহস্যই তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে! রবির
ইচ্ছা করিত, আর একটু বড় হইলেই সে একদিন পিতার
নিকট অনুমতি লইয়া খনির ভিতরকার অপূর্ব্ব ব্যাপারটা
দেখিয়া আসিবে। যে সব কুলী খনির ভিতর কাজ করিত,
প্রশ্ন করিয়া করিয়া রবি তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলিত।
"বাসুকিনাগ" "বলিরাজা" "কপিলমুনির" সম্বন্ধে তাহারা
কল্পনাতেও কখনও কোন কৌতূহল অনুভব করে নাই—
এসব কথা তাহারা বুঝিতেও পারে না। তবু এই প্রিয়-
দর্শন সুকুমার শিশুচিত্তে বেদনা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের
ছিল না, তাই রবির সকল কথাই তাহারা মানিয়া লইয়া
আগ্রহ দেখাইয়া সায় দিয়া যাইত। এমনি করিয়া সুখপূর্ণ
কল্পনারাজ্যে মা-বাপের স্নেহময় পক্ষপুটে শিশুরবি যখন
শান্তিনীড়ে বর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই সময় সহসা একদিন
কাল বৈশাখের ভীষণ ঝটিকায় আশ্রয়চ্যুত পক্ষিশাবকটির
মতই সে জলে কাদায় লুটাইয়া পড়িল—ভীষণ
বজ্রাঘাতে পায়ের তলার মাটি সরিয়া গেল। বালক
হইলেও রবি বুঝিল, সে আজ অনাথ,—আশ্রয়হীন,
একাকী! প্রতিবেশী বাঙ্গালীরা তাহাকে আশ্রয় দিল।
সুন্দর মুখের যে আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বরদত্ত—সেই আকর্ষণী
শক্তিতে রবি তাহাদের স্নেহও লাভ করিল; তবু তাহার
বুকের বেদনা ঘুচিল না। মা—তাহার মা? ক্ষুদ্র হৃদয়খানা
উদ্বেলিত করিয়া বুকের ভিতর রুদ্ধ হাহাকার ঠেলিয়া
উঠিতে চায়—"মা! আমার মা।" রবির ইচ্ছা করে, সে
অন্য বালকদের মত সামান্য খুটিনাটির ছুতা করিয়া একবার
চীৎকার করিয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদে, কিন্তু পারে না;
স্বভাবতঃ তাহার সহিষ্ণু শান্ত প্রকৃতিই তাহাকে বাধা দেয়।
তাহার উপর তাহার অবস্থা তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া
দিতে থাকে যে, সে এখানে দয়ার পাত্র—তাহার আবদার
হয়ত কেহ সহ্য করিবে না।

মামা মামীর আশ্রয় পাইয়া রবির চিত্ত অনেকটা শান্ত
হইল—কিন্তু সান্ত্বনা পাইল না। রাধানাথ গম্ভীরপ্রকৃতির
লোক, ছোট ছেলের সহিত খেলা করিয়া বা বাজে কথা
কহিয়া, সে আপনার সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্যকে "খেলো" করিতে
সাহস করিত না। হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের মতই গুম্ফ
গালপাট্টার পরিশোভিত গম্ভীর মুখখানায় গাম্ভীর্য্যের রাশি

হাসিয়া তাহার দিকে স্নেহপূর্ণ কটাক্ষে চাহিয়া বারবার বলে—"লক্ষ্মী ছেলে চুপ করে বসে থেক, আর তোমার মামীর সব কথা শুনো—বুঝলে?" সন্তানহীনা মগ্নও সন্তানপালনের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিত না। ঘরকন্নার কার্য্যের পারিপাট্য, স্বামীকে রাঁধিয়াবাড়িয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন-করান এবং অবসরকালে হরিনামের মালা জপ করা ছাড়া অপর কোন বিষয়ে তাহার চিন্তা বা সময় সে সাধ্যমত বৃথা অপব্যয় হইতে দেয় নাই। মামার বিশ্বাস ছিল, ছোট ছেলেপিলেদের যত্ন ও পারিপাট্য প্রদান করিতে পারিলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হইল। সুসজ্জিত পুতুলের মতই তাহারা আনন্দদায়ক গৃহ-শোভা। আত্মতৃপ্তির জন্য তাহাদের যে প্রয়োজন আছে—এই কয় দিনের অভিজ্ঞতায় এই নূতন তত্ত্বটুকুও সে লাভ করিয়াছে। এখন চিন্তা, এই সুন্দর ছেলেটিকে কেমন করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আরও একটু হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারা যায়? মগ্নের পিতা জমীদারের বাড়ীর সরকার ছিল। মগ্ন জানিত, সরকারের পদ খুব সম্মানিত; কারণ, সে তাহার পিতার উপার্জ্জন ও চাকরবাকরদের প্রতি আধিপত্য দেখিয়াছে। সুতরাং তাহার একান্ত ইচ্ছা, রাধানাথ নিজের মত না করিয়া, ভাগিনেয়কে স্কুলে দিয়া একটু ভাল লেখা-পড়া শিখাইয়া, জমীদারের বাড়ীর বাজার-সরকারের উপযুক্ত করিয়া তুলে, ভগবান তাহাদের উপরে যে গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ত্তব্যভার চাপাইয়া দিয়াছেন, তাহা পালন করিতে পারে।

রৌদ্রের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, মালীরা বাগানের গাছে জল দেওয়া শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভিজা মাটি হইতে একটা সুমিষ্ট সোঁদা গন্ধ উত্থিত হইতে-ছিল। রোদের তেজ কমিয়া যাওয়ায় রাস্তায় লোক চলা-চলও বাড়িয়াছিল। আফিসফেরৎ বাবুদের চলনে একটা ক্লান্তির ভাব, কলেজপ্রত্যাগত যুবকদের উৎসাহব্যঞ্জক গতি গোলদীঘীর উদ্দেশে প্রধাবিত। ফিরিওয়ালারা বিচিত্র সুরে হাঁকিয়া যাইতেছে। বাগানের সম্মুখের অংশে প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানার চওড়া সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া রবি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোলের উপর ছবি দেওয়া বইখানির একটি বিচিত্র উদ্যানে পরী-রাণীর নিকট একটি দণ্ডায়মান বালকের ছবি দেওয়া পৃষ্ঠাটি খোলা রহিয়াছে।

তাহার মন ও চক্ষু তখন অদূর প্রকাণ্ড গেটের উপর এবং তাহার গেটের বাহিরে যে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ [illegible] গিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া যাত[illegible] এমনি করিয়া এক ঘণ্টারও অধিক কাল [illegible] আছে। তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা ক[illegible] সে এখানে বসিয়া আছে? সে বোধ হয় ব[illegible] ক্ষণ—দুচার ঘণ্টা।" কারণ তাহার সময়জ্ঞ[illegible] প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সোফার মটর গাড়ী লই[illegible] যখন একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক—রবির দিকে চাহিয়া দেখিয়া, হাতের খবরের কাগজখানা পড়িতে মটরে চড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন [illegible] রবি ঠিক এই খানে এমনি করিয়া বসিয়া আছে। ভদ্র[illegible]টিকে রবি চিনিত, তিনি "বাবু"। মামা অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সে যেন কোন রকম দুষ্টামী না উৎপাত না করে, গাছের ফুলপাতায় না হাত দেয়—ত[illegible] হইলে "বাবু" ব্যাজার হবেন। প্রত্যহ এই সময় রবি দেখিতে পাইত—বাবু মোটরে চড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় প্রতিদিনই তিনি রবির দিকে চাহিয়া দেখিতেন। বাবুর সম্বন্ধে মামার নিকট হইতে সে যে সকল ভীতিপূর্ণ উপদেশ পাইত, সে সকল সত্ত্বেও বাবুকে দেখিয়া তাহার মনে কোন ভয় হইত না। তাঁহার বিষণ্ণ মুখ, কেমন এক রকম চাহনি, রবিকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত—অনেকটা সেই জন্যই সে এই সময় ঠিক এই খানে আসিয়া বসিত। বাবু চলিয়া গেলে রাধানাথ গেট বন্ধ করিয়া দিয়া রবিকে শান্ত হইয়া থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গুণ গুণ করিয়া "সখী সে নিঠুরে কালরূপ আর হেরব না" গায়িতে গায়িতে বাহিরে চলিয়া যাইত। রবির স্মরণশক্তির উপর রাধানাথের সতর্ক সাবধানতা রবিকে অনেক সময় পীড়িত করিয়াই তুলিত। রবি মুখ ফিরাইয়া তাহাদের ঘরের দিকে [illegible]। খোলা জানালা দিয়া রাধানাথ-পত্নীর [illegible] কার্য্য [illegible] রবির চোখে পড়িত। ঘর[illegible], বাসনমাজা, [illegible] সমস্ত কাজই শেষ হইয়া [illegible] একখানা ছেঁড়া [illegible] লইয়া সে তখন ঘরের [illegible] দেওয়াল-পাঁজি [illegible] গুলি, বাড়ীর আলনাটি [illegible] ঝাড়া [illegible]

। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিবে বিমুখ চিত্ত সেখানে যাইতে অতর্কিত ঘটনার জন্য সে যেন তেছিল। কিন্তু কি যে সে ঘটনা, নজে সে তাহা কিছুই জানে না। র্জনতা তাহার নিঃসঙ্গচিত্ত গভীর ৫ লাগিল। বইখানি একবার পড়ি- -যদিও বইখানির অর্দ্ধেক কথাই সে , তবু গল্পগুলি সবই তাহার মুখস্থ হইয়া । পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে গল্পগুলি । আবৃত্তি করিতেছিল। এই বইখানিই চয়ে আনন্দের জিনিষ, তাহার প্রিয়তম সঙ্গী। দিন রবির মামা রবিকে আলিঙ্গ দিয়া তাহাকে য়া চুমার পর চুমা দিয়াছিলেন, সে কথা রবির আছে। সে আর কমাসের কথাই বা? বইয়ের । মলাটে রবির মা নিজে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন বিলোচন রায়"। রবি যুক্ত অক্ষর পড়িতে পারি না, এই মাতৃ-হস্ত-লিখিত যুক্ত অক্ষরটি চেষ্টা করিয়া শিখিয়া ইয়াছিল। রবির মনে অনেক কথা উঠিতেছিল—চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গিয়াছিল, হাঁটুর উপর হইতে পাতা-খোলা বইখানা কঙ্করময় পথে পড়িয়া গেল। আজ আর বইখানাও তাহাকে আনন্দ দিতে পারিতেছিল না। বইখানিকে কুড়াইবার জন্য রবি সিঁড়ি নামিয়া বাগানের পথে দাঁড়াইল, চোখের জলে সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, বইখানা আর কুড়াইয়া লওয়া হইল না, সহসা গলার কাছে কি একটা যেন আটকাইয়া গেল। বাষ্পজড়িত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া মুখে হাত চাপা দিয়া, সহসা সে একদিকে অনির্দ্দেশ্য ভাবে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে ছুটিয়া গিয়া একটা জায়গায় ঘাসের উপর পড়িয়া খুব খানিক কাঁদিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ রকম তীব্র [illegible] দুঃখ অধিক [illegible] স্থায়ী হয় না—চোখের জল [illegible] হইয়া অনেকটা [illegible] কমাইয়া দেয়। নহিলে মানুষ [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible] কাপড়চোপড়ে [illegible] লাগিয়াছিল, মাথার চুলেও [illegible] ক্রন্দনের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, ধূলা ও শুষ্ক [illegible] পাইতেছিল। ভুগ্নগণ্ডে অশ্রুজলের মলিন চিহ্ন। কাঁদিয়া রবির মনের ভার যে [illegible] সবটুকু কমিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আগে [illegible] রবির চাহিয়া দেখিল—নাঃ—কেহ দেখিতে পায় নাই। [illegible] পিতার [illegible] হইয়া আনন্দের সহিত রবি নিকটবর্ত্তী একটা পুষ্পখা [illegible] গন্ধরাজ গাছের দিকে অগ্রসর হইল। সে যেখানে আসি [illegible] দাঁড়াইয়াছিল—সেও একটা বাগান। বড় বড় গাছের কচিপাতায় স্থানটিকে বড় বেশী অন্ধকার করিতে পারে নাই, কেবল কোমল শ্যামলতায় ভরাইয়া তুলিয়াছিল। একটা অপরিচিত ফুলের গাছে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল—সুগন্ধে দিক পূর্ণ। রবি অত্যন্ত সাবধানে কাপড় গুটাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহার ভয় হইতেছিল—পাছে সে গাছটা ছুঁইয়া ফেলে। চারিধারের সুগভীর নিস্তব্ধতায় তাহার মনে হইতেছিল—বুঝি সে পরীদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। রবির ভয় হইল, সে ফিরিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না, সামনেই একটি সরু রাস্তা; সে সেই পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, তাহার বইয়ে লেখা আছে, "মনুষ্যেরা পথ হারাইয়া সোজা পথে চলিতে চাহে না—বক্র পথেই তাহাদের দৃষ্টি।"—"মনুষ্য" "বক্র"—"দৃষ্টি" এসব কথার রবি মানে জানে না, পথ হারাইয়া সোজা পথে চলিবার কথাটুকুর অর্থই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মার কথা মনে পড়িয়া গেল। মা যদি থাকিতেন, রবি তাঁহার কাছে অবোধ্য ভাষার অর্থগুলি জানিয়া লইত। বাড়ীর ভিতর কোথা হইতে একটা ঘড়ি বাজিতেছিল, বাজনাটা অনেকটা কোকিলের সুরের ন্যায়, সে অবাক হইয়া শুনিতেছিল। তাহার মনে হইল, পরীদের গান—অমনি বুঝি, আনন্দ-কৌতূহলের সহিত ভয়ও বাড়িতেছিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে পাখীর ডাক আর ঘড়ির বাজনা, বড় মিষ্ট শুনাইয়াছিল। সে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার গা ছম ছম করিতেছিল; কারণ এ বাগান রবি আর কোনও দিন দেখে নাই। বাগানের চারিদিকে দেওয়াল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দেওয়াল গেটের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছিল। গেটের ভিতর দিকেও আবার বাগান। সে বাগানটা খুব বড় নয়। বাগানের সমস্ত গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। কতকগুলি ফুলের নাম তাহার জানা —বেল, যুঁই, ঝাঁটি, চন্দ্রমল্লিকা। আরো কত ফুল আছে,

রবি তাহার নাম জানে না। সে দেখিল, গেটের ভিতরের দিকে চাবী বন্ধ; বাহিরের দিকে রবি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানেও অনেক গাছপালা। রবির মনে হইল, এটা একটা দৈত্যপুরী। সে চোখ মুছিয়া গেটের ধারে দাঁড়াইয়া, সাদা সাদা ফুলে ভরা বাগানটির দিকে দেখিতে লাগিল। শান-বাঁধান রাস্তার উপর সাদা কাপড়-পরা একজন স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিলেন। স্ত্রীলোক-টিকে দেখিয়া রবির মার কথা মনে পড়িল, দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া, সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রমণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য, যেন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের মত একটা বিষাদে আচ্ছন্ন। তাঁহার চলনের ভঙ্গীতেও যেন অন্তরের গুরুভার ব্যক্ত করিতেছিল, নত দৃষ্টিতে তিনি রাস্তা অথবা ফুল, কি যে দেখিতেছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বক্ষবদ্ধহস্তে নত দৃষ্টিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। রবি অবাক হইয়া ভাবিতেছিল যে, কেন তিনি এমন চোখ নীচু করিয়া দাঁড়াইতেছেন? তাঁহার কি কিছু দুঃখ হইয়াছে? রবির যখন দুঃখ হয়, কান্না যখন চাপিয়া রাখা যায় না, সে এমনি চোখ নীচু করিয়া মাটির পানে চাহিয়া থাকে, চোখের জল কেহ দেখিতে পায় না। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, রমণীকে দেখিতে যেন কতকটা তাহার মায়ের মত। মনে হইতেই তাহার গলাটার কাছে কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল, বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তার পর দরজার পাশে ঘাসের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রবির উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের অস্পষ্ট শব্দ রমণীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছিল। তিনি মুখ তুলিয়াই গেটের ধারে রবিকে দেখিতে পাইলেন। সহসা সম্মুখে সর্পদর্শনে মানুষ যেমন সভয়ে পিছাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সেই রমণী পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, এখনি ছুটিয়া সে স্থান ত্যাগ করিবেন; কিন্তু সে ভাব তখনই চলিয়া গেল; মনে বল, হৃদয়ে ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া মৃদু পদক্ষেপে তিনি গেটের ধারে দাঁড়াইলেন। অত্যন্ত কোমল মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তোমার কি হয়েছে ধন্—কাঁদছ কেন?" সুমিষ্ট কোমল কণ্ঠ—সহানুভূতির স্বর। রবি তাহার উচ্ছ্বসিত মনের ভাবকে চাপিতে [illegible] বেদনায় উচ্ছ্বাসভরা ক্রন্দনের স্বরে [illegible] —"মাগো মা!"

রমণীর মুখখানা সহসা বিবর্ণ [illegible] বিবর্ণ আনত মুখে তিনি কম্পিত [illegible] জন্য রেলিংটা ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁ[illegible] থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মানসিক [illegible] পাংশু ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া কিছুক্ষণ এমনি ভ[illegible] গেলে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া রমণী স্নেহপূর্ণ [illegible] বলিলেন, "খোকা—একটুখানি থাকো—আমি এ[illegible] খুলে দিচ্ছি। চাবি [illegible]য়ে আসি, গেট্‌টা কতদিন [illegible] হয়নি—ওঃ তিনবচ্ছর!"

রমণী চলিয়া গেলে রবি উঠিয়া দাঁড়াইল, হা[illegible] চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, শুভ্রগণ্ডে অশ্রুজলের চিহ্ন তখনও রেখা টানিয়াছিল। কাপড়জামায় [illegible] লাগিয়া গিয়াছে, একবার মনে হইল পলাইয়া যায়—কি[illegible] সেত [illegible] জানে না। এ কোন্ অজ্ঞাতদেশে সে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ঐ রমণী?—তাহার মৃত জননীকেই [illegible] জগতের মধ্যে একমাত্র সুন্দর বলিয়া জানি[illegible] দেখিয়া রবির মনে হইল, ইনি বোধ হয়, [illegible] কি অত সুন্দর হয়?

রমণী তাড়াতাড়ি চাবী খুলিয়া দিলেন [illegible] পুরাতন গেট্‌টা বহুদিন অব্যবহারে—একেবারে [illegible] হইয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে গেট খোলা [illegible] পলাইয়া যাই[illegible] করিতেছে দেখি[illegible] মৃদুস্বরে রম[illegible] "[illegible] খোকা [illegible] কোন ভয় নেই! [illegible] কি হয়েছে? [illegible] গেছে? লেগেছে বুঝি [illegible] হয়েচে আমায় বল [illegible]" রবির বুক-খানা তখনও [illegible] সমুদ্রবক্ষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে কেবল বলিল—"মাগো—আমার মাগো" সে চোখ বুজিয়াই পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল কি[illegible] তাহা ঘটিল না। এক[illegible] খানি কোমল [illegible] তাহার [illegible] বলিলেন, "[illegible]—তাহার [illegible] কথা [illegible] গেল—বুকের [illegible] সহসা [illegible] বিবর্ণ হইয়া [illegible] কাঁপিতে

রমণী রবিকে বুকের কাছে টানিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, খোকা—খোকা!

নাই তাঁহাকে
লয়াছে। তিনি
বসিয়া পড়িলেন।
াহার পানে চাহিয়া
ও সে বুঝিয়াছিল যে,
কিছুই নাই। সেই
াহাকে কোলের কাছে
হার মুখের হাত সরাইয়া
চোখ মুছাইয়া দিলেন, তখন
দিল না। বরং তাঁহার
মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে
, তাঁহার কোলের ভিতর মুখ
যদিও তখন সে থাকিয়া থাকিয়া
ছিল তথাপি কি একটা অননু-
সুখে তাহার ক্ষুদ্রহৃদয়খানি ভরিয়া
ছিল। এই অপরিচিত স্নেহস্পর্শে
তাহার মৃতা জননীর সুখস্পর্শ স্মরণ
য়া সমস্ত দেহে একটা পুলক-তাড়িত-
ম্পন অনুভব করিল।

বিস্ময় ও আনন্দের বেগ শমিত হইয়া আসিলে রবি বুঝিতে পারিল, রমণী কাঁদিতেছেন। বিব্রত রবি ব্যাকুল নেত্রে বার বার তাঁহার মুখের পানে চাহিতেছিল। সে ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, কি করিয়া কি বলিয়া, সে সান্ত্বনা দিবে। রবি কাঁদে, তাহার যে মা নাই; সে ছেলে মানুষ,—তাই সে কাঁদে; কিন্তু ইনি কাঁদিতেছেন কেন? ইঁহারও কি মা নাই? ইঁহারও বুঝি খুব দুঃখ! তাহার মতই দুঃখ কি?

রমণী রবিকে বুকের কাছে টানিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "খোকা—খোকা!" রবির ক্ষুদ্র সুগোল ক্ষুদ্র হাতখানি আপনার কোমল হাতে [illegible] ভর চাপিয়া বলিলেন, "গোপাল, তুমি রোজ রোজ আমার [illegible]—বল আসবে ত?" রমণীর [illegible] এমনি একটা [illegible] কাতরতা ধ্বনিত হইল যে, [illegible] বালকও এখন তাহার গভীরতা বুঝিল। সে [illegible] করিয়া আসিবে।

[illegible] রমণীর মুখে রবির খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। একটু খানি ম্লান হাসি হাসিয়া রমণী বলিলেন, "খোকা, আমরা যে কাঁদছিলুম, একথা কেউ জানতে পারা ভাল নয়, কেমন?" সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—"না, তা হলে লোকে কাঁদুনে বলে।"—স্নেহপূর্ণ নেত্রে বালকের সুকুমার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রমণী বলিলেন, "তোমার নামটি কি গোপাল, বলত?" রবি হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "আমার নাম গোপাল নয় ত—আমার নাম শ্রীরবিলোচন রায়। আমার বয়স পাঁচ বচ্ছর!" রবির বিশ্বাস ছিল নাম বলিতে গেলে বয়সের সংবাদও জানান অবশ্য কর্ত্তব্য। "পাঁচ বচ্ছর—ওঃ—" একটা ব্যথিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস রমণীর অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। রবির কুঞ্চিত তৈলসিক্ত চুলগুলির ভিতর কোমল অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে রমণী

বলিলেন—"এস রবি, আমরা বাগানে বসি; তুমি তোমার সব কথা আমায় বল দেখি—কেমন করে তুমি [illegible] এলে ?"

"কেমন করে এলুম ?—আমার দুঃখ হচ্ছিল, আমি [illegible] এলুম।"

রবি তাঁহার হাতের চুড়ীগুলি নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় দেখে আপনার দুঃখ হয় নি ?"

"আমার—হাঁ, তোমায় দেখে আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে, আমার বোধ হয়, সকাল-বেলাই আবার তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করবে—খেলা করতে। করবে না ?"

"এঁ,—খেলা করব—এখানে খেলা করব—আপনার সঙ্গে ? আপনি খেলবেন আমার সঙ্গে ?" বেদনার উপরই বারবার আঘাত লাগে। রমণীর বিষণ্ণ মুখ আহত বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। উদ্বেলিত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া দূরপ্রসারিত দৃষ্টি রবির মুখের উপর স্থাপিত করিয়া অত্যন্ত করুণ কষ্টের স্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি খেলব—তোমার সঙ্গে ?—আচ্ছা আমি চেষ্টা করব।—খোকা—খোকা—তুমি যদি জানতে—না থাক্, আচ্ছা বল দেখি। তুমি কোথা থেকে এসেচ ?"

এক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুদ্র রবির সমস্ত ইতিহাস টুকুই তিনি জানিয়া লইলেন। আহা পিতৃমাতৃহীন বালক ! অভাবের বেদনা বেদনাতুর বক্ষেই বাজে। "আচ্ছা তোমার মামা আর মামীমার কাছে ঐ বাড়ীতে থাকতে তোমার ভাল লাগে ?" সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। কারণ, এখন নিশ্চয়ই তাহার ভাল লাগিতেছিল। দুঃখের মেঘটা কাটিয়া গিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টা আবার জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রবি কহিল, "তাঁরা রাগ করবেন খুব ?"

রমণী উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"আমি যে না বলে চলে এসেচি, আমায় তাঁরা লক্ষ্মী হতে বলেন। আমি তা হতে পারি না।" রবি একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল।

"না, না, খোকা, তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা আমি কি তাঁদের বলব, তুমি আমার কাছে এসেছিলে ?"

"আপনি বলবেন ? কি করে আপনি তাঁদের চিনতে পারবেন ?" রবি বিস্ময়পূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের [illegible]

[illegible] গেরেচি !"

বাগানের [illegible] এক [illegible] কল [illegible] ধারা মুক্তার মত চারিদিকে মুগ্ধ রবিকে কোলে করিয়া। কলের জলে মুখ ধুয়াইয়া অঞ্চলে হৃষ্টপুষ্ট বালককে কোলে করিয়া দেহে তিনি পরিশ্রম অনুভব করিতে

রমণী বলিলেন "তোমার যত সময় হয়, তুমি রোজ সকালে এইখানে আমি এই দিকেই থাকি, পড়ি—সেলাই করে বসে থাকি। দেখ খোকা, [illegible] জুতোর ফিতেটা খুলে গেছে যে, আমি

রবি নিজে ফিতাটা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তুলিয়া বলিল, "দেবেন ? দিন্ তবে ?"

জুতার ফিতা বাঁধা হইয়া গেলে রবি তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিলে, রমণী তাহার শুভ্র কপোলে চুম্বন করিয়া ক্ষীণ হাসির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রণাম করলে যে খোকা ?"

"বাঃ ! আপনি যে আমার জুতোয় হাত দিলেন ?" রমণীর চোখের মধ্যে চিরস্থায়ী যে একটি বিষাদের ভাব নিবিড়তা [illegible], শরতের [illegible] যেমন মেঘাবরণ অপসারিত [illegible] গগনের প্রশান্ত নির্মলতা [illegible] দেয়, তেমনি [illegible] সেই বিষাদের যবনিকা [illegible] মুহূর্তের জন্য [illegible]। [illegible] মধ্যে টানিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া [illegible] এক [illegible] ও তাহা খুলিবার [illegible] দিলেন।

* * * *

এমনি করিয়া রবির দিনগুলি [illegible] আনন্দের উজ্জ্বল হইয়া [illegible] আসিল। প্রতিদিন সকা[illegible] রবি ব্যাকুল [illegible] থাকে—সময়ের অনেক [illegible]

...যে, সে

... এই রকম বাড়ী।

... খোলা জমি, অন্ত

... ; দিনের বেলাও

... । এইখানে তাহারা

সে কত আবোল তাবোল

... প্রশ্ন করে, রমণী আগ্রহের

... কথাটি শ্রবণ করেন, প্রত্যেক

... ম প্রথম তিনি ভাল খেলিতে

থাকিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন।

জলে ভরিয়া আসিত, ফুল তুলিবার

... র জন্য রবিকে দূরে পাঠাইয়া দিতেন।

... য়া দেখিত, চোখে ধুলা পড়ায় তিনি

... তেছেন—তাঁহার চোখ দুইটা খুব লাল

...।

... ম এ ভাবটাও কমিয়া আসিল। ক্রমে তিনি

বেশ খেলিতে পারিতেন। যে দিন আকাশে ... দেখা দিত, তিনি রবিকে লইয়া বাগানের ভিতরে যে ... খানা বড় ঘর ছিল, সেই খানে গিয়া তাহাকে বই পড়িয়া ছোট ছোট গল্প শুনাইতেন। সেখানে সে প্রায়ই ... ভাল ভাল ... পাইতে পাইত। ইহাতে সে আপত্তি করিত, "এখানে খাবার খেলে পেট ভরে যাবে, মামী ... আমার জন্যে খাবার করে রাখ্‌বেন যে!" কিন্তু ... ইঁহাকেও দুঃখিত করিতে পারিত না, তাহার স্নেহতৃষ্ণাতু... হৃদয় স্নেহ পাইয়া আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি দিনে দিনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সুগভীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রমণী ... কথা ঠিক বলিতে পারা যায় না—কিন্তু তাঁহার দেহে ... মুখে সুদীর্ঘ বর্ষা ঋতুর অবসানে শরতের যেমন একটি উজ্জ্বল সরস মধুরতা দেখা যায়, তেমন একটা পরিবর্ত্তিত ভাব যেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

প্রবাসে

[শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী]

অতীত যুগের কথা গৌরব কাহিনী
ফল্গুর মতন এবে অন্তর বাহিনী ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে শুষ্ক বালুকায়
ঢাকা আজি, পরশিলে উৎস খুলি যায়!
... তের কারা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
উলটি ... টি চিত্ত ... পাশে
ছুটিয়া চলেছে, পথ ... বিরহীন, ...
... তে কেহ ... দিন
... আপনি
হারায়ে ... কিছু নাহি গণি!
এই ... অগস্ত্যের শাপে
... রয়েছে বিলাপে!
... রণ
... যোগে নিমগন!
... পবিত্রতায়
... পার্ব্বতী-সহায়!

কতদূর দূরান্তর হইতে মানবে
আসে যায় নিত্য নিত্য, জীবন আহবে
চিরশান্তি সফলতা করিয়া সঞ্চয়,
জন্মজন্মান্তর পাপ করিবারে ক্ষয়।
সেই সব নিরখিয়া শুধু পড়ে মনে
বহুদিন বহু ক্লেশ সহি প্রাণপণে
আসিয়াছিলেন যাঁরা তীর্থ-দরশন
করিবারে, আমাদের পূর্ব্ব গুরুজন ;
স্মরণে উঠিছে জাগি তাঁহাদের বাণী
নয়নে ঝরিছে অশ্রু বাধা নাহি মানি!
অসীম অনন্ত ধূলি দেবতার দ্বারে
পূর্ব্ব পিতৃমাতৃগণ তাহারি মাঝারে
পদরেণু রেখেছেন আমার লাগিয়া,
পথে ঘাটে, পান্থশালে একেলা জাগিয়া,
রহিয়াছি, সেই পুণ্য-পরশের তরে,
ধন্য হইবার আশে আজ শিরে ধ'রে!